প্রবাসী—১৩৩৭, বৈশাখ হইতে আশ্বিন

৩০শ ভাগ প্রথম খণ্ড

বিষয় সূচী

চিত্র-সূচী

চিত্র সূচী

লেখকগণ ও তাঁহাদের রচনা

হলায়ুধ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
১ম খণ্ড

বৈশাখ, ১৩৩৭

১ম সংখ্যা

আওরংজীবের জীবন-নাট্য

স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই

সম্রাট আওরংজীবের জীবনী ষাট বৎসর ধরিয়া ভারতের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। তিনি পিতার অধীনে বিশ বৎসর নানা প্রদেশে শাসনকর্ত্তার, নানা যুদ্ধে সেনানায়কের কাজ করেন; ইহার মধ্যে প্রথম দশ বৎসরে তেমন কিছু বড় ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু শেষের দশ বৎসর এবং নিজের পঞ্চাশ বর্ষব্যাপী রাজত্বকাল এত গুরুত্বপূর্ণ যে, তাহাতে ভারতের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত হয়, মুঘল-সাম্রাজ্যের ভাগ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন আনয়ন করে।

বাদশা আওরংজীবের অধীনে মুঘল-সাম্রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দূর বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে ঘাজনী হইতে পূর্ব্বপ্রান্তে চাটগাঁ পর্য্যন্ত, উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে কর্ণাটক (কাবেরী নদী) পর্য্যন্ত,—সমস্ত ভারতের তিনি একচ্ছত্র অধীশ্বর। তাহা ছাড়া, সুদূর লডক্ ("ছোট তিব্বত") এবং মালাবার (ভারতবর্ষের দক্ষিণ কোণ) তাঁহাকে চক্রবর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করে, তাঁহার মুদ্রা সেখানেও ছাপা হয়। এই যুগেই—ভারতীয় ইস্‌লাম অন্তিম রাজ্যবিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে ভারতের এতখানি আর কোন সম্রাটের অধীনে একতার সূত্রে গাঁথা হয় নাই। অথচ, এই সাম্রাজ্য যে শুধু আকারে অতুলনীয় ছিল তাহাই নহে, ইহার প্রদেশগুলি বাদশাহের নিজ কর্ম্মচারীরা, তাঁহারই হুকুম লইয়া একই শাসন-পদ্ধতি অনুসারে শাসন করিত; গোটাকতক ছোট ছোট করদ রাজ্যে মাত্র সামন্ত-রাজারা দণ্ড চালাইতেন। এই কারণে অশোক, সমুদ্রগুপ্ত এবং হর্ষবর্দ্ধনের সাম্রাজ্য আওরংজীবের সাম্রাজ্যের তুলনায় ছোট।

কিন্তু যে বাদশাহের সময়ে দেশীয় ভারতে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের এই পূর্ণ বিকাশ হয়, ঠিক তাঁহারই জীবদ্দশায় উহার ভাঙ্গন এবং পতনের প্রথম চিহ্নও প্রকাশ পায়। আওরংজীবের অনেক পরে নাদির শাহ অথবা আহমদ শাহ আবদালী দিল্লী অধিকার করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দেন যে, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" অসহায় পুত্তলিকামাত্র, মুঘল-সাম্রাজ্যের বাহিরের চমক তাহার ভিতরের অসারতা

আর লুকাইতে পারে না। তাঁহার অনেক পরে মারাঠারা বিভিন্ন প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া প্রায় সমগ্র মুঘল-সাম্রাজ্যের ন্যায্য রাজশক্তিকে ছাইয়া ফেলিয়া পিষিয়া মারে। পতনের এই সব জাজ্বল্যমান প্রমাণ যখন দেখা দেয় নাই, অর্থাৎ আওরংজীব চক্ষু বুজিবার পূর্ব্বেই, মুঘল-রাজশক্তি দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছে; ভাণ্ডারে টাকা নাই, বাহিরে খ্যাতি নাই, শাসকগণ অক্ষম হতভম্ব, সৈন্যগণ পরাজিত; এত বড় সাম্রাজ্য আর একত্র বাঁধিয়া রাখা অসম্ভব; একথা বিজ্ঞ লোকেরা তখনই বুঝিতে পারিলেন।

আওরংজীবের রাজত্বকালেই মারাঠা জাতি নিজশক্তি দেখাইয়া স্বাধীনভাবে খাড়া হইল; শিখগণ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের রূপ ছাড়িয়া সৈনিক দলে গঠিত হইয়া দেশের রাজার বিরুদ্ধে লড়িতে লাগিল। অর্থাৎ, অষ্টাদশ শতাব্দী এবং মধ্য-উনবিংশ শতাব্দীতে যে দুই দেশীয় শক্তি ভারত-ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে প্রধান নেতা হইবার চেষ্টা করে, তাহারা এই যুগেই প্রথম দেখা দিয়াছিল।

এই যুগেই "মুঘলের অর্দ্ধশশী" বাড়িয়া বাড়িয়া পূর্ণকলার চরমে পৌছে,আবার এই রাজার অধীনেই তাহা ক্ষয় হইতে আরম্ভ করে। এই রাজত্বকালেই ভারতের ভাবী ভাগ্য-বিধাতারা প্রথম এদেশে স্থায়িভাবে আড্ডা গাড়েন; জীর্ণ পীত অস্তাচলগামী মুঘলচন্দ্রের বিপরীত দিকে ভারত-গগনে ব্রিটিশের অরুণ-রাগ অতি সূক্ষ্ম ক্ষীণ রেখায় দেখা দেয়। বম্বে মান্দ্রাজ এবং কলিকাতা এই যুগে ব্রিটিশের হাতে আসে এবং প্রধান কুঠী (প্রেসিডেন্সী) ও দুর্গে পরিণত হয়। দেশীয় রাজাদের পক্ষে তাহা দখল করা অসম্ভব হয়। এই কুঠীর বেষ্টনীর মধ্যে যে দেশী লোকদের শাসন ও দেশী রাজাদের সহিত দৌত্যের কাজে বিদেশী বণিকগুলি এই সময় হাতেখড়ি আরম্ভ করেন, তাহাই কালক্রমে বিশাল ব্রিটিশ ভারতীয় শাসনযন্ত্রে পরিণত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুঘল-সাম্রাজ্য প্রকৃতই ঘুন-ধরা, অন্তঃসারশূন্য জীবনহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ধনবল জনবল লোপ পাইয়াছে, রাজ্যের অঙ্গগুলি পৃথক হইয়া খসিয়া পড়িতে উদ্যত। আর, নৈতিক অবনতিও ততোধিক; প্রজারা আর রাজাকে ভয়ভক্তি করে না, রাজকর্ম্মচারীরা ভীরু ও চোর, মন্ত্রীবর্গ ও রাজকুমারগণের কাহারও ধীরবুদ্ধি চরিত্র বা কার্য্যকুশলতা নাই, সেনাগণ হীনবল হতাশ।

কেন এমন হইল? সম্রাট নিজে ত একজন মহাপুরুষ, তাঁহার কোন নেশা, অলসতা বা নির্ব্বুদ্ধিতা ছিল না। আওরংজীবের বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি সারা মুসলমান-এসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; অপর লোক যেরূপ আগ্রহে বিলাসভোগে লাগিয়া যায়, তিনি সেইরূপ আগ্রহে সেইরূপ উৎসাহে শাসনকার্য্যে নিজের সমস্ত সময়, সমস্ত মন ঢালিয়া দিয়াছিলেন। কোন নিম্নতন কেরাণীও দিনের পর দিন এই বাদশাহের অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিত না। আওরংজীবের চরিত্রে অসীম সহিষ্ণুতা, একনিষ্ঠতা, শৃঙ্খলা ও নিয়ম রক্ষা করিবার আগ্রহ ছিল। যুদ্ধে এবং দ্রুত কুচ করিতে শত শত কষ্ট ও অভাব তিনি সাধারণ সৈন্যের মত অম্লানবদনে সহ্য করিতেন। তাঁহার হৃদয় ভয়ে দমিত হইত না, দুর্ব্বলতা বা দয়া তাঁহাকে গলাইতে পারিত না। প্রাচীন সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া তিনি সমস্ত হিতোপদেশ এবং রাজনীতিশাস্ত্র কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। সিংহাসনে বসিবার পূর্ব্বে জীবনের অনেক বৎসর ধরিয়া দেশশাসন ও সৈন্যচালনে গভীর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

অথচ এরূপ বিচক্ষণ সচ্চরিত্র এবং সজাগ সদা-শ্রমী রাজার পঞ্চাশ বৎসর রাজত্বের শেষ ফল কিনা তাঁহার রাজ্যের পতন এবং দেশময় গণ্ডগোল! এই আশ্চর্য্য সমস্যা পূরণ করিতে হইলে আওরংজীবের রাজ্যকালের বিস্তৃত ইতিহাস চর্চ্চা করা আবশ্যক।

প্রাচীন গ্রীকসাহিত্যের ট্রাজেডী, অর্থাৎ বিয়োগান্ত নাটকগুলি জগতময় বিখ্যাত। তাহাদের গঠন-প্রণালী যেমন নিপুণ, তাহাদের নৈতিক শিক্ষাও তেমনি উচ্চ। সেগুলি দর্শকের হৃদয় "সহানুভূতি ও ভয় সঞ্চার করিয়া পবিত্র করে।" তাহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়, ভাগ্যের বিরুদ্ধে মানুষের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধশেষে কঠোর অদৃষ্টের হাতে পুরুষকারের পরাজয়। আওরংজীবের জীবন এইরূপ ট্রাজেডীর একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত; মহাসাধু ও সজ্জন, বুদ্ধিমান

ও শ্রমী বাদশাহের পঞ্চাশ বৎসর শাসনের ফল কি না অতুলনীয় বিফলতা। ট্রাজেডীর অঙ্কগুলির মত আওরংজীবের জীবন পদে পদে ঠিক সেই অন্তিম ফলের দিকে অনিবার্য্য গতিতে অগ্রসর হইয়াছিল।

আওরংজীবের জীবন-নাটকের প্রথম অঙ্ক তাঁহার জন্ম হইতে ৪০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত, অর্থাৎ পিতা শাহজাহানের রাজত্বকাল। এটিকে উদ্যোগপর্ব্ব বলা যাইতে পারে, কারণ এই সময়ে নানা প্রদেশে সুবাদারি ও নানা যুদ্ধে সেনাপতিত্ব করিয়া রাজকুমার হাত পাকাইয়া লন এবং ভবিষ্যতে সাম্রাজ্য শাসনকার্য্যের জন্য নিজকে সম্পূর্ণ-রূপে প্রস্তুত করিয়া তোলেন। দ্বিতীয় অঙ্ককে যুদ্ধপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। এটি পিতৃসিংহাসন লইয়া চারি ভ্রাতার মধ্যে দুই বর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৬৫৮—১৬৫৯) ; ইহার ফলে আওরংজীবের চারিটি মহাযুদ্ধে জয় এবং দিল্লীর ময়ূর-সিংহাসন লাভ।

তাহার পর বাইশ বৎসর ধরিয়া তাঁহার উত্তর-ভারতে স্থিরভাবে বাস এবং রাজ্যশাসন। এই সময়ে সীমান্তে ও রাজপুতানায় যুদ্ধ বাধিলেও তাহার অবসান হয় এবং দেশের মধ্যে তেমন বড় কোন বিদ্রোহ হয় নাই। সুতরাং ইহাকে শান্তিপর্ব্ব বলা যাইতে পারে। আওরংজীবের জীবনের তৃতীয় অঙ্কে তাঁহার সমস্ত শত্রু পরাজিত, তাঁহার রাজশক্তির প্রভাব মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত প্রখর; তাঁহার রাজকোষ ধনে পূর্ণ, দেশময় শান্তি ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি; যেন তিনি সৌভাগ্য ও গৌরবের চূড়ায় পৌছিয়াছেন।

কিন্তু ট্রাজেডীর নিয়ম অনুসারে চতুর্থ অঙ্কে পতনের সূত্রপাত; এ ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটে। এই জীবন-নাটকের তৃতীয় অঙ্কের শেষ বৎসরে (১৬৮১ সালে) আওরংজীবের বুকের ভিতর হইতে এক শত্রু বাহির হইয়া তাঁহার সুখ-সম্পদ নষ্ট করিল;—শাহজাহানের বিদ্রোহী পুত্র আর নিষ্কণ্টকে সিংহাসন ভোগ করিতে পারিলেন না, কারণ আজ তাঁহার নিজেরই প্রিয়তম পুত্র (মুহম্মদ আকবর) তাঁহার বিপক্ষে বিদ্রোহী হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, পিতাকে সরাইয়া ময়ূর-সিংহাসন দখল করিতে চেষ্টা করিল (জানুয়ারি ১৬৮১)। যুদ্ধে পরাস্ত পলাতক শাহজাদা আকবর মারাঠা-রাজ শম্ভুজীর নিকটে গিয়া আশ্রয় লইলেন (জুন ১৬৮১) ; তাঁহাকে দমন করিবার জন্য আওরংজীব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন (সেপ্টেম্বর),—জীবনে আর দিল্লীতে ফিরিলেন না, দাক্ষিণাত্যে ছাব্বিশ বৎসর কাটাইয়া সেখানেই প্রাণ-ত্যাগ করিলেন, তাঁহার দেহ পর্য্যন্ত সেখানেই রহিল, উত্তর-ভারতে আসিল না।

বাদশাহের এই ছাব্বিশ বৎসর-ব্যাপী বিপুল অক্লান্ত চেষ্টা অবশেষে নিষ্ফল হইল বটে, কিন্তু প্রথম প্রথম কেহই তাহা বুঝিতে পারে নাই; তাঁহার দাক্ষিণাত্যে যাইবার পর প্রথম সাত বৎসর বোধ হইল যেন চারিদিকেই তাঁহার জয়জয়কার। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য অধিকার করিলেন (১৬৮৬ এবং ১৬৮৭) ; শম্ভুজীকে ধরিয়া বধ করিলেন (১৬৮৯), শম্ভুজীর স্ত্রী পুত্র এবং রাজধানী তাঁহার হাতে পড়িল। আর বাকী কি? তিনি ত সফলতার চরমে পৌছিয়াছেন, তাঁহার ভাগ্য সর্ব্বত্র ফলিয়াছে না কি? ইহাই চতুর্থ অঙ্কের বিষয় (১৬৮১-১৬৮৯)।

কিন্তু যে-বিষবৃক্ষ তাঁহার জীবনের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্কে বপন করা হইয়াছিল, এই চতুর্থ অঙ্কের শেষে তাহার অঙ্কুর দেখা দিল। পঞ্চম অঙ্কে এই বিষবৃক্ষ বাড়িয়া তাঁহার শরীরের সমস্ত শক্তি, জীবনের অবশিষ্ট আয়ু নিঃশেষ করিল, তাঁহার পিতৃপিতামহের সাম্রাজ্য ধ্বংস করিল (১৬৮৯—১৭০৭)।

অতএব দেখা যাইতেছে, আওরংজীবের জীবন-নাটকের ট্রাজেডী তাঁহার রাজত্বের এই শেষ আঠার বৎসরে ঘনীভূত, প্রকট হইয়াছিল। বিজাপুর-গোলকুণ্ডা-রায়গড় জয়ের চমক ক্রমে কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে সকলেই বুঝিতে পারিল যে এই সংগ্রামে বাদশাহের জয় অসম্ভব, মুঘল-সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন অনিবার্য্য, তাঁহার সমস্ত শক্তি সমস্ত পুরুষকার বিফল হইবে। কিন্তু তবুও আওরংজীব নিজে পরাজয় স্বীকার করিবেন না, আশা ছাড়িবেন না, জীবনের শেষ পর্য্যন্ত কঠোর সাধন দৃঢ় আদর্শ পালন করিবেন-ই। এক নীতি নিষ্ফল হইলে তিনি অপর নীতি চালাইয়া দেখিলেন; একদিকে দুর্ল্লঙ্ঘ্য বাধা পাইলে অপর দিকে ছুটিলেন, তাঁহার

সেনাপতিরা বিফল হইয়া ফিরিয়া আসিল, তখন তিনি স্বয়ং সেই সৈন্যদলের ভার লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন। এইরূপে ক্লান্তিজয়ী হতাশাজয়ী বিরাশী বৎসরের বৃদ্ধ আরও ছয় বৎসর ধরিয়া ঘরবাড়ী শহর ত্যাগ করিয়া তাঁবুতে থাকিয়া সৈন্যদের সঙ্গে সঙ্গে কুচ করিয়া, মহারাষ্ট্রের কত কঠোর নদী পর্ব্বত জঙ্গল পার হইতে লাগিলেন, কত গিরিদুর্গ অবরোধ করিয়া জয় করিলেন। অবশেষে কৃষ্ণা নদীর তীরে দেবাপুরে এই অষ্টাশী বৎসরের বৃদ্ধ-দেহ এমন কাতর হইল যে, সমস্ত মুঘলরাজ্য আশা ছাড়িয়া দিল (১৭০৫), বাদশাহ বুঝিলেন যে, ইহাই মৃত্যুর প্রথম আহ্বান। তখন অতিকষ্টে আহমদ-নগরে পৌঁছিয়া, আর চলিতে পারিলেন না, বলিলেন— "আহমদনগর আমার ভ্রমণের শেষস্থান বলিয়া লেখ।" তাহাই হইল, এই শহরে ১৭০৭ সালের প্রথম ভাগে তাঁহার সুদীর্ঘ অতুলনীয়-কার্য্যবহুল জীবনের উপর যবনিকা পড়িল।

ভারত-ভাগ্য

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রাজনীতি যদি ইংরাজি পলিটিক্স শব্দের প্রকৃত প্রতিশব্দ হয় তাহা হইলে ভারতবাসীর পক্ষে রাজনৈতিক আলোচনা অসম্ভব, কারণ ভারতবাসী রাজার জাতি নয়। রাজ্যরক্ষার জন্য, রাজায় রাজায় প্রীতিস্থাপন বা যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্য রাজনীতির প্রয়োজন। যে জাতি পরের অধীন, যাহার সঙ্গে রাজ্যচালনার কোন সম্বন্ধ নাই, সে জাতি রাজনীতির কি ধার ধারে? য়ুরোপে সকল জাতি স্বাধীন, তাহারা রাজনীতি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে পারে। ভারতবাসী কোন স্বাধীন জাতির সমকক্ষ নয়, তাহার আবার পলিটিক্স কি? যেদিন ভারতবাসী অপর জাতির সহিত একাসনের অধিকারী হইবে সেই দিন হইতে তাহার রাজনীতির আরম্ভ। এখন যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় সেই আসন পাইবার চেষ্টা মাত্র। আমাদের পক্ষে রাজনীতির কূট জটিলতা শিখিবার এখনও বিলম্ব আছে।

কথার হিসাবে আমরা অনেকটা অগ্রসর হইয়াছি। ডোমিনিয়ন ষ্টেটস্ (এ সব কথার বাংলা তর্জ্জমা না করাই ভাল, কেননা তাহা হইলেই রাজনীতির মতন একটা খিচুড়ী পাকাইবে) পাকা কাঁঠালের তুল্য মনে হয়, হাত বাড়াইয়া পাড়িয়া লইলেই হইল। কাঁঠাল ভাঙিবার আশায় অনেকে গোঁফে তেল দিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু কাঁঠালটা যে ইচড় আর চিরকাল অপক্ক থাকিবার সম্ভাবনা সে হুঁশ অল্প লোকেরই আছে। পক্ষান্তরে, লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণস্বরাজ অর্থাৎ সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ডুগডুগি বাজাইলেই কেল্লা ফতে হয় না, আর চক্ষু বুজিলেই মুক্তি লাভ হয় না।

বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। যে সামগ্রী যেমন দুষ্প্রাপ্য তাহার মূল্য তত বেশী। সিদ্ধি চাও ত সাধনা চাই, বর চাও ত তপস্যা চাই। যাহা আমরা চাই তাহা হারাইয়াছি অনেক কাল, এখন হাত পাতিলেই পাওয়া যাইবে না। দেখিলে মনে হয় আমাদের অনেক দিকে উন্নতি হইয়াছে। কাউন্সিল বড় হইয়াছে, দেশী লোক মন্ত্রী ও শাসন-সভার সভ্য হইয়াছে, দু-একজন দেশী গবর্ণরও হইয়াছেন। মূলে কিছুই হয় নাই, যেমন ছিল তেমনি আছে। যদি কখন অন্য অবস্থা হয় তাহা হইলে দেশের লোকের চেষ্টায় হইবে, কোন কমিশনের রিপোর্টে কিংবা কোন নূতন আইনে হইবে না। গোল টেবিলে আর গোলোক ধাঁধায় যে বিশেষ প্রভেদ নাই, কিছু দিনের পরে তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

দুই একটা কথা মোটামুটি বুঝাই। গবর্মেণ্টের

বিরুদ্ধে কি অনুযোগ? বিদেশী গবর্মেণ্ট হইলে নানা দোষ হইতে পারে, সে কথা বার বার বলিলে কি কোন লাভ আছে? স্বদেশী গবর্মেণ্ট হইলেই যে নিষ্কলঙ্ক হয় তাহাও নয়। চীনের, রুশিয়ার, জার্ম্মানির, তুর্কির সম্রাটেরা কোথায় গেল? স্বরাজ হইলেই রামরাজ্য হয় না। আবার প্রজার মঙ্গলের জন্য যে দেশসুদ্ধ লোককে বিদ্রোহী হইতে হইবে এমনও কোন কথা নাই। ইংরাজ জাতির স্বাধীনতার প্রধান পাটা ম্যাগনা চার্টা; সেজন্য যুদ্ধও হয় নাই, বিদ্রোহও হয় নাই। কয়েক জন প্রধান ব্যক্তি মিলিত হইয়া জন্ রাজাকে দিয়া স্বাক্ষর করাইয়া লইয়াছিলেন।

কন্‌গ্রেসের সূত্রপাত হইতে বহু বৎসর ধরিয়া বক্তৃতা হইত। বৎসরের শেষে তিন দিন জাতীয় সভার অধিবেশন, তিন দিন অজস্র বক্তৃতা, তাহার পরে সকলে নিজের নিজের ঘরে ফিরিয়া যাইত। সংবাদ-পত্রে লেখালেখি হইত তাহাও অনেকটা অরণ্যে রোদনের ন্যায়। যখন একটু বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল অমনি ১২৪ক ধারা অনুসারে অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি হইতে আরম্ভ হইল। যাঁহাদের রাজ্য তাঁহাদেরই আইন, সেই আইনের অনুযায়ী বিচার। আর এক আইনে বিচারেরও প্রয়োজন হয় না, ধরিয়া আটক করিয়া রাখিলেই হইল।

যাঁহারা গোড়াগুড়ি কন্‌গ্রেসে ভিড়িয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলেন বেগতিক। তাঁহাদের স্বদেশপ্রেম বক্তৃতার ফোয়ারা দিয়া বাহির হইত, ধরপাকড়ের সমারোহ দেখিয়া তাঁহারা মানে মানে পাশ কাটাইলেন। পেট্রিয়টিজ্‌ম্ যে সখের যাত্রার অপেক্ষা কখনও গুরুতর ব্যাপার হইতে পারে ইহা তাঁহারা স্বপ্নেও অনুমান করিতে পারিতেন না। বড়দিনের অবকাশের সময় তাঁহারা রেলের টিকিট কিনিয়া কন্‌গ্রেস-সভায় উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিতেন। তাঁহাদের স্বার্থত্যাগের সীমা এই পর্য্যন্ত। ইহার অধিক আর কিছু করিতে তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না।

দেশহিতব্রত যে কিরূপ কঠোর সাধনা মহাত্মা গাঁধি সে শিক্ষার প্রথম আভাস দিলেন। তিনি দেখাইলেন যে, দেশের মঙ্গলকামনায় সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে। সম্পদ, মান, জীবনের স্বচ্ছন্দতা সব ঠেলিয়া ফেলিতে হইবে, কারাবাসে ভীত হইলে চলিবে না। সর্ব্বস্ব পণ করিলে তবেই দেশের, জাতির কল্যাণ সাধিত হইবে। পতিতকে উদ্ধার করিতে হইবে, অস্পৃশ্য ঘৃণিত জাতিকে বর্ণাশ্রমে স্থান দিতে হইবে। ইংরাজি ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ স্বামী লাহোরে আমার গৃহে অবস্থান-কালে আমাকে বলিয়াছিলেন, ভারতের মুক্তি উচ্চ-শ্রেণীর লোক দ্বারা কখন সাধিত হইবে না। বিবেকানন্দ মহাপুরুষ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী এখন সফল হইতেছে। তিনি বলিতেন, সঙ্গতিপন্ন অথবা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের দ্বারা আর কোন বড় কাজ হইবে না। তাহাদের দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা হইয়া গিয়াছে। সমাজে এখন যাহারা স্থান পায় না, আমরা নীচশ্রেণী বলিয়া যাহাদিগকে ঘৃণা করি তাহারাই জাগিয়া উঠিবে, দেশে নবযুগের অবতারণা তাহারাই করিবে। ঘটিয়াছেও তাহাই। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় এখন দেশের কি করে? মহাত্মা গাঁধি জাতিতে বণিক, পঞ্জাবকেশরী লাজপত রায়ও বণিক-জাতীয় ছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের তুল্য তেজস্বিতা কোন্ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের দেখিতে পাওয়া যায়?

জলিয়নওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গাঁধি যে ননকোঅপারেশনের সূত্রপাত করেন তাহা ইঙ্গিত মাত্র। অতি অল্পসংখ্যক লোকই তাহাতে যোগ দিয়াছিল, কিন্তু সেই ইঙ্গিতে সিংহাসন টলিয়াছিল, রাজা-মহারাজার আহার-নিদ্রা ঘুচিয়া গিয়াছিল। কথাটা বদখত লম্বা, কিন্তু স্বয়ং যীশুখৃষ্ট ননকোঅপরেটর-দিগের শীর্ষস্থানীয়। পন্টিয়স পাইলেটের নিকটে যখন তাঁহার বিচার আরম্ভ হইল সে সময় তিনি উকীল কউন্সিলী ডাকিলেন না, আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করিলেন না। তিনি যে একেবারে নিরপরাধী সে কথা পর্য্যন্ত বলিলেন না। ইংরাজদিগের প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থে, খ্রীশুখৃষ্টের নিজের জীবনে ননকোঅপরেশনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বাইবেল হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি—

"And Jesus stood before the governor : and the governor asked him, saying, Art thou the king of the Jews ? And Jesus said unto him, thou sayest.

And when he was accused of the chief priests and elders, he answered nothing.

Then said Pilate unto him, Hearest thou not how many things they witness against thee ?

And he answered him to never a word ; insomuch that the governor marvelled greatly."

[ইতিমধ্যে যীশুকে দেশাধ্যক্ষের সম্মুখে দাঁড় করান হইল। দেশাধ্যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি যিহুদীদের রাজা ? যীশু তাঁহাকে কহিলেন, তুমিই বলিলে।

আর যখন প্রধান যাজকেরা ও প্রাচীনবর্গ তাঁহার উপর দোষারোপ করিতেছিল, তিনি কিছুই উত্তর করিলেন না।

তখন পীলাত তাঁহাকে কহিলেন, তুমি কি শুনিতেছ না, উহারা তোমার বিপক্ষে কত বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে ?

তিনি তাঁহাকে এক কথারও উত্তর দিলেন না ; ইহাতে দেশাধ্যক্ষ অতিশয় আশ্চর্য্যজ্ঞান করিলেন।]

বিচারের সহিত যীশুখৃষ্ট কোন সংস্রব রাখিলেন না। ইহাই ননকোঅপারেশন।

মহাত্মা গাঁধির দেশহিতব্রত তপস্যার নামান্তর মাত্র। জগতে সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়াছে যে, তাঁহার তুল্য মহচ্চরিত্রবান ব্যক্তি পৃথিবীতে বিরল। পাশ্চাত্য জগতেই তাঁহাকে যীশুখৃষ্টের সহিত উপমিত করা হইয়াছে। ননকোঅপরেশন কাহাকে বলে ফরাসী বিপ্লবের পূর্ব্বে কাউণ্ট মিরাবো তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সেই প্রসিদ্ধ বাগ্মী বলিয়াছিলেন যে, রাজ্য পরিচালন রহিত করিবার জন্য প্রজাকে অস্ত্র ধারণ করিতে হয় না, প্রজা হাত গুটাইয়া দাঁড়াইলেই বন্ধ ঘড়ীর মতন রাজকার্য্য অচল হইয়া উঠিবে। মহাত্মা গাঁধিও বলপ্রকাশের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাজকার্য্যে সহযোগিতা নিবারণই তাঁহার একমাত্র অমোঘ বল।

অনেকে বলেন কেবল খদ্দর প্রচার করিলে দেশের কল্যাণ হইবে না। হইবে কি না তাহা নিরূপণ করিবার সময় উপস্থিত হয় নাই। যদি দেশের লোক সকলে বিদেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া খদ্দর ব্যবহার করে, সকলেই যদি খাদীর গান্ধীর টুপি মাথায় দেয়, তাহা হইলে আর কিছু না হউক দেশের লোকের একতা সূচিত হইবে। সেটা কি সামান্য লাভ ?

গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিবার পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে হইবে দেশে একতা আছে কি না। ম্যাগনা চার্টার উল্লেখ করিয়াছি। যে সময় কয়েকজন লোক রাজা জনকে স্বাক্ষর করিতে বলে সেই সময় যদি আর একদল লোক উপস্থিত হইয়া বলিত, ম্যাগনা চার্টায় আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা যে অবস্থায় আছি সেইরূপ থাকিব, তাহা হইলে কি রাজা স্বাক্ষর করিতেন ?

কাউন্সিলে এসেম্ব্লিতে নানা রকম দল। স্বরাজী, লিবরাল, ন্যাশনালিষ্ট আরও কত দল। কেন ? ইংলণ্ডে সচরাচর দুই দল দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের সংখ্যা বেশী তাহারাই সাম্রাজ্য শাসন করে। এখন তিন দল হইয়া বড় গোল বাধিয়াছে, সম্ভবতঃ কিছুদিন পরে আবার দুই দল হইয়া যাইবে। এখানে দলের সৃষ্টি ইংলণ্ডের অনুকরণ, তা ছাড়া দলাদলি ত চিরকাল আছেই, নহিলে বিদেশী রাজার সুবিধা হইবে কেন ? অনুকরণ করিলেই কিছু বাড়াবাড়ি হয়, সেইজন্য দুই দলের পরিবর্ত্তে এখানে পাঁচটা দল হইয়াছে। কোন দল কি রাজ্যশাসনের ভার পাইবার আশা করে ? প্রথমে প্রজাতন্ত্র হউক, দেশ শাসনের ভার দেশের লোকের হাতে আসুক তখন না হয় ভিন্ন ভিন্ন দল হইবে, কিন্তু এখন এরূপ মতভেদে কি ফল ? একে ত আমরা দুর্ব্বল তাহাতে এরূপ পাঁচ সাত দল হইলে দুর্ব্বলতা আরও বাড়িয়া যায়।

দেশের মতিগতি কোন্ দিকে তাহার লক্ষণ চারিদিকে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। রাজদ্বারে প্রবেশ-পথ অবারিত থাকিবে, রাজদরবারে সম্মান হইবে, উপাধি লাভ হইবে, প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিব, এদিকে পেট্রিয়ট বলিয়া গলাবাজি করিয়া গগন ফাটাইব, সে কৌশল এখন আর চলে না। এইজন্য কলিকাতায় ও বোম্বেতে লিবরাল দল প্রকাশ্য সভা করিতে পারেন না। একজন বাঙালী বড় কর্ম্মচারী কলিকাতায় হিন্দু মুসলমানদের বিবাদ মিটাইতে গিয়াছিলেন; তাঁহাকে হাস্যাস্পদ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। আর একজন বেঙ্গল কাউন্সিলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাঁহার ভোটসংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল যে তাঁহার জমা টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। আগে কন্‌গ্রেসের সভাপতিরা

হাইকোর্টের জজ, কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইতেন। এখন তাঁহাদিগকে জেলে যাইতে হয়। মহাত্মা গাঁধি, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, পণ্ডিত জওয়াহর লাল নেহেরু সকলেই জেলে বাস করিয়াছেন। তাহাতে কি তাঁহাদের কলঙ্ক হইয়াছে, না গৌরব আরও বাড়িয়াছে? যাঁহারা দেশ-সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহারা জেলে যাইতে ভয় পান না, দেশের লোকের চক্ষে তাঁহাদের সম্মান হ্রাস হয় না। এখন দেশের লোকের মনের যে অবস্থা তাহাতে ত্যাগস্বীকার না করিলে, সকল রকম শাস্তি ও লাঞ্ছনার জন্য প্রস্তুত না থাকিলে কেহ লোকনেতা হইতে পারে না। যেমন যেমন দেশোন্নতির বাসনা প্রবল হইবে সেইরূপ সকল প্রকার নিগ্রহ সহ্য করিতে হইবে।

জাতির বল একতায়। যাঁহারা শ্যাম ও কুল দুই রাখিতে চান, একদিকে গবর্মেণ্টের মন রাখেন অপর দিকে পেট্রিয়ট বলিয়া পরিচয় দেন তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দিতেছি। এই শ্রেণীর লোক না থাকিলে দেশের মঙ্গল আরও দ্রুত সাধিত হইত। ইঁহারাই দেশের অধঃপতনের প্রধান কারণ, উন্নতির পথে ইঁহারাই কণ্টক। কিন্তু যাঁহারা যথার্থ দেশভক্ত, যাঁহারা দেশসেবায় ত্যাগ-স্বীকার করিয়াছেন ও ক্লেশ সহ্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বিবাদ হইলে নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। বঙ্গদেশেই ইহার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্র-মোহন সেন গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু উভয়েই যথাসাধ্য দেশের কাজ করিতেছেন। যতীন্দ্রবাবু সম্প্রতি কারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন, সুভাষবাবু এখনও কারাগারে। ইঁহাদের দুই দলের মধ্যে এরূপ বিরোধের কারণ কি? বাংলার কন্‌গ্রেস কমিটী কোন্ দলের হাতে থাকিবে ইহা লইয়াই বিবাদ। কেন? কন্‌গ্রেসের হাতে রাজ্যভার নাই, কোন ক্ষমতাও নাই। কন্‌গ্রেস জাতীয় একতা সাধন করিতে নিরত। কন্‌গ্রেসের কাজ উদ্যোগ সাধনা, দেশের লোককে ত্যাগ শিক্ষা দেওয়া, মনের বল কিসে বাড়িবে তাহার উপায় দেখা। সে কাজ কমিটিতে থাকিলেও হয়, না থাকিলেও হয়। কিন্তু আত্মবিরোধ হইলে যে সকল কাজ পণ্ড হইবে তাহা কি কেহ ভাবিয়া দেখেন না? গবর্মেণ্টের কৃপায় এ বিরোধ ঘুচিয়া যাইবে এমন আশা করা যাইতে পারে। ভারতের কলঙ্কমোচনের চেষ্টা সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, ইহারই মধ্যে নিজেদের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে সকল নষ্ট হইবে, শত্রু হাসিবে। আত্মসংযম আত্মশাসন না শিখিলে আমরা স্বায়ত্তশাসন লইয়া কি করিব?

আমাদের মুক্তিপথ আমরাই রোধ করিয়াছি। জাতি যদি একমত হয়, বিবাদ-বিসম্বাদ ছাড়িয়া সকলে এক উদ্যমে যোগ দেয় তাহা হইলে সকল বাধাবিঘ্ন ভাগীরথীর স্রোতের মুখে ঐরাবতের তুল্য ভাসিয়া যায়। যুক্তবেণী না হইয়া বহুমুখী স্রোত হইলে উপলখণ্ডও সরাইবার শক্তি থাকে না।

ভারতের ভাগ্য ভারতবাসীর চেষ্টা ও সাধনাসাপেক্ষ। কন্‌গ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম সাহেব একটি কবিতায় লিখিয়াছিলেন, Nations by themselves are made. ইহাই নিত্য সত্য। যেদিন ভারতবাসী মুক্তির নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইবে সেইদিনই ভাগ্যবিধাতা প্রসন্ন হইবেন।

মতিলাল

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

পাঠক! একবার মনশ্চক্ষু উন্মীলন করুন। কল্পনা-নেত্রে দেখুন আজিকার এই প্রাসাদ-কণ্টকিত কলকাতা শহরের বুকে, প্রায় সদর রাস্তার ওপরেই একখানা খোলা মাঠ। মাঠখানা রাস্তা থেকে দেখা যায় না। চার পাশে গোটকয়েক বড় বড় বাড়ী তাকে যেন ধনীদের শ্যেনচক্ষুর দৃষ্টি থেকে আগলে রেখেছে। রাস্তা থেকে বোঝাই যায় না যে, এখানে এত বড় একটা মাঠ একেবারে মাঠে মারা যাচ্ছে। মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চার পাশে চাইলে মনে হবে বড় বড় বাড়ীর মাঠমুখো জানলাগুলো যেন অবাক হ'য়ে এই খোলা জায়গাটুকুর শ্যামল সৌভাগ্যের দিকে চেয়ে আছে।

এই ময়দানটি ছিল আমাদের ছেলেবেলার লীলা-ভূমি। আমরা প্রায় গুটি-কুড়িক ছেলে প্রতিদিন এখানে খেলতে আসতুম—শহরের নানা দিক থেকে।

মাঠের একদিকে প্রকাণ্ড প্রাসাদের মতন একখানা বাড়ী। এই বাড়ীর একটি ছেলে ছিল আমাদের বন্ধু। তাদেরই ছিল এই মাঠ। একদিন বিকেলে, আমরা তখন খেলায় উন্মত্ত, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে কান্নার রোল উঠ্‌ল। আমরা খেলা ফেলে ছুটে বাড়ীর মধ্যে ঢুকলুম। বন্ধু বল্‌লে, দেনার দায়ে তাদের সমস্ত সম্পত্তি আট্‌কা পড়েছে। তার পরে প্রতিদিন পাওনাদারেরা এসে ঝাড়, লণ্ঠন, খাট, পালং বের কোরে নিয়ে যেতে লাগ্‌ল। সবার শেষে একদিন তারা কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ী ছেড়ে দিয়ে চলে গেল পশ্চিমের কোন্ এক শহরে। কিন্তু যাক, সে আর এক কথা—

হাইকোর্টে মামলা চলতে লাগল বছরের পর বছর ধরে, আর আমরা একদল লক্ষ্মীছাড়া ছেলে সেই বিরাট প্রাসাদ ও তারই সংলগ্ন এই মাঠখানা নিরুপদ্রবে ভোগ করতে লাগলুম।

বিকেলে স্কুলের ছুটির পর মাঠে ফুটবল খেলা সুরু হোতো। আমাদের মধ্যে দুটি দল ছিল। একদল ছিল খেলোয়াড়, আর একদল ছিল গাইয়ে-বাজিয়ে। গাইয়ে-বাজিয়ের দল খেলার সময় এক দিককার গোল-পোষ্টের কাছে বসে থাক্‌ত। খেলা শেষ হ'য়ে গেলে তাদের মধ্যে একজন বলটিকে কোলে নিয়ে বাজাতে বস্‌ত আর গান সুরু হোতো। খেলোয়াড়ের দল তখন গাইয়ে-বাজিয়েদের ঘিরে গোল হ'য়ে বস্‌ত। দু-দলই ছিল দু-দলের গুণের কদরদান আর দু-দলের মধ্যে যোগসূত্র ছিল পাঁচ নম্বরের একটি ফুটবল। যেটি ছিঁড়ে গেলে কিংবা যার ভেতরকার হাওয়া কমে গেলে দু-দলেরই ফুর্ত্তি হোতো—একদম্ মাটি।

মতিলাল ছিল শেষের দলের অর্থাৎ গাইয়ে-বাজিয়ে দলের লোক। কিন্তু মাঠের সভার রীতিমত সভ্য হ'য়েও আমাদের ধরণ-ধারণের সঙ্গে তার চাল-চলনের ঠিক মিল ছিল না। তার কথাবার্ত্তা, হালচাল সব কিছুর মধ্যেই পাকা সংসারীর একটা ছাপ ফুটে উঠ্‌ত। সে ছিল, যাকে সোজা কথায় বলে কাজের লোক। আমরা ছিলুম লেখাপড়ায় একেবারে সেরা ছেলে। প্রত্যেক পরীক্ষায় কে কত নীচে থাক্‌তে পারে আমাদের মধ্যে প্রতি বৎসর তারই প্রতিযোগিতা চল্‌ত। ছুটি জিনিষটিকে বরাবর আমরা ছুটি বলেই মান্য করতুম। কিন্তু মতিলাল ছিল ঠিক তার উল্টো। লেখাপড়ায় সে ভাল ছেলে না হ'লেও ভাল হবার চেষ্টা সে করত। একমাত্র সরস্বতী পূজোর দিন ছাড়া বছরের প্রতিদিন নিয়ম ক'রে রুটিন-মত সে পড়াশুনা করত। ইংরেজী শেখবার প্রতি তার ছিল অসাধারণ ঝোঁক। তার বাবা ও ঠাকুরদাদা দুজনেই ছিলেন ডেপুটি। সে বল্‌ত যে, তার জন্যেও হাকিমের চেয়ার খালি পড়ে রয়েছে—বি-এ পাশ ক'রে এখন গুটি গুটি সেখানে গিয়ে বসতে পারলে হয়।

মতিলাল মাঠে আস্‌ত একেবারে সন্ধ্যা ঘেঁষে। স্কুলের ছুটির পর প্রত্যহ সে গড়ের মাঠের দিকে যেত। প্রতিদিন

নিয়ম ক'রে এই বায়ু সেবন করতে যাবার স্পৃহা যে বায়ু রোগেরই একটি বিশেষ লক্ষণ—এ কথা উল্লেখ করলে মতিলাল বল্‌ত—গড়ের মাঠের দিকে কি হাওয়া খেতে যাই রে! ওদিকে মেম-সাহেবদের পেছু-পেছু ঘুরলে অনেক ভাল ভাল Idioms and Phrases শিখতে পারা যায়।

সাহেব-মেমেরা যে কি অযাচিতভাবে মুক্তকণ্ঠে Idioms ও Phrases ছড়াতে-ছড়াতে পথে বিচরণ করে,মধ্যে মধ্যে মতিলালের মুখে তারই দু-একটা উদাহরণ শুনে আমাদের মনে হোতো ইংরেজী ভাষাটা আমাদের আর শেখা হ'ল না। কারণ তা শিখতে যা অধ্যবসায়ের প্রয়োজন তা একমাত্র মতিলালেরই আছে এবং তার জন্য অনুপ্রেরণা আস্‌ছে ভবিষ্যতের সেই হাকিমী-পদ থেকে—যে অনুপ্রেরণা আমাদের মধ্যে কারুরই ছিল না।

মতিলালের দেশ ছিল পূর্ব্ববঙ্গে। কিন্তু পিতা ও পিতামহের সঙ্গে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের জেলায়-জেলায় ছেলেবেলা থেকে ঘুরে তার পূর্ব্বত্বটুকু সম্পূর্ণরূপে খসে গিয়েছিল। কথাবার্ত্তা বল্‌ত সে পরিষ্কার, আর তার কণ্ঠটি ছিল মন-মাতানো। তা ছাড়া গানের সংগ্রহও ছিল তার বিস্তর। সে-সব গান তখনও কারুর মুখে শুনতে পেতুম না—এখনও পাই না।

পাঠক, দৃষ্টি আর একটু প্রসারিত করুন। মাঠের আর এক কোণে কতকগুলো ভাঙা ঘর। এক সময়ে বোধ হয় সেখানে গোয়াল ছিল। এখানটায় রীতিমত জঙ্গল। মানুষ-ভর উঁচু উঁচু বুনো কচুগাছ হঠাৎ-বড়লোকের মত অত্যন্ত কদর্য্যভাবে নিজেদের সমারোহ জাহির করতে ব্যস্ত। এদের মাঝে পাঁচ-ছটা উঁচু নারকোল গাছ মাথার ওপরে চিরশ্যাম ডালি নিয়ে দিনরাত তাদের ঝর্ঝর রাগিণীতে বোধ হয় সেই বাড়ীরই পুরোণো গাথা গেয়ে যেত।

মাঝে-মাঝে সন্ধ্যার পরে এই জঙ্গলটার ঠিক পেছন দিকে চাঁদ উঁকি দিত। জঙ্গলের পরেই ছিল একখানা বাড়ী। এই বাড়ীর একটা আল্‌সে-বিহীন খোলা ছাত মাঠের দিকে বার করা ছিল। যেন দেওয়ালের কঠোর আলিঙ্গন থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাড়ীরই খানিকটা মাঠের দিকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে।

নারকোল গাছগুলোর পেছন থেকে চাঁদ উঁকি দেওয়ার কিছু পরেই সেই খোলা ছাতে এসে দাঁড়াত একখানি চাঁদমুখ। এরা ছিল যেন দুই সখী। চাঁদের সাড়া পেলে চাঁদমুখ আর কিছুতেই ঘরে থাক্‌তে পার্‌ত না।

সে ছিল তরুণী। উজ্জ্বল গৌর ছিল তার দেহের বর্ণ। কিছুক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে সে আকুল ভাবে মাঠের দিকে চাইত। মাঠের মধ্যে কি যে ছিল তার ধ্যানের বস্তু, কে যে তার কামনার ধন তা আমরা কেউ জানতুম না। জানবার চেষ্টাও কোনো দিন করি-নি। অনেকক্ষণ সেইভাবে চেয়ে থেকে আস্তে-আস্তে আবার সে ঘরে ফিরে যেত।

যেদিন এই ব্যাপার হোতো, সেদিন আর আমাদের গান মোটেই জম্‌ত না। তরুণী ছাতের ধারে এসে দাঁড়ানোর সঙ্গে-সঙ্গে নির্ম্মলের হাতে ফুটবলের ওপর তবলার বোল তার অজ্ঞাতেই থেমে যেত। মতিলালের কণ্ঠ ধীরে-ধীরে কখন যে বাতাসে মিলিয়ে যেত তা আমরা বুঝতেই পারতুম না। আমরা অনিমেষ নয়নে সেই তরুণীর দিকে চেয়ে থাকতুম। তার পরে ধীরে-ধীরে যখন তার মূর্ত্তি ছাতের এক কোণে মিলিয়ে যেত তখন আমাদের মনের পটে ফুটে উঠ্‌ত এক একটি ভাব-মূর্ত্তি, আর উঠ্‌ত ছোট্ট সেই সভাতলে দীর্ঘশ্বাসের ঝড়। এর পরে কথা কি গান কিছুই জম্‌বে না বুঝেই আমরা যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হতুম।

কৈশোরের কল্পনা-সাগরে আমাদের জীবন-তরণী যখন এইভাবে টলমল করছে তখন চাঁদ এসে ধরলে তার হাল আর লক্ষ্য হ'ল চাঁদমুখ। চাঁদের সঙ্গে তার সঙ্গিনীর দলও এল। চিত্রা আসতে লাগ্‌ল তার বিচিত্র রূপ ধরে, শ্রবণা এল নৃত্যের তালে দ্যুলোকে ভূলোকে মাদল বাজিয়ে, ভদ্রা তার বিরহের গাথা অশ্রুধারে ঢেলে দিতে লাগ্‌ল। স্বাতী, রাধা আর অনুরাধা খেলতে লাগ্‌ল লুকোচুরি আর সবার শেষে ফল্গু যেত হৃদয়-দোলায় দোল দিয়ে। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় গেল পড়াশুনো আর কোথায় গেল কি! বাইরের

সংসারটা হয়ে পড়্‌ল একটা অত্যন্ত অনাবশ্যক ও অবান্তর জিনিষ। নিজের মনের মধ্যে একটা বিরাট কল্পনার রাজ্য তৈরি ক'রে তারই সিংহাসনে মশ্‌গুল হয়ে বসে রইলুম। আমাদের হালচাল দেখে প্রতিবেশীদের রসনা হয়ে উঠ্‌ল সংবাদপত্রের চাইতেও তীক্ষ্ণ, আর অভিভাবকদের নির্যাতন করবার শক্তি দেখে জেলের কর্তৃপক্ষও হোতো লজ্জিত। কিন্তু আমাদের সে-সব দিকে ভ্রূক্ষেপও ছিল না। আমরাও বলতুম, হে ভগবান এরা যে কি করছে তা এরা বুঝতে পারছে না—তুমি এদের মার্জ্জনা কোরো।

একদিন—সেদিন এই চাঁদ আর ছাতের কোণের সেই চাঁদমুখ অনেকক্ষণ ধরে আমাদের মনের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা ঝড় তুলে সবেমাত্র অস্ত গিয়েছে। এমন সময় নির্ম্মল বললে যে, একটি মেয়েকে সে ভালবাসে ।মেয়েটির বাড়ী তার মামার বাড়ীর পাশেই। মামাদের সঙ্গে তাদের খুব ভাব। সেইখানেই সেই কিশোরীর সঙ্গে তার প্রথম পরিচয়। কিন্তু পরিচয় এখন দু-পক্ষ থেকেই গভীর প্রেমে পরিণত হয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে মিলনের কোনো সম্ভাবনা নেই। কারণ মেয়েটির না-কি কোন্ এক জমিদারের ছেলের সঙ্গে বিয়ের একেবারে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

নির্ম্মলের এই কাহিনীটি যে ডাহা মিথ্যে কথা তা বুঝতে আমাদের কারুরই বাকী রইল না, কিন্তু কারুর মুখ দিয়েই তার একটিপ্রতিবাদ বেরুলো না, কারণ ঘটনাটি মিথ্যা হলেও সেই ইতিহাসের মধ্যে এমন একটা শাশ্বত সত্য ছিল যা সমস্ত অসত্যকে ছাপিয়ে একটি অখণ্ড সত্যের মূর্ত্তিতে আমাদের কাছে প্রতিভাত হ'ল।

নির্ম্মলের কাহিনী শেষ হোতে-না-হোতে—আমাদের দীর্ঘনিঃশ্বাসগুলো পড়বার আগেই সত্যকুমার তার নিজের জীবনের একটা প্রেম-কাহিনীর বর্ণনা করলে। সত্যর পর বিমল—এমনি করে আবহাওয়াটা এমনি সংক্রামক হয়ে উঠ্‌ল যে, আমিও কল্পনা থেকে নিজের জীবনের অমনি একটা কাহিনী তৈরি কোরে বলে দিলুম।

সকলেই নিজের-নিজের কাহিনী বল্‌লে বটে, কিন্তু মতিলাল কেবল দীর্ঘনিঃশ্বাসই ফেললে—বললে না কিছুই। তাকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে আমাদের মনে হ'ল যে, তারও নিশ্চয়ই একটা প্রেম-কাহিনী আছে। শুধু আছে নয়, তার মূলে কিছু সত্য আছে বলেই সেটা সে প্রকাশ করতে চায় না। আমরা তাকে চেপে ধরলুম—বলতেই হবে।

মতিলালও কিছুতেই বল্‌বে না। আপত্তি তার যতই দৃঢ় হোতে থাকে আমাদের সন্দেহও ততই ঘনীভূত হয়। শেষকালে অনেক বলা-কওয়ার পরে অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে সে প্রকাশ করলে যে, তাদের বাড়ীর দোতলার ছাতের গায়েই আর একজনদের ছাত একেবারে লাগানো। এই বাড়ীরই একটি মেয়ের সঙ্গে তার খুব ভাব হয়েছে। তাকে সে ভালবেসেছে, প্রতিদানও পেয়েছে। তাকে সে বিয়ে করবেই—এতে যা হয় হবে।

মতিলালের কাহিনীটি সংক্ষিপ্ত বটে, কিন্তু আমরা সকলেই মনে-মনে স্বীকার করলুম যে, এর মধ্যে মিথ্যার আমেজ একটুকুও নেই। চাঁদ ও চাঁদমুখ মতিলালের মত ছেলের মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে জেনে মনে হোতে লাগ্‌ল যেন সে আমাদের খুব কাছে এসে পড়েছে। মনে আছে তার পরদিন থেকে সে গড়ের মাঠে Idioms ও Phrases শিখতে যাওয়া বন্ধ রেখে তাড়াতাড়ি মাঠে আস্‌তে আরম্ভ করলে। আর চাঁদমুখের চর্চ্চা করবার জন্য গানের পরে আরও আধঘণ্টা আড্ডার সময় বাড়িয়ে দেওয়া হ'ল।

এই রকম কিছুদিন যায়। দিনকয়েক মতিলালের দেখা নেই। তার বাড়ী কেউ চেনে না, কাজেই খোঁজ পাবারও উপায় নেই। ইতিমধ্যে একদিন সে আমাদের কাছে খুব গোপনে প্রকাশ করেছিল যে, তাদের মিলনের পথে দু-একজন লোক বাধা দেবার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও জানিয়ে রেখেছিল যে, তাকে না পেলে সে আত্মহত্যা করবে।

মতিলালের অদর্শনে আমরা উদ্বিগ্ন হ'য়ে দিন কাটাচ্ছি এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, তার সাংঘাতিক অসুখ, বুঝি এ যাত্রা আর বাঁচে না।

মতিলালের অসুখের খবরটা যে কেমন ক'রে কোথা দিয়ে এসে পৌছল তা মনে নেই। খোঁজ পড়ল তার

বাড়ী কোথায়! কিন্তু কেউ-ই তার বাড়ী চেনে না। ঠিক হ'ল তার স্কুলে গিয়ে বাড়ীর ঠিকানাটা জেনে আসা হবে। সে আবার পড়্ত এক অদ্ভুত ইস্কুলে। স্কুলটির নাম ছিল সর্ব্বমঙ্গলা ইন্‌ষ্টিটিউশ্যন। তার বাবার একজন চেনা লোক সেই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, সেই সুবাদে মতিলালকে সেখানে ভর্ত্তি হোতে হয়েছিল। স্কুলটি ছিল নির্ম্মলের বাড়ীর কাছেই। নির্ম্মল বললে যে, কাল সেখানে গিয়ে সে মতিলালের ঠিকানা জেনে আস্‌বে।

পরদিন নির্ম্মল মতিলালের ঠিকানা জেনে নিয়ে এল। আমরা জন-চার পাঁচ খেলা ফেলে মতিলালের বাড়ীর উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লুম।

গলির গলি তস্য গলি ঘুরে-ঘুরে প্রায় সন্ধ্যার সময় আমরা তার বাড়ী আবিষ্কার করলুম।

হরি! হরি! এই বাড়ীতে মতিলাল থাকে! সে একটা খোলার বাড়ী। পঞ্চাশ রকমের লোক হরদম্ বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ছে আর বেরুচ্ছে। যাকেই মতিলালের কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সেই বলে জানি না। নির্ম্মল নিশ্চয় ভুল ঠিকানা এনেছে সাব্যস্ত ক'রে আমরা ফির্‌ব-ফির্‌ব মনে করছি এমন সময় একটি লোককে ওষুধের শিশি হাতে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌তে দেখে জিজ্ঞাসা করা গেল—হ্যা মশায়, মতিলাল থাকে এই বাড়ীতে?

সন্ধান পাওয়া গেল। এই বাসাতেই মতিলাল থাকে বটে। লোকটি আমাদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢুক্‌ল। কতকগুলো এঁদো-পচা নর্দ্দমা ও আঁস্তাকুড় পেরিয়ে একটা নীচু ঘরে গিয়ে আমরা ঢুকলুম। ঘরের এক কোণে খাটে একটা স্যাঁৎসেঁতে বিছানায় মতিলাল পড়ে আছে। খাটের কাছে দু-তিনজন লোক মাটিতে বসে গল্প করছে। এক কোণে মাটির পিলসুজের ওপরে প্রদীপ জল্‌ছে। আমরা গিয়ে খাটের ওপরে বসতেই মতিলাল অদ্ভুত একরকম দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চাইতে লাগ্‌ল। জিজ্ঞাসা করলুম—মতিলাল কেমন আছিস্ ভাই?

মতিলাল চীৎকার ক'রে উঠ্‌ল—হামারা সর্ব্বাঙ্গমে বেশ করুকে গঙ্গামৃত্তিকা আর তুলসীপাতা বাট্‌কে লেপ্‌কে লেপ্‌কে দেও—জল্ যাতা হায়।

মতিলালের মুখে এই রকম হিন্দী কথা শুনে তো আমরা কজনেই হেসে ফেললুম। কিন্তু সে আবার তখুনি চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—কেয়া! হামারা দুর্দ্দশা দেখ্‌কে তোম্‌লোক্ হাস্‌তা হায়? নির্দ্দয় কাঁহাকা—

হাসি মিলিয়ে গিয়ে চোখ অশ্রুতে ভরে উঠ্‌ল। মতিলালের দিকে চেয়ে দেখি তার চোখে আর সেই অদ্ভুত দৃষ্টি নেই—চাহনি বেশ স্বাভাবিক। অতি ক্ষীণস্বরে একবার সে বলে উঠল—Oh how helpless!

কথাগুলো বলেই সে চোখ বুজিয়ে ফেললে।

রোগ কিংবা রোগী সম্বন্ধে আমাদের কারুরই কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু তবুও মনে হ'ল যে, মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। সেখানে যে লোকগুলি বসেছিল তাদের জিজ্ঞাসা করা হ'ল—মতিলালের বাড়ীতে অসুখের খবর দেওয়া হয়েছে কি?

তারা বললে—না এখনো জানানো হয়নি, বিকারটা তো আজ দুপুর থেকে সুরু হ'ল কিনা—

তাদের কাছ থেকে মতিলালের বাবার ঠিকানা জেনে নিয়ে তখুনি তাঁকে তার ক'রে দিলুম—তার পাওয়া মাত্র চলে আসবেন—মতিলালের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।

পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে মতিলালের এক দূরসম্পর্কের কাকা কলকাতায় থাকেন এবং মতিলাল তাঁরই তত্ত্বাবধানে থাকে।

যা হোক, সেদিন তার ক'রে রাত্রে বাড়ী ফেরা হ'ল। পরদিন বিকেলবেলা গিয়ে দেখি মতিলালের বাবা এসে পড়েছেন, খুব ধুম ক'রে চিকিৎসা সুরু হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের দেখে ভারি খুশী হলেন। আমাদের খেলার মাঠের কাছেই একখানা বাড়ী ভাড়া ছিল। সেই বাড়ীটা ঠিক ক'রে মতিলালকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তার মা ও অন্য ভাইবোনেরা দু-এক দিনের মধ্যেই এসে পড়লেন। আমরা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় গিয়ে তাকে দেখে আসতে লাগলুম।

মতিলালের সে-যাত্রা পরমায়ু ছিল। দেড়মাস রোগ-যন্ত্রণা ভোগ ক'রে সে আরোগ্যের পথে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। তার বাবা ফিরে গেলেন বিহারের সেই

শহরে—কর্ম্মস্থলে। মা ও অন্য ভাইবোনেরা কলকাতাতেই রয়ে গেলেন। ঠিক হ'ল যে, এবার থেকে তাঁরা কলকাতাতেই থাকবেন। স্কুলের গ্রীষ্মের ছুটির সময় মতিলালরা যাবে বাবার কাছে, আর পূজো ও বড়দিনের ছুটির সময় বাবা আসবেন তাদের কাছে।

মতিলাল সেরে উঠে আবার স্কুলে যেতে আরম্ভ করলে। কিছুদিনের মধ্যেই আড্ডায় নিয়মিত হাজিরাও পড়তে লাগ্‌ল। কিন্তু ছাতের কোণে সেই চাঁদমুখের উদয় হ'লেই সে আর বস্‌ত না, কোনো রকম ছুতো ক'রে পালিয়ে যেত। চাঁদমুখ দেখে সরে পড়বার কারণটা আমাদের কাছে যতই সে ঘুরিয়ে বলুক না কেন, আমরা ঠিক বুঝতে পারতুম, চন্দ্রবদনের প্রতি তার আকস্মিক এই যে বিতৃষ্ণা এর মূলে আছে দোতালার ছাতের সেই প্রেমকাহিনী। আমরা সভায় নিজেদের যে প্রেমকাহিনীর বর্ণনা করেছিলুম তার মধ্যে অন্ততঃ বাড়ীঘরগুলো ছিল সত্যি, কিন্তু মতিলাল অতখানি গৌরচন্দ্রিকার পর এমন একটি গল্প ছাড়লে যে তার মধ্যে সত্যের রেশটুকু পর্য্যন্ত নেই। খোলার বাড়ীর দোতালার ছাতের কথা নিয়ে তার অসাক্ষাতে আমাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে খুব হাসির ধূম পড়ে যেত। হয়ত মতিলালের কানে কোনো সূত্রে কিছু পৌচেছিল। তাই সে ইদানীং চাঁদের সঙ্গে চাঁদমুখের উদয় দেখলেই পালিয়ে যেত।

কিন্তু একদিন সত্যই বাঘ এল। মতিলালের বাবা বিহারের যে শহরে তখন হাকিমী করছিলেন সেই শহরের একজন উকীল ছিলেন তাঁর বিশেষ বন্ধু। উকীল বন্ধুটির দু-তিন পুরুষ ধরে এখানে বাস। তাঁর বাবা ও ঠাকুর-দাদা সে অঞ্চলে বেশ বিষয়-আশয়ও ক'রে গিয়েছেন। তাঁদেরই একখানা বাড়ী ভাড়া নিয়ে মতিলালেরা সেখানে থাকৃত। বাড়ীর পাশে বাড়ী হওয়ায় দুই পরিবারের মধ্যে সদ্ভাবও ছিল খুব। জগবন্ধু বাবুর স্ত্রী কিছুদিন থেকে নানা রকম অসুখে ভুগছিলেন। সেখানকার ডাক্তার-কবিরাজেরা কিছু করতে না পারায় তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসবার কথা চলছিল। জগবন্ধু মতিলালকে লিখলেন একটা বাড়ী ভাড়া করবার কথা। বাড়ীর জন্য বেশী কষ্ট পেতে হ'ল না। তাদের বাড়ীর পাশেই একখানা বাড়ী খালি ছিল। সেই বাড়ীখানা জগবন্ধু-বাবুদের জন্য ঠিক করা হ'ল।

জগবন্ধু বাবুর পরিবার খুব বড় নয়। তাঁর বৃদ্ধা মা পুত্রবধূর সঙ্গে এলেন, আর এল মুমূর্ষু মায়ের সেবার জন্য কৃষ্ণা একাদশীর অস্তমান চন্দ্রের পাশে শুক্লা চতুর্দ্দশীর পূর্ণশশীর মতন তাঁর একমাত্র বিধবা মেয়ে হিমানী।

জগবন্ধু বাবুর স্ত্রীকে মতিলাল মাসীমা বলে ডাকৃত। যেদিন তাঁরা এসে পৌছলেন সেদিন থেকে মতিলালের আর বিশ্রাম নেই। এই ডাক্তারের বাড়ী ছোটা, এই ডাক্তারখানায় যাওয়া, ঝি-চাকরের ব্যবস্থা করা, বাজার করা, রোগীর সেবা করা—একাই সে একশো হয়ে উঠ্‌ল।

আমরা তাদের বাড়ীতে গেলে মতিলালের মা হিমানীর মার উদ্দেশ্যে বলতেন—গেল-জন্মে মতিলাল বোধ হয় ওরই ছেলে ছিল। ছেলেটা এই সেদিন ব্যারাম থেকে উঠেছে, আবার না পড়্‌লে বাঁচি।

মতিলালের সঙ্গে-সঙ্গে হিমানীদের বাড়ীতে আমাদের গতিও অবারিত হয়ে উঠ্‌ল। হিমানীর বাবার অগাধ কাজ। তাই তিনি সব সময়ে রুগ্না স্ত্রীর কাছে থাকতে পারতেন না। দশ-পনেরো দিন অন্তর শনিবার দেখে তিনি কলকাতায় আসতেন আর রবিবার সন্ধ্যার সময় ফিরে যেতেন।

মাস-কয়েক ধরে ডাক্তার, কবিরাজ, অবধূত ক'রে কিছুতেই হিমানীর মার অসুখ সারূল না। এতদিন তবুও তিনি উঠতে-হাঁটতে পারছিলেন, কোথাকার এক দিগ্‌গজ কবিরাজ এসে দুটি-তিনটি গুলির আঘাতে ভদ্রমহিলাকে একেবারে বিছানায় পেড়ে ফেল্‌লে।

আবার ডাক্তারী সুরু হ'ল। পঞ্চাশ রকমের ওষুধ, মালিশ—ঘণ্টায় দু-তিনবার ক'রে। তার ওপরে পনেরো মিনিট অন্তর জ্বরের তাপ দেখা। খাতায় চৌকো ঘর কেটে তাতে জ্বরের নক্সা করা, ইত্যাদি ব্যাপারে কাজ বেড়ে গেল চারগুণ। আমি আর নির্ম্মল এসে হিমানী ও মতিলালকে সাহায্য করতে লাগলুম।

কিন্তু আমাদের সেবা ও ডাক্তারদের চিকিৎসা সমস্ত ব্যর্থ ক'রে দিয়ে হিমানীর মা স্থির মৃত্যুর পথে এগিয়ে চল্‌তে লাগলেন। ক্রমে তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হ'য়ে উঠ্‌ল।

সেদিন বোধ হয় পূর্ণিমা। সকাল থেকেই রোগিনীর অবস্থা খারাপ। ঠিক হ'ল যে, আমি আর নির্ম্মল রাত্রি একটা অবধি জাগ্‌ব তার পরে হিমানী ও মতিলাল বাকী রাতটুকু জাগ্‌বে। হিমানীর ঠাকুরমা রাত্রির পর রাত্রি পুত্রবধূর শিয়রে জেগে বসে থাকতেন, এতে তাঁর কোনো ক্লান্তি ছিল না। তবে তিনি ওষুধপত্র কিছু খাওয়াতে পারতেন না। পাছে ভুল ক'রে মালিশের ওষুধ খাইয়ে দেন এইজন্য আমাদের কারুকে থাকতেই হোতো।

সে রাত্রি আমি আর নির্ম্মল একটা অবধি জেগে মতিলালকে তুলে দিতে গিয়ে দেখি বিছানায় সে নেই। আমি আর নির্ম্মল শুতুম ছাতের ওপরে একটা ছোট্ট ঘরে। হাওয়া পাবার জন্য হয়ত সে আমাদের বিছানায় গিয়ে শুয়েছে মনে ক'রে ছাতে গিয়ে দেখি যে, এক কোণে মতিলাল ও হিমানী দাঁড়িয়ে আছে।

হিমানী কাঁদছিল। তার মা যে আর বেশী দিন নেই এ কথা বোধ হয় সে বুঝতে পেরেছিল। দেখলুম সে ঘাড় হেঁট ক'রে চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদছে আর মতিলাল্ গুন্ গুন্ ক'রে কি বলে তার মাথায় হাতে বুলিয়ে দিচ্ছে।

আমরা সিঁড়ির গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছি তা তাদের দু-জনের একজনও টের পায়নি। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটবার পর হিমানী সেই অশ্রুসিক্ত আঁচলখানা গলায় জড়িয়ে হাঁটু গেড়ে মতিলালকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল, আর মতিলাল হিমানীর মুখখানা তুলে ধরে তার অধরোষ্ঠে গভীর চুম্বনের দাগ এঁকে দিলে।

চাঁদের আলোতে মতিলালের মুখখানা ঝক্‌ঝক্ করছিল। তারই দেহের ছায়া হিমানীর মুখের ওপর পড়ায় তার মুখখানা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। অবর্ণনীয় সেই আলো ও আবছায়ার খেলা। দক্ষালয়ে যাবার আগে সতী যখন মহাদেবের পায়ে মাথা ঠেকিয়েছিলেন, অভিমান-অপগত প্রিয়তমার প্রসন্ন মুখ দেখে ভোলানাথ বোধ হয় এমনিই বিহ্বল হয়েছিলেন। মৃত্যু যে সাম্‌নে এসে দাঁড়িয়েছে সংহারের দেবতা মহেশ্বর সেদিন নিজেই তা দেখতে পান-নি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে মতিলাল আমাদের দেখতে পেয়ে হিমানীকে কি বললে। তার পরে আমাদের সঙ্গে কোনো কথা না বলেই তারা দুড়্ দুড়্ ক'রে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল।

পরদিন সকালবেলায় হিমানীর মা অচৈতন্য হ'য়ে পড়লেন। সমস্ত দিন তাঁর আর জ্ঞান ফিরে এল না। সন্ধ্যাবেলা আমি ও নির্ম্মল একবার বাড়ী ঘুরে এসে তাদের বাড়ীতেই শুয়ে রইলুম। সেদিন আর কারুর ব্যস্ততা বা রাত-জাগবার পালা নেই। রোগিনী সকলকেই অবসর দিয়েছেন। সকলেই শেষ মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করছে।

অনেক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙে যাওয়ায় রোগীর ঘরের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালুম। ঘরের এক কোণে একটি বাতি জ্বল্‌ছে। চারিদিক নিস্তব্ধ, নিঝুম। সেই নিষ্ঠুর নিস্তব্ধতার মধ্যে রোগিনীর অন্তিম নিঃশ্বাস—জীবনগাথার শেষ রাগিণী তালে-তালে ধ্বনিয়ে উঠ্‌ছে।

জানলায় মুখ দিয়ে ভেতরে দেখলুম, মুমূর্ষুর শিয়রে বসে আছেন হিমানীর বৃদ্ধা পিতামহী আর তাঁর দু-পায়ের দু-পাশে বসে হিমানী ও মতিলাল।

সেই দৃশ্য মনে পড়লে আজও আমার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই দৃশ্য দেখতে-দেখতে আমার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন রোগিনীর মাথার কাছে রুদ্র ভৈরব তার গৈরিক নিশান নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, আর পায়ের কাছে মন্মথ তার মকরকেতন ওড়াচ্ছে। সংহার ও সৃষ্টির দুই দেবতায় মিলে উৎসব ক'রে সেই পুণ্যবতীকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

আস্তে-আস্তে সেখান থেকে সরে এসে আবার বিছানায় শুয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে হিমানীর মা মারা গেলেন। দিন-দুয়েক পরে তার বাবা এসে তাদের নিয়ে চলে গেলেন।

সেবারে ছিল আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষা। দিন কয়েক বই নিয়ে বসা গেল। পরীক্ষার পর মতিলালেরা কলকাতার বাসা তুলে দিয়ে তার বাবার কর্ম্মস্থলে চলে গেল।

মাসকয়েক মতিলালের আর কোনো খবর পাইনি। পরীক্ষায় পাশ ক'রে আমরা কলেজে ঢুকলুম।

মতিলালও পাশ করলে, কিন্তু সে আর কলকাতায় ফিরে এল না। সেবার পূজোর ছুটির মধ্যে একদিন মতিলালের ছোট ভাই যতিলাল আমাদের বাড়ীতে এসে হাজির। যতিলাল বললে—মা তোমায় একবার ডেকেছেন—আজই যাবে।

খবর নিয়ে জানলুম যে, তারা কলকাতায় মাস-খানেকের জন্য একটা বাড়ী ভাড়া ক'রে আছে। এখানে এসেই আমাকে খবর দিয়েছে।

মাঠের আড্ডা তখনও পুরোদমে চলেছে। সেদিন আর মাঠে না গিয়ে মতিলালদের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হওয়া গেল। মতিলালের মা তো আমায় দেখেই কাঁদতে আরম্ভ ক'রে দিলেন। তাঁর চোখে জল দেখে আমি চম্‌কে উঠলুম—তবে কি মতিলাল নেই! তবুও জিজ্ঞাসা করলুম—মতিলাল কোথায়?

মা বললেন—আজ দু-মাস হ'ল সে কোথায় চলে গিয়েছে, সেই থেকে তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

কথাটা শুনে একেবারে দমে গেলুম। জিজ্ঞাসা করলুম—ঝগড়া-ঝাঁটি কিছু হয়েছিল নাকি?

তিনি বললেন—ঝগড়া হয়নি। সেই হিমানী ছুঁড়িকে তোমার মনে আছে? তাকে নিয়ে সে পালিয়েছে। তারা নিশ্চয় কলকাতাতেই কোনো জায়গায় আছে। তোমরা তাকে খুঁজে বের কর, বাবা। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে নিয়ে এস, তা না হ'লে আমি বাঁচ্‌ব না।

মতিলালের মার কাছ থেকে যতখানি সংবাদ সংগ্রহ করা গেল তার তাৎপর্য্য হচ্ছে এই যে, হিমানীর মার মৃত্যুর বোধ হয় মাস-দুয়েক পরেই তার বাবা আর একটি তরুণীর পাণিপীড়ন করেছেন। ইতিমধ্যে হিমানীর সঙ্গে কলকাতায় মতিলালের পত্র-ব্যবহার চলছিল। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ীতে যাবার কিছুদিন পরেই একদিন সকালবেলা দেখা গেল যে, মতিলাল ও হিমানী দু-জনেই অন্তর্দ্ধান করেছে।

তখুনি মাঠে গিয়ে সংবাদটা প্রচার করা গেল। তখন ফুটবল খেলা শেষ হ'য়ে গানের আসর বসেছে। মতিলালের কথা শুনে মাঠসুদ্ধ ছেলে চেঁচিয়ে উঠল—জয় মতিলালের জয়!

ঠিক হ'ল পরদিন থেকে তার খোঁজ সুরু হবে।

দিন-দশেক আতি-পাতি ক'রে খুঁজে মতিলালকে ঠিক ধরে ফেলা গেল। বেলেঘাটা অঞ্চলে একটা খোলার ঘর নিয়ে সে আর হিমানী বাস করছিল। হিমানীকে আমরা মতিলালের মতন নাম ধরেই ডাকতুম, কিন্তু এবার দেখার পরেই আমরা তাকে বৌদি বলে ডাকতে আরম্ভ করলুম। আমার মুখে বৌদি ডাক শুনে প্রথমে সে লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে-সঙ্কোচ কাটিয়ে হিমানী এমন ব্যবহার করতে লাগ্‌ল যেন এই ডাকেই সে চিরদিন অভ্যস্ত।

পরামর্শ সুরু হ'য়ে গেল। অবিশ্যি আমাদের এই পরামর্শ-সভায় হিমানীও এসে বস্‌ল। প্রথমেই উঠ্‌ল গ্রাসাচ্ছাদনের কথা। হিমানী ও মতিলালের কাছে যা ছিল তা রেল ও গাড়ীভাড়া তার ওপরে নতুন সংসার পাতা, দু-মাসের দু-টাকা ক'রে ঘরভাড়া আর খাওয়ায় প্রায় সব নিঃশেষ হ'য়ে এসেছিল। হিমানী হিসাব ক'রে বললে, মাসে দশটা টাকা হ'লে তাদের খাওয়া ও বাড়ী-ভাড়া চলে যেতে পারে। আমি আর নির্ম্মল দু-জনে এই দশ টাকার ভার নিলুম। কারণ মতিলাল বললে যে, বাড়ীতে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। হিমানীকে ফেলে সে কি ক'রে বাড়ী যাবে!

মনে হ'ল সত্যিই তো! হিমানীকে ফেলে মতিলাল কি করে বাড়ী যেতে পারে!

কয়েকদিন পরে মতিলালের মার সঙ্গে গিয়ে দেখা করলুম! ছেলেকে দেখবার আশায় তিনি দিন গুণ-ছিলেন। তাঁকে বললুম—আজ কলেজ থেকে বাড়ী ফেরবার সময় পথে মতিলালের সঙ্গে দেখা হ'য়ে গিয়েছিল।

মতিলালের মা যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। তিনি বললেন—তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলি নে—

বললুম—সে চেষ্টা অনেক করেছিলুম কিন্তু কিছুতেই সে এল না।

—কি বললে সে?

—সে বললে হিমানীকে ফেলে কি ক'রে আমি বাড়ী যাব! আমার সঙ্গে যদি তাকেও তাঁরা স্থান দেন তা হ'লে যেতে পারি।

আমার কথা শুনে তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠ্‌ল। রুদ্ধকণ্ঠে তিনি বললেন—তা কি ক'রে হবে বাবা! তোমরা তো লেখাপড়া শিখেচ—বুদ্ধি-বিবেচনাও আছে। গেরস্তর সংসারে হিমানীকে কি ক'রে ঠাঁই দিই—

মতিলালের মার পরে আরও অনেকের মার মুখেই এ রকম কথা শুনেছি বটে, কিন্তু কেন যে গেরস্তর সংসারে তাদের স্থান হোতে পারে না তা তখনও বুঝতে পারিনি, আজও বুঝতে পারি না।

তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে বসে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—হতভাগা কোথায় আছে?

বললুম অনেক চেষ্টা ক'রেও তার ঠিকানাটা বার করতে পারলুম না। সে বললে—কলেজে গিয়ে এক সময় তোর সঙ্গে দেখা করব।

—সেই ছুঁড়িটা সঙ্গে আছে তো?

কথাটা শুনে ভারি হাসি পেল। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ঘাড় নেড়ে জানালুম—হ্যাঁ আছে।

—একবার তাকে কোনো রকমে আমার কাছে ধরে নিয়ে আস্‌তে পারিস্‌?

—চেষ্টা ক'রে দেখব—বলে সেদিন তাঁর কাছে বিদায় নেওয়া গেল।

পরদিন বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে আবার আমাদের পরামর্শ-সভা বস্‌ল। হিমানীকে ফেলে মতিলালের একলা বাড়ীতে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। অনিশ্চিত অদৃষ্ট-সাগরে তারই মুখ চেয়ে যে ভেলা ভাসিয়েছে, তাকে ফেলে কেমন ক'রে সে ঘরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে ফিরে যাবে!

একদিন মতিলালের মাকে বলে ফেলা গেল—আচ্ছা, হিমানীকে স্থান দিতে আপনাদের আপত্তি কি?

কথাটা শুনে তিনি অদ্ভুত এক রকমের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। সে দৃষ্টির অর্থ—ও তোমরাও বুঝি ঐ দলের?

কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—হিমানী কি সম্পর্কে আমাদের এখানে থাকবে? সে যদি মতিলালের সঙ্গে না গিয়ে অন্য কারুর সঙ্গে যেত তা হ'লেও নয় কথা ছিল। আমার এখনও একটি ছেলেমেয়েরও বিয়ে হয়নি।

আবার কিছুক্ষণ পরে একটু শ্লেষের সঙ্গে বললেন—হিমানীর নিজের বাড়ীতেই কি তার আর স্থান হবে? তোমরা তো তার শুভার্থী, একবার চেষ্টা ক'রে দেখ না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা এই কথা শুনে হিমানী বললে—আমাকে বাড়ীতে ফিরিয়ে নিলেও আমি যাব না।

মতিলাল বললে—তোরা আর মার কাছে যাস্‌ নে।

আমরা মতিলালের মার সঙ্গে দেখা করা বন্ধ ক'রে দিলুম। পূজোর পরে কলেজ খুললে একদিন খোঁজ নিয়ে জানতে পারলুম যে, তাঁরা কলকাতা থেকে চলে গিয়েছেন।

মতিলাল দিব্যি সংসার করতে লাগ্‌ল। সে সমস্ত দিন চাকরীর সন্ধানে ঘোরে। সন্ধ্যের সময় মাঠে এসে জোটে। সন্ধ্যের পরে আমি আর নির্ম্মল তার সঙ্গে বেলেঘাটার সেই প্রাসাদে গিয়ে ঘণ্টাখানেক গল্প-গুজব ক'রে ফিরে আসি।

এমনি কিছুদিন যায়। মতিলাল ইতিমধ্যে একটি ছেলে-পড়ানোর কাজ জুটিয়েছিল। মাস-দুয়েক পরে সে কাজটা আবার চলে গেল। পাচ টাকা ক'রে দু-মাসের মাইনেতে তাদের জোড়া-দুয়েক কাপড় হ'ল, তা ছাড়া আমাকে ও নির্ম্মলকে একদিন হিমানী নেমন্তন্ন ক'রে মাংস রেঁধে খাওয়ালে।

বছরখানেক এইভাবে কাটবার পর একদিন বিকেলে মতিলাল বললে—ওহে, বেড়ে একটা মতলব ঠাওরানো গিয়েছে।

মতিলালেরা যে জায়গাটায় থাকৃত তার চারিদিকে ছিল ব্যবসাদার, আড়তদারদের বাস। এদের কারও কারও সঙ্গে তার খাতিরও জমেছিল। মধ্যে-মধ্যে দু-একজনের খাতা লিখে, ইংরেজীতে চিঠি লিখে সে টাকাটা-সিকিটা উপায়ও করত। মতলব ঠাওরানোর কথা শুনে আমরা মনে করলুম তার মাথায় বুঝি কোনো ব্যবসায়-বুদ্ধি চেপেছে। সে বললে—দেখ আমার অভাবে মা বাবা ভাই বোন সবাই কষ্ট পাচ্ছে, তা আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু একটি কাজ করলে তাঁরা হিমানীকে সুদ্ধ বাড়ীতে স্থান দিতে কোনো আপত্তি করবেন না।

হিমানীরা আমাদের স্বজাত। আমি মতলব করেছি তাকে বিয়ে ক'রে একদিন দুম্ ক'রে দু-জনে বাড়ীতে গিয়ে হাজির হবো। ছেলের বউকে তো আর বাপ মা ফেলে দিতে পারবে না।

ঠিক! মনে হ'ল চাঁদমুখের প্রভাব মতিলালের সাংসারিক-বুদ্ধিকে এখনও ম্লান করতে পারেনি। আমরা তাকে উৎসাহ দিলুম—লাগিয়ে দাও বিয়ে—আমরাও যাব তোমার সঙ্গে।

আমাদের উৎসাহে হিমানী ও মতিলাল দু-জনেরই উৎসাহ গেল বেড়ে। অনেক দিন পরে আবার একটা নতুন উত্তেজনা পেয়ে আমরা মেতে উঠলুম। মতিলাল কোথা থেকে পুরোহিত জোগাড় ক'রে আনলে। বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তার শূন্য আসন শাস্ত্রের মন্ত্রে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল। টাকাকড়িরও বিশেষ অভাব হ'ল না। নির্ম্মলের ছিল সোনার হাতঘড়ি, আর আমার ছিল সোনার বোতাম ও আংটি। তা ছাড়া দু-চারখানা বইও হকারের দোকানে চলে গেল।

শুভ দিন-ক্ষণে হিমানীর সঙ্গে মতিলালের বিয়ে হ'য়ে গেল। মতিলাল তার বাবাকে চিঠি লিখলে—হিমানী এখন আমার স্ত্রী, আপনার পুত্রবধূ। তাকে গৃহে স্থান দিতে আশা করি আপনাদের কোনো আপত্তি হবে না। আমরা শীগ গীরই বাড়ী যাব।

দিন-পনেরো চলে গেল, কিন্তু মতিলালের চিঠির কোনো জবাব এল না। চিঠির জবাব না আসাতে মতিলাল ও হিমানী দুজনেই মুষ্‌ড়ে পড়তে লাগল। সেই কঠোর দারিদ্র্য বোধ হয় আর তাদের সহ্য হচ্ছিল না।

আরও দিন-পনেরো কেটে যাবার পরও যখন তার বাবার কাছ থেকে কোনো উত্তর এল না তখন একদিন মতিলাল বললে—না আসুক জবাব—চল বেরিয়ে তো পড়া যাক্, তারপরে যা হবার তাই হবে।

আমরাও রাজি। বেনারস কলেজের সঙ্গে ফুটবলের ম্যাচ আছে ব'লে বাড়ী থেকে তিন দিনের ছুটি নিয়ে একদিন রাত্রি সাড়ে নটার গাড়ীতে মতিলাল ও হিমানীকে নিয়ে ট্রেনে উঠে পড়া গেল।

যখন ট্রেন থেকে ষ্টেশনে নামলুম তখন রাত্রি শেষ হোতে বোধ হয় ঘণ্টাখানেক দেরী। ভোর হওয়ার পর একখানা গাড়ী ভাড়া ক'রে মতিলালদের বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। শহর ষ্টেশন থেকে মাইল চার-পাঁচ দূরে। টিকোতে-টিকোতে প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে গাড়ী গিয়ে তাদের বাড়ীর কাছে পৌঁছল। বাড়ীর দরজায় মতিলালের একটি বোন দাঁড়িয়েছিল। সে আমাদের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে ছুটে বাড়ীর ভেতরে চলে গেল।

হিমানীকে নিয়েই ভেতরে যাওয়া হবে কি না তারই পরামর্শ চল্‌ছে, এমন সময় বাড়ীর মধ্যে মতিলালের বাবার চীৎকার শুনতে পাওয়া গেল। আমরা স্থির করলুম আপাততঃ হিমানী গাড়ীতেই বসে থাক। ঝড়ের প্রথম ঝাপ্‌টাটা কেটে যাবার পর তাকে নিয়ে যাওয়া যাবে।

গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে পড়া গেল। আগে নির্ম্মল, তার পরে আমি, তার পরে মতিলাল। কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হোতে হ'ল না। মতিলালের বাবা হন্ হন্ ক'রে বাইরের দিকে এগিয়ে আসছিলেন। তাঁর পেছনে তার ভাইবোনের দল উৎসাহের আবেগে চঞ্চল হ'য়ে ছুটে আসছে—এই অবস্থায় দুই শোভাযাত্রায় সঙ্ঘর্ষ বাধল। মতিলালের বাবা বললেন—বেরিয়ে যাও আমার বাড়ী থেকে, অমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না।

ভদ্রলোককে আমরা বোঝাতে লাগ্‌লুম, কিন্তু তিনি সে-সব কথা কানে না তুলে আমাদেরও গালাগালি দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর এক কথা! হিমানীকে ছেড়ে চলে এস—আমি মেয়ে ঠিক করেছি তাকে বিয়ে কর—তবেই এ বাড়ীতে তোমার স্থান হবে।

মতিলাল একধারে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইল। পিতার সহস্র কর্কশ কথার একটি জবাবও সে দিলে না। ভাই-বোনেরা একে-একে তাদের বাবার পেছন থেকে এগিয়ে এসে তাকে ঘিরে গোল হ'য়ে দাঁড়াল। সব ছোটটি মতি-লালের একটা আঙুল ধরে নাড়তে আরম্ভ ক'রে দিলে।

ঘণ্টাখানেক ধরে অবিশ্রান্ত গালাগালি শোনার পর মতিলাল ধরা-গলায় আমাদের বললে—চল যাই।

আমরা ফিরলুম। তার বাবা চীৎকার ক'রে উঠলেন

—দাঁড়াও—ওকে না ত্যাগ করলে আমার বিষয়ের একটি পয়সাও তোমায় দেব না—মনে থাকে যেন।

কথাটা শুনে মতিলালের ম্লানমুখে একটুখানি হাসি ফুটে উঠ্‌ল। অপূর্ব্ব সে হাসি। তাঁর কথার কোনো উত্তর না দিয়ে সে আমাদের বললে—চল যাই, হিমানী অনেকক্ষণ একলা বসে আছে।

আমরা ধীরে-ধীরে বাইরে এসে একে-একে গাড়ীতে উঠে বসলুম। মতিলালের ভাইবোনেরা ভিড় ক'রে বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়াল—তাদের সবার চক্ষুই অশ্রুভারাক্রান্ত। কারও মুখে কোনো কথা নেই। হঠাৎ এই নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে দড়াম ক'রে ওপরকার একটা জানলা খুলে গেল। জানলায় বোধ হয় মতিলালের মা এসে দাঁড়ালেন, কিন্তু আমরা কেউ আর গাড়ী থেকে মুখ বাড়ালুম না।

কয়েক মুহূর্ত্ত বাদে হিমানী বলে উঠ্‌ল—ঠাকুর-পো, ঐ যে দেখ্‌ছ বাড়ীটা—যেটার দরজায় তালা লাগানো —ঐটে আমাদের বাড়ী।

তারপরেই মতিলালের দিকে ফিরে সে হাসতে-হাসতে বললে—তাড়িয়ে দিলেন তো? তুমিও না যেমন! কোনো বাপ-মা কখনও এ-রকম ছেলেকে ঘরে নিতে পারে! কি বল ভাই, খুশী ঠাকুর-পো?

নির্ম্মল খুব হাস্‌ত বলে হিমানী তাকে খুশী ঠাকুর-পো বলে ডাকৃত।

নির্ম্মল বললে—আমি যদি বাপ হতুম তা হ'লে নিশ্চয় পারতুম।

হিমানী আবার মতিলালের দিকে ফিরে বললে—দেখ, তুমি ও-রকম মুখ ক'রে থাক্‌লে আমার ভারি খারাপ লাগে। আমি কিন্তু এক্ষুণি কেঁদে ফেল্‌ব—তখন তোমরা তিনজনে মিলে আমায় থামাতে পারবে না।

হিমানীর দুই চোখ অশ্রুতে ভরে উঠ্‌ল। মতিলাল গাড়ী থেকে এবার মুখ বাড়িয়ে গাড়োয়ানকে বললে— এই, ষ্টেশন চলো।

গাড়ী চলতে আরম্ভ করতেই মতিলাল হিমানীকে বললে—আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে বলে আমার কোনো দুঃখ হয়নি। আমরা সমস্ত দুঃখকে তো বরণ করেই নিয়েছি হিমানী।

হিমানীর চোখের জল এক নিমিষে অপসারিত হ'য়ে গেল। সে তার চোখ দুটোকে বড় বড় ক'রে বললে —তবে তুমি অমন মুখ ক'রে রয়েছ কেন?

মতিলাল বললে—আমার দুঃখ এই যে, আমাদের জন্য বন্ধুরা মিছিমিছি বাবার কাছে কতকগুলো গালাগালি খেলে।

মতিলালের বাবার গালাগালিতে আমাদের মনের মধ্যে যতটুকু গ্লানি জমা হ'য়ে উঠেছিল, হিমানীর হাসির আঘাতে ষ্টেশনে পৌঁছবার আগেই তা উড়ে গেল। যেমন হাসতে-হাসতে আমরা বেরিয়েছিলুম, পরদিন সকালে আবার তেমনি হাসতে-হাসতে আমরা তাদের বেলেঘাটার সেই খোলার বাড়ীর দরজায় গাড়ী থেকে নামলুম।

এই ব্যাপারের দিন দশ বারো পরে একদিন বিকেলে মতিলালের বাড়ীতে গিয়ে দেখি নির্ম্মল মুখখানি চুণ ক'রে একখানা জলচৌকির ওপরে বসে আছে। এক কোণে হিমানী দাঁড়িয়ে, তার মুখে হাসির রেখা তখনও মিলিয়ে যায়নি, আর মতিলাল গম্ভীর হয়ে খাটের ওপরে বসে।

ঘরে ঢুকেই বুঝতে পারলুম একটা কিছু হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলুম—ব্যাপার কি?

নির্ম্মল হিমানীর দিকে হাত বাড়িয়ে বললে—জিজ্ঞাসা কর ওঁদের—

হিমানীকে জিজ্ঞাসা করলুম—কি হয়েছে বৌদি?

হিমানী বললে—কি আবার হবে!

নির্ম্মল ঝেড়ে-ফুঁড়ে ঠিক হ'য়ে বস্‌তে বস্‌তে বললে— আমরা এখানে আসি—ওঁদের সেটা ইচ্ছা নয়।

হিমানী বলে উঠ্‌ল—দেখ খুশী ঠাকুরপো, যা-তা বোলো না বল্‌ছি—তা হ'লে এই পাখা-পেটা খাবে। আমি তাই বলেছি!

নির্ম্মল গম্ভীরভাবে বললে—তা না তো কি! যা বলেছ তার সরল অর্থ ঐ—

হিমানী এবার আমার দিকে চেয়ে বললে—আচ্ছা ঠাকুরপো তুমিই বল—

আমি বললুম—ব্যাপারটা কি হয়েছে খুলেই বল না ছাই।

মতিলাল এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিল। এবার সে বললে—আচ্ছা আমিই বলছি।

মতিলালের কথা শুনে নির্ম্মল মুখ তুলে তার দিকে চাইলে। কিন্তু তার চোখ দুটো অশ্রুভারে তখুনি নুয়ে পড়্‌ল। সে অন্যদিকে মুখখানা ফিরিয়ে নিলে।

মতিলাল বললে—আমি আর হিমানী স্থির করেছি যে, তোমাদের কাছ থেকে আর অর্থ-সাহায্য নেব না।

এই অবধি বলে মতিলাল চুপ করলে। আমাদের কারুর মুখ দিয়েই আর কোনো কথা বেরুলো না, মতিলালও চুপ ক'রে রইল। হেমন্তের সন্ধ্যা তার অন্ধকারের সঙ্গে রাশি-রাশি ধোঁয়া নিয়ে ছোট্ট সেই খোলার ঘরখানার ভেতরে এসে জমা হোতে লাগ্‌ল। তারই মধ্যে বসে-বসে আমার মনে হোতে লাগ্‌ল, একদিন প্রখর দিবালোকে আমরা যে এই চারটি বন্ধু পরস্পরের কাছাকাছি হয়েছিলুম এই অন্ধকারের মধ্যে বুঝি সেই বন্ধনের গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেল। অনেকক্ষণ এইভাবে কেটে যাবার পর নির্ম্মল বলে উঠ্‌ল—বাতিটা জ্বালো বৌদি।

হিমানী বললে—এই যে জ্বালি।

হিমানীর কণ্ঠস্বর ভারী। বেশ বুঝতে পারা গেল অন্ধকারে সে কাঁদছিল।

বাতিটা জ্বালবার পর মতিলাল বললে—এর জন্য তোমরা দুঃখ্ কোরো না বন্ধু। আমি হিমানীর জন্য ও হিমানী আমার জন্য কতখানি ত্যাগ করেছে ও একে অন্যের জন্য কতখানি সহ্য করতে পারে তা অভাবে না পড়লে তো বুঝতে পারব না। হিমানীকে পাওয়ার সুখ আমি সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করতে কিছুতেই পারছি না, যতক্ষণ না তাকে পাবার দুঃখটাও ভোগ করছি। এতে তোমরা ক্ষুণ্ণ হয়ো না। তা হ'লে আমরা দু-জনেই মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাব।

সেদিন এ সম্বন্ধে আর আমাদের কোনো কথা হ'ল না। বাড়ী ফেরবার সময় সমস্ত পথটা মতিলালকে গালাগালি দিতে-দিতে ফেরা গেল।

তখন মাসের শেষ, বাড়ী ভাড়া দেবার সময়। আমি আর নির্ম্মল স্থির করলুম যে, চুপি-চুপি তাদের ওখানে গিয়ে বাড়ীওয়ালাকে ঘরভাড়াটা দিয়ে হিমানীর সঙ্গে দেখা না ক'রেই পালিয়ে আস্‌ব। ঠিক করা হ'ল যে, দুপুরবেলায় গিয়ে কাজটি সেরে আস্‌তে হবে, কারণ সে সময় মতিলাল বাড়ীতে থাকে না।

দুই বন্ধু দুপুরবেলা মতিলালের বাড়ীতে গিয়ে সোজা একেবারে বাড়ীওয়ালার ঘরে গিয়ে ওঠা গেল। বাড়ী-ওয়ালা আমাদের প্রস্তাব শুনে হেসে বললে—তাঁরা তো কাল বাড়ীভাড়া চুকিয়ে দিয়ে চলে গেছেন।

মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়্‌ল। বাড়ীওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোথায় গেল তারা? কেন গেল তারা?

বাড়ীওয়ালা তার আন্দাজ মত দু-একটা জায়গার নাম করলে। তখুনি দুজনে ছুটলুম সেখানে। বস্তির পর বস্তি আতি-পাতি ক'রে খুঁজে বেড়ালুম, কিন্তু মতিলাল ও হিমানীর কোনো সন্ধানই পেলুম না।

মতিলাল কেন আমাদের ছেড়ে গেল! না হয় সে আমাদের সাহায্য না-ই নিত। এই নির্ব্বান্ধব শহরে আমাদের চেয়ে বন্ধু সে কোথায় পাবে?

পরদিন থেকে আমি আর নির্ম্মল মাঠে যাওয়া বন্ধ রেখে কলকাতা শহরের বস্তিতে-বস্তিতে সেই পলাতক বন্ধু আর বান্ধবীর সন্ধানে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। একমাস অবিশ্রান্ত চেষ্টা ক'রেও তাদের কোনো সন্ধান না পেয়ে হতাশ হ'য়ে আবার একদিন সন্ধ্যাবেলায় মাঠে ফিরে এলুম।

মাঠের সেদিনকার অবস্থা আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। সেখানে গিয়েই বুঝতে পারলুম একটা বিষাদের ছায়া সেখানকার অনাবিল আনন্দকে ম্লান ক'রে ফেলেছে। ফুটবল খেলা বন্ধ, গানও বন্ধ—বন্ধুরা এককোণে ম্লানমুখে বসে রয়েছে। মাঠের ঠিক মাঝখানেই দেখি একটা বড়গোছের হোগ্‌লার ঘর উঠেছে। এখানে-সেখানে চারিদিকে লম্বা-লম্বা গর্ত্ত।

সংবাদ পাওয়া গেল যে, যারা জমিটা কিনেছে তারা বাড়ী তুলছে। মাস-দুয়েকের মধ্যেই সেখানে বড় বাড়ী তৈরী হবে।

চোখের সাম্‌নে প্রতিদিন একখানার পর একখানা ইঁট গেঁথে মিস্ত্রিরা সেখানে দালান তুলতে লাগ্‌ল। বন্ধু-

বান্ধবেরা একে-একে আসা বন্ধ করতে লাগ্‌ল—দেখতে দেখতে আমাদের কৈশোরের স্মৃতির ওপরে বিরাট প্রাসাদ তৈরী হ'য়ে গেল।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার পর কিছুদিন আমরা এখানে-সেখানে জমায়েৎ হোতে লাগলুম, কিন্তু আড্ডা আর তেমন জম্‌ল না। বছরখানেকের মধ্যেই আমরা একেবারে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়লুম। তারপরে জীবনে কতবার চাঁদ উঠ্‌ল, কত চাঁদমুখ দেখলুম তার ঠিকানা নেই। অভিজ্ঞ সংসার দেখিয়ে দিলে, চাঁদে রয়েছে কলঙ্ক আর চাঁদমুখ—যাক্ সে কথা আর তুলে কাজ নেই।

মাঠের আড্ডা উঠে যাওয়ার বোধ হয় পনেরো বিশ বছর পরে নানা ঘাটের জল খেয়ে তখন এক মাসিকপত্রের সম্পাদকীয় বৈঠকে বেশ কায়েমী হ'য়ে বসা গিয়েছে, এই সময় একদিন সন্ধ্যেবেলা সম্পাদক-মশায় একটি নতুন লোককে আড্ডায় নিয়ে এসে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—তোমরা কবি শশিশেখরের এত প্রশংসা কর ; ইনিই সেই কবি শশিশেখর !

ভদ্রলোক সভাস্থ সবাইকে নমস্কার ক'রে অতি সঙ্কুচিতভাবে ফরাসের একটি কোণে গিয়ে বসে পড়লেন। কবির চেহারাটি যেমন সচরাচর হ'য়ে থাকে, অর্থাৎ মোটেই কবিজনোচিত নয়। মাথার চুল কদমছাঁটা, পরণে একখানা ময়লা ধুতি, অঙ্গে একটা আধময়লা জামা —সেটা না-পাঞ্জাবী, না-সার্ট না-কোট। পায়ের জুতোজোড়া ছেঁড়া, শততালি হ'লেও জুতোর মালিক যে সৌখীন তা জুতোর আকৃতি দেখলেই বুঝতে পারা যায়। মাথার চুল কতকগুলো পেকে গিয়েছে। বেশ বুঝতে পারা যায় যে, দুর্দ্দশায় পেকে গিয়েছে। মুখের চেহারাও তার অঙ্গের জামা-কাপড়েরই সামিল। দাড়ি-গোঁফ বোধ হয় মাসখানেক আগে কামানো হয়েছিল।

লোকটি খাটে বসে আসরের চারদিকে চেয়ে আমার দিকে একবার দৃষ্টিনিবদ্ধ ক'রে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলে। তার চোখের ওপরে চোখ পড়তেই আমার মনে হ'ল যেন মুখখানা কোথায় দেখেছি। যতই তার মুখের দিকে চাই, ততই মনে হয় যেন এ মুখ পরিচিত। গৃহ-প্রত্যাগত প্রবাসী ঘরে ফিরে তার বাড়ীর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যেমন ক'রে তার হারাণ রতন খুঁজে বেড়ায় আমিও তেমনি স্মৃতির ধ্বংসস্তূপে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধুদের মুখগুলো খুঁজতে লাগলুম—কে —কে এই কবি শশিশেখর !

আড্ডা ভাঙবার কিছু আগে নবাগত কবি সকলকে নমস্কার জানিয়ে বিদায় নিলে। তারপরে গুটি-গুটি আমার কাছে এসে বললে—আমায় চিনতে পারলে না তো ?

চীৎকার ক'রে উঠলুম—মতিলাল !

মতিলাল বললে—হ্যাঁ, চিনেছ ?

মতিলালকে ধরে বসালুম। কিন্তু সেদিন তার বড্ড তাড়া ছিল ব'লে আর বসতে পারলে না। পরের দিন আস্‌ব বলে সে চলে গেল।

পরের দিন তার অপেক্ষায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে বসে রইলুম, কিন্তু সে এল না। তার পরের দিন আড্ডা ভাঙ্‌বার কিছু আগে মতিলাল এসে হাজির।

মতিলালকে কাছে বসালুম। সে ছদ্মনামে কবিতা লেখে। সকালে দৈনিক একখানা বাংলা কাগজে চাক্‌রী করে। মাইনে পঞ্চাশ টাকা, কিন্তু তিন মাস অন্তর একমাসের মাইনে পায়। সন্ধ্যাবেলায় দু-জায়গায় ছেলে পড়ায়, সেখান থেকে ত্রিশ টাকা পায়।

আড্ডা ভেঙে যাবার পর রাস্তায় এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম—কোন্ দিকে যাবে ?

মতিলাল উত্তর দিকের একটা রাস্তা দেখিয়ে দিয়ে বললে—এই দিকে।

বললুম—চল, আমিও ঐদিকে যাব।

দু-জনে পাশাপাশি অনেকক্ষণ ধরে নীরবে চলবার পর অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি কোথায় ?

মতিলাল একটু হেসে বললে—তাকে মনে পড়ে ?

আর সামলাতে পারলুম না। বলে ফেললুম—রাস্কেল, ছোটলোক, বর্ব্বর, অকৃতজ্ঞ ! মনে পড়ে ! আমাদের বন্ধুত্বের যা প্রতিদান তুমি দিয়েছ তাতে তোমাদের কথা আর মনে না রাখাই উচিত—

রাগের ঝোঁকে তাকে আরও অনেক কথা বলে ফেললুম, কিন্তু সে একটি কথারও উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে সমস্ত শুনে গেল। আমার বক্তব্য শেষ হ'য়ে যাওয়ার

পর ধরা-গলায় মতিলাল জিজ্ঞাসা করলে—নির্ম্মল কোথায় ? কেমন আছে সে ?

—নির্ম্মল ! নির্ম্মল চলে গিয়েছে—সে আজ পাঁচ-ছ বছরের কথা।

মতিলাল আর কোনো প্রশ্ন করলে না। কিছুক্ষণ পরে আবার আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বৌদি কোথায় ?

মতিলাল বললে—এখানেই আছে, দেখবে তাকে ?

—নিশ্চয়, কোথায় কতদূরে, তোমার বাড়ী ?

মতিলাল বললে—বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে, সেই বাগবাজারের গঙ্গার ধারে। আজ রাত্রি হ'য়ে গিয়েছে, কাল সন্ধ্যাবেলায় এসে তোমায় নিয়ে যাব।

সেদিনকার মতন বিদায় নেওয়া গেল। পরদিন সন্ধ্যার সময় মতিলাল এসে বললে—চল।

শহরের এক কোণে, বাগবাজারের গঙ্গার ধারে একখানা একতলা বাড়ী। পথটা অত্যন্ত সরু। দূরে দূরে গ্যাস জ্বল্‌ছে। হেমন্তের শীতল আবহাওয়ায় উনুনের ধোঁয়াগুলো আটকা পড়ে পথের মধ্যে ভিড় ক'রে আছে। বিশ বছর আগে এমনি আর এক সন্ধ্যায় বেলেঘাটার সেই খোলার ঘরে হিমানীর সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র কিছুই নেই বললেই হয়। এক কোণে একটি ছোট বিছানা পাতা। সেখানে গলা অবধি চাদর ঢাকা দিয়ে কে শুয়ে রয়েছে। ঘরে ঢুকে মতিলাল বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে—ওগো, চেয়ে দেখ, কে এসেছে !

বিছানার কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখি সেখানে হিমানী শুয়ে রয়েছে। তপ্তকাঞ্চনের মত রং তার একেবারে কালিবর্ণ,পরিপূর্ণ নিটোল অঙ্গ একেবারে কঙ্কালে পরিণত।

তার সেই মূর্ত্তি দেখে আমি একেবারে শিউরে উঠলুম। একবার সন্দেহও হ'ল—নিশ্চয় এ অন্য আর কেউ।

হিমানী চোখ দুটো তুলে আমার দিকে চাইলে। তারপরে আস্তে-আস্তে বললে—ঠাকুরপো ! তোমাকে যে আর চেনা যায় না।

সেদিন অনেক রাত্রে মতিলালের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ী ফিরলুম। হিমানীর যক্ষ্মা হয়েছে, সে আর বাঁচবে না। মতিলাল বললে যে, তারও মুখ দিয়ে বার-কয়েক রক্ত উঠেছিল—হিমানী যে তার আগেই যাচ্ছে এইটেই তার মস্ত সান্ত্বনা।

পরদিন থেকে নিয়ম ক'রে তাদের ওখানে যেতে আরম্ভ করলুম। সকালবেলা আমি যাবার পর মতিলাল বেরোয় খবরের কাগজে চাকরী করতে। বেলা বারোটার সময় সে কাজ সেরে ফিরলে পর আমি বাড়ীতে ফিরি। বিকেলে আমি গেলে সে ছেলে পড়াতে যায়, সন্ধ্যার পর ফেরে। রাত্রি দশটা এগারোটা অবধি সেখানে থেকে আমি বাড়ী ফিরি।

হিমানীকে চিকিৎসা করছিল এক কবিরাজ। ডাক্তার দেখাতে বিস্তর পয়সা খরচ। খবরের কাগজের আপিস থেকে মাসে-মাসে মাইনে পাওয়া যায় না। ছেলে পড়িয়ে যা ত্রিশ টাকা পাওয়া যায় তাই তখন তাদের সম্বল। এই দুঃসময়ে মতিলাল আমার কাছে সাহায্য চাইলে, কিন্তু আমারও তখন দেবার কিছুই নেই। একদিন মতিলালকে আমরা সাহায্য করতে চেয়েছিলুম, সে তা নেয়-নি। আজ সে সাহায্য চায়, কিন্তু তাকে দেবার কিছুই নেই। নির্ম্মল ইহলোকে নেই, আমি আছি, কিন্তু সোনার বোতাম ও আংটি আর নেই।

মাসখানেক এইভাবে কেটে গেল। হিমানী বেশ জান্‌তো সে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর মুখে এগিয়ে চলেছে। একদিন সন্ধ্যাবেলায় মতিলাল তখনও বাড়ী ফেরেনি। সমস্ত দিন টিপিটিপি বৃষ্টি পড়ায় শীতটা বেশ জোরে পড়েছে। হিমানী ইদানীং আর নিজে নড়তে-চড়তে পার্‌ত না, তাকে পাশ ফিরিয়ে দিতে হয়। একখানা শততালি-দেওয়া লেপ তার অঙ্গে ঢাকা দিয়ে ধারগুলো মুড়ে দিচ্ছিলুম এমন সময় ধীরে-ধীরে সে বললে—ঠাকুরপো, তোমার হাতে এই সেবাটুকু পাব বলেই বোধ হয় এতদিন বেঁচেছিলুম— । আমার ওপরে আর রাগ নেই তো ভাই ?

আমি বললুম—রাগ তোমার ওপর কোনো দিনই ছিল না, বৌদি।

আর কোনো কথা বলতে পারলুম না। হিমানী আরও কিছু শোনবার জন্য উৎসুক হ'য়ে আমার মুখের দিকে

চেয়ে রইল। কিছুক্ষণ পরে বললুম—তোমার চিকিৎসা না হ'লেও তবুও তো তুমি আমাদের সেবা পেলে—একবার আমাদের কথা ভেবে দেখ।

হিমানী বললে—মরতে আমার বড্ড ভয় করছে ভাই। তোমরা যদি আগে যেতে তা হ'লে আমার কোনো ভয় ছিল না। আমায় সেখানে একলা থাকতে হ'বে। মা গিয়েছেন বটে, কিন্তু বাবা যখন ক্ষমা করেন-নি তখন মা কি ক্ষমা করবেন?

কিছুক্ষণ পরে সে উৎসাহভরে বলে উঠ্‌ল—কিন্তু খুশী-ঠাকুরপো আছে না সেখানে! ও, তবে কোনো ভাবনা নেই। সে ভারী অভিমানী—তা হোক্, কই তুমি তো অভিমান করে থাকতে পারনি।

পৌষের মাঝামাঝি একদিন সকালবেলা হিমানী বললে—ঠাকুরপো, আজ ভাই বিদায়ের দিন। আজ আর আমার জ্বালা-যন্ত্রণা কিছু নেই। মনে হচ্ছে আজই দিনশেষের সঙ্গে সঙ্গে—

হিমানী হাসিমুখে কথাটা আরম্ভ করেছিল, কিন্তু শেষ করবার আগেই তার দুই চোখ দিয়ে দু-ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়্‌ল। তার হাত দু-খানা আমার হাতের মধ্যে নিয়ে দেখলুম বরফের মতন ঠাণ্ডা। নাড়ী—একেবারে শেষ অবস্থা!

তার জন্য কয়েকদিন থেকে একটা ঝি রাখা হয়েছিল। তার তদ্বিরে হিমানীকে রেখে আমি ছুটলুম মতিলালের সেই খবরের কাগজের আপিসে।

সেখানে গিয়ে দেখি মতিলাল একটা চেয়ারে উবু হ'য়ে বসে বন্ বন্ ক'রে কি লিখে চলেছে। দু-পাশে দু-জন কম্পোজিটার দাঁড়িয়ে আছে। একখানা কাগজ শেষ হোতেই একজন সেটা তার হাত থেকে একরকম টেনে নিয়ে চলে গেল। সেই ফুরসতে একবার মুখ তুলে আমাকে দেখে সে বললে—কি খবর?

বললুম—বৌদির অবস্থা খুব খারাপ বলে মনে হচ্ছে। শীগ্‌গীর চল, তোমাকে ডাকতে এসেছি।

মতিলাল ততক্ষণে আর একখানা কাগজ টেনে লিখতে সুরু ক'রে দিলে। তার কাণ্ড দেখে বললুম—কি, কথার জবাব দিচ্ছ না যে বড়?

মতিলাল হেসে লিখতে-লিখতেই বলতে লাগ্‌ল—ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর মস্ত একটা ভুল ধরে ফেলা গেছে—তারই একটা জবাব আর জেনারেল ফ্রেঞ্চের সমরনৈতিক চালের আর একটা মারাত্মক রকমের ত্রুটি—তার ওপরে খানিকটা মন্তব্য লিখতেই হবে—মনিবের হুকুম। আজকে কিছু পাবার আশা আছে, লেখাগুলো যদি শেষ না ক'রে যাই তা হ'লে সে-গুড়েও বালি পড়্‌বে। তুমি বরং হিমানীর কাছে গিয়ে বোসো—আমি আস্‌চি।

তখুনি আবার ছুটলুম হিমানীর কাছে। আমায় দেখে সে জিজ্ঞাসা করলে—কোথায় গিয়েছিলে?

বললুম—এইখানেই গিয়েছিলুম একটু—

এদিকে বারোটা বেজে গেল তবুও মতিলালের দেখা নেই। আমি ব্যস্ত হচ্ছি দেখে হিমানী বললে—সে ঠিক আস্‌বে—আমারই একটু কাজে গেছে।

আরও কিছুক্ষণ কাটবার পর হিমানী হাঁপাতে হাঁপাতে বললে—ঠাকুরপো তুমি বাড়ী থেকে চট্ ক'রে ঘুরে এস। যাও, আজকে আর আমার অবাধ্য হয়ো না।

সেখান থেকে বেরিয়ে মতিলালের আপিসের দিকে ছুটলুম। সেখানে গিয়ে দেখি মতিলাল নেই। ঘণ্টা-খানেক আগে সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে।

নিজের বাসাতে এসে খেয়ে-দেয়ে যখন তাদের সেখানে গিয়ে পৌছলুম তখন তিনটে বেজে গিয়েছে। গিয়ে দেখি হিমানীকে একখানা লাল চওড়া পাড়ের শাড়ী পরানো হয়েছে, তার মাথায় একরাশ সিঁদুর, পায়ে আল্‌তা, পা থেকে গলা অবধি ফুলে ঢাকা।

খাটের কাছে গিয়ে দেখি হিমানীর একখানা হাত মতিলালের হাতে, দুটি চোখ স্থিরভাবে মতিলালের দিকে চেয়ে আছে, আর তার দুই গাল বয়ে অবিরল অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে।

আমাকে দেখে মতিলাল বললে—এই, বোধ হয় মিনিট-পাঁচেক হ'ল কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছে।

সেদিন দিনের আলো নিভে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে হিমানীর অঙ্গ হিম হ'য়ে গেল।

হিমানী মারা যাবার পরের দিন থেকে মতিলাল খবরের কাগজের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে সারাদিন বসে

বসে কবিতা লিখতে আরম্ভ ক'রে দিলে। মাসকয়েকের মধ্যে সে মোটা-মোটা খানকয়েক খাতা কবিতায় ভরিয়ে ফেললে। আমি সেগুলোকে মাসিকপত্রে ছাপাতে চাইলে সে বল্‌ত—না না থাক্‌, ওগুলো অন্য দরকারে লাগ্‌বে।

শ্রাবণ মাস নাগাদ, অর্থাৎ হিমানী মারা যাবার মাস-ছয়েক পরে একদিন রক্ত বমি ক'রে মতিলাল বিছানায় এলিয়ে পড়্‌ল। তার অবস্থা দেখে তক্ষুনি ডাক্তার ডাকা হ'ল। ডাক্তার দিনকয়েক দেখে বললেন—ওষুধে কিছু হবে না, বিদেশে নিয়ে গিয়ে দেখতে পারেন।

আমাদের একটি বন্ধুর সাঁওতাল পরগণার এক স্বাস্থ্যকর জায়গায় ছোট্ট একখানা বাড়ী ছিল। তাকে বলে-কয়ে মতিলালের জন্য বাড়ীখানা জোগাড় করা গেল। কিন্তু শুধু বাড়ী হলেই তো চল্‌বে না, অর্থও কিছু চাই।

মতিলাল বললে—আমার ঐ কবিতাগুলো যদি বিক্রি করতে পার তা হ'লে কিছু আসতে পারে।

কবিতার খাতা ক'খানা বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়া গেল। কিন্তু কবিতার বই বিক্রি করতে এসেছি শুনে বইওয়ালারা তো হেসেই আকুল। সাতদিন প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে একজন বইগুলো নিয়ে দয়া ক'রে একশটি টাকা দিলে। এ ব্যক্তি বইয়ের কারবার করার আগে সাহিত্যচর্চ্চা করত।

মতিলালকে গিয়ে যখন সংবাদটা দিলুম, তখন সে বললে—কেমন বলেছিলুম কিনা, ওগুলো সময়ে ভারি কাজ দেবে।

বললুম—আরও শতখানেক টাকা চাই যে—

মতিলাল বললে—ঐতেই হবে—আর লাগবে না!

মতিলালকে নিয়ে যাওয়া গেল। সে স্থানটি জন-বিরল। পুজো ও শীতের সময় দু-চার জন লোক আসে, অন্য সব সময়ে প্রায় সমস্ত বাড়ীতেই তালা লাগানো থাকে। সে সময়টা সেখানে বর্ষা নেমেছিল। বিকেলে রোজ এক পশলা বৃষ্টি হ'য়ে চমৎকার আলো হোতো। মতিলাল সেখানে দিনপাঁচেক বেশ রইল। ছ-দিনের দিন থেকে তার রক্তবমি সুরু হ'ল। দিনদুয়েক অনবরত বমি ক'রে সে একেবারে অবশ হ'য়ে পড়্‌ল।

তারপরে দিন-দুয়েক প্রায় নির্ব্বাক অবস্থায় কাটিয়ে একদিন সকালে সে কথা বলতে আরম্ভ করলে। ইদানীং সে বেশী কথা বল্‌তো না, কিন্তু সেদিন তার কথার পরিমাণ অস্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌ল। আমি শঙ্কিত হ'য়ে উঠলুম, কারণ হিমানী যেদিন মারা যায় সেদিন সে-ও ঐ রকম কথা বলতে আরম্ভ করেছিল।

বিকেলের দিকে সেদিন আর বৃষ্টি নাম্‌ল না। মতিলাল বললে—আমায় বারান্দায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিতে পার?

বাড়ীতে একটা মালী ছিল। তাকে ডেকে খাট-সমেত মতিলালকে বারান্দায় নিয়ে যাওয়া হ'ল।

বাড়ীর কিছু দূরেই ছিল এক শালবন। তারই মাথায় প্রকাণ্ড একখণ্ড কাল মেঘ এসে দাঁড়াল, আর তারই মধ্যে বিজলীর ছিনিমিনি খেলা চলতে লাগ্‌ল। মতিলাল আমার সঙ্গে কোনো কথা না বলে একদৃষ্টে সেই দিকে চেয়ে রইল।

সন্ধ্যার একটু পরেই মুষলধারে বৃষ্টি সুরু হ'ল। মতিলালকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এসে দরজা জানলাগুলো বন্ধ ক'রে দিলুম। দেখতে দেখতে প্রলয়ের নাচন সুরু হয়ে গেল। বাইরে আকাশ তার সম্পত্তি নিঃশেষ ক'রে দিতে চায়, আর ঘরের মধ্যে মতিলালের মহাপ্রাণ সেই জীর্ণ পিঞ্জর ভেঙে বেরিয়ে আসতে চায়। ঘরে ও বাইরে সেই মহাপ্রলয়ের মধ্যে আমি একা হাঁপিয়ে উঠতে লাগ্‌লুম।

রাত্রি তখন প্রায় চারটে। বাইরে বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, এমন সময় মতিলাল হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে—বেশ কাটানো গেল পৃথিবীতে—কি বল ভাই?

এবার অশ্রুসংবরণ করা দুরূহ হ'ল। বললুম—তোমার মতন দুঃখ—

মতিলাল আমার কথা থামিয়ে দিয়ে বললে—না না দুঃখ আমি কিছুই পাইনি রে—আমাকে দুঃখ দেবার চেষ্টা সংসার করেছে বটে, কিন্তু তাতে আমার সুখের মাত্রা বেড়েই উঠেছে—

মতিলালের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে এল। আমি ঝুঁকে পড়ে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে দেখতেই একটুখানি

হাসিতে তার মুমূর্ষু মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। সেই হাসি আর একবার তার মুখে দেখেছিলুম—যেদিন তার বাবা তাকে বিষয় থেকে বঞ্চিত করবার ভয় দেখিয়ে হিমানীকে ছেড়ে বাড়ীতে ফিরে আসবার কথা বলেছিলেন। তখনও বুঝতে পারিনি যে, সেই হাসিটুকুর অবকাশে তার প্রাণ বেরিয়ে গিয়েছে। চীৎকার ক'রে ডাকলুম—মতিলাল—

বাইরে একটা ভোরের পাখী জবাব দিলে—পি-উ-উ।

তাড়াতাড়ি জানলাটা খুলে দিয়ে দেখি, মতিলালের মুমূর্ষু মুখের শেষ হাসিটুকুর মতন একটুখানি আলোর রেখা পূব-গগনে ফুটে উঠেছে।

উপাধান

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

অন্তর মাঝে নিয়ত যা বাজে, সে ব্যথা কাহারে বলি ?
কে দাঁড়ায় কাছে, কেবা হেন আছে, সবাই যে যায় চলি'!
আজ যারে পাই, বক্ষে জড়াই, কাল তারি দেখা নাই,
চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে সম্মুখে শুধু চাই!
পেয়ে-পেয়ে আর হারিয়ে-হারিয়ে কেটে যায় তবু দিন—
পায়ে-পায়ে শোধে পথের যাত্রী দীর্ঘ পথের ঋণ!

গৃহ ধন জন, মিছে আয়োজন ; তুই শুধু উপাধান!
সারা জীবনের সঙ্গশেষেও মরণে রাখিস্ মান ;
সূতিকা-ঘরের প্রথম সকালে রেখেছি যে কোলে মাথা,
জানি সেই চির সাথের সঙ্গী, শেষের সঙ্গে গাঁথা!
নোয়াইয়া শির করি যে প্রণতি নিত্য নিভৃত রাতে,
সে নতি আমার সার্থক, সখি, তোরই অনুকম্পাতে।

কারে আর বলি, কেবা আছে মোর, তোরে শুধু বলি তাই,
আপন বলিতে বহুজন আছে, আপনার কেহ নাই!
বড় আশে ঘরে জেলেছিনু দীপ, রেখে গেছে শুধু কালি,
বড় সাধে যেথা বেঁধেছিনু ঘর, নীচে তার চোরাবালি!
বড় বেদনার বন্ধু আমার, করিস্ না অপরাধী,
তোরি কোলে মাথা রাখিয়া কেঁদেছি, তোরি কোলে আজো কাঁদি!

সবি তো জানিস্, তবু ফিরে' বলি—মনে পড়ে সেই রাতি ?
আরেকটি মাথা ঐ কোলে তোর ছিল শিথানের সাথী!
কত বার করে' সোহাগে আদরে সে-বুকে টেনেছে মাথা,
তোরি বুকে আর তারি বুকে ছিল ভাগের-শয়ন পাতা!
বাসরের বাতি সারারাতি ধরে' তা দেখে' মরেছে জ্বলে'—
তুই তো জানিস্ নীরব সাক্ষী, কি আর জানাব বলে'!

ক'টা বা রাত্রি,কেমনে কেটেছে—তোর চেয়ে কেবা জানে ?
সখীর মতন মিলন ঘটায়ে ছিলি তো রে মাঝখানে!
সেই বুকে-বুকে মুখে-মুখে মিল, দু'হাতে জড়ায়ে গলা,
কোণে থেকে কেউ শোনে বলে'সেই কানে-কানে কথা বলা;
সেই সারারাত জেগে ভোর করা,তোরে ঠেলে' রেখে পাশে,
জানিস্ তো সবি—লজ্জার কথা—দুদিনের ইতিহাসে!

মনে পড়ে কি রে, রাত্রি দুপুরে তোরে নিয়ে কাড়াকাড়ি,
তোরই ব্যবধান নিয়ে অভিমান, তাই নিয়ে আড়াআড়ি;
কভু বা আদরে কেতকী-কেশরে ভরি' তোরি কম কায়,
সুরভিত মন তারি মতো তোরে সুরভি করিতে চায়!
কভু রাগ ক'রে 'ঘরের সতীন' নাম দিয়ে তোরে ডাকা,
সারারাত ধরে' সাধাবার তরে তোরি বুকে মুখ ঢাকা!

স্বপ্ন ফুরালো—মরুর বক্ষে মরীচিকা গেল মরে'!
শুষ্ক কণ্ঠ, তপ্ত বালুকা—চলিয়াছি পথ ধরে';
কোথা শেষ এর, কোথা বা সীমানা, কে দেবে আমারে বলি ?
দুঃসহ এই দিবসের বোঝা বয়ে-বয়ে তবু চলি!
জীবনবন্ধু, শুধাইব তোরে, একটি শেষের কথা,—
সতীনের বুকে মাথাটি লুকায়ে কবে জুড়াইব ব্যথা!

মরুভূমিতে সোনা ফলন

আচার্য্য শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

আজ আমার শরীর খুবই অসুস্থ; বন্ধুবান্ধবদের ও আমার প্রিয়তম ছাত্রদের নিষেধসত্ত্বেও ফরিদপুর কৃষিক্ষেত্রের ডাকে আমি সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। এখানকার কৃষিক্ষেত্রের সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীমান দেবেন্দ্রনাথ মিত্র যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও অদম্য উৎসাহ সহকারে কৃষির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন তাহা যে কেবল প্রশংসার বিষয় তাহা নহে, আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়। ইনি অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মত মাসের পহেলা তারিখে মাহিনার বিল সহি করাটাই প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না। চাষীদের সহিত অবাধে ও সমানভাবে মেলামেশা করিয়া তাঁহাদের মধ্যে উন্নত প্রণালীর চাষবাসের প্রচলনের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিতেছেন। কৃষকেরাও ইঁহাকে সরকারী কর্ম্মচারী-হিসাবে দেখে না; তাহাদেরই একজন আপনার লোক বলিয়া মনে করে। বৎসরে বৎসরে এই কৃষিপ্রদর্শনীর জন্য তিনি যে কিরূপ পরিশ্রম করেন তাহা আপনারা সকলেই জানেন। ভগবান তাঁহাকে দীর্ঘজীবী করিয়া এরূপভাবে দেশের ও দশের কাজে নিয়োজিত রাখুন ইহাই আমার আন্তরিক প্রার্থনা।

ফরিদপুর জেলার ধনদৌলৎ ও শ্রমশিল্প সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের হিসাবনিকাশ খুঁটিনাটি করিয়া অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি গত বৎসর হইতে শিক্ষার্থী-হিসাবে এই কৃষিক্ষেত্রে আসিতেছি; এইবার লইয়া আমার তিনবার আসা হইল। এই জেলায় কি কি ফসল কত পরিমাণ জমিতে হয়, প্রত্যেক ফসলের গড়পড়তা ফলন ও উহার মূল্য-হিসাবে কৃষকেরা কত টাকা পায়—এই সকল তথ্য সঠিকভাবে সংগ্রহ করিতেছি। আজ আমার বেশী কথা বলিবার শক্তি নাই; তাই আজ আপনাদিগকে দু'চার কথায় দু'এক জায়গায় কি প্রণালীতে কৃষির উন্নতি হইতেছে তাহাই বলিব।

জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য সারের প্রয়োজন। আমাদের দেশের কৃষকগণ এ কথা জানিয়াও সার-প্রয়োগের দিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেয় না; গোবর ত এখন সাররূপে ব্যবহৃত হয় না বলিলেও চলে—জ্বালানিরূপেই আজকাল ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইবার জন্য সারের যে বিশেষ প্রয়োজন ইহা তিন হাজার বৎসর ধরিয়া চীনদেশের কৃষকগণ অবগত আছে; তাহারা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের দ্বারা চাষবাসের কাজ করিয়া থাকে। ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা যে, ইংলণ্ডে নানাবিধ বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া এবং নানা-প্রকার রাসায়নিক সার প্রয়োগের দ্বারাও সেখানকার কৃষকগণ চীনের কৃষকদের অপেক্ষা অধিক ফসল জন্মাইতে পারে না। চীন একটি জনবহুল দেশ; কিন্তু সেখানে একই জমি তিন চার হাজার বৎসরের উপর চাষ করিয়া চীনের অধিবাসীরা নিজেদের খাদ্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিতেছে। চীনদেশের জমি হইতে কি প্রণালীতে এত প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মাইতে পারা যায় তাহা দেখিবার ও শিখিবার জন্য অধ্যাপক কিং ১৯০৫ সালে চীনদেশ ভ্রমণ করেন।* তিনি বলেন চীনেরা একই জমি তিন হাজার বৎসর ধরিয়া চাষ করিতেছে এবং বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই জমি হইতেই যথেষ্ট পরিমাণে শস্য উৎপাদন করিতেছে। তিনি ইহাও বলেন যে, চীনদেশে কি প্রকারে জমিতে পয়ঃপ্রণালীর সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হয়, জলাভূমি ও নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত জমিগুলিকে কি উপায়ে কৃষির উপযোগী করিয়া তোলা হয়, কি প্রণালীতেই বা শস্য উৎপাদন করিবার জন্য জমিগুলিকে আবাদ করা হয়, কথায় বা মানচিত্রে তাহার স্পষ্ট ধারণা দেওয়া

* Whitney's Book—Soil and Civilisation, pp. 204-208.
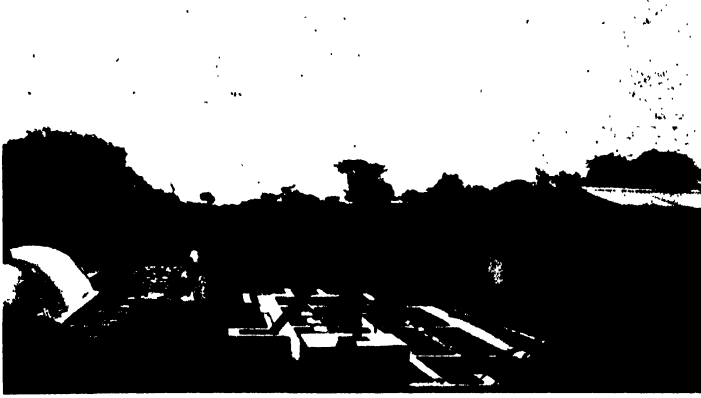
বাঙ্গালোরে মলমূত্রাদি হইতে সারপ্রস্তুত-প্রণালীর যন্ত্রাবলী

বুশেল, ইংলণ্ডে ও জার্ম্মানীতে ২৩ বুশেলের বেশী নহে। ইহা ছাড়া তিনি আর যে-সকল ফসলের ফলন দেখিয়াছিলেন তাহা আপনারা একবার শুনুন—প্রতি একারে ভুট্টা ৬০ হইতে ৬৮॥ বুশেল, আলু ২৮৬ বুশেল, মিঠাআলু ৪৪০ বুশেল, শুষ্ক জমির ধান ২০ হইতে ২৬ বুশেল, জলা জমির ধান ৪২ বুশেল। চীনদেশে বৎসরে একই জমিতে দুই তিনবার ফসল জন্মানই সাধারণ নিয়ম। চীন দেশের একজন কৃষকের পক্ষে এক একার জমি হইতে বৎসরে ১৬০ হইতে ২০০ ডলার পর্য্যন্ত পাওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নহে। এক ডলার প্রায় তিন টাকা।

কৃষি-সম্বন্ধে অপর একজন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন যে, চীনদেশে জীবের মলমূত্রাদি যাবতীয় অপবিত্র পদার্থই সেখানে সাররূপে ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ গো-বর অশ্ব-বর এবং প্রধানতঃ নর-বর সাররূপে জমিতে প্রয়োগ করা

একপ্রকার অসম্ভব। খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩৫৭ সালে চীনদেশের সম্রাট মহামান্য ইয়াও তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে প্রসিদ্ধ এন্‌জিনীয়ার ইউ-কে জলসেচ্-বিভাগের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। জলনিষ্কাশন, বন্যার জল নিয়ন্ত্রিত করা এবং বিভিন্ন প্রদেশের মৃত্তিকা পরীক্ষা করিয়া শ্রেণী-বিভাগ করাই ইঁহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। চীনদেশের সম্রাটগণ সকলেই কৃষির উন্নতির দিকে সর্ব্বদাই বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া আসিয়া ছেন এবং ইউ যে বিপুল কার্য্য-পদ্ধতির অনুসরণ করিয়াছিলেন আজ পর্য্যন্তও সেই পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য চলিতেছে।

খৃষ্টপূর্ব্ব ১১২২ সালে চৌ-বংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের প্রারম্ভ হইতে ভূমি-বিভাগের প্রথম মন্ত্রীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যাবতীয় খবর সরকারী দপ্তরে বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায়। কোন্ জমি কোন্ ফসলের উপযুক্ত, কোন্ জমি গোচারণের উপযোগী, সমস্ত আবাদী জমিতে ফসল করা, উন্নত কৃষিযন্ত্রের সদ্ব্যবহার, বিভিন্ন প্রকারের আবর্জ্জনা ও সহরের ময়লা হইতে সার প্রস্তুত-প্রণালী এবং উহা প্রয়োগ করিয়া একই জমি হইতে বৎসরে নানাপ্রকার ফসল উৎপাদন করা প্রভৃতি বিষয় জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়া উক্ত মন্ত্রীর কর্ত্তব্য ছিল। অধ্যাপক কিং বলেন যে, তিনি এমন জমিও দেখিয়াছিলেন, যে-জমি হইতে প্রতি একারে* ৯৫ হইতে ১১৬ বুশেল পর্য্যন্ত গম উৎপন্ন হয়। অথচ আমেরিকায় গমের ফলন প্রতি একারে গড়পড়তায় ১৫

বিনা সারে উৎপন্ন এক প্রকার শস্য

হয়। সমগ্র চীন ও জাপানে বিষ্ঠার আদর খুব বেশী; কিন্তু আমাদের দেশে বিষ্ঠাকে কেবল আমরা ঘৃণার চক্ষেই দেখি এবং উহাকে কাজে লাগাইবার কোন ব্যবস্থাই করি না। এইজন্য প্রত্যেক বৎসরে আমরা কোটী কোটী টাকার ফসল অপচয় করিয়া ফেলি। গত বৎসর এই

* এক একার—তিন বিঘা; এক বুশেল—এক মণ।

সার প্রয়োগে উৎপন্ন শস্য

কৃষিপ্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় আপনাদিগকে জানাইয়াছিলাম যে, বারাকপুরে প্রতি দুই বৎসর অন্তর ৩০।৪০ বিঘা জমির উপর trenching ground করা হয় ও সেই সমস্ত জমি নিলাম করা হয়। পশ্চিমা হিন্দু ও মুসলমান কৃষকেরা তিন-চার হাজার টাকা সেলামী দিয়া সারের জন্য কিনিয়া লয়। আমাদের বাংলার কৃষকেরা এর ধার দিয়াও যায় না। সেখানে হানেফ্ নামে একজন পশ্চিমা মুসলমান শাকসব্জী উৎপন্ন করিয়া বড় পাকাবাড়ী করিয়াছে।*

আমি বৎসরে বৎসরে বাঙ্গালোরে Institute of Science-এ যাই। বাঙ্গালোরে বৃষ্টিপাত অতি কম; বর্ষার দু'এক মাস ছাড়া সেখানকার মাটি সকল সময় এত বেশী নীরস থাকে যে, ঘাস তৃণাদি পর্য্যন্ত শুকাইয়া যায়; আবার সেখানে পাহাড়ে জমি। কিন্তু জলসেচনের দ্বারা ও বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া সেখানকার জমি হইতে কিরূপ সোনার ফসল উৎপন্ন করা হয় তাহা এই ছবিগুলি দেখিলেই আপনারা বুঝিতে পারিবেন। কেবল মাত্র দু'একটি ছাত্রাবাসের পাইখানার মল প্রথমতঃ একটি পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করা হয় এবং এই মলের উপর এক প্রকার জীবাণুর চাষ করা হয়; এই জীবাণুর ক্রিয়াতে মলের গন্ধ দূর হইয়া যায় এবং পরে এই গন্ধহীন মলকে জলের সহিত মিশাইয়া কিছুক্ষণ থিতানো হয়। এই মলযুক্ত জল (activated sludge) বাঙ্গালোরের মরুভূমি সম মাটিতে মাঝে মাঝে সেচন করিয়া এইরূপ সোনা ফলানো হইতেছে। আপনারা বলিতে পারেন, বাঙ্গালোর ও বাংলার মাটির অবস্থা, জলবায়ুর অবস্থা ইত্যাদি সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের, সুতরাং বাঙ্গালোরের ছবি দেখিয়া আমাদের কি উপকার হইবে? বেল পাকিলে কাকের কি? কিন্তু আমাদের এই বাংলা দেশেও উপরোক্ত প্রণালীতে মলমূত্রাদিকে সাররূপে পরিণত করিয়া মাটির উৎপাদিকা শক্তি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াইতে পারা যায়। সম্প্রতি স্বাস্থ্য-বিভাগের চেষ্টায় খড়দহের নিকটে যে-সকল পাটের কল আছে তাহার মাত্র দু-একটি কলের কুলিমজুরদের মলমূত্র ইত্যাদি উপরোক্ত উপায়ে গন্ধহীন করিবার জন্য একটি দীঘি খনন করা হইয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা হইতে বারাকপুর পর্য্যন্ত দৈনিক

সার ও বিনা সারে উৎপন্ন রাগী

যাতায়াত করেন তাঁহারা গাড়ী হইতে এই দীঘি দেখিতে পান। এই দীঘির মলযুক্ত ঘোলা জল উঠাইয়া কয়েক বিঘা জমিতে সেচন করিয়া উহাকে সারবান করা হইয়াছে।

* ভারতবর্ষ—চৈত্র ১৩৩৬

আপনারা হয় ত শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবেন যে, এই সকল জমির বার্ষিক খাজনা বিঘা-প্রতি ৮২৲টাকা; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালী কৃষকগণ এত অধিক খাজনা দিয়া এই জমি লইতে সাহস করিতেছে না—বিঘা ভুঁই ৮২৲ টাকা খাজনা দিয়া সেই জমি হইতে লাভ করা তাহাদের পক্ষে যেন একটা ভয়াবহ ব্যাপার! কিন্তু যেমন পলতা অঞ্চলে পশ্চিমারা বসবাস করিতেছে, এখানকার জমিগুলিও সেরূপ পশ্চিমারা লইতেছে। বাঙালী কৃষকদের মত তাহারা এত অধিক খাজনায় এই জমি লইতে কিছুমাত্র ভয় পায় না, কারণ তাহারা বেশ জানে ও বোঝে যে, এই সব জমিতে বার মাসে তের ফসল জন্মান যায়। এই সকল উদাহরণ হইতেই বুঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিষ্ঠাকে আমরা কতদূর কার্য্যকরী করিতে পারি ও তাহার দ্বারা আমাদের জমির ফলন কতটা বাড়াইতে পারি। কিন্তু আমরা ত চোখ চাহিয়া কিছুই দেখিব না, কেবল আরাম-কেদারায় বসিয়া পরচর্চ্চা করাই যে আমাদের স্বভাব। হা অন্ন, হা অন্ন করাটাই যেন আমাদের মজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহা একমাত্র অলসতা ও শ্রমবিমুখতার পরিচায়ক ভিন্ন আর কিছুই নহে। অনেকে আবার বলেন যে, যেখানে গড়ে মাথা-পিছু দুই তিন বিঘার বেশী জমি নাই, যেখানে হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করিয়াও কৃষকেরা দুবেলার পূরা আহারের সংস্থান করিতে পারে না, সেখানে আবার যদি ভদ্রলোকের ছেলেরা কৃষিকাজ আরম্ভ করিয়া কৃষকদিগের সহিত প্রতিযোগিতা করে তাহা হইলে কৃষকেরা দাঁড়াবেই বা কোথায় এবং অর্থ-সমস্যারই বা কি সমাধান হইবে?

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালোরের কৃষিক্ষেত্রে উৎপন্ন একটি ৭॥ পাউণ্ড ওজনের পেঁপে ধরিয়া আছেন

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, যখন বাংলা দেশের মাথা-পিছু গড়পড়তা আয় দশ পয়সা মাত্র, তখন আর অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টারই বা কি দরকার? হাত-পা গুটাইয়া চুপচাপ বসিয়া থাকাই ত ভাল। কিন্তু জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াইয়া উন্নত শ্রেণীর শস্যাদি জন্মাইয়া দেশের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়ান যাইতে পারে। বিখ্যাত লেখক সুইফ্‌টের কথা আপনারা জানেন; তিনি বলিয়াছেন, যিনি একগাছি তৃণের জায়গায় দুই গাছি তৃণ জন্মাইতে পারেন তিনিই দেশের পরম উপকারক। আমাদের দেশে তথাকথিত ভদ্রসম্প্রদায় কৃষিকাজকে এখনও অসম্মানের

চক্ষে দেখিয়া থাকেন। স্কুলকলেজের ছেলেরা নিজহাতে কৃষিকাজ করিতে নারাজ। কিন্তু সম্প্রতি ডাক্তার জিয়াউদ্দিন ইয়োরোপ ভ্রমণ করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একখানি পুস্তক লিখিয়াছেন; তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, বিলাতে পল্লীগ্রামে যে-সকল উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে তাহার মধ্যে অনেক বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিজহাতে চাষবাস করে, নিজেরাই বাজারে তরিতরকারী লইয়া বেচিয়া আসে ও তাহার হিসাব রাখে। এইরূপেই এই-সব ছেলেরা "মানুষ" হয়। কোন কোন বিদ্যালয়ে কৃষিশিক্ষা আবার বাধ্যতা-মূলক। আয়ার্ল্যাণ্ডের অপর

সার ও বিনা সারে উৎপন্ন বিলাতী বেগুন

নাম Emerald Isle, অর্থাৎ সবুজ ঘাসের দেশ। সেখানে গোধনই শ্রেষ্ঠ ধন। গরুর খাদ্যের জন্য আয়ার্ল্যাণ্ডের লোকেরা কত রকমের ঘাস জন্মায়; কিন্তু আমাদের দেশে আমরা গরুকে মা ভগবতী বলিয়া তাহার শিঙে কপালে সিঁদুর চন্দন দিয়া পূজা করিয়াই ক্ষান্ত থাকি। গরুর উপযুক্ত খাদ্যের কোন ব্যবস্থা করি কি? শুখ্‌না খড়ই তাহার একমাত্র আহার; আবার ফরিদপুরে শুনিলাম, খড় একপ্রকার দুষ্প্রাপ্য; এখানকার জেলখানার জন্য যে খড়ের দরকার হয় সে খড় মণ-প্রতি দুই টাকা, আড়াই টাকা মূল্য দিয়া রংপুর অঞ্চল হইতে আনাইতে হয়। উন্নত কৃষিপ্রণালী অবলম্বন করিয়া বৎসরে একই জমিতে আমাদের নিজেদের ও গরুর খাদ্য অনায়াসে জন্মাইতে পারা যায়। জলসেচনের ও সারপ্রয়োগের দ্বারা জমির উর্ব্বরা শক্তিকে অটুট রাখা যায়। আমি বরাবর বলিয়া থাকি, আমি একজন রাসায়নিক, টেষ্ট টিউব হাতে করিয়া কাজ করাই আমার অভ্যাস; প্রত্যক্ষ প্রমাণ ছাড়া আমি কোন কথা বিশ্বাস করি না বা বলি না। আমি যাহা বলিতেছি তাহার প্রমাণ ত এই ফরিদপুরেই যথেষ্ট আছে। এই কৃষিক্ষেত্রে যে গম জন্মিয়াছে তাহা আপনারা দেখিবেন; কই আশেপাশে ত এমন উৎকৃষ্ট গম জন্মায় নাই; সময়-মত চাষ, জমির তদ্বির ও সার-প্রয়োগই ইহার একমাত্র কারণ। গতবারে যখন এখানে আসিয়াছিলাম তখন এখানকার পুলিশ সাহেব মিষ্টার আজিজুল্ হকের বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম; তাঁহার বাগানে নানারকম তরিতরকারী ও ফুল ইত্যাদি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম; এবারেও তাঁহার বাগান দেখিতে গিয়াছিলাম; একটা বিলাতী বেগুনের গাছ কত বড় হইয়াছে ও তাহাতে কত পরিমাণ বিলাতী বেগুন ফলিয়াছে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হয়। তাঁহার বাগানে কড়াইসুঁটির গাছ দেখিয়া অবাক হইয়াছি; কেমন বড় বড় সুঁটি ও কত সুস্বাদু। ইহা ছাড়া ফুলের বাগানেরই বা বাহার কি। সময়-মত জমি তৈয়ারী, জলসেচন ও সারপ্রয়োগ করিয়া এইরূপ উৎকৃষ্ট ফসল পাওয়া গিয়াছে। একটু পরিশ্রম করিলে যে আমরা আমাদের নিজের নিজের তরিতরকারী অনায়াসে উৎপন্ন করিতে পারি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। অনেকে বলেন, সময়ের অভাব; কৃষিকাজ করিব কখন? কিন্তু তাস পাশা দাবা খেলিবার সময়ের ত অভাব হয় না! কাজ করিবার প্রবল ইচ্ছা থাকিলে সময়ের অভাব হয় না। আমরা যেমন সময়ের অপব্যবহার করি, জগতে আর কোন জাতি এমন করে না। আমি আজকাল চীনদেশ সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেছি; চীনেদের অভিধানে আলস্য বলিয়া কোন কথাই নাই। এমন কি কলিকাতার চীনেপাড়াগুলিতে ঘুরিলে এ কথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়; তাহারা সর্ব্বদা কাজে ব্যস্ত; এমন কি তাহাদের মহিলাগণও দুপুরে কিংবা অপরাহ্ণে পরিশ্রমশীল কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। দিবানিদ্রা যে কি তাহারা জানে না। আর আমাদের রমণীগণ? আপনারা হয় ত অনেকে আগাসিজের (Prof.

ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রের গমের জমিতে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, কৃষিক্ষেত্রের তত্ত্বাবধায়ক রায়সাহেব দেবেন্দ্রনাথ মিত্র এবং শিক্ষাধীন ভদ্র যুবকগণ

লেখক দৌলতপুর কলেজের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র আমাকে এ বিষয়ে যে বিবরণ পাঠাইয়াছেন তাহা আপনাদিগকে একবার শুনাইয়া আমার অদ্যকার বক্তব্য শেষ করিব। সতীশবাবু লিখিয়াছেন,"আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ একটু কষ্টকর ব্যাপার। সকল সংবাদ সত্যভাবে কেহ বলে না, পাছে কোন নূতন ট্যাক্স প্রভৃতির বিপদ হয়। যাহা হউক, এখন হইতে ক্রমান্বয়ে আপনাকে কিছু কিছু রিপোর্ট পাঠাইব। অদ্য কিছু খবর লিখিলাম।

Agassiz) নাম শুনিয়াছেন; সময়ের সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে তিনি কি বলিতেন একবার শুনুন, "আমি বুঝিতে পারি না লোকে কেমন করিয়া অলসভাবে সময় কাটায়, আমার ইহাও বুঝিতে খুব কষ্ট হয় যে, লোকে কি করিয়া বলে যে, তাহাদের সময় আর কাটিতেছে না। আমি যখন নিদ্রামগ্ন থাকি কেবলমাত্র সেই সময় ছাড়া আমি প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই নিজেকে কোন-না-কোন আনন্দদায়ক কাজে নিযুক্ত রাখি। যে সময়টা তোমরা কি করিবে ভাবিয়া পাও না, কাজের অভাবে যে সময়টা তোমাদের পক্ষে কষ্টদায়ক হয় সেই সময়টা তোমরা আমাকে দাও, আমি উহাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্যবান উপহার বলিয়া গ্রহণ করিব। আমি ভাবি দিন যদি না ফুরাইত তাহা হইলে আমি কত বেশী কাজ করিতে পারিতাম।"

আজ আর আমার বেশী কিছু বলিবার ক্ষমতা নাই। আমি যখন গ্রীষ্মাবকাশে খুলনার নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াই তখন কৃষি সম্বন্ধে যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা, এবং কে কোথায় চাষবাস করিয়া তরিতরকারী জন্মাইয়া গ্রামে থাকিয়া নিজেদের আহার সংস্থানের চেষ্টা করিতেছে সে বিষয় অনুসন্ধান করি। যশোহর-খুলনার ইতিহাস-

১। শ্রীহীরালাল মিত্র, সাং সেনহাটি গত বৎসর ৴১৮০ বিঘা জমিতে বেগুন, আক, পাট ও কপি জন্মাইয়াছিলেন। বেগুনে ২৬৲, পাট ২৫৲, ইক্ষু ১৫০৲, বাঁধাকপি ১২৭৲; মোট ৩২৮৲ বিক্রয় করেন। কিন্তু গত বৎসর তথায় এই কার্য্যের প্রথম বর্ষ বলিয়া কূয়া কাটা, জঙ্গল পরিষ্কার করা, জমি সমতল করা ও বেড়া ঘেরা প্রভৃতি কার্য্যে প্রায় ৩০০৲ খরচ গিয়াছে। অতি অল্প পরিমাণই লভ্যাংশ হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে যে-সব ফসল জন্মান হইয়াছে তাহাতে ইক্ষু ১৭৫৲, পাট ৩০৲, বেগুন ২৫৲, কপি ১২৫৲; মোট আনুমানিক ৩৫৫৲ টাকা লাভের মধ্যে মজুর প্রভৃতির আনুমানিক খরচ ১০০৲ টাকা যাইতে পারে; সুতরাং লভ্যাংশ ২৫০৲ টাকার কম হইবে না। তাঁহার জমি মাত্র পৌনে দুই বিঘা।

২। দৌলতপুর হইতে দুই মাইল দূরে গাঁইকুড় গ্রাম। সেখানে মেনাজ সেখ্ বাস করে। সে প্রথম একটি পুকুর কাটিয়া তাহার পাহাড়ের উপর আনারস জন্মায়। অল্প পরিশ্রমে উহাতে প্রচুর আনারস হয়, এবং আনারস যেমন বড় তেমনই সুমিষ্ট হয়। উহার নমুনা প্রতি বৎসর আপনাকে পাঠাইয়া থাকি। দশ-পনের বৎসরের মধ্যে সে মোট তিন-চারটি পুকুর কাটিয়াছে,

পুকুরের জোরাল মাটির পাহাড়ের উপর আনারস গাছ লাগাইয়া প্রতি বৎসর সহস্রাধিক টাকা লাভ করিতেছে। তাহার জমির পরিমাণ চার-পাঁচ বিঘার অধিক নহে। উহাতে এ বৎসর চারি হাজারের অধিক আনারস হইয়াছে, লভ্যাংশ ৮০০৲ হইতে ১,০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত। মেনাজ সেখ বেগুন, কুমড়া, ঝিঙ্গা প্রভৃতি অন্যান্য তরকারীও উৎপন্ন করে। তাহাতেও বারমাস তাহার ব্যবসা চলে। অকালে আনারসগুলি ৵০ আনা হইতে ১৷০ সিকা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়, যথাকালে তাহার আনারসগুলির বিশেষত্ব আছে বলিয়া ৶০ আনা হইতে ।৵০ আনা পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়। এই আনারসের ব্যবসায় সে সঙ্গতিসম্পন্ন হইয়াছে।"

আর আমরা ভদ্রলোক ঘরবাড়ী ছাড়িয়া বিদেশে গোলামি করিতে যাই, আর চাষকে চাষার কাজ বলিয়া উপহাস করিয়া থাকি! *

---

* ফরিদপুর সরকারী কৃষিক্ষেত্রে কৃষি ও শিল্প-প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণ-সভায় মৌখিক বক্তৃতার সারাংশ শ্রীরবীন্দ্রনাথ মিত্র বি-এ কর্ত্তৃক অনুলিখিত।

অপেক্ষায়

শ্রীঅনিলবরণ রায়

ছিল যবে শূন্য সব, শব্দ স্পন্দহীন,
নাহি ছিল সূর্য্য চন্দ্র নাহি গ্রহ তারা,
ঘনীভূত ছিল শুধু অনন্ত আঁধার—
সে-নিবিড় তমোপুঞ্জ করি বিদারণ
কোন্ শক্তিবলে কোন্ মায়ার কুহকে
করিলে জগৎমঞ্চে জ্যোতির প্রকাশ!
আজো নিত্য হয় তার পুনরভিনয়
প্রকৃতির বক্ষোপরি; আলোক পরশে
জাগি বিহঙ্গম নিত্য গাহে তব জয়;
পুষ্পে পুষ্পে ফুটে উঠে নব অনুরাগ,
বিপুল বিস্ময়ে ধরা প্রণমে চরণে!
জানি আমি একদিন এমনি করিয়া
নূতন আলোক মাঝে উঠিব জাগিয়া
তোমারি কৃপায় কেটে যাবে মোহঘোর
উষার কিরণছটা লাগিয়া নয়নে;
আপনি উঠিবে বাজি হৃদয়বীণায়
তোমার বন্দনা-গীতি, ভরিবে ধরণী
দিব্য রূপে, রসে, গন্ধে; প্রভাতের গানে
এ-জীবন কুঞ্জ মম হবে মুখরিত—
তাই উর্দ্ধমুখে আছি শান্ত অপেক্ষায়।

রূপ ও রস

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ

আমি সাহিত্যের রস এবং সাহিত্যের রূপের কথাই বলিতেছি। এ প্রবন্ধ সাহিত্যের আলোচনা, রূপ-রসের দার্শনিক ব্যাখ্যা নয়।

আমরা সকলেই—ভাল হোক মন্দ হোক—অল্পাধিক পরিমাণে প্রতিমা গড়িতে পারি। প্রতিমার মধ্যে প্রাণের উদ্বোধন করিতে পারে কয়জন ?

আকার দিবার ক্ষমতা মন্ত্রীপুত্রের ছিল। প্রাণসঞ্চারিণী বিদ্যা আয়ত্ত করিয়াছিল শুধু রাজপুত্র। কবি রাজপুত্র।

কোটালের ছেলে হয়ত অস্থিসংস্থান করিলেও করিতে পারিত, প্রকৃত রূপ দিবার ক্ষমতা তাহার ছিল না। প্রতিমা গড়িবার, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার শক্তি—উচ্চতর শক্তি। মন্ত্রীপুত্র আর্টিষ্ট, রাজপুত্র কবি।

মানুষ যদি ভগবানের সৃষ্টি হয় ত ভগবান একাধারে কবি ও কলাবিৎ। মানুষও ভগবান। তাই মানুষ গড়িতেও পারে এবং তাহার সৃষ্টিকে জীবন্তও করিতে পারে। মানুষের সৃষ্টি মানসিক। বাহিরের দিক দিয়া, ব্যবহারের দিক দিয়া প্রাণচঞ্চল না হইলেও মথুরার বুদ্ধমূর্ত্তি তাহার প্রশান্তি স্থৈর্য্য করুণা ও নির্লিপ্ততা লইয়া, অথবা অজন্তা প্রাচীরে অঙ্কিত অপ্সরোযুগল তাহাদের উদ্যত গমনভঙ্গী এবং দেহের ললিত লীলা লইয়া মানুষের কল্পনাকুশল মনের কাছে চিরদিন সজীব।

এই মূর্ত্তি-বিধায়িনী শক্তি আর্ট এবং মূর্ত্তিকে প্রাণময় মনোময় কামনাময় অনুভূতিময় করিবার শক্তি কবিত্ব। কবি নিজের জীবন দিয়া কাব্যের জীবন সঞ্চার করে, নিজের আনন্দ-বেদনায় কবিতাকে মানবী করিয়া তোলে। সকল কলা রচনাই আর্ট ও কাব্যের সম্মিলন।

কাব্য হোক, চিত্র হোক, সঙ্গীত হোক, যে-কোন কলাবস্তুকে দুইদিক দিয়া পরীক্ষা করা চলে। এক তার বাহিরের দিক—রূপ, আরেক তার অন্তরের দিক—রস। রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, রস আমরা অনুভব করি। দেখিতে পাই বলিয়া রূপ বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু, কিন্তু রস উপলব্ধির বিষয়।

রূপ ও রসের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। রূপের ভিতর দিয়াই আমরা রসের সন্ধান পাই। রসের আধার রূপ। প্রাণহীন দেহের মত রসহীন রূপের বরং কল্পনা করা চলে, কিন্তু রূপহীন রসের অস্তিত্ব নাই।

রূপে ও রসে সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। রীতি, ভঙ্গী, বাক্য ও অর্থের গৌরব, বিষয়ের সংস্থান, রচনার সজ্জা—এ-সব হইল সাহিত্যের রূপ। যে রূপ দিতে পারে সে-ই আর্টিষ্ট।

যেখানে শুধু বুদ্ধিমূলক বস্তু লইয়াই আলোচনা, ভয় বিস্ময় প্রেম কৌতুক ক্রোধ কামনার স্থান যেখানে নাই, সেখানে সুগঠিত হইলেও রচনা প্রকৃত সাহিত্য নয়। গঠন-কৌশল আমাদের মনের তৃপ্তি বিধান করে বলিয়া আমরা রচনাকে কখনো কখনো সাহিত্য পদবাচ্য করি। সেখানে শুধু আর্ট আমাদের মনকে মুগ্ধ করে। রচনা যেখানে সাহিত্য, সেখানে মানবহৃদয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত স্পষ্ট। সংশয়াত্মিকা বুদ্ধি নয়, এই মানবহৃদয় রসের উৎস। কাব্য শুধু আর্ট নয়, কাব্য রসাত্মক।

কবির সহমর্ম্মী হইয়া কাব্যে ও সাহিত্যে আমরা যে চিরনূতন আস্বাদ লাভ করি তাহাই রস। রস—কথা নয়, কল্পনা নয়, রীতি নয়, অর্থ নয়। রসকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে হইলে এ-গুলির একান্ত প্রয়োজন বটে, এ সকলের মিলনজাত বস্তুও কিন্তু রস নয়। রস ভাবও নয়। ভাববস্তু যখন কবির হৃদয়াবেগে রূপান্তরিত হইয়া পাঠকের মনে আন্দোলন উপস্থিত করে তখন মাত্র তাহা রসে পরিণত হয়। কবি ও পাঠকের মনের সম্বন্ধের উপর রসের প্রগাঢ়তা নির্ভর করে। এ সম্বন্ধ অনির্দ্দিষ্ট হইলে রসের উদ্বোধনও অস্পষ্ট হইয়া ওঠে। তাই অরসিকে রসের নিবেদন ব্যর্থ হইয়া যায়।

কাব্যের যত সূত্র সংজ্ঞা সমালোচনা ব্যাখ্যা আছে, তাহাদের মধ্যে 'বাক্যং রসাত্মকম্ কাব্যম্' এই ছোট অর্থ-নির্দ্দেশটি যেমন স্বল্পপরিসর তেমনি সুন্দর।

প্রথমে বাক্যের কথা ধরা যাক। যাহা কিছু ব্যক্ত করা যায় তাহাই বাক্য, ইংরেজিতে যাকে বলে expression. সকল সাহিত্যই কতকগুলি ভাব ও ধারণার প্রকাশ। শুধু বাক্য নয়, শুধু expression নয়, কাব্য এক বিশেষ ধরণের বিশেষ গড়নের বাক্য। সে কেমন বাক্য, কোন্ ধরণের অভিব্যক্তি? না—সে অভিব্যক্তি রসাত্মক। কাব্য রসাত্মক বাক্য।

'রসাত্মক বাক্যে'র মধ্যে দুটি কথা আছে, রস ও বাক্য। এই দুটি কাব্যের মুখ্য জিনিষ, মূল উপাদান, আর-সব গৌণ। কাব্যের মৌলিক লক্ষণ রস। এই লক্ষণ নিরূপণে কাব্যের মূলতত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল।

থিওডোর ওয়াটস-ডান্টন কাব্যকে দুইভাগে দেখিয়াছেন —Poetry as an energy and as an art. কাব্য এক ভাবে কলা, আরেক ভাবে শক্তি। অর্থাৎ দেহের দিক দিয়াও কাব্যবিচার চলে আবার প্রাণের দিক দিয়াও কাব্যকে দেখা যায়। কোথাও-বা কাব্যের প্রাণশক্তি প্রাধান্যলাভ করিয়াছে, আর কোথাও কাব্যের রূপ প্রাণকে আচ্ছন্ন করিয়াছে।

হিন্দু দার্শনিকেরা বলেন, দেহ ও প্রাণ লইয়া মানুষ নয়, এমন-কি দেহ ও মন লইয়াও মানুষ নয়। দেহ ও মনকে যে চালায় সে আত্মা। হিন্দু আলঙ্কারিকেরাও বলেন, ভাব ও রূপেই কাব্য সম্পূর্ণ নয়। ভাবকে যদি কাব্যের প্রাণ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ভাবের অতিরিক্ত আরো কিছু কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায়, তাহা রস। রস কাব্যের আত্মা।

কাব্যের যে বিচার, সাহিত্যেরও সেই বিচার। কাব্য কেবল ছন্দ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ নিয়মের অধীন।

আমরা দুই রকমের কবি দেখিতে পাই। এক ধরণের কবির অন্তর্দৃষ্টি গভীর। তাহারা কাব্যের বহিঃসজ্জার জন্য ব্যস্ত নয়। দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে যে অনুভূতির সাক্ষাৎলাভ করে সেই অনুভূতিকে তাহারা যে-কোন ভাষায়, যে-কোন ভঙ্গীতে প্রকাশ করিতে চায়। তাহাদের কাব্যের কর্কশ বহিরাবরণ ভেদ করিতে পারিলে আমরা অপূর্ব্ব রসের সাক্ষাৎ পাই। ব্রাউনিং এইরূপ কবি। ব্রাউনিঙের কাব্যে রূপ গৌণ, রসই প্রধান বস্তু। ভবভূতিও এমনি রসিক কবি।

ব্রাউনিঙের সমসাময়িক টেনিসনের কাব্য আলোচনা করিলে ইহার বিপরীত দেখিতে পাই। ভাষার সুষমা, ছন্দের লালিত্য, বাক্যের বিন্যাস—ইহাই টেনিসনের প্রধান লক্ষ্য। তাঁহার কাব্যে রূপ রসকে অতিক্রম করিয়া গেছে। ভারতচন্দ্রও এমনি রূপ দিয়া কাব্যকে বড় করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যাঁহারা আর্টিষ্ট তাঁহারা রসের শ্রেষ্ঠতা নিকৃষ্টতা বিচার করেন না, কিন্তু তাঁহারা যে-টুকু রস ফুটাইতে চান তাহা পরিপূর্ণরূপে ফুটাইতে পারেন।

আলঙ্কারিকেরা বলেন রস নয় প্রকার—আদি বীর করুণ অদ্ভুত হাস্য ভয়ানক বীভৎস রৌদ্র শান্ত। বাৎসল্যকে ধরিয়া কেউ বলেন দশ। ইহার উপর কেহ যোগ করেন ভক্তি। এ যেন কবিরাজের রসের বিভাগ—কটু তিক্ত কষায় লবণ অম্ল মধুর, কবির নয়। তাই ভবভূতি বলিয়াছেন, নিমিত্তভেদে একই রস বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন রূপে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভবভূতি রসকে এক বলিয়া ধরিয়াছেন, কারণ ভবভূতি কবি।

ঋষিরাও জানিয়াছেন—রস এক, কেন-না ঋষি ও কবি উভয়েই সত্যদর্শী। ভগবানের কথা বলিতে গিয়া তাই তাঁহারা বলিয়াছেন—রসো বৈ সঃ।

রস ন'টি নয়, দশটিও নয়, রস অসংখ্য, অর্থাৎ রসের প্রকাশ অনন্ত। অথচ রস এক।

রসো বৈ সঃ। সে কি? না—সে এক অনুভূতি, আনন্দময় অনুভূতি। জ্ঞানের নয়, কর্ম্মের নয়, কামনার নয়, সে শুধু অনুভূতির বিষয়।

এই ধ্যান ও ধারণার বস্তু, এই আনন্দময় অনুভূতি—রস। ধর্ম্মের দিক দিয়া ধ্যান ও ধারণা যাহা, কাব্যের দিক দিয়া কল্পনাও তা-ই। সরস বলিতে আমরা যে রস বুঝি, 'একো রসঃ' বলিতে ভবভূতি যে রস বুঝিয়াছেন, 'রসো বৈ সঃ' বলিতে ঋষিরা যে রসের কথা বলিয়াছেন, সে এই রস, অনুভূতির ভিতর দিয়া যা আমরা উপভোগ

করি। আস্বাদনের রস আমরা বহিরিন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করি, কাব্যের রস, ঋষিপ্রোক্ত রস আমরা অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া উপভোগ করি। উপভোগ করি বলিয়া আমরা আনন্দ পাই। রস তাই আনন্দময় অনুভূতি।

আর একবার ওয়াট্‌স-ডান্টনের কাব্য-বিচারে ফিরিয়া আসা যাক। তাঁহার মতে কাব্য প্রথমত any expression of imaginative feeling অর্থাৎ কল্পনাত্মিকা অনুভূতির প্রকাশ, দ্বিতীয়ত কাব্য ললিত কলাগুলির একতম, one of the fine arts. কাব্যধর্ম্মের এই বিবৃতি অতি যথার্থ।

আমরা দেখিয়াছি, রূপ দেওয়ার কৌশলই কলা বা আর্ট। চিত্র সঙ্গীত কাব্য প্রভৃতি রচনার সম্পর্কে আমরা কিন্তু আর্টকে একটি বিশেষণে বিশেষিত করি, এগুলিকে বলি ফাইন আর্টস বা ললিতকলা। ললিত কলার উদ্দেশ্য সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। যে-সকল কলায় সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, আর্টের অন্তর্গত হইলেও সেগুলিকে আমরা ফাইন আর্টস বলি না। প্রকাশ-কৌশলের উপর বিশেষ-ভাবে জোর দিবার জন্যই সমালোচক দ্বিতীয় সূত্রটিতে কাব্যকে ললিতকলা বলিয়া ধরিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, রস অনুভূতি মাত্র। দেখিয়াছি যাহা ব্যক্ত করা হয়, তাহাই বাক্য; কাজেই বাক্যকে expression বলিলে ভুল করা হয় না। সুতরাং any expression of imaginative feeling আর 'রসাত্মকম্ বাক্যম্' এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য নাই বলিলেই হয়, প্রভেদের মধ্যে শেষেরটি সংস্কৃতে আর আগেরটি ইংরেজিতে লেখা।

অতএব কাব্যে সাহিত্যে বা যে-কোন কলারচনায় রূপের বিচারই চরম নয় এবং রসের বিচারও চূড়ান্ত নয়। চিত্রে দেখি শিল্পীর মনোভাব বর্ণে ও রেখায় মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। শিল্পীর মনের আবেগ যে-পরিমাণে দর্শকের চিত্তে সঞ্চারিত হয়, রসসৃষ্টি হিসাবে রচনা সেই পরিমাণে সার্থক। কিন্তু ভাব-নিরপেক্ষ হইয়া রূপ-হিসাবে বর্ণ ও রেখার সমগ্রতারও একটা মূল্য আছে।

বলিবার সুবিধা হয় বলিয়া আমরা রূপ ও রসকে পৃথক করি। সত্য কথা বলিতে গেলে রূপ ও রসের পৃথক অস্তিত্ব নাই। রসকে অবলম্বন করিয়া রূপ আপনাকে প্রকাশ করে। আবার রূপের আশ্রয়ে রস ফুটিয়া ওঠে। অবচ্ছিন্নভাবে ধরিলে কথা দুইটি নিরর্থক হইয়া পড়ে।

রস থাকিলে রূপ থাকিবেই। আবার রূপের অন্তরে রসের সন্ধান কিছু-না-কিছু মিলিবেই। এমন রচয়িতা আছে রূপেই যাহার আগ্রহ অধিক। আবার এমন স্রষ্টাও আছে রসেই যাহার পরিতৃপ্তি। কাহারও রচনায় দেখি রূপ রসকে ছাড়াইয়া গেছে, কাহারও রচনায় দেখি রসের পরিস্ফূর্ত্তির কাছে রূপ ম্লান হইয়া আছে।

দু'জন শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবির কাব্যের আলোচনা করা যাক। উভয়েই রসিক। তবে বিদ্যাপতি প্রধানত রূপের পূজারী, চণ্ডীদাস মূলত রসের উপাসক।

জলধর তিমির　　চামর জিনি কুন্তল
অলকা ভৃঙ্গ শৈবালে।
ভাঙলতা ধনু　　ভ্রমর ভুজঙ্গিনী
জিনি আধ-বিধু বর ভালে॥
নলিনী চকোর　　সফরী সব মধুকর
মৃগী খঞ্জন জিনি আঁখি।
নাসা তিলফুল　　গরুড়-চঞ্চু জিনি
গিধিনী শ্রবণ বিশেখি॥

রাধার কুন্তলের সঙ্গে জলধর তিমির এবং চামর, অলকার সঙ্গে ভৃঙ্গ এবং শৈবাল, ভ্রূলতার সঙ্গে ধনু ভ্রমর এবং ভুজঙ্গিনী, কপালের সঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্র, নয়নের সঙ্গে নলিনী চকোর সফরী মধুকর মৃগী এবং খঞ্জন, নাসিকার সঙ্গে তিলফুল এবং গরুড়-চঞ্চু, শ্রবণের সঙ্গে গৃধিনী, এমনি করিয়া বিদ্যাপতি উপমার পর উপমা সাজাইয়া চলিয়াছেন। উপমার ঐশ্বর্য্যের ভিতর দিয়া রাধার রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বিদ্যাপতির পদও রূপে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের দু'একটি পদাংশের তুলনা করা যাক।

সই, কিবা সে মধুর হাসি।
হিয়ার ভিতর　　পাঁজর কাটিয়া
মরমে রহিল পশি॥

কিংবা—

ভালের সিন্দুর　　আধেক আছয়ে
নয়নে আধ কাজল।

চাঁদ নিঙাড়িয়া এমন করিয়া
কেবা নিল এ সকল ॥

এখানে দেখি বাহিরের দিকে চণ্ডীদাসের চোখ নাই। রূপ দিবার চেষ্টা নাই। অন্তরের রস আপনার আবেগে আপনাকে ব্যক্ত করিয়াছে। তাই তাঁহার পদাবলীর মধ্যে স্বল্প এবং সামান্য কথার আবরণে ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব্ব রসের সাক্ষাৎ পাই।

হইতে হইতে অধিক হইল
সহিতে সহিতে মনু।
কহিতে কহিতে তনু জর জর
পাগলী হইয়া গেনু ॥

অথবা—

সে রূপ সায়রে নয়ন ডুবিল
সে গুণে বাঁধিল হিয়া।
সে সব চরিতে ডুবিল যে চিতে
নিবারিব কিবা দিয়া ॥

এমন সব পদ চণ্ডীদাসেই সম্ভব।

ইংরেজি হইতে উদাহরণ লওয়া যাক। শেলী ও কীট্‌সের কাব্য আজ ক্ল্যাসিকের অন্তর্গত। উভয়ের রসাভিব্যক্তির শক্তি সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু কিছু অবহিত হইলেই দেখা যাইবে, একজন রস অপেক্ষা রসমূর্ত্তিরই অধিক পক্ষপাতী, আর একজন রূপকে উপেক্ষা না করিয়াও বিশেষভাবে রসের অনুরাগী।

Yet she had,
Indeed, locks bright enough to make me mad;
And they were simply gordian'd up and braided,
Leaving, in naked comeliness, unshaded,
Her pearl round ears, white neck, and orbed brow;
The which were blended in, I know not how,
With such a paradise of lips and eyes,
Blush-tinted cheeks, half smiles, and faintest sighs,
That when I think thereon, my spirit clings
And plays about its fancy ....

বেণী-নিবদ্ধ উজ্জ্বল অলকদাম, সুগোল মুক্তামসৃণ শ্রবণযুগল, শুভ্র গ্রীবা, বঙ্কিম ভ্রূ, নয়ন এবং অধরের অতুল ঐশ্বর্য্য, রক্তিম কপোল, স্মিত হাসি এবং অতি ঈষৎ দীর্ঘশ্বাস—ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কীট্‌স তাঁহার অসাধারণ রূপ-বিধায়িনী শক্তির প্রয়োগ করিয়াছেন।

এইরূপ বর্ণনার সম্পর্কে শেলীর কাব্য-পদ্ধতি আলোচনা করা যাক।

A lovely lady garmented in light
From her own beauty—deep her eyes, as are
Two openings of unfathomable night
Seen through a Temple's cloven roof—her hair
Dark—the dim brain whirls dizzy with delight,
Picturing her form.

নিজের সৌন্দর্য্যের আলোকই যাহার পরিধান, অতলস্পর্শ রাত্রির মত গভীর যাহার চোখ, কাল যাহার কেশ, যাহার মূর্ত্তি কল্পনা করিতে আনন্দের আতিশয্যে দুর্ব্বল মস্তিষ্ক ঘুরিয়া যায়, সেই নারীকে আঁকিতে গিয়া শেলী বাহিরের রূপ অপেক্ষা হৃদয়ের অনুভূতিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। শেলী তাই মূলত রসের উপাসক।

রূপ ও রসের পরিপূর্ণ সুসঙ্গতি দু'একজন শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যেই দেখিতে পাই। তাই কালিদাসের কাব্য-সুষমা আমাদের চিরদিন আনন্দবিধান করে। কালিদাস কবি-শ্রেষ্ঠ।

বাক্যে বর্ণে সুরে প্রস্তরে আমরা নানারূপে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারি। বিষয়ের নিজস্ব মহিমা অনুভূতির গভীরতার সঙ্গে মিলিত হইয়া রসের উৎকর্ষ বিধান করে। যে-সকল ভাব অল্পসংখ্যক মানুষের মনেই সীমাবদ্ধ, প্রকৃত রসোদ্বোধনে সেগুলি বিশেষ সহায় নহে। শ্রেষ্ঠ রস বিশ্বজনীন ভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ভাবের মহিমা ও রসের শ্রেষ্ঠতা বিচার না করিয়া যখন আমরা যে-কোন বিষয়ের প্রকাশের সৌষ্ঠবের দিকে মাত্র লক্ষ্য রাখি, তখন আমরা রূপকে প্রধান করি। কেমন করিয়া প্রকাশ করিব তাহার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া যখন শ্রেষ্ঠ ভাবটির দ্বারাই আমরা অনুপ্রাণিত হই, তখন রসই প্রধান বস্তু হইয়া পড়ে।

রস যিনি অনুভব করেন তিনি দ্রষ্টা। সেই রসকে যিনি রূপ দেন তিনি স্রষ্টা। যিনি শুধু দ্রষ্টা তিনি ঋষি হইতে পারেন, কবি নন। স্রষ্টাই শুধু কবি, কেন-না সৃষ্টির মধ্যে রস ও রূপ একত্রে মিলিয়াছে।

আজকাল আর্টিষ্ট কথাটির গৌরব বাড়িয়াছে। কলারচনায় রূপ-নিরপেক্ষ রস নাই, রস-নিরপেক্ষ রূপও নাই। আমরা রূপকে রস হইতে পৃথক করিয়া দেখি না। রসই রূপায়িত হইয়া নূতন সৃষ্টি সম্ভব করে। তাই আর্টিষ্ট অর্থগৌরবে আজ স্রষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছে।*

* রবি-বাসরের অষ্টম অধিবেশনে পঠিত

ভাইফোঁটা

শ্রীসীতা দেবী

কলিকাতার গলির ভিতর ছোট একটি বাড়ী। এক-তলায় এক ঘর ভাড়াটে, দোতালায় আর এক ঘর। দোতলাবাসীরা নীচের মানুষ কয়টিকে অবজ্ঞার চোখে দেখে, অনুগ্রহ করিয়া মাঝে মাঝে কথা বলে, বেশীর ভাগ সময়ই দেখিতে না পাইবার ভাণ করিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যায়।

একতলায় দুইখানা ছোট ছোট থাকিবার ঘর, একটা তাহার চেয়েও ছোট রান্নাঘর। রান্নাঘরে বসিয়া একটি তরুণী বার্লি জ্বাল দিতেছে, তাহার পাশে একটা কাঁসিতে বেগুন, মূলা, ডাঁটা কোটা রহিয়াছে, অল্প দূরে কুলায় চাল ঝাড়া রহিয়াছে।

শুইবার ঘর হইতে কাতরকণ্ঠে ডাক আসিল, "মা, তোমার আর কত দেরি? আমার বড় খিদে পেয়েছে ?"

তরুণী সান্ত্বনার স্বরে বলিল, "এই যে বাবা হয়ে গিয়েছে, আর দুমিনিটের মধ্যে পাবে।" তাহার পর অস্ফুটস্বরে বলিল, "রোগা ছেলেটাকে এক ঝিনুক দুধ দেবার ক্ষমতা নেই, এই জল খেয়ে মানুষে বাঁচে? কি যে কপাল করে এসেছিল!"

এমন সময় বছর দশ এগারোর একটি মেয়ে ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "মা, ন্টু ভয়ানক চেঁচাচ্ছে, শীগ্‌গির তার বার্লি দাও। আমারও বড় খিদে পেয়েছে, কিছু কি আছে ?"

মা বলিল, "দেখ মুড়ির টিনটা খুলে, যদি একমুঠো থাকে। এইক'টা আটা ছিল, দুখানা রুটি গড়ে রেখেছি, তোর বাবার জন্যে, নইলে এসে আমার মাথা খেয়ে ফেলবে। ন্টুর বার্লি হয়ে গেছে, আমি নিয়ে যাচ্ছি।"

মেয়ে একটা বিস্কুটের টিন খুলিয়া দেখিল, তলায় মুঠোখানিক পড়িয়া আছে, সেইটাই সে এনামেলের একটা বাটিতে ঝাড়িয়া বাহির করিয়া লইল। মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "গুড় আছে নাকি মা ?"

মা বলিল, "আছে অল্প একটুখানি। সে তুই নিস্‌নে, তোর বাবার জন্যে রাখ। এই কাঁচা লঙ্কাটা নে, ওখানে বাটিতে তেল আছে, তাই মেখে খা।"

মা, ছেলে, মেয়ে, সকলেই জানে বাপের খাইবার দাবী সর্ব্বাগ্রে, কারণ তিনি রোজগার করিয়া আনেন। এ লইয়া তাহারা কোনো গোলমাল করে না। অদৃষ্টে যাহা জোটে তাহাই খায়, একেবারেই কিছু না পাইলে ন্টু কাঁদে, তাহার দিদি কুন্তী মায়ের দুঃখ একটু বেশী বোঝে, সে ম্লানমুখে চুপ করিয়া থাকে। মা শশিমুখী, সমস্তদিন খাটে, রুগ্ন ছেলের সেবা করে, খিট্‌খিটে মেজাজের স্বামীর বকুনি খায়, মাঝে মাঝে দুচার কথা শুনাইয়াও দেয়, বেশীর ভাগ সময় পারিবারিক শান্তি-রক্ষার খাতিরে চুপ করিয়া থাকে।

বার্লি নামাইয়া একটা কাঁসার বাটিতে ঢালিতে ঢালিতে শশিমুখী বলিল, "ওরে চিনির টিনটা একটু এদিকে দে ত। আর তরকারীর ঝুড়িতে দেখ ত লেবু একটুও আছে নাকি ?"

মেয়ে বলিল, "কোথায় আবার লেবু? সকালেই ত নিংড়ে দিলে যেটুকু ছিল।"

বার্লিতে চিনি মিশাইয়া মা উঠিয়া দাঁড়াইল। নিজের অজ্ঞাতেই যেন তাহার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া পড়িল। বার্লির বাটি লইয়া সে শুইবার ঘরের দিকে চলিল। যাইবার সময় মেয়েকে বলিয়া গেল, "দেখ তোর খাওয়া হয়ে গেলে, চাল ক'টা ধুয়ে ভাতটা চড়িয়ে দিস্ ত। আমি ন্টুকে খাইয়ে, ঘরঝাঁট দিয়ে একেবারে আস্‌ব। ওঁর ত আসবার সময় হয়ে এল, বেলা পড়ে এসেছে।" কুন্তী মুড়ি খাইতে খাইতে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল, এই বয়সেই সে ছোট-বড় নানা কাজে মাকে সাহায্য করে, নইলে মা একলা হাতে এত কাজ পারিয়া উঠে না। ন্টুর অসুখ

লাগিয়াই আছে, তাহার সেবাতেও কিছু কম সময় যায় না।

মাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া মুটু নাকীস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল, "যাঁও আমি খাব না। এঁত দেরি কেন করলে?"

শশিমুখী তাহাকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বলিতে লাগিল, "কোথায় বাবা দেরি? রোজ ত এমনি সময়েই খাস্, তোর বাবাও ত এখনও আসেন নি।"

মুটু বলিল, "বাবা আজ বিস্কুট না আন্‌লে দেখাব মজা। রোজ রোজ খালি ধাপ্পা মারে আজ না কাল, আজ না কাল। আজ আর ওসব শুন্‌ছি না।"

শশিমুখী এ কথার উত্তর না দিয়া, কোণ হইতে ঝাঁটা লইয়া ঘর ঝাঁট দিতে লাগিল। দুইটি ঘরই এক ধরণের। এ ঘরে একখানা বড় তক্তপোষ, আর একটা অতি পুরাতন খাট পাতা, কোণে একটা আল্‌না, দেওয়ালের গায়ে গোটা-দুই ক্যালেণ্ডারের ছবি, আর কাঠের ফ্রেমে বাঁধান একটা আয়না। খাটের বিছানা, আল্‌নার কাপড় সবই মলিন, শ্রীহীন। ঘরে দুইটা জানালা আছে। একতলার ঘর, গলি হইতে ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, জানালা দুইটিতে পুরান কাপড়ের পরদা দেওয়া। দুইটি পরদাই ধোঁয়া ও ধূলায় একেবারে কাল। প্রথমে যে তাহাদের কি রং ছিল, তাহা বুঝিবার কোনো উপায় নাই।

ঘর ঝাঁট দেওয়া শেষ করিয়া শশিমুখী আবর্জ্জনা-গুলা এক টুক্‌রা কাগজে জড়াইয়া জান্‌লা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিল। তাহার পর আল্‌নার কাপড় গোছাইবার বা বিছানা ঝাড়িবার কোনো চেষ্টা না করিয়াই সে আবার ফিরিয়া রান্নাঘরে গিয়া ঢুকিল। কুন্তী তখন উনানে ভাতের হাঁড়ি চড়াইয়া চাল ধুইতেছিল। শশিমুখী বলিল, "যা তুই একটু মুটুর সঙ্গে গল্প করগে যা। আমি দেখছি ওসব।"

রান্নাঘরের সাম্‌নে দিয়াই দোতলায় যাইবার সিঁড়ি। দেখা গেল একটি যুবক আস্তে আস্তে উপরে উঠিতেছে, তাহার পিছন পিছন একজন চাকর একটা টিনের বাক্স কাঁধে করিয়া চলিয়াছে। কুন্তী বলিল, "দেখ মা, সেই বাবুটি আবার মিষ্টি বিক্রি করতে এসেছে। আচ্ছা, ভদ্রলোক হয়ে কেন এ রকম করে? চাকরী করে না কেন?"

শশিমুখী বলিল, "ভালই করে। চাকরী দশগণ্ডা পড়ে রয়েছে কি না? ভিক্ষে করার চেয়ে খেটে খাচ্ছে সেই ভাল।"

মা মেয়ের কথা স্পষ্ট শুনিতে না পাইলেও কথার শব্দ বোধ হয় যুবকের কানে আসিয়া থাকিবে, সে মাঝ সিঁড়িতে থামিয়া কুন্তীর দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "খুকী, তোমরা কিছু মিষ্টি নেবে? মিহিদানা আছে, সন্দেশ আছে, লালমোহন আছে।"

সখ করিয়া মিষ্টি কিনিয়া খাইবার অবস্থা কুন্তীর জন্মাবধি দেখা অভ্যাস নাই। সে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহাদের কিছু প্রয়োজন নাই। লোকটি উপরে উঠিয়া গেল। শশিমুখী রান্নার জোগাড় করিতে বসিল, কুন্তী ভাইয়ের কাছে চলিয়া গেল।

কুন্তীর বাবা অটলবিহারীও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ী আসিয়া পৌছিল। রান্নাঘরের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল, "এক গেলাস জল দিয়ে যাও ত। বাইরে একটি লোক এসে বসে আছে।"

শশিমুখী জল গড়াইতে গড়াইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কোন পাওনাদার নাকি?"

অটল বলিল, "পাওনাদার ছাড়া আর কে তোমার বাড়ী আস্‌তে যাবে? খাবার আছে নাকি কিছু?"

শশিমুখী বলিল, "কোত্থেকে আস্‌বে খাবার? তোমার জন্যে কোনোমতে দুখানা রুটি করে রেখেছি।"

অটল বলিল, "থাক, পরে খাব এখন, শুধু জলই দাও।" সে জলের গেলাস লইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

শশিমুখী নিজের কাজ করিতে লাগিল। শোবার ঘর হইতে থাকিয়া থাকিয়া মুটুর নাকে কান্না, কুন্তীর সান্ত্বনার শব্দ আসিয়া পৌছিতে লাগিল।

আধঘণ্টা খানেক পরে অটল আসিয়া বলিল, "দাও গো তোমার রুটি। নিতান্ত খিদেয় নাড়ীগুলো চোঁ চোঁ করে, তাই এসব ছাইভস্ম খেতে পারি, নইলে মানুষে বারোমাস ত্রিশদিন এই অখাদ্য মুখে দিতে পারে না।"

শশিমুখী একখানা পিড়া পাতিয়া এক গেলাস জল গড়াইয়া রাখিল। তাহার পর ছোট একখানা রেকাবীতে দুখানা রুটি এবং একটুখানি গুড় আনিয়া দিল। অটল বসিয়া খাইতে প্রবৃত্ত হইল।

মুটু চীৎকার করিয়া উঠিল, "নিজেরা দিব্যি সব গিল্‌বে, আমার বেলা শুধু বার্লি। বাবার সব বাজে কথা।"

অটল একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল, "বেটা মনে ক'রছে, বাপ না জানি কত লুচি মাংসই ঠুস্‌ছে। এগুলোর কোনো জন্মে বুদ্ধি হবে না, একেবারে গাধা।"

ছেলেমেয়ের এ হেন সমালোচনাটা তাহাদের মায়ের কানে মোটেই ভাল লাগিল না। সে একটু উত্তেজিত-ভাবেই বলিল, "ছেলেমানুষের কত আবার বুদ্ধি হবে? তবু ত কুন্তী বেচারী কোনোদিন টুঁ শব্দ করে না, খেতে না পেলেও। মুটুটার ভুগে ভুগে মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে।"

অটল বলিল, "তেমনি সব স্বাস্থ্যও হয়েছে। আমাদের গুষ্ঠীতে এত ভুগতে ত কই কাউকে দেখিনি।"

শশিমুখী বিরক্ত হইয়া বলিল, "আচ্ছা বাপু, সব না হয় আমার গুষ্ঠীর দোষেই হয়েছে। তবু ত তোমাদের বাড়ীর আর কোনো বউ আমার মত ভূতের খাটুনি খাট্‌তে পারে না।"

অটল খাওয়া শেষ করিয়া জলের গেলাসটা মুখের কাছে তুলিতে তুলিতে বলিল, "ঝগড়া করবার জন্মে একেবারে যেন কোমর বেঁধেই আছ।"

শশিমুখী উত্তর দিল না। কথা বাড়াইলেই বাড়িয়া চলে, তাহাতে কোনো পক্ষেরই কিছু লাভ হয় না। একেই ত মানসিক অশান্তির খোরাকের কিছু কম্‌তি নাই, কেন আর ইচ্ছা করিয়া বাড়ান? তাহার স্বামী জল খাইয়া উঠিয়া গেল।

কিন্তু অটলের খুঁৎ ধরার প্রবৃত্তিও যেন সেদিন বাড়িয়া গিয়াছিল। শশিমুখী কি একটা কাজে ভিতরে আসিতেই সে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা ঘরগুলো একটু গুছিয়ে রাখতে কি তোমার হাতে কাঁটা ফোটে? একে ত এই বাড়ী; তার উপর যা ছিরি করে রাখ, লোককে বাড়ীতে আনতে লজ্জা করে।"

তাহার স্ত্রী বলিল, "ঘরদোর পরিষ্কার করার উৎসাহ আর আমার নেই। সবদিক দিয়েই যা দশা, তার আর ঘর গোছান, আর না গোছান।

অটল বলিল, "কিসে যে তোমার উৎসাহ আছে তাও ত জানি না, খেটে খেটে একটা মানুষ যে মুখে রক্ত উঠে মরছে, তা কে বা বসে আছে দেখ্‌তে। উৎসাহ নেই বলে এবার আমিও হাত পা গুটিয়ে বসে থাকব।"

শশিমুখী বলিল, "তাই থাকগে যাও," বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া চলিল।

অটল বাধা দিয়া বলিল, "তোমার গিরিজা কাকাকে যে চিঠি লিখতে বলেছিলাম, তা লিখেছিলে?"

শশিমুখী সংক্ষেপে বলিল, "না।" অটল জিজ্ঞাসা করিল, "কি কারণে শুনি? একটা কথাও শুন্‌লে জাত যায় নাকি?"

শশিমুখী কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। মিনিটখানিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "পোষ্টকার্ড, খাম, কিছু ছিল না, কি করে লিখব? আমার ভাত ধরে যাবে, আমি এখন চল্‌লাম।"

অটল বলিল, "কুন্তীকে দিয়ে হ্যারিকেনটা পাঠিয়ে দিও। ঘরের ভিতরে ত বেশ অন্ধকার হয়ে এল।"

শশিমুখী চলিয়া গেল। মেয়েকে দিয়া লণ্ঠন পাঠাইয়া দিয়া নিজেও একটা কেরোসিনের ডিবে জ্বালাইয়া লইল। আবার রান্নাঘরের কাজ চলিতে লাগিল।

দরিদ্রের ঘর, দিনের পর দিন একই ভাবে কাটিয়া যায়। কোনোদিন ছেলেমেয়ে ভাল থাকে, কোনোদিন থাকে না; কোনোদিন স্বামীর সঙ্গে বেশী কথা-কাটাকাটি হয়, কোনোদিন চুপচাপ কাটিয়া যায়, এইটুকু মাত্র একদিনের সঙ্গে অন্য দিনের তফাৎ। আর কোনো আশা নাই, আনন্দ নাই, বৈচিত্র্য নাই। লোকের বাড়ী বেড়াইতে যাইবার সময় তাহাদের হয় না, তাহাদের বাড়ীও বড় কেহ আসে না। কুন্তী মাঝে মাঝে পাশের বাড়ীর নূতন বৌটির সঙ্গে গল্প করিতে যায় বটে, তাও বড় বেশীবার নয়, কারণ বউয়ের শাশুড়ী বেশী গল্প করা পছন্দ করে না।

সেদিন আপিসের সময় খাইতে বসিয়া অটল বলিল,

"একটা কথা শুনবে? তোমাকে কিছু বলতেও ত ভরসা হয় না, খ্যাঁক করে উঠবে এখনি। কিন্তু নেহাৎ ঠেকা এবার, সামলাতে না পারলে চাকরিটিও যাবে।"

স্বামীর ভূমিকা শুনিয়াই শশিমুখীর প্রাণ উড়িয়া গেল। একেই ত সুখের সীমা নাই, তাহার উপর স্বামীর কাজটিও গেলে, গলায় দড়ি দেওয়া ভিন্ন তাহাদের আর কোনো উপায়ই থাকিবে না। উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'ল আবার?"

অটল বলিল, "সেই যে বৈশাখ মাসে স্টুর ভারি অসুখটার সময় তিনশ টাকা ধার করেছিলাম, না? সেই টাকা এখন সুদে আসলে চারশ' দাঁড়িয়ে গেছে। মাড়োয়ারী ব্যাটা আর ফেলে রাখবে না, নালিশ করবার নোটিশ্ দিয়েছে। নালিশ করলেই ডিক্রীও হয়ে যাবে। সম্বল ত ঐ চাক্‌রী, তার উপর ক্রোক্ করলে, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। বড় সাহেব এ সব বিষয়ে ভয়ানক কড়া। সে বছর কালীপদর চাকরীই গেল এই জন্যে। আমাকেই কি আর ছেড়ে কথা কইবে?"

শশিমুখী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! আমরা দাঁড়াব কোথায় তাহলে? ঘরে ত কিছু এমন নেই, যা বেচ্‌লে একশ টাকাও হয়। খালি মা কুন্তীকে যে হারটা দিয়েছিলেন, সেইটা কোনোমতে লুকিয়ে রেখেছিলাম। তা বিক্রী করলে কতই আর হবে? ষাট-সত্তর টাকা বড়-জোর। তা দিয়ে কি এখনকার মত ঠেকান যাবে?"

অটল বলিল, "এ মাসটা না হয় ঠেকালাম, পরের মাসটা কি দিয়ে ঠেকাব? তার যেরকম মেজাজ, কিস্তীতে টাকা নিতে যদি রাজীও হয়, একবার দিতে না পারলেই মাইনের উপর চড়াও হবে। তাই বলছিলাম কি, তোমার জগমোহন দাদাকে একখানা চিঠি লেখ না? ভবানীপুরেই ত থাকে?"

শশিমুখীর আঁধার মুখ আরও যেন আঁধার হইয়া আসিল। একটু থামিয়া সে বলিল, "তারা কোনোদিন ডেকে জিগ্‌গেষ শুদ্ধু করে না, তাদের কাছে হাত পাত্‌তে যাব কোন্ মুখে?"

অটল বিরক্ত হইয়া বলিল, "এর পর যখন রাস্তায় হাত পাত্‌তে হবে, তখন কোন্ মুখে পারবে? গরীবের অত তেজ ভাল নয়। পূজো আসছে সামনে, ভাইফোঁটা আসছে, এখন একটু খাতির জমিয়ে নেওয়া কিছু এমন শক্ত নয়। তার পর তাঁর মেজাজ ভাল থাকলে কথাটা একদিন পেড়ে দেখ, হয়ত থোকেই টাকাটা দিয়ে দেবে। মানুষ ত নিতান্ত মন্দ নয়, তোমার দেমাক দেখেই বিরক্ত হয়। ছোটবোন ভাইয়ের কাছে হাত পাত্‌তেই বা লজ্জা কি?"

শশিমুখী বলিল, "সেবার তার বউ কিরকম সব কথা শোনালে, সে সব এরই মধ্যে ভুলে গেলে নাকি?"

অটল বলিল, "কথা ত গরীব মানুষকে আপন পর সবাই শোনায়, অত মনে রাখতে গেলে চলে না। তোমার কিছু করবার মতলব নেই, তাই বল। এর পর যখন পথে দাঁড়াতে হবে, তখন আমায় কিছু বল্‌তে এস না।" সে রাগ করিয়া অর্দ্ধেক ভাত ফেলিয়া রাখিয়াই চলিয়া গেল।

শশিমুখী কোনোমতে ছেলেমেয়েকে খাওয়াইয়া দিয়া রান্নাঘরের চৌকাঠটার উপর আসিয়া বসিল। স্নানাহারে তাহার আর রুচি ছিল না। চিরদিন ত দুঃখেই কাটিয়াছে, এতেও কি যথেষ্ট হয় নাই, আরও দুর্গতি লেখা আছে? স্বামীর চাকরী গেলে কি করিবে সে, ছেলেমেয়ে লইয়া কাহার দরজায় দাঁড়াইবে? দুঃখের উপর দুঃখ, যে স্বামী তাহার বেদনার এক কণাও অনুভব করেন না, তাঁহার বিশ্বাস শশিমুখী ইচ্ছা করিয়াই তাঁহার কোনো বিপদে সাহায্য করিতে চায় না। যদি তিনি একটু বুঝিতেন, ধনবান আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষা করিতে শশিকে কি মর্ম্মান্তিক লজ্জা পাইতে হয়! লজ্জাও না হয় সে স্বীকার করিয়া লইল, কিন্তু ভিক্ষা করাও যে নিষ্ফল তাহা অবুঝকে সে বুঝাইবে কি প্রকারে? অতীতে এ পরীক্ষাও যে দুচারবার হয় নাই তাহা নহে। তাহার ক্ষতচিহ্ন এখনও শশির হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় নাই, কিন্তু অটলের স্মৃতিশক্তি এ সব বিষয়ে বড়ই ক্ষীণ। হঠাৎ পদশব্দে চমকিত হইয়া সে চাহিয়া দেখিল, সেই যুবকটি আবার দোতলায় উঠিতেছে, আজ আর তাহার পিছনে চাকর

নাই। ছেলেটিও কি মনে করিয়া শশির দিকে একবার চাহিয়া দেখিল। তাহার মুখে গভীর হতাশা এমনভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, যুবক কিঞ্চিৎ বিস্মিতভাবে সিঁড়িতেই দাঁড়াইয়া পড়িল। শশিমুখীকে এবং কুন্তীকে সে প্রায়ই দেখে। দোতলার গিন্নির কাছে ইহাদের পরিচয়ও সে খানিক খানিক পাইয়াছে। সে নিজে দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ কি রকম তাহা ভাল করিয়াই অনুভব করিয়াছে, কাজেই অপরিচিতা হইলেও শশিমুখীর প্রতি তাহার সহানুভূতি অনেকখানিই ছিল।

শশিমুখী তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া একটু যেন বিরক্তভাবেই জিজ্ঞাসা করিল, "কি চাই আপনার, আমরা মিষ্টি কিন্‌ব না।"

যুবক কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে জন্যে আমি দাঁড়াইনি, মা। আপনাকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে, তাই মনে করলাম আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি।"

শশিমুখীর চোখে জল আসিয়া পড়িল। দুঃখ দুর্ভাবনায় সে অভ্যস্ত, কিন্তু সহানুভূতি জিনিষটা তাহার কাছে নূতন। স্বামী স্ত্রী দুজনেই এত অবসন্ন, ম্রিয়মাণ তাহারা, যে, পরস্পরকে একটু সান্ত্বনা দিবার ক্ষমতাও আর তাহাদের অবশিষ্ট নাই। অটল ভাবে, স্ত্রী ইচ্ছা করিয়া তাহার সাহায্য করে না ; শশিমুখী ভাবে, ইহার হাতে পড়িয়া আমার দুঃখ-দুর্গতির অন্ত রহিল না, এ আবার আমার কাছে আশা করে কি ? দুজনের মনে দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগের শেষ নাই, তাহাদের ভালবাসাও যেন এই আবর্জ্জনার স্তূপের নীচে চাপা পড়িয়া গিয়াছে। তাই হঠাৎ এই অপরিচিতের মুখে সমবেদনার বাণী শুনিয়া সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না।

কোনোমতে গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলিল, "না বাবা, আমার সাহায্য এক ভগবান ছাড়া কেউ করতে পারে না। মানুষের ক্ষমতার অতীত হয়ে গেছে।"

যুবক সিঁড়ি কয়টা নামিয়া শশিমুখীর সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর বলিল, "মা, আপনি আমাকে চেনেন না, আমিও আপনাকে চিনি না। কিন্তু আপনাকে দেখে আমি নিজের গত জীবনটাকেই আবার যেন দেখতে পাচ্ছি। একদিন আমিও ভেবেছিলাম দেবতা, মানুষ, আমাকে আর কেউ বাঁচাতে পারবে না, নিজের প্রাণ নিজেই নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখছেন ত, বেঁচেই আছি, করে খাচ্ছি। ভদ্রলোক হবার বালাই ঘুচে গেছে, কিন্তু মানুষ হতে পেরেছি, মা। আপনাকে মা ব'লে ডাকছি বটে, কিন্তু বয়সে আপনি আমার ছোটই হবেন। আমায় দেখে বুঝুন, হাল ছাড়তে নেই কখনও, যতই দুর্দ্দশা হোক, তার থেকে বেরিয়ে আস্‌বার পথ একটা-না-একটা থাকেই।"

শশিমুখী বলিল, "চোখে ত কিছু দেখতে পাই না। স্বামীর একশ টাকা মাইনের চাকরী সম্বল করে, ছেলে-মেয়ে নিয়ে, আধপেটা খেয়ে, ছেঁড়া কাপড় পরে, এই গর্ত্তের মধ্যে দিন কাটাচ্ছি। সেই চাকরীও ঋণের দায়ে যেতে বসেছে। আমাদের আর উপায় কি ?"

যুবক বলিল, "ঋণ অল্পে অল্পে শোধ করবার কি কোনো উপায় নেই ? বুঝিয়ে বল্‌লে সব পাওনাদারেই কথা শোনে।"

শশিমুখী বলিল, "ঐ একশ থেকে কি খেয়ে কি দেব ? কলকাতার খরচ জানেন ত ? তার উপর চারটি প্রাণী আমরা, ছেলের আবার নিত্যি রোগ লেগে আছে।" শশিমুখী একটু মন খুলিয়া কথা বলিতে পাইয়া যেন বাঁচিয়া গিয়াছিল, তাহার আর কোনো সঙ্কোচ ছিল না।

যুবক বলিল, "আয় বাড়াবার চেষ্টা করুন। আপনিও ত কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে পারেন।"

শশিমুখী বলিল, "আমি কোথা দিয়ে কি করব বাবা ? হিন্দুঘরের মেয়ে, বি-এ, এম্‌-এ, পাশ করিনি কিছু, যে চাকরী করে টাকা আনব। স্কুলে কয়েক ক্লাশ পড়েছি মাত্র। তাও যদি দু-দশটাকা কেউ দিতে চায়, তা আমার এ জেলখানা ছেড়ে নড়বার জো কই ? বড় মেয়ে ঘরে, রোগা ছেলেটাও রয়েছে, না হলে রাঁধুনীর কাজ পেলেও নিতাম।"

যুবক বলিল, "মা, উপায় ঢের আছে। আজ আমার সময় নেই, অনুমতি করেন ত কাল এই সময় আবার আসব। আমার বিশ্বাস আমার কথামত চল্‌লে আপনাদের সাহায্য হবে। আচ্ছা এখন তবে আসি, নমস্কার।"

শশিমুখী খানিকটা কথা বলিতে পাইয়াই যেন বাঁচিয়া গেল। যুবক সত্যই তাহার কোনো বিশেষ সাহায্য করিতে পারিবে, এ আশা সে করিতেছিল না। তবু একটা মানুষেও যে তাহার দুঃখ বুঝিল, ইহাই যেন ঢের।

সন্ধ্যাবেলা অটল আপিস হইতে আসিয়া বলিল, "ওগো এদিকে শুনে যাও। কুন্তী না হয় ততক্ষণ রান্না দেখুক।"

শশিমুখী কুন্তীকে ভাতটা একটু দেখিতে বলিয়া স্বামীর জন্য সামান্য যে জলখাবারটুকু জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই হাতে করিয়া ঘরে আসিয়া ঢুকিল। মুটুর আজ শরীর কিঞ্চিৎ ভাল, সে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গলির উপরের সরু রোয়াকটাতে বসিয়া ছিল।

অটল বলিল, "মাড়োয়ারী ব্যাটাকে ত অনেক হাত পা ধরে রাজী করেছি কিস্তিতে টাকা নিতে। মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দিতে হবে। আমার মাইনের থেকে দেওয়া যে অসম্ভব তা বুঝতেই পারছ। কুন্তীর হারটা দাও, এ মাসটা তাই বেচে দিয়ে দিই, তারপর পরের ভাবনা পরে ভাব্‌ব।"

শশিমুখী ম্লানমুখে উঠিয়া গিয়া বাক্স খুলিয়া ছোট একটি হার বাহির করিয়া আনিল। স্বামীর হাতে দিয়া বলিল, "এই নাও, সাড়ে তিন ভরি অন্ততঃ আছে, ঠকে এস না যেন।"

অটল জলখাবার খাইয়া উঠিয়া গেল, শশিমুখী আবার রান্নাঘরে ফিরিয়া আসিল।

অটল ফিরিল অনেক রাত্রে। ছেলেমেয়ে তখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শশিমুখী অটলের ভাত ঢাকা দিয়া রাখিয়া, খাটের উপর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। নিজে সে খায় নাই, খাইবার ইচ্ছাও নাই। দুশ্চিন্তায় তাহার সমস্ত দেহমন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল।

ছয়খানা দশটাকার নোট স্ত্রীর হাতে দিয়া অটল বলিল, "এই নাও, অনেক দর-কষাকষি করেও এর বেশী পেলাম না। সোনা ভাল নয়, পানমরতা বাদ যাবে, কত হাজার রকম কথা। পঞ্চাশ টাকা ত কালই আমি নিয়ে যাব, বাকি টাকাও তুমি খরচ কোরো না, আমার একটা ফন্দি মাথায় এসেছে।"

স্বামীর ফন্দি শুনিতে তখন শশিমুখী কোনই উৎসাহ দেখাইল না। উঠিয়া গিয়া টাকা বাক্সে তুলিয়া রাখিল। তাহার পর শুইয়া পড়িল।

পরদিবস পঞ্চাশটা টাকা লইয়া অটল চলিয়া গেল। খাওয়া-দাওয়া সারিয়া, শশিমুখী রান্নাঘরেই বসিয়া ছেলের দুটো ছেঁড়া সার্ট শেলাই করিতে আরম্ভ করিল। যুবক আসিবে কিনা তাহা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। আর আসিলেই বা কি? তাহাদের যে সমস্যা, ইহার সমাধান একরকম অসম্ভব।

বেলা বারোটা আন্দাজ যুবক আসিয়া হাজির হইল। আজ তাহার সঙ্গে বাক্স-কাঁধে চাকরটিও আছে। তাহাকে বলিল, "তুই উপরে গিয়ে গিন্নিমার কাছে রসগোল্লা দিয়ে আয়।" চাকর দোতলায় চলিয়া গেল।

শশিমুখী একখানা পিঁড়া অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "বসুন।"

যুবক বসিয়া বলিল, "আমার নাম কেশব রায়। জাতিতে কায়স্থ, বি-এ পাশও করেছি। কিন্তু দেখছেন ত আজকাল ময়রার ব্যবসা ধরেছি। আমার এতে কোনো লজ্জা নেই, যদিও বন্ধুবান্ধব অনেকে এখন আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে লজ্জা বোধ করে। অবিশ্যি ৩০৲ টাকার চাকরী করে রোজ তাদের কাছে টাকা ধার চাইতে গেলেও তারা আমাকে খুব বেশী সমাদর করত না। কাজেই ব্যাপারটা আমার পক্ষে একই। পরিশ্রম করে টাকা উপার্জ্জন করায় কোনো লজ্জা আছে বলে মনে হয় আপনার?"

শশিমুখী বলিল, "লজ্জা কিসের? এই যে শুকিয়ে মরছি, আজ বাদে কাল ভিক্ষে করতে যাব, এতেই লজ্জা। ভগবান হাত পা দিয়েছেন, খাটতে দোষ কি?"

কেশব বলিল, "সে কথাটা বোঝেন যদি তাহ্‌লে কোনো ভাবনাই নেই। আমি আজ ছানা, চিনি, ঘি সব নিয়ে এসেছি। মিষ্টি তৈরি করতে কিছু-না-কিছু জানেন ত? আমায় তৈরি করে দিন। কাল সকালে নিয়ে যাব, সমস্ত দিন বিক্রী হবে, সন্ধ্যার পর আপনাকে টাকা দিয়ে যাব।"

শশিমুখী একটু সঙ্কুচিতভাবে বলিল, "অনেকদিন

ওসব করিনি, এক সময় যদিও ভালই পারতাম। যদি বিশেষ ভাল না হয়?"

যুবক বলিল, "প্রথম দিন না হয় একটু খারাপই হল, একটু কম দরে দেব। আজ তাই বেশী জিনিষ আনিনি। যত হাত পাক্‌বে তত লাভ বেশী হবে।"

কেশবের চাকর উপর হইতে নামিয়া আসিল। টিনের বাক্স খুলিয়া সে শশিমুখীকে ছানা প্রভৃতি সব উপকরণ বাহির করিয়া দিল। কেশব জিজ্ঞাসা করিল, "দেখুন, সময় পাবেন ত?"

শশিমুখী বলিল, "তা পাব বৈ কি? বসে বসে ভাবনা করা ছাড়া এমন আর বেশী কাজ কি আছে?"

যুবক চলিয়া গেল। একটা কাজ হাতে পাইয়া শশিমুখী অনেকখানি আরাম বোধ করিল, যদি একটাকাও দিনে পায় ত ঢের লাভ। সে তখনি কাজে লাগিয়া গেল। কুন্তী পাশের বাড়ী গল্প করিতে গিয়াছিল, তাহাকে সুদ্ধ ডাকিয়া আনিল। কুন্তী এত জিনিষ দেখিয়া একেবারে আকাশ হইতে পড়িল, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "এত সব কোথা থেকে এল মা?"

শশিমুখী বলিল, "ও একজন খাবার করতে দিয়ে গেছে। তুই যেন তোর বাবাকে বলিস্‌নে।"

বাবার সঙ্গে যাচিয়া গল্প করিতে যাওয়া কুন্তীর কোনোকালেই অভ্যাস নাই, সুতরাং মায়ের অনুরোধ পালন করিতে তাহাকে কিছুই বেগ পাইতে হইল না।

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মা মেয়ে একমনে কাজ করিয়া সব চুকাইয়া ফেলিল। তাহার পর অটলের আসিবার সময় হইয়া আসিল দেখিয়া, শশিমুখী সব জিনিষপত্র আড়ালে সরাইয়া ফেলিল। বলিল, "ভাগ্যে সুটুটা ঘরে নেই, নইলে খাবারের জন্যে নাচত।"

কুন্তী একটু লোলুপভাবে বলিল, "একটা নিলেও কি সে লোকটি বুঝতে পারবে, মা?"

শশিমুখী মেয়েকে তাড়া দিয়া বলিল, "যা, যা। লোভ দেখ না মেয়ের।"

অটল রাত্রে বলিল, "একটা মাস ত নিশ্বেস ফেলবার সময় পেলাম, পরের মাস যে কোথা দিয়ে কি করব জানি না।"

সকালবেলা কেশব আসিয়া মিষ্টান্নগুলি লইয়া গেল। বলিল, "প্রথম দিনের পক্ষে কিছুই মন্দ হয়নি। আপনাকে একটা বই এনে দেব এখন। তাতে মিঠাই, আচার, চাটনী, জেলি অনেক কিছুর সন্ধান পাবেন।"

সেদিন খাইতে বসিয়া অটল বলিল, "কি গো, আজ যে বড় হাসিখুসি দেখছি? হাস্‌তে ভুলে গিয়েছ বলেই ত মনে হত।"

শশিমুখী আর কিছু বলিবার না পাইয়া বলিল, "এই পূজো আস্‌ছে কি না।"

অটল ঠোঁট উল্টাইয়া বলিল, "বেল পাক্‌লে কাকের কি? আমাদের আবার পূজো! সেই ছেঁড়া কাপড়, সেই শাকচচ্চড়ি ভাত! শুধু দিন-পাঁচ দশটা-পাঁচটা আপিস করতে হবে না, এই যা। কিন্তু সে যাই হোক, পূজোটাকে এমনি যেতে দিলে হবে না। কাজে লাগাতে হবে।"

এখনি কাহার কাহার কাছে হাত পাতিতে হইবে তাহার তালিকা সুরু হইবে। শশিমুখী বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। আজ তাহার মনের তার যে-সুরে বাঁধা ছিল, তাহার সহিত এই ভিক্ষার সুর একেবারে মেলে না। নিষ্ঠুর ভাগ্যের কাছে মাথা নত না করিয়া, জীবনে প্রথম আজ সে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে, এই গৌরবেই তাহার মন তখন পরিপূর্ণ।

সন্ধ্যার প্রদীপ সবে জ্বলিয়াছে, এমন সময় কেশব আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিমুখীর হাতে একটা টাকা ও বারো আনা পয়সা দিয়া বলিল, "আজ এই হল। ক্রমে বাড়বে, পূজোর ক'দিন খুব বিক্রী হবে। এই ক'টা পান্তুয়া বিক্রী হয়নি, ছেলেমেয়েদের দেবেন।"

আনন্দে শশিমুখীর মুখে কথা জোগাইল না। দিনে দু টাকা করিয়া যদি রোজগার করিতে পারে, তাহা হইলে ঋণের ভাবনায় আর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে হয় না। কেশবকে যে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিবে ভাবিয়াই পাইল না। কেশব তাহার মনের ভাবটা বুঝিল, বলিল, "আমার কাছে কৃতজ্ঞ হবার কিছু নেই। আমাকে যিনি পথ দেখিয়েছিলেন,

তাঁকে কথা দিয়েছিলাম, আমিও অন্ততঃ দশটা মানুষকে পথ দেখাব। আমার পাওনা কমিশন্ যা তাও আমি নিয়েছি, কাজেই আমার কাছে আপনার কোনো ঋণ নেই। আমার অনুরোধ শুধু এই, অন্য কোন মানুষ এই রকম হাবুডুবু খাচ্ছে দেখলে তাকে ডাঙায় উঠবার পথটা বলে দেবেন।"

মুটু এবং কুন্তী অপ্রত্যাশিতভাবে মিষ্টান্ন পাইয়া আহ্লাদে আটখানা হইল। বাবাকে বলিতে বারণ করাতে কেহই সেদিকে কোনো উৎসাহ দেখাইল না।

কয়েক দিন এইভাবে কাটিয়া গেল, রোজই কিছু-না-কিছু আয় হয়। ইহার একটি পয়সাও শশিমুখী প্রাণান্তে খরচ করে না, তাহার কাপড়ের বাক্সের কোণে ক্রমে একটি ছোট থলি ভারী হইয়া উঠিতে লাগিল।

পূজা আসিয়া পড়িল। ছেলেমেয়ে কান্না ধরিল, উহারা এক এক খানা নূতন কাপড় নিবে। পাড়ার সব ছেলেমেয়ে কত সাজসজ্জা করিয়া ঠাকুর দেখিতে যায়, তাহারা কি ভিখারীর মত যাইবে? শশিমুখী স্বামীকে বলিল, "হার বিক্রীর দশ টাকা ত রয়েছে, মুটুকে আর কুন্তীকে এক-একখানা কাপড় কিনে দাও।"

অটল বলিল, "থাক, থাক, আর কাপড় কেনে না, ও আমি অন্য কাজের জন্যে রেখেছি।"

শশিমুখী অনেক কষ্টে নিজের পুঁজি ভাঙিবার প্রলোভন দমন করিল। যাক এবছর কষ্ট করিয়াই, পরের বৎসর ভগবান অবশ্যই মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

কেশব আসিয়া বলিল, "শুধু মিষ্টি না করে, অন্য কাজও ত কিছু কিছু করতে পারেন। আপনি শেলাই জানেন কেমন?"

শশিমুখী বলিল, "জানি চলনসই রকম। তবে বিক্রী করবার মত কি আর হবে?"

কেশব হাসিয়া বলিল, "সব জিনিষেরই বাজার আছে, জায়গা বুঝে গেলেই হল। কলকাতায় গরীব বাঙালীর সংখ্যা কত তার খবর রাখেন? সবাই কিছু সাহেবী দোকানে পোষাক অর্ডার দিতে যেতে পারে না। সস্তা জিনিষ খুবই বিক্রী হয়। রাস্তায় বেরুলে দেখবেন, জায়গায় জায়গায় পেনী, ফ্রক, রুমাল, গেঞ্জী, ঝুলিয়ে কত লোক বসে আছে। তাদের কি আর বিক্রী হয় না? আর কিছু না পারেন, রুমাল শেলাই করে, কোণে রেশম দিয়ে নাম লিখুন, তাই কত উঠে যায় দেখবেন। 'স' দিয়ে আরম্ভ খুব বেশী নাম বাঙালীদের মধ্যে, সেইটা বেশী লিখবেন, ইংরিজিতে পারলে 'S' লিখবেন।"

শশিমুখী বলিল, "তা পারি। কিন্তু কাপড় কিনে আন্‌বে কে? ওঁকে এসব কথা আমি কিছু বলি নি।"

কেশব বলিল, "আমিই দিতাম, কিন্তু সম্প্রতি হাত খালি করে ফেলেছি একেবারে, নানা জায়গায় নানা রকম বায়না দিয়ে। টাকা ঘরে ফিরতে এখনও দিন-কয়েক দেরি আছে, কিন্তু তখন কিন্‌লে ত আর শেলাইয়ের সময় থাকবে না?"

শশিমুখী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল নিজের উপার্জ্জনের টাকা এক মাড়োয়ারীর ঋণ শোধ ভিন্ন আর কোনো কাজে ব্যয় করিবে না। একটুক্ষণ ভাবিয়া সে কুন্তীর হার বিক্রীর টাকা দশটা বাহির করিয়া আনিয়া কেশবের হাতে দিল। বলিল, "রঙীন কাপড় বা ছিটের কাপড় একটু আনবেন। কয়েকটা জামা করব ভাবছি।

কাপড় আসিল। পাশের বাড়ীর বউয়ের কাছে শেলাইয়ের কল ছিল, যখনই সময় পাইত, শশিমুখী গিয়া শেলাই করিয়া আসিত। কখনও কখনও টাকিয়া কুন্তীর হাতে সেখানে পাঠাইয়া দিত। বউটির স্বভাব মন্দ ছিল না, সে কল চালাইয়া শেলাই করিয়া দিত। রুমালগুলি শশিমুখী হাতে করিয়াই শেলাই করিতে-ছিল। সেগুলি যাহাতে অপরিষ্কার না হয়, সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখিত, শেলাই করিবার আগে সর্ব্বদা সাবান দিয়া হাত ধুইয়া লইত।

পূজা আরম্ভ হইবার দিন দুই আগে সে কোনো মতে শেলাইগুলি শেষ করিয়া ফেলিল। ইহারই মধ্যে সে কুন্তীর জন্য একটা নূতন ব্লাউজ করিয়া দিয়াছিল, মুটুকেও চলনসই গোছের একটা জামা বানাইয়া দিয়াছিল।

কেশব আসিয়া শেলাইগুলি লইয়া গেল। বলিল, এসব আমি নিজে বিক্রী করি না, তবে আমার জানা লোক আছে। তাকে বলে দেব, যতটা পারে আদায়

করতে। আপনি এখন আবার লাগুন আগেকার কাজে, মিষ্টি এ সময় খুব বিকবে।

শশিমুখীর সত্যই কপাল ফিরিয়াছিল। কাপড় বিক্রয় করিয়া সে যাহা পাইল, তাহা তাহার আশাতীত। বাক্সের ভিতরের পুঁটুলি বেশ ভারী হইয়া উঠিল। শশিমুখী বুঝিল, সামনের মাসে মাড়োয়ারীকে টাকা দিতে কিছু কষ্ট পাইতে হইবে না।

পূজা আসিয়া পড়িল। অটল বলিল, "দশ টাকায় কুলোবে না, তা না হলে তোমার জগমোহন দাদার বাড়ীর সকলকে কাপড় পাঠাতাম। যাক, ভাইফোঁটার সময় দেখা যাবে।"

দশটা টাকার কি গতি হইয়াছে, মনে করিয়া শশিমুখীর হাসি পাইল, সে তাড়াতাড়ি অন্যঘরে চলিয়া গেল।

পূজা আসিল, চলিয়াও গেল। শশিমুখীর কাজ ভালই চলিতে লাগিল, দিনও কাটিয়া চলিল একটার পর একটা।

ভাইফোঁটার দিন-তিন আগে অটল বলিল, "ও গো শোন। একটা টাকা দিয়ে যাচ্ছি, তোমাদের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলে মুটুকে নিয়ে জগমোহন দাদার বাড়ী যেও। তাঁকে ভাইফোঁটার নেমন্তন্ন করে এস। তার কাপড় চাদর আমি কাল কিনে আনব। যেও বুঝলে? একটা কথা না হয় রেখেই দেখ।"

শশিমুখী অগত্যা বলিল, "আচ্ছা যাব।"

বেলা দুইটার সময় তাহারা ভবানীপুরের এক দোতলা বাড়ীর সাম্‌নে আসিয়া পৌঁছিল। বাড়ী চুপচাপ। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে একজন ঝিয়ের সঙ্গে দেখা হইল। ঝি পুরানো, শশিমুখীকে সে চিনিত। বলিল, "ওমা, পিসিমা যে! তা বাবু ত বাড়ী নেই।"

শশিমুখী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "বৌদিদি ত আছেন?"

ঝি বলিল, "তিনি এখন ঘুমুচ্ছে, কাঁচা ঘুম ভাঙালে বড় গাল দেবে।"

এ হেন সমাদর পাইয়া শশিমুখী একেবারে হতভম্ব হইয়া গেল। কুন্তী তাহাকে ঠেলা দিয়া বলিল, "চল না মা, নীচে গাড়ীটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।"

তাহারা নামিয়া যাইতেছে দেখিয়া ঝি বলিল, "আচ্ছা, এস তবে পিসিমা, মা উঠ্‌লে আমি বল্‌ব।"

শশিমুখী যখন বাড়ী পৌঁছিল তখন তাহার নাকমুখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছে। কয়েক ঘটি ঠাণ্ডা জল মাথায় ঢালিয়া তবে সে শান্ত হইল।

অটল রাত্রে জিজ্ঞাসা করিল, "ভবানীপুর গিয়েছিলে ত?"

শশিমুখী সংক্ষেপে বলিল, "হ্যাঁ।"

ভাইফোঁটার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল হইতে শশিমুখী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। অটল উঁকি মারিয়া দেখিয়া বলিল, "একি, একেবারে যে রাজসূয় যজ্ঞ সুরু করে দিয়েছ? দশটাকাই বুঝি খরচ করে বসে আছ? কাপড় কিনব কি দিয়ে তাহলে?"

শশিমুখী হাসিয়া বলিল, "না গো না, তোমার দশ টাকা যায়নি। খাবারের টাকা আমি জোগাড় করেছি।"

অটল বলিল, "ও-বাড়ীর বউ দিলে বুঝি? আচ্ছা টাকাটা দাও, কাপড় চাদর নিয়ে আসি।"

শশিমুখী টাকা আনিয়া দিল। অটল কাপড় চাদর কিনিয়া আনিয়া বলিল, "এই নাও, এর চেয়ে ভাল আর ওর মধ্যে হল না। আমি আপিস থেকে যত পারি তাড়াতাড়ি আসব। তোমার দাদারও ত আপিস, তিনিও কিছু আগে আসবেন না চারটার।"

চারটার সময় তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে অটল ফিরিয়া আসিল। রান্নাঘরের দরজার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া বলিল, "কি গো, অতিথি এসে গিয়েছেন নাকি?

শশিমুখী তখন লুচি ভাজিতে ব্যস্ত, আর-সব কাজ এক রকম করিয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। সে বলিল, "হ্যাঁ এসে পড়েছেন, ঘরে বসে আছেন।"

অটল তাড়াতাড়ি ধনবান শ্যালকের অভ্যর্থনার জন্য ঘরে গিয়া ঢুকিল। কিন্তু চেয়ারে একটি অপরিচিত-প্রায় যুবককে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ইহাকে সে মিঠাই বিক্রী করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছে।

কেশব উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "এই যে। আমাকে নেমন্তন্ন করার কথা দিদি আপনাকে বলেন নি বুঝি ?"

অটল অনেক কষ্টে মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল,"না, তাড়াতাড়িতে বলবার সময় পাননি বোধ হয়। তা বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?" সে আবার চলিল রান্নাঘরের উদ্দেশ্যে।

চাপা গলায় তর্জ্জন করিয়া বলিল, "এসব কি কাণ্ড ? ও ছোকরাকে ডেকে এনেছ কেন ? তোমার দাদা কোথায় ?"

শশিমুখী বলিল, "দাদা নিজের বাড়াতেই আছেন সম্ভবতঃ। যে যথার্থ ভাইয়ের কাজ করেছে, তাকেই ভাইফোঁটাতে নেমন্তন্ন করেছি। যে ভিক্ষাবৃত্তির প্রশ্রয় দেয়, সে ভাই হয়েও ভাই নয়, শত্রু।"

অটল বলিল, "কি সব বাজে বকছ ?"

শশিমুখী বলিল "বাজে কি কাজের, তা রাত্রেই টের পাবে। এখন হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে যাও, ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বল গিয়ে। আমি আস্‌ছি খাবারগুলো গুছিয়ে নিয়ে।"

অটল অগত্যা ফিরিয়া গেল।

কিশলয়োৎসব

শ্রীজীবনময় রায়

আজি প্রভাতের রশ্মিপাতের উৎসব মহিমায়,
বনে বনে হেরি একি অপরূপ বেশ !
নব কিশলয়ে স্নিগ্ধ মলয়ে নীল গগনের গায়
ঘন সবুজের কাজরীর সমাবেশ।
ছিল যে ধরণী শুষ্ক অরণি-কণ্টক সমাকুল
রিক্ত মাঘের বেলা অবসান কালে,
ঘুচায়ে সহসা বিধবার দশা কে দিল তারে দুকূল,
রঞ্জিত করি হরিত পত্রজালে !
সাঁওতালী শালে নৃত্যের তালে ঠমকিছে সারি সারি—
আপন পুষ্পগন্ধে মত্ত মন।
ঋতু উৎসবে উজ্জ্বল নভে উঠিয়াছে সঞ্চারি
অবনীর নব আনন্দ শিহরণ।
ধরণীর বুকে উচ্ছ্বাস-সুখে যে দোলা লেগেছে আজ
সবুজ ফোয়ারা—একি তারি উৎসার !

একি ধরণীর শিখা বহ্নির নব পল্লব সাজ !
একি তার নব যৌবন সঞ্চার !
ধারা শ্রাবণের তমাল বনের স্মরণে আজি কি ধরা,
আকাশের পানে পাঠায়েছে মেঘদূত !
চিত্তরসের সুধা পরশের ইঙ্গিত মনোহরা
মূক ধরণীর মন্থর বিদ্যুৎ
ইউকালিপ্ত সতেজ দীপ্ত। মেহগনি, দেবদার
অরুণ-কিরণ-মুকুটে ভূষিত শির।
আমলকী, শাল, মহুয়া, বিশাল বট পিপ্পল আর
বাতাসে বাজায় কিশলয় মঞ্জীর।
মেলি দু'নয়ান কর কবি পান এই সবুজের সুধা—
বনে বনে আজ কিশলয় উৎসব
নব বধূ সাজ সাজিয়াছে আজ বিরহিনী এ বসুধা.
বুঝি আজি তার মিলিয়াছে বল্লভ।

মৃগয়া

প্রাচীন চিত্র হইতে

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্তের সৌজন্যে

আধুনিক মনোবিজ্ঞান

শ্রীহরিপদ মাইতি, এম্‌-এ

মনস্তত্ত্বের আলোচনা অতি প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পুরাতন দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থে, কামনা, প্রত্যক্ষ, স্মৃতি প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ ও সেই সেই মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা দেখা যায়। ইহা সহজেই কল্পনা করা যাইতে পারে যে, বহির্জ্জগতের ঘটনার প্রতি মানুষের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্জ্জগতের প্রতিও তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, মনোবিদ্যার ইতিহাস অতি প্রাচীন হইলেও মনস্তত্ত্বের প্রকৃত অনুসন্ধান ও আলোচনা অতি অল্প দিন হইল আরম্ভ হইয়াছে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রবেশ সর্ব্ব শেষে। মাত্র পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভুণ্ড সাহেব (Wundt) লাইপ্‌জিগে মনোবিজ্ঞানের প্রথম পরীক্ষাগার স্থাপন করেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে মনোবিজ্ঞান দ্রুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় আধুনিক মনোবিজ্ঞানও পরীক্ষামূলক। কার্য্যকারিতার দিক দিয়া ইহা অন্যান্য বিজ্ঞানের সমকক্ষ বিবেচিত না হইতে পারে, কিন্তু ইহার বিজ্ঞানত্বে আজ কেহই সন্দিহান নহেন।

দর্শন ও মনোবিদ্যা

মনোবিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় ইহাও এক সময়ে দর্শনের অঙ্গীভূত ছিল। ইহার আলোচ্য বিষয় দর্শনের একটি প্রধান তথ্য। আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধ আলোচনা কালে দার্শনিককে অনেক স্থলে মনস্তত্ত্বের কথা তুলিতে হয় এবং নিজ মত প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য চিত্তবৃত্তির বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে হয়। এই কারণে অল্পদিনের মধ্যেই মনস্তত্ত্ব দার্শনিকের 'খাসকামরার' বস্তু হইয়া দাঁড়াইল ও তিনি নিজে একাধারে দার্শনিক ও মনোবিদ হইলেন। ইহার ফলে দর্শনের অঙ্গীভূত অন্যান্য বিদ্যার তুলনায় মনোবিদ্যার যেমন এক পক্ষে প্রথমে কিছু সুবিধা হইয়াছিল, অপর পক্ষে আবার কিছু অসুবিধাও হইয়াছিল।

মনস্তত্ত্বের বিশেষ আলোচনা চলিতে লাগিল। খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে পদার্থবিজ্ঞানাদি যখন দর্শন হইতে আপনাদিগের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিল, তখন মনোবিদ্যা মনোবিজ্ঞান নাম লইলেও আপনার স্বতন্ত্র অস্তিত্বের অধিকার স্থাপন করিতে পারিল না। বিজ্ঞানের নামে অনেক দার্শনিক মত পূর্ব্বের ন্যায় মনোবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত হইয়া চলিতে লাগিল। তাহাতে এমন সব আলোচনা প্রাধান্য লাভ করিয়া রহিল, যাহা প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক সমস্যা নয় এবং যাহা মূলতঃ দার্শনিক তত্ত্ব। যেমন শরীর আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধ,বা অনুমানের দ্বারা বাহ্য-বস্তুর স্বরূপ জ্ঞানের সম্ভাব্যতা, প্রচলিত নীতিতত্ত্বের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি ইত্যাদি।

দার্শনিক মনোবিদগণ কোন বিধিমত উপায় অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যেই যে তাঁহাদের মনস্তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন এমন নহে। অনেকে বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠার সহিত বিধিমত অন্তর্দর্শন (Introspection) দ্বারা মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ ও মানসিক ক্রিয়ার পৌর্ব্বাপর্য্য লক্ষ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে চেষ্টা কয়েকটি কারণে সফল হয় নাই।

প্রথমতঃ, তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য ছিল দার্শনিক সত্যতা প্রতিপাদন,—বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কার নহে। ইহার ফলে সাবধানতা সত্ত্বেও অনেকস্থলে তাঁহাদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ-ক্রিয়া অজ্ঞাতসারে দার্শনিক মত ও কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত হইয়া পড়িত। সকলেই জানেন, পূর্ব্ব হইতে কাহারও কোন বিষয়ে স্থির বিশ্বাস কিংবা বিশ্বাসের প্রবৃত্তি থাকিলে, প্রমাণ সন্ধানের সময় অজ্ঞাতসারে তাহার দৃষ্টি কেবলমাত্র অনুকূল ঘটনার দিকেই ধাবিত হয়— প্রতিকূল লক্ষণগুলি সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না। এই

স্বাভিভাবন নীতিতে (auto-suggestion) দাঁড়াইল, ভিন্ন ভিন্ন মুনির ভিন্ন ভিন্ন মনস্তাত্ত্বিক মত। দার্শনিক মতভেদের সঙ্গে মনস্তত্ত্বের রূপান্তর।

দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা মনের একটি সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দিয়া আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিশ্লেষণ ও বিচারের সমগ্র উপাদান কেবলমাত্র পূর্ণবয়স্ক মানবের পরিণত ও চেতন মন হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। অন্যত্র কোথাও মনের অস্তিত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য হইলে তাহার স্বরূপ এই পরিণত ও চেতন মনেরই মাপকাঠিতে স্থিরীকৃত হইত। ফলে দাঁড়াইল একটি পঙ্গু মনস্তত্ত্ব, ব্যবহারিক জীবনে যাহার কার্য্যকারিতা খুবই সীমাবদ্ধ।

স্থূলতঃ বলিতে গেলে, দার্শনিক মনস্তত্ত্বকে বৃত্তিবাদ বলা যাইতে পারে। আত্মা, দেশ ও কালের অতীত, অজড় বা অধ্যাত্ম সত্ত্বা, যে সমস্ত মানসিক ব্যাপার বা অবস্থা আমরা অন্তর্দর্শন সাহায্যে লক্ষ্য করি, তাহাদিগকে সত্ত্বার বৃত্তি (Faculty) বলে। কেহ কেহ অনেকগুলি মৌলিকবৃত্তি স্বীকার করিলেন, আবার কেহ কেহ অল্প কতকগুলি মৌলিক বৃত্তি মানিয়া লইয়া অন্য বৃত্তিগুলিকে তাহাদের যৌগিক বৃত্তি বলিলেন। কিন্তু এই বৃত্তি-বাদের ফলে মানসিক অবস্থা বা ক্রিয়া-নিচয়ের শ্রেণী বিভাগ ও নাম-নির্দ্দেশ ব্যতীত আর কোন বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্য সাধিত হইল না। বিজ্ঞানের যাহা চরম উদ্দেশ্য, কার্য্যকারণ সম্বন্ধনির্ণয় বা ব্যাখ্যা, এই বৃত্তিবাদে তাহা বাদ পড়িল। সুতরাং এরূপ মনোবিদ্যাকে পোষাকী বা অকার্য্যকরী বলিয়া বিজ্ঞানবেত্তারা যে বর্ণনা করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের বিশেষত্ব

আধুনিক মনোবিজ্ঞান দর্শন হইতে সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য-লাভের প্রয়াসী। এই স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টা অনেকদিন হইতে চলিতেছে; আজ সে চেষ্টা সফল হইয়াছে বা হইতে চলিয়াছে। তাহার স্থান আজ বিজ্ঞান-মন্দিরে। পুরোহিত তাহার দার্শনিক নহেন, মনোবিদ্যার বিশেষজ্ঞ। তাহার অনুসন্ধান ও বিচার-প্রণালী অন্যান্য বিজ্ঞানে প্রচলিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী। অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন আপনাদের সিদ্ধান্তগুলি ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করিয়া মানুষের বাহ্য দুঃখ ও অভাব দূর করিয়া সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াই-তেছে, তেমনি মনোবিজ্ঞানও আজ অনুসন্ধানের ফলে মনের কার্য্য নিয়মিত করিয়া কার্য্যকুশলতা ও নৈপুণ্য বর্দ্ধিত করিতেছে। মনোবিজ্ঞান আজ বলিতেছে যে, মন জীবন-চালনায় প্রধান সহায়, মন যেখানে যন্ত্ররূপে জীবনের গতিকে সাহায্য করে, সেইখানেই আমার অনুসন্ধানের ক্ষেত্র এবং সেইখানেই অনুসন্ধানের ফলে জীবনধারাকে সুপথে পরিচালিত করিবার উপায় নির্দ্দেশ করা আমার কাজ। এতদিন পদার্থ-বিজ্ঞান বাহ্য ও জড় প্রকৃতির উপর আধিপত্য করিবার মন্ত্র মানুষকে শিখাইয়াছে। আমি আজ হইতে অন্তর্প্রকৃতির নিয়মনের মন্ত্র শিখাইব।

বিজ্ঞান যে জীবনের এত উপকার সাধন করিয়াছে ও করিতেছে তাহার মূলনীতি বেকনের সুপ্রসিদ্ধ বাণীর মধ্যে নিহিত। তিনি মানুষকে উপদেশ দিয়াছেন যে, প্রকৃতিকে বশ করিয়া কাজ করাইতে হইলে প্রকৃতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে। নিরভিমান, সংযতচিত্ত ও পূর্ব্বাভিমতশূন্য হইয়া প্রকৃতির স্বভাব ও ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ্য করিয়া কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। মহাপুরুষের এই বাণী আধুনিক মনোবিজ্ঞানে প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। "তৃণাদপি সুনীচেন" বাক্যটি ধর্ম্মান্বেষীর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইয়াছে। আমার মনে হয়, যে মনোভাব লইয়া বৈজ্ঞানিকের গবেষণাকার্য্য আরম্ভ ও পরিচালনা করা উচিত, সেই মনোভাবের সম্বন্ধে উহা অধিকতর যোগ্যতার সহিত প্রযুজ্য। বৈজ্ঞানিককে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সহিত তাঁহার বিষয়ের সম্মুখীন হইতে হয়। মানুষের স্বভাব সাধারণতঃ এমনি অভিমান ও পক্ষপাতিত্ব দোষে দুষ্ট যে, এই বৈজ্ঞানিক নিরপেক্ষতা সব সময় অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব নয়।

প্রবৃত্তিমূলক বিশ্বাস ও কল্পনা বৈজ্ঞানিকের কার্য্যের প্রতি স্তরে ভ্রমের সৃষ্টি করিতে পারে। এই কারণে বিজ্ঞানের মূল সংজ্ঞাগুলি নির্দ্ধারণ করিবার সময়, সমীক্ষা (observation) বা পরীক্ষার (experiment) দ্বারা ঘটনা বা বস্তুমূলক বিশেষ তথ্য সংগ্রহ করিবার সময়,

কিংবা সেই সেই সমীক্ষিত বা পরীক্ষিত তথ্য হইতে মৌলিক সূত্র ও পরিকল্পনা (concept) উপপত্তি করিবার সময়,—নিরপেক্ষতা ও নিরাসক্তি রক্ষার জন্য অতিশয় সাবধান হইতে হয়। আধুনিক বিজ্ঞানে এই নিরপেক্ষ ভাব কিরূপে রক্ষিত হয়, তাহার বিষয়ে দু-একটি কথা বলা দরকার।

১। কোন বিদ্যার বা আলোচনার আরম্ভে সংজ্ঞা-নিরূপণ আবশ্যক। এই সংজ্ঞা প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ে পূর্ব্ব হইতে স্থিরীকৃত পরিকল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই সংজ্ঞা নিরূপণের সময়ে বিশেষ সতর্ক হওয়া দরকার, কারণ তাহার দ্বারা যদি আমরা আলোচ্য বিষয়ের মূল স্বরূপ সম্বন্ধে এরূপ পরিকল্পনা করিয়া বসি, যাহাতে যথাযথ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ও বিচারের বিঘ্ন হয় কিংবা যাহাতে অনুসন্ধেয় তথ্য পূর্ব্ব হইতে পরোক্ষভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে বিজ্ঞানের বিশেষত্ব নষ্ট হয় এবং সেই সংজ্ঞারব্ধ অনুসন্ধান ভ্রমাত্মক ও নিরর্থক হইয়া পড়ে। দার্শনিক মনোবিদের মনের সংজ্ঞা ইহার একটি উদাহরণ। মন অধ্যাত্ম সত্ত্বা—সংবিতেই (consciousness) তাহার প্রকৃত প্রকাশ। সমীক্ষার বিষয়ীভূত যে মন তাহা তাহার প্রকাশিত বৃত্তি। এই সংজ্ঞার বিরুদ্ধে মনোবৈজ্ঞানিকের আপত্তি আছে। সংজ্ঞার মধ্যে পরিকল্পনা আছে বলিয়া আপত্তি নয়—পরিকল্পনাটি দুষ্ট বলিয়াই আপত্তি। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞার ফলে মনোবিজ্ঞানের কেন্দ্র সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে। সাধারণ জ্ঞানে ও স্পষ্টতই যে সমস্ত বিষয় মনোবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত তাহা বাদ পড়ে। যিনি মনের বিভিন্নমুখী কার্য্য লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি জানেন যে, সব সময় মনের ক্রিয়া চেতনায় সীমাবদ্ধ নয়—সংবেশন-বিদ্যা (Hypnotism), উন্মাদাদি (Hysteria) মনোগত বিকার ও চিরাভ্যস্ত ক্রিয়া প্রভৃতি হইতে নির্জ্ঞান মনের (unconscious) ক্রিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়। আধুনিক মনোবিদ্যার মনের সংজ্ঞা খুব ব্যাপক। সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের ক্রিয়া এই সংজ্ঞায় স্থান পাইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, মনের অধ্যাত্ম সংজ্ঞা বিজ্ঞানের মূল স্বতঃসিদ্ধের বিরুদ্ধে—সেই স্বতঃসিদ্ধটি মানিয়া না লইলে বিজ্ঞানের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য, কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নির্ণয়, তাহা সম্ভব হয় না, এমন কি নির্ণয়ের প্রেরণা আসে না। বিজ্ঞানের গোড়ায়ই এই কার্য্যবাদ (determinism)। বিজ্ঞানে অলৌকিকতার স্থান নাই। মনকে কার্য্য-কারণের অতীত একটি চরম সত্ত্বা বলিয়া মানিয়া লইলে বিজ্ঞানের কার্য্যবাদরূপ মূল স্বতঃসিদ্ধটি অস্বীকৃত হয়। বিচার্য্য মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়া স্বেচ্ছাচারী আত্মার বৃত্তি বা লীলা হইয়া পড়ে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এই কার্য্যবাদ গোড়াতেই স্বীকার করিয়া তাহার অনুসন্ধান আরম্ভ করে। তাই তাহার বুকে আজ এত সাহস ও উদ্যম। কোন মানসিক ক্রিয়ার কারণভেদ না করিতে পারিলেও সে নিশ্চেষ্ট নয়। সে জানে তাহার কারণ আছেই। তাই সে অভিনব পরীক্ষাপ্রণালীর অনুসন্ধানে ধাবিত হয়।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানে মনের সংজ্ঞা সমীক্ষিত ও পরীক্ষিত বিষয়ের স্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহাতে এমন কোন পরিকল্পনা করা হয় না যাহাতে পরীক্ষা ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়ের অন্তরায় ঘটে। মনকে আমরা আজকাল সত্ত্বা বলিয়া কল্পনা করি না। সমীক্ষিত মানসিক অবস্থা ও ক্রিয়ার অবশ্যকল্প্য আশ্রয় মাত্র বলিয়া ভাবিয়া থাকি; মন যেন বিশেষণ—বিশেষ্য নয়।

(২) বিজ্ঞান-সূত্রগুলি সমীক্ষা ও পরীক্ষালব্ধ ঘটনা বা বস্তুমূলক বিশেষ সত্যের (Phenomena) উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সত্যনির্দ্ধারণে ভুল হইলে সূত্রের ভুল অবশ্যম্ভাবী। ইহা বিজ্ঞান-সৌধের-ভিত্তি-স্বরূপ। ন্যায়-শাস্ত্র এই সত্যের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সমীক্ষার সময়ে ভুলের সম্ভাবনা স্বাভাবিক। সেই জন্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীর নির্দ্দেশ মত একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ দেখিতে হয়, একই অবস্থা ও বস্তু পুনঃ পুনঃ বিশ্লেষণ করিতে হয়, সুবিধা হইলে অবস্থা-নিচয়ের নিয়মমত পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিতে হয়। একজনে দেখিলে একদেশদর্শিতা কিংবা ইন্দ্রিয়বিকৃতির ফলে ভুল হইতে পারে, সেইজন্য বহু লোকে পৃথক পৃথক দেখিতে হয়।

যদি সম্ভব হয় সমীক্ষিত সত্য (Phenomena), ও যে অবস্থা-নিচয়ের মধ্যে সেই সত্যের স্থিতি ও পরিণতি সেই অবস্থা-নিচয়ের, নজির ও পরিমাপ (record and measurement) রাখিতে হয়। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে সম্যক্‌ভাবে বিশেষ সত্য (Phenomena) লক্ষ্য করিবার জন্য পরীক্ষাগারে যন্ত্রের সাহায্য লওয়া দরকার। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায়ও যন্ত্রের প্রচলন নির্ভুল ও সম্যক্ সত্য লক্ষ্য করিবার জন্যই।

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা

এই স্থানে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার প্রকৃতি সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে যে সব ভ্রান্ত ধারণা আছে তাহাদের দু'-একটি নির্দ্দেশ করিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মনস্তত্ত্বের চর্চ্চায় যন্ত্র ব্যবহার কি ? এই প্রশ্নটি ভ্রান্ত ধারণাগুলির মধ্যে নিহিত-আছে বলিয়া বোধ হয়। মন ত সকলেরই আছে, সকলেই নিজেদের মধ্যে মনের অবস্থা ও ক্রিয়াদি লক্ষ্য করিতে পারেন ও তাহাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভও করিয়া থাকেন। কই কাহারও ত সেজন্য যন্ত্রের আবশ্যক হয় না ? কেহ কেহ ভাবেন মনের সাধারণ অবস্থা বা গুণ লক্ষ্য করিবার জন্য যন্ত্রের দরকার হয় না, যোগাদি ক্রিয়ার দ্বারা লভ্য শাস্ত্রোক্ত মনের আলৌকিক বা অতি-প্রাকৃত শক্তি লক্ষ্য করিবার জন্যই যন্ত্রের ব্যবহার। বৎসর দুই পূর্ব্বে সংবাদপত্রে পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানবিদের আবশ্যক বলিয়া বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, পদপ্রার্থীর পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানে ব্যুৎপন্ন হওয়া চাই ; অধিকন্তু যোগশাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা থাকা দরকার। তাঁহাকে যোগশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াদি সম্বন্ধে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, কৌতূহলী হইয়া যাঁহারা পরীক্ষা-গারে যন্ত্রাদি দেখিতে আসেন তাঁহাদের অনেকেই যন্ত্রের বাহুল্য ও আড়ম্বর না দেখিয়া কতকটা ভগ্নোৎসাহ হইয়া চলিয়া যান। কেহ কেহ এরূপও আশা করেন যে, তাঁহারা পরীক্ষাগারে যাইয়া যন্ত্রের মধ্যে বিভিন্ন মানসিক বিকার চাক্ষুষ করিতে পাইবেন।

পরীক্ষার সময় মনোবিদ্ সামান্য যন্ত্র লইয়া অনেক সময় গুরুতর সমস্যার সমাধানে ব্যস্ত থাকে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় যন্ত্রের উদ্দেশ্য সমীক্ষণকে নিয়মন করা। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যাহা আলৌকিক বা অপ্রাকৃত তাহা কোন বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয় নহে। দৈনন্দিন জীবনে দেখিয়া শুনিয়া যে সাধারণ জ্ঞান আমরা লাভ করিয়াছি তাহাই, বা সেইরূপ জ্ঞান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূয়োদর্শন ও পরীক্ষার দ্বারা লাভ করিলে বিজ্ঞান হইয়া দাঁড়ায়। কোন মানসিক ক্রিয়া বা মানসিকক্রিয়াজনিত দৈহিক ক্রিয়া কিরূপে ঘটে, অন্যান্য ক্রিয়ার সহিত সেই সব ক্রিয়ার সম্বন্ধই বা কিরূপ তাহা সাবধানতার সহিত পুনঃ পুনঃ সমীক্ষণ, কিংবা সম্ভব হইলে যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। তাহাতে মনের সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান অপেক্ষা আমাদের সিদ্ধান্ত অধিকতর দৃঢ় ও প্রামাণ্য হয় মাত্র।

একটি মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষার দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটি বুঝাইবার চেষ্টা করিব। এককালীন মনোযোগের ফলে কতগুলি বিষয় (Stimulus objects) এক সঙ্গে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি সে-সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে ধারণা নানারূপ। কেহ কেহ বলেন, এককালে একাধিক বিষয়ে আমরা অভিনিবেশ করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন, অনেক গুলি বিষয় এক সঙ্গে উপলব্ধি করা যায়। এ সম্বন্ধে আধুনিক মনোবিজ্ঞান পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছে যে, মনঃপ্রসার বা ক্ষণমাত্র মনোযোগের ফলে বিষয়োপলব্ধি (range or span of attention) সর্ব্ব অবস্থায় বা সর্ব্বপ্রকার বিষয় উপলব্ধিতে এক নহে। মনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে এই প্রসারের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অসংযুক্ত অক্ষর (যথা স, ঈ, ফ, চ, শ, এ) চক্ষুর সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য প্রদর্শিত হইলে পাচটি কিংবা ছয়টির অধিক আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন অক্ষর মিলিত করিয়া যুক্তাক্ষর প্রদর্শন করিলে (যথা স্ফী, শ্চে ইত্যাদি) আমাদের উপলব্ধির প্রসার বর্দ্ধিত হইয়া যায়। আমরা একসঙ্গে আঠারটি কুড়িটি অযুক্ত অক্ষর আয়ত্ত করিতে পারি। আবার অক্ষর সংযোজন করিয়া অর্থপূর্ণ পদ প্রদর্শন করিলে অক্ষর উপলব্ধির প্রসার অনেকগুণ

বদ্ধিত হইতে দেখা যায়। মনঃপ্রসারের সম্বন্ধে যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত পরীক্ষা দ্বারা লব্ধ হইয়াছে সে-সব এখানে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য পরীক্ষাগারে কিরূপে যন্ত্রপ্রয়োগ হইয়া থাকে এখানে তাহাই সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিব।

এককালীন মনোযোগের ফলে উপলব্ধির প্রসার নিরূপণ করিতে হইলে প্রথমে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলির প্রতি মনোনিবেশের অনুকূল অবস্থা বা সংস্থিতি (attitude) পরীক্ষ্যমান ব্যক্তির (subject) মনে উৎপাদন করা আবশ্যক। এই সংস্থিতি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষ্যমান ব্যক্তিকে যথাযথ উপদেশ দেওয়া হয়। উপদেশ দেওয়া মাত্রই এই সংস্থিতি উৎপন্ন হয় না। অন্য পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গিয়াছে যে, কোন নূতন বিষয়ে চিত্তনিয়োগ করিতে হইলে কিছু সময় আবশ্যক। ইহাকে অভিনিবেশানুকূল সময় (time of accommodation of attention) বলা যায়। ইহার পরিমাণ প্রায় ১½ সেকেণ্ড। পরীক্ষার প্রতি পরীক্ষ্যমান ব্যক্তির মনোযোগ আকর্ষণের ১½ সেকেণ্ড পরে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি অল্পকালের জন্য উদ্ভাসিত বা প্রদর্শিত করা দরকার। দেখিবার পর পরীক্ষ্যমান ব্যক্তি দৃষ্ট বিষয়গুলি নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

উপরি উক্ত পরীক্ষাটি অতি সহজে কেবলমাত্র কাগজ ও কলমের দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। একটি কাগজের উপর দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি লিখিয়া তাহা অন্য একখণ্ড কাগজের দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হইল। পরীক্ষ্যমান ব্যক্তিকে কি করিতে হইবে বুঝাইয়া দিয়া পরীক্ষারম্ভের সঙ্কেতের প্রায় ১½ সেকেণ্ড পরে ক্ষণেকের জন্য উপরের কাগজখণ্ডটি তুলিয়া লইয়া বিষয়গুলি দেখান যাইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থাটি সহজসাধ্য হইলেও ইহা হইতে যে সিদ্ধান্ত লাভ করা যাইতে পারে তাহা নির্ভরযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; সেইজন্য কাগজ কলম ও আন্দাজের পরিবর্ত্তে পরীক্ষাগারে যন্ত্রের ব্যবহার হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য উদ্ভাসিত করা হয়। ইহার নাম ক্ষণভাসযন্ত্র (Tachistoscope)। ইহা একটি খাড়া বোর্ডের মত। এই বোর্ডের সাম্‌নে কিছু দূরে পরীক্ষ্যমান ব্যক্তিকে বসান হয়। বোর্ডের একটি গবাক্ষের পিছনে একটি কালো পর্দ্দার মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত অঙ্কিত। পরীক্ষারম্ভের পূর্ব্বে পরীক্ষ্যমান ব্যক্তি এই বৃত্তটির প্রতি চাহিয়া থাকে। প্রায় ১½ সেকেণ্ড পরে পর্দ্দাটি উঠিয়া যায় এবং দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি মুহূর্ত্তের জন্য দেখা যায়। নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত অতিবাহিত হইবার পর পর্দ্দাটি নামিয়া আসিয়া বিষয়দৃষ্টি রোধ করে। এই মুহূর্ত্তের পরিমাণ $\frac{1}{1000}$ সেকেণ্ড।

দৃষ্টান্তটি হইতে বুঝা যায় যে, মনের মনোযোগরূপ ক্রিয়ার সহিত যন্ত্রের সম্বন্ধ পরোক্ষ মাত্র। যন্ত্রদ্বারা মনের কার্য্য সাক্ষাৎভাবে পরিমিত হইল না। যে সিদ্ধান্ত আমরা কেবলমাত্র কাগজ কলমের দ্বারা মোটামুটিভাবে নির্দ্দেশ করিতে পারি তাহাই যন্ত্র সাহায্যে সম্যক্‌রূপে নির্দ্ধারিত হইল।

মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় বিঘ্ন

এখানে বলা যাইতে পারে যে, মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাকালে কতকগুলি অন্তরায় লক্ষিত হয়। এই অন্তরায়গুলি মানসিক ব্যাপারের বৈশিষ্ট্যের সহিত সংশ্লিষ্ট। এইগুলির জন্য পরীক্ষার সময় বিশেষ সাবধান হইতে হয় এবং অনেকস্থলে সাবধানতাসত্ত্বেও পরীক্ষায় সাফল্যলাভ নাও হইতে পারে।

১। পরীক্ষার সময় মনের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাব আবশ্যক। কিন্তু আমাদের অহং-কার বৃত্তি জীবনধারণের পক্ষে এতই স্বাভাবিক যে, মনের সব কাজেই আমরা এই অহং-কারের দ্বারা প্রভাবান্বিত। যে অবস্থা বা ক্রিয়া পরীক্ষণীয় তাহাকে এই অহং-কারের প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে যথার্থ অন্তর্দর্শন হয় না। ক্ষণেকের জন্যও অহং-কার ত্যাগ প্রভূত আয়াসসাপেক্ষ।

২। মনোবিজ্ঞানের একটি বিশেষ অসুবিধা এই যে, তাহার পরীক্ষিত ঘটনাগুলি জড়বিজ্ঞানের ঘটনার তুলনায় সর্ব্বদা চঞ্চল ও গতিশীল। মনের এই স্বাভাবিক গতিশীলতা পরীক্ষার সময় বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকে। যে অস্থায়ী

ও ব্যতিরেকী ন্যায়ের উপর এই সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়, তাহার প্রয়োগ সব সময় সহজ হয় না। এই সমস্ত বিঘ্নের জন্য মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। আজকাল মনোবিদ্‌গণ কোন বৈজ্ঞানিক সূত্রে উপনীত হইবার পূর্ব্বে সেই সূত্রের সত্যতা নানাদিক হইতে নানা উপায়ে নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। এই উপায়গুলির মধ্যে তুলনামূলক উপায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কার্য্যকারিতা

মাত্র অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে আধুনিক মনোবিজ্ঞানের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই উহা প্রভূত উন্নতিলাভ করিয়াছে। আজ ইহার ক্রিয়া কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকেন্দ্র ও পরীক্ষাগারের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। মানুষের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশে আজ কেহই সন্দিহান নহেন। গত চৌদ্দ-পনের বৎসরের মধ্যে মানুষের মন লইয়া বা মনের ক্রিয়ার ফলে যেখানেই সমস্যা উঠিয়াছে, মনোবিদ্‌ সেখানেই তাঁহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান প্রণালীর সাহায্যে কার্য্যকারণ নির্ণয় করিয়াছেন ও ব্যবহারিক জীবনব্যাপারের সাহায্য করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ইহার ফলে মনোবিদ্‌ পাশ্চাত্যদেশে আজ নানাক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞের পদ অধিকার করিয়া আছেন। শিক্ষা, শিল্প, রোগ নিরাকরণ প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ে মানব মন ও চরিত্রের সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হয়, সেই সেই বিষয়ে সাধারণ বুদ্ধির উপর আর নির্ভর না করিয়া মনোবিদের মত ও পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আজকাল কার্য্য করা হইয়া থাকে।

মনোবিদ্‌ আজ পরীক্ষার দ্বারা ছাত্রদের প্রকৃতিগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, শিক্ষান্বেষী সকল ছাত্রের সহজ বুদ্ধি একরূপ নয়। যাহাদের সহজ বুদ্ধি প্রখর ও উচ্চ শিক্ষার অনুকূল তাহাদেরই উচ্চ শিক্ষার চেষ্টায় সাফল্যের সম্ভাবনা। শিক্ষার প্রথমেই সহজ বুদ্ধির দিক হইতে ছাত্রদের শ্রেণীবিভাগ করিয়া এবং এই বুদ্ধির তারতম্য ও প্রকৃতি অনুসারে উপযোগী শিক্ষা-ধারার নির্দ্দেশ করিয়া মনোবিদ্‌ শিক্ষানুষ্ঠানের মধ্যে প্রভূত অপচয়ের সম্ভাবনা দূর করিয়াছেন। শিক্ষা সমাপ্তির পর কে কোন্‌ কার্য্যে প্রকৃত উপযুক্ত, তাহাও পরীক্ষা দ্বারা বলিয়া দিবার ভার তাঁহার হস্তে। শিক্ষা-বিষয়ে আমরা এতদিন চিরাচরিত প্রণালী অন্ধভাবে অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম। অল্পদিন হইল মনোবিজ্ঞানের সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষাদানপ্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কোন বিষয় শিক্ষা দিবার সহজ ও প্রকৃষ্ট উপায় কি তাহা আজকাল অনেক স্থলে মনোবিদের পরীক্ষার দ্বারা বা মনস্তত্ত্ব অনুসারে নিরূপিত হয়।

মনোবিৎ দেখাইয়াছেন, শিল্পানুশীলনে যে সব বহু-কালাভ্যস্ত কার্য্য নৈপুণ্যের অভিমান লইয়া আমরা এতদিন করিয়া আসিয়াছি সেই সব কার্য্যেও বহুস্থলে শক্তির অযথা অপব্যবহার হইয়া থাকে এবং সেই সব অভ্যস্ত কার্য্যের উন্নতি সম্ভব। পাশ্চাত্য দেশে অনেক শিল্পালয়ে কোন নৈপুণ্যমূলক কার্য্য কিরূপে আয়ত্ত ও সম্পাদন করা উচিত তাহা বিশেষজ্ঞ মনোবিদের পরামর্শ মত স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। মনোবিকার নিরাকরণের চেষ্টা আধুনিক মনোবিজ্ঞানের আর একটি প্রধান বিশেষত্ব। মনের গতি তাহার যাত্রাপথে রুদ্ধ হইয়া ঘূর্ণাবর্ত্তের সৃষ্টি করিয়া যেখানে বিকারে পরিণত হয় মনোবিদ্‌ সেখানেও তাঁহার মনের engineering-এর দ্বারা রোধের হেতু লক্ষ্য করিয়া রুদ্ধগতির মুক্তির পথ করিয়া দিতেছেন।*

* উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের বিজ্ঞানশাখায় পঠিত।

নাম-মাহাত্ম্য

শ্রীনন্দি শর্ম্মা বিরচিত

গাড়িতে মাথা গলিয়েই "বিশল্যকরণী" পত্রিকার পরিচিত রিপোর্টার বিরূপাক্ষ পাকড়াশীকে দেখে চমকে গেলুম। তিনি কাগজ থেকে চোখ তুলে আমার ওপর মেলে ধরলেন। সবিস্ময়ে বললেন,—"তুমি? আরে আমি ভেবেছিলুম যে···"

"না—সে কপাল নয়, তা হ'লে তো··"

"না না, এখনি যাবে কোথা? শুভদিন দেখে যাও। তার সংবাদ নিয়ে ফিরছি,—হাতেই রয়েছে···"

"ব্যাপার কি? গিয়েছিলে কোথায়?"

"এই যা বানিয়ে এনেছি, শুনলেই বুঝতে পারবে,—আমারও 'রিভাইজ' হয়ে যাবে!"

"বানিয়ে এনেছি মানে?"

"বানিয়ে নয় তো কি! সে-ভাষা আমা ভিন্ন আর বুঝতো কে? ত্রেতাযুগের খাটি প্রাকৃত—আজও বিরূপাক্ষের এত কদর-আদর আর কিসের!"

"তুমি বুঝলে কি করে?"

"আরে সব জিনিষ কি জেনে বুঝতে হয়! বুদ্ধির তবে কাজটা কি? শর্ট্-হ্যাণ্ড চালাইনি—লম্বা হাতেই লিখেছি, শোনো—

শুভ শ্রীরাম-নবমী দিবসে শ্রীবৃন্দারণ্যে কপিবৃন্দের একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়। নানা দিগ্‌দেশ হ'তে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সভ্যগণ সমবেত হ'ন ও মুখর-উৎসাহে সভার কার্য্যে যোগদান করেন। প্রাচীন ও নবীন সকলেই সদলে উপস্থিত ছিলেন।

বহু বিতণ্ডার পর শ্রীজাম্বুবানকেই অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্থির করা হয়েছিল। মাত্র লাঙ্গুলহীনতাই তাঁর প্রতিকূলে ছিল, কিন্তু অমরত্ব, প্রাচীনত্ব এবং জ্ঞানবৃদ্ধত্ব ছিল তাঁর অনুকূলে; সুতরাং সহজেই বিরোধ মিটে যায়।

তিনি একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় বলেন,—যদিও আপ্তসার হিসাবে বিনয় বাক্যের বাঁধুনি কোসে বক্তৃতা আরম্ভ করাই বিধি, কিন্তু আমাদের নেশুনের তা নিয়ম নয়। তাই নিজেকে ত্রিকালজ্ঞ বলে গৌরবের দাবী করচি না। কথাটা অসম্ভবরূপ সত্য হলেও, নাই বা বললুম। তবে সত্যের খাতিরে বলি—তিন যুগ দেখেছি বটে। সেই অধিকারে—'শ্রীমান' বলে সম্বোধন করলে, আশা করি তোমরা ক্ষুণ্ণ বা রুষ্ট হবে না। (সকলে এক-কালে বলে উঠলেন—বাক্যের এরূপ সুপ্রয়োগে আমরা সকলেই সন্তুষ্ট।)

—নিতান্ত প্রয়োজনবশেই তোমাদের এতটা কষ্ট দেওয়া হয়েছে; নিশ্চয়ই বহু অসুবিধা ও ক্ষতিস্বীকার করে তোমাদের আসতে হয়েছে। অথচ তোমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন যোগ্য আয়োজনই আমাদের নাই। আশা করি—এই সম্মিলনের আনন্দ দিয়ে সেই অভাব ত্রুটি পূরণ করে নেবে। মিলনের এমন সুযোগ-সৌভাগ্য, একবার মাত্র ত্রেতায় আমাদের মিলেছিল। সেটা ছিল মা জানকীর উদ্ধারকল্পে, আর এটা হচ্ছে, আমাদের ভ্রান্ত বংশধরদের,—যাঁরা নিজেদের নর বলে পর হয়ে রয়েছেন,—তাঁদের উদ্ধারকল্পে। বেচারাদের বড় সঙ্কট সময়, অবহেলা করা আর উচিত হবে না। জাতে তুলে নিয়ে,···" ইত্যাদি।

একজন বলে উঠলেন.—তারা আমাদের কে? তাদের জন্যে আমাদের এত মাথাব্যথা কেন?

—সে-কথা সুযোগ্য সভাপতি মশায়ের কাছে এখনি শুনতে পাবে। আমি কেবল এই সভার উদ্দেশ্য সফল করবার জন্যে তোমাদের সাহায্য প্রার্থনা করচি। সকলে আমার আশীর্ব্বাদ ও শুভ ইচ্ছা গ্রহণ কর।

পরে চিত্রকূটসমাগত এক সম্মানী প্রাচীন উঠে বললেন,—আমি প্রস্তাব করি, অঞ্জনাদেবীর নয়নাঞ্জন, কপিপ্রধান পবন-পুত্র শ্রীশ্রীহনুমানজী এই সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করে' আমাদের মুখরক্ষা

করেন। তিনি শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অবিসম্বাদী ভক্ত,—প্রাচীন, প্রাজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, 'বোটানির' বিশেষজ্ঞ, ভারতের গৌরবস্থল এবং চিরস্মরণীয়। তিনি অমর বলেই আজ আমরা তাঁকে লাভ করবার সৌভাগ্য লাভও করেছি।

গুম্নারের এক মাতব্বর ওজস্বিনী ভাষায় প্রস্তাবটি সমর্থন করলেন।

'বন্দে রঘুবরম্' ধ্বনির মধ্যে মহাবীরজী একটি উচ্চশাখে আসন গ্রহণ করলেন।

বলাই বাহুল্য—সম্মানীরা সকলেই ডেলো-ডায়সে আসন পেয়েছিলেন।

শ্রীযুক্ত সভাপতি তখন সমাগত সভ্যদের সম্বোধন করে বললেন—

শ্রদ্ধেয় জাম্বুবান এবং স্নেহাস্পদ প্রীতিভাজন নাতী নাতনীরা! উচ্চাসনে আমাদের জন্মগত অধিকার, তবে আজ এই সভায় সর্ব্বোচ্চ আসন দান করে' আমাকে যে সম্মান দিলে, জানি না আমি সেই আসনের সম্মান রক্ষা করতে সমর্থ কি না।

পূর্ব্বে সভাসমিতি যে ছিল না তা নয়। সে ছিল,—বিবাহ-সভা, স্বয়ম্বর-সভা, পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি। ক্রমে তা হরিসভায় এসে থেমেছিল। তাতে খোলের আওয়াজ ছাড়া গোলের কিছু ছিল না। প্রসাদ খেয়ে যে-যার নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাড়ী যেত, অপরের মাথায় কেউ হাত বুলুতো না। কিছু কাল হতে সভার বাড়বৃদ্ধি এবং নামরূপ দ্রুত বেড়ে চলেছে।—

—কি শাস্ত্রে, কি সাধনায় স্বার্থত্যাগই ছিল তখন লক্ষ্য। এখন স্বার্থরক্ষার তরেই এত সভাসমিতির সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। সব দেশের সব জাতই দল বেঁধে সভা ফেঁদেছে,—ধোপ-সভা, গোপ-সভা, ডাক্তার-সভা, মোক্তার-সভা;—ধনিক, বণিক, শ্রমিক কেউ বাদ নেই। কেরাণী-সভা কম-জোর; তাদের মেরে রেখেছে—মুদী, মা-ষষ্ঠী আর আপিস-মাষ্টার। বসেনি কেবল লেখক-সভা, তাদের অবস্থা নাকি কেরাণীরও নীচে, যেহেতু তারা কেবল লিখতেই পারে, কথা কইতে পারে না। কন্‌ফারেন্সে কথার কসরৎ আর কথার কারবারেরই কদর। সকলেই তাদের কর্ত্তা, চতুর্দ্দিকেই দিকশূল, পাবলিশার পাবলিক্, পেট আর পুলিস্। যারা দেশের মনের খোরাক যোগায় তাদের পেটের খোরাক নেই, সভার ডাকও নেই! আছে কেবল দুর্গতি, তাই নিয়ে তারা বেশ আছে।

শুনে একটি ধীমান বলে উঠলেন,—কথাটা বুঝলুম না, দুর্গতি অবলম্বনে লোক বেশ থাকে কি প্রকারে এবং কেন?

সভাপতি বললেন,—দীর্ঘজীবী হও। উত্তম প্রশ্নই করেছ বাবাজী! সর্ব্বাগ্রে এটা কিন্তু মেনে নেওয়া চাই যে লেখকেরা বুদ্ধিবিদ্যা দু-ই রাখেন (মতামত বা ভুলভ্রান্তির কথা স্বতন্ত্র)—সে-কারণ মান-মর্য্যাদা জ্ঞানও রাখেন। যদি কেউ সহসা তাঁদের বলে বসেন (যেহেতু তা বলাটা খুবই স্বাভাবিক এবং সহজ)—লেখবার জন্যে তোমাদের মাথার দিব্বি দেয় কে? লিখ্‌তে বলেছিলুম কি?

—বেচারাদের জবাব আছে কি! শুনে তাদের মাথা কাটা যায়; ভাবে—তরোয়ালদে হলেই ভাল ছিল! নিরস্ত্র দেশে তাদের সে সুখও নেই। তাই বোধ হয় তাঁরা কো-অপারেশ্যন্ আর কিস্‌মৎ নিয়ে থাকেন। বিদ্যায় বিনয় বাড়ে। এতে সেই প্রমাণই পাওয়া যায়। খুবই আনন্দের কথা। আমরা এতদিন ওই পথ ধরেই ছিলুম,—আজ ব্যতিক্রম ঘটায় তাঁদের কাছে আমাদের হটে যেতে হ'ল, তাই কথাটা তোমাদের জানিয়ে রাখচি।

সম্বলপুর, সমাগত জনৈক সভ্য বললেন,—আপনি সম্ভবত সংবাদপত্রাদি দেখা ছেড়ে দিয়েছেন, সাহিত্যিক-সভা বা সাহিত্য-সভার অধিবেশন হয় বই কি।

—হয়, বৎস, হয়। সেখানে গভীর গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া অন্য কথা বন্ধ। লেখকদের কথা কমই হয়। লেখক যদি কাতরে বলেন—

> "সকলি দিলাম তুলে ধরে বিথরে,
> এখন আমারে লহ করুণা করে।"

তখন শুনতে হয়—

> "ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই! ছোট এ তরী
> আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।"

তখন যে 'তোমারি' সোনার ধান 'আমারি' হয়ে দাঁড়ায়, সে-যে তখন সকলের—বিশ্বের। তুমি সরে পড়।

অন্নই খাই,—কে কি করে, কি খেয়ে ধান জন্মালে, তার খোঁজ রাখে কে? এই যে অমৃত-ফল আম্র আমরা উপভোগ করি, কিন্তু যাঁর প্রসাদাৎ—তাঁর প্রাপ্য যা তা তো জান! একটা ফলে হাত বাড়িয়েছে কি……! বুঝলে—এটা যে হিঁদুর দেশ—মা ফলেষু কদাচন!"

—সব দেশেই এই ব্যবস্থাই ছিল, এখন কোথাও কোথাও 'অনারেবল্ এক্‌সেপ্‌সন্' দেখা দিয়েছে। জান না—

"Haydn grew up in an attic, and Chatterton starved in one. Addison and Goldsmith wrote in garrets……Their damp stained walls are sacred to the memory of noble names………All solemn thoughts……were forged and fashioned amidst misery and pain in the sordid squalor of the city garret.

"Ever since the habitation of men were reared two storeys high, has the garret been the nursery of genius………"

আবার কি চাও?

লোক গাঁটের কড়ি বার করে তা প্রকাশ করে,—তোমাদের 'নাম'কে বাঁচিয়ে রাখে।

কি? প্রাণটা বাঁচাবার কথা বলচ? প্রাণ না দিয়ে চিরস্মরণীয় হয়েছে ক'জন—তা দেখাতে পার? সেটা বুঝি কিছু নয়? লেখকদের এসব কথাও বোঝাতে হয়!"

বেচারারা মাথা চুলকে চুপ!

কথাটা দেখচি অস্বীকার করবার নয়। বাংলার শ্রীচৈতন্য সেই দেশকে এই চৈতন্যই দিয়ে গেছেন,—খোদ ইষ্টের চেয়ে নাম বড়। তাই না ইষ্ট ভুলে, নামের জন্যে এত লড়াই লাগে,—লেগেও রয়েছে। নাম হলে তাদের সব কাম ফতে! আসল কথা পূর্ব্বসংস্কার, ল্যাজের জন্যেই লড়াই। যাকে বলে 'টগ্-অফ-ওয়ার'—ল্যাজ ছেঁড়াছিঁড়ি। তাতে টান পড়লেই লাগে।

—তোমাদের কাছে ও-বস্তুটির গুণকীর্ত্তন নিষ্প্রয়োজন; ওর মধ্যে যে কত সুযোগ-সুবিধা আত্মগোপন করে আছে, ও জিনিষটির মূল্য কত নিশ্চয়ই শ্রীমানদের তা অবিদিত নাই।

সকলেই গর্ব্বোৎফুল্ল নেত্রে পশ্চাতে চাইলেন।

সভাপতি বললেন,—আমাদের প্রাচীনত্বের প্রমাণ-প্রতীক, এই মূলধনে বাবাজীদের অনেকেরই লোভ পড়ে থাকবে। সেটা অবশ্য স্বাভাবিক। স্বনামধন্য কুলতিলক ডারউইন কাকেও ক্ষুণ্ণ করেন নি, সমান গৌরবের অধিকার দিয়ে গিয়েছেন। অস্থি-বিদ্যায় তাঁর ছিল হস্তীসদৃশ বিরাট মস্তিষ্ক,—হাড়ের হাড়হদ্দ কোরে চোখে আঙুল দিয়ে লাঙুলের অবস্থানভূমি দেখিয়ে দিয়েছেন। কারুর ক্ষুব্ধ হবার পথ রাখেন নি।

এই আবিষ্কারের খ্যাতিটা তিনি নিলেন বটে, কিন্তু সত্যের সম্মান রাখতে হলে আমাকে বলতেই হয়—সেটা ভারতেরই প্রাপ্য। মূলাধারে কুণ্ডলিনীর ইঙ্গিত তাঁর বহুপূর্ব্বে ভারত শুনিয়ে রেখেছিল। তবু আমরা ডারউইনের কাছে কৃতজ্ঞ, যেহেতু বিস্মৃতিটা তিনিই ভেঙে দেন।

—তার পরে-না জনৈক মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রকাশ্য সভায় নিজ মুখে স্বীকার করে ফেললেন,—"আমরা এক আত্মবিস্মৃত জাতি!" তিনি যে কারণেই বলুন, ইঙ্গিতটি কিন্তু ছোট হলেও খাটো নয়।

—আবার Professor Sir Arthur Keith when lecturing on Machinery of Human Evolution, at the Royal Institution—

বলে দিয়েছেন—"It was possible that if a selection were made of human beings with an incipient tendency to grow a tail, a race of people could be produced in 10 or 15 generations, well provided with tails."—

তাই না ভেতর থেকে সব সংস্কার ফুট্ কাটে! পশ্চাতে একটা কিছু পাবার তরে কত-না লালায়িত! দল বেঁধে নিজেদের মধ্যে লড়াই মক্স করে। আমাদের গোরিলা 'ওয়ার-ফেয়ার' তো অনেক দেশই অনুকরণ করছে। কিন্তু এটা-যে অধিকারী-ভেদের দেশ, গোবিন্দ অধিকারীর ক্ষেত্র। প্রেম কই? কেবলই leaps and bounds-এর দিকেই ঝোঁক! সেই পূর্ব্বসংস্কার!

—অনেক লক্ষণই বিলক্ষণ প্রবল, নেই কেবল যেটি আমাদের প্রধান সম্বল—অবাধ প্রেম। সে রসে এরা আজও বঞ্চিত। ডেমোক্রেসীও কয়—কাজে কিন্তু 'নেমো'ক্রেসী। একবার রামায়ণখানার পাতা ওল্টালেই পাত্তা পাবে,—সাম্যের জলন্ত পরিচয় ত্রেতায় আমরাই দিয়ে রেখেছি। বাল্মীকি তার পাকা রেকর্ড রেখে গেছেন। আমরা একা কোনো কিছু উপভোগ করি না,—ভাগ্যলব্ধ এই মুখের রংটা পর্য্যন্ত আপনার জনদের সমান হিস্‌সেয় বেঁটে দিয়েছি।—

সভায় 'ধন্য ধন্য' ধ্বনি উত্থিত হ'ল।

—তবে বর্ণচোরা বলে একটা কথা আছে। বুদ্ধির প্রলেপে অনেকে সেটা ঢেকে বেড়ান। কিন্তু beauty is but skin deep বলেও যে একটা দামী কথা রয়েছে। একদিন সেটা বেরিয়ে পড়বেই। সাম্য সেদিন আপনিই ফুট্‌বে।

—যতদিন না সেই শুভদিন আসে, ততদিন আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে,—এক নেশ্যন্ বলে মেনে নিতে পারচি না। কাজের মধ্যে দিয়েই তারা এসে পড়বে। হতাশ হবার কোনো কারণ দেখছি না, বরং যা দেখ্‌চি তাতে বলতেই হয়,—হবে, হবে, তাও হবে এবং নামও র'বে। তাই আশীর্ব্বাদ করি—সুমতি হউক।

—লাঞ্চের সময় হয়েছে, 'অস্পৃশ্যাদি' অন্যান্য কথা 'আফ্‌টার লাঞ্চ' হবে। ভক্তেরা—কলাগাছী, কলাবাড়ী, কান্দি, হাইলাকান্দি হ'তে যে সব শুস্পৃশ্য পাঠিয়েছেন, এখন বাবাজীরা পরিতোষপূর্ব্বক তার সদ্ব্যবহার কর।

দর্শকদের মধ্যে গোঁসাইদের ছাপমারা একজন বললেন,—"গোবিন্দ, গোবিন্দ, বেল্লিকরা বলে কি? জবরদস্তি নাকি! ওরা আবার কবে মানুষ হ'ল?"

বাচস্পতি বললেন,—"যবে থেকে আমরা অমানুষী আরম্ভ করেছি। তোমার ভয় কি শিরোমণি, ভালই তো—যজমান বাড়বে। এ দুঃসময়ে এখন ওদের পেলে যে বাঁচি! যা আসে—আসতে দাও,—ও জাপানী খদ্দর—গরমিলও হবে না, বেমানানও ঠেকবে না, খাসা মিশ্ খাবে, আসতে দাও। নামের মোহে বদ্‌নাম আর বাড়িও না।

কয়েকজন ১২৪শ ফেলে ৫৫৫ ধরালে।

রিপোর্টার বিরূপাক্ষ পাকড়াশী আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কেমন শুন্‌লে?"

বল্‌লুম—"সত্য?"

বললেন,—"তুমি না লেখক! খাদ্ ভিন্ন গড়ন হয়? তোমাদেরই বড়রা বলেন,—সত্যে আর কল্পনাতে না মেশালে উপভোগ্য উপন্যাস ওৎরায় না।"

—"যাক্, এখন চলেছ কোথায়?"

—"কাশীতে,—পিশাচমোচনে একটা ডুব্ দিতে।"

কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন ও আয়োজন

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

আজও বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বৈঠকে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন আছে, অথচ আয়োজন নাই, এই সম্বন্ধে আলোচনা উথাপন করিতে লজ্জা বোধ করিতেছি। কিন্তু দিনের পর দিন বাংলা দেশের কৃষিকর্ম্মের ও কৃষিজীবীর অবস্থা এইরূপ হইয়া উঠিতেছে যে, কৃষিশিক্ষার কথা না তুলিলে আর গতি নাই।

এমন একদিন ছিল যখন যেমন-তেমন করিয়া কৃসি-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলেও ক্ষতি ছিল না। কোন উপায়ে অত্যন্ত সাধারণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া যে পরিমাণ ফসল পাওয়া যাইত, তাহাতে অন্নবস্ত্রের অভাব ঘটিত না।

আজ, একদিকে যেমন আমাদের প্রয়োজনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে, অপর দিকে সমস্ত পৃথিবীজোড়া বিপুল বাণিজ্যের হাটে আমাদের ডাক পড়িয়াছে। কোন বিশেষ ফসলকে কোন নির্দ্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে আর ধরিয়া রাখা যাইতেছে না। রাখিবার চেষ্টা করাও বৃথা, কেন না আজ পৃথিবীর হাটে কেনা-বেচা না করিলে আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের (economic life) পুষ্টিসাধন সম্ভবপর হইবে না। এই হাটে আমাদের আবশ্যকীয় ও অনাবশ্যকীয় বহু পণ্যদ্রব্য কিনিতে হয়; আর, ইহার অধিকাংশ মূল্য দিতে হয় কৃষিজাত ফসল বেচিয়া। ১৯২৫-২৬ সালে ৩১৩ কোটি টাকার রপ্তানি মালের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ ছিল কাঁচা মাল ও আংশিক ভাবে প্রস্তুত করা দ্রব্য। বাংলা দেশের পাটের খরিদদার বিদেশীরা, পৃথিবীর হাটে ইহার চাহিদা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ভারতবর্ষের তুলা, গম, চাল, তৈলশস্য প্রভৃতি বিরাট আন্তর্জাতিক বাণিজ্য-যজ্ঞের একান্ত আবশ্যকীয় উপাদান—ইহা আমাদের যোগাইতেই হইবে। এই যজ্ঞের সহিত অভিমান করিয়া অসহযোগিতা করিলে আমরা যে কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইব তাহা নহে, পৃথিবীর কাছে হাস্যাস্পদ হইব।

তারপর আধুনিক যুগের শাসনতন্ত্র ও যন্ত্র এই দুই-ই ব্যয়সাপেক্ষ। একমুখে আমরা বলিতেছি চাই গণতন্ত্র অর্থাৎ ডিমক্রেসি,—তারপর তন্ত্রটি কার্য্যে পরিণত করিতে গিয়া দেখি কতকগুলি সভা আর অনেকগুলি সভ্য না হইলে চলিবে না; কিন্তু ইহার ব্যয়-সঙ্কলান করিতে আমাদের আয়ের তহবিলে টান পড়ে। যেমন, ১৯২৬-২৭ সালে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের আয় দশ কোটি পঞ্চাশ লক্ষ, কিন্তু ঐ বৎসর খরচ করিতে হইল দশ কোটি একাত্তর লক্ষ। শাসন-যন্ত্রটা চালাইবার ব্যয়ভার আমাদের বহন করিতেই হইবে—ইহার সহিত রাগ করিয়া অসহযোগিতা করিলে যন্ত্র পরিচালনার ব্যয় বাড়িবে বই কমিবে না।

আসল কথা এই, আধুনিক যুগের দাবী আমাদের মিটাইতে হইবে। আমরা যতই ইহা শ্রেয় বলিয়া তর্ক করি না কেন, ভারতবর্ষকে অচলায়তনের গণ্ডীর মধ্যে ফিরাইয়া লইবার চেষ্টা বৃথা—ইহা নিষ্ফল হইবেই। বাহিরের সহিত যোগ রক্ষা করিবার শক্তি অর্জ্জন করা ভিন্ন আমাদের আর কোন গতি নাই। এই শক্তি-অর্জ্জনের সাধনায় জাপান মনোনিবেশ করিয়াছিল, আজ চীন করিতেছে, বলিয়াই ইহারা ব্যাবহারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে ও রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছে ও করিতেছে। জাপান জানিত বর্ত্তমান যুগের যজ্ঞানুষ্ঠানে আসন গ্রহণ করিতে হইলে জাপানকে যুগধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে হইবে; এবং এই দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া জাপানের ক্ষেতে প্রচুর শস্য ফলে, জাপানের শিল্প পৃথিবীর হাটে আদৃত হয়, জাপানের শিক্ষাকেন্দ্র হইতে 'মানুষ' জন্মে।

কেবল জাপান কেন, সকল সভ্য দেশেই দেখিতে পাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির ও সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া কৃষি উন্নতির চেষ্টা

করা হইয়াছে। ত্রিশ বৎসরের মধ্যে জার্ম্মেণি গমের ফসল দ্বিগুণ করিয়াছে। বাংলা দেশে ১৯২০ হইতে ১৯২৫ সাল, অর্থাৎ পাচ বৎসরে প্রায় তুই কোটি দশ লক্ষ একর ধানের জমিতে বছরে গড়ে আশী লক্ষ টনের কিছু অধিক চাল জন্মিয়াছে। জাপানে পঁচাত্তর লক্ষ একর জমিতে চাল পাওয়া গিয়াছে এক কোটী টনের অধিক। অর্থাৎ জাপান পঁচাত্তর লক্ষ একর জমিতে যে পরিমাণ ধান জন্মায়, আমরা তুই কোটি দশ লক্ষ একরে তাহা পাই না।

এইবার বাংলা দেশের কৃষি সম্বন্ধে কিছু বলিব।

মোট চাষের জমি তুই কোটি আশী লক্ষ একরের কিছু বেশী, কিন্তু ইহার মধ্যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ একর জমিতে তুইবার বোনা হয় মাত্র। অতএব প্রতিবছর প্রায় তুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একর জমিতে চাষ হয়—ইহার মধ্যে তুই কোটি দশ লক্ষ একর জমিতে ধান জন্মে। ধানের ফসল পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি; ইহার দ্বারা বাংলার প্রতি ঘরে আবশ্যকীয় অন্নের সংস্থান হয় কিনা আপনারা হিসাব করিয়া দেখিবেন।

তারপর ধান-চাষের হিসাব খতাইয়া দেখা প্রয়োজন যে, চাষের সর্ব্বপ্রকার খরচ বাদ দিয়া কৃষিজীবীর কিছু লাভ থাকে কি না। আমি যতদূর জানি, বিঘাপ্রতি পাচ কি ছয় টাকার অধিক লাভ (net profit) থাকে না। লাভের পরিমাণ দশ টাকা ধরিলেও ইহা যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

অন্যান্য ফসলের ফসলও সন্তোষজনক নহে। বাংলা দেশে ইক্ষুর চাষের তেমন বিস্তার নাই, কিন্তু যেখানে জন্মে ইহার ফসল মোটের উপর প্রতি একরে এক টনের কিছু অধিক; আর জাভা দ্বীপের ফসল চারি টন। এই কারণেই জাভা চিনি আমাদের ঘরে স্থান পাইতেছে।

ফসলের কথা ছাড়িয়া গো-পালনের সমস্যা ভাবি—ভারতবর্ষের আর কোনো প্রদেশে বাংলার গরুবাছুরের মতন নিকৃষ্ট গোধন দেখা যায় না। মোটামুটি গুণ্‌তি করিয়া দেখা গিয়াছে, বাংলা দেশে তিন কোটি কুড়ি লক্ষের উপর গরুবাছুর আছে, কিন্তু ইহাদের খাদ্যোপযোগী ফসল জন্মায় মাত্র প্রায় নব্বুই হাজার একর জমিতে। ইহা যথেষ্ট নহে, বলা বাহুল্য। গো-পালনের সুব্যবস্থা নাই, ইহাদের আহার্য্যের অভাব ঘটিয়াছে, সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে ইহাদের রক্ষা করিবার তেমন ব্যবস্থা নাই,—এই কারণে বাংলার ঘরে তুধের অভাব।

কিন্তু আমি যে-সকল কৃষিসমস্যা উল্লেখ করিতেছি, বিজ্ঞানের সাহায্যে ইহার প্রত্যেকটির মীমাংসা হইতে পারে। উপযুক্ত সার প্রয়োগে জমির উর্ব্বরাশক্তি বৃদ্ধি করা, বীজনির্ব্বাচন দ্বারা ফসলের উন্নতি-সাধন করা, গো-পালনের বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করা, অনুর্ব্বর জমিতে চাষের বিস্তার করা, যতই তুরূহ সমস্যা হউক না কেন, ইহা কৃষি-বিজ্ঞানের আয়ত্তাধীন। প্রশ্ন এই—কৃষি-বিজ্ঞানের নানাপ্রণালী প্রয়োগ করিবার পথ খুলিয়া দিবে কাহারা? ইহা মনে রাখা ভাল যে, যে-দেশে এই পথ খুলিয়া দিবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা নাই, সেখানে তুর্গতি অনিবার্য্য। সকল কৃষিপ্রধান দেশ আজ জানে যে, বৈজ্ঞানিক কৃষিশিক্ষা প্রচলন না করিলে বর্ত্তমান যুগের ব্যাবহারিক জীবনের প্রয়োজন ও পৃথিবীজোড়া বাণিজ্য-যজ্ঞের ইন্ধন জোগান হইবে না। বাংলা দেশের মূল সমস্যার মীমাংসাও এইখানে।

কিন্তু, বাংলা দেশে কৃষিশিক্ষার প্রয়োজন যতই হউক না কেন, ইহার আয়োজন কি আছে ও কিছু হইবার সম্ভাবনা আছে কি না, আমি আপনাদের চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর-পশ্চিম—এই চারিটি প্রদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশে কৃষিশিক্ষা দিবার ও কৃষি-বিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার সুব্যবস্থা আছে। আসাম ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ আয়তনে ছোট এবং ইহার রাজস্ব প্রচুর নহে। পঞ্জাবের কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থার সহিত মিলিত হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ তাহাদের এই প্রয়োজন মিটাইয়াছে।

পঞ্জাব, বোম্বাই, যুক্ত-প্রদেশ, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, বর্ম্মা, এই ছয়টি প্রদেশে উচ্চ কৃষিশিক্ষার নিমিত্ত কলেজ আছে এবং ইহা প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূক্ত। কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে

স্থান দিবার পর হইতে কৃষিশিক্ষালাভের নিমিত্ত ছাত্র-মহলে আগ্রহ দেখা দিল এবং গৌরবে ও মূল্যে কৃষিশিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষার সামিল হইয়াছে বলিয়া প্রতি বৎসরই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে।

বাংলা দেশে কোন কৃষি কলেজ নাই। বহুকাল হইতে শোনা যাইতেছে, ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের কাছাকাছি এক কলেজ স্থাপন করা হইবে। কাগজে পত্রে সকল ব্যবস্থাই স্থির হইয়া আছে। কেবল বাংলার সরকারী তহবিলে টাকা নাই। টাকার সচ্ছলতা হইলে কলেজ খুলিতে বিলম্ব হইবে না, এইরূপ আশ্বাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু কবে যে এই সুদিন আসিবে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। পাটের উপর কর বসাইয়া যে আয় হয়, ইহার এক ভাগ যায় ভারত-সরকারের রাজকোষে, আর এক ভাগের মালিক এই কলিকাতা। নগরের উন্নতি-কল্পে এই টাকা ব্যয় করা হয়। বাংলার রাজস্ব-ভাণ্ডারের অবস্থা সন্তোষজনক নহে। আয় বৃদ্ধি হইবার কোন সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয় না।

১৯১৮ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি-শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার উদ্দেশ্যে বহু চেষ্টা করিতেছেন। বর্ত্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্রেরা জীবিকার্জ্জনের জন্য স্বাবলম্বী হইতে পারিতেছে না। অথচ জীবন-সংগ্রামে আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইবার সামর্থ্যই যদি বিশ্ববিদ্যালয় না দিতে পারে, তবে এই প্রতিষ্ঠানের কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই। বাংলা দেশে বেকার-সমস্যা কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং এই সমস্যার সমাধান না করিতে পারিলে আমাদের কল্যাণ নাই।

আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা এই সমস্যার মূল কারণ। বাংলা দেশে ১৯০১ সালে আট হাজার ছাত্র কলেজে পড়িত, ১৯২৬ সালের ছাত্র সংখ্যা ৩১ হাজার। অথচ ইহাদের হাতে-হাতিয়ারে কাজ করিয়া জীবিকার্জ্জন করিবার শিক্ষাদান করা হইতেছে না।

তারপর আজকাল সভা-সমিতির বৈঠকে ও সংবাদ-পত্রে পল্লীসংস্কারের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। কৃষিজীবীদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিয়া কৃষি-বিজ্ঞান-সিদ্ধ প্রণালী প্রবর্ত্তন করা প্রয়োজন, ইহাও শুনিতে পাই। কিন্তু এই কাজ করিবে কাহারা? এই কাজে ব্রতী করিবার জন্য দেশের যুবকদের শিক্ষিত করিবার ব্যবস্থা কোথায়? কৃষিবিজ্ঞান চর্চ্চা করিবার জন্য বাংলা দেশের বিশ্ববিদ্যালয় কি ব্যবস্থা করিয়াছে? আমাদের ছাত্রদিগকে রসায়ন-শাস্ত্র পড়ান হয় বটে, কিন্তু ইহার সিদ্ধান্তগুলি কৃষি ও শিল্পে প্রয়োগ করিবার কোন সুযোগ দেওয়া হয় নাই। কৃষিক্ষেত্রে রসায়ন-শাস্ত্রের কোন কোন সিদ্ধান্ত প্রয়োগ করিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সভ্য দেশ জমি হইতে সোনা ফলাইয়াছে।*

কেবল রসায়ন-শাস্ত্র নহে, বিজ্ঞানের নানা শাখা কৃষিকর্ম্মে প্রয়োগ করা হইতেছে। একদিন মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও ভূ-লক্ষ্মীর অঞ্চল হইতে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিত না, আজ বিজ্ঞান নানা প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাহা লাভ করিবার পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। আমরা যদি কৃষিশিক্ষার আয়োজন অভাবে বিজ্ঞানের সহায়তা লাভ করিতে না পারি, তবে আমরা দিনের পর দিন লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইতে থাকিব। বাঙালীকে যদি জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে বাংলা দেশে কৃষিশিক্ষার আয়োজনের নিমিত্ত সচেষ্ট হইতে হইবে:—"অন্নং বহু কুর্বীত; তদ্‌ব্রতম্।" (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

---

* আমেরিকার এক বৈজ্ঞানিক সমিতির অধিবেশনে রসায়ন-শাস্ত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে;—

"The only true basis on which the independence of our country can rest is agriculture and manufacture. To the promotion of these nothing tends in a higher degree than Chemistry. It is this science which teaches man how to correct the bad qualities of the land he cultivates by a proper application of the various species of manure."

পঞ্চাশোর্দ্ধম্
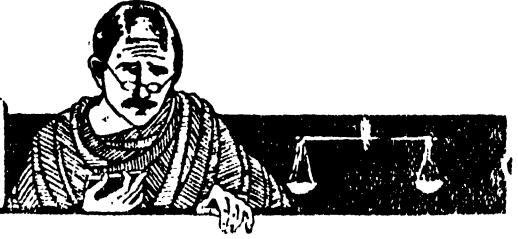
পঞ্চাশ বছরের পরে সংসার থেকে স'রে থাকার জন্য মনু আদেশ করেছেন।

যাকে তিনি পঞ্চাশ বলেচেন, সে একটা গণিতের অঙ্ক নয়, তার সম্বন্ধে ঠিক ঘড়িধরা হিসাব চলে না। ভাবখানা এই যে, নিরন্তর পরিণতি জীবনের ধর্ম্ম নয়। শক্তির পরিব্যাপ্তি কিছুদিন পর্য্যন্ত এগিয়ে চলে, তার পরে পিছিয়ে আসে। সেই সময়টাতেই কর্ম্মে যতি দেবার সময়; না যদি মানা যায়, তবে জীবযাত্রার ছন্দোভঙ্গ হয়।

জীবনের ফসল সংসারকে দিয়ে যেতে হবে। কিন্তু যেমন-তেমন ক'রে দিলেই হলো না। শাস্ত্র বলে, শ্রদ্ধয়া দেয়ং; যা আমাদের শ্রেষ্ঠ, তাই দেওয়াই শ্রদ্ধার দান; সে না কুঁড়ির দান, না ঝরা ফুলের। ভরা ইন্দারায় নির্ম্মল জলের দাক্ষিণ্য, সেই পূর্ণতার সুযোগেই জলদানের পুণ্য; দৈন্য যখন এসে তাকে তলার দিকে নিয়ে যায়, তখন যতই টানাটানি করি ততই ঘোলা হয়ে ওঠে।...

যে-কাজটা নিজের অন্তরের ফরমাসে, তা নিয়ে বাহিরের কাছে কোন দায় নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সাহিত্যে বাহিরের দাবী দুর্ব্বার। যে-মাছ জলে আছে তার কোনো বালাই নেই, যে-মাছ হাটে এসেছে তাকে নিয়েই মেছোবাজার। সত্য ক'রেই হোক, ছল করেই হোক, রাগের ঝাঁঝে হোক, অনুরাগের ব্যথায় হোক, যোগ্য ব্যক্তিই হোক, অযোগ্য ব্যক্তিই হোক, যে-সে, যখন-তখন, যাকে-তাকে, বলে উঠতে পারে, তোমার রসের জোগান ক'মে আসচে, তোমার রূপের ডালিতে রঙের রেশ ফিকে হয়ে এল;—তর্ক করতে যাওয়া বৃথা; কারণ, শেষ যুক্তিটা এই যে, আমার পছন্দ মাফিক হচ্চে না। তোমার পছন্দের বিকার হ'তে পারে, তোমার সুরুচির অভাব থাকতে পারে, এ কথা ব'লে লাভ নেই। কেন না, এ হ'লো রুচির বিরুদ্ধে রুচির তর্ক, এ তর্কে দেশকালপাত্রবিশেষে কটুভাষার পঙ্কিলতা মথিত হয়ে ওঠে, এমন অবস্থায় শান্তির কটুত্ব কমাবার জন্যে সবিনয় দীনতা স্বীকার ক'রে বলা ভাল যে, স্বভাবের নিয়মেই শক্তির হ্রাস; অতএব শক্তির পূর্ণতা কালে যে উপহার দেওয়া গেছে, তারই কথা মনে রেখে, অনিবার্য্য অভাবের সময়কার ত্রুটি ক্ষমা করাই সৌজন্যের লক্ষণ। শ্রাবণের মেঘ আশ্বিনের আকাশে বিদায় নেবার বেলায় ধারাবর্ষণে যদি ক্লান্তি প্রকাশ করে তবে জনপদবধূরা তাই নিয়ে কি তাকে দুয়ো দেয়? আপন নবশ্যামল ধানের ক্ষেতের মাঝখানে দাঁড়িয়ে মনে কি করে না, আষাঢ়ে এই মেঘেরই প্রথম সমাগমের দাক্ষিণ্য সমারোহের কথা?

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাহিত্যের ক্ষেত্রেই এই সৌজন্যের দাবী প্রায় ব্যর্থ হয়। বৈষয়িকক্ষেত্রেও পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভদ্ররীতি আছে। পেন্‌শনের প্রথা তার প্রমাণ। কিন্তু সাহিত্যেই পূর্ব্বের কথা স্মরণ ক'রে শক্তির হ্রাস ঘটাকে অনেকেই ক্ষমা ক'রতে চায় না। এই তীব্র প্রতিযোগিতার দিনে অনেকেই এতে উল্লাস অনুভব করে। কষ্টকল্পনার জোরে হালের কাজের ত্রুটি প্রমাণ ক'রে সাবেক কাজের মূল্যকে খর্ব্ব করবার জন্যে তা'দের উত্তপ্ত আগ্রহ।...

জীবনের পঁচিশ বছর লাগে কর্ম্মের জন্যে প্রস্তুত হ'তে, কাঁচা হাতকে পাকাবার কাজে। তারপরে পঁচিশ বছর পূর্ণশক্তিতে কাজ করবার সময়। অবশেষে, ক্রমে ক্রমে, সেই কর্ম্মের বন্ধন থেকে মুক্তি নেবার জন্যে আরো পঁচিশ বছর দেওয়া চাই। সংসারের পুরোপুরি দাবী মাঝখানটাতে, আরম্ভেও নয়, শেষেও নয়।

এই ছিল আমাদের দেশের বিধান। কিন্তু পশ্চিমের নীতিতে কর্ত্তব্যটাই শেষ লক্ষ্য, যে-মানুষ কর্ত্তব্য করে সে নয়। আমাদের দেশে কর্ম্মের যন্ত্রটাকে স্বীকার করা হ'য়েচে, কর্ম্মীর আত্মাকেও। সংসারের জন্যে মানুষকে কাজ ক'রতে হবে, নিজের জন্যে মানুষকে মুক্তি পেতেও হবে।

কর্ম্ম ক'রতে ক'রতে কর্ম্মের অভ্যাস কঠিন হ'য়ে ওঠে এবং তার অভিমান। এক সময়ে কর্ম্মের চলৃতি স্রোত আপন বালির বাঁধে আপনি বাঁধে, আর সেই বন্ধনের অহঙ্কারে মনে করে সেই সীমাই চরম সীমা, তার ঊর্দ্ধে আর গতি নেই।...

সংসারে যত কিছু বিরোধ—এই সীমায় সীমায় বিরোধ, পরস্পরের বেড়ার ধারে এসে লাঠালাঠি। এইখানেই যত ঈর্ষা, বিদ্বেষ ও চিত্তবিকার। এই কলুষ থেকে সংসারকে রক্ষা করবার উপায় কর্ম্ম হ'তে বেরিয়ে পড়বার পথকে বাধামুক্ত রেখে দেওয়া। সাহিত্যে একটা ভাগ আছে, যেখানে আমরা নিজের অধিকারে কাজ করি, সেখানে বাহিরের সঙ্গে সংঘাত নেই। আর একটা ভাগ আছে, যেখানে সাহিত্যের পণ্য আমরা বাহিরের হাটে আনি, সেইখানেই হট্টগোল। একটা কথা স্পষ্ট বুঝ্‌তে পারচি, এমন দিন আসে, যখন এইখানে গতিবিধি যথাসম্ভব কমিয়ে আনাই ভালো, নইলে বাইরে ওড়ে ধূলোর ঝড়, নিজের ঘটে অশান্তি, নইলে জোয়ান লোকদের কনুইয়ের ঠেলা গায়ে পড়ে পাঁজরের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

সাহিত্যলোকে বাল্যকাল থেকেই কাজে লেগেছি। আরম্ভে খ্যাতির চেহারা অনেক কাল দেখিনি। তখনকার দিনে খ্যাতির পরিসর ছিল অল্প, এই জন্যই বোধ করি, প্রতিযোগিতার পরুষতা তেমন উগ্র ছিল না। আত্মীয়-মহলে যে কয়জন কবির লেখা সুপরিচিত ছিল, তাঁদের কোনো-দিন লঙ্ঘন করবো বা ক'রতে পারবো, এমন কথা মনেও করিনি। তখন এমন কিছু লিখিনি, যার জোরে গৌরব করা চলে অথচ এই শক্তি-দৈন্যের অপরাধে ব্যক্তিগত বা কাব্যগত এমন কটুকাটব্য শুন্‌তে হয়নি—যাতে সঙ্কোচের কারণ ঘটে।

সাহিত্যের সেই শিথিল শাসনের দিন থেকে আরম্ভ ক'রে গদ্যে পদ্যে আমার লেখা এগিয়ে চ'লেচে, অবশেষে আজ সত্তর বছরের কাছে এসে পৌঁছলেম। আমার দ্বারা যা করা সম্ভব সমস্ত অভাব ত্রুটি সত্ত্বেও তা ক'রেচি। তবু যতই করি না কেন আমার শক্তির একটা স্বাভাবিক সীমা আছে সে কথা বলাই বাহুল্য। কারই বা নেই।

এই সীমাটি দুই উপকূলের সীমা। একটা আমার নিজের প্রকৃতিগত, আর একটা আমার সময়ের প্রকৃতিগত। জেনে এবং না জেনে আমরা এক দিকে প্রকাশ করি নিজের স্বভাবকে এবং অন্যদিকে নিজের কালকে। রচনার ভিতর দিয়ে আপন হৃদয়ের যে পরিতৃপ্তি

সাধন করা যায় সেখানে কোনো হিসাবের কথা চলে না। যেখানে কালের প্রয়োজন সাধন করি সেখানে হিসাব-নিকাশের দায়িত্ব আপনি এসে পড়ে। সেখানে বৈতরণীর পারে চিত্রগুপ্ত খাতা নিয়ে বসে আছেন। ভাষায় ছন্দে নূতন শক্তি এবং ভাবে চিত্তের নূতন প্রসার সাহিত্যে নূতন যুগের অবতারণা করে। কী পরিমাণে তারি আয়োজন করা গেছে তার একটা জবাবদিহী আছে।

কখন কালের পরিবর্ত্তন ঘটে, সব সময়ে ঠিক বুঝতে পারিনি। নূতন ঋতুতে হঠাৎ নূতন ফুল ফল ফসলের দাবী এসে পড়ে। যদি তাতে সাড়া দিতে না পারা যায়—তবে সেই স্থাবরতাই স্থবিরত্ব প্রমাণ করে, তখন কালের কাছ থেকে পারিতোষিকের আশা করা চলে না, তখনই কালের আসন ত্যাগ করবার সময়।

যাকে বল্‌চি কালের আসন, সে চিরকালের আসন নয়। স্থায়ী প্রতিষ্ঠা স্থির থাকা সত্ত্বেও উপস্থিত কালের মহলে ঠাঁইবদলের হুকুম যদি আসে, তবে সেটাকে মান্‌তে হবে। প্রথমটা গোলমাল ঠেকে। নতুন অভ্যাগতের নতুন আকার-প্রকার দেখে তাকে অভ্যর্থনা ক'রতে বাধা লাগে, সহসা বুঝ্‌তে পারিনে—সেও এসেছে বর্ত্তমানের শিখর অধিকার ক'রে চিরকালের আসন জয় ক'রে নিতে। একদা সেখানে তারও স্বত্ব স্বীকৃত হবে গোড়ায় তা মনে করা কঠিন হয় ব'লে এই সন্ধিক্ষণে একটা সংঘাত ঘটতেও পারে।

মানুষের ইতিহাসে কাল সব সময়ে নূতন ক'রে বাসা বদল করে না। যতক্ষণ দ্বারে একটা প্রবল বিপ্লবের ধাক্কা না লাগে, ততক্ষণ সে খরচ বাঁচাবার চেষ্টায় থাকে, আপন পূর্ব্বদিনের অনুবৃত্তি ক'রে চলে, দীর্ঘকালের অভ্যস্ত রীতিকেই মাল্যচন্দন দিয়ে পূজা করে, অলসভাবে মনে করে সেটা সনাতন। তখন সাহিত্য পুরাতন পথেই পণ্য বহন ক'রে চলে, পথ নির্ম্মাণের জন্য তার ভাবনা থাকে না। হঠাৎ একদিন পুরাতন বাসায় তার আর সঙ্কুলান হয় না। অতীতের উত্তর দিক্ থেকে হাওয়া বওয়া বন্ধ হয়, ভবিষ্যতের দিক্ থেকে দক্ষিণ হাওয়া চ'ল্‌তে সুরু করে। কিন্তু বদলের হাওয়া বইল ব'লেই যে নিন্দার হাওয়া তুলতে হবে, তার কোন কারণ নেই। পুরাতন আশ্রয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের অভাব আছে, যে অকৃতজ্ঞ অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সেই কথা বল্‌বার উপলক্ষ খোঁজে, তার মন সংকীর্ণ—তার স্বভাব রূঢ়। আকবরের সভায় যে দরবারী আসর জমেছিল, নবদ্বীপের কীর্ত্তনে তাকে খাটানো গেল না। তাই ব'লে দরবারী তোড়ীকে গ্রাম্যভাষায় গাল পাড়তে বসা বর্ব্বরতা। নূতন কালকে বিশেষ আসন ছেড়ে দিলেও দরবারী তোড়ীর নিত্য আসন আপন মর্য্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকে। গোঁড়া বৈষ্ণব তাকে তাচ্ছিল্য ক'রে যদি খাটো ক'রতে চায়, তবে নিজেকেই খাটো করে। বস্তুতঃ নূতন আগন্তুককেই প্রমাণ ক'রতে হবে, সে নূতন কালের জন্য নূতন অর্ঘ্য সাজিয়ে এনেছে কি না।

কিন্তু নূতন কালের প্রয়োজনটি ঠিক যে কি, সে তার নিজের মুখের আবেদন শুনে বিচার করা চলে না; কারণ, প্রয়োজনটি অন্তর্নিহিত হয় ত কোনো আশু উত্তেজনা, বাইরের কোন আকস্মিক মোহ তার অন্তর্গূঢ় নীরব আবেদনের উল্টো কথাই বলে; হয় তো হঠাৎ একটা আগাছার দুর্দ্দমতা তার ফসলের ক্ষেতের প্রবল প্রতিবাদ করে, হয় তো একটা মুদ্রাদোষে তাকে পেয়ে বসে, সেইটেকেই সে মনে করে শোভন ও স্বাভাবিক। আত্মীয়সভায় সেটাতে হয় ত বাহবা মেলে, কিন্তু সর্ব্বকালের সভায় সেটাতে তার অসম্মান ঘটে। কালের মান রক্ষা ক'রে চল্‌লেই যে কালের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করা হয় এ কথা বলব না। এমন দেখা গেছে, যাঁরা কালের জন্য সত্য অর্ঘ্য এনে দেন, তাঁরা সেই কালের হাত থেকে বিরুদ্ধ আঘাত পেয়েই সত্যকে সপ্রমাণ করেন।

আধুনিক যুগে য়ুরোপের চিত্তাকাশে যে হাওয়ার মেজাজ বদল হয়, আমাদের দেশের হাওয়ায় তারই ঘূর্ণি-আঘাত লাগে। ভিক্টোরিয়া যুগ জুড়ে সে-দিন পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এই মেজাজ প্রায় সমভাবেই ছিল। এই দীর্ঘকালের অধিক সময় সেখানকার সমাজনীতি ও সাহিত্যরীতি একটানা পথে এমনভাবে চ'লেছিল যে, মনে হ'য়েছিল যে, এ ছাড়া আর গতি নেই। উৎকর্ষের আদর্শ একই কেন্দ্রের চারিদিকে আবর্ত্তিত হ'য়ে প্রাগ্রসর উদ্যমকে যেন নিরস্ত ক'রে দিলে। এই কারণে কিছুকাল থেকে সেখানে সমাজে, সাহিত্যকলাসৃষ্টিতে একটা অধৈর্য্যের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। সেখানে বিদ্রোহী চিত্ত সব কিছু উলট-পালট করবার জন্য কোমর বাঁধল; গানেতে ছবিতে দেখা দিল যুগান্তের তাণ্ডবলীলা! কী চাই সেটা স্থির হল না, কেবল হাওয়ায় একটা রব উঠ্‌ল, আর ভাল লাগছে না। যা ক'রে হোক আর-কিছু-একটা ঘটা চাই। যেন সেখানকার ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব্ব মনুর বিধান মানতে চায়নি, পঞ্চাশ পেরিয়ে গেল তবু ছুটি নিতে তার মন ছিল না। মহাকালের উন্মত্ত চরগুলো একটি একটি ক'রে তার অঙ্গনে ক্রমে জুটতে লাগল, ভাবখানা এই যে, উৎপাত ক'রে ছুটি নেওয়াবেই। সেদিন তার আর্থিক জমার খাতায় ঐশ্বর্য্যের অঙ্কপাত নিরবচ্ছিন্ন বেড়ে চল্‌ছিল। এই সমৃদ্ধির সঙ্গে শান্তি চিরকালের জন্যে বাঁধা; এই ছিল তার বিশ্বাস। মোটা মোটা লোহার সিন্ধুক-গুলোকে কোনো কিছুতে নড়চড় ক'রতে পারবে, এ কথা সে ভাবতেই পারেনি।...

এমন সময় হাওয়ায় এ কী পাগলামি জাগল! একদিন অকালে হঠাৎ জেগে উঠে সবাই দেখে, লোহার সিন্দুকে সিন্দুকে ভয়ঙ্কর মাথা ঠোকাঠুকি, বহুদিনের সুরক্ষিত শান্তি ও পুঞ্জীভূত সম্বল ধূলোয় ধূলোয় ছড়াছড়ি! সম্পদের জয়তোরণ তলার উপর তলা গেঁথে ইন্দ্রলোকের দিকে চূড়া তুলেছিল, সেই ঔদ্ধত্য ধরণীর ভারাকর্ষণ সইতে পারল না, এক মুহূর্ত্তে হ'ল ভূমিসাৎ! পুষ্টদেহধারী তুষ্টচিত্ত পুরাতনের মর্য্যাদা আর রইল না। নূতন যুগ আলুথালুবেশে অত্যন্ত হঠাৎ এসে প'ড়ল, তাড়াহুড়ো বেঁধে গেল, গোলমাল চলচে; সাবেক কালের কর্ত্তাব্যক্তির ধমকানি আর কানে পৌঁছায় না।

অস্থায়িত্বের এই ভয়ঙ্কর চেহারা অকস্মাৎ দেখতে পেয়ে কোন কিছুরই স্থায়িত্বের প্রতি শ্রদ্ধা লোকের একেবারে আলগা হ'য়ে গেছে। সমাজে সাহিত্যে কলারচনায় অবাধে নানাপ্রকারের অনাসৃষ্টি সুরু হ'ল। কেউ বা ভয় পায়, কেউ বা উৎসাহ দেয়, কেউ বলে—'ভাল মানুষের মত থামো,' কেউ বলে—'মরীয়া হ'য়ে চলো'। এই যুগান্তরের ভাঙচুরের দিনে যাঁরা নূতন কালের নিগূঢ় সত্যটিকে দেখতে পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রচেন, তাঁরা যে কোথায়, তা এই গোলমালের দিনে কে নিশ্চিত ক'রে বল্‌তে পারে? কিন্তু এ কথা ঠিক যে, যে-যুগ পঞ্চাশ পেরিয়েও তক্ত আঁকড়ে গদিয়ান হ'য়ে বসেছিল, নূতনের তাড়া খেয়ে লোটা কম্বল হাতে বনের দিকে সে দৌড় দিয়েছে। সে ভালো কি এ ভালো, সে তর্ক তুলে ফল নেই, আপাততঃ এই কালের শক্তিকে সার্থক করবার উপলক্ষে নানা লোকে, নব নব প্রণালীর প্রবর্ত্তন ক'রতে ব'স্‌ল। সাবেক প্রণালীর সঙ্গে মিল হচ্চে না ব'লে যারা উদ্বেগ প্রকাশ ক'রচে, তারাও ঐ পঞ্চাশোর্দ্ধের দল, বনের পথ ছাড়া তাদের গতি নেই।

তাই বলছিলেম, ব্যক্তিগত হিসাবে যেমন পঞ্চাশোর্দ্ধম্ আছে, কালগত হিসাবেও তেম্নি। সময়ের সীমাকে যদি অতিক্রম ক'রে থাকি, তবে সাহিত্যে অসহিষ্ণুতা মথিত হ'য়ে উঠবে। নবাগত যাঁরা, তাঁরা যে-পর্য্যন্ত নবযুগে নূতন আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ক'রে নিজেরা প্রতিষ্ঠা লাভ না ক'রবেন, সে পর্য্যন্ত শান্তিহীন সাহিত্য কলুষলিপ্ত হবে।...

যেটাকে মানুষ পেয়েছে, সাহিত্য তাকেই যে প্রতিবিম্বিত করে, তা নয়, যা তার অনুপলব্ধ, তার সাধনার ধন, সাহিত্যে প্রধানতঃ তারই জন্য কামনা উজ্জ্বল হ'য়ে ব্যক্ত হ'তে থাকে। বাহিরের কর্ম্মে যে-প্রত্যাশা সম্পূর্ণ আকার লাভ ক'রতে পারেনি, সাহিত্যে কলারচনায় তারই পরিপূর্ণতার কল্পরূপ নানাভাবে দেখা দেয়। শাস্ত্র বলে, ইচ্ছাই সত্তার বীজ। ইচ্ছাকে মারলে ভববন্ধন ছিন্ন হয়। ইচ্ছার বিশেষত্ব অনুসরণ ক'রে আত্মা বিশেষ দেহ ও গতি লাভ করে। বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের, সেই সমাজের আত্মরূপসৃষ্টির বীজশক্তি। এই কারণেই যাঁরা রাষ্ট্রিক লোকগুরু, তাঁরা রাষ্ট্রীয় মুক্তির ইচ্ছাকে সর্ব্বজনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত করতে চেষ্টা করেন, নইলে মুক্তির সাধনা দেশে সত্যরূপ গ্রহণ করে না।

সাহিত্যে মানুষের ইচ্ছারূপ এমন ক'রে প্রকাশ পায়, যাতে সে মনোহর হ'য়ে ওঠে, এমন পরিস্ফুট মূর্ত্তি ধরে, যাতে সে ইন্দ্রিয়গোচর বিষয়ের চেয়ে প্রত্যয়গম্য হয়। সেই কারণেই সমাজকে সাহিত্য একটি সজীব শক্তি দান করে; যে ইচ্ছা তার শ্রেষ্ঠ ইচ্ছা, সাহিত্যযোগে তা শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও ভঙ্গীতে দীর্ঘকাল ধ'রে মানুষের মনে কাজ ক'রতে থাকে এবং সমাজের আত্মসৃষ্টিকে বিশিষ্টতা দান করে। রামায়ণ, মহাভারত, ভারতবাসী হিন্দুকে বহুযুগ থেকে মানুষ ক'রে এসেছে। একদা ভারতবর্ষ যে আদর্শ কামনা ক'রেছে, তা ঐ দুই কাব্যে চিরজীবী হ'য়ে গেল। এই কামনাই সৃষ্টিশক্তি। "বঙ্গদর্শনে" এবং বঙ্কিমের রচনায় বাংলা সাহিত্যে প্রথম আধুনিক যুগের আদর্শকে প্রকাশ ক'রেছে। তাঁর প্রতিভার দ্বারা অধিকৃত সাহিত্য বাংলা দেশের মেয়ে-পুরুষের মনকে এক কাল থেকে অন্য কালের দিকে ফিরিয়ে দিয়েচে;—এদের ব্যবহারে ভাষায় রুচিতে পূর্ব্বকালবর্ত্তী ভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। যা আমাদের ভাল লাগে, অগোচরে তাই আমাদের গ'ড়ে তোলে। সাহিত্যে শিল্পকলায় আমাদের সেই ভাল লাগার প্রভাব কাজ করে। সমাজসৃষ্টিতে তার ক্রিয়া গভীর। এই কারণেই সাহিত্যে যাতে ভদ্রসমাজের আদর্শ বিকৃত না হয়, সকল কালেরই এই দায়িত্ব।

বঙ্কিম যে যুগপ্রবর্ত্তন ক'রেছেন, আমার বাস সেই যুগেই। সেই যুগকে তার সৃষ্টির উপকরণ যোগানো এ পর্য্যন্ত আমার কাজ ছিল। য়ুরোপের যুগান্তর ঘোষণার প্রতিধ্বনি ক'রে কেউ কেউ ব'ল্চেন, আমাদের সেই যুগেরও অবসান হয়েচে;—কথাটা খাঁটি না হতেও পারে। যুগান্তরের আরম্ভে প্রদোষান্ধকারে তাকে নিশ্চিত ক'রে চিনতে বিলম্ব ঘটে। কিন্তু সংবাদটা যদি সত্যই হয়, তবে এই যুগসন্ধ্যার যাঁরা অগ্রদূত, তাঁদের ঘোষণা-বাণীতে শুকতারার সুরম্য দীপ্তি ও প্রত্যুষের সুনির্ম্মল শান্তি আসুক; নবযুগের প্রতিভা আপন পরিপূর্ণতার দ্বারাই আপনাকে সার্থক করুক, বাক্চাতুর্য্যের দ্বারা নয়।

(বিচিত্রা—ফাল্গুন, ১৩৩৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাবনা হিন্দুসম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ

হিন্দুসমাজ সনাতন ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ বিষয়ে কি নব্যপন্থী কি প্রাচীনপন্থী কাহারো মধ্যে মতভেদ না থাকিলেও সনাতন ধর্ম্ম যে কি তাহা লইয়া কিন্তু দুইটি মত দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীনপন্থীগণ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তারস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন—বিজ্ঞানেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য পর্য্যন্ত স্মৃতিনিবন্ধকারগণ নিজ নিজ নিবন্ধগ্রন্থে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণের তাৎপর্য্য বর্ণন দ্বারা যে সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন তাহা সকল হিন্দুরই সনাতন ধর্ম্ম, সেই সনাতন ধর্ম্মের ভিত্তির উপরই হিন্দুসমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও আছে এবং চিরকালই এইরূপ থাকিবে, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না; পরিবর্ত্তন বা পরিবর্জ্জন জন্য যাঁহারা চেষ্টা করেন তাঁহারা ভ্রান্ত, তাঁহাদের মতানুসারে চলিলে হিন্দুসমাজ থাকিবে না, হিন্দুজাতির অস্তিত্ব লোপ পাইবে, বর্ত্তমান সময়ের সমাজ-সংস্কারকগণ এই জাজ্জ্বল্যমান অখণ্ডনীয় সত্যকে উপেক্ষা করিয়া দেশে কালাপাহাড়ীর দল সৃষ্টি করিতেছেন, এই কালাপাহাড়ীর দলকে ছাঁটিয়া হিন্দুসমাজ হইতে বাহির করিতে হইবে, ইহাদের ছায়াস্পর্শ করিলেও পাতিত্য হয়, সুতরাং ইহাদিগকে যে কোন উপায়ে দমন করিতে না পারিলে হিন্দুর সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।...অন্যদিকে নব্যপন্থীগণ বলিতেছেন যে, প্রাচীনপন্থীদিগের এইরূপ মত মানিয়া চলিলে হিন্দুর অস্তিত্ব অচিরেই বিলুপ্ত হইবে, প্রাচীনপন্থীর মতে হাজার বৎসর চলিয়া হিন্দু আজ সর্ব্বনাশের পথে দাঁড়াইয়াছে, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম জাতিগত হওয়ায় সমাজের প্রত্যেক অঙ্গ অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ব্রাহ্মণের কোন গুণ না থাকিলেও ব্রাহ্মণের অধিকার মর্য্যাদা ও গৌরব ভোগ করিবার ফলে আজ প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য ভারত হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, রঘুনন্দনের মত যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমাদের দেশে একজনও ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য নাই, আছে কেবল কয়েক লক্ষ ব্রাহ্মণ আর কোটি কোটি শূদ্র, অর্থাৎ হিন্দুর সমাজ-শরীরের মস্তক ও পাদমাত্র বিদ্যমান, সুতরাং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিরাট চীৎকারে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করিয়া তুলিয়াছেন তাঁহারা তাঁহাদেরই সিদ্ধান্ত অনুসারে সনাতন ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের দোহাইও দিতেছেন, আবার তাঁহারই সিদ্ধান্তের খণ্ডন করিতে বদ্ধপরিকর হইতেছেন, অথচ আপনাদিগকে পিতৃপিতামহ প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষ-সেবিত সনাতন ধর্ম্মের একমাত্র রক্ষক বলিয়াও রীতিমত বড়াই করিতেছেন।...

ইহার উপরে যদি কোন প্রাচীনপন্থী বলেন—কাজ কি আমার ক্ষত্রিয়ে বা কাজ কি আমার বৈশ্যে! এই কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র অর্থাৎ সেব্য ও সেবক এই দুইটি বর্ণের সমাবেশ যদি থাকে তাহা হইলেই সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের আমলে ইহা ছিল, তখন যদি হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপ না পাইয়া থাকে তাহা হইলে এখনই বা তাহার লোপ হইবে কেন! ইহার উত্তরে নব্যপন্থীগণ বলেন—বেশ কথা, তাহাই যদি তোমার কলিযুগের সনাতন ধর্ম্মের অভিলষণীয় অবস্থা হয় তবে তাহাই সংস্থাপিত করিবার জন্য প্রাণপণে লাগিয়া যাও না কেন! দেশে বাণিজ্য বন্ধ কর কারণ বৈশ্য নাই, বাণিজ্য করিবার অধিকার অন্য কাহার থাকিতে পারে? বাণিজ্য চুলায় যাক, পীড়িত দুর্ব্বলকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে নিজ শক্তির দ্বারা রক্ষা করিবার জন্য উদ্যত হইবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ ইহা ত ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, এ ভারতে যখন এ যুগে একজনও ক্ষত্রিয় নাই,

এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পালন যখন ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের পক্ষে বিধেয় নহে তখন এই ভারত হইতে বর্ত্তমান যুগে ক্ষত্রিয়ের বীর্য্য, ক্ষত্রিয়ের শৌর্য্য, ক্ষত্রিয়ের দুর্ব্বলের প্রতি প্রবলের অত্যাচার ও নির্য্যাতন-নিবারিণী শক্তিরও কোন আবশ্যকতা নাই। শুধু কি তাই, কৃষি ও গোরক্ষাই বা কিরূপে হইতে পারে, এ সব ত বৈশ্যের কার্য্য, বৈশ্যই যখন নাই তখন এই সকল কার্য্য কে করিবে? ব্রাহ্মণ যদি এ কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহার স্ববৃত্তিত্যাগপূর্ব্বক নীচ বর্ণের বৃত্তিগ্রহণজনিত প্রত্যবায় হইবে, ইহাই ত সনাতনী ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণের পক্ষে যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তিতে দুইবেলা দুই মুঠা গ্রাসের সংস্থান সম্ভবপর, সে পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ সনাতনধর্ম্মবিরুদ্ধ। সুতরাং প্রকৃত সনাতনী হিন্দু হইয়া এই লোকে কোনরূপে শেষ পর্য্যন্ত দিন কয়টা কাটাইয়া পরলোকে অপার সুখলাভের অধিকারটা বজায় রাখিতে হইলে কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য ও যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য পরিবর্জ্জন করিতেই হইবে।

বাকী রহিল শূদ্র, তাহাদের স্বধর্ম্ম হইল দ্বিজাতিশুশ্রূষা, এবং দ্বিজাতির উচ্ছিষ্ট ভোজনে দাসোচিত দেহের পবিত্রতা রক্ষা, তাহা যতক্ষণ সম্ভবপর ততক্ষণ সে যদি তাহা না করিয়া কৃষি, বাণিজ্য বা যুদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে ত তাহার পরলোকে নরকপাত অবশ্যম্ভাবী, সে যদি নরকপাতের ভয়ের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া ঐ সকল উচ্চবর্ণের বৃত্তি গ্রহণ করে তাহা হইলেই সনাতনী ব্যবস্থা অতল জলে ডুবিবে, হিন্দুত্বের লোপ হইবে, ইহাই ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত, এই মত যিনি না মানিবেন, ইহার বিরুদ্ধে যিনি আন্দোলন করিবেন, তিনিই হিন্দুধর্ম্মের শত্রু, তিনিই বর্ত্তমান যুগের কালাপাহাড়, ইহাই হইল বাঙ্গলার ব্রাহ্মণপণ্ডিতনামে প্রথিত সমাজনেতৃবর্গের সিদ্ধান্ত, ইহাই হইল সনাতনী শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা।...

এই প্রকার পরস্পরবিরোধী মতদ্বয়ের মাঝখানে পড়িয়া বাঙ্গালার বিরাট হিন্দুসমাজ কর্ত্তব্যনির্ণয়ের অভাববশতঃ ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে।...স্বজনবিরোধসমুদ্ভূত তীব্র হলাহলের করাল গ্রাস হইতে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিবার জন্য আবার প্রকৃত সনাতন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা দ্বারা বাঙ্গালী হিন্দুজাতির নবজীবন সঞ্চার করিবার জন্য বাঙ্গালা দেশে হিন্দু-মহাসভা সংস্থাপিত হইয়াছে, ইহাই আপনাদের নিকট আমার অদ্যকার প্রধান বক্তব্য।...

হিন্দু-মহাসভা হিন্দুসমাজকে নবজীবন প্রদানপূর্ব্বক তাহাতে বিশ্ববিজয়িনী শক্তির সঞ্চার করিবার জন্য যে পন্থা ও প্রণালীর অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা সর্ব্বথা হিন্দুশাস্ত্রসম্মত এবং মহর্ষিগণের অনুমোদিত।...হিন্দু-মহাসভা হিন্দুর সর্ব্বতোমুখী জাতীয় উন্নতির জন্য প্রধানভাবে চারিটি কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, ইহা আপনাদের কাহারও বোধ হয় অবিদিত নহে; সেই চারিটি কার্য্য হইতেছে—শুদ্ধি, সংগঠন, অস্পৃশ্যতা-পরিহার ও বালবিধবা-বিবাহ।

বর্ত্তমান সময়ে এই চারিটি কার্য্য না করিলে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব যে অচিরকালের মধ্যে বিলুপ্ত হইবে ইহাই হইল হিন্দুসভার দৃঢ়বিশ্বাস, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র এই কয়টি অত্যাবশ্যক কার্য্যের অনুমোদন করিয়া থাকে।... আমার এই সিদ্ধান্তের কেহই এ পর্য্যন্ত খণ্ডন করিতে পারেন নাই।... উপযুক্ত শাস্ত্রজ্ঞ অথচ ব্যবহারজ্ঞ মনীষী ব্যক্তিকে মধ্যস্থ রাখিয়া বিচার দ্বারা নিজ বক্তব্যের সমর্থন করিতে প্রাচীনপন্থীরা পশ্চাৎপদ, প্রাচীনতা ও গতানুগতিকতার দোহাই ছাড়া তাঁহাদের বক্তৃতা বা প্রবন্ধে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিতে যেমন মজবুত, শাস্ত্র বুঝিতে কিন্তু তেমনি অপারগ, সুনিয়ন্ত্রিত সভ্যমণ্ডিত বিচারসভায় উভয়পক্ষসম্মানিত অন্ততঃ তিনজন মধ্যস্থের সাহায্যে তাঁহারা যদি নিজমতের প্রামাণিকতা ব্যবস্থাপিত করিতে সমর্থ হয়েন তাহা হইলে হিন্দুসভা এই চারিটি কার্য্যের অবৈধতা মানিয়া লইবে এবং তৎক্ষণাৎ তাহা পরিত্যাগ করিতে অনুমাত্রও দ্বিধাবোধ করিবে না।...

মানবদেহ জীবরূপে আবির্ভূত পরমাত্মার লীলানিকেতন।...নিকৃষ্ট আচার যে ছাড়িয়াছে, ভগবদ্‌ভক্তির উদয়ে যাহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে সে যে কোন জাতিতেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সে স্পৃশ্য, সে পবিত্র, ইহাই হইল শ্রীমদ্‌ভাগবতের সিদ্ধান্ত।...

মহাভারতে সাক্ষাৎ মহর্ষি বেদব্যাসও ইহাই স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন—

"এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥"
(মঃ ভাঃ অনুশাঃ পঃ ১৪৩।৪৬)

হে দেবি! এই সকল কর্ম্মের ফলে হীনজাতিকুলোদ্ভব শূদ্রও সংস্কৃত হইয়া দ্বিজত্বলাভ করে এবং আগমসম্পন্ন হয়।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥"
(হঃ ভঃ বিঃ ২য় বিঃ ৭ম সংখ্যাধৃত তত্ত্বসাগরবচন)

"যেমন রাসায়নিক প্রক্রিয়াবিশেষে কাঁসা সুবর্ণ হইয়া যায়, তেমনি দীক্ষাবিধানে মনুষ্যমাত্রেরই বিপ্রতালাভ হইয়া থাকে।"

এই শ্লোকে দ্বিজত্ব শব্দের অর্থ যে বিপ্রত্ব তাহা দিগ্‌দর্শনী নামক টীকাতে স্বয়ং শ্রীসনাতন গোস্বামীই অঙ্গীকার করিয়াছেন।

বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে সর্ব্বথা শাস্ত্রসম্মত ইহা পুণ্যচরিত দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুদিন পূর্ব্বে ব্যবস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিতই শাস্ত্রানুকূল বিচারসাহায্যে সেই ব্যবস্থার খণ্ডন করিতে পারেন নাই, কেবল কূটতর্কজড়িত বৃথাবাগ্‌জাল বিস্তার দ্বারা শাস্ত্ররহস্যানভিজ্ঞ জনকয়েক পণ্ডিতম্মন্যব্যক্তি নিজ দলের মনোরঞ্জনপূর্ব্বক আত্মতৃপ্তি লাভ করিতেছেন মাত্র, কিন্তু নবজাগরিত হিন্দুসমাজে এই প্রকার বালবিধবার পুনর্ব্বিবাহ যে ভাবে উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিতেছে—তাহা দেখিয়া মনে হয় এই সকল পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের ঐ সকল চীৎকার অচিরকালের মধ্যে অরণ্যে রোদনরূপে পরিণত হইবে।...

হিন্দুসংগঠন বলিলে আমরা কি বুঝি—এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। হিন্দুসংগঠনের মূল ভিত্তি হইতেছে বহুশতাব্দীব্যাপিনী হিন্দুর দাসোচিত মনোবৃত্তির বিসর্জ্জন। আমরা কলিযুগের মানব, সুতরাং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমাদের শক্তি নাই, জ্ঞান নাই, বীর্য্য নাই, তেজ নাই, পাপের পঙ্কে আমরা নিমগ্ন হইয়া পড়িয়াছি, আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কিসে হয় তাহা আমাদের স্বাধীন মনোবৃত্তির সাহায্যে বুঝিবার শক্তি নাই, ভবিষ্যদ্‌দর্শী ঋষিগণ আমাদের বর্ত্তমান যুগের যাবৎ কর্ত্তব্য দিব্যজ্ঞানের প্রভাবে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং আমাদের নিজের স্বতন্ত্রভাবে ভাবিবার বা ভাবিয়া স্থির করিবার কিছু নাই, আবার সেই ঋষিগণের বচনসমূহের তাৎপর্য্য কি তাহা বুঝিবার বা বুঝাইবার শক্তি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণেরই একমাত্র নির্ব্বিসংবাদিত পৈত্রিক সম্পত্তি, তাঁহাদের শ্রীমুখারবিন্দ হইতে যাহাই শাস্ত্রের অর্থ নির্গলিত হইবে, তাহাই শ্রুতির সার, স্মৃতির রহস্য, পুরাণের নিগূঢ় মর্ম্ম, ইত্যাদি প্রকারের যে মনোবৃত্তি ইহারই নাম দাসোচিত মনোবৃত্তি বা slave mentality. এই জাতীয় মনোবৃত্তিই হিন্দুজাতির সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ, এবং ইহাই হিন্দুজাতির সর্ব্বপ্রকার অভ্যুদয়ের প্রধান অন্তরায়।

এই প্রকার মনোবৃত্তির উচ্ছেদ করিতে না পারিলে আমরা কিছুতেই আমাদের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সভ্য মানবজাতির সহিত প্রতিযোগিতায় এই ভীষণ জীবনসংগ্রামের দিনে আত্মরক্ষা করিতে পারিব না, এখন এই কথা প্রত্যেক হিন্দু নরনারীকে বুঝাইতে হইবে।...

এই মহাভিত্তির উপর অকম্পিতপদে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে করিতে হইবে—গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে জাতীয়ভাবে স্ত্রীশিক্ষা প্রবর্ত্তন, সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী, লোপামুদ্রা অরুন্ধতী মৈত্রেয়ী গার্গীর ন্যায় ললনাকুলললামভূত নারিগণের পুণ্যপাদধূলিনিবহে পুণ্যতম এই ভারতে প্রত্যেক নারীই শিক্ষায় দীক্ষায় চরিত্রে সাহসে বিজ্ঞানে ও আধ্যাত্মিকতাসম্পদে সমগ্র পৃথিবীতে মাতৃত্বের ভগিনীত্বের দুহিতৃত্বের ও সর্ব্বাপেক্ষা স্পৃহনীয় মনুষ্যত্বের সমুজ্জ্বল আদর্শ সৃষ্টি করিয়া এই পাপতাপ বৈমনস্য বিষাদগ্রস্ত সংসারকে নন্দনকাননে পরিণত করিতে পারেন, তাহারই জন্য আমাদিগকে কায়মনোবাক্যে কঠোর উদ্যমের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে।...

জিতেন্দ্রিয়তার সঙ্গে দৈহিকবলের সমাবেশ ব্যতিরেকে স্বরাজলাভের কোন উপায় আছে বলিয়া আমার মনে হয় না, প্রতি গ্রামে প্রতি নগরে প্রতি পল্লীতে আমাদিগের বালকগণের জন্য ব্যায়ামশালা স্থাপিত করিতে হইবে, লাঠি, ছুরি ও তরবারি প্রভৃতি অস্ত্রনিচয়ের কৌশলপূর্ণ চালনার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে হইবে, শুধু বালকগণকে নহে—আমাদিগের বালিকাগণও যাহাতে এই সকল শিক্ষা পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যার সময় বালক বালিকা, যুবক যুবতী, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ও তথাকথিত নীচজাতির সমর্থ ব্যক্তিমাত্রকে দেবমন্দির বা ভজনমন্দিরে সমবেত হইতে হইবে, তথায় বিশুদ্ধভাবে দেহমনকে সংস্কৃত করিয়া সকলে মিলিত হইয়া শ্রীভগবানের নাম লীলা ও গুণমহিমার কীর্ত্তন করিতে হইবে, গ্রামের নগরের জনপদের প্রত্যেক সাধারণ জলাশয়ে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকেই জলগ্রহণ করিবার অধিকার দিতে হইবে, সাধারণ দেবমন্দিরে হিন্দুমাত্রেই প্রবেশ করিয়া যাহাতে দেবদর্শনের সুবিধা পায় তাহার ব্যবস্থা অচিরেই করিতে হইবে। এই সকল কার্য্যের নামই—হিন্দু-সংগঠন। কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত যত শীঘ্র অনুষ্ঠিত হইবে আমাদিগের স্বরাজ ততই নিকটবর্ত্তী হইবে, একথা যেন সকল হিন্দুর মনে সর্ব্বদা জাগরুক থাকে।

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

—

শিশুর ভয়

ভীরু বলিয়া বাঙ্গালীর একটা অপবাদ আছে; অনেকের ধারণা এই দোষটি তাহার জন্মগত। কথাটা এই হিসাবে ঠিক যে, যে পারিবারিক শিক্ষার আওতায় সে লালিতপালিত হইয়াছে, সেই সব অবস্থা ও ব্যবস্থার ভিতর যাওয়া-না-যাওয়া তাহার ইচ্ছাধীন ছিল না, এই মাত্র। কিন্তু এই অবস্থা ও ব্যবস্থা আমাদের দীর্ঘ যুগের জাতীয় কুশিক্ষার ফলে এরূপভাবে পরিণতি লাভ করিয়াছে যে, আমরা ইহাকেই স্বাভাবিক বলিয়া মনে করি; এবং ইহাদের প্রভাবে শিশুদের যে-সকল মনোবৃত্তি সৃষ্ট হয়, সেগুলিও শিশুদের জন্মলব্ধ বলিয়া মানিয়া লই। বস্তুতঃ কোন একটি বিশেষ মনোবৃত্তি লইয়া কোন শিশু জন্মগ্রহণ করে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থাই মনোবৃত্তির সৃষ্টি করে।...

যে উপায়ে ভবিষ্যতে আমরা একটি সুস্থচিত্ত সৎসাহসী জাতি গঠন করিতে পারি,—সকল দিক বিবেচনা করিয়া তাহার একটি বিধিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে দেখা উচিত—আমাদের আসল গলদ কোথায়? এই গলদের অনুসন্ধান করিতে হইলে শৈশবে এমন কি অতি শৈশবে আমরা কিরূপ শিক্ষা পাইয়াছি এবং আমাদের শিশুরা এখনও কি শিক্ষা পায়, তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। কারণ পাঠশালায় যাইবার আগেই ভয়, ভালবাসা, হিংসা, ক্রোধ প্রভৃতি বৃত্তি লইয়া শিশুচিত্তের একটি মোটামুটি গড়ন স্থির হইয়া যায়; এবং একবার ঠিক হইয়া গেলে, ইচ্ছামত তাহাকে অন্যভাবে লইয়া যাওয়া অতিশয় কষ্টসাপেক্ষ; এমন কি, একরূপ অসম্ভব বলিলেও চলে।

সকলেই জানেন, দুরন্ত শিশুকে শাসনাধীন করিবার জন্য ভূত, প্রেত, জুজুর আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। ইহা যেমনি সহজ তেমনি জনপ্রিয়। শিশু-চিত্তের উপর এই সব বীভৎস রস যে কি অনিষ্টকর প্রভাব বিস্তার করে, তাহা অনেকেই জানেন না, অথবা জানিয়াও জানিতে চাহেন না। সহজ উপায়ে কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় আমরা ভুলিয়া যাই যে, যে-জুজুর কাল্পনিক মূর্ত্তি আমরা শিশুর মনে আঁকিয়া দিই, সেই জুজুই সত্যকার মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভবিষ্যৎ জীবনে পদে পদে তাহার পথ আগলাইয়া দাঁড়ায়।...

আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলিয়া থাকেন যে, ভয়ের স্বাভাবিক হেতু সংখ্যায় অতীব অল্প। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে, উচ্চ শব্দ ও আশ্রয়চ্যুতি এই দুইটিই ভয়োৎপাদনের একমাত্র অকৃত্রিম কারণ। অন্যান্য যে-সমস্ত কারণে শিশু ভয় পায়, তাহা সমস্তই কৃত্রিম; এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে সেগুলি ভয়ের কারণ হইয়া দাঁড়ায়।...

সাপ, ব্যাঙ, কুকুর, অন্ধকার, অগ্নি, ভূত, জুজু, পুলিশ সাহেব, এদের যে-কাহাকেও অতি-শিশুর সামনে ধর, সে ভয় পাইবে না। কুকুর দেখিয়া শিশু ছুটিয়া যাইতেছে,—কুকুর উচ্চশব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল,—চীৎকার শুনিয়া শিশু ভীত হইল। পরে কুকুরের সহিত আবার তাহার সাক্ষাৎ হইল; কুকুর তখন চীৎকার করিল না; কিন্তু তবুও শিশু তাহাকে দেখিয়াই ভয় পাইল—ইহার কারণ কি? কুকুর ও উচ্চশব্দ এই দুইটি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হওয়াতে, উচ্চ শব্দের ভয় সৃষ্টি করিবার যে স্বাভাবিক শক্তি আছে, শিশু-মন সে শক্তি কুকুরে আরোপ করিয়াছিল। তাই দ্বিতীয়বার কুকুর শব্দ না করিলেও প্রথম উচ্চশব্দজনিত যে প্রতিক্রিয়া শিশুর মনে জাগরূক হইয়াছিল এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল। এরূপে কুকুর সদৃশ যে কোনও জন্তুতে, এমন কি, কোনও রোমশ নির্জ্জীব পদার্থেও ঐ প্রতিক্রিয়া আরোপিত হইতে পারে। ফলে শিশু ঐরূপ কোনও জন্তু বা বস্তু দেখিলেই ভীত হইবে।

অগ্নি দেখিয়া শিশু তাহা ধরিতে চলিল, জননী উচ্চ চীৎকার করিয়া তাহাকে নিবারণ করিলেন। শিশুর চিত্ত তখন অগ্নিই সম্পূর্ণ রূপে অধিকার করিয়া আছে। তাই উচ্চ চীৎকারজনিত যে স্বাভাবিক ভয় শিশুর মনে উদিত হইল, সে অগ্নিতেই তাহা আরোপ করিয়া বসিল। সেই হইতে তাহার মনে অগ্নিভয় সৃষ্ট হইল।...

অধিকাংশ স্থলেই কোন একটি উচ্চশব্দ লক্ষ্য করিয়া 'ঐ ভূত ডাক্‌ছে—ধ'রে নিয়ে যাবে' প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে। উচ্চশব্দ শুনিয়াই শিশুরা ভীত হইয়া পড়ে—ভূত, জুজু তাহাদের ভয়ের সৃষ্টি করে না।...

যে ব্যক্তি অসাবধানে কোলে লইয়া বা কোল হইতে নামাইয়া, ঝাঁকানি দিয়া অথবা লোফালুফি করিয়া শিশুদিগকে আশ্রয়চ্যুতির ভয়ে ভীত করিয়া গেলেন, ভবিষ্যতে আশ্রয়চ্যুতির ঐসব কারণ বিদ্যমান না

থাকিলেও, শিশুরা তাহাকে দেখিয়াই ভয় পায়। এবং শুধু তাহাই নয়, ঐ প্রকার যে-কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া শিশুরা সঙ্কুচিত হয়।...

এই দুইটি হইতে যতদূর সম্ভব অতি-শিশুদের দূরে রাখা উচিত; কারণ, শিশু-চিত্তে বারংবার ভয়ের উদয় হইলে ক্রমে তাহারা ভয়প্রবণ হইয়া পড়িবে এবং নানা অমূলক ভয়, আরোপ-প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্ট হইয়া, তাহাদের চিত্ত অধিকার করিবে। এজন্য শিশুর জাগ্রত ও নিদ্রিত অবস্থায় তাহার শয়নকক্ষে বা কোন নিকটবর্ত্তী স্থানে কোনরূপ উচ্চ শব্দ না করাই সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। এক শয্যা হইতে অন্য শয্যায় শয়ন করাইবার সময় কোলে লইতে বা কোল হইতে নামাইবার সময় যথেষ্ট সাবধান হওয়া উচিত।...

যে-সকল বিষয় হইতে বাস্তবিক গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা আছে, অতি-শিশুদিগকে সেই সব বিষয় হইতে দূরে রাখিতে হইবে। পরে বয়োবৃদ্ধির সহিত বুদ্ধির ক্রমবিকাশ হইতে থাকিলে, অনিষ্টকর বস্তুগুলির সহিত অল্পে অল্পে পরিচয় করাইয়া দিতে হইবে। শিশুদিগের ধারণাশক্তির অনুযায়ী করিয়া অনিষ্টের আশঙ্কা কোথায়, কিরূপ অনিষ্ট হইতে পারে, এই সমস্ত বুঝাইয়া দেওয়া এবং যতদূর সম্ভব প্রত্যক্ষ করাইয়া দেওয়া উচিত। অগ্নিতে সামান্য দগ্ধ হইবার অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে দেওয়া আপাতকষ্টকর হইলেও ভবিষ্যতে সুফলপ্রসূই হয়।

উচ্চ পালঙ্কের উপর শিশুকে হামাগুড়ি দিতে দেওয়া উচিত নয়; কারণ, পড়িয়া মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত লাগিতে পারে। কিন্তু মেঝের উপর শিশু যথেচ্ছা হামা দিতে পারে। হামা দিবার বা চলিবার সময় যখন শিশু বার বার পড়িয়া যায়, তখন চীৎকারের সাহায্যে সাবধান না করিয়া, তাহাকে পতনের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেওয়াই ভাল।...

গৃহপালিত কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি হইতে শিশুদিগকে সাবধান করা নিষ্প্রয়োজন। এরূপ করিলে জীবজন্তুর বিষয়ে তাহাদের প্রাণে একটি স্থায়ী ভয় থাকিয়া যাইবে। কিন্তু অপরিচিত জীবজন্তু হইতে অতি-শিশুকে দূরে রাখাই বাঞ্ছনীয়। পরে বয়োবৃদ্ধি হইলে উহাদের সহিত অল্প অল্প করিয়া পরিচিত করান উচিত।

অনেকেরই ধারণা অন্ধকারকে শিশুরা স্বভাবতঃ ভয় করে; কিন্তু সে ধারণা ভ্রমমূলক। ইহাও আরোপ-ক্রিয়া দ্বারা কৃত্রিম উপায়ে সৃজিত। এই অন্ধকার-ভীতি সৃজন করিবারও কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। বরং এই ভীতির সৃষ্টি না করিয়া, শিশুদের অন্ধকারের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।...

জীবনে আমরা যে-সমস্ত বিপদের আশঙ্কা করিয়া থাকি, আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা সাধারণতঃ দুই রকমের। কতকগুলি বাস্তব—যেমন অগ্নি হইতে বিপদ; এবং কতকগুলি সম্পূর্ণ কাল্পনিক—যেমন ভূত, জুজু হইতে বিপদ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে-সব বিষয় হইতে বাস্তবিক বিপদের আশঙ্কা আছে, সে-সব বিষয় ও অনিষ্টের সহিত প্রত্যক্ষভাবে কিছু পরিচিত হইবার পূর্ব্বে শিশুদের সাবধান করা উচিত নয়। এবং যে-সমস্ত অনিষ্টকর বস্তুর বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে, অথচ শিশু এখন তাহাদের সহিত পরিচিত হয় নাই—সেরূপ বস্তু সম্বন্ধেও শিশুর সহিত আলোচনা করা সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন। এবং কাল্পনিক বিষয় বা অনিষ্টের সম্বন্ধে শিশুর সহিত কোন সময়ে কোনরূপ আলাপ করিবে না।...

ভয় দূর করা অতি কঠিন ব্যাপার। সর্ব্বপ্রকার কৃত্রিম ভয় যে দূর করা যায়, এ কথা বলা যায় না; কিংবা সর্ব্বপ্রকার ভয়কে দূর করিবার যে কেবল একটি মাত্র পন্থা আছে, তাহাও নহে। তবে বৈজ্ঞানিকগণ একটি মূল সূত্রের সন্ধান পাইয়াছেন—যাহার স্থান-কাল-পাত্র-উপযোগীভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহার করিলে অনেক কৃত্রিম ভয় দূর হয়।

মনে করুন, কোন শিশু বিড়াল দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। সেই ভয় কিছুতেই দূর করা যাইতেছে না। শিশুকে অনেক দিন বিড়াল হইতে দূরে রাখিলেও সেই বিড়াল-ভীতি শিশু-মন হইতে একেবারে অপসৃত হয় না।...জোর করিয়া বিড়ালের নিকট লইয়া গিয়া ভয় ভাঙাইবার চেষ্টা করা অত্যন্ত বিপজ্জনক।...ঠাট্টা করিয়া উড়াইয়া দিলে তাহাকে জটিল মনোভাবের দিকে চালিত করা হয় মাত্র। অন্যান্য শিশুদিগকে ভীত শিশুর সম্মুখে বিড়াল লইয়া খেলা করিতে দিয়াও বিশেষ কোন ফল পাওয়া যায় না।

শিশুর ক্ষুধার সময় তাহাকে খাইতে দিয়া তাহার দৃষ্টিগোচর স্থানে অথচ বহুদূরে একটি বিড়াল রাখিয়া দিবে। বিড়াল দূরে আছে বলিয়া শিশুর খাদ্যের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি ও বিড়ালের প্রতি কৃত্রিম ভয়ের দ্বন্দ্বে প্রথমটি জয়লাভ করিবে। বিড়ালটিকে অতি নিকট আনিলে কিন্তু উল্টা ফল ফলিবারই সম্ভাবনা। তাই প্রতিদিন অল্প অল্প করিয়া বিড়ালটিকে নিকটে লইয়া আসিতে হইবে। এইভাবে অগ্রসর হইলে মনোবৃত্তির দিক দিয়া দুইটি কার্য্য সাধিত হইবে। শিশু উপলব্ধি করে যে বিড়াল হইতে তাহার কোন ভয়ের আশঙ্কা নাই; এবং প্রত্যেকবার খাইবার আনন্দ উপভোগের সময় বিড়াল দৃষ্টিপথে থাকাতে কতক আনন্দের কারণ সে বিড়ালেই আরোপ করে। এই ভাবে ধৈর্য্যের সহিত চেষ্টা করিলে অবশেষে শিশুর বিড়ালভীতি একেবারেই অন্তর্হিত হইতে পারে।...

যাহা হউক, অতীত সম্বন্ধে অনুতপ্ত হইয়া লাভ নাই। গতানুগতিক শিক্ষার কুফল হইতে শিশুদের সাধ্যমত রক্ষা করাই বিধেয়; কিন্তু অতি সত্বর এই সব কুশিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিয়া নূতন শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ করে,—যে শিক্ষা আবার আমাদের নির্ভীকভাবে পৃথিবীর বক্ষে দাঁড় করাইবে—সেই শিক্ষার প্রবর্ত্তন করিতে হইবে। আমাদের স্মরণ রাখা উচিত—সেই শিক্ষার ভিত্তি অতি শিশুকালে স্থাপন করিতে হইবে। শিশুশিক্ষার দিকে সকলে মনোযোগী হউন—জাতি আপনি গড়িয়া উঠিবে। কিন্তু শিশু-মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে এই প্রকৃত শিক্ষার অনুষ্ঠান ও প্রচলন একেবারে অসম্ভব।

(ভারতবর্ষ চৈত্র, ১৩৩৬) শ্রীগোপেশ্বর পাল

কালিদাসের বৃক্ষলতা

৪১। দেবদারু:—ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং। মে ২।৪৪

অন্য নাম—শতপাদক, কল্পপাদক, দারুক, স্নিগ্ধদারু, শিবদারু, শাম্ভব, ভূতহারিন্, ভদ্রবৎ, মস্তদারু। দেবদারু দুই প্রকার,—স্নিগ্ধদারু, কাষ্ঠদারু। বৈদ্যগ্রন্থে দেবদারু বলিতে স্নিগ্ধদারু বুঝিতে হইবে। স্নিগ্ধদারু—সুগন্ধি, ভারী, তৈলাক্ত এবং ঈষৎ পীতবর্ণ। ইহা পর্ব্বতে জন্মে। বণিক্‌গণ যে তৈলাক্ত গুরু সুগন্ধি কাষ্ঠ বিক্রয় করে, তাহা স্নিগ্ধদারু। দেবদারুর সুগন্ধ আছে, তাহা কালিদাস মেঘদূতে

বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাঠদারু—নির্গন্ধ, লঘুতর এবং রুক্ষ। ইহা যেখানে-সেখানে জন্মায়।

৪২। দ্রাক্ষা :—বিনয়ন্তে স্ম তদ্যোধা মধুভির্বিজয়শ্রমম্।
আস্তীর্ণাজিনরত্নাসু দ্রাক্ষাবলয়-ভূমিষু ॥ র ৪।৬৫

দ্রাক্ষা চার প্রকারের; যথা :—(১) "দ্রাক্ষা স্বাদুফলা প্রোক্তা তথা মধুরসাপি চ।" ইহাই grapes, আঙ্গুর বা অঙ্গুর। (২) মৃদ্বীকা হারহুরা চ গোস্তনী চাপি কীর্ত্তিতা। ইহাই ফারসিতে মুনক্কা, raisins (Munakha)। (৩) ক্ষুদ্র দ্রাক্ষা বা নির্বীজা, ইহাই কীস্মীস muscatales। (৪) কপিল দ্রাক্ষা, ইহার উৎপত্তিবোধিকা নাম 'উত্তরপথিকা'। ইহার হিন্দী নাম কালীদাখ, Black large grape....

অতি প্রাচীন কাল হইতেই কাশ্মীর দ্রাক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ; এই জন্য দ্রাক্ষাকে 'কাশ্মীরিকা" বলে। এখন কাবুল হইতেই এদেশে প্রচুর আঙ্গুর আসে। দ্রাক্ষা লতাগাছ। দ্রাক্ষার ভাল আসব হয়। প্রাচীন কালেও হইত। চরকসংহিতায় মৃদ্বীকা, অর্থাৎ মনাক্কা-জাতীয় আঙ্গুর হইতে আসব করা হইতে।

৪৩। নবমল্লিকা :—কুসুম-সম্ভৃতয়া নবমল্লিকা
স্মিতরুচা তরুচারুবিলাসিনী ॥ র ৯।৪২

অন্য নাম :—ভদ্রবর্ম্মা, দেবলতা, গন্ধনিলয়া, গ্রীষ্মভবা, সুকুমারী, সুরভি, শুচিমল্লিকা, শিখরিণী, নবালী এবং গ্রীষ্মী।

এই নবমল্লিকা গ্রীষ্মকালে জন্মায়। কালিদাস ইহাকে বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে ধরিয়াছেন। বসন্তের পরেই গ্রীষ্ম। আর চৈত্র মাসে গ্রীষ্ম বেশ অনুভূত হয়। সুতরাং বসন্তকালে ইহা ফোটা অসম্ভব নয়।

শকুন্তলাতে মহাকবি ইহাকে গ্রীষ্মপুষ্প বলিয়াছেন।

৪৪। নমেরু :—গণা নমেরু-প্রসবাবতংসা —কু ১।৫৫

কালিদাস হিমালয়বর্ণনা-প্রসঙ্গে রঘু ও কুমারে এই নমেরুর উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং ইহা হিমালয় প্রদেশের গাছ। যদি ইহা রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনাদি অন্য স্থানেও রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ জন্মায় এবং ফলও হয়।

৪৫। নারিকেল :—নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ ॥৪।৪২

নারিকেল গাছ নোনা মাটিতে জন্মে। খুব মিটেন মাটিতে এ গাছ বাঁচে না। পশ্চিমদেশে নারিকেল গাছ হয় না এবং এইজন্যই নারিকেল গাছের গোড়ায় নুন দিতে হয়। খনার বচনে আছে "নারিকেল গাছে নুণ মাটি, শীঘ্র শীঘ্র বাঁধে গুটি।"

৪৬। নীবার :—নীবার-পাকাদি-কড়ঙ্গরীয়ৈ-
রামৃশ্যতে জানপদৈর্ন কচ্চিৎ ॥ র ৫।৯

ইহার চাষ হয় না বা কেহ রোপণ করে না। অবস্তে এক প্রকার তৃণ জন্মে, তাহা হইতে স্বতঃই এই ধান জন্মিয়া থাকে। পুরাকালে বনবাসী মুনি, তপস্বী প্রভৃতি ইহা দ্বারা প্রাণধারণ করিতেন। এখন ইহা বাংলার 'উড়ি ধান' নামে পরিচিত। এখনও ইহার ব্যবহার আছে কি না জানি না।

৪৭। পাটল :—মনোজ্ঞগন্ধং সহকারভঙ্গং
পুরাণশীধুং নব-পাটলঞ্চ। র ১৬।৫২

বর্ত্তমানে সাধারণে ইহাকে "পারুল" বলে। কিন্তু কেহ কেহ ইহাকে দু-পাপড়ির গোলাপও বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এই পাটল পুষ্প হইতেই পাটলীপুত্র নাম হইয়া থাকিবে।

কালিদাস বসন্তে ও গ্রীষ্মে পাটলের ব্যবহার করিয়াছেন। বসন্ত-বর্ণনায় নবপাটল বলায় ইহা বসন্তেই প্রথম ফোটে, তাহা জানাইয়াছেন। ইহা সুগন্ধি ফুল। আর রক্তপাটল বলায় যে পাটলের রং লাল, তাহারই আদর করিয়াছেন, জানা গেল।

৪৮। পারিজাত :—তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ
পারিজাত-কুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্। কু ৮।২৭

ইহা দেবতরু। কালিদাস এই কল্পবৃক্ষেরই বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা যাহাকে পারিজাত নাম দিয়াছি, তাহা পালুতে মাদার। হিন্দিতে ইহাকে ফরহদ্ বা পন্‌গ্র বলে। ইহাই Coral tree।

৪৯। পুগ :—ততো বেলাতটেনৈব ফলবৎ পুগমালিনা। র ৪।৪৪

দেশভেদে নাম :—বা :—সুপারী।

সুপারির গাছ বাংলায় অতি প্রসিদ্ধ।

৫০। পুন্নাগ :—খর্জ্জূরী-স্কন্ধনদ্ধানাং মদোদ্গার-সুগন্ধিষু।
কটেষু করিণাং পেতুঃ পুন্নাগেভ্যঃ শিলীমুখাঃ ॥
র ৪।৫৭

পুন্নাগ বাংলার গাছ নহে। উড়িষ্যায় ইহা প্রচুর জন্মে। দক্ষিণ প্রদেশেই ইহার ফুল ভাল হয় এবং বড় বড় হয়।

কালিদাস কেরলে পুন্নাগ দেখিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

৫১। প্রিয়ঙ্গু :—শ্যামালতাঃ কুসুমভারনতপ্রবালাঃ—ঋ ৩।১৮

প্রিয়ে প্রিয়ঙ্গুঃ প্রিয়বিপ্রযুক্তা—ঋ ৪।১০

দেশভেদে নাম। বা :—প্রিয়ঙ্গু, গন্ধপ্রিয়ঙ্গু বা শ্যামা।

এই শ্যামালতা লইয়া বড় গোল আছে। রমণীগণ প্রিয়ঙ্গু অনুলেপনার্থ ব্যবহার করিতেন।

মহাকবি এই প্রিয়ঙ্গু, ফলিনী বা শ্যামলতাকে কি কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন দেখিলে অনেকটা উপলব্ধি হইবে। তিনি ইহার লতাকে হাতের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের হাতের ললিত ভঙ্গীর সহিত ইহার লতানে ভাবের সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। শীতকালে ইহা মলিন হইয়া যাইতেছে অর্থাৎ মরিয়া যাইতেছে। ইহা চন্দন প্রভৃতির সঙ্গে বাটিয়া স্তনে মাখা হইত।

৫২। প্রিয়াল :—মৃগাঃ প্রিয়াল-দ্রুম-মঞ্জরীণাং—কু ৩।৩১

দেশভেদে নাম। বা :—পিয়াল।

কালিদাস হিমালয়ের এক প্রদেশের বর্ণনায় এই বৃক্ষের নাম করিয়াছেন। আর বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে ইহার ফুলফোটার কথা বলিয়া ইহাকে বসন্তপুষ্প নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(প্রকৃতি, হেমন্ত সংখ্যা) শ্রীগণপতি সরকার

সুন্দরের স্থান কোথায় ?

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

যখন কোন সৌন্দর্য্যে মন মুগ্ধ হয়, যখন কোনও কিছু ভাল লাগে তখন অনেক সময়েই হয়ত আমরা তার ঠিক কোনো কারণ বুঝাইতে বা নিজেও বুঝিতে পারি না। শুধু মাত্র অনুভব করিতে থাকি যে আমার ভাল লাগিতেছে। প্রকৃতির তরুলতায় পত্রে পুষ্পে গন্ধে বর্ণে অবিরাম এই যে সৌন্দর্য্যে চিত্ত মুগ্ধ হইতেছে, এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিয়া সুন্দর লাগিল তাহা কেন লাগিল তাহার কোনও কারণের ব্যাখ্যা না জানিয়াও নিঃসংশয়-চিত্তে বলিতে পারি যে, আমার ভালো লাগিয়াছে, বলিতে পারি এইটি সুন্দর, এইটি সুন্দর নয়; বিকশিত পুষ্পে প্রভাত আলোকে সুন্দরের যে মাধুর্য্যকে অনুভব করি তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে হয় না, স্পর্শমাত্র তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া ওঠে। সেইজন্য ইহাকে যে অনুভব করে সেই ইহার মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে, যে করে না তাহাকে কথায় কোনও ব্যাখ্যা করিয়া বোঝানো কখনও সম্ভব হয় না। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোনও কথা ভাবিতে গেলে এই সৌন্দর্য্যবোধের কথাই প্রথম মনে হয়।

তারপর যখন নানারূপে আমরা এই সুন্দরের স্পর্শ অবিরাম লাভ করিতে থাকি, যখন তার মাধুর্য্যে চিত্ত পূর্ণ হইয়া যায়, তখন অন্তরের সেই অনুভূতিটি কোনও রূপে বাহিরে প্রকাশ করিবার জন্য মন উন্মুখ হইয়া ওঠে। যখন ভোরের বেলায় তরুণ সূর্য্য স্নিগ্ধ রশ্মিরাজি বিকীর্ণ করিয়া উঠিয়া আসেন তখন সেই আলোতে মানুষ এমনি সৌন্দর্য্যের আলো দেখিতে পায়, এমনি অপূর্ব্ব স্পর্শ অনুভব করে, এমনি প্রভায় তাহার অন্তর উদ্ভাসিত হইতে থাকে যে, তাহার সেই অন্তরের অনুভবটিকে বাহিরে ব্যক্ত না করিয়া মন শান্তি মানে না। তাই কেহ রং দিয়া ছবি আঁকিয়া, কেহ সুরে, কেহ ছন্দে নানা রকমে তাহাকে প্রকাশ করিতে থাকে, অন্তরে যাহাকে নিবিড়ভাবে অনুভব করিতে থাকে। যাহার স্পর্শে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইতে থাকে সেই সৌন্দর্য্যানুভবকে যখন রঙ্গে, সুরে বা ছন্দে প্রকাশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিবার চেষ্টা করে তখন তাহা হয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। যাহাকে অনুভব করিতেছিলাম, যাহাকে বুঝিতেছিলাম সাহিত্যে বা শিল্পে তাহাকে প্রকাশ করিয়া সুন্দরের সৃষ্টি করিলাম। অনেক সময় সৌন্দর্য্য-বোঝা এবং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা এই দুইটি কথা আমরা এক বলিয়া মনে করি, কিন্তু সৌন্দর্য্য বোঝা মানেই সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করা নয়। সুন্দরকে বুঝিবার মত মনের যদি সম্পদ থাকে তবেই আমরা তাহাকে বুঝিতে পারি। কিন্তু অনুভব করিলেই যে তাহা প্রকাশ করিতে পারি তাহা নয়। সেই প্রকাশ করিবার জন্য ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের প্রয়োজন। তবে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে হইলে তাহাকে অনুভব করিতে হয়। সুন্দরকে না বুঝিয়া সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় না। এবং হয়ত এই সৌন্দর্য্য-বোধের মধ্যে আমরা কিয়ৎ পরিমাণে সৌন্দর্য্য সৃষ্টিও করি। তাই এই দুইটি ব্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট যোগা-যোগ থাকিলেও ইহারা এক কথা নয়।

তারপর যখন অবিরাম ছন্দে, গানে, শিল্পে সুন্দরের সৃষ্টি করিতে লাগিলাম, তাহার জ্যোতিতে সমস্ত চিত্তকে নিমগ্ন করিতে চাহিলাম তখন একথা মনে আসিতে পারে যে ইহার কোনও প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? প্রয়োজন বলিলে সাধারণভাবে শারীরিক প্রয়োজন বুঝায়, কিন্তু আহার বিহার ইত্যাদির ন্যায় সৌন্দর্য্যের শরীর-সম্পর্কিত এই জাতীয় কোনও প্রয়োজন হয়ত নাই। যখন শারীরিক সমস্ত প্রয়োজন নিবৃত্ত হইয়াও মনের মধ্যে এমন একটা চাওয়া থাকে যাহাকে আমরা বুঝাইতে পারি না যে কি চাহিতেছি অথচ একটা রসস্পর্শের অলৌকিক আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিতে থাকে, তখন অন্তরে এই সুন্দরকে উপলব্ধি করি এবং অনুভব করি যে, ইহাই

চাহিতেছিলাম এবং ইহারই প্রকাশের বেদনায় চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল।

শরীরে ইহার অপেক্ষা না থাকিলেও অন্তরে ইহার এমনি একটি অপেক্ষা থাকে, এমনি একটি স্থান শূন্য এবং অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়, এমনি একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিতে থাকে যে, তখন যদি এই রসধারায় তাহাকে সিক্ত করিয়া সেই শূন্য স্থানটি পূর্ণ করিয়া না লইতে পারি তবে সমস্ত হৃদয় শুষ্ক কঠিন হইয়া ওঠে। তাই শরীরধারণের জন্য ইহার কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও চিত্তের সম্পূর্ণ পরিণতির জন্য ইহার প্রয়োজন আছে।

যখন ইহাকে অনুভব করি তখনি বুঝিতে পারি যে, যাহাকে খুঁজিতেছিলাম, যাহাকে চাহিতেছিলাম তাহাকে পাইলাম। এখন এই যে পাওয়া, এই যে একটি স্নিগ্ধ সুরভিত বিকাশোন্মুখ পদ্মফুল দেখিয়া আমাদের মনে হয় "কি সুন্দর!" সেই সৌন্দর্য্যটি আমরা কেমন করিয়া অনুভব করিলাম, পদ্মফুলের পাপড়িগুলির ন্যায় সেও কি কোথাও বাহিরের জগতেই রহিয়াছে? এই যে ছবিখানি, ইহার রং এবং কাগজখানির ন্যায় ইহার সৌন্দর্য্যও কি কোনও বস্তু, যাহাকে সম্মুখে দেখিয়া আমরা বলিতেছি "সুন্দর।" যদি তাই হয়, যদি সুন্দর বলিয়া কোনও বস্তু কোথাও থাকে, তবে এই সমস্ত বাহিরের পদার্থের ন্যায় তাহাকেও ত সকলেই দেখিতে পাইত। একই প্রকৃতি ত পশুও দেখিতেছে মানুষও দেখিতেছে, কিন্তু এই কুসুমগুচ্ছে, এই বসন্তসমীরে, এই মৃদু সুগন্ধে মানুষ যে সৌন্দর্য্য অনুভব করে, সে-ত পশুর কাছে নাই।

এমন কি যে ছবিখানিতে, যে রচনার মাধুর্য্যে, যে ছন্দের দোলায় রসিক ব্যক্তির চিত্ত সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, যে সঙ্গীতে একজন আত্মহারা, ঠিক সেই রচনা, সেই ছবি, সেই সঙ্গীতই আর একটি ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অর্থহীন আবর্জ্জনার মত ঠেকিতে পারে। এই প্রভেদটি কেন হয়, সুন্দর বস্তু যদি বাহিরে কোথাও থাকিত তবে তাহাকে ত সকলেই সমান দেখিতে পাইতাম। বিভিন্ন চিত্ত বিভিন্ন অনুভব দ্বারা তাহাকে এত নানা রকমে কেন দেখিতে থাকে? এই কাগজখানির আকার ত দুইজনের দৃষ্টিতে দুই রকম দেখাইবে না, "সুন্দর বস্তু" বলিয়া যদি এই রকমই কিছু থাকিত, তবে সেই পদার্থটিকে নানা লোকে নানা দৃষ্টিতে নানা রকমে কেন দেখিবে? কিন্তু যদি সুন্দর বস্তু কিছু না-ই থাকে, তবে তাহা দেখি কেমন করিয়া? এই যে গোলাপ ফুলটি দেখিয়া সুন্দর লাগিল, এইটি যদি সুন্দর নয় তবে কাহাকে ভালো লাগিতেছে, কাহাকে সুন্দর মনে হইতেছে।

একথা হয়ত বলা যায় যে "সুন্দর" আমাদের অন্তরের অনুভবের বস্তু; তাহা বাহিরে কোথাও নাই। কোনও ছবি সুন্দর নয়, কোনও ফুলও সুন্দর নয়, কুৎসিতও নয়, কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে আমরা যে একটা সুন্দরের স্পর্শ পাই তাহারই একটা প্রতিরূপ বাহিরে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি, তাহাকেই বলি সৌন্দর্য্যসৃষ্টি, আর প্রকৃতির সাহায্যে যখন আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যের সুন্দর রূপকে উপলব্ধি করি, এক নিমেষের দৃষ্টিতে তার মধ্যে ডুবে যাই তখন তাকেই বলি সৌন্দর্য্যবোধ।

কিন্তু সৌন্দর্য্য যদি কেবলমাত্র অন্তরেরই একটি বিশেষ অনুভব হয়, তবে বাহিরের জগতের সম্বন্ধে আমরা তাহার প্রয়োগ করি কেন? কেন বলি এই গোলাপ ফুলটি সুন্দর, এই ছবিটি সুন্দর। অন্তরের যা তা অন্তরের কারণে ফুটিয়া উঠিয়া অন্তরেই প্রকাশ পাক, বাহিরের জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি? কাজেই স্বীকার করিতে হয় যে, বাহিরের এই দৃশ্যে, গন্ধে, সুরে, ছন্দে এমন একটি জিনিষ থাকে যাহার স্পর্শে চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে; যাহার মধ্যে এমন একটি মন্ত্র থাকে যে সেই মন্ত্রের স্পর্শ লাগিলে হৃদয়ের মধ্যে যে ভাব রহিয়াছে আমরা তাহাকেই অনুভব করিতে পারি। এই ছন্দে, এই শব্দে কোনও সৌন্দর্য্য নাই,—আমারই অন্তরে যে সৌন্দর্য্য রহিয়াছে এই ছন্দের দোলায় তাহা দুলিয়া উঠিতে থাকে, কাজেই এই ছবিখানিতে, এই ভাষায়, এই পত্রেপুষ্পে এমন উপাদান আছে, এমন উদ্বোধক আছে যাহা দ্বারা আমারই অন্তরে যাহা রহিয়াছে আমি তাহাকেই অনুভব করিতে পারি।

যে বস্তুটি সৃষ্ট হইয়াছে, যে বস্তুটি রহিয়াছে সেইটিই

সুন্দর নয়, তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্যকে অনুভব করিবার উপাদান আছে। কিন্তু তাই বলিয়া এই রচনাটি না শুনিলে, এই ছবিখানি না দেখিলে, বাহির হইতে কোনো স্পর্শ না আসিলেও যে অন্তরে যাহা আছে তাহাকে আমরা অনুভব করিতে পারিব, তাহা নয়। চিত্তে যে বীণাটি রহিয়াছে বাহির হইতে স্পর্শ লাগিলে তবেই সে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিবে। কাজেই প্রাকৃতিক যে-সমস্ত দৃশ্য, যে-সমস্ত বস্তু আমাদের নিকট সুন্দর বলিয়া মনে হয়, তাহা তখনি মনে হয় যখন সে আমাদের ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া অন্তরে যে সৌন্দর্য্যবোধটি আছে তাহার সহিত মিলিত হয়। একটি সুর বাজিয়া উঠিলে প্রথম যখন তাহা কর্ণের তারে তারে ধ্বনিত হইতে থাকে তখনও তাহার সৌন্দর্য্যকে বা মধুরতাকে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না। কর্ণ তাহাকে গ্রহণ করিলে পর, কর্ণ হইতে সে যখন অন্তরে প্রবেশ করে, সেখানে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার যে বৃত্তিটি আছে সে যখন তাহাকে গ্রহণ করে, স্বীকার করে, তখনই তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য আমাদের নিকট প্রতিভাত হয়। তাই বাহিরে এই যে পদার্থটি রহিয়াছে এইটি সুন্দর হইয়া নাই, তবে এ যখন আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়া অন্তরের অনুভূতিটির সহিত একটি বিশেষভাবে মিলিত হয় এবং সে যখন ইহাকে স্বীকার করিয়া লয় তখনি ইহা সুন্দর হইয়া উঠে। কিন্তু অন্তরের সেই যে বৃত্তিটি, সেই যে সৌন্দর্য্য অনুভব করিবার শক্তিটি রহিয়াছে, সে কাহাকে গ্রহণ করিবে কাহাকে ফিরাইবে, কাহাকে স্বীকার করিবে কাহাকে অস্বীকার করিবে, তাহা বুঝিবার বা জানিবার কোনও উপায় নাই। সে কেন নিল কেন ফিরাইল, কেন বলিল এইটি সুন্দর এইটি অসুন্দর, তাহা জানিতে পারা যায় না, সেইজন্যই কখনই এমন কোনও কিছু স্থির করিয়া বলা সম্ভব নয় যে এইটি এমন করিলে সুন্দর হইবে বা সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিবার এই নিয়ম। যাহা সৃষ্টি করিতেছি, যাহা দেখিতেছি, অন্তরের সেই বোধশক্তিটি সমস্ত বুঝিয়া দেখিতেছে, সে যাহাকে গ্রহণ করিতেছে আমরা তাহাকে সুন্দর বলিয়া অনুভব করিতেছি; কিন্তু কি করিলে সে গ্রহণ করিবে তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি না। তবে হয়ত অনেক সময় বহুবার দেখিবার পর যখন সেই চিত্তবৃত্তির রুচির সহিত আমাদের পরিচয় ঘটে, তখন কিয়ৎ পরিমাণে অনুভব করিতে পারি। যেমন আমরা অনেক সময় মনে করি যে,ঐক্যের একটি সৌন্দর্য্য আছে; সে যে কোনও অন্তরের নিয়মের প্রত্যক্ষ সন্ধানের দ্বারা মনে করি, তাহা নয়। অনেকবার সেইরূপ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করিয়া লই যে, সামঞ্জস্য সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির একটি নিয়ম, ইংরাজিতে যাহাকে generalize করা বলে। কিন্তু অনেক স্থলে এইটি কি করিলে সুন্দর লাগিবে বা কেন সুন্দর লাগিতেছে এইরূপ অনুমান করাও সম্ভব হয় না। শুধু মাত্র একটা অব্যক্ত বোধে বুঝিতে থাকি এইটি সুন্দর,এইটি সুন্দর নয়। তাহা হইলে এখানে এই কথাটি বলা হইল যে, বাহিরের দৃশ্য, গন্ধ, সুর প্রভৃতি সৌন্দর্য্যের উপকরণ যখন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির সহিত মিলিত হয় তখনি তাহা সুন্দর হয়, তখনি আমরা সৌন্দর্য্যকে অনুভব করি। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে এই ত গেল সাধারণ কথা; এখন তাহা হইলে এ কথা মনে হইতে পারে যে, সাহিত্য বা শিল্পের (অর্থাৎ যাহাকে ইংরাজিতে artistic creation বলে) সৌন্দর্য্য তবে কি? প্রকৃতি বা অন্য কোনো বিষয় সম্বন্ধে একথা চলিতে পারে, কিন্তু সাহিত্য ত বাহিরের কিছু নয়। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্প অন্তরের সৃষ্টি হইলেও ইহার সমস্ত উপাদান ত বাহিরেই রহিয়াছে, কারণ প্রতিদিন আমরা যাহা দেখিতেছি, যাহা শুনিতেছি, যাহা পাইতেছি, যাহা হারাইতেছি সমস্ত জড়াইয়া মনের মধ্যে যে ছাপটি রহিয়া যায়, এই পৃথিবীর সহিত প্রতিদিনের ব্যবহারে যে জ্ঞান লাভ করি, যে রূপ আহরণ করি শিল্প বা সাহিত্য-সৃষ্টির সেই ত প্রধান উপকরণ। সেই প্রতিদিনের চাওয়া-পাওয়া-দেখা-শোনা জ্ঞানকেই ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধারণ করিয়া চিন্তাধারার সহিত গাঁথিয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির নিকট উপস্থিত করি। কাজেই বাহিরের সহিত সম্পর্ক রহিত কোনও কিছু সাহিত্য বা শিল্পের বিষয় হইতে পারে না। বাহির হইতে যাহা পাই, শরীরে যাহা অনুভব করি তাহাকেই চিন্তা দ্বারা, বুদ্ধির দ্বারা সাজাইয়া ছন্দে, সুরে, রঙে একটি নূতন রূপ দান করি, এবং সেই রূপটিই যখন আভ্যন্তরীণ

সেই বোধটির দ্বারা স্বীকৃত বা গৃহীত হয়, তখনই সাহিত্য বা শিল্প কলার সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রকৃতির বেলা শুধু রূপ গ্রহণের কথা ছিল, সাহিত্য বা শিল্প সম্বন্ধে শুধু রূপ গ্রহণ নয়, রূপ সৃষ্টিও ঘটিল।

এই বাহিরের দেখা শোনার স্পর্শ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করিয়া মানসিক সৌন্দর্য্য-বোধের সহিত মিলিত হইলেই আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্যকে বুঝিয়া থাকি। কিন্তু যখন আবার এই সমস্ত বাহিরের স্পর্শ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ধ্বনিত হইয়াই নয়, আমাদের সমস্ত চিন্তা, কল্পনা, বুদ্ধি দ্বারা সজ্জিত হইয়া নূতন রূপ লইয়া অন্তরের সেই বৃত্তিটির সহিত মিলিত হয়, তখন সাহিত্যের সৌন্দর্য্যের বোধ হয়।

বাহিরের যে-সমস্ত উপকরণ শুধু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া অন্তরের দ্বারে উপস্থিত হয় প্রকৃতির সৌন্দর্য্য গ্রহণের বেলা তাহাই উপাদানরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু সেই উপকরণকেই যখন আমাদের চিন্তায় বুদ্ধিতে সাজাইতে থাকি এবং সেই সাজাইবার সময় প্রতি স্তরে স্তরে অন্তর হইতে আলোক-রশ্মি বিচ্ছুরিত হইয়া তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে থাকে, তখন ক্রমে ক্রমে যে রূপটি গড়িয়া উঠে সেই রূপটি সাহিত্য বা শিল্পের সৌন্দর্য্যের উপাদান, কাজেই সাহিত্য বা শিল্প-সৃষ্টিকে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি এই কারণেও বলা যাইতে পারে যে,বাহিরের উপকরণকে যখন চিন্তার সহিত যুক্ত করিয়া সাজাইতে থাকি তখন প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরের সেই সৌন্দর্য্যবোধটি তাহাকে বিচার করিয়া দেখিতে থাকে এবং তাহারই নির্দ্দেশ অনুসারে এই রূপটি গড়িয়া উঠে। ইহাই সাহিত্যের সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি।

প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে এবং সাহিত্যের সৌন্দর্য্যে এই পার্থক্য। কাজেই সৌন্দর্য্য বা সুন্দর বলিয়া কিছুই অন্তরেও নাই, বাহিরেও নাই ; শুধু যখন এই দৃশ্য, গন্ধ, রূপ, রস, ছন্দ, সুর, প্রভৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়কে চঞ্চল করিয়া আপন রূপে অথবা বুদ্ধি, চিন্তা, কল্পনায় নূতন রূপ লইয়া অন্তরের আভ্যন্তরীণ সেই বোধটির সহিত মিলিত হয়, সে যখন ইহাকে গ্রহণ করে, তখনই ভিতর বাহিরের এই বিশেষ মিলনের মধ্যে আমরা সুন্দরকে লাভ করি।*

* উনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের সাহিত্য-শাখায় পঠিত।

বন্দী

শ্রীনগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

চারিদিকে প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। মাথার উপর একখণ্ড আকাশ, আকাশে কখন পাখী উড়িয়া যায়, কখন মেঘ ভাসিয়া যায়, দিনের বেলা কিছুক্ষণ সূর্য্য দেখা দেয়, রাত্রে কিছু নক্ষত্র, জ্যোৎস্না রাত্রে কিছুক্ষণ চন্দ্র দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীর-বেষ্টিত স্বল্প স্থানের মধ্যে কয়েক শত মনুষ্য—সকলের এক বেশ, মোটা কাপড়ের হাঁটু পর্য্যন্ত পায়জামা, গায়ে সেই কাপড়ের পিরাণ, মাথায় সেই রকম টুপী। মোটা কাপড়, তাহাতে নীল ডোরা। সকলের গলায় একটা টিনের চাকৃতি, তাহাতে একটা নম্বর খোদা। এই সকল লোকদের নাম নাই, শুধু নম্বর। যাহার যে নম্বর তাহাকে সেই নম্বর বলিয়া ডাকে।

ইহারা বন্দী, ইহাদের বাসস্থান কারাগার।

কতক লোকের পায়ে শৃঙ্খল, সকলের মাথার চুল ছোট করিয়া কাটা। কারাগারের মধ্যে আর একটা প্রাচীর, এক ভাগে বন্দীরা শয়ন করে, আর এক ভাগে কাজ করে। জাঁতায় আটা পিষিতেছে, ঘানিতে তেল বাহির করিতেছে। কোথাও শতরঞ্জি, গালিচা প্রস্তুত হইতেছে, কোথায়ও ছুতারের কাজ। পাকশালায় কয়েকজন বন্দী সকলের জন্য পাক করিতেছে, মোটা

অপরিষ্কার চাউল, মোটা আটার রুটী, জলের মত ডাল, অর্দ্ধসিদ্ধ একটা তরকারি। সকল স্থানে কয়েদী ওয়ার্ডার, অপর কয়েদীদের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে।

প্রত্যূষে, অন্ধকার থাকিতে ঘণ্টা বাজে, বন্দীদিগকে তাড়াতাড়ি উঠিয়া, প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কাজে যাইতে হয়, দ্বিপ্রহরে আহারের জন্য এক ঘণ্টা অবকাশ, আবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এই রকম চলিয়াছে, কখন বিরাম নাই, কখন কোন পরিবর্ত্তন নাই।

মাঝে মাঝে যাহা নূতন কিছু হয় তাহাতে বন্দীদের ভয় হয়, আনন্দ হয় না। কখন কোন বন্দী আদেশ-পালনে আপত্তি করে অথবা কর্ম্মে অবহেলা করে, শাস্তি-স্বরূপ বেত্রাঘাতের আদেশ হয়। একটা কাঠের তিন-কোণা ফ্রেমে অপরাধীর জামা খুলিয়া তাহাকে বাঁধে, আর একজন কয়েদী তাহাকে বেত মারে। জেলের অধ্যক্ষ ও ডাক্তার দাঁড়াইয়া থাকে, চারিদিকে কয়েদীরা ঘিরিয়া দাঁড়ায়। প্রথম কয়েক ঘা পড়িতে অপরাধী আর্ত্তনাদ করে, তাহার পর চীৎকার করিবার ক্ষমতা থাকে না, মাথা স্কন্ধে হেলিয়া পড়ে, কাতরোক্তি বন্ধ হইয়া আসে। যখন তাহাকে ছাড়িয়া দেয়, কিছুক্ষণ উঠিতে পারে না, তাহার পর হামাগুড়ি দিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া যায়।

রাত্রে প্রাচীরের উপর ভরা বন্দুক লইয়া, পায়চারি করিয়া প্রহরীরা পাহারা দেয়, মাঝে মাঝে হাঁকে, অল ওয়েল্! চারিদিক হইতে, চারিটা প্রাচীর হইতে সেই সাড়া আসে, অল ওয়েল্! কদাচ কখন, ভারি রাত্রে মহা কোলাহল উত্থিত হয়, দুমদাম বন্দুকের আওয়াজ, চারিদিকে ছুটাছুটি, চারিদিকে চীৎকার, কয়েদী ভাগা! কয়েদী ভাগা! বন্দীরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে আসিয়া কি হইয়াছে জানিতে চায়, অমনি বন্দুকধারী কয়েকজন প্রহরী তাহাদের পথরোধ করে, তাহাদিগকে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিতে আদেশ করে। বন্দীগণ মেষের পালের মতন জড়সড় হইয়া কোন্ কয়েদী পলায়ন করিয়াছে, তাহাই আলোচনা করে।

পলায়ন করিয়া কয়জন কয়েদী রক্ষা পায়? তখনি, না হয় কিছুদিন পরে, আবার ধরা পড়ে, পলায়নের অপরাধে শাস্তি বাড়িয়া যায়! কয়েদীদের নিজের কথা, জেলের ভিতর যেন পোষা পাখী, খাঁচা হইতে উড়িয়া গেলে যেন বাজ তাড়া করে। জেলের মধ্যে শুধু আটক, পলায়ন করিলে পিছন হইতে যেন বাঘ গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসে।

এই সকল নাম-হারা, নম্বরমারা বন্দীদের মধ্যে যাহার গলার চাক্‌তিতে ৩৫১ নম্বর খোদা সে যেন কি রকম কি রকম। তাহার বয়স হইয়াছে, কিন্তু যত বয়স, দেখিতে তাহার অপেক্ষাও বৃদ্ধ। শীর্ণ, ক্ষীণমূর্ত্তি, চক্ষের দৃষ্টি ভয়চকিত, সর্ব্বদাই যেন সঙ্কুচিত, সশঙ্কিত ভাব। মুখে বড়-একটা কথা নাই, কলের মতন ঘুরিয়া বেড়ায়, কলের মতন কাজ করে। কেহ ডাকিতেই তাড়াতাড়ি আসিয়া মাথা নীচু করিয়া দাঁড়ায়। শ্বাপদকুলের মধ্যে মেষ পড়িলে তাহার যেমন দশা হয় ইহার যেন সেই অবস্থা। কয়েদীদের অনেকেই দুর্ব্বৃত্ত, নির্ভীক, জেলের শাসনকে তৃণ জ্ঞান করে, নিজেদের মধ্যে আপন আপন দুষ্কর্ম্মের বড়াই করে, কারামুক্ত হইয়া আবার কি করিবে তাহার জল্পনা করে। তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই হাসি, সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ততা। ৩৫১ নম্বর যেন তাহাদের দলের কেহ নয়, যথাসাধ্য তাহাদের পাশ কাটায়, আলাদা নিত্য নির্দ্দিষ্ট কাজ করে। কোন কয়েদী তাহাকে কিছু আদেশ করিলে তাহাও করিত।

জেল হইবার পূর্ব্বে তাহার নাম ছিল কালীচরণ। লেখাপড়া জানিত না, গ্রামে কখন মোট বহিয়া, কখন চাষীর কাজ করিয়া কষ্টে দিনপাত করিত। উপার্জ্জনের লোভে সহরে গিয়াছিল। সহরের সব দেখিয়া অবাক হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এমন সময় একজন ভদ্রবেশী লোক তাহাকে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—কি হে তুমি এখানে নতুন এসেচ, না?

কালীচরণ নমস্কার করিয়া বলিল,—হাঁ, বাবুমশায়, আমি দেশ থেকে এই সবে এসেচি।

—চাকরী করবে?

—আজ্ঞে, চাকরীর জন্যই এখানে আসা।

—তবে আমার সঙ্গে এস।

কালীচরণ তাহার সঙ্গে গেল। একটা ছোট গলির

ভিতর একটি ছোট বাসাবাড়ী, আরও দুই-তিনজন লোক আছে, স্ত্রীলোক কেহ নাই। যে কালীচরণকে ডাকিয়া আনিয়াছিল সে বলিল,—দেখ, আমরা এই চারজন মেসে আছি, বেশী কাজকর্ম্ম নেই, তোমাকে খাওয়া পরা আর পাঁচ টাকা মাইনে দেব। কি বল ?

কালীচরণ যেন হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল। বাড়ীতে মাসে মাসে পাঁচ টাকা পাঠাইতে পারিলে আর ভাবনা কি ? ঘরে তাহার স্ত্রী আর একটি ছোট মেয়ে। স্ত্রী হাটের দিন লাউ, কুমড়া, পটল বেচিয়া কিছু পায়। ঘরে চরকায় সূতা কাটিয়া তাঁতিকে বিক্রয় করে, কুঁড়েঘরের পাশে ফালির মতন এতটুকু জমি তাহাতে ঝিঙ্গে, ধুঁতুল, লাউ, কুমড়া, লঙ্কা আজ্জায়, চাষীদের ধান কাটা হইলে ধানের বোঝা বহন করিয়া কিছু ধান পায়, ঢেঁশকেলে ঢেঁকিতে পাড় দিয়া কিছু চাল পায়, ডাল ভাঙিয়া মাসকলাইয়ের খোসা খুদ পায়। আহ্লাদে আটখানা হইয়া কালীচরণ বলিল,—যে আজ্ঞে, ঐ মাইনেই আমার কবুল।

কালীচরণের চাকরী হইল। মনিবেরা তাহাকে এক জোড়া কাপড় আর একখানা গামছা কিনিয়া দিল। সে বাড়ীর কাজকর্ম্ম করে, বাজার-হাট করে, ফাই-ফরমাস খাটে। সকাল বেলা বাজার করিবার সময় মেসের একজন বাবু তাহার সঙ্গে যায়, বাজারে ঢুকিতেই তাহার হাতে একখানা দশ টাকার নোট দিয়া বলে,—আলুর দোকানে এই নোট খানা ভাঙিয়ে তুমি বাজার কর ত, আমি একটা কাজ সেরে আসি। কালীচরণ নোট ভাঙাইয়া বাজার করে কিন্তু বাবুর আর দেখা নাই। বাজার করিয়া কালীচরণ বাড়ী ফিরিয়া যাইত। বাজারের পয়সা হইতে চুরী করা তাহাকে দিয়া হইত না, তার একটা পাড়াগেঁয়ে কুসংস্কার ছিল যে, মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, অধর্ম্মের পয়সা ভোগে আসে না।

বাবুরা রোজ এক বাজারে যাইত না, কালীচরণকে সাত বাজার ঘুরিতে হইত, আর প্রতিদিন তাহাকে একখানা নূতন খসখসে নোট ভাঙাইতে হইত। খুচরা টাকা চাহিলে বাবুরা বলিত, তাহাদের নিজের অন্য খরচ আছে, দশ টাকার কমে হয় না। বাবুরা পালা করিয়া কালীচরণের সঙ্গে যাইত, এক বাজার ছাড়িয়া অন্য বাজারে ঘুরিত, কিন্তু নোট ভাঙাইবার বেলা কালীচরণ একা, কোন বাবুর টিকিটি পর্য্যন্ত দেখা যাইত না।

কালীচরণের ক্রমে উন্নতি হইতে লাগিল। শুধু গায় নিতান্ত অসভ্য দেখায় বলিয়া বাবুরা তাহাকে পিরাণ কিনিয়া দিল, পায়ের জন্য পুরাতন জুতা দিল। সেই সঙ্গে বাজারের মাত্রাও বাড়িতে লাগিল। কোন দিন এক বাবু তাহার হাতে চারিখানা নোট গুঁজিয়া দিয়া, কাপড়ের দোকান দেখাইয়া দিয়া বলিত, 'কালীচরণ, দশ টাকা জোড়া দু-জোড়া লালপেড়ে আর দু-জোড়া কালা পেড়ে দেশী ধুতি কিনে তুমি এই সামনের মোড়ে গিয়ে দাঁড়াও আমি এই এলাম বলে।'

কালীচরণ কাপড় কিনিয়া মোড়ে আসিয়া দেখে বাবুর কোন চিহ্ন নাই। সে ধুতি কয়জোড়া বগল দাবা করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসে।

একদিন একটা দোকানে কালীচরণ বাবুর হুকুম-মত কতকগুলা জিনিষ খরিদ করিয়া পাঁচখানা নোট বাহির করিয়া দিল। বাবু তাহাকে বলিয়াছিল, একজনের সঙ্গে দেখা করে আমি এখনি আসচি।

দোকানদার নোট পাঁচখানা হাতে করিয়া কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া কহিল, 'দোকানে রেজকি নেই, আমি একখানা নোট ভাঙিয়ে আনি।

দোকানের পিছনে এক পোদ্দারের দোকান। দোকানদার পোদ্দারকে বলিল,—এ গুলো একবার দেখ দেখি, আমার যেন কি রকম, কি রকম ঠেক্‌চে।

পোদ্দার নোটগুলা হাতে করিয়া, উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া ঠাহর করিয়া দেখিল। বলিল,—এ জাল। বাজারে কিছুদিন থেকে জাল নোট চল্‌চে, শোন নি ?

—শুনেচি বই কি। তাই ত আমার সন্দ হ'ল।

দোকানদার দোকানে ফিরিল না। মোড়ে গিয়া পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া আনিল। কালীচরণের বাবু মোড়ের কাছে দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতেছিল। দোকানদার পাহারাওয়ালাকে সঙ্গে করিয়া দোকানে লইয়া যাইতেছে দেখিয়া বাবু একটা ট্যাক্সি ডাকিয়া ভোঁ করিয়া চলিয়া গেল।

কালীচরণ দোকানে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছে।

দোকানদারের সঙ্গে পাহারাওয়ালাকে দেখিয়া সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। পাহারাওয়ালা নোট কয়খানা দেখাইয়া কালীচরণকে জিজ্ঞাসা করিল,—এ নোট তুমি কোথায় পাইলে?

কালীচরণ বিস্মিত হইয়া কহিল,—আমি নোট কোথায় পাব? এ নোট বাবুর।

—বাবু কোথায়?

—বাবু একজনের সঙ্গে দেখা করে হয়ত ফিরে আসচে। মোড়ের গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

পাহারাওয়ালা, দোকানদার, কালীচরণ বাহিরে আসিয়া চারিদিকে অনেক খুঁজিল, বাবুর কোথাও দেখা পাওয়া গেল না। পাহারাওয়ালা কালীচরণকে গলাধাক্কা দিয়া, গালি দিয়া থানায় লইয়া গেল। দোকানদার থানায় গিয়া লিখাইল, কালীচরণ দোকানে একা আসিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কোন বাবু ছিল না।

পুলিশের লোক কালীচরণকে সঙ্গে করিয়া যখন বাবুদের বাসায় গেল তখন বাসা খালি, পাখী উড়িয়া গিয়াছে। ঘরগুলায় চারিদিকে তচনচ্ হইয়া আছে, যাহারা ছিল তাহাদের বড় তাড়া, বর্গীর ভয়ে যেমন ঘর-দুয়ার ছাড়িয়া লোকে পলায়ন করিত সেই রকম পলায়ন করিয়াছে।

দেখিয়া শুনিয়া ইন্সপেকটর বলিল,—এর সঙ্গে আরও লোক আছে, তারা সব ফেরার।

অনুসন্ধানে কালীচরণের যথার্থ পরিচয় পাইতে বিলম্ব হইল না। সে যেমন জানিত তাহাই বলিল, কিন্তু সে কতটুকু? সাক্ষীর বেলা বিশ পঁচিশ জন দোকানদার, মুদি, পসারী তাহাকে সনাক্ত করিল। সকলেই একবাক্যে বলিল, এ ব্যক্তি নোট ছাড়া কখন টাকা আনিত না, সব নতুন নোট, আর পরে জানা গেল সব জাল।

ইন্সপেক্টর কালীচরণকে জুতার ঠোক্কর মারিয়া বলিল,—শালা, ঝানু, বোকা সেজেচে।

দায়রার বিচারে কালীচরণের সাত বৎসর মেয়াদ হইল।

সেই যে পুলিশ কালীচরণকে ধরিয়া লইয়া গিয়াছিল সেই হইতে সে যেন কি রকম হইয়া গেল। থানায়, আদালতে, জেলে হাবা কালা জন্তুর মত হইয়া থাকিত, মুখে বড় একটা কথা নাই, চক্ষে শূন্যদৃষ্টি, কলের মত চলা-ফেরা করে, কলের মত খাটে। কাজে সে চটপটে কোনকালেই ছিল না, এখন যেন আরও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। অন্য কয়েদী যে কাজ দু ঘণ্টায় করে সে কাজ তাহার করিতে চার ঘণ্টা লাগে। দুই একবার জেলর তাহাকে শাস্তি দিল, কিন্তু বেত মারিতে ডাক্তার নিষেধ করিল, কারণ দেশের মেলেরিয়ায় তাহার শরীর খারাপ হইয়া গিয়াছিল। জেলর লক্ষ্য করিয়া দেখিল, ৩৫১ নম্বর কয়েদী কাজে ফাঁকি দেয় না, অলসও নয়, কিছু নিড়বিড়ে, কাজ করিতে সময় অধিক লাগে।

কাজ না থাকিলে কালীচরণ চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিত। চারিদিকে সেই চারিটা প্রাচীর, মাথার উপর সেই খানিকটা আকাশ। শব্দের মধ্যে কয়েদীদের পায়ের বেড়ীর শব্দ, জাঁতার ঘরঘরাণি, ওয়ার্ডারের ধমক, কয়েদীদের হাসি আর গল্প। এই প্রাচীর-বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ স্থানের বাহিরে আর কিছু আছে কি? বাহিরে কি লোকালয়, গ্রাম আছে, তাহার পাশে ধান ভরা ক্ষেত? পুকুরের পাড়ে কি মেয়েরা বাসন মাজে? মাজিবার সময় পিতলের চুড়ীতে কি ঠুনঠুন্ করিয়া শব্দ হয়? মাঠে কি ছেলেরা হাড়ুডুডু খেলা করে, বাঁশ গাছে বসিয়া কি ঘুঘু ডাকে? সন্ধ্যায় সময় সেই যে কে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া যাইত সে কি এখনও তেমনি গান করে? এই সব ভাসা ভাসা দিবাস্বপ্নের মধ্যে আর একটা স্বপ্ন যেন তাহার বুক চাপিয়া ধরিত। তাহার মেয়ে হিমী তাহার বড় নেওটা, সে কি বাপকে খোঁজ করে না? তাহার স্ত্রীর কেমন করিয়া চলে? ভাবিতে ভাবিতে তাহার দৃষ্টি আরও শূন্য হইয়া যায়, সূর্য্যের আলোক যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে নিভিয়া যায়।

আর একজন কয়েদী তাহার পাশে আসিয়া, তাহাকে আঙুলের খোঁচা দিয়া বলিল,—কি রে, কি ভাব্‌চিস্?

কালীচরণের একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িল, বলিল,—কি আর ভাব্‌ব?

—এই দেশের কথা?

—তাই ভাবচি।

—চিরকাল এইখানে পচে মর্‌বি? আমরা ক'জন পালাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি?

—কেমন করে?

—কেমন করে পালাতে হয় জানিস্ নে? পাচিল টপ্‌কে, আবার কেমন করে। জমাদার আস্‌চে, এখন আর কথা হবে না, রাত্রে বল্‌ব।

রাত্রে তাহারা ফিস্ ফিস্ করিয়া পলায়ন করিবার পরামর্শ করিতে লাগিল। কালীচরণকে লইয়া পাঁচজন। সব কথা শুনিয়া কালীচরণ বলিল,—তোরা যা, আমার পালাবার ক্ষমতা নেই।

একজন অন্ধকারে কালীচরণের গলা টিপিয়া ধরিল, বলিল,—সব কথা জেনে আমাদের ধরিয়ে দিবি, না? তোকে খুন করে আমরা ফাঁসি যাব।

গলা ছাড়িয়া দিলে কালীচরণ হাঁপাইয়া বলিল,—আমাকে দিয়া কোন কথা প্রকাশ হবে না, আমি যেন কোন কথা শুনিনি।

আর চারজন কয়েদী দিন-কতক পরে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু একজন তখনি প্রহরীর গুলিতে মরিল, বাকি তিনজন কিছুদিন পরে ধরা পড়িল। জেল হইতে পলায়ন করিবার অপরাধে তাহাদের আরও তিন বৎসর করিয়া কারাদণ্ড হইল, পায়ে দিনরাত বেড়ী, অপর কয়েদীদের সঙ্গে মিশিতে পাইত না।

বৎসর দুই জেলে কাটাইবার পর ৩৫১ নম্বর কয়েদী জেলরের কৃপাচক্ষে পড়িল। চোর ডাকাত বদমায়েস লইয়াই জেলে নিত্য কর্ম্ম, কিন্তু ৩৫১ নম্বর সে দলের নয়, ইহার সাজা হওয়া সম্বন্ধে একটা কিছু গলদ আছে। জেলর খাতা খুলিয়া মকদ্দমার সংক্ষিপ্ত নোট পড়িল। ৩৫১ নম্বরকে ডাকিয়া পাঠাইল। সে ঘরে আর কেহ ছিল না।

জেলর বলিল,—কালীচরণ!

কালীচরণ থতমত খাইয়া উত্তর দিতেই ভুলিয়া গেল। এতদিন পরে আবার তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকে! এখানে তো কাহারও নাম নাই, যে যার নাম জেলের ফটকের বাহিরে রাখিয়া আসে। তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতেই যেন জেলের প্রাচীরের ইটের গাঁথনি কোথায় মিলাইয়া গেল, যেন আনন্দ কোলাহলপূর্ণ মুক্ত সংসার তাহার মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হইল, কারাগারের বন্ধন টুটিয়া গেল।

জেলর আবার ডাকিল,—কালীচরণ!

কালীচরণ চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—হুজুর, আমার কসুর মাপ হয়, কেমন অন্যমনস্ক হয়েছিলাম।

জেলরের চক্ষু কোমল, মুখে অল্প হাসি। যে ভ্রূকুটি ও গর্জ্জনে কয়েদীদের প্রাণ শুকাইত তাহার কোন চিহ্ন নাই। জেলর বলিল,—জাল নোট ভাঙাইবার জন্য তোমার সাজা হইয়াছিল?

—হাঁ, হুজুর।

—অনেক দোকানে ভাঙাইতে?

—হাঁ, হুজুর।

—তুমি জানিতে সেগুলা জাল নোট?

—না, হুজুর।

—আসল আর জাল নোট চিন্‌তে পার?

—না হুজুর, আমি মুখ্‌খু মানুষ।

—নোট তুমি কোথায় পেতে?

—যে বাবুদের কাছে চাকরী করতাম তারা ভাঙাতে দিত।

—তারা কোথায়?

—তারা পালিয়ে গিয়েচে।

জেলর খানিকক্ষণ কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর কহিল,—আচ্ছা, এখন তুমি যাও।

কালীচরণ নিজের কাজে চলিয়া গেল। সেই দিন হইতে জেলরের আদেশ-মত কালীচরণকে কোন কঠিন কাজে নিযুক্ত করা হইত না। আরও কিছুদিন পরে কালীচরণ ওয়ার্ডার হইল। কয়েদীরা সকলে দেখিল, জেলর কালীচরণকে অনুগ্রহ করে, তাহাকে কোন রকম শাসন করে না, কখনো দুর্ব্বাক্য বলে না, অনেক সময় নিজের আপিস ঘরে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া কথাবার্ত্তা কয়।

একা থাকিলেই কালীচরণ অন্যমনস্ক হইত। জেলের বাহিরে মুক্ত সংসার কি রকম দেখিতে তাহা কল্পনা করিবার চেষ্টা করিত। এক এক সময় পূর্ব্বকথা স্বপ্ন মনে হইত, এই কারাগারই যেন বাস্তব, আর সব মিথ্যা।

গ্রামের কথা যেন বহুকালের বাল্য-স্বপ্ন, মায়াপুরের ইন্দ্রজাল। সত্য সত্যই কি এমন স্থান থাকিতে পারে? এমন মুক্ত আকাশ, এমন মধুর বাতাস, আম বাগানে এমন বিহঙ্গকাকলী? শিশুদের ভাঙা ভাঙা কথা, বৃদ্ধদের আগেকার কালের কথা, কালীচরণ কখনও কি শুনিয়াছিল? শীতকালে মাথার উপর দিয়া হাঁসের দল উড়িয়া যাইত, নদীর মাঝখানে বালুকার চরে বসিয়া বুনো হাঁস রৌদ্র পোহাইত, মাল-বোঝাই-করা নৌকা ভাসিয়া যাইত, মাঝি হাল ধরিয়া আপনার মনে গান গাহিত। গ্রামে রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির সময় কি রকম কাঁসর ঘণ্টা বাজে! সহরের কথা একটা দারুণ দুঃস্বপ্নের ন্যায় মনে হইত, সবই যেন জাল, সবই প্রবঞ্চনা, মানুষ মানুষের শত্রু। সে কথা মনে হইলে তাহার বুকের ভিতর কাঁপিয়া উঠিত।

একদিন সন্ধ্যার পর কয়েকজন নূতন কয়েদী আসিল। অপর কয়েদীরা তখন শয়ন করিতে গিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া কালীচরণ জেলরের আপিসে গেল। সেখানে সে নিত্য টেবিল ঝাড়িয়া, ঘর ঝাঁট দিয়া ঘর পরিষ্কার করিত, জেলর আসিলে পর অপর কাজে যাইত। কাজ তাহাকে বিশেষ কিছু করিতে হইত না, অন্য কয়েদীদের কাজ দেখিত। ধমক-ধামক বড় একটা দিত না।

কালীচরণ দেখিল তেলের ঘানিতে দুইজন নূতন কয়েদী ঘানি টানিতেছে। তাহাদিগকে দেখিয়া কালীচরণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। তাহার চক্ষু স্থির হইল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইল। কয়েদী দুইজনের গলার চাক্‌তিতে নম্বর ৪০৫ আর ৪০৬। কয়েদী দুইজন কালীচরণকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল। একজন বলিল,—এই যে কালীচরণ! তোমাকে অনেক দিন দেখতে না পেয়ে আমাদের মন কেমন কর্‌ছিল, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেচি।

কালীচরণ নিস্পন্দ, একটি কথাও কহিতে পারিল না। অজগরের চক্ষে পড়িলে পাখী যেমন আড়ষ্ট হইয়া যায়, কালীচরণ সেই রকম আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

দ্বিতীয় নূতন কয়েদী হাসিয়া সুর করিয়া কহিল,—চিরদিন কখনও সমান না যায়, কখনও বাবুয়ানা, কখনও ঘানিটানা।

কালীচরণ প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, এমন সময় জেলর আসিয়া উপস্থিত। সে তীক্ষ্ণকটাক্ষে একবার কালীচরণের দিকে আর একবার নূতন কয়েদীদের দিকে চাহিয়া দেখিল। কালীচরণকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এদের চেন?

—হাঁ, হুজুর।

—কে এরা?

—যে বাবুদের কাছে আমি চাকরী করতাম আর যারা আমাকে নোট ভাঙাতে দিত তাদের মধ্যে এই দু' জন।

জেলরের ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া চক্ষু ছুঁচের মত হইল। কয়েদী দুইজনকে যেন চক্ষের দৃষ্টিতে বিদ্ধ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল, তোমরা এই নিরপরাধী ব্যক্তিকে ফাঁসাইয়াছিলে?

পুরাতন কয়েদীরা জানিত যে, জেলরের তর্জ্জন-গর্জ্জনকে যত না ভয়, সে চিবাইয়া চিবাইয়া মৃদু মৃদু কথা কহিলে তাহার অপেক্ষা অধিক ভয়। এই দুইজন কয়েদী সবে শ্রীঘরে শুভাগমন করিয়াছে, তাহারা সে কথা কেমন করিয়া জানিবে? একজন দাঁত বাহির করিয়া রহস্য করিয়া বলিল,—এমন হয়েই থাকে, উদোর বোঝা অনেক সময় বুদোর ঘাড়ে পড়ে।

জেলর আরও মৃদুস্বরে বলিল,—নরকে যাবার আগেই নরক কাকে বলে তোমরা জান্‌তে পারবে।

জেলর চলিয়া গেল, কালীচরণও সেই সঙ্গে গেল।

৪০৫ আর ৪০৬ কয়েদীর নরক-যন্ত্রণা আরম্ভ হইতে বড় বিলম্ব হইল না। তাহারা জাল নোট তৈরী করা ছাড়া কখন কোন পরিশ্রম করে নাই, কখন কাহারও আদেশে কোন কর্ম্ম করে নাই, কখন কোনরূপ ক্লেশ স্বীকার করে নাই। জেলের কদন্ন আহার করিতে তাহাদের রুচি হইত না, জেলের কঠোর শাসনে তাহাদের রাগ হইত। তাহার উপর হাড়ভাঙা পরিশ্রম আর জেলরের তীব্র দৃষ্টি। জেলর যখন-তখন আসিয়া তাহাদের কাজ দেখিত, অলস বলিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিত। পাঁচ সাতদিন যাইতেই একদিন কয়েদী দুইজন জেলরের

মুখের উপর জবাব করিল। জেলরও তাহাই চায়। প্রত্যেক কয়েদীকে ত্রিশ ঘা বেতের আদেশ হইল।

ডাক্তার আসিয়া কয়েদী দুইজনকে দেখিল। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট নীরোগ শরীর, ডাক্তার বেত মারিতে অনুমতি দিল।

জেলর কালীচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইল। ৪০৫ নম্বর কয়েদীর কাপড় খুলিয়া তাহাকে ত্রিকোণ কাঠের ফ্রেমে বাঁধিবার উদ্যোগ করিতেছে। পাশে দশ বার গাছা আটি বাঁধা লম্বা বেত পড়িয়া রহিয়াছে। জেলর কালীচরণকে বলিল,—তুমি ইহাকে বেত মার।

কালীচরণের মুখ শুকাইয়া গেল, তাহার চক্ষু কপালে উঠিল। সে ঢোক গিলিয়া বলিল,—হুজুর, আমি পারব না।

জেলর গর্জ্জন করিয়া উঠিল,—কী! আমার হুকুম শুনবে না?

—হুজুর, হুকুম শোনাই ত আমার কাজ, কিন্তু ওকে আমি বেত মারতে পারব না।

—হুকুম না মানলে তোমাকে বেত খেতে হবে।

—তাই খাব হুজুর, বলিয়া কালীচরণ গায়ের জামা খুলিতে লাগিল।

জেলর হাত তুলিয়া তাহাকে নিষেধ করিল। ঠোঁট কামড়াইয়া বলিল,—আচ্ছা, তোমাকে মারতে হবে না, তুমি এইখানে দাঁড়িয়ে থাক।

কালীচরণ দাঁড়াইয়া রহিল।

জেলর আর একজন বলবান কয়েদীকে বেত মারিতে আদেশ করিল। ৪০৫ নম্বর কয়েদী প্রথম কয়েক ঘা বেত খাইয়া আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহার পর শুধু গোঙানি। ৪০৬ দাঁড়াইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল। কালীচরণ মুখ ফিরাইল। দুইজনকে বেত মারা হইলে পর জেলর কালীচরণকে ডাকিয়া নিজের ঘরে লইয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিল,—ঐ দু জনের জন্য তোমার জেল হয়েচে, তুমি ওদের বেত মারতে অস্বীকার করলে কেন?

—হুজুর, আমার যা হবার তা হয়েচে। ওদের মেরে আমি ত আর জেল থেকে খালাস পাব না। ওরা অধর্ম্ম করেচে, তেমনি সাজাও পেয়েচে। আমি ওদের গায় হাত তুললে আমার পাপ হবে।

জেলর কালীচরণের মুখের দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ ভাবিল। কালীচরণ মূর্খ, অশিক্ষিত, অকারণে বন্দী হইয়াছে, অথচ যাহারা তাহাকে এরূপ বিপদে ফেলিয়াছে তাহাদের প্রতি ক্রোধ নাই, প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি নাই। জেলর কালীচরণের কাঁধে হাত দিয়া বলিল,—তুমি যদি তোমার শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতে চাও তা হলে আমি আর তাঁদের পীড়ন করব না।

কালীচরণ বলিল,—হাঁ হুজুর, সেই ভাল। মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন তিনি বিচার করবেন। অধর্ম্ম সইবে কেন?

৪০৫ আর ৪০৬ নম্বর কয়েদী সারিয়া উঠিয়া আবার যখন কাজ করিতে আরম্ভ করিল, সেই সময় জেলর একদিন তাহাদিগকে বলিল, আমি তোমাদের আচ্ছা করে জব্দ করতাম, কালীচরণের জন্য তোমরা রক্ষা পেলে। সে তোমাদের পিঠে নিজে বেত মারেনি, এখনও তোমাদের দয়া করে। যদি আবার সাজা পেতে না চাও তা হ'লে কালীচরণকে খুসি রাখবে।

সেই দিন হইতে এই দুইজন কয়েদী কালীচরণের খোসামোদ করিত।

জেলর ইহাতেই ক্ষান্ত হইল না। কয়েদী দুইজনকে দিয়া কালীচরণের সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনা লিখাইল। তাহারা স্বীকার করিল,কালীচরণ সম্পূর্ণ নিরপরাধী, যে-সকল নোট তাহাকে ভাঙাইতে দেওয়া হইত সেগুলা যে জাল তাহা তাহার জানিবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে সবে গ্রাম হইতে আসিয়াছিল, দরিদ্র, নিরক্ষর, নোট কখন চক্ষে দেখিয়াছিল কি না তাহাই সন্দেহ। সেই সঙ্গে জেলর লিখিল, কালীচরণের স্বভাব-চরিত্র সে উত্তমরূপে লক্ষ্য করিয়াছিল। সে নিরীহ, ভালমানুষ, কিছুই জানে না, তাহাকে যে-কেহ স্বচ্ছন্দে ঠকাইতে পারে।

কালীচরণের মুক্তির জন্য জেলর যে সময় লিখিতে আরম্ভ করিল তখন কারাবাস পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ছয় মাসে নয় মাসে কখন কালীচরণের নামে একখানা চিঠি আসিত। তাহার স্ত্রী গ্রামের কাহাকেও

দিয়া লিখাইত। জেলর কালীচরণকে পড়াইয়া শুনাইত, উত্তরও সে লিখিয়া দিত। এই সময় পত্র আসিল কালীচরণের কন্যা বসন্ত রোগে মারা পড়িয়াছে। কালীচরণ বজ্রাহতের ন্যায় বসিয়া পড়িল। জেলর তাহাকে দুই চারিটা সান্ত্বনাবাক্য বলিল। কালীচরণের চক্ষে জল পড়িল না, শূন্য, শুষ্ক, উত্তপ্ত চক্ষে চাহিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের কোমল সরসতা, অশ্রুর উৎস যেন দগ্ধ হইয়া গেল। ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ইহার পূর্ব্বেও কালীচরণ অধিক কথা কহিত না, অপর কয়েদীদের সঙ্গে বড়-একটা গল্প-গুজব করিত না, কিন্তু এই বিপদের পর সে যেন মূকের মত হইয়া গেল, তাহার মুখে কথা শুনিতেই পাওয়া যাইত না। কেহ কিছু বলিলে একটা কথার উত্তর দিত বা সেখান হইতে চলিয়া যাইত। কাজ যেটুকু করিতে হয় করিত, কিন্তু কাজে অমনোযোগী হইলে জেলর তাহাকে কিছু বলিত না।

কয়েক মাস পরে একদিন জেলর তাহাকে ডাকিয়া বলিল, কালীচরণ, আমার কাছে পত্র আসিয়াছে যে তোমার মকদ্দমার সমস্ত কাগজ সরকার হইতে তলব হইয়াছে। বোধ হয় শীঘ্রই তোমার খালাসের হুকুম হইবে। কালীচরণের মুখে আনন্দের কোন চিহ্ন নাই। কহিল,—হুজুর, আমার এখন সব জায়গায়ই সমান।

এক সপ্তাহ পরে কালীচরণের গ্রাম হইতে পত্র আসিল যে সর্পাঘাতে তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছে। এ সংবাদেও তাহার চক্ষে জল আসিল না। সে পাষাণ মূর্ত্তির মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

আরও একমাস কাটিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় জেলর কালীচরণকে বলিল,—তোমার খালাসের হুকুম হয়েচে, কাল সকালে তুমি খালাস পাবে।

কালীচরণ বলিল,—হুজুর, আমি কোথায় যাব? আমার ত যাবার কোথাও জায়গা নেই।

জেলর দুঃখ প্রকাশ করিল, কহিল,—তোমার যে বিপদ হয়েচে তার তো কোন উপায় নাই। বাড়ী গিয়ে ভগবানকে ডেকো।

—তিনি তো এখানেও আছেন।

পর দিবস প্রাতঃকালে কালীচরণের মুক্তি হইল। কাজের হিসাবে কিছু সামান্য টাকা তাহার পাওনা ছিল, সেই সঙ্গে জেলর আর পাঁচটি টাকা দিল।

জেলের প্রকাণ্ড ফটক পার হইয়া কালীচরণ বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আকাশপ্রান্তে মাঠের মাঝখান দিয়া সূর্য্যোদয় হইতেছে। সম্মুখে রাজপথ, পথের দুইধারে বড় বড় অশ্বত্থ ও বট গাছ, গাছে পাখীর কোলাহল, প্রভাত-বায়ুতে বৃক্ষপত্রে মর্ম্মর শব্দ। দূরে ধানের ক্ষেতে ধান পাকিয়াছে, ধানের শীষ রাশি রাশি স্বর্ণশলাকার ন্যায় ক্ষেত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।

অন্ধকারে ঘরের দেয়াল যেমন মাথায় লাগে, প্রভাত-আলোকে মুক্ত আকাশ যেন সেই রকম কালীচরণের মাথায় লাগিল। তাহার হাঁপ ধরিল, বৃহৎ সংসার-অরণ্যে দিশেহারা হইয়া পড়িল। সে কোথায় যাইবে? তাহার গন্তব্য স্থান কোথায়? কে তাহার পথ চাহিয়া আছে? সে কাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইবে? কারাগারের চারিটা প্রাচীরের গণ্ডী বরং ছিল ভাল। সংসার যে বৃহৎ কারাগার, ইহাতে পথহারা হইয়া ঘুরিতে হয়। এ মেয়াদ কবে ফুরাইবে, এ কারাগার হইতে কবে মুক্তি হইবে?

প্রেম ও জীবন

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

('চপল প্রেম, থির জীবন দুরন্ত'—গোবিন্দদাস।)

আজ রাতে ঘুম নাই, ফাল্গুনের দোল-পূর্ণিমা যে!
রজনী পরেছে শাড়ী নীলাম্বরী জ্যোৎস্না-বারাণসী,
দু'চারি তারার কুঁড়ি জড়াইয়া ওড়নার ভাঁজে,
কালো সে শাড়ীর পাড় লুটায়েছে বনান্ত পরশি'।
নয়নে লেগেছে আজ অবনীর বৃন্দাবনী মায়া,
যে জীবন-যৌবনের ক্ষয় নাই, খেদ নাহি যা'য়—
হাসি অশ্রু দুই-ই এক, একই শোভা—গোলাপে শিশির,
—আজিকার আলো আর ছায়া
মিলায় মধুর করি' তারি রস প্রাণের সীমায়,
জীবন-বসন্ত শেষ, শেষ নাই পূর্ণিমা-নিশির!

২

ভেসে আসে হাহা-হাসি রহি' রহি,' গীতবাদ্য রোল—
জনপদ-যুবজন মাতিয়াছে মদন-উৎসবে;
সে শব্দ-তরঙ্গ যেন দূর হ'তে হানিছে হিল্লোল
হেথাকার স্তব্ধ তটে, রাত্রি ওঠে রোমাঞ্চিয়া নভে!
জীবনের জয়গাথা গাহে মুগ্ধ মৃত্যুভয়হীন
অধীর যৌবন-মদে; রাধা শ্যামে আজি হোরী খেলা—
বনে বনে শীর্ণ শাখা শ্যাম-রূপে উঠিছে শিহরি,'
মরণের বদন মলিন!—
জরা কেহ মানিবে না, আজ সমবয়সীর মেলা—
পল্লীপথে হুলাহুলি, উথলিছে পুলক-লহরী!

৩

রজনী গভীর হ'ল; এ নির্জ্জন নিরালা কুটীরে
একা জাগি, সমুখে সে যতদূর দৃষ্টি মোর ধায়—
জ্যোৎস্নাম্বরা তৃণভূমি, মাঝে মাঝে শ্বসিছে সমীরে
তন্দ্রাহত ছায়া-তরু, দূরে দূরে প্রহরীর প্রায়।
চাহিনু আকাশ পানে, মনে হ'ল এ-কোন্ স্বপন
রচিছে নিশুতি-রাতি?—হোলি খেলা পলকে হারাই!
রাধার ফাগের থারি কোথা গেল, কে লইল হরি'?—
শূন্য করি' সারা বৃন্দাবন
শ্যামরূপহ্রদে বুঝি ডুবিয়াছে উন্মাদিনী রাই—
নীল জলে জলে রূপ, ভেসে ওঠে সোনার গাগরী!

৪

ঢুলে আসে আঁখিপাতা, যামিনীর মায়া-যবনিকা
খুলে' গেল ক্ষণতরে, ঘনতর অন্ধকারে ঘেরি'
ভুলাইল দেশ-কাল; নিমীলিত নেত্র-কনীনিকা
স্ফুরিল অরূপ-রসে, নেপথ্যের নাট্যশালা হেরি'!
ভুলে গেনু নীলাকাশে হেম-কান্ত কৌস্তভ-আভাস—
শ্যাম-দেহে লীনাঙ্গিনী রাধিকার বরণ-মাধুরী;
মনে হ'ল, ঊর্দ্ধে ওই অকম্পিত চন্দ্রাতপ-তলে
—স্তব্ধ যেথা নিশার নিঃশ্বাস,
যেন কারা মেলিয়াছে অভিজ্ঞান-তারকা-অঙ্গুরী
অতীতের, মৃত্যুর ময়ূরকণ্ঠী উত্তরীয় গলে!

৫

সহসা পশিল কানে শতাব্দীর সঙ্গীত-মর্ম্মর—
আলোকের কুঞ্জে কুঞ্জে জাগিল কি শত পিকরব!
শুনিনু গাহিছে গাথা—পুরাতন ব্যথার নির্ঝর—
চিরযুগজীবী কবি, বাঙ্গালার বাউল-বৈষ্ণব।
সেই সুর!—যার রসে যুগযুগ গোঙাইল কাঁদি'
জীবন-পূর্ণিমানিশি, হেরি' রূপ মনোহারিকার
'নয়ন না তিরপিত', ঘুচিল না সুচির বিরহ—
বক্ষে চাপি, বাহুপাশে বাঁধি'!
সেই সুর!—ভাষা যার বাণী-কণ্ঠে গজমোতিহার—
'প্রেম সে চপল, থির এ জীবন দুরন্ত অসহ'!

৬

সেই রূপ, সেই প্রেম, সেই নীল-লাবণ্য-লালসে
মূর্চ্ছি' আছে চরাচর—ভালো নহে শুধু ভালোবাসা !
সে সুধা-সাগর-বারি উছলিছে যাহার কলসে—
ধরণীর এই ঘাটে বুঝি তার নাই যাওয়া-আসা !
এমন পূর্ণিমা-রাতে মৃত্যু বুঝি বার্ত্তা বহি' আনে
জীবনের বাতায়নে—ফুটিয়াছে স্বপন-দুর্ল্লভ
সুন্দরের পারিজাত কোন বনে, কোন নদীপার !
—শুনি' পুন সঙ্গিনীর পানে
চায় যবে, জ্বালা করে বল্লভের নয়ন-পল্লব,
পিরীতির খর-তাপে ফোটে রূপ মৃগতৃষ্ণিকার !

৭

হে চির-যৌবন কবি ! লভিয়াছ অমর-জীবন
কবিতার কল্পলোকে, নাই সেথা জরা, মৃত্যু-ভয় ;
প্রেমের বৈকুণ্ঠপুরে আজও তাই পূর্ণিমা-যাপন
কর সবে,—কীর্ত্তনের সুরে শুনি সুন্দরের জয় !
যে রূপের পিপাসায় প্রেম হ'ল জীবন-অধিক,
একদিন এই পথে তার নেশা ঘুচে নাই, কবি ?
রাতি-শেষে এই শশী ডুবে নাই দিক্‌চক্রবালে ?
সশরীর হে স্বর্গ-পথিক !
পশ্চাতে চাহ নি কভু ? আর কারো ম্লান মুখচ্ছবি
তব দেহচ্ছায়াতুর, দেখ নাই অপরাহ্ণ-কালে ?

৮

সেই কথা জাগে মনে, তবু হায় পারি না ভুলিতে—
প্রেম যে চপল বটে, এ জীবন আরও যে চপল !
যৌবন-বসন্তশেষে ফাগুনের সে ফুল তুলিতে
হেরি সবই রঙ্-ছুট, প্রেমেরও যে মিনতি বিফল !
তবু জানি, মধুমাসে এই দেহ মাধবী-বল্লরী
মুঞ্জরিয়া উঠেছিল পরিমল-পরাগ-রভসে,—
শেষে রচি ঝরাফুলে মৃত্তিকার মঞ্জু আভরণ !
বৃন্দাবন চির পরিহরি'
গেছে শ্যাম, ব্রজভূমি পূত তবু সে পদ-পরশে,
কালিন্দীর কূল ছাড়ি' রাধিকার চলে না চরণ !

৯

আজি এই রজনীর রূপমধু-পিয়াসে বিহ্বল
মরণেরে মনে হয় রমণীয়, মদির-মধুর !
শুনি যেন সমীরণে মৃদুশ্বাস স্বনিছে কেবল—
হায় প্রেম ক্ষণ-প্রভা, এ জীবন আঁধার-বিধুর !
জীবনের চেয়ে ভালো সে প্রেমের ক্ষণিক পুলক,
অচেতন হয়ে ডুবি সুপ্তিহীন স্বপ্ন-রসাতলে।
হেনকালে ওই শুন—মর্ম্মভেদী এ কি পরিহাস !—
বৃক্ষশাখে ডাকিছে তক্ষক !
জীবনের মত প্রেম উবে যায় যাদুমন্ত্র-বলে,
ভাসে শুধু এক সুর—সুখহীন, একান্ত উদাস।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

৯

বৎসর দুই কোথা দিয়া কাটিয়া গেল।

অপু ক্রমেই বড় জড়াইয়া পড়িয়াছে, খরচে আয়ে কিছুতেই আর কুলাইতে পারে না। নানাদিকে দেনা—কত ভাবে হুঁসিয়ার হইয়াও কিছু হয় না। এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া দুই বেলা খাইল, নিজে সাবান দিয়া কাপড় কাচিল, লজ্ঞেঞ্চুস্ ভুলিয়া গেল, কিন্তু হঠাৎ একদিন নব-আগন্তুক এক হিন্দুস্থানী হালুইকরের নতুন দোকানে তাহার পকেট হইতে সদ্যপ্রাপ্ত স্কলারশিপের টাকার যে অংশ উড়িয়া গেল—তাহার ভোজ-তৃপ্ত, প্রফুল্লমুখ বন্ধুদলের নিকট তাহা যতই সামান্য বলিয়া মনে হউক্ না কেন, তাহার নিজের পক্ষে সেটা আদৌ উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না।

পরদিনই আবার বোর্ডিংয়ে ছেলেদের দল চাঁদা করিয়া হালুয়া খাইবে।

অপু হাসিমুখে সমীরকে বলিল—দু আনা ধার দিবি সমীর, হালুয়া খাবো ?···দু আনা কোরে চাঁদা—ওই ওরা ওখানে করচে—কিস্‌মিস্ দিয়ে বেশ ভাল কোরে কোর্‌চে—

সমীরের কাছে অপুর দেনা অনেক। সমীর পয়সা দিল না।

প্রতি বার বাড়ী হইতে আসিবার সময় সে মায়ের যৎসামান্য আয় হইতে টাকাটা আধুলিটা প্রায়ই চাহিয়া আনে—মা না দিতে চাহিলে রাগ করে, অভিমান করে, সর্ব্বজয়াকে দিতেই হয়।

ইহার মধ্যে আবার পটু মাঝে মাঝে আসিয়া ভাগ বসাইয়া থাকে। সে কিছুই সুবিধা করিতে পারে নাই পড়াশুনার। নানাস্থানে ঘুরিয়াছে, ভগ্নীপতি অর্জ্জুন চক্রবর্ত্তী তো তাহাকে বাড়ী ঢুকিতে দেয় না, বিনিকে এ সব লইয়া কম গঞ্জনা সহ্য করিতে হয় নাই বা কম চোখের জল ফেলিতে হয় নাই; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পটু নিরাশ্রয় ও নিরালম্ব অবস্থায় পথে পথেই ঘোরে, যদিও পড়াশুনার আশা সে এখনও অবধি ছাড়ে নাই। অপু তাহার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছে, কিছু সুবিধা করিতে পারে নাই। দু তিন মাস হয়ত দেখা নাই, হঠাৎ একদিন কোথা হইতে পুঁটুলি বগলে করিয়া পটু আসিয়া হাজির হয়, অপু তাহাকে যত্ন করিয়া রাখে, তিন চারদিন ছাড়ে না, সে না চাহিলেও যখন যাহা পারে তাহার হাতে গুঁজিয়া দেয়—টাকা পারে না, সিকিটা, দুয়ানিটা। পটু নিশ্চিন্দিপুরে আর যায় না—তাহার বাবা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন—সৎমা দেশের বাড়ীতে তাঁহার দুই মেয়ে লইয়া থাকেন, সেখানে ভাইবোন্ কেহই আর যায় না। পটুকে দেখিলে অপুর ভারী একটা সহানুভূতি হয়, কিন্তু ভাল করিবার তাহার হাতে আর কি ক্ষমতা আছে ?

পৌষ মাসের প্রথমে অপুর নিজের একটু সুবিধা ঘটিল। নতুন ডেপুটীবাবুর বাসাতে ছেলেদের জন্য একজন পড়াইবার লোক চাই। হেড্‌পণ্ডিত তাহাকে ঠিক করিয়া দিলেন। দুটি ছেলে পড়ানো, থাকা ও খাওয়া।

দুই তিন দিনের মধ্যেই বোর্ডিং হইতে বাসা উঠাইয়া অপু সেখানে গেল। বোর্ডিংয়ে অনেক বাকী পড়িয়াছে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তলে তলে হেডমাষ্টারের কাছে এসব কথা রিপোর্ট করিয়াছেন, যদিও অপু তাহা জানে না।

বাহিরের ঘরে থাকিবার জায়গা স্থির হইল। বিছানা-পত্র গুছাইয়া পাতিয়া লইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার পরে খানিকটা বেড়াইয়া আসিয়া রাঁধুনী ঠাকুরের ডাকে বাড়ার মধ্যে খাইতে গেল। দালানে ঘাড় গুঁজিয়া খাইতে খাইতে তাহার মনে হইল একজন কে পাশের দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ

হইতে তাহার খাওয়া দেখিতেছেন। একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিতে তিনি সরিয়া আসিলেন। খুব সুন্দরী মহিলা, তাহার মায়ের অপেক্ষা বয়স অনেক—অনেক কম। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার বাড়ী কোথায় ?

অপু ঘাড় না তুলিয়া বলিল—মনসাপোতা—অনেক দূর এখেন থেকে—

—বাড়ীতে কে কে আছেন ?

—শুধু মা আছেন, আর কেউ না।

—তোমার বাবা বুঝি—ভাইবোন ক'টি তোমরা ?

—এখন আমি একা—আমার দিদি ছিল—সে সাত আট বছর হ'ল মারা গিয়েচে—

কোনো রকমে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারিয়া সে উঠিয়া আসিল। শীতকালেও সে যেন ঘামিয়া উঠিয়াছে !

পরদিন সকালে অপু বাড়ীর ভিতর হইতে খাইয়া আসিয়া দেখিল বছর তেরো বয়সের একটি সুন্দরী মেয়ে ছোট্ট একটি খোকার হাত ধরিয়া বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া আছে। অপু বুঝিল সে কাল রাত্রের পরিচিতা মহিলাটির মেয়ে। অপু আপন মনে বই গুছাইয়া স্কুলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল, মেয়েটি একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছিল। হঠাৎ অপুর ইচ্ছা হইল, এ মেয়েটির সামনে কিছু পৌরুষ দেখাইবে—কেহ তাহাকে বলিয়া দেয় নাই, শিখায় নাই, আপনা আপনি তাহার মনে হইল। হাতের কাছে অন্য কিছু না পাইয়া সে নিজের অঙ্কের ইন্‌ষ্ট্রুমেণ্ট বাক্সটা বিনা কারণে খুলিয়া প্রোটেক্টর, সেট্‌স্কোয়ার, কম্পাসগুলোকে বিছানার উপর ছড়াইয়া ফেলিয়া পুনরায় সেগুলা বাক্সে সাজাইতে লাগিল। কি জানি কেন অপুর মনে হইল এই ব্যাপারেই তাহার চরম পৌরুষ দেখান হইবে। মেয়েটি দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, কোনো কথা বলিল না। কেহই কোনো কথা বলিল না।

আলাপ হইল সেদিন সন্ধ্যায়। সে স্কুল হইতে আসিয়া সবে দাঁড়াইয়াছে, মেয়েটি আসিয়া লাজুক চোখে বলিল—আপনাকে মা খাবার খেতে ডাকচেন

আসন পাতা,—পরোটা বেগুন ভাজা, আলু চচ্চড়ি, চিনি। অপু চিনি পছন্দ করে না, গুড়ের মত জিনিস নাই, কেন যে ইহারা এমন সুন্দর গরম গরম পরোটা চিনি দিয়া খায় ?···

মেয়েটি কাছে দাঁড়াইয়াছিল। বলিল—মাকে বল্‌ব আর দিতে ?···

—না; তোমরা চিনি খাও কেন ?···গুড় তো ভাল—

মেয়েটি বিস্মিতমুখে বলিল—কেন, আপনি চিনি খান না ?···

—ভালবাসিনে—রুগীর খাবার—খেজুরের গুড়ের মত কি আর খেতে ভাল ?···মেয়েটির সামনে তাহার আদৌ লাজুকতা ছিল না, কিন্তু এই সময়ে মহিলাটি ঘরে ঢোকাতে অপুর লম্বা লম্বা কথা বন্ধ হইয়া গেল। মহিলাটি বলিলেন—ওকে দাদা বলে ডাক্‌বি নির্ম্মলা, কাছে বসে খাওয়াতে হবে রোজ। ও দেখছি যে রকম লাজুক, এ পর্য্যন্ত তো আমার সঙ্গে একটা কথাও বল্লে না—না দেখলে ও আধ-পেটা খেয়ে উঠে যাবে।

অপু লজ্জিত হইল। মনে মনে ভাবিল ইঁহাকে সে মা বলিয়া ডাকিবে। কিন্তু লজ্জায় পারিল না, সুযোগ কোথায় ?···এমনি থামকা মা বলিয়া ডাকা—সে বড়—সে তাহা পারিবে না।

মাস খানেক ইঁহাদের বাড়ী থাকিতে থাকিতে অপুর কতকগুলি নতুন বিষয়ে জ্ঞান হইল। সবাই ভারী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, আটপৌরে পোষাক পরিচ্ছদও সুদৃশ্য ও সুরুচিসম্মত। মেয়েদের শাড়ী পরিবার ধরণটি বেশ লাগে, একে সবাই দেখিতে সুশ্রী, তাহার উপর সুদৃশ্য শাড়ী সেমিজে আরও সুন্দর দেখায়। এই জিনিষটা অপু কখনও জানিত না, বড়লোকের বাড়ী থাকিবার সময়ও নহে, কারণ সেখানে ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বরে তাহার অনভ্যস্ত চক্ষু ধাঁধিয়া গিয়াছিল—সহজ গৃহস্থ জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারের পর্য্যায়ে তাহাকে সে ফেলিতে পারে নাই।

অপু যে সমাজে, যে আবহাওয়ায় মানুষ—সেখানকার কেহ এ ধরণের সহজ সৌন্দর্য্যময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত নয়। নানা জায়গায় বেড়াইয়া নানা ধরণের

লোকের সঙ্গে মিশিয়া তাহার আজকাল চোখ ফুটিয়াছে, সে আজকাল বুঝিতে পারে নিশ্চিন্দিপুরে তাহার গৃহস্থালী ছিল দরিদ্রের, অতি দরিদ্রের গৃহস্থালী। শিল্প নয়, শ্রী ছাঁদ নয়, সৌন্দর্য্য নয়, শুধু খাওয়া আর থাকা।

নির্ম্মলা আসিয়া কাছে বসিল। অপু অ্যালজেব্রার শক্ত আঁক কসিতেছিল, নির্ম্মলা নিজের বইখানা খুলিয়া বলিল—আমায় ইংরেজীটা একটু বলে দেবেন দাদা ? অপু বলিল—এসে জুট্‌লে ?…এখন ও-সব হবে না, ভারী মুস্কিল, একটা আঁকও সকাল থেকে মিল্‌লো না !

নির্ম্মলা নিজে বসিয়া পড়িতে লাগিল। সে বেশ ইংরেজী জানে, তাহার বাবা যত্ন করিয়া শিখাইয়াছেন, বাংলাও খুব ভাল জানে।

একটু পড়িয়াই সে বইখানা বন্ধ করিয়া অপুর আঁক কসা দেখিতে লাগিল। খানিকটা আপন মনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তাহার পর আর একবার ঝুঁকিয়া দেখিয়া অপুর কাঁধে হাত দিয়া ডাকিয়া বলিল—এদিকে ফিরুন দাদা, আচ্ছা এই পদ্যটা মিলিয়ে—

অপু বলিল—যাও ! আমি জানিনে, ওই তো তোমার দোষ নির্ম্মলা, আঁক মিল্‌চে না, এখন তোমার পদ্য মেলাবার সময়—আচ্ছা লোক—

নির্ম্মলা মৃদু মৃদু হাসিয়া বলিল—এ পদ্যটা আর মেলাতে হয় না আপনার—বলুন দিকি—সেই গাছ গাছ নয়, যাতে নেই ফল—

অপু আঁক-কসা ছাড়িয়া বলিল—না ? আচ্ছা দ্যাখো—পরে খানিকটা আপন মনে ভাবিয়া বলিল—সেই লোক লোক নয়, যার নাই বল—হ'ল না ? ··

নির্ম্মলা লাইন দুটি আপন মনে আবৃত্তি করিয়া বুঝিয়া দেখিল কোথাও কানে বাধিতেছে কি না। ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আচ্ছা এবার বলুন তো আর একটা—

—আমি আর বল্‌ব না—তুমি ওর কম দুষ্টুমি কর কেন ? আমি আঁকগুলো কসে নিই, তারপর যত ইচ্ছে পদ্য মিলিয়ে দেবো—

—আচ্ছা এই একটা—সেই ফুল ফুল নয় যার—

—মাকে এখুনি উঠে গিয়ে বলে আস্‌বো, নির্ম্মলা—ঠিক বল্‌চি—ওরকম যদি—

নির্ম্মলা রাগ করিয়া উঠিয়া গেল। যাইবার সময় পিছন ফিরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—ওবেলা কে খাবার ব'য়ে আনে বাইরের ঘরে দেখ্‌বো—

এরকম প্রায়ই হয়, অপু ইহাতে ভয় পায় না।

বেশ লাগে নির্ম্মলাকে।

পূজার পর নির্ম্মলার এক মামা বেড়াইতে আসিলেন। অপু শুনিল তিনি নাকি বিলাতফেরৎ—নির্ম্মলার ছোট ভাই নন্তুর নিকট কথাটা শুনিল। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশী নয়, রোগা শ্যামবর্ণ। এ লোক বিলাত ফেরৎ !

তাহার আজন্ম সকল স্বপ্নের কাম্য, সকল কল্পনার সার্থকতা, সকল আশা উৎসাহের লীলাস্থল—বাল্যে নদীর ধারে ছায়াময় বৈকালে পুরাতন বঙ্গবাসীতে পড়া সেই বিলাত-যাত্রীর চিঠির মধ্যে পঠিত আনন্দ-ভরা পুরাতন পথ বহিয়া মরুভূমির পার্শ্বের সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া, নীল ভূমধ্যসাগর মধ্যস্থ দ্রাক্ষাকুঞ্জ বেষ্টিত কর্সিকা দূরে ফেলিয়া সে মধুর স্বপ্ন মাখা পথ-যাত্রা !…

এই লোকটা সেখানে গিয়াছিল ? এই নিতান্ত সাধারণ ধরণের মানুষটা যে দিব্য নিরীহমুখে রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মোচার ঘণ্ট দিয়া ভাত খাইতেছে ?

দু এক দিনেই নির্ম্মলার মামা অমরবাবুর সহিত তাহার খুব আলাপ হইয়া গেল। স্কুলের ছুটীর পর দুজনে মাঠে বেড়াইতে যায়, অপু তাঁহাকে শুধুই প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে। স্কুল-লাইব্রেরীতে বিদেশ-ভ্রমণসংক্রান্ত সব বই আনিয়া সে পড়িয়া ফেলিয়াছে—বিশেষ করিয়া সমুদ্র-ভ্রমণ সংক্রান্ত।···

বিলাতের কত কথা সে জানিতে চায়। পথের ধারে সেখানে কি সব গাছ পালা ? আমাদের দেশের পরিচিত কোনো গাছ সেখানে আছে ? প্যারিস খুব বড় সহর ? অমরবাবু নেপোলিয়নের সমাধি দেখিয়াছেন ? ·· ডোভারের খড়ির পাহাড় ? ব্রিটিশ মিউজিয়ামে নাকি নানা অদ্ভুত জিনিষ আছে—কি কি ? ভেনিস্ ? ইটালির আকাশ নাকি দেখিতে অপূর্ব্ব ?

পাড়াগাঁয়ের স্কুলের ছেলে, এত সব কথা জানিবার কৌতূহল হইল কি করিয়া সুনীলবাবু বুঝিতে পারেন না। এত আগ্রহ করিয়া শুনিবার মত জিনিষ সেখানে আর কি

আছে? · একঘেয়ে—ধেঁায়া—বৃষ্টি—শীত—তিনি পয়সা খরচ করিয়া সেখানে গিয়াছিলেন সাবান প্রস্তুতপ্রণালী শিখিবার জন্য, পথের ধারের গাছপালা দেখিতে যান নাই বা ইটালির আকাশের রং লক্ষ্য করিয়া দেখিবার উপযুক্ত সময়ের প্রাচুর্য্যও তাঁর ছিল না।

নির্ম্মলাকে অপুর ভাল লাগে, কিন্তু সে তাহা দেখাইতে জানে না। পরের বাড়ী বলিয়াই হউক, বা একটু লাজুক প্রকৃতির বলিয়াই হউক, সে বাহিরের ঘরে শান্ত ভাবে বাস করে—কি তাহার অভাব, কোন্‌টা তাহার দরকার, সে কথা কাহাকেও জানায় না। অপুর এই ঔদাসীন্য নির্ম্মলার বড় বাজে, তবুও সে না চাহিতেই নির্ম্মলা তাহার ময়লা বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়া নিজে কাচিয়া দিয়া যায়, গামছা পরিষ্কার করিয়া দেয়, ছেঁড়া কাপড় বাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া মাকে দিয়া সেলাইয়ের কলে সেলাই করিয়া আনিয়া দেয়। নির্ম্মলা চায় অপূর্ব্ব দাদা তাহাকে ফাই-ফরমাস করে, তাহার প্রতি হুকুমজারি করে; কিন্তু অপু কাহারও উপর কোনো হুকুম কোনো দিন করিতে জানে না—এক মা ছাড়া। দিদির ও মায়ের সেবায় সে অভ্যস্ত বটে, তাও সে সেবা অযাচিত ভাবে পাওয়া যাইত তাই। নহিলে অপু কখনো হুকুম করিয়া সেবা আদায় করিতে শিখে নাই। তাহা ছাড়া সে সমাজের যে স্তরের মধ্যে মানুষ, ডেপুটী বাবুরা সেখানকার চোখে ব্রহ্মলোকবাসী দেবতাদের সমকক্ষ জীব। নির্ম্মলা ডেপুটী বাবুর বড় মেয়ে—রূপে, বেশভূষায়, পড়াশুনায়, কথাবার্ত্তায় একমাত্র লীলা ছাড়া সে এ পর্য্যন্ত যত মেয়ের সংস্পর্শে আসিয়াছে—সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে কি করিয়া নির্ম্মলার উপর হুকুমজারি করিবে? নির্ম্মলা তাহা বোঝে না—সে দাদা বলিয়া ডাকে, অপুর প্রতি একটা আন্তরিক টানের পরিচয় তাহার প্রতি কাজে—কেন অপূর্ব্ব দাদা তাহাকে প্রাণপণে খাটাইয়া লয় না নিষ্ঠুর ভাবে অযথা ফাই-ফরমাস করে না?···তাহা হইলে সে খুসী হইত।

চৈত্র মাসের শেষে একদিন ফুটবল খেলিতে খেলিতে অপুর হাঁটুটা কি ভাবে মচ্‌কাইয়া গিয়া সে মাঠে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া ডেপুটীবাবুর বাসায় দিয়া গেল। নির্ম্মলার মা ব্যস্ত হইয়া বাহিরের ঘরে আসিলেন, কাছে গিয়া বলিলেন—দেখি দেখি কি হয়েচে? অপুর উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সুন্দর মুখ ঘামে ও যন্ত্রণায় রাঙা হইয়া গিয়াছে, ডান পা-খানা সোজা করিতে পারিতেছে না। মনিয়া চাকর নির্ম্মলার মার স্লিপ লইয়া ডাক্তারখানায় ছুটিল। নির্ম্মলা বাড়ী ছিল না, ভাইবোন্‌দের লইয়া গাড়ী করিয়া মুন্সেফ্ বাবুর বাসায় বেড়াইতে গিয়াছিল। একটু পরে সরকারী ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। সন্ধ্যার আগে নির্ম্মলা আসিল। সব শুনিয়া বাহিরের ঘরে আসিয়া বলিল—কই দেখি—বেশ হয়েচে—দস্যিবৃত্তি করার ফল হবে না? ভারী খুসি হয়েচি আমি—

অপু বলিল—যাও এখান থেকে—তোমাকে আর বক্তৃতা দিতে হবে না—

নির্ম্মলা কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। অপু মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইয়া ভাবিল—যাক্ না, আর কখনো যদি কথা কই—

আধ ঘণ্টা পরেই নির্ম্মলা আসিয়া হাজির। কৌতুকের সুরে বলিল—পায়ের ব্যথা ট্যাথা জানিনে, গরম জল আন্‌তে বলে দিয়ে এলাম এমন করে সেঁক দেবো—লাগে তো লাগ্‌বো দুষ্টুমি করার বাহাদুরি বেরিয়ে যাবে—কমলা লেবু খাবেন একটা?—না তাও না?

মনিয়া চাকর গরম জল আনিলে নির্ম্মলা অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ব্যথার উপর সেঁক করিল। নির্ম্মলার ভাইবোনেরা সব দেখিতে আসিয়া ধরিল—ও দাদা, এইবার একটা গল্প বলুন না? অপুর মুখে গল্প শুনিতে সবাই ভালবাসে।

নির্ম্মলা বলিল—হ্যাঁ—দাদা এখন পাশ ফিরে শুতে পারচেন না—এখন গল্প না বল্লে চল্‌বে কেন?···চুপ্ করে বসে থাকো সব—নয়তো বাড়ীর মধ্যে পাঠিয়ে দোব।

পরদিন সকালটা নির্ম্মলা আসিল না। দুপুরের পর আসিয়া বৈকাল পর্য্যন্ত বসিয়া নানা গল্প করিল, বই পড়িয়া শোনাইল। বাড়ীর ভিতর হইতে থালায় করিয়া

আক ও শাঁক আলু কাটিয়া লইয়া আসিল। তাহার পর তাহাদের পদ্য-মেলানোর আর অন্ত নাই! নির্ম্মলার পদটি মিলাইয়া দিয়াই অপু তাহাকে আর একটা পদ মিলাইতে বলে—নির্ম্মলাও অল্প এক মিনিটে তাহার জবাব দিয়া অন্য একটা প্রশ্ন করে।...কেহ কাহাকেও ঠকাইতে পারে না।

ডেপুটীবাবুর স্ত্রী একবার বাহিরের ঘরে আসিতে আসিতে শুনিয়া বলিলেন—বেশ হয়েচে, আর ভাবনা নেই—এখন তোমরা দু ভাইবোনে একটা কবির দল খুলে দেশে দেশে বেড়িয়ে বেড়াও গিয়ে—

অপু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিল। ডেপুটীবাবুর স্ত্রীর বড় সাধ অপু তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে। সে যে আড়ালে তাঁহাকে মা বলে, তাহা তিনি জানেন—কিন্তু সাম্‌নাসাম্‌নি অপু কখনো তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকে নাই, এজন্য ডেপুটীবাবুর স্ত্রী খুব দুঃখিত।

অপু যে ইচ্ছা করিয়া করে না তাহা নহে। ডেপুটীবাবুর বাসায় থাকিবার কথা এবার সে বাড়ীতে গিয়া মায়ের কাছে গল্প করাতে সর্ব্বজয়া ভারী খুসি হইয়াছিল। ডেপুটীবাবুর বাড়ী! কম কথা নয়!...সেখানে কি করিয়া থাকিতে হইবে, চলিতে হইবে সে বিষয়ে সে ছেলেকে নানা উপদেশ দিয়া অবশেষে বলিয়াছিল - ডেপুটীবাবুর বউকে মা বলে ডাক্‌বি—আর ডেপুটীবাবুকে বাবা বলে ডাক্‌বি—

অপু লজ্জিত মুখে বলিয়াছিল—হ্যাঁ, আমি ও সব পার্‌বো না—

সর্ব্বজয়া বলিয়াছিল—তাতে দোষ কি?...বলিস্, তাঁরা খুসি হবেন—কম একটা বড় লোকের আশ্রয় তো নয়—তাহার কাছে সবাই বড়মানুষ।...

অপু তখন মায়ের নিকট রাজী হইয়া আসিলেও এখানে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে নাই। মুখে কেমন বাধে, লজ্জা করে।

একদিন—অপু তখন একমাস হইল সারিয়া উঠিয়াছে—নির্ম্মলা বাহিরের ঘরে চেয়ারে বসিয়া কি বই পড়িতেছিল, ঘোর বর্ষা সারা দিনটা, বেলা বেশী নাই—বৃষ্টি একটু কমিয়াছে। অপু বিনা ছাতায় কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসিয়া দৌড়িয়া ঘরে ঢুকিতেই নির্ম্মলা বই মুড়িয়া বলিয়া উঠিল—এঃ, আপনি যে দাদা ভিজে একেবারে—

অপুর মনে যে জন্যই হউক খুব স্ফূর্ত্তি ছিল—তাহার দিকে চাহিয়া বলিল—চট্ ক'রে চা আর খাবার—তিন মিনিটে—

নির্ম্মলা বিস্মিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত আনন্দিত হইল। এ রকম তো কখনো হুকুমের সুরে অপূর্ব্বদা বলে না! সে হাসিমুখে টিপিয়া বলিল—পারবো না তিন মিনিটে—ঘোড়ায় জিন দিয়ে এলেন কিনা একেবারে!

অপু হাসিয়া বলিল—আর তো বেশীদিন না—আর তিনটি মাস তোমাদের জ্বালাবো, তারপর চলে যাচ্ছি—

নির্ম্মলার মুখ হইতে হাসি মিলাইয়া গেল। বিস্ময়ের সুরে বলিল—কোথায় যাবেন!

—তিন মাস পরেই এগ্‌জামিন—দিয়েই চলে যাবো, কল্‌কাতায় পড়্‌বো পাশ হোলে—

নির্ম্মলা এতদিন সম্ভবতঃ এটা ভাবিয়া দেখে নাই—বলিল—আর এখানে থাকবেন না?

অপু ঘাড় নাড়িল। খানিকটা থামিয়া কৌতুকের সুরে বলিল তুমি তো বাঁচো যে খাটুনি—তোমার তো ভাল—ওকি? বারে—কি হোলো—শোন নির্ম্মলা—

হঠাৎ নির্ম্মলা উঠিয়া গেল কেন—চোখে কি কথায় তাহার এত জল আসিয়া পড়িল, বুঝিতে না পারিয়া সে মনে মনে অনুতপ্ত হইল। আপন মনে বলিল—আর ওকে ক্ষেপাবো না—ভারী পাগল—আহা, ওকে সব সময় খোঁচা দিই—সোজা খেটেচে ও, যখন পা ভেঙে পড়ে ছিলাম পনেরো দিন ধ'রে জান্‌তে দেয়নি যে, আমি নিজের বাড়ীতে নেই—

ইহার মধ্যে আবার একদিন পটু আসিল। ডেপুটী বাবুর বাসাতে অপু উঠিয়া আসিবার পর সে কখনও আসে নাই। খানিকটা ইতস্ততঃ করিয়া বাসায় ঢুকিল। এক-পা ধূলা, রুক্ষ চুল, হাতে পুঁটুলি। সে কোনো সুবিধা খুঁজিতে আসে নাই, এদিকে আসিলে অপুর সঙ্গে না দেখা করিয়া সে যাইতে পারে না। পটুর মুখে অনেক দিন পরে সে রাণুদির খবর পাইল। পাড়াগাঁয়ের নিঃসহায়

নিরুপায় ছেলেদের অভ্যাসমত সে গ্রামের যত মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ানো সুরু করিয়াছে। বাপের বাড়ীর লোক, অনেকেই হয়ত বাল্যসঙ্গী, মেয়েরা আগ্রহ করিয়া রাখে, ছাড়িয়া দিতে চাহে না, যে কটা দিন থাকে খাওয়া সম্বন্ধে নির্ভাবনা। কোনো স্থানে দু'দিন, কোথাও পাঁচদিন—মেয়েরা আবার আসিতে বলে, যাবার সময় খাবার তৈয়ারী করিয়া সঙ্গে দেয়। এ এক ব্যবসা পটু ধরিয়াছে মন্দ নয়—ইহার মধ্যে সে তাহাদের পাড়ার সব মেয়ের শ্বশুরবাড়ীতে দু চার বার ঘুরিয়া আসিয়াছে।

এইভাবে একদিন রাণু-দির শ্বশুরবাড়ী সে গিয়াছে —সে-গল্প করিল। রাণু-দির শ্বশুরবাড়ী রাণাঘাটের কাছে--তাঁহারা এখানে থাকেন না, পশ্চিমে কোথায় চাকুরি উপলক্ষে থাকেন—পূজার সময় বাড়ী আসিয়াছিলেন, সপ্তমী পূজার দিন অনাহুতভাবে পটু গিয়া হাজির। সেখানে আট দিন ছিল। রাণু-দির যত্ন কি! তাহার দুরবস্থা শুনিয়া গোপনে তিনটা টাকা দিয়াছিল—আসিবার সময় নতুন ধুতি-চাদর, এক পুটুলি বাসি লুচি সন্দেশ।

অপু বলিল—আমার কথা কিছু বল্লে না ?

—শুধুই তোর কথা। যে কয়দিন ছিলাম, সকালে সন্ধ্যাতে তোর কথা। তারা আবার একাদশীর দিনই পশ্চিমে চলে যাবে, আমাকে রাণুদি বল্লে, ভাড়ার টাকা দিচ্ছি, তাকে একবার নিয়ে আয় এখানে—ছবচ্ছর দেখা হয় নি--তা আমার আবার জ্বর হোল—দিদির বাড়ী এসে দশ বারো দিন পড়ে রইলাম—তোর ওখানে আর যাওয়া হোল না—ওরাও চলে গেল পশ্চিমে—

ভাড়ার টাকা দেয়নি ?

পটু লজ্জিত মুখে বলিল—হাঁ, তোর আর আমার যাতায়াতের ভাড়া হিসেব কোরে—সেও খরচ হয়ে গেল, দিদি কোথায় আর পাবে, আমার সেই ভাড়ার টাকা থেকে নেবু ডালিম, ওষুধ—সব হোল। রাণু-দি'র মতন অমন মেয়ে আর দেখিনি অপু-দা, তোর কথা বল্‌তে. বল্‌তে তার চোখে জল পড়ে—

হঠাৎ অপুর গলা যেন কেমন আড়ষ্ট হইয়া উঠিল– সে তাড়াতাড়ি কি দেখিবার ভাণ করিয়া জানালার বাহিরের দিকে চাহিল।

—শুধু রাণুদি না, যত মেয়ের শ্বশুরবাড়ী গেলাম, রাণীদি, আশালতা, ওপাড়ার সুনয়নী-দি—সবাই তোর কথা আগে জিগ্যেস করে –

ঘণ্টা দুই থাকিয়া পটু চলিয়া গেল।

দেওয়ানপুর স্কুলেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা গৃহীত হয়। খরচ-পত্র করিয়া কোথাও যাইতে হইল না। পরীক্ষার পর হেড্‌মাষ্টার মিঃ দত্ত অপুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন—বাড়ী যাবে কবে ?

এই কয়বৎসরে হেড্‌মাষ্টারের সঙ্গে তাহার কেমন একটা নিবিড় সৌহার্দ্দ্যের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিয়াছে, দুজনের কেহই এতদিনে জানিতে পারে নাই সে বন্ধন কতটা দৃঢ়।

অপু বলিল—সাম্‌নের বুধবারে যাব ভাব্‌চি।

—পাশ হোলে কি করবে ভাব্‌চো? কলেজে পড়্‌বে তো ?

কলেজে পড়্‌বার খুব ইচ্ছে আছে স্যর্।

—যদি স্কলারশিপ না পাও ?

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া থাকে।

—ভগবানের ওপর নির্ভর করে চলো, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, বাইবেলের একটা জায়গা পড়ে শোনাই তোমাকে—

মিঃ দত্ত খৃষ্টান। ক্লাশে কতদিন বাইবেল খুলিয়া চমৎকার উক্তিগুলি তাহাদের পড়াইয়া শোনাইয়াছেন, অপুর তরুণ মনে বুদ্ধদেবের পীতবাসধারী সৌম্যমূর্ত্তির পাশে তাহাদের গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশালাক্ষীর পাশে, বোষ্টম দাদু নরোত্তম দাসের ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের পাশে, দীর্ঘ দেহ শান্তনয়ন যীশুর মূর্ত্তি কোন্‌কালে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল—তাহার মন যীশুকে বর্জ্জন করে নাই, কাঁটার মুকুট পরা লাঞ্ছিত, অপমানিত এক দেবোন্মাদ যুবককে মনে প্রাণে বরণ করিতে শিখিয়াছিল।

মিঃ দত্ত বলিলেন—কল্‌কাতাতেই পড়ো—অনেক জিনিষ দেখ্‌বার শিখ্‌বার আছে—কোন কোন পাড়াগাঁয়ে কলেজে খরচ কম পড়ে বটে কিন্তু সেখানে মন বড় হয় না, চোখ ফোটে না, আমি কল্‌কাতাতেই ভালো বলি।

অপু অনেকদিন হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, কলেজে পড়িবে এবং কলিকাতার কলেজেই পড়িবে।

মিঃ দত্ত বলিলেন—স্কুল লাইব্রেরীর 'লে মিজারেবল্'-খানা তুমি খুব ভালবাস্‌তে—ওখানা তোমাকে দিয়ে দিচ্চি, আমি আর একখানা কিনে নেবো।

অপু বেশী কথা বলিতে জানে না—এখনও জানে না—মুখচোরার মত খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া হেড্ মাষ্টারের পায়ের ধূলা লইয়া প্রমাণ করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

হেড মাষ্টারের মনে হইল তাঁহার দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরের শিক্ষক-জীবনে এ রকম আর কোনো ছেলের সংস্পর্শে তিনি কখনও আসেন নাই—ভাবময়, স্বপ্ন-দর্শী বালক, জগতে সহায়হীন, সম্পদহীন!···হয়তো একটু নির্ব্বোধ, একটু অপরিণামদর্শী···কিন্তু উদার, সরল, নিষ্পাপ, পিপাসু ও জিজ্ঞাসু। মনে মনে তিনি বালককে বড় ভালবাসিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনে এই একটি আসিয়াছিল, চলিয়া গেল। ক্লাশে পড়াইবার সময় ইহার কৌতূহলী ডাগর চোখ ও আগ্রহোজ্জ্বল মুখের দিকে চাহিয়া ইংরেজির ঘণ্টায় কত নতুন কথা, কত গল্প, ইতিহাসের কাহিনী বলিয়া যাইতেন—ইহার নীরব, জিজ্ঞাসু চোখ দুটি তাঁহার নিকট হইতে যেরূপ জোর করিয়া পাঠ আদায় করিয়া লইয়াছে সেরূপ আর কেহ পারে নাই, সে প্রেরণা সহজ লভ্য নয় তিনি তাহা জানেন।

গত চার বৎসরের কত স্মৃতি-জড়ানো দেওয়ানপুর হইতে বিদায় লইবার সময়ে অপুর মন ভাল ছিল না। দেবব্রত বলিল - তুমি চলে গেলে অপূর্ব্ব-দা, এবার আমি পড়া ছেড়ে দেবো। আমি আর এখানে থাক্‌তে পারবো না।

নির্ম্মলার সঙ্গে বাহিরের ঘরে দেখা। ফাল্গুন মাসের অপূর্ব্ব, অদ্ভুত দিনগুলি। বাতাসে কিসের যেন মৃদু, স্নিগ্ধ, অনির্দ্দেশ্য সুগন্ধ। আমের বউলের সুবাস সকালের রৌদ্রকে যেন মাতাল করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু অপুর আনন্দ সে সব হইতে আসে নাই—গত কয়েক দিন ধরিয়া সে রাইডার হ্যাগার্ডের 'ক্লিওপেট্রা' পড়িতেছিল। তাহার তরুণ কল্পনাকে অদ্ভুত ভাবে নাড়া দিয়াছে বই-খানাতে। কোথায় এ হাজার হাজার বৎসরের পুরাতন সমাধি—জ্যোৎস্না-ভরা নীলনদ, বিস্মৃত 'রা' দেবের মন্দির!···ঔপন্যাসিক হ্যাগার্ডের স্থান সমালোচকের মতে যেখানেই নির্দ্দিষ্ট হউক্, তাহাতে আসে যায় না - তাহার নবীন, অবিকৃত মন একদিন যে গভীর আনন্দ পাইয়াছিল বইখানা হইতে—এইটাই বড় কথা তাহার কাছে।

নির্ম্মলার সহিত দেখা অপুর মনের সেই অবস্থায়, অপ্রকৃতিস্থ, মত্ত, রঙীন্—সে তখন শুধু একটা সুপ্রাচীন রহস্যময়, অধুনালুপ্ত জাতির দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! ক্লিওপেট্রা? হৌন তিনি সুন্দরী—তাঁহাকে সে গ্রাহ্য করে না। পিরামিডের অন্ধকার গর্ভগৃহে বহু হাজার বৎসরের সুপ্তি ভাঙ্গিয়া সম্রাট মেঙ্কাউ-রা গ্রানাইট পাথরের সমাধিসিন্দুকে যখন রোষে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করেন—মনুষ্য সৃষ্টির পূর্ব্বেকার জনহীন, আদিম পৃথিবীর নীরবতার মধ্যে শুধু সিহোর নদী লিবীয় মরুভূমির বুকের উপর দিয়া বহিয়া যায়—অপূর্ব্ব রহস্য ভরা মিশর! অদ্ভুত নিয়তির অকাট্য লিপি! তাহার মন সারা দুপুর আর কিছু ভাবিতে চায় না।

গরম বাতাসের দমকা ধূলাবালি উড়াইয়া আনিতে ছিল বলিয়া অপু দরজা ভেজাইয়া বসিয়াছিল নির্ম্মলা দরজা ঠেলিয়া ঘরে আসিল। অপু বলিল—এস এস, আজ সকালে তো তোমাদের স্কুলে প্রাইজ হোল—কে প্রাইজ দিলেন মুন্সেফ্ বাবুর স্ত্রী না? ঐ মোটামত যিনি গাড়ী থেকে নাম্‌লেন, উনি তো?

—আপনি বুঝি ওদিকে ছিলেন তখন?·· মাগো, কি মোটা!—আমি তো কখনো—পরে হঠাৎ যেন মনে পড়িল এই ভাবে বলিল, তার পর আপনি তো যাবেন, আজ না দাদা?

—হাঁ, দুটার গাড়ীতে যাবো—রামধারিয়াকে একটু ডেকে নিয়ে এস তো—জিনিষপত্তরগুলো একটু বেঁধে দেবে।

—রামধারিয়া কি আপনার কাজ চিরকাল করে দিয়ে এসেছে নাকি? কই, কি জিনিষ আগে বলুন না।

দুইজনে মিলিয়া বইয়ের ধূলা ঝাড়িয়া গোছানো, বিছানা বাঁধা চলিল। নির্ম্মলা অপুর ছোট টিনের তোরঙ্গটা খুলিয়া বলিল—মাগো! কি করে রেখেছেন যে

অর্দ্ধনারীশ্বর

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বাক্সটা! কাপড়ে, কাগজে বইয়ে হাণ্ডুল পাগুল—আচ্ছা এত বাজে কাগজ কি হবে দাদা? ফেলে দেবো?…

অপু বলিয়া উঠিল—হাঁ হাঁ—না না—ওসব ফেলো না।

সে আজ দুই তিন বছরের চিঠি, নানা সময়ে নানা কথা লেখা কাগজের টুক্‌রা, সব জমাইয়া রাখিয়াছে। অনেক স্মৃতি জড়ানো সেগুলির সঙ্গে, পুরাতন সময়কে আবার ফিরাইয়া আনে—সেগুলি প্রাণ ধরিয়া অপু ফেলিয়া দিতে পারে না। কবে কোন্ কালে তাহার দিদি দুর্গা নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে আদর করিয়া তাহাকে কোন্ বন হইতে একটা পাখীর বাসা আনিয়া দিয়াছিল, কত কালের কথা—বাসাটা সে আজও বাক্সে রাখিয়া দিয়াছে - বাবার হাতের লেখা একখানা কাগজ—আরও কত কি।

নির্ম্মলা বলিল—এ কি আপনার মোটে দুখানা কাপড়, আর জামা নেই?

অপু হাসিয়া বলিল—পয়সাই নেই হাতে, তা জামা! নৈলে ইচ্ছে তো আছে সুকুমারের মত একটা জামা করাবো—ওতে আমাকে যা মানায়—ওই রংটাতে—

নির্ম্মলা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—থাক্ থাক্, আর বাহাদুরী কর্ত্তে হবে না। এই রইল চাবী, এখুনি হারিয়ে ফেলবেন না যেন আবার! আমি মিশির ঠাকুরকে বলে দিয়েচি, এখুনি লুচি ভেজে আন্‌বে—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে আপনার গাড়ীর কত দেরী?…

—এখনও ঘণ্টা দুই। মা'র সঙ্গে দেখা করে যাবো, আবার হয় তো কত দিন পরে আস্‌বো তার ঠিক কি?…

—আস্‌বেনই না। আপনাকে আমি বুঝিনি ভাব্‌ছেন?…এখান থেকে চলে গেলে আপনি আবার এ-মুখো হবেন?—কক্‌খনো না।

অপু কি প্রতিবাদ করিতে গেল, নির্ম্মলা বাধা দিয়া বলিল—সে আমি জানি। এই দু বছর আপনাকে দেখে আস্‌চি দাদা, আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই, আপনার শরীরে মায়া দয়া কম।

—কম?…বারে - এ তো তুমি—আমি বুঝি—

—দাঁড়ান, দেখি গিয়ে মিশির ঠাকুর কি করচে—তাড়া না দিলে সে কি আর—

নির্ম্মলার মা যাইবার সময় চোখের জল ফেলিলেন। নির্ম্মলা বাড়ীর মধ্যে কি কাজে ব্যস্ত ছিল, মায়ের বহু ডাকাডাকিতেও সে কাজ ফেলিয়া বাহিরে আসিতে পারিল না। অপু ষ্টেশনের পথে যাইতে যাইতে ভাবিল—নির্ম্মলা আচ্ছা তো? একবার বার হোল না যাবার সময়টা দেখা হ'ত—আচ্ছা খামখেয়ালি!

যখন তখন রেলগাড়ীতে চড়াটা ঘটে না বলিয়াই রেলে চড়িলেই তাহার একটা অপূর্ব্ব আনন্দ হয়। ছোট্ট তোরঙ্গ ও বিছানার মোট লইয়া জানালার ধারে বসিয়া চাহিয়া দেখিতে দেখিতে কত কথা মনে আসিতেছিল। এখন সে কত বড় হইয়াছে—একা একা ট্রেনে চড়িয়া বেড়াইতেছে। তার পর এমনি একদিন হয়ত নীল নদের তীরে, ক্লিওপেট্রার দেশে, এক জ্যোৎস্না রাতে, শত শত প্রাচীন সমাধির বুকের উপর দিয়া অজানা সে যাত্রা!

ষ্টেশনে নামিয়া বাড়ী যাইবার পথে একটা গাছতলা দিয়া যাইতে যাইতে মাঝে মাঝে কেমন একটা সুগন্ধ—মাটির, ঝরা পাতার, কোন ফুলের। ফাগুনের তপ্ত রৌদ্র গাছে গাছে পাতা ঝরাইয়া দিতেছে, মাঠের ধারে অনেক গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে,—পলাশের ডালে রাঙা রাঙা নতুন ফোটা ফুল যেন আরতির পঞ্চপ্রদীপের ঊর্দ্ধমুখী শিখার মত জ্বলিতেছে। অপুর মন যেন আনন্দে শিহরিয়া ওঠে—যদিও সে ট্রেনে আজ সারা পথ শুধু নির্ম্মলা আর দেবব্রতের কথা ভাবিয়াছে…কখনো শুধুই নির্ম্মলা, কখনো শুধুই দেবব্রত…তাহার স্কুল-জীবনে এই দুইটি বন্ধু যতটা তাহার প্রাণের কাছাকাছি আসিয়াছিল, অতটা নিকটে অমন ভাবে আর কেহ আসিতে পারে নাই, তবুও তাহার মনে হয় আজকার আনন্দের সঙ্গে নির্ম্মলার সম্পর্ক নাই, দেবব্রতের নাই—আছে তার নিশ্চিন্দিপুরের বাল্যজীবনের স্নিগ্ধস্পর্শ আর বহুদূর বিসর্পিত, রহস্যময় কোন্ অনন্তের ইঙ্গিত—সে মনে বালক হইলেও একথা বোঝে।

প্রথম যৌবনের সুরু, বয়ঃসন্ধিকালের রূপ ফাটিয়া পড়িতেছে,—এই ছায়া, বউলের গন্ধ, বনান্তরে অবসন্ন

ফাগুনদিনে পাখীর ডাক, ময়ূরকণ্ঠী রংয়ের আকাশটা—রক্তে যেন এদের নেশা লাগে—গর্ব্ব, উৎসাহ, নবীন জীবনের আনন্দ-ভরা প্রথম পদক্ষেপ। নির্ম্মলা তুচ্ছ!··· আর এক দিক হইতে ডাক আসে—অপু আশায় আশায় থাকে।

নিরাবরণ মুক্ত প্রকৃতির এ আহ্বান, রোমান্সের আহ্বান—তার রক্তে মেশানো, এ আসিয়াছে তাহার বাবার নিকট হইতে উত্তরাধিকার সূত্রে—বন্ধন মুক্ত হইয়া ছুটিয়া বাহির হওয়া, মন কি চায় না বুঝিয়াই তাহার পিছু পিছু দৌড়ানো, এ তাহার নিরীহ শান্তপ্রকৃতি ব্রাহ্মণপণ্ডিত পিতামহ রামহরি তর্কালঙ্কারের দান নয়—যদিও সে তাঁর নিস্পৃহ জ্ঞানপিপাসা ও অধ্যয়নপ্রিয়তাকে লাভ করিয়াছে বটে। কে জানে পূর্ব্বপুরুষ ঠ্যাঙাড়ে বীরুরায়ের উচ্ছৃঙ্খল রক্ত কিছু আছে কিনা—

তাই তাহার মনে হয় কি যেন একটা ঘটিবে, তাহারই প্রতীক্ষায় থাকে।

অপূর্ব্ব গন্ধ-ভরা বাতাসে নবীন বসন্তের শ্যামলশ্রীতে অস্তসূর্য্যের রক্ত আভায় সে রোমান্সের বার্ত্তা যেন লেখা থাকে।

বাড়ীতে অপু মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করিল। কলিকাতায় যদি সে পড়িতে যায় স্কলারশিপ না পাইলে কি কোনো সুবিধা হইবে? সর্ব্বজয়া কখনো জীবনে কলিকাতা দ্যাখে নাই—সে কিছু জানে না। পড়া তো অনেক হইয়াছে আর পড়ার দরকার কি?···অপুর মনে কলেজে পড়িবার ইচ্ছা খুব প্রবল। কলেজে পড়িলে মানুষে বিদ্যার জাহাজ হয়। সবাই বলিবে কলেজের ছেলে। যাহারা কলেজে পড়ে, তাহাদের মুখে সে কলেজ-জীবনের কত গল্প শুনিয়াছে, সেখানে রোজ রোজ দাঁড়াইয়া উঠিয়া পড়া বলিতে হয় না, প্রোফেসার আসিয়া বক্তৃতা দেন। ক্লাশের টাস্ক‌্ও দেখাইতে হয় না, কিছুই হয় না—কিছুই না—সে ভারী মজার ব্যাপার।

মাকে বলিল—নাই যদি স্কলারশিপ পাই, তাই বা কি? একরকম কোরে হয়ে যাবে—রমাপতি-দা বলে। কত গরীবের ছেলে কল্‌কাতায় পড়্‌চে, গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই নাকি সুবিধা হয়ে যায়, ও আমি কোরে নেবো মা—

কলিকাতায় যাইবার পূর্ব্বদিন রাত্রে আগ্রহে উত্তেজনায় তাহার ঘুম হইল না। মাথার মধ্যে যেন কেমন করে, বুকের মধ্যেও। গলায় যেন কি আট্‌কাইয়া গিয়াছে। সত্য সত্য সে কাল এমন সময় কলিকাতায় বসিয়া আছে!···কলিকাতায়!··

কলিকাতা সম্বন্ধে কত গল্প, কত কি সে শুনিয়াছে। অতবড় সহর আর নাই। কত কি অদ্ভুত জিনিষ দেখিবার আছে, গড়ের মাঠ, মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, থিয়েটার—কত কি! বড় বড় লাইব্রেরী আছে সে শুনিয়াছে, বই চাহিলেই সেখানে বসিয়া পড়িতে দেয়। মোটর গাড়ী বলিয়া যে গাড়ীর বিষয় 'নন্দন কানন সিরিজে'র বইতে কত পড়িয়াছে, বইয়ে ছবি দেখিলেও এ পর্য্যন্ত চক্ষে দেখা ঘটে নাই কলিকাতার রাস্তায় নাকি রোজ পঞ্চাশ ষাটখানা মোটরগাড়ী দেখা যায়। সাম্‌নের বারের এ-সময় সে একজন কলেজের ছেলে।

বিছানায় শুইয়া সারারাত্রি ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। বাড়ীর পিছনের তেঁতুল গাছের ডালপালায় অন্ধকারকে আরও ঘন করিয়াছে, ভোর আর কিছুতেই হয় না। হয়ত তাহার কলিকাতা যাওয়া ঘটিবে না, কলেজে পড়া ঘটিবে না, কতলোক হঠাৎ মারা গিয়াছে, এমনি হয়ত সেও মরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভগবানের কাছে সে প্রার্থনা করে, কলিকাতা না দেখিয়া, কলেজে অন্তত কিছুদিন পড়ার আগে যেন সে না মরে।

কলিকাতায় সে কাহাকেও চেনে না, কোথায় গিয়া উঠিবে ঠিক নাই, পথঘাটও জানা নাই। মাসকতক আগে দেবব্রত তাহাকে নিজের এক মেসোমহাশয়ের কলিকাতার ঠিকানা দিয়া বলিয়াছিল, দরকার হইলে এই ঠিকানায় গিয়া তাহার নাম করিলেই তিনি আদর করিয়া থাকিবার স্থান দিবেন। ট্রেনে উঠিবার সময় অপু সে কাগজখানা বাহির করিয়া পকেটে রাখিল। রেলের পুরানো টাইমটেব্‌লের পিছন হইতে ছিঁড়িয়া লওয়া একখানা কলিকাতা সহরের নক্সা তাহার টিনের

তোরঙ্গটার মধ্যে অনেকদিন আগে ছিল, সেখানাও বাহির করিয়া বসিল।

(১০)

ইহার পূর্ব্বেও অপু সহর দেখিয়াছে, তবুও ট্রেন হইতে নামিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনের সম্মুখের বড় রাস্তায় একবার আসিয়া দাঁড়াইতেই সে অবাক হইয়া গেল। এরকম কাণ্ড সে কোথায় দেখিয়াছে? ট্রাম গাড়ী ইহার নাম? আর একরকমের গাড়ী নিঃশব্দে দৌড়িয়া চলিয়াছে, অপু কখনো না দেখিলেও মনে মনে আন্দাজ করিল ইহারই নাম মোটরগাড়ী। সে বিস্ময়ের সহিত দু একখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ষ্টেশনের অপিস্ ঘরে সে মাথার উপর একটা কি চাকার মত জিনিষ বন্ বন্ বেগে ঘুরিতে দেখিয়াছে, সে আন্দাজ করিল উহাই ইলেকট্রিক পাখা।

যে ঠিকানা তাহাকে তাহার বন্ধু দিয়াছিল, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা তাহার পক্ষে এক মহা মুস্কিলের ব্যাপার, পকেটে রেলের টাইম টেব্‌লের মোড়ক হইতে সংগ্রহ করা কলিকাতার যে নক্সা ছিল তাহা মিলাইয়া হ্যারিসন রোড খুঁজিয়া বাহির করিল। জিনিষপত্র তাহার এমন বেশী কিছু নহে, বগলে ছোট বিছানাটি ও ডান হাতে ভারী পুঁটুলিটা ঝুলাইয়া পথ চলিতে চলিতে সামনে পাওয়া গেল আমর্হাষ্ট ষ্ট্রীট্। তাহার পর আরও খানিক ঘুরিয়া সে পঞ্চানন দাসের গলি বাহির করিল। ৫৬।১ নম্বরের বাড়ীটা একটা ছোট গোছের দোতালা বাড়ী, খোঁজ করিয়া জানিল অখিল বাবু সেখানে থাকেন বটে কিন্তু এখন আপিসে গিয়াছেন, বৈকাল ছটার এদিকে আসিবার কোনো সম্ভাবনা নাই। অপুর খাওয়াদাওয়া হয় নাই, সে মেসে জিনিষপত্র রাখিয়া—রাস্তার ধারের একটা দোকান হইতে ছয় পয়সার খাবার খাইয়া আসিল।

অখিল বাবু সন্ধ্যার আগে আসিলেন, কালো নাদুস্ নুদুস্ চেহারা, অপুর পরিচয় ও উদ্দেশ্য শুনিয়া খুসি হইলেন ও খুব উৎসাহ দিলেন। ঝিকে ডাকাইয়া তখনই খাবার আনাইয়া অপুকে খাইতে দিলেন, সারাদিন খাওয়া হয় নাই জানিতে পারিয়া তিনি এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, নিজে সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য আসনখানি মেসের ছাদে পাতিয়াও আহ্নিক করিতে ভুলিয়া গেলেন। গোটা পঞ্চাশেক টাকা মাহিনা পান, সওদাগরি আপিসের কেরাণী আর কোথায় সন্ধ্যার পর ছেলে পড়ান—তাতেই কোনো রকমে চলে। সদাশিব লোক, একটা ভাঙ্গা তানপুরা বাজাইয়া মাঝে মাঝে মোটা গলায় শ্যামা-বিষয়ক গান গাহিয়া থাকেন, ধার দিতে মুক্ত হস্ত, অভাব জানাইয়া চাহিলে এ পর্য্যন্ত কাহাকেও বিমুখ করেন নাই, যদিও ধার লইবার পর হইতেই দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ করিয়াছে এরূপ লোকের সংখ্যা কম নহে। বাড়ী গিয়াই পাঠাইয়া দিব বলিয়া কত লোক ধার রাখিয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া গিয়াছে, এ পর্য্যন্ত তাহাদের আর কোনো সন্ধান অখিল বাবু পান নাই।

এ সকল কথা অপু ক্রমে ক্রমে মেসের লোকের মুখে শুনিল। সন্ধ্যার সময় সে মেসের ছাদে শুইয়া পড়িল। সারাদিন বেড়াইয়া সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। একজন কে বলিতেছিল—গড়ের মাঠে আজ মোহন-বাগান আর ব্ল্যাকওয়াচের খেলা আছে, দেখতে যাবে না হে? অপু ভাবিল, 'গড়ের মাঠ', মোহনবাগান কথাগুলা এরা এত সাধারণ ভাবে উচ্চারণ করে কেন?...এ সব নামের চারিধারে অনেকখানি রহস্য ও মহিমা জড়ানো আছে, তাহার মনের মধ্যে। 'গড়ের মাঠ' কথাটা বলিবার সময় যেন সকলকে চুপ করিয়া দিয়া হাঁটু গাড়িয়া বিশেষ আয়োজনের সহিত তবে নামটা উচ্চারণ করিতে হইবে। আর ব্ল্যাকওয়াচ?...সে তো কথাই নাই।...

সে তো কলিকাতায় আসিয়াছে—মিউজিয়াম, গড়ের মাঠ দেখিতে পাইবে তো?...বায়োস্কোপ দেখিবে?... এখানে খুব বড় বায়োস্কোপ আছে সে জানে। তাহাদের দেওয়ানপুরে স্কুলে একবার একটা ভ্রমণকারী বায়োস্কোপের দল গিয়াছিল, তাহাতেই সে জানে কি অদ্ভুত দেখিতে। তবে এখানে নাকি বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখায়। সেখানে তাহা ছিল না—রেলগাড়ী দৌড়াইতেছে, একটা লোক হাত-পা নাড়িয়া মুখভঙ্গি

করিয়া লোক হাসাইতেছে—এই সব। এখানে সে বায়োস্কোপে গল্পের বই দেখিতে চায়। অখিল বাবুকে জিজ্ঞাসা করিল বায়োস্কোপ যেখানে হয়, এখান থেকে কত দূর ?

অখিলবাবুর মেসে খাইয়া অপু ইহার-উহার পরামর্শমত নানাস্থানে হাঁটাহাঁটি করিতে লাগিল, কোথাও বা থাকিবার, স্থানের জন্য, কোথাও বা ছেলে পড়াইবার সুবিধার জন্য, কাহারও কাছে বা কলেজে বিনা বেতনে ভর্ত্তি হইবার যোগাযোগের জন্য। এদিকে কলেজে ভর্ত্তি হইবার সময়ও চলিয়া যায়, সঙ্গে যে কয়টা টাকা ছিল তাহা পকেটে লইয়া একদিন সে ভর্ত্তি হইতে বাহির হইল। প্রেসিডেন্সি কলেজের দিকে সে ইচ্ছা করিয়াই ঘেঁসিল না, সেখানে সবদিকেই খরচ অত্যন্ত বেশী, মেট্রোপলিটান কলেজ গলির ভিতর, বিশেষতঃ পুরানো ধরণের বলিয়া সেইখানে ভর্ত্তি হইতে ইচ্ছা হইল না। বাছিয়া বাছিয়া একটা মিশনারীদের কলেজের বাড়ী বেশ ভাল বলিয়া মনে হইলেও ভর্ত্তি হইবার খরচ এত বেশী যে, সেখান হইতেও হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। মিশনারীদের কলেজ হইতে একদল ছেলে বাহির হইয়া সিটি কলেজে ভর্ত্তি হইতে চলিয়াছিল, তাহাদের দলে মিশিয়া গিয়া কেরাণীর নিকট হইতে কাগজ চাহিয়া লইয়া নাম লিখিয়া ফেলিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বাড়ীটার গড়ন ও আকৃতি তাহার কাছে এত খারাপ ঠেকিল যে, কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া সে বাহির হইয়া আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনের বৈশিষ্ট্য ও অন্তর্লীন সৌন্দর্য্যজ্ঞান উচ্চতর শিক্ষায়তনের যে মহনীয় ছবি আঁকিয়া তাহার সম্মুখে ধরিয়াছিল, তাহার সহিত এই মান্ধাতার আমলের প্রাচীন চুণবালি-খসা দেওয়াল, বিবর্ণ জানালা দরজা, আলো-হাওয়াশূন্য ক্লাশরুমগুলির দীনহীন চেহারা আদৌ খাপ খাইল না। অবশেষে রিপণ কলেজের বাড়ী তাহার কাছে বেশ ভাল ও খুব উঁচু মনে হইল। ভর্ত্তি হইয়া সে আর একটি ছাত্রের সঙ্গে ক্লাশরুমগুলি দেখিতে উপরে গিয়া ইলেকট্রিক পাখা খুলিয়া খুসির সহিত তাহার নীচে খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল, এত হাতের কাছে ইলেকট্রিক পাখা পাইয়া বার বার পাখাগুলা খুলিয়া বন্ধ করিয়া দেখিতে লাগিল।

অখিলবাবুদের মেসে থাকা ও পড়াশুনা দুইয়েরই ঘোর অসুবিধা। এক একঘরের মেজেতে তিনটা ট্রাঙ্ক, কতকগুলি জুতার বাক্স, কালি বুরুশ, তিনটি হুঁকা। ঘরে আর কোনো আসবাবপত্র নাই, রাত্রে আলো সবদিন জ্বলে না। ঘর দেখিয়া মনে হয় ইহার অধিবাসিগণের জীবনে মাত্র দুইটি উদ্দেশ্য আছে—আপিসে চাকরী করা ও মেসে আসিয়া খাওয়া ও ঘুমানো। এক একঘরে যে তিনটি বাবু থাকেন তাঁহারা ছটার সময় আপিস হইতে আসিয়া হাতমুখ ধুইয়া যে যার বিছানায় শুইয়া পড়িয়া চুপ করিয়া তামাক টানিতে থাকেন, একটু আধটু গল্পগুজব যাও বা হয়, প্রায়ই আপিস সংক্রান্ত। তারপরেই আহারাদি সারিয়া নিদ্রা। অখিলবাবু কোথায় ছেলে পড়ান, আপিসের পর সেখানে ফিরিতে খুব দেরী হইয়া যায়। তিনিও সারাদিন খাটুনির পর মেসে আসিয়াই শুইয়া পড়েন।

অপু এ রকম ঘরে এতগুলি লোকের সহিত এক বিছানায় কখনও শুইতে অভ্যস্ত নয়, রাত্রে তাহার যেন হাঁপ ধরে, ভাল ঘুম হয় না। অন্য কোথাও কোন রকম সুবিধা না হইলে সে যাইবে কোথায় ? তাহা ছাড়া অপুর আর এক ভাবনা মায়ের জন্য। স্কলারশিপ পাইলে সেই টাকা হইতে মাকে কিছু কিছু পাঠাইবার আশ্বাস সে আসিবার সময় দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোথায় বা স্কলারশিপ, কোথায় বা কি। মার কিরূপে চলিতেছে, দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবনাই তাহার আরও প্রবল হইল।

একদিন অখিল বাবু আপিস হইতে হাসিমুখে মেসে ফিরিলেন। অপুর জন্য তিনি কোথায় একটা ছেলে পড়ানো ঠিক করিয়া আসিয়াছেন, দুইবেলা একটা ছোট ছেলে ও একটি মেয়েকে পড়াইতে হইবে, মাসে পনেরো টাকা।

(ক্রমশঃ)

গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য-প্রভাব

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

মহীপালের মৃত্যুর পরে আর্য্যাবর্ত্তে পালবংশের রাজাদের প্রভাব হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে গৌড়ীয় শিল্পের প্রভাবও কমিতে লাগিল। ইহার কারণ তৎকালীন ইতিহাস। গজনীর স্থলতান মহমুদের ভারতবর্ষে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তের রাজাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদ বাড়িয়া চলিল। খৃষ্টাব্দের দশম শতক শেষ হইবার পূর্ব্বে পূর্ব্বসাগর হইতে পশ্চিমসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও বিশাল গুর্জ্জর-প্রতীহার সাম্রাজ্য ভাঙিয়া আট নয়টি বড় ও ছোট রাজপুত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশ লোপ পাইবার পূর্ব্বেই জব্বলপুরের কলচুরী চেদী বংশীয় রাজপুত রাজা গাঙ্গেয় দেব গঙ্গার দক্ষিণকূল পর্য্যন্ত জয় করিয়া কাশী ও প্রয়াগ অধিকার করিয়া লইলেন (খৃঃ ১০১৯)। খৃষ্টাব্দের একাদশ শতকের প্রথমভাগে যখন মহমুদের পিতা সবুক্তিগীন কাবুলের হিন্দুশাহীয় রাজ্য-ধ্বংসে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন চন্দেল্ল, পরমার, কচ্ছপঘাত, চাহমান প্রভৃতি রাজপুত রাজগণ মুসলমান-দিগকে বাধা দিবার জন্য একত্র হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের বংশগৌরব ও অভিমান ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে তাঁহারা অধিক দিন একত্র থাকিয়া শাহীয় বংশের রাজাদিগের বিশেষ উপকার করিতে পারেন নাই। তখনও রাজপুত রাজচক্রের নামেমাত্র অধিনেতা কান্য-কুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় সম্রাট, কিন্তু সমবেত রাজপুত-সেনার অধিনায়ক কালঞ্জর দুর্গের সামন্ত, চন্দেল্লবংশীয় রাজপুত সামন্ত রাজা ধঙ্গ বা গণ্ড। এই চন্দেল্ল বংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল। ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মথুরা ধ্বংস করিয়া স্থলতান মহমুদ যখন কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, তখন গুজরাটের শোলাঙ্কি, মালবের পরমার বা পঁবার, আজমেরের চাহমান বা চৌহান; গোয়ালিয়রের কচ্ছপঘাত বা কছবাহা, দিল্লীর তোমর, কালঞ্জরের চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্ল ও জব্বলপুর বা ত্রিপুরীর কোনও সামন্তরাজাই কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার বংশীয় শেষ মহারাজাধিরাজ রাজ্যপালদেবের সাহায্যার্থ আসিল

মাতা ও শিশু

না। অবশেষে অসহায় রাজ্যপাল স্থলতান মহমুদের নিকটে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। মহমুদ কান্যকুব্জ মহানগরের মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া গজনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন সমবেত সামন্তচক্র চন্দেল্ল-

রাজ্যধন্বের পুত্র গণ্ডের নেতৃত্বে যবনের পদানত হইবার অপরাধে দরিদ্র সহায়হীন হতভাগ্য রাজ্যপালকে শাস্তি তখন পূর্ব্বদিকে দুইটি নূতন স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইতেছিল।

তারামূর্ত্তি রামপালের রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে উৎসর্গী কৃত

খদির বনীতারা—নালন্দায় প্রাপ্ত

দিতে উদ্যত হইলেন। যুদ্ধে গোয়ালিয়রের কচ্ছবাহ সামন্ত অর্জ্জুন রাজ্যপালকে হত্যা করিল। অবসর বুঝিয়া জব্বলপুরের চেদীবংশীয় সামন্ত গাঙ্গেয়দেব চম্পারণ অধিকার করিলেন, তাঁহার পুত্র কর্ণদেব জনশূন্য কান্যকুব্জ নগর জয় করিয়া সেখানে নিজের রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিলেন। হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিকের যখন এইরূপ দশা,

বর্ত্তমান বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ দিকের অংশের পুরাতন নাম কর্ণাট। বোম্বাইয়ের বেলগাঁও বিজাপুর, শোলাপুর, ধারবাড় ও উত্তর-কানাড়া, মাদ্রাজের বেলারি ও দক্ষিণ-কানাড়া এবং সমগ্র মহীশূর রাজ্য লইয়া প্রাচীন কর্ণাট দেশ বিস্তৃত ছিল।

এই দেশের দুইজন ক্ষত্রিয় খৃষ্টাব্দের একাদশ শতকের

শেষভাগে হিন্দুস্থানের পূর্ব্বপ্রান্তে দুইটি ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রথম কর্ণাটরাজ্য স্থাপক মিথিলার নান্যদেব এবং দ্বিতীয় কর্ণাটক রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বিক্রমপুর বা পূর্ব্ববঙ্গের সামন্তসেন। এই সামন্তসেনের পৌত্র বিজয়সেন বাঙ্গালার স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা এবং কৌলীন্য-রীতি প্রতিষ্ঠাতা বল্লালসেনের পিতা। এইরূপে রাজ্য-প্রতিষ্ঠার ফলে কর্ণাট-প্রভাব গৌড়ে ও মিথিলায় প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু অদ্যাবধি শিল্পে কর্ণাটক-প্রভাব কেহ লক্ষ্য করেন নাই।

কি উপলক্ষে কোন্ পথে কেমন করিয়া সামন্তসেন বা নান্যদেব হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে রাজা হইলেই ক্ষত্রিয় হইত এবং ক্ষত্রিয়দের মধ্যে কর্ণাটক ও কান্যকুব্জ বলিয়া বিশেষ কোনও তফাৎ ছিল না। আমাদের দেশের শিল্পের ইতিহাস নাই, সুতরাং মূর্ত্তি দেখিয়া উপকর্ষ বা অপকর্ষের ক্রম স্থির করিতে হয়। কর্ণাটক বা দাক্ষিণাত্য প্রভাব প্রথম গৌড়েশ্বর রামপালদেবের রাজ্যের প্রারম্ভে দেখিতে পাওয়া যায়। মহীপালের রাজ্যকালের শেষভাগে গৌড়ীয় শিল্পরীতির বিস্তার কমিয়া গিয়া যে অবনতির সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা একাদশ শতকের শেষপাদ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ইহারই মধ্যে একাদশ শতকের তৃতীয়পাদে যে উৎকর্ষের চিহ্ন দেখা যায় তাহাই গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য-প্রভাব।

প্রথম মহীপালের পৌত্র তৃতীয় বিগ্রহপালের তিন পুত্র; দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল ও রামপাল। হিন্দু আইনমতে পিতার মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় মহীপাল রাজত্ব পাইলেন, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার নীতি-বিরুদ্ধ আচরণে পালরাজ্যের বড় বড় সামন্তেরা ও প্রজারা তাঁহার উপরে এরূপ বিরক্ত হইয়া গেল যে, উত্তর-বঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতি বিদ্রোহী হইলে কেহই রাজার সাহায্য করিতে আসিল না। দ্বিতীয় মহীপাল অল্প সৈন্য লইয়া বিদ্রোহ

বোধিসত্ত্ব—পাটনা জেলায় চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত

দমন করিতে গিয়া নিহত হইলেন। কৈবর্ত্তরা উত্তর-বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিল। প্রথম মহীপাল অসংখ্য শত্রু বিনাশ করিয়া ও নাই। দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ কারাগারেই মরিলেন, তখন তৃতীয় বিগ্রহপালের কনিষ্ঠ পুত্র সামন্তদিগকে একত্র করিয়া পৈতৃক রাজধানী উদ্ধারের চেষ্টা করিতে

বিষ্ণুমূর্ত্তি

অর্দ্ধনারীশ্বর

পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিয়া গৌড়ের পঞ্চবিভাগ একত্র করিয়া যে-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সে-রাজ্যে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে এত বড় বিপদ আর হয় লাগিলেন। উদ্যোগে ও যুদ্ধে অনেক সময় কাটিয়া গেল। ইহার মধ্যে বারেন্দ্র কৈবর্ত্তদের প্রথম রাজা দিব্বোক মরিয়া গেলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম রাজা হইলেন।

রামপালের সামন্তেরা গঙ্গার উপরে নৌকার সেতু বাঁধিয়া বারেন্দ্র কৈবর্ত্তদের হারাইয়া দিলেন। গৌড়রাজ্য আবার একরাজার অধীন হইল।

যুদ্ধবিগ্রহ, অশান্তি ও রক্তপাতের সময় কোনও দেশেই সুকুমার কলার উন্নতি দেখা যায় না। গৌড়েও

দেবীমূর্ত্তি—গয়ার বিষ্ণুপাদ মন্দিরের নিকট প্রাপ্ত

তাহাই হইল। প্রথম মহীপালের মৃত্যুর পরে অবনতি হইতে আরম্ভ হইয়া কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের সময়ে শিল্পকলা লোপ হইবার উপক্রম হইল, কিন্তু রামপাল সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে হিন্দুস্থানের পূর্ব্বদিকে আবার শান্তি ফিরিল। ধ্বংসপ্রায় গৌড়ের নিকটে নূতন রাজধানী

বুদ্ধমূর্ত্তি
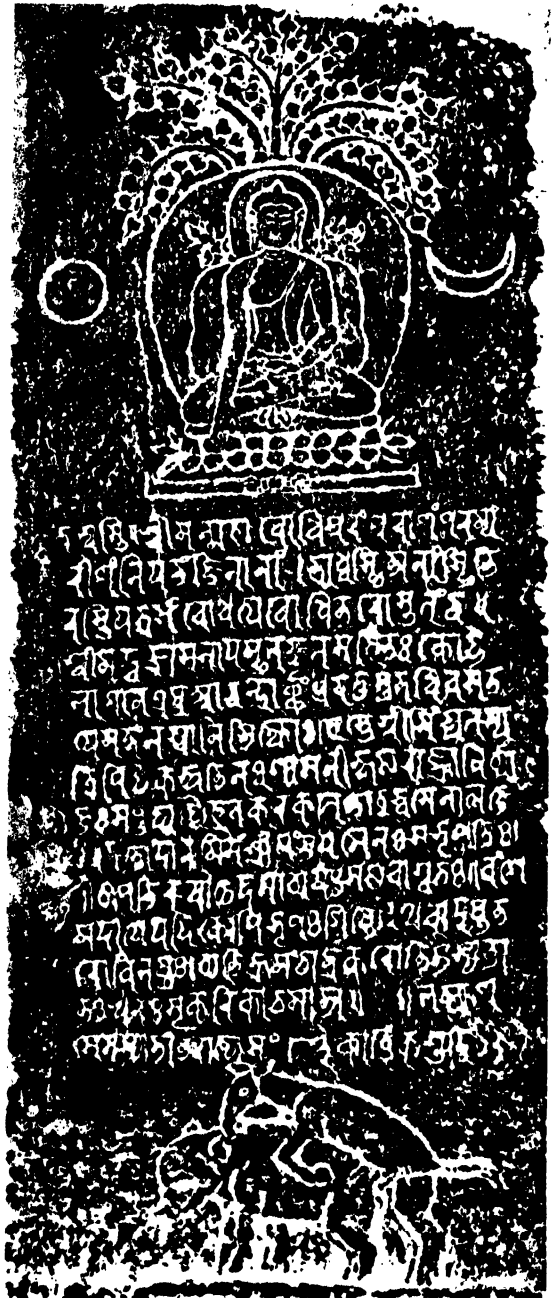
নির্ম্মাণ করাইয়া রামপাল তাহার নাম রাখিলেন রামাবতী। বৌদ্ধরাজা রামপাল জগদ্দল মহাবিহার সংস্কার করাইয়া

তাহাতে অনেক মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। এই রামপালদেবের রাজ্যের দ্বিতীয় বৎসর হইতে গৌড়ীয় শিল্পে—বিশেষতঃ স্ত্রী-মূর্ত্তিতে — দাক্ষিণাত্য-প্রভাবের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এই দাক্ষিণাত্য বা কর্ণাটক প্রভাব তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা দ্বিতীয়

চণ্ডীমূর্ত্তি

মহীপালের রাজত্বে গৌড়ীয় শিল্পে অনুভূত হইয়াছিল কিনা তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না। তবে মিথিলা ও পূর্ব্ববঙ্গে কর্ণাটক-রাজ্য প্রতিষ্ঠার অতি অল্প পরেই যে গৌড়দেশের শিল্পে দাক্ষিণাত্য বা কর্ণাটক প্রভাব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু রামপালের রাজত্বকালের দ্বিতীয় সম্বৎসরের পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য-প্রভাব এত স্পষ্ট বুঝা যায় না। নালন্দায় আবিষ্কৃত ও এই বৎসরের প্রতিষ্ঠিত তারামূর্ত্তিতে উরঃস্থলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে গৌড়ীয় শিল্পের উপরে দাক্ষিণাত্য রীতির প্রভাব প্রমাণ করিয়া দিতেছে। এই জাতীয় দ্বিতীয় মূর্ত্তিতে কোনও লেখ নাই। ইহা উত্তর-বঙ্গের কোনও স্থানে আবিষ্কৃত অর্দ্ধ-নারীশ্বর মূর্ত্তি। এই দুইটি মূর্ত্তিতে চালুক্য বা চোল বংশের আমলের শিল্পের মত গৌড়ীয় শিল্পেও অলঙ্কার ও বস্ত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও উরস্থলের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালা দেশের পাল-বংশের শেষ রাজা ও রামপালের কনিষ্ঠপুত্র মদনপালের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হারীতি মূর্ত্তিতেও দাক্ষিণাত্য-রীতির প্রভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু উরস্থলের অস্বাভাবিক বিকাশ কমিয়া আসিয়াছে। নিজ বাঙ্গালা দেশে পাল-রাজ বংশের অধিকার লোপ হইবার পরে সেন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে পূর্ব্ববঙ্গে দামোদর নামক একজন রাজকর্ম্ম-চারী একটি চণ্ডীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি এই মূর্ত্তিটি ঢাকা নগরে ডালবাজারে বুড়িগঙ্গার একটি ঘাটের উপরে আবিষ্কার করিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিতেও কর্ণাটক বা দাক্ষিণাত্য রীতির প্রভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রামপালের সময়ে শিল্পের কথঞ্চিৎ উৎকর্ষ হইয়া পাল-রাজবংশের অধঃপতনের সময়ে আবার অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। গয়ায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত স্ত্রীমূর্ত্তিতেই এই অবনতির সময়ে গৌড়ীয় শিল্পে দাক্ষিণাত্য-প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীমূর্ত্তিতে দাক্ষিণাত্য বা কর্ণাটক প্রভাব যে পরিমাণ বুঝিতে পারা যায়, গৌড়ীয় শিল্পের পুরুষমূর্ত্তিতে তাহা পারা যায় না। প্রমাণ চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত রাম-পালের রাজত্বকালের ৪২ বর্ষের বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি। পুরুষ মূর্ত্তিতে উরস্থলের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায় না। কেবল কাপড়ের ভাজের দাগ ও তাহার অঙ্কনের রীতি দেখিয়া শিল্পের প্রগতি বুঝিতে হয়। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত গরুড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্ত্তিতেও কাপড়ের ভাজের দাগে

কর্ণাটক রীতির প্রভাব গৌড়ীয় শিল্পে অনুভব করা যায়। মুসলমান-বিজয়ের কিছু পূর্ব্বে গৌড়ীয় শিল্পে পুরাতন গৌড়ীয় রীতি ও নবাগত কর্ণাটক বা দাক্ষিণাত্য রীতির একটা সমীকরণ হইয়া গিয়াছিল। ইহাই গৌড়ীয় শিল্প-রীতির শেষ উৎকর্ষের যুগ। এই যুগেও গৌড়ীয় শিল্পী নিজের প্রভাবের অপূর্ব্ব নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। প্রথম নিদর্শনটি মগধে, ইহা নালন্দার নিকটে আবিষ্কৃত পাষাণময়ী বৌদ্ধ দেবীর খদিরবনীতারা। রাজের পুত্র বণিক্ জশদেব (যশোদেব) খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকের কোনও সময়ে এই মূর্ত্তিট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এখনও মূর্ত্তিট প্রায় অখণ্ডিত আছে। কাপড়ের ভাঁজের দাগে কর্ণাটক-রীতির প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু উরস্থলের অস্বাভাবিক স্ফীতি কমিয়া আসিয়াছে। সেনরাজকুলের রাজত্বকালে গৌড়ীয় শিল্পে যে উৎকর্ষের যুগ আসিয়াছিল তাহার আর একটি নিদর্শন প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় বিক্রমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা একটি অতিক্ষুদ্র বৃদ্ধার মূর্ত্তি। বৃদ্ধা জরাজীর্ণা অস্থিচর্ম্মাবশিষ্টা, তাঁহার দুইখানি হাত এবং তিনি অলঙ্কারহীনা। শিল্প-হিসাবে এই বৃদ্ধা রমণীর মূর্ত্তি ভারতবর্ষে অতুলনীয়। একটি বৃহৎ ফুল্ল কমলের উপরে দেবী উপবিষ্টা। পদ্মের নীচে একদিকে একটি ক্ষুদ্র গর্দ্দভ মূর্ত্তি আছে বলিয়া মূর্ত্তিটি শীতলাদেবীর মূর্ত্তি বলিয়া অনুমিত হয়।

খৃষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকের শেষভাগে ভগবৎ প্রেরিত একটা নূতন শক্তি আসিয়া সকল অসমের সমীকরণ করিয়া গেল, বৌদ্ধ ও হিন্দুর দ্বন্দ্ব, শৈবের গর্ব্ব, বৈষ্ণবের প্রেম, শাক্তের রৌদ্র, এমন কি জৈনের অহিংসা পর্য্যন্ত ধূলায় লুটাইয়া সমান হইয়া গেল। সেইদিন মথুরায় শক রাজার অভ্রংলিহ বৌদ্ধবিহার, ব্রাহ্মণ্যস্পর্দ্ধী নীলাম্বরচুম্বী মন্দির-শিখর, প্রয়াগ ও কাশীর অতি-স্ফীত তীর্থরাজ-গর্ব্ব, নালন্দা ও বিক্রমশিলার সহস্র সহস্র বর্ষের সযত্ন-সঞ্চিত গ্রন্থরাশি ও বিপুলজ্ঞানমণ্ডিত পণ্ডিত-সম্প্রদায় সমান হইয়া ধূলায় লুটাইয়া মানবের জ্ঞান-বীর্য্যের অসারতা প্রতিপন্ন করিয়া দিল। সেইদিন সিন্ধুতট হইতে ব্রহ্মপুত্র তীর পর্য্যন্ত শিল্পের ইতিহাস শেষ হইল।

তখনও দেশে বৌদ্ধ ছিল, তখনও হিন্দু ছিল, তখনও বৌদ্ধ বা হিন্দু তীর্থযাত্রায় বাহির হইত। ভারতীয় শিল্পেতিহাসের শেষ অধ্যায় শেষ হইলে শিল্পের কি অবস্থা

শীর্ণ নারীমূর্ত্তি—নদীয়া জেলার বিক্রমপুর গ্রামে প্রাপ্ত

হইয়াছিল তাহা এই সমস্ত তীর্থযাত্রীর শেষ উপহারে দেখিতে পাওয়া যায়।

পাল-বংশের শেষরাজা গোবিন্দ পালের রাজ্যের ৩৮শ বর্ষে মগধ দেশেও পাল-বংশের অধিকার লুপ্ত হইল। এই গোবিন্দ পাল ১১৬১ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন,

সুতরাং ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে এই সময়ে অথবা সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ইখ্‌তিয়ারুদ্দীন মহম্মদ বিন বখ্‌তিয়ার বিহার শরীফ্‌ বা নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিহার ধ্বংস করিয়া সমস্ত মগধ দেশ বা দক্ষিণ-বিহার প্রদেশ জয় করেন। তখনও বৌদ্ধতীর্থে যাত্রী আসিত। বুদ্ধগয়া বা মহাবোধি বৌদ্ধতীর্থের মধ্যে তীর্থরাজ। বৌদ্ধেরা তখন লুকাইয়া চুরি করিয়া মহাবোধি বা বুদ্ধগয়ায় আসিত। আগে আগে তীর্থযাত্রীরা মহাবোধিতে আসিয়া যেমন বড় বুদ্ধ মূর্ত্তি বা স্তূপ প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইত তখনও সে রীতি ছিল, কিন্তু মুসলমানদের ভয়ে যাত্রীরা বেশী দিন তীর্থে বাস করিতে ভরসা করিত না, সুতরাং শিল্পীর আর পাথর হইতে মূর্ত্তি কুঁদিয়া বাহির করিবার অবসর হইত না, সে তাড়াতাড়ি পাথরের গায়ে আঁচড় কাটিয়া বোধিবৃক্ষতলে বৌদ্ধমূর্ত্তি আঁকিয়া দিত। দশ বার বৎসর পূর্ব্বে মহাবোধি বা বুদ্ধগয়ার নিকটে জানিবিঘা গ্রামে এরকম একটা আঁচড়-কাটা বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্মণসেনের প্রতিষ্ঠিত অব্দের ৮৩ সম্বৎসরে, অর্থাৎ ১২০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, নালন্দা-ধ্বংসের তিন বৎসর পরে গৌড়ীয় শিল্পের একটা দুরবস্থা হইয়াছিল।

ধবলেশ্বরী, শীতললক্ষা ও মেঘনার তীরে সেনরাজ-বংশ তখনও স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু শিল্পের উৎস শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে পাথর দুষ্প্রাপ্য, সুতরাং শিল্পীকে বাধ্য হইয়া মাটি অথবা কাঠের মূর্ত্তি গড়িতে হইত। ঢাকা জেলার মাণিকগঞ্জ মহকুমায় এবং কুমিল্লায় মুরাদনগরে অনেক হিন্দু ও বৌদ্ধ কাঠের মূর্ত্তি বাহির হইয়াছে এবং তাহার অনেকগুলি ঢাকার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

কোথায় পঞ্চজন ?

শ্রীবৈদ্যনাথ কাব্য-পুরাণতীর্থ

মরণভীরুর আশা মিটানোর সময় নাহিক আর।
সম্মুখে হের গর্জ্জে ভীষণ মৃত্যুর পারাবার।
মরণ ডাকিছে আয়,—
শহীদ সাধক ছোট খেলোয়াড় মরণের ইসারায়।
মৃত্যুর পারে মরণের দ্বারে ওই যে অরূপ আলো—
চক্ষে ধরালো বিষম ধাঁধা, বক্ষে লাগিল ভালো।
কুরুক্ষেত্রে রক্তোৎসবে মানুষের মাতামাতি;
পাঞ্চজন্যে নর-নারায়ণ ফুলান বুকের ছাতি।
হে মোর পৌর সন্ন্যাসী সুধী, তোরাই পঞ্চজন;
তোমাদের লাগি যুগ যুগ জাগি কাঁদিছেন নারায়ণ।

কিসের জীবন ? কোথা তার রূপ ? ফুল ফোটা ?
ফুল ঝরা ?
হে দরদী, কেন দরদ এমন— ? কেন এই বেঁচে মরা ?
জীবনের হাসি খুসি—
কি দিয়েছে তোমা ? বঞ্চনা কি এ নিজেরে
নিজেই তুমি।
সন্তোষ ? সে ত ভাল কথা ভাই; আকাঙ্ক্ষা দুর্দ্দম—
জীবন-যুদ্ধে সহজ নয় সে—নয় তা সে মনোরম।
হাসির উৎস রুদ্ধ বন্ধু ; কোথা হাসি ? কোথা গান ?
ক্ষুধাতুর দোঁকে ক্ষুধারি জ্বালায়, ব্যথাতুর কাঁদে প্রাণ।
এই সুসময়, আর দেরি নয় কোথায় পঞ্চজন ?
ক্ষীরোদ-সাগরে সমাধি-মগ্ন নর লাগি নারায়ণ।

রোদনের শাঁখ বৃথা বেজে যায় ঐ ত রে সাহানায়।
পাঞ্চজন্যে হের নারায়ণ ডাকিছেন আয়, আয়!
তোদেরি অস্থি দিয়া
পাঞ্চজন্য তৈরি সে কি রে ভুলেছে তোদের হিয়া।
পৃথুল পার্থ পৃথিবী কি তোরে করে নাই আবাহন ?
কেন তবে ঐ আগমনী-স্বরে বোধনে বিসর্জ্জন ?
এই রূপ-রস-মোহন মাধুরী তোরি লাগি—তোরি লাগি।
ওরে শাশ্বত ভিখারী তবুও ফিরিছ কি ধন মাগি।
কিছু বৃথা নয়, এই সুসময়, কোথায় পঞ্চজন ?
এমনি কি করি যুগ যুগ ধরি ফিরিবেন নারায়ণ ?

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৫) বলিদ্বীপ : বুলেলেঙ্—কিন্তামানি—বাঙ্লির পথে।

২৬শে আগষ্ট ১৯২৭, শুক্রবার।—
ভোর ছটার মধ্যে তৈরী হ'য়ে কাপড় টাপড় প'রে ডেকে এসে দাঁড়ালুম। দক্ষিণ-মুখো জাহাজ চ'ল্ছে, ভোরের আলো-আঁধারীর মধ্যে দূরে বলির পাহাড় নজরে প'ড়ল। জাহাজ পঁউছুতে পঁউছুতে বেশ ফরসা হ'য়ে গেল, নীচে সমুদ্রের ধারেই বুলেলেঙ শহরের দু চারখানা বাড়ী দেখা গেল, তার পিছনে কালো বনের ছায়া, তার উপরের নারক'ল গাছের চূড়োয় পূবদিক থেকে উঠন্ত সূর্য্যের দু চারটে সোজা রশ্মি এসে ফিকে সবুজ মাখিয়ে দিয়েছে। একটু মন্দ মধুর হাওয়া দিয়েছে। বলিদ্বীপে আমাদের এই প্রথম প্রবেশের সময় প্রকৃতি দেবী যেন অতি সুমিষ্ট ভাষে স্বাগত ক'রলেন। বুলেলেঙ-এ বন্দর ব'ল্তে তেমন কিছু নেই—ডাঙার ধারেই অগভীর জল, চটান মতন, সেই জলের উপর দিয়ে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত ছোটো একটা জেটী চ'লে এসেছে—শহরের সমুদ্রের ধারের রাস্তা থেকে সটান জলের ভিতর যেন খানিকটা মানুষ-চলবার পথ; তা থেকে আরও বেশ খানিকটা দূরে একটু গভীর জলে আমাদের জাহাজ লঙ্গর ফেল্লে। নৌকায় ক'রে আমাদের তীরে আস্তে হল। স্থানীয় নৌকা, চওড়া খোল, লোহার কীল দিয়ে পাটাতনগুলি আটকানো; মাঝীমাল্লাদের রঙীন চিত্রবিচিত্র সারং মালকোঁচা ক'রে পরা, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় রঙীন রুমাল জড়ানো, বেশ মজবুত চেহারার লোক। জাহাজের সিঁড়ি বেয়ে আমরা নামলুম; আমাদের মালপত্র ডেকের উপর স্তূপাকার করে রাখা হ'য়েছিল, সেগুলিকেও নামানো হ'ল। জেটি দিয়ে শেষে ডাঙায় এসে পঁউছুলুম, বলিদ্বীপের মাটিতে অবতরণ ক'রলুম।

আমাদের সঙ্গে দু চার জন যবদ্বীপীয় ছিল, আর ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয় ছিল; আর ছিল গুজরাটী খোজা দোকানদার জন কতক—এরা তৃতীয় শ্রেণীতে আস্ছিল, গাঁঠরী গাঁঠরা নিয়ে নাম্‌ল, সেই কালো কাপড়ের বুক-খোলা কোট-আচকান পরা, পেট-মোটা চেহারা, নেড়া মাথায় জরীর বাঁধা পাগড়ী; এরা দক্ষিণ বলিতে বাদুঙ শহরে যাবে।

জেটীর ধারেই, সমুদ্রের কিনারায়, একটী মন্দির; বলিদ্বীপের এই প্রথম মন্দির চোখে প'ড়ল। পাচীল দিয়ে ঘেরা হাতার মধ্যে মন্দিরের বাড়ী; সমুদ্রের ধারে এই পাচীলের মধ্যে একটী সাগর-মুখো উন্মুক্ত তোরণ-দ্বার খালি দেখা যাচ্ছিল। বেলা বেশী হয় নি, লোকজনের বেশী ভীড় নেই। যাত্রীদের মাল-পত্র নিয়ে ব্যস্ত জন-কতক কুলী, আর দূরে কুত-ঘাটায় বা চুঙ্গীর দপ্তরে জন কতক ডচ আর অন্য সরকারী লোক দাঁড়িয়ে। কবিকে, আর আমাদের সঙ্গের ডচ্ কাউণ্টটীকে স্বাগত করবার জন্য জন কতক ডচ ভদ্রলোক এসেছেন; আর অন্য ইউরোপীয় যাত্রীদের জন্য স্থানীয় Travellers Agents কোম্পানীর লোক। একটু দূরে কতকগুলি মোটর দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দলকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবার জন্য বিশেষ ক'রে একটী ডচ্ ভদ্রলোক এসেছিলেন, ইনি বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপে আমাদের সঙ্গে অনেকটা সময় একত্র থেকে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন; এঁর নাম Samuel Koperberg সামুএল কোপেয়ার্‌বেয়ার্গ্ (বা কোপ্যারব্যার্গ)। আমাদের মালপত্র কাষ্টম আপিসে নিয়ে গিয়ে, দু এক মিনিটের মধ্যেই ছেড়ে দিলে। কোপ্যার্‌ব্যার্গ্ কবিকে নিয়ে গেলেন তাঁর গাড়ীতে চড়িয়ে দিতে। কবি,

ধীরেন বাবু, সুরেন বাবু, Bake বাকেরা স্বামী স্ত্রী, Drewes দ্রেউএস ব'লে 'বালাই-পুস্তাকা'র কর্ম্মচারী ডচ যুবকটী, কোপ্যারব্যার্গ, আর আমি—এই আট জনে একটা দল হ'ল। আমরা একত্রে ভ্রমণ ক'রবো, যতদূর সম্ভব এক জায়গায় থাকবো। তিনখানি মোটর আমাদের জন্য ঠিক ছিল, একটায় কবি,
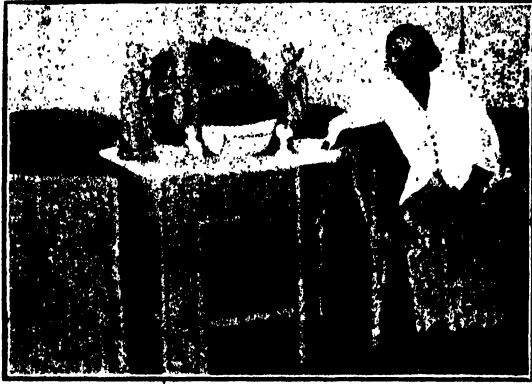
'রাণী' পাতিমা

বাকে-পত্নী, কোপ্যারব্যার্গ্ আর আমি,—একটাতে বাকে, সুরেন বাবু, ধীরেন বাবু, আর দ্রেউএস, আর তৃতীয়টায় আমাদের মালপত্র। অন্য অন্য ডচ যাত্রীরা চট্ পট মোটরে ক'রে বেরিয়ে প'ড়লেন।

মোটর চ'ড়ে ব'স্তে ব'স্তেই বেলা বেড়ে গেল, সাতটা হ'য়ে গেল। ছোটো শহরটিতে ধীরে ধীরে সাড়া প'ড়ে গেল। ফেরিওয়ালা বেরুলো, আর জেটির ধারের সরু রাস্তায় বলিদ্বীপের দুচারটী মেয়েকে যেতে দেখলুম। মাথায় জলের পাত্র, বা ঝোড়ায় ক'রে কিছু নিয়ে যাচ্ছে, কি অপূর্ব্ব মনোহর গতিভঙ্গীতে এই সব তন্বঙ্গী মেয়েরা চলা ফেরা ক'রে যেতে লাগ্‌ল! বলিদ্বীপের মেয়েদের তন্বী শ্রী আর তাদের অপূর্ব্ব সুষমাময় সৌন্দর্য্যের কথা যে প'ড়ে ছিলুম, তার একটু আধটু আভাস এই দ্বীপে অবতরণের অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা পেলুম।

মোটরগুলি ভাড়া করা হ'য়েছিল; মোটরের মালিক—অধিকারিণী—এলেন। ইনি বলিদ্বীপের একটি সর্ব্বজন-পরিচিত ব্যক্তি। বলিদ্বীপের কোনও বর্ণনা এঁকে বাদ দিয়ে হবার জো নেই। ইনি হ'চ্ছেন্ একটী প্রৌঢ় বয়স্কা বলিদ্বীপের মহিলা, এঁর নাম পাতিমা। এঁকে অনেক সময়ে Princess Patima বা 'রাণী পাতিমা' ব'লে উল্লেখ করা হয়। এঁর জীবনের কাহিনী রহস্যময়। আপাততঃ ইনি বুলেলেঙ শহরে বলিদ্বীপের প্রাচীন কারুশিল্পের জিনিষের একটি কারখানা আর দোকান নিয়ে আছেন। বলিদ্বীপের প্রাচীন সোনা রূপার কাজ, ছাপা কাপড়, অস্ত্রশস্ত্র, ছবি, চামড়ায় কাটা নানা মূর্ত্তি, কাঠে খোদাই মূর্ত্তি, এই সব বিদেশী টুরিস্ট্‌দের বিক্রী করেন। এ ছাড়া বলিদ্বীপের বৈশিষ্ট্য যত লোক রকমের শিল্প আছে, তাও লোক লাগিয়ে তৈরী ক'রে বিক্রী করেন। তারপর এঁর কতকগুলি মোটর গাড়ী আছে, সেগুলি ভাড়ায় খাটান। এই সব কারবারে এঁর বেশ আয় হয়। ইনি ডচ আর বলিদ্বীপীয় উভয় শ্রেণীর লোকেদের কাছে খাতির পান। কোনও জাহাজ বুলেলেঙ-এ লাগ্‌লে, ইনি নিজের দোকান থেকে শিল্প দ্রব্যের পসরা নিয়ে যাত্রীদের কাছে দেখান, নিজের বাড়ীতে দোকানেও তাদের নিয়ে আসেন। মোট কথা, পাতিমা হ'চ্ছেন একজন বেশ ব্যবসায়-বুদ্ধিযুক্ত স্ত্রীলোক, এ বিষয়ে তাঁর চরিত্রের বিশেষ দার্ঢ্য আছে। কিন্তু পাতিমার অতীত জীবন, যার সম্বন্ধে একটু আধটু আভাস মাত্র বিদেশীরা পায়—তার দ্বারাই এঁর চারদিকে একটা আকর্ষণের আবেষ্টন ক'রে দিয়েছে, লোকে স্বতঃ-প্রবৃত্ত হ'য়ে এঁর কথা শুনতে চায়। পাতিমা যমের দরজার ফেরত—যৌবন কালে পাতিমা আসন্ন মৃত্যুর কবল থেকে নিজেকে উদ্ধার করেন, নিজের প্রাণ বাঁচান। পাতিমা নাকি দক্ষিণ বলির এক রাজার অন্যতমা পত্নী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর কয় মাস পরে অন্ত্যেষ্টির সময় অন্য রাণীদের সঙ্গে পাতিমাকেও হত্যা ক'রে বলিদ্বীপের প্রথা অনুসারে সতীদাহ করবার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু পাতিমা নিজের জীবন এমনি ভাবে দিতে সম্মত হন নি—তিনি কোনও রকমে দেশ থেকে পালিয়ে এসে উত্তরে ডচেদের কাছে আশ্রয় নেন। এখন থেকে (১৯২৭ থেকে) এ প্রায় ১৭।১৮ বছর পূর্ব্বেকার কথা। ডচেরা তখন কেবল উত্তর বলির একটু অংশ দখল ক'রে ছিল—দক্ষিণ বলি এদের অধীন তখনও হয় নি, তবে অধীনে আনবার তোড়-

জোড় চ'লছিল। সেই থেকে পাতিমা বুলেলেঙ্ শহরের অধিবাসিনী, আর ক্রমে ক্রমে প্রতিপত্তিশালিনী হ'য়ে দাঁড়ান। পাতিমার সম্বন্ধে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে—তদনুসারে ইনি কোনও রাজার রাণী ছিলেন না, দক্ষিণ বলির ক্লুংকুং নগরের রাজার অন্তঃপুরের একজন পরিচারিকা মাত্র ছিলেন, ডচেরা ক্লুংকুং আক্রমণ ক'রলে ক্লুংকুং-এর রাজা যখন সপরিজনে 'পুপুতান' বা আত্মহত্যা করেন, তখন পাতিমা কোনও রকমে নিজের প্রাণ রক্ষা করেন, পরে উত্তরে এসে অধিষ্ঠিতা হন।

বলিদ্বীপ দেখে ফেরবার পথে যখন আমরা আবার বুলেলেঙ-এ আসি, তখন পাতিমার সঙ্গে আমাদের আলাপ করবার সুযোগ হয়, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বলির শিল্পজাত কিছু কিছু দেখি, আর কিছু কিনি,—আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে দু চারটে কথা হয়। তখন পাতিমা বলেন যে তিনি 'বাকার' বা সতীদাহ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যই উত্তরে ডচেদের রাজ্যে চ'লে আসেন।—বুলেলেঙ-এ পাতিমার পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে কোনও খবর কেউ ভালো জানে না। পাতিমার আবার বিবাহ হ'য়েছিল, দুটী কন্যাও হয়। এই মেয়ে দুটী মায়ের দোকানপাটের কাজে সাহায্য করে। এদের একজনকে পরে পাতিমার বাড়ীতেই দেখি —মা যে কত সুন্দরী ছিল তা এই মেয়েকে দেখে অনুমান করা যায়।

পাতিমা একজন হুঁশিয়ার চট্‌পটে কার্য্যক্ষম স্ত্রীলোক বটে; কথাবার্ত্তায় চাল-চলনে যে পাঁচ জনের সঙ্গে মিশ্‌তে অভ্যস্ত, তাও বেশ বোঝা যায়। জগতের অভিজ্ঞতা আছে,—একেবারে সাধাসিধে সরল ব'লে মনে হ'ল না; আর একটু প্রগলভাও বটে। বুলেলেঙ শহরের তিনি একজন প্রধান; রবীন্দ্রনাথ আস্‌ছেন, তাঁর কথা শুনেছেন,—রবীন্দ্রনাথ তাঁরই গাড়ীতে যাচ্ছেন, পাতিমা স্বয়ং এলেন তদারক ক'রতে, যাতে তাঁর কোনো কষ্ট না হয়। পাতিমার কথা আগেই প'ড়েছিলুম, এইবার তাঁকে চাক্ষুষ দেখলুম। গৌরবর্ণা বলিজাতীয়া মহিলা, একটা রঙীন ফুলপাতার নক্‌শা ছাপা বিলিতী কাপড়ের সারং পরা, গায়ে মালাই মেয়েদের মত একটা 'কাবায়া' বা কোর্ত্তা, হাতে ছাতী, খালি পা, পান-দোক্তা খেয়ে দাঁত গুলি কালো রঙ হ'য়ে গিয়েছে; কোপ্যারব্যার্গ্ পরিচয় করিয়ে' দিলেন, ইনি হ'চ্ছেন 'রাণী পাতিমা'। রবীন্দ্রনাথও এ'র কথা আগেই শুনেছিলেন। পাতিমা স্বয়ং হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইউরোপীয় কায়দায়

বলিদ্বীপের মন্দির-তোরণ

আমাদের সকলের সঙ্গে করমর্দ্দন ক'রলেন। তার পরে সব ঠিক হ'লে, গাড়ী ছাড়বার সময়ে আমাদের 'সালামাৎ জালান্' বা শুভযাত্রা ব'লে বিদায় দিলেন।

আমরা যাবো, বুলেলেঙ থেকে ঘণ্টা তিনেকের মোটর পথে, পূর্ব্ব-মধ্য বলিতে Bangli বাঙ্‌লি বলে একটা গণ্ডগ্রামে। কোপ্যারব্যার্গ আর ডচ সরকারের কতকগুলি কর্ম্মচারী সব ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন—বাঙলিতে স্থানীয় জমীদার বা রাজার—ইনি আবার ডচ সরকারের অধীনে Regent রেখণ্ট বা ম্যাজিষ্ট্রেটও বটেন—তাঁর বাড়ীতে তাঁর পিতৃব্যের শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে উৎসব হবে— পূজা

আর অন্যান্য অনুষ্ঠান,যাত্রা নাচ গান সব হবে,আমরা গিয়ে সে সব দেখবো; আর দুপুরে বাঙলির রাজারই অতিথি হবো। তার পরে সারা দুপুর বাঙ্লিতে কাটিয়ে বিকালে আমরা যাবো পূর্ব্ব-বলিতে,—কারাঙ-আসেম ব'লে একটী ছোটো শহরে, সেখানকার রাজার অতিথি হ'য়ে সেখানে দু তিন দিন কাটাবো। কারাঙ-আসেম-এর রাজা, আর অন্যান্য অনেক রাজা, আর বিস্তর ডচ্ কর্ম্মচারী,—সকলে বাঙলিতে এসে জমা হবেন। প্রথম দিনেই এই শ্রাদ্ধ সভায় বলিদ্বীপের সভ্যতার আর আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে আমাদের একটু বেশ পরিচয় হবে।

বুলেলেঙ থেকে যাত্রা ক'রলুম। ছোট শহরটী, দু তিন মিনিটের মধ্যেই শহর ছেড়ে মাঠের মধ্যে প'ড়লুম। বুলেলেঙ-এর মাইল দুই দক্ষিণে বলির রাজধানী Singaradja সিংহরাজা শহর; দুধারে সবুজ ধানের খেত, তার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার মোটরের রাস্তা। পায়ে হাঁটা দু চার জন রাহী ছাড়া আর লোক চলাচল নেই। অল্প কয় মিনিটে সিংহরাজায় পঁউছে আমরা এখানকার Pasanggrahan 'পাসাংগ্রাহান্' বা ডাক-বাঙ্লার সামনে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের এই 'পাসাংগ্রাহান'গুলির সম্বন্ধে পরে ব'লবো। সিংহরাজার এই ডাক বাঙলাটি মোটর গাড়ী থামবার একটী আড্ডা; এখানে কোপ্যারব্যার্গ্ তাঁর বাক্স-পেঁটরা রেখেছিলেন, সেগুলি তুলে নিলেন। ইতিমধ্যে দেখি, পাতিমা আমাদের পিছনে পিছনে আর একখানা মোটরে ক'রে এসে হাজির। মোটরগুলির কি ঠিক ক'রে নেবার ছিল, সিংহরাজায় আমাদের ৮।১০ মিনিট দেরী হ'ল। পাতিমা আবার ঘটা করে কবির কাছথেকে বিদায় নিলেন—আবার 'সালামাৎ জালান'-এর বার বার আবৃত্তি। পাতিমাকে এবার খানিকক্ষণ ধ'রে আমাদের দেখবার অবকাশ ঘ'ট্‌ল। মহিলাটিকে বিশেষ একটু forward বা গায়ে-পাড়া ব'লে বোধ হ'ল। ধরণ ধারণ সম্বন্ধে আমাদের সকলেরই এক মত হ'ল, যেন কতকটা হীরা মালিনীর ভাব—এমন একজন স্ত্রীলোক who has a past that is not yet wholly past.

সিংহরাজা শহরটী বুলেলেঙ্-এর চেয়েও বিরল-বসতি ব'লে মনে হ'ল। ডচ রাজকর্ম্মচারীদের বাঙলা বাড়ী, আর কতকগুলি আপিস, এই নিয়েই যেন শহরটী। কিছু বৈশিষ্ট্য নেই। সিংহরাজার পরে খানিকটা সমতল ভূমি, তারপরে দক্ষিণ-পূর্ব্বে একটী পাহাড় পেরিয়ে পাহাড়ের ওপারে সমতলভূমিতে আমাদের গন্তব্য স্থল বাঙ্লি। বলিদ্বীপে ডচেরা হালে অনেকগুলি সুন্দর রাস্তা তৈরী ক'রেছে। সমস্ত দ্বীপটী জুড়ে এখন মোটর-গাড়ী চ'ল্‌ছে, এদেশে রেলের আর সুবিধা হবে না। আগে লোকে হেঁটে বা টাট্টু ক'রে, ভ্রমণ ক'রত পাহাড় অঞ্চলে যেখানে মোটর চলে না সেখানে টাট্টুই একমাত্র উপায়। রাজা রাজড়ার ঘরের মেয়েরা চৌদোল বা তাঞ্জাম ক'রে কাছে-পিঠে এখনও যাওয়া আসা করেন, মানুষের কাঁধে এই যান বাহিত হয়। বড়ো লোকেদের নিজের মোটর আছে, সাধারণ লোকের জন্য প্রচুর লরী বা বাস্ এক শহর থেকে আর এক শহরে যাচ্ছে। সিংহ-রাজা ছেড়ে, পূব-মুখো আর তার পরে দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে খুব ঘন-বসতি বহু গ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা চ'ললুম। প্রথমটা রাস্তায় একটু ধূলো পেলুম, তার পরে সব পরিষ্কার। চমৎকার সবুজে ঢাকা দেশটী। ঠিক দক্ষিণ বাঙলার মত। রাস্তার দুধারে সাধারণ গৃহস্থের বাড়ী। মাটীর বা কাঁচা ইটের দেওয়ালে ঘেরা; দেয়ালগুলি সাধারণতঃ মানুষপ্রমাণ উঁচুও নয়। মাটীর দেওয়ালের মাথায় আবার বৃষ্টির জল আটকাবার জন্যে খড়ের ছাউনি করা—ঠিক বাঙলাদেশের মতন। অনেকখানি জায়গা নিয়ে এক একটী বাড়ী। বাড়ীর নাছ-দুয়ার বা সদর দরজা বেশ উঁচু, ছোট দেয়ালের বহু উর্দ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, লাল ইটের দুয়ারে সাধারণতঃ নক্‌শা কাটা পাঁশুটে রঙের পাথরের একটু কাজ করা। বাড়ীর ভিতরে প্রচুর গাছ-পালা, আর উঁচু রোয়াকের উপরে এক একটি ক'রে ঘর। কলা, সুপুরী, নারক'ল, বাঁশঝাড়, এই সবই বেশী। বাড়ীর মধ্যে ধানের মরাই, কাঠের তৈরী, খড়ে ঢাকা। বেশ শান্তিময় আর শ্যামলশ্রী-মণ্ডিত, বাড়ীগুলি দেখে বেশ তৃপ্তি হয়। বাঙলাদেশের ছায়াশীতল পল্লীগ্রামে ঠিক এমন্‌টি, আর মালাবারেও এই রকমটিই দেখেছি। মালাবারের বাড়ীর আর নীচু
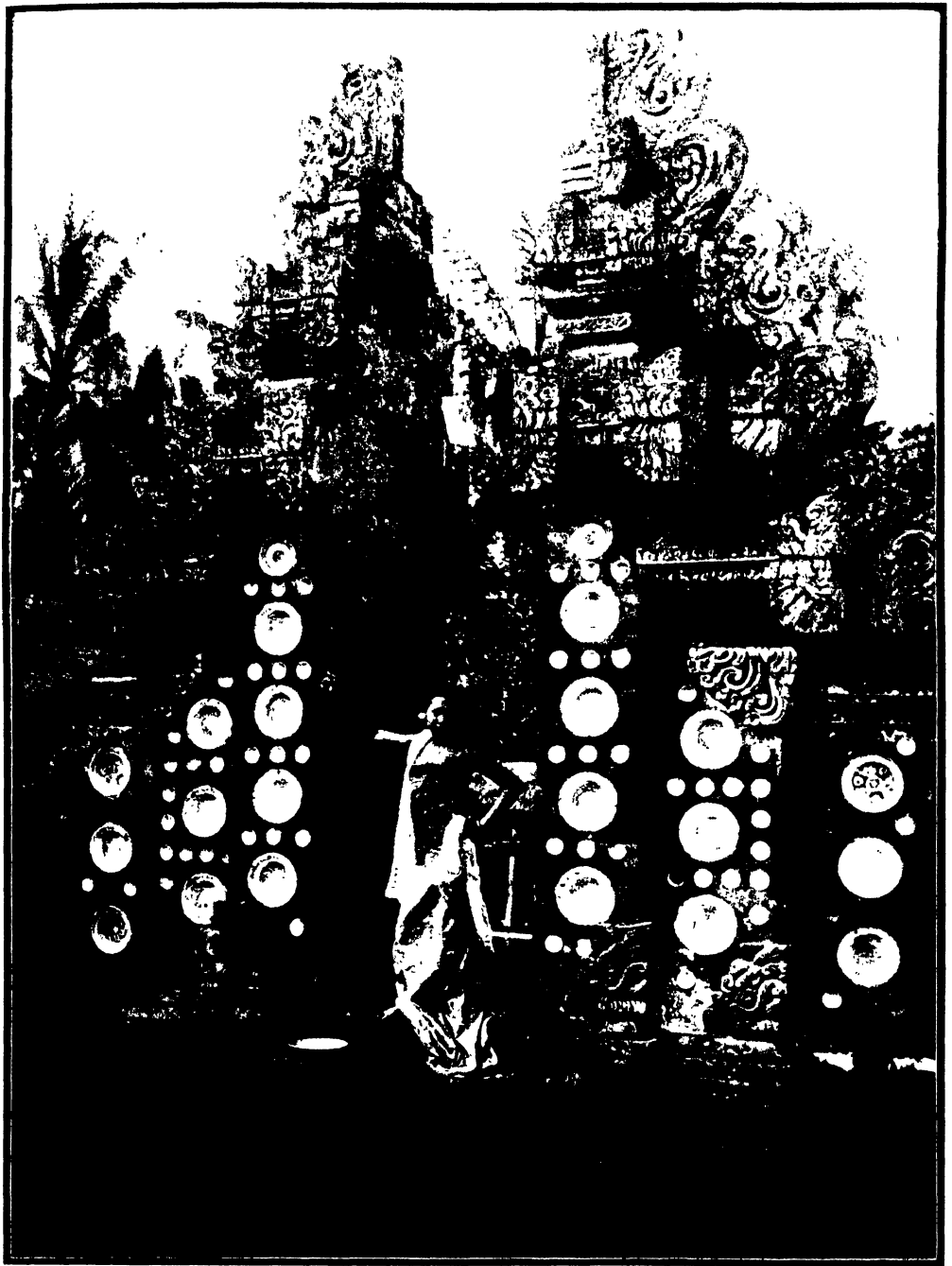
মন্দির দ্বারে
(বলিদ্বীপ)

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

দেয়ালে ঘেরা গাছপালার মধ্যে বাড়ী আর ঘরগুলির সমাবেশ, এই বিষয়টীতে বলিদ্বীপের সঙ্গে আশ্চর্য্য মিল আছে।

বুলেলেঙ আর সিংহরাজার আশে-পাশে অধিবাসীদের সংখ্যা খুব বেশী। রাস্তায় যেতে যেতে সেটা বেশ উপলব্ধি ক'রতে পারা গেল। দুপা যেতে না যেতেই গ্রাম, আর হাট বাজার। লোকেরা রাস্তায় খুবই চলা ফেরা ক'রছে—অনেকের কাঁধে বাঁকে ক'রে ভারে ভারে জিনিস—তরি-তরকারী, ধান, চাল, ধানের আঁটি, ফল; মাথায় ঝুড়ি বা মেটে হাঁড়ী নিয়ে চমৎকার গতিলীলা দেখিয়ে মেয়ের দল চ'লেছে। বাজারে ফল, আনাজ-কোনাজ, চাল প্রভৃতির পসরা দিয়ে ব'সেছে মেয়েরা। পুরুষদের পরণে রঙীন ছিটের হাঁটু পর্য্যন্ত ধুতি—তার কাছা দেয় না; আর মাথায় একটা রঙীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে একটা কোনও রকমের জামা। বলিদ্বীপের এ অঞ্চলে মেয়েরা পরে একখানা কাপড়—সাধারণতঃ নীল বা কাল রঙের বা গাছপালার নক্শা ছাপা লাল নীল হ'ল্দে প্রভৃতি নানান রঙের, গায়ে থাকে একটা মালাই মেয়েদের ধরণের জামা, আর একখানা লম্বা অপ্রশস্ত চাদর, সেটা হয় কাঁধে ফেলা থাকে, নয় কোমরে জড়িয়ে' রাখে। গাছের ছায়ায় ছেলে বুড়োর দল, উবু হ'য়ে ব'সে জটলা ক'র্ছে। প্রায় সব বাড়ীর সাম্নের বড়ো ওড়া বা ঝুড়ির মতন খাঁচায় ঢাকা লড়াইয়ে মোরগ র'য়েছে। এখানে ওখানে সেখানে পথে প্রচুর দেব মন্দির চোখে প'ড়ল। অনেক মন্দিরে আর বাড়ীর সামনে উঁচু বাঁশের খুঁটিতে তালপাতায় তৈরী চমৎকার মালা ঝুল্ছে, এ হচ্ছে সমাপ্ত উৎসবের চিহ্ন। আর বলির লোকেরা তাদের সরল স্মিত-বিস্ময়-পূর্ণ চাউনীর দ্বারা আমাদের যেন স্বাগত ক'র্ছে। দেশটী যে সুন্দরীর দেশ - প্রতি পদে তার পরিচয় পেতে লাগলুম।

সমতল ভূমি ছাড়িয়ে আমরা পাহাড়ে উঠতে লাগলুম। নবীন থেকে নবীনতর, মনোহর থেকে আরও মনোহর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের চোখের সাম্নে দৃশ্যপটের মতন খুলে যেতে লাগ্ল। কী চমৎকার এই তাজা সবুজের রঙ! সকাল বেলার নীল আকাশ সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত; যত উঁচুতে উঠ্ছি, ততই নীচের দেশটা সবুজ সাগরের মতন খুলে যাচ্ছে। দূরে দু একবার নীল সমুদ্রের ও দর্শন পেলুম। নীচে সবুজের যেন বান ডেকেছে। উপরেও

বলিদ্বীপ

প্রচুর গাছ পালা। ধানের খেত্ সব জায়গায়। পাহাড়ের গা কেটে কেটে খেত্ বানিয়েছে। জলের বন্দোবস্ত এমন চমৎকার যে উপরের জল যেটুকু ঝরনা আর পাহাড়ে' নদী থেকে পাওয়া যায় তার একটুও নষ্ট হয় না, উপরের খেত্‌কে ভিজিয়ে বাড়তি জল আলের মধ্যকার পথ দিয়ে নীচেকার খেতগুলিতে এসে পড়ে। পাহাড়ের গা কেটে এইরূপ সমতল ধান-খেত করে চাষ করা দ্বীপময় ভারতের একটী বৈশিষ্ট্য, যবদ্বীপে এইরকম ধান-খেত‌কে sawah 'সাওয়াঃ' বলে। এই পাহাড় অঞ্চলটায় দেখে অনুমান হ'ল যে লোকের বাস একটু কম।

বেলা সাড়ে-আটটা আন্দাজ আমরা এই পাহাড়ে' রাস্তার প্রায় সর্ব্বোচ্চ অংশে Kintamani কিন্তামানি

ব'লে একটী স্থানে এসে পৌছুলুম। হাত মুখ ভালো ক'রে ধুয়ে নেবার জন্য, আর কিছু প্রাতরাশ সেরে নেবার জন্য এখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে আমরা সদলে অবতরণ ক'রলুম। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশ গম্ভীর। জায়গাটী খুব উঁচু নয়—প্রায় সাড়ে পাচ হাজার ফুট হবে ; চারিদিকে পাহাড় ; পূর্ব্বে বাতুর শৃঙ্গ, আর দক্ষিণ-পূর্ব্বে আবাঙ শৃঙ্গ, আর তার দক্ষিণ-পূর্ব্বে আগুঙ্ শৃঙ্গ। এ সব দেশ চির-বসন্তের দেশ, কিন্তু কিন্তামানিতে আমাদের একটু শীত ক'রতে লাগ্‌ল। বাতুর আর আবাঙ্-এর মাঝে বাতুর
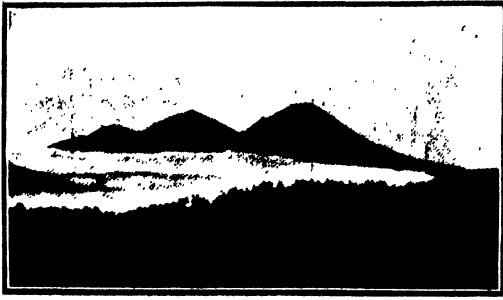
কিন্তামানি হইতে পাহাড়ের দৃশ্য

হ্রদ। সোজা দক্ষিণে আবার মধ্য আর দক্ষিণ বলির সমতল ভূমির দৃশ্য দেখা যায়, দূরে সমুদ্রও দেখতে পাওয়া যায়। জায়গাটী যেমন মনোরম তেমনি নির্জন। দুদশ দিন কাটিয়ে যাবার পক্ষে চমৎকার। দ্বীপময় ভারত আগ্নেয় গিরির দেশ। যবদ্বীপের কতকগুলি আগ্নেয় গিরি বিখ্যাত। বলিদ্বীপের বাতুর গিরি এক আগ্নেয় গিরিরই শৃঙ্গ। এই বাতুরের কোলে একটী গ্রাম ছিল, বছর ২০।২১ পূর্ব্বে বাতুর গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাতে অন্য কতকগুলি গ্রামের সঙ্গে বাতুর গ্রামটী একেবারে ধ্বংস হ'য়ে যায়, খালি বাতুর হ্রদের ধারে গ্রামের মন্দিরটী বেঁচে যায়।

কিন্তামানির ডাক-বাঙলাটী গ্রামের বাইরে একটী মাঝারী আকারের একতালা বাড়ী ; গুটী পাচ ছয় কামরা নিয়ে, কাঠের তৈরী, সাদা রঙ করা। আলাদা জলের কলের ঘর আর রান্নাঘর আর চাকরদের ঘর আছে। মোটর থাকবার জন্য গারাজ বা আস্তাবল আছে। ডাক বাঙলাগুলি যে খানসামার জিম্মায় থাকে, তাকে এসব দেশে 'মান্দুর' বলে। এখানকার মান্দুরটী বলিদ্বীপীয় ; অনেক ডাক-বাঙলায় মালাই বা যবদ্বীপীয় মান্দুরই পাওয়া যায়। বেচারী আজ একটু বিপদে প'ড়েছে। অনেক ইউরোপীয় যাত্রী এই ডাক বাঙলার পথ দিয়ে বাঙ্লির উৎসবে গিয়েছে, এরা এখানে প্রাতরাশ সেরে নিয়েছে,—এর খাবার সব ফুরিয়ে গিয়েছে ; দুচারটী ডিম আর কিছু রুটী আর একটু কফী ছাড়া আর কিছু দিতে পারলে না। আমরা কেউ কেউ একটু মাথাটা মুখ হাতের সঙ্গে ধুয়ে নিলুম।

যাত্রার পূর্ব্বে বাকে, ক্রেউএস্ আর কোপ্যারব্যার্গ আমায় ব'ল্‌লেন, এ দেশে ব্রাহ্মণের সম্মান খুব বেশী, আপনি ভারতবর্ষ থেকে আস্‌ছেন, তায় আপনি ব্রাহ্মণ, ইউরোপীয় পোষাক ছেড়ে ভারতীয় পোষাক, ব্রাহ্মণের পোষাক পরুন, এদের সঙ্গে সহজে মিশ্‌তে পারবেন। রবীন্দ্রনাথও এ কথার অনুমোদন ক'রলেন। আমি সাদা কোট-প্যান্টলুন টাই হ্যাট সব ব'দলে মট্‌কার ধুতি, মুগার পাঞ্জাবী, বহরমপুরী রেশমের চাদর আর আগরার নাগরা প'রলুম। পোষাকটা অবশ্য প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতের ব্রাহ্মণের মতন হ'ল না, কিন্তু ডচেরা এইতেই খুশী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণের যে বেশ ছিল তা এখনকার সভ্য সমাজে আদৃত হবে না, আর আমাদের মতন এ-যুগের জীবের পক্ষে সে-রকম বেশভূষা করাও একটু সময় আর সাহস সাপেক্ষ। সাঁচীর স্তূপের ভাস্কর্য্য থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন ভারতীয় শিল্পে, আর সংস্কৃত আর অন্য বইয়ে, ব্রাহ্মণের যে ছবি আর বর্ণনা পাই, তা থেকে দেখা যায় যে তখনকার দিনে ব্রাহ্মণ লম্বা দাড়ী রাখতেন, মাথার চুলও লম্বা রাখতেন, আর সেই চুলে হয় জট পাকাতেন, নয় চুল মাথার উপরে চূড়ো ক'রে বেঁধে রাখ্‌তেন—শিখেরা এখন যেমন ক'রে থাকে। পরণে হ'ত হয় মোটা কাপড়, হাঁটু পর্য্যন্ত, নয় হরিণের ছড় ; আর গায়ে একখানা উত্তরীয় ; আর পায়ে চামড়ার চাপ্‌লি বা কাঠের খড়ম, হাতে লম্বা দণ্ড। চীন জাপান কম্বোজ শ্যাম মধ্য-এশিয়ার শিল্পেও ভারতের ব্রাহ্মণের এই ছবিই পাই, আর বলির ব্রাহ্মণেরাও এই রকম বেশেরই অনুকরণ করে, শ্যামের

ব্রাহ্মণেরা (পরে শ্যামদেশে গিয়ে দেখেছিলুম) আর সব বিষয়ে পোষাকটা হাল-ফ্যাশানের ক'রে নিলেও মাথার চুলের ঝুঁটিটা (একে কেবল শিখা বা টিকি বলা চলে না, বাঙলাদেশে আমরা যাকে বলি পুরুষের 'উড়ে খোঁপা', বা 'কৃষ্ণ-চূড়া' খোঁপা, এ তাই) এখনও বজায় রেখেছে। যাই হো'ক, কলির ব্রাহ্মণ—কলিযুগেরই বেশভূষা করা গেল। ডচেরা দেখে তো খুব খুশী হ'লেন, বিশেষ ক'রে কোপ্যারব্যার্গ। কোপ্যারব্যার্গ্ অল্প কয়েক বছর পূর্ব্বে ক'লকাতায় এসেছিলেন, তখন এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হ'য়েছিল, এঁকে সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহ দেখিয়ে দিই, ক'লকাতার পরেশনাথের মন্দিরের সাজসজ্জা আর বাগিচার উৎকট বাহারটাও দেখিয়ে আনি; তারপর ইনি যবদ্বীপে ফিরে গেলে একটু পত্র-ব্যবহারও এঁর সঙ্গে করি, ইনি তাই আমায় পরিচিত বন্ধুভাবেই গোড়া থেকে গ্রহণ ক'রে ছিলেন।

এইরূপে তৈরী হ'য়ে আমরা আবার আগের মতন যে যার গাড়ীতে চ'ড়লুম। বলিদ্বীপীয় যারা ছিল, তারা আমার এই অদৃষ্ট-পূর্ব্ব পোষাক দেখে তো অবাক্।

কোপ্যারব্যার্গকে নিয়ে একবিষয়ে মুস্কিল হ'ল। ইংরেজী বা আমাদের জ্ঞাত আর কোনও ভাষা ভালো ব'লতে পারেন না, বা জানেন না, আর আমরা ডচ্ বুঝি না। অল্পস্বল্প ইংরিজি যা জানেন তাতে কোনও রকমে পথের কাজ চালিয়ে নেওয়া যায় মাত্র। এতে হৃদ্যতায়—খোলাখুলি গভীর আলাপে যে হৃদ্যতা জমে—তাতে বাধা পড়ে। ওদিকে কোপ্যারব্যার্গ তাঁর এই অক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন ব'লে, নির্ব্বাক সেবা দিয়ে তার পূরণ ক'রতে চান। আমরা এঁর আন্তরিক স্নেহের নানা নিদর্শন পেয়ে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলুম,—আর ভাষার অভাবে আমাদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের বৃদ্ধিতে কোনও বাধা ঘটে নি। কোপ্যারব্যার্গ সম্বন্ধে আমাদের কৃতজ্ঞতা আর আমাদের অকৃত্রিম স্নেহ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবার বিষয়। এঁর সাহায্য আর অক্লান্ত চেষ্টা আর পরিশ্রমের ফলেই বহু স্থলে আমাদের বলি আর যবদ্বীপ দর্শন সার্থক আর সম্পূর্ণ হ'তে পেরেছিল।

কিন্তামানির পর উৎরাই পথ। একটু এগিয়ে পাহাড়ের গায়ে পানালোকান ব'লে একটী গ্রাম, সেখান থেকে বাঁয়ে বাতুর হ্রদের চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল। তার পর যত নাম্‌তে থাকি তত লোকের বসতি বাড়ে; পাহাড়ে অঞ্চলের নির্জ্জনতা আর গম্ভীর সৌন্দর্য্য আর নেই। তবে অন্য ধরণের সৌন্দর্য্য। দক্ষিণ-মুখো পথ, খানিকটা উত্তর-দক্ষিণ পাহাড়ের পাশ দিয়ে গা দিয়ে চ'লেছে। সমতল দেশে এলুম। প্রচুর মাঠ, আর ধানের খেত্।

পাহাড়ের গায়ে ধানের খেত্

খেতগুলি আ'লে ঘেরা, মাঠগুলির চার পাশে হয় পাথরের নোড়ার দেয়াল, নয় গাছের বেড়া। দেশটা বেশ উঁচুনীচু—কোথাও ঢল, কোথাও উঁচু। সবুজের ছড়াছড়ি। এখানে লক্ষ্য ক'রলুম, এদেশের গোরুগুলি একটু অন্য ধরণের। দূর থেকে এদেশের গোরু দেখে মনে যেন লাল রঙের হরিণ। লাল রঙটাই বেশী, গোরুর দাবনা গুলি, বিশেষতঃ পিছন থেকে দেখলে, সাদা: অনেকগুলি আবার পৃষতী, গায়ে সাদা সাদা ফোঁটা আছে—মাথাটা ছোটো, আর গল-কম্বল নেই। ভারী সুন্দর দেখায়। এদেশে গোরুর দুধ খায় না, খালি লাঙলের জন্য আর মাল বইবার জন্যই পোষে। এ একেবারে 'হট্টমালার দেশ', এখানে গাই বলদে চষে।

পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ধানের খেত, আর জলের ব্যবস্থা, এগুলি দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। নীচের জমীতে জলের ব্যবস্থাও বেশ। বলিদ্বীপের সম্বন্ধে 'অনূপ' (অর্থাৎ

প্রচুর জলের দেশ) এই আখ্যাটী বেশ খাটে। বেলা প্রায় দশটা বাজে, রাস্তায় লোকেদের চলাফেরা খুব। তবে যত বাঙলির দিকে এগোচ্ছি, তত দেখছি, রাহী লোকেরা দৈনন্দিন কাজের জন্য বেরোয় নি, সব যেন দল বেঁধে উৎসব ক্ষেত্রে চ'লেছে। কোথাও বা মেয়েরা সার বেঁধে চ'লেছে, মাথায় এদের ফল-ফুলুরীর চুবড়ী, বা বেতের ঢাকন দেওয়া ডমরুর-আকারের-খুরোওয়ালা

নৈবেদ্য শিরে মন্দিরাভিমুখিনী নারীগণের শোভাযাত্রা

কাঠের পাত্র। আমরা মুগ্ধ হ'য়ে বলিজাতীয় মেয়ে পুরুষের এই অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রা, মাঝে মাঝে যা চোখে প'ড়তে লাগ্‌ল, তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে যেতে লাগলুম। বলিদ্বীপের লোকেদের আমাদের ভাষায় গৌরবর্ণই বল্‌বো—ইউরোপীয় ধরণের দুধে-আলতার রঙের শ্বেতকায়—কাশ্মীরী বা পাঠান, পারসী বা আর্ম্মানী বা ইউরোপীয়দের মতন—এরা নয়। এরা কাঞ্চন বর্ণ, পীতাভ গৌরবর্ণ—গায়ের রঙ চীনাদের মতন। কালো রঙের লোক একেবারে নেই ব'ললেই হয়। যবদ্বীপের লোকেরা এদের চেয়ে শ্যামবর্ণ, কতকটা ভারতবাসীদেরই মত। বলিদ্বীপীয়েরা মালাই জাতির একটী বেশ শ্রীসৌষ্ঠবশালী শাখা। সাধারণ মালাইদের চেয়ে একটু ভারী আর ঢাঙা চেহারা, বিশেষ ক'রে মেয়েরা তো মালাই মেয়েদের মতন ক্ষুদ্রকায় বা ক্ষীণকায় নয়। মেয়ে আর পুরুষদের নাকটা একটু চেপটা, ভারতবাসীর প্রিয় বাঁশী-নাসা যবদ্বীপে একটু আধটু দেখ্‌তে পেলেও, এদেশে তা বিরল বা দুর্লভ। চোখ গুলি সাধারণতঃ বেশ ডাগর আর ভাবব্যঞ্জক হয়। মেয়ে আর পুরুষদের মাথায় চুল খুব বড়ো হ'লেও পুরুষদের মুখে গোঁফ দাড়ীর অপ্রাচুর্য্য। এদেশের মেয়েদের অনেকের ঠোঁট দুটি একটু আধখোলা মতন থাকে, তাতে মুক্তা-ধবল দাঁত একটু দেখা যায়, হঠাৎ দেখে মনে হয় এরা কি যেন ব'লতে চাচ্ছে, কিন্তু ব'ল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে যাচ্ছে। আধুনিক সভ্যতা থেকে এতদিন পর্য্যন্ত নিভৃতে পালিত সারল্য-মণ্ডিত এই সমস্ত জনপদ-কন্যাদের মুখে এই wistful, এই অস্ফুট প্রশ্নময় ভাবটী বাস্তবিকই আমাদের বড়ো মনোহর ব'লে বোধ হ'ত। বলিদ্বীপের রূপকারেরা এদেশের মেয়েদের আর পৌরাণিক দেবীদের ছবিতে বা মূর্ত্তিতেও এই ঈষৎ-প্রকটিত-দন্তরুচি-কৌমুদীটুকু বর্জ্জন ক'রতে পারে নি—বলির পটের বা মূর্ত্তির এই একটী বিশেষত্ব। এ দেশের পোষাকে রঙের বাহুল্য একটা লক্ষ্য করার জিনিস। একটা কথা শুনেছিলুম যে যে দেশে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বেশী, সবুজের ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানকার লোকেরা বর্ণ-সুষমা বিষয়ে প্রকৃতি-দেবীর মুক্ত হস্তের দান পেয়ে নিজেদের সৃষ্ট পারিপার্শ্বিকে—পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে বর্ণসম্বন্ধে উদাসীন হয়। উদাহরণ স্বরূপ বাঙলাদেশের আর মালাবারের পোষাকে রঙের অভাবের কথা শুনি। মালাবারে আর বাঙলাদেশের মেয়ে পুরুষে রঙীন কাপড় ছেড়ে সাদাটাই আজকাল বেশী প'রছে বটে, কিন্তু বাঙলাদেশ সম্বন্ধে বলা যায়, যে এই যে বর্ণজ্ঞান-হীনতা, এটা হালের, আর মধ্য-উনবিংশ শতকের ইংরিজি মনোভাবের প্রভাবের ফল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নানা রঙের কাপড় প'রতে লজ্জা বোধ ক'রতেন না। এখন আবার রঙ্‌ ফিরে আস্‌ছে—পুরুষের পোষাকে। রঙীন লুঙ্গী এখন সাদা সুতোর কাপড়কে তাড়াচ্ছে। ২৫।৩০ বছর পূর্ব্বে বাঙালা দেশে কয়জন লোক লুঙ্গী প'রত? বাঙলার মুসলমান কৃষাণেরাও সেই সনাতন ধুতীরই ভক্ত ছিল। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান খালাসী আর বর্ম্মাগামী কৃষাণেরাই বর্ম্মা থেকে লুঙ্গীর আমদানী করে, ক্রমে রঙীন লুঙ্গী এখন বিশেষ ক'রে বাঙালী মুসলমানেরই পোষাক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, সখ ক'রে বাঙালী হিন্দু বাবু-ভেইয়ারাও প'রছেন; কালে হয়

তো রঙীন লুঙ্গীই আমাদের পোষাক হ'য়ে দাঁড়াবে, আর এই রকম ক'রে আমাদের পরিধেয়ে একটু নোতুনভাবে বর্ণ-বৈচিত্র্যের সমাবেশ ঘ'টবে। এই বর্ণ প্রীতিটুকু শীতের কাপড়ে শাল-র‍্যাপারে এখনও যা একটু বজায় আছে। গুজরাটের বহু স্থল বাঙলার মতনই সবুজ, কিন্তু সেখানকার মেয়ে আর পুরুষদের পরিধেয়ের বর্ণবিন্যাসের সৌন্দর্য্য সর্ব্বজনবিদিত। বর্ণ-প্রিয়তার সঙ্গে দেশের প্রকৃতির অবস্থার কোনও যোগ আছে ব'লে মনে হয় না। বেশী দিনের কথা নয়, অষ্টাদশ শতকে ইংলণ্ডের পুরুষেরাও মেয়েদের মতন লাল নীল সবুজ প্রভৃতি নানা রঙের কোট জামা প'র্‌ত; চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে রঙের বাহার আরও বেশী ছিল; আর এখন ইউরোপ কালো রঙই গ্রাহ্য, রুমালে মোজায় আর টাইয়ে যা একটু রঙ এখন চলে। শিক্ষা, রুচি, অর্থ,—এই গুলির উপর বর্ণপ্রিয়তা নির্ভর করে। বাঙালী জা'তের রুচি গিয়েছে, শিক্ষা ভালো নেই, অর্থ তো নেইই। যাক্—বলিদ্বীপের মেয়ে পুরুষে আগে এ দেশেই তৈরী ছাপা বা ছোবানো কাপড় প'রত, এখন বেশীর ভাগ বিলিতি কাপড়ই পরে, কিন্তু এই কাপড়ে খুব নক্‌শা কাটা থাকে, ফুল আর পাতার বিচিত্র নক্‌শাই বেশী। মেয়েদের চেয়ে পুরুষেরাই যেন নক্‌শা-করা ছাপা কাপড় একটু বেশী পছন্দ ক'রে ব'লে মনে হ'ল। তিন খানা কাপড় হ'লে তবে বলিদ্বীপের পরিধেয় সম্পূর্ণ হয়—প্রাচীন বাঙলা বইয়ে যেমন আছে—"একখান কাছিয়া পিন্ধে, একখান মাথায় বান্ধে, আর খান দিল সর্ব্ব গায়"—ধোত্র, উষ্ণীষ, উত্তরীয়। আজকাল যবদ্বীপের আর আধুনিক সভ্যতার প্রভাবে একটা ক'রে জামাও গায়ে চ'ড়ছে, হয় ইউরোপীয়দের মতন গলা আঁটা সাদা জীনের কোট, নয় মালাইদের মতন ঢিলা কোর্ত্তা। খালি পা-ই আগে রেওয়াজ ছিল, ক্বচিৎ চাপলি প'রত, কিন্তু ইউরোপীয় জুতো আর মোজা অনেকের পায়ে উঠছে। মোটের উপর, বলির সাবেক পুরুষদের পোষাক বেশ ছিল, বেশ সুদৃশ্য, লোকগুলির চেহারার সঙ্গে সুন্দর মানাত।—বলির পুরুষের পোষাককে সম্পূর্ণ ক'রতে হ'লে আর একটা জিনিসের দরকার হ'ত—একখানা বড় ছোরা, বা তলওয়ার, যাকে 'ক্রীস্' বলে। হাতলে সোনার রাক্ষস-মূর্ত্তি-ওয়ালা এই বিদ্যুৎ-লতানো বাঁকা তলওয়ার এরা পিঠে বাঁধ্‌ত, সামনে বা পাশে ঝুলিয়ে রাখার রেওয়াজ ছিল না।—বলিদ্বীপের মেয়েদের পোষাক শীঘ্র শীঘ্র অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়বে, আর প'ড়ছে, যত বেশী ক'রে ও-দেশে বিদেশীর আমদানী হ'চ্ছে। মেয়েদের পরণে তিন খণ্ড বস্ত্র থাকে—একখানা ছোট ভিতর বস্ত্র; তার উপরে কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত দুই আড়াই ফের দিয়ে জড়ানো আর কাপড়ের সরু কটিবন্ধ দিয়ে বাঁধা একখানা বস্ত্র, যাকে 'কাইন্' বা কাপড় বলে—এরা সারং বা লুঙ্গীর মত সেলাই করা কাপড় পরে না—এই কাইনের দ্বারা উর্দ্ধাঙ্গ আবৃত হয় না; তার জন্য তৃতীয় আর একখানা কাপড় থাকে, খুব কম চওড়া একখানা চাদরের মতন,—এই উত্তরীয় আবার প্রায়ই নেটের বা জালের কাপড়ের হয়; বলির মেয়েরা কিন্তু এই চাদর খুলে গায়ে মুড়ি দিয়ে পরে না, হয় কাঁধে ফেলে রাখে নয় কোমরেই জড়িয়ে রাখে। পরিচিত অপরিচিত সকলের সামনে এইরূপে নিরাবরণ-বক্ষে চলাফেরা করা এই দেশের রীতি। কিন্তু এই রীতি যে সত্যযুগের উপযুক্ত ছিল, সে সত্যযুগ আর এখন থাকছে না। উত্তর বলি বহুদিন থেকে ডচেদের অধীনে আছে; সেখানে সভ্যতার সংস্পর্শে আসায় জামা এখন মেয়েদের পোষাকের একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। মধ্য আর দক্ষিণ বলিতেও আস্তে আস্তে এখন জামা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রছে। মেয়েদের এইরূপ পোষাক, বা পোষাকের অভাব,—যা আধুনিক রুচি অনুসারে বর্জ্জনীয়,—তা এক সময়ে আমাদের ভারতবর্ষেও সাধারণ ছিল। মালাবারের পল্লী-অঞ্চলে নায়র আর অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের মধ্যে এই রীতি এখনও প্রচলিত। দেহ যাতে সুসমাবৃত হয়, মেয়েদের এইরূপ পোষাক আমাদের ভারবর্ষে ঠাণ্ডাদেশের অধিবাসী আর্য্যেরাই আনে ব'লে অনুমান হয়। ঈরানে খ্রীষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতকে পাথরে খোদাই করা ঈরানী আর্য্য মেয়েদের যে প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে, তা থেকে অবগুণ্ঠনবতী আবৃতদেহা আর্য্য রমণীর পরিচ্ছদের ধারণা ক'রতে পারা যায়। ভারতের অনার্য্য দ্রাবিড়, কোল-

আর মোন-খ্মেরদের মেয়েদের পরিচ্ছদ এরূপ (আধুনিক শিক্ষিত রুচি অনুসারে) শালীনতাময় ছিল না। রাঁচির পল্লী-অঞ্চলের কোলেদের মেয়েদের দেখ্‌লে বুঝতে পারা যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম আর ষষ্ঠ শতকের প্রাচীন তামিল সাহিত্যে মেয়েদের পোষাক যা বর্ণিত হ'য়েছে, তাতে বোঝা যায় যে দ্রাবিড়-দেশে ঐ যুগে মালাবারের মতনই ব্যবস্থা ছিল। সাঁচী-বরহুতে, খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে, মথুরায়, অমরাবতীতে, মহাবলিপুরে, অন্যত্র সব জায়গার প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্য্যের নারীমূর্ত্তি, আর অজণ্টার বাঘের সিত্তন্নবসলের আর সিংহলের সিগিরির ভিত্তি চিত্রের নারী-চিত্র—এ সব দেখে মনে হয়, মেয়েদের পোষাক বিষয়ে প্রাচীন অনার্য্য ভারত, ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়া একই দেশ ছিল। ভারতে হয় তো পাঞ্জাব-অঞ্চলে আর্য্য প্রভাবে—আর শীতের প্রভাবে—সভ্য ভব্য পরিচ্ছদই সাধারণ হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রায় সমগ্র ভারতে অনার্য্য প্রভাবই বলবান থাকায়, অন্যত্র প্রাচীন রীতিই অক্ষুণ্ণ ছিল—অন্ততঃ বিদেশী তুর্কী মুসলমানের আগমন পর্য্যন্ত। সুদূর বলিদ্বীপ প্রাচীন ভারতের এই পরিধেয়-বৈশিষ্ট্য আংশিক ভাবে রক্ষা ক'রছে। ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলের পোষাক নিয়ে কত না কথা বলা যায়—কত সংস্কৃতির সামাজিক রীতি-নীতির লুপ্ত সুর, গুপ্ত কথা, অতীত ইতিহাস এই পরিচ্ছদকে অবলম্বন ক'রে র'য়েছে। পাঞ্জাবী মেয়েদের লহঙ্গা বা পাজামা, কুর্ত্তী আর চাদর; রাজপুতানার মেয়েদের লহেঙ্গী, কাঁচলী, ওড়না; উত্তর ভারতের আর গুজরাটের মেয়েদের সামনে-কোঁচা ডান-কাঁধ ঢাকা ঘোমটা-টানা সাড়ী, আর দুপট্টা; মারাঠাদেশের মেয়েদের কাছা দেওয়া মাথা-খোলা সাড়ী; পশ্চিম বাঙালার বাঁ কাঁধ আর মাথা ঢাকা সাড়ী; পূর্ব্ব বঙ্গের ফেরতা দিয়ে পরা সাড়ী;—আর সঙ্গে সঙ্গে কোল মেয়েদের আর মালাবারী মেয়েদের অনাবৃত-ঊর্দ্ধাঙ্গ কাপড় পরার রীতি;—এ-সবকে অবলম্বন ক'রে ভারতের নানান্ জা'তের অতীত সংস্কৃতির খবর লুকিয়ে র'য়েছে।—প্রাচীন ভারতে মেয়েদের গায়ের জামা যে ছিল না, তা নয়; অজণ্টায় আর অন্যত্র তার ছবি আছে। কিন্তু অনার্য্য পদ্ধতি অনুসারে গায়ে কিছু না দেওয়াই যে সাধারণ রীতি ছিল, এইটাই অনুমান হয়।

বলিদ্বীপের মেয়েরা অপূর্ব্ব সৌষ্ঠববতী, তন্বঙ্গী। এদেশে কি মেয়ে কি পুরুষ কাউকেও আমরা অতিকৃশ বা অতিস্থূল দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বলির মেয়েরা মাথায় করে সব জিনিস ব'য়ে নিয়ে যায়। কোথায় যেন প'ড়েছি, মাথায় ক'রে জিনিস নিয়ে যাওয়ার অভ্যাসের ফলেই মেয়েদের গতিভঙ্গী এই রকম ছন্দোময় হ'য়ে যায়। এরা যখন একক বা অনেকে সার বেঁধে জিনিস-পত্র মাথায় ক'রে নিয়ে চলে,—কি তাদের দৈনন্দিন কাজে, কি উৎসব উপলক্ষে মন্দিরে বা স্থানীয় রাজবাটীতে—তখন এদের ঋজু শুদ্ধ-সংযত দেহ-সুষমা আর রাজ্ঞীর মত গৌরব-দৃপ্ত চলন-ভঙ্গী এক অপূর্ব্ব অতি দুর্লভ সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে। এদেশের মেয়েরা সাধাণতঃ 'কাইন' বা পরিধেয় বস্ত্রের জন্য একটা রঙ্-ই বেশী পছন্দ করে,—কৃষ্ণাভ নীল রঙ; আর উত্তরীয়টার রঙ সাধারণতঃ হয় হ'ল্‌দে। বলিদ্বীপের উপরে রবীন্দ্রনাথ পরে যে চমৎকার কবিতাটি লেখেন, যেটা ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের 'প্রবাসী'তে "বালী" নামে প্রকাশিত হয়, তাতে বলিদ্বীপের মেয়েদের পরিধেয়ে এই দুই রঙের কথা তিনিও লক্ষ্য ক'রে গিয়েছেন :

> 'শিথিল পীত বাস
> মাটির পরে কুটিল রেখা লুটিল চারি-পাশ।
> নিরাবরণ বক্ষে তব, নিরাভরণ দেহে
> চিকন সোনা-লিখন উষা আঁকিয়া দিল স্নেহে।'
> 'কটিতে ছিল নীল দুকূল, মালতী-মালা মাথে,
> কাঁকণ দুটী ছিল দুখানি হাতে।'

কষিত-কাঞ্চনাভ গৌরবর্ণ দেহে কটিদেশে কৃষ্ণ-নীল পরিধেয়ের উপর আবেষ্টিত এই কাঞ্চন বর্ণের উত্তরীয়,—বর্ণ-সমাবেশ এতে অপরূপ সুন্দর হয়। মেয়েদের গায়ে গয়না নেই ব'ল্‌লেই হয়—বড় জোর এক হাতে বা দু হাতে সরু কাঁকণ এক গাছি ক'রে পরে। এদের দেশের আর একটা রীতির কথা এইখানে ব'লে নিই—হাটে বাটে মাঠে গৃহমধ্যে এই গাত্রাবরণ উত্তরীয়ের যথাযথ ব্যবহার সম্বন্ধে মেয়েরা নিঃসঙ্কোচে উদাসীন হলেও, দেবমন্দিরের ভিতরে প্রবেশ

করবার সময়ে এরা এ বিষয়ে সংযত হয়, তখন উত্তরীয়ের আবেষ্টন দ্বারা বক্ষোদেশ আবৃত ক'রে থাকে, কিন্তু অংসদেশ অনাবৃত রাখে। দেবমন্দিরে প্রবেশের সময়ে বা দেবতার সামনে পূজা-অর্চ্চনার সময়ে এরূপ ব্যবস্থা হ'ল কেন? এটা কি আর্য্য মনোভাবের প্রভাবেই ঘ'টেছে, যে প্রভাব ভারতের ব্রাহ্মণ্যের মধ্য দিয়ে কার্য্যকর হ'য়েছিল? অথচ প্রাচীন ভারতের দেবদেবীদের মূর্ত্তি কল্পনায় অঙ্গাবরণ বস্ত্র সম্বন্ধে আধিক্য দেখা যায় না। প্রাচীন ভারতের রাজা রাজড়ারা খালি গায়েই থাকতেন,—ছবি আর খোদিত মূর্ত্তি দেখে রাজান্তঃপুরিকাদের সম্বন্ধেও ওই কথাই বলা যায়। তামিল দেশে তো জামা গায়ে দেওয়া প্রাচীনকালে সৈনিক কিংবা ভৃত্যেরই পরিচায়ক ছিল।—বলিদ্বীপের প্রাচীন প্রথায়, কেবল চরিত্রহীনা সাধারণী স্ত্রীদেরই দেহ পূর্ণভাবে আবৃত রাখ্‌তে হ'ত, সদ্বংশীয়া কন্যা বধূ গৃহিণীরা বক্ষোবাস বিষয়ে নিরাবরণ হ'য়েই থাকতেন। এখন অবশ্য সর্ব্বত্রই মালাই 'কাবায়া' বা লম্বা ঢিলা জামায় চল বেড়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন বাঙলার লক্ষ্মণ সেন মহারাজার সভার কবি ধোয়ী মেঘদূতের অনুকরণে রচিত তাঁর 'পবনদূত' কাব্যে লিখেছেন—

গঙ্গাবীচিপ্লুতপরিসরঃ সৌধমালাবতংসো
যাস্যত্যুচ্চৈস্ত্বয়ি রসময়ো বিস্ময়ং সুহ্মদেশঃ।
শ্রোত্রক্রীড়াভরণপদবীম্ ভূমিদেবাঙ্গনানাং
তালীপত্রং নবশশিকলাকোমলং যত্র যাতি ॥ ২৭ ॥

এই শ্লোক থেকে গঙ্গার ধারের সুহ্মদেশে অর্থাৎ দক্ষিণ রাঢ়ে—আজকালকার হুগলি জেলায়—ভূমিদেব অর্থাৎ রাজার ঘরের মেয়েদের কানে তালপাতার গহনা পরার কথা পাওয়া যাচ্ছে। এখনও মালাবারে আর ভারতের অন্যত্র কানে তালপাতার গোঁজ প'রে থাকে। কুমারী মেয়েদের কানে পাকানো তালপাতার গোঁজ এদেশে খুবই প্রচলিত। প্রাচীনে ভারতে যেমন, তেমনি এখানেও নাক-ফোঁড়বার বর্ব্বর প্রথা নেই। আর কি পুরুষ কি মেয়ে কানের পাশে দুএকটা ফুল পরে,—চাঁপা, গন্ধরাজ, জবা; আর পুরুষেরা প্রায়ই মাথার রুমালের নীচে কপালের ঠিক উপরে একটা ফুল গুঁজে রাখে।

বাঙলির পথে আমরা এই সব দৃশ্য দেখতে দেখতে চ'ললুম। এই রকম মেয়ে আর পুরুষের দল দেখে—দলের মধ্যে নানা রঙের ছাতা নিয়ে আবার চলেছে, এ ছাতা হালের লোহার সিক-ওয়ালা বিলিতি ফ্যাশানের ছাতা নয়, পুরাতন ছাঁদের তালপাতার ছাতা, সাদা লাল নানা রঙের কাপড় মোড়া—দেখে মাঝে মাঝে মনে হ'তে লাগল, এ কি! একি স্বপ্ন দেখ্‌ছি! এ অজন্টা আর বাঘ গুহার দেয়ালে আঁকা আর প্রাচীন ভারতের মন্দিরের গায়ে খোদা স্ত্রীলোক আর পুরুষেরা হঠাৎ কোনও যাদুকরের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে শিল্পের চিরস্থির কল্পলোক থেকে অবতীর্ণ হ'য়ে, এই বলিদ্বীপের মনোহর প্রাকৃতিক পট-ভূমিকার সামনে জীবন্ত হ'য়ে যেন চ'লে ফিরে বেড়াচ্ছে! এরা ভারতীয়দের মতন শ্যামবর্ণ নয়, আর গায়ে অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নেই—এই যা পার্থক্য। এরা আপন মনে চ'লেছে, চকিত দৃষ্টিতে আমাদের তিনখানি মোটরের সারির প্রতি তাকিয়ে দেখ্‌ছে—প্রথমটীতে উপবিষ্ট রবীন্দ্রনাথের প্রশান্ত জ্ঞানোজ্জ্বল-দৃষ্টিমণ্ডিত মুখের প্রতি কেউ কেউ সম্ভ্রমের সঙ্গে নেত্র-পাত ক'রছে বটে—কিন্তু এই সব বলিদ্বীপের জানপদগণ অনুমানও ক'রতে পারছে না, কতদূর থেকে আমরা ক'জন ভারতবাসী এসেছি, তাদেরি মধ্যে আমাদের পিতৃপুরুষদের জ্যোতি দেখ্‌তে পাবো ব'লে আশা ক'রে এসেছি,—আর তাদেরি মধ্যে এমনি অনপেক্ষিত সুন্দর ভাবে তাদের বাহ্য জীবনের স্রোতের একটা পরিদৃশ্যমান প্রবাহ দেখতে পেয়ে আমরা কতটা পুলকিত হ'চ্ছি!

বাঙ্‌লি গ্রামের যত কাছে গিয়ে প'ড়ছি, উৎসবমুখী জনতা ততই বাড়ছে। শেষটা রাস্তায় ভীড় এত বেশী হ'তে লাগ্‌ল, যে আমাদের গাড়ী আস্তে আস্তে চ'লতে বাধ্য হ'ল, শেষটায় যেন ভীড়ের স্রোতে বাহিত হ'য়েই আমরা চ'ল্‌লুম। লোকেদের গায়ের রঙে, আর কি মেয়ে কি পুরুষ সকলকার দৈহিক সৌন্দর্য্যে, তাদের রঙীন কাপড়ে, তাদের কানে আর মাথায় পরা

ফুলে আর ফুলের মালায়—আমাদের চোখের সামনে যে দৃশ্যের পর দৃশ্য খুলে যেতে লাগ্‌ল, তাতে আমরা একটা রূপের আর সৌরভের অজ্ঞাত মায়া-রাজ্যের মোহের মধ্যে যেন প'ড়ে গেলুম। আমাদের গাড়ী অবশেষ এক চৌরাস্তায় উপর এসে থাম্‌ল। দেখি, সামনে কাঁচা বাঁশের কতকগুলি উঁচু মঞ্চ, বাঁশের চাঁচাড়ীর দেওয়ালের পিছনে আমরা র'য়েছি ব'লে ভিতরের ব্যাপার কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছি না। ডান দিকে একটী সুন্দর বলির বাস্তুরীতিতে তৈরী বাড়ী। গাড়ী থামতে অতি চমৎকার তালময় বাজনার ধ্বনি কানে এলো। এখানে লোকের ভীড় যেন জমাট বেঁধে গিয়েছে।—কোপ্যারব্যার্গ সামনে শোফারের পাশে ছিলেন, দাঁড়িয়ে উঠে ব'ল্‌লেন—এইবার আমরা বাঙ্‌লিতে পৌছুলুম, এখন নাম্‌তে হবে। কবি আর অন্য সহযাত্রীরা নামলেন, স্বপ্নাবিষ্ট মতন আমিও নামলুম।

(ক্রমশঃ)

আমাদের কথা

শ্রীপ্রফুল্লময়ী দেবী

আমাদের ভারতবর্ষের মেয়েরা যে-সকল ব্রত পালন করিয়া থাকেন, সেইগুলির মধ্য দিয়া অনেক দিক হইতে তাঁহাদের চরিত্র-গঠনের সহায়তা হইয়া থাকে। পরিবারের সকলের সহিত স্নেহ, মমতা, দয়া, সহিষ্ণুতা ক্ষমার দ্বারা আপনার মনের দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া আপনাকে নতভাবে মিলাইয়া দিবার পথনির্দ্দেশের একটি পথ মাত্র, এই ব্রত। এখন ইহা ক্রমশঃ বিদেশীয় ভাবের ও শিক্ষার প্রভাবে ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। পারিবারিক সুখশান্তি, কল্যাণ সবই স্ত্রীলোকের উপর পুরুষের অপেক্ষা বেশী নির্ভর করিয়া থাকে; সন্তান পালন, তাহাতেও স্ত্রীলোকের দায়িত্ব বেশী। মাতা যদি সন্তানদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সক্ষম না হত তবে সে সংসার সুখের হয় না। কত বড় দায়িত্ব এবং সংসারের বন্ধনের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা জড়িত রহিয়াছেন, তাহা বোধ করিবার প্রয়োজন ও শক্তি আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দেখাইয়া গিয়াছেন।

শিশুকাল হইতে এই ব্রতপালনের ফলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে, কোনও একটা সামাজিক বা নিজেদের সংসারের কার্য্যের ভিতর ত্রুটি বা বিশৃঙ্খলতা আনয়ন করিতে তাঁহারা সহজে সাহস পান না, অকল্যাণের, অমর্য্যাদার ভয় তাঁহাদের মনে প্রথমেই ঘা দেয়, এই কারণে ইহাকে আমরা যতই হীনচক্ষে দেখি না কেন, এখন সমাজের যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখা যায় যে, বাল্যকালে এই ব্রতের ভিতর দিয়া তাঁহারা যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অর্জ্জন করিতেন এখনকার ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ভিতর সেইটারই বড় অভাব। যে শিক্ষা আমাদের দেশের উপযোগী ও সংসারে কল্যাণ এবং শ্রীবৃদ্ধি করিবে, সেই শিক্ষা সন্তানদিগকে দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ ভবিষ্যতের চিরমঙ্গল তাহাদেরই উপর নির্ভর করিতেছে। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন ঐরূপ অনেক ব্রত করিয়াছি, একটি ব্রত উহার মধ্যে আমার মনে পড়ে তাহাকে "পুণ্যিপুকুর ব্রত" বলা হইত। ইহার মধ্যে দশটি শ্লোক আছে, যথা—সীতার মত সতী হবে, দশরথের মত শ্বশুর হবে, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হবে, রামের মত পতি হবে, লক্ষণের মত দেওর হবে, কুন্তীর মত পুত্রবতী হবে, দুর্গার মত সৌভাগ্যবতী হবে, দ্রৌপদীর মত রাঁধুনী হবে,

গঙ্গার মত শীতল হবে, পৃথিবীর মত ধৈর্য্য হবে। এই সব গুণই যদি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিত তবে সুখের সীমাই থাকিত না, কিন্তু সে যদি কিছু পরিমাণেও এগুলি পাইয়া থাকে তবে তাহাও তাহার পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। আমার ভাগ্যে দু একটি ছাড়া সব ইচ্ছাই পূর্ণ হইয়াছিল। ধনে, মানে, যশে, ঐশ্বর্য্যে, চরিত্রে, রূপে, গুণে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতম বংশের মধ্যে আমি আসিয়া পড়িয়াছিলাম। কুন্তীর মত বহু পুত্রের জননী হই নাই বটে, কিন্তু যে পুত্রকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম তাহা শত পুত্রের অপেক্ষাও কিছু কম বলিয়া মনে করি নাই। এ শুধু জননীর নিকট পুত্রের প্রশংসা নহে, পরিবারের সকলে, এবং বাহিরের লোকেরা যাঁহারা তাহার সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন কোন্ পুত্রের জননী হইবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। পঞ্জাবের অধিবাসীরা, যাঁহারা তাহাকে প্রাণের মত ভালবাসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিতে পারেন যে, অল্পদিনের মধ্যে কি বস্তুকে তাঁহারা হারাইয়াছিলেন।

অল্পদিনের জন্য তাহাকে পাইয়াছিলাম, কিন্তু তারই ভিতর তাহার ভালবাসার গুণে সে সকলকে আপনার করিয়া চলিয়া গিয়াছে। সমস্ত সুখ ঈশ্বর আমাকে দিয়াছিলেন, কিন্তু আবার তিনিই ধীরে ধীরে সবই কাড়িয়া লইয়াছেন। সুখ-দুঃখের ভিতরই মানুষের জন্ম এবং মৃত্যুর লীলাখেলা চলিতেছে, আমার এই লেখার ভিতর সুখ হইতে দুঃখের অংশ বেশী। যাঁহারা আমার মতনই ভাগ্যের সহিত জড়িত, তাঁহারাই আমার এই ক্ষুদ্র লেখার ভিতর তাঁহাদের অবস্থাকে মিলাইয়া আমার সুখদুঃখের ভাগী হইয়া তৃপ্ত বোধ করিবেন। জীবনের শেষপ্রান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, যিনি এত বড় দুঃখ কষ্টকে সহ্য করিবার শক্তি আমার ভিতরে দিয়াছিলেন তাঁহারই চরণে আশ্রয় পাইবার জন্য অপেক্ষায় আছি, জানি না কবে তিনি আমার শেষ আশা পূর্ণ করিবেন। এই লেখার মধ্য দিয়া যদি কাহারও মনে একটুকুও শান্তি বা সান্ত্বনা আনিয়া দেয় তবেই এই লেখা সার্থক।

* * *

হুগলি জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া গ্রামে প্রাণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র আমার পিতা ছিলেন। পিতারা দুই ভাই, হরদেব ও কালিপদ। আমার পিতার নাম হরদেব চট্টোপাধ্যায় ও মাতার নাম বামাসুন্দরী। আমার পিতা প্রথমে সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁর এই ধর্ম্মানুরাগ থাকার দরুণ আমার শ্বশুর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত পিতার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। আমার পিতাকে তিনি খুবই ভালবাসিতেন। আমার পিতামহের শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে শ্বশুর একবার বাঁশবেড়িয়াতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, সেখানে যাইয়া তাঁহার কর্ম্মচারী কিশোরী চট্টোপাধ্যায়, কৈলাস মুখোপাধ্যায় ও দেওয়ান চন্দ্রনাথ রায়ের নিকট পিতার অবস্থার কথা শুনিলেন, তারপর পিতাকে ডাকাইয়া তাঁহার বেশ-পরিবর্ত্তনের চিহ্ন দেখিয়া, নানারূপ সৎ বাক্যদ্বারা তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। বাড়ী আসিয়া পিতামহের যাহাতে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সফল, ভালরূপে সম্পন্ন হয় তাহারই জন্য পিতার নিকট অর্থ পাঠাইয়া দিলেন, পিতা সেই অর্থের সাহায্যে তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেন। পিতার সহিত তাঁহার এতদূর সৌহৃদ্য জন্মাইয়াছিল যে, দুইজনের মধ্যে স্থির ছিল যে, যাঁহার আগে মৃত্যু হইবে, তাঁহার বিধিমত সৎকার যিনি জীবিত থাকিবেন তিনিই করিবেন। পিতার মৃত্যু পূর্ব্বেই হওয়াতে, আমার শ্বশুর স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া চন্দনকাষ্ঠে তাঁহার চিতাশয্যা প্রস্তুত করিয়া সুচারুরূপে সৎকারকার্য্য সম্পন্ন করেন। ইঁহাদের দুইজনের পরস্পরের মধ্যে এত ভালবাসা থাকার জন্য তাঁহার ইচ্ছা ছিল এই ঠাকুর-পরিবারের সহিত বিবাহ দ্বারা আরও নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপন করা। তাঁহার এই ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছিল। পিতা দয়াবান ও ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, গ্রামের গরীব-দুঃখীদের বিপদ-আপদে নিজের শরীর ও অর্থ দ্বারা নানারূপে তাহাদিগকে সাহায্য করিতেন। ইহা ছাড়া গ্রামে দাতব্য চিকিৎসাও তিনি করিতেন।

আমার পিতা তিনবার বিবাহ করেন। তিনি কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর দুই কন্যা, দ্বিতীয়ার সন্তানাদি হয় নাই। শেষে আমার মাকে বিবাহ করেন। মায়ের আট কন্যা এবং তিন পুত্র হয়। আমি ভাই-

বোনদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠা। বোনদের নাম ছিল সারদা, সুখদা, জ্ঞানদা, নিস্তারিণী, লক্ষ্মী, নৃপময়ী ও প্রফুল্লময়ী। ভাই তিনটির নাম তারাপ্রসন্ন, শ্যামাপ্রসন্ন, দুর্গাপ্রসন্ন। আমার সৎবোন দুটির নাম অন্নদা ও সৌদামিনী। সর্ব্বপ্রথম মায়ের যে কন্যা হইয়াছিল সে খুবই অল্পদিনের ভিতর মারা যায়, সেইজন্য তা‍ার নাম রাখা হয় নাই।

জ্ঞানদাকে আমার মনে পড়ে না, কারণ সেও পাঁচ বৎসর বয়সের সময় বসন্ত রোগে মারা যায়। অন্নদা ও সৌদামিনী দুইজনেই বেথুন স্কুলে পড়িয়াছিলেন।

পিতার প্রথম পক্ষের স্ত্রী যিনি ছিলেন, তাঁর স্বভাব বড়ই কর্কশ ও ব্যবহার অত্যন্ত খারাপ ছিল। আমার ঠাকুরমা, তাঁহার নানা রকম দুর্ব্যবহারে অত্যন্ত জ্বালাতন হইয়া আমার পিতার পুনরায় বিবাহ দেন। এই বৌ-এর কোনও সন্তানাদি হয় নাই। ইনি বাপ মায়ের খুবই আদরের একমাত্র কন্যা ছিলেন বলিয়া, তাঁর বাপ মা তাঁহাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতেন না, শুনিতে পাই সেই সব নানা কারণে পিতা আমার মাকে বিবাহ করেন, এবং ঠাকুরমাও এই বিবাহ দিতে বাধ্য হন। আমার মেজমার (পিতার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী) স্বভাব বড়মার মতন রুক্ষ ছিল না, তিনি পতিব্রতা সরল প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিলেন। আমার মা মাকুরদা গ্রামে বাসাণ্ডা নিবাসী গোরাচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা। মায়ের যখন দুই তিনটি সন্তান হয় তখন বড়মার দৌরাত্ম্যে পিতামাতা সকলে বাঁশবেড়ে ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। প্রথমে কলিকাতায় আসিয়া আমার পিতা শাঁখারিটোলা, নেবুতলায় কিছুকাল বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকেন। তারপর বৌবাজারে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে কিছুদিন ছিলেন, সেই বাড়ীতেই আমার জন্ম হয়। মায়ের কাছে শুনিয়াছি, যখন সিপাহীবিদ্রোহ হয় সেই সময় আমি সূতিকাগৃহে। আমার যখন বয়স পাঁচ ছয় বৎসর তখন আমার দুই বোন নিস্তারিণী ও লক্ষ্মীর পনের দিনের মধ্যে মৃত্যু হয়। আমরা সে সময় শিয়ালদহে একটা বাড়ীতে বাস করি। নিস্তারিণীর শিমলাপাড়ায় বিবাহ হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ীর নানা রকম যন্ত্রণা ভোগ করায় তাহার শরীর মন ক্রমশঃ খারাপ হইতে থাকে, তাহা হইতেই কঠিন রোগের সূত্রপাত, তারপরই তাহার মৃত্যু ঘটে। লক্ষ্মী, বড় অভিমানিনী মেয়ে ছিল, সে কাহারও কর্কশ কথা সহ্য করিতে পারিত না, একদিন আমার ভাইয়ের কাছে কোনও কারণে মার খাইয়াছিল এবং তারপর হইতে তাহার প্রায়ই জ্বর হইতে থাকে, সেই জ্বরই তাহার মৃত্যুর এক রকম কারণ হয়।

দুজনেই খুব অল্প বয়সে মারা যায়, নিস্তারিণী তের বছরে ও লক্ষ্মী দশ বছরে। তাহাদের দুজনের মৃত্যুর পর আমার পিতা সাঁতরাগাছিতে একটি বাড়ী কিনিয়া বরাবরের জন্য সেখানে বাস করিতে থাকেন। আমার বয়স যখন দশ বৎসর সেই সময় আমার দিদি নৃপময়ী দেবীর সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তৃতীয় পুত্র হেমেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। ইহার পূর্ব্বে সারদাসুন্দরী ও সুখদার বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। সারদাসুন্দরীর উত্তর-পাড়ায় যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল।

নৃপময়ীর বিবাহের সময় আমাদের দিকে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়। আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা সকলেই মনে করিলেন এই বিবাহ হইলে তাহাদের জাত নষ্ট হইবে, সেই আক্রোশে একশত লাঠিয়াল ঠিক করিয়া রাখিলেন, যে, যেম্‌নি বর সভায় আসিবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে লাঠির ঘায়ে শেষ করিয়া কনেকে তুলিয়া লইয়া যাইবেন। এই খবর পাইবামাত্র আমার ভাই দুর্গাপ্রসন্ন, পুলিশের সাহায্য লইয়া যাহাতে বিবাহে কোনও রূপ বাধাবিঘ্ন না ঘটে তাহার জন্য সার্জ্জেন কনেষ্টবল্ পুলিশের পাহারা বসাইয়া রাখিলেন। ভাগ্যক্রমে কোন বিপদ ঘটে নাই। বর যখন বিবাহের আসরে আসিয়া বসিলেন তখন মনে হইতেছিল সত্য সত্যই যেন মহাদেব ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যেমন রূপ, আবার তেমনি সাজের বাহার! বর দেখিয়া পাড়ার লোকেরা স্তম্ভিত হইয়া গেল, চারিদিক হইতে লোকেরা বর দেখিবার জন্য উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। সে যে তাঁহাকে কি সুন্দর দেখাইয়াছিল

তাহা আজও ভুলিতে পারি নাই। অগ্রহায়ণ মাসে গোধূলী লগ্নে বিবাহ হইয়াছিল। দিদির বিবাহের পর আমি প্রায়ই মায়ের সঙ্গে জোড়াসাঁকোর বাড়ী আসা যাওয়া করিতাম, সেই সময় আমাকে দেখিয়া আমার ননদ স্বর্ণকুমারী ও শরৎকুমারীর পছন্দ হওয়াতে আমার স্বামীকে বিবাহ করিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিতে থাকেন। আমার স্বামী সেই কথায় তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি কনাবৌকে বিবাহ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তাঁহাদের মধ্যে খুব একটা হাসাহাসির রোল পড়িয়া যায়। আমি আসিতেই আমাকে তাঁহারা দুজনে মিলিয়া সাজাইয়া আমার স্বামীকে দেখাইবার জন্য বাহিরের বারাণ্ডায় লইয়া যাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু আমি পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, তখন লজ্জাই বেশী ছিল, কাজেই আমি কিছুতেই বাহিরে তাঁর সামনে যাইতে রাজি হইলাম না, বাড়ীর ভিতর চলিয়া আসিলাম। সেই বছর ফাল্গুন মাসের ৮ই তারিখে আমার বিবাহ হয়। দিদির বিবাহের দুই বৎসর পরেই ওই বাড়ীতেই মহর্ষির চতুর্থ পুত্র বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে বিবাহ হইয়াছিল, তখন আমার বয়স বার বৎসর ছয় মাস মাত্র। আশ্বিনের ঝড়ের বছরেই আমার বিবাহ হয়, আমার বিবাহে কিছু গোলমাল হয় নাই, তবুও পাছে হয় বলিয়া পুলিশের কিছু বন্দোবস্ত রাখা হইয়াছিল।

বিবাহের পরদিন আমার দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরকারকে সঙ্গে করিয়া গয়নার বাক্স সঙ্গে লইয়া আমাকে সেই সকল পরাইয়া আনিবার জন্য আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। আমাকে সেই সব গহনা কাপড় পরাইয়া, মা আমার দুর্গা প্রতিমার-স্তব করিয়া আমাকে পাল্কীতে তুলিয়া দিয়া পা মুছাইয়া দিলেন। মা বাপকে ছাড়িয়া আসিবার সময় খুবই কষ্ট হইল, সারারাস্তা তাঁহাদের জন্য মন কেমন করিতে লাগিল, কাঁদিতে লাগিলাম। তখন এ রকম পাল্কী ছিল না, পাল্কীর ধরণেরই ছোট এক রকম বস্‌বার ছিল, তার উপর নানা রকম কাজ করা কাপড় দিয়া উহা ঢাকা থাকিত, তাহাকে তখনকার দিনে তাঞ্জাম বলিত। সেই তাঞ্জামসুদ্ধ আমাকে জাহাজে উঠান হইল, আমি তাহার মধ্যে বসিয়া রহিলাম। আমার স্বামী, চার ঘোড়ার গাড়ীতে চড়িয়া বিবাহ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা যখন বাড়ী আসিয়া পৌছিলাম তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। বাড়ীর ফটকের সামনে গাড়ী যখন থামিল সেই সময় আমার শাশুড়ী, বড় ননদ সৌদামিনী দেবী ও বাড়ীর কয়েকজন স্ত্রীলোকেরা আমাকে পাল্কী হইতে নামাইয়া লইলেন। আমার শাশুড়ী জলের ঝারা দিয়া পানসন্দেশ মুখের মধ্যে দিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দোতলায় আনিয়া আমাদের দুজনকে মসলন্দের উপর বসান হইল এবং সেইখানেই বিবাহের নানারকম অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন হইল। বিবাহের আট দিন পরে যেদিন বাপের বাড়ীতে যাই, সেই দিন শাশুড়ী নিজে গহনা পরাইয়া আমাকে সাজাইয়া দিলেন, তাঁর নিজের একটি চুনী-মুক্তোর নথ ছিল, সেইটি আমার নাকে পরাইয়া দিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেটা এত ভারী ছিল যে, পরিতে গিয়া আমার চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া আমার বড় ননদ আর পরিতে দিলেন না, আমি সে যাত্রা রেহাই পাইলাম। চুনী এবং দুটি মুক্তোর দাম দু হাজার টাকা। বিবাহের পর শ্বশুর-বাড়ীতে আসিয়া, ননদ, জা, ও আত্মীয়স্বজনদের নিকট হইতে এত আদর-যত্ন পাই যে, তাহাতেই অনেকটা বাপ মায়ের শোকটা ভুলিতে পারিয়াছিলাম। আমার বিবাহের সাত মাসের মধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হয়। তিনি অনেক দিন হইতেই অর্শের রোগে ভুগিতেছিলেন।

তখনকার দিনে আমার শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ম ছিল যে, বিকাল হইলেই মালিনীরা ফুলের মালা গাঁথিয়া আনিবে এবং সেই মালা বাড়ীর বৌঝিরা মাথায় গলায় দিয়া যাহার যেমন ইচ্ছা তেম্‌নি করিয়া সাজিবে। আমি তখন নতুন বৌ আসিয়াছি, আমার বড় ননদ রোজ নানা রকমের খোঁপা বাঁধিয়া সেই মালা উহাতে জড়াইয়া দিতেন। আমার বড় জা সর্ব্বসুন্দরী দেবী নিজের টাকা-পয়সা খরচ করিয়া নানা রকম পাড়ের শাড়ী কিনিয়া নানা রঙে ছুবাইয়া, আমাকে প্রত্যেক দিন পরাইয়া সাজাইতেন। বড় জা আমাকে তাঁর নিজের বোনের

মত স্নেহ করিতেন। তখন আমরা ননদ, জায়েরা মিলিয়া সকলে একসঙ্গে খাইতে বসিতাম। নতুন বৌ আমি, তার উপর পাড়াগেঁয়ে মেয়ে, কাজেই ঘোমটার বহরটা বেশী রকমই ছিল, ঘোম্‌টা ছাড়া এক মুহূর্ত্ত থাকিতাম না। খাইতে বসিবার সময় এক হাত ঘোম্‌টার ভিতরেই কোন রকমে খাইতাম। আমার দেওর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঘোমটা দেওয়াটা পছন্দ করিতেন না। আমি যখন খাইতে বসিতাম তখন পর্দ্দার আড়াল হইতে, আমি কি করিয়া খাই দেখিবার জন্য প্রায়ই উঁকি-ঝুঁকি মারিতেন। খাওয়ার রকম দেখিয়া থাকিতে না পারিয়া, আমাকে নানারকম ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না। নতুন ঠাকুরপোর (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ) গানে ঝোঁক খুব ছিল ও গান বড় পছন্দ করিতেন, একদিন আমার গান তাঁর শুনিবার খুব ইচ্ছা হইল। স্বর্ণকুমারী—তাঁরও এ-সব বিষয়ে খুব উৎসাহ ছিল, তিনি আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁর কাছে লইয়া গেলেন। কি যে গাহিব কিছুই ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিতেছিলাম না, মনে বড় ভয় ও লজ্জা করিতে লাগিল, শেষকালে যাহা একটু আধটু বাড়ীতে শুনিয়া শিখিয়াছিলাম তাহাই তাঁর কাছে ভরসা করিয়া গাহিলাম। তিনি গান শুনিয়া খুসী হইলেন বলিয়া মনে হইল, এবং যাহাতে আরও ভাল করিয়া শিখিবার সুবিধা হয় তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। তখন বাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদ্ গায়কেরা আসিয়া গান করিতেন, আমি মাঝে মাঝে সেই সকল গান শুনিয়া শিখিবার চেষ্টা করিতাম। এমনি ভাবে চার বৎসর বেশ সুখেই কাটিয়াছিল বিবাহের চার বৎসর পরে আমার স্বামী মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত হইয়া সাড়ে তিন বৎসর ওই ভাবে কষ্টে কাটান। আমার বিবাহের পরই তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এই রোগের পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট মেধাশক্তি ছিল বলিয়া আমার শ্বশুর, সমস্ত সংসারের তহবিলের আয়ব্যয় দেখিবার ভার তাঁহার উপর দিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে আমার মামাশ্বশুর হিসাবপত্র দেখিতেন, কিন্তু তাঁরও মাথার দোষ থাকায় শ্বশুর তাঁহাকে ছাড়াইয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার যখন এইরূপ অবস্থা হইল এবং দিন-দিনই রোগের বৃদ্ধি হইতে লাগিল তখন আমার মনের অবস্থা বড়ই খারাপ হইয়া গেল, কি যে করিব কিছুই ভাবিতে পারিতাম না, বাড়ীর সকলে এবং আমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী সকলেই তাঁর জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আমার স্বামী স্নান আহার পর্য্যন্ত সব ছাড়িয়া দিলেন, ও সকলের উপর একটা তাঁর সন্দেহের ভাব বাড়িতে লাগিল। এই সন্দেহ বাতিকের জন্য প্রায়ই আমাকে নানা রকম ভুগিতে হইত। যখন নানা রকম দুশ্চিন্তায় আমার মনকে অস্থির করিয়া তুলিত তখন আমি একটি ঘরে বসিয়া একলা একলা কাঁদিতে থাকিতাম। সে সময় আমার মেজ 'জা' জ্ঞানদানন্দিনী তেতলার ঘরে থাকিতেন; তিনি আমার এই দুঃখ সহিতে না পারিয়া আমাকে তাঁর কাছে ডাকিয়া মায়ের মতন নানা রকম সান্ত্বনা দ্বারা আমার মনে শান্তি দিবার চেষ্টা করিতেন। তাঁর স্নেহ আদর যত্নে তখন আমার মনের ভিতর কত যে বল ভরসা আনিয়া দিয়াছিল তা এ সামান্য লেখার ভিতর দিয়া প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আজও সেই কথা যখন মনে করি তখন ভক্তি শ্রদ্ধায় আমার মন তাঁর প্রতি ভরিয়া উঠে; তিনি যদি তখন উপস্থিত না থাকিতেন, তবে কি যে করিতাম বলিতে পারি না। জানকীনাথ, তিনিও সেই সময় ভাইয়ের ন্যায় আমার অনেক উপকার করেন।

আমার স্বামী খাওয়া-দাওয়া এক রকম ছাড়িয়াই দিলেন। তার উপর তাঁর কাসি ও হাঁপানী অল্প অল্প দেখা দিল, এইসব কারণে তাঁকে লইয়া আমি আমার বড় জা, নতুন বৌ, আমার দিদি সকলে মিলিয়া বোলপুরে যাই। সেখানে গিয়াও খাওয়ার কোন পরিবর্ত্তন হইল না। চায়ের চামচের এক চামচ ভাত বা কোনও দিন একটি পটল-পোড়া খাইয়া থাকিতেন। এমনি ভাবে সেখানে তিন দিন কাটিল, খাওয়ার বা শরীরের কোনই বদল না হওয়াতে তিন দিন পর আবার আমরা কলিকাতায় ফিরিয়া আসি। দিন দিন শরীরের অবস্থা খারাপ হইতে থাকায় আমার শ্বশুর কিছুদিনের জন্য তাঁহাকে আলিপুর পাগ্‌লাগারদে পাঠাইয়া দেন। সেখানে ছয়মাস থাকিয়া অনেকটা সুস্থ হইয়া ফিরিয়া

আসেন। সেই সময় আমার শরীর নানা চিন্তার মধ্যে বড়ই খারাপ হইয়াছিল, তাঁর কথা ভাবিতে ভাবিতে আমার অধিকাংশ সময় কাটিয়া যাইত, মনে কিছুতেই আনন্দ পাইতাম না। পাগলাগারদ হইতে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে বলুর (বলেন্দ্রনাথের) জন্ম হয়। তার জন্মের পূর্ব্বে একদিন স্বপ্ন দেখিলাম যে, একটি মেয়ে লাল শাড়ী পরিয়া একমাথা সিঁদুর মাখিয়া একটি সরাতে রক্তমাখা ছাগমুণ্ড হাতে লইয়া আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। আমি স্বপ্নের কথা আমার দিদিশাশুড়ীর কাছে সব খুলিয়া বলিলাম। তিনি বলিলেন যে, "এ স্বপ্ন শুভ হইবে।" তারপরই বলুর জন্ম হয়।

১২৭৭ সাল ২১শে কার্ত্তিক রবিবার বিকাল ৫টায় তার জন্ম হইয়াছিল। সে ভূমিষ্ঠ হইবার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একেবারেই কোনও কান্নার শব্দ পাওয়া যায় নাই, নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়াছিল। তাহার পর ডাক্তারেরা নানা উপায়ে তাহাকে কাঁদাইতে সক্ষম হন। আমারও সেই সময় খুবই অসুখ। নাড়ী ছাড়িয়া কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আমার নানারকম মনের অশান্তির মধ্যে ওর জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারও শরীরটা তেমন সুস্থ ছিল না, দুটি পা-ও একটু বাঁকা মতন হইয়াছিল। তাহার দরুণ অনেক দিন পর্য্যন্ত পা ঘসিয়া ঘসিয়া চলিত। সে যখন ছয় দিনের, তখন আমার বড় ভাসুর (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর) উপাসনা করিয়া বলুকে একটি গিনি দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

আট দিনের দিন, আমার শাশুড়ী, ছেলের পরমায়ু-বৃদ্ধির জন্য বাড়ীর যত দাসদাসী ছিল সকলকেই তেল দিয়া এক একটি কাঁসার বাটি দান করেন। শাশুড়ী বলুকে বড় ভালবাসিতেন। বলু যখন ছোট ছিল তখন আমার শ্বশুরের চলার নকল করিত, আমার শাশুড়ী তাই দেখিতে খুব ভালবাসিতেন এবং তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া দেখিতেন।

বলু যখন সাড়ে চার বছরের, তখন আমার কাছেই তাহার হাতে খড়ি হয়। তখন হইতে পাচ বছর পর্য্যন্ত আমি নিজেই তাকে অল্প অল্প পড়াইতাম। ছয় বছরের সময় তাকে সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে তার মামাতো ও জ্যেঠতুতো ভাইদের সঙ্গে আমাদের সরকারি গাড়ীতে করিয়া পড়িতে যাইত, কিন্তু তার পায়ের দোষ থাকায় অন্য ভাইরা ঠাট্টা করিত। এই কথা শুনিতে পাইয়া আমি প্রিয়নাথ ডাক্তারের গাড়ী কিছুদিনের জন্য ভাড়া করিয়া পাঠাইতে লাগিলাম। তাহার পর তার জন্য ঘোড়াগাড়ী কিনিয়া দিয়াছিলাম, সে তাহাতে করিয়া যাইত। বার বছর বয়সের সময় সে হেয়ার স্কুলে ভর্ত্তি হয় ও পনের বছর বয়সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা দেয়। যে বছর বলু বিদ্যালয়ে যায় সেই বছরে আমার শাশুড়ীর মৃত্যু হইয়াছিল। বলুর বিদ্যালয়ে যাইবার সংবাদ আমার কাছে পাইয়া, তিনি খুবই খুসী হইয়াছিলেন। আমার শাশুড়ীর মৃত্যুতে আমি চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। শাশুড়ীর মত শাশুড়ী পাইয়াছিলাম। তাঁর মতন সৌভাগ্যবতী, পতিভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোক এখনকার দিনে খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার সৌভাগ্যের জোরে দ্বারকানাথ ঠাকুরের ব্যবসা-বাণিজ্যে যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি লাভ হইয়াছিল। শাশুড়ীর কাছে শুনিয়াছিলাম যে, তাহারই জন্য তাঁহার শ্বশুর খুসী হইয়া, তাঁহাকে একলক্ষ টাকার হীরা, পান্না, মোতি বসানো খেলনা কিনিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম্মে মতি তাঁর যথেষ্ট ছিল। কেহ যদি তাঁহার সাক্ষাতে পুত্রকন্যাদের প্রশংসা করিত, তখনই তিনি মাথা নত করিয়া থাকিতেন, পাছে তাঁর মনে অহঙ্কার আসে। সেই সময় আমাদের বাড়ীতে পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর যখন পূজার দালানে বসিয়া উপাসনা করিতেন, তখন তিনিও অধিকাংশ সময় তাঁহার পাশে বসিয়া উপাসনায় যোগ দিতেন। তাহা ছাড়াও জপ করিতেন দেখিয়াছি। অত বড় বৃহৎ পরিবারের সমস্ত সংসারের ভার তাঁহারই উপর ছিল, তিনি প্রত্যেককে সমানভাবে আদর যত্নে অতি নিপুণভাবে সকলের অভাব, দুঃখ, দূর করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। কাহাকেও কোনও বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া মনে ব্যথা দিবার কখনও চেষ্টা করিতেন না। তাঁর মনটি শিশুর মত কোমল ছিল। এত বড় লোকের পুত্রবধূ এবং গৃহিণী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মনে কোনরকম জাঁক, বা বিলাসিতার ছায়া স্পর্শ করিতে

পারে নাই। যতদূর সম্ভব সাধাসিধে ধরণের সাজ-পোষাক করিতেন, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার দেহের সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়াইয়া তুলিত। হাতের উপর একবার একটি লোহার সিন্দুকের ডালা পড়িয়া যাওয়াতে সেই অবধি হাতের ব্যথায় প্রায়ই কষ্ট পাইতে থাকেন। পাঁচ ছয়জন বড় বড় ডাক্তার দেখানর পরও ভাল না হওয়াতে পুনরায় অস্ত্রোপচার করিতে হইয়াছিল। ক্ষতটি যখন শুকাইতেছিল সেই সময় একজন আচার্য্যিনীর পরামর্শে তেঁতুলপোড়া বাটিয়া ক্ষতের চারিদিকে লাগাইবার পর বিষাক্ত হইয়া আবার পাকিয়া উঠে। সেইটাই ক্রমশঃ ভিতরে দূষিত হইয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

আমার বড় জা, তাঁরও সৌভাগ্য কিছু কম হয় নাই। যাঁর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত পতিলাভ ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁরও ভাগ্যের কম জোর নয়! আমার বড় জা একত্রিশ বছর বয়সে পাঁচটি পুত্র ও দুইটি কন্যা রাখিয়া মারা যান। আটমাসের একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া মারা যাইবার পর হইতে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে। নানা চিকিৎসার দ্বারা কোনও ফল না হওয়াতে শেষকালে মৃত্যু হয়।

দ্বিপেন্দ্র, অরুণেন্দ্র, নীতেন্দ্র, সুধীন্দ্র, কৃতীন্দ্র—এই পাঁচ পুত্র এবং সরোজা, ঊষা দুই কন্যা। ইহারা সব খুবই অল্প-বয়সে মাতৃহারা হইয়াছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিপেন্দ্রনাথের তখন ষোল বছর বয়স মাত্র।

আমার বড় জা আমাকে ঠিক নিজের ছোট বোনের মতন ভালবাসিলে আমিও তাঁকে সেইরূপ ভালবাসিতাম ও ভক্তি করিতাম। তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পূর্ব্ব হইতে কেন জানি না আমার মন বড়ই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, কিছুতেই বাড়ীতে থাকিতে পারিতাম না। মৃত্যুর সময় আমি নিকটে ছিলাম, মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বেই সঙ্কেতের দ্বারা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁহার স্বামীকে ও ছেলেমেয়েদের দেখিতে চান। আমি তৎক্ষণাৎ বড় ভাসুরকে তাঁহার ইচ্ছার কথা জানাইলাম। তিনি আসিবার অল্পক্ষণ আগেই তাঁহার প্রাণ বাহির হইয়া গেল। বড় জায়ের মৃত্যুর পর ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের ভার আমি প্রথমে বহন করিলাম, স্নান আহার সবই তারা আমার নিকট করিত। বড় মেয়ে সরোজার তখন বিবাহ হইয়াছিল, জামাই মেয়ের দেখাশুনা যাহা করিবার আমিই করিতে লাগিলাম। শাশুড়ী এবং বড় জা, এই দুজনের মৃত্যুর পর আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিল। বিবাহ হইয়া শ্বশুর-ঘর যখন করিতে আসি তখন আমার বড় জা, বড় ননদের আদরযত্নই বেশী পাইয়াছিলাম। অন্য ননদেরা তখন ছোট ছোট, কাজেই ইহাদের যত্নটাই বেশী মনের মধ্যে গাঁথিয়া গিয়াছিল। আমার মেজ জা বেশীর ভাগ সময় বিদেশে স্বামীর সহিত থাকিতেন, যখন তিনি বাড়ী আসিতেন তখন তাঁহার সকলের প্রতি আদরযত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি হইত না, সকলের খোঁজখবর লওয়া তাঁহার কার্য্যের ভিতর একটি প্রধান কাজ ছিল। তাঁহার আগমনে বাড়ীর সকলের আর আনন্দের সীমা থাকিত না। আমাদের সেই সময় বেশ-ভূষার বড়-একটা কিছু আড়ম্বর ছিল না। আমরা কেবলমাত্র একটি শাড়ী পরিয়া থাকিতাম, গায়ে জামা দিবার চলন ছিল না। তিনি প্রথমে বম্বে হইতে আসিয়া শাড়ীর নীচে পায়জামা পরা, সায়া পরা, জামা পরা ও বম্বে ধরণের শাড়ী পরা আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রচলন করিয়াছিলেন। তাই দেখিয়া বাহিরের অন্যান্য লোকেরা তাহার অনুকরণ করিতে থাকেন। বাড়ীর দাসদাসী ভিন্ন বাহিরের দর্জ্জি, স্যাকরা, ইত্যাদি কাহারও অন্দরমহলে প্রবেশ করিবার হুকুম ছিল না, আমার মেজ জা-ই সেই নিয়ম ধীরে ধীরে ভঙ্গ করেন এবং ছায়াচিত্রকর (photographer) ডাকিয়া আমার বড় জার শাশুড়ীর এবং বাড়ীর সকলের ছবি তুলাইয়াছিলেন।

বড় জায়ের মৃত্যুর দুতিন বছর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ৺দ্বিপেন্দ্রনাথের বরিশালের জমিদার রাখাল রায়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা সুশীলার সহিত বিবাহ হয়। তার বাপ-মায়ের দেওয়া সুশীলা নাম সার্থক হইয়াছিল—ধর্ম্মে কর্ম্মে স্বভাবে মায়ায় দয়ায় মনটি পূর্ণ ছিল। সে যখন যাহার নিকট আসিত সেই তাহার মিষ্ট ব্যবহারে সুখী হইত। এত ভাল বউ পাওয়া সত্ত্বেও আমাদের ভাগ্যে তাহাকে লইয়া ঘর করা বেশী দিন ঘটিল না। সে

আমাকে বড়ই স্নেহ ভক্তি করিত। তাহার একটি কন্যা এবং পুত্র হইবার কয়েক বছর পর হইতেই শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ায় শেষকালে ক্ষয়কাশ রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে। সেই দুরন্ত রোগের সময় তাহার চতুর্থ দেওর ৺সুধীন্দ্রনাথ তাহার পার্শ্বে বসিয়া পুত্রের ন্যায় সেবা করিয়াছিলেন। সে মৃত্যুর সময়, একমাত্র কন্যা নলিনী ও পুত্র দিনেন্দ্রনাথকে রাখিয়া যায়। তাহার মৃত্যুতে আমার মনে বড়ই ব্যথা লাগিয়াছিল। তাহার কন্যা নলিনী ঠিক তাহার মায়ের স্বভাবটিই পাইয়াছে। স্নেহে, মমতায়, দয়া, মায়ায়, সেবাযত্নে তাহারও মনটি খুবই সুন্দরভাবে গঠিত হইয়াছে। পুত্র দিনেন্দ্রনাথ, তাহার সুমধুর কণ্ঠস্বরে সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। সুশীলার গলাও মিষ্টি ছিল। যে গানই সে করিত, তাহা এতই ভাবের সহিত গাহিতে থাকিত যে তাহাতেই লোকের মনকে মুগ্ধ করিত। দিনেন্দ্রনাথের গানের মধ্যেও তাহার মাতার সঙ্গীতের সেই বিশেষত্বটুকু রহিয়া গিয়াছে। তাহাদের মাতার আশীর্ব্বাদের ফলে, তাহারা দুজনেই উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত সন্তান হইতে পারিয়াছে।

সুশীলার মৃত্যুর পর দ্বিপেন্দ্রনাথ পুনরায় ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয়া কন্যা হেমলতা দেবীকে বিবাহ করেন। হেমলতার পুত্রকন্যা হয় নাই, তিনি তাঁহার সপত্নীর সন্তানদিগকে ঠিক নিজের সন্তানের ন্যায় স্নেহে, যত্নে প্রতিপালন করিয়াছেন। আমি যখন পুত্রশোকে কাতর, সেই সময় তিনি যথেষ্ট যত্ন আদরে আমার সেবা ও তত্ত্বাবধান করিয়াছিলেন। ইঁহারই দুই ভ্রাতা, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় ও রজনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের সহিত আমার বড় জায়ের দুই কন্যা, সরোজা ও উষার দুইজনের বিবাহ হইয়াছিল। এখন তাঁহাদের দুই ভগ্নীর মধ্যে কেহই জীবিত নাই। আমার বড় ননদ সৌদামিনী দেবীর, তাঁর পিতার ন্যায় ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল এবং স্বভাবও বড় মিষ্ট ছিল। ১১ই মাঘের উৎসবের দিন সন্ধ্যার সময়, আমাদের বাড়ীর একটি ঘর ফুল দিয়া নিজের হাতে সাজাইয়া তিনি আমাদিগকে সকলকে সঙ্গে করিয়া লইয়া সেই ঘরটিতে উপাসনা করিতেন, আমার শাশুড়ীও যাইতেন। সেখানে উপাসনা করিবার পর বাহিরে—যেখানে বিশেষ-ভাবে উৎসবের জন্য আয়োজন করা হইত, সেইখানে যাইয়া আমরা আড়াল হইতে শুনিতাম। শ্বশুর মহাশয় যখন বাড়ীতে থাকিতেন তখন তিনি নিজেই উপাসনা করিতেন, তাহা না হইলে তাঁহার অনুপস্থিতিতে, বেদান্ত-বাগীশ আনন্দরাম, —পাকড়াশি, জ্ঞানেন্দ্র—, এই তিন জনে ১১ই মাঘের উৎসবে বেদীতে বসিতেন। মাঝে মাঝে আমার বড় ভাসুর দ্বিজেন্দ্রনাথও উপাসনা করিতেন।

আমার শ্বশুর আমার বড় ননদকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহার এই সকল সৎকার্য্যে খুসী হইয়া তাঁহাকে তিনি "গৃহরক্ষিতা সৌদামিনী" নামকরণ করিয়াছিলেন। আমার শ্বশুর চার কন্যাকে ঘরজামাইরূপে বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, তাহা ছাড়াও প্রত্যেককে এক একখানি বাড়ী দিয়াছিলেন। আমার বড় ননদ ছাড়া অন্য ননদেরা সেই বাড়ীতে উঠিয়া গেলেন। বড় ননদ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার বাপের বাড়ীতে ছিলেন এবং মৃত্যুও তাঁহার এই বাড়ীতেই হইয়াছিল। পিতা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন পিতার খাওয়া-দাওয়া সর্ব্ববিষয় তত্ত্বাবধান তিনিই সব করিতেন। আমার বড় ননদের দুটি কন্যা ও একটি পুত্র হইয়াছিল। বড় মেয়ে ইরাবতীর, রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভাইপো, ৺নিত্যরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হয়, ছোট মেয়ে ইন্দুমতীর সহিত বর্দ্ধমান জেলায় একটি ব্রাহ্মণের পুত্র ৺নিত্য চট্টোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। এই জামাতা পরে খুব বড় ডাক্তার হইয়াছিলেন। পুত্র, সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়, বিষয়কার্য্যে ও সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার মাতার ন্যায় সুদক্ষ ছিলেন। মাতার মৃত্যুর পর তিনি এখন বরোদায় তাঁহার পুত্র ও পুত্রবধূর নিকট রহিয়াছেন।

উৎসবের সময় আমাদিগকে নানারকম গহনা পরিয়া সাজিতে হইত। এখনকার মত তখনকার দিনের গহনা অত হাল্কা ছিল না। বাড়ীর যে নতুন বউ আসিত তাহাকে আরও বেশী রকম গহনার উৎপাত সহ্য

করিতে হইত! আমি তখন নতুন বৌ, কাজেই আমারও অবস্থা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। গলায়—চিক, ঝিলদানা; হাতে—চুড়ী, বালা, বাজুবন্ধ; কাণে—মুক্তার গোচ্ছা, বিরবৌলি, কাণবালা; মাথায়—জড়োয়া সিঁথী; পায়ে—গোড়ে, পায়জোড়, মল, ছান্‌লা চুট্‌কী। এই ছয়-সাত সের ওজনের গহনা পরিয়া চলাফেরা করিতে হইত, না বলিবার উপায় ছিল না। গয়নার ভারে কোনরকমে বাঁকিয়া চুরিয়া চলিতাম, তাহাতে বাহিরের লোকেরা মনে করিত যে, আমি গহনার ঝাঁকে ও গুমরে ঐরূপ ভাবে চলিতেছি, কিন্তু আমার যা অবস্থা হইত তাহা আমিই জানিতাম। ইহা ছাড়াও দশ ভরির গোট কোমরে পরিবার নিয়ম ছিল।

* * *

আমাদের এই সব সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া বলু বড় হইতেছিল।

বাপের ওই রকম অবস্থা হওয়াতে তার মনে তখন হইতেই একটা বড় হইবার প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল। যখন আট নয় বছরের, সেই সময় আমাকে প্রায় বলিত যে, সে লেখাপড়া শিখিয়া ইঞ্জিনিয়ার হইবে। লেখা-পড়া তার নিকট একটা প্রিয় বস্তু ছিল, কোনও দিন তাহাতে অবহেলা করে নাই। যখন ওর তের বছর বয়স সেই সময় আমরা একবার শ্রীরামপুরে যাই। সেখানে থাকিবার সময় একদিন একটা মাঝি নৌকায় চড়িয়া গান গাহিতে গাহিতে যাইতেছিল "আমার খুড়োখুড়ী পায় না মুড়ী" ইত্যাদি। এই গান শোনার পর হইতেই ওর মনে কি এক রকম ভাব উপস্থিত হয়, তখন হইতে সে প্রায়ই এক একটা প্রবন্ধ লিখিয়া আমাকে শোনাইত। বুঝিবার মত লেখাপড়া যদিও আমার তেমন জানা ছিল না, কিন্তু তবুও শুনিয়া ভালই লাগিত। তখন হইতেই সাহিত্যের প্রতি তাহার দিন দিন অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

বলুর যখন ছাব্বিশ বছর বয়স্ সেই সময় ডাক্তার ফকিরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাহানা দেবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। বিবাহে খুবই ঘটা হইয়াছিল। বিবাহের যত রকম আয়োজন করিবার সবই আমার মেজ জা করিয়াছিলেন। আমার ছোট জা (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী) মৃণালিনী দেবীও সঙ্গে যোগ দিয়া নানা রকম ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে লইয়া, নানা রকম আমোদ-আহ্লাদ করিতে ভালবাসিতেন। মনটি খুব সরল ছিল, সেইজন্য বাড়ীর সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসিতেন। আমার সব জায়েরাই আমাকে নিজের বোনের মতন মনে করিয়া স্নেহ ভক্তি করিতেন। মৃণালিনী, যশোহর জেলার বেণীমাধব রায়ের কন্যা।

বলুর বিবাহ ১৩০২ সালে ২২শে মাঘ হয়। বউ যখন ঘরে আসিল তখন এত কষ্টভোগের পর মনে বড় আহ্লাদ হইল, ভাবিলাম এইবার ঈশ্বর আমাকে একটু বুঝি সুখের মুখ দেখাইলেন। সাহানার যখন বিবাহ হয় তখন তাহার বয়স বার পূর্ণ হইয়া তের বছর। দেহের রং যদিও শ্যামবর্ণ, কিন্তু চেহারা খুবই সুশ্রী ছিল। স্বভাবটি সরল শিশুর মত, যে যাহা বলিত বা ঠাট্টা করিত, সে তাহাই সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া লইত। আমার কন্যা হয় নাই, সে আমার কন্যার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আমি যখন খাইতে বসিতাম সেই সময় সেও আহ্লাদ করিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে খাইতে বসিত। তাহার যখন বিবাহ হয়, তখন বাড়ীতে অনেক গুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ছিল। তাহাদের সঙ্গে সেও ছোটাছুটি-খেলাধূলা করিত। বলুও অনেক সময় তাহার সঙ্গে খেলা করিত। সে বাড়ীর বউ হওয়ার জন্য, তাহাকে সেইভাবে বদ্ধ অবস্থায় বা কোনও রকম নিয়মের বাঁধনে রাখি নাই।

একবার আমাকে বলুকে সঙ্গে লইয়া কোন একটি আত্মীয়ের দুটি কন্যার বিবাহ স্থির করিবার জন্য তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতে হইয়াছিল। যখন বাড়ীতে ফিরিলাম তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে। পথের মধ্যে হঠাৎ শুনিলাম যে,মুসলমান এবং ইংরাজদের ভিতর ভীষণ রকম মারামারি আরম্ভ হইয়াছে। মুসলমানেরা ইংরাজ দেখিলেই তাহাকে অতি ভয়ানক রকমে মারিতেছে। রাজা যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুরের জমীর উপর একটা মস্‌জিদ্ ছিল, সেই মস্‌জিদ্‌টি ইংরাজের সাহায্যে তিনি ভাঙিয়া

ফেলেন। তারই জন্য ইহাদের আক্রোশ। আগে জানিতাম না, রাস্তার মাঝে আসিয়া এই ব্যাপার দেখিলাম—আমাদের ঘরের গাড়ী ছিল, আমরাই এক ডাক্তার নন্দাইয়ের গাড়ীতে সেদিন গিয়াছিলাম। তাহারা কোচম্যানকে প্রথমে কার গাড়ী জিজ্ঞাসা করাতে সে অত বিবেচনা না করিয়া বলে যে 'সাহেবের।' এই কথা বলিবামাত্র অজস্র ধারায় ইট লাঠি সমানে গাড়ীর উপর পড়িতে লাগিল। গাড়ীর কাঁচ ভাঙিয়া চারিদিকে ছিটকাইয়া পড়িল। আমি বলুর মাথাটা আমার বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া তাহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। আমার পিঠের উপর অনেক ইট আসিয়া পড়িয়াছিল। আমাদের যখন এই অবস্থা, তখন কোচয়ান্ চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল,"এ গাড়ী বাঙ্গালীবাবুর—সাহেবের নয়।" তাহারা গাড়ীর নিকটে যখন আসিয়া দেখিল সত্য সত্যই ইহা বাঙ্গালীর গাড়ী তখন নিরস্ত হইল। আমরাও কোনরকমে প্রাণটুকু হাতে লইয়া বাড়ী ফিরিলাম। বাড়ী আসিয়া তিন চার দিন প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় দুজনে পড়িয়াছিলাম। সারা দেহে অসহ্য রকম বেদনা এবং তার দরুণ যন্ত্রণায় আমার সর্ব্বশরীর নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার আসিয়া ওষুধ-পত্তর ব্যবস্থা করিবার পর ক্রমশঃ আরাম পাই। বলুর কপালের ভিতর একটি ছোট কাঠের টুক্‌রা বিঁধিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ছিল, তারপর আপনা হইতেই সেটা বাহির হইয়া যায়।

পঞ্জাবে আর্য্যসমাজের সহিত আমাদের ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে যাহাতে মিলন স্থাপন হয় সেইজন্য তাহার প্রাণের প্রবল ইচ্ছা ছিল এবং তাহারই জন্য বলু, আর্য্য-সমাজে যাতায়াত করিতে থাকে, তাঁহারাও তাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে যদি কখনও বিবাদ উপস্থিত হইত, তাহা হইলে বলুকে মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিতেন, এবং সে গিয়া তাহাদের মধ্যে বিবাদ মিটাইয়া মিলন স্থাপন করিয়া আসিত। তাহার এই ইচ্ছা পূর্ণ করিবার সুযোগ আর জীবনে ঘটিয়া উঠিল না। দ্বিতীয়বার যখন সে তাঁহাদের টেলি-গ্রাম পাইয়া চলিয়া যায়, সেইদিন আমার মেজ জায়ের কন্যা ইন্দিরার ফুলশয্যা। সেইজন্য সকলেই তাকে যাইতে বারণ করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের টেলিগ্রাম পাওয়াতে পাছে কর্ত্তব্যের অবহেলা হয় বলিয়া নিষেধ সত্ত্বেও সে চলিয়া গেল। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিবার পথে মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এবং কাছাকাছি অনেক তীর্থস্থান দর্শন করিয়া আসিল। সীতাকুণ্ডতে স্নান করিবার পর তার কানে খুব যন্ত্রণা হয় এবং তাহা লইয়াই বাড়ীতে ফিরিয়া আসে। বাড়ী আসার পর নানারকম সেবা-যত্নে কানের যন্ত্রণা অনেকটা কমিয়া আসিতেছিল, কিন্তু সেই সময় ঠাকুর কোম্পানীর হিসাবপত্তর চুকাইবার জন্য তাহাকে শিলাইদহে জমীদারিতে যাইতে হয়। সাহানা ওখানে আমার ছোট জায়ের কাছে ছিল, তাহাকে সেই সময় ওখানে একজন ইংরাজ মাষ্টার পড়াইত। সারা দিন-রাত হিসাবপত্র লইয়া বলু এত ব্যস্ত থাকিত যে, সময় মত স্নানাহার তাহার হইত না, কখনও বা বেলা তিনটায় কখনও বা পাঁচটায় খাইত, এইরূপ অনিয়ম হওয়াতে পুনরায় কানের যন্ত্রণা খুব বাড়িয়া উঠে। সে যখন শিলাইদহে, তখন একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে, বলু আমার কাছে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "মা,আমার শরীর ভাল নাই।" ইহার পর আমার মন তাহার জন্য আরও অস্থির হইতে লাগিল। আমি সাহানাকে লিখিলাম যে, তাহাকে আমার কাছে শীঘ্র পাঠাইয়া দাও, আমি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। সে যখন ফিরিয়া আসিল তখন তাহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমার চিন্তার অবধি রহিল না, কিসে সে আরাম হইবে এই কেবল ভাবিতে লাগিলাম। অঘোর ডাক্তার, উমাদাস বাঁড়ুয্যে, ডাক্তার সাল্‌জার্ এই তিনজনে দেখিতে লাগিলেন। তাঁরা আমাকে বলিতেন, যে, ভয়ের কোনও কারণ নাই, ভাল হইয়া যাইবে, কিন্তু আমি কিছুতেই সে ভরসা পাইলাম না। বাড়ীর সকলে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমি কোনও বিশেষজ্ঞ ডাক্তারকে দেখাইতে চাই কিনা, আমার তখন ভাবনা-চিন্তায় মনের এমন অবস্থা হইয়াছিল যে হিতাহিত জ্ঞান একেবারেই হারাইয়া ফেলিয়াছিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। তাঁহারাই তখন সাহেব ডাক্তারকে আনাইয়া দেখান। বলুর অবস্থা

ক্রমশঃই খারাপের দিকে যাইতে লাগিল। যেদিন সে জন্মের মত আমাকে তাহার বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেল, সেইদিন রবি (আমার ছোট দেওর) আসিয়া আমাকে বলিলেন যে, "তুমি একবার তার কাছে যাও, সে তোমাকে মা, মা করিয়া ডাকিতেছে। আমি এক এক সময় তাহার যন্ত্রণা দেখিতে না পারিয়া পাশের ঘরে গিয়া বসিয়া থাকিতাম। রবির কথা শুনিয়া যখন তার কাছে গিয়া তার পাশে বসিলাম, তখন তাহার সব শেষ হইয়া আসিয়াছে। মনে হইল, আমাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল, তাহার পর একবার বমি করিয়া সব শেষ হইয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবীকে সজীব করিয়া তুলিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময় তাহার দীপ নিভিয়া গেল। অনেক্ষণ তাকে লইয়া বসিয়া রহিলাম। তারপর সকলে আমাকে অন্য ঘরে লইয়া গেল। যখন আবার ফিরিয়া আসিলাম তখন সে নাই, ঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। বুকের মধ্যেও সবই তখন শূন্য হইয়া গিয়াছে। সেই শূন্যতার কঠিন মর্ম্ম তারাই বুঝিতে সক্ষম হইবে, যাহারা এই পুত্রশোকের তীব্র জ্বালা অনুভব করিয়াছে। তাহার স্মৃতি চারিদিক হইতে আমাকে প্রতিমুহূর্ত্তে দগ্ধ করিতে লাগিল। তারই ঘর সাজাইবার জন্য নানারকম জিনিষ কিনিয়া দিয়াছিলাম, তখন মনে হইতে লাগিল তাহারই চিতার সঙ্গে এইগুলিও সব জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া ফেলি। কিন্তু বউটির মুখের দিকে চাহিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হইলাম। যেদিন তার মৃত্যু হয় সেইদিন আমার স্বামী ক্রমাগত ঘর আর বাহির করিয়াছিলেন। শুনিয়াছি চাকরদের নিকট বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বাড়ীতে সব তালাবন্ধ কেন?" যদিও তখন তিনি উন্মাদ অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু ভগবান তাঁর ভিতরেও পুত্রশোকের দারুণ যন্ত্রণার অনুভব-শক্তি দিয়াছিলেন।

যাহাকে ছাড়িয়া কখনও থাকিতে হইবে একথা মনেও আনিতে পারি নাই, তাহাকে ছাড়িয়া একত্রিশ বছর কাটিয়া গেল। উনত্রিশ বছর বয়সে ১৩০৬ সাল, ৩রা ভাদ্র তাহার মৃত্যু হয়।

তাহার মৃত্যুর পর সেই ঘরেই দরজা বন্ধ করিয়া অচেতন অবস্থায় পড়িয়া থাকিতাম। মনে হইত, সে যেন পূর্ব্বেকার মত আমার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। তাহারই ঘরের সামনের বারান্দায় একটি মাদুরের উপর দিনরাত্রি শুইয়া কাটাইতাম। জল ঝড় বৃষ্টি সবই আমার উপর দিয়া যাইত, কিন্তু আমার তখন কোনও দিকেই হুঁস ছিল না, কেবল সর্ব্বদা মনে হইত আমি না থাকায় তাহার আহারের না জানি কতই কষ্ট হইতেছে। সে যখন যাহা খাইত, আমি নিজের হাতে তাহা খাইতে দিতাম। তাহার জন্য গরু কিনিয়াছিলাম এবং গরুটিকে নানা রকম ভাল জিনিষ খাইতে দিতাম, কেন না তাহার দুধ ভাল হইলে বলুর শরীর সুস্থ হইবে। সেই দুধের সর তুলিয়া নিজের হাতে মাখন করিয়া তাহারই ঘি হইতে সে যাহা খাইত সব রকম খাদ্য প্রস্তুত করিতাম। এইসব যখন মনে হইত ও খাবার সময় নিকটে আসিত তখন মন আরও অস্থির হইয়া পড়িত। একদিন বৈকাল বেলা তাহার কথা চিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, কে যেন আমাকে বলিতেছে, "কে তোমাকে দুধের ঘটি দিয়া তাহার সঙ্গে পাঠাইয়াছিল?" যখন এই কথাটা মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল তখন মনে অনেকটা শান্তি পাইলাম। মনে হইল, যিনি তাহাকে দয়া করিয়া আমার কোলে আনিয়া দিয়াছিলেন তিনিই তাহার সমস্ত অভাব মোচন করিয়া দিবেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সেই সময় আসিতেন, তিনি আমার মনে শান্তি আসিবার জন্য গীতা, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা পড়িয়া শুনাইতেন। আমার এক ভাইপো শিবপ্রসন্ন তখন আমার কাছে থাকিত, তারও খুব ধর্ম্মের ভাব ছিল, সেও শুনিত, এবং আমার সঙ্গে আহুতি করিত। আমার বড় ভাসুরের পুত্রবধূ হেমলতা দেবীর কাছে পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী আসিতেন, তাঁর নিকট হইতে অনেক সৎ উপদেশ পাইয়া মনে শান্তিলাভ করি। তিনি আহুতি করিতে বলেন এবং বলুও বলিয়াছিল যে "আহুতি কর মনে শান্তি পাবে। ভগবানের দর্শন পাবে।" ভগবানের দর্শন পাইবার জন্য তখন মন বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিল, আহুতি করিবার পর হইতে মনে একটা বিশেষ আরাম অনুভব করিতে লাগিলাম।

আমার শ্বশুর ও রবি, দুইজনে মিলিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়কে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন, এক বৎসর তিনি প্রত্যহ আমাকে ওই সকল ধর্ম্মপুস্তক পড়াইয়া শুনাইয়াছিলেন। বলুর মৃত্যুর পর পনের-ষোল বছর আমার স্বামী উন্মাদ অবস্থাতেই বাঁচিয়া ছিলেন, মাঝে মাঝে বলুকে খোঁজ করিতেন। আমি সেই সময় হইতে গেরুয়া কাপড় পরিতে আরম্ভ করি, হাতে দুগাছি শাঁখা রাখিয়াছিলাম। আমার এই গেরুয়া বসনের জন্য তিনি প্রায় জিজ্ঞাসা করিতেন যে কেন আমি এইরূপ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিতাম যে আমার পিতা পরিতেন তাই আমিও পরিতেছি, তাঁহার নিকট এই দুঃখের সংবাদটা নিজ মুখে দিতে পারি নাই। সংসারের কর্ম্মের ভিতর, আমি আমার মনকে আরও দৃঢ়ভাবে নিয়োগ করিতে লাগিলাম। মানুষের দুঃখের লাঘব, একমাত্র কর্ম্মবন্ধু। কর্ম্মের ভিতর মানুষ নিজের অতি প্রচণ্ড দুঃখকেও ভুলিয়া থাকিবার সুযোগ খুঁজিয়া পায়। আমার এত বৃদ্ধ বয়সেও সেই কর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। স্বামী যতদিন বাঁচিয়াছিলেন তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করা, পুত্রবধূকে দেখা, এই সকল ভার আমার উপরে পড়িল। তাহা ছাড়া আমার ভাই, ভাইপোরা, প্রায়ই আমার কাছে আসিয়া থাকিতেন, তাহাদের তত্ত্বাবধান করা—এই সব কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে লাগিলাম। শিবপ্রসন্নকে ছোট হইতেই প্রতিপালন করিয়াছিলাম, সেও আমাকে খুব ভালবাসিত, তাহার বিবাহের কয়েক বছর পরেই সেও আমাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেল। আমার পুত্রবধূ সাহানাকে ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলাম, ভাবিলাম লেখাপড়ার ভিতর নিজের মনকে নিয়োগ করিতে পারিলে মনে অনেকটা শান্তি পাইবে, শিক্ষার দ্বারা মনের উন্নতি লাভ হওয়া সম্ভবপর—অবশ্য যদি প্রকৃত শিক্ষা পায়। কিছুদিন পরে সে বিলাতে ট্রেনিং পড়িবার জন্য গিয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন থাকিবার পর শরীর অসুস্থ হওয়ায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

সে যাহা করিতে চাহিত আমি কখনই তাহাতে বাধা দিই নাই, তাহার শরীর মন যাহাতে প্রফুল্ল থাকে তাহারই চেষ্টা করিতাম। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তাহার শরীর সুস্থ হইলে সেলাই পড়াশুনার মধ্যে সে তাহার দিনগুলি কাটাইতে লাগিল, সংসারের কাজকর্ম্ম দেখাশুনা সে তেমনভাবে করিতে পারিত না, আমিও তাহাকে কখনও করিতে দিই নাই। বলুর স্ত্রী বলিয়া, পাছে তাহার কোনও বিষয়ে কষ্ট হয় সেইজন্য সর্ব্বদা তাহাতে আমার মন পড়িয়া থাকিত। বলু মারা যাওয়াতে এবং স্বামী উন্মাদ হওয়ার জন্য আমরা আমাদের বিষয় হইতে বঞ্চিত হইলাম। যতদিন আমরা বাঁচিয়া থাকিব ততদিন পর্য্যন্ত এই বাড়ীর একটা অংশ ভোগ করিবার অধিকার এবং মাসাহারা পাইবার ব্যবস্থা হইল। এই বন্দোবস্তের ভিতরেই আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলাম, কিন্তু দিন দিন সকল জিনিষই অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য হওয়ার দরুণ সেই সামান্য অর্থে সংসার নির্ব্বাহ হওয়া কঠিন হইলে আমাদের বাড়ীর অংশ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতে বাধ্য হইলাম। প্রথম শিবপুরে বাড়ীভাড়া করিয়া আমার বোনঝি সুষমার সঙ্গে কিছুকাল বাস করি, সেখানে বাড়ীটিতে নানা অসুবিধার জন্য পুনরায় ব্যাটারিতলায় বাড়ীভাড়া করিয়াছিলাম। বাড়ীটি বেশ বড় ছিল কিন্তু অনেক দিন পর্য্যন্ত মেরামত না হওয়ায় অতিশয় জীর্ণ অবস্থায় পড়িয়া ছিল। বাড়ীটি লইয়া বেশ কিছু অর্থব্যয় করিয়া উহার জীর্ণতার আবরণ আমাদের ঘুচাইতে হইয়াছিল। সেই বাড়ীতে কিছুদিন থাকার পর সাহানার শরীর হঠাৎ বড়ই অসুস্থ হয় এবং সেইজন্য মাথার নানারকম পীড়া হইতে আরম্ভ হইলে সে আবার জোড়াসাঁকো বাড়ীতে চলিয়া আসে। আমি তখন সেখানে একলা, কেবলমাত্র একটি ঝি সহায়। আমার আর এক ভাইপো, হরিপ্রসন্ন আমার কাছে থাকিত, সারাদিন তাকে তাহার কার্য্যের জন্য বাহিরে থাকিতে হইত। রাত্রি যখন দশটা, সাড়ে দশটা তখন সে বাড়ী ফিরিত। বাড়ীটি মুসলমানপাড়ার ভিতরে ছিল, নানা রকম বিপদের ভিতর বাস করা সত্ত্বেও এই নির্জ্জন পুরী আমার মনে কেমন একটা শান্তি আনিয়া দিল, নিজের জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তও অবস্থাগুলিকে তখন মিলাইয়া দেখিবার

একটা সুযোগ পাইলাম। কত অবস্থার পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া এক একটি মনুষ্যজীবন গঠিত হইতেছে, আবার কত প্রকারে সংসারের তাড়নায় মুহূর্ত্তের মধ্যে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম। আমরা সংসারের নানা কোলাহলের মধ্যে সেই দিনগুলি চিন্তা করিবার সুযোগ খুঁজিয়া পাই না বলিয়াই মনের বিক্ষিপ্ততা আসিয়া থাকে, এইজন্যই মহাপুরুষেরা নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে জানিবার পথ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। ঈশ্বরের দয়ায় আমার সেই সুবিধা জীবনে একটিবার মাত্র ঘটিয়াছিল। সাহানা ওখান হইতে চলিয়া আসার পর পুনরায় তাহার অনুরোধে আবার সেই চিরপরিচিত জোড়াসাঁকো বাড়ীতে আসিলাম। সে আমাকে ছাড়িয়া বেশীদিন কোথাও একলা থাকিতে পারিত না, খুব ছোট-বেলায় বাপ-মা ছাড়িয়া আমার কাছে আসিয়াছিল বলিয়া রাগ, অভিমান, দুঃখ, আব্দার সবই সে আমার উপর করিত। বাপ, মা, স্বামী, সবই সে অল্প বয়সে হারাইয়াছিল, কাজেই সব আব্দার, অভাব পূর্ণ করিতে আমিই তাহার একমাত্র সহায় ছিলাম।

শরীর অনেক দিন হইতেই তাহার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, কাসি মাঝে মাঝে হইত এবং তাহারই দরুণ হাঁপ হইতে সুরু হইল। এই সবের জন্য প্রায়ই তাহাকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য বিদেশে যাইতে হইত। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে তাহার ইচ্ছা হইল সে একবার কাশ্মীর ভ্রমণ করিয়া আসিবে। সেই সময় আমার ছোট ননদ বনকুমারীর পুত্র সরোজ ও তাহার স্ত্রী দুইজনে কাশ্মীর যাইতেছিলেন। সাহানা তাঁহাদের সঙ্গে যাওয়া স্থির করিল। আমার এক ভাইপোর পুত্র সুশীল, সে সাহানার শরীর অসুস্থ হওয়া অবধি তাহার সেবা করিত এবং সর্ব্বদা নিকটে থাকিত, ইহাকে সে আপনার পুত্রের ন্যায় ভালবাসিত, এবং যাহা কিছু তাহার অর্থ ছিল সবই মৃত্যুর পর তাহাকে উইলে দান করিয়া যায়। সুশীলকেও সে সঙ্গে লইয়া গেল। কিন্তু কাশ্মীর হইতে ফিরিবার পথে রাওলপিণ্ডির নিকট আসিয়া তাহার বুকের ব্যথা খুবই বাড়িয়া গেল। বাড়ী ফেরা তার পক্ষে খুবই কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি একদিন নাড়ী ছাড়িয়া গিয়া প্রাণ বাহির হইবার উপক্রম হইল। সেখানকার একজন পঞ্জাবী ডাক্তার তাহার চিকিৎসা করিতে থাকেন। অনেক সেবা-যত্নের পর সুস্থ হইলে, তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনা হয়। সেই কাশ্মীর-যাত্রাই তাহার মরণ-পথের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিল, বাড়ী আসিয়া ক্রমশঃই বুকের ব্যথা বাড়িতে লাগিল, চিকিৎসাতে কোনও ফল আর হইল না। ফাল্গুন মাসে ঐ রোগই বৃদ্ধি পাইল। ২৭শে ফাল্গুন বেলা একটার সময় তাহার সকল জ্বালা জুড়াইয়া সে চিরশান্তি লাভ করিল।

দুঃখের ভিতরেও শান্তি পাইবার জন্য যাহার মুখ তাকাইয়া এতদিন কাটাইয়াছিলাম, সেও আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে ছাড়িয়া চলিয়া গেল। পাষাণের ন্যায় বুক বাঁধিয়া এককোণে পড়িয়া আছি। এই দুঃখিনীর একমাত্র সম্বল, শুধু সেই দয়াময়।

দুঃখশোকে অনুতাপের মধ্য দিয়া সেই পরব্রহ্মের লাভ ঘটিয়া থাকে। মানুষ যখন দুঃখসাগরের ভিতরে পড়িয়া কূলকিনারা খুঁজিয়া পায় না, শান্তির পথ খুঁজিবার জন্য চারিদিকে অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করে, তখন তিনি তাঁর পরশকাঠিখানি ছোয়াইয়া তাহাকে বিপদের সম্মুখ হইতে উদ্ধার করিয়া দেন। সংসারে নানা বিঘ্ন বাধা ঘুচাইয়া কাহাকে কোন্ পথের পথিক করিয়া, আলোকের সন্ধান দেখাইয়া দেন কেহ তাহা বলিতে পারে না। মহাত্মা বাল্মিকীর দস্যুবৃত্তির ভিতর তাঁহার পরম ধনের সন্ধান লাভ ঘটিয়াছিল, অনুতাপের তীব্র জ্বালায় যখন তাঁহার দেহমন জর্জ্জরিত, সেই জ্বালা জুড়াইবার জন্য যখন সত্যই ভগবানের দর্শনের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল, তখন সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন বিশ্ববিধাতার আসন টলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। বিধাতা স্বয়ং আসিয়া তাঁহার জীবনকে পবিত্র করিয়া মলিনতার আবরণ ঘুচাইয়া দিলেন।

সুখ ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনের মাঝখানে গৌতমের জ্ঞানের পিপাসা জাগিয়াছিল, জরা মৃত্যু শোকের অতীত যিনি সেই বস্তুকে পাইবার জন্য তাঁহার অতি প্রিয়, পিতামাতা পুত্র পরিবার সকলকে ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সংসারে দুঃখরূপ পাষাণ আমাদের হৃদয়ে

ভার-স্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, সেই ভার নামাইয়া মানুষ যখন মুক্তি পায় তখনই তাহার মোক্ষলাভ। ভগবান বুদ্ধের সেই সৌভাগ্যের দিন একদিন আসিয়াছিল। এই মহাপুরুষদিগের জীবনের পরিচয়ের ভিতর আমরা এই জ্ঞানলাভের সুযোগ পাই যে, দুঃখ-শোক, সুখ-ঐশ্বর্য্য, প্রলোভন যাহা কিছু, আমাদের দেহ মনের উপর তাহাদিগের প্রভাব বিস্তার করিতেছে, সকলকে জয় করিবার একটি মাত্র উপায় সেই সর্ব্বদুঃখহারী যিনি আমাদিগের মধ্যে নিয়ত বিরাজমান তাঁহারই করুণার আশ্রয়লাভ। মৃত্যুর জন্যই জন্ম, এবং জন্মের জন্যই মৃত্যু, ইহাই যুগে যুগে ইতিহাসে লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। ইহারই কারণে শোক দুঃখ অনুতাপ যাহা কিছু সবেরই উৎপত্তি। জহুরী যেমন কষ্টিপাথরে ঘষিয়া সোনা রূপার খাঁটি রূপটি চিনিয়া লয়, সেইরূপ আমাদের মনকে দুঃখরূপ কষ্টিপাথরে আঘাতের দ্বারা অলক্ষ্যে বিধাতাপুরুষ অহরহ যাচাই করিয়া লইতেছেন। আমরা শোকে এতই অভিভূত হইয়া যাই, ভাল মন্দ বিবেচনা করিবার জ্ঞান শক্তিকে তখন হারাইয়া ফেলি। সেই দারুণ দুঃখের ভিতরেও যদি আমাদের মনের স্থিরতা, সহিষ্ণুতা আনিয়া দেয়, তবে ইহার ভিতরেও তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা ও অসীম স্নেহের পরিচয় পাইতে পারিব। অগ্নির জ্বলন্ত শিখাগুলিকে যেমন বারিধারায় মুহূর্ত্তের মধ্যে শীতল করিয়া নির্ব্বাপিত করে, তেমনি শোকের বহ্নি যখন হৃদয়ের চারিপাশে জ্বলন্ত শিখা বিস্তার করিয়া দগ্ধ করিতে থাকে তখন সেই করুণারূপ বারিধারা অজস্রধারায় ঝরিতে থাকিয়া সব জ্বালা দূর করিয়া দেয়।

দেহমন যখন শোকে নিতান্তই অভিভূত, কিছুতেই মন শান্তি লাভ করিতেছে না, তখন ভগবানের দর্শন-লাভের জন্য আমার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সেই ব্যাকুলতার আবেগে দিবারাত্রি যখনই তাঁহার চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতাম, তখনই ধ্যানের মধ্যে বলুর মুখখানি দেখিতে পাইতাম। একদিকে বলু, একদিকে তিনি, এই দুইয়ের যোগে আমার যোগসাধন সমাপন হইত।

রবি বলুকে খুবই ভালবাসিতেন। আমার এই অবস্থার ভিতর এই সময়ে তিনি একদিন গীতা হইতে একটি উপযোগী সুন্দর শ্লোক পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি কি এখন আমার ঠিক মনে নাই, তবে তাহার কথাগুলি আমার প্রাণে আসিয়া বাজিয়াছিল। উহা শুনিয়া একই আত্মা সর্ব্বভূতে বিরাজমান, বলুর ভিতর যে আত্মা, সেই আত্মা সব মানুষের মধ্যে রহিয়াছেন, এই কথাটিই তখন আমার বারংবার স্মরণ হইতে লাগিল। সেই জ্ঞান যখন উদয় হইল তখন বলুর স্বরূপ সকলের ভিতর দেখিবার আকাঙ্ক্ষা ও কর্ম্মের দ্বারা সেবাই আমার পরম লক্ষ্য হইল। কর্ম্মের ভিতরে সাহস বল ভরসা আনিয়া দিতে লাগিল, ভাঙা মনকে জোড়া দিয়া তাঁহারই কার্য্য সাধন করিবার পথ খুঁজিয়া পাইলাম। চরাচরবেষ্টিত সমস্ত পদার্থ ও তাহাদের কার্য্যসকল সবই অনিত্য, কিছুই চিরদিন থাকিবে না; নিত্য সেই, যাঁর পরিবর্ত্তন নাই, চিরদিনই সমানভাবে জন্ম মৃত্যুর অতীত-রূপে বর্ত্তমান। শোককে অতিবিভীষিকার ন্যায় মনে করি বলিয়া ইহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে আমরা অক্ষম, কিন্তু দুঃখশোক যদি জগতে না থাকিত, কেবল সুখের তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়াইতাম তবে বোধ হয় তেমন ভাবে অমৃতের সন্ধান পাইবার প্রবল ইচ্ছা জাগিয়া উঠিত না বা মনের ভ্রম দূর হইত না। যে পরশমণির পরশ লাভের জন্য মানুষ পথের ভিখারী হইয়া শূন্যমনে অন্ধের ন্যায় চরাচরকে শূন্য দেখিতে থাকে, জীবনের কোনও এক সময় সেই শুভ মুহূর্ত্ত আসে যখন সে তাহাকে পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করে। বিশ্ব নিজেই এক অপরূপ রূপে তাহার নিকট প্রকাশিত হন। তাঁহারই প্রেরণায়, যতটুকু সাধনা তিনি আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা করাইয়া লইয়াছেন, সেই আলোকে আমি আমার বলুকে সকলের ভিতর দেখিবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। মনে হয়, সে আঙ্গিনায়, সেই পূর্ব্বের মত হাসিয়া খেলিয়া বেড়ায়, পূর্ব্বাকাশে ভোরের আলোতে তাহারই মুখখানি জ্বল্ জ্বল্ করে, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে সেও যেন ঘুমের অচেতনে আমার কোলে ঢলিয়া পড়ে। আমার বলুকে আমি হারাইয়াও হারাই নাই, বরং তাহাকে আরও নিকটে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয়, এক সে আমার বহু হইয়া অহরহ আমার সম্মুখে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আজ

সে অনন্তরূপে অনন্ত বাহু মেলিয়া আমার বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে।

জননী! মাতৃগর্ভ হইতে যখন নিঃসহায় অবস্থায় আমরা ভূমিষ্ঠ হই, তখন তুমিই সেই অসহায় জীবকে তোমারই কোলে স্থান দিয়া জন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত তাহার সহিত নানা সংগ্রামের মধ্যে, তাহাকে মাতার ন্যায় বক্ষে ধারণ করিয়া থাক, কিছুতেই পরিত্যাগ কর না। আমার যে দুঃখ সুখ সবই তোমার চরণে অবসান হইয়াছে, জন্মের শুভমুহূর্ত্তে প্রথম যেদিন তোমার স্নিগ্ধ আলোকে চোখ মেলিয়া চাহিয়াছিলাম, সেই শিশুকাল হইতে বার্দ্ধক্যের সীমানায় আজ পর্য্যন্ত জীবনের প্রতিক্ষণে প্রতিঘটনায়, তুমিই আমার মাতৃরূপে সঙ্গিনী হইয়াছিলে এবং এখনও হইয়া আছ। পুত্রশোকে যখন কাতর, সেই সময় ধৈর্য্যের সীমা ছাড়াইয়া যখন কাতর প্রার্থনায় বলিয়াছিলাম, "সবই নিলে যখন, তখন তুমি আমাকেও নাও," অর্দ্ধচেতনায় সেই অসহ্য বেদনার শুষ্ককণ্ঠের বাণীর ভিতর আমার মনে আনন্দময় রূপে ক্ষণিকের তরে কি যে এক অপূর্ব্ব আনন্দ জাগাইয়া দিয়াছিল, তাহা কথায় ব্যক্ত করিতে পারা যায় না—তাহা তুমিই জান। যারা দুঃখশোকে অহর্নিশি কাতর হইয়া তোমারই কোলে অশ্রুজল বারংবার ফেলিতেছে, তুমি তোমার অসীম ধৈর্য্যগুণে তাহাদিগের প্রাণে এই মহাশক্তি আনিয়া দিয়া অশ্রু মুছাইয়া দাও, যাহাতে তাহারা মনে বল পাইয়া সংসার-সমুদ্রের মাঝখানে তরঙ্গের বাধাগুলি কাটাইয়া চলিয়া যাইতে পারে। সেই শক্তি দাও যাহার গুণে বিপদও আমাদের নিকট তুচ্ছ হইয়া শান্তম্ শিবম্ রূপে প্রতীয়মান হয়।

পুস্তক-পরিচয়

ওমর খৈয়াম—শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

বাংলা ভাষায় উমর খইয়ামের জীবনী সম্বন্ধে কোনও বহি নাই বলিলেই চলে। উমরের রুবাইয়াৎ-এর তথাকথিত অনুবাদগুলিতে যেটুকু সন্নিবিষ্ট হইয়াছে তাহা পড়িয়া উমর সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনও ধারণা হয় না। উমর খইয়ামকে জানিতে হইলে তখনকার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অধ্যাপক মাহমুদ আলী ভারেসি এম-আর-এ-এস এই অভাব দূর করিবার জন্য ১৯২২ সালে তাঁহার *Umar Khayyam* প্রকাশিত করেন। এই পুস্তকখানি বহু বৎসরের সাধনার ফল, যদিও উমরের রুবাই-এর আসল অর্থ সম্বন্ধে তাঁহার সহিত অনেকেরই মতের অমিল থাকিতে পারে। সুরেশবাবুর বইটি Varesi সাহেবের 'উমর খইয়াম-'এর নিকট বিশেষভাবে ঋণী। যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থ পড়েন নাই, তাঁহারা সুরেশবাবুর বইটিতে অনেক নূতন তথ্য পাইবেন। সুরেশবাবু কিন্তু একটি ভুল করিয়াছেন। তাঁহার বইটিতে ভারেসি সাহেবের নাম উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। আশা করি, আগামী সংস্করণে তিনি এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিটি সারিয়া লইবেন। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আরবী ফার্সী কথাগুলির শুদ্ধিপত্রটি যথেষ্ট হয় নাই।

শ্রীহিতেন্দ্রমোহন বসু

অমিয় গীতা—স্বামী শিবানন্দ প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বসু, ২৭৩ নং নবাবপুর, ঢাকা। মূল্য ॥০

গীতার বহু পদ্যসংস্করণ আছে। এই পুস্তিকায় তাহাদের সংখ্যা আর একটি বাড়িল। অনুবাদে কোন বিশেষত্ব নাই। অনেকস্থলে অনুবাদক শ্লোকের মধ্যে তাঁহার নিজের ভাব ঢুকাইয়া দিয়াছেন। প্রথম শ্লোকের অনুবাদ এইরূপ—

> ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের কারণ
> মিলি মম পুত্র আর পাণ্ডুসুতগণ,
> কি করিছে হে সঞ্জয়! কহ পরিশেষ,
> স্থানের মাহাত্ম্যে দূরে গেল হিংসা দ্বেষ?

শেষের লাইনটি গ্রন্থকার কোথায় পাইলেন? পুস্তকের শেষভাগে বিভিন্ন অধ্যায়ের সারাংশ বুঝান হইয়াছে। এই সূত্রে গ্রন্থকার তাঁহার নিজের মতামত প্রচার করিয়াছেন। লেখায় উচ্ছ্বাসের বাহুল্য দেখা যায়।

খাদ্য—শ্রীচুণীলাল বসু, সি-আই-ই প্রণীত, পঞ্চম সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিঃপ্রকাশ বসু, ৩১।১।১এ, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

চুণীবাবুর নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। তাঁহার শারীর-বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলির সহিত সকলেই পরিচিত। চুণীবাবু খাদ্য সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ। কিরূপ খাদ্যে দেহের পুষ্টিলাভ হয়, বিভিন্ন খাদ্যের গুণাগুণ, খাদ্যের পরিমাণ, আহারের সময়, আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের দোষগুণ, পথ্য প্রস্তুতকরণ, ইত্যাদি বহু জ্ঞাতব্য তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে। তাহা ও

বর্ণনাভঙ্গী সরল ও আড়ম্বরশূন্য। সাধারণ পাঠকের বুঝিতে কোনই কষ্ট হয় না। পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণই ইহার গুণের প্রমাণ। সম্প্রতি 'ভাইটামিন' সম্বন্ধে যে-সমস্ত নূতন তথ্য জানা গিয়াছে চুণীবাবু সংক্ষেপে তাহার সমস্তই বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই সংস্করণের উপযোগিতা অনেক বেশী হইয়াছে। ছাত্রদের খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় সম্বন্ধে চুণীবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পুস্তকের শেষে বর্ণানুক্রমিক সূচী থাকায় পাঠকের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তক প্রত্যেক গৃহস্থের একখানি করিয়া রাখা উচিত।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

মার্কো পোলো—শ্রীগঙ্গাচরণ দাশ-গুপ্ত, বি-এ, বি-টি প্রণীত, সচিত্র ভ্রমণকথা। প্রকাশক—ম্যাক্‌মিলান্ এণ্ড কোং লিমিটেড্, ২৯৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভেনিস নগরে পরিব্রাজক মার্কো পোলো প্রায় সাড়ে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে এসিয়ার বহুস্থান পর্য্যটন করিয়া এ দেশের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। ইউরোপের লোকদের নিকট এগুলি এতই বিচিত্র বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, তাহারা ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে চায় নাই—গাঁজাখুরি বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বড় বড় পরিব্রাজকগণ এসিয়ার ঐ সব অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া বুঝিয়াছেন যে মার্কো পোলোর বিবরণের মধ্যে অত্যুক্তি নাই বলিলেও চলে। তাই এখন আবার তাঁহার ভ্রমণকাহিনীর কদর খুব বাড়িয়া গিয়াছে। মার্কো পোলো তাঁহার ভ্রমণকথা নিজের হাতে লেখেন নাই, জেনোয়ার জেলে বন্দী হইয়া, দেশভ্রমণের বহুদিন পরে বন্ধু রাষ্টিশিয়ানোকে দিয়া লিখাইয়াছিলেন। এই বিচিত্র ভ্রমণকথা গঙ্গাচরণবাবু বাহুল্য বর্জ্জন করিয়া এমন মধুর সরল ভাষায় লিখিয়াছিলেন যে, দেশের তরুণেরা ইহা পাঠে জ্ঞান ও আনন্দ দু-ই লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীনিশিকান্ত সেন

বাঙ্গালীর খাদ্য—কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, ভিষগ্‌রত্ন, এল-এ-এম-এস্ প্রণীত, ও ২০ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১১১ পৃষ্ঠা, মূল্য ৷৷০ মাত্র।

মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ শ্রীযুত গণনাথ সেন সরস্বতী মহাশয় এই পুস্তকখানির ভূমিকা লিখিয়াছেন। বাঙ্গালীর খাদ্যতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য স্বর্গীয় ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক, রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু, ডাঃ রমেশচন্দ্র রায়, প্রভৃতি অনেকদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন। আয়ুর্ব্বেদের দিক দিয়া কিছু কিছু বুঝাইবার জন্য লেখকের এই উদ্যম প্রশংসনীয়।

পুস্তকখানিতে বিভিন্ন জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা, নিত্য-ব্যবহার্য্য খাদ্যগুলির পরিচয় ও দোষগুণ ও অন্যান্য খাদ্য সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদ ও পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্রের অভিমত, লেখক বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। পরিশেষে বিভিন্ন ঋতুর উপযোগী খাদ্য, দিনচর্য্যা, আহার সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ও কয়েকটি রোগের সংক্ষিপ্ত পথ্য সম্বন্ধেও উপদেশ দিয়াছেন।

বাঙ্গালীর খাদ্যসমস্যা সমাধানে এ পুস্তকের দ্বারা অনেক সহায়তা হইবে, এ কথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

পূর্ণচ্ছেদ—শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক, রাখহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্। পৃঃ ২৩৪। মূল্য ১৷৷০।

শৈলজাবাবু কথাসাহিত্যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। আলোচ্য উপন্যাসখানিতেও তাঁহার সে প্রতিভা অক্ষুণ্ণ আছে। শৈলজাবাবুর ভাষায় একটা নতুন সুর আছে। যে আবহাওয়া তিনি বর্ণনা করিতে যাইতেছেন, যে ভাবকে ফুটাইতে চেষ্টা পাইতেছেন—তাঁর শব্দচয়নও তখন সে ভাব ও আবহাওয়ার উপযোগী হয়। এই জিনিষটা লেখনী-শিল্পের একটা পুরাতন কথা বটে কিন্তু ইহাকে কার্য্যে পরিণত করার কৃতিত্বের পরিচয় আমরা আধুনিক তরুণ সাহিত্যের যে লেখকদের লেখায় পাই, তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

বইখানাতে একটি দরিদ্র পল্লীযুবকের চিত্র আঁকা হইয়াছে। দরিদ্রের গৃহস্থালী বর্ণনা সংক্ষেপে অতি নিপুণতার সহিত করা হইয়াছে। ছোট মেয়ে পুঁটি যখন মায়ের সঙ্গে পরের বাড়ী হইতে খাইয়া আসিয়া আনন্দে বাবাকে পানে-রাঙা জিব বাহির করিয়া দেখাইতেছে, তখনই এই দরিদ্র পরিবারের সমগ্র দৈন্য ও অতৃপ্ত লোভের ইতিহাস এক নিমেষে আমাদের চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে।

বইয়ের শেষদিকে অতি ট্র্যাজিক সুরটা আমাদের ভাল লাগে নাই। যে প্রশান্ত বেদনার ভাব প্রথম পাতা হইতেই মনে গড়িয়া উঠে,—এইখানে তাহা একটা রূঢ় ভাবের খোঁচা খাইয়া ভাঙিয়া চুরিয়া পড়ে। Emotional unity একটু ব্যাহত হয়। ছাপা ও কাগজ ভাল।

গরীবের ছেলে—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক রাখহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স, ২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ২৯৫। মূল্য দুই টাকা

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে গ্রন্থকার যে সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন, উপাখ্যানভাগেই তাহার স্বাভাবিক সমাধানের ইঙ্গিতও করিয়াছেন। সরোজ দরিদ্রের ছেলে, কলিকাতায় কলেজে পড়ে। এক সহপাঠীর জন্মদিনে তাহার বাড়ীর পার্টিতে নিমন্ত্রণে গিয়া সুন্দরী তরুণী মিনি রায়ের সহিত পরিচয় হইল। মিনি রায় ভাবপ্রবণ ও মার্জ্জিতরুচি, কিন্তু তাহার বিবাহ হইয়াছে যাহার সঙ্গে, সে লোকটি কয়লায় ব্যবসায় কি করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয় জানে—আর্ট বা কবিতার ধার ধারে না। প্রথম দর্শনেই মিনি ও সরোজ পরস্পর পরস্পরের দিকে আকৃষ্ট হইল। গল্পের বাকীটুকু বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই, এই আকৃষ্ট হওয়াটাই সমস্যা এবং এই সমস্যা কোনো বিশেষ সমাজের বা বিশেষ সময়ের নহে। গ্রন্থকার কোনো কৌশল অবলম্বন না করিয়া চরিত্র দুটিকে স্বাভাবিক পরিণতির দিকে লইয়া গিয়াছেন, কিন্তু শ্লীলতা বা শোভনতাকে বিসর্জ্জন দেন নাই।

মিনির চরিত্র বেশ ফুটিয়াছে কিন্তু সরোজের পরিণীতা পত্নী নিভাকে অতটা জড়পদার্থ না করিলেও ক্ষতি ছিল না। পাঠকের মনে এ কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক যে, নিভা বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী হইলে অবস্থা না-জানি কিরূপ দাঁড়াইত। নিভাকে নেহাৎ পুঁটুলী বানাইয়া গ্রন্থকার ঘটনাকে অনেক সহজ করিয়া তুলিয়াছেন। অপরপক্ষে এ কথা মনে ওঠে যে দরিদ্রের ছেলে পঞ্চানন নিজের গুণে মিনি রায়ের পিতার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তাঁহার অর্থে বিলাত গেল ও তাঁহার কন্যা মিনিকে বিবাহ করিল এবং যে ব্যবসায় পরিচালনে তাঁহার দক্ষিণহস্ত—সে কি অতখানি জানোয়ার?

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

লীলা-কমল—শ্রীরাধারাণী দত্ত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

বইখানি গীতিকবিতার সমষ্টি। কবি যেখানে অকৃত্রিমভাবে আপনাকে ব্যক্ত করিতে পারে, গীতিকাব্যের সার্থকতা সেইখানে। 'লীলা-কমলে'র লেখিকা আপনার অন্তর উদ্‌ঘাটিত করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করি। আত্মপ্রকাশ করা পুরুষের পক্ষেও সহজ নয়, নারীর পক্ষে তাহা আরও কঠিন, বিশেষত আমাদের দেশে। সেই বাধা অতিক্রম করিবার সাহস 'লীলা-কমল' রচয়িত্রীর আছে। তাই তাঁহার কবিতাগুলি প্রথাগত হইয়া উঠে নাই। কমলের সহিত একাত্ম হইয়া কবি বলিতেছেন,

বক্ষে উতল ঘন-মধু-রস মর্ম্ম সুরভি-ভোর,
প্রভাত-রবির প্রেম অঞ্জনে পরাণে রঙ্গের ঘোর।

কমল যে সূর্য্য-স্বয়ম্বরা, 'সলিল-শয়নে সমাধি হলেও শিশির সহে না তাই।'

অতৃপ্ত বাসনার বেদনায় নিপীড়িত প্রাণের আকুল আকূতি এই কবিতাগুলির মধ্যে শুনিতে পাই।

পরাণভ্রমর জনম ব্যাপিয়া কেঁদে ফেরে অবনীতে,
জীবনপদ্মে মধু-মঞ্জুষা পারেনি উন্মোচিতে।

লেখিকা 'রাণার মহিষী মীরা'র ব্যথা প্রকাশ করিতেছেন,

রাজার ঝিয়ারী রূপসী পিয়ারী কনকপ্রতিমা রাধা
বুঝিয়াছি কেন রাখালের প্রেমে মানিল না কোন বাধা।

'লীলা-কমলে'র মধ্যে রচয়িত্রী মানবজীবনের চিরন্তন তৃষাতুর একটি দিককে বিশেষভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলেন।

মর্ম্ম কারা কক্ষে কোন্ বন্দিনীর নিরুদ্ধ ক্রন্দন,
গুমরি গুমরি ওঠে, ওগো খোলো, খোলো এ বন্ধন!

'প্রেম-প্রশস্তি'তে তাই তিনি প্রশ্ন করিতেছেন,

পুঁথির মানুষ হ'য়ে রবো বেঁচে আর কত কাল?

ভাষার লালিত্যে এবং ছন্দের বৈচিত্র্যে এই অন্তরোত্থিত কবিতাগুলি অত্যন্ত উপভোগ্য হইয়াছে।

ছাপা ও কাগজ চমৎকার। স্বপ্নের মত সুন্দর প্রচ্ছদপটখানি, উপরে আকাশ, নীচে নীল জল, অপূর্ব্বসুন্দর দেবতা সূর্য্যের চুম্বনে প্রভাত কমল দল মেলিতেছে। পদ্মপত্রগুলি পর্য্যন্ত যেন সজীব। রঙে রূপে একটি চিত্রকবিতা। শিল্পী যতীন্দ্রকুমারের যোগ্য বটে।

পারিজাত—শ্রীবিমল সেন। ৫, ওলাই চণ্ডী রোড, বেলগাছিয়া, কলিকাতা। দাম আট আনা।

বইখানি বিদ্যামন্দির শিশুতোষ গ্রন্থমালার অন্তর্গত। এখানি গ্রন্থমালার প্রথম পুস্তক। দু'টি ছোট গল্প আছে। ইটালিতে প্রচলিত কয়েকটি গল্পের ছায়াবলম্বনে এগুলি রচিত। গল্প ক'টি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। লেখকের ক্ষমতা আছে। লেখার গুণে শুধু ছেলে কেন, ছেলের গুরুজনদের মনেও গল্পগুলির ছাপ পড়িবে। ভাষা যেমন ঝর ঝরে, প্রতি গল্পের অন্তর্নিহিত করুণ মাধুর্য্যটুকুও লেখক তেমনি ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এমন লেখার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করি।

অশ্বিনীকুমার—শ্রীতীর্থরঞ্জন চক্রবর্ত্তী। দুয়ানী কাছারী; বরিশাল হইতে শ্রীমতিলাল ঘোষাল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

এখানি প্রাতঃস্মরণীয় জননেতা অশ্বিনীকুমার দত্তের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত। প্রথম খণ্ড বলিয়া উল্লিখিত। বরিশালের মুকুটহীন রাজা অশ্বিনীকুমারের জীবনকথা আজিকার দিনে যত আলোচিত হয়, ততই ভাল। তিনি ছিলেন ধর্ম্মে উদার, চরিত্রবলে মহৎ, দেশপ্রেমে অদ্বিতীয়। বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয় ও কলেজ তাঁহারই কীর্ত্তি। শাক্তের তেজ ও বৈষ্ণবের নিষ্ঠা তাঁহার মধ্যে ছিল। অহিংসা-সম্পর্কে তিনি বলিতেন, 'রাজনীতি-শাস্ত্রে ও-কথাটার কোন মানে হয় না।' স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা নাই।

পতিতা—শ্রীসিদ্ধেশ্বর ঘোষ। ৭, গড়পার রোড, কলিকাতা হইতে কে-এম-ঘোষ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৹

এখানি নাটক। বহুবাজার ক্লাবের সভ্যগণ কর্ত্তৃক কয়েকবার অভিনীত হইয়াছে। নাটকের প্লটটি ঘোরাল। বিশেষ নূতনত্ব না থাকিলেও অভিনয়ে ইহা উপভোগ্য হইবে বলিয়া মনে হয়। দীর্ঘ অঙ্কগুলি সংক্ষিপ্ত করা প্রয়োজন।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সমানাধিকারবাদ—শ্রীহৃষীকেশ সেন প্রণীত। আত্মশক্তি লাইব্রেরী, কলিকাতা। ১৩৩৬ সন। মূল্য পাঁচ সিকা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানাকে সমানাধিকারবাদ বা কম্যুনিজমের ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবে বিচার করিতে গেলে ইহার প্রতি অবিচার করা হইবে। মাত্র ১৫৫ পৃষ্ঠার মধ্যে এই বাদটির উৎপত্তি ও প্রসার সম্বন্ধে সব কথা বলা সম্ভবপর নয়, লেখক তাহা করিতে চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য মোটামুটিভাবে সোশ্যালিষ্ট বাদের বিকাশ ও কর্ম্মক্ষেত্রে সোশ্যালিষ্ট আন্দোলনের প্রভাব ও ফল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলা। আমাদের মনে হয় লেখক এই দুইটি বিষয়েই কিছু কিছু বলিতে গিয়া ভুল করিয়াছেন; ইহাতে একটা নূতন সামাজিক 'থিওরী' হিসাবে সোশ্যালিজমের আলোচনাও অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে এবং কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার যে প্রভাব দেখা গিয়াছে তাহার আলোচনাও ভাল করিয়া করা হয় নাই। ইহা ছাড়া আর একটি কথাও আছে। লেখকের ভঙ্গী হইতে মনে হয় তিনি সমানাধিকার বাদের পক্ষপাতী এবং এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল। সেজন্য সমানাধিকারের সপক্ষে তিনি নিজস্ব অনেক যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন। সেগুলি বর্ত্তমান ইয়োরোপের সমানাধিকারবাদের যুক্তিতর্কের অঙ্গীভূত নয়। সেজন্য ও সোশ্যালিজমের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানের পরিচয় না থাকায় বইখানাকে সমানাধিকারবাদের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবেও পাঠকের হাতে দেওয়া যাইতে পারে না। তবে রাজনৈতিক পুস্তিকা হিসাবে ইহার কোনও মূল্য আছে কিনা সে কথা স্বতন্ত্র।

বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের প্রতিবাদের উত্তর

[আমরা এই প্রত্যুত্তরটি খুব সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলাম। এ বিষয়ে আর বাদানুবাদ ছাপা হইবে না।—প্রবাসীর সম্পাদক]

শ্রীযুক্তা নন্দরাণী দেবী রেঙ্গুনের বেঙ্গল একাডেমীর সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমার কিছু বলিবার আছে। লেখিকা প্রসন্নকুমার মজুমদার মহাশয়ের বিরুদ্ধে এরূপভাবে কেন লিখিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিলাম না। বস্তুতঃ প্রসন্নবাবুই বেঙ্গল একাডেমীর প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা। তাঁহারই পরিশ্রম ও যত্নে এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন হয়। প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার সম্মান একমাত্র প্রসন্নবাবুরই প্রাপ্য, এ কথা স্বীকার না করিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে। সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য হইলাম, শশীবাবুকে বড় করিয়া প্রসন্নবাবুকে লোকচক্ষে হীন করাই লেখিকার উদ্দেশ্য। এরূপ পরশ্রীকাতরতা যেন আমাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। * * *

প্রসন্নবাবু স্কুলের সাহায্যপ্রার্থী হইয়া কখনও একাকী, কখনও বন্ধুবান্ধবসহ ধনী-দরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন বলিয়াই ৺শশীভূষণ নিয়োগী ও জ্যাষ্টিস্ দাশ প্রভৃতি মহৎ লোকেরা স্কুলের সাহায্য করিয়াছিলেন। একনিষ্ঠ কর্ম্মী প্রসন্নবাবু স্বীয় কর্ম্মকুশলতা ও সততা দ্বারা এ সব দানের সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই স্কুলের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দয়ালু দাতাদের দানের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেইজন্যই বিদ্যালয় সামান্য অবস্থা হইতে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

ডাঃ ঘোষ স্কুলে কাজ করিবেন বলিয়া ডাক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন কিন্তু কাজও করেন নাই, টাকাও পান নাই, সুতরাং দানও করেন নাই। ডাঃ বিশ্বাস সবেমাত্র কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। আশা করি, লেখিকা পৌষ মাসের প্রবাসীতে মিঃ বি, কে, হালদার মহাশয়ের নাম দেখিয়াছেন।

এক কথায় বলিতে গেলে, প্রসন্নবাবু এই বিদ্যালয়টিকে মায়ের মত বুকে করিয়া আপদে বিপদে রক্ষা করিয়াছেন এবং ইহাকে প্রতিপালন করিতে জ্যাষ্টিস্ দাশ পিতার ন্যায় নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। স্বর্গীয় শশীভূষণ নিয়োগী মহাশয় অর্থসাহায্য করিয়া ইহার উন্নতিসাধন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের দ্বারা স্কুল আরম্ভ করার সময় বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

শ্রীমৃণালবালা দেবী

বৈজু বাওরা

১৩৩৬ সনের ফাল্গুন সংখ্যার প্রবাসীতে 'বৈজু বাওরা' শীর্ষক প্রবন্ধের লেখকের মতে বৈজু বাওরা ত্রয়োদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। আমরা কিন্তু দেখিতে পাই, বৈজু বাওরা ছিলেন হুমায়ুনের রাজত্বকালে। হুমায়ুনের রাজত্বকাল ১৫৩০ হইতে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। ভাৎখণ্ডে মহাশয়ের মত, সম্রাট আকবরের রাজত্বকালেও বৈজু বাওরা বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা অসম্ভব বলা চলে না, কারণ হুমায়ুন মাত্র দশ বৎসর রাজত্ব করেন, পরে তৎপুত্র সুপ্রসিদ্ধ আকবর সম্রাট হন। বৈজু যে হুমায়ুনের রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আকবরের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন তাহা খুবই সম্ভব। স্বর্গীয় রাধামোহন সেন প্রণীত 'সঙ্গীত-তরঙ্গ' নামক প্রাচীন পুস্তকে দেখিতে পাই, সম্রাট আলাউদ্দীনের সভায় নায়ক গোপাল ও আমীর খস্রু নামক দুইজন গুণী ছিলেন। তাহা হইলে নায়ক গোপাল সম্রাট আলাউদ্দীনের রাজত্ব কালের আর বৈজু বাওরা সম্রাট হুমায়ুনের রাজত্ব কালের। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দিন খিলিজি সিংহাসন আরোহণ করেন। তবেই বুঝা গেল, নায়ক গোপাল ও বৈজুর মধ্যে প্রায় দেড় শত বৎসরের ব্যবধান।

বৈজু বাওরার কতকগুলি গানে গোপাল নায়ককে সম্বোধন করা আছে, যথা—"কহে বৈজু বাওর, শুনহো গোপাল নায়ক।" শ্রদ্ধেয় হরিনারায়ণবাবু বোধ হয় ইহা হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, গোপাল ও বৈজু সমসাময়িক। তাহা যদি হইত তবে গোপাল নায়কের কোন-না-কোন গানে বৈজু বাওরার নাম থাকিত। গোপাল নায়ক যখন বৈজুকে গুরু বলিয়া (?) স্বীকার করিতেন না (হরিনারায়ণবাবুর মতে), তখন দুই একটা গান বৈজুকে কটাক্ষ করিয়া রচনা করা বিশেষ বিচিত্র ছিল না, বরং ইহাই স্বাভাবিক, কারণ তথাকথিত নায়ক গোপাল চরিত্রে উদার ছিলেন না বলিয়াই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। বস্তুতঃ বৈজুর গানে গোপাল নায়কের নামের উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, কেবল গুণীশ্রেষ্ঠ মহতের নাম শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ সন্নিবিষ্ট করা। হরিনারায়ণবাবুর উল্লিখিত "খরজ কাঁহানস" ও "মেইকি সুর খরজ" গান দুইটি একদিনে গোপাল ও বৈজুর প্রশ্নোত্তর প্রতিপন্ন করিবার যুক্তি কি? সম্পূর্ণ গান দুইটি প্রবাসীতে তুলিয়া দিলে উহাদের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে বিচার করা যাইত।

শ্রীআশুতোষ ঘোষ

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(২৩)

ষ্টীমারের পথটা মায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী নানা ভাবনার মধ্য দিয়া কাটিয়া গেল। ইন্দুর পীড়ার ভাবনা সারাক্ষণই প্রায় তাহার মনকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিত বটে, কিন্তু মাঝে মাঝে ইহারই মধ্যে অকারণেই তাহার মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিত। তরুণের ধর্ম্মই ভাবনাকে ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করা। মায়ার মনে হইত পিসীমা নিশ্চয়ই কিছু ভাল আছেন, না হইলে প্রথম সেই টেলিগ্রামের পর আরও টেলিগ্রাম আসিত। টাকা পাইয়া কাকারা নিশ্চয়ই পিসীমাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়াছে, চিকিৎসা শুশ্রূষা সেখানে ভালমতেই হইতেছে। বহুকাল পরে সে আত্মীয়-স্বজনদের দেখিবে, মনে করিতে বেশ খানিকটা আনন্দ পাইত। পিসীমা যদি ভালয় ভালয় সারিয়া ওঠেন, তাহা হইলে বাবাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া সে গ্রামেও এক-বার বেড়াইয়া আসিতে পারে।

প্রথম যখন ব্রহ্মদেশে আসে তখনকার ষ্টীমার যাত্রা আর এবারকার তফাৎ দেখিয়া মধ্যে মধ্যে তাহার হাসি পাইত। সেবারও চারিদিকের ম্লেচ্ছ কাণ্ডকারখানা দেখিয়া সে ঘৃণায় সঙ্কোচে একেবারে পাগল হইয়া উঠিবার জোগাড় করিয়াছিল। আর এখন এই-সব সাহেবীয়ানার মধ্যেই কত নোংরামী, কত বেআদবী আবিষ্কার করিয়া সে বিরক্ত হইতেছে। মানুষের চিন্তার ধারার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুর চেহারাই বদ্‌লাইয়া যায়। গ্রামে যাইতে পারিলে সেখানটাও না জানি তাহার কেমন লাগিবে। আগেকার সেই প্রবল টান এখন নাই বটে, তবু তাহার বাল্যের লীলাভূমির প্রতি মমতা একেবারে যায় নাই। তাহার মাতার স্মৃতির সহিত এই গ্রামখানির স্মৃতি অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে গ্রামে একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান করিবার ইচ্ছা বহুদিন হইল মায়া মনে মনে পোষণ করিতেছে, কিন্তু কেমনভাবে কি করিবে, তাহা এখনও স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। বাপের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলিতে তাহার সঙ্কোচ বোধ হইত। স্থির করিয়া রাখিয়াছিল ইন্দু ভাল হইয়া উঠিলে তাহারই সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দেখিবে। টাকার ভাবনাটা আসল ভাবনা নয়, যাহা সংগ্রহ করা মায়ার পক্ষে বিশেষ শক্ত হইবে না। তাহার হাতখরচের টাকা সে সব খরচ করিয়া উঠিতে পারে না, জমা থাকে বেশ খানিকটাই। গহনাও তাহার প্রচুর জমিয়া উঠিয়াছে, সখ করিয়া গড়ায় বটে, তবে প্রায় সে কিছুই পরে না। তাহারও দু একখানা বিক্রী করিয়া দেখা যাইতে পারে।

একখানা ডেক চেয়ার টানিয়া বসিয়া মায়া এই সব ভাবনাই ভাবিতেছিল। নিতান্ত ঘুমানোর সময় ভিন্ন অন্য সময় সে কেবিনে থাকিতেই পারিত না। তাহার দুইটি সহযাত্রীর ভিতর একটি বাঙালী, একটি গুজরাটি, কাহারও সঙ্গে তাহার বিশেষ ভাব হয় নাই। বাঙালী বধূটিকে দেখিয়া তাহার নিজের কয়েক বৎসর আগেকার কথা মনে হইতেছিল। সেই খাওয়া ছোঁওয়া লইয়া বিচার, সেই সব বিষয়ে খুঁৎখুঁতানি, সেই সব বিষয়ে সন্দেহ। এক রকম না খাইয়াই তাঁহার দিন কাটিতে-ছিল। সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে, তাহারও প্রায় সেই অবস্থা। কোনোমতে টিনের দুধ একটু করিয়া খাইয়া সে বেচারী প্রাণধারণ করিয়া ছিল। মায়ার সঙ্গে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রচুর ছিল, মেয়েটিকে দিতে তাহার ইচ্ছা করিত, কিন্তু পাছে মেয়ের মা বিরক্ত হয়, এই ভয়ে সে লোভ সংবরণ করিয়া চলিত। ভদ্রমহিলা মায়াকে মেমসাহেবের কাছাকাছিই একটা কিছু মনে করিয়া-ছিলেন, তাহার সম্বন্ধেও তাঁহার ছোঁয়াছুঁয়ির বিচারের অন্ত ছিল না।

নিরঞ্জন মেয়ের পাশে আসিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত কি ভাবছ?"

মায়া বলিল, "পিসীমাকে নিশ্চয়ই কাকারা কলকাতায় নিয়ে এসেছে, না বাবা?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "আনারই ত সম্ভাবনা। যাক, শুধু শুধু ভেবে লাভ কি? আর কয়েক ঘণ্টা পরে সব জানাই যাবে। মাঝে এই রাত্রিটা বই ত নয়?"

মায়া বলিল, "জিনিষগুলো সব গুছিয়ে রাখতে হবে। সব চারিদিকে ছড়িয়ে আছে।"

ষ্টীমারের শেষের রাত্রিটা বড়ই বিরক্তিকর। সময় আর যেন কাটিতেই চায় না। মায়া যে কতবার উঠিল, বসিল, ঘড়ি দেখিল, তাহার ঠিকানাই নাই। অবশেষে কোনোমতে রাত কাটিয়া ভোরের আলো দেখা দিল।

একলা মানুষ, গুছাইতে তাহার বেশী সময় লাগিল না। চা খাইয়া, ডাঙ্গায় নামিবার কাপড়-চোপড় পরিয়া, সে বসিয়া বসিয়া সঙ্গিনীটির কাণ্ডকারখানা দেখিতে লাগিল। তাঁহার কাজ আর ফুরাইল না, একটা বাক্স দশবার খোলেন আর বন্ধ করেন। মেয়েটিকে একবার এক জামা পরাইলেন, আবার কি কারণে সেটা পছন্দ না হওয়ায় খুলিয়া রাখিলেন। মেয়ে তারস্বরে আপত্তি জানাইতে লাগিল।

দেখিয়া দেখিয়া আর যখন তাহার ভাল লাগিল না, তখন মায়া উঠিয়া ডেকে চলিয়া গেল। নিরঞ্জনও ডেকেই ছিলেন। বলিলেন, "যে কারণেই আসি, অনেক কাল পরে বাংলা দেশের মাটি দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে।"

মায়া বলিল, "আমার কেবলি মনে হচ্ছে বাবা, পিসীমা অনেকটা ভাল আছেন। তা না হলে আমার মন এত হাল্কা লাগ্‌ত না।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "মন কি আর সব সময় সত্যি কথা বলে মা? আমরা যা চাই, মন সেটাতেই সায় দেয় বেশীর ভাগ সময়ই।"

কলিকাতার ঘাটে জাহাজ লাগিতেই মহা কোলাহল সুরু হইয়া গেল। নিরঞ্জন বলিলেন, "খোকার মত একটা কাকে দেখা যাচ্ছে যেন?"

মায়া ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল, "হ্যাঁ ছোটকাকাই ত। এ দিকের লম্বা ছেলেটা বিজয় বলে মনে হচ্ছে, বাবাঃ, কম লম্বা হয়নি ত, অজয়কেও ছাড়িয়ে গেছে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "ভাল, লম্বা চওড়া হলে তবু একটু আশা থাকে যে বাপের মত অকালমৃত্যু হবে না।"

নামার গোলযোগে খানিকক্ষণ কাটিয়া গেল। কাঠগড়া পার হইবার পর খোকা এবং বিজয় তাড়াতাড়ি আসিয়া হাজির হইল। মায়াকে দেখিয়া দুজনে ত একেবারে অবাক্! এই নাকি সেই মায়া!

মায়া কিন্তু আগেকারই মত ছুটিয়া গিয়া তাহাদের কাছে দাঁড়াইল, ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "পিসীমা এখন কেমন আছেন, ছোটকাকা?"

খোকা বলিল, "নাড়ানাড়িতে একটু যেন খারাপই মনে হচ্ছিল, কিন্তু কাল থেকে আবার বেশ খানিকটা ভালই মনে হচ্ছে।"

মায়া খুসি হইয়া বলিল, "দেখলে বাবা, মন মাঝে মাঝে সত্যি কথাও বলে।"

আধ ঘণ্টার মধ্যে তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ইন্দুর অবস্থা এখন আর বিশেষ আশঙ্কাজনক নয়। তবে বেশী কথাবার্ত্তা বলিতে বা উত্তেজিত হইতে ডাক্তার তাহাকে বারণ করিয়া রাখিয়াছেন। সে মায়াকে এবং নিরঞ্জনকে দেখিয়া একটু হাসিল মাত্র। মায়ার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "নাওয়া-খাওয়া করে, তারপর এসে একটু বসিস্। এখন ত তবু কিছু ভাল, যা দশায় নিয়ে এল আমরা ত ভয়েই মরি।"

মায়া জ্যাঠাইমার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। যাইবার সময় ইঁহাকে দেখিয়া গিয়াছিল, চওড়া লালপেড়ে শাড়ী পরা, হাতে গলায় গহনা, কপালে ও সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু। আসিয়া দেখিল নিরাভরণ। শুভ্রবসনা বিধবার মূর্ত্তি। তাহার বুকের ভিতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়া উঠিল। জগতে সবই পরিবর্ত্তনশীল, সুখও থাকে না, দুঃখও থাকে না, স্মৃতিও দেখিতে দেখিতে মলিন হইয়া আসে। জননীর বিয়োগ দুঃখ সে কবে ভুলিয়া গিয়াছে, জীবনের আনন্দে সে এখন ভরপুর। জ্যাঠাই-মাকে দেখিলেও ত মনে হয় না শোকের আগুন তাঁহাকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, অথচ কয়েকটা বৎসর আগে

স্বামী-বিহীন জীবন হয়ত তিনি কল্পনাও করিতে পারিতেন না। প্রেম মৃত্যুঞ্জয়ী বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু সত্যই মৃত্যুকে জয় করিবার ক্ষমতা মানুষের ভালবাসার আছে কি? চিরদিনের মত যে চোখের আড়াল হইয়া গেল, জীবনের বিচিত্র লীলার মধ্যে কোথাও যাহার সঙ্গে যোগস্থাপনের সম্ভাবনা রহিল না, তাহাকে মনের মধ্যে কতক্ষণ মানুষ ধরিয়া রাখিতে পারে? তাহার বিয়োগে যে দারুণ শূন্যতার সৃষ্টি হয়, নিজের অজ্ঞাতে কখন তাহা আবার পূর্ণ হইয়া ওঠে, মানুষ জানিতেও পারে না।

মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া তাহার জ্যাঠাইমা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, সে কি চিন্তা করিতেছে। একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আমার দশা দেখে মুখ কাল করছিস্ মা? ঘরে ঘরেই ত এই। তোরা সব সুখে থাক্, তোদের দেখে মরতে পারলেই আমাদের ঢের। অজয়টা কেমন আছে? একখানা চিঠিও কি দিতে পারে না?"

মায়া বলিল, "তার কথা আর বোলো না জ্যাঠাইমা। বলে বলে হায়রান হয়ে যাই, ছেলের কানেই ওঠে না কথা। বলে রোজ নাইছি, খাচ্ছি, ঘুমচ্ছি, এ আর কত লিখ্‌ব?

অজয়ের মা বলিলেন, "নিজে ছেলের বাপ হলে তবে বুঝতে পারবে, তার আগে আর পারবে না। সন্তান ভাল আছে এই খবরটুকু জানবার জন্যেই যে মা-বাপের প্রাণ কত ছট্‌ফট্ করে, তা আর বলে কি বোঝাব? শরীর কেমন তার?"

মায়া চুলের কাঁটা খুলিতে খুলিতে বলিল, "শরীর ত বেশ ভালই দেখি, অসুখবিসুখ একদিনও হয়নি। এখানকার চেয়ে মোটা হয়েছে খানিকটা। আচ্ছা জ্যাঠাইমা, জয়ন্তীর শ্বশুরবাড়ী এখান থেকে কত দূর? তোমার কাছে আসে না?"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "বেশী আস্‌তে আর পারে কই? শাশুড়ীটা বড় দজ্জাল, সারাক্ষণ পেছনে লেগে থাকে। তার উপর কোলে কচিমেয়ে। তোর পিসীর অসুখ শুনে একদিন এসেছিল, আজ তুই আস্‌বি বলে ত খবর পাঠিয়েছি, দেখি আসে কি না। তোদের দেখে সত্যি হিংসে হয়, বেশ আছিস্ বাছা। মেয়েগুলোর বিয়ে দিয়ে শুধু শুধু ভোগ বাড়ান। তখন যদি পড়াতে পারতাম, তাহলে এত তাড়াতাড়ি বিয়ে দেবার কোনো দরকার হত না। তা ওঁর মত হল কই?"

স্নানাহার করিতে অনেক সময় কাটিয়া গেল। তাহার পর মায়া গিয়া ইন্দুর ঘরে বসিল। তাহার তখন একটু তন্দ্রার মত আসিয়াছে, পাশে বসিয়া একজন ঝি তাহাকে বাতাস করিতেছে। মায়া ঝিটাকে উঠিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া, নিজে পাখা হাতে করিয়া বসিল।

খানিক পরে চোখ খুলিয়া মায়াকে দেখিয়া, ইন্দু একটু হাসিয়া বলিল, "কতক্ষণ বসে আছিস্?"

মায়া বলিল, "এই মিনিট পাঁচ হবে বড়-জোর। আজ তুমি কেমন আছ পিসীমা?"

ইন্দু বলিল, "একই রকম ত লাগে। এখানে এসে প্রথম কয়েক দিন বড় বাড়াবাড়ি হয়েছিল, এ যাত্রা টিঁকব বলে কেউ আর ভাবেনি। যাক, না টিঁকলেই বা কি? মেজদা কোথায়?"

মায়া বলিল, "খেয়ে-দেয়ে ছোটকাকার সঙ্গে কথা বল্‌ছেন। এখনি আসবেন তোমার কাছে। ভালর দিকে যখন যাচ্ছে, তখন নিশ্চয়ই সেরে উঠবে। কিই বা তোমার বয়েস যে এখনি টিঁকবে না?"

ইন্দু বলিল, "বয়েসে কি এসে যায় রে? তোর মায়ের কত বয়েস হয়েছিল? দাদারই বা কি এমন বয়েস হয়েছিল? যার যখন ডাক পড়ে।"

মায়া বলিল, "ও সব কথা রাখ এখন, তাড়াতাড়ি করে সেরে ওঠ, তোমার সঙ্গে আমার ঢের পরামর্শ আছে। একবার গ্রামে যেতে হবে, সেখানে মেলা কাজ।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "গ্রামে আবার তোর কি কাজ? তা কাজ থাক বা নাই থাক, চল একবার। সবাই তোকে দেখতে কত ব্যস্ত, দেখলে খুব খুসি হবে।"

মায়া বলিল, "আমি আর এমন একটা কি আজব চিজ যে সবাই আমাকে দেখতে এত ব্যস্ত? দেখেছে ত ঢেরই।"

ইন্দু বলিল, "তুই কি আর সেই আগের মানুষ

আছিস্? কত বদলে গিয়েছিস্। যত বা না বদ্‌লেছিস্, মানুষে গুজব তুলেছে তার দশগুণ। তোকে গাউন-পরা মেম বলেই তারা এখন মনে করে, শাড়ী পরতে দেখলে অবাক হয়ে যাবে। তুই নাকি ঘোড়ায় চড়িস্, মোটর হাঁকাস্, লাটসাহেবের বাড়ী গিয়ে বল নাচিস্, আরও কত কি।"

মায়া বলিল, "বেশ বাপু, কিছু না করতেই এত। তবু যদি যা কিছু করবার সুবিধা আছে, সব করতাম, তা হলে কি যে আমার নামে বেরত, তাই ভাবছি।"

ইন্দু বলিল, "অসুখে পড়বার দিনকয়েক আগে প্রভাসের মায়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে বলে কি "হাঁগা তোমাদের মেয়ে নাকি বিলাত যাচ্ছে? সে আজকাল নাকি বাংলায় কথা বলতে পারে না, মুরগী ছাড়া খায় না? সাবিত্রীর মেয়ে শেষে এমন হ'ল? বাপের রক্তের গুণ আর কি?

মায়ার মুখ হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেল। সে বলিল, "থাক্, গুজব না উঠেছে যার সম্বন্ধে, এমন মানুষ আর আছে কোথায়? তবে সাবিত্রীর মেয়ের অনুপযুক্ত এখনও কিছু করিনি। এবার গ্রামের লোককে চোখে আঙুল দিয়ে সেটা বেশ করে বুঝিয়ে আসব।"

নিরঞ্জন আসিয়া ঢোকাতে এই অপ্রিয় আলোচনাটা থামিয়া গেল। তিনি ইন্দুকে সহজভাবে কথা বলিতে দেখিয়া খুসি হইয়া বলিলেন, "এই যে অনেকটাই ভাল আছিস্ দেখছি। তাই বলে ভাইঝির সঙ্গে গল্প করে জ্বর বাড়িয়ে বসিস্ না যেন। এইবার সেরে ওঠ্ আর ও গ্রামের মুখো হতে দিচ্ছি না, সোজা আমার সঙ্গে নিয়ে যাব। মায়াও বাঁচবে, তোরও অসুখ-বিসুখ এত করবে না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কেন মেজদা, তোমার বর্ম্মা মুলুকে কি মানুষের অসুখ করে না, না মানুষ মরে না?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "অসুখও করে, মরেও বটে। তবে গ্রামে বসে তোমরা যে রকম ইচ্ছামরণ করতে পার, সেটার সুবিধা ওখানে হয় না।"

ইন্দু বলিল, "আচ্ছা, দেখা যাক, আগে সেরেই ত উঠি। এই বয়সে আর দেশ ছেড়ে থাকতে ইচ্ছা করে না। নেহাৎ তোমরা জেদ কর ত কলকাতায়ই থাকব না হয়।"

সিঁড়িতে এমন সময় বেশ একটা কলরব শোনা গেল। কচিছেলের কান্না, নারীর কণ্ঠস্বর, গাড়োয়ানের চীৎকার প্রভৃতির এক বিচিত্র সমন্বয়। মায়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "জয়ন্তীটা আসছে বোধ হয়, একটু গিয়ে দেখে আসি।"

নিরঞ্জনও উঠিয়া বলিলেন, "একটু কেন আর, বেশ খানিকক্ষণের জন্যেই যাও। এঘরে এখন আর আড্ডা কোরো না। ইন্দুকে বেশী tired করে তোলা উচিত হবে না। ওর ঝিটাকে ডেকে দাও গিয়ে।"

মায়া ঝিকে ডাকিয়া দিয়া তাড়াতাড়ি জ্যাঠাইমার শুইবার ঘরে গিয়া ঢুকিল। জয়ন্তী ততক্ষণে ঘরে আসিয়া বসিয়াছে। তাহার চেহারা অনেক খারাপ হইয়া গিয়াছে, গায়ের রঙের আর সে উজ্জ্বলতা নাই, রোগাও হইয়া গিয়াছে। পোষাক-পরিচ্ছদের সে বাহার, সে সৌষ্ঠব আর নাই, একটা সেমিজের উপর আধময়লা একখানা শাড়ী জড়াইয়া চলিয়া আসিয়াছে। সঙ্গে একটি বছর আড়াইয়ের ছেলে, কোলে একটি শিশুকন্যা, মাস সাত আটের হইবে। ছেলেটি দেখিতে মন্দ নয়, মেয়েটি অত্যন্তই রোগা।

মায়া ঢুকিবামাত্র জয়ন্তী বলিল, "কি গো চিন্‌তে পার?"

মায়া বলিল, "যা মূর্ত্তি বার করেছ, চিন্‌তে না পারলেও কিছু অন্যায় হত না। মেয়েটিও দেখছি তোমারই দলের।"

জয়ন্তী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "যেমন অদৃষ্ট, তেমনি চেহারা। এটা ত হয়ে অবধি ভুগ্‌ছে আর ভোগাচ্ছে। তুই ত দিব্যি দেখতে হয়েছিস্ রে! কে বল্‌বে বাঙালীর মেয়ে। ঠিক যেন কাশ্মিরী রাজকন্যা।"

মায়া বলিল, "তারা কি এত থ্যাদা হয়?"

হাস্য-পরিহাসে সকলের মনের ভারটা একটু কমিয়া গেল।

(২৪)

সপ্তাহখানেক কাটিয়া গিয়াছে। ইন্দু অল্পে অল্পে সারিয়া উঠিতেছিল। তবে এখনও নাড়ানাড়ি করিবার মত অবস্থা হয় নাই।

নিরঞ্জনের পক্ষে আর বেশীদিন কাজকর্ম্ম ফেলিয়া বসিয়া থাকা কঠিন হইয়া উঠিতেছিল। মায়াকে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইতে পারেন, কিন্তু তাহাকে আবার পরে লইয়া যাইবে কে? আবার ইন্দু ভাল করিয়া সারিয়া উঠিবার আগেই যে যার নিজের পথে চলিয়া যাওয়া ভাল দেখায় না। গ্রামে আর তাহাকে রাখিবার ইচ্ছা নিরঞ্জনের নাই। রেঙ্গুনে যদি সে নিতান্তই না যাইতে চায়, তাহা হইলে কলিকাতায় তাহার থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর সকলে মিলিয়া কথা হইতেছিল। মায়ার জ্যাঠাইমা বলিতেছিলেন, "এরই মধ্যে কি আর যাওয়া হয়? কতদিন পরে বলে এলে। ঠাকুরপো না থাকতে পার, মায়াকে রেখে যাও। ঠাকুরঝি ভাল করে সেরে উঠুক, তারপর ও যাবে এখন। তোমরা আসার পর থেকেই দেখছ না কেমন তাড়াতাড়ি সেরে উঠ্‌ছে?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা যেন রেখে গেলাম, এরপর ও যাবে কার সঙ্গে?"

তাঁহার বৌদিদি বলিলেন, "ও মা, নিয়ে যাবার লোকের আবার ভাবনা। ছোটঠাকুরপোই নিয়ে যেতে পারে। বিজুও বর্ম্মা দেখবার জন্যে নাচ্‌ছে কতদিন থেকে।"

মায়া বলিল, "তাই দিনকয়েক থাকি না হয় বাবা। কেউ না নিয়ে গেলেই বা কি? জাহাজে একলা যেতে কিছু মুস্কিল নেই।" এখনি চলিয়া গেলে তাহার গ্রামে যাওয়া বা আর কিছু করা ঘটিয়া উঠিবে না।

নিরঞ্জন বলিলেন, "তা ঠিক্। তবে একলা যাবার দরকার হবে না। আমি গেলেই শিবচরণ আসবে, ছেলেকে receive করতে, তাদের সঙ্গেই যেতে পারবে।"

বাণীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিয়া মায়ার হাসি পাইল। জোগাড় হইয়া উঠিতেছে সেই রকমই বটে। দেব-কুমারের সঙ্গে একত্রে রেঙ্গুনে গিয়া নামিলে তাহার সঙ্গিনীরা আর রক্ষা রাখিবে না। তাহার হাড় জ্বালাতন করিয়া খাইবে।

মায়ার জ্যাঠাইমা বলিলেন, "জয়ন্তী ত ক'দিন এসে থাকবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। মায়ার সঙ্গে একটু সেদিন ভাল করে কথাও বল্‌তে পারল না। আমি ত বল্‌লে বেয়ান-ঠাকরুণ কথা কানেই নেননা। ঠাকুরপো যদি বেহাইকে একখানা চিঠি লিখে গাড়ী পাঠিয়ে দাও, তাহলে এখনি মেয়েটা আসতে পায়। তোমায় তারা খুব খাতির করে।"

নিরঞ্জন হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা না হয় দিচ্ছি। আমার কথা ত তখন তোমরা কেউ শুন্‌লে না, এখন দেখ্‌ছ ত মেয়ের বিয়ে দেওয়ার কত সুখ?"

জয়ন্তীর মা বলিলেন, "বিয়ে না দিয়েই বা করি কি ভাই? তোমার মেয়ের মত শিক্ষা দিতে পারতাম ত বিয়ে না দেওয়া চল্‌ত। এদিকও না ওদিকও না, শুধু শুধু বসিয়ে রেখে লাভ কি?"

নিরঞ্জন বলিলেন, "যাক্, যা হয়ে গেছে তা হয়েই গেছে। এখন জামাই বাবাজী যদি রোজগার করতে পারেন ভাল করে তবেই। নইলে ছেলেপিলে নিয়ে চিরকাল কষ্ট পাবে।"

ক্রমশঃ

"বাঙ্গালার প্রথম"

অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

ছাপায় প্রথম বঙ্গাক্ষর

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানার সৃষ্টি হয় নাই। এসময়ে ভারতবর্ষেও ছাপাখানার অস্তিত্ব ছিল না। কাজেই ছাপার হরফে বঙ্গাক্ষর দেখিবার সুযোগও তখন ছিল না। এখন হইতে উনিশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত (এক্ষণে, রায় বাহাদুর, ডাক্তার) দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কাঠে ক্ষোদাই করা ব্লক হইতে ছাপা ন্যূনাধিক দুইশত বৎসরের পুরাতন একখানি বাঙ্গালা পুঁথির সংবাদ দিয়াছেন। তাঁহার মতে, বাঙ্গালার এই পুঁথির মুদ্রণ-প্রণালী তিব্বতী বা নেপালী পদ্ধতির অনুকরণ। * চীনারাই কিন্তু ব্লক-প্রিন্টিং-এর আবিষ্কারক। কাঠের ব্লকে হরফ ক্ষুদিয়া ইহারাই প্রথম ছাপে। তিব্বতে ও নেপালে অনেকদিন এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া ছাপা চলিতেছিল।†

১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে ভাস্কো দা গামা মলবরের রাজধানী কালিকাটে পদার্পণ করেন। তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিলেন একজন ট্রিনিটেরিয়ান, নাম—পেদ্রো দে কোবিলহম (Pedro de Covilham)। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইঁহার অদ্ভুত ত্যাগের দৃষ্টান্ত হইতেই ভারতে খৃষ্টান মিশনের সূত্রপাত হয়। এই বৎসর আটজন যাজক ও আটজন ফ্রান্‌সিস্‌কান্—পেদ্রো আলভারেজ কাব্রালের সঙ্গে আসেন। মুসলমানরা ইঁহাদের তিনজনকে মারিয়া ফেলে। তাহাতে দমিয়া না গিয়া এই ফ্রান্‌সিস্‌কানরা এবং ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ডমিনিকানরা ভারতে খৃষ্টান মিশনের পথিপ্রদর্শক-রূপে আগমন করেন। ফলে, ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে এবং গোয়ায় ১৫১০ খৃষ্টাব্দে মিশনের কার্য্যারম্ভ হয়। পর্ত্তুগীজরা ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গোয়া নগরী অধিকার করে। গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বইও ছাপিয়াছিল। বই ছাপিবার জন্য ছাপাখানারও ব্যবস্থা করিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য-ব্যবসায়ও চলিত। পর্ত্তুগীজদের বাণিজ্য যখন কোন কোন প্রাচ্য দেশে চলিতেছিল, তখন নুনো দা কুন্‌হা (Nuno da Cunha—১৫২৯-৩৮) তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম বঙ্গদেশের সহিত রীতিমত ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করেন। এই সময় দা কুন্‌হার চেষ্টায় অনেক পর্ত্তুগীজ বঙ্গে আসিয়া বালেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত এবং হুগলী হইতে আরম্ভ করিয়া ঢাকা পর্য্যন্ত নানা স্থানে বাস করিতে লাগিল। ইহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিত, জল-দস্যুতা ও লুটতরাজ করিতেও নারাজ ছিল না। এইরূপে কিছুদিন চলিয়া যায়। পর্ত্তুগীজ মিশনরীরা লিসবন ও গোয়ার পথে বাঙ্গালায় আসে। অতঃপর ধর্ম্মের তথা বাণিজ্যের কোন এক খেয়ালের বশে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পড়ে। তাহারা যে জায়গায় থাকিত সেইখানকার কথ্যভাষা যথাসাধ্য শিক্ষা করিতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা সেই সময়ের উপযোগী প্রণালী অনুসারে বাঙ্গালার ব্যাকরণ ও অভিধান সঙ্কলন করে এবং ধর্ম্মপ্রচারের জন্য খৃষ্টধর্ম্মের প্রার্থনাপুস্তকাদি বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করে। তাহাদের এই সমস্ত রচনা রোমান অক্ষরে তাহারা লিখিত। বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থাদি প্রণয়ন-ব্যাপার কিন্তু জেসুইটগণের ভারতে আগমনের পূর্ব্বে হয় নাই। জেসুইটদের নবসম্প্রদায় ১৫৪০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গঠিত হয়। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা ভারতের মিশন-ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। সেণ্ট ফ্রান্‌সিস্ জেভিয়ার পর্ত্তুগালের তৃতীয় জনের অনুরোধ-ক্রমে দুইজন সহকর্ম্মীর সহিত মিশন-কার্য্যের সূত্রপাত করেন। ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ইঁহারা বাঙ্গালা মিশনের ব্যবস্থা করেন।

* History of the Bengali Language and Literature, Calcutta (1911), p. 849; Bengal Past and Present, Vol IX, July-Sept. 914. Pl. No 1., p 40.

† J. A. S. B., Vol IX, April 1913, p. 149.

১৫৮১ খৃষ্টাব্দ হইতে প্রতিবর্ষে একখানি করিয়া পর্ত্তুগীজ জাহাজ বাণিজ্য-সূত্রে চট্টগ্রামে আসিত। পাদরে ফ্রান্সিস্ ফারনান্দেজের ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের (১৭ই জানুয়ারীর) একখানি পত্র হইতে জানিতে পারা যায় যে,তিনি খৃষ্টধর্ম্মের একখানি পুস্তিকা এবং কথোপকথনচ্ছলে একখানি প্রশ্নোত্তরমালা রচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, পাদরে ডমিনিক দে সুজা এই দুইটী বই বাঙ্গালায় তর্জ্জমা করিয়াছেন। ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জেসুইট পাদরে মার্কস আণ্টনিও সাটুচি বাঙ্গালা মিশনের অধ্যক্ষতা করেন।

১৬৯২ খৃষ্টাব্দে চারিজন জেসুইট্ পাদরে মিলিত হইয়া ফরাসী ভাষায় একখানি পুস্তক লেখেন। এই গ্রন্থে প্রকৃতিবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ ও ভূগোলের আলোচনা আছে। এইগুলির সঙ্গে আর এক অদ্ভুত ব্যাপার ইহাতে আছে,—তাহা বঙ্গ ও ব্রহ্মভাষার অক্ষর। অক্ষরগুলি বড় কৌতূহলোদ্দীপক। এই চারিজন গ্রন্থকারের নাম—Jen de Fontenay, Guy Tachard, Etienne Noel ও Claude de Beze, আর পুস্তকখানির নাম—"Observations Physiques et mathematiques pour servir a l'histoire naturelle, et a la perfection de l'Astronomie et de la Geographie: Envoyees des Indes et de la Chine a l'Academie Royale des Sciences a Paris, par les Peres Jesuites......"

অতঃপর ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে লাইপজিগে জোহান ফ্রীড্রিক্ ফ্রিজের (Johann Friedrich Fritz) প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষাধিকার-গ্রন্থে ("Orientalisch und Occidentalischer Sprachmeister") যেমন একশটি ভাষার বর্ণমালা স্থান পাইয়াছিল, তেমনই কতকগুলি বাঙ্গালা বর্ণমালাও তাহাতে স্থানলাভ করিয়াছিল। ইহাতে বাঙ্গালা বর্ণমালার শিরোদেশে লিখিত আছে,—"Alphabetum Bengalicum et Jentivicum". বিলাতে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পুস্তকখানির খুব প্রতিপত্তি ছিল।* ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন ও অর্ব্বাচীন বর্ণমালার ফরাসীকোষগ্রন্থে (Encyclopædie Francoise des Alp. anc. et mod ; plate no. 18, Livourne) ঠ, ট, ঞ, ঝ, জ, ছ, চ, ঙ, ঘ, গ, খ, ক, ভ, ব, ফ, ব, ধ, দ, থ, ত, ল, ঢ, ড, ক্ষ—এই চব্বিশটী বঙ্গাক্ষরের চিত্র আছে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এডমণ্ড ফ্রাই (Edmund Fry, Letter-Founder, Type Street) তাঁহার Pantographia নামক পুস্তকের ১৯ পৃষ্ঠায় এই কোষের উল্লেখপূর্ব্বক লিখিয়াছেন—"This is the Character used in the extensive Country of Bengal, now subject to the English East India Company."

* G. A. Grierson, Specimens of the Bengali and Assamese Languages, 1913.

বাঙ্গালায় প্রথম মুদ্রাযন্ত্র

প্রাচ্য দেশের মধ্যে চীনের কথা ছাড়িয়া দিলে প্রথমে গোয়ায় মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্ত্তিত হয়। ঠিক কোন্ সময়ে মুদ্রাযন্ত্র সেখানে স্থাপিত হয় তাহা জানিতে পারি নাই; তবে গোয়াতে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্মপ্রচারের জন্য ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে সেখানে মুদ্রণ-কার্য্য চলিতেছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় (Da Cunha, Bombay, p. 7)। ট্রানকোয়েবারের ডেনিশ পাদ্রেরা জেসুইট্দের পরে ১৭১০ খৃষ্টাব্দে ছাপাখানা খোলে। ইহার পর ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হুগলীর ছাপাখানা। ভারতবর্ষের ভিতরে বোম্বে ও বাঙ্গালায় প্রথম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার পূর্ব্বে কলিকাতায় বা বাঙ্গালা দেশে ছাপাখানা ছিল না।

ডাক্তার বসটিড সংবাদ দিয়াছেন যে, ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দেও এদেশে ছাপাখানা ছিল না।*

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে আমাদের দেশে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের ব্যবহার হয়। এণ্ড্রুস্ নামে একজন পুস্তক-বিক্রেতা হুগলীতে একটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। এই মুদ্রাযন্ত্রে ন্যাথেনিয়াল ব্রাসি হালহেডের (Nathaniel Brassey Halhed) বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক কিছুই ছিল না। বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর কেমন করিয়া তৈরী করিতে হয় তাহাও কেহ জানিতেন না। চার্লস্ উইলকিন্স্

* Echoes from Old Calcutta, 2nd Edn., p. 270.

(ইনি পরে স্যর উপাধিভূষিত হন) বহু চেষ্টা করিয়া বাঙ্গালার মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। উইল্‌কিন্স্ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিবিল সার্ভিস পরীক্ষার একজন সদস্য ছিলেন। এ দেশের নানা ভাষায়ও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ওয়ারেন হেষ্টিংসের আনুকূল্যে ইনি সংস্কৃত ভগবদ্গীতা ইংরেজিতে ভাষান্তরিত করিয়া সর্ব্বপ্রথম ইউরোপে প্রচার করেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য তিনি এতদূর আগ্রহান্বিত ছিলেন যে, ছয় সাত বৎসর এদেশে থাকিয়া স্বয়ং মুদ্রাক্ষরের ছেনী তৈরী করিতে শিখিয়া স্বহস্তে এক সেট বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তারপর ছেনী প্রস্তুত করিবার কৌশল পঞ্চানন কর্ম্মকার নামক এক ব্যক্তিকে শিখাইয়া দেন। পঞ্চানন অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই বিদ্যা শিক্ষা ও আয়ত্ত করেন। উইলকিন্স ও পঞ্চাননের অক্ষরে হালহেডের ব্যাকরণ (*A Grammar of the Bengal Language*) ছাপা হয়। ভারতবর্ষের ছাপাখানা হইতে যত বই ছাপা হইয়াছে, এই বইখানিই তাহাদের ভিতরে প্রথম—সকলের চেয়ে পুরাতন। প্রায় এই সময়ে বোম্বে সহরেও পার্সী রস্তমজি কেরসম্প্‌জি (Rustomji Kersaspji) একটি ছাপাখানা খোলেন (Bombay Times, December, 1855)। এই ছাপাখানার প্রথম বই—*English Calender for the year 1780*। বোম্বে ও কলিকাতায় প্রায় একই সময়ে ছাপাখানা খোলা হয়। তারপর স্যর ইলাইজা ইম্পে-সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থাসকল জোনাথন ডনকন কর্ত্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত হইয়া ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে "কোম্পানীর প্রেসে" মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিন হইতে সাত বৎসর পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের আদৌ উন্নতি হয় নাই। অতঃপর কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ সালের ব্যবস্থা হেনরী পিট্‌স্ ফষ্টর সরল ও চলিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া যে গ্রন্থ কোম্পানীর প্রেসে মুদ্রিত করেন তাহার সমস্ত অক্ষর পঞ্চানন নূতন এক সেট তাঁবা তৈরী করিয়া প্রস্তুত করেন। সেই সময়ে নূতন তৈরী মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া সকলের প্রিয় ছিল। কালীকুমার রায় নামে একজনের লেখার ছাঁদ খুব সুন্দর ছিল। তাহারই লেখার অনুকরণ করিয়া বর্ত্তমান ছাপা হরফের ছাঁদের সৃষ্টি। গোড়ায় গোড়ায় হরফের ছাঁদ খুব খারাপ ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে মিশনরীরা শ্রীরামপুরে প্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেন। শ্রীরামপুরেই হরফের ছাঁদের যাহা-কিছু উন্নতি হইয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উইল্‌কিন্সের শিষ্য পঞ্চানন কর্ম্মকার মিশনরীদের ছাপাখানায় কাজ করিবার জন্য উপস্থিত হন। কেরী সাহেব তখন একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ ছাপিবার উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। পঞ্চাননকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে দেবনাগর অক্ষরের ছেনী প্রস্তুতকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পঞ্চানন অতি অল্প সময়ের মধ্যে অর্দ্ধেক ছেনী তৈরী করিয়া ফেলিলেন; কিন্তু দেবনাগরে অনেক যুক্তাক্ষর থাকায় তাঁহাকে সাত শত ছেনী প্রস্তুত করিতে হয়। তিনি একলা পারিয়া উঠিলেন না। তাঁহার জামাতা মনোহর কর্ম্মকারকেও ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। মনোহর খুব নিপুণ কারিগর। তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া মিশনরীরা শ্রীরামপুরের ছাপাখানায় তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। মনোহর সেখানে চল্লিশ বৎসর কাজ করিয়া বাঙ্গালা, দেবনাগর, চীনা ও নানাবিধ মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। দেবনাগর মুদ্রাক্ষরের সৃষ্টি ১৮০৩ সালে। পার্সী ও আরবী অক্ষরের ছেনী কলিকাতার সিমুলিয়া-নিবাসী রাধামোহন কর্ম্মকার প্রস্তুত করেন। পার্সীর ছাদ তিন রকমের—মৌলবী আপ্তাবুদ্দী, এলাদাদী ও মহানন্দী। মহানন্দ নামে এক পণ্ডিতের হাতের লেখার ছাঁদ দেখিয়া তৈরী বলিয়া ছাঁদের নাম—মহানন্দী। পার্সীর ছেনী আড়াই শত, আরবীর দুই শত।

ইউরোপীয়নের ছাপা প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ

Padre Frey Manoel da Assumpcao একজন পর্ত্তুগীজ অগসটিনিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত মিশনরী ছিলেন। ইনি পর্ত্তুগালের এভোরা-নিবাসী ছিলেন। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ইনি ঢাকা জেলার ভাওয়ালের অন্তর্গত নগরীর সেণ্টনিকোলাস টলেন্টিনো মিশনের (Missio dos Nicolas Tolentino) অধ্যক্ষের (Rector) পদ প্রাপ্ত হন এবং ১৭৩৪ খৃষ্টাব্দের ২৮-এ আগষ্ট তারিখে বাঙ্গালা ও পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথোপকথনচ্ছলে একখানি

খৃষ্টীয় ধর্ম্মমতের সংক্ষিপ্তসার রচনা করেন। পুস্তকখানির নাম—'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ।' Barbosa Machado ও Da Cunha Rivara-র তালিকায়* ইহা "Compendio dos Misterios da Fee, Ordenado Em linga Bengalla" নামে পরিচিত ও লিসবনে মুদ্রিত। এই গ্রন্থখানি এবং ইহার আরও দুইখানি গ্রন্থ ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে লিসবন হইতে প্রকাশিত হয়। পুস্তকখানির প্রত্যেক বাম দিক্‌কার পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Crepar Xaxtrer Orth'bhed" (কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ), এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠার শিরোভাগে "Cathecismo do Doutrina Christaa" (খৃষ্টমতের প্রশ্নোত্তরী) লিখিত আছে। আকার ক্রাউন ১৬ পেজি। পুস্তকখানির বামদিকের পৃষ্ঠায় রোমান অক্ষরে পর্তুগীজ ভাষার উচ্চারণের পদ্ধতি-ক্রমে লিখিত বাঙ্গালা এবং দক্ষিণ দিকের পৃষ্ঠায় তাহার পর্তুগীজ অনুবাদ। বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটীতে এই পুস্তকের একখণ্ড সংরক্ষিত আছে। কিন্তু তাহা খণ্ডিত। পরিচয়-পত্র নাই, ৩২ হইতে ৪৯, ১৫৪ হইতে ১৫৯, ৩২০ হইতে ৩৩৭ এবং ৩৭০ হইতে ৩৭৩ পৃষ্ঠা নাই। শেষেও কয়েকখানি পৃষ্ঠা নাই—ইহার শেষ পত্রের সংখ্যা ৩৮০। এই গ্রন্থের ভূমিকা লাটিন ভাষায় লিখিত। ইহার ভূমিকা হইতে বোঝা যায় যে, ইহা ১৭৩৪ সালে লেখা হইয়াছিল, বইখানি কিন্তু ১৭৪৩ সালে বাহির হয়। সর্ব্বপ্রথম হষ্টেন সাহেব *Bengal : Past and Present* (Vol.IX, pt. 1) নামক পত্রে মানোএল আস্সুম্পশাওর তিনখানি গ্রন্থের বিবরণ ও আলোচনা প্রকাশ করেন। তারপর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ১৩২২ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের 'প্রতিভা' পত্রিকায় এই পুস্তকের উল্লেখ করেন। অতঃপর এই গ্রন্থের সামান্য পরিচয় আমি "১৩২২ বঙ্গাব্দের বঙ্গ-সাহিত্যের বিবরণে" বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অধিবেশনে পাঠ করি। ইহার পর শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে ও শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই পুস্তক সম্বন্ধে দুইটী অতি মূল্যবান্ ও উপাদেয় প্রবন্ধ প্রকাশ করেন (সাঃ পঃ প, ৩য় সংখ্যা ১৩২৩)। সুশীল বাবুর প্রবন্ধে কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদের বিস্তৃত পরিচয় ও আলোচনা আছে। সুনীতিবাবু ইহার ভাষা ও লিপ্যন্তর-পদ্ধতি সম্বন্ধে গবেষণার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। যাঁহারা এই পুস্তক সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ জানিতে চাহেন তাঁহাদের এই দুইটী প্রবন্ধ অবশ্যপাঠ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে স্থানে স্থানে সুশীলবাবুর প্রবন্ধ হইতেও সাহায্য গৃহীত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থবেদ' হইতে পুস্তকের পরিচয়স্বরূপ কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

Puthi I

Xo (col ...) oner ortho, ebong Prothoqhie prothoqhie buzhan [ইহার লিপ্যন্তর—স (কল ..) অনের অর্থ এবং প্রথখো প্রথখো (পৃথক্ পৃথক্) বুঝান]

এই পুথির দুইটী অংশ। প্রথমাংশে ৭টী Tazel অর্থাৎ অধ্যায়।

Tazel I (পৃঃ ২—১৮)—xidhi crucer orthobhed [সিদ্ধি ক্রুশের অর্থবেদ]

Tazel II (পৃঃ ২—)—Pitar poron, ebong tahan ortho [পিতার পড়ন, এবং তাহান্ অর্থ]

Tazel III (পৃঃ—৭৬)—খণ্ডিত

Tazel IV (পৃঃ ৭৬-১৩৬)—manі xottio Niranzon, Axthar chodo bhed ebong tahandiguer ortho [মানি সত্য নিরঞ্জন, আস্থার চৌদ বেদ এবং তাহান্দিগের অর্থ]

Tazel V. (পৃঃ ১৩৬-২৪৪) Dos Aggnia, ebong tahandiguer ortho [দশ আজ্ঞা, এবং তাহান্দিগের অর্থ]

Tazel VI. (পৃঃ ২৪৪-২৭২)—Pans aggnia, ebong tahandiguer ortho. [পাঁচ আজ্ঞা এবং তাহান্দিগের অর্থ]

Tazel VII (পৃঃ ২৭২-৩১৩)—xat Sacramentos, ebong tahandiguer ortho [সাত সাক্রামেণ্টোস্ এবং তাহান্দিগের অর্থ]

Puthi II

দ্বিতীয়াংশে দুইটী অধ্যায়।

Tazel I. (পৃঃ ৩১৪-৩৫৬)—Axthar bhed bichar xotto coria xiqhibar xiqhaibar upae toribar [আস্থার বেদ বিচার, সত্য করিয়া শিখিবার শিখাইবার উপায় তরিবার]

Tazel II. (পৃঃ ৩৫৬-৩৮০ অসম্পূর্ণ)—Paron xaxtro nirala [পড়ন শাস্ত্র নিরালা]

এই পুস্তকে কয়েকটি গান আছে। দুইটি গানের নমুনা নিম্নে প্রদত্ত হইল :

G. Poromexor que zodi tomi paro cohibar
tobe ami colubo upae tomar ?

* Barbosa Machado—Bibliotheca Lusitara Historica Critica e chronologica, tome III, p. 183.

Cata'ogo dos manuscri tos da Bibliotheca Publica Evorera, tome I, par J. H. de Cunha Rivara p. 345.

X. Eq poromo Tthacur xorbo corta xorbozan
xei triloquer nath que'io nahi tahan xoman

G. Coto zon tini zodi tomi paro cohibar
Tabe ami cohibo que upae tomar

X. Tini tinzon : pita putro, Doeamoe,
Tin zon xotontor poro nexor eq oi
Poromexor pita, putra poromexor,
Poromexor Doeamoe, tinzon xotontor.

[গুরু। পরমেশ্বর কে যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব উপায় তোমার ?
শিষ্য। এক পরম ঠাকুর সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞান,
সেই ত্রিলোকের নাথ কেহ নাহি তাহান্ সমান।
গুরু। কতজন তিনি যদি তুমি পার কহিবার
তবে আমি কহিব কি উপায় তোমার ?
শিষ্য। তিনি তিন জন, পিতা পুত্র দয়াময়,
তিন জন সতন্ত্র। পরমেশ্বর এক অয় (হয়)
পরমেশ্বর পিতা, পুত্র পরমেশ্বর
পরমেশ্বর দয়াময় তিন জন সতন্ত্র।] —পৃঃ ৩৪৯

আর একটী গানের কিয়দংশ কেবল লিপ্যন্তর করিয়া বঙ্গাক্ষরেই প্রদত্ত হইল :—(বালক যেসুসের গীত জর্ম্ম (জন্ম) স্থানে শুইয়া) পৃঃ ৩৫৩

হে বাবা যেসুস	হে বাবা যেসুস
বালক নির্ম্মল	পরমেশ্বর সত্য
কন্তা মারিয়ার উদরে	কাপড়ের উপরে
সিদ্ধি ধর্ম্ম ফল।	কেন শুইয়াছ।
আমার দয়ার যেসুস।	আমার দয়ার যেসুস।
হে বাবা যেসুস	আমারদিগের কারণ
হে সোনার বাবা	এখানে শুইয়াছ।
তোমারে আমি তই	আইস রে কৃস্তানেরা
করি তোমার সেবা।	তাঁহার সেবা কর।
আমার দয়ার যেসুস।	আমার দয়ার যেসুস।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। চন্দননগরের St. Louis গির্জ্জার Vicar জ্যোতিষ-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত পাদ্রে জাকবস ফ্রানসিস্কস্ মারিয়া গেরেঁ (Father J. F. M. Guerin) ইহার মাত্র বাঙ্গালা অংশের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন। বাঙ্গালা অংশ বঙ্গাক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহা নামে সংস্করণ, বস্তুত ঢালিয়া সাজা। এই সংস্করণের বাঙ্গালা প্রথম সংস্করণ অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নয়। ইহার ভূমিকাও লাটিন ভাষায় লিখিত। ভূমিকার মর্ম্ম এই যে, ১৭৩৫ সালে (১৭৩৪ হইবে) মানোএল আসুম্পশাও এই গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রচনা করেন এবং ১৭৬৫ (১৭৪৩ হইবে) তাহা রোমান অক্ষরে মুদ্রিত করেন। পাদ্রে গেরেঁ বঙ্গাক্ষরে ইহা মুদ্রিত করেন। প্রথম সংস্করণে অনেক ভুল ছিল, অনেক অনাবশ্যক বিষয় ছিল। অর্দ্ধেকের উপর বাদ দিয়া, তিনটী নূতন কথোপকথন সংযোজন করিতে তাঁহাকে দুইজন ব্রাহ্মণ, দুইজন খৃষ্টান ও একজন মুসলমানের সাহায্য লইতে হইয়াছে। এই কার্য্যে তাঁহার নয় মাস সময় লাগিয়াছে। ১৭৩৬ সাল হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত ইহাতে চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণের মাস, তারিখ, সময় ও গ্রামের বিবরণের তালিকা আছে। এই অংশ পুনর্মুদ্রিত হওয়া উচিত। এই গ্রন্থের নাম—

"কৃপারশাস্ত্রের অর্থবেদ
আর
১০৪ বৎসরের গ্রহণ গণনা।"

ইহার পরিচয়-পত্রের বাঙ্গালা অংশ কৌতুকপ্রদ বলিয়া নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"কৃপারশাস্ত্রের অর্থবেদ।

সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণ গণনার সহিত ১৪০ (১০৪ হইবে) বৎসরের
আরম্ভ ১৮৩৬ সাল অবধি
সহর চন্দননগর
এবং সমস্ত বাঙ্গালা দেশের নিমিত্তে।

করিয়াছেন জাকবস্ ফ্রান্সিসকস্ মারিয়া গেরেঁ
চন্দননগরের সর্ব্বগ্রামের পাদ্রী
নিয়োজিত প্রেরিত সম্পর্কীয় এবং ধর্ম্মাত্মার সভায়।

দ্বিতীয়বার এবং শুদ্ধরূপে
শ্রীরামপুরে মুদ্রাঙ্কিত হইল।
সন ১৮৩৬"

পাঠকগণ রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিবেন এই আশায় এই গ্রন্থের গ্রহণাংশ আরম্ভ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বের একপৃষ্ঠা ভাষার নমুনাস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

[প=পণ্ডিত, গু=গুরু, দৈ=দৈবজ্ঞ মো=মোল্লা]

প। উত্তম। দেখহ এক দৈবজ্ঞ আসিতেছে ও হয় বাঙ্গালার মধ্যে সকল অপেক্ষা অতি বিদ্যাবান এবং জ্যোতির্ব্বেত্তা।

গু। বলহ উহাকে নিকটে আসিতে।

পরে দৈবজ্ঞ আসিয়া করিল ছেলাম।

গু। কি আছে তোমার বগলের ভিতরে।

দৈ। আমার স্থানে আছে বার পঞ্জিকা আর চারি জ্যোতিষ।

গু। কি নাম ঐ জ্যোতিষের।

দৈ। ১ নীলধূম্রিতাজক (জাতক) ২ স্বরোদয় দ্বাদশ নবগ্রহ ভাবগণনা ৩ পঞ্চ স্বরা ও কোষ্ঠ প্রদীপ।

প। কোথায় যাহ তুমি এতেক বিলম্বেতে।

দৈ। আমি আপনার গৃহে যাই।

মো। কোথায় হইতে তুমি আসিতেছ।

দৈ। আমি করিয়া আনিতেছি এক জন্মকালীন গ্রহের নির্ণয় এক বালকের নিমিত্তে। এই কর্ম্মে আমি পাইয়াছি একশত টাকার উপর অতএব কথন কেহ এমত যোগ গ্রহের গণনা ঠিক করিতে পারে নাই যেমত আমি। ঐ বালক হইবেক ভাগ্যবান একদিন।

প। হইতে পারে যে ঐ বালকের হইবেক মহাব্যাধি আর ফাঁসি যাইবেক। তারপরে দৈবজ্ঞ হাই ফেলায় আর জোরে তুড়ি দেয় এবং মহাশব্দ করিয়া ঢেকুর তোলে।

গু। ভয় করিও না। এথন রাত্রি হয় নাই। ভূত তোমার মুখের মধ্যে প্রবেশ করিবেক না।

দৈ। এইক্ষণে গ্রহণ হইয়াছে। গ্রহণের সময় ভূত উড়িয়া বেড়ায় বাতাসেতে যেমত রাত্রিতে। আমার বড় ভয় যে সূর্য্যেরে সর্পে না খাইয়া ফেলে।

গু। এই গ্রহণ দেখা যায় কেবল বিলাতে কি ভয় তোমার আমি তোমারে নির্দ্ধার্য্য কহিতে পারি যে বিলাতের জ্যোতির্বেত্তারদিগের ভয় নাই যে সূর্য্যের সর্পে খাইয়া ফেলে।

দৈ। বিলাতের দৈবজ্ঞরা ভাবে না আমাদিগের মত। যথন উহারা হইবেক আর বিদ্যাবান তথন ভাবিবেক। যেমত বাঙ্গালার দৈবজ্ঞ কিন্তু উহাদিগের লাগিবেক অনেক যুগ শিখিতে এবং করিতে এক জন্মকালীন গ্রহের নির্ণয় আর আন্দাজ করিতে গ্রহণ আর যোগ গ্রহের গণনা।

গু। তুমি গণনা করিয়া দিতে পারিবা আমারে দশ বৎসরের গ্রহণ আমি তোমারে একশত টাকা দিব।

দৈ। ব্রহ্মা পারিবেন না। বিনা বহু ক্লেশে। হইবেক অসাধ্য পাইতে এক দৈবজ্ঞ কাশীতে কিম্বা নদীয়াতে উপযুক্ত এই কর্ম্মের। যিনি পারিবেন গীত গাইয়া সকল গণনা দুই বৎসরের গ্রহণের হইবেক প্রথম ভারতবর্ষের দৈবজ্ঞ।

গু। লহ ১০৪ বৎসরের গণনা সূর্য্যের আর চন্দ্রের গ্রহণের। যে এক বিলাতী জ্যোতির্বেত্তা গণনা করিয়াছে ফরাসডাঙ্গার নিমিত্তে। অনেক দেরি হইয়াছে। তোমরা এইক্ষণে যাহ।

প। মো। দৈ। ছেলাম প্রণাম।

গু। আশীর্ব্বাদ। পৃষ্ঠা—৯৮-৯৯

প্রথম বাঙ্গালা অভিধান

মানোএল দা আসসুম্পশাওর দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম—Cat ecisms da Doutrina Christa (খৃষ্টধর্ম্মবিষয়ক প্রশ্নোত্তরী)। রোমান ক্যাথলিক খৃষ্টান ও ব্রাহ্মণের মধ্যে কথোপকথনচ্ছলে ইহা লিখিত। Francisco da Sylva কর্ত্তৃক ইহা লিসবনে ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। ইহা Da Antonio da Rozario নামক একজন ভূষণানিবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক রচিত এবং মানোএল কর্ত্তৃক পর্ত্তুগীজ ভাষায় অনূদিত। এ পুস্তক আমি কখনও দেখি নাই। হস্টেন সাহেব সংবাদ দিয়াছেন তিনি ইহা এভোরার সাধারণ পাঠাগারে দেখিয়াছেন।

মানোএল দা আসসুম্পশাওর তৃতীয় পুস্তকখানির নাম—*Vocabulario em idioma Bengala Portuguesa*।* এ পুস্তকখানিও আমি কখনও দেখি নাই। ভারতবর্ষে কোথাও আছে বলিয়া জানিও না। Grierson তাঁহার *Linguistic Survey*-তে (১ম খণ্ড, ১ম অংশ, পৃঃ ১৩) ইহার একটি অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রদত্ত পরিচয় অনুসারে গ্রন্থখানি তিনভাগে বিভক্ত—১ম ভাগ, ১ হইতে ৪০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, সংক্ষিপ্ত বঙ্গভাষার ব্যাকরণ; ২য় ভাগ ১৭ পৃষ্ঠা হইতে ৩০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত—ইহা বাঙ্গালা-পর্ত্তুগীজ অভিধান; তৃতীয় ভাগে (৩০৭ পৃঃ হইতে ৫৭৭ পৃঃ) পর্ত্তুগীজ-বাঙ্গালা অভিধান। স্বর্গত কেদারনাথ মজুমদার, (বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭, ১৯১৭) ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে (*Bengali Literature*, পৃঃ ৭৫, ১৯১৯; সা-প-প,১৩২৩, পৃঃ ১৮১-৮২) মহাশয় ইহার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। শুনিয়াছি, ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে এই গ্রন্থের পরিচয় দিবার মত অনেক শব্দাদি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। আসসুম্পশাওর এ গ্রন্থখানিরও বাঙ্গালার শব্দগুলি রোমান অক্ষরে লিখিত। ইহা এভোরার Archbishop Senhor D. F. Miguel da Tavoraর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে।

* গ্রন্থখানির আখ্যা-পত্র (title-page) এইরূপ—

"Vocabulurio em Idioma Bengalla e Partugues, dividido em duas Partes dedicado ao Excellent e Rever. Senhor D. F. Miguel de Tavora Arcebispo de Evora do Concelho de Sua Magestade Foy Delegencia do Padre Fr. Manoel da Assumpcam Religioso Eremita da Santo Agostinho da Congregacao da India Oriental. Lisboa: Na Offic. de Francisco da Sylva. Livreiro da Academia Real, e do Senado. Anno Decxi III. Com todas ao licenc, as necessarias."

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির

শ্রীকামিনী রায়

শেঠ মহাশয়, সমাগত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ এই পারিতোষিক-বিতরণ উৎসবে আপনারা যে আমাকে সভানেত্রী পদে বরণ করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিজকে সম্মানিত বোধ করিতেছি। আজ এখানে উপস্থিত হইয়া এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয় পাইয়া এবং বালিকাদের আবৃত্তি ও সঙ্গীতাদি শুনিয়া আমি বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম। আমার বাল্যকালে বালিকাশিক্ষার ব্যবস্থা অল্পই ছিল, শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের ব্যবস্থা ছিল না বলিলেই হয়। এখন চারিদিকে যাহা দেখিতেছি চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না। সভা বসিবার পূর্ব্বে এখানকার ছাত্রীনিবাস পরিদর্শন করিয়া আসিয়াছি। দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দলাভ হইল। আজ কলিকাতার বাহিরে আসিয়া যাহা দেখিলাম, ঠিক তাহা দেখিব কল্পনা করিয়া আসি নাই। আজ তাই আমার আনন্দ ও শুভকামনা জ্ঞাপন করিয়াই সভাভঙ্গ করিব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু 'প্রোগ্রামে' সভানেত্রীর অভিভাষণরূপ একটি কর্ত্তব্যের উল্লেখ আছে। এই অভিভাষণ রীতিটি রক্ষা করিতে গিয়া বালিকাদের তরুণকণ্ঠের মিষ্ট সঙ্গীতের পর আমার বার্দ্ধক্যনীরস কণ্ঠে আরও দুই একটি কথা বলিতে হইল।

কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব সভা

দুই বৎসর পূর্ব্বে আমি এখানে আসিবার জন্য প্রথম অনুরুদ্ধ হই। সেই সময়ে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম আমার

২রা মার্চ্চ চন্দননগর কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরে চতুর্থ বাৎসরিক উৎসব-সভায় সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায়ের অভিভাষণ।

সভানেত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় ও মন্দিরের শিক্ষয়িত্রীগণ

কাছে একটু বিশিষ্টতাসূচক মনে হইয়াছিল, সত্যই 'নারী-শিক্ষা-মন্দির' নামটির মধ্যে চিন্তা উদ্রেক করিবার জিনিষ আছে। শিক্ষা কি? বিদ্যা বলিলে চলিত না? নারী-শিক্ষা-মন্দির কি কেবল নারীজাতীয় শিক্ষার্থীর জন্য বলিয়া, অথবা যে শিক্ষা কেবল নারীরই প্রয়োজনীয়, পুরুষের নহে, সেই শিক্ষা এখানে দেওয়া হয় বলিয়া? সাধারণ শিক্ষা হইতে নারীশিক্ষার পার্থক্য কি?

শিক্ষা বলিলেই কোন কর্ম্মের জন্য নিপুণভাবে প্রস্তুত হওয়া, একটা প্রয়োজন সিদ্ধির আয়োজন, একটা লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া সাধন বুঝায়। মন্দির শব্দটির প্রাথমিক অর্থ সাধারণ গৃহ হইলেও আমরা সর্ব্বদাই উহার সহিত দেবপূজার কথা স্মরণ করি। ভক্তি, নিষ্ঠা ও পূতাচারের সহিত ইহার association বা স্মৃতিগত যোগ রহিয়াছে। যেখানে কেনা-বেচা সেখানে নিষ্ঠাভক্তি দাঁড়ায় না। যেখানে শিক্ষাদান আর দশটা ব্যবসার মত একটা ব্যবসা মাত্র, অর্থাৎ অর্থোপার্জ্জনের একটা উপায়স্বরূপ, সেখানে বিদ্যালয়কে মন্দির বলা সঙ্গত হয় না। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানটির নামের পূর্ব্বভাগে একটি বঙ্গ-মহিলার নাম সংযুক্ত আছে। মাতৃভক্ত পুত্র মাতার নাম স্মরণীয় করিবার জন্য এই মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার এই মাতৃপূজার ভিতর দিয়া নারী-সাধারণকে শিক্ষা দান করিয়া তাহাদিগকে ভবিষ্যতে যোগ্যা জননী করিয়া তুলিবেন, ইহাই বোধ হয় তাঁহার উদ্দেশ্য।

প্রকৃত শিক্ষা কেবল লিখিতে ও পড়িতে সমর্থ হওয়া নহে, কেবল স্মরণশক্তির চর্চ্চা নহে, কেবল বিষয়-বিশেষের জ্ঞানলাভও নহে। প্রকৃত শিক্ষা (culture) গঠনমূলক ও উহার প্রভাব অতিশয় ব্যাপক। মনন-

শক্তিসম্পন্ন জীবরূপে মানুষের স্বাভাবিক শক্তিসমূহের অনুশীলন, যথাযথ পরিচালন ও উৎকর্ষসাধন—এক কথায়

ছাত্রীদের যন্ত্র-সঙ্গীত

চিত্ত ও চরিত্রগঠনই শিক্ষা। আশা করি এই শিক্ষা-মন্দিরে এই সত্যটি স্বীকৃত ও অনুশীলিত হইতেছে।

এই দুর্ভাগ্য দেশে নারী বহুকাল নানারূপে নিগৃহীত হইয়া আসিতেছে। দেশাচার তাহাকে অবরোধে বদ্ধ রাখিয়া, অকালে পত্নীত্ব ও মাতৃত্বে দীক্ষিত করিয়া তাহার জ্ঞানচর্চ্চার পথে ঘোর প্রতিবন্ধক স্থাপন করিয়াছে। দেহের ও মনের সর্ব্বথা পরিপুষ্টি সাধন তাহার ঘটে নাই, জীবনের অনেক আনন্দ হইতে সে বহুকাল বঞ্চিত। ইহাতে দেশেরই ক্ষতি হইয়াছে। অন্যের জন্মগত অধিকার হইতে যে তাহাকে বঞ্চিত করে, সে নিজেই বঞ্চিত হয়। অজ্ঞ পত্নীর স্বামী, অজ্ঞ জননীর সন্তান নারীর অজ্ঞতার ফলে হীন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। সকল নারী যে নিজে পঙ্গু হইয়াও পঙ্গু সন্তানের জননী হয় নাই, আজিও যে বহু সুপত্নী ও সুমাতা আছেন, ইহা দেবতার বিশেষ কৃপা। প্রকৃতি সহজে পরাজয় স্বীকার করে না। নদীপ্রবাহ বাধা পাইলে হয় সেই বাধা উল্লঙ্ঘন করিয়া বর্দ্ধিত বেগে চলে, নতুবা বাঁকিয়া অন্য পথ খুঁজিয়া লয়; প্রস্তরের আবরণ ভেদ করিতে না পারিয়া বৃক্ষের অঙ্কুর একটু হেলিয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়; ছায়াজাত লতাটি আলোকের দিকে মুখ বাড়াইয়া চলে। অনেক প্রতিকূলতা জয় করিয়া বহু নারী কালে কালে আপনার জ্ঞানস্পৃহা ও ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে।

বর্ত্তমানে সুশিক্ষার উপায় বিধান করিয়া যাঁহারা নারীদের উন্নত জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইবার সুযোগ দিয়াছেন,

রেশমের কাজ
শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি*

তাঁহারা দেশের নারীসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র, এবং এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাদের অন্যতম।

* রবীন্দ্রনাথ, শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল, শ্রীকৃষ্ণ ও পুরীর মন্দিরের ছবি চারিখানি ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত বিভিন্ন প্রকার সূচী-শিল্পের নমুনা।

নারীশিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত এ বিষয়ে প্রশ্ন ও আলোচনা যথেষ্ট হইয়াছে, এখনও হইতেছে। এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন কেন উঠে না—পুরুষের শিক্ষা কিরূপ হওয়া উচিত? নারী যেমন কন্যা ও ভগিনী ও ভবিষ্যতে পত্নী ও জননী, সেইরূপ পুরুষও পুত্র ও ভ্রাতা এবং ভবিষ্যতে পতি ও পিতা হইবেন। শিক্ষার প্রথম সোপান বা প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষার শেষ লক্ষ্য—মনুষ্যত্বের বিকাশ, উভয়েরই এক। মধ্য সোপানগুলি পথের ভিন্নতা অনুসারে কিছু ভিন্ন হইবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার স্থানও এখানে আজ নহে। কেবল এইটুকু স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, যে, পত্নী, গৃহিণী ও মাতারূপে মাতাকে যেমন নিবিড় ও ঘনিষ্ঠরূপে গৃহের সহিত সংসৃষ্ট থাকিতে হয়, পুরুষকে সচরাচর সেরূপ হয় না। সন্তানের সঙ্গে মাতার যে সম্বন্ধ তাহা আর কোন সম্বন্ধের সঙ্গেই তুলনীয় নয়। এইজন্য ভবিষ্যৎ পত্নী ও মাতার শিক্ষা

জরি ও রেশমের কাজ
শ্রীকৃষ্ণ

আঁশের কাজ
শৃগাল ও দ্রাক্ষাফল

কেবল নীতি ও গৃহকর্ম্মের দিক দিয়াই নহে গৃহের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ বর্দ্ধনের দিক দিয়াও পুরুষের শিক্ষা হইতে কিছু ভিন্নতর হওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য জগতে এই পার্থক্য ক্রমশঃ দূর হইতেছে দেখিয়া আমাদের অনেক সময়ে আশঙ্কা হয়। কিন্তু সেখানেও সাধারণের শিক্ষা ও ব্যবহার যুক্তিযুক্ত পথেই চলিয়াছে। শিক্ষার গুণে নারী সেখানে বিজ্ঞানচর্চ্চায়, রাষ্ট্রীয় কর্ম্মে, সামাজিক দুর্গতি ও দুর্নীতি নিবারণে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। এদেশেও কালে তাহা হইবে। শিক্ষার লক্ষ্য মনুষ্যত্বের বিকাশসাধন—জ্ঞানের দ্বারা, সুরুচির দ্বারা, আত্ম-সংযম ও পুণ্যাচরণের দ্বারা সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলের প্রতিষ্ঠা ও পূজা। তাই পুরুষ ও নারীর শিক্ষার চরম লক্ষ্য এক ও অভিন্ন।

কল্যাণীয়া বালিকারা সম্মুখে এই আদর্শ রাখিয়া জীবনপথে অগ্রসর হও। জীবন ঋণে ভরা। সেই ঋণ জীবন ভরিয়া শোধ কর। শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ

স্নেহ, চিন্তা ও পরিশ্রমের সঙ্গে যে শিক্ষা দিতেছেন, সেই শিক্ষার ভিতর দিয়া যতটা জ্ঞান আনন্দ ও কল্যাণ লাভ করিতেছ ততটা ত দিবেই, তাহার সুদ এবং [illegible] সুদ দিয়া যাইবে। একগুণ সৌভাগ্য লাভ
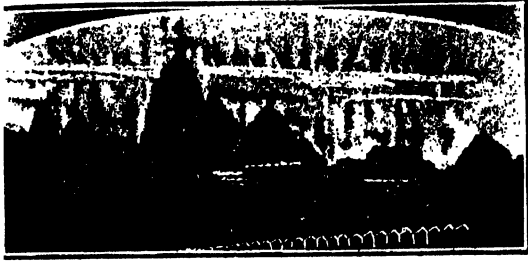
সাটিন ও সূতার কাজ
পুরীর মন্দির

করিয়া, আশেপাশে ও দূরে, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য দশগুণ সৌভাগ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যাও। একটি বীজ তরুরূপে বিকাশ পাইয়া শতসহস্র বীজ রাখিয়া যায় তাহা দেখিতেছ। তোমরাও তাহাই করিবে। পাঠের দ্বারা এখন ঋষিঋণ অর্থাৎ শিক্ষকঋণ শোধ কর। তোমাদের গৃহ ও পরিবার সদাচারে পবিত্র কর, গীত-বাদ্য ও অন্যান্য ললিতকলায় আনন্দময় ও সৌন্দর্য্যময় করিয়া তোল। স্বাস্থ্যের নিয়ম শিক্ষা করিয়া নিজের ও প্রতিবেশীর গৃহ নীরোগ রাখ। সৎকার্য্যে দান করিতে শিখিয়া সর্ব্বপ্রকার ক্ষুদ্রতা ও কার্পণ্য হইতে হৃদয় মুক্ত রাখ। যেখানে তোমরা গিয়া দাঁড়াইবে লোকে যেন বলিতে পারে—এরা শিক্ষিতা কি না, তাই এমন সুন্দর ব্যবহার, সাজসজ্জায় এমন স্বাধীনতা, চরিত্রে এমন বিনয় ও মাধুর্য্য, এমন সহানুভূতি এমন সেবাপরায়ণতা। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেম, প্রেমের সঙ্গে কর্ম্ম, কর্ম্মের সঙ্গে উদারতা ও নিরহঙ্কারতা আসুক। এই কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দিরের নাম ও প্রতিষ্ঠা সার্থক হইবে। আমি সেই প্রার্থনাই করি।

বাংলা

জার্ম্মানী প্রবাসী কৃতী বাঙ্গালী ছাত্র—

শ্রীদেবকুমার চৌধুরী ডিপ্ল-ইওজ্ ৺স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র। স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় বেঙ্গল টেক্নিক্যাল কলেজের প্রেসিডেন্ট থাকার সময় ইউরোপীয় কলকারখানার বিষয় বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিবার জন্য জার্ম্মাণী গমন করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, উক্ত বিষয়ের যে সব উন্নতি দ্বারা জার্ম্মাণী বিগত মহাসমরে বিধ্বস্ত হইয়াও পুনরায় মাথা তুলিয়া জগতের অন্যান্য জাতির সহিত পূর্ব্বের মত প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহা আমাদের দেশে কিরূপে প্রয়োগ করা যায় তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করা। তিনি এ বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় সে আশা ফলবতী হয় নাই। তবে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীদেবকুমারকে এই উদ্দেশ্যে জার্ম্মাণী রাখিয়া আসেন। দেবকুমার তথায় সাত বৎসরাধিক কাল যাপন করিয়াছেন এবং ভারতীয়দের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম তিনিই বার্লিনের টেক্নিশে হক্‌শুলে হইতে খনিজবিদ্যায় ডিপ্লোমা পরীক্ষা পাশ করিয়াছেন। জার্ম্মাণীতে এই ডিপ্লোমা পরীক্ষা খুব কঠিন বলিয়া গণ্য এবং যাঁহারা ইহাতে উত্তীর্ণ হন তাঁহারা বিশেষ সম্মানের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিবার জন্য তিনি আপার সাইলেশিয়ার কয়লার খনিতে, হার্টসে সীসা, রূপা ও দস্তা প্রভৃতি ধাতু দ্রব্যের খনিতে এবং অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত আইজেনের্যার্টস্ নামক স্থানে সার্ভেয়িং ইত্যাদির কাজ করিয়াছেন। ষ্টাপফুর্টএর ব্রাউন খনি জার্ম্মাণীর প্রসিদ্ধ কয়লার খনি; তথায় তিনি ডিপ্লোমার জন্য চার বৎসর অধ্যয়ন ও এক বৎসর হাতেকলমে কাজ করেন। এই কৃতী বাঙ্গালী যুবক দেশে ফিরিয়া আসিয়া দেশের বৈজ্ঞানিক উন্নতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিবেন আমরা ইহা আশা করি।

মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনী—

মহিলাদের হাতের কাজের প্রদর্শনীর দ্বারা নারীশিক্ষা-সমিতি বঙ্গে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন। এ পর্য্যন্ত চারি বৎসরে চারিবার এই প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রতিবারে প্রায় ১০০০ ভদ্রলোক ও মহিলা ইহা দেখিতে আসিয়াছিলেন। ইহাতে চরকার কাটা সূতা, সূতী ও রেশমী কাপড়, দরজির কাজ, কার্পেট বয়ন, সাদা ও শোভন ছুঁচের কাজ, পুঁতির কাজ, মাটির জিনিষ গড়ন, নারিকেলের মিঠাই, খেলনা, চিত্র; বাগানের জিনিষ এবং চাটনী ও আচার প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রদর্শিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যসমূহের জন্য কয়েকটি পদক ও সার্টিফিকেট পুরস্কার দেওয়া হয়। এবার পুরস্কার বিতরণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত রণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী।

নারীশিক্ষা-সমিতি এইরূপ প্রদর্শনী দ্বারা বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন, যে, দুঃস্থা মহিলারা কি কি শিল্পের দ্বারা কিছু উপার্জ্জন করিতে পারেন। সমিতির শিল্পবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পঁচাত্তরটি ছাত্রীকে সুতা কাটা, কাপড় বোনা, দরজির কাজ, ছুচের কাজ, কাপড় ও সুতা রঙান, ছাপ দিয়া ছিটের কাপড় তৈরী করা, নানা রকম ফলের আচার ও মোরব্বা, কৃত্রিম পুষ্প রচন, গহনা গড়া ও কার্পেট বোনা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। ছাত্রীরা শিক্ষা পাইয়া যখন নিজেদের বাড়ী ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহাদের কিছু মূলধন এবং তাঁহাদের তৈরী জিনিষ বিক্রীর বন্দোবস্ত দরকার হইবে। তাহার জন্য একটি সমবায় সমিতি স্থাপিত ও রেজিষ্টরী করা হইয়াছে।

প্রদর্শনী হইতে মহিলারা জানিতে পারেন, এদেশের মহিলারা কিরূপ সুন্দর কাজ এখনও করিতে পারেন। যাঁহাদের উপার্জ্জনের দরকার তাঁহারা ইহার দ্বারা উপার্জ্জন করিতে পারেন। যাঁহাদের সেরূপ

শ্রীমতী সুলাজিনী দেবী

দরকার নাই, তাঁহারা আপনাদের অবসর সময় এইরূপ কাজ করিয়া আনন্দে কাটাইতে পারেন ও নিজ নিজ গৃহ সুশোভিত করিতে পারেন। আমাদের পুরস্ত্রীদের জীবন অনেকটা একঘেয়ে। নারীশিক্ষা-সমিতি এই প্রদর্শনী ও তাহার সঙ্গে নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করিয়া নারী-জীবনে কিছু বৈচিত্র্য আনিয়াছেন, ইহাও কম লাভ নহে। শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা ইহার জন্য সর্ব্বসাধারণের কৃতজ্ঞতার পাত্র।

আগামী প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন—

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত লালগোপাল মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, আগ্রাপ্রবাসী বাঙ্গালীরা "প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মিলন"কে আগামী বাৎসরিক অধিবেশনের

সত্যাগ্রহে বাঙ্গালী মহিলা—বাঁকড়া জেলার বেতুড় গ্রামের এই কয়েকজন মহিলা সত্যাগ্রহ করিয়াছেন

জন্য আগ্রায় নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসে আগ্রায় ঐ অধিবেশন হইবে। সম্মিলনের সভাপতি সকল বঙ্গবাসী ও প্রবাসী বঙ্গবাসীকে সম্মিলনে যোগদান করিতে সাদরে আহ্বান করিতেছেন। ১৯৩১ সালের অধিবেশন আজমীরে হইবে।

রংপুরে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনী—

গত ২৩শে মার্চ্চ রবিবার রংপুর ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রাঙ্গণে শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই উপলক্ষে জিলাবোর্ড অর্থ ব্যয় করিতে কোন কার্পণ্য করেন নাই। কিন্তু এরূপ ভাবে সহরের উপর বৎসরে একবার শিশুমঙ্গল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া কয়েকটি শিশুকে পারিতোষিক দিলে অথবা স্বাস্থ্যসম্পর্কে কতিপয় বক্তৃতার ব্যবস্থা করিলে বিশেষ কোন লাভ হয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না। শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। বিশেষজ্ঞগণ নির্দ্দেশ করেন যে, অত্যধিক শিশু ও প্রসূতির মৃত্যুর মূলে শিক্ষিতা ধাত্রীর অভাবই বিশেষরূপে অনুভূত হয়। অবশ্য ইহার সহিত অপরাপর কারণও যে জড়িত আছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু শিশু ও প্রসূতিপরিচর্য্যা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান থাকিলে মৃত্যু যে কম হইবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সম্মেলন—

আগামী ইষ্টারের ছুটীতে এবার বরিশালে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক-সম্মেলনের দশম অধিবেশন হইবে। ঐ সঙ্গে এখানে শিক্ষক, শিল্প ও স্বাস্থ্য-বিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছে। প্রদর্শিত দ্রব্যের গুণানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক এবং প্রশংসাপত্র প্রভৃতি প্রদত্ত হইবে। সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন এই, তাহারা যেন দেশের শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতিকল্পে প্রদর্শনযোগ্য সূচের কাজ, বেত, বাঁশ ও কাঠ দ্বারা প্রস্তুত নানা প্রকার ব্যবহার্য্য জিনিষ, হাতে কাটা সূতা, তাঁতে বোনা কাপড়, খদ্দর, মাটির তৈরী পুতুল, খেলনা প্রভৃতি, দা, ছুরি কাঁচি ইত্যাদি, হাতে আঁকা ছবি, এবং অন্যান্য নানা প্রকার শিল্প এই প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়া উহার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। মেয়েদের প্রস্তুত জিনিষপত্র প্রদর্শন জন্য একটি মহিলা বিভাগ থাকিবে। শিক্ষক ও ছাত্রগণের প্রতি বিশেষ নিবেদন তাঁহারা যেন নিজ নিজ কলা-কৌশলের পরিচায়ক এবং শিক্ষাপ্রদ দ্রব্যাদি দ্বারা আমাদের এই আয়োজন সাফল্য মণ্ডিত করেন। ছাত্রদিগের কলা-কৌশল প্রদর্শনের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ থাকিবে। দেখা যায় আমাদের ছাত্রদিগের মধ্যে স্বাভাবিক কলাকুশলতার অভাব নাই। আশা করি শিক্ষকগণ উৎসাহ ও প্রেরণা দ্বারা নিজ নিজ ছাত্রগণের মধ্য হইতে নানা প্রকার প্রদর্শনযোগ্য দ্রব্য প্রস্তুত করাইয়া লইবেন।

তরুণ আন্জোমান সমিতি—

কয়েকজন মুসলমান যুবকের বিশেষ চেষ্টায় বরিশাল কসাই মসজিদের বারান্দায় তরুণ আন্জোমান সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। বিগত ছয় মাস যাবৎ এই সমিতির সভ্যগণ অনাথ, নিরাশ্রয় মুসলমান রোগীদের সেবাশুশ্রূষা চিকিৎসা প্রভৃতিতে সাহায্য প্রদান করিয়া মুসলমানসমাজের বিশেষ ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন। ইহাদের চেষ্টায় মসজিদের বারান্দায় একটি সংবাদপত্র পাঠাগার স্থাপিত হইয়াছে। মুসলমান যুবকগণের জন্য সেখানে প্রত্যহ অপরাহ্নে দৈনিক সাপ্তাহিক, মাসিক সংবাদপত্র-পাঠের ব্যবস্থা আছে। ইঁহাদের পঁচিশ জন যুবক কর্ম্মী আছেন, তাঁহারাই প্রায় সমুদয় কার্য্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। সাম্প্রদায়িক কলহে যোগদান না করিয়া ইঁহারা যদি সমাজের হিতের জন্য এইরূপ আত্মনিয়োগ করেন, তাহা হইলেই দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইবে।

(বরিশাল)

ভারতবর্ষে আইন অমান্য আন্দোলন—মহাত্মা গান্ধীর অভিযানের চিত্র

শ্রীযুক্ত কনুদেশাই কর্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

সর্দ্দার বল্লভ ভাই পাটেল গ্রেপ্তার হইবার পর মহাত্মা গান্ধী সবরমতীর তীরে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা করিতেছেন
মহাত্মাজীর সম্মুখে শ্রীযুক্ত তায়েবজী ও পশ্চাতে শ্রীযুক্ত মহাদেব দেশাই উপবিষ্ট

খেড়া জেলার গ্রামবাসিগণ মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য ও তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সমবেত হইয়াছে

নর্ম্মদা পার হওয়া

মহাত্মা গান্ধী বিশ্রাম করিতে যাইতেছেন
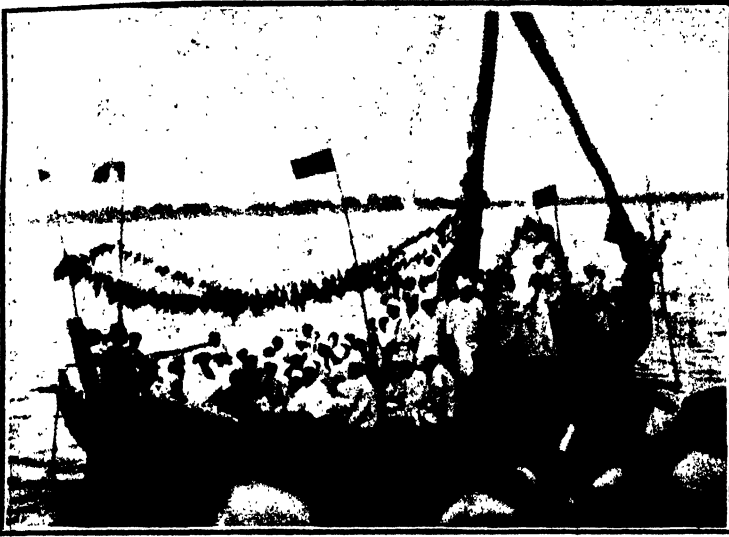
দরবার গোপাল দাস

ইনি কাঠিয়াবাড়ের একজন করদ নৃপতি—লবণ আইন অমান্য করা অপরাধে ইঁহার দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও পাঁচশত টাকা জরিমানা হইয়াছে

হাঁটতে আঘাত পাইবার পর মহাত্মা গান্ধী দুইজন সঙ্গীর কাঁধে ভর দিয়া চলিয়াছেন

মহাত্মাজী এক অস্পৃশ্যা রমণীর দত্ত মালা গ্রহণ করিতেছেন
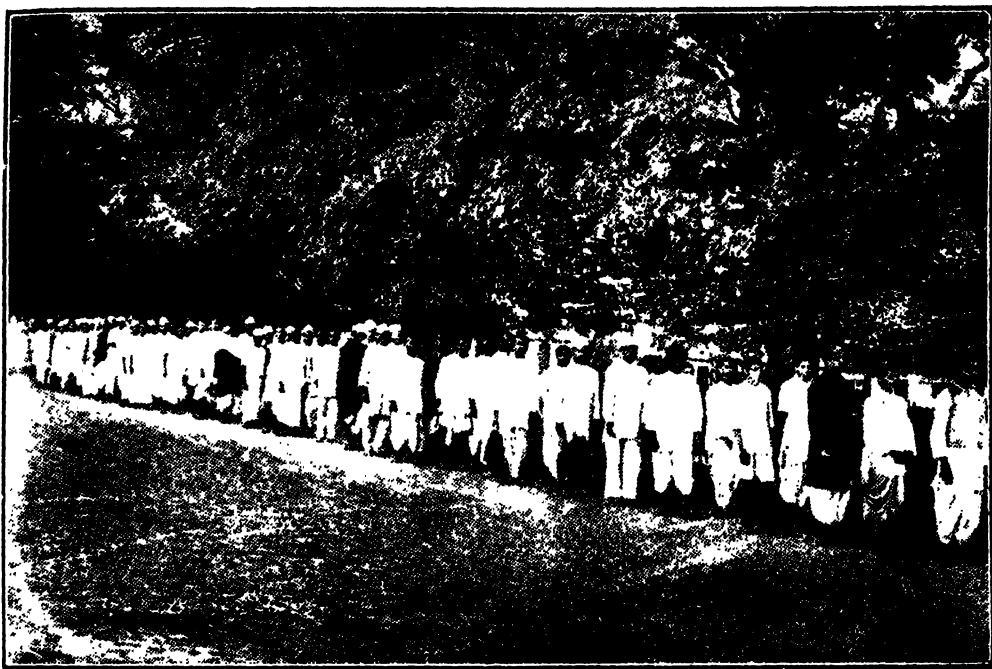
উনাশীজন সত্যাগ্রহী সহ মহাত্মা গান্ধীর লবণ আইন ভঙ্গ করিতে যাত্রা।
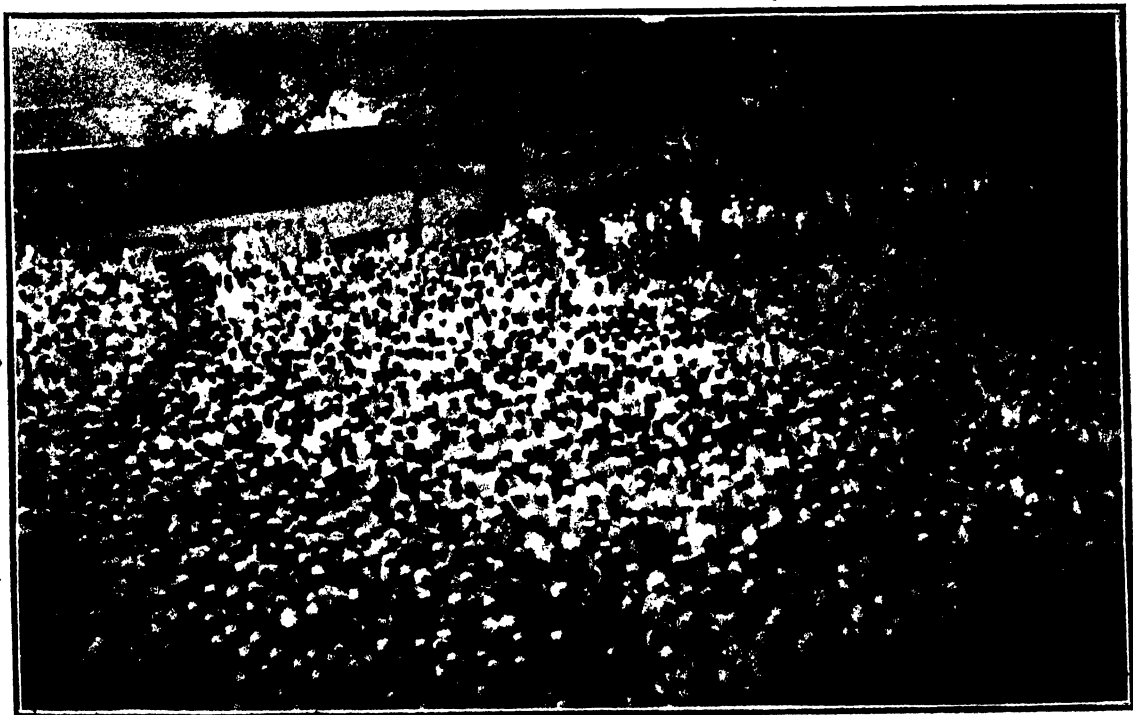
মহাত্মাজীকে দেখিবার জন্য নাডিয়াদে বিরাট জনতা

যানের বিবর্ত্তন—

রেল, জাহাজ, মোটরকারে তাড়াতাড়ি চলাফেরা অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের এতটা গা-সহা হইয়া গিয়াছে যে, আমরা আজ আর এই
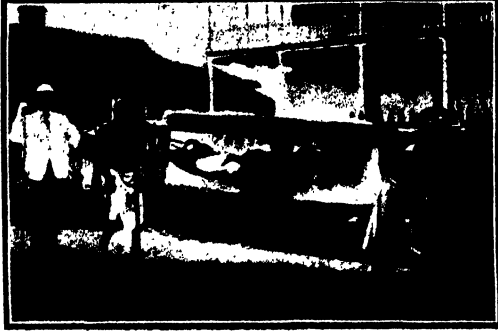
পশ্চিম আফ্রিকার পাল্কী, অনেকটা আমাদের দেশের পার্ব্বত্য জায়গার ডাণ্ডীর মত।

"পাফিং বিলি"—জর্জ্জ ষ্টিফেনসনের প্রথম ইঞ্জিন।

১৮৬২ সনে নির্ম্মিত একটি বাষ্পচালিত গাড়ী। ইহাকে রেলগাড়ী ও মোটরের মাঝামাঝি একটা জিনিষ বলা যাইতে পারে

উনবিংশ শতাব্দীর "ষ্টেজ-কোচ" বা ঘোড়ার গাড়ী
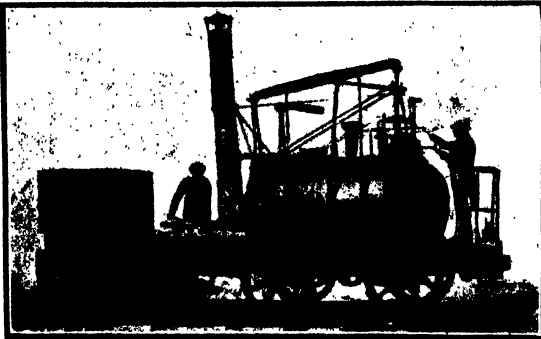
আবিষ্কারগুলি কত যে আধুনিক তাহা উপলব্ধি করিতে পারি না। রেলগাড়ীই প্রথম যন্ত্র চালিত যান। উহার পূর্ব্বে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া পশুচালিত যানই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। রেলগাড়ী প্রচলনের পর একশত বৎসর হইতে চলিল।
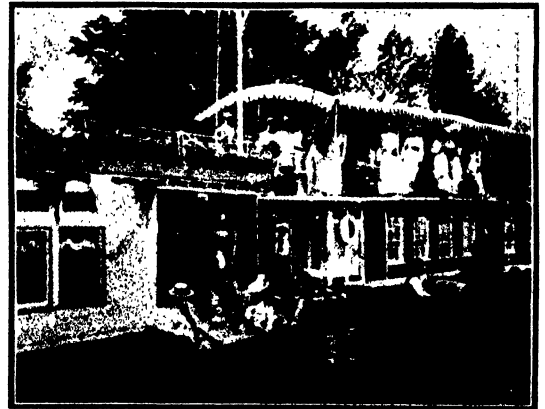
ভিক্টোরীয় যুগের "হাউস্ বোট"। এইরূপ নৌকায় করিয়া তখনকার দিনের সৌখীন লোকেরা টেম্স্ নদীতে আমোদ করিতে যাইতেন।

এই একশত বৎসরের মধ্যেও পেট্রোল চালিত ইঞ্জিনের আবিষ্কার হওয়াতে মোটরগাড়ী ও এরোপ্লেন নির্ম্মাণ সম্ভব হইয়াছে এবং মানুষের
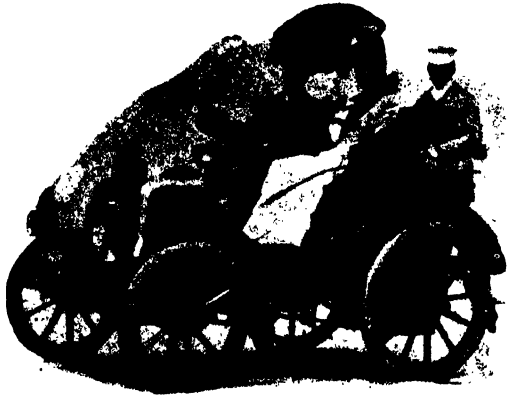
মোটরকারের প্রথম রূপ। তখনকার দিনে মোটরকারগুলিকে অনেকটা ফিটন বা ল্যাণ্ডো গাড়ীর মত করিয়া নির্ম্মাণ করা হইত।

চলাফেরার উপায়ে একটা যুগান্তর আসিয়া গিয়াছে। সঙ্গের চিত্রগুলিতে এই যান বিবর্ত্তনের ইতিহাস বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

—

জাপানের প্রাচীন ও আধুনিক নৃত্য—

পূজাপার্ব্বণে ও আমোদ উৎসবে নৃত্য জাপানের সাধারণ লোকের মধ্যে বরাবরই প্রচলিত ছিল। সাধারণ গ্রামবাসীদের পক্ষে জীবন-যাত্রার কাজকর্ম্ম সারিয়া দূর সহরে গিয়া অভিনয় দেখিবার সুযোগ ঘটিত না। তাই তাহারা নানা পূজাপার্ব্বণ ও উৎসব উপলক্ষে গ্রামে নানাপ্রকার নৃত্যে যোগ দিয়াই আমোদের জোগাড় করিয়া লইত। এই সকল প্রাচীন নৃত্যের মধ্যে 'কাগুরা' নৃত্যই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। উৎসবের দিনে গ্রামের দেবতার মন্দিরের সম্মুখে গ্রামবাসীরা একত্র

নর্ত্তকী ইশি-ই কোনামি চীনের পুতুল নামক নাটকের একটি ভূমিকায়

হইয়া নৃত্য করিত। এই নাচ ভক্তিমূলক ও ইহার জন্য কোনও পেশাদার লোক ছিল না। কিন্তু জাপানের পাড়াগাঁয়েও সিন্তো ধর্ম্মের প্রভাব ক্ষীণ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 'কাগুরা' নাচের প্রসার কমিয়া যাইতেছে। বর্ত্তমানে কয়েকজন শিক্ষিত লোক আবার চেষ্টা করিয়া এই সকল নাচের পুনঃপ্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন।
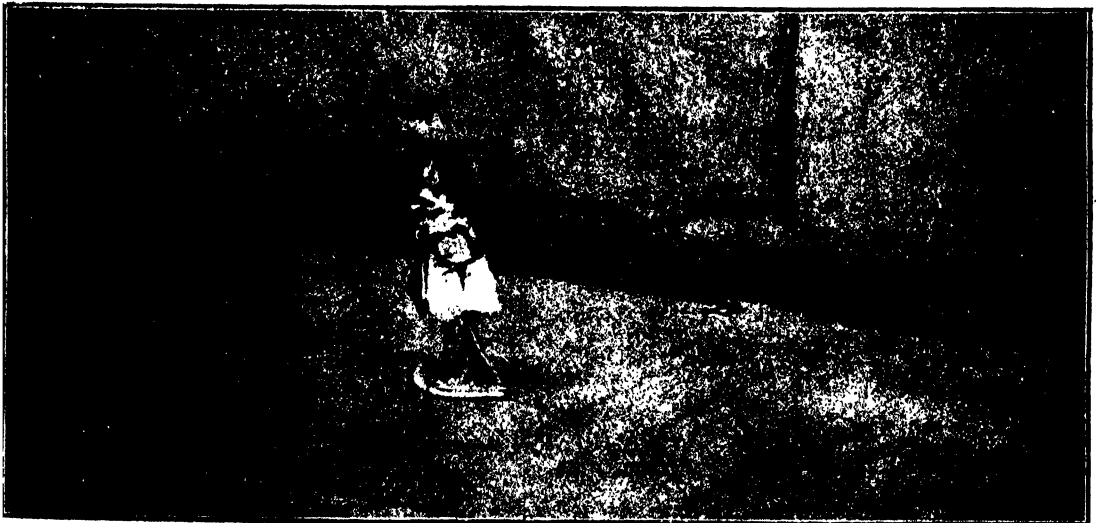
আধুনিক জাপানের বালিকা-নর্ত্তকী ফুজিমা শিজু—"ওনাৎসু ও শেইজুরো" নামক নাটকের একটি ভূমিকায়

জাপানের বিখ্যাত নর্ত্তক—ওনোয়ে কিকুগরো

বর্ত্তমান যুগে জাপানে নৃত্যকলার যে পুনরভ্যুদয় হইতেছে, তাহা পাশ্চাত্যের প্রভাবে। জাপানের নগরবাসীরা বহুকাল ধরিয়া নৃত্য ছাড়িয়া দিয়াছিল। যুদ্ধের পরে আমেরিকা হইতে অনেক পেশাদার নর্ত্তক ও নর্ত্তকী জাপানে আসে। ইহাদের নাচ দেখিয়া জাপানের ভদ্রসমাজ আবার নৃত্যের জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে। নৃত্যের এই পুনরভ্যুদয়ে আনা পাভ্‌লোভা, রুথ সেণ্ট ডেনিস্, লা আর্জ্জেণ্টিনা প্রভৃতির নৃত্যের খুব বেশী প্রভাব দেখা যায়।

জাপানে য়ুরোপীয় নৃত্যের প্রভাবের মত য়ুরোপীয় সঙ্গীতের প্রভাবও অত্যন্ত বেশী। অনেকে নূতনত্বের ঝোঁকে জাপানে বিশুদ্ধ ও প্রাচীন য়ুরোপীয় সঙ্গীত প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু এই চেষ্টা বিশেষ সফল হইতেছে না। ইহা দেখিয়া জাপানের সঙ্গীতও নৃত্যের প্রকৃত কল্যাণকামী অনেকেই বলিতেছেন যে, বিদেশী সঙ্গীত জাপানী প্রকৃতির সহিত খাপ খাইবে না। সেদেশের প্রাচীন সঙ্গীতকেই একটু ভাঙিয়া চুরিয়া বর্ত্তমান কালের উপযোগী করিয়া লইতে হইবে। জাপানের নৃত্যেও এই চেষ্টাই চলিতেছে। জাপানী ও য়ুরোপীয় আদর্শের সমন্বয় করিয়া একটা সুন্দর, শোভন, অথচ জাতির প্রকৃতিসুলভ কলাবিদ্যা সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে।

সাদো দ্বীপের ওকেসা নৃত্য। ইহা সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত কাগুরা নৃত্যের মত একটি নৃত্য।

নীড়রাজি—শ্রীসোভাগমল গেহ্‌লোট

ভারতীয় চিত্রকলা ও বঙ্গীয় পন্থা

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

আমাদের বাল্যকালে এদেশে চিত্রকলার তথা অন্য ললিত-কলার আদর্শ ছিল গ্রীক ক্লাসিক পন্থা (school) বা তাহার ইটালীয় রেনেসান্স সংস্করণ। ইহার বাহিরে যে ললিতকলার ক্ষেত্রে রূপ রস সম্বন্ধীয় অন্য কিছু থাকিতে পারে, তাহা এদেশে তখন কেহই বিশ্বাস করিতেন না—এবং এখনও অনেকে করেন না। বিদেশে অবশ্য এই ভ্রম বহু পূর্ব্বেই দূর হইয়াছিল। তবে তখন এবং এখনকার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাঁহারা এককালে ভারতীয় চিত্রকলার নামেই মহা উৎসাহে নানা প্রকার ব্যঙ্গোক্তি করিয়া বাহবা লইতেন, তাঁহারা এখন অনেকটা নিরুৎসাহ হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ এদেশের শিক্ষিতসমাজে দেশীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে অল্পবিস্তর চর্চ্চার ফলে ঐরূপ ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে অজ্ঞতার অংশ কতটা তাহা লোকে এখন স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারিতেছে।

এই শিল্পচর্চ্চার মূলে এদেশে রূপরসজ্ঞানের বৃদ্ধি বা জাগরণ কতটা এবং বৈদেশিকের অজন্টা, বাঘ, ইত্যাদির সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রভাবই বা কতটা আছে, তাহা বলা কঠিন। তবে ইহা সত্য যে, এখন ক্রমে শিল্পী ও সমালোচক উভয়েই সংযত হইতেছেন। সুতরাং তাঁহাদের মতের বৈষম্যও লাঘব হওয়ায় জনসাধারণ নিশ্চিন্ত মনে মূল ব্যাপারটা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে।

এদেশে ললিতকলার পুনরভ্যুদয়ের প্রথম যুগে রবিবর্ম্মা ও বোম্বাই কলাবিদ্যালয়ের ছাত্রগণের চিত্রাবলীই এদেশে খুব আদৃত হইয়াছিল। তাহার পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ বিদেশী, উপকরণ দেশী, এবং পরিকল্পনা কতক দেশী কতক বিলাতী। রবিবর্ম্মার পৌরাণিক ভিন্ন অন্য ছবিগুলির প্রায় সবই অজন্টার পরিকল্পনার ক্ষীণ অনুকরণ।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে ভারতীয় চিত্রকলায় বঙ্গীয় প্রথার অনুশীলন হয়। সেই সময় যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাঁহাদের বক্তব্যের মধ্যে প্রধান যুক্তি ছিল যে, এই প্রথায় পাশ্চাত্য ললিতকলার নিয়ম ও রীতির ইচ্ছাকৃত বিকৃতি এবং কতকগুলি গতানুগতিক

মা ও ছেলে—শ্রীসত্যরঞ্জন কর

পরিকল্পনার "ঢালা ও সাজা" ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইহা সত্য যে কিছুকাল পর্য্যন্ত এদেশের চিত্রশিল্পিগণ এরূপ সমালোচনার যথেষ্ট সুযোগ দিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পরিকল্পনায় এবং চিত্রের উপাদান ও সজ্জায় গতানুগতিক ভাবের বড়ই প্রচলন হইতেছিল।

সুখের বিষয়, অল্পদিনের মধ্যেই এদেশের কয়েকজন শিল্পী নূতন নূতন পথ প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন, যাহার ফলে ভারতীয় চিত্রকলার ঐ অকালবার্দ্ধক্যজনিত স্থাণু ভাব দূর হয় এবং এদেশীয় ললিতকলা পুনর্ব্বার সবল ও সজীব হইয়া উঠে। এই পথপ্রদর্শকগণ যে নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছেন বা সম্পূর্ণ মৌলিক কোন প্রথার অনুশীলন করিয়াছেন তাহা নহে। বিভিন্ন পদ্ধতির সহিত এদেশীয় ভাব ও প্রথার আশ্চর্য্য সমন্বয় এবং তদনুযায়ী সতেজ পরিকল্পনা ও লেখন—ইহাই ইঁহাদের বিশেষত্ব।

এই নূতনত্ব ও জীবন্তভাবের—ললিতকলার ক্ষেত্রে এই দুই শব্দের একই অর্থ—প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর নাম করিতে হয়। ইঁহাদের দৃষ্টান্তে এদেশের বহু নবীন শিল্পী এখন ভরসা করিয়া নূতনত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইতেছেন, এবং তাহাতে যে কিছু সাফল্যলাভও করিতেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ গতবারের কলাশিল্প প্রদর্শনী দুইটির কথা বলা যায়। এই দুইটি প্রদর্শনীতেই এবার অনেকগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য চিত্র আসিয়াছিল।

ওরিয়েণ্টাল সোসাইটির প্রদর্শনীতে শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ

মা ও ছেলে—শ্রীসুধাংশু রায়
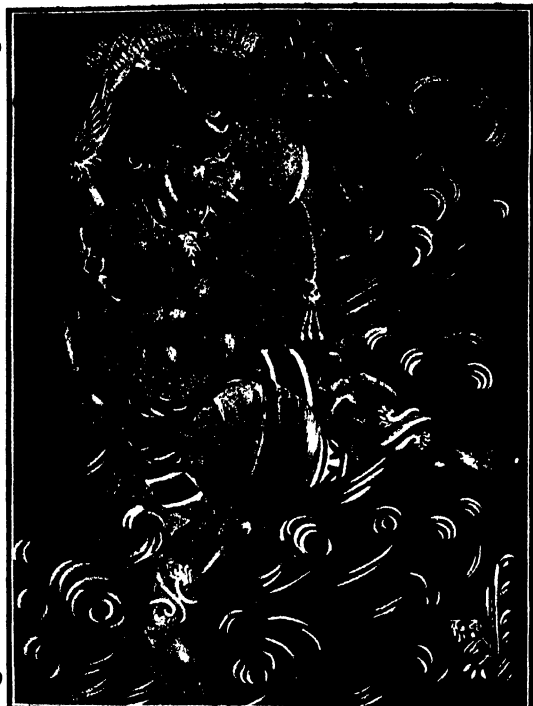
বীর হনুমান—শ্রীরেণু রায়

সন্ন্যাসিনী—শ্রীসুনয়নী দেবী
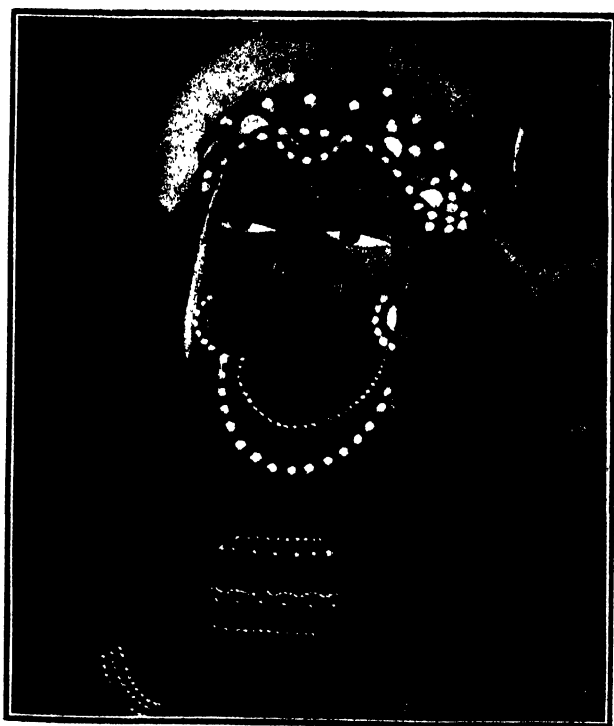
ঠাকুরের 'ইম্প্রেশ্যনিষ্ট'-জাতীয় ছবিগুলিতে আলো ও ছায়ার সামঞ্জস্য ও বৈপরত্যের খেলা, এবং সবল ও প্রশস্ত তুলিকাপাত সত্যসত্যই বিস্ময়জনক। 'জীবন ও মৃত্যু' এবং 'কহ মৃত্যু কানে কানে কথা', এই পদ্ধতির দুই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অভিনন্দন লিপি
শ্রীঅসিতকুমার হালদার

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর "শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর টোল" তাঁহারই নিজস্ব রেখাপাতে অলঙ্কৃত। কিন্তু ইহাতে এবং তাঁহার পরিকল্পনার সাধারণ ছাঁচে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে। পরিকল্পনার মধ্যে মনুষ্যমূর্ত্তির অতিসংযত প্রয়োগ তাঁহার প্রধান প্রধান চিত্রের বৈশিষ্ট্য। এক্ষেত্রে অল্প চিত্রপরিসরের মধ্যে সম্মুখে চারিটি ও দূর পশ্চাতে দুইটি মূর্ত্তি আছে। কেবল মাত্র চিত্রকরের দৃঢ় রেখাপা[ত] ইহার আলঙ্কারিক ভাব বজায় রাখিয়াছে। শিল্পে বা[স্তব] ও আলঙ্কারিক ভাবের মিশ্রণের ইহা একটি নূতন পথ।

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদা[রের] অঙ্কিত অভিনন্দন-লিপি বি[ভিন্ন] পদ্ধতির সামঞ্জস্যপূর্ণ মিশ্রণে[র] দৃষ্টান্ত। পারসীক, অজন্টা, দক্ষি[ণ] ভারতীয়, মঙ্গোলীয় এই সক[ল] পদ্ধতিরই প্রভাব ইহাতে লক্ষি[ত] হয়।

শ্রীযুক্ত চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ে[র] "ইন্দ্রের সহিত দানবগণের যুদ্ধ" mas[s] treatment-এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের প্রচলিত পদ্ধতিতে এইরূপ পরিকল্পনার নিদর্শন অ[তি] অল্প। পদ্ধতিহিসাবে ইহা অজন্টা [ও] তিব্বতীয় রীতির মিশ্রণ। ইহা[র] অৰ্দ্ধনারীশ্বর চিত্রে তিব্বতীয় প্রথা[র] প্রভাব সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।

শ্রীযুক্তা সুনয়নী দেবীর চি[ত্রে] প্রাচীন বঙ্গের শিল্প-প্রতিভার আভা[স] পাওয়া যায়। তাঁহার "শিব" [ও] গবর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে প্রদর্শি[ত] "লক্ষ্মী" আমাদিগকে অনেকদি[ন] আগেকার কথা মনে করাইয়া দেয়। "শিব" চিত্রে বৈরাগ্য ও যোগব[ল] যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্র মজুমদারের "হরপার্ব্বতী" তাঁহার ও এই চিত্রাঙ্কন পন্থার প্রথম যুগের মৌলিকত্ব বজায় রাখিয়াছে।

অন্যান্য চিত্রের মধ্যে শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চৌধুরী[র] "ফেরিওয়ালা যাত্রী" উল্লেখযোগ্য। ইহার উদ্ভা[বিত] পরিকল্পনা সুবিন্যস্ত রেখাপাতের সৌন্দর্য্যে ভূষি[ত] হইয়াছে। নন্দলাল বাবুর নিকট এই চিত্রশিল্পীর শিক্ষা সার্থক হইবে আশা করা যায়।

"মা ও শিশু" এই সাধারণ বিষয়ের দুইটি নবীন শিল্পীর অঙ্কিত দুইটি ছবি, একই বিষয়ের বিভিন্ন শিক্ষা-রীতি ও দেশাচারের প্রভাবে কতটা পার্থক্য হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রীযুক্ত মেড়-এর ছবিতে তাঁহার বাঙ্গালী গুরুর প্রভাব রহিয়াছে, কিন্তু উপাদান পশ্চিমদেশীয়।

শিব
শ্রীসুনয়নী দেবী

শ্রীযুক্ত সুধাংশু রায়ের শিক্ষা ও উপাদান দুই-ই বঙ্গীয়। আর একটি তরুণ শিল্পীর এই বিষয়ক চিত্র আমরা বঙ্গীয় পদ্ধতির দৃষ্টান্ত রূপে এখানে দিলাম।

"বুদ্ধদেব ও পূজারিণী" পদ্ধতি ও উপাদান হিসাবে এ দেশীয়, কিন্তু রচনা পাশ্চাত্য প্রথানুযায়ী।

গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুল প্রদর্শনীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র নন্দলাল বসুর "মহাপ্রস্থান"। এই চিত্রে নন্দলালের দৃঢ় রেখাপাতের শক্তি, এবং পরিকল্পনায় কঠোর সংযমের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। ইহা এই বৎসরের শ্রেষ্ঠ চিত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ইহার বিষয় মহাভারতে বর্ণিত পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদীর মহাপ্রস্থান। ইহাতে প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুসারে

ফেরিওয়ালা যাত্রী—শ্রীনিশিকান্ত চৌধুরী

একই চিত্রে মহাপ্রস্থানের বিভিন্ন অঙ্কের চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু রেখার যোজনা এতই সমীচীন ও চিত্রের আলেখ্য এতই বাহুল্য-বর্জ্জিত যে, যুধিষ্ঠিরের ধ্যান, দ্বিতীয় অঙ্কে দ্রৌপদীর পতন, এবং শেষে যুধিষ্ঠির ও সারমেয়রূপী ধর্ম্মরাজ এ সমস্তই একটি সংযুক্ত ও সুবিন্যস্ত চিত্রে পরিণত হইয়াছে।

কয়েক খণ্ড কাগজ, কিঞ্চিৎ চৈনিক মসী এবং অতি সংক্ষিপ্ত, সংযত তুলির টান, ইহার দ্বারা নির্ব্বিকারচিত্ত

সাঁওতালী নৃত্য—শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

যুধিষ্ঠিরের ধ্যান, অন্য ভ্রাতৃগণের মানসিক অবসাদ ও নৈরাশ্য, দ্রৌপদীর উৎকণ্ঠা, দুর্গম পথে পঞ্চপাণ্ডবের স্থিরলক্ষ্যভাবে যাত্রা, দ্রৌপদীর পতন এবং সর্ব্বশেষে সারমেয় ও যুধিষ্ঠিরের দূরে বিলীন হওয়া; হিমালয়ের অভ্রলেহী চূড়া মণ্ডিত ভীষণ তুষার মরু এবং সম্মুখে বিরাট অতিপ্রাচীন দেবদারুরূপ জীবিতজগতের শেষ পরিচয়, এই সকল সুস্পষ্টভাবে জীবন্ত চিত্রে পরিণত করা—নন্দলালেরই পক্ষে সম্ভব। চিত্রের প্রথা জাপানী হইতে পারে, কিন্তু ইহার প্রত্যেক রেখায় প্রাচীন ভারতের পৌরুষ ও দৃঢ়সঙ্কল্পের ভাব জাগ্রত রহিয়াছে।

আর্ট স্কুল প্রদর্শনীর অন্যান্য চিত্রাবলীর মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের 'বাঁশী' ইজিপ্টের চিত্রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, কিন্তু ইহার রচনা এদেশের রীতি অনুযায়ী। শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কাষ্ঠখোদন পদ্ধতির চিত্রাঙ্কণ ক্রমেই খ্যাতি লাভ করিতেছে। এই প্রদর্শনীতে তাঁহার কলাকৌশলের নিদর্শন কয়েকটি ছিল, যথা, "সাঁওতালী নৃত্য"।

শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্র শ্রীযুক্ত সোভাগমল গেহলোট অঙ্কিত "নীড়রাজি" সুন্দর চিত্র। শ্রীযুক্ত রেণু রায়ের "বীর হনুমান" চিত্র তাঁহার পরিকল্পনা ও রচনার নূতনত্বের পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত ইন্দু রক্ষিতের "রেলের কামরার আর এক ধার"-ও ঐ হিসাবে প্রশংসনীয়।

যে-সকল চিত্রের উল্লেখ করা হইল তাহা হইতে ইহাও সুস্পষ্ট যে নূতন পদ্ধতিই এই বৎসরের চিত্রাবলীর

রেলের কামরার আর এক ধার—শ্রীইন্দু রক্ষিত

একমাত্র উল্লেখযোগ্য গুণ নহে। বিষয়বৈচিত্র্যও এখানে যথেষ্ট আছে।

কেবল মাত্র দুঃখের বিষয় এই যে, এদেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক যুগ এখনও আমাদের শিল্পীদিগের মন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

কহ মৃত্যু কানে কানে কথা

মৃত্যু

- গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাণ্ডবগণের

শ্রীনন্দলাল

অসুরগণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ

শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়

মহাপ্রস্থান

বসু

বুদ্ধ-পূজা

শ্রীনলিনীকান্ত মজুমদার

শ্রীচৈতন্যের টোল
শ্রীনন্দলাল বসু

হরপার্ব্বতী
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার

মা
শ্রীএইচ, এল, মেড়
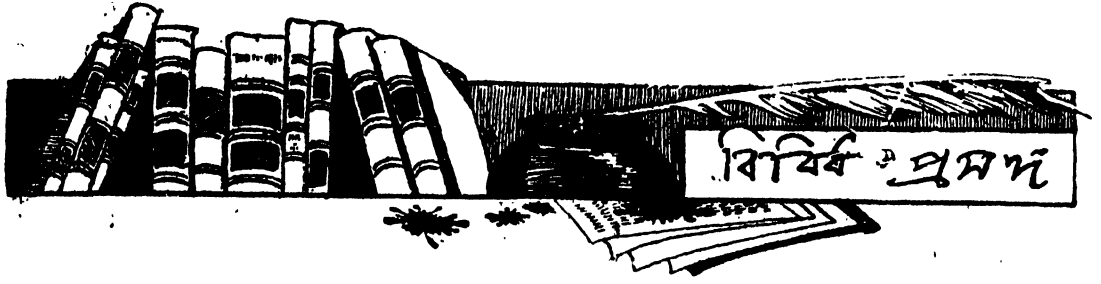
দুষ্করতার ও বিপদের আহ্বান

কোন কোন ধর্ম্মবিধি সম্বন্ধে তাহার সমর্থকেরা বলিয়া থাকেন, মানবপ্রকৃতির দুর্ব্বলতা বিবেচনা করিয়া ঐরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে; কেন না, যে আদর্শের অনুসরণ করা অতি কঠিন,বা কতকটা কঠিন,সেরূপ আদর্শ মানুষের সম্মুখে ধরিলে অল্পলোকেই তাহার অনুসরণ করিতে পারিবে। যাঁহারা এরূপ কথা বলেন, তাঁহারা বিস্মৃত হন, যে, ধর্ম্মের মহত্ত্বই এইখানে যে তাহা মানুষকে দুষ্কর কাজ করিতে বলে, মহৎ আদর্শের অনুসরণে দুঃখ ও বিপদকে অগ্রাহ্য করিতে বলে। যাহা সহজ, ধর্ম্ম যদি আমাদিগকে কেবল তাহাই করিতে বলিত, তাহা হইলে মানুষের উন্নতি হইত না।

'কেজো' ধর্ম্মবিধির সমর্থকেরা আরও এই একটি কথা ভুলিয়া যান, যে, অনেক মানুষ যেমন আরামের বিলাসের সহজসাধ্যতার আহ্বানে সাড়া দেয়, তদ্রূপ অনেকে দুষ্করতার ও বিপদের ডাকেও সাড়া দেয়। বস্তুতঃ, যাহাদের মনুষ্যত্ব আছে, পৌরুষ আছে, শক্তি আছে, সাহস আছে, তাহারা দুঃসাধ্য যাহা, বিপদসঙ্কুল যাহা, তাহার ডাকেই বেশী সাড়া দেয়। নতুবা মানুষ কৈশোরে ও যৌবনেও কাঠের ঘোড়া চড়িতেই ভালবাসিত, তেজীয়ান জীবন্ত ঘোড়া চড়িতে চাহিত না। এই জন্য দুঃসাহসের কাজ করিতে যাওয়া সকল দেশেই যৌবনের ধর্ম্ম। বৈধ এরূপ কাজ করিবার সুযোগ কোন দেশে না থাকিলে, যৌবনের ধর্ম্ম অনেককে বিপথে লইয়া যায়।

রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য পালন করিবার জন্য, স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা করিবার জন্য, যে-সব উপায় অবলম্বনে কোন বিপদ নাই, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখায় দোষ নাই। বক্তৃতা করা, প্রস্তাব ধার্য্য করা, সমালোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, প্রতিবাদ করা—এ সব কোনটাই দোষের নয়। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে, যে, এ সবে সমুচিত ফললাভ হয় না, তখন ঐ সব সহজসাধ্য উপায় অবলম্বনই কলুর ঘানির বলদের মত আমরা চিরকাল করিতে থাকিব, এরূপ আশা বা ব্যবস্থা করা উচিত নয়। যাঁহারা এই সব উপায় অবলম্বনই যথেষ্ট মনে করেন, তাঁহারা এই উপায়গুলিও পূর্ণমাত্রায় এবং চূড়ান্ত-রূপে 'কৌন্সিলগৃহের বাহিরে' অবলম্বন করেন না। যাহাতে জেলে যাইতে হয়, জরিমানা দিতে হয়, সেরূপ সত্য কথা সাধারণতঃ 'চরম পন্থী'রাই কৌন্সিলগৃহের বাহিরে বলেন, লেখেন।

দুষ্করতার ও বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে। কিন্তু তাহার জন্য গর্হিত কিছু করিবার দরকার নাই।

মহাত্মা গান্ধী আইন-লঙ্ঘনের যে পথ দেখাইয়াছেন তাহাতে বিপদ আছে। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা সত্যাগ্রহীদিগকে নিবৃত্ত করিতেছে না। দলে দলে সত্যাগ্রহী জুটিতেছে। মহাত্মা গান্ধী যদি এমন কোন উপায় নির্দ্দেশ করিতেন, যাহাতে আরও বেশী বিপদ আছে, তাহা হইলে হয় ত এমন অনেক লোক আইন লঙ্ঘন প্রচেষ্টায় যোগ দিতেন যাঁহারা এখনও তাহাতে যোগ দেন নাই। সশস্ত্র বিপ্লবপ্রয়াসীরা এই শ্রেণীর লোক। অন্য লোকও থাকিতে পারেন। অবশ্য, যাঁহারা বেশী বিপদের আহ্বান শুনিতে প্রস্তুত, তাঁহাদের পক্ষে কম বিপদের পথে যাইতে কোন বাধা নাই।

ভারতীয় ও বিলাতী কোন কোন ইংরেজদের কাগজ লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন লঙ্ঘন ও তদ্দ্বারা স্বাধীনতা অর্জ্জনের চেষ্টাকে উপহাস করিতেছে, প্রহসন বলিতেছে। মহাত্মা গান্ধী যদি স্বাধীনতালাভের জন্য দুএকটা মানুষের প্রাণ বধ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে অবশ্য আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টাটা প্রহসন হইত না; কিন্তু তাহাও কি

ইংরেজদের পছন্দসই হইত? হিংস্র প্রচেষ্টা কাহারও বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হইলে, তাহা তাহার পক্ষে সুখকর নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষের লোকদের বর্ত্তমান অস্ত্রাল্পতা ও অদলবদ্ধতা বিবেচনা করিলে অনেক সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ অহিংস প্রচেষ্টা অপেক্ষা হিংসাত্মক প্রচেষ্টা পছন্দ করিতে পারে। কারণ, এখন ভারতে মারামারি কাটাকাটি যতটা হওয়া সম্ভব, তাহা দমন করা ও তাহার প্রতিশোধ লওয়া তাহাদের পক্ষে যত সহজ, অহিংস আন্দোলন দমন করা তত সহজ নহে। যাঁহারা অহিংসাকে ধর্ম্মমতের মত অলঙ্ঘনীয় বলিয়া মানেন না, তাঁহাদের এই কথা মনে রাখা উচিত।

ব্রিটিশজাতির স্বার্থপ্রসূত গর্হিত লবণআইন ভঙ্গ করিবার গুরুত্ব সত্যাগ্রহীদের দ্বারা প্রস্তুত লবণের ওজন-দ্বারা পরিমিত হইবার নহে। এই আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার মানে, "আমরা পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শক্তিদ্বারা সমর্থিত অন্যায় আইন মানিব না এবং অন্যায়ের সমর্থক শক্তিকে আমরা ভয় করি না। তাহা আমাদিগকে অবনত করিয়া রাখিতে পারিবে না।" এই যে অন্যায়ের ও অধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, ইহার শক্তি সত্যাগ্রহীদের সংখ্যাদ্বারা নির্ণীত হইতে পারে না। সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ত বাড়িতেছেই। অধিকন্তু একজন কার্য্যতঃ সত্যাগ্রহীর জায়গায় দেশে হাজার লোক আছে, যাহারা এই বিদ্রোহের সমর্থন করে, এবং তাহারাও কোন-না-কোন প্রকারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে।

ভারতবর্ষ স্বরাজ পাইলেও যে রকম আইন ও ট্যাক্স থাকিবে, বিদেশী গবন্মেণ্টের সেরূপ আইন ও ট্যাক্সের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে মহাত্মা গান্ধী নিষেধ করিয়া ঠিক্ কাজই করিয়াছেন; কারণ, স্বরাজের মানে অরাজকতা, আইনশূন্যতা বা ট্যাক্সবিহীনতা নহে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব জাগান ঠিক্, কিন্তু অবাধ্যতার জন্য অবাধ্যতার উদ্রেক কোন বিবেচক ব্যক্তির অভিপ্রেত হইতে পারে না। যাহা স্বরাজের আমলে থাকিবে না, এরূপ ব্যবস্থা বন্দোবস্ত ও অবস্থা অনেক আছে। তাহাদের বিরুদ্ধে চেষ্টা খুব চলিতে পারে। বিদেশী কাপড় বর্জ্জনের চেষ্টা খুবই করা উচিত। এই চেষ্টা সরকারী বেসরকারী সমুদয় দেশী লোক করিতে পারেন। মদ আফিং গাঁজা প্রভৃতি নেশার জিনিষ যাহাতে নেশার জন্য ব্যবহৃত না হয়, তাহারও চেষ্টা খুব চলিতে পারে। সরকারী লোকেরাও নেশা করিতে বা অন্যকে নেশা করাইতে বাধ্য নন! এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বক্তৃতা পুস্তিকাপ্রচার প্রভৃতি ছাড়া, বিদেশী কাপড়ের দোকানের ও নেশার জিনিষের দোকানের সম্মুখে পিকেটিং প্রবর্ত্তিত হইবে। কোন কোন ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস-কর্ম্মচারী সভা মিছিল প্রভৃতি বন্ধ করিবার ক্ষমতার অপব্যবহার করিয়া থাকে। এইরূপ অপব্যবহার হইলে তাহাদের হুকুম অনেকেই মানিতেছেন না। বর্ত্তমান সিডীশ্যন আইন স্বাধীন মত প্রকাশের ও স্বাধীনতা লাভ চেষ্টার পরিপন্থী। এইজন্য ইহাও অনেকে মানিতেছেন না। এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

—

লবণআইন লঙ্ঘন

অনেক জায়গায় বেআইনী ভাবে লবণ প্রস্তুত হইতেছে এবং এরূপ লবণ নানাস্থানে প্রকাশ্যভাবে বিক্রীও হইতেছে। ইহার জন্য অনেক নেতা ও অন্য সত্যাগ্রহীকে সত্যাগ্রহের প্রথম দিনেই গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। পরে আরও অনেককে দণ্ডিত করা হইয়াছে। কিন্তু প্রধান নেতা গান্ধীজির গ্রেপ্তারের সংবাদ এখন (২৮শে চৈত্র দ্বিপ্রহর) পর্য্যন্ত আমরা পাই নাই। বোধ হয় তাহার বেশী বিলম্ব নাই। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিলেও নেতার অভাব হইবে না—যদিও সব বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ নেতা সদ্য সদ্য পাওয়া যাইবে না।

লবণআইন লঙ্ঘনের জন্য শাস্তির বৈচিত্র্য আমোদ-জনক। কাহারও এক মাস বিনাশ্রমে কারাবাস, কাহারও বা দুই বৎসর সশ্রম কারাবাসের ব্যবস্থা হইতেছে। জরিমানা কাহারও ৫০০ টাকা, কাহারও বা ৩০০০ টাকা হইতেছে। ইহা কি খামখেয়ালী ব্যাপার, না মানুষ বুঝিয়া শাস্তির প্রভেদ করা হইতেছে?

—

লবণ কাড়িয়া লওয়ায় বাধা দেওয়া

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, যে, সত্যাগ্রহীরা তাহাদের প্রস্তুত লবণ পুলিসকে যেন সহজে কাড়িয়া লইতে না দেয়, যেন তাহারা তাহা রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। ইংরেজদের একখানা কাগজে তাঁহার এই উপদেশকে নিরুপদ্রব (নন্‌-ভায়োলেণ্ট) প্রচেষ্টার নূতন পরিবর্ত্তন-রূপে প্রতীত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। তাহা হইবারই কথা। কিন্তু নিরুপদ্রব বা অহিংস প্রচেষ্টার মানে এ নয়, যে, আমরা নিজেদের জিনিষ রক্ষার চেষ্টা করিব না। ইহার মানে এই, যে, সত্যাগ্রহীরা কাহাকেও আক্রমণ করিবেন না এবং জ্ঞাতসারে ইচ্ছাপূর্ব্বক কাহাকেও আঘাত করিবেন না। সত্যাগ্রহীরা যে লবণ প্রস্তুত করিতেছেন, তাহা তাঁহাদের নিজের জিনিষ মনে করিবার ন্যায্য অধিকার আছে। সুতরাং কেহ তাহা কাড়িয়া লইতে আসিলে তাহা প্রাণপণে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস ইংরেজকৃত বর্ত্তমান আইন অনুসারে ঐ লবণ বাজেয়াপ্ত করিতে অধিকারী বটে। কিন্তু সত্যাগ্রহীরা ঐ কৃত্রিম ও অন্যায় আইন মানেন না, উহা বিধির বিধান মনে করেন না। এই কারণে, যে-কেহ তাঁহাদের লবণ কাড়িয়া লইতে আসিতেছে, সে তাঁহাদের চক্ষে পরস্বাপহারক বলিয়া প্রতীত হওয়ায় তাহার চেষ্টায় তাঁহারা বাধা দিতেছেন।

[ইহা কয়েকদিন পূর্ব্বে লিখিত হয়। আজ ২৮শে চৈত্র দৈনিক কাগজে দেখিতেছি, মহাত্মাজীও এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]

ধস্তাধস্তিতে উত্তেজনা ও তাহা হইতে মারামারি হইতে পারে। সত্যাগ্রহীদিগকে শান্ত ভাবে হাসিমুখে নিজেদের উৎপন্ন ও অর্জ্জিত সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে।

—

বর্ত্তমান অবস্থায় ছাত্রদের কর্ত্তব্য

বর্ত্তমান অবস্থায় দেশের প্রতি কর্ত্তব্য সকলেরই আছে। নানা শ্রেণীর বয়সের ও আর্থিক অবস্থার অনেক লোক সেই কর্ত্তব্য পালন করিয়া ধন্য হইতেছেন। ছাত্রদের কর্ত্তব্য আলোচনা করিবার কারণ আছে। তাহাদের উৎসাহ ও শ্রমশক্তি প্রচুর, এবং সাধারণতঃ তাহাদিগকে রোজগার করিয়া পোষ্য পালন করিতে হয় না। এই জন্য সকল দেশেই স্বাধীনতার সংগ্রামে তাহারা যোগ দিয়া থাকে।

ছাত্রদের মধ্যে যাহারা নাবালক, সাধারণতঃ তাহাদের আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টায় যোগ না দেওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহারা সাবালক, তাহাদের মধ্যে যাহারা নেতার অধীনে বাস্তবিক অহিংস ভাবে আইন লঙ্ঘন করিবে, তাহারা তাহাদের ছাত্রাবস্থার কাজ আপাততঃ ছাড়িতে পারে—সংগ্রাম শেষ হইলে এবং সুযোগ পাইলে তাহারা আবার শিক্ষালাভে প্রবৃত্ত হইতে পারে। কিন্তু কেবল হুজুক করিবার জন্য এবং কোন একটা অছিলায় লেখা-পড়া ছাড়িয়া দিবার জন্য কাহারও শিক্ষালয় ত্যাগ করা উচিত নয়।

যাঁহারা সত্যাগ্রহ করিবার পরও ভরণপোষণের জন্য পিতামাতা বা অন্য অভিভাবকের উপর নির্ভর করিবেন, তাঁহারা যেন তাঁহাদের অনুমতি গ্রহণ করেন। অন্যেরাও গুরুজনের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ সহ সত্যাগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে পূর্ণোদ্যমে কাজ করিতে পারিবেন।

—

বাণিজ্যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যকে অধিক সুবিধা দান

যে কারণেই হউক, পণ্যদ্রব্য প্রস্তুতি ও তাহার বাণিজ্যে ব্রিটেন খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে প্রায় দেড় শত বৎসর পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অগ্রসর ছিল। কিছু কাল হইতে অন্যান্য দেশ ব্রিটেনের সহিত খুব প্রতিযোগিতা করিতেছে। আমেরিকা, জার্ম্মেনী, জাপান প্রভৃতি দেশ পণ্যশিল্প ও বাণিজ্যের কোন কোন ক্ষেত্রে ব্রিটেনের সহিত সমকক্ষতা করিতেছে, কিংবা ব্রিটেনকে হারাইয়া দিয়াছে বা দিতে বসিয়াছে। ব্রিটিশ জাতি তাই নিজের শ্রেষ্ঠ পদ রক্ষার জন্য নানা উপায় চিন্তা ও অবলম্বন করিতেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত সব দেশ পরস্পরকে বাণিজ্য বিষয়ে অন্যান্য দেশ

অপেক্ষা স্নবিধা দিবে, এই নীতি অবলম্বন অন্যতম উপায়। এই সব দেশের খাদ্য শস্য, কাঁচা মাল ও কারখানায় প্রস্তুত পণ্যদ্রব্য যাহা দরকার হইবে, তাহা তাহারা যথাসম্ভব সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশ হইতে লইবে। যদি ঐ রকম কোন জিনিস সাম্রাজ্যের বহির্ভূত কোন দেশ হইতে লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার উপর আমদানী শুল্ক বসাইতে হইবে, যাহাতে তাহা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত কোন দেশ হইতে আমদানী জিনিষ অপেক্ষা মহার্ঘ হয়। কোন জিনিষ রপ্তানী করিবার সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশে উহা বিনা রপ্তানী শুল্কে বা অল্প রপ্তানী শুল্কে চালান করিতে হইবে, কিন্তু অন্য দেশে চালান করিবার সময় কিছু রপ্তানী শুল্ক বা অধিকতর রপ্তানী শুল্ক বসাইতে হইবে। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশসমূহের পরস্পরকে বাণিজ্যবিষয়ক অধিকতর স্নবিধা দানের অর্থ এই রূপ।

ভারতবর্ষকে ঐ নীতি অবলম্বন করিতে হইলে কি করিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করা যাক্। ভারতবর্ষ হইতে খাদ্য শস্য চাল, গম ইত্যাদি বিদেশে চালান হয়। সাম্রাজ্যিক স্নবিধাদান নীতি অনুসারে চাল ও গম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশ সকলে বিনা রপ্তানী শুল্কে চালান দিতে হইবে, এবং অন্যান্য সব দেশে চালান দিবার সময় রপ্তানী শুল্ক বসাইতে হইবে; কিংবা সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশে চালান দিবার সময় যত রপ্তানী শুল্ক বসাইতে হইবে, বাহিরের দেশে চালান দিবার সময় তদপেক্ষা বেশী শুল্ক বসাইতে হইবে। তুলা প্রভৃতি রপ্তানীর সময়ও ঐরূপ নিয়ম করিতে হইবে। আমদানীর সময়ও ঐ রকম নিয়ম করিতে হইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, লোহা ইস্পাতের কোন জিনিষ বিলাত হইতে আমদানী করিলে ভারতবর্ষের বাজারে তাহা বিনা শুল্কে বা অল্প শুল্কে আসিতে পারিবে, কিন্তু জার্মেনী বা অন্য কোন ব্রিটিশসাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশ হইতে আসিলে তাহার উপর অল্প বা অধিক শুল্ক লাগিবে, এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্যবহির্ভূত দেশ হইতে আগত সেই দ্রব্য বিলাতী জিনিষ অপেক্ষা ভারতবর্ষে দুর্মূল্য হইবে।

ইহাতে ভারতবর্ষের লাভ ক্ষতি কিরূপ, বিবেচনা করিতে হইবে। বেশী পরিমাণে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী হয়, এরূপ জিনিষের মধ্যে কেবল পাটই ভারতবর্ষ ভিন্ন আর কোথাও উৎপন্ন হয় না। স্নতরাং যদি সাম্রাজ্য-বহির্ভূত দেশগুলি দেখে, যে, ভারতবর্ষ হইতে জিনিষ কিনিতে হইলেই তাহারা শুল্কসমেত অধিক দামে কিনিতে বাধ্য হইবে, তাহা হইলে তাহারা ঐ সব জিনিষ ভারতবর্ষে না কিনিয়া অন্য কোন দেশ হইতে কিনিবে যেখানে রপ্তানীশুল্ক নাই। তাহাতে ভারতবর্ষের রপ্তানী বাণিজ্য কমিবে। পাটও যে চিরকাল ভারতবর্ষের একচেটিয়া মাল থাকিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম; অন্য কোন কোন দেশে ইহা বা ইহার সমতুল্য কোন জিনিষ কাল-ক্রমে উৎপন্ন হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

রপ্তানী বাণিজ্যে ভারতবর্ষের ক্ষতির বিষয় বলিলাম। আমদানী বাণিজ্যেও ভারতবর্ষের ক্ষতি হইবে। কারণ, এখন যে সব লোহা ইস্পাতের বিলাতীর সমান উৎকৃষ্ট বা বিলাতী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জিনিষ আমরা বিলাতী অপেক্ষা কম দামে অন্য বিদেশ হইতে পাই, আমদানী শুল্ক বসাইলে তাহা পাইব না।

—

ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যিক ও অসাম্রাজ্যিক বাণিজ্য

আমরা আমাদের আমদানী বিদেশী জিনিষের যত অংশ বিলাত হইতে লই, ব্রিটেন যদি আমাদের রপ্তানী জিনিষের তত অংশ লইত, তাহা হইলে বরং আপাততঃ কেবল বাণিজ্যিক হিসাবে ব্রিটেনকে বাণিজ্যিক স্নবিধা প্রদানে ভারতবর্ষের আর্থিক ক্ষতি হইত না। কিন্তু আমাদের আমদানী পণ্যের অধিকাংশ আমরা বিলাত হইতে কিনি বা নানা পরোক্ষ কারণে কিনিতে বাধ্য হই, অথচ আমাদের রপ্তানী দ্রব্যের অধিকাংশের ক্রেতা ব্রিটেন নহে, সাম্রাজ্যের বাহিরের নানা দেশ অধিকাংশের ক্রেতা। স্নতরাং ভারতবর্ষ ব্রিটেনকে আমদানী রপ্তানী বিষয়ে অধিকতর স্নবিধা দিলে ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

নীচের তালিকাদ্বয়ে ভারতবর্ষের আমদানী রপ্তানী বাণিজ্যের শতকরা কত অংশ ব্রিটেনের সহিত ও

সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অন্যান্য দেশের সহিত এবং কত অংশ বাহিরের দেশের সহিত তাহা দেখান হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আমদানী—

	১৯১৩-১৪ সাল।	'২৫-'২৬ সাল।	'২৭ সাল।
ব্রিটেন হইতে	৬৪.০	৫১.৪	৪৭.৮
সাম্রাজ্যিক অন্যান্য দেশ হইতে	৬.০	৮.৪	৬.৯
সাম্রাজ্যবহির্ভূত দেশ হইতে	৩০.০	৪০.২	৪৫.৩

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী—

	১৯১৩-১৪।	১৯২৫-২৬।	১৯২৭
ব্রিটেনে	২৩.৪	২১.০	২১.৪
সাম্রাজ্যের অন্যান্য দেশে	১৪.৪	১৪ ০	১৭.২
সাম্রাজ্যবহির্ভূত দেশে	৬২.২	৬৫.০	৬১.৪

তালিকা দুটি হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ভারতবর্ষ তাহার আমদানী জিনিষের খুব বেশী অংশ ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে ক্রয় করে, কিন্তু ব্রিটেন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আমাদের জিনিষ অল্পই ক্রয় করে। খাদ্য শস্য ও কাঁচা মাল বিক্রী করিয়া বেশী লাভ হয় না, কারখানায় তৈরী পণ্যদ্রব্য বেচিয়া তার চেয়ে খুব বেশী লাভ হয়। ব্রিটেন এইরূপ পণ্যদ্রব্য ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী বেচিয়া বহু কোটি টাকা লাভ পায়। তাহার বিনিময়ে আমাদের কাঁচা মাল অল্প পরিমাণে কিনিয়া ব্রিটেন আমাদিগকে তেমন কিছু লাভবান্ করে না।

অন্য দিকে যে-সব সাম্রাজ্যবহির্ভূত দেশ আমাদের জিনিষ খুব বেশী কিনে, ব্রিটেনের ইচ্ছা আমরা তাহাদের পণ্যদ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া ভারতবর্ষে সে সব জিনিষের আমদানী কমাইয়া ফেলি। অর্থাৎ যাহারা আমাদের জিনিষ বেশী ক্রয় করে তাহাদিগকে অসুবিধায় ফেলিয়া আমাদের জিনিষসকলের অল্প অংশের ক্রেতা ব্রিটেনকে লাভবান্ ও খুশি করি।

ভারতবর্ষ স্বাধীন নহে বলিয়া এ পর্য্যন্ত ইহার বাণিজ্যিক সব আইন ব্রিটেনের সুবিধার্থ প্রণীত হইয়াছে। তাহা হইলেও, ইংলণ্ডের ডোমীনিয়ন ও উপনিবেশগুলি বাণিজ্য বিষয়ে সাম্রাজ্যিক সুবিধাদান-নীতির পক্ষপাতী না হওয়ায়, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট এ পর্য্যন্ত সমগ্রসাম্রাজ্যব্যাপী এমন কোন ব্যবস্থা করিতে পারে নাই, যাহাতে সাম্রাজ্যের সব দেশে ঐ নীতি চলিতে পারে; সুতরাং ভারতবর্ষেও উহা এতদিন চালান হয় নাই। কিন্তু সম্প্রতি ভারতীয় কাপড়ের কলওয়ালাদিগকে সাহায্য করিবার ওজুহাতে ঐ নীতির সূচাগ্র ভারতীয় বাণিজ্যশুল্কের ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করান হইয়াছে; তাহা ক্রমে ফালের আকার ধারণ করিতে পারে—যদি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত না হয়। এই কূটনীতিকে সংস্কৃতে 'চঞ্চুপ্রবেশে মুণ্ডপ্রবেশঃ' বলা হয়।

—

কার্পাসশিল্পে ব্রিটেনকে বাণিজ্যিক সুবিধাদান

কোম্পানীর আমলে কি প্রকারে রাজশক্তির অপব্যবহার দ্বারা ভারতবর্ষের তুলার সুতার ও কাপড়ের শিল্পবাণিজ্যের সমূহ ক্ষতি করা হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস এখন শিক্ষিত লোকেরা মোটামুটি জানেন। তাহার পর নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ভারতবর্ষে দেশী লোকদের কতকগুলি সুতার ও কাপড়ের কল হইয়াছে। বিলাতী কলওয়ালাদের প্রতিযোগিতায় তাহারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। তাহার উপর কয়েক বৎসর হইতে জাপানের প্রতিযোগিতাও অত্যন্ত প্রবল হইয়াছে। তাহাতে শুধু বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা নহে, বিলাতী কলওয়ালারাও বিপন্ন ও উদ্বিগ্ন হইয়াছে। এ অবস্থায় ভারতীয় কলগুলিকে বাঁচাইবার জন্য বিদেশী কাপড়ের উপর আমদানী শুল্ক বসাইবার অধিকার ভারত গবর্ন্মেণ্টের আছে—আত্মরক্ষার জন্য সব দেশের গবর্ন্মেণ্টই ইহা করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের গবর্ন্মেণ্ট বিলাতী। সুতরাং প্রভুত্বশক্তিসম্পন্ন ইংরেজ রাজপুরুষেরা এই সুযোগে ভারতবর্ষের উপকার করিবার ওজুহাতে নিজেদের দেশের সুবিধার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছেন।

বিদেশ হইতে আমদানী কাপড়ের উপর সামান্য একটা শুল্ক ছিল। তাহা বাড়াইয়া এবারকার বজেটে শতকরা ১৫ টাকা করা হয়। এইখানে থামিলে কোন কথা উঠিত না। কিন্তু ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদের শুল্ক বিলে

এইরূপ ব্যবস্থা করি[illegible] যে, আমদানী কাপড় ব্রিটেন ছাড়া অন্য দেশ হই[illegible] আসিলে শুল্ক শতকরা ১৫ টাকা না হইয়া ২০ টাকা হইবে। অভিপ্রায়, ইহার দ্বারা জাপানকে অসুবিধায় ফেলিয়া ইংলণ্ডের সুবিধা করা।

এই যে অতিরিক্ত শতকরা পাচ টাকা শুল্ক, ইহা বোম্বাইয়ের ও ভারতের অন্য জায়গার কাপড়ের কলগুলি রক্ষার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় নহে। কারণ, য[illegible] শতকরা ১৫ টাকা শুল্কে বিলাতী কাপড়ের সহিত প্রতিযোগিতায় দেশী কাপড় টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে জাপানের সহিত প্রতিযোগিতাতেও তাহা টিকিয়া থাকিতে সমর্থ। সুতরাং এই অতিরিক্ত ৫ টাকা শুল্ক বাড়াইবার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষে বিদেশী কাপড়ের বাজার হইতে জাপানকে তাড়াইয়া দিয়া ঐ বাজার সম্পূর্ণরূপে বিলাতের জন্য রাখা।

বাণিজ্যিক স্বার্থপরতা ছাড়া ইহার মধ্যে গূঢ় রাজনৈতিক চা'লও থাকিতে পারে, যদিও সে বিষয়ে নিশ্চয় কিছু বলা যায় না। ভারতবর্ষ এখন পূর্ণ বা অপূর্ণ স্বরাজের জন্য চেষ্টা করিতেছে। এখন বিদেশী জাতিদের ভারতবর্ষের প্রতি মিত্রভাব কার্য্যতঃ কতটা সুবিধাজনক হইবে, বলা যায় না; কিন্তু জগতের লোকমতের, বিশেষতঃ আমেরিকার লোকমতের, মূল্য আছে। এখন এইরূপ শুল্কের আইন দ্বারা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের বাহিরের বস্ত্রনির্মাতা সব দেশকে ভারতবর্ষের প্রতি বিরূপ করিবার অভিপ্রায় থাকিতে পারে। অবশ্য, যে-সব বিদেশী লোক ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় তর্ক-বিতর্কের খবর রাখিবে, তাহারা বুঝিতে পারিবে, যে, অধিকাংশ নির্ব্বাচিত ভারতীয় প্রতিনিধিদের স্বাধীন ভোট দ্বারা এই শুল্ক-আইন পাস হয় নাই; ইংরেজ সভ্য ও গবর্ন্মেণ্টের মনোনীত সভ্যদের ভোট ইহার সপক্ষে প্রদত্ত না হইলে ইহা পাস হইত না। নির্ব্বাচিত যে-সব সভ্য ইহার সপক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাঁহারাও, সকলে না হউক, অনেকেই ভয়ে তাহা করিয়াছেন। কারণ, সরকার পক্ষ হইতে বলা হয়, যে, যদি কোন সংশোধক প্রস্তাব দ্বারা ব্যবস্থাপক সভা বিলাতী ছাড়া অন্য কাপড়ের উপর ২০ টাকা শুল্ক নামঞ্জুর করেন, তাহা হইলে গবর্ন্মেণ্ট সমগ্র বিলটিই তুলিয়া লইবেন; অর্থাৎ দেশী কলগুলির রক্ষার জন্য যে ১৫ টাকা শুল্কের ব্যবস্থা তাহাতে আছে, সেই শুল্ক স্থাপনের চেষ্টাও আর করা হইবে না। বেশীর ভাগ কল বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে স্থাপিত। বোম্বাইয়ের সভ্যেরা দেখিলেন, যে, তাঁহারা যদি অবিলাতী সব বিদেশী কাপড়ের উপর ২০ টাকা শুল্কে রাজী না হন, তাহা হইলে বিলাতী অবিলাতী কোন কাপড়েরই উপর দেশী-কাপড়-সংরক্ষক ১৫ টাকা শুল্কও বসিবে না, এবং তাহা হইলে তাঁহাদের প্রদেশের কলগুলি রক্ষা করা কঠিন হইবে। এই জন্য তাঁহারা ব্রিটিশসাম্রাজ্যের বাহিরের সব দেশের কাপড়ের উপর ২০ টাকা শুল্কেই রাজী হইলেন।

—

"কার্য্যতঃ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস"

পার্লেমেণ্টে ভারতসচিব মিঃ বেন তাঁহার এক বক্তৃতায় বলেন, গত দশ বৎসর ভারতবর্ষ, নামে না হইলেও, কার্য্যতঃ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস ভোগ করিয়া আসিতেছে, এবং ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ (ব্রিটেনের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়াও) আমদানী দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইতে পারে। শেষোক্ত মত তিনি আরও দুই একবার ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু আলোচ্য আইনটির বেলায় ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-শুল্কবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব রহিল না, গবর্ন্মেণ্ট ভয় দেখাইয়া ইংলণ্ডের সুবিধা করিয়া লইলেন। সেই কারণে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় প্রভৃতি অনেক সভ্য ব্যবস্থাপক সভার পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

—

কাপড়ের উপর শুল্ক কে দিবে ?

কাপড়ের উপর শুল্ক বসাইবার প্রকাশিত উদ্দেশ্য কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে, দেখা যাক্।

যদি ইহা সত্য হয়, যে, শুল্ক বসাইবার আগে যে প্রকারের যত গজ দেশী কাপড়ের দাম ছিল ১১০ টাকা, সেইরূপ তত বিলাতী কাপড়ের দাম ছিল ১০২ টাকা এবং জাপানীর ছিল ১০০ টাকা, তাহা হইলে এখন দেশীর দাম ১১০ই থাকিবে, বিলাতীর হইবে ১১৭ এবং জাপানীর

হইবে ১২০। ইহা অবশ্য কাল্পনিক দৃষ্টান্ত। এরূপ ঘটিলে জাপানী কাপড় বাজার হইতে নিশ্চয় দূরীভূত হইবে; বিলাতী দূরীভূত না হইলেও তাহার কাটতি কমিবে। মোটামুটি বলা যাইতে পারে, যে, শুল্ক বসাইবার দরুন জাপানীর দাম সকলের চেয়ে বেশী হইবে এবং বিলাতী ও দেশীর দাম সমান সমান হইলেও দেশী কাপড় টিকিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শুল্ক বসান সত্ত্বেও যদি বিলাতী ও জাপানী কাপড় দেশী অপেক্ষা সামান্য সস্তা থাকে, তাহা হইলে দেশী কাপড়ের টিকিয়া থাকা কঠিন হইবে। বিলাতী ও জাপানী কাপড় শুল্ক সত্ত্বেও দেশী অপেক্ষা সস্তা করিবার নানা উপায় থাকিতে বা হইতে পারে, যাহা অব্যবসায়ী আমাদের অজ্ঞাত। বস্ত্রবয়ন প্রণালীর উন্নতি ও দ্রুততা সাধন একটা উপায়। যে-সব জাহাজ ভারতবর্ষ হইতে জাপানে তুলা লইয়া যায়, এবং জাপান হইতে ভারতবর্ষে কাপড় লইয়া আসে, তাহাদিগকে জাপানী গবর্মেণ্ট যথেষ্ট বাউণ্টী (বাণিজ্যিক সুবিধার জন্য অর্থসাহায্য) দিয়া যদি জাহাজভাড়া খুব কম করিয়া দেন, তাহা হইলে জাপানী কাপড় এদেশে আরও সস্তা হইতে পারে। কাপাসে ভেজাল এবং কাপড়ে বেশী মণ্ড দিয়া খেলো জিনিষ দেখিতে সরেসের মত করিলেও আপাততঃ সস্তায় দেওয়া যায়। জাপানীরা শিল্পনৈপুণ্য ও ব্যবসাবুদ্ধির প্রভাবে বিলাতে পর্য্যন্ত কোন কোন কাপড় ও গেঞ্জী প্রভৃতি বিলাতী অপেক্ষা সস্তায় বেচিতেছে। তাহারা সহজে পরাস্ত হইবে না।

জয় পরাজয় যাহারই হউক বা না হউক, শুল্কের জন্য কাপড়ের দাম বাড়িবে এবং সেই বর্দ্ধিত দাম ভারতীয় ক্রেতাদিগকে দিতে হইবে। যদি শুল্কের দরুন বিলাতী ও অন্য সব বিদেশী কাপড়ের দাম দেশীর তুলনায় এত বেশী হইয়া যায়, যে, তজ্জন্য বিদেশীর কাটতি না থাকায় তাহার আমদানীই বন্ধ হয়, তাহা হইলে অবশ্য ভারতীয়দিগকে বেশী দাম দিয়া বিদেশী কাপড় কিনিতে হইবে না। কিন্তু সেরূপ অবস্থাতেও নিশ্চিন্ত হইবার জো থাকিবে না। বিদেশী কাপড়ের প্রতিযোগিতা না থাকিলে দেশী কলওয়ালারা তাহাদের কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিতে পারে। তাহা হইবার খুবই সম্ভাবনা। কারণ, এখন ভারতবর্ষের যত কাপড় দরকার হয়, দেশী মিলে ও হাতের তাঁতে তত কাপড় উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বাজারে শুধু দেশী কাপড় থাকিলে তাহার চাহিদা অপেক্ষা যোগান কম হওয়ায় তাহার দাম বাড়িবে।

কোন প্রকার শুল্ক না বসিলেও, স্বদেশীর প্রতি ভারতীয়দের অনুরাগ বশতও বিদেশী কাপড় বাজার হইতে দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু এই অনুরাগের মাত্রা এপর্য্যন্ত যথেষ্ট হয় নাই। যথেষ্ট হইলেও মূল্য সম্বন্ধে সুবিধা না হইতে পারে। তাহা বঙ্গবিভাগজনিত আন্দোলনের সময় দেখা গিয়াছিল। যখন ঐ আন্দোলন প্রযুক্ত বঙ্গের বাজার হইতে বিদেশী কাপড় অনেকটা বহিষ্কৃত হইয়াছিল এবং দেশী মিলের কাপড়ের কাটতি বাড়িয়াছিল, তখন সেই সুযোগে বোম্বাইয়ের কলওয়ালারা তাহাদের কাপড়ের দাম খুব বাড়াইয়াছিল এবং জাপানী ও বিলাতী কাপড় দেশী বলিয়া চালাইয়াছিল।

মানুষের নৈতিক উন্নতি না হইলে কেবল বাহ্য উপায়ে কখনও জাতীয় কল্যাণসাধন ও সুবিধাবর্দ্ধন করা যায় না।

—

বস্ত্রশিল্প রক্ষা ও উন্নতির উপায়

ইংলণ্ডে ও জাপানে তুলা উৎপন্ন হয় না। এই দুই দেশ ও ইটালী চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশ অন্য দেশ হইতে তুলা লইয়া গিয়া সুতা ও কাপড় তৈয়ার করে। মিহি সুতা ও কাপড়ের জন্য আমেরিকা ও মিশর দেশ হইতে এবং অন্য রকম সুতা ও কাপড়ের জন্য প্রধানতঃ ভারতবর্ষ হইতে তাহাদিগকে তুলা লইয়া যাইতে হয়। তাহাদিগকে সেই তুলার জিনিষ ভারতবর্ষে বিক্রী করিবার নিমিত্ত দুবার জাহাজ ভাড়া দিতে হয়—তুলা লইয়া যাইবার জন্য এবং কাপড় ও সুতা এদেশে পাঠাইবার জন্য। তাহা সত্ত্বেও তাহারা ভারতীয় মিলগুলিকে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করে। তাহার অনেক কারণ আছে। যথা— ক্রয়বিক্রয়ের উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত, কলের উন্নতি সাধন ও উৎকৃষ্টতম কল ব্যবহার, শিক্ষার দ্বারা কারিগর মজুরদের নৈপুণ্য বৃদ্ধি, শ্রমিকদিগকে যথেষ্ট বেতন দিয়া ও তাহাদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি বৃদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়া তাহাদের শ্রমশক্তি ও পণ্য উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, ইত্যাদি।

অনেক বৎসর হইতে ভারতীয় মিলওয়ালারা প্রতিযোগিতার অসুবিধা ভুগিতেছেন। প্রতিযোগিতা হঠাৎ আকাশ হইতে পড়ে নাই। অথচ তাঁহারা বিনা শুল্কে কেবল নিজেদের মিলগুলির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনের দ্বারা নিজেদের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। আর সব দেশের লোকেরা শিল্পে উন্নতি করিতে পারে, ভারতবর্ষের লোকেরা পারে না, ইহা সত্য নহে। সত্য কথা এই, যে, আমাদের মিল-ওয়ালারা যথেষ্ট চেষ্টা করেন নাই। বিদেশে স্বয়ং নানা স্থানে গিয়া ও বুদ্ধিমান কর্ম্মিষ্ঠ লোক পাঠাইয়া সস্তায় ভাল জিনিষ দিবার উপায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। স্থায়ী লাভের জন্য ইহা করা উচিত। এবং করা উচিত স্বদেশের গৌরব রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য। দেশে তুলা হয়, অথচ ভারতবর্ষের লোকেরা কাপড় কেনে বিদেশের, ইহা শুধু ক্রেতাদের লজ্জার বিষয় নহে; মিলের মালিক ধনিকদের ও কর্ম্মী শ্রমিকদেরও ইহা লজ্জার বিষয়। এই লজ্জা হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করা সকলেরই উচিত।

—

শুল্করূপ অমঙ্গল হইতে মঙ্গলসম্ভাবনা

বিদেশী কাপড়ের উপর শুল্ক স্থাপন দ্বারা সাক্ষাৎ ভাবে দেশী কাপড় উৎপাদনের ও তাহা সস্তা করিবার কিছু সুবিধা হইবে কি না অব্যবসায়ী আমরা ঠিক্ বলিতে পারি না। কিন্তু একটা শুভফলের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। গবন্মেণ্ট ভয় দেখাইয়া পার্থক্যমূলক শুল্ক স্থাপনের আইন পাস করাইয়া লওয়ায় অনেকের মন বিলাতী কাপড়ের উপর বিরক্ত হইয়াছে। সেই জন্য অনেকে তাহা বর্জ্জন করিবার নিমিত্ত আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই আন্দোলন প্রবল করিতে পারিলে এবং শুধু বিলাতীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ না করিয়া সব বিদেশী কাপড়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিলে দেশী শিল্পের সুবিধা ও দেশের আর্থিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু স্থায়ী মঙ্গল বিদেশীর প্রতি বিরাগ বিদ্বেষ দ্বারা হইবে না; তাহা পোষণ না করিয়া দেশের মানুষ ও দেশী জিনিষের প্রতি অনুরাগ দ্বারাই প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। এই অনুরাগ আর্থিক লোভ হইতে জন্মিবে না; স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি হইতে জন্মিতে পারে।

শুল্ক স্থাপন বশতঃ যদি খদ্দর উৎপাদন ও সস্তায় বিক্রীর সুবিধা হয়, তাহা হইলে সুখের বিষয় হইবে। কারণ, খদ্দর সম্পূর্ণ স্বদেশী জিনিষ। ইহার তুলা দেশী, উৎপাদক কৃষকেরা দেশী, চরকা দেশী কারিকরের তৈরী দেশে নির্ম্মিত দেশী যন্ত্র, সুতা কাটে দেশী লোক এবং ইহা বোনে দেশী লোক দেশী লোকের তৈরী হাতের তাঁতে।

—

ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকটি প্রদেশের প্রতি অবিচার

আমরা ইংরেজী মডার্ন রিভিউ ও বাংলা প্রবাসীতে অনেকবার দেখাইয়াছি, যে, যদিও বঙ্গের ও আগ্রা-অযোধ্যার লোকসংখ্যা বোম্বাইয়ের আড়াই গুণেরও অধিক, তথাপি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় এই বৃহৎ প্রদেশগুলির প্রতিনিধির সংখ্যা বোম্বাই অপেক্ষা বেশী নয়। তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা লোক সংখ্যার অনুযায়ী হইলে গবন্মেণ্ট ভয় দেখাইয়াও শুল্ক আইন পাস্ করিতে পারিতেন না—বঙ্গের ও আগ্রা-অযোধ্যার প্রতিনিধিসংখ্যা ন্যায়সঙ্গত হইলে তাহাদের ভোটাধিক্যে, বোম্বাইয়ের সমর্থন সত্ত্বেও, গবন্মেণ্টকে হারিতে হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গবন্মেণ্ট বোম্বাইকে লোকসংখ্যা হিসাবে যে অধিকসংখ্যক প্রতিনিধি দিয়াছেন, তাহার ফল ফলিয়াছে। ইংরেজরা ইহাকে সুফল মনে করিবে, কিন্তু অধিকাংশ ভারতীয় প্রদেশের লোকের মতে ইহা কুফল।

—

স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় বিরাশী বৎসর বয়সে এলাহাবাদের বিখ্যাত হাইকোর্ট জজ স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার জন্মস্থান উত্তরপাড়া। কলি-কাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে ওকালতী করিতে যান। কিছু

কাল ওকালতী করিয়া তিনি মুন্‌সেফ হন। তাহার পর আইনজ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও বিচারশক্তির গুণে তিনি ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে অধিরূঢ় হইয়া শেষে এলাহাবাদ হাইকোর্টের জজ হন। প্রায় ত্রিশ বৎসর ধরিয়া তিনি তথায় জজিয়তী করেন। তিনি যে সময়ে জজ হইয়াছিলেন, তখন কোন একটা নির্দ্দিষ্ট বয়সে হাইকোর্ট জজেরা পেন্সান লইতে বাধ্য হইতেন না। এই জন্য তিনি ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জজিয়তী করেন। তাহার পূর্ব্বেই তিনি দুই বার অবসর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এরূপ বিচক্ষণ ও ভাল বিচারক ছিলেন, যে, দুই দুই জন প্রধান বিচারপতির অনুরোধে তাঁহাকে দীর্ঘ কাল জজিয়তী করিতে হইয়াছিল। ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের নিয়মের মহিমায় তিনি কিন্তু প্রধান বিচারপতি হইতে পারেন নাই। অথচ ইহা এলাহাবাদ হাইকোর্টের আইনজীবীরা এবং তাঁহার সমসাময়িক বিলাতী প্রিভি কৌন্সিলের জজেরা জানিতেন, যে, এলাহাবাদের কোন প্রধান বিচারপতি ও সাধারণ বিচারপতি তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। এলাহাবাদের বিখ্যাত এড্‌ভোকেট স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রু একবার বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া লিখিয়াছিলেন, যে, লর্ড হলডেন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের কোন হাইকোর্টের স্যার প্রমদাচরণের সমসাময়িক কোন জজ তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন না, এবং খুব বিশেষ কারণে স্যার প্রমদাচরণের কোন রায়ের বিপরীত বিশ্বাস তাঁহার না জন্মিলে তিনি (লর্ড হলডেন) বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কোন রায় উল্টাইয়া দিতে খুব ইতস্তত: করিতেন।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সৌজন্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল ছিল।

বাংলা দেশের বাহিরে গিয়া কোন বাঙালী কৃতিত্ব দেখাইলে বাঙালীরা স্বভাবতঃ সন্তোষ ও গৌরব বোধ করিয়া থাকে, এবং সেই জন্য আমাদের অজ্ঞাতসারে কখন কখন প্রশংসার আতিশয্যও ঘটিতে পারে। এই জন্য আমরা বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে অবাঙালীদের আরও দুই একটি মত উদ্ধৃত করিব।

এলাহাবাদের ইংরেজী দৈনিক লীডারের প্রধান সম্পাদক মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর লোক। অন্য সম্পাদকও
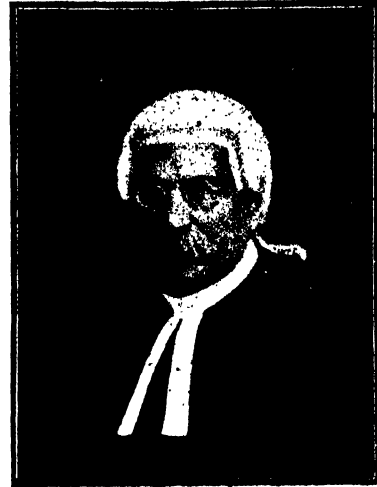
স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঙালী নহেন। এই কাগজে স্যার প্রমদাচরণ সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে :—

Sir Promoda Charan Banerjea, whose death we reported yesterday, was a great judge, a great lawyer, a great gentleman and one of the most respected citizens of Allahabad. It is given to few judges to enjoy in such ample measure the respect and confidence of the bar and of those who seek justice in the High Court as he did. His profound knowledge of law, marvellous memory, judicial independence and detachment, grasp of juristic principles and untiring patience and courtesy made him a model judge and every Indian who came to know him felt proud of him. By sheer dint of merit he rose rapidly from the lowest rung of the judicial ladder to the position of Judge of the High Court, and adorned the High Court bench for nearly 30 years. In such value were his legal knowledge and judgment held that he was prevailed upon by two Chief Justices to prolong his connection with the High Court. And when he retired, deep and universal regret was felt at the heavy loss which the High Court suffered by his retirement. The autobiographical speech he delivered in the High Court on the eve of his retirement, which we reproduced yesterday, would

show that he was the first Indian to occupy positions in the judical service which had been previously reserved for Europeans. This was a tribute to outstanding merit and high character which compelled recognition and transcended racial barriers which he helped in breaking down. Modest and unassuming and intensely sincere, he was courtesy personified, and the death of such a one who had no enemies and a host of friends and admirers, cannot but be widely mourned.

তাৎপর্য্য। "স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন বিচারক ও আইনজ্ঞ, সৌজন্যে মহান এবং এলাহাবাদের একজন বিশেষ সম্মানিত অধিবাসী ছিলেন। যাহারা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হয়, তাঁহার মত প্রচুর পরিমাণে তাহাদের ও উকীল ব্যারিষ্টারদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসভাজন হওয়া কম জজেরই ভাগ্যে ঘটে। তাঁহার গভীর আইনজ্ঞান, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি, বিচারবিষয়ে স্বাধীনতা ও নির্লিপ্ততা, ব্যবহারবিজ্ঞানের সম্যক্ বোধ, অক্লান্ত ধৈর্য্য ও সৌজন্য তাঁহাকে আদর্শ বিচারকে পরিণত করিয়াছিল, এবং যে-কোন ভারতীয়ের তাঁহাকে জানিবার সুযোগ হইত তিনিই স্যার প্রমদাচরণ এক জন ভারতীয় বলিয়া গৌরব বোধ করিতেন। * * * * * অবসর গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি নিজের জীবন সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে জানা যায়, যে, তাঁহার পূর্ব্বে বিচার-বিভাগের যে-সকল পদে কোন ভারতীয় নিযুক্ত হন নাই, তিনিই নিজ গুণশালিতার প্রভাবে তাহাতে প্রথম নিযুক্ত হন। ইহা তাঁহার অসাধারণ গুণশালিতা ও উচ্চ চরিত্রের পরিচায়ক। ব্যবহারে নম্র, অমায়িক ও অকপট, তিনি মূর্ত্তিমান সৌজন্য ছিলেন।"

এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রধান জজও তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এই প্রশস্তির অল্প অংশ নীচে উদ্ধৃত হইল।

At times, on one's journey through life, one meets men so abundantly dowered with qualities that lift them so much above their fellow-men, that there seems to be almost an element of unfairness in so lavish a concentration of gifts. Sir Promoda Charan Banerji was one of those rare men. He had, as a foundation, abundant vitality, without which so sustained an achievement as his spread over, as one might say, two life-times; would have been impossible. He possessed a clear and powerful brain and being by temperament industrious, after years of hard work, became a profound lawyer. His higher gifts of character and kindliness of disposition drew all of us to him.

তাৎপর্য্য। "জীবন-পথে কখন কখন অসাধারণ গুণসম্পন্ন দুই একজন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। এই সব গুণ তাঁহাদিগকে অন্য সব মানুষের এত উর্দ্ধে স্থাপন করে, যে, মনে হয় যেন কোন কোন মানুষকে এত বেশী গুণশালী করা বিধাতার পক্ষপাতিত্বের ও অবিচারের একটা দৃষ্টান্ত। স্যার প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন এইরূপ দুর্লভ অসাধারণশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ভিত্তি ছিল প্রচুর জীবনীশক্তি, যাহা ব্যতিরেকে তিনি বলিতে গেলে দুজন মানুষের জীবিত-কাল ধরিয়া এরূপ কৃতিত্ব দেখাইতে পারিতেন না। তাঁহার মস্তিষ্ক পরিষ্কার ও শক্তিশালী ছিল এবং বহু বৎসরের কঠোর পরিশ্রমে তিনি গভীর আইনজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার উচ্চতর চারিত্রিক গুণাবলী এবং প্রকৃতির মাধুর্য্য ও সদয়তা আমাদের সকলকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করিত।"

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনাড়ম্বর সাদাসিধা জীবন যাপন করিতেন। অনেক বৎসর পূর্ব্বে তিনি বিপত্নীক হন। তাঁহার পত্নী দানশীলতার জন্য এলাহাবাদে বিখ্যাত ছিলেন। স্যার প্রমদাচরণ দীর্ঘ জীবনে অন্য শোকও পাইয়াছিলেন। তিনি সমুদয় শোকভার ধৈর্য্যের সহিত বহন করিয়াছিলেন।

শিক্ষাকার্য্যের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। তিনি কয়েক বৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজ করেন। এলাহাবাদে বাঙালীদের যে ইণ্টারমীডিয়েট কলেজ আছে, তাহার সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

তিনি ৭৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত জজ থাকায় সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিতে পারেন নাই, এবং তাহার পর পারিবারিক শোক ও দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা বশতঃ নূতন

করিয়া জাতীয় জীবনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার প্রকৃতিও সম্ভবতঃ তাহার অনুকূল ছিল না। কিন্তু জজ থাকিবার সময় অরাজনৈতিক কোন কোন কাজে তিনি যোগ দিতেন। আমরা যখন এলাহাবাদের বাসিন্দা ছিলাম, তখন শেষের দিকে বাঙালীদের বাঙালী সমিতি স্থাপিত হয়। ইহার বার্ষিক অধিবেশনে ব্যায়াম, দৌড়াদৌড়ি, লাঠিখেলা, ছেলেদের ও মেয়েদের কবিতা আবৃত্তি, তাহাদের ও বয়স্ক লোকদের গানবাজনা, মহিলা ও বালিকাদের-শিল্পকার্য্য প্রদর্শনী প্রভৃতি হইত। এই সমিতির সহিত তাঁহার যোগ ছিল—বরাবর ছিল কিনা এখন মনে পড়িতেছে না।

স্যার প্রমদাচরণ যখন পশ্চিমে ওকালতী করিতে যান, তাহার পূর্ব্বেও সেখানে বাঙালীরা বিষয়কর্ম্ম ও তীর্থবাস উপলক্ষে বসবাস করিয়াছিল। অনেকের জন্ম ও শিক্ষাও সেখানেই হইত। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন এবং অন্য দিকেও বড় ছিলেন। তথাপি তিনি সেকালের বাঙালীদের আমোদজনক গল্প আমাদের কাছেও দুই এক বার করিয়াছিলেন। একটি এখন মনে পড়িতেছে। পশ্চিমেই জন্মগ্রহণ ও শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাঁহার এরূপ একজন বাঙালী বন্ধু ছিলেন। তিনি সাধারণ রকমের বাংলা বলিতে ও বুঝিতে পারিতেন কিন্তু বাংলা লিখিতে পড়িতে পারিতেন না। সেই ভদ্রলোকটির বিবাহ হয় বাংলা দেশে। তাঁহার স্ত্রী বাংলা লিখিতে পড়িতে পারিতেন। নববিবাহিতা বধূ স্বামীকে চিঠি লিখিতেন। স্বামী কিন্তু তাহা পড়িতে পারিতেন, না, এবং তাহার উত্তরও স্বহস্তে লিখিয়া পাঠাইতে পারিতেন না। এই সঙ্কটে তিনি বন্ধু প্রমদাচরণের শরণাপন্ন হইতেন। প্রমদাচরণ বন্ধুর স্ত্রীর চিঠি পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইয়া দিতেন। তাহার পর ভদ্রলোকটি ফারসী অক্ষরে বাংলা ভাষায় স্ত্রীর চিঠির জবাব লিখিয়া আনিলে প্রমদাচরণকে তাহা বাংলা অক্ষরে লিখিয়া দিতে হইত! বন্ধুর নাম দস্তখতটাও তিনিই করিয়া দিতেন কিনা জানি না।

—

ডাক্তার রামকালী গুপ্ত

সাতাশী বৎসর বয়সে পাটনার প্রাচীনতম বাঙালী ডাক্তার রামকালী গুপ্ত মহাশয়ের মৃত্যু হইয়াছে। তিনি বিহারের অন্যতম প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন। পাটনা মেডিক্যাল স্কুল স্থাপনে তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার শিক্ষার গুণে ঐ বিদ্যালয় এরূপ খ্যাতি লাভ করে, যে, তাহার জন্য উহাকে পাটনার প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্ মেডিক্যাল কলেজে পরিণত করা সম্ভব হয়। তিনি বিদ্বান্, জনহিতৈষী ও হৃদয়বান লোক ছিলেন।

—

সরদার বল্লভভাই পটেলের কারাবাস

বারদোলীর সত্যাগ্রহ শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেলের নেতৃত্বে সফল হয়। তিনি মহাত্মা গান্ধীর দক্ষিণহস্ত

সরদার বল্লভভাই পটেল

স্বরূপ ছিলেন। লবণআইনের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহে তিনি নিশ্চয়ই খুব কর্ম্মিষ্ঠতা দেখাইতেন এবং জেলেও তাঁহাকে যাইতে হইত। কিন্তু সে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার কারাদণ্ড হইয়াছে। কেন তাঁহাকে জেলে পাঠান হইল, তাহার বর্ণনা করিতে গিয়া বোম্বাই গবন্মেণ্টের একজন মেম্বর যাহা বলেন, তাহা হাস্যকর। সংক্ষেপে তাহা এই, যে, পটেল মহাশয়কে একটি গ্রামে বক্তৃতা করিতে নিষেধ করা হয়। তিনি সেই গ্রামে যান। অনেক লোক একত্র হয়। "তিনি বক্তৃতা করিবার উপক্রম করেন।" কি উপক্রম করেন, গলা-পরিষ্কার করেন, না আর কিছু করেন, মেম্বরপুঙ্গব তাহা বলেন নাই। এইরূপ উপক্রম করায় তাঁহাকে পুলিসে গ্রেপ্তার করে, এবং পরে এক ম্যাজিষ্ট্রেটের বিচারে তাঁহার তিন মাস জেল হয়। কিন্তু ঐ গ্রামেই মহাত্মা গান্ধী গিয়া, বক্তৃতার উপক্রম নহে, বক্তৃতা করিয়াছেন এবং তিনি যেখানে যাইতেছেন সেখানেই লোককে আইন লঙ্ঘন করিয়া অহিংস বিদ্রোহ করিতে বলিতেছেন। অথচ ঐ গ্রামে বক্তৃতা করার জন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। ব্রিটিশ আইনের মহিমা অপার। যেখানে বক্তৃতা না করিয়া "উপক্রম" করিলেই একজনের শাস্তি হয়, সেখানে অন্য একজনের বক্তৃতা করা সত্ত্বেও কিছু হয় না।

মানুষকে কোন কাজের জন্য সাজা দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য তাহাকে ও অন্য লোকদিগকে ভীত করিয়া ঐরূপ কাজ হইতে নিবৃত্ত করা। বল্লভভাই পটেল যে ভীত হন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। অন্যেরাও যে ভীত হয় নাই, তাহা গুজরাটে সত্যাগ্রহীর দল ক্রমশঃ বাড়িয়া চলা হইতেই বুঝা যাইতেছে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের "শাস্তি"

কলিকাতার মেয়র শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত স্বাস্থ্যলাভের জন্য জাহাজে সিঙ্গাপুর গিয়াছিলেন। যাতায়াতের পথে রেঙ্গুন পড়ে। অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি সেখানে গোটা দুই বক্তৃতা করেন। তাহার জন্য, তাঁহার কলিকাতা প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহাকে এখানে গ্রেপ্তার করিয়া রেঙ্গুন লইয়া যাওয়া হয়। কলিকাতায় পুলিস তাঁহাকে অন্য জামিন দিতে বলে নাই, তাঁহার নিজের জামিনেই তাঁহাকে বিচারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিতে চায়। কিন্তু তিনি জামিননামায় দস্তখত করিতে অস্বীকার করেন। সুতরাং সরকারী ব্যয়ে তাঁহাকে
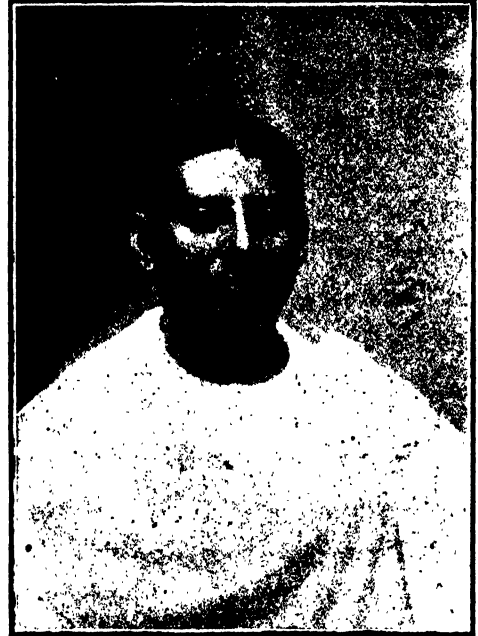
শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

জাহাজে তাঁহার পদোচিত আরামে রেঙ্গুন লইয়া যাওয়া হয়। রেঙ্গুনে তাঁহাকে আরামে হাজতে রাখা হয়। বিচারের সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে ও কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে অসম্মত হন এবং বলেন, যে, তদ্দ্বারা আদালতের প্রতি কোন রূঢ়তা প্রদর্শন তাঁহার অভিপ্রেত নহে। সরকার-পক্ষ হইতে যে-সব ইংরেজ, বর্ম্মী ও বাঙালী সাক্ষী ডাকা হয়, তাঁহাদের কাহারও সাক্ষ্যে সেনগুপ্ত মহাশয়ের কোন বক্তৃতায় সিডীশ্যন প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি পুলিসের রিপোর্টারদের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে দশ দিনের অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য ন্যায়বিচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নতুবা

আরও কঠিন শাস্তি দিতে পারিতেন। কিন্তু একেবারে খালাস দিবার স্বাধীনতা হয়ত তাঁহার ছিল না।

যাহা হউক, এইরূপ বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়ায় বর্ম্মা গবন্মেণ্টের কি লাভ হইল? তথাকার গবর্ণর বোকা বনিলেন, সেনগুপ্ত মহাশয় অনেকটা বিনি পয়সায় একটু বেড়াইয়া আসিলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও জনপ্রিয় হইলেন, বিচারের সময় রেঙ্গুনের আদালতের সম্মুখে দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইল, তথাকার নির্ব্বাপিত বা স্তিমিতপ্রায় রাজনৈতিক আন্দোলন আবার জ্বলিয়া উঠিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুনিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেটটি সেনগুপ্ত মহাশয়কে লঘু শাস্তি দেওয়ায় তাঁহার জাতভাই ইউরোপীয়দের দ্বারা লাঞ্ছিত হইতেছেন। তিনি নাকি জাতিতে আইরিশ এবং যতীন্দ্রবাবুকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গিয়া চা খাওয়াইয়াছিলেন।

এই ব্যাপারে আগাগোড়া যতীন্দ্রবাবুর আচরণ সুসঙ্গত হইয়াছে।

শ্রীমতী শন্নোদেবী

পঞ্জাবের জলন্দরস্থিত কন্যা মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী কুমারী শন্নোদেবী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে, ঐ

শ্রীমতী শন্নোদেবী

বিদ্যালয়ের জন্য এক লক্ষ টাকা তুলিতে না পারিলে তিনি আর জলন্দরে ফিরিয়া যাইবেন না। এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তিনি ভারতবর্ষের নানা স্থানে চাঁদা আদায় করিবার জন্য গমন করেন। কিন্তু এদেশে পঁয়ষট্টি হাজার টাকার বেশী তুলিতে পারেন নাই। তখন তিনি সমুদ্র পার হইয়া আফ্রিকা যাত্রা করেন। সেখানে কেবল টাঙ্গান্যীকা হইতেই পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তথাকার প্রবাসী ভারতীয়েরা বেশ মুক্তহস্ত। তাঁহার সাহস ও পরার্থপরতায় মুগ্ধ হইয়া সেখানকার ইংরেজরাও তাঁহাকে টাকা দিয়াছিলেন। তাঁহার মত মহিলাকে দেখিয়া ভারতনারী সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা কিছু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

পঞ্জাব শ্রীমতী শন্নোদেবীর গর্ব্ব করিতে পারে, ভারতবর্ষও পারে। নারীশিক্ষার উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য অল্পে অল্পে মহিলারা উদ্যোগী হইতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে শ্রীমতী শন্নোদেবীর দৃষ্টান্ত শিক্ষাপ্রদ, ও তাঁহার চেষ্টার সাফল্য উৎসাহজনক।

বর্ত্তমান সংগ্রামে নারীদের কর্ত্তব্য

স্বাধীনতার জন্য যে অহিংস সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে নারীদের কর্ত্তব্য তাঁহারা অনায়াসেই স্থির করিতে পারিবেন। আপাততঃ তিন প্রকার কাজ করিবার কথা হইয়াছে। পুরুষদের মত তাঁহারাও লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া লবণ প্রস্তুত করিতে পারেন। সত্যাগ্রহীদের দ্বারা প্রস্তুত লবণ ত তাঁহারা নিশ্চয়ই ক্রয় করিয়া রন্ধনের কার্য্যে লাগাইতে পারেন। তাহা কোথাও কিছু ময়লা বোধ হইলে জলে গুলিয়া থিতাইতে দিয়া উপরের জলটি রোদে রাখিলে বা জ্বাল দিয়া লইলে পরিষ্কার লবণ পাওয়া যাইবে। বিদেশী কাপড় না কিনিয়া দেশী কাপড় কেনা সম্পূর্ণরূপে মহিলাদের স্বেচ্ছাধীন। অনেক প্রসাধন ও বিলাসের জিনিষ, এমন কি অনেক খাদ্যদ্রব্যও, আজ কাল বিদেশ হইতে আনীত হইয়া মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র গৃহস্থদের বাড়ীতেও ব্যবহৃত হয়। সুস্থ ব্যক্তিদের জন্য সে সমুদয় পরিত্যাগ মহিলাদের সাধ্যায়ত্ত। বিদেশী বস্ত্রাদির দোকানে পিকেটিংও তাঁহারা করিতে পারেন—বিশেষতঃ যে-সব প্রদেশে অবরোধ প্রথা নাই। তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সুরা ও অন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা তাঁহারা করিতে পারেন, এবং সেই উদ্দেশ্যে দরকার হইলে তাঁহারা সত্যাগ্রহ করিয়া উপবাস দিয়া থাকিতে পারেন। যে সব প্রদেশে অবরোধ প্রথা নাই, সেখানে মদ্যাদির দোকানে মহিলারা পিকেটিং করিতে পারেন। যে সব জায়গায় পর্দ্দার চলন আছে,

থায় ইহা সহজসাধ্য বা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে; ন্তু সেখানেও, অবরোধ মুক্ত ভাবে যাঁহারা চলাফিরা রিতে অভ্যস্ত, তাঁহারা ইহা হয়ত করিবেন।

পিতা স্বামী ভ্রাতা পুত্র প্রভৃতিকে স্বাধীনতা-সংগ্রামে স্ততঃ উৎসাহ দিতে বা বাধা না দিতে মহিলারা পারেন।

যাঁহারা আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টার পক্ষপাতী নহেন, কেবল ক্ত তর্ক সমালোচনা প্রতিবাদ প্রভৃতির পক্ষপাতী, াহারা এই সব উপায়েরই চূড়ান্ত পরীক্ষা করিয়া দেখুন। বল গান্ধীজীর সমালোচনা, তাঁহাকে উপহাস করিলে লিবে না। যাঁহাদের মত ও পথ ভিন্ন, তাঁহারা তাঁহার ত সাহসের সহিত নিজেদের পথেরই বিপদ বরণ করুন। হা পুরুষ ও নারী উভয়েরই কর্ত্তব্য।

—

অহিংস সংগ্রামের ফলাফলের সময় নির্দ্দেশ

সশস্ত্র যুদ্ধ দ্বারা যে সব দেশ স্বাধীন হইয়াছে, াহাদেরও তাহাতে সময় লাগিয়াছে—অনেক দেশের য়েক বৎসর সময় লাগিয়াছে। অহিংস সংগ্রামের দ্বারা ধীনতা লাভের চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। হাতে কত সময় লাগিতে পারে, ইহাতে পতন অভ্যুদয় য়পরাজয় কি আছে কত আছে, কোন ঐতিহাসিক ীর দ্বারা তাহা অনুমান করিবার জো নাই। স্তু ইহাতে সশস্ত্র বিদ্রোহ অপেক্ষা বেশী বই কম সময় গিবার কথা নহে; অন্ততঃ সমান সময় লাগিবে। তএব, পরাধীনতা যাঁহাদের একান্ত অসহ্য হইয়াছে, হাদিগকেও ধৈর্য্য ধারণ করিতে হইবে। ইংরেজ ভুরা আমাদিগকে "ইম্পেশ্যাণ্ট আইডিয়ালিষ্ট" অর্থাৎ য্যহীন আদর্শকামী বলিয়া থাকেন। তাঁহারা চান, যে, মরা অনন্তকাল বা অনির্দ্দিষ্ট কাল তাঁহাদের মর্জ্জির পর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া বসিয়া থাকি। আমরা ধীনতালিপ্সু সত্যাগ্রহীদিগকে সেই অর্থে ধৈর্য্যশীল ইতে বলিতেছি না। আমাদের কথার অর্থ এই, যে, াহারা স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন কিন্তু তিশীঘ্র সফলকাম না হইলে নিরাশ হইবেন না।

আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। যে-সব াতি স্বাধীনতা রক্ষা বা লাভের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধ করে, াহারাও সবাই দিন রাত কেবল যুদ্ধই করে না। পায়চিন্তা পরামর্শ প্রভৃতির জন্য সময় রাখে। সমর্থ াকিবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি থাকিয়া কখন খন খেলাধূলা আমোদ প্রমোদ পর্য্যন্ত করে। অর্থাৎ াসল কাজ, মুখ্য কাজ ও লক্ষ্য হইল জয়লাভ; কিন্তু াহার সহায়ক ও অপরিপন্থী অন্য কাজও করা যাইতে ারে।

জাতির যে-সব লোক যুদ্ধক্ষেত্রে যায় না, যাইতে পারে না, তাহারা জাতিকে ও যোদ্ধাদিগকে হৃদয়মন-শরীরে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য এবং রসদ যোগাইবার জন্য সচেষ্ট থাকে।

—

সরকারী কর্ম্মচারীদের দেশসেবা

চৈত্রের প্রবাসীতে আমরা এই মর্ম্মের কথা লিখিয়া-ছিলাম, যে, যে-সকল দেশী সরকারী কর্ম্মচারী বৈধ ও সুনীতিসঙ্গত ভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য করেন, তাঁহারাও পরোক্ষভাবে দেশকে পরাধীন রাখিতে ইংরেজকে সাহায্য করেন। কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এক প্রকারের দেশসেবা ও জাতিসেবার উল্লেখ করা হয় নাই। তাঁহাদের কাজের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে, যে, ছোট বড় যে-কোন কাজের ভার দেশী লোকের উপর পড়ে, তাহা তাঁহারা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ। ইহা আমাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে কেবল ইংরেজ ও অন্য বিদেশীদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্যই যে দরকার ছিল, তাহা নহে। আমাদের দেশেরও বিস্তর লোকের এই বিশ্বাস ছিল এবং এখনও অনেকের আছে, যে, আমরা নিকৃষ্ট, আমাদের নিকৃষ্টতা জাতিগত, আমরা অনেক কাজই পারি না। এই মিথ্যা নিকৃষ্টতাবোধ যে-পরিমাণে সরকারী দেশী কর্ম্মচারীদের দ্বারা দূরীভূত হইয়াছে, সেই পরিমাণে তাঁহারা দেশের সেবা করিয়াছেন। তা ছাড়া, তাঁহাদের দ্বারা সুবিচার, চোরডাকাত দমন, শিক্ষাবিস্তার, স্বাস্থ্যরক্ষা, প্রভৃতি যে-সব কাজ হইয়াছে তাহাও দেশের সেবা—যদিও তাহার দ্বারা পরোক্ষ ভাবে এই ধারণাও জন্মিয়াছে, যে, পরাধীনতাও দেশের পক্ষে কিছু মঙ্গলকর হইতে পারে।

—

অনাবশ্যক বৈদেশিক প্রভাব বিস্তার

কতকগুলি জিনিষ ও কার্য্যপ্রণালী আমাদিগকে বিদেশী লোকদের নিকট হইতে লইতে হয়। যেমন ছাপিবার কল, ছাপিবার প্রক্রিয়া, বিদেশী ভাষার পুস্তক, ইত্যাদি। অনেক স্বাধীন সভ্যদেশের লোকদিগকেও কোন কোন জিনিষ ও প্রক্রিয়া বিদেশ হইতে লইতে হয়। সব জাতি সব রকম জিনিষের আবিষ্কর্ত্তা ও নির্ম্মাতা নহে, হইতে পারে না। নানা জাতির মধ্যে আদান প্রদানে শুধু যে দোষ নাই, তাহা নহে, তাহা আবশ্যক। তাহার দ্বারা মানব জাতির মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও মৈত্রী বৃদ্ধি হয়। কিন্তু কোন জাতি যদি কেবলই ধার করে, দিতে পারে না, তাহা হইলে তাহা দোষের বিষয় হয়।

যেগুলা অনাবশ্যক, কিংবা যাহা আমরা নিজেই প্রস্তুত করিতে পারি ও করা উচিত, তাহা বিদেশ হইতে লওয়া অনুচিত।

অনেক বিদেশী খেলা আছে, তাহাতে অনর্থক অপব্যয় ও সময় নষ্ট হয়। দেশী অনেক খেলাতে সেইরূপ স্বাস্থ্য-বৃদ্ধি, নেতৃত্ব শিক্ষা বা আমোদ হইতে পারে। তাহার জায়গায় বিদেশী খেলার অনুকরণ ঠিক্ নয়। বিদেশী কোন খেলাই লইতে হইবে না, বলিতেছি না; কিন্তু রাষ্ট্রীয় পরাজয় ও অধীনতা, শিল্পবাণিজ্যে পরাজয় ও অধীনতা, মহাজনীতে অধীনতা, শিক্ষা ও জ্ঞানলাভে অধীনতা, আর্টে অধীনতা, ইত্যাদি অধীনতা ত আছেই; তাহার উপর খেলার নকলে যে পরাজয় ও অধীনতা তাহা মাথা পাতিয়া লওয়া উচিত নয়।

আমাদের দেশে শিশুদের সব খেলনা আগে দেশেই নির্ম্মিত হইত। চীনে মাটির পুতুল প্রভৃতি পরে বিদেশ হইতে আসিতে আরম্ভ করে। সেগুলা অবশ্য বিদেশী শিশু ও স্ত্রীপুরুষদের মূর্ত্তি এবং জীবজন্তুর মূর্ত্তি। ক্যালকাটা পটারী ওয়ার্কসে এইরূপ পুতুল দেশী মানুষ ও শিশুর হওয়ায় যাঁহারা স্বদেশী জিনিষ চান, তাঁহাদের সুবিধা হইয়াছিল। হাত তাহার বিদেশী নকলও হইয়াছে।

অনেক দিন হইতে বাজারে ছোট বড় ফাপা বিদেশী পুতুল বিক্রী হইতেছে। এই পুতুলগুলির রং গোলাপী কটা, চুল কটা, পোষাক বিদেশী। ইহার দ্বারা শৈশব হইতে আমাদের শিশুদের হৃদয়মনের উপর অজ্ঞাতসারে বৈদেশিক প্রভাব বিস্তৃত হইতেছে; তাহাদের রুচি বিদেশী ফ্যাশন অনুযায়ী হইতেছে। দেশী পোষাক পরা দেশী রকমের চেহারার এইরূপ পুতুল নির্ম্মাণ করিবার কারখানা বাংলা দেশেই স্থাপিত হওয়া উচিত। নতুবা কোন্ দিন দেখিব ধুতি পরা, সাড়ী পরা, কাল চুলওয়ালা শিশুর পুতুল বিদেশ হইতে আসিয়া বাজারে আধিপত্য করিতেছে।

জীবজন্তুর, মানুষের, রেলওয়ের, জাহাজের ও অন্য নানা পদার্থের রঙীন ছবিযুক্ত বিস্তর ইংরেজী খেলনার বহি অনেকদিন হইতে বাঙালীর ঘরে ঘরে দেখা যাইতেছে। যে সব শিশু পড়িতে শিখে নাই, যাহারা শুধু বাংলা পড়িতে পারে, তাহাদের হাতেও এই সব বহি দেখা যায়। এই রূপ বাংলা বহি কোন বাঙালী পুস্তকপ্রকাশক প্রকাশ করিলে তাঁহার লোকসান হইবে না, লাভই হইবে। অধিকন্তু তাঁহার দ্বারা এই দেশসেবা হইবে, যে, তিনি শিশুদিগকে এই পরোক্ষ ধারণা হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন, যে, তাহাদের মজার জিনিষ কেবল বিদেশীরাই যোগাইতে পারে। এই সব ছবির বহির ছবির নানা রং বেশ ঘোরালো হওয়া চাই। লিথোর উপর বার্নি[illegible] হইলে তবে বিদেশীর মত হইবে। কাগজ বে[illegible] মজবুত ও পুরু হওয়া চাই। কোন কোন এই রূপ বিদে[illegible] বহির কাগজের পিঠে কাপড় আঁটা থাকায় শিশুরা তা[illegible] সহজে ছিঁড়িতে পারে না। এই রকম বহি বাহির করা আমাদের দেশের ছাপাখানার ও পুস্তক-প্রকাশকদে[illegible] সাধ্যের অতীত নহে।

আমাদিগকে যেমন বড় বড় বিষয়ে মন দিতে হইবে তেমনি ছোট বলিয়া আপাতপ্রতীয়মান জিনিষের প্রতি[illegible] মনোযোগী হইতে হইবে। শুনিয়াছি, খৃষ্টিয়ানদের মধ্যে জেস্যুইটরা বলেন, তাঁহারা দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শিশুদে[illegible] শিক্ষার ভার পাইলে পরে তাহাদের ভার কে পাই[illegible] তাহা বড় একটা গ্রাহ্য করেন না। শৈশবে জ্ঞাত [illegible] অজ্ঞাতসারে হৃদয়মনের উপর যে ছাপ পড়ে, তাহ[illegible] স্থায়িত্ব খুব বেশী। দেশের যাহা কিছু ভাল, তাহা য[illegible] আমাদের শিশুদিগকে দিয়া ভবিষ্যদ্বংশাবলীর [illegible] রক্ষা করিতে চাই, তাহা হইলে তাহাদের উ[illegible] কিসের প্রভাব পড়িতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ সতর্ক থা[illegible] একান্ত আবশ্যক।

—

মহিষ ও মানুষ

আমরা শৈশব হইতে চাষের কাজে ও শকটদ্ব[illegible] ভারবহনের কাজে মহিষের ব্যবহার দেখিয়া আসিতে[illegible] ১২টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত গোরু গাড়ী টানিবে [illegible] মহিষ টানিবে না, এরূপ রীতি দেখি নাই। খুব রো[illegible] সময় শ্রমিক মানুষ ও পশু উভয়েই বিশ্রাম করে, শৈ[illegible] হইতে দেখিয়াছি। এই রীতি গরম দেশের উপযো[illegible] শীতের দেশ হইতে প্রভু ও বণিক উভয়ই আমদ[illegible] হওয়ায় এখন আফিস আদালত দোকান স[illegible] বিকাল না হইয়া দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত [illegible] সুতরাং আফিস আদালত স্কুল কলেজ বড় কার[illegible] দোকানের সহিত যাহাদের সম্পর্ক, দুপরে বি[illegible] তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না। এ অবস্থায় যদি [illegible] হয়, বাণিজ্যের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ কেবল [illegible] মহিষশকটচালকদিগকে ও মহিষগুলিকে দুপর ব[illegible] হইতে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেই হ[illegible] তাহা হইলে কেমন খটকা লাগে। ঐ সময়টা কাজক[illegible] প্রধান সময়। কারণ, অনেক কারবারের দোকান [illegible] ও অন্য গুদাম ১০টা ১১টার সময় খুলে। [illegible] হইতে মাল লইয়া গাড়ীতে বোঝাই করিতে সময় ল[illegible] তাহাতে প্রায় ১২টা বাজিয়া যাইতে পারে। ত[illegible] পর তিন ঘণ্টা নড়চড় করা নিষিদ্ধ হইলে শকটচাল[illegible]

কে কাজ দিবে? মোটরলরীওয়ালাকেই তাহা হইলে মালবহনের একচেটিয়া অধিকার দিতে হয়। ফলে শকটচালকদের অন্ন মারা যায়। বাক্‌শক্তিহীন মহিষ বা অন্য পশুর প্রতি দয়া করিতে নিষেধ করিতেছি না; কিন্তু মহিষের প্রতি দয়া করিতে গিয়া গরীব দেশী মানুষের অন্ন মারিয়া বিদেশী মোটর ও লরী বিক্রেতাদের টাকার সিন্ধুক বোঝাই, অনভিপ্রেত ভাবে ও অজ্ঞাতসারে করিলেও, দয়াই কর্ত্তাদের কর্ম্মের একমাত্র কারণ কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হয়।

যদি এইরূপ প্রস্তাব করা হয়, যে, ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত মালবহনের কাজ মহিষের গাড়ীও করিবে না, মোটরলরীও করিবে না, দয়ালু ব্যক্তিরা তাহাতে রাজী হইবেন না। কিন্তু আর এক রকম বন্দোবস্ত নিশ্চয়ই সাধ্যাতীত নহে। ১২টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত রাস্তার সব গাড়ীর মহিষের মাথা ও পৃষ্ঠদেশ মোটা মোটা ভিজা চটে ঢাকা থাকিবে ও তাহা শুকাইতে দেওয়া হইবে না, এবং গাড়ীগুলি এরূপ করিতে হইবে, যে, কেবল মহিষের পিঠের উপর ছত্রী বা ছই থাকিবে। তাহাতে পশুগুলি অনেকটা ছায়ায় থাকিবে। এই ধাচের গাড়ী তৈরী করা বিশেষ ব্যয়সাধ্য হইবে না।

—

গুলি দ্বারা চিকিৎসা

যে দেশে মানুষের জীবনের মূল্য নাই বা অত্যন্ত কম, সে দেশে গুলিদ্বারা চিকিৎসার প্রসারবৃদ্ধি সহজেই ঘটে। কলিকাতার মহিষের গাড়ীর গাড়োয়ানরা তাহাদের রোজগার কমিয়া যাওয়ায় ১২টা—৩টা বিশ্রামের হুকুম অমান্য করিয়া গাড়ী লইয়া হাবড়া পুলের নিকটবর্ত্তী রাস্তায় অন্য যানবাহনের চলাচল বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা এরূপ করিবার পূর্ব্বে তাহাদের আবেদন-নিবেদনে কর্ত্তৃপক্ষ কর্ণপাত করিয়াছিলেন কিনা জানি না। পুলিসের লোকে তাহাদের দ্বারা ও পরে নিজেদের চেষ্টায় গাড়ীগুলি সরাইয়া রাস্তা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করে। ক্রমে পুলিসের উপর গাড়োয়ানরা এবং কোন কোন বাড়ীর ছাদ হইতে অন্য লোকেরা ইট পাটকেল ঢিল ছুঁড়িতে থাকে। উভয় পক্ষের অনেক লোক আহত হয়। তখন পুলিস গুলি চালায়। তাহাতে কয়েকজন লোকের মৃত্যু হয়। খবরের কাগজে ব্যাপারটি সংক্ষেপে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

পুলিসকে গাছের মত সহিষ্ণু হইয়া দাঁড়াইয়া মৃত্যু বরণ করিতে কেহ বলিবে না। কিন্তু গুলি চালান ভিন্ন অন্য উপায় ছিল না, সব সময়ে সব ক্ষেত্রে ইহা বিশ্বাস করা যায় না। অনেক জায়গায় ব্যাটন ও রেগুলেশ্বন লাঠি চালাইয়া, রাস্তার জল দিবার হোস দ্বারা জল নিক্ষেপ করিয়া, অবিরাম-অশ্রুউৎপাদক গ্যাসের বোমা (tear gas bomb) ছুঁড়িয়া, ফাঁকা আওয়াজ করিয়া, কিংবা সাংঘাতিক ভাবে গুলি না চালাইয়া শরীরের নিম্নার্দ্ধের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালাইয়া কেবল জখম করিয়া, দাঙ্গা থামান যায়। এই সব উপায়—বিশেষতঃ অশ্রু-বোমা—অবলম্বিত হইতে বেশী শোনা যায় না; আমরা যতদূর জানি অশ্রুবোমা ভারতবর্ষের কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই। কারণ, পুলিস ও পুলিসের কর্ত্তারা দেশের লোকের কাছে জবাবদিহি নহে।

অন্য রকমের ধর্ম্মঘট বা জনতা ভাঙিবারও উপায় গুলি চালান। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্‌সুলার রেলওয়ের শ্রমিকদের উপর এবং একটি খনির শ্রমিকদের উপর এই ঔষধ প্রয়োগ করা হইয়াছে। মৃত ও আহত লোকদের জন্য আমরা দুঃখিত। কিন্তু চিকিৎসকদিগের জানা উচিত, ইহাতে সমস্যার সমাধান হইবে না, এবং তাহাদের লাভও শেষ পর্য্যন্ত হইবে না। লোকে চিরকাল ভয়ে ভীত থাকে না।

—

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনের ফল

রায় সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয় তাঁহার বাল্য-বিবাহ নিরোধ বিল পাস করাইয়াছিলেন, বাল্যবিবাহ বন্ধ করিবার জন্য। কিন্তু তাহা ১লা এপ্রিল ১৮ই চৈত্র হইতে জারী হইবে জানিয়া ভ্রান্ত গোঁড়া লোকেরা ঐ তারিখের পূর্ব্বে এমন সব শিশুরও বিবাহ দিয়াছে যাহাদের বয়সে বিবাহ হইবে বলিয়া রঘুনন্দন স্বপ্নেও কল্পনা করেন নাই। কয়েক দিন মাত্র বয়সের, এক মাসেরও কম বয়সের খুকীর, বিবাহ অনেকগুলি হইয়া গিয়াছে! ইহা শুনিতে হাসি পায় বটে, কিন্তু ইহা অতি শোচনীয় ও লজ্জাকর ব্যাপার। অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সের অথচ চৌদ্দ অপেক্ষা কম বয়সের বালিকার বিবাহ ত হাজার হাজার হইয়া গিয়াছে!

যাহা হউক, ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকাদের প্রকাশ্য বিবাহ এই শেষ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বয়স লুকাইয়া বা গোপনে অল্প বয়সের বালিকার বিবাহ আরও হইতে পারে।

এতগুলি শিশুবলি যে দুই এক মাসের মধ্যে হইয়া গেল, ইহা শারদা আইনের কুফল বটে। কিন্তু ভূত পিশাচদের সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে, যে, তাহারা কোন জায়গা হইতে তাড়িত হইলে একটা গাছের ডাল বা ঘরের মটকা ভাঙিয়া দিয়া চিহ্ন রাখিয়া যায়। হাজার

হাজার শিশুর বিবাহ সেইরূপ, বাল্যবিবাহ যে গেল, তাহার চিহ্ন স্বরূপ।

শারদা আইন যখন পাস হয় নাই, তখন ইহার বিরোধীরা প্রধানতঃ দুই দলে বিভক্ত ছিলেন। একদল বলিতেন, "বাল্যবিবাহে কোন দোষ নাই, বরং উহা ভাল ও ধর্ম্মরক্ষার জন্য একান্ত আবশ্যক; অতএব আইন করিলে বড় জুলুম হইবে, আমাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে।" অন্য দল বলিতেন, "বাল্যবিবাহের দোষ আছে; কিন্তু আমরা নিজেই উহার সংশোধন করিব, বিদেশী গবর্মেণ্ট কেন আমাদের সামাজিক ও ধার্ম্মিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবে? তা ছাড়া, শিক্ষিত ও ভদ্র সমাজ হইতে ত উহা প্রায় উঠিয়াই গিয়াছে।" কোন দলের সহিতই তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু তথ্য সম্বন্ধে একটা ভ্রম প্রদর্শিত হইতে পারে। ১লা এপ্রিল ১৮ই চৈত্রের পূর্ব্বে তাড়াতাড়ি কেবল অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীর লোকেরাই খুকীদের বিবাহ দেয় নাই; খুব উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত ও উচ্চপদস্থ লোকেরাও তাহা করিয়াছেন! একটা এইরূপ বিবাহ লইয়া কাগজে আলোচনা হইয়াছে বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেছি। মাহমুদাবাদের মহারাজা অযোধ্যা প্রদেশের এক জন বড় তালুকদার এবং মুসলমানদের বড় নেতা। তাঁহার ছয় বৎসরের পুত্রের সহিত লক্ষ্ণৌ চীফ্ কোর্টের জজ ওয়াজির হোসেনের চারি বৎসরের কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। মান্দ্রাজের এক জন ভূতপূর্ব্ব হিন্দু হাইকোর্ট জজের বাড়ীতেও একটি বাল্যবিবাহ তাড়াতাড়ি হইয়া গিয়াছে। তাঁহার নামটি মনে পড়িতেছে না। অন্য কোন কোন হিন্দু শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সম্বন্ধেও এইরূপ কথা শুনিয়াছি।

যাহা হউক, এখন ধনী দরিদ্র উচ্চ নিম্ন সকল শ্রেণীর সকল বালিকার লেখাপড়া ও নৈতিক শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের উত্তেজনায় ইহা ভুলিয়াথাকিলে বড় অকল্যাণ হইবে। বাংলা দেশের মত যে সব প্রদেশে নারীনির্যাতন অধিক হয়, সেখানে অবিবাহিতা বালিকাদের এবং অন্য নারীদের রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য পুরুষদের অধিক দলবদ্ধ ও সাহসিক-কর্ম্মশীল হওয়া দরকার।

—

বঙ্গে নারীনির্যাতন

সে দিন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত বিজয়-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সুধাংশুমোহন বসুর বক্তৃতায় বঙ্গে নারীনির্যাতনের আধিক্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। সরকারী সভ্য মিঃ মোবার্লী বলেন, যে, নারীদের উপর অত্যাচার যাহা হয় তাহা দুঃখের ও চিন্তার বিষয় বটে, কিন্তু বঙ্গের আয়তন ও লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে এরূপ অত্যাচারের সংখ্যা বেশী নয়। আমাদের বিবেচনায় ইহা তাঁহার ভ্রম। ব্রিটেনের লোকসংখ্যা বঙ্গের প্রায় সমান। সেখানে নারীহরণাদি অত্যাচার কত হয়? পাশ্চাত্য কোন কোন দেশে পুরুষ নারী উভয় পক্ষের সম্মতিজাত দুর্নীতি হয় ত বেশী, কিন্তু বঙ্গে, সিন্ধুদেশে, পঞ্জাবে, কাঠিয়াবাড়ে, রাজপুতানায় ও অন্য কোন কোন অঞ্চলে যে প্রকারের অত্যাচার হয়, পাশ্চাত্য ঐ সব দেশে তাহা হয় না।

মোবার্লী সাহেব বলিয়াছেন, গবর্ন্মেণ্ট প্রতিকার চিন্তা করিতেছেন, এবং এইরূপ অপরাধ নিবারণের কোন উপায় করা যায় কিনা পুলিসের ইনস্পেক্টর-জেনারালের সহিত সে বিষয়ে পরামর্শ হইতেছে। ফল কি হয় দেখা যাক।

—

প্রাথমিক শিক্ষা বিল

বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী প্রাথমিক শিক্ষা বিল প্রত্যাহার করিয়াছেন। তাহার প্রধান কারণ, সিলেক্ট কমিটি উহা সংশোধন করিয়া শিক্ষার কর্তৃত্ব গবর্ন্মেণ্টের হাত হইতে লইয়া একটি বোর্ডের হাতে দিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন! সরকার বাহাদুর চান, প্রজারা শিক্ষার জন্য নূতন ট্যাক্স প্রদান করুক, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব তাহারা করিতে পারিবে না। অতঃপর একটা নূতন বিল পেশ হইবে।

—

বিলাতী মেডিক্যাল কৌন্সিলের ঔদ্ধত্য

বিলাতী মেডিক্যাল কৌন্সিল চাহিয়াছিলেন, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সকলের চিকিৎসা বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত একজ ইংরেজ ডাক্তার পরীক্ষা করিবেন। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা তাহাতে রাজী না হওয়ায় উক্ত কৌন্সিল চিকিৎসা-বিদ্যায় ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উপাধিগুলি গ্রাহ্য করিবেন না স্থির করিয়াছেন। ব্রিটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের বাহিরে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শিক্ষার বন্দোবস্ত পরীক্ষা করিবার অধিকার কোন আইন অনুসারে ব্রিটিশ মেডিক্যাল কৌন্সিলের নাই। কিন্তু যাহাদের প্রভুত্ব থাকে, তাহাদের অধিকার না থাকিলেও তাহারা কর্ত্তৃত্ব ফলায়।

ব্রিটিশ কৌন্সিলের এই জুলুমে আমাদের ডাক্তার গ্রাজুয়েটেরা চিকিৎসাবিষয়ক ব্রিটিশ উপাধি পাইবে না, উপাধিলাভের পর ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে পোষ্টগ্রাজুয়েট শিক্ষা পাইবে না, এবং চাকরী (বিশেষতঃ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসের) পাইবে না। কিন্তু ইউরোপের

জার্ম্যানী ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার চিকিৎসাবিষয়ক শিক্ষা ও উপাধি বিলাতী শিক্ষা ও উপাধির চেয়ে নিকৃষ্ট নহে; অধিকন্তু সেই সব দেশে কোথাও কোথাও বিলাত অপেক্ষা কম খরচে উৎকৃষ্টতর শিক্ষা পাওয়া যায়। যাঁহারা সরকারী বড় চাকরী চান, তাঁহাদের আপাততঃ অসুবিধা হইতে পারে বটে। কিন্তু এখন দেশে স্বাধীনতার চেষ্টা চলিতেছে। স্বাধীনতা লব্ধ হউক বা না হউক, গবর্মেণ্ট স্বাধীনতাপ্রয়াসী দলে সকলে যাহাতে যোগ না দেয় তাহার জন্য কোন শ্রেণীর চাকরীই ইংরেজদের একচেটিয়া রাখিতে পারিবেন না; সুতরাং চাকরী ভারতীয় ডাক্তারদিগকে দিতেই হইবে। আর যদি ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়, তাহা হইলে কোথায় বা ব্রিটিশ মেডিক্যাল কৌন্সিল, কোথায় ব্রিটিশ অন্য কিছু!

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কৌন্সিলের এই চা'লটা আই-এম-এসের চাকরীগুলা এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ের বেশী লাভজনক উচ্চ অংশটা ইংরেজদের হাতে রাখিবার ইচ্ছা-প্রসূত। কিন্তু চাকরীর কথা যাহাই হউক, ইংরেজ ডাক্তারদের ডাকা না-ডাকা দেশী লোকের হাতে। এখন ভারতবর্ষে এত ভাল ভাল দেশী ডাক্তার আছেন, যে, ইংরেজ ডাক্তার ডাকা অনেক সময়ই কেবল মোহের ফল।

ব্রিটিশ মেডিক্যাল কৌন্সিল নাকি মনে করেন, আমাদের ডাক্তাররা ধাত্রীবিদ্যা ভাল করিয়া শিখেন না। কিন্তু ধাত্রীবিদ্যায় পারদর্শী অনেক দেশী ডাক্তার আছেন, এবং সবাই যে চিকিৎসাদি বিদ্যার সব অংশে সমান পারদর্শী হইবে এমন কোন কথা নাই। ইংরেজ আই-এম-এস ডাক্তাররাও ত তাঁহাদের দেশ হইতে কলেরা কালাজ্বর রক্তামাশয় প্রভৃতির চিকিৎসা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে শিখিয়া আসেন না।

বিলাত হইতে ঔষধ ও অস্ত্র চিকিৎসাদির যন্ত্রাদি না কিনিবার যে প্রস্তাব হইয়াছে, তাহা উত্তম। আত্মনির্ভরশীল হইবার জন্য উহা করা আবশ্যক। কিন্তু ইংলণ্ডের পরিবর্ত্তে অন্যান্য দেশ হইতে ঐ সব জিনিষ আনিলে ইংরেজেরা কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও তাহাতে ভারতবর্ষের উন্নতি হইবে না। ঔষধ পরীক্ষা ও প্রস্তুত করিবার জন্য আমাদের পরীক্ষণালয় ও কারখানা এবং অস্ত্রাদি নির্ম্মাণের আমাদের কারখানা চাই। ধনী ডাক্তার ও ঔষধবিক্রেতারা এবং স্বদেশপ্রেমিক দেশী রাজ্যের রাজারা তাহা স্থাপনের চেষ্টা করুন।

—

ভারতে ও বিদেশে উচ্চতম সরকারী বেতন

গান্ধীজী বড়লাটকে লিখিত তাঁহার চিঠিতে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীর বেতন, বড়লাটের বেতন, এবং ইংলণ্ডের ও ভারতের লোকদের মাথাপিছু গড় আয়ের উ[ল্লেখ] করিয়াছেন। আমরা ভারতবর্ষ, আমেরিকা ও জাপা[নের] উচ্চতম বেতনের সহিত ঐ সকল দেশের নিম্নপ[দস্থ] কর্ম্মচারীদের বেতনের ও লোকদের মাথাপিছু আয়ের তুলনা করিব।

ভারতের বড়লাট শুধু বেতন পান বৎসরে আ[ড়াই] লক্ষ টাকা; নানা রকমের ভাতায় পান যে আরো ক[ত] লক্ষ তাহা ধরিব না। ভারতীয় লোকদের মাথা[পিছু] বার্ষিক গড় আয় সকলের চেয়ে বেশী ধরিয়াছেন অধ্যা[পক] ফিণ্ডলে শিরাস। তাহা ১১৬ টাকা। তাহা যদিও ঠিক [নয়,] তথাপি তাহাই ঠিক বলিয়া মানিয়া লইলাম। ত[াহা] হইলে শুধু বেতন হইতেই বড়লাটের আয় ভারতী[য়দের] গড় আয়ের ২১৫৫ গুণ। ভারতবর্ষের গ্রাম্য চৌকিদা[র] কোথাও কোথাও মাসে ৫।৬ টাকা বেতনও পায়। ত[াহা] না ধরিয়া আমরা পাহারাওয়ালাদের বার্ষিক বেতন ২[৫০] টাকা (আড়াই শত টাকা) ধরিলাম। তাহা হইলে বড়[লাট] এই নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারীদের এক হাজার গুণ বেতন পা[ন]।

আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের দেশপ[তি] (প্রেসিডেণ্ট) কোন দেশের সম্রাটের কর্ম্মচারী নহেন, বে[কোন] দেশের সম্রাট অপেক্ষা মর্য্যাদায় হীন নহে[ন]; ইউনাইটেড্ ষ্টেটস কোন দেশের চেয়ে হীন নহে। তাহ[ার] দেশপতি বেতন পান বার্ষিক ৭৫,০০০ ডলার—অ[র্থাৎ] বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে ২,০৭,৭৫০ টাকা। ঐ দে[শের] লোকদের মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় ১৭১৬ টাকা [—] পৃথিবীতে সর্ব্বোচ্চ। কিন্তু তাহার দেশপতি দ[রিদ্র] ভারতের বড়লাটের চেয়ে কম বেতন পান। আমেরিক[ার] প্রেসিডেণ্টের বেতন তথাকার এক একজন লো[কের] গড় আয়ের ১২১ গুণ মাত্র। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক[দের] গড় প্রায় খুব বেশী ধরিলেও বড়লাটের বেতন তাহ[ার] ২১৫৫ গুণ। আমেরিকার পাহারাওয়ালাদের সর্ব্বে[াচ্চ] বেতন বার্ষিক ২,৫০০ ডলার। প্রেসিডেণ্ট তাহাদের কে[বল] ৩০ গুণ বেতন পান। ভারতের পাহারাওয়ালাদের বে[তন] বেশী করিয়া বৎসরে ২৫০ ধরিলেও বড়লাট পান তাহ[ার] হাজারগুণ বেতন।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী বৎসরে ১২,০০০ ইয়েন বে[তন] পান। বর্ত্তমান বিনিময়ের হারে ইহা ১৬,২০০ টাক[ার] সমান। জাপানীদের মাথাপিছু গড় বাৎসরিক অ[ায়] ৩৫১ টাকা। তাহা হইলে তথাকার প্রধানমন্ত্রী জাপানী[] দের গড় আয়ের ৪৬ গুণ বেতন পান। ভারতের বড়ল[াট] পান আমাদের গড় আয়ের ২,১৫৫ গুণ। জাপানে সর্ব্বনি[ম্ন] শ্রেণীর কর্ম্মচারীদিগকে হান্-নিন বলা হয়। ইহাদের এগ[ার] উপশ্রেণীর নিম্নতম একাদশ উপশ্রেণীর লোকেরা বার্ষি[ক]

ইয়েন বেতন পায়। তাহা হইলে জাপানী প্রধান-নিম্নতম এই কর্ম্মচারীদের কেবল ২৫গুণ বেতন। বড়লাট পাহারাওয়ালাদের হাজারগুণ বেতন।

মনে রাখিতে হইবে, ইউনাইটেড ষ্টেটস ও জাপান য়েই ভারতবর্ষ অপেক্ষা ধনী এবং প্রথম ার শক্তিশালী স্বাধীন দেশ; ভারতবর্ষ দরিদ্র ধীন দেশ। আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট সকলের চেয়ে ও শক্তিশালী দেশের গবর্মেণ্টের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। ানের প্রধান মন্ত্রী এসিয়ার সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও ান্ দেশের গবর্মেণ্টের নেতা।

—

অনিচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি

লণ্ডন টাইম্‌স্ গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী একটি "ভারতবর্ষ া" বাহির করে। তাহাতে দুজন ইংরেজ লেখক কথা বলিয়াছেন, যাহা অনিচ্ছাকৃত স্বীকারোক্তি মনে যাইতে পারে। মৃত স্যার ভ্যালেণ্টিন চিরল (না ল ?) একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

Never, perhaps, has the profound difference veen the Hindu and Mohamedan mentality so strikingly illustrated as during the period n India was definitely passing under British ."

তাৎপর্য্য। "যখন ভারতবর্ষ নিশ্চিতরূপে ব্রিটিশ নের অধীন হইতেছিল, তখন যেমন হিন্দু ও মানের মনোভাবের গভীর পার্থক্যের সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত য়া গিয়াছিল, এমন বোধ হয় আর কোন সময়ে ।"

বিদেশী মুসলমানদের দ্বারা সিন্ধুদেশ আক্রমণেরও নক আগে মালাবার উপকূলে হিন্দুরাজার রাজ্যে মান আরব বণিকেরা যাতায়াত করিত এবং অনেকে ানে বসবাস ও তথাকার কতক লোককে মুসলমান দীক্ষিত করিয়াছিল। তখন হিন্দু মুসলমানের াভাবের পার্থক্য দেখা গেল না। তাহার পর শত বৎসর ধরিয়া ভারতের নানা অংশে মুসলমান ও ন কোন অংশে হিন্দু রাজত্ব করিল। তখনও ঐ ভটা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হইল না। কিন্তু যখন রজ রাজা হইতে বসিল, তখনই উহা বিশেষ ব ফুটিয়া উঠিল। এই বিকাশ কিসের বা কাহার কি অবস্থায় হইল, তাহা চিন্তনীয়। এই বিকাশ জের কৌশলের ফল, না ইংরেজ শাসন ইহার ফল, কঠিন।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর স্যার য়ম ম্যারিস অন্য একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন :—

"That the two communities, *viz.* Hindus and Moslems, have fallen much farther apart in feeling during the past ten years is the conclusion formed by most competent observers, and is, indeed, generally admitted by far-seeing men on either side."

তাৎপর্য্য। "যোগ্যতম পর্য্যবেক্ষকগণের সিদ্ধান্ত এই, যে, হিন্দু ও মুসলমানেরা গত দশ বৎসরে মনের ভাবে পরস্পর হইতে আরও অধিকতর দূরে গিয়া পড়িয়াছে; এবং ইহা বস্তুতঃ উভয় পক্ষের দূরদর্শী লোকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন।"

এই মন্তব্যটিতে ও প্রবন্ধটিতে হিন্দুমুসলমানের ছাড়াছাড়ির জন্য কোন দুঃখবোধের আভাস পর্য্যন্ত নাই।

গত দশ বৎসর আমরা মণ্টেগু-চেম্‌সফোর্ড্ কৃত সংস্কৃত শাসনপ্রণালীর গুণে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনাদি "বর" পাইয়াছি। মনের ভাবে এই অধিকতর দূরতা সেই বরগুলির ফল। তৎসমুদয়ের ফল যে এইরূপ হইবে, তাহা বহুদর্শী ও দূরদর্শী সাম্রাজ্যশাসক রাজনীতিজ্ঞ ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা আগে হইতে অনুমান করেন নাই মনে করিলে তাঁহাদের মানসিক শক্তির ও মানবপ্রকৃতি-জ্ঞানের অপমান করা হইবে।

—

সেনেট ও মিউনিসিপালিটীতে বাঙালী মহিলা

আচার্য্য প্রসন্নকুমার রায় মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরলা রায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম ফেলো। বালিকাদের শিক্ষা ও নারীশিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। ইনি সে দিকে সেনেটকে মনোযোগী করিতে পারিলে ইঁহার নিয়োগ সার্থক হইবে।

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দে মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা সরোজিনী দে বাঙালী মহিলাদের মধ্যে প্রথমে কলিকাতা মিউনিসিপালিটীর অন্যতম কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রসূতিদের প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টিপাত, শিশুদের জন্য যথেষ্ট খাটি দুগ্ধ সরবরাহ, শিশুদের যথেষ্ট খেলার জায়গা, বালিকাদের শিক্ষার নিমিত্ত যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় প্রভৃতি নানা কাজ মহিলা কমিশনারদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। একজন মহিলা কমিশনার এত কাজ করিতে না পারিলেও কিছু করিতে পারিবেন। তাঁহার আরও সহযোগিনী আবশ্যক।

—

বিলাতযাত্রী ভারতীয় বিমাননাবিক

করাচী হইতে চাউলা নামক একজন পঞ্জাবী যুবক একটি ছোট এরোপ্লেনে ইংলণ্ড পৌছিয়াছেন। ইঁহার বয়স এখনও কুড়ি হয় নাই। তাঁহার সঙ্গে কেবল

এঞ্জিনীয়ার নামক একজন পার্সী যুবক ছিলেন। শ্রীমান্ চাউলা খুব নৈপুণ্য ও বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। তিনি যেরূপ প্রশংসা ও আর্থিক পুরস্কার পাইয়াছেন,তাহা একটুও বেশী নয়।

—

যোগ্য ন্যাসরক্ষক বটে !

ইংরেজ জাতির দাবী এই, যে, তাহারা ভারতীয়দের ট্রষ্টী অর্থাৎ ন্যস্তসম্পত্তির রক্ষক; আমাদের নাবালক অবস্থা বশতঃ তাহারা আমাদের মঙ্গলের জন্য ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া আছে ও শাসন করিতেছে। তাহাদের যোগ্যতাও খুব বেশী। বিখ্যাত ইংরেজ সাংবাদিক মিঃ গারভিন অবজার্ভার পত্রে লিখিয়াছেন :—

"Among the many millions of our new electorate, hardly one in a thousand has the vaguest knowledge of India."

তাৎপর্য্য। "ব্রিটেনে পার্লেমেণ্টের সভ্যনির্ব্বাচকদের নূতন তালিকায় যে বহু নিযুত নির্ব্বাচকের নাম আছে, তাহাদের মধ্যে হাজারে এক জনেরও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে খুব আবছা রকমের জ্ঞান আছে কি না সন্দেহ।"

—

একটা ন্যক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা

আমাদের নিকট একটা ন্যক্কারজনক জঘন্য পুস্তিকা প্রেরিত হইয়াছে। ইহার মলাটে "প্রভুপাদ শ্রীতুলসী চন্দ্র গোস্বামী বিরচিত" এবং "পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ" ছাপা আছে। মলাটে কোন একটি বালিকা-বিদ্যালয়ের বোর্ডিং সম্বন্ধে জঘন্য মিথ্যা কুৎসা রচিত হইয়াছে। এরূপ কোন বোর্ডিংএই আজকাল শুধু ব্রাহ্ম বা খৃষ্টান সমাজের দেড় শত বালিকা থাকে না। সুতরাং এই কুৎসা হিন্দুসমাজকে স্পর্শ করে নাই মনে করিয়া হিন্দুসমাজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না। এরূপ পুস্তিকার ২য় সংস্করণ হওয়া সমগ্র দেশের ও জাতির কলঙ্কের বিষয়।

এই চটি বহিখানাতে সমগ্র ব্রাহ্মসমাজের মিথ্যা কুৎসা করা হইয়াছে। কিন্তু নাম করিয়া যে-সকল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলার কুৎসা করা হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকে ব্রাহ্ম নহেন। তাঁহারা যে সমাজেরই হউন, জীবিত ব্যক্তিরা প্রয়োজন মনে করিলে নিজ নিজ সুনাম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারিবেন। একজন ভক্তিভাজন পরলোকগত ব্যক্তির সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, কেবল সে সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলা কর্ত্তব্য। স্বর্গীয় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় সম্বন্ধে এবং তাঁহার কল্পিত কোন কন্যা ও জামাতা সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে, তাহার একটি বর্ণও সত্য নহে। তাঁহাদের সকলকে আমরা বিশেষরূপে না জানিলেও এরূপ গল্প বিশ্বাসের অযোগ্য মনে করিতাম।

ইহাতে হিন্দু ব্রাহ্ম সমুদয় শিক্ষিত "বাবুর দল"কে ও তাঁহাদের বাড়ীর মহিলাদিগকে জঘন্যভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে। অনেকগুলি বালিকা শিক্ষালয়ের বোর্ডিংয়ের ব্যাপকভাবে মিথ্যা কুৎসা করা হইয়াছে।

বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন গবর্ন্মেণ্ট কেন পাস করিতে দিয়াছেন, তাহার সম্বন্ধে এই মর্ম্মের মিথ্যা কথা লেখা হইয়াছে, যে, মিস্ মেয়োর বহির উত্তরে কোন কোন ভারতীয় পাশ্চাত্য সমাজের দুর্নীতির চিত্র অঙ্কিত করায়, "এরূপে 'কেঁচো খুঁড়িতে সাপ' বাহির হইয়া পড়ায় গবর্ন্মেণ্টের টনক নড়িল—তাঁহারা 'শিখণ্ডি'কে সম্মুখে রাখিয়া অর্জ্জুনের ভীষ্মবধের মত রায়সাহেব হরবিলাস সর্দ্দার দ্বারা আইন সভা হইতে এই আইন পাশ করাইয়া লইলেন—লোকে বলে, ভারতীয় কুমারীদের মধ্যেও এই লাম্পট্য ও ব্যভিচারের সহায়তার জন্য।"

গবর্ন্মেণ্ট সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও হিতকর বহিও কখন কখন বাজেয়াপ্ত করেন, অথচ কলিকাতার রাস্তায় এই ধরণের অনেকগুলি বহি প্রকাশ্যভাবে বিক্রয় হইতেছে। অশ্লীল, দুর্নীতিমূলক ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ পুস্তকের প্রচার বন্ধ করিবার ভার একজন সরকারী কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত আছে, তাহা আমরা জানি। তাঁহার কার্য্যরীতি কিরূপ এবং তাঁহার সুনীতি দুর্নীতির আদর্শ কি, তাহা অবশ্য আমাদের জানা নাই। তবে এই ধরণের পুস্তক-পুস্তিকার অবাধ প্রচার হইতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছা যদি নিতান্ত অযৌক্তিক না হয়, তাহা হইলে একথা মনে করিবার কোন কারণ দেখি না, যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিতেছেন। আমাদের বিবেচনায়, এবিষয়ে গবর্ন্মেণ্টের অভিরুচি ও কর্ম্মনীতি কি, একথা প্রকাশ্যভাবে জিজ্ঞাসা করিবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু এই সকল ব্যাপারে কেবলমাত্র গবর্ন্মেণ্টকে দোষী করিলে এবং গবর্ন্মেণ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই চলিবে না। এই ধরণের পুস্তক রচনা এবং উহাদের অবধি প্রচার বন্ধ করিবার ক্ষমতা একমাত্র দেশের জনসাধারণেরই আছে। দেশের জনমত যদি এই সকল কুৎসা প্রচারকে নিন্দনীয় মনে না করে, দেশের লোকের যদি নিজেদের কন্যা এবং ভগিনীকে এই সকল জঘন্য কুৎসা হইতে রক্ষা করিবার প্রবৃত্তি ও শক্তি না থাকে, তাহাদের পরোক্ষ সমর্থনের জন্যই যদি এই সকল পুস্তকরচনা একটা লাভজনক ব্যবসা হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে শুধু গবর্ন্মেণ্টকে দোষ দিয়া কি লাভ? উহা আমাদেরই নিদারুণ লজ্জা ও শোচনীয় অধোগতির পরিচয়।

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বীণাপাণি

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
১ম খণ্ড

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭

২য় সংখ্যা

ক্যানাডার পথে

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

চিঠিতে খবর দেওয়া ছাড়া আমি সব কথাই লিখি ব'লে আমার দুর্নাম আছে। আমার মনটা যেন বড়ো বড়ো ফাঁকওয়ালা জাল—তার ভিতর দিয়ে বাইরের দৈনিক খবরগুলো ধরাই পড়ে না, ভিতরকার চিন্তার কথা হয়তো আটকা পড়ে, কিন্তু সেগুলো আজ লিখলেও যা কাল লিখলেও তা। তবু একবার ভেবে দেখি উল্লেখযোগ্য কোনো ঘটনা ঘটেচে কি না।

বি-এন-আর-এর কূপে অর্থাৎ খণ্ডগাড়ির অখণ্ড আধিপত্য বোম্বাই ষ্টেশন পর্য্যন্ত একটানা ভোগ করে এসেচি। স্নান শয়ন ধ্যান ধারণা কোনো কিছুর অসুবিধা হয়নি। রাত্রে রেল-পাচকের অন্ন স্পর্শ করিনি। মোবারক রুটি-কুক্কুটের সংযোগে পাঁচ খণ্ড স্যাণ্ডুয়িচ প্রস্তুত করে দিয়েছিল—তাই আমরা তিন সহযাত্রী ভাগাভাগি করে খেয়েচি। আমার অপর্য্যাপ্ত হয়েছিল। যুবক দুজন আমাকে সান্ত্বনা দিবার জন্যে স্মিতমুখে বললেন, তাঁদের সামান্য ক্ষুধার পক্ষে আয়োজন যথেষ্ট। আমি বিস্মিত হলুম, কিন্তু এ নিয়ে আমি অনাবশ্যক পরিতাপ করিনি—কারণ সুধীন্দ্রকে উপলক্ষ্য ক'রে যথাস্থান থেকে গাড়িতে প্রচুর মিষ্টান্নের আমদানি হয়েছিল। তখন দেখলুম, ক্ষুধা তাঁদের কম ছিল তা নয়। এলুমিনিয়ম ভাণ্ডে অনেকগুলি রসনিমজ্জিত গোলাকার ও চপেটাকার পিষ্টক ছিল, সেগুলি উপাদেয়। তা ছাড়া জোড়াসাঁকো ও কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট থেকে একত্রীকৃত যে সন্দেশ-সম্মেলন ঘটেছিল আমাদের অন্তর্জঠরে তাদের মিলন সমাপ্ত হল। আহারাবসানে শ্রীযুক্ত নীলমণি জলভাণ্ডটাকে তা'র কাষ্ঠবেষ্টনী থেকে বিশ্লিষ্ট করে নিয়ে তৃষ্ণিকে জল বিতরণের অনেক চেষ্টা করলে, কিন্তু উভয়ে তারা সুনিবিড়ভাবে একাত্ম হয়ে গেছে—দুটির মধ্যে প্রলয়সাধন ছাড়া অন্যটির মুক্তিসাধনের উপায় ছিল না। ভাণ্ডটিকে ধ্রুব প্রতিষ্ঠা দেবার পক্ষে ব্যবস্থাটি আশ্চর্য্য নিপুণ ছিল, কিন্তু তাকে স্বকার্য্যে উদ্যত করার পক্ষে অসহযোগিতার প্রয়োজন সঙ্গত ছিল। অবশেষে হতাশ্বাস নীলমণি দুটিকে একসঙ্গে নত করে কাজ চালিয়ে দিলে।

গাড়িতে আমার দুটি কাজ ছিল। একটি বাইরের, একটি ভিতরের। সুরেনের মহাভারতখানা নিয়ে তার থাটি গল্পাংশটুকু চিহ্নিত করছিলুম। আমার পেনসিলের

দাগের মধ্যে বি-এন-আর এবং জি-আই-পি রেল-বাহিনীর হৃৎস্পন্দন দুই দীর্ঘ দিন ধরে চিহ্নিত হয়ে গেছে। এই কাজটা খুব ভালো লাগছিলো। আমার নিশ্চিন্ত বিশ্বাস মহাভারতের অতি বিপুলতা থেকে আমি তার যে সারভাগ উদ্ধার করেছি সেটা অতি উত্তম হয়েচে। আশা করি ওটা ছাপানো হবে। বাকি সময়টা আমার দীর্ঘকাল সঞ্চিত রুদ্ধচিন্তা নির্জ্জন অবকাশের উপর দিয়ে উদ্বেল হয়ে চলেছে। আজ পঁচিশ বছর থেকে যে কাজ বহু দুঃখে বহন করে এসেছি তার পরিশিষ্টভাগের অনেক গভীর বেদনা সূর্য্যাস্তকালের প্রলয়চ্ছটার মতো অন্তর থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠ্‌ছিল। লোক-ব্যবহারে তোমরা আমাকে অনেকে নির্ব্বোধ বলেই জানো—আমার সেই নির্ব্বুদ্ধি বেঁকেচুরে নানা আকারে জেগে ওঠে, যে হেতু আমি সাহস করে কাজ করি। কর্ম্মে যদি প্রবৃত্ত না হতুম তা হলে আমার বুদ্ধিভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেত না। কিন্তু তবুও ব্যবহারিক অবিবেচনা সত্বে কেবলমাত্র ভাবের জোরে নানাবিধ ভাঙাচোরা ভুলত্রুটির উপর দিয়েও কিছু সৃষ্টি করতে পেরেচি। কেবলমাত্র কর্ম্মকুশল বুদ্ধি দিয়ে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না, ব্যবস্থা করতে পারে। কিন্তু সৃষ্টির বাইরেকার যে ব্যবস্থা তার খুব বেশি দাম নয়, বড়ো দুঃখের মধ্যে দিয়েও এ গর্ব্ব আমি করতে পারি। একটা ধারা রয়েচে, সে ধারা দুর্গম নির্জ্জন উপরের শিখর থেকেই অবতীর্ণ—সেই ধারাকে স্রোতহীন বালুকাস্তূপে আবদ্ধ করতেও পারে—সেই বালিকে জমতে দেখেচি—তবু অব্যক্ত যদি কোনো এক সময়ে ব্যক্ত হয়ে থাকে সেও কম কথা নয়।

প্রথম দিনের ভোজ থেকে কল্পনা কোরো না দ্বিতীয় দিনে আমাদের আহার্য্যে কিছু কৃপণতা ঘটেছিল। যাকে ইংরেজি ভাষায় বলে, লাঞ্চ, বলে ডিনার, বলে টি, তারি রেলগাড়ীর মূর্ত্তিমান বিগ্রহ যথাসময়ে ক্ষণে ক্ষণে আমার কামরায় আবির্ভূত হয়েচে। তাতে গ্রহণের চেয়ে বর্জ্জনই বেশি ঘটল। সেজন্যে দুঃখ কোরো না—সমস্তই যদি অঙ্গীকার করতুম, তাহলেই অনেক বেশি অনুশোচনার কারণ ঘটত।

অবশেষে বোম্বাই ষ্টেশনে প্রাতঃকালে গাড়ি এসে থামল। ইতিমধ্যে আমার অভিভাবক আমাকে সুসজ্জিত করবার অভিপ্রায়ে সন্ধান করতে গিয়ে আবিষ্কার করলে চাবি নেই। আমার প্রসাধনের পেটিকায় সৌভাগ্যক্রমে একটা সাধুবেশ ছিল। সেইটে পরে নিলুম।

অম্বালাল এসে আমাকে অধিকার করে তাজমহল হোটেলে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়েই চাবি তৈরির ব্যবস্থা করা গেল। ইতিমধ্যে রুটি টোষ্ট ও কফি খেয়ে জানালার কাছে একটি আরাম-কেদারায় নিবিষ্ট হয়ে বসলুম। অদূরে ক্ষীণ কুহেলিকার আভাসে অনতিস্পষ্ট আকাশের নীচে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্চে—সূর্য্যদেব তখনো ওঠেন নি।

ক্লান্তি-সমুদ্রের সাত বাঁও জলে তখন ডুবে আছি। আগের রাত্রে কয়েকটি অত্যন্ত নিষ্প্রভ লোকের সঙ্গে ডিনার খেয়ে দেহমনপ্রাণ অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল। শুতে যাবার সময় চৌকি থেকে বিছানায় যেতে মনে হচ্ছিল যেন পর্ব্বত লঙ্ঘন কর্‌তে যাচ্চি। একে একে সকলেই শুতে গেল—আমিও বহুকষ্টে শয্যা আশ্রয় করে রাত্রিযাপন কর্‌লুম। সকালে সহযাত্রীরা বাজার করতে বেরলেন। ফিরে এসে অপূর্ব্ব গর্ব্বোৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে জানালেন যে, তিনি আমার জন্যে আশ্চর্য্য সস্তাদামে একটি কুশন কিনেচেন। একাত্তর টাকা তার মূল দাম—নিতান্তই কেবল নিজের বুদ্ধিকৌশলে সেটাকে নামিয়ে সাঁইত্রিশ করেচেন। আমি শান্তিরক্ষার অভিপ্রায়ে তাঁর বুদ্ধিকৌশলের সম্বন্ধে কোনো মত প্রকাশ করলেম না।

ক্লান্তিভার ও দেহভার একসঙ্গে বহন করে শুভ পয়লা মার্চ্চ তারিখে শুক্রবাসরে অপরাহ্ণ চারটের সময় জাহাজে ওঠা গেল। যখন ষ্টুয়ার্ড দেখা দিলে প্রকাশ পেলে এ আমার পূর্ব্ব-বন্ধু। মোরিয়া জাহাজে এ দুই যাত্রায় আমার সেবা করেছিল। নীলমণির বদলে শ্বেতমণিকে পেলুম।

তার পরে দিনমণি অস্তাচল-চূড়াবলম্বী। অকস্মাৎ অপূর্ব্ব চমকে উঠে খবর পেলে ডিনারের সময় সমাগত। দুই বন্ধু তাড়াতাড়ি ক্যাবিনে প্রবেশ করলে। ডিনারের সময় অতিবাহিত হতে চলল। এরা ক্যাবিনে প্রবেশ

করার বিদ্যে শিখেচে, বেরোবার বিদ্যে শেখেনি। তখন টাকারকে নিয়ে আমি নিঃসহায়ভাবেই ভোজনশালায় গেলুম। তখন অর্দ্ধেক ডিনার শেষ হয়ে গেছে। এরা তুজনে যখন এল তখন ডিনার চন্দ্রমার পূর্ণগ্রাসের কেবল এক কলা বাকি। তারপরে ট্র্যাজিডি কি রকম জম্‌ল বলবার সময় নেই। আজ সকালে জাহাজের প্রকাশ্য স্থানে নোটিশ প্রচার করা হয়েছে, আরোহিগণ দয়া করে ডিনার টেবিলে আধঘণ্টার বেশি দেরী যেন না করেন। পি-এণ্ড-ও জাহাজের ইতিহাসে এমন ঘটনা আর কখনো ঘটেনি।

২

মানুষ মাকড়সারই মত। সে নিজের অন্তর থেকেই হাজার হাজার সূক্ষ্ম সূত্র বের করে জাল বাঁধে, নিজের অব্যবহিত পরিবেশের সঙ্গে নিজের বিশেষ সম্বন্ধ ধ্রুব করতে চেষ্টা করে। যখন সেই বাসা বাঁধে, গ্রন্থি এমন পাকা করে আঁটতে থাকে যে, ভুলে যায় যে বারে বারে এগুলো ছিন্ন করতে হবে। এইজন্যেই যখন দূরে যাত্রা করবার সময় আসে তখন খোঁটা ওপড়ানো ও রসি টেনে ছেঁড়া এত কঠিন হয়ে ওঠে। মানুষ যখন বাড়ি তৈরি করে তখন নিজেকে মনে মনে আপন সুদূর ভাবীকালে বিস্তার করে দেয়—যে কালের মধ্যে তার নিজের স্থান নেই। তাই পয়লা নম্বরের ইঁট ও সেরামার্কার দামী সিমেণ্ট ফরমাস করে—তা'র নিজের ইচ্ছের কঠিন স্তূপটাকে উত্তরকালের হাতে দিয়ে যায়,—সেই কাল সেটার গ্রন্থি শিথিল করতে লেগে যায় নয়তো নিজের চল্‌তি ইচ্ছের সঙ্গে সেই স্থাবর ইচ্ছেটার মিল করাবার জন্যে নানাপ্রকার কসরৎ করতে থাকে। বস্তুতঃ মানুষের বাস করা উচিত সেই তাঁবুতে যে তাঁবুর ভিৎ মাটিকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে না এবং পাথরের দেয়াল উঁচিয়ে মুক্ত আকাশকে মুষ্টিঘাত করতে থাকে না। আমাদের দেহটাই যে আলগা বাসা, আমাদের যাযাবর আত্মার উপযোগী, যাত্রা করবার সময় এলে সেটাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয় না। এইজন্যেই আমি তোমাকে অনেকবার পরামর্শ দিয়েচি ইঁটকাঠের বাঁধন দিয়ে অচল ডাঙার উপরে বাড়ি তৈরি কোরো না, স্রোতের উপর সচল বাসার ব্যবস্থা কর—যখন স্থির থাকতে চাও একটা নোঙর নামিয়ে দিলেই চলবে—আবার যখন চলতে চাও তখন নোঙরটা টেনে তোলা খুব বেশি কঠিন হবে না। আমাদের কালস্রোতে-ভাসা জীবনের সঙ্গে আমাদের বাসাগুলোর সামঞ্জস্য থাকে না বলেই টানা ছেঁড়ায় পদে পদে দুঃখ পেতে হয়। আমাদের বাসাগুলোর মধ্যে দুটো তত্ত্ব থাকা চাই—স্থাবর এবং জঙ্গম। থাকবার বেলা থাকতে হবে ফেলবার বেলা ফেলতে হবে—আত্মার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধের মত। এ সম্বন্ধ সুন্দর, কারণ এটা ধ্রুব নয়। সেইজন্যেই নিয়তই দেহের সঙ্গে দেহীর বোঝাপড়া করতে হয়, সাধনার অন্ত নেই, এর বেদনা, এর আনন্দ সমস্তই অধ্রুবতার স্রোত থেকেই আবর্ত্তিত হয়ে উঠ্‌চে—এর সৌন্দর্য্যও সকরুণ, তার উপরে মৃত্যুর ছায়া। কালের এবং ভাবের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই এর পরিবর্ত্তন চলেইচে—আমাদের জোড়াসাঁকোর বাড়িটার মতো অবস্থান্তরগুলোকে অস্বীকার করবার চেষ্টা করচে না। তারপরে জীবনের পালা যখন শেষ হল তখন ভাবীকালের সঙ্গে নতুন সম্বন্ধ পাতাবার জন্য পথের ধারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে না।

সংসারে আমাদের সব বাসা এমনি হওয়াই ভালো। আমার ধ্যান যে রূপকে আশ্রয় করেচে, পরের কথাতে নিজেকে বেচবার জন্যে সে যেন সেজেগুজে লোভনীয় হয়ে বসে না থাকে। নিজেকে সম্পূর্ণ করে পরে অন্যকালের অন্যলোকের তপস্যাকে ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়ে যেন একেবারেই সরে দাঁড়ায়। নইলে কালের পথরোধ করতে চেষ্টা করলে তার দুর্গতি ঘটতে বাধ্য। টাকার জোরে আমরা আমাদের ধ্যানের রূপটাকে বেঁধে দিয়ে যেতে ইচ্ছা করি। তার মধ্যে অন্য পাঁচজনের ধ্যান যখন প্রবেশ করতে চেষ্টা করে তখন সেটা বেখাপ হতেই হবে। আমার উচিত ছিল বিশ্বভারতীর সম্পূর্ণতা সাধনের জন্যে বিশ্বভারতীর শেষটাকা ফুঁকে দিয়ে চলে যাওয়া। তার পরে নতুন কাল নিজের সম্বল ও সাধনা নিয়ে নিজের ধ্যানমন্দির পাকা করুক। আমার সঙ্গে যদি মেলে তো ভালো, যদি না মেলে সেও ভালো। কিন্তু এটা যেন ধার করা জিনিষ না হয়। প্রাণের জিনিষে ধার চলে না—অর্থাৎ তাতে প্রাণবান কাজ হয় না—আমগাছ নিয়ে

তক্তপোষ করা চলে, কিন্তু কাঁঠাল-ব্যবসায়ী তা নিয়ে কাঁঠাল ফলাতে চেষ্টা যেন না করে। এর ভিতরকার কথাটা হচ্চে মা গৃধঃ।

আমি যে-কথাটা বল্‌তে বসেছিলুম সেটা এ নয়। তোমরা তাঁবুতে থাকবে কিংবা নৌকোতে থাক্‌বে সে-পরামর্শ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না, আমার হাল খবরটা হচ্চে এই যে কাল যখন জাহাজে চড়েছিলুম তখন মনটা তার নতুন দেহ না পেয়ে থেকে থেকে ডাঙা আঁকড়ে ধরেছিল—কিন্তু তার দেহান্তরপ্রাপ্তি ঘটেচে। তবুও নতুন দেহ সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে কিছুদিন লাগে। কিন্তু খুব সম্ভব কাল থেকেই লেক্‌চার লিখতে বসতে পারব। সেটাকে বলা যেতে পারে সম্পূর্ণ নতুন ঘরকন্না পাতানো। যে পার ছেড়ে এলুম সে পারের সঙ্গে এর দাবীদাওয়ার সম্পর্ক নেই। এর ভাষাও স্বতন্ত্র। বাজে কথা গেল। এবার সংবাদ শুনতে চাও। আজ সকাল সাতটা পর্য্যন্ত অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলুম, ক্লান্তি যেন অজগর সাপের মতো আমার বুকপিঠ জড়িয়ে ধরে চাপ দিচ্ছিল। তারপর থেকে নিজেকে বেশ ভদ্রলোকের মতোই বোধ হচ্চে। যুগল ক্যাবিনের অধীশ্বর হয়ে খুসি আছি। পূব ক্যাবিনে দিন কাটে পশ্চিম ক্যাবিনে রাত্রি—অর্থাৎ আমার আকাশের মিতার পন্থা অবলম্বন করেছি—পূর্ব্বদিগন্তে ওঠা, পশ্চিমদিগন্তে পড়া, আমার সহচরত্রয় ভালোই আছে—ত্রিবেণী-সঙ্গমের মতো উত্তর-প্রত্যুত্তর হাস্যপরিহাসের কলধ্বনি তুলে তাদের দিন বয়ে চলেচে। আমি আছি ঘরে, তারা আছে বাইরে। অপূর্ব্ব মনে করচে এখানে আমার যা-কিছু সুযোগ সুবিধা সমস্তই তার নিজের ব্যবহার-গুণে। আমি তার প্রতিবাদ করিনে—প্রতিবাদের অভ্যেসটা খারাপ—স্থানবিশেষে সংসারে ছোটো ছোটো অসত্যকে যাঁরা মেনে নিতে পারে না তারা অশান্তি ঘটায়। এই জন্যেই ভগবান মনু বলেচেন—সে কথা যাক্। ইতি ২ মার্চ্চ ১৯২৯।

৩

জাহাজ জিনিষটা আগাগোড়া চলে, কিন্তু আর সব চলাকেই সে সীমাবদ্ধ করে রেখেচে। এই বাসাটুকুর বেড়ার মধ্যে সময়ের গতি অত্যন্ত মন্দবেগে। সময়ের এই মন্দাক্রান্তা ছন্দে যে-সব ঘটনা অত্যন্ত প্রধান হয়ে প্রকাশ পায় অন্যত্র ছন্দের বেগে সেগুলো চোখেই পড়তে চায় না। এই মুহূর্ত্তেই ডাঙার মানুষ যে-সব খেলা খেলচে তা প্রচণ্ড খেলা—জীবনমরণ নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করুচে। তাতেই উৎসাহ-উত্তেজনার অন্ত নেই। এই সব দেখলে এ কথা স্পষ্ট করেই বোঝা যায় যে, স্থানান্তরকে লোকান্তর বলে না। বিশেষ বিশেষ বেড়া বেঁধে সময়ের গতির মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে আমাদের জগতের বিশেষত্ব ঘটাই। তার মানেই হচ্চে ছন্দবদল হলেই রূপ বদল হয়। আমি এবং আমার প্রতিবেশী এক জায়গায় বাস করি, কিন্তু এক জগতে নয়। তার মানে তার জীবনে কালের ছন্দ আমার থেকে স্বতন্ত্র। সেইজন্যেই তার খেলার সঙ্গে আমার খেলার তাল মিলে না। আমি ঠেলাগাড়িতে চল্‌চি—সে মোটরে চলচে, আমাদের উভয়ের পরিমাণ এক, ছন্দ আলাদা। বস্তু এক হলেও ঝাঁপতালে এবং ঢিমে-তেতালায় তার মূল্য সম্পূর্ণ বদলে যায়। মানুষে মানুষে সুরের ঐক্য থাকতেও পারে, সবচেয়ে বড়ো অনৈক্য তালের। তালের দ্বারা জীবনের ঘটনাগুলোকে ভাগ করে, সাজায়, বিশেষ বিশেষ জায়গায় ঝোঁক দেয়। একেই বলে সৃষ্টি। জগৎ জুড়ে এই ব্যাপার চলচে। মহাকালের মৃদঙ্গ এক এক তাণ্ডবক্ষেত্রে এক এক তালে বাজচে। সেই নৃত্যের রূপেই রূপের অসংখ্য বৈচিত্র্য। আমার জীবনের নটরাজ আমার মধ্যে যে নাচ তুলেচেন, সে আর কোথাও নেই, কোনো জীবনচরিতের পটে এর সম্পূর্ণ ছবি উঠ্‌বে কি করে! কোনো কালেই উঠ্‌বে না। আমাদের আর্টিষ্ট যা গড়েন তার নব নব সংস্করণ ঘট্‌তে দেন না। সাজানো টাইপ ভেঙে ফেলেন, অতএব রবীন্দ্রনাথ কালের চয়নিকায় একবার ধরা দেয়, তারপরে তাকে ফেলে দেয়—অনন্তকালে আর রবীন্দ্রনাথ নেই। হয়তো পরকালে এর একটা ধারা চলতে পারে, কিন্তু আর এ নাম নয়, এ পরিবেশ নয়, এ সমাবেশ নয়, সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পালা এইখানেই চিরকালের মতো চুকিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। আর যাই হোক্ বিশ্বসভায় কারো মেমোরিয়াল

মীটিং হয় না। হয় কেবল আগমনীর ও বিসর্জ্জন, আজ রাত্রে পিনাঙ, ইতি ৭ই মার্চ্চ ১৯২৯।

কাল পৌছব কোবে।

৪

পাখী বাসা বাঁধে খড়কুটো দিয়ে, সে বাসা ফেলে যেতে তাদের দেরি হয় না। আমরা বাসা বাঁধি প্রধানত মনের সামগ্রী দিয়ে—কাজেকর্ম্মে লেখায় পড়ায় ভাবনা-চিন্তায় চারদিকে অদৃশ্য আশ্রয় তৈরি হতে থাকে। হাওয়াগাড়ির গদি যেমন শরীরের মাপে টোল খেয়ে খোঁদলগুলি গ'ড়ে তোলে, মন তেমনি নড়তে চড়তে তা'র হাওয়া-আসনে নানা আকারের খোঁদল তৈরি করে—তা'র মধ্যে যখন সে বসে তখন সে ব'সে যায়। তা'র পরে যখন সেটাকে ছাড়তে হয় তখন আর ভালো লাগে না। এ জাহাজে আমার তেমনি ঘটেচে। এই ক্যাবিনে একটা লেখবার ডেস্ক, আর এক পাশে বিছানা, তা ছাড়া আয়না-ওয়ালা দেরাজ, আর কাপড় ঝোলাবার আলমারি। এর সংলগ্ন একটি নাবার ঘর—সেটা পেরিয়ে গিয়ে আর একটা ক্যাবিন, সেখানে আমার বাক্স তোরঙ্গ প্রভৃতি। এরই মধ্যে মন নিজের আসবাব গুছিয়ে নিয়েচে। অল্প জায়গা বলেই আশ্রয়টি নিবিড়। প্রয়োজনের জিনিষ সমস্ত হাতের কাছে। এখান থেকে নেমে দুদিনের জন্যে সাংহাইয়ে "সু"-র বাড়িতে ছিলুম। ভালো লাগেনি—অত্যন্ত ক্লান্ত করেছিল। তা'র প্রধান কারণ, নতুন জায়গায় মন তা'র গায়ের মাপ পায়নি—চারদিকে এখানে ঠেকে, ওখানে ঠেকে—আর তার উপরে দিনরাত আদর অভ্যর্থনা গোলমাল। অ-দের সঙ্গে আমার তফাৎ এই যে, এই রকমটাই ওদের ভালো লাগে—অভ্যস্ত জায়গাতেই ওদের বিরক্ত করে। ওদের মন বোধ হয় নিজের ভাবনা দিয়ে বাসা তৈরি ক'রতে জানে না। প্রতিদিনের প্রবহমান ভাবনাকল্পনার মধ্যেই নতুনত্ব—বাইরের নতুনত্ব তাকে বাধা দিতে থাকে। জীবনে আমরা যে কোনো পদার্থকে গভীর ক'রে পেয়েছি, অর্থাৎ অনেক দিন ধ'রে অনেক ক'রে জেনেছি সত্যিকার নতুন তারি মধ্যে। তাকে ছেড়ে নতুনকে খুঁজতে হয় না। অন্য সব মূল্যবান জিনিষেরই মতো নতুনকে সাধনা ক'রে লাভ ক'রতে হয় অর্থাৎ পুরানো ক'রে তবে তা'র পরিচয় পাওয়া যায়। হঠাৎ যাকে পেয়েছি ব'লে মনে হয় সে ফাঁকি দুদিন বাদেই তা'র যথার্থ জীর্ণতা ধরা পড়ে। আজকের দিনে এই সস্তা নতুনত্বের মৃগয়ায় মানুষ মেতেছে—সেই জন্যেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তা'র বদল চাই। তা'র এই বদলের নেশায় বিজ্ঞান সহায়তা ক'রচে, কেননা, তা'র কাজ ভোগ করা নয় কেবলি যোগ করা। মানুষ সময় পাচ্চে না গভীরের মধ্যে তলিয়ে গিয়ে চিরনূতনের পরিচয় পেতে। এইজন্যেই চারদিকে একটা পুঁথি-পড়া ইতরতা ব্যাপ্ত হ'য়ে প'ড়চে। ধ্রুবসত্যকে সত্যরূপে পাবার সময় নেই—সময় নেই। সাহিত্যে যে ব্যক্তিগত গালমন্দ, যে অশ্লীলতা দেখা দিয়েচে এই তা'র কারণ। এই সমস্ত ক্লেদাক্ত স্থূল পদার্থ অতি সহজেই মনে দাগ লাগায় ও মনকে জোরের সঙ্গে ঠেলা মারতে পারে। যাদের সময় নেই, যাদের শক্তি কম তাদের পক্ষে অতি দ্রুতবেগে আমোদ পাবার এই সস্তা উপায়। তীব্র উত্তেজনা চাই সেই মনের পক্ষে যে-মন নির্জ্জীব, যে-মনের জীবনী শক্তি ক'মে গেছে, অগভীর মাটির তলায় যার শিকড় গুলো উপবাসী।

যুগাবতার

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

জ্ঞানের দুয়ারে প্রেমের মিলন, প্রেমের দুয়ারে কাজ—
যুগে-যুগে-আসা যত অবতার মানুষে মিলেছে আজ!
সুরধুনীধারা ত্রিধা বিভক্ত
অনুরাগে রাঙি' হয়েছে রক্ত—
মানবের দেহে মুক্তি বিলায়ে দেবতারে দিতে লাজ।

মাটির মানুষ বাহিরিল পথে মাটিতে চরণ ফেলি,'
বাতাসে বাতাসে ধ্বনি উঠে তার আকাশের দ্বার ঠেলি';
এপারে ওপারে লাগে কানাকানি,
ভূর্ভুবস্ব মন জানাজানি—
জগতের আঁখি উঠিছে চমকি' তারায় নয়ন মেলি'!

কে কোথা আছিস্ তন্দ্রা জড়ায়ে, আয় তোরা ছুটে' আয়,
যুগরথে ঐ যুগের সারথী তোরি দ্বার দিয়ে যায়;
ধূলিরেণু হ'ল ফুলরেণু আজি,
সকল দ্বন্দ্ব সঙ্গতে সাজি'
শান্তিশঙ্খে উঠে বুঝি বাজি' সিন্ধুর সীমানায়!

ইতরে মেথরে কোল দেয় কেরে চৈতন্যের মত',
করুণ হাসির দীপ্তিতে ফিরে' আসে কি রে তথাগত!
কর্ম্মযোগের নূতন গীতায়
কার বাণী শুনি—চিনিস্ কি তায়?
দেশের সীতায় ফিরা'তে এ কা'র নববনবাসব্রত!

সত্য-কঠিন কণ্ঠে সে কহে—শত্রু আমার নাই,
জীবজগতের যে কেহ যেখানে, সবি যে আপন ভাই;
শত্রু আমার বিলাস-বাসনা,
রূপা ও সোনার হীন উপাসনা,
স্বার্থকুটিল হিংসা কামনা—শত্রু আমার তাই!

মানুষের পাপ শত্রু তাহার, আত্মা মৃত্যুহীন,
পাপের বিনাশে জীবের মুক্তি—সত্য অপরাধীন!
যুদ্ধ আমার আঁধারের সাথে,
হিংসা-অস্ত্র লাগে না তাহাতে,
দীপ্ত প্রেমের শিখাতে যে তার পরাভব চিরদিন!

*　　*　　*　　*

সংযত দেহে সংযত মনে রুধিতে তাহারি পথ,
ধর্ম্মের বরে সচল হ'ল কি হিমাচল পর্ব্বত!
ভীষ্ম-কঠোর সত্যনিষ্ঠ
অদৃষ্টসম সাধি' অভীষ্ট
শান্ত সুধীর নিরস্ত্র বীর হাঁকে তার জয়-রথ।

বিস্ময়ে মূঢ় জগতের জীব হেরি' সেই অভিযান,
জগৎ নাথের রথের কাছিতে বুঝি-বা পড়িছে টান!
মেদিনী মুছিয়া মাটির লজ্জা
স্বর্গের পথে করে কি সজ্জা—
প্রেমের যুদ্ধে জয়ী করিবারে মানুষের সম্মান!

মেকী

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিপুল বিষয়ের অধিকাংশই দেবতার সম্পত্তি। পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে করিতে ছয় ঘর ছাপান্ন ঘরে দাঁড়াইয়াছিল, এবং কালস্রোতে ভাসিতে ভাসিতে সেই ছাপান্ন ঘরের অধিকাংশ কে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। এই বনজঙ্গলাকীর্ণ পল্লীগ্রামে এখনও যাহারা ঝড়ঝঞ্ঝা সহিয়া টিঁকিয়া আছে, তাহাদের সংখ্যা সাড়ে তিনঘর,—অর্থাৎ এক অংশে মাত্র এক বিধবা বর্ত্তমান। ইহারাই পালা করিয়া বিগ্রহের সেবা চালাইয়া থাকেন। বিগ্রহদত্ত সামান্য ভূসম্পত্তি ও দূরদূরান্তে অবস্থিত চাষী যজমানই ইহাদিগের অশনবসনের সমস্ত ভার বহন করে। সে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত বিপুল বিষয় কোথায় উড়িয়া গিয়াছে,—কেহ তাহার সন্ধান রাখে না। সেই অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষ্য দেয় শুধু অর্দ্ধভগ্ন পূজার দালান, জঙ্গলাকীর্ণ নাটমন্দির,—স্থানভ্রষ্ট ইষ্টকস্তূপে সমাচ্ছন্ন নহবৎখানা, পঙ্ক-শৈবাল-সমাকীর্ণ লুপ্তপ্রায় পুষ্করিণী ও তাহার চারিপাশের বহুদূর-বিস্তৃত ভগ্ন দেউলের সীমারেখা।

যদিও অরণ্যচারী হিংস্র শ্বাপদ ইহার অভ্যন্তরে গর্জ্জন করিয়া ফিরে না, তথাপি ঐ সাড়ে তিনঘরের দ্বেষ কলহ ও কুৎসিৎ গালিগালাজে দেবতার পাষাণবেদী লজ্জায় নিত্য কালো হইয়া উঠে।

একে জনবিরল পল্লী, নিত্য পূজার্থীর পদধ্বনি পাষাণ-সোপানে বাজিয়া উঠে না, কিন্তু কোন পর্ব্ব উপলক্ষ্যে দেবদুয়ারে যে অল্পসংখ্যক জনসমাগম হইয়া থাকে, তাহা লইয়া ইহাদের মধ্যে ধূমায়মান কলহের বহ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে এবং পরবর্ত্তী পর্ব্ব আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতি প্রভাতে বা সন্ধ্যায় তাহার জের চলিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সনাতনের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। গুরুহীন দেশে, তিনি প্রত্যহ গ্রাম্য নদীতে অনুকল্প স্নান করিয়া, ফোঁটা তিলক কাটিয়া, মুখে দেবস্তোত্র আবৃত্তি করিতে করিতে অতি প্রত্যূষে ভগ্ন দেউলের মধ্যে পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন। পালা না থাকিলেও দেবতার পূজা অর্চ্চনাদি ইহার নিত্যকর্ম্মের মধ্যে। শিষ্য-সেবক-গণের নিকট সেই কারণে খ্যাতি-প্রতিপত্তিও কিছু অধিক। অবসরমত ডাক্তারী, এ্যালোপাথি ও হোমিওপাথি, দুই চিকিৎসাই চালাইয়া থাকেন এবং সময়ে সময়ে অবস্থা বুঝিয়া বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে ঔষধাদির ব্যবস্থাও—করেন। তাই দিন দিন গুণমুগ্ধ শিষ্যদল, অপর সরিকের আশ্রয় ছাড়িয়া তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া অবশেষে তাঁহাকেই গুরুপদে বরণ করিয়া লইতেছে! সেজন্য অবশ্য প্রতিপক্ষের আক্রোশ অত্যধিক; এবং তাঁহাদের বাধাহীন রসনা শ্লীলতা ভুলিয়া দিবারাত্র উঁহাকে অভিনন্দন দিয়া থাকে।

প্রত্যুত্তরে তিনি হাসিয়া বলেন,—ঈর্ষা!—এবং ললাটে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া জানাইয়া দেন, ইহা ত কেহ কাড়িয়া লইতে পারে না! হয় ত এ বিশ্বাসও তাঁহার দৃঢ় ছিল যে, লোকের মনোগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে সরকারী আইন কোন কালেই কার্য্যকরী হয় না। শিষ্য যদি গুরুত্যাগ করিয়া অপরকে আশ্রয় করে ত সে দোষের শাস্তি দিবার সামর্থ্য ইহলোকের বিচারালয়ে নাই, কাজেই শিষ্যবৃন্দে পরিপুষ্ট হইয়া তিনি উচ্চকণ্ঠে অদৃষ্টেরই জয় ঘোষণা করিয়া থাকেন!

সনাতনের সংসারে পত্নী আছে, এক পুত্র ও দুই কন্যা আছে—এবং অনাবশ্যক পোষ্যস্বরূপ বৃদ্ধা মাতা ও বিধবা ভগিনীও বর্ত্তমান। সুতরাং বাহিরে অভাব-অনটন লাগিয়াই আছে।

নিত্য এককাঠা সিদ্ধ ও আধকাঠা আতপ চাউলের খরচ। ছোটমেয়ের দুধ, হাটবাজার, মাছ তরি-তরকারিও সময় সময় কিনিতে হয়। তার পর ধোপা-নাপিত, অতিথি-অভ্যাগতের খরচও নেহাৎ মন্দ নয়!

শিষ্যসেবকেরা অধিকাংশই গরীব চাষী; তাহারা কলাটা মূলাটা হাতে করিয়া যখন গুরুদর্শনে আসে, তখন গুরুপত্নী অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠেন। কেন না, একখানা আঙ্‌ট কলাপাতে যে পরিমাণ অন্ন তাহারা প্রসাদ পাইয়া থাকে, তাহার তুলনায় কলামুলা ও তাহার সঙ্গে প্রণামীস্বরূপ দু'-একটি সিকি, দুয়ানী কিছুই আনুকূল্য করিতে পারে না। তথাপি ভক্তির আদান-প্রদানে এটুকু বহন করিতেই হয়।

পুত্র গদাধর গ্রামের মাইনর স্কুলের উচ্চশ্রেণী অবধি অতি কষ্টে উঠিয়া এবং তথায় দুই বৎসর একই ভাবে অবস্থান করিয়া সহসা একদিন গৃহে আসিয়া বই খাতা উঠানের মাঝখানে আছড়াইয়া ফেলিয়া জননীকে জানাইল,—এ ভাবে বৃথা ভূতের বেগার খাটিতে সে রাজি নহে। তাহার চেয়ে বরং,—অঙ্গুলি সঙ্কেতে গৃহ-সংলগ্ন বেণুকুঞ্জ দেখাইয়া কহিল,—ছিপ কেটে মাছ ধ'রে খাব, সেও ভাল।

ভবিষ্যতে মৎস্যমুণ্ড ভক্ষণের আশা আপাতত ঐ এক টুক্‌রা কঞ্চির সাহায্যে সফল হইবে ভাবিয়া জননী হয়ত মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে কহিলেন,—ওমা! মুখপোড়া মাষ্টারের আক্কেল দেখ না! এবারও উঠিয়ে দিলে না?

পুত্র একটু রুষ্টস্বরে বলিল,—উঠিয়ে আবার দেবে কোথায়? একেবারে মগডালেই ত উঠে আছি!

পরম বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া জননী বলিলেন,—তবে?

পুত্র বলিল,—তুমি কিছু বোঝ না,—চুপ কর। মাইনর পাশ করতে হবে না?

জননী বলিলেন,—ওঃ,—মাইনর পাশ করবি! তা হরি মাষ্টারকে উনি না হয়—একবার বলে ক'য়ে—

পুত্র বলিল,—এ যেন ঘণ্টা নেড়ে পূজো করা, তাই বলে ক'য়ে দিলেই চুকে যাবে! লেখার নম্বর আছে—জান! তাই যে কেটে নিয়েছে,—তার পাশ হব কি দিয়ে?

জননী হাসিয়া কহিলেন,—আচ্ছা আচ্ছা, সে ভার আমার। কাটা নম্বর জুড়ে দিতে কতক্ষণ! নৈলে মনসা পূজো,—লক্ষ্মী পূজো, ষষ্ঠী পূজো কে এসে ক'রে যায় একবার দেখে নেব না?—বলিয়া আপন বৃহৎ নথটি নাড়িয়া পুত্রকে অভয় দিলেন।

পুত্র মাথা নাড়িয়া বলিল,—তুমি যদি কিছু বল ত আমি ঘরবাড়ী ছেড়ে একদিক পানে দৌড় দেব। বলছি পড়াশুনো আর করবো না,—তবু বকর বকর—।

জননী অতঃপর কোন কথা না কহিয়া বোধ করি মনে মনে হরি-মাষ্টারের মুণ্ডপাত করিতে করিতে গৃহকর্ম্মে মনঃসংযোগ করিলেন।

দ্বিপ্রহরে সনাতন স্ত্রীর মুখে সমস্ত শুনিয়া পুত্রকে ডাকিলেন।

একটি সরল কঞ্চির অগ্রভাগ ছুরি দ্বারা পরিষ্কার করিতে করিতে সে আসিয়া দাওয়ার নিম্নে দাঁড়াইল।

সনাতন গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—স্কুল ত ছেড়ে দেওয়া হ'ল,—এখন করবে কি শুনি?

গৃহিণী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—ষাট—ষাট! দুধের ছেলে, এর মধ্যে আবার করবে কি! আরও দু'চার বছর যাক।

সনাতন তাঁহাকে ধমক দিয়া বলিলেন,—তালুক-মুলুক জমিজমা আছে কি না, তাই করবে আবার কি? তুমি থাম। মাছ ধরলে দিন চলবে না,—বুঝেছ? আর এক বছর পড় গিয়ে।

পুত্র অবাধ্য ঘোটকের মত ঘাড় বাঁকাইয়া উত্তর দিল,—ও-স্কুলে আর যাব না।

—কেন?—

—মাষ্টার—

—বড় এক-চোকো, নয়? ও কথা ওইখানে বুঝিও বাপু। তবে এটা ঠিক জেনো, বসে অন্ন আমার ঘরে কেউ পাবে না। কাল থেকে আমার সঙ্গে বেরিও, শিষ্যবাড়ী নিয়ে যাব।

ঘাড় গুঁজিয়া সে চলিয়া গেল।

রাশভারী কর্ত্তার সম্মুখে গৃহিণীও আর উচ্চবাচ্য করিলেন না। বহুক্ষণ পরে একবার অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—দেখ, ছেলেমানুষ—অত হাঁটতে পারবে কি?

সনাতন অদ্ভুত এক হাসি হাসিয়া বলিলেন,—তাই তো

বলছিলাম লেখাপড়া শিখতে! তা যখন শিখলে না, তখন উপায় কি? বামুনের ছেলে কচিবেলা থেকে না হাঁটলে পা শক্ত হবে কেন? যে বিয়ের যে মন্ত্র, বুঝলে না?

গৃহিণী কিছুই না বুঝিয়া বলিলেন,—কিন্তু—

সনাতন বলিলেন,—আর 'কিন্তু' 'টিন্তু' নয়, কাল সকালেই রওনা। তুমি আমি কিছু চিরকাল থাকবো না,—কচি পা শক্ত না হ'লে ভর দিয়ে দাঁড়াবে কিসে? তখন শুয়ে শুয়ে আমাদেরই চতুর্দ্দশ পুরুষ উদ্ধার করবে যে!

২

কয়েক মাস পরে শিষ্যবাড়ী বেড়াইয়া সপুত্র সনাতন যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন দেখা গেল, গদাধরের পুষ্ট বপু পুষ্টতর হইয়াছে এবং পথশ্রমজনিত অবসাদে সে মুখের সতেজ প্রফুল্লতা একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই। কক্ষে মস্তকে অসংখ্য দ্রব্যসামগ্রী বহিয়া আনিয়া প্রফুল্লচিত্ত দুই পিতাপুত্র বাটীর কয়েক মাসের দুশ্চিন্তা দূর করিয়া দিলেন সত্য, কিন্তু গৃহে আসিয়া পুত্রের আহার লইয়া বড়ই বিপত্তি বাধিল। পূর্ব্বের মত কড়াইয়ের ডাল ও শাকচর্চ্চড়ি সে মুখে তুলিতে চায় না; মোটা চাউলের অন্নও থালার পার্শ্বে জড়ো হইতে থাকে। শিষ্যবাড়ীর সরস গব্যঘৃত ও ঘন দুগ্ধের বিরহ তাহাকে বড়ই বাজিয়াছিল। লুব্ধ রসনা সেই অতীতের সুখ স্মরণ করিয়া সদাই ম্রিয়মাণ হইয়া থাকিত।

মাতা এ দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিলেন অন্যরূপ। উপযুক্ত পুত্রের অক্ষুধা ও আহারে অরুচি! দৈহিক কোন রোগের লক্ষণ না পাইয়া মনের অন্ধকারে হাতড়াইয়া দেখিলেন,—একটি মাত্র সন্দেহের উদ্রেক করে; এবং তাহা এই ক্রমবর্দ্ধিত বয়সের দোষ বা গুণ।

স্কুলের পাঠ শেষ হইয়াছে, সংসার-প্রবেশ-মুখে জীবিকা-সংস্থানের মোটামুটি উপায়ও বিগত কয়েক মাসে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে, শুধু বাকী আছে—সংসারের মাঝে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া মনুষ্য-জন্মের পরিপূর্ণতার আস্বাদ লওয়ার। মনুষ্যজন্মের একমাত্র চরম কামনা একটি ফুটফুটে টুকটুকে বধূ,—এবং তাহার প্রতিষ্ঠা করিয়াই পিতামাতার কর্ত্তব্য শেষ।

এটুকু কল্পনায় অনন্ত সুখ। প্রতি সংসারের প্রত্যেক গৃহিণী ইহা কামনা করিয়া থাকেন। বধূজীবনের সায়াহ্নে শঙ্খ হুলুধ্বনির মাঝে পরম পুলকের সঙ্গে তাঁহারা গৃহলক্ষ্মীকে বড় আদরেই গৃহে বরণ করিয়া তুলেন। কিন্তু কামনার অবসানে কল্পনা যখন কল্পলোকে আত্মগোপন করে, তখন এই সোহাগহর্ষ আদরউচ্ছ্বাস ভাঁটার জলের মত দুই কূল হইতে সরিয়া গিয়া শুধু তীরের কর্দ্দম কঙ্করকেই প্রকাশ করে। সংসারী মন সে পথে চলিতে গিয়া প্রতিপদে প্রতিহত হয়, সংসারীর নয়ন সে দৃশ্যের কুশ্রীতায় মনে মনে পীড়া অনুভব করিয়া থাকে। তার পর আরম্ভ হয়, কঠোর বাস্তবের অতিরূঢ় পদক্ষেপ, যাহার ধ্বনি প্রত্যেক সংসারীর একান্ত পরিচিত।

যাহা হউক, গৃহিণী এ মনোসাধ একদা কর্ত্তার নিকট প্রকাশ করিলেন। কর্ত্তা হাসিয়া জানাইলেন,— এ ইচ্ছা সম্প্রতি তাঁহারও চিত্তে জাগিয়াছে। সুতরাং শুভস্য শীঘ্রং।

মা এবং বোন একথা শুনিয়া আগ্রহ প্রকাশ করিয়া কয়েক ফোঁটা চোখের জল ফেলিয়া জানাইলেন যে, ক্ষণস্থায়ী মানবজীবনে এই চরমসুখকে চর্ম্মচক্ষের প্রত্যক্ষীভূত করিতে কালবিলম্ব করা মোটেই বিধেয় নহে। পৌত্রবধূ যে কি অমূল্য জিনিষ, তাহা একমাত্র বৃদ্ধ পিতামহীরাই জানে ইত্যাদি।

সনাতন পাত্রী-অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন। প্রথমতঃ, সুন্দরী সালঙ্কারা কন্যার আকাঙ্ক্ষাই মনে জাগিয়াছিল, কিন্তু ক্রমে দেখিলেন তাহা একান্ত দুর্লভ। যদি বা সুন্দরী মিলে, তো অলঙ্কার মিলে না এবং অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য যেখানে, সেখানে কন্যাকর্ত্তার আকাঙ্ক্ষাও উচ্চ। অবশেষে রূপ ছাড়িয়া চিত্তের দিকে মনোনিবেশ করিলেন।

ময়নাগাছির মাখন ভট্টাচার্য্যের মধ্যমা পৌত্রী নবতারার সঙ্গে সনাতন সম্বন্ধটা পাকা করিয়া ফেলিলেন। মেয়ে দেখিলেন এবং কন্যাপক্ষের ফর্দ্দ আদিও শুনিলেন। কালো রঙের উপর রৌপ্যের কষ লাগাতে চক্ষের পীড়া বা চিত্তের বিমুখতা কিছুই জন্মাইতে পারিল না।

হৃষ্টমনে সনাতন গৃহে ফিরিয়া এই আসন্ন মঙ্গল-সংবাদ ঘোষণা করিয়া দিলেন।

গৃহিণী জিজ্ঞাসিলেন,—মেয়ে দেখতে কেমন?

সনাতন বলিলেন,—মন্দ নয়, গৃহস্থ ঘরের উপযোগী।

—রং ফরসা,—না কালো,—না শ্যামবর্ণ?

কর্ত্তা বলিলেন,—খুব ফরসা নয়, রংটা একটু চাপা। এই তোমারই গায়ের রং।

গৃহিণী নিজের মসীবর্ণ দেহের পানে চাহিয়া বলিলেন—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ! গড়ন-পেটন?

কর্ত্তা উত্তর দিলেন,—তাও বোধ হয় তোমার মত।

গৃহিণী একটু ক্ষুন্ন হইয়া আপন খর্ব্বাকৃতি স্থূল দেহের পানে পুনর্ব্বার চাহিয়া বলিলেন,—এমনি খাটো খোটো—গায়ে পায়ে——?

কর্ত্তা বলিলেন,—না না তোমার চেয়ে মাথায় ঢেঙা।

—দেবে থোবে কত?

—ঘর-বসত সবসুদ্ধ হাজার টাকা।

গৃহিণী আর বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। বিনিময় বিবাহ এ বংশের প্রচলিত প্রথা। 'পণ' বলিয়া কেহ কখনও এক পয়সা পায় নাই,—তাহার পুত্রের বিবাহে মাত্র এতবড় অঘটন সংঘটন হইল। ইহা সত্যই গৌরবময়।

অবিলম্বে বিবাহের উদ্যোগপর্ব্ব আরম্ভ হইল। আনন্দনাড়ু এ বংশের চিরপ্রচলিত প্রথা। একমণ না হউক—আধমণ চাল গুঁড়া করিতে হইবে। নহিলে আত্মীয়স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী,—শিষ্যসেবকের নিকট বড়ই নিন্দা হইবে। বৌভাতের মশলা পেষা, বরণের শ্রী তৈয়ারী, কুলাডালা সাজান, বাহিরের ভাঙা রান্না ঘরখানি মেরামত করা, সামনের বনজঙ্গল সাফ ও পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার এবং সর্ব্বোপরি বৌভাতের উদ্যোগ আয়োজন; শ্রম এবং অর্থ দুয়েরই আবশ্যক।

কন্যাপক্ষ নগদ ২০০৲ টাকা দিবে বলিয়াছে সত্য, কিন্তু উপস্থিত তাহাদের নিকট অর্থ চাওয়া যায় না। কোন স্থান হইতে কর্জ্জ করিয়া শুভকার্য্যের শুভ উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। তারপর,—পণের অর্থে ঋণ পরিশোধ হইবে।

সনাতন পাড়ার একমাত্র উত্তমর্ণ যজ্ঞেশ্বরের নিকট গিয়া হাত পাতিলেন।

যজ্ঞেশ্বর ভক্তিতে গদ্‌গদ্ হইয়া তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইয়া বলিল,—এ আর বেশী কথা কি দা'-ঠাকুর! আপনাদের শ্রীচরণের ধূলো নিয়েই আমার যা কিছু ধূলোগুঁড়ো। তবে সময়টা বড় মন্দা; তালপুকুরের বসরুদ্দিন তিন বছর হ'ল ১০০৲ টাকা কর্জ্জ নিয়েছে, সুদে আসলে সেটা দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৫০৲ টাকা। তিন চার দিনের ভেতর তার টাকা শোধ করবার কথা আছে, সেই টাকা পেলেই—

সনাতন যজ্ঞেশ্বরকে ভালরূপেই জানিতেন। বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া পকেট হইতে বাড়ীর দলিলখানি বাহির করিয়া তাহার সম্মুখে রাখিলেন ও কহিলেন,—কিন্তু ভাই তিন চার দিন অপেক্ষা তো করতে পারবো না। অদ্যেই টাকাটা চাই। এদিকে সময় সংক্ষেপ।

যজ্ঞেশ্বর দলিল দেখিয়া হৃষ্টমনে আর একবার তাঁহার পায়ের ধূলা লইল, বলিল,—সেকি দা-ঠাকুর, আপনার বাস্তুর দলিল বাঁধা দিয়ে? আরে রাম, রাম!

সনাতন হাসিয়া বলিলেন,—শরীরের কথা তো বলা যায় না ভাই, কাজটা পাকা হওয়াই ভাল। তা'হলে, দশটায় খাওয়া- দাওয়া করে আপিসে গিয়ে রেজেষ্টারী করে দিয়ে আসবো, কি বল?

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন,—তা আপনি যখন বলছেন দা'-ঠাকুর, কিন্তু এ-ও বলে রাখছি, সুদ আমি ওর এক পয়সাও নেব না—বলিয়া ভক্তিতে অবনত হইয়া আর একবার তাঁহার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিল।

সনাতন বলিলেন,—না ভায়া, ন্যায্য সুদ আমি দেব, বেশী দেব না। তবে টাকাটা বোধ হয় বেশীদিন ফেলে রাখতে হবে না, এই মাসেই শোধ করবো।

শুনিয়া যজ্ঞেশ্বরের প্রফুল্ল মুখে ছায়া পড়িল। সে কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া বলিল,—তা শোধবার জন্যে এত তাড়া কেন দা'-ঠাকুর! যখন গিয়ে আপনার সুবিধে হবে, তখন দেবেন।

সনাতনের বাগান-বাগিচা-সমন্বিত বাস্তুখানি বহুদিন হইতেই যজ্ঞেশ্বরের লুব্ধ দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিয়াছিল।

নতুবা এতখানি ঔদার্য্য ও মহত্ত্ব তাহার মত কুসীদজীবীর পক্ষে সম্ভবে না।

অপরাহ্ণে অর্থ মিলিল। বিবাহবাড়ীতে কোলাহল পড়িয়া গেল। ঢেঁকীশালে নূতন ঢেঁকী আসিল, রান্নাঘর সুসংস্কৃত হইল, দোকান হইতে চাল, ডাল, মশলা, জামা কাপড় প্রভৃতি আসিল ও ঘন ঘন শঙ্খ হুলুধ্বনির মধ্যে ভাবী শুভকার্য্যের উল্লাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

৩

বিবাহের পরদিন প্রচুর বাদ্যোদ্যম সহকারে বরবধূ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিল—পুরনারীরা মহোল্লাসে তাহাদের বরণ করিয়া লইলেন।

বধূর বর্ণ দেখিয়া, গৃহিণী অন্তরে অন্তরে শত ধিক্কার দিয়া প্রকাশ্যে হাসিয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কেমন বৌ হয়েছে গা?

সকলে একবাক্যে বলিল,—তা বেশ হয়েছে, আয়-পয় থাকলেই হ'ল। গেরস্ত ঘরে কে আর ডানাকাটা পরী আশা ক'রে থাকে মা!

বৃদ্ধা ঠাকুরমা বধূর গালে সাতটা চুম্বন দিয়া বলিলেন,—আমার মা লক্ষ্মী।

কিন্তু লক্ষ্মীর আগমনে একজনের মুখ অকস্মাৎ বিষম গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল;—উল্লাসমত্ত মেয়েরা তাহা লক্ষ্য করেন নাই। তিনি বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ লইয়া সারাদিন বাড়ীর ভিতর আসিলেন না, মেয়েদের আনন্দ-প্রবাহ রুদ্ধ করিতে চাহিলেন না।

সন্ধ্যার পর গৃহিণী কি প্রয়োজনে বাহিরের ঘরে আসিয়া স্বামীর চিন্তাবিহ্বল মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব্যাপার?

তিনি ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—ও কিছু নয়, তোমরা কাজ করগে।

গৃহিণী বলিলেন,—শুভকর্ম্মের দিনে এমন মুখ গোমড়া ক'রে থাকলে কারই বা কাজেকর্ম্মে মন যায়! কাল বৌভাত, লোকজন নেমন্তন্ন কত্তে হবে—

সনাতন বাক্যব্যয় না করিয়া কাগজ কলম লইয়া ফর্দ্দ করিতে বসিলেন।

একমাত্র পুত্র—তাহার বিবাহে মনুষ্যজন্মের সাধ-আহ্লাদ মিটাইবার জন্য অবশ্যপ্রয়োজনীয় উৎসব-অঙ্গকে বাদ দেওয়া চলে না।

কুটুম্ব কুটুম্বিনী, অতিথ অভ্যাগত, শিষ্য সেবক, ও পাড়াপ্রতিবেশী যাহাদের চক্ষুলজ্জার খাতিরে নিতান্তই না বলিলে নয়,—সকলের নাম ফর্দ্দস্থ হইলে দেখা গেল, চারি শত মুদ্রার কম এ সাধ-আহ্লাদ কোন প্রকারেই মিটিতে পারে না।

কর্জ্জের অধিকাংশ অর্থই ব্যয়িত হইয়াছিল, ছিল যৎসামান্য।

গৃহিণী বলিলেন,—দেনার টাকাটা আর শুধে কাজ নেই,—গদাধরের শ্বশুর যা দিয়েছে, তাই দিয়ে এখন মান রক্ষে কর।

কর্ত্তা গম্ভীর মুখে একবার 'হুঁ' বলিয়া চুপ করিলেন।

গৃহিণী পুনরায় কহিলেন,—ঐ একটি মাত্র ছেলে, মেয়েটি ঈশ্বর ইচ্ছায় পার হয়ে গেছে, ভাবনা কেন? তুমি যাও,—কোন রকমে মানটা তো বাঁচুক।

'মান রক্ষার' জন্য অগত্যা সনাতনকে পুনরায় যজ্ঞেশ্বরের নিকট হাত পাতিতে হইল। গদাধরের শ্বশুর-বাড়ীর রহস্য আর গৃহিণীর কর্ণগোচর করিতে প্রবৃত্তি হইল না। ভাবিলেন,—জ্ঞানই মানুষের যত কিছু অশান্তির মূল। সংসার-সমুদ্রের তুফানে চক্ষু মুদিয়া, পিঠ পাতিয়া পর্ব্বতাকার তরঙ্গ লওয়াতে তৃপ্তি ও উল্লাস আছে, কিন্তু চক্ষু চাহিয়া সে ভয়ঙ্কর সুন্দরকে দূর হইতে দেখিলেও আশঙ্কায় মুখ ম্লান হইয়া যায়, বক্ষ দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে—স্পর্শ তো দূরের কথা। মনুষ্যজন্মের সাধ-আহ্লাদও অমনি আবর্ত্তের মাঝে পাক খাইয়া চলিয়াছে। কল্পনার নেত্র মেলিয়া যত কিছু রমণীয়তা দেখিতে ইচ্ছা কর, দেখ ক্ষতি নাই, কিন্তু সাবধান,—কখনও জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন করিও না। তাই আদিম মানব জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইবার পূর্ব্বে সর্ব্ব দেহে ও অন্তরে পরম স্বাচ্ছন্দ্য ও তৃপ্তি অনুভব করিত।

যজ্ঞেশ্বর হাসিমুখে টাকাটা আনিয়া দিলেন ও ভক্তি-গদ্‌গদ্‌চিত্তে আর একবার সনাতনের পদধূলি লইয়া জয় কামনা করিলেন।

জয় হয়তো তাহার নিঃসন্দেহই হইবে, কেন না,

বরযাত্রীস্বরূপ তিনিও সনাতনের সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং তথাকার ব্যাপার সমস্তই চর্ম্মচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

বিবাহে কন্যাকর্ত্তা পণ-স্বরূপ এক পয়সাও দেয় নাই। গোলযোগ বাধিয়াছিল, কিন্তু আপন কোর্টে পাইয়া উকীল বৈবাহিক সব গোলযোগের সুমীমাংসা করিতে পারিয়াছিলেন।

যাহা হউক, পরদিন উদ্যোগ আয়োজন দরিদ্রের পক্ষে প্রচুরই হইল। শিষ্যসেবক দলে দলে আসিল,—নববধূর মুখদর্শনীস্বরূপ দুয়ানি সিকি, কেহ কেহ বা আধুলি দিয়া প্রণাম করিয়া উদর পূর্ত্তি করিয়া চলিয়া গেল।

উৎসব-পর্ব্ব মিটিয়া গেলে, পরদিন দলে দলে পাওনাদার আসিয়া উপস্থিত হইল।

সনাতন যজ্ঞেশ্বরের নিকট যাহা কর্জ্জ করিয়াছিলেন, তাহা নগদ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেই নিঃশেষ হইয়াছিল। ঘি, ময়দা, তেল, ডাল, মাছ, সন্দেশ, দধি প্রভৃতির দাম বাকী পড়িয়াছিল। ভাবিয়াছিলেন শিষ্য আদির প্রণামী হইতে উহাদের দেনা শোধ করিবেন।

পাওনাদারদের বসিতে বলিয়া সনাতন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,—ওগো; শুনছো? একবার এ দিকে এসো।

গৃহিণী তখন কক্ষান্তরে কাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চকণ্ঠে মধুবর্ষণ করিতেছিলেন। পাড়াপ্রতিবেশীরা নিকটে বসিয়া শত কণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিল ও দীর্ঘ অবগুণ্ঠনাবৃত নববধূ নিঃশব্দে নয়নের ধারা নিঃসরণ করিতেছিল।

কর্ত্তার কণ্ঠস্বরে গৃহিণীর লুপ্তপ্রায় বিক্রম সহসা ভীম উৎসাহে জাগিয়া উঠিল। রোদনরতা বধূর একখানি হাত ধরিয়া সজোরে তাহা হইতে একগাছি বালা টান মারিয়া ছিনাইয়া লইয়া তিনি দুম্ দুম্ শব্দে বাহিরে আসিলেন ও কর্ত্তার সম্মুখে সেটি আছড়াইয়া ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—এই নাও।

সনাতন বিস্ময়ে হতভম্ব হইয়া ভূপতিত বালাগাছির দিকে চাহিয়া রহিলেন।

গৃহিণী আপন বর্ত্তুলাকার কৃষ্ণবর্ণ দেহ দোলাইয়া উচ্চকণ্ঠে দিক প্রকম্পিত করিয়া তীক্ষ্ণস্বরে কহিলেন,—জোচ্চুরীর আর জায়গা পায়নি, তাই ঠকাতে এসেছে। আমার ছেলে কি ফেল্‌না,—হেঁজিপেঁজী? তাই ওই জলার পেত্নী———

উঠানে কৌতূহলী জনতা ও কক্ষদ্বারে ক্ষণপূর্ব্বের সহানুভূতি-ভরা কয়েক জোড়া চক্ষু সনাতনকে বড়ই চঞ্চল করিয়া তুলিল। তাড়াতাড়ি তিনি বালাটা হাতে তুলিয়া লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—চুপ কর, চুপ কর।

কিন্তু গৃহিণী পাগলের মত চক্ষু ঘুরাইয়া তাঁহার হাত হইতে ছোঁ মারিয়া সেটি কাড়িয়া লইলেন ও নর্দ্দামার মধ্যে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন,—ঐ গিল্‌টির গয়না দিয়ে কুচ্ছিত মেয়ে পার করেছে,—হারামজাদা মিন্সে! আমার ছেলে কি মেকী?

সনাতন ধীরে ধীরে উঠানের ধূলার উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার নয়নের সম্মুখে রাশি রাশি হরিদ্বর্ণের বিকশিত সর্ষপ ফুল হিল্লোলিত হইয়া উঠিল।

পুত্র গদাধর রণরঙ্গিণী মায়ের হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে উচ্চকণ্ঠে প্রতিজ্ঞা করিল,—ও বউয়ের মুখ আমি যদি ইহজন্মে দেখি তো—ইত্যাদি।

ভিড় কমিয়া গেলে সনাতন উঠান হইতে উঠিয়া রান্নাঘরে ভূশায়িত শোকবিহ্বল পত্নীর নিকটে আসিয়া বলিলেন,—যা হবার তা তো হয়েছে, উপস্থিত বাইরে পাওনাদার দাঁড়িয়ে। প্রণামী, মুখ-দেখা যা কিছু আছে বার ক'রে দাও, আপাতত তো এ ধাক্কা সামলাই।

গৃহিণী তীরবেগে ভূমিশয্যা ত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং দ্রুতপদে কক্ষান্তর হইতে একগোছা বই, আঁচল ভরিয়া সিকি, দুয়ানী ও কয়েকটি টাকা লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

বইয়ের রাশি সনাতনের সম্মুখে ঝুপঝাপ করিয়া ফেলিয়া দিয়া মুখ বাঁকাইয়া কহিলেন,—মুখপোড়া বন্ধুর দল, এই বইয়ের গাদা দিয়ে গেছে। উনুন ধরান ছাড়া এতে যদি দেনা শোধ যায় তো দেখ! আর এই তোমার শিষ্যি সেবকের পাল, আঙট কলার পাতা পেতে ছেলে-মেয়ে নাতি-নাত্‌নী নিয়ে আকণ্ঠ গিলে-কুটে পেন্নামী দিয়ে গেছে! যেন হোটেল আর কি! বলিয়া

সিকি দুয়ানীগুলো মেঝের চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন। পরে তাহা হইতে কয়েকটি টাকা বাছিয়া লইয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—এই ক'টা টাকা যারা বই দেয়নি—তারা দিয়েছে, বন্ধুর দল। বলিয়া সেগুলি মেঝেয় আছড়াইয়া ফেলিলেন।

কিন্তু সেগুলি হইতে কোন মিষ্ট আওয়াজ বাহির হইল না।

সনাতন বলিলেন,—বাজিয়ে দেখেছ, টাকাগুলো অচল নয় তো?

গৃহিণী তিক্ত কণ্ঠে কহিলেন,—হাঁ, ও যাচাই হয়ে গেছে। মুকীর মাকে মাছের দাম দিতে গেছলুম,—সে বাজিয়ে একে একে সবগুলো ফেরত দিয়ে গেছে। সব অচল টাকা। হাড়হাবাতে বন্ধুরা বিয়ের ক'নে দেখে মেকী চালিয়ে গেছে! আর যাবে নাই বা কেন? নিজের চোখে দেখে শুনে তুমিই যখন এই কাণ্ড বাধিয়ে বসলে? ছিঃ ধিক্! বলিয়া রোষে, ক্ষোভে, ঘৃণায় গৃহিণী চক্ষু, মুখ ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া চুপ করিলেন।

সনাতন আর সিকি দুয়ানীগুলা স্পর্শ না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

*　*　*　*

কক্ষান্তরে তখন অভুক্তা, রোদনরতা বালিকাবধূর চিবুক ধরিয়া বৃদ্ধা-ঠাকুর মা বলিতেছিলেন,—চুপ কর মা, চুপ কর। তোমার দোষ কি?

বালিকাবধূ ধীরে ধীরে আপন কণ্ঠ হইতে হার খুলিয়া বৃদ্ধার হাতে দিয়া মৃদু কম্পিত কণ্ঠে বলিল,—এটা গিল্টির নয় দিদিমা,—বাবাকে দিন। তিনি এটা বেচে দেনা শোধ করুন। সত্যিই আমরা জোচ্চোর।

ঠাকুর-মা বধূর গণ্ডে স্নেহচুম্বন দিয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন ও স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—না মা, তুমি আমার আসল মাণিক, খাঁটি সোনা। যে তোমায় এখনো চেনে নি, তার চোখই মেকী! ছি মা, কেঁদো না, চুপ কর।

মহারাণা রাজসিংহ

অধ্যাপক শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

বাঙ্গালী পাঠকের কাছে মহারাণা রাজসিংহ, সুপরিচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' লিখিয়া অমর হইয়াছেন। তিনি ঔপন্যাসিক; আমি ইতিহাস-অনুসন্ধিৎসু; উভয় দলের মধ্যে বিরোধ শাশ্বত হইলেও তাঁহার অনুপম কল্পনা-সৌধের ভিত্তি-খুনন আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সাহিত্যক্ষেত্রে উপন্যাস-লেখক আপন মনে পুতুল গড়েন; তাঁহার সৃষ্টি নিত্যনূতন। ঐতিহাসিক নূতন কিছু বলিতে বা গড়িতে পারেন না; তিনি সমাজের বার্ত্তাবহ; সত্যের ধর্ম্মাধিকরণে বিচারক। ইতিহাস অনেক অপ্রিয় কথা শুনায়। নীতিবিদের "সত্যং নানৃতং ব্রূয়াৎ" বাক্য উপেক্ষা করিলে যে বিপদ তাঁহাকে তাহাই সর্ব্বাগ্রে বরণ করিয়া লইতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টই বলিয়াছেন,তিনি ইতিহাস-বিচার করেন নাই—তিনি গল্প-লেখক; সুতরাং ঐতিহাসিক বিচার-বিশ্লেষণ না করিবার জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। তিনি ঔরঙ্গজেবের পত্নী-স্থানীয়া উদীপুরী বেগমকে দিয়া রাজপুতনীর তামাক সাজাইয়াছেন, এজন্য প্রবুদ্ধ মুসলমান-সমাজ তাঁহার উপর রুষ্ট; মুসলমান-বিদ্বেষী বলিয়া তাঁহার গ্রন্থ অনেক মুসলমান পড়িতে চান্ না; অনেকে উত্তেজনার আতিশয্যে পাল্টা জবাব লিখিয়াছেন। সুতরাং অন্যান্য জিনিষের মত বিলাত হইতে নায়ক-নায়িকা আমদানী না করিলে উপন্যাস-লেখকও নিরাপদ নন। ইতিহাস-চর্চ্চা আরও বিপজ্জনক; ইহাতে কেহ কেহ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের ছায়াপাত দেখেন।

ইতিহাস-বিচারে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ-পঞ্জী আলোচনা আবশ্যক। রাজসিংহ-উপাখ্যানের মৌলিক উপাদানগুলি, অর্থাৎ সমসাময়িক বিবরণ-সমূহ, সরকারী ও বেসরকারী—এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা, মোগল-দরবারের সরকারী ইতিহাস, ওয়ারিস লিখিত পাদশানামা, মির্জ্জা-মহম্মদ কাজিম কৃত আদাব-ই আলমগিরি, এবং সম্রাট শাহ্ আলমের সময়ে সাকী মুস্তায়িদ খাঁ লিখিত মাসির-ই-আলমগিরি। রাজপুতানায় চারণ এবং কবিই ঐতিহাসিক; এই হিসাবে রাজসিংহের সভাকবি "মান" বিরচিত 'রাজবিলাস' কাব্যই তাঁহার রাজত্বের সরকারী ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। বে-সরকারী ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরদাস নাগর কৃত ফতুহাৎ-ই-আলম-গিরি এবং ম্যানুসীর *Storia do Mogor* উল্লেখযোগ্য। সরকারী ইতিহাসের যাহা কিছু দোষগুণ, অর্থাৎ ঘটনার সন তারিখ ও বর্ণনার প্রাচুর্য্য, পরাজয়-গোপন, কৃতিত্বের অতিরঞ্জন ও চাটুবাদ মোগল-দরবারের ইতিহাসে থাকিবে—ইহা কিছু আশ্চর্য্য নয়। দরবারী ইতিহাসের এই সব দোষ মহারাণার জীবনচরিত রাজবিলাসেও আছে; কিন্তু গুণ অনেকগুলি নাই। চিতোর-দুর্গ সংস্কার করার অপরাধে সাদুল্লা খাঁর সেনাপতিত্বে মহারাণার বিরুদ্ধে মোগল-অভিযান, দারা শুকোর কাছে মহারাণার দূত-প্রেরণ, শাহজাদার মধ্যস্থতায় উভয়পক্ষের শান্তিস্থাপন, সম্রাট শাহজাহানের আদেশে সাদুল্লা কর্ত্তৃক চিতোরের দুর্গপ্রাকার ধ্বংস ইত্যাদি কাহিনী রাজবিলাসে নাই; ওয়ারিসের পাদশানামায় এই-সব ঘটনার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। মহারাণা কর্ত্তৃক মালপুরা ধ্বংস এবং রূপকুমারীর স্বয়ম্বরের কথা একমাত্র মান কবিই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

পাদশানামায় ইহার উল্লেখ না থাকিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। রূপকুমারীকে ঔরঙ্গজেব বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন কি না সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ আছে; তবে রাঠোর-দুহিতা যে রাজসিংহকে বরণ করিয়াছিলেন, ইহা কবি-কল্পনা হইতে পারে না। কবি "মান" সরস্বতী-বিনয়ে দুই স্থলে তাঁহার কাব্য-রচনার সময়-নির্দ্দেশ করিয়াছেন—১৭৩৪ সম্বতের (১৬৭৮ খৃঃ)। আষাঢ় মাস, বুধবার শুক্লা সপ্তমী তিথি; অর্থাৎ ঔরঙ্গজেব

কর্তৃক মিবার আক্রমণের ঠিক এক বৎসর পূর্ব্বে। বহুস্থলে পরবর্ত্তী সময়ের "প্রক্ষেপ" থাকিলেও রাজসিংহের মৃত্যুর পর "রাজবিলাস" রচিত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা ভ্রমাত্মক; কেননা, হিন্দী কাব্যের রীতি অনুসারে কবি দেবতা-স্তুতির পর রাজবন্দনা স্থলেও রাজসিংহের প্রশংসা করিয়াছেন; পরবর্ত্তী রাণা জয়সিংহ কিংবা অন্য কাহারও রাজত্বে এ কাব্য রচিত হইলে নিশ্চয়ই গ্রন্থারম্ভে রাজবন্দনায় সমসাময়িক অন্য মিবার-নৃপতির প্রশংসা থাকিত। কবি মান বলিতেছেন—

সব হিন্দবান কুল রবি সমান
রাজন্ত রাজ শ্রী রাজরাণ।
ইক লিঙ্গ রূপ মেবার ইশ,
যাচক-জন-মন-পুরণ জগীশ॥

রাজবিলাসে রাজসিংহের সহিত ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের দীর্ঘ বর্ণনা আছে। কোন কোন বিষয়, যথা মন্ত্রী দয়াল সাহর মালব-লুট ইত্যাদি যাহা রাজসিংহের মৃত্যুর পরে ঘটিয়াছিল, রাজবিলাসে তাহার সন্নিবেশ পরবর্ত্তী কালে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান হয়। মহারাণার মৃত্যুর বিবরণ রাজবিলাসে নাই; তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু অশুভ বিবেচনা করিয়াই কবি বোধ হয় 'রাজবিলাস' অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। রাজস্থানী কবির প্রত্যক্ষ ঘটনার বর্ণনা হিসাবে ইতিহাসের দিক্ দিয়া এ কাব্যের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। সমসাময়িক রাজপুত-সমাজ, রাঠোর, কচ্ছবাহ, শিশোদিয়ার পরস্পর বিদ্বেষ, মহারাণার সৈন্যবল, এবং সামন্তগণের বীর্য্যবত্তার কাহিনী এই গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দু'এক স্থলে ঘটনার তারিখের গোল, অথবা রাজকুমার আকবরের অধীনস্থ সৈন্যবলের সংখ্যা নির্ণয়ে ভুল ও অতি-রঞ্জনের অজুহাতে রাজবিলাসকে ইতিহাসের পর্য্যায়ে না ফেলা যুক্তিবিরুদ্ধ। এই কাব্য অবলম্বন করিয়াই টড সাহেব রাজসিংহ উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তিনি অনেক জায়গায় এমন সব ভুল করিয়াছেন যাহার জন্য রাজবিলাসকে দোষ দেওয়া চলে না। স্যর যদুনাথ তাঁহার আওরংজীবের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডে (পৃঃ ৩৭৮) সুনিপুণভাবে টডের গ্রন্থের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন।

বে-সরকারী ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরদাস নাগর কৃত ফতুহাৎ-ই-আলমগিরিতেই মোগল-রাজপুত যুদ্ধের নিরপেক্ষ ও সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। লেখক হিন্দু হইলেও মুসলমান-ভাবাপন্ন এবং মোগল-দরবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর; শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার স্বাভাবিক পক্ষপাতিত্ব দোষ কাটিয়া গিয়াছিল। এমন কি, স্থানে স্থানে তিনি অনেক মুসলমান-লেখক অপেক্ষাও অধিক পরিমাণে স্বজাতি-নিন্দা করিয়া গিয়াছেন; রাজসিংহের সহিত তাঁহার অহেতুকী শত্রুতা বা প্রীতি কিছুই ছিল না। সুতরাং তিনি যে রাজসিংহের অতিরিক্ত প্রশংসা করিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। ম্যানুসীর *Storia do Mogor* গ্রন্থের কিয়দংশ শাহ্জাহান এবং ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের বে-সরকারী ইতিহাস। হিন্দু-মুসলমান ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ থাকিলে সম-সাময়িক ইয়োরোপীয় ভ্রমণকারী ও ভাগ্যান্বেষীদের সাক্ষ্যই নিরপেক্ষ বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু ম্যানুসী বিদেশী হইলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক নহেন। বিলাতী সাহেব দেশী হইয়া গেলে যেমন প্রাচ্য-প্রতীচ্যের গুণ-বর্জ্জিত হইয়া উভয়ের দোষরাশির সমন্বয় হইয়া পড়েন, দীর্ঘকাল মোগলাই আব্হাওয়ায় বাস করার ফলে তিনিও অনেকটা সেই রকমই হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বাদশাহী গল্পগুচ্ছ ইতিহাস-হিসাবে ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতা ও বিচারের প্রয়োজন। তিনি প্রথম বয়সে দারা শুকোর চাকরী করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেবের রাজ্যারোহণের পর মোগল-সরকারে চাকরী স্বীকার করিলেও সম্রাটের প্রতি তাঁহার পূর্ব্ববিদ্বেষ দূর হয় নাই; এইজন্য মনে হয়, ঔরঙ্গজেব সম্বন্ধে বহুবিধ মিথ্যা আজগুবি গল্প ইতিহাসের নামে চালাইয়া তিনি আত্মপ্রসাদ লাভের চেষ্টা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের দুইটি প্রধান দোষ—বিশ্বাস-প্রবণতা ও বিচারমূঢ়তা, ম্যানুসীর মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। প্রাচ্যে যাহা কিছু অদ্ভুত কল্পিত ও মানব-বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার ইয়োরোপে তাহাই ঐতিহাসিক মহাসত্য বলিয়া সমাদৃত হয়; সেইজন্য বোধ হয় যাহা কোনদিন ভূভারতে

ছিল না অথবা যাহা লোপ পাইয়াছে তাহাই ম্যানুসীতে পাওয়া যায়। আজকালকার মত বাদশাহী আমলেও "গুপ্তকথার" চানাচুর ও রাজনিন্দার চাটনী দিল্লী-আগ্রার অলি-গলিতে এবং সময় সময় চকেও প্রকাশ্যভাবে বিক্রী হইত; আমীরি মজলিসেও এগুলির চাহিদা ছিল। বেগমমহলের কলঙ্ককাহিনী, রাজসিংহের সহিত যুদ্ধে ঔরঙ্গজেবের লাঞ্ছনা ও উদীপুরী বেগমের দুর্গতি এই জাতীয় বস্তু। এরকম জিনিষের বেশ কাট্‌তি হইবে বুঝিয়া ম্যানুসী বে-পরোয়াভাবে হিন্দুস্থানের বাজার-গুজবে কিঞ্চিৎ মসলা-সংযোগ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিলাতে চালান দিয়াছিলেন; একশত বৎসর পরে সাহেবেরা উহাই আবার এদেশে আমদানী করেন। বিংশ শতাব্দীতেও বিলাতী-ছাপ দেখিলেই জিনিষের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে আমাদের সকল সন্দেহ দূর হইয়া যায়; বঙ্কিম যুগে আদৌ সন্দেহই হইত না; কাজেই ঐরকম গুপ্ত কথা ও গুজব এদেশে ইতিহাস বলিয়া অবাধে প্রচারিত হইয়াছে।

১৭৮৬ বিক্রম সংবতের কার্ত্তিক মাস কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে বুধবার রাত্রে রাঠোর-রাজকুমারী রাণী জনা দেবীর গর্ভে মহারাণা জগৎসিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজসিংহের জন্ম হয়। দ্বিতীয় দিন দৈবজ্ঞের জন্ম-পত্রিকা গণনা, ষষ্ঠী-বাসর জাগরণ, একাদশ দিবসে রাণীর শুচিস্নান ও দ্বাদশ দিবসে প্রীতিভোজ—কবি যথারীতি বর্ণনা করিয়াছেন। জন্ম ও বিবাহের মধ্যবর্ত্তী এগারো বারো বৎসরে রাজকুমারের বাল্যজীবনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই। তাঁহার শিক্ষায়ও কোন বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া মনে হয় না। মোগল-বিদ্বেষ তাঁহার জন্মগত ভাব কিংবা শিক্ষার ফল নহে। শিশোদিয়া ও মোগল-রাজপরিবারের সহিত কোনরূপ বিবাহ-সম্বন্ধ না থাকিলেও সখ্য ও কৃতজ্ঞতার বন্ধন তখনও অটুট ছিল। মিবার-বিজেতা যুবরাজ খুরম্ কুমার কর্ণকে পাগড়ী-বদল করিয়া ভাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিই এ সময় দিল্লীশ্বর শাহজাহান; কর্ণের পুত্র জগৎ-সিংহ ধর্ম্ম-সম্পর্কে তাঁহার ভাই-পো। মিবার-রাণা মোগল-সরকারের নামমাত্র পাঁচ-হাজারী মনসব্‌দার হইলেও সন্ধির সর্ত্তানুসারে তাঁহাকে স্বয়ং বাদশাহী দরবারে উপস্থিত থাকিতে হইত না। মিবার-সৈন্য কোন সর্দ্দার বা রাজ-পরিবারের কোন ব্যক্তির অধীনে সম্রাটের জন্য যুদ্ধ করিত। মুসলমানদের সহিত মিবারের বিশেষ সম্পর্ক না থাকাতে উহা যোধপুর অম্বরের মত অশনে [নিষিদ্ধ বস্তু ব্যতীত] বসনে, সভ্যতায় ও আচার-ব্যবহারে "মোগলাই" হইয়া পড়ে নাই। শিশোদিয়ার রাজচ্ছত্র-ছায়ায় তুর্কী-তেজ কিঞ্চিৎ স্তিমিত ছিল; মহারাণা তখনও হিন্দুপতি; মিবার উত্তর-ভারতে সনাতন আর্য্য-সভ্যতা ও হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয়-স্থল। কুমার রাজসিংহ সনাতন হিন্দুভাবের মধ্যে বর্দ্ধিত, তিনি কখনও বাদশাহী দরবারে কুর্ণিশ করিতে যান নাই; সুতরাং সাম্রাজ্যের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যদল তাঁহাকে চমকিত বা ভীত করিতে পারে নাই। ১৬১৫ খৃষ্টাব্দে মোগলের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর বিধ্বস্ত মিবারভূমি শস্য-সম্পদ ও পশুযূথে সমৃদ্ধিশালিনী হইয়া আবার পূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজিত এবং রাজকোষ ধনভাণ্ডারে পরিপূর্ণ। মিবারের বুকে অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রণচণ্ডীর তাণ্ডব-লীলার চিহ্ন অপনয়নে মহারাণা জগৎসিংহ এই নবসঞ্চিত ধন অকাতরে ব্যয় করিলেন। কুমার রাজসিংহও তাঁহার সমবয়সী সর্দ্দারপুত্রেরা দুর্দ্দিনের সে ভয়াবহ স্মৃতি-চিহ্ন শুধু পরিত্যক্ত রাজধানী চিতোরেই দেখিতে পাইতেন; কেননা, ইহার সংস্কার ও দৃঢ়ীকরণ সন্ধির সর্ত্তানুসারে নিষিদ্ধ ছিল। যুদ্ধক্লান্তি অপনয়নের পর বীরজাতির স্বাধীনতা-স্পৃহা ও রণোন্মাদনা ফিরিয়া আসে; নববলে বলীয়ান্ শিশোদিয়া-হৃদয়েও মোগলের সহিত শক্তিপরীক্ষার বাসনা-বীজ আবার অঙ্কুরিত হইল। চারণের গীত একাধারে রাজপুতানার ইতিহাস, কাব্য ও সঙ্গীত, মারবাড়ের মরুভূমি ও আরাবল্লীর গিরি-কন্দরে তখনকার রাজপুত বালকের মনোবৃত্তি চারণ-গীতিদ্বারা গঠিত হইত। চারণ দুঃখ,দৈন্য ও নিরাশার গীত গায় না; তাহার গান রক্তরাগোজ্জ্বল মৃত-সঞ্জীবনী সুরা; তাহার অগ্নিবীণায় অগ্নি ও অসির ভৈরবী তান ও বীরের রৌদ্রসাধনার সুর বাজিয়া উঠে। রাজসিংহ রাণা প্রতাপের কীর্ত্তি-লতার শেষ প্রসূন; রাজপুত জীবন-সন্ধ্যার মুহূর্ত্তোজ্জ্বল আরক্তিম আভা।

বুন্দীপতি রাও ছত্রসাল হাড়ার এক কন্যার সহিত

কুমার রাজসিংহের প্রথম বিবাহ হয়। তাঁহার দুই কন্যার সম্বন্ধ একই সময়ে কুমার রাজসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের সহিত স্থির হইয়াছিল; এবং একই দিনে মিবার ও মারবাড়ের বর-পক্ষ বুন্দীতে উপস্থিত হন। কোন্ রাজ-কুমার প্রথমে বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করিবে এই লইয়া উভয় দলের মধ্যে বিবাদ বাধিল। কোনো পক্ষই পশ্চাৎপদ হইবার নহে; ক্রুদ্ধ সিংহশাবকদ্বয় পরস্পরের প্রতি কুটিল দৃষ্টি হানিতে লাগিল। যশোবন্ত বলিয়া উঠিলেন, "আমরা উদ্ধত রাঠোর; অনাদিকাল হইতে মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজা; বিবাহ-তোরণে আমিই প্রথমে ভল্লাঘাত করিব।" কুমার রাজসিংহ বলিলেন, "বটে কামধ্বজ! তোমরা কোন্ দিন হইতে নৃপ-পদ-বাচ্য হইলে? তোমরা অম্বরের পদানত; কন্যা-বিনিময়ে ভূমি রক্ষা করিয়াছ; এস! আজই পুরুষকারের পরীক্ষা হউক্।" শিশোদিয়া ও রাঠোরের তরবারি যুগপৎ কোষমুক্ত হইল; বুন্দীরাজ তখন যুদ্ধোদ্যত কুমারদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যশোবন্তের হাত ধরিলেন। বৃদ্ধ হাড়া-নৃপতির বাক্যে উভয় পক্ষ নিরস্ত হইল। তিনি যশোবন্তকে বলিলেন, "কামধ্বজ কুমার! ইঁহার সহিত তোমার স্পর্দ্ধা ও বিরোধ শোভা পায় না। ইঁহারা যুগে যুগে হিন্দুপতি আখ্যা সার্থক করিয়া আসিতেছেন।" কুমার রাজসিংহ প্রথমে "তোরণ বন্দনা" করিলেন; কিন্তু চতুর বুন্দীরাজ কনিষ্ঠ জামাতা যশোবন্তকে অধিক ধন ও যৌতুক দিয়া সম্বর্দ্ধনা করিলেন। রাজ-কুমারদ্বয় বন্ধুভাবে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। কয়েক বৎসর পরে যশোবন্ত রাজসিংহের এক ভগ্নীকে বিবাহ করেন; ইহাতে উভয়ের মধ্যে প্রীতির বন্ধন আরও দৃঢ় হইল।

রাজবিলাসে রাজসিংহের রাজ্যারোহণের পূর্ব্বে উদয়পুরের অগ্নিকোণে ঋতু-বিলাস নামক উদ্যান-নির্ম্মাণের উল্লেখ আছে। ছাব্বিশ বৎসর রাজত্বের পর মহারাণা জগৎ-সিংহ পরলোকগমন করেন। তেইশ বৎসর বয়সে ১৬৫৩, ২৮এ মার্চ* খৃষ্টাব্দে রাজসিংহ গদীতে বসিলেন; তাঁহার কাছে যথারীতি বাদশাহী "খেলাত" (পোষাক, এবং উপহার ইত্যাদি) প্রেরিত হইল। কিন্তু রাজ্যারোহণের কয়েক মাস পরেই মোগল-সম্রাটের সহিত মহারাণার যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা দেখা গেল। অমরসিংহ কর্ত্তৃক সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া রাজসিংহ চিতোর-দুর্গের প্রাকারাদি সংস্কার করিয়া দৃঢ়ীভূত করিতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল বুঝা যায় না; রাজবিলাসের কবি প্রভুর পক্ষে অযশস্কর এই সংঘর্ষের কথা আদৌ উল্লেখ করেন নাই; জানিয়াও এ বিষয়ে সত্য গোপন কিংবা, ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে, "সত্যের মিতব্যয়" করিয়াছেন। তিনি কবি; তাঁহার কাব্য চাটুবাদ, এজন্য তিনি বিশেষ নিন্দার্হ নহেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা আলোচনা করিয়া আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি, হয়ত চিতোর-দুর্গ সংস্কারের উদ্দেশ্য মোগল-সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করা; কিংবা যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সন্ধির ঐ অপমানজনক সর্ত্তটি অপসারিত করা। ১৬৫২ ও ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব ও দারার সেনাপতিত্বে দুইবার অর্দ্ধলক্ষাধিক সৈন্য পাঠাইয়া শাহ্‌জাহান কান্দাহার-দুর্গ পারসীকদিগের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারেন নাই। ইহাতে হয়ত রাজসিংহও সম্রাটের বৈরিতা সাধনে সাহসী হইয়াছিলেন।

মোগল-সম্রাটের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার এই নিষ্ফল চেষ্টাকে অনেকে হয়ত রাজসিংহের অবিমৃষ্য-কারিতা বলিবেন; এবং সাম্রাজ্যের দুর্দ্দিনে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণের সহিত সখ্য সূত্রে আবদ্ধ শাহজাহান এই বিরুদ্ধাচরণকে কৃতঘ্নতা বলিয়া নিন্দা করিবেন। অধীনতার অপমানে উদাসীনতা স্বাধীনতা লাভে নিশ্চেষ্টতা বোধ হয় এরূপ নিষ্ফল চেষ্টা হইতে সমধিক নিন্দনীয়; কৃতজ্ঞতার প্রতিদান সখ্য ও প্রত্যুপকার;—উপকারীর কাছে আত্ম-সম্মান বিক্রয় কিংবা দাসত্বস্বীকার নহে। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে শরৎকালে মহারাণার বিরুদ্ধে এক বিরাট মোগল-বাহিনী সুজ্জিত হইল। মোগলের ইঙ্গিতে কচ্ছবাহ, রাঠোর, হাড়া প্রভৃতি সমস্ত রাজপুত কুল শিশোদিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল; কেননা, তাঁহারা মোগল-দরবারের ভৃতিভুক যোদ্ধা; কয়েক পুরুষ ধরিয়া বাদশার নিমক খাইয়াছেন, স্বকৃত কার্য্যের ন্যায়-অন্যায় বিচারের

* টডের মতানুসারে ১৭১০ সম্বতে জগৎসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল; ইহা ভুল। রাজবিলাসে সঠিক তারিখ নাই। ওয়ারিসের গ্রন্থপাঠে (*f.* 68 *b*) জানা যায়, ১৬৫২, ২৭এ অক্টোবর তারিখে বাদশাহ পঞ্জাবের সরহিন্দের নিকট জগৎসিংহের মৃত্যু-সংবাদ পান।

অধিকার তাঁহাদের নাই। মহারাণা প্রমাদ গণিলেন; তিনি মোগল-সম্রাটের ক্রোধ-প্রশমনের জন্য হিন্দুর একমাত্র আশ্রয় দারার শরণাপন্ন হইলেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর (২ জিলহজ্জ, ১০৬৪ হিজরা; Waris, ii. 73) মহারাণার পক্ষ হইতে রাও রামচাঁদ চৌহান, রঘুদাস হাড়া, সান্দু দাস রাঠোর, গণপৎ দাস পুরোহিত দারার সহিত দেখা করিলেন। কিন্তু দুইদিন পরেই মোগল-সৈন্য মন্ত্রী সাদুল্লা খাঁর সেনাপতিত্বে চিতোর অভিমুখে যাত্রা করিল; তাঁহার প্রতি সম্রাটের কঠোর আদেশ ছিল,—যেন অগ্নিতে অসিতে মহারাণার রাজ্য ধ্বংস করা হয়। উভয়পক্ষে শান্তিস্থাপন ও রাণাকে আশ্বস্ত করিবার জন্য দারা প্রথমে নিজের ইমারত-বিভাগের দেওয়ান চন্দ্রভান ব্রাহ্মণকে মিবারে প্রেরণ করেন; কিছুদিন পরে তাঁহার রাজস্ব-বিভাগের দেওয়ান আবদুল করিমকেও তথায় পাঠাইলেন। এদিকে সম্রাট স্বয়ং যুদ্ধের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য দারাকে সঙ্গে লইয়া আজমীঢ়ের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময়ে দারা আম্বেরাধিপতি মির্জ্জা রাজা জয়সিংহকে যে-সমস্ত চিঠি লিখিয়াছিলেন তাহাতে মহারাণার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে স্যর যদুনাথ সরকারই সর্ব্বপ্রথমে এই সমস্ত চিঠি জয়পুর-দরবারের সরকারী দলিল-বিভাগ হইতে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। ২২শে অক্টোবর,১৬৫৪ (২৯ জিলকাদ, ১০৬৪ হিঃ) দারা জয়সিংহের কাছে লিখিতেছেন, "দ্বিতীয় সংবাদ সম্রাট আজমীঢ়ের দিকে যাত্রা করিয়াছেন; আপনার বাড়ীর কাছ দিয়াই যাইবেন। আমি আপনার ওখানে অতিথি হইব; বাদশাহী ফৌজ মহারাণার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছে। আমি সর্ব্বদাই রাণার শুভানুধ্যায়ী। রাণার রাজভক্তি ও সদুদ্দেশ্যের কথা সম্রাটের কাছে নিবেদন করিয়া তাঁহার রাজ্য যাহাতে বাদশাহী ফৌজের পায়মাল হইতে রক্ষা পায় সে চেষ্টা করিব।"

শাহ্‌জাহানের কাছে দারার সব আবদার চলিত; শাহ্‌জাদা রাতকে দিন করিতে পারিতেন। তিনি মহারাণার জন্য কৃপাভিক্ষা করিলেন, মিবার-রাজ্য রক্ষা পাইল; চিতোর-দুর্গের নবনির্ম্মিত প্রাকার ভূমিসাৎ করিয়া সাদুল্লা খাঁ ফিরিবার আদেশ পাইলেন। নবেম্বর মাসেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গেল। সম্ভবতঃ এই মাসের শেষদিকে লিখিত অন্য একখানি পত্রে দারা জয়সিংহকে জানাইতেছেন, "রাণা মহা বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। অনেক চেষ্টায় তাঁহার মামলা মিটাইয়া দিয়াছি; তাঁহার রাজ্য ও সম্মানের কোন হানি হইতে পারে নাই। রাজপুত জাতি জানুক আমি তাহাদের কিরূপ হিতৈষী এবং তাহারা সর্ব্বদা আমার বিশেষ অনুগ্রহ-ভাজন।"

টড্ সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন, রাজসিংহ শিশোদিয়া-বংশের লুপ্ত প্রথা "টিকা-দৌর" (অভিষেকের পর পররাজ্য আক্রমণ) পুনঃপ্রবর্ত্তিত করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের অধীন আজমীঢ় প্রান্তস্থিত মালপুরা নামক জনপদ লুট করেন। এ সংবাদ শাহ্‌জাহানের কানে পৌছিলেও তিনি রাণার কোন শাস্তি বিধান না করিয়া বলিলেন, "এটা ভাই-পোর [নাতি?] দুর্ব্বুদ্ধি।" ওয়ারিসের পাদ্‌শানামায় মালপুরা-লুটের কোন উল্লেখ নাই; চিতোর-দুর্গ সংস্কার অপেক্ষা অকারণ মোগল-রাজ্য আক্রমণ গুরুতর অপরাধ। সত্যই যদি এ রকম কোন ব্যাপার ঘটিত সম্রাট শাহ্‌জাহান কখনও রাণাকে এত সহজে অব্যাহতি দিতেন না। টড সাহেব রাজবিলাস হইতে নিশ্চয়ই মাল পুরা-লুটের কথা গ্রহণ করিয়াছেন। রাজবিলাসে মালপুরা-লুটের কথা আছে; শাহজাহানের সদাশয়তা, কিংবা মোগলের সহিত সংঘর্ষের কোন উল্লেখ নাই। রাজ্যারোহণ অধ্যায়ের অব্যবহিত পরেই মালপুরা-লুটের বর্ণনা থাকায় টড্ বোধ হয় এই ভ্রমে পড়িয়াছেন। নাগরী প্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত রাজবিলাসে মালপুরা-লুটের সময় নির্দ্দেশ আছে।—

"সম্বত প্রসিদ্ধ দহ সত্ত [সপ্ত] ভাস।
বৎসর সু পঞ্চদশ জিঠ মাস॥"

অর্থাৎ, ১৭১৫ সম্বতের (১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাস। মালপুরা-লুট সত্য ঘটনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে; কিন্তু টড্ কথিত টীকা-দৌর প্রথার পুনঃপ্রবর্ত্তন এবং শাহ্‌জাহানের ভাইপোর উৎপাত নীরবে সহ্য করা ইত্যাদি ভিত্তিহীন জনশ্রুতি মাত্র। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে

সম্রাটের কারাবাসের পর মোগল-সাম্রাজ্য যখন অরাজক হইয়া উঠিয়াছিল তখন সুযোগ বুঝিয়া রাজসিংহ মালপুরা লুট করিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব তখনও দারা এবং শুজার সহিত যুদ্ধে ব্যতিব্যস্ত; সুতরাং রাণার এ কার্য্যের দণ্ড-বিধান নীতিবিরুদ্ধ মনে করিয়া বোধ হয় তিনি নীরব ছিলেন।

কবি মান মালপুরা লুটের পরই দুই অধ্যায়ে রূপনগরের রাজকন্যার উপাখ্যান সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কবিই "সত্যবাদীর" সাধারণ সংজ্ঞায় পড়েন না: তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া কি একটা গুরুতর ব্যাপারকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত? কবি হইলেও একজন সমসাময়িক ব্যক্তি মিথ্যা প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া কাল্পনিক রাজকন্যার সহিত তাঁহার রাজার বিবাহ দিবেন, ইহা অনুমান করা যায় না। রূপনগর রাজপুতানার মানচিত্র হইতে মুছিয়া যায় নাই; রূপসিংহ রাঠোরের নাম ওয়ারিসের পাদশানামায় মনসবদারের তালিকাতে আছে; একাধিক মানসিহের নামও উহাতে দেখা যায়, কিন্তু রূপকুমারীর নাম কিংবা রাজসিংহ কর্ত্তৃক ঔরঙ্গজেবের বিবাহের পাত্রী হরণ করা কোন সরকারী ইতিহাসে নাই, থাকিতেও পারে না; সুতরাং কবি-বর্ণিত ঘটনাকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। প্রথমতঃ বিচার্য্য, কোন্ সময়ে ঔরঙ্গঃজবের ঈপ্সিতা নারীকে মহারাণা হরণ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন? রাজবিলাসে এই ঘটনার কোন তারিখ নাই; কিন্তু টড্ সাহেব ঘটনাটিকে এমনভাবে সাজাইয়াছেন যে দেখিলেই মনে হয় ইহা মোগল-রাজপুত সংঘর্ষের প্রারম্ভে ঘটিয়াছিল, এবং ইহা সেই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। যদি ধরিয়া লওয়া যায়, রাজসিংহের জীবনীর ঘটনাগুলি কবি তারিখ অনুসারে সাজাইয়াছেন তাহা হইলে বলিতে হয় ১৭১৫ সংবত (১৬৫৯) এবং ১৭১৭ সংবতের (রূপকুমারী-পরিণয়ের পরবর্ত্তী অধ্যায় মিবারে সাতবর্ষব্যাপী দুর্ভিক্ষের আরম্ভের তারিখ) মধ্যে রাজসিংহ রাঠোর-কুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। ১৬৫৯-১৬৬১ খৃষ্টাব্দে মোগল-সাম্রাজ্যে গৃহযুদ্ধের জের চলিতেছিল; ঔরঙ্গজেবের সিংহাসন তখনও নিষ্কণ্টক হয় নাই; কাজেই এ সময় স্বার্থহানির ভয়ে তিনি দু'-একটা চড়চাপড় দ্বিরুক্তি না করিয়া হজম করিতেও পারেন। দ্বিতীয়তঃ, বিচার করা উচিত আলমগীর বাদশা ছিলেন জিন্দাপীর; তাঁহারও কি রূপ-তৃষ্ণা ছিল? সরল ধর্ম্মবিশ্বাসী, অপ্রতিম শৌর্য্য ও নীতির আধার, সুকুমার বৃত্তি বর্জ্জিত হইলেও তাঁহার ভয়াবহ হৃদয়-মরুর নিভৃত-প্রদেশে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রেম-স্রোতস্বিনীর গুপ্তধারা প্রবাহিত হইত; এবং সময়ে সময়ে উহা ফোয়ারার মত সহস্রধারায় উৎসারিত হইত; হীরাবাঈ ও উদীপুরী সেই মরু-মালঞ্চের লাবণ্য-প্রসূন।

রূপকুমারীর রূপে ঔরঙ্গজেবের প্রেমোচ্ছ্বাস হইয়াছিল কি না ঐতিহাসিক তাহার সন্ধান রাখেন না। এ সময়ে মহারাজ যশোবন্ত সিংহের সহিত তাঁহার বিরোধ চলিতেছিল; ভেদনীতি দ্বারা রাঠোরকুলকে হীনবল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি মানসিংহ রাঠোরের ভগ্নীর সহিত বিবাহ প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং "রাজশ্যালক" হইবার লোভে রাঠোর-সর্দ্দারও এরূপ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছিলেন —কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

ঔরঙ্গজেব রূপকুমারীকে আনিবার জন্য দুই সহস্র অশ্বারোহী প্রেরণ করিয়াছিলেন; রাজসিংহ তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া রাঠোর-কুমারীকে উদ্ধার করিলেন—এ সমস্ত কথা রাজবিলাসে নাই; অথচ টডের রাজস্থানে আছে। রূপনগরে মহাসমারোহে মানসিংহ রাঠোর আপনার ভগ্নীকে পরমশ্লাঘ্য শিশোদিয়া-রাজের হস্তে অর্পণ করিলেন; বিনা বাধায়, বিনা রক্তপাতে বর-বধু উদয়পুরে ফিরিয়া আসিলেন—মান কবি এরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

এইবার আমরা রূপকুমারীর সংবাদের বিস্তৃত উপাখ্যান ও রাজসিংহ-চরিতের অবশিষ্টাংশ আলোচনা করিব।

মানসিংহ রাঠোর মারবাড়ের একজন ভূমিয়ারাজা; তিনি মোগল-দরবারের সেনাবিভাগের উচ্চপদস্থ মনসবদার ছিলেন। তাঁহার এক সর্ব্বসুলক্ষণা বিবাহযোগ্য ভগ্নী ছিল; নাম রূপকুমারী। সম্রাট ঔরঙ্গজেব বহু ধন ও রাজ্যের লোভ দেখাইয়া মানসিংহের কাছে রূপকুমারীর সহিত নিজের বিবাহ প্রস্তাব করেন। দিল্লীশ্বরের আদেশ অলজ্ঘনীয়; ভয়ে ও লোভে তিনি

ইহাতে সম্মতি প্রকাশ করেন। রাজপুতের নিকট মুসলমানকে কন্যাদান মৃত্যুতুল্য অপমানজনক; তবে রাঠোর এবং কচ্ছবাহের এ অপমান কতকটা সহিয়া গিয়াছিল; তাই মিবারের কবি আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, "কলি যুগ প্রমাণ কবি মান কহি কমধজ কচ্ছবাহা কুমতি", অর্থাৎ কলিযুগে অনাচারের প্রমাণ কুমতি রাঠোর ও ও কচ্ছবাহ।

এই ঘৃণ্যপ্রস্তাবে ভ্রাতা সম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন জানিয়া রূপকুমারী অন্নজল ত্যাগ করিলেন। রাজপুত-বালিকার দুঃখ ও অভিমান কবি সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; নিম্নে কবিতার কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করা গেল।

করুণা-করতে ইহ বিধি করী,
অব আসুর-গেহ তিয়া অমরী।
গুরু সংকট তেঁ মুহি কৌন গহেঁ,
কুননস্তি সখীজন মংঝ কহেঁ॥
গিরি শৃঙ্গ উতংগনি তে যু গিঁরু
কুল কজ্জ হলাহল পান করুঁ॥
জরতে ঝর পাবক-কুণ্ড জরু,
বরিহোঁ সুর আসুর হো ন বরুঁ॥
জিন আনন রূপ লংগুর জিসো,
পল সর্ব্ব ভথে সুর সোঁ যুগ সোঁ।

করুণাময়! তোমার কি বিধান! অমরী এখন অসুর-গৃহে বন্দিনী; আমায় এ ঘোর সঙ্কট হইতে কে উদ্ধার করিবে? কুমারী সখিজনমধ্যে এরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন। উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে লম্ফ প্রদান করিব; কুল-কার্য্য হলাহল পান করিব, জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব, তবুও অসুরকে আত্মদান করিব না,—সুরকেই বরণ করিব। যাহার মুখাকৃতি বাঁদরের ন্যায়, যে সর্ব্ব-মাংস ভক্ষণকারী, সে কি সুরস্ত্রীর যোগ্য হইতে পারে?

রূপকুমারী মহারাণা রাজসিংহের কাছে এক বিনয়-পত্রিকা প্রেরণ করিলেন, ভূমি ও স্ত্রী ভাগ্যক্রমেই মিলে; গৃহাভিমুখী লক্ষ্মীকে কে উপেক্ষা করে? (মহি মানিনী জানি দসারু মিলে; ঘর আবত লচ্ছিয় কোন ঠিলে); শিশোদিয়া কুলের শরণার্থিনী রাঠোর-দুহিতাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চিতোর হইতে সসৈন্য রূপনগর যাত্রা করিলেন। মহারাণা স্বয়ং উপযাচক হইয়া তাঁহার ভগ্নীকে গ্রহণ করিতে আসিয়াছেন; তাঁহাকে কন্যাদান না করিয়া ঔরঙ্গজেবকে দিবে—এরূপ ভয় ও নীচতা কোনো রাজ-পুতের থাকিতে পারে না। রূপনগরবাসী মিবার-বাহিনীকে বরযাত্রীভাবে সংবর্দ্ধনা করিল; বিবাহান্তে মানসিংহ বহুমূল্য যৌতুকসহ রূপকুমারীকে মহারাণার সঙ্গে উদয়পুরে প্রেরণ করিলেন। রূপনগরে কোন মোগল-সৈন্যের উপস্থিতি কিংবা তাহাদের সহিত মহারাণার সংঘর্ষের কথা রাজবিলাসের এ অধ্যায়ে নাই। নবপরিণীতা রাণীর রক্ষার্থ মিবারের রক্ত-পতাকাতলে শিশোদিয়া-সামন্তমণ্ডলীর যুদ্ধোদ্যম, ইত্যাদি যাহা আমরা টডের রাজস্থানে পড়িয়াছি তাহা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য। এই বিবাহের অন্ততঃ আঠার-উনিশ বৎসর পরে ঔরঙ্গজেবের সহিত মহারাণার বিবাদের সূচনা হইয়াছিল।

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দের অভিজ্ঞতার পর মহারাণা রাজসিংহ সম্রাট শাহজাহানের সহিত আর বিবাদ করিতে সাহসী হন নাই। দিল্লীশ্বর শাহজাহানের এক ভুজ ছিল দারা শুকো, অন্য ভুজ ঔরঙ্গজেব; ভ্রাতৃদ্বয় যেন তাঁহার দ্বিমূর্ত্তি; তাঁহারই চরিত্র-চিত্রের আলো ও ছায়া। জীবনের অপরাহ্ণে যখন তাঁহার জরাকম্পিত হস্ত রাজদণ্ড-ধারণে অক্ষম হইয়া পড়িতেছিল, তাঁহার পুত্রত্রয় দারার সৌভাগ্যে ঈর্ষাপ্রজ্বলিত হইয়া অসিবলে ভাগ্যপরীক্ষায় বদ্ধপরিকর হইলেন। দারা জীবনের অধিকাংশ ভাগ হিন্দুদর্শন আলোচনায় এবং হিন্দু পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীর সাহচর্য্যে কাটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রপিতামহের মত উদারচরিত্র, পরমত-সহিষ্ণু ছিলেন; এবং বিপন্ন হিন্দুর পক্ষে যেন বিধাতার আশীর্ব্বাদ। ঔরঙ্গজেব সর্ব্ব-বিষয়ে ইঁহার বিপরীত; শরিয়তের চাকে ইনি নিখুঁৎ মৌলানা-মডেলে তৈয়ারী। তিনি সরলবিশ্বাসী মুসলমান, যুক্তিতর্ক বিচারের অধিকার তিনি দাবী করিতেন না; তাঁহার ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি ছিল কোরাণ হদিস; নবী ও তাঁহার পরবর্ত্তী পুণ্যশ্লোক খলিফা চতুষ্টয়ের অনুসৃত পথ অবলম্বন করিয়া মোগল-সাম্রাজ্যকে খাটি খিলাফতে পরিণত করাই ছিল তাঁহার জীবনের মোহন স্বপ্ন। ঔরঙ্গজেবের মত চরিত্র সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে গোঁড়া সমাজ কর্ত্তৃক আদর্শভাবে পূজিত হইয়া থাকে; মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুর মন্দির ধ্বংস করিয়াছেন; হিন্দু হইলে তিনি ভবভূতির রামচন্দ্রের মত শূদ্রতপস্বীর মাথা কাটিতেন

কিংবা জয়দেবের কল্কি অবতারের মত "ম্লেচ্ছনিবহ নিধনে কলয়সি করবালং" হইতেন। কবি মান ঔরঙ্গজেব-চরিত্রের একদিক বেশ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন

> "রসনা রটন্ত মহমদ রসুল,
> ইদহ, নিবাজ, রোজা অভুল।
> * *
> গরবর বদন্ত ফারসী গুমান,
> প্রাসাদ তিথ্য খণ্ডে পুরাণ॥"

তাঁহার জিহ্বায় সর্ব্বদা মহম্মদ রসুলের নাম; ইদ্, নমাজ ও রোজা পালনে তিনি ত্রুটি করেন না; অহঙ্কারে তিনি বিড়বিড় করিয়া ফারসী কথা বলেন; প্রাচীন দেবালয় ও তীর্থ ধ্বংস করাই তাঁহার কাজ। হিন্দুদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা এবং অকর্ম্মণ্যতার ফলে দারার পরাজয় হইল। হিন্দুসমাজের এই দুর্দ্দশার জন্য রাঠোর কচ্ছবাহের তুলনায় হিন্দুপতি মহারাণাও কম দোষী নহেন। রাজসিংহ হতভাগ্য দারার পূর্ব্ব উপকারের কোন প্রতিদান দেন নাই; আন্তরিক সহানুভূতি থাকিলেও প্রকাশ্যে ঔরঙ্গজেবের সহিত বিবাদ করিতে তিনি সাহসী হন নাই। তাঁহার এরূপ দুর্ব্বলতা ও অকৃতজ্ঞতা শিশোদিয়া কুলের দুরপনেয় কলঙ্ক। তিনি চতুর রাজনৈতিক কিংবা দূরদর্শী নেতা ছিলেন না; তাঁহার স্বধর্ম্মপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগ ক্ষুদ্র মিবার-রাজ্যেই আবদ্ধ ছিল। মহারাণা সমস্ত হিন্দুসমাজের মুখপাত্র হইয়া "জিজিয়া" বা অ-মুসলমানের মুণ্ড-করের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন নাই। এ সম্বন্ধে যে চিঠি টড রাজসিংহের নামে চালাইয়াছিলেন, স্যর যদুনাথ তাহা শিবাজী কর্ত্তৃক লিখিত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। তাঁহাকে অব্যাহতি দিয়া বাকী সমস্ত হিন্দুকে নিষ্পেষিত করিলেও তিনি ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দুর মন্দির এবং মূর্ত্তি ধ্বংস ব্যাপারেও মহারাণার ভাব এরূপই ছিল। যশোবন্তের মৃত্যুর পর ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমে সমস্ত মারবাড় রাজ্য মোগল সরকারে বাজেয়াপ্ত হইল। পরস্পর-বিরোধী মুসলমান ফৌজদার-গণ মারবাড়ের প্রধান প্রধান শহর ও দুর্গগুলি হস্তগত করিয়া সর্ব্বত্র মন্দির ও মূর্ত্তি ধ্বংস সুরু করিল। তখনও মহারাণা নিশ্চেষ্ট; বরং ঔরঙ্গজেবের কোপ-দৃষ্টি যাহাতে মিবারের উপর পতিত না হয় সেজন্য এপ্রিল মাসে সম্রাটের নিকট কুমার জয়সিংহকে পাঠাইয়া দিলেন; তবুও ঔরঙ্গজেব মিবারের উপর জিজিয়ার দাবী ছাড়িলেন না। জুলাই মাসে দুর্গাদাস অসীম বীরত্বে যশোবন্তের পরিবার এবং শিশুপুত্র অজিতকে মোগলের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া যোধপুর পৌছিলেন। মহারাণার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া সমস্ত রাঠোর-সর্দ্দারগণ স্ত্রীপুত্র সহিত মিবার-রাজ্যে আসিয়া বাস করিতে লাগিল; মহারাণা তাঁহাদিগকে বারখানি গ্রাম দান করিলেন এবং নানা প্রকারে সম্মানিত করিলেন। ঔরঙ্গজেব দেখিলেন মিবার জয় না করিলে রাঠোরেরা দমিত হইবে না। ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নবেম্বর আজমীঢ় হইতে সসৈন্যে মিবার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মহারাণা রাঠোর ও শিশোদিয়া-সর্দ্দারগণকে দরবারে আহ্বান করিয়া পরামর্শ করিলেন। প্রত্যেকের মুখেই দুর্জ্জয় সাহস ও অদম্য উৎসাহের উজ্জ্বল জ্যোতিঃ; সকলেই শত্রু-সৈন্যের উপর নিপতিত হইবার জন্য উৎসুক। কিন্তু বৃদ্ধ কুলপুরোহিত গরীবদাস নিবেদন করিলেন, আরাবল্লীর পর্ব্বতশিখর আশ্রয় করিয়াই রাণা প্রতাপ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন; সম্মুখসমরে সৈন্যবল ক্ষয় না করিয়া আরাবল্লীর দুর্গম গিরিসঙ্কট এবং বনদুর্গের আশ্রয় হইতে অতর্কিত আক্রমণে মুসলমান-সৈন্য ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত। চিতোর কিংবা উদয়পুর রক্ষার জন্য বৃথা সৈন্যক্ষয় না করিয়া মহারাণা আরাবল্লীর পার্ব্বত্য-প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৬৮০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী হইতে ৬ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঔরঙ্গজেব উদয়পুরের বুকে ধ্বংসলীলা প্রকট করিলেন। এ যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা এখানে অনাবশ্যক। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার এক বৎসর পরেই ২২শে অক্টোবর মহারাণা রাজসিংহের হঠাৎ মৃত্যু হয়। তিনি উচ্চশ্রেণীর রাজনীতিজ্ঞ না হইলেও সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন। মোগলেরা যাহাতে সমস্ত শক্তি মিবারের বিরুদ্ধে নিয়োগ করিতে না পারে, সেজন্য তিনি রাজপুতদিগকে মালব এবং গুজরাত প্রান্ত লুট করিতে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে যে শুধু যুদ্ধের খরচ

যুদ্ধের আমদানী হইতে নির্ব্বাহিত হইত তাহা নহে; অপেক্ষাকৃত অল্পআয়াসসাধ্য জয়লাভে রাজপুতদের আত্মক্ষমতায় বিশ্বাস বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যুদ্ধে না হারিলেও ঔরঙ্গজেব আশাভঙ্গজনিত পরাজয়ে ম্রিয়মান হইয়াছিলেন। রাজপুতজাতির এক বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ সময়ে তিনি তাহাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি অবলম্বন করিয়া রাজপুত দুর্জ্জয় হইয়া উঠিয়াছিল; যে হারিয়াও হার মানে না, পৃথিবীর কোন শক্তি তাহাকে পরাজিত করিতে পারে না; প্রবলতর শত্রু দ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া মরিলেও সে জয়োচ্ছ্বাস অনুভব করে। রাজসিংহ রাজপুতের মনোবৃত্তিকে এই-ভাবে দৃঢ়ীভূত করিয়াছিলেন। মহারাণা রাজসিংহের প্রারব্ধ কার্য্য মহাবীর দুর্গাদাসের নেতৃত্বেই বহু বৎসর পরে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। জীর্ণ অক্ষয়বটের মত সপ্তদশ শতাব্দীতে মৃতপ্রায় হিন্দুজাতির যে কয়েকটি নূতন শাখার উদ্গম হয়, মহারাণা রাজসিংহ তাহারই অন্যতম।

পাখী—হাজার বছর পরে

অধ্যাপক শ্রীহৃষীকেশ ভট্টাচার্য্য

১

সৃষ্টির রহস্যপটে কালের তুলিকা আজো আঁকে নাই
রূপটি তোমার,
ওগো মোর অনামিকা পাখি!
ঊষার বরণ-ছন্দ গভীর স্পন্দনে তব বাঁধে নাই
কাকলি ঝঙ্কার,
আলো তোমা যায় নাই ডাকি।
তবু অন্তরের কোন্ গূঢ়তম অনুভূতি
ভবিষ্যের অন্ধকার শেষে
জাগাইছে তোমার বারতা;
তবু কোন্ নামহীন-বিরহ-বেদন-ঘন হৃদয়ের
বাষ্পাকুল দেশে
ফুটি ওঠে দীর্ঘ ব্যাকুলতা।

২

তোমারে দেখেছি বুঝি তরুণ-বিশ্বের বুকে
নবদীপ্ত অরুণ-কিরণে
ক্ষীণ স্মৃতি জাগে মোর প্রাণে,
শুনেছি তোমার গীতি, জ্যোতিষ্কবিন্দুর রূপে
যবে তুমি বরণে বরণে
আকাশ ভরেছ গানে গানে!
অযুত যুগের মৈত্রী হৃদিরক্ত মাঝে মোর
তাই আজি তোলে চঞ্চলতা,
—সুমুখে পিছনে শুধু চাই;
অনাগত বন্ধু মোর! অনাহত সুর তব আনে
যেন কোন্ আকুলতা;
তোমারে নন্দিব আজি তাই।

৩

সহস্র বৎসর পরে যবে নীল নভোতলে স্পন্দিবে
তোমার পক্ষরেখা,
গানের ঝরণা যাবে ঝরে,
তব সুখ-কলতান-মুখরিত উপবনে ফুলের
অক্ষরে রবে লেখা
স্বাগত বচন তব তরে;—
তখন এমনি ধারা ধরণীর অন্তরেতে দুলিবে
ফুলিবে সুখ দুখ,
অযুত প্রাণের হবে মেলা;
মিলন-গীতিকা কত গুঞ্জরিবে কুঞ্জবনে,
বিরহে ভরিবে কত বুক,
হবে কত প্রণয়ের খেলা।

তখনো প্রাণের স্রোত দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে
আবর্ত্তিবে নব নব পথে,
জাগাইবে চির নবীনেরে,
সুখীর আহ্লাদ-রোল, ব্যথিতের গুমরণ
মুখরিবে কাল-মহারথে,
শেষহীন চক্রের ঘর্ঘরে।

৪

সহস্র বৎসর পরে নব মালতীর বনে মদির
হইবে যবে ছায়া
সায়াহ্নের আসন্ন বেলায়
তোমার সঙ্গীতরাশি পুঞ্জে পুঞ্জে স্তরে স্তরে
রচিবে গো সুর-ঘন মায়া
কুসুমের মিলন মেলায় ;—
আসিবে তখন ধীরে গোপনচারিণী কোন্ নব
অভিসারিকার বেশে,
অনুরাগে রাঙা আঁখি দুটি—
বাজিবে চরণে তার শঙ্কিত নূপুর-বোল—
আঁধার নিবিড় হবে কেশে—
নিশ্বাসে উঠিবে ফুল ফুটি ;—
তোমার গানের দীপ পথ দেখাইবে তার
পথহারা ক্লান্ত প্রণয়ীরে,
মিলাবে চঞ্চল দুটি হিয়া,
তব সুর-পরশনে বিরহ-বাহিনী-ব্যথা লুপ্ত হবে
ধীরে অতি ধীরে,
অন্ধকার দিবে আবরিয়া।

৫

সহস্র বৎসর পরে আমি ত র'ব না বন্ধু সেই
সুর-বাসরের তলে,
হেরিব না মধুর ধরণী ;
মোর অণু পরমাণু বিরাট প্রশান্তি মাঝে
স্তব্ধ রবে অসীম অতলে,
জ্যোতি হবে আঁধার বরণি।

বাদলের প্রীতিধারা, আলোকের আবাহন,
বসন্তের প্রণয় সঞ্চার
পুষ্পপত্র জল স্থল মাঝে
উঁকি ঝুঁকি দিয়া মোর কালোর তোরণ দ্বারে
আঘাত করিবে বারে বার,—
মোর কানে কিছু নাহি বাজে।
তব কণ্ঠ-ভরা গীতি নিতুই-নূতন-সুর-শিহরণ
জাগাবে জগতে
জীবনের হরিৎ উৎসবে,—
উষাহীন রাত্রি মোর তারাহীন অন্ধকারে
শুনিতে পাবে না কোনমতে,
অসাড় চেতন হীন রবে।

৬

তবুও তবুও ওগো সহস্র বৎসর আগে
তোমারে পাঠান সম্ভাষণ
আজি এই শীতের দুর্দ্দিনে
অদেখা বান্ধব এক প্রীতির অঞ্জলি দিল
একথাটি করিও স্মরণ
ধূলিমাঝে তারে নিও চিনে।
আমার মাটিতে বন্ধু আমার তৃণের দলে,
মোর ক্ষুদ্র পুষ্পিত বিথানে
কভু এঁকো তব চক্ষুরেখা,
নিভৃত সন্ধ্যায় গাওয়া একটি স্নেহের গান লুকাইয়া
রাখিও এখানে—
রেখে যেও বেদনের লেখা।
যদি কভু আঁধারের অসীম রহস্যতলে
চেতনার ক্ষণিক সঞ্চারে
কোনমতে হই সুপ্তিহীন
কাঁপিয়া উঠিব আমি প্রচুর পুলকাবেশে
পেয়ে তব প্রীতি উপহারে—
—মনে হবে আজিকার দিন।

মরুচারিণী

শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী

রাত্রি এক প্রহর থাকিতে মাধব শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরের চৌকীতে বসিয়া নির্ব্বিকারভাবে ভৃত্য হরিধনের স্বহস্তে-সাজা তামাকু সেবন করিলেন। তাহার পর কোঁচার খুঁটটি অনাবৃত বক্ষের উপর জড়াইয়া লইয়া গ্রামের রাস্তায় আসিয়া দেখিলেন, তাঁহারই আদেশ-মত গরুর গাড়ী গরু ও গাড়োয়ান-সহ প্রস্তুত হইয়া আরোহীর প্রতীক্ষা করিতেছে। গাড়োয়ানকে সম্বোধন করিয়া একবার বলিলেন,—'কিরে নিধে, সব ঠিক রেখেছিস্ ত !' অর্দ্ধতন্দ্রামগ্ন গাড়োয়ান নিধিরাম সহসা সেই গম্ভীর স্বরে সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ কত্তা—সব ঠিক রয়েছেন।

—পাঁচটা সাতান্ন মিনিট, কি না, একটু সকাল হ'লেই ইষ্টিশান থেকে গাড়ী ছাড়ে—একটু তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকিয়ে যাস্—কি জানি যদি—

কর্ত্তাকে আর কিছু বলিতে হইল না। চতুর নিধিরাম কর্ত্তার মুখের কথা লুফিয়া লইয়া বলিল—তুমি কিছু ভাব্‌বেন না কত্তা—ঠিক টাইনে গাড়ী যদি ধরিয়ে দিতে না পারি, ত আমার নাম নিধিরাম-ই নয়!

'আচ্ছা, আচ্ছা' বলিয়া কর্ত্তা নিধিরামকে জাগাইয়া দিয়া সেই পথ ধরিয়া আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া গেলেন। পথ যেখান হইতে মোড় ফিরাইয়া পশ্চিমের দিকে চলিয়া গিয়াছে, পথের সেই বাঁকে একঝাড় বাঁশের পিছনে কচা ও চিতার বেড়া-ঘেরা দু'খানি ছোট ছোট মাটির ঘর। সেইখানে আসিয়া কর্ত্তা ডাকিলেন—হিরণের মা! ও হিরণের মা!

বার-কয়েক ডাকার পর একটি বৃদ্ধা সাড়া দিয়া বেড়ার কাছ পর্য্যন্ত অতি কষ্টে লাঠি ধরিয়া ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—চোখে ত ভালো দেখ্‌তে পাইনে, কানেও কি ভালো শুন্‌তে পাই ছাই! হিরণ আমাকে উঠিয়ে দিলে—বল্‌লে বড়বাড়ীর কত্তাবাবু এসেছেন—তুমি যাও! তা, আজ্ঞে কি বল্‌ছেন?

কর্ত্তা আরও একটু আগাইয়া আসিয়া একটু উচ্চ-কণ্ঠেই বলিলেন,—হিরণকে তৈরী হয়ে নিতে বলো, গাড়ী ছাড়বার আর দেরী নেই।—বলিয়া তিনি আর উত্তরের অপেক্ষা করিলেন না, ধীরে ধীরে যে-পথে আসিয়াছিলেন, সেই পথেই বাড়ীর দিকে ফিরিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে সেই বাড়ীর সদর-দরজা হইতে একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে একটি অর্দ্ধাবগুণ্ঠিতা মহিলার আগে আগে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

হিমশীতল পৌষ-রাত্রি-শেষের বাতাস বহিয়া যাইতেছিল। সম্মুখের পূজামণ্ডপের পাশে দুইটি শেফালি তরু। তখনও সেই শেফালি তরু-তলে রাত্রিতে ঝরা কতকগুলি শুভ্র শেফালি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারই পাশ দিয়া শিশির-সিক্ত দূর্ব্বা-লুটানো ছোট একটুখানি পথ পূজামন্দিরের দিকে চলিয়া গিয়াছে। ছোট ছেলেটি ও মহিলাটি সেই পথ ধরিয়া পূজামন্দিরে আসিয়া উঠিলেন। মহিলাটি গলায় আঁচল দিয়া নত হইয়া সেই মন্দিরের সোপানে প্রণাম করিলেন; বালককে বলিলেন—নীরদ, প্রণাম করো।'

ভোরের দিকের গাঢ় ঘুম ভাঙিয়া যাওয়াতে বালক সন্তুষ্ট ছিল না। বলিল,—'খুড়ি মা, আমরা কোথায় যাচ্ছি!

দৃঢ় স্বরে মহিলা বলিলেন,—'আগে আমার কথা শোনো, তার পর তোমার কথার উত্তর দেব।'

অগত্যা নীরদ নত হইয়া প্রণাম-কার্য্য শেষ করিয়া উঠিয়া বলিল—এবারে বলো খুড়ি-মা!

খুড়ি-মা মৃণ্ময়ী বলিলেন—আমাদের সহরে যেতে হবে।

সেখানে তোমাকে পড়াশুনা করতে হ'বে—ইস্কুলে ভর্ত্তি হ'তে হ'বে।

এই সব ভীতিপ্রদ কথা শুনিতে হইবে জানিলে নীরদ বোধ হয় তাহার খুড়িমাকে কোনো প্রশ্নই করিত না। হঠাৎ বাহির হইতে মাধবচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনা গেল ;—'একটু তাড়াতাড়ি এসো বৌমা! ট্রেনের সময় থাক্‌বে না!'

ইহার পর আর কথা বলা চলে না। যেখানে নিধিরাম গরুর গাড়ী-সহ আরোহীদের প্রতীক্ষা করিতে ছিল, উভয়ে সেইখানে আসিয়া পৌঁছিলে—কর্ত্তা মাধবচন্দ্র বলিলেন,—যাও, যাও সব উঠ' গিয়ে। বৌমা, তুমি গাড়ীর ভিতরের দিকে বসো। নীরদ, তুই বৌমার কোলের কাছে বস্! এ মেয়েটা ত এখনো এলো না—

আর বেশী বলিতে হইল না। কথা শেষ না হইতেই 'এই যে আমি এয়েছি' বলিয়া একটি অল্পবয়সী শ্যামা মেয়ে হাতে একটি ছোট কাপড়ের পুঁট্‌লি লইয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিল। মাধবচন্দ্র তাহাকে দেরী করার জন্য ধমকাইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু মেয়েটির সেদিকে মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সহর দেখিবার আনন্দে সে তর্‌ তর্‌ করিয়া বাড়ী হইতে অনেকখানি পথ হাঁটিয়া আসিয়াছে—কাহাকেও কিছু বলিবার অবসর না দিয়া সে একেবারে গাড়ীতে উঠিয়া মৃণ্ময়ীর কোলের কাছে যেখানে নীরদ বসিয়াছিল, সেইখানে আসিয়া বসিল; বলিল, 'খুড়ি মা, নীরদবাবুর মুখখানি কাঁদ কাঁদ দেখ্‌ছি যে! আমার ত বেশ ভালই লাগছে।' বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি ছল ছল করিয়া উঠিল—এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির সুখদুঃখ মিশ্রিত প্রতিদিনের জীবনযাত্রা হইতে তাহারা যে কিছুকালের জন্য অবসর লইল, তাহাই বোধ হয় এই দুটি বালকবালিকাকে অধীর করিয়া তুলিতে-ছিল। মৃণ্ময়ী তাহাদের দুইজনকেই কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, আবার শীগগির ফিরে আস্‌ব।

এদিকে মাধবচন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বসিলে নিধিরাম গাড়ীতে গরু জুড়িয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিল। প্রথম শীতের ধূলি-ধূসর মাঠের রাস্তা দিয়া গাড়ী বিচিত্র কলরব করিতে করিতে ষ্টেশন অভিমুখে চলিয়া গেল।

গ্রাম হইতে হিরণ সহরে চলিয়া যাওয়ায় তাহাকে কেন্দ্র করিয়া গ্রামে একটি গোল বাধিল। সংসারে থাকিবার মধ্যে আছে হিরণের মা, হিরণের এক চিররুগ্ন খিটখিটে মেজাজের ভাই—আর দুটি চাষের বলদ, একটি কুকুর ও একটি বিড়াল। হিরণ বাড়ী হইতে চলিয়া গিয়াছে, বিড়াল হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণের রুগ্ন ভাইটির পর্য্যন্ত হাজারো রকমের অসুবিধা। হিরণের এই ভাইটি হিরণের অপেক্ষা প্রায় দশ বছরের বড়। কিন্তু তাহাকে দেখিলে হিরণের ছোট বলিয়াই মনে হয়। সরু সরু পাট-কাটির মতো পা—লাঠি ধরিয়া চলিতে পারে। পেটটি প্লীহা-যকৃতে প্রায় জয়ঢাকের আকার ধারণ করিয়াছে। মাথায় চুল নাই। প্রত্যহ বিকালের দিকে চোখমুখ জালা করিয়া কম্প দিয়া জর আসে।

আজও জর আসিয়াছে। হি-হি করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে হাঁটু দু'টি গুটাইয়া পড়িয়া আছে। হিরণের মা 'আমার কি মরণ হবে না—নাকালের কি আর শেষ আছে' ইত্যাদি বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে বকিতে একখানি কাঁথা তাহার উপর চাপাইয়া দিল। তাহার পর এক হাতে একটি লাঠি ও কাঁকালে একটি ছোট কলসী লইয়া ঘাটের দিকে চলিয়া গেল।

হিরণের ভাই শশী আপন মনেই বকিতে লাগিল। প্রলাপ নয়—বেশ অর্থপূর্ণ কথা—'ঠাকুর হিরণকে ঝি-গিরির জন্যে নিয়ে গেল; বাড়ীতে ত এই অবস্থা। পই-পই ক'রে বারণ ক'রলাম, যাসনে হিরণ, যাস্‌নে! সে কি আর আমার কথা শোনে? ধিঙ্গী মেয়ে—সহর দেখ্‌বে—সহর!'

এমন সময়ে সম্মুখের রাস্তায় অনেকগুলি লোকের পায়ের শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। গুপীদাস, যতনচন্দ্র, নিধিরাম প্রভৃতি অনুচ্চকণ্ঠে কি আলাপ করিতে করিতে হিরণদের বাড়ীর দিকে আসিতে লাগিল। ইহারা সব হিরণের সমাজের লোক—মাতব্বর মোড়ল। যতনচন্দ্র বলিল,—দেখ্‌লে গো, আমি বলেছিলাম, এ ত আর যে-সে লোক নয়; স্বয়ং কর্ত্তা; তা'র কথা কি আর ঐ রোগা ছেলেটা ঠেল্‌তে পারে?

নিধিরাম বলিল,—আরে শুধু কি তাই! যেদিন গাড়ী

ক'রে ওদের ইষ্টিশনে নিয়ে যাই, সেদিন ভাই, বল্‌লে না পেত্যয় যাবি—মেয়েটার কি হাসি! সে হাসি শুন্‌লে অবাক্ হ'য়ে যেতে হয়!

যতনচন্দ্রের আক্রোশ অতি প্রবল। সে চীৎকার করিয়া সকলকে জানাইয়া দিল যে, ঐ হাসি সে একদিন বন্ধ করিয়া দিবে। তাহাদের সমাজের অল্পবয়সী বিধবা মেয়ে—তাহাকে কি না মা-ভাই হইয়া সহরে পাঠানো! মজাটি টের পাইবে তাহারা—যাহারা তাহাকে সহরে লইয়া গিয়াছে এবং যাহারা তাহাকে জানিয়া শুনিয়া সহরে পাঠাইয়াছে। সহরে কি আর চরিত্তির ঠিক থাকে? গুপীদাস অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সে যতনচন্দ্রের আস্ফালন থামাইয়া দিল; বলিল,—যা না, ঐ শশীকে ধ'রে নিয়ে আয় না! ওর সঙ্গে গোটাকতক কথা আছে।

ইহারা যেন এই আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সলম্ফে হিরণদের উঠানের উপর পড়িয়া দাওয়ার উপরে যেখানে শশী কাঁপিতেছে, সেইখানে সশব্দে উঠিয়া আসিয়া শশীকে চ্যাংদোলা করিয়া উঠাইয়া লইয়া একেবারে গুপীদাসের পায়ের কাছে নামাইয়া দিল। রুগ্ন শশী ইহাদের জানিত। ইহাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা তাহার ক্ষমতার বাহিরে। সে ভাবিল ইহাদের কথায় সায় দিয়া যাওয়াই তাহার পক্ষে মঙ্গল। অদৃষ্ট খারাপ, দেহও বিকল—অগত্যা কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কেঁউ কেঁউ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে, তাহার নিজের এ-বিষয়ে বিশেষ আপত্তি ছিল। কর্ত্তাঠাকুর ক্ষমতাশালী লোক—তাহার উপর তিনি তাহাকে কিছু টাকা কর্জ্জ দিয়াছেন। হিরণ তাঁহার বাড়ীতে দাসীবৃত্তি করিলে তাহার পারিশ্রমিক হইতে ঋণটা শোধ যাইবে। সেইজন্যই হিরণের যাওয়াতে আপত্তি থাকিলেও তাহাকে বাধ্য হইয়া যাইতে দিতে হইয়াছে।

গুপীদাস ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—ওসব আমরা শুন্‌তে চাই নে। তোকে আমরা একঘরে কর্‌লাম। হুঁকো-নাপিত-ধোপা সব বন্ধ।

—দোহাই দাদা, একঘরে করো না। তোমরা যা' বল্‌বা, তা-ই কর্‌বো। হুঁকো-নাপিত বন্ধ করো না দাদা—দোহাই দাদা!"

শশী পড়িয়া পড়িয়া আবার কেঁউ-কেঁউ করিতে লাগিল। গুপীদাস, যতনচন্দ্র ও নিধিরামে আবার পরামর্শ চলিতে লাগিল। শেষে গুপীদাস বলিল—আচ্ছা, তুই দশটা টাকার সিন্নি দে—কালই দিতে হ'বে। নইলে তোকে জাতে উঠ্‌তে দেওয়া হ'বে না। বুঝ্‌লি রে?

শশী সবই বুঝিল—টাকা কোথায়? আবার কালই দিতে হবে—কাজেই সে আবার কেঁউ-কেঁউ করিতে করিতে লাগিল। যতনচন্দ্র প্রস্তুত হইয়াই ছিল। বলিল—কেন, টাকার জন্যে ভাবনা কি তোর? কর্ত্তা-ঠাকুরকে ধর্ না।

শশী,—মরণাপন্ন রুগ্ন শশী তাহাতেই স্বীকার আছে বলিয়া লাঠি ধরিয়া ধীরে ধীরে বাড়ী আসিয়া বিছানার আশ্রয় লইল। শ্রান্তিতে বিরক্তিতে রোগের যন্ত্রণায় সে অবসন্ন হইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল।

একখানি পড়ো বাড়ী। সহরের একটি সংকীর্ণ রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটি ভাঙা প্রাচীরবেষ্টিত খানিকটা জমির উপর বাড়ীখানি। প্রাচীরের গায়েই একটি শীর্ণ পেয়ারা গাছ - কয়েকটি কাঁটাল গাছ তাহাদের ঘন সবুজ পল্লব-পত্রবহুল শাখাবাহু বিস্তার করিয়া স্থান-টিকে একটি স্নিগ্ধ ছায়ায় ভরিয়া রাখিয়াছে। ছুটির দিন দ্বিপ্রহরে এই গাছ-তলে ছেলেদের মেলা বসে। কেহ বা পেয়ারা গাছে উঠিয়া পেয়ারাগুলি না পাকিতেই তাহাদের সদ্ব্যবহার করে। অপর কেহ কাঁঠাল গাছের প্রসারিত শাখার নীচে গাবু কাটিয়া মার্ব্বল্ খেলিতে ব্যস্ত থাকে। বাড়ীখানির দক্ষিণ দিকে—ঠিক সদর দরজার সম্মুখে একখণ্ড পতিত জমির উপর অভ্রভ্র কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ফাল্গুনের আবির্ভাবে সব গাছগুলি ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়া স্থানটিকে নানা অদ্ভুত ধরণের মৌমাছির গুঞ্জনে মুখর করিয়া রাখিয়াছে।

আজ আর সেখানে ছেলেদের মেলা বসে নাই। পেয়ারা গাছের খুব উঁচু ডালে বোধ হয় দুই একটি পেয়ারা তখনও অবশিষ্ট ছিল। গাছটির নীচে দাঁড়াইয়া নীরদ সতৃষ্ণনয়নে পেয়ারা দুটির দিকে তাকাইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

মধ্যে সহরে আসিয়া তাহার সাংঘাতিক পীড়া হইয়া গেছে। মৃণ্ময়ী তাহাকে খুব সাবধানে রাখিয়াছেন। নিত্য নিয়মিত পথ্য ছাড়া আর কিছুই ইচ্ছামত নীরদ খাইতে পাইত না। কিন্তু পেয়ারায় বিশেষ নিষেধ ছিল না। নিষেধ না থাকিলেও পেয়ারা পাড়িয়া দিবে কে ?

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। হিরণ বোধ হয় বাজার করিতে গিয়াছিল। বাড়ী প্রবেশ করিতেই দেখিল, নীরদ পেয়ারা গাছের তলে একান্তমনে উপরের ডালের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আস্তে আস্তে তরি-তরকারী-ভরা চুপ্‌ড়িটি নামাইয়া পা টিপিয়া টিপিয়া আসিয়া নীরদের পিছনে দাঁড়াইল। বলিল—কি গো নীরদ বাবু, পেয়ারা খাওয়া হচ্ছে বুঝি।

—হ্যাঁ, হচ্ছে বৈ কি ! কি, মিথ্যা কথা বল্‌তে শিখেছিস্ তুই- কই, কোথায় পেয়ারা দেখা দেখি !

—দাঁড়াও, খুড়িমাকে বলে দিচ্ছি—খেয়ে ফেলে এখন চালাকি হচ্ছে !

—বা, বেশ ত, আমি ত গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি —পেয়ারা খেলাম কখন ?—মিথ্যা দোষ দেওয়ায় নীরদ ভয়ানক রাগিয়া উঠিল—একবার রাগিয়া উঠিলে তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইত না। শুধু মুখটা লাল হইয়া উঠিত। নাকের ডগাটি মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠিত।

হিরণ তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে বুঝিয়া নীরদকে খুশী করিতে সচেষ্ট হইল। বলিল,—আহা থাক্ থাক্—আর রাগতে হ'বে না নীরদবাবু! পেয়ারা চাই ত—আমি পেড়ে দিচ্ছি এখনই।

তাহার পর সে আঁচলখানি এক নিমেষে কোমরে জড়াইয়া লইল—দ্রুত গতিতে পেয়ারা গাছের ডাল বাহিয়া ছোট্ট কাঠবিড়ালীটির মত সর্ব্বোচ্চ শাখায় উঠিয়া পড়িল। মট্ করিয়া একটি ডাল ভাঙিয়া পেয়ারা দু'টি সংগ্রহ করিয়া নীচে ক্ষিপ্রগতিতে নামিয়া পড়িল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে পেয়ারা দু'টি নীরদের হাতে দিয়া বলিল—হয়েছে ত! এইবার খাও।

নীরদ ঈপ্সিত বস্তুটি পাইয়া মহা খুশী হইয়া উঠিল। বলিল—তুই একটা নিবি নে!

—না, আমি আর নেব না; তুমিই খাও ভাই!—বলিয়া হিরণ তরকারির চুপড়িটি তুলিয়া লইয়া বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেল।

এমনি করিয়া আরও কয়েক বৎসর সহরে কাটিয়া গেল। নীরদের পড়াশুনা বেশ নির্ব্বিবাদে চলিতে লাগিল। একদিন নীরদের পিতা মাধবচন্দ্র সহরের বাসায় আসিলেন। তাঁহার মুখে হিরণ শুনিল যে, বাড়ীতে তাহাদের মহা দুরবস্থা। হিরণের মা-ও খাটিয়া খাটিয়া শয্যা লইয়াছে। শশীও সেই অবস্থায় শয্যাশায়ী আছে। হিরণকে বাড়ী যাইতে হইবে।

মাধবচন্দ্র হিরণকে কিছু টাকা দিয়া দিলেন। যাইবার সময় হিরণ বলিল—চল্লাম নীরদবাবু, তুমি বিদ্বান্ হ'য়ে গাঁয়ে যাবে ত? আমি অনেক দোষ করেছি, কিছু মনে করো না ভাই!

হিরণের জন্য নীরদের বড় দুঃখ হইতে লাগিল। ঝি হইয়াও সে ঠিক্ ঝি ছিল না। তাহার সঙ্গে নিত্য ঝগড়া-ঝাঁটির মধ্য দিয়াও এমন একটি প্রীতির সম্বন্ধ হইয়াছিল যে, তাহা ভুলিবার নহে। নীরদের নিজের ভগ্নী ছিল না। স্কুলের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া ঝগড়া-ঝাঁটি মারামারি করিয়া আবার ভাব করিতে একমাত্র হিরণ-ই ছিল তাহার সাথী। মেয়েটি তাহার অপরূপ চাঞ্চল্য ও অদ্ভুত হাসি-তামাশার লীলার মধ্য দিয়া নীরদের কিশোর চিত্তে একটি আনন্দ-সুখের রেখাপাত করিয়া গিয়াছিল। তাই তাহাকে ষ্টেশনে উঠাইয়া দিয়া আসিয়া নীরদের চোখ দুটি ছল-ছল করিতে লাগিল। কিন্তু সে বেশীক্ষণের বা বেশী দিনের জন্য নহে। পরীক্ষা ও পড়াশুনার মোহে নীরদ সব ভুলিয়া গেল। নিবিষ্টচিত্তে বিদ্যা-সাধনায় তন্ময় হইয়া উঠিল—সাফল্য ও স্বাস্থ্যের আনন্দ-হিল্লোলের মধ্য দিয়া নীরদ কৈশোরের শেষ সোপানে আসিল। যৌবন-সূর্য্যের প্রথম রশ্মিরেখা তাহার জ্ঞানোজ্জ্বল ললাটে একটি নবীন আশা-স্বপ্নের দীপ্তি আনিয়া দিল। নীরদ সে-সহর ছাড়িয়া আর এক সহরে অধ্যয়নের জন্য চলিয়া গেল।

চৈত্র-সন্ধ্যা। দূর-প্রসারিত মাঠখানির উপর একটি বিষণ্ণ ছায়া ধীরে ধীরে ঘনাইয়া আসিতেছে। আশে-

পাশের গ্রামগুলি স্পষ্ট দেখা যায় না। কাজল-ঘন তরু-বীথির উপর গোধূলি-শেষের গ্রাম-ধূমপুঞ্জ একখানি শুভ্র মেঘ-আস্তরণের মতো ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মাঠ তৃণহীন। পথের ধূলি পাশের উষর জমিগুলির উপর গরুর ক্ষুরে ক্ষুরে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। সেই ধূলি-ধূসর পথ বাহিয়া হিরণ ষ্টেশন হইতে বাড়ী চলিতেছিল। ধূলায় ধূলায় পরণের কাপড়খানি গেরুয়া রং ধারণ করিয়াছে—তাহারই উপর পশ্চিমের এক ঝলক তরল রক্তরাগ তাহার যৌবন-সুন্দর দেহখানিকে বেষ্টন করিয়া প্রতিপদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার অপরূপ মন্থর গতি-ভঙ্গীকে সুষমান্বিত করিয়া তুলিতেছিল।

মাঠের পথ শেষ করিতেই সুনিবিড় অশ্বত্থ-ছায়া-ঘেরা গ্রাম-পথ। সেই পথে পা দিতেই হিরণের মনে হইল এইবার সে দেশে আসিয়াছে। দেশে আসার আনন্দের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার মনে একটা সঙ্গীহীন নিঃসম্বল দীনতা রাত্রির বাদুড়ের মতো কালো ডানা প্রসারিত করিয়া আনন্দের রেশটুকু ঢাকিয়া ফেলিল। বাড়ীতে শয্যাশায়ী মা-ভাই—প্রতিদিনের অন্ন-সংস্থানের ব্যবস্থাই বোধ হয় নাই। কি করিয়া যে কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে তাহার মন ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। মানসিক চঞ্চলতা গতিকেও চঞ্চল করিয়া তুলিল—শ্লথ পদবিক্ষেপ দ্রুত হইল। হিরণ প্রায় বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া পড়িল।

সেখানে কতকগুলি পাতিনেবুর গাছ এক সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়া প্রায় পথের উপর শাখা প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। হিরণ দেখিল, সেই গাছগুলির নীচে ঢালু জমির উপর দুই-তিনজন লোক বসিয়া বসিয়া তামাকু সেবন ও গল্প করিতেছে। হিরণকে আসিতে দেখিয়া একজন উঠিয়া দাঁড়াইল। গাছের তল হইতে গুঁড়ি মারিয়া বাহিরে আসিয়া একেবারে হিরণের সম্মুখে দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে হিরণকে আপাদমস্তক দেখিতে দেখিতে লোকটি বলিয়া উঠিল—আরে, এ যে হিরণ—সহর থেকে এলে? ভালো ছিলে ত?

হিরণ তাহার কোনো কথার উত্তর না দিয়া আরও দ্রুতগতিতে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। লোকটি তাহার সঙ্গীদের কাছে ফিরিয়া গেলে, একব্যক্তি বলিল,—আরে যতন, ও যে তোর কোনো কথারই উত্তর দিলে না—সহরে থেকে কি রকম দেমাক বেড়েছে দেখেছিস!

যতনচন্দ্র কোনো কথা বলিল না। গম্ভীরভাবে হাত বাড়াইয়া হুঁকাটি লইয়া তামাক টানিতে লাগিল।

হিরণ তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরিয়া বেড়ার আগলটি নিজেই সরাইয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখনও চাঁদ উঠে নাই—পূর্ব্ব দিগন্তে একটু আলোর আভাস দেখা দিয়াছে মাত্র। কিন্তু সেইটুকু আলো-রেখাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া কয়েকটি ছোট ছোট পাখীর সে কি আনন্দ-নৃত্য! হিরণ মাথার উপরে সেইদিকে চাহিয়া চাহিয়া একটু শান্তি পাইল; উঠানের এক কোণে বাঘা কুকুরটা তা'র বিচিত্র বর্ণের দেহখানি আঁকাইয়া বাঁকাইয়া এতক্ষণ শুইয়াছিল—কে একজন বেড়ার আগল খুলিল, সে তাহা দেখিয়াছে—সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। হিরণ ভিতরে আসিয়া বলিল—'ওরে থাম্ থাম্—আমি এয়েছি—আয়, আয়!' আর কিছুই বলিতে হইল না। বাঘা তিন লম্ফে হিরণের পায়ের কাছে আসিয়া লেজ নাড়িতে লাগিল; কোথা হইতে একটি দুধের মতো শাদা বিড়াল লাফাইতে লাফাইতে ছুটিয়া আসিল—সে আসিয়া একেবারে হিরণের পায়ের চারি পাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া অবশেষে লুটাইয়া পড়িল—তাহার কণ্ঠ দিয়া এক প্রকার অবিশ্রাম ঘর্ঘর শব্দ উঠিতে লাগিল।

ঘরের মধ্য হইতে শশীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—'এলি রে, হিরণ—এত দিন পরে এলি!'

হিরণের মা আজকাল কিছুই শুনিতে পায় না—হিরণ ঘরে আসিলে তাহাকে ভালো করিয়া দেখিতে পাইল না। শুধু বিড় বিড় করিয়া কি কতকগুলা কথ বলিয়া গেল। হিরণ আসিয়া তাহার চিররুগ্ন ভা শশীর শিয়রে বসিল। ছোট্ট পুঁটলিটি খুলিয়া সামা কিছু ফলমূল, একটু মিছরী—যা' সে সহর হইতে লই আসিয়াছে—শশীকে সে সব খাওয়াইল। মার কা আসিয়া মাকেও কিছু কিছু খাওয়াইল—তারপর খাব জল ঢালিতে গিয়া দেখে, কলসীতে মোটেই জল নাই শশী বলিল,—জল কি আর আছে, দিদি! আমি এ

ভালো থাক্‌লে নিজেই যাই—বাবুদের ইঁদারা থেকে জল নিয়ে আসি ; আজ আর যেতে পারি নি।

হিরণ বলিল – আচ্ছা আমি-ই নিয়ে আস্‌ছি।

হিরণ কলসী লইয়া জল আনিতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘা কুকুরও চলিল। রাত্রি আটটা হয় নাই। কিন্তু তখনই সমস্ত গ্রাম নিশুতি। কোথাও জন মানবের সাড়া-শব্দ নাই। চৈত্র-শেষের দক্ষিণা হাওয়ায় পথের গাছগুলির পাতার মধ্যে কেবলি একটি অনাহত থর্‌ থর্‌ মর মর শব্দ হইতেছিল। হিরণ ইঁদারা হইতে জল লইয়া আসিল। সেই জলে মা ও শশীর তৃষ্ণা নিবারণ করিয়া, নিজেও খানিকটা জল পান করিল।

তারপর দাওয়ায় একখানি মাদুর বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত পথের ক্লান্তি অবসাদ—ভয়, উত্তেজনা—সব কিছুকে ঢাকিয়া তাপহারিণী নিদ্রা তাহাকে বিশ্রাম দিল।

পরদিন সকালে জাগিয়া হিরণ দেখিল শশী বিছানার উপরে উঠিয়া বসিয়াছে। দুই হাতে বাঁশের খুঁটিটি চাপিয়া ধরিয়া প্রবল বেগে কাশিতেছে। ভোরের দিকের বাতাস একটু ঠাণ্ডা হয় ; সেই ঠাণ্ডা বাতাসে শশী আদুল গায়েই বিছানার উপর শুইয়া থাকে। হিরণকে উঠিয়া বসিতে দেখিয়া তাহার কাশির বেগ কিছু মন্দীভূত হইল। ভাঙা গলায় বলিল—হিরণ, মুদীর দোকান থেকে খানিকটা কাবাবচিনি আন্‌তে পারিস্‌—কাশতে কাশতে ত আর বাঁচি না দিদি !

হিরণ বলিল—হ্যাঁ, এনে দিচ্ছি এখনি। তুমি খানিকটা মিছরীর ডেলা মুখে রেখে দাও—ত'াতে কাশিটা কিছু কম পড়তে পারে।—এই বলিয়া হিরণ তাহাকে খানিকটা মিছরী দিল : তাহার পর কোমরে কাপড় জড়াইয়া ঘরের কাজে লাগিয়া গেল। ঘরের এক কোণে ছোট একটি বাঁশের মাচার উপর দুই একটি ছোট ছোট হাঁড়ি কলসী তাহার মধ্যে সংসারের চাল, ডাল মশলা ইত্যাদি থাকে। সেখানে গিয়া হাঁড়িগুলি সব নামাইয়া দেখিল, তাহাতে কিছুই নাই—না চাল, না ডাল, না মশলা ! হিরণ এসব ভাবিয়া রাখিয়াছিল ; কিছুমাত্র নিরাশ না হইয়া ঘর উঠান সব অতি-যত্নে ঝাঁট দিল। তাহার পর ইঁদারা হইতে কলসী ভরিয়া জল আনিয়া রাখিল। ঘরখানি বেশ করিয়া নিকাইয়া লইয়া মা'কে বিছানা হইতে উঠাইল। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে দুই একটি পেঁপেগাছ—একটি পেয়ারা গাছ। সেখান হইতে কতকগুলি পেয়ার পাতা ছিঁড়িয়া আনিয়া মাকে ও শশীকে দিল, বলিল—'তোমরা এই দিয়ে মুখ ধোও।' তাহাদের বিছানা ও শতচ্ছিন্ন বালিশগুলি লইয়া উঠানের একদিকে যেখানে বেশ রৌদ্র আসিয়া পড়ে, সেইখানে রাখিয়া দিল। তারপর গোয়ালঘরে বলদ দু'টির খাবার ব্যবস্থা করিতে গিয়া দেখিল, গোয়ালঘর শূন্য—সে-ঘরে যে কোনকালে গরু ছিল—এমন কোনো চিহ্নই নাই। হিরণ ব্যাপারটা আংশিকভাবে বুঝিল। শশী তখন মুখ-হাতপা ধুইয়া পরণের কাপড়খানি গায়ে জড়াইয়া চুপ করিয়া রৌদ্রে বসিয়াছিল। হিরণ তাহাকে আসিয়া বলিল—দাদা বলদ কোথায় ?

—বলদ কি আর আছেরে ? দেখ্‌তেই ত পাচ্ছিস্‌, খেতে পাইনে, শুকিয়ে চিঁচিঁ কর্‌ছি। এর উপরে আবার বলদ ! কে তা'দের খেতে দেয়—যত্ন করে ! কেনরে বাপু এত ঝক্কি, ওসব একদম চুকিয়ে দিয়েছি। কখনো যদি চাষবাস করি ত, গাঁথা ক'রে চাষ কর্‌ব। কিন্তু ততদিন বোধ হয় এগুতে হ'বে না—তা'র আগেই –

—'আমি শুধু জিজ্ঞাসা কর্‌ছি, বলদ দু'টি কোথায় গেল —এই সোজা কথাটার উত্তর দাও!' অতঃপর শশী তাহাকে জানাইল যে, বলদ মহাজন ও জমিদারের ঋণশোধ করিবার জন্য বিক্রয় করা হইয়া গিয়াছে। ভিন্ন গ্রাম হইতে খরিদ্দার আসিয়া বলদ লইয়া গিয়াছে। এবারের চাষে সে নিজে যাইতে পারে নাই। কোনো রকমে ভাগে বন্দোবস্ত করায় যা'কিছু খুদ্‌কুটা হইয়াছিল—সবই বিক্রয় করিয়া অতি কষ্টে সে সংসার চালাইতেছে।

হিরণ আর কিছু জিজ্ঞাসা করিল না। দুটি টাকা হাতে করিয়া সে পথে বাহির হইল। দোকান হইতে চাল ডাল প্রভৃতি সংসারের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া লইয়া আসিল – গাছে কয়েকটি পেঁপে ছিল ; তাহাই পাড়িয়া লইয়া দীর্ঘদিনের অনশনক্লিষ্ট মা-ভাইকে চারিটি রাঁধিয়া খাওয়াইল।

এমনি করিয়া দিনের পর দিন কাটিতে থাকে। মাধবচন্দ্রের প্রদত্ত টাকা প্রায় নিঃশেষ। হিরণের উপরই সংসারের যাবতীয় ভার। সে চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না। তাহারই মতো বিধবা মেয়ের সংখ্যা তাহাদের গ্রামে নিতান্ত কম নয়। তাহাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহারা কি ভাবে সংসার চালায় তাহা সে দেখিয়া আসিল। সেই পথ অনুসরণ করিয়া যে কয়টি টাকা অবশিষ্ট ছিল, তাহার কিয়দংশ লইয়া মহাজনদের নিকট হইতে কিছু ধান সুবিধা দরে কিনিয়া লইয়া, সেই ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তত করিতে লাগিল। গ্রামে শ্রমজীবীর সংখ্যা অল্প নহে। তাহাদের জমি নাই। তাহারা চাষও করে না। মজুরীর অর্থে চাউল ইত্যাদি কিনিয়া সংসার চালায়। তাহারাই হিরণের চাউল কিনিয়া লইয়া যাইত। হিরণ এইভাবে পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইতে লাগিল।

এমনি করিয়া হিরণের আন্তরিক চেষ্টায় ও যত্নে তাহাদের গৃহস্থালীতে একটু শ্রী-শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসিল। হিরণের মা ও শশী অল্পে অল্পে সুস্থ হইতে থাকে। কিছুদিন পরে শশী উঠিয়া হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। হিরণ তাহার পথ্যের ব্যবস্থা করিয়াছিল কিন্তু ঔষধের অর্থ জোগাইতে পারিত না। কিছুদিন ঔষধ খাইয়া শশী ঔষধ বন্ধ করিল—কিন্তু কিছুতেই সে আর সুস্থ সবল হইয়া উঠিতে পারিল না। হিরণের মা'রও সেই অবস্থা। কাজেই একা হিরণ তাহাদের সংসার চালাইতে লাগিল।

গ্রামের ইতর-ভদ্র সকলেই এই কর্ম্মপটু আনন্দময়ী মেয়েটিকে দেখিয়া মনে মনে খুসি হইত। অনেকের বাড়ীতে কাজেকর্ম্মে এই মেয়েটি গিয়া অনেক সাহায্য করিত। অনেক অসহায় গ্রামবাসীর রোগে বিপদে হিরণ তাহার যথাসাধ্য করিত। বহুদূরের গ্রাম হইতে তাহাদের জন্য সে ঔষধ আনিয়া দিত। প্রয়োজন হইলে সেবা-শুশ্রূষাও করিত।

এক একদিন দিনের সব কাজ শেষ করিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে পরিশ্রান্ত হিরণ দাওয়ায় একান্ত আপন মনে বসিয়া থাকিত। দু'টি একটি তারা জামগাছের অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিত—সন্ধ্যার সেই সকল-ভুলানো মায়ার মধ্যে হিরণের মনে হইত—সে নিতান্তই একা। মনের এই অবস্থাটি সে ঠিক নিজেও বুঝিতে পারিত না। বাতাস যেমন করিয়া নবীন কিশলয়গুলি দুলাইয়া দিয়া যায়, তেমনি এক-একটি অস্পষ্ট চিন্তা-বায়ু হিরণের মনের কিশলয়গুলিকে দুলাইয়া দিয়া যাইত। কিন্তু সে শুধু এক মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বৃত হইয়া সংসারের কাজে মন দিত।

একদিন একটি ছোট ছেলে হিরণকে ডাকিতে আসিল। তাহার মা'র বড় অসুখ। কেহই দেখিবার নাই। হিরণ যদি গিয়া একটু সাহায্য করে ত সব দিক রক্ষা হয়।

এসব আহ্বানকে হিরণ উপেক্ষা করিতে পারিত না। কোথা হইতে তাহার মনে একটি অদ্ভুত শক্তির আবির্ভাব হইত। তাহারই প্রেরণায় আজিও সে ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাড়ীর দিকে চলিল।

পথে সেই নেবুগাছতলায় ঢালু জমির উপর আজিও তামাকের ও নানালোকের শ্রাদ্ধ চলিতেছিল। ছেলেটির সঙ্গে হিরণকে আসিতে দেখিয়া সেখানে একটি সাড়া পড়িয়া গেল। যতনচন্দ্র নিধিরামের কানে কানে বলিতে লাগিল—মতিচরণের বাড়ীর দিকে চলেছেন দেখ্‌ছি যে—সঙ্গে সঙ্গে তা'র ছেলেটাও আছে দেখ্‌ছি! ব্যাপার কি বলো ত হে!

—আরে জানো না বুঝি! মতির ইস্ত্রী যে মরতে বসেছে! একটা মরা ছেলে হ'য়েছিল, তারপরে এখন খুব অসুখ!'

—আচ্ছা ও গিয়ে কি করবে শুনি—ও কি পাশকরা ধাই, না কি!

গুপীদাস গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল। বলিল—আরে যেতে দাও না হে, যেতে দাও! মতেটাকে একবার দেখে নেব আমি—কিপ্‌টে লোক; পাছে কিছু খসাতে হয় ভেবে ওকে নিয়ে যাচ্ছে—ও গিয়ে যে কি করবে তা আমার জানা আছে।

হিরণ তাহাদের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। মতিচরণ অল্পদিন হইল গ্রামের বাহিরে মাঠের কাছে একখানি

মাটির ঘর তুলিয়াছে। মতিচরণ কাহারও সঙ্গে বিশেষ মিশিত না। সে সারাদিন মাঠের কাজ লইয়াই থাকিত। নিয়মিত কর্ম্মে ও পরিশ্রমে তাহার বলিষ্ঠ উন্নত দেহ দেখিয়া ও তাহার স্বল্পবাক্ আচরণ বুঝিয়া কেহই তাহার কাছে বড় আসিত না। সে আপনার মনে কাজ করিয়া আপনার ঘরখানি লইয়াই থাকিত। গ্রামের মধ্যে তাহার স্থান হয় নাই। তাই সে গ্রামের বাহিরে বাসা বাঁধিয়াছিল।

হিরণ তাহার বাড়ীর ভিতর আসিতেই একগাল হাসিয়া যে লোকটি তাহার অভ্যর্থনা করিল, সে মতিচরণ নয়—মতিচরণের ভগ্নীপতি। তাহার নিজের একটি যাত্রার দল ছিল। মতিচরণের বাড়ীতে পদার্পণ করিয়া সে ভাবিয়াছিল, একবার এই গ্রামে তাহার বিখ্যাত অভিনয় দেখাইয়া সকলকে থ' বানাইয়া দিবে। তাহার একটি বিশেষ মৌতাত ছিল—তাহারই তাতে হিরণকে দেখিয়াই সে হাসিয়া ফেলিল; অভিনয়ের ভঙ্গীতে হাত নাড়িয়া সে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, —এস ভদ্রে, এস মোর গৃহে—!

লোকটির এই আচরণে হিরণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল, ছেলেটির দিকে চাহিয়া সে বলিল—'কৈ, তোমার বাবা! তোমার মা কোথায় আছে!' ছেলেটি কিছু উত্তর দিবার পূর্ব্বেই মতিচরণের ভগ্নীপতি শশব্যস্তে উঠানে নামিয়া আসিয়া অতিশয় ভদ্রভাবে বলিল—'এই যে এদিকে আসুন না—এই ঘরে ওরা আছে।' সেই ঘরের কাছে আসিয়া হিরণ দাঁড়াইতে ক্ষীণকণ্ঠে মতিচরণের স্ত্রী বলিল,—তুমি এখন এলে ভাই! আমি আর বাঁচব না!

ঘরের মধ্যে আসিয়া হিরণ দেখিল, মতিচরণ তাহার স্ত্রীর শিয়রে বসিয়া কাঁদিতেছে। শতছিন্ন একখানি মাদুরের উপর মতিচরণের স্ত্রী তাহার শেষশয্যা পাতিয়াছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গ জলে-ডোবা মানুষের মতো ফুলিয়া উঠিয়াছে।

মতিচরণের ভগ্নীপতি বলিল—হেঁ-হেঁ—বাঁচ্‌বে না; মারে কার সাধ্যি! যে ব্র্যাণ্ডি খাইয়েছি—একেবারে তিন তিন বোতল!—হেঁ, হেঁ!'

মতিচরণ চোখের জল মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই, হিরণ একেবারে তাহার স্ত্রীর শয্যার উপর গিয়া বসিল; মতিচরণকে বলিল—ডাক্তার দেখিয়েছিলেন?

—ডাক্তার ডাকতে যাবার আগেই আমার এই ভগ্নীপতি ওকে কি সব ওষুধ খাইয়ে দিলেন; তারপর থেকেই ওর শরীর ফুলে উঠতে আরম্ভ কর্‌ল। আজ প্রায় এক হপ্তা ধরে সেই ওষুধ খাওয়ানোর পর আজ এই দশা!

মতিচরণের ভগ্নীপতি বলিল—'ওসব সেরে যাবার পূর্ব্বলক্ষণ হে! তুমি ভয় খাচ্ছ কেন?' মতিচরণ সবই বুঝিল। ডাক্তার না দেখানোর জন্যে তাহার আর অনুতাপের সীমা রহিল না। হিরণ বলিল—আপনি এখুনি ডাক্তার ডেকে আনুন! যান্, আর দেরী করবেন না!

মতিচরণ একখানি উড়ানি কাঁধে ফেলিয়া ডাক্তার ডাকিতে গেল দুই ক্রোশ দূরের একখানি গ্রামে। সে প্রায় বাড়ী হইতেই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

ডাক্তার লইয়া যখন সে বাড়ী ফিরিল, তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে! মতিচরণের ভগ্নীপতি উধাও। ছেলেটি কাঁদিতেছে; আর হিরণ তাহার স্ত্রীর দেহ কোলে লইয়া অনুচ্চস্বরে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে।

গুপীদাসের মিটিং আজ আর নেবুগাছতলায় বসে নাই। গ্রামের একপ্রান্তে কতকগুলি বট-অশ্বত্থের নিবিড় ছায়ায় গুপীদাস, যতনচন্দ্র ও নিধিরাম প্রভৃতি বসিয়া বসিয়া গভীরভাবে কি সব আলোচনা করিতেছিল। যতনচন্দ্রই আলোচ্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিল—প্রত্যেকটি কথা ব'লে আর মুখের উপরে এক একটি অস্বাভাবিক কুটিল রেখাপাত হয়—'আচ্ছা, মতেকে ত আমরা একঘরে করেছি! ও তার বউকে ঘাটে নিয়ে গেল কি ক'রে—তোমরা জানো কিছু?'

নিধিরাম বলিল,—হ্যাঁ তা জানো না বুঝি—কেন, হিরণ যে ওর সঙ্গে গিইছিল। মড়ার একদিক হিরণ, আর একদিন মতে—ধরে নিয়ে গিয়ে পুড়িয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটা কাঁদতে কাঁদতে গিইছিল!

গুপীদাস গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল—'তা হ'লে' ব্যাপারটা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে দেখছি! মেয়েটার আস্পদ্দা দেখেছিস্! আমরা কোন রকমে ওকে জাতে তুলে নিইছি—আর ও কিনা ঐ একঘরে পাজী লোকটার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে! দাঁড়াও;—এর একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত না করি ত—কোন্ বাপের ব্যাটা।

যতনচন্দ্র আপনমনে কি যেন সব ভাবিতেছিল—সহসা সে যেন কূল পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, বলিল—হ্যাঁ দেখো, ও সব সিন্নী-ফিন্নী আর নয়-ওতে কিছুই হবে না। এবার এমন একটা কিছু করতে হ'বে—যা'তে এক ঢিলে দুই পাখী মরে—বুঝলে হে; তোমরা আস' আর না-ই আস'—আমি একাই ও দু'টোকে জব্দ করতে পারি।

নিধিরাম আপনার তালে ছিল, বলিল—আরও জানো না বুঝি! মতে তা'র ছেলেটাকে নিয়ে ঐ হিরণের বাড়ী এসে দু'বেলাই খেয়ে যায়! তারপর হিরণ গিয়ে ওর বাড়ীঘরদোর তরী-তদারক করে। আর ছেলেটা হিরণের কাছে থাকে বল্লেই হয়—

যতনচন্দ্র লাফাইয়া উঠিল—'ব্যাস্—আবার কি চাই—একেবারে হাতে হাতে প্রমাণ! এবার আর মন্ত্রণা-টন্ত্রণা নয় গো—আসল কাজ কিছু করা দরকার! বুঝলে!' শেষ কথাটির উপর সে এমন জোর দিল যে, গুপীদাস প্রভৃতি অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল! যতনচন্দ্র তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিল—অবাক হয়ে দেখছ কি, এমন একটা কিছু করো—

গুপীদাস লোকটি স্থূলকায়। অতি শীঘ্র তাহার শরীর ঘামিয়া উঠে—দেখিলে মনে হয় যেন সে এইমাত্র স্নান করিয়া উঠিল—ভ্রূ কুঁচকাইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল—সমাজের বুকের উপর ব'সে এই সব কীর্ত্তি—এ কিছুতেই হ'তে দেব না—দেব না—দেব না!

সন্ধ্যা হয় হয়। তখনো তাহাদের মন্ত্রণা শেষ হইল না। অনেক ছিলিম তামাকের শ্রাদ্ধ করিয়া রাত্রি প্রায় এক প্রহরের সময় তাহারা সভা ভঙ্গ করিল।

ছোট গ্রামখানির উপর দিয়া নববর্ষার অবিরল জলধারার আর বিরাম নাই। দীর্ঘদিনের অবসর-অলস চাষীর দল যেন হঠাৎ সজাগ সচকিত হইয়া আপন আপন চাষের কাজে মন দিয়াছে। মতিচরণ মাথালি মাথায় দিয়া জমি নিড়াইয়া দিতেছিল। ছোট ছেলেটিও মাথালি মাথায় দিয়া একখানি ছোট্ট নিড়ানি লইয়া পিতার অনুকরণ করার চেষ্টায় ছিল। পুবালি হাওয়া তীরবেগে মাঠের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বহিয়া যাইতেছিল। সেই হাওয়ার ভরে নৌকার বড় বড় কালো পালের মতো এক একখণ্ড কালো মেঘ মন্থর গতিতে মাটির কাছাকাছি নামিয়া আসে—দম্‌কা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবিশ্রাম বর্ষণে দিগদিগন্ত মুখরিত করিয়া নবোদ্গত ধানের অঙ্কুরগুলিকে যেন প্রাণ-দান করিয়া আবার উত্তরের দিকে ভাসিয়া যায়। মতিচরণ এত বৃষ্টিতেও নড়ে না—এ যেন তাহার কঠোর তপস্যা—এক একখানি জমির একপ্রান্ত হইতে নিড়াইতে আরম্ভ করে, শেষ না হইলে উঠে না।

জমির পিছন দিকে একটি ঘন-পল্লব নিমগাছের তলে হিরণ তাহাদের দুইজনের খাবার লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। বৃষ্টিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে—আর্দ্র কালো চুল বহিয়া বৃষ্টিধারা মাটিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। যে টোকাটি সে মাথার উপরে বৃষ্টি নিবারণের জন্য দিয়াছিল—প্রবল বৃষ্টিতে তাহাতে কিছুই হয় নাই। সেটি সে মাটিতে খাবার ঢাকিবার জন্য রাখিয়া দিয়াছে। ছেলেটির নাম ধরিয়া বারকয়েক ডাকিতেই সে নিড়ানি ফেলিয়া ছুটিয়া আসিল। মতিচরণও কাজ ফেলিয়া আসিয়া খাইতে খাইতে বলিল—এত বৃষ্টিতে তোমার আসার কি দরকার ছিল; কাজ শেষ করে খেতে যেতাম।

হিরণ হাসিয়া বলিল—তোমার কাজ ত শেষ হ'বে সেই সন্ধ্যাবেলায়!

মতিচরণ বলিল—আর সন্ধে হ'লেই বা কি করছি—তা বেশ করেছ—ভাতের থাল আগ্‌লে আর কেই বা বসে থাকে।

হিরণ যেন তাহার কথা শুনিতে পায় নাই-এমনি-ভাবে বলিল নাও নাও শীগ্‌গিরি খেয়ে নাও—আবার মেঘ করে আস্‌ছে—এখুনি বৃষ্টি নাম্‌বে।

—কত বৃষ্টি কোন্ দিকে গেল, এখনও অনেক কাজ

বাকী, তোমার দাদার জমিও নিড়িয়ে দিয়েছি—আরও দু'মাদা জমি বাকী আছে—সেটা শেষ করে বাড়ী ফিরব। হিরণ স-প্রশংস দৃষ্টিতে লোকটিকে একবার দেখিয়া লইল। তারপর নীরবে থালবাসনগুলি লইয়া টোকা মাথায় দিয়া ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেল। ঢালু রাস্তা বহিয়া সমস্ত গ্রামের বর্ষণের জল প্রবলবেগে একটি ডোবার মধ্যে গিয়া পড়িতেছে—সেই জলের মধ্যে হাঁটু পর্য্যন্ত ডুবাইয়া ডুবাইয়া হিরণ পথ চলিতে থাকে।

সেদিন সকাল হইতে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যার দিকেও বৃষ্টি আর কমিল না। রাস্তাঘাট পুকুর ও ডোবাগুলির সঙ্গে মিতালি স্থাপন করিল। চারিদিকেই জলস্রোত আর অবিরলধারে বর্ষণ—হিরণ তাহারই মধ্যে সমস্তদিন ধরিয়া অনেক কাজ করিয়াছে; সন্ধ্যা হইলে একটি কলসী লইয়া দীঘির দিকে জল আনিতে চলিল। বৃষ্টির মধ্যে কাজ করিয়া হিরণ আনন্দ পাইত।

দীঘি হইতে জল লইয়া বাড়ী ফিরিতে সন্ধ্যা শেষ হইয়া রাত্রি হইল। ছোট পথখানির দুইদিকেই ঘন বাঁশের বন। বর্ষার জলে ঝড়ে বাঁশগুলি প্রায় রাস্তার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে পথঘাট কিছুই দেখা যায় না। বাঁশের কঞ্চিগুলির সূক্ষ্ম অগ্রভাগ মাঝে মাঝে মুখে আসিয়া লাগে। হিরণ অতি সন্তর্পণে সেই অন্ধকারের মধ্যে পথ চলিতেছিল। সে দীঘিতে আসিবার আগে ভাবিয়াছিল, হয় ত কোনো সঙ্গিনীকে পাইবে। কিন্তু তাহার মত বৃষ্টিতে ভিজিয়া কাজ করার সখ অতি অল্প লোকেরই আছে। ঘাটে বা পথে কাহারও দেখা সে পাইল না। অনেকখানি পথ এই বাঁশবনের মধ্য দিয়া অতিক্রম করিতে হইবে। এক একবার জোরে বাতাস বয়—সমস্ত বাঁশবন যেন একটি প্রকাণ্ড কালো দৈত্যের মতো গভীর গর্জ্জনে সোঁ সোঁ করিয়া দুলিতে থাকে; অতি সাহসী হিরণেরও আজ যেন হৃৎকম্প হইতেছিল; মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিতেছিল। প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মনে হইতে লাগিল বুঝি বা এক কৃষ্ণকায়া প্রেতিনী তাহার সম্মুখে বাঁশের ডগার মতো সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া খোঁনা খোঁনা গলায় তাহাকে ডাকিতেছে। একবার মনে হইল কলসীটি নামাইয়া রাখিয়া দৌড়িয়া বাড়ী পলায়। আবার কাল সকালে আসিয়া কলসীটি লইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুতেই কলসী নামাইতে পারে না। কে যেন কলসীর সঙ্গে তাহার হাতখানি দড়ি দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। পথও অত্যন্ত পিছল। অতি সন্তর্পণে চলিতে হয়। কলসী নামাইবার কথা দূরে থাকুক, সে সেই পিছল পথেই প্রায় দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। কলসীর জল ছলাৎ ছলাৎ করিয়া প্রায় অর্দ্ধেকের উপর পড়িয়া গেল। জল ঢালিয়া ফেলিয়া যে, কলসী লইয়া ছুটিবে এমন সাহসও হইল না।

—খটাং খঙ্!

পরক্ষণেই হুড়হুড় করিয়া কলসী হইতে সব জল পড়িয়া গেল! কি করিয়া যে কলসী ভাঙিয়া গেল, হিরণ তাহা বুঝিতেই পারিল না। কলসীর দিকে তখন আর কে চাহিয়া দেখে! ভয়ত্রস্তা হিরণ উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে বোধ হয় ঢালু পিছল পথ—সেখানে সে পা হড়্‌কাইয়া মাটির উপর পড়িয়া গেল।

কোথায় যেন গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে! সমস্ত শরীর অবসন্ন, মাথা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে—বোধ হয় এখনি চোখের সম্মুখ হইতে বিশ্বসংসার লোপ পাইবে!

কে যেন প্রবল শক্তিতে তাহার সমস্ত নিঃশ্বাসবায়ুকে চাপিয়া ধরিয়াছে। হিরণ প্রাণপণ বলে চীৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু কণ্ঠ হইতে স্বর নির্গত হইল না। শুধু একটা ঘড় ঘড় শব্দ উঠিতে লাগিল। কে যেন নিদারুণ বলে তাহার গলা চাপিয়া ধরিয়াছে। চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে নিবিড় অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। হিরণের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল।

মাধবচন্দ্র খুব ভোরেই শয্যাত্যাগ করিতেন এবং প্রত্যহ মাঠের দিকে বেড়াইতে যাইতেন। বর্ষার দিনে খালিপায়ে একটি ছাতা ও একটি লাঠি লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে যাইবেন, এমন সময় দেখিলেন, বটগাছের নীচে একটি বৈচীবনের পাশে কে একজন শুইয়া আছে। তখন সবে সকাল হইয়াছে। বর্ষা না হইলে বোধ হয় সূর্য্য উঠিত। তিনি সেদিকে

আসিয়া শায়িত লোকটির দিকে চাহিয়াই বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। এ যে হিরণ! মাথার একপাশ কাটিয়া রক্তে রক্তে স্থানটি প্লাবিত হইয়া গিয়াছে—এক এক চাপ কালো রক্ত জমাট বাঁধিয়া কপালে মুখে ও গলায় লাগিয়া রহিয়াছে! তিনি আর দেরী করিলেন না, নিকটেই একটি জমিতে জল বাধিয়াছিল। কোঁচার খুঁট ও চাদর ভিজাইয়া তাহার আহত স্থানে ক্রমাগত জল দিতে লাগিলেন। তারপর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, অত্যন্ত মৃদুস্পন্দন। এমনি করিয়া জল দিতে দিতে হিরণ বহুক্ষণ পরে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পরক্ষণেই 'মা গো' বলিয়া যন্ত্রণায় কাঁদিয়া ফেলিল। তখন অনেক বেলা হইয়াছে। অনেক চাষী মাঠে বাহির হইয়াছে। তাহারা মাধবচন্দ্র ও হিরণকে এখানে এই অবস্থায় দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে কৌতূহলে আসিয়া দাঁড়াইল। মাধবচন্দ্র তাহাদের এখানে সমবেত হইতে দেখিয়া বলিলেন,—হতভাগারা, এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখ্‌ছিস্! একটা গাড়ী নিয়ে আয়, শীগ্‌গির যা!

দুই একজন গাড়ী আনিতে ছুটিল। গাড়ী আসিলে সকলে মিলিয়া হিরণকে ধীরে ধীরে গাড়ীর উপর তুলিয়া দিল। তারপর গ্রামের মধ্যে গাড়ী প্রবেশ করিলে পিপীলিকার শ্রেণীর মত বিস্মিত নরনারীর দল রাস্তার দুই-পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। কেহই কিন্তু নির্ব্বাক্ রহিল না।

কিছুদিন পরের কথা। হিরণ সুস্থ হইয়াছে কিন্তু তাহার মনে আর শান্তি নাই। সকল কর্ম্মে সে স্বচ্ছন্দগতি আর নাই। হৃদয়ের অশান্তি মুখের উপর একটা গভীর সুস্পষ্ট রেখাপাত করিয়াছে। সে পথে বাহির হইলেই অজস্র প্রশ্ন বর্ষিত হইতে থাকে। অনেক কৌতূহলী নেত্রের চাহনী-কণ্টকের মধ্য দিয়া তাহাকে পথ চলিতে হয়। গ্রামের আর কোনো বাড়ীতেই সে যায় না। কেবলমাত্র মাধবচন্দ্রের বাড়ীতেই মাঝে মাঝে যায়। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিলেই মাধবচন্দ্রকে গিয়া প্রণাম করে; নির্জ্জনে তাঁহার সঙ্গে সংসারের কথা—মা-ভাইয়ের চিররুগ্নতার কথা তুলিয়া আলাপ করে। মাধবচন্দ্র তাহাকে আশ্বাস দেন, সান্ত্বনা দেন, কিন্তু এই সহায়-সম্বলহীনাকে আশ্রয় দিতে পারেন না। কেন না, মাধব বড় শান্তিপ্রিয় লোক—কাহারও সঙ্গে বিবাদ-বিসম্বাদ তিনি বড় ভালবাসেন না।

একদিন মাধব তাহাকে বলিলেন, 'দেখ্‌, তোকে একটা কথা বলি! ক'দিন থেকে শুন্‌ছি তোর ডাক পড়্‌বে গাঁয়ের কাছারী বাড়ীতে। আরও শুন্‌ছি মতিচরণও নাকি তোর এই দশা করেছে। তারও ডাক পড়্‌বে;—তা দেখ্‌, কিছুতেই ভয় পাস্ না' পরমেশ্বরকে ডাক্—তিনিই তোর সব বিপদ খণ্ডন করবেন।' হিরণ আবার বিপদের সম্ভাবনায় চমকিয়া উঠিল। এই ব্যাপারের মধ্যে মতিচরণের ডাক পড়িবে ইহা সে কল্পনাতেও ভাবিতে পারে নাই। এ কীর্ত্তি যে কাহাদের তাহা সে মনে মনে স্থির করিয়াছিল। কোনো প্রমাণ কিন্তু সে পায় নাই। কাজেই মুখ ফুটিয়া একথা কাহাকেও জানাইতে পারে নাই। কিন্তু নিরীহ মতিচরণকে যে কেন ইহারা পীড়া দিতেছে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। মাধবচন্দ্রের মুখে এই কথা শুনিয়া সে আর কিছু না বলিয়া থাকিতে পারিল না। বলিল—সবই মিথ্যে দাদা মশাই! আমার অনেক শত্রু হ'য়েছে, তা'ত আপনি জানেন। এ কীর্ত্তি তাদেরই—অন্য কারুর নয়।

মাধবচন্দ্র শান্তভাবে বলিলেন—'কাউকেই শত্রু ভেব না হিরণ, আজ যারা তোমার শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তারাই কাল এমন কাজ কর্‌বে, যে, সে কাজ বন্ধুতেও পারে না।

অত্যাচরিত প্রপীড়িত হিরণ মাধবচন্দ্রের একথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। শুধু তাহার নিপীড়িত অন্তর নবতর বিপদের সম্ভাবনার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। কয়দিন ধরিয়া মাধবচন্দ্রের কাছেও সে আর আসিল না। ইতিমধ্যে সুদীর্ঘকায় এক পাইক আসিয়া তাহাকে জানাইয়া গেল যে, একদিন তাহাকে কাছারী বাড়ী যাইতে হইবে।

নীরদ দীর্ঘকাল গ্রামে আসে নাই। পরীক্ষাগুলিকে

শেষ করিয়া একবার জীবনের সত্যকার পরীক্ষার মধ্যে আত্মসমর্পণ করিবে—এই রকম ইচ্ছাই তাহার ছিল। ইতিমধ্যে মাধবচন্দ্র পুত্রের বিবাহ দিবার আয়োজন করিতেছিলেন। নীরদ এ সম্বন্ধে কিছু জানিত না। নীরদকে তাহার বাঞ্ছিত জ্ঞানচর্চ্চার মধ্যে রাখার ব্যবস্থাই তিনি করিয়াছিলেন—ইহার মধ্যে অনেকবার সে গ্রামে আসিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মাধবচন্দ্র তীব্রভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়া পুত্রকে চিঠি দিয়াছিলেন। বাহিরের পরীক্ষা প্রায় শেষ হইয়াছে, তাই সে বহুকাল পরে গ্রামে ফিরিবার অনুমতি চাহিয়া পিতাকে পত্র দিল। পিতার অনুমতি লইয়া আজ সে গ্রামে ফিরিতেছে। রাস্তায় আসিতে আসিতে সে দেখিল, ইহারই মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে—যেখানে ফাঁকা মাঠ ছিল, সেখানে জঙ্গল হইয়া মাঠকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। সে ভাবিল, হয়ত মানুষগুলিরও বিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এমনি আশাআকাঙ্ক্ষা-আন্দোলিত চিত্তে সে ষ্টেশন হইতে সমস্ত পথ হাঁটিয়া আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল। বাহির বাড়ীতে আসিয়া দেখিল, মাধবচন্দ্র অত্যন্ত গম্ভীর মুখে একখানি চৌকীতে বসিয়া আছেন। পিতাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাড়াইতেই মাধবচন্দ্র তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহার পর বলিলেন—যাও বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বিশ্রাম কর।

বাড়ীর মধ্যে গিয়া নীরদ কিছুক্ষণ তাহার ঘরে বিশ্রাম করিল। উত্তরের জানালাটি খুলিয়া দিয়া বাহিরের দিকে বহুক্ষণ শূন্যমনে চাহিয়া রহিল। তখন প্রায় রাত্রি হইয়া আসিয়াছে। নারিকেল পাতাগুলির মধ্যে ক্রমাগত একটা শির শির মির মির শব্দ উঠিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ প্রশান্তির মধ্যে পথের শ্রান্তিতে নীরদ একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল। গভীর তন্দ্রা আসিলে হয় ত নীরদ কিছুই শুনিতে পাইত না। কিন্তু সেই অনাহত বৃক্ষ-পত্রের মর্ম্মরধ্বনিকে আহত করিয়া বহুদূ হইতে একটি করুণ আর্ত্তনাদের ক্ষীণ ধ্বনি নীরদের কানে ভাসিয়া আসিল। কে যেন করুণ কণ্ঠে কাহার কাছে মিনতি জানাইতেছে—ধ্বনি ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে লাগিল। নীরদের তন্দ্রা টুটিয়া গেল। সে সজাগ হইয়া জানালার কাছে উঠিয়া আসিল। ধ্বনি আরও স্পষ্ট—আরও করুণ! সহসা 'রক্ষা করো, 'রক্ষা করো—মলাম—মলাম!'—চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে নারীকণ্ঠের মর্ম্মভেদী উচ্চক্রন্দনধ্বনি ঘনপল্লব বৃক্ষ-প্রাচীর, ঘনবসতি গ্রাম—সকলই অতিক্রম করিয়া নীরদকে আকুল করিয়া তুলিল।

নীরদ আর অপেক্ষা করিতে পারিল না—নীচে নামিয়া আসিয়া বাহির বাড়ীতে মাধবচন্দ্রের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল—বাবা, খুব কাঁদছে কে, শুনতে পেয়েছেন?

মাধবচন্দ্র ধীরভাবে বলিলেন—হ্যা শুনেছি—বহুদিন বহুকাল থেকে এ রকম শুনে আস্‌ছি; শুনে শুনে কান প্রায় কালা হ'য়ে গেছে বাবা! আর শুনতে পাই নে!

নীরদ অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া পিতার দিকে চাহিয়া রহিল। মাধব আবার বলিলেন—'কি আর দেখছ বাবা! বাড়ী যাও—ওখানে আর যেয়ো না!' নীরদ মাধবচন্দ্রের চোখের কোণে অশ্রু দেখিতে পাইল। আবার সেই আকুল আর্ত্তনাদ! পিতার কথাবার্ত্তার ভাবে ভঙ্গীতে এবং সেই আর্ত্তনাদের করুণ সুরে নীরদ বিচলিত হইয়া উঠিল। তাহার মাথার মধ্যে কি যেন সব অস্থিরতার বীজ ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। পায়ের জুতা খুলিয়া ফেলিয়া কোঁচাটি কোমরে গুঁজিয়া লইয়া সে ছুটিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। নীরদ বোধ হয় এই প্রথম পিতার কথার অবাধ্য হইল।

ছুটিতে ছুটিতে নীরদ যেখানে আসিল, সেখানে দেখিল, নিশ্চল আগাছার মতো একদল ছোট-বড় মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ভিতর হইতে পুরুষকণ্ঠের বিপুল তর্জ্জন-গর্জ্জন শুনা যাইতেছে। তারপরেই প্রহারের ধ্বনি ও সঙ্গে সঙ্গে সেই করুণ বিলাপ! নীরদকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়াই আগাছার দল সরিয়া দাঁড়াইল। নীরদ নিঃশব্দে ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল; নিদারুণ বজ্রপতনের শব্দে লোক যেমন করিয়া চমকিয়া উঠে নীরদকে দেখিয়া কাছারীর কর্ম্মচারী হইতে পাইক পর্য্যন্ত

সকলেই তেমনই চমকিয়া উঠিল। নীরদ তাহাদের কাছে অপরিচিত—তাহার কণ্ঠস্বরও যেমন অপরিচিত, তেমনি তাহার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ ও পুষ্ট বাহুও তাহাদের কাছে সম্পূর্ণ নূতন। নীরদ তাহার চারিদিকের অবস্থা একবার দেখিয়া লইল। একটি লোক অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। আর একটি মেয়ের কেশাকর্ষণ করিয়া একটি যমদূতের মতো পাইক পায়ের নাগড়া খুলিয়া লইয়া প্রহারে উদ্যত। দাওয়ার উপরে একটি হারিকেন লণ্ঠনের সম্মুখে একটি নাতিবৃহৎ সভা। গুড়গুড়ির নল মুখে দিয়া কর্ম্মচারী মহাশয় উপবিষ্ট! তাঁহাদের বিস্ময়ের ঘোরটা একবার কাটিয়া গেলেই সমস্বরে একটি বাক্য উচ্চারিত হইল—আপনি এখানে কেন মশায়—যান্ যান্, নিজের কাজে যান্!

নীরদ আর কিছুদূর অগ্রসর হইতেই পাইক তাহাকে লক্ষ্য না করিয়াই বলিল,-বল্ না—বল্—ঐ হতভাগা লোকটা কি না বল্—সত্য কথা বল্!

—'না, আমি বল্‌তে চাইনে! আমি জানি নে—' কণ্ঠের এই স্বর নীরদের পরিচিত। মেয়েটির দিকে ফিরিয়া চাহিতেই সে তাহার দিকে চাহিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল—'নীরদ ভাই, আমাকে বাঁচাও—আমি মলাম্!' সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পাদুকা-প্রহার। নীরদের চোখমুখ জ্বালা করিতে লাগিল! তাহার পর তাহার মাথার মধ্যে আগুন জলিয়া উঠিল—আগাছার দল কোলাহল করিতে করিতে দূরে পলাইয়া গেল। পাদুকা-পাণি পাইক রক্তাক্তমুখে ভূলুণ্ঠিত হইল। কর্ম্মচারী মহাশয় ঘরের ভিতর গিয়া তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করিলেন, কেবল স্থূলকায় গুপীদাস পলাইতে পলাইতে প্রবলবেগে পৃষ্ঠদেশে এক ঘা লাঠির মিষ্টত্ব আস্বাদন করিয়াই 'বাপ্' বলিয়া বসিয়া পড়িল।

যে লোকটি এতক্ষণ অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পড়িয়াছিল, সে হাতে ভর দিয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত—রক্ত ঝরিতেছে। সে উঠিয়া আসিতেই নীরদ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—'তোমার নাম কি?' সে বলিল—মতিচরণ। 'প্রণাম দাদাবাবু!' বলিয়া সে নত হইয়া প্রণাম করিতে যাইতেছিল—নীরদ তাহাকে ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—'ওসব পরে হবে; এখন একে নিয়ে যেতে হ'বে—'বলিয়া ভূলুণ্ঠিতা মূর্চ্ছিতা হিরণকে দেখাইয়া দিল। তাহার পর দুইজনে ধরাধরি করিয়া হিরণকে বাড়ীর দিকে লইয়া গেল। বহু শুশ্রূষায় হিরণের জ্ঞান হইলে মতিচরণের সাহায্যে নীরদ তাহাকে তাহাদের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

আরও কয়েক মাস পরের কথা। নীরদ তাহার ঘরখানিতে বসিয়া একখানি পুস্তকে মনঃসংযোগ করিয়াছিল। দক্ষিণের খোলা জানালার সম্মুখে একটি তরুণী তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল; পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় নীরদ তাহার মনটিকে রাখিতে পারিয়াছিল কি? তরুণীটি শেষে হাসিতে হাসিতে বলিল,—কি গো বীরপুরুষ, তুমি না কি একা অনেক লোককে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিলে!

পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়া নীরদ বলিল—কে বল্‌লে একথা!

—কেন, আমি কি শুন্‌তে পাই না ভাব! তুমি না বল্‌লেও আমি অনেক কথা জান্‌তে পারি!

—হাঁ, সে একটা ব্যাপার হ'য়েছিল; অল্পদিন হ'ল তুমি এসেছ, তাই আর সে-কথা তোমাকে বলি নি! তুমি কি ক'রে জান্‌লে মীরা?

মীরা বলিল যে, সে এমন অনেক কথা জানে যে নীরদও তাহা এখনও জানে না! তাহার নাকি অনেক গুপ্তচর আছে, তাহাদেরই কাছে এসংবাদ সে শুনিয়াছে।

নীরদ মীরার একখানি হাত আপনার হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—হ্যাঁ সে অনেক কথা; আর একদিন তোমাকে তা' বল্‌ব!

কিন্তু মীরা কিছুতেই শুনিল না। অগত্যা নীরদ বিস্তারিত সকল কথাই একে একে মীরাকে বলিয়া গেল। মীরা সব শুনিয়া বলিল—ওঃ এই!—আমি এর চেয়ে আরও অনেক কিছু জানি!

নীরদ বলিল—কি ক'রে জান্‌লে—কি জেনেছ সব বলো আমাকে!

মীরা কিন্তু একরাশ কালো এলোচুল দুলাইয়া পলাইয়া যাইতেছিল। নীরদ তাহাকে মধ্যপথে ধরিয়া ফেলিল।

শেষে সে হাসিতে হাসিতে হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল—'তা' হ'লে শোনো। একদিন আমি সন্ধ্যার পর পুকুর ঘাটের দিকে গিয়েছিলাম, সঙ্গে ঠাকুরঝিও ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, কিছু বেলফুল তুলে আন্‌ব, ফুল-তোলা শেষ হ'লে ঘাটের শেষপৈঠায় নেমে দেখি, জলের ধারে একটি মেয়ে বসে বসে কাঁদছে। ঠাকুরঝি বল্‌ল—ও হিরণ। ওর সম্বন্ধে অনেক কথা না কি তুমি জানো ,সে বল্‌লো। আমার বড় ইচ্ছা হ'ল, মেয়েটিকে ডেকে কথা কই। ঠাকুরঝিকে বল্‌লাম। সে গিয়ে তা'কে ডেকে নিয়ে এলো। সে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে ছল ছল চোখে বল্‌ল,—'কি লক্ষ্মী বৌদি, আমাকে ডেকেছ কেন? আমাকে যে দেখে সেই ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেয়; তুমি আমায় ডাক্‌লে দেখে, আশ্চর্য্য হচ্ছি!' তারপর তার সঙ্গে অনেক কথাই হ'ল। শুন্‌লাম, তা'র ভাই তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে! মা-ও! তাই সে এখন মতিচরণ ব'লে একটি লোকের আশ্রয়ে আছে। সেখানেও তা'র শান্তি নেই—রাস্তায় বেরুলেই চারিদিক থেকে ছি-ছি শুন্‌তে শুন্‌তে তা'র কান ও প্রাণ ঝালাপালা হ'য়ে গেছে, তাই রাত্রে যখন রাস্তায় কেউ থাকে না, তখন সে একা পুকুরঘাটে এসে জলের ধারে ধারে কেঁদে বেড়ায়!'—বলিতে বলিতে মীরার চোখের পাতা আর্দ্র হইয়া উঠিল। নীরদ তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল—'একথা আমি জান্‌তাম। তুমিও জেনেছ শুনে সুখী হ'লাম।'—বলিয়া তাহার ললাটের চুলগুলি সরাইয়া দিয়া মুখখানি মুছাইয়া দিল। বলিল—'বাবার মুখে শুনেছি, আমাদের গ্রামে এরকম অত্যাচার আরও অনেকবার হ'য়ে গেছে। তাই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হ'য়েছি যা'তে এ-রকমটা আর না হয়, তারই ব্যবস্থা করব। ভাই একদিন হিরণকে আমি ব'লেছিলাম যে, তুমি যদি মতিচরণকে বিয়ে করো, তাহলে আমি তোমাদের সাহায্য করব, আইন তোমাদের দিকে! তা'তে হিরণ বলেছিল যে, সে এখন ভালোই আছে। সমাজের উপর তা'র আর কোনো শ্রদ্ধাই নেই। এখন সে চায় যে, সমাজ তা'কে যেন একটু একা থাক্‌তে দেয়।'

এই বলিয়া নীরদ বাহিরের দিকে তাকাইল। যেখানে নারিকেল-কুঞ্জের পিছনেই ইঁদারা, সেইখান হইতে হিরণ তাহাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিয়াছে, দেখিতে পাইল।

নীরদ সেখান হইতে ধীরে ধীরে সরিয়া গেল!

সেকালের কলিকাতায় লটারি খেলা

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রাচ্যের লণ্ডন, ধনজনপূর্ণ প্রাসাদময়ী কলিকাতা নগরীর উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে ইহার পুরাতন যুগের লটারি খেলার কার্য্যকারিতার কথা উপেক্ষা করা যায় না। তখনকার দিনের সমাজের সকল সম্প্রদায়, সকল স্তরের লোক, এমন কি উপাসনা-মন্দিরের পাদ্রিরাও, এই খেলায়, বনাম জুয়াতে, যোগ দিতেন এবং তাহা দোষের বিষয় ছিল না। সেকালে পথঘাট এবং সাধারণের ব্যবহারার্থ বহু অট্টালিকাদি লটারির চাঁদার টাকা হইতে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সরকারও তখন এই খেলায় আপত্তি করিতেন বলিয়া জানা যায় না, বরং উৎসাহিতই করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন ইংরাজ অধিবাসীরাই প্রধানতঃ ইহার প্রবর্ত্তক।

কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম লটারি খেলা আরম্ভ হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই লটারির টিকিট কিনিবার জন্য খরিদ্দারের সংখ্যা অসম্ভবরূপ অধিক হইয়াছিল। এই সময়ের কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত লটারি-সংক্রান্ত বহু বিজ্ঞাপন হইতে জানা যায়, সে সময় কলিকাতায় ঠিক এখনকার মত ইউরোপীয় মালপত্র বিক্রয়ের জন্য দোকান বা আফিসের সৃষ্টি হয় নাই। তখন ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কোন-না-কোন জাহাজে দুই চারিজন উৎসাহশীল ভদ্র-লোক বিবিধপ্রকার মালপত্র আমদানী করিয়া খুচরা বিক্রয়ের চেষ্টা করিতেন, না হয় লটারির দ্বারা উহা বিক্রয় করিতেন। ১৭৮৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরের কলিকাতা গেজেট পাঠে জানা যায়, কাপ্তেন ডান্স (Captain Dance) তাঁহার আমদানী মালপত্র বিক্রয়ের জন্য একটি লটারির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই লটারির প্রথম পুরস্কারের দ্রব্যসম্ভারের মূল্য নির্দ্ধারিত ছিল ৩,৫০০৲ টাকা। ১৫০ খানি টিকেট ১০০ সিক্কা টাকা দরে বিক্রয় হইয়াছিল।
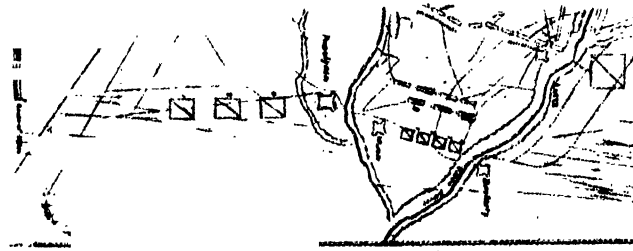
ঊর্দ্ধাংশ—চতুর্থ টাউন হল লটারির টিকিট
নিম্নাংশ—এসাই যুদ্ধের নক্সা

১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর তারিখের গেজেট হইতে তৎকালীন একজন খ্যাতনামা ব্যক্তির একটি অতি মূল্যবান সম্পত্তি লটারিতে বিক্রয়ের কথা জানা যায়। সেই লটারির প্রথম পুরস্কার ছিল মিঃ এডওয়ার্ড টিরেটা'র বাজার। ইহাতে আর পাঁচটি প্রাইজ ছিল তাহাও মূল্যবান স্থাবর সম্পত্তি। বর্ত্তমানে টেরিটি বাজার বলিতে যে বাজারটি বুঝায় উহাই সেই বিক্রীত সম্পত্তি। মিঃ টিরেটা একজন ইতালী দেশীয় ভদ্রলোক, কোন

রাজনৈতিক অপরাধের জন্য স্বদেশ হইতে পলাইয়া আসিয়া এখানে বর্ত্তমান কর্পোরেশনের সিটি আর্কিটেক্টের কার্য্যের অনুরূপ পথ ও বাড়ীসমূহের পরিদর্শকের কার্য্য করিতেন। তাঁহার বাজারের তদানীন্তন মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়াছিল ১,৯৬,০০০ সিক্কা টাকা। যাঁহার নাম হইতে বর্ত্তমান ওয়েষ্টন ষ্ট্রীট্-এর নামকরণ হইয়াছে সেই চার্লস ওয়েষ্টন সাহেব এই প্রথম পুরস্কার পান। ওয়েষ্টন একজন উচ্চহৃদয়বান দানশীল ইউরেশীয়ন্, হল্‌ওয়েল সাহেবের বন্ধু ও মহারাজা নন্দকুমারের মোকদ্দমায় একজন জুরী ছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার চুঁচুড়ার বাটীতে প্রতিমাসে এক শত করিয়া সোনার মোহর দরিদ্রদের মধ্যে স্বহস্তে বিতরণ করিতেন।

লটারির টাকায় নির্ম্মিত কলিকাতার টাউন হল

সাধারণের জন্য যে সব লটারির কথা জানা যায়, তন্মধ্যে এক্সচেঞ্জ বাটী নির্ম্মাণার্থ ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে যে লটারি হয় উহাই বোধ হয় প্রথম। সেকালের সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ লটারি কলিকাতা টাউনহল লটারি। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে গ্যালিশ ট্যাভার্ণ (Le Gallais Tavern) নামক হোটেলে এক সভায় সাধারণের ব্যবহারার্থ একটি বাটী নির্ম্মাণার্থে টাকা তুলিবার কথা হইয়াছিল। ইহাকেই টাউনহল লটারির ভিত্তি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করিয়াছেন। এই সময় ফ্রি-ম্যাসন্ ও অন্যান্য সমিতির সভ্যদের জমায়েৎ, বলনাচ্, কন্‌সার্ট, প্রভৃতির জন্য একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণার্থ বড় লটারি হয়। ইহাতে একশত টাকা মূল্যের ৮০০ খানি টিকেট করা হইয়াছিল। টাউনহলের জন্য প্রথম যে লটারি হয়, উহার জন্য ৬০ সিক্কা টাকা মূল্যের ৫০০০ টিকেট করা হইয়াছিল তন্মধ্যে ১৩৩১টি পুরস্কার ছিল।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে যে টাউন্‌হল লটারি হয় তাহা সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের অনুমোদিত ছিল। উহাতে পাঁচলক্ষ টাকা তোলা হইয়াছিল। মোট ১৪০০ টিকিটের মধ্যে একহাজার পুরস্কার ছিল। এই সময় ইহাও স্থির হয়, এই লটারির লভ্যাংশ যখন সাধারণ হিতকারী কার্য্যে নিয়োজিত হইবে, তখন যতদিন না আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হয় ততদিন বৎসরে একটি করিয়া লটারি হইবে। তৃতীয় দফায় এই লটারি ১৮০৭এর ২০শে জানুয়ারী কমিশনর জর্জ্জ ডোডেস্‌ওয়েলের (George Dowdeswell) সমক্ষে খোলা হয়। চতুর্থ বারের এই লটারির কথাও ঐ বৎসরেই বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। সেবার মোট সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা তোলা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৫০০০৲ টাকা লটারির খরচ বাদ ৭,৩৫,০০০৲ হাজারের মধ্যে ৬,৬০,০০০৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ৭৫,০০০৲ টাকা মাত্র টাউনহল নির্ম্মাণে ব্যয়িত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লির শাসনকালে টাউন্ ইম্‌প্রুভ্‌মেণ্ট কমিটি গঠিত হইয়াছিল, এই কমিটি দ্বারাই এই সকল লটারির কার্য্য পরিচালিত হইত।
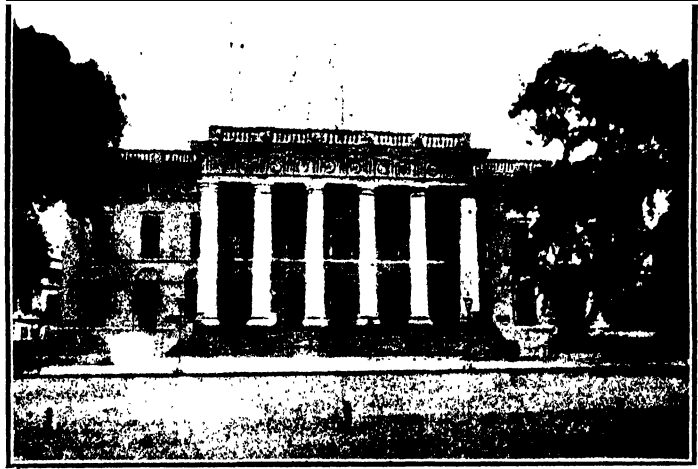
কলিকাতা সহরের বিভিন্ন বিষয়ের উন্নতিকল্পে সরকারের অনুমোদনে প্রথম যে লটারি হয় উহার কথা ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারীর কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। উহার প্রথম পুরস্কার এক লক্ষ ও দ্বিতীয় পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিল। মোট পুরস্কার দেওয়া হইয়াছিল তিন লক্ষ টাকা। উদ্বৃতাংশ রাস্তা

মেরামত, সাধারণ উদ্যান ও ভ্রমণের স্থানসমূহ, সাধারণ সৌধাবলী প্রভৃতি নির্ম্মাণকল্পে ব্যয়িত হইয়াছিল।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লটারি তহবিলে সহরের বহুল উন্নতি সাধন করা সত্ত্বেও পূর্ব্বের সতেরটি লটারির টাকা হইতে খরচ করিয়াও উদ্বৃত্ত মোট সাড়ে চার লক্ষ টাকা জমা ছিল বলিয়া জানা যায়। ১৮১৩ সালে টাউন হলের নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইলিয়ট রোড, কলেজ ষ্ট্রীট, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার, মৃজাপুর ট্যাঙ্ক, ষ্ট্র্যাণ্ড রোড প্রভৃতির নির্ম্মাণ বা উন্নতি যাহা কিছু সমস্তই উল্লিখিত লটারি তহবিল হইতে সাধিত হইয়াছিল। সুতিবাগানের উন্নতি ও পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্য লটারির টাকাতেই হয় বলিয়াই এই নাম রহিয়া গিয়াছে।

BULRAUM MULLICK'S 17th LOTTERY.
No.
Received from
the sum of Sicca Rupees Thirty being his subscription for
the above chance in the 17th Lottery on Govt. Lottery Tickets.
Calcutta
1830.

একখানি পুরাতন লটারির টিকিট
(সুপ্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় ইহা কিনিয়াছিলেন)

বেসরকারি ভাবে সেকালে অনেকেই লটারির দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিত। আজকাল যেমন মধ্যে মধ্যে কন্যা-দায়গ্রস্ত দরিদ্র ভদ্রসন্তানকে সাহায্যার্থ, কাহারও বা গৃহ-নির্ম্মাণকল্পে সহায়তা করিবার জন্য থিয়েটারে সাহায্য-রজনী নাম দিয়া অভিনয়াদি হইয়া থাকে, তখনকার দিনে সেইরূপ লটারির দ্বারা অর্থসংগ্রহের কথা জানা যায়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বরের একটি বিজ্ঞাপনে একটি দুস্থ পরিবারের সাহায্যের কথা জানা যায়। জনহিতৈষী, দয়ালু ও পরদুঃখকাতর জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়াই এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছিল।

ব্যক্তিবিশেষের বাটী বা ভূসম্পত্তি ছাড়াও হীরকাঙ্গুরীয়, মূল্যবান গ্রন্থ প্রভৃতি কোন একটি দ্রব্যের জন্যও লটারির আয়োজনের কথা শোনা যায়। খ্যাতনামা পাশ্চাত্য চিত্রকর ড্যানিয়েল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিয়া সে-দেশের চিত্রাদি অঙ্কিত করিয়া ফিরিয়া আসিলে তাঁহার চিত্রসমূহ বিক্রয়ের জন্য এই পথ অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। উহার প্রথম পুরস্কার ১২০০৲ এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পুরস্কার ২৫০৲ টাকা ঘোষিত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গাড়ীওয়ালা ষ্টুয়ার্ট কোম্পানিও ৬০০০৲ টাকা মূল্যের একখানি গাড়ী বিক্রয়ের জন্য এই পথ গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপায়ে নীলের কারখানা, বিলাতের সম্পত্তি প্রভৃতিও এখান হইতে বিক্রয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন শুধু কলিকাতায় নহে মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলেও লটারি খেলার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। সেকালে দেশীয় ধনী লোকদের মধ্যে অনেকেই লটারির টিকিট কিনিতেন। দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ যে অনেক টিকিট কিনিতেন এখনও তাহার নিদর্শন আছে।

লটারির দ্বারা বহু প্রকারে সহরের উন্নতিসাধনের যথেষ্ট সহায়তা হইলেও ইহার অনিষ্টকর দিকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে সুপ্রীম্ গভর্ণমেণ্ট লটারি কমিটির কার্য্য বন্ধ করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করেন।

এই প্রবন্ধের সহিত দুইখানি লটারির টিকিটের প্রতিলিপি দেওয়া হইল। চতুর্থ টাউন হলে লটারি টিকিটের যে ছবি দেওয়া হইল, উহার তামার ব্লকখানি ঘটনাক্রমে কলিকাতা কর্পোরেশন আপিসে পাওয়া যায়। নিম্নাংশে যে নক্সা অঙ্কিত আছে, উহা আসাই যুদ্ধের নক্সা বলিয়া মনে হয়। উক্ত ব্লকের পশ্চাৎ দিকে উহা খোদিত আছে। উহা থাকিবার কারণ নির্ণয় করা কঠিন। ব্লকখানি এক্ষণে ভিক্টোরিয়া স্মৃতিসৌধে রক্ষিত আছে।*

* নিম্নলিখিত গ্রন্থ হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

(1) The Town Hall Lotteries—Bengal, Past & Present, Vol.—1
(2) The Good Old Days of the Honourable John Company.
(3) Old Calcutta Lotteries and Theatres—The Calcutta Municipal Gazette Vol.—VII no. 1

বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

এখন বাঙ্গালী জাতির অন্নসমস্যাই প্রধান সমস্যা। কি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক, কি কৃষক, কি শ্রমজীবী সকলেরই এখন অন্নসঙ্কট উপস্থিত। বাঙ্গালীকে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই অন্নসমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে।

বঙ্গ দেশের প্রায় শতকরা আশী জন লোক কৃষিজীবী; তাহারা পল্লীগ্রামে বাস করে। বাকী বিশ জনের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ জমির উপস্বত্ব ভোগ অথবা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অবশিষ্ট সকলে ব্যবসায় বাণিজ্যাদি দ্বারা প্রতিপালিত হয়। এই বিশ জনেরও অর্দ্ধেক পল্লীগ্রামে বাস করে।

প্রথমতঃ, কৃষকশ্রেণীর অবস্থা আলোচনা করা যাইতেছে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলায় জরিপ (cadastral survey) হইয়াছিল। সেটল্‌মেণ্ট-অফিসার জ্যাক সাহেব জরিপ শেষ হইলে এই জেলার লোকের আর্থিক অবস্থা (economic condition) সম্বন্ধে একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে এই জেলার সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়। আমার বোধ হয় কৃষিপ্রধান ফরিদপুর জেলার যেরূপ অবস্থা, বাঙ্গলার অধিকাংশ জেলারই সেইরূপ অবস্থা, সামান্য কিছু ইতর বিশেষ থাকিতে পারে। জ্যাক্ সাহেবের রিপোর্ট বিশ বৎসর পূর্ব্বে লেখা হইয়াছিল, তাহার পর কোন কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, আমরা যথাস্থানে তাহার উল্লেখ করিব।

কৃষকের আয়ব্যয়

জ্যাক সাহেব বলেন, ফরিদপুর জেলার একশটি কৃষক-পরিবারের মধ্যে মাত্র পঁয়ত্রিশটি পরিবার কেবল জমির উৎপন্ন হইতে বাঁচিতে পারে, পঁচিশটি পরিবারকে জমির আয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হয়, বাকী চল্লিশটি পরিবারকে সারাবছর ধান কিনিয়া খাইতে হয়।

ভদ্র পরিবারের মধ্যে অর্দ্ধেক লোকের জমিজমা আছে, সিকি লোক চাকরী দ্বারা, অবশিষ্ট সিকি লোক ব্যবসা বাণিজ্য, ওকালতি, মোক্তারি, ডাক্তারি তেজারতি প্রভৃতি উপায়ে জীবিকানির্ব্বাহ করে। শতকরা আটজন লোক শিল্পকার্য্য (তাঁত বোনা ইত্যাদি) দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করে।

যাহারা কৃষিকার্য্য করে তাহাদের একটি পরিবারের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৮০৲ টাকা, যাহারা কৃষিকার্য্য করে না তাহাদের একটি পরিবারের গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৯৩৲ টাকা এবং এই উভয় শ্রেণীর গড়পড়তা বার্ষিক আয় ২৮২৲ টাকা। প্রতি পরিবারের গড়ে পাঁচজন লোক সচরাচর ধরা হইয়া থাকে—একটি বয়স্ক পুরুষ দুইটি স্ত্রীলোক, দুইটি বালকবালিকা; তাহা হইলে প্রতিজনের গড়ে বাৎসরিক আয় ৫৬৲ টাকা, প্রতি মাসে ৪৷৵৮ পাই।

এই পাঁচটি লোকের প্রত্যেকে গড়ে মাসে ২৭৷৹ সের চাউল খায়, সুতরাং এই পাঁচ জনের মাসে ৩৭৷৹ সের চাউলের প্রয়োজন। যে সময়ে এই রিপোর্ট লেখা হইয়াছিল, তখন চাউলের দাম পল্লীগ্রামে ৫৲ টাকা মণ ছিল, এখন ৭৷৹ টাকা হইয়াছে। সেই সময়ের দর ধরিলে, উক্ত পরিবারের তখন বৎসরে ২০৬৷৹ আনার চাউল কিনিতে হইত। কিন্তু কেবল চাউল খাইয়া কেহ বাঁচিতে পারে না, তাহার সঙ্গে ডাল, তরকারি, মাছ, তেল, নুন, মশলা ইত্যাদিও চাই। এতদ্ভিন্ন এই পাঁচটি পরিধেয় বস্ত্র ও শীতবস্ত্র কিনিতে হয়। আবার জমির খাজনা ট্যাক্স ইত্যাদিও আছে। সুতরাং একটি লোকের পরিবারের বাৎসরিক আয় গড়ে ২৮২৲ টাকা হইলে তখনকার দিনেও ইহাতে কোন রকমে সংসার চলিতে

পারিত না। এখন ত চাউলের দাম ও অন্যান্য জিনিষের দাম দেড়গুণ বাড়িয়াছে। যদি বল, চাউলের দাম ও পাটের দাম বৃদ্ধি হওয়াতে কৃষকদিগের আয়ও সেই পরিমাণে বাড়িয়াছে। কিন্তু সে কত লোকের? জ্যাক্ সাহেব বলিয়াছেন, শতকরা চল্লিশটি পরিবারকে ধান চাউল কিনিয়া খাইতে হয়।

জ্যাক্ সাহেব সচ্ছলতা ও অসচ্ছলতার হিসাবে পরিবারসমূহকে এই চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া তাহাদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় দেখাইয়াছেন :

	শতকরা পরিবার সংখ্যা	বার্ষিক আয়	জনপ্রতি বার্ষিক আয়
[১] "Comfort" (সচ্ছল)—	৪৯ —	৩৬৫৲ —	৬০৲
[২] "Below comfort [অসচ্ছল]—	২৮ —	২৩৩৲ —	৪৩৲
[৩] "Above indigence" [দরিদ্র নহে]—	১৮॥০ —	—১৬৬৲ —	৩৪৲
[৪] "Indigence [দরিদ্র]—	৪॥০ —	১১৫৲ —	২৭৲

যাহারা কৃষিকার্য্য করিয়া খায় তাহাদের উক্ত প্রকার আয় দেখান হইয়াছে, অপর শ্রেণীর আয় জনপ্রতি যথাক্রমে ৮০৲, ৪২৲, ৩১৲ ও ২৪৲ টাকা।

কিন্তু আমরা উপরে যে হিসাব করিয়াছি, তাহাতে দেখা যায় একটি পরিবারের কেবল চাউলের খরচই বৎসরে ২০৬।০ টাকা। তাহা হইলে কৃষকদিগের মধ্যে অর্দ্ধেক লোককে অতিকষ্টে জীবনযাপন করিতে হয় এবং প্রায় সিকি লোকের একবেলার বেশী অন্ন জোটে না। যাহারা কৃষিকার্য্য করে না, ও যাহাদের জমিজমা নাই তাহাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। কারণ তাহাদের "সচ্ছল" লোকদিগের বাৎসরিক আয় জনপ্রতি ৮০৲ টাকা রহিয়া গিয়াছে, অথচ চাউলের দাম পূর্ব্বাপেক্ষা দেড় গুণ বাড়িয়াছে।

কৃষকের ঋণভার

এই কারণে অধিকাংশ লোকেই ঋণ-গ্রস্ত হয়।

জ্যাক্ সাহেব লিখিয়াছেন :

Among the cultivators 55 p. c. are free from debt, 39 p. c. in debt, but only to a moderate extent; 6 p. c. heavily indebted. Of non-agriculturists 73 p. c were free from debts. Among cultivators average debt per family was Rs. 121 among non-cultivators Rs. 258. In the district as a whole the debt amounted to Rs. 11 per head of population, and Rs. 59 for each family."

যখন চাউলের দাম ৫৲ টাকা মণ ছিল তখন কৃষক-শ্রেণীর শতকরা ৩৯ জন এবং অপর শ্রেণীর শতকরা ২৭ জন ঋণগ্রস্ত ছিল। চাউলের দর বৃদ্ধি হওয়াতে এই ঋণগ্রস্ত লোকের সংখ্যাও অনেক বাড়িয়াছে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ নির্দ্দিষ্ট অল্প আয়ের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণীর।

মধ্যবিত্ত লোকের আয়ব্যয়

এই জেলায় ভদ্রলোক শ্রেণীর মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক লোকের [১২,৭৭১ পরিবার] জমিজমা নাই। যাঁহাদের জমি নাই,তাঁহাদের অর্দ্ধেক লোক কেরাণীগিরি বা মুহুরি-গিরি করেন, আর অর্দ্ধেক উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ, শিক্ষক ইত্যাদি। জ্যাক্ সাহেব বলেন :

"Clerks are ill-paid; those in Government service in Bengal are far better paid than their fellows in most of the countries of Europe. অর্থাৎ যে সকল কেরাণী গভর্ণমেণ্টের চাকুরী করেন তাঁহাদের বেতন ইয়ুরোপের অনেক দেশের কেরাণীর চেয়ে বেশী। এ কথা কতদূর সত্য জানি না। তবে এ দেশের সাহেব ও অর্দ্ধসাহেব কেরাণীগণ গভর্ণমেণ্ট ও সওদাগরী আপিসে যে বাঙ্গালী কেরাণীর চেয়ে অনেক বেশী বেতন পান তাহা ত প্রত্যক্ষই দেখিতেছি। তাঁহাদের standard of living [চালচলন] অনেক উচ্চ-ধরণের বলিয়া কম মাহিনায় তাঁহাদের পোষায় না। ইয়ুরোপের নানা দেশে যাহারা কেরাণীগিরি করে তাহাদের চালচলন কি ইহাদের চেয়ে কম? গভর্ণমেণ্ট আপিসের কেরাণীদের সম্প্রতি মাহিনা বৃদ্ধি হওয়াতে তাহাদের অর্থকষ্ট অনেকটা দূর হইয়াছে স্বীকার করি। গভর্ণমেণ্ট স্কুলসমূহের শিক্ষকদিগেরও কপাল খুলিয়াছে, কিন্তু বে-সরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকগণের

দুরবস্থার একশেষ। অনেক স্কুলেই গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণের মাহিনা ৩০৲।৪০৲।৫০৲ টাকার বেশী নহে। আইন ব্যবসায়ীদের উপর জ্যাক্ সাহেবের অত্যন্ত রাগ। তিনি বলেন :

The lawyers are the spoilt children of Bengal. They make an income entirely disproportionate to their abilities.

অর্থাৎ উকীল মোক্তারগণ "আলালের ঘরের দুলাল"। তাঁহাদের গুণপনার তুলনায় রোজগার অনেক বেশী। আমি মনে করি আধুনিক কালে অনেক average civilian সম্বন্ধে বরং এই মন্তব্য বেশী খাটে। মফস্বল কোর্টের কয়জন উকীল জজ ম্যাজিষ্ট্রেট্‌দের চেয়ে বেশী রোজগার করেন? আমি মনে করি একটা জেলায় বিশ লক্ষ লোকের মধ্যে মাত্র দুই তিনটি উকীল ও হাকিমের মাসিক আয় হাজার টাকা ও তাহার উপরে এবং

৫০০৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা আয়—১৫।২০ জনের
৩০০৲ " " ৫০০৲ " আয়—৫০।৬০ জনের
১৫০৲ " " ৩০০৲ " আয়—১৫০।২০০ "
১০০৲ " " ১৫০৲ " আয়—৪০০।৫০০ "

ইহার মধ্যে হাকিম, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কেরাণী, পুলিশ, প্রফেসর, মাষ্টার ইত্যাদি সব রকম মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক পড়িতেছে। জমিদার ও তালুকদারদিগকে ধরা হয় নাই।

ফরিদপুর জেলায় বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা আয়ের জমিদার ৩।৪টির বেশী হইবে না [অবশ্য বিদেশবাসী জমিদার বাদে]; ১০।২০।২৫ হাজার টাকা আয়ের জমিদার ২০।২৫টি হইবে; অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই ক্ষুদ্র তালুকদার তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেরই আয় ৫০০৲ হইতে ২০০০৲ টাকা হইবে। প্রজার নিকট হইতে বৎসরে ৫০৲ কি ১০০৲ টাকা খাজনা আদায় করিয়া তাহার অর্দ্ধেক গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব দেয় এবং ২০।২৫ বিঘা খামার জমির উপস্বত্ব ভোগ করে, এইরূপ ক্ষুদ্র তালুকদারের সংখ্যাই এ জেলায় হাজার হাজার।

ব্যবসাদারদিগের অবস্থা

এই জেলায় মাদারীপুর, পালং, গোপালগঞ্জ, ভাঙ্গা, কাশীয়ানি, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী, পাংশা প্রভৃতি বন্দরে অনেক ব্যবসাদার আছে, তাহাদের কাহারও কাহারও কারবার খুব বড়। ইহারা ধান, চাউল, পাট, কাপড়, বাসন, টীন, কাঠ প্রভৃতি জিনিষের ব্যবসা করে। এই সকল ব্যবসাদারের মধ্যে প্রায় ৫০০ লোক ইন্‌কামট্যাক্স দেয়, অর্থাৎ তাহাদের বাৎসরিক আয় দুই হাজার টাকার উপরে। এতদ্ভিন্ন বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসাদার (petty traders) আছে, যাহারা ধান, চাউল, কাপড়, বেনেতি মসলা, তেল, নুন, তামাক, চিনি মনিহারী দ্রব্য ইত্যাদি হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া মাসে ১৫।২০৲ টাকা লাভ করে। এই সকল ব্যবসাদার অধিকাংশ জাতিতে তেলি কিংবা সাহা। আজকাল অনেক নমঃশূদ্রও এই ব্যবসা ধরিয়াছে। বারুই জাতি বরোজে পান উৎপাদন করিয়া হাটে হাটে বিক্রয় করে। তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল। এ জেলায় মাড়োয়ারী ব্যবসাদারের সংখ্যা খুব কম। ব্রাহ্মণ কায়স্থাদি জাতি ব্যবসা ভাল বুঝে না, এই সকল ব্যবসায় চালাইতে হইলে যেরূপ শিক্ষার দরকার স্কুল কলেজে তাহারা সেরূপ শিক্ষা পায় না, বরং আধুনিক স্কুল কলেজের বিলাসিতার আবহাওয়ার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়া তাহারা ঐ সকল ব্যবসায়োচিত শারীরিক পরিশ্রম ও কষ্টসহিষ্ণুতাতে সম্পূর্ণ অপটু হইয়া পড়ে। একজন সাহা মহাজন বা মাড়োয়ারী তাহার দৈনিক বেচাকেনার হিসাবে একটি পয়সার গরমিল হইলে তাহা মিলাইবার জন্য হয়ত রাত্রি ১২টা পর্য্যন্ত খাটিবে, কিন্তু একজন কলেজেপড়া বাবু "একপয়সা ত জানে দাও" বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিবে, এবং সেইরূপ অভ্যাস হওয়াতে পরে একশত টাকাকেও "don't care" করিয়া অবশেষে একহাজার টাকা লোক্‌সান দিয়া বসিবে। ব্যবসায় ব্যাপারে এক পয়সাও একশত টাকার সমান মূল্যবান মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ habit of mind (অভ্যাস)ই আসল বস্তু। ইংরেজীশিক্ষিত যুবকদিগকে ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে সেই মনের অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হইবে।

কারুকার্য্য

এ জেলায় শিল্পকার্য্য অতি সামান্যই আছে। মুসলমান কারিগরেরা তাঁত বোনে, ছুতারমিস্ত্রীরা কাঠের

কাজ করে, এতদ্ভিন্ন স্বর্ণকার, লোহার কামার, কুম্ভকার, মালাকার,চর্ম্মকার ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পী অনেক আছে। সাতৈর গ্রামে উৎকৃষ্ট শীতলপাটী প্রস্তত হয়, কিন্তু এই শিল্প শ্রীহট্টের আমদানী সস্তা পাটির সহিত প্রতিযোগিতা করিতে না পারিয়া লোপ পাইতে বসিয়াছে। পূর্ব্বে এ জেলায় অনেক সূত্রধর ছিল, তাহারা কাঠের উপর অতি সূক্ষ্ম খোদাইকার্য্য এবং মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে পারিত। এখন সেরূপ কারিগর প্রায় দেখা যায় না, কেবল বিঙ্কুদি নিবাসী শ্রীপূর্ণচন্দ্র মিস্ত্রীকে রথের ঘোড়া ও সারথি, শিব, দুর্গা, গণেশ, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়াছি। গাজনা গ্রামের কুম্ভকারগণ ("দেউড়ী") উৎকৃষ্ট দেবদেবীর মৃণ্ময়মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিত, এখন তাহাদের বংশ প্রায় লোপ পাইয়াছে। তবুও স্থানে স্থানে এখনও অনেক "দেউড়ী" আছে। ফরিদপুর সহরের নিকটেও অনেক গ্রামে রাজমিস্ত্রী আছে, তাহারা পাকা কোঠা নির্ম্মাণ করে। এই সকল শিল্পীদিগের মাসিক আয় সাধারণতঃ ৩০৲।৩৫৲ টাকা, বেশী দক্ষ হইলে ৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত হইতে পারে। আমি যে পূর্ণচন্দ্র মিস্ত্রীর কথা বলিলাম, তাহার মাসিক বেতন ৩৫৲ টাকা এবং খোরাকী।

দিনমজুর বা শ্রমিকগণ

যাহারা দিনমজুরী করিয়া খায় এবং অন্য জেলায় যে সকল লোক "মুনিষ," "জনমজুর", "কামলা" ইত্যাদি নামে পরিচিত, ফরিদপুর জেলায় সে শ্রেণীর লোক খুব কম, সেইজন্য এই জেলায় সেই শ্রেণীর লোক বুঝায় এরূপ শব্দও প্রচলিত ছিল না—সম্প্রতি "কৃষাণ" শব্দ প্রচলিত হইয়াছে। তাহার কারণ এ জেলায় সকলেরই কিছু-না-কিছু জমি ছিল, ভূমি-শূন্য লোক খুব কম। তবে মহাজনের কবলে পড়িয়া আজকাল এইরূপ অনেক লোকেব উৎপত্তি হইয়াছে। এখনও সহর বাজারের নিকটেই এরূপ কতক লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সুদূর পল্লীগ্রামে কোন একজন কৃষক শ্রেণীর লোককে যদি বলা যায়, "তুমি আমার এই বাক্সটা মাথায় করিয়া লইয়া চল, তোমাকে ৷৷০ আনা দিব," তবে সে বলিবে।" "ক্যান্ তুমি নিজে মাথায় করিয়া নিতে পার না? আমি বুঝি তোমার চাকর?" এ জেলায় কুষ্টিয়া, মেহেরপুর প্রভৃতি স্থানের লোক আসিয়া মাটিকাটা, জঙ্গল আবাদ, পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কাজ করে এবং ধান কাটার সময় ঢাকা জেলা হইতে অনেক কৃষক আসিয়া ধান কাটে এবং পারিশ্রমিক-স্বরূপ ধান লইয়া যায়। যাহাদের চাষের জমি নিতান্ত অল্প সেরূপ কোন কোন লোক আবার এ জেলা হইতে বরিশাল, খুলনা জেলার "ভাটী অঞ্চলে" ধান কাটিতে যায়। তবে কৃষকেরা দলগঠন (গাঁতা) করিয়া পরস্পরের ধানপাট নিড়ান ও ধানকাটার কাজ করে তাহাতে অপমান বোধ করে না। যে সময়ে ক্ষেতে কোন কাজ থাকে না, তখন ইহারা আলস্যে কাল কাটায় অথ পয়সা লইয়া কোন কাজ করে না। তবে কোন কোন লোক নৌকার মাঝিগিরি করে। ইহারা আরোহিগণের বাক্স্ বিছানা মাথায় করিয়া লইতে অপমান বোধ করে না, কিন্তু পয়সা লইয়া অন্য লোকের মোট বহিতে কিছুতেই সম্মত হইবে না। এইরূপ শারীরিক পরিশ্রমে অপমানবোধ শুভ লক্ষণ নহে, ইহা তাহাদের দুর্ব্বুদ্ধির পরিচায়ক। এ জেলায় দিনমজুরের সংখ্যা কম বলিয়া শ্রমিকের মজুরীও অত্যন্ত বেশী। পল্লীগ্রামে সাধারণতঃ দৈনিক ৷৷০ আনা ও দুই বেলা খোরাকী না দিলে লোক পাওয়া যায় না। ইহারা বেলা ৬টা ৭টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করে, মধ্যাহ্নভোজনের পর ২ ঘণ্টা বিশ্রাম করে। সহরের নিকট দৈনিক হার ৷৷৵০ আনা, কিন্তু খোরাকী দিতে হয় না। ইহারা বেলা ৮টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত কাজ করে। যেবার পাটের দর খুব বাড়ে সে বার এই সকল কৃষাণগণ দৈনিক একটাকা পাঁচ সিকাও রোজগার করে।

পাটের চাষ

পাটের চাষ এই জেলায়, এমন কি পূর্ব্ববঙ্গের ও পশ্চিম বঙ্গের কোন কোন জেলায় এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে, কৃষক, মজুর, জমিদার, মহাজন, উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাজ প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সচ্ছলতা এই পাটের মূল্যের উপর নির্ভর করে। জ্যাক্ সাহেব বলেন, ফরিদপুর জেলার কৃষকেরা পাট বেচিয়া বৎসরে বার

কোটী টাকা রোজগার করে, অবশ্য সে ১৫ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন সাধারণতঃ পাটের দাম ৫।৬ টাকা ছিল। তাহার পরে যুদ্ধের সময় পাটের দর হঠাৎ কমিয়া গিয়া মণ ২।৩৲ পর্য্যন্ত নামিয়াছিল পরে ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া ৩ বৎসর পূর্ব্বে অত্যন্ত বাড়িয়া ২০।২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল। কিন্তু সে কেবল এক বৎসরের জন্য। গত ৩ বৎসরে আবার ৮৲।১০৲ টাকা দাঁড়াইয়াছে, এখন ইহাকেই normal price বলা যায়। এই দরে পাট বিক্রয় করিয়া ফরিদপুরের কৃষকেরা এখন বৎসরে প্রায় ১৮ কোটী টাকা পাইতেছে। বিদেশ হইতে বৎসরে এতগুলি টাকা পাওয়া কেবল এক পাটচাষের দ্বারাই সম্ভব হইয়াছে। সুতরাং পাটের চাষ তুলিয়া দেওয়ার জন্য হাজার আন্দোলন করিলেও লোকে তাহাতে কর্ণপাত করিবে না, আর সেরকম আন্দোলন সমীচীনও নহে। কারণ কেবল এক ধান-চাষের উপর নির্ভর করিলে কৃষকের কিছুতেই চলিতে পারে না। কেবল কৃষক বলিয়া নহে, অন্যান্য শ্রেণীরও চলিতে পারে না। আর বৎসর বৎসর এতগুলি টাকা বিদেশ হইতে যখন আসিতেছে তাহা বন্ধ করিতে চেষ্টা করা নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। আমরা সর্ব্বদা বলিয়া থাকি বিদেশী বণিকেরা নানা প্রকার পণ্য-দ্রব্য আমদানি করিয়া আমাদের টাকা লুটিয়া লইতেছে, কেবল একমাত্র পাটের দ্বারাই আমরা তাহার কথঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করিতেছি। তবে এক কথা এই, বিদেশী পাট খরিদ্দারদিগের ষড়যন্ত্রে কৃষকেরা তাহাদের উৎপন্ন পাটের সমুচিত মূল্য অনেক সময় পায় না। তাহার প্রতিবিধানের জন্য কৃষকদিগের পাট বিক্রয়ের সমবায় গঠন করা কর্ত্তব্য।

জ্যাক্ সাহেবের সময়ে এক একর অর্থাৎ ৩ বিঘা জমিতে ৭৫৲ টাকা মূল্যের পাট হইত এবং সেই জমিতে পাট না বুনিয়া ধান বুনিলে ৩৭৷৷০ টাকা মূল্যের ধান হইত। এক বিঘায় গড়ে ৫ মণ পাট হইলে তাহার বর্ত্তমান মূল্য ৫০৲ টাকা, ও ৬ মণ ধান হইলে তাহার বর্ত্তমান মূল্য ২৫৲ টাকা। ধান ও পাটের চাষে এতটা প্রভেদ। আর পাট চার পাঁচ মাসের ফসল, ধান ছয় সাত মাসের ফসল। ধান আবাদে অনাবৃষ্টি, অত্যন্ত বর্ষা, প্রভৃতি যে সকল বিপদ আছে, পাটের আবাদে তাহা নাই। সুতরাং নানা কারণে পাটের চাষই কৃষকদিগের অধিকতর লাভজনক। একজন কৃষকের যদি ১০ বিঘা জমি থাকে, আর তাহার ৫ বিঘাতে ধান ও ৫ বিঘাতে পাট উৎপাদন করে, তবে ফসল নষ্ট না হইলে সে পাট বিক্রয় করিয়া ২৫০৲ টাকা ও ধান বিক্রয় করিয়া ১৫০৲ টাকা, মোট ৪০০৲ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারে। কৃষক নিজহাতে চাষের সমস্ত কাজ করিলে এই আয় হইবে, কিন্তু একজন ভদ্রলোক যদি মজুরের দ্বারা সমস্ত কাজ করান, তবে তাঁহার কৃষাণ খরচ দিয়া বৎসরে ১৫০।২০০৲ টাকা লাভ দাঁড়াইবে কিনা সন্দেহ। এইজন্য যাঁহারা লাঙ্গল খামার করিয়া শ্রমিকের সাহায্যে জমি চাষ করান তাঁহাদের মোটের উপর বেশী লাভ দেখা যায় না, বিশেষতঃ ফসলের মূল্য যখন কম হয়।

আমরা এইরূপে কৃষক, মজুর, মধ্যবিত্ত লোক, ব্যবসাদার, চাকুরিজীবী প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর আয়ব্যয়ের একটা rapid survey করিয়া দেখিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরিদপুর জেলার যে অবস্থা, বঙ্গের সকল জেলায়ই প্রায় সেই অবস্থা। কারণ ধান্যাদির বাজার সর্ব্বত্রই একরূপ দাঁড়াইয়াছে এবং লোকের আয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে না। বাঙ্গালা দেশের প্রায় অর্দ্ধেক পরিবারের বার্ষিক আয় গড়ে ৩৬৫৲ টাকা, এবং তাহাদের সচ্ছলভাবে চলে, বাকী অর্দ্ধেক পরিবারের মধ্যে কাহারও অসচ্ছলভাবে, কাহারও কষ্টে এবং কাহারও অতিকষ্টে দিন যাপন করিতে হয়।

এখন ইহার প্রতিকারের উপায় কি?

কৃষকশ্রেণীর বিষয়ই আগে চিন্তা করা যাক্। যে কৃষকের ১০ বিঘা চাষের জমি আছে, তাহার ধানে ও পাটে বৎসরে প্রায় ৪০০৲ টাকা আয় হয়। একটি ভদ্র পরিবার পল্লীগ্রামে বাস করিলে, এই আয়ে তাহার দেনা না হইয়া সচ্ছলভাবেই চলিতে পারে। আজকালকার বাজারে একজন ভদ্রসন্তান বি-এ পাশ করিয়াও বৎসরে ৪০০৲ টাকা রোজগার করিতে পারে না। কিন্তু কৃষকদিগের ঋণ হয় কেন? তাহার কারণ,

কৃষকের অমিতব্যয়িতা ও দূরদৃষ্টির অভাব। আবার পূর্ব্ববঙ্গে তাহাদের মামলাপ্রিয়তা। এই মামলা-প্রিয়তার মূলে হিংস্র প্রকৃতি ও বৈরনির্যাতনস্পৃহা। আমি একটা দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝাইতেছি।

রমজান সেখ এ বছর পাট বেচিয়া ৩০০৲ টাকা পাইয়াছিল। তাহার কতক টাকা দিয়া সে মহাজনের দেনা শোধ করিয়াছে, কতক টাকা নানা বাবদে খরচ করিয়া ফেলিয়াছে। কারণ নগদ টাকা হাতে আসিলে ইহাদের নানা প্রকার অভাব ত আসিয়া উপস্থিত হয়। যে ধান পাইয়াছিল তাহা চৈত্র মাসের মধ্যেই খাইয়া ফেলিয়াছে। বৈশাখ মাসেই মাসিক টাকা প্রতি ⁄০ আনা সুদ স্বীকার করিয়া সে মহাজনের নিকট হইতে আবার ২৫৲ টাকা কর্জ্জ করিল। ইহাতে দুই মাস কষ্টেসৃষ্টে চালাইয়া আষাঢ় মাসে কিছু আউষ ধান পাইল, এবং শ্রাবণ মাসে পাট বেচিয়া কিছু নগদ টাকা হাতে পাইল। তখন তাহাকে পায় কে? সে একদিন হাটে যাইয়া একটা ইলিশ মাছের দাম বার আনা বলিল; তাহার প্রতিবেশী আরজান সেখ ঐ মাছের দাম চৌদ্দ আনা বলাতে রমজান এক টাকা দিয়া ঐ মাছ কিনিল, এবং আরজানের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—"কি? আমি আব্বাচ মাতব্বরের বেটা, আমার দরাস করা মাছ তুই কিন্‌তে চাস্? আমি তোর চেয়ে কম কিসে?" আরজানও ক্রোধভরে একটা গালি দিল। তখন রমজান তাহার মাথায় লাঠির বাড়ি মারিল। আরজানের সঙ্গে আরও লোক ছিল, তাহারা লাঠি হাতে আসিয়া জুটিল, রমজানের আত্মীয়স্বজনও আসিয়া জুটিল। এইরূপে উভয় পক্ষে একটা মস্ত হাঙ্গামা হইল। তাহার ফলে উভয় পক্ষের চার পাঁচ জন লোকের মাথায় জখম হইল। পরে থানায় এজাহার দেওয়া হইল, পুলিশ আসিল, উভয় পক্ষের ঘুষ খাইয়া রমজান ও তাহার ছেলে বছিরুদ্দিকে চালান দিল। এই মোকদ্দমা তিনমাস ঘুরিল, রমজান উকীল মোক্তার আমলা প্রভৃতিকে ২০০৲ টাকা আক্কেল সেলামী দিয়া তিন মাস জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিল। এই ব্যাপারে সে পাট বেচিয়া যে টাকা জমাইয়াছিল তাহা নিঃশেষ হইয়া আরও ১০০৲ টাকা মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত হইল।

অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ন কৃষক শ্রেণীর এই সকল দোষ সংশোধন করিবার জন্য চাই (১) বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তার (২) বাধ্যতামূলক অর্থসঞ্চয় এবং (৩) বাধ্যতামূলক বিবাদের নিষ্পত্তি। বাধ্যতামূলক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা ও স্কুল স্থাপন করা আবশ্যক। বাধ্যতামূলক সঞ্চয় শিক্ষার জন্য কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে। বাধ্যতামূলক বিবাদনিষ্পত্তির জন্য সালিসী পঞ্চায়েৎ স্থাপন করিতে হইবে। যে সকল কর্ম্মী-যুবক এখন পল্লীগ্রামের পুনর্গঠন (reconstruction) ও উন্নতিবিধানের সঙ্কল্প করিতেছেন, আমি এই কয়েকটি বিষয়ে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

যে সকল কৃষকের জমি আছে, তাহাদের অভাব-অনটনের জন্য বরং তাহারা নিজেরা দায়ী। যাহাদের অধিক জমি নাই, তাহারা যদি কায়িক শ্রম দ্বারা রোজগারের চেষ্টা করে তবে তাহাদের অভাব দূর হইতে পারে। শ্রমিকগণের মজুরির হার ক্রমেই বাড়িতেছে, সুতরাং তাহাদের জন্য ভাবনার বিশেষ কারণ নাই। কিন্তু মধ্যবিত্ত ভদ্রসন্তানগণের অন্নসমস্যাই ক্রমে অধিকতর কঠিন হইয়া পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করিয়া হাজার হাজার যুবক বেকার বসিয়া আছে। একজন গ্রাজুয়েট যদি এখন ৩০৲ টাকা মাহিনায় একটি চাকুরী পায় তবে সে নিজেকে সৌভাগ্যশালী মনে করে। একটা ৫০৲ টাকা মাহিনার চাকুরীর বিজ্ঞাপন দিলে তিন চারি শত দরখাস্ত আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহার মধ্যে সকলেই গ্রাজুয়েট্, অনেকে এম-এ পাশ, আবার দুই চারি জন এম-এ বি-এলও হইতে পারেন।

গবর্ণমেণ্টের গত পাঁচসনা শিক্ষাবিভাগের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, ১৯২৬-২৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৪,২৯০ জন বালক ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়াছিল, তাহার মধ্যে পাশ হইয়াছিল ৭,৫৩৭ জন। বাকী সাত হাজার ছেলের মধ্যে যাহারা আবার পড়ে নাই তাহারা অবশ্যই চাকুরীর উমেদার হইয়াছে। আবার যাহারা পাশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও অনেক

ছেলে আই-এ, আই-এসসি পড়িতে পায় নাই। ঐ সনে উক্ত দুই পরীক্ষা দিয়াছিল ৮,২৬২ জন, তাহার মধ্যে ৩,৮৩৩ জন পাশ করিয়াছিল। ঐ সনে ৪০৯৭ জন বি-এ ও বি-এস-সি দিয়াছিল, তাহার মধ্যে ১,৬৫১ জন পাশ করিয়াছিল, বাকীগুলি কতক আবার পড়িবার চেষ্টা করিয়াছিল, অবশিষ্টগুলি উমেদার হইয়াছে। এই এক বৎসরে যদি ১,৬৫১ জন গ্রাজুয়েট্ বাহির হইয়া থাকে, তবে পাচ বৎসরে প্রায় ৮ হাজার গ্রাজুয়েট্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়াছে। যাহারা আই-এ, আই-এস-সি, বি-এ, বি-এস-সি, পাশ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে অতি অল্প ছেলেই মেডিক্যাল কলেজ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাইতে পারিয়াছে। ঐ সনে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে মাত্র ২৯১ জন ছাত্র ছিল এবং ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে ছিল ৪৪৩ জন। কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছিল ৯৩৯ জন, বেলগাছিয়া কলেজে ছিল ৫৯৮ জন, ট্রপিক্যাল স্কুলে ছিল ৭৯ জন। এতদ্ভিন্ন ক্যাম্বেলে ও ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ছিল খুব সম্ভব ৩।৪ শত। সুতরাং যাহারা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বৎসর বৎসর বাহির হইতেছে, তাহাদের মধ্যে অতি অল্প লোকই চাকুরি পায়, কারণ চাকুরির সংখ্যা অত্যন্ত কম। অবশিষ্ট লোকেরা কি করিয়া খাইবে ?

আমরা তাহাদিগকে বলিতেছি, go back to the village—অর্থাৎ তোমরা আবার গ্রামে যাইয়া বাস কর ও চাষ করিয়া খাও। একজন ভদ্রসন্তান জমিচাষের দ্বারা কিরূপ উপার্জ্জন করিতে পারে তাহা আমি ইতিপূর্ব্বে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছি। ১০ বিঘা জমি চাষ করিলে ৪০০৲ টাকা মূল্যের ধান ও পাট হইতে পারে। কিন্তু যে নিজহস্তে জমি চাষ করিতে পারে, তাহার এই লাভ। যদি কৃষাণ দিয়া জমি চাষ করান হয় তবে শ্রমিকের মজুরি দিয়া ২০০৲ টাকা লাভ থাকিবে কিনা সন্দেহ। ফরিদপুরের সরকারী কৃষি আপিসে কয়েকটি ভদ্রসন্তানকে নিজ হাতে জমি চাষ করান শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, যদি তাহারা কৃতকার্য্য হয় তবে তাহাদিগের প্রত্যেককে গবর্ণমেণ্ট খাস মহাল হইতে চাষ করিবার জন্য ২০ বিঘা জমি দেওয়া হইবে এরূপ প্রলোভন দেওয়া হইয়াছে। স্যার পি, সি, রায় ফরিদপুরে যাইয়া তাহাদের কার্য্য-প্রণালী দেখিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। এরূপ শিক্ষাদান খুব আশাপ্রদ সন্দেহ নাই। কিন্তু হাজার হাজার বেকারের সমস্যা ইহা দ্বারা মীমাংসা হইবে না। তবে ভদ্রসন্তানগণ যদি ইহা দ্বারা নিজ হাতে কৃষিকার্য্য করিতে উৎসাহিত হন তবে পল্লীগ্রামে নিজ নিজ বাড়ীতে বসিয়া তাঁহারা জমি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারিবেন। শিক্ষিত যুবকগণ কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলে তাঁহারা নানা প্রকারে কৃষি কার্য্যের উন্নতিবিধান করিতে পারিবেন। তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবর্ত্তিত বৈজ্ঞানিক প্রণালী কৃষিকার্য্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন। ফরিদপুর জেলায় বৃষ্টির অভাবে জমি চাষ হইতে পারে না, অথবা বোনা ফসল রৌদ্রে শুকাইয়া যায়, অথচ সেই ক্ষেতের নিকটেই বিলে অথবা নদীতে গভীর জল আছে। বগুড়া জেলায় দেখিয়াছি, এইরূপ স্থলে কৃষকেরা তালগাছের ডোঙ্গার সাহায্যে ক্ষেত্রে জলসেচন করিয়া ফসল রক্ষা করে। কিন্তু ফরিদপুরের কৃষকেরা তাহা জানে না, বুঝাইয়া দিলেও আলস্যবশতঃ কেহ তাহা করে না, কেবল "হায় আল্লা" বলিয়া আকাশের দিকে মেঘের অপেক্ষায় তাকাইয়া থাকে। একজন শ্রমশীল শিক্ষিত যুবক হাতেকলমে জল সেচন করিয়া তাহাদিগকে ইহা শিক্ষা দিতে পারেন এবং নিজের ফসলও রক্ষা করিতে পারেন। মুর্শিদাবাদ জেলায় দেখিয়াছি, ক্ষেতের মধ্যে অথবা জঙ্গলে বিস্তর বুনো কুল গাছ আছে, কৃষকেরা সেই সকল গাছে গালা উৎপাদন করে, তাহাতে একটা অতিরিক্ত লাভ হয়। একজন শিক্ষিত যুবক নদীয়া অথবা ফরিদপুর জেলায় চাষ হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন এবং আমার বিশ্বাস মুর্শিদাবাদে যখন গালা-চাষ সম্ভব হইয়াছে তখন তাহার পার্শ্ববর্ত্তী নদীয়া জেলায়, এমন কি ফরিদপুর জেলায়ও তাহা সম্ভবপর হইবে। তাহা হইলে ধান ও পাট ভিন্ন আরও একটী নূতন ফসল জমিতে উৎপন্ন হইয়া আয় বৃদ্ধি করিবে। এইরূপ উদ্যমশীল সুশিক্ষিত যুবকগণের দ্বারা কৃষিকার্য্যের অনেক প্রকার উন্নতি হইতে পারে।

তারপরে কেবল ধান ও পাটচাষের উপর নির্ভর না

করিয়া এক বিঘা কি দুই বিঘা জমিতে বাগান করা যাইতে পারে। কলাগাছ লাগাইলে এক বৎসরেই তাহার ফল হয়, একটা কলাগাছে বৎসরে আট আনা আয় হয়। নারিকেল ও সুপারি গাছ খুব লাভজনক; একটা নারিকেল গাছে বৎসরে পাঁচ টাকা ও একটা সুপারি গাছে এক টাকা আয় হয়। এইরূপে দুই বিঘা জমিতে যদি একশত নারিকেল গাছ, ও দুইশত সুপারি গাছ লাগান যায়, তবে দশ বৎসর পরে, বছরে অন্ততঃ পাঁচশত টাকা লাভ হইবে।

এইরূপে ক্ষেতের ফসল ও বাগানের ফল ভিন্ন গ্রামে বসিয়া একজন শিক্ষিত যুবক আরও নানা রকমে আয় বৃদ্ধি করিতে পারেন। প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই ভাল স্কুল নাই। তিনি যদি একটা স্কুল করেন, তবে তাঁহার দ্বারা গ্রামে শিক্ষাবিস্তারে দেশের উপকার করা হইবে, সঙ্গে সঙ্গে নিজেও মাসে অন্ততঃ দশ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। ইহার সঙ্গে আবার তিনি যদি কবিরাজী অথবা হোমিওপ্যাথি পুস্তকাদি অধ্যয়ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা আরম্ভ করেন তাহা দ্বারাও নিজের আয় বৃদ্ধি ও দেশের উপকার করা হইবে।

এইরূপে একজন উদ্যমশীল ও শ্রমসহিষ্ণু যুবকের পল্লী-গ্রামে অনেক প্রকার অর্থোপার্জ্জনের পথ রহিয়াছে। তাঁহাকে কেবল চাকুরির মোহ ও সহরের মায়া ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ পল্লীগ্রামে বাস করিলে তাঁহারা পল্লীগ্রামের ও পল্লীবাসিগণের অশেষবিধ কল্যাণসাধন করিতে পারিবেন। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহার চেয়ে বড় কাজ আর নাই।

মায়ের প্রতি

শ্রীমতী স্নেহসুধা গুপ্ত

এই বিংশ শতাব্দীতে, সভ্যতার যুগে বাংলা দেশে মেয়েদের অবস্থা যে-রকমটি দাঁড়িয়েছে, এমন আর বোধ হয় কোনও দেশে হয়নি। দেশ অরাজক হলে অথবা সহস্ররাজক হ'লে মেয়েদের এরকম অবস্থা হওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু আমরা কি অরাজক রাজ্যে রয়েছি? দশটি ছেলে একত্র হয়ে একটি ক্লাব অথবা লাইব্রেরী করলে রাজার পক্ষ থেকে খোঁজ নেওয়া হয়, তারা কোনও মন্দ কাজ করছে কি না; কোনও যুবক অবিবাহিত থেকে নিজের উপার্জ্জনের টাকা যদি দেশসেবায় দেয়, তাহলে রাজার পক্ষ থেকে তার কৈফিয়ৎ চাওয়া হয়—যে তার উপার্জ্জনের টাকা জীবিতদের জন্য খরচ না করে সামান্য জড়পদার্থের জন্য খরচ করছে কেন? তবু আমাদের মেয়েরা রাত্রে নির্ভয়ে ঘুমতে পারে না কেন, দুষ্টদের এত স্পর্দ্ধা কেন হয়েছে যে, তারা সহরের বুক থেকে ভদ্রঘরের মেয়েদের ছিনিয়ে নিয়ে যায়?

নিজেদের দুর্দ্দশা ঘোচাবার ভার নিজেদের নিতে হবে। রাজার উপর রাগ করে বা অভিমান করে একাজের ভার নিলে চলবে না—নিজেদের প্রাণ নিয়ে টানাটানি, সেই প্রাণের টানে মেয়েদের দুর্দ্দশা ঘুচাবার কাজ ও দুষ্টকে দমন করবার কাজ নিতে হবে।

এ-বিষয়ে আমাদের খুব ভাল করে ভেবে-চিন্তে কাজ করা দরকার। উত্তেজনাপূর্ণ কথায় বা শুধু উত্তেজনায় মেতে হৈ চৈ করে,—সভা ক'রে এ-বিষয়ে যে খুব সফলতা লাভ করা যাবে তা নয়। বাঙালী আজকাল বোধ হয় খুব উত্তেজনাপ্রিয় হয়েছে। যে-বিষয়ে উত্তেজনা আছে তাতে মেতে শত শত যুবক হৈ চৈ করতে প্রস্তুত আছে, কিন্তু ক্ষীণদৃষ্টি, ভগ্নস্বাস্থ্য বৃদ্ধকে নেতা করে মুষ্টিমেয় মাত্র দেশের লোক উত্তেজনাহীন নারীরক্ষা-কার্য্যে ব্রতী হয়েছে। যে-সকল বৃদ্ধ নারীরক্ষার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন তাঁরা আমাদের পূজনীয় ও নমস্য; আর তাঁদের

সঙ্গে যাঁরা এই কাজে নেমেছেন তাঁরাও আমাদের শ্রদ্ধেয়, কিন্তু দেশের যুবকরা যদি মিলিতভাবে তাঁদের সাহায্য না করেন তবে তাঁরা আর কত করবেন? নারী-রক্ষা কার্য্যে শুধু যুবকেরা মিলে কাজ করলেও চলবে না, শুধু বৃদ্ধরা মিলে কাজ করলেও চলবে না, বৃদ্ধদের পরামর্শ নিয়ে যুবকরা যদি মিলিতভাবে কাজ করেন, তাহলে কাজ অগ্রসর হতে পারে। যে দেশের যুবকদের নারীরক্ষার ক্ষমতা নেই, ইচ্ছাও নেই, তাদের কাছে কাঁদুনি গাওয়া মেয়েদের পক্ষে অতিশয় ঘৃণা ও লজ্জার কথা।

প্রথমেই বলা হ'য়েছে, নিজেদের দুর্দ্দশা ঘোচাবার ভার নিজেদের নিতে হবে। নিজেদের নিতে হবে মানে, মেয়েদেরই নিজেদের রক্ষাকার্য্যে মন দিতে হবে। দেশের লোক এ কাজে মন দিতে ইচ্ছুক নয়, যে কয়জন বৃদ্ধের উৎসাহে একাজ চলছে তাঁরাও অমর নন; কাজেই মেয়েরাই যদি নিজেদের রক্ষাকার্য্যে মন না দেন, তাহলে তাঁদের দুর্দ্দশা বেড়েই চলবে। আর শুধু পরের উপর নির্ভর করলে কোন কাজই সুসম্পন্ন হয় না। অপরে আমায় রক্ষা করবে ভেবে যদি গা ঢেলে দিয়ে বসে থাকা যায় তাহলে কেউই রক্ষা পায় না, বঙ্গনারীরাও রক্ষা পাবেন না। বঙ্গনারী নিজের রক্ষার দিকে মন না দিলে শুধু আজ বঙ্গদেশের সমস্ত পুরুষের সমবেত চেষ্টাতেও তাঁদের দুর্দ্দশা ঘুচবে না, একথা ঠিক। আত্মরক্ষার জন্য মেয়েদের লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষা খুবই দরকারী, কিন্তু আমি এখানে মেয়েদের অস্ত্রব্যবহার-শিক্ষার আগে তাদের আত্মরক্ষার জন্য যে অন্য শিক্ষার দরকার তারই কথা বলব। প্রত্যেক মাকে এই শিক্ষার শিক্ষয়িত্রী হতে হবে। মেয়ের পক্ষে মায়ের মত উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রী ও রক্ষয়িত্রী আর কে হতে পারেন? দুষ্ট লোকে তো দুর্ব্বৃত্ততা করবেই। "উপদেশে কখনও কি সাধু হয় খল?" প্রত্যেক মা যদি মেয়েদের কতকগুলি বিষয়ে উপযুক্ত সময়ে সাবধান করে দেন, আর মেয়েদের রক্ষার বিষয়ে নিজেরাও যথেষ্ট সাবধান হন, তা'হলে মেয়েদের প্রতি অত্যাচার অনেকটা কমতে পারে। আমার যতদূর মনে হয়, মায়েদের অনভিজ্ঞতা ও অসাবধানতার জন্যই অনেক স্থলে মেয়েরা নিগৃহীত হচ্ছে। সংবাদপত্রে কয়েকটি নারীহরণের বৃত্তান্ত পড়ে মনে হয় অভিভাবকের অসতর্কতা ও উদাসীনতার জন্যই ঐ সর্ব্বনাশ ঘটেছে, আর মায়েদের কাছ থেকে কোনও রকম উপদেশ ও শিক্ষা পায়নি বলেই কোনও কোনও সরলমতি মেয়ে তাদের কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে তা না বুঝেই দুষ্টের ফাঁদে ধরা দিয়েছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ-আইন জারি হওয়ায় অতঃপর আগেকার চেয়ে বেশী বয়সের কুমারী মেয়ে বাড়ীতে বাড়ীতে থাকবে। সেইজন্যও মা এবং মাতৃস্থানীয়াদের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছি। এ তো বিশেষ কারও ঘরের কথা নয়, প্রত্যেকের ঘরেই মেয়ে আছে, প্রত্যেকেরই প্রাণ নিয়ে টানাটানি। যে-সব মেয়েরা সবে বড় হয়ে উঠছে তারাই বেশী নিগৃহীত হচ্ছে, তাদের সম্বন্ধে মেয়েদের নিম্নলিখিত বিষয়-গুলিতে বিশেষভাবে সাবধান হওয়া দরকার :—

(১) মেয়ে যে বড় হয়ে উঠছে সে বিষয়ে তাকে সচেতন করে দিতে হবে।

(২) মেয়েদের গতিবিধি সম্বন্ধে অতিশয় সতর্ক থাকতে হবে।

(৩) পুরুষের, বিশেষতঃ অনাত্মীয় পুরুষের সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হবে তা মেয়েকে বলে দিতে হবে, আর তাদের মেশামেশির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

(৪) পোষাক-পরিচ্ছদের শালীনতার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মেয়ের বার বছর পূর্ণ হলেই তাকে বলে দেওয়া দরকার তার চালচলন বদলাবার সময় এসেছে। অনেক পিতা মাতা মনে করেন যে, মেয়ে যতদিন ছোট আছে, থাক, এর পর সংসারের ঝঞ্ঝাট ঘাড়ে পড়লেই আপনিই বুঝবে যে, সে আর খুকীটি নেই। এ ভাবটি হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের দেশের মায়েরা নিজেদের বালিকা ও বধূজীবন স্মরণ করে মেয়েদের যে এরকম করুণার সঙ্গে বিচার করবেন, তার আর বিচিত্র কি? কিন্তু কোনও জিনিষেরই আতিশয্য ভাল নয়, স্নেহের আতিশয্যও ভাল নয়। মেয়ের বার বছর পুরলেই যে তাকে সমস্ত বালিকা-সুলভ আমোদ-আহ্লাদ ছেড়ে চুপ করে লক্ষ্মীর বাহনটির

মত বসে থাকতে হবে তা নয়, বরঞ্চ এতদিন যে শিশু ছিল সে আজ নূতন শোভা-সম্পদ নিয়ে লক্ষ্মীর মতই ঘরের শ্রী ও আনন্দ হয়ে উঠবে। তাকে শুধু বলে দিতে হবে যে, সে এতদিন যা ছিল তা আর নেই। এ বিষয়টি মা মেয়েকে কথা দিয়ে নয়, কাজ ও ব্যবহার দিয়ে পরোক্ষভাবে যেমন বোঝাতে পারেন এমন আর কেউ পারে না। মেয়েকে বড়দের কতকগুলি সুবিধা দিতে হবে, যেমন ছোট ভাই-বোনরা তাকে আগের মত মারতে বা হুকুম করতে পারবে না। কোনও পুরুষ-আত্মীয়, যেমন বড় ভাইরা, এমন কি বাবা পর্য্যন্ত, তার গায়ে আর হাত তুলতে পারবেন না, কারণে-অকারণে বকতে পারবেন না। বাড়ীর খুব হাল্কা ও অল্প দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তার উপর থাকবে। আবার অন্য পক্ষে সেও ভাইদের মত বালক-সুলভ খেলা ছাড়বে। চলবার ধরণ, কথা বলবার ধরণ, কাপড় পরবার ধরণ সবই অল্পাধিক বদলাবে। অথচ আমোদ-আহ্লাদ খেলাধূলা যে ছাড়বে তা নয়।

আর একটি বিষয়ে সব থেকে সাবধান হতে হবে, সেটা শুধু মেয়ে নয় ছেলে মেয়ে দুইয়ের পক্ষেই প্রযোজ্য। অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলে অথবা মেয়ে কেউই মা, বাবা অথবা অভিভাবকস্থানীয় কাউকে না বলে যাতে বাড়ী ছেড়ে না যায় সেই শিক্ষা শিশুকাল থেকেই দিতে হবে। প্রতিবেশীর বাড়ী যতই কাছে হউক আর তার সঙ্গে যতই আত্মীয়তা থাকুক, এমন কি রক্তের সম্পর্ক থাক্‌লেও সেখানে যেতে হ'লে বলে যেতে হবে। অনুমতি নেবার জন্যই যে সব সময়ে বলে যেতে হবে তা নয়, বাড়ী ছেড়ে যে যাচ্ছে সেই কথাটুকু শুধু জানিয়ে যাওয়া মাত্র।

অতি শিশুকাল থেকেই শিশুর বাড়ী থেকে বের হওয়ার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। ছেলের দিকে এবিষয়ে দৃষ্টি না রাখলে কি কুফল তা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয়। মেয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখলে তার যে বিষময় ফল কি, তা কি আর নতুন করে বলতে হবে? আমাদের দেশের মেয়েদের রাস্তায় বের হবার স্বাধীনতা নেই বটে, কিন্তু একদিকে এরা অতি স্বাধীন। একটি ঝি অথবা ছোট ভাই মাত্র সঙ্গে করে আমাদের মেয়েরা অনেক সময়ে গাড়ী করে আত্মীয়-বন্ধুদের বাড়ী যাতায়াত করে। এই রকম স্বাধীনতার চেয়ে রাস্তায় বের হবার স্বাধীনতা ঢের নিরাপদ। আমাদের মেয়েরা যদি আজ নির্ভয়ে রাস্তায় বের হবার শিক্ষা পেত, বাহির সম্বন্ধে তাদের অমূলক ভয় যদি না থাকতো, বাহিরে বের হ'লেই যদি লজ্জায় সঙ্কোচে তাদের চোখ নত, পা জড়ীভূত হয়ে না পড়তো, অবগুণ্ঠনে তাদের দৃষ্টি যদি বাধা না পেত, তবে তাদের দশা আজ এমন হত না।

ঝি চাকর অথবা ছোট ভাই সঙ্গে করে গাড়ী চ'ড়ে যাতায়াতও নিরাপদ নয়। একটু বড় হ'লেই মায়ের উচিত সব জায়গায় মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া। আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে বেড়াতে অথবা নিমন্ত্রণে যেতে হ'লে অথবা কোথাও বেড়াতে যেতে হ'লে সর্ব্বদা মা অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেই ভাল হয়। যেখানে মা, বড় বোন অথবা মাতৃস্থানীয়া কেউ যাবেন না সেখানে মেয়েকে না পাঠানই ভাল। অনেক সময়ে এরকম ক্ষেত্রে মা মেয়ের চোখে জল দেখে মেয়েকে একা পাঠাতে বাধ্য হন, কিন্তু মাকে এখানে শক্ত হতে হবে। বিলাতের মেয়েরাও যতদিন পর্য্যন্ত স্কুল থেকে বাহির না হয়, অথবা "টীন" পার না হয় ততদিন পর্য্যন্ত একলা কোনও পার্টি অথবা অল্প-পরিচিত কারুর বাড়ীতে যায় না; তাদের অবশ্য অন্য আমোদের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু বেচারী আমাদের মেয়েদের জীবন একেবারে বৈচিত্র্যহীন; আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীর উৎসবের আনন্দের ভাগ যখন তাদের হাতের কাছে আসে তখন তাদের সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত করা অতিশয় নিষ্ঠুরতা। কাজেই হয় তাদের জন্য নানা রকমের আমোদের ব্যবস্থা করা উচিত, নয়তো উপযুক্ত সঙ্গীর সঙ্গে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ীতে পাঠানো উচিত। শুধু পর্দ্দার বাইরে আসাই পরম এবং চরম স্বাধীনতা তো নয়ই, আর স্বাধীনতা শুধু দিলেই হয় না, কি ভাবে তার ব্যবহার করতে হবে সেটাও শেখাতে হবে। আগুনের ব্যবহার ঠিকমত না জানলে পুড়ে মরতে হয়, স্বাধীনতার ব্যবহারও না জানলে সে স্বাধীনতা অধীনতার চেয়েও মারাত্মক হ'য়ে উঠতে দেরী হয় না। যে-সব প্রতিবেশীর বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে

মায়ের অথবা বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের তেমন আলাপ-পরিচয় নেই অথবা বিশেষ যাতায়াত নেই সেই সব বাড়ীতে মেয়েকে কিছুতেই যেতে দেওয়া উচিত নয়। যদি মেয়ের সমবয়সী কোনও মেয়ে পাশের বাড়ীতে থাকে, মেয়ের সঙ্গে যদি তার বন্ধুত্ব থাকে, তবে অন্ততঃ মেয়ের দিক চেয়েও মায়ের সেই সব বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে নেওয়া উচিত। এ সমস্তই সবে বড় হয়ে উঠছে যে সব মেয়ে, তাদের বিষয়ে বলা হচ্ছে। মায়ের অজ্ঞাতে মেয়ে কোনও ছেলের সঙ্গে মিশছে তা জেনে কোনও মায়েরই উদাসীন থাকা উচিত নয়। ছেলেদের সঙ্গে কি ভাবে মিশতে হবে, তা মা মেয়েকে প্রতিদিনের দৈনন্দিন কাজের ভিতর দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন। আমাদের বাংলা দেশ এখনও পথেঘাটে ভদ্র-মেয়েদের দেখ্‌তে অভ্যস্ত হয়নি। কাজেই একটু বড় মেয়ে পথে বের হচ্ছে দেখলেই শত শত বিস্মিত চোখের দৃষ্টি তাকে আঘাত করতে থাকে। কাজেই মেয়েকে ভাল করে বোঝান উচিত যে, ওসব দিকে একেবারে মন না দেওয়াই হচ্ছে বুদ্ধিমতীর কাজ। যে-সব অভদ্র লোক মেয়েদের দেখে অভদ্রতা করে তাদের অভদ্রতা, দেখেও দেখা উচিত নয়। অভদ্রেরা যদি দেখে যে তাদের দিকে কেউ চেয়েও দেখছে না, তাহলে তারা আপনিই নিরস্ত হবে।

তারপর পোষাক-পরিচ্ছদের কথা। আমাদের দেশে ছোট মেয়েদের বিলাতী ফ্যাসানে হাঁটুর উপর ফ্রক পরানো হয়। অথচ বিলাতী রীতি অনুসারে মোজা দিয়ে পায়ের অনাবৃত অংশ ঢেকে দেওয়া হয় না; হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত যদি অনাবৃত থাকে তবে তা দেখতেও সুন্দর হয় না। আর তাতে কাপড় পরবারও সার্থকতা থাকে না। কলিকাতার বাহিরেই প্রায় এরকম অপরূপ পোষাক দেখা যায়। ইস্কুলে শিক্ষয়িত্রী যদি ওরকম পোষাকে আপত্তি প্রকাশ করেন তাতে কিছুই হয় না, কারণ বাড়ীতে মায়েরা উদাসীন। আমাদের শাড়ীই যদি হাতকাটা সেমিজের উপর কোমরে একটি পাড় বেঁধে পরিয়ে দেওয়া হয় তবে ঢের সুন্দরও দেখায়, আর গা-ও ঢাকা থাকে। অনেক সময়ে দেখা যায় রাস্তাঘাটে মেয়েরা আলগা গায়ে ছুটাছুটি করছে। আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, গায়ে কাপড় রাখা কষ্টকর সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু মেয়েদের শিশুকাল থেকেই গায়ে অন্ততঃ একটি জামা রাখা অভ্যাস করানো উচিত। শিশুকাল থেকে গা-ঢাকা অভ্যাস না করলে অনেক সময়ে বড় হয়ে তারা গা ঢেকে কাপড়-জামা পরতে চায় না, এমনও দেখা যায়। মেয়েকে লেখাপড়ার মত লজ্জাশীলতাও শিক্ষা দিতে হয়। সঙ্কুচিত ভাবকেই লজ্জাশীলতা বলা যায় না। নতুন মানুষ দেখলেই তিন হাত জিভ বের করে লাফ দিয়ে পালানো-রূপ লজ্জাশীলতা থেকে মেয়েকে সর্ব্বদা রক্ষা করা উচিত।

সহরের উপরেই ভদ্রগৃহস্থের মেয়েদের উপরও যেরকম অত্যাচার হচ্ছে তাতে অনেকে ভয় পেয়ে মেয়েদের রাস্তায় বের হওয়া বন্ধ করছেন, হেঁটে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করছেন। সেটা আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক এবং উচিত বলেই মনে হয়। কিন্তু তাতে কি মেয়েদের উপর অত্যাচার কমবে? মেয়েদের ঘরের মধ্যে রেখেও তো মা-বাবা তাদের দুষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে পারছেন না। অথচ মেয়েরা যেটুকু বাহিরের মুখ দেখতে পেত তাও বন্ধ করে তাদের আরও দুর্ব্বল ক'রে তোলা হচ্ছে।

রাস্তায় বের হলেই যে সবল হয় তা নয়, কিন্তু রাস্তায় বের হলে বাহির সম্বন্ধে মেয়েদের কাল্পনিক ভয় ভেঙে যায়। সাহস বাড়ে। আত্মরক্ষার পক্ষে সাহস শারীরিক বলের থেকে কোনও অংশে হীন নয়। অবশ্য এ বিষয়ে শুধু মায়েদের ব'লে কোনও লাভ নেই, মা বাবা উভয়েরই এদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। অন্যান্য স্বাধীন দেশের মত আমাদের মেয়েরাও যদি বাইরে বের হতে অভ্যস্ত হয় তবে তারাও লোকের চোখে খুব বেশী করে পড়বে না। আর তাতে সুবিধাও অনেক। সে-সব সুবিধার কথা আলোচনা করতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়। স্বাধীন দেশেও যে মেয়েদের উপর অত্যাচার হয় না তা নয়, কিন্তু সে-সব দেশে মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে যাওয়াই বেশী। আমাদের দেশের মত ঘরের মধ্যে থেকে তুলে নিয়ে যায় বলে তো শুনিনি। নিরীহ মেষশাবকও শত্রুর দিকে তেড়ে যায়! কিন্তু হায়! আমাদের মেয়েরা তার

থেকেও ভীরু ও অসহায়। আমাদের দেশে শক্তির দেবতাকে নারীরূপে পূজা করা হয়, আর শক্তির জীবন্ত স্বরূপগুলিকে কি করা হয়? তাদের কি আত্মরক্ষা করতে শিক্ষা দেওয়া হয়? না তাদের আত্মরক্ষায় পটু করা হয়; না তাদের রক্ষা করবার কোনও উপায় করা হয়। বিপদ আসলে তখন আদালতে যাওয়া আর নাকে কাঁদুনীই সার।

কবে আমাদের মেয়েরা মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, গুজরাট, কেরল ও তামিল দেশের হিন্দু মেয়েদের মত গা তুলে চোখ মেলে ঘোমটার আবরণ ত্যাগ করে বাইরে এসে দাঁড়াবে? কবে তারা আত্মরক্ষায় সমর্থ হবে?

দেশের কোনও কাজে স্বেচ্ছাসেবিকার দরকার হলে পাওয়া যায়, কিন্তু যেই অভিভাবক শোনেন দল বেঁধে বাইরেও বের হতে হবে অমনি তখন পিছিয়ে যান "যদি কোনও বিপদ হয়"—যেন বাইরে বের হতে না দিলেই বিপদকে ঠেকাতে পারবেন। আমাদের মেয়েরা যে বাইরে বের হন না তা নয়, কিন্তু তাঁরা যে-রকম ঘোমটা টেনে, ভীতচকিত দৃষ্টিতে জড়িত চরণে বের হন, সেরকম ভাবে বের হলে কিছুই হবে না, তাতে দুষ্টদের দমনে কিছুমাত্র সাহায্য হবে না। পরিচ্ছদে পূরামাত্রায় শালীনতা রক্ষা করে, সাহসের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে বের হতে পারলে তবেই বাইরে বের হওয়া সার্থক হবে। দেশের বর্ত্তমান সমস্যাগুলির মধ্যে অন্ততঃ একটির কিছু পরিমাণে সমাধান হবে। মাতাপিতা এই বিষয়গুলি ভেবে দেখবেন ও কন্যাদের এই সকল শিক্ষা দেবেন, এই তাঁদের কাছে প্রার্থনা।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকদিন ছেলে পড়াইবার পর অপু ভাবিল, এইবার সে কোনো মেসে আলাদাভাবে থাকিবে। অখিল বাবুর মেসে পরের বিছানায় শুইয়া থাকা তাহার পছন্দ হয় না। কখনো সে ও ভাবে থাকে নাই। কিন্তু কলেজ হইতে ফিরিবার পথে কয়েকটি মেসে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল পনেরো টাকা মাত্র আয়ে কোনো মেসে থাকা চলে না। তাহার ক্লাশের কয়েকটি ছেলে মিলিয়া একখানা ঘর ভাড়া করিয়া থাকিত, নিজেরাই রাঁধিয়া খাইত, অপুকে তাহারা লইতে রাজী হইল। কলেজের কাছে হয়, তাহা ছাড়া এখানে সকলেরই নিজের নিজের বিছানা পাতিবার জায়গা আছে, বিশেষ করিয়া আরও সেইজন্য অপু অখিল বাবুর মেস হইতে ইহাদের কাছে আসিল। খরচও কম, পনেরো টাকাতে কুলাইবার আশা বন্ধুরা দিয়াছেন।

যে তিনটি ছেলে একসঙ্গে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, তাহাদের সকলেরই বাড়ী মুর্শিদাবাদ জেলায়। ইহাদের মধ্যে সুরেশ্বরের আয় কিছু বেশী, এম-এ ক্লাশের ছাত্র, চল্লিশ টাকার টিউশনি আছে। জানকী কোথায় ছেলে পড়াইয়া টাকা কুড়ি পায়। নির্ম্মলের আয় আরও কম। সকলের আয় একত্র করিয়াও যে মাসে যাহা অকুলান হয়, সুরেশ্বর নিজেই তাহা দিয়া দেয়, কাহাকেও বলে না। অপু প্রথমে তাহা জানিত না, মাস দুই থাকিবার পরে তাহার সন্দেহ হইল প্রতি মাসেই সুরেশ্বর পঁচিশ ত্রিশ টাকার দোকানের দেনা শোধ করে, অথচ কাহারও নিকট চায় না কেন? সুরেশ্বরের কাছে একদিন কথাটা তুলিলে সে হাসিয়া উড়াইয়া দিল। সে বেশী এমন কিছু দেয় না, যদিই বা দেয়—তাতেই বা কি? তাহাদের যখন আয় বাড়িবে তখন তাহারাও অনায়াসে দিতে পারে, কেহ বাধা দিবে না তখন।

নির্ম্মল রবিঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে
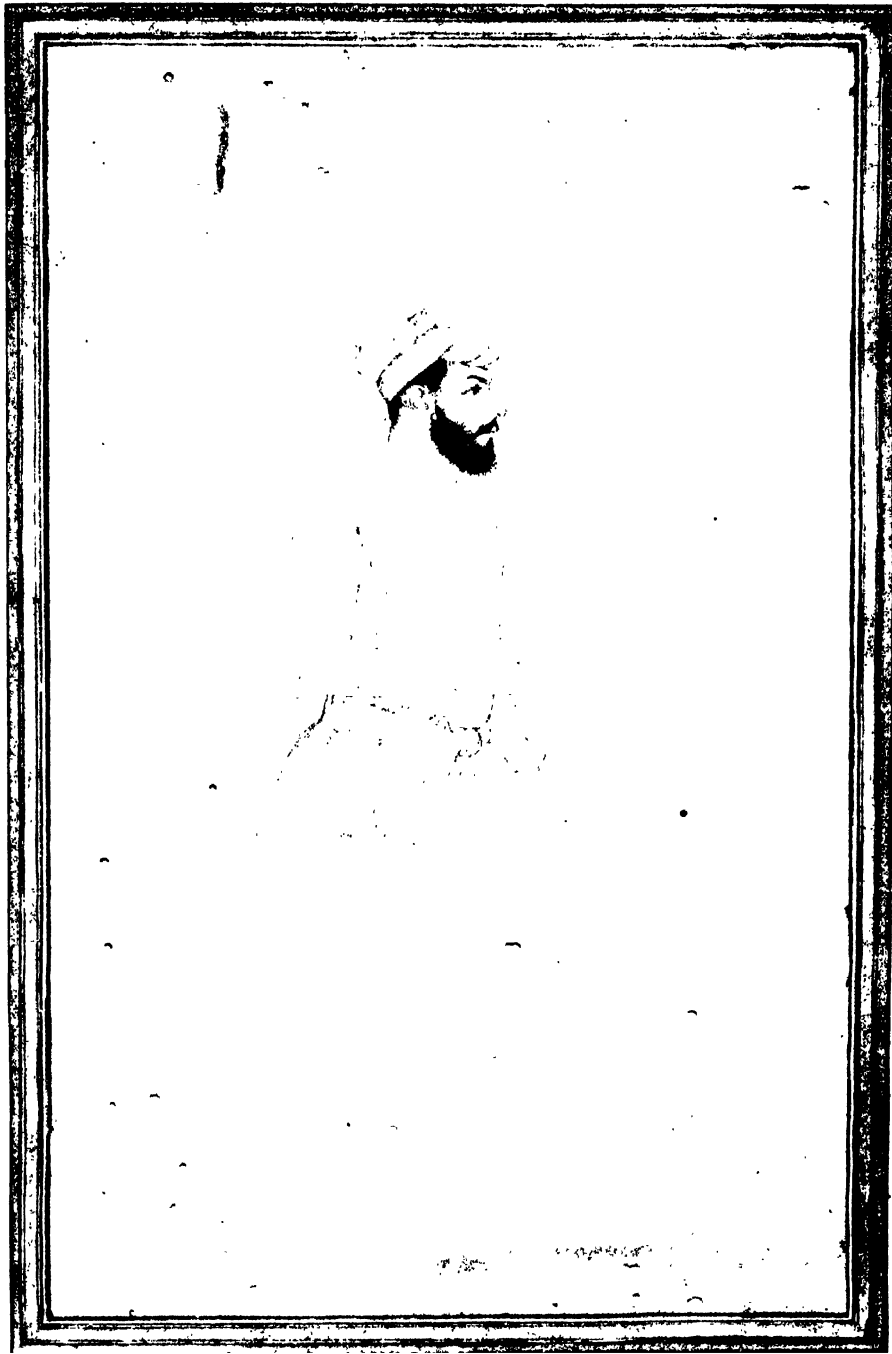
শাহজাদা মুহম্মদ শাহ্

চিত্রমন কর্ত্তৃক অঙ্কিত

প্রাচীন চিত্র

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা।

ঘরে ঢুকিল। তাহার গায়ে খুব শক্তি, সুগঠিত মাংসপেশী, চওড়া বুক। অপুর মতই বয়স। হাতের একটা কাগজের ঠোঙা দেখাইয়া বলিল—নতুন মটরসুঁটি—লঙ্কা দিয়ে ভেজে—

অপু হাত হইতে ঠোঙাটা কাড়িয়া লইয়া বলিল—দেখি? পরে হাসিমুখে বলিল—সুরেশ্বর-দা ষ্টোভ ধরিয়ে নিন্—আমি মুড়ি আনি—ক'পয়সার আন্‌বো? এক-দুই-তিন-চার—

—আমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে গুণো না ওরকম—

অপু হাসিয়া নির্ম্মলের দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া বলিল—তোমার দিকেই আঙ্গুল বেশী ক'রে দেখাবো—তিন-তিন-তিন—

নির্ম্মল তাহাকে ধরিতে যাইবার পূর্ব্বে সে হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সুরেশ্বর বলিল—একরাশ বই এনেচে কলেজের লাইব্রেরী থেকে—এতও পড়্‌তে পারে—মায় মম্‌সেনের রোমের হিষ্ট্রী এক ভলুম—

অপুর গলা মিষ্টি বলিয়া সন্ধ্যার পর সবাই গান গাওয়ার জন্য ধরে। কিন্তু পুরাতন লাজুকতা তাহার এখনও যায় নাই, অনেক সাধ্যসাধনার পর একটি বা দুটি গান গাহিয়া থাকে, আর কিছুতেই গাওয়ানো যায় না। কিন্তু রবিঠাকুরের কবিতার সে বড় ভক্ত, নির্ম্মলের চেয়েও। যখন কেহ ঘরে থাকে না, নির্জ্জনে হাত পা নাড়িয়া আবৃত্তি করে—

সন্ন্যাসী উপগুপ্ত
মথুরাপুরীর　　প্রাচীরের তলে
একদা ছিলেন সুপ্ত।

ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে অপুর সব চেয়ে ভাল লাগে। সবদিন তাঁহার ক্লাস থাকে না—কলেজের পড়ায় কোনো উৎসাহ থাকে না সেদিন। কালো রিবন্ ঝোলানো প্যাঁস-নে চশ্‌মা উজ্জ্বলচক্ষু মিঃ বসু ক্লাসরুমে ঢুকিলেই সে নড়িয়া চড়িয়া সংযত হইয়া বসে, বক্তৃতার প্রত্যেক কথা মন দিয়া শোনে। এম-এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট! অপুর ধারণায় মহাপণ্ডিত।—গিবন বা মম্‌সেন বা লর্ড ব্রাইস্ জাতীয়। মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস, ইজিপ্ট, ব্যাবিলন, আসিরিয়া, ভারতবর্ষীয় সভ্যতার উত্থান-পতনের কাহিনী তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে ছবির মত পড়িয়া আছে।

ইতিহাসের পরে লজিকের ঘণ্টা। হাজিরা ডাকিয়া অধ্যাপক পড়ানো সুরু করিবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলে কমিতে সুরু করিল। অপু এ ঘণ্টায় পিছনের বেঞ্চিতে বসিয়া লাইব্রেরী হইতে লওয়া ইতিহাস, উপন্যাস বা কবিতার বই পড়ে, অধ্যাপকের কথার দিকে এতটুকু মন দেয় না, শুনিতে ভাল লাগে না। সেদিন একমনে অন্য বই পড়িতেছে হঠাৎ অধ্যাপক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কি প্রশ্ন করিলেন। প্রশ্নটা সে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু ক্লাশ হঠাৎ নীরব হইয়া যাওয়াতে তাহার চমক ভাঙ্গিল চাহিয়া দেখিল সকলেরই চোখ তাহার দিকে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। অধ্যাপক বলিলেন—তোমার হাতে কি ওখানা লজিকের বই?

অপু বলিল—না স্যার প্যালগ্রেভের গোল্‌ডেন্ ট্রেজারি—

—তোমাকে যদি আমার ঘণ্টায় পার্সেণ্টেজ না দিই? পড়া শোনো না কেন?

অপু চুপ করিয়া রহিল। অধ্যাপক তাহাকে বসিতে বলিয়া পুনরায় অধ্যাপনা আরম্ভ করিলেন। জানকী চিম্‌টি কাটিয়া বলিল—হোল তো? রোজ রোজ বলি লজিকের ঘণ্টায় আমাদের সঙ্গে পালাতে—তা শোনা হয় না—আয় চলে—

দেড়শত ছেলের ক্লাশ। পিছনের বেঞ্চের সাম্‌নের দরজাটি ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া খুলিয়া রাখে পলাইবার সুবিধার জন্য। জানকী এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া সরিয়া পড়িল। তাহার পরে বিরাজ। অপুও মহাজনদের পথ ধরিল। নীচের লাইব্রেরীয়ান্ বলিল—কি রায় মশায়, আমাদের পার্ব্বণীটা কি পাব না?

অপু খুব খুসী হয়। কে তাহাকে চিনিত পাঁচ মাস আগে! এতবড় কলিকাতা সহর, এতবড় কলেজ, এত ছেলে। এখানেও তাহাকে রায় মশায় বলিয়া খাতির করিতেছে, তাহার কাছে পার্ব্বণী চাহিতেছে! হাসিয়া বলে—কাল এনে দেবো ঠিক সত্য বাবু, আজ ভুলে

গিইচি—আপনি এক ভলুম গিবন্ দেবেন কিন্তু আজ—

গিবন্ উৎসাহে পড়িয়া বাড়ী লইয়া যায় বটে কিন্তু ভাল লাগে না। এত খুঁটিনাটি বিরক্তিকর মনে হয়। পরদিন সেখানা ফেরৎ দিয়া অন্য ইতিহাস লইয়া গেল।

পূজার কিছু পূর্ব্বে অপুদের বাসা উঠিয়া গেল। খরচে আয়ে অনেকদিন হইতেই কুলাইতেছিল না, সুরেশ্বরের ভাল টুইশনিটি হঠাৎ হাতছাড়া হইল—কে বাড়্‌তি খরচ চালায়? নির্ম্মল ও জানকী অন্য কোথায় চলিয়া গেল, সুরেশ্বর গিয়া মেসে উঠিল। অপুর যে মাসিক আয়, কলেজের মাহিনা দিয়া তাহা হইতে মোট বারো টাকা বাঁচে—কলিকাতা সহরে বারো টাকায় যে কিছুতেই চলিতে পারে না, অপুর সে জ্ঞান এতদিনেও হয় নাই। সুতরাং সে ভাবিল বারো টাকাতেই চলিবে, খুব চলিবে। বারো টাকা কি কম টাকা!

কিন্তু বারো টাকা আয় বেশী দিন রহিল না, একদিন পড়াইতে গিয়া শুনিল ছেলের শরীর খারাপ বলিয়া ডাক্তারে হাওয়া বদলাইতে বলিয়াছে, পড়াশুনা এখন বন্ধ থাকিবে। এক মাসের মাহিনা তাহারা বাড়্‌তি দিয়া জবাব দিল।

টাকা কয়টি পকেটে করিয়া সেখান হইতে বাহির হইয়া অপু আকাশ পাতাল ভাবিতে ভাবিতে ফুট্‌পাথ বহিয়া চলিল। সুরেশ্বরের মেসে সে জিনিষপত্র রাখিয়া দিয়াছে, সেখানেই গেষ্ট্-চার্জ্জ দিয়া খায়, রাত্রে মেসের বারান্দাতে শুইয়া থাকে। টাকা যাহা আছে, মেসের দেনা মিটাতেই যাইবে। সামান্য কিছু হাতে থাকিতে পারে বটে কিন্তু তাহার পর?···

সুরেশ্বরের মেসে আসিয়া একখানি নিজের নামের পত্র ডাকবাক্সে দেখিল। হাতের লেখাটা সে চেনে না—খুলিয়া দেখিল চিঠিখানা মায়ের কিন্তু অপরের হাতের লেখা। হাতে ব্যথা হইয়া মা বড় কষ্ট পাইতেছে, অপু কি তিনটি টাকা পাঠাইয়া দিতে পারে? মা কখনো কিছু চায় না, মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করে, সে-ই বরং দেওয়ানপুরে থাকিতে নানা ছল-ছুতায় মাঝে মাঝে কতটাকা মায়ের কাছ হইতে লইয়াছে। হাতে না থাকিলেও তেলিবাড়ী হইতে চাহিয়া চিন্তিয়া মা যোগাড় করিয়া দিত। খুব কষ্ট না হইলে কখনো মা তাহাকে টাকার জন্য লেখে নাই।

পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া গুণিয়া দেখিল সাতাশটি টাকা আছে। মেসের দেনা সাড়ে পনেরো টাকা বাদে সাড়ে এগারো টাকা থাকে মাকে কত টাকা পাঠানো যায়? মনে মনে ভাবিল—তিনটে টাকা তো চেয়েচে, আমি দশটাকা পাঠিয়ে দিই, মনিঅর্ডার পিওন যখন টাকা নিয়ে যাবে, মা ভাব্‌বে বুঝি তিন টাকা কিংবা হয়তো দু' টাকার মনিঅর্ডার—জিগ্যেস্ করবে, কত টাকা? পিওন যেই বল্‌বে দশ টাকা, মা অবাক হয়ে যাবে। মাকে তাক্ লাগিয়ে দেবো—ভারী মজা হবে, বাড়ীতে গেলে মা শুধু সেই গল্পই কর্‌বে দিন রাত—

অপ্রত্যাশিত টাকা প্রাপ্তিতে মায়ের আনন্দোজ্জ্বল মুখ খানা কল্পনা করিয়া অপু ভারী খুসি হইল। বৌবাজার পোষ্টাপিস্ হইতে টাকাটা পাঠাইয়া দিয়া সে ভাবিল—বেশ হোল! আহা, মাকে কেউ কখনো দশ টাকার মণিঅর্ডার এক সঙ্গে পাঠায় নি—টাকা পেয়ে খুসি হবে। আমার তো এখন রৈল দেড় টাকা, তারপর একটা কিছু ঠিক হয়েই যাবে।

কলেজে একটি ছেলের সঙ্গে তাহার খুব বন্ধুত্ব হইয়াছে। সেও গরীব ছাত্র, ঢাকা জেলায় বাড়ী, নাম প্রণব মুখার্জ্জি। খুব লম্বা, গৌরবর্ণ, দোহারা চেহারা, বুদ্ধিপ্রোজ্জ্বল দৃষ্টি। কলেজ-লাইব্রেরীতে এক সঙ্গে বসিয়া বই পড়িতে পড়িতে দুজনে আলাপ। এমন সব বই দুজনে লইয়া যায়, যাহা সাধারণ ছাত্রেরা পড়ে না, নামও জানে না। ফার্ষ্ট-ইয়ারের ছেলেকে মম্‌সেন লইতে দেখিয়া প্রণব তাহার দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। আলাপ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে।

অপু শীঘ্রই বুঝিতে পারিল প্রণবের পড়াশুনা তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী। অনেক গ্রন্থকারের নামও সে কখনও শোনে নাই—নীট্‌শে, এমার্সন, টুর্গেনিভ, ব্রেষ্টেড প্রণবের কথায় সে ইহাদের বই পড়িতে আরম্ভ করিল। তাহারই উৎসাহে সে পুনরায় ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের সহিত গিবন সুরু করিল, ইলিয়াডের অনুবাদ পড়িল।

অপুর পড়াশুনার কোনো বাঁধাবাধি রীতি নাই। যখন যাহা ভাল লাগে, কখনো ইতিহাস, কখনো নাটক, কখনো কবিতা, কখনও প্রবন্ধ, কখনও বিজ্ঞান। প্রণব নিজে অত্যন্ত সংযমী ও শৃঙ্খলাপ্রিয়—সে বলিল—ওতে কিছু হবে না, ওরকম পড় কেন?

অপু চেষ্টা করিয়াও পড়াশুনায় শৃঙ্খলা আনিতে পারিল না।

লাইব্রেরী-ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উঁচু বড় বড় বইয়ে ভরা আল্‌মারির দৃশ্য তাহাকে দিশাহারা করিয়া দেয়। সকল বই-ই খুলিয়া দেখিতে সাধ যায়, Gases of the Atmospher সার উইলিয়ম্ র‍্যাম্‌জের? সে পড়িয়া দেখিবে কি কি গ্যাস। Extinct Animals—ই রে ল্যান্‌কাষ্টার, জানিবার তার ভয়ানক আগ্রহ! Worlds Around Us, প্রক্টর? উঃ, বইখানা না পড়িলে রাত্রে ঘুম হইবে না। প্রণব হাসিয়া বলে—দূর! ও কি পড়া? তোমার তো পড়া নয়, পড়া-পড়া খেলা—হোক্ খেলা, অধীর উৎসুক মনের পিপাসা অপু কিছুতেই দমন করিতে পারে না প্রণবের তিরস্কারেও নহে।

প্রণবের কাছেই সে সন্ধান পাইল শ্যামবাজারে এক বড়লোকের বাড়ী দরিদ্র ছাত্রদের খাইতে দেওয়া হয়। প্রণবের পরামর্শে সে ঠিকানা খুঁজিয়া সেখানে গেল। এ পর্য্যন্ত কখনও কিছু সে চায় নাই, কাহারও কাছে, চাহিতে পারে না। আত্মমর্য্যাদাবোধের জন্য নহে, লাজুকতা ও আনাড়ি-পণার জন্য। এতদিন সে সবের দরকারও হয় নাই কিন্তু আর যে চলে না।

খুব বড়লোকের বাড়ী। দারোয়ান বলিল—কি চাই?

অপু বলিল—এই এখানে গরীব ছেলেদের খেতে দ্যায়, তাই জানতে—কাকে বলবো জানো? দারোয়ান বলিল বাবু এখনও ঘুম হইতে উঠেন নাই, ওবেলা আসিও। অপু আশ্চর্য্য হইল—দশটা বাজে, এখনও ঘুম হইতে উঠেন নাই বাবু? জিজ্ঞাসা করিল, কখন আস্‌বো ওবেলা?

দারোয়ানের কথামত সে পুনরায় বৈকালে গেল। লালরংএর বাড়ীটা, সাম্‌নে অনেক বিলাতী ফুল গাছ ও গোলাপের টব। ফটকের কাছে একটা ছোট কোঁকড়া চুল শিশুর হাত ধরিয়া একজন মধ্যবয়সী লোক দাঁড়াইয়া আছে। দারোয়ান তাহাকে পাশের দিকে একটা ছোট ঘরে লইয়া গেল। ইলেক্‌ট্রিক পাখার তলায় একজন মোটাসোটা ভদ্রলোক বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মুখ তুলিয়া বলিলেন—কি আপনার?

অপু সাহস সঞ্চয় করিয়া বলিল—এখানে পুওর ষ্টুডেন্টদের খেতে দেওয়ার—

আপনি দরখাস্ত করেছিলেন?

কিসের দরখাস্ত অপু জানে না।

—জুন মাসে দরখস্তে কর্ত্তে হয়, আমাদের নাম্বর লিমিটেড্ কিনা, এখন আর খালি নেই। আবার আস্‌চে বছর—তা ছাড়া আমরা ভাব্‌চি ওঠা উঠিয়ে দোব, এষ্টেট রিসিভারদের হাতে যাচ্ছে, ও সব আর সুবিধে হবে না।

ফিরিবার সময় গেটের বাহিরে আসিয়া অপুর মনে বড় কষ্ট হইল। কখনও সে কাহারও নিকট কিছু চায় নাই, চাহিয়া বিমুখ হইবার দুঃখ কখনও ভোগ করে, নাই, চোখে তাহার প্রায় জল আসিল। কোঁকড়া চুল শিশুটি তখনও দাঁড়াইয়া আছে, কি সুন্দর দেখিতে।...

পকেটে আনা দুই পয়সা মাত্র অবশিষ্ট আছে—এই বিশাল কলিকাতা সহরে তাহাই শেষ অবলম্বন। কাহাকেই বা সে এখানে চেনে, কাহার কাছে যাইবে? অখিল বাবুর মেসে দুই মাস যে প্রথম আসিয়া খাইয়াছে, সেখানে যাইতে লজ্জা করে। সুরেশ্বরের নিজেরই চলে না, তাহার উপর সে কখনো জুলুম করিতে পারিবে না।

আরও কয়েক দিন কাটিয়া গেল। কোনদিন সুরেশ্বরের মেসে একবেলা খাইয়া, কোনোদিন বা জানকীর কাছে কাটাইয়া চলিতেছিল। একদিন সারাদিন না খাওয়ার পরে সে নিরুপায় হইয়া অখিল বাবুর মেসে সন্ধ্যার পরে গেল। অখিল বাবু অনেক দিন পরে তাহাকে পাইয়া খুব খুসি হইলেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর অনেকক্ষণ গল্পগুজব করিলেন। বলি বলি করিয়াও অপু নিজের দুর্দ্দশার কথা অখিল বাবুকে বলিতে পারিল না। তাহা হইলে হয়ত তিনি তাহাকে ছাড়িবেন না, সেখানে থাকিতে বাধ্য করিবেন। সে জুলুম করা হয় অনর্থক।

কিন্তু এদিকে আর চলে না। এক জায়গায় বই, এক জায়গায় বিছানা। কোথায় কখন রাত কাটাইবে কিছু ঠিক নাই—ইহাতে পড়াশুনা হয় না। পরীক্ষাও নিকটবর্ত্তী। না খাইয়াই বা কয় দিন চলে!

অখিল বাবুর মেস হইতে ফিরিবার পথে একটা খুব বড় বাড়ী। ফটকের কাছ মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। এই বাড়ীর লোকে যদি ইচ্ছা করে তবে এখনি তাহারা কলিকাতায় থাকার সকল ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারে। সাহস করিয়া যদি সে বলিতে পারে, তবে হয়তো এখনি হয়। একবার সে বলিয়া দেখিবে?

কোথাও কিছু সুবিধা না হইলে তাহাকে বাধ্য হইয়া পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া দেশে ফিরিতে হইবে। এই লাইব্রেরী এত বই, বন্ধুবান্ধব, কলেজ—সব ফেলিয়া হয়তো মনসাপোতায় গিয়া আবার পুরাতন জীবনের পুনরাবৃত্তি করিতে হইবে। পড়াশুনা তাহার কাছে একটা রোমান্স, একটা অজানা বিচিত্র জগৎ দিনে দিনে চোখের সামনে খুলিয়া যাওয়া, ইহাকেই সে চায়, ইহাই এতদিন চাহিয়া আসিয়াছে। কলেজ হইতে বাহির হইয়া চাক্‌রী, অর্থোপার্জ্জন এসব কথা সে কোনদিন ভাবে নাই, তাহার মাথার মধ্যে কোনোদিন এসব সাংসারিক কথা ঢোকে নাই—সে চায় এই অজানার রোমান্স্—এই বিচিত্র ভাবধারার সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ। প্রাচীনদিনের জগৎ, অধুনালুপ্ত অতিকায় প্রাণীদল, বিশাল শূন্যের দৃশ্য অদৃশ্য গ্রহনক্ষত্র রাজি, ফরাসী-বিদ্রোহ—নানা কথা। এই সব ছাড়িয়া শালগ্রাম হাতে মনসাপোতায় বাড়ী বাড়ী ঠাকুর পূজা ···!

অপুর মনে হইল এই রকমই বড় বাড়ী আছে লীলাদের কলিকাতারই কোন জায়গায়। অনেক দিন আগে লীলা তাহাকে বলিয়াছিল, কলিকাতায় তাহাদের বাড়ীতে থাকিয়া পড়িতে। সে ঠিকানা জানে না কোথায় লীলাদের বাড়ী, কেই বা এখানে তাহাকে বলিয়া দিবে, তাহা ছাড়া সে সব আজ ছয় সাত বছরের কথা হইয়া গেল, এতদিন কি আর লীলা তার কথা মনে রাখিয়াছে? কোন কালে ভুলিয়া গিয়াছে।

অপু ভাবিল—আর ঠিকানা জান্‌লেও কি আর আমি সেখানে যেতে পার্‌তাম, না গিয়ে কিছু বল্‌তে—সে আমার কাজ নয়—তার ওপর এই অবস্থায়! দূর্ তা কখনো হয়? তা ছাড়া লীলার বিয়ে-থাওয়া হয়ে এতদিন সে শ্বশুরবাড়ী গিয়েচে চলে সে সব কি আর আজকের কথা?

ক্লাসে জানকী একদিন একটা সুবিধার কথা বলিল। সে ঝামাপুকুরে কোন্ ঠাকুরবাড়ীতে রাত্রে খায়। সকালে কোথায় ছেলে পড়াইয়া একবেলা তাঁহাদের সেখানে খায়। সম্প্রতি সে বোনের বিবাহে বাড়ী যাইতেছে, ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অপু রাত্রে ঠাকুরবাড়ীতে তাহার বদলে খাইতে পারে। বাড়ী যাইবার পূর্ব্বে ঠাকুরবাড়ীর সেবাইতকে বলিয়া কহিয়া সে সব ব্যবস্থা করিয়া যাইবে এখন। অপু রাজি আছে? হাতে স্বর্গ পাওয়া নিতান্ত গল্প কথা নয় তাহা হইলে!

ঠাকুরবাড়ীর খাওয়া নিতান্ত মন্দ নয়, অপুর কাছে তাহা খুব ভাল লাগে। আলোচালের ভাত, টক্, কোনো কোনো দিন ভোগের পায়স পাওয়া যায়, তবে মাছ-মাংসের সম্পর্ক নাই, নিরামিষ।

কিন্তু এ তো আর দুবেলা নয়, শুধু রাত্রে। দিন-মানটাতে বড় কষ্ট হয়। দু পয়সার মুড়ি ও কলের জল। তবুও তো পেটটা ভরে! কলেজ হইতে বাহির হইয়া বৈকালে তাহার এত ক্ষুধা পায়, যে গা ঝিম্ ঝিম্ করে, পেটে যেন এক ঝাঁক বোল্‌তা হুল ফুটাইতেছে এমন মনে হয়। পয়সা জুটাইতে পারিলে অপু এ সময়টা পথের ধারের দোকান হইতে এক পয়সা ছোলাভাজা কিনিয়া খায়।

সবদিন পয়সা থাকে না, সেদিন সন্ধ্যার পরেই ঠাকুর-বাড়ী চলিয়া যায়, কিন্তু ঠাকুরের আরতি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে খাইতে দিবার নিয়ম নাই—তাও একবার নয়, দুবার দুটি ঠাকুরের আরতি। আরতির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই, সেবাইত ঠাকুরের মর্জ্জি ও সুবিধামত রাত আটটাতেও হয়, ন'টাতেও হয়, দশটাতেও হয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যার পরেই হয়।

কলেজে যাইতে সেদিন মুরারি বলিল—সি, সি, বি'র ক্লাসে কেউ যেও না—আমরা সব ষ্ট্রাইক্ করেচি। অপু

বিস্ময়ের সুরে বলিল, কেন কি করেচে সি-সি-বি? মুরারী হাসিয়া বলিল,—করে নি কিছু পড়া জিগ্যেস্ করবে বলেচে রোমের হিষ্ট্রীর। একপাতাও পড়িনি, না পারলে বকুনি দেবে কি রকম জানো তো?

গজেন বলিল—আমার তো আরও মুস্কিল! রোমের হিষ্ট্রীর বই-ই যে আমি কিনি নি! মন্মথ আগে সেণ্ট্ জেভিয়ারে পড়িত, সে বিলাতী নাচের ভঙ্গিতে হাত লম্বা করিয়া বার কয়েক পাক খাইয়া একটা ইংরাজি গানের চরণ বার দুই গাহিল।

অপু বলিল—কিন্তু পার্সেণ্টেজ্ যাবে যে?

প্রতুল বলিল—ভারী তো একদিনের পার্সেণ্টেজ! তা আমি ক্লাসে নাম প্রেজেণ্ট করেও পালিয়ে আসতে পারি—সে তো তুমি আর পারবে না?

অপু বলিল—খুব পারি। পারবো না কেন?

প্রতুল বলিল—সে তোমার কাজ নয়, সি-সি-বি'র চোখ ভারী ইয়ে—আমরা বলে তাই এক একদিন সর্বেফল দেখি, তা তুমি! পারো পালিয়ে আস্তে?

—এখখুনি। দ্যাখো সবাই দাঁড়িয়ে—পারি কি না পারি, কিন্তু যদি পারি খাওয়াতে হবে বলে দিলাম।—

অপু উৎসাহে সিঁড়ি ভাঙিয়া উপরে উঠিয়া গেল। গজেন বলিল—কেন ওকে আবার ওসব শেখাচ্ছিস্?

শেখাচ্ছি মানে? ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানে না—ভারী সাধু!

মুরারী বলিল—না না তোমরা জানো না, অপূর্ব্ব ভারী pure spirit সেদিন—

হাঁ হাঁ জানি, ও-রকম সুন্দর চেহারা থাকলে আমাদেরও কত সার্টিফিকেট আস্তো—বাবা, বঙ্কিমবাবু কি আর সাধে সুন্দর মুখের গুণ গেয়ে গেছেন?

—কি বাজে বক্‌চিস্ প্রতুল? দিন দিন ভারী ইতর হয়ে উঠ্‌ছিস্ কিন্তু—

প্রিন্সিপ্যালের গাড়ী কলেজের সাম্‌নে আসিয়া লাগাতে যে যেদিকে সুবিধা সরিয়া পড়িল।

মিঃ বসুর ক্লাসে নামটা প্রেজেণ্ট করিয়াই আজ অপু পালাইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। বাঁ দিকের দরজাটা একদম খোলা, প্রোফেসরের চোখ অন্যদিকে। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে প্রোফেসরের চোখ আবার তাহার দিকে পড়িল, কাজেই খানিকক্ষণ সে ভালমানুষের মত নিরীহমুখে বসিয়া থাকিতে বাধ্য হইল। এইবার একবার অন্য দিকে চোখ পড়িলেই হয়! হঠাৎ প্রফেসর তাহাকেই প্রশ্ন করিলেন,—Was Marius justified in his action?

সর্ব্বনাশ! মেরিয়াস কে! একদিনও সে যে রোমের ইতিহাসের লেক্‌চার শোনে নাই।

উত্তর না পাইয়া প্রোফেসার অন্য একটা প্রশ্ন করিলেন—What do you think of Sulla's—

অপু বিপন্নমুখে কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রাস্কেল্ মণিলালটা মুখে কাপড় গুঁজিয়া খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতেছে!

প্রোফেসার বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন।

—You, You there—you behind the pillar—

এবার মণিলালের পালা। সে থামের আড়ালে সরিয়া বসিবার বৃথা চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দেখা গেল সল্লা বা মেরিয়াসের সম্বন্ধে অপুর সহিত তাহার মতের কোন পার্থক্য নাই। সমানই নির্ব্বিকার। মনিলালের দুর্গতিতে অপু খুব খুসী হইয়া পাশের ছেলেকে আঙুলের খোঁচা দিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিল—Rightly served! ভারী হাসি হচ্ছিল—

—চুপ্ চুপ্ এখুনি আবার এদিকে চাইবে। সি-সি-বি কথা শুনলে—

—এবার আমি সোজা—

পিছন হইতে নৃপেন ব্যস্তস্বরে বলিল—এবার আমায় জিজ্ঞেস করবে—ডেট্‌টা ভাই দে না শীগ্‌গির বলে—শীগ্‌গির—

অপুর পাশের ছেলেটি বলিল—কে কাকে ডেট্ বলে দাদা—মেরিভেল পুলারের বইয়ের রং কেমন এখনও চাক্ষুষ দেখিনি—কেটে পড় না সোজা—

অপু খানিকক্ষণ হইতে প্রোফেসারের দৃষ্টির গতি একমনে লক্ষ্য করিতেছিল, সে বুঝিতে পারিল ও-কোণ

হইতে চোখ একবার এদিকে ফিরিলে পালানো অসম্ভব হইবে, কারণ এদিকে এখনও অনেক ছেলেকে প্রশ্ন করিতে বাকী। এই স্বর্ণ সুযোগ। বিলম্ব করিলে···।

দু একবার উস্‌খুস্ করিয়া, একবার এদিক ওদিক চাহিয়া অপু বেঞ্চি হইতে উঠিয়াই সাঁ করিয়া খোলা দরজা দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

পিছু পিছু হরিদাস—অল্প পরেই নৃপেন।···

তিন জনেই উপরের বারান্দাতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করিয়া তর্ তর্ করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া একেবারে একতালায় নামিয়া আসিল।

অপু পিছন ফিরিয়া সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া হাসিয়া বলিল—হি-হি-হি—উঃ—আর একটু হোলেই—

নৃপেন বলিল—আমাকে তো—মিনিট দুই দেরী—কাল হয়েচে কি বুঝ্‌লে ?···

অপু বলিল—যাক্ এখানে আর দাঁড়িয়ে খোসগল্প করার দরকার দেখ্‌ছিনে। এখুনি প্রিন্সিপ্যাল নেমে আস্‌বে গাড়ী লাগিয়েচে দরজায়—কমনরুমে বরং এস—

একটু পরে সকলে বাহির হইয়া পড়িল। আজ আর ক্লাস ছিল না। ইহাদের সেই প্রথম যৌবন, যে দৃপ্ত যৌবন যুগে যুগে বিপদকে, বাধাকে, দুঃখকষ্টকে, মৃত্যুকে পর্য্যন্ত তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে—শুধু বাঁচার আনন্দে ইহারা মাতাল—সারা পৃথিবীটা ইহাদের পায়ে-চলার পথ।

কে গ্রাহ্য করে বুড়ো সি-সি-বি ও তাহার রোমের ইতিহাসের যত বাজে প্রশ্ন ?

অপু কিন্তু কিছু নিরাশ হইল। ক্লাস হইতে পালাইতে পারিলে প্রতুলের দল খাওয়াইবে বলিয়াছিল। কিন্তু লাইব্রেরীয়ানের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল তাহারা অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে;···কোন্ সকালে দু পয়সার মুড়ি ও এক পয়সার ফুলুরি খাইয়া বাহির হইয়াছে—পেট যেন দাউ দাউ জ্বলিতেছিল, কিছু খাইতে পারিলে হইত! ক্লাসে এতক্ষণ বেশ ছিল, বুঝিতে পারে নাই, বাহিরে আসিয়া ক্ষুধার যন্ত্রণাই প্রবল হইয়া উঠিল। এদিকে পকেটে একটাও পয়সা নাই। সে ভাবিল—ওরা আচ্ছা তো? বল্লে খাওয়াবো তাই তো আমি পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিকে সরে পড়েচে কোন্ কালে!··· এখন কিছু খেলে তবুও রাত অবধি থাকা যেতো—আজ সোমবার, আটটার মধ্যেই আরতি হয়ে যাবে—উঃ খিদে যা পেয়েচে!···

এ ধরণের কষ্ট করিতে অপু কখনো অভ্যস্ত নয়। বাড়ীর এক ছেলে, চিরকাল বাপ-মায়ের আদরে কাটাইয়াছে। সহরে বড় লোকের বাড়ীতে অন্য কষ্ট থাকিলেও খাওয়ার কষ্টটা অন্ততঃ ছিল না। তা ছাড়া সেখানে মাথার উপর ছিল মা, সকল আপদবিপদে সর্ব্বজয়া ডানা মেলিয়া ছেলেকে আড়াল করিয়া রাখিতে প্রাণপণ করিত, কোনো কিছুর আঁচ লাগিতে দিত না। দেওয়ানপুরে স্কলারশিপের টাকায় বালকবুদ্ধিতে যথেষ্ট সৌখীনতা করিয়াছে—খাইয়াছে, খাওয়াইয়াছে, ভাল ভাল জামা কাপড় পরিয়াছে· তখন সে সব জিনিস সস্তাও ছিল।

কিন্তু শীঘ্রই অপু বুঝিল কলিকাতা দেওয়ানপুর নয়। এখানে কেহ কাহাকে পোছে না। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া গত কয়েক মাসের মধ্যে কাপড়ের দাম এত চড়িয়াছে, যে কাপড় আর কেনা যায় না। ভাল কাপড় তাহার মোটে আছে একখানা, একটা টুইল সার্ট সম্বল; ছেলেবেলা হইতেই ময়লা কাপড় পরিতে সে ভালবাসে না, দেওয়ানপুরে থাকিতে আবার সৌখীন চাল বাড়িয়া গিয়াছে দু'তিন দিন অন্তর সাবান দিয়া কাপড় কাচিয়া শুকাইলে, তবে তাহাই পরিয়া বাহিব হইতে হয়। সবদিন কাপড় ঠিক সময়ে শুকায় না, কাপড় কাচিবার পরিশ্রমে এক একদিন আবার ক্ষুধা এত বেশী পায়, যে, মাত্র দু' পয়সার খাবারে কিছুই হয় না—ক্লাসে লেক্‌চার শুনিতে বসিয়া মাথা যেন হঠাৎ সোলার মত হাল্‌কা বোধ হয়।

এদিকে থাকার কষ্টও খুব। সুরেশ্বর এম-এ পরীক্ষা দিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছে, তাহার মেসে আর থাকিবার সুবিধা নাই। যাইবার আগে সুরেশ্বর একটা ঔষধের কারখানার উপরের একটা ছোট ঘরে তাহার থাকিবার স্থান ঠিক করিয়া দিয়া গিয়াছে। ঐ কারখানায় সুরেশ্বরের জানাশোনা একজন লোক কাজ করে ও রাত্রে ওপরের

ঘরটাতে থাকে। ঠিক হইয়াছে যতদিন কিছু একটা সুবিধা না হইতেছে, ততদিন অপু ওই ঘরটাতে লোকটার সঙ্গে থাকিবে। ঘরটা একে ছোট, তাহার অর্দ্ধেকটা ভর্ত্তি ঔষধ বোঝাই প্যাক্-বাক্সে, রাশীকৃত জঞ্জাল বাক্সগুলার পিছনে জমানো, কেমন একটা গন্ধ। নেংটি ইঁদুরের উৎপাতে কাপড় চোপড় রাখিবার জো নাই, অপুর একমাত্র টুইল সার্টটার দু' জায়গায় কাটিয়া ফুটা করিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘরময় আরশুলার উৎপাৎ। ঘরের সে লোকটা যেমন নোংরা তেমনিই তামাকপ্রিয়, রাত্রে উঠিয়া অন্ততঃ তিনবার তামাক সাজিয়া খায়। তাহার কাসির শব্দে ঘুম হওয়া দায়। ঘরের কোণে তামাকের গুল রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া দেয়। অপু নিজে বার দুই পরিষ্কার করিয়াছিল। একটুক্‌রা রবারের ফিতার মতই ঘরটা স্থিতিস্থাপক—পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিতে এতটুকু দেরী হয় নাই। খাওয়া-পরা থাকিবার কষ্ট অপু কখনো করে নাই, বিশেষ করিয়া একা যুঝিতে হইতেছে বলিয়া কষ্ট আরও বেশী।

অন্যমনস্ক ভাবে যাইতে যাইতে সে কৃষ্ণদাস পালের মূর্ত্তির মোড়ে আসিল। যুদ্ধের নূতন খবর বাহির হইয়াছে বলিয়া কাগজওয়ালা হাঁকিতেছে। শেয়ালদার একটা ট্রাম হইতে লোকজন নামা-উঠা করিতেছে। একটি চোখে-চশমা তরুণ যুবকের দিকে একবার চাহিয়াই মনে হইল, চেনা চেনা মুখ। একটু পরে সেও অপুর দিকে চাহিতে দুজনে চোখোচোখি হইল। এবার অপু চিনিয়াছে—সুরেশ দা! নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীর পাশের সেই পোড়ো ভিটার মালিক নীলমণি জেঠা মশায়ের ছেলে সুরেশ!

সুরেশও চিনিয়াছিল। অপু তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া হাসিমুখে বলিল, সুরেশ দা যে!

যেবার দুর্গা মারা যায়, সে বৎসর শীতকালে ইহারা সেই যে কয়েক মাসের জন্য দেশে গিয়া ছিল, তাহার পর আর কখনো দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। সুরেশ আকৃতিতে যুবক হইয়া উঠিয়াছে। দীর্ঘ দেহ সবল, সুগঠিত হাত পা। বাল্যের সে চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

সুরেশ সহজসুরেই বলিল—আরে অপূর্ব্ব? এখানে কোথা থেকে?

সুরেশের খাঁটি সহুরে গলার সুরে ও উচ্চারণ ভঙ্গিতে অপু একটু ভয় খাইয়া গেল।

সুরেশ বলিল, তারপর এখানে কি চাক্‌রী-টাক্‌রী করা হচ্চে?

—না—আমি যে পড়ি ফার্ষ্ট-ইয়ারে, রিপনে—

—তাই নাকি? তা এখন যাওয়া হচ্চে কোথায়?

অপু সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া আগ্রহের সুরে বলিল, জেঠীমা কোথায়?

—এখানেই শ্যামবাজারে আমাদের বাড়ী কেনা হয়েচে সেখানে—

সুরেশের সহিত সাক্ষাতে অপু ভারী খুসি হইয়াছিল। তাহাদের বাড়ীর পাশের যে পোড়ো ভিটার বন-ঝোপের সহিত তাহার ও দিদি দুর্গার আবাল্য অতি-মধুর পরিচয়, সে ভিটারই লোক ইহারা। যদিও কখনও সেখানে ইহারা বাস করে নাই, সহরে সহরেই ঘোরে, তবুও তো সে ভিটারই লোক! তাহা ছাড়া দশ রাত্রির জ্ঞাতি, অতি আপনার জন।

অপু বলিল—অতসী-দি এখানে আছেন? সুনীল? সুনীল কি পড়ে?

এবার সেকেন্ ক্লাসে উঠেচে—আচ্ছা, যাই তা হলে আমার ট্রাম আস্‌চে—

সুরেশের সুরে কোনো আগ্রহ বা আন্তরিকতা ছিল না, সে এমন সহজে সুরে কথা বলিতেছিল যেন অপুর সঙ্গে তাহার দুবেলা দেখা হয়। অপু কিন্তু নিজের আগ্রহ লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে সুরেশের কথা-বার্ত্তার সে-দিকটা তাহার কাছে ধরা পড়িল না।

আপনি কি করেন সুরেশ দা?

—মেডিকেল কলেজ, এবার থার্ড ইয়ার—

—আপনাদের ওখানে একদিন যাবো সুরেশ দা—জেঠীমার সঙ্গে দেখা করে আস্‌বো—

সুরেশ ট্রামের পা-দানিতে পা দিয়া উঠিতে উঠিতে অনাসক্ত সুরে বলিল, বেশ বেশ, আচ্ছা আমি আসি—এখন—

এত দিন পরে সুরেশদার সহিত দেখা হওয়াতে অপুর মনে এমন বিস্ময় ও আনন্দ হইয়াছিল যে ট্রামটা ছাড়িয়া দিলে তাহার মনে পড়িল সুরেশদা'দের বাড়ীর ঠিকানাটা তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

সে চলন্ত ট্রামটার পাশে পাশে ছুটিয়া জিজ্ঞাসা করিল—আপনাদের বাড়ীর ঠিকানাটা—ও সুরেশ দা—ঠিকানাটা যে—

সুরেশ মুখ বাড়াইয়া বলিল—চব্বিশ এর দুই সি বিশ্বকোষ লেন—শ্যামবাজার—

সাম্‌নের রবিবারে সকালে স্নান করিয়া অপু শ্যামবাজারে সুরেশদের ওখানে যাইবার জন্য বাহির হইল। আগের দিন টুইল সার্টটা ও কাপড়খানা সাবান দিয়া কাচিয়া শুকাইয়া লইয়াছিল। জুতার শোচনীয় দুরবস্থাটা ঢাকিবার জন্য একটা পরিচিত মেসে এক সহপাঠীর নিকট হইতে জুতার কালি চাহিয়া নিজে বুরুশ করিয়া লইল। সেখানে অতসী-দি ইত্যাদি রহিয়াছে, দীনহীন বেশে কি যাওয়া চলে?

ঠিকানা খুঁজিয়া বাহির করিতে দেরী হইল না। ছোট খাটো দোতলা বাড়ী, আধুনিক ধরণে তৈয়ারী। ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে, বাহিরে বৈঠকখানা, পাশেই দোতলায় উঠিবার সিঁড়ি। সুরেশ বাড়ী ছিল না, ঝিয়ের কাছে সে পরিচয় দিতে পারিল না, বৈঠকখানায় তাহাকে লইয়া বসাইয়া ঝি চলিয়া গেল। ঘড়ি, ক্যালেণ্ডার একটা পুরানো রোল্-টপ ডেস্ক্, খানকতক চেয়ার। ভারী সুন্দর বাড়ী তো! এত আপনার জনের কলিকাতায় এরকম বাড়ী আছে, ইহাতে অপু মনে মনে একটু গর্ব্ব ও আনন্দ অনুভব করিল। টেবিলে একখানা সেদিনের অমৃতবাজার পড়িয়াছিল, উলটাইয়া পালটাইয়া যুদ্ধের খবর পড়িতে লাগিল। বসিয়া বসিয়া অনেক বেলায় সুরেশ আসিল।

তাহাকে দেখিয়া বলিল, এই যে অপূর্ব্ব কখন এলে! অপু হাসিমুখে দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—আসুন সুরেশ দা—আমি, আমি, অনেকক্ষণ ধরে—বেশ বাড়ীটা তো আপনাদের!—

—এটা আমার বড়মামা যিনি পাটনায় উকীল, তিনি কিনেচেন, তাঁরা তো কেউ থাকেন না, আমরাই থাকি। বসো, আমি আসি বাড়ীর মধ্যে থেকে---

অপু মনে মনে ভাবিল---এবার সুরেশ-দা বাড়ীর ভেতর গিয়ে বল্লেই জেঠীমা ডেকে পাঠাবে, এখানে খেতে বল্‌বে—

কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সুরেশ বাড়ীর ভিতর হইতে বাহির না। সে যখন পুনরায় আসিল, তখন বারোটা বাজিয়া গিয়াছে। চেয়ারে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িয়া নিশ্চিন্তসুরে বলিল, তারপর?... বলিয়াই খবরের কাগজখানা হাতে তুলিয়া চোখ বুলাইতে লাগিল। অপু দেখিল, সুরেশ পান চিবাইতেছে। খাওয়ার আগে এতবেলায় পান খাওয়া অভ্যাস, না-কি খাওয়া হইয়া গেল!...

দু' চারিটা প্রশ্নের জবাব দিতে ও খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে একটা বাজিল। সুরেশের চোখ ঘুমে বুজিয়া আসিতেছিল। সে হঠাৎ কাগজখানা টেবিলে রাখিয়া দিয়া চেয়ার হইতে উঠিয়া পড়িয়া বলিল, তুমি না হয় বসে কাগজ পড়, আমি একটুখানি শুয়ে নি। একটা ডাব খাবে?...

ডাব খাইবে কি রকম, এতবেলায়, এ অবস্থায়? অপু ভাল বুঝিতে না পারিয়া বলিল, ডাব? না থাক, এতবেলায় —ইয়ে—না।

সেই যে সুরেশ বাড়ী ঢুকিল একটা—দুইটা—আড়াইটা, আর দেখা নাই। ইহারা কত বেলায় খায়! রবিবার বলিয়া বুঝি এত দেরী? কিন্তু যখন তিনটা বাজিয়া গেল তখন অপুর মনে হইল কোথায় কিছু ভুল হইয়াছে নিশ্চয়। হয় সেই ভুল বুঝিয়াছে না হয় উহারা ভুল করিয়াছে। তাহার এত ক্ষুধা পাইয়াছিল যে, সে আর বসিতে পারিতেছে না।

উঠিবে কিনা ভাবিতেছে, এমন সময় সুরেশের ছোট ভাই সুনীল বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিল। অপু ডাকিবার পূর্ব্বেই সে সাইকেল লইয়া বাটীর বাহিরে কোথায় চলিয়া গেল।

সেই সুনীল যাহাকে সঙ্গে লইয়া নিমন্ত্রণে ছাঁদা বাঁধিবার দরুণ জেঠীমা তাহাকে ফলারে বামুনের

ছেলে বলিয়াছিলেন। ইহাদের যে এতদিন পরে আবার দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহা যেন অপু ভাবে নাই। সুনালকে দেখিয়া তাহার বিস্ময় ও আনন্দ দুই-ই হইল। এ যেন কেমন একটা—ঠিক বুঝানো যায় না—বেশ কিন্তু।

ইহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসিবার মূলে অপুর কোনো স্বার্থসিদ্ধি বা সুযোগ-সন্ধানের উদ্দেশ্য ছিল না বা ইহা যে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া আলাপ জমাইবার মত দেখাইতেছে—একবারও সে কথা তার মনে উদয় হয় নাই। এখানে তাহার আসিবার মূলে সেই বিস্ময়ের ভাব—যাহা তাহার জন্মগত। কে আবার জানিত খাস কলিকাতা সহরে এতদিন পরে নিশ্চিন্দিপুরের বাড়ীর পাশের পোড়ো ভিটাটার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে দেখা হইয়া যাইবে। এই ঘটনাটুকুই তাহাকে মুগ্ধ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। এ যেন জীবনের কোন্ অপরিচিত বাঁকে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অজানা কোন্ কুঞ্জবন—বাঁকের মোড়ে ইহাদের অস্তিত্ব যেন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিস্ময় মনের অতি উচ্চ ভাব—এবং উচ্চ বলিয়াই সহজলভ্য নয়। সত্যিকার বিস্ময়ের স্থান অনেক উপরে—বুদ্ধি যার খুব প্রশস্ত ও উদার, মন সব সময় সতর্ক, নূতন ছবি, নূতন ভাব গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রাখে—সেই প্রকৃত বিস্ময় রসকে ভোগ করিতে পারে। যাদের মনের যন্ত্র অলস, মিন্‌মিনে—পরিপূর্ণ, উদার বিস্ময়ের মত উচ্চ মনোভাব তার চির অপরিচিত থাকিয়া যায়।

বিস্ময়কে যাঁরা বলিয়াছেন Mother of Philosophy তাঁরা একটু কম বলেন। বিস্ময়ই আসল Philosophy, বাকীটা তার অর্থসঙ্গতি মাত্র।

তিনটার পরে সুরেশ বাহির হইয়া আসিল। সে হাই তুলিয়া বলিল—কাল রাত্রে ছিল নাইট-ডিউটি, চোখ মোটে বোজেনি—তাই একটু গড়িয়ে নিলাম—চল একটু পরে মাঠে ক্যালকাটা টিমের হকি খেলা আছে—দেখে আসা যাক্—

অপু মনে মনে সুরেশ-দাকে ঘুমের জন্য অপরাধী ঠাওর করিবার জন্য লজ্জিত হইল। সারারাত কাল বেচারী ঘুমায় নাই—তাহার ঘুম আসা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিকই তো।…

সে বলিল—আমি আর মাঠে যাবো না সুরেশ-দা, কাল এগজামিন আছে, পড়া তৈরী হয়নি মোটে—আমি যাই—ইয়ে—জেঠীমার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে হতো—

সুরেশ বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ—বেশ তো—এস না—

অপু সুরেশের সঙ্গে সঙ্কুচিত ভাবে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিল। সুরেশের মা ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলেন—সুরেশ গিয়া বলিল—এ সেই অপূর্ব্ব মা—নিশ্চিন্দিপুরের হরিকাকার ছেলে—তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে এসেচে—

অপূর্ব্ব পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল—সুরেশের কথার ভাবে তাহার মনে হইল সে যে এতক্ষণ আসিয়া বাহিরের ঘরে বসিয়া আছে, সে কথা সুরেশ-দা বাড়ীর মধ্যে আদৌ বলে নাই।

জেঠীমার মাথার চুল অনেক পাকিয়া গিয়াছে বলিয়া অপুর মনে হইল। অপুর প্রণামের উত্তরে তিনি বলিলেন এস—এস—থাক্, থাক্—কল্‌কাতায় কি কর?

অপু ইতিপূর্ব্বে কখনো জেঠীমার সম্মুখে কথা বলিতে পারিত না। গম্ভীর ও গর্ব্বিত (যেটুকু সে ধরিতে পারিত না) চালচলনের জন্য জেঠীমাকে সে ভয় করিত। আনাড়ি ও অগোছালো স্বরে বলিল, এই এখানে পড়ি, কলেজে পড়ি

জেঠাইমা যেন একটু বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, কলেজে পড়? ম্যাট্রিক পাশ দিয়েচ।—

—আর বছর ম্যাট্রিক পাশ দিইচি

—তোমার বাবা কোথায়?…তোমরা তো সেই কাশী চলে গিয়েছিলে?

—বাবা তো নেই—তিনি তো কাশীতেই…তারপরে অপু সংক্ষেপে বলিল সব কথা। এই সময়ে পাশের ঘর হইতে একটা বাইশ তেইশ বছরের তরুণী এঘরে ঢুকিতেই অপু বলিয়া উঠিল, অতসী-দি না?…

অতসী অনেক বড় হইয়াছে, তাহাকে চেনা যায় না। সে অপুকে চিনিতে পারিল, বলিল, অপূর্ব্ব কখন এলে? আর একটি মেয়ে ও-ঘর হইতে আসিয়া দোরের কাছে

দাঁড়াইল। পনেরো ষোল বৎসর বয়স হইবে বেশ স্থশ্রী, বড় বড় চোখ। কথা বলিতে বলিতে সে দিকে চোখ পড়াতে অপু দেখিল মেয়েটি তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। খানিকটা পরে অতসী বলিল—মণি, দেখে এসো তো দিদি কুর্শিকাঁটাগুলো ওঘরের বিছানায় ফেলে এসেচি কি না?...

মেয়েটি চলিয়া গেল এবং একটু পরেই আবার দুয়ারের কাছে সেই জায়গাটাতে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল—না বড়দি, দেখ্‌লাম না তো?···

জেঠীমা অল্প দুইচারিটা কথার পরই কোথায় উঠিয়া গেলেন। অতসী অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিল। অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। তারপর সেও চলিয়া গেল। অপু ভাবিতেছিল, এবার সে উঠিবে কিনা। কেহই ঘরে নাই এসময় ওঠাটা কি উচিত হইবে?···ক্ষুধা একেবারে উঠিয়া পড়িয়া গিয়াছে, এখন ক্ষুধা আর নাই, তবে গা ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে। যাওয়ার কথা কাহাকেও ডাকিয়া বলিয়া যাইবে?··

দোরের কাছে গিয়া সে দেখিল সেই মেয়েটি বারান্দা দিয়া ও-ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছে—আর কেহ কোথাও নাই, তাহাকেই না বলিলে চলে না। উদ্দেশে ডাকিয়া বলিল—এই গিয়ে—ইয়ে—আমি যাচ্ছি আমার আবার কাজ—

মেয়েটি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল—চলে যাবেন?··· দাঁড়ান দিদিমাকে ডাকি—চা খেয়েচেন?

অপু বলিল—চা—তা—ইয়ে—থাক্ বরং অন্য একদিন—

মেয়েটী বলিল—বস্থন, বস্থন—দাঁড়ান চা আনি—পিসিমাকে ডাকি দাঁড়ান—কিন্তু খানিকটা পরে মেয়েটিই এক পেয়ালা চা ও একটা প্লেটে কিছু হালুয়া আনিয়া তাহার সাম্‌নে বসিল। অপু ক্ষুধার মুখে হালুয়াটুকু গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা খাইতে গিয়া প্রথম চুমুকে মুখ পুড়াইয়া ফেলিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া খাইতে লাগিল।

মেয়েটি বলিল—আপনি বুঝি ওদের খুড়্‌তুতো ভাই? থাক্ প্লেটটা এখানেই—আর একটু হালুয়া আন্‌বো?

—হালুয়া?···নাঃ—ইয়ে তেমন খিদে নেই—হ্যাঁ, স্থরেশ-দার বাবা আমার জেঠামশাই হতেন, জ্ঞাতি সম্পর্ক—

এই সময় অতসী ঘরে ঢোকাতে মেয়েটি চায়ের বাটি ও প্লেট্ লইয়া চলিয়া গেল।

জেঠীমা আসিলেন না। অপু অতসীর কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল।

সন্ধ্যার পরে ঠাকুরবাড়ীতে খাইয়া খানিক রাত্রে সে নিজের থাকিবার স্থানে ফিরিয়া দেখিল আরও একজন লোক সেখানে রাত্রের জন্য আশ্রয় লইয়াছে। মাঝে মাঝে এরকম আসে, কারখানার লোকের দু'একজন আত্মীয় স্বজন মাঝে মাঝে আসে ও দু'চার দিন থাকিয়া যায়। একে ছোট ঘর, থাকিবার কষ্ট, তাহাতে লোক বাড়িলে এইটুকু ঘরের মধ্যে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। লোকটার পরণের কাপড় এমন ময়লা যে ঘরের বাতাসে একটা অপ্রীতিকর গন্ধ। অপু সব সহ্য করিতে পারে, এক ঘরে এ-ধরণের নোংরা-স্বভাবের লোকের ভিড়ের মধ্যে শুইতে পারে না···জীবনে কখনও সে তাহা করে নাই··· ইহা তাহার অসহ্য। কোথায় রাত্রে আসিয়া নির্জ্জনে একটু পড়া-শুনা করিবে, না ইহাদের বক্‌বকের চোটে সে ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নতুন লোকটি বড়বাজারের আলু পোস্তায় আলুর চালান লইয়া আসে, হুগলী জেলার কোন জায়গা হইতে, অপু জানে, আরও একবার আসিয়াছিল। লোকটি বলিল··· কোথায় যান ও মশায়? আবার বেরোন না কি?

অপু বলিল, না এই খানটাতে দাঁড়িয়ে বেজায় গরম আজ···

একটু পরে লোকটা বলিয়া উঠিল—হাঁ, হাঁ, হাঁ, বিছানাটা কি মশায়ের? আস্থন, আস্থন, সরিয়ে ন্যান্ একটু-এঃ—হুঁকোর জলটা গেল গড়িয়ে পড়ে—দুত্তোর্—না—

অপু বিছানা সরাইয়া পুনরায় বাহিরে আসিল। সে কি বলিবে? এখানে তাহার কি জোর খাটে? উহারাই উপরোধে পড়িয়া দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছে এখানে। মুখে কিছু না বলিলেও অপু অন্য দিন হয় তো মনে মনে বিরক্ত হইত, কিন্তু আজ সে সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ছিল।

বাহিরের বারান্দায় জীর্ণ কাঠের রেলিং ধরিয়া অন্ধকারের দিকে চাহিয়া ভাবিতেছিল—সুরেশদা-দের কেমন চমৎকার বাড়ী কলিকাতায়! ইলেকট্রিক্ পাখা, আলো, ঘরগুলি কেমন পরিপাটী সাজানো, মেয়েটির কেমন সুন্দর কাপড় পরণে। চারিটা না বাজিতে চা, জলখাবার, চারি দিকে যেন লক্ষ্মীশ্রী, কিছুই অভাব নাই।

তাহাদেরই যে কি হইয়াছে, কোথায় মা আছে একাটি পড়িয়া, সে কলিকাতা সহরে এই রকম ছন্নছাড়া অবস্থার পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, পেট পুরিয়া আহার জোটে না, পরণে নাই কাপড়!...

ক্রমশঃ

উড়িষ্যার মণ্ডন-শিল্প

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ

জীব-শিশুমাত্রেই কতকগুলি স্বাভাবিক ও সহজাত সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। এই সকল সংস্কার কোথা হইতে আসে তাহা নির্ণয় করিবার ভার বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের উপর আছে। যদিও আমরা এই রহস্য ভেদ করিতে পারি না, তথাপি ইহাকে একটি প্রাকৃতিক সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর যেমন জীবনের পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই সঙ্গে তাহার সংস্কার বহির্জগতের শিক্ষার প্রভাবে প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। এই অন্তর্জগত ও বহির্জগতের ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে যে সকল সুপ্ত সংস্কার প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে আমরা তাহাকেই স্বভাব বলি।

মানুষ মণ্ডণপ্রিয় জীব। কেন যে মানুষ কেবলমাত্র আপনার জীবনযাত্রার উপযোগী বস্তু সৃষ্টি করিয়াই ক্ষান্ত হয় না এবং কেন যে সে সেই সকল বস্তুকে উজ্জ্বল, সুন্দর, ও বিবিধ কারুকার্য্যে মণ্ডিত করে তাহার কারণ দার্শনিকের গবেষণার বিষয় হইলেও বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্যবিষয় নয়। এই প্রশ্নের উত্তরে এইটুকুমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইহা একটি সংস্কার। এই সার্ব্বজনীন সংস্কার এতই গভীর ও বদ্ধমূল, ইহার প্রেরণা এতই অদম্য ও বলবতী যে, কেহই ইহা অতিক্রম করিতে পারে না। যাঁহারা ভগবৎবিশ্বাসী এবং ঈশ্বরকে স্রষ্টা বলিয়া ভক্তি করেন, তাঁহারা অবশ্য বলিবেন যে এই সংস্কার—সৌন্দর্য্যলিপ্সা ও সৌন্দর্য্য সৃষ্টি ও অনুভূতির জন্য এই গভীর আকাঙ্ক্ষা—এ সকলই যিনি উপনিষদে "সত্যং শিবং সুন্দরং" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন তাঁহারই দান।

এই সৌন্দর্য্যলিপ্সা যে আদিম মানবকে বর্ব্বরতার অন্ধকার হইতে সভ্যতার শুভ্র আলোকে লইয়া আসিয়াছে, তাহা অতি সহজেই অনুমেয় এবং প্রমাণপ্রয়োগদ্বারা বুঝান যাইতে পারে। মানুষ যে আপনার সৃষ্ট রূপরসাদির মধ্যে আপনার সত্তাকে স্পর্শ করে তাহা চিত্রকরের একাগ্রতা, গায়কের তন্ময়তা এবং শিল্পীর ভাবুকতা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

আদিম মানব কোনও জিনিষকে আপনার ব্যবহারোপযোগী করিয়াই নিরস্ত হয় নাই। সে এই অদম্য মণ্ডণপ্রিয়তার বশবর্ত্তী হইয়া স্বহস্তনির্ম্মিত সামান্য প্রস্তরফলক, অস্থি, ছুরিকা বা পরিধেয় বস্ত্রকেও তৎক্ষণাৎ চাকচিক্য ও কারুকার্য্যদ্বারা সুশোভিত ও নয়নাভিরাম করিয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিয়াছে।

শিল্পমাত্রেই কল্পনাপ্রসূত। সৌন্দর্য্য অনুভূতির সহিত কল্পনার গভীরতার সম্বন্ধ আছে। শিল্পী যে সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়া থাকে, প্রধানতঃ সেই সৃষ্ট বস্তুকে শিল্পীর কল্পনা কতটা সুন্দর ও মনোহর করিয়াছে, সৌন্দর্য্যবিচারের তাহাই মাপকাঠি। "সকল শিল্পই মূলত মণ্ডণশিল্প," এই উক্তি অত্যন্ত সত্য। কোনও

বস্তুকে তাহার আকৃতি, গঠনভঙ্গী, বর্ণ ও রেখাসম্পাত-দ্বারা যদি একটী বিশিষ্ট রূপ দিতে পারা যায়, তবে তাহাই শিল্পের প্রাণ ও মোটামুটি ভাবে আমরা তাহাকেই সৌন্দর্য্য বলি। আমরা হয়ত মনে করিতে পারি যে, সামান্য একটু রং বা রেখার এমন কি মূল্য আছে? কিন্তু এই ধারণা ভ্রান্ত। বস্তুত কোনও বৃহৎ ও বিরাট পরিকল্পনা যে মহান্ সৌন্দর্য্যকে প্রস্ফুটিত করে, তাহাও কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, ও আমাদের চক্ষে অতি সামান্য, রং ও রেখার সমবায়ে গঠিত নয়? সৌন্দর্য্যস্রষ্টা আপনার কল্পনাকে মূর্ত্ত করিবার জন্য যে অতি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চিত্রালঙ্কার প্রয়োগ করেন, সেই প্রয়োগের সমষ্টি কি একটি বিশিষ্ট কলা হইতে পারে না? স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শিল্পের, এমন কি চিত্রকলার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ যদি সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে ইহাও প্রমাণ করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ঐ সকল শিল্পের মূলে মণ্ডণশিল্প আছে।

অতি আদিমযুগের মানবের মনোবৃত্তির সহিত মানবশিশুর মনোবৃত্তির এক অতি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা উভয়েই অত্যন্ত অনুকরণপ্রয়াসী। আদিমমানব প্রকৃতির অনুকরণে একান্ত তৎপর। নৈসর্গিক জগতে যে অসীম রূপলোক আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়া আছে, তাহার প্রভাব সকলেরই উপর কিছু না কিছু কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু কৃত্রিম শিক্ষার অভাবে আদিমমানব সেই প্রভাবে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িত এবং যখনই সে আপনার আনন্দবর্দ্ধনের জন্য সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিবার প্রয়াস পাইত, তাহার প্রত্যেক খুঁটিনাটিতে সেই রূপলোকের ধার করা ছবির ছাপ ফুটিয়া উঠিত। এক কথায়, তাহার শিল্প প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপর নির্ভর করিত। আদিমমানব ফুলে ফলে, লতায় পাতায় ও পশুপক্ষীর মধ্যে যে সকল রেখা ও রংএর ভঙ্গী দেখিয়া মুগ্ধ হইত, আপনার কুটীরে, বস্ত্রে, এমন কি আপনার অঙ্গরাগে ও প্রসাধনে সেই সকল রেখার টান ও বর্ণসম্পাত সুকৌশলে অঙ্কিত করিত। এপর্য্যন্ত জীবজন্তুর চিত্রে সজীবতায় ও স্বাভাবিকতায় কেহই প্রস্তরযুগের (Palaeolithic) শিল্পীদের সমকক্ষ হইতে পারে নাই।

প্রাচীন মানবের শিল্পপ্রতিভা ও সৌন্দর্য্য-সংস্কারের প্রেরণা যে প্রাকৃতিক জগতের নিকট হইতে আসিয়াছিল তাহা প্রস্তরযুগের মানবনির্ম্মিত নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষগুলি একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। কালক্রমে যখন মানব নবপ্রস্তর (Neolithic) যুগে আসিয়া পৌছিল, যখন সে উদ্ভিদজগতের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলামেশা করিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার অন্তর সেই সকল বৃক্ষবল্লরীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইল। সেই সৌন্দর্য্য তাহার চিত্তকে অস্থির ও ব্যাকুল করিয়া তুলিল। কোন এক গভীর রহস্যময় নৈসর্গিক নিয়মে চালিত হইয়া, মানব ধীরে ধীরে শিল্পে অনুকরণের স্তর হইতে, নব নব সৌন্দর্য্যসৃষ্টির স্তরে উত্থিত হইল। তখন সে আর যাহাই দেখিতে ঠিক তাহাই আঁকিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারিত না। সেই সকল সৌন্দর্য্যকে আত্মসত্তার মধ্যে, আপনার রসানুভূতি ও সৌন্দর্য্যবোধের দ্বারা পরিবর্ত্তিত ও পরিকল্পিত করিয়া কৃত্রিম অভূতপূর্ব্ব শিল্পজগতের সৃষ্টি করিল। সেই শিল্প-সৌন্দর্য্য স্রষ্টার কল্পনার যন্ত্রে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই সময় তাহার শিল্পপ্রতিভা অতি সুন্দর সুন্দর জ্যামিতিক ও মনোকল্পিত চিত্রগুলি উদ্ভাবন করিল; এবং সেই সকল চিত্র প্রকৃতিজাত হইয়া মানবের খেয়ালের চক্রে ঘূর্ণিত হইয়া অপ্রাকৃত ও অদ্ভুত সৌন্দর্য্যসৃষ্টি করিল। তাহার শিল্পের প্রেরণা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগৎ হইতে আসিল বটে, কিন্তু উর্ণনাভ যেমন তাহার দেহাভ্যন্তরস্থ রস হইতে প্রকৃতির প্রেরণায় বিচিত্র উর্ণাজাল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, মানবও সেইরূপ প্রাকৃতিক জগতের রূপ সৌন্দর্য্য আপনার অন্তরের রসবোধের দ্বারা মণ্ডিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া বাস্তব জগত হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এক অভিনব রূপজগৎ সৃষ্টি করিয়া বসিল। সঙ্গীত-বিজ্ঞানে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখন দুইটি বিভিন্ন সুর মিশ্রিত হয়, তখন সেই সংমিশ্রণের ফলে আর একটি তৃতীয় সুর উৎপন্ন হয় না কিন্তু সেই দুইটি সুর আপনাদের স্বাতন্ত্র্য না হারাইয়া সম্মিলিত ভাবে এক অভিনব শ্রুতিমধুর সুর (harmony) উৎপন্ন করে। চিত্রশিল্পেও

ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুইটি বিভিন্ন বর্ণ সংমিশ্রিত হইয়া এক সম্পূর্ণ নূতন বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ঠিক এই ভাবেই নব নব রেখাভঙ্গী বৃদ্ধি করিয়াছে। এইরূপে পাষাণে মানবমূর্ত্তি পরিকল্পনা ও বিরাট সৌধাদি নির্ম্মাণ করিবার বহুপূর্ব্বেই মানব মণ্ডন-শিল্পের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মণ্ডন-শিল্প

চিত্র ১। মকর, বৈতাল দেউল,
ভুবনেশ্বর, খৃঃ অষ্টম শতাব্দী

চিত্র ২। কীর্ত্তিমুখ, মুক্তেশ্বর মন্দির,
ভুবনেশ্বর, খৃঃ দশম শতাব্দী

চিত্র ৩। সিংহবিড়াল, লিঙ্গরাজ মন্দির,
ভুবনেশ্বর, খৃঃ ১০০০ ।

চিত্র ৪। গজসিংহ, সূর্য্য দেউল, কোণারক,
খৃঃ ত্রয়োদশ শতাব্দী।

চিত্র ৫। ত্রিকোণাকৃতি অলঙ্কার, বৈতাল দেউল।
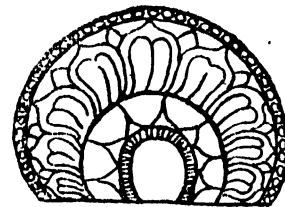
চিত্র ৬। পদ্মপুষ্প, বৈতাল দেউল।

মানবের কল্পনার মুখে সৃষ্ট হইয়াছে। এইরূপে শিল্পী এক হইতে বহুত্বে এবং বহু হইতে একত্বে আপনার কল্পনাকে ফেনাইয়া কত অদৃষ্টপূর্ব্ব এবং অকল্পিতপূর্ব্ব রেখার মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়া শিল্পজগতের সৌন্দর্য্য-সম্পদ যে একটি প্রাচীন এবং প্রধানতম ললিতকলা তাহা আমরা বোধ হয় দেখাইতে সমর্থ হইয়াছি। কিন্তু সুমহান্ কল্পনাপ্রসূত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অঙ্গরাগ স্বরূপ ইহা সাধারণ মানবের স্থূলদৃষ্টিতে যেন শিল্পকলাহিসাবে

নিম্নস্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা বলিয়া এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে, এই সুকুমার মণ্ডণ-শিল্প ভাবগ্রাহীর সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এবং সহৃদয় সমালোচকের নিকট অন্য কোনও শিল্পের তুলনায় দ্বিতীয়স্থান অধিকার করে।

যদি এই মত সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে সর্ব্বযুগে, সভ্যাসভ্য সর্ব্বজাতি জীবনে সর্ব্ববিষয়ে, এমন কি সকল কাজে এই মণ্ডণ-প্রেরণার ডাকে যে প্রাণ-ভরিয়া সাড়া দিয়া আসিয়াছে, তাহা সেই সকল জাতির শিল্পসভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলেই বোঝা যাইবে। তবে "ভিন্নরুচিহি লোকঃ।" দেশকালপাত্র ভেদে প্রাকৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাভেদে ও এই মণ্ডণবুদ্ধির অভিব্যক্তির স্তরভেদে সৌন্দর্য্যরচনা যে অদ্ভুত বৈচিত্র্যময় এবং বিভিন্নমুখী হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

Yrjo Hirn বলিয়াছেন:

Man endeavoured to create a representation of God, a receptacle of the divine spirit, by means of which he may enter into relations with the divinity. Alongside with this endeavour, however there can be always observed another tendency which has been of scarcely less importance in the history of art—the effort to flatter and propitiate the divinity. Thus the ornamental art which is lavished in the decoration of temples may in most cases be interpreted as homage to the God who is believed to inhabit the temple or to visit it." *

প্রাচীন ভারতবর্ষীয়গণের শিল্পরচনার মধ্যে এই বিশ্বজনীন সনাতন পদ্ধতির কোনও ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাহারা এই সৌন্দর্য্যসংস্কারের আহ্বানে আপনাদের জীবনের সকল অনুভূতি ও হৃদয়ের সকল আকুলতা লইয়া সাড়া দিয়াছিল, এবং ফলস্বরূপ সমগ্র জাতীয় জীবন এক অপূর্ব্ব রূপলোক সৃষ্টি করিয়াছিল। "যাঁহারা প্রস্তর মূর্ত্তির নির্ম্মাণ-ব্যাপারে গ্রীক আদর্শের প্রভাব স্বীকার করিতে দ্বিধা বোধ করেন না, তাঁহারাও এই প্রসাধক কলা-কৌশলের মৌলিকতা যে ভারতীয় ভাস্করের নিজস্ব, তাহা অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া থাকেন। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ স্যর্ জন মার্শাল মহোদয় মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যবোধ ও শোভা সম্পাদন কুশলতা ভারতীয় শিল্পের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিদ্যমান, তাহা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত, বিদেশীয়ের নিকট ঋণস্বরূপ গৃহীত নহে।"* সেই যুগের শিল্পীরা, সৌন্দর্য্যের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবার জন্য ও আপনাদের আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণবিকাশ ও পরিপুষ্টির জন্য, কেবলমাত্র ধ্যানগম্য যে রসলোক, সেখান হইতে নানাবিধ রসব্যঞ্জনার আধার-স্বরূপ উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মণ্ডণশিল্পের সাধনায় তাঁহাদের প্রতিভা যেন সবিশেষ ভাবে স্ফূরিত হইবার অবকাশ পাইয়াছিল। আপনাদের সরল ও পবিত্র হৃদয়ের ভক্তি ও প্রীতি ভগবানকে নিবেদন করিবার জন্যই যেন তাহারা একান্তভাবে এই শিল্পের সাধনা করিয়াছিল। তাহারা এতদূর একাগ্র ও তদ্‌গতচিত্তে মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি নানাবিধ সুচারু অলঙ্কারে ভূষিত করিত যে, সময় সময় যেন অলঙ্কার ও স্থাপত্যের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিত না। এমন ভক্তশিল্পের কল্পনাপ্রসূত অসাধারণ কলাকৌশল যে দেবমন্দিরের নিরস কঠোর পাষাণগাত্রকে অসংখ্য রমণীয় চিত্র ও নয়নাভিরাম জটিল অলঙ্কারের আতিশয্যে এবং আলো ও ছায়ার সমাবেশে যে অপূর্ব্ব শ্রী ও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুচতুর ও সুদক্ষ শিল্পী যেন আপনার অভীষ্ট দেবতার প্রীতি-কামনায় আপনার বহুকষ্টার্জ্জিত বিদ্যাসম্ভার ও জীবনের সমগ্র শিল্পসম্ভার পূজার অর্ঘ্যরূপে দান করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের মহামানবের দেবায়তনগুলি তাহার রসানুভূতির পূর্ণ বিগ্রহ। সাধক যেরূপ আপনার ইষ্টদেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ইষ্টমন্ত্র জপ করিয়া থাকে এবং সেই নামজপের দ্বারা যেমন তাহাকে সেই দেবতার সান্নিধ্যে লইয়া যায় ঠিক সেই ভাবেই অনুপ্রাণিত হইয়া প্রাচীন ভারতের রূপকার অসংখ্য চিত্র পুনঃ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়া মন্দিরগাত্র আলোকিত ও উদ্ভাসিত করিয়াছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যেও যে অনুপ্রাস ও অলঙ্কারের বাহুল্য দেখা যায়, তাহার

* Origins of Art, *Encyclopaedia of Religion and Ethics*, Vol. I, 819.

* গুরুদাস সরকার—মন্দিরের কথা, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৩৬

মূলেও এই শোভাসম্পাদনপ্রবৃত্তির ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীর মধ্যে আবার প্রাচীন উৎকলবাসিগণ তাহাদের রচিত সুচারু ও রমণীয় বিচিত্র অলঙ্কার-

চিত্র ৭। চৈত্যবাতায়ন, মুক্তেশ্বর মন্দির

চিত্র ৯। ফাঁদ গ্রন্থি, মুক্তেশ্বর মন্দির

তাহার বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা এই সামান্য প্রবন্ধের বিষয় নহে। কিন্তু তথাপি ইহা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, প্রাচীন উড়িয়া-শিল্পী এই ক্ষেত্রে একেবারে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে।

প্রাচীন উৎকলবাসী পাষাণশিল্পে যে নৈপুণ্য ও চাতুর্য্য দেখাইয়াছে তাহা জগতের শিল্পকলা-রাজ্যে এবং শিল্পকলার ইতিহাসে চিরদিনই একটী বিশিষ্ট স্থান

চিত্র ১১। বনলতা, সূর্য্য দেউল, কোণারক

অধিকার করিবে। এই কারুকার্য্যে বিশেষভাবে চিত্রালঙ্কার ও রূপসৌন্দর্য্যের বাহুল্য পরিলক্ষিত হয়। উড়িয়া-শিল্পী নব নব রূপের কল্পনা করিয়া এবং নব নব মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যে আনন্দ লাভ করিত তাহা বোধ হয় আর কোন জাতি এই শিল্পের সাধনা হইতে লাভ করিতে পারে নাই। এই শিল্প-সাধনা তাহার জীবন-ধারার সহিত ওতঃপ্রোতভাবে এমনই মিশিয়া গিয়াছিল যে, তাহাদের চিত্তের সমগ্র ভাব-ধারা নয়নাভিরাম অলঙ্কার-ধারারূপে প্রকাশিত হইত।

উড়িয়া-শিল্পী কেবলমাত্র কাল্পনিক চিত্রচাতুর্য্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। দেবমন্দিরকে শ্রী-সম্পদে ও শোভার ঔজ্জ্বল্যে ভূষিত করিবার জন্য প্রাচীন

চিত্র ৮। চৈত্যবাতায়ন, ব্রহ্মেশ্বর মন্দির, ভুবনেশ্বর, খৃঃ একাদশ শতাব্দী
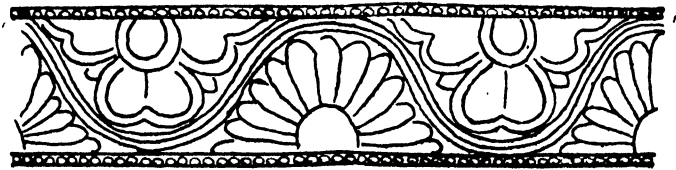
চিত্র ১০। ফুল লতা, রাজারাণী মন্দির, ভুবনেশ্বর, খৃঃ একাদশ শতাব্দী

খচিত সুমহান্ মন্দিরগুলির জন্য সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। মণ্ডণশিল্পের সাধনায়, ইন্দ্রজাল প্রভাবে তাহারা যে কত অগণিত সৌন্দর্য্যমালা রচনা করিয়াছিল,—কত নব নব রূপ ও রেখার সমন্বয়ে অপরূপ অলঙ্কার সৃজন করিয়াছিল, আসিরীয়গণের ন্যায় সে প্রাণী-জগতেরও আশ্রয় লইয়াছে। সেখান হইতে আপনার রূপতৃষ্ণার ও রূপ-কল্পনার উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছে। যে দৃষ্টি বস্তুর বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তাহার গঠনভঙ্গীর অন্তরালে

রস-সৌন্দর্য্যের সন্ধান পায়, যে দৃষ্টি দ্বারা শিল্পী অতি তুচ্ছ ও হেয় বস্তুর মধ্যে আপনার শিল্পকলার প্রেরণা পায় এবং যে কল্পনা থাকিলে, সেই অন্তরের বস্তু-স্বতন্ত্র রূপ-সৌন্দর্য্য অভিনব শ্রী ধারণ করে এবং এক অবাস্তব কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি করিয়া থাকে, সে দৃষ্টি উড়িয়া শিল্পীর ছিল। তাহা না হইলে সে বনের পশুপক্ষীর গঠনভঙ্গীটুকু প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ করিয়া এক অবিনশ্বর কীর্ত্তি স্থাপন করিতে পারিত না। আজ যে জগতের সুসভ্য দেশের সুধী ও সহৃদয় সমালোচকগণ উড়িয়া শিল্পীর প্রস্তর ক্ষোদিত লতাপাতা ও জীবজন্তু দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইতেছেন, সেই শিল্পের মূলে যে কতখানি গভীরতা ও রসবস্তুর অনুভূতি আছে তাহা বর্ত্তমানের সাধারণ শিল্পীর বা সাধারণ দর্শকের কল্পনার অতীত। বর্ত্তমানে এমন কোন মণ্ডণ-শিল্প-বিশারদ আছেন কিনা জানি না, যাঁহার বা যাঁহাদের শিল্প-কল্পনা উড়িয়া-শিল্পীর সান্নিধ্য-লাভের দাবী করিতে পারে। উড়িয়া শিল্পী প্রাণীজগৎ হইতে কত মনোহর আকৃতি, কত সুন্দর অঙ্গবিন্যাস, কত সুঠাম ভঙ্গী, কত বিচিত্র চলন আপনার শিল্প-কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রোজ্জল ও ভাস্বর রূপচ্ছটায় দেবমন্দিরের গাত্রকে ভূষিত করিয়াছে। যে পশুপক্ষীর আকৃতি বা শক্তি তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিয়াছিল বা যাহাদিগের নিকট মানুষ উপকারের ঋণে আবদ্ধ ছিল কিংবা যাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি মানবচিত্তে ত্রাস উৎপন্ন করিত তাহাদের সকলে উড়িয়া-শিল্পীর শিল্প-সাধনায় যথাযোগ্য স্থান পাইয়াছিল।

প্রত্যেক মূর্ত্তিটিকে আপনার সুরুচি এবং সুকৌশল দ্বারা শিল্পী অতি সযত্নে নবসৌন্দর্য্য মণ্ডিত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিল। প্রাণীরাজ্যের প্রায় সকলই এই ভাস্কর্য্য-শিল্পে স্থান পাইয়াছিল এবং যে স্থানে ও যে ভাবে সুশোভন হইত সেই স্থানে সেই সকল পশুমূর্ত্তিকে উৎকীর্ণ করিয়া শিল্পী অশেষ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। এই সকল জীব-শ্রেণীর মধ্যে যে কেবলমাত্র পশুরাজ সিংহ, মাতঙ্গ, অশ্ব, হরিণ প্রভৃতির মূর্ত্তিই মন্দিরগাত্রের শোভা সম্পাদন করিবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছিল তাহা নহে; হংস, মীন, বানর, মেষ, সারমেয়, কূর্ম্ম, শুক, বরাহ, বৃষ, এমন কি সামান্য দর্দ্দুর ও কর্কট পর্য্যন্ত—মানবের অতি ভয়ঙ্কর শত্রু হইতে তাহার অতি অন্তরঙ্গ গৃহপালিত পশু পর্য্যন্ত, সকলকেই শিল্পী সমাদৃত করিয়াছিল।

এই সকল জীবজগতের প্রতিনিধিগণ, শিল্পীর কলা-কৌশলে, প্রস্তর মূর্ত্তি হইয়াও যেন সজীব এবং সজাগ হইয়া অবস্থিতি করিতেছে। প্রস্তরশিল্পে এরূপ বস্তুতান্ত্রিকতা, এরূপ প্রাকৃতিক সাদৃশ্য ও গঠন-বিন্যাসের জীবন্ত অনুকরণ অতি বিরল। এই সকল জান্তব চিত্র সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে উহাদের অঙ্কন ও গঠন-ভঙ্গীর বৈচিত্র্যে মুগ্ধ না হইয়া পারা যায় না। ভাস্কর শিল্পী এই সকল পাষাণ চিত্র এরূপ বলদৃপ্ত ও তেজস্বী করিয়া খোদিত করিয়াছে এবং এই সকল মূর্ত্তির স্বাভাবিকতা এতই মনোরম যে, ইহার আশেপাশে চিরপ্রচলিত কলাপদ্ধতির প্রথানুযায়ী ও কল্পনা-প্রসূত ভাবপ্রবণ মূর্ত্তিগুলির তুলনায় একটা সুস্পষ্ট বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় শিল্পী আপনার শিল্পকলার সৌন্দর্য্যসম্পাদনের জন্য প্রাকৃতিক জগতকে কত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং কিরূপ তন্ময় হইয়া বনের পশুপক্ষীদিগের রূপ ও গঠন-সৌন্দর্য্য আপনার স্মৃতিতে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন এবং কিরূপ সুকৌশলে সেই সকল মূর্ত্তির স্বাভাবিক রেখা-বিন্যাস ও গঠন-ভঙ্গী প্রস্তরশিল্পের চিত্ররূপে একেবারে অবিকল ফুটাইয়া তুলিতেন এবং তাহাদের কল্পনাকুশল এবং সহৃদয় তক্ষণ সূচিকাস্পর্শে সেই সকল পশু ও পক্ষীর চিত্র কি অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইত তাহা ভাষার দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।

ভারতীয় শিল্পীর, বাস্তবের এই সজীব ও মর্ম্মস্পর্শী অনুকরণ এবং পাষাণশিল্পের কুহক-মন্ত্রবলে উৎকীর্ণ পশু-পক্ষীর দেহ-সৌন্দর্য্যের জীবন্ত ব্যঞ্জনা, এই বিশেষ বিদ্যার পারদর্শিতার সাক্ষ্য আজও রহিয়াছে। লিঙ্গরাজের অপূর্ব্ব সিংহ মূর্ত্তি, অনন্তবাসুদেব ও কোণার্কের বলদৃপ্তা গজগামিনী, মুক্তেশ্বরের সুন্দর সুঠাম মৃগযূথ এবং সূর্য্য-দেউলের অনলোপম তেজস্বী এবং প্রাণবান যুদ্ধাশ্বসমূহ, ভারতীয় শিল্পীর অবিনশ্বর স্মৃতিস্তম্ভরূপে এখনও তাহার ভাস্কর্য্য শিল্পের বিজয়ঘোষণা করিতেছে।

একজন বিচক্ষণ সমালোচক যথার্থ বলিয়াছেন,—

The craftsmen's designs are not content with a mere artistic appeal to our sense perceptions in a peculiarly happy disposition of lines and forms but are also informed, imbued and scintillating, as it were, with an infinite variety of national ideas and beliefs, religious or mythical, which it would be difficult to find in their artistic elements alone.১

আর একজন সুপ্রসিদ্ধ শিল্পশাস্ত্রজ্ঞ এতদূর পর্য্যন্ত ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সৌন্দর্য্য-শিল্পের প্রেরণা হইতে মণ্ডন চিত্রগুলির উদ্ভব হইয়াছিল তাহা নহে; এবং তিনি আরও বলেন যে, এই চিত্রগুলির মধ্যে যতটুকু সনাতন ও অপরিবর্ত্তনীয়, ঠিক ততটুকুই রূপকভাবে প্রযুক্ত এবং যতটুকু পরিবর্ত্তনশীল তাহাই মাত্র তাহার বহিরাকৃতি।

In the pre-animistic conception of the world, ornamentation has, as its principal aim to provide an object as a building with magically protective or strengthening signs or symbols. In the course of time, however, their original magical and symbolic character was nearly forgotten and the ornamental forms were frequently applied as purely decorative motifs."২

শিল্পীকে কেবলমাত্র তাহার শিল্প রচনার স্রষ্টা বলিয়া বিচার করিলে দোষ হয় না বটে, তবে সেই বিচার ঠিক পক্ষপাতশূন্য হয় না। যেহেতু উড়িয়া শিল্পী প্রাচীন ভারতবাসী, সেই হেতু তাহার হৃদয়ে দেবতা ও দেবমন্দিরের প্রতি যে একটা অকৃত্রিম ও অবিচলিত ভক্তি ছিল তাহা ধরিয়া লইতেই হইবে। দেবতার মন্দিরকে ও দেবতাকে ঐন্দ্রজালিকের সর্ব্বব্যাপী অকল্যাণকর মন্ত্রশক্তি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ভক্ত শিল্পীর একটা প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়। ভয় আদিম মানবের একটি স্বাভাবিক ও সহজাত সংস্কার। উড়িয়া শিল্পী এই ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া আপনার দেবতাকে, অমঙ্গলকে অশুচি এবং প্রতিকূল পিশাচাদির প্রভাবকে প্রতিহত করিবার জন্য দেবালয়ের গাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি খোদিত করিয়াছেন। তাহারা সেই বিরাট সুবিশাল ও মহান ধর্ম্মমন্দিরগুলিকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার জন্য নীলাকাশ-পটে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, মহাকায় জাগ্রত ও আক্রমণোন্মুখ গজসিংহ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল (চিত্র ৪)। ঠিক একই উদ্দেশ্যে তোরণশীর্ষে অদ্ভুত মকর মুখসকল (চিত্র ১)। এবং কিম্ভূতকিমাকার কীর্ত্তিমুখসকল প্রাচীরগাত্রে এবং প্রাচীর কোটরে স্থাপিত করা হইয়াছিল (চিত্র ২)। সেই সকল অগণিত ভীষণদর্শন কীর্ত্তিমুখ এখনও দর্শককে ভয়ে অভিভূত করিয়া ফেলে। বিকটাকার ও বিরাটকায় রহস্যময়ী বিড়ালমূর্ত্তি সকল ছায়াবেষ্টিত প্রাচীরের অন্তরাল হইতে ভয়াবহরূপে বহির্গত হইয়া আছে (চিত্র ৩)। এই সকল কাল্পনিক এবং বিকটাকার দানব মূর্ত্তির গূঢ়ার্থক এবং প্রহেলিকাময় প্রকৃতি চিরদিনই মণ্ডন-শিল্পীর দৃষ্টিতে শিল্পসৌন্দর্য্যবর্দ্ধনের উপকরণরূপে সমাদৃত হইয়াছে। আদিম ও অসভ্য পূর্ব্ব-পুরুষদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ত্রাস ও বিভীষিকার স্বাভাবিক সংস্কার হইতেই মধ্যযুগের উড়িয়া-শিল্পিগণ এই সকল ভীষণ প্রতিকৃতি রচনা করিতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল।

উড়িষ্যার চিত্রমাত্রেই অলঙ্কারের আতিশয্য দেখা যায়। গঠনভঙ্গিমা ও রেখাঙ্কনের প্রতি উড়িয়া রূপকারের যে অপূর্ব্ব অনুরাগ ছিল, তাহা অন্যান্য জাতির মধ্যে বিরল। অষ্টম হইতে ত্রয়োদশ এই সার্দ্ধ ছয় শতাব্দীর মধ্যে, উড়িয়া শিল্পীদের অসাধারণ রসানুভূতি ও শোভন প্রবৃত্তির চরিতার্থ সাধনের একটা গৌরবময় প্রচেষ্টার আরম্ভ, সম্পূর্ণ মৌলিক ও অপূর্ব্ব শিল্প-সৃষ্টির বিপুল উদ্যম এবং তাহাদের জাতীয় প্রতিভার উন্মেষ ও তাহার পূর্ণ প্রকাশ শিলাবক্ষে দেখা যায়। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে, শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দিরে অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিপক্ক হস্তের মণ্ডন-শিল্প-সৃষ্টির প্রথম প্রয়াসের স্থূল আভাষ পাওয়া যায়। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে গঠিত পরশুরামেশ্বর মন্দির, রূপকারের দক্ষতা ও কারিগরির বিশিষ্ট উন্নতির পরিচায়ক। প্রায় সমসাময়িক বৈতাল দেউলের সুন্দর ও মনোহর পুষ্পলতার, বিশেষতঃ পদ্মপুষ্পের, সুস্পষ্ট পরিকল্পনা ও মনোরম অঙ্কন শিল্প-প্রতিভা এবং রূপ-সৌন্দর্য্যগ্রাহিতার ক্রমবিকাশের

১। Gangoly, O. C.—A Note on Kirtimukha, *Rupam*, January, 1920. p. 11.

২। Stutterheim, W. F.—The Meaning of Kala-Makara ornament; *Indian Arts and Letters*, 1st issue, 1929 pp. 28—29.

অপরূপ নিদর্শন (চিত্র ৫ এবং ৬)। এই প্রাচীনযুগের মন্দিরনিচয়ের অলঙ্কার-সম্পদের মধ্যে মনোকল্পিত ও পুষ্পিক অলঙ্কারের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য ও বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তৎকালীন শিল্পীর অপরিস্ফুট প্রতিভা মন্দিরের বিভিন্ন অঙ্গগুলিকে এক সুরে বাঁধিয়া স্থাপত্যের দিক দিয়া সামঞ্জস্য সাধন করিতে পারে নাই। পুরাতন দেবমন্দিরগুলি দেখিলে পরিষ্কার বোধ হয় যে, তাহাদের অলঙ্কারের প্রকৃতি ও বিন্যাস এখনও প্রাচীন ভারতের নিয়মানুযায়ী এবং শুঙ্গ ও গুপ্তযুগের শিল্পরীতির প্রথানুযায়ী।

কিন্তু দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন উড়িয়া শিল্পীরা পুরাতন পথ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের পথিক হইল, মুক্তেশ্বর মন্দির সেই নবোদ্ভাসিত শিল্প-পদ্ধতির প্রতীক রূপে এখনও দণ্ডায়মান। ইহা উড়িষ্যা শিল্পে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। কারণ ঐ সময়েই সর্ব্বপ্রথম উড়িষ্যার জাতীয় শিল্প-প্রতিভার গৌরব ও মহিমা সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হয় (চিত্র ৭ এবং ৯)। ফার্গুসন ইহাকে উড়িষ্যা স্থাপত্য-শিল্পের রত্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু সেই উৎকীর্ণ চিত্রগুলি স্বতন্ত্রভাবে অতি মনোজ্ঞ এবং অতি রমণীয় হইলেও তাহাদের সম্মিলিতসৌন্দর্য্য-সৌধ পরিকল্পনার উপযোগী অঙ্গাঙ্গীভাবে সংবদ্ধ হইয়া অখণ্ড সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে পারে নাই। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই কিন্তু বিরাট লিঙ্গরাজে এই অপরূপ মণ্ডণসমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ব্রহ্মেশ্বরের প্রসাধক চিত্রের মধ্যে খৃষ্টপূর্ব্ব বৌদ্ধচৈত্যবাতায়নের (যাহাকে কুমারস্বামী "চন্দ্রশালা" নামে অভিহিত করিয়াছেন) পারসী অক্ষর-সদৃশ আশ্চর্য্য-জনক অলঙ্কারে পরিণতি, বিশেষজ্ঞ মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে (চিত্র ৮)।

মধ্যযুগের মন্দিরগুলিতে অন্যান্য চিত্রাপেক্ষা লতামণ্ডণ ও বৃক্ষবল্লরীর প্রাধান্য দেখা যায়। "স্থাপত্য অলঙ্কার রূপে ব্যবহৃত যে অপূর্ব্ব কারুকার্য্য ও কলাকৌশল কুড্যস্তম্ভ গাত্রে মাল্যাকৃতি ডালিতে এবং ফুললতা নটীলতা পত্রলতা বনলতা (চিত্র ১১) প্রভৃতি লতার আবর্ত্তনে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাতে অভিজ্ঞ সমালোচকের মতে চারু-শিল্পের এ শাখায় গ্রীক-শিল্পী অপেক্ষা উড়িয়া কারুকারেরই কৃতিত্ব সমধিক ভাবে প্রকট হইয়াছে।" এই সকল কারুকার্য্যের চিত্তাকর্ষক সৌন্দর্য্য ও লালিত্যপূর্ণ সৌষ্ঠবই রাজারাণীমন্দিরের মণ্ডণ-মহিমার প্রধান কারণ। মন্দির-গাত্র এইরূপে সূক্ষ্ম ও চিত্তরঞ্জিনী অলঙ্কারদ্বারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উৎকীর্ণ থাকায়, গভীরভাবে খোদিত কমনীয় মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত সুদৃশ্য হইয়াছে এবং সুগোল সুঠাম অলস নায়িকাদের ললিতকোমল দেহবল্লরীর লীলায়িত ভঙ্গী ও উদ্দাম যৌবনশ্রীকে সুন্দর ও সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

কিন্তু রসলোকের মধ্য দিয়া অতীন্দ্রিয় দৃষ্টির দ্বারা যে অপরূপ সম্পদলাভ করা যায়, ত্রয়োদশ শতাব্দীর উড়িয়া শিল্পী কোণারকের সূর্য্যদেউলে তাহার চরমপ্রকাশ ব্যক্ত করিয়াছে এবং যাহা কিছু সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিয়াছে। বিচিত্র কারুকার্য্যের প্রাচুর্য্যে ও তাহাদের চমৎকার গঠনে এবং নিখুঁত সমানুপাতে এই চিত্তাকর্ষক সুবৃহৎ দেবালয় শুধু উড়িষ্যা কেন, সারা জগতে অতুলনীয়। ইহা উড়িষ্যার স্থাপত্যশিল্পাকাশে একটি অত্যুজ্জ্বল গ্রহবিশেষ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্থপতি প্রদীপের ইহাই শেষ শিখা। এই হতভাগ্য দেশের নিবিড় অন্ধকার বিদূরিত করিয়া শিল্পীর সে আলোক পুনরায় প্রজ্জলিত হইল না। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, দুই শতাব্দীর মধ্যে যখন উড়িষ্যার বিস্তৃত সাম্রাজ্য উত্তরে মেদিনীপুর হইতে দক্ষিণে ত্রিচিনপল্লী পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড অধিকার করিয়াছিল এবং যখন প্রবলপরাক্রান্ত গজপতি রাজবংশের প্রতাপে গৌড় ও বাহমনীরাজ্যের মুসলমান সুলতানগণ এবং কাঞ্চী ও বিজয়নগরের হিন্দু-নৃপতিগণ সর্ব্বদা সশঙ্কিত থাকিতেন, উড়িষ্যার ইতিহাসের এত গৌরবময় যুগেও উৎকল-শিল্পের লুপ্তগৌরব ফিরিয়া আসে নাই। (১)

কিন্তু উড়িষ্যার বিচিত্র ও অপূর্ব্ব শিল্পমহিমা কেবল মাত্র যে ঐ দেশের চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল না এবং ইহার প্রভাব যে প্রাচীন উৎকলবাসীদের সমুদ্রভ্রমণ ও উপনিবেশ স্থাপন অভিলাষ গুণে ভারতের বাহিরে ভারতীয় উপনিবেশসমূহের শিল্পকলায় বিশেষভাবে পরিলক্ষিত

---

(১) Banerji, R. D.—The Empire of Orissa, *Indian Antiquary*, December 1928, pp. 235—39.

হয়, সে কথা ঐতিহাসিক গবেষণার সাহায্যে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতেছে। আমরা দেখিতে পাই ব্রহ্মে, শ্যামে, চম্পায়, কাম্বোজে ও যবদ্বীপে উড়িষ্যার মণ্ডণ-শিল্পের প্রভাব সুস্পষ্ট বিদ্যমান। প্রাচীন ব্রহ্মদেশীয় পুঁথিতে লিখিত আছে যে, এককালে নিম্নব্রহ্মের কতকাংশ উক্কল বা উৎকল নামে, এমন কি অধুনা প্রোম নগরীও, শ্রীক্ষেত্র নামে অভিহিত ছিল। ব্রহ্মদেশে প্রাচীন উড়িষ্যাবাসী কর্ত্তৃক উপনিবেশ স্থাপনের ইহা অকাট্য প্রমাণ। ব্রহ্মদেশীয় অগণিত বৌদ্ধস্তূপ ও মন্দিরে যে পুষ্পপত্রের অলঙ্কার কীর্ত্তিমুখ, মকর ও সিংহাদির অসংখ্য চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি যে মধ্যযুগের উড়িষ্যার স্থাপত্য-অলঙ্কারের আদর্শে রচিত, তাহা নিঃশঙ্কচিত্তে বলা যাইতে পারে। মালয় উপদ্বীপ ও তৎসংলগ্ন দ্বীপসমূহের সহিত যে এককালে উৎকল বা কলিঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। এখনও সেখানে ভারতবাসীমাত্রেই, কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ ক্লিং নামে সুপরিচিত। এই কথা স্মরণ রাখিলে, যবদ্বীপের আশ্চর্য্যজনক স্থাপত্যসম্পদের মধ্যে যাহা সাধারণতঃ "কান-মকর" অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত, তাহার সহিত ভুবনেশ্বরের অষ্টমশতাব্দীর দেউলের কীর্ত্তিমুখ ও মকরের অসাধারণ সাদৃশ্য বিস্ময়কর মনে হইতে পারে না। চম্পার ধ্বংসস্তূপের মধ্যেও আমরা উড়িষ্যার লতাবিতানের ও হস্তীযূথের চমৎকার পরিকল্পনার আভাস পাইয়া থাকি।

উপসংহারে এই বলিয়া আমাদের প্রসঙ্গ শেষ করিতে চাই যে, প্রাচীন উড়িষ্যার এই বিচিত্র ও অপরূপ মণ্ডণ-শিল্প যে চিরকালই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও আলোচনার বিষয় হইয়া থাকিবে ইহা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। আমাদের মনে হয়, জাতীয় শিল্প ও অনুশীলনের এই পুর্নর্জাগরণের দিনে, অবহেলা ও বিস্মৃতির জাল ছিন্ন করিয়া এই সকল মনোরম চিত্রগুলি আমাদের দৈনিক জীবনে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবার সময় আসিয়াছে। আমরা ইচ্ছা করিলেই আজকালকার প্রচলিত তৃতীয় শ্রেণীর বিদেশী অলঙ্কারগুলির বৃথা অনুকরণের পরিবর্ত্তে, জাতীয় জীবন ও আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বিজড়িত এই সকল সুচারু প্রাচীন ভারতীয় চিত্রগুলি রেখাঙ্কনে, বস্ত্রশিল্পে, সূচীকার্য্যে, এবং স্থাপত্য শিল্পের গৃহভূষণরূপে সচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারি। আমাদের দেশে আজকাল প্রাচীন ভারতীয় কলা বলিলেই, সাধারণতঃ লোকে অজন্তা ও ইলোরার শিল্পসম্পদই বুঝেন। কিন্তু অজন্তার আলেখ্যগুলি রেখার ভঙ্গিমায়, বর্ণের শোভায় এবং ভাবের প্রকাশে জগতে অতুলনীয় হইলেও আমরা ইহা বলিতে বাধ্য হইব ইহাতে উড়িষ্যার ন্যায় মণ্ডণচিত্রে বৈচিত্র্য নাই। পরবর্ত্তীকালের অন্যান্য অসংখ্য মন্দিরগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও একমাত্র বৈতাল দেউলই মণ্ডণের অসাধারণ বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্য্যে এবং অপূর্ব্ব কলাকৌশলে আমাদের চিত্ত একেবারে বিস্ময়াভিভূত করিয়া ফেলে। আশা করি যথাসময়ে দেশবাসীমাত্রেরই দৃষ্টি এ-বিষয় আকৃষ্ট হইবে।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

২৫

ছোট প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানি ক্রমেই মহামায়াদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছিল। মাঠ, বন, গ্রাম, নদী, দুইপাশে নাচিতে নাচিতে তীরবেগে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই কথাবার্ত্তায় ব্যস্ত, বাহিরের দিকে বড় বেশী মনোযোগ কেহ খরচ করিতেছে না।

একখানি সেকেণ্ড ক্লাশ গাড়ীর ভিতর ইন্দু, মায়া এবং তাহার ছোটকাকা বসিয়া। ইন্দুর শরীর এখনও সারে নাই, যদিও রোগশয্যা হইতে সে উঠিয়া বসিয়াছে। গ্রামের হাওয়ায় স্বাস্থ্য খানিকটা ভাল হইবে এই আশায়, এবং খানিকটা মায়ার আগ্রহাতিশয্যে তাহারা গ্রামে চলিয়াছে।

নিরঞ্জন কয়েকদিন হইল রেঙ্গুন ফিরিয়া গিয়াছেন। মায়া মাসখানেক পরে যাইবে বলিয়াছে, সম্ভব হইলে ইন্দুকেও লইয়া যাইবে।

মায়াতে এবং ইন্দুতে কথা হইতেছিল। মায়া বলিতেছিল, "কয়েকটা বছরের মধ্যেই সমস্ত জীবনটা কেমন যেন উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে পিসীমা, কিছুই যেন আর আগের চোখে দেখতে পারছি না।"

ইন্দু বলিল, "মেয়েমানুষের কপালই এই রকম। একটা জীবনের মধ্যে কতরকম তার অদলবদল। আমাদেরও বিয়ের পর কম ঝাঁকানি খেতে হয়নি। তোর বিয়ের আগেই হল, এই যা। মনে আছে গ্রাম ছেড়ে যেতে কি রকম কেঁদেছিলি? আর এখন বোধ হয় সকলের পাড়াগেঁয়ে কাণ্ডকারখানা দেখে তোর হাসিই পাবে।"

মায়া বলিল, "তুমিও দেখচি আমাকে ভয়ানক রকম মেম ঠিক করে রেখেছ, আমার বরং ভয় হচ্ছে আমার রকমসকম দেখে সবাই খুব অদ্ভুত কিছু না ভাবে। জুতোটা খুলেই ফেলি, কি বল?"

ইন্দু বলিল, "ঘরে গিয়ে সে যা হয় করিস্, এখন থাক। শেষে ইষ্টিশানের কাঁকর পায়ে ফুটে মরবি। এখন জুতো মোজা দেখা লোকের চোখে সয়ে গেছে। কলকাতা থেকে সদাসর্ব্বদা মানুষ আস্‌ছে যাচ্ছে, মেয়েতে জুতো-মোজাও কত পরছে। আসলে তোর বিয়ে হয়নি দেখেই সব ফুসুর ফুসুর সুরু করবে। তা তাতে রাগ করিস্ না।"

মায়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। বলিল, "পিসীমা, তোমরা যাই মনে কর, গ্রামটাকে, গ্রামের লোকদের আমি এখনও ভালবাসি। কিন্তু এই সারাক্ষণ পরের কথা নিয়ে থাকাটা আমার একটুও ভাল লাগে না। কার বারো বছরে বিয়ে হচ্ছে আর কার চব্বিশ বছরে হচ্ছে, তা নিয়ে এত মাথা ঘামাবার কি দরকার তাদের? তাদের ত আর বিয়ে দিতে হবে না?"

ইন্দু ভাইঝির কথার ঝাঁঝে একটু হাসিয়া বলিল, "অত চটিস্ কেন! সহরে তোদের কত রকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। থিয়েটার আছে, বায়োস্কোপ আছে, নাটক নভেল পড়া আছে। কাজেই পরের খবরে তোদের অত দরকার নেই, খবর নেবার সময়ও নেই। গ্রামে ত ঘরের রান্না-খাওয়ার কাজ হয়ে গেলে আর কোনো কর্ম্ম নেই, কাজেই পরনিন্দা, পরচর্চ্চা করে মুখটা একটু বদলায়। তা না হলে কি মানুষ বাঁচে?"

মায়া বলিল, "চরকা কাটলেও ত পারে। নিজেদেরও উপকার হয়, পরেরও অপকার হয় না।"

তাহার ছোটকাকা বলিল, "নিজের মঙ্গল যাতে, তা যদি মানুষ অত সহজে বেছে নিত, তা হলে ত জগৎ সংসারের অধিকাংশ problem-ই মিটে যেত। কোন্‌টা ভাল, কোন্‌টা মন্দ তা ত প্রায় সব মানুষেই জানে, কিন্তু কার্য্যত করতে চায় ক'জন?"

মায়া বলিল, "কেন যে করে না তাও ত বুঝি না।"

ইন্দু বলিল, "এরই মধ্যে কি আর সব বুঝবি রে,

এখনও জগতের অনেক জিনিষ বুঝতে বাকি আছে। নিজেরই মনের সঙ্গে কত লড়াই ঝগড়া যে করতে হয়, তা বেঁচে থাকলে বুঝতেই হবে।"

ষ্টেশন নিকটে আসিয়া পড়ায় তাহাদের আলোচনা থামিয়া গেল। এদিক ওদিক ছড়ানো জিনিষপত্র আবার গুছাইয়া তুলিয়া, তাহারা ট্রেন থামিবার প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইন্দু বলিল, "মনে করে গাড়ী যদি পাঠায় তবেই, নইলে সেই গরুর গাড়ী করে যেতে গায়েগতরে ব্যথা হয়ে যাবে। একেই ত বিছানায় শুয়ে পড়ে থেকে থেকে গাঁটে গাঁটে ব্যথা ধরে গেছে।"

গ্রামে মাত্র দুইখানি ঘোড়ার গাড়ী, আগে হইতে জোগাড় করিয়া না রাখিলে তাহা পাইবার আশা করা দুরাশা মাত্র।

মিনিট পাঁচের মধ্যে ক্ষুদ্র গ্রাম্য ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেনটি দাঁড়াইয়া পড়িল। থামিবে মাত্র দুই মিনিট। কাজেই ধীরেসুস্থে নামিবার সময় পাওয়া যায় না, কোন-মতে হুড়াহুড়ি করিয়া, পোটলা-পুটলি লইয়া সকলে নামিয়া পড়িল। যাত্রী বেশী নামিল না, তবু গ্রামের ষ্টেশনটি যেন সরগরম হইয়া উঠিল। গ্রামের অধিকাংশ বেকার মানুষই ট্রেন আসিবার সময় ষ্টেশনে আসিয়া বসিয়া থাকে। কে গেল, কে আসিল, ট্রেনের কামরার জানালার পথে সারি সারি অপরিচিত মুখ, এই সকল দেখিয়া তাহাদের দৈনন্দিন জীবনের বৈচিত্র্যহীনতার দুঃখ কিছু যেন কাটিয়া যায়।

নিরঞ্জনদের বাড়ীতে যে বিধবা প্রৌঢ়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারই পুত্রকে ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করিবার জন্য টেলিগ্রাম করা হইয়াছিল। ইন্দু নামিয়া পড়িয়াই ব্যগ্রভাবে চারিদিকে তাকাইতে তাকাইতে বলিল, "মিস্তার পিসী যদি আক্কেল করে গাড়ী না পাঠায়, তা হলেই গেছি। মেয়েটার কষ্টের একশেষ হবে।"

মায়া বলিল, "তুমি ত বেশ পিসীমা। নিজের ভাবনা ছেড়ে আমার ভাবনা ভাবতে বসে গেলে? দু'পা হাঁটলে আমি গলে যাব নাকি? তুমি রোগা মানুষ, তোমার কষ্ট হবে ঢের বেশী। ছোটকাকা একটু এগিয়ে দেখ না গাড়ী এসেছে কি না। মাগো, ষ্টেশনটা কি রকম বদলে গেছে। আগে ত টিনের shed ছাড়া কিছুই ছিল না।

যাহা হউক গাড়ী খুঁজিতে আর যাইতে হইল না। খদ্দরের ধুতি, পাঞ্জাবী পরা একটি যুবক হঠাৎ অগ্রসর হইয়া আসিয়া ইন্দুকে বলিল, "এই যে ইন্দু পিসী, আমি আপনার জন্যে গাড়ী নিয়ে এসেছি।"

ইন্দু বলিল, "ওমা, প্রভাস যে! এখনও রয়েছিস? আমি শুনেছিলাম অনেক দিন আগেই কাজের জায়গায় চলে গিয়েছিস্।"

প্রভাস একবার মায়ার মুখের দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল, "গিয়েত ছিলাম, কিন্তু মা আবার অসুখ বাধিয়ে বসলেন, কাজেই কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে এলাম। আজই আবার যাচ্ছি।"

ইন্দু বলিল, "তাই নাকি? ভাগ্যে ইষ্টিশানে এসেছিলি, তাই ত দেখা হল! ক'টার সময় ট্রেন?"

প্রভাস বলিল, "এই ঘণ্টাখানেক পরে। আমি আর বাড়ী যাচ্ছি না, ষ্টেশনেই ঘুরে ফিরে কাটিয়ে দেব। তোমরা আসছ শুনে গাড়ী নিয়ে একটু আগে আগেই এসেছি।

ইন্দু একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "নিস্তার পিসী বুঝি এইটুকু আর করে উঠতে পারলেন না?"

প্রভাস বলিল, "না, এ ত্রুটিটা বোধ হয় তাঁর ইচ্ছাকৃত নয়। তাঁর বড় ছেলেটা কয়েক দিন হল জ্বরে ভুগছে, তাকে নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আমিই নিজে বলে গাড়ী নিয়ে এলাম, নইলে ছোট ছেলেটা আসত বোধ হয়।"

মায়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। প্রভাসকে দেখিয়া কেন জানি না, তাহার গলার কাছটা বেদনায় টন টন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সাবিত্রীকে বড় বেশী করিয়া তাহার মনে পড়িতেছিল। এই গ্রামের বাড়ীর সঙ্গে কি গভীরভাবে তাহার মায়ের স্মৃতি জড়ান। সেই বাড়ী, সেই গ্রাম, সেই পথঘাট, কিন্তু ইহাদের মাঝখানের সেই অতিপ্রিয়, অতিপরিচিত মঙ্গলমূর্ত্তিটি কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে? এ যেন শুধু বহুমূল্য ফ্রেমখানি পড়িয়া আছে, ভিতরের ছবিখানি নাই। প্রভাসের সঙ্গে তাহার মা মায়ার বিবাহের কত না চেষ্টা

করিয়াছিলেন, সেই অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়াই তিনি পরপারে চলিয়া গেলেন। প্রভাসকে দেখিয়া সেই জন্যই কি তাহার মনে এতটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল? তাহাদের দুইজনের এখন দুই পথ, হঠাৎ আজ সাক্ষাৎ হইয়া গেল নিতান্তই ঘটনাচক্রে, না হইলে দেখা হইবার কিছু কথা নয়, আর কখনও হইবে কিনা কিছুই ঠিকানা নাই।

হঠাৎ তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া প্রভাস বলিল, "ইন্দু পিসী, গাড়ীতে উঠবেন চলুন, রোগা শরীরে কতক্ষণ আর এই রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন?"

ইন্দু বলিল, "তোর ট্রেনের ত এখনও দেরি আছে প্রভাস, তুই চল্ না আমাদের সঙ্গে, মিনিট পনরো কুড়ি বসে আবার ফিরে আস্‌বি। সঙ্গে ত আর মাল বেশী নেই?"

প্রভাস বলিল, "বেশী মাল পাব কোথা থেকে? তা চলুন।"

জিনিষপত্র লইয়া তাহারা গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইল। মায়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "প্রভাস-দা, আপনি আমাকে চিন্‌তে পারেননি একেবারেই?"

প্রভাস একটা পোঁটলা হাতে চলিতে চলিতে একেবারে দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর পূর্ণ দৃষ্টিতে মায়ার দিকে চাহিয়া বলিল, "চিন্‌তে পারিনি কি রকম? আমি ত আর অন্ধ নই? তবে গায়ে পড়ে কথা বল্‌লে হয় ত কিছু মনে করবে এই ভয়ে কথা বলিনি।"

মায়া বলিল, "চার পাঁচটা বছর বাইরে ছিলাম বলেই আমি এমন কি একটা হয়ে উঠেছি যে, আমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও ভয় করে? এখানকার বুড়ো-বুড়িরা না হয় এ সব বাজে কথা ভাবতে পারে, তাই বলে আপনিও ভাববেন? সকলের সঙ্গেই আমার নূতন করে পরিচয় করতে হবে নাকি?"

প্রভাস আবার চলিতে সুরু করিয়া বলিল, "চার পাঁচ বছরটা কি আর কম? বিশেষ করে এই বয়সে? নিজের কতখানি পরিবর্ত্তন হয়েছে, তাই দিয়েই আন্দাজ করতে পারি অন্যেরও কতখানি হওয়া সম্ভব। বাইরে থেকে দেখ্‌লে হয় ত এই খদ্দরের ধুতি চাদর ছাড়া অন্য কিছু পরিবর্ত্তন দেখতে পাবে না, কিন্তু ভিতরটা আমার একেবারে সবটাই যেন বদলে গেছে।"

মায়া হঠাৎ একটুখানি গম্ভীর হইয়া গেল, বলিল, "তাই না কি? আমার বরং বাইরেটাই খানিকটা বদ্‌লে গেছে, মনের ভিতরে খুব বেশী কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে বলে মনে হয় না।"

প্রভাস বলিল, "নিজের ভিতরের বদল আবার অনেক সময় নিজেও মানুষ বোঝে না। হঠাৎ আগেকার একটা position-এ ঠিক ফিরে আসার চেষ্টা করলে তখন তফাৎটা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই যে গ্রামে এলে, এতেই ভাল করে বুঝতে পারবে কতখানি দূরে তুমি সরে গেছ।"

ইন্দু মাঝখানে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "নে নে গাড়ীতে উঠে গল্প কর না বাপু, রোদে ত মাথার চাঁদি উড়ে যাবার জোগাড় হল।"

বাস্তবিকই রৌদ্রের তেজ অত্যন্ত তীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। আগন্তুকদের মনে হইতেছিল, যেন মাথার উপর অগ্নিশর বর্ষণ হইতেছে। গাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া মনে হইল যেন বাঁচিয়া গেল।

পল্লীগ্রামের অল্পপরিসর উঁচু নীচু রাস্তা দিয়া সজোরে ঝাঁকানি দিতে দিতে গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল। এ সবই তাহার জন্মাবধি পরিচিত, এই ছোট পুকুর, এই চারিপাশে নারিকেল গাছের সার, এই মাঠের মাঝের বুনো কুলের ঝোপ, এই বাব্‌লা ফুলের সাজ পরা গাছগুলি। অতি পুরাতন, অতি পরিচিত, কিন্তু ইহাদের দেখিয়া যে আনন্দ সে আজ পাইতেছে তাহা একেবারে নূতন, একেবারে অভূতপূর্ব্ব। এই মাঝের কয়েকটা বৎসরের সুখৈশ্বর্য্য ভোগ তাহার মনকে এমন করিয়া ত নাড়া দেয় নাই, রূপার কাঠির স্পর্শে তাহার মানসী অন্তরলোকবাসিনীটি যেন ঘুমাইয়াই পড়িয়াছিল। আজ জাগিয়া উঠিল সে কিসের ছোঁয়ায়? সোনার কাঠি খুঁজিয়া পাইল সে কিসের মধ্যে?

তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। ইন্দু বলিল, "ওমা, এই দুমাসও হয়নি ঘর ছেড়েছি, এরই মধ্যে ছিরি হয়েছে দেখ! প্রাণের দরদ যাদের নেই, তাদের হাতে কি আর

ঘরদোরের যত্ন হয়? ফুলগাছগুলো শুদ্ধু যেন মরতে বসেছে। মায়া দেখ, তোর পেঁপেগাছ কত বড় হয়েছে। ওগুলো গরুতে নেহাৎ নেড়া মুড়ো করতে পারে নি বলে এখনো অবধি টিকে আছে।"

সকলে গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িতেই একজন বিধবা রমণী তাড়াতাড়ি সদর দরজার কাছে বাহির হইয়া আসিলেন, তাঁহার পিছনে একটি চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলে, তাহার আপাদমস্তক র্যাপারে ঢাকা। বিধবা বলিলেন, "এস বাছা এস। রঘুটার জ্বর নিয়ে এত ভুগ্‌ছি যে কোনোদিকে আর চোখকান দেবার সময় নেই। তবু তোমার পাশের ঘরটা ঝাঁটপাট দিয়ে রেখেছি। তোমার গরুর দুধ ত এতদিন পাড়ার ছেলেপিলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিচ্ছিলাম, আজ রেখে দিয়েছি। এই বুঝি নাত্‌নি? ওমা এ যে একেবারে রাজরাণী। বউয়েরই রূপের নামডাক ছিল, তা নাতনী তাকেও টেক্কা দিয়েছে। এর পর জামাই ঘরে আন্‌ বাছা, মস্ত ডাগরটি হয়েছে, আর ভাল দেখায় না।"

বক্তৃতার প্রথম কিস্তিতেই মায়ার পিত্ত জ্বলিয়া গেল, কাকার পিছন পিছন সে ঘরে ঢুকিয়া পড়িবার জোগাড় করিতেছে দেখিয়া ইন্দু ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া বলিল, "বুড়িকে একটা প্রণাম করে যা, নইলে হাজার রকম কথা বার করবে।"

বুড়ীকে প্রণাম করিবার ইচ্ছা মায়ার বিন্দুমাত্রও ছিল না, তবু পিসীর কথায় বৃদ্ধার পায়ের কাছে নত হইয়া একটা নমস্কার করিয়া সে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল।

পূর্ব্বকালে যে ঘরখানি তাহার মায়ের শুইবার ঘর ছিল, এ সেই ঘর। সংস্কারের অভাবে একটু যেন জীর্ণ, আসবাবপত্রের মধ্যে বড় তক্তপোষ এবং আল্‌নাটা ছাড়া আর কিছুই নাই। মায়া জুতা খুলিয়া রাখিয়া তক্তপোষটার উপর বসিল। মিনিটখানেকের মধ্যে ইন্দু এবং প্রভাসও আসিয়া জুটিল। ইন্দু বলিল, "তোর জন্যে ওদিকের ছোট ঘরটায় জল এনে রেখেছে, একেবারে হাত-মুখ ধুয়ে বোস্‌ না!"

মায়া বলিল, "যাচ্ছি দাঁড়াও, রোদের ঝাঁঝে মাথার ভিতরটা এখনও জ্বালা করছে।"

ইন্দু বলিল, "তা ত করবেই, অনেককাল এ রোদ্দুরের সঙ্গে তোর পরিচয় নেই। এককালে কিন্তু এই রোদ্দুরের মধ্যেই টো টো করে বেড়িয়েছিস্‌। প্রভাস বোস্‌ না।"

বসিবার জায়গা একমাত্র তক্তপোষখানি। তাহার উপর মায়া বসিয়া আছে বলিয়াই বোধ হয় প্রভাস তাহাতে বসিল না। একটা বিছানার পোঁটলার উপর বসিয়া বলিল, "ইন্দু পিসী, খুব চট্‌ করে সেরে উঠুন, নইলে আমাদের গ্রামের বদনাম হবে।"

মায়া বলিল, "প্রভাস-দা, আপনি এত শীগ্‌গির চলে যাচ্ছেন। আমি কিন্তু আশা করে এসেছিলাম, আপনাকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নেব।"

প্রভাস একটু বিস্মিতভাবে বলিল, "কি ধরণের কাজ?"

মায়া বলিল, "মায়ের নামে আমি একটা কিছু করতে চাই, পুকুর, অতিথিশালা, কি পাঠশালা, যা সবাই গ্রামের জন্যে সব চেয়ে বেশী দরকারী মনে করেন। আমি ত টাকা দেওয়া ছাড়া আর কিছু করে উঠতে পারব না। কাজের দিকটার ভার আপনার ঘাড়ে চাপাব মনে করেছিলাম।"

প্রভাস বলিল, "থাকবার উপায় থাকলে আমি থেকে যেতাম। গ্রামের জন্যে মেয়েদের পাঠশালা একটি কতখানি যে দরকার, তা তোমায় একমুখে বোঝাতে পারব না। এইটাই সব চেয়ে উপযুক্ত স্মৃতি-মন্দির হবে। মাস দুই তিন পরে আমি আবার ফিরে আস্‌ব, কিন্তু ততদিন কি তুমি থাকতে পারবে?"

মায়া বলিল, "তিন মাস ত থাকতে পারব বলে মনে হয় না। বাবা এক মাসের বেশী দেরি করতে অনেক করে বারণ করে গেছেন।"

প্রভাস বলিল, "তাই ত। আচ্ছা অন্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখ। আমিও খুব চেষ্টা করব, মাঝে দুই চার দিনের ছুটি নিয়ে আস্‌তে।"

তাহার ট্রেনের সময় হইয়া আসিতেছিল বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

২৬

দিন পাঁচছয় কাটিয়া গিয়াছে। মায়াদের গ্রামের বাড়ীতে

এখন লোক ধরে না। জয়ন্তী ছেলেমেয়ে লইয়া আসিয়া জুটিয়াছে, তাহার মাও সঙ্গে আসিয়াছেন। মেয়ের শরীর বড় খারাপ, গ্রামের খোলা হাওয়ায় তাহার স্বাস্থ্যের অবশ্যই উন্নতি হইবে ইত্যাদি নানা অছিলায় জয়ন্তীকে উদ্ধার করা হইয়াছে। অবশ্য পিছনে নিরঞ্জনের চিঠির জোর না থাকিলে কতদূর কি হইত বলা যায় না। নিস্তারিণী ঠাকুরাণী কিঞ্চিৎ কোণঠাশা হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে আরো একখানি ঘর ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। যাহাদের বাড়ী তাহাদের উপর ত আর জোর করা চলে না, কিন্তু বৃদ্ধা মনে মনে অত্যন্তই চটিয়া গিয়াছেন।

মায়া ক্রমেই বুঝিতেছে এই সামান্য কয়েকটা বৎসরের অনভ্যাসে সে পল্লীজীবন হইতে কতখানি দূরে সরিয়া গিয়াছে। পদে পদে তাহার কত রকম যে অসুবিধা হইতেছে, তাহার ঠিক-ঠিকানা নাই। সকলেই যে তাহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত, ইহাতে তাহার লজ্জারও সীমা নাই। ইন্দু রোগের বালাই সব ঝাড়িয়া ফেলিয়া সারাদিন কোমর বাঁধিয়া ঘুরিতেছে যদি মায়ার অসুবিধা খানিকটাও দূর করিতে পারে সেই চেষ্টায়। দুপুরেই সে খাইয়া দাইয়া বাহির হইয়াছে মজুরের সন্ধানে, উঠানের মধ্যে অস্থায়ী-মত একটা স্নানের ঘর মায়ার জন্য না বাঁধিয়া দিলেই নয়, বেচারীকে এ কয়দিন রাত থাকিতে উঠিয়া পুকুরে গিয়া স্নান সারিয়া আসিতে হইয়াছে। বিকালে হাত-মুখ ধুইতে হয় শোবার ঘরের মধ্যেই, তাহার পর সে ঘরমোছার আরো এক পর্ব্ব চলে। জয়ন্তী বসিয়া বসিয়া সব দেখে আর হাসে। মাঝে মাঝে বলে, "থাক, তোর কল্যাণে আমরাও রাজার হালে আছি, একলা এলে কেউ কি আর এত যত্ন করত? এর সিকির সিকিও করত না।"

ভিজা গামছা মাথায় জড়াইয়া ইন্দু যেই ফিরিয়া বাড়ীর চৌকাঠ ডিঙাইয়াছে, নিস্তারিণী ঠাকুরাণীর সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল। বৃদ্ধা নিতান্তই অপ্রসন্নমুখে নিজের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ইন্দুকে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁরে, এই ভরা দুপুরে কোথায় টৈ টৈ করে বেড়াচ্ছিস? ফের যে জ্বরে পড়বি? দেখছিস্ না আমার ছেলেটার দশা, একদিন ভাল হয় ত ফের দশ দিন শোয়।"

ইন্দু বলিল, "না বেশী ঘুরিনি, মধুকে বলে এলাম জন-কয়েক মজুর জোগাড় করে নিয়ে আস্‌তে।"

নিস্তারিণী বলিলেন, "আবার মজুর কিসের জন্যে? ভাইঝির চানের ঘর?—রক্ষে কর, এ সব মেমসাহেব নিয়ে গাঁয়ে আসা কেন বাছা? তাদের সহরে থাকাই ভাল!"

ইন্দু বলিল, "তা তাদেরই বাড়ী তাদেরই ঘর, তারা কি একবার আস্‌বে না? নিজেদের ব্যবস্থা ত তারা নিজেরাই করছে, অন্য কাউকে ত করে দিতে হচ্ছে না?"

তাহার কণ্ঠস্বরে বিরক্তির স্পষ্ট আভাস পাইয়া নিস্তারিণী খানিকটা দমিয়া গেলেন। বলিলেন, "তা ত ঠিকই বাছা, তোমাদের বাড়ীঘর তোমরা আস্‌বে যাবে বৈকি? তবে কিনা রোগা শরীর নিয়ে তোমাকে দৌড়ে বেড়াতে হচ্ছে, এই জন্যেই আমাদের বলা। নইলে কার গরজ পড়েছে বল?"

বৃদ্ধা কথা বলিতে বলিতে ঘরের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলেন।

ইন্দু ভিতরে ঢুকিয়া দেখিল, ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া মায়া আর জয়ন্তী শুইয়া গল্প করিতেছে, জয়ন্তীর ছেলেমেয়ে তক্তাপোষের উপর দিব্য নিদ্রা দিতেছে। ইন্দু বলিল, "একটু বুঝি ঘুমতেও নেই, রাত্রে ত মশা আর গরম বলে ঘুম হয় না, দিনেই না হয় একটু ঘুমিয়ে নিতিস্?"

মায়া বলিল, "যাদের ঘুমনো দরকার তারাই যখন পাড়াময় দৌড়ে বেড়াচ্ছে, তা আমাদের কি দরকার? নিস্তারিণী বুড়ি তোমায় কি বলছিল পিসিমা?"

ইন্দু বলিল, "ও বুড়ীর কথায় কার কি এসে যায়? নিজে কোথা থেকে এসে উড়ে জুড়ে বসেছে তার ঠিকানা নেই, লম্বা লম্বা কথা আছে খুব। তোমাদের দুই বোনের কি পরামর্শ হচ্ছে শুনি।"

জয়ন্তী বলিল, "খুড়ীমার নামে সেই ইস্কুল করার কথা। আমি বলছিলাম- পুকুর প্রতিষ্ঠাই কর, ইস্কুল-টিস্কুল ত খুড়ীমা বড়-একটা পছন্দ করতেন না। নয়তো ব্রহ্মোত্তর জমি কিছু দান কর। ঐসবে তাঁর খুব ভক্তি ছিল।"

মায়া বলিল, "কতকগুলো পেটুক বামুনকে খাইয়ে কি হবে? মা যা ভালবাসতেন, তাই আমি করতে চাই যদিও, তবু এটাও দেখতে হবে যে, কাজটা নিতান্ত বাজে কিছু না হয়, দেশের লোকের একটু উপকারও তাতে হয় কি না। প্রভাস-দা এখানে থাকলে কত যে সুবিধে হত, তার ঠিকানা নেই। এখানে ত এমন একটা লোক দেখি না যার কাছে একটু পরামর্শ পাওয়া যায়।"

ইন্দু বলিল, "প্রভাসের মায়ের সঙ্গে আজ পুকুরঘাটে একবার দেখা হ'ল। বল্‌লে তোর সঙ্গে দেখা করতে একদিন আস্‌বে। মেজছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করতে মহাব্যস্ত, তাই এ কদিন আস্‌তে পারেনি।"

জয়ন্তী বলিল, "ওমা বড়ছেলে রইল পড়ে, আগেই মেজছেলের বিয়ে?"

ইন্দু বলিল, "প্রভাস ত এখন আর বিয়ে করতেই চায় না। তার অনুমতি নিয়ে সুভাষের বিয়ে দেবে বল্‌ছে।"

জয়ন্তী বলিল, "কেন, বিয়ে করতে চায় না কেন? এককালে ত খুবই চাইত। এই ত আমাদের বাড়ীর জামাই হবারই একবার জোগাড় হয়েছিল, নিতান্ত খুড়িমা সেই সময় মারা গেলেন তাই, নইলে ত হয়েই যেত।"

মায়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া গেল। এখনও এসব কথায় তাহার মনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় কেন? যাহা হইবে না, যাহা হইবার নয়, অস্ফুট কৈশোরের সেই স্বপ্নকে আবার কেন এই যৌবনের জাগরণ-ক্ষেত্রে টানিয়া আনা? প্রভাস তাহার বাল্যের সঙ্গী, এইটুকু মনে রাখাই কি যথেষ্ট নয়?"

ইন্দু ভাইঝির গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "থাক্ গে, ও সব কথায় কাজ কি? যাদের ছেলে তারা বুঝবে। তুই যেন মাগী এলে ও সব কথা আবার পাড়িস্ নে।"

জয়ন্তী বলিল, "আমাকে তুমি তেমনি ন্যাকাই পেয়েছ। কথা তারা নিজেরা পাড়তে পেলে বর্ত্তে যায়। এখন তাদের ছেলেতে আর আমাদের মেয়েতে তুলনা হয়? আর মেজকাকা এখনই মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন আর কি?

মায়া হঠাৎ মাদুর ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল, "দোহাই তোমাদের, আর কি দুনিয়ায় কথা নেই? কেবল বিয়ে আর বিয়ে। বিয়ে করে কে যে কত লাটসাহেব হয়েছে তা ত দেখাই যাচ্ছে।"

জয়ন্তী হাসিয়া বলিল, "বাপ্ রে, অত রাগ কিসের? কোনোদিকে বেশী বাড়ান ভাল নয়। মেয়ে-জন্ম যখন নিয়েছ তখন বিয়ে একদিন না একদিন করবেই। তখন লাট হও না হও দেখাই যাবে। আমার না হয় গরীবের ঘরে পড়তে হয়েছে বলে দুঃখে-কষ্টে দিন যাচ্ছে, তুমি ত আর তা পড়বে না?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, সে যখন পড়ব, তখন দেখা যাবে। এখনই এত ভাবনার দরকার নেই। আমার পড়া শেষ হতেই ত এখনও কত দেরী। সম্প্রতি এখানে থাকতে থাকতে মায়ের নামের কাজটা করে যেতে পারলে খুসী হতাম। বাবা যে কখন ডাক দেবেন তার ঠিক নেই। প্রভাস-দা না থাকাতে সব মাটি হতে বসেছে।"

ইন্দু বলিল, "কেন প্রভাস ছাড়া কি পরামর্শ দেওয়ার মানুষ নেই? সেদিনকার ছেলে, সে এত কি বোঝে? মেজদাকে লিখে দেখ না, সে কি বলে। সে ত কারুর চেয়ে কম বোঝে না, এ সব বিষয়ে?"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "বাবাকে মায়ের সম্বন্ধে কোনো কথা বলতে আমার ভাল লাগে না। তিনি নিজে থেকে কখনও যদি বল্‌তেন ত না হয় আমি বল্‌তাম।"

ইন্দু বলিল, "তিনি আর কি বলবেন বল্? তোর মা ত কোনোদিন কোন সম্পর্ক রাখল না, মেজদা ত চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সেধে-সুদ্ধ চাইল না।"

মায়া সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "থাক্ গে পিসীমা, তিনি ত স্বর্গে চলে গেছেন, এখন আর তাঁর সমালোচনা করে কি হবে? আমি নিজেই ভেবে দেখি, যদি কিছু ঠিক করতে পারি।"

এমন সময় বাহির হইতে কে যেন নারীকণ্ঠে ডাকিয়া বলিল, "কৈ গো গেরস্তর কেউ বাড়ীতে নেই নাকি?"

নিস্তারিণী ঠাকুরাণী তাঁহার ঘর হইতে উত্তর দিলেন, "সব ঐ দক্ষিণদিকের ঘরে আছে গো, দেখ গিয়ে।"

জয়ন্তী বলিল, "ঠাকরুণ অনেককাল বাঁচবেন, নাম করতে না করতে এসে হাজির।"

ইন্দু বলিল, "তা বাঁচুক, স্বামী পুত্র সব ঘর জুড়ে রয়েছে, এখনি ত বেঁচে থাকার সময়। পা দুটো ব্যথা করছে আর উঠতে পারি না, যা না একটু ডেকে নিয়ে আয়।"

জয়ন্তী উঠিয়া গেল। মায়া বলিল, "আমার ইচ্ছে করছে অন্য ঘরে পালাতে। এখনি ত তোমাদের যত বিয়ের গল্প সুরু হবে।"

ইন্দু বলিল, "তোকে দেখতেই আসছে, আর তুইই চলে যাবি? বোস্ না, তোকে ত আর খেয়ে ফেল্‌বে না?

জয়ন্তীর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাসের মা আসিয়া ঢুকিলেন। মায়া তাঁহাকে যেমন দেখিয়া গিয়াছিল, তাহার তুলনায় অনেকখানি রোগা হইয়া গিয়াছেন, বয়সও যেন দশ পনেরো বৎসর বাড়িয়া গিয়াছে।

সে উঠিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। প্রভাসের মা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "ওমা, মায়া আর সে মায়া নেই! দিব্যি জগদ্ধাত্রীর মত চেহারা হয়েছে। যে ঘরে যাবে, সে ঘর আলো হয়ে উঠ্‌বে।"

জয়ন্তী চিরকালই ঠোঁটকাটা, সে চট্ করিয়া বলিল, "আমাদের বোন আর কাল কুৎসিৎ ছিল কবে জ্যাঠাইমা? চিরকালই ত তার ঘর-আলো-করা রূপ।"

ইন্দু বলিল, "তোর এক কথা। একেবারে উকীলের মত কথার খুঁটিনাটি ধরতে বসে গিয়েছিস্।"

প্রভাসের মা জয়ন্তীর মন্তব্যে একটু অপ্রস্তুত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন ইন্দুর কথায় একটু হাসিয়া বলিলেন, "আমরা বুড়ো মানুষ বাছা, তোমাদের সহরের মেয়েদের সঙ্গে কি আর কথায় পারি? মায়া যে দেখতে ভাল চিরকালই তা'ত জানিই। ছোটবেলা তোমরাই বরং তাকে কম দেখেছ, আমাদের ত সে ঘরের মেয়ের মতই ছিল।"

মায়া বলিল, "আপনার চেহারা কিন্তু অনেক খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আর বুড়ীসুড়ি হয়ে গেলাম মা, চেহারা আর কতদিন ভাল থাকবে? তোমার মা বেঁচে থাকলেও এতদিন বুড়ী হয়ে যেত। মায়ের নামে নাকি পুকুর পিতিষ্ঠে করবে শুন্‌ছি? এই ত মেয়ের মত কাজ।"

ইন্দু বলিল, "তোমার ছেলে ত আবার পরামর্শ দিয়ে গেছে, মেয়ে-ইস্কুল করতে।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "ওটা এক পাগল, ওর কথা শুনো না। যত-সব আজগুবি খেয়াল ওঁর মাথায়। বয়স হল ত বুদ্ধি হল না। রাতদিন আছে কেবল দেশোদ্ধার আর পরোপকার নিয়ে, নিজের কথা একবার ভুলেও ভাবে না। এত যে বিয়ে করবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছি, তা কেবা শোনে কার কথা।"

জয়ন্তী বলিল, "সুভাষের বিয়েই আগে দেবেন নাকি?'

প্রৌঢ়া বলিলেন, "অগত্যা তাই করতে হবে। একটা সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছে, তা বলে ত সব ক'টাকে সন্ন্যাসী করে দিতে পারি না? দুটো একটা সম্বন্ধও আস্‌ছে, কাল একটি মেয়েকে দেখতে যাবার কথা আছে। তা এ ছেলেও আবার জেদী কম নয়।"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "এ আবার কি নিয়ে জেদ করছে?"

সুভাষের মা বলিলেন, "আজকালকার ছেলেদের যা রোগ। লেখাপড়া জানা চাই, বয়েস বেশী হওয়া চাই, এই সব আর কি!"

জয়ন্তী বলিল, "তা ছেলের যেমন পছন্দ, তেমনি মেয়ে দেখুন, নইলে পরে আবার ঝগড়াঝাঁটি বেধে যাবে।"

সুভাষের মা বলিলেন, "তা ত বটে, তবে কিনা শুধু ছেলের দিক দেখলেই ত হবে না। পাড়াগাঁয়ের গেরস্ত-ঘরে দিন কাটাতে হবে, পাঁচ জনের সঙ্গে, সেটাও ভাবতে হবে। একেবারে সহরের শিক্ষাদীক্ষা হলে ত চলবে না?"

জয়ন্তী বলিল, "আমার যেমন দশা হয়েছে। শাশুড়ী চান এক রকম, তাঁর ছেলে চান এক রকম। মাঝ থেকে দোটানায় পড়ে আমার প্রাণ যেতে বসেছে।"

ইন্দু বলিল, "এখন ঘরে ঘরেই এই। দিশি শিক্ষা, বিলিতি শিক্ষা দুইয়ের খিচুড়ী হয়ে, কোনোদিকই রক্ষা হচ্ছে না। মা-বাপ ভাবে ছেলে আমাদের মানে না, ছেলে ভাবে মা বাবা একটু আমার দিক দেখে না। মাঝ থেকে বউগুলো মরে ভুগে।"

প্রভাসের মায়ের বোধ হয় কথাগুলি বিশেষ পছন্দ

হইতেছিল না, তিনি বলিলেন, "তা যতদিন এক সঙ্গে ঘর করতে হচ্ছে ততদিন মা বাপকে না মান্‌লে চলবে কি করে? যখন নিজেরা স্বাধীন হবে, তখন নিজের মতে চলতে পারবে।"

মায়া খালি শুনিয়াই যাইতেছিল, কোনো কথা বলে নাই। তাহাকে কেমন একটু অন্যমনস্ক দেখাইতেছিল।

প্রভাসের মা যাইবার সময় ইন্দুকে বলিয়া গেলেন, "একদিন যেও আমাদের বাড়ী মেয়েদের নিয়ে।"

ইন্দু বলিল, "তা যাব। তবে বিয়ের কথা বেশী বোলো না যেন আমাদের মেয়ের কানের কাছে, শুন্‌লে সে একেবারে ক্ষেপে যায়।"

মায়া তাড়া দিয়া বলিল, "আর তুমি যেন কি পিসীমা! কি যে বল—"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "কেন আমি কি মিথ্যে কথা বল্‌লাম? নিস্তার পিসী কবে বিয়ের কথা বলেছিল বলে এখনও বুড়ীর উপর ক্ষেপে আছিস্।"

প্রভাসের মা বলিলেন, "আজ তবে আসি এখন। তুমি যেয়ো আমাদের বাড়ী মা লক্ষ্মী, কেউ কিছু বল্‌বে না।"

তিনি চলিয়া যাইতেই মায়া উঠিয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

ছায়া

শ্রীসুবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্মৃতি-বিস্মৃতি-কাহিনী ভাসিছে পরাণে মম।
—থমকি দাঁড়ানু দুয়ারে তোমার, হে অনুপম।
শর্ব্বরী-বুকে আলো-আলিপনা,
কালো আর্-ছায়ে আজো মুছিল না?
মানস-তিমিরে কুসুম-কামনা
—কী নির্ম্মম।

কায়াহীন আঁধি!—ছায়াটি তবুও পিছনে ফিরে?
হানে করাঘাত তোরণে আমার—তিমির-তীরে।
সুদূর নীলিমা-বিলীন পাথার!—
কোটি তারকায় কাঁদিছে আঁধার!
ধরণী মুকুরে ছায়াছবি তার—
নামিছে ধীরে।

অন্তর-মণি-মঞ্জুষা মোর, রুদ্ধ আজি:
হারাণো সুরের রেশ তবু কেন উঠিছে বাজি'?
মেরু-শির-তলে স্মৃতি-তপোবন,
নিদাঘ-মরুর তন্দ্রা-মগন।
—টুটিছে মাধবী-রজনী-স্বপন
—কণিকারাজি!

জীবন-উষার স্মৃতিটি আজিও পরাণে জ্বলে।
দীঘল-কবরী-পরিমল, মন-কমল-তলে।
হেরি যবে রূপ, নবীন-নবনী,
স্মৃতির ছায়াটি থমকে অমনি।
ম্লান তনুখানি ফিরিছে অবনী
—পরশছলে।

অমা-আঁধিয়ারে ফিরে পিপাসিনী সুমধ্যমা!
দ্বিধা-ভয়-হারা মূর্চ্ছনাহত রাগিণী-সমা।
বিস্মৃতি-মোহে বালুকা-বেলায়,—
ছুটে চলি মহ' মরু-পিপাসায়।
—ছায়াটি আসিয়া চরণে লুটায়
—মরম-রমা!

বিস্মৃত সাঁঝি, রাগিণী ধ্বনিছে পরাণে মম।
—সে পরশ-ভীতি হারায়ে এসেছি,—আমারে ক্ষম
চমকি চাহিনু স্মৃতি-তপোবনে,
তারাদীপ কাঁপে ফুল-শিহরণে!
নিশীথ-বীণায়, স্বনিছে পবনে
—হে মনোরম!

বাংলা গদ্যসাহিত্য

বাঙলার আদি গদ্য-লেখকদের মধ্যে দুজন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে মেদিনীপুর-জাত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। আর রামমোহন রায় যদি হুগলি জেলার লোক হন ত, সে হুগলি মেদিনীপুরের গা-ঘেঁষা।

শুনতে পাই, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের "প্রবোধচন্দ্রিকা" বাঙলা ভাষার প্রথম গ্রন্থ। এ গ্রন্থ লিখিত হয়েছিল, "যুবক সাহেবজাত"গণকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিবার জন্য, এবং "ছাপা" হয়েছিল লণ্ডন সহরে। সুতরাং বাঙলা গদ্যের যে বিলেতে জন্ম, এমন কথা বললে অত্যুক্তি হয় না।...এই পুস্তক ছিল সেকালের স্কুলপাঠ্য গ্রন্থ। সে স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কলিকাতার কেল্লায়, আর সে স্কুলের ছাত্ররা ছিল সব ইংরাজ যুবক, বাঙালী বালক নয়; সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, একালের স্কুল-বুকের সঙ্গে "প্রবোধচন্দ্রিকা" সম্পূর্ণ বিভিন্ন-জাতীয়। একালের স্কুলের উদ্দেশ্য বালক বঙ্গজাতগণকে কিঞ্চিৎ বিলাতী শিক্ষা দান করা; অপরপক্ষে সেকালের স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল, "যুবক সাহেবজাত" গণকে কিঞ্চিৎ এদেশী শিক্ষা দান করা।

বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ছিলেন সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণপণ্ডিত, সুতরাং ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির কিঞ্চিৎ জ্ঞানদান করা তিনি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করেছিলেন; উপরন্তু কিঞ্চিৎ নীতি-শিক্ষা দেওয়াও তাঁর অভিপ্রেত ছিল। এ কারণ, প্রবোধচন্দ্রিকা দু' ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আছে শাস্ত্রপরিচয়, দ্বিতীয় ভাগে নীতিকথা। এ পুস্তক হচ্ছে একাধারে বোধোদয় আর কথামালা। কিন্তু বোধোদয় সম্পূর্ণ দুর্ব্বোধ্য, আর এই কথামালা আজকালকার রুচিতে অ-কথা-মালা। কারণ নীতির যুগে যুগে ঐক্য থাকলেও, রুচি যুগে যুগে বিভিন্ন হয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় ছিলেন শ্লীলতা ও অশ্লীলতার ভেদজ্ঞান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। ফলে তাঁর কথামালায় রসের অভাব নেই, অভাব আছে শুধু ভাষা ও ভাবের শুচিতার। কিন্তু এই কথামালার একটি মস্ত গুণ আছে। এ অংশ খাঁটি বাঙলায় লেখা। সে গদ্য যে স্থানে স্থানে কতদূর চমৎকার, আমি পূর্ব্বে রাজসাহীর সাহিত্য-সম্মিলনে তার পরিচয় দিয়েছি। সুতরাং এস্থলে তার আর পুনরুক্তি করব না। আমাদের মামুলি গদ্য এ গদ্যের evolution নয়, তাঁর রচিত বোধোদয়েরই পরিবর্ত্তিত রূপমাত্র। বিদ্যালঙ্কার মহাশয় সংস্কৃত ভাষাকে বাঙলা আকার দিতে চেষ্টা করেছিলেন; তাঁর পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণপণ্ডিতেরা একই পদ্ধতিতেই বাঙলা গদ্য লিখেছেন। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দ্বিতীয় পুস্তক "পুরুষ পরীক্ষা" কার জন্য লেখা হয়েছিল?—সে কথা তিনি তাঁর গ্রন্থের আরম্ভেই বলেছেন। "অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকদের নীতি-শিক্ষার নিমিত্তে এবং কামকলাকৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে শ্রীশিবসিংহ রাজার আজ্ঞানুসারে বিদ্যাপতি নামে কবি এই গ্রন্থ রচনা করিতেছেন।"

এই মুখবন্ধ থেকে বোঝা যায় যে, একমাত্র নীতিশিক্ষা দান করা নয়, সেই সঙ্গে হর্ষ উৎপাদন করাও ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যে গ্রন্থ "কামকলা-কৌতুকাবিষ্ট পুরস্ত্রীগণের হর্ষের নিমিত্তে" হয়, সেই গ্রন্থ "অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট বালকদিগের" নীতিশিক্ষা দান করার উপযোগী গ্রন্থ কি না, সে বিষয়ে একালের লোকের সন্দেহ আছে।...সে যাই হোক, লোকে বলে সাহিত্যের উদ্দেশ্য এক শিক্ষা দান করা, আরেক আনন্দ দান করা। আর এই দুই শ্রেণীর সাহিত্য এ যুগে সম্পূর্ণ পৃথক। আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি সম্পূর্ণ নিরানন্দ; অপরপক্ষে যাতে আনন্দ লাভ করা যায়, তাকে আমরা কু-শিক্ষা বলেই জানি। "পুরুষ পরীক্ষা" গ্রন্থে সাহিত্যের এই উভয় গুণের একত্র মিলন করবার চেষ্টা হয়েছিল, সুতরাং এ গ্রন্থকে বাঙলা গদ্য-সাহিত্যের প্রথম পুস্তক বলে' গণ্য করা যেতে পারে। এবং এই গ্রন্থের ভাষাই বাঙলা সাধুগদ্যের প্রথম নমুনা।

প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ গদ্যে অন্বয়ের কৌশল লেখকের করায়ত্ত হয়নি। নিম্নলিখিত বাক্যটির প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সকলেই দেখতে পাবেন যে, এর পদসমূহ পরস্পর অন্বিত নয়। "যে রসজ্ঞান দ্বারা নির্ম্মলবুদ্ধি যে পণ্ডিতসকল তাহারা নীতিবোধানুবোধক সে এই সকল বাক্যের গুণ তন্নিমিত্তে কি আমার রচিত এই গ্রন্থ শ্রবণ করিবেন না, অর্থাৎ অবশ্য শ্রবণ করিবেন?"...

আমার বিশ্বাস, সংস্কৃত ভেঙে বাঙলা গড়তে গিয়েই ব্রাহ্মণপণ্ডিত মহাশয়রা বাঙলা গদ্য বিশৃঙ্খল করে ফেলেছিলেন। এর কারণ এই যে, বাঙলা ভাষার গঠন যে সংস্কৃত ভাষার গঠনের অনুরূপ নয়, সে জ্ঞান পণ্ডিত মহাশয়দের ছিল না। ফলে তাঁরা সংস্কৃত ভেঙেছিলেন বটে, কিন্তু বাঙলা গড়তে পারেন নি।

সংস্কৃত ভাষায় syntax-এর তেমন বাঁধাবাঁধি নিয়ম নেই, কারণ সংস্কৃত হচ্ছে inflectional language। বাক্যের ভিতর যেখানে যে শব্দ বসিয়ে দেও, তা'তে কোনও ক্ষতি নেই। পদসমূহের বিভক্তি থেকেই বোঝা যায় যে, কোন্ পদের সঙ্গে কোন্ পদ অন্বিত হচ্ছে। ধাতুরূপ ও শব্দরূপ যদি আমাদের মুখস্থ থাকে, তাহলে সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ আমরা সহজেই গ্রহণ করতে পারি; আর সে বিদ্যা যদি আমাদের না থাকে ত সংস্কৃত আমাদের কাছে গ্রীক হয়ে ওঠে,—অর্থাৎ সমান দুর্ব্বোধ হয়।...

অপরপক্ষে বাঙলা হচ্ছে ইংরাজীর মত analytical language, অর্থাৎ বিভক্তিপ্রবণ ভাষা নয়। ইংরাজিতে যদি কেউ বলে Ram struck Sham, অথবা Sham struck Ram, তাহলে কে কাকে মেরেছে তা বুঝতে কোন মুখস্থ বিদ্যার সাহায্য নেবার আমাদের দরকার নেই। বাক্যের প্রথমেই যাঁর স্থান, তিনিই যে শেষোক্ত ব্যক্তিকে প্রহার করেছেন, তা সর্ব্বজনবিদিত। বাঙলাও ঐ জাতীয় ভাষা, সুতরাং বাক্যের ভিতর পদের স্থানের উপরই তার অপর পদের সঙ্গে সম্বন্ধ অনেকটা নির্ভর করে। বাঙলার পদ্যলেখকদের কস্মিন্-কালেও এ বিপদে পড়তে হয়নি। তাঁরা সংস্কৃত ভেঙে বাঙলা গড়তে চাননি; তাঁরা চেয়েছিলেন বাঙালীর মুখের ভাষাকে কাব্যের রূপ দিতে। সুতরাং জাতির মুখে যে syntax আপনা হতেই গড়ে উঠেছে, সেই syntax অনুসারে তাঁরা কথার সঙ্গে কথা গেঁথেছেন। সেই কারণেই নবাবী আমলের বাঙালী কবিদের ভাষা স্বচ্ছন্দ, কোম্পানী

আমলের গদ্যলেখকদের ভাষার মত কিম্ভূত কিমাকার নয়। জাতি-মাত্রেরই মনের একটা বিশেষ গড়ন আছে, মুখের ভাষাও স্বভাবতঃ সেই ছাঁচেই ঢালাই হয়। অপর কোন ভাষার ছাঁচে কষ্টেসৃষ্টে ভাষাকে গড়তে গেলে, লিখিত ভাষার আকৃতি মনের প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে পড়ে।...

সে যাই হোক্, বিদ্যাসাগর এই ভাষাকে যতদূর সম্ভব সমন্বিত ও শ্রুতিমধুর করে তুলেছিলেন। এই পণ্ডিতী বাঙলা আদিতে যে কতদূর শ্রুতিকটু ছিল, নিম্নোক্ত উদাহরণ থেকেই আপনারা নিজের কান দিয়ে তা যাচাই করে নিতে পারবেন। মানে না বোঝা যাক্, কানে শুনতে মিষ্টি লাগলেই অনেক জিনিষ আমাদের কাছে গ্রাহ্য হয়, যেমন হিন্দি গান। একে দুর্ব্বোধ, তার উপর আবার কানের মাথা খায়, এহেন ওস্তাদী বাঙালীর কাছে অসহ্য,—সঙ্গীতেও, সাহিত্যেও। "পুরুষ পরীক্ষা" হ'তে ক'টি ছত্র নিয়ে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি, তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, পণ্ডিত মহাশয়দের হাতে পড়ে বাঙলা ভাষা কি অপরূপ মূর্ত্তি ধারণ করেছিল।

"রাজা বড়াহ নদীতীরে নর্ত্তক বেতালের পাদাস্ফালনযুক্ত এবং ভয়ঙ্কর ডাকিনীর ডমরুধ্বনিসহিত ও সহস্র শিবার ঘোর রাবসংযুক্ত এবং রাক্ষসীর ক্রীড়াযুক্ত আর নৃকপালসহিত এবং চিতাঙ্গারকরণক বিচিত্রিত মহাভয়ানক শ্মশানস্থান প্রাপ্ত হইলেন।" অবশ্য এ বর্ণনার উদ্দেশ্য পাঠকের মন ভয়ানক রসে অভিভূত করা, কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বর্ণনা পড়ে আমাদের মন শুধু হাস্যরসে আপ্লুত হয়। সে যাই হোক্, বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের উক্ত রচনা যেমন কর্কশ, তেমনি তাল-মান-লয়ে বর্জ্জিত। এ গদ্য পাঠ করে কান ও মন দু-ই পীড়িত হয়, কারণ এতে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনি সংযুক্ত নয়, এবং শব্দের সহিত শব্দ অন্বিত নয়।...এ হচ্ছে এক কথায় গণ্ডগোলের ভাষা, ডাকিনীর ডমরুধ্বনি। এই বেয়াড়া ভাষা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে পড়ে অনেকটা সায়েস্তা হয়। প্রথমতঃ তিনি সংস্কৃত শব্দ বে-পরোয়া ভাবে বাঙালীর কানে ছুঁড়ে মারেন নি। শেয়াল অবশ্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের শ্মশানেও নেই, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্রাক্ষাবনেও নেই। তবে শিবা তাঁর হাতে পড়ে শৃগাল হয়ে উঠেছে, আর সে শৃগাল দণ্ডায়মান থাকে দ্রাক্ষাবৃক্ষের নিম্নে, বাঙ্গলার শিশুদের এই শিক্ষাদান করবার জন্য, যে দ্রাক্ষাফলের নাগাল পাওয়া যায় না—"সো আঙুর খাট্টা হ্যায়।" ফলে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্যের ধ্বনি উৎকটও নয়, শ্রুতিকটুও নয়। বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের ভাষার তুলনায় বিদ্যাসাগরের ভাষাকে সুললিত বলা যেতে পারে। এবং তাঁর গদ্যের অন্বয় উচ্ছৃঙ্খলও নয়, বিশৃঙ্খলও নয়। সীতার বনবাসের প্রথম ছত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

"রঘুকুলধুরন্ধর রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।"

এ বাক্যটির অন্বয় সহজ, অর্থ সরল, গতি সচ্ছন্দ। উপরন্তু এ গদ্যের অন্তরে ছন্দ আছে। গদ্যেরও ছন্দ আছে, কিন্তু সে ছন্দ ব্যক্ত নয়—প্রচ্ছন্ন; সে ছন্দের হিসেব লেখকও জানেন না, জানে শুধু তাঁর কান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গদ্য সুগঠিত, এবং স্থানে স্থানে শ্রুতিমধুর হলেও যে কায়েমি হয়নি, তার কারণ এ ভাষা কৃত্রিম, এ ভাষায় বাঙালী তার মনের কথা খুলে বলতে [illegible]রে না। এ গদ্য যে বাঙালীর মনঃপুত হয়নি, তার প্রমাণ পরবর্ত্তী লে[illegible]কেরা বাঙলা গদ্যের রূপান্তর ঘটালেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা বিদ্যাসাগরী ভাষার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধন করলে। বদলটা যে কি হ'ল, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। কোম্পানী আমলের বাঙলা গদ্য সেকালের ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের রচিত ভাষা। সিপাহী-বিদ্রোহের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর প্রভুত্বের অবসান, এবং সেই সঙ্গে বাঙলা ভাষার উপর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের প্রভুত্বেরও অবসান হল। আমাদের ভাষার উপর টোলের প্রভাব নষ্ট হল, এবং তার পরিবর্ত্তে নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল। আমরা আজকাল যাকে সাধুভাষা বলি, সে ভাষার সৃষ্টি করেছেন ইংরাজীশিক্ষিত বঙ্গসাহিত্যিকেরা।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, এই টুলো বাঙলার বিরুদ্ধে বঙ্গসাহিত্যে যে ইতিমধ্যে কোনও বিদ্রোহ হয়নি, তা নয়। টেকচাঁদ বাহাদুরের "আলালের ঘরের দুলাল" এবং "হুতোম পেঁচার নক্সা" এই বিদ্রোহের নিদর্শন।

হুতোমের নক্সা যে কস্মিন্‌কালেও সমাজে আদৃত হয়নি, তার কারণ হুতোমের ভাষা নয়,—তাঁর নক্সার রূপ। উক্ত পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণের গৌরচন্দ্রিকায় লেখক বলেছেন যে, 'কতকগুলি আনাড়িতে রটান হুতোমের নক্সা অতি কদর্য্য বই, কেবল পরনিন্দা, পরচর্চ্চা, খেঁউড় ও পচালে ভরা।" এ অপবাদ যে ষোল আনা মিথ্যে, তা নয়। কিন্তু ভাষার দিক থেকে বিচার করতে হলে, হুতোমের ভাষা যে জীবন্ত—শুধু জীবন্ত নয়, ধড়ফড়ে বাঙলা,—সে কথা আমরা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য। তাঁর ভাষা যে সেকালে প্রচলিত গদ্যের প্রতিবাদ, সে কথা তিনি নিজমুখেই বলেছেন। তিনি এই বলে তাঁর গ্রন্থ আরম্ভ করেছেন যে, "বেওয়ারিস লুচির ময়দা বা তৈরী কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্ম্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তৈরী করে খেলা করে, তেমনি বেওয়ারিস বাঙালা ভাষাতে, অনেকে যা মনে যায় কচ্ছেন।" এ ভাষা পণ্ডিতী ভাষার উল্টো ভাষা, একেবারে সংস্কৃতছুট; সুতরাং বাঙলা গদ্য ঐ বামমার্গে অগ্রসর হল না। সংস্কৃত ভাষাকে বয়কট করে বাঙলায় গদ্য-সাহিত্য রচনা করা অসম্ভব।"...ইয়ারকি করতে হলেই কলকাতার dialect-য়ে লিখতে হবে, আর নীতিধর্ম্ম প্রভৃতির বিচার করতে হলে পণ্ডিতী ভাষায় লিখতে হবে,—সম্ভবতঃ এই ছিল তাঁর ধারণা। এ দুয়ের মাঝামাঝি যে কোন ভাষা হতে পারে, যার প্রসাদে হাস্যরস, শান্তরস, প্রভৃতি সব সমান প্রকাশ করা যেতে পারে, এ কথা বোধ হয় তিনি বিশ্বাস করতেন না। কালীপ্রসন্ন সিংহ ছিলেন প্রতিভাসম্পন্ন 'আলালের ঘরের দুলাল'। সুতরাং কি জীবনে, কি সাহিত্যে, কোনও মধ্যপথ অবলম্বন করা তাঁর ধাতে ছিল না।

টেকচাঁদ আমার বিশ্বাস এই মধ্যপথের প্রথম প্রদর্শক। তথাকথিত আলালী ভাষার, সাহিত্যে সুনাম নেই, তার কারণ 'আলালের ঘরের দুলালে'র সঙ্গে অধিকাংশ পাঠকের পরিচয় নেই; যদি থাকত ত তাঁরা দেখতে পেতেন যে, আজকালকার সাধুভাষার সঙ্গে আলালী ভাষার বিশেষ কোনও প্রভেদ নেই। 'আলালের ঘরের দুলাল' নভেল হিসাবে প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থ নয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, নীতিজ্ঞান ছিল, রুচিজ্ঞান ছিল,—ছিল না তাঁর শুধু প্রতিভা। তাই তাঁর গদ্য পর যুগের আদর্শ গদ্য হয়ে ওঠেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার আলোক টেকচাঁদের রচনাকে একেবারে ম্লান করে দিলে।

"আলালের ঘরের দুলাল" যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন বহু পাঠক মুক্তকণ্ঠে বইখানির অতি প্রশংসা করেন। এই অনুকূল সমালোচকদের মধ্যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন অন্যতম। এঁরা সকলেই ইংরাজী-শিক্ষিত, তার প্রমাণ অনেকেই ইংরাজী ভাষায় গদ্যের একটা সুগঠিত ও সহজ সুন্দর রূপ আছে যার অনুকরণে বাঙলা গদ্য লেখা যায়—অপরপক্ষে সংস্কৃত গদ্যের অনুসরণ করা বাঙলা গদ্যের পক্ষে অসম্ভব।

আমার মতে বাণভট্টের কাদম্বরী সংস্কৃত গদ্যকাব্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, কিন্তু তাই বলে কোন বাঙালী লেখক একান্ত মতিচ্ছন্ন না হলে বাঙলা ভাষায় কাদম্বরী রচনা করতে বসে যাবেন না। ও কাব্য বড়-জোর অনুবাদ করা যায়, এবং তা করাও হয়েছে। তারাশঙ্করের কাদম্বরী সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালীর নিকট অতি সুপাঠ্য গ্রন্থ। কিন্তু তার ভাষা বাঙলা নয়,—বিভক্তি-মুক্ত সংস্কৃত। এ অনুবাদে সংস্কৃত ভাষার বিশেষ্য বিশেষণ সব স্বরূপে বিরাজ করেছে—যা কিছু বদল হয়েছে, সে সর্ব্বনামে ও অব্যয়ে। কাদম্বরীতে ক্রিয়ার বড়-একটা বালাই নেই; সুতরাং ক্রিয়ার বিভক্তির বাঙলা রূপ পাঠকের বড় একটা চোখে পড়ে না। তারাশঙ্করের কাদম্বরীই বোধ হয় পণ্ডিতী বাঙলার চরম কীর্ত্তি।

ইংরাজী-শিখিত সম্প্রদায় যে এ ভাষার কবল থেকে বাঙলাকে মুক্ত করবার জন্ম ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। তারাশঙ্করের কাদম্বরীর পর "আলালের ঘরের দুলালের" সাক্ষাৎ পেয়ে সকলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। সাহিত্য যে ধর্ম্মের শুপমাত্র নয়—কিন্তু প্রাণের কথা, আর সে কথা যে বিশেষ করে জীবন্ত ভাষাতেই বলা যায়, এর পরিচয় পেয়ে বাঙালী পাঠক মুক্তির আনন্দ অনুভব করেছিলেন। কিন্তু এ সম্প্রদায়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন শুধু পাঠক নয়—লেখক, উপরন্তু ইংরাজী নয়, বাঙলা লেখক। সুতরাং এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মতের একটু বিশিষ্টতা আছে। বাঙলা গদ্যকে কোন্ পথে অগ্রসর করতে হবে, সে বিষয়ে তাঁকে মনস্থির করতে হয়েছিল। তিনি সংস্কৃত ও বাঙলার ভিতর মধ্যপথই সুপথ বলে প্রচার করলেন, এবং নিজেও সেই পথ অবলম্বন করেন।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, টেকচাঁদই হুতোমী ভাষা ও পণ্ডিতী ভাষার মধ্যপথ প্রথমে আবিষ্কার করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যপথ কিন্তু সে পথ নয়। তিনি যে পথ দেখিয়েছেন, সে পথ হচ্ছে তারাশঙ্করের কাদম্বরী ও টেকচাঁদের আলালের ভিতর মধ্যপথ। কারণ তিনি চেয়েছিলেন, বাঙলা গদ্যকে একাধারে সহজ ও সুন্দর করতে। ধ্বনির গৌরবে ও শব্দের ঐশ্বর্য্যে সংস্কৃত ভাষা অতুলনীয়, সুতরাং বাঙলা ভাষাকে সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করতে হলে, সে সৌন্দর্য্য যে সংস্কৃতের কাছে ধার করতে হবে, এই ছিল তাঁর ধারণা। পণ্ডিত মহাশয়েরা সংস্কৃতকে বাঙলা করতে চেয়েছিলেন, অপরপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাকে সংস্কৃত করতে চেয়েছিলেন। ফলে তাঁর প্রথম বয়সের লেখা অনাবশ্যক সংস্কৃতবহুল। দুর্গেশনন্দিনীর গায়ে আলো কখনও পড়ে না, দীপরশ্মি প্রপতিত হয়। অপরপক্ষে দেবী চৌধুরাণীর মুখে আলো পড়ে, দীপরশ্মি প্রপতিত হয় না। অর্থাৎ ভাষাকে সুন্দর করতে হলে যে তাকে কৃত্রিম করতে হবে, আর সহজ ভাষা যে সুন্দর হয় না, এ ভুল ধারণা হতে তিনি নিজেই মুক্তিলাভ করেছিলেন। দেবী চৌধুরাণীর ভাষা দুর্গেশনন্দিনীর তুলনায় ঢের বেশী সুন্দর।

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের সঙ্গে আমার যে স্বল্প পরিচয় আছে, তার থেকে আমার মনে এ ধারণা জন্মেছে যে, বাঙলা গদ্যের সৃষ্টিকর্ত্তারা, অর্থাৎ পণ্ডিত মহাশয়েরা, সংস্কৃত ভাষাকে বাঙলা করতে চেয়েছিলেন—উক্ত ভাষাকে সংস্কৃত ব্যাকরণের বন্ধন থেকে মুক্ত করে। ফলে তাঁদের হাতে পড়ে সংস্কৃত ভাষা শুধু এলো হয়ে পড়েছিল, বাঙলা হয়নি।

তার পরে টোলের নয়, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের B. A., M. A.-রা বাঙলাকে সংস্কৃত করতে চেষ্টা করেছিলেন—বাঙলার অন্তরে সংস্কৃত অভিধানের খাদ মিশিয়ে। ফলে এ ভাষা হয়ে উঠেছে, শুদ্ধ ভাষা নয়, সাধুভাষা। এঁরা বাঙলার গৌরব বৃদ্ধি করতে গিয়ে, করেছেন শুধু তাকে গুরুভার। আমাদের ভাষা এইরূপে গুরুভারাক্রান্ত হয়ে তার সহজ ও সচ্ছন্দ গতি হারিয়ে বসেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় কোন নদীর বর্ণনা করতে বলেছেন যে, তার জল—"হাসিতেছিল, চলিতেছিল, চলিতে চলিতে হাসিতেছিল, হাসিতে হাসিতে চলিতেছিল।" কিন্তু সাধুভাষার স্রোত নেই, সে ভাষা হাসিতে হাসিতে চলেও না, চলিতে চলিতে হাসেও না।

আমি এ প্রবন্ধে রামমোহন রায়ের গদ্যের কোন নমুনা দিইনি। এর কারণ, তিনি "অভিনব প্রজ্ঞাবিশিষ্ট" বালকদের শিক্ষা দান করবার জন্যও লেখনী ধারণ করেননি, "কামকলাকৌতুকাবিষ্ট" পুরস্ত্রীগণকে আনন্দ দান করবার জন্যও কাব্য রচনা করেননি। তিনি করেছিলেন সামাজিক লোকের সঙ্গে শাস্ত্রবিচার। ফলে তিনি সংস্কৃতকেও বাঙলা করতে চাননি, বাঙলাকেও সংস্কৃত করতে চাননি। তাঁর ভাষা দর্শনের ভাষা। সে ভাষা যে আমাদের কানে একটু কটমট ঠেকে, সে অনেকটা তাঁর ব্যবহৃত দার্শনিক পারিভাষিক শব্দের দরুণ। প্রকরণভঙ্গ, অনবস্থাদোষ, বিনিগমনারহিত প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নেই। কিন্তু বাঙালী জাতি যখন রীতিমত দর্শনের চর্চ্চা সুরু করবে, তখন হয়ত তারা আবিষ্কার করবে যে, উক্ত পারিভাষিক শব্দসকল বাদ দিয়ে দর্শন চর্চ্চা করা যায় না। বিদ্যাসাগর যখন বিধবা-বিবাহের আলোচনা করেন, তখন তিনি এই ভাবামার্গই অবলম্বন করেন।

আর একটি কথা বলেই এ প্রবন্ধের উপসংহার করব। বাঙলা সাহিত্যের পূর্ণ অভিব্যক্তির পথে বাধা পণ্ডিতী ভাষাও নয়, সাধু ভাষাও নয়, তথাকথিত বীরবলী ভাষাও নয়। পণ্ডিতী ভাষা যেমন কালক্রমে সাধুভাষায় পরিণত হয়েছে, সাধুভাষাও যে কালক্রমে তেমনি বাঙলা ভাষায় পরিণত হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? মাতৃভাষার দিকে আমরা আরও একটু এগিয়ে এসেছি—এই ত ব্যাপার। Evolution-এর ফলে ভাষা যখন নূতন রূপ ধারণ করে, পূর্ব্ব সাহিত্যিক ভাষার নানা গুণ অঙ্গীকার করেই তা নব কলেবর ধারণ করে। হার্বাট স্পেন্সর্ বলেছেন যে, জগতের অভিব্যক্তির ক্রম হচ্ছে from the simple to the complex; কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, মানব সভ্যতার ক্রম, অনেক ক্ষেত্রে from the complex to the simple। সুতরাং আধুনিক গদ্যের simplicity যে তার অবনতির লক্ষণ, এ কথা কিছুতেই বলা যায় না। বীরবলী ভাষার উপর যে আক্রমণ হয়েছে, সে সম্বন্ধে এই মাত্র বলতে চাই যে, সে আক্রমণ সম্পূর্ণ লক্ষ্যভ্রষ্ট। কারণ বীরবলী ভাষা বলে কোনও বিশেষ ভাষা নেই, যা আছে, সে হচ্ছে কথা কইবার একটা বিশেষ ভঙ্গী। এ ভঙ্গীর মূলে আছে বীরবলের মন, মুখ নয়।

বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির প্রধান অন্তরায় হচ্ছে, ইংরেজী বলবার ও লেখবার নেশা। সরকারী ও দরবারী ভাষায় অনর্গল কপচানোর লোভ যে কি পর্য্যন্ত দুর্দ্দমনীয়, তা আমি সম্পূর্ণ জানি। যে-কেউ যেন-তেনপ্রকারেণ ইংরাজী মুখস্থ বুলি আউড়ে গেলেই তিনি দেশে বক্তা হিসাবে, চিন্তাশীল হিসাবে, দেশভক্ত হিসাবে গণ্য ও মান্য হন; অপর পক্ষে, নিজের মনের কথা নিজের মুখের ভাষায় যিনি ব্যক্ত করেন, শিক্ষিত সমাজ তাঁকে উপেক্ষা করেন। মনোজগতে এই দাস-মনোভাব আমাদের মন হতে যতদিন না দূর হচ্ছে, ততদিন দেশবাসীর অবজ্ঞা শিরোধার্য্য করেই আমাদের বাঙলা সাহিত্য রচনা করতে হবে। কারণ বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা করেই বাঙালী তার মনের স্বরাজ্য লাভ করবে।

মাধবী, ফাল্গুন, ১৩৩৬ শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস

কৌটিল্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" ইতিহাসকে বেদের মধ্যে গণনা করিয়াছেন। ইতিহাস কি? তিনি লিখিয়াছেন, "পুরাণ, ইতিবৃত্ত" আখ্যায়িকা, উদাহরণ, ধর্মশাস্ত্র, ও অর্থশাস্ত্র,—এইগুলি ইতিহাস।" অপরাহ্নে ইতিহাস-শ্রবণ রাজাদিগের কর্তব্য ছিল। ইতিহাস নামের এই ব্যাপক অর্থ ধরিলে বুঝিতে পারি, মহাভারতকে কেন ইতিহাস এবং কেন পঞ্চমবেদ বলা হইত। শুক্রাচার্য লিখিয়াছেন "এক রাজকৃত্যাদি বর্ণনচ্ছলে যাহাতে প্রাচীন বৃত্তান্ত কথিত হয়, তাহার নাম ইতিহাস। ইতিহাসের অপর নাম পুরাবৃত্ত।" কৌটিল্যই ধরি আর শুক্রাচার্যই ধরি, ইতিহাস এক বিপুল বিদ্যা। স্মৃতিশাস্ত্রই কি অল্প? শুক্রাচার্য বলেন, "বেদ-অবিরোধক ধর্ম-স্মরণ যাহাতে আছে, আর যাহাতে অর্থ-শাস্ত্রের কীর্তন আছে, তাহার নাম স্মৃতি।" পুরাণ কি? "যাহাতে সৃষ্টি, প্রতিসৃষ্টি, বংশ, মন্বন্তর, এবং বংশানুচরিত কীর্তিত হয়।" পুরাণে ও অমরকোষে পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণ স্বীকৃত হইয়াছে। তথাপি, পুরাপরম্পরা-কথন, পুরাণ শব্দের নিরুক্তি। সত্যবতী-পুত্র অদ্ভুতকর্মা ব্যাস অষ্টাদশ পুরাণ ও ভারত-আখ্যান লিখিয়া সত্যই অমর হইয়া রহিয়াছেন। ইহাদের শ্লোকসংখ্যা পঞ্চ লক্ষ।

মৎস্য পুরাণ (৫৩ অঃ) লিখিয়াছেন, "সর্বশাস্ত্রের প্রথমে পুরাণ, তার পর বেদ! কল্পান্তরে মাত্র একখানি পুরাণ ছিল। অনেক কাল পরে ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণসমূহ প্রবর্ত্তিত হয়। কালে লোকে পুরাণ গ্রহণ করে না দেখিয়া আমি ব্যাসরূপ ধারণ করিয়া যুগে যুগে তাহা সংগ্রহ করি! বুধগণ পুরাণসমূহকে পুরাকালের ইতিবৃত্ত বলিয়া জানেন।" এইরূপ বাক্য অন্য দুই এক পুরাণেও আছে। যে জাতিই দেখি পুরাণই তাহার প্রথম অবলম্বন। তখনও বেদও পুরাণের মধ্যেই থাকে, এবং বেদেও পুরাকালের বাত্ময় প্রবৃষ্ট হয়। কালে ভাগ হইয়া নানা শাস্ত্র রচিত হয়। বেদব্যাসের পূর্বে বহু পৌরাণিক কথা লোকসমাজে শ্রুত হইত। তিনি সে সকল বার্তা লইয়া অষ্টাদশ সংহিতা করিয়াছিলেন। তাহাতে আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা ও কল্পশুদ্ধি ছিল। স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়ের কথন, আখ্যান; শ্রুত বিষয়ের কথন, উপাখ্যান; পিত্রাদি দ্বারা গীত বিষয়, গাথা; আর কল্প, শাস্ত্র ও বিধিমতে শুদ্ধি নির্ণয়, কল্পশুদ্ধি। মহাভারত প্রধানতঃ আখ্যান। পুরাণের অধিকাংশ উপাখ্যান। ব্যাসের শিষ্য-পরম্পরা ছিলেন। প্রথম শিষ্য, সূত রোমহর্ষণ। এই সকল শিষ্যও নূতন সংহিতা করিয়াছিলেন, এবং ব্যাসের পুরাণে নূতন নূতন বিষয় যোজিত করিয়াছিলেন। ক্ষত্রিয় পিতা ও ব্রাহ্মণী মাতার সন্তানেব নাম, সূত ছিল। ইহাদের মধ্যে কেহ পুরাণ-বক্তা, কেহ সারথি, কেহ বা রথকার হইত। এ কালের পুরাণ-পাঠক ও পুরাণ-কথক সেই পূর্বকালের সূত-স্থানীয়। যাত্রা গায়কও সূতের অনুবর্তন করে।

দেশের ইতিহাসের পক্ষে রাজবংশানুচরিত মেরুদণ্ড স্বরূপ বটে, কিন্তু প্রজাসাধারণের ধর্ম অর্থাৎ আচার ব্যবহার, নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম তাহাতে পাওয়া যায় না। এ বিষয়ের নিমিত্ত রামায়ণ ও মহাভারত, পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র আছে। কিন্তু ইতিহাসের আকর স্বরূপ গ্রহণ করিতে হইলে এই সকল গ্রন্থের দেশ ও কাল জানা আবশ্যক। সকল স্মৃতিশাস্ত্র যেমন এক কালে কিম্বা এক দেশে প্রণীত হয় নাই সকল পুরাণও হয় নাই।

কেহ কেহ পুরাণের কাল-নির্ণয় করিয়াছেন। শুনিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী দেশও নির্ণয় করিয়া "এসিয়াটিক সোসাইটি"র জন্য দুই খণ্ড পুস্তক লিখিয়াছেন। কোন্ পুরাণের কোন্ দেশ কোন্ কাল অনুমতি হইয়াছে, আমি অবগত নই। অন্যের কৃত কাল-নির্ণয়ও দেখিতে পাই নাই, দেখিবার মধ্যে একখানি দেখিয়াছি। আমার এক মরাঠি বন্ধু উপহার দিয়াছিলেন। বইখানি মরাঠি ভাষায় লিখিত। নাম "পুরাণ নিরীক্ষণ"; কর্তা শ্রীযুত ত্র্যম্বক গুরুনাথ কালে; ধাম, মুম্বই পনবেল। ইনি অষ্টাদশ মহাপুরাণের বর্তমান রূপ, প্রণয়ন-কাল ও কয়েকটি প্রসিদ্ধ রাজবংশের রাজগণের কাল-নির্ণয়ে যত্ন করিয়াছেন। ইহা পুরাণের এক চমৎকার নিদর্শক। এখানে দুইখানি পুরাণের দেশ ও কাল অনুসন্ধান করিয়া যৎকিঞ্চিৎ ইতিহাস সঙ্কলন করিতে বসিতেছি। এই প্রবন্ধে 'পুরাণ' বলিলে "বঙ্গবাসী"র সংস্করণ, এবং 'কবি' বলিলে পুরাণকার বুঝিতে হইবে।

(১) বৃহদ্ধর্ম পুরাণ

বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণ ও মহাভারত প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্যান্য মুনিও ব্যাসের পুরাণের সদৃশ পুরাণ লিখিয়াছেন। এই সকল পুরাণ, উপপুরাণ। পুরাণ অষ্টাদশ, উপপুরাণও অষ্টাদশ। এইরূপ গণ্য হইলেও, উপপুরাণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। অষ্টাদশের অধিক উপপুরাণ আছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, একখানি উপপুরাণ। অষ্টাদশ উপপুরাণের যে নাম পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে এই পুরাণের নাম নাই। যথা, মৎস্য পুরাণে (৫৩ অঃ), "জগতে যে সকল উপপুরাণ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে, তাহাদের বিবরণ বলিতেছি। (১) পদ্মপুরাণোক্ত নরসিংহ-চরিত অবলম্বনে নারসিংহ পুরাণ; (২) কার্তিকেয়-বর্ণিত নন্দামাহাত্ম্য যাহাতে কীর্তিত হইয়াছে, তাহা নান্দী পুরাণ; (৩) যাহাতে শাম্ব সম্বন্ধীয় বিবরণ এবং বহুল ভবিষ্যৎ কথানক আছে, তাহা শাম্ব। বুধগণ পুরাণসমূহকে পুরাকল্পের বৃত্তান্ত বলিয়াই জানেন। এইরূপ আদিত্য সংজ্ঞক আর এক পুরাণ কীর্তিত হয়।" অতএব দেখা যাইতেছে, মৎস্য পুরাণের বর্তমান সংস্করণের সময়ে উক্ত চারি উপপুরাণ সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং সেই চারিটিও মহাপুরাণ হইতে নির্গত হইয়াছিল।

কূর্ম পুরাণে (১ অঃ), এবং গরুড় পুরাণে (পূর্ব, ২২৭ অঃ) অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম আছে। উভয়ে একই নাম, একই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। সে সকল নামের মধ্যে বৃহদ্ধর্ম পুরাণ নাই। পরে, দেখা যাইবে এখানি ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের শেষের দিকে রাঢ়দেশে প্রণীত হইয়াছিল।

এই বৃহদ্ধর্ম পুরাণে (পূর্ব খণ্ড, ২৫ অঃ) অষ্টাদশ পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের নাম আছে। এই পুরাণ মতে ১৮ খানি উপপুরাণের নাম এবং তুলনার নিমিত্ত কূর্ম ও গরুড় পুরাণোক্ত নামও দেওয়া যাইতেছে।

	কূর্ম ও গরুড় পুরাণে		বৃহদ্ধর্ম পুরাণে
১।	সনৎকুমার (আদি)	১	আদি
	নারসিংহ	২	আদিত্য
	স্কান্দ	৩	বৃহন্নারদীয়
	শিবধর্ম বা নন্দীশ্বর	৪	নারদ
	দুর্বাসস্	৫	নন্দীশ্বর
৬	নারদীয়	৬	বৃহন্নন্দীশ্বর
৭।	কাপিল	৭।	শাম্ব
-	বামন	৮	ক্রিয়াযোগসার
৯	উশনস্	৯।	কালিকা
১০	ব্রহ্মাণ্ড	১০।	ধর্ম
১১	বারুণ	১১।	বিষ্ণুধর্মোত্তর
১২	কালিকা	১২।	শিবধর্ম

কূর্ম ও গরুড় পুরাণে	বৃহদ্ধর্ম পুরাণে
১৩। মাহেশ্বর	১৩। বিষ্ণুধর্ম
১৪। শাম্ব	১৪। বামন
১৫। সৌর	১৫। বারুণ
১৬। পরাশর	১৬। নারসিংহ
১৭। মারীচ	১৭। ভার্গব
১৮। ভার্গব	১৮। বৃহদ্ধর্ম

বৃহদ্ধর্ম পুরাণ তিন খণ্ডে বিভক্ত—পূর্ব, মধ্য, উত্তর। তিন খণ্ডে ৮১ অধ্যায় আছে। পূর্বখণ্ডে ধর্মমাহাত্ম্য, মধ্যখণ্ডে গঙ্গামাহাত্ম্য, এবং উত্তরখণ্ডে বিবিধ ধর্মোপদেশ কীর্তিত হইয়াছে। "ইদং হি বৈষ্ণবং শাস্ত্রং শৈবং শাক্তং তথৈবচ। সাংখ্যযোগ-পরঞ্চৈবং সারাত্ম জ্ঞানদং দ্বিজ॥" "ইহা বৈষ্ণব, শৈব, ও শাক্ত শাস্ত্র। ইহা সাংখ্য যোগের অনুমত এবং সাধু ও আত্মজ্ঞানপ্রদ।"

প্রথমে বৃহদ্ধর্ম পুরাণের দেশ দেখি।

(১) তুলসীবৃক্ষের জন্মবৃত্তান্তে (পূ ৭), মহাদেব দুর্গার সহিত বনশোভা দর্শন মানসে বিচরণ করিতে করিতে কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষ দেখিলেন। যথা, মালতী, মল্লিকা, যূথিকা, তগর, কুন্দ, মন্দার, শেফালী, কুটজ, কনক (ধুস্তূর), চম্পক, কেশর, শিরীষ, নবমল্লিকা, মুচুকুন্দ, এবং বন্ধূক। অনন্তর দেখিলেন, কদম্ব, পনস, চূতাম্র, আম্রাতক, অশ্বত্থ, বট, নিম্ব, শিংশপা, চন্দন, লাঙ্গলী, তাল, হিন্তাল, গুবাক, বেত্র, বংশ, খর্জুর, বেতস, নীপ, নল, শাল, পিয়াল, নমেরু, এবং কোবিদার। দশম অধ্যায়ে শঙ্করের প্রিয় পুষ্প পাইতেছি,—করবীর, শেফালিকা, কুন্দ, মল্লিকা, দ্রোণপুষ্প, চম্পক, শিরীষ, নাগকেশর, মুচুকুন্দ, তগর, তুলসী, বজ্রপুষ্প, ধুস্তূর, কেতকী, পদ্ম। এই সকল বৃক্ষের নাম কবি তাঁহার পঠিত সাহিত্যে ও সংস্কৃত-কোষে পাইয়া থাকিবেন। কিন্তু মানুষের স্বভাব এই, পরিচিত ও দৃষ্ট বৃক্ষই তাহার অধিক মনে পড়ে। আর, দেখাও যাইতেছে, কবি নানাদেশ-জাত বৃক্ষের নাম করেন নাই। মালতী অবশ্য জাতি (চামেলী)। একটি নাম মন্দার পাইতেছি। এটি অবশ্য স্বর্গীয় মন্দার বৃক্ষ নয়, পারিভদ্র-মন্দার হইবে, অর্থাৎ পালিতা মাদার। আর একটি নাম নমেরু। এটি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। ইহাকে ছাড়িয়া দিলেও ক্ষতি নাই। চূত শব্দে আম্র বুঝি; চূতাম্র লিখিয়া কবি ক্ষুদ্রাম্র অপর নাম কোশাম্র (কোশম, কুশুম) হইতে পৃথক করিয়াছেন। চন্দন শব্দে রক্তচন্দন, অন্য নাম কুচন্দন, বুঝিতে হইবে। লাঙ্গলী, নারিকেল।

এখন প্রথম দ্রষ্টব্য, নারিকেল। নারিকেল বৃক্ষ সমুদ্রতীর হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে জন্মে। অতএব কবির দেশ, সমুদ্র হইতে দূরে নয়। হিন্তাল গাছও সমুদ্রের লোণাজল অপেক্ষা করে। আর এক দিকে দেখিতেছি, দেশ শুষ্ক প্রস্তরময়। নইলে কুটজ (কুড়চি)' শিংশপা (শিশু), পিয়াল, কুচন্দন, ও কোবিদার (রক্তকাঞ্চন) পাইতাম না। অতএব সমুদ্র হইতে দূরে নহে; পাথর জঙ্গলও দূরে নহে, এমন দেশ, যে দেশে এই সকল বৃক্ষ স্বচ্ছন্দে জন্মে। জন্মগ্রামের পাশেই বন থাকিবে এমন কথা নয়। এমন দেশ রাঢ় হইতে পুরী পর্যন্ত মনে হয়। দুই শত বৎসর পূর্ব পর্য্যন্ত রাঢ়ের পশ্চিমার্দ্ধ অরণ্যময় ছিল। কেশর, নাগকেশর। নমেরু নামে কেহ বুঝিয়াছেন রুদ্রাক্ষ। রাজনির্ঘণ্ট মতে সুরপুন্নাগ। পুরীর নিকট সাক্ষীগোপল গ্রামে "ছুরিয়ানা" নামক বৃক্ষের উপবন আছে। ছুরিয়ানা, ওড়িয়া নাম। কেহ কেহ ইহাকেই সুরপুন্নাগ বলেন। ফুলের সৌরভে ও পাতার সৌন্দর্য্যে সুরপুন্নাগ নামের উপযুক্ত বটে। কালিকা পুরাণে নমেরু বৃক্ষ নাম আছে। সেখানেও ইহা রুদ্রাক্ষ হইতে পারে না। পুন্নাগ, ওড়িয়া নাম পুনাঙ্গ; ওড়িষ্যায় প্রচুর। কুটজের এক নাম গিরিমল্লিকা, ইহার বীজের নাম কলিঙ্গ। সে দেশে উল্লিখিত সকল বৃক্ষই আছে। পূর্বকালে রাঢ়ের পশ্চিম ভাগের নাম কলিঙ্গ ছিল। বাঁকুড়ায় পিয়াল আছে। কিন্তু কবি গঙ্গাতীরের এত মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন যে, তাহাকে গঙ্গাতীরবাসী মনে করিতে সন্দেহ হয় না। অতএব মনে হয়, তাঁহার নিবাস বর্দ্ধমান জেলার পূর্বাংশে ছিল।

(২) দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে শিব সেই মৃতদেহ মাথায় লইয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু চক্র দ্বারা সে দেহ ছিন্ন করিলেন। যেখানে যেখানে সতীর অবয়ব পড়িয়াছিল, সেখানে সেখানে এক মহাপীঠ হইয়াছে। এইরূপে ৫১ মহাপীঠের উৎপত্তি। কিন্তু কবি মাত্র তিনটি পীঠ উল্লেখ করিয়াছেন। একটি কামরূপে (ম।১০)। ইহার মহিমা জ্ঞাত হইতে কালিকা পুরাণ দেখিতে বলিয়াছেন। দ্বিতীয়টি বীরভূমের বক্রেশ্বর। ইহার নিমিত্ত ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ দেখিতে বলিয়াছেন। তৃতীয়টি উজ্জয়িনীতে। কবি লিখিয়াছেন, "উজ্জয়িনী-পুরে মঙ্গল কোষ্ঠপীঠ, যেখানে শুভ মঙ্গল-চণ্ডী, বরদায়িনী হইয়া আছেন। (পূ।১৪)। এই উজ্জয়িনী মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণের উজানীনগর, বর্তমান নাম মঙ্গল-কোট। কবি এই কথা বলিতে বলিতে লিখিয়াছেন, যেখানে বহু জাতির বাস, সেখানেও উত্তম তীর্থ। এখানে এই তীর্থের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে। মনে হয় কবির জ্ঞাতিগণের নিবাস মঙ্গলকোটে এবং তাঁহার নিবাস পূর্ব্বদিকে গঙ্গার নিকটে ছিল।

কবি ত্রিবেণীকে তীর্থ বলিয়া বিশেষ করিয়াছেন (পূ।৬)। প্রয়াগে গঙ্গার সহিত সরস্বতী ও যমুনা যুক্ত হইয়াছে, ত্রিবেণীতে মুক্ত হইয়াছে। অন্য কারণে মনে হয়, কবির নিবাস ত্রিবেণীর নিকটে ছিল।

(৩) কবি যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ আছে। (উ।১৬)। দেবতারা ভগবতীর স্তব করিতেছেন। স্তবে বলিতেছেন, "আপনি জলে গোধিকা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কালকেতুর প্রতি বরদা হইয়াছিলেন। আপনি শুভা-মঙ্গল-চণ্ডিকা। আপনি কমলে কামিনী রূপে গজগ্রাস ও বমন করিয়া বণিক্ ও তৎ পুত্রকে শ্রীশাল-বাহন রাজার কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।" শুভা-মঙ্গল-চণ্ডিকার এই যে মাহাত্ম্য, তাহা বোধ হয়, ভারতের অন্য কোন প্রদেশে প্রকাশিত হয় নাই। মুকুন্দরামের চণ্ডী হইতে, জানি, কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হইয়াছিলেন। এই গুজরাট কলিঙ্গের নিকট ছিল। এ বিষয়ে রাঢ়ের ইতিহাসে দেখা যাইবে। অতএব কালকেতু ও শ্রীমন্তের কাহিনী বৃহদ্ধর্ম পুরাণের একটি শ্লোক হইতে অন্য দেশীয় লোকের বুঝিবার সম্ভাবনা ছিল না।

(৪) এই পুরাণে (উ।১৩), ছত্রিশ শঙ্কর জাতির নাম, উৎপত্তি, ও বৃত্তি বর্ণিত আছে। বঙ্গদেশে "ছত্রিশ জাতি" বলা সাধারণ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও আছে। আমরা কথায় বলি, "ছত্রিশ জাতির ভাত।" এই সকল জাতি বঙ্গদেশে অদ্যাপি আছে। ওড়িষ্যায় শূদ্রবর্ণ ছত্রিশ জাতিতে বিভক্ত নয়।

বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কাল

এখন বৃহদ্ধর্ম পুরাণের কাল বিবেচনা করি।

(১) এই পুরাণে (ম।১০), তিথ্যাদি-কৃত্য বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণের কালে রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতি "তত্ত্ব থাকিলে, পুরাণকারের তিথি-কৃত্য লিখিবার প্রয়োজন হইত না। রঘুনন্দন ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার "তত্ত্ব" লিখিয়াছিলেন। অতএব এই পুরাণ উক্ত শতাব্দের পূর্ব্বে রচিত।

মহারাজা রণজিৎ সিংহ

একখানি প্রাচীন চিত্রের প্রতিলিপি

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

(২) এই পুরাণে যে দুর্গাপূজাপদ্ধতি প্রদত্ত হইয়াছে (৬।২০), তাহা কালিকা পুরাণ হইতে গৃহীত। অতএব বৃহদ্ধর্মপুরাণ কালিকাপুরাণের পরে রচিত। কালিকাপুরাণ আসামে দশম শতাব্দে প্রণীত মনে হয়।

(৩) ইহাতে কালী তারা মহাবিদ্যা ইত্যাদি দশমহাবিদ্যার নাম আছে। (মৃ।৬) দশমহাবিদ্যা গণনা প্রাচীন। কিন্তু ইহাতে আছে, "শিব, মন্ত্র-তন্ত্র আগমকর্তা, হরি স্বয়ং বেদকর্তা। আগম ও বেদ, দুইই মঙ্গলদায়ক। কিন্তু দুরূহ, দুর্ঘট, দুর্জ্ঞেয় ও দুষ্পার। শাক্ত ও বৈষ্ণব, ভিন্ন নয়। বিষ্ণুভক্তি না থাকিলে শাক্তবিধি আচরণ করিতে পারা যায় না।" অন্যত্র (উ।৬) আছে, "শাস্ত্র নিষিদ্ধকালে মদ্য, মৎস্য, মাংস ও নরবলির দ্বারা শক্তির পূজা করিবে না।" মঙ্গল চণ্ডীর প্রতি ভক্তি হইতেও বোধ হয় কবি চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে পড়েন নাই। তিনি, বৎসরের বার মাসের মধ্যে আষাঢ়, কার্তিক, মাঘ ও বৈশাখ, এই চারি মাস শ্রেষ্ঠ গণ্য করিয়া এই চারি মাসের বিশেষ বিশেষ কৃত্য লিখিয়াছেন। কিন্তু কার্তিক মাস কৃত্যের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের রাস উল্লেখ করেন নাই। বার মাসের বেলায় করিয়াছেন (উ।২১)। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা তৎকালে স্মরণীয় উৎসব হয় নাই।

(৪) এই পুরাণে ম্লেচ্ছ নারী ও যবন নারী গমনে জাতিপাতের কথা আছে। আরও আছে কলিকালে যবন প্রাধান্য হইবে। অর্থাৎ কবির কালে পূর্ণভাবে হয় নাই। রাঢ়ে ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ পর্যন্ত হয় নাই, স্থানে স্থানে হিন্দুরাজা ছিলেন। লিখিত আছে (উ।২০) যবনের সহিত সংসর্গ ও যবনীভাষা সুরাপান তুল্য। যবনান্ন ততোঽধিক।" অতএব এই পুরাণ ত্রয়োদশ শতাব্দের কিছু পরে আসিয়া পড়িতেছে।

চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস এই পুরাণের কালে ছিলেন। এই পুরাণ হইতে তাঁহাদের কালের দেশের অবস্থা জানিতে পারা যাইবে।

কবির কালে দেশে যবন অধিকার হইলেও ছোট বড় অনেক রাজা ছিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যের প্রজাপালন ও শাসন করিতেন। তাঁহাদের গড় ছিল, সৈন্যও ছিল, রাজ্যের সপ্ত অঙ্গ ছিল। কবি রাজাকে পরিখা খনন, যুদ্ধ-সামগ্রী সংগ্রহ, চরদ্বারা রাজ্য দর্শন, মন্ত্রিগণের সহিত মন্ত্রণা প্রভৃতি করিতে বলিয়াছেন।

কবি ব্রাহ্মণকে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডী-স্তব ও মহাভারতের গীতা পাঠ করিতে বলিয়াছেন। লিখিয়াছেন, যিনি চণ্ডী ও গীতাপাঠ, হরিনাম স্মরণ ও গঙ্গাস্নান না করেন, তাঁহার জন্ম বৃথা (উ।৭)।

কবির কালে, গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, অম্বিকা এই পঞ্চদেবতার পূজা সকল মঙ্গল কার্যে করা হইত (উ।৯)। পঞ্চ দেবতার পূজা কোথায় কবে প্রবর্তিত হইয়াছিল, বলিতে পারি না। কালিকাপুরাণে ইহার চিহ্ন পাই না। রাঢ়ে বিঘ্নবিনাশক গণাধিপের পৃথক পূজা হয় না বোধ হয় গণেশের মন্দিরও নাই। সূর্যপূজার মন্দিরও নাই। ওড়িষ্যার কণারকে কোনার্ক নামে অর্কক্ষেত্র আছে। কিন্তু সে বহুদূরে। এখন বালিকারা অগ্রহায়ণ মাসে মিত্রপূজা করে। মিত্র, দ্বাদশ আদিত্যের এক আদিত্য। গ্রহবৈগুণ্য হইলে লোকে সূর্যার্ঘ দান করে। এই পুরাণে দেখিতেছি, সে কালে লোকে অবিঘ্ন ব্রত করিত। চতুর্থী তিথিতে গণেশ পূজা হইত। পাঁজিতেও "গণেশচতুর্থী" লিখিত হইতেছে। সে কালে সূর্যব্রত ও সূর্য পূজাও প্রচলিত ছিল। (উ।৯)। সপ্তমীতিথি সূর্যব্রত ও পূজার তিথি। পাঁজিতেও কয়েকটি সপ্তমীর সহিত সূর্য নাম যুক্ত আছে, কিন্তু মাত্র দুই একটি প্রসিদ্ধ আছে।

অষ্টমী তিথি, অম্বিকার তিথি বলিয়া জানি। কবির কালে সে তিথি শিবপূজারও ছিল। সে কালে চৈত্রমাসে শিবোৎসব হইত। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র করিত, ব্রাহ্মণ করিতেন না। এটি বর্তমান কালের চড়ক। বিষ্ণুপূজার নিমিত্ত একাদশী, বৈষ্ণবী তিথি। অন্য তিথিতেও হরির পূজা ও উৎসব হইত। অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল, আষাঢ় মাসে রথ। কিন্তু কবি রাস ভুলিয়া গিয়াছেন। আশ্বিন মাসে শুক্ল নবমীতে দুর্গাপূজা। এটি 'বার্ষিক দুর্গাপূজা'। চৈত্রমাসে পূজার কথা নাই। এই পঞ্চদেবতার পূজা ব্যতীত শ্রাবণ-শুক্ল-পঞ্চমী ও ভাদ্র শুক্ল-পঞ্চমীতে নাগপূজা হইত। কবি কিন্তু মনসার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্য সম্বন্ধে পৌরাণিক কথা শোনান নাই। দেখা যাইতেছে, তখনকার তুলনায় এখন ব্রতের ও দেবদেবীর পূজার সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছে।

এই পুরাণের কবিকে পশু ও নরবলি দিতে দেখিতেছি, হরিনাম স্মরণ ও গঙ্গাস্তব করিতে দেখিতেছি। শিবকেও অমান্য করিতে দেখি না। তিনি কোন্ 'যুগে' ছিলেন? কেহ কেহ বর্তমান হিন্দু-ধর্মকে পৌরাণিক ধর্ম বলেন। কিন্তু কোন পুরাণ বেদের বিরোধী নয়, কোনও মতেরও প্রতিষ্ঠাতা নয়। বেদের পর স্মৃতি মান্য। বর্তমান হিন্দুধর্ম, স্মার্তধর্ম। আমরা স্মৃতি মানিয়া চলি।

কবি ইন্দ্রমূর্তি পটে লিখিয়া ভাদ্র মাসের শুক্ল প্রতিপৎ হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পূজা করিতে বলিয়াছেন। "কারণ ইন্দ্র পৃথিবীতে স্বয়ং ব্রীহি, শস্য ওষধি পালন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ রাজার ইন্দ্রপূজা কর্তব্য। তিনি ভার্যাগণ, অনুযাত্র, আয়ুধ বাহন সহিত পূজা করিবেন। দ্বাদশীতে রাজা স্বয়ং ইন্দ্রধ্বজ উত্তোলন করিবেন।" বঙ্গে আর হিন্দু রাজা নাই, প্রাচীন কালের শক্রোত্থানও নাই। শত বৎসর পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরে হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহার রাজ্যে এখনও ইন্দ্রপূজা হইয়া থাকে।

এই পুরাণে সদাচার সম্বন্ধে নানা উপদেশ আছে (উত্তরখণ্ড)। ইহা হইতে কবির কালের শিষ্টাচার জানিতে পারা যায়। কবি চারি বর্ণই দেখিয়াছিলেন এবং ইহাদের পৃথক পৃথক ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ব্রাহ্মণের দেবশর্মা, ক্ষত্রিয়ের রায় ও বর্মা, বৈশ্যের ধনসংজ্ঞা, ও শূদ্রের দাস সংজ্ঞা যোগ করিবে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্ত্রীর নামে দেবী, বৈশ্য ও শূদ্র স্ত্রীর নামে দাসী যোগ করিবে।

পূর্বে বঙ্গভাষায় কবি ককারাদি ক্রমে 'চৌত্রিশা' রচনা করিতেন। এই পুরাণে চৌত্রিশার সূত্রপাত হইয়াছে (মা২০)। কবি গঙ্গার সহস্র নাম করিয়া তৃপ্ত না হইয়া ক হইতে ক্ষ এবং অ হইতে ঔ অং, অঃ, ক্রমে আবার নাম করিয়াছেন।

কেবল চৌত্রিশায় নয়, বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন কবি সংস্কৃত ভাষার পৌরাণিকের তনয় হইয়াছিলেন। এই পুরাণের উপাখ্যানের সহিত কবিকঙ্কণের তুলনা করিলে দেখি, উভয়েই সেই দক্ষযজ্ঞ নাশ, হরপার্বতীর বিবাহ, গণেশের জন্ম, গঙ্গার উৎপত্তি প্রায় একই রূপ। কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যানে চণ্ডীর মাহাত্ম্য বৃহদ্ধর্ম পুরাণের পূর্ব হইতে লোকমুখে প্রচলিত ছিল। পরে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের লেখনীতে সংস্কৃত ভাষার পুরাণের বিষয় হইয়াছিল। কবিকঙ্কণ কাব্য লেখেন নাই, পুরাণ লিখিয়াছেন। রামাই পণ্ডিত পুরাণ লিখিয়াছেন। 'মঙ্গল' নামে যে সব পুথী লিখিত হইয়াছিল, সে সব বাঙ্গালা পুরাণ। এই সকল পুরাণের মূল, বাঙ্ময়ী মূর্তিতে দেশময় বিদ্যমান ছিল।

এই পুরাণে একটা নূতন কথা পাইতেছি। আশ্বিন হইতে বৎসরের মাস গণনা হইত। "আশ্বিনাদ্যা মতা মাসাঃ সৌরচান্দ্র প্রমাণতঃ।" (পূ।১৫)। আশ্বিন ও কার্তিক লইয়া শরৎ ঋতু।

উল্লিখিত নিদর্শন হইতে জানিতেছি, পুরাণখানি ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দের অধিক পরে আনিতে পারা যায় না। এ বিষয়ে শঙ্কা হইতে পারে যে, (১) পুরাণ-কার প্রাচীন সময়ের কথা লিখিয়াছেন, তাঁহার সময়ের কথা লেখেন নাই। কিন্তু ধর্মশিক্ষা দেওয়া এই পুরাণের এত স্পষ্ট উদ্দেশ্য যে, সে শঙ্কা আসিতে পারে না। (২) ইহাতে যে সকল উপপুরাণের নাম আছে, যেমন বৃহন্নারদীয়, বৃহৎ নন্দীশ্বর, এই সকল পুরাণ কি এই পুরাণের পূর্বে? ইহার উত্তর এই, ঐ সকল পুরাণের নাম আছে বলিয়া উহারা পূর্ববর্তী কি পরবর্তী তাহা বলিতে পারা না। অনেক পুরাণে অষ্টাদশ মহাপুরাণের নাম আছে। এইরূপ নামোল্লেখ পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩৩৭ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

—

বঙ্গনারীর বিশেষত্ব

বিশেষত্ব বল্লেই যে শুধু গুণ বোঝায় তা নয়, দোষেরও বিশেষত্ব থাকতে পারে—যথা, কতকগুলি দোষ কিম্বা ত্রুটি, দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতা আমরা বঙ্গনারীরা উত্তরাধিকারসূত্রেই হোক কিম্বা দেশাচার, সমাজ-প্রথার অনুমোদনেই হোক, নির্ব্বিচারে ভোগদখল ক'রে আসছি। আমরা অধিকাংশ সময়েই দুর্ব্বল মাতা, কন্যা, ভগ্নী ও পত্নী। আমরা মনে করি, ভালোবাসা মানে বুঝি আমাদের পুত্র কন্যা স্বামী ভ্রাতা ও পিতা যা করেন তারই সাহচর্য্য করা,—তাঁদের মতের বিরুদ্ধে কিছু না বলা কিম্বা না করাই আমাদের স্নেহপ্রেমের পরিচয় দেবার প্রকৃষ্ট প্রথা। অন্তর্য্যামী যখন বলে, এ যে ব্যাপার চলছে, এ তো ঠিক হ'চ্ছে না, তবু দেখি তার পরিবর্ত্তন করবার সাহস, সৎবুদ্ধি কিম্বা মানসিক শক্তিপ্রয়োগে আমরা অগ্রসর হইনে, দিনের পর দিন, অন্যায়ের পোষকতা ক'রে, অবিচারের বিধানে সম্মতি ও দুষ্কর্ম্মের শাস্তিবিধান না ক'রে, সেটা অপরের চক্ষু হ'তে আড়াল ক'রে রাখবার জন্যেই চেষ্টিত হই। স্বামী মদ্যপ, অথচ তাঁর হৃদয় উদার, স্নেহশীল, অন্য সকল বিষয়ে চরিত্রবান্, চাঁদের কলঙ্কের মত ঐ দোষটুকু গেলেই সংসার সুখের হয়; আর এই অকারণ অপরিমিত ব্যয়বহনের ফলে, সংসারে অস্বচ্ছলতা, গৃহে অশান্তির সৃষ্টি করে, তবু আমরা কয়জন বঙ্গজননী, ভগিনী, কন্যা কি পত্নী তার প্রতিবিধানে চেষ্টিত হই? বরং সুখস্বাচ্ছন্দ্য-বিধানে তৎপরতা দেখিয়ে থাকি। চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি ছেলেটি অসৎ সংসর্গে নষ্ট হ'চ্ছে, তাকে সে সম্বন্ধে সতর্ক কিম্বা শাসিত না ক'রে বরং তার দোষ ত্রুটি স্বামীর চক্ষের আড়াল ক'রে তাকে উচিত দণ্ডের হাত হতে রক্ষা ক'রে ভাবি, মাতার কর্ত্তব্যপালন করা হ'ল। আমাদের শাস্ত্রেই বলে, পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী। কিন্তু স্বামী যখন কোন সমাজ-সংস্কার কাজে কিম্বা দেশোদ্ধার ব্রত নিয়ে প্রাণপাত করছেন, তখন আমরা কজন তাঁর সহায় হই?—তাঁকে উৎসাহ দিয়ে তাঁর ত্যাগধর্ম্মের পোষকতা করি? স্বামী চান মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় ক'রে তাকে তার মনোমত বরে বিবাহ দেবেন, স্ত্রী কিন্তু অনেক সময় তাঁর প্রতিকুলাচরণ করেন, জাতিধর্ম্ম সব বিনাশ গেল, সমাজে মুখ দেখান দায় ইত্যাদি নানা বাধার সৃষ্টি ক'রে তাঁর জীবন বরং অতিষ্ঠই ক'রে তোলেন।

দোষসংশোধন এবং গুণের সমর্থন করাই স্নেহ-প্রেমের প্রধান কর্ত্তব্য, এই কথা আমাদের সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। এই যে মধুর মা নাম, এর মূলের ধাতুগত অর্থ—যিনি পরিমাণ ক'রে সব দিয়ে থাকেন, শুধু চাল ডাল তেল নুন লকড়ি নয়, স্নেহ ও শাসন, প্রেমের আতপত্র ও সংযমনের রুদ্র দণ্ড দুইই তাঁর কর-ধৃত হওয়া আবশ্যক। প্রকৃতি ও পুরুষের মধ্যে প্রকৃতি অর্থাৎ নারীকেই শক্তি-স্বরূপিণী বলা হয়। পুরুষ নির্ব্বিকার, উদাসীন; সে কথা অন্যে বিস্মৃত হ'লেও আমরা স্বয়ং স্মরণ রাখি না কেন? এ বিপুল বিশ্বসংসারে প্রকৃতিই পরিবর্ত্তন-শীল—গঠন-নিপুণ জীবনধারার গতি তিনিই নিয়ন্ত্রণ ক'রে আসেন।

তাই আমরা যাঁরা প্রত্যেকেই এই শক্তির আধার, আমাদের এ দুর্ব্বলতায় প্রবল প্রলয় এসে উপস্থিত হয়,—উন্নতি ব্যাহত, গতি অবরুদ্ধ হ'য়ে পড়ে,—জীবনীশক্তির প্রাচুর্য্য স্থগিত হ'য়ে যায়। তাই সমাজে সংসারে, দেশে কালে আমাদিগকেই অবহিত হ'য়ে চল্‌তে হয়। দেশে দেশে কালে কালে এ বিশ্বে নারীর দ্বারাই আদর্শ ও ধর্ম্ম রক্ষিত ও পালিত হ'য়ে আসছে—আমাদের দেবীপ্রতিমার হাতে যেমন 'লক্ষ্মীর' লীলাকমল, তেমনি চণ্ডীর সংহারের প্রহরণ। তাই বলি, আমরা যেন স্মরণ রাখি নারী অবলা ন'ন, শক্তিস্বরূপিণী।

আমি যে দৌর্ব্বল্য দোষ বলেছি সেইগুলি প্রত্যেকটিই আবার অপরপক্ষে গুণ—স্নেহ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, সত্য সবই গুণ, বিশেষ করে বঙ্গনারীর বিশেষত্ব। তবে সর্ব্বমত্যন্ত গর্হিতং, সীমা অতিক্রম করলেই গুণই দোষ হ'য়ে দাঁড়ায়—গণ্ডী পেরোতে দিতে নেই—সেই যে পড়েছিলাম 'গুণ হয়ে দোষ হ'ল বিদ্যার বিদ্যায়।' স্নেহ করি ব'লেই স্নেহপাত্রকে, প্রিয়জনকে, প্রেমাস্পদ দয়িতকে আদর্শের অনুকূল সর্ব্বাঙ্গসৌন্দর্য্যে ভূষিত দেখিতে চাই—এবং চাওয়াই কর্ত্তব্য, এই কথাটি যেন ইষ্টমন্ত্রের মত অন্তরে জপ করি—আর কাজে 'মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন' করতে অবহেলা না করি।

বঙ্গনারীর নমনীয়তা, কমনীয়তা শ্রীমণ্ডিত তাঁর শ্যামা স্নিগ্ধ মূর্ত্তি কাকে না মুগ্ধ করে? তাঁর স্বামীপুত্রের আত্মীয়বন্ধুর জন্যে আত্মত্যাগ, নির্ব্বাক ধৈর্য্য, সংসারের সুখশান্তি বিধান করা,—স্বদেশে বিদেশে প্রবাসে যেখানেই থাকি না কিম্বা যাই না কেন, জীবনের ঊষর মরুভূমিতে সলিলশীতল, নির্ঝরমুখরিত, তরুচ্ছায়ামণ্ডিত মরুদ্বীপের মত মনকে স্বস্তি দান না করে? কতই তো সজ্জা দেখি চিত্রকরের চিত্রে, ভাস্কর-গঠিত শিল্পে, সৌন্দর্য্যের চরম আদর্শ গ্রীসীর মূর্ত্তিতে, তবু ঐ যে আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের সীমন্তে গোধূলির রক্তরাগের সিন্দূর-রেখা বালার্ক-বিন্দুর মত ললাটের সিন্দূর-টিপ, লাল ও চওড়া পাড় ঘোমটা-খানি, তাঁর পায়ের রাঙা আলতা, হাতের কুন্দধবল শাঁখা ও সোনার কঙ্কনে সজ্জিত অপরূপ শ্রীমূর্ত্তির মত কিছু তো মনকে মুগ্ধ ও অভিভূত করে না। তাঁরা যুগে যুগে বঙ্গলক্ষ্মী হ'য়েই দেশের, দশের, দশার উন্নতি করুন,—আমাদের জীবনের অভীষ্ট-তীর্থে অগ্রণী হ'য়ে চলুন, এই প্রার্থনা করি ও করব।

বঙ্গলক্ষ্মী, বৈশাখ ১৩৩৭ শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

স্বাধীন হিন্দুজাতির বিবাহ-প্রকরণে সঙ্কোচ-সাধন :—স্বামী ভূমানন্দ কৃত ; পৃঃ ৷৵০+৫৯, মূল্য ।৵০ ।

শ্রীযুক্ত শারদার বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন বিধিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে—রব উঠিয়াছে 'ধর্ম্ম গেল!' 'ধর্ম্ম গেল!' ধর্ম্মটা এই—আঁতুড়ঘর হইতে একটা কচি খোকা ও কচি খুকীকে কোন উপায়ে বাহির করিয়া একটা সভাতে আনা হইল, এ সভা বিবাহ-সভা। খোকা-খুকী ঈশ্বর ও সমাজকে সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, তাহারা পরস্পরকে স্বামী-স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিল। তাহারা কথা বলিতে শেখে নাই, তাহাদের পিতাই তাহাদের প্রতিজ্ঞা পাঠ করিলেন। সকলে স্বীকার করিয়া লইলেন, প্রতিজ্ঞা ধর্ম্মসঙ্গতই বটে ও সুতরাং বিবাহও ধর্ম্মবিবাহ।

একটা পয়সার দেনা-পাওনা বিষয়ে যাহাদের কোন অধিকার নাই, তাহাদের অধিকার আছে পতি বা পত্নী গ্রহণ করিবার। সমস্তটাই ফাঁকি, অথচ ইহাই নাকি ধর্ম্ম। ইহাতে বাধা পড়িলেই ধর্ম্ম গেল! সমাজের অবস্থা এই।

স্বামী ভূমানন্দের পুস্তকখানি সময়োপযোগী হইয়াছে। তিনি শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিয়াছেন। তাঁহার সিদ্ধান্ত এই—রঘুনন্দনের মতে রজস্বলা কন্যার বিবাহ দোষজনক হইতে পারে, কিন্তু "প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ" যাঁহারা মনে রাখিতে পারিবেন, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, "শারদা বিলে" বেদ ও বেদানুগামী শাস্ত্রের মান্যই রক্ষা হইয়াছে, বেদদ্রোহিতা কেহ করেন নাই।"

এই পুস্তকের বহুল প্রচার প্রার্থনীয়।

ভাগবত ধর্ম্ম :—শ্রীঅবনীমোহন বটব্যাল কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং অনুবাদিত, এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত (ঢাকা, গেণ্ডারিয়া, ফরিদাবাদ ডাকঘর)। পৃঃ ৷৷০+৮৪ ; মূল্য ৷৷০ ।

এই পুস্তকে শ্রুতি, স্মৃতি এবং অপরাপর গ্রন্থ হইতে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ক অনেক উক্তি সংগৃহীত ও অনূদিত হইয়াছে। গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "এতৎ পুস্তক ধৃত মহাজন বাক্যচয় শ্রীমদাচার্য বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের বাক্য।"

পুস্তকে ৩৬টি অধ্যায় ; এক একটি অধ্যায়ে বিশেষ বিশেষ ভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীনপন্থাবলম্বিগণ ইহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত সুখী হইবেন। অনেক উক্তি অসাম্প্রদায়িক, উদার ও অমূল্য।

মহাভাগবত রায় মহাশয় :—শ্রীনরেশচন্দ্র দাশ কর্ত্তৃক লিখিত। প্রকাশক শ্রীদুর্গাকান্ত সেন, উকীল, আলেকান্দা, বরিশাল। পৃঃ ৵০+২৮৬ ; কাগজের মলাট ; মূল্য ১৲ ।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত গলিসাকোটা গ্রামের পার্ব্বতীচরণ রায় মহাশয়ই "রায় মহাশয়" নামে পরিচিত। জন্ম ১৭৬৯ শক, ২৫ অগ্রহায়ণ ; পরলোক গমন ১৮৪৩ শক, ৩২ আষাঢ়। ইনি একজন সুচিকিৎসক ও পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। একদিকে প্রতিভা, অপর দিকে বিনয়। তাঁহার ধর্ম্মভাবে লোকে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গ্রন্থকার কিছু অসহিষ্ণু ও অতি অনুদার ; অনর্থক বিরোধীদিগের মতামতকে অসংযত ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের পঞ্চোপনিষদ্—শ্রীসুধীরলাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীজহরলাল সরস্বতী, ১০১ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ১০০ ; মূল্য ৷৷০, কাপড়ের বাঁধাই।

এই পুস্তিকায় রাজা রামমোহন রায়ের ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ কেন, ঈশ, কঠ, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই পাঁচখানি উপনিষদ্ দেওয়া হইয়াছে।

রামমোহনই বর্ত্তমান যুগে প্রথম উপনিষদের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ করেন। এজন্য সমগ্র ভারত, বিশেষতঃ বঙ্গদেশ, তাঁহার নিকট ঋণী। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যাদি আর বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নহে। ভাষা এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রণালী অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

লক্ষ্মীছাড়া—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এম-এ, ডি-এল, প্রণীত। প্রকাশক—রাধহরি শ্রীমানী এণ্ড সন্স্। মূল্য দুই টাকা পৃঃ সংখ্যা ১৮৬।

আলোচ্য উপন্যাসখানিতে নরেশ বাবু বিবাহিত জীবনের যে শ্রেণীর সমস্যার অবতারণা করিয়াছেন। তাহা তাঁহার মত চিন্তাশীল লেখকের উপযুক্ত হইয়াছে বটে। স্বামী রমণী ও স্ত্রী ক্ষণপ্রভা উভয়েই ঐশ্বর্য্যের ফুলশয্যায় প্রথম বিবাহিত জীবন অতি আনন্দে কাটাইল, পরে পিতার সহিত মনোবিবাদ ঘটাতে তেজস্বী রমণী পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিয়া, এমন কি তাঁহার সম্পত্তির প্রতি লোভ না রাখিয়া, কলিকাতায় আসিয়া সামান্য বেতনে কোনো আপিসে চাকুরী স্বীকার করিল এবং স্ত্রীকেও আনিল। এইখান হইতেই সমস্যার সূত্রপাত—যে ভালবাসার জন্ম ঐশ্বর্য্যের আবহাওয়ায়, তাহারই আওতায় দিনে দিনে যার বৃদ্ধি, খোলার ঘরের দীনতার মধ্যে শত অভাবের তাড়নায় আঁচ সহিয়া তাহা কি টিকিয়া থাকিবে?...নরেশ বাবু এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা আমরা এখানে বলিতে চাহি না, সকলকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

উপন্যাসখানির শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া কিন্তু তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলাম না—পাঠককে বিশ্বাস করাইবার শক্তি ও নিপুণতার যে অভাব এ বইখানিতে দেখিলাম, তাহা নরেশ বাবু ত দূরের কথা, একজন সাধারণ শ্রেণীর লেখকের পক্ষেও অপযশের বিষয়। তাহা ছাড়া আখ্যানবস্তুও শেষের দিকে বেশ জমাট বাঁধিতে পারে নাই—ইহার একটা কারণ এই যে, প্রথম হইতেই লেখকের রচনাভঙ্গিতে পাঠক ধরিয়া লন যে, শেষ পর্য্যন্ত স্বামী-স্ত্রীর মিলনই হয় তো পুস্তকের বলিবার বিষয়। কিন্তু কেন জানি না এ কথা জানিবার জন্ম পাঠকের মনে কোনো কৌতূহলই জাগে না। কয়েকস্থানে ছাপার ভুল আছে।

রূপের অভিশাপ—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশক—শ্রীঅভয়হরি শ্রীমানী, ২০৪নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট। পৃঃ ২৪৭। মূল্য দুই টাকা।

পরী দরিদ্র মুসলমান ঘরের মেয়ে। রূপ লইয়া দরিদ্রের ঘরে জন্মিয়া

তাহাকে যে যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইল এবং যার আগুনে শেষ পর্য্যন্ত নিজের জীবন আহুতি দিতে হইল—নরেশ বাবুর চিত্রে সে অশ্রুসজল ছবিটি বেশ ফুটিয়াছে। উপন্যাসখানির চরিত্রগুলির কথাবার্ত্তায় পূর্ব্ব-বঙ্গের মৌখিক ভাষার ব্যবহার ভারী উপযোগী হইয়াছে। নেকজানের চরিত্র সকলের অপেক্ষা আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করে বেশী, এবং বই মুড়িয়া বন্ধ করিবার পরে ইহার কথাই অনেকক্ষণ মনে থাকে। স্থানে স্থানে একটা কৃত্রিমতার গন্ধ না থাকিলে বইখানি আরও উপভোগ্য হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীশিবপূজা-দীপিকা—শ্রীপরেশচন্দ্র রায়, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতার আর-এইচ, শ্রীমানী এণ্ড সন্সের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য বার আনা।

শিবপূজা হিন্দুভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত ; কিন্তু কি প্রণালীতে শিবপূজা করিতে হয়, তাহা অনেকে জানেন না। গ্রন্থকার নানা শাস্ত্র হইতে শিবপূজাপদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। শিবপূজা সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য কথা ইহাতে আছে। শিবরাত্রি ব্রতকথা, শিব-সহস্র নামস্তোত্র, শিবমহিম্না স্তোত্র প্রভৃতিও এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। পরিশিষ্টে শিবলিঙ্গ ও শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। মোট কথা বইখানি সব দিক দিয়াই শিবভক্ত হিন্দুদের উপকারে লাগিবে।

বিশ্বশান্তি—শ্রীযদুনাথ সিংহ, এম-এ, পি-আর-এস, কর্ত্তৃক লিখিত। অরুণাচল মিশন কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

অরুণাচল মিশনের প্রতিষ্ঠিতা ঠাকুর দয়ানন্দের নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। গ্রন্থকার তাঁহারই মতবাদ এই গ্রন্থে সাধারণকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকার পণ্ডিত, দার্শনিক ও ভাবুক ;—তিনি তাঁহার মতবাদ বিশেষ পাণ্ডিত্য ও শ্রদ্ধাসহকারেই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

এই মতবাদের তিনি নাম দিয়াছেন নবযুগের নবধর্ম্ম। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ, জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সমন্বয় ইহার মূলতত্ত্ব উদ্দেশ্য "বিশ্বমিলনী স্কীম," বিশ্বমানব সঙ্ঘ। যে নূতন ধরণের গুরুবাদ ও অবতারবাদ বাঙ্গলাদেশের নানাস্থানে কয়েকজন সাধুপুরুষকে আশ্রয় করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এই গ্রন্থে তাহার কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। এই গুরুবাদের প্রভাব দেশ ও সমাজের উপর কিরূপে কার্য্য করিতেছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীভগবানে "পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ"-যোগ শ্রীমদ্ভাগবদগীতার ব্যাপার হইয়াছে। উহা হিন্দুধর্ম্মের অতি উচ্চাঙ্গের কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু গুরুরূপী কোন মানুষকেই যদি ভগবানের আসনে বসাইয়া তাহাকে নির্ব্বিচারে সর্ব্বস্ব অর্পণ,—আত্মসমর্পণ করা যায়, তবে তাহার ফলে জাতির মধ্যে দাস-মনোভাব বৃদ্ধি পায়, তাহার নৈতিক অধোগতি হয়, এরূপ আশঙ্কা করিবার কারণ আছে। সেইজন্যই নব্য গুরুবাদ ও অবতারবাদে অনেক সময় কুফল প্রসব করিতে দেখা যায়। পরাধীন জাতির পক্ষে এই মতবাদ অধিকতর ভয়াবহ। যাহা হউক, গ্রন্থখানি সুলিখিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, সুতরাং বিচার ও আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার

পারের-চিন্তা—শ্রীমিহিরমোহন মুখোপাধ্যায়, সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।

আধ্যাত্মিক তত্ত্বমূলক কয়েকটি কবিতা ও প্রবন্ধের সমষ্টি। কতকগুলি সুচিন্তা আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষত্ব নাই।

মন্দাকিনী—শ্রীজগদীশচন্দ্র রায়গুপ্ত। সৌরভ প্রেস, ময়মনসিংহ। আট আনা।

কবিতার বই। ছন্দের ও মিলের ত্রুটি যথেষ্ট। মাঝে মাঝে সামান্য কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

রুদ্রবীণা—শ্রীপ্রিয়বল্লভ সরকার। মহেশপুর, গাঁড়াদহ, পাবনা। তিন আনা।

কবিতার বই। দেশের দাসত্বদলিত ও সমাজপিষ্ট ব্যক্তিগণের জন্য কবি বেদনাবোধ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলি উদ্দীপনাময় ও সমবেদনার পরিচায়ক। বইখানি ক্ষুদ্র হইলেও সুখপাঠ্য।

বেনলানা-সনেট্‌স্—আসাদ-উল্লাহ্। ৫২।৪ মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এই পুস্তকে কতকগুলি সনেট আছে। অধিকাংশ সনেটের ভাব অস্পষ্ট, শব্দ-প্রয়োগ অসঙ্গত, মিল দোষযুক্ত এবং ভাষা বিড়ম্বিত। নবীন গ্রন্থকারগণের মনে রাখা উচিত, পুস্তকে নিজের ছবি জুড়িয়া দিলে গ্রন্থের মূল্য বৃদ্ধি হয় না।

প

আলোচনা

গত বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের "বাঙ্গালার প্রথম" শীর্ষক উপাদেয় প্রবন্ধে Manoel da Assumpcao প্রণীত Vocabulario গ্রন্থের যে পরিচয় আছে, তাহা সম্পূর্ণ নহে। আমার *Bengali Literature* (1919) যখন লিখিত হয়, তখন এ পুস্তকখানি আমি দেখি নাই, এবং Grierson প্রভৃতি ইহার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ইহার পর, ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই গ্রন্থখানি দেখিবার সুযোগ পাইয়া, *Indian Historical Quarterly* (Vol. i. 1925, pp. 318-20) পত্রিকায় আমি ইহার একটি বিবরণ প্রকাশিত করিয়াছি। ইহার আখ্যাপত্র বা title-page-এর একটি প্রতিলিপি উক্ত প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই গ্রন্থের সমস্ত ব্যাকরণ-অংশ কাপি করিয়া আনিয়াছেন, অভিধান অংশ হইতে শব্দাদি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং অনেকগুলি পত্রের প্রতিলিপি করাইয়াছেন। আশা করি, তিনি শীঘ্রই ভাষাতত্ত্বের দিক হইতে এই গ্রন্থের পরিচয় ও মূল্যসম্বন্ধে মতামত বিদ্বৎসমাজে প্রকাশিত করিবেন।

শ্রীসুশীলকুমার দে

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৬) বলিদ্বীপ—বাঙ্‌লি

শুক্রবার ২৬শে আগষ্ট ১৯২৭।

বেলা সাড়ে দশটা এগারোটা। তখন হবে, রোদ্দুর খুব, কিন্তু ততটা গরম বোধ হ'চ্ছিল না। বাঙলিতে নেমে প্রথমটা এই অপ্রত্যাশিত লোকের ভীড় আর অদৃষ্ট-পূর্ব্ব নোতুন কাণ্ড-কারখানা দেখে আমরা একটু খানি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়-গোছ হ'য়ে গিয়েছিলুম। কোথায় উঠ্‌ছি, কি কি দেখবো, কি ক'রতে হবে, কিছুই জানি না। বলিদ্বীপের অনুষ্ঠানগুলির বিষয়ে জারমান লেখক Krause ক্রাউসের বলিদ্বীপ সম্বন্ধীয় ছবির বই দেখে, আর অন্য বই কিছু প'ড়ে, কিছু কিছু ধারণা আছে মাত্র। দক্ষিণ-মুখো হ'য়ে একটা চৌরাস্তায় আমাদের গাড়ী দাঁড়ালো। চৌরাস্তাটি বলিদ্বীপের মেয়ে আর পুরুষদের ভীড়ে ভরতি, তিল ধারণের ও স্থান নেই ব'ল্‌লেই হয়। রবীন্দ্রনাথ নামলেন, তাঁর সঙ্গে আমরা, কোপ্যার্‌ব্যার্গ পথ দেখিয়ে আগে আগে চ'লছেন লোকেরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলে। এই ভীড়ের একটি গুণ দেখলুম—এরা অতি মৃদু ভাবে কথা-বার্ত্তা কইছে, প্রায় হাজার দুই লোক জড়ো হ'য়েছে, কিন্তু অনাবশ্যক চেঁচামেচি একটুও নেই—জা'তটীকে বেশ ভব্য, কোমল, ধীর প্রকৃতির ব'লে মনে হ'ল। আর তার উপরে এদের সৌষ্ঠবপূর্ণ আকৃতি, মানান-সই রঙচঙে' কাপড়-চোপড়, আর মনোহর ছন্দোময় গতি-ভঙ্গী। গাড়ী থেকে নেমে ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমরা চৌরাস্তার পশ্চিম-মুখো সড়কে ঢুকলুম। তখন আমাদের ডান দিকে প'ড়্‌ল একটা বলিদ্বীপের প্রাসাদ, তার এক কোণে লোক-জন বসবার জন্য একটা উঁচু চার খুঁটির উপর ছাতওয়ালা ছতরীর মতন, বলিদ্বীপের ঢঙে তৈরী—যেমন ছতরী রাজপুত আর মোগল রীতির বাড়ীতে পাওয়া যায় সেই জাতীয়, তবে বাস্তু রীতিতে একেবারে অন্য ধরণের। লাল ইটে তৈরী বাড়ীর দেয়াল, উঁচু তোরণ, মাঝে মাঝে কাল পাথরের উপর নকশা কাটা, ইটের মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে বাহার ক'রেছে। বাঁ দিকে একটা বড়ো মাঠ ছিল, সেই মাঠে কাঁচা বাঁশ দিয়ে কতকগুলি উঁচু মাচা বেঁধেছে, তালপাতায় তৈরী নানা রকম ফুলপাতা ঝালর দিয়ে, রঙীন আর সোনালী কাগজ আর কাপড় দিয়ে মাচাগুলি সাজানো হয়েছে, অতি সুন্দর ভাবেই সাজানো হ'য়েছে; আর ধবধবে সাদা সুতির কাপড় দিয়ে মাচার সবুজ বাঁশ আর বাঁশের চাঁচাড়ীর ঝাঁপ প্রভৃতি ঢেকে দেওয়া হ'য়েছে। মাচাগুলি বেশ খড়ে ছাওয়া হ'য়েছে; এগুলিকে মাচা না ব'লে মণ্ডপ ব'ললেই হয়। বাঁশের আর চাঁচাড়ীর তৈরী পথ বেয়ে এগুলির উপরে উঠতে হয়। গুটী চারেক এই রকম মণ্ডপ আমাদের বাঁ ধারের মাঠটীতে ক'রেছে একটা বড়ো, পশ্চিম-মুখো; তার সামনে দুটী ছোটো, তা'রএকটির উঠবার পথ পশ্চিমে, একটির দক্ষিণে; আর এ ছাড়া আর একটি। এই মণ্ডপ-গুলির আশে পাশে লোক একেবারে যেন গিশগিশ ক'রছে।

অনুষ্ঠানটি হচ্ছে বাঙ্‌লির রাজা বা জমীদার—যাঁর উপাধি হ'চ্ছে Poenggawa বা পুঙ্গব—তাঁর এক আত্মীয়ের (বোধ হয় তাঁর এক খুড়োর) আদ্য শ্রাদ্ধ। বলিদ্বীপের ভাষায় এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানকে 'মেমুকুর' বলে। দাহ হ'য়ে গিয়েছে দিন বারো আগে, আর মৃত্যু হ'য়েছিল দাহের ৪।৫ মাস পূর্ব্বে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বলিদ্বীপে দাহ করে না, কাঠের শবাধারে মৃতদেহ রেখে দেয়, তারপরে পুরোহিতে পাঁজী-পুঁথী দেখে ভালো দিন স্থির ক'রে দেন, সেই দিনে মৃতদেহের সংকার হয়। বছরে দুবার এই দাহকর্ম্মের উপযোগী ভালো সময় আসে, কাজেই

চার পাচ মাস ধ'রে মৃতদেহ রেখে দেওয়া এদেশে সাধারণ ব্যাপার। বড়ো লোকের ঘরে আলাদা একটী কামরায় এইরূপে দেহ রক্ষিত হয়,- সাত পুরু কাপড় জড়িয়ে আর নানা মশলা লাগিয়ে। কিন্তু কিছুদিন পরেই ঘ্রাণেন্দ্রিয়-সাহায্যে লোকের জানতে বাকী থাকে না যে, বাড়ীতে, পাড়ায় বা গ্রামে একটী মৃত্যু হ'য়েছে। এইরূপ

বলিদ্বীপে নৈবেদ্য-সাজানো-- ফল ও তালপাতার সাজ

বীভৎস ব্যাপার—মৃতদেহকে মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই সৎকার না ক'রে তাকে রেখে দিয়ে ২।৩।৪ মাস পরে দাহ করা—হিন্দুরীতিতে দাহ করা আর আদিম ইন্দোনেসীয় রীতিতে মৃতদেহ মাঠে ফেলে দিয়ে আসা, বা কাপড় জড়িয়ে গাছের উপরে রেখে দিয়ে আসা—এই দুইয়ের একটা আপসের ফলে হ'য়েছে। এই ২।৩।৪ মাসের মধ্যে বাড়ীতে আর একটি মৃত্যু হ'লে, সে দেহও রক্ষিত হয়, আবার একত্র সংকৃত হয়। তারপরে, নির্দ্দিষ্ট দিনের দিন কতক আগে, শবাধার নিয়ে নানা অনুষ্ঠান, পূজা পাঠ নৈবেদ্য-প্রদান শ্রাদ্ধ-ভোজ নাটক-অভিনয় নাচ-গান শোভাযাত্রা প্রভৃতি হয়, আর খুব ঘটা ক'রে বাঁশের তৈরী এক বিরাট শবাধারে ক'রে দেহ নিয়ে গিয়ে অগ্নিকর্ম্ম করা হয়। এতে মৃতের উত্তরাধিকারী বা আত্মীয়ের বিস্তর অর্থব্যয় হয়। গরীব বা সাধারণ লোকে এত ঘটা ক'রতে পারে না, তারা মৃত্যুর কিছু পরেই দেহ ভূ-প্রোথিত করে। তারপরে শুভদিনে যখন গ্রামের বা প্রদেশের রাজা বা ভূম্যধিকারী বা অন্য ধনবান লোক যাঁর বাড়ীতে ঘটা ক'রে সৎকার করবার জন্য দেহ রক্ষিত থাকে তাঁর আত্মীয়ের যখন অগ্নিকর্ম্ম করেন, তখন সাধারণ লোকে মাটীথেকে দেহাবশেষ যা পাওয়া যায় তাই নিয়ে, অভাবে মৃতের প্রতীকস্বরূপ তালপত্রের মূর্ত্তি নিয়ে দাহকার্য্য সম্পন্ন করে। কাজেই একই সময়ে অনেকগুলি অগ্নিকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়—একটী বা দুটী ঘটা ক'রে, বাকী সাধারণ ভাবে।—দাহের পরে দেহাস্থি যা পাওয়া যায় তা সংগ্রহ ক'রে নিকটবর্ত্তী নদীতে বা সাগরে নিক্ষিপ্ত হয়। দাহের পরে নির্দ্দিষ্ট দিনে শ্রাদ্ধ, বা আমাদের শ্রাদ্ধের ন্যায় একটী অনুষ্ঠান করে, সেটী হচ্ছে এই 'মেমুকুর।'

বাঙ্‌লির পুঙ্গব এর জন্য তাঁর উচ্চ-কুলোপযোগী ব্যবস্থা ক'রেছেন। তাঁর আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি নিমন্ত্রিত হ'য়েছেন, বিস্তর প্রজা আর অন্য সাধারণ লোকও এসেছে। শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির মধ্যে একটীতে পুরোহিতেরা ব'সে ব'সে তাঁদের মন্ত্র-পাঠ নৈবেদ্যাদি প্রস্তুত করা আর অন্য খুঁটিনাটী বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুষ্ঠান যেরূপ আমাদের শ্রাদ্ধতেও আছে তাই ক'রছেন। আর একটীতে মৃতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নানা ভোজ্য উপচার, পরিধেয়, সোনা রূপার বাটী রেকাবী প্রভৃতি তৈজস ইত্যাদি রক্ষিত হ'য়েছে—আমাদের শ্রাদ্ধসভায় 'ষোড়শ' যেমন সাজিয়ে রাখা হয়, এ যেন সেই ভাব। আর একটী মণ্ডপে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কতকগুলি বাঁশ চাঁচাড়ি রঙীন কাগজ আর তালপাতায় তৈরী মানুষের চেয়েও বড়ো আকারের মন্দিরের মতন রাখা হ'য়েছে; বলিদ্বীপের মন্দিরে দেবমূর্ত্তির অধিষ্ঠান-স্থান বা গর্ভগৃহকে 'মেরু' বলে, সেই মেরু যেরূপ হয়, এগুলি সেইরূপ আকারের—কতকটা
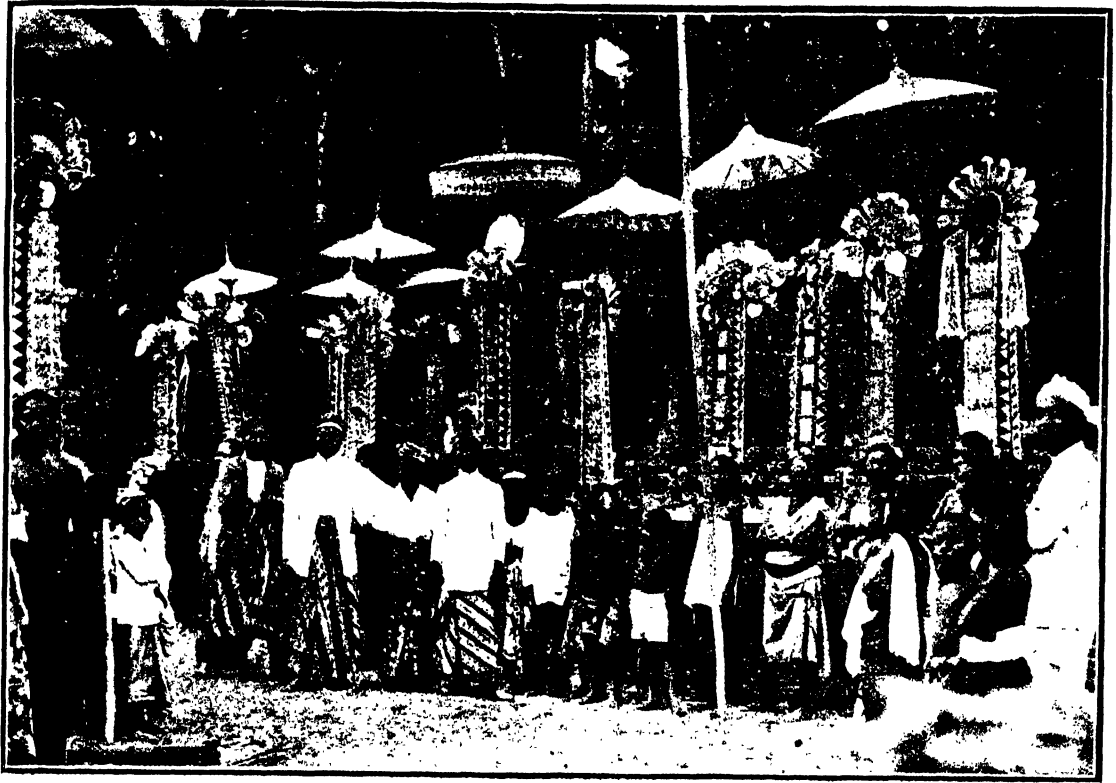
শ্রাদ্ধ উপলক্ষে] শোভাযাত্রায় মৃতগণের আত্মার প্রতীক

নেপালী মন্দির বা চীনে প্যাগোডার ভাব। মোটর থেকে নামবার কালে যে সুন্দর বাজনার আওয়াজ আমাদের কানে এসেছিল, এই মণ্ডপগুলির একটীর তলায় তার বাদকেরা স্থান ক'রে নিয়েছে; খ্রীষ্টান গির্জ্জার ঘণ্টায় যেমন নানা তালে chimes বাজে তাদের বাজনার তেমনি আওয়াজ, জনতার লোকেদের আস্তে আস্তে কথা কওয়ার সামান্য কলরবের উপরে, সমগ্র দৃশ্যটীর চমৎকার পটভূমিকার মতন শোনা যাচ্ছে। দূরে আর একটী মণ্ডপে নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীয় ব্রাহ্মণ আর অন্য বিশিষ্ট ভদ্র সজ্জন আর অভিজাত-বংশীয় লোকেদের বসবার জন্য স্থান হ'য়েছে। এদিকে রাস্তার ডান ধারে পূর্ব্ববর্ণিত প্রাসাদটীর পশ্চিমে আর একটী মাঠে না'রকল পাতায় ছাওয়া এক যাত্রার আসর তৈরী হ'য়েছে।

এই মণ্ডপ আর আসর সব পেরিয়ে আমরা বাঁ দিকের মাঠে মণ্ডপগুলির লাগোয়া ইটের তৈরী একটী pavilion বা চারটী খুঁটীর উপর ছাতওয়ালা চবুতরার মতন বসবার জায়গায় পৌছুলুম, সেখানে অনেকগুলি চেয়ার সাজানো আছে। আমাদের সেখান-বরাবর আসতে দেখে, জন কতক ইউরোপীয় আর বলিদ্বীপীয় রাজকর্ম্মচারী আর অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তি নেমে এলেন, কবিকে স্বাগত ক'রে আমাদের চবুতরায় নিয়ে গেলেন। পরিচয় হ'ল— একজন ইউরোপীয় হ'চ্ছেন শ্রীযুক্ত Leonardus Johannes Jacobus Caron লেওনার্ডস্ য়োহানেস যাকোবস্ করোন—ইনি বলি আর লম্বক এই দুই দ্বীপের ডচ্ Resident বা শাসনকর্ত্তা; বাঙ্লির পুঙ্গব—গোঁফ-দাড়ি কামানো, বলিদ্বীপীয়ের পক্ষে একটু বেশী শ্যাম বর্ণ, প্রৌঢ়বয়স্ক প্রসন্নমুখ, একটি ভদ্রলোক, পরণে বেগুণে রংয়ের রেশমী বলিদ্বীপীয় বস্ত্র, গায়ে সাদা গলা-আঁটা

কোট, মাথায় একটা রঙীন রুমাল বাঁধা, হাতে অনেক গুলি আঙটি, পায়ে চাপ্‌লি; বলিদ্বীপের আরও দু'চার জন ডচ্‌ রাজকর্মচারী; Karang-Asem কারাঙ-আসেম নামে একটী খণ্ডরাজ্যের রাজা; আর একটী খণ্ডরাজ্য Gianjar গিয়াঞ্জার-এর জমীদার, ইনি আবার ডচ্‌ সরকারের অধীনে Regent রেগণ্ট বা ম্যাজিষ্ট্রেট—(এঁদের দুজনের বাড়ীতে আমরা আতিথ্য স্বীকার ক'র্‌বো

মন্দির-দ্বার-বর্ত্তিনী নারীগণ

স্থির হ'য়েছিল); Oeboed উবুদ-এর পুঙ্গব Gde Rake Tjokorde Soekawati গডে রাকে চকর্দ্দে সুখবতী—পরে এঁর বাড়ীতেও আমাদের যেতে হ'য়েছিল। এ ছাড়া আরও অন্য বলিদ্বীপীয় জমীদার আর উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় হল, এঁরা সকলেই বাঙলির পুঙ্গবের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে এসেছেন। ডচেদের পরিধানে সাদা জীনের গলা-আঁটা কোট, সাদা পেণ্ট্‌লুন, মাথায় বড় সোলার টুপী; আর বলিদ্বীপীয় অভিজাতবর্গের পোষাক বাঙ্‌লির পুঙ্গবের মতন।

রবীন্দ্রনাথকে শ্রীযুক্ত কা রোন খুব সম্মানের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বসালেন। সকলের সঙ্গে পরিচয়ের পরে শ্রীযুক্ত কারোন রবীন্দ্রনাথকে বলিদ্বীপে স্বাগত ক'রলেন, প্রাচীন ভারতের কীর্ত্তি-মণ্ডিত স্মৃতি দেখবার জন্য তিনি বলিদ্বীপে এসেছেন, শ্রীযুক্ত কারোন তাঁর আশা জ্ঞাপন ক'রলেন যে রবীন্দ্রনাথ যা দেখ্‌তে এসেছেন তা দেখে খুশী হ'য়ে যাবেন, অধিকন্তু তিনি আশা করেন তাঁর আগমনে বলিদ্বীপীয়দের এই মনোহর হিন্দু সংস্কৃতি আরও সুদৃঢ় হবে। রবীন্দ্রনাথ যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। পথে আস্‌তে আস্‌তে বলিদ্বীপের দৃশ্য আর লোকেদের দেখে তিনি যে মোহিত হ'য়ে গিয়েছেন, সে কথা ব'ল্‌লেন। আধুনিক ভারতবর্ষ আর বলিদ্বীপ পরস্পরকে পরস্পরের মঙ্গলের জন্য জানুক, এই হ'চ্ছে তাঁর কামনা, তাঁর আগমনের এটী হ'চ্ছে একটী মুখ্য উদ্দেশ্য—এ কথা ব'ল্‌লেন। ডচেরা দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন আর আধুনিক সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ক'র্‌বার জন্য যে কার্য্য ক'রেছে, কবি তারও প্রশংসাসূচক উল্লেখ ক'র্‌লেন।—বলিদ্বীপীয় শিষ্ট আর অভিজাত ব্যক্তিগণ বিনীত শ্রদ্ধাপূর্ণ স্মিত-হাস্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে সংবর্দ্ধনা ক'রলেন, বাঙ্‌লির পুঙ্গব রবীন্দ্রনাথকে মালাই ভাষায় দু চার কথা ব'লে তাঁর গৃহে স্বাগত ক'র্‌লেন। ডচ কর্ম্মচারীরা বলিদ্বীপীয় রাজাদের সঙ্গে মালাই ভাষায় কথা কইছিলেন; কেবলমাত্র একজন রাজা ডচ্‌ জানেন, তিনি ডচ্‌ই ব্যবহার ক'রছিলেন—তিনি হ'চ্ছেন উবুদের পুঙ্গব গডে রাকে চকর্দ্দে সুখবতী। রবীন্দ্রনাথ আসছেন, সে কথা এঁরা শুনেছিলেন; ডচ্‌ কর্ম্মচারীদের কাছে শুনে তাঁর ব্যক্তিত্ব, আর আধুনিক শিক্ষিত জগতে তাঁর স্থান কোথায়, সে সম্বন্ধেও কিছু কিছু ধারণা ক'রেছেন।

আমরা বুলেলেঙে-এ যে মোটরে চড়ি, তার চালক ছিল একজন বলিদ্বীপীয়—হিন্দু। এ দেশে 'হিন্দু' এই শব্দটী অজ্ঞাত, তবে ডচেদের সম্পর্কে এসে Hindoe এই শব্দটী যে ভারতবর্ষের তথা প্রাচীন

দ্বীপময় ভারতের আর আধুনিক বলিদ্বীপের ধর্ম্ম আর সংস্কৃতিকে বোঝায়, একথা এখানকার লোকেরা এখন শিখ্‌ছে। সাধারণতঃ এদের বৌদ্ধ-মিশ্র তান্ত্রিক শৈব ধর্ম্মকে এরা Agama Bali 'আগম বলি' বা 'বলিদ্বীপের ধর্ম্ম' ব'লে থাকে; কখন কখন Agama Siwa বা Agama Boeda 'শিব বা বুদ্ধের ধর্ম্ম' ও বলে—Agama Hindoe শব্দের ততটা প্রচার হয়নি। এ-ছাড়া যবদ্বীপের মুসলমান ধর্ম্মকে Agama Islam বলে, আর ডচেদের খ্রীষ্টানধর্ম্মকে Agama Belanda বা হলাণ্ডের ধর্ম্ম বা Agama Kristen ব'লে থাকে। রবীন্দ্রনাথকে গাড়ীতে চড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাঁকে দেখে পার্শ্বে উপবিষ্ট কোপ্যারব্যার্গকে জিজ্ঞাসা ক'রলে, ইনি কে। কোপ্যারব্যার্গ মালাইয়ে ব'ললেন ইনি Voor-India বা Hindoestan থেকে আগত Mahagoeroe 'মহাগুরু'। 'মহাগুরু'—এই উপযোগী শব্দদ্বারা রবীন্দ্রনাথের যথার্থ পরিচয় হ'ল—মোটর-চালককে আর বেশী কিছু ব'ল্‌তে হ'ল না। কিন্তামানির ডাক-বাঙ্‌লাতে মোটর চালক দু-চার জন ব্যক্তিকে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় এই ভাবেই দিয়েছে—'হিন্দুস্থান থেকে আগত মহাগুরু।' পরে সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথ বলিদ্বীপে এই নামেই পরিচিত আর অভিহিত হ'তে থাকেন। আর আমার সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ের সাহায্যে আর ডচ্ বন্ধুদের মধ্যস্থতায় এখানকার রাজা আর ব্রাহ্মণ যাঁদের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল, তাঁরা সকলেই রবীন্দ্রনাথকে 'মহাগুরু' ব'লেই উল্লেখ ক'রতেন। বাঙ্‌লির নিমন্ত্রণ সভায়ও সহজেই রবীন্দ্রনাথের এই বিরুদ বা অভিধা বলিদ্বীপীয়দের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গেল।

শ্রীযুক্ত কারোন-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, আমার সম্বন্ধে তিনি দুচারটী উচ্চ প্রশংসার কথা ব'ল্‌লেন যাতে আমার নিজের অযোগ্যতা স্মরণ ক'রে আমি মনে মনে বিশেষ লজ্জিত বোধ ক'রলুম। রাজাদের সঙ্গেও আমার পরিচয় হ'ল। বাঙালীর পোষাক ধুতী পাঞ্জাবী চাদর প'রে র'য়েছি, ডচ্ বন্ধুরা বিশেষ ক'রে আমার পরিচয় দিলেন যে আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ। আমার মালাই ভাষার পুঁজি অতি অল্প, শ'দুই আড়াই শব্দও হয় তো আয়ত্ত হয় নি,—যেটুকু দখল হ'য়েছে তার সাহায্যে পথে-ঘাটে চলা-ফেরা করা যায়, চাকর বাক্‌রদের সঙ্গে কথা কওয়া যায়। কিন্তু কোনও ভদ্রলোকদের সঙ্গে দুদণ্ড আলাপ করা যায় না। পকেটে একখানি ছোট্টো ইংরাজি-মালাই অভিধান আছে, আবশ্যক-মতন সেখানি দেখে শব্দ সংগ্রহ ক'রে কাজে লাগাই, কিন্তু এভাবে আলাপ বেশী দূর

পূজা-রত 'পদণ্ড'

এগোতে পারে না। সুতরাং এযাত্রা এঁদের সঙ্গে পরিচয় বিশেষ কিছু অগ্রসর হ'তে পারল না।

বলি আর লম্বকের রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারোন অতি চমৎকার লোক। ইনি আমায় একটী পাতলা চেহারার ডচ যুবকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন—এঁর নাম ডাক্তার R. Goris খোরিস, ইনি বলিদ্বীপের হিন্দু ধর্ম্ম, অনুষ্ঠান আর সংস্কৃতির চর্চ্চা ক'রছেন এঁরই লেখা ডচ ভাষায় বলিদ্বীপের হিন্দু মন্ত্র আর আচারের উপর একটী বইয়ের

ইংরাজি সমালোচনা বাকের কাছ থেকে নিয়ে প'ড়েছিলুম। হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার যাতে বলিদ্বীপে হয়, তদ্বিষয়ে কারোন সাহেবের পুরা সমবেদনা আর সমর্থন আছে দেখলুম। ভারতবর্ষ থেকে আগত এদেশের সংস্কৃতির মূল উৎসের সঙ্গে এদের আবার যোগ সাধন হয়, এটী তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে চান। শ্রীযুক্ত কারোন রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে

শ্রাদ্ধ-মণ্ডপ

শ্রাদ্ধমণ্ডপগুলির আশে পাশে একটু ঘুরলেন, সঙ্গে ডচ পার্ষদ আর বলিদ্বীপের রাজারাও রইলেন, কিন্তু সে ভীড়ের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করা কবির পক্ষে একটু কঠিন ব্যাপার, আর বাঁশের পথ আর সিঁড়ি বেয়ে মণ্ডপগুলিতে ওঠা তাঁর পক্ষে আরও কষ্টকর। কবি ফিরে এসে আমাদের বিশ্রামের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব'সলেন, অন্য ডচ ভদ্রলোকদের সঙ্গে আলাপ ক'রতে লাগলেন। এদিকে এই অপূর্ব্ব জন-সমাগম আর উৎসব অনুষ্ঠান ছেড়ে আমরা থাকতে পারলুম না—সুরেন বাবু, ধীরেন বাবু, বাকেরা, আমি, ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম। ডাক্তার খোরিস আর শ্রীযুক্ত কারোন অনুগ্রহ ক'রে আমাদের সঙ্গে এলেন—আমাদের কিছু কিছু ব্যাপার বুঝিয়ে দেবার জন্য। মুস্কিল হ'ল, ডাক্তার খোরিস সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আর খুব উদার-হৃদয় দরদী ব্যক্তি হ'লেও ইংরেজি ভালো ব'লতে পারেন না, আর দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা ডচ বা মালাই ও জানি না। আমাদের সৌভাগ্য ক্রমে শ্রীযুক্ত কারোন কিন্তু বেশ ভালো ইংরিজি বলেন। আমরা মঞ্চ বা মণ্ডপগুলিতে একে একে উঠে দেখলুম। মৃতের উদ্দেশ্যে নানা খাদ্য-দ্রব্য আর বসন-ভূষণাদি একটী মণ্ডপের উপরে আর একটী মাচা ক'রে সাজিয়ে রাখা হ'য়েছে। মণ্ডপের দেয়ালে, চারি দিকে সাদা তাল আর না'রকল পাতার নানা ঝালরের মত অলঙ্কারে এগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। খাদ্য দ্রব্য কাঠের পাত্রে যা সাজান র'য়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলুম—মন্দির বা পাহাড়ের আকারে সাজানো ভাত র'য়েছে, ভাতের উপরে আবার খোলা-শুদ্ধ সিদ্ধ ডিম, নানা রকমের তরকারী, নানা রকমের ফল র'য়েছে; আর কতকগুলি আস্ত আস্ত শূকর-শাবক শূলপক্ব অবস্থায় দেখা গেল। রঙীন জরী আর রেশমের বুটী আর নকশাদার কাপড়ের ছড়াছড়ি, আর মাঝে মাঝে ফুল-লতা-পাতা-তোলা বেশ ভারী দেখাচ্ছে এমন সোনা রূপোর বাসন এই সব কাপড় আর খাবারের স্তূপের মধ্যে র'য়েছে। এই সব খাবার আর কাপড় মনে হ'ল উপহার-স্বরূপ নানা স্থান থেকে আস্‌ছে—কতকগুলি মেয়ে আর পুরুষ সারি বেঁধে মাথায় ক'রে এই সব দ্রব্য মণ্ডপে নিয়ে আস্‌ছে, কতকগুলি লোক সেখানে মোতায়েন র'য়েছে। এই মণ্ডপ দেখিয়ে, মুসলমানদের তাজিয়ার ধরণে বাঁশ আর চাঁচাড়ী আর রঙীন কাগজের 'মেরু' বা মন্দির র'য়েছে যে মণ্ডপে, ডাক্তার খোরিস আর শ্রীযুক্ত কারোন সেখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। এখানেও সেই রকম তাল আর না'রকল পাতায় উৎসব-সজ্জায় মণ্ডপটী অলঙ্কৃত। তার পরে তৃতীয় মণ্ডপে উঠলুম—এখানে শ্রাদ্ধের আসল যজ্ঞ বা পূজা আর অন্য অনুষ্ঠান হ'চ্ছে। এই মণ্ডপটীর উপরে ঠিক মাঝখানে বাঁশ দিয়ে একটী মাচা ক'রে রেখেছে, তার চার দিক দিয়ে সরু বারান্দার মত একটী পথ। মাচার উপরে
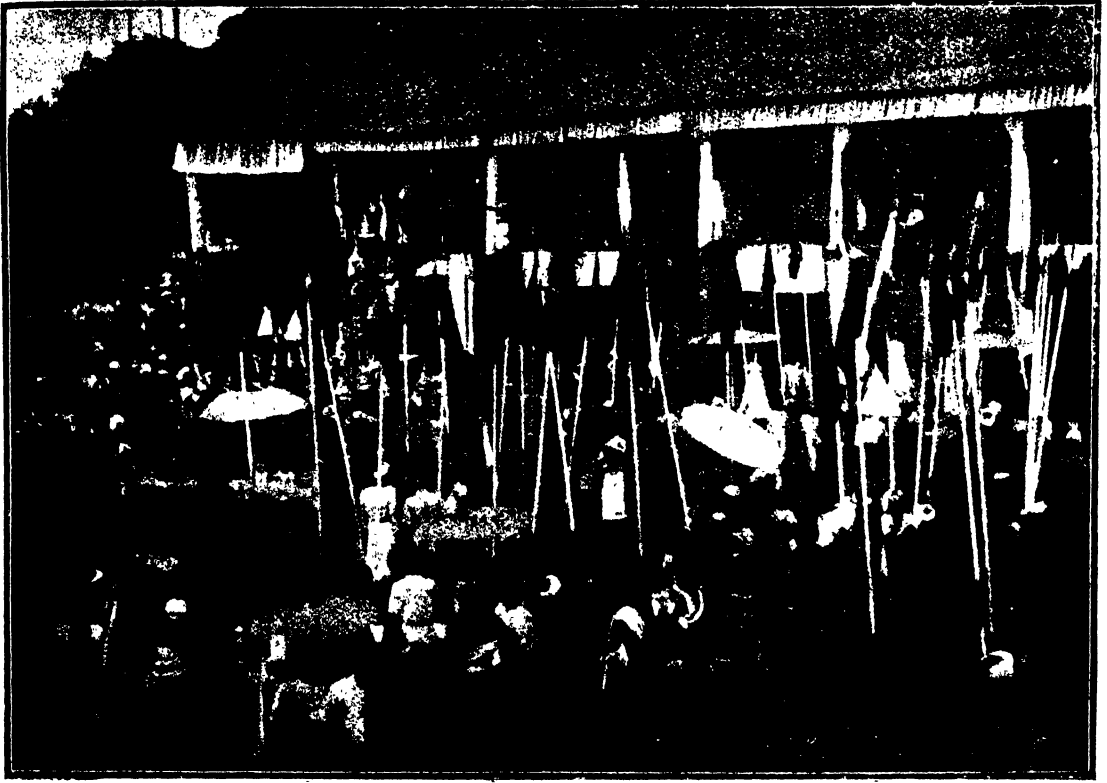
শ্রাদ্ধমণ্ডপ- শোভাযাত্রার ছত্র ও অস্ত্রধারী অনুচরগণ

পূজার নানা সম্ভার নিয়ে এখানকার pedanda পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ পুরোহিত জন কতক ব'সেছেন—একটু হৃষ্টপুষ্ট চেহারার লোক এঁরা, মাথার চুল ঝুঁটী বাঁধা, পরণে ধবধবে সাদা সুতির কাপড়, একখানা ধুতির মত কোমরে জড়ানো আর একখানা উত্তরীয়ের মতন দুই কাঁধের নীচে বুকে জড়ানো, সামনে গেরো দিয়ে আঁটা। এঁদের সহকর্ম্মী স্বরূপ আর অন্য ঝুঁটী-বাঁধা পুরোহিত জন তিন-চার র'য়েছে—এদেরও সাদা কাপড় আর বুকে বাঁধা উত্তরীয়,—কিন্তু কেউ কেউ কালো কোট-জামাও তার উপর চড়িয়েছে, আর পিঠে কারও কারও বড়ো ক্রিস্ বা তলওয়ার বাঁধা। মাচার উপর এক জায়গায় একটা পাত্রে আগুন জ্ব'লছে। আর ধূপা ধুনা জ্ব'লছে—তার সৌরভ আমাদের বাঙ্গালা দেশের ধূপ বা মাদ্রাজী ধূপের মতন নয়, একটু অন্য রকমের, ভারী রকমের সুবাস। পূজার দ্রব্যসম্ভার দেখলুম। নানা রকমের ফল, চা'লের নৈবেদ্য, কলার ছড়া, পান সুপারী, কলার বাসনার পাত্র, এই সব র'য়েছে, কাপড় সুতো র'য়েছে,—কত রকমের পাতা ফল ফুল আর তাল পাতার মূর্ত্তি আর নানা রকম অদৃষ্ট-পূর্ব্ব জিনিস র'য়েছে যে তা দেখে হিসাব নেওয়া মুস্কিল। আমাদের শুভ অনুষ্ঠানে, স্ত্রী আচারে আর পূজাদিতে নৈবেদ্যের আর অন্য কাজের জন্য যে সকল রকমারি জিনিসের—পূর্ব্ববঙ্গের কথায়, 'হাবিজাবি'র—সমাবেশ হয়, একজন বিদেশীর কাছে সে সকল জিনিসের সংখ্যা আর উদ্দেশ্য স্থির ক'রে নেওয়া কত না মুস্কিল! এদের এই সব অনুষ্ঠান ঠিক পুরাপুরি আমাদের দেশের হিন্দু অনুষ্ঠান নয়; এদের নিজেদের খুঁটীনাটী বিস্তর আছে যা আমাদের আছে অজ্ঞাত আর আমাদের সংস্কৃত শাস্ত্রেও অজ্ঞাত; কিন্তু সে-সমস্ত এখানকার হিন্দু অনুষ্ঠানের অঙ্গ,--

এরা এদেশে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র আর আনুষ্ঠানিক পরিপাটীর সঙ্গে সে সমস্তের বেশ সঙ্গতি রক্ষা ক'রেছে। আমাদের পৌরাণিক পূজার অনুষ্ঠানে যে সব 'দশ-কর্ম্ম দ্রব্য' ব্যবহার করা হয় তা এরা জানে না, আবার এদের ব্যবহৃত 'দশকর্ম্ম' কি কি, তাও আমরা বুঝবো না। অথচ এদের এই পূজা বা অনুষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে আমাদের নানা উপচারে পূজারই মতন একই বর্গের ব্যাপার।—আদিম কালে ভারতবর্ষে যে অনুষ্ঠান ছিল তার এক রকম বিকাশের ফলে বৈদিক যজ্ঞের বাইরে যে সব ব্রাহ্মণ্য অনুষ্ঠান দাঁড়িয়েছে, যে সব জিনিসের ব্যবহার প্রচলিত হ'য়েছে সেগুলি একদিকে,—আর তার অন্য রকমের বিকাশ হ'য়েছে এই দ্বীপময় ভারতে, মালাইজাতির প্রাচীন রীতি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটার ফলে।

উপরে মণ্ডপের মধ্যে মাচায় পূজা সম্ভার নিয়ে ব'সে 'পদণ্ড' ব্রাহ্মণেরা নিজ নিজ কৃত্য সম্পাদনেই নিযুক্ত রইলেন। একবার মাত্র চোখ তুলে আমাদের দিকে তাকালেন, আমরা বাঁশের সিঁড়ি-পথ বেয়ে উপরের মাচার চারিদিকে যে বারান্দার কথা ব'লেছি তাতে এসে দাঁড়ালুম। জন তিনেক ইউরোপীয় র'য়েছেন, ইউরোপীয় বেশে ধীরেন বাবু আর সুরেন বাবু র'য়েছেন, আর এদের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব ভারতীয় পোষাকে আমি; দলটীকে দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'ল বটে, কিন্তু মুখ না তুলে নিজ নিজ কাজে রত রইল। পুরোহিতদের মধ্যে দুজনে মিলে বাঁশের কঞ্চি, তালপাতা, কাপড় আর ফুল দিয়ে একটা কি জিনিস তৈরী ক'রছে, সেটা আকারে দাঁড়াচ্ছে আমাদের বিয়েতে ব্যবহৃত চালের গুঁড়োর 'শ্রী'-র মতন—শুনলুম জিনিসটার নাম poespa 'পুষ্প', এটা মৃতের আত্মার প্রতীক; এতে তালাপাতায় মৃতের মুখের একটা যেমন-তেমন প্রতিকৃতি এঁকে দেওয়া হয়, আর ওঁ-কার লিখে দেওয়া হয়, আর মৃতের নামও লিখে দেওয়া হয়। একজন পদণ্ড ব'সে ব'সে মন্ত্র প'ড়তে প'ড়তে তালপাতায় নিবিষ্টমনে কি লিখছেন। আর একজন,—তাঁর গালের ভিতরে এক তাল পান-দোক্তা পূরে রাখার জন্য একদিককার গাল ফুলে র'য়েছে,—তিনি বিঘৎ মেপে মেপে কঞ্চি কিংবা কলার বাসনার ফালি টুকরো টুকরো ক'রে কেটে রাখছেন। পাশে বারান্দায় দাঁড়িয়ে কালো জামা পরা পুরোহিতের সহায়ক জন দুই, একটি কাটারীর মতন অস্ত্রে তালপাতা আর কাঠ চিরে চিরে রাখছে, আর মাঝে মাঝে চাপা গলায়, গলা বিলক্ষণ ভারী ক'রে, মন্ত্র প'ড়ছে; কিছু কিছু সুর আছে এই পাঠ রীতিতে—খানিক ক্ষণ নিবিষ্টভাবে শোনবার চেষ্টা ক'রলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম না—সংস্কৃত শব্দ দু একটা মাত্র ধ'রতে পারা গেল ব'লে বোধ হ'ল—'সিওঅ, সিওঅ' আর 'ম-হ-ডেও-অ' (শিব শিব, মহাদেব)। তবে দূর থেকে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠের মতই লাগে, যদিও যেন কেমন এক ধরণের পড়া ব'লে মনে হয়। এই সব মন্ত্র বিকৃত সংস্কৃতে রচিত—অর্থাৎ সংস্কৃত চর্চ্চা না ক'রে বহু শতাব্দী ধ'রে এই সব মন্ত্র ব্যবহার করায় তাদের উচ্চারণ-বিকৃতি তো হ'য়েছেই, মূল দেবভাষারও বিকৃতি হ'য়েছে, বহুস্থানে বলিদ্বীপের বিস্তর শব্দ ঢুকে গিয়েছে। সম্প্রতি সংস্কৃতজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতদের দ্বারা এই সব মন্ত্রের ভালো ক'রে চর্চ্চা আরম্ভ হ'চ্ছে। আমি তো একেবারে অত্যন্ত কৌতূহলী আগ্রহের সঙ্গে এই সব জিনিস দেখ্‌তে লাগলুম। কিন্তু হায়, এদের এই সব ব্যাপার আমায় বুঝিয়ে দেয় কে! আমরা তো ওখানে থাকবো মাত্র ২।৩ ঘণ্টা, আরো কত দেখবার আছে। ডাক্তার খোরিস কিছু কিছু জানেন, তিনি খাতা বের ক'রে মাঝে মাঝে নোট নিচ্ছেন, পদণ্ডদের দু একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রছেন, তিনি নিজে এ সব আরও জানবার চেষ্টা ক'রছেন; ভাষার অভাবে তাঁর কাছে খবর পাওয়াও দুর্ঘট; আর রেসিডেন্ট সাহেবের ওসব বিষয়ে বড়ো খোঁজ নেবার আবশ্যকতা হয় নি, তাই তিনি খুঁটী-নাটী ব্যাপার কিছু বুঝোতে অক্ষম। এখনও বলিদ্বীপের কথা স্মরণ হ'লে মনে কত আপশোশ হয়, বলিদ্বীপে বেশীদিন তো থাকা সম্ভব হ'ল না—এখনও যদি সুবিধা পাই, তো কিছুকাল ধ'রে এদের সঙ্গে মিশে এদের ভাষা শিখে সমস্ত জিনিস পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা ক'রে আমাদের পূজা অনুষ্ঠানের সঙ্গে এদের যোগ-সূত্র বা'র ক'রবার চেষ্টা করি। আমার বিশ্বাস কোনও কৃতকর্ম্মা ভারতীয় ব্রাহ্মণ না হ'লে এ কাজ ভালো ক'রে পারবে না। কবে

সে ভারতীয় ব্রাহ্মণ ওদেশে গিয়ে এই কার্য্যে হাত দেবেন!

মণ্ডপগুলি দেখবার সময়ে শ্রীযুক্ত কারনো-এর সঙ্গে ভারত আর বলির সংস্কৃতির যোগের কথা নিয়ে আমার একটু আলাপও বেশ হ'ল—রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা আর তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়েও হ'ল। শ্রীযুক্ত কারোন ব'ল্‌লেন—আপনারা যদি সত্যি সত্যিই ভারতবর্ষের সভ্যতার ধারা আবার এদেশে বহাতে পারেন, তা হ'লে এই সুন্দর জা'তকে এদের নিজেদের সুন্দর সংস্কৃতিটীকে রক্ষা করাতে পারবেন। আজ কালকার দিনে যখন জগতে সর্ব্বত্রই অশান্তি আর বর্ব্বরতা এসে প'ড়ছে, জীবনের সৌন্দর্য্য চ'লে যাচ্ছে, তখন বলিদ্বীপে যে তাদের জীবনের মনোহারিত্ব সারল্য শান্তি অরে শ্রী বজায় রাখতে পেরেছে, তার কারণ এই যে, প্রাচীন হিন্দু ভাব এদের জীবন থেকে এখনও অপসৃত হয় নি। আপনারা আসুন, রবীন্দ্রনাথের মত ব্যক্তি বিশ্বভারতীর মারফৎ এদের সঙ্গে সহযোগে কাজ করুন। এদের সভ্যতাকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত আর সুদৃঢ় করে তুলুন—আমরা ডচেরা আপনাদের সাদরে গ্রহণ কর'বো, আপনাদের সমস্ত সুযোগ দেবো। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন—পলিটিক্স ক'রতে এলে চ'লবে না। যে ঘণ্টা কতক আমরা বাঙলিতে ছিলুম তার খানিকটা সময় রেসিডেন্ট সাহেবের মতন হৃদয়বান ব্যক্তির সঙ্গে এই রকম আলাপে ভারত আর বলির মধ্যে পুনরায় যোগসাধন বিষয়ে মনে খুব আশা আর আনন্দ হ'য়েছিল। কিন্তু হায়, কার্য্যতঃ তা এখনও ঘ'টল না। এদিকে দৃষ্টি দেবার সময় নেই আমাদের। আমাদের প্রস্তাবিত সংস্কৃত শিক্ষকও পাঠানো হ'ল না, আমাদের কেউ গিয়ে ওদের ভাষা ওদের অনুষ্ঠিত হিন্দু ধর্ম্মের চর্চ্চা করবার জন্য গেল না,—আবার ওদের দেশের দু চার জন পদণ্ড আর ছাত্রকে ভারতবর্ষে আনবার কথা হ'য়েছিল তা ও হ'লো না। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আলাপে মনে হ'চ্ছিল, ভারতের মানসিক আর আধ্যাত্মিক শক্তির প্রতি তাঁর অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস আছে; আর আমি আমাদের নানা অযোগ্যতার কথা আর নানা মূর্খতা আর গোঁড়ামির কথা মনে ক'রে মরমে ম'রে যাচ্ছিলুম।
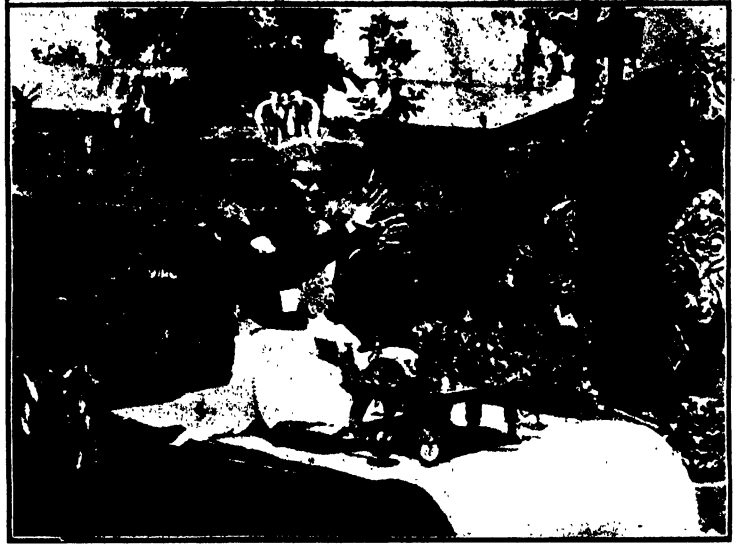
পূজা-নিরত পদণ্ড—হাতে 'মুদ্রা' ক'রছেন

বলিদ্বীপের পদণ্ডরা নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত, বিদেশীদের দিকে দৃষ্টিপাত করবার তাঁদের কৌতূহল বা সময় নেই। এ'রা বেশ একটা ভদ্র, ভব্য আর সংযত ভাবে, বেশ গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন ক'রে যেতে লাগলেন।—এদেশের হিন্দুসমাজে জাতিভেদ আছে—তা কেবল বিয়েতেই; ছুঁৎমার্গ বা স্পর্শদোষ, আর দক্ষিণ ভারতের 'দৃষ্টিদোষ'—এ-সকলের মত বর্ব্বরতা থেকে এরা মুক্ত। মণ্ডপে মৃতের উদ্দেশ্যে ভাত ডিম শূলপক্ক শূকর প্রভৃতি সাজানো রয়েছে, ডচ সাহেবেরা সেখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কোনও আপত্তি নেই। পূজা মণ্ডপে

ইউরোপীয় দ্রষ্টা উঠে হয় তো পূজায় বা পূজার উপকরণ সজ্জীকরণে নিরত পদণ্ডের সঙ্গে মালাই ভাষায় বা দেশ ভাষায় দু একটা কথা কইলেন, তার পরে তার সামনে রাখা পিতলের পূজার ঘণ্টা, বা পঞ্চপাত্র, বা প্রদীপ বা কর্পূর জ্বালাবার ছোট বাটী, এই সব তৈজস হাতে ক'রে তুলে নিয়ে নেড়ে চেড়ে দেখে আবার রেখে দিলেন, তাতে আপত্তি নেই, ব্রাহ্মণ তাতে কোনও দোষ মনে না ক'রে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগলেন। ছুঁৎমার্গের দেশথেকে আগত ব'লে আমাদের চোখে এটা বিস্ময়কর লাগ্‌ল—কে জানে, হয় তো প্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও এই রকম রীতি ছিল, ছুঁৎমার্গের উদ্ভব তখন হয় নি—তা না হ'লে আমরা যবন (গ্রীক) আর শক হূণ প্রভৃতিদের হিন্দুসমাজ ভুক্ত ক'রে নিতে পারতুম না।

মণ্ডপগুলি দেখে, আমরা এর পরে নীচে ভীড়ের মধ্যে অবতরণ ক'রলুম। যে শ্রুতি-মধুর তালে বাজনা বাজ্‌ছিল, মনে হ'চ্ছিল, যেন দূর থেকে কোনও বড়ো পুকুর বা নদীর ওপার থেকে কোনও দেবমন্দিরে তালে তালে নানা রকমের ঘণ্টা বাজছে,—সেই বাজনা প্রথম চোখে দেখলুম, বাজনদারেরা একটা মণ্ডপের তলায় আসর জমিয়েছে। উল্‌টানো বাটীর মতন কতকগুলি ধাতুর পাত্র, উপবিষ্ট বাদকের তিনদিকে অর্দ্ধচন্দ্রকারে কাঠের ফ্রেমে সাজানো র'য়েছে, দুটী কাঠির ঘায়ে বাদক বাজিয়ে যাচ্ছে; এইরূপ একটী যন্ত্র হ'চ্ছে প্রধান। তা ছাড়া ছোটো ঢোল আছে, বর্ম্মীদের যেমন কাঠের ফলকের একটা বাদ্যযন্ত্র আছে—নানা আকারের কাঠের ফলক পাশাপাশি সাজিয়ে একটা ফ্রেমে রাখে, ফ্রেমের উপর কাঠি দিয়ে ঘা মেরে ফলকের দৈর্ঘ্য প্রসার আর স্থূলতার অনুপাতে টং টাং টিং টুং ক'রে উঁচু নীচু আওয়াজ বা'র হয়,—সেই রকম একটী যন্ত্র আছে। দ্বীপময় ভারতের বাদ্য আমাদের দেশের বাদ্য থেকে একেবারে অন্য ধরণের। এসম্পর্কে ভারতবর্ষ আর চীন থেকে কিছু কিছু জিনিস পেলেও, এদের বাদ্যটা অনেকটা স্বতন্ত্র, মূল ইন্দোনেসীয় জাতির সংস্কৃতি প্রসূত। আমাদের বীণা আর এসরাজের মত যন্ত্র এদেশে নেই। সুর আর লয়ের চেয়ে তালেরই আধারের উপর এদের যন্ত্র-সঙ্গীত প্রতিষ্ঠিত। যবদ্বীপে এই যন্ত্র-সঙ্গীতের আরও উৎকর্ষ হ'য়েছে। আর যবদ্বীপে এর নাম হ'চ্ছে gamelan 'গামেলান'। বলিদ্বীপেও 'গামেলান' বলে—শব্দটী মালাই ভাষায়ও মেলে। এই রকম বাদ্য খালি ইন্দোনেসিয়ায় নয়, ইন্দোচীনে কম্বোজ শ্যাম আর বর্ম্মায়ও মেলে—কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা ভারতবর্ষে পাওয়া যায় না। এইখানে ভারতের সঙ্গে দক্ষিণ পূর্ব্বের বহির্ভারতের—ইন্দোচীন আর ইন্দোনেসিয়ার একটী বড়ো পার্থক্য আছে দেখা যায়।

নীচে মণ্ডপগুলির আশে পাশে, রাস্তার ওধারের বড়ো প্রাসাদটিতে আর যাত্রার আসরে প্রচুর লোক সমাগম হ'য়েছে। সকলেই উৎসবের বস্ত্রে মণ্ডিত হ'য়ে এসেছে, সকলেই প্রফুল্লমুখ। কোথাও বা দূর গ্রাম থেকে আগত একদল মেয়ে পুরুষ আর ছেলে ব'সে বিশ্রাম ক'রছে, এরা মাথায় ক'রে নৈবেদ্য ফল প্রভৃতি নিয়ে সারি দিয়ে মিছিল ক'রে এসেছে, সঙ্গে গামেলান বাদ্যের যন্ত্রপাতি, আর রঙীন আর সাদা ছাতা কতকগুলি; বহুস্থলে কাজকরা বেতের চুবড়ী আর বাক্‌স থেকে পান চুন সুপুরী দোক্তা নিয়ে পান সেজে খাচ্ছে। পানের রেওয়াজ খুবই—আর অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, পান খেয়ে খেয়ে এদের দাঁত কালো হ'য়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষের ইন্দোচীনের আর ইন্দোনেসিয়ার সংস্কৃতিতে পানের একটা বড়ো স্থান আছে তা নিয়ে দু কথা পরে ব'লবো। এত লোকের আগমন, কিন্তু একটুও ধাক্কাধাক্কি বা চেঁচামেচি নেই। আমরা এই উৎসব-নিরত প্রিয়দর্শন জাতির মধ্যে যথেচ্ছ ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। জনকতক ইউরোপীয় লোকও আছে। এদের মধ্যে একদল মার্কিন এসেছে, সিনেমার ক্যামেরা নিয়ে। খাকীর কাছ বা হাফ-প্যাণ্ট পরা সাদা টুইলের কামিজ গায়ে সিনেমা-ওয়ালা একজনের সঙ্গে কথা হ'ল। তার ছবি ভালোই উঠবে ব'লে তার জন্য সে খুশী। এদেশে এই পোষাকে আমাকে সে দেখে আশ্চর্য্য হ'ল। রবীন্দ্রনাথেরও ছবি নিলে। অন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে জারমান আর অষ্ট্রিয়ান চিত্রকর জন দুই ছিলেন। ইউরোপীয়দের কেউ কেউ ক্রমাগত ফোটোগ্রাফ নিচ্ছে। লোকজনের তাতে আপত্তি নেই, যদি তাদের নিয়ে সাজিয়ে দাঁড় করিয়ে

ব্রাহ্মমণ্ডপে উপচার ও নৈবেদ্য মস্তকে স্ত্রীগণের আগমন

বা বসিয়ে তোলবার চেষ্টা না হয়,— তবে ছবি তোলাবার আকাঙ্ক্ষাও নেই।

আমরা মণ্ডপগুলি থেকে নেমে আস্‌ছি। কাঁচা বাঁশের মিঠে সোঁধা গন্ধ, কলা তাল আর না'রকল পাতার আর কলার বাসনার গন্ধ, আর তার সঙ্গে ধূপ ধুনার গন্ধ; এত লোক ভালো কাপড় প'রে কিছু কিছু সুগন্ধি মেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সৌরভ; আর লোকেদের মাথায় আর কানের পাশে melati বা মালতী, tjempaka বা চম্পক, গন্ধরাজ প্রভৃতি আমাদের পরিচিত ফুলের সৌরভ—একটু উগ্র ব'লে মনে হ'ল এই সমস্ত ফুলের সৌরভকে; তার উপর মেয়েরা আর পুরুষেরা মাথায় লম্বা চুলে প্রচুর না'রকল তেল মেখেছে তার বাস;—এই সমস্ত মিলে যুগপৎ নাসাপথকে যেন অভিভূত ক'রে ফেলছে;—চোখের সাম্‌নে ভীড়ের লোকেদের নিরাবরণ সৌষ্ঠব আর সৌষম্য পূর্ণ দেহের পীতাভ, ক্বচিৎ বা শ্যামাভ গৌরবর্ণের রৌদ্র-চিক্কণ ঔজ্জ্বল্য; এদের দেহের ঋজুতা আর তনিমা; বর্ণোজ্জ্বল বস্ত্রে মনোহর গতি-ভঙ্গিতে এদের চলাফেরা; আর কানে অনিরুদ্ধভাবে তালে তালে গামেলান বাজনার সুমিষ্ট ধ্বনি; এ সমস্তের উপরে মিঠে-কড়া রোদ্দুরের প্রভাব প'ড়ে এই সৌরভ আর বর্ণ-সমাবেশকে যেন আরও কড়া আরও তীব্র ক'রে তুলেছে; আর জনতার অপরিহার্য্য কলরব এই বাদ্যধ্বনির সঙ্গে discord বা বিবাদের সঙ্গে সঙ্গে যেন একটা harmony বা সংবাদিভাবের সৃষ্টি ক'রে তুলেছে; এক সঙ্গে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় আক্রান্ত হ'য়ে পড়ায়, আর এত অদৃষ্টপূর্ব্ব বস্তুর সমাবেশের মধ্যে প'ড়ে যাওয়ায় মনও যেন অভিভূত হ'য়ে পড়েছে— যেন একটা অবসাদে আমাদের মনকে ঘিরে ফেলেছে, এ রকম অবস্থা আমাদের হ'ল। রেখায় রূপে বর্ণে গন্ধে ধ্বনিতে মিলে যে কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রে তুলেছিল, তা

আমাদের অদৃষ্ট-পূর্ব্ব, অননুভূতপূর্ব্ব। বলিদ্বীপে নেমে প্রথম দিনেই এতটা সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার এমনি অনপেক্ষিতপূর্ণ ভাবে আমাদের সামনে খুলে যাবে, তা আমরা কল্পনাও ক'রতে পারি নি। এই দিনটীর স্মৃতি চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে মনে থাকবে। একটি অষ্ট্রিয়ান মহিলা, ইনি ছবি আঁকেন, অন্য ইউরোপীয়দের সঙ্গে ছিলেন; তিনি তো দেখে শুনে আমাদের মতনই মুগ্ধ, তবে অজন্টা আর মহাবলিপুর আর ইলোরার চিত্র আর ভাস্কর্য্য, আর প্রাচীন ভারতের কথা আর তার সঙ্গে বলিদ্বীপের যোগ চিন্তা করার দরুন যে এক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক স্মৃতিজনিত আনন্দের ভাগী হ'য়ে আমরা ভারতীয় কয়জন ছিলুম, তাথেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন;—ফরাসীতে তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল—উচ্ছ্বসিত প্রশংসার সঙ্গে ব'ল্‌লেন—Monsieur, tout cela – c'est comme un rêve—মহাশয়, এসব – এসব যেন একটা স্বপ্ন!

স্বপ্নই বটে! সমস্তই দেখছিলুম,—এখানকার লোকেদের জীবনের বাহ্য সৌন্দর্য্যের প্রবাহ অপার্থিব বস্তুর মতই বোধ হ'চ্ছিল। কিন্তু এদের জীবনের এই প্রাচীন যুগের উপযুক্ত শিশু-সুলভ সারল্য দেখে মনে হ'চ্ছিল, আমরা এ জিনিস অনেক দিন হ'ল পিছনে ফেলে এসেছি—এদের এই জগতের সদানন্দ, elemental বা মৌলিক কতকগুলি সুখ দুঃখের অনুভূতির মধ্যেই নিবদ্ধ থাকা, আমাদের পক্ষে আর রুচিকর বা সম্ভবপর হবে না; দূর থেকে দেখ্‌তে বেশ, কিন্তু যতই নয়নরঞ্জন যতই মনোহর লাগুক না কেন, এদের জীবনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা আমি ভাবতে পারি না; এর মধ্যে, কাঁচা বাঁশের গন্ধ তালপাতার গন্ধ আর এই দেশের ফুলের উগ্র সৌরভ আর ভীড়ের মানুষের গায়ের বাস, এ সবে মিলে আমার চিত্ত মধ্যে যে একটা মাদকতার ভাব যে একটা সংজ্ঞা-হারা ক'রে দেবার ভাব সৃষ্টি ক'রছিল, সেটার সঙ্গে সঙ্গে যেন চিত্তে একটা প্রতিক্রিয়াও এনে দিচ্ছিল:—সুপরিচিত, অনাড়ম্বর, জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত, আত্ম-সমাহিত প্রাচীনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক সভ্য জীবনের শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক আদর্শগুলি যেন বিদ্যুতের ঝলক দেখিয়ে মনে দু একবার উদিত হ'ল—আমি চারিদিকের এই সত্য-যুগের সৌন্দর্য্য রাশির মধ্যে থেকে নিজেকে যেন নির্লিপ্ত আর পৃথক্ ক'রে ভেবে, আধুনিক আর ভবিষ্যতের প্রবর্দ্ধমান সেই মানসিক নৈতিক আর আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির আদর্শের সম্বন্ধে প্রাণের মধ্যে একটা অব্যক্ত আকুলতার সাড়া পেয়ে একটা আরামের নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম।

ঘুরে ঘুরে একটী না'রকল পাতা ছাওয়া স্থানে এলুম, সেখানে মাদুর পাতা র'য়েছে, আর অনেকগুলি নিমন্ত্রিত বলিদ্বীপীয় ভদ্রলোক ব'সে র'য়েছেন। সাবেক বলিদ্বীপীয় পোষাকপরা বেশীর ভাগের—মাথায় রঙীন রুমালের পাগড়ী, গায়ে বুকে-বাঁধা রঙীন জরীর বা রেশমের কাজ করা চাদর, পরণে হাঁটু-পর্য্যন্ত রঙীন চেলির মতন কাপড়, পিঠে ক্রিস বাঁধা; কেউ কেউ সাদা কিংবা কালো জামা গায়ে চড়িয়েছেন। অনুমানে বোধ হ'ল, এঁরা আশ-পাশের গ্রামের অভিজাত ব্যক্তি। এঁরা মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা ক'রছেন, আর সামনে চৌকো বাক্সের আকারের রূপোর পানের বাটা র'য়েছে তা থেকে পান চুন সুপুরী আর দোক্তার তামাক নিয়ে পানের বীড়ে পাকিয়ে মুখের ভিতরে পুরে দিচ্ছেন। জন ষাট সত্তর লোক হবে এই আসরে ব'সে। আমি সেখানে এসে দাঁড়ালুম, একজন আমায় ব'সতে ব'ল্‌লেন, আমি ব'সলুম। মালাই ভাষায় জিজ্ঞাসা হ'ল আমি কে। এইবারে আমার ভাষার পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল। সংক্ষেপে ব'ল্‌লুম, 'ব-র-ট-ওঅর্-স' বা ভা-র-ত-বর্ষ থেকে যে মহাগুরু এসেছেন, তাঁর সঙ্গেকার লোক আমি। এখন এরা সংস্কৃত শব্দ কি রকমে উচ্চারণ করে, তা ডাক্তার খোরিস যখন পদণ্ডদের সঙ্গে কথা কইছিলেন তখন একটু লক্ষ্য ক'রে স'মঝে নিচ্ছিলুম; যেমন 'মুদ্রা' শব্দের উচ্চারণ ক'রলে 'মুড়ে' বা 'মুড্রো' (mudrö)। আমাদের মোটরচালকের কাছে 'রাম, সীতা' এই দুইটী নাম 'র-ম, সী-ত্যো' (Romo, Sitö) এইরূপে শুনি; 'গঙ্গা, যমুনা'কে 'গাঙ্গে বা গাঙ্গ্যো' (Gangö), 'জামুনে বা জামুন্যো (Jamunö) এইরূপে শুনি। এই থেকে হদিস পেয়ে বুঝলুম যে, এদের মতন ক'রে না ব'ল্‌লে, বাঙালী বা বিশুদ্ধ সংস্কৃত ধরণে ব'ল্‌লে, এরা আমার কথা এদের জানা থাক্‌লেও ধ'র্‌তে পারবে না। এদের ব'ল্‌লুম—'জাম্বুড়ুইপো' বা জম্বুদ্বীপ থেকে আমরা আস্‌ছি—

(হিন্দুস্থান বা ইণ্ডিয়া এইসব বলিদ্বীপীয় লোক যারা ডচ্ ভাষায় অনভিজ্ঞ আর ইস্কুলে কখনও পড়েনি তারা বুঝতে পারবে না)—আমাদের দেশে 'গাঙ্গ্যো, জামুন্ত্যো' নদী আছে, 'হি-ম-ল-য়' 'উইন্‌ডিঅ' (বিন্ধ্য) পর্ব্বত আছে, 'আজোডিঅ্য', 'ইণ্ড্রাপ্রাস্তা' প্রভৃতি নগর আছে, 'র-ম-য়-ন' 'ম-হ্-ব-র-ট'-র দেশ হ'চ্ছে আমাদের দেশ—তোমাদের মতন আমাদের দেশে 'ব্রা-ম্যো' 'উইস্নু' আর 'সিওঅ'-র সম্মাননা হয়; 'বুদা' আমাদের দেশেরই মানুষ;—আমরা এসেছি তোমাদের দেখতে, তোমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রতে। যে কটী কথা ব'ললুম তাতে খুব বেশী মালাইয়ের জ্ঞানের দরকার হয় না। এরা নামগুলি শুনে একটু কৌতূহলী হ'য়ে ঘিরে ব'স্‌ল;—তারপরই আমার বিপদ, ভাষার আর কুলায় না। অনেক কষ্টে ব'ললুম—বুলেলেঙ্ (উত্তর বলির বন্দর) থেকে 'কাপাল-আপি' (অর্থাৎ 'আগ-বোট' বা ষ্টীমার) ক'রে দুই রাতের পথ সুরাবায়া; সুরাবায়া থেকে দুরাতের পথ বাতাবিয়া; বাতাবিয়া থেকে উত্তরে আরও দুই রাতের পথ 'নগরী সিঙ্গাপুরা'; সেখান থেকে সমুদ্র দিয়ে পশ্চিমে আর উত্তরে আরও ৮।১০ রাতের পথ গেলে পরে আমাদের দেশ 'ব-র-ট-ওঅর্-স' বা 'জাম্বুডুইপ'তে পৌছানো যায়। ইতিমধ্যে মালাই-ভাষী একজন ডচ রাজ-কর্ম্মচারী এসে প'ড়লেন, তিনি এদের দু কথা ব'ললেন। এরা বিশেষ কৌতূহলী হ'য়ে কথা কইতে লাগ্‌ল। ভারতবর্ষের সঙ্গে যোগ হারানোর সঙ্গে সঙ্গে তার স্মৃতির এমন কি তার অস্তিত্বের কথা সাধারণ লোকে এখন ভুলে গিয়েছে। নিজেদের ভাষায় পুরাণ রামায়ণ মহাভারত পড়ে বটে, বিস্তর পৌরাণিক কাহিনী জানে বটে, কিন্তু এদের বিশ্বাস, দেবদেবীর লীলা আর পৌরাণিক যত ঘটনা ঘ'টেছিল, তার সমস্ত বলিদ্বীপে আর যবদ্বীপেই ঘ'টেছিল—আর জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষের কথা এদের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা জানেন বটে, এদের কাছে, কিন্তু সে জম্বুদ্বীপ পুরাণের যুগের ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে বাস্তব জগতে তার যেন অস্তিত্ব নেই। তবে আজকাল ইউরোপীয়

পূজার উপচার

শিক্ষার ফলে ভূগোল বিদ্যা আর ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এরা একটু সচেত হ'চ্ছে বটে।

আমার সময় অল্প, ভাষাও জানি না। খানিকক্ষণ থাকবার পরে আস্তে আস্তে সেখান থেকে বিদায় নিয়ে উঠে যেদিকে যাত্রার আসর হ'য়েছিল সেদিকে গেলুম।

(ক্রমশঃ)।

শেফালি

শ্রীনিশিকান্ত রায় চৌধুরী

১

ঐ যে সামনের গলির মোড়ে ইঁট-বেরকরা পুরনো বাড়ীটা, ঐ বাড়ীতেই সে থাকে।

বাবা নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ। বাড়ীতে ঠাকুর আছেন; তাঁরই পূজোর জন্যে সকাল বেলায় ও ফুল তুলছে। ছোট্ট মেয়েটি, চাঁপার মত রঙ্। দুধের মত সাদা ধোপ দেওয়া কাপড়। মুখখানি ধুয়ে মুছবার অবসর পায়নি। ছুটে চলে এসেছে। গালের উপরে জল চিক্ চিক্ করছে যেন শিশির।

এক পাশে একটা শিউলি গাছ অজস্র ফুল ঝরিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ওখানে গিয়ে দু-একবার ফুল কুড়োবার জন্যে ঝুঁকে পড়লো। তখনি থম্‌কে গিয়ে হাত উঠিয়ে নিল। ওর বাবা ওকে বলেছেন—ধুলোয় লুটানো ফুলে ঠাকুরের পূজো হয় না।

ও ভাবতে লাগলো; ঠাকুর যে ফুলকে ধুলোয় ফেলেন তাকে তুলে নেন না কেন? সে কি দোস করেচে?

২

ওদের বাড়ীর পাশের ঐ হলদে বাড়ীটা খালি পড়েছিল। সেখানে ভাড়াটে বাবুরা এসেছেন। তাঁদের ছোট্ট দুটি মেয়ে ওরই বয়সী। ওর সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

তারা এল ছোট ছোট চুপড়ী নিয়ে ফুল তুলতে। ও বল্লে—ভাই তোমাদের তো ঠাকুর নেই, কার জন্যে ফুল তুলবে? তারা বল্লে—সই, আমরা শিউলি ফুল কুড়োবো রোজ রোজ। ফুলের বোঁটা রদ্দরে শুকিয়ে শুকিয়ে জমাব। তাই দিয়ে কাপড় রঙানো হবে। এই রকম রঙের কাপড়।

একজনের পরণে ছিল শিউলি বোঁটার রঙ-করা কাপড়।

পূজোর ফুল তোলা সারা হয়েচে। তখন ও আর একটি চুবড়ীতে শিউলি ফুল ভরতে লাগল। ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওর বাবা বলেন—ওরে পাগলী, ও ফুলগুলো কিসের জন্যে?

ও বলে—সইদের মত রঙীন কাপড় পরবো।

ওর বাবা তাই শুনে মুখ ফিরিয়ে চলে যান। ঘরের থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে ওর মা আঙ্গিনার মাঝখানে ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কপালে হাত চাপড়ে বলেন—ওরে হতভাগী তোর আবার রঙীন কাপড় পরবার সাধ কেন? তোকে যে ঐ সাদা থান প'রেই সারাজীবন কাটাতে হবে।

ওর সখীরা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে, ওর পরনের সাদা কাপড়ের দিকে। কি মনে করে' তারা চলে যায়। শিউলি ফুল ধুলোয় পড়ে থাকে।

অনেক দিনের পুরনো শোক নতুন কোরে মনে পড়ে—ওর মায়ের কান্না আর থাম্‌তে চায় না।

পাড়ার চক্রবর্ত্তী-খুড়ো সেই পথে যেতে যেতে বলেন—আর কেন বৌ সকাল বেলায় কেঁদে কেঁদে অমঙ্গল কর? যা হবার তাতো হয়েই গিয়েছে। কোন্ পুণ্যের ফল ভোগ করবার জন্যে যে শিশু-বয়সে মেয়েটার বিয়ে দিয়েছিলে, তা তো বুঝিনে ছাই!

৩

তিন চার বছর চলে গেছে। ও বুঝতে পেরেছে ওর অবস্থা। পাশের বাড়ীতে ঢাক-ঢোল উঠলো বেজে। সেই মেয়ে দুটির বিয়ে। এক রাত্রিতেই দুটিকে সম্প্রদান করবার জন্যে তাদের বাবা দুটি ভাল পাত্র জুটিয়েছেন। পর পর দুটো লগ্ন। দেরী করা উচিত নয়।

ওর মা গিয়েছেন তাদের বাড়ীতে। ও যায়নি। ও নাকি রাক্ষুসী; ও নাকি ডাইনি; বিয়ে-বাড়ীর অমঙ্গল ঘটাবে।

সন্ধ্যেবেলায় বিয়ে-বাড়ীর আঙিনায় দুইখানা পাল্কী এলো। কত লোকের গোলমাল; কত আলো; কত বাতি; কত বাজীপোড়ানর ধূম; কত হুলুধ্বনি, কত শঙ্খধ্বনি কত ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হ'ল তাদের পথে পথে।

ঐ দিক্‌কার জানালা খুলে ও একবার উঁকি মেরে দেখ্‌লে—পাল্কী থেকে কারা নামল; ও ভাবলে তারা বুঝি সাতসমুদ্র পারের রাজকুমার।

অনেক রাত্তির। বিয়ের গোলমাল থেমে গিয়েছে। ওর মা ঘরে ফিরে এসেছেন। দেখেন, মেয়ের ঘরের প্রদীপটা তেলের অভাবে নিবু নিবু। মেয়ে পড়ে রয়েছে ঘরের মেঝের ওপরে। ওর রাত্তিরবেলাকার খাবার খই, চিঁড়ে চারিদিকে ছড়ানো। দুধের বাটি উপুড় করা।

সেই নিবন্ত প্রদীপের আলো আঁধারের মাঝখানে, ওর মা খানিক্ষণ ওর মুখের দিকে চুপ কোরে চেয়ে রইলেন। তার পরে ধীরে ধীরে নিজের ঘরে চ'লে গেলেন। ওকে জাগালেন না।

ভোরবেলা উঠে ওর বাবা ওকে দেখ্‌তে না পেয়ে ডাক দিয়ে বল্লেন—ওরে পাগলী আজ এখনও উঠিস্‌নি কেন? পূজোর ফুল তুলতে হবে না?

ওর মা তাড়াতাড়ি এসে বল্লেন—আহা থাক্‌ থাক্‌। ওকে এখন জাগিয়ো না। আমিই তোমার পূজোর ফুল তুলে দেব।

হিমের হাওয়া দেওয়া সকাল। তেমনি শিশির-ভেজা বাগান। তেমনি আকাশের আলো।

মা স্নান সেরে পূজোর ফুল তুলছেন। এতক্ষণ ওর ঘুম ভেঙে গেছে; উঠে এসে বসেছে এই কোণের শিউলি-গাছ তলায়। ওর চারিদিকে ঝরা শিউলি ফুল। ওর সাদা কাপড়ে আর শিউলি ফুলের পাপড়ীতে এক সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে।

ওকে ঐ ভাবে বসে থাকতে দেখে ওর মা বল্লেন—ওঠ্‌ মা, মুখ হাত ধুয়ে কিছু মুখে দে। কাল সারারাত্তির শুকিয়ে র'য়েছিস যে।

ও কোনো উত্তর দেয় না। যেন কিছু শুনতে পায়নি।

ওর মা আবার ডাকেন—শেফালি!

আফ্‌গানিস্থানের নবযুগ

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

দুরাণী রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ শাহ্‌ আব্‌দালীর মৃত্যুর পর আফগানিস্থানের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় আরম্ভ হয়। পুত্র তৈমুর অকর্ম্মণ্য না হইলেও পিতার অসাধারণত্বের দাবী করিতে পারিত না। কিন্তু এই শক্তির অভাব তাহার অপরিমিত আকাঙ্ক্ষাকে দমন করিতে পারে নাই। পিতার মত তাহারও বাসনা ছিল যে, তাহার রাজত্ব হিন্দুস্থানের গঙ্গানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবে। এই ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিতে তৈমুর যে দুই চারি বার চেষ্টা না করিয়াছিল তাহাও নহে, তবে সাফল্য তাহার ভাগে ঘটিয়া উঠে নাই।

তাহার মৃত্যুর পর আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে থাকে। ইহার প্রধান কারণ একজন শক্তিমান শাসকের অভাব। ক্রমশঃ এই গোলযোগ পরিপুষ্ট হইয়া অন্তর্বিপ্লবে পরিণত হইল এবং ক্রমাগত যুদ্ধ-বিগ্রহের পর আফগানিস্থানের সিংহাসনে পুনরায় বারাকজই বংশ প্রতিষ্ঠিত হইল। দোস্ত মহম্মদ ইহাদের অধিনায়ক।

এই অন্তর্বিপ্লবের সময় তৈমুরের দুই তিন জন পুত্র পর পর কিছুদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্যভোগ তাঁহাদের বেশীদিন ঘটে নাই। ক্রমাগত ভ্রাতৃবিরোধের

ফলে রাজবংশ একদিকে যেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, শাসন শৃঙ্খলাও তেমনি নষ্ট হইতে লাগিল। এ পর্য্যন্ত লাহোর অবধি রাজ্যের সীমানা ছিল। লাহোরের জমন্ শাহ তৈমুরের এক পুত্র, তিনি রণজিৎ সিংহকে শাসকরূপে

কাবুলের বড় মসজিদ

নিযুক্ত করেন। কিন্তু ১৮০০ খৃষ্টাব্দে জমন্ শাহের সিংহাসনচ্যুতির কথা জানিতে পারিয়াই রণজিৎ সিংহ আপনাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় দমন করিবার সামর্থ্য আফগান রাজশক্তির ছিল না—ফলে পঞ্জাব ক্রমশঃ স্বাধীন হইয়া পড়িল।

তৈমুরের পুত্র শাহ্ সুজা দুরাণী বংশের শেষ আমীর। তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া দোস্ত মহম্মদ রাজ্য অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে বিপত্তির নিবৃত্তি হইল না। দোস্ত মহম্মদ এদিকে যেমন বারবার পঞ্জাব প্রদেশ পুনরুদ্ধার করিতে চেষ্টা পাইতে লাগিলেন, অন্যদিকে তাহাকে তেমনি কান্দাহারের সীমানায় শাহ্ সুজার সঙ্গে সদাসর্ব্বদা সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিতে হইল। সুতরাং পঞ্জাবের পুনরুদ্ধার সহজসাধ্য বলিয়া বোধ হইল না।

এই সময়ে লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ভারতবর্ষের গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। দোস্ত্ মহম্মদ চিঠিতে তাঁহাকে অভিনন্দন করিবার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জাবের পুনরুদ্ধারে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বসিলেন। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড এই অভিনন্দনের যথাযোগ্য উত্তর দিলেন, কিন্তু আমীরকে সাহায্য করিতে তিনি স্বীকৃত হইলেন না। এই অস্বীকৃতির কারণ ছিল। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড ও তাহার মন্ত্রি-পরিষদের চিন্তাধারা ভিন্ন-পথে চালিতে হইতেছিল। তাহাদের মনে হইল, আমীর গোপনে রুষশক্তির সহিত মিলিত, অথবা ঠিক মিলিত না হইলেও যে কোন মুহূর্ত্তে তাহাদের এই মিলনের সম্ভাবনা। তাঁহারা ভাবিলেন, রুষিয়া বৃটিশ-শাসিত ভারতের প্রতি লোলুপদৃষ্টিতে চাহিয়া আছে—আফ্‌গানিস্থানের সাহায্য পাইলে তাহার পক্ষে ভারতবর্ষ আক্রমণের পথ অত্যন্ত সুগম হইবে।

পক্ষান্তরে, রণজিৎ সিংহের সহিত বৃটিশের সদ্ভাব যথেষ্ট। রুষ-আক্রমণে রণজিৎ সিংহই ভারতবর্ষের তোরণদ্বার রক্ষা করিবেন। কাজেই এই নিশ্চিত মিত্রের বিরুদ্ধে যাইয়া আমীরের সহায়তা করা কোনও ক্রমেই সমীচীন হইবে না। দোস্ত্ মহম্মদ লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের এই অসম্মতিতে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং বার বার গভর্ণর-জেনারেলের সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড কিন্তু শুধু এ-সব ভাবিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তাঁহার রুষভীতি ক্রমশঃ প্রবল আকার ধারণ করিল। তিনি যে কোনো মুহূর্ত্তে রুষ-আক্রমণের আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার মনে হইল, যদি আফগানিস্থানে কোনও শক্তিমান স্বাধীন আমীরের পরিবর্ত্তে এমন কোনও আমীরকে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যে বাহিরের সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারে ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অনুশাসন মানিয়া চলিবে, তাহা

প্রজাদের এক জিরগায় নূতন আমীর নাদির শাহের প্রথম বক্তৃতা

হইলে এই রুষ-আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হইবে। এই ধারণা ক্রমশঃ ভারত-গভর্ণমেণ্টের মনে দৃঢ়বদ্ধ হইতে লাগিল। প্রথম আফ্গান যুদ্ধের ইহাই মূলসূত্র।

এই মনোভাবের বশে লর্ড অক্ল্যাণ্ড আফগানিস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপার হস্তক্ষেপ করিবার সুযোগ খুঁজিতে লাগিলেন। সুযোগেরও অভাব ঘটিল না।

১৮৩৮ সানের ২০শে জুলাই তারিখে এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। শাহ সুজা, রণজিৎ সিংহ ও গভর্ণর জেনারেল ইহাতে স্বাক্ষর করিলেন। চুক্তিপত্রে লেখা হইল যে, এই তিন শক্তি একত্র সম্মিলিত হইয়া একযোগে বারাকজই বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শাহ্সুজাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবেন। লর্ড অক্ল্যাণ্ডের এ-সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার কোনও সঙ্গত কারণ ছিল না, কাজেই প্রথম আফগান যুদ্ধকে ঐতিহাসিক মাত্রেই ব্রিটিশ-শাসনের কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন।

এই ঘটনার পরবর্ত্তী দুই বৎসরের কাহিনী অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষের চারিদিক হইতে ইংরাজ সৈন্য আফগানিস্থান বিজয়ে যাত্রা করিল। পথে অসংখ্য সৈন্য, ভারবাহী জীব ও অনুচরদিকের মৃত্যু হইল—মাঝে মাঝে দস্যুদের আক্রমণে রসদ-সমস্যা কঠিন উঠিল।

বৃটিশ সৈন্যাধ্যক্ষেরা পদে পদে ভুল করিতে লাগিলেন। কিন্তু নানারূপ ভ্রম-প্রমাদ সত্ত্বেও শুধু ভাগ্যদেবীর সহায়তায় বৃটিশ সৈন্য পরিশেষে আফ্গানিস্থানের তক্তে শাহ্ সুজাকে বসাইতে সমর্থ হইল। দোস্ত মহম্মদ পলাতক হইলেন, পরে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

শাহ্ সুজা 'গদী'তে বসিলেন সত্য, কিন্তু রাজ্যে শান্তি সংস্থাপনের ক্ষমতা তাহার ছিল না। শান্তিরক্ষার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে শাহ্ সুজার মারফৎ রাজ্যের বিভিন্ন দলপতিকে অর্থদান করিতে হইত। দুই বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত এই অর্থসাহায্যে ভারতবর্ষের রাজকোষের যথেষ্ট শোষণ হইয়াছিল। গভর্ণর জেনারেল এই প্রকার অর্থব্যয় আর কিছুতেই সমর্থন করিতে পারিলেন না—তিনি শাহ সুজাকে এ-বিষয়ে ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

শাহ্ সুজার অর্থবল কিছুই ছিল না, কাজেই তাঁহাকে এই উৎকোচ দান বন্ধ করিতে হইল, এবং উৎকোচ বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হইল।

এতদিন বৃটিশ সৈন্যই আফগানদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করিতেছিল, এখন তাহার প্রতিফল আরম্ভ হইল। এই গোলযোগের প্রারম্ভেই আফ্গানিস্থানে

আফগানিস্থানে গৃহবিবাদ, রুসঋক্ষ ও ব্রিটিশ সিংহ

বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি ম্যাক্নটেন সাহেব দোস্ত মহম্মদের পুত্র আকবর কর্ত্তৃক নিহত হইলেন. চারিদিকে প্রবল আক্রমণে সৈন্যদের নানাপ্রকার দুর্দ্দশা আরম্ভ হইল। এমন কি এলফিন্ষ্টোনের নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। পরিশেষে শাহ্ সুজাও নিহত হইলেন। আর এই চরম দুর্দ্দৈবের সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্থানে বৃটিশ-শক্তির সম্মান একেবারে বিনষ্ট হইল।

এই সময় লর্ড অক্ল্যাণ্ড ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলেন এবং তাহার স্থানে লর্ড এলেনবরা গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন। তাহার আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আফ্গানিস্থানে বৃটিশ-নীতির পরিবর্ত্তন হইল, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আফ্গানিস্থানের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে কোনও রূপ হস্তক্ষেপ করিবেন না বলিয়া তিনি ঘোষণা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আফ্গানিস্থান হইতে সমস্ত বৃটিশ সৈন্য ফিরাইয়া আনিবার আদেশ হইল। দোস্ত মহম্মদকে বিনাসর্ত্তে রাজ্য ছাড়িয়া দেওয়া হইল। লর্ড এলেনবরা নানা কথা কহিয়া ভারতবাসীর নিকট প্রথম আফগান যুদ্ধের সফলতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা পাইলেন সত্য, কিন্তু তাহাতে সমগ্র জগতের সম্মুখে বিনষ্ট বৃটিশ-গৌরবের মর্য্যাদা আরও কমিয়া গেল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ্চ দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে এক সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল। তখন এবং তৎপরবর্ত্তী কালেও আমীর এই সন্ধিপত্রের সম্মান রাখিয়াছিলেন। ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহ ইহার পরক্ষণেই আরম্ভ হয়। এই গোল-যোগের সময় আফগানিস্থানের আমীরের পক্ষে ভারত আক্রমণের পন্থা অত্যন্ত সুগম ছিল, এমন কি পঞ্জাব হইতে তাঁহাকে একরূপ আহ্বানও করা হইয়াছিল। সেই সময়ে আমীর ভারত আক্রমণ করিলে সিপাহী-বিদ্রোহের ইতিহাস অন্যরূপ হইত বলিয়া ধারণা করা একান্ত অন্যায় হইবে না।

ইহার পর হইতে অনেককাল ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্থানের বিশেষ কিছু সম্পর্ক ছিল না। লর্ড লরেন্স-এর শাসনকাল হইতে লর্ড লিটনের শাসনকালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আফগানিস্থান সম্পর্কে আর বৃটিশ-নীতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই অর্থাৎ গভর্ণর জেনারেল আর আফগানিস্থানের কোনও ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন নাই। এই নীতিকে ইংরাজীতে "masterly inactivity"-র নীতি বলা হইত। ইহার মূলসূত্র সংক্ষেপে এই ছিল যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সে দেশের কোনও দলকে সাহায্য করিবেন না; তাহাদের বিবাদ-বিসম্বাদ নিজেদেরই মিটমাট করিতে দেওয়া হইবে, আর সে দেশে যখন যিনি আমীর হইবেন তাহার সঙ্গেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মিত্রতা থাকিবে।

ইতিমধ্যে দোস্ত মহম্মদের মৃত্যু হইল। তাহার মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া তাহার যোল জন পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। অবশেষে তৃতীয় পুত্র শের আলি গদী দখল করিয়া বসিলেন। পূর্ব্বতন নীতি

অনুসরণ করিয়া তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং তাঁহাকেই আমীর বলিয়া মানিয়া লইলেন।

লর্ড লিটন যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতে আসিলেন, তখন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী প্রথিতযশা ডিজরেলী। তিনি পূর্ব্বতন নীতির ভক্ত ছিলেন না। লর্ড লিটনও ভাবিতেন, আফগানিস্থানের একদিকে যেমন বৃটিশ শক্তি অন্যদিকে তেমনি রুষিয়ার বিরাট শক্তি। মাঝখানে এই দুর্ব্বল আমীরকে রাখিয়া ইহারা কেহই বহু দিন বসিয়া থাকিবে না—পরন্তু এক দিন না একদিন তাহাদের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হইবেই। এই যুদ্ধ যখন নিশ্চিত তখন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি সুরক্ষিত সীমান্তপ্রদেশ গঠন একান্ত আবশ্যক। হিন্দুকুশকেই তিনি ইহার সর্ব্বোত্তম সীমারেখা বলিয়া মনে করিলেন। ইহাকে scientific frontier বলিয়া অভিহিত করা হইত।

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল পেশোয়ারে এক সভা আহ্বান করিলেন। কিন্তু আমীর সেখানে তাহার প্রতিনিধি পাঠানও সঙ্গত বোধ করিলেন না। এদিকে নানা বিষয় আলোচনার জন্য গভর্ণর-জেনারেল আফ্‌গানিস্থানে বৃটিশ দূত প্রেরণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু আমীর তাহাতে সম্মত হইলেন না, পরন্তু রুস গভর্ণমেণ্টের দূতকে তিনি গ্রহণ করিলেন। ফলে দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধের সূচনা হইল।

বৃটিশ সৈন্য পুনরায় আফগানিস্থান অভিযানে অগ্রসর হইল। লর্ড লিটন এবার চারিদিকের আটঘাট বাঁধিয়া কাজ করিতেছিলেন, কাজেই আফগানিস্থান বিজয় বৃটিশ শক্তির নিকট এবার অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িল। শের আলি পলায়ন করিলেন এবং ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রুষসাম্রাজ্যের সীমান্তে এই পলাতক অবস্থাতেই তাহার মৃত্যু ঘটিল।

শের আলীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র ইয়াকুব খাঁ ইংরাজের সহিত সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন। এই সন্ধি গুণ্ডামুক-এ স্বাক্ষরিত হইল। ইহার নিয়মানুযায়ী ইয়াকুব খাঁ একজন ইংরাজ প্রতিনিধিকে তাহার রাজধানীতে রাখিয়া দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বেশি দিন তিনি এই সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন না। ফলে কাবুলে ইংরাজ প্রতিনিধি কাভেনরী নিহত হইলেন।
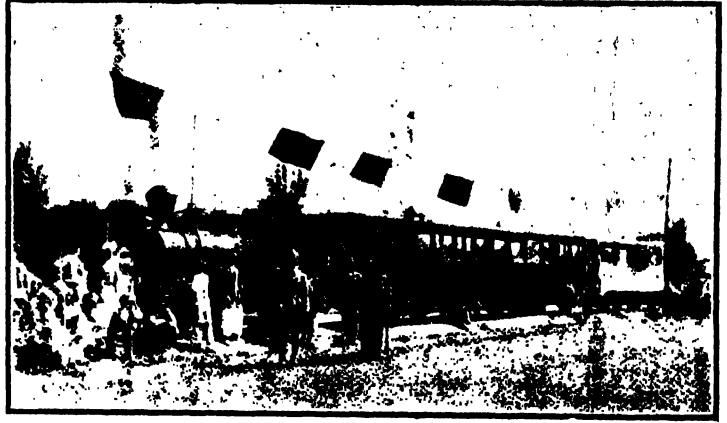
আফগানিস্থানের একমাত্র রেলপথ

এই শোকসংবাদ জানা মাত্রই পুনরায় আফ্‌গানিস্থান আক্রমণের আয়োজন আরম্ভ হইল এবং কিছু দিনের মধ্যেই সৈন্যাধ্যক্ষ রবার্টস-এর বিপুল বাহিনী মহাসমারোহে কাবুল অভিমুখে যাত্রা করিল। রবার্টস্-এর এই বিজয়যাত্রা ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছে।

রবার্টস্ অনায়াসে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার আগমনের কথা শুনিয়াই আমীর ইয়াকুব খাঁ নির্ব্বিবাদে সিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, আফগানিস্থানের আমীরী করা অপেক্ষা ইংরাজের তাঁবুতে থাকিয়া ঘোড়ার ঘাস কাটাও সমীচীন।

ইয়াকুব খাঁকে বন্দী করা হইল সত্য, কিন্তু তাহার এই আমীরী ত্যাগে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট আফ্‌গানিস্থান সম্পর্কে বেশ বিব্রত হইয়া পড়িলেন! ইয়াকুব্ খাঁকে

বন্দী অবস্থায় সপারিষদ বাচ্চা-ই-সাকাও

পুনরায় নির্ব্বিচারে গদীতে স্থাপিত করা কোনও মতে যুক্তিযুক্ত বোধ হইল না, অথচ আফগানিস্থানকে একরূপ অরাজক অবস্থায় ফেলিয়া আসাও অসঙ্গত মনে হইল। লর্ড লিটন ভবিষ্যতের ব্যবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

এমন সময় একজন নূতন আফগান অধিনায়ক ক্রমশঃ শক্তিমান হইয়া উঠিতে লাগিলেন। ইঁহার নাম আব্দার রহমান্। ইনি মৃত আমীর শের আলির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আফ্জল খাঁর পুত্র। আফ্জল খাঁ বৎসরাধিক কাবুলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যে অন্তর্বিপ্লব হয় তাহাতে শের আলি জয়ী হইয়া গদী দখল করেন। কাজেই আব্দার রহমান্ একহিসাবে আইনতঃ সিংহাসনের মালিক। বিশেষতঃ তাহার শক্তি ক্রমশঃ এত বৃদ্ধি পাইয়া চলিল যে, লর্ড লিটন মনে করিলেন সময় থাকিতে তাহার সঙ্গে সন্ধি না করিলে পরে নানারূপ গোলযোগ হইতে পারে এমন কি শেষে নিজেদের সুবিধা ও ইচ্ছানুরূপ সর্ত্তে সন্ধিস্থাপন না ঘটিয়া উঠিতে পারে।

এই সময় ডিজরেলীর স্থলে গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হইলেন। তাঁহার মতের সঙ্গে ডিজরেলীর মতের মিল ছিল না। লীবারেল গভর্ণমেণ্ট আফ্গানিস্থান সম্পর্কে গভর্ণর-জেনারেলের অভিমত অনুমোদন করিলেন না। ফলে লর্ড লিটন পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং তাহার স্থলে নিযুক্ত হইয়া আসিলেন মারকুইস অফ রিপন।

যাহা হউক ইংরাজের সঙ্গে আব্দার রহমানের সন্ধি হইয়া গেল এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আফ্গানিস্থানের আমীররূপে রাজত্ব আরম্ভ করিলেন।

রুষ বা পারস্য-এ পর্য্যন্ত আফ্গানিস্থানের সহিত তাহাদের কোনও রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে বলিয়া স্বীকার করিত না, কাজেই এই সন্ধিপত্রে এই সর্ত্ত থাকিল যে, শুধু

ইংরাজের সঙ্গেই আফ্‌গানিস্থানের রাজনৈতিক সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিল—বহির্জ্জগতের যাবতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে আমীরকে ইংরাজের কথামত চলিতে হইবে, কিন্তু দেশের আভ্যন্তরীণ কোনও ব্যাপারে ইংরাজ হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। আব্‌দার রহমান তাহার রাজত্বকালে প্রায় সর্ব্বথা এই সর্ত্তগুলি প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ইংরাজেরা আব্‌দার রহ্‌মানের সহিত সন্ধিপত্র একেবারে ব্যক্তিগত ব্যাপার বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাহার মৃত্যুর পর পুত্র হবিবুল্লাও গদী দখল করিয়া ইহা বহাল রাখিতে চাহিলেন। পূর্ব্বের সন্ধি অনুযায়ী আব্‌দার রহমানকে ভারতবর্ষের মধ্য দিয়া অস্ত্রশস্ত্র আনয়ন করিতে দেওয়া হইত। হবিবুল্লাও সেই প্রকারে যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করিতে যত্নবান হইলেন। ইংরাজ তাহা বন্ধ করিয়া দিল। ইহাতে আমীর ইংরাজের উপর চটিয়া গেলেন।

তথাপি ইংরাজের সহিত আমীরের বিশেষ কোন গোলযোগ উপস্থিত হইল না। কিন্তু মহাযুদ্ধের সময় আমীর একটু দোটানায় পড়িয়া গেলেন। যুদ্ধের আরম্ভ হইতেই তিনি ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিবেন না বলিয়া প্রচার করেন, কিন্তু পরে তুর্কী ও জার্ম্মাণীর সম্মিলন তাহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল। এই সম্মিলিত শক্তির দূত আমীরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। আমীর মৌখিকভাবে তুর্কীর সহিত যোগদান করিলেন সত্য কিন্তু কার্য্যতঃ কোনও কিছু করিলেন না। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী হবিবুল্লা আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন।

তাহার মৃত্যুর পর আফগানিস্থানে আর একবার অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হইল। মৃত আমীরের ভাই নসরুল্লা মাত্র ছয়দিন রাজত্ব করেন, পরে হবিবুল্লার দ্বিতীয় পুত্র আমানুল্লা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া গদী অধিকার করিয়া বসেন। তাহার পর হইতে আফ্‌গানিস্থানের ইতিহাসের যে নবীনতম অধ্যায় আরম্ভ হয় তাহার পরিসমাপ্তি কবে ঘটিবে কেহ বলিতে পারে না।

আমানুল্লা যখন আমীর হইলেন তখন দেশে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লব। এই গোলযোগ তাঁহাকে একেবারে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। তাঁহার সিংহাসনলাভের সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় আফগান যুদ্ধের সূচনা হইল।

পাগমানে আমানুল্লার রাজপ্রাসাদ

আমানুল্লা সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভাবিলেন যে, এই অন্তর্মুখী বিপ্লবকে বহির্মুখী করিতে পারিলে দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে। হয়ত ইহাও তাঁহার ধারণা ছিল যে, মহাযুদ্ধে ইংরাজ এত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে যে এই সুযোগে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলে বাধ্য হইয়া ইংরাজকে খুব সুবিধামত সন্ধিপত্রে রাজী করান যাইবে। এই প্রকার নানা দিক ভাবিয়া আমানুল্লা ভারত অভিযানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অভিযান বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারিল না।

নূতন সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইল এবং ইহার দ্বারা আফগানিস্থানের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত হইল। নূতন সন্ধিমতে ইংরাজ আফগানিস্থানের পররাষ্ট্রীয় বা আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোনও ব্যাপারে আর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না বলিয়া স্বীকৃত হইল। পৃথিবীর নানাশক্তি আফ্‌গানিস্থানে তাহাদের প্রতিনিধি

প্রেরণ করিল এবং আমীরও নানাদেশে আপনার প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। রাজ্যশাসন যথাক্রমে চলিতে লাগিল।

আমীর হবিবুল্লাই প্রথম আফ্‌গানিস্থানে আধুনিক সভ্যতা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেন। তিনি দেশে, মোটর-কার, টেলিফোন, সংবাদপত্র প্রভৃতির প্রচলনে সচেষ্ট হন। শিক্ষাবিস্তারই যে সভ্যতার ভিত্তি এ-ধারণা তাহার যথেষ্টই ছিল এবং তাহারই সময়ে কাবুলে একটি উচ্চ-বিদ্যালয় ও হাবিবিয়া কলেজ স্থাপিত হয়। এই সকল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের জন্য সাধারণতঃ ভারতবর্ষ হইতে শিক্ষক সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

আফগানিস্থানের নূতন সরকারী দপ্তরখানা

আফগানরা যে এখনও একপ্রকার অসভ্য একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শিক্ষার বিস্তার সেখানে বিশেষ কিছু হয় নাই—কুসংস্কারে সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ। কাজেই আমীর হবিবুল্লা প্রবর্ত্তিত এই সকল নূতনত্ব কোনও দিনই মোল্লাদের মনঃপূত হয় নাই। কিন্তু তাহা লইয়া বিশেষ কোনও গোলযোগের সৃষ্টিও হয় নাই।

কিন্তু আমীর আমানুল্লা আফগানিস্থানের যে সংস্কার আরম্ভ করিলেন তাহা প্রকারেও যেমন ব্যাপক, উহার গতিও তেমনি দ্রুত। তিনি দেশে একটা যুগান্তর আনিতে চেষ্টা করিলেন। কি নারীশিক্ষায়, কি সামাজিক ব্যাপারে, কি রীতিনীতিতে, সর্ব্বত্র একটা নব-ভাবের আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু অশিক্ষিত আফ্‌গানিস্থান এত দ্রুত সংস্কারগ্রহণে সমর্থ হইল না। ইহার ফল বিষময় হইয়া দাঁড়াইল। সনাতন পন্থানুসারী মোল্লাগণ আমানুল্লার উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠিল। দেশের সর্ব্বত্র বিরক্তি সঞ্চারিত হইতে হইতে ক্রমে সেই ধূমায়মান বিদ্রোহ বাচ্চা-ই-সাকো রূপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। ফলে, আমীর আমানুল্লা রাজ্য ছাড়িয়া ইটালীতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন।

বাচ্চাই-সাকোর পিতা ভিস্তি বহন করিতেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ বর্ত্তমান। সে যাহাই হউক, ইহার ভাগ্যেও বেশি দিন আমীরী ঘটিয়া উঠে নাই। নাদির শাহ ইহাকে নিহত করিয়া গদী দখল করিয়া বসিয়াছেন।

আফ্‌গানিস্থানের আয়তন অল্পকম ২৪৫০০০ বর্গ মাইল। দেশের অধিবাসী প্রায় ১০,০০০,০০০ লক্ষ—সকলেই ইসলামধর্ম্মী।

সাধারণতঃ আফগানেরা বড় অর্থলোলুপ। বহুকাল যাবৎ হিন্দুস্থানের তোরণদ্বার রক্ষা করিয়া ইহাদের আচরণ সভ্যতাসঙ্গত হইতে পারে নাই। চুরি ও ডাকাতি ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত সচরাচর ঘটিয়া থাকে—নরহত্যা ইহাদের পক্ষে অতি সাধারণ ব্যাপার। দেশে জমির অভাব, কাজেই সকলের পক্ষে চাষবাস করিয়া আহার-সংগ্রহের সম্ভাবনা নাই। উপজীবিকার জন্য বহু আফগানকে দস্যুতা অবলম্বন করিতে হয়।

গ্রামে গ্রামে মোল্লারাই প্রধান। তাহাদের কথামত ইহারা চলিয়া থাকে। দৈবজ্ঞ ও মোল্লাতে আফগানদের অতিশয় বিশ্বাস। দিনক্ষণ দেখিয়া তাহারা শুভ কার্য্য আরম্ভ করে। দোষশান্তির জন্য কবচধারণ তাহাদের পক্ষে অতি সাধারণ প্রথা—এমন কি শান্তি-কবচ তাহাদের ঘোড়ার শরীরেও বাঁধিয়া দিতে দেখা যায়।

আফগানেরা অতিথিপরায়ণ, বহুকালের আচরিত রীতি প্রতিপালন করিয়া তাহারা এই বিশিষ্টতার অধিকারী হইয়াছে। তাহাদের রীতি অনুসারে যদি কোন শত্রুও আসিয়া গৃহে আশ্রয় প্রার্থনা করে তবে নির্ব্বিচারে তাহারা তাহাকে আশ্রয় দান করে, এবং সাধারণতঃ এ ব্যাপারে সর্ব্বথা বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলে। গ্রামে কোথায়ও বা মোল্লারা অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেক লোকের নিকট হইতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে চাঁদা গ্রহণ করে। এ সকল যে তাহারা আপনাদের বুদ্ধি-বিবেচনার দৌলতে করিয়া থাকে তাহা নহে, সনাতন প্রথার আচরণই এ সকলের মূলসূত্র।

আফগানিস্থানে পথঘাট এখনও বিশেষ কিছু নাই। কাবুলের চারিপাশে কিছুদূর পর্য্যন্ত বাঁধা রাস্তা হইয়াছে এবং কোথায়ও বা মোটরগাড়ী চলে। ভারতবর্ষের সঙ্গে আফগানিস্থানের টেলিগ্রাফ-সংযোগ আছে। সম্প্রতি কাবুলে বেতারবার্ত্তা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কিন্তু দেশের ভবিষ্যৎ এখনও যে তিমিরে সেই তিমিরে। স্ত্রীলোককে এখনও সেখানে একপ্রকার দ্রব্যসম্ভারের মধ্যে গণ্য করা হয়, এমন কি অর্থের বিনিময়েও ক্রয় করা চলে।

দেশে কাব্য, সাহিত্য কিছু কিছু আছে—ইহাদের ভাষার নাম পুস্তু। ইহা পুরাতন পারসী ও হিন্দুস্থানীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন। দেশে লেখ্য ও কথ্য ভাষারূপে পারসীর প্রচলন এখনও সমধিক। অন্য কোনও বিষয়ের গ্রন্থ সে-সাহিত্যে একেবারে নাই বলিলেও চলে।

শিক্ষাবিস্তার ব্যতিরেকে আফ্‌গানিস্থানের সংস্কার-সাধন অসম্ভব, আর সে-দেশের পক্ষে অতি দ্রুত সংস্কারও সম্ভবপর নহে। তবে চারিদিক চিন্তা করিলে মনে হয় শিক্ষার আলো লাভ করিলে এই শক্তিমান জাতির মধ্যে একটা বিরাট জাতীয়তা গড়িয়া উঠিবে।

মল্লজগতে ভারতের স্থান

ব্যায়ামাচার্য্য শ্রীশ্যামসুন্দর গোস্বামী

(২)

জার্ম্মানীর আর্থার স্যাক্‌শন্

ইনি ভারোত্তলন ব্যায়ামে জগতে নবযুগের সূচনা করিয়াছেন। ১৯০৩, ৮ই এপ্রিল তারিখে লণ্ডনে Bent press-এ ৩১৪ পাঃ ভার সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে উত্তোলন করেন। পরবৎসর নভেম্বর মাসে ঐ ভাবে ৩৩১ পাঃ; পুনরায় হলে ৩৩৫¾ পাঃ; ১৯০৫, ১২ই ডিসেম্বর, জার্ম্মানীর ষ্টুটগার্টে ৩৭০ পাঃ; এবং আপলো-স্কুলে ৩৮৬ পাঃ, যাহা এযাবৎ কাহারও দ্বারা অনুকৃত হয় নাই, অচিরকাল মধ্যে হইবার সম্ভাবনাও অল্প।

Bent press, two hands any how, one hand any how এ সকলে তিনি অদ্যাপি অজেয়ই আছেন। স্যাকশন ছিলেন smooth type, তত্রাচ মেদশূন্য। এইটি তাঁহার শরীরের বিশিষ্টতা।

ইংলণ্ডের টমাস ইঞ্চ

Bent pressএ স্যাকশনের পরেই টমাস ইঞ্চ—৩০৪½ পাঃ ইহার সীমা। Side pressএ ২০৯ পাঃ—অসাধারণ। ইনি Inch Challenge Dumbbellএর আবিষ্কর্ত্তা। ইঞ্চ ব্যতীত অপর কেহ ইহা তুলিতে পারে না।

পেশী-নিয়ন্ত্রণে অদ্ভুত কৃতিত্বশালী ম্যাক্সিক্

ব্যায়ামজগতে ম্যাক্সিকের অভ্যুত্থান একটি বিশিষ্ট ঘটনা। শারীরিক বলে যেমন তিনি অসীম বলশালী ছিলেন, তেমনই পেশী-নিয়ন্ত্রণে তাঁহার কৃতিত্ব ছিল অসাধারণ। Skeletal muscle আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার আয়ত্তাধীন ছিল। এ-বিষয়ে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি Muscular type পর্য্যায়ভুক্ত ছিলেন। দৈহিক পূর্ণতা ও দেহকে আয়ত্তাধীন রাখার কৌশলে তিনি তাঁহার স্থান স্যাণ্ডোর উপরে। এ কথার উল্লেখ বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না যে, আমার শিষ্য দীনবন্ধু আবয়বিক সম্পূর্ণতায় প্রায় ম্যাক্সিকের অনুরূপ, কিন্তু পেশীনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতায় অধিকতর কৃতিত্বশালী।

আমেরিকায় ষ্ট্রংফোর্ট

ইনি muscular type. পেশীনিয়ন্ত্রণেই ইঁহার বিশিষ্টতা। গ্রীবা হইতে উরুদেশ পর্য্যন্ত পেশী সমূহের স্রোতোপম আকুঞ্চন বাস্তবিকই দেখিবার জিনিষ। এই প্রক্রিয়াটি আমার ছাত্র নিতাইসুন্দর অতি সুন্দরভাবেই সম্পন্ন করিয়া থাকে। ইঁহার Bridge positionএ শরীরের উপর দিয়া আরোহীসহ মোটর গাড়ী চালাইয়া দেওয়া যে প্রশংসাসূচক ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। এইভাবে আরোহীসহ মোটর অপেক্ষা অধিকতর ভারী পাথর আমি বক্ষঃস্থলে ধারণ করিতে সমর্থ।

বজ্রমুষ্টি ভ্যান্‌সিটার্ট

হস্তের দ্বারা পয়সা ভাঙ্গা, লোহার প্রেক বাঁকান, বাঁলুর চাপে বা সাহায্যে ক্লারেটের বোতল ভাঙ্গা, ঘোড়ার নাল ভাঙ্গা, টেনিস বল ছেঁড়া (অশেষ মুষ্ট বলের পরিচয়); কভার-সহ দুই প্রস্থ তাস ছেঁড়া (আমার মতে অসম্ভব) বলের পরিচায়ক আর কভার ব্যতীত তিন প্রস্থ তাস ছেঁড়া (যাহা আমি নিজেই করিয়াছি) এই সকল তাঁহার অসাধারণ শক্তির ক্রিয়া। এই ইংরেজ ব্যায়ামবীর ছিলেন muscular type। ভারোত্তোলনের সহায়তায় তিনি শক্তিসঞ্চয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান ভারতে এইরূপ শক্তির কার্য্যে সমর্থ লোক দৃষ্ট হয় না। তবে এই জার্ম্মানীর মার্কস্ প্রায় এইরূপ মুষ্টিবলবিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া অনেকের মত।

জর্জ্জ জট্‌ম্যান (আমেরিকা)

স্মুথ টাইপ; স্যাণ্ডোর চেয়েও বলবান্ ছিলেন। এক প্রকার ভারোত্তোলন যাহা crucifix lift বলিয়া কথিত তাহা তাঁহার নিজস্ব ছিল।

জো নর্ডকোয়েস্ট

ইনি একজন বিশেষ খ্যাতনামা ভারোত্তলনকারী। স্মুথ টাইপ; pull over ও press on back without bridgeএ ৩৬৩½ পাঃ আর pull over ও push on back with bridgeএ ৩১৮ পাঃ তুলিয়াছিলেন। স্যাকসনের চেয়ে ২ পাঃ বেশী। সে যাহা হউক ইহাদের চেষ্টায় ও অভিজ্ঞতার ফলে ভারোত্তলন সম্বন্ধে নানাবিধ পদ্ধতি পন্থা, বৈজ্ঞানিক অবস্থান ও যন্ত্রাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে সুতরাং পাশ্চাত্য জগতে এই রীতির ব্যায়াম প্রণালীর প্রচুর উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

পৃষ্ঠদ্বারা অপরিমিত ভারোত্তোলনকারী ট্রাভিস

ট্রাভিস দ্বারা যে ভার উত্তোলন করিতেন তাহার গুরুত্ব ৪০০০ পাঃ আর তাঁহার harness lift-এর ওজন ছিল ৩৬০০ পাঃ এ-যাবৎ ইহা সর্ব্বোচ্চ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিতেছে তবে সির ইহার ব্যতিক্রম। সির-এর back lift ছিল ৪৩০০ পাঃ—অভূতপূর্ব্ব এবং অদ্যাবধি অনতিক্রান্ত। ট্রাভিস ছিলেন স্মুথ টাইপ।

স্ববোডা, রিগোলা ও গর্ণার

পাশ্চাত্য রীতিতে পৈশিক সামর্থ্য কতটা পরিপুষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে ইঁহারা তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলনকারী

দেবী চৌধুরী

এইবার অমানুষিক বলসম্পন্ন দেবী চৌধুরীর কিঞ্চিৎ পরিচয় দিব। তাঁহার সহিত পাশ্চাত্য ভারোত্তোলন-কারিগণের বলের তুলনা করিলে দেখা যায়, ভারতীয় ভারোত্তলন পদ্ধতি বলের আদর্শকে কত উচ্চ স্থান দিতে সমর্থ। ভারতীয় ভারোত্তোলন তিন ভাগে বিভক্ত—নাল উত্তোলন, গদা উত্তোলন এবং মুদ্গার উত্তোলন। দেবী চৌধুরী এই তিন প্রকার উত্তোলনেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার গদা ও মুদ্গারের গুরুত্ব অভাবনীয় ছিল। আর উত্তানভাবে শায়িতাবস্থায় তাঁহার "নাল" উত্তোলন ইউরোপীয় বা আমেরিকায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভারোত্তোলকদিগেরও স্বপ্নাতীত ছিল। পাশ্চাত্য মতে ইহার নাম Pull over এবং push on back with bridge। পূর্ব্বোক্ত প্রথায় মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে, আর ভারতীয় প্রথায় সম্মুখ হইতে আবক্ষ উত্তোলন—ইহাদের মধ্যে এই পার্থক্য, যদিও শেষ ব্যাপারে অর্থাৎ pushing-এ কার্য্যের ধারা উভয়ের মধ্যে একই প্রকার।

দেবী চৌধুরী এইভাবে ৯৬০ পাঃ উত্তোলন করিতে পারিতেন। আর পাশ্চত্য জগতের ভারোত্তোলন-কারীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আর্থার স্যাক্সন্ তুলিতেন ৩৮৬ পাঃ; জো নর্ডকোয়েষ্ট ৩৮৮ পাঃ আর জর্জ্জ লুরিক ৪৪৩ পাঃ। দেবী চৌধুরীর অতুলনীয় শক্তিমত্তার তুলনায় ইঁহাদের স্থান বহু নিম্নে। ভারোত্তলন জগতে দেবী চৌধুরী ছিলেন বিশ্ববিজয়ী। স্যাণ্ডো তাঁহার অদ্ভুত বলের পরিচয় দিবার জন্য যখন ভারতে আগমন করেন তখন দেবী জীবিত, কিন্তু স্যাণ্ডোর পক্ষে অবশ্য সৌভাগ্যের বিষয় হইলেও, আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ উভয়ের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ঘটে নাই, সুতরাং বল পরীক্ষাও হয় নাই। হইলে ফল যাহা দাঁড়াইত তাহা সহজেই অনুমেয়। আরও পরিতাপের কথা, দেবী দেশ-দেশান্তরে বহির্গমনের সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই, সুতরাং ইউরোপ, আমেরিকায় যাইয়া বলপরীক্ষা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এরূপ সুযোগ ঘটিলে তিনি যে সর্ব্বত্র জয়ী হইয়া সাফল্যের বিজয় মাল্য পাইয়া স্বদেশে ফিরিতে পারিতেন তাহা না বলিলেও চলে।

ভীমকর্ম্মা রামমূর্ত্তি

ভারতীয় পদ্ধতিতে ব্যায়ামাভ্যাসের অন্যতম নিদর্শন ও ব্যায়াম জগতে নবযুগের প্রবর্ত্তক রামমূর্ত্তি। কতভাবে যে পৈশিক শক্তির প্রয়োগ সম্ভবপর তাহা ইনি অতি প্রত্যক্ষভাবেই দেখাইয়াছেন। এক বিশালকায় হস্তীর ভারে যে মানুষের বক্ষস্থিত অস্থিপঞ্জর চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায় না, শ্বাস রুদ্ধ হয় না,—রামমূর্ত্তিই পৃথিবীর মধ্যে প্রথমে নিজের কৃত কার্য্যের দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অদ্ভুত বলের পরিচয় দিয়াছেন; যথা উন্মুক্ত বক্ষস্থল ও উরুদেশের উপর দিয়া সমকালে ভারবহ শকট চালাইয়া দেওয়া, উন্মুক্ত বক্ষ, উরু ও পৃষ্ঠের উপর দিয়া মোটর গাড়ী চালান, এক বা দুইখানি মোটরের গতি রোধ করা, পৃষ্ঠে ও বক্ষে প্রকাণ্ড ভারী পাথর রাখা, মোটা লোহার শিকল ছিঁড়িয়া ফেলা প্রভৃতি।

ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এবং প্রিন্স অব ওয়েলস, রাজা-মহারাজা, বড়লাট, প্রাদেশিক লাট প্রভৃতি বহু গণ্যমান্য লোকের সমক্ষে তিনি তাঁহার অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া অসংখ্য পদক ও মহামূল্য পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। তিনি শক্তি প্রদর্শন করিবার জন্য লণ্ডনেও গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে ইউরোপের অন্যান্য স্থানে বা আমেরিকায় তাঁহার যাওয়া হয় নাই। ১৯০৫, মে মাসে রামমূর্ত্তি মান্দ্রাজে স্যাণ্ডোকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিয়া-ছিলেন, কিন্তু স্যাণ্ডো পৃষ্ঠপ্রদর্শনই সমীচীন বোধ করিয়া সুদূর রেঙ্গুনাভিমুখে যাত্রা করেন।

রামমূর্ত্তি স্মিথ টাইপ; বাংলায় ভীম ভবানীও এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তিনিও রামমূর্ত্তির সমস্ত প্রক্রিয়া করিতে পারিতেন। তিনি ভারোত্তলন ও বুক্ষণ দুই-ই পারিতেন। ভীম ভবানী পাশ্চাত্য প্রথায় ভারোত্তলনে অভ্যস্ত ছিলেন।

ইউরোপের শ্রেষ্ঠ মল্ল হেকেনস্মিট ফ্রান্স, জার্ম্মেণী, বেলজিয়ম, অষ্ট্রিয়া, ইটালী, ইংলণ্ড, রুশিয়া প্রভৃতি

ইউরোপের সকল দেশের সকল মল্লকেই পরাস্ত করেন। ১৯০০, ২০শে সেপ্টেম্বর বিখ্যাত মল্ল এবং ভারোত্তোলক জর্জ্জ লুরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহূত হইয়াও শেষে পলায়ন করেন। এই বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে বুডাপেস্তে তুর্ক মল্ল কারা আমেদকে তিন ঘণ্টায় পরাস্ত করেন। এতদ্ব্যতীত অন্যতম খ্যাতনামা তুর্ক মল্ল হালিল আদোনিকে ১৯০১ এপ্রিল ভিয়েনাতে পরাভূত করেন। প্যারিসে যে ইউরোপের নানা স্থান হইতে সমাগত ১৩০ জন মল্লের "দঙ্গল" হয় তাহাতে হেকেনস্মিট সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন পরিগ্রহ করেন। তিনি ১৯০৫, ৪ঠা মে অমেরিকার শ্রেষ্ঠ মল্ল টম জেঙ্কিন্সকেও পরাস্ত করেন। তাহার পর অলিম্পিয়াতে তুরস্কের সুবিখ্যাত মল্ল আমেদ মাদ্রানি হেকেনস্মিটের নিকট পরাভব স্বীকার করিতে বাধ্য হন। কাহারও কাহারও মতে হেকেনস্মিট—"চ্যাম্পিয়ন"। তবে জন লেনিন, জ্‌বিস্কো, ফ্রাঙ্ক গচ-এর অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকা সম্বন্ধে সে কথা স্বচ্ছন্দেই বলা চলে, কারণ তিনি তৎকালে ঐ সকল দেশের যাবতীয় মল্লকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের জন লেনিনের বার বার আহ্বানে তিনি সাড়া দেন নাই জ্‌বিস্কোর সঙ্গেও তিনি বলপরীক্ষায় প্রস্তুত ছিলেন না। কাল্লু, গামা, ইমাম বক্স, গোলাম মহীদীন, আমেদ বক্স প্রভৃতি ভারতবাসী আর তুর্কী কুর ডিরেলি ইঁহাদের ত কথাই নাই। শেষে তিনি গচ-এর নিকট পরাজিত হন। সুতরাং তাঁহাকে "পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মল্ল" বলা চলে না।

মল্লজগতে ফ্রাঙ্ক গচ্‌-এর অভ্যুদয়

গচ-এর অভ্যুদয়ে পাশ্চাত্য মল্লজগৎ বিশেষরূপ আলোড়িত হইয়াছিল। এখন পর্য্যন্ত অনেক পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণের ধারণা তাঁহার তুল্য মল্ল আর জন্মগ্রহণ করে নাই। ১৯০৮, ৩রা এপ্রিল শিকাগো শহরে গচ্‌-এর সহিত হেকেনস্মিটের মল্লযুদ্ধ হয়। একঘণ্টাকাল যুদ্ধের পর হেকেনস্মিট লড়িতে অসমর্থ হন এবং গচ্‌ই বিজয়ী বলিয়া ঘোষিত হন।

১৯০৯ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়ার সুবিখ্যাত মল্ল জ্‌বিস্কো গচ্‌-এর সহিত কুস্তি করেন এবং তাহাতে কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারেন নাই। পর বৎসরের ১লা জুন পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে মল্লযুদ্ধ হয়। প্রথমবারে অসাবধানতার জন্য জ্‌বিস্কো কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই পরাজিত হন। দ্বিতীয়বারে তাঁহাকে হারাইতে গচ্‌-এর ২৭ মিঃ ৩৩ সেকেণ্ড লাগিয়াছিল।

পরাজয়ের তিন বৎসর পরে হেকেনস্মিট পুনরায় গচ-এর সহিত বলপরীক্ষার জন্য আমেরিকায় উপস্থিত হন। প্রথমবার ১৪ মিনিটের মধ্যে, এবং দ্বিতীয়বার অতি সহজেই হেকেনস্মিট পরাজিত হন।

পাশ্চাত্য জগতে মল্লগণের সংঘর্ষ

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে গচ মল্লজগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। গচ-এর মধ্যস্থে হেন্‌রি অর্ডিম্যান্ ওয়েষ্টগার্ড নামক মল্লকে পরাজিত করেন। এই কারণে গচ তাঁহার জগজ্জয়ী উপাধি অর্ডিম্যানকে প্রত্যর্পণ করেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চার্লস কাটলার আবার হেনরি অর্ডিম্যানকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বোচ্চ সম্মান লাভ করেন। তাহার পর ডাক্তার রোলার-এর সহিত কাট্‌লারের তিন বার মল্লযুদ্ধ হয় এবং তাহাতে পর্য্যায়ক্রমে জয়-পরাজয় হয় জো ষ্টেচার নামক মল্ল ১৯১৫ খৃষ্টাব্দেই কাট্‌লারকে পরাজিত করিয়া বিজয়মাল্যে ভূষিত হন।

তারপর ১৯১৭, ৯ই এপ্রিল অর্ল কেডক্ আবার ষ্টেচারকে পরাস্ত করিয়া 'জগজ্জয়ী' উপাধিতে ভূষিত হন। কিন্তু ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ষ্টেচারের হস্তে কেডকের পরাজয় ঘটে। ১৯২০, ১৩ই ডিসেম্বর ষ্ট্যাংলার লিউইস্ ষ্টেচারকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর মে মাসে জ্‌বিস্কো লিউইসকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু ১৯২২, ৩রা মার্চ লিউইস-এর হস্তে বিস্কোস হার হয়। জ্‌বিস্কো সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন; তিনি পুনরায় ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে মে লিউইসকে পরাভূত করিয়া বিজয়ী আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইটালীর সুবিখ্যাত মল্ল রাইসাভিচ জো ষ্টেচারের সম্মুখীন হইয়া পরাজিত হন। তারপর ইটালীর অপর এক মল্ল, ক্যাল্‌জা বহু চেষ্টা করিয়াও ষ্টেচারকে হারাইতে পারেন নাই।

মল্লরাজ গামা

পাশ্চাত্য মল্লগণের সহিত বলপরীক্ষার মানসে কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইমাম বক্সের সহিত গামা ১৯১০ সনে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। আমেরিকার সর্ব্বজনবিদিত এবং হেকেনস্মিটের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত ডাঃ রোলার-এর সহিত গামার বলপরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১ মিনিট ২ সেকেণ্ডের মধ্যেই গামা বিপক্ষকে ভূমি-শয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। পুনরায় ১০ মিনিট ব্যবধানে আবার তাঁহাদের কুস্তি আরম্ভ হয়। এবারেও ২ মিনিট, ২০ সেকেণ্ডের মধ্যে ডাঃ রোলার পরাস্ত হন।

যে রোলারকে পরাজিত করিতে গচ্-এর মত মল্লের ১৫ এবং ২৬ মিনিট লাগিয়াছিল, সেই দুরূহ কার্য্য ভারতীয় মল্ল গামা কত অল্প সময়ে সম্পন্ন করিয়াছিলেন! গামা যে গচের অপেক্ষা অনেক বেশী বলশালী তাহা না বলিলেও চলে। ইচ্ছা থাকিলে গচ অনায়াসেই গামার সহিত বলপরীক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু গচ্ ভারতীয় মল্লগণের সান্নিধ্য সতর্কতাসহকারেই বর্জ্জন করিয়া চলিতেন। গোলাম মহীদীনের আহ্বানে তিনি নিরুত্তরই ছিলেন।

গামা-জ্‌বিস্কো দ্বন্দ্ব

অষ্ট্রিয়ার মল্ল বিস্কো এবং রোলার-বিজয়ী ভারতীয় বীর গামা,—এই উভয়ের মধ্যেই লণ্ডনে ১৯১০ সনের সেপ্টেম্বর মাসে যে বলপরীক্ষা হয় তাহা "Gama Zbysyko fiasco" বলিয়াই বিদিত। এ সম্বন্ধে উইল রো যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"১৯১০ সেপ্টেম্বর মাসে এই দ্বন্দ্বযুদ্ধ ঘটে। গোড়া হইতে শেষ পর্য্যন্ত জ্‌বিস্কোর কার্য্যপ্রণালী নিতান্তই উপহাসের বিষয়। ইহার ফলে 'পেশাদারী' মল্ল-প্রতিযোগিতার অন্তিম দশা উপস্থিত হইবে। এই মল্লযুদ্ধের বাজি ছিল—২৫০ পাউণ্ড এবং সোনার একটি Championship Belt। এই লড়াই আড়াই ঘণ্টা চলিয়াছিল। নিষ্ফল নিশ্চেষ্টভাবে জ্‌বিস্কো উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকিলেন। গামা প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে তুলিতে পারিলেন না। একবার উঠিলেই তাঁহার পতন যে অবশ্যম্ভাবী একথা বুঝিতে জ্‌বিস্কোর বাকি ছিল না। আড়াই ঘণ্টা পর সেদিনের মত পালা শেষ হইল এবং পরবর্ত্তী সোমবারে পুনরায় প্রতিযোগিতা হইবে এইরূপ ঘোষণা করা হইল। গামা প্রস্তুত থাকিলেন, কিন্তু বীর জ্‌বিস্কো কোথায়?" (*Health and Strength*, March 3,1923) গামা ও বিস্কোতে যে কত পার্থক্য—অবশ্য মল্লযুদ্ধে—তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ পাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, গামাই জয়ী সাব্যস্ত হন। গামা ও জ্‌বিস্কো উভয়েই স্মুথ টাইপ।

ইমাম বক্স

যে জন লেলিন্ গচের সহিত ১৫ মিনিটকাল "ধস্তাধ্বস্তি"তেও "সমান সমান" গিয়াছিলেন, ইমাম বক্স ১ মিনিট ৮ সেকেণ্ডে তাঁহাকে পর্য্যুদস্ত করেন। ইহা হইতেই বুঝা যায় ইমাম বক্স কিরূপ ক্ষমতাশালী ছিলেন।

দ্বিতীয় পর্য্যায়ভুক্ত আমেদ বক্স

Maurice Deriaz Cherpillod (যিনি ৪০ মিনিটে ফ্রান্সের আপলোকে ভূমিসাৎ করেন) ইঁহাদের সকলকেই ইংলণ্ডে আমেদ অনায়াসেই পরাস্ত করেন। ভারতীয় দ্বিতীয় শ্রেণীর মল্ল কতখানি শক্তিমান আমেদ তাহার প্রমাণ দিয়াছিলেন।

পাতিয়ালার রণক্ষেত্রে

গামার হস্তে পর্য্যস্ত হইবার পর জ্‌বিস্কো ক্রমে ক্রমে দেহের ও শিক্ষার বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। ১৯২৪, ২২শে মে নিউ ইয়র্কে ষ্টাংলার লুইসকে পরাজিত করিয়া বিশ্ববিজয়ী মল্ল উপাধি লাভ করেন বটে কিন্তু ইহাতে অনেকেরই আপত্তি ছিল; কারণ তিনি গামাকে হারাইতে পারেন নাই। যাহা হউক, বিস্কো নবীন উদ্যমে পুনরায় গামার সহিত বলপরীক্ষায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ১৯২৮, ২৯শে জানুয়ারী তারিখে চরম মীমাংসার জন্য উভয়ে মিলিত হইলেন। দুঃখের বিষয় বিরাট উদ্যোগ পর্ব্ব কয়েক মুহূর্ত্তেই শেষ হইয়াছিল। নিমেষের মধ্যে জ্‌বিস্কো ভূপাতিত এবং পরাজয়ের চূড়ান্ত প্রমাণ তাঁহার স্কন্ধদেশ ভূমিতলবদ্ধ হইল, সুতরাং পূর্ব্বাপর গামাই অজেয় রহিলেন। ভারতীয় ব্যায়াম প্রণালী যে

রীতি পদ্ধতি অপেক্ষা যত দূর উন্নত উভয়ের মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ তাহা লোকে বুঝিল। প্রতিযোগিতার পুরস্কার স্বরূপ পাতিয়ালার মহারাজা গামাকে ৪১ পাঃ ওজনের একটি রৌপ্য নির্ম্মিত গদা প্রদান করেন।

জগদ্বরেণ্য মল্লশ্রেষ্ঠ গামা

আমরা কি এখনও গামাকে বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মল্ল বলিয়া অভিবাদন করিতে পারি না? বাধা এই যে, পাতিয়ালার পরাজয়ের পূর্ব্বে জ্‌বিস্কো লিউয়িসের নিকটও পরাজিত হইয়াছিলেন; সুতরাং লিউইসকে পরাস্ত না করা পর্য্যন্ত গামার সে দাবী অসঙ্গত। কিন্তু যে ভাবে গামা জ্‌বিস্কোকে পরাভূত করিয়াছেন তাহাতে তিনি যে লিউয়িস অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। আবার ইহাও শুনা যাইতেছে যে এই লিউয়িস, Gas Sowenburgএর নিকট পরাজিত হইয়াছে। এখন এই Gas Sowenburg আর গামার মধ্যে পরীক্ষা হইলেই কে যে বিশ্ব-বীর তাহার মীমাংসা হইতে পারে। জগজ্জয়ী উপাধির জন্য আর একজন দাবীদার আছেন। তাঁহার নাম ডিক্‌শিকাট ১৯২০খৃঃ লণ্ডনে গামা champaionship belt প্রাপ্ত হন। তাহার পর অনেক মল্লই উক্ত পদবীর উপর অধিকারের দাবী করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধের বিরাম নাই। আজ একজন champion, কাল আর একজন। তবে যতদিন পর্য্যন্ত গামাকে কেহ পর্য্যুদস্ত করিতে না পারিতেছেন ততদিন গামাই অবিসংবাদিতভাবে নিঃসংশয়ে বিশ্ববীর বলিয়াই গৃহীত হইতে থাকিবেন।

ভ্যালডেক জ্‌বিস্কো এবং রেজিনাল্‌ড সিকি

শুনা যাইতেছে, বিস্কো তাঁহার ভ্রাতা ভ্যালডেক এবং সিকির পক্ষ হইতে গামা ও ইমাম বকস্‌কে আহ্বান করিয়াছেন। ভ্যালডেক সম্প্রতি Prlubunny কর্ত্তৃক পূর্ব্বে পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ভ্যালডেকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গামার পক্ষে অ-সম ও সম্মানহানিকর। অধিকন্তু যে কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর মল্ল অনায়াসেই এই ভ্যালডেক জ্‌বিস্কোকে পরাজিত করিতে পারেন।

ভারতীয় মল্লগণকে উদ্দেশ করিয়া জ্‌বিস্কো যে আহ্বান পাঠাইয়াছেন তাহা ১৯২৯, ১৯শে নভেম্বরের "Liberty"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি একটি "অজুহাৎ"এর অবতারণার যথেষ্ট উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। এখন তিনি বলিতে চান যে গামার সহিত লড়াই কালে তিনি ভারতীর পদ্ধতি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এই পদ্ধতিতে তিনি সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। একথার স্পষ্ট উত্তর ভারতীয় মল্লেরা যখন ইউরোপে গিয়া তথাকার মল্লগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন, তখন কি তাহারা ইউরোপীয় পদ্ধতিতে অনভিজ্ঞ এই অজুহাৎ দেখাইয়াছিলেন? জ্‌বিস্কো আরও বলিয়াছেন যে, তিনি এখন আরও ভাল অবস্থায় আছেন। তবে কি পাতিয়ালার প্রতিযোগিতা-কালে তাঁহার শরীর মন তেমন ভাল ছিল না? যদি তিনি সে সময়ে "ষোল আনা" ভাল না থাকিতেন তবে কি তাঁহার সে সাহস হইত? এখন যদি তিনি অধিকতর সবল সুস্থ হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য হইবে ষ্ট্রাংলার লিউয়িসএর সহিত বল পরীক্ষা করা, কারণ এই বীরের নিকট তিনি পরাজিতই আছেন। পরে লিউইস-বিজেতা Gas Sowenburg এবং শিকাট-এর সহিতও তাঁহার প্রতিযোগিতা হইতে পারে।

শেষ কথা

দেবী চৌধুরাণী, গোলাম, রামমূর্ত্তি ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের সময়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। কিক্কর, কাল্লুর সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। আর বর্ত্তমান সময়ে গামাই সর্ব্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত। ভারতে, ভারতীয় পদ্ধতিতে এই সমস্ত বিশ্ববিখ্যাত বীর সৃষ্ট ও শিক্ষিত হইয়াছেন সুতরাং ইহা সুনিশ্চিত যে, এই পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া চলিলে এখনও এই ভারতের মাটিতে, ভারতীয় শিক্ষার প্রভাবে, ভারতীয় প্রথার অনুকরণে ভারত সন্তানের মধ্য হইতেই বহু বিশ্ববিজেতা মল্লের আবির্ভাব ঘটিতে পারে।

বন্য হস্তী ধরা—

নীচের চিত্রগুলিতে পাহাড়ে-জঙ্গলে বন্য হস্তী শিকারের দৃশ্য দেওয়া গেল। ইহা হইতে বুঝা যাইবে, বন্য হস্তী শিকার কিরূপ বিপজ্জনক। পোষা হাতী কোপনস্বভাব উচ্চচীৎকারকারী বন্য

একটি হাতী দড়ির জাল হইতে পলাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছে

একটি ছোট হাতী ঐরূপ পলাইবার চেষ্টা করিয়া দড়িতে ভীষণভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

বন্য হাতীরা দল সমেত ধৃত হইয়াছে। এই হাতীরা দলে দশ হইতে পনর, এবং কখনো কখনো একশতটিও থাকে।

ধৃত এবং বন্ধ অবস্থায় বন্য হাতীরা স্নান করিতেছে। ভারতবর্ষীয় হাতীদের প্রচুর ছায়া ও জল আবশ্যক। ইহারা স্নান করিয়া বড়ই আরাম পায়। ইহারা সাঁতার কাটিয়া থাকে। সমস্ত শরীর জলে মগ্ন হইলেও ইহারা ইহাদিগের শুণ্ড দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে।

বাঁধা দড়ির সঙ্গে বৃথা লড়াই

হাতীকে ভুলাইয়া দলবদ্ধ করে, তারপর বড় বড় দড়ি দিয়া বাঁধে এবং জীবিত অবস্থায় ধরিয়া ফেলে।

—

একসঙ্গে বিলাতি বেগুন ও গোল আলু গাছ—

উরষ্টারের সব্জীবাগানের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত অস্কার সডারহলম্ বিশ বৎসর চেষ্টার ফলে 'টম্যাপটেটো' নামে এক প্রকার নূতন গাছ উৎপাদন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই গাছের গোড়ায় মাটির মধ্যে গোল আলু জন্মে এবং মাটির উপর ডাঁটায় শুড় বেগুন (টম্যাটো) হয়। সডারহলম্ পরীক্ষাদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, গোল আলু গাছের মূল টম্যাটোর মূলের চেয়ে শক্ত হওয়ায় উভয়ের মিলনে উৎকৃষ্টতর বেগুন হয়। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, এই যুক্ত গাছে কেবল যে গোল আলু হয় তাহা নহে, ইহার যে অংশে বেগুনগাছ থাকে তাহা দশ ফুটেরও অধিক বড় হয় এবং স্বাভাবিক বেগুনগাছের চেয়ে বেশী বেগুন দেয়।

"টম্যাপটেটো" গাছ

সডারহলম্ প্রথমে দু'চোখা এক টুক্‌রা আলু মাটিতে পুতিয়া রাখেন এবং টম্যাটোর বীচি একটা পাত্রে রাখেন। পরে উভয়ের চারা যখন দু'ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয় তখন তিনি ইহাদিগকে কাটিয়া আড়াআড়ি জুড়িয়া দেন এবং জোড়া যায়গাটা সুতো দিয়া বাঁধিয়া দেন। যাহাতে এই গাছ দুটি ঠিক্ খাড়া থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

সডারহলম্ এখন আবার স্কোয়াশের উপরে শশার লতা লাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন। কারণ স্কোয়াশের মূল নাকি শশার মূলের চেয়ে বেশী শক্ত।

ব্যঙ্গচিত্র
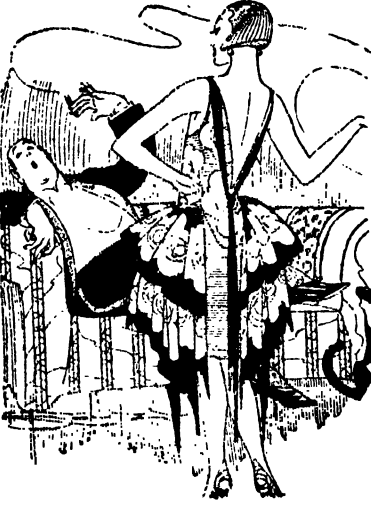
"আপনি কি মেয়েদের জন্য ক্লাবের অনুমোদন করেন ?"

"হ্যাঁ—কিন্তু শুধু আর কোনো উপায়ে তাদের শান্ত রাখতে না পারলে।"

—*Bulletin*, Sydney .
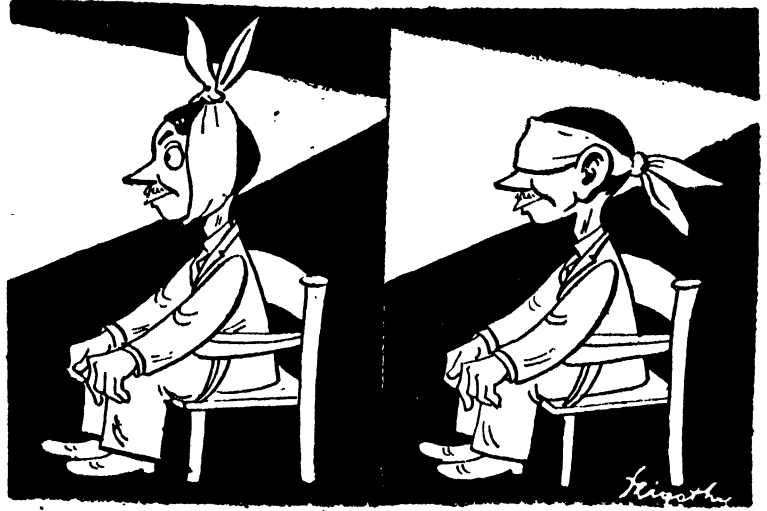
"টকি" ফিল্‌মের ফল

প্রথম—বাঃ, বেশ ছবি তো !

দ্বিতীয়—বাঃ, বেশ শব্দ হচ্চে তো !

—*Lustige Sachse*, Leipzig

স্বামী—"তুমি ঐ হতভাগা পাখীটাকে রেখেছ কেন ? দিন রাত গালি দিচ্চে।"

পত্নী—"রেখেছি এর জন্তে যে ও থাকাতে বাড়ীতে একটা পুরুষ মানুষের মত জীব রয়েছে বলে মনে হচ্চে !"

—*Smith's weekly*, Sydney

ছেলে—"মা, আমরা হাতী হাতী খেলব। তুমিও এস না !

মা—"আমি এসে কি করব ?"

ছেলে—"হাতীকে যে কেক্‌ বিস্কুট দেয়, তোমাকে সেই বুড়ী হতে হবে।

—*Passing Show*, London
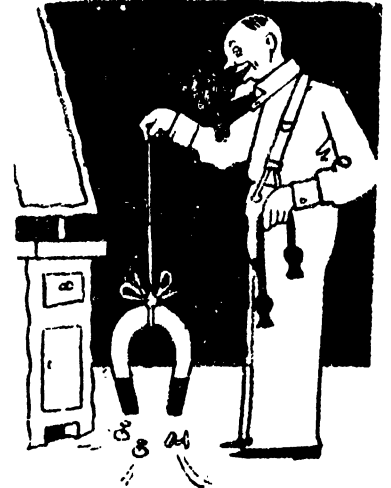
অবিবাহিতদের জন্য বোতাম খুঁজিয়া বাহির করিবার চুম্বক।

—*Lustige Blatter*, Berlin

সাম্যবাদের বিস্তার

সাম্যবাদ—"পৃথিবীর গা-টা বড় পিছল, মোটে এগনো যাচ্ছে না!"

—*Philadelphia Inquirer*

নব-নির্মিত প্রকাণ্ড বাথ-রুমের অধীশ্বর—"আমার দাঁতগুলো কোথায় রাখলুম!"

—*Passing Show*, London

ছোট ছেলে (চিত্রকরের প্রতি)—"বাবা বল্লে একটু লাল রং দিতে। শূয়োরের খোঁয়াড় রং করতে একটু কম পড়ে গেছে।"

—*Bulletin*, Sydney

লণ্ডনের নৌ-বৈঠক

উৎসাহে ভাটা পড়িয়া আসিয়াছে।

—*Washington Post*

ভারতবর্ষ—

মহাত্মা গান্ধীর কারা বরণ—

গত ৫ই মে মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিয়া বিনা বিচারে ইয়ারাওদা জেলে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। এই জেলেই পূর্ব্ববারেও তিনি কারারুদ্ধ ছিলেন।

"ইয়ং ইণ্ডিয়া"র জন্য লেখননিরত মহাত্মাজী
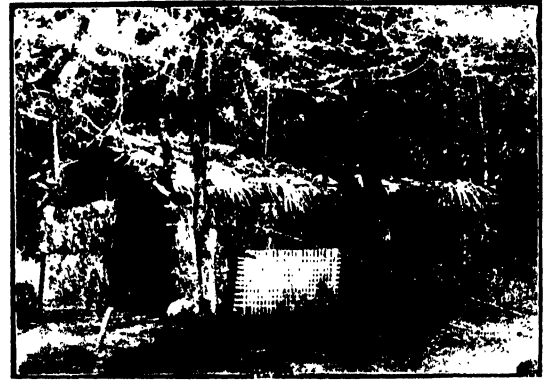
গভীর রাত্রে মহাত্মাজী যখন তাঁহার পর্ণকুটিরে নিদ্রিত ছিলেন তখন সুরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট, দুইজন ভারতীয় পুলিশের কর্ম্মচারী ও ত্রিশজন বন্দুকধারী পুলিশ তাঁহার ঘরে ঢুকিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করে। গোলমালের আশঙ্কায় সহরের সর্ব্বত্র পাহারা বসান হইয়াছিল, সেই-সময়ে কাহাকেও টেলিগ্রাফ প্রভৃতি ব্যবহার করিতে দেওয়া হয় নাই। "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে গান্ধীজীর একশিষ্য এই ঘটনার যে বর্ণনা দিয়াছেন আমরা নীচে তাঁহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"আমি গান্ধীজীর পাশেই শুইয়া ছিলাম। রাত্রিটা গরম বলিয়া আমার তেমন ঘুম আসিতেছিল না। হঠাৎ আমি কতকগুলি দ্রুত পদশব্দ শুনিলাম, যেন কাহারা খুব তাড়াতাড়ি গান্ধীজীর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। আমি চোখ খুলিতে না খুলিতেই আমার চোখে একটা ইলেক্‌ট্রিক মশালের আলো পড়িল, এবং কতকগুলি পুলিশ আমাদের পূজনীয় গুরুর বিছানা ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া গিয়া বাপুজীর পাশে দাঁড়াইলাম। তখন রাত্রি পৌনে বারোটা।

"গান্ধীজী ইহারা তাঁহাকে চায় কি না জিজ্ঞাসা করাতে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, যে, হাঁ, তাঁহার উপর গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম আসিয়াছে। গান্ধীজী তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তিনি মুখ ধোয়া ও দাঁত মাজা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে তাঁহাদের আপত্তি আছে কিনা। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ইহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। তখন পুলিশেরা গান্ধীজীর বিছানার চারিদিকে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। উহাদের লাইনের ভিতরে রহিলাম শুধু

মহাত্মাজীর পর্ণকুটীর

আমি ও আশ্রমের এক ভগিনী। একটু পরেই পুলিশেরা সরিয়া দাঁড়ানতে স্বেচ্ছাসেবকেরা গান্ধীজীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। গান্ধীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মিঃ ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, আমি কোন অপরাধে গ্রেপ্তার হইলাম জানিতে পারি কি? ১২৪ ধারা?" ম্যাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "না, ১২৪ ধারা নয়। আমার নিকট লিখিত আজ্ঞাপত্র আছে।"

"আমাকে তাহা পড়িয়া শুনাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?" ম্যাজিষ্ট্রেট তখন পড়িলেন—

"যেহেতু স-কৌন্সিল গভর্ণর জেনারেল মোহনদাস করমচাদ গান্ধীর কার্য্যকলাপ আশঙ্কার চক্ষে দেখেন, সেজন্য তিনি আদেশ করিতেছেন, যে, তাঁহাকে যেন ১৮২৭ সালের ২৫শ রেগুলেশন অনুযায়ী বন্দী করা হয়, এবং গভর্ণমেণ্টের যতদিন অভিরুচি ততদিন কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়, ও তাঁহাকে যেন অবিলম্বে ইয়ারাওদা সেণ্ট্রাল জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।"

গান্ধীজী তখন ম্যাজিষ্ট্রেট কে ধন্যবাদ দিয়া শান্তভাবে দাঁত মাজিতে লাগিলেন। পুলিশেরা তাঁহাকে রাত্রি একটার পূর্ব্বেই গ্রেপ্তার করিতে চায় বলিয়া তাঁহাকে একটু তাড়াতাড়ি করিতে বলিল।

ডাণ্ডি—এইখানেই প্রথমে লবণ আইন ভঙ্গ করা হয়

ডাণ্ডিতে সত্যাগ্রহীগণ—দুরে তাহাদের শিবির
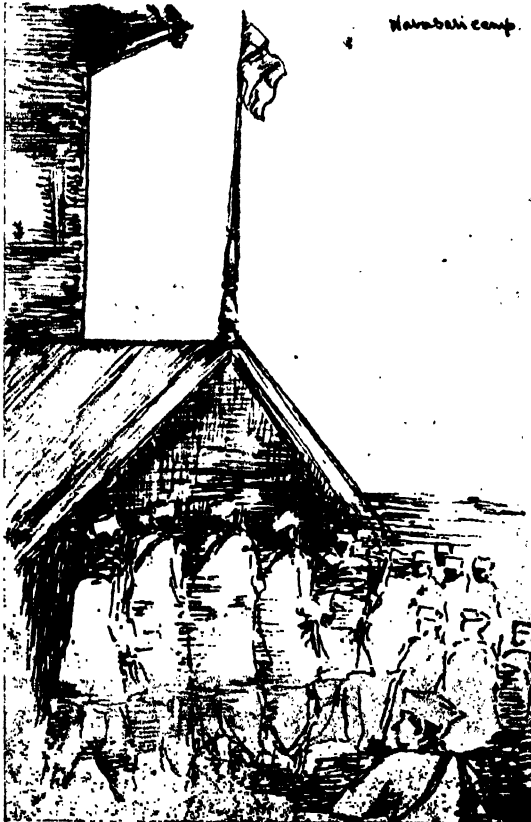
নবসারি সত্যাগ্রহ শিবির

তিনজন সত্যাগ্রহী

শ্রীকনু দেশাই কর্ত্তৃক অঙ্কিত

রেখাচিত্র

খদ্দর পরিহিত দুইজন ফরাসী সাংবাদিক

মহাত্মা গান্ধী ও শ্রীযুক্ত আব্বাস তায়েবজী

গান্ধীজী আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে পণ্ডিত খারেকে "বৈষ্ণব জন তো" এই বিখ্যাত ভজনটি গাহিতে অনুরোধ করিলেন। এই গান গাহিয়াই আমরা প্রথম যাত্রা করিয়াছিলাম। গান আরম্ভ হইলে গান্ধীজী মস্তক নত করিয়া মুদ্রিতনয়নে দাঁড়াইয়া রহিলেন। উপাসনা শেষ হইলে আমরা সকলে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। গান্ধীজী সস্নেহে আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন। একজন পুলিশ কনেষ্টেবল তাঁহার কাপড় চোপড় ও খদ্দরের ব্যাগটি লইল। একটা দশ মিনিটের সময় তাঁহাকে পুলিশের লরীতে তোলা হইল এবং কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি আমাদের চক্ষের অন্তরাল হইয়া গেলেন।"

বাংলা

বঙ্গমহিলার উচ্চ শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা—

যাঁহারা শিক্ষয়িত্রী হইতে চান, তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান প্রণালী ও তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিদ্যা শিখাইবার নিমিত্ত বাংলাদেশে

শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক

অল্পসংখ্যক ট্রেনিং স্কুল আছে। কলিকাতার ব্রাহ্ম ট্রেনিং স্কুল তদ্রূপ একটি বিদ্যালয়। অন্যান্য ট্রেনিং স্কুলের মত ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের ছাত্রী লওয়া হয়। ইহার লেডী প্রিন্সিপ্যাল শ্রীযুক্তা পূর্ণিমা বসাক গত ২৮শে বৈশাখ বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তিনি শিক্ষাদান প্রণালী প্রভৃতি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশসকলে আধুনিক জ্ঞানলাভ করিবেন এবং আধুনিক অভিজ্ঞতার সহিত পরিচিত হইবেন। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে। তিনি নারীশিক্ষাসমিতির প্রধান কর্ম্মী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক মহাশয়ের বিধবা জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ।

বিদেশ

লণ্ডনের নৌ-বৈঠক—

গত ২১শে জানুয়ারী লণ্ডনে যে নৌ-বৈঠক আরম্ভ হয় তাহা শেষ হইয়া গিয়াছে। এই তিন মাসের মধ্যে অনেকবার নৌ-বৈঠকের ফলাফল সম্বন্ধে নিরাশ হইবার কারণ ঘটিয়াছিল। মনে হইয়াছিল ১৯২৭ সনের জেনেভা কনফারেন্সের মত এবারকার নিরস্ত্রীকরণ সভাও বুঝি কোনও মীমাংসায় না পৌঁছিয়াই ভাঙিয়া যাইবে। ইংলণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাজ্য ও জাপানের মধ্যে পূর্ব্বেই একটা বোঝাপড়া থাকায় এবারে আর তাহা হইতে পারে নাই। ফ্রান্স ও ইটালী সম্পূর্ণভাবে যোগ না দেওয়ায় প্রথমে ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে একটা সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরে ফ্রান্স ও ইটালীও তাহাতে আংশিকভাবে যোগদান করে।

নিরস্ত্রীকরণের দিক হইতে এই নৌ-বৈঠক খুব বেশী ফলপ্রদ হইয়াছে তাহা বলা চলে না। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়া যাওয়ায়, এই তিনশক্তিরই কয়েকটি করিয়া যুদ্ধের জাহাজ কমিয়া যাইবে এবং ইহাদের মধ্যে রণপোত নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতার উগ্রতা অনেকটা লাঘব হইয়া আসিবে সত্য, কিন্তু এই তিন শক্তি সমবেত হওয়ার ফলে আর এক দিক হইতে একটা আন্তর্জ্জাতিক সংঘর্ষেরও সম্ভাবনা দেখা দিবে। ফ্রান্স এখনই বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, যে, ইংলণ্ড ও আমেরিকার নৌবল একত্রিত হইয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতে চেষ্টা পাইবে। এই যুক্তি একেবারেই ভিত্তিহীন এ-কথা বলা কঠিন।

রাজা পঞ্চম জর্জ্জ কর্ত্তৃক লণ্ডন নৌ-বৈঠক উন্মোচন

কিন্তু ইংলণ্ড ও ব্রিটিশসাম্রাজ্যের ইতিহাসে লণ্ডনের নৌ-বৈঠক একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা হইয়া বিরাজমান থাকিবে। ফ্রান্সের "ল্য তাঁ" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্রের একজন লেখক বলিয়াছেন, ভবিষ্যতে যদি কোনদিন ব্রিটিশসাম্রাজ্যের অধঃপতনের ইতিহাস রচিত হয়, তবে দেখা যাইবে ১৯৩০ সনের লণ্ডন কনফারেন্সেই তাহার সূচনা। তাঁহাকে নাকি এক বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছিলেন, যে, যদি ইংলণ্ডের রাজকোষে যথেষ্ট পরিমাণ পাউণ্ড ষ্টার্লিং থাকিত, তবে লণ্ডন কনফারেন্স বসিত না। কথাটা খুবই সত্য। এই কনফারেন্সের মূলে আন্তর্জ্জাতিক শান্তিস্থাপনের স্পৃহা অপেক্ষাও বেশী করিয়া যে জিনিষটা বর্ত্তমান তাহা ইংলণ্ডের অর্থসমস্যা ও মার্কিনপ্রতিযোগিতার ভয়। রণপোত নির্ম্মাণে আমেরিকার সহিত প্রতিযোগিতা করিতে যাওয়া আজ ইংলণ্ডের সাধ্যাতীত। সেইজন্যই যে ইংলণ্ড গত একশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম রণপোতবাহিনীর সমান সংখ্যক রণপোত বরাবর রাখিয়া আসিয়াছে, সে বিনাবাক্যব্যয়ে সমুদ্রে আমেরিকার প্রাধান্য স্বীকার করিল। এই সন্ধির পর হইতে আমেরিকা কাগজে-পত্রে ইংলণ্ডের সমকক্ষ হইলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে সমুদ্রে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া দাঁড়াইল।

মিশর ও ইংলণ্ড—

মিশর ও ইংলণ্ডের সম্পর্কের রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি মীমাংসা করিবার জন্য লণ্ডনে সম্প্রতি যে কনফারেন্স বসিয়াছিল তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব মিঃ হেণ্ডারসন জানাইয়াছেন, যে, ব্রিটিশগভর্ণমেণ্ট সুদান সম্বন্ধে মিশরের দাবী মানিয়া লইতে অক্ষম। সুতরাং অদূর ভবিষ্যতে মিশরসমস্যার কোন মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই। আমেরিকার উদারনৈতিক পত্রিকা "নিউ রিপাব্লিক" লিখিয়াছেন, যে, সময় থাকিতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কাহারও সহিত বোঝাপড়া করিতে অগ্রসর হয় না। মিশর সম্বন্ধে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ দেখিলে এই কথাটা কত সত্য তাহা অতি সহজেই বুঝা যায়।

প্রথম "লেবর" গভর্ণমেণ্ট ১৯২৪ সনে সুয়েজখালের রক্ষণাবেক্ষণ, সুদানশাসন, বিদেশীর ধনপ্রাণরক্ষা, বিদেশী রাজ্যের সহিত সম্বন্ধ ও মিশরে ইংরেজ সৈন্যের অবস্থান, এই কয়েকটি বিষয় ছাড়া অন্যান্য সকল বিষয়েই মিশরকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার দিতে সম্মত হন। বলা বাহুল্য মিশরের জাতীয় দল এই সকল সর্ত্তে রাজী হন নাই এবং রাজনৈতিক আন্দোলন পূর্ব্বের ন্যায় চলিতে থাকে। এই আন্দোলনের ফলে মিশরের শাসনতন্ত্র প্রায় অচল হইয়া পড়ায় হাই কমিশনার লর্ড লয়েড পার্লেমেণ্ট, সভাসমিতি ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দেন। ইহাতে "শান্তি ও শৃঙ্খলা" স্থাপিত হইলেও শাসন চালান সম্ভবপর হয় নাই। সেজন্য রক্ষণশীল গভর্ণমেণ্টই গতবৎসর মিশরের সহিত একটা মিটমাট করিয়া ফেলিতে প্রস্তুত হন। এমন সময়ে "লেবর" গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা আসে এবং তাঁহারা লর্ড লয়েডকে অপসারিত করিয়া মিশরকে আরও অনেক অধিকার দিতে সম্মত হন। কিন্তু এবারেও ওয়াফাদ বা জাতীয় দল সুদানের উপর মিশরের সম্পূর্ণ অধিকার আছে ইহা স্বীকার না করিলে ইংলণ্ডের সহিত কোনও সন্ধি করিতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে জাতীয় দলের নেতা নাহাস্ পাশা লণ্ডন হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছেন।
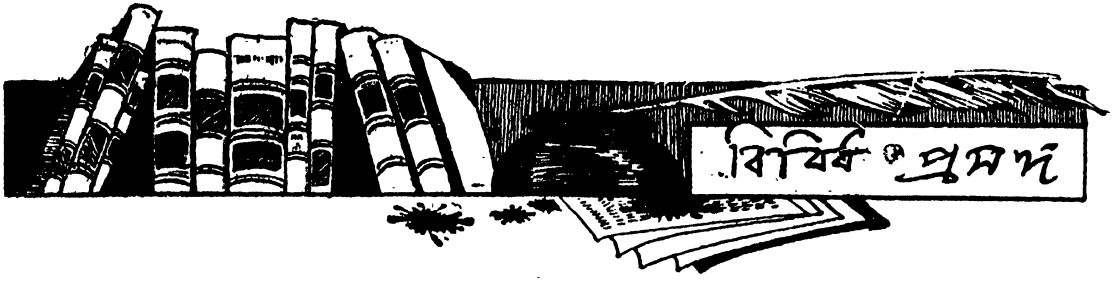
মহাত্মা গান্ধী কারাগারে

শীঘ্র হউক, বিলম্বে হউক, মহাত্মা গান্ধী বন্দী হইবেন এ অনুমান সকলেই করিয়াছিলেন। এত দিন সরকার কেন তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন নাই, সে বিষয়ে নানা জনে নানা অনুমান করিতেছেন, কিন্তু বিলম্বের ঠিক কারণ কি, বোধ করি বড়লাটও বলিতে পারিবেন না। ব্রিটিশ সরকার একজন মানুষ নহেন, অনেক মানুষের সমষ্টি। এই মানুষগুলি ঠিক্ একই কারণে এতদিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করার বিরোধী ছিলেন, মনে হয় না।

ভারতবর্ষে ও বিলাতে ইংরেজদের খবরের কাগজে সাধারণতঃ প্রথম প্রথম এই রূপ ধারণা প্রকাশ পাইয়াছিল যে, গান্ধীজীর সমুদ্রতীরে লবণ প্রস্তুত করিতে যাওয়া প্রহসন মাত্র, শীঘ্রই উহার সমাপ্তি হইবে; সুতরাং আপনা হইতেই শীঘ্র যাহা লোপ পাইবে, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিলে তাহাকে কৃত্রিম উপায়ে আরো কিছু দিন বাঁচাইয়া রাখা হইবে মাত্র। ব্রিটিশ সরকারের ধারণাও হয় ত এই রূপ ছিল। সম্ভবতঃ শীঘ্রই এই ধারণা বদলাইয়া যায়; সরকারী লোকেরা দেখিতে পান গান্ধীজীর দলে লোকের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। তখন হয় ত এক এক প্রদেশের এবং স্থানের নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মহাত্মাজীকে তাঁহাদের সাহায্য হইতে বঞ্চিত করিবার নীতি অবলম্বিত হয়। এমনও হইতে পারে, যে, দেশে দাঙ্গা হাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব না হওয়া পর্য্যন্ত গবর্ন্মেণ্ট অপেক্ষা করিতেছিলেন। কারণ, কোথাও বিশেষ কোন অশান্তি উপদ্রব না থাকা সত্ত্বেও গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিলে সভ্যজগতের লোকমত ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাইবে, এইরূপ অনুমিত হইয়া থাকিবে। এমনও হইতে পারে, যে, ভারতসরকার বিলাতী গবর্ন্মেণ্টের আদেশে গান্ধীজীকে বন্দী করিয়াছেন, এবং বিলাতী গবর্ন্মেণ্ট ইংলণ্ডের বিপুর লোকের চীৎকার থামাইবার জন্য এইরূপ আদেশ করিয়াছেন। এ সমস্তই অনুমান। গান্ধীজীকে এত দিন গ্রেপ্তার না করিবার প্রকৃত কারণ কোন বেসরকারী লোকের জানিবার কথা নয়। উপদ্রব অশান্তি যাহা ঘটিতেছে, ব্রিটিশ পক্ষ হইতে সেগুলিকে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টার সহিত জড়িত করিবার চেষ্টা স্বাভাবিক। আমরা কিন্তু তৎসমুদয়ের কারণ অন্যরূপ মনে করি।

অনেক সম্পাদক ও অন্য লোক বলিতেছেন, গান্ধীজীকে বন্দী করিয়া গবর্ন্মেণ্ট বড় ভুল করিয়াছেন, তাহাতে গবর্ন্মেণ্টের অনিষ্ট হইবে, ইত্যাদি। গবর্ন্মেণ্ট বেসরকারী লোকদের পরামর্শ ও মত তখনই গ্রহণ করেন, যখন তাহা তাঁহাদের মতের সঙ্গে মিলে ও তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধনের অনুকূল হয়। সুতরাং গবর্ন্মেণ্টকে পরামর্শ দিতে চাই না। অযাচিত ভাবে গবর্ন্মেণ্টকে পরামর্শ দিবার প্রবৃত্তিও আমাদের নাই। গবর্ন্মেণ্ট যদি ভুল করিয়া থাকেন, নিজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। দেশী খবরের কাগজগুলি বেসরকারী লোকমত গঠনে কিছু সাহায্য করিয়া থাকে। সুতরাং আমরা যাহা লিখিতেছি, তাহা স্বদেশবাসী বেসরকারী লোকদের জন্য।

তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা দেশের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা করেন, তাঁহারা সকলেই ভাবিতেছেন, গান্ধীজী কারারুদ্ধ হওয়ায় তাঁহার দ্বারা প্রবর্ত্তিত স্বাধীনতা-লাভ-চেষ্টা কি মন্দীভূত হইবে বা থামিয়া যাইবে? ভবিষ্যতের গর্ভে কি লুক্কায়িত আছে, জানি না। কিন্তু গান্ধীজী ধৃত হওয়ার পরেই দেখিতেছি, তাঁহার মতানুবর্ত্তী লোকদের দলে নূতন লোক জুটিতেছে, যাঁহারা আগে যোগ দেন নাই, তাঁহারাও অনেকে যোগ দিতেছেন, বিশ হাজার পঞ্চাশ

হাজার এক লক্ষ পাঁচ লক্ষ লোকের সভা ও মিছিলের খবর সংবাদপত্রে বাহির হইতেছে, নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘকদের গ্রেপ্তারির ও কারাদণ্ডের বিস্তর খবরও পূর্ব্ববৎ নানা কাগজে বাহির হইতেছে, এবং কংগ্রেসের যে-সব প্রধান কর্ম্মী এখনও জেলে যান নাই, তাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্ত্তিত উপায় অবলম্বন ছাড়া আরও কি করিবেন তাহা স্থির করিতেছেন। সুতরাং গান্ধীপত্নী শ্রীমতী কস্তুর বাঈ স্বামী কারারুদ্ধ হওয়ার পর যে বলিয়াছেন, গান্ধীজীকে কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসৃত করায় ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য তিনি যে মহৎ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা ব্যাহত হইবে না, তাহা আপাততঃ সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। উত্তেজনা কিছু কমিলে মহাত্মাজীর মতাবলম্বী লোকদের কর্ম্মিষ্ঠতা কমিবে কিনা, তাহা কালক্রমে বুঝা যাইবে। বস্তুতঃ, গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করিয়া গবর্ন্মেণ্ট স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টার ব্যাপ্তি, গভীরতা ও শক্তি প্রমাণ বা অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষের বেসরকারী লোকদিগকে প্রকারান্তরে আহ্বান করিয়াছেন। ভারতীয় বেসরকারী লোকদের কার্য্যগত জবাব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লেখা থাকিবে।

শ্রীমতী কস্তুর বাঈ

গান্ধীদম্পতি

মহাত্মা গান্ধীজীকে যখন সরকারী লোকেরা গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তখন তাঁহার সহধর্ম্মিণীর জন্য তাঁহার কোন অনুরোধ উপদেশ বা আদেশ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করা হয়। মহাত্মাজী বলেন, "তিনি বীরাঙ্গনা, তাঁহার জন্য বাণীর কি প্রয়োজন?" মহাত্মাজীর আত্ম-চরিত যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন শ্রীমতী কস্তুর বাঈ কিরূপ অসাধারণ সাহস, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়ের অধিকারিণী। তাঁহার পাতিব্রত্য অনতিক্রান্ত, এবং তিনি অনেক বিষয়ে মহাত্মাজী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

স্বামীর কারারোধের সংবাদ পাওয়ার পর শ্রীমতী কস্তুর বাঈর সহিত সংবাদসংগ্রাহক এসোসিয়েটেড্ প্রেসের ও ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধিরা দেখা করেন। তিনি এসোসিয়েটেড্ প্রেসের লোককে বলেন:—

"মহাত্মাজীকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে স্থানান্তরিত করা দ্বারা ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতা অর্জ্জনের মহৎ কার্য্য ব্যাহত হইতে পারে না। যদি জাতি অন্তরের সহিত তাঁহার অনুবর্ত্তন করে, তাহা

হইলে দ্বিগুণ তেজে কাজটি চালান উচিত। আইনজীবীদের এখন আদালত ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, এবং মহিলাদের উপর মহাত্মাজী যে ভরসা রাখেন তাঁহাদের আপনাদিগকে তাহার যোগ্য প্রমাণ করা উচিত। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন ও মদ্যপান ত্যাগ প্রচেষ্টা দুটিকে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তোলা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। আমি আগ্রহের সহিত আশা করি, ভারতবর্ষ কোন্ ধাতুতে গড়া তাহা ভারতীয়েরা প্রমাণ করিবে এবং গবর্মেণ্টকে তাহার অসমর্থনীয় কাজের যথোচিত জবাব দিবে।"

শ্রীমতী কস্তুর বাঈ যখন জালালপুরে দেশসেবিকা মহিলাদের সহিত বাস করিতেছিলেন, মহাত্মাজীর গ্রেপ্তার হওয়ার সংবাদ তখন তাঁহার নিকট পৌছিলে তিনি বলেন, "ওঃ, তাতে কি আসে যায়? আমি একটুও বিস্মিত হই নাই," এবং শান্ত ভাবে তৎক্ষণাৎ নিজ প্রাতঃকালীন কর্ত্তব্য করিতে থাকেন। তাহার পর ফ্রী প্রেসের প্রতিনিধি জাতীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার বাণী জানিতে চাহিলে তিনি বলেন :—

'গান্ধীজী গিয়াছেন, এখন সকলের বাহিরে আসিয়া সম্মুখীন হওয়া উচিত। খদ্দর পরিধান, চরকায় সুতা কাটা এবং মদ্যপান নির্মূল করা দেশের এখন এই তিনটি কাজ করা উচিত।"

শ্রীমতী কস্তুর বাঈ সরল ও স্বাভাবিক ভাষায় প্রফুল্ল চিত্তে এই সব কথা বলেন। নবসারিতে এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, "ভারতীয়দের এখন অবিলম্বে স্বরাজ পাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া উচিত। তাহাদের যুদ্ধ ন্যায়যুদ্ধ; সুতরাং পরমেশ্বর তাহাদের সঙ্গে আছেন।"

—

গান্ধীজীকে ধরিবার প্রণালী

গান্ধীজীকে রাত্রি দুই প্রহরের পর গ্রেপ্তার করিবার ভারপ্রাপ্ত বোম্বাইয়ের সরকারী লোকেরা খুব সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিল। সে জন্য তাহাদের তারিফ করা যাইতে পারে। কিন্তু গান্ধীজী চোর নহেন, পলাইবার কোন চেষ্টা করিতেন না। কেহ তাঁহাকে পুলিসের হাত হইতে কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিত না, করিলে তিনিই সর্ব্বাগ্রে তাহাতে বাধা দিতেন। সুতরাং একজন ক্ষীণকায় বৃদ্ধ অহিংসাব্রতী সাধু ব্যক্তিকে ধরিবার জন্য এত আয়োজন দেখিলে সরকারী লোকগুলির প্রতি মনে শ্রদ্ধার ভাব আসে না। মহাত্মাজীর নিদ্রার ব্যাঘাত করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। দিনের বেলা তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিলে স্থানীয় লোকদের একটু ভিড় হইত মাত্র, কিন্তু তাহারা সরকারী মোটর গাড়ীর সঙ্গে দৌড়িতে পারিত না।

গান্ধীজীকে ধরিবার আয়োজনে মনে হয়, মানুষের চারিত্রিক শক্তি বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিনিধিদের মনেও আশঙ্কার উদ্রেক করে।

—

মহাত্মাজীর বিরুদ্ধে উপ-আইন প্রয়োগ

রেগুলেশ্যন নামক কতকগুলি বিধি আছে, যেগুলিকে ঠিক্ আইন বলা চলে না। তদনুসারে কোন আদালতে বিচার হয় না—বিনা বিচারে শাস্তি হয়। বিশ বৎসরেরও পূর্ব্বে বাংলা দেশে এইরূপ একটা উপ-আইন (১৮১৮ সালের তিন নম্বর 'রেগুলেশ্যন) অনুসারে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতির নির্ব্বাসন ও কারারোধ হয়। মহাত্মা গান্ধীকে ১৮২৭ সালের ২৫ নম্বর রেগুলেশ্যন অনুসারে বন্দী করা হইয়াছে।

একশত তিন বৎসর আগে যুদ্ধে যে-সব অস্ত্র ব্যবহৃত হইত, এখন কোন সভ্য জাতিই সেরূপ কামান বন্দুক বারুদ গোলাগুলি লইয়া যুদ্ধ করে না; মানুষ মারিবার নূতন নূতন অস্ত্র ও উপায় নির্ম্মিত ও উদ্ভাবিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী যে অহিংস স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, তাহার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ১০৩ বৎসরের পুরাতন মরিচা-পড়া অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ প্রয়োগ করিতে হইল! রাজনীতিকুশল ব্রিটিশ জাতির উদ্ভাবনী শক্তি এক্ষেত্রে নূতন কিছু উপায় আবিষ্কার করিতে পারিল না। ইহার মানে এই, যে, ১০৩ বৎসর আগে ভারতবর্ষের কোন কোন অবস্থায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে-উপায় অবলম্বন করিতেন বা করিবার সঙ্কল্প করেন, আজ ১০৩ বৎসর পরেও

কোম্পানীর উত্তরাধিকারী ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মতে ভারতবর্ষের অবস্থা তাহারই মত কিছু হওয়ায় পুরাতন উপায় অবলম্বিত হইতেছে। তাহা হইলে ইংরেজদের ১০৩ বৎসরের অবিরাম অবিশ্রাম ভারত হিতৈষণা ও হিত চেষ্টা সত্ত্বেও ভারতবর্ষ ১৮২৭ সালে যেমনটি ছিল ১৯৩০ সালেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে মূলতঃ তেমনই আছে বলিতে হইবে। শতাব্দী পরেও যদি ভারতবর্ষ সন্তুষ্ট, শান্ত, ঠাণ্ডা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার চিকিৎসার জন্য ব্রিটিশ জাতি তাহাদের জ্ঞান বুদ্ধি অনুসারে ঔষধ প্রয়োগ অবশ্যই করিবে। কিন্তু দেশটাকে ঠাণ্ডা করিতে তাহারা পারে নাই, এই অকৃতকার্য্যতা কি তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে না?

দেশটা ঠিক আছে, কেবল গান্ধী ও তাঁহার মত কতিপয় ব্যক্তি ক্ষেপিয়াছে বলিলে চলিবে না। তাহা হইলে সংবাদপত্র নিরোধের কড়া হুকুম জারী, এবং বঙ্গে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও কয়েদ করিবার হুকুম জারী হইত না, প্রকাশ্য সভার অধিবেশন ও মিছিল বিস্তর স্থানে নিসিদ্ধ হইত না, অগণিত স্থানে পুলিশকে লাঠি ও বন্দুক ব্যবহার করিতে হইত না। হইতে পারে, ভারতীয়েরা যে ঠাণ্ডা হয় নাই, সেটা সম্পূর্ণ তাহাদের মানসিক ব্যাধির ফল। কিন্তু তাহা হইলেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে, বিলাতী রাজনৈতিক চিকিৎসাশাস্ত্র এই ব্যাধির নিকট হার মানিয়াছে। সুতরাং এখন ব্রিটিশ জাতির ভাবিয়া দেখা উচিত যে, এক শত বৎসর আগেকার নিদান ও ঔষধ এখন প্রযোজ্য কি না।

১৮২৭ সালের ২৫নং রেগুলেশ্যনের হেতুবাদে আছেঃ—

Whereas reasons of State embracing the due maintenance of the alliances formed by the British Government with foreign Powers, the preservation of tranquillity in the territory of Indian Princes entitled to its protection and the security of the British Dominions from foreign hostility and internal commotion, occasionally rendered it necessary to place under personal restraint individuals against whom there may not be sufficient ground to institute any judicial proceedings or when such proceedings may not be adapted to the nature of the case or may for some other reasons be unadvisable or improper,...

পররাষ্ট্রের সহিত ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের মিত্রতা রক্ষার জন্য,ভারতীয় দেশী রাজ্যগুলির মধ্যে শান্ত ভাব রক্ষার জন্য কিংবা ব্রিটিশ ভারতবর্ষকে বিদেশীর শত্রুতা হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত গান্ধীজীর বিরুদ্ধে উপ-আইনটি প্রযুক্ত হয় নাই। কথিত হইতে পারে, যে, ইণ্টার্ন্যাল অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ কমোশ্যন হইতে দেশকে রক্ষা করিবার জন্য গান্ধীজীকে আটক করা হইয়াছে। সুতরাং কমোশ্যনের মানে বুঝিতে চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরেজী অভিধানে ইহার মানে agitation, tumult, riot, violence, insurrection ইত্যাদি লিখিত আছে। সাধারণ আন্দোলন, জনসাধারণের চাঞ্চল্য ইত্যাদি দমনের জন্য এই রেগুলেশ্যন মজুত ছিল বিশ্বাস করিতে হইলে মানিয়া লইতে হয় যে, আমরা সাধারণ আইনের রাজ্যে বাস করিতেছি না। গান্ধীজীর অভিযান গত মার্চ্চ মাসে আরম্ভ হয়। তাহার পর যে অল্পসংখ্যক দাঙ্গা হাঙ্গামা হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা সংখ্যায় বেশী ও অধিক সাংঘাতিক দাঙ্গা হাঙ্গামা আগে আগে হইয়া গিয়াছে, এবং আধুনিক দাঙ্গা আদির সহিত গান্ধীর সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ যোগ নাই। তখন এরূপ রেগুলেশ্যন খাটান হয় নাই। চট্টগ্রামে যাহা হইয়াছে, তাহার সহিত গান্ধীজীর কোন প্রকার যোগ পাগলে ভিন্ন কল্পনা করিতে পারে না, এবং চট্টগ্রামের ব্যাপারটা মোপলা বিদ্রোহের মত বিদ্রোহও নহে। মোপলা-বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহীদের বিচারানন্তর শাস্তি হইয়াছিল, কোন রেগুলেশ্যন অনুসারে নহে। অতএব গান্ধীজীর প্রতি রেগুলেশ্যনটার ঠিক প্রয়োগ হয় না।

কিরূপ লোকদের বিরুদ্ধে রেগুলেশ্যনটা প্রযুক্ত হইবার কথা, তাহাও দেখা যাক। আদালতে যাহাদের বিচার চালাইবার জন্য যথেষ্ট প্রমাণাদি নাই, এরূপ লোককে এই বিধি অনুসারে আটক করা যায়। কিন্তু গান্ধীজী সেরূপ লোক নহেন; তিনি প্রকাশ্য ভাবে লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়াছেন এবং যাহার জন্য অন্য অনেক বক্তা ও সম্পাদক জেল খাটিতেছেন এমন বিস্তর কথা বলিয়াছেন ও লিখিয়াছেন। প্রমাণেরও কোন অভাব হইত না, কারণ তিনি কিছুই অস্বীকার করিতেন না। হেতুবাদে তাহার পর যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার মানে এই দাঁড়ায়, যে, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ভারতীয়

কর্ত্তৃপক্ষ যাহাকে ধরিতে চাহিতেন, তাহাকেই গ্রেপ্তার করিতে ও বিনা বিচারে আটক রাখিতে পারিতেন। *

কিন্তু সাধারণতঃ লোকের এই বিশ্বাস আছে, যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের চেয়ে এখন ভারতীয়দিগের ব্যক্তিগত অধিকার বাড়িয়াছে। তাহা সত্য না মিথ্যা ?

গান্ধীজীকে রেগুলেশ্যন অনুসারে বন্দী রাখিবার কয়েকটি সহজবোধ্য কারণ অনুমান করা যাইতে পারে। রাজনৈতিক অপরাধের জন্য অভিযুক্ত সাধারণ লোকদের ও ছোট ছোট নেতাদের বিচারের সময়েও অনেক স্থলে আদালত-গৃহে ও তাহার বাহিরে জনতা, কোলাহল, হুলস্থূল এবং মারপিট হইতে দেখা গিয়াছে। গান্ধীজীর বিচার হইলে খুব বেশী পরিমাণে ইহা হইতে পারিত। গবর্ন্মেণ্ট কৌশলে তাহা এড়াইয়াছেন। কিন্তু আগে হইতে সুবন্দোবস্ত করিলে কোলাহল আদি নিবারণ করা যায়। এবং গবর্ন্মেণ্টকে বন্দোবস্তের কষ্ট স্বীকার করিতে হইবে বলিয়া সাধারণ আইনসঙ্গত বিচারের প্রণালী রহিত করা উচিত নয়। গান্ধীজীকে রেগুলেশ্যন অনুসারে বন্দী করিবার দ্বিতীয় কারণ এই অনুমিত হয়, যে, আইন অনুসারে যে-কোন অভিযোগে তাঁহার বিচার হইত, তাহার জন্য তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট অল্প বা দীর্ঘ কালের জন্যই বন্দী রাখা চলিত, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য জেলে রাখা যাইত না; কিন্তু রেগুলেশ্যন অনুসারে তাঁহাকে গবর্ন্মেণ্টের খুশি অনুসারে যতদিন দরকার বন্দী রাখা চলিবে। এই অনুমানের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু গুরুতম কারণ বোধ হয় রাজপুরুষদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। প্রকাশ্য আদালতে গান্ধীজীর বিচার হইলে তিনিও গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে তাঁহার বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় বলিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না, এবং তাঁহার উক্তি সমূহ সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পৌঁছিত ও শ্রদ্ধার সহিত শ্রুত হইত। গান্ধীজীর সত্যবাক্য রূপ অস্ত্রের বার বার সম্মুখীন হইবার সাহস হয় ত রাজপুরুদের হয় নাই।

—

গান্ধীজীর গ্রেপ্তারে গবর্ন্মেণ্টের কৈফিয়ৎ

গান্ধীজীকে বোম্বাই সরকার কেন বন্দী করিয়াছেন, তাহার কারণ দেখাইয়াছেন। কারণগুলির ভিত্তিহীনতা যদি প্রমাণ করা যায়, তাহাতেও কোন ফল হইবে না; কেন না, আমাদের যুক্তি অনুসারে কাজ করিতে গবর্ন্মেণ্টকে বাধ্য করিবার কোন উপায় নাই। তথাপি বোম্বাই সরকারের কৈফিয়ৎটি জানিয়া রাখা ভাল। প্রথম কারণ এই বলা হইয়াছে :—

The campaign of civil disobedience, of which Mr. Gandhi has been the chief instigator and leader, has resulted in widespread defiance of law and order and in grave disturbances of the public peace in every part of India. Professedly non-violent, it has inevitably, like every similar movement in the past, led to acts of violence, which have as the days pass become more frequent. While Mr. Gandhi has continued to deplore these outbreaks of violence, his protests against the conduct of his unruly followers have become weaker and weaker, and it is evident that he is no longer able to control them.

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার যে বর্ণনা ও কারণব্যাখ্যা উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে কিঞ্চিৎ সত্য থাকিলেও মোটের উপর উহা অযথার্থ ও অঠিক। গান্ধীজীর অসামরিক আইন-লঙ্ঘন অভিযানের ফলে একটি আইন (লবণ আইন) সকল প্রদেশের লোকে 'ডিফাই' অর্থাৎ অগ্রাহ্য করিতেছে, ইহা সত্য কথা; লোকে ঐরূপ করুক, গান্ধীজীর উদ্দেশ্যই তাহা ছিল। কিন্তু দেশে যত প্রকার উপদ্রব, উচ্ছৃঙ্খলতা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতেছে, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে গান্ধীজীর প্রচেষ্টা তাহার জন্য দায়ী, ইহা সত্য নহে।

ইহা সুবিদিত কথা, যে, ভারতবর্ষের সব লোক রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসায় বিশ্বাসী নহে। অনেক লোক মনে করে, বলপ্রয়োগ ভিন্ন ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারিবে না। লাহোরে কংগ্রেসের গত অধিবেশনে, বড় লাটের ট্রেন বোমাদ্বারা উড়াইয়া দিবার চেষ্টার নিন্দা করিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তৎসম্বন্ধে তর্কবিতর্কের সময় এবং অন্য তর্কবিতর্কের সময়ও, ইহা বুঝা গিয়াছিল,

---

* কথাগুলি এই :—

"—or when such (judicial) proceedings may not be adapted to the nature of the case or may for some other reason be unadvisable or improper."

যে, কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যেও বাহুবল ও অস্ত্রবলে বিশ্বাসী লোক অনেক আছে। কিন্তু উক্ত প্রস্তাবটি অধিকাংশের মতে গৃহীত হওয়ায় অহিংসার পথকেই কংগ্রেসের অনুমোদিত পথ মনে করিতে হইবে; কারণ, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশের যাহা মত, তাহাই প্রতিষ্ঠানের মত মনে করিতে হইবে, ইহাই নিয়ম। অহিংস উপায়ে পূর্ণ-স্বরাজলাভ কংগ্রেসের উদ্দেশ্য, ইহাও সুবিদিত।

কংগ্রেসের দলভুক্ত নহে এরূপ লোকদের মধ্যে এবং কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যেও বাহুবলে ও অস্ত্রবলে বিশ্বাসী লোক আছে বলিয়াই মহাত্মা গান্ধী অসামরিক নিরস্ত্র আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। ইহা বড়লাটকে লিখিত তাঁহার প্রথম চিঠিতে আছে। যথা :—

"বর্ত্তমানে তাহারা যতই অসংহত হউক এবং সামান্য হউক, বলপ্রয়োগ-নীতির সমর্থক দল প্রতিপত্তি লাভ করিতেছে এবং নিজেদের অস্তিত্ব অনুভব করাইতেছে। আমার উদ্দেশ্য যাহা, এই হিংসাবাদীদের উদ্দেশ্যও তাহাই। কিন্তু আমি ঠিক্ বুঝিয়াছি, যে, হিংসানীতি লক্ষ লক্ষ মূক ভারতীয়ের অভিলষিত দুঃখশান্তি আনয়ন করিতে পারিবে না। আমার মনে এই বিশ্বাস গভীর হইতে গভীরতর হইতেছে, যে, একমাত্র অবিমিশ্র অহিংসা ভিন্ন ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের সুপ্রণালীবদ্ধ বলপ্রয়োগ-নীতির প্রতিরোধ করিবার উপায় নাই।...ব্রিটিশ শাসনের সুশৃঙ্খল উপদ্রব-শক্তির এবং ভারতীয় হিংসাবাদীদের অনিয়ন্ত্রিত উপদ্রব-শক্তির বিরুদ্ধে সেই অহিংসাশক্তিকে সমভাবে প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়।"

দেশে উপদ্রব, মারপিট, রক্তারক্তি বেসরকারী ও সরকারী উভয়বিধ লোকদের দ্বারাই হইতেছে। সব বেসরকারী লোক ইহা করিতেছে না, সব সরকারী লোকেও ইহা করিতেছে না। বেসরকারী যে-সব লোক ইহা করিতেছে, তাহারা গান্ধীর দলের লবণ-আইন-ভঙ্গ-কারী লোক নহে। একটি যায়গাতেও তাহারা আততায়ী হইয়া মারপিট করিয়াছে, এরূপ সংবাদ পড়ি নাই; কিন্তু তাহারা প্রতিশোধ দিবার চেষ্টা না করিয়া মারপিট সহ্য করিয়াছে, এরূপ বিস্তর সংবাদ প্রত্যহ দৈনিক কাগজসমূহে বাহির হইয়াছে।

বেসরকারী যে-সব লোক উপদ্রব করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক সম্ভবতঃ বাহুবল অস্ত্রবলে বিশ্বাসী দলের লোক; কতক লুণ্ঠনপ্রিয় গুণ্ডা শ্রেণীর লোক; কতক পুলিসের উত্তেজক গুপ্তচর হওয়া অসম্ভব নহে; কতক কৌতূহলী দর্শক, সরকারী লোকদের উপদ্রবে উত্তেজিত হইয়া শান্তিভঙ্গ করিয়াছে। এই সমুদয় শ্রেণীর লোকের দুষ্কার্য্যের জন্য সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে গান্ধীজীকে দায়ী করা যুক্তি-সঙ্গত ও ন্যায়সঙ্গত নহে। এই সকল দুষ্কার্য্য গান্ধীজীর প্রচেষ্টার ফল, মনে করা ভ্রম। যখন তিনি বিখ্যাত হন নাই, ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁহার আবির্ভাব হয় নাই, সেই সময়ে, কুড়ি বা তার চেয়েও বেশী বৎসর আগে হইতে, এই প্রকারের নানা রকম উপদ্রব হইয়া আসিতেছে। গান্ধীজীকৃত প্রচেষ্টা তখন না থাকাতেও যদি এই সব উপদ্রব ঘটিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে এখন তদ্রূপ উপদ্রবসমূহের কারণ নিশ্চয়ই গান্ধী-প্রচেষ্টা, এরূপ বলা যায় না। যে যে ঘটনা একই সময়ে ঘটে, কিংবা যে যে ঘটনা একটির পর একটি ঘটে, তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ সম্পর্ক থাকিবেই মনে করা ভুল। সংস্কৃতে কাকতালীয় ন্যায় বলিয়া একটা কথা আছে। ইহা পাশ্চাত্য তর্ক শাস্ত্রের, "post hoc ergo propter hoc" "ইহার পরে ঘটিত অতএব ইহার জন্য ঘটিত,"এইরূপ ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের অনুরূপ। একটা কাক তালগাছে বসিবার পর একটা পাকা তাল মাটিতে পড়িল। তাহা হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত করা ভুল যে, কাকের উপবেশনই তাল পতনের কারণ; কেন না, কাক না বসিলেও পাকা তালটি মাটিতে পড়িত।

আমাদের বিশ্বাস, গান্ধী-প্রচেষ্টা আরব্ধ না হইলেও নানা উপদ্রব ঘটিত, সম্ভবতঃ আরও অধিক পরিমাণে ঘটিত। তাঁহার প্রচেষ্টা তিনি আরম্ভ করিয়াছেন সরকারী ও বেসরকারী বলপ্রয়োগ-নীতির প্রতিরোধ করিবার জন্য। বড়লাটকে লিখিত তাঁহার চিঠিতেই আছে, "ব্রিটিশ শাসনের সুশৃঙ্খল উপদ্রব-শক্তির এবং ভারতীয় হিংসা-বাদীদের অনিয়ন্ত্রিত উপদ্রব-শক্তির বিরুদ্ধে অহিংসার শক্তিকে সমভাবে প্রয়োগ করাই আমার অভিপ্রায়।" যে-সব বেসরকারী লোক বলপ্রয়োগ-নীতির পক্ষপাতী, সম্ভবতঃ তাহাদের অনেকেই গান্ধী-প্রচেষ্টার ফল কি হয় তাহা দেখিবার জন্য নিষ্ক্রিয় আছে, কেবল মাত্র কেহ কেহ

নিজেদের নীতি অনুসারে এখনই কাজ করিতেছে। কিন্তু অনেক জায়গা হইতে প্রত্যহ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সংবাদে দেখা যায়, পুলিশের লোক নিরুপদ্রব লবণ-আইন-ভঙ্গকারী ও দর্শকদের উপর লাঠি চালাইয়াছে। সরকার পক্ষ হইতে এই সকল সংবাদের প্রতিবাদ হয় নাই। একমাত্র বোম্বাই সহরের পুলিশ কমিশনার তাঁহার এলাকায় এরূপ মারপিট করার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া কাগজে পড়িয়াছি। কর্তৃপক্ষীয় অন্য কোন সরকারী লোক এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, বা মারপিট না করিতে পুলিশের লোকদিগকে আদেশ দিয়াছেন, এরূপ কোথাও কিছু পড়ি নাই। অবশ্য, পুলিশের লোকমাত্রেই জুলুমবাজ নহে, সেরূপ বলাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। যেখানে সেখানে পুলিশের লোক নিরুপদ্রব লোকদের উপর লাঠি চালাইয়াছে, সেরূপ কাজ ভারতগবর্ন্মেণ্টের বা প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের হুকুমে করিয়াছে, এমন কথাও বলিতে পারি না; কারণ তেমন হুকুম আমরা দেখি নাই, তেমন কোন আদেশের অস্তিত্ব আমরা অবগত নহি। আমরা কেবল তথ্য হিসাবে ইহা বলিতেছি, যে, নানাস্থানের লবণ-আইন-ভঙ্গকারী-দিগকে স্থানীয় পুলিশের অনেক লোক প্রহার করিয়াছে বলিয়া দৈনিক কাগজে বিস্তর সংবাদ পড়িয়াছি। নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘকদিগকে গ্রেপ্তার করিবারই অধিকার পুলিশের আছে, প্রহার করিবার আইনসঙ্গত অধিকার নাই।

সরকারপক্ষ বলিতে পারেন, গান্ধী-প্রচেষ্টা এমন একটা উত্তেজনার আবহাওয়া সৃষ্টি করিয়াছে, যাহা উপদ্রব উচ্ছৃঙ্খলতা দাঙ্গাহাঙ্গামার অনুকূল। এই যুক্তি সম্বন্ধে আমরা দুটি কথা বলিতে চাই। গান্ধীজী যখন অহিংস অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্ত্তিত করেন, তাহার ফলে রাজনৈতিক হত্যা ও তৎসদৃশ রাজনৈতিক অপরাধ খুব কমিয়া গিয়াছিল। ইহা একটি ঐতিহাসিক তথ্য। বর্ত্তমান প্রচেষ্টাও অহিংসামূলক। ইহার দ্বারাও হিংস্র বলপ্রয়োগনীতি কতকটা প্রতিরুদ্ধ হইয়াছে, যদিও তাহা একেবারে প্রতিরুদ্ধ হয় নাই। আমাদের দ্বিতীয় বক্তব্য এই, যে, যে রাজনৈতিক আব-হাওয়ার উদ্ভব হইয়াছে, ধীরভাবে চিন্তা করিলে তাহার জন্য গবর্ন্মেণ্ট নিজের দায়িত্ব বুঝিতে পারিবেন। সরকারী অনেক লোকের আচরণে যদি লোকের এই ধারণা হয়, যে, গবর্ন্মেণ্টের মতে বলপ্রয়োগই চরম ও শ্রেষ্ঠ উপায়, তাহা হইলে যদি কতক অদূরদর্শী ও অসাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক ঐ সরকারী লোকদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে, তবে তাহা কি নিতান্ত আশ্চর্য্য ব্যাপার? অনুনয়-বিনয় আবেদন-নিবেদন প্রতিবাদ অনুরোধ যুক্তি তর্ক প্রভৃতির ব্যর্থতা দেখিয়া, একদিকে যেমন গান্ধীজী ও তাঁহার অনুচরেরা অহিংস প্রচেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন, অন্যদিকে তেমনি অস্ত্রবল বাহুবলে বিশ্বাসী লোকেরা নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিতেছে, ইহা কি অসম্ভব?

যদি গবর্ন্মেণ্ট শান্তির পথকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন, তাহা হইলে আমাদের বিবেচনায় গান্ধীজীকে সরকারের বন্ধুই মনে করা উচিত।

আমরা আগেই বলিয়াছি ও দেখাইয়াছি, যে গান্ধীজীর অনুচরেরা 'আনরুলী' বা উচ্ছৃঙ্খল নহে। সুতরাং তিনি তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল অনুচরদিগকে শাসন করিতেছেন না, বা করিতে পারিতেছেন না, এই দোষারোপ ন্যায়সঙ্গত নহে। কিন্তু যদি তাহারা তাহা হইত, তাহা হইলে, একদিকে গবর্ন্মেণ্টের তাঁহাকে দোষ দিবার যেমন অধিকার জন্মিত, অন্যদিকে তেমনই পুলিশের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল জুলুমবাজ লোকদিগকে শাসন করাও গবর্ন্মেণ্টের উচিত হইত। গান্ধীজীর অনুচরদের যে-সব সত্য বা অযথার্থ দোষের জন্য গবর্ন্মেণ্ট গান্ধীজীকে দোষ দিতেছেন, সরকারী অনেক লোকের বিরুদ্ধে সেই সব দোষ অহরহ খবরের কাগজে বাহির হওয়া সত্ত্বেও গবর্ন্মেণ্টের প্রতিবাদ বা প্রতিকার কিছুই না করা সঙ্গত আচরণ নহে। ভারত গবর্ন্মেণ্ট বা কোন প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট যদি নিরুপদ্রব ভাব ও অবস্থা ভালবাসেন, তাহা হইলে পরিষ্কার ভাষায় সরকারী জুলুমবাজ লোকদের ব্যবহারের তিরস্কারপত্র বাহির করা, কিংবা এরূপ জুলুমের সম্বন্ধে অনুসন্ধান কমিটি বসান, কিংবা অন্ততঃ জুলুমের সংবাদের প্রতিবাদ করা গবর্ন্মেণ্টের উচিত। সেরূপ কিছু না করিলেও গান্ধীজীর অনুচরেরা জুলুম সহ্য করিয়াই চলিবে, কিন্তু উত্তেজনাপরায়ণ অন্য

লোকেরাও জুলুমবাজ সরকারী লোকদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিবে না, এরূপ আশা করা সরকারী লোকদের পক্ষে অযৌক্তিক হইবে।

বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট গান্ধীজীর অনুচরদের দোষের উল্লেখই করিয়াছেন। কিন্তু অহিংস ভাব ও সহিষ্ণুতাও ত তাহারা দেখাইয়াছে। তাহারা সহিষ্ণু না হইলে রক্তারক্তি আরও হইত, বোম্বাই গবর্ন্মেণ্ট ইহা কেন ভাবিয়া দেখেন নাই ও স্বীকার করেন নাই?

—

সামাজিক ভয় প্রদর্শনের অভিযোগ

গান্ধীকে গ্রেপ্তার করিবার অন্য কতকগুলি কারণ বোম্বাই সরকার নিম্নলিখিত রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

It is naturally in Gujarat, where his personal influence is greatest and through which he marched from Ahmedabad to Dandi, that the effects of his campaign have been most felt. In this area, but chiefly in certain Talukas, his followers have instituted a severe form of social boycott, accompanied by threats of expulsion from caste, by insult and contumely, and even by deprivation of food and water, whereby they have induced a very considerable number of the patels (village head-men) to resign, thus causing serious inconvenience to the administration. Even private persons who have remained loyal to Government have been exposed to this boycott, not excluding the members of the depressed classes, of whose interests Mr. Gandhi used to claim to be the protector. At the later stages, finding that neither the breach of the salt laws nor the picketing of liquor shops and the boycott of foreign cloth were producing the results he desired, Mr. Gandhi has on several occasions incited the cultivators to withhold payment of land revenue, and still more recently he has declared that he intends to march on the salt works at Dharasna or Chharwada and to take possession of the salt collected at those places, which is the property not of Government but of the salt manufacturers. Such a raid could not, whatever protestations may be made, be conducted without the use of force and would inevitably be resisted by force by the agrias (salt-makers) and the police.

পটেল অর্থাৎ সরকারী গ্রাম্য মণ্ডলদিগকে জোর করিয়া বা ভয় দেখাইয়া পদত্যাগ করাইবার অভিযোগ যে মিথ্যা, তাহা গান্ধীজীর [এখন কারারুদ্ধ] সেক্রেটারী মহাদেব দেশাই খবরের কাগজে দেখাইয়াছেন। গান্ধীজী বড়লাটকে লিখিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্রে লিখিয়াছেন, যে, সরকারী কর্ম্মচারীরাও মিথ্যা কথা রটায় ("Officials, I regret to have to say, have not hesitated to publish falsehoods to the people even during the last five weeks.")

গান্ধীজীর অনুচরেরা "একঘরে" করিয়া সামাজিক শাসন চালাইবার যে রীতি চলিত আছে, তাহা প্রয়োগ করিয়াছে, বোম্বাই সরকারের ইহা আর এক অভিযোগ। এই অভিযোগ সত্য কিনা, অংশতঃ সত্য হইলেও কি পরিমাণে ও কি অর্থে সত্য, বলিতে পারি না। প্রকাশ্য আদালতে গান্ধীজীর বিচার ত হইল না, অধিকন্তু তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার মুখ বন্ধ করিবার পর তাঁহার ও তাঁহার অনুচরদের অখ্যাতি রটান হইতেছে। ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে। গবর্ন্মেণ্টের শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে, শাস্তি দিবেন; কিন্তু যাঁহাকে দণ্ডিত করা হয়, তাঁহাকে অভিযোগের উত্তর দিবার সুযোগ দেওয়া কি উচিত নহে?

বড়লাটকে শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল প্রথম যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত আছে, যে, ভারত গবর্ন্মেণ্টের কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে সামাজিক ভাবে বয়কট অর্থাৎ "একঘরে" করিয়াছিল। বড়লাট এ কথার কোন জবাব দেন নাই। পটেল মহাশয়কে বয়কট করার জন্য কেহ বিনা বিচারে বন্দীকৃত হইয়াছেন বলিয়াও শুনি নাই। "বয়কট" কথাটা আয়ার্ল্যাণ্ড হইতে আমদানী এবং জিনিষটা পাশ্চাত্য দেশেও আছে। তাহার প্রমাণ, এক্সকম্যুনিকেট ও অষ্ট্রাসাইজ কথা দুটির সামাজিক অর্থে প্রয়োগ। সকল স্থলে এবং সকল প্রকারের সামাজিক বয়কটের সমর্থন আমরা করি না; কাহাকেও অনাহারে মারিবার বন্দোবস্তের সমর্থন ত করিই না। কিন্তু সামাজিক ভাবে কে কাহার সহিত মিশিবে, কাহাকে সম্মান বা সৌজন্য দেখাইবে, কাহার সঙ্গে খানাপীনা চালাইবে, কোন্ কোন্ পরিবারের সহিত ঔদ্বাহিক আদান-প্রদান চালাইবে, কাহাকে জিনিষ বিক্রী করিবে, ইত্যাদি বিষয়ে সকলের স্বাধীনতা থাকা চাই। এবম্বিধ সামাজিক ব্যাপারে গবর্ন্মেণ্ট হস্তক্ষেপ করিতে চাহিলে ভ্রম করিবেন, এবং সেরূপ সরকারী চেষ্টা সফল হইবে না।

মহাত্মা "গান্ধী অবনত শ্রেণীর লোকদের স্বার্থের রক্ষক বলিয়া দাবী করিতেন," ইত্যাদি কথার মধ্যে

লুক্কায়িত ব্যঙ্গ ব্যর্থ। এরূপ দাবী পৃথিবীর লোকে সত্য বলিয়া জানে।

—

খাজনা না-দিবার পরামর্শদান

মদের দোকানে ও বিদেশী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং তাঁহার অভিলষিত ফল উৎপাদন করিতেছে না দেখিয়া গান্ধীজী কৃষকদিগকে জমীর খাজনা না-দিতে উত্তেজিত করিতেছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে বোম্বাই গবন্মেণ্টের ইহা আর এক অভিযোগ। পিকেটিং যথেষ্ট ফলপ্রদ হইতেছে না, ইহার কোন প্রমাণ আছে কি? পিকেটিং যথেষ্ট ফলপ্রদ না হওয়াটাই কৃষকদিগকে খাজনা দিতে নিষেধ করার কারণ, তাহাই বা বোম্বাই গবন্মেণ্ট কেমন করিয়া জানিলেন? গান্ধীজী কি মনে করিয়া কি করেন, তাহা তিনি প্রকাশ করিয়া না বলিলে কেবল থট্-রীডার বা পরচিত্তজ্ঞানীরাই তাহা বলিতে পারেন। পরচিত্ত-জ্ঞানের দাবী বোম্বাই গবন্মেণ্ট করেন বলিয়া অবগত নহি। জমীর খাজনা বা অন্য কোন রকম ট্যাক্স না দিলে তাহার জন্য আইনে নির্দ্দিষ্ট দুঃখ ভোগ করিতে হয়। যাহারা ট্যাক্স দিবে না স্থির করে, তাহা সহ্য করিবার জন্য তাহারা প্রস্তুত থাকে। কিন্তু বিশেষ কোন ট্যাক্স না-দেওয়া বা তাহা না-দিতে লোককে বলা সভ্য জগতে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) প্রচেষ্টার একটা বৈধ (constitutional) অঙ্গ বলিয়া স্বীকৃত, যদিও নূতন প্রেস-বিধান অনুসারে সংবাদপত্রের পক্ষে ইহা একটা গুরুতর অপরাধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মত প্রজাতন্ত্র শাসনপ্রণালীতে দেশের শাসনব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পার্লেমেণ্ট প্রভৃতি ব্যবস্থাপক সভা কর্ত্তৃক অর্থ মঞ্জুর করিবার আগে গবন্মেণ্ট অভাব অভিযোগ শুনিতে ও তাহার প্রতিকার করিতে বাধ্য, ইহা একটা মামুলী কথা। সংক্ষেপে ইহাকে "grievances before supplies" বলা হয়। আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালী প্রচলিত নাই বলিয়া, অন্য সভ্য দেশের লোকদের ট্যাক্স না-দিয়া নিজেদের অভাব অভিযোগের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার রীতি অবলম্বন করিতে ভারতীয়েরা অনধিকারী, ইহা স্বীকার করিতে পারি না। ভারতীয়েরা অনেকে ট্যাক্স না দিবার দুঃখ ভোগ করিতে প্রস্তুত, কিন্তু প্রতিকার-লাভার্থ ট্যাক্স না-দেওয়া একটা ক্রাইম্ বা গুরুতর অপরাধ, ইহা তাহারা স্বীকার করিতে পারে না। গুজরাটের খেড়া জেলায় ও বারদোলীতে এবং যশোহর জেলার বন্দবিলাতে লোকে ট্যাক্স না দিয়া দুঃখ ভোগ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের কোন পরামর্শদাতা নেতা তজ্জন্য বিনা বিচারে বন্দীকৃত হয় নাই। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ করিতে পরামর্শ দেওয়া সম্প্রতি সংবাদপত্র-সমূহের পক্ষে নূতনসৃষ্ট একটি ক্রাইম্ বা দুষ্কৃতি বটে।

—

লবণগোলা "আক্রমণ"

অতঃপর, ধরাসনা বা ছারওয়াড়ার লবণের কারখানা "আক্রমণ" করিবার অভিপ্রায় গান্ধীজীর বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ বলিয়া লিখিত হইয়াছে। এবিষয়ে গান্ধীজী কিছুদিন হইল বলিয়াছিলেন, যে, তিনি ধরাসনায় লবণ অধিকার করিতে যাইবার অভিপ্রায় যে বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার অন্যান্য অনেক বক্তৃতার ন্যায় গুজরাতী ভাষাতে করিয়াছিলেন। "ধরাসনা" নামটির সহিত যাহার অনুপ্রাস হয়, তিনি পরিহাসচ্ছলে এরূপ একটি গুজরাতী কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাহার ঠিক্ ইংরেজী প্রতিশব্দ নাই। কিন্তু ইংরেজীতে উহা "রেড্" ("raid") অনুবাদ করায় তিনি কাহাকেও দোষ দেন না। এসব কথা তিনি তাঁহার গ্রেপ্তারির কিছুদিন আগেই বলিয়াছিলেন। তথাপি অরসিক বোম্বাই গবন্মেণ্ট রসবোধের অভাব বশতঃ এই তথা-কথিত "রেড"টির লুণ্ঠনের জন্য সহসা আক্রমণ অর্থ করিয়া গম্ভীর ভাবে অনেক কথা লিখিয়াছেন। বস্তুতঃ গান্ধীজীর অভিপ্রায় ছিল, লবণের কারখানায় গিয়া সর্ব্বসাধারণের পক্ষ হইতে সেখানে রক্ষিত লবণের স্বত্ব দাবী করা, কারণ তাঁহার মতে লবণকে গবন্মেণ্টের একচেটিয়া জিনিষ করা অন্যায়। তাঁহার অভিপ্রায় যে এইরূপ ছিল,

তাহা বড়লাটকে লিখিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্র হইতে বুঝা যায়। তাহাতে তিনি বলিতেছেন :—

"God willing, it is my intention on ……… to set out for Dharasna and reach there with my companions and demand possession of the salt works. The public have been told that Dharasna is private property. This is a mere camouflage. It is as effectively under Government control as the Viceroy's House. Not a pinch of salt can be removed without the previous sanction of the authorities. It is possible for you to prevent this 'raid', as it has been playfully and mischievously called, in three ways :……… "

তাৎপর্য্য। আমার সঙ্কল্প এই যে, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে…তারিখে ধরাস্না রওনা হইব এবং সেখানে আমার সঙ্গীদের সহিত পৌঁছিয়া লবণের কারখানার দখল চাহিব। সর্ব্বসাধারণকে বলা হইয়াছে, যে, ধরাস্না বেসরকারী লোকের সম্পত্তি। একথা সত্যগোপনের কৌশল মাত্র। বড়লাটের গৃহ যেমন গবন্মেণ্টের কর্ত্তৃত্বের অধীন, ইহাও তেমনি কার্য্যকারী ভাবে সরকারী কর্ত্তৃত্বের অধীন। আগে কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি না লইয়া সেখান হইতে এক চিমটি লবণও সরান যায় না। যাহাকে পরিহাসচ্ছলে ও দুষ্টামি করিয়া 'রেড' বা লুণ্ঠনার্থ আক্রমণ বলা হইয়াছে, তাহা তিন উপায়ে নিবারণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হইবে…"

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জোর করিয়া, লাঠালাঠি মারা-মারি ঘুষা-ঘুষি ধাক্কা-ধাক্কি করিয়া, দরজা ভাঙিয়া কারখানা দখল করিবার অভিপ্রায় গান্ধীজীর ছিল না। তিনি ও তাঁহার সঙ্গীরা দখল চাহিলে পুলিস তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিলেই তাঁহারা ধৃত ও নিরস্ত হইতেন। তাঁহাতে তাঁহাদের পক্ষ হইতে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইত না।

—

বোম্বাই সরকারের সহিষ্ণুতা

ইহার পর বোম্বাই গবন্মেণ্ট বলিতেছেন :—

The Government of Bombay have, ever since Mr. Gandhi left his ashram at Ahmedabad, pursued a policy of the utmost toleration. They have been content to risk the accusation of weakness in the firm conviction that the attack on the salt laws, if violence were excluded from the methods by which it was conducted, must before long come to a peaceful ending. Events have shown that the laws of nature are inexorable and that the history of the earlier non-co-operation movement, with its accompaniments of blood and fire, would repeat itself, if Mr. Gandhi's campaign were allowed to continue unchecked.

তাৎপর্য্য। মিঃ গান্ধী আহমদাবাদের আশ্রম ত্যাগ করিবার পর হইতে গবন্মেণ্ট যৎপরোনাস্তি সহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। তাঁহারা এই দৃঢ় বিশ্বাসেই দুর্ব্বলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবার ঝুঁকি লইয়া সন্তুষ্ট ছিলেন, যে, যদি লবণ আইনের উপর আক্রমণ জুলুম জবরদস্তি না করিয়া চালান হয়, তাহা হইলে উহা অচিরে শান্তিপূর্ণভাবে থামিয়া যাইবে। ঘটনাবলী দেখাইয়াছে, যে, প্রকৃতির নিয়মাবলী কঠোর ও অনমনীয়, এবং যদি মিঃ গান্ধীর অভিযান অব্যাহত ভাবে চালাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী অসহযোগ-প্রচেষ্টার রক্ত ও অগ্নির সংসর্গযুক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হইবে।"

গান্ধীজীর মত সাধুলোকেরা ছাড়া নিজেদের সব ভুল ভ্রান্তি ত্রুটি দোষ লোকে প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করে না। গবন্মেণ্ট ব্যক্তিবিশেষ নহে; কোন দুর্ঘটনা ও দোষের জন্য দায়িত্ব স্বীকার করা কোন দেশের শাসকদেরই দস্তরও নহে। রক্তারক্তি ও অগ্নিসংযোগ আদি অত্যাচার উপদ্রব যাহা অতীতকালে ও বর্ত্তমানকালে ঘটিয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘটিতে পারে, তাহার জন্য আংশিক দায়িত্বও সরকারী লোকদের কোন সমষ্টি স্বীকার করিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের মত প্রকৃতিবিশিষ্ট লোকেরা সম্ভবতঃ উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় বাক্যের শেষ অংশটি, বাঁকা অক্ষরে মুদ্রিত কথাগুলি যোগ করিয়া, এইরূপ লেখাই অপেক্ষাকৃত অধিকতর সঙ্গত মনে করিতেন—"the attack on the salt laws, if violence were excluded *both* from the methods by which it was conducted

and from the official methods by which it was sought to be frustrated, must come to a peaceful ending," "যদি লবণ-আইনের উপর আক্রমণ এবং তাহা ব্যর্থ করিবার সরকারী চেষ্টা উভয়ই জুলুম জবরদস্তি না করিয়া চালান যায়, তাহা হইলে উহা অচিরে শান্তিপূর্ণভাবে থামিয়া যাইবে।" লবণ-আইন-লঙ্ঘন-প্রচেষ্টা সত্যাগ্রহীরা সাধারণতঃ জুলুম জবরদস্তি দ্বারা চালাইতেছে, এরূপ সংবাদ কোন দৈনিক কাগজে আমাদের চোখে পড়ে নাই, কিন্তু ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য বিস্তর জায়গায় অনেক সরকারী লোক জুলুম জবরদস্তি অত্যাচার করিয়াছে ও করিতেছে এরূপ সংবাদ দিনের পর দিন, বিনা সরকারী প্রতিবাদ ও বাধায়, নানা দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। এ অবস্থায় রক্তপাত ও আগুনের খেলার জন্য কোন্ পক্ষ দায়ী, বা কাহারা কম কাহারা বেশী অথবা উভয় পক্ষই সমান দায়ী, তাঁহা ভবিষ্যতে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্থির করিবেন। অসহযোগ আন্দোলনের আগেকার ইতিহাস আলোচনা করা এখন অপ্রাসঙ্গিক হইবে। সুতরাং, বোম্বাই গবর্মেণ্ট তৎসম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন আমরা তাহা নির্ভুল মনে না করিলেও, সেরূপ আলোচনা করিব না।

বোম্বাই সরকার সম্ভবতঃ যে-যে কারণে এতদিন গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেন নাই, তাহার আলোচনা আগে করিয়াছি। তাহাতে সহিষ্ণুতার বা অন্য কিছুর পরিচয় পাওয়া যায়, পাঠকেরা তাহা অনুমান করিতে পারিবেন। কিন্তু বোম্বাই সরকার যদি সহিষ্ণুই হন, তাহা হইলে গান্ধী ছাড়া অন্য নেতাদের এবং অনেক অনুচরদের সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা দেখান নাই কেন?

—

মহাত্মা গান্ধীর কারারোধের ফলাফল

সাধারণ মানুষেরা যেমন অমর নহে, অসাধারণ মানুষেরাও তেমনি মৃত্যুর অধীন। তাঁহারা সাধারণ লোকদিগকে উপদেশ ও উৎসাহ দিবার জন্য এবং চালিত করিবার নিমিত্ত চিরকাল বাঁচিয়া থাকেন না। তাঁহাদের মৃত্যুর পর তাঁহাদের জীবন চরিত্র চিন্তা কথা ও কাজের প্রভাব মানুষ অনুভব করে ও তাহার দ্বারা চালিত হয়। অসাধারণ মানুষদের মধ্যে যে সকল গুণ ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, সাধারণ মানুষদের মধ্যেও তাহা আছে, কিন্তু ততটা বিকশিত অবস্থায় না থাকিতে পারে। মহাপুরুষদের জীবনের প্রভাবে তৎসমুদয় বিকশিত হইতে পারে।

অতীত কালের মহাপুরুষদের মৃত্যু হইলেও তাঁহাদের শক্তি ও প্রভাব লুপ্ত হয় নাই। মহাপুরুষদের শক্তি ও প্রভাব মৃত্যু যখন বিনষ্ট করিতে পারে না, কারাদণ্ডও তখন নিশ্চয়ই তাহার হ্রাস বা বিনাশ সাধন করিতে পারে না। সুতরাং মহাত্মা গান্ধীর কারাদণ্ড বশতঃ তাঁহার জীবনের সুপ্রভাব ও সুফল হইতে ভারতবর্ষ ও অন্যান্য দেশ বঞ্চিত হইবে না। তৎকর্তৃক প্রবর্তিত প্রচেষ্টা তাঁহার ব্যক্তিগত পরিচালনা হইতে বঞ্চিত হইবে বটে; কিন্তু অন্য নেতাদেরও বুদ্ধি এবং অন্যবিধ যোগ্যতা আছে। সুতরাং ভারতীয়দের স্বাধীনতালাভ-অভিযান কর্ণধারবিহীন হইবে না। মহাত্মাজীর মানবপ্রেম এবং অহিংস ভাবও তাঁহার দলের অনেকের বহু পরিমাণে আছে।

তাঁহাকে বন্দী করায় গবর্মেণ্টের কি সুবিধা বা অসুবিধা হইবে, তাহা আমাদের ভাবিবার ও বলিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু সরকারী লোকেরা যদি মনে করিয়া থাকেন, যে, তাঁহাকে বন্দী করিলেই আন্দোলন থামিয়া যাইবে, এবং দেশে শান্তি ও সন্তোষের আবির্ভাব হইবে, তাহা হইলে সেটা তাঁহাদের ভ্রম বলিয়া মনে করি।

মহাত্মাজীর কারারোধে তাঁহার কোন চিত্তবিকার হয় নাই। আমরাও দুঃখিত, চিন্তিত, উত্তেজিত বা ক্রুদ্ধ হই নাই। তাহা যদি হইতাম, তাহা হইলেও গবর্মেণ্টের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতাম না; কারণ প্রতিবাদ নিষ্ফল এবং অক্ষমের ছদ্মবেশী ক্রন্দন মাত্র।

গান্ধীজী বন্দীকৃত হইবার পূর্ব্বে ও পরে সরকারী ও বেসরকারী লোকদের দ্বারা যে সব উপদ্রব হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয়। শাসন ও পুলিশ বিভাগের সরকারী লোকদের উপর গান্ধীজীর উপদেশের ও চরিত্রের

প্রভাব কিছু আছে কি না জানি; কিন্তু বেসরকারী বিস্তর লোকের উপর আছে। এই প্রভাব মানুষকে অহিংসাপ্রবণ করে। স্বদেশবাসীদের সহিত স্বেচ্ছায় স্বচ্ছন্দে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার এবং তাহাদিগকে উৎসাহ উপদেশ দিবার, অনুপ্রাণিত করিবার ও অনুযোগ তিরস্কার করিবার সুযোগ এখন তাঁহার না থাকায় যদি ঐ প্রভাব মন্দীভূত হয় এবং তাহার ফলে পাশবিক বলে বিশ্বাসী দলের পুষ্টি ও কর্ম্মিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয় হইবে।

—

বড়লাটকে লিখিত গান্ধীজীর দ্বিতীয় পত্র

মহাত্মা গান্ধী গ্রেপ্তার হইবার পর বড়লাটকে লিখিত তাঁহার দ্বিতীয় পত্রের হস্তলিপি তিনি তাঁহার সহচর স্বেচ্ছাসেবকদিগকে দেন। তাহা এসোসিয়েটেড প্রেসের মারফৎ ইংরেজদের ও ভারতীয়দের অনেক কাগজ পাইয়া আদ্যোপান্ত মুদ্রিত করিয়াছেন। এই চিঠির কোন কোন কথার উল্লেখ আমরা আগে করিয়াছি। মহাত্মা গান্ধীর সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্মেণ্টের সমুদয় অভিযোগ আমরা ছাপিয়াছি। তিনি বড়লাটকে কি জানাইতে চাহিয়াছেন, তাহারও অন্ততঃ কিয়দংশ লোকের জানা উচিত। এই জন্য এসোসিয়েটেড প্রেস কর্ত্তৃক প্রচারিত চিঠিখানির কোন কোন অংশ অনুবাদ না করিয়া মূল ইংরেজীতে উদ্ধৃত করিতেছি। -

I had hoped that the Government would fight the civil resisters in a civilized manner. I would have had nothing to say if in dealing with the civil resisters the Government had satisfied itself with applying the ordinary processes of law. Instead, whilst well-known leaders have been dealt with more or less according to legal formality, the rank and file have been often savagely and, in some cases, even indecently assaulted. Had these been isolated cases, they might have been overlooked. But accounts have come to me from Bengal, Bihar, Utkal, United Provinces, Delhi and Bombay confirming the experiences of Gujarat, of which I have ample evidence at my disposal.

In Karachi, Peshawar and Madras the firing would appear to have been unprovoked and unnecessary. Bones have been broken and private parts have been squeezed for the purpose of making volunteers give up, to Government valueless, to volunteers precious, salt. At Mathura, the Assistant Magistrate is said to have snatched the national flag from a ten-year-old boy. The crowd that demanded the restoration of the flag thus illegally seized, is reported to have been mercilessly beaten back. That the flag was subsequently restored, betrayed a guilty conscience.

In Bengal there seems to have been only a few prosecutions and assaults about salt*, but unthinkable cruelties are said to have been practised in the act of snatching flags from the volunteers. Paddy fields are reported to have been burnt, eatables forcibly taken and a vegetable market in Gujarat to have been raided, because the dealers would not sell vegetables to officials. These acts have taken place in front of crowds who, for the sake of the Congress mandate, have submitted without retaliating.

I ask you to believe the accounts given by men pledged to truth. Repudiation, even by high officials, has, as in the Bardoli case, often proved false. Officials, I regret to have to say, have not hesitated to publish falsehoods even during the last five weeks.

মদের দোকানে পিকেটিং সম্বন্ধে এই চিঠিতে লিখিত হইয়াছে :—

Liquor dealers have assaulted pickets, admitted by an official to have been peaceful, and sold liquor in contravention of regulations. Officials have taken no notice, either of assaults or of illegal sales of liquor. As to assaults, though they are known to everybody, they take refuge under the plea that they have received no complaints.

চিঠিটিতে সত্যাগ্রহ এবং অবিমিশ্র অহিংসা সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে : —

I know the dangers attendant upon the method adopted by me. But the country is not likely to mistake my meaning. I say what I mean and think, and I have been saying for the last fifteen years in India and outside for twenty years more and repeat now that the only way to conquer violence is through non-violence, pure and undefiled. I have said also that every violent act, word and even thought interferes with the progress of non-violent action. If in spite of such repeated warnings, people will resort to violence, I must disown responsibility, save such as inevitably attaches to a human being for the acts of every other human being. But the question of responsibility apart, I dare not postpone action on any cause whatsoever, if non-violence is a force the seers of the world have claimed it to be, and if I am not to belie my own extensive experience of its working. But I would fain avoid a further step.

I would, therefore, ask you to remove the tax which so many of your illustrious countrymen have condemned in unmeasured terms; and which, as you could not have failed to observe, has evoked universal protest and resentment expressed in civil disobedience. You may condemn civil disobedience as much as you like. Will you prefer violent

* এবিষয়ে মহাত্মাজী বোধ হয় ঠিক খবর পান নাই।—প্রবাসীর সম্পাদক।

revolt to civil disobedience? If you say, as you have said, that civil disobedience must end in violence, history will pronounce the verdict that the British Government, not bearing, because not understanding non-violence, goaded human nature to violence which it could understand and deal with. But in spite of goading, I shall hope God will give the people of India wisdom and strength to withstand every temptation and provocation to violence.

মহাত্মা গান্ধীর এই চিঠি ষ্টেট্‌স্‌ম্যান প্রভৃতি কোন কোন ইংরেজদের কাগজে এবং ভারতীয় অনেক কাগজে মুদ্রিত হইয়াছে।

—

রংপুরের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান

সম্প্রতি আমাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের রংপুর শাখার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষ্যে সেখানে যাইতে হইয়াছিল। রংপুর পরিষদের নিজের বাড়ী আছে। তাহাতে অনেক প্রাচীন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং দগ্ধ মৃণ্ময় মূর্ত্তি ও অন্যান্য শিল্প দ্রব্য, পুরাতন মুদ্রিত কিছু পুস্তক ও পত্রিকা, হস্তলিখিত অনেক প্রাচীন পুঁথি, নানা শতাব্দীর পুরাতন মুদ্রা, প্রভৃতি রক্ষিত আছে। অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত পদার্থবিদ্যার মূল হস্তলিপি সংগ্রহ করিয়া পরিষদের গৃহে রাখা হইয়াছে। পরিষদ একটি উৎকৃষ্ট ত্রৈমাসিক পত্রিকা বাহির করেন, এবং পুরাতন পুঁথিও কিছু ছাপাইয়াছেন, অল্পবয়স্ক সাহিত্যিকেরা ইহাতে উৎসাহের সহিত যোগ দিলে এই প্রতিষ্ঠানটির কর্ম্মিষ্ঠতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং তাহা সর্ব্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়। রংপুরের মত ছোট সহরে এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান থাকা প্রশংসার বিষয়।

কারমাইকেল কলেজের বাড়ী দূর হইতে দেখিলাম। সেখানে গিয়া কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময় পাই নাই—রংপুরে ছত্রিশ ঘণ্টা মাত্র ছিলাম।

স্থানীয় মহিলাসমিতির শিল্পপ্রদর্শনী দেখিয়া প্রীত হইয়াছিলাম। আমাদের অন্তঃপুরিকাদের মধ্যে কিরূপ সৌন্দর্য্য-বোধ, পরিকল্পনাশক্তি, ও কারুদক্ষতা আছে, তাহা এইরূপ সব প্রদর্শনী দেখিলে বুঝা যায়। প্রদর্শনীতে কেবল যে প্রয়োজনীয় সৌখীন জিনিষ এবং ঘর সাজাইবার জিনিষই ছিল, তাহা নহে, নিত্য-ব্যবহার্য্য ছেলেমেয়েদের ও মহিলাদের জামা প্রভৃতিও ছিল। এই সকল জিনিষ প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয়ের বন্দোবস্ত করিলে অন্তঃপুরিকাদের ব্যক্তিগত আয়ের একটি উপায় হইতে পারে। এরূপ আয় কেবল যে দুঃস্থা মহিলাদেরই দরকার তাহা নহে। পিতা স্বামী পুত্রের উপার্জ্জনে বা সম্পত্তিতেই যাঁহারা সম্পৎশালিনী কিংবা যাঁহাদের নিজস্ব যথেষ্ট স্ত্রীধন আছে, তাঁহারাও উপার্জ্জন করিতে পারিলে নিজের শক্তির পরিচয় পাইয়া মনুষ্যত্বের গৌরব ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিবেন। উপার্জ্জিত অর্থের যেরূপ ইচ্ছা সদ্ব্যয় তাঁহারা করিতে পারেন।

রংপুরে গোবংশের উন্নতিকল্পে যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, তাহা দর্শনীয়। ভিন্ন প্রদেশের ভাল জাতির বৃষ এখানে রাখা হয়। গাভীও বিস্তর আছে। হালের এবং গাড়ীর গরু এবং দুগ্ধবতী গাভীর উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে, তাহার জন্য নানাবিধ পরীক্ষা এখানে চলিতেছে। জেলায় জেলায় এইরূপ গোবংশ উন্নতির পরীক্ষাক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত এবং বিশেষজ্ঞদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক। রংপুরের পরীক্ষাক্ষেত্রটি দ্বারা বেশ কাজ হইতেছে।

এই জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাপতি রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সৌজন্যপূর্ব্বক বোর্ডের খাদ্য পরীক্ষার গৃহ ও যন্ত্রাদি দেখাই-লেন। তখন ইহার কাজ আরম্ভ হয় নাই। বাংলা গবর্ন্মেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ কর্ম্মচারী সে দিন তৎসমুদয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সন্তোষজনক রিপোর্ট দিলে কাজ আরম্ভ হইবে। তাঁহারা আমার সম্মুখেই বলিলেন, যে, মফঃস্বলে এরূপ সুন্দর এবং যন্ত্রাদিতে সুসজ্জিত বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা এরূপ আশা করিয়া আসেন নাই। ইঁহাদের মধ্যে এক জন আমাকে বুঝাইয়া দিলেন, ঘৃতে ভেজাল, তৈলে ভেজাল কোন্ যন্ত্রের দ্বারা কিরূপে ধরা যাইবে। গব্য ঘৃতের সঙ্গে ভঁয়সা ঘী মিশাইলে তাহাও ধরা পড়িবে। এই

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারটির দ্বারা রংপুরবাসীদের খাঁটি খাদ্য-দ্রব্য পাইবার পক্ষে সাহায্য হইবে।

স্বরাজ্যলাভের চেষ্টা যাঁহারা রংপুরে করিয়া থাকেন, তাঁহাদের আশ্রমে প্রাতে আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। আমি স্বরাজ লাভ কেন আবশ্যক এবং আমরা যে তাহার যোগ্য, তদ্বিষয়ে কিছু বলিলাম। কোনও স্বাধীন দেশের লোকেই নিজেদের দেশের সব কাজ আদর্শের সম্পূর্ণ অনুযায়ীরূপে করিতে পারে না; আমরাও তাহা না করিতে পারি। তথাপি কেন আমাদের স্বরাজ পাওয়া আবশ্যক ও উচিত এবং আমাদের তাহার যোগ্যতা কিরূপ, তাহা আমি খুলিয়া বলিয়াছিলাম।

এই প্রতিষ্ঠানটির নিকটে শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা মহাশয়ের পরিচালিত ক্ষত্রিয় ব্যাঙ্ক ও অন্য ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠান আছে। স্বরাজ্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবার পর আমি উহা দেখিতে যাই। ইঁহারা অন্যান্য কাজের মধ্যে অত্যাচারীদের হস্ত হইতে নিগৃহীতা নারীদের উদ্ধারকল্পে বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাহা অপেক্ষাও সন্তোষের বিষয় এই, যে, কয়েকটি ঘটনায় দুর্ব্বৃত্ত লোকেরা অত্যা-চারের উপক্রম করিতে গিয়া কয়েক নারীর দ্বারা হত বা গুরুতররূপে আহত হইয়াছিল। বর্ম্মা মহাশয়ের ক্ষত্রিয় প্রতিষ্ঠান, আদালতে এই বীরাঙ্গনারা অভিযুক্ত হইলে, তাহাদের পক্ষ সমর্থনের বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। অতঃপর আমি স্থানীয় ব্রাহ্মমন্দির দর্শন করিতে যাই। সেখানে সমবেত মহিলা ও ভদ্রলোকদের সহিত ব্রহ্মো-পাসনা করি।

মহিলা সমিতির শিল্প প্রদর্শনী যখন দেখিতে গিয়া-ছিলাম, তখন সেখানে মহিলারা আমার সম্বন্ধে যাহা পড়িলেন বলিলেন, তাহা উপলক্ষ্য করিয়া আমাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল। প্রধানতঃ পরিষদের কাজের জন্য রংপুর গিয়াছিলাম। তাহার বার্ষিক অধিবেশনে আমি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করি। সামাজিক সম্মেলনের আগে লাঠি খেলা প্রভৃতি দেখান হয়। সম্মেলনে ছেলেরা আবৃত্তি করে ও পুরস্কার বিতরিত হয়। কিছু সঙ্গীত হয়। শেষে আমি কিছু বলি।

বরিশালে বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন

রংপুর হইতে আসিবার পর বঙ্গীয় শিক্ষক সম্মেলনে সভাপতির কাজ করিবার নিমিত্ত বরিশাল যাইতে হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের স্মৃতিপূত এই সহরটির সব প্রতিষ্ঠান দেখিবার সময় পাই নাই। দত্ত মহাশয়ের বাসভবনের ফটকের একটি স্তম্ভে মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে ইংরেজীতে লেখা আছে, যে, তিনি সেই বাড়ীতে বাস করিতেন। এবিষয়ে আমাদের অনুরোধ ইংরেজীতে যখন লেখা হইয়াছে, তখন তাহা থাক্, কিন্তু বাংলা ভাষায় ও বাংলা অক্ষরেও সেই কথাটি লিখিত হউক।

প্রাতে বরিশাল পৌঁছিবামাত্র আমাকে সহরের নদীতটবর্ত্তী রাস্তা দিয়া লইয়া যাওয়া হইল এবং সর্ব্ব-সাধারণের ভ্রমণোদ্যান দেখান হইল। এখন নদী রাস্তা হইতে দূরে গিয়া পড়ায় এই স্থানটির সৌন্দর্য্য আগেকার মত নাই। অতঃপর যথাস্থানে পৌঁছিয়া জলযোগের পর সহর হইতে কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী মাধবপাশা নামক স্থান দেখিতে গেলাম। রবীন্দ্রনাথের "বৌঠাকুরাণীর হাট" চন্দ্রদ্বীপের যে রাজবংশের আখ্যায়িকা লইয়া রচিত, তাহার বংশধরেরা এখনও এখানে আছেন। আগেকার শ্রীসম্পদ নাই। তাহারা পুরাতন প্রাসাদাদির ধ্বংসাবশেষের নিকটে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। রাজবংশের বয়োজ্যেষ্ঠ এখন যিনি আছেন, আমাদের মাধবপাশা দর্শনের সময় তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন। তথাপি আমাদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি সৌজন্য সহকারে আমা-দিগকে ধ্বংসাবশেষের প্রাসাদের দেবমন্দির, রাজকোষ, হস্তিশালা প্রভৃতি কোথায় কি ছিল দেখাইলেন। তিনি চন্দ্রদ্বীপের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহার হস্ত-লিপি দেখাইলেন। চণ্ডীমণ্ডপের দেওয়ালের ভিতরের পিঠে কোন কোন স্থানে নানা রঙের ছবির রং এখনও ফিকা হইয়া যায় নাই। বরিশাল হইতে মাধবপাশা যাইবার পথে রাজবংশের খনিত একটি বড় দীঘি আছে। অন্য একটি দীঘির পাড়ে কয়েক রাজা ও রাণীর সমাধি দেখিলাম।

বরিশালে মোটামুটি ৬০ ঘণ্টা ছিলাম। তাহার মধ্যে আহার নিদ্রাদি বাদে বেশী সময় দিতে হইয়াছিল দুই দিন শিক্ষক সম্মেলনের কাজে। একদিন অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন কলেজ তাহার অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইলেন। কলেজ তখন বন্ধ ছিল। ঘর বাড়ী লাইব্রেরী, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারগুলি, ছাত্রদের ব্যায়ামশালা ইত্যাদি দেখিলাম। কলেজের হাতা বেশ বড়। কলেজের অনেক গৃহের মেজে ভরাট করিবার জন্য মাটি লওয়াতেই হাতার মধ্যে কয়েকটি পুকুর কাটা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে ছাত্রনিবাসের ছাত্রদের স্নান সন্তরণ চলে। এই কলেজে ছাত্রীদিগকেও ভর্ত্তি করা হয়। যত দূর মনে পড়িতেছে, এখন ছাত্রী-সংখ্যা পঞ্চাশ। অধিকাংশ হিন্দু পরিবারের মেয়ে।

অনুরুদ্ধ হইয়া এক দিন এখানকার ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করি। উপাসনার সময় স্থানীয় উপাসক-মণ্ডলীর পুরুষ ও মহিলা সভ্যেরা ছাড়া শিক্ষক সম্মেলনের জন্য আগত নানা স্থানের কতকগুলি শিক্ষকও উপস্থিত ছিলেন।

"বাণীপীঠ" নামক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে বরিশালের মিউনিসিপাল কমিশনারগণ, স্বরাজ সেবক বৃন্দ, সাহিত্য পরিষদ এবং হিন্দুসভা আমার প্রতি প্রীতি প্রদর্শনার্থ চারিটি অভিনন্দনপত্র পাঠ করেন। তাহার উত্তরে আমাকে বক্তৃতা করিতে হয়। সভাস্থলে অনেক মহিলাও উপস্থিত ছিলেন।

আসিবার দিন ষ্টীমারে উঠিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ঐ বিদ্যালয়ে একটি বক্তৃতা করি। বক্তৃতার নাম দিয়াছিলাম "ছাত্রদের সামাজিক কর্ত্তব্য।" এই নামটি বোধ হয় সুনির্ব্বাচিত হয় নাই। অনেকেই মনে করিয়া থাকিবেন, আমি সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে কিছু বলিব। সম্ভবতঃ সেই কারণে ছাত্র বেশী আসেন নাই, বয়স্ক লোকদেরও যেরূপ ভীড় ঐ বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রথম দিনের সভায় হইয়াছিল এই বক্তৃতায় তেমন হয় নাই। "সামাজিক কর্ত্তব্য" আমি সামাজিক জীবদের কর্ত্তব্য অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলাম। তাহার মধ্যে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজসংস্কার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্তই আসে।

শিক্ষক সম্মেলন উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইয়াছিল তাহা খুব শিক্ষাপ্রদ হইয়াছিল। দেশী কাপড় ও অন্যান্য জিনিষ অনেক ছিল। তদ্ভিন্ন স্বাস্থ্যতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য এবং রোগমুক্ত থাকিবার ও স্বাস্থ্যের উন্নতি করিবার উপায় জানাইবার নিমিত্ত যে-সব ছবি প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা। আর কতকগুলি চিত্র ও প্রতিকৃতি দ্বারা কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ধন প্রভৃতি বিষয়ে অন্য কোন কোন দেশের সহিত ভারতবর্ষের তুলনা করিয়া ভারতের দুর্দ্দশা বুঝান হইয়াছিল।

এখন শিক্ষক সম্মেলন সম্বন্ধে কিছু বলি।

নানাস্থান হইতে কয়েক শত শিক্ষক আসিয়াছিলেন এবং সম্মেলনের কাজ সুনির্ব্বাহিত হইয়াছিল। আমাদের দেশে বালিকা বিদ্যালয়ের ও শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা কম। তাহা হইলেও সম্মেলনে পঁচিশজন শিক্ষয়িত্রী উপস্থিত ছিলেন শুনিয়াছি। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ সারবান্ হইয়াছিল। আমি কোন অভিভাষণ লিখিয়া লইয়া যাইতে পারি নাই। মৌখিক কিছু বলিয়াছিলাম। তাহার চুম্বক শিক্ষকদিগের মাসিক পত্রিকায় বাহির হইবার কথা। সম্মেলনে অনেকগুলি প্রয়োজনীয় প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তৎসমুদয়ও উক্ত মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। একটি প্রস্তাব এই ছিল, যে, এখনকার মত ১০টা হইতে ৪টা ইস্কুল না চালাইয়া প্রাতে ও অপরাহ্নে ইস্কুল চালাইলে সুবিধা অসুবিধা, ফলাফল কি হইবে, তৎসম্বন্ধে শিক্ষা বিষয়ে অভিজ্ঞ শিক্ষাতত্ত্বজ্ঞদিগের এবং স্বাস্থ্যতত্ত্বজ্ঞদিগের মত সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত একটি কমিটি নিযুক্ত করা হউক। এইরূপ মত সংগ্রহ করা বিশেষ আবশ্যক। সকলের বা অধিকাংশের মতে যদি সকাল বিকাল ইস্কুল বসান ভাল হয়, তাহা হইলেও ইংরেজ-প্রবর্ত্তিত রীতির ব্যতিক্রম করিতে অনেকে সমর্থ না-হইতে পারেন; তথাপি শ্রেষ্ঠ কি তাহা জানা আবশ্যক। কোন কোন বিদ্যালয় এখন সকাল বিকাল বসিয়া থাকে।

সম্মেলনের কাজ আপাততঃ একরকম বন্ধ রাখিবার জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপিত ও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইহার সমর্থকদের মতে দেশের বর্ত্তমান স্বাধীনতালাভ-প্রচেষ্টার দিনে শিক্ষকদের তাহাতেই যোগ দেওয়া উচিত, বিদ্যালয় সকল বন্ধ রাখা উচিত, সুতরাং শিক্ষক সম্মেলনের কাজও স্থগিত রাখা উচিত। অবশ্য যে-সব শিক্ষক এই প্রচেষ্টায় যোগ দিতে চান, তাঁহাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা কাহারও উচিত নহে। কিন্তু যে-সব দেশ সশস্ত্র যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়, তাহারাও সাধারণতঃ স্কুলগুলি বন্ধ করিয়া দেয় না। মহাত্মা গান্ধীও গুজরাট বিদ্যাপীঠের স্কুলবিভাগ বন্ধ করেন নাই। বিদ্যালয়গুলি খোলা রাখিতে হইবে। সুতরাং তাহার শিক্ষক চাই। শিক্ষক থাকিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য এবং অভাব-অভিযোগের আলোচনার জন্য সম্মেলনও চাই।

সম্মেলনে কতকগুলি প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল। মহিলাদের মধ্যে একমাত্র কুমারী শান্তি ঘোষ, বি-এ, প্রবন্ধ পড়িয়াছিলেন। তাহা সুচিন্তিত, সুলিখিত ও সুপঠিত হইয়াছিল। সব কথা নির্ভীক ভাবে অথচ ওজন করিয়া বলা হইয়াছিল।

শিক্ষকমহাশয়দিগকে ছাত্রেরা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, সড়কিখেলা প্রভৃতি দেখাইয়াছিল।

—

প্রেস ও সংবাদপত্র উপ-আইন

ইংরেজীতে যাহাকে অর্ডিন্যান্স বলে, বাংলায় তাহার কোন প্রতিশব্দ নাই। উহা এক প্রকার উপ-আইন। ঐরূপ উপ-আইন প্রণয়নের জন্য ব্যবস্থাপক সভার প্রয়োজন নাই; বড়লাট স্বেচ্ছা অনুসারে তাহা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন। সম্প্রতি তিনি উপর্য্যুপরি তিনটি উপ-আইন জারী করিয়াছেন। তাহাতে এই জানা কথাটা স্পষ্টতর হইয়াছে, যে, ভারতবর্ষে গণতন্ত্র যতটুকু প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা নামে মাত্র; কার্য্যতঃ আমাদের যে-কোন অধিকার বড়লাটের ইচ্ছায় লুপ্ত হইতে পারে। সুতরাং উপ-আইনের সৃষ্টি তিনটিতেই না থামিতে পারে। তিনটির মধ্যে একটি প্রেস ও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয়।

এই উপ-আইনে উল্লিখিত "অপরাধের" অধিকাংশ স্থায়ী পূর্ব্বতন কোন-না-কোন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় ছিল। তদ্রূপ অপরাধ দমনের জন্য নূতন ব্যবস্থার দরকার ছিল না। কিন্তু আগেকার আইনগুলি অনুসারে কাহাকেও শাস্তি দিতে হইলে তাহাতে বিচারের প্রয়োজন হইত। সেটা একটা অসুবিধা। বিচার করিয়া শাস্তি দিতে গেলে বিলম্ব হয়, ব্যয়ও হয়। কচিৎ কোন আসামী বিচারকের ন্যায়পরায়ণতা, খেয়াল বা ভ্রমে খালাসও পাইয়া যাইতে পারে। উপ-আইনে এরূপ কোন অসুবিধার সম্ভাবনা নাই। তদ্ভিন্ন সাধারণ আইন ও উপ-আইনের কার্য্যকারিতায় আর একটি প্রভেদ এই আছে, যে, সাধারণ আইনে কোন প্রেসের বা সংবাদপত্রের (গবন্মেণ্টের মতে) অনিষ্টকারিতা সম্পূর্ণ নষ্ট করা সময়সাপেক্ষ ও ব্যয়সাপেক্ষ। কোন অপরাধের জন্য কোন প্রিণ্টার বা সম্পাদক দণ্ডিত হইলে অন্য প্রিণ্টার বা সম্পাদক তাহার স্থান অধিকার করিতে পারে—ছাপাখানাটা বা কাগজটা শীঘ্র বা বিলম্বে উঠিয়া না যাইতে পারে। কিন্তু উপ-আইন অনুসারে "অপরাধী" ছাপাখানা ও সংবাদপত্র সরকার সমূলে বিনা ব্যয়ে বিনষ্ট করিতে ত পারেনই, অধিকন্তু আমানতি টাকাটা গবন্মেণ্টের থাকিয়া যায়, এবং বাজেয়াপ্ত ছাপাখানা বিক্রী করিয়াও অনেক আয় হইতে পারে। ভারতসরকার এই প্রকার উপরি পাওনার জন্য এই উপ-আইনটি জারী করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিশ্বাস নহে। আমরা কেবল সাধারণ আইন এবং আলোচ্য উপ-আইনটির কার্য্যকারিতা, সুবিধা অসুবিধা এবং লাভ-অলাভের প্রভেদ দেখাইতেছি।

এই উপ-আইন দ্বারা সংবাদপত্রের ও ছাপাখানার স্বাধীনতা বিনষ্ট হইল। ইহার অর্থ এ নয়, যে, কোন খবরের কাগজ গবন্মেণ্ট সম্বন্ধে বা অন্য কোন বিষয়ে কিছু বলিতে পারিবে না বা বলিবে না; অর্থ এই, যে, যে যাহা লিখিবে ছাপিবে তাহার জন্য শাস্তি পাওয়া না-পাওয়া সম্পূর্ণরূপে সরকারী লোকবিশেষের মর্জ্জি খেয়াল বা অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইবে। শাস্তি না-পাইবার অধিকার আমাদের থাকিল না। যদি শাস্তি

না পাই, তাহা কর্ত্তাদের দয়া, অনবধানতা বা অজ্ঞতা বশতঃ, বুঝিতে হইবে। এরূপ অবস্থা সম্মানের অবস্থা নহে। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য কাজ পূর্ণ-মাত্রায় করা অসম্ভব; অল্প যাহা করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতেও আশঙ্কা অনেক, বিপদ বিস্তর। সাধারণ আইন অনুসারেও বিপদ ছিল, কিন্তু হঠাৎ সত্বর লুপ্ত হইবার আশঙ্কা ছিল না।

মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, যে, শাসক ও সর্ব্বসাধারণ উভয়ের পক্ষেই আবশ্যক, তাহা খৃষ্টীয় এই বিংশ শতাব্দীতে খুলিয়া বলা অনাবশ্যক। এ কথাটার উল্লেখ করিতেছি এই জন্য, যে, প্রভু ইংরেজরা মনে করিতেছেন যেন সংবাদপত্র-সমূহকে অসঙ্কোচে সব কথা বলিতে দেওয়ায় তাহাদের কোনই লাভ নাই।

উপ-আইনটার জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকম "অপরাধের" মধ্যে নৈতিক প্রভেদ লুপ্ত হইল। কোন কাগজ যদি কাহাকেও খুন করিতে উত্তেজিত করে, তাহার যে শাস্তি, কোন কাগজ যদি কাহাকেও বিশেষ কোন একটা অন্যায় ট্যাক্স না-দিতে বলে কিংবা অত্যাচারী কোন সরকারী লোককে জিনিষ বিক্রী না-করিতে বলে, তাহারও সেই শাস্তি। অথচ শেষোক্ত "অপরাধ" দুটাতে নৈতিক কোন দোষ নাই।

অপরাধের মাত্রা ও শ্রেণীভেদে দণ্ডের তারতম্য হয়। উপ-আইনটিতে কিন্তু সেরূপ তারতম্য নাই। উপরে লিখিত তথাকথিত কোন "অপরাধের" জন্য কাহারও লাখ টাকার প্রেস বাজেয়াপ্ত হইবে, আবার খুন করিতে উত্তেজিত করা-রূপ অতি-গর্হিত অপরাধের জন্য হয় ত অন্য যাহার প্রেস বাজেয়াপ্ত হইবে তাহার দাম কয়েক শত টাকা মাত্র হইতে পারে।

স্বয়ং বড়লাট বা অন্য কোন লাট যদি প্রত্যেক সংবাদ-পত্রের নথি বা প্রত্যেক প্রেসে মুদ্রিত জিনিষের স্তূপ দেখিতে পারিতেন, তাহা হইলেও এরূপ উপ-আইনের অপব্যবহার হইত; কারণ, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাইয়া, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিলে, কখনও সুবিচার হইতে পারে না। কিন্তু উপ-আইন অনুসারে শাস্তি যদিও প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্টের নামে দেওয়া হইবে, তথাপি বাস্তবিক শাস্তি দেওয়া হইবে কোন কোন অধস্তন কর্ম্মচারীদের মত অনুসারে। সেই সব কর্ম্মচারীরা স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন এবং তাহাদের সকলের জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা ন্যায়পরায়ণতা সমান নহে। এই কারণে এই উপ-আইনের প্রয়োগে বিস্তর অসাম্য দেখা যাইবে। অবশ্য সাধারণ আইনের প্রয়োগেও কতকটা এরূপ হয়। কিন্তু সাধারণ আইন অনুসারে প্রকাশ্য বিচার হয় বলিয়া লোকে অভি-যোগের ও তদ্বিষয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির বক্তব্য জানিতে পারিয়া অবিচারের সমালোচনা করিতে পারে। তাহাতে খামখেয়ালি কিছু দমন হয়। উপ-আইনের প্রয়োগের কারণ প্রায় আঁধারে থাকিয়া যাইবে বলিয়া সম্যক্-জ্ঞান-প্রসূত সমালোচনা হইবে না, এবং তাহার প্রভাবও পূর্ব্বোক্ত অধস্তন কর্ম্মচারীরা অনুভব করিবে না।

অসামরিক আইন লঙ্ঘন (civil disobedience) বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (passive resistance) সকল সভ্যদেশে জনসাধারণের দুঃখ দূরীকরণের এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার বৃদ্ধির একটি বৈধ (constitutional) উপায় বলিয়া স্বীকৃত। ভারতীয়েরা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দক্ষিণ-আফ্রিকায় যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ প্রচেষ্টা চালাইয়া-ছিল, বড়লাট থাকাকালে লর্ড হার্ডিং তাহা বৈধ (constitutional) বলিয়াছিলেন। আলোচ্য উপ-আইনে কোন কাগজ কাহাকেও এরূপ প্রচেষ্টায় যোগ দিতে বলিলে তাহা একটা অপরাধ হইবে। অবশ্য, যিনি আইন অমান্য করিবেন, বা ট্যাক্স না দিবেন, তিনি এরূপ অবাধ্যতার ও ট্যাক্স না-দেওয়ার ফল ভোগ করিবেন। কিন্তু কোন আইনের বা ট্যাক্সের বিরুদ্ধে অসামরিক নিরুপদ্রব বিদ্রোহ চালানর সমর্থন, বা তাহাতে লোক-দিগকে উৎসাহিত করা সাধারণ আইনে দণ্ডনীয় ছিল না। এখন মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রের পক্ষে তাহা দণ্ডনীয় হইল। এই প্রকারে, অন্যান্য সভ্যদেশের লোকদের যে একটি মূল্যবান বৈধ অধিকার আছে, ভারতীয়েরা তাহা হইতে বঞ্চিত হইল।

তাহারা আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভের জন্য যাহাই করুক,

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের তাহা চক্ষুশূল হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের ভাবিয়া দেখা উচিত, যে, আলোচ্য উপ-আইন সশস্ত্র রাজদ্রোহ, সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘনকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়াছে। তাঁহাদের চক্ষে দুটাই কি নৈতিক হিসাবে সমান? অথবা এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করাই হয় ত ভাল। তাঁহারা বলিতে পারেন, "সশস্ত্র বিদ্রোহ দমন করা আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন দমন করা তত সহজ নহে; সুতরাং শেষোক্তটাই গুরুতর অপরাধ।

—

সাংবাদিকদের কন্‌ফারেন্স

গত রবিবার ২৮শে বৈশাখ কলিকাতার ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশুন হলে প্রেসের ও সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী, পরিচালক ও কর্ম্মচারীদের যে কন্‌ফারেন্স হয়, তাহার কিছু বিকৃত রিপোর্ট কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছে। সভায় দুটি প্রস্তাব সকলের সম্মতিক্রমে ধার্য্য হয়। প্রথমটিতে প্রেস উপ-আইনকে গর্হিত ও নিন্দার্হ বলা হয়, এবং উহা জারী হইতে-না-হইতেই, যে, কতকগুলি কাগজের কাছে টাকা আমানত চাওয়া হয়, তাহাকে যথেচ্ছাচার-প্রসূত (arbitrary) এবং পূর্ব্বসঙ্কল্পানুযায়ী (pre-meditated) বলা হয়। যে সকল কাগজের কাছে আমানত চাওয়ায় তাঁহারা টাকা না দিয়া কাগজ বন্ধ রাখিয়াছেন, দ্বিতীয় প্রস্তাবটির দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করা হয়। তাহার পর কর্ম্মচারীদের একজন প্রতিনিধি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে চান, যে, যাঁহারা কাগজ বন্ধ রাখিয়াছেন তাঁহারা যেন বন্ধ থাকার সময়ের বেতন কর্ম্মচারীদিগকে দেন। কাগজ অতঃপর বন্ধ রাখা হইবে কিনা, সেইরূপ প্রস্তাব বিবেচিত হইয়া গেলে এই প্রস্তাবটি বিবেচিত হইবে, ইহা ঠিক্ হওয়ায় অতঃপর একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যে, দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সর্ব্বসাধারণের সত্য সংবাদ পাইবার ঔৎসুক্য বিবেচনা করিয়া অতঃপর যাঁহারা কাগজ প্রকাশ করিতে চান তাঁহাদিগকে প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা দেওয়া হউক; পরে তাঁহারা অবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে অন্যরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন। এই প্রস্তাব সংশোধন করিয়া অন্য এই একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, যে, উহার বিবেচনা সাতদিন স্থগিত থাকুক এবং ইতিমধ্যে কংগ্রেসের অস্থায়ী প্রেসিডেণ্ট পণ্ডিত মোতিলাল নেহরুকে সমস্ত ভারতবর্ষের সাংবাদিকদিগের একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করিতে বলা হউক। এই সংশোধক প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি যখন এক এক জনের ভোট লইয়া লিপিবদ্ধ করিতেছিলাম এবং যখন উহার সপক্ষে ৯৯ এবং বিপক্ষে ২২ ভোট লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তখন এরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিলাম, যে, সভাভঙ্গ করিতে বাধ্য হইলাম।

কথাকাটাকাটি, কথায় ব্যক্তিগত আক্রমণ, একসঙ্গে অনেক লোকের চীৎকার, ইত্যাদি বিশৃঙ্খলা প্রায় প্রথম হইতেই মধ্যে মধ্যে হইতেছিল। আমার

সাইকেলে মহাত্মা গান্ধী

প্রতি দোষারোপও হইয়াছিল। আমি বার বার সকলকে শান্তভাবে কাজ চালাইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। মধ্যে মধ্যে দীর্ঘকাল শান্তভাবে কাজ চলিয়াও ছিল। সভা অধিকাংশ সময় সুশৃঙ্খলই ছিল। উচ্ছৃঙ্খলতার

মাত্রা বাড়িয়া উঠায় আমি সভা ভঙ্গ করি। কিন্তু আমি যতক্ষণ হলে ছিলাম ও সভাপতি ছিলাম, ততক্ষণ কেহ কাহাকেও প্রহার করিয়াছে, এরূপ দেখি নাই। আমি সভাভঙ্গ করিবার পর ও হল ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার পর মারামারি হইয়াছিল শুনিয়াছি। কিন্তু কেহ গুরুতর আঘাত পাইয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। মারামারি যতটুকু হইয়াছে, তাহা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের বিষয়।

এই সভা আহ্বান আদিতে প্রচলিত নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালিত হইয়াছিল বলিয়া আমি মনে করি না। সভাস্থলে তাহা আমি বলিয়াও ছিলাম। কিন্তু আমাকে সভাপতি হইতে বাধ্য করায় আমি পোষ্টকার্ডে সভার মুদ্রিত নোটিস্ অনুসারে যথাসাধ্য কাজ চালাইতে এবং কংগ্রেস, অকংগ্রেস ও দলাদলির বাহিরের সব কাগজের পক্ষের সব কথা বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।

লেখকদিগের প্রতি

সঙ্গে উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট না থাকিলে প্রবন্ধাদি ফেরৎ না দেওয়াই আমাদের নিয়ম। তবুও এপর্য্যন্ত আমরা ডাকটিকিট না থাকিলেও প্রবন্ধ ও গল্প নিজ ব্যয়েই ফেরৎ দিয়া আসিয়াছি। ভবিষ্যতে আর তাহা করা সম্ভব হইবে না। সেজন্য যে-সকল লেখক তাঁহাদের রচনা ফেরৎ চান তাঁহারা যেন পাণ্ডুলিপির সঙ্গে উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট পাঠাইতে না ভোলেন।

ভ্রম সংশোধন

বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে শ্রীকামিনী রায় লিখিত "কৃষ্ণভাবিনী নারীশিক্ষা-মন্দির" প্রবন্ধে একটি বর্ণাশুদ্ধি আছে।—

পৃঃ	পাটী	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৪১	২	১১	ধাবীনতা	শালীনতা

আব্বাস তায়েবজী মহাত্মা গান্ধীর পর গুজরাটে আইন অমান্য আন্দোলনে ইঁহারই নেতা হইবার কথা ছিল কিন্তু নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি উনষাট জন স্বেচ্ছাসেবকসহ গ্রেপ্তার হইয়াছেন।

পুরস্কার প্রতিযোগিতা

প্রবাসীর গ্রাহকদের বিবেচনায় ১৩৩৬ সনে প্রকাশিত সমুদয় মৌলিক ছোট গল্পের মধ্যে যে তিনটি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে ও ঐ বৎসরে প্রকাশিত ভারতীয় চিত্রকলা রীতিতে আধুনিক চিত্রকর কর্ত্তৃক অঙ্কিত সমুদয় ত্রিবর্ণে মুদ্রিত চিত্রের মধ্যে যেটি পুরস্কার-যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে, তাহাদের নাম ও ভোট সংখ্যা নিম্নে বিজ্ঞাপিত হইল। ইহাদের লেখকগণ ও চিত্রকর যথানির্দ্দিষ্ট পুরস্কার প্রবাসী আপিসে আবেদন করিলেই পাইবেন।

আমাদের লেখক ও পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া স্মরণ রাখিবেন যে, পুরস্কার বিতরণ প্রবাসীর গ্রাহকগণের দ্বারা হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ইতিপূর্ব্বে ছোট গল্প বা চিত্রের জন্য এই মূল্যের পুরস্কার কখনও দেওয়া হয় নাই। এই পুরস্কার প্রবর্ত্তনের সময়ে আমরা আশা করিয়াছিলাম, যে, ইহার দ্বারা বাংলা দেশের কথা-সাহিত্য ও চিত্রকলার যথার্থ মূল্য নিরূপণ হউক আর নাই হউক, অন্ততঃ আমাদের দেশের শিক্ষিত জন-সাধারণের সাহিত্যিক রুচির একটা পরিচয় পাওয়া যাইবে। আমাদের এ আশা সফল হয় নাই। আমাদের বহুসংখ্যক গ্রাহকের মধ্যে মাত্র সাতাত্তর জন এই পুরস্কার প্রতিযোগিতায় ভোট দিয়াছেন। এই মুষ্টিমেয় ভোটের উপরই আমাদিগকে পুরস্কার বিতরণ করিতে হইতেছে। ইহাতে আমাদের প্রতিশ্রুতিরক্ষা হইল বটে, কিন্তু পাঠকদের সাহিত্য-প্রীতি বা সাহিত্যিক বিচারের কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

গল্পপ্রতিযোগিতার ফল

পুরস্কার	গল্পের নাম	লেখক	ভোটসংখ্যা
১ম পুরস্কার ২০০৲	গড্ডলিকা	পরশুরাম	১৩
২য় পুরস্কার ১৫০৲	রাণুর প্রথমভাগ	শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	১৩
৩য় পুরস্কার ১০০৲	চাপা আগুন	শ্রীমাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৪

চিত্রপ্রতিযোগিতার ফল

পুরস্কার	চিত্রের নাম	চিত্রকর	ভোটসংখ্যা
১০০৲	আলো ও আঁধার	এস-কে-ধর	২০

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

১২০।২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাপুজী

শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
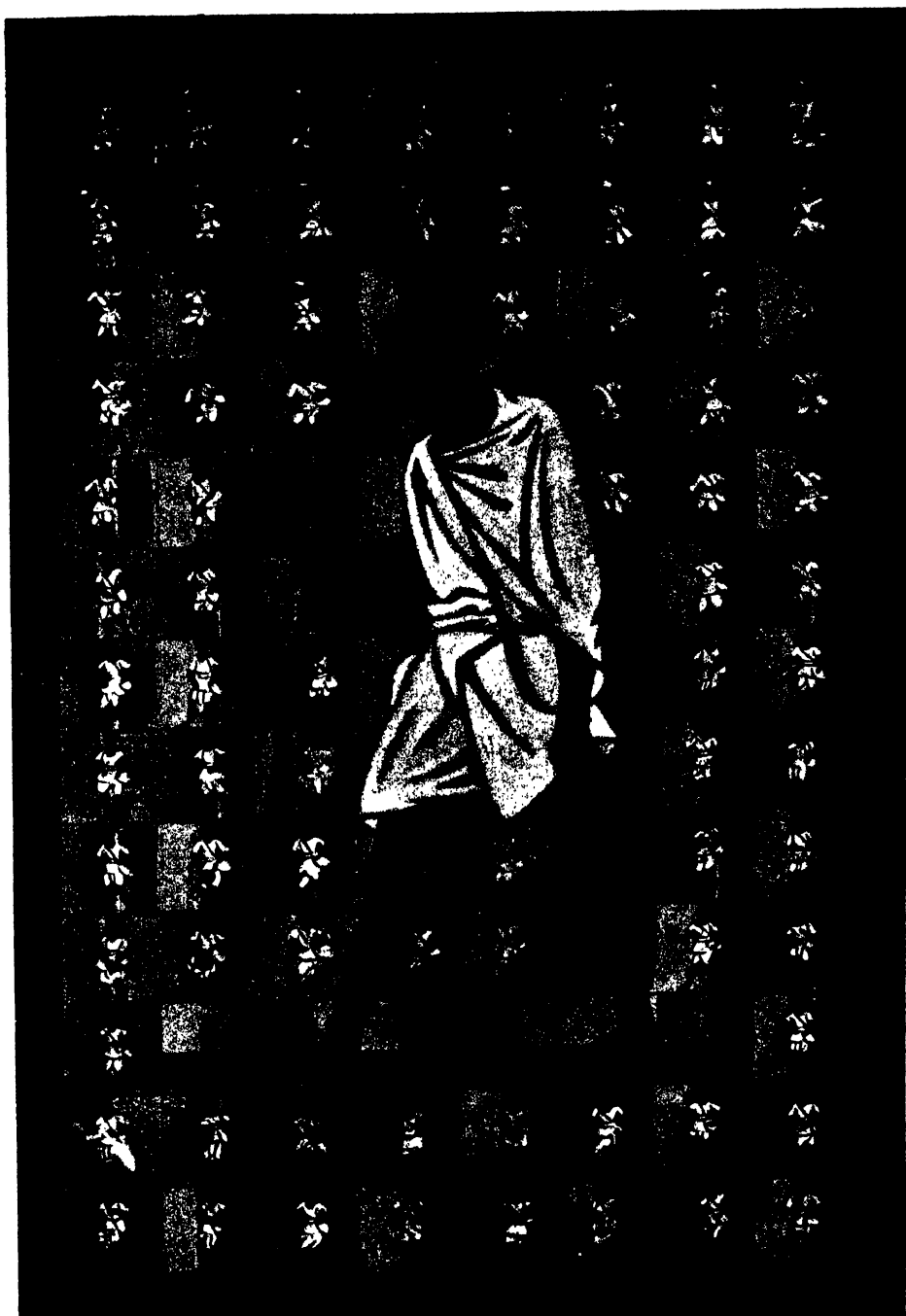
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৩৭

৩য় সংখ্যা

জীবের নিয়তি

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বেদান্তরত্ন, এম-এ

জীবের উৎপত্তি ও নিয়তির নির্দ্দেশ করিয়া কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সরল ভাষায় বলিয়াছেন :—

Man, who is from God sent forth
Doth yet again to God return.

ইহা এ দেশের সেই প্রাচীন কথা—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উপনিষদ্, ৩।১।১

অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি, ব্রহ্মদ্বারা জীবের স্থিতি এবং চরমে ব্রহ্মেই জীবের বিলয়। এক কথায়, জীবের সম্পর্কে ব্রহ্মই "প্রভবঃ, প্রলয়ঃ, স্থানম্।"

মুণ্ডক উপনিষদ্ উপমার সাহায্যে এ বিষয় বিশদ করিয়াছেন :—

যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে স্বরূপাঃ।
তথাক্ষরাদ্ বিবিধাঃ সোম্য ! ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।—মুণ্ডক, ২।১।১
[ভাবাঃ = জীবাঃ—শঙ্কর]

"যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্যরূপ বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ সেই অক্ষর পুরুষ (ব্রহ্ম) হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।"*

জীব যখন ব্রহ্ম হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে এবং তাঁহাতেই নিবৃত্ত হইবে, তখন ব্রহ্মকে জীবের স্বধাম বলা অসঙ্গত নহে। কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ তাহাই বলিয়াছেন—

But trailing clouds of glory
do we come
From God who is our home.
--*Ode on the Intimations of Immortality.*

ব্রহ্মলোক যদি আমাদের 'মুলুক' হয়, তবে এখানে আমরা প্রবাসী ;—আমরা 'দীর্ঘজীবনপথযাত্রী' পান্থ এবং এ জগৎটা পান্থনিবাস (সুফি সাধকদিগের ভাষায় caravan-sarai)—আমরা স্বরূপতঃ অমৃতের পুত্র (শৃণ্বন্তু সর্ব্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ)—আত্মবিস্মৃত হইয়া সংসারে

---

* এই মর্ম্মে জে কৃষ্ণমূর্ত্তি তাঁহার *By What Authority* পুস্তিকায় লিখিয়াছেন :—Out of that flame came many sparks, which eventually rejoin the flame. তাঁহার মতে জীবের নিয়তি কি ? To start as the spark of a flame, to gather experience and eventually to rejoin the flame.

অজ্ঞাতবাস করিতেছি। কিন্তু তথাপি সেই 'সকৃৎ-বিভাত' ব্রহ্মলোকের কথা সময়ে সময়ে স্মৃতির অতল হইতে উত্থিত হইয়া আমাদের উন্মনা করে ; তখন সেই 'প্রত্ন ওকঃ' (Ancient Home-এ) ফিরিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া উঠি। এই ভাব লক্ষ্য করিয়া একজন পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন যে, জীবের সমস্ত জীবন-চেষ্টার মূলে 'Getting back to God'—ব্রহ্মসাযুজ্যের জন্য অশ্রান্ত প্রযত্ন। জীবের মধ্যে যে অদম্য ব্রহ্মক্ষুধা (যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Hunger for the Absolute বলিয়াছেন)—বিত্তের দ্বারা, যশঃ মান গৌরব পদ সম্পদ্ দ্বারা সে ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় না। চাতক পক্ষী 'ফটিক' জল ব্যতীত অন্য জলে তৃপ্ত হয় কি ?

সেইজন্য বৈদিক ঋষি বলিয়াছেন 'ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ।' যাজ্ঞবল্ক্য স্বীয় পত্নী মৈত্রেয়ীকে বহু বিত্তের অধিকারিণী করিতে চাহিলে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—'স্বামিন্, যদি আমার পক্ষে সমস্ত পৃথিবী বিত্তপূর্ণা হয়, তদ্দ্বারা আমি কি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিব ?' উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন—'অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন।' তখন মৈত্রেয়ী বলিলেন, 'যেনাহং নামৃতাস্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।' ইহাই জীবের চিরন্তন উত্তর। যদ্দ্বারা সে অমৃতত্ব লাভ না করিবে, তাহার ততঃ কিম ?—সে তুচ্ছ লাভ, লাভ নহে, ক্ষতি। কারণ, অমৃতের পুত্র সে চিরদিনই অমৃতপিপাসী। আর সেই অমৃত পুরুষ সুদূর স্বর্গে নহে, তাহারই অন্তরে। তিনি 'হৃদি অয়ং'—নিউম্যানের ভাষায় Closer than our hands and feet। সেইজন্যই বোধ হয় মানুষ নিপট নাস্তিক হইতে পারে না। হয় আস্তিক হয়, না হয় বড় জোর মাস্তিক হয়,—Atheist হইতে পারে না, বড় জোর Agnostic হয়। যে হেতু সেই হৃদিস্থিত হৃষীকেশের সহিত তাহার আন্তরিক সংযোগ ;—ঋগ্‌বেদের কথায়—'দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া'—অর্থাৎ এই দেহপুরে জীব পুরঞ্জনরূপে অবস্থিত, কিন্তু সেই নিরঞ্জন তাহার সত্য সখা।

এইভাবে উপনিষদ্ সংসারকে 'ব্রহ্মচক্র' বলিয়াছেন—তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে—শ্বেত, ১।৬ হংস অর্থে জীব। চক্রের আরম্ভ-অবসান নাই—এবং যে হেতু 'Evolution is a complete circle,' সেইজন্য সংসারকে ব্রহ্মচক্র বলা বেশ সঙ্গত। এই সংসার-চক্রে জীবরূপী হংস ভ্রমণ করিতেছে। তাহার সম্বন্ধে ধ্যানরসিক কবীর বলিয়াছেন

> শুন হংসা পুরাতন বাত !
> কোন মুলুকসে আয়সি হংসা—
> উৎরঙ্গে কোন্ ঘাট।

অর্থাৎ জীব আজব মুলুক হইতে সংসারের ঘাটে অবতরণ করিয়াছে। যে ব্যোমবিহারী হংস—অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য পৃথিবীর মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। কিন্তু কিছুদিনে আবার স্বধামে ফিরিয়া যাইবে, এবং ব্রহ্ম-সাযুজ্য লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি করিবে। ইহাই তাহার নিয়তি।

> যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্‌ধাম পরমং মম ॥—গীতা

এই যে ব্রহ্মচক্র—জীব ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া যে বৃত্তে আবর্ত্তন করিয়া চরমে ব্রহ্মে নিবৃত্ত হইবে—সেই বৃত্তের প্রথমার্দ্ধকে প্রবৃত্তি মার্গ ও শেষার্দ্ধকে নিবৃত্তি মার্গ বলে। উপনিষদের ভাষায় ইহাদের নাম প্রেয়ের পথ ও শ্রেয়ের পথ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে ভবের পথ ও ব্রজের পথ বলেন।

> অন্যৎ শ্রেয়ঃ অন্যদুতৈব প্রেয়ঃ
> তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীথঃ।—কঠ

এক কথায় বলিলে, প্রবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম আদান এবং নিবৃত্তি মার্গের ধর্ম্ম প্রদান। প্রেয়ের পথে গ্রহণের দ্বারা জীব সমৃদ্ধ হয় (grows by grasping) এবং শ্রেয়ের পথে বিসর্গ বা ত্যাগের দ্বারা জীব সমৃদ্ধ হয় (grows by giving)। ভবের পথে (যাহাকে সেক্‌স্‌-পীয়রের কথায় Primrose path of dalliance বলা যাইতে পারে) জীবের ঈশ্বর-বৈমুখ্য এবং ব্রজের পথে তাহার ঈশ্বর-সাম্মুখ্য। প্রবৃত্তি মার্গে চলিতে চলিতে একদিন সে মধ্যবিন্দু (turning-point) অতিক্রম করে। এতদিন তাহার মুখ ঈশ্বরের প্রতি বিমুখ ছিল, এইবার 'মোড়' ফিরিয়া তাহার মুখ ঈশ্বরের সম্মুখ হয়। এই হইতে তাহার ধর্ম্ম-জীবনের আরম্ভ। কিন্তু এই শুভ মুহূর্ত্তের পশ্চাতে প্রত্যেক জীবের সুদীর্ঘ ক্রমবিকাশের

ইতিহাস। আমরা সংক্ষেপে এই ইতিহাসের ইঙ্গিত করিব।

আমরা দেখিয়াছি উপনিষদের মতে জীব ব্রহ্মখণ্ড, চিদ্-অণু, ব্রহ্মসিন্ধুর বিন্দু। ঐ ব্রহ্ম অনন্তবিধ শক্তি-খচিত।

অনন্তশক্তি-খচিতং ব্রহ্ম সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্।

ব্রহ্মে যে সমস্ত শক্তি সুব্যক্ত, ব্রহ্মাংশ জীবে তাহা অনাদি কাল হইতে বিদ্যমান থাকিলেও অব্যক্ত।

সত্যং জ্ঞানমনন্ত চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্—পঞ্চদশী

জীবের ঐ সকল সুপ্ত শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য, ঐ সকল অব্যক্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করিবার জন্য জীবকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে বপন করা হয়।

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্—গীতা ১৪।৩

খৃষ্টানেরা এই কথা অন্য ভাষায় বলেন—

He is sown in weakness so that he may be raised in power.

মাতার কুক্ষিতে যেমন সন্তান-বীজ ধীরে ধীরে বিবর্দ্ধিত হয়, তেমনি প্রকৃতি-ক্ষেত্রে উপ্ত জীবের সুপ্ত শক্তি-সমূহ ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করে। ইহাই তাহার ক্রমবিকাশ—যাহাকে Evolution বলে—(e=out, volvo=roll)। সেই ক্রমবিকাশের ধারা এইরূপ।

প্রথম খনিজ বা স্থাবর (mineral), তাহার পরে ক্রমে ক্রমে স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ, অণ্ডজ ও জরায়ুজ অবস্থা। জীব কিরূপে ক্রমবিকাশের ফলে স্থাবর রাজ্য অতিক্রম করিয়া জঙ্গম রাজ্যে উপনীত হয় এবং জঙ্গম রাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথমে স্বেদজ (amoeba প্রভৃতি), তারপর সরীসৃপ, তারপর জলজ, স্থলজ, খেচর, ভূচর, উভচর, লক্ষ লক্ষ পক্ষীর ও পশুর দেহে বসতি করিয়া অবশেষে মনুষ্যদেহ গ্রহণ করে—সে এক বিচিত্র কাহিনী। এই ক্রমবিকাশের পর্ব্বগুলির স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়া সুফি সাধক জালালুদ্দিন রুমি বলিয়াছেন :—

I died from the mineral and became a plant. I died from the plant and re-appeared in an animal.. I died from the animal and became a man. Wherefore then should I fear? When did I grow less by dying?

এইরূপে ক্রমবিকাশের ফলে জীব সুদীর্ঘকালে মনুষ্য-উপাধি লাভ করে। *

মানুষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীব প্রথমে অসভ্য, তাহার পর অর্দ্ধসভ্য, তাহার পর সভ্য হয়। তখনও সে প্রবৃত্তিমার্গে। কিন্তু একদিন এক শুভ মুহূর্ত্তে, সে ব্রহ্ম-চক্রের মধ্যবিন্দু অতিক্রম করিয়া সুসভ্য মানুষে বিকশিত হয়। এই সমস্ত ব্যাপারটাকে এ দেশের ভাষায় বলে 'চৌরাশীর চক্র'। বৃহৎ বিষ্ণুপুরাণ এই বিষয়ের বিস্তার করিয়া বলিয়াছেন :—

স্থাবরং বিংশতের্লক্ষং জলজং নবলক্ষকম্।
কূর্ম্মাশ্চ নবলক্ষং চ দশলক্ষং চ পক্ষিণঃ॥
ত্রিংশল্লক্ষং পশূনাঞ্চ চতুর্লক্ষং চ বানরাঃ।
ততো মনুষ্যতাং প্রাপ্য ততঃ কর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥
এতেষু ভ্রমণং কৃত্বা দ্বিজত্বমুপজায়তে।
সর্ব্বযোনিং পরিত্যজ্য ব্রহ্মযোনিং ততোঽভ্যগাৎ॥

অর্থাৎ "স্থাবর ২০ লক্ষ, জলজ ৯ লক্ষ, কূর্ম্ম ৯ লক্ষ, পক্ষী ১০ লক্ষ, পশু ৩০ লক্ষ, বানর ৪ লক্ষ—ইহার পরে জীব মনুষ্যযোনিতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ দ্বিজত্বে উপনীত হয়। দ্বিজের শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ। সমস্ত যোনি ভ্রমণ করিয়া জীব শেষে ব্রহ্মযোনি প্রাপ্ত হয়।"

বিষ্ণুপুরাণ যাহাদিগকে 'দ্বিজ' বলিলেন, তাঁহারা ঐ নিবৃত্তি-মার্গস্থ জীব। ঐরূপ জীব সাধারণ মনুষ্যের পদবী অতিক্রম করিয়া অতিমানবতার উচ্চস্তরে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া চরমে জীবন্মুক্তির তুঙ্গ চূড়ায় অধিরূঢ় হন। বিষ্ণুপুরাণ ঐরূপ উন্নত সাধককে 'ব্রহ্মবিৎ' বলিলেন। 'দ্বিজ' না হইলে ব্রহ্মবিৎ হওয়া যায় না। যিশুখৃষ্টও ঐরূপ দ্বিজের উল্লেখ করিয়াছেন—

Verily verily I say unto you, unless you be

---

* এ স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, উপাধির তারতম্যেই জীবগত শক্তির প্রকাশের তারতম্য হয়। স্থাবরে যে চিদ্-অণু নিরুদ্ধ-চেতন হইয়া আচ্ছন্ন অবস্থায় ছিল, উদ্ভিদে যে চিদ্-অণু জ্ঞানশক্তির স্তম্ভনে প্রাণের স্পন্দন মাত্র অনুভব করিয়াছিল, পশু-পক্ষীতে যে চিদ্-অণু সুখ দুঃখের অনুভূতি লাভ করিয়াও প্রজ্ঞা ও প্রেমের উচ্চতর স্পন্দনে সাড়া দিতে পারে নাই, সেই চিদ্-অণুই মানব-শরীর গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ প্রজ্ঞা ও প্রেমের অধিকারী হয়। ঐতরেয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। ওষধিবনস্পতয়ো যচ্চ কিঞ্চিৎ প্রাণভৃৎ স আত্মানমাবিস্তরাং বেদ। ওষধি বনস্পতিষু হি রসো দৃশ্যতে, চিত্তং প্রাণভৃৎসু। প্রাণভৃৎসু ত্বেব আবিস্তরাম্ আত্মা; তেষু হি রসোঽপি দৃশ্যতে। ন চিত্তং ইতরেষু ইত্যাদি।—২।৩।২

born again you cannot enter the kingdom of heaven.

অধ্যাপক জেমস্ তাঁহার *Varieties of Relgious Experience* গ্রন্থে, মনোবিজ্ঞানের দিক্ হইতে এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন, খৃষ্টানেরা যাহাকে 'conversion' (উদ্ধার বা উদ্ধার) বলেন, ঐরূপ 'converted' জীবের নবজন্ম (new birth) হয় :—

'The personality is changed—the man is born anew.—(p. 241). He is a new man, a new creature —(Joseph Alline cited by James on p. 228.)

এইরূপ converted একজনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া অধ্যাপক জেম্স্ বলিতেছেন :—

The man must die to an unreal life before he can be born into the real life (p. 165).

উদ্ধৃত উক্তিটি এই—

'I had a vivid realization of forgiveness and renewal of my nature. Old things have passed away, all things have become new.'

ইহাই নবজন্ম—প্রকৃত দ্বিজত্ব। কারণ, এইবার জীব ভবের পথ ছাড়িয়া ব্রজের পথে প্রবেশ করিয়াছে, প্রেয়কে ছাড়িয়া শ্রেয়কে বরণ করিয়াছে। এখন সে নব বৃন্দাবনের মানুষ—New Jerusalem-এর অধিবাসী। এখন সে ব্রজগোপীর সহিত সুর মিলাইয়া বলিতে পারে—

> সুখের রাতি, জ্বাল হে বাতি
> মন্দির কর' আলা।

অথবা ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষির উদাত্ত বাণীর প্রতিধ্বনি করিতে পারে :—

> 'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্য পিহিতং মুখং।
> তৎ ত্বং পূষণ্ অপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।
> যৎ তে রূপং কল্যাণতমং তৎ তে পশ্যামি—

'হে জগৎপতি ব্রহ্মণ্যদেব! হিরণ্ময় আবরণে আবৃত তোমার মুখ এইবার অনাবৃত কর—একবার সেই কল্যাণতম রূপ দর্শন করি।'

এই প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ধ্যানী রেসিজ্যাক (Recejac)-এর একটি উক্তি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য :—

When mystical activity is at its height, we find consciousness possessed by the sense of a being at once excessive and identical with the self: great enough to be *God*: interior enough to be *me*.

ইহাকেই বেদান্তের ভাষায় সংরাধন বলে,—

অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।—ব্রহ্মসূত্র, ৩।২।২৪

অপি চৈনমাত্মানং নিরস্তসমস্তপ্রপঞ্চং অব্যক্তং সংরাধনকালে পশ্যন্তি যোগিনঃ সংরাধনঞ্চ ভক্তিধ্যান প্রণিধানাদ্যনুষ্ঠানং।—শঙ্করভাষ্য

উপনিষদে এ বিষয়ে বিস্পষ্ট উপদেশ আছে—

> অধ্যাত্ম যোগাধিগমেন দেবং
> মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ, ২।১২

'অধ্যাত্মযোগ অধিগত হইলে সেই দেবকে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষশোক অতিক্রম করেন।'

> জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বঃ
> ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ —মুণ্ডক, ৩।১।৮

'জ্ঞান প্রসাদে বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া ধ্যান দ্বারা সেই নিষ্কল পুরুষকে দর্শন করেন।'

> কশ্চিদ্ ধীরঃ প্রত্যগাত্মানম্ ঐক্ষৎ
> আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ —কঠ, ৪।২

'কোন ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব ইচ্ছা করিয়া, আবৃত্তচক্ষুঃ হইয়া (বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গ্রাম প্রত্যাহার করিয়া) সেই প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।'

ইহাই ব্রহ্মদর্শন—ব্রহ্মের সাক্ষাৎ অপরোক্ষ অনুভূতি (Realization)। সেইজন্য স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন :—

—Religion is realization.

অর্থাৎ "ইতি শুশ্রুম ধীরাণাং" এরূপ শোনা কথা (hearsay) নহে; কিন্তু অগম্য জ্যোতিঃ—

> বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং
> আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

—সেই জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎকার। বাস্তবিক ইহাই প্রকৃত ধর্ম্মজীবন। Creed, dogma, আচার, অনুষ্ঠান, পদ্ধতি, পূজা—এই সকল ধর্ম্মের বহিরঙ্গ মাত্র। ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ব্রহ্মানুভূতি,ব্রহ্মসাযুজ্য। পাশ্চাত্যেরা ইহাকে Mysticism বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। Mysticism = সংরাধন। Mysticism কি? ইউরোপীয় মিস্টিকের ভাষায়—Temperamental reaction to the vision of Reality—সেই সত্যস্য সত্য, ত্রিসত্যের অপরোক্ষ অনুভূতি। সেইজন্য ধর্ম্মাচার্য্য Dean of St. Paul-এর মুখে সম্প্রতি শুনিতে পাইতেছি :—

Mysticism is the core of religion. ইহা কিন্তু এ দেশের প্রাচীন কথা। উপনিষদের ঋষিরা অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিকেই ধর্ম্মজীবনের সার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন এবং 'তত্ত্বমসি' 'সোহং' প্রভৃতি বেদের মহাবাক্য প্রচার করিয়া ঐ সত্যকে স্থায়ী আকার দান করিয়াছেন। সম্প্রতি একজন খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক (Revd. J. T. Davies) এ সম্বন্ধে কয়েকটি সহৃদয় বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন; তাহার একাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি।—

No great Soul has appeared in India during the last 3000 years that has not accepted the call of the teaching of the Upanishads, the spirit of the oldest and most enduring religious philosophy based not on speculation but on *real experience*, and summed up in three words (তৎত্বমসি). That doctrine is the fulcrum upon which every lever of spiritual appeal has ever been made from India to move the world. The ancient Aryan formula sums up the researches of all the greater Rishis. Generations of men delved deep to find this; great men of our Aryan race, the creators of our heritage. * * * This is the secret of the greatest philosophy that the world has known; it is on this foundation that all the greater Rishis of the East have built the essential divinity of man. "Thou art That". "Thou art God". "Thou art Brahman." Man in his deepest essence is identical with the cosmic spirit, with the absolute Infinite behind all things. ....When man attains this knowledge, *realises* it in all its power, he becomes one with *That*. Such is the teaching of India.

মেঘের মতন

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ, অসীম আকাশ'পরে,
কখনো শুভ্র, কখনো ধূসর, কখনো গেরুয়া পরে'।
বুকেতে আমার আঁকিয়া আদরে, অতুল বাসবধনু,
মুখেতে মাখিয়া তপনের তপ্ত আলোর উজল রেণু—
মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ নিখিল বাতাস বহি,
পাগল সিন্ধুর বাষ্পের শ্বাস পরশিয়া রহি রহি॥

অতলের তার মরম ব্যথার, বেদনা বুকেতে নিয়ে
শীতল নয়ন সলিলে তাহার যাতনা জুড়ায়ে দিয়ে,
মেঘের মতন ভেসে যেতে সাধ গৌরীশিখর-শিরে,
সকল তাপের অন্তিম মুক্তি শেষের তুষার তীরে,
গলিয়া ঝরিতে গোমুখীর মুখে পাবনী-গঙ্গাধারা,
সাগরের সনে অবাধ মিলনে আবার হইতে হারা।

ঘনীকৃত তৈল

শ্রীরাজশেখর বসু

চলিত কথায় 'তৈল' বলিলে যে-সকল বস্তু বুঝায় তাহাদের কতকগুলি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়। সকল তৈলই দাহ্য, অল্লাধিক তরল এবং জলে অদ্রাব্য। তার্পিন কেরাসিন ও তিল তৈলে এই সকল লক্ষণ বর্ত্তমান। পক্ষান্তরে স্পিরিট তৈল নয়, কারণ তাহা দাহ্য ও তরল হইলেও জলের সহিত মিশে।

কিন্তু তার্পিন কেরাসিন ও তিল তৈলে কতকগুলি প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। তার্পিন সহজে উবিয়া যায়, কেরাসিন উবিতে সময় লাগে, তিলতৈল মোটেই উবে না। তিলতৈলের সহিত সোডা মিশাইয়া সাবান করা যায়, কিন্তু তার্পিন ও কেরাসিনে সাবান হয় না।

আমরা মোটামুটি কাজ চালাইবার জন্য পদার্থের আপাতলক্ষণ দেখিয়া শ্রেণীবিভাগ করি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক তাহাতে সন্তুষ্ট নন। তাঁহারা নানাপ্রকার পরীক্ষা করিয়া দেখেন কোন্ লক্ষণগুলি পদার্থের গঠন ও ক্রিয়ার পরিচায়ক, এবং সেইগুলিকেই মুখ্যলক্ষণ গণ্য করিয়া শ্রেণীবিভাগ করেন। শ্রেণীনির্দ্দেশের জন্য বৈজ্ঞানিক নূতন নাম রচনা করেন, অথবা প্রচলিত নাম বজায় রাখিয়া তাহার অর্থ সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করেন। এজন্য লৌকিক ও বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগে অনেকস্থলে বিরোধ দেখা যায়। লোকে বলে চিংড়ি-মাছ, বৈজ্ঞানিক বলেন চিংড়ি মাছ নয়। লোকে কয়েকপ্রকার লবণ জানে, যথা—সৈন্ধব, লিভারপুল, করকচ, বে-আইনী ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক বলেন, লবণ তোমার রান্নাঘরের একচেটে নয়, লবণ অসংখ্য, ফটকিরি তুঁতেও লবণ। কবি লেখেন—তাল-তমাল। বৈজ্ঞানিক বলেন—ও দুই গাছে ঢের তফাৎ, বরং ঘাস-বাঁশ লিখিতে পার।

কিমিতি-শাস্ত্র অনুসারে তার্পিন কেরাসিন ও তিল তৈল তিন বিভিন্ন শ্রেণীতে পড়ে। তার্পিন, চন্দন ও নেবুর তৈল প্রভৃতি গন্ধতৈল প্রথমশ্রেণী। কেরাসিন, পেট্রল, ভাসেলিন, এমন কি কঠিন প্যারাফিন—যাহা হইতে বর্ম্মা-বাতি হয়, দ্বিতীয়শ্রেণী। তিলতৈল, ঘৃত, চর্ব্বি প্রভৃতি উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ স্নেহদ্রব্য তৃতীয়শ্রেণী। তৃতীয়শ্রেণীর সাধারণ ইংরেজী নাম fat; আমরা এই শ্রেণীকেই 'তৈল' নামে অভিহিত করিব। অপর দুই শ্রেণী এই প্রবন্ধের বিষয়ীভূত নয়।

তৈল মানুষের খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। ভারতের প্রদেশভেদে সর্ষপ তিল চীনাবাদাম ও নারিকেল তৈল রন্ধনে ব্যবহৃত হয়। ঘৃতের ত কথাই নাই, ভারত-বাসী মাত্রই ঘৃতভক্ত। চর্ব্বির ভক্তও অনেক আছে। কার্পাসবীজের তৈলও আজকাল রন্ধনে চলিতেছে, কোনো কোনো স্থানে তিসির তৈলও বাদ যায় না। মাদ্রাজ-প্রদেশে রেড়ির তৈলে উপাদেয় আমের আচার প্রস্তুত হয়।

সাবানের উপাদান তৈল ও সোডা। তৈলভেদে সাবানের গুণের তারতম্য হয়। চর্ব্বি ও নারিকেল-তৈলের সাবান শক্ত, রেড়ি তিল চীনাবাদাম প্রভৃতি তৈলের সাবান নরম। লোকে নরম সাবান পছন্দ করে না, সেজন্য অন্য তৈলের সহিত কিছু চর্ব্বি ও নারিকেল-তৈল মিশানো হয়। নারিকেলতৈলের বিশেষ গুণ—সাবানে প্রচুর ফেনা হয়। কোনো কোনো কাজে নরম সাবানই দরকার হয়, সেজন্য নারিকেলতৈল ও চর্ব্বি না দিয়া তরল উদ্‌ভিজ্জ তৈল বা মাছের তৈল ব্যবহার করা হয় এবং সোডার বদলে অল্পাধিক পটাশ দেওয়া হয়। কিন্তু মোটের উপর কঠিন সাবানেরই আদর বেশী, সেজন্য চর্ব্বি ও নারিকেলতৈলের কাটতি ক্রমে বাড়িতেছে।

তাঁতে বুনিবার পূর্ব্বে সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় তাহার একটি প্রধান উপকরণ চর্ব্বি। আমাদের দেশের তাঁতীরা নারিকেলতৈল দেয়, কিন্তু মিলে চর্ব্বিই প্রকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। এই কারণেও চর্ব্বির মূল্যবৃদ্ধি হইতেছে।

লুচি কচুরি প্রস্তুত করিবার সময় ময়দায় ঘিয়ের ময়ান দেওয়া হয়, তাহার ফলে খাবার খাস্তা হয়, অর্থাৎ ময়দা-পিণ্ডের চিমসা ভাব দূর হয়। খাজা গজায় প্রচুর ময়ান থাকে, সেজন্য ভাজিবার সময় স্তরে স্তরে আল্‌গা হইয়া যায়। কিন্তু যদি ঘিয়ের বদলে তেলের ময়ান দেওয়া হয় তবে তত ভাল হয় না। চর্ব্বি দিলে ঘিয়ের চেয়েও ভাল হয়, অবশ্য সকলে সে পরীক্ষা করিতে রাজী হইবে না। বিলাতী বিস্কুটে এযাবৎ চর্ব্বির ময়ান চলিয়া আসিতেছে। এদেশে যে 'হিন্দু-বিস্কুট' প্রস্তুত হয় তাহা বিলাতীর সমকক্ষ নয়। ইহার প্রধান কারণ—নিপুণতার অভাব, কিন্তু চর্ব্বির বদলে ঘি বা মাখন ব্যবহারও অন্যতম কারণ।

তৈল চর্ব্বি ইত্যাদির যতরকম প্রয়োগ আছে তাহার বর্ণনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। এখন ঘনীকৃত তৈলের কথা পাড়িব।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একজন ফরাসী কৈমিতিক আবিষ্কার করেন যে নিকেল-ধাতুর সূক্ষ্ম চূর্ণের সাহায্যে তৈলের সহিত হাইড্রোজেন গ্যাস যোগ করা যায় এবং তাহার ফলে তরল তৈল ঘনীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় নিকেল ঘটকের (catalyst) কাজ করে মাত্র, উৎপন্ন বস্তুর অঙ্গীভূত হয় না। উক্ত আবিষ্কারের পর বহু বৈজ্ঞানিক এই প্রক্রিয়ার উত্তরোত্তর উন্নতিসাধন করিয়াছেন, তাহার ফলে একটি বিশাল ব্যবসায়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

যে-কোনো তৈল এই উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারা যায়। হাইড্রোজেনের মাত্রা অনুসারে ঘৃতের ন্যায় কোমল, চর্ব্বির তুল্য ঘন, মোমের তুল্য কঠিন অথবা তদপেক্ষাও কঠিন বস্তু উৎপন্ন হয়। অধিকন্তু, উপাদানের বর্ণ ও গন্ধও প্রায় দূর হয়। সর্ষপতৈল, নিমতৈল, এমন কি পূতিগন্ধ মাছের তৈল পর্যন্ত বর্ণহীন গন্ধহীন ঘনবস্তুতে পরিণত হয়।

Hydrogenated oil বা solidified oil বা ঘনীকৃত তৈল এখন ইউরোপ ও আমেরিকার নানাস্থানে প্রস্তুত হইতেছে। এই ব্যবসায়ে হলাণ্ড মুখ্যস্থান অধিকার করিয়াছে এবং ইংলাণ্ডও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। একদিন চর্ব্বি দ্বারা যে কাজ হইত, এখন বহুস্থলে ঘনীকৃত তৈল দ্বারা তাহা সম্পন্ন হইতেছে। যে-সকল উদ্‌ভিজ্জ ও প্রাণিজ তৈল এতদিন অতি নিকৃষ্ট ও অব্যবহার্য্য বলিয়া গণ্য হইত, তাহারও সদ্‌গতি হইতেছে।

রুটি-মাখন বিলাতের জনপ্রিয় খাদ্য। কিন্তু গরিব লোকে মাখনের খরচ যোগাইতে পারে না, সেজন্য 'মার্গারিন' নামক কৃত্রিম মাখনের সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে ইহার উপাদান ছিল—চর্ব্বি, উদ্‌ভিজ্জ তৈল, কিঞ্চিৎ দুগ্ধ এবং ঈষৎ মাত্রায় পিষ্ট গোস্তনের নির্য্যাস। শেষোক্ত উপাদান মিশ্রণের ফলে মার্গারিনে মাখনের গন্ধ ও স্বাদ কিয়ৎপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ভাল মার্গারিনে কিছু খাঁটি মাখনও মিশ্রিত থাকে। আজকাল যে মার্গারিন প্রস্তুত হইতেছে তাহাতে চর্ব্বি ও স্বাভাবিক উদ্‌ভিজ্জ তৈল প্রায় থাকে না, তৎপরিবর্ত্তে মাখনের ন্যায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যান্য উপাদান পূর্ব্ববৎ বজায় আছে। চকোলেট টফি প্রভৃতি খাদ্যে পূর্ব্বে মাখন দেওয়া হইত, এখন প্রায় ঘনীকৃত তৈল দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে লাভ বাড়িয়াছে এবং বিকৃতির আশঙ্কাও কমিয়াছে। বিস্কুটেও ক্রমশঃ চর্ব্বির পরিবর্ত্তে ঘনীকৃত তৈল চলিতেছে, সেজন্য কোনো কোনো ব্যবসায়ী সগর্ব্বে বলিতেছেন—তাঁহাদের মাল খাইলে হিন্দু-মুসলমানের জাতি যায় না। সাবান ও অন্যান্য বহু ব্যবসায়ে ঘনীকৃত তৈলের প্রয়োগ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে। মোট কথা, বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের উপযুক্ত অনেকপ্রকার ঘনীকৃত তৈল প্রস্তুত হইতেছে এবং লোকেও তাহার প্রয়োগ শিখিতেছে।

এই নূতন বস্তুর ব্যবহার কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপ ও আমেরিকাতেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু উৎপাদন-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়িগণ নব নব ক্ষেত্রের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অচিরে দৃষ্টি পড়িল এই দেশের উপর। ভারতগাভী সর্ব্বদা হাঁ করিয়া আছে, বিলাতী বণিক্ যাহা মুখে গুঁজিয়া দিবে তাহাই নির্ব্বিচারে গিলিবে এবং দাতার ভাণ্ড দুগ্ধে ভরিয়া দিবে। অতএব বিশেষ করিয়া এই দেশের জন্য এক অভিনব বস্তু সৃষ্ট হইল—"vegetable product" বা "উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ"। ব্যবসায়িগণ প্রচার

করিলেন—ইহাতে স্বাস্থ্যহানি হয় না, ধর্ম্মহানি হয় না, এবং পবিত্রতার নিদর্শনস্বরূপ ইহার মার্কা দিলেন—মহীরুহ বা পদ্মকোরক বা নবকিশলয়। ভারতের জঠরাগ্নি এই বিজ্ঞানসম্ভূত হবির আহুতি পাইয়া পরিতৃপ্ত হইল, হালুইকর ও হোটেল-ওয়ালা মহানন্দে স্বাহা বলিল, দরিদ্র গৃহস্থবধূ লুচি ভাজিয়া কৃতার্থ হইল। দেশের সর্ব্বত্র এই বস্তু ক্রমে ক্রমে প্রচলিত হইতেছে, এবং শীঘ্রই পল্লীর ঘরে ঘরে কেরাসিন তৈলের ন্যায় বিরাজ করিবে এমন লক্ষণ দেখা যাইতেছে। আজকাল বহুস্থলে ভোজের রন্ধনে ঘৃতের সহিত আধা-আধি ইহা চলিতেছে। ধর্ম্মভীরু ঘি-ওয়ালার কুণ্ঠা দূর হইয়াছে, এখন আর চর্ব্বি ভেজাল দিবার দরকার নাই, মহীরুহ-মার্কা মিশাইলেই চলে।

কিন্তু এত গুণ এত সুবিধা সত্ত্বেও এই দ্রব্যের বিরুদ্ধে কয়েকজন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। কলিকাতা-কর্পোরেশনে এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক কাউন্সিলে এ সম্বন্ধে বহু বিতর্ক হইয়া গিয়াছে, অবশ্য তাহাতে কোনো ফল হয় নাই। ঘনীকৃত তৈলের সপক্ষে ও বিপক্ষে যে-সকল যুক্তি দেওয়া হইয়াছে তাহার মর্ম্ম এই।—

সপক্ষ বলেন—খাঁটি ঘি নিশ্চয়ই খুব ভাল জিনিষ, তাহার সহিত আমরা প্রতিযোগিতা করিতেছি না। কিন্তু সকলের ঘি খাইবার সঙ্গতি নাই। অনেক খাদ্যদ্রব্য আছে যাহা তেল দিয়া প্রস্তুত করিলে ভাল হয় না, যথা লুচি কচুরি গজা মিঠাই কালিয়া চপ। এই সকল খাদ্য ভাজিবার জন্য বাজারের ভেজাল ঘিয়ের বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা অথচ নির্দ্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিবে না কেন? ইহাতে ভাল ঘিয়ের সুগন্ধ নাই সত্য, কিন্তু দুর্গন্ধও নাই, এমন কি কোনো গন্ধই নাই। ইহাতে খাবার ভাজিলে তেলে-ভাজা বলিয়া বোধ হইবে না, বরং ঘিয়ে-ভাজা বলিয়াই ভ্রম হইবে, অথচ বাজারের ঘিয়ের দুর্গন্ধ অনুভূত হইবে না। ঘিয়ের উপর ভারতবাসীর যে প্রবল আসক্তি আছে তাহা অন্য তৈলে মিটিতে পারে না, কিন্তু নির্গন্ধ ঘনীকৃত তৈলে বহুপরিমাণে মিটিবে। সাধারণ লোকের ঘিয়ের উপর লোভ আছে কিন্তু পয়সা নাই, সেজন্যই ভেজাল ঘি চলিতেছে। দূষিত চর্ব্বি-মিশ্রিত ভেজাল ঘি না খাইয়া নির্দ্দোষ ঘনীকৃত তৈল ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্য ও ধর্ম্ম দু-ই রক্ষা পাইবে। যদি ঘৃতের সুগন্ধ চাও, তবে ঘনীকৃত তৈলের সহিত কিঞ্চিৎ বিশুদ্ধ ঘৃত মিশাইয়া লইতে পার, বাজারের ভেজাল ঘি খাইয়া আত্মবঞ্চনা করিও না।

বিপক্ষ বলেন—ভেজাল ঘি খুবই চলে ইহা অতি সত্য কথা। কিন্তু ঘনীকৃত তৈলের আমদানির ফলে ঐ ভেজাল বাড়িয়াছে এবং আরও বাড়িবে। ভেজাল ঘিয়ে চর্ব্বি চীনাবাদাম-তৈল ইত্যাদির মিশ্রণ যত সহজে ধরা যায়, ঘনীকৃত তৈলের মিশ্রণ তত সহজে ধরা যায় না। যাহারা সজ্ঞানে বা চক্ষু মুদিয়া সস্তায় ভেজাল ঘি কেনে তাহাদিগকে কেহই রক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু যাহারা সাবধানতার ফলে এপর্য্যন্ত প্রবঞ্চিত হয় নাই, এখন তাহারাও অজ্ঞাতসারে ভেজাল কিনিতেছে। মাখন গলাইলেও বিশ্বাস নাই, কারণ তাহাতেও মার্গারিন-আকারে ঘনীকৃত তৈল প্রবেশ করিয়াছে। আর এক কথা—ঘৃতে ভাইটামিন আছে, ঘনীকৃত তৈলে নাই, অতএব ঘৃতের পরিবর্ত্তে ঘনীকৃত তৈলের চলন বাড়িলে লোকের স্বাস্থ্যহানি হইবে। আর, যতই বৃক্ষ লতা ফল ফুলের মার্কা দাও এবং উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ বলিয়া প্রচার কর, উহা যে অতি সস্তা মাছের তেল হইতে প্রস্তুত নয় তাহারই বা প্রমাণ কি? ব্যবসাদার মাত্রেই ত ধর্ম্মপুত্র নয়।

এই বাদানুবাদের উপর মন্তব্য অনাবশ্যক, বহু দূরদর্শী দেশহিতৈষী ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন—ঘনীকৃত তৈল সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কেবল একটা কথা বলা যাইতে পারে—ভাইটামিনের যুক্তি প্রবল নয়। ঘৃতে যে ভাইটামিন থাকে তাহা তপ্ত অবস্থায় বায়ুর স্পর্শে নষ্ট হয়। সাবধানে মাখন গলাইয়া ঘি করিলে ভাইটামিন সমস্তই বজায় থাকে। কিন্তু বাজারের ঘি তৈয়ারির সময় বিশেষ যত্ন লওয়া হয় না, গোয়ালা ও আড়তদারের গৃহে একাধিকবার উন্মুক্ত কটাহে জ্বাল দেওয়া হয়, তাহাতে ভাইটামিন অনেকটা নষ্ট হয়, অবশ্য কিছু অবশিষ্ট থাকে। হালুইকরের কটাহে যে ঘি দিনের পর দিন উত্তপ্ত করা হয় তাহাতে কিছুমাত্র ভাইটামিন

থাকা সম্ভব নয়। এবিষয়ে কেহ পরীক্ষা করিয়াছেন কিনা জানি না। মোট কথা, বাড়ির রান্নায় যে ঘি দেওয়া হয় তাহাতে অল্পাধিক ভাইটামিন থাকাই সম্ভব, কিন্তু বাজারের ঘৃতপক্ক খাবারে না থাকাই সম্ভব। ইহাও বিবেচ্য—দেশের অধিকাংশ লোক ঘি খাইতে পায় না, রান্নায় তেলই বেশী চলে, এবং তেলে ভাইটামিন নাই।

কিন্তু অন্য যুক্তি অনাবশ্যক, ঘনীকৃত তৈলের বিরুদ্ধে অখণ্ডনীয় যুক্তি—ইহাতে ধর্ম্মহানি হয়। এই ধর্ম্ম গতানুগতিক অন্ধসংস্কার নয়, ভাইটামিনের ধর্ম্মও নয়,—দেশের স্বার্থরক্ষার ধর্ম্ম, আত্মনির্ভরতার ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মবুদ্ধি উন্মেষের ফলে ভারতবাসী বুঝিয়াছে যে, বিদেশীবস্ত্রে লজ্জানিবারণ হয় না। ঘি খাইবার পয়সা নাই, কিন্তু কোন্ দুঃখে বিদেশী তৈল খাইব? এদেশের তৈল কি দোষ করিল? সর্ষপতৈলের ঝাঁজ সব সময় ভাল না লাগে ত অন্য তৈল আছে। প্রাচীন ভারত তৈল শব্দে তিলতৈলই বুঝিত, তাহাতেই রাঁধিত, বোম্বাই মাদ্রাজ মধ্যপ্রদেশের লোক এখনও তাহাতে রাঁধে। ইহা স্নিগ্ধ, নির্দ্দোষ, সুপচ। বাঙালীর নাক সিঁটকাইবার কারণ নাই। সর্ষপতৈলের উগ্র গন্ধ আমরা সহিতে পারি, বাজারের কচুরি গজা খাইবার সময় ঘিয়ের বিকৃত গন্ধ মনে মনে মার্জ্জনা করি, নির্গন্ধ ভেজিটেব্‌ল্ প্রডক্ট্ উত্তপ্ত হইলে দুর্গন্ধ হয় তাহাও জানি, তবে তিল চীনাবাদাম তৈলে অভ্যস্ত হইব না কেন? অশ্বত্থামা পিটুলিগোলা খাইয়া ভাবিয়াছিলেন দুধ, আমরাও একটা নূতন কিছু খাইয়া ভাবিতে চাই ঘি খাইতেছি। এজন্য বিদেশী "উদ্‌ভিজ্জ পদার্থ" অনাবশ্যক, লুচি কচুরি ভাজার উপযুক্ত স্বদেশী উদ্‌ভিজ্জ তৈল যথেষ্ট আছে। নিমন্ত্রিত কুটুম্বকে ঠকানো হয়ত শক্ত হইবে, কিন্তু দেশবাসীর আত্মসম্মান রক্ষা পাইবে। যদি কলিকাতা ও অন্যান্য নগরের মিউনিসিপালিটি চেষ্টা করেন তবে তিলাদি তৈলের প্রচার সহজেই হইতে পারে। শ্রীযুক্ত চুণীলাল বসু বিমলচন্দ্র ঘোষ রমেশচন্দ্র রায় প্রভৃতি ভিষক্‌-মহোদয়গণ এবিষয়ে প্রবন্ধাদি দ্বারা সাধারণকে জ্ঞানদান করিতে পারেন। ময়রা যাহাতে প্রকাশ্যভাবে বিশুদ্ধ তৈল অথবা ঘৃতমিশ্রিত তৈলের খাবার বেচিতে পারে তাহার ব্যবস্থা আবশ্যক। এই রকম খাবার ঘনীকৃত তৈলের খাবার অথবা খারাপ ঘিয়ের খাবার অপেক্ষা কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। ঘি খাইব, অভাবে অজ্ঞাত-উপাদান ভেজাল দ্রব্য খাইব—লোকের এই মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন আবশ্যক। ঘি খাইব, না জুটিলে সজ্ঞানে বিশুদ্ধ তৈল খাইব বা ঘৃতমিশ্রিত তৈল খাইব—ইহাই সদ্‌বুদ্ধি।

কয়েকজন বাঙালী বৈজ্ঞানিক ঘনীকৃত তৈল উৎপাদনে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের চেষ্টায় এদেশে ইহার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে ধর্ম্মহানির আপত্তি থাকিবে না। এখন—ক্ষমতায় কুলাইলে খাঁটি ঘি খাইব, নতুবা সর্ষপ তিল চীনাবাদাম নারিকেল তৈল খাইব, অথবা ঘৃত ও তৈল মিশাইয়া খাইব, রুচিতে না বাধিলে চর্ব্বিও খাইব, কিন্তু বিদেশী ঘনীকৃত তৈল পূতনার স্তন্যবৎ পরিহার করিব।

কুজ্ঝটিকা ও কিরণ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বেলার বিবাহে মিত্র-বংশের যে যেখানে ছিলেন আসিয়া জড় হইলেন। খুড়তুত, জ্যাঠতুত, মাসতুত, পিসতুত ছাড়া বেলার বাপেরাই সাত ভাই বর্ত্তমান। ভগিনী ছয়।

জন্মপল্লীতে সেই জীর্ণ বাড়ীখানি সংস্কার-অভাবে সুদূর অতীতের বিস্মৃত ইতিহাসের ছিন্ন পৃষ্ঠাখানি মেলিয়া ভাবী বংশধরদের পানে করুণনয়নে চাহিয়া আছে। অতটুকু বাড়ীতে স্থান-সঙ্কুলান না হওয়ায় ও পল্লীর সহস্র কল্পিত অকল্পিত অসুবিধার মধ্যে চাকুরিয়ার জীবনকে দু'একদিনের জন্যও দুঃখ-তাপে জর্জ্জরিত করিবার আকাঙ্ক্ষা না থাকায়, কেহই সেই ভগ্ন জন্মভিটার মমতাময় চাহনিটুকু দেখিয়াও দেখেন নাই। বিলীন অতীত বিস্মৃতিতে ডুবিয়াছে, সোনার বর্ত্তমান স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের সাহচর্য্যে সুখেই কাটিয়া যাইতেছে। ভারতের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত। কেহ বা হিমালয়ের শিরোদেশে,—কেহ বা কুমারিকার প্রান্তসীমায়; পর্ব্বত, মরুভূমি, সমুদ্র—সর্ব্বত্রই এই অভিজাত বংশীয়ের চরণচিহ্নে চিহ্নিত।

অনন্তশূন্যে ঘূর্ণ্যমান গ্রহতারা স্ব স্ব গতিপথে যেমন প্রতিনিয়ত আবর্ত্তিত হইবার সময় সহসা এক একবার অতিনিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ে ও পরস্পরের জ্যোতিরেখার সংঘর্ষে উজ্জ্বল দীপ্তি বিচ্ছুরিত করিয়া জানাইয়া দেয়, তাহারা সমধর্ম্মী বা সমজাতীয়, তেমনি এই হিমালয়-কুমারিকা-প্রান্তবাসীবর্গ কথনও কেহ কাহারও সম্মুখবর্ত্তী হইলে আদর-আপ্যায়নে পরস্পরকে প্রীতি-সম্ভাষণ জানাইয়া লোকের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া বুঝাইয়া দেন—বংশপরম্পরায় উঁহাদের ধমনীতে একই শোণিত প্রবাহিত। তা যাহাই হউক, বেলার পিতা মণিমোহন মোটা মাহিনার চাকুরী করেন, একজন নামজাদা অফিসার তিনি। সম্মান ও অর্থ দুই-ই অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহার মনে রক্তের সম্বন্ধটা এতকাল পরে বেলার বিবাহে সহসা জাগিয়া উঠিল এবং বেশ একটু গভীর আন্দোলনেরই সৃষ্টি করিল।

অসংখ্য সম্বন্ধ-সূত্রের ন্যায় ভারতের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে ঊর্ণনাভের জাল বিস্তার করিয়াছে; তিনি দৃঢ়করে তাহা টানিয়া তুলিবার প্রয়াস করিলেন। নিমন্ত্রণ-পত্র গেল, অর্থ প্রেরিত হইল, লোক ছুটিল। সমগ্র ভারতবর্ষ কলিকাতার ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লইল।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অসংখ্য কক্ষে অগণ্য আলোক জ্বলিতেছে এবং আগন্তুকগণের কোলাহলে সে স্থান মুখরিত।

সকলেই নিকট-আত্মীয়—সকলেই অভ্যাগত। দীর্ঘ দিন বিচ্ছেদের পর মিলনের ব্যগ্রতাটুকু কাহারও নয়নে বা অন্তরে রেখাপাত করে নাই। দশজন নিঃসম্পর্কীয় পরিবার ট্রেনে বা ষ্টীমারে যেমন কয়েক ঘণ্টার জন্য একত্র মিলিয়া মুহূর্ত্তের তরে সাংসারিক পরিচয় ও সুখ-দুঃখের সংবাদ লইয়া থাকে এবং গন্তব্যস্থানে আসিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে ক্ষণিকের পরিচয় বিস্মৃত হইয়া আপন আপন পোটলা-পুঁটলি লইয়া মুখ ফিরাইয়া নামিয়া যায়, উঁহাদের অন্তরেও নিকটতম আত্মীয়ের সুখ-দুঃখের স্পর্শ অমনি নির্লিপ্ততার অনাসক্তিতে ফুটিয়া উঠিতেছিল। এই বিবাহ মিলনের উপলক্ষ মাত্র, কয়েক দিনের বিদেশ-বাস। যে যাহার পুত্রপৌত্রের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লইয়াই বিভোর। ইহাদের বিলাইয়া যেটুকু উদ্বৃত্ত থাকে তাহা লইয়া যত কিছু আত্মীয়তার শিষ্টাচার। প্রিয়পরিজনের সুখ-স্বার্থের প্রাচীর-পার্শ্বে—তাই এই আত্মীয় বন্ধুর পরিচয়ের এতটুকু শীত-সঙ্কুচিত কিরণ আসিয়া জমিয়াছে! গৃহলক্ষ্মীরা যে যাহার পুত্রকন্যা লইয়া এক একখানি কক্ষ দখল করিয়া বাক্স পেঁটরা বিছানা গুছাইয়া অপর কক্ষের সংবাদ সংগ্রহে তৎপর। বাহিরে ঠাকুর, চাকর—কাজ-কর্ম্ম, রন্ধন-আয়োজনের ভার লইয়াছে। অর্থের অপ্রতুলতা

নাই, কার্য্যে বিশৃঙ্খলারও অভিযোগ নাই। জিনিষ আসিতেছে প্রচুর—খরচ হইতেছে অজস্র এবং অপচয় হইতেছে তাহার চতুর্গুণ। বৃহৎ বটবৃক্ষের অসংখ্য শাখায় শুধু রাত্রিযাপনের মানসে নানা দিগ্‌দেশ হইতে দলে দলে পক্ষী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে; কলরব উঠিয়াছে বিচিত্র। ইহাকে আনন্দ বলিতে চাও—বল, জীবনের সাধ-আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি বলিতে চাও—আপত্তি নাই, কিন্তু দোহাই—কামনার শ্রেষ্ঠত্ব যেন আরোপ করিয়া বসিও না। আত্মীয়তার দোহাই দিয়া এত বড আত্ম-প্রতারণা জগতে আর আছে কি না সন্দেহ!

বরণের সময় কুলা, ডালা, শ্রী কিছুই মিলিল না। বেলার মা অসহায়নেত্রে সমাগত জনমণ্ডলীর পানে চাহিলেন।

মেজদিদি বলিলেন,—আ আমার কপাল! বড়দি যে জোগাড় করেছিলেন সব। এসো দেখি।

বহুকষ্টে বড়দিদির সন্ধান মিলিল। বাটীর প্রান্ত-সীমায় তিনি এক বৃহৎ হলে কুড়ি-পঁচিশটি কুটুম্বিনীর মধ্য-স্থলে বসিয়া চোখমুখ ঘুরাইয়া কি বলিতেছিলেন, আর সমাগত মহিলারা উচ্ছ্বসিত হাসির বেগে পরস্পরের স্কন্ধে ঢলিয়া পড়িয়া কক্ষ বিদীর্ণ করিয়া সেই রস উপভোগ করিতেছিলেন।

মেজভাইয়ের স্ত্রী রেণুকার কৌতূহলটাই কিছু বেশী। সে হাসিতে হাসিতে বলিল,—তারপর বড়দি, কচুরি খেয়ে চাষা কি বল্লে?

বড়দি গম্ভীর হইয়া কহিলেন,—চাষা অনেকক্ষণ ভেবে-চিন্তে চাষানীর কাছে এসে বল্লে, হ্যাঁ ছ্যাখ্ নেপলার মা, বামুনবাড়ী যা খেয়ে এলাম তার তুলনা নেই। কি ক'রে এমন ধারা করে লো বল দিকি? চাষানী অনেক ভেবে-চিন্তে বল্লে, বোধ হয় কলুই আর গম একসাথে বুনেছেল!

সকলে খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেজদিদির আর কুলাডালার কথা জিজ্ঞাসা করা হইল না। হাসিতে হাসিতে বড়দিদির কাছে বসিয়া পড়িয়া বলিলেন,—সেই থাকমণির মোহনভোগের গল্পটা বড়দি।

বড়দিদি তৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—আর পারি না বাপু! এইমাত্তর সে গল্প হ'য়ে গেল।

মেজদিদি অনুনয় করিলেন,—তা হোক আর একবার। দোহাই তোমার লক্ষ্মীটি।

বড়দিদি বলিলেন,—গলা যে শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। ওলো ছাড় এখন। বর এসেছে—একবার দেখিগে—

মেজদিদি বলিলেন, যে ভিড় সেখানে,—কোথায় যাবে? তার চেয়ে গল্প বল, শুনি।

বড়দিদি আরম্ভ করিলেন,—

কৈবর্ত্তদের মেয়ে থাকমণি অল্প বয়সে বিধবা হয়। সংসারে তার বুড়ো মা ছাড়া আর কেউ ছিল না। হাতে কিছু নগদ টাকা ছিল, আর দুঃখ-ধান্ধা ক'রে দিন চালাতো। একদিন একাদশীতে আমার কাছে এসে বল্লে, আর শুনেছ দিদি ঠাকরুণ, কাল দশুমীতে কি অমত্তই খেলাম—আহা! যেন স্বগগের সুধা!

জিজ্ঞাসা করলুম, কি'লা, কি খেয়েছিলি? থাকোর চোখ দুটো চক্ চক্ করে উঠলো, জিভটা অল্প একটু বেরিয়ে এলো,—মুখে একটা শব্দ ক'রে বল্লে, অমত্ত গো দিদিঠাকরুণ অমত্ত। তোমাদের বুড়ো গিন্নি বলেছেলো—আসছে দশুমীতে ক'রে খাস থাকো! আহা—কি খেলাম—কি খেলাম!

—যতই জিজ্ঞাসা করি, কি? থাকো ততই গুণ-বর্ণনায় পঞ্চমুখ; নামটি আর কিছুতেই মুখে আনে না। শেষে রাগ ক'রে বল্লুম, এক ঘণ্টা ধ'রে তো কেবল কি খেলুম—কি খেলুমই কচ্ছিস; যদি নামটা বলতিস তো আমরাও না হয় একটু পরখ ক'রে দেখতুম! যাই বলা—অমনি থাক তাড়াতাড়ি বল্লে, মোহনভোগ গো দিদিঠাকরুণ—মোহনভোগ। খেতে রাজভোগ, অল্প পয়সায় বড়মানুষী খোরাক। মাথা খাও,—আর-দশুমীতে ক'রে খেও।

অবাক হ'য়ে বল্লুম, মোহনভোগ কি লা থাকি? সে আবার কেমন ক'রে করতে হয়?

থাক জেঁকে বসে বল্লে,—তবে শোন দিদি ঠাকরুণ। এক পয়সার সুজি, এক পয়সার ঘি আর আধ পয়সার চিনি বাজার থেকে কিনে নিয়ে এসে মাকে বল্লাম, উনুন জ্বাল্। দাউ দাউ ক'রে উনুন জ্বলে উঠলো। বল্লাম, চাপা

কড়া। কড়া চাপলো। তারপর, বল্লে না পেত্যয় যাবে দিদিঠাকরুণ,—সেই এক পয়সার ঘি সবখানি হড় হড় ক'রে দিলাম ঢেলে কড়ায়। ঘি যখন কল্ কল্ ক'রে উঠলো, তখন সুজি ঢেলে খুন্তি দিয়ে নাড়তে লাগলাম। বেশ লাল লাল ভাজা ভাজা হ'য়ে এলো যখন, পাশে ছিল বড় ঘটির এক ঘটি জল, দিলাম ঢেলে সবটা। তারপর খুন্তি দিয়ে কেবল নাড়তে লাগলাম। বলবো কি দিদিঠাকরুণ, নাড়তে, নাড়তে, নাড়তে হাতের নড়া ছিঁড়ে যাবার জো। এমন সময় মা দিলে চিনি ঢেলে। আবার নাড়তে লাগলাম। নাড়তে নাড়তে যেই ঘন ফুট ধরেছে, অমনি কড়াখানা উনুন থেকে নামিয়ে নিলাম। মস্ত একটা পাথরের খোরা ছিল ঘরে,—সেই মোহনভোগ,—আহা দিদি ঠাকরুণ কি যে তার রূপ,—ঢাল্‌লাম সেই খোরায়। হ'ল এক খোরা। তারপর? মুখে দিই আর নেই, মুখে দিই আর নেই। নাম মোহনভোগ, খেতে রাজভোগ, অল্প পয়সায় বড়-মানুষী খোরাক। মাথা খাও দিদিঠাকরুণ—আর-দশমীতে ক'রে খেয়ো।

সকলে হাসিতে হাসিতে গড়াইয়া পড়িল। বড়দিদি উঠিয়া বলিলেন,—আর নয়। চ—জামাই দেখিগে, নৈলে বড়বউ আবার কি মনে ক'রবে?

কলরব করিতে করিতে মেয়েরা উঠিলেন।

কথায় বলে, লোকবল—বড় বল।

কিন্তু জামাই-বরণের বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক কার্য্যের খুঁটিনাটি ধরিয়া বড়বধূ ভাবিলেন,—এমন বল যেন অতি বড় শত্রুরও না থাকে। কথায়-কথায় ক্রোধ দেখাইয়া মানের বোঝাটা অতিরিক্ত রকমে ভারী করিয়া প্রত্যেকে প্রতি পদক্ষেপটি হিসাব করিয়া করিতেছে। স্বামী নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, স্ত্রী করজোড়ে গলবস্ত্রে ত্রুটি সারিতে সারিতে প্রাণান্ত হইতেছেন। তথাপি কি মন উঠে!

ওই সিঁড়ির কাছে প্রথম ঘরখানিতে নাতিনাতিনী লইয়া বড়দিদি আশ্রয় লইয়াছেন। তিনি সকলের জ্যেষ্ঠ—মাতৃস্থানীয়া। পুত্র নাই, কন্যাও সবেমাত্র একটি ছিল; কয়েক বৎসর হইল মায়ের খর রসনা সঞ্চালনের ফলে আত্মঘাতিনী হইয়া জ্বালা জুড়াইয়াছে। নাতিনাতিনী লইয়া তাঁহার সংসার। বিধবা মানুষ, মাঝে মাঝে কাশী, বৃন্দাবন বাসের হুম্‌কি দিয়া ইহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তুলেন, কিন্তু সে ঝড়ের পূর্ব্বক্ষণে মাত্র। তুফান থামিলে হাসিয়া খেলিয়া গল্প করিয়া, ছেলেমেয়ে ঠেঙাইয়া দিনগুলি বেশ স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দেন। একটা স্বতন্ত্র রান্নাঘর তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, বিধবার আয়োজন ম্লেচ্ছপনার মধ্যে তো চলিতে পারে না।

পাশের ঘরখানিতে থাকেন ন'বউ—উমাতারা। স্বামী কাবুল-সীমান্তে কমিসরিয়েটে মোটা মাহিনার চাকুরী করেন। স্ত্রীর অলঙ্কার-পারিপাট্য দেখিলে সে সচ্ছলতার অনেকখানি অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। দুই পুত্র—কন্যা নাই। সুতরাং, নিরুদ্বিগ্নচিত্তে সংসার তরণীতে দোলা খাইতেছেন!

সেজবউ যদিও তার পাশের ঘরখানি পাইয়াছে তথাপি সে যেন আর একটু দূরে থাকিলেই ভাল দেখাইত। স্বামীর চাকুরী সামান্য;—কোন্ আপিসের ৮০ টাকা মাহিনার কেরাণী সে। স্ত্রীর কোলভর্ত্তি পুত্রকন্যা—প্রবল বন্যার মত না হইলেও সংখ্যায় নিতান্ত মন্দ নহে। হাতে শাঁখা ও রুলি, পরণে বঙ্গলক্ষ্মী শাড়ী। বিবাহ উপলক্ষে বহুকালের পুরাণো ভাঁজ-করা শান্তিপুরী শাড়ীখানি বাহির হইয়াছে, আর বাহির হইয়াছে শাশুড়ীর দেওয়া পুরাণো অনন্ত গাছি। অবশ্য এ সবের চলন্ এখন আর নাই। উপর হাতের গহনা আড়াইপেঁচ তাগায় আসিয়া ঠেকিয়াছে—অতি আধুনিক ফ্যাসানে তাহারও স্থান নাই। সেজবউ কেরাণীর স্ত্রী, তার এসব আধুনিকত্বের খোঁজখবর লইতে যাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। তাই কর্ম্মবাড়ীতে ঘষিয়া-মাজিয়া পুরাতন জিনিষগুলিকে সজ্জার উপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

পাশেই সেজঠাকুরঝির বিবিয়ানা ফ্যাসানের সাজসজ্জা তাহার দারিদ্র্যকে যেন শতকণ্ঠে উপহাস করিতেছে। সেজবোনের স্বামী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। কোথাও অন্নজলের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নাই। দু'মাস ছ'মাস করিয়া বাংলা দেশের সমস্ত স্থানের জলবায়ু চাখিয়া চাখিয়া বেড়াইতে হয়। তিনি সাহেব-ঘেঁষা বলিয়া স্ত্রীরও

পদ্দার বালাই নাই। স্বামীর সঙ্গে মোটরে চড়িয়া, টেনিস্ খেলিয়া, টি পার্টি, ডিনার পার্টিতে যোগ দিয়া দিনগুলি বেশ লঘু স্বচ্ছন্দভাবেই উড়াইয়া দেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি চকলেট বিস্কুট চাখিয়া, ঘাড় কামাইয়া খাট চুল রাখিয়া, হাঁটুর উপর স্কার্ট ঝুলাইয়া প্রজাপতির মত বিচিত্র ছন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। ব্যাঙ্কের খাতা শূন্য হইলেও ফ্যাসানের কেতা দুরস্ত। বড় বড় পার্টিতে সেজদিদি কয়েকবার ফ্যান্সি ড্রেসের পুরস্কার পাইয়াছেন।

বৈষম্যই বোধ হয় জগতের বৈশিষ্ট্য। তাহার পাশের ঘরেই পুরাদস্তর হিন্দুয়ানী বজায় রাখিয়া মেজদিদি স্বামী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ অবস্থিতি করিতেছেন। স্বামী ব্যাঙ্কের ক্যাশিয়ার ছিলেন; উপস্থিত অবসর লইয়া সঞ্চিত ক্যাশের তত্ত্ব লইতেছেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে নিজস্ব বাটী করিয়াছেন। একমাত্র পুত্র। সে-ও সম্প্রতি তাঁহার পরিত্যক্ত ব্যাঙ্কের একখানি চেয়ার দখল করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু তাহাতে সাংসারিক আয়ের কিছুমাত্র সচ্ছলতা হয় না। ছেলের পান সিগারেট চা চপেই ঐ টাকাটা খরচ হইয়া যায়। মেজদিদি সেজন্য কিছুমাত্রও দুঃখিত নহেন। নিজ বসতবাড়ীরই একাংশ জনৈক মান্দ্রাজবাসীদের চড়া হারে ভাড়া দিয়াছেন,—বলেন, এই বাড়ীই আমার রোজগেরে ছেলে! কথাটা সত্য। তাহা ছাড়া ব্যাঙ্কের কল্যাণে মোটা সুদের টাকাটা সংসারের আয়ব্যয় সম্বন্ধে বহুদিন হইতেই তাঁহাকে অভয়বাণী শুনাইয়া আসিতেছে। মানুষটি দৈর্ঘ্যপ্রস্থে দশাসই। গায়ের গহনাও খুব বেশী নাই; তবে তাগা, বালা, হার ও চুড়ি লইয়া সর্ব্বসুদ্ধ সের-পাঁচেক সোনা তাঁহার অঙ্গে চাপান রহিয়াছে। পরণে গরদের শাড়ী, দেখিলে বোধ হয় বনিয়াদী চাল।

তার পরের ঘরখানিতে থাকেন মেজভাইয়ের স্ত্রী। ভাই পুলিশ-ইনস্পেক্টর—ছুটি পান নাই। স্ত্রী তাঁহার ছয়টি কন্যা ও একটি পুত্রসহ বৃহৎ সমুদ্রের স্রোতে মিলিতে আসিয়াছেন। গৃহস্থ মানুষ, পুলিশের চাকরী করেন। স্ত্রীর অষ্ট অঙ্গে অলঙ্কারের অপ্রতুল নাই! তবে প্যাটার্ণগুলি মিশ্রিত, সেকাল ও একালের সমন্বয় বজায় রাখিয়াছেন। হিসাবী লোক বলিয়া বারে বারে বাণীর টাকাটা খচর করিতে তিনি নারাজ। পুরাতন যাহা ছিল তাহার উপর নূতন তৈয়ারী হইয়াছে এবং এখানে আসিবার সময় স্ত্রীকে বারংবার বলিয়া দিয়াছেন—সদা-সর্ব্বদা সমস্ত অলঙ্কার ও ভাল ভাল জামাকাপড় পরিয়া যেন তিনি চারিদিকে আপনার স্বামীগর্ব্ব প্রচার করিতে কুণ্ঠিত না হন। তবে সাবধানও করিয়া দিয়াছেন—উহার একখানিও যেন অসাবধানে তাঁহার অঙ্গচ্যুত না হয়। স্বামীর রুক্ষ মেজাজের কথা স্ত্রী ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই নূতন পুরাতন সমস্ত অলঙ্কার পরিয়া, মুহুর্মুহু শাড়ী বদল করিয়া স্ত্রীমহলে বেশ একটু কৌতুকের সঞ্চার করিয়াছেন।

সম্মুখের সারিতে প্রথম কক্ষখানিতে ন'দিদির স্থান হইয়াছে। কক্ষটি ছোট—মানুষও তাঁহারা সবেমাত্র দুটি। পুত্রকন্যা হয় নাই—হইবার বয়সও গিয়াছে। তথাপি স্বামী স্ত্রী কেহই অসুখী নহেন। পরের ছেলে দেখিলেই কোলে তুলিয়া আদর করেন—ভাল ভাল খেলানা কিনিয়া দিয়া তাহাদের মুখে হাসি ফুটাইতে যত্ন করেন। বোম্বাইয়ের কোন-একটা মিলের ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার ইঁহার স্বামী। নাসিকে বাড়ী কিনিয়াছেন। সময়ে সময়ে স্বামী স্ত্রী মিলিয়া ভারতের সমস্ত তীর্থ-পরিভ্রমণ করেন। অলঙ্কার বা বেশভূষার বাহুল্য নাই। স্থির সমুদ্রের জল—অল্প বাতাসে বোধ হয় এমনই তরঙ্গহীন গাম্ভীর্য্যে সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া থাকে!

ফুলদিদির স্বামী আসিয়াছেন—পুত্রকন্যারাও আসিয়াছে; তিনি নিজে আসিতে পারেন নাই। অন্তঃসত্ত্বা বলিয়া ডাক্তার নড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। পাশের ঘরখানি তাঁহার পুত্রকন্যারাই দখল করিয়াছে। স্বামী কণ্ট্রাকটার—উপার্জ্জন নেহাৎ মন্দ করেন না।

তৃতীয় ঘরখানিতে আলমোড়ার প্রসিদ্ধ যক্ষ্মা-চিকিৎসক বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার এ-এন, মিটার আশ্রয় লইয়াছেন। ইনি পঞ্চম ভ্রাতা। ডাক্তারীর আয়ে শৈলাবাসে জায়গাজমি কিনিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতেছেন। বাংলা ভাষা না ভুলিলেও বাঙালী রীতি বিস্মৃত হইয়াছেন। ভুলিয়াও ধুতি পরেন না, আসনে

বসিয়া ভোজন করেন না, বাবুর্চির রান্না ছাড়া মুখে তুলেন না। স্ত্রীর হিঁদুয়ানী প্রথম প্রথম একটু একটু ছিল। কিন্তু পাহাড়ে গোময় গঙ্গাজলের অভাবে সেটুকু বহুদিন হইতেই ধুইয়া মুছিয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। একটি মাত্র কন্যা আঠারয় পা দিয়াছে। এতদিন পর্য্যন্ত কেহ বিবাহের নামগন্ধও উত্থাপন করেন নাই। সর্দ্দা বিল সম্বন্ধে ডাঃ মিটারের কি অভিমত ঠিক বুঝা না যাইলেও বিবাহের বয়স আরও বৃদ্ধি করা উচিত, তাহা তাঁহার আচরণ হইতে অনুমান করা যায়।

চতুর্থ ঘরে জব্বলপুরের সিনিয়র উকীল এল-এন, মিত্র বাস করিতেছেন। ইনি ষষ্ঠভ্রাতা। সরস্বতীর কৃপার আধিক্য থাকিলেও লক্ষ্মীর অনুগ্রহে ইনি বঞ্চিত। কোনক্রমে স্ত্রীপুত্র লইয়া বিদেশ-বাসের ব্যয়-সঙ্কলান করিয়া থাকেন। হাতে উদ্বৃত্ত যাহা কিছু থাকে স্ত্রীর অলঙ্কার প্রসাধনেই ব্যয়িত হইয়া যায়। ফলে, তাঁহার আট-দশ বৎসরের পুরাতন চাপকান, গরম স্যুট, সামলা বনিয়াদী চাল বজায় রাখিলেও বহুদূর হইতে মাত্র পশ্চাদ্ভাগ দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বলিতে পারে—ঐ রে নরেন উকীল যাচ্ছে। স্ত্রী নবীন কালী—নব নব সখে মাতিয়া ও পুত্রকন্যাদের মাতাইয়া সদা-সর্ব্বদা ইঁহার হাড় ও মাংস ভাজা ভাজা করিয়া থাকেন।

সপ্তম ভাই—সাত বৎসর পূর্ব্বে বিবাহ ও ম্যাট্রিক ফেল, দুই কার্য্যই একযোগে সমাধা করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে সরিয়া পড়েন। বৎসরখানেক কোন সাধুর আশ্রমে থাকিয়া যোগযাগ ভজনপূজনের সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া গৃহীর শ্রেষ্ঠ যোগ কর্ম্মমার্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

পিতৃপিতামহের জমিজমার কিছু কিছু অংশ পাইয়াছিলেন, সাধুর আশ্রমে থাকিবার কালে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র, ঝাড়ফুক ও ছাইভস্মের শিকড় সংগ্রহ করিয়াছেন এবং অবসরমত বাংলা হোমিওপ্যাথি পুস্তক কিনিয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রের দুরূহ তত্ত্বও কিছু কিছু আয়ত্ত করিয়াছেন। এখনও তিনি গেরুয়া পরেন নাই, ছাই না মাখিলেও মাথা রুক্ষ—চুলে জট ধরিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি তীক্ষ্ণ, বাহুতে ও কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা বিলম্বিত, এবং চিত্ত-একাগ্রতার জন্য প্রত্যহ সকালসন্ধ্যায় ছোট কলিকার ধূমপান করিয়া থাকেন। সুতরাং সংসারযন্ত্র তাঁহার নিকট অচল নহে। অমূর্ত্তের আলোক অনুসন্ধান করিলেও ইহলোক সম্বন্ধে মোটেই অচেতন নহেন। পাঁচটি পুত্রকন্যা প্রতিনিয়ত তাঁহাকে সংসার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া রাখে। পঞ্চম ঘরখানিতে তিনি অস্থায়ী সংসার বাঁধিয়াছেন।

ষষ্ঠ ঘরে ছোট বোন কনকলতা বহুদূর হইতে আসিয়া বিশ্রাম লইতেছেন। সুদূর দক্ষিণে কোনো দেশী রাজার অধীনে ইঁহার স্বামী চাকুরী করেন। একটি মাত্র পুত্র, বছরখানেকের হইয়াছে। মাকে মা ও বাবাকে বাবা ছাড়া আরও অনেক অস্পষ্ট ভাষা সে উচ্চারণ করিতে শিখিয়াছে। তাহার অর্থবোধ লইয়া স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রত্যহ তর্কযুদ্ধ চলিয়া থাকে। খোকা হাসিয়া, হাত পা ছুঁড়িয়া, মায়ের মুখে ও বাপের গালে চুমা দিয়া সেই সব তর্কের সুমীমাংসা করিয়া দেয়। অর্থবান, স্বাস্থ্যবান এই দম্পতি ভালবাসার পথ ধরিয়া সুখ-স্বর্গের অভিমুখে চলিয়াছে। অভাবের তীব্র তাড়না সে পথে কণ্টক-গুল্মে বাধা জন্মাইয়া তাহাদের স্বচ্ছন্দ গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই। প্রেমের স্পর্শ তাহাদের দুটি হৃদয়ের পারাবারে—চিরমিলন পূর্ণিমার আলোয় স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনস্বর্গে তাহারা সুরসম্রাট ইন্দ্র ও শচী।

উপরের ত্রিতল কক্ষে বড় ভাই মণিমোহন ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কক্ষ সকলে খুড়তুত, জাঠতুত প্রভৃতি 'তুত' সম্পর্কীয়েরা আশ্রয় লইয়াছেন। ইঁহাদের বিস্তৃত ইতিহাস এই সবেরই পুনরুক্তি মাত্র। বাঙালী সংসারের অভাব-অনটন বা বিলাসবাহুল্য অথবা পরিমিত চাল-চলনের ভগ্নাংশ লইয়া ইঁহারা গঠিত। সকলেরই স্বামী পুত্র কন্যা পৌত্রের সমষ্টি-সীমায় এক একটি গণ্ডী ঘেরা। সংসার ঐ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ।

বর-বিদায়ের দিন বাড়ীতে খুব একটা হৈ চৈ উঠিল। মেজদিদি তাঁহার বিশাল বপু আন্দোলন করিয়া ও কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠ উচ্চগ্রামে তুলিয়া অতবড় বাড়ীখানা দলিয়া চষিয়া বেড়াইতে

লাগিলেন। শাপমন্যি, গালিগালাজ, শাসন-তিরস্কার, অনুনয়-বিনয়, ভয়-ক্রন্দন প্রভৃতি বিবিধ রসের বিস্তার করিয়া জানাইলেন, তাঁহার পুত্রবধূর গলার হার খোয়া গিয়াছে। কে লইয়াছে তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, শুধু আত্মীয়তার খাতিরে এতক্ষণ পুলিশ ডাকেন নাই। যদি না সে হার বাহির করিয়া দেয় তো চক্ষু লজ্জার খাতির করিবেন না—একথাও প্রবল কণ্ঠে বারংবার জানাইয়া দিতেছেন। প্রথম সারির তৃতীয় কক্ষখানিই তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টির লক্ষ্যস্থল।

তাঁহার দৃষ্টির অনুসরণ করিয়া মেজবৌ বলিল,—ওমা, কি ঘেন্না! কি প্রবৃত্তি গো! ছোটবৌ আশ্বাস দিয়া কহিল,—ভয় কি মেজঠাকুরঝি, আমার ঘরে এসো। উনি এখনি গুণে গেঁথে বলে দেবেন, কোন্ চোরের কাজ এ।

অন্যান্য সকলে শতমুখে হায় হায় করিতেছিলেন। ছোটবৌয়ের কথা শুনিয়া যেন অকূলে কূল পাইলেন। একসঙ্গে প্রবল কলরব তুলিয়া কহিলেন,—তাই চল গো—তাই চল। ছোটকর্ত্তা যখন সাধুসন্ন্যাসীর ঠেঁয়ে এমন বিদ্যেটা শিখে এসেছে, তখন পরখ করতে আপত্তি কি?

আপত্তি কাহারও ছিল না। অবিলম্বে ছোটকর্ত্তার ঘরে ভিড় জমিয়া গেল।

তিনি খড়ি পাতিয়া, মেজদিদির হাতের রেখা কচলাইয়া, দুই চক্ষু উর্দ্ধে তুলিয়া বহুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন, পরে একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—সে আর শুনে কাজ নেই মেজদি।

মেজদি চক্ষু ঘুরাইয়া কহিলেন,—তবু শুনি?—ছোটকর্ত্তা আবার ধ্যানস্থ। নির্ব্বাক্। বহুক্ষণ অনুনয়-বিনয়ের পর কহিলেন,—নাম আমি বলবো না। তবে জেনে রাখ—এ তোমার আপনার লোকের কাজ।

মেজদিদি শেষ পর্য্যন্ত না শুনিয়াই বোমাফাটার মত শব্দমুখর হইয়া উঠিলেন,—থাক আর বলতে হবে না। আমি বুঝেছি—বলিতে বলিতে একরূপ ছুটিয়াই তৃতীয় কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেজবৌয়ের হাত ধরিয়া একটা হেঁচকা টান দিলেন। এ্যাঁ এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমার বোয়ের গয়নায় হাত! ছোট পুত্রটিকে ঘুম পাড়াইয়া সেজবৌ সবেমাত্র জলযোগ করিতে বসিয়াছিল। মিষ্টিটায় একটা কামড় দিয়া জলের ঘটিটা এক হাতে তুলিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময়ে এই প্রচণ্ড আকর্ষণ।

তৃষ্ণার্ত্ত কণ্ঠ ছাপাইয়া ভয়ার্ত্ত করুণ স্বর বাহির হইয়া পড়িল,—মেজদি!

মেজদি ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—চোরের কান্না দেখে আর বাঁচি না! নে, ঢং রাখ, বার কর আমার হার।

মেজবৌ গরীব কেরাণীর স্ত্রী। এতগুলি অতিথ-অভ্যাগতের মধ্যে তার অবস্থা শোচনীয়, সুতরাং চৌর্য্য যে একমাত্র তাহারই অপরাধ তাহা বলিতে ধনগর্ব্বিতার বাধিবে কেন? যদিও সেজবৌয়ের ঘর মেজদিদির ঘরের পাশে নহে। তাঁহার দুই পার্শ্বের ঘরে সেজদিদি ও মেজ-বৌ বাস করিতেছে। কিন্তু অবস্থা উভয়েরই উন্নত। একজনের স্বামী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট,—অন্যের পুলিশ ইন্স্পেক্টর। সন্দেহের সাধ্য কি তাহার ধার ঘেঁষিয়াও চলে। তাই ইহাদের মধ্যে সবচেয়ে অপরাধী সেজবৌকে দোষী সাব্যস্ত করিতে বড়মানুষ ননদের কিছুমাত্র বাধিল না। কারণ, সে আর যাহাই হউক—দরিদ্র।

সেজবৌ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ঘুমন্ত পুত্রের মাথায় হাত রাখিয়া বলিল,—আমি যদি নিয়ে থাকি মেজদি, তো একরাত্তির যেন—

কে পিছন হইতে আসিয়া তীক্ষ্ণকণ্ঠে বাধা দিয়া কহিল,—থাম সেজবৌদি, মা হ'য়ে অমন কঠিন দিব্যি করো না। পরে মেজদিদির পানে ফিরিয়া তেমনি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—ছিঃ! ছিঃ! তোমার লজ্জাও হ'লো না মেজদি, এই এক বাড়ীর লোকের সামনে সেজবৌকে চোর ব'লে শাসন করতে! কি অপরাধ ওর! গরীব ব'লে কি ও মানুষ নয়, না মানসম্ভ্রম নেই?

সকলে মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সদাহাস্যময়ী ন'দিদির মুখ বজ্রগর্ভ মেঘের মত ভীষণ গম্ভীর। মেজদিদি ক্ষণকাল চুপ করিয়া কি যেন ভাবিয়া লইলেন; পরে সহসা লুপ্ত বিক্রম জাগাইয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন,—বেশী বকিসনে

শৈল, পুলিশে খবর দিলে দোষী নির্দ্দোষী এখনি টের পাওয়া যাবে তা জানিস ?

শৈল দমিল না, তেমনি নির্ভীক কণ্ঠে কহিল,—দু'দশ ভরি সোনার জন্যে যদি আত্মীয়স্বজনকে এমন লাঞ্ছিত করাই তোমার ইচ্ছে হয় মেজদি, বেশ তাই কর। পুলিশ ডাক—প্রমাণ হোক। কিন্তু এ-ও ব'লে রাখছি, প্রমাণ করতে না পারলে, তার পরের ব্যবস্থা আমিই ক'রবো মনে রেখো।

জনতা মুহূর্ত্তে সরিয়া গেল। মেজদিদি উপযুক্ত জবাব পাইয়া মুখ এতটুকু করিয়া শাসাইতে শাসাইতে গেলেন,—আচ্ছা দেখব, কার তেজ কতদূর গড়ায়! যদি পুলিশ না ডাকি তো—ইত্যাদি।

কিন্তু তিনি পুলিশ ডাকিলেন না, ডাকিলেন স্বামীকে, বলিলেন,—আর একদণ্ড নয়, এ চোরের বাড়ীতে থেকে আমার সর্ব্বস্ব খোয়াতে পারব না—ডাক গাড়ী।

ন'দিদি সেজবৌয়ের মাথাটি সস্নেহে কোলে তুলিয়া বলিলেন, চুপ কর সেজবৌদি—কেঁদ না। ওরা মানুষ নয়, চামার। কাল রাতে দেখলে তো একধামা লুচির জন্য বড়দিদির কি অপমানটাই না করলে ? তাঁর দোষ নাতিনাতনীদের একটু ভালবাসেন, মা-মরা ছেলে-মেয়েগুলো! বাছারা খাবে ব'লে একধামা লুচি ঠাকুরের ঠেঁয়ে চেয়ে নিয়ে ঘরের মধ্যে এনে রেখেছিলেন। ছোট বৌ অনায়াসে বল্লে কি না, বড়দি পরিবেশনের সময় সরিয়ে রেখেছে! ছি-ছি! ইতরের মত ওরা সামান্য জিনিষ নিয়ে কি ক'রে এমন লোক-হাসাহাসি করে আমি তাই ভাবি!

আরও একটা দুঃসংবাদ অবিলম্বে—প্রচার হইয়া পড়িল। জামাইয়ের হাতের হীরার আংটি পাওয়া যাইতেছে না। জামাই বাসরঘরে একবারমাত্র খুলিয়া বিছানার উপর রাখিয়া রাত্রিতে আহার করিতে গিয়াছিল, আসিয়া দেখে আংটি নাই। নূতন জামাই, কেহ রহস্য করিয়াছে ভাবিয়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে পারে নাই। প্রাতঃকালে বরের পিতা আসিয়া আংটির খোঁজ করাতেই ব্যাপার প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কৌতুক পরিহাস গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে।

ছোটবৌ আসিয়া বড়বৌকে বলিল,—বড়দি যদি একবার ওঁর কাছে গুণিয়ে আসতে পার—

বড়বৌ বাধা দিয়া গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দিলেন, তাতে ফল কি ছোটবৌ। যে নিয়েছে সে এই বাড়ীরই লোক, আমাদের আত্মীয়। আমাদের জিনিষ যদিই আমরা ফিরে পাই তার লজ্জার অপমানটা ঢাকবো কি দিয়ে। চোর যেই হোক অপমানটা বিঁধবে গিয়ে আমাদেরই। লোকে বলবে অমুকের অমুক এই কাজ করেছে। না ছোটবৌ—মাথা হেঁট আমি করাবো না, টাকার উপর দিয়ে যায় সে ভাল। উনি আংটি কিনে আনতে গেছেন।

ন'দিদি অদূরে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিলেন। দ্রুতপদে সেখানে আসিয়া বড়বৌয়ের পায়ে একটা প্রণাম করিয়া কহিলেন,—মানুষ যে, সে এই কথাই বলে বড়বৌদি। ইচ্ছে ক'রছে তোমায় পূজা করি।

পরে ছোটবৌয়ের পানে ফিরিয়া হাসিমুখে কহিলেন,—আচ্ছা ছোটবৌ গণকেরা নিজের অদৃষ্ট গুণতে পারে না, নয় ? তা হ'লে অনেক ব্যাপারই জান্‌তে পারা যেত।—

ছোটবৌ মুখখানি কাঁচুমাচু করিয়া সহসা সক্রোধে বলিল,—টাকার গরমে তুমি ধরাখানা সরাখানা দেখো, না ন'দি! আমরা ঘাস খাই না,—কিছু কিছু বুঝি। বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

কনকের স্বামী বলিল,—সব দেখে শুনে মনে হয় কনক, আমরা বেশ আছি। আত্মীয়তার বালাই যার যত নেই সে তত সুখী।

কনক কহিল,—আত্মীয়-বান্ধব নিয়েই তো সমাজ। তবে ওসব বজায় রাখতে গেলে, কিছু কিছু ত্যাগস্বীকার করতে হয়। নৈলে গণ্ডী ঘিরে কেউ কখনও পরিপূর্ণ সুখটুকু পায় না।

খোকা তাহার গালের কাছে কচি মুখখানি আনিয়া ডাকিল,—মা!

চুকনক তাহার অধরে স্বন আঁকিয়া দিতে দিতে হাসিয়া

কহিল,—কিন্তু এরা ডাকাত। একদণ্ডের এতটুকু সুখকে ত্যাগ করতে চায় না, জোর করে আদায় করে।

কক্ষান্তরে ডাক্তার মিটার তাঁহার পত্নীকে বলিতেছিলেন, দেখলে তো মিনু, বাঙালীর কুসংস্কার! এত অল্পবয়সে বিয়ে——

পত্নী কহিলেন,—ওসব কথা এখন থাক। পরের বাড়ীতে না-ই-বা করলে ওসব আলোচনা!

ডাঃ মিটার বলিলেন,—বল কি মিনু? যা কুসংস্কার তা উচ্ছেদের জন্য আমি চিরকাল প্রাণপণ ক'রে এসেছি, হ'লেই বা ভাইয়ের বাড়ী! বাঙালীদের এই কুসংস্কার—

পত্নী হাসিয়া বলিলেন,—ওগো সায়েব মানুষ, থাম। তোমার ও গরম বক্তৃতা পরিপাক করবার মত শক্তি সকলের থাকে না। আর কি ক'রবে লেকচার দিয়ে! বিলেত ঘুরে সায়েব হ'য়ে এলেও ভাগ্যক্রমে বাঙালীর ঘরেই যখন জন্মগ্রহণ করেছ তখন এ সমাজের দোষ কীর্ত্তন ক'রলেই তো তোমার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে না।

ডাঃ উত্তেজিতকণ্ঠে কি বলিতে যাইতেছিলেন,—বয় আসিয়া সেলাম জানাইল,—হুজুর খানা তৈয়ারী।

অতঃপর বাক্যব্যয় না করিয়া সাহেব ভোজনকক্ষে চলিলেন।

নবীনকালী স্বামীকে কহিলেন,—বিয়ে তো ফুরুলো, এরই মধ্যে আমি কিন্তু ফিরছি না। দিনকতক ক'লকাতায় থেকে থিয়েটার, বায়স্কোপ, সার্কাস,—মিউজিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখে কিছু জামাকাপড় কিনে জব্বলপুর যাব। একখানা ছোটখাটো বাড়ী দেখ।

সভয়কম্পিত অন্তরে শুষ্কস্বরে উকীল-স্বামী বলিলেন,—কিন্তু আমার কোর্ট যে পরশু খুলবে?

পরম উদাসীনভাবে নবীনকালী কহিলেন,—বেশ তো তুমি যাও কোর্ট করগে। ভূপেনকে নিয়ে আমি সব দেখে বেড়াব। ভাল কথা, এখন কিছু টাকা দিয়ে যাও, তারপর সেখানে গিয়ে মনিঅর্ডার করো। ন'দিদির মত ব্লাউজ, মেজদিদির মত গরদের লালপাড় সাড়ী, ফুলীর মত একটা ব্রুচ, আর বড় বৌদির মত ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী ক'খানা আমার চাই।

উকীল-স্বামী কোন উত্তর না দিয়া আলনায়-টাঙানো আপনার দশ বৎসরের পুরাতন কোটটির পানে একবার সতৃষ্ণ করুণ নয়নে চাহিলেন!

সেজবৌয়ের স্বামী কহিলেন,—তুমি না হয় দিনকতক এখানে থেকে যাও। ছেলেপুলেগুলো ম্যালেরিয়া জ্বরে ভুগে ভুগে অস্থি-চর্ম্মসার হয়েছে, একটু সেরে উঠুক।

সেজবৌ ছল ছল চক্ষে উত্তর দিল,—আমার আসাই অন্যায় হয়েছে। চোর বদনাম কপালে লেখা ছিল, পেলুম, আর কেন! যার পয়সা নেই তার এ সব সাধ-আহ্লাদ কেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামী বলিলেন,—তা ঠিক। গরীবের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা!

বিদায়কালে বেলা একে একে সকলকে প্রণাম করিল। সকলেই নববিবাহিতাকে অবস্থানুযায়ী নূতন নূতন যৌতুক দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সেজবৌয়ের পায়ে প্রণাম করিতেই সে লজ্জাবিবর্ণ মুখখানি নত করিয়া কুণ্ঠিতস্বরে কহিল,—স্বামী সোহাগিনী হও, এর চেয়ে বড় আশীর্ব্বাদ আমার নেই।

বেলা বলিল,—কাকীমা, আমায় কিছু দেবেন না?

সেজবৌ ম্লানমুখী হইয়া মৃদুস্বরে কহিল,—সোনাদানা কিছুই তো আমার নেই মা, আছে শুধু এই দুগাছা শাঁখা। এত লোকের সাম্‌নে এ বার করতে লজ্জায় যে আমার মাথা কাটা যাচ্ছে, বেলা!

বেলা সলজ্জ হাসি হাসিয়া তাঁহার হাত হইতে শাঁখা দু'গাছি লইয়া পরম শ্রদ্ধাভরে আপনার মাথায় ঠেকাইল ও তেমনি পুলক-কম্পিত মৃদুস্বরে কহিল,—আজ এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ সম্পদ কেউ তো আমায় দান করেন নি, কাকীমা।—বলিয়া অবনত হইয়া আর একবার তাঁহার পায়ের ধূলা তুলিয়া মাথায় লইল।

পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ডাঃ মিটার সমস্ত লক্ষ্য করিতেছিলেন। তিনি ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া আপন কন্যা মীরাকে কহিলেন,—কি কুসংস্কার মীরা! লেখাপড়া

জানা মেয়ে বেলার কাছে ওই ক্যাটাভ্যারাস শাঁখার মূল্যই বেশী হ'ল ?

মীরা হাসিয়া বলিল, আমার কাছেও বাবা।

অতি বিস্ময়ে দুই চক্ষু কপালে তুলিয়া ডাঃ মিটার বলিলেন,—তুইও একথা বলছিস মীরা ?

মীরা তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল,—আমি হিন্দুধর্ম্মের কোনো শিক্ষাই পাইনি বাবা, কিন্তু মনুষ্য-ধর্ম্মের কিছু কিছু তোমারই কাছে শিখেছি। অন্তরের অকৃত্রিম দান ব'লে ওই শাঁখা জোড়াটা মাথায় তুলে নিতে আমিও রাজী আছি বাবা। মানুষকে যে এটুকু দিতেই হবে।

ডাঃ মিটার বলিলেন,—আর এত ভাল ভাল দামী উপহারগুলো বুঝি কিছুই নয় মীরা ?

মীরা হাসিয়া বলিল, ওখানে যে ঐশ্বর্য্যের পাল্লা দেওয়া চলেছে, একের অপরকে খাটো করবার চেষ্টা প্রবল হয়ে ফুটে উঠেছে। তুমিই বল দেখি বাবা, উঠেছে কি না ?

—বলিয়া ক্ষণকাল পিতার পানে চাহিয়া বলিতে লাগিল,—আর আমি দেখছি সেজ জেঠাইমা যখন বেলাকে শাঁখাগাছি দেন, তখন কত না লজ্জিত, কত না কুণ্ঠিত। কিন্তু চোখেমুখে ওঁর কি আন্তরিকতাই না ফুটে উঠেছিল! যেন যথার্থ কল্যাণময়ী মা—ঈশ্বরের কাছে অকপটে সন্তানের মঙ্গল কামনা করছেন।

কন্যার কথায় ডাঃ মিটার সহসা গম্ভীর হইয়া সিগার ধরাইয়া ধূম্র উদ্গীরণ করিতে লাগিলেন।

মহাকাল শর্ব্বরী

শ্রীজীবনময় রায়

আজি ফাল্গুনী পূর্ণিমা নিশি ঘেরিয়াছে মেঘজালে ;
খর চঞ্চল পূরবী পবন পরশিছে আসি ভালে।
ইন্দু-কিরণ-লিখা
বিদ্যুৎ অসি রূপে ঝলকিছে, হানিছে অগ্নিশিখা।
পঙ্কিল হ'ল অম্বরতল, শঙ্কিল বনরাজি,
ধরণী গগনে শ্বসিছে সঘনে শাখানাগিনীরা আজি।
পঞ্চশরের ফুলবন মথি' এ কোন মত্ত করী,
নির্ম্মম রোষে মাতিয়া বেড়ায় গগনাঙ্গন ভরি'।

কতদিন বসি' কল্পনালোকে আজি সায়াহ্নটিরে
রচিয়া রচিয়া তুলেছিনু সুখে কত রঙে রসে ঘিরে।
শিশুকাল হ'তে যত রূপকথা যতেক আখ্যায়িকা ;
আজিকার এই সন্ধ্যাবাসরে দিয়েছিল রাজটীকা।
সাগর হইতে সুনীলকান্ত, আকাশ হইতে চুনী,
ত্রিদিব হইতে এনেছিনু লুটে আজিকার ফাল্গুনী।

কত দুর্গম গিরির শিখরে, কত বিনিদ্র পুরে,
সিন্দবাদের রত্নগুহায় ফিরিয়াছি ঘুরে ঘুরে।
আম্রমুকুল ঘন সুগন্ধ-ধূপে সন্ধ্যার ছায়া
ভরিয়া তুলেছি পুলকোৎসবে রচিয়া রঙীন মায়া।
তারি মাঝে মোর চিত্তপুরের মণিকোঠাবাসিনীরে
অরুণ লেখার সোনার কাঠিতে জাগায়ে তুলিব ধীরে ;
চন্দ্রকিরণ চন্দন লেখা শুভ্র ললাটে তব
স্বপনজড়িত নয়ন-আলোকে মনে হবে অভিনব ;
এই ছিল মোর মনে,
সহসা কখন ভাঙিল স্বপন গম্ভীর নিঃস্বনে।
আকুলি' উঠিল শান্ত আকাশ ব্যাকুল বক্ষতল
অন্ধ আবেগে আম্রবীথিকা হইল বিচঞ্চল।
ঝর ঝর ঝরে চূতমঞ্জরী থর থর কাঁপে পাতা,
চিত্ত মাঝারে উঠে হাহাকারে কলক্রন্দন গাথা।
আজি ফাল্গুনী পূর্ণিমা মোর নিমেষে ব্যর্থ করি'
ঝঞ্ঝাডমরু নিনাদে নামিল মহাকাল শর্ব্বরী।

মানুষের মন

ডাঃ শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু, ডি-এস্‌সি, এম-বি

অপবিজ্ঞান

এক এক সময়ে এক একটা কথার ভূত আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "বিজ্ঞান" কথাটি এইরূপ আমাদের স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিয়াছিল। তখন সব বিষয়ে আমরা 'বিজ্ঞানসম্মত কারণ,' 'বৈজ্ঞানিক গবেষণা' ও 'বৈজ্ঞানিক যুক্তি'র আশ্রয় লইতাম। পরে "বিদ্যুৎ" কথাটা ঘাড়ে চাপিল। তখন 'টিকিতে বিদ্যুৎ,' 'কোষাকুষীতে বিদ্যুৎ,' 'তুলসী গাছে বিদ্যুৎ,' 'জীবনী শক্তির মূলে বিদ্যুৎ' দেখিতে লাগিলাম। সম্প্রতি "মনস্তত্ত্ব" কথাটা সাধারণের স্কন্ধে ভর করিয়াছে। 'বৃদ্ধের মনস্তত্ত্ব,' 'শিশুর মনস্তত্ত্ব,' 'বোমার মনস্তত্ত্ব,' 'দুর্ব্বৃত্তের মনস্তত্ত্ব,' psychological moment, slave mentality ইত্যাদি কথা শুনিতে শুনিতে কান পচিয়া গেল। অতি-আধুনিক সাহিত্যে পাঁচ বৎসর বয়স্ক নায়কও এখন মনস্তত্ত্বের দোহাই না দিয়া কথা বলে না।

যখন যে বিজ্ঞানের কথা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত হয় তখনই সেই বিজ্ঞানের আশ্রয়ে এক একটি অপবিজ্ঞান গড়িয়া ওঠে। মনোবিদ্যারও এইরূপ অপবিজ্ঞান সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহারই প্রভাবে যেখানে সেখানে মনোবিদ্যার বুক্‌নি শোনা যাইতেছে। ভুল পথেই হোক, আর ঠিক পথেই হোক, মনোবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণের কৌতুহল জাগিয়াছে—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মনোবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞান

মনোবিদ্যা অতি-আধুনিক বিজ্ঞান। বহু পুরাকাল হইতে মনোবিদ্যার চর্চ্চা প্রচলিত থাকিলেও মাত্র কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসর হইল ইহা বিজ্ঞানের আসন পাইয়াছে। যে মন লইয়া সকলকেই কারবার করিতে হয় তাহারই বিজ্ঞানের উৎপত্তি অন্যান্য বিজ্ঞানের পশ্চাতে হইয়াছে। ভূতবিদ্যা বা Physics, কিমিতি-বিদ্যা বা Chemistry, জ্যোতিষ, ইত্যাদি জড়বিজ্ঞান বহুকাল পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখনও অনেক পণ্ডিত মনোবিদ্যাকে বিজ্ঞানের আসন দিতে প্রস্তুত নহেন। বিজ্ঞানের ইতিহাসে মনোবিদ্যার আসন যে সকলের শেষে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। মানুষের অনুসন্ধান-প্রবৃত্তির উপর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, বহির্বস্তু সম্বন্ধে মানুষ যতটা কৌতূহলী, তাহার নিজের মনে কি হইতেছে সে সম্বন্ধে ততটা নহে। এই কারণেই মানুষ মনোবিদ্যার দিকে বিশেষ আকৃষ্ট হয় নাই। সকল অবস্থায় অন্তর্দর্শনের চেষ্টা ভিন্ন মনোবিজ্ঞানের উন্নতি হইতে পারে না, কিন্তু অতি অল্পলোকেরই অন্তর্দর্শনের ইচ্ছা মনে উঠে। কঠোপনিষদে আছে,—

> পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু
> তস্মাৎ পরাঙ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
> কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষ
> দাবৃত্ত চক্ষুর মৃতত্বমিচ্ছন্॥ ১ ॥
>
> পরমুখী হলদ্বার স্বয়ম্ভু বিধানে
> দৃষ্টি পরমুখী নহে অন্তরাত্মা পানে
> কদাচিৎ কোনো ধীর অমৃত সন্ধানে
> আবরিয়া চক্ষু দেখে প্রত্যক আত্মনে।

অতএব মানুষের কি অপরাধ! স্বয়ম্ভু ভগবান সাধারণ মানুষের দৃষ্টি বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। বাহিরের জড়বস্তু লইয়াই মানুষের তৃপ্তি। কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তির আত্মদর্শনের ইচ্ছা দেখা দেয়। এইজন্যই মনোবিদের সংখ্যা অন্যান্য বৈজ্ঞানিকের তুলনায় কম এবং মনোবিজ্ঞানেরও উন্নতি অন্যান্য বিজ্ঞানের পরেই হইয়াছে।

মানুষের নিজের মন পর্য্যবেক্ষণ করিতে স্বভাবগত অনিচ্ছা আছে। আমরা যখন রাগি তখন যাহার উপর রাগ হইয়াছে তাহাকে শাস্তি দিতে মন নিবদ্ধ থাকে। রাগের সময় নিজের মনোভাবের কি পরিবর্ত্তন হইতেছে

না হইতেছে, সে দিকে দৃষ্টি থাকে না। কেহ সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেও দেখিতে ইচ্ছা হয় না। বাঘ দেখিয়া ভয় পাইলে পলাইতে ব্যস্ত হই। ভয়ে মনের কি পরিবর্ত্তন ঘটিল তাহা দেখিবার অবসর থাকে না। সামান্য সামান্য বিষয়েও দৃষ্টি অন্তর্মুখ না হইয়া বহির্মুখে ধাবিত হয়। মনকে তাহার স্বভাবগত বহির্মুখিতা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া অন্তর্মুখ না করিতে পারিলে মনোবিৎ হওয়া যায় না। হিন্দুশাস্ত্রের আদর্শের দিক দিয়া দেখিতে গেলে এই হিসাবে মনোবিজ্ঞানের স্থান সকল বিজ্ঞানের উপরে। আত্মার সাক্ষাৎকারের চেষ্টাই হিন্দুধর্ম্মের চরম উপদেশ। শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা অন্নময় ইত্যাদি পঞ্চকোষ দ্বারা আবৃত। মনোময়কোষ ইহাদের অন্যতম। মনোময় কোষের ভিতর দিয়া না যাইলে আত্মদর্শন সম্ভব নহে। মনোবিদ্যা এই মনোময় কোষের স্বরূপ বুঝাইতে চেষ্টা করে, সেজন্য মনোবিদ্যা আত্মদর্শনের সহায়ক। একমাত্র মনোবিদ্যাই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে সাত্ত্বিক বিদ্যা, অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞান রাজসিক। তাহারা মনকে বহির্মুখ করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। মনোবিদ্যা মনকে অন্তর্মুখ করে ও আত্মজ্ঞান লাভে সহায়ক হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্র

প্রত্যেক বিজ্ঞানই নিজ নিজ আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা গণ্ডী ঠিক করিয়া লয়। বিজ্ঞানের প্রথম অবস্থায় এই গণ্ডী খুব নির্দ্দিষ্ট না হইলেও বিজ্ঞান যতই উন্নতি লাভ করে গণ্ডী ততই স্পষ্টতর হয়। প্রথম অবস্থায় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সহিত ভূতবিদ্যা, কিমিতি-বিদ্যা ইত্যাদি নানা বিজ্ঞান জড়িত ছিল। পুরাকালে কেহ পৃথক কিমিতিবিদ্যার আলোচনা করিতেন না। যিনি চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা করিতেন তিনি চিকিৎসা-তত্ত্বের অঙ্গরূপে কিমিতি-বিজ্ঞান শিখিতেন। যেদিন হইতে ভূতবিদ্যা ও কিমিতিবিদ্যা চিকিৎসাশাস্ত্র হইতে পৃথক হইল এবং নিজ নিজ গণ্ডী ও আলোচ্য বিষয় স্থির করিয়া লইল, সেইদিন হইতেই এই দুই বিদ্যা দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। এখনও চিকিৎসককে কিমিতি-বিদ্যা শিখিতে হয়, কিন্তু এই বিজ্ঞানকে কেহ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন না। কিমিতি-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হইতে পৃথক বলিয়া এখন সকলেই জানিয়াছেন। অবশ্য এই দুই বিজ্ঞানের পরস্পর আদান-প্রদান থাকা কিছু বিচিত্র নহে।

মনোবিজ্ঞানের স্বাতন্ত্র্য

মনোবিদ্যা প্রথমতঃ দর্শনশাস্ত্রের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। অল্পদিন হইল মনোবিদ্যা দর্শনশাস্ত্র হইতে পৃথক হইয়া নিজের ক্ষেত্র নির্দ্দেশের চেষ্টা করিতেছে। এখনও অনেক মনীষী মনোবিদ্যাকে স্বাতন্ত্র্য দান করিতে স্বীকৃত নহেন। একদিকে দার্শনিক যেমন মনোবিদ্যার উপর নিজের দখল সাব্যস্ত করিতে ব্যস্ত, অপরদিকে তেমনি শারীরশাস্ত্রবিদ (Physiologist) বলিতেছেন, মনোবিদ্যার উপর অধিকার আমার। শরীরের বিশেষ বিশেষ পরিবর্ত্তনে মনের পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। শরীরের পরিবর্ত্তন যখন শারীরবিদ্যার আলোচ্য বিষয়, তখন তাহার আনুষঙ্গিক মানসিক পরিবর্ত্তনও শারীরবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত। শারীরবিদ্যা ছাড়া মনোবিদ্যার পৃথক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। আরও একদিক হইতে মনোবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে আপত্তি উঠিতেছে। কোনো কোনো প্রাণিবিৎ বলিতেছেন, মনোবিদ্যা বিজ্ঞানের আসন পাইতে পারে না। পরের মন আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় নয় এবং সে সম্বন্ধে কিছুই নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভবপর নহে। অপরের কথায় বা ব্যবহারে তাহার মনোভাব প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহা প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত নয় বলিয়া বৈজ্ঞানিকের পরিত্যজ্য। ইতরপ্রাণীর মনের যেমন আলোচনা চলে না, তাহার ব্যবহার মাত্র পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, সেইরূপ মানুষেরও মনের আলোচনা না করিয়া কোন্ অবস্থায় পড়িলে তাহার কিরূপ ব্যবহার হয় তাহাই বৈজ্ঞানিকের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এই হিসাবে মনোবিদ্যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই—তাহা প্রাণিবিদ্যার অন্তর্গত মাত্র।

প্রাণিবিদের আপত্তি

প্রাণিবিদের আপত্তি বিচার করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, মনোবিদ্যার স্বাতন্ত্র্য দানে আপত্তির প্রধান কারণ, মন-পর্য্যবেক্ষণের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা। একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, একমাত্র নিজের মন ব্যতীত অপরের মন প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না। মন স্বতঃই চঞ্চল এবং তাহার পর্য্যবেক্ষণও দুরূহ ব্যাপার সন্দেহ নাই। কিন্তু দুরূহ বলিয়াই তাহা অসম্ভব নহে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মন পর্য্যবেক্ষণের ফলাফল জানাইতে পারেন এবং এই সমস্ত "দত্তি" (data) লইয়া মনোবিজ্ঞান গড়া সম্ভব। কেবল মাত্র প্রত্যক্ষের উপরেই যে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইবে এমন কথা নহে। যুক্তিযুক্ত অনুমান সকল বিজ্ঞানেই স্থান পাইয়া থাকে। অপরকে চিম্‌টি কাটিলে তাহার যে লাগে তাহা অনুমানমাত্র। কারণ বেদনাটা আমরা দেখিতে পাই না, —অপরের কথা শুনিয়া ও তাহার মুখভঙ্গী দেখিয়া বেদনার অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। কিন্তু এই অনুমানের মূল্য যে প্রত্যক্ষেরই অনুরূপ তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব মনোবিৎ প্রাণিবিদের আপত্তি গ্রাহ্য করিবেন না।

শারীরবিদের আপত্তি

শরীরের পরিবর্ত্তনে মনের পরিবর্ত্তন হয় একথা সত্য বলিয়া পৃথকভাবে যে মনের পর্য্যবেক্ষণ করা চলে না তাহা নহে। এমন অনেক অবস্থা আছে, যেখানে শরীরের কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত না হইলেও মনের গুরুতর পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব। কি অবস্থায় মনের কি পরিবর্ত্তন হয়, মনোবিৎ তাহা অবশ্য লক্ষ্য করিবেন, কিন্তু অবস্থাটাকেই বড় মনে করিয়া মন-পর্য্যবেক্ষণকে নিষ্ফল মনে করা ভুল। রোগে শারীর-ক্রিয়া বিপর্য্যস্ত হয়, কিন্তু সেজন্য কেহ শারীরশাস্ত্রকে রোগবিজ্ঞান মনে করেন না। অতএব শারীরবিদের কথায় মনোবিদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার কোনই কারণ নাই। অপরপক্ষে শারীরবিদের আপত্তির উত্তরে মনোবিৎ বলিতে পারেন, মনে পরিবর্ত্তন হইলে শরীরে পরিবর্ত্তন হয়, অতএব শারীরশাস্ত্র মনোবিদ্যার অন্তর্গত হওয়া উচিত।

দার্শনিকের আপত্তি

দার্শনিকের আপত্তি ভিন্ন প্রকারের। তিনি বলেন, মানসিক ব্যাপার লইয়া আমরা কারবার করি। অতএব মনোরাজ্যে আমাদেরই অধিকার। দার্শনিক চরমতথ্যের বিচার করেন, বৈজ্ঞানিক তাহা করেন না। কি প্রকারে পরমপদ লাভ হয়, মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি, ইত্যাদি প্রশ্ন দার্শনিক সমাধান করিবার চেষ্টা করেন। মানসিক ব্যাপারের পর্য্যবেক্ষণ তাঁহার চরমলক্ষ্য নহে। মানসিক প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিচার করিয়া, কি করিয়া পরমসত্যে উপনীত হওয়া যায় তাহাই তিনি নির্দ্দেশ করেন। মানসিক ব্যাপার তাঁহার কাছে এই সত্যে পৌছিবার করণ মাত্র। পদার্থবিদ্যার তথ্যও তিনি করণরূপে ব্যবহার করেন। মনের পর্য্যালোচনাই মনোবিদের চরম-লক্ষ্য। দার্শনিক-বিচারে তাঁহার অধিকার নাই। শিল্পী, পেন্সিল তুলি ইত্যাদি লইয়া কারবার করেন, কিন্তু পেন্সিল তুলি নির্ম্মাণ ও তাহাদের গুণাগুণ পরীক্ষা তাঁহার আয়ত্বাধীন নহে। একাজ অন্য লোকের। ডাক্তার ছুরি ব্যবহার করেন, কিন্তু তিনি যে ছুরি-সম্পর্কীয় সমস্ত ব্যাপার জানিবেন তাহা আশা করা ভুল। সেইরূপ দার্শনিকের নিকট মনোবিদ্যার তথ্য প্রত্যাশা করা সমীচীন নহে। কেবলমাত্র মনোবিদ্‌ই মনোবিদ্যা অনুশীলনের পূর্ণ অধিকারী, অপরে নহে।

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়

মনোবিদ্যার সহিত অন্যান্য বিজ্ঞানের সম্পর্ক থাকিলেও বিজ্ঞান-হিসাবে মনোবিদ্যার আসন যে পৃথক তাহা আর অস্বীকার করা চলে না। মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয়ে বৈশিষ্ট্য আছে এবং তাহারও একটা গণ্ডী আছে। এই গণ্ডী মনোবিদ্যাকে অন্যান্য বিজ্ঞান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। একটা উদাহরণ লওয়া যাক্। ঘণ্টা বাজিতেছে। পদার্থবিৎ, শারীরবিৎ, প্রাণিবিৎ, দার্শনিক, মনোবিৎ, সকলেই সেই শব্দ শুনিতেছেন। পদার্থবিদের কাছে

শব্দটা বায়ুর কম্পনমাত্র। শারীরবিৎ বিচার করিতেছেন, সেই শব্দে কর্ণপটহ কিরূপ নড়িতেছে, স্নায়ুমণ্ডলীতে কি প্রকার বিদ্যুৎ-প্রবাহ চলিতেছে, মস্তিষ্কের কোন্ বিশেষ অংশে কি পরিবর্ত্তন ঘটিল ইত্যাদি। প্রাণিবিৎ দেখিতেছেন—সেই শব্দ শুনিয়া কোন্ জীবের মুখের রেখার কি বিকার ঘটিল, কে শব্দায়মান ঘণ্টার নিকট গেল, কেই বা দূরে গেল, ঘণ্টা শুনিয়া কে নৃত্য করিল, কেই-বা লাঠি বাহির করিল, ইত্যাদি। দার্শনিক ভাবিতেছেন—এই শব্দ মানুষের মনকে কতটা উচ্চস্তরে লইয়া যাইতে পারে, শব্দ শোনার আনন্দে আনন্দময়ের কি সন্ধান পাওয়া যায়, পরমপুরুষের কোন্ সত্তা শব্দে প্রকাশিত হয়, শব্দ সত্য না ঘণ্টা সত্য, না উভয়ই মিথ্যা, মায়ামাত্র ইত্যাদি। মনোবিৎ দেখিতেছেন, ঘণ্টার শব্দের স্বরূপ কি, সেই শব্দের অনুভূতির সহিত অন্যান্য শব্দের সাদৃশ্য বা পার্থক্য কোথায়, ইত্যাদি। একই ঘটনাকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকারে দেখিয়া থাকেন। প্রত্যেকেরই ক্ষেত্র পৃথক। প্রত্যেকেই ঘটনার একটা বিশিষ্ট দিক দেখিতেছেন। পদার্থবিদের কাছে শব্দের অনুভূতিটা আবশ্যকীয় বিষয় নহে—তাহা গৌণ ব্যাপারমাত্র। আবার মনোবিদের কাছে শব্দের অনুভূতিটাই মুখ্য বিষয়; ঘণ্টার বা বায়ুর কম্পন গৌণ ঘটনা। পদার্থের কম্পন ভিন্ন সাধারণতঃ শব্দের উৎপত্তি হয় না, অতএব মনোবিৎ ও পদার্থবিদের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। পদার্থবিদের কাছে শব্দের অনুভূতি শব্দায়মান পদার্থের কম্পনের পরিচায়কমাত্র। এ অনুভূতি না থাকিলেও তাঁহার চলে। পদার্থবিৎ বধির হইলেও যন্ত্র-সাহায্যে ত্বক কিংবা চক্ষুর দ্বারা কম্পন নির্ণয় করিতে পারেন। কিন্তু বধির মনোবিৎ শব্দের অস্তিত্বই জানেন না। শব্দায়মান পদার্থের কম্পন তাঁহার কাছে কম্পনমাত্র,—তাহা শব্দ নহে। "শব্দ" কথাটা আমরা দুই বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি বলিয়াই পদার্থবিদের শব্দ ও মনোবিদের শব্দকে অনেক সময় একই বস্তু মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হই। শারীরবিৎ বলেন, শব্দায়মান বস্তুর কম্পন বায়ুতে সংক্রামিত হয় এবং তাহা কর্ণপটহে আঘাত করিয়া কর্ণপটহকে আন্দোলিত করে। এই আন্দোলনে কর্ণের স্নায়ু উত্তেজিত হয়। সেই উত্তেজনা স্নায়ু বাহিয়া মস্তিষ্কে উপনীত হইয়া বিশেষ অংশে আঘাত করে। তাহাতেই শব্দের অনুভূতি হয়। অতএব শব্দের অনুভূতির স্থান মস্তিষ্ক। শব্দায়মান বস্তু না থাকিলেও যদি কর্ণমধ্যস্থ স্নায়ু অন্য উপায়ে উত্তেজিত করা যায় তাহা হইলেও শব্দের অনুভূতি হয়। চক্ষুতে আঘাত করিলে অনেক সময় আলোকের অনুভূতি হয়। বহির্জগতে শব্দ বা আলোক না থাকিলেও শব্দ বা আলোকের অনুভূতি হইতে পারে। স্বপ্নে বিভিন্ন অনুভূতি সুপ্রসিদ্ধ। শারীরবিৎ যখন বলেন, অনুভূতি মস্তিষ্কে হয় তখন তাহার অর্থ এই বুঝিতে হইবে যে, মস্তিষ্ক না থাকিলে অনুভূতি হইত না। ইহার অর্থ এমন নয় যে, মস্তিষ্কের মধ্যেই শব্দ হইতেছে। মনোবিদের আছে এক হিসাবে মস্তিষ্কের অস্তিত্বই নাই। হাতে স্পর্শানুভূতি হয়, জিহ্বায় রসানুভূতি হয়। সে হিসাবে মস্তিষ্কে কোন অনুভূতিই হয় না। শব-ব্যবচ্ছেদ করিলে মস্তিষ্ক আছে জানিতে পারি, নচেৎ নহে। মাথার মধ্যে দপ্ দপ্ টন্ টন্, মাথাঘোরা, ভারবোধ ইত্যাদি সংবেদন অনুভূত হইতে পারে মাত্র। মনোবিৎ অগত্যা বলিবেন, শব্দবোধ মাথায় হয় না, কানে হয়; স্পর্শবোধও সেইরূপ মস্তিষ্কে না হইয়া ত্বকেই হইয়া থাকে। এইখানে শারীরবিদ্যা ও মনোবিদ্যার পার্থক্য স্পষ্ট। মনোবিদের কাছে মানুষের মাথা চোখ মুখ হাত পা ইত্যাদি বস্তু সত্য, কিন্তু মস্তিষ্ক, যকৃৎ, প্লীহা ইত্যাদির বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষ অনুভূতি নাই। আমরা মস্তিষ্কে দয়া, মায়া ইত্যাদি মনোভাব অনুভব করি না। এই সকল মনোভাবের সহিত যে-সকল সংবেদন জড়িত থাকে হৃদয়ের উপরেই তাহাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। এই জন্য দয়ালুকে 'সহৃদয়' ব্যক্তি বলি। হিন্দুশাস্ত্রকারগণও হৃদয়কে রাগদ্বেষ আদির উৎপত্তিস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দেখা যাইতেছে, শারীরশাস্ত্রবিদের কাছে যাহা সত্য, মনোবিদের কাছে তাহা সত্য না হইতেও পারে। বিভিন্ন বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বিভিন্ন বলিয়া জানিলে এ বিষয়ে ভুল হইবে না।

পদার্থবিজ্ঞানে শৈত্য বা অন্ধকার বলিয়া কোন সত্তা

নাই। ইহারা 'অভাব' পদার্থ। তাপের ও আলোকের অভাব শৈত্য ও অন্ধকার। মনোবিদের নিকট এই উভয় পদার্থই সৎ পদার্থ। তাপের ও আলোকের যেমন বিশিষ্ট অনুভূতি আছে, শৈত্য ও অন্ধকারেরও সেইরূপ নিজস্ব অনুভূতি আছে। রঙের উজ্জ্বলতাও (brightness) মনোবিদের অনুসন্ধেয় পদার্থ। ইহার আনুষঙ্গিক কোন বস্তু বা ব্যাপার পদার্থবিদ্যায় এখনও ধরা পড়ে নাই।

মানসিক ব্যাপারের বিশিষ্টতা

মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও অন্যান্য বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে একটা স্পষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। অধিকাংশ বিজ্ঞানের বিষয়বস্তুই জড়পদার্থ। পদার্থবিৎ বা কিমিতিশাস্ত্রবিৎ যে-সকল বস্তু লইয়া গবেষণা করেন, তাহাদের রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ ইত্যাদি জড়গুণ আছে। জড়পদার্থের গুরুত্ব আছে ও তাহা পরিমিত স্থান অধিকার করে। স্থির জড়পদার্থ গতিশীল হইলে অথবা তাহাতে অন্য পরিবর্ত্তন ঘটিলে বিজ্ঞানবিৎ পরিবর্ত্তনের কারণ-স্বরূপ বিভিন্ন 'শক্তির' অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সকল জড়শক্তির জড়গুণ সুস্পষ্ট না হইলেও তাহাদের বিশেষত্ব এই যে, তাহারা জড়বস্তুর অবস্থা পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে ও এক জড়শক্তি আর এক জড়শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে। বৈদ্যুতিক শক্তি তাপে রূপান্তরিত হয়, তাপ গতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয়, চৌম্বকশক্তি হইতে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়, বিদ্যুৎ হইতে আলোক হয়, ইত্যাদি। মনোবিদের আলোচ্য পদার্থে কোন স্থূল জড়ধর্ম্ম নাই। পদার্থবিৎ চিনি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু চিনির মিষ্টতা-গুণের আলোচনা মনোবিদের অধিকারে। পদার্থবিদের চিনির রূপ আছে, স্বাদ আছে, গুরুত্ব আছে; তাহা পরিমিত স্থান অধিকার করে। কিন্তু মনোবিদের চিনির স্বাদ বা মিষ্টতার কোন দর্শনীয় রূপ নাই, কোনো গুরুত্ব নাই, তাহা স্থান অধিকার করে না। চিনি এক মণ বা দুই মণ হইতে পারে। তাহা কোনো পাত্র আংশিক বা পূরা ভর্ত্তি করিতে পারে, সাদা বা ময়লা হইতে পারে। কিন্তু মিষ্টতার ওজন নাই, এক সের দুই সের মিষ্টতা হয় না, এক বাটি মিষ্টতাও হয় না। অবশ্য মিষ্টতার কম-বেশী হইতে পারে। ক্রোধ একটা মানসিক ব্যাপার এবং তাহা মনোবিদের আলোচ্য বিষয়। ক্রোধের কম-বেশী আছে, কিন্তু ক্রোধের কোনো বর্ণ নাই, স্বাদ নাই। ক্রোধ স্থান অধিকার করে না, ক্রোধের কোন ওজনও নাই। কোনো জড়শক্তির প্রভাব ক্রোধের উপর আসিতে পারে না।

জড়শক্তি ও চিৎশক্তি

জড়শক্তি জড়শরীরকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে, কিন্তু কোনো মানসিক ব্যাপারে জড়শক্তির প্রভাব নাই। কোনো ব্যক্তিকে আঘাত করিলে তাহার যে ক্রোধ হয় তাহা জড়শক্তি হইতে উৎপন্ন, একথা বলা চলে না। জড়শক্তি শরীরে পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে এবং সেই পরিবর্ত্তনের আনুষঙ্গিক মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আনুষঙ্গিক বলিয়াই মানসিক পরিবর্ত্তন যে জড়শক্তির দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে, এরূপ স্বীকার করা চলে না। কেন-না তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, জড়শক্তি জড়পদার্থ ব্যতীত অন্যরূপ পদার্থেও পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরে আরও বিশদ আলোচনা করা যাইতেছে।

মানসিক ব্যাপারে সাক্ষাৎভাবে জড়শক্তির প্রভাব না মানিলে এমন একটি শক্তি স্বীকার করিতে হয় যাহার দ্বারা মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। মনের অবস্থা প্রতি মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনের কারণস্বরূপ মানসিক শক্তির কল্পনা করা যাইতে পারে। এই মানসিক শক্তি বা চিৎশক্তি কেবল মানসিক ব্যাপারেই কার্য্যশীল, জড় ব্যাপারে নহে। বহির্জগতে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিলে যেমন বলি কোনো জড়শক্তির সাহায্যে তাহা ঘটিয়াছে, মনোমধ্যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটিলে সেইরূপ বলিব ইহার মূলে চিৎশক্তি রহিয়াছে।

দেহ ও মনের সম্বন্ধ

মনোবিদের আলোচ্য বিষয় কি এবং তাহার গণ্ডী কতটা এতক্ষণে তাহা বোঝা গেল। মানসিক ব্যাপারের আলোচনা করিতে গেলে একটা প্রশ্ন প্রথমেই মনোবিদের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি? মনের সহিত শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয়, মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়। জড়বস্তু বা জড়শক্তির সন্নিকর্ষে আসিলে শরীরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী মানসিক বৃত্তির উদ্ভব হয়। কম্পমান বস্তু কেবল যে কর্ণপটহকে আন্দোলিত করে তাহা নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। ত্বকে জড়বস্তুর স্পর্শে স্পর্শানুভূতির উদ্ভব হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ সমস্ত মানসিক বৃত্তি জড়বস্তুজাত। সুরা জড়পদার্থ, কিন্তু সুরাপানে কেবল যে জড়শরীরেই বিকার ঘটে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। মনের উপর দেহের প্রভাব যে কত, তাহা এই সকল ব্যাপার হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। একথাও বলা চলে যে, দেহে মস্তিষ্ক না থাকিলে মনই থাকিত না।

অপরপক্ষে, তাপাদি মানসিক বিকার দ্বারা দেহ খিন্ন হয়, মনের আনন্দে দেহের তৃপ্তি হয়। এই সকল ব্যাপারে দেহের উপর মানসিক শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ নহে। ইচ্ছা মানসিক বৃত্তি এবং ইচ্ছাতে কোনো সাধারণ জড়ধর্ম্ম নাই। তথাপি ইচ্ছামাত্রেই আমরা হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে পারি। এখানে শরীরের উপর মানসিক বৃত্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।

দেহমনের ঘাত-প্রতিঘাত

শরীর ও মনের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত সাধারণের নিকট অতি সহজ ও নিত্য ঘটনা, কিন্তু মনোবিদের নিকট পরম বিস্ময়কর। মাটিতে আপেল পড়ার ভিতর যে কি গুরুতর প্রাকৃতিক রহস্য ছিল, সাধারণে তাহা লক্ষ্য করে নাই। নিউটনের মত মনীষীর চক্ষেই প্রথমে তাহা ধরা পড়িল। শরীর ও মনের সম্বন্ধের মধ্যে যে রহস্য রহিয়াছে সাধারণে তাহা না দেখিলেও মনোবিৎ তাহা লক্ষ্য করিবেন। স্পষ্ট দেখিতেছি, মন শরীরকে চালাইতেছে ও শরীর মনকে প্রভাবান্বিত করিতেছে, কিন্তু কি করিয়া তাহা ঘটিতেছে বুঝা সহজ নহে। মনের উপর শরীরের প্রভাব স্বীকার করিলেই মনকে সাধারণ জড়পদার্থের মধ্যে ফেলিতে হয়, কারণ জড়শক্তি কেবল জড়কেই চালাইতে পারে। মনের কোনো জড়গুণ দেখা যায় না। মন ও শরীর একেবারেই পৃথকবর্গের পদার্থ। আবার যদি বলি, শরীরের উপর মনের ক্রিয়া আছে, তাহা হইলেও বিপদ। কেন-না তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, চিৎশক্তি জড়শক্তির মতই ও তাহা জড়বস্তুকেও চালাইতে সক্ষম। ইচ্ছার মত মানসিক ব্যাপার যদি শরীরকে চালাইতে পারে তবে স্বীকার করিতে হয় যে, ইচ্ছা, তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি জড়শক্তির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারকে জড়শক্তির বর্গে ফেলা যায় না। অতএব হয় ইচ্ছাশক্তিকে জড়শক্তি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে, জড়শক্তি ব্যতীতও শরীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। এই কথা মানিলে Law of Conservation of Energy মানা চলে না। বিজ্ঞানের এই সূত্র অনুসারে স্বীকার করা হয় যে, এক-শক্তি অপর শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে—যদি তাহারা একই বর্গের হয়। কিন্তু শক্তি বিনা কোনো পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

মনোদৈহিক সহচারবাদ

উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। একটা ব্যাণ্ডের দলে নানা প্রকার যন্ত্রবাদক থাকে। তাহারা ব্যাণ্ডমাষ্টার বা নেতার ইঙ্গিতে নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র বাজায়। নেতা হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে এবং সকলে সেই অনুসারে চলে। ধরা যাক, কোনো অনভিজ্ঞ দর্শক বাজনা শুনিতেছে এবং সে এমন জায়গায় বসিয়াছে যেখান হইতে ব্যাণ্ড-মাষ্টারকে বা বাদকদিগকে দেখা যায় না। বেহালা ও বাঁশী---এই দুই যন্ত্রের শব্দে শ্রোতার মনোযোগ নিবদ্ধ। এই দুই যন্ত্র একসঙ্গে বাজিতেছে এবং একসঙ্গেই থামিতেছে। বাঁশী যখন দ্রুত বাজে, বেহালার শব্দও তখন দ্রুত হয়। আবার বেহালার সুর সপ্তমে উঠিলে বাঁশীর সুরও সপ্তমে চড়ে। কখনও মনে হয় বেহালা বাঁশীকে চালায়, আবার কখনও মনে হয় বাঁশীর বশে বেহালা

চলে। দর্শক দেখিতেছে, এই দুই যন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয়, এই দুই যন্ত্র পরস্পরকে চালাইতে সক্ষম। অনভিজ্ঞ দর্শক কৌতূহলী হইলে বাঁশী ও বেহালা আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে ইহাদের বাজাইবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। কি করিয়া একটা যন্ত্র আর একটাকে চালাইতে পারে তাহা বোঝা সহজ নহে, অথচ সে স্পষ্ট শুনিতেছে, বাঁশীর স্বর চড়িলে বেহালার স্বর চড়ে, এবং বেহালা দ্রুত বাজিলে বাঁশী দ্রুত বাজে। মৃদঙ্গে আঘাত করিলে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি বেহালায় আঘাত করিলে কি বাঁশী বাজিয়া ওঠে, না বাঁশীতে ফুঁ দিলে বেহালা বাজে? দুই যন্ত্র একসঙ্গে চলে, ইহা অতি স্পষ্ট কথা; কিন্তু কি করিয়া চলে ভাবিতে গেলেই গোলে পড়িতে হয়।

অনভিজ্ঞ দর্শক বৈজ্ঞানিকের চিন্তা-প্রণালী অবলম্বন করিলে বলিবে বাঁশী বেহালাকে চালাইতেছে, কিংবা বেহালা বাঁশীকে চালাইতেছে এমন কথা বলা চলে না; কি করিয়া এই দুই যন্ত্র একসঙ্গে চলিতেছে বলিতে পারি না, তবে এই দুই যন্ত্র যে একত্রে স্বর মিলাইয়া চলে ইহা সুস্পষ্ট। কৌতূহলী দর্শকের বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাহাকে নূতন কোন তথ্য জানাইল না সত্য, কিন্তু কোনো ভ্রমেও পড়িতে দিল না। একে অপরকে চালাইতেছে, এই যে স্পষ্ট অনুভূতি তাহা ভুল বলিয়া সে জানিল। ইহাই তাহার লাভ।

এই দর্শক যে-ভাবে সমস্যার সমাধান করিল, একদল মনোবিদ্‌ও সেইভাবে দেহ ও মনের সম্বন্ধের মীমাংসা করেন। তাঁহারা বলেন, দেহের উপর মনের প্রভাব বা মনের উপর দেহের প্রভাব আছে মানিব না। তবে আপাত-দৃষ্টিতে দেহের পরিবর্ত্তনে যে মনের পরিবর্ত্তন ও মনের পরিবর্ত্তনে দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ এই যে উদাহরণের বাঁশী ও বেহালার মত দেহ ও মন একই সঙ্গে চলিতেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মতকে মনোদৈহিক সহচারবাদ (Psycho-physical parallelism) বলা হয়। সহচারিতা মানিলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানিবার আবশ্যকতা থাকে না অথচ প্রাত্যহিক ঘটনায় দেহমনের যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে তাহাও অস্বীকার করিতে হয় না।

সহচারবাদীর সমস্যা

পূর্ব্বের উদাহরণের অনভিজ্ঞ দর্শক যদি বাদ্যকরদিগের নেতাকে দেখিতে পান তবে তিনি বলিবেন, বাঁশী ও বেহালা যে একই সুরে চলিতেছে তাহার কারণ উভয় যন্ত্রই একই ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দেহ ও মনের সহচারিতার কারণ অনুমান করিতে পারি যে, উভয়কেই একই শক্তি একই সময়ে চালিত করিতেছে। বাদ্যকরদিগের নেতার ইঙ্গিত বংশীবাদক ও বেহালা-বাদক উভয়েই বুঝিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সঙ্কেতের মধ্যে বাঁশী ও বেহালা এই দুই বিভিন্ন যন্ত্রকে চালাইবার মত দুই বিভিন্ন শক্তি আছে স্বীকার করিতে হয়। সেই-রূপ একই শক্তি দেহ ও মনকে চালাইতেছে বলিলে তাহার মধ্যে চিৎশক্তি ও জড়শক্তি উভয়ই আছে অনুমান করিতে হয়, নতুবা গোল মেটে না। সেজন্য অধিকাংশ মনোদৈহিক সহচারবাদীরা বলেন যে, যখন আমরা ব্যাণ্ড-মাষ্টারকে দেখি নাই তখন মাত্র দেহমনের সহচারিতা মানিয়াই ক্ষান্ত হইব। এই সহচারিতার মূলে কি আছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার মত মালমশলা আমাদের নাই এবং সেইরূপ গবেষণার আবশ্যকতাও নাই।

দেহের উপর মনের ক্রিয়া

সহচারবাদের যবনিকা এইখানেই ফেলিয়া দিতে আমার আপত্তি আছে। কেন আছে তাহা বলিতেছি। ইচ্ছা করিলেই হাত তুলিতে পারি এবং ইচ্ছা না করিলে হাত তুলি না। সহচরবাদী বলিবেন, ইচ্ছা করা-না-করার উপর বাস্তবিক হাত তোলা-না-তোলা নির্ভর করে না। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন নহে। ঘড়ির কাঁটা যদি মনে করে বারটার দাগে গিয়া তবে বাজিব নচেৎ বাজিব না, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতার মূল্য যেরূপ, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার মূল্যও ঠিক সেইরূপ। পূর্ব্ব মানসিক ঘটনাপরম্পরার ফলেই ইচ্ছার উৎপত্তি। এই সকল মানসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। যখন মনে হাত তুলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল

দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ কি? মনের সহিত শরীরের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। শরীর খারাপ হইলে মন খারাপ হয়, মন খারাপ হইলে শরীর খারাপ হয়। জড়বস্তু বা জড়শক্তির সন্নিকর্ষে আসিলে শরীরের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তদনুযায়ী মানসিক বৃত্তির উদ্ভব হয়। কম্পমান বস্তু কেবল যে কর্ণপটহকে আন্দোলিত করে তাহা নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে শব্দানুভূতি হইয়া থাকে। ত্বকে জড়বস্তুর স্পর্শে স্পর্শানুভূতির উদ্ভব হয়। পঞ্চেন্দ্রিয়লব্ধ সমস্ত মানসিক বৃত্তি জড়বস্তুজাত। সুরা জড়পদার্থ, কিন্তু সুরাপানে কেবল যে জড়শরীরেই বিকার ঘটে তাহা নহে, সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন দেখা দেয়। মনের উপর দেহের প্রভাব যে কত, তাহা এই সকল ব্যাপার হইতে সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। একথাও বলা চলে যে, দেহে মস্তিষ্ক না থাকিলে মনই থাকিত না।

অপরপক্ষে, তাপাদি মানসিক বিকার দ্বারা দেহ খিন্ন হয়, মনের আনন্দে দেহের তৃপ্তি হয়। এই সকল ব্যাপারে দেহের উপর মানসিক শক্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ নহে। ইচ্ছা মানসিক বৃত্তি এবং ইচ্ছাতে কোনো সাধারণ জড়ধর্ম্ম নাই। তথাপি ইচ্ছামাত্রেই আমরা হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে পারি। এখানে শরীরের উপর মানসিক বৃত্তির প্রভাব প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।

দেহমনের ঘাত-প্রতিঘাত

শরীর ও মনের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত সাধারণের নিকট অতি সহজ ও নিত্য ঘটনা, কিন্তু মনোবিদের নিকট পরম বিস্ময়কর। মাটিতে আপেল পড়ার ভিতর যে কি গুরুতর প্রাকৃতিক রহস্য ছিল, সাধারণে তাহা লক্ষ্য করে নাই। নিউটনের মত মনীষীর চক্ষেই প্রথমে তাহা ধরা পড়িল। শরীর ও মনের সম্বন্ধের মধ্যে যে রহস্য রহিয়াছে সাধারণে তাহা না দেখিলেও মনোবিৎ তাহা লক্ষ্য করিবেন। স্পষ্ট দেখিতেছি, মন শরীরকে চালাইতেছে ও শরীর মনকে প্রভাবান্বিত করিতেছে, কিন্তু কি করিয়া তাহা ঘটিতেছে বুঝা সহজ নহে। মনের উপর শরীরের প্রভাব স্বীকার করিলেই মনকে সাধারণ জড়পদার্থের মধ্যে ফেলিতে হয়, কারণ জড়শক্তি কেবল জড়কেই চালাইতে পারে। মনের কোনো জড়গুণ দেখা যায় না। মন ও শরীর একেবারেই পৃথকবর্গের পদার্থ। আবার যদি বলি, শরীরের উপর মনের ক্রিয়া আছে, তাহা হইলেও বিপদ। কেন-না তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, চিৎশক্তি জড়শক্তির মতই ও তাহা জড়বস্তুকেও চালাইতে সক্ষম। ইচ্ছার মত মানসিক ব্যাপার যদি শরীরকে চালাইতে পারে তবে স্বীকার করিতে হয় যে, ইচ্ছা, তাপ, বৈদ্যুতিক শক্তি ইত্যাদি জড়শক্তির রূপান্তর মাত্র। কিন্তু ইচ্ছা প্রভৃতি মানসিক ব্যাপারকে জড়শক্তির বর্গে ফেলা যায় না। অতএব হয় ইচ্ছাশক্তিকে জড়শক্তি বলিয়া মানিতে হইবে, নতুবা স্বীকার করিতে হইবে যে, জড়শক্তি ব্যতীতও শরীরে পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। এই কথা মানিলে Law of Conservation of Energy মানা চলে না। বিজ্ঞানের এই সূত্র অনুসারে স্বীকার করা হয় যে, এক-শক্তি অপর শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে—যদি তাহারা একই বর্গের হয়। কিন্তু শক্তি বিনা কোনো পরিবর্ত্তন সম্ভব নহে।

মনোদৈহিক সহচারবাদ

উদাহরণের সাহায্যে সমস্যাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি। একটা ব্যাণ্ডের দলে নানা প্রকার যন্ত্রবাদক থাকে। তাহারা ব্যাণ্ডমাষ্টার বা নেতার ইঙ্গিতে নিজ নিজ বাদ্যযন্ত্র বাজায়। নেতা হাত নাড়িয়া সঙ্কেত করে এবং সকলে সেই অনুসারে চলে। ধরা যাক, কোনো অনভিজ্ঞ দর্শক বাজনা শুনিতেছে এবং সে এমন জায়গায় বসিয়াছে যেখান হইতে ব্যাণ্ড-মাষ্টারকে বা বাদকদিগকে দেখা যায় না। বেহালা ও বাঁশী---এই দুই যন্ত্রের শব্দে শ্রোতার মনোযোগ নিবদ্ধ। এই দুই যন্ত্র একসঙ্গে বাজিতেছে এবং একসঙ্গেই থামিতেছে। বাঁশী যখন দ্রুত বাজে, বেহালার শব্দও তখন দ্রুত হয়। আবার বেহালার সুর সপ্তমে উঠিলে বাঁশীর সুরও সপ্তমে চড়ে। কখনও মনে হয় বেহালা বাঁশীকে চালায়, আবার কখনও মনে হয় বাঁশীর বশে বেহালা

চলে। দর্শক দেখিতেছে, এই দুই যন্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। প্রথমদৃষ্টিতে মনে হয়, এই দুই যন্ত্র পরস্পরকে চালাইতে সক্ষম। অনভিজ্ঞ দর্শক কৌতূহলী হইলে বাঁশী ও বেহালা আনিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে ইহাদের বাজাইবার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ পৃথক। কি করিয়া একটা যন্ত্র আর একটাকে চালাইতে পারে তাহা বোঝা সহজ নহে, অথচ সে স্পষ্ট শুনিতেছে, বাঁশীর সুর চড়িলে বেহালার সুর চড়ে, এবং বেহালা দ্রুত বাজিলে বাঁশী দ্রুত বাজে। মৃদঙ্গে আঘাত করিলে যেমন শব্দ উৎপন্ন হয়, তেমনি বেহালায় আঘাত করিলে কি বাঁশী বাজিয়া ওঠে, না বাঁশীতে ফুঁ দিলে বেহালা বাজে? দুই যন্ত্র একসঙ্গে চলে, ইহা অতি স্পষ্ট কথা; কিন্তু কি করিয়া চলে ভাবিতে গেলেই গোলে পড়িতে হয়।

অনভিজ্ঞ দর্শক বৈজ্ঞানিকের চিন্তা-প্রণালী অবলম্বন করিলে বলিবে বাঁশী বেহালাকে চালাইতেছে, কিংবা বেহালা বাঁশীকে চালাইতেছে এমন কথা বলা চলে না; কি করিয়া এই দুই যন্ত্র একসঙ্গে চলিতেছে বলিতে পারি না, তবে এই দুই যন্ত্র যে একত্রে সুর মিলাইয়া চলে ইহা সুস্পষ্ট। কৌতূহলী দর্শকের বৈজ্ঞানিক চিন্তা তাহাকে নূতন কোন তথ্য জানাইল না সত্য, কিন্তু কোনো ভ্রমেও পড়িতে দিল না। একে অপরকে চালাইতেছে, এই যে স্পষ্ট অনুভূতি তাহা ভুল বলিয়া সে জানিল। ইহাই তাহার লাভ।

এই দর্শক যে-ভাবে সমস্যার সমাধান করিল, একদল মনোবিদ্‌ও সেইভাবে দেহ ও মনের সম্বন্ধের মীমাংসা করেন। তাঁহারা বলেন,দেহের উপর মনের প্রভাব বা মনের উপর দেহের প্রভাব আছে মানিব না। তবে আপাত-দৃষ্টিতে দেহের পরিবর্ত্তনে যে মনের পরিবর্ত্তন ও মনের পরিবর্ত্তনে দেহের পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে বলিয়া মনে হয় তাহার কারণ এই যে উদাহরণের বাঁশী ও বেহালার মত দেহ ও মন একই সঙ্গে চলিতেছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই মতকে মনোদৈহিক সহচারবাদ (Psycho-physical parallelism) বলা হয়। সহচারিতা মানিলে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানিবার আবশ্যকতা থাকে না অথচ প্রাত্যহিক ঘটনায় দেহমনের যে সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে তাহাও অস্বীকার করিতে হয় না।

সহচারবাদীর সমস্যা

পূর্ব্বের উদাহরণের অনভিজ্ঞ দর্শক যদি বাদ্যকরদিগের নেতাকে দেখিতে পান তবে তিনি বলিবেন, বাঁশী ও বেহালা যে একই সুরে চলিতেছে তাহার কারণ উভয় যন্ত্রই একই ব্যক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। দেহ ও মনের সহচারিতার কারণ অনুমান করিতে পারি যে, উভয়কেই একই শক্তি একই সময়ে চালিত করিতেছে। বাদ্যকরদিগের নেতার ইঙ্গিত বংশীবাদক ও বেহালা-বাদক উভয়েই বুঝিতে পারে, অর্থাৎ তাহার সঙ্কেতের মধ্যে বাঁশী ও বেহালা এই দুই বিভিন্ন যন্ত্রকে চালাইবার মত দুই বিভিন্ন শক্তি আছে স্বীকার করিতে হয়। সেই-রূপ একই শক্তি দেহ ও মনকে চালাইতেছে বলিলে তাহার মধ্যে চিৎশক্তি ও জড়শক্তি উভয়ই আছে অনুমান করিতে হয়, নতুবা গোল মেটে না। সেজন্য অধিকাংশ মনোদৈহিক সহচারবাদীরা বলেন যে, যখন আমরা ব্যাণ্ড-মাষ্টারকে দেখি নাই তখন মাত্র দেহমনের সহচারিতা মানিয়াই ক্ষান্ত হইব। এই সহচারিতার মূলে কি আছে, তাহা অনুসন্ধান করিবার মত মালমশলা আমাদের নাই এবং সেইরূপ গবেষণার আবশ্যকতাও নাই।

দেহের উপর মনের ক্রিয়া

সহচারবাদের যবনিকা এইখানেই ফেলিয়া দিতে আমার আপত্তি আছে। কেন আছে তাহা বলিতেছি। ইচ্ছা করিলেই হাত তুলিতে পারি এবং ইচ্ছা না করিলে হাত তুলি না। সহচরবাদী বলিবেন, ইচ্ছা করা-না-করার উপর বাস্তবিক হাত তোলা-না-তোলা নির্ভর করে না। আমাদের ইচ্ছা স্বাধীন নহে। ঘড়ির কাঁটা যদি মনে করে বারটার দাগে গিয়া তবে বাজিব নচেৎ বাজিব না, তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতার মূল্য যেরূপ, মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতার মূল্যও ঠিক সেইরূপ। পূর্ব্ব মানসিক ঘটনাপরম্পরার ফলেই ইচ্ছার উৎপত্তি। এই সকল মানসিক ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তনও ঘটিতেছে। যখন মনে হাত তুলিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইল

সেই সময় শরীরও তাহার জন্য প্রস্তুত হইল। ইহার ফলে মনে হইল আমার ইচ্ছার বশেই হাত উঠিল। সহচারবাদীর শরীরের উপর মনের তথাকথিত প্রভাব বুঝিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। মানসিক ব্যাপারের কারণ মনে খুঁজিতে হইবে এবং শারীরিক ব্যাপারের কারণ শরীরে খুঁজিতে হইবে, ইহাই সহচারবাদীর প্রধান কথা।

মনের উপর দেহের ক্রিয়া

এখন মনের উপর শরীরের ক্রিয়ার ব্যাখ্যা দেখা যাক। শরীরের রোগ হইলে মনের অবসাদ হয়। সহচারবাদী বলিবেন যে, এখানেও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই। শরীরের অবসাদের সঙ্গে সঙ্গে মনের অবসাদ হয় বটে, কিন্তু মনের অবসাদের কারণ মনের মধ্যেই আছে। ইহাও না হয় মানিলাম, কিন্তু মদ খাইলে মনে যে আনন্দ আসে তাহার ব্যাখ্যা কি? মদ ত জড়বস্তু, তাহা কেবল শরীরের উপরই ক্রিয়া করিতে পারে। মনে তাহার প্রভাব কি করিয়া বিস্তৃত হয়? মনের পরিবর্ত্তন চিৎশক্তি ভিন্ন হইতে পারে না। এই চিৎশক্তি কোথা হইতে আসিল? সহচারবাদী এ প্রশ্ন বিচার করেন নাই। তিনি হয়ত বলিবেন, কোন্ মুহূর্ত্তে কোন্ ব্যক্তি মদ খাইবে, বা কোন্ সময়ে কে কাহাকে মদ খাওয়াইবে, তাহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির আছে এবং যে মদ খাইল তাহার মনও এমনভাবে প্রথম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে যাহাতে ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্তে তাহার মনে পূর্ব্ব মানসিক ঘটনা-পরম্পরার ফলে আনন্দ জাগিয়া উঠে। কঠিন নিয়তি বা ভগবান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই মন ও দেহের সহচারিতা বিধান করিয়া রাখিয়াছেন। কোনো মনোবিৎ ঠিক এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিনা আমার জানা নাই, তবে মনের উপর দেহের প্রভাব বুঝাইতে হইলে সহচারবাদীর ইহাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা।

জড়ে চিৎশক্তি

এটা খুবই সত্যকথা যে, প্রায় সমস্ত বৈজ্ঞানিকই কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা মানিয়া থাকেন। এই হিসাবে তাঁহারা নিয়তিই মানিতেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, নিয়তি বা ভগবানকে টানিয়া না আনিলেও মনের উপর দেহের প্রভাবের সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। মদ খাওয়ার উদাহরণেই বা যাই কেন? প্রত্যেক জড়বস্তুই আমাদের মনে কোনো-না-কোনো পরিবর্ত্তন আনে। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ বোধ প্রত্যেকটি মানসিক ব্যাপার এবং তাহা জড়বস্তুর দ্বারাই সংঘটিত হয়। মদে যেমন আনন্দ আনে, জড়দ্রব্যে সেইরূপ রূপরসাদি বোধ আনে। অতএব সমস্ত জড়দ্রব্যে এমন গুণ মানিতে হয় যাহাতে মনের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব, নচেৎ জড়দ্রব্যের কোন অনুভূতি বা জ্ঞানই থাকিত না। জড়দ্রব্যে যেমন জড়শক্তি নিহিত আছে সেইরূপ চিৎশক্তিও আছে মানিলে কোনো গোল হয় না। আমার মনে হয় ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ব্যাখ্যা। মদের জড়শক্তি শরীরে বিকার আনে এবং মদেরই চিৎশক্তি মনের বিকার আনে। কম্পমান বস্তুর জড়শক্তি কর্ণ-পটহ আন্দোলিত করে এবং তাহারই চিৎশক্তি শব্দবোধ জন্মায়। ব্যাপারটা দাঁড়াইল এই,—কোনো জড়বস্তুই নিছক জড় নহে। প্রত্যেক জড়ের মধ্যেই নিহিত চৈতন্য-শক্তি আছে এবং তাহারই প্রভাবে জড়বস্তু চৈতন্যে প্রতিভাত হয়।

জড়ে চৈতন্যশক্তি আছে বলিলাম তাহা অনুমান-মাত্র। অনুমান হইলেও ইহা ন্যায়সঙ্গত অনুমান। বৈজ্ঞানিককে এইরূপ অনুমান বা থিওরী বা ঊহের আশ্রয় সর্ব্বদাই লইতে হয়। যে থিওরী বা ঊহ মানিলে প্রত্যক্ষ সকল ঘটনার সহজ ও সঙ্গত ব্যাখ্যা হয় তাহা গ্রাহ্য। কোনো কোনো জড়বাদী বৈজ্ঞানিক হয়ত বলিবেন, জড়ে চিৎশক্তির অবস্থান অসম্ভব। চিৎশক্তি প্রাণী ভিন্ন অপর কোনো আশ্রয়ে থাকিতে পারে না। জড়ে চৈতন্যশক্তির আরোপ কষ্টকল্পনা। তাহা দার্শনিকের একপ্রকার রহস্যবাদ (mysticism) মাত্র। উত্তরে বলা যাইতে পারে, যখন পদার্থবিৎ বলেন যে, আমরা ঈথর-সমুদ্রে ডুবিয়া আছি এবং ঈথরের মধ্য দিয়াই গতায়াত করি অথচ এই ঈথর ইস্পাত অপেক্ষা চল্লিশগুণ ঘন, তখন তাঁহার কল্পনা অধিকতর অবিশ্বাস্য বলিয়াই মনে হয়। পক্ষান্তরে ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, জড়ে চিৎশক্তি থাকা এমন কিছু অসম্ভব বিষয়

নহে, বরং না থাকাই বিচিত্র। প্রাণিদেহ জড় হইলেও তাহাতে চিৎশক্তি আছে। প্রাণ থাকিলে চিৎশক্তির কল্পনায় কোন ব্যাঘাত নাই। জড়ে যদি প্রাণের গুণ থাকা সম্ভব হয় তবে চিৎশক্তি থাকাও সম্ভব। জড়বস্তু আহার্য্যরূপে প্রাণিশরীরে প্রবেশ করিয়া প্রাণের সংস্পর্শে আসিলে প্রাণবান জীবকোষে পরিণত হয়, তাহা না হইলে প্রাণিশরীরের বৃদ্ধি হইত না। প্রাণের গুণ জড়ে অব্যক্তভাবে না থাকিলে তাহা জীবিত বস্তুতে পরিণত হইত না। জগদীশচন্দ্র জড়ে প্রাণের অনুরূপ ক্রিয়ার অস্তিত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। জড়ে অব্যক্ত প্রাণশক্তির সহিত চৈতন্যশক্তি থাকা সম্ভব। এ কল্পনা কষ্টকল্পনা বা দার্শনিক রহস্যবাদ নহে। ইহা বিজ্ঞানসম্মত উহ বা থিওরি।

ঘটনার ধারাবাহিকতা ও অনিবার্য্যতা

সমস্ত জড়জগৎ অচ্ছেদ্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে আবদ্ধ। যাহা কিছু ঘটিতেছে সমস্তই তৎপূর্ব্ব ঘটনাবলীর অবশ্যম্ভাবী ফল। জড়জগতে কোনো ঘটনার স্বাধীনতা নাই। যাহা আপাতদৃষ্টিতে বিনা কারণসম্ভূত মনে হইতেছে, অনুসন্ধান করিলে তাহারও কারণ আবিষ্কার করা যাইতে পারে। ঘটনার মধ্যে অনিবার্য্যতা আছে বলিয়াই বৈজ্ঞানিক অনেক সময় কোন্ ঘটনা কখন ও কিরূপে ঘটিবে পূর্ব্ব হইতে বলিতে পারেন। জ্যোতিষী গণনার দ্বারা কবে সূর্য্যগ্রহণাদি হইবে পূর্ব্বেই জানিতে পারেন। যে বিজ্ঞান যত অগ্রসর হইয়াছে সেই বিজ্ঞানে ভবিষ্য ঘটনার নির্দ্দেশ তত অধিক সম্ভবপর। কার্য্যকারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া পর পর ঘটনার মধ্যে কোনো ছেদ বা অবকাশ নাই। কারণরূপ ঘটনার পরিণতিতেই কার্য্যরূপ ঘটনা উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাই আবার পরবর্ত্তী ঘটনার কারণ হইতেছে। একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র পূর্ব্বাপর ঘটনাগুলিকে সংযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার সহিত সম্বন্ধ না রাখিয়া কোনো পরবর্ত্তী ব্যাপার ঘটিতে পারে না। বৈজ্ঞানিক কোনো ভুঁইফোড় বা খামখেয়ালী ঘটনার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। আকাশে হঠাৎ ধূমকেতু দেখা দিল। সাধারণে ইহাকে আকস্মিক ঘটনা বলিবেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন, দৃষ্টিপথের অতীত থাকিলেও পূর্ব্ব হইতেই ধূমকেতুর অস্তিত্ব ছিল। ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া নির্দ্দিষ্ট গতিতে আসিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে উদিত হইয়াছে মাত্র। এই ব্যাপারে আকস্মিকতা কিছুই নাই।

ঘটনায় অবিচ্ছেদ্য ধারাবাহিকতা ও অনিবার্য্যতা স্বীকার না করিলে কোনো বিজ্ঞানই সম্ভবপর হয় না। মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধেও এই কথা সত্য। যদি বলি মানসিক ঘটনাগুলি যদৃচ্ছা মনে উঠে, পূর্ব্বাপর মনের অবস্থার সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই, তবে মনোবিজ্ঞান বলিয়া কিছুই থাকিতে পারে না। অনেক বিদ্বান ব্যক্তিও মনোরাজ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানেন না। তাঁহারা মনে করেন, মনোরাজ্য স্বাধীন রাজ্য। কার্য্যকারণরূপ দাসত্ব-শৃঙ্খল সেখানে কাহাকেও পীড়া দেয় না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, এরূপ চিন্তার মূল্য নাই। একশ্রেণীর ব্যক্তি জড়জগতেও কার্য্যকারণ সম্বন্ধ মানেন না। তাঁহারা বলেন, ফল গাছ হইতে নিজের স্বভাবে মাটিতে পড়ে, তাহার আবার কারণ কি? বৈজ্ঞানিক ভাবিতেই পারেন না যে, কোনো ঘটনা আকস্মিক হইতে পারে, তা জড়-জগতেই কি আর মনোজগতেই কি।

সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মন

মনোদৈহিক সহচারবাদ ও মানসিক ঘটনার অনিবার্য্যতা এবং কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানিলে ব্যাপার কি দাঁড়ায় দেখা যাক। সুষুপ্তির সময়ে আমাদের মনে কোনো চিন্তা থাকে না। ক্লোরোফরমে অজ্ঞান ব্যক্তিরও মনের চিন্তাশূন্য অবস্থা অনুমান করা যায়। এই প্রকার অজ্ঞান অবস্থায় মনের কোনো বৃত্তি আছে বলিয়াই মনে হয় না,—ধারাবাহিক মানসিক ব্যাপারে একটা ছেদ বা অবকাশ ঘটিয়াছে অনুমান হয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, সুষুপ্তি হইতে উঠিলে বা চেতনা ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বের সমস্ত ঘটনাই স্মৃতিপথে আসে। অতএব চেতনার অভাবেও পূর্ব্বাপর মানসিক ঘটনার যোগসূত্র ছিন্ন হয় নাই বুঝিতে হইবে। যাহা ছেদ বা অবকাশ বলিয়া মনে হইতেছিল তাহা সমস্ত মনের নহে, মাত্র মনের এক অংশের বা

চেতনায় ছেদ। সহচারবাদীর মতে, এই যোগসূত্র দৈহিক হইতে পারে না; তাহা মনেতেই অবস্থিত, অতএব চেতনার অভাবে মনের অস্তিত্ব লুপ্ত হয় নাই। মনের এক নির্জ্ঞান অবস্থা আছে। যে মানসিক ব্যাপার স্মৃতি হইতে লুপ্ত হয় বা জ্ঞানগোচরে থাকে না তাহা এই নির্জ্ঞান মনে আশ্রয় পায়, এবং সেখান হইতে পুনরায় স্মৃতিপথে আসিতে পারে। বুঝাইবার সুবিধার জন্য আপাততঃ মনের এই দুই ভাগকে সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান বলিব। যে-সকল মানসিক ঘটনা আমাদের চেতনায় বা জ্ঞানগোচরে ঘটিতেছে তাহা সংজ্ঞানে অবস্থিত বলিব। আর যাহা চেতনার বহির্ভূত, যাহার অস্তিত্ব আমরা জানি না অথচ যাহা মনে আছে বলিয়া অনুমান করা যায়, যেমন সুষুপ্তির পূর্ব্বাপর ঘটনার যোগসূত্র, তাহা নির্জ্ঞানে অবস্থিত বলিব। মনকে নদীর স্রোতের সহিত তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে নৌকা, তরঙ্গ ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর পদার্থ যেমন জলের উপরেই দেখা যাইতেছে, সেইরূপ আমাদের চেতনার অন্তর্গত মানসিক ব্যাপার-সমূহ উপরের মনেই ঘটিতেছে। মৎস্য প্রভৃতি জলজন্তু যেমন আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে জলের নীচে থাকে, সেইরূপ আমাদের মনের নীচের তলেও নানা মানসিক বৃত্তি আশ্রয় লাভ করে। অবশ্য বাস্তবিক পক্ষে মনের উপর-নীচ বলিয়া কিছু নাই, কারণ মন সাধারণ জড়বস্তু নহে এবং তাহার কোনো আকার নাই এবং মন কোনো স্থানও অধিকার করে না। কেবল বর্ণনার সুবিধার জন্যই উপরের মন, নীচের মন বলা যাইতে পারে।

নির্জ্ঞান মানিতে আপত্তি

সাধারণের ধারণা, উপরের মন বা সংজ্ঞানই বুঝি সমস্ত মন। মনে যাহা কিছু ঘটে সমস্তই বুঝি আমরা জানিতে পারি। হঠাৎ কোনো বিষয় স্মৃতিপথে আসিলে পূর্ব্ব ঘটনার সহিত তাহার কি যোগ আছে, সাধারণে তাহা লইয়া মাথা ঘামান না। কাজেই একটা নির্জ্ঞান মন আছে, এ কথা জানিবার তাঁহাদের দরকার নাই। দেহবাদী বৈজ্ঞানিকও বলিবেন, যে-সকল ব্যাপারের আমাদের প্রত্যক্ষ মানসিক অনুভূতি আছে তাহা লইয়াই মন। যাহা জানি না, যাহা চেতনার বাহিরে, তাহাকে মন বলা যায় না। চেতনাই মনের একমাত্র অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা বা গুণ। চেতনাহীন মন বা নির্জ্ঞান মন আর সোনার পাথরবাটি একই কথা। স্মৃতির আশ্রয় মন নহে,—মস্তিষ্ক। গানের ছাপ যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডে থাকে, তেমনি মানসিক ঘটনার ছাপ মস্তিষ্কে থাকিয়া যায়। তাহাই স্মৃতির মূল। গ্রামোফোন-যন্ত্রে চড়াইলে যেমন রেকর্ডে গান বাহির হয়, মস্তিষ্কের রেকর্ডেও তেমনি উত্তেজিত হইলে লুপ্ত স্মৃতি জাগিয়া উঠে; এক সংজ্ঞান মনই আছে,—নির্জ্ঞান মন বলিয়া কিছু নাই। সহচারবাদী বলিবেন, মস্তিষ্কে চিন্তা উৎপন্ন হয় মানিতে যে বাধা, মস্তিষ্কে স্মৃতির আরোপেও সেই বাধা। মস্তিষ্কে স্মৃতির ছাপ নির্জ্ঞান মনের সহচারী ঘটনামাত্র, তাহা স্মৃতির কারণ নহে। তাহা ছাড়া স্মৃতিকে মস্তিষ্কের ছাপ বলাও যা, গানকে রেকর্ডের দাগ বলাও তা। অমুক রেকর্ডে এই প্রকার উঁচু-নীচু দাগ আছে বলিলে লোকে কিছুই বুঝিবে না, কিন্তু যদি বলা যায় অমুক গান আছে, তবে সহজেই তাহা লোকের বোধগম্য হইবে। মস্তিষ্কের স্মৃতির ছাপ কেহ কখন দেখেন নাই, তাহা অনুমান মাত্র; অতএব ছাপ আছে বলা অপেক্ষা অমুক ঘটনার স্মৃতি নির্জ্ঞান মনে আছে বলা ভাল। মনের সমস্ত ব্যাপার কেবল চেতনায় নিবদ্ধ বলিলে মনের সঙ্কীর্ণ সংজ্ঞা দেওয়া হয়। জড়জগতে প্রত্যক্ষ অনুভূত পদার্থ ব্যতীত যেমন অদৃষ্ট পদার্থের বাস্তবতা স্বীকার করা হয়, সেইরূপ মনোজগতেও প্রত্যক্ষ মন ছাড়া নির্জ্ঞান মনের কল্পনা যুক্তিযুক্ত।

নির্জ্ঞানের প্রমাণ

অন্য একদিক দিয়াও আমাদের নির্জ্ঞান মন স্বীকার করিতে হয়। মানসিক রোগের নিদান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, নির্জ্ঞান মন না মানিলে মানসিক লক্ষণের সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কোনো রোগিনী হয়ত তাহার পুত্রকে খুবই ভালবাসে কিন্তু তাহার মনে ক্রমাগত চিন্তা উঠিতেছে "ছেলেকে কাটিয়া ফেলিব।" এই চিন্তা রোগিনী ইচ্ছা করিলেও

মাল্যদান

শ্রীস্বর্ণলতা রাও

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

তাড়াইতে পারে না। বলা বাহুল্য, এইরূপ চিন্তা রোগিনীর স্বভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। রোগিনী অনেক সময় বলে কে যেন জোর করিয়া তাহার মনে এই চিন্তা ঠেলিয়া দিতেছে। হিষ্টিরিয়া রোগী ফিটের সময় হয়ত এমন আচরণ করে যাহার জন্য পরে সে অত্যন্ত লজ্জিত হয়। এক প্রকার মানসিক ব্যাধি আছে যাহাতে রোগীর মনে হয় কে যেন তাহার কানে কানে কথা বলিতেছে ও তাহাকে নানারূপ অবৈধ কার্য্য করিতে প্ররোচিত করিতেছে। রোগী সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহার কথা শোনা বন্ধ করিতে পারে না। সাধারণে অনেক সময়ে এই সকল রোগীকে ভূতাবিষ্ট বলিয়া মনে করে। কারণ রোগীর ব্যবহারে মনে হয় তাহার নিজের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতির এক আত্মার বশে সে চলিতেছে। ভূত মানিলে এই সকল রোগীর ব্যবহারের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ভূত রোগীর স্কন্ধে অধিষ্ঠান করিয়া তাহার শরীর মন দখল করিয়াছে ও তাহাকে ইচ্ছামত চালাইতেছে, কাজেই রোগী তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছে বা ভূতের কথা শুনিতে পাইতেছে। নির্জ্ঞান মন মানিলে এই সকল লক্ষণের ব্যাখ্যা করিবার জন্য ভূত ডাকিতে হয় না। নির্জ্ঞানবিৎ বলেন, মানুষের স্বভাবে নানা প্রকারের বিরুদ্ধ বৃত্তির সমাবেশ দেখা যায়। মানুষ যে অবস্থায় পড়ে, সেই অবস্থানুযায়ী মানসিক বৃত্তি প্রকাশ পায়। ছোটছেলে চোরের মধ্যে প্রতিপালিত হইলে চোর হইয়া দাঁড়ায়। সামাজিকহিসাবে মানসিক প্রবৃত্তিগুলিকে ভাল ও মন্দ—এই দুই ভাগে ফেলা যায়। যাহার মধ্যে ভাল প্রবৃত্তি অধিক, সে ভাল লোক; যাহার মন্দ প্রবৃত্তি অধিক, সে মন্দ লোক। অবস্থাবিশেষে পড়িয়াই মানুষ অধিকাংশ সময়ে ভাল মন্দ হয়। ভাল লোকের মন্দ প্রবৃত্তি একেবারে নাই তাহা বলা চলে না। সাধারণতঃ আমাদের মন্দ প্রবৃত্তিগুলি সামাজিক আবেষ্টনের গুণে নির্জ্ঞান মনে নির্ব্বাসিত হয় ও আমরা তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে চাই না। মাঝে মাঝে নানা কারণে এই সকল মন্দ প্রবৃত্তি নির্জ্ঞান হইতে সংজ্ঞানে আসিবার চেষ্টা করে। কখনো মন্দ প্রবৃত্তিগুলি স্বরূপে আসিয়াই চেতনায় দেখা দেয়। কখনও বা তাহারা ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে আসে। নির্জ্ঞানে অবস্থিত নিরুদ্ধ প্রবৃত্তিই মানসিক রোগের মূল। এইজন্যই মানসিক রোগের লক্ষণ রোগীর স্বভাববিরুদ্ধ মনে হয় এবং সম্পূর্ণ পৃথক স্বভাবের এক মন রোগীর দেহ আশ্রয় করিয়াছে, এইরূপ অনুমান হয়। মানসিক লক্ষণগুলি নির্জ্ঞান হইতে উঠে বলিয়াই তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা নিবারিত হয় না। যুক্তিতর্কের ফলে কেবল সংজ্ঞানের মনোভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব; নির্জ্ঞান মনে তাহাদের প্রভাব প্রবেশ করিতে পারে না। বিশেষ প্রক্রিয়ার দ্বারা চিকিৎসা করিলে নির্জ্ঞানস্থিত মনোভাব সংজ্ঞানে আসিয়া উপস্থিত হয় ও তখন তাহা যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রশমিত হয়। নির্জ্ঞানের বৃত্তি চেতনায় আসিলে রোগী অনেক সময়ে ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় অভিভূত হয়, কারণ তখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারে যে, এই অসামাজিক বৃত্তি তাহার নিজের মনেরই এক অংশ। এই সকল প্রমাণ হইতে নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়াছে। বাস্তবিক অপ-মনোবিদ্যার (abnormal psychology) অনুশীলনে প্রথমে নির্জ্ঞান মনের প্রভাব ধরা পড়ে। অপ-মনোবিদ্‌ই নির্জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয় করেন। নির্জ্ঞানে অবস্থিত বৃত্তিগুলি যে নিশ্চল নহে ইহাও তাঁহার আবিষ্কার। এই সকল বৃত্তি সর্ব্বদাই আমাদের চেতনায় আসিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সংজ্ঞানের বিরোধী প্রবৃত্তিগুলি তাহাদিগকে বাধা দিতেছে। এই সংঘর্ষের ফলে মনের রোগের উৎপত্তি।

নির্জ্ঞান মনের আরও প্রমাণ আছে। হিপ্‌নটিজম্ বা সংবেশনের কথা অনেকে শুনিয়াছেন। কোনো ব্যক্তিকে সংবেশিত করিয়া যদি সংবেশক তাঁহাকে বলেন যে তুমি ১০,০০০ মিনিট পরে অথবা অমুক তারিখে অমুক সময়ে মাথার উপর তিনবার হাত তুলিবে, তবে দেখা যায় যে, নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে ঐ ব্যক্তি আদেশমত কাজ করে। আশ্চর্য্য এই যে, সংবেশিত অবস্থা হইতে উঠিবার পর সংবেশকের আদেশের কথা তাহার কিছুই মনে থাকে না এবং সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ব্যক্তির মতই ব্যবহার করে। এক

বৎসর পরেও সংবেশকের আদেশ পালিত হইতে দেখা গিয়াছে, অথচ এই মধ্যবর্ত্তী কালে সেই ব্যক্তির মনে আদেশের কোনো ধারণাই থাকে না। তাহাকে এ সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে কিছুই মনে করিয়া বলিতে পারে না। আদেশ প্রতিপালন করিবার পর যদি তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, সে কেন ঐরূপ ব্যবহার করিল, তবে তাহারও কোনো সন্তোষজনক কারণ দেখাইতে পারে না, বলে আমার ইচ্ছা হইয়াছে করিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠিতেছে, কি করিয়া সংবেশিত ব্যক্তি সময়ের হিসাব রাখে এবং কি করিয়াই বা সে বুঝিতে পারে যে, নির্দ্দিষ্টকাল গত হইয়াছে। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সংবেশকের আদেশ সংবেশিত ব্যক্তি নিজের স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়াই মনে করে। সংবেশিত ব্যক্তির মনে যে কাল-গণনা চলিতেছিল এবং তাহার মনেরই কোনো অজ্ঞাত প্রদেশে যে সংবেশকের আদেশের ধারণা লুক্কায়িত ছিল তাহা মানিতেই হইতেছে। নির্জ্ঞান মনেই এই ধারণা ছিল এবং নির্জ্ঞান মনই কাল নিরূপণ করিতেছিল এবং নির্দ্দিষ্ট সময় গত হইলে সেই আদেশকে ইচ্ছার আকারে সংজ্ঞানে ঠেলিয়া দিয়াছে বলিলে সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত ব্যাখ্যা হয়।

স্বপ্নতত্ত্ব বিচার করিলেও নির্জ্ঞান মন মানিতে হয়। স্বপ্নে যে-সকল উদ্ভট কল্পনা দেখা দেয় তাহাদের উৎপত্তিও নির্জ্ঞানে। নির্জ্ঞানের রুদ্ধ ইচ্ছা ছদ্মবেশে নিদ্রাকালে সংজ্ঞানে দেখা দিয়া স্বপ্ন সৃষ্টি করে।

অচল ও সচল মন

মনোবিদ্যার ক্ষেত্রের পরিধি কতদূর বিস্তীর্ণ, এতক্ষণে তাহা বোঝা গেল। মনোবিৎ কেবল যে সংজ্ঞানেরই আলোচনা করিবেন তাহা নহে,—নির্জ্ঞানস্থিত মানসিক ব্যাপারও তাঁহার আলোচ্য বিষয়। মনোবিদ্যার দুইটা দিক আছে। মনের বৃত্তি কি কি, এই সকল বৃত্তির পরস্পর সম্বন্ধ কি প্রকারের, তাহাদের স্বরূপই বা কি ইত্যাদির আলোচনা মনোবিদ্যার এক দিক। কোন্ প্রবৃত্তির বশে মানুষ কাজ করে, কোন্ প্রবৃত্তি জন্মগত, প্রবৃত্তিগুলির পরস্পর ঘাতপ্রতিঘাতের ফলাফলই বা কি, কি ঘটনায় মনে সাধু ইচ্ছা উঠে, কখনই বা মনে অসামাজিক ইচ্ছা জাগে, কেন একজন কবি হয় অপরে চিকিৎসক হয়, একই আবেষ্টনে থাকিয়াও কেনই বা বিভিন্ন মানুষে বিভিন্ন ব্যবহার করে ইত্যাদি আলোচনা মনোবিদ্যার আর একদিক। এই দুই দিক পরস্পর বিযুক্ত নহে। প্রথমটির আলোচ্য বিষয়—মনের কাঠামো বা গঠন। ইহাকে অচল মন বলা যাইতে পারে। দ্বিতীয়টির আলোচ্য—মনের ক্রিয়া বা গতি। ইহাকে সচল মন বলা যায়। মনকে এন্‌জিনের সহিত তুলনা করিলে বলা যাইতে পারে, প্রথমটিতে এন্‌জিনের কলকব্জার গঠন-সংস্থান ইত্যাদি বিচার করা হয়; দ্বিতীয়টিতে এন্‌জিনের গতি, কি করিয়া এন্‌জিন দ্রুত চলে, কখনই বা আস্তে চলে, কি করিয়া বাঁশী বাজে ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা করা হয়। আমরা কয় প্রকার সংবেদন (sensation) অনুভব করিতে পারি, সংবেদনের স্বরূপ কি, প্রত্যক্ষ অনুভূতিই (perception) বা কি, সংবেদনের সহিত প্রত্যক্ষের কি সম্বন্ধ বা প্রতিরূপের (image) সহিত প্রত্যক্ষের কি যোগ আছে, মনোযোগ কাহাকে বলে, কয়টা বিষয় একসঙ্গে অবধান করিতে পারি, দুই ব্যক্তির মধ্যে কাহার স্মৃতিশক্তি অধিক, চিন্তায় কি কি মানসিক বৃত্তি আছে, ইত্যাদি প্রশ্ন অচল মনের অন্তর্গত। কেন মনে রাগ হয়, বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির সংঘর্ষে মনোভাবের কি পরিবর্ত্তন ঘটে, কেন একটা কাজ ভাল লাগে, অপরটা ভাল লাগে না, উদ্ভট চিন্তা কি করিয়া মনে উদয় হয়, কি করিয়া মানুষ স্বপ্ন দেখে ইত্যাদি প্রশ্ন সচল মনের। বহুকাল যাবৎ মনোবিৎ অচল মনের তথ্য আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। মাত্র অল্পদিন, হইল সচল মনের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িয়াছে।

অন্তর্দর্শন

অচল ও সচল উভয় মনের তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করিবার জন্য মনোবিৎ বিভিন্ন উপায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে অন্তর্দর্শনই মনোবিদের প্রথম ও প্রধান অস্ত্র। বিভিন্ন ঘটনায় ও বিভিন্ন অবস্থায়

মনোভাব কিরূপ হয় তাহা লক্ষ্য করিলে মনের অনেক কথা জানা যায়। অন্তর্দর্শন নিতান্ত সহজ নহে। অভ্যাসের দ্বারা অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা বাড়াইতে হয়। কেবল নিজের মন দেখিলেই মনোবিদের চলিবে না। অন্তর্দর্শনে অভিজ্ঞ বহু ব্যক্তির সাক্ষ্য মনোবিৎ গ্রহণ করিবেন, তবে সঠিক তথ্য নির্ণীত হইবে। কখন কখন মনোবিদ্‌কে যন্ত্রাদিরও সাহায্য লইতে হয়। চিনির মিষ্টতার স্বরূপ কি, অথবা কষ্টের সময় মনোভাব কিরূপ হয় ইত্যাদি জানিবার জন্য অন্তর্দর্শনই যথেষ্ট। কতটা পার্থক্য থাকিলে দুইটি স্বরের প্রভেদ ধরা পড়ে জানিতে হইলে যন্ত্রসাহায্যে বিভিন্ন স্বর উৎপাদন করিয়া অন্তর্দর্শনের দ্বারা তাহা নির্ণয় করিতে হয়। বোঝার উপর শাকের আঁটির ভার আমরা টের পাই না, কিন্তু শাকের আঁটিকে যদি ক্রমেই বড় করা যায় তবে এমন এক অবস্থা আসিবে যখন শাকের আঁটি চাপাইলেই বোঝার ভারের আধিক্য অনুভব করিতে পারিব। কতখানি বোঝায় কত বড় শাকের আঁটি চাপাইলে টের পাওয়া যাইবে, মনোবিৎ তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। এই পরীক্ষাতেও যন্ত্র আবশ্যক। আলোর প্রখরতার তারতম্য কখন্ চোখে ধরা পড়ে তাহা মনোবিৎ যন্ত্রসাহায্যেই বুঝিতে পারেন। হাত তুলিতে বলিলে কথা-শোনা ও হাত-তোলার মধ্যে কত সময় যায় তাহাও মনোবিৎ বিশেষ যন্ত্রের দ্বারাই নিরূপণ করেন। মনে রাখিতে হইবে, মনোবিৎ যন্ত্র ব্যবহার করিলেও অন্তর্দর্শনই সত্যাসত্য নির্ণয়ে তাঁহার প্রধান অবলম্বন। উদাহরণ দিলে কথাটা সরল হইবে। আলোর প্রখরতার তারতম্য নির্ণয়কালে যন্ত্রের দ্বারাই আলো বাড়ান বা কমান হয়, কিন্তু এই বাড়া-কমা আলোর সংবেদনের বাড়া-কমার অনুরূপ না হইতে পারে। পদার্থবিদের কাছে হাজার এক বাতির আলো হাজার বাতির আলো অপেক্ষা অধিক, কিন্তু মনোবিদের কাছে এই দুই আলোকজনিত সংবেদন একই; অতএব দেখা গেল, মনোবিৎ পদার্থবিদেরই যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া ভিন্ন সত্যে উপনীত হইতেছেন। অনেকে মনোবিদের যন্ত্রাগারে শারীর-বিদ্যার যন্ত্রাদি দেখিয়া মনে করেন বুঝি শারীরবিদ্যার জ্ঞান থাকিলেই মনোবিজ্ঞানও আয়ত্ত করা যায়, কিন্তু মনে রাখা উচিত, এই দুই বিদ্যার নির্ণীত তথ্য সম্পূর্ণ বিভিন্ন। পদার্থবিদ্যা, শারীরবিদ্যা, কিমিতিবিদ্যা ইত্যাদি বহুতর বিদ্যার যন্ত্রাদি মনোবিৎ ব্যবহার করেন সত্য, কিন্তু এই সকল যন্ত্র-সাহায্যে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহা তাঁহার নিজস্ব।

ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ

মন-অনুসন্ধানের দ্বিতীয় উপায় আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করা। কুকুরকে লেজ গুটাইয়া দৌড়াইতে দেখিলে যেমন তাহার ভয় হইয়াছে অনুমান করা যায়, সেইরূপ মানুষের ব্যবহার দেখিয়াও অনেক সময় তাহার মনোভাব বুঝিতে পারা যায়। যেখানে অন্তর্দর্শনের সম্ভাবনা নাই, সেখানেই এই উপায় অবলম্বন করা হয়। সুবিধা হইলে মনোবিৎ প্রথম ও দ্বিতীয় উপায় একত্র প্রয়োগ করেন, অর্থাৎ পরীক্ষ্যমান্ ব্যক্তিকে অন্তর্দর্শন করিতে বলিয়া তাহার অনুভূতির বিবরণ সংগ্রহ করেন এবং সেই সঙ্গে তাহার আচার-ব্যবহারও লক্ষ্য করেন। মানুষের ব্যবহারের দুইটা দিক আছে,—একটা স্থূল ও একটা সূক্ষ্ম। ভয় পাইলে আমরা বিপদ হইতে দূরে সরিয়া যাই। পলাইয়া যাওয়াটা ভয়জনিত ব্যবহারের স্থূল দিক। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটে, যথা মুখ শুখাইয়া যাওয়া, বুক দুড়দুড় করা, ঘাম হওয়া ইত্যাদি। এইগুলি ব্যবহারের সূক্ষ্ম দিক। কারণ তাহা বাহিরের লোকের চোখে ধরা পড়ে না। শারীরিক পরিবর্ত্তন ব্যবহারের অঙ্গ বলিয়াই পরিগণিত হয়। যন্ত্র ভিন্ন অনেক সময় এই সকল সূক্ষ্ম শারীরিক পরিবর্ত্তন ধরা পড়ে না। পরীক্ষ্যমান ব্যক্তিকে সূচ ফুটাইয়া কষ্ট দেওয়া হইল। যতক্ষণ কষ্টবোধ রহিল মনোবিৎ নানা যন্ত্রের দ্বারা দেখিলেন কষ্টের সঙ্গে সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয় কিনা, নিঃশ্বাসে কি পরিবর্ত্তন ঘটে, রক্তের চাপ বাড়ে কি কমে, চক্ষুতারকা বিস্ফারিত হয় কি না ইত্যাদি। এইরূপ পরীক্ষা হইতে কোন্ মানসিক অবস্থায় কি শারীরিক পরিবর্ত্তন হয় মনোবিৎ তাহার সন্ধান লন। পরে যদি কাহারও শরীরে ও

ব্যবহারে এই সকল পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তখন মনোবিৎ অনুমান করেন যে, তাহার মনেও তদনুরূপ বৃত্তি জাগিয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সংজ্ঞানের অচল মনের তথ্যসমূহ অন্তর্দর্শনের দ্বারাই নির্ণীত হইয়াছে। ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণে সচল মন ও নির্জ্ঞানের কিছু কিছু সংবাদ পাওয়া যায়। কাহারও ব্যবহারে হয়ত কোনো বিশেষ ব্যক্তির প্রতি আক্রোশের লক্ষণ প্রকাশ পাইল, কিন্তু মনে হয়ত তাহার কোনো আক্রোশই জাগিল না। এরূপ স্থলে মনোবিৎ অনুমান করেন যে, সংজ্ঞানে আক্রোশ না থাকিলেও নির্জ্ঞান মনে আক্রোশ আছে এবং তাহা হইতে আক্রোশের লক্ষণ উৎপন্ন হইয়াছে। জ্ঞানতঃ আমি সাধু হইলেও যদি আমার ব্যবহার চোরের মত হয়, তবে বুঝিতে হইবে, আমার নির্জ্ঞানে চুরি করিবার ইচ্ছা আছে। নির্জ্ঞানের সচল দিকটাই এই সব লক্ষণে ধরা পড়ে।

অবাধ-ভাবানুষঙ্গ

ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ ব্যতীত অন্য উপায়েও নির্জ্ঞানের সংবাদ পাওয়া যায়। এই উপায়ের নাম "অবাধ-ভাবানুষঙ্গ-ক্রম" বা Free Association Method। চিত্ত-বিশ্লেষণে মনোবিদের ইহাই তৃতীয় অস্ত্র। পরীক্ষ্যমান ব্যক্তিকে বিছানায় শোয়াইয়া তাহার মনে যে চিন্তা উঠে তাহা অকপটে প্রকাশ করিতে বলা হয়। পরীক্ষ্যমান ইচ্ছা করিয়া কিছু ভাবিবেন না, আপনা হইতে তাঁহার মনে যে চিন্তা উঠিবে তাহাই তিনি বলিবেন। তিনি কোনো কথা মিথ্যা করিয়া বলিবেন না বা কিছু গোপন করিবেন না। এরূপ অবস্থায় পরীক্ষ্যমানের মনে যে-সকল চিন্তার উদয় হয়, মনোবিৎ তাহার সমস্তই লিখিয়া লন। অনেক সময় এই চিন্তাগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিযুক্ত ও অর্থশূন্য মনে হয়। মনোবিৎ জানেন কোনো চিন্তাই অর্থশূন্য হইতে পারে না এবং পর-পর চিন্তাগুলির মধ্যে একটা যোগসূত্র নিশ্চয়ই আছে। এই যোগসূত্র বাহির করিতে পারিলেই নির্জ্ঞানে কি আছে বুঝা যাইবে। ধরা যাক, একজনের অবাধ-ভাবানুষঙ্গ দ্বারা পাওয়া গেল—"কোকিল—বসন্ত—মড়ক—থিয়েটার—জগন্নাথ বিষয় নষ্ট করছে---অসুখে পড়বে---ডাক্তার—বাবার অসুখ—ভাবিত আছি।" বলা বাহুল্য, এই চিন্তাগুলি সবই সংজ্ঞানের চিন্তা; কিন্তু মনোবিৎ দেখিয়াছেন অবাধ-ভাবানুষঙ্গে যে-সকল কথা মনে উঠে নির্জ্ঞানের রুদ্ধ প্রবৃত্তির দ্বারাই তাহারা নিয়ন্ত্রিত হয়। 'কোকিলের' চিন্তার সহিত 'বসন্ত' এবং 'বসন্তের' সহিত 'মড়কের' চিন্তা কেন উঠিয়াছে বোঝা সহজ। মড়কের পর 'থিয়েটার' কেন উঠিল তাহা হয়ত পরীক্ষ্যমানও বলিতে পারিবেন না। এই দুই ভাবের যোগসূত্র নির্জ্ঞানে অবস্থিত। "থিয়েটার—বিষয় নষ্ট—অসুখ---ডাক্তার—বাবার অসুখ—ভাবিত আছি"—এই চিন্তাগুলির পরস্পর যোগ সংজ্ঞানেই রহিয়াছে। অনেক সময় পর পর যে চিন্তা উঠে তাহাদের যোগসূত্র সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান উভয় মনেই দেখা যায়, অর্থাৎ একাধিক যোগসূত্রের দ্বারা এই ভাবগুলি পরস্পর-সংযুক্ত। সংজ্ঞানে এক একটি ভাবের বহুমুখী অনুষঙ্গ থাকে। "পেন্সিল" মনে উঠিলে কাগজ, কলম, লেখা, ছবি, ছুরি, ইত্যাদি যে-কোনো বিষয়ের কথা মনে আসিতে পারে। অর্থাৎ, এই সকল বিভিন্ন বিষয়ের সহিত "পেনসিল" কথাটার ভাবানুষঙ্গ রহিয়াছে। কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ ভাবটি পেন্সিল কথার পর মনে জাগিবে তাহা নির্জ্ঞান মন নিয়মিত করে। উদাহরণের "থিয়েটার" কথাটার পর "বিষয় নষ্ট" করার কথা মনে না আসিয়া "নাচ-গান" ইত্যাদি মনে আসিতে পারিত। কিন্তু এই সমস্ত কথা না আসিয়া "বিষয় নষ্ট" করা কেন আসিল বুঝিতে হইলে নির্জ্ঞানে সন্ধান লইতে হইবে। পরীক্ষ্যমানকে জিজ্ঞাসা করিলে হয়ত জানা যাইবে যে, পরীক্ষার সময় কোকিল ডাকিতেছিল বলিয়া তাহার মনে কোকিলের কথা আসিয়াছে। পরের ভাবগুলি কেন উঠিল পরীক্ষ্যমান তাহা জানেন না। নির্জ্ঞান মনোবিৎ দেখিবেন "কোকিল" কথাটার পরেই "রোগ ও মৃত্যুর" কথা আছে। তাহার পর আমোদ-প্রমোদ ও টাকা খরচের কথা; তাহার পরে পিতার অসুখের জন্য চিন্তা। বুঝিতে হইবে, পরীক্ষ্যমানের নির্জ্ঞানে এমন এক ভাব আছে যাহারই প্রভাবে এই সমস্ত চিন্তা পর পর সংজ্ঞানে

উঠিয়াছে। নির্জ্ঞানবিদের মতে এই পরীক্ষ্যমান ব্যক্তি সংজ্ঞানে তাহার পিতাকে হয়ত খুবই ভালবাসে এবং তাঁহার অসুখের জন্য সে হয়ত বাস্তবিক চিন্তিতও হইয়াছে, কিন্তু তাহার নির্জ্ঞানে সে পিতার মৃত্যুকামনা পোষণ করিতেছে। পিতার মৃত্যু হইলে সে বিষয় ভোগ করিতে পারে, এই ইচ্ছার বশেই সংজ্ঞানের চিন্তা পর পর উঠিয়াছে। এইজন্যই কোকিলের ডাকে তাহার অন্য কোনো কথা মনে না পড়িয়া এমন কথা মনে পড়িয়াছে, যাহার সহিত এক মারাত্মক রোগের সম্বন্ধ বর্ত্তমান। এইজন্যই এমন এক লোকেরও কথা মনে পড়িয়াছে যে পৈতৃক বিষয় নষ্ট করিতেছে। সেই ব্যক্তি অসুখে পড়িবে এই ধারণা মনে উঠিবার কারণ এই যে, তাহা না হইলে পিতার অসুখের কথা আসা সহজ হয় না। সামান্য চিন্তার ধারা হইতে নির্জ্ঞানবিৎ কি ভয়ানক সিদ্ধান্ত করিলেন! প্রথম-দৃষ্টিতে নির্জ্ঞানবিদের এইরূপ সিদ্ধান্তকে কষ্টকল্পনা মনে হইতে পারে। কিন্তু যদি পরীক্ষ্যমানের বিভিন্ন সময়ের চিন্তাধারা হইতে বার বার এই একই অনুমান সম্ভবপর হয় তবে আর নির্জ্ঞানস্থিত পিতৃবিদ্বেষকে অস্বীকার করা চলে না। নির্জ্ঞানে এইরূপ রুদ্ধ ইচ্ছা থাকিলে নানা ব্যবহারেও তাহা প্রকাশ পায়। এইরূপ রুদ্ধ ইচ্ছা ছদ্মবেশে স্বপ্নেও নানা আকারে দেখা দেয়।

মনোবিদ্যার সাফল্য

অন্তর্দর্শন, ব্যবহার-পর্য্যবেক্ষণ ও অবাধ-ভাবানুষঙ্গক্রমের যথাযথ প্রয়োগে সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান উভয় মনের তথ্যসমূহ নির্ণীত হয়। অল্পদিন মাত্র নির্জ্ঞান মনোবিদ্যার অনুশীলন হইতেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই নির্জ্ঞানের যে-সমস্ত তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে চমৎকৃত হইতে হয়। সংজ্ঞান মনের উপর নির্জ্ঞানের প্রভাব অতিশয় প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের মনোবৃত্তি নির্জ্ঞানের দ্বারাই চালিত হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক কেন পুষ্টিলাভ করে, নির্জ্ঞানবিৎ তাহার কারণ দেখাইতে পারেন। সকলেই জানেন প্রাত্যহিক জীবনে আমরা নিজ নিজ স্বভাববশে চলিয়া থাকি। অনেকে মনে করেন, এই স্বভাব জন্মগত ও অপরিবর্ত্তনীয়। 'স্বভাব যায় না ম'লে।' নির্জ্ঞানবিৎ দেখাইয়াছেন, যাহাকে আমরা স্বভাব বলি তাহার অধিকাংশই জন্মগত নহে। নির্জ্ঞান মনই তাহার প্রধান নিয়ন্তা। শৈশবের আবেষ্টনে নির্জ্ঞান মন গড়িয়া উঠে এবং তাহার গতি কোন্ দিকে যাইবে শৈশবে তাহা এক প্রকার স্থির হইয়া যায়। কে কবি হইবে, কে চিকিৎসক হইবে, কে চোর হইবে, কে সাধু হইবে, তাহা অনেকটা শৈশব জীবনের পারিপার্শ্বিক ঘটনার উপর নির্ভর করে। নির্জ্ঞানবিৎ বলেন, শিশুর জীবন যথাযথ নিয়ন্ত্রিত হইলে ভবিষ্য জীবন সুখের হয়। নির্জ্ঞান মনের গোলমালে মানসিক রোগ সৃষ্টি হইতে পারে এবং চরিত্রের পূর্ণতা লাভ হয় না। নির্জ্ঞানের পরিণতির ব্যাঘাতই জীবনে অসুখী হইবার এক প্রধান কারণ।

মানুষ সাধারণতঃ বহির্জগতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া সুখভোগ করিবার চেষ্টা করে। সমস্ত জড়বিজ্ঞান মানুষের এই চেষ্টার সহায়ক। হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ, বহির্বস্তুতে স্থায়ী সুখ নাই, মনঃসংযমেই প্রকৃত সুখলাভ হয়। স্থিরপ্রজ্ঞ ব্যক্তি সর্ব্বাবস্থায় সুখী। মনকে শাসনে রাখিবার জন্য নানা আচার, অনুষ্ঠান ও কৃচ্ছ্রতাসাধনের উপদেশ দেওয়া হয়। নির্জ্ঞান নিরাকরণ সুখশান্তি পাইবার অন্যতম পথ। নির্জ্ঞানবিৎ ভরসা দিতেছেন, রুদ্ধ প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইলে মনের দ্বন্দ্ব মিটিয়া সমস্ত দুঃখ অপনীত হয়। শোক-তাপ-দগ্ধ শ্রান্ত-ক্লান্ত বিক্ষুব্ধ মনের শান্তির উপায় এতদিন ধর্ম্মের উপদেশের মধ্যে নিহিত ছিল। জড়বিজ্ঞানবিদ্‌কে এখানে ধর্ম্মোপদেষ্টার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছে। কিন্তু আজ মনোবিদ্যা মানুষকে আশ্বাস ও শান্তির বাণী শুনাইয়া বিজ্ঞানের মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

পুনশ্চ—

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

রাত এগারোটা হ'বে—চাঁদ ওঠেনি, অন্ধকার। অন্ধকারের মধ্যেই পাথরে গাঁথা একটা বেঞ্চের ওপর বসে বসে সমুদ্রের গর্জ্জন শুনছিলাম,—একা। দিনের কোলাহলে, জনতার মাঝখানে সমুদ্রকে আমি চিনতে পারিনি, এই অন্ধকারের মধ্যেই তার পরিচয় পেলাম।

লোকজন বড়-একটা নেই, আকাশে মেঘ করেচে। ঠিক যেন উপরের প্রকাণ্ড আয়নায় অস্থির সমুদ্রের ছায়া। চৈত্র-শেষের এলো-মেলো হাওয়া। একা একা কি যে ভাবছিলাম মনে নেই, হয়ত কিছুই না। পায়ে কিসের স্পর্শ পেলাম; আর একটু উন্মনা থাকলেই চমকে উঠতাম বোধ হয়।

ছোট একটি কুকুরছানা, পশমের মত নরম। শরীরে মাংসের চেয়ে লোমই বোধ হয় বেশী। চমৎকার, কিন্তু এখানে কেন? যে জন্যই হোক, কোলে তুলে নিই। খানিক যেতে না যেতেই নিরুপদ্রব ঘুম!

এই অযাচিত জীবটিকে নিয়ে কি করি, তাই ভাবছিলাম।—না, কোন উপায়ই নেই। ছেড়েই দেব শেষ পর্য্যন্ত। এমন কত জিনিষই ত ফেলে এলাম!

বারটা বাজে, ওঠবার আগ্রহ নেই। দরকারই বা কি! কুকুরছানাটি যতক্ষণ না জাগে, ততক্ষণ বসেই থাকবো, কিন্তু কোত্থেকে এল কে জানে!

কিছুক্ষণ কেটেছে। বৃষ্টি হ'ল না, কিন্তু সমুদ্রের চাঞ্চল্য বাড়চে। আজ অমাবস্যা।

জুলু! জুলু!

কাছেই কে কাকে খুঁজে বেড়াচ্চে, টর্চ্চের আলোই শুধু দেখা যায়, পিছনের মানুষটিকে নয়।

জুলু!—এবার আরও কাছে! মেয়েমানুষের কণ্ঠ। চঞ্চল হয়ে উঠলাম, কুকুরছানাটাই যদি জুলু হয়! উঠে দাঁড়ালাম।

—কি খুঁজছেন জিজ্ঞাসা করতে পারি?

মেয়েটি আমাকে দেখেনি; অন্ধকারের মধ্যে এতরাত্রে এখানে কেউ থাকতে পারে তাও আশা করেনি বোধ হয়। বুঝলাম একটু বিব্রত।

—বোধ হয়, আপনার কোন কুকুরছানা,—

কুকুরছানাটি সত্যই তাঁর। হাতে তুলে দিলাম, বিনিময়ে ছোট্ট অস্ফুট একটি ধন্যবাদ। কিন্তু কণ্ঠস্বরে উচ্ছ্বাস নেই, বেশ একটি সহজ স্থিরতা আছে। অন্ধকারে মুখ দেখতে পেলাম না। চলে যাবার সময় বললাম—বলবার কোন দরকারই ছিল না, তবু বললাম,—ওটা আমি অপহরণ করিনি। নিজেই আমার পায়ের কাছে এসে বসেছিল। কিছু মনে করবেন না।

মেয়েটি আরও বিব্রত হয়েচে। মাথা নেড়ে বললে,—কি আশ্চর্য্য, সে কথা আমি মনেই করিনি।

গলা শুনে আশ্চর্য্য বোধ হ'ল! ভুলেই গিয়াছিলাম, কিন্তু···কি জানি!

—একটা অন্যায় কথা জিজ্ঞেস করবো, ক্ষমা করবেন। আপনার নাম—মনে হ'চ্চে বনলতা, নয় কি?

বনলতাই বটে। কিন্তু আমায় চিন্‌তে পারেনি। আশ্চর্য্য হয়ে চেয়ে আছে।

—চিনতে পারছি না।

—না চেনারই কথা বটে। কিন্তু আমি তোমায় মনে করতে পারি—কলকাতার—গোপাল বোসের লেনে,—

কুকুরছানাটিও হাত থেকে পড়ে গেল। বললে,—তুমি,—পঙ্কজ! এখানে?

—কারো সন্ধানে নয়, নিতান্ত অকারণে। কিন্তু তুমি?

—সমুদ্রের হাওয়া খেতে নয় গো! চল আমাদের ওখানে, দাঁড়াতে পারছি না। হতভাগা কুকুরটা দেড়ঘণ্টা খোঁজাখুঁজি করিয়েছে।

—যেতে পারলে সুখী হ'তাম। কিন্তু তার দরকার নেই।

—কেন!

—তুমিই বল।

বনলতা কিছুই বলতে পারলে না। হয়ত, সত্যই আমাদের দেখা হ'বার কোন দরকার ছিল না। কিই-বা থাকতে পারে।

পায়ের তলা থেকে ছানাটিকে তুলে নিয়ে ও ফিরে চললো। বনলতাও অভিমান করতে পারে তা' কে জান্‌ত!

খানিক পরে ধর্ম্মশালায়।—কেউ জেগে নেই, কিন্তু ঘুম এলো না চোখে।—পুরাণো কথাগুলি বড় বেশী করে মনে পড়চে।

গোপাল বোসের লেনে ছোট্ট একটি দোতলা বাড়ী। আমরা নীচে, বনলতারা উপরে। 'আমরা' বলতে আমি আর মা; বনলতারাও দু'জন,—স্বামী-স্ত্রী। বনলতার স্বামী মাকে দিদি বলতেন, সেই সূত্রে বনলতা আমার মামী। ওর স্বামী হাবুমামাকে আমার অনেক দিন মনে থাকবে। বিয়ের বয়স যখন পার হয়ে গেছে, তখন বনলতাকে তিনি বিবাহ করেছিলেন; কেন করেছিলেন তা আজও ঠিক বুঝতে পারি না। রাত্রে বাড়ীর সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ থাকতো ক্বচিৎ, বনলতার নিঃসঙ্গতা দূর করতে হ'ত মাকে। কি করতেন ঠিক জানি না, বোধ হয় রেশ খেলতেন এবং আরও অপ্রকাশ্য একটা কিছু করতেন। যাই হ'ক, সে বয়সে ও-বিষয়ে মাথা ঘামাবার কথা আমার নয়।

একাদশীর দিন রাত্রে মা উপবাসে অবসন্ন হয়ে পড়তেন; সেদিন—আমার খাবার তৈরী ও পরিবেশনের ভার নিত এই বনলতা। প্রদীপের আলোয়—আমার সামনে বসে বনলতা ছেলেমানুষের মত গল্প করে যেত! তার অদ্ভুত ও অকারণ অনেক প্রশ্ন আজও আমি মনে করতে পারি।

—আচ্ছা, বিয়ে হ'লে মেয়েমানুষের ইস্কুল যাওয়া চলে না বুঝি?

—আচ্ছা, তুমি আরও বড় হ'লে না কেন? তা' হ'লে এদ্দিন তোমার বিয়ে হ'ত, তোমার বউটির সঙ্গে বসে বসে এতক্ষণ গল্প কর্‌তাম।

—আমাদের গাঁয়ের রাধারাণীর বিয়ে হয়েচে এই কলকাতায়। শুনেচি ওর বর খুব বড়লোক, একটি ছেলেও হয়েচে। কতদিন তাকে দেখিনি। ভারি দুষ্টু ছিল ও! তার খোঁজ নিয়ে আসবে? কিন্তু ঠিকানা জানি না।

—আচ্ছা, তুমি কটা পাশ দিয়েচ? মোটে একটা! আমাদের সেখানকার বিশু-দা তিনটে পাশ দিয়েচে। তুমি দাওনি কেন? কিন্তু সে তোমার মত সুন্দর নয়।

সেদিন মানুষের গহন মনোলোকের কোন কথাই জানা ছিল না; কিন্তু আজ সেগুলো জোড়াতাড়া দিয়ে একটা সুলভ এবং লোভনীয় কাহিনী খাড়া করে তোলা হয়ত বিশেষ কষ্টসাধ্য নয়, তবে সে প্রবৃত্তি নেই।

বনলতা বোধ করি আমার সমবয়সী, অন্তত আমাদের বয়সের ব্যবধানটা খুব বেশী নয়। মনে হয়, এইজন্যেই বনলতা আর আমার মধ্যে এমন একটি অস্পষ্ট রহস্যময় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল, যা প্রচলিত কতকগুলি শব্দ দিয়ে ব্যাখ্যা করবার উপায় নেই। মায়ের কোলে শুয়ে আষাঢ়ের অন্ধকার রাত্রে শিশু যেমন চোখ বুজে রাজকন্যার রূপ-কথা শোনে, তাকে বুঝতে পারে না, অথচ দেখতে পায়, অনুভব করে—আমিও তেমনি বনলতাকে না বুঝেই মনে করতাম, ওকে আমি জানি ও আমার একান্ত নিকট। কতদিন মনে হ'ত, হাবু যদি মাকে দিদি না বলতেন, তা হ'লে এই বনলতাকে আমি দিদি বলে ডাক্‌তুম। 'মামী'র মধ্যে সম্পর্ক আছে বৈ কি, কিন্তু দূরত্ব আছে আরও বেশী!

এমনি পুরো পাঁচ বৎসর।

তারপর হঠাৎ একদিন ওর স্বামী গেল মারা। মা বললেন,—ও-সব লোক এমনিই হঠাৎ মারা যায় রে, দুঃখু করে লাভ নেই।

ভারি আশ্চর্য্য হয়েছিলাম। অতবড় একটা মানুষ,

দেখতে দেখতে শুকিয়ে গেল ; দুচার দিন মুখ দিয়ে উঠল রক্ত, তার পরেই—

সেদিন বনলতার মত দুরবস্থা বোধ করি আর কারো নয়। বর্দ্ধমানের ওধারে কোন্ এক অজ পাড়াগাঁয়ে ওদের দেশ। কলকাতায় আসতে লাগে দু'দিন, কারণ একদিন গরুর গাড়ীতে কাটিয়ে তারপর রেল। সেখানে চিঠি লিখে দিয়ে, পাড়ার ছেলেদের ডেকে এনে হাবু মামার সৎকার করা হয়েছিল।

বনলতার এয়স্ত্রীর চিহ্ন মুছে গেল, থান উঠলো পরণে,—ষোল বছরের বিধবা বনলতা,—যেন শ্বেতাম্বরী উষা।

দিন-পাঁচেক পরে এল ওর ভাই। তারপর একদিন উপরের ঘর দু'খানা খালি হ'ল। যাবার সময় বনলতা মা'র পায়ে প্রণাম ক'রে বলেছিল,—আর বোধ হয় দেখা হ'বে না দিদি, পঙ্কজকেও কোনো দিন যেতে বলবার উপায় নেই, কারণ সে দেশে মানুষ সহজে যায় না।

মা বলেছিলেন,—ম্যালেরিয়ায় ভুগে আর উপোস করে যদি বেঁচে থাক বউ, তা' হ'লে পঙ্কজ মানুষ হ'লে আবার দেখা নিশ্চয়ই হবে।

গাড়ীতে উঠে বনলতা অদ্ভুতভাবে একটু হেসেছিল ; বলেছিল,—দিদি কি বললেন, মনে থাকবে ত পঙ্কজ ?

মনে আছে, সে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়নি। উত্তর দিলেও সেটা মিথ্যা হ'ত। কারণ, তার ঠিক ছ'মাস পরেই হঠাৎ বিসূচিকায় মা'র মৃত্যু এবং তার কিছুদিন পরেই দেশে অসহযোগের বন্যা, ফলে লেখাপড়া ত্যাগ। ভেবেছিলাম, তুষার-কিরীটিনী ভারত তাতে স্বর্ণ-কিরীটিনী হবে, বারকয়েক আলিপুরেও আতিথ্য স্বীকার করা গিয়েছিল সেই উদ্দেশ্যে ; কিন্তু কিছুই হয়নি। জীবনের হাটে আজ আর আমার দাম নাই। অসহযোগের সেই বিরাট চাঞ্চল্যের মধ্যে বনলতার কোনো কথাই মনে ছিল না, মনে ছিল না,—বাংলার ম্যালেরিয়ার জীর্ণ কোনো গ্রামের প্রান্তে আজও তার জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা হয়ত পড়েনি।

তারপর আজ এই আকস্মিক সাক্ষাৎ। কিন্তু কার সঙ্গে ও এখানে এল, কিছুই জানা হ'ল না। হঠাৎ ওর সঙ্গে ওরকম ব্যবহারই বা কেন করলাম তাই বা কে জানে !

তখনও সূর্য্যোদয়ের বিলম্ব ছিল, অন্ধকার স্বচ্ছ হয়নি। ছোট ছেলেমেয়েগুলি বালির উপর ছুটে বেড়াচ্ছে, সমুদ্রের জল হঠাৎ পা ছুঁয়ে সরে যাচ্চে বলে' ওদের খুসীর অবধি নেই। কতকগুলি মেয়ে অন্ধকারের মধ্যে ঝিনুক খুঁজে বেড়ায়। আকাশে শ'ত রঙের সমারোহ !

লক্ষ্য স্থির ছিল না, হঠাৎ চোখ পড়ল বনলতার অস্পষ্ট মূর্ত্তির উপর ; একখানি মোটা এণ্ডির চাদর ভাঁজ করে গায়ে দিয়ে জলের ধারে দাঁড়িয়ে আছে। কি বলে ডাকা ওকে সঙ্গত হ'বে তাই মনে মনে ভাবছিলাম, এমন সময় ও নিজেই ফিরে দাঁড়াল।

—সমস্ত রাত কি সমুদ্দুরের ধারেই ছিলে না কি ?

—ঠিক তা নয়, এই আসছি। কিন্তু তুমি কার সঙ্গে এ দেশে এলে সেইটেই কাল জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

বনলতা মুচ্‌কে একটু হাস্‌লো,—তবু ভাল ! কাল যেভাবে বিদেয় করে দিলে, তা'তে একটুও আশা করতে পারিনি। এসেছি দাদাকে নিয়ে, তার অসুখ। অবস্থাও খুব ভাল নয়। সমস্ত রাত্রি চীৎকার করে এইমাত্র ঘুমিয়ে পড়লেন। ক'দিন উপরি উপরি রাত জেগে ভারি ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল, বেরিয়ে এলাম এখানে।

বনলতার মুখের দিকে চাইলাম। সিন্দুরহীন সীমন্ত, পাংশু দুটি ওষ্ঠাধর, নিষ্প্রভ দুটি চোখ ! সূর্য্যোদয় হ'ল, কিন্তু সেদিকে চাইতে ভুলে গেলাম।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বনলতা বললে,—ওকি, তুমি যে দেখলেই না ! কি আশ্চর্য্য ! ভাবছ কি ?

—তাই ত ! না, কতদিন এখানে আছ ?

—দিন বাইশ।

—একা ?

—নইলে আর কে ? বৌ-দি বছর দুই আগেই মারা গেছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, আমার সব খবরই ত' একে একে জেনে নিলে, কিন্তু তোমার—

—দেবার মত একটা খবরও নেই।

—কেন, মা···

—নেই!

বনলতা আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল। বোধ করি ও ভেবেছিল, ম্যালেরিয়া, কলেরার অত্যাচারের মধ্যে ও যেমন বেঁচে আছে, মাও তেমনি থাকবেন! ওর দু' চোখ দিয়ে জল নেমে এল। অসঙ্কোচে কাঁধের উপর হাত রেখে বললে,—বলো। আমি দাঁড়াতে পারচি না।

সমুদ্রের জল আছাড় খাচ্চে পায়ের কাছে; বসলাম দু'জনে। কিন্তু কথা বলতে পারলাম না অনেকক্ষণ!

বনলতাই বললে,—কি করচ এখন?

—কিছু না, একটা বিপ্লবী-দলে আছি।

—সে আবার কি!

একটু হেসে বললাম,—বিশেষ কিছু নয়, বোমা-টোমা তৈরী করতে হয়, ধরা পড়লে জেলে যেতে হয়, দল ভেঙে গেলে এমনি কোনো জায়গায় এসে হাওয়া খেতে হয়।

বনলতা তবু ঠিক বুঝল না, বললে,—কত মাইনে দেয়?

বিজ্ঞতার হাসি আসেনি, কারণ বনলতাকে আমি চিনি। দুঃখের হাসি হেসেই আমি বললাম,—জেলে যাওয়াটাকেই মাইনে বলতে পারো। ওর বেশী আমরা পাই না, চাই-ও না।

—কটা পাশ দিলে? তিনটে? তোমাকে বলিনি, আমাদের বিশু-দা মারা গেছে।

—তা যাক, সে বেচারি তিনটে পাশ করেও মারা গেল, আমি একটা নিয়েই বেঁচে আছি। তার বেশী এগোতে পারিনি।

এত কথার পরেও বনলতা জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় বিয়ে করা হ'ল শুনি?

—কোথাও না।

বনলতা হেসে উঠ্‌লো,—তাতে আজও পুরানো দিনের সুর পুরোমাত্রায় বজায় আছে।

—সব মিছে কথা। আমাকে বোকা পেয়ে খালি যা'তা বলা হচ্চে।

—সত্যি, একটাও মিছে কথা নয়। আমার চাল-চুলো কোনো কিছুরই ঠিক নেই।

বনলতা আবার হঠাৎ হেসে উঠ্‌লো! কোলের উপর হাত রেখে বললে,—কাল কি মজা হয়েছিল, শোনো। দাদাকে ওষুধ খাইয়ে বসে আছি, পিদিমের তেল ফুরিয়ে এসেছে। ঘুম আসছিল, চোখ বুজতেই মনে হ'ল দিদি আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলচেন,—'ভয় কি বউ, পঙ্কজ মানুষ হ'লে আবার দেখা হবে!'

বনলতা কথাটা আরম্ভ করেছিল হাসি দিয়ে, শেষ হ'ল অশ্রুজলে। ওকে এ অবস্থায় আর কেউ হয়ত পাগল বলে মনে করত।

জেলেরা তখন অথৈ জলে নৌকা ভাসিয়েছে, তরঙ্গের মাথায় মাথায় নৌকার নাচ!—অনেকে স্নানও সুরু করেচে।

বনলতা উঠে দাঁড়াল।

—বেলা হ'ল, দাদা বোধ হয় ঘুম থেকে উঠেচেন। এখুনি আমায় খুঁজতে লোক পাঠাবেন! ছিঃ—তাঁর অসুখের কথা মনেই ছিল না। চল আমার সঙ্গে, বাড়ীটা দেখে আসবে।

বনলতাকে বাড়ী পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলাম। ভিতরে ঢুকিনি, কিন্তু বিকালে যাব ব'লে এসেচি। বুঝলাম, বনলতার অন্তরের অন্তঃপুরের গোপাল বোসের লেনের সেই অতিজীর্ণ, অন্ধকার দোতালা বাড়াটি আজও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। কিন্তু সে তার অবশিষ্ট প্রকাণ্ড জীবনের কতটুকু?

জীবনের চলার পথে অনেক নারীর পরিচয় পেলাম, কিন্তু বনলতার মত কেউ নয়। ও একা, অনন্যসাধারণ, অদ্ভুত। বুদ্ধি তার নিতান্ত মোটা নয়, কিন্তু তার ব্যবহার সে শেখে নি। জীবনের যে ছবি একদিন দেখেচে, ও আশা করে চিরকাল সেটি সেই মত থাকবে।

বৈকালে আবার দেখা হয়। ওর ভাইয়ের জীবনের অবস্থা সত্যিই খারাপ হয়ে এসেচে। চোখ দুটো যেন মুখের অনেকখানি নীচে নেমে গেছে, নাকটা খাড়ার মত উঁচু। গ্রামেই একটা গোলাদারি দোকান খুলে বেচারি কোনো মতে নিজের ব্যয়নির্ব্বাহ করছিল। ছেলেমেয়ে নেই, ভাই-বোন শুধু। কিন্তু 'শিবের

অসাধ্য' এই ব্যাধিই তাকে নিয়ে এল সমুদ্রের দেশে। বলা বাহুল্য, গোলাদারি দোকান আর নেই। সেই টাকায় খরচা চলচে।

জীবনকে আমি কলকাতায় দেখেচি।

বললে,—এ রোগের বৈশিষ্ট এই যে, মৃত্যুকে এতে তিলে তিলে অনুভব করা যায়। অন্য ব্যাধির মত অচৈতন্য করে রাখে না। চমৎকার! কিন্তু পঙ্কজবাবু, হাতে আর শ'খানেক টাকা মাত্র আছে। যদি মরতেই হয় তবে সেইগুলি শেষ হ'বার সঙ্গেই যেন আমারও শেষ হয়।

•

জড়িয়ে গেলাম। ভুঃখিনী ভারতবর্ষের সহস্র কোটী তুঃখের কথা মনে করে অশ্রুজল ফেলার পরিবর্ত্তে জীবনের রুগ্ন দেহ কোলে তুলে নিলাম। আবার বনলতা নিজের হাতে রেঁধে খেতে দিল। ধর্ম্মশালার বাস তুলে দিলাম।

সেদিন রাত্রে বনলতা ঘুমিয়ে পড়েচে। বারটা হ'বে হঠাৎ জীবনের একটা যন্ত্রণা বেড়ে উঠলো। বল্লে বাক্সে একটা ওষুধ আছে, বনোকে জাগাও। কিন্তু বনলতার নিদ্রা-শিথিল মুখের দিকে চেয়ে ওকে জাগাতে পারিনি। যা দিনের প্রখরতায় কোনো দিন চোখে পড়েনি, রাত্রির মাথায় তা বোঝা গেল। সে যে কি তা বুঝতে পারি, বলতে পারি না। সে এক প্রগাঢ় ক্লান্তি, সুগোপন দারিদ্র্যের ইতিহাস। চাবিটা ওর আঁচল থেকে খুলে নিলাম, বাক্সও খুললাম নিজেই। কিন্তু ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এমন একটা জিনিষ চোখে পড়ে গেল যা জীবনে কোনো দিন আশা করিনি।

একখানি ছবি। স্কুলে ফুটবল খেলায় নাম করেছিলাম; কি-একটা ফাইনালের গ্রুপ ছবি, আমিও ছিলাম। বনলতার কলকাতা ত্যাগের পর একদিন আবিষ্কার করি,—ছবিটা নেই। কিন্তু সেটা যে আজ বনলতার বাক্সে পাব, তা কে জানত। মাও এ কথা জানতেন বলে মনে হয় না, কিন্তু বনলতার এই গোপন-সংগ্রহের অর্থ যে কি তা কেমন করে বলি?

তার স্বল্পায় কলকাতার জীবনের স্মৃতি যাতে মুকুন্দপুরের আগাছা-জঙ্গলের মধ্যে একেবারেই বিলুপ্ত না হয়ে যায়, বোধ করি সেইজন্য, কিংবা,—? জানি না।

জুলুকে ভালবেসে ফেললাম এবং সে ভালবাসার প্রতিদানও পেলাম। রাত্রে ও আমার পাশে পড়ে ঘুমোয়, দিনের বেলায় কেবল আমারই পাশে পাশে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু জুলুর মধ্যে অস্থিরতা নেই, ওর প্রভু যে রুগ্ন, এ কথাটা কেমন করে যেন ওর মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে। জীবন গোলাদারি দোকান চালায় বটে, কিন্তু তার রুচি অমার্জ্জিত নয়, সে কথা জুলুকে দেখলেই বোঝা যায়।

দলের সুরেশ্বরের কাছ থেকে চিঠি পেলাম।—যাওয়া চাই, নতুন করে একটা সমিতি গড়তে চায়। আমাকে নইলে ওর চলবে না। এ কথা আমিও জানি; কিন্তু সুরেশ্বরকে যাবার আশ্বাস দিয়ে হঠাৎ কোনো চিঠি দিতে পারলাম না। বনলতার সামনে যাবার কথা তোলা আমার পক্ষে সহজ নয়। সুরেশ্বর আমার ওপর মর্ম্মান্তিক অসন্তুষ্ট হবে বুঝতে পারচি।

* * * *

বনলতার সঙ্গে দেখা হবার তের দিন পরে জীবনের অবস্থা হঠাৎ শোচনীয় হয়ে উঠলো। হ'বারই কথা। শেষের ক'দিন ভাল পথ্যও জুটছিলো না।

বনলতা বললে,—দাদা ওটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, নইলে জুলুকে বিক্রী করে……

বুঝলাম। কিন্তু জীবন যতদিন আছে, ততদিন সত্যিই ওকে বিক্রী করা সম্ভব নয়।

সুরেশ্বরকে চিঠি লিখে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলাম,—সামান্যই। কিন্তু জীবনের অবস্থার কোনো উন্নতি হ'ল না, আরও তের দিন পরে এক ঝলক রক্তের সঙ্গে জীবনের এবারের জীবন-কাহিনী শেষ হয়ে গেল।

জীবন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, অনেক দিন থেকেই পুড়ছিল। কিন্তু আমার পায়ে ও লোহার বেড়ী পরিয়ে দিয়ে গেল। বহু জাতি, বহু মত, বহু ধর্ম্মে বিভক্ত, বহু রকমের তুঃখ দুর্দ্দশায় ঘেরা আমার ভারতবর্ষের মধ্যে,

তার মুক্তিসাধনার স্বপ্নের মধ্যে, বনলতা এসে দাঁড়াল অদ্ভুতভাবে।

মুকুন্দপুরে বনলতার আশ্রয় ব'লে কিছু নেই, সহায়ও না। ও আশা করচে, আমি তাকে আশ্রয় দেব, আর তাকে পুরো একদিন গরুর গাড়ীর ধাক্কা সহ্য করে মুকুন্দপুরে যেতে হ'বে না। বনলতা আজও জানে, আমি মানুষ হয়েছি, অর্থাৎ আমার টাকাকড়ির কোনো অভাব নেই। মানুষ বলতে ও এইটুকুই বোঝে। ও জানে না,—আজও ভারতবর্ষের পা থেকে পরাধীনতার বেড়ী খসে পড়েনি, আজও একদল ছেলে দেশের বনে-জঙ্গলে লুকিয়ে, লোকালয় থেকে আত্মগোপন করে, নিরাহারে অনিদ্রায় ভারতের মুক্তির স্বপ্ন দেখচে···

বনলতাকে কথাটা স্পষ্ট করেই বলতে হ'ল। কিছুক্ষণ কোনো কথাই তার মুখে এল না, নিরর্থক নিষ্প্রভ দু'টি চোখ দিয়ে আমার মুখ চেয়ে রইলো। খানিক পরে বললে,—তা হ'লে কোথায় যাব? সেখানে আমার কেউ নেই, একজনও না, আসবার সময় দাদা বাড়ী বিক্রী করে এসেচেন···তা'ছাড়া, তুমি সেখানকার মানুষগুলোকে চেনো না, তোমাকে কি করে বোঝাব—

বোঝানোর কোনো দরকার ছিল না। কিন্তু উপায় কি?

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের ধারে বসে কাটালাম। জ্যোৎস্নাময় বালুবেলা বনলতার শাদা থানের মত অদ্ভুত!

পৃথিবীতে আমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তির সঙ্গে বনলতার পরিচয় থাকলে আজ সে বেঁচে যেত, কিন্তু আমিই এসে দাঁড়ালাম তার পথে! বনলতাকে আমি ভুলেছিলাম···কিন্তু এতদিন পরে এ কি কৌতুক!

বনলতার মত মেয়ে আমার পথে বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নয়; ওর নিজের কোন সত্তা নেই, নিজের ওপর ও নির্ভর করতে পারে না। আমিও ত' আজ পর্য্যন্ত একটি সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে নিজেকে বন্দী করতে পারলাম না-কাঁটাবন মাড়িয়ে, অন্ধকারের মধ্যে শুধু পথ চলে যাচ্চি। আমার দেশের মাটি আজও নিজের হয়নি!

সুরেশ্বর যদি শোনে একটা মেয়ের নিরাশ্রয়তার ব্যথা দূর করবার জন্যে আমি···তা হ'লে আমায় মেরে ফেলবে। ওর কাছে হাজার বনলতার দুঃখের চেয়ে একটা শপথ ঢের বড়। না, সে হয় না।

ট্রেনে উঠে বসলাম। তখনও বনলতাকে কিছু বলিনি। ঘণ্টা দুই পরে জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় চলেচি আমরা।

— কলকাতায়।

বনলতা ছোট মেয়ের মত খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে,—কলকাতায় এখনও ট্রামগাড়ী চলে? আমাদের সেই বাড়ীটায় এখন কারা থাকে? কোথায় গিয়ে উঠব আমরা?

বললাম,—সে কলকাতা আজ অনেকখানি বদ্‌লে গেছে, চিনতেই পারবে না। কিন্তু সেই পুরানো বাড়ীতে আমরা উঠবো না। তোমাকে অবলা-আশ্রমে তুলে দিয়ে কালই আমি পালাব। নইলে পুলিশে ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

বনলতা বিস্ময়ে চুপ হয়ে গেল।

—কেন সেখানে কেন? অবলা-আশ্রম কি,—তুমিই বা,—

—অন্য উপায় নেই। আজ পাঁচ বছর ধরে যে সুনাম কিনেচি, তাতে কোনো বে-সরকারী আপিসেও চাকরি দেবে না, বিদ্যে-বুদ্ধিই বা এমন কি বেশী! অবলা-আশ্রমে ভয় পাবার কিছু নেই, সেখানে থাকে শুধু মেয়েরা —সবাই তোমার মত। তারা সুতো কাটে, জামা তৈরী করে, আরও অনেক কিছু করে। সেই তোমার পথ। আমার জন্যে ভেব না, যেখানেই থাকি খবর পাব।

অত লোকের মধ্যেও বনলতার চোখ ভিজে গেল। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে বাইরে গাছপালার দিকে চেয়ে রইল।

পরের দিন কলকাতা ছাড়া সম্ভব হয়নি। জীবনের শ্রাদ্ধ-শান্তি শেষ করেই এলাম। অবলা-আশ্রমে জুলুর স্থান হ'বার কথা নয়, শেয়ালদার হাটে জুলু একদিন বিক্রী হয়ে গেল। দাড়িওয়ালা লোকটার আনুগত্য স্বীকার করতে জুলু অনেক আপত্তি করেছিল কিন্তু আমিই-বা তাকে নিয়ে কি করতাম!

পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন

(সরকারী কাগজপত্রের সাহায্যে লিখিত)

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পলাশী-যুদ্ধের পর প্রথম কয়েক বৎসর বঙ্গদেশে বৃটিশদের শুধু অধিকার-বিস্তারের যুগ। বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজের মন হইতে বিদেশী শত্রু কর্তৃক বঙ্গ-বিহার আক্রমণের শেষ আশঙ্কাটুকু বিদূরিত হইবার পর ক্লাইভের দ্বিতীয় শাসনকালে ও ওয়ারেন হেষ্টিংসের আমলে দেশকে সুশাসন ও শান্তির বন্ধনে নিয়ন্ত্রিত করিবার আয়োজন সুরু হইল। কর্ণওয়ালিস যখন আসিলেন, তখন ইংরেজ-শাসিত ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কারের যুগ উপস্থিত হইয়াছে। এই সময়কার যে-সব রাজকর্ম্মচারীর চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ-শাসনের ভিত্তি স্থায়ী ও দৃঢ় হয়, তাঁহাদের মধ্যে স্যর উইলিয়াম জোন্স একজন প্রধান।

সে-সময় সমস্ত ফৌজদারী মামলার বিচার মুসলমান-আইন-মতে, এবং দেওয়ানী মামলার বিচার হিন্দুদিগের জন্য হিন্দুমতে এবং মুসলমানদিগের জন্য মুসলমান আইন-মতে সম্পন্ন হইত। বাদশা আওরংজীবের আমলে সঙ্কলিত আইন-সারসংগ্রহ—'ফতাওয়া-ই-আলমগীরি'র সাহায্যে মুসলমানদের দেওয়ানী মামলার বিচার হইত। কিন্তু হিন্দুদিগের এই ধরণের কোনো লিখিত ব্যবস্থা-পুস্তক ছিল না। বিচার-বিভ্রাট উপস্থিত হইলে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত আনাইয়া তাহার মীমাংসা করান হইত। হিন্দুদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে কার্য্যোপযোগী একখানি ব্যবস্থা-পুস্তক সঙ্কলিত করাইবার প্রথম আয়োজন করেন—ওয়ারেন হেষ্টিংস। বাংলার এগারজন পণ্ডিতের* উপর তিনি (মে ১৭৭৩) এই কার্য্যের ভার দেন। তাঁহারা দুই বৎসরে গ্রন্থ-রচনা সম্পূর্ণ করেন। কিন্তু সে-সময় খুব কম ইংরেজই সংস্কৃত ভাষা জানিতেন, কাজেই গ্রন্থখানিকে ইংরেজ-বিচারকদিগের কাজের সুবিধার জন্য দোভাষীর সাহায্যে ফার্সীতে তর্জ্জমা করান হয়। তাহার পর কোম্পানীর কর্ম্মচারী ন্যাথানিয়েল ব্রাসি হল্‌হেড গ্রন্থখানি ফার্সী হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন (মার্চ্চ ১৭৭৫)। ইহাই পর বৎসর (১৭৭৬) বিলাতে *A Code of Gentoo Laws* নামে মুদ্রিত হয়।

দুঃখের বিষয়, দুই দুইবার ভাষান্তরিত হইবার ফলে গ্রন্থখানি মূল সংস্কৃত হইতে কিছু পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল। এইজন্য একখানি বিশুদ্ধ ও প্রামাণিক হিন্দু ব্যবস্থা-পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। সে-অভাব পূরণের জন্য অগ্রণী হইলেন—স্যর উইলিয়াম জোন্স।

কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের জজ স্যর উইলিয়াম জোন্স বঙ্গদেশে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা। সুধীজন সমাজে তিনিই প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলিয়া বিখ্যাত। সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং আইনশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের ফলে সাহেবদের মধ্যে একমাত্র জোন্সই এই দুরূহ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি এই কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া ১৭৮৮ সালের ১৯এ মার্চ্চ গভর্ণর-জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিসকে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। পত্রখানিতে আছে,—

"হিন্দু ও মুসলমানদের বিধিব্যবস্থাসমূহ প্রধানতঃ সংস্কৃত ও আরবী—এই দুই কঠিন ভাষার নিগড়ে আবদ্ধ। খুব কম ইউরোপীয়ই এই ভাষা শিখিবে, কারণ ইহা দ্বারা তাহাদের পার্থিব কোন লাভ হইবে না। অথচ বিচার-সম্পর্কে যদি আমরা কেবল দেশীয় ব্যবহারজীব ও পণ্ডিতগণের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকি, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা যে প্রবঞ্চিত হইতে থাকিব না, সে-বিষয়ে নিশ্চিতরূপে কিছু বলা যায় না।

---

* রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার, বীরেশ্বর পঞ্চানন, কৃষ্ণজীবন ন্যায়লঙ্কার, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, কৃপারাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র সার্ব্বভৌম, গৌরীকান্ত তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণকেশব তর্কালঙ্কার, সীতারাম ভট্ট, কালীশঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, শ্যামসুন্দর ন্যায়সিদ্ধান্ত।

"যুষ্টিনিয়ানের (রোম-সম্রাট্) আদেশে সঙ্কলিত, রোমীয় ব্যবস্থাশাস্ত্রকে আদর্শ করিয়া যদি আমরা এদেশীয় বিজ্ঞ ব্যবহারজীবদের দ্বারা হিন্দু ও মুসলমান ব্যবহার-শাস্ত্রের একখানি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ সঙ্কলিত করাই, এবং তাহার নির্ভুল ও যথাযথ ইংরেজী অনুবাদ এক এক খণ্ড সদর দেওয়ানী আদালত ও সুপ্রীম কোর্টে রাখিয়া দিই, তাহা হইলে প্রয়োজন-মত বিচারকেরা এই গ্রন্থ দেখিতে পারিবেন; ফলে পণ্ডিত বা মৌলবীরা আমাদিগকে ভুল পথ দেখাইতেছে কি-না, তাহা ধরা সহজ হইবে। আমরা কেবল উত্তরাধিকার এবং চুক্তি-সংক্রান্ত আইনগুলি সঙ্কলন করাইতে চাই, কারণ এই দুই শ্রেণীর মামলাই সচরাচর বেশী হয়।" (১৯এ মার্চ্চ, ১৭৮৮)

লর্ড কর্ণওয়ালিস এরূপ আইন-গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া, গ্রন্থ-সঙ্কলনের সমুদয় ব্যয়ভার রাজকোষ হইতে বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। স্যর উইলিয়ামের তত্ত্বাবধানে ও নির্দ্দেশ-মতে কাজ আরম্ভ হইয়া গেল। হিন্দু আইন-সারসংগ্রহের জন্য নিযুক্ত হন (১) রাধাকান্ত শর্ম্মা—পাণ্ডিত্য ও বহু সদ্‌গুণের আধার বলিয়া বাংলা দেশের আপামরসাধারণের পূজ্য। (২) সব্বর তিওয়ারী (পাঠান্তরে সর্ব্বরী); ইনি বিহারী পণ্ডিত,—পূর্ব্বে পাটনা কাউন্সিলের অধীনে কার্য্য করিয়াছেন। ব্যবহারশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বলিয়া স্বদেশবাসীর নিকট অত্যন্ত সম্মানের পাত্র।"

সরকারী কর্ম্মে নিয়োগ

সৌভাগ্যক্রমে অল্পদিন পরেই স্যর উইলিয়াম জোন্স এক মহাপণ্ডিতের সন্ধান পাইলেন। ইনি হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রাম নিবাসী, বাংলার অদ্বিতীয় পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন। তর্কপঞ্চানন সম্বন্ধে গভর্ণর-জেনারেল কর্ণওয়ালিসের মন্তব্যে প্রকাশ,—

"গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে জানাইতেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান আইন-সারসংগ্রহ সম্বন্ধে সম্প্রতি তাঁহার সহিত স্যর উইলিয়াম জোন্সের কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ইহার তত্ত্বাবধানের ভার স্যর উইলিয়াম জোন্সের উপর। এই কাজের জন্য পূর্ব্বে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা ছাড়া জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন নামক এক ব্যক্তিকে লইবার জন্য সেই সময় স্যর উইলিয়াম তাঁহাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিয়াছেন। এই ব্যক্তির বয়স অধিক হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাঁহার মতামত, পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতা সম্বন্ধে সকল শ্রেণীর লোকেরই সর্ব্বোচ্চ ধারণা। তাঁহার সাহায্য পাইলে এবং সঙ্কলয়িতারূপে তাঁহার নাম যুক্ত থাকিলে গ্রন্থখানির প্রামাণিকতা ও খ্যাতি যথেষ্ট বাড়িয়া যাইবে।

"গভর্ণর-জেনারেল বোর্ডকে আরও জানাইতেছেন যে, স্যর উইলিয়াম জোন্স জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে মাসিক তিনশত, এবং তাঁহার সহকারীদিগকে মাসিক একশত টাকা বেতন দিবার জন্য সুপারিশ করিয়াছেন।

সুপারিশ গ্রাহ্য হইল এবং সেইমতে আজ্ঞা দেওয়া হইল।"*

পরিচয়

এখানে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার ত্রিবেণী গ্রামে
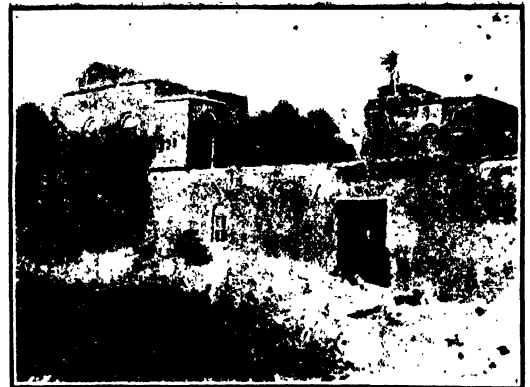
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের বাড়ী—ত্রিবেণী

তাঁহার জন্ম। তাঁহার পিতা রুদ্রদেব তর্কবাগীশ তখনকার দিনের একজন নামজাদা পণ্ডিত ছিলেন। জগন্নাথ পিতার অধিক বয়সের সন্তান; তাঁহার জন্মকালে রুদ্রদেবের বয়স ছিল ৬৬। বাল্যেই তাঁহার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া আত্মীয়-

* *Public Dept. Consultation*, 22 August, 1788, No. 28.

স্বজনরা অবাক হইতেন, এবং তিনি যে কালে একজন অসামান্য ব্যক্তি হইবেন সেই বয়সেই তাহার আভাস পাওয়া যাইত। বিশ বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই অসাধারণ নৈয়ায়িক বলিয়া চারিদিকে জগন্নাথের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িল। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। কোনো সমস্যায় পড়িলে ওয়ারেন হেষ্টিংস্, শোর, সদর দেওয়ানী ও নিজামৎ আদালতের রেজিষ্ট্রার হ্যারিংটন্ প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা তাঁহার পরামর্শ লইবার জন্য প্রায়ই ত্রিবেণীতে ছুটিতেন। জগন্নাথের অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য দেশের উচ্চনীচ সকলেই তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান করিত এবং অনেক ধনী জমিদারের নিকট হইতে তিনি ব্রহ্মোত্তর জমি পাইয়াছিলেন। শোভাবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা, মহারাজা নবকৃষ্ণের সভায় সে-সময়ে অনেক জ্ঞানী-গুণীর সমাবেশ হইত। পণ্ডিত জগন্নাথও এই সভা অলঙ্কৃত করিতেন। "মহারাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে একখানি তালুক ও পাকা বসতবাটি নির্ম্মাণের উপযোগী অর্থ-সাহায্য করিয়াছিলেন। মহারাজা একবার তাঁহাকে বাৎসরিক লক্ষ টাকা আয়ের একটি জমিদারী দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত তাহা প্রত্যাখান করিয়া বলেন যে,তাহা হইলে তাঁহার বংশধরেরা বিলাসী হইয়া পড়িবে—ধনগর্ব্বে বিদ্যাচর্চ্চা বন্ধ করিয়া দিবে। মহারাজা নবকৃষ্ণের সুপারিশেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে হিন্দু-আইন সঙ্কলনে নিযুক্ত করেন।"*

জগন্নাথ অদ্ভুত শ্রুতিধর ছিলেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে আজও অনেক গল্প শোনা যায়। তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সংস্কৃত নাটক 'রামচরিত' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু যে-কাজের দ্বারা তিনি দেশ ও দশের মঙ্গলসাধন করিয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন, এইবার তাহারই আলোচনা করিব।

'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব'-রচনা

হিন্দু ব্যবহারশাস্ত্র মতভেদ-সঙ্কুল। পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন অসাধারণ পাণ্ডিত্যের সহিত বিভিন্ন মতের সামঞ্জস্য করিয়া 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচনা করিলেন। এই কার্য্য তিনি একাই সম্পাদন করেন,—সময় লাগিয়াছিল তিন বৎসর। ১৭৯২,ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি আটশত পৃষ্ঠাব্যাপী এই সুবৃহৎ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি স্যর উইলিয়াম জোন্সের হাতে দেন।

জোন্স আশা করিয়াছিলেন, শীঘ্রই তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত আইন-গ্রন্থখানি সংস্কৃত হইতে ইংরেজীতে অনুবাদ করিয়া ফেলিতে পারিবেন। ইহার ভূমিকার জন্য তিনি অনেক মূল্যবান্ উপাদানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি বাম হইলেন। ১৭৯৪, ২৭এ এপ্রিল নিষ্ঠুর মৃত্যু তাঁহার ইহলোকের সমস্ত আশা বিফল করিয়া তাঁহাকে লোকান্তরে লইয়া গেল। তাঁহার মৃত্যুতে জনসাধারণ এই আইন-সারসংগ্রহের জন্য প্রস্তাবিত, তাঁহার স্বহস্তে রচিত, ইংরেজী অনুবাদ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভূমিকা হইতে বঞ্চিত হইল।

কিন্তু জোন্সের সাধু ইচ্ছা অপূর্ণ থাকে নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর, গভর্ণর-জেনারেল স্যর জন শোরের নির্দ্দেশে, মীর্জ্জাপুর জিলা আদালতের জজ এইচ-টি-কোলব্রুক তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত ব্যবস্থা-পুস্তকখানি *Digest of Hindu Law on Contracts and Successions* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। ১৭৯৮ সালে ইহা কলিকাতায় মুদ্রিত হয়। এই অনুবাদ-কার্য্যে কোলব্রুকের দুই বৎসরের কিছু অধিক সময় লাগিয়াছিল (ডিসেম্বর ১৭৯৬)। পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট হইতে পনের হাজার টাকা পাইয়াছিলেন।

তর্কপঞ্চাননের রচনা-সম্বন্ধে কোলব্রুক তাঁহার অনুবাদগ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—

"হিন্দু-আইনের অনেকগুলি সারসংগ্রহ, এবং টীকা হইতে চয়ন করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা ভক্তিভাজন জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয় নিজে মূল সূত্রগুলির যতপ্রকার সম্ভব ভাষ্য করিয়াছেন।... আধুনিক হিন্দু-আইন-সারসংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে এই কয়খানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :—(১) হেষ্টিংসের আদেশে সঙ্কলিত 'বিবাদার্ণব-সেতু', (২) স্যর উইলিয়াম জোন্সের অনুরোধে, মিথিলার আইনজ্ঞ সর্ব্বরী ত্রি কর্তৃক সঙ্কলিত 'বিবাদ-সারার্ণব' এবং জগন্নাথ তর্কপঞ্চা

* N. N. Ghose's *Memoirs of Maharaja Nubkissen Bahadur*, p. 185.

সঙ্কলিত বিবাদ-ভঙ্গার্ণব—যাহা (অর্থাৎ শেষখানি) অনূদিত হইল।"*

তর্কপঞ্চানন-সঙ্কলিত 'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' গ্রন্থের মূল সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি অনেকদিন সদর দেওয়ানী আদালতে ছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের সমস্ত কাগজপত্র এখন কলিকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে আছে। ধৈর্য্যের সহিত অনুসন্ধান করিলে তর্কপঞ্চাননের পাণ্ডুলিপি এই-সব প্রাচীন কাগজপত্রের মধ্যে মিলিতে পারে।

সরকারী পেন্সন-ভোগ

'বিবাদ-ভঙ্গার্ণব' রচিত হইবার পর তর্কাপঞ্চাননের মাসিক তিন শত টাকা বেতন সরকার বন্ধ করিয়া দিলেন, কিন্তু হেষ্টিংসের আমলে যে এগারজন পণ্ডিত প্রথমে ব্যবস্থাপুস্তক সঙ্কলন করেন, তাঁহারা কার্য্য শেষ হইবার পরও পেন্সন পাইয়া আসিতেছিলেন। ১৭৯৩, জানুয়ারি মাসে জগন্নাথ শর্ম্মা গভর্ণর-জেনারেল শোরকে পেন্সনের জন্য একখানি আবেদন পত্র পাঠান। পত্রখানি আমি ভারত-গবর্ণমেণ্টের দপ্তরখানায় আবিষ্কার করিয়াছি:—

"হেষ্টিংস সাহেব যখন মহারাজা রাজবল্লভকে দিয়া আমার নিকট হিন্দু আইনগ্রন্থ সঙ্কলনের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, তখন আমি উহাতে সম্মত হই নাই। হেষ্টিংস তখন রামগোপাল ন্যায়লঙ্কার-প্রমুখ নদীয়ার এগারজন পণ্ডিতের উপর ঐ কার্য্যের ভার দেন। বহু পরিশ্রমের ফলে তিন বৎসরে সঙ্কলন-কার্য্য শেষ হইলে, গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি ইংলণ্ডে পাঠান হয়, কিন্তু অনুবাদ সুবোধ্য না হওয়ায় উহা কর্ত্তৃপক্ষের মনঃপূত হয় নাই। একথা শোর সাহেব আমাকে জানান। তিনি আমাকে হিন্দু আইনপুস্তক সঙ্কলনে হস্তক্ষেপ করিতে, এবং রচনা শেষ করিয়া স্যর উইলিয়াম জোন্সের হাতে দিতে বলেন। আমি জানিয়াছি, পূর্ব্বোক্ত নদীয়ার পণ্ডিতেরা তাঁহাদের কার্য্য শেষ হইয়া যাইবার পর, এখনও নিয়মিতরূপে মাহিনা পাইয়া আসিতেছেন। ভাবিয়াছিলাম, কার্য্যশেষে আমিও তাঁহাদের মত আমরণ বেতন পাইতে থাকিব। এই আশাতেই আমি কার্য্যভার গ্রহণ করি। আমার সঙ্কলিত আটশত পৃষ্ঠার গ্রন্থখানি ঠিকমত অনূদিত হইলে, আপনি পাঠ করিয়া বুঝিতে পারিবেন যে, উহা সঙ্কলন করিতে আমাকে কতটা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ করিয়া আমি গত ফেব্রুয়ারি মাসে [১৭৯২] স্যর উইলিয়াম জোন্সকে দিয়াছি, এবং সেই অবধি আমার মাহিনা বন্ধ করা হইয়াছে। পূর্ব্বে আমি পরিবার ও শিষ্যবর্গ প্রতিপালন করিতে সমর্থ ছিলাম, কিন্তু এখন বৃহৎ সংসার পরিচালনে অশক্ত। ১৭৮৮, ২২এ আগষ্ট আপনি অধীনকে এক খিলি পান দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। তাহাতে আমি বুঝিয়াছিলাম যে, আমি কোম্পানীর চাকরিতে বহাল থাকিব। এই কারণে আমি আপনাকে নিবেদন করিতেছি যে, পূর্ব্বে আমাকে যাহা দেওয়া হইত, অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা দিবার আজ্ঞা দিয়া, বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ও আমার পরিবারবর্গকে রক্ষা করুন।"*

১৭৯৩, ১১ই জানুয়ারি বোর্ডের সভায় আবেদন-পত্রখানি পাঠ করা হইল। জগন্নাথ শর্ম্মার পাণ্ডিত্য ও সদ্‌গুণের সম্মান-স্বরূপ তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্টকাল মাসিক তিন শত সিক্কা টাকা পেন্সন দিতে বোর্ড সম্মত হইলেন, তবে একথা পরিষ্কার করিয়া জানান হইল যে, পণ্ডিতের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বা অপর কোনো আত্মীয় এই পেন্সন পাইবে না।†

* *Miscellaneous Essays by H. T. Colebrooke,* A new edition, with notes, by E. B. Cowell, (1873), i. 405, 473.

* *Public Dept. Consultation,* dated 11 Jan. 1793. No. 11.

† *Public Dept. Procdgs.,* dated 11 Jany. 1793.
জগন্নাথ শর্ম্মার পেন্সন-প্রসঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষকে লেখেন:—"On our Proceedings of 11 Jany. 1793 a petition is recorded from Jagannath Sharma, the oldest Pandit in Bengal, and a man of great learning and of most respectable character.....In consideration of the very favourable testimonies, we have received, of the petitioner, his great age, and numerous family, we have granted him a pension of Rs. 300 per mensem, but it is not to be continued after the death to his family or descendants."—*Bengal Public Letter to the Court of Directors,* dated Fort William 29 January, 1793, paras 56-57.

তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু

১৮০৭, নবেম্বর মাসে, শত বৎসরের উপর বয়সে ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর দিন অবধি তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি ম্লান হয় নাই। তাঁহাকে তীরস্থ করিলে তাঁহার প্রধান নৈয়ায়িক ছাত্র বলেন,—"গুরুদেব! নানা শাস্ত্র পড়াইয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন, ঈশ্বর কি বস্তু। কিন্তু ঈশ্বর কি বস্তু তাহা এক কথায় বুঝাইয়া দেন নাই।"

অন্তর্জলী অবস্থায় তর্কপঞ্চানন ঈষৎ হাসিয়া, মনে মনে এই শ্লোকটি রচনা করিয়া ছাত্রকে বলিয়াছিলেন,—

"নরাকারং বদন্ত্যেকে নিরাকারঞ্চ কেচন।
বয়ন্তু দীর্ঘসম্বন্ধাদ্ নারাকারাম্ (নীরাকারাম্) উপাস্মহে॥*

"একদল (ঈশ্বরকে) নরাকার বলেন, কেহ কেহ বা নিরাকারও বলেন। কিন্তু আমরা দীর্ঘসম্বন্ধের জন্য (অর্থাৎ বহুকাল গঙ্গাতীরে বাস করার জন্য) নারাকারাকে (অথবা নীরাকারাকে) উপাসনা করি।"

মৃত্যু-তারিখ লইয়া মতভেদ

হুগলী ঐতিহাসিক সমিতির অনুরোধে সরকার সম্প্রতি ত্রিবেণীতে তর্কপঞ্চাননের চণ্ডীমণ্ডপে মর্ম্মরফলকের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাহাতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর তারিখ—১৮০৬ সাল বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য স্থলেও আমি এই তারিখটি দেখিয়াছি। অনেক দিন পূর্ব্বে উমাচরণ ভট্টাচার্য্য নামে তর্কপঞ্চাননের এক আত্মীয় পণ্ডিতের যে সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত প্রকাশ করেন, সম্ভবতঃ তাহাই ভিত্তি করিয়া এই তারিখটি চলিতেছে। কিন্তু জীবনচরিত হিসাবে এই পুস্তকখানির মূল্য খুব কম,—কেবল জনপ্রবাদ ও প্রচলিত গল্পের ভাগই ইহাতে বেশী। 'বিশ্বকোষ' বা সুবলচন্দ্র মিত্রের অভিধানেও তর্কপঞ্চাননের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাতেও ভুল তারিখ দেওয়া আছে। জগন্নাথের মৃত্যু-তারিখ—১৮০৭ অক্টোবর। অল্পদিন হইল ভারত-সরকারের দপ্তরখানায় অনুসন্ধানকালে, গভর্ণর-জেনারেল
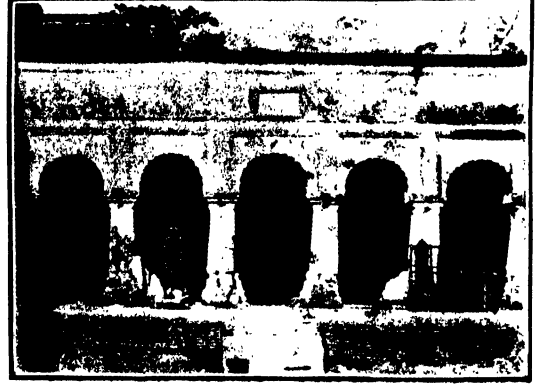
পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের চণ্ডীমণ্ডপ - ত্রিবেণী

লর্ড মিণ্টোকে লিখিত, তর্কপঞ্চাননের পৌত্র কাশীনাথ শর্ম্মার একখানি আবেদন পত্র আমার নজরে পড়ে। পত্রখানির তারিখ ১৮০৮, ৫ই জানুয়ারি। কাশীনাথ লিখিতেছেন, "তাঁহার পিতামহ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন গত অক্টোবর মাসে শতবর্ষের উপর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন।"* ইহা হইতে তর্কপঞ্চাননের মৃত্যু-তারিখ স্পষ্ট জানা যাইতেছে।

জগন্নাথের বংশধর কাশীনাথ শর্ম্মা

কাশীনাথের আবেদন-পত্রে প্রকাশ, "তর্কপঞ্চাননের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মাসিক তিন শত টাকা পেন্সন সরকার বন্ধ করিয়া দিয়াছেন; এই অর্থসাহায্য বন্ধ হইলে তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গের সংসার চালান দুর্ঘট হইবে, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বংশধরগণের বিদ্যানুশীলনের পথও রুদ্ধ হইবে।"†

* শ্রীযুত পূর্ণচন্দ্র দে (উদ্ভটসাগর) মহাশয় আমাকে এই সংস্কৃত শ্লোকটি দিয়াছেন। তিনি তর্কপঞ্চাননের রচিত আরও কয়েকটি উদ্ভট শ্লোক সংগ্রহ করিয়াছেন।

* "The humble petition of Kashinath Sharmana, grandson of the late Jagannath Tarka-panchanan most humbly sheweth unto your Lordship that the said Jagannath Tarka-panchanan...*died in October' last* [1807] at the age of more than 100 years..."*Public Dept. Con.* 8 January 1808, No. 100.

† কাশীনাথের আবেদন-পত্রখানি আমি *Modern Review* (Sep. 1929. pp. 261-62), পত্রে প্রকাশিত করিয়াছি।

১৮০৮, ৮ই জানুয়ারি সরকার হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে কাশীনাথের আর্জীখানি পাঠাইয়া, তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গের প্রকৃত অবস্থা অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন।

১৮০৮, ১৩ই এপ্রিল হুগলীর জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ আর্ণষ্ট (T. H. Ernst) সাহেব উত্তরে কর্তৃপক্ষকে জানাইলেন :-

"তর্কপঞ্চাননের পরিবারবর্গ আট শত বিঘা জমির মালিক। এই জমি বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত এবং ইহা হইতে বছরে আট শত টাকা আয় হয়। পরলোকগত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন মহা খ্যাতিমান্ পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার বেশীর ভাগ সময় অসংখ্য ছাত্রের শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাঁহার পেন্সনের টাকা বাহাল রাখিবার জন্য তাঁহার পৌত্র কাশীনাথ আবেদন করিয়াছেন; দেখা যাইতেছে তর্কপঞ্চাননের পরিবার-বর্গের বিদ্যানুশীলন ও ছাত্রবর্গের অধ্যাপনা-কার্য্য বজায় রাখিবার জন্যই প্রধানতঃ কাশীনাথ এই আবেদন-পত্র পাঠাইয়াছেন। কিন্তু যতটা জানি, আবেদনকারী কাশীনাথ অথবা বংশের অন্য কেহ তর্কপঞ্চাননের মত প্রতিভা বা উদ্যমের অধিকারী হন নাই। এই পরিবারের একমাত্র গঙ্গাধরই খুব যোগ্য লোক। তিনি কয়েক বৎসর কৃষ্ণনগরে জজপণ্ডিত ছিলেন; পিতামহ জগন্নাথের দেহত্যাগের মাস-কয়েক পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়।"

হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেটের এই পত্র পাইয়া গভর্ণর-জেনারেল কাশীনাথের আবেদন মঞ্জুর করা সঙ্গত মনে করেন নাই।*

* ঊনবিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখায় পঠিত।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শীতকালের দিকে একদিন কলেজ ইউনিয়নে প্রণব একটা প্রবন্ধ পাঠ করিল। ইংরেজীতে লেখা, বিষয়—"আমাদের সামাজিক সমস্যা।" বাছিয়া বাছিয়া শক্ত ইংরেজীতে সে নানা সমস্যার উল্লেখ করিয়াছে, বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা, পণপ্রথা, বাল্য-বিবাহ ইত্যাদি। প্রণবের লেখার খুব জোর, অনভিজ্ঞ, তরুণ মনের সকল শক্তি ও আগ্রহ দ্বারা সে প্রত্যেক সমস্যাটি নিজের দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছে, এবং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই সনাতন প্রথার সপক্ষেই মত দিয়াছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অন্যভাবে সমাধানের ইঙ্গিতও যে না করিয়াছে এমন নহে। প্রণবের উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গী খুব ভাল, যুক্তির ওজন-অনুসারে সে কখনও ডান হাতে ঘুষি পাকাইয়া, কখনও মুঠাদ্বারা বাতাস আঁকড়াইয়া, কখনও বা সম্মুখের টেবিলে সশব্দে চাপড় মারিয়া বাল্যবিবাহের প্রয়োজনীয়তা ও স্ত্রীশিক্ষার অসারত্ব প্রমাণ করিল। প্রণবের বন্ধুদলের ঘন ঘন করতালিতে প্রতি-পক্ষের কানে তালা লাগিবার উপক্রম হইল।

অপরপক্ষে উঠিল মন্মথ—সেই যে ছেলেটি সেণ্ট্-জেভিয়ারে পড়িত। লাটিন জানে বলিয়া ক্লাসে সকলে তাহাকে ভয় করিয়া চলে, তাহার সামনে কেহ ভয়ে ইংরেজী বলে না, পাছে ইংরেজীর ভুল হইলে তাহার বিদ্রূপ শুনিতে হয়। সাহেবদের চালচলন, ডিনারের এটিকেট, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে ক্লাসের মধ্যে সে অথরিটি—তাহার উপর কারুর কথা খাটে না। ক্লাসের এক হতভাগ্য ছাত্র সাহেব-পাড়ার কোন্ রেষ্টরেণ্টে তাহার সহিত খাইতে গিয়া ডানহাতে কাঁটা ধরিবার অপরাধে এক সপ্তাহকাল ক্লাসের সকলের সাম্নে মন্মথর টিট্‌কারী সহ্য করে। মন্মথর ইংরেজি আরও চোখা, কম আড়ষ্ট, উচ্চারণও সাহেবী ধরণের। কিন্তু একেই তাহার উপর ক্লাসের অনেকের রাগ আছে, এদিকে আবার সে বিদেশী বুলি আওড়াইয়া

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের চিরাচরিত প্রথার নিন্দাবাদ করিতেছে, ইহাতে একদল ছেলে খুব চটিয়া উঠিল—চারিদিক হইতে 'shame, shame,' 'withdraw, withdraw,' রব উঠিল—তাহার নিজের বন্ধুদল প্রশংসাসূচক হাততালি দিতে লাগিল—ফলে এত গোলমালের সৃষ্টি হইয়া পড়িল যে, মন্মথ বক্তৃতার শেষের দিকে যে কি বলিল সভার কেহই তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারিল না।

প্রণবের দলই ভারী। তাহারা প্রণবকে আকাশে তুলিল, মন্মথকে স্বধর্ম্মবিরোধী নাস্তিক বলিয়া গালি দিল, সে যে হিন্দুশাস্ত্র একছত্রও না পড়িয়া কোন্ স্পর্দ্ধায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সভায় কথা বলিতে সাহস করিল তাহাতে কেহ কেহ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। লাটিন ভাষার সহিত তাহার পরিচয়ের সত্যতা লইয়াও দু' একজন তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিল—(লাটিন জানে বলিয়া অনেকের রাগ ছিল তাহার উপর)—একজন দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, —প্রতিপক্ষের বক্তার সংস্কৃতে যেমন অধিকার, যদি তাঁহার লাটিন ভাষার অধিকারও সেই ধরণের—

আক্রমণ ক্রমেই ব্যক্তিগত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সভাপতি অর্থনীতির অধ্যাপক মিঃ দে বলিয়া উঠিলেন—'Come, come,—Manmatha has never said that he is a Seneca or a Lucretius—have the goodness to come to the point.

ঘণ্টাখানেক ব্যাপী তুমুল তর্কযুদ্ধের পর সব শান্ত হইলে সভাপতি কিছু বলিতে উঠিলেন। নিজের কথা কিছু বলিলেন না—নব-আবিষ্কৃত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র লইয়া তিনি সম্প্রতি মশ্‌গুল হইয়া ছিলেন—চাণক্যনীতির অনুসরণে সুবুদ্ধির মত মধ্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁতি ও বৈষ্ণব উভয় কুলই রক্ষা করিলেন।

অপু এই প্রথম এ-রকম ধরণের সভায় যোগ দিল—স্কুলে এসব ছিল না, যদিও হেড্‌মাষ্টার প্রতিবারই হইবার আশ্বাস দিতেন। এখানে এদিনকার ব্যাপারটা তাহার কাছে নিতান্ত হাস্যাস্পদ ঠেকিল। ওসব মামুলি কথা মামুলি ভাবে বলিয়া লাভ কি? সামনের অধিবেশনে সে নিজে একটা প্রবন্ধ পড়িবে। সে দেখাইয়া দিবে ওসব একঘেয়ে মামুলি বুলি না আওড়াইয়া কি ভাবে প্রবন্ধ লেখা যায়। একেবারে নূতন, এমন বিষয় লইয়া সে লিখিবে, যাহা লইয়া কখনও কেহ আলোচনা করে নাই।

এক সপ্তাহ খাটিয়া প্রবন্ধ লিখিয়া ফেলিল। নাম—"নূতনের আহ্বান।" সকল বিষয়ে পুরাতনকে ছাঁটিয়া একেবারে বাদ। কি আচার-ব্যবহার, কি সাহিত্য, কি দেখিবার ভঙ্গী—সব বিষয়েই নূতনকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। অপু মনে মনে অনুভব করে, তাহার মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাহা খুব বড়, খুব সুন্দর। তাহার উনিশ বৎসরের জীবনের প্রতিদিনের সুখদুঃখ, পথের যে ছেলেটি অসহায়ভাবে কাঁদিয়া উঠিয়াছে, কবে এক অপরাহ্লের ম্লান আলোয় যে পাখীটা তাহাদের দেশের বনের ধারে বসিয়া দোল খাইত, দিদির চোখের মমতা-ভরা দৃষ্টি, লীলার বন্ধুত্ব, রাণুদি, নির্ম্মলা, দেবব্রত, রৌদ্রদীপ্ত নীলাকাশ, জ্যোৎস্না রাত্রি—নানা কল্পনার টুকরা, কত কি আশা-নিরাশার লুকোচুরি—সবশুদ্ধ লইয়া এই যে উনিশটি বৎসর—ইহা তাহার বৃথা যায় নাই—কোটি কোটি যোজন দূর শূন্যপার হইতে সূর্য্যের আলো যেমন নিঃশব্দ জ্যোতির অবদানে শীর্ণ শিশু-চারাকে পত্র-পুষ্পফলে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে, এই উনিশ বৎসরের জীবনের মধ্য দিয়া শাশ্বত অনন্ত তেমনি ওর প্রবর্দ্ধমান তরুণ প্রাণে তার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছে ছায়ান্ধকার তৃণ-ভূমির গন্ধে, ডালে ডালে সোনার সিঁদুর-মাখানো অপরূপ সন্ধ্যায়, উদার কল্পনায় ভরপুর নিঃশব্দ জীবন-মায়ায়···সে একটা অপূর্ব্ব শক্তি অনুভব করে নিজের মধ্যে—এটা যেন বাহিরে প্রকাশ করিবার জিনিষ—মনে মনে ধরিয়া রাখার নয়। কোথায় থাকিবে প্রণব আর মন্মথ?···সবাই মামুলি কথা বলে। সকল বিষয়ে এই মামুলি ধরণ যেন তাহাদের দেশের একচেটে হইয়া উঠিতেছে—কোনো বাংলা বই তাহার ভাল লাগে না আজকাল। যে মন গরুড়ের মত ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া সারা পৃথিবীটার রসভাণ্ডার গ্রাস করিতে ছুটিতেছে, সে তীব্র আগ্রহভরা পিপাসার্ত্ত নবীন মনের সকল কল্পনা তাহাতে তৃপ্ত হয় না। ইহারই বিরুদ্ধে, ইহাদের সকলের বিরুদ্ধে

দাঁড়াইতে হইবে, সব ওলটপালট করিয়া দিবার নিমিত্ত সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে তাহাদিগকে এবং সে-ই হইবে তাহার অগ্রণী।

দিনকতক ধরিয়া অপু ক্লাসে ছেলেদের মধ্যে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধরণে গর্ব্ব করিয়া বেড়াইল যে, এমন প্রবন্ধ পড়িবে যাহা কেহ কোনোদিন লিখিবার কল্পনা করে নাই, কেহ কখনও শোনে নাই ইত্যাদি। লজিকের ছোকরা-প্রোফেসার ইউনিয়নের সেক্রেটারী। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি ব'লে নোটিশ দেবো তোমার প্রবন্ধের হে, বিষয়টা কি?

পরে নাম শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন,—বেশ বেশ! নামটা বেশ দিয়েছ—but why not পুরাতনের বাণী? অপু হাসিমুখে চুপ করিয়া রহিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে যদিও ভাইস্‌-প্রিন্সিপ্যালের সভাপতি হইবার কথা নোটিশে ছিল, তিনি কার্য্যবশতঃ আসিতে পারিলেন না—ইতিহাসের অধ্যাপক মিঃ বসুকে সভাপতির আসনে বসিতে সকলে অনুরোধ করিল। ভিড় খুব হইয়াছে, প্রকাশ্য সভায় অনেক লোকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছু করা অপুর এই প্রথম। প্রথমটা তাহার পা কাঁপিল, গলা খুব কাঁপিল, ক্রমে সে বেশ সহজভাবে আসিয়া পৌঁছিল, প্রবন্ধ খুব সতেজ – এ বয়সে যাহা কিছু দোষ থাকে উচ্ছ্বাস, অনভিজ্ঞ আইডিয়ালিজম, ভালমন্দনির্ব্বিশেষে পুরাতনকে ছাঁটিয়া ফেলিবার দম্ভ, বেপরোয়া সমালোচনা, তাহার প্রবন্ধে কোনটাই বাদ যায় নাই। প্রবন্ধ পড়িবার পরে খুব হৈ চৈ হইল। খুব তীব্র সমালোচনা লইল। প্রতিপক্ষ কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিতে ছাড়িল না। কিন্তু অপু দেখিল অধিকাংশ সমালোচকই ফাঁকা আওয়াজ করিতেছে। সে যাহা লইয়া প্রবন্ধ লিখিয়াছে, সে বিষয়ে কাহারও কিছু অভিজ্ঞতাও নাই, বলিবার বিষয়ও নাই, তাহারা তাহাকে মন্মথের শ্রেণীতে ফেলিয়া দেশদ্রোহী, সমাজদ্রোহী বলিয়া গালাগালি দিতে সুরু করিয়াছে। নূতনভাবে জীবনকে দেখিবার জন্য তাহার নবীন মনের এই যে আমন্ত্রণ,—কেহ তাহা ধরিতেও পারিল না তো!

অপু মনে মনে একটু বিস্মিত হইল। হয়ত সে আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিলে ভাল করিত। জিনিসটা পরিষ্কার হয় নাই? অপু আশ্চর্য্য হইল যে এত বড় সভার মধ্যে তাহার নিতান্ত অন্তরঙ্গ দু'একজন বন্ধু ছাড়া সকলেই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে – টিট্‌কারী গালাগালির অংশের জন্য মন্মথকে হিংসা করার তাহার কিছুই নাই। শেষে সভাপতি তাহাকে প্রতিবাদের উত্তর দিবার অধিকার দেওয়াতে সে উঠিয়া ব্যাপারটা আরও খুলিয়া বলিবার চেষ্টা করিল। দু' চারজন সমালোচক—যাহাদের প্রতিবাদ সে বসিয়া বসিয়া নোট্ করিয়া লইয়াছিল তাহাদিগকে উত্তর দিতে গিয়া যুক্তির খেই হারাইয়া ফেলিল। অপর পক্ষ এই অবসরে আর এক পালা হাসিয়া লইতে ছাড়িল না। অপু রাগিয়া গিয়াছিল, এইবার যুক্তির পথ না ধরিয়া উচ্ছ্বাসের পথ ধরিল, সকলকে সঙ্কীর্ণমনা বলিয়া গালি দিল, একটা বিদ্রূপাত্মক গল্প বলিল, অবশেষে টেবিলের উপর একটা কিল মারিয়া এমার্সনের একটা কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে বক্তৃতার উপসংহার করিল।

ছেলের দল খুব গোলমাল করিতে করিতে হলের বাহির হইয়া গেল। বেশীর ভাগ লোকে তাহাকে যা-তা বলিতেছিল—নিছক বিদ্যা জাহির করার চেষ্টা ছাড়া যে তাহার প্রবন্ধ অন্য কিছুই নহে, ইহাও অনেকের মুখে শোনা যাইতেছিল, সে যে শেষের দিকে এমার্সনের কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিল—

I am the owner of the sphere
Of the seven stars and the solar year.

তাহাতেই অনেকে তাহাকে দাম্ভিক ঠাওরাইয়া নানারূপ বিদ্রূপ ও টিট্‌কারী দিতেও ছাড়িল না। কিন্তু অপু ও কবিতাটায় নিজেকে আদৌ উদ্দেশ করে নাই, করিয়াছিল সম্পূর্ণ অবাস্তব ও ধরা-ছোঁয়ার বাহিরের একটা সম্মিলিত তারুণ্যের শক্তিকে—যদিও তাহার নিজেকে জাহির করার স্পৃহাও কিছু কম ছিল না, বা মিথ্যা গর্ব্বপ্রকাশে যদিও সে ক্লাসের কাহারও অপেক্ষা কম নহে, বরং বেশী।

তাহার নিজের দলের কেহ কেহ তাহাকে ঘেরিয়া কথা বলিতে বলিতে চলিল – ভিড় একটু কমিয়া গেলে সে সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কলেজ হইতে

বাহির হইতে যাইতেছে, গেটের কাছে একটি সতেরো আঠারো বছরের লাজুক প্রকৃতির ছেলে তাহাকে বলিল,—একটুখানি দাঁড়াবেন ?

অপু ছেলেটিকে চেনে না, কখনও দেখে নাই। একহারা, বেশ সুশ্রী, পাতলা সিল্কের জামা গায়ে, পায়ে জরির নাগ্‌রা জুতা।

ছেলেটি কুণ্ঠিতভাবে বলিল,—আপনার প্রবন্ধটা আমায় একটু পড়্‌তে দেবেন ? কাল আবার আপনাকে ফেরৎ দোব ?

অপুর আহত আত্মাভিমান পুনরায় হঠাৎ ফিরিয়া আসিল। সে যেন রাজা, পথিপার্শ্বস্থ ভিক্ষুকের উপর নিতান্ত কৃপা করিয়া তাহার প্রার্থনা মিটাইতেছে, এরূপ ভঙ্গীতে খাতাখানা ছেলেটির হাতে দিয়া বলিল,—দেখ্‌বেন কাইগুলি, যেন হারিয়ে না যায়—আপনি বুঝি—সায়েন্সে ?—ও !—

পরদিন কলেজ বসিবার সময় ছেলেটি গেটেই দাঁড়াইয়া ছিল—অপুর হাতে খাতাখানা ফিরাইয়া দিয়া ছোট একটি নমস্কার করিয়াই ভিড়ের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে ক্লাসে বসিয়া অপু খাতাখানা উল্টাইতেছিল, একখানা কি কাগজ খাতাখানার ভিতর হইতে বাহির হইয়া ইলেক্‌ট্রিক পাখার হাওয়ায় খানিকটা উড়িয়া গেল। পাশের ছেলে সেখানা কুড়াইয়া তাহার হাতে দিলে সে পড়িয়া দেখিল, পেন্সিলে লেখা একটা কবিতা—তাহাকে উদ্দেশ করিয়া :

শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকুমার রায়

করকমলেষু—

বাঙ্গালী সমাজ যেন পঙ্কময় বদ্ধ জলাশয়
নাহি আলো স্বাস্থ্যভরা বহে হেথা বায়ু বিষময়।
জীবন-কোরকগুলি, অকালে শুকায়ে পড়ে ঝরি
বাঁচাবার নাহি কেহ সকলেই আছে যেন মরি।
নাহি চিন্তা, নাহি বুদ্ধি, নাহি ইচ্ছা, নাহি উচ্চ আশা
সুখদুঃখহীন এক জড়পিণ্ড, নাহি মুখে ভাষা।
এর মাঝে দেখি যবে কোনো মুখ উজ্জ্বল সরস,
নয়নে আশার দৃষ্টি, ওষ্ঠপ্রান্তে জীবন হরষ—
অধরে ললাটে ভ্রূতে প্রতিভার সুন্দর বিকাশ,
স্থির দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ইচ্ছাশক্তি প্রত্যক্ষ প্রকাশ,
সম্ভ্রমে হৃদয় পূরে, আনন্দ ও আশা জাগে প্রাণে,
সম্ভাষিতে চাহে হিয়া বিমল প্রীতির অর্ঘ্যদানে।
তাই এই ক্ষীণ-ভাষা ছন্দে গাঁথি দীন উপহার
লজ্জাহীন অসঙ্কোচে আসিয়াছি সম্মুখে তোমার,
উচ্চ লক্ষ্য, উচ্চ আশা বাংলায় এনে দাও বীর
সুযোগ্য সন্তান যে রে তোরা সবে বঙ্গ-জননীর।

গুণ-মুগ্ধ

শ্রী—

ফার্ষ্ট ইয়ার, সায়েন্স, সেক্‌সন্ বি

অপু বিস্মিত হইল। আগ্রহে ও ঔৎসুক্যের সহিত আর একবার পড়িল—তাহাকেই উদ্দেশ করিয়া লেখা এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। একে চায় তো আরে পায়,—একেই তো নিজের কথা জাঁক করিয়া বেড়াইতে সে অদ্বিতীয়, তাহার উপর তাহারই উদ্দেশে লিখিত এক অপরিচিত ছাত্রের এই পত্র পাইয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে সে ভুলিয়া গেল যে, ক্লাসে স্বয়ং মিঃ বসু ইতিহাসের বক্তৃতায় কোন এক রোমান সম্রাটের অমানুষিক ঔদরিকতার কাহিনী সবিস্তারে বলিতেছেন। সে পাশের ছেলেকে ডাকিয়া পত্রখানা দেখাইতে যাইতেই জানকী খোঁচা দিয়া বলিল,—এই !·· সি-সি-বি এখুনি বকে উঠ্‌বে—তোর দিকে তাকাচ্ছে, সাম্‌নে চা—এই !···

আঃ—কতক্ষণে সি-সি-বি'র এই বাজে বকুনি শেষ হইবে !···বাহিরে গিয়া সকলকে চিঠিখানা দেখাইতে পারিলে যে সে বাঁচে।···

ছেলেটিকেও খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে ।

ছুটির পর গেটের কাছেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা হইল। বোধ হয় সে তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিল। কলেজের মধ্যে এরূপ একজন মুগ্ধ ভক্ত পাইয়া অপু মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করিয়াছিল বটে, কিন্তু সেই তাহার পুরাতন মুখচোরা রোগ। তবে তাহার পক্ষে একটু সাহসের বিষয় এই দাঁড়াইল যে, ছেলেটি তাহার অপেক্ষাও লাজুক। অপু গিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া

তাহার হাত ধরিল। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। কেহই কাগজে লেখা পদ্যটার কোনো উল্লেখ করিল না, যদিও দুজনেই বুঝিল যে, তাহাদের আলাপের মূলে কালকার সেই চিঠিখানা। কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি বলিল,—চলুন, কোথাও বেড়াতে যাই, কল্‌কাতার বাইরে কোথাও মাঠে—সহরের মধ্যে হাঁপ ধরে—কোথাও একটা ঘাস দেখবার জো নেই—

কথাটা শুনিয়াই অপুর মনে হইল এ ছেলেটি তো সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। ঘাস না দেখিয়া কষ্ট হয় এমন কথা তো আজ প্রায় এক বৎসর কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কলেজের কোন বন্ধুর মুখে শোনে নাই।

সাউথ্ সেক্‌সনের ট্রেনে গোটাচারেক ষ্টেশন পরে তাহারা নামিল। অপু কখনো এদিকে আসে নাই। ফাঁকা মাঠ, কেয়া ঝোপ, মাঝে মাঝে হোগ্‌লা বন। সরু মেঠো পথ ধরিয়া দুজনে হাঁটিয়া চলিতেছিল—ট্রেনের অল্প আধঘণ্টার আলাপেই দুজনের মধ্যে একটা নিবিড় পরিচয় জমিয়া উঠিয়াছিল। মাঠের মধ্যে একটা গাছের তলায় ঘাসের উপরে দুজনে গিয়া বসিল।

ছেলেটি নিজের ইতিহাস বলিতেছিল—

হাজারিবাগ জেলায় তাহাদের এক অভ্রের খনি ছিল, ছেলেবেলায় সে সেখানেই মানুষ। জায়গাটার নাম বড়বনী, চারিধারে পাহাড় আর শাল-পলাশের বন, কিছুদূরে দারুকেশ্বর নদী। নিকটে পাহাড়ের গায়ে একটা ঝরণা।··· পড়ন্ত বেলায় শালবনের পিছনের আকাশটা কত কি রঙে রঞ্জিত হইত—প্রথম বৈশাখে শাল-কুসুমের ঘন সুগন্ধ দুপুরের রৌদ্রকে মাতাইত, পলাশ-বনে বসন্তের দিনে যেন ডালে ডালে আরতির পঞ্চপ্রদীপ জ্বলিত—সন্ধ্যার পরই অন্ধকারে গা ঢাকিয়া বাঘেরা ঝরণায় জলপান করিতে আসিত—বাংলা হইতে একটু দূরে বালির উপর কতদিন সকালে বড় বড় বাঘের পায়ের থাবার দাগ দেখা গিয়াছে।

সেখানকার জ্যোৎস্না রাত্রি। সে রাত্রির বর্ণনা নাই, ভাষা জোগায় না। স্বর্গ যেন দূরের নৈশকুয়াসাচ্ছন্ন, অস্পষ্ট পাহাড়শ্রেণীর ওপারে—ছায়াহীন, সীমাহীন, অনন্তরসক্ষরা জ্যোৎস্না যেন দিক্‌চক্রবালে তাহারই ইঙ্গিত দিত।

এক আধ দিন নয়, শৈশবের দশ দশটি বৎসর সেখানে কাটিয়াছে। সে অন্য জগৎ, পৃথিবীর মুক্ত প্রসারতার রূপ সেখানে চোখে কি মায়া-অঞ্জন মাখাইয়া দিয়াছে,—কোথাও আর ভাল লাগে না। অভ্রের খনিতে লোকসান হইতে লাগিল, খনি অপরে কিনিয়া লইল, তাহার পর হইতেই কলিকাতায়। মন হাঁপাইয়া ওঠে—খাঁচার পাখীর মত ছট্‌ফট্ করে। বাল্যের সে অপূর্ব্ব আনন্দ মন হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে।

অপু এ ধরণের কথা কাহারও মুখে এ পর্য্যন্ত শোনে নাই—এ যে তাহারই অন্তরের কথার প্রতিধ্বনি! গাছপালা, নদী, মাঠ ভালবাসে, নির্জ্জনতা ভালবাসে বলিয়া দেওয়ানপুরে তাহাকে বলিত পাগল। একবার মাঘ মাসের শেষে পথে কোন্ গাছের গায়ে আলোক-লতা দেখিয়া রমাপতিকে বলিয়াছিল,—কেমন সুন্দর! দেখুন দেখুন রমাপতি-দা—

রমাপতি মুরুব্বিয়ানার সুরে বলিয়াছিল মনে আছে,—ও সব যার মাথায় ঢুকেছে, তার পরকালটি একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে—

পরকালটা কি জন্যে যে ঝরঝরে হইয়া গিয়াছে, এ কথা সে বুঝিতে পারে নাই কিন্তু ভাবিয়াছিল রমাপতি-দা স্কুলের মধ্যে ভাল ছেলে, ফাষ্টক্লাশের ছাত্র, অবশ্যই তাহার অপেক্ষা ভাল জানে। এ পর্য্যন্ত কাহারও নিকট হইতে সে ইহার সায় পায় নাই, এই এতদিন পরে ইহাকে ছাড়া। তাহা হইলে তাহার মত লোকও আছে!···সে একেবারে সৃষ্টিছাড়া নয়!···

অনিল বলিল,—দেখুন, এই এত ছেলে কলেজে পড়ে, অনেকের সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি—ভাল লাগে না—dull, unimaginative mind; পড়্‌তে হয় পড়ে যাচ্ছে, বিশেষ কোন বিষয়ে কৌতূহলও নেই, জান্‌বার একটা সত্যিকার আগ্রহও নেই; তা ছাড়া, এত ছোট কথা নিয়ে থাকে যে, মন মোটে—মানে, কেমন যেন—যেন মাটির উপর hop করে করে বেড়ায়। প্রথম সেদিন আপনার কথা শুনে মনে হ'ল, এই একজন অন্য ধরণের, এদলের নয়।

অপু মৃদু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিল। এ সব সেও

নিজের মনের মধ্যে অস্পষ্টভাবে অনুভব করিয়াছে, অপরের সঙ্গে নিজের এ পার্থক্য মাঝে মাঝে তাহার কাছে ধরা পড়িলেও সে নিজের সম্বন্ধে আদৌ সচেতন নয় বলিয়া এ জিনিষটা সে বুঝিতে পারিত না। তাহা ছাড়া অপুর প্রকৃতি আরও শান্ত, উগ্রতাশূন্য ও উদার,—পরের তীব্র সমালোচনা ও আক্রমণের ধাতই নাই তাহার একেবারে! কিন্তু তাহার একটা মহৎ দোষ এই যে, নিজের বিষয়ে কথা একবার পাড়িলে সে আর ছাড়িতে চায় না—অপরেও যে তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে বলিতে ইচ্ছা করিতে পারে, তরুণ বয়সের অনাবিল আত্মম্ভরিতা ও আত্মপ্রত্যয় সে বিষয়ে তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে। সুতরাং সে নিজের বিষয়ে একটানা কথা বলিয়া যায়—নিজের ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, নিজের ভাল-মন্দ লাগা, নিজের পড়াশোনা। নিজের কোনো দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা বলে না, কোনো ব্যথা বেদনার কথা তোলে না—জলের উপরকার দাগের মত সে সব কথা তাহার মনে মোটে স্থান পায় না—আন্‌কোরা তাজা নবীন চোখের দৃষ্টি শুধুই সম্মুখের দিকে সম্মুখের বহুদূর দিকচক্রবাল রেখারও ওপারে—আনন্দ ও আশায় ভরা এক অপূর্ব্ব রাজ্যের দিকে।

সন্ধ্যার পরে বাসায় ফিরিয়া চিম্‌নি-ভাঙা পুরাণো হিঙ্কসের লণ্ঠনটা জ্বালিয়া সে পকেট হইতে অনিলের চিঠিখানা বাহির করিয়া আবার পড়িতে বসিল। আমায় যে ভাল বলে সে আমার পরম বন্ধু, আমার মহৎ উপকার করে, আমার আত্মপ্রত্যয়কে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে সাহায্য করে, আমার মনের গভীর গোপন কোনো লুকানো রত্নকে দিনের আলোয় মুখ দেখাইতে সাহস দেয়।

পড়িতে পড়িতে পাশের বিছানার দিকে চাহিয়া মনে পড়ে—আজ আবার তাহার ঘরের অপর লোকটির এক আত্মীয় কাঁচরাপাড়া হইতে আসিয়াছে এবং এই ঘরেই শুইবে। সে আত্মীয়টির বয়স বছর ত্রিশেক হইবে, কাঁচরাপাড়া 'লোকো' আপিসে চাক্‌রী করে, বেশী লেখাপড়া না জানিলেও অনবরত যা-তা ইংরেজী বলে, হরদম সিগারেট্ খায়, অত্যন্ত বকে, অকারণে গায়ে পড়িয়া ভাই ভাই বলিয়া কথা বলে, তার মধ্যে বারো আনা থিয়েটারের গল্প; অমুক এ্যাক্‌ট্রেস্ তারাবাইএর ভূমিকায় যে রকম অভিনয় করে, অমুক থিয়েটারের বিধুমুখীর মত গান—বিশেষ করে 'হীরার ফুল' প্রহসনে বেদেনীর ভূমিকায় নয়ন জলের ফাঁদ পেতেছি, নামক সেই বিখ্যাত গানখানি সে যেমন গায়, তেমন আর কোথায়, কে গাহিতে পারে?—তিনি এজন্য বাজি ফেলিতে প্রস্তুত আছেন।

এসব কথা অপুর ভাল লাগে না, থিয়েটারের কথা শুনিতে তাহার কোনো কৌতূহল হয় না, এ লোকটির চেয়ে আলুর ব্যবসাদারটি অনেক ভাল। সে পাড়া-গাঁয়ের লোক, অপেক্ষাকৃত সরল প্রকৃতির, আর এত বাজে কথা বলে না, অন্তত তাহার সঙ্গে ত নয়ই। এ ব্যক্তিটির যত গল্প তাহার সঙ্গে।

মনে মনে ভাবে—একটু ইচ্ছে করে বেশ একা একটি ঘর হয়! একা বসে পড়াশুনো করি, টেবিল থাকে একটা, বেশ ফুল কিনে এনে গ্লাসের জলে দিয়ে সাজিয়ে রাখি, ঘরটায় না-আছে জান্‌লা, পড়্‌তে পড়্‌তে একটু খোলা আকাশ দেখ্‌বার জো নাই, তামাকের গুল রোজ পরিষ্কার করি, আর রোজ ওরা এইরকম নোংরা করবে—মা ওয়াড় করে দিয়েছিল, ছিঁড়ে গিয়েছে, কি বিশ্রী তেল চিট্‌চিটে বালিশটা হয়েছে! এবার হাতে পয়সা হ'লে একটা ওয়াড় করাবো।

অনিলের সঙ্গে মাঝে মাঝে পথের ধারে বেড়াইতে যায়। চাঁদপাল ঘাটে, প্রিন্সেপস্ ঘাটে বড় বড় জাহাজ নোঙর করিয়া থাকে, অপু পড়িয়া দেখে কোনোখানার নাম 'বম্বে', কোনোখানার নাম 'ইদ্‌জ্জ মারু'। সেদিন বৈকালে নতুন ধরণের রং-করা একখানা বড় জাহাজ দেখিয়াছিল, নাম শেনানডোয়া, অনিল বলিল, আমেরিকান্ মাল জাহাজ, জাপানের পথে আমেরিকা যায়। শুধুই মাল বহন করে। অপু অনেক্ষণ দাঁড়াইয়া জাহাজখানা দেখিল। নীল পোষাক পরা একটা লস্কর রেলিং ধরিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া জলের মধ্যে কি দেখিতেছে। লোকটা কি সুখী! কত দেশে বিদেশে বেড়ায়, কত সমুদ্রে পাড়ি দেয়, চীন সমুদ্রে টাইফুনে পড়িয়াছে, পিনাং-এর

নারিকেলকুঞ্জের ছায়ায় কত দুপুর কাটাইয়াছে, কত ঝড় বৃষ্টির রাত্রে এই রকম রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া বাত্যাক্ষুব্ধ, উত্তাল,উন্মত্ত মহাসমুদ্রের রূপ দেখিয়াছে। কিন্তু ও লোকটা বোঝে কি? কিছুই না। ও কি দূর হইতে ফুজিসান দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছে! দক্ষিণ-আমেরিকার কোনো বন্দরে নামিয়া পথের ধারে কি গাছপালা আছে তাহা নিবিষ্টমনে সাগ্রহে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে! ইহারই উপর তাহার ভারী ঝোঁক, হয়ত জাপানে পথের ধারে বাংলা দেশের পরিচিত কোনো ফুল আছে, ও লোকটা জানে না, হয়ত কালিফর্ণিয়ার সহর-বন্দর হইতে দূরে নির্জ্জন Sierra-র মধ্যে, বনঝোপের নানা অচেনা ফুলের সঙ্গে তাদের দেশের সন্ধ্যামণি ফুলও ফুটিয়া থাকে, ও লোকটা কি কখনো সেখানে সূর্য্যাস্তের রাঙা আলোয় বড় একখণ্ড পাথরের উপর আপনমনে বসিয়া নীল আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিয়াছে!

অথচ ও লোকটারই অদৃষ্টে ঘটিতেছে দেশ বিদেশে ভ্রমণ, সমুদ্রে সমুদ্রে বেড়ানো—যাহার চোখ নাই, দেখিতে জানে না, আর সে যে শৈশব হইতে শত সাধ পুষিয়া রাখিয়া আসিতেছে মনের কোণে···তাহার কি কিছুই হইবে না!··· কবে যে সে যাইবে!···কলিকাতার শীতের রাত্রের এ ধোঁয়া তাহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। চোখ জ্বালা করে, নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসে, কিছু দেখা যায় না, মন তাহার একেবারে পাগল হইয়া ওঠে—এ এক অপ্রত্যাশিত উপদ্রব! কে জানিত শীতকালে কলিকাতার এ চেহারা হয়!

ওই লোকটার মত জাহাজের খালাসী হইতে পারিলেও সুখ ছিল!

Ship ahoy!···কোথাকার জাহাজ?···

কলিকাতা হইতে পোর্ট মর্স্‌বি, অষ্ট্রেলিয়া।

ওটা কি উঁচুমত দূরে?

প্রবালের বড় বাঁধ···The Great Barrier Reef···

এই সমুদ্রের ঠিক এই স্থানে, প্রাচীন নাবিক ভ্যান্ ডিমেন্ ঘোর তুফানে পড়িয়া মাস্তুল-ভাঙা, পাল-ছেঁড়া, ডুবু ডুবু অবস্থায় অকূলে ভাসিতে ভাসিতে বারো দিনের দিনে কূল দেখিতে পান—সেইটাই সেকালের ভ্যান্ ডিমেন্‌স ল্যাণ্ড, বর্ত্তমানে অষ্ট্রেলিয়া। কেমন দূরে নীল চক্রবালরেখা!···উড়ন্ত সিন্ধুশকুন দলের মাতামাতি, প্রবালের বাঁধের উপর বড় বড় ঢেউয়ের সবেগে আছড়াইয়া পড়ার গম্ভীর আওয়াজ।

উপকূলরেখার অনেক পিছনে যে পাহাড়টা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ওটা হয়ত জলহীন, দিক্‌দিশা-হীন ধূ ধূ নির্জ্জন মরুর মধ্যে···শুধুই বালি আর শুক্‌না বাবুল গাছের বন,···শত শত ক্রোশ দূরে ওর অজানা অধিত্যকায় লুকানো আছে সোনার খনি, কালো ওপ্যালের খনি···এই খর, জলন্ত, মরু-রৌদ্রে খনির সন্ধানে বাহির হইয়া কতলোকে ওদিকে গিয়াছিল, আর ফেরে নাই, মরুদেশের নানা স্থানে তাহাদের হাড়গুলা রৌদ্র বৃষ্টিতে ক্রমে শাদা হইয়া আসিল।

অনিল বলিল, চলুন আজ, সন্ধ্যে হয়ে গেল দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখে আর কি হবে?···

অপু সমুদ্র ভ্রমণ-সংক্রান্ত বহু বই কলেজ-লাইব্রেরী হইতে লইয়া পড়িয়া ফেলিয়াছে। কেমন একটা নেশা, কখনো কোনো ছাত্র যাহা পড়ে না, এমন সব বই। বহু প্রাচীন নাবিক ও তাহাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, নানা-দেশ আবিষ্কারের কথা, ভ্যান ডিমেন্, সিবাষ্টিয়ান ক্যাবট, এরিক্‌সন, কর্টেজ ও পিজারো কর্তৃক মেক্সিকো ও পেরু বিজয়ের কথা। দুর্দ্ধর্ষ স্পেনীয় বীর পিজারো ব্রেজিলের জঙ্গলে রূপার পাহাড়ের অনুসন্ধানে গিয়া কি করিয়া জঙ্গলের মধ্যে পথ হারাইয়া বেঘোরে অনাহারে সসৈন্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল—আরও কত কি।

পরদিন কলেজ পলাইয়া দুজনে দুপুরবেলা ষ্ট্রাণ্ড রোডের সমস্ত ষ্টীমার কোম্পানীর আপিসগুলি ঘুরিয়া বেড়াইল। প্রথমে 'পি এণ্ড ও'। টিফিনের সময়, কেরাণী বাবুরা নীচের জলখাবার ঘরে বসিয়া চা খাইতেছেন, কেহ বিড়ি টানিতেছেন। অপু পিছনে রহিল, অনিল আগাইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—আজ্ঞে আমরা জাহাজে চাকরী খুঁজ্‌ছি এখানে খালি আছে জানেন?···একজন টাক-পড়া রোগা চেহারার বাবু বলিলেন,—চাকরী?··· জাহাজে, কোন্ জাহাজে?

—যে কোনো জাহাজে—

অপুর বুক উত্তেজনায় ও কৌতূহলে টিপ্‌টিপ্ করিতেছিল, কি বুঝি হয়!

বাবুটি বলিলেন,—জাহাজের চাকরীতে তোমাদের চলবে না হে ছোক্‌রা,—দ্যাখো একবার ওপরে মেরিন্ মাষ্টারের ঘরে খোঁজ করো।

কিছুই হইল না। বি-আই-এস্-এন্ তথৈবচ। নিপন্ ইউসেন্ কাইশাও তাই। টার্ণার মরিসনের আপিসে তাহাদের সহিত কেহ কথাও কহিল না। বড় বড় বাড়ী, সিঁড়ি ভাঙিয়া ওঠা-নামা করিতে করিতে শীতকালেও ঘাম দেখা দিল। অবশেষে মরিয়া হইয়া অপু গ্ল্যাড্‌ষ্টোন ওয়াইলির আপিসে চারতালায় উঠিয়া মেরিন্ মাষ্টারের কামরায় ঢুকিয়া পড়িল। খুব দীর্ঘদেহ, অতবড় গোঁফ সে কখনও কাহারও দেখে নাই। সাহেব বিরক্ত হইয়া ঘণ্টা বাজাইয়া কাহাকে ডাক দিল। অপুর কথা কানেও তুলিল না। একজন প্রৌঢ় বয়সের বাঙালীবাবু ঘরে ঢুকিয়া ইহাদের দেখিয়া বিস্ময়ের সুরে বলিল,—এ-ঘরে কি? এস এস, বাইরে এস। বাহিরে গিয়া অনিলের মুখে আসিবার উদ্দেশ্য শুনিয়া বলিলেন,—কেন হে ছোক্‌রা বাড়ী থেকে রাগ করে পালাচ্চ?

অনিল বলিল,—না, রাগ করে কেন পালাব?

—রাগ করে পালাচ্চ না তো এ মতি হ'ল কেন? জাহাজে চাক্‌রী খুঁজ্‌চো, কোন্ চাক্‌রী হবে জানো? খালাসীর চাক্‌রী···এক বছরের এগ্রিমেণ্টে জাহাজে উঠ্‌তে হবে। বাঙালীর খাওয়া জাহাজে পাবে না···কষ্টের একশেষ হবে, গোরা লস্করগুলো অত্যন্ত বদ্‌মায়েস, তোমাদের সঙ্গে বন্‌বে না। আরও নানা কষ্ট—ষ্টোকারের কাজ পাবে, কয়লা দিতে দিতে জান্ হায়রাণ হবে—সে সব কি তোমাদের কাজ?···

—এখন কোনো জাহাজ ছাড়্‌চে নাকি?

—জাহাজ তো ছাড়্‌চে "গোলকুণ্ডা"—আর সাতদিন পরে মঙ্গলবারে ছাড়্‌বে মাল জাহাজ—কলম্বো হ'য়ে ডার্‌বান যাবে—

দু'জনেই মহা পীড়াপীড়ি সুরু করিল। তাহাদের কোনো কষ্ট হইবে না, কষ্ট করা তাহাদের অভ্যাস আছে। দয়া করিয়া তিনি যদি কোনো ব্যবস্থা করেন! অপু প্রায় কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—তা হোক্, দিন আপনি জোগাড় করে—ওসব কিছু কষ্ট না—দিন্ আপনি—গোরা লস্করে কি কর্‌বে আমাদের? কয়লা খুব দিতে পার্‌বো···

কেরাণী বাবুটি হাসিয়া বলিলেন,—একি ছেলেখেলা হে ছোক্‌রা! কয়লা দেবে তোমরা? বুঝতে তো পার্‌চো না সেখানকার কাণ্ডখানা! বয়লারের গরম, হাওয়া নেই, দম বন্ধ হইয়া আস্‌বে—চার শভেল্ কয়লা দিতে না দিতে হাতের শির দড়ির মত ফুলে উঠ্‌বে—আর তাতে ওই ডেলিকেট্ হাত—হাঁফ জিরুতে দেবে না, দাঁড়াতে দেখ্‌লে ইঞ্জিনিয়ার সাহেব মার্‌বে চাবুক—দশ-হাজার ঘোড়ার জোরের এঞ্জিনের ষ্টীম বজায় রাখ্‌তে হবে সব সময়, নিঃশ্বাস ফেল্‌বার সময় পাবে না—আর গরম কি সোজা! কুম্ভীপাক নরকের গরম ফার্ণেসের মুখে। সে তোমাদের কাজ?···

তবুও দুজনে ছাড়ে না।

ইহারা যে বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইতেছে, সে ধারণা বাবুটির আরও দৃঢ় হইল। বলিলেন,—নাম ঠিকানা দিয়ে যাও তো তোমাদের বাড়ীর। দেখি তোমাদের বাড়ীতে না হয় নিজে একবার যাবো।

কোনোরকমেই তাঁহাকে রাজী করাইতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা চলিয়া আসিল।

একদিন অপু দুপুরবেলা কলেজ হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া গায়ের জামা খুলিতেছে, এমন সময় পাশের বাড়ীর জানালাটার দিকে হঠাৎ চোখ পড়িতে সে আর চোখ ফিরাইয়া লইতে পারিল না। জানালাটার গায়ে খড়ি দিয়া মাঝারি অক্ষরে মেয়েলি ছাঁদে লেখা আছে—"হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।" অপু অবাক্ হইয়া খানিকটা সেদিকে চাহিয়া রহিল এবং পরক্ষণেই কৌতুকের আবেগে হাতের নোটখাতাখানা মেজেতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া আপন মনে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

পাশেই বাড়ী—তাহার ঘরটা হইতে জানালাটা হাত পাঁচ ছয় দূরে—মধ্যে একটা সরু গলি। অনেকদিন সে দেখিয়াছে, পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে জানালার গরাদে ধরিয়া এদিকে চাহিয়া রহিয়াছে। বয়স চৌদ্দ পনেরো।

রং উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল, বেশ মুখখানা, সে কলেজ হইতে আসিবার সময় হইলেই প্রায়ই মেয়েটিকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিত—ক্রমে শুধু দাঁড়ানো নয়, মেয়েটি তাহাকে দেখিলেই হঠাৎ হাসিয়া জানালার আড়ালে মুখ লুকায়, কখনো বা জানালাটার খড়খড়ি বারকতক খুলিয়া বন্ধ করিয়া মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চেষ্টা করে, দিনের মধ্যে দু'বার, তিন বার, চার বার কাপড় বদ্‌লাইয়া ঘরটার মধ্যে অকারণ ঘোরাফেরা করে এবং ছুতানাতায় জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। কতদিন এরকম হয়, অপু মনে মনে ভাবে—মেয়েটা আচ্ছা বেহায়া তো! কিন্তু আজকের এ ব্যাপার একেবারে অপ্রত্যাশিত।

আজ ও-বেলা উড়ে ঠাকুরের হোটেলে খাইতে গিয়া সে দেখিয়াছিল, সুন্দর ঠাকুর মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছে। দুই তিন মাসের টাকা বাকী, সামান্য পুঁজির হোটেল, অপূর্ব্ববাবু ইহার কি ব্যবস্থা করিতেছেন?... আর কতদিন এ ভাবে সে বাকী টানিয়া যাইবে? সুন্দর ঠাকুরের কথায় তাহার মনে যে দুর্ভাবনার মেঘ জমিয়াছিল, সেটা কৌতুকের হাওয়ায় এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। —আচ্ছা তো মেয়েটা? দ্যাখো কি লিখে রেখেচে—ওদের—হো হো—আচ্ছা—হিহি—

সেদিন আর মেয়েটিকে দেখা গেল না, যদিও সন্ধ্যার সময় একবার ঘরে ফিরিয়া সে দেখিল জানালার সে খড়ির লেখা মুছিয়া ফেলা হইয়াছে। পরদিন সকালে ঘরের মধ্যে মাদুর বিছাইয়া পড়িতে পড়িতে মুখ তুলিতেই অপু দেখিতে পাইল মেয়েটি জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আছে। কলেজে যাইবার কিছু আগে মেয়েটি আর একবার আসিয়া দাঁড়াইল। সবে স্নান সারিয়া আসিয়াছে, লালপাড় শাড়ী পরণে, ভিজে চুল পিঠের উপর ফেলা, সোনার বালা পরা নিটোল ডান হাতটি দিয়া জানালার গরাদে ধরিয়া আছে। অল্পক্ষণের জন্য...

কথাটা ভাবিতে ভাবিতে সে কলেজে গেল। সেখানে অনেকের কাছে ব্যাপারটা গল্প করিল। প্রণব তো শুনিয়া হাসিয়া খুন, জানকীও তাই। সবাই আসিয়া দেখিতে চায়—এ যে একেবারে সত্যিকার জানালা-কাব্য! সত্যেন বলিল, নভেলে ও মাসিকের পাতায় পড়া যায় বটে, কিন্তু বাস্তব জগতে এরকম যে ঘটে তাহা তো জানা ছিল না!...নানা হাসি তামাসা চলিল, সকলেই যে ভদ্রতাসঙ্গত কথা বলিয়াই ক্ষান্ত রহিল তাহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হইবে।

তারপর দিনচারেক বেশ কাটিল, হঠাৎ একদিন আবার জানালায় লেখা—'হেমলতা আপনাকে বিবাহ করিবে।' জানালার খড়খড়ির গায়ে এমনভাবে লেখা যে, জানালা খুলিয়া লম্বা কব্জাটা মুড়িয়া ফেলিলে লেখাটা শুধু তাহার ঘর হইতেই দেখা যায়, অন্য কারুর চোখে পড়িবার কথা নহে। প্রণবটা যদি এসময় এখানে থাকিত! তারপর আবার দিন-দুই সব ঠাণ্ডা।

সেদিন একটু মেঘলা ছিল—সকালে কয়েক পশ্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। দুপুরের পরই আবার খুব মেঘ করিয়া আসিল। কারখানার উঠানে মাল বোঝাই মোটর লরিগুলার শব্দ একটু থামিলেও দুপুরের 'শিফ্‌ট'-এ মিস্ত্রিদের প্যাক্‌বাক্সের গায়ে লোহার বেড় পরাইবার দুম্‌দাম্‌ আওয়াজ বেজায়। এই বিকট আওয়াজের জন্য দুপুরবেলা এখানে তিষ্ঠানো দায়।

অপু ঘুমাইবার বৃথা চেষ্টা করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখিল মেয়েটি জানালার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অল্পক্ষণের জন্য দুজনের চোখোচোখি হইল। মেয়েটির চোখে কেমন একটা অদ্ভুত ধরণের দৃষ্টি। অপুর মনটা কেমন করিয়া উঠিল—মেয়েটি পাগল না তো? ঠিক—এতদিন সে বুঝিতে পারে নাই—মেয়েটি পাগল! কথাটা মনে হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি গভীর করুণা ও অনুকম্পায় তাহার সারা মন ভরিয়া গেল। মেয়ের বাপকে সে মাঝে মাঝে প্রায়ই দেখে—প্রৌঢ়, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোনো আপিসের কেরাণী বোধ হয়। সে কলেজে যাইবার সময় রোজ ভদ্রলোক ট্রামের অপেক্ষায় ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া থাকেন। হয় ত মেয়েটির বাবাই, নয় ত কাকা বা জেঠামশায়, কি মামা—মোটের উপর তিনিই একমাত্র অভিভাবক। খুব বেশী অবস্থাপন্ন বলিয়া মনে হয় না। হয় ত তাহাকে দেখিয়া মেয়েটা ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে—এরকম ত হয়!

তাহার ইচ্ছা হইল, এবার মেয়েটিকে দেখিতে পাইলে তাহাকে দুটা মিষ্ট কথা, দুটা সান্ত্বনার কথা বলিবে। কেহ কিছু মনে করিবে? যদি নিতাইবাবু টের পায়?···পায় পাইবে।

খবরের কাগজে সে মাঝে মাঝে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিত, একদিন দেখিল কোন্ একজন ডাক্তারের তাঁর বাড়ীর জন্য একজন প্রাইভেট টিউটার দরকার। গেল সে সেখানে। দোতালা বড় বাড়ী, নীচে বৈঠকখানা, কিন্তু সেখানে বড় কেহ বসে না, ডাক্তারবাবুর কন্‌সাল্‌টিং রুম দোতলার কোণের কামরায়, সেখানেই রোগীর ভিড়। অপু গিয়া দেখিল নীচের ঘরটাতে অন্যূন জন-পনেরো নানা বয়সের লোক তীর্থের কাকের মত হাঁ করিয়া বসিয়া—সেও গিয়া একপাশে বসিয়া গেল। তাহার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, ঐ বিজ্ঞাপনটা শুধু তাহারই চোখে পড়িয়াছে—এত সকালে, অত ছোট ছোট অক্ষরে এককোণে লেখা বিজ্ঞাপনটা—সে ভাবিয়াছিল—উঃ—এ যে ভিড় দেখা যায় ক্রমেই বাড়িয়া চলিল!

কাহাকে পড়াইতে হইবে, কোন্ ক্লাসের ছেলে, কত বড়, কেহই জানে না। পাশের একটি লোক জিজ্ঞাসা করিল—মশাই জানেন কিছু কোন্ ক্লাসের—

অপু বলিল, সেও কিছুই জানে না। একটি আঠারো উনিশ বছরের ছোক্‌রার সঙ্গে অপুর আলাপ হইল। ম্যাট্রিকুলেশন ফেল করিয়া হোমিওপ্যাথিক পড়ে, টুইশানির নিতান্ত দরকার, না হইলেই চলিবে না, সে নাকি কালও একবার আসিয়াছিল, নিজের দুরবস্থার কথা সব কর্ত্তাকে জানাইয়া গিয়াছে, তাহার হইলেও হইতে পারে। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া অপু দেখিতেছিল কাঠের সিঁড়িটা বাহিয়া এক একজন লোক উপরের ঘরে উঠিতেছে এবং নামিবার সময় মুখ অন্ধকার করিয়া পাশের দরজা দিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেছে। যদি তাহারও না হয়! পড়া বন্ধ করিয়া মনসাপোতা—কিন্তু সেখানেই বা চলিবে কিসে?

চাকর আসিয়া জানাইল আজ বেলা হইয়া গিয়াছে, ডাক্তারবাবু কাহারও সঙ্গে এখন আর দেখা করিবেন না। এক একখানা কাগজে সকলে নিজের নিজের নামধাম ও যোগ্যতা লিখিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, প্রয়োজন বুঝিলে জানানো যাইবে।

ছেঁদো কথা। সকলেই একবার ডাক্তারবাবুর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল—প্রত্যেকেরই মনে মনে বিশ্বাস একবার গৃহস্বামী তাহাকে চাক্ষুষ দেখিয়া তাহার গুণ শুনিলে আর চাকুরী না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোক্‌রা এখনি ছুটিয়া উপরে যায় আর কি, তাহাকে বারণ করিতে করিতে ওদিকে আর জন-দুই লোক কাহারও নিষেধ না মানিয়া সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া গেল! অপুও ভাবিল সে উপরে যাইলে একবার চেষ্টা করিয়া দেখিত। তবে সে নিজের দুরবস্থার কথা কাহারও কাছে বলিতে পারিবে না। তাহার লজ্জা করে। দৈন্যের কাঁদুনি গাহিয়া পরের সহানুভূতি আকর্ষণ করিবার চেষ্টা—অসম্ভব! লোকে কি করিয়া যে করে! প্রথম প্রথম সে কলিকাতায় আসিয়া ভাবিয়াছিল কত বড়লোকের বাড়ী আছে কলিকাতায়, চাহিলে একজন দরিদ্র ছাত্রের উপায় করিয়া দিতে কেহ কুণ্ঠিত হইবে না। কত পয়সা তো তাদের কত দিকে যায়? কিন্তু তখন সে নিজেকে ভুল বুঝিয়াছিল, চাহিবার প্রবৃত্তি, পরের চোখে নিজেকে হীন প্রতিপন্ন করিবার প্রবৃত্তি, এসব তাহার মধ্যে নাই। তাহার আছে—সে যাহা নয় তাহা হইতেও নিজেকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, বাহাদুরী করিবার, মিথ্যা গর্ব্ব করিয়া বেড়াইবার একটা কুঅভ্যাস। তাহার মায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা এইদিক দিয়া ছেলেতে বর্ত্তাইয়াছে, একেবারে হুবহু---অবিকল। এই কলিকাতা সহরে মহাকষ্ট পাইলেও সে নিতান্ত অন্তরঙ্গ এক আধজন ছাড়া কখনও কাহাকে—তাও নিজের মুখে কখনও কিছু বলে না। পাছে লোকে তাহাকে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে না ঠাওরায়! পাছে ভাবে গরীব!

ইতস্ততঃ করিয়া সেও অপরের দেখাদেখি কাঠের সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে গেল! নীচের উঠান হইতে চাকরে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল—আরে কাঁহে আপ্‌লোক উপরমে যাতে হেঁ?···বাত্ নেহি মান্‌তে হেঁ, এ বড়া

মুস্কিল—অপু সে কথা গ্রাহ্য না করিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রৌঢ় বয়সের একটি ভদ্রলোক ঘরের মধ্যে বসিয়া, হোমিওপ্যাথি-পড়া ছোক্‌রাটির সঙ্গে কি তর্ক চলিতেছে বাহির হইতে বুঝা গেল—ছোক্‌রাটি কি বলিতেছে, ভদ্রলোকটি কি বুঝাইতেছেন। সে ছোক্‌রা একেবারে নাছোড়বান্দা, টুইশানি তাহার চাই-ই। ভদ্রলোক বলিতেছেন, ম্যাট্রিকুলেশন-ফেল টিউটার দিয়া তিনি কি করিবেন? ক্রমে সকলে একে একে বাহিরে আসিয়া চলিয়া গেল। অপু ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া সঙ্কুচিতভাবে বলিল,—আপনাদের কি এক-জন পড়াবার লোক দরকার—আজ সকালের কাগজে বেরিয়েছে—

যেন সে এত লোকের ভিড়, উপরে উঠার নিষেধাজ্ঞা, কাগজে নামধাম লিখিয়া রাখিবার উপদেশ কিছুই জানে না। আসলে সে ইচ্ছা করিয়া এরূপ ভালমানুষ সাজে নাই—অপরিচিত স্থানে আসিয়া অপরিচিত লোকের সহিত কথা কহিতে গিয়া আনাড়িপনার দরুণ কথার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ন্যাকা সুর আসিয়া গেল।

ভদ্রলোক একবার আপাদমস্তক তাহাকে দেখিয়া লইলেন, একটা চেয়ার দেখাইয়া দিয়া বলিলেন, বসুন। আপনি কি পাশ? ও, আই-এ পড়ছেন,—দেশ কোথায়?···ও!···এখানে থাকেন কোথায়?···হুঁ!

তিনি আরও যেন খানিকক্ষণ তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিলেন। মিনিট পনের পরে—অপু বসিয়াই আছে—ডাক্তারবাবু হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—দেখুন পড়ানো মানে—আমার একটি মেয়ে—তাকেই পড়াতে হবে। যাকে তাকে তো নিতে পারিনে---কিন্তু আপনাকে দেখে আমার মনে হচ্চে—ওরে শোন্—তোর দিদিমণিকে ডেকে নিয়ে আয় তো—বল্‌গে আমি ডাক্‌চি---

একটু পরে মেয়েটি আসিল। বছর পনেরো বয়স, তন্বী, সুন্দরি, বড় বড় চোখ, আঙুলের গড়ন ভারি সুন্দর, রেশমী জামা গায়ে, চওড়া পাড় শাড়ী, গলায় সোনার সরু চেন, হাতে প্লেন বালা। মাথায় চুল এত ঘন যে, দুধারের কান যেন ঢাকিয়া গিয়াছে—জাপানী মেয়েদের মত ফাঁপানো খোঁপা!

—এইটি আমার মেয়ে, নাম প্রীতিবালা। বেথুন স্কুলে পড়ে, এইবার সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেচে। ইনি তোমার মাষ্টার খুকী—আজ বাদ দিয়ে কাল থেকে উনি আস্‌বেন—হ্যাঁ এঁর মুখ দেখেই আমার মনে হয়েচে ইনিই ঠিক হবেন। বয়েস আপনার আর কত হবে—এই উনিশ-কুড়ি মুখ দেখেই তো মনে হয় ছেলেমানুষ, তা ছাড়া একটা distinction-এর ছাপ রয়েছে। খুকী বসো মা—

টুইশনি জোটার আনন্দে যত হোক্‌-না-হোক্‌, ভদ্রলোক যে বলিয়াছেন তাহার মুখে একটা distinction এর ছাপ আছে, এই আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া সে সারাদিনটা কাটাইল ও ক্লাসে, পথে, বাসাতে, হোটেলে—সর্ব্বত্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথাটা লইয়া নির্ব্বোধের মত খুব জাঁক করিয়া বেড়াইল। মাহিনা যত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা অনেক বেশী বলিল, মেয়েটির সৌন্দর্য্য-ব্যাখ্যা অনেক বাড়াইয়া করিল, ইত্যাদি।

কিন্তু পরদিন পড়াইতে গিয়া দেখিল মেয়েটি নির্ম্মলা নয়। সে রকম সরলা, স্নেহময়ী, হাস্যমুখী নয়—অল্প কথা কয়, খাটাইয়া লইতে জানে, একটু যেন গর্ব্বিত। কথাবার্ত্তা বলে হুকুমের ভাবে। অমুক অঙ্কটা কাল বুঝিয়ে দেবেন। অমুকটা কাল ক'রে আন্‌বেন, আজ আরও একঘণ্টা বেশী পড়াবেন, পরীক্ষা আছে—ইত্যাদি। একদিন কোনো কারণে আসিতে না পারিলে তার পরদিন কৈফিয়ৎ তলব করিবার সুরে অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করে। অপু মনে মনে বড় ভয় খাইয়া গেল, যে রকম মেয়ে, কোন্ দিন পড়ানোর কোন্ ত্রুটির কথা বাবাকে লাগাইবে, চাকুরীতে দিয়ে দিবে জবাব—পথে বসা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকিবে না। ছাত্রীর উপর অসন্তুষ্টি ও বিরক্তিতে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

মাসখানেক কাটিয়া গেল। প্রথম মাসের কুড়িটি টাকা মাহিনা পাইয়াই মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল, বৌবাজার ডাকঘর হইতে টাকাটা পাঠাইয়া সে চলিয়া যাইতেছিল, সঙ্গের বন্ধুটি বলিল, এসো তো ভাই, একটু চোরা-বাজারে, একটা ভাল অপেরা-গ্লাস কাল দর ক'রে রেখে এসেচি—নিয়ে আসি?

চোরা-বাজার নামও কখনো অপু শোনে নাই।

ঢুকিয়া দেখিয়াই সে অবাক হইয়া গেল। নানা ধরণের জিনিষপত্র, খেলনা, আস্‌বাবপত্র, ছবি, ঘড়ি, জুতা, কলের গান, বই, বিছানা, সাবান, কৌচ, কেদারা—সবই পুরানো মাল। অপুর মনে হইল বেশ সস্তাদরে বিকাইতেছে একটা ফুলের টব, দর বলিল ছ' আনা। একটা ভাল দোয়াতদান দশ আনা। এগারো টাকায় কলের গান মায় রেকর্ড। এতদিন কলিকাতায় আছে, এত সস্তায় এখানে জিনিষপত্র বেচা-কেনা হয়, তা তো সে জানে না। এত সব সৌখীন জিনিষের এত কম দাম!

তাহার মাথায় এক খেয়াল আসিয়া গেল। পরদিন সে বাকী টাকা হাতে বৈকালে আসিয়া চোরা-বাজারে ঢুকিল। মনে মনে ভাবিল—এইবার একটু ভাল ভাবে থাক্‌বো, ও রকম গোয়ালঘরে আর থাক্‌তে পারি নে—যেমন নোংরা তেম্‌নি অন্ধকার। প্রথমেই সে কালকার ফুলদানিজোড়া কিনিল। দোয়াতদানের উপর অনেক-দিন হইতে ঝোঁক, সেটিও কিনিল। একটা জাপানী পর্দ্দা, খানচারেক ছবি, খানকতক প্লেট্, একটা আয়না, ঝুটা পাথর বসানো ছোট একটা আংটি, ছেলেমানুষের মত আনন্দে শুধু জিনিষগুলাকে দখলে আনিবার ঝোঁকে যাহাই চোখে ভাল লাগিল, তাহাই কিনিল। দাঁও বুঝিয়া দু-একজন দোকানদার বেশ ঠকাইয়াও লইল। ডবল-উইকের একটা পিতলের টেবিল-ল্যাম্প পছন্দ হওয়াতে দোকানীকে জিজ্ঞাসা কলিল,—এটার দাম কত? দোকানী বলিল,—সাড়ে তিন টাকা। অপুর বিশ্বাস এরকম আলোর দাম পনেরো ষোল টাকা। এরূপ মনে হওয়ার একমাত্র কারণ এই যে, অনেকদিন আগে লীলাদের বাড়ী থাকিবার সময় এই ধরণের একটি আলো লীলার পড়িবার ঘরে টেবিলে জ্বলিতে দেখিয়াছিল। সে বেশী দর কষিতে ভরসা করিল না, চার আনা মাত্র কমাইয়া তিন টাকা চার আনা মূল্যে সেই মান্ধাতার আমলের টেবিল ল্যাম্পটা মহাখুসীর সহিত কিনিয়া ফেলিল। মুটের মাথায় জিনিষপত্র চাপাইয়া সে উৎসাহে ও আগ্রহে সব আনিয়া বাসায় হাজির করিল ও সারাদিন খাটিয়া ঘরদোর ঝাড়িয়া, ঝাঁট দিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া ছবিগুলা দেয়ালে টাঙ্গাইল, সস্তা জাপানী পর্দ্দাটা দরজায় ঝুলাইল, আয়নাটাকে গজাল আঁটিয়া বসাইল, ফুলদানির জন্য ফুল কিনিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছিল, সেগুলিকে ধুইয়া মুছিয়া আপাততঃ জানালার ধারে রাখিয়া দিল, দোয়াতদানটা তেঁতুল দিয়া মাজিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া রাখিল। টেবিল ল্যাম্পটা পরিষ্কার করিয়া, বাহিরে অনেকদিনের একটা খালি প্যাকবাক্স পড়িয়াছিল, সেটা ঝাড়িয়া মুছিয়া টেবিলে পরিণত করিয়া সন্ধ্যার পর টেবিল ল্যাম্পটা সেটার উপর রাখিয়া পড়িতে বসিল। বই হইতে মুখ তুলিয়া সে ঘন ঘন ঘরের চারি-দিকে খুসীর সহিত চাহিয়া দেখিতেছিল—ঠিক একেবারে যেন বড়লোকদের সাজানো ঘর! ছবি, পর্দ্দা, ফুলদানী, টেবিল ল্যাম্প সব…সে একটু ভালভাবে থাকিতে চায়। এতদিন পয়সা ছিল না, হয় নাই। কিন্তু এইবার কেন সে মহিষের মত বিলের কাদায় লুটাইয়া পড়িয়া থাকিতে যাইবে?

পরদিন সে ক্লাসের বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া নিজের ঘরে খাওয়াইল—প্রণব, জানকী, সতীশ, অনিল, এমন কি সেন্ট্-জেভিয়ার কলেজের সেই ভূতপূর্ব্ব ছাত্র চালবাজ মন্মথকে পর্য্যন্ত।

মন্মথ ঘরে ঢুকিয়া বলিল—হুররে!…আরে আমাদের অপূর্ব্ব এসব করেচে কি! কোত্থেকে বাজে রাবিশ্ এক পুরোনো পর্দ্দা জুটিয়েচে দ্যাখো। এত খাবার কে খাবে? অপু নীচের কারখানার হেড্ মিস্ত্রীকে বলিয়া তাহাদের বড় লোহার চায়ের কেটলীটা ও একটা পলিতা-বসানো সেকেলে লোহার ষ্টোভ্ ধার করিয়া আনিয়া চা চড়াইয়াছে, একরাশ কমলা নেবু, সিঙ্গাড়া, কচুরী, পানতুয়া কলা ও কাঁচা পাপর কিনিয়া আনিয়াছে—সবাই দেখিতে দেখিতে খাবার অর্দ্ধেকের উপর কমাইয়া আনিল। কথায় কথায় অপু তাহাদের দেশের বাড়ীর কথা তুলিল—মস্ত দোতালা বাড়ী, নদীর ধারে, এখনও পূজার দালানটা দেখিলে তাক্ লাগে, দেশে এখনও খুব নাম—দেনার দায়ে মস্ত জমিদারী হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, তাই আজ এ অবস্থা—নহিলে ইত্যাদি।

প্রণব চা পরিবেশন করিতে গিয়া খানিকটা জানকীর পায়ের উপর ফেলিয়া দিল। ঘরসুদ্ধ সবাই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সতীশ আসিয়াই সটান্ শুইয়া

পড়িয়াছিল অপুর বিছানায়, বলিল,—ওহে তোমরা কেউ আমার গালে একটা পানতুয়া ফেলে দাও তো!...হাঁ করে আছি—

সতীশ বলিল,—হাঁ হে—ভাল কথা মনে পড়েছে। তোমার সেই জানালা-কাব্যের নায়িকা কোম্‌দিকে থাকেন? এই জানালাটি নাকি?—

অনিল বাদে আর সকলেই হাসি ও কলরবের সঙ্গে সেদিকে ঝুঁকিয়া পড়িতে গেল—অপু লজ্জামিশ্রিত স্বরে বলিল,—না না ভাই, ওদিকে যেও না—সে কিছু না সব বানানো কথা আমার—ওসব কিছু না—

মেয়েটি পাগল এই ধারণা হওয়া পর্য্যন্ত তাহার কথা মনে উঠিলেই অপুর মন করুণার্দ্র হইয়া ওঠে। তাহাকে লইয়া এই হাসি-ঠাট্টা তাহার মনে বড় বিঁধিল। কথার স্বর ফিরাইবার জন্য সে নতুন-কেনা পর্দ্দাটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। পরে হঠাৎ মনে পড়াতে সে সেই ঝুটা পাথরের আংটিটা বাহির করিয়া খুসীর সহিত বলিল,—এটা দ্যাখো তো কেমন হয়েচে? কত দাম হবে? মন্মথ দেখিয়া বলিল,—এ কোথাকার একটা বাজে পাথর বসানো আংটি, কেমিকেল সোনার, এর আবার দামটা কি...দূর।

অনিলের এ কথাটা ভাল লাগিল না। মন্মথ ইতিপূর্ব্বে অপুর কেনা পর্দ্দা দেখিয়া নাক সিটকাইয়াছে, ইহাও তার ভাল লাগে নাই। সে বলিল—তুমি তো জহুরী নও সব—তাতেই চাল দিতে এস কেন? চেনো এ পাথর?

—জহুরী হবার দরকারটা কি শুনি—এটা কি এমারেল্ড, না হীরে, না—

শুধু এমারেল্ড আর হীরে নাম শুনে রেখেছ বৈ তো নয়। এটা কর্ণেলিয়ান্—চেনো কর্ণেলিয়ান? অভ্রের খনিতে পাওয়া যায়, আমাদের ছিল, আমি খুব ভাল জানি।

অনিল খুব ভালই জানে অপুর আংটিটা কর্ণেলিয়ান নয়, কিছুই নয়—শুধু মন্মথর কথার প্রতিবাদ করিয়া অপুর মনে কোনো ঘা না লাগে মন্মথর চালিয়াতি কথাবার্ত্তায় সেই চেষ্টায় কর্ণেলিয়ান ও টোপাজ পাথরের আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা মুখে আসিল তাহাই বলিতে লাগিল। তার অভিজ্ঞতার বিরুদ্ধে মন্মথ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারিল না!

তাহার পর প্রণব একটা গান ধরাতে উভয়ের তর্ক থামিয়া গেল। আরও অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিখুসী, কথাবার্ত্তা ও আরও বার-দুই চা খাইবার পরে অন্য সকলে বিদায় লইল, কেবল অনিল থাকিয়া গেল, অপুও তাহাকে থাকিতে অনুরোধ করিল।

সকলে চলিয়া যাইবার কিছু পরে অনিল ভৎর্সনার স্বরে বলিল—আচ্ছা এসব আপনার কি কাণ্ড? (সে এতদিনের আলাপে এখনও অপুকে 'তুমি' বলে না) কেন এসব কিনবেন মিছে পয়সা খরচ করে?

অপু হাসিয়া বলিল,—কেন তাতে কি? এসব তো—ভাল থাকৃতে কি ইচ্ছে যায় না?

—খেতে পান না এদিকে, আর মিথ্যে এই সব—সে যাক্, এই দামে পুরোনো বইয়ের দোকানের সে গিবনের সেটটা যে হয়ে যেতো। আপনার মত লোকও যদি এই ভুয়ো মালের পেছনে পয়সা খরচ করেন তবে অন্য ছেলের কথা কি? একটা পুরোনো দূরবীন যে এই দামে হয়ে যেত। আমার সন্ধানে একটা আছে ফ্রী ইস্কুল ষ্ট্রীটের এক জায়গায়—একটা সাহেবের ছিল—স্যাটার্ণের রিং চমৎকার দেখা যায়—কম টাকায় হোত, মেম বিক্রী করে ফেল্‌চে অভাবে—আপনি কিছু দিতেন, আমি কিছু দিতাম, দুজনে কিনে রাখ্‌লে ঢের বেশী বুদ্ধির কাজ হোত—

অপু অপ্রতিভের হাসি হাসিল। দূরবীনের উপর তাহার লোভ আছে অনেকদিন হইতে। এতক্ষণে তাহার মনে হইল এ টাকার ইহার অপেক্ষাও সদ্ব্যয় হইতে পারিত বটে। কিন্তু সে যে ভাল থাকিতে চায়, ভাল ঘরে সুদৃশ্য সুরুচিসম্মত আসবাবপত্র রাখিতে চায়—সেটাও তো তার কাছে বড় সত্য—তাহাকেই বা সে মনে মনে অস্বীকার করে কি করিয়া?

অনিল আর কিছু বলিল না। পুরোণো বাজারের এ-সব সস্তা খেলো মালকে তাহার বন্ধু যে এত খুসীর সহিত ঘরে আনিয়া ঘর সাজাইয়াছে, ইহাতেই সে মনে

মনে চটিয়াছিল—শুধু অপুর মনে আর বেশী আঘাত দিতে ইচ্ছা না থাকায় সে বিরক্তি চাপিয়া গেল।

অপু বলিল,—হুল্লোড়ে পড়ে তোমার খাওয়া হ'ল না অনিল, আর খানকতক কাঁচা পাঁপর ভাজবো?

অনিল আর খাইতে চাহিল না। অপু বলিল,—তবে চল, কোথাও বেরুই—গড়ের মাঠে কি গঙ্গার ধারে। অনিলও তাই চায়, বলিল দেখুন অপূর্ব্ববাবু, উনিশ কুড়ি একুশ বছর থেকে পঞ্চাশ ষাট বছর পর্য্যন্ত বয়সের লোকে কি রকম গলির মধ্যে বাড়ীর সাম্‌নেকার ছোট্ট রোয়াকটুকুতে বসে আড্ডা দিচ্ছে—এমন চমৎকার বিকেল কোথাও বেরুনো নেই, শরীরের বা মনের কোনো অ্যাড্‌ভেঞ্চার নেই, আসনপিঁড়ি হয়ে সব ষষ্ঠিবুড়ী সেজে ঘরের কোণের কথা, পাড়ার গুজব, কি দরে কে ওবেলা বাজারে ইলিস মাছ কিনেচে সেই সব—ওহ্‌ হাউ আই হেট্‌ দেম্‌।···আপনি জানেন না এই সব র‍্যাঙ্ক ষ্টুপিডিটি দেখলে আমার রক্ত গরম হয়ে ওঠে—বরদাস্ত কর্ত্তে পারিনে মোটে—গা যেন কেমন—

—কিন্তু ভাই তোমার ও গড়ের মাঠে আমার কিন্তু মন ভোলে না—মোটরের শব্দ, মোটর বাইকের ফট্‌ ফট্‌ আওয়াজ, পেট্রোল গ্যাসের গন্ধ, ট্রামের ঘড়ঘড়ানি—নামেই ভাই মাঠ, গঙ্গার কথা আর নাই বা তুল্‌লাম।

—কাল আপনাকে নিয়ে যাবো একজায়গায়। বুঝতে পারবেন একটা জিনিষ—একটা ছেলে—আমার এক বন্ধুর বন্ধু—ছেলেটা সাউথ আফ্রিকায় মানুষ হয়েচে, সেইখানেই জন্ম—সেখান থেকে তার বাবা তাদের নিয়ে চলে এসে উঠেছে কল্‌কাতায়, ফিয়ার লেনে থাকে। তার মুখের কথা শুনে এমন আনন্দ হয়! এমন মন! এখানে থেকে মরে যাচ্ছে—শুনবেন তার মুখে সেখানকার জীবনের বর্ণনা—হিংসে হয় সত্যি!

অপু এখনি যাইতে চায়। অনিল বলিল, আজ থাক্‌, কাল ঠিক যাবো দুজনে। দেখুন অপূর্ব্ববাবু কিছু যেন মনে করবেন না আপনাকে তখন কি সব বল্লাম বলে। আপনারা কি জন্যে তৈরি হয়েচেন জানেন? ও সব চিপ ফাইনারীর খদ্দের আপনারা কেন হবেন? দেখুন, এ পুরুষ তো কেটে গেল, এসময়ের কবি, বৈজ্ঞানিক, দাতা, লেখক, ডাক্তার, দেশসেবক এঁরা তো কিছুদিন পরে সব ফৌৎ হবেন, তাঁদের হাতে থেকে কাজ তুলে নিতে হবে কাদের, না যারা এখন উঠচে। একদল তো চাই এই জেনারেশনের হাত থেকে সেই সব কাজ নেবার? সাহিত্যে, বিজ্ঞানে, আর্টে, দেশসেবায়, গানে—সব তাতে, নতুনদল যারা উঠছে, বিশেষ করে যাদের মধ্যে গিফ্‌ট আছে তাদের কি হুল্লোড় করে কাটাবার সময়?

অপু মুখে হাসিয়া কথাটা উড়াইয়া দিল বটে, কিন্তু মনে মনে ভারি খুসী হইল—কথার মধ্যে তাহারও যে দিবার কিছু আছে বা থাকিতে পারে সেদিকে ইঙ্গিত করা হইয়াছে বুঝিয়া।

পরে দুজনে বেড়াইতে বাহির হইল।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের কয়েকখানি পত্র

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

রাজা রাজেন্দ্র "লালা" মিত্রের পর ৺অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের তুল্য ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্গদেশে বিরল, একথা অত্যুক্তি নহে। য়ুরোপীয় বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া সংস্কার-বর্জ্জিত বুদ্ধিতে ইতিহাস আলোচনা মৈত্রেয় মহাশয় বঙ্গদেশে প্রথম প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মাটি খুঁড়িয়া পাথুরে প্রমাণের বলে ইতিহাসের নূতন উপাদান সংগ্রহে মৈত্রেয় মহাশয় পথ-প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন। গৌড় ও মগধ-শিল্পের আলোচনার সূত্রে প্রতিমা-তত্ত্বের নানা নূতন সত্যের আবিষ্কারের মূল-সূত্রগুলি, তিনিই প্রথম নির্দ্দেশ করিয়া যান। বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজনৈতিক ও নানা ধর্ম্ম-প্রভাবের ইতিহাস মৈত্রেয় মহাশয় নানা দিক দিয়া পরিদর্শন করিয়াছিলেন, এবং ধৈর্য্য ও পাণ্ডিত্যের সহিত তাহার মূল উপকরণাদির তত্ত্ব-সংগ্রহে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। ইতিহাস ছাড়া আর একটি সংস্কৃতির উপর তাঁহার গভীর প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, সেটি গৌড়-শিল্পের উৎপত্তি ও ইতিহাস। এই সূত্রে তাঁহার সহিত পত্র ব্যবহার করিবার সৌভাগ্য আমার ঘটিয়াছিল। এই পত্রাবলীতে তাঁহার গভীর গবেষণা, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, পাণ্ডিত্যের আদর্শ, ও গৌড়-শিল্পের উপর অনুরাগের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। আজ বঙ্গদেশে একাধিক পণ্ডিত ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব লইয়া নানা গবেষণা ও আলোচনা করিতেছেন, ভরসা করি তাঁহারা মৈত্রেয় মহাশয়ের উদাহরণ নূতন গৌরবে উজ্জ্বল করিবেন। তাঁহার পত্রে তাঁহার জ্ঞানের যে দিকটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, আশা করি তাহার পরিচয়ে আমাদের নূতন ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতেরা নূতন প্রেরণা ও শক্তি পাইবেন। এই ভরসাতেই পত্রগুলি প্রকাশিত হইল। এক শ্রেণীর শিল্পী আছেন যাঁহাদের প্রতিভা পরিপুষ্ট চিত্রে (finished paintings) ততটা প্রকাশ পায় না, যতটা ফুটিয়া উঠে তাঁহাদের রেখা পরিকল্পনায় (drawings); তেমনই এক শ্রেণীর লেখক আছেন, যাঁহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনের ভঙ্গীটি প্রবন্ধ-পুস্তকাদিতে ততটা প্রকাশ পায় না, যতটা আত্মপ্রকাশ করে তাঁহাদের পত্রাবলীতে। এই হিসাবে অনেক লেখকের পত্রাবলী কতকটা আত্মজীবন-চরিত। "সিরাজ-উদ্দৌলা"র লেখকের মানসিকতার একটা নূতন দিক তাঁহার পত্রাবলীতে প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা তাঁহার প্রকাশিত পুস্তক-প্রবন্ধাদিতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই হিসাবেও মৈত্রেয় মহাশয়ের এই পত্রগুচ্ছের একটা নূতন মূল্য আছে।

গৌড়-শিল্পের উৎপত্তি ও দ্বীপ-পুঞ্জের শিল্প-কলার সহিত মৈত্রেয় মহাশয় যে সম্বন্ধ পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ, বঙ্গদেশে নূতন প্রমাণের আবিষ্কারে তাঁহার পরিকল্পনার অপরাপর অংশ ভবিষ্যতে সুপ্রমাণিত হইবে। মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমি ভট্টকর্ণের ছাত্রী শ্রীমতী মার্টিন্ টয়নট নাম্নী একজন ডচ্-মহিলার সাহায্যে যবদ্বীপের প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের ডচ্-ভাষায় লিখিত নানা রিপোর্ট ও monograph অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছি। যবদ্বীপের শিল্প-তত্ত্বের উপাদানগুলি তখনও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। আমার অল্পবিদ্যার শূন্য-গর্ব্ব লইয়া মৈত্রেয় মহাশয়ের theory সবেগে আক্রমণ করিয়াছিলাম। মনীষী পণ্ডিত আমার বক্তব্য ধৈর্য্য, সৌজন্য ও সহৃদয়তার সহিত আলোচনা করিয়া আমাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন; এই পত্রব্যবহারের ফলে যবদ্বীপের শিল্পের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা নূতন পথ আমার চক্ষের সম্মুখে তিনি খুলিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। বঙ্গের একজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকের স্মৃতি-রক্ষার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিশ্চয় হইবে, ভরসা করা যায়

ইতিমধ্যে তাঁহার দুই-চারিখানি পত্র প্রকাশ উপলক্ষ্যে আমি তাঁহার স্মৃতির পূত-মন্দিরে এই অর্ঘ্য কয়টি নিবেদন করিয়া ধন্য হইলাম।

(১)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী,
৮ই বৈশাখ ১৩১৯ বং

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আপনি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রবাবুকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তিনি তাহা আমাকে পাঠাইয়া আপনার সহিত পত্রব্যবহারের অনুরোধ জানাইয়াছেন বলিয়া অপরিচিত হইয়াও এই পত্র লিখিতে সাহসী হইলাম। গৌড়ে, বরেন্দ্রে, বিক্রমপুরে ফটো তুলিবার লোকের অভাব নাই এবং অনেক দ্রব্যেরই ফটো তুলিয়াছি, তদ্বিষয়ে আপনাকে আর কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না। কিন্তু উড়িষ্যায় যে সকল দ্রব্যের ফটো করিতে পারি নাই, তাহার স্কেচ্ করাইতে হইবে। তাহার ব্যবস্থা করিতে পারিলে জানাইবেন। কোথায় কোথায় গৌড়শিল্পকলার কি কি নিদর্শন উড়িষ্যায় দেখিয়াছি তাহার তালিকা ও ঠিকানা পাঠাইব। 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে'র একখানা বঙ্গাক্ষরের পুথি পাইয়াছেন জানিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। উহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। একখানি মাত্র হস্তলিখিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করা যায় না, সুতরাং একখানি পাইয়াছেন বলিয়া সন্ধান লইবার চেষ্টা পরিত্যাগ করিবেন না। আর একখানি হস্তলিখিত পুথির আবশ্যক—তাহার দুই তিন রকমের ছাপা প্রচলিত আছে, সকলগুলিই ভুলভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ, তাহার হস্তলিখিত পুথি না পাইলে, ছাপা দেখিয়া কাজ করা চলে না। পুথিখানির নাম 'হরিভক্তিবিলাস।' উহার টীকাও আছে। সটীক হরিভক্তিবিলাসের হস্তলিখিত পুথি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে, আমার কাজের সাহায্য হইবে। আপনারা যখন স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া এ সকল ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া অভয় দিয়াছেন, তখন আর ভয় না খাইয়া, প্রথম পত্রেই অনেক ফরমাইশ পাঠাইতে সাহসী হইলাম। ভরসা করি পত্রোত্তরে আনন্দদান করিতে বিরত হইবেন না। অলমতি বিস্তরেণ।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(২)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
১১ বৈশাখ ১৩১৯।

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আপনার পত্র পাইয়া যুগপৎ হর্ষ ও গর্ব্ব লাভ করিলাম। আপনার সহিত পূর্ব্বপরিচয়ের সৌভাগ্য না থাকিলেও, আপনার শিল্পালোচনার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় ছিল। আপনার পত্রে তাহার আরও পরিচয় পাইয়াই হর্ষ ও গর্ব্ব লাভ করিলাম, আপনাদিগের মত উৎসাহী, অধ্যবসায়ী, এবং একনিষ্ঠ সাধকের সাধনা অবশ্যই সিদ্ধিলাভ করিবে। আমি যখন ভারতশিল্পের তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন বোধ করি, তখনও গৌড়-শিল্পের ইতিহাসের অনুসন্ধানের কামনাই একমাত্র কামনা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে। সে অনেক দিনের কথা। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পুরাতন শিল্পের নিদর্শন দেখিয়াই আমি তাহার প্রতি আকৃষ্ট হই। আমার পক্ষে সর্ব্বদা কলিকাতা যাতায়াত ও তথা হইতে ইচ্ছামত পুস্তকাদি আনিয়া অধ্যয়ন কখনও সুবিধাজনক হয় নাই; ইহাতে বাধ্য হইয়াই আমাকে অন্যান্য উপায়ে এ বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে। আমি কিছু লিখিতাম না, বন্ধুবান্ধবকে ল্যাণ্টার্ণের সাহায্যে ছবি দেখাইতাম। তাঁহাদিগের উপদ্রবে বঙ্গদর্শনে শ্রীমূর্ত্তি-বিবৃতি নামক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহার পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি আমাকে গৌড়-শিল্পকলার ইতিহাস লিখিবার জন্য তাড়না করায় এত-কালের পর লিখিবার চেষ্টা করিতেছি বলিয়া এখন দুই একটি প্রবন্ধ ছাপিতে দিতেছি। আমি আর আপনা-দিগকে কি অভয় দিব,—আপনারাই আমাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন বলিয়া অভয় দিয়া আমাকে চিরঋণে আবদ্ধ করিয়াছেন।

আমি ইতিহাসের দিক্ দিয়াই বিষয়টির আলোচনা করিয়াছি—শিল্পসৌন্দর্য্যের দিক্ দিয়া সকল বিষয়ের আলোচনা করিবার অধিকার লাভ করি নাই। ইতিহাসের দিক্ দিয়া আলোচনা করিতে গিয়াই আমি বুঝিয়াছি—শিল্পবিধি প্রথমে কারিকারূপে প্রচলিত ছিল, পরে ক্রমে ক্রমে তাহা সঙ্কলিত হইয়া, বাস্তুশাস্ত্রে, পুরাণে, তন্ত্রে বিবিধ ভাবে বিবিধ গ্রন্থে স্থান লাভ করিয়াছে। যেমন আগে ভাষা, তাহার পর ব্যাকরণ;—সেইরূপ আগে শিল্প, তাহার অনেক পরে শিল্পশাস্ত্র। সুতরাং শিল্পশাস্ত্রে "ব্যাকার", বিবরণ, লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে শিল্পরীতি অধ্যয়ন করা চলিতে পারে। সকল যুগের সকল শিল্পই শাস্ত্র মানিয়া চলে নাই, স্বাধীন উদ্ভাবনা অনেক সময়ে গণ্ডী ছাড়াইয়া চলিয়া গিয়াছে। এই কথাটি না ধরিয়াই স্যর জর্জ্জ বার্ডউড্ ভ্রমে পতিত হইয়া রহিয়াছেন। ভাষা বুঝিবার জন্য ব্যাকরণের প্রয়োজনের মত শিল্প বুঝিবার জন্য শিল্পশাস্ত্রের প্রয়োজন,---তাহার অধিক ইহার নিকট কিছু প্রত্যাশা করা যায় না, ইহাই আমার মত। গৌড়-শিল্প কোন্ শিল্পশাস্ত্র ধরিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব, তখন তাহারই অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া বুঝিয়াছিলাম—মগধ, উড়িষ্যা, এবং দ্বীপপুঞ্জের শিল্প গৌড়শিল্প। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য একসঙ্গে চলিয়াছে বলিয়া একসঙ্গে বুঝিতে হইলে, সমস্ত উত্তরাপথের (আর্য্যাবর্ত্তের) শিল্পে বিশ্বকর্ম্মার প্রভাব দেখা যায়—একথা ঢাকা রিভিউ পত্রে লিখিয়াছিলাম। আমাদিগের দেশের নব্য স্মৃতিতে দেখা যায়—হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের প্রভাব এদেশেও বর্ত্তমান ছিল। সেই হইতেই উহার সন্ধান করিতেছি, এবং গ্রন্থ না পাওয়ায় উদ্ধৃত শ্লোকাবলী হইতে হয়শীর্ষ মতের পরিচয়-লাভের চেষ্টা করিতেছি, এমন সময়ে উড়িষ্যায় গ্রন্থ দেখিলাম। উহার নকল আনিতে পারি নাই। উড়িয়া অক্ষর হইতে বঙ্গাক্ষরে নকল করাইতে ব্যয়বাহুল্য আছে। আমি উড়িষ্যায় ফটোগ্রাফ তুলিতেই ব্যয়বাহুল্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমার সাংসারিক অবস্থায় অধিক ব্যয়বাহুল্য সম্ভবে না। আপনি যখন বঙ্গাক্ষরে পুথি পাইয়াছেন তখন আমাকে একবার আদ্যন্ত দেখিতে দিবেন। যে Bibliography প্রস্তুত করিতেছেন তাহা অবশ্যই উপাদেয় হইবে, তাহাও দেখিবার আশায় রহিলাম। বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি অনেক পুরাণ তন্ত্রের পুথি সংগ্রহ করিয়া ও দক্ষিণাপথ হইতে শিল্পশাস্ত্রের পুথিগুলির নকল ক্রমশঃ আনাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়া আমার সাহায্য করিতেছেন, আপনার নিকটেও সেইরূপ সাহায্য পাইলে আমার পরিশ্রমের লাঘব হইবার আশা আছে। শিল্পকারগণ অনেক অধ্যাপক অপেক্ষা শিল্পশাস্ত্রের মর্ম্ম ভালরূপ জ্ঞাত আছে। অধ্যাপকবর্গ শিল্পশাস্ত্রে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—কারণ প্রয়োজনের অভাবে তাঁহারা এই শাস্ত্রের চর্চ্চা ত্যাগ করিয়াই অনভিজ্ঞ হইয়াছেন। আপনি যে পুস্তক রচনা করিতেছেন, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক, ইহাই প্রার্থনা। আমি তাহার কোন কাজে লাগিলে ধন্য বোধ করিব, সুতরাং আমাকে অসঙ্কোচে লিখিবেন।

গৌড়শিল্পের ইতিহাসের আভাসটি এইরূপ,—খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব্বে আমাদিগের দেশে স্বতন্ত্র শিল্প ছিল না, নিদর্শনও অল্প ছিল, যাহা ছিল তাহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া কথিত হইতে পারে না। কিছু কিছু নিদর্শন এখানে সংগৃহীত হইয়াছে। অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে, [মগধে ও উড়িষ্যায় ত বটেই] গৌড়ীয় পালসাম্রাজ্যের প্রভাব বর্ত্তমান থাকায়, সমগ্র উত্তরাপথের ভাষায়, রচনায়, শিল্পে ও লোকাচারে গৌড়ীয় প্রভাব প্রাধান্য লাভ করে;—ইহা ইতিহাসের কথা, তাম্রশাসন শিলালিপি ও পুরাতন গ্রন্থ হইতে ইহা দেখাইয়া যাহা লিখিয়াছি তাহা বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির প্রথম গ্রন্থে জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত হইবে। দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ যে বাঙ্গালীর উপনিবেশ তাহার প্রমাণ দেখাইয়া গ্রন্থ লিখিতেছি, এবং যবদ্বীপের শিল্প-প্রতিভা-শীর্ষক একটি প্রবন্ধ সাহিত্যে পাঠাইয়াছি, তাহাও জ্যৈষ্ঠ মাসেই বাহির হইবে। লামা তারানাথের গ্রন্থের পরে তিব্বতীয় ভাষায় প্যাগ-সাম-জন্-জাঙ্গ নামে আর একখানি গ্রন্থ রচিত হয়। উহাতেও ধীমানের পরিচয় আছে। যে অংশে তাহা আছে তাহার অনুবাদভার রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাসের উপর অর্পিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া

কোনও সংস্কৃত গ্রন্থে গৌড়-শিল্পরীতির উল্লেখ দেখি নাই; নামটি আমিই প্রচলিত করিতেছি, কারণ উহাই প্রকৃত নাম হওয়া উচিত। প্রতিমালক্ষণ বা Iconology ভারতীয় Iconographyর একাংশ বলিয়াই আমি *Dawn* পত্রে Iconography শব্দেরই ব্যবহার করিয়াছি।

আপনি যেভাবে শিল্পযুগের বিভাগ করিয়াছেন, উহাই প্রচলিত বিভাগ, কিন্তু উহা ঐতিহাসিক বিভাগ নয়—কাল্পনিক। ঐতিহাসিক বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক যুগ ধরিয়া করিতে হইবে। যে যুগে যে কারণে মূর্ত্তিকল্পনা যে ধারা অবলম্বন করিয়াছিল, সেই যুগের সকল সম্প্রদায়ের মূর্ত্তিতেই তাহা দেদীপ্যমান। সুতরাং সম্প্রদায়-অনুসারে যুগের নামকরণ করিলে, তাহা ইতিহাসের বিচারে টিকিতে পারিবে না।

উড়িষ্যার দেবমূর্ত্তিগুলির মধ্যে যাহার ছবি বা স্কেচ পাইলে আমার উপকার হইতে পারে তাহার তালিকা এইরূপ:—(১) যাজপুরের মাতৃকামূর্ত্তি, (২) পুরীর মার্কণ্ডেয় সরোবরতীরে একখানি চালাঘরে রক্ষিত মাতৃকামূর্ত্তি, (৩) পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের বাহিরের বৃহৎ বরাহ ও নৃসিংহমূর্ত্তি, এবং পুরী ও কোণার্কের কষ্টিপাথরের সমস্ত মূর্ত্তি, (৪) সাক্ষী গোপালের মূর্ত্তি। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে তাহার কথা লিখিয়াছি।

আমার পত্রও দীর্ঘ হইয়া পড়িল। যত কথা বলিব, তত কথা বলা হইল না। আর দুই একটা কথা বলিয়া এবার বিদায় লইব। আপনি বাঙ্গালা দেশের গৌড়-শিল্পের নিদর্শনের তালিকা চাহিয়াছেন, তাহা বৃহৎ। আমরা তাহার magic lantern slide করিয়াছি ও করিতেছি। কলিকাতার যাদুঘরে কিছু আছে, কিন্তু বেশী আছে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহ-মন্দিরে। তাহার ব্লক হইতেছে, একসঙ্গে গৌড় শিল্পকলা পুস্তকে বাহির হইবে। গৌড়শিল্পরীতি সম্বন্ধে আমার অভিমত কি তাহার একটা 'নোট' চাহিয়াছেন। সংক্ষেপে লিখিলেও তাহা বৃহৎ 'নোট' হইবে। এক কথায় বলিতে গেলে মহাযান-সম্প্রদায়ের অধ্যাত্মবাদের পরিণামই গৌড়ীয় শিল্পরীতি রূপে আকার-গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছিল। পঞ্চপাল নয়পালের সময় পর্য্যন্ত সেই অধ্যাত্মবাদ বিশুদ্ধি রক্ষা করিয়া ক্রমে অবসন্ন হয়, শিল্পও তাহার অনুগমন করে। বরেন্দ্রে যে শিল্পরীতির উদ্ভব, তাহা উড়িষ্যায়,মগধে, দ্বীপপুঞ্জে গিয়াছিল। মগধ ও গৌড় একসূত্রে গ্রথিত থাকায়, মহাযান মতের অধোগতির সঙ্গে এই দুই স্থানের শিল্পরীতি ক্রমে অবনতি লাভ করিতে থাকে; কিন্তু উড়িষ্যায় ও দ্বীপপুঞ্জে সেরূপ কারণ বর্ত্তমান না থাকায়, তদ্দেশে উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করে। বরেন্দ্রে উদ্ভব—উড়িষ্যায় শক্তিলাভ—দ্বীপপুঞ্জে পরিণতি, ইহাই গৌড়ীয় শিল্পকলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। ভুবনেশ্বরে বসিয়া ইহার পরিচয় লাভ করা যাইতে পারে। ফর্গসনের নূতন সংস্করণের দ্বিতীয় ভাগে উড়িষ্যার স্থাপত্যের কাল-নির্ণয়াত্মক তালিকা দেখুন,—যবদ্বীপের উৎকৃষ্ট মূর্ত্তিগুলির রচনাকালের কথা চিন্তা করুন,—সহজেই ইতিহাসের সূত্র ধরিতে পারিবেন। প্রাদেশিক রচনারীতি মূলরচনারীতিকে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিলেও আচ্ছন্ন করিতে পারে না। কোন্‌টি মূল, কোন্‌টি প্রাদেশিক, তাহা বাছিয়া বাহির করিবামাত্র, উড়িষ্যার এবং দ্বীপপুঞ্জের শিল্পরীতি যে গৌড়শিল্পরীতি তাহা বুঝিতে বিলম্ব ঘটিবে না। এ বিষয়ে আমি অল্পে অল্পে অনেক লিখিয়াও কিছুই লিখিতে পারিলাম না। সাহিত্যে মাসে মাসে কিছু কিছু লিখিব মনে করিয়াছি, তাহাতেই আমার বক্তব্যের আভাস পাইতে পারিবেন। এখন বিদায় গ্রহণের সময়ে প্রার্থনা জানাইয়া রাখি— আপনি যে শিল্পগ্রন্থের নকল আনাইয়াছেন, সেগুলি রেজেষ্টারী ডাকে অথবা লোক মারফতে ক্রমে ক্রমে আমাকে দেখিতে দেন এবং যে সকল স্কেচ্ আবশ্যক তাহা সংগ্রহ করিয়া দেন, আমি তদবলম্বনে আপনাদের প্রস্তাবিত শিল্পসূত্রসংগ্রহ নামক গ্রন্থ সঙ্কলনের চেষ্টা করি। অলমতি বিস্তরেণ।

ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

পুনঃ নিঃ

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সংগৃহীত গৌড়শিল্পের নিদর্শনের একটি নমুনা পাঠাইলাম। উহা গৌড়-শিল্পকলা-পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি কর্ত্তৃক উহা প্রথমে প্রকাশিত হইবে। সুতরাং

এই চিত্র আপনি ব্যবহৃত করিবেন না, আপনাকে সেরূপ অধিকার দানের অধিকার আমার নিজেরই নাই। কেবল আপনাকে গৌড়শিল্প চিনিবার উপযোগী একটি নিদর্শন দিবার জন্য ইহা পাঠাইলাম। আপনি শিল্পী, এই চিত্র সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা জানিবার জন্য আশান্বিত হইয়া রহিলাম। কি গুণে গৌড়শিল্প আমার মত একজন শুষ্ক ঐতিহাসিককেও রসসিক্ত করিয়াছে, ইহাতে তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। ইতি

(৩)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
১৫ বৈশাখ ১৩১৯

প্রীতিনমস্কার নিবেদন

আপনার উপদেশপূর্ণ পত্র পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আপনি সাবধান না করিলেও, আমার পক্ষে যাহা তাহা á priori সিদ্ধান্ত ধরিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া, দীর্ঘকালের ইতিহাসচর্চ্চার গৌরব ক্ষুন্ন করিবার সম্ভাবনা নাই। আমার অজ্ঞতাই আমার সাবধানতার অবলম্বন। যতক্ষণ না বুঝিতে পারি, ততক্ষণ বুঝিবারই চেষ্টা করি। যবদ্বীপাদির উপনিবেশ যে হিন্দু উপনিবেশ তাহা শুনিয়া তৃপ্তি হয় না,—কাহাদের উপনিবেশ জানিতে ইচ্ছা করে। এ বিষয়ে আমি যে সকল প্রমাণের যে ভাবে আলোচনা করিতেছি, তাহা কাহারও অভিমতের প্রতিধ্বনি নহে; আমার নিজের অভিমত এবং তাহা কেবল প্রমাণের উপরেই প্রতিষ্ঠিত; á priori সিদ্ধান্ত নহে। পত্রে তাহার পরিচয় প্রদান করা অসম্ভব। তাহা প্রবন্ধে ও গ্রন্থে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী গৌড়শিল্পের উত্থান-পতনের ঐতিহাসিক কাল। এই কালের মধ্যে যে শিল্পকলা গৌড়ে উদ্ভূত, উড়িষ্যায় শক্তিপ্রাপ্ত ও যবদ্বীপে পরিণতাবস্থায় আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকেই আমি "গৌড়শিল্পকলা" বলিয়াছি। তাহার মধ্যে পূর্ব্বকালবর্ত্তী শিল্পপদ্ধতির ধারা অবশ্যই কিছু কিছু লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে গৌড়শিল্পের নিজের অস্তিত্ব নষ্ট হয় না। গৌড়শিল্পই যে ভারতবর্ষের সকল যুগের সকল শ্রেণীর শিল্পের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, আমি এমন দাবী উপস্থিত করিতে পারি না; কেহ করেন কিনা জানি না। গৌড়শিল্প যে ভাবটির অভিব্যক্তি, তাহাকে ইতিহাসের মধ্যেই সন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছি। তর্কস্থলে যদি আমার এই সিদ্ধান্তটি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে গৌড়ের, উড়িষ্যার ও যবদ্বীপের শিল্পনিদর্শনগুলি এই সিদ্ধান্তের অনুকূল হয় কি না, শিল্পের দিক্ দিয়া আপনারা তাহার বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। সেদিকে যদি এমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, যে কিছুতেই আমার সিদ্ধান্তের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না, তখন না হয় শিল্পসৌন্দর্য্যের প্রমাণের বলে ভিন্নরূপ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিবেন। একটা theory না হইলে বিচার চলে না। আপনারা আপাততঃ আমার অভিমতটিকে একটা theory মাত্র মনে করিয়াও বিচার করিয়া দেখিতে পারেন। তাহার অধিক আর কিছু বর্ত্তমান অবস্থায় দাবি করিতে চাহি না—আমাদের সম্পাদক মহাশয় ছবি দাগাইয়া যে কি অপকর্ম্ম করিয়াছেন তাহা আপনার পত্র হইতে তাঁহাকে শুনাইলাম। আমাদের সংগৃহীত নিদর্শনগুলি 'আমাদের', আমার নহে। সমিতির অনুমতি না পাইলে, তাহার ফটো ইত্যাদি দিতে পারি না ও কাহাকেও দেখাইতে পারি না। সমিতি পুস্তক লিখিতেছেন বলিয়াই এরূপ সাবধানতার প্রয়োজন বুঝিয়াও আমার অধিকার অতিক্রম না করি, এই আশঙ্কায় আপনাকে পূর্ব্বপত্র লিখিয়াছি। আপনার পত্রখানি সমিতিতে পেশ করিয়া, অনুমতি লইয়া, তালিকা ইত্যাদি পাঠাইব। গৌড়শিল্পের নিদর্শন-গুলি নানা দেশে চলিয়া যাইতেছে বলিয়া আমরা তাড়াতাড়ি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছি—সে কেবল আপনাদের জন্যই। যোগ্য ব্যক্তি আসিয়া তাহার আলোচনা করিবেন, ইহাই উদ্দেশ্য। ইহার জন্য আমরা অনাহারে অকথ্য ক্লেশে নানা স্থানে যাতায়াত করিয়া ম্যালেরিয়াগ্রস্ত হইয়াছি। ইহাও আপনাদের জন্যই। আমরা কোথায় কি পাইলাম, কেমন করিয়া পাইলাম, কাহার নিদর্শন পাইলাম,—তাহাই লিখিয়া রাখিতেছি। তারানাথ যে ধীমানের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি কোথায়

উদ্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহার শিল্পের নিদর্শন কোন্‌গুলি,—আমরা এখন কেবল এই সকল বিষয়েরই প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছি। সে শিল্পের মূল্য কি, সমগ্র ভারতশিল্পে তাহার স্থান কোথায়, তাহা আমাদিগের আলোচ্য নয়। যাহা কেবল আমাদিগেরই আলো— এবং আমরা না করিয়া গেলে, আপনাদের পক্ষে করা একরূপ অসম্ভব দাঁড়াইতে পারে, আমরা আপনাদের জন্য সেই "ভূতের বেগার" খাটিতেছি। ইহার অধিক আমাদের কাজের মূল্য নাই। আপনি তাহাকে কল্পনাবলে ও সদাশয়তাগুণে বহুমূল্য মনে করিবেন না। আমি পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়া রাখিয়াছি—আমি শুষ্ক ঐতিহাসিক। তবে আমার দাবি একটু আছে, একটু মাত্র, সেটুকু স্বীকার করিতেই হইবে। আর কিছু নয়—যাহা ইতিহাস ধরিয়া বুঝিতে হইবে, সেইটুকু আমরা ইতিহাস ধরিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া যাইব। Architecture and History সম্বন্ধে *Spectator* পত্রে যে বাদানুবাদ চলিতেছে ২৩ মার্চ্চ ও ৩০ মার্চ্চ সংখ্যক পত্রে তাহা দেখিবেন। সুতরাং আমাদের "অনুসন্ধান-চেষ্টা আরও কয়েক শতাব্দী ক্ষান্ত থাকিলে, গৌড়-শিল্পের আলোচনার পথ আপনাদের পক্ষে সুগম হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই। মাটির নীচে হইতে খুঁড়িয়া তুলিবার সময় নাসিকাচ্ছেদ হইয়াছে বলিয়া পরিতাপ করিলেও বলিতে হইবে—মাটিচাপা অপরিজ্ঞাত অবস্থায় থাকিলেও লাভ হইত না। এ সকল অনিবার্য্য বিষয়কে একটু ক্ষমার চক্ষে, একটু সহৃদয়তার চক্ষে দেখিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।

আমাকে তালিকা পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তালিকা পাঠাইলাম। যথা :—(১) উড়িষ্যাশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের ছবি, (২) মাতৃকামূর্ত্তির ছবি, যাজপুর ও পুরীধামের, (৩) কোণার্কের নবগ্রহের ছবি, (৪) পুরীর ভোগ-মন্দিরের বিশেষ বিশেষ ছবি, (৫) শিল্পগ্রন্থের তালিকা, (৬) হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের প্রতিমালক্ষণের নকল এবং (৭) হরিভক্তিবিলাসের একখানি হস্তলিখিত পুথি। কশ্যপ, অগস্ত্য ও অত্রি প্রণীত গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল কি না সন্ধান পাই নাই, তবে তাঁহাদের কারিকা উদ্ধৃত হইতে দেখিয়াছি। পঞ্চরাত্র গ্রন্থ একশ্রেণীর তন্ত্রগ্রন্থ—উহা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের গ্রন্থ—সুতরাং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের ঐতিহাসিক মূল্য আছে। সমস্ত গ্রন্থেরই নকল রাখা উচিত।

অনুসন্ধান সমিতির প্রধান নায়ক কুমার শরৎকুমার এখন কলিকাতায়। তিনি সপ্তাহ মধ্যে দেশে ফিরিবেন। তিনি আসিবার পর আমাদের বৈঠক হইবে। তাহার পর আপনার "আবেদনের তালিকার" অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিব। নটরাজ ও নৃত্যগণেশের ধ্যান আমরা দাক্ষিণাত্য হইতে সংগৃহীত পুথিতে পাইয়াছি, নকল এখন আমাদের সম্পাদকের হস্তে, উহাও একসঙ্গেই পাঠাইতে পারিব। বাঙ্গালার নটরাজ একটু পৃথক—তাহার নৃত্য-ভঙ্গীও পৃথক—এবং তাহার একটি ভগ্নমূর্ত্তি আমরা পাইয়াছি। ভুবনেশ্বরে [মুক্তেশ্বরের আঙ্গিনায় আম গাছের নীচে ও ছোট ছোট মন্দিরে] যে সকল মূর্ত্তিমধ্যে একটি নটরাজ মূর্ত্তি ছিল, সেটি কলিকাতা মিউজিয়মে আসিয়াছে ;—আমি সেদিন উহা দেখিয়া আসিয়াছি—তাহার ছবি না লওয়া থাকিলে, লইবেন। শিল্পের হিসাবেও হয়ত অসুন্দর মূর্ত্তির প্রয়োজন থাকে, উদ্ভবের বা অবনতির পরিচয় দিবার সময়ে তাহার দরকার হয়। ইতিহাসের হিসাবে তাহার প্রয়োজন আরও অধিক। সুতরাং কেবল সুন্দর লইয়াই আমার ঘরকন্না নয়,—তাহাতে যাহা আছে, কবির ভাষায় তৎসম্বন্ধে বলিতে হয়—"তোমরা সবাই ভাল।" পত্র দীর্ঘ হইয়া গেল, অতএব এইখানেই বিদায় গ্রহণ করিতেছি। নিবেদনমিতি।

ভবদীয়

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

পুঃ নিঃ। ভিন্সেন্ট স্মিথের নূতন গ্রন্থের ২৬৪ পৃষ্ঠার ১৯৯ নং "সরস্বতীমূর্ত্তি" দেখিয়া তৎসম্বন্ধে এই পত্রের উত্তরেই আপনার অভিপ্রায় জানাইবেন। মূর্ত্তিটি আদৌ স্ত্রী-মূর্ত্তি নয়, সরস্বতী হওয়া ত দূরের কথা। ইহা জম্ভল-মূর্ত্তি কি না মিলাইয়া দেখুন এবং পরীক্ষার ফল কি হইল, লিখুন।

ক্রোড়পত্র

অভয় পাইয়াছি বলিয়া কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি। আপনি অনেক দেখিয়াছেন, আপনি আমার কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। যে প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারেন, তাহাও লিখিয়া জানাইবেন—

১। কীর্ত্তিমুখ কোন্ কোন্ প্রদেশের প্রস্তরমূর্ত্তিতে দেখিয়াছেন? উহা কোন্ কোন্ প্রদেশের স্থাপত্যে দেখিয়াছেন?

২। যেগুলি দেখিয়াছেন, তাহা কোন্ শতাব্দীর নিদর্শন?

৩। সকল স্থানে সকল যুগে একরূপ দেখিয়াছেন, কি ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিয়াছেন।

ভিন্ন ভিন্ন type দেখিয়া থাকিলে, কোন্ টাইপ আদি টাইপ ও ক্রমে তাহার কি কি বিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়াছেন? উহা প্রথমে স্থাপত্যে কিম্বা ভাস্কর্য্যে [প্রতিমায়] ব্যবহৃত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছেন কি না? করিয়া থাকিলে তাহার ফল কি? কীর্ত্তিমুখের কথা কোন্ শিল্পশাস্ত্রে পাইয়াছেন; বচন উদ্ধৃত করুন। কীর্ত্তিমুখ সম্বন্ধে অনেক জিজ্ঞাস্য আছে; উপরে একটু নমুনা দিলাম। আমার সিদ্ধান্ত বা অভিমত কি তাহা বলিব না, তাহাকে theory বলিয়াই বলিব। আমার theory এই যে, উহা প্রথমে স্থাপত্যের জন্য উদ্ভাবিত হইয়াছিল; খিলানের মধ্যশীর্ষকে শোভন করিবার জন্য উহা উত্তরকালে উদ্ভাবিত হইয়াছিল, ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বে উহা উদ্ভাবিত হয় নাই, উদ্ভাবনার পর উহা ক্রমে নানারূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেশে গৌড়ীয় প্রভাব বর্ত্তমান, কেবল সেখানেই উহার নিদর্শন পাওয়া যায়, অন্য প্রদেশে পাওয়া যায় না। আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহার উপর এই theory দাঁড় করাইয়াছি। আমার দেখার সঙ্গে যদি আপনার দেখাও মিলিয়া যায়, তবে তাহা একটি fact-রূপে গণ্য করিতে পারা যাইবে। সেই fact ধরিয়া অন্যান্য কথার বিচার চলিতে পারিবে। ইহা fact কিনা আগে তাহা স্থির করিয়া দেন, পরে এই fact হইতে কি সিদ্ধান্ত হইবে তাহা আপনা হইতেই নির্ণীত হইতে পারিবে। ইহার জন্য স্কেচ চাই, ফটোতে ইহার অনুসন্ধান চলিতে পারে না। এই কারণে আপনার ন্যায় আমার পক্ষে স্কেচকে একেবারে অবজ্ঞা করিবার উপায় নাই। আমার অনুসন্ধান-প্রণালী ঐতিহাসিক; তাহার এই সামান্য নমুনা দিলাম। আমার উত্তরগুলিও লিখিতেছি।

১। কীর্ত্তিমুখ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের সকল স্থানে, [বরেন্দ্রে ও মগধে বেশী] দেখা গিয়াছে, দ্বীপপুঞ্জেও দেখা গিয়াছে।

২। খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে।

৩। ভিন্ন ভিন্ন type দেখা গিয়াছে, স্কেচ্ দ্বারা দেখান যাইতে পারে। কেবল মুখ, মুখবিবর হইতে দোদুল্যমান মালা ইত্যাদি বিভিন্ন type etc. etc. প্রথমে স্থাপত্যে, পরে প্রতিমার চালির স্থাপত্যে উহা ব্যবহৃত হইয়াছে—উহা স্থাপত্যেরই অলঙ্কার। কোনও শিল্পশাস্ত্রে পরিচয় পাই নাই। উহা শিল্পীর প্রতিভা হইতে উদ্ভাবিত —সে উদ্ভাবনার আদিক্ষেত্র বরেন্দ্র, ধীমানের জন্মভূমি।

এই সকল উত্তর যদি যথার্থ হয়, তবে শিল্পশাস্ত্রে অনুক্ত স্থাপত্যের এই 'টেক্‌নিক'টি যেখানে যেখানে দেখা যায় সকল স্থানেই যদি একই যুগের নিদর্শন হয়, তবে সেই যুগে সেই সকল স্থানের মধ্যে শিল্প টেক্‌নিকের সামঞ্জস্য কিরূপে আসিল? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয় কি? আমার উত্তরগুলির কোথায় ভুল আছে, তাহা দেখাইয়া দিলেও উপকার হইবে। আমি একা মফঃস্বলে পড়িয়া অসহায় অবস্থায় অনুসন্ধান করিতেছি, এ সকল কথা স্মরণ করিয়া ইহার উত্তর দানে সাহায্য করিবেন। আমি à priori ভাবে চলিতেছি কিনা, ইহাতে তাহারও প্রমাণ পাইবেন।

আর একটি আর এক শ্রেণীর প্রশ্ন করিব। *J. R. A. S.*, New Series, vol. VIII. p. 191 "ওঙ্ গ'মুণ্ড গণপতয়ে নমঃ" ইহার "গ'মুণ্ডটি কি? ২০৮ পৃষ্ঠার Resikesah রেসিকেশঃ যে হৃষীকেশঃ তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। ভারতের কোন্ প্রদেশের কোন্ খৃষ্টাব্দে হৃষীকেশের এরূপ বর্ণবিন্যাসের প্রমাণ পাইয়াছেন জানাইবেন। আরও একটা প্রশ্ন আছে। শিবশাসন্ তন্ত্রই বলীদ্বীপের প্রধান তন্ত্র—উহা ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের কোন্ যুগের গ্রন্থ? এ সকল আলোচনা

কোনও গ্রন্থে দেখিয়াছেন কি? দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ কাহাদের উপনিবেশ এই সকল এবং এইরূপ অগণ্য প্রশ্নের মীমাংসার উপরই তাহা নির্ভর করিতেছে। ইহাকে à priori ভাবের আলোচনা বলা যায় কি?

আমার অনুসন্ধান-পদ্ধতির একটু নমুনা দিতে গিয়া আপনাকে কত কথা লিখিতে হইল; পত্রে এ সকল আলোচনা চলে না। ভিন্সেণ্ট স্মিথের ন্যায় যাঁহারা পুরুষ-মূর্ত্তিকে স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া ইতিহাস রচনা করেন, তাঁহাদের সভ্যসমাজে প্রতিষ্ঠা আছে বলিয়াই তাঁহাদের অভিমতকে আমরা বিনা-বিচারে গ্রহণ করি। তাঁহারা দ্বীপপুঞ্জকে [অগৌড়ীয়] ভারতবর্ষের পৃথক প্রদেশের উপনিবেশ বলায়, সেরূপ বলিবার প্রমাণ কি কি, তাহা à priori কিনা, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া, আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে ধরিয়া লইয়া আসিতেছি। দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ যে "অগৌড়ীয়" তাহার প্রমাণ নাই। প্রমাণ যদি আপনার জানা থাকে, আমার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিবেন। এ সকল বিষয়ে আমি অজ্ঞ, সর্ব্বদা উপদেশের ও শিক্ষার প্রার্থনা রাখি। শিল্প-সাদৃশ্য সম্বন্ধে ভিন্সেণ্ট স্মিথ একটি পাদটীকায় একটা কথা লিখিয়াছেন—পশ্চিম-ভারতের গুহার মূর্ত্তির সঙ্গে যবদ্বীপের মূর্ত্তির সাদৃশ্য আছে বলিয়া ফর্গসন্ একটা অভিমত প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রচলিত মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্মিথ বলেন—The differences rather than the resemblances impress my mind. একথা কি সত্য? সত্য হইলে ফর্গসনের সিদ্ধান্ত উল্টাইয়া যায়; মিথ্যা হইলেও জিজ্ঞাস্য,—পশ্চিম-ভারতের যে সকল মূর্ত্তির সঙ্গে মিল আছে, সে সকল কোন্ কোন্ যুগের কোন্ মূর্ত্তি,—তাহা কোন্ শিল্পের নিদর্শন? এ সকল বিষয়ে এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাতে à priori সিদ্ধান্তের আতিশয্য। আমি বরং প্রমাণের অনুসন্ধান করিতেছি—প্রচলিত মতে সংশয় প্রকাশ করিতেছি—সংশয়চ্ছেদের আশায় আপনাদের শরণাপন্ন হইতেছি। ইত্যলম্

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(৪)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
২।৬।১২ ইং—

প্রীতিনমস্কার নিবেদন—

পত্র পাইয়া অনুগৃহীত হইলাম। অতি শীঘ্র এখানে আসিতেছেন জানিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিলাম। সম্প্রতি এখানে আসিবার পথ একটু ক্লেশকর, আর তিন সপ্তাহমধ্যে ষ্টীমার হয়ত সহরের নীচে আসিবে। সেই সময়ে আসিলে কষ্ট হইবে না, এখন আসিতে হইলে বড় পথক্লেশ ঘটিবে। আমি আগামী কল্য হইতে দিন-কয়েক বগুড়ায় থাকিব এবং ৮ জুন হইতে আবার এখানে থাকিব জ্ঞাতার্থে নিবেদন করিলাম।

আপনার প্রশ্নগুলির উত্তর পত্রে লিখা অসম্ভব। কাজেই উত্তর দিয়া সন্তুষ্ট করিতে পারিব না। সাগরিকায় ক্রমশঃ সকল কথাই লিখিতেছি। ভারত-দ্বীপপুঞ্জের উপনিবেশ ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশের উপনিবেশ তাহার অনুসন্ধান-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া যে সকল প্রমাণ পাইয়াছি তাহা লিখিতেছি। তদ্দ্বারা প্রদেশটি স্থির হইবার পর শিল্পেও তাহার কি কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা লিখিব। আর আর সিদ্ধান্ত আপনাকে পূর্ব্বেই জানাইয়াছি। বরেন্দ্রে যাহার উদ্ভব, মগধে ও উৎকলে তাহারই বিকাশ—এ পর্য্যন্ত স্মিথও এবার স্বীকার করিয়াছেন। তাহারই পরিণতি যবদ্বীপে, ইহাই আমার বক্তব্য। এ পর্য্যন্ত যে সকল ছবি বাহির হইয়াছে, দেখিয়াছি। তাহাতে কি কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একে একে দেখাইবার চেষ্টা করিব।

আপনি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিকে একটু অনুযোগ দিয়াছেন। সমিতি অনেকের, আমার একার নয়। যাহা বহু ক্লেশে সংগৃহীত হইতেছে, তাহার প্রথম বিবরণ সমিতি লিখিবেন, এরূপ নিয়ম নূতন নিয়ম নয়। সর্ব্বত্রই এইরূপ। সমিতি যাহা লিখিবেন আপনারা তাহার সমালোচনা করিতে পারিবেন। আর যদি এখনই তৎসম্বন্ধে লিখিতে চান, সমিতির সঙ্গে যোগদান করিয়া লিখুন। ইহা আমার বিবেচনায় অসঙ্গত প্রস্তাব বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, আপনাদের

ন্যায় মনীষিগণের তিরস্কারও আমাদের পক্ষে পুষ্পাঞ্জলি। আমাদের চেষ্টা শিল্প-সৌন্দর্য্য সমালোচনার চেষ্টা নয়, ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলনের চেষ্টা। মূর্ত্তিগুলি যে ভাবসম্পদের বাহ্যস্ফূর্ত্তি, সেই ভাবসম্পদ কোন্ সময়ে কিরূপে বিকাশ লাভ করিয়াছিল, তাহার অনুসন্ধান-চেষ্টাই আমাদিগের প্রধান চেষ্টা।

Iconography সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস নিবন্ধই শেষ নিবন্ধ—সনাতন গোস্বামী উহার টীকা লিখিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন টীকা-সংযুক্ত আর কোনও নিবন্ধ দেখি নাই। আমি এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের জন্য পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। ছাপার পুথিতে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। সনাতনের টীকাটি বড় সারগর্ভ—অধ্যয়নে আনন্দ লাভ করা যায়।

আপনার প্রেরিত ফটো অদ্যও পাইলাম না। বগুড়া যাইতে ব্যস্ত আছি বলিয়া দীর্ঘপত্র লিখিতে পারিলাম না,—ক্ষমা করিবেন।

বরেন্দ্রের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি বৃহৎ বলিয়া নানাস্থানে পড়িয়া আছে, সংগ্রহ করা হয় নাই—যথাস্থানে গিয়া দেখিতে হয়। যাহা এখানে আনা হইয়াছে তাহা অল্প, তাহাতে কেবল type সংগ্রহের চেষ্টাই অধিক। তন্মধ্যে সকল type-এরই কিছু কিছু নমুনা আছে। অলমতি বিস্তরেণ।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(৫)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
১লা কার্ত্তিক

প্রীতিনমস্কার নিবেদনমিদং

আপনার অনুগ্রহ লিপি পাইয়া আনন্দ লাভ করিলাম। আমার কাজের সুবিধা করিয়া দিবার জন্য আপনি গ্রন্থাদি ধার দিলে ও প্রয়োজনমত গ্রন্থাদি হইতে কিছু কিছু সঙ্কলন করিয়া দিলে আমার প্রচুর উপকার হইবে। আপনার নিমন্ত্রণের জন্য ধন্যবাদ। অল্পকাল কলিকাতায় থাকা হইবে। তার মধ্যে নানাস্থানে দেখাশুনা করিব; সুতরাং নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করার জন্য অপরাধ লইবেন না। আমি অবশ্যই দেখা করিব এবং আপনার নিকট পুস্তকাদি ও প্রয়োজনীয় উপদেশ সাদরে গ্রহণ করিব। আমি কোনও ব্যক্তিগত কাজ করিতেছি না,—ইহা সকলেরই কাজ। কিন্তু এ কার্য্যের মর্য্যাদা বুঝিয়া সাহায্য ও উপদেশ দিবার মত লোক অল্প। এরূপ অবস্থায় আপনার মত অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট অবশ্যই উপনীত হইব।

আগামী কল্য পূজার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ নাটোর, দীঘা-পতিয়া প্রভৃতি স্থানে যাইতেছি; সেখান হইতে বিজয়ার পরই কলিকাতায় পৌছিব ও দেখা করিব। একখানা পুস্তিকা পাঠাইয়াছি, বোধ হয় পাইয়াছেন। আমাকে যাহা যাহা দিবেন কলিকাতায় গিয়াই লইব। ডাকে পাঠাইবেন না। অলমতি বিস্তরেণ।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(৬)

ঘোড়ামারা, রাজসাহী
১৭।১১।১৭ ইং

সবিনয় নিবেদন

অনেক দিনের পর আপনার পত্র পাইয়া আনন্দলাভ করিলাম। আমাদের সংগৃহীত দ্রব্যাদির সংখ্যা ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া একটি স্বতন্ত্র মিউজিয়ম-বাটী প্রস্তুত করা হইতেছে। এই কার্য্য শেষ না হইলে আমরা অন্য ব্যয়সাধ্য কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেছি না, গ্রন্থাদি প্রকাশের ইহাই একটি প্রধান বাধা। আমাদের সংগ্রহকার্য্যের সঙ্গে অনুসন্ধানকার্য্য সংযুক্ত থাকায় সংগ্রহ-কার্য্য সর্ব্বদাই চলিতেছে তজ্জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক নূতন মূর্ত্তিও সংগৃহীত হইতেছে। সার জন উড্রফ মহোদয় আপনার গ্রন্থখানা দেখিতে দিয়াছিলেন, তাহার পর গভর্ণমেণ্ট হইতে আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার শরীর এবার বড় ভাল নাই। আশা করি আপনার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। নিবেদনমিতি।

ভবদীয়
শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

কামিখ্যের ঠাকুর

শ্রীঅরবিন্দ দত্ত

নারীহরণের মামলায় কেবলরাম দু'দু'বার কাঠগড়ায় উঠে সত্যপাঠ করেছে, আবার পরক্ষণেই অসত্য ব'লে সত্যকে রম্ভাও দেখিয়েছে। তৃতীয়বারে কিন্তু সে বেতের শীষের ঘন কাঁটায় জড়িয়ে গেল। দীর্ঘ চারিটা বছর আলিপুরের ঘানিগাছে চক্র ফিরে শেষের দিনে জেল-দারোগার বাসায় দু'টি খেয়ে দেয়ে যখন বিদায় নিলে, তখন রাত্রি বেশ জমে উঠেছে।

রাজপথ জনশূন্য। দু'ধারের গ্যাসের আলো তরল স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার সঙ্গে মিশে এক হয়ে গেছে। পোষ্টের ছায়ার আড়ালে পাহারাওয়ালা দাঁড়িয়ে। লাল চোখ দুটি ঘুমের তরে ক্ষুধার্ত্ত। হেঁট মাথায় ঝিমুচ্ছে।

রাস্তাটা মাজাঘষা পিচ-ঢালা। ছাড়া পেয়ে কেবলরাম এক নূতন জগতে ফিরে এল। ঘাড় আর সোজা নেই, কৌতূহলে এঁকে বেঁকে ঘুরে ফিরে চলেছে। এক টুক্‌রা ভাঙা পাথরে সে হোঁচট খেলে। ঝুঁকে পড়ে দেখ্‌লে—পায়ের আঙুল একটা ছিঁড়েছে। যাক্—হাড়-গোড়গুলো ঠিকই আছে। সে চল্‌তে লাগল।

একে মনসা তায় ধুনোর গন্ধ। তার এই খুঁড়িয়ে চলা আর উস্কখুস্ক চেহারা দেখে গ্যাসপোষ্টের আড়াল থেকে এক গালপাট্টাওয়ালা আলোকের দিকে হেলে মাথার লাল পাগড়ীটা সুদর্শন চক্রের মত বিস্তৃত করে ধরলে। গুরু গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করলে, "কোন্ হায়?"

"সাধু হায়।"

"দিনকা সাধু—না, রাতকা?"

কেবলরাম এই পাগড়ীর বিভীষিকার মাঝখানে বাস করছিল। কাজেই মনে কিছু সাহস জমা ছিল। কাছে এসে বল্‌লে, "কেন মহারাজ, পাক্কা চারটা বছর তোমাদেরই সঙ্গে ত সাধুসঙ্গ কিয়া। দেখিয়ে মহারাজ, চুল, দাড়ি, নওখর দেখিয়ে—" সে ঝাঁক্‌ড়া-মাক্‌ড়া চুল-গুলোয় একবার ঝাড়া দিলে।

পাহারাওয়ালা তখন চূণ-দোক্তা বের করে হাতের তালুতে টিপ্‌তে সুরু করেছিল। সেটায় দু'তিনটা থাবা মেরে ঝেড়ে ঠোঁটের ফাঁকে ফেলে জমিয়ে রাখলে। জিজ্ঞাসা করলে, "কাঁহা সাধুসঙ্গ কিয়া?"

"আজ্ঞে শ্বশুরবাড়ী বল্‌লে পেত্যয় অধিক হ'ত—দেহের যে কান্তি খুলেছে। কিন্তু ঘোড়ামার্কা মদ আমি খাইনে। যদি দিব্যি কর্‌তে বল, চলিয়ে ওই কালীবাড়ীমে।"

পাহারাওয়ালা চোখ রাঙিয়ে বল্‌লে, "কাঁহা থে, ঠিক কহিয়ে।"

কেবলরাম হাতজোড় করে বল্‌লে, "আজ্ঞে, ওই যে লাল রঙের পাঁচিলটা আকাশে গিয়ে ঠেকেছে, ঐটেয়। কি আদর-যত্নের ঘটা! লাউ-কুম্‌ড়োর ডাঁটা কভি খায়া হ্যায়?"

"কেন, কোবি, বিট, গাজর এসব নেহি খায়া?"

"ও সব খেলে যে পাজর বাড়ে! ময়রায় বুঝি সন্দেশ খায়? হামারা হাতকা তৈরী হ্যায়, মহারাজ।"

পাহারাওয়ালা দাড়িটায় অঙ্গুলি চালনা ক'রে জিজ্ঞাসা করলে, "আজ তুমারা ছুটি মিলা?"

"আজ্ঞে, হাঁ। মামাটি ডেকে বল্‌লে,—যা, তোর শিংয়ের দড়ি খোলা পড়ল। জলে, স্থলে, মরুৎ ব্যোমে যথেচ্ছ চরে বেড়া গে। শুধু পরকা পাচিল মাথ ডাকো।"

পাহারাওয়ালা জিজ্ঞাসা করলে, "নেংড়াতে কেঁও হো?"

"আজ্ঞে অনেককাল পরে গ্যাসের আলোটা চোখে লেগে সইছে না। পাথরে লেগে আঙুলটা ছিঁড়ে গেল, এই দেখ। খোঁড়াই কি সাধে, মহারাজ?"

পাহারাওয়ালা তার হাত চেপে ধর্‌লে। বল্‌লে, "তুম্ বড়ে বেকুব, আউর বদমাস্ হো।"

কেবল বল্‌লে, "এটা কিন্তু তোমাদের ছাইগোষ্ঠীর

অনুরূপ কথাই হ'ল। এমনি ত যেতে দাও না! অত বড় পাঁচিলটার ভিতরে কি বস্তু আছে না দেখ্‌লে যে প্রাণ ছুক্‌ছাক করতা হ্যায়।"

পাহারাওয়ালা তার হাতের পাঞ্জাটায় একটু চাপ দিলে। কেবলরাম ব্যথায় 'উঃ! হু' করে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "কসুর মাপ কর জী! পিঠ্‌টায় বেত চালিয়ে মিহিদানা বেঁধে দিয়েছ, হাতটায় আর কেন, বাবা! হাত যানেসে কসরৎ ক্যায়সে দেখায়গা?"

পাহারাওয়ালা হাস্‌লে।

কেবলরাম বল্‌লে, "মাপ কর মহারাজ! খাঁচার দরজাটা যদি বা খোলা পেলাম, রাস্তাঘাটে শিং উঁচিয়ে আছ, পথ চলি কি করে? রেহাই দাও, ভাই! তোমাদের রূপার কথা ভুলব না। ঘর যা'কে ভাই বন্‌ধ খেলায়কে সুদ আসল আদা কর্‌ দেগা।"

পাহারাওয়ালা চুপ করে রইল।

কেবলরাম বল্‌লে, "আবি:হাম যাঁয়ে?"

"আচ্ছা! মন ঠিক রাখ্‌না!"

কেবলের তখন পায়ের আঙুল দিয়ে রক্ত ঝর্‌ছে, আর ব্যথায় টস্‌ টস্‌ কর্‌ছে। কিছু দূর এগিয়ে উঠ্‌তে সে দেখ্‌লে, একটা বটগাছের তলায় ধুনী জ্বলছে। ছেঁড়া আঙুলটায় একটু ছাই ঠেসে দেবার মতলবে সে সেখানে গিয়ে দেখলে, এক লম্বোদর সন্ন্যাসী—বোধ করি নাগা—হিষ্টিরিয়ার রোগীর মত হাত পা খিঁচিয়ে মাটির উপর গড়াগড়ি যাচ্ছে।

কেবলের একমাথা রুক্ষচুল, আর গা দিয়ে খড়ি উড়ছে দেখে ঘনিষ্ঠতায় সন্ন্যাসীর স্নেহরস বেগবতী হয়ে উঠ্‌ল। তিনি ইঙ্গিতে তাকে কাছে ডেকে বসালেন। স্মিতহাস্যে বল্‌লেন, "জয় সীতারাম! রামকে ছাড়তে চাই—রাম ছাড়ে না। মহাপ্রভুর প্রেম দেখ। তোমার মত একটি কল্যাণবস্তুকে কাছে পেতে সীতারামকে প্রার্থনা জানাচ্ছিলাম।"

কেবলরাম আড়চোখে তাকিয়ে বল্‌লে, "কেন, বঁড়শী গেলাতে?"

সন্ন্যাসী হেসে বল্‌লেন, "সে রকমের চার নেই ঝুলিতে, বাবুজী!"

কেবলরাম আঙুলটায় ছাই ঠেসে দিচ্ছে, এমন সময় সন্ন্যাসী তার দিকে চেয়ে আবার মৃদুহাস্য কর্‌লেন। বল্‌লেন, "ভুঁড়িটা—মৃদঙ্গ। দুপুরের আহারটাও পরিপাক হয়নি। এক টিপ সাজো। দুধ আছে, কলা আছে, খাও। পরে তেলেজলে পেটটা একবার মর্দ্দন করে দাও।"

কেবলরাম ভ্রূ-কুঞ্চিত করে বল্‌লে, "সর্ষে মর্দ্দন করেই ত সবে বের হচ্ছি। পথে পা না দিতেই ভুঁড়ি মর্দ্দন? মর্দ্দনযোগই কায়েম হ'ল তা' হলে?"

"সর্ষে কোথায় মাড়ালে?"

"আজ্ঞে, এই ভবসিন্ধুর কাছাকাছি।"

"কেমন?"

"আজ্ঞে, ভবঘুরে লোক আপনারা, ঘানিগাছটাও দেখেন নি? নাগরদোলায় চড়েছেন ত? ঐ রকমের ঘুরপাক আর কি! কলির রাজ্য—মানুষ হ'ল বলদ। চোখ দিয়ে ফুল কেটেছে, আর ভেবেছি ভবসিন্ধু বুঝি কাছে।"

সন্ন্যাসী হাস্য কর্‌লেন। বল্‌লেন, "দেহে দেখি মেদমাংস নেই। নির্ব্যূঢ় স্কন্ধেই এই মর্দ্দনের কাজ করেছ?"

"এখানে কিন্তু দুধ আছে—কলা আছে।"

"হাঁ, ও দ্রব্যটায় লোভও আছে। অনেককাল খাইনি। কথাটা এই,—এখানেও যে সেই সর্ষে?"

"সর্ষে নয়—সর্ষের ক্বাথ। আম আর আচার এক জিনিষ নয়। তেলেজলে মালিস কর্‌লে পেটটা ঠাণ্ডা হবে।"

তিনি পুনর্ব্বার হাস্য কর্‌লেন।

সন্ন্যাসীর নাম যমুনাগিরি। সত্য সত্যই একজন শ্রেষ্ঠ সাধক। কেবলের ভাগ্যসূত্র তখন অপর রাস্তা ধরে চল্‌ছিল। সে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "কল্‌কের আগুনটা?"

" ছাই পড়ে যাচ্ছে? দাও, শুয়ে পড়েই টানি?

কেবলরাম ক্ষুধার্ত্ত ছিল। কলিকাটা সাধুর হাতে দিয়া, ঘন আঠা দুধের মধ্যে গোটা-আষ্টেক কলা চট্‌কিয়ে হাপুস্‌ হুপুস্‌ করে খেয়ে বাটিটা সে চাট্‌তে লাগ্‌ল। সন্ন্যাসীর তখনও দম চল্‌ছে। শিয়রের কাছে চারপয়সা

দামের একখানা টিনের আয়না মাটিতে পড়েছিল। সেখানা হাতে তুলে নিয়ে চেহারাটা বহুকাল পরে একবার সে দেখে নিলে। সন্ন্যাসীর দিকে তাকিয়ে মুচ্‌কি হাসলে। মনে মনে বললে, "রতনে রতন চিনে।"

সন্ন্যাসী কেবলের হাতে কলিকাটি দিলেন। সে ভরাপেটে আমেজ করে বসে বসে টান্‌তে লাগ্‌ল। ভাব্‌তে লাগল,—জট পাকিয়ে ঘট হয়ে বসে নিষ্কলুষ বামাচার সাধনা—বিবেচক বটে! দুধ, ঘি, আটা, চিনি, কলা, করুণা—উপরি পাওনার অভাব নেই। তারপর বামহাতে নিজের চুলগুলো টেনে টেনে দেখে ভাবলে,—চুলটা লম্বাই আছে, ঘোঁট বেঁধে নাকের ডগায় নজর রাখ্‌তে পারলেই পাকা কচ্ছপ। খোলার ভিতর শুঁড় গুঁজে জোচ্চুরি চোখে মক্কেল খোঁজা—মন্দ কি?

সে আর নড়্‌ল না। যমুনাগিরির কাছে চেলাগিরি কর্‌তে রয়ে গেল।

২

কেবলরামের বুদ্ধির ঘটে চেতনা ত নেই—আছে ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াটাকেই আঁক্‌ড়ে ধরে সে ঘনীভূত কর্‌তে চায়। যমুনাগিরির সঙ্গে থেকে দুধ, ঘি, আটা, কলা আর মিষ্টান্নের সহযোগে দেহখানা সে বেশ জুতসই করে তুল্‌লে এবং সাধু সাজ্‌বার খুঁটিনাটি মারপ্যাচ—মায় তাবিজ, মাদুলী, সিঁদুর পড়া—সমস্তই সে আয়ত্ত করে নিলে। তখন আর এ ভুঁড়িমর্দ্দনের কাজ একান্ত আপত্তিকর, অপমানজনকও বটে! একদিন মধ্যরাত্রে নাসিকাধ্বনির অবসরে সাধুকে অঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে সে সুদূর পূর্ব্বাঞ্চলে কামিখ্যায় চলে এল।

কেবলের গায়ে কুসুম রংয়ের খদ্দরের আলখাল্লা। পরণে গৈরিক বস্ত্র। অঙ্গে বিভূতি। ওষ্ঠে মৃদুহাসি। বাহিরে বিনয়—অন্তরে প্রণয়। চোখে আধঘুম,—জুতার শব্দে বোঁজে—চুড়ির ঠুং ঠাংএ খোলে। গাছতলায় দিবারাত্র ধূনী জ্বলে। সে ভাং খায়—তুলসীদাস পড়ে—সিদ্ধ হতে বাকী কি?

তা' হলেও ক্ষিধে তেষ্টায় প্রথম প্রথম দিনকতক চোখে তার তারা কেটেছে। এক এক সময় মনে এসেছে,—ধূনীর আগুন সে নিবিয়ে দেয়—আলখাল্লার বোতাম ছিঁড়ে ফেলে। এই সময় ব্রহ্মপুত্রের স্নান উপলক্ষে আস্তে আস্তে অনেকগুলি লোটা চিম্‌টাধারী এসে তাকে ঘিরে বস্‌ল। বেশ মিশ খেলে—কেবলের রীতি প্রকৃতির সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক। অতগুলো বয়োবৃদ্ধ জটাজুটোর মাঝখানে তরুণ সন্ন্যাসীটির আসন দেখে, দেশের লোকের চোখে তাক্‌ লেগে গেল। মাথা গেল গুলিয়ে। ছেলের অসুখে ডাক্তার কবিরাজ কেহ ডাকে না—বাবার বিভূতি নিতে ছুটে আসে। শান্তি স্বস্ত্যয়ন কেহ করে না—বাবার পদরেণু পাবার জন্য সাষ্টাঙ্গ হয়ে ভূমি চুম্বন করে। পসার বেশ জমে উঠ্‌ল। ক্রমে জনৈক ধনাঢ্য লোকের কৃপায় একটা পাকাবাড়ীতে সে আশ্রম ফেঁদে বস্‌ল। সকলে এখন তাকে 'ঠাকুর বাবা' বলে সম্বোধন করে।

সকাল সন্ধ্যা দু'বার বাবার দেহ লয়ে চেলা চামুণ্ডারা ময়দা ঠাসে। বেলা আটটা অবধি শৌচাচার, আসনযোগ, কুলকুণ্ডলিনী শক্তির চেতনা সঞ্চার। পরে বৈরাগ্যযোগ,—কামিনীকাঞ্চনে স্পৃহাহীনতা, ঠাকুরের কৃপার জন্য বিপন্নগণের আনীত তুচ্ছ ঘৃত দুগ্ধ ও ফলমূলের প্রতি আড়নেত্র। তারপর উদর এবং বিশ্রামযোগের পর বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত গীতা, তুলসীদাস ও চণ্ডীপাঠ, খোল করতাল সহ নাম সঙ্কীর্ত্তন। বাবা এ সময় ভাববিভোর হয়ে পড়েন। সময় সময় চৈতন্য থাকে না। পরে আবার আসনযোগ,—দেশের আপদ বিপদ আধি-ব্যাধির কল্যাণ ভিক্ষা। অন্তিমে শান্তিপর্ব্ব। এই সময় ঠাকুরবাবা নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করেন। এদিকে উৎকণ্ঠায় বাহিরে সোরগোল পড়ে যায়, না জানি কাকে কাছে ডেকে ঠাকুরবাবা অনুগ্রহ বিতরণ কর্‌বেন। চেলারা টহল ফেরে, তল্পিতল্পার আঘ্রাণ নিয়ে দেখে কাকে বাবার কাছে এগিয়ে তোলা যায়। নেড়া মাথা অনেকেরই—ধন্না দেওয়া সার হয় অনেকের। পনের দিনে হয়ত একটি লোক নির্জ্জন কক্ষে বাবার সঙ্গে সাক্ষাতের অধিকারী হয়। অপর সকলে নিজ নিজ অদৃষ্টের উপরই দোষারোপ করে। বাবার প্রতি অনুযোগ থাকে না। এইরূপে

কেবলরাম যে একজন সিদ্ধপুরুষ এ বিষয়ে কারও মতভেদ ছিল না।

এখানকার ফেরৎ ঝণ্টুর মা একদিন বিরাজ ঘোষের স্ত্রী কেতকীকে এসে বল্‌লে, "মা, এই অসুখে ভুগ্‌ছ, একবার কামিখ্যের ঠাকুরের কাছে যাও। বল্‌লে পেত্যয় যাবে না,—আমার ঝণ্টুর কি আর বাঁচার পিত্যেশ ছিল? যা খায়, পেটে পড়লেই গড়্ গড়্—গড়্ গড়্—ঢেঁকুর আর ঢেঁকুর। একবিন্দু ভস্মিতে ত সব জল হয়ে গেল।"

কেতকীরও এই ঢেঁকুরের রোগ। যা খায়, অম্ল হয়; হজম হয় না।

ঝণ্টুর মা বল্‌লে, "সবাই কি আর তাঁর কৃপা পায়, মা? কত লোকে হা-পিত্যেশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে। পয়সাকড়ির ত অভাব নেই, একবার ঘুরে এস।"

এইরূপে কেতকীর প্রাণে বেশ একটু ক্ষুধা বাড়িয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

বিরাজ বাজার করে ঘরে ফির্‌লে। বল্‌লে, "কুমড়োর ফরমাস ছিল, বলে কিনা—আটগণ্ডা পয়সা। পুঁজি ত সবে একটি টাকা। অৰ্দ্ধেক যদি তোর গেঁজেয় গেল, বাড়ীর লোকের আর নিরনব্বইটা আইটেম ঠেকাই কি দিয়ে? এনেছি গলা সরু, পেট্‌টায় একটা ফ্যাক্‌ড়া—যেন ম্যালেরিয়ার পিলে। তা' তরকারীতে বলন দেবে। তিন পয়সা সেলামী। ছোঁড়া হাবাগোবা তাই রক্ষে।"

স্বামীর হাতের মাছের খারাটায় নজর পড়্‌তে কেতকী রেগে উঠ্‌ল। বল্‌লে, "আজ আবার চিংড়িমাছ এনেছ? ও ঘুষোচিংড়ি খেতে লোকের মুখে কতকাল রোচে? ছেলেরাও খেতে চায় না।"

বিরাজ হাতের বোঝাটা মাটির উপর ধপাস্ করে ফেলে রেখে রুক্ষস্বরে জবাব দিলে, "না চায়, এনে নিয়ে খেতে পারে? দর করলাম ত রুইমাছ। বলে,—পাঁচসিকে সের। বল্‌লাম,—পয়সাটা আমরাও কপাল ঘামিয়ে আনি। এই দশগণ্ডা পয়সা নে, বরফ দিয়ে মাছের জেতের কি আর ইজ্জত্ রেখেছিস্? বেটী দাঁত খিঁচিয়ে এল, যেন ক্ষ্যাপা কুকুর। যেই পিছন ফিরেছি অমনি বল্‌লে,—'মিন্‌সে বাবার কালে কখনও মাছ চোখে দেখেছে? ও আবার মাছ কিনে খায়!"

একটু দম নিয়ে বিরাজ বল্‌লে, "নগদা টাকার মাছ কিনে সুখ দেখ। ঘরে এনে কড়ায় ছাড়লে ঘণ্ট, তেলের কড়ি গেল উড়ে, পেটে পড়্‌লে বদ্দির কড়ি গেল বেড়ে, তার ওপর ছোট জেতের মুখের এই চৌদ্দপুরুষ। বাবার কালটা আমিই দেখিনি, আর ও-মাগী কি না মেছোহাটায় বসে দেখে ফেল্‌লে। বাজারে কি মানুষ আসে তুমি ভাবো? সব হাঙ্গর—কুমীর—কর্কট।"

কেতকী জবুস্থবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভাব্‌লে, মাছে দরকার নেই, এখন থাম্‌লে বাঁচি।

বিরাজ আবার সুরু করলে। বল্‌লে, "চিংড়ীমাছটাও মুফোতের জিনিষ নয়। পয়সায় গণ্ডা দিক্ আর এণ্ডাই দিক্, কিন্‌তে সুবিধে আছে। মার্কামারা দু'পয়সার ভাগা। চারটে ভাগা তুলে নিয়ে—আটটি পয়সা তক্তাখানার উপর বাজিয়ে রেখে চলে এলাম—ঝঞ্ঝাট নেই। নিজেও বাঁচলাম, বাপ-ঠাকুরদাও বেঁচে গেল।"

কেতকী নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিরাজ বল্‌লে, "তুমি যে একেবারে কাঠ হয়ে গেলে? বেটা পাঞ্জাবী মোটর ভোঁ ভোঁ করে রাস্তার সমস্ত জল কাদা ছড়িয়ে দিলে জামাটায়, সেদিকে তোমার দৃষ্টি নেই। এক্ষুণি আবার গিয়ে চার পয়সার একখানা সাবান—এই সব দম্‌কা খরচ। তা তোমারও যে সুবিধে। এর আর ল্যাজামুড়ো বাছাবাছি নেই। ছেলেদের চেঁচামিচি নেই। রাঁধ্‌তেও সুবিধে। লঙ্কা কেটে সাঁত্‌লে দাও—তোফা!"

বিরাজের একটি ছেলে সেখানে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, "বাবা, বেগুন কি মোটে দুটো এনেছ? বেশ বড় বড় ত, একসের?"

"হ্যাঁ।"

"আমিও সেদিন একসের এনেছিলাম। সে কিন্তু ছ'টা।"

বিরাজ মুখ ভেঙ্‌চিয়ে বল্‌লে, "আরে গাধা! সেই সঙ্গে বোঁটাও আন্‌লি ছ'টা! তার বুঝি ওজন নেই?"

কেতকী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে সেইখানে মাছগুলি ঢেলে দু'হাতে খোসা ছাড়াতে বসে গেল।

কেতকী এই যে রোগে ভুগ্‌ছিল তবুও দেহের অসামান্য রূপ তার ঢাকা পড়েনি। উদাসীন শান্তশিষ্ট সদাশিবের মত নির্লিপ্ত সে রূপ। আকর্ষণও আনে—শ্রদ্ধাও জন্মায়। বিরাজ এক কল্‌কে তামাক সেজে দেহের ক্লান্তি দূর করার জন্যে স্যাঁতস্যেঁতে মেঝেটার উপর প্রায় কেতকীর ভূলুণ্ঠিত অঞ্চলটার গা ঘেঁষে উপবেশন কর্‌লে।

কেতকী যেন বিনা আয়াসে অনেকখানি আদর কেড়ে নিতে পার্‌লে। বাজারের খুঁটিনাটি ভুলে গিয়ে মিষ্টস্বরে সে বল্‌লে, "অম্বলের ব্যারামটা কি আমার পুষে রাখবে ?"

বিরাজ হুঁকাটা একবার জোরে টেনে নিয়ে বল্‌লে, "পোষ মানাচ্ছ ত তুমি। একটু নড়াচড়া কর দিকিনি, দেখি, অম্বল কেমন কম্বল পেতে বসে যায় ?"

কেতকী হাসিমুখে কটাক্ষ হেনে বল্‌লে, "নড়াচড়া করিনে বুঝি ? ঠাকুর চাকরের ছড়াছড়ি করে রেখেছ কি না ?"

বিরাজ বল্‌লে, "ওই ত একটা পরের মেয়ে এনে ঘোরাচ্ছ। সেও বা দুটো ভাতের জন্যে দাসী বাঁদীর মত খেটেখুটে অকারণ এ ভালবাসার টান্‌ দেখাতে যায় কেন ?"

কেতকী কিছুদিন থেকে তার এক বিধবা নিরাশ্রয়া ভগ্নীকে এনে কাছে রেখেছিল। এবার মুখখানা ঘোলাটে করে সে জবাব দিলে, "বল্‌তে গেলে তোমার কথার মধ্যে ত খেই পাওয়া যায় না। আমার কাজের আসান করতে আমি ওকে আনিনি। ওর কি দাঁড়াবার ঠাঁই আছে কোথাও ? পয়সাটাই কেবল চিনেছ তুমি !"

বিরাজ একমুখ ধূম হাওয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। নিষ্ফলতায় কতকটা দমে গিয়ে লঘুস্বরে সে বল্‌লে, "নেহাৎ গালির মত করে কথাটা বল্‌লে। পয়সা চেনা ভাল কেতকী ! যে তিনটি রত্ন তুমি ভূমিষ্ঠ করেছ, ওরা তোমার ভাত কাপড় জোগাবে কি ?"

কেতকী বিষণ্নমুখে জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "ওরা আবার কি দোষ করলে ?"

বিরাজ কানের পাশের চুলগুলো চুলকিয়ে নিয়ে বল্‌লে, "তুমি ওদের মা, শুনতে তোমার টকই লাগবে। আমিও জন্মদাতা, অকারণ ওদের নিন্দুক হতে পারিনে। মুস্কিল যে, বিরাজের চোখে কিছুই এড়িয়ে যায় না। তোমার জ্যেষ্ঠপুত্রটি ইউক্লিডের পাতা খুলে সমবাহু বিষমবাহু আবৃত্তি করে যান্—নীচে নকুল চৌধুরীর বটতলার 'প্রণয়ের হাট' উঁকি মারে। কচি ছেলে—এখন কি হাট-ঘাট বসানর বয়েস ওর ? মধ্যমটি সকাল-সন্ধ্যে ছাদের উপর মুগুর নিয়ে ক্ষেপে ওঠে। ভূমিকম্পটা তোমার গায়ে লাগে না বুঝি ? আমি ত ভাবি বাড়ীটায় বুঝি অসুর আশ্রয় করেছে। বাপ-ঠাকুর্দ্দার একটু-খানি স্মৃতি ও-ই ইষ্টকস্তূপ করে ছাড়বে।"

সন্তানের প্রতি এই মর্ম্মভেদী বাক্যবাণে কেতকীর অন্তর ক্রন্দনোন্মুখ হয়ে উঠল, বিরক্তির সঙ্গে সে বল্‌লে, "মুগুর ভেঁজে বাড়ীটা ফেলে দেবে ও ?"

"না দিক্, পথেঘাটে ঘুষি বাগাতে ত বাধা নেই ? শেষটা পুলিশ কেস—ঢালো টাকা—খোঁজো মহাজন··· এই ত ?"

কেতকীর আড়ষ্ট ওষ্ঠ দু'খানা কাঁপছিল। অগ্নিময় চক্ষুদুটি সম্ভবমত স্নিগ্ধ করে সে জিজ্ঞাসা করলে, "তিনটি রত্নের দুটির খবর ত দিলে। আর একটি ?

বিরাজ বল্‌লে, "তোমার ঐ কোলের ছেলেটি ? যে লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি করে—হাড় ত একখানা ভাঙলো। ডাক্তারের ফি ত ফ্রি নেই। আর গিয়ে এখনকার এই আধুনিক চিকিৎসে···লাঠির জায়গায় সড়কী। বেটারা যাকে বাগে পায়···ভাবে টাকার আণ্ডিল। শেষটা আমারই বুকে ভল্ল। এই বয়সে মায়ের কোলে চড়ার তেষ্টা কমে গেল, মিষ্টিমুখে কোলের মধ্যে চেপেচুপে ঠেসে ধরে রাখতে পার না ?"

কেতকী ঠোক্কর মেরে বল্‌লে, "যে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে ওকে—ওষুধের বালাই নেই, লাফালাফি না কর্‌লেও বা রোগ তাড়ায় কি করে ?"

বিরাজ বল্‌লে, "মাত্রাজ্ঞান ত থাকা চাই। পোষ্টাপিসের

কুইনাইন দু'বড়ী এনে খাওয়ালে পার! ওষুধের রাজা! হ্যাণ্ডবিল দেখেছ?"

কেতকী দেখলে এ আসরে কামিখ্যের পালা আর জমে না। ঝণ্টুর মা নেশাও ত বড় কম ধরিয়ে দিয়ে যায় নি। সেই ঝোঁকে সে প্রশ্ন করলে,—আমার অম্বলের কথাটা—

বিরাজ হেসে বল্‌লে, "ছাদে উঠে দিনকতক ডাম্বেল ভাঁজ না!"

কেতকী ভাবলে পরিহাস। পুনশ্চ বল্‌লে, "কামিখ্যেয় শুনেছি একজন ভাল সাধু আছে। ঝণ্টুর এই অম্বলের ব্যারাম, তাঁর ওষুধে ত সেরে গেল।"

"কামিখ্যে—ক্ষেপেছ তুমি?"

চোখদুটো কপালে তুলে দুই কর্ণে সে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে দিলে।

কেতকী বল্‌লে, "চম্‌কে গেলে যে!"

"শুধু আমি চম্‌কাইনি—পেটের পিলে পর্য্যন্ত। আক্কেল গুড়ুমের দেশ, বাবা! শেষে লোকে বলুক,—বিরাজ একটা আহাম্মক—আর মুখ টিপে হাসুক!"

কেতকী হেসে বল্‌লে, "কেন, কাছাকোঁচা নেই নাকি তোমার?"

"সেটা ত আছেই। না থাক্‌লে তোমার বাবাই বা জামাই বলে স্বীকার করবেন কেন? এক একটা দম্‌কা হাওয়া এক এক সময় এমন আসে, কাছা ত কাছা—কোঁচা ত কোঁচা—মানুষ পর্য্যন্ত উড়ে যায়। বুড়ো বয়সে আর ডিগবাজী না খেলালে?"

কেতকী তখনকার মত চুপ করে গেল।

৩

বিরাজ বাক্‌লে কি হয়—কেতকী আর অধিক রাগলেও না, গোঁ ধর্‌লেও না, চুপচাপ শয্যা নিলে। বিরাজ দেখলে, মা মঙ্গলচণ্ডী পাঁচ পয়সার সিন্নিতে আর তুষ্ট হলেন না, দম্‌কা খরচ একটা লাগবেই। কামিখ্যাটা একবার ঘুরিয়ে না আনলে, এঁকে শয্যার উপর আর চাঙ্গা করে তোলা যাবে না। তখন কেতকীর বোনের কাছে ছেলে তিনটির ভার দিয়ে সে সস্ত্রীক সেই আক্কেল-গুড়ুমের দেশে চলে এল। এসে দেখলে, ঝণ্টুর মা বড় মিথ্যা বলেনি। সাধুর আশ্রমটি লোকে লোকারণ্য। ভূমে লুটিয়ে কাতারে কাতারে লোক পড়ে রয়েছে। কেহ সাত দিন—কেহ পনর দিন—কেহ বা মাসের উপর। সাধুর কৃপা মিল্‌ছে না। বিরাজের অন্তরে কিছু শ্রদ্ধার সঞ্চার হ'ল।

সে সস্ত্রীক নাটমণ্ডপে শুয়ে আছে। রাত্রি গভীর, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুনলে, ঠাকুরবাবার একটি চেলা এসে তারই অল্পদূরে শায়িত মথুরবাবুকে বল্‌ছে, "বাড়ীর পূজোপার্ব্বণে তোমার দৃষ্টি নেই। ছেলের অন্নপ্রাশনে বেশ ঘোরঘটা আছে। তোমার চিনির নৈবিদ্দি জগন্মাতা গিল্‌তে পারে না। বাবা তাঁরই উপাসক। মায়ের কৃপা না হ'লে, বাবা কি করতে পারেন?"

মথুরবাবু বল্‌লেন, "দেবতা ত অল্পেতে তুষ্ট সাধুজী?"

"তা তুষ্ট। ঝোঁক্‌টা ত অল্প হ'লে হয় না। দেবতার পিছু ব্যয় তুমি অপব্যয় বলে মনে কর। আধি-ব্যাধির আর দোষ কি? তোমার ভোগকাল এখনও গত হয়নি যা। দায়ে পড়ে মায়ের উপর যেমন লোভ বাড়াও, বেদায়ে সেইরকম শ্রদ্ধা করতে শেখো,—তারপর এস। বাবা এই কথা বলে দিলেন।"

মথুরবাবু নিঃশ্বাস ছাড়্‌লেন। স্ত্রীটি অশ্রু মার্জ্জনা করতে লাগ্‌লেন।

মনের ভিতর কোথায় কি ঘটে গেছে, নিজের কাছে ওজন করে পরিমাণ করাও শক্ত। তাতে আবার এই অবলার মন। মথুরবাবু বল্‌তে লাগ্‌লেন, "অন্তর্দ্দর্শী সিদ্ধপুরুষ। ওঁর অগোচর কিছুই নেই। মনের খবরটি পর্য্যন্ত টেনে বের করেছেন। সত্যি ত ঠাকুর-দেবতার পূজো বাইরের ঘরে ঘণ্টা বাজিয়ে পুরোহিতে কি করছেন না করছেন—ফিরেও দেখিনে। অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে জনে জনে ডেকে জিজ্ঞাসা করি,—তৃপ্ত হলেন কিনা? চেলাটি যা বলে গেলেন ওর আর ব্যত্যয় হবে না। চল, কৃপা পাবার মত যদি হতে পারি, তখন আসব।"

এই বলে আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে রেখে তাঁরা স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

বিরাজ স্ত্রীকে ডেকে বল্‌লে, "শুন্‌লে? না জানি তোমার ঘাড়ে আবার কি অস্ত্র রয়েছে। গোস্ত খরচ—খাই খোরাকী—রাত জাগুনি—আঃ! একেবারে জ্যান্তে মেরেছ? যে রকম গতিক, কতকগুলো টাকার শ্রাদ্ধ করে, তোমার পেটের অম্বল সম্বল করে ঘরে ফির্‌তে হবে।"

কেতকী এ-কথার আর জবাব দিলে না। ঘাড় হেঁট করে বসে রইল।

তিনদিন পরে বিরাজের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হ'ল। ঠাকুর-বাবার প্রধান শিষ্যটি এসে প্রশ্ন কর্‌লে—সেই একই প্রশ্ন,—দেবতার ভোগ কত'র দাও, ছেলের অন্নপ্রাশনে বা কি খরচ কর? অবশ্য প্রশ্নটি কিছু রকমফের করে করা হ'ল।

বিরাজ বল্‌লে, "দেবতার ভোগ সওয়া আনার বেশী কোনদিন দিতে পারিনি। আর অন্নপ্রাশন—ইষ্টদেবের একটু কৃপাদৃষ্টি আছে গরীবের উপর। তাই তাঁর প্রসাদ নিয়ে ছেলেমেয়েগুলোর গালে ভাত দিয়েছি।"

বিরাজ ও তার স্ত্রীকে ভালমত পর্য্যবেক্ষণ করে চেলাটি চলে গেল।

বাবা বড়লোক সেই দেমাকে না হোক্, লোকের চোখে স্বামীর কোপন-স্বভাব কতকটা ঢাকা দেবার জন্য বাবার প্রদত্ত অলঙ্কারগুলি কেতকী কখনও গা থেকে খুল্‌ত না। এবার এ সমস্ত ঘাড়ে চেপে আস্‌তে বিরাজ অনেক আপত্তি জানিয়েছিল। কেতকী বলেছিল, "তোমার এঁদো ঘরে দরজা এঁটে—গায়ে দিয়ে বসে থাক্‌তে অথবা সিন্দুকে ঢাকা দিয়ে রাখতে ত বাবা এ সকল দেননি? যায়—যাবে; তখন আর পর্‌বার বালাই থাকবে না।"

এদিকে কিছুক্ষণ পরে চেলাটি আবার ফিরে এল। বল্‌লে, "মাকে তলব করেছেন, ঠাকুরবাবা।"

বিরাজ জিজ্ঞাসা কর্‌লে, "অর্দ্ধাঙ্গ ছেড়ে? না, আমারও যাবার অনুমতি আছে?"

চেলাটি বল্‌লে, "উনি একলাই যাবেন। সঙ্গে আর কারও থাকার নিয়ম নেই। গোলযোগ বাড়ে, বাবা মনস্থির কর্‌তে পারেন না।"

বিস্ময়ে বিরাজের চক্ষু দুইটি ঠিক্‌রে পড়ল। বল্‌লে, "রাত্রি যে অত্যন্ত গভীর সাধুজী। উনি গিয়ে আমার ঘরের পর্দ্দা—অম্বল সারাতে শেষটা আমাকে আবার হাঁপানিতে ধর্‌বে?"

চেলাটি কুপিত হয়ে বল্‌লে, "বাবার উপর ভা হ'লে বিশ্বাস নেই আপনাদের?"

বিরাজ আম্‌তা আম্‌তা করে বল্‌লে, "না—না, তা অবিশ্বাসই বা কি? শুধু নাভিশ্বাসের ভয় করি। সেটা যেন তোমাদের এই নাটমণ্ডপে ঘটে না ওঠে।"

চেলাটি এবার রোষ প্রকাশ করে কিছু উগ্রকণ্ঠে বল্‌লে, "পেয়েও হাতছাড়া কর্‌লেন আপনারা? দুর্য্যোগ এখনও কাটেনি। আপনারা আর এখানে বৃথা ভিড় জমিয়ে অপর লোকের অসুবিধা ঘটাবেন না।"

কেতকী চেলাটির পা জড়িয়ে ধর্‌লে। বল্‌লে, "আপনি ক্ষমা করুন সাধুজী!" স্বামীকে বল্‌লে, "তুমি কি পাগল হলে নাকি? এই সব দেবতা-লোকের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে?"

বিরাজ বল্‌লে, "পাকক্রিয়ার একটু দোষ ঘটেছে ওঁর, বাবা যদি তুক্‌তাক্ জানেন, এইখানেই একটু মেহেরবাণী করতে বল না। আমি ওঁর স্বামী—দেবতা। ঝক্কিঝাটি যে আমার অনেক।"

কেতকী বল্‌লে, "তোমার পায়ে ধরি আর তর্ক তুলো না। এই পয়সাকড়ি ব্যয় করে এসে সমস্তই যে ফাঁসিয়ে দিলে তুমি।"

বিরাজ দেখ্‌লে, কথাটাও সত্যি। বল্‌লে, "ঝণ্টুর মা তোমার গলায় ফাঁসি পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ও আর আমি ফাঁসিয়ে দিতে চাইনে। আচ্ছা! যাও। হাস্‌তে হাসতে ফিরো যেন?"

কেতকী বাবার সকাশে নীত হ'ল। বিরাজ উৎকণ্ঠিতচিত্তে নাটমণ্ডপে বসে রইল।

৪

কেবলরামের সম্বন্ধে কিছুদিন থেকে কানাঘুষা চল্‌ছিল। সে নাকি নিশীথ রাত্রে মেয়েদের একাকী বাগানে নিয়ে যায়। নৌকায় নদীর উপর নিয়ে গিয়ে হাওয়া

খায়। এই সব। জনরবটি বহুবিস্তৃত না হওয়ায় নূতন আগন্তুকদের কাছে গোপনই ছিল। কিন্তু কেবলরাম বুঝেছিল এখানে আর অধিকক্ষণ বসে অশুভনাশের প্রলোভনে লোককে বাতিকগ্রস্ত করা নিরাপদ হবে না। সে জাল গুটাবার সমস্ত বিধিব্যবস্থাই ইতিপূর্ব্বে করে রেখেছিল। যাবার বেলায় মোটা রকমের একটা শিকার সে খুঁজছিল।

নির্জ্জন কক্ষে প্রবেশ করে কেতকী দেখলে ঠাকুর-বাবা যোগাসনে ধ্যানমগ্ন। সেখানেও একটা ধুনী জল্‌ছিল। ঘরটি গাঢ় ধূমে আচ্ছন্ন। কোথায় কি আছে ভাল দেখা যায় না। সে ত্রাসে সঙ্কোচে বাবার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বাবার ধ্যানভঙ্গ হ'লে কেতকীকে তিনি উপবেশন করতে ইঙ্গিত করলেন। ঘরটি তখন নির্জ্জন। চেলাটি চলে গেছে। বাবা বল্‌লেন, "তোমার সম্বন্ধে আমার উপর মায়ের প্রত্যাদেশ হয়েছে। আমার সঙ্গে প্রয়াগ-তীর্থে যেতে হবে। সেখানে বিল্বপত্র পাবে। যাত্রার জন্য সকলই প্রস্তুত। তোমার অভিপ্রায় কি, বল?"

কেতকী জিজ্ঞাসা করলে, "আমার স্বামীও ত সঙ্গে যাবেন?"

"তেমন আদেশ নেই। তোমাকে একলাই যেতে হবে।"

কেতকী ভাবিত হ'ল। বল্‌লে, "আমার স্বামী এখানে আছেন। তাঁর অনুমতি ভিন্ন ত যেতে পারিনে।"

বাবা মৃদু হাস্‌লেন। বল্‌লেন, "এই জায়গায় গোল বাধে। সংসারী লোকের দৃষ্টি সঙ্কীর্ণতায় আবদ্ধ। মায়ের আদেশ পালন করা যায়—কি যায় না, সে সম্বন্ধে নিজের মনেও জেরা কর, মায়িক লোকের অনুমতিরও অপেক্ষা রাখ। এ তোমার একান্ত নির্ব্বুদ্ধিতা হ'লেও মায়েরও অবহেলার কারণ। শুধু অম্বলের অসুখ নয়, সকল ইষ্টানিষ্ট সম্বন্ধেই আমার মারফতে মায়ের কাছে একটা আদানপ্রদান তোমার চল্‌ছে। তুমি এখন বস্তুজগৎ ছাড়া। যদি ইচ্ছা কর, তোমার স্বামীকে আমি জানাতে পারি। কিন্তু মায়ের কৃপা পাবে কি না সন্দেহ। স্বামীর অস্বীকৃতির দরুণ এ সুযোগ ব্যর্থ হতে পারে। আবার হয় ত তোমার প্রার্থনার মধ্যে অপর্য্যাপ্ত আগ্রহ নেই, এ কারণেও ব্যর্থ হতে পারে। ভেবে দেখ, এ সৌভাগ্য ত্যাগ করবে কি না?"

কেতকী বল্‌লে, "খবর পর্য্যন্ত না দিয়ে গেলে তিনি যে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়বেন?"

বাবা হাস্য করলেন। বল্‌লেন, "আমার কথায় বোধ করি মনোযোগ করনি। এই প্রশ্নেরই উত্তর কেবলমাত্র দিয়েছি। আমার শক্তি অতি সামান্য। তোমার সম্বন্ধে তিন দিনের চেষ্টায় কিছু ফল ফলেছে। বলেইছি ত তুমি এখন বস্তুজগৎ ছাড়া। অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য সকল আকর্ষণের সকল প্রলোভনের অতীত হও। মঙ্গল হবে। প্রয়াগে গেলেই বিল্বপত্র পাবে, বিলম্ব হবে না। তখন আমার শিষ্যেরা কেহ গিয়ে তোমাকে ঠিকানায় পৌছে দিয়ে আস্‌তে পারবে। না হয় তোমার স্বামীকেও সে সময় খবর দিয়ে আন্‌তে পারা যাবে।"

কেতকী বল্‌লে, "আচ্ছা।"

নির্জ্জন ঘরের পিছনেই আমকাঁঠালের একটা বাগান। বাবা পিছনের দরজা দিয়ে সেখানে ঢুকলেন। কেতকী পিছু পিছু গেল। তথায় গোযানে জিনিষপত্র সজ্জিত হচ্ছিল। বাবা সকলকে নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেন এবং অবিলম্বে নিকটবর্ত্তী একটা ষ্টেশনে এসে ষ্টীমার ধর্‌লেন।

এদিকে কেতকীকে কাছছাড়া করা অবধি বিরাজের মনে উদ্বেগের অন্ত ছিল না। ছম্‌ছমে গুমোট অন্ধকারের ভিতর দিয়ে তুটি ঘণ্টা পার হয়ে গেল—যেন বছরের মত দীর্ঘ। অথচ অম্বলের ঔষধের ফর্দ্দটা তার এ পর্য্যন্ত মিল্‌ল না। বিরাজ আর অপেক্ষা না করে নির্জ্জন ঘরটির দিকে ছুটে গেল। দরজার সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে সে কান পেতে রাখ্‌লে। সাড়াশব্দ নেই—মৃত্যুর মত নির্ব্বাক। আকাশের ওই বড় তারাটা বড় একটা বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে এখনই যেন সরে পড়্‌বে, সেই উদ্যোগ করছে। বাতাস যেন একটা কুৎসিৎ সংবাদ প্রচার করতে ঘরটার চারিপাশে জোট্ পাকিয়ে আট্‌কে রয়ে গেল। বিরাজের মনে কত প্রশ্ন, কত শঙ্কা—সমাধান কিছু নেই। স্বামীজী তিনি—ধর্ম্মেরই জীবন তাঁর—ভাব্‌তে আর ভাল লাগ্‌ছিল না। সে বেড়া টপকিয়ে

বাগানের মধ্যে ঢুকে পড়্‌ল। দেখ্‌লে নির্জ্জন কক্ষের পিছনের দরজাটা খোলা। সে অতি দ্রুত ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল। একটা বিরাট শূন্যতা হি হি শব্দে বিকট হাসি হেসে তাকে যেন অভিনন্দিত কর্‌লে। কোথায় ব্যাঘ্র-চর্ম্ম—কোথায় কমণ্ডলু—আর কোথায় কম্বল চিম্‌টা। কেবল তাকে পাগল করে তুল্‌তে নিকষ কালো বিকৃত অন্ধকার ঘরটি জুড়ে আড়ি পেতে রয়েছে। বিরাজের দেহের রক্ত জল হয়ে মাটি ভিজ্‌তে লাগ্‌ল।

কতক্ষণ এ ভাবে কাট্‌ল জ্ঞান ছিল না। চেতনা ফির্‌লে ব্যাকুলভাবে ছুটে নাটমণ্ডপে পড়ে যারা ঘুমুচ্ছিল সকলকে এসে সে সচেতন করে তুললে। তাহার ভয়ার্ত্ত মুখের কাহিনী শুনে সকলে বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়ে গেল। বাগানের পথে ঘরে ঢুকে সকলে দেখ্‌লে,—সত্যই পাখী উড়েছে!

একান্ত নিরুপায় হয়ে বিরাজ তখন ছুট্‌তে ছুট্‌তে নদীর ঘাটে চলে এল। ষ্টীমার তখন ঘাট ছেড়ে চলে গেছে। সে হাঁটু গেড়ে সেইখানে বসে পড়্‌ল।

তখন সকাল হয়েছে। অনেক লোকজন এসে জমে গেছে। সকলে যুক্তি করে একখানা ডিঙ্গি নৌকায় তাকে তুলে দিলে এবং খালের পথে সোজা গিয়ে ষ্টীমার পৌছানোর পূর্ব্বে তাকে রেল ষ্টীমারের সঙ্গমস্থলের ষ্টেশনটি ধরিয়ে দিতে পারে মাঝিমাল্লাদের সকলে উপদেশ দিয়ে দিলে। নৌকা খরবেগে ছুটে চল্‌ল। বিরাজ নৌকার মধ্যে স্তব্ধভাবে বসে এই দুর্জ্জ্যেয় মর্ম্মপীড়া উপভোগ কর্‌তে লাগ্‌ল।

বিরাজের নৌকা যখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছল তখন ষ্টীমার এসে গেছে। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে। সে ডাঙ্গায় পা দিতেই দেখ্‌তে পেলে বাবার একটি চেলা এক লোটা জল নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌ছে। টিকিট কেনার আর খেয়ালও হ'ল না—সময়ও হ'ল না। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে চলন্ত গাড়ীটার হাতল ধর্‌তে পুলিশের একটি লোক তার হাত চেপে ধর্‌লে। বিরাজ 'হাউ হাউ' করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বল্‌লে, "আমাকে ছাড় বাবু! আবার যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে নিয়ে ওই চল্‌ল - পালিয়ে চল্‌ল।"

বাবুটি পুলিশের একজন ইনস্পেক্টার। বিরাজের হাত ছেড়ে দিলেন। নিজেও সঙ্গে সঙ্গে গাড়ীতে গিয়ে উঠে বস্‌লেন। গাড়ী তখন চল্‌তে আরম্ভ করেছে। একটু স্থির হয়ে বসার পর বাবুটি জিজ্ঞাসা কর্‌লেন,—"কি হয়েছে আপনার এইবার গুছিয়ে বলুন দিকিনি?"

বাষ্পোচ্ছ্বাসে বিরাজের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে আস্‌ছিল। গলাটা ঝেড়েঝুড়ে নিয়ে সে বল্‌লে, "আর হয়েছে—হতভাগা—রাস্কেল—গর্দ্দভ—আহাম্মক—"

এই বলে সে নিজের গালে নিজে চপেটাঘাত করতে লাগল।

ইনস্পেক্টর হাস্য করে বল্‌লেন, "ক্ষেপে গেলেন যে, বাবু! গাড়ীতে ত সঙ্গী করেই নিলেন। আবার পাগলা গারদ পর্য্যন্ত ভোগাবেন না কি? আমার ত সময় কম।"

বিরাজ দাঁত খিঁচিয়ে বল্‌লে, "সময় আমার খুব বেশী! বেটা সাধু—তৈলঙ্গস্বামী। বুকে শ্লেষ্মা—মুখে বব-বম—ও কি কখ্‌খনো ফোটে? আর তোমরা হয়েছ গিয়ে ওদের মাসতুতো ভাই।"

একদল শিষ্য সঙ্গে একজন সাধুকে এই গাড়ীতে উঠ্‌তে ইনস্পেক্টর দেখেছিলেন। এইখানেই বিরাজের সম্পর্ক তিনি অনুমান করে নিলেন। বল্‌লেন, "কেন, মাসতুতো ভাই হলাম কিসে?"

"না—কেন? এই আমার উপর দরদ দেখাচ্ছ। জোচ্চুরির পয়সা—বেটার ত অভাব নেই। গেঁজের টাকাটা ঘোমটার ফাঁকে মুচ্‌কি হাসার মত দেখিয়ে দিলে চোঁয়। ঢেকুরটা আমারই নাকের ছেঁদা দিয়ে ঢুকিয়ে দেবে। এই চিং—এই কাং—এই ত হ'ল ব্যবসা তোমাদের গিয়ে।"

ইনস্পেক্টর হেসে বল্‌লেন, "ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, তাই ত পয়সার মায়া কাটাতে পারিনে। আপনি কিছু ঝাড়ুন না? চিংটা বজায় থেকে যাক্।"

বিরাজ বল্‌লে, "ঝেড়ে ত দিলুম। এত পাপের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছ আখেরে ছেলেপুলে কি ও পাপ ঘাড়ে নেবে? বলবে,—বাবা, তুমি একটু জিরোও? বালককালে 'রত্নাকরের গল্পটাও পড়নি!"

"নাই বা নিলে। সন্তান তারা, সমস্ত বোঝাটা না হয় আমরাই নিলুম!"

বিরাজ ভেবে দেখ্‌লে লোকটাকে হাতছাড়া করলে ফল বড় শুভ হবে না। দৈবাৎ যদি জুটে গেছে, সোজা পাকে রাখাই ভাল। কিন্তু পেটের ঠাঁই যে অনেক। হিড়িম্বা রাক্ষসী। বল্‌লে, "কি চাও, বল। নোটফোটের কথা পেড় না যেন। পেটের ক্ষিধে বাড়ালে পেরে উঠ্‌ব না।"

ইনস্পেক্টর মুচকি হেসে বল্‌লেন, "ক্ষিধে ত খুবই। আপনি যে দাতা, বিড়ি সিগারেটের পয়সাটা হ'লেই কৃতার্থ হব।"

বিরাজের সমস্ত দেহে গোটা চল্লিশেক টাকা ছড়ানো ছিল। কতক কাছায়—কতক কোঁচায়—কতক কোমরের গেঁজেয়—কতক পকেটে। সকলদিকটায় হাত্‌ড়ে টিপে টিপে দেখে নিরাশ হয়ে সে বল্‌লে, "সবই যে আস্ত? টাকা না ধোঁয়া—ভেঙেছে, না উড়েছে। আচ্ছা! দাঁড়াও—"

এই বলে সে বুকপকেটটা হাত্‌ড়ে একটা সিকি টেনে বের করে জিজ্ঞাসা করলে, "পথে কিছু খাবার খাব বলে সিকিটে ছিল, তা' তোমার গিয়ে সিগারেটের দাম কত?"

"বেশী না—দশ পয়সা।"

"তা হ'লে থাক্‌ছে গিয়ে ছ' পয়সা। খুচরো পয়সা আছে তোমার কাছে? থাকে ত ছটা পয়সা দাও। ক্ষিধে তেষ্টা ত চুলোয় গেছে। মনে করব'খন দশ পয়সার কলা কিনে খেয়েছি।"

"কিন্তু যে আপনাকে কলা দেখালে তার গল্পটা ত এখনও শোনা হয়নি। পয়সা এখন থাক্‌। সিগারেট যা আছে, আপাততঃ চল্‌বে।"

হেসে কেস্ হতে একটা সিগারেট টেনে বের করে তিনি আগুন ধরালেন। বিরাজ খুসী হয়ে সিকিটা আবার যথাস্থানে রেখে দিলে। বল্‌লে, "মেজাজের কি আমার ঠিক আছে? পাজি—জোচ্চর—জরদ্গব—পাক মেরে কি না মাথার উপরে ছোঁ?"

"গালিটা এখন থাক, গল্পটাই আগে বলুন: পরের ষ্টেশনে এখুনি গাড়ী ধরবে। তার আগে আপনার বক্তব্য শোনা চাই। দেখি, যদি কিছু করা যায়।"

বিরাজের কাছে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি বল্‌লেন, "গাড়ী থামলে আপনি যদি আপনার স্ত্রীর অনুসন্ধানে ছুটোছুটি করেন, আমি কিছুই করতে পারব না। সামনের ষ্টেশনে নেমে আমি কলিকাতার পুলিশকে সদলবলে সজ্জিত থাক্‌তে তার করব। সেইখানে ওদের গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা করা যাবে। আপনি এই সময়টা চাদর মুড়ি দিয়ে বেঞ্চের উপর শিষ্ট ছেলের মত নাকসিটকে পড়ে থাকুন দিকিনি! কাকেও মুখ দেখাবেন না যেন। বুঝলেন?"

"বুঝব না কেন? শঠ ছেড়ে স্যাকরার হাতে পড়েছি, যেদিকে দমাবে, সেইদিকে দম্‌তে হবে। বলে,—নিজের জালায় মরে মনসা, বর দিয়ে যা!"

ইনস্পেক্টর দরজাটা ভিতরের দিকে টেনে ধরে বল্‌লেন, "তা হ'লে নাম্‌লুম আমি?"

"নামো। দেশে গিয়ে মুখ ত ঢাক্‌তেই হবে। তুমি দেখি ঘোমটাটা গাড়ীর মধ্যেই টেনে দিচ্ছ। নিধের বোঝা সিধে নিয়ে পালাবে না ত? তুমি ত, বাবা পুলিসের লোক!"

"পুলিসের উপর মমতা আপনার খুবই বেশী। যাক্, আমি এই নাম্‌লুম। আপনি যেন নেমে পড়বেন না। চাদর মুড়ি দিন্।"

তিনি নেমে পড়লেন। বিরাজ আগাগোড়া মুড়ি-সুড়ি দিয়ে পড়ে রইল।

গাড়ীখানা কলিকাতায় পৌছিলে বাবা নেমে সঙ্গের লোকজন এবং কেতকীকে নিয়ে ষ্টেশনের একধারে উপবেশন করলেন। কুলীরা জিনিষপত্র নামিয়ে তাঁদের সম্মুখে স্তুপীকৃত করতে লাগল। এদিকে পুলিশের লোকেরা এসে তাঁদের ঘেরাও করে দাঁড়াল।

ইনস্পেক্টর সঙ্গে বিরাজ তথায় উপস্থিত হ'লে সে আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না। রোষে কাঁপতে কাঁপতে বল্‌লে, "পাজী—বদমাস্—ডাকু—মুখে চূণকালী দিয়েছিস্, শালা!"

কেতকী শশব্যস্তে উঠে এসে স্বামীর হাত চেপে ধরে সভয়ে বল্‌লে, "কাকে কি বল্‌ছ? কি সর্ব্বনাশ করছ তুমি, বাবার উপর পেত্যাদেশ হয়েছে পেরাগে গিয়ে আমাকে বিল্বপত্র দিতে।"

"আর আমার উপর পেত্যাদেশ হয়েছে তোমার বাবার কানদুটো টেনে ছিঁড়ে দিতে।"

কেতকীকে এক ধাক্কায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের মত পুলিশের কর্ত্তাদের সম্মুখেই কেবলরামের কানদুটি দুই হাতের মুঠায় পূরে নিয়ে সে সজোরে মর্দ্দন করতে লাগল।

কেবলের সেই মাস-ছয়েকের গুরু যমুনাগিরি ৺চন্দ্রনাথ যাবার মানসে ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি দূর থেকে একজন সাধুকে বিপন্ন হতে দেখে নিকটে এসে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। বল্‌লেন, "কেবলরাম যে! মর্দ্দনযোগ কাটেনি এখনও?"

আর্টের অর্থ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, এম-এ

আজকাল আর্ট কথাটি বাংলায় চলিয়া গেছে। চলিয়া গেছে বলিলে অল্পই বলা হয়, আর্টের বন্যায় কলা কারু শিল্প সকলই ভাসিয়া গেল। লেখায় আর্ট, ছাপায় আর্ট, ছবিতে আর্ট, চরিত্রে আর্ট, সাহিত্যে আর্ট, আলাপে আর্ট, অভিনয়ে আর্ট—এমনি করিয়া আর্টের স্রোতে জীবন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

সব সময় আর্ট কথাটি আমরা যে কোনো নির্দ্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তাহা নয়। একদিকে আমরা বলি, এই কাব্যে আর্টের চরম নিদর্শন দেখিতে পাই, অন্যদিকে বলি, ঐ উপন্যাসের চরিত্রাঙ্কনে আর্টকে বিনষ্ট করা হইয়াছে, বলি সে বড় অভিনেতা কিন্তু আর্টিষ্ট নয়, বলি এই পরিকল্পনাটি আর্টসঙ্গত, বলি আর্টের সঙ্গে নীতির সম্বন্ধ নাই, বলি আদর্শ আর্টকে খাটো করে, বলি যাহা অবাস্তব তাহা আর্ট নয়, বলি দেহগত আকাঙ্ক্ষা আর্টের অপরিহার্য্য উপাদান। এমনিভাবে যেখানে-সেখানে যখন-তখন যেমন-তেমন করিয়া আর্ট কথাটা লাগাইয়া দি। কথার মোহ যখন পাইয়া বসে, বস্তু বুঝিবার তখন অবসর থাকে না।

দোষ যে সম্পূর্ণ আমাদের তাহা নয়। যে ভাষা হইতে আর্ট শব্দটি গ্রহণ করিয়াছি, একদা কিছু কাল ধরিয়া সেই ভাষার সাহিত্যে ঐ শব্দটি নিতান্ত ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল।

ইংরেজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল যুক্তি-তর্কের কাল। কল্পনাকে মনে করা হইত মনের বিকার। প্রত্যক্ষ ছিল একমাত্র প্রমাণ। গদ্য ও পদ্যের তফাৎ ছিল ভাবে নয়—রূপে। ছন্দে-রচিত পোপের *Essay on Man* গদ্যেও লেখা যাইতে পারিত। অবশেষে প্রতিক্রিয়া সুরু হইল। শতাব্দীর সঙ্গে এই ছদ্ম-ক্ল্যাসিসিজ্‌মও অবসানলাভ করিল।

উনবিংশ শতাব্দী রোমাণ্টিসিজ্‌মের যুগ। বিস্ময়ের উদ্বোধনে, কল্পনার নব-জাগরণে মানুষের মনোভাবের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন সাধিত হইল। বোঝা গেল, মনের কাছে বস্তুজগতের অপেক্ষা ভাবজগৎ অধিকতর সত্য। যে অনুভূতি অস্পষ্ট, জীবনে তাহার প্রভাব অল্প নয়। যাহা অব্যক্তপ্রায়, তাহাকে ব্যক্ত করিবার জন্য একটা অদম্য অভিলাষ জাগিয়া উঠিল। অতীত হইতে অতিপ্রাকৃত পর্য্যন্ত সর্ব্ববিষয়ে মানুষের কৌতূহল প্রধাবিত হইল। ছন্দ নব নব রূপ ধারণ করিল। কাব্য রসাত্মক হইয়া উঠিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী লেখকেরা যে কুশল গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা সরল স্পষ্ট পরিচ্ছন্ন আতিশয্য-বর্জ্জিত। সে যুগের পদ্যও ছিল গদ্যানুগামী। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গদ্য হইয়া উঠিল কাব্যধর্ম্মী। কথার ব্যঞ্জনায় গদ্যরচনা কাব্যের মত উপভোগ্য হইয়া উঠিল

বটে, পূর্ব্বযুগের প্রাঞ্জলতা কিন্তু খানিকটা নষ্ট হইয়া গেল। অর্থকে অতিক্রম করিয়া অর্থের ব্যঞ্জনা বড় হইয়া উঠিল।

প্রকৃতির পূজা এবং সাধারণ বাস্তবের অসাধারণত্ব লইয়া রোমান্টিক যুগের আরম্ভ। সেই সঙ্গে সাহিত্যে অতীতের স্মৃতিও অপরূপ রূপে দেখা দিল। ক্রমে পুরাতন অনেক জিনিষের মত অতীতের কলা-মহিমাও গুণিজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। আর্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিল। ইহা হইল রোমান্টিসিজ্‌মের তৃতীয় পর্ব্ব। ওয়ার্ডসওয়ার্থ কোলরিজ ইহার প্রথম পর্ব্বের এবং শেলী কীট্‌স ইহার দ্বিতীয় পর্ব্বের কবি-পুরোহিত।

আর্ট আন্দোলনের প্রবর্ত্তকগণকে প্রি-র‍্যাফেলাইটস্‌ বলা হইত। রসেটি, মরিস, সুইনবার্ণ প্রভৃতিকে লইয়া এই দল গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই দলের অনেকেই ছিলেন একাধারে কবি ও কলাবিৎ। দলের অন্তর্ভুক্ত না হইলেও রাস্‌কিন ছিলেন ইঁহাদের মতের অনুরাগী। রাস্‌কিনের আর্টধর্ম্মের ব্যাখ্যা সে-সময়ের ইংরেজী পাঠকের পরম উপভোগের বস্তু হইয়া উঠিয়াছিল।

রাস্‌কিন হইতে অস্কার ওয়াইল্ড পর্য্যন্ত বহু সুধী-জনের বিচিত্র ব্যাখ্যায় আর্ট অর্থগৌরবে অসাধারণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাই উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজী সাহিত্যে দেখিতে পাই, আর্ট শব্দটিকে ঘিরিয়া একটি রোমান্টিক ভাবের ছটা, একটি ইঙ্গিতের পরিমণ্ডল রচিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই রোমান্টিক যুগের সাহিত্য হইতে শব্দটি গৃহীত হইয়াছে বলিয়া আমাদের দেশেও আর্টের সংজ্ঞা সুনির্দ্দিষ্ট হয় নাই। বুঝিয়া এবং না বুঝিয়া বাক্যটি আমরা ইচ্ছামত অর্থে প্রয়োগ করি। বহুকালের তর্ক ও আলোচনার ফলে বর্ত্তমান ইংরেজী সাহিত্যে ইহার অনির্দ্দিষ্টতা কাটিয়া গেলেও বাংলার আর্টে এখনও পর্য্যন্ত রোমান্টিক অস্পষ্টতা রহিয়া গেছে।

ভগবানের সৃষ্টি প্রকৃতি, মানুষের সৃষ্টি আর্ট। আর্টের ইহাই প্রাথমিক অর্থ।

প্রকৃতি সকল শক্তির ভাণ্ডার। নূতন শক্তি সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। মানুষ নিজের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির প্রয়োজনে স্বভাবের শক্তিকে নানারূপে নিয়ন্ত্রিত করে মাত্র। এই হিসাবে হয়ত প্রকৃতি হইতে পৃথক অস্তিত্ব আর্টের নাই। প্রকৃতির দিক দিয়া দেখিলে ইহা সত্য হইতে পারে। আমরা কিন্তু আর্টকে মানব-সম্পর্কেই দেখি। শক্তির উৎস যেখানেই থাক্‌, মানুষ যখন সেই শক্তিকে কাজে খাটাইয়া লয় তখনই আর্ট জন্মগ্রহণ করে। আর্ট হইতেছে, উদ্দেশ্য-সাধনের উদ্দেশে উপায়ের প্রয়োগ। আর্ট স্বয়ম্ভূ নয়, মানবের চেষ্টাকৃত।

প্রকৃতিকে দুই রূপে দেখি। বাহিরে বিশ্বপ্রকৃতি, মনের ভিতর অন্তঃপ্রকৃতি। অর্থাৎ জগতে হোক্‌ অন্তরে হোক্‌, যে-সকল ব্যাপার স্বতই ঘটিতে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহাদের ঘটনায় আমাদের কোন হাত নাই, সেগুলিকে বলি প্রকৃতির লীলা। এই লীলার অন্তরালে যে শক্তির সমগ্রতা কল্পনা করি, তাহাকে বলি প্রকৃতি। অতএব চেষ্টা-নিরপেক্ষ ব্যাপার মাত্রই প্রাকৃতিক। কিন্তু বাবুই পাখীও বাসা বাঁধে, মৌমাছিও মৌচাক গড়ে, চেষ্টা-যত্নের ক্রটি ত উহাতে থাকে না। এই-সব রচনাকে স্বভাবজাত বলিব, না আর্ট বলিব? জীব সহজ প্রবৃত্তির বশে যাহা করে, তাহা স্বভাবের অন্তর্গত। মানুষও সহজ প্রবৃত্তির প্রেরণায় যে কাজ করে তাহা আর্ট নয়।

আর্টের মধ্যে একটা সঙ্কল্প থাকে, ফললাভের অভিলাষ থাকে। উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মানুষ যখন অনুকূল উপায়ের প্রয়োগ করে, চেষ্টা যত্ন ও অনুধ্যানের ফলে সে যখন কিছু গড়িয়া তোলে, তখনই তাহা আর্ট হয়। আর্টের মধ্যে মানুষের বিচার অভিনিবেশ সঙ্কল্প সাধনা থাকে। প্রাচীন যুগের হাঁড়ি-কুঁড়ি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক কালের সূক্ষ্ম কল-কব্জা পর্য্যন্ত প্রাথমিক অর্থে আর্ট। আর্ট চেষ্টার ফল। অনায়াসপ্রসূত বলিয়া কোনো কোনো কাব্যরচনা সম্বন্ধে আমরা বলি, ইহাতে আর্ট নাই, এ রচনা স্বত-উচ্ছ্বসিত, স্বাভাবিক। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। মানুষের সাধনায় আর্টের সৃষ্টি। রচনা মাত্রই আর্ট।

একদিকে মানব-সম্পর্ক ধরিয়া আর্ট ও প্রকৃতির মধ্যে যেমন ব্যবধান করি, আর-একদিকে তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞান হইতে কর্ম্মকে পৃথক করিয়া বিজ্ঞান ও আর্টের মধ্যে সীমারেখা টানি। বিজ্ঞানে আমরা নানা তথ্য ঘটনা এবং

নিয়মের পরিচয় লাভ করি। বিজ্ঞান হইতে আমরা জানি। এই জ্ঞান আমাদের সকল কার্য্যসাধনের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু জ্ঞানের ক্ষেত্র হইতে কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রবেশ করিবা-মাত্র আমরা আর্টের রাজ্যে উপস্থিত হই। বিজ্ঞান বলে—'জান', আর্ট বলে—'কর'।

দেখা যাইতেছে, স্বভাব সম্পর্কেই হোক্ আর বিজ্ঞান সম্পর্কেই হোক্, আর্ট মানুষের কর্ম্মপ্রবৃত্তি এবং কর্ম্ম-প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করে। পথ ও প্রণালীর সন্ধান বলিয়া দিয়া বিজ্ঞান আমাদের উপায়বিৎ করিয়া তোলে। কিন্তু কর্ম্মে ও ব্যবহারে সেই উপায় এবং পদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত-ভাবে প্রয়োগ করিয়া আমরা আর্টের ধর্ম্ম পালন করি। করি বলিয়া আর্টের সঙ্গে কৌশল ও নৈপুণ্যের সম্বন্ধ একান্তরূপে ঘনিষ্ঠ। তাই আর্ট ও কৌশল অনেক সময় একার্থবাচক। এই কৌশলকে সংস্কৃতে বলা হয় কলা। গীত বাদ্য নৃত্য নাট্য কৌশল প্রভৃতি চৌষট্টি বিদ্যাই কলার মধ্যে পড়ে। পুষ্পাস্তরণ অঙ্গরাগ গন্ধযুক্তি ভূষণ-যোজন—প্রাচীনমতে ইহারাও কলা। এমন-কি জানা ও করার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলিয়া আকরজ্ঞান মণিরাগজ্ঞান দেশভাষাজ্ঞানকে পর্য্যন্ত চতুঃষষ্ঠি কলার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

শুধু কৌশলে অথবা কলা হিসাবে ব্যবহৃত হইলে আর্ট কথাটির মধ্যে এত জটিলতা থাকিত না। কিন্তু প্রয়োগের বৈচিত্র্যে আর্ট কথাটি বিচিত্রার্থ হইয়া উঠিয়াছে। উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার হইতে পারে। পাথরে যখন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করি, তখন তাহাকে বলি ভাস্কর্য্য। ভাস্কর্য্য একটি কলা। এখন পাথর খোদাইয়ের কৌশলকেও আমরা বলি আর্ট, ক্ষোদিত করিবার কাজটিকেও বলি আর্ট, আবার যে বিধিতে ক্ষোদনক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় সেই নিয়মপ্রণালীকেও বলি আর্ট; শুধু তাই নয়, সুনিয়ন্ত্রিত ক্রিয়ার ফলে যে মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিল, তাহাকেও বলিলাম আর্ট। অর্থাৎ কৌশল, প্রয়োগ, প্রয়োগ-প্রণালী এবং রচিত বস্তু—ইংরেজী আর্ট কথাটিতে এ সকলই বুঝাইয়া গেল।

এ পর্য্যন্ত আর্টের যে অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা আর্টের মৌলিক অর্থ। আর্ট মানবী সৃষ্টি। সৃষ্টি ও রচনার সহিত কর্ম্মনৈপুণ্য একান্তভাবে জড়িত। আর্ট ও কলা তাই একার্থবোধক। জীবনধারণের প্রয়োজনে আর্টের উদ্ভব। কিন্তু শুধু কি তাই? আর্টের সহিত আনন্দের যে সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? বর্ব্বর মানব আত্মরক্ষা ও খাদ্য-আহরণের প্রয়োজনে পাথর অথবা হাড়ের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিত, আশ্রয়ের জন্য গুহার অন্বেষণ করিত। কিন্তু অস্ত্র ও গুহার গাত্রে যে চিত্র সে ক্ষোদিত অথবা অঙ্কিত করিত তাহা ত প্রয়োজন-বশে নয়। করিবার আনন্দে ইহাদের উদ্ভব। মানুষের আদিম প্রবৃত্তির উপর অলঙ্করণ-স্পৃহার প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য প্রবৃত্তির মত মানুষের সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে স্বীকার করিতে হইবে।

অতএব যেমন প্রয়োজনের তাড়নায়, তেমনি আনন্দের বশেও মানুষের সৃষ্টিশক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে। তাই আর্টের দুইটি বিভাগ দেখিতে পাই। জীবনের সুখ-সুবিধা অথবা প্রয়োজনের উপর যে সৃষ্টি নির্ভর করে তাহাকে বলি useful অর্থাৎ আবশ্যক আর্ট। বস্ত্র নির্ম্মাণাদি শিল্প অথবা কারু এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যন্ত্রকলাকে শিল্প বলা চলে।

যে-সকল কলা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, আনন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ ব্যাবহারিক সুবিধা যাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, সেগুলিকে ইংরেজীতে বলে ফাইন আর্টস। ইংরেজির অনুসরণে বাংলায় আমরা নামকরণ করিয়াছি ললিত কলা। ললিত কলা মানুষের সৌন্দর্য্যবৃত্তিকে চরিতার্থ করে। চিত্র কাব্য সঙ্গীত স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য্য—কলার মধ্যে এই পাঁচটিকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ধরা হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর আর্ট-আন্দোলনের সময় বিলাতের রসিক সমাজ যখন শুধু কাব্য নয়, সবগুলি ললিত কলার দিকেই চোখ ফিরাইলেন তখন বিশেষভাবে ফাইন আর্টস অর্থে আর্ট কথাটি সাহিত্যে প্রচলিত হইতে সুরু করিল। অবশ্য ফিক্‌টে শেলিং হেগেল প্রমুখ জার্ম্মান দার্শনিকগণের আর্ট-ব্যাখ্যাই ইহার জন্য মূলত দায়ী। প্রয়োজনকে পিছাইয়া সৌন্দর্য্য বড় হইয়া উঠিল। সৌন্দর্য্য ও রুচির সঙ্গে আর্টের যোগসাধন সম্পূর্ণ হইয়া গেল।

সাধারণ অর্থে আর্ট কথাটি এখনকার সাহিত্য অথবা কলা-সমালোচনায় ক্বচিৎ ব্যবহৃত হয়। ললিত কলার সম্বন্ধেই বিশেষভাবে প্রযোজ্য, অধুনা আর্টের এমন অর্থই প্রচলিত। তবুও আর্ট যে মুখ্যত মানুষের রচনা এই মূলভাবটিই আর্টের সর্ব্ববিধ প্রয়োগের মধ্যে দেখিতে পাই।

মানুষ সমাজে বাস করে। তাই সে আপনাকে প্রকাশ করিতে চায়। একে অন্যের কথাও তাই শোনে। এই প্রকাশেই সমবেদনা জাগিয়া উঠে। পর আপনার হয়। আর্ট আমাদের আত্মপ্রকাশ।

মানুষের রচনাকে বিশ্লেষণ করিলে দুটি জিনিষ দেখিতে পাই। একটি রচয়িতার মনোভাব, আর একটি সেই মনোভাবের মূর্ত্তি বা রূপ। মনোভাব যাহাই হোক না কেন, আর্ট হইল সেই ভাবের অভিব্যক্তি। যে অভিব্যক্তি আমাদের চিরদিবসের আনন্দ বিধান করে, তাহা শ্রেষ্ঠ আর্ট। শ্রেষ্ঠ আর্ট প্রয়োজনের অতিরিক্ত বা প্রয়োজনাতীত হইতে পারে, অপ্রয়োজনীয় নয়। প্রয়োজনের অর্থ ব্যাবহারিক সুবিধা। রাসকিন অনবহিত-ভাবে অপ্রয়োজনীয় কথাটি ব্যবহার করিয়া ফেলিয়াছেন।

ললিত কলা হিসাবে স্থাপত্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়া রাসকিন বলিতেছেন,—"Architecture is that art which taking up and admitting, as conditions of its working, the necessities and common uses of the building, impresses on its form certain characters venerable or beautiful, but otherwise unnecessary."—অর্থাৎ, নির্ম্মাণকালে গৃহ মন্দিরের সাধারণ প্রয়োজনাদির কথা মনে রাখিতে হইবে বটে, কিন্তু ললিত কলা হিসাবে স্থাপত্য সেই রচনা যাহা গঠনটির উপর এমন কতকগুলি ভাবের ছাপ মুদ্রিত করিয়া দেয় যাহা গম্ভীর অথবা সুন্দর, কিন্তু অন্য দিক দিয়া দেখিতে গেলে অনাবশ্যক।

রাসকিন এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে যে কথা প্রয়োগ করিয়াছিলেন, অস্কার ওয়াইল্ড কিন্তু সেই কথা দিয়াই আর্টের সংজ্ঞা নির্ণয় করিয়াছেন। ওয়াইল্ডের মতে, 'All art is quite useless.'—আর্ট মাত্রই একান্ত ভাবে অনাবশ্যক। 'Art never expresses anything but itself.'—অন্য কিছুকেই নয়, আর্ট আপনাকে মাত্র অভিব্যক্ত করে। ওয়াইল্ডের কাছে আর্ট জীবন-নিরপেক্ষ। তাই কলা-সৃষ্টিতে নৈতিক বিধানের স্থান নাই।

সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া আর্টকে বিচার করিতে গিয়া জীবনের সহিত আর্টের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। Art for artএর অর্থ এই।—বাক্যে বর্ণে স্বরে, যে-কোনো উপাদানে হোক না, মানুষ রচনার আনন্দে রচনা করিয়া যায়। সৃষ্টি করিয়া যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয় তাহা ছাড়া সৃষ্টির অন্য উদ্দেশ্য নাই। কিন্তু আত্মপ্রসাদের লোভেও নয়, মানুষ শুধু সৃষ্টির প্রেরণায় সৃষ্টি করিয়া যায়। সমাজকে ভাল করিব অথবা মানুষের দুঃখ দূর করিব, এমন একটা বাহ্য উদ্দেশ্য যেখানে আছে, বুঝিতে হইবে সৃষ্টির পূর্ণ প্রেরণা সেখানে নাই। অতএব আর্টের উপর নীতি প্রভৃতি বাহিরের জিনিসের কোন অধিকার নাই।

শুধু প্রকাশই যদি একমাত্র কাম্য বস্তু হইত, তাহা হইলে মনে করিতাম এ যুক্তি অকাট্য। কিন্তু ভাব হইতে আর্টকে, রস হইতে রূপকে বিচ্ছিন্ন করিয়া গ্রহণ করিবার উপায় মানুষের নাই। বরং প্রকাশনৈপুণ্য অপেক্ষা প্রকাশিত বস্তুটির দিকেই সাধারণ মানুষের কৌতূহল অধিক।

বহুমুখী জীবনের একতর প্রকাশ আর্ট। জীবনে কৌতূহলের আর অন্ত নাই। সাংসারিক প্রয়োজনকে অতিক্রম করিয়া এই কৌতূহল যখন সৌন্দর্য্যের সন্ধানে আনন্দের রাজ্যে উপস্থিত হয়, জীবন তখন নবপরিণতি লাভ করে। রূপ রস শব্দের ভিতর দিয়া যে সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি সম্ভবপর হয়, তাহা পরম উপভোগের বস্তু। কখনও কাব্যে, কখনও চিত্রে, কখনও সঙ্গীতে এই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি আত্মার যে তৃপ্তি বিধান করে, জীবনের বিকাশে তাহার সাহায্য অপরিহার্য্য। প্রেয় বলিয়াই ইহা একান্তরূপে শ্রেয়। জীবন আপনাকে ব্যক্ত করিবার নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। আর্ট জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি।

রোমাণ্টিক যুগের অস্পষ্টতা কাটাইয়া এখন আমরা বিংশ শতাব্দীর বাস্তববাদে উপনীত হইয়াছি। ইহাই যদি সত্য হয় যে জীবনের সহিত আর্টের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য, আর্টে যদি জীবনকেই প্রকাশ করিতে হয়, তাহা হইলে কোনোরূপ পক্ষপাত অথবা সংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনকে দেখিলে চলিবে না, জীবনকে সমগ্রভাবে নিরপেক্ষভাবে প্রকাশ করিতে হইবে; কল্পনাগত নরনারী নয়, প্রকৃত মানুষকে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। ইহাই হইল আর্টে বাস্তববাদের মূল কথা।

তবুও প্রশ্ন থাকিয়া যায়, আর্ট সৃষ্টি না রসসৃষ্টি? আর্টে রস প্রধান, না সৃষ্টিই প্রধান? মৌলিক অর্থে আর্ট সৃষ্টি। সেই সৃষ্টিকার্য্যে ভাব অথবা রস উপাদান মাত্র। অতএব দেখিতেছি, ভাবকে রূপায়িত করাই আর্ট। আর্টে সৃষ্টি মুখ্য, ভাব গৌণ। মূর্ত্ত হইয়া না উঠিলে ভাবের মূল্য নাই। আর্টিষ্ট রূপ-বিধাতা। ভাবের শ্রেষ্ঠতার সহিত আর্টের সম্পূর্ণতা যখন মিলিত হয়, আর্টিষ্ট তখন স্রষ্টা।

ভাব ও রস প্রায় একই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। ভাব কখন্ রসে পরিণত হয়, এখানে সে তর্কে প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। কাব্যে সাহিত্যে অথবা যে-কোনো কলারচনায় আমরা রস উপভোগ করিতে চাই, অর্থাৎ যে অনুভূতির দ্বারা কবি বা কলাবিৎ উদ্বুদ্ধ হইয়াছেন, সেই অনুভূতির আস্বাদ রচনার মধ্যে পাইতে চাই। রচয়িতা এই রসকে যেখানে সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে পারিয়াছেন, আমরা বলি রচনা সেইখানেই সার্থক। আর্টের সার্থকতায় রচনার চরিতার্থতা। কিন্তু রস হইতে প্রকাশকে অবচ্ছিন্ন করিয়া দেখিবার একাগ্র শক্তি মনের নাই। তাই সাধারণ দৃষ্টিতে সৃষ্টি ও রস-সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য দেখিতে পাই না। এই সৃষ্টি-শক্তি যখন আনন্দের উদ্বোধনে প্রযুক্ত হয়, রচনা তখন ললিত কলা। ললিত কলায় আর্ট সৌন্দর্য্যসন্ধানী।

গুজরাটী গরবা

শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

(শ্রীকনু দেসাই অঙ্কিত রেখাচিত্র)

গর্‌বা গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের নিজস্ব একরকম নৃত্যকলা। এ নৃত্য যে কতদূর নিখুঁত কলাসম্মত তা যিনি এ নৃত্য কখনও দেখেন নাই, তিনি ধারণাও করিতে পারিবেন না। ইহার মনোরম ছন্দবৈচিত্র্য, সুশ্রী অঙ্গচালনা, ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত গুজরাটী রমণীর অসাধারণ কলানৈপুণ্যের নিদর্শন। যাহাদের পক্ষে এই নৃত্য চাক্ষুষ দেখিবার সুযোগ ঘটে নাই, তাহাদিগকে গরবা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্য এইখানে সংক্ষেপে কিছু বলা যাইতেছে।

মেয়েরা বৃত্তাকারে নৃত্যের তালে তালে এই গান গাহিয়া থাকে। যতক্ষণ গান চলে তাহারা বৃত্তাকারে ঘুরিতে ঘুরিতে একযোগে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাল দিতে থাকে। দলের যিনি প্রধানা, তিনিই প্রথমে গানটি ধরিয়া দেন, পরে সকলে মিলিয়া একসঙ্গে গাহিতে থাকে।

গর্‌বার এক অংশের নাম সাখী। এ অংশ গাহিবার সময় তাল দিতে হয় না, স্থির থাকিয়া বৃত্তাকারে দাঁড়াইয়া গাহিতে হয়। ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাল দিবার সময় তালের ছন্দবৈচিত্র্য, পাদবিক্ষেপের সমতা, হস্তের সঞ্চালন, দেহের বিচিত্র লীলায়িত ভঙ্গী ও সাজসজ্জার পারিপাট্য—দর্শকদিগকে অজস্র আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকে।

'গর্‌বা' নৃত্যকলার এক প্রাচীন ভঙ্গী। নবরাত্রে কালী ও অপরাপর দেবীদের জন্য 'গর্‌বো' নির্ম্মাণের প্রথা হইতেই 'গর্‌বা' শব্দটির উৎপত্তি। 'গর্‌বো' একটি সাদা গোলাকার মাটির পাত্র, তাহার চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করা হয়, আর সেই পাত্রে একটি ঘৃতের প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। দশহরার পূর্ব্বদিন বা নবরাত্রে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহারা উৎসবটি

নিজের নিজের বাড়ীতে করিতে চাহেন, তাঁহারা নয় রাত্রি ব্যাপিয়া গর্‌বা গান করিবার জন্য প্রতিবেশিনীদের সাদর আমন্ত্রণ করেন এবং বাড়ীর যিনি গৃহিণী তিনি 'গর্‌বো'টি নিজের মাথায় লইয়া আগে ঘুরিতে থাকেন

আরম্ভ
সন্ধ্যা হইলে গৃহস্থঘরের মেয়েরা রাস্তার এককোণে সমবেত হয়। একজন গান গায়, অপর সকলে তাল দিতে দিতে "গর্‌বো"র চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে।

এবং তাঁহার সঙ্গিনীরা বৃত্তাকারে তাঁহার অনুগমন করেন। এই সুপ্রাচীন প্রথাটি গুজরাটে আজ পর্য্যন্ত অব্যাহত রহিয়া গিয়াছে। উৎসবের শেষ দিন সারা রাত্রি ব্যাপিয়া গর্‌বা গান গীত হইয়া থাকে এবং পরদিন ভোরে বিগ্রহ বিসর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে 'গর্‌বো'ও নদীতে বিসর্জ্জিত হইয়া থাকে। যে সকল স্ত্রীলোক উৎসবের প্রথম হইতে শেষ দিন, অর্থাৎ নয় দিনই গরবা গানে যোগদান করে, তাহাদিগকে বাতাসার মত একপ্রকার মিষ্ট দ্রব্য দান করা হয়। পরে অবশ্য উপস্থিত আর সকলকেই মিষ্ট বিতরণ করা হয়। এই মিষ্টান্ন বিতরণকে লহানী বলে। নয় দিন ব্যাপী উৎসবে গৃহিণীকেই যে প্রতিদিন মিষ্ট বিতরণ করিতে হইবে এমন কোনও কথা নাই। গৃহিণী একদিন মিষ্ট বিতরণ করেন এবং তাঁহার দলের অপর অপর মহিলার মধ্যে যাহার যেমন শক্তি তিনিই পালাক্রমে বাকী আটদিন লহানী করেন। উৎসবের শেষ রাত্রিতে গুজরাটের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তের প্রত্যেক শহরের প্রতি রাজপথের মোড়ে মোড়ে, পল্লীতে পল্লীতে গর্‌বা গান শোনা যায় এবং এই প্রথা যে কবে হইতে সুরু হইয়াছে তাহা কেহই সঠিক বলিতে পারে না। 'গর্‌বা' বলিতে গেলে সর্ব্বসাধারণের উৎসব, সুতরাং যে-কোন মহিলা তাঁহার পল্লীস্থ উৎসবে যোগদান করিতে পারেন এবং পুরুষেরাও তাহা শুনিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নহেন। 'গর্‌বা' নৃত্যের সঙ্গে সাধারণত ঢোলকই বাদ্যযন্ত্র-হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে। তবে বর্ত্তমানে অবশ্য হার্মোনিয়ম পর্য্যন্ত চলিয়াছে।

'গর্‌বা' গানে বহু দেবীর আবাহন করা হয়, যেমন ভদ্রকালী, বহুচারজী, অম্বাজী ইত্যাদি। এখানেও যেমন, অন্যত্রও তেমনি—ধর্ম্ম হইতেই সকল শিল্পকলার উদ্ভব। এবং নৃত্যকলা ও সঙ্গীতও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় অনুভূতিরই এক একটি বিশিষ্ট প্রকাশ।

কাথিয়াবাড় অঞ্চলে আর এক প্রকার 'গর্‌বা'র চলন আছে, তাহাকে বলা হয় 'রাস'। ইহা শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীগণের রাসলীলা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। কাথিয়াবাড় অঞ্চলে এখনও স্ত্রী-পুরুষে মিলিয়া একযোগে রাসলীলা করিয়া থাকে। আবার কেবল স্ত্রীলোকেরাও স্বতন্ত্রভাবে এই গর্‌বা গাহিয়া থাকে। এইস্থানে এই কথাটিও উল্লেখ করা দরকার যে, পুরুষেরাও আবার স্বতন্ত্রভাবে তাহাদের রাস-উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। পুরুষেরা তাল দিবার জন্য এক প্রকার খাটো লাঠি ব্যবহার করে, লাঠির একধারে ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকে। এই লাঠিকে বলা হয় 'দাণ্ডি'। এই লাঠিকে তালে মানে

সঞ্চালিত করিয়া সঙ্গীতের সমতা রক্ষা করা হয়। ইহাতে গান যত-না মধুর হোক, নৃত্যের ভঙ্গী বড়ই মনোরম হয়।

দেবীর স্তবস্তুতি ছাড়াও আর এক রকম সাধারণ গর্‌বা প্রচলিত আছে, এইগুলির সবই শ্রীকৃষ্ণের প্রেম সম্বন্ধে। প্রণয়ের সঙ্গে ভক্তি ও প্রীতির অপূর্ব্ব সংমিশ্রণে এ-জাতীয় গর্‌বাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়া থাকে।

কলসী হাতে করিয়া নৃত্য

আধুনিক কবিদের রচিত গর্‌বা হইতে এই সকল ভক্তি-মিশ্রিত প্রেমের গরবাগুলি জনসাধারণের মনের উপর বিশেষ কার্য্যকরী হয়। ইহার কারণ, প্রাচীন কবিদের রচিত গরবা আকারে ছোট, ভাবের দিক দিয়াও অত্যন্ত সহজ ও সরল, তাহা ছাড়া প্রাচীন গর্‌বায় কাব্যাংশের উপর তেমন জোর না দিয়া তাহার স্বরের দিকেই বেশী জোর দেওয়ায় উহা জনসমাজে বেশী সমাদর লাভ করিয়াছে। মীরাবাঈয়ের গর্‌বা, নরসিংহ মেহতার "রাস" এবং বল্লভের রচিত গরবাগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। দয়ারাম নামে আর একজন বিখ্যাত প্রাচীন বৈষ্ণব কবির রচিত গর্‌বাগুলি সবই কৃষ্ণলীলা সম্পর্কীয়। তাঁহার

গরবায় সম্ভ্রান্ত মহিলারাও যোগদান করেন

রচিত গর্‌বা বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং আজও গুজরাটে তাহা পরম সমাদরে গীত হইয়া থাকে। এই গর্‌বাগুলির

নৃত্যের আরম্ভ

একটা বিশেষত্ব এই যে, এগুলি কখনও লিখিত হয় নাই, লোকের মুখে মুখে দেশের সর্ব্বত্র পুরুষানুক্রমে ছড়াইয়া
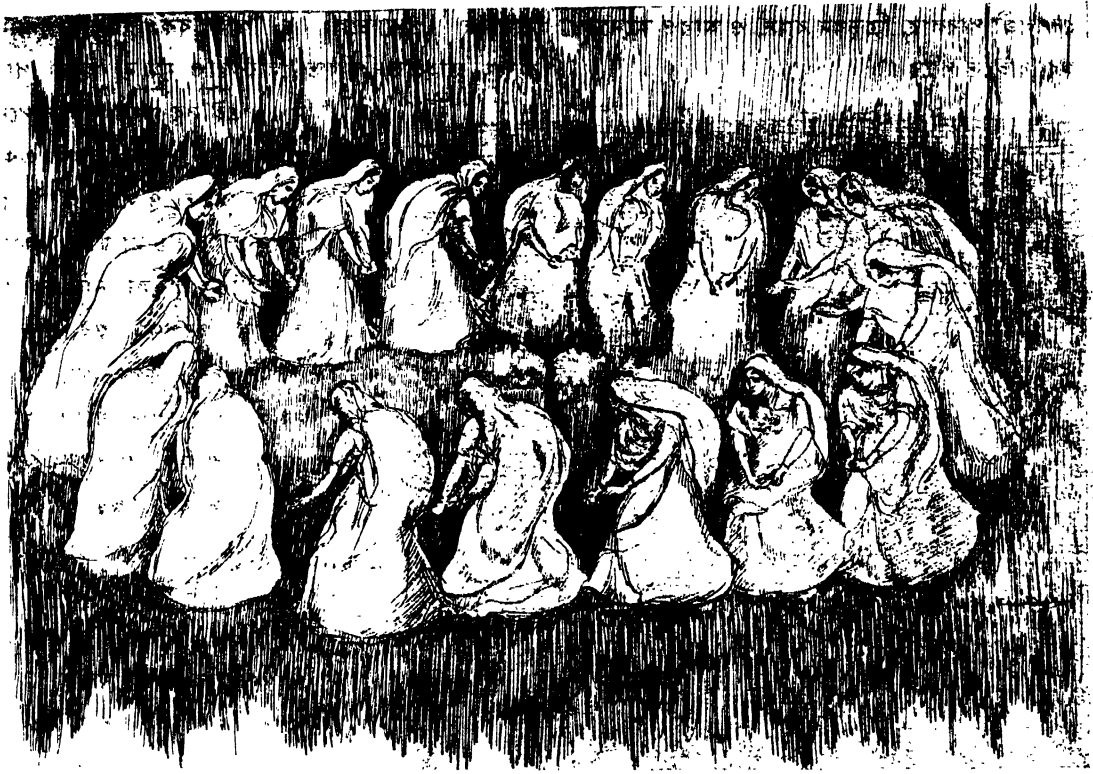
গর্‌বা নৃত্য

পড়িয়াছে এবং তাহা বর্ত্তমানে জাতিগত কৃষ্টিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আধুনিক যুগের কবিগণও গরবা লিখিতেছেন। তাহা ছাড়া এ-যুগের কবিরা প্রাচীন কবিদের রচিত গর্‌বাগুলি সঙ্কলন ও কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতেছেন। আধুনিক যুগের যে সকল কবি গর্‌বা-গান রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নন্দলাল ডি কবি মহাশয়ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইঁহার রচিত গর্‌বাগুলি কেবল কাব্যাংশেই শ্রেষ্ঠ নহে, সঙ্গীতের দিক দিয়াও অনবদ্য। বিশেষত কবি মহাশয় তাঁহার রচিত এক শ্রেণীর গরবায় যে সুর-সংযোগ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সহজ ও সরল, এই কারণে গরবা উৎসবে গীত হইবার অতি উপযোগী। ইহা ছাড়া, তিনি আর এক শ্রেণীর গর্‌বাও রচনা করিয়াছেন। সেগুলি বিভিন্ন

গর্‌বা নাচের বিভিন্ন ভঙ্গী

উৎসবে গীত হইতে পারে। কবি মহাশয় ছাড়া আরও অনেকে গরবা গান রচনা করিয়াছেন। ইঁহাদের

মধ্যে শ্রীযুক্ত দিবতিয়া, খবরদার, বোটদকার, কেশব শেঠ, দেশলজী পারলার, ত্রিভুবন ব্যাস, ও আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে।

শেষরাত্রে

কিছুদিন হইতেই গ্রাম্য গান ও গর্‌বাগুলির প্রতি শিক্ষিত লোকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, ফলে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাও এই সব গান গাহিয়া তৃপ্তি বোধ করিতেছেন। এই সব গ্রাম্য গরবাগুলি কথ্যভাষায় রচিত, সুতরাং তাহার মধ্যে এমন একটা মনোরম গ্রাম্যভাব ও স্বাভাবিক কলানৈপুণ্য দৃষ্ট হয় যে, তাহাতে শিক্ষিত লোকেরাও মুগ্ধ না হইয়া পারে না। এই সব গানে কাব্যসম্পদের প্রাচুর্য্য না থাকিলেও একটা সহজ মিষ্টতা ও সরস খাঁটি সুর আছে। রচনায় কোনো আলঙ্কারিক বাহুল্য নাই, কাজেই আবৃত্তি অপেক্ষা সুর ও লয়েই তাহা বেশী উপভোগ্য। এই সব মূল্যবান সম্পদ সংগ্রহ করিয়া দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়ার জন্য রণপুরের [কাথিয়াবাড়] সৌরাষ্ট্র পত্রের (গুজরাটী-ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাপ্তাহিক) সম্পাদকীয় বিভাগের শ্রীযুক্ত ঝাবেরচাঁদ মেঘানী মহাশয় বিশেষ করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদের পাত্র। এই গ্রাম্য-নৃত্যকলা এখনও গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বহু সম্প্রদায়ের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছে। যেমন, আমেদাবাদের লোট, ভিল, খবস, ঢেড সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা এখনও ঐ সব গ্রাম্য-গর্‌বা গান গাহিয়া নৃত্য করিয়া থাকে।

নবরাত্র উৎসবে দেবীর স্তুতি উপলক্ষে গীত হইয়া থাকিলেও এক সময় মনে হইয়াছিল গর্‌বা গানের সমাদর যেন ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু গত বিশ পচিশ বৎসরের চেষ্টায় তাহা পুনরায় গুজরাটে একটু একটু করিয়া জনপ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য, এই পুনঃপ্রচলনে গর্‌বার একটা নূতন

রূপ ও ব্যাখ্যা দিতে হইয়াছে। কেন না, লোকের শিক্ষাদীক্ষা রুচির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, কাজেই বর্ত্তমানের সঙ্গে যোগ না রাখিলে সাধারণে তাহার আদর বেশী দিন করিবে না। গর্‌বা নবরাত্র উপলক্ষে ত গীত হয়ই, তাহা ছাড়া অন্যান্য উৎসবেও গীত হয়—যেমন বিবাহ, জন্মোৎসব ইত্যাদি। পূজাপার্ব্বণ ছাড়া নিছক স্ফূর্ত্তির জন্যও গর্‌বার চলন হইয়াছে। বর্ত্তমান-কালে বিভিন্ন নারী-সমিতি ও সভা কেবলমাত্র আমোদ উপভোগের জন্য গর্‌বা গানের আয়োজন করিয়া থাকেন। শুধু ব্যক্তিবিশেষের বাড়ীতে বা সভা-সমিতিতেই যে গর্‌বার সমাদর হইয়াছে তাহা নহে; স্কুল-কলেজে সখের নাট্যাভিনয়েও গর্‌বার প্রতিষ্ঠা দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। আশ্বিন মাসে কোনো বিদেশী গুজরাট অঞ্চলে গেলেই এখানে-সেখানে স্ত্রীলোকদের গবরা নৃত্য দেখিতে পাইবেন। বর্ত্তমানে গর্‌বায় এমন সব নূতনত্বের আমদানী হইয়াছে যাহার জন্য তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোরম হইয়াছে। পূর্ব্বকালে হাতে তালি দিয়া তাল ঠিক রাখার রেওয়াজ ছিল, বর্ত্তমানে রূপার কলসী, খঞ্জরী, মঞ্জীরা ইত্যাদির প্রচলন হইয়াছে। মেয়েরা সময় সময় ছোট ছোট মাটির কলসীতে প্রদীপ লইয়া তালে তালে নৃত্য করে। আরও অনেক প্রকার নূতনত্বের আমদানী হইয়া গর্‌বা নৃত্য অধিকতর মনোরম করিয়া তোলার চেষ্টা চলিয়াছে। যে সকল স্ত্রীলোক গর্‌বা গান গাহেন তাঁহাদের সাজ-সজ্জা ও অলঙ্কারের প্রতিও সকলের দৃষ্টি পড়িয়াছে। রঙীন উজ্জ্বল শাড়ীর রেওয়াজ বাড়িয়াছে। এই সব শাড়ী রাজপুতানা ও কাথিয়াবাড়ে প্রস্তুত হয় এবং পাড়ে সোনালী ও রূপালী কারুকার্য্য

মন্দিরপথে

থাকে। গর্‌বা সাধারণতঃ রাত্রিবেলায় গীত হইয়া থাকে, কাজেই উজ্জ্বল শাড়ীতে আরও শোভন হয়। মেয়েরা পায়ে মল, পায়জোড় ইত্যাদি পরিধান করে। নাচের তালে তালে অলঙ্কারের টুংটাং শব্দ সঙ্গীতের মাধুর্য্য আরও বাড়াইয়া তোলে।

গর্‌বায় আছে রং, সুর, লীলা ও মাধুর্য্য। ইহা একদিকে যেমন জনসাধারণের আদরের বস্তু, অন্যদিকে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরাও ইহার যথেষ্ট আদর করিয়া থাকেন। ভারতের অপূর্ব্ব শিল্পকলার ভাণ্ডারে গরবা গুজরাটের এক বিশিষ্ট দান।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৬) বলিদ্বীপ—বাঙলি

রাস্তার উত্তর ধারে, প্রাসাদের পশ্চিমে খানিকটা খোলা জায়গায়, যাত্রার আসর হ'য়েছে। যাত্রার আসর ঠিক আমাদের দেশের মতন — সামিয়ানার উপরে না'রকল পাতায় ছাওয়া আসর, সাত আট শ' লোক সেখানে ব'সে দাঁড়িয়ে দেখ্‌তে পারে। আসরের মাঝখানটায় একটু খালি জায়গা, এইখানে অভিনেতারা দাঁড়িয়ে, ঘুরে ফিরে অভিনয় করে। তার চারিদিক ঘিরে দর্শক আর শ্রোতার দল মাটিতে ব'সেছে। ভুইয়ের উপর চাটাই পাতা, তার উপরে খুব ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে ব'সেছে, খাটন মালা হ'য়ে, উবু হ'য়ে। একদিকে বাজনদারের দল, গামেলান বাজনার যন্ত্র পাতি নিয়ে ব'সে আছে। আসরের চারিদিক ঘিরে উপবিষ্ট শ্রোতাদের চক্র, কেন্দ্র থেকে সাত আট জন ব'সে-থাকা মানুষের পরে দাঁড়িয়ে থাকা শ্রোতাদের আর এক চক্র। দর্শক আর শ্রোতাদের চেহারায় আর পোষাকে সেই তাজা রঙের খেলা, মেয়েদের সেই নিরাবরণ আর নিরাভরণ বেশভূষা। আমি ভীড়ের মধ্য দিয়ে আসরের প্রান্তে এসে দাঁড়ালুম। সুমধুর তালে বাদ্য বাজ্‌ছে। ইউরোপীয়েরা অনেকে আমার মতন দাঁড়িয়ে আছে—বাকেরা, খোরিস্, এঁরা এসে প'ড়লেন। তার পরে খান পাঁচ ছয় চেয়ার এনে দিয়ে গেল, পরে বাঙলির পুঙ্গব, রেসিডেণ্ট সাহেব, কবি, আর কে কে এলেন, আর এই চেয়ারগুলিতে ব'স্‌লেন। যাত্রার অভিনয় চ'ল্‌ল। আমরা যতক্ষণ ছিলুম, প্রায় বিশ মিনিট হবে, ততক্ষণ দুজন অভিনেতা কেবল বীররসের অবতারণা ক'রছিলেন। ঠিক আমাদের সেকেলে যাত্রায় ভীম আর দুর্য্যোধন, বা প্রবীর আর অর্জ্জুন, বা লক্ষ্মণ আর মেঘনাদের পরস্পরের প্রতি তুজ্জন গর্জ্জনের মতন।— অভিনেতাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুব উঁচুদরের ছিল না, একটু পুরাতন আর গরিবানা ভাবের ব'লে মনে হ'ল। শস্তা বিদেশী ছিটের পাজামা, তার উপরে একটা লুঙ্গীর মত রঙ্গীন কাপড় জড়ানো, কাপড়খানাতে খুব জরীর কাজ করা, সামনে সেটা কোমরে তুলে আটকানো,—তাতে ক'রে পিছনটায় পায়ের ডিম পর্য্যন্ত তলার ছিটের পেণ্টুলেন অনেকটা ঢেকে দিয়েছে, কিন্তু সাম্‌নে হাটুর উপর পর্য্যন্ত এই পেণ্টুলেন বেশ দেখা যাচ্ছে, গায়ে রঙচঙে' জরীর কাজ করা জামা, হাতের কব্জা পর্য্যন্ত আস্তিন, পীঠে ক্রিস বাঁধা, মাথায় মুকুট, কপালে দুই ভুরুর মাঝে একটা সাদা ফোঁটা, ঠোঁট লাল রঙে রঙানো। অভিনয়ের ভাষা বুঝলুম না, অনেক চেষ্টা ক'রে 'প্রা-ট-প' বা 'প্রতাপ', 'ডেও-আ টো্যা' বা 'দেবতা' এই রকম একটা আধটা সংস্কৃত শব্দ যেন কানে লাগছিল। তবে অভিনেতারা যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হাত চালাবার আগে জীভের একটু ব্যায়াম ক'রে নিচ্ছেন তা বুঝতে বাকী ছিল না, দেখে মনে হ'ল, একজন আর একজনকে ব'ল্‌ছে—'ইঃ—এতবড় স্পর্দ্ধার কথা! চুবাচার, এখনি তোকে রসাতলে পাঠাবো।' অভিনয়ের বিষয়টা কি জানবার চেষ্টা ক'রলুম—শুন্‌লুম যবদ্বীপের হিন্দু আমলের একটা ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত নাটক। ক্রীস বা'র ক'রে দুই বীর যখন দাপাদাপি লাফালাফি ক'রতে লাগলেন, অমনি আমাদের যাত্রার যুদ্ধে যেমন ঢোল বায়া তবলা আর খঞ্জনীর তাল দেওয়া হয় সেই রকম তালে গামেলান বাজনার আরম্ভ হ'ল। রবীন্দ্রনাথও আমাদের যাত্রার সঙ্গে এই অভিনয়ের সাদৃশ্য দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে রেসিডেণ্ট সাহেবের কাছে আর আমাদের কাছে সেকথা একাধিকবার উল্লেখ না ক'রে থাকতে পারলেন না।—প্রায় বিশ পচিশ মিনিট ধ'রে আমাদের সাম্‌নে এই দুই যুযুৎসু বীরের আস্ফালন চ'ল্‌ল; কতক্ষণ শেষ হ'ল জানি না—আমাদের অন্যত্র ডাক প'ড়ল।

ইতিমধ্যে বেলা একটা বেজে গিয়েছে। সকালে সেই কিন্তামানির ডাক বাঙলায় দুটুক্‌রো রুটী আর ডিম খাওয়া হ'য়েছিল,—অনেকের তাও জোটে নি। বাঙলির পুঙ্গবের গৃহে আমাদের মাধ্যাহ্নিক সেবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল, কবিকে সেখানে নিয়ে গেল, আমরাও তাঁর অনুগমন ক'রলুম। পুঙ্গবের বাড়ীতে যেতে হ'ল—চৌরাস্তা থেকে পূবে একটা ছায়াশীতল রাস্তা ধ'রে একটুখানি গিয়েই বাঁয়ে তাঁর 'পুরী' বা প্রাসাদ। বলিদ্বীপের বাড়ীর ভিতর এই প্রথম প্রবেশ। একটী তোরণদ্বার পার হ'য়ে এক প্রশস্ত চত্বরে প'ড়লুম—বাঙলাদেশের পল্লীগ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বা'র-বাড়ীর ঘাসে ঢাকা আঙিনার মতন। এই চত্বরের তিন দিকে ঘরবাড়ী, আর উত্তর দিকে আর একটী তোরণ পার হ'য়ে কতকগুলি ঘর। এই গুলিই হচ্ছে বাঙ্‌লির পুঙ্গবের খাস কামরা। উঁচু চাতালের উপর কতকগুলি বড়ো বড়ো ঘর, সামনে বেশ বড়ো একটু দর-দালান —আমাদের দেশের পূজোর দালানের মতন। ইটের বাড়ী, টালির ছাত, দরজায় কড়িকাঠে আড়কাঠে খোদাই কাজ করা। দর-দালানটীতে ভোজনের স্থান করা হ'য়েছে ইউরোপীয় কায়দায় লম্বায় আর আড়ে T অক্ষরের আকারে সব টেবিল সাজানো। অতিথিরা স্নান-ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলেন, নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ ক'রলেন। রেসিডেণ্ট সাহেব কবিকে নিয়ে ব'সলেন, আর অন্য অন্য মাননীয় অতিথিরাও ব'সলেন—ডচ্‌ আর বলিদ্বীপীয়—আমাদের গৃহকর্ত্তাও ব'সলেন। কবিকে দেখে বিশেষ শ্রান্ত ব'লে বোধ হ'চ্ছিল। সেই সকালে মোটরে চ'ড়েছেন, তার পরে বাঙলির উৎসবের গোলমালের মধ্যে থাকতে হ'য়েছে—স্নান-টান হয় নি, ভোজে বসার চেয়ে একটু নিরিবিলি বিশ্রাম করা তাঁর বেশী দরকার ছিল। কিন্তু উপায় নেই—তাঁর প্রতিষ্ঠার গৌরবের ভার তাঁকে বহন ক'রতেই হবে। ভোজন ব্যাপার চুকতে ঘণ্টা দেড়েক লাগ্‌ল। ডচ, যবদ্বীপীয় আর বলিদ্বীপীয়, এই তিন রকমের মিশ্র ব্যবস্থা। সুমাত্রায় আর বাতাবিয়ায় রাইস্‌ট্-টাফ্‌ল্‌ খাওয়ার কল্যাণে যবদ্বীপীয় ভোজনের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টেছিল—দেখ্‌লুম বলিদ্বীপীয় রান্না ওই পর্য্যায়েরই। শূলপক্ক 'গ্রাম্য-বরাহ' মাংস বলিদ্বীপের ভোজের একটী পদ, এটা বোঝা গেল। খাওয়ার টেবিলে আমার দুপাশে আর সামনে বলিদ্বীপীয় অভিজাত বংশের পুরুষ কতকগুলি ব'সেছিলেন, ভাষার অভাবে কথা কওয়া হ'য়ে উঠ্‌ছিল না বটে—কিন্তু তাঁদের স্মিত হাস্যে আর বিনয়-পূর্ণ ব্যবহারে বেশ একটা হৃদ্যতার পরিচয় পাচ্ছিলুম।

খাওয়া শেষ হবার পরে, বেলা তিনটের দিকে, কারাঙ-আসেমের রাজা বাড়ী ফিরবেন, কবি কারাঙ-আসেমে গিয়ে তাঁর অতিথি হবেন, স্থির হ'ল তাঁর নিজের গাড়ীতে ক'রে তিনি কবিকে নিয়ে যাবেন। রাজার গাড়ী এল—বিরাট এক মোটর-কার, তার সামনের কলের বাক্সের মাথায় mascot বা শুভ-লাঞ্ছনস্বরূপ খাটী সোনার বড় একটা গরুড়মূর্ত্তি,—প্রসারিতপক্ষ সুপর্ণ রাজার বাহনকে যেন রক্ষা ক'রছেন। এই গরুড়মূর্ত্তিটী তৈরী করাতে সোনায় আর বানীতে রাজার প্রায় হাজার দুই টাকা খরচ হ'য়েছে। কারাঙ-আসেমের রাজা—এঁর পুরো নাম Hida Anake Agoeng Bagoes Djelantik 'হিডা আনাকে আগুঙ্‌ বাগুস্‌ জেলান্তিক্‌',—দেখতে ক্ষীণকায়, খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু খুব বুদ্ধিমান লোক ব'লে মনে হ'ল। এঁর পরণে ছিল সবুজ রঙের কাপড়, গায়ে সাদা গলা-আঁটা কোট, পায়ে ইউরোপীয় জুতা, মাথায় জরী লাগানো ঘরের চালের ছাঁচের মত কপাল-ঢাকা ইউরোপীয় ফৌজী টুপী; আর সব চেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রছিল, তাঁর মোটরের সোনার গরুড়ের মতন, তাঁর গলায় বিরাট এক ঘড়ির চেন—মাথার ফিতার মত চওড়া, চেপ্‌টা আকারের, সোনার তৈরী। বলিদ্বীপের রাজাদের রীতি-মত, তাঁর সঙ্গে ছিল দুজন ছোকরা বয়সের অঙ্গ-ভৃত্য—একজন হ'চ্ছে রাজার তাম্বূলকরঙ্কবাহী—চৌকো বাক্সের আকারের নক্‌শা-কাটা সোনার পানের বাটা হাতে; আর একজন রাজার তরবারিবাহী, রাজার সোনার হাতলওয়ালা জহরতের কাজকরা খাপে পোরা তলওয়ার কাঁধে। শ্রীযুক্ত কারোন, বাঙলির পুঙ্গব, আর অন্য অন্য ব্যক্তিদের কাছথেকে বিদায় নিয়ে কবি কারাঙ-আসেমের রাজার গাড়ীতে উঠ্‌লেন। রাজা নিজে উঠ্‌লেন, তাঁর দুই

ভৃত্য উঠে মোটর-চালকের পাশে ব'স্‌ল, এঁরা কারাঙ-আসেম অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। কবির সঙ্গে স্বরেন বাবুও রইলেন। আর স্থির হ'ল যে আমরা বাঙলির উৎসব ক্ষেত্রে আরও খানিকক্ষণ কাটিয়ে ঘণ্টাখানেক ঘণ্টাদেড়েক পরে যাত্রা ক'রবো।

'আভ্যন্তর মানব'কে তুষ্ট ক'রে আমরা উৎসবক্ষেত্রে আবার অবতীর্ণ হলুম। এইবারে দেখি, ভীড় আরও বেড়েছে, আর একটী নয়নাভিরাম অনুষ্ঠানের জন্য লোকেরা তৈরী হ'চ্ছে। একটি মিছিল বা যাত্রার আয়োজন হ'চ্ছে। ছাতি ধ'রে, বল্লম ঘাড়ে ক'রে পদাতিকের দল সার দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, আর অনেকগুলি কম-বয়সী মেয়ে মাথায় কাঠের ডমরু-পদ পাত্র আর জলের ভৃঙ্গার নিয়ে দাঁড়াচ্ছে—এদের সকলেই উৎসবের জন্য সুসজ্জিত হ'য়ে এসেছে; আর ছাতার নীচে কতকগুলি শ্বেতাম্বর ব্রাহ্মণ 'পদণ্ড' দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে গামে-

বলিদ্বীপ শোভাযাত্রা

লানের বাদ্য নিয়ে এরা যাত্রা ক'রলে, বাঙলি গ্রামথেকে প্রায় দেড় মাইল দূরে একটা স্রোতস্বিনী আছে, এরা সেখানে 'জল সইতে' যাচ্ছে—নদী থেকে এরা ভৃঙ্গারে ক'রে 'তোইয়া-তীর্থা' বা তীর্থতোয়—তীর্থ-সলিল আনতে যাচ্ছে; এই তীর্থজল শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানে লাগ্‌বে। বাকেরা, আর কেউ কেউ এদের সঙ্গে নদী পর্য্যন্ত গেলেন; বেলা তিনটের চড়চড়ে' রোদে আমি দেড়মাইল দেড়মাইল তিন মাইল মিছিলের অঙ্গীভূত হ'য়ে হাঁটা সমিচীন বিবেচনা ক'রলুম না, আমি বাঙলিতেই র'য়ে গেলুম। ধীরে ধীরে এই মিছিল যাত্রা ক'রলে, দেখে আমরা নয়ন সার্থক ক'রলুম। যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে উৎসবক্ষেত্রের ভীড়টা একটু পাতলা হ'য়ে গেল।

ইতিমধ্যে আর একটি অপরূপ দৃশ্য নজরে প'ড়ল। মৃতের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্য বস্ত্র তৈজসাদি যেখানে রক্ষিত হ'য়ে আছে, পূব দিকের সেই বড়ো মণ্ডপটীতে রাজবাড়ীর মেয়েরা দলবদ্ধ হ'য়ে এলেন। ধীরে ধীরে এঁরা গড়েন পথ দিয়ে মণ্ডপের মাচায় উঠলেন—কী মনোহর, আর রাজকন্যা আর রাজবধূদেরই উপযুক্ত গতিভঙ্গি এদের! পরিধানে সোনালী কাজকরা গাঢ় নীল রঙের, বেগুনে রঙের আর আবীরের রঙের বস্ত্র, তার উপরে সোনালী-ছাপ-মারা বক্ষোবস্ত্র, কারু কারু কাঁধে পাতলা কাপড়ের ছোবানো বা সাদা জালের কাপড়ের একখানি ক'রে ছোট উত্তরীয়; সৌষ্ঠবময় অংশদেশ অনাবৃত, খালি পা, কানে সেই সনাতন তালপাতার গোঁজ—'সদ্যঃকৃত্ত-দ্বিরদরদ-চ্ছেদ-গৌর' বর্ণে তুচ্ছ এই তালপাতার অলঙ্কার তাদের কালো চুলের পাশে মহার্ঘ বস্তু ব'লে বোধ হ'চ্ছিল; কারু বা কানে কালো কাঠের গোঁজ; কারু দুই রগের নীচে দুই ভুরুর পাশে গোলগোল ছোট্ট ছোট্ট সবুজ পাতার টিপ লাগানো—সত্যিকারের 'পত্র-রচনা'; এদের গায়ে অলঙ্কার খুবই কম—এক বা দু হাতে হয় তো কারু বা একগাছি ক'রে সোনার কাঁকন, কারু বা কনুইয়ের উপর বাঁকা তাড় একগাছি ক'রে—গলায় হারবা মালার পাটই নেই। মাথায় এলো খোঁপায় বাঁধা সুপ্রচুর কেশ-রাশির মধ্যে নানারঙের ফুল গোঁজা, আর দু একটি ক'রে পাতলা সোনার গহনা, প্রজাপতির মতন দেখ্‌তে, প্রতি পদক্ষেপে গতির হিল্লোলে বা শিরশ্চালনায় সোনার এই কেশের অলঙ্কারের তারের কাজ, মাথার পুষ্পরাশির মধ্যে ফুলের সোনার কেশরের মতন কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ছে।

রাজবাটীর মহিলারা এই মণ্ডপে উঠে, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি অনুষ্ঠান সেরে আস্তে আস্তে নেমে চ'লে গেলেন।

রেসিডেণ্ট সাহেব উৎসবক্ষেত্রেই ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমার আরও অনেক কথা হ'ল। নানা খুঁটানাটী বিষয়ে তাঁর সহৃদয়তা আর বলিদ্বীপের

লোকেদের প্রতি তাঁর একটা আন্তরিক টানের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।—আর একটী জিনিস বেশ লাগল; বাঙলির পুঙ্গব আর অন্য অন্য বলিদ্বীপীয় জমিদার ঘরের ব্যক্তিদের সঙ্গে একটা বেশ সহজ সৌজন্যতার—এমন কি আত্মীয়তার—সঙ্গে এঁর ব্যবহার। এই ব্যক্তিগত আত্মীয়তার ভাবটুকু ডচ্ রাজকর্ম্মচারীদের একটা বিশেষত্ব। বলিদ্বীপের স্মৃতির সঙ্গে রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত কারোনের সৌজন্য-পূর্ণ ব্যবহার আমার মনে চিরকাল উজ্জ্বল হ'য়ে জাগরূক থাক্‌বে।

'তোয়-তীর্থ' নিয়ে শোভাযাত্রা ফিরে এলো। সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে। আমাদের কারাঙ-আসেম যাবার জন্য তৈরী হ'তে হবে, নইলে পৌঁছুতে রাত হ'য়ে যাবে। সঙ্গী বন্ধুরা ফিরে এলেন, ধীরেনবাবু, দেউএস্, কোপ্যারব্যার্গ, বাকে-দম্পতী—সবাই তৈরী হ'লেন। এমন সময়ে রেসিডেণ্ট সাহেব আমায় ডেকে নিয়ে গেলেন—একটি চালা-ঘরে শ্রাদ্ধের একটি শেষ অঙ্গস্বরূপ পদণ্ডদের ভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছে, তাঁরা ভোজনে ব'স্‌বেন, তাই দেখ্‌তে। চালা-ঘরটির চারদিক খোলা; মেঝেয় মাদুর বা চাটাই পাতা। নাতিদীর্ঘ একটি পংক্তিতে জন-তিরিশেক পদণ্ড ব'সে আছেন। পদণ্ডেরা সাধারণ বলিদ্বীপীয় রঙীন কাপড় আর অন্য রকমের গাছপালার নক্‌শা-কাটা কাপড় প'রে আছেন, কারু কারু গায়ে জামাও আছে। অনেকের মাথায় ঝুঁটা বাঁধা, প্রায় সকলেরই ছোটো বা বড়ো দাড়ী আছে। প্রত্যেকের সামনে বস্‌বার চাটাইয়ের উপরে রাখা ডমরু আকারের কাঠের পায়াওয়ালা বারকোষের মত পাত্র একটি ক'রে, সেটি আভের কাজ করা বেতের ঢাকনা চাপা দেওয়া। পদণ্ডদের প্রত্যেকের পিছনে এক বা একাধিক ছাত্র বা শিষ্য ব'সে আছে। প্রত্যেক পদণ্ডকে তাঁরা মর্য্যাদার জন্য দক্ষিণা-স্বরূপ একাধিক বলিদ্বীপীয় কৌষেয় বস্ত্র দান করা হ'য়েছে - ভোজন কক্ষে গিয়ে দেখি, তাঁরা সেগুলি গ্রহণ ক'রেছেন, তাঁদের পৃষ্ঠভাগে উপবিষ্ট অন্তেবাসীদের হাতে তুলে দিচ্ছেন, আর তারা বেতের তৈরী ব্যাগের মত চমৎকার স্থালী এনেছে তাইতে কাপড়গুলি পূরে রাখ্‌ছে। গৃহস্বামী বাঙলির পুঙ্গব বিনয়নম্রভাবে মাদুরের উপরে ব'সে আছেন। আশেপাশে অভ্যাগত অন্য জনগণ আর চাকর-বাকর, সম্ভ্রমপূর্ণ দৃষ্টিতে পদণ্ড-ভোজন দেখ্‌ছে। সাহেব অতিথিদের সঙ্গে গৃহস্বামী আগেই আহারেই ব'সে গিয়েছিলেন, সেটা বোধ হয় এদেশের রীতিতে বাধে না। শ্রীযুক্ত কারোনের সঙ্গে আমিও ভোজন মণ্ডপে উঠে দাঁড়ালুম, যে চাটাইয়ের উপরে পদণ্ডরা ব'সেছিলেন, আর যার উপর তাঁদের আহার্য্য রক্ষিত হ'য়েছিল তার উপর জুতো পায়ে দিয়ে আমরা উঠ্‌লুম, তাতেও আট্‌কালো না।—দক্ষিণার বস্ত্র গ্রহণের পরে এরা খাবারের থালের ঢাক্‌না খুল্‌লেন, ব্রাহ্মণ-ভোজনের উপকরণ তখন আমাদের নয়নগোচর হ'ল। নৈবেদ্যের আকারে ভাত বাড়া হ'য়েছে; তার চারদিকে নানা রকমের তরকারী; ছোটো ছোটো পাত্রে তরকারী, ওই থালার উপরেই সজ্জিত র'য়েছে; আর ভাতের পাশে প্রত্যেকের থালায় রাখা হ'য়েছে একটি ক'রে আস্ত অগ্নি-দগ্ধ হংসদেহ। বুঝ্‌লুম, এই 'রোস্‌ট্‌ ড্যাক্' হ'চ্ছে এখানকার একটা রাজভোগ, তাই ব্রাহ্মণদের জন্য তার ব্যবস্থা হ'য়েছে। ভাতের ঢাকনা খুলে, প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পাশে পুষ্পপাত্র আর জলের পঞ্চপাত্র ছিল, তা থেকে তাঁরা জল নিয়ে আচমন ক'রলেন, তারপর প্রত্যেকে বিড় বিড় ক'রে মন্ত্র প'ড়তে প'ড়তে অঙ্গুলি সহযোগে মুদ্রা ক'রতে আরম্ভ ক'র্‌লেন। দশ আঙুল দিয়ে এই মুদ্রা করাটী এক বড়ো আশ্চর্য্য ব্যাপার—এরা নানা রকমের কঠিন অঙ্গুলি-সঙ্কেত এমনি অবলীলাক্রমে ক'রতে লাগ্‌ল যে দেখে অবাক হ'য়ে যেতে হয়। কতকাল ধরে অনন্যকর্ম্মা হ'য়ে ক'রলে পরে তবে এই মুদ্রার সাধনায় এদের মতন সিদ্ধ হওয়া যায় তা জানি না; তবে আট দশ বছর বয়স থেকে চব্বিশ পঁচিশ পর্য্যন্ত এই শিক্ষায় পদণ্ডদের বাল্য কৈশোর আর যৌবন কেটে যায়। কর-মুদ্রার এই সমস্ত অদ্ভুত অঙ্গুলি-সঞ্চালনের যে একটি মোহমন্ত্রবৎ শক্তি আছে, তা স্বীকার ক'রতে হয়; মনেও এর একটা যেন প্রভাব এসে পড়ে, মনে হয় বুঝি বা অঙ্গুলির এই মোহময় সঞ্চালন-নৃত্যের ফলে দেবতারাও আকৃষ্ট হ'য়ে আস্‌ছেন। এ বিষয়ে

বলিদ্বীপের পদণ্ডেরা এখনও বিশেষ দক্ষ, ভারতবর্ষে এ বিষয়ে এদেশের সমকক্ষ তান্ত্রিক সাধক বোধ হয় খুব বেশী পাওয়া যাবে না। করমুদ্রা সহযোগে দেবার্চ্চনা বা মন্ত্রসাধন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে চীন আর জাপানেও প্রবেশ লাভ করেছে, আর জাপানের বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-বিশেষের অনুষ্ঠানে এই কর-মুদ্রা এখনও একটা বড়ো স্থান দখল ক'রে আছে। বলিদ্বীপের পদণ্ডদের হাতের মুদ্রা দেখে ডচ্ আর অন্য ইউরোপীয়েরাও তার আকর্ষণী শক্তিকে মান্‌তে বাধ্য হ'য়েছে। এইরূপে খানিকক্ষণ মুদ্রা ক'রে ক'রে মন্ত্র আওড়াতে লাগলেন, মাঝে আবার ডাইনে বাঁয়ে তাকাতে লাগ্‌লেন, টগর-জাতীয় এক রকম ফুল নিয়ে হাতের তালি বাজিয়ে সজোরে দক্ষিণ দিকে ফেলে দিলেন, এই ভাবে ভোজনারম্ভের অনুষ্ঠান শেষ ক'রে অন্নে হাত দিলেন।

ইতিমধ্যে বন্ধুরা তৈরী, পাচটা বাজে, আমাদের এখনি যাত্রা ক'রতে হবে, এক তো দেরী হ'য়েই গিয়েছে। ব্রাহ্মণেরা সেবায় ব'সলেন, আমরাও বিদায় নিলুম—আমাদের গৃহকর্ত্তা আর রেসিডেণ্ট সাহেব আর অন্য ভদ্রলোকদের অভিবাদন ক'রে আমরা গাড়ীতে চ'ড়লুম্। বাঙলিতে আমাদের সঙ্গে একজন আধা-ডচ্ আধা-যবদ্বীপীয় ডাক্তার আর তাঁর যবদ্বীপীয় স্ত্রী কারাঙ-আসামে চ'ললেন!

আবার সেই নয়নাভিরাম দেশের মধ্যে দিয়ে যাত্রা। সৌন্দর্য্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার যেন শেষ হ'তে চায় না। একে একে পাহাড়ের পর পাহাড় ক্ষেতের পর ক্ষেত পার হ'য়ে আমরা যেতে লাগলুম্। ক্রমাগত ধানের ক্ষেত, আর না রকল বাগান,বাঁশ-ঝাড়,আর কলা-বাগান। ছোটো ছোটো পাহাড়ে' নদী পেরুলুম্ অনেকগুলি লোহার ঝোলা সাঁকো দিয়ে এই নদীগুলির উপর দিয়ে পথ ক'রেছে। বিকাল বেলা, সন্ধ্যে হয় হয়, পাহাড়ে' নদীর উপল-বিষম তীরে বহুস্থলে স্নানার্থিনী আর স্নাননিরতা বলিদ্বীপীয় জনপদ-বধূ আর গ্রামণী-কন্যাদের মেলা—হঠাৎ চোখে প'ড়ে, গ্রীক কবিদের বর্ণিত তাদের আফ্রোদিতে আর্তেমিস্ প্রভৃতি দেবী আর দেবকন্যাদের নানা কাহিনী স্মরণ করিয়ে' দিতে লাগল। পথে আমরা Kloeng-koeng ক্লুঙকুঙ আর Kosambe কোসাম্বে নামে দুটি বড়ো গণ্ডগ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম্। সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিকটা পথ;—এই অনির্ব্বচনীয় সুন্দর পথকে সমুদ্রের সান্নিধ্য আর ও সুন্দর ক'রে তুলেছে। কারাঙ-আসেম রাজ্যের এলাকা যেখান থেকে আরম্ভ হ'ল, সেখানে রাস্তার উপরে একটি উঁচু লোহার তোরণদ্বার বানিয়ে রেখেছে। আমরা দেহে শ্রান্তি অনুভব ক'রছি, তবু নয়নের আর তৃপ্তি যেন হয় না। এইভাবে পথ চ'লতে চ'লতে যখন আঁধার হয় হয়, এমন সময়ে, আমরা কারাঙ-আসেম শহরে এসে পৌঁছুলুম্। এখানে খালি কবি আর সুরেনবাবু রাজার বাড়ীতে থাকবেন স্থির হ'য়েছিল, তাঁরা সেখানেই উঠেছিলেন। বাকী আর সকলের জন্য কারাঙ-আসেমের 'পাসাঙ্গ্রাহান' বা ডাক-বাঙলা নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছিল। মালপত্রের মোটর সমেত আমরা সেই ডাক-বাঙলায় গিয়েই উঠলুম্, ডাক-বাঙলার 'মান্দুর' বা খানসামা আমাদের অভিবাদন ক'রে স্বাগত ক'র্‌লে। মালপত্র নামিয়ে, যে যার ঘর ঠিক ঠাক ক'রে নিয়ে, মোটরের সারা দিনের ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে, মুখ হাত ধুয়ে ব'স্‌তে ব'স্‌তে অন্ধকার ঘনিয়ে এল—বলিদ্বীপে আমাদের ঘটনা বহুল প্রথম দিবসটী এইরূপে সাঙ্গ হ'ল।

(৭) বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম

পাসাঙ্গ্রাহানে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে আমরা বাঙলির 'পুরী' বা রাজবাটীতে কবির কাছে গেলুম্। পথে ডাকঘর, পুলিস আফিস প্রভৃতি সরকারী আপিস পড়ে। কারাঙ্-আসেমকে শহর না ব'লে বড়ো একটী গ্রাম বলা চলে। একটী বড়ো রাস্তা আছে, রাস্তার ধারে কতকগুলি দোকান-চীনেমান দোকানদার বেশী, নানা মণিহারী জিনিস বিক্রী করে, চীনা ফোটোগ্রাফরও একজন আছে; আর দু চার জন বোম্বাইয়ে' খোজার দোকানও আছে, এরা বিলিতি কাপড় আমদানী ক'রে বেচে। আরব কাপড়ওয়ালা আছে, এরা বোম্বাইয়েদের কাছ থেকে কাপড়

নিয়ে গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি ক'রে বেড়ায়। ফল ফুলুরী মাছ তরীতরকারী ধান চালের একটা বাজারও আছে। এই বড়ো রাস্তা ধ'রে গিয়ে পুরীতে পৌছুতে হয়, রাস্তা সেখানেই শেষ হ'য়ে গিয়েছে। কোপ্যারব্র্যার্গ সব চেনেন, তিনি আমাদের নিয়ে চ'ল্‌লেন। ন্ত্রেউএস্, বাকে দম্পতী, ধীরেনবাবু, আমি, চ'ললুম। রাস্তা শেষে ডানদিকে পুরী। এই রাজবাটী হালের তৈরী। রাস্তার বাঁ দিকে সরু একটী গলিপথে পুরাতন পুরী – রাজা সেখানে এখন আর বাস করেন না, এখন অনেকটা বেমেরামতী অবস্থায় এই পুরী প'ড়ে আছে। এ বাড়ীটী বলিদ্বীপের ভদ্রাসন বাস্তুরীতির একটী সুন্দর নিদর্শন। পরে আমরা একদিন এই বাড়ীটী দেখে আসি। রাজবাড়ীর তোরণদ্বারে জনকতক বলিদ্বীপীয় লোক ব'সে আছে, প্রহরীর মত; আমরা আস্‌তে এরা ভিতরে এত্তেলা দিলে। তোরণ পেরিয়ে ঢুকেই একটা মাঠের মতন আঙিনা। আঙিনার ডানধারে আটচালা ঘর একখানা, সেখানে বাড়ীর জন্য কাঠ-কাঠড়ার কাজ হয়। আর একটী তোরণ দিয়ে বা'র বাড়ীর দ্বিতীয় মহলে ঢুকতে হয়। এখানে খুব কাজ-করা কাঠের থাম আর দরজা জানালাওয়ালা বড়ো একটী অলিন্দ বা দালান যুক্ত কতকগুলি ঘর। এই দালান আর ঘর দ্বিতীয় তোরণের প্রায় সাম্‌নাসামনি পড়ে। দালানটী হ'চ্ছে রাজার বৈঠকখানা, আর ঘর-গুলিতে সম্ভ্রান্ত অতিথিরা থাকেন। ঘরগুলি ইউরোপীয় ধরণে সাজানো। দামী আসবাবপত্র খাট-বিছানা আছে। দরজাগুলিতে চমৎকার খোদাই কাজ। ঘরে দু চারখানি তৈজসপত্র আছে, চুরোটের ডিবা, দেয়াশলাইয়ের বাক্স, ছাইয়ের পাত্র,সব ভারী ভারী সোনার তৈরী, নকশা-কাটা।

জানালায় পরদা আছে, আবার এদিকে মেঝেতে কার্পেট নেই। ঘরগুলির পিছনে যথারীতি স্নানের ঘর ইত্যাদি আছে। দালান আর ঘর উঁচু পোতার উপর। তার সামনে একটুখানি উঠান, কাঁকর-ঢাকা,—দু চারটী গাছ আছে তাতে। উঠানের পরে একটী পুষ্করিণীযুক্ত ছোটো বাগিচা। পুষ্করিণীর মাঝে একটী বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছতরী। দালানে দাঁড়িয়ে পুকুরটীর দিকে তাকালে ডান ধারে পড়ে বাইরে যাবার তোরণ, আর বাঁ হাতে পড়ে ভিতর বাড়ী, রাজার শুদ্ধান্তঃপুর। রাজবাড়ীর মেয়েরা অসূর্য্যম্পশ্যা নয়, কিন্তু তা ব'লে সাধারণতঃ

বলিদ্বীপীয় ছতরী

লোকচক্ষের সাম্‌নে এঁরা আসেন না। দালান আর পুকুরের মাঝে একটা উঁচু চবুতরা বা ছতরী আছে। সেটাকে নানা রঙের কাপড়, জরী, আর তাল আর নারকেল পাতার ঝালর দিয়ে বেশ ক'রে সাজানো হ'য়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দালানে দেখা হ'ল। রাজার আপ্যায়নের আতিশয্যে প্রথমটা একটু অস্বস্তিতে ছিলেন। কবি যাতে আরামে আনন্দে থাকতে পারেন, রাজা সে বিষয়ে খুবই অবহিত। কিন্তু কি ভাবে তা করা যায় তা তাঁর অজ্ঞাত। একই গাড়িতে ঘণ্টাদেড়েক পথ রাজার সঙ্গে এসেছেন,—কেউ কারু ভাষা জানেন না। ভাষা-সাম্য নেই, মূক হ'য়ে পাশাপাশি ব'সে আছেন,—পথে হঠাৎ সমুদ্র দেখে রাজা কবিকে সমুদ্র-বাচা কতকগুলি সংস্কৃত শব্দ শুনিয়ে দিলেন, তার পর ভারতবর্ষের পৌরাণিক ভৌগোলিক নাম কতকগুলি শুনিয়ে দিলেন। এই ভাবে কবির সঙ্গে তাঁর সংস্কৃতি-গত যোগের কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে কবির মনে আত্মীয়ভাব আনবার জন্য তাঁর আগ্রহ।

কবি পুরীতে পদার্পণ ক'রতে, তাকে স্বাগত ক'রে সুসজ্জিত মণ্ডপে রাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা মিলে একটি অনুষ্ঠান করেন, সুললিত ভাবে মন্ত্রাদি পাঠ করেন। মাননীয় অতিথিকে সম্মাননা দেখাবার জন্য রাজা আগে থাকতেই এই ব্যবস্থা ক'রে রেখে ছিলেন। কবিকে তাঁর কামরায় অধিষ্ঠিত ক'রে দিয়ে রাজা ঘরের বারান্দায় বা দালানে হাজির রইলেন, অতিথির সেবার যাতে ক্রটি না হয়। তার পর কবির থাকবার ঘরটী, বিবিক্ত-দেশ ব'ল্‌লে যা বোঝায়, তা একেবারেই নয়। ঘরের সামনে রাজার কাছে হরদম লোকজন যাওয়া-আসা ক'রছে, আঙ্গিনার কাঁকরের উপরে কার্য্যার্থী প্রজার দল এসে হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে, কথাবার্ত্তা লোকের চলাফেরা খুবই হ'চ্ছে। কবি পথ-ভ্রমণে বিশেষ ক্লান্ত, তিনি যে নির্জ্জনে আর নিস্তব্ধতার মধ্যে একটু বিশ্রাম ক'রতে চান, ভাষা সঙ্কটে প'ড়ে সেকথা রাজাকে বুঝিয়ে দিতে পারা যাচ্ছিল না। শেষে কে বুদ্ধি ক'রে বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালার দোকান থেকে দোভাষীর কাজ করবার জন্য একজন খোজা বানিয়াকে পুরীতে ডেকে নিয়ে এল। কবির আহারাদির ব্যবস্থা কি রকম হবে, তাঁর কি কি আবশ্যক, এই সব প্রশ্ন রাজা তাকে দিয়ে করালেন। লোকটী কবিকে আশ্বাস দিলে যে রাজা অতি সৎলোক, কবিব কোনও তকলিফ হবে না, 'আরামসে' আর 'মজেমে' রাজবাটিতে তিনি থাক্‌তে পারবেন। যার ভাষা বোঝা যায় এতক্ষণ পরে এমন একজনকে পেয়ে কবি আর সুরেন বাবু সত্য সত্যই একটু আশ্বাস পেলেন। হিন্দুস্থানীতে তাকে ব'লতে সে বলিদ্বীপের ভাষায় তরজমা ক'রে রাজাকে আর রাজার লোকেদের বুঝিয়ে দিলে যে রাজা তাঁর অতিথিকে একটু একলা থাক্‌তে দিয়ে নিজেও বিশ্রাম করুন। রাজা তখনই সেইমত ব্যবস্থা ক'র্‌লেন। কবি একটু আরামের নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন। একটু বিশ্রাম ক'র্‌ছেন, এমন সময়ে আমরা গিয়ে উপস্থিত হ'য়েছি। মালাই-ভাষী দ্রেউএস্ এর আগমনে কবিকে আর রাজার সঙ্গে মূকবৃত্ত হ'য়ে চ'ল্‌তে হবে না।

রাজার সঙ্গে দেখা হ'ল। সহাস্যমুখে আমাদের স্বাগত ক'র্‌লেন। দেখলুম, বাড়ীতে তিনি খালি-পায়েই চলাফেরা ক'রে থাকেন; on his native heath—স্বভবনে রাজাকে দেখে মনে হ'ল, অবস্থায় ইনি আমাদের দেশের মাঝারিগোছের জমীদারের মতনই হবেন। রাজা ডচদের অধীনে ম্যাজিষ্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত—এঁর সরকারী পদবী হচ্ছে Stedehouder. এঁরা বৈশ্যবংশীয়। বলিদ্বীপে Bramana ব্র-মা-না, Satrija সাত্রিয়া, Wesija ওএসিয়া ও Soedara সুদারা—এই চতুর্বর্ণ আছে, শূদ্রেরা সংখ্যায় বেশী, শতকরা তিরেনব্বই জন শূদ্র, বাকী সাত জন Triwongse ত্রি-ওঅং-সে বা ত্রিবংশ—অর্থাৎ তিনটী 'দ্বিজ'বংশের লোক। রাজার পিতা একজন খুব শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি দিলেন, রাজাও পিতার নিকট থেকে এই গুণ বা শিক্ষা পেয়েছেন। তার পরিচয় পরে আমরা পাই। রাজা ডচ্ জানেন না, মালাই জানেন। বছর এগার বয়সের তাঁর একটী ছেলে আছে, তাকে ডচ্ পড়াচ্ছেন। কৌলিক হিন্দুধর্ম্মে এঁর বিশেষ আস্থা। এঁর বাড়ীতে অনেকগুলি অতিথিকে রাখবার মতন স্থান নেই, তাই আমাদের পাসাঙ্গ্রাহানে ওঠবার বন্দোবস্ত হ'য়েছিল। রাত্রি হ'য়ে যাচ্ছে, কবিও শ্রান্ত; খানিকক্ষণ পরে কবির কাছ থেকে আর রাজার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এলুম।

আগেই ব'লেছি দ্বীপময় ভারতের সরকারী ডাক-বাঙলাকে 'পাসাঙ্গ্রাহান' বলে। শব্দটীর মূলে আছে আমাদের সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দ। রাজকর্ম্মচারীরা 'ভ্রাম্যমান' হ'লে পাসাঙ্গ্রাহানে এসে ওঠেন। তাঁদের অধিষ্ঠান হ'লে আশপাশের মাতব্বরদের বা কার্য্যার্থীদের 'সংগ্রহ' বা মেলা বা একত্রিত হওন ঘটে, তাই যে স্থানে এই একত্রীকরণ বা সংগ্রহ হয়, সেই স্থানকে জানাবার জন্য সংস্কৃত 'সংগ্রহ' শব্দের উত্তর মালাই ভাষার উপসর্গ 'প' বা 'পা' আর প্রত্যয় 'অন্' বা 'আন্' যোগ ক'রে ইন্দোনেসীয় শব্দ সৃষ্টি হ'য়েছে 'প-সংগ্রহ-অন'—উচ্চারণে আমাদের কানে লাগে 'পাসাঙ্গ্রাহান' 'পাসাঙ্গা-আন' বা 'পাসাঙ্গ্রান'। পাসাঙ্গ্রাহানগুলি আমাদের ডাক-বাঙলার চেয়ে বড়ো, আর এগুলিকে এক হিসাবে ছোটোখাটো হোটেল ব'ললেও চলে, ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলায় যেমন খালি ঘর আর বিছানাহীন খাট আর

আর দু একটা টেবিল চেয়ার মাত্র পাওয়া যায়, এখানে তা নয়, রীতিমত হোটেলের মতন সব ব্যবস্থা, ৮।১০ জন লোক অনায়াসে থাক্‌তে পারে। প্রশস্ত হাতার মধ্যে বাড়ী, ঘরগুলি বেশ বড়ো বড়ো। খানসামাকে 'মান্দুর' বলে, মান্দুর নিয়মিত ইউরোপীয় খানা যোগায়। ভারতবর্ষের ডাক-বাঙলা আর ইন্স্‌পেক্‌শন্ বাঙলার মতন পাসাঙ্গ্রাহানগুলিতে রাজকর্ম্মচারীদের দাবী আগে, তবে সাধারণতঃ অন্য লোকদের জন্য ও স্থান পাওয়া যায়। থাকা, খাওয়া,—সাকল্যে দৈনিক খরচের হার সরকার থেকে বেঁধে দেওয়া আছে—বাইরের লোক হ'লে সাড়ে সাত গিলডার আর সরকারী কর্ম্মচারী হ'লে সাড়ে পাঁচ গিলডার, যথাক্রমে—আমাদের দেশের আনুমানিক ছ টাকা আর চার টাকা; ডচ্ খোরাকের অনুরূপ তিন প্রস্থ আহার্য্য দেবে, তা ছাড়া চা কফি আছে;—দাম খুব বেশী নয়। বলিদ্বীপে আমরা আর তিন জায়গায় পাসাঙ্গ্রাহানে ছিলুম, যবদ্বীপে সে আবশ্যকতা হয় নি;—মোটের উপর, পাসাঙ্গ্রাহানের ব্যবস্থায় আমরা খুবই খুশী হ'য়েছিলুম।

পাসাঙ্গ্রাহানে রাত্রের আহার চুকিয়ে আমরা বারান্দায় চেয়ারে ব'সে ব'সে গল্প ক'রছি, এমন সময়ে পুরী থেকে টেলিফোন ক'রে জানালে, রবীন্দ্রনাথকে দেখাবার জন্য রাজা বলিদ্বীপীয় নাচের ব্যবস্থা ক'রেছেন, আমরা যেন দেখ্‌তে আসি,—একটু পরেই মোটর আস্‌বে। প্রায় সাড়ে ন'টা তখন। পুরীতে গিয়ে দালানে আমরা ব'সলুম। ছোট্ট একটী নাটক, নাচে আর গানে অভিনীত হ'ল। শল্য-সত্যবতীর উপাখ্যান নিয়ে—আখ্যান-বস্তুটী আমাদের মহাভারতের কোথায় আছে স্মরণ হ'চ্ছে না। একজন রাজা, তাঁর একজন পারিষদ বা অনুচর, আর রাণী—এরাই হ'ল পাত্র পাত্রী। বাঙলির যাত্রার যে ধরণের পোষাক দেখেছিলুম, এদের পরণে সেই ধরণের পোষাক, তবে আরও ঝলমলে আরও দামী। শুন্‌লুম এই রকম নৃত্যময় গীতাভিনয়ের নাম 'লুণ্‌টুক্', না কি। উঠানে অভিনয় হ'ল। বাদ্যের ব্যবস্থা ছিল, বাজনা কিন্তু কম বাজানো হ'য়েছিল। বেশী সময় রাজা আর রাণী কান্নার সুরে গান গেয়ে গেয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা ক'চ্ছেন, আর মাঝে মাঝে পারিষদটী নতজানু হ'য়ে দুহাত জোড় ক'রে রাজাকে যেন কাতর ভাবে কি নিবেদন ক'রছে। গান নয়, সুর ক'রে পাঠ ক'রে তারা কথা কইছে বলা যায়—গানের ভাগ খুবই কম। অভিনেতা তিন জনেই অল্পবয়সী ছোকরা। কথা বা গান বা পাঠের সুরটা একঘেয়ে, টেনে টেনে কাঁদুনি গাওয়ার মতন লাগছিল; খানিক শুনে, সেটা

বলিদ্বীপের নর্ত্তক অভিনেতা

যে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছিল তা বলা চলে না; কিন্তু জিনিষটা মানিয়ে যাচ্ছিল, রুচিকর হ'চ্ছিল এদের নাচের ভঙ্গীতে, চলাফেরার একটা লক্ষণীয় সুষমায়। ঝলমলে পোষাকটা দেখতে সুশ্রী না হ'লেও নাচের কায়দায় সেটাকে শোভন ক'রে তুলছিল। ঘণ্টাখানেক এই অভিনয় দেখা চ'ল্‌ল। তার পরে আমরা রাত এগারোটা আন্দাজ বিদায় নিয়ে পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এলুম।

শনিবার ২৭শে আগষ্ট ১৯২৭।

ভোরে উঠে প্রাতঃকৃত্য সমাপন ক'রে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে ব'সে প্রকৃতির আর মানুষের উভয়ের মধ্যে সৌন্দর্য্যের কি চমৎকার সমাবেশ যে দেখলুম, তা কথায় বর্ণনা করা যায় না। চারিদিকে সবুজ ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে দু একটা বনস্পতি, দূরে ডাইনে বাঁয়ে নীল পাহাড়ের শ্রেণী, আর সামনে দূরে নীল সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। পূবে পাহাড়ের উপর থেকে সূর্য্য উঠ্‌ল, সমস্ত দেশ ভোরের মিষ্টি রোদ্দুরে যেন নোতুন প্রাণ পেয়ে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ল। পাসাঙ্গ্রাহানের সামনেই শহরে যাবার রাস্তা। আলোর সঙ্গে সঙ্গে লোকজনের চলাফেরায় রাস্তা সজীব হ'য়ে দাঁড়াল। একজন দুজন ক'রে বা দলে দলে আশপাশের গাঁ থেকে চাষার ঘরের মেয়েরা মাথায় বেতের আর বাঁশের চুবড়ীতে আর ঝোড়ায় ক'রে ফল-ফুলুরী ধান-চাল মাছ-টাছ নিয়ে চ'লেছে কারাঙ-আসেমের বাজারে—এদের নীলকৃষ্ণ-বস্ত্র-পরিহিত স্বাস্থ্যে নিটোল গৌরবর্ণ সুন্দর দেহশ্রী; কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে উচ্চ শিরে সরল সহজ আর দৃপ্তভাবে নিজেদের নৃত্যছন্দে চ'লেছে;—বহুক্ষণ ধ'রে এই পসারিনীর দলের

বলিদ্বীপ—গ্রামের মেয়ে

অভিযান দেখা গেল। পাসাঙ্গ্রাহানের সাম্‌নে রাস্তার ও পারে একটা পাথরভাঙা কলে কাজ ক'রছে কতকগুলি গ্রাম্য নারী, এদেরও চলন-ভঙ্গীর ছন্দোময় গর্ব্বদৃপ্ত ভাবে দেহের তনিমাকে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। রাস্তার ধারে একটী মেয়ে ভুট্টা বিক্রী ক'রতে ব'সেছে, অনেকক্ষণ ধ'রে ব'সে ব'সে সে তার ভুট্টার পসার সাজাতে লাগ্‌ল, তার মনোমত সাজানো যেন আর হয় না। ক্রমে অন্য বন্ধুরা এসে যোগ দিলেন, বারান্দাতেই খানিকক্ষণ গল্পগুজব চ'ল্‌ল। একজন মণিহারী জিনিসওয়ালা তার পসরা নিয়ে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় দেখা দিলে; রোগা লোকটী, জা'তে 'বলি স্লাম' অর্থাৎ মুসলমান বলিদ্বীপীয়; মোট থেকে বলিদ্বীপের তৈরী নানারকমের কাপড়, কাপড়ের উপরে আঁকা ছবি, ক্রীস্, কাঠের ছোটো মূর্ত্তি, এইসব দেখাতে লাগ্‌ল। কোপ্যারব্যার্গ ব'ললেন, ক্লুঙকুঙ গ্রামে আরোও ভালো ভালো নানা রকমের সব জিনিস পাওয়া যাবে, এখানে কেনা বৃথা; তবুও সকলেই কিছু কিছু কিনলুম। আমি এগারো গিল্‌ডারে পিতলের একটী ছোট্ট পুরাতন রাক্ষসমূর্ত্তি, আর ছয় গিল্‌ডারে রাক্ষসের মূর্ত্তির আকারে কালো কাঠের একটী ক্রীসের হাতল, এই দুটী জিনিস কিনলুম। পরে দেখলুম, কিনে ভালোই ক'রেছি; 'কিউরিও' কেনায় ভালো জিনিস পেলেই সংগ্রহ ক'রে ফেলা উচিত, উপস্থিত-লভ্য ভালো কিছু ছেড়ে দিলে পরে অনেক সময়েই পছতাতে হয়।

প্রাতরাশ সেরে, বাকে আর কোপ্যারব্যার্গের সঙ্গে ব'সে কবির যবদ্বীপ ভ্রমণের দেশ কাল আর কার্য্য সম্বন্ধে একটী মোটামুটি খসড়া ক'রে ফেলা গেল। তার পরে আমরা পুরাতে চ'ল্‌লুম। আজ দিনের আলোয় শহরটী দেখতে দেখতে যাওয়া গেল। বেশ চমৎকার একটী বলিদ্বীপের সাবেক চালের বাড়ী দেখলুম, এটী একটী প্রাচীন পুরী, দুপাশে দুটী বড়ো ওয়ারিঙিন্ গাছ থাকায় দৃশ্যটী ভারী গম্ভীর-ভাবদ্যোতক লাগল। বড়ো রাস্তা ধ'রে দোকান-পাট পার হ'য়ে আমরা বাজারে এসে প'ড়লুম। বাজারে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়াবার লোভ আমরা সংবরণ ক'রতে পারলুম না। লোকেরাও আমাদের দিকে বিস্মিত হ'য়ে তাকিয়ে দেখে—তিনজন ইউরোপীয় পুরুষ একজন ইউরোপীয় মেয়ে, ইউরোপীয় পোষাকে ধীরেনবাবু, আর ধুতি চাদর পাঞ্জাবী প'রে আমি। গুটিকতক বেতের ছোট ছোট ব্যাগ

কিনলুম, এগুলি এদেশের একটী বিশেষ শিল্পের জিনিস। বাজারে রূপের হাট ব'সে গিয়েছে। দোকানী পসারীর চেয়ে পসারিনীদেরই সংখ্যা বেশী। বর্ম্মার বাজারেও এইরকম শুনেছি। দূর গ্রাম থেকে যারা এসেছে তাদের

কারাঙ্-আসেম—গ্রামের লোক

জন্য খাবারের দোকান ব'সে গিয়েছে—ভাত তরকারী ফল না'রকল-কোরা এসব বিক্রী হ'চ্ছে, স্ত্রী পুরুষে সকলে কিনে কিনে খাচ্ছে। বাজারে একজন শ্যামবর্ণ ছোকরা রঙীন ছিটের কাপড়ের ছোট্ট একটী বোঁচকা নিয়ে কৌতূহলী হয়ে আমাদের অনুসরণ ক'র্‌ছে দেখলুম। পোষাক সাধারণ মালাইদের মত, সারং-পরা, মাথায় লাল টুপী। দেখে মনে সন্দেহ হ'ল, হয় আরব, নয় আরব আর যবদ্বীপীয় বর্ণসঙ্কর। আমার আরবীর পুঁজি গুটিকতক শব্দ মাত্র নিয়ে; তবুও তাই অবলম্বন ক'রে সন্দেহ নিরসনের জন্য জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'মন্ আন্‌তা? তুমি কে?' তখন একটু তেজোদৃপ্ত হাসির সঙ্গে সুশুভ্র দন্তপংক্তির ঝলক্ দেখিয়ে ছোকরা মরুদেশের শুখো হাওয়ায় স্পষ্ট চাঁচা গলায় উত্তর দিলে—'অ্যানা আআরাব', আমি আরব।' 'আরব' শব্দের 'আইন'-অক্ষরের ধ্বনি খাঁটী আরবের মার্জ্জিত উচ্চারণে বেরুলো। তখন জিজ্ঞাসা ক'রলুম—কোন্ প্রদেশ থেকে—'মিন্ অ্যায়্য্ বেলেদ?' সে ব'ল্‌লে তার বাড়ী হাদ্রামওৎ-এ—দক্ষিণ আরবে। তার 'তি-জ্যা-রৎ' বা ব্যবসায় হ'চ্ছে গাঁয়ে গাঁয়ে কাপড় বিক্রী করা। তারপর আমি কে, আমার দেশ কোথা—আর আমি কি ক'রতে এসেছি, আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে। সব কথা বলা আমার আরবীতে কুলোবে না, আরবী-মিশ্র ভাঙা ভাঙা মালাইয়ের শরণ নিয়ে ব'ল্‌লুম যে, হিন্দ্ হ'চ্ছে আমার 'ওএৎন্' বা মাতৃভূমি, এদেশে বেড়াতে এসেছি। ছোকরা সিঙ্গাপুরে চেটীদের দেখেছে—আমি চেটী বা বেনিয়া কিনা, আর কিসের ব্যবসা করি একথা আবার জিজ্ঞাসা ক'রলে—আমি 'মুঅল্লিম্' বা শিক্ষক, আমার এই উত্তরে খুশী হ'ল না।

বাজারে একজন তামিল মুসলমানের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেও কাপড়ের ব্যবসা করে। তারপরে আমরা গুজরাটী খোজাদের দোকানে উঠ্‌লুম; খান দুই কাপড়ের দোকান এদের আছে। এরা বেশ খাতির ক'রে বসালে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এরা পরিচয় জান্‌তে চাইলে, কারণ স্থানীয় ডচেদের কাছে তাঁর প্রশংসা শুনেছে। নিজেদের ব্যবসার কথা নিয়েই এরা ব্যস্ত, অন্য কিছুর খবর রাখবার বড়ো অবসর বা উৎসাহ এদের নেই। এই দূর দেশে এসে ব্যবসার দিক থেকে মন্দ ক'রছে না।

কারাঙ্-আসেমের রাস্তা

বন্ধুরা কেউ কেউ আগেই পুরীর দিকে অগ্রসর হ'লেন। আমি একা ধীরে ধীরে পুরীতে গিয়ে পৌছুলুম। তোরণ পেরিয়ে প্রথম আঙিনার ডান ধারের আটচালায় দেখলুম, কতকগুলি দেবমূর্ত্তি আর নকশা-কাটা টালির মতন র'য়েছে, কাছে গিয়ে দেখি, সেগুলি সিমেন্টে জমানো, পাথরের

বা মাটির নয়। লক্ষ্য ক'রে দেখলুম, আশে পাশে কাঠের ছাঁচ র'য়েছে, তাই থেকে সিমেণ্ট ঢেলে এই সব মূর্ত্তি আর নক্‌শাদার ফলক তৈরী হ'চ্ছে। এই দূর বলিদ্বীপে এই রকম আধুনিক রীতিতে এই সব ব্যাপার রাজা আরম্ভ ক'রিয়ে দিয়েছেন দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'লুম। সেখানে একজন মিস্ত্রী বাটালী আর হাতুড়ী দিয়ে নোতুন এক-খানা কাঠের ছাঁচ তৈরী ক'রছে, আমরা নির্ব্বাক্ ভাবে পরস্পরের প্রতি তাকিয়ে দেখলুম।

দ্বিতীয় তোরণের কাছে একজন পদণ্ডের সঙ্গে দেখা হ'ল—বলিদ্বীপের ছোটো লুঙ্গীর উপরে একটা কালো কোট পরা, মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা, খালি পা, হাতে লাঠি। আমি তাঁকে আমাদের ভারতীয় প্রথায় দু'হাত তুলে নমস্কার ক'রলুম, সে ভদ্রলোক একটু ভাবাচাকা খেয়ে আমাকে প্রতিনমস্কার ক'রে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালে। আমি মালাইয়ে ব'ল্লুম, আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত মহাগুরুর সঙ্গে এসেছি, আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ, আপনিও তো ব্রাহ্মণ। তাতে ভদ্রলোক ব'ল্লেন, হাঁ, আমি ব্রাহ্মণ। সংস্কৃত জানেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম। বল্লেন, সংস্কৃত জানেন না, দেশে সংস্কৃত পড়া হয় না, তবে অনেক 'মাণ্ট্রা' বা মন্ত্র জানেন। মহাভারত প'ড়েছেন কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম, সমস্ত মহাভারতের বলি-ভাষায় অনুবাদ আছে কিনা জিজ্ঞাসা ক'রলুম। তিনি ব'ল্লেন, মহাভারত ভাষায় প'ড়েছেন, তবে সমস্ত মহাভারত বলিদ্বীপের ভাষায় পাওয়া যায় না, কতকগুলি পর্ব্ব ওদেশে নেই। এই বলে তিনি ভাঙা ভাঙা সংস্কৃতে একটি শ্লোক প'ড়লেন, শ্লোকটিতে মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব্বের নাম উল্লিখিত আছে। আমি কাগজ পেন্‌সিল বা'র ক'রে শ্লোকটি তাঁর কাছে শুনে শুনে তাঁর উচ্চারণ মত লিখে নিলুম! পরে দেশে এসে বিখ্যাত ডচ্ পণ্ডিত Hendrik Kern এর ('ভট্ট কর্ণ'র) প্রবন্ধসংগ্রহে দেখি (Verspreide Geschriften, IX, p. 219), এই শ্লোকটী তিনি একখানি প্রাচীন পুথিতে পেয়েছিলেন, আর এটী তিনি প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন। রোমান অক্ষরে শ্লোকটী তিনি এই ভাবে ছাপিয়েছেন—

Adih Sabha Wana Wirata Samodapamaka (? = Sayogaparwwa ?)
Bhisma Dwija'rkkasuta Calya Gada'cwa Sopti.
Stri Prastani Mucala Canti tatha'cramanca
Swarggantam astadaca-parwwarniyuk-tasangkhyam.

নক্‌শা-কাটা পাথর লাগানো ইটের দেওয়াল

শ্লোকটী থেকে এই কয়টী পর্ব্বের নাম পাই—আদি (১), সভা (২), বন (৩), বিরাট (৪), সযোগ (?) বা উদ্যোগ (৫), ভীষ্ম (৬), দ্বিজ বা দ্রোণ (৭), অর্কসুত বা কর্ণ (৮), শল্য (৯), গদা (১০), অশ্ব বা অশ্বমেধ (১১), সৌপ্তি বা সৌপ্তিক (১২), স্ত্রী (১৩), প্রাস্থনি বা প্রাস্থনিক (১৪), মুশল বা মুষল (১৫), শান্তি (১৬), আশ্রম বা আশ্রমিক (১৭), স্বর্গ বা স্বর্গারোহণ (১৮)। আমাদের দেশের প্রচলিত পর্ব্বগুলির সঙ্গে মোটামুটী মেলে; তবে এই শ্লোকে কতকগুলি নাম উলটো পালটা ক'রে দেওয়া আছে। আর আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কৃত মহাভারতে গদা-পর্ব্ব ব'লে আলাদা পর্ব্ব নেই। আছে তার জায়গায় অনুশাসন পর্ব্ব। বাঙলা কাশীদাশের মহাভারতে কিন্তু গদা-পর্ব্ব আছে; সংস্কৃত মহাভারতে ভীম আর দুর্য্যোধনের গদাযুদ্ধ বিষয়ক পর্ব্বটী শল্যপর্ব্বের মধ্যেই ধরা।

হ'য়েছে। দ্বীপময় ভারতের মহাভারতের সঙ্গে শল্য পর্ব্ব পর্য্যন্ত মেলে, তার পরে আমাদের দেশের সংস্কৃত মহাভারতে পাই—সৌপ্তিক পর্ব্ব (১০), স্ত্রী (১১), শান্তি (১২), অনুশাসন (১৩), অশ্বমেধ (১৪), আশ্রমবাসিক (১৫), মৌষল (১৬), মহাপ্রস্থানিক (১৭), আর স্বর্গারোহণ (১৮)। মহাভারতের প্রাচীন বিভাগ আর প্রাচীন পাঠ নির্ণয় করবার জন্য প্রাচীন যবদ্বীপের ভাষায় অনূদিত মহাভারত থেকে বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাবে। এবিষয়ে ডচেরা কিছু কিছু কাজ ক'রেছেন, কিন্তু বিষয়টী নিয়ে অনেক আলোচনা করবার আছে। মহাভারতের পর্ব্ব সম্বন্ধে পরে গিয়াঞারের রাজার বাড়ীতে সেখানকার পদণ্ডদের সঙ্গে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা হ'য়েছিল।

পদণ্ড যখন আমাকে শ্লোকটী শোনালেন, তখন প্রথমটা আমার বুঝ্‌তে একটু মুস্কিল লাগ্‌ছিলো। কিন্তু এঁর পাঠের ধরণ থেকে বলিদ্বীপের সংস্কৃত উচ্চারণের রীতিটা বোঝবার সুবিধা হ'য়েছিল। এঁর পড়ায় বোঝা গেল, এ দেশে সংস্কৃত অ-কারের উচ্চারণ হ'চ্ছে আ-কারের মতন; আ-কারের উচ্চারণ, শব্দের আদিতে বা মধ্যে থাকলে বাঙলা অ-র মত হয়, আর অন্তে থাকলে ফরাসীর eu বা জারমানের ö-র মত হয়; ঋ-কারের উচ্চারণ হয় 'রে'; ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে, মহাপ্রাণ বর্ণ গুলিকে অল্পপ্রাণ ক'রে দেয়,—'খ ঘ ছ ঝ ঠ ঢ থ ধ ফ ভ' যথাক্রমে 'ক গ চ জ ট ড ত দ প ব' হ'য়ে যায়; 'শ ষ স' তিনেরই উচ্চারণ দন্ত্য স; অন্তঃস্থ ব-এর (v বা w-র) উচ্চারণ করে কখনও বা 'ব' (b), কিন্তু সাধারণতঃ 'উঅ' বা 'ওঅ' w; ত-বর্গ কতকটা ট-বর্গের মত শোনায়, আবার ট-বর্গকে ত-বর্গের মত শোনায় (অর্থাৎ মূর্দ্ধণ্য ট-বর্গ আর দন্ত্য ত-বর্গ, এই দুইয়ের বদলে একের উচ্চারণে উভয়ের মধ্যস্থিত [বাঙলায় অজ্ঞাত] দন্ত্যমূলীয় বর্গের ধ্বনিই আসে)। কাজেই 'আদি, সভা, বন, গদা' কানে শোনাল যেন 'তা-ডি, সা-ব্যো, উআনা, গা-ড্যো', আর 'অষ্টাদশ' শব্দ শোনাল যেন 'আস্তডাসা'। পদণ্ডটীর নাম জেনে নিলুম—নামটী হচ্ছে 'পদণ্ড ওক'; এঁর সঙ্গে আলাপে বেশ খুশী হ'লুম। রাজা এঁকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন, ইনি যাচ্ছেন রাজার কাছে, সেখানে মহাগুরুর সঙ্গে দেখা হবে।

আমরা একত্র দ্বিতীয় মহলে দালানে রাজার বৈঠক-খানায় গেলুম। সেখানে দেখি, কবিকে রাজা কতকগুলি প্রাচীন তাল পাতার পুঁথি দেখাচ্ছেন। রাজার পিতা শাস্ত্রগ্রন্থের একটী ভালো সংগ্রহ রেখে গিয়েছেন শুনলুম। দালানের সাজসজ্জা দিনের আলোয় এখন ভালো ক'রে দেখা গেল। কাঠের কাজে খোদাইয়ে লাল আর সোনালি রঙ লাগানো। দালানে প্রচুর আরসী দেওয়া আছে। দেয়ালে কতকগুলি ফোটোগ্রাফ—রাজার নিজের, পরিবারের লোকেদের, রানী আর অন্য মহিলাদের, আর উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদের সঙ্গে তোলা গ্রুপ ছবি। একখানি ছবি সকলের দৃষ্টিপথে যাতে বেশ ক'রে পড়ে সেই ভাবে তিনি টাঙিয়ে রেখেছেন—এখানি হ'চ্ছে ফ্রেমে-বাঁধানো রবীন্দ্রনাথের একখানি ফোটো। ডচেদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কথা শুনে, আর তিনিই তাঁর বাড়ীতে এসে অতিথি হ'চ্ছেন একথা জেনে, রাজা ছবিখানি সংগ্রহ ক'রে টাঙিয়ে রেখে থাক্‌বেন। ভারতবর্ষের প্রতি রাজার শ্রদ্ধা দেখাবার একটী পন্থা ব'লে ব্যাপারটীকে নিতে পারা যায়। আমাদের সম্বন্ধে রাজার জান্‌বার যে আগ্রহ কত, তা ক্রমে আমরা টের পাই। তিনজন পদণ্ড চেয়ারে ব'সে আছেন। রাজা কতকগুলি তালপাতায় লেখা পুঁথি কবিকে দেখাচ্ছেন। পুঁথিগুলি উড়িয়া বা দক্ষিণা পুঁথির মতন, তালপাতার উপর লেখন বা ছুঁচালো-মুখ লোহার শলা দিয়ে আঁচড়ে' আঁচড়ে' লেখা। স্রেউএস দোভাষীর কাজ ক'রছেন। রাজা সংস্কৃত ভাষায় বলিদ্বীপের অক্ষরে লেখা একখানি পুঁথি নিয়ে ব'ল্‌লেন, এই পুঁথির অর্থ তিনি জান্‌তে চান, 'মহাগুরু' ব্যাখ্যা করে তাঁকে বুঝিয়ে দিন। তিনি পুঁথি প'ড়ে গেলেন, তাঁর উচ্চারণ দুর্ব্বোধ্য। আমার পরামর্শ-মত তিনি রোমান অক্ষরে লিখে যেতে লাগ্‌লেন, তখন আমাদের পড়ার সুবিধা হ'ল, পুঁথিখানির মানে বুঝতে মুস্কিল হ'ল না। সরল অনুষ্টুপ ছন্দে লেখা যোগশাস্ত্রের বই এখানি: জিজ্ঞাসু রাজা ব্যাখ্যা ক'রে বল্‌বার জন্য কবিকে নির্ব্বন্ধ ক'রে অনুরোধ ক'রলেন। মাঝে মাঝে রাজার

রোমান প্রত্যক্ষরীকরণ থেকে শ্লোকগুলি আমাদের মতন ক'রে আমি প'ড়ে যেতে লাগলুম, আর কবি ইংরিজিতে তার অনুবাদ ক'রতে লাগলেন, আর দ্রেউএস্ তা থেকে মালাই ভাষায় ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন,—রাজা সেই মালাই অনুবাদ লিখে নিতে লাগলেন। আমার সমস্ত বিষয়টা মনে হ'চ্ছে না, তবে পুথিখানিতে যোগদর্শনের কথা আছে। কতকগুলি শ্লোক লিখে নিয়ে এলে বুঝতে পারা যেত যে এ বই এখনও আমাদের দেশে প্রচলিত বা পরিজ্ঞাত কি না। রাজার উৎসাহ অদম্য—যে দু'তিন দিন তিনি কবিকে পেয়েছিলেন সেই দুতিন দিনে দ্রেউএস্-এর সাহায্যে প্রায় ২০।২২টী শ্লোকের অনুবাদ তিনি করিয়ে নিয়েছিলেন। সংস্কৃত না শিখলে যে নিজেদের সংস্কৃতি আর ধর্ম ভালো ক'রে বুঝতে পারা যাবে না, রাজা একথা উপলব্ধি ক'রেছেন। তিনি বার বার এই কথা ব'ল্‌তে লাগলেন, কি ক'রে সংস্কৃতের চর্চা আবার বলিদ্বীপে আরম্ভ করা যায়। কবি ব'ল্‌লেন, ভারতবর্ষে ফিরে তিনি সংস্কৃত পণ্ডিত পাঠাবার চেষ্টা ক'রবেন। তার পর বলিদ্বীপের অল্পবয়স্ক দুচারজন ব্রাহ্মণকে ভারতবর্ষে নিয়ে গিয়ে সংস্কৃত পড়াতে পারা যায় কিনা, সে বিষয়েও কথা হ'ল। পদণ্ডদেরও খুব আগ্রহ দেখলুম। ওই দিন সকালে তিনজন শ্রেষ্ঠ পদণ্ড রাজবাটীতে এসেছিলেন, এঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'ল। আমার রোজ-নামচার পাতায় এঁরা নাম সই ক'রে দিলেন—বলি অক্ষরে। দুজন শৈব পদণ্ড, আর একজন বৌদ্ধ পদণ্ড। এঁদের নাম—পদণ্ড ওক (শৈব), পদণ্ড রাহি (শৈব), আর পদণ্ড Wayan Djilantik বয়ন্ জিলাস্তিক্ (বৌদ্ধ)। রাজার সঙ্গে আর পদণ্ডদের সঙ্গে একত্র দ্রেউএস্ আর আমার একখানি সুরেনবাবু ছবি তুলেছিলেন, ঘরের ভিতরে আলোর অভাবে ছবি ভালো ওঠে নি, তবুও কারাঙ্-আসেম্-এর ঐ দিনটীর স্মারক হিসাবে আমাদের কাছে ছবিখানির মূল্য আছে।

দণ্ডায়মান—প্রবন্ধকার ও শ্রীযুক্ত দ্রেউএস্, বাম হইতে দক্ষিণে
উপবিষ্ট—কারাঙ-আসেমের রাজা, পদণ্ড রাহি, পদণ্ড ওক, পদণ্ড বয়ন্ জিলান্তিক্

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

২৭

দারুণ গ্রীষ্মের দিন। দুপুরবেলা কাহারও সাধ্য থাকে না যে, বাহিরে গিয়া কোনো কাজ করে। ঘরের ভিতরেও কোনো কাজ করা কষ্টসাধ্য। নিতান্ত নিরুপায় নয় যাহারা, তাহারা এ সময়টা আলস্যচর্চ্চায়ই কাটাইয়া দেয়।

মায়াদের বাড়ীর সকলের খাওয়া-দাওয়া চুকিয়া গিয়াছে। একঘরে জয়ন্তী তাহার পুত্রকন্যাদের লইয়া ঘুম পাড়াইতেছে। ছেলেটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, মেয়েটি মাদুরে গড়াগড়ি দিয়া নাকে কাঁদিয়া মাকে বিরক্ত করিতেছে। মায়ের নিজের চোখ ঘুমে ঢুলিয়া আসিতেছে, সে চোখ বুজিয়া মেয়ের পিঠে চাপড়াইতেছে, এবং মাঝে মাঝে একেবারে ঘুমাইয়া পড়িতেছে। হাতের তলা হইতে মেয়ের পিঠটা সরিয়া গেলেই আবার চমকিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। পাশের ঘরে মায়া এবং ইন্দু শুইয়া। মায়ার এত গরমে মোটেই ঘুম আসিতেছে না। রেঙ্গুনে গরমের সময় চব্বিশ ঘণ্টাই সে ইলেক্‌ট্রিক পাখার নীচে বসিয়া থাকে। এখানে রেঙ্গুন হইতে গরমও ঢের বেশী এবং পাখার সঙ্গে সম্পর্কও নাই, কাজেই তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দু অনেকক্ষণ হইল ঘুমাইয়া পড়িয়াছে।

দরজার উপর হঠাৎ কে গুম্ গুম্ করিয়া কিল মারাতে মায়া উঠিয়া বসিল। ইন্দুরও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে চোখ না খুলিয়াই বলিল, "মায়া দেখ্‌ত রে, এই দুপুর রোদে কে আবার এল।"

মায়া উঠিয়া পড়িয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাইরের এক ঝলক উত্তপ্ত হাওয়া তাহার মুখের উপর তীব্র স্পর্শ বুলাইয়া দিয়া গেল। নিস্তারিণী-ঠাকুরাণীর ছোট ছেলেটি বাহিরে দাঁড়াইয়া, তাহার হাতে গোটাকতক চিঠি। বলিল, "ডাকওয়ালাটা এইমাত্র দিয়ে গেল।"

মায়া চিঠিগুলি লইয়া দরজা আবার বন্ধ করিয়া দিল। ইন্দু মাদুরের উপর পাশ ফিরিয়া বলিল, "কার চিঠি রে?"

মায়া বলিল, "আমার তিনখানা, জয়ন্তীর একখানা, তোমার একখানা।"

পাশের ঘরে জয়ন্তীর ঘুম একেবারে ছুটিয়া গেল। সে হুড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা লিখেছেন নাকি?"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "আহা, মায়ের চিঠির জন্যেই তুমি এমন পড়ি-কি-মরি দৌড়ে এসেছ কি না? মায়ের জামায়েরই চিঠি, না রে মায়া?"

জয়ন্তী বলিল, "পিসীমা যেন কি! আমার সঙ্গে তোমার ঠাট্টারই সম্পর্ক না কি?"

ইন্দু বলিল, "কি আর করি বাছা? ঠাট্টার সম্পর্কের মানুষ একটাও নেই এখানে। সারাদিন হাঁড়িমুখ করে কি মানুষের প্রাণ বাঁচে? তাই ভাইঝি ভাইপো যাকে পাই, তারই সঙ্গে একটু ঠাট্টা-তামাসা করি।"

জয়ন্তী আর দাঁড়াইল না। মায়ার হাত হইতে চিঠিখানা ছোঁ মারিয়া লইয়া তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে চলিয়া গেল। ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "আমাকে কে চিঠি লিখল রে?"

মায়া বলিল, "বাবাই ত লিখেছেন দেখ্‌ছি।"

ইন্দু বলিল, "মেজদা এক চিরকালের উড়ুন্দুড়ে। তোর চিঠির মধ্যেই আমাকে ত দু লাইন লিখতে পারে। তা না প্রতিবারে একখানা করে আলাদা চিঠি আসে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "আমার নামে কিছু লিখেছেন হয়ত, তাই আর আমার চিঠির মধ্যে দেননি।"

ইন্দু বলিল, "হ্যাঁ, তোমার বাবা আবার তোমার নামে কিছু লিখবেন! সাত রাজার ধন এক মাণিক বলে তুমি। আমাদের গুষ্টিতে কোনো ছেলেরও তোর অর্দ্ধেকের অর্দ্ধেক আদর হয়নি। ছোটবেলায় যেমন

মায়ের কাছে মার খেয়ে দিন কাটিয়েছিস্, এখন ভগবান তার সুদসুদ্ধ পূরিয়ে দিচ্ছেন।"

মায়া একটু মুখ গম্ভীর করিয়া বলিল, "হয়ত মার খেলেই ছিল ভাল। বেশী শাসন ভাল, না বেশী আদর ভাল, তা এখনও ঠিক করে বুঝতে পারছি না।"

ইন্দু হাসিয়া বলিল, "তা জানি না বাছা, তবে পিঠটা জুড়িয়ে থাকলেই মানুষের ভাল লাগে। যাক গে, দেখ্ না তোকে কে চিঠি লিখল।"

মায়া চিঠি তিনখানা উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া বলিল, "একখানা বাবার, একখানা বাণীর, আর একখানা প্রভাসদার।"

ইন্দু একেবারে খাড়া হইয়া উঠিয়া বসিল। বলিল, "তাই নাকি? প্রভাস আবার তোকে চিঠি লিখতে গেল কেন? কি লিখেছে?"

মায়া একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "দেখ না কি লিখেছেন। একখানা পোষ্টকার্ড ত? কেউ কাউকে চিঠি লিখেছে শুনলে তোমরা এমন আঁৎকে ওঠ কেন? চিঠি ত যে কোনো মানুষ যে কোনো মানুষকে লিখতে পারে। কথা যদি বলা যায়, ত চিঠি লিখলে কি হয়?"

ইন্দু তাহার কথার উত্তর না দিয়া পোষ্টকার্ডখানা মন দিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বিশেষ কিছু তাহাতে নাই। প্রভাস দিনকুড়ি পরে আবার গ্রামে আসিবে। মায়া যদি ততদিন থাকে, তাহা হইলে গ্রামে স্কুল করার পরামর্শ ভাল করিয়াই হইবে। আর মায়া যদি আগেই চলিয়া যায়, তাহা হইলে প্রভাস সব ব্যবস্থা একলাই করিতে চেষ্টা করিবে, এবং চিঠিতে মায়াকে সব জানাইবে।

ইন্দু চিঠি পড়া শেষ করিয়া বলিল, "মায়া দেখ্, তুই হয়ত শুনলে বিরক্ত হবি, কিন্তু আমি ভালর জন্যেই বলছি। তুই এ চিঠি ছিঁড়ে ফেল, উত্তর দিস্ না। অন্ততঃ এখানে বসে দিস্ না। তাহলে এই নিয়ে আর ঘোঁটের শেষ থাকবে না। নিস্তারিণী বুড়ীর ছেলে চিঠি নিয়ে এসেছে, সে কি আর পোষ্টকার্ডখানা উল্টেপাল্টে দেখেনি? আমরা চিঠিপত্র পোষ্টও ত ওদের দিয়েই করাই। তুইও লিখছিস্ দেখলে এখন ঘরে ঘরে কত রকম করে বলে বেড়াবে।"

মায়া বলিল, "তাদের ভয়েই তা হলে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকি? এখানে এলাম কি করতে শুনি? স্কুলটার ত এখন পর্য্যন্ত একটা কিছুই ঠিক হল না। একেবারে রেঙ্গুনে গিয়ে উঠলে তখন কি করে সব ব্যবস্থা করব?"

ইন্দু বলিল, "আরে চটিস্ কেন বাপু? তুই না হয় রেঙ্গুনে গিয়ে প্রভাসকে ডেকে নিয়ে যাস্ পরামর্শ করবার জন্যে। সেখানে কেউ একটা কথাও বল্‌বে না। কিন্তু গাঁয়ে একটা ছুতো পেলেই সবাই এমন ঢি ঢি লাগাবে যে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে করতে আমার প্রাণ যাবে।"

মায়া আর কথা বলিল না। অন্য চিঠি দুইখানা খুলিয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। বাণী তাহার ফরমাশী জিনিষের জন্য অনেক তাগিদ দিয়াছে। তাহার নাকি এখনই দরকার, জিনিষপত্র সব তৈয়ারী করিতে আরম্ভ করিয়াছে, আর বেশী সময় হাতে নাই। নিরঞ্জন মেয়েকে শীঘ্র শীঘ্র ফিরিবার জন্য তাগিদ দিয়াছেন। শিবচরণ বাবু কলিকাতায় আসিয়া পুত্রের অপেক্ষায় বসিয়া আছেন; সে আসিয়া পৌঁছিলেই তাহাকে লইয়া বর্ম্মায় চলিয়া যাইবেন। মায়াকে টেলিগ্রাম করিয়া তাঁহাদের যাত্রার দিন জানান হইবে। সে যেন প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং আর দেরি না করে। বর্ষা আরম্ভ হইলে সমুদ্র বড় অশান্ত হইয়া উঠে, যাওয়া-আসা করাই কঠিন। তাহা ভিন্ন এমন ভাল সঙ্গীও আর জুটিবে না। অন্য যাত্রিনীদের সঙ্গে আসিতে যদি মায়ার বেশী অসুবিধা হয়, সে যেন কেবিন রিজার্ভ করিয়া আসে। ইন্দু তাহার সঙ্গে আসিলেই ভাল, গ্রামে থাকিলে সে আবার অসুখ বাধাইবে। নিরঞ্জন তাহাকেও পৃথক চিঠি লিখিতেছেন।

মায়া চিঠি পড়া শেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা তোমাকে কি লিখেছেন, পিসীমা?"

ইন্দু একটু মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "সে অনেক কথা। বাপ-জ্যাঠায় মেয়েছেলে সম্বন্ধে কত রকম পরামর্শ করে, সবই কি আর তাদের কাছে বলা যায়?"

মায়া বলিল, "তা না বল, নাই বল্‌লে। এখন আমার সঙ্গে যাচ্ছ কিনা তাই বল।"

ইন্দু বলিল, "মেজদা ত খুব জেদ করে লিখেছে, আমি কিন্তু বাপু এখন যেতে পারব না।"

মায়া বলিল, "কেন পারবে না শুনি? তোমার দেশে এমন ত কিছু কাজ নেই?"

ইন্দু বলিল, "না যত কাজ কেবল তোমার। আমি এই মাসটা গেলে একটু তীর্থে বেরব, কবে থেকে ঠিক করে রেখেছি। রেঙ্গুন যাই তো সেই শীতকালে। নিয়ে যাবার লোক ঢের জুটবে। কলকাতা থেকে ত বারমাসই বর্ম্মায় লোক যাচ্ছে। আর কেউ না যাক বিজয়টাকে ধরে নিয়ে গেলেই হবে।"

মায়া রাগ করিয়া বলিল, "যা খুসি করগে। শীত-কালের আগে তো চারপালা অসুখ বাধাবে।"

সে নিজের চিঠিপত্র লইয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

জয়ন্তী ততক্ষণে চিঠি পড়া শেষ করিয়া, গালে হাত দিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল। মায়া বলিল, "কি গো, তুমি যে একেবারে দশ হাত জলের তলায় পড়ে গিয়েছ মনে হচ্ছে।"

জয়ন্তী বলিল, "তা না পড়ে আর করি কি? সংসারে ঢুকলে কত রকম ভাবনা যে আছে, তা তোমরা ধারণাও করতে পার না। তোমাদের ভাবনা কেবল নিজেকে নিয়ে, আমাদের পরের ভাবনার চোটে নিজের কথা মনে করবারই অবসর হয় না।"

মায়া বলিল, "কথা ত বুড়ী দিদিমার মত চিরকালই তুমি বল। সম্প্রতি কি ভাবনা হল তোমার শুনি?"

জয়ন্তী বলিল, "উনি যেতে লিখেছেন। শরীর বড় খারাপ হয়ে পড়েছে, দেখবার শুনবার কেউ তেমন নেই ত।"

মায়া বলিল, "সব বাজে কথা। তুমি যেও না ত। মা বাবা সবই সেখানে রয়েছেন, তবু তাঁর দেখবার লোক নেই। বিয়ের আগে কে দেখত শুনি?"

জয়ন্তী হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আরে বাপু, যা বুঝিস না তা নিয়ে তর্ক করিস কেন? বুদ্ধি দিয়ে কি আর সব জিনিষই বোঝা যায়? আগে বিয়ে হোক তারপর বুঝবি, কেন বাবা মা থাকলেও কেউ নেই মনে হয়।"

মায়া বলিল, "তার মানে তুমি এখনই স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করতে ছুট্‌ছ ত? বাপরে বাপ, আমি কোনো জন্মে বিয়ে করব না। মেয়েরা নিজেরাই নিজেদের সব চেয়ে বড় শত্রু।"

জয়ন্তী বলিল, "অমন বলে সবাই, শেষ অবধি ত কাউকে বাদ যেতে দেখি না। আমাদের স্কুলের সৌদামিনীদি বিয়ের নামে নাক যা সিটকতেন! কেউ বিয়ে করছে শুন্‌লে, লেক্‌চার দিয়ে আর তাকে আস্ত রাখতেন না। তিনিও ত বুড়ো বয়সে বিয়ে করে বস্‌লেন। কিন্তু এখন যে ভাবছিস্‌, যে, নিজের কথা ভুলে থাকতে বড় কষ্ট হয়, তখন দেখবি তা মোটেই নয়। নিজের থেকেই ওদের কথাটা বড় হয়ে উঠবে, তাদের অসুখ, অসুবিধার ভাবনা সবার আগে মনে হবে।"

মায়া বলিল, "আহা, সবাই তোমার মত কিনা।"

জয়ন্তী বলিল, "দেখাই যাবে। যারা মুখে আগে বেশী বড়াই করে, পরে তারাই তত ঘাড়মোড় ভেঙে পড়ে।"

মায়া আর কথা না বলিয়া, হাতবাক্স খুলিয়া চিঠি-গুলি গুছাইয়া রাখিল। প্রভাসের চিঠিখানা ছিঁড়িয়া ফেলার বদলে সযত্নে রাখিয়া দিল।

জয়ন্তী সত্যই তারপর দিন যাইবার জন্য জেদ ধরিল। ইন্দু বলিল, "যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। একি কলকাতা পেয়েছ, যে, হট্‌ করে যাব বল্‌লেই চলে যাওয়া যায়? তা হলে জামাইকে বল এসে নিয়ে যেতে।"

জয়ন্তী নাছোড়বান্দা মেয়ে। অনেক বলিয়া কহিয়া, বায়স্কোপের লোভ দেখাইয়া সে নিস্তারিণী-ঠাকুরাণীর মেজছেলেকে রাজী করিল। পরের দিন আর গুছাইয়া-গাছাইয়া যাইবার সময় নাই, কাজেই আর একটা দিন বাধ্য হইয়া দেরী করিতে হইল। বাক্স-প্যাটরা টানিয়া বাহির করিয়া সে গুছাইতে আরম্ভ করিল।

হঠাৎ মায়া বলিয়া বসিল, "আমিও এই সঙ্গে চলে যাই না পিসীমা? আমাকেও ত যেতেই হবে, দু'-দিন পরে?"

ইন্দু গালে হাত দিয়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ, মেয়ে না

ত সব ধিঙ্গী। ওর না হয় বর তলব করেছে, তোমাকে আবার কে ডাক দিল ?"

মায়া বলিল, "বর ছাড়া আর কেউ ডাকতে জানে না নাকি ? বাবা ত আমায় শিবচরণবাবুদের সঙ্গে যেতে লিখেই দিয়েছেন। তাঁরা কবে চট্ করে বেরিয়ে পড়বেন, তখন আমায় হুড়োহুড়ি করে মরতে হবে। তার চেয়ে কলকাতায়ই গিয়ে থাকি না। এখানেই বা বসে থেকে করব কি ? যে কাজের জন্যে এলাম, তার ত কিছুই হল না।"

ইন্দু বলিল, "তবে যাও, আর কি বল্‌ব ? আজকাল সবাই স্বাধীন, নিজের ইচ্ছামতই ত চল্‌বে ?"

জয়ন্তী বলিল, "স্বাধীন আর কই ? অত্যন্ত পরাধীন বলেই না যেতে হচ্ছে।"

তাহার পিসী বলিল, "আহা, যেতে তোমার বড়ই অনিচ্ছে, না ? পারলে ত এখন ধেই ধেই করে দুহাত তুলে নাচ।"

রোদ। ক্রমে পড়িয়া আসিল। ঝিরঝির করিয়া একটুখানি হাওয়াও দিতে আরম্ভ করিল। মায়া বলিল, "চা-টা খেয়ে চল একবার প্রভাসদাদের বাড়ী ঘুরে আসা যাক। আর ত সময় হবে না, সেদিন অত করে বলে গেলেন।"

ইন্দু বলিল, "তা চল্। কিন্তু প্রভাসের চিঠির কথা কিছু বলিস্‌নে। দেখি বামুনদিদিকে তাড়া দিয়ে, নইলে উনুন ধরাতেই তার চার ঘণ্টা কেটে যাবে।"

ইন্দুর শরীর ভাল নয় বলিয়া রান্নার কাজ একজন দরিদ্রা ব্রাহ্মণ-কন্যার দ্বারা চলিত।

চায়ের জল যথাসময়েই গরম হইয়া আসিল। সঙ্গে আসিল এক রাশ বাড়ীর বাগানের ফল, আর ঘরে প্রস্তুত মিষ্টান্ন। এখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে ময়রার দোকান নাই। তাই পাছে মায়ার খাওয়ার কষ্ট হয় বলিয়া ইন্দু রোজই ঘরে কিছু-না-কিছু মিষ্টি তৈয়ারী করিয়া রাখে। আত্মীয়স্বজন পাড়া-প্রতিবেশীর ঘর হইতেও মায়ার নামে প্রায়ই মিষ্টান্ন উপহার আসে। কাজেই খাওয়ার অসুবিধার বদলে একটু বেশী রকম সুবিধাই হইয়া গিয়াছে।

কাঁসার রেকাবীতে ইন্দুকে খাবার সাজাইতে দেখিয়া মায়া বলিল, "কাল চলে যাব বলে কি আজই একমাসের খাওয়া খাইয়ে দিচ্ছ ?"

ইন্দু বলিল, "তা এগুলো সব নষ্ট হবে নাকি ? না গরুবাছুরে খাবে ?"

মায়া বলিল, "নিস্তারিণীদিদির ছেলেদের দাও না ? তারা ত ভাল জিনিষ চোখেও দেখে না, কেবল ভাত আর মুড়ি গিলে মরে।"

ইন্দু বলিল, "দেখে না যে তা কার দোষ ? বুড়ী এদিকে ত টাকার কুমীর, অথচ একটা পয়সা বার করতে হলে তার যেন বুক ফেটে যায়। ছেলেগুলোরও এমন লক্ষ্মীছাড়া স্বভাব যে তাদের কিছু দিতে ইচ্ছে করে না।"

যাহা হউক জিনিষগুলা নষ্ট হইবার ভয়ে হোক বা মায়ার অনুরোধেই হোক, নিস্তারিণী-ঠাকুরাণীর ঘরে শীঘ্রই বড় এক থালা সন্দেশ, পান্তুয়া এবং ক্ষীরের ছাঁচ গিয়া পৌঁছিল। মায়া, ইন্দু, জয়ন্তী, তার ছেলেমেয়ে সকলে মিলিয়া পাড়া বেড়াইতে চলিল।

প্রভাসের মা তখন বসিয়া একখানা গহনার ক্যাটালগ্ মন দিয়া দেখিতেছিলেন। অভ্যাগতদের দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিলেন। বারান্দায় নানারকম নক্সাকাটা বড় একখানা মাদুর পাতিয়া সকলকে বসাইলেন।

গহনার ক্যাটালগটা সর্ব্বপ্রথম চোখে পড়িয়াছিল জয়ন্তীর। সে বলিয়া উঠিল, "ছেলের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেল ? বৌয়ের জন্যে গহনার ফরমাশ দিচ্ছেন ?

প্রভাসের মা বলিলেন, "তা একরকম ঠিকই বাছা। আর শুধু শুধু দেরি করে কি হবে ?"

ইন্দু জিজ্ঞাসা করিল, "কবে বিয়ে ? দিনও ঠিক হয়ে গেছে নাকি ?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "এই প্রভাস এলেই ঠিক হবে। সে দিনকুড়ি পরে আস্‌ছে কি না। এলে একবার মাথা কোটাকুটি করে দেখব। নিতান্তই যদি রাজী না হয়, তাহলে সুভাসের বিয়েই আগে হবে।"

মায়া এতক্ষণ পরে কথা বলিল, জিজ্ঞাসা করিল, "কিরকম মেয়ে ঠিক করলেন ? আপনি নিজে দেখেছেন ?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "এই হয়েছে মাঝামাঝি একরকম। দেখতে ভালই, তবে লেখাপড়া খুব বেশী শেখেনি। দেবে থোবে মন্দ না।"

জয়ন্তী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার ছেলের পছন্দ হয়েছে?"

প্রভাসের মা বলিলেন, "বল্‌ছে না ত কিছু, খুব বেশী অপছন্দ বোধ হয় হয়নি।"

তাহার পর অন্য কথা আসিয়া পড়িল। প্রভাসের মা কিছু খাইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতে লাগিলেন। বাড়ীর খাওয়ার চোটেই তখন সকলের আকণ্ঠ ভরিয়া উঠিয়াছে, আর খাইবার জায়গা কোথায়? ভদ্রমহিলা কিছুতেই ছাড়েন না দেখিয়া অবশেষে এক এক গেলাস আমপোড়ার সরবৎ খাইয়া সকলে তাঁহার মানরক্ষা করিল।

আরও দু'-চারটা কথার পর সকলে উঠিয়া পড়িল। রাস্তায় বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় নিস্তারিণী-ঠাকুরাণীর ছোটছেলেটি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সারা পথটাই ছুটিয়া আসিয়াছে।

ইন্দু ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "অমন করে আস্‌ছিস্ কেন রে? কি হয়েছে?"

ছেলেটি ঢোক গিলিয়া বলিল, "টেলিগেরাপ এসেছে। লোকটা দাঁড়িয়ে আছে।"

মায়া বলিল, "শিবচরণবাবুর টেলিগ্রাম বোধ হয়। দেখ আমি কেমন ভবিষ্যৎ দেখতে পাই। আগের থেকেই যাবার ব্যবস্থা করে রাখলাম।"

ইন্দু বলিল, "আগে দেখইত কোথাকার তার। টেলিগ্রাম শুন্‌লেই কেমন একটা ভয় ভয় করে যেন।"

বাড়ী পৌছিয়া মায়া দেখিল সত্যই শিবচরণবাবুর টেলিগ্রাম। দেবকুমার আসিয়া পৌছিয়াছে, এই সপ্তাহেই তাঁহারা বর্ম্মা রওনা হইবেন।

২৮

ঘরময় কাপড়-চোপড়,বই বাসন নানা জিনিষ ছড়াইয়া মায়া বাক্স গুছাইতে বসিয়াছে। জিনিষগুলির মধ্যে কতক তাহার নিজের, কতক বাণীর ফরমাশী। বাণীর মায়ের ফরমাশও কিছু কিছু আছে। বাসনকোসন মোটেই রেঙ্গুনে ভাল পাওয়া যায় না, সুতরাং মেয়ের বিবাহের বাসন সবই তিনি কলিকাতা হইতে কিনাইয়া লইয়া যাইতেছেন।

মায়া অনেক বকাবকি রাগারাগি করিয়াও ইন্দুকে সঙ্গে যাইতে রাজী করাইতে পারে নাই। তাহার সেই এক কথা, তীর্থভ্রমণ না সারিয়া সে বর্ম্মায় যাইবে না। মায়ার জন্য কেবিন একটা রিজার্ভ করিয়াই লওয়া হইয়াছে, আসিবার সময় সহযাত্রিনীদের উৎপাতে তাহার বড় কষ্ট হইয়াছিল।

বাক্স গুছাইতে গুছাইতে, কাগজপত্রের মধ্যে প্রভাসের চিঠিখানা বাহির হইয়া পড়িল। ইহার এখনও উত্তর দেওয়া হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া উত্তর দিবে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু কি উত্তর দিবে, মায়া ভাবিয়াই পায় না। রেঙ্গুনে তাহাকে ডাকিয়া লইয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে? অন্ততঃ নিরঞ্জনকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত। কিন্তু মায়ের সম্পর্কিত কোনো কথা, পিতার নিকট বলিতে মায়ার এখনও সঙ্কোচ লাগে। কিছু যদি তিনি মনে করেন? কিন্তু প্রভাসদার চিঠির কোনো একটা উত্তর ত দিতে হয়? সে তাহা না হইলে কি ভাবিবে? ভাবিবে হয়ত মায়ার আসলে কিছু করিবার মতলব নাই, কেবল কথা বলার খাতিরে কতকগুলা বাজে কথা বলিয়াছিল। এখনই যাহা হয় কিছু-একটা উত্তর লিখিয়া দেওয়া যাক, যত দেরি করিবে তত আলস্য বাড়িতে থাকিবে।

উঠিয়া গিয়া মায়া একখানা চিঠির কাগজ, খাম এবং তাহার ফাউণ্টেন পেন লইয়া আসিল। পোষ্টকার্ডে চিঠি লিখিতে তাহার কোনকালেই ভাল লাগে না। দু' লাইন হইলেও সে খামেই চিঠি লেখে। অনেক ভাবিয়া সে লিখিল, যে, সম্প্রতি সে রেঙ্গুন ফিরিয়া যাইতেছে। সেখানে গিয়া পিতার সহিত পরামর্শ করিয়া, সে প্রভাসকে আবার চিঠি লিখিবে। রেঙ্গুনের ঠিকানা সে দিয়া দিল, যদি বিশেষ কোনো প্রয়োজন ঘটে, প্রভাস যেন তাহাকে লিখিয়া জানায়।

মায়ার জ্যাঠাইমা আসিয়া বলিলেন, "কি রে, আজ আর নাওয়া-খাওয়া নেই নাকি? যাবি ত সেই পরশু, আজই সব কাজ শেষ না করলে চলবে না?"

মায়া বলিল, "অন্ততঃ এই বড় বাক্স দুটো শেষ করে নি জ্যাঠাইমা। সব কাজ কালকের আশায় ফেলে রাখলে শেষ অবধি হয়েই উঠবে না। বেশী দেরি না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই হয়ে যাবে।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "জয়ন্তী তোর জন্যে আমসত্ব পাঠিয়েছে, টিফিন-বাক্সের মধ্যে করে নিয়ে যাস্।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তোমার মেয়ে খুব পাকা গিন্নি হয়েছে এরি মধ্যে।"

জয়ন্তীর মা বলিলেন, 'আর না হয়ে কি করবে বাছা? ঘাড়ে পড়লে সবই করতে হয়। নইলে তোর চেয়ে কতই বা বড়? অল্প বয়সে দায়ে পড়ে বিয়ে দিয়ে দিতে হল, নইলে তোরই মত হেসে খেলে বেড়াতে পারত।"

এমন সময় চাকর আসিয়া একখানা চিঠি অগ্রসর করিয়া ধরিল, বলিল, "একটা ছোক্‌রা দিয়ে গেল, দিদি-মণিকে দিতে বললে।"

মায়া চিঠি খুলিয়া দেখিল, শিবচরণবাবু লিখিয়াছেন, পরশু যাওয়ার সব ঠিক। আজ বেলা তিনটার সময় পুত্রকে লইয়া তিনি মায়ার সঙ্গে দেখা করিতে যাইবেন।

মায়া একটু হাসিয়া চিঠিখানা রাখিয়া দিল। চাকরটাকে বলিল, "ছোকরাকে যেতে বল, কোনো জবাব নেই।" শিবচরণবাবুর ছেলেকে লইয়া রেঙ্গুনে তাহার সঙ্গিনীরা কি রকম ঠাট্টা করিত, তাহাই মনে করিয়া মায়ার হাসি পাইতেছিল। দেবকুমার কি রকম মানুষ কে জানে? কাহার মুখে যেন মায়া শুনিয়াছিল, সে দেখিতে অতিশয় সুপুরুষ। যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। মায়ার এখন ও-সব ভাবনা না ভাবিলেও চলিবে। তবু বাক্স গোছানতে আর তাহার মন লাগিল না। তাড়াতাড়ি করিয়া জিনিষপত্রগুলা উঠাইয়া ফেলিয়া, সে স্নান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িল। স্নান খাওয়া সারিয়া আসিয়া আর একবার জিনিষ গোছানোতে মন দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই মন বসিল না। জ্যাঠাইমার সঙ্গে গল্পও বেশী ক্ষণ জমে না, ছেলেরা কেহ বাড়ীতে নাই, সুতরাং মায়া অকারণে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরিয়া সময় কাটাইতে লাগিল।

আচ্ছা, শিবচরণবাবু এবং দেবকুমার আসিয়া পড়িতে আর বেশী দেরি নাই। বড় জোর ঘণ্টা-দেড়েক হইবে। সে তাহাদের বসাইবে কোথায়? এ বাড়ীটা নিতান্তই সাবেকী ধরণের। আলাদা বসিবার ঘর বলিয়া কোনো ঘর নাই। মেয়েরা বেড়াইতে আসিলে গৃহিণীর শুইবার ঘরে আড্ডা করে, ছেলেরা আসিলে হয় বিজয়ের পড়িবার ঘরে, না-হয় সদর দরজার সামনে বা সিঁড়িতে দাঁড়াইয়াই কাজ চালাইয়া দেয়। মায়া স্থির করিল বিজয়ের পড়ার ঘরটাই কাজে লাগাইতে হইবে। সে ঘরে অন্ততঃ খাট পাতা নাই। একটুখানি গুছাইয়া লওয়া দরকার; কোনোরকমে তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতে হইবে।

মায়ার জ্যাঠাইমা খাওয়া-দাওয়া সারিয়া ঘরের মেঝেতে মাদুর পাতিয়া একটুখানি গড়াইয়া লইবার আয়োজন করিতেছিলেন। দেবরঝিকে ঢুকিতে দেখিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে দুপুরেও কি তোদের একটু ঘুম আসে না? খালি টো টো করে ঘুরছিস। আমাদের ত পেটে দুটো পড়লেই ঘুমে চোখ ঢুলে আসে।"

মায়া বলিল, "সারা দুপুর ত স্কুল আর কলেজ করে মরি, ঘুমব কখন? আজ ত এখনি আবার তারা সব দেখা করতে আসবে। তাদের কোথায় বসাব তাই ভাবছি।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "বিজয়ের ঘরেই বসা। আর সব ঘরই ত জোড়া হয়ে আছে।"

মায়া বলিল, "ও ঘরে মোটে দুটো চেয়ার রয়েছে। আরও খান-দুই অন্ততঃ দরকার হবে। আর তাঁদের একটু চা টা দিতে হবে ত? ঠিক চা খাবার সময়েই আসছেন।"

এতগুলা কাজের কথা শুনিয়া মায়ার জ্যাঠাইমা অগত্যা উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আমার ঘরের ইজি চেয়ারটা পাঠিয়ে দিই, আর একটা বেতের চেয়ার তোর ঘরেই আছে, সেটাও নিয়ে যা। মহেশটাকে ডাক না? ঘরটা একটু ঝেড়ে মুছে দিক। চায়ের সরঞ্জাম সব আছে।

উনি থাকতে ত দু বেলা চায়ের পাট বসত। আমি এখনই না হয় ও সব তুলে দিয়েছি। চা সামনের দোকানেই পাবে। খাবার ঘরে কিছু আছে, আর কিছু আনিয়ে নিলেই হবে।”

মায়া অনিচ্ছুক মহেশকে লইয়া বিজয়ের ঘর সংস্কার করিতে চলিল। ঘরখানির চেহারা দেখিয়া তাহার বুক দমিয়া গেল। অল্প সময়ের মধ্যে ইহার রূপান্তর ঘটান একটু কঠিন ব্যাপার বটে। টেবিল এবং চেয়ারের উপর বই, খাতা, ছেঁড়া কাগজ নির্ব্বিচারে ছড়ানো; দেয়ালের গায়ে কালির দাগ, এবং ছেঁড়া ধূলিলিপ্ত ক্যালেণ্ডারের প্রাচুর্য্য, ছাদের দিকে কোণে কোণে ঝুল এবং মাকড়শার জালের আলপনা, আলনার উপর ময়লা ধুতি গেঞ্জি, পাঞ্জাবীর ভীড়। এক ঘণ্টায় এ ঘরকে কি করিয়া সংস্কার করা যায়?

মায়া দেখিল, এক্ষেত্রে সব গুছাইবার চেষ্টা করা বৃথা। আবর্জ্জনাগুলি কোনোমতে আড়াল করিয়াই এখন কাজ সারিতে হইবে। আল্‌নার সমস্ত কাপড় সে একটানে নামাইয়া পুঁটলি বাঁধিয়া ফেলিল। চাকরকে বলিল, “এটা জ্যাঠাইমার ঘরে রেখে আয়, আর আল্‌নাটা নিয়ে যা আমার ঘরে।” চাকর যাইবামাত্র টেবিলের উপরের সব বই, খাতা, কাগজও সে নামাইয়া ফেলিল। টেবিলটার বানিশ ইত্যাদির বালাই নাই, কালি ও তেলের প্রাচুর্য্যে সেটি মসৃণ। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ছুটিয়া গিয়া জিনিষপত্রের মধ্য হইতে মায়া একটি লক্ষ্ণৌএর ছিটের চাদর টানিয়া বাহির করিল। এটা সে রেঙ্গুন লইয়া যাইতেছিল, বিছানা-ঢাকা হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য। সম্প্রতি আর কিছু হাতের কাছে না পাইয়া ইহার দ্বারাই সে কাজ চালাইয়া দিল। টেবিল ঢাকা দিয়া, বিজয়ের বই এবং আস্ত খাতাপত্র যাহা কিছু ছিল, তাহা উহার উপর ভাল করিয়া সাজাইয়া রাখিল। ছেঁড়া খাতা এবং কাগজ যতটা পারিল, দেরাজ-গুলির মধ্যে ঠাসিয়া রাখিল। যাহা কুলাইল না, তাহা ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিল।

মহেশ ইতিমধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, “আর কিছু কাজ আছে দিদিমণি?”

মায়া বলিল, “আরও কিছু মানে? কোন্ কাজটা হয়েছে শুনি? সবইত এখনও বাকি। এ ক্যালেণ্ডার-গুলো সব নামিয়ে ফেল্, আর বড় ঝাঁটাটা এনে ঝুলটুল-গুলো সব ঝেড়ে ফেল্।”

মহেশ অপ্রসন্নমুখে ঝাঁটা খুঁজিয়া আনিয়া ঘর ঝাড়িতে আরম্ভ করিল। ক্যালেণ্ডারগুলি মায়া নিজেই নামাইয়া ফেলিল। তাহার পর ঘর ঝাঁট শেষ হইবামাত্র চেয়ারগুলি ঠিক করিয়া রাখিয়া জ্যাঠাইমার সন্ধানে ছুটিল। তিনি তখন উঠিয়া বসিয়া বিকালে কি কি রান্না হইবে সেই বিষয়ে বামুন-ঠাকরুণের সঙ্গে আলোচনা করিতেছিলেন। এ বাড়ীতে ঝি-চাকর বেশী নাই, ঐ রাঁধুনীটি এবং মহেশ। টাকার টানাটানি বলিয়া ইহাদের দিয়াই কাজ চালাইয়া লইতে হয়।

মায়া বলিল, “জ্যাঠাইমা, ঘর ত একরকম ঠিক করলাম। চায়ের জোগাড় কিছু হয়েছে?

জ্যাঠাইমা তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, “মাগো, ঘেমে, ধুলো মেখে, একেবারে ভূত হয়ে গেছিস্? এত করবার কি দরকার ছিল? এ ত আর কেউ কনে দেখতে আস্‌ছে না? যা যা, গা ধুয়ে কাপড় ছাড়গে যা, আমি ফল, মিষ্টি সব আনিয়ে রাখছি।”

মায়া গা ধুইতে চলিল। নিজেরও তাহার একবার মনে হইল, সত্যই ত, এত করিবার প্রয়োজন ছিল কি? শিবচরণবাবু বৃদ্ধ, সেকেলে মানুষ, দেবকুমারকে সে চেনেও না। তাহাদের জন্য এত করিয়া ঘরদোর ঠিক না করিলেই বা কি হইত? কিন্তু মন বুঝিতে চায় না। তাহাকে কেহ হীন, মলিন, কদর্য্য আবেষ্টনের মধ্যে দেখিবে কেন? তরুণী নারীর চিত্ত নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন সারাক্ষণ পুরুষজাতির বিস্ময়মিশ্রিত শ্রদ্ধার অর্ঘ্যের অপেক্ষা করিয়া থাকে। তাহার জন্য আয়োজন না করিলে চলিবে কেন?

গা ধুইয়া যখন সে কাপড় পরিতে আসিল, তখনও যা-তা করিয়া কাজ শেষ করিতে পারিল না। খোঁপা বাঁধিতে বেশ সময় গেল। বাদামী রঙের পাত্‌লা রেশমের ব্লাউস, তাহার হাতে এবং গলায় জরির পাড়, এবং জরির পাড় দেওয়া একটি ঢাকাই কাপড় সে বাছিয়া

বাহির করিল। এ সজ্জায় ভার নাই, আড়ম্বর নাই। কিন্তু তাহার উজ্জ্বল রূপ ইহাতেই আরও দীপ্ত হইয়া উঠিল, আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া সে ক্ষুদ্র একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া গেল।

ঘড়িতে দেখিল তিনটা বাজিতে মাত্র আর কয়েক মিনিট আছে। জ্যাঠাইমা যখন চায়ের ভার নিজেই লইয়াছেন, তখন তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়া আর উত্যক্ত করিতে তাহার ইচ্ছা হইল না।

এমন সময় মহেশ ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, "দিদিমণি, দুজন বাবু এসেছেন, নীচে গাড়ীতে বসে আছেন, আপনাকে খবর দিতে বল্‌লেন।"

মায়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "তাঁদের উপরে নিয়ে এসে দাদাবাবুর ঘরে বসা, আর জ্যাঠাইমাকে বল্, যেন চায়ের জল চড়িয়ে দিতে বলেন।"

সে চুলটা একটু আর একবার ঠিক করিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বিজয়ের ঘরের দিকে চলিল। অতিথিরা ততক্ষণে ঘরে আসিয়া বসিয়াছে।

ভিতরে ঢুকিতেই শিবচরণবাবু বলিলেন, "এস মা, এস। এইটি আমার ছেলে দেবকুমার, এর আসবার কথা ছিল, আগেই শুনেছ। এই তোমাদের সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম।"

দেবকুমার উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিল। মায়া প্রতিনমস্কার করিয়া, নিজে বসিয়া তাহাকে বসিতে বলিল। কিছু একটা তাহার বলা উচিত, ইহা যতই বেশী করিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল, ততই যেন বলিবার কথা কিছুই সে খুঁজিয়া পাইল না।

বৃদ্ধ শিবচরণ কথা বলিয়া চলিলেন। মায়া এবং দেবকুমার দুজনেই চুপ করিয়া রহিল। মায়া একবার মাত্র চাহিয়া দেখিল, দেবকুমার দেখিতে সত্যই খুব সুপুরুষ। এতটা ভাল চেহারা বাঙালীর ঘরে বিরল।

[ক্রমশঃ।

ঢাকায় খুন লুট গৃহদাহ

জনৈক ঢাকানিবাসীর কয়েকটি পত্রাংশ

[ঢাকাতে যে শোকাবহ লজ্জাকর পৈশাচিক কাণ্ড অনেকদিন ধরিয়া ঘটিয়াছে, তাহার অনেক বিস্তারিত বৃত্তান্ত দৈনিক কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও আমরা যে কয়েকখানি চিঠির কোন কোন অংশ ছাপিতেছি, তাহার কারণ ইহাতে নূতন এবং অজ্ঞাত কোন কোন কথা আছে, এবং যাহাতে নৈরাশ্যের পরিবর্ত্তে কিছু আশারও সঞ্চার হয় এমন বৃত্তান্তও কিছু আছে। বলা বাহুল্য, পত্রাংশগুলির প্রত্যেকটি কথা গণিতশাস্ত্রের সত্যের মত নির্ভুল না হইতে পারে ; কিন্তু লেখক যথাসাধ্য প্রকৃত সংবাদ নিজে দেখিয়া শুনিয়া বা সন্ধান লইয়া লিখিয়াছেন। ব্যাপারটার উৎপত্তি সম্বন্ধে লেখক কিছু বলেন নাই।

ঢাকার এই ব্যাপারটাকে আমরা ঠিক হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মনে করি না। ঢাকাতেই কোন কোন মুসলমান আছেন যাঁহারা এরূপ ব্যাপারের বিরোধী, এবং স্বরাজের জন্য সম্মিলিত চেষ্টার পক্ষপাতী, আমরা ইহা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি। তাঁহারা ঢাকার পৈশাচিক ব্যাপারে কেন বাধা দেন নাই বা দিতে পারেন নাই, অবগত নহি।—প্রবাসীর সম্পাদক]

(১)

২৮-৫-১৯৩০

ঢাকার অবস্থা বিষম। মুসলমানেরা লোককে খুন করছে, ঘর দোকান লুট ক'রে তাতে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। ঢাকা হলের সম্মুখের একটি পাড়া বিধ্বস্ত

করেছে। দুটি মেয়ে এক বাড়ীতে ছিল, তাদের পিতা বিদেশে, বড় ভাই তার দুদিন আগে অডিন্যান্সের কবলে জেলখানায় গেছে। সেই বাড়ী মুসলমানেরা আক্রমণ করে; অপরাধ যে, তাদের ভাই ভবেশ নন্দী ছেলেদের বলচর্চ্চার আখড়া করেছিল, মেয়েদেরও আত্মরক্ষায় শিক্ষিত করত।* মেয়ে দুটি অবিবাহিতা, অল্পবয়স্কা। তারা দীর্ঘকাল দু তিন শ মুসলমানের আক্রমণ প্রতিরোধ ক'রে নিজেদের ঘরবাড়ী ও ইজ্জত রক্ষা ক'রেছে। ঢাকা ইউনিভার্সিটির তিনজন লেক্‌চারার ভবানীচরণ গুহ, রুক্মিণীকান্ত পুরকায়স্থ ও হরিপ্রসন্ন মুখুজ্জে মুসলমানদের কাপুরুষতার প্রতিবাদ করায় ও অবশেষে বাধা দিতে বাড়ীর বাহির হওয়ায় আততায়ীরা মেয়ে দুটিকে ছেড়ে তাঁদের দিকে ধাবিত হয়। তাঁরা বাড়ীতে ঢুকে দ্বার বন্ধ করেন। মুসলমানেরা বাড়ীতে ঢুকতে না পেরে বাড়ীর চতুর্দ্দিকে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। মুসলমান জনতার মধ্যে ৮।১০ বছরের ছেলে থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত ছিল; কিন্তু সারা পাড়ার মধ্যে তিনটি হিন্দু ছাড়া কেউ মেয়ে দুটিকে রক্ষা করবার চেষ্টা করেননি। এঁদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারা অন্যান্য বাড়ীতে আগুন ধরাতে লাগ্‌ল। সেই অবসরে এঁরা জলন্ত বাড়ীর দোতলা থেকে লাফ দিয়ে প'ড়ে আহত হ'য়ে মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঢাকা হলে পালিয়ে আসেন। এই আক্রমণের আড়াই ঘণ্টা পরে পুলিশ আসে। তখন সাহস পেয়ে হিন্দুরা তাদের আক্রান্ত পাড়া ছেড়ে প্রায় ৫০০শত নরনারী আবালবৃদ্ধবনিতা এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলে আশ্রয় নিয়েছেন। এখন ছুটি। হলে মাত্র জন ৪০ পরীক্ষার্থী আছে। তারা এই ৫০০ লোকের অতিথিসৎকারের গুরুভার নিয়েছে। মুসলমানেরা ঢাকা হলের নিকটের সব দোকান পাহারা দিচ্ছে আর দোকানদারদের শাসাচ্ছে ঢাকা-হলে এক পয়সার জিনিষ বেচেছ কি তোমাদের খুন করব। চাল ডাল কয়লা নেই; চোখের সামনে কয়লার দোকান পুড়িয়ে দিলে, চালের দোকান লুট করলে। ছেলেরা নিজেরা উপবাসী থেকে অতিথিদের সেবা করছে, আহতদের শুশ্রূষা করছে; সমস্ত রাত্রি জেগে ঘাটিতে ঘাটিতে হল পাহারা দিচ্ছে। মুসলমানদের ভয়ানক আক্রোশ হয়েছে ঢাকা-হলের উপরে, কেন সে এত লোককে আশ্রয় দিলে। তারা শাসাচ্ছে—দেখে নেবো ঢাকা-হলের জোর। ছেলেরা নিজেরা মাথায় ক'রে জীবন বিপন্ন ক'রে চাল কয়লা স্মাগ্‌ল্ ক'রে আনছে। এত টাকা যে কোথা থেকে আসবে সে সম্বন্ধে তাদের একবার প্রশ্ন নেই; নিজেদের তহবিল শূন্য ক'রে ভয়ার্ত্ত নিরাশ্রয়দের সেবা করছে। মন্দের মধ্যেও মঙ্গলের রূপ দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে, প্রাণ আশায় আনন্দে ভ'রে উঠছে, ভগবান যে মঙ্গলময় তা

নন্দী-পরিবার। ইঁহাদের বাড়ীর ১০০ গজের ভিতরে পুলিসের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাদিরী মহাশয়ের বাড়ী

* এই বাড়ী আক্রমণের ও রক্ষার বিস্তারিত সঠিক বৃত্তান্ত শেষ চিঠিতে আছে।—প্রবাসীর সম্পাদক

উপলব্ধি করছি। দেশকে অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ক'রে তুল্‌ছেন তিনি।

একজন লেক্‌চ্যারারের স্ত্রীর আচরণে মুগ্ধ হয়েছি। যখন মুসলমানেরা ভবেশ নন্দীর বাড়ী আক্রমণ করে

ঢাকা নবাবগঞ্জের একটি মুদির দোকান

তখন মেয়ে দুটি বিউগ্‌ল্ বাজিয়ে বিপদ-সঙ্কেত করে। হলের ছেলেরা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত। বয়োবৃদ্ধেরা তাদের আটকাচ্ছেন। লেক্‌চারার মহাশয়ের স্ত্রী তাঁর ছেলেকে বল্‌লেন, "যা যা, তুই যা…" আর বীর মাতার আদেশ পাওয়া মাত্র পুত্র একা ছুটল অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে। অনেক কষ্টে তাকে ফেরানো হ'ল। লেক্‌চারার পত্নীকে তিরস্কার করুলেন, "ছেলেকে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়ে দিচ্ছিলে মা হ'য়ে?" তাতে তিনি বল্‌লেন, "যারা বিপন্ন তারাও তো মা, তাদেরও তো ছেলে আছে?"

ঢাকা-হলের লোকরা ৫০০ লোকের আহার, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যরক্ষার বন্দোবস্ত, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে দিবা-রাত্রি ব্যস্ত আছেন। সবাই ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। কিন্তু যতক্ষণ একজন লোকও ঢাকা-হলে আশ্রয় নিয়ে থাকবে, ততক্ষণ হলের লোকদের নড়বার জো নাই। তাঁরা অবরুদ্ধ দুর্গে আছেন।

(২)

১-৬-১৯৩০

কাল রাত্রে ঢাকা-হলের আশ্রিতদের সেন্সস নেওয়া হয়েছিল ; তাতে এখনও সেখানে ৬৯ পুরুষ, ৭৪ স্ত্রীলোক ও ১০৭ বালক বালিকা শিশু আছে। যাঁরা সর্ব্বস্বান্ত ও আহত হয়ে এসেছেন তাঁরাও অত্যাচারীদের নাম প্রকাশ করতে সাহস করুছেন না; হিন্দুসভা ও কংগ্রেস রিপোর্ট নিতে এসেছিলেন ; এঁরা কারও নাম করতে সাহস করুলেন না অথচ তাঁরা বলছেন যে, অনেককে তাঁরা চেনেন, তারা পাড়ারই লোক, এমন কি [কোনও মুসলমান বাড়ীর একজনের] মোটর গাড়ীও তাঁরা আক্রমণের সময় গতায়াত করতে দেখেছেন। রোজ সন্ধ্যার পরে [কোনও মুসলমান] বাড়ীর মোটর ঢাকা-হলের চারিদিকে ঘোরাফেরা করে। লুটের পর যখন পুলিস এসেছে তখনও তারা মুসলমান জনতাকে কেবল মাত্র কথায় হট্ যাও হট্ যাও ব'লে সরিয়ে দিয়েছে, আর হিন্দুর বাড়ীতে খানাতল্লাসী করেছে বাড়ীতে কোন অস্ত্রশস্ত্র আছে কিনা। যে-সব লোক আত্মরক্ষার্থ বন্দুক আওয়াজ করেছে তাদের বন্দুক বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে। স্বয়ং [*] নাকি এক লুণ্ঠিত বাড়ী দেখে যাবার সময় একখানি মাউণ্টেড বাঘের চামড়া নিজের বাড়ীতে নিয়ে গেছেন। কাপড়ের দোকানের লুণ্ঠনাবশেষ পুলিসের লোকে মোটর বোঝাই ক'রে বাড়ী নিয়ে গেছে। কাল হিন্দুসভার লোকদের সঙ্গে শহর দেখতে বেরিয়েছিলাম। দেখ্‌লাম কয়েকজন মুসলমান একখানা ঘোড়ার গাড়ীর ছাদে চালের বস্তা ও ভিতরে তেল ঘিয়ের টিন বোঝাই ক'রে নিয়ে চলেছে। চকে জেলের সামনে কাল তিন টাকা মণ চাল ও এক টাকা

* একজন পুলিস অফিসার।

সের ঘি বিক্রী হয়েছে। পুলিস দেখেছে কি না, অথবা বিক্রেতা পুলিসকে কি বলে বুঝিয়েছে জানি না।

হিন্দুরা নালিশ কর্‌লেই ইংরেজেরা ঠাট্টা করে—Go to your Gandhi and get Swaraj. এখনো পথে হিন্দু চলে না, মুসলমান চলছে অল্প অল্প; দোকান বাজার এখনো প্রায় বন্ধ; হিন্দুরা দুট বাজার বসিয়েছে সেখানে কেবল হিন্দুর কারবার, কিন্তু ভিন্ন পাড়ার লোক সাহস ক'রে যেতে পারে না।

শিক্ষায়তন-বিশেষের সহিত সম্প ক্ত এক মৌলবী সাহেব বল্‌ছিলেন যে, মুসলমানেরা দুঃখ কর্‌ছিল যে, তারা একটা আয়রণ-চেষ্ট লুট করে আন্‌ছিলো, পথে পুলিস ছিনিয়ে নিয়ে সেটা ভেঙে টাকা কড়ি নিজেরা সব নিয়ে নিয়েছে, তাদের কিছু দেয়নি। কাল দেখলাম বহু পোদ্দারের দোকান লুট করেছে ও পুড়িয়ে দিয়েছে—সোনারূপার দ্রব্য ও গিনি প্রচুর নিয়ে গেছে। হিন্দুরাও স্থানে স্থানে মুসলমানের দোকান লুট ও দাহ করেছে, কিন্তু একটা দর্জ্জির দোকান, একটা কয়লা কাঠের দোকান এমনি, তাতে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষতি খুবই হয়েছে, কিন্তু সমাজ-হিসাবে মুসলমানদের বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তারা যে বীভৎস কাণ্ড করেছে তা যে কোনো মানুষ কর্‌তে পারে, এ না দেখলে বিশ্বাস ও ধারণা করা যায় না। অনেক মুসলমানের রাগ ছিল পিকেটিঙের দরুণ মদ গাঁজা কিন্‌তে বাধা পাওয়াতে; দুর্বৃত্ত পক্ষ সেই রাগ এখন কাজে লাগিয়েছে।

(৩)

৩-৬-১৯৩০

[কোনো বিখ্যাত লোকের] ভাগিনেয় তাঁর সদ্য-প্রসূতা পত্নীকে নিয়ে ঢাকা-হলে পালিয়ে এসেছিলেন একটি ইউরোপীয় নার্সের সাহায্যে জলন্ত রাস্তার মাঝখান দিয়ে। মনে হয়েছিলো এই বুঝি ট্র্যাজেডির ক্লাইম্যাক্স। কিন্তু ঢাকা-হলের ইতিহাসে বিধাতা আরো অচিন্তনীয় ঘটনা লিখেছিলেন—কাল প্রভাতে একটি মহিলা কন্যা প্রসব করেছেন এবং একটি মহিলা প্রাণত্যাগ করেছেন। যিনি মারা গেছেন, তাঁরা ধনী। তাঁদের সুশীলা-নিবাস

কায়েতটুলীর "সুশীলা-নিবাসে"র দগ্ধ বিধ্বস্ত দিক্‌। মালিক বরিশালের পুলিস সব্‌-ইন্‌স্পেক্টর। এই বাড়ীর সম্মুখে ডাঃ শমসুদ্দীন আহমদ এবং অদূরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ গিয়াসুদ্দীন সাফদর বাস করেন

নামক সুরম্য সুন্দর বাড়ীখানি দুর্বৃত্তেরা চূর্ণ দগ্ধ লুট ক'রে গেছে, মোটর গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে; এই "শক্‌" বধূটির হৃদয়ে লেগেছিলো; কাল রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন, সকালে উঠতে বিলম্ব দেখে ডাকাডাকির পর দেখা যায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এতগুলি আহত নরনারী ও শিশু এখানে আশ্রয় নিয়ে আছে, কিন্তু একজন ডাক্তারও কোনো দিন খোঁজ নিলেন না কিছু দরকার আছে কিনা। ডাক্তারের ধাত্রীর কাজ সব আনাড়িরাই কর্‌ছেন।

ঢাকায় একটি রিলীফ-কমিটি গঠিত হয়েছে; তাতে নাকি নবাব বাহাদুর হাজার টাকা দিয়েছেন ও এখনকার প্রসিদ্ধ ধনী রমানাথ দাস হাজার দেবেন প্রতিশ্রুত হয়েছেন। সাহায্য ভিক্ষা করতে হবে সাহাবুদ্দীন সাহেবের কাছে, নয় তো মাজিষ্ট্রেটের কাছে। কোন্‌ আত্মসম্মানসম্পন্ন হিন্দু তাঁদের কাছে হাত পাততে যাবে? মুসলমানদের যা ক্ষতি হয়েছে তা ঐ দুই হাজারেই

পূরণ হবে, কিন্তু হিন্দুদের যে অনেক লাখ টাকা ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করবে কে? এতগুলি লোক নিরাশ্রয় আহত ভয়ার্ত্ত হয়ে ঢাকা-হলে আশ্রয় নিয়েছে, এখনও গভর্মেণ্টের তরফ থেকে কোনো কর্ম্মচারী দয়া করে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে যান নি। পরন্তু এক গোয়েন্দা ঢাকা-হলে গিয়েছিল বটে।

"সুশীলা-নিবাসে"র অপেক্ষাকৃত অল্পক্ষতিগ্রস্ত অংশ

বাজার দোকান এখনও বন্ধ। পথ জনবিরল। ঢাকা-হলের ছেলেরাও ক্লান্ত হ'য়ে একে একে বাড়ী যাচ্ছে। এখনও দশবার জন আছে।

এপর্য্যন্ত কংগ্রেস ও হিন্দুসভা ছাড়া ঢাকা-হলে কোন ধনী লোক সাহায্য দিতে অগ্রসর হন নি। কেবল একজন ঢাকা-হলের প্রাক্তন ছাত্র স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কুড়ি টাকা হলের এক লেকচ্যারারের পকেটে গুঁজে দিয়ে গেছেন।

(৪)

৫-৬-১৯৩০

৩রা ও ৪ঠা তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় ঢাকার যে বিবরণ বেরিয়েছে, তা সত্য। এখন ঢাকার নিকট-বর্ত্তী গ্রামে দাঙ্গা লুট আরম্ভ হয়েছে। ঢাকাতেও ছাড়া বাড়ীর তালা ভেঙে জিনিষপত্র চুরি হচ্ছে। বাসিন্দারা বাসায় ফিরে যেতে চাইলেও মুসলমানরা বাধা দিচ্ছে ও ভয় দেখাচ্ছে, মহরমের আগে ফিরে গেলে ভাল হবে না। কোনো হিন্দু মুসলমানের কাছ থেকে কিছু কেনে না। তাই তারা হিন্দু দোকানীদের ভয় দেখিয়ে তাদের দিয়ে চোরাই মাল বেচ্ছে। ঢাকা-হলের সাম্‌নের এক দোকানী এই রকমে বরাবর দোকান খোলা রেখেছে। এই খবর পেয়ে তার দোকান থেকে জিনিষ কেনা ছেড়ে দেওয়া গেছে।

মুসলমানেরা খুব ব্ল্যাকমেল করছে। যে-সব পরিবার পালিয়েছে তাদের অনেককে ঘুষ দিয়ে যেতে হয়েছে। যারা পালাতে পারে নি তাদের অনেকে ক্রমাগত ঘুষ দিচ্ছে। অনেক ইউনিভার্সিটি লেক্‌চ্যারারদের কাছ থেকে ২০০ টাকা করে ঘুষ চেয়েছে। তাঁরা দেন নি; কাজেই তাঁদের বাসা ছাড়তে হয়েছে।

ঢাকার থেকে ব্যবস্থাপক সভায় যে তিনজন প্রতিনিধি গেছেন, তাঁদের কেউ বা অন্য কোন সভ্য কি গভর্মেণ্টকে প্রশ্ন করতে পারেন না—(১) কতজন হিন্দু ও মুসলমান হতাহত হয়েছে? (২) হিন্দু ও মুসলমানের সম্পত্তিক্ষতির পরিমাণ কি? (৩) কতজন হিন্দু ও মুসলমান গেরেপ্তার হয়েছে? (৪) ভবেশ নন্দীকে অডিন্যান্স অনুসারে গেরেপ্তার করার পর কয়েক শত মুসলমান তাদেরই বাড়ী আক্রমণ করলে কেন? (৫) যারা আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক ছুড়েছে তাদের বন্দুক বাজেয়াপ্ত হয়েছে কেন? (৬) তেসরা জুন তারিখে কেবল মাত্র দুজন নিম্নশ্রেণীর মুসলমানের নির্দ্দেশ অনুসারে নবাবপুর, টিকাটুলি, উয়ারী, ঠাঠারী বাজার গুর্খা দিয়ে ঘিরে বহু হিন্দুকে গেরেপ্তার করা হয়েছে কি না? (৭) বেলা ৯টা ১০টার সময় যখন কয়েক শত মুসলমান কায়েতটুলী ধ্বংস করে তখন ক'জন মুসলমানকে গেরেপ্তার করা হ'য়েছে? (৮) রাত্রি ১০টার সময় বাবুপুর থানার অদূরে যখন মুসলমানেরা

আল্লা-হো-আকবর চীৎকার ক'রে ইন্দুপ্রভা ক্যাবিনেট ওয়ার্কস পুড়িয়ে ফেলে, তখন পুলিস সেখানে গিয়েছিল কি না এবং ক'জন মুসলমানকে গেরেপ্তার ক'রেছে ? (৯) লালবাজার পুলিস থানার নিকটে নবাবগঞ্জ প্রভৃতি স্থান যখন লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হয়, তখন পুলিস গিয়েছিল কি না ও ক'জন মুসলমানকে গেরেপ্তার ক'রেছে ? (১০) মুসলমানদের জামিনে খালাস দেওয়া হচ্ছে, হিন্দুদের বেশী হচ্ছে না, একথা ঠিক কি না ? (১১) দিনে রাতে লুট করার কোনো বাধা পুলিস কোথাও দিয়েছে কি না ?

(৫)

৬-৬-১৯৩০

ঢাকা উকীল-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ও অপর কয়েকজন উকীল ঢাকা-হলে গিয়েছিলেন দেখতে শুন্‌তে। তাঁর মুখে শোনা গেছে, যে, তাঁর যে কয়টি রিজল্যুশন অমৃতবাজার পত্রিকায় বাহির হয়েছে, তার তৃতীয়টিতে পুলিস সাহেবের নামে একটি অভিযোগ পরিষ্কার ভাষায় ব্যক্ত করা হ'য়েছিল। পত্রিকায় কেবল serious allegation বলা হ'য়েছে। কিন্তু অভিযোগটি সুস্পষ্ট ভাষায় বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও বঙ্গের লাটের চীফ সেক্রেটারীর নিকট পাঠান হ'য়েছে।

(৬)

৬-৬-১৯৩০

কাল বেঙ্গল গভর্মেণ্ট কমিশনারকে তদন্ত করবার জন্য টেলিগ্রাফ ক'রেছেন। আজ বেলা ১১টার সময় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হল্যাণ্ড ও তাঁর স্ত্রী ঢাকা-হলে গিয়েছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে হয়ত জানাতে চেয়েছিলেন যে, এটা অফিশ্যাল ভিজিট নয়, কেবল সামাজিক ভাবে গিয়েছিলেন। সুশীলা-নিবাসের মালিক পেন্সানপ্রাপ্ত পেশ্‌কার রাধিকামোহন আঢ্যকে কায়েতটুলী ধ্বংসের বিষয়ে জেরা করলেন—"কখন আক্রমণ করেছিল—রাত্রে ?" বেলা ৯॥০টার সময় চীৎকারে গগন বিদীর্ণ ক'রে আক্রমণ করলে এবং সেই

কয়েতটুলীর "মাধবানন্দ-ধাম"। বাহিরের ছবি। মালিক শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী, সীনিয়র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট, ঢাকা

চীৎকার ঢাকা-হল থেকে শোনা যাচ্ছিল, অথচ ম্যাজিষ্ট্রেট কিছুই জানেন না !! প্রশ্ন হ'ল, "কত লোক আক্রমণ করেছিল ?" উত্তর, "তিন শ' হবে।" প্রশ্ন, "তারা চীৎকার ক'রেছিল ?" উত্তর, "হাঁ, খুব।" প্র—"পুলিস ছিল ?" উ—"দেখিনি ; তবে শুনেছি [------] অদূরে দাঁড়িয়েছিলেন।" ম্যাজিষ্ট্রেট—"[———] ?" তখন উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন লেক্‌চ্যারার বল্লেন—"হাঁ, তিনি (পুলিশের একজন অফিসার) ছিলেন, আমি বহু লোকের কাছে শুনেছি।"

ঢাকায় একথা অনেকে শুনেছেন, যে, কোনো সরকারী কর্ম্মচারী ঐ পুলিস অফিসারকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ফায়ার করলেন না কেন ?" উত্তরে তিনি বলেন, "কি ক'রে করি, স্বয়ং [----] উপস্থিত ছিলেন, তিনি যখন ফায়ার করছেন না।" ঐ পুলিশ অফিসার নাকি, কার প্ররোচনায় এ সব হচ্ছে, সে বিষয়েও ইঙ্গিত করেন।

পূর্ব্বোক্ত লেক্‌চারারটি ম্যাজিষ্ট্রেটকে আরো বলেন, "আমি ৫।৬জন কনষ্টেবলের মুখে নিজে শুনেছি যে, তারা উপস্থিত ছিল এবং তারা প্রতিরোধ করতেও পারত, কিন্তু তারা কোনো হুকুম পায় নি।" এই কথা শুনে ম্যাজিষ্ট্রেট বললেন, "৪।৫জন কনষ্টেবল ৩০০।৪০০ লোকের বিরুদ্ধে কি করতে পারত? সব লোকে বলছে পুলিস কোনো সাহায্য করে নি—এ কি ঠিক্?" রাধিকাবাবু বললেন, "যখন ডি-আই-জি আমার বাড়ীতে এলেন, তখনও বহু মুসলমান আমার বাড়ীর মধ্যে ছিল; তিনি তাদের শান্তভাবে বললেন, 'যাও যাও, চলা যাও।' তখন তারা চলে গেল, কিন্তু কাউকে গেরেপ্তার করা হ'লো না।"

এই কথার পর ম্যাজিষ্ট্রেট আর রইলেন না। নন্দী-পরিবারের সঙ্গে মোকাবেলা করাবার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু তিনি আর বিলম্ব করতে সম্মত হলেন না। দাঙ্গার ১২ দিন পরে এই হলো তদন্ত। মেম সাহেব চুপিচুপি সাহেবকে বলছিলেন যে, লোকে বলে ২০০ লোক আছে, কিন্তু ১৫।২০ জনের বেশী নেই। তা শুনতে পেয়ে পূর্ব্বোক্ত লেক্‌চারারটি বললেন—"এখন পুরুষেরা কতক বাজারে গেছে, কতক আফিসে গেছে, আর মেয়েরা এখন দিনের বেলা নিজের নিজের বাড়ী দেখতে যায় ও কেউ কেউ বাড়ীতেই খাওয়া-দাওয়া করে; সন্ধ্যার সময় রাত্রের খাওয়াও সেরে বা রাত্রের খাওয়া সঙ্গে নিয়ে সকলে হলে ফিরে আসে।"

ইন্দুপ্রভা ক্যাবিনেট ওয়ার্কস, দেওয়ান বাজার, ঢাকা। এই বাড়ীর ২০০ গজের ভিতরে ঢাকা ইউনিভার্সিটির মুসলমান রেজিষ্ট্রার, ইস্‌লামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের মুসলমান প্রিন্সিপাল, দুজন মুসলমান ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং একজন মুসলমান সবজজ বাস করেন

(৭) ৭-৬-১৯৩০

কাল বিকালবেলা একজন দারোগা তদন্ত করতে ও জবানবন্দী নিতে ঢাকা-হলে গিয়েছিলেন। ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন লোকেরা বললেন যে, তারা পুলিসের [——]কে উপস্থিত দেখেছেন, স্বয়ং পুলিসের [——] এসেও কোনো লুণ্ঠনকারীকে গেরেপ্তার করেন নি, কেবল হটিয়ে দিয়েছেন; লুণ্ঠনকারীরা [*]কা হুকুম, [*]কা জয়, ব'লে বাড়ী লুট ক'রেছিল। দারোগা এ সব কিন্তু লিখে নেন নি। ১২ দিন পরে এই তদন্ত। একজন পেন্সানপ্রাপ্ত ভদ্রলোক এক থানায় গিয়ে, অন্য থানায় ফোন করে, তার পর বড় পুলিস আফিসে ফোন করে, পুলিস সাহেবের মোটর যাচ্ছে দেখে সেটা থামিয়ে প্রার্থনা জানাবার জন্যে হাত তুলে, কিছুতেই কোনো সাহায্য পান নি। তাঁর বাড়ী তৈরীর সময় যে মিস্ত্রী দরজা রং ক'রেছিল, সে-ই বাড়ীতে ঢুকে ছোরা দেখিয়ে টাকা চায়; তাঁর বাড়ীর কাছের মসজিদের মোল্লাও তাঁকে শাসিয়েছিল।

এর অল্পক্ষণ পরে দুজন সাধারণ কাপড় পরা কনষ্টেবল দোকানে জিনিষ কিনতে যায়; মুসলমান গুণ্ডারা তাদের ধরে ঘরে বন্ধ ক'রে ছোরা লাঠি দেখিয়ে টাকা আদায় করবার চেষ্টা করে। একজন কনষ্টেবল পালিয়ে বাবুপুরা থানায় খবর দেয় এবং তখন অল্পক্ষণ পরেই একজন পুলিস অফিসার পুলিস নিয়ে এসে কনষ্টেবলকে উদ্ধার করেন ও

* একজন প্রভাবশালী মুসলমান।

১৫।১৬ জন মুসলমানকে গেরেপ্তার করেন। বাকী লোক মসজিদে গিয়ে লুকোয়। একথা তাঁকে বলা সত্ত্বেও তিনি মসজিদের লোকদের কিছু বলেন নি।

পুলিস এখনো অনেক মুসলমানের বাড়ী তল্লাস করলে অনেক চোরাই মাল ধর্‌তে পারে। মুসলমানের ভয়ে মৃতদেহের সংকার করা দায় হয়ে উঠেছে। ওরা শ্মশানে জটলা করে। দাঙ্গার সময় শ্মশান-যাত্রী তুজনকে খুন করেছিল।

এই-সব কুৎসিৎ হিংস্র ব্যাপারের মধ্যে ভালোমন্দ মেশানো একটি ঘটনা জানান দরকার। একজন ব্রাহ্মণ লেক্‌চারার যখন দোতলা থেকে লাফিয়ে পাশের বাড়ীতে পড়েন তখন একটি মুসলমান ছাত্র তাড়াতাড়ি তাঁকে লুঙ্গি পরিয়ে পৈতা ছাড়িয়ে মুসলমান ব'লে পরিচয় দিয়ে তার প্রাণরক্ষা করে। ছাত্রটির উদ্দেশ্য ভালই ছিল, কিন্তু প্রাণের জন্যও নিজের ধর্ম্মমত গোপন করার হীনতার লজ্জা ভুল্‌বার নয়।

(৮)

৮-৬-১৯৩০

ম্যাজিষ্ট্রেট্ ঢাকা-হলে এসে আর একটা প্রশ্ন ক'রে-ছিলেন, "এত লোকের খাওয়ার কি ব্যবস্থা হয়েছে?"

উত্তর। "প্রথম ৪ বেলা আমরা এঁদের খাইয়েছি, পরে যে যার নিজের নিজের ব্যবস্থা করেছেন। কেবল তিনটি পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছেন; তাঁদের খাওয়ার ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হয়েছে।"

ম্যাজিষ্ট্রেট আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না।

কয়েকটি পরিবার একেবারে একবস্ত্রে এসেছিলেন। কেউ কেউ পরে দ্রব্যাদি উদ্ধার করেছেন; কারো কিছুই নেই। এক পেন্সনভোগী বৃদ্ধ ছাত্রদের বিছানায় শয়ন করেন ও সপরিবারে ছাত্রদের আতিথ্যে ঢাকা-হলে বাস করছেন।

Hindu citizens' Relief Committee হ'য়েছে। তাঁরা নিঃস্ব পরিবারদের চাল ও টাকা সাহায্য ক'রে গেছেন। এবং চাল কিনে অন্যদেরও বাড়ীতে পৌঁছে দেবেন বলেছেন, যাঁদের চাল ডাল পাওয়া দুষ্কর।

কায়েতটলীর একটি বাড়ী। মালিক পুলিসে কাজ করেন

বাজারে প্রত্যেক দোকানে ২।৪ জন মুসলমান পাহারা থাকে; তারা হুকুম করে এই বাবুকে পাচ, ঐ বাবুকে দশ সের দেবে, বেশী দিলে দোকান লুট করব। ক্রমশঃ বড় হিন্দু বাজার বস্‌ছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সেই বাজারের দোকানীদের পুরাতন বাজারে যাবার জন্য নিজে গিয়ে অনুরোধ করছেন; কিন্তু দোকানীরা বল্‌ছে আমাদের যেতে সাহস হয় না।

পরশু দিনের বেলাও তুজন মুসলমান ঢাকা-হলে আশ্রিত এক ভদ্রলোককে পথে অতর্কিতে ছোরা নিয়ে তাড়া করেছিল। তিনি পায়ের জুতো খুলে ফিরে দাঁড়ানোতে আততায়ীরা থমকে যায় এবং সেই সময় আর একজন হিন্দু পথিক আসাতে তারা পালিয়ে যায়।

(৯)

৮-৬-১৯৩০, রাত্রি

ভবেশ নন্দীকে গেরেপ্তার করার পর তার পিতা ছাড়া আর সকলেই বাড়ীতে ছিলেন, শুধু মেয়ে তুটি নয়। (যাঁরা বাড়ীতে ছিলেন, তাঁদেরই গ্রূপ

ফোটোগ্রাফ প্রবাসীতে ছাপা হ'ল।) ভবেশ নন্দীর জন্য ১৯২৬ সালের জন্মাষ্টমীর সময় ও গত ২৬শে জানুয়ারী ইণ্ডিপেণ্ডেন্স্ ডে'র পরের দুবারের দাঙ্গায় মুসলমানেরা কায়েতটুলী আক্রমণ করতে চেষ্টা ক'রেও সফলকাম হয় নি। এবার ভবেশ বাড়ীতে না থাকাতে মুসলমানেরা দলবদ্ধ হ'য়ে এসে প্রথমেই তারই বাড়ী আক্রমণ করে। ১৯২৬ সালের দাঙ্গার পর বৃদ্ধ কর্ত্তা নন্দী মহাশয় দোতলায় ওঠবার সিঁড়ির মুখে একটা লোহার গেট লাগিয়ে নিয়েছিলেন। গেট বাহিরের দিকে খোলা। যখন মুসলমানেরা বাড়ী আক্রমণ করল, তখন বাড়ীর লোকেরা সেই লোহার গেট বন্ধ ক'রে দিয়ে দোতলায় চ'লে যান। কিন্তু মুসলমানেরা উপরে ইট ছুঁড়তে থাকে ও বাড়ীতে প্রবেশ করে। এই সময় ভবেশের দুই বোন ও ভ্রাতৃজায়া উপর থেকে ইট ছুঁড়ে আক্রমণে বাধা দিতে থাকে; ভবেশের মা শিশুগুলিকে আগ্‌লে ঘরের মধ্যে ছিলেন। ছেলেরা ইট ভেঙে মেয়েদের এনে এনে দিচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরে মুসলমানেরা লোহার গেট ভাঙতে আরম্ভ করে। তখন ছেলেরা একটা বড় লোহার শিকল দিয়ে গেট বেঁধে একটা লোহার খুঁটিতে শিকল পেঁচিয়ে টেনে ধ'রে বসে থাকে। মেয়ে দুটি ও মাঝে মাঝে বধূটি ইট ছুঁড়ে আক্রমণে ক্রমাগত বাধা দিতে থাকে। অনিন্দ্যবালা সম্মুখে ছিল, সে আহত হয়। আক্রমণকারীদের সংখ্যা ঠিক কেউ বল্‌তে পারে না, পার্‌বার কথাও নয়; তবে ৫০০ লোকের কথাই বেশী লোকে বলে। নন্দীদের বাড়ী একটা চৌমাথার কাছে; সেখানে এত লোক জড় হ'য়েছিল যে চারিদিকের গলি ভ'রে গিয়েছিল—তাদের মধ্যে কে যে দর্শক, কে যে আক্রমণকারী, তা পৃথক করা তখন দুষ্কর হয়েছিল। এই বিবরণ বৃদ্ধ কর্ত্তা প্রসন্নকুমার নন্দী মহাশয়ের নিকট হ'তে শুনে লেখা। ইনি গভর্মেণ্ট স্কুলের পেন্স্যানপ্রাপ্ত হেড পণ্ডিত।

শ্রীমতী অনিন্দ্যবালা নন্দীকে

"মাধবানন্দ ধাম।" ভিতরের ছবি

শ্রীমতী অনিন্দ্যবালা নন্দী। আক্রমণকারী মুসলমানদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতে গিয়া আহত

নিখিল-ভারত হিন্দু-সভার পক্ষ থেকে তার বীরত্ব ও ধৈর্য্যের জন্য একটি স্বর্ণপদক দেওয়া হবে স্থির হ'য়েছে। হিন্দু মহাসভার বর্ত্তমান কর্ম্মকর্ত্তা সভাপতি ডাঃ মুঞ্জে এই কথা বলেছেন।

পুঃ—সকল হিন্দুর মুখে কেবল এই কথা শুনি, যে, পুলিশ যদি হিন্দুকে রক্ষা না করে, তবে যেন তাদের আত্মরক্ষায় বাধা না দেয়; তা হ'লেই আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে বাস করতে পারি। যখনই হিন্দুরা প্রতিরোধ ক'রতে গেছে, তখনই পুলিশ এসে নাকি তাদের প্রতিরোধ ক'রেছে। তাতেই হিন্দুর এমন সর্ব্বনাশ হ'তে পেরেছে। এখনও ঢাকা-হলের আশ্রিত অবশিষ্ট লোকেরা নিজেদের বাড়ীতে ফিরে যেতে সাহস করছেন না।

রক্তের হাসি

শ্রীসান্ত্বনা গুহ

প্রয়োজনের তাগিদ ফুরোলে চলে যাওয়াই হয় ত জগতের চিরন্তন নিয়ম। তাই মাঘের কন্‌কনে বাতাস গায়ে লাগতে না লাগতেই পাতারা সব ঝরে পড়ে, ফুলের হাসিটুকু শুকোতে না শুকোতেই পথের ধূলায় তার চির-সমাধি হয়। কিন্তু মানুষের হৃদয় বলে যে একটা জিনিষ আছে, তাও ত অস্বীকার করবার নয়। তার কাছে আইন নাই, কানুন নাই, নীতি-সংহিতার বিধি-নিষেধও সেখানে অচল।

কাজের বাইরে গেলে গরু-ঘোড়ার হয় গো-হাটায়, ন ত পিঞ্জরাপোলেই চিরটা কাল সদ্গতি হয়ে আসছে। কিন্তু পরেশবাবুর বুড়ো ঘোড়াটার বেলায় হঠাৎ এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে গেল। ছোটবেলা হ'তে তিনি এটার কোলেপিঠে চড়ে আজ এতবড়টি হয়েছেন একথা তিনি কিছুতেই ভুলতে পারেননি। আর তাই তার সঙ্গে তার ওপর ছিল একটা অন্ধ-মমতা জড়িয়ে।

ছোক্‌রা সহিস রামলালটার কিন্তু সহ্য হ'ত না। সে কিছুতেই বুঝত না,—যে ফুল শুকিয়ে গিয়েছে তাকে ধরে রাখবার জন্যে এই ব্যর্থ চেষ্টা কেন? মনিবের পক্ষ-পাতিত্বকে সে তাই কিছুতেই সুনজরে দেখতে পারত না। অক্ষম সহিসের সব রাগ গিয়ে শেষে পড়ত—এই অসহায় জীবটির ওপর। ফলে কোনদিন তার বরাদ্দ আহার জুটত, কোনদিন জুটত না। পরেশবাবু সহিসকে বুড়ো ঘোড়াটার উপযুক্ত যত্ন করতে আদেশ দিয়েই তাঁর কর্ত্তব্য শেষ করেছিলেন, কার্য্যক্ষেত্রে তার কতদূর প্রয়োগ হচ্ছে তা' দেখা হয়ত প্রয়োজন মনে করেন নি।

এমনি অনাহার ও স্বল্পাহারের ফলে তার বুকের সব-ক'টি পাঁজরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে পড়্‌ল, নড়তে গেলে পাঁজরায় পাঁজরায় ঠোকাঠুকি লাগে। ক'দিন উপর্য্যুপরি অনাহারের পর সেদিন মনিবের হুকুমে রামলাল তাকে নিয়ে গেল মাঠে চড়াতে। সবুজ মাঠ ঘাসে ভরা। তাকে কিন্তু নিয়ে বেঁধে দিলে এমনি এক জায়গায়, যেখানে ঘাসের কোন চিহ্ন নেই—শুক্‌নো খট্‌খটে মাটি। খাটো করে বাঁধা দড়িটার ঠিক নাগালের বাইরেই কচি কচি দূর্ব্বা। মুখ গিয়ে কিন্তু তার সেখানে পৌঁছয় না। উপবাসশীর্ণ করুণ মুখটা তুলে মূক জীবটি একবার সহিসের দিকে চায়, আবার দড়ি ছিঁড়বার ব্যর্থ চেষ্টায় ছট্‌ফট্‌ করে। সারাটা অঙ্গে তার করুণ প্রার্থনা উন্মুখ হয়ে ফুটে উঠল। বুভুক্ষু চোখের ড্যালাদুটোও ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চায় যেন। রামলাল নির্ম্মম উল্লাসে হাততালি দিয়ে নেচে উঠল। বঞ্চনা-বেদনার সবটুকু ব্যথা তার প্রতিহিংসাপরায়ণ মনে একটা মস্ত হাসির জিনিষ বলেই মনে হ'ল। পঞ্জরসার শীর্ণ দেহের সবটুকু শক্তিকে এক করে মরীয়া ঘোড়া দড়ি টেনে ধরল। জীর্ণ দড়ি আর আত্মরক্ষা করতে পারলে না, সশব্দে ছিঁড়ে গেল। উপবাসখিন্ন তার ম্লান দেহখানি এই অসহ্য বেগে আর টাল সামলাতে পারলে না। হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল,—হাঁটুদুটোও দুমড়ে ভেঙে গেল। সবুজ দূর্ব্বা-দলের ওপর কস বেয়ে একরাশ ফেনার সঙ্গে একটু রক্ত পড়ল, একটিবারের জন্যে নড়ে উঠেই জন্মের মত সে নিস্পন্দ হয়ে গেল।

জয়ের উল্লাসে উন্মত্ত রামলাল ফিরেও চাইল না। হয়ত প্রয়োজন মনে করলে না।

যথাসময়েই মনিবের কাছে খবর গেল—বুড়ো ঘোড়াটা মরে জুড়িয়েছে। পরেশবাবুর অশ্রুঝাপসা চোখের কোলে দু'ফোঁটা জল টল্‌টল্‌ করে উঠ্‌ল; কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। জগৎ তারপরে আবার যথারীতি আপনার পথে ছুটে চল্‌ল। ধূলোর ঘূর্ণী উড়িয়ে কাল-বৈশাখী দেখা দিল, মেঘের ঘন জটাজালে আকাশ ঢেকে বর্ষা এল, কারুর যাত্রাপথে এতটুকু বাধারও সৃষ্টি হ'ল না।

ধীরে ধীরে মরা ঘোড়াটা পচতে লাগ্‌ল, টেনেও ফেলে না কেউ। তারপরে বর্ষাশেষে একদিন, যে একবিন্দু ঘাসের জন্যে সে হাহাকার করে মরেছিল, তবু এতটুকুন ঘাসও পায়নি, তারই গলিত শবে উর্ব্বর-করা পাষাণমাটির বুকে একরাশ কচি দূর্ব্বার হাসি ফুটে উঠল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বক্তৃতা

লাইব্রেরীর সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে প্রথমেই বলতে হয় যে বই সংগ্রহ করা ভাল বটে কিন্তু আসল জিনিষ হচ্ছে পড়া।

আগেকার দিনে এই পড়ে আর পড়িয়ে পণ্ডিতরা জ্ঞানের বিস্তার করতেন। কিন্তু তখন অনেক অসুবিধা ছিল।

আজকাল আর লেখা-পড়া শিখবার জন্য, জ্ঞান অর্জ্জন করবার জন্য, কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাওয়ার আবশ্যকতা নাই।...বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ না থাক্‌লে কিছু হবে না একথা ঠিক নয়।...

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, ডিগ্রীধারীর অজ্ঞানতা ঢেকে রাখবার আবরণ মাত্র।...

আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একমাত্র কাজ যেন গ্র্যাজুয়েট তৈরী করা। কিন্তু আমাদের দেশে বহু লোক ছিলেন এবং এখনও আছেন প্রতিভায় উজ্জ্বল, তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ ছিল না। যেমন কেশবচন্দ্র সেন, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ, গিরীশ ঘোষ, শরৎচন্দ্র।...

সেকলে বিলাত থেকে ভারতে আসবার পথে জাহাজে বিস্তর বই পড়ে ফেলতেন। তখনও সুয়েজ খালের পথে ভারতে আসবার রাস্তা হয়নি। বিলাত থেকে ভারতে আস্‌তে হ'ত কেপ্ অব গুড্ হোপ ঘুরে। তাতে বহু সময় লাগত। এই দীর্ঘ সময়ে জাহাজেই তার হাজার হাজার বই পড়া হয়ে যেত।

গিবন অক্সফোর্ড গিয়েই ফিরে এসেছিলেন, কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর মত জ্ঞানী কয়জন? তিনি অক্সফোর্ড থেকে ফিরে এসে লাইব্রেরীতে বসে জ্ঞান অর্জ্জন করেছিলেন। সেই জ্ঞানের ফল পৃথিবীতে দিয়ে গিয়েছেন, রোমক সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস— এক অতি অপূর্ব্ব জিনিষ।

বিশ্ববিখ্যাত জ্ঞানী জনসন নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। দু'বেলা তাঁর আহার জুট্‌ত না। একদিন তিনি তাঁর পুস্তক-প্রকাশকের কাছে কিছু টাকা ধার চেয়ে এক পত্র লিখেছিলেন,—নীচে সই করেছিলেন- খাদ্য-হীন। এই জন্‌সন লাইব্রেরীতে পড়ে পড়ে জ্ঞানবান হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা লাভ করবার মত সঙ্গতি তাঁর ছিল না।

মহাপণ্ডিত কার্লাইলের বাড়ী ছিল স্কটল্যাণ্ডে। তাঁর পিতা রাজমিস্ত্রীর কাজ করতেন। অতি দরিদ্র ছিলেন এঁরা। কার্লাইল বল্‌তেন,—রক্ষে যে আমি জমিদারের ছেলে হয়ে জন্মাই নি, তাই মানুষ হয়েছি।...

তাঁর পিতা তখন তাঁকে এডিনবরার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের জন্য পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে এসে তিনি বল্‌লেন, একমাত্র গণিত ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছাড়া এখানে আর মানুষ কেহ নেই। তবু যে তিনি এডিনবরায় রইলেন তার কারণ হচ্ছে এই যে, এডিনবরায় খুব ভাল একটি লাইব্রেরী ছিল। তিনি সেই লাইব্রেরীতে বসে নিজের চেষ্টায় ইটালীয়ান, ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মেন ভাষা শিখেছিলেন।

ভারতবর্ষে যে কয়েকজন মহা মহা দার্শনিক পণ্ডিত আছেন, কেউই বিদেশে গিয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করে পণ্ডিত হন্ নি। এঁদের কারও নামের পেছনের ক্যাণ্টাব, অক্সন নেই। এঁরা ভারতে থেকেই লেখাপড়া করে পণ্ডিত হয়েছেন।...

অনেক জাপানী লণ্ডনে যায় বিদেশ থেকে জ্ঞান আহরণ করে আন্‌তে। তাদের কাউকে যদি আপনি জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি লণ্ডনের ডাক্তার উপাধি নিতে এসেছ? তবে সে চটে যাবে। সে তৎক্ষণাৎ জবাব দেবে, কেন, আমাদের দেশের ডক্টরেট কি কিছু নয়, যে, আমরা বিদেশের উপাধির জন্য লালায়িত হব?

আমরা যে বিদেশী ডিগ্রীর জন্য ব্যস্ত হই সেটাও আমাদের দাস-মনোভাবের ফল। আসল জিনিষ হচ্ছে জ্ঞানস্পৃহা।...

পড়াশোনা করতে চাইলে আমাদের যে সব লাইব্রেরী আছে তাতেও যথেষ্ট বই পাওয়া যায়। কলিকাতার ইম্পীরিয়েল লাইব্রেরী ও ইয়ুনিভার্সিটী লাইব্রেরী থেকে আমি বছরে অন্ততঃ এক হাজার বই নিয়ে পড়ি। পড়ি, নোট করি—যেন রাত পোহালে আমার এম্-এ এগ্‌জামিন। দেশে যে সব লাইব্রেরী আছে তারও সদ্ব্যবহার দেশের লোক করে না। সারবান্ বই খুব কম লোকেই পড়ে।

আমাদের দেশে শিক্ষালাভের আর একটা প্রকাণ্ড বাধা এই যে, আগে ইংরেজী ভাষা শিখে পরে তার মারফত অন্য সব শিক্ষা করতে হয়। ইংরাজী শিখ্‌তে কি সময় নষ্ট, কি পরিশ্রম! কোন ইংরেজকে যদি বলা হয় যে, তোমাকে আগে জার্ম্মেন শিখে তারপর সেই ভাষার মারফত অপর যা কিছু শিখ্‌তে হবে, তবে সে ঐ কথাকে পাগলের প্রলাপ বলে ভাববে। অথচ এই বিষম অস্বাভাবিক শিক্ষাপ্রণালী আমাদের দেশে চলে আসচে। বাংলা ভাষায় সব শেখা যায়।...

প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে দু'ঘণ্টা করে পড়লে বছরে একটা সাধারণ লাইব্রেরীর সমস্ত বই পড়ে শেষ করা যায়। নিজের চেষ্টায়ই লোকে জ্ঞানবান্ হ'তে পারে, পরে আর সাহায্য আবশ্যক হয় না।

ইংরেজীতে একটা কথা আছে, মানুষের সঙ্গী দেখলেই তাকে চেনা যায়। আমি বলি, মানুষ কি বই পড়ে তা দেখলেই তাকে চেনা যায়।

আসল কথা হচ্ছে, পড়া দরকার। যাকে বলে Well informed' তাই হওয়া দরকার। Well informed না হ'তে পারলে লেখাপড়া শেখার কোন সার্থকতা নেই।

মাধবী, চৈত্র, ১৩৩৬]

—

শক্তি-বিজ্ঞান

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যখন আধুনিক পদার্থতত্ত্ব ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিতেছিল, ফ্যারাডে প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের অমানুষিক প্রতিভা যখন নিত্যনূতন পরীক্ষায় বিস্ময়মুগ্ধ লোক-সাধারণের নিকট আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল, তখন কয়েকজন গণিতজ্ঞ মনীষী পণ্ডিত "শক্তি"র স্বরূপ নির্দ্ধারণে ব্যাপৃত ছিলেন।...বহুকাল পূর্ব্বে দার্শনিক পণ্ডিতেরা শক্তি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর চিন্তা করিয়াছিলেন। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শক্তির

অবিনশ্বরতা সম্বন্ধে একাধিক দার্শনিক মতবাদ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করাও কিছুমাত্র কঠিন নহে।…যখন আধুনিক যুগে জুলিয়াস্ রবার্ট মায়ার, হেলমহোল্‌ট্‌স্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক মহারথিগণ এই অতি পুরাতন তথ্যটীকে নূতন করিয়া জাহির করিলেন, তখন বিজ্ঞান-জগতের সর্ব্বত্র এক মহা সাড়া পড়িয়া গেল।…

শক্তির স্বরূপ কি, এবং শক্তির সহিত আমাদের পরিচয়ই বা কি ভাবে স্থাপিত হয়। বলা বাহুল্য, বৃক্ষ লতা প্রভৃতির ন্যায় শক্তি সহজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে। কার্য্য দ্বারা কারণের অস্তিত্ব অনেক সময় অনুমান করিতে হয়।…লক্ষণের সাহায্যে শক্তির অস্তিত্ব অনুমান করিতে হয়। শক্তির আধারের প্রধান লক্ষণই এই যে, শক্তির প্রভাবে ইহা নানারূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে। প্রাকৃতিক জগতে দেখিতে পাই, শক্তিশালী পুরুষ বৃহৎ ভার অনায়াসে উত্তোলন করিতে পারেন, জলীয় বাষ্প শক্তির প্রভাবে পিচকারীর চাকতি ঠেলিয়া দিয়া এঞ্জিন চালাইতে পারে, বহমান বায়ু শক্তির প্রভাবে বায়ুচক্রের চাকা ঘুরাইয়া কল কারখানা চালাইতে পারে, স্রোতস্বিনীর জলরাশি চক্রের উপর প্রতিহত হইয়া জলচক্র চালাইতে পারে। সুতরাং আমরা বলবান্ মনুষ্য, জলীয় বাষ্প, বহমান বায়ু ও স্রোতস্বিনীর জলরাশিতে শক্তির আরোপ করিয়া থাকি। শক্তির স্বরূপ এই ভাবে নির্ণীত হইল। এখন বিবেচ্য, শক্তির পরিমাণ কি ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইবে? যে লক্ষণের দ্বারা শক্তির অস্তিত্ব নির্দ্ধারিত হয়, তাহার সাহায্যেই শক্তির পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট হয়। অর্থাৎ সম্পাদিত কার্য্যের পরিমাণ দ্বারাই শক্তির পরিমাণ স্থির হয়। যে বস্তুর শক্তি যত অধিক, শক্তির প্রভাবে সে তত অধিক পরিমাণে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।…

বিশ্ব-জগতে নানা প্রকার শক্তির সহিত আমরা পরিচিত হই—আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ, অঙ্গারের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রভৃতি কত অসংখ্য প্রকার শক্তি নৈসর্গিক জগতে আত্মগোপন করিয়া থাকে। কোনটী দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিয়া স্বরূপ প্রকাশ করে, কোনটী শ্রবণেন্দ্রিয়ের নিকট ধরা পড়ে, কোন-কোনটী আবার অতি সঙ্গোপনে লুক্কায়িত থাকে, এবং অতি জটিল বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার ফলে আত্ম-প্রকাশ করে। কিন্তু এই যে অসংখ্য রূপে শক্তি মানুষের সম্মুখে দেখা দেয়, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের মধ্যে কোন মূলগত পার্থক্য নাই,—ইহারা সকলেই এক গোষ্ঠীভুক্ত, প্রত্যেকেই "শক্তির" এক বিশেষ রূপ মাত্র।

প্রশ্ন উঠিতে পারে, আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ প্রভৃতি আপাতবিষম বিষয়কে শক্তির রূপান্তর বলিয়া মনে করিবার কি সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? কারণ ইহাই যে, শক্তির যাহা অবশ্য প্রয়োজনীয় লক্ষণ, তাহা প্রত্যেকটীতেই আরোপ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ আলোক, উত্তাপ, তড়িৎ—প্রত্যেকেরই কার্য্যোৎপাদনের ক্ষমতা আছে। উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে ষ্টীম এঞ্জিন চালান অতি পরিচিত ব্যাপার। এক্ষেত্রে উত্তাপই আংশিক ভাবে এঞ্জিন চালানরূপ কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যান-বাহন পরিচালন করাও বর্ত্তমান যুগে অপরিচিত নহে—কলিকাতার রাস্তার বৈদ্যুতিক ট্রাম তড়িতের কার্য্যকরী শক্তির পরিচয় দিতেছে। আলোকের সাহায্যে যে কোন কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, সাধারণ লোকে প্রথমে তাহা বিশ্বাস নাও করিতে পারেন; কিন্তু এরূপ দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে। ফোটোগ্রাফির প্লেট আলোক-সম্পাতে যে ভিন্ন আকার ধারণ করে, তাহা আলোকের কার্য্যকরী শক্তিরই পরিচায়ক। উদ্ভিজ্জগতে আলোকশক্তির প্রভাব অতি স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাই। ভূমি ও বাতাসে উদ্ভিদের খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত থাকিলেও আলোকশক্তির সাহায্য ব্যতীত উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্ভবপর নহে সুতরাং আলোকের মধ্যেও কার্য্য করিবার শক্তি নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের সকলকে শক্তির রূপান্তর বলিয়া মনে করিবার আর এক কারণ এই যে, ইহাদের প্রত্যেকটীকে অন্য রূপে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভবপর। উত্তাপ হইতে তড়িতের উৎপত্তি অথবা তড়িৎ হইতে উত্তাপ সৃষ্টি আধুনিক যুগের লোকের নিকট প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট সত্য। অবশ্য এ কথা স্বীকার্য্য যে, সকল সময়েই এই প্রকার পরিবর্ত্তন সহজে সংঘটিত হয় না; কিন্তু বৈজ্ঞানিকের দৃঢ় বিশ্বাস, যে-কোন প্রকারের শক্তিকে অন্য যে-কোন রূপে পরিবর্ত্তিত করা অসম্ভব নহে।

প্রকারভেদে শক্তি অনন্ত হইলেও, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সমগ্র শক্তির পরিমাণ নিত্য, ইহার হ্রাসবৃদ্ধি নাই, ইহাই হইল শক্তিশাস্ত্রের প্রথম প্রতিপাদ্য। সুতরাং যখন কোনও প্রকারের শক্তির রূপান্তর ঘটে, তাহাতে শক্তির বিন্দুমাত্র বিনাশ হয় না, শুধু এক শ্রেণীর শক্তির পরিবর্ত্তে অন্য আর এক প্রকারের শক্তির উদ্ভব হয়। শক্তির উৎসের সন্ধানে বুদ্ধিমান মানুষ অহরহঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; শক্তির আধারের সন্ধান পাইলেই তাহা হইতে সুবিধাজনক কার্য্য আদায় করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু কোনও সময়েই মানুষ অসীম শূন্য হইতে শক্তি উৎপাদন করিতে পারে নাই এবং ভবিষ্যতে পারিবেও না। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক। সভ্য সমাজে এখন তাড়িত-শক্তি নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে,—প্রাত্যহিক জীবনে ইহা অনেকটা স্থান জুড়িয়া বসিয়াছে। কিন্তু তড়িৎ উৎপাদন করিতে মানুষকে হয় অঙ্গারের অন্তর্নিহিত শক্তি বা জলের গতি অথবা অন্য কোন প্রকার নৈসর্গিক শক্তির শরণাপন্ন হইতে হয়। আজ পর্য্যন্ত মানুষের বুদ্ধির ফলে এমন কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহা হইতে, কোনও প্রকারের শক্তির আরোপ না করিয়াই, তাড়িত-শক্তি উৎপাদন করা যাইতে পারে। এই প্রকার কাল্পনিক যন্ত্রকে অষ্টওয়াল্ড "প্রথম শ্রেণীর অনন্তগতিশীল যন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করেন।

এই প্রকার একটা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারিলে সংসারের অনেক গণ্ডগোলের হাত হইতে আমরা নিষ্কৃতি পাইতাম।…এই 'কাল্পনিক' যন্ত্র হইতে বিনামূল্যে অজস্র উত্তাপ, আলোক প্রভৃতি নানা প্রকারের শক্তি আমাদের ইচ্ছানুসারে বাহির হইয়া আসিত।…প্রকৃত পক্ষে সংসারে নিত্যই দেখিতেছি যে, কয়লা ও তৈল ব্যতীত কোন যন্ত্রই চলিতেছে না এবং আহার্য্য প্রস্তুত ও আলোক উৎপাদনের জন্য ইন্ধনও পুড়াইতে হইতেছে। বহুকালের অভিজ্ঞতার ফলে বৈজ্ঞানিক স্থির করিয়াছেন যে, শূন্য হইতে শক্তির জন্ম অসম্ভব। বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টির প্রারম্ভে যে পরিমাণ শক্তি কোন অব্যক্ত কারণের প্রভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, আজ পর্য্যন্ত নৈসর্গিক পরিবর্ত্তনের ফলে তাহার একচুল হ্রাস-বৃদ্ধি হয় নাই। তবে ইহার রূপান্তর হইতেছে, এ কথা সত্য।

শক্তির উৎপত্তি যেমন মানুষের আয়ত্তাধীন নহে, শক্তির বিনাশও সেইরূপ অসম্ভব। বিশ্বসংসারে শক্তির বিনাশ নাই—ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেও ইহার বিনাশ হয় না; ফলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শক্তির পরিমাণ চিরকাল একই রহিয়া গিয়াছে। প্রশ্ন উঠিবে—শক্তি যদি সৃষ্টই না হয়, তবে বেগবতী স্রোতস্বিনীর তেজ নিত্য কোথা হইতে সংগৃহীত হইতেছে? প্রায় সকল প্রকার শক্তির আধারের অনুসন্ধান করিলে অবশেষে সৌরকিরণে গিয়া পৌছিতে হয়। আমি মৎস্যমাংসভোজী সবল মনুষ্য, আমার পেশীসমূহ শক্তির আধার। মানুষের এই পশুশক্তি আসে কোথা হইতে? এক অনির্দ্দিষ্ট প্রাণ-শক্তির প্রভাবে উদ্ভিজ্জ ও মাংসে পুষ্ট হইয়া পেশীসমূহে শক্তি সঞ্চিত হইতে থাকে। উদ্ভিজ্জ ব্যতীত প্রাণী জীবন ধারণ করিতে পারে না; এবং সৌরকিরণ ভিন্ন উদ্ভিদ্ শক্তিসঞ্চয় করিয়া বর্দ্ধিত হইতে পারে

না। সুতরাং মৎস্যমাংসভোজী মানুষের পেশীতে যে শক্তি সঞ্চিত থাকে, তাহাও সৌরকিরণ হইতেই সঞ্জাত। লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভূপৃষ্ঠ বিশাল অরণ্যানী-সমাকুল ছিল। এই সকল বৃক্ষ সূর্য্যকিরণের প্রভাবেই বর্দ্ধিত হইয়া অতিকায় আকার ধারণ করিতে পারিয়াছিল। ক্রমিক বিবর্ত্তনের ফলে এই সকল বৃক্ষ মাটীর স্তরে প্রোথিত হইয়া যায়। পৃথিবীর কুক্ষিগত হইয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া এই সকল বৃক্ষ চাপ ও উত্তাপ ভোগ করিতে থাকে এবং অবশেষে অঙ্গারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বর্ত্তমান যুগের সুচতুর মানব এখন ভূপৃষ্ঠ খনন করিয়া সেই সুদূর যুগের সঞ্চিত সৌরশক্তি নিজের কাজে লাগাইতেছে। স্রোতস্বিনীর স্রোতোবেগও সৌরশক্তি হইতেই গৃহীত। সৌর-উত্তাপের ফলে বাষ্প হইয়া জল উর্দ্ধে উঠিয়া মেঘে পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং নানা প্রকার নৈসর্গিক কারণের ফলে মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইতেছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে এই জল সঞ্চিত হইয়া ক্রমশঃ ভীষণ বেগ ধারণ করিয়া সাগর বা হ্রদের উদ্দেশে চলিয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ নৈসর্গিক শক্তির কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে অবশেষে সৌরশক্তিতে গিয়া ঠেকিতে হয়। সৌরশক্তির কারণ কি? ক্ষুদ্র মানবের কৌতূহলের সীমা নাই; সূর্য্যের উত্তাপের কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া মানবকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যের অবয়বের স্বতঃসঙ্কোচন বা নীহারিকাপুঞ্জের অবিশ্রাম ঘাত-প্রতিঘাত অথবা সৌরশক্তির অন্য যে-কোন কারণই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, ইহার দ্বারা শক্তির চরম উৎস নির্দ্ধারিত হয় না, ইহা বলাই বাহুল্য।...

এমন কোন যন্ত্র নির্ম্মাণ করা কি সম্ভবপর নহে, যাহা চতুষ্পার্শ্বের তাপ-শক্তি আহরণ করিয়া চলিতে থাকিবে,—এদিকে বাতাস বা সমুদ্রের জল ক্রমশঃ শীতল হইয়া আসিবে? এরূপ একটা যন্ত্র শূন্য হইতে শক্তি উৎপাদন করিবে না, চারিপার্শ্বের উত্তাপ সংগ্রহ করিয়া সুবিধাজনক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত করিবে মাত্র। বাহির হইতে দেখিতে গেলে এ যুক্তির মধ্যে কোনই অসারতা আছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, ইহা শক্তির নিত্যতা নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করে না। কিন্তু বহু কাল ধরিয়া এরূপ একটা যন্ত্র নির্ম্মাণের চেষ্টা করিয়া উৎসাহী বৈজ্ঞানিকগণ বিফলমনোরথ হইয়াছেন।...কিন্তু বহুকালের বিফলতার পর এঞ্জিনিয়ারগণ যখন হাল ছাড়িয়া নিরুৎসাহ হইয়া পড়িতেছিলেন, তখন ক্লসিয়স নামক একজন বৈজ্ঞানিক বুঝাইয়া দিলেন যে, এই প্রকার যন্ত্রনির্ম্মাণের প্রচেষ্টা একটা প্রাকৃতিক সত্যের বিরুদ্ধে পরিচালিত হইতেছে। ক্লসিয়স বলিলেন যে, দুইখণ্ড প্রস্তর ঘর্ষণ করিলে উত্তাপ ও আলোকের উৎপত্তি সহজেই হইতে পারে; অর্থাৎ সংঘর্ষণজনিত কার্য্যকে সহজেই উত্তাপে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে; কিন্তু তাপ-শক্তিকে যে সকল সময়েই সহজে বাহ্যিক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত করা যায় তাহা নহে; কার্য্যে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে উত্তপ্ত বস্তু হইতে উত্তাপের অপেক্ষাকৃত শীতল বস্তুতে প্রবাহিত হওয়া আবশ্যক। এই নূতন ব্যাখ্যায় অনেকেরই মনে প্রথমে বিষম খট্‌কা বাধিয়া গেল; কিন্তু ম্যাক্সওয়েল, হেলমহোলট্‌স্ প্রভৃতি পণ্ডিতেরা শীঘ্রই এ সমস্যার সমাধান করিয়া দিলেন। ষ্টীম এঞ্জিন বাষ্পে চলে তাহা সকলেই জানেন; অর্থাৎ ইহাতে তাপশক্তি বাহ্যিক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত করা হয়। বাহির হইতে এঞ্জিনের গঠন ভয়াবহ জটিল মনে হইলেও, প্রত্যেক এঞ্জিনে দুইটী প্রধান অংশ থাকে। ইহাদিগকে যথাক্রমে বয়লার ও কন্‌ডেন্‌সার বলা হয়। বয়লারের মধ্যে উত্তপ্ত করিয়া জলকে বাষ্পে পরিবর্ত্তিত করা হয় এবং কন্‌ডেন্‌সারে গিয়া এই উত্তপ্ত বাষ্প কতক পরিমাণে শীতল হয়। এঞ্জিনের চাকার সহিত একটা পিচকারীর যোগ থাকে, যাহার মধ্যে জলীয় বাষ্প ক্রমান্বয়ে উত্তপ্ত ও শীতল হয়। উত্তপ্ত বাষ্প পিচকারীর চাকতি বাহিরে ঠেলিয়া দেয় এবং শীতল হইলে আয়তনের সঙ্কোচন হেতু চাকতি ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। পিচকারীর চাকতির এই প্রকার ইতস্ততঃ গতি-কৌশল ক্রমে এঞ্জিনের চাকার ঘূর্ণায়মান গতিতে পরিবর্ত্তিত করা হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ষ্টীম এঞ্জিনের বয়লার হইতে উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প বাহির হইয়া পিচকারির ভিতর গিয়া কিঞ্চিৎ শীতল হয়, এবং শীতল হইবার ফলে যে তাপশক্তি বহির্গত হয়, তাহাই এঞ্জিন চালাইবার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং মোটের উপর দাঁড়াইল এই যে, উত্তপ্ত বয়লার হইতে বাষ্প বাহির হইয়া অপেক্ষাকৃত শীতল কন্‌ডেন্‌সারে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং উত্তপ্ত বাষ্পের উষ্ণতা হ্রাসের ফলে উত্তাপ বাহ্যিক কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এখন যদি বয়লার ও কন্‌ডেন্‌সারের মধ্যে উষ্ণতার তারতম্য না থাকিত, তাহা হইলে তাপ-শক্তি এইভাবে বাহ্যিক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিত না। প্রকৃত পক্ষে উত্তপ্ত বস্তু হইতেই শীতল বস্তুতে তাপ প্রবাহিত হয়, ইহাই হইল স্বাভাবিক ধর্ম্ম। দুইটী বস্তু যদি সমোষ্ণ হয়, তবে একটার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ উত্তাপ থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে উত্তাপ প্রবাহিত হয় না। বলা বাহুল্য, উত্তাপ সঞ্চারিত না হইলে ইহা বাহ্যিক কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্ববর্ণিত কাল্পনিক যন্ত্র যদি সম্ভবপরই হইত, তাহা হইলে ইহাকে সর্ব্বক্ষণ বাতাস বা সমুদ্রের জল হইতে শীতল অবস্থায় রাখিতে হইত। কারণ উভয়ের মধ্যে উষ্ণতার তারতম্য না থাকিলে যন্ত্রে উত্তাপ প্রবাহিত হইতে পারে না। দুঃখের বিষয়, যন্ত্রটাকে সর্ব্বসময় শীতল অবস্থায় রাখিতে যে পরিমাণ শক্তির ব্যয় হইবে, তাহার দ্বারাই ইচ্ছামত কাজ করাইয়া লওয়া যাইতে পারে। এই শ্রেণীর কাল্পনিক যন্ত্রকে অষ্টওয়াল্ড "দ্বিতীয় শ্রেণীর অনন্তগতিশীল যন্ত্র" বলিয়া অভিহিত করেন।

শক্তিশাস্ত্রের এই দুই মূল্যবান সত্য আবিষ্কৃত হইবার পর বায়বীয় পদার্থের স্বরূপ সম্বন্ধে গবেষণা চলিতে থাকে। বায়বীয় পদার্থের ধর্ম্মই এই যে, ইহার আয়তন আধারের আয়তনের উপর নির্ভর করে। আধারের আয়তন বৃদ্ধি করিলে সঙ্গে সঙ্গে গ্যাসের আয়তনও বাড়িয়া যায়; অর্থাৎ গ্যাস্ সমস্ত স্থানটুকু অধিকার করিয়া বসে। এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? পদার্থশাস্ত্র-মতে বায়বীয় পদার্থের অণুগুলি সর্ব্বদাই ভীষণ বেগে সঞ্চরণশীল। ফলে অণুগুলি পরস্পরের সহিত ও সমাবেষ্টনীর সঙ্গে ধাক্কা খাইতে থাকে। মনে করা যাউক, একদল শিশুকে চোখ বাঁধিয়া একটী বদ্ধ ঘরের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। স্বধর্ম্মবশতঃ বালকেরা ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে এবং সম্ভবতঃ একজন আর একজনের ঘাড়ে পড়িবে—কেহ হয় ত দেওয়ালের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া ঘুরিয়া আসিবে। এই প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেও যদি শিশুগণের শক্তির বিপর্য্যয় না হয়, তবে তাহাদের এই উদ্দাম গতি সমান ভাবেই চলিতে থাকিবে। মনে করিতে পারি, সমাবেষ্টনীর মধ্যে গ্যাসের অণুগুলি সরল-রেখা ক্রমে এই ভাবেই ছুটিয়া বেড়ায় এবং পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাতের পর অগ্রসর হইতে থাকে। উষ্ণতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই আণবিক গতিও বাড়িতে থাকে। ফলতঃ বায়বীয় পদার্থের শক্তি এইরূপ আণবিক গতিতেই পর্য্যবসিত। যদি গ্যাসকে উত্তপ্ত করা যায়, অণুগুলির গতিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং শীতল করিলে গ্যাসের অণুগুলি অপেক্ষাকৃত নির্জ্জীব হইয়া পড়ে, ইহাদের সঞ্চরণশীলতা কমিয়া আসে।

প্রথম যখন বায়বীয় পদার্থের উদ্ভব হয় তখন ইহার অণুগুলি বেশ একটী নিয়ম অনুসারে সজ্জিত ছিল এরূপ ধারণা করিতে পারি।

স্বধর্ম্ম অনুসারে জন্ম-মুহূর্ত্ত হইতেই ইহারা ছুটাছুটি আরম্ভ করিবে এবং ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আন্তরিক সাম্য ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া আসিবে। একটী পাত্রের মধ্যে কতকগুলি সাদা এবং কতকগুলি কাল বল যদি এমন ভাবে সাজান যায় যে, প্রত্যেক শ্বেত গোলকের পার্শ্বে একটী কৃষ্ণবর্ণের গোলক থাকে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত পাত্রটীকে নাড়াচাড়া না করা হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ পর্য্যন্ত বলগুলি স্থির থাকে, ততক্ষণ আভ্যন্তরীণ সাম্য বেশ থাকিয়াই যায়। কিন্তু যদি পাত্রটীকে লইয়া আর একটী শূন্য পাত্রের মধ্যে উপুড় করিয়া দেওয়া যায় এবং এই ভাবে কয়েকবার ঢালা-ওপর করা হয়, তাহা হইলে শীঘ্রই আভ্যন্তরিক শৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই প্রকার পরিবর্ত্তনকে পদার্থশাস্ত্রের ভাষায় "চিরস্থায়ী পরিবর্ত্তন" (Irreversible change) বলিতে পারি। কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে বলগুলি পুনরায় পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না,—পূর্ব্বের শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে হইলে সমস্ত বলগুলি ঢালিয়া এক একটী করিয়া যথাস্থানে সাজাইতে হইবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে অনুমান করিতে পারি যে, যদি গোলকগুলির ছুটাছুটি করিবার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে এই প্রকার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে পূর্ব্বেকার সাম্য ফিরিয়া আসিত না। পূর্ব্বের সাম্য ফিরিয়া আসিতে গেলে ইহার উপর কার্য্যের আরোপ করিতে হয়। কোন স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার ফলে আপনা হইতে কোন বস্তু পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইতে পারে না, ইহাই হইল স্বভাবের নিয়ম।...

পূর্ব্বেকার দৃষ্টান্ত এই নিয়ম অনুসারে আলোচনা করা যাউক। খানিকটা গ্যাস একটী পাত্রে পুরিয়া একটী বায়ুশূন্য পাত্রের সঙ্গে যুক্ত করিলে দেখা যায় যে, আণবিক শক্তিপ্রভাবে গ্যাসের অণুগুলি সমুদয় স্থানটুকু ব্যাপিয়া ছুটাছুটি করিতে থাকে। মানুষের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যাইতে পারে যে, কোন সময়েই অণুগুলি আবার সরিয়া গিয়া পাত্রের এক ধারে জমায়েৎ হইয়া অন্য দিক খালি করিয়া দিবে না। বৈজ্ঞানিক পর্য্যবেক্ষণ অনুসারে বলিতে পারি যে, গ্যাস একবার প্রসারিত হইলে আপনা হইতে সঙ্কুচিত হইয়া পূর্ব্বের অবস্থা ফিরিয়া পায় না। এই প্রকার পরিবর্ত্তনশীল কোন বস্তুকে পুনরায় প্রাথমিক অবস্থায় আনিতে গেলে বাহির হইতে শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। পূর্ব্ববর্ণিত গ্যাসকে সঙ্কুচিত করিয়া পূর্ব্বের অবস্থায় আনিতে গেলে বাহির হইতে ইহার উপর চাপ প্রয়োগ করা আবশ্যক। একখণ্ড প্রস্তর শূন্যে ছাড়িয়া দিলে মাটিতে পড়িয়া যায়, ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক প্রক্রিয়া।...

বোল্‌টস্‌ম্যান্ নামে একজন পণ্ডিত ব্যাপারটীকে গণিতশাস্ত্রের সাহায্যে বুঝাইতে চেষ্টা করেন। গণিতে probability বলিয়া একটী অধ্যায় আছে। ইহার সাহায্যে কোন ব্যাপার ঘটিবার সম্ভাবনা কতটুকু তাহার আভাস দেওয়া যায়। পূর্ব্বোল্লিখিত গোলকের দৃষ্টান্ত এই ভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, গোলকের সংখ্যা কম হইলে ঢালা-ওপর করিবার মধ্যে একবার হয় ত বলগুলি পূর্ব্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতে পারে। কিন্তু গোলকের সংখ্যা বাড়িয়া গেলে, পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা নিতান্তই কম।...গ্যাসের অণুগুলি সংখ্যায় বড় কম নহে, এক ঘন-ইঞ্চি স্থানের মধ্যে কোটী কোটী অণু বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং যেখানে এত অধিক সংখ্যক অণু ছুটাছুটি করিতেছে, সেখানে তাহাদের পক্ষে এক ধারে জমায়েত হইয়া অন্য দিক খালি করিয়া দিবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প—হয় ত কোটী কোটী বৎসরে একবার হইলেও হইতে পারে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে অণুগুলির আন্তরিক সমতা ক্রমশঃ নষ্ট হইতে থাকে; এবং সময়ের সঙ্গে এই অসামঞ্জস্যের পরিমাণ একটী চরম সীমায় আসিয়া পৌছায়। যখন এই আভ্যন্তরিক অসমতার পরিমাণ চরমে পৌছায়, তখন গ্যাসের মধ্যে স্থির ভাব (Equilibrium) আসিয়াছে মনে করিতে পারি। এইরূপ স্থির ভাব আসিবার পর ঘাত-প্রতিঘাতের ফলেও গ্যাসের মধ্যে আর অধিক বিশৃঙ্খলা আসিবে না। উইলার্ড জিবস্ (Willard Gibbs) এই বিশৃঙ্খল ভাবের নাম দিয়াছিলেন Entropy। সুতরাং ক্লসিয়াস্ ও ম্যাক্সওয়েলের প্রতিপাদ্য বিষয়কে এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ামাত্রেই এরূপভাবে সংঘটিত হয়, যাহাতে আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা চরম সীমায় গিয়া পৌছে। প্রকৃতির লক্ষ্যই হইতেছে আপাত-বিশৃঙ্খলতার ভিতর দিয়া সাম্য স্থাপন করা।

ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে সকল অণুর গতি সমান থাকে না। কাহারও গতি কমিয়া যায়, কাহারও বা বাড়িয়া যায়। কিন্তু অধিক সংখ্যক অণু একটী বিশেষ গতি লইয়া ছুটিয়া বেড়ায়; গড়ে ইহাকেই অণুর গতি বলা হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে খানিকটা গ্যাসের মধ্যে সকল প্রকার গতিই বর্ত্তমান থাকে। ম্যাক্সওয়েল কল্পনা করিয়াছিলেন যে, এমন একটী সূক্ষ্মাবয়ব দৈত্যকে যদি গ্যাসের মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া যাইত যে সে শুধু বসিয়া বসিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জীব অণুগুলিকে তুলিয়া এক পাশে রাখিয়া দিত, তবে সহজেই গ্যাসের এক অংশ শীতল ও অপর অংশ উত্তপ্ত হইত; কারণ, অণুসমূহের গতির উপরই গ্যাসের উষ্ণতা নির্ভর করে। ফলে উত্তপ্ত অংশ হইতে শীতল অংশে তাপ সঞ্চারিত হইত এবং তাহার সাহায্যে সুবিধাজনক কাজ করাইয়া লওয়াও চলিত। ম্যাক্সওয়েল বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, গ্যাসের মধ্যে আপনা হইতে এরূপ অবস্থা আসিতে পারে না, এবং সেই জন্যই দুইটী সমোষ্ণ বস্তুর মধ্যে উত্তাপ প্রবাহিত হইতে পারে না। কিন্তু বোল্‌টস্‌ম্যানের যুক্তি অনুসারে দেখিতে গেলে বলিতে হয়, ম্যাক্সওয়েলের দৈত্য যে নিছক কাল্পনিক তাহা নহে; তবে ইহার আবির্ভাব কোটী কোটী বৎসরে একবার হইলেও হইতে পারে।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন মনস্বিনী মহিলার আবিষ্কারবার্ত্তা যখন বৈজ্ঞানিক জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তখন অনেকেই শক্তির এক অভিনব উৎসের সন্ধান পাইয়াছেন ভাবিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এ আনন্দ স্থায়ী হয় নাই। ক্যুরী দম্পতি যখন রেডিয়ম ও রেডিয়মধর্ম্মী আর দু'একটী মূল পদার্থের আবিষ্কার করিলেন, তখন লোকে বিস্মিত হইয়া শুনিল যে, রেডিয়ম হইতে অনবরত শক্তির বিকীরণ হইতেছে এবং তাহার ফলে রেডিয়ম্ পরমাণু স্বল্পভার পরমাণুতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। এক কণিকা রেডিয়ম হইতে যতটা উত্তাপ আপনা হইতে বাহির হয়, তাহার দশলক্ষগুণ ওজনের কয়লা পুড়াইলেও সে উত্তাপ পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বুঝা যাইতেছে, বস্তুর আণবিক শক্তি কি প্রচণ্ড। কিন্তু সামান্য গোল বাধিয়াছে যে, রেডিয়ম্ ও সমধর্ম্মী কয়েকটী পদার্থ ভিন্ন অন্য সকল পদার্থে এ ধর্ম্ম দেখা যায় না; এবং সকল বস্তুকে স্বল্পভার বস্তুতে পরিণত করিবার ক্ষমতা মানুষের আজও আসে নাই। রেডিয়মতত্ত্বের পরিচয় দেওয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; কিন্তু অদূর-ভবিষ্যতে মানুষ যদি এই ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে শক্তির জন্য আর তাহাকে তেল, কাঠ ও কয়লার সন্ধানে ছুটিতে হইবে না। এক মুষ্টি ধূলিতে যে অজস্র শক্তি সঞ্চিত আছে, তাহার তুলনায় রাশি রাশি কয়লার তাপ উৎপাদিকা শক্তি যৎসামান্য।

(ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭) অধ্যাপক শ্রীসুবোধকুমার মজুমদার

তরুণী ভার্য্যা

শ্রীসীতা দেবী

বসুবাড়ীর দোতলা, তিন তলা একরকম নিঝুম হইয়া আসিয়াছে। গরমের দিন, কিন্তু এখনও গ্রীষ্মের ছুটি আরম্ভ হয় নাই। ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেগুলি বড় সেগুলি স্কুলে গিয়াছে। কর্ত্তারা দুই ভাই, একজন গিয়াছেন কোর্টে, একজন গিয়াছেন কলেজে। উকীল-গৃহিণী বড় বউ তরু কোলের ছোট মেয়েটিকে লইয়া নিদ্রা দিতেছেন। তিন তলায় প্রফেসার-গৃহিণী মুক্তামালা, একটা নূতন ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন লইয়া পাতা উল্টাইতেছেন। ঘুমে তাঁহারও চোখ ঢুলিয়া আসিতেছে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছেন যে, আজ অন্ততঃ কোনোমতেই ঘুমাইবেন না। অনেকগুলি ছোটখাট শেলাই অর্দ্ধ-সমাপ্ত হইয়া পড়িয়া আছে, তাহা আর শেষ না করিলে চলে না। রোজ সকালে সঙ্কল্প করেন, দুপুরে নিশ্চয়ই শেলাই লইয়া বসিবেন, কিন্তু ভাত খাওয়ার পরেই শরীর ভার হইয়া ঘুমে চোখ ঢুলিয়া আসে, মনের সঙ্কল্প মনেই থাকিয়া যায়, ঘুমের কোলেই তিনি অঙ্গ ঢালিয়া দেন।

ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিনটা তৃতীয়বার তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া পড়িয়া গেল। তিনি চমকিয়া উঠিয়া বসিয়া সেটা কুড়াইয়া লইলেন। একেবারে উঠিয়া পড়িয়া, শেলাইগুলি দেরাজ হইতে বাহির করিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় বাহির হইতে কে যেন ডাকিল, "ছোটবহুমা।"

মুক্তামালা খাটের উপর সোজা হইয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে, রূপলাল নাকি? কি চাস?"

বৃদ্ধ ভৃত্য রূপলাল আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার দুই চোখে জল, কাঁধের মলিন গামছা দিয়া সে বার বার চোখ মুছিতেছে। অনেক দিনের চাকর সে, মুক্তামালার শাশুড়ীর আমল হইতে এ বাড়ীতে কাজ করিতেছে। জাতে হিন্দুস্থানী কাহার, কিন্তু প্রায় বাঙ্গালীরই মত বাংলা বলিতে পারে। এই বাড়ীই তাহার আপনার বাড়ী হইয়া উঠিয়াছে, বছরে একবার বাড়ী যায়, তাও সম্প্রতি সুরু করিয়াছে। দেশে বুড়ী চাচী, এবং এক খুড়তুতো বোন ভিন্ন বিশেষ কেহই ছিল না। কাজেই চার পাঁচ বছর পরে পরে এক এক বার গিয়া দর্শন দিলে, এবং মাসে একখানা করিয়া 'খৎ' লিখিলেই রূপলালের বিবেক শান্ত থাকিত। কিন্তু বছর চার হইল সে এক বিষম জালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। বৃদ্ধা চাচীর হা হুতাশে, এবং পাড়া-প্রতিবেশীর কুপরামর্শে ভুলিয়া, বুড়া বয়সে বহু অর্থব্যয়ে এক কিশোরীর পাণিপীড়ন করিয়া বসিয়াছে। এখন বছরে একবার করিয়া দেশে না গেলেই চলে না। বউয়ের নাম ঝুলনী, বয়স পনেরো, কি ষোলো। দেশেই সে থাকে, রূপলালের শাশুড়ীর অভিভাবকত্বে।

রূপলালকে কাঁদিতে দেখিয়া, মুক্তামালা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হল রে রূপলাল? কাঁদছিস যে? কেউ কিছু বলেছে নাকি? বড়দি বকেছেন বুঝি?"

রূপলাল ভাঙা গলায় বলিল, "আমায় কে কি বলবে বহুমা? এ বাড়ীর সবাইকে আমি হতে দেখেছি, বড় বহুমাকে সাদি দিয়ে এনেছি, আমাকে তিনি কি বকবেন? আর বকবার মত কাণ্ডই বা আমি কি করি?"

মুক্তামালা বলিলেন, "তবে শুধু শুধু কাঁদছিস্ কেন?"

বৃদ্ধ বলিল, "দেশ থেকে 'তার' এসেছে বহুমা, আমার চাচী মারা গেছে, আমার আজ রাতেই বাড়ী যেতে হবে", বলিয়া আবার সে চোখ মুছিতে সুরু করিল।

মুক্তামালা বলিলেন, "তা কেঁদে আর কি করবি বল্? বাপ মা, খুড়ো খুড়ী, কেই বা চিরদিন থাকে? তোর খুড়ী ত তবু ঠিক বয়সে গিয়েছে, তোদের রেখে গিয়েছে। কত লোক অকালেই যায়। তা কবে ফিরবি?"

বৃদ্ধ বলিল, "চাচীর কাজ হয়ে গেলেই ফিরব, তার বেশী ছুটি কি আর বড়বহুমা দেবেন?"

মুক্তামালা বলিলেন, "আচ্ছা তা আয় গিয়ে।"

রূপলাল দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু চাস্ নাকি? বড়দি তোর মাইনে দিয়ে দেন নি?"

বৃদ্ধ বলিল, "হ্যা তা দিয়েছেন। টাকার কথা নয় মা, অন্য কথা। আপনি কি ঝি রাখবেন?"

মুক্তামালা বলিলেন, "রাখার ত দরকার, কেন তোর জানা-শোনা কেউ আছে নাকি?"

রূপলাল বলিল, "আপনি যদি রাখেন ত বউটাকে নিয়ে আসি। চাচী ত মরে গেল, এখন কার কাছেই বা তাকে রেখে আসব? মাইনে আপনাদের যেমন খুসি দেবেন। নীচে ত আমার ঘরে আমি ছাড়া কেউ থাকে না, সেইখানেই থাকবে।"

মুক্তামালা হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা তা নিয়েই আসিস। অচেনা লোকের চেয়ে জানা-শোনা হলে ত ভালই। মাস দুই পরে ত আয়াটা চলে যাবে, তখন লোক না হ'লে আমার বড় অসুবিধা হবে।"

"আমি একমাস পরেই ঠিক আসব বহুমা" বলিয়া রূপলাল বাহির হইয়া চলিয়া গেল। তাহার ঘাড় হইতে যেন একটা মস্ত বোঝা নামিয়া গেল। চাচীর দুঃখে সে যত না কাতর হইয়াছিল, তাহার চেয়ে বেশী হইয়াছিল, ঝুলনীর ভাবনায়। ছেলেমানুষ বউ, তাহাকে কোথায় সে রাখিয়া আসিবে? গ্রামের লোকগুলা যা অসাধারণ পাজী, চাচী বাঁচিয়া থাকিতেই কতজনে কত কথা বলিত। রূপলাল অবশ্য সে সব কথা বিশ্বাস করে নাই। আত্মীয়ের মধ্যে ত অবশিষ্ট আছে এক খুড়তুতো বোন। কিন্তু সে পরের ঘরের বউ, তাহার কাছে কি আর স্ত্রীকে রাখিয়া আসা যায়? সে রাজীই বা হইবে কেন?

ছোটবহুমা ঝুলনীকে রাখিতে রাজী হওয়াতে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। ছোট ছেলেমেয়ের কাজ হাল্কা কাজ, দেখাইয়া দিলে ঝুলনী নিশ্চয়ই পারিবে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে তাহারা, খাটিতে-খুটিতে অভ্যস্তই আছে।

রূপলালের সহিত কথা বলিতে গিয়া মুক্তামালার ঘুমও ছুটিয়া গিয়াছিল। শেলাই পাড়িয়া লইয়া তিনি কাজে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু অল্প পরেই নীচে বড় জায়ের ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইল।

রূপলাল ছাড়াও এবাড়ীতে আরও দুজন চাকর, দুজন ঝি। কিন্তু বুড়া না থাকিলে কাহারও কোনো কাজ ঠিকমত হয় না। গৃহিণীদের প্রতিনিধি-স্বরূপ, সে-ই সকলকে চালাইয়া লইত। বড়বউ ছেলেপিলে লইয়া বিব্রত, সেগুলি সংখ্যায় বড় কম নয়। ছোটবউয়ের যদিও মাত্র দুটি ছেলে মেয়ে, তবু তিনিও ঘরের কাজ বড় একটা দেখিতেন না। পড়াশুনা, বায়োস্কোপ, সখের শেলাই ইত্যাদি লইয়াই তাঁহার দিন কাটিয়া যাইত। রূপলাল গিয়া সকলেরই অত্যন্ত অসুবিধা হইতে লাগিল।

বাজারে চুরি হইতে লাগিল দেদার। কোনো জিনিষ হাতের কাছে পাওয়া যায় না, কোনো কাজ ঠিক সময়ে হয় না, কর্ত্তা গিন্নি সকলে চটিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন। খাইতে বসিয়া বড়কর্ত্তা বলিলেন, "বাজারে কি আজকাল পচা চিংড়ি ছাড়া মাছ পাওয়া যায় না? না, বাজার-খরচের পয়সা নেই?" ছোটবাবু স্ত্রীকে খোঁচা দিয়া বলিলেন, "ইউরোপীয় রাজনীতির খবর দুদিন না নিয়ে, সুক্তোতে যে লঙ্কাবাটা দেয় না, সেটা ঠাকুরকে বলে দিলে ভাল হয়।"

কর্ত্তারা রাগ ঝাড়িতে লাগিলেন গিন্নিদের উপর, গিন্নিরা ঝাল মিটাইতে লাগিলেন চাকর-ঝিদের উপর। তাহারা কেহ বা কাজ ছাড়িবার ভয় দেখাইল, কেহ বা বেশী করিয়া দুষ্টামী করিতে লাগিল। আয়ারা ছোট ছেলেদের দুই চারিটা টিপুনি দিতেও ত্রুটি করিল না।

যত দিন কাটিতে লাগিল, বিশৃঙ্খলা তত বাড়িতে লাগিল। বড়বউ ত বকাবকি করিয়া নিজেকে এবং বাড়ীসুদ্ধকে পাগল করিয়া তুলিবার জোগাড় করিতে লাগিলেন, মুক্তামালা স্বামী-বেচারীকে নোটিশ দিলেন যে, মা অনেক দিন হইতে তাঁহাকে একবার যাইতে বলিতেছেন, তাই তিনি ভাবিতেছেন যে, একবার গিয়া মাসখানেকের মত থাকিয়া আসিবেন।

ঠিক এই সময় রূপলাল ফিরিয়া আসিল, সঙ্গে আসিল, ঝুলনী। দিব্য সুশ্রী মুখ, পরিপুষ্ট গঠন। রং শ্যামবর্ণ বটে, কিন্তু তাহা যেন নবোদ্গত কিশলয়ের শ্যামলতা

গৌরবর্ণের চেয়েও সময়-বিশেষে অধিকতর মনোহর। চোখ দুইটি বড় বড়, সুর্‌মা টানিয়া তাহার বাহার আরও সে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। মাথাভরা সিঁদুর, কপালেও টীপের প্রাচুর্য্য কম নয়। হাতে পায়ে কাঁসার চুড়ি বালা ও মলের ঘটা দেখিয়া মুক্তামালা ত শিহরিয়া উঠিলেন।

বড়বউ বলিলেন, "বাপ রে, ওর কোলে তুমি ছেলে দেবে কি করে? কোনোরকমে যদি হাতখানা মাথায় লেগে যায়, তাহলে মাথা ফেটে চৌচির হবে।"

মুক্তামালা হাসিয়া বলিলেন, "দেখি বুড়োকে বলে ওর চুড়ি বালার গোছা যদি কিছু কমাতে পারি।"

ঝুলনী আসিয়াই নিজের দেহাতী হিন্দি ভাষায় সকলের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। খুব ফুর্ত্তিবাজ মেয়ে, মুখে তাহার হাসি লাগিয়াই আছে। রূপলাল বউকে আদরযত্ন করে খুব, সাধ্যমত গহনা কাপড় দিয়াছে, বেশী কাজ করিতে দেয় না, রান্নাসুদ্ধ নিজেই বেশীর ভাগ করে।

বড়বউ বলিলেন, "বুড়ো বয়সে বিয়ে করে হতভাগার রকম দেখ না, পারে ত বৌটাকে মাথায় করে নাচে।"

মুক্তামালা বলিলেন, "সত্যি দিদি, আমরাই ঠকে গিয়েছি। ঝুলনীর চেয়ে কিইবা আমার এমন বেশী বয়স, তবু তোমার দেবরের মুখে খ্যাঁকানী ছাড়া একটা ভাল কথা ত কখনও শুনি না।

ঝুলনীকে দেখিয়া মোটের উপর সবাই খুসি হইল, এক মুক্তামালার আয়া ছাড়া। ঝুলনী যে তাহার জায়গায় কাজ করিতে আসিয়াছে তাহা সে শুনিয়াছিল। এ বাড়ীতে কাজ খুব বেশী নয়, মাহিনা সে তুলনায় ভালই, বকশিস প্রভৃতিতেও ছোটবউ মুক্তহস্ত। সুতরাং কাজটা ছাড়িবার তাহার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। ছাড়িবার কথা যে তুলিয়াছিল তাহা কেবল মাহিনা বাড়াইবার চেষ্টায়। কিন্তু ঝুলনী আসিয়া পড়িয়া তাহার এমন পাকা চালটাকে কাঁচা করিয়া দিল। মেয়েটার উপর সে হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

যাক বদলী লোক যখন আসিয়াই পড়িয়াছে তখন আর থাকা ভাল দেখায় না। নিজের আত্মসম্মানের হানি হয়। আয়া যাইবার জন্য জেদ ধরিল। মুক্তামালা বলিলেন, "ওকি, তুই না বলেছিলি ঝুলনী এলেও মাস-খানেক থেকে তাকে একটু কাজকর্ম্ম শিখিয়ে দিয়ে যাবি?"

আয়া মুখ গোঁজ করিয়া বলিল, "না মা, আমি থাকতে পারব না, আমার মায়ের বড় অসুখ।"

চাকর-বাকরকে বেশী সাধাসাধি করা মুক্তামালার ধাতে ছিল না। তিনি আয়াকে ছাড়িয়া দিলেন। সে যাইবার সময় শেষ একটা খোঁচা দিয়া গেল। ছোট-বউকে বলিল, "ছোট বউদিদি, ছুঁড়ীর উপর একটু নজর রেখো, ওর চাউনিটা যেন কেমন কেমন। ভাল কাপড়, ভাল জিনিষ যা দেখবে তাই যেন দুচোখ দিয়ে গিলতে চায়।"

ছোটবউ গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা সে ভাবনা তোমার ভাবতে হবে না।"

মুক্তামালা ভাবিয়াছিলেন ঝুলনী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, তাহাকে কাজকর্ম্ম শিখাইয়া লইতে বেশ কষ্ট পাইতে হইবে। স্বাস্থ্য ভাল হইলে কি হয়, রূপলাল তাহাকে যেরকম আহ্লাদ দেয়, তাহাতে মেয়েটা নিশ্চয়ই খানিকটা কুঁড়ে হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা গেল ঝুলনী কোনো শহুরে আয়ার চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়। খাটিতে পারে সে অসাধারণ রকম, পুরুষ চাকরগুলা পর্য্যন্ত তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। সমস্তক্ষণই তাহার মুখে হাসি লাগিয়া আছে, কিছুতেই তাহার অসন্তোষ নাই। যে কাজ একবার দেখাইয়া দেওয়া যায়, তাহাতে আর সে ভুল করে না। মুক্তামালার ছেলেমেয়ের সহিত সে এমন ভাব করিয়া লইল যে, তাহারা পুরাতন আয়ার শোক একেবারে ভুলিয়া গেল।

চুড়ি খোলান লইয়া প্রথম প্রথম একটু গোলযোগ বাধিল। কনুই পর্য্যন্ত কাঁসার চুড়িগুলি ঝুলনীর অতি প্রিয় অলঙ্কার। সেগুলি বিদায় দেওয়ার নামে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। রূপলালেরও বিশেষ
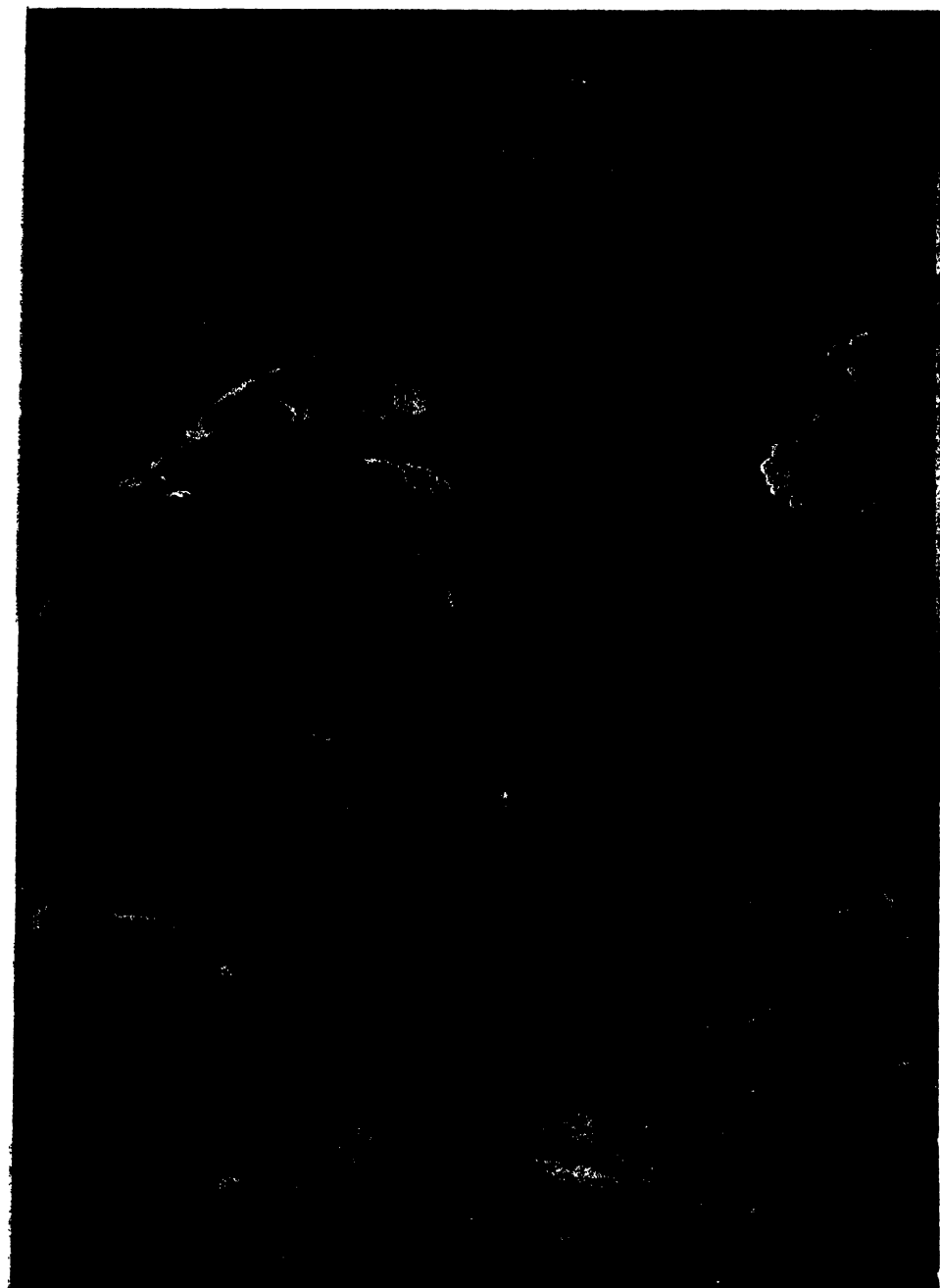
উষা ও অরুণ

শ্রীপ্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সম্মতি ছিল না। দেশের লোক কেহ আসিয়া দেখিলে কত কথা উঠিবে, ঝুলনীর হাতে হয়ত তাহারা জলও খাইতে চাহিবে না।

কিন্তু ক্রমে ব্যাপারটার বিভীষিকা তাহাদের মন হইতে দূর হইয়া গেল। রূপলাল এবাড়ীর অতি পুরাতন ভৃত্য, ইহাদের জন্য ত্যাগস্বীকারে সে অভ্যস্ত। ঝুলনীও শেষে রাজী হইল, খানিকটা সকলের কথায়, খানিকটা লোভে পড়িয়া। মুক্তামালা তাহাকে বলিলেন, "তোকে দু-মাসের মাইনে আগাম দিয়ে আট গাছা ঝক্‌ঝকে রূপোর চুড়ি গড়িয়ে দেব এখন। কাঁসার চুড়ির চেয়ে সে দেখতে কত ভাল হবে।"

সাজসজ্জা সম্বন্ধে ঝুলনীর একটা মারাত্মক রকম দুর্ব্বলতা ছিল। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, গরীবের বউ, সোনার গহনা তাহারা কোনোদিন চোখেও দেখে নাই। রূপাটাকেই তাহারা যথেষ্ট দামী মনে করে। গ্রামে তাহারা গল্প শুনিত বটে যে, সহরে বড়মানুষের মেয়ে বউরা সোনার হাঁস্থুলি, সোনার নথ পরে। সে নথ আবার এতবড় যে, খাইবার সময় উল্টাইয়া গলায় পরিতে হয়। ঐ সব বৌঝিরা কখনও খাট হইতে নীচে নামিয়া বসে না। অলঙ্কার এবং দেহভারের বিপুলতায় তাহারা দর্শকমাত্রেরই বিস্ময় উৎপাদন করে।

সুতরাং আটগাছা রূপার চুড়ি যখন সত্যই স্যাক্‌রা বাড়ী হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিল, তখন পুরাতন কাঁসার গহনাগুলিকে বিসর্জ্জন দিতে ঝুলনী কিছুই আপত্তি করিল না। এই কিছুদিনের মধ্যেই তাহার মতামতের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে হাল-ফ্যাশানে চুল বাঁধে, কপালে এবং সীমন্তে সিঁদুর ও টীপের বাজার খুলিয়া আর বসে না। চিরকাল সাজিমাটি দিয়া অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া আসিয়াছে, আজকাল সাবান না হইলে তাহার চলে না। প্রথম প্রথম খোকাখুকীর কাপড়-কাচা সাবান যা দুএক টুক্‌রা বাঁচিত, তাহাই সে কাজে লাগাইত, অবশেষে সাহস করিয়া একদিন মুক্তামালাকে বলিয়া ফেলিল, "ছোট বহুজী, আমায় একটা সাবান দেবেন?"

মুক্তামালা হাসিয়া বলিলেন, "কেন রে?"

ঝুলনী একটুখানি অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "এই হাতমুখ ধোবার জন্যে। আপনি সারাক্ষণ পরিষ্কার থাক্‌তে বলেন কিনা।" মুক্তামালা বিনা বাক্যব্যয়ে তাহাকে একখানা 'পাম্‌অলিভ' সাবান দান করিয়া ফেলিলেন। ঝুলনী একেবারে হাতে স্বর্গ পাইয়া চলিয়া গেল।

রূপলাল বেচারা স্ত্রীর এত দ্রুত পরিবর্ত্তন বোধ হয় পছন্দ করিতেছিল না, কিন্তু শক্ত কথা বলিয়া বউয়ের বড় বড় চোখ জলে ভরাইয়া তুলিতে তাহার কষ্ট হইত। হাজার হউক ছেলেমানুষ, সাজসজ্জা করিতে ত তাহার ইচ্ছাই করিবে! যেখানে যেমন দেখে তেমন শেখে। কাজেই যতক্ষণ নিতান্ত অন্যায় কিছু না দেখিবে, ততক্ষণ ঝুলনীকে কিছু বলিবেই না স্থির করিল। এমন কি দুখানা মোটা শাড়ী, যাহা মাত্র সে ছয় মাস আগে কিনিয়া দিয়াছে, যাহার মেটে গোলাপী রং এখনও ম্লান হয় নাই, তাহাই যখন ঝুলনী ফিরিওয়ালাকে দান করিয়া ফুল-কাটা আয়না এবং বাহারের চিরুণী কিনিল, তখন রাগে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসা সত্ত্বেও রূপলাল কিছু বলিল না।

কিন্তু ঝুলনী একদিন বড়ই বাড়াবাড়ি করিল। কানের বড় বড় কাঁসার "তড়্‌কি" খুলিয়া ফেলিয়া আব্দার ধরিল যে,সোনার ইয়ারিং না হইলে সে কানে কিছুই পরিবে না রূপলালের ত টাকার অভাব নাই, কত টাকা সে সুদে খাটায়, কাঠের বাক্সে তাহার গেঁজে-ভরা টাকা ঝুলনী কতদিন দেখিয়া ফেলিয়াছে। ঝুলনীকে কি পনেরো টাকা দিয়া একজোড়া ইয়ারিং সে দিতে পারে না? মরিয়া গেলে টাকা কি সে পুঁটুলী বাঁধিয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে?

রূপলাল আর থাকিতে পারিল না। গালি দিতে দিতে একগাছা লাঠি লইয়া ঝুলনীকে তাড়া করিয়া গেল। কিছু সে বলে না বলিয়া এমনি বাড়ই বাড়িয়াছে!

ঝুলনী ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া গিয়া মুক্তামালার ঘরে আশ্রয় লইল। তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া অবাক হইয়া মুক্তামালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হঠাৎ কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলি যে? কি হয়েছে?"

ঝুলনী বলিল, "বুড়া তাহাকে লাঠি লইয়া মারিতে আসিয়াছে।"

মুক্তামালা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন রে ?"

ঝুলনীর কল্পনাশক্তি মন্দ ছিল না। চটপট্ কথা বানাইয়া সে বলিয়া দিতে পারিত। অম্লানবদনে বলিল, "সারাক্ষণ নাকি আমি কেবল সাজ করে বসে থাকি, বড় বিবি হয়েছি।"

মুক্তামালা চটিয়া বলিলেন, "বুড়ো হয়ে যেন ভীমরতি ধরেছে। ওর মত একটা ছেঁড়া গেঞ্জি পরে ছ'মাস সকলকে থাকতে হবে নাকি ? ওরে বেহারি, রূপলালকে ডাক্ ত।"

রূপলাল উপরে আসিয়া দাঁড়াইল। ঝুলনী তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়া খোকার সঙ্গে খেলিতে বসিয়া গেল।

মুক্তামালা তাড়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ রে রূপলাল,দিন দিন তুই কি হচ্ছিস ? বউটাকে নাকি লাঠি নিয়ে মারতে গিয়েছিলি ? ঘরে যা করিস্ তা করিস্, কিন্তু আমাদের বাড়ী ও-সব চল্‌বে না। ও সমস্ত ছোটলোকমী আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না।"

রূপলাল বলিল, "বেয়াড়া চাল দেখলেও শাসন করব না বহুমা ?"

মুক্তামালা বলিলেন, "কি বেয়াড়া চাল ? ভূত সেজে না থাকলেই তোমাদের সব বেয়াড়া হয় ? ছেলেপিলের ঝি, পরিষ্কার ত থাকতেই হবে।"

রূপলাল আর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল। ঝুলনী না জানি ছোট বহুমার কাছে কি বলিয়াছে। কিন্তু থাক, সে ছেলেমানুষী করিয়াছে বলিয়া রূপলালও করিতে পারে না। ঘরের কথা পরের কাছে বলিয়া লাভ কি ? সে যদি নিজের স্ত্রীকে বসে না রাখিতে পারে, ত অন্যলোক আসিয়া কি তাহার সাহায্য করিবে ? তাহারা বরং হাততালি দিয়া হাসিবে।

রূপলালের ঘরের মধ্যে যতই অশান্তি হোক, সে এবং ঝুলনী আসিয়া বসু-পরিবারকে অনেকাংশে শান্তিতেই রাখিয়াছিল। কর্ত্তারা আর চটাচটি করিতেন না, বউ দুজনও নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিত-ভাবে অশান্তির সূত্রপাত হইল।

বড়বউ আয়াকে দিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, খোকা খুকি কেহ তাঁহার ড্রেসিং টেবিল্ হইতে পাউডারের কৌটা উঠাইয়া আনিয়াছে কিনা। মুক্তামালা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "তাঁরা ওঁর ঘরে গেলই বা কখন, আর পাউ-ডারের কৌটো নিলেই বা কখন ? খুকী ত অত উঁচুতে হাতই পায় না। দেখ্‌ত রে ঝুলনী খুঁজে।"

ঝুলনী এধার ওধার সব খুঁজিয়া আসিল, বলিল, "নেই বহুমা।"

বড়গিন্নী খানিকক্ষণ বক বক করিয়া চুপ করিয়া গেলেন, রাগটা পড়িল না বটে, তবে সামান্য জিনিষ লইয়া বেশী সোরগোল করিতে লজ্জা বোধ করিলেন। মুক্তামালা বড়মানুষের মেয়ে, পাছে সে মনে করে যে দিদি গরীবের মেয়ে, সামান্য একটা জিনিষ গেলেও সে ক্ষেপিয়া যায়।

দুদিন পরেই আবার একটা নূতন টার্কিশ তোয়ালে চুরি গেল। ইহাও বড়বউয়ের সম্পত্তি। তিনি চটিয়া আগুন হইয়া বলিলেন, "আ মর ! চোরের মুখে আগুন ! আমার ঘরটা খুব চিনে নিয়েছে।"

তাঁহার আয়া সৌরভী বলিল,"এ ঠিক ঐ ঝুলনী ছুঁড়ীর কাজ মা। বিবিয়ানা করার সাধ একেবারে ভরপুর, অথচ বুড়োর কাছে একটা পয়সা পায় না, তাই এখন এই বিদ্যে শুরু করেছে।

বড়বউ বলিলেন, "যমের অরুচি ! নিজের মনিবের ঘর থেকে নিতে পারে না ! মরতে আসে আমার ঘরে। ওকে আর এখানে আস্‌তে দিস্‌নে।"

কথাটা চাপা রহিল না, জানাজানিই হইয়া গেল। রূপলাল ঝুলনীকে একপালা গাল দিল, ঝুলনী কাঁদিয়া চোখ ফুলাইল এবং দুই জায়ের মধ্যে একটুখানি মনো-মালিন্যের সূত্রপাত হইয়া রহিল।

ইহার পর দিনকয়েক ঘর ঠাণ্ডা রহিল। তাহার পর চুরি গেল অপেক্ষাকৃত দামী জিনিষ, ছোটবাবুর একটা টাই পিন্। তিনি ত চটিয়া-মটিয়া স্ত্রীকে এক পালা বকিয়া দিয়া, কলেজ চলিয়া গেলেন, কিন্তু বাড়ীর গোলমাল সহজে থামিল না। মুক্তামালা সব ক'জন ঝি চাকরকে ডাকিয়া বকিয়া ভূতঝাড়া করিলেন। একটা সাবান বা তোয়ালে গেলে কেহ মারা পড়ে না,

স্তু এ যে বিষম বাড় বাড়ান! সোনারূপার জিনিষ চুরি রু হইল, ইহার পর গলায় ছুরি দিলেই হয়! পুলিশ াকিবেন বলিয়াও ভয় দেখাইলেন। বড়বউ মনে নে কি ভাবিতেছিলেন বলা যায় না, তবে মুখে তিনিও ছাটবৌএর সঙ্গে যোগ দিলেন।

রূপলাল সব চাকরবাকরের প্রতিনিধি হইয়া বলিল, ছোট বহুমা আমি এই বাড়ী কাজ করে করে চুল াকিয়েছি, অন্যরাও আপনাদের নিমক খেয়ে, এমন াজ কখনও করবে না। কিন্তু আপনাদের যখন সন্দেহ চ্ছে, তখন পুলিশ ডেকে আগে আমাদের বেইজ্জৎ না রে, নিজেরা খুঁজে দেখুন। আমরা সব এখানে দাঁড়াচ্ছি, াবি দিয়ে দিচ্ছি, বড় খোকাবাবুকে নিয়ে আপনারা ব তল্লাস করে দেখুন। যদি কারও কাছে কিছু পাওয়া ায়, তখন পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেবেন।"

মুক্তামালা এতই চটিয়াছিলেন যে, সত্যসত্যই তিনি চাবি লইয়া চাকরদের ঘর তল্লাস করিতে গেলেন। বলা বাহুল্য কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। লাভের মধ্যে একজন চাকর সেই রাত্রেই পলায়ন করিল, এবং বাকি সকলেও চলিয়া যাইবার ইচ্ছা থাকিয়া থাকিয়া প্রবলভাবে প্রকাশ করিতে লাগিল। চার পাচ দিন এইভাবেই কাটিয়া গেল।

বাড়ীর খাইবার ঘর নীচের তলায়। ছোটবাবু আগে খাইয়া কলেজ চলিয়া যান, বড়বাবুর একটু দেরি হয়। মুক্তামালা স্বামীকে খাওয়াইবার জন্য নীচে নামিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি একলাফে চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, "ঐ যা ভুলে হাতবাক্সটা খুলে ফেলে রেখে এসেছি।"

ছোটবাবু বলিলেন, "এততেও তোমাদের শিক্ষা হয় না। এই রকম অসাবধান বলেই ত চাকরবাকর আস্কারা পায়।"

মুক্তামালা তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া গেলেন। ঝুলনী টেবিল চেয়ার আলমারী প্রভৃতি ঝাড়িয়া, মুছিয়া পরিষ্কার করিতেছিল। মুক্তামালাকে দেখিবামাত্র সে তাড়াতাড়ি কি একটা জিনিষ আলমারীর নীচে গুঁজিয়া দিল। মুক্তামালা যেন কিছু দেখিতে পান নাই, এমন ভাবে হাত বাক্সের কাছে গিয়া ডালা খুলিয়া ফেলিলেন। কোনো জিনিষ নড়চড় হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল না। তখন বাক্স বন্ধ করিয়া ঝুলনীকে বলিলেন, "যা ত রে নীচে থেকে বেহারাকে ডেকে নিয়ে আয়, আমাদের একটা জিনিষ কিনতে হবে।"

ঝুলনী নীচে চলিয়া যাইতেই তিনি আলমারীর তলা হইতে কাগজে-মোড়া জিনিষটা বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারই মাথায় পরিবার ছোট একটা ব্রোচ, ব্লাউজের গায়ে কয়েক দিন আগে তিনি সেটা গুঁজিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার পর আর সেটার খোঁজ করেন নাই।

মুক্তামালা রাগে দুঃখে প্রায় কাঁদিয়া ফেলিবার যোগাড় করিলেন। তিনি মরেন ইহার হইয়া ঝগড়া করিয়া, আর তলে তলে কিনা মুখপুড়ীর এই কাণ্ড!

ঝুলনী এই সময় ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আসছে মা বেহারা।" কিন্তু মুক্তামালার হাতে কাগজে মোড়া ব্রোচ দেখিয়াই সে একেবারে থতমত খাইয়া গেল।

মুক্তামালা ধমক দিয়া বলিলেন, "এসব কি কাণ্ড রে শয়তানী? পেটে পেটে তোর এত বিদ্যে!"

ঝুলনী কোণে দাঁড়াইয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। মুক্তামালা জানলা দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিলেন, "রূপলাল, রূপলাল!"

রূপলাল তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে ছোট বহুমা?"

মুক্তামালা ব্রোচটা বাড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, "এইটা তোমার বউ কাগজে জড়িয়ে আলমারীর তলায় লুকিয়ে রেখেছিল, আমি টেনে বার করেছি।"

রূপলাল কপালে এক চড় মারিয়া মাটিতে বসিয়া পড়িল। মুক্তামালা ঝুলনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন এমন কাজ করলি বল ত? তুই কি খেতে পাস্ না, না পরতে পাস্ না?

ঝুলনী কাঁদিতে কাঁদিতে যাহা বলিল তাহার অর্থ এই যে, সে চুরি করিবার জন্য ব্রোচটা আলমারীর নীচে রাখে নাই। ব্রোচটা মেজের ওপর পড়িয়াছিল, পাছে ঝাঁট দিবার সময় চলিয়া যায়, এই ভয়ে সে সেটাকে কাগজে

মুড়িয়া ওখানে রাখিয়াছিল, কাজ সারা হইলেই বাহির করিয়া বহুজীর হাতে দিত।

শ্রোতারা দুজনেই বুঝিল কথাটা ঠিক নয়, কিন্তু তাহা লইয়া তর্ক করিয়া আর লাভ কি! রূপলাল নিজেই বলিল, "ছোটবহুমা, আমি আজই ওকে দেশে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমি আপনার বাপের বয়সী বুড়ো, আমার একটা কথা রাখুন, আপনার পায়ে ধরছি," সে সত্যসত্যই মুক্তামালার পায়ে হাত দিতে গেল।

মুক্তামালা তাড়াতাড়ি সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "যা যা, আমার পায়ে হাত দিস্ না। কি কথা বল্?"

রূপলাল বলিল, "আপনি এ কথা কারও কাছে প্রকাশ করবেন না। ওর বাপের খুব অসুখ এই কথা বলে, আমি ওকে নিয়ে চলে যাব।"

মুক্তামালার রাগ খানিকটা পড়িয়া আসিয়াছিল। বুড়ার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার দয়াও হইতেছিল। তিনি বলিলেন, "আচ্ছা, তোর খাতিরে তাতেই আমি রাজী হলাম, যদিও তোর বউয়ের শাস্তি হওয়া উচিত ছিল। একরত্তি মেয়ের এত সাহস যে, বসে বসে এতগুলো চুরি করল।"

রূপলাল বলিল, "বহুমা, অন্য জিনিষগুলো ত ওকে কেউ নিতে দেখেনি। একবার যখন হাতে হাতে ধরা পড়েছে, তখন সবাই ওকেই সন্দেহ করবে জানি, কিন্তু এমনও ত হতে পারে যে, অন্য লোকে নিয়েছে?"

বুড়ার কথা শুনিয়া মুক্তামালার হাসি পাইল। এখনও বউয়ের সাফাই গাহিবার চেষ্টা! যাহা হউক, তিনি আর কিছু বলিলেন না। রূপলাল বউকে লইয়া নীচে চলিল। ঝুলনী শেষ পর্য্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতেই গেল।

তাহার হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে সবাই একটু বিস্মিত হইল। তবে ঝুলনীর বাপের অসুখের কথাটা রূপলাল খুব ভালভাবেই প্রচার করিয়া গিয়াছিল, সুতরাং ইহা লইয়া আর বেশী কথা উঠিল না। দুই চারদিন পরে মুক্তামালার এক নূতন আয়া আসিল, এবং কাজ যেমন চলিতেছিল, চলিতেই লাগিল। রূপলালও সপ্তাহখানেক পরে ফিরিয়া আসিল।

বড়বউ একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে রূপলাল, ঝুলনী আসবে না?"

রূপলাল গম্ভীরভাবে বলিল, "না মা, তার বাপের বড় অসুখ, এখন আস্‌তে পারবে না।"

দিন কাটিতে লাগিল। বড়বউ একদিন কথাচ্ছলে খাবার টেবিলে বলিলেন, "চুরি যে কে করত, তা ত বোঝাই যাচ্ছে, ওটা গিয়ে অবধি বাড়ীর একটা কুটোও ত যায়নি।" রূপলাল দরজার কাছে যে দাঁড়াইয়া আছে তাহা তিনি দেখিতে পান নাই।

দিন-তিনেক পরে আবার বাড়ীতে মহা সোরগোল লাগিয়া গেল, বড়বাবুর দামী হাতঘড়িটা পাওয়া যাইতেছে না। ছোটবউ গালে হাত দিয়া বলিলেন, "মাগো, কি কাণ্ড! ঠিক মনে হচ্ছে যেন বাড়ীটাকে ভূতে পেয়েছে! এ সব হচ্ছে কি?"

বড়বউ বলিলেন, "ভূতে পাবে কিসের দুঃখে? একজন বিদ্যে শিখিয়ে গেলেন, এখন সবাই শিখেছে।"

এবার কর্ত্তারা স্বয়ং আসরে নামিলেন। বকাবকি, গালাগালি, চড়চাপড়, পুলিশের ভয় দেখান, কিছুই আর বাকি রহিল না। কিন্তু কোনোই কিনারা হইল না। বড়কর্ত্তা বাহির হইবার সময় শাসাইয়া গেলেন, "অফিস থেকে এলেও যদি শুনি যে ঘড়ি পাওয়া যায়নি, আর এক মিনিট দেরি না করে পুলিশে খবর দোব। যে নিয়েছে, ভালয় ভালয় রেখে দিও, কোনো কথা হবে না।"

বাড়ী আসিয়া নূতন কিছু শুনিবেন এমন আশা তাঁহার ছিল না। কিন্তু সংসারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপারও ঘটিয়া থাকে। ঘরে ঢুকিতেই বড় খোকা ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল, বাবা ঘড়ি পাওয়া গেছে। পিছন হইতে গৃহিণী এবং অন্য ছেলেমেয়েরাও ভীড় করিয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় পাওয়া গেল?"

সকলে প্রায় সমস্বরে বলিল, "রূপলালের ট্র্যাংকে।"

বড়কর্ত্তা উকীল, মানুষের কোনো দুর্ব্বলতা বা পতনে অবাক হওয়া তাঁর অভ্যাস নয়। তিনি রূপলালকে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন এবং ছেলেপিলে চাকরবাকর প্রভৃতিকে সরিয়া যাইতে আদেশ দিলেন।

রূপলাল আসিয়া মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইল। বড়বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর এমন মতি হ'ল কেনরে? বাপের বয়সী বুড়ো তুই, এতদিন পরে একি কাণ্ড করলি?"

রূপলাল প্রথমে কথা বলিল না। বার বার জিজ্ঞাসা করায় অবশেষে বলিল, "বাবু, আমায় পুলিশে দেবেন, দিন, কিন্তু লোভে পড়ে একাজ আমি করিনি, আপনাদের আশীর্ব্বাদে আমার অভাব কিছু নেই।"

বড়বাবু বলিলেন, "তাত জানি, কেন করলি তাই ত জানতে চাইছি। তোকে পুলিশে দিয়ে কি লাভ আমাদের?"

রূপলাল বলিল, "বাবু সবাই কানাঘুষো করে যে ঝুলনীই চুরি করত, সে যাবার পর আর চুরি হয় না। আমার বুকে বড় বাজ্‌ত বাবু, তাই ভেবেছিলাম, এখন একটা চুরি হ'লে, তার বদ্‌নামটা ঘুচ্‌বে।"

বড়বউ ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন, "আ মর্ বুড়ো হয়ে ভীমরতি ধরেছে। কোন্‌মুখে এসব কথা বল্‌ছিস্?"

বড়বাবু বলিলেন, "যাক, এখন বকে আর কি হবে? বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিপত্তির কারণ, জানই ত? যা রূপলাল সরে যা। আমি কোনোমতে কথাটা চাপা দিয়ে দেব।"

বড়বউ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। রূপলাল আস্তে আস্তে চলিয়া গেল।

পুস্তক-পরিচয়

রাজা-বাদ্‌শা—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা, (১৩৩৬)। দ্বিতীয় সংস্করণ, মূল্য আট আনা।

গল্প বলা ও গল্প শোনার ইচ্ছা মানুষের সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইতিহাস—বিশেষত শিশুপাঠ্য ইতিহাস—গল্প বাদ দিয়া রচনা করিতে গেলে প্রাণহীন হইয়া পড়ে—গল্পই তার প্রাণ। সেই কথা ভুলিয়া অনেক গ্রন্থকার আজকাল বই লিখিতেছেন বলিয়া ইতিহাস এত নীরস হইয়া উঠিয়াছে যে ছেলেরা প্রায় ইতিহাসের বই ছুঁইতে চায় না। ব্রজেনবাবু একদিকে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহে যেমন একনিষ্ঠ, অন্যদিকে তেমনি ঘটনার জাল ছিন্ন করিয়া অতীত যুগের নরনারীকে মুক্ত উদার ভঙ্গীতে চোখের সম্মুখে ধরিতে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব। তাঁহার রাজা-বাদ্‌শা বইখানি পড়িয়া শুধু শিশু নয়, প্রবীণেরাও মুগ্ধ হইবেন। বাবর, নাদির শা দুর্গাবতী প্রভৃতি যেন আবার জীবন্ত হইয়া আমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছেন। গ্রন্থকারের রচনাভঙ্গী যেমন সরল তেমনই মনোমুগ্ধকর।

শ্রীশান্তা দেবী

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর লীলাবসান—শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত। ঢাকা, ১৩৩৬।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন রায় বাহাদুর ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে 'ভারতবর্ষ' মাসিকপত্রের ফাল্গুন-সংখ্যায় "শ্রীগৌরাঙ্গের লীলাবসান" সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব প্রত্নতত্ত্ব বাহির করেন। ঢাকা-নিবাসী বৈষ্ণব-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় দীনেশবাবুর মতের প্রতিবাদ করিয়া একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানিতে লেখক যাহা বলিতে চান তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেই ভাল হইত। ধান ভানিতে শিবের গীতের মত অনেকটা হইয়াছে। তবে দীনেশবাবুর মত-খণ্ডনের উপকরণ তাঁহার লেখায় যথেষ্ট আছে। প্রতিবাদটির প্রণালী বেশ সুষ্ঠু হয় নাই।

শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ

দম্পতী—শ্রীশশিকুমার সেন, বি-এ, এল-এম-এস্। ২য় সংস্করণ, পৃঃ ২০৬, মূল্য ২॥০। প্রাপ্তিস্থান—৪৫।১বি, বিডন ষ্ট্রীট্ কলিকাতা।

যৌনতত্ত্ব ও দাম্পত্য বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলা ভাষায় যে-কয়টি পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, 'দম্পতি'র স্থান সে-সকলের উপরে। গ্রন্থকার সংযত ভাষায় তাঁহার বক্তব্য বিবৃত করিয়াছেন। যৌন-ব্যাপার সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে নানাপ্রকার ভ্রান্তধারণা দেখা যায়, এই পুস্তকপাঠে তাহা দূরীভূত হইবে। সুখ ও স্বাস্থ্যের জন্য বিবাহিত নরনারীর যে-সকল যৌন বিধিনিষেধ জানা উচিত আলোচ্য পুস্তকে তাহা বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বাংলা পুস্তকে ইংরেজীর অবতারণা সঙ্গত নহে; ১৩৯পৃষ্ঠা হইতে ১৭০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত যৌনব্যাধি সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে ইংরেজী আলোচনা উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা বাংলায় হইলেই উপযুক্ত হইত। বাৎসায়ন প্রণীত কামশাস্ত্রের সহিত আধুনিক যৌনবিজ্ঞানের সমন্বয়ের চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রদ হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। গর্ভাবস্থায় সম্প্রয়োগ সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে উপদেশ দিয়াছেন তাহার সহিত অনেক যৌনতত্ত্ববিদেরই মতভেদ হইবে। গ্রন্থকার আইনদ্বারা 'অল্পবয়স্কা'র বিবাহ নিষিদ্ধ করা সমীচীন মনে করেন না;—এ বিষয়েও অনেকেই তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। সন্তানরোধের বিভিন্ন উপায়ের আলোচনা আরও বিশদ হইলে ভাল হইত। পুস্তকের গুণের তুলনায় এ সকল ত্রুটি সামান্য। এরূপ পুস্তকের বহুলপ্রচার প্রার্থনীয়।

শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু

জাগ্রত পারস্য—শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়, এম্-এ, বি-এল প্রণীত ও ঢাকা এন্-এম্ প্রেস হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা সংখ্যা ।০+১৫৯, কাগজে বাঁধাই, মূল্য দেড় টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থে লেখক পারস্যের পুরাতন ও আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসের ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। বিশেষ করিয়া তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে দেশে নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপরিষদের স্থাপনা হইতে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে রেজা শাহের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত দেশের চিরন্তন অন্তর্বিপ্লবের একটি চিত্র আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তকখানি সময়োপযোগী সন্দেহ নাই।

কিন্তু গ্রন্থখানি পড়িতে আরম্ভ করিয়া হতাশ হইতে হয়। ইহার ভাষা প্রায় সর্ব্বত্র কৃত্রিম; বিশেষতঃ অনেকস্থলই ইংরেজীর অক্ষম অনুবাদ বলিয়া অত্যন্ত বিসদৃশ মনে হয়। ভগবান্ জরথুষ্ট্রদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম ও ইস্‌লামের অধুনাতন 'বাহাই' সম্প্রদায় সম্বন্ধে লেখকের ধারণা অল্প। দার্শনিক গজ্জালীকে জামী, রুমী হাফেজের সঙ্গে কবিদলের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

লেখক আরও কিছু কিছু ভুল করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আর একটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি। বোম্বাই প্রদেশের পার্শী সম্প্রদায় পারস্যের 'মজলিসে' প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে পারে না। 'মজলিসে' পারস্যের অধিবাসী পারসিক সম্প্রদায়ের (আজকাল তাহাদের সংখ্যা ১২,০০০) একজন প্রতিনিধি থাকে। অধুনাতন প্রতিনিধির নাম, Arbab Kaikhosrow Sharokh.

গ্রন্থকার ইংরেজী গ্রন্থাদি হইতে সর্ব্বত্র লেখা উদ্ধৃত করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও সেই সকল গ্রন্থকর্ত্তাদের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। পুরাতন প্রসঙ্গের জন্য Sykesএর History of Persia এবং আধুনিক প্রসঙ্গের জন্য Browneএর Persian Revolutionএর নামোল্লেখ করিলে লেখকের সৌজন্য প্রকাশ পাইত।

আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার এ সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ ভাষা সম্বন্ধে, অবহিত হইবেন, নচেৎ গ্রন্থ প্রকাশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে। নানা দোষ, ত্রুটি সত্ত্বেও এই উদ্যম প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই।

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

ছন্দের টুংটাং—শ্রীযুত সুনির্ম্মল বসু প্রণীত, প্রকাশক বাগচী এণ্ড কোং, ২০৩।২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। দাম ॥০ আনা।

শিশুসাহিত্যে সুনির্ম্মলবাবুর কবিতা অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। নিত্য নূতন নূতন ছন্দে কবিতা লিখিয়া তিনি শিশু পাঠকদের চিত্তহরণ করিতেছেন। ছন্দে তাঁর দখল যে কি আশ্চর্য্য রকমের, এই ছন্দের টুংটাং পড়িলেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

ছেলেমেয়েরা যাহাতে নূতন নূতন ছন্দের সঙ্গে পরিচিত হইয়া সহজে কবিতা আয়ত্ত করিতে পারে, তাহার জন্যই সুনির্ম্মলবাবু এই বইটি লিখিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, শুধু জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি, কোকিলের কুহু, আর মলয়ের হুহুর মধ্যেই কবিতার ছন্দ নাই—বরফওয়ালার ডাকে, চৌকিদারের হাঁকে, শেয়ালের হুক্কাহুয়ায়, এমন কি শ্মশানযাত্রীর বোল হরি,হরি বোলের মধ্যেও ছন্দের অভাব নাই, আর তার সাহায্যে অতি সহজেই কাব্যের বীণায় ঝঙ্কার তোলা যায়। ছন্দ শিখাইবার জন্য তিনি যে-সব টুংটাং শুনাইয়াছেন, তাহা দেশের চলতি ছড়ার মতোই মিষ্টি ও চটুল, কিন্তু তাহার চেয়েও উঁচুদরের এই জন্য যে, ছড়ার ভাব অনেক স্থলেই এলোমেলো অর্থসঙ্গতিহীন—সুরের ঝঙ্কার তোলাই তাহার প্রধান কাজ, কিন্তু এই টুং টাংয়ে সুরের ঝঙ্কার তো আছেই, অর্থসঙ্গতিরও ব্যতিক্রম নাই। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেমেয়েরা ইহা পাঠে বিশেষভাবে উপকৃত হইবে। খুব ছোটরা—যাহারা ছন্দের বিশ্লেষণ বুঝিতে পারিবে না, তাহারাও টুংটাং বা ছোট ছোট কবিতা সানন্দে ছড়ার মতো মুখস্থ করিবে। 'ছন্দের টুংটাং' যে সুনির্ম্মলবাবু কিরূপ সুন্দর বাজাইয়াছেন, তাহার একটু ধ্বনি তাঁহার মলের গানে শুনুন,—

'ঝিনিক ঝিন্ ঝিন্
ফুরায় ক্ষীণ দিন।
গাঁয়ের বৌ যায়
ঘাটের দিকটায়
বাজায় জোর জোর
পায়ের মল্-বীণ—
ঝিনিক ঝিন্ ঝিন্।'

শ্রীনিশিকান্ত সেন

বসন্তরোগ চিকিৎসা—দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)। কবিরাজ শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত ও ১৬নং কম্বুলিয়াটোলা লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীরণেন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৬৬ পৃষ্ঠা, মূল্য ।০ আনা।

কবিরাজ মহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি। আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বসন্তরোগ সম্বন্ধে যে অমূল্য তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা সহজ বাঙ্গালা ভাষায় সাধারণের নিকট প্রচার করিয়া কবিরাজ মহাশয় প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। বসন্তরোগের বিভিন্ন অবস্থায় লক্ষণাবলী, উপসর্গ, পথ্যাপথ্য নির্ণয়, প্রতিষেধক বিধি ও চিকিৎসা প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

প্রত্যেক গৃহস্থের এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রভাতী—কবিতার বই। শ্রীপ্রভাবতী দেবী প্রণীত ও ২নং বেথুন রো, কলিকাতা হইতে শ্রীহিরণকুমার মৈত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৫৬ পৃঃ। মূল্য এক টাকা

জীবন-সন্ধ্যায় কবি মর্ম্মে যে আঘাত পাইয়াছেন তাঁহার জীবন-দেবতাকে তাহার অংশ তিনি দিতে পারেন নাই, প্রভাতের ফুলে ডালা সাজাইয়া দেবতার পায়ে নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু কবির বাসনা পূর্ণ হয় নাই। ডালার ফুলের অনেকগুলিতেই অশ্রুবিন্দু টলটল করিতেছে।

নিকষ-কালো আকাশ-কোলে
কাঁচা সোনার বরণ-রেখা;
মেঘের ফাঁকে তারার আলো
দেখা দিয়েই হয় অ-দেখা;
রাত্রি যেন আঁধার ভারে
নুইয়ে পড়ে ধরার বুকে
ভিজে মাটীর গন্ধ পরশ
চায় সে নিতে কি উৎসুকে;
... ...
আমিই কি গো রইব ডুবে'
হিয়ার তমো সিন্ধু-নীরে?

এই সুরই 'প্রভাতী'তে বেশী বাজিয়াছে। তাঁহার ছন্দ কোথায়ও বেসুরা হয় নাই। দেবতার প্রতি তাঁহার নির্ভরশীলতা পাঠককে মুগ্ধ না করিয়া পারে না। কাব্যসৃষ্টি-হিসাবে কবিতাগুলি সার্থক। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। স
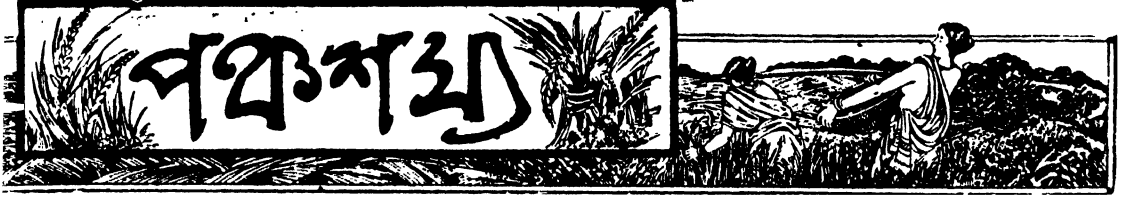
তারা আবিষ্কারে সহায়ক দূরবীণ—

গ্যালিলিওর সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত আমরা বিশ্ব ... যে নূতন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছি, তাহার প্রধান সহায়ক ...ণ যন্ত্র।

গ্যালিলিওর দূরবীণটি হাতে করিয়া স্বচ্ছন্দে নাড়াচাড়া করা ...। এখনকার দূরবীণকে চালাইবার জন্য ইলেক্‌ট্রিক মোটরের প্রয়োজন হয়। বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম দূরবীণ আমেরিকার মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের। এই দূরবীণের নলটির ব্যাস একশত ইঞ্চ। ইহার সাহায্যেই নীহারিকা সম্বন্ধে গবেষণা সম্ভবপর হইয়াছে। আমেরিকায় ইহার অপেক্ষাও বড় একটি দূরবীণ ও মানমন্দির নির্ম্মাণের জল্পনা-কল্পনা চলিতেছে। যদি এই চেষ্টা সফল হয়, তবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনেক অজ্ঞাত রহস্য জানা যাইবে, ইহা আশা করা যায়।
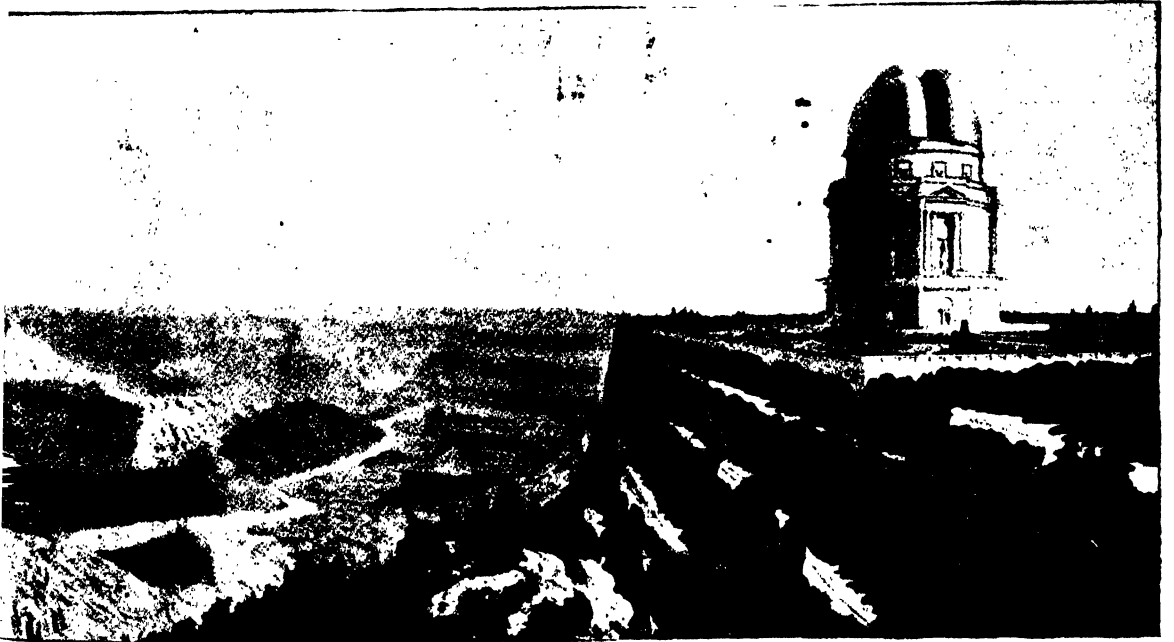
...রাজ্যের আরিজোনা ষ্টেটের অন্তর্গত গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের ধারে একটি বিরাট মানমন্দির স্থাপনের প্রস্তাব হইয়াছে। এই ছবিটিতে তাহারই পরিকল্পনা দেখান হইয়াছে। এই মানমন্দিরে যে দূরবীণটি থাকিবে তাহার নলের ব্যাস প্রায় তিনশত ইঞ্চ হইবে। বর্ত্তমান যুগের বৃহত্তম দূরবীণের নলের ব্যাস একশত ইঞ্চ। অন্যান্য তারার গ্রহ-উপগ্রহ থাকিলে এই দূরবীণের সাহায্যে তাহাও দেখা সম্ভবপর হইতে পারে।
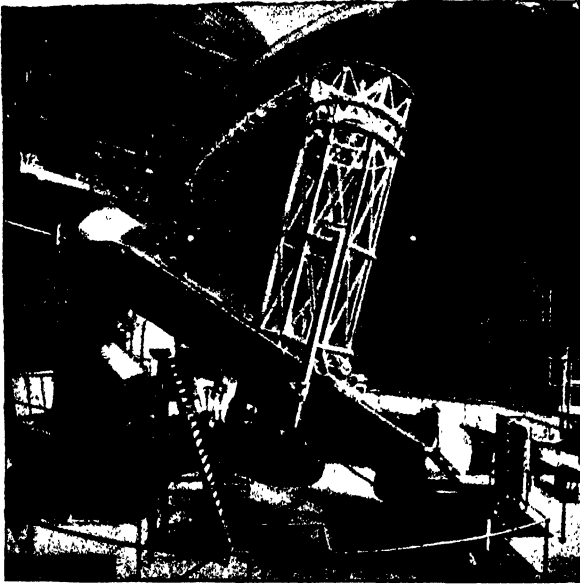
মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের ১০০ শত ইঞ্চ ব্যাসের দূরবীণ। ইহা জগতের বৃহত্তম দূরবীণ। ইহার দ্বারা তারা ও নীহারিকার ফটোগ্রাফ তোলা হয়।

মাউণ্ট উইলসন মানমন্দিরের একটি দৃশ্য

কৃত্রিম উপায়ে পাকান নাসপাতি

কৃত্রিম উপায়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফল পাকান—

যুক্তরাজ্যের কৃষিবিভাগের গবেষণা বিভাগ কৃত্রিম উপায়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফল পাকাইবার একটি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে। যে ফলগুলিকে পাকাইতে হইবে সেগুলিকে "এথেলিন" গ্যাসপূর্ণ একটি বাক্সে রাখিয়া দেওয়া হয়। গাছে থাকিয়া পাকিতে যে ফলের কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লাগিত, ইহাতে সেগুলি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাকিয়া যায়। এই গ্যাসের দ্বারা ফলের রং উজ্জ্বল করা যায় এবং মিষ্টতাও বাড়ান যায়। উপরের ছবিতে কৃত্রিম উপায়ে পাকান কতকগুলি নাসপাতি দেখান হইয়াছে।

'শ্লট' যন্ত্রে ছাতা বিক্রয়—

বার্লিনে ছাতা ফেরি করিবার একপ্রকার যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই যন্ত্রে পনর সেণ্ট মূল্য দিয়া একটি ছাতা টানিয়া আনিতে পারা যায়। বার্লিনের পথচারীরা বৃষ্টি হইলেই এই যন্ত্রের সদ্ব্যবহার করিয়া থাকে। বিপদে বন্ধু এই ছাতার উপরে তৈলাক্ত কাপড় থাকে এবং কাঠের একটা হাতল থাকে।
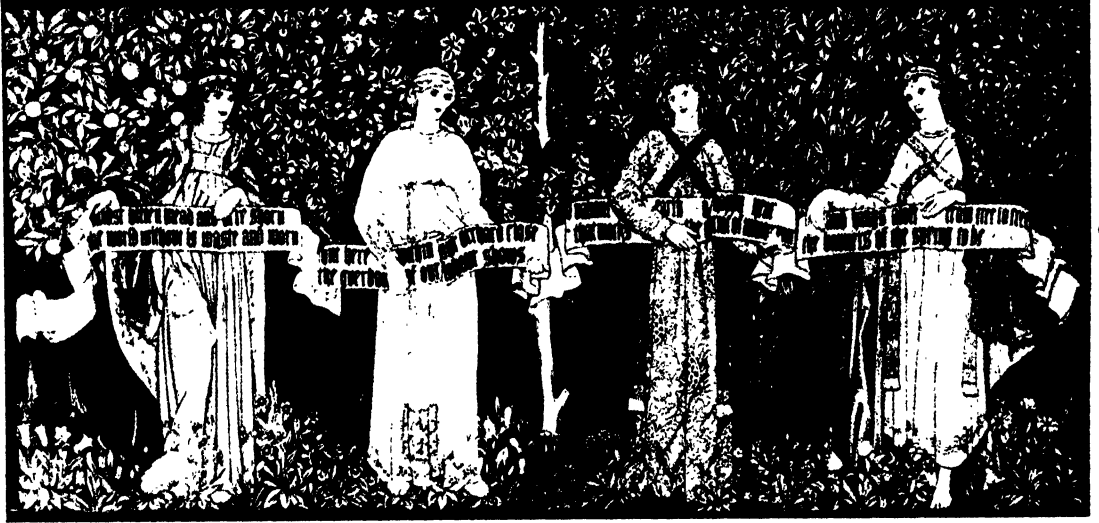
"ফলের বাগান"—উইলিয়াম মরিসের পরিকল্পনা হইতে রেশমী সুতায় বোনা ট্যাপেষ্ট্রী

"প্রি-র‍্যাফেলাইট" চিত্রকলা

ইয়ুরোপীয় চিত্রকলার ইতিবৃত্তলেখক ও অনুরাগীর কাছে তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইবার মত কোন জায়গা যদি থাকিয়া থাকে, তবে সে ফ্লোরেন্স ও প্যারিস। ইহাদের প্রথমটি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইয়ুরোপের চিত্রকলাকে রূপ ও বাণী দিয়া আসিয়াছে, অপরটির ছায়া বর্ত্তমান যুগের সমগ্র শিল্পসাধনার উপর রঙীন মেঘের মত বিস্তৃত। জোত্তো, মাসাট্চো, পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কা (ইতি আম্ব্রিয়ান হইলেও ফ্লোরেন্টিন প্রভাবেই অনুপ্রাণিত), বত্তিচেলি, লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো, রাফায়েল (পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কার মত ইনিও ফ্লোরেন্সের প্রভাবে প্রভাবান্বিত)—আঁগর্, দ্যলাক্রোয়া, মোনে, দেগা, স্যুরা, সেজান, মাতিস্, দ্যরেঁ, ইহাদের বাদ দিলে অতীত ও সমসাময়িক য়ুরোপীয় চিত্রকলার ইতিহাসে আর বিশেষ কিছু থাকে না—অবশ্য দুই এক জন ভেনিশিয়ান এবং ভেলাস্কেথ ও রেমব্রাণ্ট ছাড়া। প্যারিস ও ফ্লোরেন্স, এই দুইটি জায়গার শিল্পচর্চ্চার বিশেষত্ব এই যে, এখানকার শিল্পীরা সমভাবে চিত্রকলার হাতে-কলমে সাধনা ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিয়া একটির দ্বারা অপরটিকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। চিত্রকলার ইতিহাসে যে সকল তথ্য "আবিষ্কার" বলিয়া পরিগণিত সে সবই প্রায় ফ্লোরেন্স ও প্যারিসের চিত্রকরদের কীর্ত্তি। সেজন্যই চিত্রকলার বিবর্ত্তন ও ধারাবাহিক ইতিহাসে এই দুইটি জায়গার স্থান এত উচ্চে।

ফ্লোরেন্স ও প্যারিসের এই বিশেষ কৃতিত্বটুকু স্বীকার করিয়া লইলেই অন্য অন্য দেশের চিত্রকলার যথোচিত প্রশংসা করিবার পথে আমাদের আর কোন বাধা থাকে না। চিত্রকলার বৈজ্ঞানিক চর্চ্চায় না হউক, অসামান্য চিত্রাঙ্কণনৈপুণ্যে ভেনিস, হল্যাণ্ড অথবা ফ্ল্যাণ্ডার্সের শিল্পী-দের স্থান কাহারও নীচে নয়। তাহার পরেই ফ্রান্সের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর চিত্রকলা এবং জার্ম্মেনী, স্পেন ও ইংলণ্ডের চিত্রকলার স্থান। এই সকল বিভিন্ন শিল্পরীতির প্রত্যেকটিই বিভিন্ন দিক হইতে কলাশিল্পকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। চিত্রকলার ইতিহাসে ইহাদের প্রত্যেকটিরই নিজস্ব দান আছে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে চিত্রকলার যে বিশিষ্ট একটি রূপ দেখা দিয়াছিল, এই প্রবন্ধের তাহাই আলোচ্য বিষয়।

একদিক হইতে দেখিতে গেলে "প্রি-র‍্যাফেলাইট্ ব্রাদারহুড"-এর সৃষ্ট শিল্প ইংলণ্ডের চিত্রকলার ইতিহাসের একটি অবান্তর অধ্যায় মাত্র। ইহার সহিত অতীত ও পরবর্ত্তী যুগের চিত্রকলার কোন মূলগত সম্পর্ক নাই। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংলণ্ডে ফ্লেমিশ প্রভাবযুক্ত ও

অনেক সময়ে ফ্লেমিশ চিত্রকরের দ্বারাই সৃষ্ট একটা চিত্রকলা ছিল বটে, কিন্তু সে-দেশের নিজস্ব চিত্রকলার

ভার্জিন মেরীর শৈশব
এইখানি রসেটীর প্রথম ছবি। ইহা আঁকিবার সময়ে রসেটীর বয়স মাত্র কুড়ি বৎসর ছিল।

সৃষ্টি হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে হগার্থের সময় হইতে। হগার্থ যেন চিত্রকলার ফিল্ডিং। তাঁহার চিত্রগুলিতে রূপসৃষ্টি অপেক্ষা সামাজিক রীতিনীতির সমালোচনার উপরই বেশী জোর দেওয়া হইয়াছে। রেনল্ডস্, গেন্স্‌বরো, রম্‌নে ও লরেন্স হগার্থের তুলনায় চিত্রকর হিসাবে অনেক "বিশুদ্ধ"। ইঁহাদের সকলের চিত্রকলাই মূলতঃ ইতালীয় "বারোক" পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ ইঁহাদের সকলেই চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য রোমে গিয়াছিলেন। রোম তখন সম্পূর্ণ ভাবে কারাট্‌চি, গিদো রেণী, কারাভাডজো ও সালভাটর রোজা প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দিষ্ট অঙ্কনরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত। High Renaissance হইতে উদ্ভূত হইলেও বারোক আর্ট বিশুদ্ধ renaissance রীতি নয়। ইংলণ্ডের অ্যাকাডেমিক চিত্রকলার উপর বারোক রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তবুও অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ চিত্রকলাকে বারোকের অনুকরণ মাত্র বলিলে অন্যায় হইবে। ইংলণ্ডের চিত্রকলার বিশেষত্ব তাহার বর্ণবিন্যাসে। উনবিংশ শতাব্দীতে কনষ্টেবল্ ও টার্ণার তাহার দৃষ্টান্ত। এই ত গেল "প্রি-র‍্যাফেলাইট"-দিগের আগেকার কথা। বর্ত্তমান যুগের ব্রিটিশ চিত্রকলা আবার ইম্প্রেশ্যনিজম্ ও পোষ্ট-ইম্প্রেশ্যনিজম্ দ্বারা অনুপ্রাণিত। মাঝখানে বছর পঞ্চাশেকের জন্য প্রি-র‍্যাফেলাইটিজম্ ইংলণ্ডের চিত্রকলার ইতিহাসে বন্যার জলের মত আসিয়া আবার নামিয়া গিয়াছে।

মিঃ ক্লাইভ বেলের মত সমালোচকগণ ইয়ুরোপীয় চিত্রকলার বিবর্ত্তনে ইংলণ্ডের চিত্রকলার এই বিচ্ছিন্ন অঙ্কটির যে কোনও মূল্য বা দান আছে তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, প্রি-র‍্যাফালাইট ব্রাদারহুড-এর মূঢ়তা

বধূ—রসেটী
সলোমনের Song of Songs স্মরণে অঙ্কিত :

ইংলণ্ডের চিত্রকলার উপর যে কালীর দাগ আঁকিয়া দিয়াছে তাহা আজ পর্য্যন্তও মুছিয়া যায় নাই। মিঃ ক্লাইভ বেলের এই তীব্র সমালোচনার একটা হেতু আছে। তিনি "pure art"-বাদের পক্ষপাতী। তাঁহার কাছে কবিত্বময়,'মিষ্টিক', বা রূপক চিত্রকলা চিত্রকলার ব্যভিচার-

মাত্র। প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড-এর চিত্রে এই কয়টি জিনিষই উগ্রভাবে বর্ত্তমান। কেন বর্ত্তমান, সে কথাটা বুঝিতে হইলে প্রি-র‍্যাফেলাইটপন্থীদের চিত্রাঙ্কণ পদ্ধতি ও থিওরী এবং এই দলভুক্ত চিত্রকর, হলমান হাণ্ট, রসেটি, মিলে, মরিস্ প্রভৃতির—বিশেষ করিয়া ডাণ্টে গেব্রিয়েল রসেটীর—রুচি ও ব্যক্তিগত ঝোঁকের একটু আলোচনা করা প্রয়োজন।

"প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড" প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৯ সনে। ব্রিটিশ চিত্রকলার অবস্থা তখন বিশেষ শোচনীয় বলিতে হইবে। সে-সময়ে অ্যাকাডেমিক রীতির প্রাণহীন ও

"লা গীরলাণ্ডাটা"—রসেটী

বৈশিষ্ট্যহীন অনুকরণ ছাড়া ইংলণ্ডের চিত্রকলায় আর বিশেষ কিছু ছিল না। প্রতিকৃতি, দৃশ্যচিত্র, ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র প্রভৃতি প্রত্যেক ধরণের চিত্র আঁকিবার জন্যই বাঁধা-ধরা কতকগুলি নিয়ম ছিল। প্রকৃতির দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ব্যক্তিগত প্রেরণার অপেক্ষা না রাখিয়া চিত্রকরেরা সেই সকল বাঁধাধরা নিয়মে, অক্ষর গুণিয়া কবিতা লিখিবার মত ছবি আঁকিয়া যাইতেন, তাহাতে না থাকিত প্রাণ, না থাকিত সৌন্দর্য্য। অথচ তখন ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে—ফ্রান্সে—দ্যলাক্রোয়া ও গেরিকোর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া রোমাণ্টিক চিত্রকলার জয়যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও জড় অ্যাকাডেমিক রীতি

"ব্লেসেড ড্যামোজেল"—রসেটী
"ব্লেসেড ড্যামোজেল" রসেটীর একটি বিখ্যাত কবিতা। এই চিত্রটিতে রসেটী তাঁহার কাব্যকল্পনাকে মূর্ত্তি দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন

চিত্রকলাকে প্রাণহীন করিতে বসিয়াছিল, রোমাণ্টিক চিত্রকরগণ উহারই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চিত্রকলায় আবার জীবনের স্রোত বহাইয়াছিলেন।

প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড-এর উপর ফ্রান্সের রোমাণ্টিক চিত্রকলা কোন প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল কিনা তাহা ঠিক জানা নাই। তবে একথাটা সত্য যে রোমাণ্টিক আন্দোলনেরই প্রভাব ইংলণ্ডের কয়েকটি যুবকের মনেও প্রাচীন প্রথা ও প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহঘোষণার ভাব আনিয়া দিয়াছিল। তাহাদের মনেও চিত্রকলাকে আবার কি করিয়া সরস, সচল ও জীবন্ত করিয়া তোলা যায় এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে যাঁহারা অবশেষে প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদারহুড স্থাপিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্রোহ করিয়া বসেন তাঁহাদের নাম হলম্যান হাণ্ট, রসেটি ও মিলে।

প্রি-র‍্যাফেলাইটগণ চিত্রকলায় যে নূতনত্বের সূত্রপাত করেন তাহা প্রকৃতপক্ষে রোমাণ্টিক আন্দোলনের একটি অংশ। Lyrical Ballads প্রকাশের সঙ্গে ইংরেজী সাহিত্যে যে নবভাব দেখা দেয়, বিলম্বিত হইলেও প্রি-র‍্যাফে-

সোনার সিঁড়ি
বার্ণ জোনস্ কর্তৃক অঙ্কিত

লাইটিজম তাহারই আর একটা দিক মাত্র। ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ "লিরিক্যাল ব্যালাডস"এর ভূমিকায় কথাশিল্প ও কাব্যের সহিত প্রকৃতির যে সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, রাস্কিন তাঁহার Modern Painters-এ সেই কথাটাই একটু ঘুরাইয়া চিত্রকলার সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন। রাস্কিন ইংলণ্ডের তরুণ চিত্রকরগণকে একনিষ্ঠভাবে—কিছু বাদ না দিয়া, কোনও বাছবিচার না করিয়া - প্রকৃতির শরণাপন্ন হইতে বলিয়াছিলেন। প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকর-গণ তাঁহার এই কথা কি ভাবে মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা হলমান হাণ্টের দুইটি চিত্র অঙ্কনের কাহিনী হইতেই স্পষ্ট বোঝা যাইবে। Light of the World ও Scapegoat হলমান হাণ্টের দুইটি বিখ্যাত ছবি। প্রথমটিতে যীশু গভীর রাত্রিতে এক গৃহস্থের দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতেছেন, এই বিষয়টি অঙ্কিত হইয়াছে। খৃষ্টের হাতে একটি লণ্ঠন, পিছনে কতকগুলি গাছপালা, পায়ের কাছে কাঁটাগাছ, চারিদিক চন্দ্রালোকে প্লাবিত। লণ্ঠনের আলোর সঙ্গে চাঁদের আলো মিশিয়া খৃষ্টের মূর্ত্তির চারিদিকে এক অপরূপ জ্যোতির সৃষ্টি হইয়াছে। এই আলো ঠিক ভাবে দেখাইবার জন্য হলমান হাণ্ট তিন মাস ধরিয়া প্রতি শুক্লপক্ষে রাত্রি নয়টা হইতে ভোর পাচটা পর্য্যন্ত তাঁহার বাগানে বসিয়া ছবিটি আঁকিয়া-ছিলেন। এই চিত্রটির ক্ষুদ্রতম অলঙ্কারটি পর্য্যন্ত বাস্তব হইতে অঙ্কিত। রাস্কিন এই জন্য ইহাকে "the most perfect instance of expressional purpose with technical power which the world has yet produced" বলিয়াছেন। কথাটা অত্যুক্তি সন্দেহ নাই। তবু ইহার দ্বারা প্রি-র‍্যাফেলাইট ব্রাদার-হুডের সত্যের প্রতি অনুরাগ ও সত্যের জন্য কষ্টস্বীকার করিবার ইচ্ছা সূচিত হয়। হলম্যান হাণ্টের Scape-goat নামক ছবিটি ডেড-সির তীরে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধ ছাগের প্রতিকৃতি মাত্র। কিন্তু হাণ্ট এই ছবিটি আঁকিবার জন্য সুদূর প্যালেষ্টাইনে গিয়া মাসের পর মাস অসাধারণ পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করিয়াছিলেন। এই দলের অন্যান্য চিত্রকরগণের মধ্যেও এই সত্যনিষ্ঠার বহু দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সকল জিনিষই প্রকৃতি হইতে লইতে হইবে, এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হওয়ায় ইঁহাদের সকল চিত্রের সকল আলেখ্যই কোন-না-কোন ব্যক্তিবিশেষের। রসেটির Girlhood of Mary Virgin-এ সেণ্ট অ্যানের মুখ তাঁহার মাতার প্রতিকৃতি। অন্যান্য ছবির সকল প্রতিকৃতিও তাঁহার ভাই, বোন অথবা বন্ধু-বান্ধবীদের।

নিসর্গপরায়ণতা ছাড়া অন্য দিক দিয়াও সাহিত্যের রোমান্টিক আন্দোলনের সহিত প্রি-র‍্যাফেলাইটিজ্‌মের একটা সাদৃশ্য আছে। সাহিত্যিক রোমান্টিসিজ্‌ম যেরূপ ভাবের দিক দিয়া কাব্যের মধ্যে মধ্যযুগের মিষ্টিসিজ্‌ম ও অলৌকিকতা ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, প্রি-র‍্যাফেলাইটিজমও সেইরূপ চিত্রকলায় মধ্যযুগের একটা রং ও অনুভূত দিবার প্রয়াস পাইয়াছিল। ইহার জন্য অবশ্য দায়ী প্রধানত রসেটী, ও তারপরই মরিস্।

স্যর গালাহাড ও "হোলিগ্রেল"—বার্ণজোন্সের পরিকল্পনা অনুসারে নির্ম্মিত রঙীন কাচের প্যানেল

রসেটীর ছবির সহিত কীট্‌স্ ও কোলরিজের কাব্যের একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। রসেটীর কাব্যও কীটসের দ্বারা অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার শিল্পপ্রেরণা তাঁহার কাব্যপ্রেরণার একটা রূপান্তর মাত্র। সেইজন্যই রসেটীর চিত্রে শিল্পসৌন্দর্য্য অপেক্ষা কবিত্বের চেষ্টা বেশী। রসেটী প্রথমে কবি তারপর চিত্রকর।

এই কথাটা বোধ করি প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকলা সম্বন্ধে আরও ব্যাপকভাবেও বলা চলে। এই দলের সকলের চিত্রেই রূপক ও কবিত্বের একটা অসংযত আতিশয্য দেখা যায়। এইজন্যই এই পদ্ধতির প্রভাব ইংলণ্ডের চিত্রকলার ইতিহাসে বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই।

প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকরদিগের কবিত্বপরায়ণতার আর একটি নিদর্শন তাঁহাদের প্রি-র‍্যাফেলাইট নাম গ্রহণ করিবার বিশেষ ভঙ্গিটি। "প্রি-র‍্যাফেলাইট" বলিতে রাফায়েলের পূর্ব্বতন ইতালীয় চিত্রকলা বুঝায়। কিন্তু ইতালীয় চিত্রকলার ইতিহাসে রাফায়েল একজন যুগ-প্রবর্ত্তক ন'ন। তাঁহার পূর্ব্বেকার চিত্রকলা একই ধরণের বা একই পদ্ধতিরও নয়। রসেটী ও তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রাচীন ইতালীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এই ভুলটি ঘটিয়াছিল। চিমাবুয়ে বা জোত্তো হইতে আরম্ভ করিয়া মাসাট্‌চোর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইতালীয় চিত্রকলার একযুগ; মাসাট্‌চো হইতে লিওনার্দো পর্য্যন্ত আর এক যুগ; তাহার পর High Renaissance; ও

সর্ব্বশেষে "বারোক"। লিওনার্দো High Renaissanace-এর অগ্রদূত হইলেও উহার পূর্ণ বিকাশ হয় করেজ্জো, জর্জ্জোনে ও টিশিয়ানে। অঙ্কণরীতি দিয়া বিচার করিতে হইলে রাফায়েলের স্থান লিওনার্দো ও করেজ্জোর মাঝামাঝি একটা জায়গায়। সুতরাং প্রি-রাফেলাইট কথাটির অর্থ হয় না। ইহা ছাড়া রসেটী ও তাঁহার বন্ধুগণ আর একটা গুরুতর ভুলও করিয়াছিলেন—High Renaissance এর পূর্ব্বকার ইতালীয় আর্টেও যে দুইটি স্তর আছে, তাঁহারা তাহা লক্ষ্য করেন নাই। মাসাচ্চোর পূর্ব্বতন ও পরবর্ত্তী ইতালীয় চিত্রকলার মধ্যে প্রভেদ গুরুতর। কোন চিত্রকরের পক্ষে এ ভুল করা গৌরবের কথা নয়। ভাজারি প্রকৃত চিত্রকর ছিলেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে Trecento, Quattrocento ও Cinquicento-র মধ্যে সুস্পষ্ট সীমারেখা টানিয়া গিয়াছেন। এই তিন যুগের চিত্রকরগণের technique-এর মধ্যে কি প্রভেদ, তাহা ধরাইয়া দিতে তাঁহার বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় নাই। এই পার্থক্য কোথায় তাহা বিস্তারিত বলিবার প্রয়োজন বা স্থান এ প্রবন্ধে হইতে পারে না। তবে এ কথাটা সত্য যে রসেটী ও তাঁহার বন্ধুবর্গ নিজেদিগকে প্রি-রাফেলাইট বলিয়া পরিচয় দিয়া, ইতালীয় প্রিমিটিভগণের টেক্‌নিককে অনুকরণ করা অপেক্ষা তাঁহাদের তথাকথিত attitude towards life-এর দিকে অনেক বেশী জোর দিয়াছিলেন। একদিন মিলের বাড়ীতে রসেটী ও হলমান হাণ্ট একটি ছবির বই দেখিতে পান। পিজার কাম্পোসান্তোতে বেনোৎজো গোৎসলী ও অন্যান্য প্রাচীন ইতালীয় চিত্রকরদের আঁকা যে সকল ফ্রেস্কো আছে, এই পুস্তকটিতে তাহারই অনেকগুলি প্রতিলিপি ছিল। এই সকল ছবি দেখিয়া রসেটী ও হাণ্টের যেন চোখ খুলিয়া গেল একজন সমালোচকের কথায়—"In the work of thes men they found a sweetness, depth, an sincerity of devotional feeling, a self-forgetf

HERE BEGINNETH THE TALES OF CANTERBURY AND FIRST THE PROLOGUE THEREOF

WHAN that Aprille with his shoures soote
The droghte of March hath perced to the roote,
And bathed every veyne in swich licour,
Of which vertu engendred is the flour;
Whan Zephirus eek with his swete breeth
Inspired hath in every holt and heeth
The tendre croppes, and the yonge sonne
Hath in the Ram his halfe cours yronne,
And smale fowles maken melodye,
That slepen al the nyght with open eye,
So priketh hem nature in hir corages;
Thanne longen folk to goon on pilgrimages,
And palmeres for to seken straunge strondes,
To ferne halwes, kowthe in sondry londes;
And specially, from every shires ende
Of Engelond, to Caunterbury they wende,
The hooly blisful martir for to seke,
That hem hath holpen whan that they were seeke.
BIFIL that in that seson on a day,
In Southwerk at the Tabard as I lay,
Redy to wenden on my pilgrymage
To Caunterbury with ful devout corage,
At nyght were come into that hostelrye
Wel nyne and twenty in a compaignye,
Of sondry folk, by aventure yfalle
In felaweshipe, and pilgrimes were they alle,
That toward Caunterbury wolden ryde.

উইলিয়ম মরিস কর্ত্তৃক কেলমস্কট প্রেসে মুদ্রিত চশারের কাব্যগ্রন্থের একটি পৃষ্ঠা

ness and humble adherence to truth, which were absent from the sophisticated art of Raphael and his successors."এই ধরণের সমালোচনা কবিত্বের প্রচেষ্টা ভিন্ন আর কিছুই নয়। কোনও চিত্রের মাধুর্য্য বা সৌন্দর্য্য চিত্রকরের শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয়, তাহার চরিত্র-মাধুর্য্যের প্রতিফলিত দীপ্তি না-ও হইতে পারে। যে-সকল চিত্রকরের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কিছু জানা নাই তাহাদের সম্বন্ধেই সাধারণতঃ এইরূপ কথা বলা হইয়া থাকে। প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকরগণ সর্ব্বপ্রথমে কবি বলিয়া কবিত্ব ও চিত্রকলার প্রকৃত সম্বন্ধ কি তাহা বুঝিতে পারেন নাই।

তবে কি বর্ত্তমান ভারতীয় চিত্রকলার মত প্রি-র‍্যাফেলাইট চিত্রকলার মধ্যেও একটু কবিত্ব, একটু দুর্ব্বল সৌন্দর্য্য, নানাযুগের নানারীতির জোড়াতাড়ার সাহায্যে একটা অদ্ভুত ধরণের নূতনত্ব করিবার প্রয়াস ছাড়া আর কিছুই নাই? হয়ত নাই। ইংলণ্ডের বিদগ্ধসমাজে আজ প্রি-র‍্যাফেলাইটিজ্‌মে নেশা কাটিয়া গিয়াছে। তবুও শিল্পসৃষ্টির দিক হইতে প্রি-র‍্যাফেলাইটিজ্‌ম্ একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে একথা বলা ঠিক হইবে না। ললিতকলায় না হউক, কারুশিল্পের ক্ষেত্রে প্রি র‍্যাফেলাইটদিগের প্রচেষ্টা একটা নবজাগরণ আনিয়া দিয়াছে। এই দিক হইতে প্রি-র‍্যাফেলাইট দলের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হাণ্ট ন'ন, রসেটী ন'ন, মিলে ন'ন, বার্ণজোন্‌স ন'ন,—সে স্থান উইলিয়ম মরিসের। মরিসের বলিষ্ঠ কল্পনা কারুশিল্পের ক্ষেত্রে যে নবচেতনার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ প্রভাব কাটিয়া গেলেও বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎযুগের কারুশিল্পস্রষ্টারা পথপ্রদর্শক বলিয়া তাঁহাকে চিরকাল সম্মান করিবে।

দেশবিদেশের কথা

ভারতবর্ষ

সাইমন রিপোর্ট

গত ১০ই জুন সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ড ২৪শে জুন প্রকাশিত হইবে। প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার এবং শাসন-প্রণালীর বিবরণ আছে। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে প্রস্তাব ২য় খণ্ডে থাকিবে।

প্রথম খণ্ডটি সাত ভাগে বিভক্ত। প্রথমভাগে ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা ও ভাষা, গ্রাম ও শহর, বিভিন্ন ধর্ম্ম, জাতিভেদ ও অনুন্নত জাতি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বা ফিরিঙ্গী সম্প্রদায়, ভারতবর্ষের নারী, বিভিন্ন প্রদেশ, দেশীয় রাজা, ও সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সকলগুলি বিষয়েই যাহা বলা হইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের লোকের নিকট একটুও নূতন বলিয়া ঠেকিবে না। অনেক সময়ে এই সকল বিষয়ের আলোচনা গতানুগতিক ইংরেজী ধারণা অনুযায়ী করা হইয়াছে। নানা জাতি, নানা ভাষা ও নানা ধর্ম্মের অস্তিত্বের জন্য ভারতবর্ষে একতার কতদূর অভাব তাহা বুঝাইয়া বলিবার চেষ্টায় ত্রুটি হয় নাই। কমিশনের মতে এদেশের কৃষকগণের দারিদ্র্য ও অনুন্নত অবস্থার কারণ তিনটি—(১) কৃষিকার্য্যের গতানুগতিক রীতি, (২) পথঘাট ও সংঘবদ্ধ ব্যবসা বাণিজ্যের অভাব, এবং (৩) ধনপ্রাণ কতদূর নিরাপদ এ সম্বন্ধে কৃষকদিগের ভয়। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কৃষকদের উন্নতির জন্য কি করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থা অনুন্নত থাকিবার কারণ সম্বন্ধে কিছু বলা হয় নাই। এই রিপোর্টে শিক্ষিত ভদ্রলোকদের সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মত একটি সম্প্রদায় অন্যত্র পাওয়া বিরল। ইঁহাদের অনেকেই পাশ্চাত্য শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইঁহাদের অনেকেই বিদেশী ভাষার সাহায্যে কাজ করিতে, এমন কি অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা করিতেও অভ্যস্ত। অথচ ইঁহাদের সকলেই সনাতন প্রথা রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ ভারতবর্ষীয় জনগণের সঙ্গে একাত্মতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। হিন্দুমুসলমান বিরোধ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, দুই পক্ষের মধ্যে শান্তিকামী ও শান্তিপ্রয়াসী লোক থাকিলেও উহা প্রকৃতপক্ষে একটা জাতিগত, ধর্ম্মগত ও সভ্যতাগত বিরোধ, রাজনৈতিক রেষারেষির জন্য আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই সম্পর্কে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা ও দ্বেষ কমাইবার কি চেষ্টা করা হইতেছে তাহার যথোচিত আলোচনা করা হইয়াছে। জাতিভেদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নজাতির ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সম্বন্ধে আপত্তির কথা বলা হইয়াছে। অনুন্নত জাতি সম্বন্ধে কমিশন বলেন যে, অনুন্নত শ্রেণীর লোকেরা তাঁহাদের সাক্ষ্যে সমাজসংস্কার আন্দোলনের ফলে তাহাদের অবস্থার কোন উন্নতি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই, যদিও কমিশনের নিজস্ব মত এই, যে, তাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল হইতেছে। ভারতবর্ষের নারী সমন্ধে কমিশন যাহা

বলিয়াছেন তাহার কিঞ্চিৎ আলোচনা অন্যত্র করা হইবে। ভারতবর্ষ প্রবাসী ইয়ুরোপীয় সম্প্রদায় সম্বন্ধে কমিশনের খুব উচ্চ ধারণা। এ সম্বন্ধে কমিশন বলেন, এত অল্প সংখ্যক লোকের দ্বারা এত বড় ও এত দূরগামী পরিবর্ত্তনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। ভারতবর্ষে দেশীয় ও ইউরোপীয়দের সামাজিক মেলামেশার কোন ব্যাঘাত আছে বলিয়া কমিশন মনে করেন না। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের বর্ণনাপ্রসঙ্গে কলিকাতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কমিশন বলেন, "Calcutta has become a great Hindu intellectual and political centre; with its newspapers and its enormous university, it exercises a profound influence over the views of the province—an influence which naturally does not stop at its boundaries."

রিপোর্টের ২য় হইতে ৫ম ভাগে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসন-তন্ত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করা হইয়াছে। ২য় ভাগে বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র, ৩য় ভাগে 'রিফর্ম্মড' শাসনপ্রণালী, ৪র্থ ভাগে আমলাতন্ত্র, ৫ম ভাগে রাজস্বসংগ্রহের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এই বিবরণের মধ্যে ভবিষ্যতের কনষ্টিটিউশন সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও, যাহা আছে তাহাতে সাইমন কমিশন ভারতবর্ষের শাসনতন্ত্রের কোন গুরুতর পরিবর্ত্তনের পক্ষে মত দিবেন বলিয়া মনে হয় না। রিপোর্টের এই অংশে সিভিল সার্ভিসের কার্য্যতৎপরতা ও প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। রিপোর্টের ষষ্ঠ ভাগে শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এসম্বন্ধে কমিশন বলেন, নিরক্ষরতা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছে বটে কিন্তু, ভারতবর্ষের সকল লোকের নিরক্ষরতা দূর হওয়া এখনও সুদূরপরাহত। শিক্ষক নিয়োগ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা আরও উন্নত করা প্রয়োজন।

রিপোর্টের শেষ খণ্ডে রাজনৈতিক প্রশ্ন সম্বন্ধে এদেশের লোকেদের ধারণার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। কমিশন বলেন, রাজনৈতিক আন্দোলন অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের মধ্যে আবদ্ধ। কৃষক ও সাধারণ লোক এখনও নিজেদের দৈনন্দিন জীবন ও চিরপ্রচলিত আচার-ব্যবহারের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। রাজনৈতিক চিন্তাধারা ইয়ুরোপের দ্বারা অনুপ্রাণিত। এদেশের রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে কমিশনের সুচিন্তিত অভিমত এই:—

"We should say without hesitation that with all its variations of expression and intensity, the political sentiment which is most widespread among all educated Indians is the expression of a demand for equality with Europeans and a resentment against any suspicion of differential treatment. The attitude the Indian takes up on a given matter is largely governed by considerations of his self-respect. It is a great deal more than personal feeling; it is the claim of the East for due recognition of status.

সাইমন কমিশন ও ভারতবর্ষ
- দুই বৎসর পূর্ব্বে এবং আজও

ব্যঙ্গচিত্র

লণ্ডনের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠক

[নৌ-বলে কে কাহার উপর প্রভুত্ব করিবে লণ্ডনের নিরস্ত্রীকরণ বৈঠকের দ্বারা উহাই প্রমাণিত হইয়াছে।]

Izvestia, Moscow

"সাপুড়ে"

[ব্রিটিশ অজগর ভারতবর্ষকে জড়াইয়া ধরিয়াছে, মহাত্মা গান্ধী কি বাঁশী বাজাইয়া তাহাকে ভুলাইতে পারিবেন? মস্কোর বিখ্যাত সংবাদপত্র "প্রাভ্‌ডা" এই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন]

Pravda, Moscow

"ইয়ং প্ল্যান"-এর দুইদিক

[ইয়ং প্ল্যানের দ্বারা জার্ম্মাণী ও মিত্রশক্তি-বর্গের মধ্যে দেনাপাওনা সম্বন্ধে একটা রফা হইয়াছে। 'প্রাভ্‌ডা'র মতে উহা গোলাপ ফুলের মত, সুগন্ধের দিকটা মিত্রশক্তিবর্গের, কাঁটার দিকটা জার্ম্মেণীর]

Pravda, Moscow

ভারতবর্ষে গণ্ডগোল

জনবুল—"এমন হবে তা যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি!

Campana de Gracia, Barcelona

লণ্ডন কনফারেন্সের ফল!

নাগাল পাওয়া দায়!

Philadelphia Inquirer
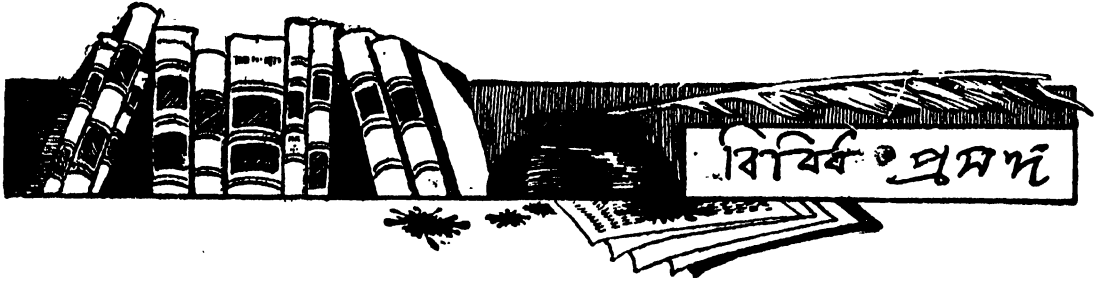
ব্রিটানিকী শান্তি

ভারতপ্রবাসী ও ব্রিটেনবাসী ইংরেজরা এবং তাঁহাদের পাশ্চাত্য বন্ধুরা বলিয়া থাকেন, যে, ব্রিটেন ভারতবর্ষে শান্তি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা এই অর্থে সত্য, যে, সিপাহী যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের মধ্যে তেমন কোন বড় যুদ্ধ হয় নাই। কিন্তু এই ব্রিটানিকী শান্তির অর্থ এ নয়, যে, দেশে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লুটতরাজ রক্তপাত হয় না। তাহা বরাবরই আছে; ক্রমশঃ সেরূপ ঘটনার সংখ্যা, ব্যাপকতা ও ভীষণতা বাড়িয়া চলিতেছে। গান্ধীজির অহিংস অবাধ্যতা ইহার কারণ নয়। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বেও এরূপ ঘটনা ঘটিত। এখন ঘটিতেছে, প্রধানতঃ লাঠি ও অন্য অস্ত্র দ্বারা স্বরাজলাভপ্রচেষ্টা থামাইবার চেষ্টা করাতে।

ব্রিটানিকী শান্তির যাঁহারা প্রশংসা করেন, তাঁহারা আধুনিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা লুটতরাজ রক্তপাত প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া বলেন, ইংরেজরা চলিয়া গেলে ভারতবর্ষের যেরূপ অবস্থা হইবে, ইহা তাহার নমুনা। কিন্তু এখানে যুক্তিতে ভুল আছে। ঘটনাগুলি ঘটিতেছে ইংরেজ-রাজত্বে, ইংরেজ পূর্ণপ্রতাপশালী থাকিতে থাকিতে। সুতরাং ইংরেজ চলিয়া গেলে কি ঘটিবে, তাহার প্রমাণ বা নমুনা এগুলি হইতে পাওয়া যায় না। ইংরেজ-রাজত্বে কি ঘটে ও ঘটিতে পারে, ব্রিটানিকী শান্তির সীমা কোন্ খান পর্য্যন্ত, শান্তিরক্ষার শক্তি বা ইচ্ছা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কত টুকু, এগুলি হইতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আগে ইংরেজ সম্পূর্ণ সরিয়া দাঁড়ান, তাহার পর যাহা ঘটিবে, তাহা হইতে ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের অবস্থার ঠিক্ ধারণা জন্মিতে পারিবে। ইংরেজবর্জ্জিত ভারতবর্ষের অবস্থা এখনকার চেয়ে ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে, কিংবা এইরূপই থাকিতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা হইতে তৎসম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যায় না, যে, ইংরেজ চলিয়া গেলে অবস্থা নিশ্চয়ই আরও খুব খারাপ হইবে।

ব্রিটানিকী শান্তির ভক্তেরা বলেন, ইংরেজ চলিয়া গেলে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ হইবে, তাহা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইতে বুঝা যায়। এ অনুমানও ঠিক্ নয়। ইংরেজ থাকিতে যাহা ঘটিতেছে তাহা, ইংরেজের অবর্ত্তমানে কি ঘটিবে, তাহার নমুনা হইতে পারে না।

—

ঢাকায় হিন্দুমুসলমান

যাহারা বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রতিবেশীরূপে বাস করিয়াছে এবং পরেও করিবে, যাহাদের মধ্যে অকপট বন্ধুত্বের দৃষ্টান্তের অভাব নাই, যাহারা পরস্পরের নিকট উপকার পাইয়াছে ও পাইবে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে যাহাদের সম্বন্ধে ডাক্তার টেলার তাঁহার টপগ্রাফী অব্ ঢাকা পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—

"Religious quarrels between the Hindus and Mahomedans are of rare occurrence. These two classes live in perfect peace and concord, and a majority of the individuals belonging to them have even overcome their prejudices so far as to smoke from the same *hookah*."—(Dr. Taylor's *The Topography of Dacca*, ch. ix, p. 257.)

তাহাদের মধ্যে অন্তর্যুদ্ধের কল্পনা করাও শোকাবহ ও লজ্জাকর। কিন্তু বর্ত্তমান বৎসরে কয়েক মাসের মধ্যেই বার বার যাহা ঘটিয়াছে, তাহাতে বাধ্য হইয়া এরূপ ব্যাপারের আলোচনা করিতে হইতেছে। অপ্রীতিকর বলিয়া কোনও ব্যাপারের সম্মুখীন হইতে বিরত থাকা উচিত নহে।

পূর্ব্ব বঙ্গের সকল জেলাতেই হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী। কিন্তু ঢাকা শহরে মুসলমানের চেয়ে

হিন্দুর সংখ্যা বেশী। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ঢাকার মোট লোকসংখ্যা ১,১৯,৪৫০। তাহার মধ্যে হিন্দু ৬৯,১৪৫, মুসলমান ৪৯,৩২৫। অল্পসংখ্যক মুসলমান স্ত্রীলোকও গত মাসের শোচনীয় লুটে যোগ দিয়াছিল বলিয়া কাগজে সংবাদ বাহির হইয়াছে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষরাই মারপিট লুট প্রভৃতি করে। এই জন্য এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ঢাকায় পুরুষ-জাতীয় হিন্দুর সংখ্যা ৪০,৩২৬ এবং পুরুষজাতীয় মুসলমানের সংখ্যা ২৬,৫১০। সুতরাং যদি ঢাকার ব্যাপারটা বাস্তবিক হিন্দুসমষ্টির সহিত মুসলমানসমষ্টির যুদ্ধ হইত (বাস্তবিক তাহা নয়) তাহা হইলে প্রধানতঃ হিন্দু-দিগকেই হত আহত লুণ্ঠিতসর্ব্বস্ব ও গৃহহীন হইতে হইত না। তাহার কারণ বলিতেছি। যুদ্ধে পরাজয় নানা কারণে হয়। সংখ্যান্যূন পক্ষের পরাজয় হইতে পারে। অর্থবল ও শিক্ষায় নিকৃষ্ট যাহারা, তাহাদের পরাজয় হইতে পারে। যাহাদের মধ্যে একতা ও দলবদ্ধতা কম, তাহাদের পরাজয় হইতে পারে। যাহাদের সাহস কম, তাহাদের পরাজয় হইতে পারে। যাহারা অস্ত্রব্যবহারে কম অভ্যস্ত, তাহাদের পরাজয় হইতে পারে। যাহারা জীবহিংসায় কম অভ্যস্ত, তাহাদের পরাজয় হইতে পারে। এইরূপ নানা কারণের অস্তিত্ব অনস্তিত্ব ন্যূনতা বা আধিক্যে জয়পরাজয় হইতে পারে।

ঢাকা শহরে মুসলমানের চেয়ে হিন্দু বেশী। সুতরাং সংখ্যার দিক্ দিয়া হিন্দুর পরাজয় হইবার কথা নহে। অবশ্য বাস্তবিক যুদ্ধ হইলে শহরের বাহির হইতে মুসলমান আসিয়া মুসলমানদিগকে সংখ্যা-বহুল করিতে পারিত, কিম্বা পশ্চিম বঙ্গ বা বঙ্গের বাহির হইতে হিন্দু আসিয়া হিন্দুদের সংখ্যা আরও বাড়াইতে পারিত। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের যুদ্ধ হয় নাই, কখনও যেন না হয়, এবং আমরা কেবল ঢাকা শহরেরই কথা বলিতেছি। হিন্দুরা অর্থবলে ও শিক্ষায় মুসলমানদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং সে হিসাবেও তাহাদের পরাজয়ের কারণ নাই। একতা ও দলবদ্ধতা হিন্দুদের কম; জাতিভেদ তাহার একটা কারণ। হিন্দুদের ঐক্য ও দলবদ্ধতা কম বলিয়া তাহারা নিগৃহীত হয়। পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুদের—ঢাকার হিন্দুদের—সাহস নাই বলা যায় না। রাজনৈতিক কারণে হিন্দুদের শাস্তি বেশী হয়; তাহাতে হিন্দুদিগকে অন্য দোষ যিনি যাহা দিতে চান দিতে পারেন, কিন্তু তাহা তাহাদের সাহসের অভাব বা ন্যূনতা প্রমাণ করে না, তাহার বিপরীতই প্রমাণ করে। ঢাকার দাঙ্গাতে কোন কোন পাড়ায় (সর্ব্বত্র নহে) হিন্দুরা সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করায় এবং তাহাদের আত্মরক্ষার চেষ্টা পুলিসের কোন কাজ দ্বারা ব্যাঘাত না পাওয়ায়, সেই পাড়াগুলি মুসলমানদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় নাই—অন্ততঃ কিছু কাল হয় নাই, এইরূপ সংবাদ কাগজে পড়িয়াছি। একটা ফাঁকা আওয়াজেই মুসলমান জনতা পলাইয়াছে, অন্ততঃ তখন তখন পলাইয়াছে, এরূপ বহু সংবাদ কাগজে বাহির হইয়াছে। আক্রান্ত একমাত্র হিন্দু জুতা খুলিয়া রুখিয়া দাঁড়ানতে আততায়ী মুসলমানগণ আক্রমণে ক্ষান্ত হইয়াছে, এরূপ ঘটনাও ঘটিয়াছে। হিন্দু বালিকা ও হিন্দু যুবকদের সাহসের অনেক প্রমাণও আছে।

শিক্ষিত হিন্দু যুবকেরা অস্ত্রব্যবহারে শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের চেয়ে কম দক্ষ নহে, বোধ হয় বেশী; এ বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের অশিক্ষিত শ্রেণীর প্রভেদের কথা বলিতে পারি না।

জীবহিংসায় কম অভ্যস্ত হইলে মানুষ মারিতে হাত উঠে কম; কিন্তু মহৎ কোন লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কাজ করিলে জীবহিংসায় অনভ্যস্ত লোকদেরও সাহস খুব বেশী হইতে পারে। গুজরাটের যে-সব লোক মহাত্মাজি-কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া অহিংস বিদ্রোহ করিয়াছে, তাহারা প্রধানতঃ লিখনপঠনজীবী ও ব্যবসাদার শ্রেণীর লোক এবং জীবহিংসায় অভ্যস্ত নহে। অথচ তাহারা যেরূপ সাহসের সহিত সাংঘাতিক আঘাতের সম্মুখীন হইতেছে এবং আঘাত সহিতেছে, তাহা অসাধারণ এবং জগতের ইতিহাসে অনতিক্রান্ত। জীবহিংসায় অভ্যস্ত না হইলে রক্ত দেখার অভ্যাস হয় না বটে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্যদলে নিরামিষভোজী জাতিদের সিপাইরাও খুব ভাল যোদ্ধা; এবং আধুনিক লড়াই বেশীর ভাগ দূর হইতে আগ্নেয় অস্ত্র দ্বারা হয়, তাহাতে তখনি তখনি রক্ত দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব জীবহিংসায়

অনভ্যাস যুদ্ধে পরাজয়ের একটা কারণ না হইতেও পারে।

আমাদের বিবেচনায় হিন্দুদের নিগ্রহের একটা প্রধান কারণ, তাহাদের অনৈক্য ও অদলবদ্ধতা। জাতিভেদ ও তাহার সর্ব্বাধম ফল অস্পৃশ্যতা ও অনাচরণীয়তা ইহার একটা কারণ।

ঢাকার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যেই একটা প্রভেদ দেখুন। ঢাকার মুসলমানদের একটি সংগঠন (organization) আছে, তার নাম বাইশ পঞ্চায়েতী। ঢাকা শহরটা বাইশটা মহল্লায় বিভক্ত; প্রত্যেক পাড়ার ধনী ও প্রভাবশালী মুসলমান সেই পাড়ার মহল্লাসর্দ্দার নিযুক্ত হয়; ঐ সব মহল্লা-সর্দ্দারদের মধ্যে রাজমিস্ত্রী, দরজী, ভিস্তী, আড়তদার, চামড়াওয়ালা, কসাই ইত্যাদিও আছে; ইহারা সব ঢাকার নবাবের অধীন ও অনুগত হইয়া কাজ করে, এবং ইহাদের হুকুম পাড়ার সব মুসলমান মানিতে বাধ্য। যে না মানে তাহার হুকা বন্ধ, গলায় জুতার মালা পরান, ইত্যাদি শাস্তি হইতে পারে। হিন্দুদের এরূপ কোন সংগঠন নাই। হইবার একটা অন্তরায় জাতিভেদ। কোন্ মহল্লায় কাহাকে সর্দ্দার করিবেন? শিক্ষা বা ধনশালিতা অনুসারে করিবেন, না জাতি-বিচার করিয়া করিবেন?

এ সব বাধা না-মানিয়াও ভারতের সব প্রদেশে রাজনৈতিক কর্ম্মিষ্ঠতা অনুসারে দলের সর্দ্দার হিন্দুর নানা জাতির লোককে করা হইতেছে বটে। কিন্তু প্রত্যেক শহর ও গ্রামকে ঢাকার মুসলমানদের মত দলবদ্ধ করার চেষ্টায় সম্ভবতঃ পুলিস বাধা দিবে। কারণ, মুসলমানদের ঐরূপ দলবদ্ধতা দেশে স্বরাজস্থাপনের চেষ্টায় সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে প্রযুক্ত হয় না; হিন্দুদের তাহা হইতে পারে। তথাপি আত্মরক্ষার ও আত্মোন্নতির জন্য হিন্দুকে দলবদ্ধ হইতে হইবে।

হিন্দুদের নিগৃহীত হইবার একটা গূঢ় নিশ্চিত কারণ তাহাদের নিজ হীনতায় বিশ্বাস (যাহাকে inferiority complex বলে)। প্রথমতঃ, সব জাতির অনেক হিন্দুই মনে করে তাহারা রাজনৈতিক হিসাবে পুনঃপুনঃ পরাজিত একমাত্র হীন জাতি। ইহা যদি সত্য হইত তাহা হইলেও জীবিত হিন্দুদের ঘাড় হেঁট করিয়া থাকিবার কারণ হইত না। ইটালী চৌদ্দ শত বৎসর পুনঃপুনঃ আক্রান্ত হয় ও পরাধীন ছিল; এখন স্বাধীন ও প্রতাপশালী। ইংলণ্ডও অনেকবার আক্রান্ত, পরাজিত ও পরাধীন হইয়াছে। আরও অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ইংরেজদের লেখা ইতিহাস এই ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়াছে, যে, ভারতীয় হিন্দুরাই সকলের চেয়ে ভীরু এবং বেশী বার পরাজিত জাতি। তাহা সত্য নহে। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমানরাও অধিকাংশ হিন্দুদের বংশধর, জেতা আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর নহে। আমাদের নির্জীব ও সদা সঙ্কুচিত হইবার আর একটা কারণ পারিবারিক ও সামাজিক কোন কোন প্রথা। যাহাদিগকে ভদ্রশ্রেণীর হিন্দু বলা হয়, তাহারা কয়জন? অন্যেরাই সংখ্যায় বেশী। অথচ, রূপক ভাষায় বলিতে গেলে, ব্রাহ্মণ বা অন্য উচ্চ জাতির লোকেরা এই অন্যদের ঘাড়ে ও মাথায় পা দিয়াই আছেন। তাহার উপর পরিবারে সর্ব্বদাই, এটা করতে নেই ওটা করতে নেই, লাগিয়াই আছে। সুতরাং হিন্দুরা তেজস্বী হইবে কেমন করিয়া? এসব বাধা সত্ত্বেও যে বহুসংখ্যক হিন্দু তেজস্বী হয়, তাহা এই কারণে, যে, মানুষের মনুষ্যত্ব, তাহার তেজস্বিতা, এমন প্রকৃতিগত, যে, একেবারে নষ্ট হইবার নহে।

—

ঢাকায় দানবীয় কাণ্ড

যাহা হউক, ঢাকার দানবীয় কাণ্ডে সব বা অধিকাংশ হিন্দু সাহস দেখাইয়াছে, ইহা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। সবাই ভীরুতা দেখাইয়াছে, ইহাও সত্য নহে। অনেকে খুব সাহসের সহিত কাজ করিয়াছে। যাহারা সাহসের পরিচয় দিতে পারে নাই, তাহারা স্বভাবতঃ ভীরু, ইহা বলা দুটা কারণে উচিত নহে। প্রথমতঃ, বিপদের ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া কাহাকেও ভীরু বলা এক রকম কাপুরুষতা; দ্বিতীয়তঃ, সাহসী বলিয়া পরিচিত স্বাধীন জাতির লোকরাও অনেক সময় ঢাকাবাসী হিন্দুদের অবস্থায় পড়িয়া আতঙ্কগ্রস্ত হয় ও ভীরুর মত কাজ করে। ভগবান করুন, ঢাকার যেরূপ বিপদ হইয়াছে, পুনর্ব্বার আর সেরূপ না হউক। কিন্তু যদি আবার হয়, তাহা

হইলে ঢাকার হিন্দুরা তাহার জন্য প্রস্তুত থাকুন এবং অধিকতর মনুষ্যত্ব দেখাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হউন। সর্ব্বস্বান্ত, লাঞ্ছিত, আহত বা নিহত হওয়াটা পরাজয় নহে; নিজেকে অসহায় মনে করিয়া ভয়ে মনুষ্যত্ব বিসর্জ্জন দেওয়াই পরাজয়।

ঢাকার যে যে হিন্দু মুসলমানদের অল্পসংখ্যক ঘরবাড়ী পুড়াইয়া দিয়াছে, বা মুসলমানদের উপর ঢিল ছুঁড়িয়াছে বা অতর্কিতে কোন মুসলমানকে ছোরা মারিয়াছে, আমরা তাহাদের এরূপ গর্হিত কাজের তীব্র নিন্দা করিতেছি। অবশ্য এরূপ দোষ কি পরিমাণে হইয়াছে, তাহা আমরা জানি না। কাগজে খুব কমই বাহির হইয়াছে। আত্মরক্ষার জন্য এ রকম কাজের প্রয়োজন হয় না। আত্মরক্ষা ভিন্ন অন্য কোন কারণে বলপ্রয়োগ অবৈধ। বড় রাগ হইয়াছিল, বড় উত্তেজনা হইয়াছিল, প্রতিহিংসার ভাব জাগিয়াছিল, এরূপ কোন ওজর গ্রাহ্য নহে।

ঢাকার মুসলমানদের সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য বলিতেছি। ঢাকার সমুদয় মুসলমান খুন লুট ও গৃহদাহে যোগ দেয় নাই। সুতরাং সকলকে দোষ দেওয়া যায় না। কাগজে দেখিয়াছি, এক জন উচ্চপদস্থ মুসলমান ভদ্রলোক দৌরাত্ম্যে বাধা দিতে পারিয়াছিলেন। একটী ছাত্রের তদ্রূপ চেষ্টার কথা অন্যত্র প্রকাশিত ঢাকার পত্রাংশগুলিতে আছে। এইরূপ চেষ্টা আরও কোন কোন মুসলমান যদি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য। ভাল ইচ্ছা হয়ত আরও অনেকের ছিল। কিন্তু তাঁহারা কার্য্যতঃ কিছু করেন নাই, বা করিতে পারেন নাই। যে-সব বাসগৃহ ও দোকান লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হইয়াছে, তাহার অনেকগুলির নিকটেই পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত কোন কোন মুসলমানদের বাস; তাঁহারা দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে পারেন নাই বা করেন নাই। কায়েতটুলী পাড়ার খুব ক্ষতি হইয়াছে। সেখানেও এরূপ মুসলমানেরা ছিলেন। এই সব ভদ্রশ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষ সমর্থন করিতে কেহ ইচ্ছা করিলে তিনি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিবেন, যে, নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের উপর তাঁহাদের কোন প্রভাব না থাকায় তাঁহারা ভাল চেষ্টা কিছুই করিতে পারেন নাই। হিন্দু সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর শিক্ষিত ও ভদ্রলোকদের যতটা প্রভাব আছে, মুসলমান সমাজে নিম্নশ্রেণীর লোকদের উপর ভদ্র ও শিক্ষিত মুসলমানদের ততটা প্রভাব আছে কিনা জানি না; হয় ত নাই। পত্রাংশগুলিতে লিখিত হইয়াছে, যে, মুসলমানদিগকে ঘুষ দিয়া অনেক হিন্দু ঢাকায় থাকিতে বা ঢাকা হইতে পলাইতে পারিয়াছে। একজন হিন্দু তাঁহার নিকট গুণ্ডারা এইরূপ ঘুষ চাওয়ায় খুব উচ্চপদস্থ এক সরকারী মুসলমান কর্ম্মচারীর সাহায্য চান। তাহাতে ঐ কর্ম্মচারীটি বলেন, "যা চাচ্ছে দিয়ে দিন"। এই হিন্দু ও মুসলমানের এবং ঘুষদাতা আরও কাহারও কাহারও নাম আমাদের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। প্রমাণ আছে কিনা, না জানায় আমরা নামগুলি ছাপিলাম না।

বোধ হয় মুসলমানদের কতকটা সাফাইস্বরূপে একটি মুসলমান কাগজে লেখা হইয়াছে দেখিলাম, যে, একজন মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক হত হয় এবং তাহার শব মিছিল করিয়া লইয়া যাইবার সময় হিন্দুরা ঢিল ছুঁড়ে। তাহাতে মুসলমানেরা উত্তেজিত হওয়ায় ঢাকায় দাঙ্গা আদি ঘটিয়াছে। এবিষয়ে বিবেচনা করিতে হইবে, যে, মুসলমানটি যে হিন্দুকর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই, মুসলমান মুসলমানকে বধ করে না এমন নয়, যদি হন্তা হিন্দুই হয়, তাহা হইলেও ঢাকার সব হিন্দু বা লুণ্ঠিত পাড়ার আবালবৃদ্ধবনিতা সব হিন্দু মৃত মুসলমানটিকে মারিয়াছিল বা মারিবার ষড়যন্ত্রে ছিল, আশা করি কোন মুসলমানের ধারণা এরূপ নহে। হিন্দুরাই যে ঢিল ছুঁড়িয়াছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। ইহা উত্তেজক চরদের বা লুণ্ঠনপ্রিয় গুণ্ডাদের কাজ হইতে পারে—তাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই। জনকতক হিন্দু ঢিল ছুঁড়িলে সমস্ত শহরের হিন্দুদের তাহাতে যোগ ছিল, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই; সুতরাং নির্ব্বিচারে যাহাকে তাহাকে বধ করিবার এবং যাহার তাহার ঘরবাড়ী লুট ও দগ্ধ করিবার কোন কারণ ঘটে না। সভ্য সমাজের রীতি ও আইন এই, যে, কেবল মাত্র দোষীর শাস্তি হইবে; তাহা হইতে ভিন্ন অন্য রীতি বর্ব্বরতার লক্ষণ। লুট গৃহদাহ ও খুনের কোন

সমর্থন হইতে পারে না, সাফাই হইতে পারে না। যে-সকল দুর্বৃত্ত এইসব কাজ করে, বাহ্যতঃ তাহারা যে ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই লোক হউক, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান বা অন্য যে নামেই তাহারা পরিচিত হউক, তাহাদের কোন ধর্ম্ম নাই।

আদালতে রীতিমত বিচারের পর শাস্তি না হইয়া উচ্ছৃঙ্খল জনতা কর্ত্তৃক দণ্ড প্রদত্ত হইলে দোষী নির্দোষ অবিচারিত ভাবে দণ্ডিত হয়, এবং দণ্ডের কোন মাত্রা থাকে না—তাহা খুব অতিরিক্তই হয়। মানুষ-মারা, ঢিল ছুঁড়া প্রভৃতি প্রকৃত দোষ, কিম্বা পিকেটিং ও অন্য তথাকথিত অপরাধ হিন্দুদের বাস্তবিক ছিল ধরিয়া লইলেও শাস্তিদানের ভারটা উচ্ছৃঙ্খল জনতার হাতে গিয়া না পড়িয়া পুলিসের হাতে থাকিলেই ইংরেজ-শাসনের যশের পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইত। কারণ, হিন্দুকে শাস্তিদানের ভার গুণ্ডাদের হাতে অর্পিত একটা হস্তান্তরিত বিষয় (transferred subject) এখনও হয় নাই, এবং তাহার ভারপ্রাপ্ত কোন মন্ত্রীও নিযুক্ত হয় নাই।

—

ঢাকার শান্তিরক্ষকগণ

গতমাসে প্রায় একপক্ষ কাল ঢাকার যে অবস্থা গিয়াছে এবং যাহার ফল এখনও প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে, সেই অবস্থাকে কেহ কেহ অরাজকতা বলিয়াছেন। অরাজকতা কথাটি সুপ্রযুক্ত হয় নাই। কারণ, ঢাকায় গতমাসে ইংরেজরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল, এখনও আছে; এবং তখনও রাজশক্তির পরিচালকগণ সেখানে ছিলেন, এখনও আছেন। অতএব, ঢাকা অ-রাজক হয় নাই, তাহা অপেক্ষা অধম অবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন এবং শান্তিরক্ষা যে-সব সরকারী কর্ম্মচারীদের কাজ, তাঁহাদের দ্বারা সেই কাজ নির্ব্বাহিত হয় নাই; রাজভৃত্যেরা ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা রাজধর্ম্ম পালিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তাহার উত্তর তাঁহাদের নিকট আদায় করিবার ক্ষমতা দেশের লোকদের নাই। রাজধর্ম্ম কেন পালিত হয় নাই তাহা গবর্মেণ্টের জানা না থাকিলে এবং জানিবার প্রয়োজন হইলে, সরকার বাহাদুর নিজের মঙ্গলের জন্য ঢাকার শাসন ও পুলিস বিভাগের উচ্চতম, উচ্চতর ও উচ্চ কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে এই উত্তর আদায় করিতে পারিবেন;—ঢাকার হিন্দুরা গবর্মেণ্টের নিকট প্রতিকারপ্রার্থী হইতে প্রকাশ্য সভায় অস্বীকার করিয়াছেন; বোধ হয় তাঁহারা ঐরূপ কিছু জিজ্ঞাসা করাও আবশ্যক মনে করেন না।

অরাজক অবস্থা একটুও বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু প্রকৃত অরাজকতায় মন্দের ভাল এইটুকু আছে, যে, যে-যে স্থলে অরাজকতা হয়, সেখানে যুধ্যমান উভয়পক্ষের মধ্যে অত্যাচরিতদের যাহার যতটুকু আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্য থাকে, সে তদনুসারে তাহার চেষ্টা করিতে পারে, তৃতীয় কোন পক্ষ তাহাতে বাধা দেয় না; এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময় অন্ততঃ এই তৃপ্তিটুকু সে অনুভব করিতে পারে, যে, মানুষের মত মরিবার চেষ্টা করিতে পারিয়াছে। কিন্তু ঢাকায় অনেক স্থানে হিন্দুদের এই আক্ষেপ থাকিয়া গিয়াছে, যে, তাহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিত, অন্ততঃ তাহার চেষ্টা করিতে পারিত, কিন্তু তৃতীয় পক্ষ, পুলিস, তাহাদের অস্ত্র কাড়িয়া লওয়ায় এবং কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করায় তাহা সম্ভব হয় নাই। এইজন্য ঢাকার অবস্থা অরাজকতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হইয়াছিল।

মুসলমানদের মধ্যে যাঁহারা বীরধর্ম্মী, তাঁহাদের এই ব্যাপারে কোন গৌরববোধ হইবে না। কারণ, শক্তির পরীক্ষা ত এমন করিয়া হয় না। যাহারা কেবল ধনী হইতে চায়, তাহাদের পক্ষেও লুণ্ঠন শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। এই প্রকার লুটে সামাজিক আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয় না।

হিন্দুদিগকে রক্ষা করাইবার জন্য আমরা রাজধর্ম্মের কথা তুলি নাই—কারণ, যে সমাজ নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না, তাহাকে কেহই রক্ষা করিতে পারে না। যে দেশে জনশক্তি প্রবল নহে, সে দেশে রাষ্ট্রশক্তি বা রাজশক্তি দ্বারা নিয়মিতরূপে শান্তি রক্ষার কার্য্য হইতে পারে না। এইজন্য এদেশেও তাহা হইতেছে না।

রাজধর্ম্মপালন ঢাকায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানদের জন্য বেশী প্রয়োজন ছিল। যাহাদের সম্পত্তি ও প্রাণ গিয়াছে, যাহারা আহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যাই খুব বেশী। হিন্দুর লুণ্ঠিত ও দগ্ধ সম্পত্তির মূল্যও মুসলমানের লুণ্ঠিত ও দগ্ধ সম্পত্তি অপেক্ষা অনেক হাজার গুণ বেশী। কিন্তু হিন্দু অপেক্ষা অনেক অধিকসংখ্যক মুসলমানের এই গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে, যে, তাহারা কাপুরুষতা, নিষ্ঠুরতা ও দস্যুতার সুযোগ পাইয়া মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে এবং ধর্ম্মচ্যুত ও বর্ব্বরীভূত হইয়াছে। অতএব, যাহাদের প্ররোচনা, প্রশ্রয় বা অবহেলায় ঢাকায় দানবীয় কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহারা হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানেরই শত্রুতা ও ক্ষতি বেশী করিয়াছে। হিন্দুদের অন্ততঃ এই উপকারটুকু হইয়াছে, যে, তাহারা চিন্তা করিলে নিজেদের অবস্থা বুঝিতে পারিবে ও প্রকৃত প্রতিকারের উপায় করিতে পারিবে, এবং তাহাদের অনেকের প্রকৃতিগত বীরত্ব ও মানবপ্রীতির পরিচয় দিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। অবশ্য, দৈহিক ও আর্থিক ক্ষতি ছাড়া, যে সব হিন্দুর সাহস কমিয়াছে ও ভীরুতা বাড়িয়াছে, তাহাদের গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে বটে।

শহর ছাড়িয়া গ্রামেও লুট খুন গৃহদাহের ঢেউ পৌঁছিয়াছে, ইহা অতি দুর্লক্ষণ। হিন্দু-মুসলমান সকলেরই এরূপ অবস্থার বিস্তৃতি নিবারণের যথাসাধ্য চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

—

ঢাকার ব্যাপারের তদন্ত কমিটি

ঢাকার ব্যাপারের তদন্ত কমিটির কথা উঠিয়াছে। সাফাইয়ের জন্য তদন্তে কুফলই বেশী হয়। কিন্তু প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করিয়া ভবিষ্যতে এরূপ কাণ্ড যাহাতে না ঘটে, তাহা করিবার ইচ্ছা থাকিলে তদন্তে সুফল ফলিতে পারে। এরূপ তদন্তের ফলে কোন কোন দুষ্টের শাস্তি হইতে পারে; কিন্তু হত ব্যক্তিরা বাঁচিয়া উঠিবে না,. আর্থিক ক্ষতিপূরণও হয় ত সামান্যই হইবে। তথাপি প্রকৃত তদন্ত হওয়া ভাল। গবন্মেণ্ট কি করিবেন, জানি না। কিন্তু বেসরকারী কোন তদন্ত কমিটি হইলে তাঁহাদের দস্তুরমত প্রকাশ্য সাক্ষ্য লইয়া সাক্ষীকে জেরা করিয়া সমুদয় সাক্ষ্য এবং তদুপরি রিপোর্ট ছাপান উচিত। দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিকে যাহা বাহির হইতেছে, তাহাতে ব্যাপারটার একটা স্থূল ধারণা হয়, কিন্তু সব বিষয়ের ঠিক ধারাবাহিক তথ্য জানা যায় না।

—

সাইমন-রিপোর্ট-প্রকাশ পরিহাস (?)

ভিন্ন ভিন্ন দেশের লোকেরা তথাকার গবন্মেণ্টের কখন গুণ কখন বা দোষ কীর্ত্তন করে আবার একই সময়ে তথাকার কোন দলের লোক গবন্মেণ্টের প্রশংসা করে, অন্য কোন দলের লোক নিন্দা করে। শাসকেরা জনগণের ভাল করেন, না মন্দ করেন, প্রশংসা ও নিন্দা এই রকমের হইয়া থাকে। কিন্তু কোন দেশের গবন্মেণ্ট পরিহাস করেন, এমন কথা শোনা যায় না—সচরাচর ত শোনাই যায় না। বাস্তবিক গবন্মেণ্টের পরিহাস করিবার কথাও নয়। কিন্তু কোন কোন দেশে—অন্ততঃ আমাদের দেশে—সরকার বাহাদুর কখন কখন কাজ এমন করেন যাহার উদ্দেশ্য পরিহাস না হইলেও যাহা দেখায় পরিহাসের মত।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের রাজদ্রোহবিষয়ক ধারাটি এমন যে, আদালত ইচ্ছা করিলে, সরীসৃপজাতীয় ভিন্ন অন্য যে-কোন দেশী সংবাদপত্রের সম্পাদককে শাস্তি দিতে পারেন—দেন না যে, সেটা দয়া। এরূপ আইনের উপর আবার অর্ডিন্যান্স গোটা তিন জারি হইয়াছে। সুতরাং খুব ভাল উদ্দেশ্যে ও খুব মন খুলিয়া ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের সমালোচনা করা সাতিশয় বিপৎসঙ্কুল।

এহেন অবস্থায় সরকার বাহাদুর সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম ভল্যুম বাহির করিয়া সম্পাদকদিগকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাদের মতামত জানিবার জন্য। আমরাও এসোসিয়েটেড্ প্রেসের মারফৎ ৯ই জুন অপরাহ্ণে উহার আল্‌গা পাতাগুলি পাইয়াছি—তাহার সঙ্গের মানচিত্রগুলি পাই নাই। ইহার ঠিক সমালোচনা, গবন্মেণ্ট দণ্ডবিধির রাজদ্রোহবিষয়ক ধারাটি ও প্রেস অর্ডিন্যান্সটি রদ না করিলে, হইতে পারে না। অথচ,

সরকার বাহাদুর সম্পাদকদের ও সর্ব্বসাধারণের খাঁটি মত চান। ইহাকেই বলে অনভিপ্রেত কার্য্যগত পরিহাস।

—

সাইমন কমিশন রিপোর্টের সারসংগ্রহ

এসোসিয়েটেড্ প্রেস্ সাইমন কমিশন রিপোর্টের একটি সংক্ষিপ্তসার রিপোর্টের আলগা পাতাগুলির সঙ্গে ৯ই জুন সম্পাদকদিগকে বিলি করিয়াছেন। উহাই সব কাগজে বাহির হইয়াছে। ঐ সংক্ষিপ্তসার লণ্ডন হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। উহা হইতে রিপোর্টের ঠিক ধারণা হইবে না। উহা সরকারী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা লব্ধ।

—

দুইবারে প্রকাশের কারণ

এই প্রকার কমিশনের সমগ্র রিপোর্ট একেবারে প্রকাশ করাই রীতি। এক্ষেত্রে এই রীতির ব্যতিক্রম করা হইয়াছে। তাহার কারণ মোটামুটি এই বলা হইয়াছে যে, সমগ্র রিপোর্ট একসঙ্গে বাহির করিলে লোকে প্রথমেই কমিশন ভারতে কিরূপ শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিতে বলিয়াছেন, জনগণকে আত্মশাসন-ক্ষমতা কতটা দিতে বলিয়াছেন, তাহা লইয়াই আলোচনা আন্দোলন করিবে; ভারতবর্ষের আগেকার ও আধুনিক রাজনৈতিক সামাজিক শৈক্ষিক ও অন্যান্য যে-যে অবস্থার জন্য কমিশন তাঁহাদের প্রস্তাবগুলি নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, লোকে তাহা পড়িয়া দেখিবে না, বিবেচনা করিবে না। কমিশন চান, যে, প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছে তাহা ন্যায্য ও নিরপেক্ষ কিনা তাহা আগে বিবেচিত হউক। তাহা যদি ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য বলিয়া গৃহীত হয়, তাহা হইলে ভারতীয়েরা তাঁহাদের রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ডে লিপিবদ্ধ প্রস্তাবিত শাসনবিধির সমীচীনতা ও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবে বলিয়া তাঁহারা মনে করেন।

তাঁহাদের আসল মতলবটা কি, তাহা তাঁহারাই জানেন। আমরা অনুমান করি, তাঁহারা প্রথম খণ্ডে ভারতবর্ষের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা কেহ ন্যায্য ও পক্ষপাতশূন্য বলিয়া গ্রাহ্য করিলে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনবিধিতে তাঁহারা ভারতীয়দিগকে অল্প কিছু অধিকার দিলেও তাহা খুব দেওয়া হইয়াছে মনে হইবে। বস্তুতঃ রিপোর্টটি ভারতীয়দের জন্য লিখিত নহে বলিয়াই বোধ হয়। অধিকাংশ ভারতীয় ইহা ন্যায্য ও নিরপেক্ষ মনে করিবে না। ভারতবর্ষকে স্ব-শাসন এখন কেন দেওয়া যায় না, এবং ভবিষ্যতে দিতে হইলেও খুব পরে ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া কেন দিতে হইবে, তাহারই কারণ কৌশলপূর্ব্বক রিপোর্টের এই প্রথম খণ্ডে লেখা হইয়াছে। ভারতীয়দের প্রশংসা ও যোগ্যতার কথাও মধ্যে মধ্যে আছে। তাহা না থাকিলে লোকে অবিলম্বে রিপোর্টটাকে পক্ষপাতদুষ্ট মনে করিবে। কিন্তু অন্য দিকের কথাও আবার এমন করিয়া বলা হইয়াছে, স্ব-শাসনের অধিকার ভারতবর্ষের কেন এখনই পাওয়া উচিত নয়, তাহা এমন করিয়া বলা হইয়াছে, যে, ভারতীয়দের পক্ষে যাহা বলা হইয়াছে তাহার মূল্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

—

সাইমন রিপোর্টের প্রথম ভাগ

রিপোর্টের এই খণ্ডটিতে যাহা লেখা হইয়াছে তাহার জন্য এত লক্ষ টাকা ব্যয়ে কমিশনের সভ্যদের ভারতে যাতায়াত ভারতভ্রমণ সাক্ষ্যগ্রহণাদির বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। যে-সব সরকারী কাগজপত্র ও রিপোর্ট আগে হইতেই মজুত ছিল, তাহা পড়িয়াই ইহার অধিক অংশ ও দরকারী অংশ লেখা যাইত।

যে যে অবস্থার ও কারণের জন্য ভারতবর্ষের স্ব-শাসনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা বলিয়া সাইমন কমিশন তাঁহাদের রিপোর্টে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, সেই সেই অবস্থা ও কারণগুলি নূতন আবিষ্কার নহে। আমাদের জাতীয় কর্ত্তৃত্ব লাভের বিরোধীরা অনেকদিন হইতে সেই সব কথা বলিয়া আসিতেছেন। তাহাই সাতভাই সাইমন ভাষা বদলাইয়া বলিয়াছেন। পরাধীন জাতির দুর্ভাগ্য এই যে, যে সব আপত্তির জবাব অনেক বার দেওয়া হইয়াছে, আমরাইঅন্যূন পনর বৎসর পূর্ব্বে বার বার দিয়াছি, তাহাই পুনঃ পুনঃ অকাট্য যুক্তি বলিয়া উত্থাপিত হয়। সে সব আপত্তির খণ্ডন নাই বা হয় নাই বলিয়া যে আমরা স্বরাজ পাই নাই, তাহা নহে; একতাপ্রসূত সংঘবদ্ধ শক্তি স্বরাজলাভার্থ এপর্য্যন্ত

আমাদের দিক্ হইতে ভাল করিয়া প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া আমাদের দুর্দশার অন্ত হয় নাই।

পৃথিবীর কোন দুটি দেশ ঠিক্ এক রকম নয়, তাহাদের অবস্থা ও ইতিহাস ঠিক্ এক রকম নয়। তথাপি ভারতবর্ষকে পরাধীন অবস্থায় রাখিবার ন্যায্যতা প্রমাণ করিবার জন্য যে-যে অবস্থার ও কারণের উল্লেখ করা হয়, ঠিক্ সেইরূপ বা তৎসদৃশ অবস্থা ও কারণ বিদ্যমান থাকাতেও অন্য কোন কোন দেশ স্বাধীন রহিয়াছে, ইহা বার বার দেখান হইয়াছে। তাহা হইলেও আবার তাহা দেখাইতে হইবে। কিন্তু তাহা দেখাইতে হইলে সাইমন কমিশনের রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের মত বা তাহা অপেক্ষাও বড় একটি বহি লিখিতে হয়। তাহা লিখিবার এখন অবকাশ নাই। লিখিয়া প্রকাশ করিলে এবং তাহার প্রত্যেকটি কথার সত্যতার প্রমাণ সুবিদিত পদস্থ ইংরেজদের লিখিত অবাজেয়াপ্ত কেতাবপত্র হইতে উদ্ধৃত হইলেও, তাহা বাজেয়াপ্ত হইবে না কেহ তাহার গ্যারান্টী দিতে পারেন না।

রিপোর্টের দ্বিতীয় ভলুাম ২৪শে জুন ৯ই আষাঢ় বাহির হইবে। তাহাতে সাইমন সাত-ভাই"য়া"ই ভারতের ললাটে কি শাসনবিধির খসড়া লিখিয়াছেন, প্রথম ভলুামে তাহার কোন সঙ্কেতও যাহাতে পাওয়া না যায়, তজ্জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। তথাপি তাঁহাদের প্রস্তাব ভারতীয়দের দাবী অনুযায়ী হইবে না, তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। তাহার দুএকটা প্রমাণ পরে দিতেছি।

আমাদের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ অবিলম্বে কিরূপ হওয়া উচিত, তাহা স্থির করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই, যোগ্যতাও নাই, সে অধিকার ও যোগ্যতা ব্রিটিশ জাতির ও পার্লেমেণ্টের আছে; আমরা নিজেদের হিত বুঝিতে অসমর্থ, ব্রিটিশরাই তাহা বুঝিতে সমর্থ; আমরা ভারতের রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পক্ষপাতশূন্য কিছু বলিতে পারিব না, ব্রিটিশরাই পারিবে; ইত্যাকার ঘোষিত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অবিমিশ্র শ্বেতকায় কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সাতজন ধলার সঙ্গে একজন কালা আদমীও রাখেন নাই। এই নীতি ভারতীয় স্বাজাতিকেরা সম্পূর্ণ রূপে অগ্রাহ্য করিয়া সাইমন কমিশনের সহিত সম্পর্ক বর্জ্জন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার রিপোর্টে যাহাই লেখা থাক্ তাহার দ্বারা ভারতীয় স্বাজাতিকেরা চালিত হইবেন না; তাঁহারা ভারতের ভবিষ্যৎ ভারতেই গড়িতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে।

ভারতীয় স্বাজাতিকদের দাবী এই, যে, এদেশে অবিলম্বে কানাডার মত স্বশাসনবিধি প্রবর্ত্তিত হউক। মুসলমানদের অনেক অংশ এবং মান্দ্রাজী অ-ব্রাহ্মণদল সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন চান বটে, কিন্তু তাঁহারাও কানাডার মত অধিকার ভারতের জন্য চান। কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতা লাভের প্রয়াসী বটে; কিন্তু আমরা এখানে সর্ব্বনিম্ন দাবীটিরই উল্লেখ করিতেছি। সাইমন্ সাত-ভাইয়ারা যে ভারতের তাহা পাইবার সমর্থন করেন নাই, তাহার ইঙ্গিত রিপোর্টের প্রথম খণ্ডের নানা জায়গায় পাওয়া যায়। একটার উল্লেখ করিতেছি।

—

রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ক্রমবিকাশ

৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—

"Indian political thought finds it tempting to foreshorten history, and is unwilling to wait for the final stage of a prolonged evolution. It is impatient of the doctrine of gradualness."

তাৎপর্য্য। "ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তকগণ ইতিহাসের চিত্র অগ্রসংহার রীতিদ্বারা আঁকিতে প্রলুব্ধ হন (অর্থাৎ যে প্রক্রিয়ার পরিণতি দীর্ঘ কালে হইয়াছে তাহা যেন অল্প সময়ে হইয়াছে এইরূপ দেখাইতে তাঁহাদের লোভ হয়), এবং তাঁহারা দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমবিকাশের শেষ অবস্থার জন্য অপেক্ষা করিতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা ক্রমিকতা নীতি সম্বন্ধে অধৈর্য্য।"

এস্থলে লেখকরা নিজেই একটা মস্ত ভুল করিয়াছেন। যে-জিনিষটির ক্রমবিকাশ হইতে যত সময় লাগে, তাহা শিখিতে তত সময় লাগে না। ইস্পাতের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে মানবজাতি একদিনে শিখে নাই, সত্য। প্রাচীন প্রস্তরাস্ত্র, নবীন প্রস্তরাস্ত্র, অস্থির অস্ত্র, ব্রঞ্জধাতুর অস্ত্র

ইত্যাদি অনেক হাজার বৎসর ব্যাপী নানা যুগের পর মানুষ লোহা ইস্পাতের অস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু এখন অসভ্য বা সভ্য জাতির কেহ একটা ছুরী বানাইতে চাহিলে তাহাকে হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া পাথর, হাড়, প্রভৃতির অস্ত্র গড়িয়া তাহার পর ইস্পাতের ছুরী তৈরী করিতে কোন আহাম্মকও বলিবে না। ষ্টীম এঞ্জিনের গোড়াপত্তন হয় ১৩০ খৃঃ পূঃ অব্দে আলেকজান্দ্রিয়ার হীরোর কলে। তাহার আঠার শতাব্দী পরে সেভারী (১৬৯৮ খৃঃ অঃ), আরও কয়েক বৎসর পরে নিউকোমেন (১৭০৫ খৃঃ অঃ), আরও ৫০ বৎসর পরে ওয়াট (১৭৬৩ খৃঃ অঃ),—এই প্রকারে নানা জনে উহার উন্নতি করিয়া উহাকে বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছাইয়াছে। কিন্তু এখন কেহ ষ্টীম এঞ্জিন তৈরী করিতে শিখিতে চাহিলে তাহাকে ২,০০০ বৎসর এপ্রেন্টিসী করিতে হয় না।

ভারতের জাতীয় কর্ত্তৃত্বের বিরোধীরা অবশ্য রাষ্ট্রীয় ব্যাপারেই ক্রমিকতার নীতির সমর্থন করেন। তাহা উপযুক্ত সীমার মধ্যে সত্যও বটে। কিন্তু তাঁহারা যে-অর্থে সত্য মনে করেন, সে অর্থে সত্য নহে। ইংলণ্ডের জনপ্রতিনিধিসভার দ্বারা দেশশাসনপ্রণালী বর্ত্তমান অবস্থায় পৌঁছিতে হাজার দেড় হাজার বৎসর লাগিয়া থাকিবে; কিন্তু অন্যান্য দেশ উহা অল্পদিনেই গ্রহণ ও শিক্ষা করিয়া নিজেদের কাজে লাগাইয়াছে। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি জাপানীরা এক আধ বৎসরের মধ্যেই উহা জাপানে প্রবর্ত্তিত করে, আমেরিকানরা ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিবার কুড়ি বৎসরের মধ্যেই উহার অধিবাসীদিগকে আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ববিশিষ্ট প্রতিনিধিসভা দেয়। ভারতবর্ষ প্রায় দুইশত বৎসর ইংরেজের অধীন থাকিয়াও তাহা পাইতে পারে না, ইহা অতি অদ্ভুত যুক্তি। আমেরিকার নিগ্রোরা ১৮৬৩ সাল পর্য্যন্ত দাস ছিল, এবং তাহারা আফ্রিকার অসভ্য জাতি হইতে উদ্ভূত। তাহারা দাসত্বমুক্ত হইয়াই আমেরিকার প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালীতে ভোটদানের অধিকার পাইয়াছে। ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি প্রাচীন, পুরাকালেও ভারতবর্ষে প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-প্রথা এবং প্রতিনিধিতন্ত্র শাসনপ্রণালী ভিন্ন ভিন্ন যুগে ও স্থানে প্রচলিত ছিল।

এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে, ক্রমিকতার দোহাই দিয়া আমাদের দাবী উড়াইয়া দিবার চেষ্টা অযৌক্তিক বলিয়া প্রতীত হইবে।

—

দেশরক্ষাসম্বন্ধীয় আপত্তি

ভারতবর্ষ নিজের সৈন্যবল দ্বারা নিজেকে রক্ষা করিতে যতদিন না পারিতেছে ততদিন তাহার স্ব-শাসন অধিকার পাওয়া উচিত নয়, এটা একটা পুরাতন বৃটিশ আপত্তি। তাহার উত্তরে বলা হইয়াছে, যে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি যখন স্বশাসন অধিকার পাইয়াছিল তখন তাহাদের আত্মরক্ষার ক্ষমতা ছিল না, এখনও পূরা ক্ষমতা নাই। সাইমন রিপোর্ট ইহা মোটামুটি মানিয়া লইলেও, এবং ভারতীয় সিপাহীরা যে খুব ভাল যোদ্ধা তাহা মৌনতা দ্বারা স্বীকার করিয়া লইলেও, বলিতেছেন, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমসীমার বিপদ এবং তাহা হইতে আত্মরক্ষার সমস্যার মত সমস্যা অন্য কোন স্ব-শাসক ডোমীনিয়নের নাই। ইহা সত্য, কিন্তু ভারতবর্ষের জনবল এবং অন্যবিধ সামর্থ্যও ঐ সব স্ব-শাসক দেশের চেয়ে বেশী। তাহার পর সাইমনরা আর এক আপত্তি তুলিতেছেন। তাঁহারা বলেন, ভারতের সৈন্যদল প্রধানতঃ পঞ্জাব, নেপাল ও মহারাষ্ট্র হইতে সংগৃহীত, দেশের অধিকাংশ অঞ্চল হইতে কোন সৈন্য পাওয়া যায় না; এরূপ অবস্থা ইউরোপের কোন দেশে নাই, সেখানকার সব দেশের সব অঞ্চল হইতেই সৈন্য পাওয়া যায়; ভারত-রক্ষার সুবন্দোবস্ত তখনই হইবে, যখন সব প্রদেশ হইতেই ভাল সৈন্য পাওয়া যাইবে।

ইহার উত্তরে ভারতীয় স্বাজাতিকেরা বলিয়া থাকেন, যে, ব্রিটিশ কূটনীতি শিক্ষায় অগ্রসর ও দেশাত্মবোধে কতকটা উদ্বুদ্ধ অঞ্চল সকল হইতে ইচ্ছা করিয়া সৈন্য লয় না। প্রত্যুত্তরে সাইমন রিপোর্ট বলিতেছেন, গত মহাযুদ্ধের সময় ত সব প্রদেশ হইতেই সৈন্য চাওয়া ও লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তখনও পঞ্জাব সকলের চেয়ে

বেশী সৈন্য দিয়াছিল, বাংলা প্রভৃতি দেশ খুব কম সৈন্য দিয়াছিল।' এই তথ্য ও যুক্তির জবাব যাহা দেওয়া হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মৌন অবলম্বন করিয়া রিপোর্ট সুবুদ্ধিরই কাজ করিয়াছেন। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপন ও বিস্তৃতির ইতিহাস হইতে দেখা যায়, যে, যখন ক্লাইব প্রভৃতি সাম্রাজ্যস্থাপকেরা যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন শিখ গুরখা পাঠান রাজপুত গাড়োয়ালী মরাঠা সৈন্য লইয়া করে নাই, তাহাদিগকে তখন পাইবার উপায়ও ছিল না। মান্দ্রাজী বাঙালী ও ভোজপুরী সিপাহীরাই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের অস্ত্রস্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাহার পর যেমন ইংরেজ-রাজত্ব বিস্তৃত হইতে লাগিল, আধুনিক শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ-শাসনের মর্ম্ম লোকে বুঝিতে লাগিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অঞ্চল হইতে সৈন্য লওয়া বন্ধ হইতে লাগিল যে-সব অঞ্চলে ইংরেজ-রাজত্ব দীর্ঘতমকালস্থায়ী, এবং নূতন বিজিত প্রদেশ, দেশী রাজ্য, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও নেপাল হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার রীতি বেশী করিয়া অবলম্বিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে সৈন্যদলে যাওয়ার ইচ্ছা ও রীতি লুপ্ত হইয়াছে। ইহা লুপ্ত হইবার পর ইংরেজরা গত মহাযুদ্ধের সময় নিজেদের সঙ্কট অবস্থায় ভারতের সব প্রদেশ হইতে সৈন্য চাহিয়া যদি যথেষ্ট না পাইয়া থাকেন, তাহা কাহার দোষ?

যদি সব প্রদেশ হইতে সিপাহী সংগ্রহের বাস্তবিক ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে সব প্রদেশে যুদ্ধবিদ্যা শিখাইবার—অন্ততঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে শিখাইবার—ব্যবস্থা কেন করা হয় না?

যাহা হউক, রিপোর্ট অতঃপর বলিতেছেন, যে, কেবল কয়েকটি অঞ্চল হইতে সিপাহী সংগৃহীত হওয়া সত্ত্বেও ভারতবর্ষের অ-যোদ্ধা প্রদেশগুলির কোটি কোটি লোক যে শান্তিতে আছে অর্থাৎ যোদ্ধা জাতিদের সিপাহীদের দ্বারা আক্রান্ত ও অত্যাচরিত হইতেছে না, তাহার কারণ তাহাদের নায়ক অফিসাররা ইংরেজ এবং তা ছাড়া গোরা সৈন্যদলও আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে কোন কোন ইংরেজ অসভ্য ভাষায় কাল্পনিক শিখ বা রাজপুত সৈন্যদের মুখ দিয়া যে কথা বলাইত, সাইমন রিপোর্টে এস্থলে সভ্য প্রচ্ছন্ন ভাষায় সেই কথাই বলা হইয়াছে (৯৬-৯৮ পৃষ্ঠা)।

যুদ্ধ করিবার প্রথা যত দিন জগতে থাকিবে, ততদিন ভারতবর্ষেরও সৈন্যদল রাখিবার প্রয়োজন হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। এই সৈন্যদলে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশ হইতে সৈন্য লওয়া দরকার, ইহাও স্বীকার্য্য। গত মহাযুদ্ধের সময় যে সকল প্রদেশ হইতে সৈন্য চাহিয়া ইংরেজ গবর্ন্মেণ্ট যথেষ্ট সৈন্য পান নাই, তাহার একটা প্রধান কারণ উপরে বলিয়াছি। আর একটা কারণ এই, যে, যে-যে প্রদেশে শিক্ষার বিস্তার বেশী এবং লোকদের গড় আয় বেশী, তথাকার লোকেরা ইংরেজের হুকুমে ইংরেজের উদ্দেশ্য সাধনার্থ যুদ্ধ করিয়া মরিতে রাজী নয়, এবং সিপাহীরা যে বেতন ও ব্যবহার পায় তাহাতেও সন্তুষ্ট নয়। দেশে স্বরাজ্য স্থাপিত হইলে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিবার লোক উপযুক্ত বেতনে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ইংরেজনিন্দা-ভাজন বাংলাদেশ হইতেও পাওয়া যাইবে।

ইংরেজ সেনানায়ক ও গোরা সৈন্য আছে বলিয়াই সিপাহীরা অ-যোদ্ধা প্রদেশগুলিকে আক্রমণ করে না, ইহা সত্য নহে। এক সময় ছিল, যখন ইংলণ্ডনামক ছোট দেশটি সাতটা রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং তাহারা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিত। স্কটল্যাণ্ড ইংলণ্ড পরস্পরকে আক্রমণ করিত। এখন সে দিন নাই। আগে আগে ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুদ্ধ হইত বলিয়া এখনও বা অদূর ভবিষ্যতেও হইবে মনে করা ভুল। তাহা সত্য হইলে, ইংলণ্ড যে ভারতকে সভ্য করিয়া তুলিবার দাবী করেন, তাহা একেবারে মিথ্যা। ভারতীয় যোদ্ধা জাতিরা তথাকথিত অ-যোদ্ধা জাতিদিগকে অবজ্ঞা করে, এই কাল্পনিক কথা ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য রটনা করিয়া থাকে। গান্ধী অ-যোদ্ধা বণিকজাতীয়, তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া ভারতের যোদ্ধা অ-যোদ্ধা নানা জাতির ও ধর্ম্মের লোক শুধু মৌখিক ও কাগজিক আন্দোলন করিতেছে না; প্রাণ দিতেছে, অকথ্য ও দুঃসহ প্রহার ও অত্যাচার অম্লানবদনে অসামান্য সাহসের সহিত সহ্য করিতেছে এবং অসাধারণ সংযম ও নিয়ম-বাধ্যতা প্রদর্শন করিতেছে। যোদ্ধা সিপাহীদের সাহস

ও দুঃখসহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে-সব গুণ আছে, তাহা গান্ধীর দলের সত্যাগ্রহীদের সেই সব গুণের চেয়ে বেশী নয়। 'বাণিয়া' গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস-সংগ্রামে যদি ভারতীয় যোদ্ধা অ-যোদ্ধা জাতিদের লোক প্রাণ দিতে পারে ও দুঃসহ দুঃখ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় ভবিষ্যৎ স্বরাজের আমলে প্রয়োজন হইলে যোদ্ধা অ-যোদ্ধা জাতিদের সৈনিকেরা সম্মিলিতভাবে যোদ্ধা ও অ-যোদ্ধা জাতিদের নায়কদের অধীনে নিশ্চয়ই দেশরক্ষার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধও দক্ষতা ও কৃতিত্বের সহিত করিতে পারিবে।

—

গ্রামের অবস্থা

বলা হইয়াছে, গ্রাম্য আর্থিক উন্নতির (rural prosperity) বৃদ্ধি হইতেছে। ইহা সত্য নহে। স্থানাভাবে অভিজ্ঞ ইংরেজ ও দেশী লোকদের উক্তি দিতে পারিলাম না। গ্রামসমূহের যে-দারিদ্র্য অস্বীকার করিবার জো নাই, তাহার যে-সব কারণ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে শিক্ষার অভাবের উল্লেখ নাই। গ্রামসমূহের স্বাস্থ্যের অবস্থা যে খুব খারাপ, তাহাও লেখা হয় নাই। অথচ ইহা "India in 1928-29" নামক সরকারী বহির ৭৯-৮০ পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত ভাবে লেখা আছে—

In addition to these economic distresses the Indian villager normally finds himself bound in a chain of circumstances adverse to his welfare and prosperity. In the first place, innumerable villages all over India are foci of preventible disease which causes immense economic wastage. No survey of the conditions under which the Indian agriculturist lives and works can ignore this vitally important factor. The following quotation from a resolution passed at the All-India Conference of Medical Research Workers, held in 1926, will enable the reader to understand what the ravages of disease mean to India in terms of economic loss :—

"This Conference believes that the average number of deaths resulting every year from preventible disease is about five to six millions, that the average number of days lost to labour by each person in India, from preventible disease, is not less than a fortnight to three weeks in each year, that the percentage loss of efficiency of the average person in India who reaches a wage-earning age is about 50, whereas it is quite possible to raise this percentage to 80 or 90. The Conference believes that these estimates are under-statements rather than exaggerations, but, allowing for the greatest possible margin of error, it is absolutely certain that the wastage of life and efficiency which result from preventible disease costs India several hundreds of crores of rupees each year. Added to this is the great suffering which affects many millions of people every year.

"The Conference believes that the greatest cause of poverty and financial stringency in India is loss of efficiency resulting from preventible disease and, therefore, considers that lack of funds, far from being a reason for postponing the enquiry, is a strong reason for immediate investigation of the questions."

—

রিপোর্টের আরও কতকগুলি কথা

"স্বভাবসিদ্ধ নেতা"

জমীদার প্রভৃতি লোকদিগকে জনগণের স্বাভাবিক নেতা বলা হইয়াছে। আগে তাঁহারা ছিলেন বটে। এখন তাঁহারা চিন্তার গতি ও অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত সমান বেগে অগ্রসর হইতে না পারায় সে নেতৃত্ব অনেকস্থলে হারাইয়াছেন, অন্যত্র হারাইতে বসিয়াছেন।

হিন্দুমুসলমানের মিলন

হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সদিচ্ছাসম্পন্ন লোকেরা পরস্পরের মিলনচেষ্টা করিয়া থাকেন, লেখা হইয়াছে; কিন্তু লাট সাহেবদের দু-একটা ধর্ম্মোপদেশ ছাড়া কার্য্যতঃ এরূপ চেষ্টা সরকার বাহাদুর কি করিয়াছেন, তাহা লেখা হয় নাই। "(Religious zeal)" লক্ষিত হইলে উভয় পক্ষের দলাদলিপ্রিয় লোকেরা যে সেই সুযোগ অবলম্বন করিয়া স্বকার্য্যোদ্ধার করে, রিপোর্টে একথা আছে; কিন্তু সরকারী অনেক লোকও যে এইরূপ সুযোগে কাজ হাসিল করে, তাহার উল্লেখ নাই।

সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন-রীতি এবং ভারত-শাসনের নূতন বিধি দ্বারা যে হিন্দুমুসলমান-বিরোধ বাড়ে নাই, সাইমন সাত-ভাইয়ের এই মত। কিন্তু ইহা ঠিক নয়। উভয় সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যের অন্য কারণ আছে ও থাকিতে পারে। কিন্তু উক্ত বিধিও একটা কারণ। যেরূপ কম যোগ্যতা বিশিষ্ট মুসলমান ভোট দিবার অধিকার পাইয়াছে, সেরূপ যোগ্যতার অন্য লোকেরা তাহা পায় নাই, ইহা ত একটা খাটি তথ্য। ইহা মুসলমানদের প্রতি অন্য সব সম্প্রদায়ের সদ্ভাব, ঈর্ষ্যাবিহীন ভাব, বাড়াইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল কি?

নারীদের অবস্থা

যে-সব শিক্ষিতা নারী অন্য সকল নারীদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের কিছু ন্যায্য প্রশংসা আছে, কিন্তু গবর্মেণ্ট যে বরাবর নারীশিক্ষার জন্য লজ্জাকর কম ব্যয় করিয়া আসিতেছেন, তাহার উল্লেখ নাই। নারীশিক্ষার অল্পতার কারণ কতকগুলা সামাজিক প্রথা, ইহা বলিলেই যথেষ্ট সত্য বলা হয় না।

মহিলাদের প্রভাব

মহিলাদের প্রভাবের কিছু উল্লেখ রিপোর্টে আছে। কিন্তু তাঁহারা অনেকে সত্যাগ্রহ অভিযানে যেরূপ নেতৃত্ব করিতেছেন এবং অন্য বহুসংখ্যক মহিলা যে ঐ অভিযানে যোগ দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ উহাতে নাই। তাহার কারণ সম্ভবতঃ দুটি ; [১] লিখনপঠনের বিস্তার না হওয়া সত্ত্বেও রাষ্ট্রীয় চিন্তা কি পরিমাণে অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা কমিশনের লিপিবদ্ধ করিবার অনিচ্ছা, কিম্বা [২] রিপোর্ট এত আগে লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছিল যে, সত্যাগ্রহের বিস্তারিত বৃত্তান্ত সভ্যদের কাছে তখন কেহ পৌঁছাইয়া দেয় নাই ; এখনও বিলাতে পৌঁছিতেছে কিনা সন্দেহ।

মুসলমানদের দাবী

লেখা হইয়াছে, যে, লর্ড মিণ্টোর আমলেই প্রথমে আগা খানের নেতৃত্বে কয়েকজন মুসলমান "প্রতিনিধি" তাঁহাদের স্বতন্ত্র নানা অধিকারের দাবী গবর্মেণ্টকে জানান। কিন্তু রিপোর্টে একথা লেখা নাই, যে, আগা খানের ঐ দলটি গবর্মেণ্টেরই গুপ্ত অনুরোধে বড়লাটের নিকট গিয়াছিল। ইহার প্রমাণ, মৌলানা মহম্মদ আলী কংগ্রেসে তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে ইহাকে "command performance" অর্থাৎ দরবারী আদেশে অভিনয় বলিয়াছিলেন। তার চেয়ে ভাল এবং অকাট্য প্রমাণ তৎকালীন ভারতসচিব লর্ড মর্লীর "স্মৃতি" (*Recollections*) পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃত কথাগুলি :—

"*December* 6. I won't follow you again into our Mahometan dispute. Only I respectfully remind you once more that it was *your* early speech about their extra claims that first started the Mahometan hare. I am convinced my decision was best."
—*Recollections* by John Viscount Morley, Vol. ii, p. 325.

হিন্দুমুসলমান কনষ্টেবলদের ব্যবহার

২৭৭ পৃষ্ঠায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হিন্দুমুসলমান কনষ্টেবলদের সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও বিরোধের সময়ও স্ব স্ব কর্ত্তব্যপালনের প্রশংসা আছে। এই কনষ্টেবলরা ভারতবর্ষের জনসাধারণের মধ্য হইতেই নিযুক্ত হয়। উর্দ্দি পরিলেই তাহারা অসাম্প্রদায়িক রকমের ব্যবহার করিতে পারে, অথচ ঠিক তাহাদেরই মত শিক্ষা সংস্কার ও প্রকৃতিবিশিষ্ট তাহাদের জা'তভাইয়েরা কেন ধর্ম্মান্ধতায় হিংস্র হয়, কর্তৃপক্ষ কখনও তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়াছেন কি ?

অনেক কাগজে এরূপ বিস্তর খবর বাহির হইয়াছে, যে, ঢাকার উপদ্রবে, শুধু কনষ্টেবল নয়, উচ্চতর পুলিস কর্ম্মচারীদের দ্বারাও কর্ত্তব্য পালিত হয় নাই। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কি বলেন ?

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

১৬২ পৃষ্ঠায় কমিশন বলিতেছেন, এ দেশে মুদ্রাযন্ত্র ও সংবাদপত্রকে কেবল সাধারণ পিন্যালকোড্ মানিতে হয়, তাহাদের স্বাধীনতার আর কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা লিখিত হইবার সময় প্রেস অর্ডিন্যান্স ও তাহার পরবর্ত্তী অর্ডিন্যান্স দুটি জারী হয় নাই।

পুলিস বাক্যবাণের লক্ষ্য

কমিশনের বড় দুঃখ, যে, পুলিসকে লক্ষ্য করিয়া বক্তাদের ও সংবাদপত্রলেখকদের বাক্যবাণ নিক্ষিপ্ত হয়—তাহারা পুলিসকে "টার্গেট" করেন। তাঁহারা এরূপ আক্রমণের অসঙ্গতি প্রমাণ করিবার জন্য লিখিয়াছেন, যে, কোন জায়গা হইতে পুলিসের থানা উঠাইয়া লইবার প্রস্তাব হইলে সেই অঞ্চলের লোকেরা তাহা না উঠাইয়া লইবার জন্য দরখাস্ত করে। ইহার মধ্যে অসঙ্গতিটা কোথায় ? লোকে চোরবদ্‌মায়েসদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাইবার আশায় ঐরূপ করে—রক্ষা করাই পুলিসের কাজ। এবং প্রত্যেক থানার প্রত্যেক পুলিস কর্ম্মচারী অত্যাচারী ও ঘুষখোর, ইহা কেহ বলে না।

কিন্তু কমিশন বা অন্য যে-কেহ যাহাই বলুন, যাঁহাদের সত্যবাদিতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই এরূপ প্রসিদ্ধ ও অপ্রসিদ্ধ অনেক লোক অনেকস্থানে পুলিসের অত্যাচার স্বচক্ষে দেখিয়া তাহা ভারতবর্ষের সব প্রদেশের বড় বড় খবরের কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং পুলিসের লোকেরা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা দেবতার মত আচরণ করে, ইহা ভারতবর্ষের লোকেরা বিশ্বাস করিবে না।

রাজনৈতিক উদ্বোধন

রিপোর্টের শেষের দিকে (পৃষ্ঠা ৪০৪) দেশের লোকদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগৃতি বা উদ্বোধন কতটা হইয়াছে, তাহার একটা আন্দাজ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কমিশনের মতে অবশ্য তাহা নিতান্ত সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ। কিন্তু আজকাল যে-কোন প্রদেশের গ্রামসকলের মধ্যে গিয়া কেহ খবর লইলে তাঁহার ভ্রম

ভাঙিবে। সরকারী মতে জাগরণটা খারাপ রকমের হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু রাজনীতি সম্বন্ধে জনসাধারণ একেবারে অসাড় থাকিলে গ্রামে পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কারণে ধরপাকড় ও পিটুনী চলিতেছে কেন?

সাম্যের দাবী

রিপোর্টের শেষের দিকে সভ্যেরা লিখিয়াছেন, ভারতীয়েরা ইউরোপীয়দের সহিত সমান পদবীর, সাম্যের, দাবী করে। ৭২ বৎসর পূর্ব্বে সাম্যের প্রতিশ্রুতি মহারাণী ভিক্টোরিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই যে ভারতীয়েরা এই দাবী করে, তাহা নহে। ইহা মানুষের একটা জন্মগত অধিকার। এই অধিকার ভারতীয়েরা কিরূপে কখন্ পাইবে, কমিশন প্রথম ভাগে তাহা বলেন নাই।

—

ঢাকার উপদ্রব

ঢাকার বহুদিনব্যাপী সাম্প্রত উপদ্রব এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যাপার এমন অশ্রুতপূর্ব্ব, যে, সে বিষয়ে অনেক কথাই লিখিতে হইতেছে। গুজব শুনা যাইতেছে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট যে ঢাকা-হল দেখিতে গিয়াছিলেন, তাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চপদস্থ মুসলমান কর্ম্মচারীর আহ্বানে। বোধ হয়, উক্ত হলে আশ্রিত অনেক নিরাশ্রয় স্ত্রীলোক ও শিশু হয় ত বা নিকটবর্ত্তী মুসলমানদিগকে ও মুসলিম হলের ছাত্রদিগকে আক্রমণের জন্য আয়োজন করিতেছে, এই ভয় তাঁহার হইয়াছিল! এইজন্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে লইয়া গিয়াছিলেন। আরও শুনা যায়, উক্ত মুসলমান কর্ম্মচারীটি দার্জিলিঙস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলারকে এবং বঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী মিঃ নাজিমুদ্দীনকে ঢাকা-হলের 'ভীষণ' অবস্থা জানাইয়াছেন। হলের প্রভষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষও এখন দার্জিলিঙে। ভাইসচ্যান্সেলার নাকি ডাঃ ঘোষকে জানাইয়াছেন এবং ডাঃ ঘোষ মুসলমানদের ত্রাস (!!) দূর করিবার জন্য যথাস্থানে অনুরোধ জানাইয়াছেন। এসব খবর সত্য হইলে, সেকেলে শেক্সপীয়ার ঠিকই লিখিয়াছিলেন, "Conscience does make cowards of us all"! মুসলমানরা হিন্দুর মনস্তত্ত্ব বুঝিলে এই ত্রাস হইত না। শুনা যায়, সম্ভবতঃ এই ত্রাস বশতঃ ঢাকা-হলের সম্মুখে সমস্ত দিন রাত দুই চারি জন মুসলমান পাহারা থাকে, এবং রাত্রি দশটার পর নবাব-বাড়ীর মোটর গাড়ী ঢাকা-হলের আয়ত কম্পাউণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া দেখিয়া বেড়ায়।

খবর পাওয়া গেল, ৯ই জুন রাত্রে প্রায় হাজার মুসলমান একত্র হইয়া হল্লা করিয়াছিল, যে, হিন্দুরা তাহাদের বাড়ী পুড়াইয়া দিতে আসিয়াছিল। এই কল্পিত ঘটনার প্রতিশোধ-স্বরূপ তাহারা ১০ই জুন রাত্রে নবাবপুরে ধনী শ্যামচাঁদ বসাকের বাড়ীর সংলগ্ন একটি কাঠের গোলা পেট্রল দিয়া পুড়াইয়া দিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েক দিন পূর্ব্বে শহরময় এই আশ্বাসবাণী প্রচার করিয়াছিলেন, যে, আর গৃহদাহ ও লুট হইবে না। তবে আবার উপদ্রব হইল কেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান উপাধ্যায় ও কর্ম্মচারীরা নাকি বলাবলি করিতেছেন, যে, ঢাকা-হল এত দিন বাহিরের এত লোককে রাখিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের মীটিঙে এই অন্যায়ের কৈফিয়ৎ তলব করা হইবে। বাস্তবিকই বড় গুরুতর অপরাধ হইয়াছে! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমুদয় হিন্দু শিক্ষক, অন্য কর্ম্মচারী ও ছাত্রদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। কালিকাপুরে ও ধড়াসনায় রেডক্রসের শুশ্রূষাকারীদিগকে ঠেঙান হইয়াছিল। তাহার তুলনায় ঐরূপ বহিষ্কার খুব মৃদু শাস্তি হইবে।

শুনিলাম ঢাকায় পথে অল্প লোক চলাচল আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ১০ই জুনের অগ্নিকাণ্ডে আবার লোকের আতঙ্ক হইয়াছে। পুলিস এখনও নাকি মুসলমান পাড়া খানাতল্লাসী করিতেছে না, তাহাদের কোন রকমে শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে না; অথচ হিন্দু যুবকদের গ্রেপ্তার করিতেছে।

—

মুসলমানদের চা'লের ভুল

কলিকাতার "মুসলমান" নামক ইংরেজী কাগজে এই মর্ম্মের কথা লেখা হইয়াছে, যে, স্বরাজলাভের চেষ্টায় মুসলমানদেরও যোগ দেওয়া উচিত। আমাদেরও মত তাই। অবশ্য মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টায় কেহ যোগ দিবেন কি দিবেন না, তাহা তাঁহার স্বেচ্ছাধীন। কিন্তু স্বরাজ লব্ধ হইলে তাহার ফল ভোগ সকল ধর্ম্মাবলম্বী লোকেই করিবেন, সুতরাং যিনি যে বৈধ উপায় ভাল মনে করেন, তাঁহার সেই উপায়েই স্বরাজ লাভের চেষ্টা করা উচিত। তাহা না করিয়া অনেক মুসলমান ইংরেজদিগকে খুশি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বেশী সুবিধা যোগাড় করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত, খুব শীঘ্র না হইলেও, অনতিবিলম্বে ভারতবর্ষে অন্ততঃ আংশিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। অর্থাৎ সৈন্যদল, বিদেশের সহিত সম্বন্ধ এবং দেশী রাজ্যগুলির সহিত সম্বন্ধ, জোর এই তিনটি বিষয় বাদে আর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারতীয় লোকদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইবে। কতক মুসলমান স্বরাজ প্রচেষ্টায়-

যোগ না দিলেও অন্ততঃ এইরূপ আংশিক স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। "কতক মুসলমান" বলিতেছি এই জন্য, যে, জামিয়াৎ-উল্-উলেমা স্বরাজপ্রচেষ্টায় যোগ দিবার অনুকূলে মত প্রকাশ করিয়াছেন, বোম্বাইয়ের অধিকাংশ মুসলমান যোগ দিয়াছেন, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিস্তর মুসলমান স্বরাজের জন্য প্রাণ দিয়াছেন ও জেলে গিয়াছেন, বিহারেও তাই।

কতকগুলি মুসলমানকে স্বরাজপ্রচেষ্টা হইতে দূরে রাখিবার জন্য এখন ইংরেজরা যাহাই বলুন, তাঁহাদের প্রতিশ্রুতির মূল্য বেশী মনে করা ভুল। স্বরাজ স্থাপিত হইলে, যে-সব মুসলমান ও অমুসলমান উহা লাভের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারাই হইবেন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল (majority); এবং তাঁহারা যদি ইংরেজদের বর্ত্তমান প্রতিশ্রুতিগুলি দেশের পক্ষে অনিষ্টকর মনে করেন, তাহা হইলে তদনুসারে কাজ হইবে না।

কতক মুসলমান মনে করিতে পারেন, যে, স্বরাজ হইলে তাহার সুবিধা ত তখন পাওয়াই যাইবে; সুতরাং এখন ইংরেজদের নিকট হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহা ছাড়ি কেন? কিন্তু, "অন্য লোকেরা প্রাণপণ করিয়া, মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া, জেলে গিয়া, একটা জিনিষ দেশের জন্য অর্জ্জন করুক, আর আমরা এখন তাহাদিগকে বাধা দিয়া কিছু সুবিধা করিয়া লই, পরে যথাসময়ে স্বরাজের বখরা লইবার জন্য উপস্থিত হইব," এরূপ মনের ভাব কোন মনুষ্যত্ববিশিষ্ট বীরধর্ম্মী লোকের হওয়া উচিত নয়।

যাহারা পুরা অরাজনৈতিক ধাঁচের মানুষ, তাঁহারা ত চুপ করিয়া থাকিলেই পারেন?

—

নারীদের দ্বারা পিকেটিং

গত বৃহস্পতিবার ১২ই জুনের ষ্টেট্‌সম্যানে এই খবর বাহির হইয়াছে, যে, তাহার আগের দিন "কলিকাতার বড়বাজারের প্রায় সমস্ত কাপড়ের দোকান বন্ধ হইয়াছিল।" ইহার কারণ এই বলা হইয়াছে, যে,

"স্বরাজী মত বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যবসায়ী পিকেটারদিগকে গ্রেপ্তার করা রূপ দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ কারবার বন্ধ রাখে, কিন্তু অধিকাংশ ব্যবসায়ী পিকেটারদের উপস্থিতি বশতঃ নূতন উপদ্রবের আশঙ্কায় দোকান-পাট বন্ধ করে।"

এরূপ বর্ণনায় ব্যাপারটি ঠিক্ বুঝা যায় না। আমরা যে বৃত্তান্ত পাইয়াছি তাহা এই:—

"১০ই মে বড়বাজারে ক্রশ ষ্ট্রীটে নারী সত্যাগ্রহী সমিতির কতিপয় সভ্য বিকালে পিকেটিং করিতেছিলেন। তখন একজন পুলিশ-কর্ম্মচারী পথিকদের উপর মারপিট সুরু করে। একজন ঐ অঞ্চলের ব্যবসায়ী পথিক মাথা ফাটিয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে নারী সত্যাগ্রহীগণ তাহাকে পুলিশের হাত হইতে রক্ষা করিয়া শুশ্রূষা করিতে চেষ্টাপর হন। কিন্তু ইত্যবসরে পুলিশের লোকটি নূতন একদল পুলিশ লইয়া পচাগলিতে প্রবেশ করিয়া তথাকার পথিক ও দোকানীদের উপর লাঠি চালাইতে সুরু করে। সমস্ত বড়বাজার এই ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া উঠে। তখন নারী সত্যাগ্রহীদের উত্তেজিত জনতাকে একদিকে শান্ত করিতে ও অপরদিকে পুলিশের লাঠি হইতে রক্ষা করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া কঠিন বেগ পাইতে হইয়াছে। দোকানীগণ দোকান প্রায় ৫টার সময় বন্ধ করিয়া ফেলেন, কিন্তু অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার দিয়াও পুলিশ তাহাদিগকে দোকানের মধ্যে প্রহার করিতেছিল। সত্যাগ্রহী সমিতির সভানেত্রী শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী এক দোকানের দ্বারদেশে দাঁড়াইয়াছিলেন। সব-ইন্‌স্পেক্টর মহাশয় তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধে লাঠি প্রহার করেন। ইহা ছাড়া সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকাকেও তিনি অপমানিত করেন। পত্রিকার স্তম্ভে সমস্ত ঘটনার এক অলীক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু সেদিন দেখিতে না দেখিতে বড়বাজারের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ হইয়া যায়। পরের দিনও ক্রশ ষ্ট্রীট, পচাগলি অঞ্চলের ও তুলাপটির দোকান-পাট বন্ধ রহিয়াছে।"

এই ব্যাপারটি গবর্ন্মেণ্টের অনুসন্ধানের যোগ্য।

ষ্টেট্‌স্‌ম্যানে এসম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে, যে,

"বিকালে ৫০জন নারী-সত্যাগ্রহী সদাসুখ কাটরা, পগেয়াপটী এবং কটন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হন, যেখানে তখনও কয়েকটি দোকান খোলা ছিল। তাঁহাদের উপস্থিতির ফলে দিবসের বাকী সময়ের জন্য তাহারাও কারবার বন্ধ করে।"

খবরের কাগজে পূর্ব্বেই সংবাদ বাহির হইয়াছে, যে, এই সমিতির চেষ্টায় কলেজ ষ্ট্রীটের প্রধান প্রধান দোকানদার বিদেশী বস্ত্র বেচিবেন না বলিয়া স্বীকারপত্র দিয়াছেন, ফুটবল ম্যাচগুলিতে দেশী খেলোয়াড়ের দল খেলা বন্ধ করিয়াছেন, ম্যাডান কোম্পানী নিম্নলিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছেন:—

"(১) ব্রিটিশ চিত্র আনিবেন না, (২) চিত্রগৃহসংলগ্ন মদ্য বিক্রয় সাহেবী পাড়ায় ও সাহেব কেতাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিবেন, (৩) এই বৎসর ব্রিটিশ চাট্‌নি, আচার, প্রভৃতি আমদানী করিবেন না, (৪) স্বদেশীয় চিত্র আরো বেশী প্রদর্শন করিবেন, ও (৫) হরতালের দিন সমস্ত চিত্রগৃহ বন্ধ রাখিয়া হরতাল পালন করিবেন।"

—

আসামীর অসাক্ষাতে বিচার

বর্ত্তমান বৎসরের তিন নম্বর অর্ডিন্যান্সের ৯ (১) ধারা অনুসারে কোন কোন স্থলে আসামীর অসাক্ষাতে বিচার করা চলিবে। লাহোর ষড়যন্ত্রের বিচারের জন্য ঐ অর্ডিনান্স জারি হইয়াছে। লর্ড মর্লী যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তিনি বিনা বিচারে কয়েকজন ভারতীয়ের নির্ব্বাসন মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও আসামীর অসাক্ষাতে তদন্তের বিরুদ্ধে তখনকার বড়লাট লর্ড মিণ্টোকে লিখিয়াছিলেন:—

"One thing I do beseech you to avoid—a *single case* of investigation in the absence of the accused. We may argue as much as we like about it, and there may be no substantial injustice in it, but it has an ugly continental, Austrian, Russian look about it, which will stir a good deal of doubt or wrath here, quite besides the Radical Ultras. I have considerable confidence, after much experience, in my *flair* on such a point."—Morley's *Recollections*. Vol. ii, p. 289.

—

বাংলা দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা

ভারতবর্ষের ও বঙ্গের রাজনৈতিক অবস্থা এরূপ সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে, যে, তাহার আলোচনা না করিলে চলে না; এবং সেরূপ আলোচনাতে আমাদের বিবিধ প্রসঙ্গের প্রায় সব জায়গা ভরিয়া যাইতেছে। আলোচনা অবশ্য আবশ্যকানুরূপ, এবং আমাদের ইচ্ছার অনুরূপও, হইতেছে না। তাহার একটা কারণ, সংবাদপত্রে সব খবর বাহির হইতেছে না, যাহা বাহির হইতেছে তাহাও কাটছাটের পর এবং রং ফিকা করিয়া। মাসিকপত্রের সাময়িক আলোচনা বিভাগে সেই সব সংবাদ অবলম্বন করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা হয়; সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশ করা মাসিকপত্রের কাজ নহে। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অপ্রচুর হইলে ও তাহাতে খুঁত থাকিলে আমাদের মন্তব্যও আশানুরূপ হইতে পারে না। মন্তব্যগুলি আশানুরূপ না হইবার অন্য গুরুতর কারণ যে আছে, তাহা বলা অনাবশ্যক।

আমরা বলিতে যাইতেছিলাম, রাজনৈতিক ঘটনা ও তাহার আলোচনার ভীড়ে অন্য নানা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনার স্থান হইতেছে না। যেমন, বঙ্গের স্বাস্থ্য। ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। ১৯২৮ সালের যে স্বাস্থ্যবিষয়ক সরকারী রিপোর্ট ডাক্তার বেণ্টলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, বঙ্গের লোকসংখ্যার স্বাভাবিক বৃদ্ধি অন্য সব প্রদেশের চেয়ে কম।

যত মানুষ প্রতি বৎসর জন্মগ্রহণ করে ও যত মরে, তাহার মধ্যে প্রভেদকেই স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাস বলা হয়। যদি জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু কম হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যা বাড়ে; যদি জন্ম অপেক্ষা মৃত্যু বেশী হয়, তাহা হইলে লোকসংখ্যা কমে। এই প্রকার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও হ্রাস ছাড়া, কৃত্রিম বৃদ্ধি ও হ্রাসও আছে। যদি কোন দেশে অন্য স্থান হইতে লোক আসিয়া বাস করায় লোকসংখ্যা বাড়ে, তাহা কৃত্রিম বৃদ্ধি; আর যদি কোন দেশ হইতে লোক অন্যত্র চলিয়া যায়, তাহা কৃত্রিম হ্রাস।

স্বাভাবিক বৃদ্ধি বা হ্রাস দ্বারাই কোন দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা বুঝা যায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ১৯২৮ সালে হাজারকরা স্বাভাবিক লোকসংখ্যা বৃদ্ধি কত হইয়াছিল তাহার তালিকা নীচে দিতেছি।

প্রদেশ	হাজারকরা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি
পঞ্জাব	২১.৬
আগ্রা-অযোধ্যা	১৪.১
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ	১৩.২
বিহার উৎকল	১৩.০
মধ্য প্রদেশ	১২.৮
মান্দ্রাজ	১১.০
বোম্বাই	১০.৯
আসাম	৯.১
ব্রহ্মদেশ	৪.৬
বঙ্গদেশ	৪.১

বঙ্গে শিশুমৃত্যুর অবস্থা অতি ভয়াবহ। আলোচ্য বৎসরে ২,৪৫,০৪৫ শিশুর মৃত্যু হয়। তাহার মধ্যে ছেলে ১,৩১,৪৫৩ এবং মেয়ে ১,১৩,৫৯২। হাজারটি জন্মের মধ্যে মরিয়াছে ১৭৮.১টি শিশু:—ছেলে মরিয়াছে হাজারকরা ১৮৩.২, মেয়ে মরিয়াছে হাজারকরা ১৭২.৬। পূর্ব্ববৎসরের চেয়ে মোট শতকরা ৬.৯ মৃত্যু বাড়িয়াছিল। প্রতি ১০০ মেয়ে শিশুতে ১১৬ ছেলে শিশু মরিয়াছিল।

বঙ্গের সমগ্র মৃত্যুসংখ্যার একপঞ্চমাংশ শিশুমৃত্যু। শতকরা ৪৫.৪ শিশুমৃত্যু একমাসের নীচের বয়সে হয়, ২৬.৭ এক হইতে ছয় মাস বয়সে হয়, এবং বাকী ১৭.৯ ছয় হইতে বারমাস বয়সের মধ্যে হয়।

দারিদ্র্যজনিত যথেষ্টখাদ্যাভাব বঙ্গে মৃত্যুসংখ্যার আধিক্যের একটি প্রধান কারণ। ম্যালেরিয়া, কলেরা, কালাজ্বর, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ক্ষয়রোগ, বসন্ত প্রভৃতিতেও বিস্তর মৃত্যু হয়। চিকিৎসার বন্দোবস্ত গ্রাম-অঞ্চলে অল্পই আছে—এবং বাংলা দেশ গ্রামপ্রধান।

শিশুমৃত্যুর আধিক্যের নানা কারণ বিদ্যমান। কোন্‌টি প্রধান কোন্‌টি অপ্রধান তাহার বিচার না করিয়া বলা যাইতে পারে, বাল্যমাতৃত্ব, সূতিকাগারের অসন্তোষজনক অবস্থা, অশিক্ষিতা ধাত্রীদের দ্বারা প্রসবকার্য্য সম্পাদন, শিশুপালন সম্বন্ধে জননীদের জ্ঞানাভাব এবং তাহাদের দ্বারা শিশুদের যথেষ্ট যত্নের অভাব, যথেষ্ট খাঁটি দুগ্ধের অভাব, প্রসূতিদের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব, যথেষ্ট আলোক ও বায়ুহীন আর্দ্রগৃহে বাস, ইত্যাদি শিশুমৃত্যুর কারণ।

—

বিলাতে স্বদেশী

বিলাতের লোকেরা স্বদেশের হিতচিন্তা খুব করিয়া থাকে। তাহার একটি প্রমাণ, সে দেশে কার্পাস বস্ত্রের ব্যবহার বাড়াইবার চেষ্টা। ভারতবর্ষে বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিবার চেষ্টা হওয়ায় এবং জাপান কার্পাস সূত্র ও বস্ত্রের ব্যবসায়ে ইংলণ্ডের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় বিলাতে কার্পাসশিল্পের অবস্থা খারাপ হইয়াছে। তাহার প্রতিকারের জন্য বিলাতের লোকেরা নানা উপায় অবলম্বন করিতেছে। মাসাধিক পূর্ব্বে সেখানে "জাতীয় কার্পাস সপ্তাহ" (National Cotton Week) খোলা হয়। বর্ত্তমান শ্রমিক গবর্নেণ্টের মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য কুমারী মার্গারেট বণ্ডফীল্ড উহা খোলেন। তিনি পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়া প্রধান একটি পোষাকের দোকানে যান। সেখানে কার্পাসসূত্রনির্ম্মিত মাল প্রদর্শিত হইতেছিল। তিনি সেই দোকান হইতে একটি কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পোষাক ক্রয় করেন। তাহা পরিয়া তিনি পার্লেমেণ্টে যাইবেন। এরূপ উচ্চপদস্থা মহিলার ফ্যাশন অন্যেরাও অনুসরণ করিবে।

বিলাতের আস্কট নামক স্থান ঘোড়দৌড়ের জন্য বিখ্যাত। "জাতীয় কার্পাস সপ্তাহের" দরুন এবার আস্কটে খুব বেশী লোক কার্পাস বস্ত্রের পোসাক পরিয়া গিয়াছিল, তাহাতেও ল্যাঙ্কেশায়ারের কাটতি বাড়িয়াছে। একজন বিখ্যাত মহিলা "জাতীয় কার্পাস সপ্তাহে" "কার্পাস চা-সম্মিলনের" আয়োজন করিয়াছিলেন। তাহাতে সব মহিলারা সুতী কাপড়ের পোষাক পরিয়া গিয়াছিলেন। আমাদের দেশের ফ্যাশনেবল মহিলারা এই প্রকারে দেশী সুতার কাপড়ের ব্যবহার চালান না ?

পাশ্চাত্য মহিলারা আজকাল হাঁটু পর্য্যন্ত লম্বিত পোষাক পরেন। তাহাতে কাপড় কম লাগে, সুতরাং কাপড়ের দোকানে কাপড় বিক্রী কম হয়। কাপড়ের বিক্রী বাড়াইবার জন্য এখন মেমদের পোষাকের ফ্যাশন বদলাইয়া ফেলা হইতেছে। কভেণ্ট গার্ডেনের থিয়েটারের মরসুমে খাট পোষাক একটিও দেখা যায় নাই। মেজে ও সিঁড়ির ধাপ ঝাঁট দেওয়া লম্বা গাউনও খুব দেখা দিয়াছে।

—

ভারতে স্বদেশী

বড় মেজো ছোট লাটসাহেবেরা স্বদেশীর উন্নতি কামনা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু পার্লেমেণ্টে ভারতসচিব ওয়েজ্‌উড বেনকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে, যে, তিনি একজন ব্রিটিশ নাগরিক এবং তাঁহাকে ভারতবর্ষে ল্যাঙ্কেশায়ারের কাপড়ের বিক্রী রক্ষা ও বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে।

ল্যাঙ্কেশায়ারের ব্যবসা শুধু কলের ও নৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠতা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই ; ভারতবর্ষের কাপড়ের উপর অত্যধিক শুল্ক বসাইয়া এবং বিলাতে উহার ব্যবহার আইন দ্বারা নিষিদ্ধ করিয়া তবে বিলাতের কার্পাস শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইয়াছিল।

ভারতে বিদেশী কাপড় বয়কট আইন দ্বারা করা হয় নাই। আইন করিবার ক্ষমতা ভারতীয়দের নাই। উহার চেষ্টা প্রধানতঃ বিক্রেতা ও ক্রেতাদিগকে বলিয়া বুঝাইয়া করা হইতেছে। কোথাও ভয় প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ হয় নাই, একথা বলিবার মত সংবাদ সংগ্রহ আমরা করিতে পারি নাই, সরকারী বেসরকারী কাহারও তাহা করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু সর্ব্বত্র বা অধিকাংশস্থলে বিদেশী কাপড় বয়কটের চেষ্টা ভয়প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ দ্বারা হইতেছে, ইহা সত্য নহে। ইহা প্রমাণ করিবার ক্ষমতা গবর্মেণ্টেরও নাই। অথচ এই অপ্রকৃত ওজুহাতে অর্ডিন্যান্স জারী করা হইয়াছে।

—

দুটি নূতন অর্ডিন্যান্স

বড়লাট লর্ড আরুইন উপর্য্যুপরি ছয়টি অর্ডিন্যান্স জারী করিলেন। শেষ দুটির মধ্যে পঞ্চমটির দ্বারা বিদেশী কাপড়ের এবং দেশী বিদেশী মদের দোকানে পিকেটিং বে-আইনী ও দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। সরকারী ভৃত্য-দিগকে জিনিষ বিক্রী না করা, সামাজিক ভাবে তাহা-দিগকে একঘরো করা, ইত্যাদিও দণ্ডনীয় করা হইয়াছে। এইরূপ আইন করা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতেও সরকারী চাকরোরা সর্ব্বত্র আরামে থাকিতে পারিতেছেন না। গুজরাটে খেড়া (Kaira) জেলার অনেক সরকারী চাকরো সামাজিক বয়কটের জালায় অতিষ্ঠ হইয়া বড়োদা রাজ্যের পেটলাড্ নামক স্থানে চলিয়া গিয়াছেন, এবং সেখান হইতে ব্রিটিশসরকারের কাজ করিবেন স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজের কর্ম্মচারীদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

কি হেতু পঞ্চম অর্ডিন্যান্সটি জারি করা হইল, তাহার কারণ জানাইবার জন্য বড়লাট যে বর্ণনা-পত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে লিখিত হইয়াছে :—

The most common object with which picketing and other kinds of molestation and intimidation are being employed is for the purpose of preventing the sale of foreign goods or of liquor. It is no part of the duty of my Government, and certainly it is not their desire, to take steps against any legitimate movements directed to these ends. They are anxious to see the promotion of indigenous Indian Industries, and it is perfectly legitimate for any person, in advocacy of this

object, to urge the use of Indian goods to the utmost extent of which Indian industry is capable. Nor have I anything but respect for those who preach the cause of temperance.

But what is not legitimate is for those who desire these ends, proper as they are in themselves, to pursue them by means amounting in effect to intimidation of individuals, and to endeavour to force their views on others, not by argument but by the coercive effect of fear. When resort is had to such methods, it becomes necessary for Government to protect the natural freedom of action of those who may wish to sell and those who may wish to buy.

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, "the purpose of preventing the sale of foreign goods or of liquor" অর্থাৎ "বিদেশী মালের, বা মদ্যের বিক্রী নিবারণের উদ্দেশ্য," বড়লাটের মতে বে-আইনী উদ্দেশ্য নহে; কারণ তিনি বলিতেছেন, যে, "এই উদ্দেশ্যগুলি সাধনার্থ অবলম্বিত কোন বৈধ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে উপায় অবলম্বন আমার গবন্মেণ্টের কর্ত্তব্যের কোন অংশ নহে, এবং নিশ্চয়ই তাঁহাদের ইচ্ছাও নহে," এবং স্বদেশী প্রচেষ্টা দমনও যে গবন্মেণ্টের উদ্দেশ্য নহে, তাহাও এই বর্ণনাপত্রের চতুর্থ প্যারাগ্রাফে বলা হইয়াছে। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত দ্বিতীয় প্রচ্ছেদটীর অন্তর্ভূত না হয়, এরূপ উপায় অবলম্বন বে-আইনী নহে। কিন্তু ভয়-প্রদর্শন যে কি নয় এবং কি বটে, স্থির করা কঠিন। প্রবল যুক্তিকেও আদালতবিশেষ "endeavour to force views on others" মনে করিতে পারেন।

এই অডিন্যান্সটি জারী করিয়া গবন্মেণ্টের বিশেষ কিছু লাভ হইল, মনে হয় না। কারণ, ইহার আগে হইতেই ত পিকেটিঙের জন্য সত্যাগ্রহীরা দণ্ডিত হইতেছিল। মহাত্মা গান্ধীকে বিনাবিচারে আটক করিয়া রাখিবার জন্য বোম্বাই গবন্মেণ্ট যে-সব কারণ দেখাইয়াছেন, সরকারী চাকর্য্যেদিগের বয়কট তাহার মধ্যে অন্যতম। সুতরাং বয়কটও কার্য্যতঃ আগে হইতেই বেআইনী এবং দণ্ডনীয় বিবেচিত হইয়াছিল।

এই অডিন্যান্স বশতঃ সত্যাগ্রহীদের ব্যবহারে কোন প্রভেদ হইবে কিনা, তাহা আলোচনার যোগ্য। তাহারা এইরূপ কাজের জন্য আগেও দুঃখ পাইতেছিল। সুতরাং নূতন একটা ভয় তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল না। অন্যদিকে ইহাও বিবেচ্য, যে, বর্ষার আগমনে নূন তৈরী করা ও নূনের কারখানা দখল করিতে যাওয়া স্থগিত হইয়াছে বা হইতেছে। এখন গবন্মেণ্ট কয়েক রকম কাজকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করায় হয় ত সেই কাজগুলি সত্যাগ্রহীরা আরও জোরে করিবে। অবশ্য, অর্ডিন্যান্স না হইলে যে তাহারা করিত না, তাহা বলিতেছি না;—সম্ভবতঃ করিত। কিন্তু যাহা নিষিদ্ধ তাহা করিবার দিকে ঝোঁক শিশু হইতে প্রাপ্তবয়স্ক পর্য্যন্ত সব মানুষের প্রকৃতিতে আছে। এই প্রবৃত্তিকে অর্ডিন্যান্স হয় ত পরোক্ষভাবে উস্কাইয়া দিবে।

ষষ্ঠ অর্ডিন্যান্সটি, গবন্মেণ্টের পাওনা জমীর খাজনা বা অন্য ট্যাক্স যাহারা দিতে অস্বীকার করিবে বা যাহারা লোককে তাহা না দিতে বলিবে বা বাধ্য করিবে, তাহাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য জারী করা হইয়াছে। কোন খবরের কাগজ বহি প্রভৃতিতে ট্যাক্স না দিবার প্ররোচনা থাকিলে, তাহাও বাজেয়াপ্ত হইবে। যাহারা কোন খাজনা বা ট্যাক্স দেয় না, তাহাদের নিকট হইতে তাহা আদায় করিবার এবং আদায় না হইলে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবার ব্যবস্থা আগেও ছিল। আগে কিন্তু ট্যাক্স না দেওয়াটা সিবিল দোষ ছিল, এখন একটা ফৌজদারী দোষ (crime) হইল। তা ছাড়া, আগে ট্যাক্স না-দেওয়ার প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তনটা ক্রাইম বা ফৌজদারী অপরাধ ছিল না, এখন হইল। এইরূপ প্রচেষ্টা সভ্যদেশসমূহে অভিযোগ-দূরীকরণের কন্‌ষ্টিটিউশ্যনাল অর্থাৎ রাষ্ট্রের মূলবিধিসঙ্গত উপায় বলিয়া স্বীকৃত। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ভারতীয়েরা যখন এইরূপ উপায় অবলম্বন করে, তখন তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হার্ডিং তাহা বৈধ বলিয়াছিলেন; গোপালকৃষ্ণ গোখলেরও মত তাহাই ছিল। গুজরাটের খেড়া ও বারদোলিতে, বিহারের চম্পারনে এবং বঙ্গের বন্দবিলায় এরূপ প্রচেষ্টা হইয়াছিল। যাঁহারা ট্যাক্স দেন নাই, তাঁহারা দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রচেষ্টার নেতারা ফৌজদারী সোপর্দ্দ হন নাই।

এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে গবন্মেণ্টের কোন্ কোন্ পাওনা না-দিলে, না-দেওয়াটা দণ্ডনীয় হইবে, তাহা গেজেটে আগে ছাপাইয়া দিতে হইবে। জমীদারদের পাওনা খাজনা যদি রায়তরা না দেয়, কিম্বা কেহ তাহা না দিতে তাহাদিগকে প্ররোচিত করে, তাহা হইলে তাহাদেরও শাস্তি এই অর্ডিন্যান্স অনুসারে হইতে পারিবে।

গবন্মেণ্টের কিরূপ আইন করিবার বা আদেশ প্রচার করিবার ন্যায্য ও ধর্ম্মনীতিসঙ্গত অধিকার আছে, তাহা সংক্ষেপে বলা কঠিন। কিন্তু আমাদের বোধ হয়, রায়তদের নিকট হইতে প্রাপ্য জমীদারদের খাজনাকে সরকারী ট্যাক্সের সমশ্রেণীস্থ করিয়া গবন্মেণ্ট অধিকারের বাহিরে গিয়াছেন। কেন গিয়াছেন, তাহার একটা অনুমান ভারতভৃত্যসমিতির মুখপত্র দি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া কাগজে দেখিলাম। তাহার সম্পাদকের মতে ইহা করিয়া গবন্মেণ্ট কংগ্রেসী প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে জমীদারদের সাহায্য পাইবার জন্য বায়না দিয়াছেন। সরকার বাহাদুরের এরূপ অভিপ্রায় ছিল কিনা, কেমন

করিয়া জানিব? তবে ইহার ফলে জমীদারেরা আরও বেশী করিয়া স্বাজাতিকতা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে।

—

অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অকালে অধ্যাপক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ভারতবর্ষ এক জন শ্রেষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হারাইল। সিন্ধুদেশে তৎকর্তৃক মোহেন-জো-দড়ো আবিষ্কার তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। তিনি আরও অনেক আবিষ্ক্রিয়ার জন্য বিখ্যাত। ঔপন্যাসিক বলিয়াও তাঁহার খ্যাতি ছিল।

—

দমননীতির ফল

সরকারী যেরূপ দমন-নীতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার ফল কি হইবে বলিতে পারি না। জেলে যাওয়ার ভয় খুব কমিয়া গিয়াছে, অনেকে তাহা গৌরবের বিষয় মনে করে। প্রহারের ভয়ও যাইতেছে। গুলি খাইয়া মরার ভয়ও আগেকার মত নাই। সুতরাং দমন-নীতি—অন্ততঃ গুজরাটে—শীঘ্র বা বিলম্বে সফল হইবে মনে হয় না। যদি হয়, তাহাতেই যে সভ্য গবর্ন্মেণ্টের কর্ত্তব্য সমাধা হইবে, এমন মনে করি না। জনগণের তেজস্বিতা, মানসিক শক্তি, অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত সব অধিকার দিয়া যে গবর্ন্মেণ্ট দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারেন, সেই গবর্ন্মেণ্টই প্রকৃত প্রশংসা-ভাজন। জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে এক প্রকার শান্তি ও শৃঙ্খলা আছে, শ্মশানে ও গোরস্থানেও তদ্রূপ নিরুপদ্রব অবস্থা আছে। ভীত ত্রস্ত আতঙ্কগ্রস্ত লুপ্ততেজ মানুষদের অধ্যুষিত দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা ঐ প্রকারের। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট ভাবিয়া দেখিলে অবিলম্বে বুঝিতে পারিবেন, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

অতএব প্রেষ্টিজ্-গত-প্রাণ না হইয়া ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট যদি শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার অন্য উপায়—জনগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার স্বীকার রূপ উপায়—অবলম্বন করেন,তাহা হইলে তাহা ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয়দেশের পক্ষে কল্যাণকর হইবে।

কোন দেশেরই বন্ধুত্ব অবজ্ঞেয় নহে। ভারতবর্ষের মত বৃহৎ ও মহৎ দেশের বন্ধুত্ব ত অবজ্ঞেয় নহেই। যদি ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া যায়, তাহা হইলেও এই বন্ধুত্বের আত্মিক ও মানসিক এবং বাণিজ্যিক মূল্য থাকিবে। সুতরাং এই বন্ধুত্ব অসম্ভব করিয়া তুলা উচিত নয়। ভারতবর্ষ স্বরাজ লাভ করিবেই—কেহ তাহা আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। যাঁহারা তাহাতে বিলম্ব বা ব্যাঘাত জন্মাইতে চান, তাঁহারা নিজেদের বিবেচনা অনুসারে চলিবেন। কিন্তু এরূপ কিছু করা তাঁহাদের পক্ষে অসমীচীন হইবে, যাহাতে ভারতবর্ষের হৃদয়ে স্থায়ী অপমানরেখা অঙ্কিত হইয়া ব্রিটেনের সহিত তাহার বন্ধুত্ব অসম্ভব করিয়া তুলে।

—

"ন্যূনতম বলপ্রয়োগ"

এলাহাবাদের পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু একজন দেশহিতব্রত ত্যাগী পুরুষ। তিনি গোখলে প্রতিষ্ঠিত ভারতসেবক সমিতির সহকারী সভাপতি ও সভ্য। এই সমিতি ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের চিরস্থায়ী যোগে বিশ্বাসী। ইহার সভ্যেরা দারিদ্র্যব্রতী এবং তাঁহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে অনন্যকর্ম্মা দেশসেবক। ইঁহারা মহাত্মা গান্ধীর সহকর্ম্মী বা অনুচর নহেন এবং সত্যাগ্রহে যোগ দেন নাই। পণ্ডিত হৃদয়নাথ ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য। দেশে দমননীতি প্রবর্ত্তিত হওয়ায় এবং পুলিস নানাস্থানে অত্যাচার করায় তিনি সেই কারণ উল্লেখ করিয়া বড়লাটকে ব্যবস্থাপক সভার সভ্যপদত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। সেই পত্রের উত্তরে বড়লাট পুলিসের অত্যাচার অস্বীকার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে, যখন পুলিসকে বলপ্রয়োগ করিতে হইয়াছে কেবল তখন পুলিস ন্যূনতম বলপ্রয়োগ করিয়াছে। এই জবাব পড়িয়া ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকে স্তম্ভিত হইবে। শুধু সংবাদপত্রের সংবাদস্তম্ভে অজ্ঞাতনামা লোকদের দ্বারা প্রেরিত সংবাদে নহে, কিন্তু সকল রাজনৈতিক দলের

অনেক প্রসিদ্ধ এবং সত্যবাদী বলিয়া সুবিদিত লোক স্বচক্ষে দেখিয়া পুলিসের অত্যধিক ও অনাবশ্যক বল-প্রয়োগের কথা অনেক কাগজে লিখিয়াছেন। বড়লাট কি এই সকল বর্ণনার একটাও পড়েন নাই? এই সমস্তকেই কি তিনি মিথ্যা মনে করেন? যে-সব সরকারী কর্ম্মচারী তাঁহাকে সংবাদ জোগায় তাহাদের কথাই বেদবাক্য। যাঁহারা দেশের সেবায় তাঁহাদের মত অনুসারে কোন একটা পথ ধরিয়াছেন, তাঁহারা ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত। তাঁহারা বড়লাট কিম্বা অন্য কোন মানুষের কাছে প্রতিকারপ্রার্থী নহেন। কিন্তু বড়লাটের মত পদস্থলোক নিজের কর্ত্তব্য পালনের জন্য এবং তাঁহার দেশের মঙ্গলের ও সুনামের জন্য জানিয়া শুনিয়া চিন্তা করিয়া কথা বলিলে তাঁহার নিজের ও ব্রিটেনের কল্যাণ হইত। মানুষে কিছু না করিলেও ভারতের ভাগ্যবিধাতা যিনি তিনি নিশ্চয়ই ভারতের মঙ্গল করিবেন। তিনি তাঁহার সত্যানুসন্ধায়ী সেবক-দিগকে ঠিক্‌পথ দেখাইয়া দিবেন।

—

ভারতসচিবের বক্তৃতা

গত ২৬শে মে পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে তর্কবিতর্ক হয়, তদুপলক্ষ্যে ভারতসচিব মিঃ ওয়েজ্‌উড্ বেন্ একটা খুব লম্বা বক্তৃতা করেন। তাহাতে কতকগুলা মামুলী বাঁধা বুলির পুনরুক্তি ছিল এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্য, জলসেচন, শ্রমিক-সমস্যা, রাজস্ব, শুল্ক, রেলওয়ে, ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন নানা কথা ছিল যাহার কতক অসত্য, কতক অর্দ্ধসত্য এবং কতক এরূপ সত্য যাহাতে কিছু আসে যায় না। যাঁহারা ছয় হাজার মাইল দূরে বসিয়া কেবল এখানকার সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রেরিত বর্ণনা ও সংবাদ পড়িয়া ভারতবর্ষের উজ্জ্বল চিত্র আঁকেন, তাঁহাদের কথার প্রতিবাদ ও সমালোচনা করিলে তাঁহার অজ্ঞতা দূর হইবে না। কারণ, আমাদের কথা তাঁহাদের কানে পৌঁছিবে না এবং পৌঁছিলেও তাঁহারা অবিশ্বাস করিবেন। আমরা যাহা লিখি, তাহা যদি আমাদের স্বদেশবাসীরা পড়েন ও বিশ্বাস করেন, তাহাই আমাদের সন্তোষের বিষয় হওয়া উচিত।

ভারতসচিব তাঁহার বক্তৃতার গোড়ার দিকে বলেন, যে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক, এমন কি নগরসমূহের লোকেরাও, দিনের পর দিন সুশৃঙ্খল ও সুপ্রতিষ্ঠিত গবর্ন্মেণ্টের হিতৈষণার অধীনে স্ব স্ব বৃত্তির অনুসরণ করিতেছে। ইহার মধ্যে আক্ষরিক সত্য আছে। ভারতবর্ষের সব লোকের বা অধিকাংশ লোকের পিঠে পুলিসের লাঠি পড়িতেছে না, ইহা নিশ্চয়ই সত্য কথা। কিন্তু ভারতসচিব যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিলে লোকের যাহা ধারণা হয় তাহা সত্য নহে। ইতিহাসে অনেক দেশ বিদেশী শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত ও উপদ্রুত হওয়ার বর্ণনা পড়া যায়। সেই সব দেশেরও সব বা অধিকাংশ লোক প্রহার খায় না। মোটকথা, ভারতবর্ষের লোকে শান্তিতে সুখে নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করিতেছে, ইহা সত্য নহে। তাহার পর ভারতসচিব বলিতেছেন, রাষ্ট্রীয় কার্য্যসম্পাদনের যন্ত্রটি ("Governmental machine") যদিও হয়ত ব্রিটিশ হাতের গড়া, তাহা হইলেও ইহা এখন খুব বেশী পরিমাণে ভারতীয় হাতের দ্বারা চালিত হইতেছে, কেবল উচ্চপদে নহে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে নিম্নপদগুলিতে। বক্তার মতলবটা এই, যে, ভারতবর্ষ কার্য্যতঃ দেশীলোকদের দ্বারা শাসিত। ভারতবর্ষের সরকারী পুতুলনাচের পুতুলগুলি অধিকাংশই দেশীলোক বটে, কিন্তু যাহারা সুতা টানিয়া পুতুল নাচায় তাহারা ব্রিটিশ—উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত ভারতীয়ও সেই সুতার টানে নাচে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যুধিষ্ঠিরের পাশাখেলা
শ্রীনন্দলাল বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ } শ্রাবণ, ১৩৩৭ { ৪র্থ সংখ্যা
১ম খণ্ড

নাদির শাহের অভ্যুদয়

স্যর যদুনাথ সরকার

দেশের দুর্দ্দশার দিন

পারস্য দেশ প্রাচীনকালে পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে সভ্যতার কেন্দ্র ছিল,—যেমন দক্ষিণ-এসিয়ায় আমাদের ভারতবর্ষ, তেমনি। এই দুই দেশেই আর্য্যজাতির বাস; দুই দেশের মধ্যেই তখন ভাষা ও ধর্ম্মের অনেক সাদৃশ্য ছিল। পরে মুসলমান বিজয়ের ফলে পারস্য দেশ ভারত হইতে বড় বিভিন্ন হইয়া পড়িল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে যখন ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর আসিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়া দেশে শান্তি সুখ ধন আনয়ন করিলেন, ভারত আবার সভ্যতার কেন্দ্র হইল,—ঠিক তখনই পারস্য দেশ সফবী রাজবংশ স্থাপনের ফলে জাগিয়া উঠিল, ধনে বলে সভ্যতায় আবার এসিয়ার প্রদীপ হইয়া দাঁড়াইল।

আবার এদিকে যেমন আওরংজীবের সঙ্গে সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব-রবি দ্রুত অস্তগামী হইল, তেমনি ঐ সম্রাটের জীবনকালে পারস্য দেশেও রাজশক্তির অবনতি এবং দেশের অধঃপতন স্পষ্ট দেখা দিল। পারস্যের নবীন শাহরা আর যুদ্ধ শিখেন না, বাল্যকাল অবধি অন্তঃপুরে স্ত্রীলোক ও খোজার মধ্যে প্রতিপালিত হন এবং সিংহাসন লাভ করিবার পর রাজ্যভার উজীরের হাতে সঁপিয়া দিয়া নিজে ইন্দ্রিয়-সুখ ও সুরাপানে অকালমৃত্যু ডাকিয়া আনেন। এই সফবী বংশের শেষ রাজা, শাহ সুলতান হুসেন (রাজ্যকাল ১৬৯৪-১৭২২ খৃষ্টাব্দ) নেশা করিতেন না বটে, কিন্তু মুল্লা ও খোজাদের হাতে সমস্ত শাসনকার্য্য ছাড়িয়া দিয়া নিজে মালাজপ করিতেন এবং হারেমে অসংখ্য রমণী লইয়া সময় কাটাইতেন। মুল্লাদের পরামর্শে তিনি দেশ হইতে সমস্ত দার্শনিক, সুফী এবং শিয়া ভিন্ন অপর সব সম্প্রদায়ের মুসলমানকে নির্যাতন করিয়া তাড়াইতে লাগিলেন। ইহাতে দেশে জ্ঞান-চর্চ্চা বিদ্যাবুদ্ধি লোপ পাইল। সৈন্যগণ এবং প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশগুলি রাগে অপমানে এহেন রাজাকে পরিত্যাগ করিল। অবশেষে শাসন-কার্য্যের বিশৃঙ্খলা ও অবহেলার অনিবার্য্য ফল ফলিল। সীমান্ত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইতে আরম্ভ করিল। উত্তর-পূর্ব্ব কোণে হিরাট জেলায় আবদালি জাতি এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে কান্দাহার প্রদেশে ঘিলজাই জাতি পারসিক সৈন্যকে পরাস্ত করিয়া পারসিক শাসনকর্ত্তাকে তাড়াইয়া দিয়া বা মারিয়া ফেলিয়া দেশ দখল করিল,

স্বজাতির প্রভুত্ব স্থাপন করিল। ইহারা আফঘান এবং সুন্নী, সুতরাং শিয়া পারসিকদের মহাশত্রু।

তাহার পর ঘিলজাই রাজা মাহমুদ গিয়া পারস্য দেশ আক্রমণ করিলেন। রাজধানী ইস্‌ফাহানের নিকট দুই পক্ষে যুদ্ধ হইল। পারসিক সৈন্য পঞ্চাশ হাজার, সঙ্গে চব্বিশটি বড় কামান। আফঘানেরা সংখ্যায় মাত্র বিশ হাজার আর সঙ্গে উটের পিঠে চাপান এক শত জম্বুরক বা লম্বা বড় বন্দুকবিশেষ; অথচ পারসিকেরা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিল। শাহ ইস্‌ফাহানে অবরুদ্ধ হইয়া অন্নাভাবে আত্মসমর্পণ করিলেন (২১ অক্টোবর, ১৭২২), পারস্য দেশে আফঘানরা রাজত্ব আরম্ভ করিল এবং সাত বৎসর ধরিয়া দেশ উৎসন্ন করিল। এই সাত বৎসরে দশলক্ষ প্রজার প্রাণ গেল, সুন্দর সুন্দর প্রদেশগুলি মরুভূমিতে পরিণত হইল, আর কত মহামূল্য অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে ভীরু অকর্ম্মণ্য হৃতরাজ্য শাহ হুসেনের পুত্র মির্জা তহমাস্প সুদূর উত্তরে মাজেন্দ্রান্ প্রদেশে পলাইয়া গিয়া সেখানে নিজকে রাজা ঘোষণা করিয়া দেশ দখলের চেষ্টায় ছিলেন। পারস্যের বিপদ দেখিয়া পুরাতন শত্রু রুষ এবং তুর্কী উত্তরে ও পশ্চিমে নানা স্থান জয় করিয়া ফেলিল। তহমাস্প যুবক, বুদ্ধি বা চরিত্রের বল নাই, তাহার উপর ইন্দ্রিয়সুখে মগ্ন। দেশের চারিদিকে এই বিপদের দিনে জাতীয় উদ্ধার-কার্য্য তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হইবার নহে। এবার পারস্য চিরদিনের জন্য ধ্বংস হয় হয়।

জাতীয় ত্রাণকর্ত্তা নাদির

এমন সময় পারস্যের সৌভাগ্যে উদ্ধারের এক অভাবনীয় পথ খুলিয়া গেল, জাতীয় দলে এক অপূর্ব্ব শক্তিমান পুরুষসিংহ দেখা দিলেন। তিনিই পরে নাদির শাহ নামে বিখ্যাত হন।

খুরাসান প্রদেশে একটি সামান্য গ্রামে আফশার নামক তুর্কমান জাতির দলভুক্ত কির্কলু বংশে এক গরিব মেষ-পালক ও চামড়ার জামাটুপী প্রস্তুতকারী দর্জির ঘরে নাদিরের জন্ম (১৬৮৮)। তাঁহার বয়স যখন আঠার সেই সময় একদল উজবেগ দস্যু আসিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার মাতাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া তাতার দেশে দাস করিয়া রাখে। সেখানে মাতার মৃত্যু হইল, কিন্তু নাদির চারি বৎসর পরে পলাইয়া আসিয়া, খুরাসান প্রদেশের একটি ছোট জেলার প্রধান শহর অবিভার্দ নগরে শাসনকর্ত্তার অধীনে চাকরি লইলেন এবং তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পদ পাইলেন।

নাদিরের ঈশ্বর-দত্ত প্রতিভা যুদ্ধে ও লোকশাসনে প্রকাশ পাইল। খুরাসানের পাঠান-রাজার সঙ্গে ঝগড়া হওয়ায় তিনি দস্যুদল জুটাইয়া দেশ লুঠ ও জয় করিয়া নিজ বল বাড়াইলেন, এবং ক্রমে কিলাৎ-ই-নাদিরি দুর্গ এবং খুরাসানের রাজধানী নীশাপুর নগর দখল করিলেন, এবং তাহার পরেই স্বদেশের রাজা মির্জা তহমাস্পের সঙ্গে যোগ দিয়া (১৭২৭) দেশ উদ্ধারের কেন্দ্র ও নেতা হইয়া দাঁড়াইলেন। দুই বৎসরের মধ্যে নাদির যুদ্ধের পর যুদ্ধে আফঘানদের হারাইয়া পারস্য দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেন এবং এরূপ কঠোরভাবে পশ্চাদ্ধাবন করিলেন যে, কান্দাহারে যাইবার সমস্ত পথ হত আফঘান স্ত্রী-পুরুষ বালক-বৃদ্ধের মৃতদেহে ভরিয়া গেল। একজন ঘিলজাইও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারিল না। পারস্যে তাহারা যে সাত বৎসর ধরিয়া অত্যাচার করিয়াছিল তাহার পূর্ণ প্রতিশোধ হইল, আবার পারসিকেরা মাথা তুলিতে পারিল, নাদির স্বদেশবাসীর আহ্লাদের ও গর্ব্বের বস্তু হইলেন।

কৃতজ্ঞ রাজা শাহ তহমাস্প অর্দ্ধেক পারস্য দেশ নাদিরের হাতে দিয়া তাঁহাকে সুলতান উপাধি এবং নিজ নামে টাকা বাহির করিবার অধিকার দান করিলেন। আফঘানরা বিতাড়িত হইল বটে, কিন্তু এখনও তুর্ক হইতে পারস্যের পশ্চিম প্রদেশগুলি উদ্ধার করিতে বাকী। নাদির সেই কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং তুর্কী সৈন্যদলকে কয়েকবার যুদ্ধে হারাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ পূর্ব্বপ্রান্তে হিরাট অধিকার করিতে যাওয়ায় তাঁহার অনুপস্থিতিতে শাহ তহমাস্প তুর্কী-সৈন্য আক্রমণ করিতে গিয়া বুদ্ধি ও বীরত্বের অভাবে পরাস্ত হইয়া নাদিরের উদ্ধার-করা সমস্ত পশ্চিম প্রদেশগুলি হারাইলেন। দেশের লোক তাঁহাকে ধিক্কার দিতে লাগিল, পারসিক সেনানায়কেরা একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন যে, তহমাস্পকে দেশের নেতা করিয়া

রাখিলে আবার জাতীয় পরাধীনতা ও দুর্দ্দশা ফিরিয়া আসিবে। তাঁহারা নাদিরকে রাজা করিতে চাহিলেন। কিন্তু নাদির সম্মত হইলেন না। ২৬ আগষ্ট, ১৭৩২ তহমাস্পকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার আট মাসের শিশু-পুত্র আব্বাসকে শাহ বলিয়া ঘোষণা করা হইল, নাদির হইলেন তাহার অভিভাবক ও প্রতিনিধি, অর্থাৎ দেশের প্রকৃত শাসক। চারি বৎসর পরে বালক-রাজা মারা যাওয়ায় নাদির প্রকাশ্যভাবে সিংহাসনে বসিলেন (২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৭৩৬); তাঁহার উপাধি হইল শাহান্-শাহ নাদির শাহ; পূর্ব্ব উপাধি ছিল তহমাস্প কুলী খাঁ।

নাদিরের প্রতিভা সর্ব্বতোমুখী, একদিকে রাজনীতির চাল চালিতে সন্ধি ও ভেদের বন্দোবস্ত করিতে তিনি যেমন দক্ষ, তেমনি অপরদিকে যুদ্ধবিদ্যায় সে যুগে কেন, সমগ্র ইতিহাসে এসিয়াখণ্ডে তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিল না। ঠিক কোন্‌দিকে সৈন্য চালনা করা দরকার, কখন যুদ্ধ করিতে হইবে এবং কখন হটিয়া আসা বা অপেক্ষা করা উচিত, কামানের ব্যবহার ও উন্নতি এবং ঠিক পরিমানে বন্দুকচী ও অশ্বারোহী সৈন্য সমাবেশ করা, ইউরোপীয় (ফরাসী) গোলন্দাজদিগকে নিযুক্ত করা অথচ তাহাদের নিজ আজ্ঞায় চালনা করা, স্বয়ং সেনাদলের সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধে নেতৃত্ব করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রতিপত্তি ও খ্যাতির বলে তাহাদের পূজ্য দেবতা হওয়া—এ সব গুণই তাঁহার ছিল। এজন্য পারস্য দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরাজ ইতিহাস-লেখক (তিনি নিজে ব্রিগেডিয়ার জেনারল) নাদিরকে "এসিয়ার নেপোলিয়ন" বলিয়াছেন।

রাজা হইয়াই নাদিরের প্রথম কাজ হইল পারস্যের হৃত প্রদেশগুলি উদ্ধার করা। তুর্কদের হারাইয়া দিয়া তাহাদের হাত হইতে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়া কাড়িয়া লইলেন; রুষের সঙ্গে সন্ধিবিগ্রহের ফলে কাস্পিয়ান হ্রদের তীরের প্রদেশগুলি ফিরাইয়া পাইলেন; আরবদের হাত হইতে পারস্য-উপসাগরের দ্বীপগুলি পুনরুদ্ধার করিলেন। দেশস্থ দস্যুজাতিগুলিকে খুব হারাইবার পর নিজ সৈন্যদলে ভর্ত্তি করিয়া নেতার শাসনে রাখিয়া তাহাদের অত্যাচারের পথ বন্ধ করিলেন। অবশেষে ১৭৩৭ সালে একমাত্র অবশিষ্ট প্রদেশ, কান্দাহার জয় করিতে নাদির রওনা হইলেন। সেখানে আফঘান শাসন বজায় থাকিলে পারস্যের ভবিষ্যৎ বিপদের কারণ রহিবে। আর, ভারতের অগণিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করিতে হইলে কান্দাহারের পথ দিয়াই যাইতে হইবে। এক বৎসর অবরোধের পর, ১২ মার্চ্চ ১৭৩৮ কান্দাহার দুর্গ তাঁহার হাতে আসিল। তিনি উহা সম্পূর্ণ ধ্বংস করিয়া উহার দুই মাইল পূর্ব্বদিকে ময়দানের মধ্যে এক নূতন কান্দাহার স্থাপন করিলেন এবং তাহা প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দিলেন। ইহার নাম হইল "নাদির-আবাদ"।

অতুলনীয় যোদ্ধা নাদির শাহ রাজনীতিতেও অতি গভীর বুদ্ধিশালী ও দক্ষ ছিলেন। কান্দাহার আফঘানদের দেশ, সুতরাং উহা জয় করিবার পর পরাজিত আফঘান শাখাদিগকে কোনরূপ শাস্তি দিলেন না, লুণ্ঠন করিলেন না, সমস্ত বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিয়া, তাহাদের প্রধানদিগের বার্ষিক বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া, নানাপ্রকারে দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়া, তাহাদের যোদ্ধাদিগকে নিজ-সৈন্যদলে চাকরি দিয়া, এই সমস্ত আজন্মযোদ্ধার জাতিকে বশ করিয়া ফেলিলেন, নিজের ভবিষ্যৎ দেশবিজয়ের ভৃত্য করিলেন। অথচ পাঠানদের সংযত রাখিবার জন্য আবদালী বংশকে তাহাদের আদিবাসস্থান খুরাসান হইতে আনিয়া কান্দাহার প্রদেশের রক্ষার ভার দিলেন এবং কান্দাহারের আদিম ঘিলজাইদের উঠাইয়া লইয়া খুরাসানে বসতি করাইলেন। এই দুই শাখা আফঘান হইলেও পরস্পর চির-বিরোধী।

নাদির নিজে পারস্যদেশীয় হইলেও জাতিতে পারসিক অর্থাৎ আর্য্য নহেন, তিনি তুর্কমান্। আসল পারসিকেরা খুব বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পকলায় লেখনী চালনে জগদ্বিখ্যাত, কিন্তু যুদ্ধে প্রায়ই দুর্ব্বল এবং ভীরু। পারস্যরাজের প্রধান সম্বল কিজিল্‌বাশ্ ('লালমাথা' অর্থাৎ লালটুপী পরা) সৈন্য; ইহারা তুর্কস্থান হইতে পারস্যে আনিয়া স্থাপিত করা সাতটি তুর্কী শাখার বংশধর, অদম্য বীর। কিন্তু ধর্ম্মে শিয়া হওয়ায় সফবী রাজগণের এবং পরে নাদিরের, অতি ভক্ত অনুচর হয়।

ইহার পর নাদিরের ভারতবিজয়। সে এক অতি রোমাঞ্চকর, কিন্তু শিক্ষাপ্রদ কাহিনী।

বঙ্গসাগরের ঝড় ও তাহার প্রকৃতি

শ্রীসুধাংশুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডি-এস্‌সি

বাংলা দেশে প্রতি বৎসর ঝড়ে এবং জলপ্লাবনে কিরূপ অনিষ্ট হয় তাহা সকলেই অবগত আছেন। কি প্রকারে এই প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা প্রতিবৎসর ঘটে সে সম্বন্ধে এদেশের অনেকেরই প্রকৃত ধারণা নাই। সচরাচর জনসাধারণ এইগুলিকে ভগবানের অভিসম্পাত বলিয়া মনে করে।

বাংলা দেশে দুই প্রকারের ঝড় সমূহ ক্ষতি করে। চৈত্র বৈশাখ মাসে কোনো কোনো দিন হঠাৎ অপরাহ্নকালে উত্তর-পশ্চিম কোণে ক্ষুদ্র একখানি কাল মেঘ উদিত হইয়া অচিরে কিরূপ ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের সহিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং মুষলধারে বৃষ্টি ও মুহুর্মুহু অশনিসম্পাতে মনে ভীতি জাগাইয়া তোলে, তাহা বাংলা দেশের কাহারও অবিদিত নাই। এই ঝড়গুলিকেই আমরা কালবৈশাখী বলি। এগুলি বাংলা দেশেই উৎপন্ন হয়। যতই ভীতিপ্রদ হউক ইহাদের অনিষ্টকারী ক্ষমতা অনেকটা সীমাবদ্ধ এবং ইহারা কখনও জলপ্লাবন ঘটায় না। দ্বিতীয় প্রকার ঝড়ের উৎপত্তিস্থান বঙ্গসাগর। প্রতিবৎসর বর্ষাকালে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এবং শ্রাবণ মাসে বঙ্গসাগরের উত্তর-সীমায় বাংলা দেশের ঠিক দক্ষিণে এমন অনেক দিন আসে যখন বায়ু চক্রাকারে বহিতে থাকে এবং ভীষণ ঝড়ের সৃষ্টি করে। বাংলা দেশে বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত প্রায় নিত্যকার ঘটনা; কিন্তু যখন এই ঝড়গুলির সৃষ্টি হইতে থাকে তখন এই বৃষ্টিপাত কমিয়া যায়। এই ঝড় ধীরে ধীরে বৃদ্ধি হইয়া পূর্ণাকৃতি প্রাপ্ত হওয়া মাত্র সচরাচর পশ্চিম অভিমুখে ধাবিত হয় এবং সর্ব্বপ্রথমে উড়িষ্যা দেশে প্রবেশ করিয়া প্রচুর বারি বর্ষণ করে। এই প্রকার ঝড়ের আবর্ত্ত প্রায় তিনচার শত বর্গমাইল কিংবা তাহারও অধিক। সুতরাং পশ্চিম অভিমুখে গতি হইলেও ইহাদের প্রকোপ বাংলা দেশেও কিয়ৎ পরিমাণে অনুভূত হয়। মধ্যভারতের ভিতর দিয়া যাইতে যাইতে ইহাদের গতি কখনও কখনও বাঁকিয়া যায়। এইরূপে যুক্ত-প্রদেশের কিংবা পঞ্চনদের উত্তর-সীমায় উপস্থিত হয় এবং হিমালয়ে বাধা পাইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। আবার কখনও সোজা পশ্চিমদিকে যাইয়া সিন্ধুদেশ পর্য্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টিপাত করে। বঙ্গসাগরের উত্তর-সীমার এই ঝড়গুলি কখনও কখনও পশ্চিম অভিমুখে না যাইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করে এবং বঙ্গের উত্তর-সীমার পর্ব্বতমালায় বাধা পাইয়া বিলীন না হওয়া পর্য্যন্ত প্রবল বায়ু ও জলধারায় বাংলা দেশ ভাসাইয়া দেয়। বর্ষাকালের এই ঝড়গুলি অপেক্ষাও ভীষণতর ঝড় বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হইয়া কখনও কখনও বঙ্গদেশকে আক্রমণ করে। ১৯১৯ সালের আশ্বিন মাসে এইরূপ একটি ঝড় পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিয়া বহু লোকের প্রাণনাশ এবং বহু লোককে আশ্রয়হীন করিয়াছিল। বর্ষাকালের ঝড়ের আবর্ত্তে হাওয়ার গতি সাধারণতঃ ঘণ্টায় ৪০।৫০ মাইলের অধিক হয় না। কিন্তু বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে যে ভীষণ ঝড়গুলি বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হয় তাহাদের ঘূর্ণাবর্ত্তে হাওয়ার গতি ঘণ্টায় ১০০ মাইলেরও অধিক হয়। এই ভীষণ গতি কেন্দ্রস্থলের নিকটে দ্রুত কমিয়া গিয়া প্রায় কিছুই থাকে না। এই ঝড়ের আবর্ত্তের ক্ষেত্র বর্ষার ঝড়ের অপেক্ষা আয়তনে ছোট। পূর্ব্ববঙ্গের অনেকেই ১৯১৯ সালের ঝড়ের সময় লক্ষ্য করিয়াছেন যে ঝড়ের বহির্ভাগের মৃদুমন্দ বাতাস ঝড়ের উত্তরাভিমুখে অগ্রসরের সঙ্গে সঙ্গে অতি দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ভীষণ বেগে পূর্ব্ব দিক হইতে বহিতে থাকে, এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই গতির বেগ কমিয়া গিয়া কেন্দ্রস্থলে উপস্থিত হইলে প্রায় কিছুই থাকে না। তখন আকাশ রক্তবর্ণ হয় এবং একটা শান্তগম্ভীর ভাব ধারণ করে। কেন্দ্রস্থল পার হইয়া গেলে হাওয়া বিপরীত দিক হইতে

বহিতে থাকে এবং ইহার গতি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া পূর্ব্বের মত ভীষণ হইয়া উঠে এবং ঝড় পার হইয়া গেলে অল্পে অল্পে কমিয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গের কেহ কেহ ঝড়ের এইরূপ দুইবার হাওয়ার বৃদ্ধি এবং বিপরীতাভিমুখে বহিবার বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রকারের ঝড়ের আবর্ত্তে ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীত দিকে হাওয়া বহিতে থাকে এবং কেন্দ্রস্থলে হাওয়ার বেগ কিছুই থাকে না, ইহা স্মরণ রাখিলে উপরিউক্ত পর্য্যবেক্ষণের কারণ সহজেই অনুভূত হইবে।
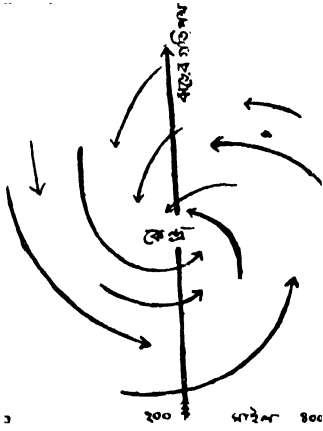
ঝড়ের বায়ুচক্র
(ক্ষিতিজ তলের সহিত সমান্তরালভাবে)

ঝড়গুলির উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে সত্য, কিন্তু ঝড় উপস্থিত হইলে হাওয়া কেন ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে চক্রাকারে বহিতে থাকে তাহার কারণ বৈজ্ঞানিকগণ অনেকদিন পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্ষার পূর্ব্বের এবং পরের ঝড়গুলি উৎপন্ন হইবার কয়েক দিন পূর্ব্ব হইতেই দেখিতে পাওয়া যায়, সমস্ত বঙ্গসাগরে প্রকৃতি কেমন একটা শান্তগম্ভীর ভাব ধারণ করিয়াছে। আকাশ নির্ম্মল, কোথাও যেন মেঘের চিহ্নমাত্র নাই। এইরূপ অবস্থায় প্রখর সূর্য্যের উত্তাপে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইয়া উষ্ণ হাওয়ার সঙ্গে মিশিতে থাকে। হাওয়া উষ্ণ হইলে হাল্কা হইয়া যায়। এইজন্য সমুদ্রের উপরের জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ হাওয়া ঊর্দ্ধমুখী গতি প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উপরে উত্থিত উষ্ণ হাওয়ার পরিত্যক্ত স্থান পূর্ণ করিবার জন্য চতুর্দ্দিক হইতে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা হাওয়া ছুটিয়া আসে। এই প্রক্রিয়ার ফলে সমুদ্রের উপরে কোনো নির্দ্দিষ্ট স্থানে হাওয়ার ঊর্দ্ধমুখী গতি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং সেই স্থানকে কেন্দ্র করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে উত্তরোত্তর বেগবৃদ্ধির সহিত ঠাণ্ডা হাওয়া প্রবহমান হয়। পৃথিবীর আহ্নিকগতির ফলে উহার উপরিতলস্থ হাওয়ায় প্রতিমুহূর্ত্তে ঘর্ষণ লাগিতেছে। এইরূপ ঘর্ষণের ফলে উপরিউক্ত কেন্দ্রমুখী প্রবাহী হাওয়ামণ্ডলী চক্রাকারে গতিপ্রাপ্ত হয়। পৃথিবী পশ্চিম হইতে পূর্ব্বদিকে ঘুরিতেছে বলিয়া জ্যামিতির সূত্র অনুসারে বিষুবরেখার উত্তর দিকে এইরূপ চক্রাকারের হাওয়ার গতি ঘটিকা যন্ত্রের কাঁটার বিপরীতমুখী হইবে, এবং বিষুবরেখার দক্ষিণ দিকে উহা ঘটিকা-যন্ত্রের কাটার অভিমুখী হইবে। এইজন্যই বঙ্গসাগরের ঝড়গুলির হাওয়া ঘটিকা-যন্ত্রের বিপরীত দিকে বহিতে থাকে।

উষ্ণ হাওয়ার ঊর্দ্ধে উঠিবার শক্তি পারিপার্শ্বিক হাওয়ার সহিত উহার তাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে। এই তারতম্য যত অধিক হয় হাওয়াও তত অধিক ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। পরীক্ষার দ্বারা জানিতে পারা যায়, উষ্ণ হাওয়া যত উপরে উঠে তত ঠাণ্ডা হইতে থাকে। তিন শত ফিট উপরে উঠিলে তাপের মাত্রা প্রায় এক ডিগ্রি কমিয়া যায়। ইহা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, ঝড়ের কেন্দ্রস্থলের উষ্ণ হাওয়া কিছুদূর উঠিয়া যখন সেই স্তরের হাওয়ার তাপের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয় তখন আর উহার ঊর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। জলীয় বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ বায়ু যখন ঊর্দ্ধে উঠিয়া উহার তাপ হারাইয়া ফেলে তখন বাষ্পগুলি জমিয়া মেঘের আকারে দেখা দেয়। তাপ-বিজ্ঞানের নিয়ম অনুসারে জলীয় বাষ্প জলকণাপূর্ণ মেঘে পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আভ্যন্তরিক তাপ (latent heat) নির্গম করিতে থাকে। এই আভ্যন্তরিক তাপের ব্যাপারটি বুঝিতে হইলে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাষ্পে পরিণত করিতে হইলে জলে যেমন অনেক তাপ প্রয়োগ করিতে হয়

সেইরূপ বাষ্প যখন পুনরায় জলে পরিণত হয় তখন এই তাপ বাহির করিয়া দেয়। এইরূপ তাপ নির্গমের ফলে যে বায়ু উর্দ্ধে উঠিয়া ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরায় উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং আরও অধিক উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে বায়ু ঠাণ্ডা হইয়া আরও অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাপনির্গমের ফলে অধিকতর উর্দ্ধে উঠিতে থাকে। যখন এইরূপে প্রায় অধিকাংশ জলীয় বাষ্প মেঘে পরিণত হইয়া যায় এবং উর্দ্ধে উত্থিত বায়ু তাপ হারাইয়া পারিপার্শ্বিক বায়ুর তাপের সহিত সমতা প্রাপ্ত হয়, তখন আর উহার উর্দ্ধে উঠিবার ক্ষমতা থাকে না। কিন্তু সেই অবস্থায় উহার স্থির থাকিবারও উপায় নাই, কারণ নীচ হইতে উষ্ণ হাওয়া স্থান-ত্যাগের জন্য ক্রমাগত ধাক্কা দিতেছে। এইরূপ অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত মেঘপূর্ণ হাওয়া ক্ষিতিজ রেখার সহিত সমান্তরালভাবে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে এবং দিঙ্মণ্ডল ঘন মেঘে আবৃত করিয়া মুষলধারে বৃষ্টিপাত আরম্ভ করে। বৃষ্টিপাতের দরুণ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত এই উপরের ঠাণ্ডা হাওয়াতে আর জলকণা থাকে না এবং উহা বহুদূরে যাইয়া ধীরে ধীরে নিম্নে অবতরণ করিতে থাকে ; কারণ হাওয়া ঠাণ্ডা হইলে একটু ভারী হয়। পরে ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত ঝড়ের কেন্দ্রমুখী প্রবাহিত হাওয়ার সঙ্গে পুনরায় একীভূত হইয়া যায়।
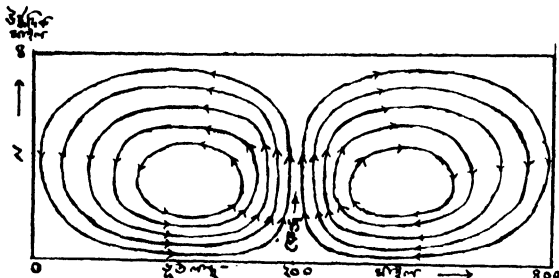
ঝড়ের বায়ুচক্র (উর্দ্ধ অধঃ ভাবে)

সমুদ্রের উপর দিয়া গমনের সময় এই হাওয়া সমুদ্রের জল হইতে পুনরায় বাষ্প গ্রহণ করিতে থাকে। সুতরাং যখন ঝড়ের কেন্দ্রস্থানে উপস্থিত হয় তখন উহা প্রায় পূর্ব্বের ন্যায়ই বাষ্পপূর্ণ থাকে এবং পূর্ব্বোক্ত উপায়ে উর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে মেঘের সঞ্চার করিতে থাকে। এইরূপ বাষ্প হইতে মেঘ, এবং হাওয়ার গতির উর্দ্ধ হইতে নিম্নে চক্রাকারে পরিবর্ত্তন অহনিশ ঘটিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পৃথিবীর দৈনন্দিন ঘূর্ণনের জন্য ঝড়ের কেন্দ্রমুখী প্রবাহিত বায়ুর ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীতাভিমুখে চক্রাকারে গতি উৎপন্ন হয়। এখন আবার আমরা দেখিতে পাইতেছি যে উর্দ্ধে উত্থিত বায়ুরও এইরূপ একটা চক্রাকার গতি আছে। এই উভয় প্রকারের গতি মিলিয়া ঝড়কে একটা নিজস্ব সত্তা দান করে, এবং উহা দুই তিন শত বর্গমাইলব্যাপী বায়ু নিজ দেহের ভিতরে গ্রহণ করে। একটু কল্পনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়, ঝড়ের এই বিশাল নিজস্ব দেহ আরও একটা বিশালতর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে নিহিত আছে। এই বিশালতর বায়ুমণ্ডলেরও একটা নির্দ্দিষ্ট গতি আছে ; এই গতির দিক যেদিকে উহার অভ্যন্তরস্থ ঝড়ও সেইদিকে চলিতে থাকে। সাধারণতঃ এই গতির মাত্রা ঘণ্টায় দশ হইতে বিশ মাইল হইয়া থাকে। বিশালতর বায়ুর গতির দিক যদি উত্তরাভিমুখী হয় তাহা হইলে ঝড়ও ঐরূপ গতিতে উত্তরাভিমুখে চলিতে থাকে।

দক্ষিণ-পশ্চিম মনসুন যখন ভারত-সাগরের উপর দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে থাকে তখন বঙ্গসাগরের উপরস্থ হাওয়ার গতি সাধারণতঃ উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া থাকে। এই নিমিত্ত এই সময়ের বঙ্গসাগরে উৎপন্ন ঝড়গুলি আরাকান-তীরের উপর দিয়া ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করে। চলিতে চলিতে কখনও দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া বঙ্গদেশেও প্রবেশ করে।

বর্ষার পরে উত্তর-পূর্ব্ব মনসুন ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে থাকে। এইজন্য এই সময়ের ঝড়ের দিক সাধারণতঃ পশ্চিমাভিমুখী হয়, এবং ইহারা করোমণ্ডল তীরের উপর দিয়া মান্দ্রাজে প্রবেশ করে। কখনও কখনও দাক্ষিণাত্য পার হইয়া এই ঝড়গুলি আরব-সাগরে আসিয়া পৌঁছায়, এবং পুনরায় সমুদ্র হইতে জলীয় বাষ্প গ্রহণের সুযোগ পাইয় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহারা চলিতে চলিতে কখনও আফ্রিকায়, কখনও আরবে আসিয়া পৌঁছায় এবং মরুভূমির উপরে জলীয় বাষ্প না

পাইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। বঙ্গসাগরের উপরে বর্ষার পরের হাওয়ার গতি সাধারণতঃ পশ্চিম অভিমুখী হইলেও এবং উহার অভ্যন্তরস্থ ঝড় প্রথমে পশ্চিম অভিমুখে চলিতে থাকিলেও, কখনও কখনও দিক পরিবর্ত্তিত হইয়া ঐ ঝড় উত্তরাভিমুখে চলিতে থাকে এবং বঙ্গদেশে আসিয়া প্রবেশ করে।

ঝড়ের উৎপত্তির পূর্ব্বোক্ত প্রকারের কল্পনার মধ্যে অনেক সত্য রহিয়াছে, ইহা বৈজ্ঞানিকগণ বহুদিন যাবৎ মনে করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সম্প্রতি নরওয়ে প্রদেশের বিয়ার্কনিস প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ আটলান্টিক সাগরে যে ঝড় হয় তাহার উৎপত্তির আর এক প্রকারের কারণ অনেক পরীক্ষার পর স্থির করিয়াছেন। ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে, উত্তর-মেরুপ্রদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখী হাওয়া যখন গ্রীষ্মমণ্ডল হইতে উত্তরাভিমুখী প্রবাহিত উষ্ণ বায়ুর সঙ্গে ধাক্কা খায় তখন এই দুই প্রকারের হাওয়ার সঙ্গমস্থলে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হয়। উষ্ণ হাওয়া বৃত্তাকারে উত্তর-পশ্চিম কোণাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সর্ব্বপ্রথম ঠাণ্ডা হাওয়াকে আক্রমণ করে এবং উহার ঘাড়ে চড়িয়া বসে। ঠাণ্ডা হাওয়া এই আক্রমণ নিশ্চেষ্টভাবে গ্রহণ না করিয়া একটু ঘুরিয়া বিপরীত দিক হইতে, অর্থাৎ পূর্ব্ব কোণ হইতে, উষ্ণ হাওয়াকে আক্রমণ করে এবং উহাকে আরও অধিক ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেয়। এই আক্রমণের ফলে ঐস্থলে সমুদ্রের উপরিতলের হাওয়ার ঘটিকা-যন্ত্রের কাঁটার বিপরীত দিকে চক্রাকারে গতি উদ্ভূত হয়, এবং উষ্ণ হাওয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হওয়ার দরুণ উহার জলীয় বাষ্প ঘন মেঘে পরিণত হইয়া মুষলধারে বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দেয়।
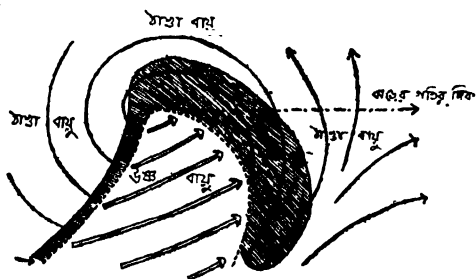
ঠাণ্ডা বায়ু এবং উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে ঝড়ের উৎপত্তি
(ছায়া চিহ্নিত স্থানে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে)

বঙ্গসাগরের ঝড়ের উৎপত্তির এই প্রকার কারণ নির্দ্দেশের প্রধান বাধা এই যে, উহার চতুর্দ্দিকের হাওয়ার তাপের বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। কিন্তু তথাপি কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সমুদ্র হইতে উত্তর কিংবা উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখী প্রবাহিত বায়ু, এবং স্থল হইতে দক্ষিণ কিংবা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখী বায়ুর সংঘর্ষ এইরূপ ঝড়ের উৎপত্তির আদি কারণ। এইরূপ অনুমান করিবার প্রধান হেতু এই যে, ইহা হইতে বর্ষার পূর্ব্বের এবং পরের ঝড় কি জন্য দক্ষিণ-বঙ্গসাগরে এবং বর্ষাকালের ঝড় উত্তর-বঙ্গসাগরে উৎপন্ন হয় তাহা অনুধাবন করা যায়। কারণ সর্ব্বদাই দেখা যায়, ঝড় এই দুই প্রকারের হাওয়ার মিলন-স্থলে উৎপন্ন হয়। বর্ষার পূর্ব্বে ও পরে এই মিলন
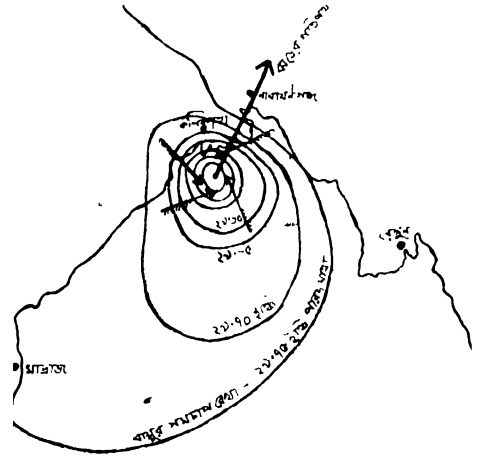
১৯১৯ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর ৮ ঘটিকার সময় বঙ্গসাগরের ঝড়ের বায়ুচক্র
(এই ঝড় ২৪শে মধ্যরাত্রিতে এবং ২৫শে প্রাতঃকালে পূর্ব্ববঙ্গের উপর দিয়া বহিয়া যায়)

বঙ্গসাগরের দক্ষিণে এবং বর্ষার সময়ে বঙ্গসাগরের উত্তরে ঘটিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকারের হাওয়ার তাপের বিশেষ পার্থক্য না থাকিলেও ইহাদের অন্যান্য গুণ—যেমন, অভ্যন্তরস্থ জলীয় বাষ্প কিংবা ঊর্দ্ধ দিকে তাপ-মাত্রার হ্রাস,—সমান নহে।

যদিও ঝড় উৎপত্তির প্রথম অবস্থায় ঐ দুই প্রকার

বঙ্গসাগরের বিভিন্ন সময়ের ঝড়ের গতিপথ
(ক্ষুদ্র বৃত্তগুলি প্রতিদিন ৮ ঘটিকার সময় ঝড়ের অবস্থান নির্দ্দেশ করিতেছে)

হাওয়ার সংমিশ্রণে অনেক শক্তি গ্রহণ করিতে পারে, তথাপি পূর্ব্বে উহার উৎপত্তির এবং গতির কারণ যেরূপ লিখিত হইয়াছে তাহাই যে বহুল পরিমাণে প্রকৃত কারণ সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

সম্প্রতি কালবৈশাখীর সময় বেলুনের সাহায্যে বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন বায়ু-স্তর পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারা গিয়াছে যে, এই ঝড়গুলি দুইটি বিভিন্ন প্রকার বায়ুর সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। কাজেই সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সময় হিমালয় হইতে দক্ষিণদিকবাহী ঠাণ্ডা হাওয়া এবং বঙ্গসাগর হইতে উত্তরদিকবাহী জলীয় বাষ্প পূর্ণ উষ্ণ হাওয়ার সংঘর্ষে এই ব্যাপার সংঘটিত হয়।

এ পর্য্যন্ত ঝড় কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু কি প্রকারে ধ্বংস হয় তাহার কথা বিশেষ কিছু বলা হয় নাই। একবার ঝড়ের বায়ু-প্রবাহ চক্রাকারে গতি প্রাপ্ত হইলে উহার ধ্বংস ঘটা সহজ ব্যাপার নহে। উহার প্রবল বায়ু-প্রবাহ মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করিতে করিতে দিনের পর দিন অগ্রসর হইতে থাকে। ঝড়ের ধ্বংস দুই প্রকারে সংঘটিত হইতে পারে। প্রথম উহার প্রধান আহার্য্য পদার্থ,—অর্থাৎ জলীয় বাষ্প যাহা মেঘে পরিবর্ত্তিত হইয়া উহাকে শক্তি প্রদান করে, তাহা নিরোধ করা। দ্বিতীয়তঃ, কোনো পর্ব্বতমালায় ধাক্কা খাইয়া উহার বায়ুপ্রবাহের চক্রাকারের গতি ভঙ্গ হইয়া গেলে সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। ভারতবর্ষে যে-সমস্ত ঝড় প্রবেশ

করে তাহাদের ধ্বংস এই দ্বিতীয় কারণে অর্থাৎ হিমালয় পর্ব্বতে কিংবা ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে ধাক্কা লাগিয়া ঘটিয়া থাকে। বঙ্গসাগর হইতে ঝড় দাক্ষিণাত্য প্রদেশের উপর দিয়া আরব-সাগরে গমনের সময় কখনও পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালায় বাধা পাইয়া ধ্বংস হইয়া যায়। কিন্তু আবার কখনও কোনো প্রকারে এই ধাক্কা সামলাইয়া আরব-সাগরে উপস্থিত হইয়া পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। কখনও বঙ্গসাগরের ঝড় মধ্যভারতের উপর দিয়া পশ্চিম অভিমুখে যাইতে যাইতে সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমির উপরে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং দুই তিন দিন ধরিয়া স্থলের উপর দিয়া গমনের ফলে এবং মরুভূমির উপর অবস্থানের জন্য জলীয় বাষ্পের অভাবে উহাদের মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

শীতকালে বঙ্গসাগরে কখনও ঝড় উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ঐ সময় আটলাণ্টিক কিংবা ভূমধ্যসাগরে উৎপন্ন ঝড় পূর্ব্বাভিমুখে চলিতে চলিতে পশ্চিম সীমান্ত (বেলুচিস্থান) দিয়া ভারতবর্ষে প্রবেশ করে এবং সমস্ত উত্তর-ভারতে বারি বর্ষণ করিতে করিতে ব্রহ্মদেশে আসিয়া পৌছায়। কখনও ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতে ধাক্কা খাইয়া ইহারা ধ্বংস হইয়া যায়, কখনও বা পর্ব্বত পার হইয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে উপস্থিত হয়। হাজার হাজার মাইল চলিয়াও যে ঝড়ের ধ্বংস হয় না তাহাদের অস্তিত্ব কত দৃঢ় এবং সেগুলি ধ্বংস করা কত কঠিন তাহা সহজেই ধারণা করা যায়। যাঁহারা শীতকালের এই ঝড়গুলির প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন এই ঝড় আসিবার পূর্ব্বে হাওয়া কেমন উষ্ণ হইয়া উঠে এবং চলিয়া গেলে বায়ুর তাপ ১৫।২০ ডিগ্রি পর্য্যন্ত কমিয়া যায়। ইহা হইতে এই ঝড়গুলি যে উষ্ণ ও ঠাণ্ডা বায়ুর মিলন-স্থলে উৎপন্ন তাহা অনায়াসে বুঝা যায়।

এই আটলাণ্টিক ও ভূমধ্যসাগর হইতে আগত ঝড়গুলির উপরে উত্তর-ভারতের রবি-শস্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। কারণ এইগুলি না আসিলে ঐ সময়ে বৃষ্টি-পাতের কোন সম্ভাবনা থাকিত না। কাজেই এই ঝড়গুলি আমাদের পরম বন্ধু।

প্রাণের দাবী

শ্রীসান্ত্বনা দেবী

১

নিজের সর্ব্বশেষ অলঙ্কারখানি, স্বামী অনাথের হাতে তুলে দিয়ে পত্নী মমতার মনে হয়েছিল সে বুঝি আজ সত্যই নিশ্চিন্ত হয়েছে।

অসীম শূন্য বিরাট আকাশের মতই তার হৃদয়ও আজ কানায় কানায় শূন্যতার শান্তি দিয়ে ভরে উঠেছে। চাওয়ারও আর কিছু নেই, দেবারও আজ কিছু নেই। সবেরই সমাপ্তি হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু পরক্ষণেই যখন বাড়িওয়ালী এসে তাকে বাকি ভাড়ার জন্য অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত করে গেল, তখন মনে হ'ল, দেবার আর কিছুই নেই—এ একটা মস্ত সান্ত্বনা বটে, তবুও চাই—আর দিতে হবেই—এর হাত হতে পরিত্রাণের উপায় কি?

ভিড়ের দিনে মন্দির-যাত্রীরা যেমন মার মার করে পিষে ফেলে মন্দিরে ঢোকে তেমনি করেই তার মগজের ভিতর নানান্ দুঃখ, নানান্ দেনা এসে ঢুকতে লাগল।

বাড়িভাড়া সত্তর টাকা বাকি পড়েছে, তা দিতে হবে। ধোপারও খুব কম করে কুড়িটাকা বাকি, তাও চাই। গয়লা দুধের জোগান বন্ধ করে দিয়েছে, তারও পঞ্চাশ ষাট টাকা না মিটিয়ে দিলেই নয়। ঘরে চাল নেই, ডাল নেই, একটু নুন পর্য্যন্ত নেই।

দোকানে প্রায় একশ' টাকা ধার হয়েছে। না মিটিয়ে

দিলে তার রক্ষা নেই। পরিধেয় বস্ত্র নেই, শত তালি, শত গ্রন্থিবিশিষ্ট বস্ত্রে আর লজ্জানিবারণ হয় না। এমনি কত কি।

দেবার আর কিছুই নেই, অথচ দিতে যে হবেই। এই এক ভাবনায় মমতার মাথাটা এমন ঘুরে উঠল যে, সে ঝুপ করে দালানে বসে পড়ে, থামের খুঁটিতে মাথা রেখে চোখ বুজল।

শ্বশুরের রেখে যাওয়া এই দু'হাজার টাকার ঋণ ছাড়া আর কিছু ছিল না। ভরসা স্বামীর ত্রিশ টাকা বেতনের একটি চাকরী। তাও আজ ছয়মাস তিনি চাকরীশূন্য—বেকার।

নিজের গায়ে একখানি গয়না নেই—দেনার সুদে সুদে সব নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। তবুও বাঁচতে হবেই—আর রাঁধতে খেতেও ঠিক তারি জন্যেই হবে।

দোকানে ধার মেলে না। তবুও চাই যেমন করে হোক। নিজের না হোক, স্বামীর জন্য—শিশু পুত্র কন্যাদের জন্যও অন্ততঃ চাই। নুনভাত—ফ্যান্-ভাত যা হোক এক্ষণি চাই।

ছেলে মেয়ে দুটি সেই সকালে দুটি বাসি ভাত খেয়ে খেলা করতে গিয়েছে। এবার এসে ক্ষুধায় আর দাঁড়াতে পারবে না। যে করে হোক, ধার করে ভিক্ষা করে তাদের দুটি না খেতে দিলে ত চলবে না। মমতাকে উঠতেই হ'ল।

প্রথমটা মাথা তুলে সোজা হয়ে বসে সে একবার চারিদিকে চাইল। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ঘরের ঘটিবাটি তৈজসপত্র সব বিক্রী হয়ে গিয়েছিল। এমন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে তাদের জননী আজ দুটি বুভুক্ষিত শিশুর মুখে আহার্য্য জোগান।

রৌদ্রে উঠানটা ভরে উঠেছে। চৌবাচ্ছায় জলের কল দিয়ে জল পড়ার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছিল না। মমতা কলতলায় গিয়ে, প্রথমে খুব খানিকটা আঁজলা পূরে জল খেয়ে নিল। তারপর ছেঁড়া কাপড়খানাই ভাল রকম গুছিয়ে নিয়ে সদর দ্বারটা খট্ করে খুলে বের হয়ে গেল।

২

মমতাদের বাড়ীর পাশেই জমিদারের মস্ত বাড়ী। সেখানে তখন তক্তপোষের উপর ফরাসপাতা বিছানায় ডজনখানেক তাকিয়া ঠেস দিয়ে ডজনখানেক লোক তবলা, বাঁয়া, ডুগি, এসরাজ, হারমোনিয়ম, এই-সব নিয়ে গান-বাজনায় রত ছিল।

শীঘ্রই জমিদার-পুত্রের উৎসাহে তাদের থিয়েটার পার্টি খোলা হবে, তারই রিহার্সাল চলছিল!

মমতা সেইখানে গিয়েই সোজা হয়ে দাঁড়াল। জমিদার-পুত্র হতে সকলেই চমকে উঠল।

প্রথম মমতাই কথা বলল। তার চোখে পলক ছিল না। গলার স্বরও বেশ স্পষ্ট স্থির।

"বাবু আমরা বড় গরীব। দয়া করে চারটি টাকা দিন না।"

ঘরের সবাই নিস্তব্ধ হয়ে তার দিকে চেয়ে রইল। সকলেই মমতাকে চিনত, ভদ্র গৃহস্থ বধূ সে। সে যে কতখানি অভাব-অসুবিধায় পড়ে আজ ভিক্ষার্থ নিজে এসে দাঁড়াতে পেরেছে, তা সবাই বুঝল।

জমিদার-পুত্র একটু তোতলার মত বলে উঠলেন, "তুমি—আপনি—নিজে এসেছেন কেন? যান্ যান্ আমি চাকরের হাতে আপনার যা' যা' দরকার পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

মমতা বেশ অবিচলিতভাবেই বলল, "না আমায় চারটি টাকা দিন তাহলেই হবে।"

জমিদার-পুত্র পকেট হতে তাকে চারটি টাকা বের করে দিলেন। প্রসারিত দক্ষিণ হস্তখানায় অকুণ্ঠিতভাবে নিয়ে মমতা চলে এল।

জমিদার-পুত্রের চোখের চাহনির তলায় যে একটা গুপ্ত দৃষ্টি উঁকি মারছিল, টাকা দেবার সময় অলক্ষ্যে তার হাত যে তার হাতখানা স্পর্শ করেছিল, তা দেখেও সে গ্রাহ্য করল না।

তারপর চাল এলো—ডাল এলো—সামান্য তরি-তরকারি ও মাছ এলো। রান্না হ'ল। কিন্তু মমতার সেই শুষ্ক মুখ আর মৌন প্রখর দৃষ্টি কিছুতেই বদলাল না।

সন্তানদের খাইয়ে শুইয়ে রেখে স্বামীর অন্নব্যঞ্জন

গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে উনানে জল ঢেলে রেখে যখন সে শোবার উদ্যোগ করছে তখন বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। আর সেদিন নিয়ে উপরি উপরি তিন দিন প্রায় আর কিছু খাওয়া হয়নি।

স্বামী কোথায় গিয়েছেন জানা নেই। কখন ফিরবেন তাও স্থির নেই। পৈতৃক ঋণের স্বদে স্বদে সব সম্বল শেষ। তবুও দেনায় মাথার চুল অবধি বিক্রী। ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে ইচ্ছা করে না। বর্ত্তমানও ভয়াবহ দিন নিয়ে উপস্থিত। চরম সময় ভগবানকেই নারী ডাকে। তাও প্রবৃত্তি হয় না। শিশুকাল হতে হিঁদুর মেয়ে ঈশ্বরকে বুক দিয়ে অনুভব করতে শেখে, তাঁকে প্রত্যক্ষ জ্ঞান করে। কিন্তু আজ তার সে অটল বিশ্বাস নেই। চোখে এক ফোঁটা জল নেই, কণ্ঠে ভাষা নেই, হৃদয়ে কিছু অভিযোগও বুঝিবা নেই।

বাপ নেই—মা নেই। আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই। এক ধনী মামাশ্বশুর আছেন, তিনি খোঁজখবর নেন না। বিতৃষ্ণায় মমতারও তাঁর শান্তি ভঙ্গ করতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যক্ষ নারায়ণ আছেন, তুলসী বৃক্ষ। নিত্য তার তলায় দীপ জেলে দেয়। কিন্তু প্রার্থনা করে না, কেবল প্রণাম করে। কেন বৃথা তাঁর শান্তি ভঙ্গ করা। স্বামীকে কিছু বলে না—বলা বৃথা। বিষম বিতৃষ্ণায় সে তাঁরও শান্তি-ভঙ্গ করতে ইচ্ছা করে না। নিজের মন? হাঁ, সেইটা শান্তিতে রাখা সব চাইতে শক্ত। তবু সে যথাসম্ভব চিন্তা করে না। যা' হবার হোক। ছেলেমেয়ে না-খেয়ে মারা যাক্ দেনার দায়ে স্বামী জেলে যান্—বাড়িভাড়ার জন্য অপমানিত হতে হোক—যা-কিছু সব হোক—সে কিছু ভাবতে চায় না। বৃথা কান্নাকাটি করে নিজের মনের শান্তির ব্যাঘাত করতেও সে ভালবাসে না।

বিশ্রাম-সময়ে নির্ভীক বীরের মত নিজের ভবিষ্যৎ-টাকে নানারূপে সম্ভব অসম্ভব দুঃখের ছবিতে গড়ে তোলে, নিস্পন্দ হয়ে তাই দেখে।

চোখের পাতায় পলক পড়ে না। একফোঁটা জলও আর বুঝি তাতে নেই যে ঝরবে।

৩

স্বামীর সামনে সকালের বাড়া ভাত-ব্যঞ্জন ধরে দিয়ে প্রদীপ জেলে মমতা বসেছিল।

নির্ণিমেষদৃষ্টি স্বামীর অন্নের দিকেই নিবদ্ধ করে সে ভাবছিল। এই যে মহাপুরুষটি খোঁজ রাখেন না, খবর করেন না, শান্ত নিরীহের মত যা পান খান, কোথা হতে এসব এল জানবারও যার প্রয়োজন নেই, একেই স্বস্তিতে রাখবার জন্য সে ভিক্ষা করছে। নিজের সমস্ত সম্বল বিক্রী করেছে।

রেঁধে ভাত দেওয়া। পরকে তৃপ্তিসহকারে খাওয়ানোতে যে আনন্দ আছে সে-রকম আনন্দ নারীজীবনে আর কিছুতেই নেই। তবু এসব সে পায় কোথা হতে?

নিত্য পলে পলে অভাব, পলে পলে দুঃখ—এ পাষাণ-প্রাণেও যে, আর সহ্য হয় না।

জননীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর কর্ত্তব্য সব কি তারই জন্য সৃষ্টি হয়েছিল? আর কি কারোর কর্ত্তব্য বলে কোন দায়িত্ব থাকতে নেই? সহসা মর্ম্মভেদী একটা দীর্ঘশ্বাস মমতার বক্ষ মথিত করে বের হয়ে এল।

চমকে মুখ তুলে অনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হ'ল গা?"

"নাঃ, কিছু না।" মমতা উঠে দাঁড়াল। আঁচাতে আঁচাতে অনাথবন্ধু বললেন, "আজ সারা দিন ভারি খাটুনী গিয়েছে। বিছানাটা পেতে দাও ত।"

মমতা বলল, "বিছানা পেতেই রেখেছি।"

"রেখেচ? আঃ, বাঁচলাম। যতীন্ দাস মারা গিয়েছেন জান ত, আজ রাত্রেই তাঁর মৃতদেহ হাওড়ায় আস্‌বে। তারই যথাবিহিত ব্যবস্থা হচ্ছে। সেই দলেই ছিলাম সারাদিন। আবার খানিক বাদেই চলে যাব। রাত্রে ফিরব কি না বলতে পারি না। তুমি দোরটা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ো।"

স্বামী অনর্গল বকে গেলেন। মমতা একটিও হাঁ হুঁ না দিয়ে চুপ করেই বসে রইল।

বলবারই বা তার আছে কি? এই সহরের একটা চাকরদাসীশূন্য আত্মীয়স্বজনশূন্য বাড়ীতে একা অসহায় দুটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে যে স্ত্রীকে ফেলে যেতে পারে তাকে বলবারই বা মমতার কি থাকতে পারে?

খানিক বাদে স্বামী আবার নিজেই বললেন, "উঃ!

অমর কীর্ত্তি জগতে রাখলেন কিন্তু। ভাবতে গেলেও গা শিউরে ওঠে। এক আধ দিন নয় ত দুমাস ধরে তিলে তিলে দেহ বিসর্জ্জন! ভাব দেখি, দেখ দেখি একবার—"

মমতার ভারি হাসি পেল। মহাপুরুষ তিনি, দধীচির মত আত্মত্যাগী সে বিষয়ে তার সন্দেহ নেই। কিন্তু রাজ-কারাগারে নাই হোক, অবরোধ কারাগারে নিরুপায় বিদ্রোহীর মত অনশনে সেও ত প্রতিদিনে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করছে, কে তার খবর রাখে? সে ত একা নয়। এ-রকম কত আছে। কত মেয়ে ঠিক এমনি সঙ্কটে, এমনি অবস্থায়, দিনে দিনে নিজের কামনা বাসনা সুখশান্তিকে হত্যা করছে। অনশনে প্রাণ দিচ্ছে। কিন্তু ক'জন তা নিয়ে মাথা ঘামায়? কে-ই বা সে হতভাগিনীদের মৃতদেহ ঘাড়ে নিয়ে এমন সমারোহ করে বেড়ায়?

জগৎ হয়ত জানতেও পারে না যে সে কেন মরল, কি জন্য মরল! এই ত তার নিজের স্বামীই সে খোঁজ রাখেন না, তখন অপরে রাখবে কি করে?

এই হুজুগে যিনি মেতে বেড়াচ্ছেন তাঁর স্ত্রী যে ক'বেলা উপোস করে তা জানবারও বোধ হয় তাঁর আবশ্যক নেই।

উপার্জ্জন না করলে সংসার চলে না। মাঝে মাঝে চাকরীর দরখাস্ত করা ছাড়া আর কোনো চেষ্টাও ত তাঁর নেই। ভাবেন হয়ত, সংসার চলছে ত, যে করে হোক! কিন্তু সে যে কি করে চলচে, তা তার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে খবর রাখে?

শক্ত খুঁটীর মত বসে মমতা জ্বলন্ত প্রদীপটার দিকেই চেয়ে ছিল। কখন যে স্বামী চলে গিয়েছেন, কখন যে দালানের প্রদীপটা নিবু নিবু হয়ে এসেছে,তা তার খেয়ালও ছিল না। হঠাৎ পাশের বাড়ীর একটা বিশ্রী বেয়াড়া হাসি ও বাহবার শব্দে তার চমক ভাঙল।

অন্ধকার দালানের দিকে চোখ পড়তেই তার সর্ব্বাঙ্গ অজানা শঙ্কায় কাঁটা দিয়ে উঠল। কোনো মতে উঠে গিয়ে সদর দ্বারটা বন্ধ করে এসে সে শিশুদুটির পাশে উপুড় হয়ে শুয়ে বিষম ঘামতে লাগল।

বুকের ভিতরও তার ঢিপ ঢিপ করে আওয়াজ হচ্ছিল। পিপাসায় তার আকণ্ঠ শুকিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু উপবাস-ক্লিষ্ট শ্রান্ত দেহে আতঙ্কে সে এমন অভিভূত হয়ে পড়েছিল যে উঠে এক গ্লাস জল খেতেও তার সাহস হ'ল না।

জনশূন্য বাড়ীটায় মনে হ'ল যেন অন্ধকারটাই আরও ঘনিয়ে এসে তাকে ঘিরে ফেলবার জন্য হাত বাড়াচ্ছে।

সেই অতল তমসাচ্ছন্ন আঁধারে এমন একটা কিছু আছে যা সে চেনে না—জানে না—তবুও আতঙ্কে ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ তার আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছে। কণ্ঠে একটা অস্ফুট শব্দ পর্য্যন্ত আর বাহির হচ্ছে না।

৪

পরদিন সকালে মমতা কলতলা হতে সবেমাত্র স্নান সেরে ভিজে কাপড়ে বের হয়ে আসছে, এমন সময় 'এই যে বৌদি' বলে জমিদার-পুত্র নরেন্দ্রনাথ এগিয়ে এসে তার পায়ের গোড়ায় ঢিপ করে প্রণাম করল।

সঙ্কোচে লজ্জায় বিস্ময়ে হতবুদ্ধিপ্রায় হয়ে মমতা ভিজে কাপড়টাই যথাসম্ভব সংবরণ করতে লাগল। মুখে তার তখনও জলকণাগুলি মুক্তাবিন্দুর মতই লেগে ছিল, ভিজে চুলের বোঝা তখনও সোজা হয়নি, তা দিয়েও জল ঝর-ছিল। নরেন্দ্র প্রভাতী রৌদ্র-ফলিত ধৌত সুন্দর মুখ-খানা একটু ভাল করেই দেখতে দেখতে বলে উঠল, "হঠাৎ এসে বৌদি বলে ডাকলাম বলে রাগ করলেন নাকি?"

"না বসুন।" সে একখানা মাদুর দালানে পেতে দিল। মাদুরটার উপরে জাঁকিয়ে বসে নরেন্দ্র বলল, "সেদিন যেমন একটু দরকারে পড়েই আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন, আমিও তেমনি দরকারে পড়েই আজ আপনার কাছে এসেছি।"

মমতার কণ্ঠে একটাও ভাষা ফুটল না যে জিজ্ঞাসা করে অতবড় জমিদার-পুত্রের তার মত দুঃখীর কাছে কি দরকার থাকতে পারে। কেবল নতনেত্রে দাঁড়িয়ে রইল। নরেন্দ্র তার দিকেই চেয়ে আবার বলল, "ভাবছেন বুঝি আমার আবার আপনার কাছে কি দরকার থাকতে পারে? কিন্তু বৌদি এ আপনি ছাড়া আর কারও দ্বারা সম্ভব নয়। তাই আপনার কাছেই এলাম। আমরা একটা সখের থিয়েটার খুলছি জানেন ত? তাই একজন অভিনেত্রীর দরকার। আপনি যদি সে অভাব দূর করেন,

এই দেখুন দু হাজার আগাম দিচ্ছি। এর পর মাসে মাসে দেব। কেমন ? রাজি ?"

হাতের নোটগুলো সে সবে মাত্র মাটিতে মমতার পায়ের কাছে নামিয়ে রাখছিল। কিন্তু মমতার আগুন-রাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে তার কেমন সাহস হ'ল না।—"বেরিয়ে যান—আমরা গরীব মানুষ, তা ব'লে অত হীন নই—আমার স্বামীর অসাক্ষাতে আর এ বাড়ীতে ঢুকবেন না।"

চমকে উঠে তোতলার মত নরেন্দ্র বলল,—"আপ—আপ - তো - তোমার ভালর জন্যই বলছিলাম, খেতে পাও না, ভিক্ষা করতে হয়। সুখে থাকতে। তোমার জানোয়ার স্বামীর মুখে ঝাড়ু মেরে চলে যেতে।"

জলন্ত কয়লার মত দু'চোখ তার মুখের উপর তুলে মমতা বলল, "যান—"

নরেন্দ্র ঘাড় নীচু করে নোটের তাড়াটা পকেটে পূরে মমতার তর্জ্জনী-নির্দ্দিষ্ট পথে নিরীহের মত বের হয়ে গেল। একটিও কথা আর বল্‌তে পারল না।

আর মমতা—সেইখানে ধপ করে বসে পড়ে বহুদিন পরে অঝোরে কাঁদতে লাগল।

এত দুঃখ সে আর সত্যিই বহন করতে পারছে না। বাঁচবার স্পৃহা নেই, তবু বাঁচতে হবে। অন্ন নেই, ক্ষুধা আছে, খেতে হবে। অর্থ নেই, ধার করতে হবে, না পেলে ভিক্ষা করতে হবে। সম্ভ্রম আছে, বজায় রাখবার পথ নেই। লজ্জা আছে, নিবারণ করবার উপায় নেই। স্নেহ আছে, সামর্থ্য নেই। সে আর পারে না। ঈশ্বরের করুণা অসীম শোনা যায়, এতদিন তারও সেই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু অসীম দুঃখ যন্ত্রণার পেষণে তার আর সে বিশ্বাসও নেই।

শিশুপুত্র এসে মমতার ভিজে কাপড়ের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়ল। "মা একটা পয়ছা দাও—বাঁছী কিনব।" কন্যা এক টুক্‌রো ভাঙা শ্লেটে কাটাকুটি খেলবার ঘর এঁকে ডাকল,—"ভাইটি খেলবি আয়, মার পয়সা নেই চেও-না।" ছেলে শুনল না, কচি কচি ছোট ছোট দুটি হাতে মমতার মুখ তুলে ধরে বলল, "দাও না মা, দুতি পায়ে পলি।" মমতা চোখ মুছে বলল,"পয়সা নেই বাবা, আজ থাক আর একদিন কিনো।" "না মা, আজকেই দাও।" সংসার-অনভিজ্ঞ মহা-আবদারে শিশু আঁচল ধরে টানাটানি করতে লাগল।

মমতা ডাক্‌ল, "শিউলি!"—"কি মা?" "বাক্সটা একবার ভাল করে খুঁজে দেখত মা, যদি পয়সা থাকে"—মেয়ে মুখের উপর হতে এক ঝাঁকড়া চুল সরিয়ে দিয়ে বল্‌ল, "কোথায় খুঁজব? সকালেই ত দুবার খুঁজলাম মুড়ি আনব বলে; তা একটিও পয়সা পেলাম না।"

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করে খোকাকে শান্ত করবার জন্য মমতা উঠে পড়ল। বেলা বাড়তে লাগল, স্বামীর দর্শন নেই। সেই যে কাল বেরিয়ে গিয়েছেন এখনও আসেন নি। শুকনো মুখে কাছে দাঁড়িয়ে মেয়ে কুণ্ঠিত-ভাবে বলল, "ভারি ক্ষিদে পেয়েছে মা।" যেন ক্ষিধে পাওয়াটা তার একটা বিষম অপরাধ! ছয় বৎসরের মেয়ে তবু মার অবস্থাটা বেশ ভাল রকমই বোঝে। কোলের ছেলে কেঁদে কেঁদে কাঁধের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কন্যা তৃতীয়বার চুলঢাকা চাঁদের মত মুখখানি মলিন করে পাশে দাঁড়িয়ে।

হাতে একটি পয়সা নেই যে ক্ষুধার্ত্ত কন্যার হাতে তুলে দেওয়া যায়। ঘরে একটি কণাও চাল নেই।

এসব চিরাভ্যস্ত অভাব তার গা-সহাপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। তবুও আজ যেন একেবারেই নিরুপায় সে।

নিজের সর্ব্বস্ব বিক্রী করেছে সে এদেরই খাওয়া-পরার জন্য। কোনো সম্বল নেই। সাহায্য করবারও আজ কেউ নেই।

অথচ—যাক্‌—। কন্যা আবার বলল, "মা বড্ড ক্ষিদে পাচ্ছে যে।" খোকাকে মাদুরে শুইয়ে দিয়ে মমতা বলল, "একটা কাঁচা পেয়ারা আছে, এখন খা। পরে ভাত রেঁধে দেব।" কবে কার বাড়ির প্রসাদী চরণামৃতের সঙ্গে দেওয়া একটা শুকনো কালো কাঁচা পেয়ারা বের করে এনে পরম উল্লাসে কন্যা তাই খেতে লাগল।

আর স্তব্ধ কালবৈশাখীর আকাশের মত নিস্পন্দ নির্ব্বাক হয়ে বসে বসে মমতা তাই দেখ্‌তে লাগ্‌ল।

ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে উঠল। মাথার চুল

মোছা হ'ল না। দালানে খোকাকে শুইয়ে রেখে তাদের নিরুপায় জননী দুটি ক্ষুধার্ত্ত শিশুকে আগলে বসে রইল। যিনি বিশ্বজননী, যাঁর অসীম স্নেহ,—তাঁর মনে এতে এতটুকুও দুঃখ হয়েছিল কিনা জানা যায় না। কিন্তু তাঁরই একবিন্দু করুণা দিয়ে গড়া এই মর্ত্ত্যজননীর বুকে আর দুঃখ রাখবার তিলমাত্রও ঠাঁই ছিল না। সেদিন সে এই ছেলে মেয়ে দুটির কথা ভেবেই সম্ভ্রম ত্যাগ করে অসঙ্কোচে ভিক্ষা করে এনেছিল।

সেদিনের মত আজ ভিক্ষায় বেরতে তার কিন্তু প্রবৃত্তি হ'ল না। তার অন্তরের নারী-মহিমা আজ সন্তানের অনাহারের চাইতেও বড়-কিছুর জন্য তাকে কিছুতেই রাস্তায় ভিক্ষার্থ বাহির হতে অনুমতি দিল না।

৫

মমতা ভাবছিল।

জট্‌পাকানো খেইহারানো শত শত বারের পুরানো ভাবনাই তার সম্বল। এই ত তার সবে মাত্র বাইশ বৎসর বয়স, এ বয়সের মধ্যে এত দুঃখ সে পেয়েছে যে, তার পরিমাণ করা যায় না।

আত্মহত্যায় সব দুঃখের অবসান হয় বটে, কিন্তু তার পর? এই ছেলে মেয়ে খাবে কি? জননীবিহনে তারা দাঁড়াবে কোথায়? স্বামী নিতান্ত নিরুপায়। বুঝি মমতার চাইতেও নিরুপায়। তবু লোকের এক-আধটা ছোটখাট কাজ করে দিয়ে সামান্য দুএক টাকাও সে মাঝে মাঝে পায়। কিন্তু সবল কর্ম্মঠ পুরুষ, তাকে কে দয়া করবে? সে নারী, সকলের কৃপার দানে সে বঞ্চিত নয়।

নিজ ঋণ পিতৃঋণ বড় জিনিষ! তা শোধ করাও কর্ত্তব্য। কিন্তু এই আজন্মের সাথী ঋণের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তাঁর ঘাড়ও যে নুয়ে পড়ছে।

তবু শ্বশুর থাকতে এত কষ্ট জানতে হয় নি। তাঁর পেন্সন-লব্ধ টাকাতেই সচ্ছলে সংসার চলেছিল। তিনি যে ভিতরে ভিতরে এত দেনা করে, তাদের সর্ব্বনাশ করে গিয়েছেন, তা তারা ঘূণাক্ষরেও আগে টের পায় নি ত।

চাকরীর বাজার কি রকম দুর্ম্মূল্য তা সে বেশ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। ব্যবসা—তাও মূলধন চাই। ভদ্র-সন্তান। কিছু লেখাপড়াও জানা। তিনি যে ঘাড়ে মোট বয়ে ছেলেপুলেদের জন্য রোজগার করবেন এমন ভরসাও তাঁর নেই।

এত অভাব, এত দুঃখ, তবুও তাঁর পরিধেয় বস্ত্র সাবান দিয়ে নিত্য ফরসা রাখতে হয়, তিনি ময়লা কাপড় পরে বেরতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁর ছেলেপুলে একটি পয়সার জন্য ক্ষুধায় কাঁদে, কিন্তু তাঁর পায়েও নিতান্ত কম পক্ষে পাঁচ টাকা জোড়ারও এক জোড়া জুতা চাই।

ছেলেমেয়ের জামা ছেঁড়া সেলাই করে গ্রন্থি দিয়ে চালান যায়। কিন্তু তাঁকে ভদ্রসমাজে ঘুরতে হয়, তাঁর জামা ফরসা এবং নূতন চাই।

তিনি যে নিজের ভদ্রয়ানা ভুলে গিয়ে তাদের জন্য মাথায় মোট বইবেন, এমন কল্পনা তার স্বপ্নেরও অগোচর।

আর বাস্তবিক তার স্বামীরই বা কি দোষ? সত্যিই যে তিনি ইচ্ছা করে তাদের কষ্ট দিচ্ছেন তা ত নয়। এই রকমই যে আজকাল ভদ্র গৃহস্থ লোকের সমস্যাময় জীবন হয়েছে।

দোষ কারও নয়, দোষ তার অদৃষ্টের। তার স্বকৃত কর্ম্ম-ফলের। ইহজন্মে সে এমন-কিছু করেনি যে, তার এ শাস্তি বহন করতে হয়। তবে পূর্ব্বজন্মে না জানি কত পাপই লুকিয়ে করে এসেছিল, তাই তার অন্তর্যামী এ শাস্তি তাকে দিচ্ছেন।

সব সে সইতে পারত, যদি তার না ছেলেমেয়ে থাকত। তারাই তার জীবনের সব চাইতে বড় সমস্যা—তারাই তার সব চাইতে বড় আনন্দ।

শিউলি শ্লেটটুকু নিয়ে কি সব হিজিবিজি লিখছিল, অনেক পরে বলল, "মা, কই ভাত রাঁধলে না?" মমতা কোনো সাড়া দিল না, মেয়ে মার কাছে ঘেঁষে জিজ্ঞাসা করল, "মা—ওমা—ভাত রাঁধলে না।"

"একটু পরে মা।"

ক্ষুণ্ণ হয়ে শিউলি বলল, "আরও পরে রাঁধবে মা? বিকেল হয়ে গিয়েছে যে।"

বেলার দিকে চেয়ে শুষ্ককণ্ঠে অন্যমনস্কে মমতা বলল, "আগে উনি আসুন।"

শিউলি কাঁদতে লাগল। "আমার খিদে পেয়েছে যে, বাবা নাই বা এল—বাবা ত আর আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসছে না, তুমি ভাত রাঁধ না।—যতীন দাস যেমন না খেয়ে মারা গেল আমিও কি তেমনি না খেয়ে মরে যাব?"

মমতা চমকে উঠল। "ষাট্—কে তোকে একথা বলল শিউলি?"

দুহাতে চোখের জল মুছতে মুছতে শিউলি বলল, "আমি জানি। সরলা আমায় বলেছে। তাই জন্যেই ত আজ তাদের ইস্কুলের ছুটি হয়ে গেল।"

মেয়ের মাথাটা বুকে টেনে নিয়ে তার অম্লান কপালের উপরকার চুলের গোছাটা সরিয়ে দিয়ে চুমু খেয়ে, মমতা বলল, "রাঁধছি মা—একটু দেরী কর।"

"আর দেরী করতে পার্‌ছি না মা। এখনি আমার বড় ক্ষিদে পাচ্ছে।"

উপায়হীনা জননীর বুকের ভিতরটা কি রকম ধড় ফড় করে উঠল। তাই ত! এই যে দুটি শিশুসন্তান আজ ক্ষুধায় শীর্ণ হয়ে তার কাছে আহার চাইছে, এদের এই ক্ষুধার দাবী, প্রাণের দাবী, সে জননী হয়ে কি করে অগ্রাহ্য করে? সে ত জননী, অপর ত কেউ নয়। তিলে তিলে সন্তান-হত্যা তার দ্বারা সম্ভব কি করে হয়?

বাঁচবার দাবী সবারই আছে। তারও কি নেই? সমাজের গণ্ডী পার হয়ে, তার বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে, প্রাণ বাঁচাতে সে কি নারী বলেই পারে না?

যিনি জন্ম দিয়েছেন, তাঁর আইন অমান্য করে আত্ম-হত্যায় যদি পাপ থাকে, তা হলে সমাজের সবল মুঠোর মধ্যে তিলে তিলে নিজেকে হত্যা করে জননী হয়ে সন্তান-হত্যার পাপ হতে পরিত্রাণের উপায় কি? যে-সমাজ হাত-পা বেঁধে চিরদিনের মত এই নারীজগতকে পঙ্গু করে রেখেছে, যার স্বাধীনভাবে রোজগারের কোনো ক্ষমতাই সে রাখেনি, সেই সমাজের ভিতর এই দুইটি শিশুকে সে বাঁচাবে কি করে? এই নিরুপায় বঙ্গনারীর উপর জননীর দায়িত্ব চাপান কি বিধাতারই সুবিচার হয়েছে বল্‌তে হবে! কিন্তু—না। তাকে বাঁচতেই হবে। ছেলেমেয়েকেও বাঁচাতে হবে। তার শরীরের একখানি অস্থি থাকতে সন্তানদের এভাবে না খেয়ে শুকিয়ে মারা যেতে সে দেখতে পারবে না। তাতে যাই হোক।"

"শিউলি—।" "কি মা।" "এই চিঠিখানা নরেন্দ্র-বাবুকে দাও গে ত মা।"

মা দিল, মেয়ে কাগজখানা মুড়ে হাতে নিয়ে বলল, "যাচ্ছি—কিন্তু তুমি আগে রান্না চড়াও।"

"চড়াব। আগে তুই আয়।"

মেয়ে চলে গেল। একটা বহুবিলম্বী শ্বাস মোচন করে মমতা সেইখানে আছড়ে পড়ল।

চোখ বুজে মড়ার মত মাটি আঁকড়ে পড়ে রইল। আর কালির ধারার মত বহুকষ্টের অশ্রুজল চোখের কোণ বেয়ে ঝরতে লাগল।

শিউলি এসে একখানা চিঠি আর একগোছা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিল। বল্‌ল, "মা, নরেন্দ্র-বাবু দিলেন। বললেন, আমি কাল যাব বলে দিস্।"

মমতা উঠে বসল। "যা মা আর দেরী করিস নে—এই নোটখানা নিয়ে পাঁচ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা কিনে আন। এত বেলায় আর কখন ভাত চড়াব বল্?"

একমুখ হেসে মেয়ে বলল, "পাঁচ টাকার সন্দেশ রসগোল্লা কি হবে মা? সে যে অনেক—।"

"হোক গে—তুই যা।"

তারপর সেই এক চ্যাঙারী ভাল ভাল সন্দেশ নিজের হাতে নিয়ে একটি একটি করে দুটি বুভুক্ষিত শিশুর মুখে তাদের জননী তুলে দিতে লাগ্‌ল। আর একটি একটি করে অশ্রুকণা টপ্ টপ্ করে ঝরে, তার বক্ষবসন সিক্ত করে দিতে লাগল।

সংসারে ভাল যা-কিছু দারিদ্র্যদুঃখের পেষণে এমনি করেই তারা দিনে দিনে ধ্বংস হয়ে যায়। কে তার খবর রাখে, কেবা তার প্রতিকার-চেষ্টায় মাথা ঘামায়। জগৎ জানেও না হয়ত। আর যদিই বা কেউ জানে তাহ'লে সেই দুর্ভাগিনীর নিন্দায় তারা বিশ্ব মুখর করে

তুলতে একটুও দ্বিধা করে না। একবার ভাবেও না যে, বুকভরা স্নেহ নিয়ে, সামর্থ্যহীন নিরুপায় নারী কত যন্ত্রণা নীরবে সয়েছিল, কত দুঃখেই তার এ কাজ।

বিশ্বসুদ্ধ সবাই তর্জ্জনী তুলে তাকে শাসন করে, কিন্তু যদিই অন্তর্যামী কেউ থাকেন, তাহ'লে হয়ত বা তিনি তার জন্যে ব্যথিতই হন, তাঁরও হয়ত বা করুণার অশ্রুজলই ঝরে।

৬

নূতন কাপড়-জামা পরিয়ে, ছেলেমেয়ের মুখে নূতন একটা আলোক, নূতন একটা হাসির দীপ্তি দেখে মমতার অনেক দিনের একটা ব্যর্থ আশা পূর্ণ হয়েছিল। তার আনন্দই হচ্ছিল। তবুও কি-একটা কাল মেঘ তার বুকের ভিতর এমন ঘনিয়ে এসেছিল যে, সে ভাল করে কথা কইতেও পারছিল না।

আজ নিয়ে দুদিন অনাথ বাড়ীতে অনুপস্থিত। অন্য সময় হ'লে তার উদ্বেগের আর সীমা থাক্‌ত না, আজ কিন্তু তার মনে হচ্ছিল, এ ভাল। সে এখন আরও খানিকটা না আসে যেন।

অথচ মনে মনে স্বামীকে সে যে কি পর্য্যন্ত চাইছিল, তা নিজের অগোচর অন্ততঃ ছিল না।

সারাদিন সে মুখ বুজে জীর্ণ বাড়ীখানির আগাগোড়া ধোয়া-মোছা করল। যা যা জিনিষ অনাথ খেতে ভালবাসে পরিপাটি করে রাঁধলে। অর্থাভাবে এ-সাধ তার অনেক দিন পূর্ণ হয়নি।

বিছানার চাদর, বালিশের ওয়াড় সাবান দিয়ে কেচে ধপ্‌ধপে করে শয্যা পেতে রাখল।

ছোট একখানি খাতায় খুচরা দেনা শোধ, বাজার দেনা শোধ, বাকী বাড়িভাড়া শোধ ইত্যাদি নানা ব্যয়ের হিসাব লিখে রাখল। একটা মোটা কাপড় জড়ান এক তাড়া নোট প্রায় দেড় হাজার টাকার, তারই উপর বড় বড় করে লিখল, 'তোমার পিতৃঋণ শোধের জন্য!' এ ভালই হ'ল। সে তার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়জনদের জন্য প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় সম্ভ্রম বলি দিয়েছে। নইলে যে তারা বাঁচত না। এ তার বড় রকমের আত্মহত্যা!

সে তার নারী-মহিমার ঘাড় মুচড়ে চিরদিনের মত তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আর এর পর হয়ত কোনোদিন নিজের কোনো অন্যায় কাজেই সে বাধা দিতে পারবে না। সমস্ত গৃহ-কোণ জানালা দেয়াল কড়িকাঠ যেন আজ স্তব্ধ চোখে তার মুখের দিকে চেয়েছিল।

অসীম মমতায় সে এই আত্মীয় স্বজনশূন্য, শত দুঃখের নিলয়, শত ব্যথার স্মৃতি মাখানো বাড়িখানির প্রতি আগাগোড়া বার বার চেয়ে দেখতে লাগল।

তুলসীতলায় দীপ জেলে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করবার সময় বলল, "প্রভু এ অপরাধিনীকে তার যাবার দিনে তুমি মার্জ্জনা কোরো।"

ছেলেমেয়ে বার বার প্রশ্ন করতে লাগল, "কোথায় যাবে মা আজ? কই তুমি কাপড় পরলে না?"

সে তাদের কি করে বোঝাবে যে এ যাওয়ার তার কত প্রয়োজন অথচ কত শক্ত! কত দুঃখ, কত ব্যথা, কত স্মৃতির ডোর ছিন্ন করা তা তারা কি বুঝবে?

এই শত পাকে জড়ান শত দুঃখের জীর্ণ বাড়িখানা, নিত্য অভাবরাক্ষসীর তাড়নাকে ছাড়তেও আজ তার দুঃখের অবধি ছিল না।

রাত্রি হ'ল। সকল ঘরে আলো জ্বেলে দিয়ে উঠানের মাঝে একটা আলো রেখে সে অসীম স্নেহের চোখে এই বাড়িখানার ছাদ হতে নীচে পর্য্যন্ত দেখতে দেখতে কেঁদে ফেলল। এবাড়ি তার নিজের নয়। তার শ্বশুরেরও নয়। ভাড়া বাড়ি মাত্র। তবু এই বাড়িতেই সে প্রথম নববধূ রূপে পদার্পণ করেছিল। এটি তার ঘর। এই ঘরেরই পাশের ঘরে তার শাশুড়ী মারা যান।

শাশুড়ী মারা যাবার সময় তার হাত দুটি ধরে তিনি বলে গিয়েছিলেন, "বৌমা! অনাথ আমার আজ সত্যিই অনাথ হ'ল। তুমি তাকে দেখো-শুনো। সে অন্যমনস্ক ভারি সরল, রোজগার করতে পারুক-না-পারুক তুমি তাকে গঞ্জনা দিও না। সংসার ঘাড়ে পড়লে আপনিই সব শিখবে। সে অনুরোধ সে একদিনও অবহেলা করেনি। একে একে সর্ব্বস্ব সে তাঁদের অনাথের হাতে তুলে দিয়েছে, তবু কোনো দিন মুখ ফুটে বলেও নি যে, "ওগো, রোজগার না করলে সংসার চল্‌বে কেন?

এরকম করে রোজ রোজ গয়না বিক্রী ত আর আমি করতে পারি না।"

শ্বশুরও মারা গিয়েছিলেন এই তুলসীতলায়। তিনিও মারা যাবার সময় তাকে বলে গিয়েছিলেন, "মা, আমি তোমাদের অকূলে ফেলেই চললাম। তবু ভগবান আছেন, তাঁর মঙ্গলবিধানে অমঙ্গল হতেই পারে না। অনাথ এখন যাই করুক, সংসার ঘাড়ে পড়লে সবই শিখবে। তাকে কিছু বল্‌তে হবে না।"

তা সে তাঁদের দুজনের অনুরোধই জীবনভোর প্রতিপালন করেছে। তাঁরা দুজনে তাঁদের অনাথের দিক্‌টাই দেখেছিলেন, কিন্তু রক্তমাংসে গড়া ক্ষুধাতৃষ্ণার অধীন এই বধূর দিকে তাঁদের একটুও দৃষ্টি ছিল না, বল্‌লে কি খুবই অত্যুক্তি করা হয়? অথচ তখন তার কতই বা বয়স!

সবে ষোল বৎসর মাত্র। অনেক বাসনা-কামনা তখন তার হৃদয়ের প্রতি রন্ধ্রে পোরা।

তবুও সে নিজের জীবনের ব্যর্থতায় বেশী কষ্ট পায় নি। কিন্তু সন্তানের জননী হয়ে তার একি কষ্ট! একি দুঃখ! একি সমস্যা! অথচ ঐ ছেলে দুটি না হ'লে সে বাঁচত বা কি করে? এত দুঃখঝঞ্ঝা সইত কি করে, যদি না ঐ শিশু তার বর্মের কাজ করত? পৃথিবীর কঠিনতম বন্ধনে তারা তাকে বেঁধে রেখেছে যে!

ঐ যে তার ঘর, ঐ কড়িকাঠগুলি কত মুখর কলরব, কত উচ্ছল আনন্দ, কত নীরব ব্যথা, কত অশ্রুজলের মৌন সাক্ষী।

যদি আজ তাদের ভাষা ফুটত, তা হ'লে হয়ত তারা সমস্বরে চেঁচিয়ে বলত,—"মমতা—মমতা—তুই যাস্‌নে—যাস্‌নে।"

৭

ঘরের মাটি বুক দিয়ে আঁকড়ে মমতা খানিক পড়ে রইল। শত শত বন্ধনে এ বাড়ীর ঘরদ্বার আজ তাকে টান্‌ছে—তবু তাকে যেতে হবেই।

যে স্বামীর উপর এতদিন বিতৃষ্ণার অবধিও ছিল না—আজ তাঁরই উপর করুণা তাকে সব চাইতে বাধা দিতে লাগল। আজ তাঁরই উপর দুকূল ছাপিয়ে যে সব ভালবাসা-প্রীতির বান এসে পড়ল, এতদিন তারা ছিল কোথায়?

নিত্য অভাব, নিত্য দুঃখ, নিত্য যাতনার মধ্যে কি তার অন্তরের এই এত বড় ভালবাসার বহ্নিও চাপা পড়ে গিয়েছিল? অথচ আজ যখন সে সবই পরিত্যাগ করে স্বামীর ঋণসুদ্ধ পরিশোধের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, তখন এই চিরদিনকার ভুলে থাকা—ভুলে যাওয়া ভালবাসার বহ্নি দাউদাউ করে জ্বলে উঠ্‌ল কেন? কি তার প্রয়োজন ছিল?

আজ সেই বহ্নির দাহে তার যে মনে হচ্ছে, শত দুঃখ, শত লাঞ্ছনা, শত শত কষ্ট অনাদর সহ্য করে থাকাও এর চাইতে ভাল। এমন করে পরিত্যাগ করে যেতে সে এই বদ্ধ অন্ধ বধির সমাজকেও পারছিল না।

শত কষ্টের ভিতরও তার চিরচেনা গৃহস্থালী তার চিরদিনকার পিতামহী মাতামহীর সংস্কার—নারী-জীবনের প্রধান স্বর্গ—তাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানছিল।

কিন্তু যতই হোক, সন্তান-হত্যা সে জননী হয়ে করে কি করে? তাদের মৌনভাষার আবেদন তিলে তিলে দিনে দিনে অগ্রাহ্য সে করবে কি করে?

তাকে যেতে হবেই জমিদার-পুত্রের জমিদারীতে থিয়েটারের অভিনেত্রী হয়ে। সম্পূর্ণ অজানা এক গন্তব্য পথ মাত্র তার সাম্‌নে, আর কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না।

রাত্রি প্রায় বারোটা বাজল। দ্বারে একটা গাড়ী দাঁড়াবার শব্দ হ'ল। মমতা চমকে উঠল। একবার এই ইঁট কাঠ দিয়ে তৈরী বাড়িটার দিকে চেয়ে দেখল। তারপর ঘুমন্ত ছেলেমেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সব দ্বিধা জোর করেই ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল।

স্বামীর আহার্য্য গুছিয়ে ঢাকা দিয়ে রেখে সাংসারিক আয়ব্যয়ের খাতাখানি বিছানার উপর রাখল। তারই উপর আঁচলের রিংসুদ্ধ চাবির থলোও রেখে দিল, এ যেন সমস্ত গৃহিণীপনার হিসাব-নিকাশ শোধ করে তারই পদত্যাগের নোটীশ-পত্র!

শত তালিবিশিষ্ট শতছিদ্র স্বামীর বহু ব্যবহৃত পুরানো মলিন জুতো জোড়াটার ধূলি ঝেড়ে মাথায় দিয়ে

সে ছেলে কোলে নিয়ে মেয়ের হাত ধরে ঘর হতে বাহির হয়ে এল।

তখন তারার স্বরভরা অনন্ত আকাশ তার মুখের দিকে অনন্ত ভাষা-ভরা চাউনি মেলেই চেয়েছিল।

* * *

শিয়ালদহ ষ্টেশনে ছোট একখানা ইণ্টার ক্লাস কামরার মধ্যে মমতা খোকাকে কোলে নিয়ে বসেছিল। শিউলি মার ঘাড়ে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিল। কোলের ছেলেও নিদ্রিত। রুক্ষ ঘনকৃষ্ণ অযত্ন-রক্ষিত কুণ্ডলীকৃত কবরীটায় মাথার কাপড়টা অর্দ্ধস্খলিত হয়েও আট্‌কে গিয়েছিল। জনতার আসা যাওয়া, ফিরিওয়ালার কলরব, লোকদের উঠানামা, এই সবের মধ্যে নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে মমতা নিজের বাড়ীখানার কথাই মনে মনে ভাবছিল।

এতক্ষণ নিশ্চয় তার স্বামী সেখানে ফিরেছেন, সদর-দ্বার খোলা দেখে হয়ত অবাক হয়ে গিয়েছেন, কি-কি। নিজের ঘরে তালাবন্ধ তাও তাঁকে হয়ত কম বিস্মিত করেনি। দুই একবার বোধ হয় তিনি তাকে রান্নাঘরে খুঁজে এসেছেন। খোকাকে শিউলিকে হয়ত বারে বারে ডেকেছেন। শেষে তালা ভেঙে ঘরে ঢোকা স্থির ক'রে হয়ত ঢুকে পড়েছেন। সেখানে সে বিছানা পেতে আলো জেলে, খাবার রেখে এসেছে; তাঁর অসুবিধা আজ অন্ততঃ কিছু হবে না।

কিন্তু—যদি তাকে গৃহত্যাগিনী জানতে পেরে, তিনি তার স্বহস্ত-প্রস্তুত খাদ্য, স্বহস্ত-রচিত শয্যা—স্পর্শও না করেন?

সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে মমতার একটা লজ্জার ঝড় বয়ে গেল! দাঁত দিয়ে অধর দংশন ক'রে সে একটা বিপুল ক্রন্দনোচ্ছ্বাসকে চাপতে লাগ্‌ল।

ট্রেন বংশীধ্বনি করে ছাড়ল। চলতি গাড়ীর সামনে ছুটতে ছুটতে নরেন্দ্র বলে গেল, "আমি পাশের গাড়ীতেই আছি। তোমার কিছু ভয় নেই।"

* * *

অসীম মমতা ব্যথা মাখা চাউনি মেলে গাড়ীর জানালার পথে অসীম আকাশ তার মুখের দিকেই চেয়ে ছিল।

স্বপ্ন দেখে খোকা কেঁদে উঠ্‌ল। তাকে জড়িয়ে ধরে এতক্ষণ বাদে একটি দীর্ঘশ্বাস মোচন করে মমতা বলল, 'ষাট'!

বঙ্গলক্ষ্মী

শ্রীগোপাললাল দে

তোমারে হেরেছি রোগে, শয্যাপার্শ্বে জাগর যামিনী,
জাগিছ নিষ্পন্দ বক্ষে; হেরিয়াছি পুনঃ স্বামিহীনা,
পালিছ অনাথ পুত্রে; অসহায়া, নিঃস্বা, একাকিনী,
কঠোর সংযম পুণ্যে দীপ্তরুচি, শুচিকায়া, ক্ষীণা।
সতত ত্বরিত-পদ, উদাসীন নিজ সুখ পানে,
দেখেছি ভগিনীরূপে, সখিরূপে প্রেয়সী কল্যাণী,
ব্যস্ত আছ অবিরত গৃহস্থের মঙ্গল-বিধানে;
দেহ ত্যজিয়াছ সতী; ধরণীর প্রেম সত্য জানি।

সেদিনও চিতায় বসি হাসিমুখে তব পিতামহী,
স্বর্ণ-দেহ দেছে ডালি অযোগ্যের প্রেমের স্মরণে;
নন্দিনী দুহিতা রূপে আমাদের গৃহে গৃহে রহি',
বাজাও মঙ্গল-শঙ্খ জালো দীপ তুলসী-চরণে।

অত্যাচারী, তারও পরে রাখিয়াছ প্রেম অধিকার,
জননি, ভগিনি, জায়া, নন্দিনি! তোমারে নমস্কার

পরলোকগত রাখালদাস্ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ

শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু শ্রীযুত হরিহর শেঠ মহাশয়ের পত্রে রাখালদাসের অকালমৃত্যুর জন্য চন্দননগরে শোক-সভার উদ্যোগের সমাচার পাইয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। রাখালদাস ভারতের পুরাতত্ত্ব-সেবকগণের অগ্রণী ছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পেশাদার পুরাতত্ত্ব-সেবক ছাড়া, অপর সাধারণের পুরাতত্ত্বকথা বা পুরাতত্ত্ব-সেবকের কথা লইয়া মাথা ঘামাইবার অবকাশ কোথায়!

এ দেশের শিক্ষিত যুবক-বৃদ্ধ-বনিতা এখন ভবিষ্যতের ইতিহাস স্বহস্তে গড়িয়া তুলিতে একান্ত বিব্রত। এই গঠনকার্য্য আবার যেভাবে চলিতেছে, তাহাতে অতীতের সহিত সম্বন্ধরক্ষার কোন চেষ্টা দেখা যায় না। এই অভিনব সৃষ্টিলীলার এক বিভাগের কাজ হইতেছে—অতীতের প্রধান কীর্ত্তি, বর্ত্তমান সভ্যতার বেড়াজাল হইতে সমাজকে মুক্ত করিয়া আদিম অকৃত্রিম অবস্থায়, যে অবস্থায় রাণী সুতা কাটিতেন এবং রাজা গরু চরাইতেন—when Adam delved and Eve span—সেই অবস্থায় টানিয়া লইয়া যাওয়া; অপর বিভাগের কাজ টাট্‌কা পাশ্চাত্য আদর্শে স্বহস্তে ভবিষ্যতের স্বরাষ্ট্র নির্ম্মাণ। এইরূপ গড়ন কখনও বিনাযুদ্ধে হয় নাই, সুতরাং বর্ত্তমান সময়কে যুদ্ধ-বিগ্রহের সময় বলিয়া কথিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ স্কচ্ সাহিত্যিক টমাস্ কার্লাইলের জন ষ্টার্‌লিং নামক একজন প্রিয় বন্ধু ছিলেন। ষ্টারলিং কবিতা রচনা করিতে ভালবাসিতেন। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ দশাব্দে ইংলণ্ডে গমের আমদানীর উপর যে কর ছিল (Corn Law), তাহা রহিত করিয়া দিবার জন্য যখন ঘোরতর আন্দোলন এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা চলিতেছিল, তখন কার্লাইল ষ্টারলিংকে উপদেশ দিয়াছিলেন, "যখন গ্রীক-সেনা ট্রয় নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, তখন যেমন ইউলিসিসের মত ট্রয় নগর অধিকার করিতে সমর্থ সুচতুর সেনাপতির প্রয়োজন ছিল, হোমারের মত কবির বা ভাটের কোনো প্রয়োজন ছিল না, তেমনই বর্ত্তমান গোলযোগের সময় কবির প্রয়োজন নাই, যোদ্ধা চাই। সুতরাং তুমি কবিতা রচনা ছাড়িয়া আন্দোলনে যোগদান কর।" বর্ত্তমান উত্তেজনার সময়েও আপনারা যে একজন মৃত ঐতিহাসিকের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিবার জন্য সমবেত হইতে পারিয়াছেন, তাহার একটি কারণ বোধ হয়, চন্দননগর বৃটিশ-সীমান্তের বাহিরে।

শিক্ষিত ভারতবাসী এখন স্বহস্তে স্বরাষ্ট্র গড়িতে একান্ত বিব্রত। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উপাদান মানুষ। মানুষরূপ ইষ্টকরাশিকে পরস্পরের সহিত সুদৃঢ়-রূপে বদ্ধ রাখিবার মশলা—দেশানুরাগ প্রভৃতি উচ্চ আদর্শ। কিন্তু স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে হইলে স্থপতিকে ইট এবং মালমশলা ছাড়া অন্য বিষয়েও দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথমেই তাঁহাকে ভিতের মাটি পরীক্ষা করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে হয় সেই মাটি প্রাসাদের ভার সহিতে পারিবে কি না; স্থানীয় জল, বায়ু পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়, জলবায়ুর সংস্পর্শে ইটে লোনা ধরিবে কি না। সেইরূপ যে জননায়ক দৃঢ়ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে স্বরাষ্ট্র গড়িতে চাহেন, তাঁহাকে বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, দেশের মাটি, দেশের জলবায়ু দেশের ফল ফসল (physical environment) দেশের লোক-চরিত্রের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। মানব-প্রকৃতির উপর বাহ্যবস্তুর প্রভাব একদিনে কার্য্যকরী হয় না, দীর্ঘকালের সংযোগের ফলে ধীরে ধীরে ফলোৎপাদন করে। এ দেশের জলবায়ু, ফলফুল এই দেশবাসীর স্বভাবকে অন্য দেশের লোকের তুলনায় কতটা বিভিন্ন করিয়া তুলিয়াছে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে ইতিহাসের অনুশীলন করা আবশ্যক। মানবের অদৃষ্ট-চক্রের উপর আরও একটি শক্তির বিশেষ প্রভাব আছে।

এই শক্তি বংশধারা (heredity)। আমাদের ধমনীতে যে বংশের এবং যে জাতির রক্ত প্রবাহিত হইতেছে তাহা আমাদিগকে কিরূপ সামর্থ্য দান করিয়াছে, ইহাও হিসাব করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই হিসাব করিতে হইলেও ইতিহাসের শরণাগত হইতে হইবে। যে জননায়ক জনসাধারণের ধাত এবং ইতিহাস উপেক্ষা করিয়া নবরাষ্ট্র গড়িতে যাইবেন, তিনি কাগজে কলমে অভিনব ইউটোপিয়ার চিত্র অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার পক্ষে স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এ দেশের লোক যখন একথা বুঝিতে পারিবেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন, আজ আমরা যাঁহার অকালমৃত্যুতে শোক-প্রকাশ করিবার জন্য মিলিত হইয়াছি, সেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কত বড়লোক ছিলেন এবং দেশের জন্য তিনি কত কাজ করিয়া গিয়াছেন।

একটি লাটিন প্রবাদ আছে যাহার অর্থ—'Poet is born, not made', কবি তৈয়ার করা যায় না, কবিত্ব জন্মগত। প্রকৃত পুরাতত্ত্ববিদ্‌ও কোনো শিক্ষাদীক্ষার দ্বারা তৈয়ারী করা যায় না, শিক্ষাদীক্ষার মূলে জন্মগত প্রবৃত্তি, জন্মগত প্রতিভা থাকা চাই। রাখালদাস এইরূপ প্রবৃত্তি, এইরূপ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রাখালদাস আমাকে বলিয়াছিলেন, কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে যখন তিনি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন, তখন শাস্ত্রী-মহাশয়ের উপদেশের ফলে তাঁহার মনে পুরাতত্ত্ব অনু-শীলনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাস্ত্রী-মহাশয়ের ক্লাশে অনেক ছাত্র পড়িয়া গিয়াছেন, অনেকে তাঁহার উপদেশ শুনিয়া বিশেষ সুখ্যাতির সহিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইয়াছেন, কিন্তু সেখান হইতে একটি বই দু'টি রাখালদাস বাহির হয় নাই। অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকারের নিকট শুনিয়াছি, বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজ পরিত্যাগের পূর্ব্বেই পুরাবিদ্যা শিক্ষার জন্য রাখালদাস ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের পুরাবস্তু-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার থিওডোর ব্লকের শরণাগত হইয়াছিলেন। থিওডর ব্লক যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন রাখালদাস ছায়ার মত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন। রাখালদাস বরাবরই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেন, পুরাতত্ত্ব বিষয়ে যাহা কিছু শিক্ষা করিয়াছেন তাহার জন্য তিনি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং থিওডর ব্লকের নিকট ঋণী। ১৯০৫ সালে অধ্যাপক ভাণ্ডারকার যখন ব্লকের স্থানে কিছুদিনের জন্য মিউজিয়মে কাজ করিতে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি রাখালদাসের সংগৃহীত ফটোগ্রাফাদি উপকরণ পরীক্ষা করিয়া এবং পুরাবিদ্যা অর্জ্জনের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তখন হইতেই রাখালদাস শক-কুষাণ যুগের ইতিবৃত্ত অনুশীলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

ডাক্তার থিওডর ব্লকের পরলোকগমনের অল্পকাল পরে, ১৯০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে, দিঘাপতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় আমাকে রাখালদাসের সহিত পরিচিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই সময় ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে রাখালদাস, শরৎকুমার প্রভৃতি কর্ম্মিগণ সাহিত্য-পরিষদের রমেশভবনের জন্য পুরাবস্তু সংগ্রহ করিতেছিলেন। সেই সংগ্রহকার্য্যের প্রাণস্বরূপ ছিলেন রাখালদাস। পর বৎসর, কতক পরিমাণে রাখালদাসের পরামর্শানুসারেই কুমার শরৎকুমার আমাদিগকে লইয়া বরেন্দ্রের ভগ্নাবশেষ পর্য্যবেক্ষণ এবং পুরাবস্তু সংগ্রহ আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথম যাত্রায় রাখালদাসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। সংগৃহীত বস্তু ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামে এবং সাহিত্য-পরিষদে প্রেরিত হইবে, কিংবা রাজসাহীতে রক্ষিত হইবে, ইহা লইয়া আমাদের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় আমরা স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছিলাম। স্বর্গীয় নাটোরের মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়ের সহিত মানসী পত্রিকার যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া-ছিল, তাহারও মূলে রাখালদাস ছিলেন।

রাখালদাস ইংরেজী ও বাঙ্গলা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ, অনেক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইখানি বৃহৎ ইংরেজি গ্রন্থ—উড়িষ্যার ইতিহাস এবং প্রাচ্য ভারতের মধ্যযুগের ভাস্কর্য্যের বিবরণ, এখন যন্ত্রস্থ। এই সকল রচনার অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয়

দিবার অবকাশ আমার নাই। কিন্তু পুরাবৃত্তকার রূপে রাখালদাসের যে একটি অতি মহৎ গুণ ছিল, তাহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক। এ দেশে এখন অনেকেই প্রাচীন ইতিহাসের চর্চ্চা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ স্থলেই দেশের অতীত কালের গৌরব-কাহিনীর কীর্ত্তন ইতিহাস-চর্চ্চার লক্ষ্য বলিয়া ঘোষিত হয় এবং সেই স্বরেই ইতিহাস সঙ্কলিত হয়। কিন্তু এই হিসাবে ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে,সত্যের মর্য্যাদার হানি হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা থাকে। জাতীয় জীবনে গৌরবকর, অগৌরবকর এবং মামুলী সকল প্রকার ঘটনাই অবশ্য ঘটিয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে ইতিহাসে কেবল গৌরবকর ঘটনার বিবরণের স্থান দিতে গেলে তাহা একদেশদর্শিতা-দোষে দুষ্ট হইয়া যায় এবং স্থলবিশেষে সত্যের অপলাপও ঘটিতে পারে। রাখালদাস সত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। ইতিহাস সঙ্কলন করিতে গিয়া কোনো পক্ষের ওকালতী করা বা কোনো মত প্রচার (propaganda) করা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেন না। পাল-যুগের শেষভাগে রচিত সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' নামক ঐতিহাসিক কাব্যে এবং কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের কমৌলীতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বরেন্দ্র দেশকে পাল-রাজবংশের আদিনিবাস স্থান, অর্থাৎ পাল-রাজগণ বাঙ্গালী ছিলেন এইরূপ কথিত হইয়াছে। পালবংশের রাজ্যলাভের প্রায় তিনশত বৎসর পরে সঙ্কলিত এই বিবরণ যে নির্ভরযোগ্য একথা রাখালদাস অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মৌর্য্য ও শুঙ্গ যুগের ভারতীয় শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব আছে কি না, এই কথা লইয়া একদিকে এদেশী এবং অপর দিকে বিদেশী পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বাদ-বিবাদ চলিতেছে, অনেক এদেশী পুরাবিদেরই মত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষে কোনো ভাল জিনিষের উৎপত্তি স্বীকার করা কষ্টকর মনে করেন বলিয়াই প্রাচীন-ভারত শিল্পে পাশ্চাত্য প্রভাব দেখিতে পান। রাখাল-দাস এই প্রকার বাদ-বিবাদে ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনি যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেন। স্বয়ং বন্দ্যঘটীয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ হইয়াও আদিশূর যে বন্দ্যঘটীয়গণের বীজপুরুষকে কান্যকুব্জ হইতে আনিয়া বঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কেবল কুলপঞ্জিকার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া রাখালদাস একথা স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। এইরূপ সকল প্রকার সংস্কারবর্জ্জিত বিশুদ্ধচিত্তে সত্যের সাধন আমাদের দেশের ঐতিহাসিকসমাজে সুলভ নহে।

রাখালদাসের প্রধান কীর্ত্তি, রাখালদাসের অক্ষয় কীর্ত্তি—মহেন-জো-দড়োতে অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক যুগের সভ্যতার নিদর্শনের আবিষ্কার। রাখালদাসের মহেন-জো-দড়োতে ভগ্নস্তূপ খননের পূর্ব্বেই হরপ্পায় এই শ্রেণীর পুরাবস্তু আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিন্তু এই সকল বস্তু যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন তাহা রাখালদাসই প্রথম অনুমান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তিনিই তৎপ্রতি পুরাতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। রাখালদাসের আবিষ্কারের গুরুত্ব বুঝিতে হইলে তাহার প্রাচীনতা বিবেচ্য। এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে বৈদিক সাহিত্য ছাড়া অবিসম্বাদিত রূপে মৌর্য্য যুগের পূর্ব্বকালের উন্নত সভ্যতার কোন নিদর্শন আমাদের হস্তগত ছিল না। এই আবিষ্কার হিন্দুসভ্যতার ইতিহাসকে খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দ হইতে এক ধাক্কায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দে পৌঁছাইয়া দিয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নাবশেষ যে অতি প্রাচীন তাহার এক প্রমাণ এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে লোহার চিহ্নও পাওয়া যায় নাই, কেবল ফ্লিণ্ট পাথরের ছুরি এবং তামার তৈয়ারী অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হইয়াছে, যে যুগে মানুষ লোহার অস্তিত্ব অবগত ছিল না, লোহার অভাবে তামার অস্ত্র ব্যবহার করিত, এবং যে যুগ, তামা আবিষ্কারের পূর্ব্বে ব্যবহৃত পাথরের অস্ত্রও একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই, হরপ্পার এবং মহেন-জো-দড়োর ভগ্নস্তূপ সেই অতি প্রাচীন পাষাণ-যুগের এবং তাম্রযুগের সন্ধিক্ষণের সভ্যতার পরিচায়ক। খৃষ্টাব্দের হিসাবে এই সভ্যতার বয়ঃক্রম কত তাহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হরপ্পায় এবং মহেন-জো-দড়োতে অপরিচিত অক্ষরের লেখাযুক্ত বহুসংখ্যক সচিত্র মোহর (seal পাওয়া গিয়াছে। অনেক দিন পূর্ব্বে ঠিক এই প্রকার একটি মোহর পারস্যের অন্তর্গত সুসার ভগ্নাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল এবং আর একটি মোহর কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মেসোপটেমিয়ার অন্তর্গত কিশের ভগ্নাবশেষ খনন-কালে পাওয়া গিয়াছে। এই দুইটি মোহর যে সুসায় এবং কিশে তৈয়ারী হয় নাই, কিন্তু হরপ্পা—মহেন-জো-দড়ো অঞ্চল হইতে তথায় নীত হইয়াছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য। সুসার এবং কিশের ভগ্নস্তূপের যে স্তরে এই সিন্ধুদেশীয় মোহর আবিষ্কৃত হইয়াছিল, নানা প্রমাণের বলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ সেই স্তরের সময় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০০ অব্দ। সিলমোহর ছাড়া অন্যান্য বস্তুও মেসোপটেমিয়ার ভগ্নস্তূপনিচয়ের ঐ একই স্তরে পাওয়া গিয়াছে যাহা খুব সম্ভব সিন্ধুদেশ হইতে সেখানে আমদানী করা হইয়াছিল। ঋক্‌ বেদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির রচনা-কাল লইয়া পণ্ডিত-সমাজে বিস্তর মতভেদ থাকিলেও, মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পা নগরী যে খৃষ্টাব্দের আরম্ভের ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল, এই বিষয়ে মতভেদের অবকাশ নাই। সেই সময় এই নগরীদ্বয়ের সভ্যতা নিকটবর্ত্তী দেশের সভ্যতার তুলনায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং এ সভ্যতাকে ধার করা সভ্যতা অথবা আগন্তুক-গণের আনীত সভ্যতা বলা যায় না; এই সভ্যতা সিন্ধু-নদের তীরেই বিকাশ লাভ করিয়াছিল। মহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা যেমন প্রাচীন, তেমনই উন্নত ছিল, একথাও সর্ব্ববাদিসম্মত। এই সমুন্নত সভ্যতা যখন আমদানী করা নয়,—দেশজ, তখন স্বীকার করিতে হইবে, আনুমানিক ছয় সাত হাজার বৎসর পূর্ব্বে সিন্ধু-তীরে সভ্যতার সূত্রপাত হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে টাইগ্রিস্‌ এবং ইউফ্রেটিস্‌ নদীর তীরে যে সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহা দেশজ নহে, আগন্তুকগণের আনীত। এখন জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে, সুমেরীয় সভ্যতা কি সিন্ধুদেশ হইতে গত ঔপনিবেশিকগণের সৃষ্টি? প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুদেশের সভ্যতা এবং

সুমেরীয় সভ্যতায় কোনো কোনো বিষয়ে এত প্রভেদ আছে যে, পণ্ডিতেরা এই দুই সভ্যতার মধ্যে এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা আপাতত সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ভারতবর্ষের পশ্চিম-সীমান্তের বাহিরে, অথচ ভারতবর্ষেরই নিকটে, হয়ত বেলুচিস্থান অথবা সিস্তানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার যাহা মূল, তাহা রোপিত হইয়াছিল। সেই মূল হইতে যে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহার এক কাণ্ড সিন্ধুনদের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং আর এক কাণ্ড টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস নদের তীরদেশে পৌছিয়াছিল।

সিন্ধু-তীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার উৎপত্তি অপেক্ষা পরিণতির প্রসঙ্গ আমাদের কাছে অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। সুমেরীয় সভ্যতার মূল ধারা এবং মিশরীয় সভ্যতার মূলধারা বহুকাল শুকাইয়া গিয়াছে। সিন্ধু-তীরের সভ্যতার মূলধারাও কি সেই দশাই প্রাপ্ত হইয়াছে? না, হিন্দু-সভ্যতার আকার ধারণ করিয়া আজও প্রবহমান আছে? গত বৎসরে প্রকাশিত একখানি পুস্তকে আমি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি, সিন্ধু-তীরের প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা, বর্ত্তমান হিন্দু-সভ্যতার অন্তরালে এখনও জীবিত রহিয়াছে, অর্থাৎ হিন্দু-সভ্যতা মূলতঃ সিন্ধু-তীরের প্রাচীন সভ্যতা। রাখালদাসের আবিষ্কারের ফলে ঐতিহাসিক চিন্তা-স্রোত এখন কোন্ খাতে চলিয়াছে তাহা দেখাইবার জন্য একথাটা একটু খোলসা করিয়া বলা আবশ্যক মনে করি। রাখালদাসের পরে যাঁহারা মহেন-জো-দড়ো খনন করিয়াছেন তাঁহারা কতকগুলি পাথরের মূর্ত্তি পাইয়াছেন, যে-সকল মূর্ত্তির অঙ্গ-ভঙ্গী এবং মুখভঙ্গী হুবহু হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত ধ্যানযোগীর মুখভঙ্গীর মত। ভগবৎ গীতায় (৬।১১-১৪) উক্ত হইয়াছে—

> শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
> নাত্যুচ্ছিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
> তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
> উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
> সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির।
> সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
> প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্বহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
> মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥

মহেন-জো-দড়োর এই সকল মূর্ত্তির হাত-পা ভাঙিয়া গিয়াছে। কিন্তু যে অংশ অবশিষ্ট আছে তাহাতে 'সমং কায়শিরোগ্রীবং' এবং নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি পরিষ্কার বিদ্যমান রহিয়াছে। মহেন জো-দড়োতে প্রাপ্ত কোনো কোনো মোহরে যোগীর মত পদ্মাসনবদ্ধপদে উপবিষ্ট মনুষ্যের চিত্রও অঙ্কিত রহিয়াছে। ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও এইরূপ মূর্ত্তি বা চিত্র দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ভারতবর্ষে যত দেব-দেবীর এবং বুদ্ধ বা জিনের মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে তাহার সকল-গুলিই নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। ইহার কারণ হিন্দুর উপাসনাকাণ্ড এক হিসাবে যোগীর পূজা। বুদ্ধ এবং জিনগণ ধ্যানস্থ বা যোগযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। বৈষ্ণবের বিষ্ণু এবং শৈবের শিবও যোগীর আকারে কল্পিত। তাই বুদ্ধ ও জিন মূর্ত্তির ন্যায় হিন্দুর ইষ্টদেবতার মূর্ত্তিও নাসিকাগ্রবদ্ধদৃষ্টি। যে ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষণে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্ত্তির সহিত মহেন-জো-দড়োর মূর্ত্তির এমন ঐক্য দেখা যায়, সেই ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণীর মূর্ত্তির মধ্যে যে একটা নিকট সম্পর্ক আছে, এ কথা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের মহেন জো-দড়োর অধিবাসিগণের মধ্যে কোনো এক প্রকার যোগসাধন এবং যোগস্থ দেবতার বা সাধুর উপাসনা প্রচলিত ছিল, যাহা কালক্রমে হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের প্রাণবস্তুতে পরিণত হইয়াছে।

রাখালদাসের মহান্ আবিষ্কার যে মানবের ইতিহাস এবং সমাজ-বিজ্ঞানকে উন্নতির পথে কতদূর লইয়া যাইবে তাহা এখন অনুমান করা দুঃসাধ্য। ভবিষ্যতে এই সকল বিদ্যার যতই অনুশীলন হইবে, রাখালদাসের স্মৃতির প্রতি পণ্ডিত-সমাজের শ্রদ্ধা ততই বাড়িতে থাকিবে। রাখালদাসকে আর আমরা সশরীরে দেখিতে পাইব না বটে, কিন্তু রাখালদাসের মৃত্যু নাই, রাখালদাস অমর। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

---

* ১৯৩০, ৭ই জুন তারিখে চন্দননগর পুস্তকাগারের উদ্যোগে নৃত্যগোপাল স্মৃতিমন্দিরে শোকসভায় সভাপতির নিবেদন।

মুসাফীর

জসীম উদ্‌দীন

চলে মুসাফীর গাহি,
এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলী, কেহ নাই শুনিবার।
চলে মুসাফীর নির্জ্জন পথে, দুপুরের উঁচ বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।
দুধারে উধাও বৈশাখ মাঠ, রৌদ্রেরে বুকে চাপি,
ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস, ধুলার বসন ছিঁড়ে,
ফুঁদিয়ে ফুঁদিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের ঢেলারে ঘিরে।
দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফীর, আয় আয় আয় আয়,
কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হল্‌কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।

চলে মুসাফীর দূর দূরাশার জনহীন পথপাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে দিগন্তে দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।
মেঘের খাড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করী,
দূর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্ন মুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছায়, লোল সে রসনা মেলি,
হাসে দিগন্তে মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।
চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে,
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মসজিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিণী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূর—কতদূর.
আর কতদূরে গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গণেছে বরষ মাস,
ধূঁয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোন গেঁয়ো ঘর হতে
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিনী নদীসোঁতে?

চলেছে পথিক চলেছে সে তার ললাটের লেখা পড়ি,
সীমালেখাহীন পথ-মায়াবীর অঞ্চলখানি ধরি;
ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বধূরা বঁধুর গলে,
বাহুর লতায় বাহুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখরজনীর মদিরা সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি।
নতুন বধূর বক্ষ জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মাণিকের ধূলি।
চলিছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্ত্তনাদ,
ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।

রে পথিক, বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন করে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে?
কোন্ ছায়াপথ নীহারিকাপারে, দেখেছিলি তুই কারে,
কোন্ সে কথার মাণিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে!
কার গেহ ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিনিকি ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী!

চলে মুসাফীর আপনার রাহে কোন দিকে নাহি চায়,
দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখী গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আঁহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কও—কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল্, আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল!

সে নিঠুর আজো কহিল না কথা, রহস্য-যবনিকা,
খুলিয়া আজিও পরাল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা।
চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,
কোনো পথ বাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরাল না কেউ তারে
চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবন্ত হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহারে ঘিরে!

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৫

ছাত্রীকে পড়াইতে যাইবার সময় অপুর গায়ে যেন জ্বর আসে, ছুটী-ছাটার দিনটা না যাইতে হইলে সে যেন বাঁচিয়া যায়। অদ্ভুত মেয়ে! এমন কারণে-অকারণে প্রভুত্ব জাহির করার চেষ্টা, এমন তাচ্ছিল্যের ভাব—এই রকম সে একমাত্র অতসী-দি'তে দেখিয়াছে।

একদিন সে ছাত্রীর একটা রূপা-বাঁধানো পেন্সিল হারাইয়া ফেলিল, পকেটে ভুলিয়া লইয়া গিয়াছিল, কোথায় ফেলিয়াছে, তারপর আর কিছু খেয়াল ছিল না, পরদিন প্রীতি সেটা চাহিতেই তাহার তো চক্ষুস্থির। সঙ্কুচিত-ভাবে বলিল—কোথায় যে হারিয়ে ফেল্‌লাম - কাল বরং একটা কিনে—

প্রীতি অপ্রসন্ন মুখে বলিল, ওটা আমার দাদুমণির দেওয়া বার্থ-ডে গিফ্‌ট্ ছিল—

ইহার পর আর কিনিয়া আনিবার প্রস্তাবটা উত্থাপিত করা যায় না, মনে মনে ভাবিল, কাল থেকে ছেড়ে দেবো—এখানে আর চল্‌বে না।

কি একটা ছুটীর পরদিন সে পড়াইতে গিয়াছে, প্রীতি জিজ্ঞাসা করিল কাল যে আসেন নি? অপু বলিল, কাল ছিল ছুটির দিনটা—তাই আর আসিনি। প্রীতি ফট্ করিয়া বলিয়া বসিল—কেন, কাল তো আমাদের সরকার, বাইরের দুজন চাকর, ড্রাইভার সব এসেছিল? আমার পড়াশুনো কিছু হ'ল না, আজ ডিটেন্ করে রাখ্‌লে পাঁচটা অবধি। অপুর হঠাৎ বড় রাগ হইল, দুঃখও হইল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, আমি তোমাদের সরকার কি রাঁধুনী ঠাকুর তো নই প্রীতি? কাল স্কুল-কলেজ সব বন্ধ ছিল, এজন্যে ভাবলাম আর যাব না। আমার যদি ভুলই হয়ে থাকে—তোমরা সেই রকম মাষ্টার রেখো যিনি এখানে বাজার-সরকারের মত থাক্‌বেন আমি কাল থেকে আর আস্‌বো না বলে যাচ্ছি।

বাটীর বাহিরে আসিয়া মনে হইল দেওয়ানপুরের নির্ম্মলাদের কথা। তাহারাও তো অবস্থাপন্ন, তাহাদের বাড়ীতেও তো সে প্রাইভেট মাষ্টার ছিল, কিন্তু সেখানে সে ছিল বাড়ীর ছেলের মত—নির্ম্মলার মা দেখিতেন ছেলের চোখে, নির্ম্মলা দেখিত ভাইয়ের চোখে—সে স্নেহ কি পথেঘাটে সুলভ? নির্ম্মলার মত মমতাময়ীকে তখন সে চিনিয়াও চেনে নাই, আজ নতুন করিয়া তাহাকে আর চিনিয়া লাভ কি? আর লীলা? সে কথা ভাবিতেই বুকের ভিতরটা যেন কেমন করিয়া উঠিল—যাক্ সে-সব কথা।

হাতের টাকায় কিছুদিন চলিল। ইতিমধ্যে কলেজে একটা বড় ঘটনা হইয়া গেল, প্রণব লেখাপড়া ছাড়িয়া দেশের নাকি কি কাজ করিতে চলিয়া গেল। সকলে বলিল, সে এনার্কিষ্ট দলে যোগ দিয়াছে।

প্রণব চলিয়া যাওয়ার মাসখানেক পরে একদিন অপু হোটেলে খাইতে গিয়া দেখিল সুন্দর-ঠাকুর হোটেল-ওয়ালার মুখ ভার ভার। দু-তিন মাসের টাকা বাকী, হাতে যতদিন ছিল দিয়াছে, তারপর বার বার তাগাদা সত্ত্বেও শোধ দিতে পারে নাই। পাওনাদার আর কতদিন শোনে? আজ সে স্পষ্ট জানাইল দেনা শোধ না করিলে আর সে খাইতে দিতে পারিবে না। বলিল, বাবু অন্য খদ্দের হ'লে মাসের পয়লাটি যেতে দিই নে—ওই কেষ্টোবাবু খায়, ওদের পাটের কলের হপ্তাটি পেলে দিয়ে দেয়—তুমি ব'লে আমি কিছু বলেচি না—দু-মাসের ওপর আজ লিয়ে সাত দিন। যাক্ আমি আর পারবো না, আপুনি আর আসবেন না—আমার ভাত একজন ভদ্দর নোকের ছেলে খেয়েচে ভাব্‌বো, আর কি কর্‌বো?

কথাগুলি খুব ন্যায্য এবং আদৌ অসঙ্গত নয়, কিন্তু খাইতে গিয়া এরূপ রূঢ় প্রত্যাখ্যানে অপুর চোখে জল আসিল। তাহার তো একদিনও ইচ্ছা ছিল না যে,

ঠাকুরকে সে ফাঁকি দিবে, কিন্তু সেই প্রীতির টুইশানি ছাড়িয়া দেওয়ার পরে আজ দুই তিন মাস একেবারে নিরুপায় অবস্থায় ঘুরিতেছে যে!

বিপদের উপর বিপদ। দিন-দুই পরে সে কলেজে গিয়া দেখিল নোটিশবোর্ডে লিখিয়া দিয়াছে যাহাদের মাহিনা বাকী আছে এক সপ্তাহের মধ্যে শোধ না করিলে কাহাকেও বার্ষিক পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। অপু চক্ষে অন্ধকার দেখিল। প্রায় গোটা এক বৎসরের মাহিনাই যে তাহার বাকী!···মাত্র মাস-দুইয়ের মাহিনা দেওয়া আছে—সেই প্রথম দিকে একবার, প্রীতির টুইশানির টাকা হইতে একবার—তাহার পর হইতে খাওয়াই জোটে না তো কলেজের মাহিনা!···দশ মাসের বেতন ছ'টাকা হিসাবে ষাট টাকা বাকী—কোনোদিক হইতে একটা কলঙ্কধরা নিকেলের সিকিও আসিবার সুবিধা নাই যাহার—ষাট টাকা সে এক সপ্তাহের মধ্যে কোথা হইতে যোগাড় করিবে?···হয়ত তাহাকে পরীক্ষা দিতে দিবে না, গ্রীষ্মের ছুটীর পর সেকেণ্ড ইয়ারে উঠিতেও দিবে না—সারা বছরের কষ্ট ও পরিশ্রম সব ব্যর্থ নিরর্থক হইয়া যাইবে। উপায়?

কলেজ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় সে হাত-খরচের পয়সা হইতে চাউল ও আলু কিনিয়া আনিয়া থাকিবার ঘরের সাম্‌নের বারান্দাতে রান্নার যোগাড় করিল। হোটেলে খাওয়া বন্ধ হইবার পর হইতে আজ কয়দিন নিজে রাঁধিয়া খাইতেছে। হিসাব করিয়া দেখিয়াছে ইহাতে খুব সস্তায় হয়। কাঠ কিনিতে হয় না। নীচের কারখানার ছুতার-মিস্ত্রীদের ঘর হইতে কাঠের চোঁচ ও টুক্‌রা কুড়াইয়া আনে, পাঁচ ছ' পয়সায় খাওয়া-দাওয়া হয়। আলুভাতে ডিমভাতে আর ভাত। ভাত চড়াইয়া ডাক দিল—ও বহু—বহু—নিয়ে এস আমার হয়ে গেল বলে—ছোট কাঁসিটাও এনো—

কারখানার দারোয়ান শম্ভুদত্ত তেওয়ারীর বৌ একখানা বড় পিতলের থালা ও কাঁসি লইয়া উপরে আসিল—এক লোটা জল ও গোটাকতক কাঁচা লঙ্কাও আনিল। থালা বাসন নাই বলিয়া সে-ই দুই বেলা থালা আনিয়া দেয়। হাসিমুখে বলিল, মছলিকী তরকারি হম্ নেহী ছুয়েঁগা বাবুজী—

—কোথায় তোমার মছ্‌লি?···ও শুধু আলু—একটু হলুদ বাটা এনে দ্যাও না বহু?···রোজ রোজ আলুভাতে ভাল লাগে না—

বহুকে ভাল বলিতে হইবে, রোজ উচ্ছিষ্ট থালা নামাইয়া লইয়া যায়, নিজে মাজিয়া লয়—হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণে যাহা কখনও করে না—অপু বাধা দিয়াছিল, বহু বলে, তুম্ তো হমারে লেড়্‌কেকে বরাবর হোকে বাবুজী—ইস্‌মেঁ ক্যা হ্যায়?···

দিনকতক পরে মায়ের একটা চিঠি আসিল, হঠাৎ পিছ্‌লাইয়া পড়িয়া সর্ব্বজয়ার পায়ে বড় লাগিয়াছে, পয়সার কষ্ট যাইতেছে। মায়ের অভাবের খবর পাইলে অপু বড় ব্যস্ত হইয়া উঠে, মায়ের নানা কাল্পনিক দুঃখের চিন্তায় তাহার মনকে অস্থির করিয়া তোলে, হয়ত আজ পয়সার অভাবে মায়ের খাওয়া হইল না, হয়ত কেহ দেখিতেছে না মা আজ দু-দিন উপবাস করিয়া আছে, এই-সব নানা ভাবনা আসিয়া জোটে, নিজের আলুভাতে ভাতও যেন গলা দিয়া নামিতে চায় না।

এদিকে আর এক গোলমাল—কারখানার ম্যানেজার ইতিপূর্ব্বে তাহাকে বার-দুই ডাকাইয়া বলিয়াছিলেন উপরে সে যে ঘরে আছে তার সমস্তটাই ঔষধের গুদাম করা হইবে—সে যেন অন্যত্র বাসা দেখিয়া লয়—বলিয়াছিলেন আজ মাসতিনেক আগেকার কথা, তাহার পর আর কোনো উচ্চবাচ্য করেন নাই—অপুও থাকিবার স্থানের জন্য কোথায় কিভাবে কাহার কাছে গিয়া চেষ্টা করিবে বুঝিতে না পারিয়া একরূপ নিশ্চেষ্টই ছিল এবং দিন যাইতে দেখিয়া ভাবিয়াছিল ও-কথা হয়ত আর উঠিবে না—কিন্তু এইবার যেন সময় পাইয়াই ম্যানেজার বেশী পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন।

হাতের পয়সা ফুরাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে অপু এত সাধ করিয়া কেনা সখের আসবাবগুলি বেচিতে আরম্ভ করিল। প্রথমে গেল প্লেট্‌গুলি—তাও কেহই কিনিতে চায় না—অবশেষে চৌদ্দ আনায় এক পুরানো দোকানদারের কাছে বেচিয়া দিল। সেই দোকানদারই ফুলদানিটা

আট আনায় কিনিল, দুখানা ছবি দশ আনা। তবু শেষ পর্য্যন্ত সে স্যাণ্ডোর ডাম্বেল্‌টা ও জাপানী পর্দ্দাটা প্রাণপণে আঁকড়াইয়া রহিল।

সে শীঘ্রই আবিষ্কার করিল ছাতু জিনিষটার অসীম গুণ—সস্তার দিক্ হইতেও বটে, অল্প খরচে পেট ভরাইবার দিক হইতেও বটে। আগে আগে চৈত্র বৈশাখ মাসে তাহার মা নতুন যবের ছাতু কুটিয়া তাহাদের খাইতে দিত—তখন ছাতু ছিল বৎসরের মধ্যে একবার পাল-পার্ব্বণে সখ করিয়া খাইবার জিনিষ, তাই এখন হইয়া পড়িল প্রাণধারণের প্রধান অবলম্বন। আগে একটু-আধটু গুড়ে তাহার ছাতু খাওয়া হইত না। গুড় আরও বেশী করিয়া দিবার জন্য নিশ্চিন্দিপুরে থাকিতে মাকে কত বিরক্ত করিয়াছে—এখন খরচ বাঁচাইবার জন্য শুধু নুন ও তেওয়ারী-বহুর নিকট হইতে কাঁচা লঙ্কা আনাইয়া তাই দিয়া খায়। অভ্যাস নাই, খাইতে ভাল লাগে না।

কিন্তু ছাতু খুব সুস্বাদু না হউক, তাহাও বিনা পয়সায় পাওয়া যায় না। অপু বুঝিতেছিল টানাটানি করিয়া আর বড়-জোর দিনদশেক—তার পর কূল-কিনারাহীন অজানা মহাসমুদ্র!...তখন কি উপায়?...

সে রোজ সকালে উঠিয়া নিকটবর্ত্তী এক লাইব্রেরীতে গিয়া দৈনিক ইংরেজি বাংলা কাগজে ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন খুঁজিয়া ও চেষ্টা করিয়া দেখিল। গ্যাস্-পোষ্টের গায়ে অনেক সময় এই ধরণের বিজ্ঞাপন মারা থাকে—চলিতে চলিতে গ্যাস্ পোষ্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া-বেড়ানো তাহার একটা বাতিক হইয়া দাঁড়াইল। প্রায়ই বাড়ী-ভাড়ার বিজ্ঞাপন। আলো ও হাওয়াযুক্ত, ভদ্রপরিবারের থাকিবার উপযোগী দুইখানি কামরা ও রান্নাঘর, ভাড়া নামমাত্র। যদি বা কালেভদ্রে এক আধটা ছেলে-পড়ানোর বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়,তার ঠিকানাটি আগে কেউ ছিঁড়িয়া দিয়াছে, পাছে উমেদার বেশী হইয়া পড়ে। কাপড় ময়লা হইয়া আসিল বেজায়, সাবানের পয়সার অভাবে কাচিতে পারিল না। তেওয়ারীর স্ত্রী একদিন সোডা ও সাবান দিয়া নিজেদের কাপড় সিদ্ধ করিতে বসিয়াছে, অপু নিজের ময়লা সার্ট ও ধুতিখানা লইয়া গিয়া বলিল—বহু, তোমার সাবানের বোল্ একটু দেবে, আমি এ দুটোয় মাখিয়ে রেখে দি—তার পর ওবেলা কলেজ থেকে এসে কলে জল এলে কেচে দেবো—দেবে?...

তেওয়ারী বহু বলিল—দে দিজিয়ে না বাবুজী, হাম্ হাঁড়ি মে ডাল দেগা।

অপু ভাবে—আহা, বহু কি ভাল লোক!...যদি কখনও পয়সা হয় ওর উপকার করবো—

এক একবার তাহার মনে হয় যদি কিছু না জোটে, তবে এবার হয়ত কলেজ ছাড়িয়া দিয়া মনসাপোতা ফিরিতে হইবে—কিন্তু সেখানেও আর চলিবার কোনো উপায় নাই, তেলি ও কুণ্ডুরা পূজার জন্য অন্যস্থান হইতে পূজারী বামুন আনাইয়া জায়গাজমি দিয়া বাস করাইয়াছে। আজ কয়েকদিন হইল মায়ের পত্রে সে-খবর জানিয়াছে, এখন তাহার মাকেও আর তেলিরা তেমন সাহায্য করে না, দেখে শোনে না। মায়ের একাই চলে না—তার মধ্যে সে আবার কোথায় গিয়া জুটিবে?...তাহা ছাড়া পড়াশুনা ছাড়া?... অসম্ভব!...

সে নিজে বেশ বুঝিতে পারে এই এক বৎসরে তাহার মনের প্রসারতা এত বাড়িয়া গিয়াছে, এমন একটা নতুন-ভাবে সে জগতটাকে, জীবনটাকে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে—যা কি না দশ বৎসর মনসাপোতা কি দেওয়ান-পুরে পড়িয়া হাবুডুবু খাইলেও সম্ভব হইয়া উঠিত না। সে এটুকু বেশ বোঝে কলেজে পড়িয়া ইহা হয় নাই, কোনো প্রোফেসারের বক্তৃতাতেও না—যাহা কিছু হইয়াছে, এই বড় আল্‌মারী ভরা লাইব্রেরীটার কাছে সে তাহার জন্য কৃতজ্ঞ। প্রণবের ও অনিলের মত সহপাঠী বন্ধুর সাহচর্য্য—সকলের উপরে এই দু-চারজন অতি অল্প সংখ্যক বন্ধুবান্ধবের কথাবার্ত্তা ও আশা-নিরাশা লইয়া যে একটা অনুকূল আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই অনুপ্রেরণা। বাকীটা হইয়াছে সবই কলেজ লাইব্রেরীটা হইতে।

যতক্ষণ সে লাইব্রেরীতে থাকে, ততক্ষণ তাহার খাওয়া-দাওয়ার কথা তত মনে থাকে না। এই সময়টা এক একটা খেয়ালের ঘোরে কাটে। খেয়ালমত এক একটা বিষয়ে প্রশ্ন জাগে মনে· তাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া বিকারের রোগীর মত অদম্য পিপাসায় সে সম্বন্ধে

যত বই পাওয়া যায় হাতের কাছে—পড়িতে চেষ্টা করে। কখনও খেয়াল নক্ষত্র জগৎ···কখনও প্রাচীন গ্রীস ও রোমের জীবনযাত্রা-প্রণালীর সহিত একটা নিবিড় ধরণের পরিচয়ের ইচ্ছা—কখনও কীট্স্, কখনও হল্যাণ্ড রোজের নেপোলিয়ন। কোনো খেয়াল থাকে দুদিন, কোনোটা আবার একমাস। তার কল্পনা সব সময়ই বড় একটা কিছুকে আশ্রয় করিয়া পুষ্টিলাভ করিতে চায়—বড় ছবি, জাতির উত্থান-পতনের কাহিনী, চাঁদের দেশের পাহাড়শ্রেণী, বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ, কোনো বড় লোকের জীবনী।

কারখানার ম্যানেজার আর একদিন তাগিদ দিলেন। খুব সুখের বাস ছিল না বটে,কিন্তু এখন সে যায় কোথায়? হাতে কিছু না থাকায় সে এবার পর্দ্দাটা একদিন বেচিতে লইয়া গেল। এটা তাহার বড় সখের জিনিষ ছিল। পর্দ্দাটাতে একটা জাপানী ছবি আঁকা—ফুলে ভরা চেরীগাছ, একটু জলরেখা, মাঝ-জলে বড় বড় ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ফুটিয়া আছে, ওপারে ঢেউখেলানো কাঠের ছাদওয়ালা একটা দেবমন্দির, দূরে ফুজিসানের তুষারাবৃত শিখর একটু একটু নজরে পড়ে। এই ছবি-খানার জন্যই সে পর্দ্দাটা কিনিয়াছিল, এইজন্যই এতদিন হাতছাড়া করিতে পারে নাই– কিন্তু উপায় কি? সাড়ে তিন টাকা দিয়া কেনা ছিল, বহু দোকান ঘুরিয়া তাহার দাম হইল এক টাকা তিন আনা।

পর্দ্দা বেচিয়া অনেকদিন পরে সে ভাত রাঁধিবার ব্যবস্থা করিল। ছাতু খাইয়া খাইয়া অরুচি ধরিয়া গিয়াছে, বাজার হইতে এক পয়সার কলমী শাকও কিনিয়া আনিল। মনে পড়িল সে কলমী শাক ভাজা খাইতে ভালবাসিত বলিয়া ছেলেবেলায় দিদি যখন-তখন গড়ের পুকুর হইতে কত কলমী তুলিয়া আনিত! দিন-সাতেক পর্দ্দা-বেচা অর্থে চলিল মন্দ নয়, তার পরেই যে কে সেই! আর পর্দ্দা নাই, কিচ্ছু নাই, একেবারে কানাকড়িটা হাতে নাই।

কলেজ যাইতে হইল না-খাইয়া—কিছু না খাইয়া। বৈকালে কলেজ হইতে বাহির হইয়া সত্যই মাথা ঘুরিতে লাগিল, আর সেই মাথা ঝিম ঝিম করা, পা নড়িতে না চাওয়া। মুস্কিল এই যে, এই অবস্থা সে কাহারও কাছে বলিতেও পারে না—ক্লাসে মিথ্যা গর্ব্ব ও বাহাদুরীর ফলে সকলেই জানে যে, সে অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে, কাহারও কাছে বলিবার মুখও তো নাই। দু-একজন যাহারা জানে, যেমন জানকী—তাহাদের নিজেদের অবস্থাও তথৈবচ।

সারাদিন না খাইয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়াই শুইয়া পড়িল। রাত আটটার পরে আর না থাকিতে পারিয়া তেওয়ারী-বধূকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ছোলা কি অড়রের ডাল আছে, বহু? আজ আর খিদে নেই তেমন, রাঁধবো না আর, ভিজিয়ে খেতাম।

সকালে উঠিয়াই প্রথমে তাহার মনে আসিল যে, আজ সে একেবারে কপর্দ্দক শূন্য। আজও কালকার মত না খাইয়া কলেজে যাইতে হইবে। কতদিন এভাবে চালাইবে সে? না খাইয়া থাকার কষ্ট ভয়ানক—কাল লজিকের ঘণ্টার শেষে সেটা সে ভাল করিয়া বুঝিয়াছিল··· বিকালের দিকে ক্ষুধাটা পড়িয়া যাওয়াতে তত কষ্ট বোঝা যায় নাই—কিন্তু সেই বেলা দুটোর সময়টা!··· পেটে ঠিক যেন বোল্‌তার ঝাঁক হুল ফুটাইতেছে—বার দুই জল খাইবার ঘরে গিয়া গ্লাস-কতক জল খাইয়া কাল যন্ত্রণাটা অনেকখানি নিবারণ হইয়াছিল। আজ আবার সেই কষ্ট সম্মুখে!

হাত মুখ ধুইয়া বাহির হইয়া বেলা দশটা পর্য্যন্ত সে আবার নানা গ্যাস-পোষ্টের বিজ্ঞাপন দেখিয়া বেড়াইল, তাহার পর বাসায় না ফিরিয়া সোজা কলেজে গেল। অন্য কেহ কিছু লক্ষ্য না করিলেও অনিল দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করিল তাহার কোনো অসুখ-বিসুখ হইয়াছে কিনা, মুখ শুকনো কেন। অপু অন্য কথা পাড়িয়া প্রশ্নটা এড়াইয়া গেল। বই লইয়া আজ সে কলেজে আসে নাই, খালি হাতে কলেজ হইতে বাহির হইয়া রাস্তায় রাস্তায় খানিকটা ঘুরিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, মা আজ দিন-বারো আগে যে টাকা চাহিয়া পত্র পাঠাইয়াছিল—টাকাও দেওয়া হয় নাই, পত্রের জবাবও না।

কথাটা ভাবিতেই সে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িল—না খাওয়ার কষ্ট সে খুব ভাল বুঝিয়াছে—মায়েরও হয় ত

বা এতদিন না-খাওয়া সুরু হইয়াছে, কে জানে? তাহা ছাড়া মায়ের স্বভাব সে ভাল বোঝে, নিজের কষ্টের বেলা মা কাহাকেও বলিবে না বা জানাইবে না, মুখ বুজিয়া সমুদ্র গিলিবে।

অপু অস্থির হইয়া পড়িল। এখন কি করে সে! জ্যেঠাইমাদের বাড়ী গিয়া সব খুলিয়া বলিবে?···গোটা-কতক টাকা যদি এখন ধার পাওয়া যায় সেখানে, মাকে তো আপাততঃ পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে এখন! কিন্তু খানিকটা ভাবিয়া দেখিল, সেখানে গিয়া সে টাকার কথা তুলিতেই পারিবে না, জ্যেঠাইমাকে সে মনে মনে ভয় করে। অখিলবাবু? সামান্য মাহিনা পায়, সেখানে গিয়া টাকা চাহিতে বাধে। তাহার এক সহপাঠীর কথা হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, খুব বেশী আলাপ নাই, কিন্তু শুনিয়াছে বড়লোকের ছেলে—একবার যাইয়া দেখিবে কি? ছেলেটির বাড়ী বৌবাজারের একটা গলিতে, কল্‌কাতার বনেদী ঘর, বড় তেতলা বাড়ী, পূজার দালান, নাটমন্দির, সাম্‌নে বড় বড় সেকেলে ধরণের থাম, কার্ণিসে একঝাঁক পায়রার বাসা। বাহিরের ফ্লোরের খোপটা একজন হিন্দুস্থানী ভুজাওয়ালা ভাড়া লইয়া ছাতুর দোকান খুলিয়াছে। একটু পরেই অপুর সহপাঠী ছেলেটি বাহিরে আসিয়া বলিল—কৈ, কে ডাক্‌চে···ও—তুমি?—রোল টুএল্‌ভ্‌, এক্স্‌কিউজ্‌ মি—তোমার নামটা জানিনে ভাই—সরি—এস এস ভেতরে এস।

খানিকক্ষণ বসিয়া গল্পগুজব হইল। খানিকক্ষণ গল্প করিতে করিতে অপু বুঝিল এখানে টাকার কথা তোলাটা তাহার পক্ষে কতদূর দুঃসাধ্য ব্যাপার। ···অসম্ভব—তাহা কি কখনও হয়? কি বলিয়া টাকা ধার চাহিবে সে এখানে? এই আমাকে এই—গোটা-কতক টাকা ধার দিতে পারো ক'দিনের জন্যে? কথাটা কি বিশ্রী শোনাইবে! ভাবিতেও যেন লজ্জায় ও সঙ্কোচে তাহার মুখ ঘামিয়া রাঙা হইয়া উঠিল। ছেলেটি বলিল—বা রে এখুনি উঠবে কি—না না বোসো, চা খাও—দাঁড়াও আমি আস্‌চি—

ঘি দিয়া চিঁড়া-ভাজা, নিম্‌কী, পেঁপে-কাটা, সন্দেশ ও চা। অপু ক্ষুধার মুখে লোভীর মত সেগুলি ব্যগ্র-ভাবে গোগ্রাসে গিলিল। গরম চা কয়েক চুমুক খাইতে শরীরের ঝিম্‌ ঝিম্‌ ভাবটা কাটিয়া মনের স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরিয়া আসিল এবং আসিবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে টাকা ধার চাওয়াটা যে কতদূর অসম্ভব সেটাও বুঝিল। বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া বাহিরে আসিয়া ভাবিল—ভাগ্যিস্‌—হাউ এ্যাবসার্ড! তা কি কখনও আমি—দূর্‌!

রাত্রিতে শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে তাহার মনে পড়িল, আগামী কাল নববর্ষের প্রথম দিন! কাল কলেজের ছুটী আছে। কাল একবার শ্যামবাজারে জ্যেঠাইমাদের বাড়ীতে যাইবে, নববর্ষের দিনটা জ্যেঠাই-মাকে প্রণাম করিয়া আসাও হইবে—সেটাও একটা কর্ত্তব্য, তাহা ছাড়া—

মনে মনে ভাবিল—কাল গেলে জ্যেঠীমা কি আর না খাইয়ে ছেড়ে দেবে? বছরকারের দিনটা—সেদিন সুরেশ-দা তো আর বাড়ীর মধ্যে বলেনি—বললে কি আর খেতে বল্‌তো না?···সুরেশ-দা ওই রকম ভুলো মানুষ!···

ভুল কাহার, পরদিন অপুর বুঝিতে দেরী হইল না। সকালে ন'টার সময় সুরেশদের বাড়ী গিয়া প্রথমে বাহিরে কাহাকেও পাইল না। বলা না, কওয়া না, হুপ করিয়া কি বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া যাইবে? কি সমাচার, না নববর্ষের দিন প্রণাম করিতে আসিয়াছি—ছুতাটা যে বড় দুর্ব্বল! সাত পাঁচ ভাবিতে ভাবিতে সে খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়া একেবারে জেঠাইমাকেই পাইল দরজার সাম্‌নের রোয়াকে। প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল, জ্যেঠাইমার মুখে যে বিশেষ প্রীতি বিকশিত হইল না, তাহা অপু ছাড়া যে-কেহ বুঝিতে পারিত। তাহার সংবাদ লইবার জন্য তিনি বিশেষ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না, সে-ই নিজের সঙ্কোচ ও আনাড়িপনা ঢাকিবার জন্য অতসী-দি কবে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে, সুনীল বুঝি কোথায় বাহির হইয়াছে প্রভৃতি ধরণের মামুলি প্রশ্ন করিয়া যাইতে লাগিল।

তাহার পর জ্যেঠাইমা কোথায় চলিয়া গেলেন, কেহ

বাড়ী নাই, সে দালানের বেঞ্চিতে একাটি বসিয়া একখানা এস্ রায়ের ক্যাটালগ নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিবার ভাণ করিল। এই বইখানার মধ্যেই একখানা বিবাহের প্রীতিউপহার পাইল, হাতে লইয়া বিস্ময়ের সহিত দেখিল সেখানা সুরেশের বিবাহের দরুণ অতসী-দি দিতেছে সুরেশ-দাকে। সে দুঃখিতও হইল, আশ্চর্য্যও হইল, মাত্র মাসখানেক আগে বিবাহ হইয়াছে, সুরেশ-দা তাহার ঠিকানা জানে, সবই জানে, অথচ কি জেঠাইমা, কি সুরেশ-দা কেহই তাহাকে জানায় নাই!

'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় বেলা সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত বসিয়া থাকিয়া সে জেঠাইমার কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া আসিল, জেঠাইমা নির্লিপ্ত, অন্যমনস্ক সুরে বলিল—আচ্ছা তা এসো—থাক্, থাক্—আচ্ছা।

ফুট্‌পাথে নামিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। মনে মনে ভাবিল সুরেশ-দার বিয়ে হয়ে গিয়েচে ফাল্গুন মাসে, একবার বললেও না!···অথচ আমাদের আপনার লোক···আজ দ্যাখো না নববর্ষের দিনটা খেতেও বললে না—

খানিক দূরে আসিতে আসিতে তাহার কেমন হাসিও পাইল। আচ্ছা যদি বল্‌তাম, জেঠিমা আমি এখানে এবেলা খাবো তা হ'লে—হি হি—তা'হলে কি হোত!

বাসার কাছে পথে সুন্দর-ঠাকুর হোটেলওয়ালার সঙ্গে দেখা। দু-দুবার নাকি সে অপুর বাসায় গিয়াছে, দেখা পায় নাই, আজ পয়লা বৈশাখ, হোটেলের নতুন খাতা—টাকা দেওয়া চাই-ই। সুন্দর-ঠাকুরের চড়া চড়া কথায় পথে লোক জুটিয়া গেল—পথে দাঁড়াইয়া অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সে কোথা হইতে দিবে বিন্দুবিসর্গ না ভাবিয়াই বলিল, বৈকালে নিশ্চয়ই সব শোধ করিয়া দিবে।

বৈকালে একটা বিজ্ঞাপনে দেখিল কোন্ স্কুলে একজন ম্যাট্রিকুলেশন পাশ-করা শিক্ষক দরকার, টাট্‌কা মারিয়া দিয়া গিয়াছে, এখনও কেহ ঠিকানাটা ছেঁড়ে নাই। খুঁজিয়া তখনি বাহির করিল, মেছুয়াবাজারে একটা গলির মধ্যে কাহাদের ভাঙা বাড়ীর বাহিরের ঘরে স্কুল—অপার প্রাইমারী পাঠশালা। জনকতক বৃদ্ধ বসিয়া দাবা খেলিতেছেন, একজন তাহার মধ্যে স্কুলের না কি হেড্‌মাষ্টার। অঙ্কের শিক্ষক···দশটাকা মাহিনা···বাজার যা তাতে ইহাই যথেষ্ট—ইত্যাদি।

অপুর মন বেজায় দমিয়া গেল। এই অন্ধকার স্কুল-ঘরটার দারিদ্র্য, এই ত্রিকালোত্তীর্ণ বৃদ্ধগণের মুখের একটা বুদ্ধিহীন সন্তোষের ভাব ও মনের স্থবিরত্ব, ইহাদের সাহচর্য্য হইতে তাহাকে দূরে হঠাইয়া লইতে চাহিল। যাহা জীবনের বিরোধী, আনন্দের বিরোধী, সর্ব্বোপরি তাহার অস্থিমজ্জাগত যে রোমান্সের তৃষ্ণা তাহার বিরোধী, অপু সেখানে একদণ্ড তিষ্টিতে পারে না। ইহারা বৃদ্ধ বলিয়া যে এমন ভাব হইল অপুর তাহা নয়, ইহাদের অপেক্ষাও বৃদ্ধ ছিলেন শৈশবের সঙ্গী নরোত্তম দাস বাবাজি। কিন্তু সেখানে সদাসর্ব্বদা একটা মুক্তির হাওয়া বহিত, কাশীর কথক-ঠাকুরকেও এইজন্যই ভাল লাগিয়াছিল। অসহায়, দরিদ্র বৃদ্ধ একটা আশা-ভরা আনন্দের বাণী বহন করিয়া আনিয়াছিলেন তাহার মনে—যেদিন জিনিষপত্র বাঁধিয়া সে হাসিমুখে নতুন সংসার বাঁধিবার উৎসাহে রাজঘাটের ষ্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া দেশে রওনা হইয়াছিলেন।

স্কুল হইতে যখন সে বাহির হইল, বেলা প্রায় গিয়াছে। তাহার কেমন একটা ভয় হইল—এ ভয়টা এতদিন হয় নাই। না খাইয়া থাকিবার বাস্তবতা ইতিপূর্ব্বে এ ভাবে কখন নিজের জীবনে সে অনুভব করে নাই—বিশেষ করিয়া যখন এখানে খাইতে-পাওয়া নির্ভর করিতেছে নিজের কিছু একটা খুঁজিয়া বাহির করিবার সাফল্যের উপর। কিন্তু তাহার সকলের চেয়ে দুর্ভাবনা মায়ের জন্য—একটা পয়সা সে মাকে পাঠাইতে পারিল না, আজ এতদিন মা পত্র দিয়াছে—কি করিয়া চলিতেছে মায়ের!···

কিন্তু এখানে তো কোনো কিছুই আশা দেখা যায় না—এত বড় কলিকাতা সহরে, পাড়াগাঁয়ের ছেলে, সহায় নাই, চেনাশোনা নাই, সে কোথায় যাইবে—কি করিবে?···

পথে একটা মাড়োয়ারীর বাড়ীতে বোধ হয় বিবাহ। সন্ধ্যার তখনও সামান্য বিলম্ব আছে, কিন্তু এরই মধ্যে

সাম্‌নের লাল-নীল ইলেকট্রিক আলোর মালা জ্বালাইয়া দিয়াছে, দু'চারখানা মোটর ও জুড়ি গাড়ী আসিতে সুরু করিয়াছে। লুচি ভাজার মন-মাতানো সুগন্ধে বাড়ীর সাম্‌নেটা ভরপুর। হঠাৎ অপু দাঁড়াইয়া গেল। ভাবিল—যদি গিয়ে বলি আমি একজন পুওর ষ্টুডেণ্ট—. সারাদিন খাইনি—তবে খেতে দেবে না?…ঠিক দেবে—এত বড় লোকের বাড়ী, কত লোক তো খাবে—বল্‌তে দোষ কি—কে-ই বা চিন্‌বে আমায় এখানে?… যাবো?…

অত্যন্ত ইচ্ছা হইল। কে যেন তার ঘাড় ধরিয়া বাড়ীর মধ্যে ঢুকাইয়া দিতে চাহিতেছে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পারিল না। সে বেশ বুঝিল, মনে ষোল আনা ইচ্ছা থাকিলেও মুখ দিয়া এ কথা সে বলিতে পারিবে না কাহারও কাছে—লজ্জা করিবে। লজ্জা না করিলে সে যাইত। মুখচোরা হওয়ার অসুবিধা সে জীবনে পদে পদে দেখিয়া আসিতেছে।…

কলিকাতা ছাড়িয়া মনসাপোতা ফিরিবে?…কথাটা সে ভাবিতে পারে না—প্রত্যেক রক্তবিন্দু বিদ্রোহী হইয়া ওঠে। যাইবে না সে কখনও। তাহার জীবন-সন্ধানী মন তাহাকে বলিয়া দেয় এখানে জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা —সেখানে অন্ধকার, দৈন্য, নিবিয়া যাওয়া। এখানেই সে টিকিয়া থাকিবে—থাকিতেই হইবে তাহাকে। কিন্তু উপায় কই তাহার হাতে? সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নাই! সবদিকেই গোলমাল। কলেজের মাহিনা না দিলে আপাততঃ পরীক্ষা দিতে দিলেও বেতন শোধ না করিলে প্রমোশন বন্ধ। থাকিবার স্থানের এই দশা, দু বেলা ওষুধের কারখানার ম্যানেজার উঠিয়া যাইবার তাগিদ দেয়, আহার তথৈবচ, সুন্দর-ঠাকুরের দেনা, মায়ের কষ্ট—একেই তো সে সংসারানভিজ্ঞ, স্বপ্নদর্শী প্রকৃতির—কিসে কি সুবিধা হয় এম্‌নিই বোঝে না—তাহাতে এই কয়দিনের ব্যাপার তাহাকে একেবারে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে।

বাসায় ফিরিয়া ছাদের উপর একখানা খাপরা ছুঁড়িয়া সে একবার দেখিল, দুইবার দেখিল—কলিকাতা ছাড়িয়া যাইবার যে দিক্‌টা সেই দিক্‌টাই পড়ে। তৃতীয় বার ফেলিয়া দেখিতে আর তাহার সাহস হইল না।

বাল্যকাল হইতে নিশ্চিন্দিপুরের বিশালাক্ষী দেবীর উপর তাহার অসীম শ্রদ্ধা। করুণাময়ী দেবীর কত কথা সে শুনিয়াছে, সে তো তাঁর গ্রামেরই ছেলে—কলিকাতায় কি তাঁর শক্তি খাটে না?…

পরীক্ষা হইবার দিনকয়েক পরে একদিন অনিল তাহাকে জানাইল সায়েন্স সেক্‌সনের মধ্যে সে গণিত ও বস্তু-বিজ্ঞানে প্রথম হইয়াছে, প্রোফেসরের বাড়ী গিয়া নম্বর জানিয়া আসিয়াছে। অপু শুনিয়া আন্তরিক সুখী হইল, অনিলকে সে ভারি ভালবাসে, সত্যিকার চরিত্রবান, বুদ্ধিমান্ ও উদারমতি ছাত্র। অনিলের যে জিনিষটা তাহার ভাল লাগে না, সেটা তাহার অপরকে তীব্রভাবে আক্রমণ ও সমালোচনা করিবার একটা দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনো তুচ্ছ কাজে বা জিনিষে অপু তাহার আসক্তি দেখে নাই—কোনো ছোট কথা, কি সুবিধার কথা, কি বাজে খোসগল্প তাহার মুখে শোনে নাই।

অপু দেখিয়াছে সব সময় অনিলের মনে একটা চাঞ্চল্য, একটা অতৃপ্তি—তাহার অধীর মন মহাভারতের বকরূপী ধর্ম্মরাজের মত সব সময়ই যেন প্রশ্ন ফাঁদিয়া বসিয়া আছে—কা চ বার্ত্তা?

অপুর সহিত এইজন্যই অনিলের মিলিয়াছিল ভাল। দুজনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রবৃত্তি এক ধরণের, অপুর বাংলা ও ইংরেজি লেখা খুব ভাল, কবিতা, প্রবন্ধ, মায় একখানা উপন্যাস পর্য্যন্ত লিখিয়াছে। দু'তিনখানা বাঁধানো খাতা ভর্ত্তি—লেখা এমন কিছু নয়, গল্পগুলি ছেলেমানুষী ধরণের উচ্ছ্বাসে ভরা, কবিতা রবি ঠাকুরের নকল, উপন্যাসখানাতে—জলদস্যুর দল, প্রেম, আত্মদান কিছুই বাদ যায় নাই—কিন্তু এইগুলি পড়িয়াই অনিল সম্প্রতি অপুর আরও ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

সপ্তাহের শেষে দুজনে বোটানিকেল গার্ডেনে বেড়াইতে গেল। একটা ঝিলের ধারে ঘনসবুজ লম্বা

লম্বা ঘাসের মধ্যে বসিয়া অনিল বন্ধুকে একটা সুসংবাদ দিল। বাগানে আসিয়া গাছের ছায়ায় এইভাবে বসিয়া বলিবে বলিয়াই এতক্ষণ অপেক্ষায় ছিল। তাহার বাবার এক বন্ধু তাহাকে খুব ভালবাসেন, বড়বনীর অভ্রের খনির তিনি ছিলেন একজন অংশীদার, তিনি গত পরীক্ষার ফলে অনিলের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া নিজের খরচে বিদেশে পাঠাইতে চাহিতেছেন। আই-এস্‌সি-টা পাশ দিলেই সোজা বিলাত বা ফ্রান্স্।

—কেম্‌ব্রিজে কি ইম্পিরিয়াল কলেজ অফ্ সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নোলজি, ওতে পড়বো, রাদারফোর্ড আছেন, টম্‌সন্ আছেন, এঁদের সব দুবেলা দেখতে পাওয়াও একটা পুণ্য—যুদ্ধ থাম্‌লে জার্ম্মানিতে যাব, মস্ত জাত—বিরাট ভাইটালিটি—গেটে, অষ্টওয়াল্‌ডের দেশ—ওখানে কি আর না যাব?...

সাম্‌নের ঝিলে অজস্র রক্তকুমুদ ফুটিয়াছে, পেন্‌সিয়ানা ও মেহগেনি গাছের ডালপালার মধ্যে কোকিল ডাকিতেছে, ভারি স্নিগ্ধ ছায়া, অনিলের কথা শুনিতে শুনিতে অপুর সারা শরীর উৎসাহে, উত্তেজনায় কেমন করিয়া উঠিল। জগতের বড় বড় লোক, বড় বড় ব্যাপারের কথা মনে করিয়া দিবার জন্য পাশে পাশে অনিলের মত বন্ধুকে ভাগ্যে সে পাইয়াছে!

অনিল অপুর বিদেশে যাইবার টান জানে -বলিল, আমি আপনাকে নিয়ে যাবার ঠিক করবো, না হয় দুজনে আমেরিকায় চলে যাব—আমি সব ঠিক করবো দেখবেন।

অনিলের প্রভাব যেমন অপুর জীবনে বিস্তার লাভ করিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপুর চরিত্রের পবিত্রতা, মনের ছেলেমানুষী ও ভাবগ্রাহিতা অনিলের কঠোর সমালোচনা ও অযথা আক্রমণ-প্রবৃত্তিকে অনেকটা সংযত করিয়া তুলিতেছিল। দূরের পিপাসা অপুর আরও অনেক বেশী, অনেক উদ্দাম—কলিকাতার ধোঁয়া-ভরা, সঙ্কীর্ণ, ভ্যাপ্‌সা-গন্ধ সিওয়ার্ড ডিচের ভিতর হইতে বাহির হইয়া হঠাৎ যেন একটা উদার প্রান্তর, জ্যোৎস্না-মাখা মুক্ত আকাশ, পাখীদের আনন্দ-ভরা পক্ষ-সঙ্গীতের, একটা বন-প্রান্তের রহস্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় অপুর কথার সুরে, জীবন-পিপাসু নবীন চোখের দৃষ্টিতে, অন্ততঃ অনিলের তো মনে হয়।

কোন্ পথে যাওয়া হইবে সে কথা উঠিল। অপু উৎসাহে অনিলের কাছে ঘেঁষিয়া বলিল—এস একটা প্যাক্ট করি—দেখি হাত? এস আমরা কখ্‌খনো কেরাণীগিরি করবো না পয়সা পয়সা কর্‌বো না কখ্‌খনো—সামান্য জিনিষে ভুল্‌বো না কখনও—বাস্! পরে মাটিতে একটা ঘুসি মারিয়া বলিল—খুব বড় কাজ কিছু একটা কর্‌বো জীবনে।

অনিল সাধারণতঃ অপুর মত নিজের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া ওঠে না, তবুও আজ উৎসাহের মুখে অনেক কথা বলিয়া ফেলিল, বিলাতে পড়া শেষ করিয়া সে আমেরিকায় যাইবে, জাপান হইয়া দেশে ঘুরিয়া আসিবে। বড় একজন বৈজ্ঞানিক হইতে চায় সে, ছোটখাটো বা মাঝারিতে তাহার মনের তৃপ্তি হইবে না, তাহা তার লক্ষ্যও নয়। বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সারাজীবন বৈজ্ঞানিক গবেষণা লইয়াই থাকিবে।

অপু বলিল—যখন দেশে ছিলাম, তখন আমার একখানা 'প্রাকৃতিক ভূগোল' বলে ছেঁড়া, পুরনো বই ছিল—তাতে লেখা ছিল এমন সব নক্ষত্র আছে, যাদের আলো আজও এসে পৃথিবীতে পৌঁছয়নি সে সব এত দূরে - মনে আছে সন্ধ্যের সময় একটা নদীতে নৌকো ছেড়ে দিয়ে নৌকোর ওপর বসে সে কথা ভাবতাম, ওপারে একটা কদম গাছ ছিল, তার মাথাতে একটা তারা উঠত সকলের আগে, তারাটার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতাম—কি যে একটা ভাব হতো মনে! একটা mystery, একটা uplift-এর ভাব—ছেলেমানুষ তখন সে সব বুঝতাম না, কিন্তু সেই থেকে যখনই মনে দুঃখ হয়েচে কি কোনো ছোট কাজে মন গিয়েচে, তখনই আকাশের নক্ষত্রদের দিকে চাইলেই আর ছেলেবেলার সেই uplift-এর ভাবটা একটা joy - বুঝলে? - একটা অদ্ভুত transcendental joy—সে মুখে তোমাকে ভাই—

বেলা পড়িলে দুজনে ষ্টীমারে কলিকাতায় ফিরিল।

পরদিনও কলেজের কমন-রুমে অনেকক্ষণ আবার সেই কথা।

কলেজ হইতে উৎফুল্ল মনে বাহির হইয়া অনিল

প্রথমে দোকানে এক কাপ চা খাইল, পরে ফুটপাথের ধারে দাঁড়াইয়া একটুখানি ভাবিল, কালীঘাটে মামীর বাড়ী যাওয়ার কথা আছে, এখন যাইবে কি না। একখানা বই কিনিবার জন্য একবার কলেজ ষ্ট্রীটেও যাওয়া দরকার। কোথায় আগে যায়? অপূর্ব্ব একমাত্র ছেলে, যার কথা তার সব সময় মনে হয়। যে কোনোরূপে হউক অপূর্ব্বকে সে নিশ্চয়ই বিদেশ দেখাইবে।

তলপেটে অনেকক্ষণ হইতে একটা কি বেদনা বোধ হইতেছিল, এইবার যেন একটু বাড়িয়াছে,হাঁটিয়া চৌরঙ্গীর মোড় পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছা ছিল, সেটা আর না যাওয়াই ভাল। সম্মুখেই ড্যালহাউসি স্কোয়ারের ট্রাম, সে ভাবিল পরেরটাতে যাব, বেজায় ভিড়, ততক্ষণ বরং পত্রখানা ডাকে ফেলে আসি।

নিকটেই লালরংয়ের গোল ডাকবাক্স ফুটপাথের ধারে, ডাকবাক্সটায় গা ঘেঁসিয়া একজন মুসলমান ফিরিওয়ালা পাকা কাঁচকলা বিক্রী করিতেছে, তাহার বাজরায় পা না লাগে এইজন্য একপায়ে ভর করিয়া অন্য পা খানা একটু অস্বাভাবিকভাবে পিছনে বাঁকাভাবে পাতিয়া সে সবে চিঠিখানা ডাকবাক্সের মুখে ছাড়িয়া দিয়াছে—এমন সময় হঠাৎ পিছন হইতে যেন কে তীক্ষ্ণ বর্শা দিয়া তাহার দেহটা এফোঁড় ওফোঁড় করিয়া দিল, এক নিমেষে অনিল সেটাতে হাত দিয়া সাম্‌লাইতেও যেন অবকাশ পাইল না···হঠাৎ যেন পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া গেল···চোখে অন্ধকার—কাঁচকলার বাজরার কাণাটা মাথায় লাগিতেই মাথাটার একটা বেদনা—মুসলমানটি কি বলিয়া উঠিল···হৈ হৈ, বহু লোক···কি হয়েচে মশায়?···কি হ'ল মশায়? সরো সরো—বাতাস করো বরফ নিয়ে এস···এই যে আমার রুমাল নিননা···

অনিলের দুটা মাত্র কথা শুধু মনে ছিল - একবার সে অতিকষ্টে গোঁয়াইয়া গোঁয়াইয়া বলিল—রি—রিপণ কলেজ—রিপণ কলেজ—অপূর্ব্ব রায়—রিপণ—

আর মনে ছিল সাম্‌নের একটা সাইনবোর্ড—গণেশচন্দ্র দাঁ এণ্ড কোং—কারবাইডের মশলা, তারপরেই পেটে পুনরায় তীক্ষ্ণ বর্শাটা কে যেন সজোরে তলপেটে ঢুকাইয়া দিল···সঙ্গে সঙ্গে সব অন্ধকার···কতক্ষণ পরে সে জানে না, তাহার জ্ঞান হইল একটা বাক্স বা ঘরের মধ্যে সে শুইয়া আছে, ঘরটা বেজায় দুলিতেছে··পেটে ভয়ানক যন্ত্রণা··· কাহারা কি বলিতেছে, অনেক মোটর গাড়ীর ভেঁপুর শব্দ আবার ধোঁয়া ধোঁয়া···

* * * *

পুনরায় যখন অনিলের জ্ঞান হইল, সে চোখ মেলিয়া চাহিয়া দেখিল একটা বড় সাদা দেওয়ালের পাশে একখানা খাটে সে শুইয়া আছে। পাশে তাহার বাবা ও ছোট-কাকা বসিয়া, আরও তিন-চারজন অপরিচিত লোক, নার্সের পোষাক-পরা দুজন মেম। এটা হাঁসপাতাল? কোন্ হাঁসপাতাল? কি হইয়াছে তাহার?···তলপেটের যন্ত্রণা তখনও সমান, শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, সারা দেহ যেন অবশ।

পরদিন বেলা দশটার সময় অপু গেল। সে-ই কাল খবর পাইয়া তখনি ছুটিয়া শিয়ালদহের মোড়ে গিয়াছিল। সঙ্গে ছিল সত্যেন ও চার-পাঁচজন অন্য অন্য শ্রেণীর ছেলে। টেলিফোনে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ী আনাইয়া তখনি সকলে মিলিয়া তাহাকে মেডিকেল কলেজ হাঁসপাতালে আনা হয় ও বাড়ীতে খবর দেওয়া হয়। ডাক্তার বলেন হার্নিয়া·ষ্ট্রাঙ্গুলেটেড্ হার্নিয়া···তখনি অস্ত্র করা হইয়াছে।

বৈকালেও সে গেল। কেবিন ভাড়া করা হইয়াছে, অনিলের মা বসিয়াছিলেন, অপু গিয়া পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল। অনিল এখন অনেকটা ভাল আছে, অস্ত্র করার পরে বেজায় যন্ত্রণা পাইয়াছিল, সারারাত ও সারাদিন—দুপুরের পর সেটা একটু কম। তাহার মুখ রক্তশূন্য পাণ্ডুর। সে হাসিয়া অপুর হাত ধরিয়া কাছে বসাইল, বলিল—স্বাস্থ্যের মতন জিনিষ আর নেই, যতই বলুন—এই তিনটে দিন যেন একেবারে মুছে গিয়েচে জীবন থেকে।

অপু বলিল—বেশী কথা বোলো না, যন্ত্রণা কেমন এখন?

অনিলের মা বলিলেন—তোমার কথা সব শুনেচি, ভাগ্যিস তুমি ছিলে বাবা সেদিন!

অনিল বলিল, দেখবেন মজা, ঘণ্টা নাড়লেই নার্স

এখুনি ছুটে আসবে—বাজাব দেখবেন? সে হাসিয়া একটা হাতঘণ্টা বাজাইতেই লম্বা একজন নার্স আসিয়া হাজির। সে চলিয়া গেলে অনিলের মা বলিলেন—কি যে করিস্ মিছেমিছে? ছিঃ—

দুজনেই খুব হাসিতে লাগিল।

খানিকক্ষণ গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইয়া সন্ধ্যার পর বাসায় ফিরিয়া অপু সবে আলোটি জ্বালিয়াছে, এমন সময় সত্যেন ও অনিলের পিস্তুতো ভাই ফণি—অপু তাহাকে হাঁসপাতালেই প্রথম দেখিয়াছে, সেইখানেই প্রথম আলাপ - ব্যস্তসমস্ত অবস্থায় ঘরে ঢুকিল। সত্যেন বলিল—ওঃ তোমাকে ড়ুবার এর আগে খুঁজে গেছি—এখুনি হাঁসপাতালে এস—জান না?···

অপু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে উহাদের মুখের দিকে চাহিতেই ফণি বলিল অনিল মারা গিয়েচে এই সাড়ে ছ'টার সময়—হঠাৎ আপনার কাছে দুবার ··

সকলে ছুটিতে ছুটিতে হাঁসপাতালে গেল। অনিলের মৃতদেহ খাট হইতে নামাইয়া শাদা চাদর দিয়া ঢাকিয়া মেজেতে রাখিয়াছে। বহু আত্মীয়স্বজনে কেবিন ভরিয়া গিয়াছে, ক্লাসের অনেক ছেলে উপস্থিত, একদল ছেলে এইমাত্র এসেন্স ও ফুলের তোড়া লইয়া কেবিনে ঢুকিল। অল্পপরেই মৃতদেহ নিমতলায় লইয়া যাওয়া হইল।

সব কাজ শেষ হইতে রাত্রি তিনটা বাজিয়া গেল।

অন্য সকলে গঙ্গাস্নান করিতে লাগিল। অপু বলিল, তোমরা নাও, আমি গঙ্গা নাইবো না, কলের জলে সকাল বেলা নাইবো। কল্‌কাতার গঙ্গায় নাইতে আমার মন যায় না।

অনিলের বাবার উপর অপুর অত্যন্ত ভক্তি হইল—এমন দৃঢ়চেতা লোক সে কখনও দেখে নাই, এত বিপদেও তিনি সারারাত বাঁধানো চাতালে বসিয়া ধীরভাবে কাঠের নল বসানো সট্‌কাতে তামাক টানিয়াছেন, অপুকে বার-দুই জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—বাবা তোমার ঘুম লাগেনি তো?··· কোনো কষ্ট হয় তো ব'লো বাবা। অপু কথা শুনিয়া চোখের জল রাখিতে পারে নাই।

সুনীল সিগারেট কেস্‌টা তাহার জিম্মায় রাখিয়া জলে নামিল, সে ঘাটের ধাপের উপর বসিয়া রহিল। অন্ধকার আকাশে অসংখ্য জল্‌জ্বলে নক্ষত্র, রাত্রিশেষের আকাশে উজ্জ্বল সপ্তর্ষিমণ্ডল ওপারে জেসপ কোম্পানীর কারখানার মাথায় ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, পূর্ব্ব-আকাশে চিত্রা প্রত্যাসন্ন দিবালোকের মুখে মিলাইয়া যাইতেছে। অপু মনের মধ্যে কোনো শোক কি দুঃখের ভাব খুঁজিয়া পাইল না—কিন্তু মাত্র তিনদিন আগে কোম্পানীর বাগানে বসিয়া যেমন অনিলের সঙ্গে গল্প করিয়াছিল, সারা আকাশের অসংখ্য নক্ষত্ররাজির দিকে চাহিয়া বাল্যে নদীর ধারে বসিয়া সন্ধ্যার প্রথম নক্ষত্রটি দেখিবার মত এক অপূর্ব্ব, অবর্ণনীয় রহস্যের ভাবে তাহার মন পরিপূর্ণ হইয়া গেল, কেমন যেন মনে হইতে লাগিল অসীম রহস্য ও বিপুলতার আবেগে নির্ব্বাক নক্ষত্রজগৎ-যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে স্পন্দিত হইতেছে।

অনিলের মৃত্যুর পর অপু বড় মুষড়াইয়া পড়িল। শোকে বা দুঃখে নয়, কিন্তু নানারকম গোলমালে, অভাব অনটনে, অনাহার, কলেজে একরাশ দেনা—ওদিকে মায়ের কষ্ট। তাহা ছাড়া অনিলের মৃত্যুর পর কেমন এক ধরণের অবসাদ শরীরে ও মনে আশ্রয় করিয়াছে, কোনো কিছু কাজে উৎসাহ আসে না, হাত-পা ওঠে না।

বৈকালে ঘুরিতে ঘুরিতে সে কলেজ স্কোয়ারের একখানা বেঞ্চির উপর বসিল। এতদিন তো রহিল, কিছুই স্থির হইল না, এভাবে আর কতদিন চলে? ভাবিল না হয় এ্যাম্বুলেন্সে যেতাম, কলেজের অনেকে তো যাচ্ছে, কিন্তু মা কি তা যেতে দেবে?

পরে ভাবিল—বাড়ী চলে যাই, মাসখানেক অর্ডারলি রিট্রিট করা যাক্—তারপর জি, এইচ, কিউ কি ব্যবস্থা করেন দেখা যাবে।

পাশে একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক অনেকক্ষণ হইতে বসিয়াছিলেন। মধ্যবয়সী লোক, চোখে চশমা, হাতের শিরগুলা দড়ির মত মোটা। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সাঁতারের ম্যাচ কবে হবে জানেন? অপু জানে না, বলিতে পারিল না। ক্রমে দু-চার কথায়

আলাপ জমিল। সাঁতারেরই গল্প। কথায় কথায় প্রকাশ পাইল তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বহুস্থান ঘুরিয়াছেন। অপু কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিল।

ভদ্রলোক বলিলেন—আমার নাম সুরেন্দ্রনাথ বসু মল্লিক—

অনেক দিনের একটা কথা অপুর মনে পড়িয়া গেল, সে সোজা হইয়া বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আমি আপনাকে চিনি, আপনি অনেক দিন আগে বঙ্গবাসীতে 'বিলাত-যাত্রীর চিঠি' লিখতেন।

—হাঁ-হাঁ···ঠিক, সে দশ এগারো বছর আগেকার কথা— তুমি কি করে জান্‌লে? পড়তে না কি?

—ওঃ, শুধু পড়তাম না, হাঁ করে বসে থাক্‌তাম কাগজখানার জন্যে—তখন আমার বয়েস বছর দশ— পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তাম···কি inspiration যে পেতাম আপনার লেখা থেকে!···

ভদ্রলোকটি ভারি খুশী হইলেন। কি করে, কোথায় থাকে জিজ্ঞাসা-বাদ করিলেন। বলিলেন, দ্যাখো কোথায় বসে কে লেখে আর কোথায় গিয়ে তার বীজ উড়ে পড়ে—বিলেতে হ্যাম্পষ্টেডের একটা বোর্ডিংয়ে বসে লিখতাম, আর বাংলায় এক obscure পাড়া-গাঁয়ের এক ছোট ছেলে আমার লেখা পড়ে—বাঃ বাঃ—

ভদ্রলোকটির ব্যবসা-বাণিজ্যে খুব উৎসাহ দেখা গেল। মাদ্রাজে সমুদ্রের ধারে জমি লইয়াছেন, নারিকেল ও ভ্যানিলার চাষ করিবেন। তেরো বৎসরের নিগ্রো বালককে নিঃসম্বলে ইউরোপে আসিয়া নিজের উপার্জ্জন নিজে করিতে দেখিয়াছেন—দেশের যুবকদের চাষবাস করিতে উপদেশ দেন।

ভদ্রলোকটিকে আর অপুর অপরিচিত মনে হইল না। তাহার বাল্যজীবনের কতকগুলি অবর্ণনীয় আনন্দ-মুহূর্ত্তের জন্য এই প্রৌঢ় ব্যক্তিটি দায়ী, ইঁহারই লেখার ভিতর দিয়া বাহিরের জগতের সঙ্গে সে আনন্দ-ভরা প্রথম পরিচয়—সেই ধূমায়মান ভিসুভিয়াস্, বীর-প্রসবিণী কর্সিকা, পল্লীবালা জোয়ান, সঙ্গে সঙ্গে ওদের সঙ্গে জড়িত সেই ইছামতী, ওপারে মাধবপুরের ঘন সবুজ উলুখড়ের মাঠ···দিগম্বর পাটনির ভাঙা খেয়ার ডিঙিখানা।

সম্পূর্ণ নতুন ধরণের উৎসাহ লইয়া সে ফিরিল। কে জানিত বঙ্গবাসীর সে লেখকের সঙ্গে এভাবে দেখা হইয়া যাইবে!···শুধু বাঁচিয়া থাকাই এক সম্পদ, তোমার বিনা চেষ্টাতেই এই অমৃতময়ী জীবনধারা প্রতি পলের রসপাত্র পূর্ণ করিয়া তোমায় অন্যমনস্ক, অসতর্ক মনে অমৃত পরিবেশন করিবে···সে যে করিয়া হউক্ বাঁচিবে।

(১৬)

অনেকদিন পরে মনসাপোতা খুব ভাল লাগিল, পথের প্রত্যেক গাছপালা যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত সাথী, উলা ষ্টেশন হইতে হাঁটাপথে ক্রোশ-চারেক, গহনার নৌকাতেও রাণাঘাট হইতে আসা যায় বটে, কিন্তু এই পথটাই সুবিধা। অপু ভাবে, 'এইবার সেই তেঁতুল গাছটা', এইবার কাটাদ'র মিত্তির বাড়ীর অশথ গাছটা দেখা যাবে।

সন্ধ্যা ঠিক হয় নাই, উঠানে তেলী-বাড়ীর বড়-বৌ দাঁড়াইয়া কি গল্প করিতেছিল, দূর হইতে অপুকে আসিতে দেখিয়া হাসিমুখে বলিল—কে আসচে বলুন তো মা-ঠাকরুণ? সর্ব্বজয়ার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিল, অপু নয় তো! অসম্ভব—সে এখন কেন—

পরক্ষণেই সে ছুটিয়া আসিয়া অপুকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরে। সর্ব্বজয়ার চোখের জলে তাহার জামার হাতটা ভিজিয়া উঠিল। মাকে যেন এবার নিজের অপেক্ষা মাথায় ছোট দুর্ব্বল ও অসহায় বলিয়া অপুর মনে হইতে লাগিল। তপঃকৃশা শবরীর মত ক্ষীণাঙ্গী, আলুথালু অর্দ্ধরুক্ষ চুলের গোছা একদিকে পড়িয়াছে, মুখের চেহারা এখনও সুন্দর, গ্রীবা ও কপালের রেখাবলী এখন অনেকাংশে ঋজু ও সুকুমার। তবে এবার মায়ের চুল পাকিয়াছে, কানের পাশের চুলে পাক ধরিয়াছে। নিজের সবল দৃঢ় বাহুবেষ্টনে সরলা, চিরদুঃখিনী মাকে সংসারের সহস্র দুঃখাবপদ হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে অপুর ইচ্ছা যায়। এভাবটা এইবার প্রথম সে মনের মধ্যে অনুভব করিল, ইতিপূর্ব্বে কখনও হয় নাই।

বড়-বৌ একপাশে হাসিমুখে দাঁড়াইয়াছিল, সে অপুকে ছোট দেখিয়াছে, এখন আর তাহাকে দেখিয়া ঘোমটা দেয় না। সর্ব্বজয়া বলিল, এবার ও এসেছে বৌমা, এবার কালই কিন্তু। অপু নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খুড়ীমা, কাল কি? বড়-বৌ হাসিয়া বলিল, দেখো কাল আজ বোল্‌বো না তো?

খিচুড়ী খাইতে ভালবাসে বলিয়া সর্ব্বজয়া অপুকে রাত্রে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিল, পেট ভরিয়া খাওয়া ঘটিল এই সাত আট দিন পরে আজ মায়ের কাছে। সর্ব্বজয়া জিজ্ঞাসা করিল, হাঁ রে সেখানে খিচুড়ী খেতে পাস্?

অপুর শৈশবে তাহার মা শত প্রতারণার আবরণে নগ্ন দারিদ্র্যের নিষ্ঠুর রূপকে তাহাদের শিশুচক্ষুর আড়াল করিয়া রাখিত, এখন আবার অপুর পালা। সে বলিল—হুঁ, বাদ্‌লা হলেই খিচুড়ী হয়।

—কি ডালের করে?

—মুগেরই বেশী, মুসুরীরও করে, খাঁড়ি মুসুরী।

—সকালে জলখাবার খেতে দ্যায় কি কি?

অপু প্রাতঃকালীন জলযোগের এক কাল্পনিক বিবরণ খুব উৎসাহের সহিত বিবৃত করিয়া গেল। মোহনভোগ, চা, এক একদিন লুচিও দেয়। খাওয়ার বেশ সুবিধা।

প্রীতির টুইশানি কোন্ কালে চলিয়া গিয়াছে, কিন্তু অপু সেকথা মাকে জানায় নাই, সর্ব্বজয়া বলিল—হাঁরে তুই যে সে মেয়েটি পড়াস্—তাকে কি বলে ডাকিস্? খুব বড়লোকের মেয়ে না?

—তার নাম ধরেই ডাকি—

—দেখতে শুনতে বেশ ভাল?

—বেশ দেখ্‌তে—

—হাঁ রে তা তোর সঙ্গে বিয়ে দেয় না? বেশ হয় তা হ'লে—

অপু লজ্জারক্ত মুখে বলিল, হাঁ—তা তারা বড়লোক আমার সঙ্গে—তা কি কখনও—তোমার যেমন কথা!

সর্ব্বজয়ার কিন্তু মনে মনে বিশ্বাস অপুর মত ছেলে পাইলে লোকে এখনি লুফিয়া লইবে। অপু ভাবে, তবুও তো মা আসল কথা কিছুই জানে না! প্রীতির টুইশানি থাকিলে কি আর না খাইয়া দিন যায় কলিকাতায়?

অপু দেখিল সে যে টাকা পাঠায় নাই, মা একটি-বারও সে কথা উত্থাপন করিল না, শুধুই তাহার কলিকাতার অবস্থানের সুবিধা অসুবিধা সংক্রান্ত নানা আগ্রহ-ভরা প্রশ্ন। নিজেকে এমনভাবে সর্ব্বপ্রকারে মুছিয়া বিলোপ করিতে তাহার মায়ের মত সে আর কাহাকেও এপর্য্যন্ত দেখে নাই। সে জানিত এ লইয়া বাড়ী গেলে মা কোনো কথা তুলিবে না।

সর্ব্বজয়া একটা এনামেলের বাটী ও গ্লাস ঘরের ভিতর হইতে আনিয়া হাসিমুখে বলিল—এই ছাখ্, এই দুখানা ছেঁড়া কাপড় বদলে তোর জন্যে নিইচি—বেশ ভাল, না?...কত বড় বাটীটা ছাখ। অপু ভাবিল—মা যা দ্যাখে তাই বলে ভালো, এ আর কি ভালো, যদি আমার সেই পুরনো দোকানে কেনা প্লেট্‌গুলো মা দেখ্‌তো!

কলিকাতার সে দুরূহ জীবন-সংগ্রামের পরে এখানে বেশ আনন্দে ও নির্ভাবনায় দিন কাটে রাত্রে। মায়ের কাছে শুইয়া সে আবার নিজেকে ছেলেমানুষের মত মনে করে, ব'লে সেই গানটা কি মা, ছেলেবেলায় তুমি আর আমি শুয়ে শুয়ে রাত্রে গাইতাম—এক একদিন দিদিও—সেই চিরদিন কখনও সমান না যায়—কভু বনে বনে রাখালেরি সনে কভু বা রাজত্ব পায়—

পরে আবদারের সুরে ব'লে—গাও না মা গানটা?

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলে—হ্যাঁ, এখন কি আর গলা আছে—দূর—

—এস দুজনে গাই—এস না মা—খুব হবে, এস—

খুব নীচু সুরে দুজনে গানটা গায়। সর্ব্বজয়ার মনে আছে অপু যখন ছোট ছিল, তখন কোনো মেয়েমজলিসে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের গান সেখানে হয়ত হইত, অপুর গলা ছিল খুব মিষ্ট, কিন্তু তাহাকে প্রথমে কিছুতেই গান-গাওয়ানো যাইত না—অথচ যেদিন তাহার গান গাহিবার ইচ্ছা হইত, সেদিন মায়ের কাছে চুপি চুপি বার বার বলিত আমি কিন্তু আজ গান গাইবো না বলো মা। অর্থাৎ সেদিন লোকে এক-আধবার বলিলেই সে

গাহিবে। সর্ব্বজয়া ছেলের মন বুঝিয়া অমনি বলিত—তা অপু এবার কেন একটা গান কর্ না?…ত্ব' একবার লাজুক মুখে অস্বীকার করার পর অমনি অপু গান স্বরু করিয়া দিত।

সেই অপু এখন একজন মানুষের মত মানুষ। এত রূপ এ অঞ্চলের মধ্যে কে কবে দেখিয়াছে? একহারা চেহারা বটে, কিন্তু সবল, দীর্ঘ, শক্ত হাত-পা। কি মাথার চুল, কি ডাগর চোখের নিষ্পাপ, পবিত্র দৃষ্টি, রাঙা ঠোঁটের দুপাশে বাল্যের সে সুকুমার ভঙ্গী এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, শুধু সর্ব্বজয়া তাহা ধরিতে পারে।

অপু কিন্তু সে ছেলেবেলার অপু আর নাই। প্রায়ই সব বদ্‌লাইয়া গিয়াছে, সে অপূর্ব্ব হাসি, সে ছেলেমানুষি, সে কথায় কথায় মান-অভিমান, আবদার, গলায় সে রিণ্‌রিণে মিষ্টি স্বর—এখনও অপুর স্বর খুবই মিষ্ট—তবুও সে অপরূপ বাল্যস্বর, সে চাঞ্চল্য—পাগলামি—সে সবের কিছুই নাই। সব ছেলেই বাল্যে সমান ছেলেমানুষ থাকে না, কিন্তু অপু ছিল মূর্ত্তিমান শৈশব। সরলতায়, দুষ্টুমিতে, রূপে, ভাবুকতায়—দেবশিশুর মত। এক ছেলে ছিল তাই কি, শত ছেলেতে কি হয়? সর্ব্বজয়া মনে মনে বলে—বেশী চাইনে, দশটা পাঁচটা চাইনে ঠাকুর, ওকেই আর জন্মে আবার কোলজোড়া করে দিও।

সর্ব্বজয়ার জীবনের পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া অপু যে অমৃত শৈশবে পরিবেশন করিয়াছে, তারই স্মৃতি তার দুঃখ-ভরা জীবন-পথের পাথেয়। আর কিছুই সে চায় না।

কোনো কোনো দিন রাত্রে অপু মায়ের কাছে গল্প শুনিতে চায়। সর্ব্বজয়া বলে—তুই তো কত ইংরিজি বই পড়িস্, কত কি—তুই একটা গল্প বল না বরং শুনি। অপু গল্প করে। দুজনে নানা পরামর্শ করে, সর্ব্বজয়া পুত্রের বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কাঁটাদহের সাণ্ডাল বাড়ী নাকি ভাল মেয়ে আছে সে শুনিয়াছে, অপু পাশটা দিলেই এইবার…।

কলিকাতায় যে জেঠাইমাদের বাড়ীতে সে গিয়াছিল, সে কথা বলে। সর্ব্বজয়া বলে—তাই নাকি?…তোকে খুব যত্নটত্ন করলে?…কি খেতে দিলে?…অপু নানা কথা সাজাইয়া বানাইয়া বলে। সর্ব্বজয়া বলে—আমায় একবার নিয়ে যাবি?…কল্‌কাতা কখনও দেখিনি, বট্‌ঠাকুরদের বাড়ী দুদিন থেকে মা কালীর চরণ দর্শন করে আসি তা হ'লে?…অপু বলে, বেশ তো মা, নিয়ে যাব, যেও সেই পূজোর সময়।

সর্ব্বজয়া বলে একটা সাধ আছে অপু, বট্‌ঠাকুরদের দরুণ নিশ্চিন্দিপুরের বাগানখানা তুই মানুষ হয়ে যদি নিতে পারতিস্ ভুবন মুখুয্যেদের কাছ থেকে, তবে—

সামান্য সাধ, সামান্য আশা। কিন্তু যার সাধ, যার আশা, তার কাছে তা ছোটও নয়, সামান্যও নয়। মায়ের ব্যথা কোন্‌খানে অপুর তাহা বুঝিতে দেরি হয় না। মায়ের অত্যন্ত ইচ্ছা নিশ্চিন্দিপুরে গিয়া বাস করা, সে অপু জানে। সর্ব্বজয়া বলে—তুই মানুষ হ'লে, তোর একটা ভাল চাকরী হ'লে, তোর বৌ নিয়ে তখন আবার নিশ্চিন্দিপুরে গিয়ে ভিটেতে কোঠা উঠিয়ে বাস করবো। বাগানখানা কিন্তু যদি নিতে পারিস্—বড় ইচ্ছে হয়।

অপুর কিন্তু একটা কথা মনে হয়, মা আর বেশী দিন বাঁচিবে না। মায়ের চেহারা অত্যন্ত রোগা হইয়া গিয়াছে এবার, কেবলই অসুখে ভুগিতেছে। মুখে যত রকম সান্ত্বনা দেওয়া, যত আশার কথা বলা সব ব'লে। জানালার ধারে তক্তপোষে দুপুরের পর মা একটু ঘুমাইয়া পড়ে, অনেক বেলা পড়িয়া যায়। অপু কাছে আসিয়া বসে, গায়ে হাত দিয়া বলে—গা যে তোমার বেশ গরম, দেখি?

সর্ব্বজয়া সে সব কথা উড়াইয়া দেয়। এ-গল্প ও-গল্প করে। ব'লে—হ্যাঁরে, অতসীর মা আমার কথাটথা কিছু ব'লে?

অপু মনে মনে ভাবে—মা আর বাঁচবে না বেশী দিন। কেমন যেন—কেমন—কি কোরে থাক্‌বো মা মারা গেলে?

(ক্রমশঃ)

বঙ্গসাহিত্যে প্যারীচাঁদ

শ্রীরামসহায় বেদান্তশাস্ত্রী

বাঙ্গলার বর্ত্তমান গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা বলিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা পূজা করি। বঙ্গসাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয় বঙ্কিমচন্দ্র হইতেই হইয়াছে বলিয়া থাকি। কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে যাঁহারা আছেন, এই অভ্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী হেতুরূপে যাঁহাদের নির্দ্দেশ করা যায়, তাঁহাদিগকে ভুলিলে আমাদের চলিবে না। সে কাঁহারা? রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, ও প্যারীচাঁদ মিত্র, অর্থাৎ টেকচাঁদ ঠাকুর। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব্বে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্কৃত-বহুল ভাষাই বাঙ্গলার আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা হইবে, ইহাই তখন লোকে ভাবিয়াছিল। সেই সংস্কৃত-বহুল ভাষাই ভদ্র ভাষা, সাহিত্যের ভাষা। ইহারই অনুসরণ করিয়া সে সময়কার বাঙ্গলার গদ্য ভাষা গড়িয়া উঠিতেছিল। সকল লেখকই এই ভাষা আশ্রয় করিয়া পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা আরম্ভ করিতেছিলেন, এই সংস্কৃত-বহুল ভাষার পরিবর্ত্তে যিনি সাধারণবোধ্য গ্রাম্যভাষা চালাইতে চাহিয়াছিলেন, বাঙ্গলার গদ্য ভাষাকে সম্পূর্ণ সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার আকর্ষণ হইতে মুক্ত করিবার জন্য যিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন, তিনি প্যারীচাঁদ মিত্র বা টেকচাঁদ ঠাকুর। বাঙ্গলা ভাষা বাঙ্গলা ভাষা হইবে, অনুস্বার বিসর্গ হীন সংস্কৃত হইবে না, এই বলিয়া তিনি বিদ্রোহীর বেশে সাহিত্যের আসরে নামিয়াছিলেন। পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা করিয়া, ব্যঙ্গচিত্র আঁকিয়া দল বাঁধিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। টেকচাঁদী ভাষা বা আলালী ভাষা সাহিত্যের ভাষা নহে, ভদ্রলোকের ভাষা নহে, শিক্ষিতের ভাষা নহে, উহা ছোটলোকের ভাষা এবং অপভাষা, এইরূপ বহু অপবাদ বহু গালাগালিই তাঁহাকে খাইতে হইয়াছিল। তথাপি তিনি উদ্দেশ্যভ্রষ্ট হন নাই। অসম সাহসে গন্তব্য পথে বিজয়ীর মতই চলিয়া গিয়াছেন ; পশ্চাতে ফিরেন নাই, সম্মুখের দিকে গতি আদৌ নিয়ন্ত্রিত করেন নাই।

টেকচাঁদ ঠাকুর—এই ছদ্মনাম তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাহা না করিয়া তাঁহার উপায়ও ছিল না। প্রথম সাহিত্যের ভিতর গ্রাম্যভাষা চালাইতে হইলে নিজের প্রকৃত নামের পরিবর্ত্তে ছদ্মনামেই অধিক কার্য্য হইবে ভাবিয়াই তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ সাহস তখনকার কালে অসম সাহস বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবে প্রভাবিত দেশের অবস্থা, আর এখনকার বর্ত্তমান অবস্থা এক নহে। বাঙ্গলা ভাষা—সাধারণের বোধ্য হউক, প্রাণের ভাষা হউক, সংস্কৃতের নাগপাশে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ হইবে কেন, ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়। সেই সময়ে তিনি বাঙ্গলা ভাষাকে চলিত ভাষা করার চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই মধ্যযুগের সাহিত্যিকগণের পক্ষে মধ্যপথ ধরার বিশেষরূপ সুবিধাই হইয়াছিল। সংস্কৃতানুবর্ত্তিতার প্রবল স্রোতকে তিনি বাধা না দিলে বর্ত্তমান গদ্যসাহিত্যের উন্নতি আরও পিছাইয়া যাইত কি না কে জানে? বিদ্যাসাগর, অক্ষয়চন্দ্র, ও এই প্যারীচাঁদের সংঘর্ষের ফলেই আমরা এত শীঘ্র বঙ্কিমচন্দ্রকে পাইয়াছিলাম।

প্যারীচাঁদ আলালী ভাষার স্রষ্টা বলিয়া তিনি যে সংস্কৃতবহুল ভাষা লিখিতেন না, বা লিখিতে জানিতেন না, এমন নহে। তখন যে-ভাষা সাহিত্যের ভাষা ও ভদ্রলোকের ভাষা ছিল, তাহাও তাঁহাকে প্রথম লিখিতে হইয়াছিল। প্যারীচাঁদের ভাষা হইতে আমরা এই নমুনা তুলিয়া দেখাইতেছি। বলিয়া রাখি যে, এই নমুনা আমাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হয় নাই। যে স্থানটি খুলিয়াছি, সেই স্থানটিতেই পাইয়াছি—

"দময়ন্তীও পতিপরায়ণা ছিলেন। সকল কামনা পতিতে পর্য্যবসান করত পতিতে মগ্ন হইয়া আত্ম-লাভ সাধন করিতেন। পতি সত্বেই হউক আর পতি-বিয়োগেই হউক, সাকার কিংবা নিরাকার পতি অবলম্বনে পূর্ব্বকালীন অঙ্গনারা আত্মার উদ্দীপন করিতেন। দময়ন্তী ঘোর ক্লেশে পতিত হইয়াছিলেন। অরণ্যে পতি-কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অর্দ্ধবস্ত্রপরিধানা, তথায় নিমেষমাত্র পতিকে বিস্মরণ না করিয়া অনেক দুর্গম স্থানে পর্য্যটন-পূর্ব্বক পুনরায় পতিকে পাইয়াছিলেন।" (বসুমতী সংস্করণ ১৪১ পৃষ্ঠা—সদ্ভাব প্রবন্ধের মধ্যে)

আজকাল এই ভাষা আর চলে না, অথচ তখন ইহাই আদর্শ এবং শ্রেষ্ঠ ভাষা ছিল।

তুলনার মধ্যবর্ত্তী ভাষার নমুনাও তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে অনেক স্থানে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তাঁহার প্রবন্ধ রচনা সকল প্রকারের ভাষাতেই লিখিত আছে। ঐ পৃষ্ঠাতেই শকুন্তলা সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন—

"শকুন্তলার উচ্চ শিক্ষা হইয়াছিল। পালক পিতা কহেন—কন্যা ঋণ-স্বরূপ—উৎকৃষ্ট অমূল্য রত্ন—পিতারই গচ্ছিত ধন, রাজা দুষ্মন্ত কণ্বের আশ্রমে শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া রাজ্যে গমন করেন। অনন্তর শকুন্তলার এক পুত্র জন্মে। তিনি ঐ পুত্রকে সঙ্গে করিয়া রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া বলেন—'রাজন্! আমি তোমার ভার্য্যা, এই বালকটি তোমার পুত্র!' রাজা তাঁহার কথা অবিশ্বাস করিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, 'রাজন্! ভার্য্যাকে অবহেলা করিও না—ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পিতার স্বরূপ—আর্ত্ত ব্যক্তির জননী-স্বরূপ এবং পথিকের বিশ্রাম-স্থান স্বরূপা—আর সত্যই পরম ব্রহ্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন করাই পরমোৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। অতএব তুমি সত্য পরিত্যাগ করিও না।'

আর একটি স্থল দেখাইতেছি, মনে হয় এইবার ক্রমশ প্যারীচাঁদের নিজের রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছি। প্যারীচাদের প্রাণ যে-ভাষা চাহে, সেই ভাষাই এইবার আরম্ভ হইতেছে। তত্ত্বের দিক দিয়াও ইহার বিশেষ মূল্য আছে, উদ্ধৃত করিতেছি।—

"একজন নাস্তিক ও একজন আস্তিক দুইজনে এক জাহাজে গমন করিতেছিল। দুইজনে ঘোর বিচার হইতেছে, গজকচ্ছপের মত কেহই কাহাকে পরাজয় করিতে পারে না। দৈবাৎ আকাশ ঘন মেঘে পূর্ণ হইল—বায়ু ঘোরতর প্রচণ্ড হইতে লাগিল। তরঙ্গ যেন মাতঙ্গের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইল—জাহাজ ডুবুডুবু হয়, এমত সময়ে নাস্তিক প্রাণভয়ে অতিশয় ব্যাকুল হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, 'পরমেশ্বর রক্ষা কর।' কিয়ৎক্ষণ পরে বায়ু শান্ত হইলে আস্তিক নাস্তিককে জিজ্ঞাসা করিল, 'মহাশয়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বারংবার অস্বীকার করেছেন, তবে কেন তাঁহাকে ডাকেন?' নাস্তিক কহিল, 'আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক ডাকি না, কে যেন আমাকে ডাকালে। বোধ হয় বিপদে পড়িলে সকলেই এইরূপ করে।' (যৎকিঞ্চিৎ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

প্যারীচাঁদ মিত্রের মর্ম্মর-মূর্ত্তি

বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্য যে ক্রমশই সংস্কৃত ভাষা হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে, উপন্যাস নাটকের কথোপকথনে খাঁটি বাঙ্গলা শব্দের প্রচলন যে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে, এমন কি প্রবন্ধের ভাষাও যে অনেক স্থলে কথ্যভাষার অনুরূপ হইয়া গড়িয়া উঠিতেছে, তাহার মূলে এই প্যারীচাঁদের প্রভাবই বিদ্যমান। তবে প্যারীচাঁদ ভাষাটিকেই মাত্র কথ্যভাষা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু রুচি দেশীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত থাকুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা ছিল। বঙ্গভাষা সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হউক,

কিন্তু ভাবের আদর্শও সংস্কৃতের প্রভাব হইতে মুক্ত হউক ইহা তিনি চাহেন নাই। সকল রচনার ভিতরই তাঁহার আদর্শের উপর গৌরব বৃদ্ধির ভাবটি বর্ত্তমান ছিল, দেশ-হিতৈষণার অভাব কোথাও পরিলক্ষিত হয় নাই। সরস ব্যঙ্গের মধ্যেও ঐ স্বর, ঐ ধ্বনি। একস্থানে তিনি বলিতেছেন,"পুরুষজাত শিকলিকাটা টিয়া—কারে না পড়লে স্ত্রীকে স্মরণ হয় না। সুতরাং স্ত্রীর মান বেড়ে উঠে—সে সময় কেবল স্ত্রীই হর্ত্তা, স্ত্রীই কর্ত্তা, নতুবা স্ত্রী পায়ের তলায় পড়ে থাকে।"

তাঁহার গ্রাম্যভাষার মধ্যে মাধুর্য্য ছিল, বর্ণনার মধ্যেও সৌন্দর্য্য ছিল। একটি স্থান আমরা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি—

"দেখিতে দেখিতে পশ্চিমে একটা কাল মেঘ উঠিল—তুই এক লহমার মধ্যে চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার হইয়া আসিল—হু হু করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল—কোলের মানুষ দেখা যায় না—সামাল সামাল ডাক পড়ে গেল। ঢেউগুলো এক একবার রেগে উচ্চ হইয়া উঠে, নৌকার উপর ধপাস ধপাস করিয়া পড়ে।"

'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যে ঠক্ চাচা নামক একটি মুসলমান-চরিত্রের অবতারণা আছে। ঐ জাতীয় চরিত্র যে কথাসাহিত্যে স্থান পাইতে পারে, বিদ্যাসাগরের যুগে কেহ কল্পনা পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার ঐ অসম সাহস দেখিয়াই মধুসূদন দত্ত এবং দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় স্ব স্ব গ্রন্থে ঐ জাতীয় চরিত্র অঙ্কন করিতে আর ভীত হন নাই।

ঠক চাচার বর্ণনায় লেখক বলিতেছেন—

"ঠক্ চাচা বগলে একটা কাগজের পোটলা, মুখে কাপড়, চোক দুটী মিটমিট করিতেছে। দাড়িটি ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ঘাড় হেঁট করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কাপড়ে বাঁধা মিঠাই খুলিয়া মুখে ফেলিতে যান অমনি পিছন হইতে দুই বেটা মিশ কালো কয়েদি গোপ চুল ও ভুরু সাদা, চোক লাল, হা হা শব্দে বিকট হাস্য করত মিঠায়ের ঠোঙ্গাটি সট করিয়া কাড়িয়া লইল এবং দেখাইয়া দেখাইয়া টপ-টপ খাইয়া ফেলিল।"

এমন স্বাভাবিক করিয়া সাধারণ ঘটনা বর্ণনা করার প্রথা প্যারীচাঁদই প্রথম প্রবর্ত্তন করিলেন।

'পোটলা', 'চোক', 'মট', 'টপাটপ' 'মিশকাল' প্রভৃতি বাঙ্গলার গ্রাম্য শব্দগুলি সাহিত্যের ভিতর চালান বড় অল্প সাহসের কার্য্য নহে। উপন্যাসোক্ত যাহার তাহার মুখে বসান আর সাহিত্যের মধ্যে চালান, এক কথা নহে।

প্যারীচাঁদের ভাষা, লিখনপদ্ধতি ও মতামত পর্য্যন্ত উত্তরকালে বাঙ্গলা সাহিত্যের ভিতর এরূপভাবে চলিয়া যাইবে, তাহা তিনি নিজে ভাবিয়াছিলেন কি না জানি না। তাঁহার "মদ খাওয়া বড় দোষের" জীবন্ত চিত্র যে সধবার একাদশীর নিমচাঁদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে, কে ভাবিয়াছিল? কে মনে করিয়াছিল, মাইকেলের "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ"এর মধ্যে তাঁহার প্রভাব এরূপ সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যাইবে?

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত মহাশয় সম্যক সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা সৃষ্টি করিয়া উহাই সাহিত্যের ভাষা, উহাই আদর্শ বঙ্গভাষা, উহাই ভদ্রলোকের ভাষা, এই ধারণা দেশবাসীর মস্তিষ্কে প্রবেশ করাইয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে আদর্শও ছিল, মনুষ্যত্ববর্দ্ধক উপাদানও ছিল, সমাজ-হিতৈষণাও ছিল। কিন্তু সে আদর্শ ঠিক বাঙ্গালী সাধারণের মধ্য দিয়া ফোটে নাই। সে উপাদানটি পল্লীর বাঙ্গালী সমাজের বলিয়া আমাদের গ্রহণ করিবার উপায় ছিল না। সে সমাজ-হিতৈষণা উচ্চাঙ্গের; সাধারণের দোষ দুর্ব্বলতার মধ্য দিয়া আমাদের মধ্যে আসে নাই, এক কথায় তাঁহাদের আদর্শ সৃষ্টি ও আদর্শ বর্ণনার মধ্যে বাঙ্গলার, তথা দীনদুঃখীর, সুখদুঃখ স্থান পায় নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় সাধারণতঃ অনুবাদ সাহায্যেই সাহিত্যের প্রচার এবং প্রসার করিয়া গিয়াছেন। অনুবাদ-সাহিত্যই তাঁহার দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়াছিল। বর্ণপরিচয়, ব্যাকরণকৌমুদী, সে স্বতন্ত্র সামগ্রী। অক্ষয়চন্দ্র দত্ত মহাশয় একজন নীতিবাদী ও আদর্শকাম ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতির অনুরূপ সাহিত্যই তিনি গড়িয়া তোলেন; মানবের সদগুণ-সকল কি প্রকারে সমাজের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতে পারে তাহার উপায় তিনি নানারূপে দেখাইয়াছেন। তিনিও

পল্লীগ্রামের মধ্যে আসিয়া, পল্লীর সুখদুঃখ আলোচনা করেন নাই। তাঁহারা করেন নাই বলিয়া মন্দ করিয়াছিলেন, তাহা বলিতেছি না। তাঁহাদের আদর্শে তাঁহারা ঠিকই ছিলেন।

প্যারীচাঁদের আদর্শ অন্যপ্রকারের। তিনি ইঁহাদের অনুসৃত পথে আদর্শের সন্ধান না করিয়া অন্যত্র আদর্শের সন্ধান করিয়াছেন। তিনি ইঁহাদের বিরুদ্ধ একটি নূতন পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি আপনার কথাসাহিত্যে বাঙ্গলার খাঁটী সমাজচিত্র, পল্লীর প্রকৃত নরনারীর চিত্র এবং তাহাদেরই সত্যকারের সুখদুঃখের চিত্রই আঁকিয়াছেন। সীতা, শকুন্তলা, বা দময়ন্তী প্রভৃতির কথা প্রবন্ধের ভিতর রাখিয়া দিয়া কথাসাহিত্যে বাবুরাম-গৃহিণী ও মতিলালের বধূটিকে আনিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধা কাহারও অপেক্ষা তাঁহার অল্প ছিল না। তবে সেই আদর্শটি সাধারণ লোকের সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া, পল্লীর ছায়াস্নিগ্ধ ছবিখানির বর্ণনা করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙ্গালী সমাজের পাপ, দোষ ও দুর্ব্বলতাও তাঁহার বর্ণনার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। পল্লীর সুখদুঃখ অভাব-অভিযোগের আলোচনা করিয়া সমাজকে দোষশূন্য করাই তাঁহার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল। প্রবন্ধ লিখিয়া সমাজ-চিত্র আঁকিয়া, এমন কি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়াও সেই উদ্দেশ্য, সেই অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

তিনি জানিতেন পল্লী-জননীর ছায়াশীতল পর্ণকুটীরখানির মধ্যেই জাতির মঙ্গলের বীজ নিহিত আছে। জাতির জীবনীশক্তি নগরে নাই, আছে পল্লীতে। তাই তিনি পল্লীর ঘটনা লইয়া আপনার কথা-কাহিনী আরম্ভ করিয়াছেন। শ্যামশষ্পময় মাঠ এবং গ্রামের গোময়-লিপ্ত অঙ্গনের মধ্যেই তিনি আপনার স্থান বাছিয়া লইলেন। পুষ্করিণীর ঘাটে পল্লীরমণীদের আলাপের মধ্যে তিনি কেবল মাধুর্য্যই দেখেন নাই। পরকুৎসা এবং হিংসাদ্বেষের কালিমাটুকুও দেখিয়াছেন। ধনী পরিবারের যে চিত্রখানি তিনি কথাসাহিত্যে স্থান দিয়াছেন, তাহা পল্লীর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্র, নগরবাসী বিলাসী ধনীর নহে। সে ধনী পরিবারের গৃহিণীকে হিন্দুরমণী করিয়াই আঁকিয়াছেন। স্বয়ং ইংরেজী শিক্ষিত হইয়াও পাশ্চাত্য রমণীর প্রাণ তাহার মধ্যে পূরিয়া দেন নাই। দেশীয় মূর্ত্তির ভিতর ইঙ্গবঙ্গ সমাজের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার পক্ষপাতী তিনি একেবারেই ছিলেন না। দেশীয় চিত্রের দেশীয় সজ্জাই হউক, প্রাণপ্রতিষ্ঠাও দেশেরই মন্ত্রে হউক্, ইহাই তাঁহার মত ছিল। তাঁহার সৃষ্ট নারী দোষে গুণে বাঙ্গালী নারী; তথাকথিত অর্দ্ধসভ্য হউক, তথাপি পল্লীর নারী। প্রৌঢ় বাবুরামের দ্বিতীয় পক্ষের অল্পবয়স্কা স্ত্রীকে পর্য্যন্ত মৌন বেদনাময়ী পল্লীবধূরূপেই তিনি গড়িয়া তুলিয়াছেন। বাবুরামের পুত্র মতিলাল ফোতোবাবু! পল্লীর কুসঙ্গে মিশিয়া কলিকাতার আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া সে একটি অদ্ভুত জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার নিকট গর্ভধারিণী (অবশ্য পতিহীনা হইলে পর) কেবল অনাদর ও তিরস্কারেরই ভাগিনী হইয়াছেন তাহা নহে, দুঃখ বেদনা জানাইতে আসিয়া গালে চড় পর্য্যন্ত খাইয়া ফিরিতে হইয়াছে। চড় খাইয়া মতিলালের মায়ের মুখে তিরস্কার ফুটিল না। উপদেশ বর্ষিত হইল না। সৌন্দর্য্য বিকাশ তেমন হইল না বটে, কিন্তু কঠোর সত্য ফুটিয়া উঠিল। মাধুর্য্য রহিল না বটে, কিন্তু স্বাভাবিক হইল। সেই মাতাই একদিন (অবশ্য স্বামীর বর্ত্তমানে) মতিলাল এবং তাহার সঙ্গীদের দ্বারা অবমানিতা এক রমণীকে তাহাদের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই মা চড় খাইয়া ফিরিয়াই গেল, মুখে কিছু প্রকাশ করিল না।

রক্ষা করিয়া গৃহিণী যে কথাকয়টি রমণীটিকে বলেন, তাহা বড়ই মিষ্ট; পাঠককে উহা শুনাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না।

'মা! কেঁদ না, ভয় নাই—তোমাকে আমি বুকের উপর রাখ্‌ব। তুমি আমার পেটের সন্তান—যে স্ত্রী পতিব্রতা তাহার ধর্ম্ম পরমেশ্বর রক্ষা করেন। এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া গৃহিণী সঙ্গে লইয়া তাহার পিত্রালয়ে রাখিয়া আসিলেন।"

বাঙ্গালী গৃহের এরূপ চিত্র বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির যুগেও অধিক আছে মনে হয় না।

প্যারীচাঁদের অঙ্কিত চরিত্রগুলি সৌন্দর্য্যের দিক দিয়া

অবশ্য ভ্রমর, সূর্য্যমুখী, কুন্দ, আয়েষা, রজনী, দলনী, কমল বা ইন্দিরার মত ফুটে নাই। একেবারে ফুটে নাই, তাহা বলিতে পারি না। এ চরিত্র ছায়ার মত চক্ষুর উপর ভাসে, প্রাণপ্রতিষ্ঠার দ্বারা সজীব হইয়া হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত থাকে না। কায়া আছে কিন্তু তাহার সাজসজ্জা নাই, প্রাণ আছে কিন্তু তাহার স্পন্দন নাই। কতকগুলি বৃক্ষের চারা তৃণরাশির মধ্যে মাথা তুলিয়াছে, ফলফুলে ভরিয়া উঠে নাই। আজ সেই চারাগুলিই বঙ্গসাহিত্যের উদ্যানে পৃথক্ নাম ধরিয়া, সুন্দর বেশভূষা পরিয়া ফুলফলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

সংস্কৃত দুরূহ শব্দগুলির স্থানে যাহাতে বাঙ্গালা ভাষার নিজস্ব শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। খয়ের ছাড়িয়া খদির, চিনি ছাড়িয়া শর্করা, কলা ছাড়িয়া রম্ভা, ঘি ছাড়িয়া ঘৃত প্রভৃতির ব্যবহার তিনি পছন্দ করিতেন না। বাপ, মা, দাদা, ভাই, বহিন, ঠাক্রুণ ও ভায়া প্রভৃতি ডাকই তাঁহার প্রিয় ছিল।

তাঁহার উপন্যাসের নাম-করণেই তাহার অভিপ্রায় বুঝা যায়। কর্ত্তা জমিদারের নাম বাবুরাম। তাহার বন্ধুদের নাম বেচারাম ও বাঞ্ছারাম; এমন কি ঠক্ চাচা (মুসলমান বন্ধুটির নাম) পর্য্যন্ত। নায়কের নামটি মতিলাল, তাহার ভ্রাতার নাম রামলাল। লাল কথাটি জুড়িয়া দেওয়ার মধ্যে ঐ একই উদ্দেশ্যসিদ্ধি। প্যারীচাঁদের সৃষ্ট পুরুষ-চরিত্রগুলির কোনোটি অবশ্য গোবিন্দলাল, নগেন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ, নবকুমার, ব্রজেশ্বর, সত্যানন্দ বা জগৎসিংহের মত হয় নাই। সাধারণতঃ ইঁহার চরিত্রগুলি যেন অৰ্দ্ধশিক্ষিত, অৰ্দ্ধমাৰ্জ্জিত, অৰ্দ্ধসভ্য, ও কথঞ্চিৎ গ্রাম্যভাবাপন্ন। যাঁহাকে ভাল করিয়াও আঁকিয়াছেন, তিনিও বর্ত্তমান যুগের বর্ত্তমান ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া গড়িয়া উঠেন নাই। প্যারীচাঁদ বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী সমাজের খাঁটী বাঙ্গালীই করিয়াছেন। তাহার মধ্যে অবশ্য তেমন সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। আবার তাহাদের বিদেশীয় করিয়াও গড়িয়া তোলেন নাই। বাঙ্গালায় মাতঃ, পিতঃ, ভ্রাতঃ প্রভৃতি সম্বোধনগুলি তিনি দেখিতে পারিতেন না। বাঙ্গালী নরনারী সাধুভাষায়, কাব্যের ভঙ্গীতে এবং ইংরেজী আদবকায়দায় কথা কহিবে, ইহা তিনি ভালবাসিতেন না। স্ত্রীকে গিন্নী, শাশুড়ীকে ঠাকরুণ, বন্ধুদের কাহাকেও বেণী ভায়া, কাহাকেও বেচারাম-দাদা এইরূপ সম্বোধন পদই ব্যবহার করিয়াছেন।

প্যারীচাঁদ প্যারীচাঁদই ছিলেন। টেকচাঁদ ঠাকুরই তাঁহার যথার্থ পরিচয়। বিদ্যাসাগর বা অক্ষয় দত্ত মহাশয়ের কার্য্য এক, তাঁহার কার্য্য পৃথক। তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল"-এর যথার্থ পরিচয় দিতে হইলে বা তাহার প্রকৃত বিচার করিতে হইলে, সেই সময়কার দেশ কাল অবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে। জঙ্গলের মধ্যে উদ্যানের সৌন্দর্য্য অন্বেষণ করিলে চলিবে না।

"আলালের ঘরের দুলাল" সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই পাঠকগণকে শুনাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব।

'আলালের ঘরের দুলাল' বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকেন অথবা কেহ ভবিষ্যতে করিতে পারেন, কিন্তু আলালের ঘরের দুলালের দ্বারা বাঙ্গলা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই। ভবিষ্যতে হইবে কিনা সন্দেহ। বাঙ্গলা গদ্য যে উন্নতির পথে যাইতেছে, প্যারীচাঁদ মিত্র তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ, ইহাই তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।" (প্যারীচাঁদ মিত্রের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা)

বঙ্গসাহিত্য এখন উন্নতির পথে গিয়া চরম পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। তাঁহার যোগ্য সম্মান দিবার উপযুক্ত সময় আমাদের মনে এখনই আসিয়াছে। তাঁহার বিদ্রোহ এক নূতন রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। তাঁহার উদ্যম জয়যুক্তই হইয়াছে। প্যারীচাঁদ মিত্র সত্যসত্যই যে একজন অন্যতম যুগপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষ, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।*

---

* বঙ্কিম-সাহিত্য-সম্মিলনে পঠিত।

জাতক

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

তুমি আসো,—আসিতেছ তুমি চিরদিন,—
চিরন্তন,—সুচির নবীন,—
প্রকাশের হে উৎস চপল !
বসুধার সুখদুঃখজন্মমৃত্যু-বন্ধুর উপল
প্রগতি-তরঙ্গে ভরি',
নির্ম্মল নির্ঝরি',
উষরে পুষ্পিত করি' আনন্দ-উৎপল,
আসিতেছ প্রাণস্পন্দ নৃত্যছন্দে দুলে'
স্বচ্ছন্দ প্রবল,—
আলোকে আঁধারে নিত্য পা-ফেলে' পা-তুলে'।
তোমার চলন-তালে চরণের তলে
শঙ্কিত, স্তম্ভিত কাল···কালজয়ী তুমি ক্রীড়াচ্ছলে !

যতিহীন গতিসূত্রে অপরূপ গীতিমাল্য গাঁথো সৃজনের,—
প্রথম সম্ভব তুমি অ-কল্পিত অ-সম্ভব রহস্যঘনের।
ফুটে ফুল,—বোঁটা টুটে প্রত্যহ সে ঝরে
এই মর্ত্ত্য-মৃত্তিকার 'পরে ;
তবু ফুটে' উঠে ফুল—
আকুল মুকুল
স্ফুটন-উন্মুখ সারি সারি
পাপ্‌ড়ির পাখা মেলে' দিয়ে চলে পাড়ি।
এই যে ফুলের ধারা
মৃত্যুহীন—শেষ-হারা,
অ-শেষের অ-মৃতের এই ধারা তুমি।

ঐ তারা তুমি—
অসীমের অন্ধকারে জেগে'
মহাশূন্য থেকে,
অসম্বৃত জ্যোতির্বেগে
বাসনার বাষ্প উৎক্ষেপিয়া,
অন্তরের অসহ উল্লাসে যে তারাটি উচ্ছ্বসি' কাঁপিয়া
অবিশ্রান্ত আবর্ত্তিয়া
ফিরিছে নর্ত্তিয়া
দিক হ'তে দিগন্তরে তাপ বৃষ্টি করে,'—
নব নব আলোক ও লোক সৃষ্টি করে'···
তুমি নিখিলের সেই তাপের তাপস
জ্যোতির্ম্ময় ;—সৃষ্টি-তামরস
সে তাপের তপেতে তোমার
রূপে রসে অভিনব
নব নব
এক হ'তে আর
অগণিত দলে
বিকশিয়া চলে :—
জড় চলে আবর্ত্তিয়া প্রাণে,
প্রাণ ধায় আত্মার সন্ধানে,
আত্মা ছুটে পরমাত্মা পানে ;
তারপর জড় ও চেতন
হারাইয়া সীমা-আয়তন
অসীমায় করে আবর্ত্তন।
তুমি এই রূপ ও অরূপ—
বিবর্ত্তিত অপূর্ব্বের রূপ !

তুমি আবরণাতীত,—মুক্ত,—দিগম্বর,—
উজ্জ্বল-সুন্দর,
সুখদুঃখশোকোত্তর ক্ষয়হীন আনন্দ-ভাস্বর
স্বপ্রকাশ প্রত্যুষ-ভাস্কর ;
নিশান্ত জগৎ জাগে নিদ্রা পরিহরি'
শুনি' তব আলোক-বাঁশরী
শাশ্বত অমর।

মাঝখানে

শ্রীজ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

রাত্রি এগারটা। প্রায় নিশুতি। রাস্তায় মুসলমান পথিক গাইতে গাইতে চলে গেল,

মেরে দরদী জীগর কি খবর হি নেহি।
এ মেরে দরদী জীগর কী—

স্বামী 'ল্যান্সেট'খানা মুড়ে একটা হাই তুলে বললেন—কি আশ্চর্য্য! এত পড়তেও পার! দেখ দিকিনি, ঠিক যেন আমারি মনের কথা গেয়ে গেল লোকটা।

স্ত্রী হাতের মাসিকপত্রখানা রেখে হাসলে,—আমি ত পড়ছিলাম, নিজে কি করছিলে—ধ্যান করছিলে বুঝি?

—তাই ত করছিলাম। দেখ না ও গান গেয়ে গেল, সুরটি কথাটি আমার 'কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশিল গো'। তোমার কি হয়েছে—বেশ তন্ময় হয়ে পড়ছিলে ত। বেশ গানটি, মানেটা বুঝেছ?

—কি? না, তেমন শুনিনি। আমি ত তোমার মতন অমনোযোগ দিয়ে পড়ি না—

—কি মনোযোগিনী!

—আর কাজ নেই, থাক। কি বলতে কি ব'লে বসবে। বরং গানটার ব্যাখ্যা করা হোক শুনি।

—'মেরে দরদী জীগর কি খবর হি নেহি,' মানে আমার যে দরদী স্বজন তার কোনো বার্ত্তা খোঁজই পাওয়া গেল না আজও—এইটুকুই শোনা গেল। আমার মনে হ'ল, আমার যিনি দরদী স্বজন তাঁর পাত্তা আমি পেয়েছি বটে, কিন্তু আপাততঃ—

বাধা দিয়ে স্ত্রী বললে,—হয়েছে থামো দিকি এখন, কিন্তু বেশ গানটা, না?

—তাই ত বলছিলাম, শুনলেই না।

গোলাপ ফুলের কুঁড়ির গায়ের সবুজ আবরণের মাঝ থেকে কুঁড়িটি আস্তে আস্তে বড় হয়ে ফুটে ওঠার মতন—রাত্রির বুক থেকে দিনের পাপড়ি বিকশিত হয়ে ওঠে; তেমনি সুন্দর, বিকশিত, অপরূপ। বাধাহীন আলো আনন্দের বার্ত্তা বয়ে আনে, ধারা বর্ষণ সেই আনন্দেরই চঞ্চল উচ্ছল নূপুরের নৃত্য-ঝঙ্কার নিয়ে আসে; হেমন্তের কুহেলিকা তারই চারিপাশে ভবিষ্যতের স্বপ্ন রচনা করে। মাস ঋতু দিনের আনন্দ-চঞ্চলতা যেন সমস্ত দেহে মনে জীবনে ভরপূর হয়ে থাকে। প্রভাতের আলোয় রক্ত শুভ্র শেফালির সৌন্দর্য্য; দুপুরের রৌদ্র কল্কে ফুলের রঙে ত্রিভুবন আলোয় ভরিয়ে দেয়; অসামান্য অপূর্ব্ব শান্ত শ্রীমতী সন্ধ্যা নেমে আসে। দিন আসে লঘু নৃত্যপর; রাত্রি আসে যেন চিত্ত-শিশুকে জননীর মত তার ঘুম পাড়ানী কোলে নিতে ...

জীবন যেন স্বচ্ছ প্রবাহিনী!

পাচ বছরে খোকার নাম বদলে রণজিৎ বলে ডাকা হয়, মেয়ের নাম শীলা হয়। ছেলে বাড়ীতে পড়ে, মেয়ে স্কুলে যায়।

মা ভাবে নিজেরা কত বড় হয়েছে। ছেলে-মেয়ের মা। তাদের খাওয়া দাওয়া দেখে—কাপড় গোছায়, ঘরকরণার কাজ দেখে শোনে। কাজেরই পারিপাট্য সাধনে সারা বেলা কেটে যায়। নিজে কিন্তু সিঁদুর-টিপটি পরে পরিষ্কার ফরসা শাড়ীখানি পরতেও লজ্জা করে। চুল বাঁধতে পারে না, কোনোক্রমে এলো-খোঁপা জড়িয়ে নেয়।

বাপ বলে, তুমি যে কি হয়ে থাক, যেন ভূতের মতন। আর কেউ-ই ত তোমার মতন করে থাকে না। কোত্থেকে একটা আধময়লা মোটা শাড়ী খুঁজে আনো, আশ্চর্য্য! সে-সব সখটখগুলো গেল কোথা? আমি কি শাড়ীও তোমার ঐরকম বিদঘুটে মোটা আনি? নিজে আনানো হয়েছে বুঝি?

—তুমি যেন কি—মোটা আবার কোথায়? বুড়ো বয়সে আবার সাজলে যে সং মনে করবে ছেলেরা।

—আচ্ছা পাগল তো! আট বছরের ছেলেমেয়ের কাছে লজ্জা! নাঃ, তোমার মাথার কিছু গোল আছে। আরে, আমি কি সাজতে বলছি? বলছি—পরিষ্কার কাপড় পরার কথা—

অপ্রস্তুত মা হাসে।

কিন্তু পরিষ্কার শাড়ী আর পরা হয় না, সিঁদুর-টিপটি পরা হয় ত চুল বাঁধা হয় না। মনে হয়, বুঝি সকলেই তার দিকে চেয়ে আছে।

মৃদু হেসে স্বামী বললেন, কত বয়স হ'ল গো আমাদের. মনে আছে?

সরলভাবে স্ত্রী উত্তর দিলে,—আমার হ'ল ছাব্বিশ, তাহলে তোমার তেত্রিশ—না?

—উহুঁ, ভুলে গেছ বোধ হচ্ছে। আমার আমি ঠিক বলতে পারলাম না, মাকে জিগগেস করব'খন। তোমার বোধ হচ্ছে একচল্লিশ হ'ল, তাহ'লে আমার কত হবে অবশ্য হিসেব করতে পার।

—যাও, ঠাট্টা করছ,—রাগ করে স্ত্রী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পকেট থেকে ষ্টেথস্‌কোপ ইত্যাদি বের করে টেবিলে রাখতে রাখতে স্বামী মৃদু স্বরে গাইলে—

ঈষৎ রাগের নিছনি বহিয়া…

ওগো শুনছ? উত্তর দেয় না। এ সাজের কথা নয়—কাজের কথা। মা ডাকছিলেন খেতে,—দেখ ত খাবার দিলে কি না।

শ্বাশুড়ী সন্ধ্যেবেলা মালা করেন, মানস জপ করেন। শ্বশুর নাতি নাতনীকে গল্প বলেন।

মা থাকেন কাজের মাঝে, আদেশ-নির্দ্দেশের সরবরাহ তদারক করতে। আনন্দচঞ্চল মন শরতের শুভ্র লঘু মেঘের মতন ছোট ছোট হাসি কথা, তুচ্ছ মানঅভিমানের স্বপ্নলোক থেকে স্বামীর পায়ের শব্দে চকিত হয়ে ওঠে, উন্মুখ স্মিত হাসিভরা দৃষ্টিতে তরুণ মন ফুটে ওঠে—কিন্তু ভাবে, কত বড় হয়েছে, কত বয়স হয়েছে · সন্তানের মা···

তারা ডাকলে উত্তর দেন, "কি বাবা"! যেন বর্ষীয়সী গৃহিণী।

শ্বাশুড়ী হাসেন মনে মনে, ওঁদের কালে ছেলেদের ডাকে ও রকম করে উত্তর দিতে ওঁদের ভারি লজ্জা হ'ত! এখনকার এরা···

বিকেল হ'লে প্রায়ই বলেন, বৌমা চুলগুলো জড়াও না গা। ব'লে, এলো চুলে শুতে নেই। তোমাদের বাছা এখনকার কিছু 'মানা' জানা নেই।

স্বামী থাকেন কাজের উন্নতির কল্পলোকে। বাড়ীতে যখন থাকেন তখনও নিজের কথা ভাবলে একবারও নিজকে বয়স্ক বলে মনে করেন না।

বেদনাহীন বিরামহারা চঞ্চলগতিতে দিন বয়ে যায়। স্ত্রীর মনের ছেলেমানুষটি কখনও ধরা দেয়, কখনও লুকিয়েই থাকে; স্বামীর ব্যস্ততার পাশ থেকে, কাজের মাঝ থেকে সেটা কিন্তু সময়ে অসময়ে বেরিয়ে এসে তাকে পরিহাস করে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে।

হঠাৎ একদিন সমস্ত ত্রিভুবনের গতিচক্র ওদের বাড়ীতে থেমে গেল।

আমি যে ডাক্তার, আমার কথাই ঠিক। অসুস্থ স্বামী চোখ বুজে স্ত্রীর হাতখানা নিজের কপালের উপর হাত দিয়ে চেপে ধরলেন।

—হোক্ গে, তাই বলে আমি মার ঘরে থাকতে পারব না।

—আর খোকাকে কি করে দেখবে?—ক্লান্তভাবে পাশ ফিরে শুয়ে স্বামী বল্লেন, আঃ—গায়েও এত ব্যথা হয়েছে। শঙ্কিত ব্যাকুল চোখে স্ত্রী শুধু চেয়ে রইল।

রাত্রে ছেলে মেয়ে শুইয়ে স্ত্রী ফেরে,শ্বাশুড়ী যান শুতে।

—কোথায় যে তোমার ছোঁচ জানি না।

—তুমি শুধু বোসো না তাহ'লেই হবে। আঃ, তাই ব'লে অত কাছে এস না—ওকি পাগল!

তোমার লাগবে না, মিনতি করে স্ত্রী বল্‌লে। দু ফোঁটা জল ঝরে পড়ল।

—আহা তোমার হবে যে, কি ছেলেমানুষ!

সকালে পূজো সেরে শ্বাশুড়ী আসেন ঘরে, "খোকা চন্নামেত্তরটুকু মুখে দিই, হাঁ কর্।"

ছেলে চরণামৃত নেয়। বধূ সংসারের কাজ করে,

ফাঁকে ফাঁকে এসে দেখে যায়, ছুঁতে পারে না ; একবার ধূপকাঠি জেলে দেয়, একবার নিমঝাড় দিয়ে যায়। কখনো ব'লে 'হাত বুলোনো বাতাস কিছু করলে কষ্ট কম্‌তে পারে কি ?' শ্বাশুড়ী না থাকলে কথা কইতে চোখ কেবলি সজল হয়ে ওঠে।

স্বামী ওর দিকে চেয়ে থাকে। খানিকটা বুঝতে পারে, আবার আশাও হয়। ভাবে এমনি কি হবে। মুখে ব'লে, 'তুমি ওদিকের সব দেখে সেরে তখন এসো, মা যখন খোকাকে দেখবেন দুপুর বেলা'।

মনে হয়, কি দুর্ভাগ্য, কি করে থাকবে···স্ত্রী ভাবতে পারে না, সমস্ত শরীরমন অবসাদে শিথিল···

স্বামী বলে, আমাকে কি রকম দেখতে হয়েছে ? তোমার ঘেন্না-করছে ?

সন্তর্পণে স্বামীর পাশে নীচু হয়ে মাথাটা রেখে বলে, আমার হ'লে করত তোমার ?

দিনরাত্রি কাজকর্ম্ম সংসার ঘরকন্না হঠাৎ কেমন করে গতিহীন অলস মন্থর হয়ে গেল। সমস্ত যেন মিছে নিরর্থক বিস্বাদ হয়ে গেল।

কেমন করে দিন কাটল, আর কাটে কে জানে। ঐ চার প্রহরবেলা ঘিরে রাত্রিদিন বর্ষা-বসন্ত তেমনি আসে যায়। কোনোদিন মন যেন থমকে দাঁড়ায়, এ কি আলো···?

চকিত হয়ে ওঠে কখনও, একি ছায়া···শ্রান্ত রাত্রি, অলস দিন···

যেন দৃষ্টিহীনের জগৎ···

গুরুজনেরা ডাকেন 'মা', ছেলে-মেয়েরা ডাকে 'মা', ধ্যানমগ্না তপস্বিনী জেগে ওঠে, কর্ম্মলোকে বেরিয়ে আসে। আর 'বড়' হবার বাধা নেই, বুড়ো হওয়ায় কোনো আপত্তি নেই--সবারি মা। কেমন করে শোকার্ত্ত স্বজনআত্মীয় তাকে বড়র সিংহাসনে মার আসনে কখন বসিয়ে দিয়েছেন। অনেক বড়—সংসারে থেকে অনেক দূরে,—যেন কোন্ তপোবনে নৈমিষারণ্যে সে আছে।

মনের ভেতর জেগে ওঠে, কত বয়স হ'ল গো আমাদের ? তোমার বুঝি একচল্লিশ !

গোপন অন্তরের কোন্‌খান থেকে সেই ছেলে মানুষ নারীটি বেরিয়ে এসে সন্ন্যাসিনীর সিংহাসন থেকে নেবে তার পায়ে লুটিয়ে পড়তে চায়।

রাত্রির স্বপ্নে দিনের অবসর লোকের স্বপ্নে সে থাকে মহতের সঙ্গে, আপনার মৃত অস্তিত্ব নিয়ে ধ্যানের মাঝে ! কর্ম্মলোকে, সংসারে সে 'মা'। অতিথি-সজ্জন অপরিচিত পরিচিত, বৃদ্ধ তরুণ সকলের 'মা'।

রাত্রিদিবার মাঝখানে সন্ধ্যার মতন জীবনমরণের মাঝখানেও একটা জায়গা আছে যেখানে মৃত্যুসাগরের নোনাজল চোখে লেগে চোখ আকুল করে জল আসে। তটের ধারে বসে এ-পারের গর্জ্জন, ও-পারের তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ে না, কানে আসে না। পিছনে ফিরে যেতে পথহীন মরু, মৃত্যু যেখানে অমৃতপাত্র ভরে নিয়ে প্রতীক্ষা করে মনে হয়। জীবনের সমস্ত গতি অচল হয়ে স্তব্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে। ওর আর বড় হওয়া হয়নি-- সেইখানে থেকে একই লাইন ফিরে ফিরে মনে আসে—

কথা ছিল—এক তরীতে কেবল তুমি আমি,
যাব অকারণে ভেসে—কেবল ভেসে।

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

২৯

সন্ধ্যার সময় বিজয় বাড়ী ফিরিয়া ঘরে ঢুকিয়াই চীৎকার করিয়া বলিল, "এ কি মায়া-দি, কোন্ আলাদিনের দৈত্য এসে দিন-দুপুরে আমার ঘরটা এরকম বদলে দিয়ে গেল?"

মায়া গম্ভীর মুখে বসিয়াছিল। বিজয়ের কথায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "দৈত্যের মধ্যে ত আমি আর মহেশ। যা ছিরি করে রেখেছিলে ঘরের, ঢুকলেই মাথা ঘুরে ওঠে।"

বিজয় বলিল, "তা না ঢুকলেই ত হয়। কি কারণে হঠাৎ আমার ঘরে তোমার শুভাগমন হ'ল? আমার কাপড়-চোপড় বই-খাতা সব ফেলে দিয়ে ঘর পরিষ্কার করেছ না কি?"

মায়া বলিল, "সব আছে তোমার মায়ের ঘরে, ভাবনা নেই। এখন হাত মুখ ধুয়ে চা-টা খাও, ক্রমে সব আবর্জ্জনাগুলিই ফিরে পাবে, কিছুর জন্যে আফসোস করতে হবে না।"

বিজয় বলিল, "চা? চা পাব কোথায় শুনি? বাবা গিয়ে অবধি ত ও-জিনিষটার মুখও দেখিনি। গেলাস গেলাস জলই গিলি দুবেলা, কেবল কলেজের টিফিনের সময় ট্যাঁকে পয়সা থাক্‌লে, বেরিয়ে গিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে আসি।"

মায়া বলিল, "আজ বাইরের দুজন ভদ্রলোক এসেছিলেন কি না, তাঁদের জন্যে চা, জলখাবার সব ঘরে করা হয়েছে, তোমার জন্যেও তুলে রেখেছি।"

বিজয় বেতের চেয়ারটায় বসিয়া বলিল, "কে আবার ভদ্রলোক এল এখানে? তাই বুঝি আমার ঘর চড়াও করেছিলে?"

মায়া বলিল, "এ যে বাবার ম্যানেজার শিবচরণবাবু আর তাঁর ছেলে। ওদেরই সঙ্গে পরশু আমি যাচ্ছি কি না, তাই আজ দেখা করতে এসেছিলেন।"

বিজয় বলিল, "ও, এমন জিনিষটা মিস্ করলাম। নানা কারণেই দেবকুমার-চিজ্‌টিকে দেখবার আমার বড্ড ইচ্ছে ছিল।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "কি কারণগুলি শুনি?"

বিজয় বলিল, "তা নাইবা শুন্‌লে? সব কথাই কি আর মেয়েদের সাম্‌নে বলা যায়?"

বিজয় একপালা বাঁদরামীর জোগাড় করিতেছে দেখিয়া মায়া তাড়াতাড়ি ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জ্যাঠাইমার ঘরে আর তখনই যাইতে ইচ্ছা করিল না, সোজাসুজি ছাদের উপরে উঠিয়া গেল।

দেবকুমার এবং মায়াকে লইয়া একটা গুজব কেবল মাত্র যে রেঙ্গুনেই ছড়াইয়া ছিল, তাহা নহে। কলিকাতায়ও যে এক রকম একটা-কিছু কানাঘুষা পরিচিত মহলে কিছু দিন হইতে চলিতেছে, তাহা মায়া ক্রমেই টের পাইতেছিল। অথচ এত দিন পর্য্যন্ত তাহারা দুজন দুজনকে চাক্ষুষ দেখে নাই পর্য্যন্ত। কিন্তু বাঙালী সমাজে তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। গুজব রটান স্বচ্ছন্দেই চলে।

আজ তাহার সহিত দেবকুমারের দেখা হইয়াছে বটে, কিন্তু এমন ভাবে দেখা না হইলেই যেন ছিল ভাল। দেবকুমারের কথা সে আগে অনেক শুনিয়াছে, নিজের পিতার কাছে, শিবচরণবাবুর কাছে, বাণী ও তাহার মায়ের কাছে। সে যে কত সুশ্রী, কত বুদ্ধিমান্ এবং কত খানি উগ্র রকম নবীনপন্থী তাহা শুনিতে শুনিতে মায়ার দুই কান বোঝাই হইয়া গিয়াছে। দেবকুমারকে দেখিবার এবং তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার কৌতূহল চিরদিনই তাহার ছিল; দেবকুমারের চিত্তের উপর নিজের কিছু একটু প্রভাব বিস্তার করিবার ইচ্ছাও যে আপনার অজ্ঞাতসারে তাহার মনে ছিল না, তাহাই বা কে বলিতে

পারে? মনে মনে এই প্রথম সাক্ষাৎ ব্যাপারটিকে কত বার কত রকম করিয়া সে ভাবিয়া দেখিয়াছে, কল্পনায় কত রকম রং তাহার উপর মাখাইয়াছে; কিন্তু বাস্তবিক যাহা ঘটিল, তাহা মায়ার মনকে একেবারে বিরক্ত করিয়া তুলিল, দেবকুমারের উপরে নয়, নিজের উপরেই। দেবকুমার বিলাত যাইবার আগে না কি তাহার আত্মীয়স্বজন রক্ষাকবচ-স্বরূপ তাহার গলায় একটি পত্নী ঝুলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তাহাতে সে বলিয়াছিল, "আমার আয়ার কাজ করা অভ্যাস নেই, খুকীটুকি মানুষ করতে পারব না।" জনৈক আত্মীয় বলিয়াছিলেন, "তবে তোমার মতলবখানা কি বল দেখি? বিলাত থেকে মেম বউ নিয়ে আস্‌বে বুঝি?"

দেবকুমার বলিয়াছিল, "মেমের শাদা চামড়ার লোভে ত করব না, শিক্ষাদীক্ষার লোভে করতে পারি।"

মায়া এই গল্পটি বাণীর কাছে অনেকবার শুনিয়াছে। শুনিলেই তাহার মনে কেমন একটা উত্তেজনা আসিত। দেবকুমার নিজে এমন একটা কি যে, দেশের মেয়েদের প্রতি তাহার এমন অবজ্ঞা? এমন মেয়ে কি দেশে কেহ নাই, যে, রূপে গুণে শিক্ষায় এই অবিনীতকে পায়ের তলায় টানিয়া আনিতে পারে? সে নিজেই কি পারে না? বাণী একদিন ঠাট্টা করিয়াছিল, "বাছাধন ফিরে এলে আশা করি তোর কাছে একটু জব্দ হবেন। সহজে ছাড়িস্ না।"

মনে মনে মায়া তখন ইহাতে আপত্তি অনুভব করে নাই, যদিও প্রকাশ্যে বাণীর পিঠে চড় মারিয়া বলিয়াছিল, "আমি ত আর সার্কাসের ট্রেনার নয় যে যত দুরন্ত জানোয়ার বশ করে বেড়াব? তোমাদের দেবকুমার যা খুসি ভাবুক আর বলুক না, আমার তাতে কি এল গেল?" কিন্তু ঝাপসা রকম একটা সঙ্কল্প তখন হইতে তাহার মনে ছিল, দেবকুমারের সহিত কখনও যদি তাহার পরিচয় ঘটে, তাহা হইলে মায়া তাহাকে বুঝাইয়া ছাড়িবে যে, বাঙালীর মেয়েও এমন আছে, যে, মেমের চেয়ে কোনো অংশে হীন নয়।

কিন্তু আজ দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া কি ভাবিল কে জানে? নিতান্ত মায়ার চেহারা দেখিয়া যদি কিছু মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহাও বিশেষ হইবার কথা নয়। কারণ মায়া সুন্দরী হইলেও, সদ্য বিলাত-ফেরতের চোখে তাহাকে এমন কিছু অপরূপ রূপসী মনে নাও হইতে পারে। অন্য কোনোদিকে সে মূর্খ পাড়াগেঁয়ে মেয়ে অপেক্ষা বিন্দুমাত্রও ভাল ব্যবহার করিতে পারে নাই। শিবচরণবাবু যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তাহাকে হাঁ কিংবা না উত্তর দিয়াছে মাত্র। দেবকুমারের সহিত একটাও কথা বলে নাই। দেবকুমার তাহাকে বেশ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লইতেছে, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু সপ্রতিভ ভাবে একবারও তাকাইয়া তাহাকে দেখিতে পারে নাই। ছি, ছি, এ কি কাণ্ড! বিলাত-ফেরৎ ছেলেটি বাড়ী ফিরিয়া মনে মনে হয়ত প্রচুর হাসিয়া লইয়াছে। মায়ার কথা সেও আগে কিছু শুনিয়া থাকিবে। তাহাকে কিরূপ কল্পনা করিয়াছিল, কে জানে? বাস্তবে এবং সেই কাল্পনিক মূর্ত্তিতে কতখানি প্রভেদ দেখিল, তাহা বলা যায় না।

যাইবার সময় দেবকুমার নমস্কার করিয়া বলিয়াছিল, "আচ্ছা, আসি তবে, স্টীমারে আবার দেখা হবে।"

মায়া তাহার উত্তরেও সামান্য একটা 'হাঁ' ছাড়া আর কিছু বলিয়া উঠিতে পারে নাই।

মোটের উপর সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর হইয়াছিল। উহারা না আসিলেই ছিল ভাল। নিঃসম্পর্কীয় যুবকের সহিত আলাপ-পরিচয় করা মায়ার কাছে কিছু নূতন নয়, সর্ব্বদাই সে সপ্রতিভ ভাবে আলাপ করিতে পারিয়াছে, আজই তাহাকে কি ভূতে পাইল কে জানে?

নীচ হইতে তাহার জ্যাঠাইমা ডাকিয়া বলিলেন, "মায়া, নীচে আয়, খাবার দেওয়া হয়েছে যে। আজ কি আর ছাদ থেকে নামবিই না?"

হাজার ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সন্ধ্যার ধূসর ম্লান আলো রজনীর গাঢ় কালিমায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, মায়া তাহা লক্ষ্যও করে নাই। যাক্, আর ভাবিয়া কি হইবে? যদিও আজ বিকালের ব্যাপারটা না ঘটিলেই সে খুসি হইত, তাহা হইলেও ভয়ানক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে মনে করিবার কোনো কারণ নাই। না হয় দেবকুমার তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ না-ই হইয়াছে। কেবল

তাহাকে মুগ্ধ করিবার জন্যই ত মায়ার জন্ম হয় নাই? জগতে কত কাজ হয়ত তাহার জন্য পড়িয়া আছে।

এই কথা মনে হইতেই তাহার প্রভাসের কথা মনে পড়িল। স্কুল-করা বিষয়ে মায়া এখন পর্য্যন্ত ত কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। সাবিত্রীর এ সকল বিষয়ে খুব যে সহানুভূতি ছিল, তাহা মনে হয় না। অথচ জনহিতের দিক দিয়া দেখিতে গেলে, স্কুলটাই গ্রামের পক্ষে সব চেয়ে প্রয়োজনীয়। প্রভাসকে বিস্তৃত ভাবে চিঠি লিখিয়া সব বিষয় আলোচনা করা মায়ার উচিত ছিল রেঙ্গুন যাইবার আগেই, কিন্তু কিছুই সে করে নাই। স্কুলের জন্য কত টাকা লাগিবে, সেটা এক সঙ্গে লাগিবে, না বারে বারে দিলেও চলিবে, এ সব কথাও ভাল করিয়া জানিয়া গেলে হইত। নিরঞ্জনকে না জানাইয়া শেষ অবধি চলিবে কি না, তাই-বা কে জানে? নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে মায়া নীচে নামিয়া গেল।

মাঝের দিনটা যাত্রার আয়োজনেই কাটিয়া গেল। মায়া একটি মাত্র মানুষ, কিন্তু নিজের এবং বাণীর জন্য জিনিষ যাহা জুটাইয়াছিল, তাহা গুছাইতেই তাহার প্রাণ বাহির হইবার জোগাড় হইল। বিজয় বলিল, "একটা কেবিনে ধরবে বলে ত মনে হচ্ছে না, আর একটার জন্যে লেখ।"

বাড়ীতে বড় ছেলে একমাত্র বিজয়, সে-ই মায়াকে জাহাজে তুলিয়া দিতে চলিল। জয়ন্তী আসিবে বলিয়াছিল, সেও আসিতে পারিল না, তাহার কোলের মেয়েটির সর্দ্দি-জ্বর হইয়াছে। বিজয় হাজার হইলেও ছেলেমানুষ, এ সব কর্ম্মে বিশেষ অভ্যস্ত নয়; মায়ার ভাবনা হইতেছিল, জাহাজঘাটের হাজার হাঙ্গামা বাঁচাইয়া সে মায়াকে ঠিক উঠাইয়া দিতে পারিবে কি না। অন্যান্য বারে নিরঞ্জন সঙ্গে থাকেন, তাহাকে কিছুই ভাবিতে হয় না।

ঘাটে পৌঁছিতেই দেখা গেল, শিবচরণবাবু এবং দেবকুমারও সেই মাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, জিনিষপত্র নামানো হইতেছে। দেবকুমারের জিনিষই বেশীর ভাগ, ইউরোপের বিভিন্ন দেশভ্রমণের ছাপ মারিয়া তাহারা বিচিত্র রূপ ধারণ করিয়াছে। শিবচরণবাবুর জিনিষের মধ্যে ছোট একটি ট্রাঙ্ক, এবং সতরঞ্চিতে জড়ানো বিছানা। জলের কুঁজা এবং বেতের প্যাটরাও আছে বোধ হইল। অর্থব্যয় সম্বন্ধে বৃদ্ধ সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক, কখনও ডেক্ ভিন্ন কেবিনে যাতায়াত করেন না। এবারে ছেলে সঙ্গে থাকায় কিছু বিপদে পড়িয়াছেন। দেবকুমার যেরকম সাহেব হইয়া আসিয়াছে তাহাকে ডেকে যাইবার কথা বলাও যায় না, অথচ পুত্র কেবিনে গেলে, পিতা ডেকে যাইবেন, ইহাও হয় না। সুতরাং দুজনের জন্যই সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট করিতে হইয়াছে।

জাহাজঘাট তখন লোকে লোকারণ্য। যাত্রী, যাত্রীর বন্ধু, কুলি এবং জাহাজঘাটের অন্যান্য লোক মিলিয়া এমন একটা বিরাট জনতার সৃষ্টি হইয়াছে যে, তাহার ভিতর দিয়া যাওয়ার কথা ভাবিতেও ভয় হয়। থার্ড ক্লাসের যাত্রীগুলি নিজেদের পোঁটলাপুঁটলি সব নিজেরাই বহন করিয়া আনিয়াছে, এবং আগেভাগে কাঠগড়া পার হইয়া ষ্টীমারে উঠিবার জন্য এমন ভীষণ ঠেলাঠেলি আরম্ভ করিয়াছে যে, সেদিকে, স্ত্রীলোক কেন, কোনো ভদ্র পুরুষ মানুষেরও যাওয়া প্রায় অসম্ভব। মায়া ট্যাক্সি হইতে নামিয়া বলিল, "কি রে বিজয়, আজ শেষ অবধি উঠতে পারব বলে মনে হচ্ছে?"

বিজয়ের নিজেরও সে বিষয়ে একটু যে সন্দেহ না হইতেছিল এমন নয়, তবু মুখে খুব সাহস দেখাইয়া বলিল, "না, পারবে কি আর, এইখানেই থেকে যাবে। আপাততঃ কুলি ডাকিয়ে, জিনিষপত্রগুলো ত নামান যাক্।"

কুলি ডাকিবার কোনোই প্রয়োজন ছিল না, গাড়ী থামিবামাত্র যে পরিমাণ কুলি আসিয়া তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, তাহারা এক হাজার যাত্রীর মাল স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারিত। মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বিদায় কর, বিদায় কর, একটা কি দুটোকে রাখ, এখনি টানাটানি করে অর্দ্ধেক জিনিষ নষ্ট করে ফেলবে।"

এমন সময় পিছন হইতে কে যেন বলিল, "আপনি ভীড় থেকে বেরিয়ে আসুন, জিনিষপত্রের ব্যবস্থা আমি কর্‌ছি। বাবা ঐদিকে বসে আছেন, তাঁর কাছে বস্‌বেন চলুন।"

মায়া ফিরিয়া দেখিল দেবকুমার। দ্বিতীয় সাক্ষাতে আর বোকা বনিবে না বলিয়া সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিয়াছিল। তাড়াতাড়ি বিজয়কে দেখাইয়া বলিল, "এই আমার জ্যাঠামশায়ের মেজ ছেলে বিজয়। আপনি ওকে নিয়ে জিনিষগুলোর গতি করুন, আমি যাই।"

ভীড়ের একপাশে একগাদা জিনিষের মধ্যে বৃদ্ধ শিবচরণ-বাবু বসিয়াছিলেন। দেবকুমার মায়াকে সেইখানে লইয়া আসিয়া বলিল, "এইখানে বসুন, ওঠবার পথ একটু মুক্ত দেখলে আমি এসে ডেকে নিয়ে যাব।" জিনিষ-পত্রের গাদা হইতে সে একটা ডেক চেয়ার টানিয়া বাহির করিয়া মায়ার জন্য পাতিয়া দিল। কয়েকটা ইংরেজী ম্যাগাজিন এবং খবরের কাগজ বাহির করিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিল, "ততক্ষণ এইগুলো উল্টে সময় কাটান, আশা করি খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না।"

দেবকুমার চলিয়া গেল। মায়া বসিয়া বসিয়া ছবি দেখিতে দেখিতে ভাবিতে লাগিল, ছেলেটির ভদ্রতার কোনো ত্রুটি অন্ততঃ নাই। দেশী ভদ্রতা হইতে একটু পার্থক্যও আছে। বিজয়, অজয় অথবা তাহার বাবা সঙ্গে থাকিলে তাহাকে ভীড় হইতে সরাইয়া আনা পর্য্যন্ত করিতেন বটে, তবে চেয়ার পাতিয়া বসান বা ম্যাগাজিন পড়িতে দেওয়া পর্য্যন্ত হইত কি না সন্দেহ। বিলাত হইতে ছেলেটি সবে ফিরিয়াছে, তাই এ সব অতি-সৌজন্য এখনও ছাড়িতে পারে নাই। কিন্তু ইহাতে মায়াকে বিন্দুমাত্রও অসন্তুষ্ট বোধ হইল না, যদিও অতি-সাহেবীআনাকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা করা অভ্যাসটা তাহার এখন পর্য্যন্ত একেবারে যায় নাই।

মিনিট কয়েক পরেই দেবকুমার আসিয়া বলিল, "চলুন এইবার, একটুখানি লাইন্ ক্লিয়ার্ পাওয়া গিয়েছে।"

মায়া এবং শিবচরণবাবু উঠিয়া পড়িলেন। সঙ্গের জিনিষপত্র দুইজন কুলি ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল। ডাক্তারের পরীক্ষা প্রভৃতি অতি সংক্ষেপে সারিয়া, তাহারা সিঁড়ির কাছে আসিয়া পৌছিল। দেবকুমার বলিল, "এই বড় ট্রাঙ্কটা নিয়ে কুলিটা উঠুক, আপনি ঠিক তার পিছনে যান, আমি থাক্‌ব তার পরেই। এরকম করে উঠলে আপনাকে আর গুঁতো খেতে হবে না।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "জিনিষপত্রগুলো সব ঠিক এসেছে ত? ক'টা ছিল তাও আপনাকে বল্‌তে ভুলে গেছি।"

দেবকুমার বলিল, "সে আমি গাড়ী থেকে নামাবার সময়েই গুণে নিয়েছি। সব লাইন করে পিছনে আস্‌ছে, বিজয়বাবু তাদের রিয়্যার্ গার্ড হয়ে আসছেন, আপনার কোনো ভাবনা নেই, উঠে পড়ুন।"

মায়া উপরে উঠিয়া গেল। 'বয়' সাম্‌নেই দাঁড়াইয়া-ছিল, তাহার সাহায্যে সহজেই নিজের কেবিন খুঁজিয়া পাইল। জিনিষপত্রও শীঘ্রই আসিয়া পড়িল। দেবকুমার এবং বিজয় মিলিয়া সেগুলির সুব্যবস্থা করিতে লাগিল। বিজয় বলিল, "মায়া-দি, অকারণ কতকগুলো টাকা বাজে খরচ করলে, অনেক ত জায়গা পড়ে রইল, আর একজন লোক অন্ততঃ বেশ যেতে পারত।"

দেবকুমার বলিল, "একটুখানি খালি জায়গা যে কি রকম মূল্যবান জিনিষ, তা জাহাজে চড়ে কিছু দূর যদি যান, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন। স্বজাতি-প্রীতি কমাবার এতবড় ওষুধ আর নেই। বিশেষ করে আমাদের স্বজাতি যাঁরা, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ঘরের বাইরের লোকের সঙ্গে ব্যবহার করতে তাঁরা মোটেই জানেন না।"

জিনিষ গোছান হইয়া যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, একটু আমাদের কেবিনটার গতি করে আসি, বাবা বোধ হয় জিনিষপত্র নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।"

সে বাহির হইয়া যাইতেই বিজয় বলিল, "আমার আসবার কিছু দরকারই ছিল না, মায়া-দি, যা গ্যাল্যান্ট সঙ্গী তুমি জুটিয়েছ।"

মায়া বলিল, "আমি আর কোথায় জুটালাম, বাবাই জুটিয়ে রেখেছেন। তা ভালই ত হ'ল, তোমাকে বেশী খাটতে হ'ল না। পূজোর ছুটিতে আস্‌ছ ত ঠিক?"

বিজয় বলিল, "সে অনেক পরের কথা। ততদিনে কত কি ঘটে যেতে পারে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "অনেক কিছু ঘটলে ত আরও আসা উচিত।"

৩০

রেঙ্গুনযাত্রী জাহাজটি সমুদ্রের নীল জলরাশি ভেদ করিয়া অবলীলাক্রমে চলিয়াছিল। বাহির হইতে শোনা যায় কেবল এঞ্জিনের শব্দ, কেবল সফেন তরঙ্গরাজির জাহাজের অঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়ার শব্দ। দুপুরে জাহাজের ভিতরটা একটু যেন নিস্তব্ধ থাকে। খাওয়া-নাওয়ার হ্যাঙ্গাম নাই, ডেকের যাত্রীর দল অধিকাংশই চাদর মুড়ি দিয়া শুইয়া আছে। দুই চারি জন উঠিয়া বসিয়া সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেছে, এবং আশেপাশে সহযাত্রিনী কেহ দর্শনযোগ্যা আছে কি না, তাহারই সন্ধান লইতেছে। বাঙালীবাবু ডেকযাত্রীও কিছু কিছু আছেন, তাঁহারা হয় মাসিকপত্র বা খবরের কাগজ পড়িতেছেন, নয় তাস খেলিতেছেন। বর্ম্মা চুরুটের উৎকট গন্ধে স্থানটি ভরপুর। ছেলে-পিলেরা এদিক ওদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, মেয়েরা স্থানে স্থানে জটলা পাকাইয়া গল্প করিতেছে। জাহাজে কাজ নাই, কর্ম্ম নাই, সময় যেন আর কাটিতেই চায় না।

মায়া কেবিনের মধ্যে শুইয়া বসিয়া বৃথা কাগজ পড়িবার চেষ্টা করিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ত সবেমাত্র প্রথম দিন, এখনও পুরা দুইটা দিন বাকি। আরামের জন্য একলা একটা কেবিনে আসিয়া তাহার যেন আরও বিপদ হইয়াছিল। সঙ্গিনী থাকিলে যেমন নানাদিক দিয়া জ্বালাতন হইতে হয়, তেমনি দুটা কথাও তাহার সঙ্গে বলা চলে। এই ত মাত্র কয়েক ঘণ্টা জাহাজ ছাড়িয়াছে, ইহারই ভিতর তাহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিল, বাকি সময়টা কাটিবে কি করিয়া? খোঁজ লইলে হয়, জাহাজে বাঙ্গালী সহযাত্রিনী কেহ আর আছে কি না, তাহা হইলে যাইয়া খানিক গল্প করিয়া আসিতে পারে। তাহার প্রথমবারের সমুদ্রযাত্রার কথা মনে পড়িল। সেবার বাণী এবং বাণীর মা সঙ্গে থাকায়, তাহাদের কোনো ভাবনা ছিল না, সময় দিব্যই কাটিয়া গিয়াছিল।

কেবিনের দরজার গায়ে ঠক্ ঠক্ করিয়া শব্দ হইল। হয়ত জাহাজের ভাণ্ডারী রান্নার জোগাড় লইতে আসিয়াছে মনে করিয়া মায়া বলিল, "ভিতরে এস।"

দরজাটা অল্প খুলিয়া গেল, কিন্তু ভিতরে কেহ প্রবেশ করিল না দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কে?"

বাহির হইতে উত্তর আসিল, "আমি দেবকুমার। একলা কেবিনে বসে আছেন, তাই জান্‌তে এলাম যে, ডেকে একটু বেড়াতে যাবেন কি না।"

মায়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া, চটি পায়ে দিয়া দরজার কাছে অগ্রসর হইয়া গেল। দেবকুমার সাহেবী পোষাক ছাড়িয়া, বাঙালী সাজিয়া আসিয়াছে। মায়াকে দেখিয়া বলিল, "চলুন না ডেকে? বেশ হাওয়া আছে, এই ষ্টাফী খোপটার মধ্যে একলা বসে বসে করবেন কি? জাহাজ না জাহাজ! ঠিক যেন মোচার খোলা, একটু নড়ে বসতে গেলেই অন্য কারো ঘাড়ে গিয়ে পড়তে হয়।"

মায়া ত তখন যাইতে পারিলেই বাঁচিয়া যায়। কিন্তু ডেকে যাইতে হইলে ঠিক এই ভাবেই যাওয়া যায় না। কাজেই বলিল, "আচ্ছা আপনি এগোন, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যেই যাচ্ছি।"

দেবকুমার তৎক্ষণাৎ চলিয়া গেল। পাঁচ মিনিটের বেশী সময় অবশ্য মায়ার লাগিল। চুল বাঁধিতে হইল, স্যুটকেস্ খুলিয়া, শাড়ী ব্লাউস সব বদ্‌লাইতে হইল। শাদা কাপড় পরিয়া যাইতে কিছুতেই তাহার মন উঠিল না। হাল্কা গোলাপী রংএর ক্রেপের পোষাক পরিয়া, গলায় একছড়া প্রবালের মালা দুলাইয়া সে উপরে চলিল। চটি ছাড়িয়া, এক জোড়া নাগ্‌রা জুতা পরিয়া গেল।

দেবকুমার তাহার জন্য সিঁড়ির মুখেই অপেক্ষা করিতেছিল। মায়াকে দেখিয়া বলিল, "চলুন, এখন লোক বেশী নেই, আরাম করে বস্‌তে পারবেন।"

দুইজনে উপরের ডেকে উঠিয়া গেল। নিজের ডেক চেয়ারখানির পাশে, দেবকুমার আরও একখানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া রাখিয়াছে, বই, ম্যাগাজিন, খবরের কাগজ প্রভৃতিতে তাহার একখানা সম্পূর্ণ বোঝাই।

মায়া একটা চেয়ারে আসিয়া বসিতেই দেবকুমার তাহার পাশেরটিতে আসিয়া বসিয়া দিব্য অসঙ্কোচে গল্প

আরম্ভ করিয়া দিল। মায়ার সামান্ত একটু সঙ্কোচ যাহা ছিল, দেবকুমারের ব্যবহারে সেটাও কাটিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, জাহাজের জার্ণী আপনার কেমন লাগে? বেশ কয়েকবারই এই লাইনে গিয়েছেন এসেছেন, না?"

মায়া বলিল, "না, খুব বেশী বার কি আর? এই নিয়ে বার চারেক হ'ল। আমার মোটেই ভাল লাগে না, সময় কিছুতেই কাটতে চায় না। ঘড়ি দেখে দেখে আমার ত চোখ ব্যথা করতে থাকে।"

দেবকুমার বলিল, "প্রতিবারেই কি একলা এক কেবিনে থাকেন?"

মায়া বলিল, "না, প্রথমে ত আমার এক পিসীমা সঙ্গে ছিলেন। তার পর অন্য লোকের সঙ্গেও এসেছি, কিন্তু এত বেশী অসুবিধা হয় যে, বাবা লিখেছিলেন এবারে একটা কেবিন রিজার্ভ করে যেতে। এতেও এক বিপদ, সারাক্ষণ হাঁ করে একলা বসে থাকতে থাকতে প্রাণ যেন বেরিয়ে আসে।"

দেবকুমার বলিল, "কিই বা দরকার ও খুপরীটার মধ্যে সারাক্ষণ বসে থাক্‌বার। খাওয়া, নাওয়া, ঘুমনো ছাড়া সব সময়টাই ডেকে থাকতে পারেন। ওদিককার বড় বড় জাহাজগুলোতে ডেক ত কোনো সময় খালি দেখবার জো নেই। হয় খেলা চল্‌ছে, নয় গান বাজনা, নয় গল্প। নিদেন পক্ষে চুপচাপ বসে সমুদ্রও ত দেখা যায়। কেবিনের মধ্যে সে সুবিধেও ত নেই।"

মায়া বলিল, "তা এলে হয়, তবে সব সময় একলা হট্ হট্ করে আসতে যেতে ভাল লাগে না। ডেকের এই পাশের লোকগুলো এমন অসভ্যের মত তাকিয়ে থাকে, যে, তাদের সাম্‌নে দিয়ে যাওয়া-আসা করাই এক ট্রায়াল্।"

দেবকুমার বলিল, "যতবার বল্‌বেন ততবার গিয়ে আমি নিয়ে আসব। বয়টাকে বল্‌লেই সে আমায় ডেকে দেবে।"

মায়া একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল, "আপনি আবার এত কষ্ট করে, বার বার আসবেন—"

দেবকুমার আবার বলিল, "কষ্ট আবার কি? আমি ত বেঁচে যাই, সারাদিন একলা হাঁ করে বসে থাকতে আমার বুঝি বড় ভাল লাগে? এক এক সময়ে ইচ্ছে করে ঐ মেড়োগুলোর সঙ্গেই গিয়ে ভাব করি।"

মায়া অন্য কথা পাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, এতকাল বিলেতে থেকে এসে দেশটা আপনার কেমন লাগছে?"

দেবকুমার বলিল, "তা ত বলা শক্ত। এক এক দিক দিয়ে বেশ খারাপই লাগে, যেমন রাস্তাঘাট, বাড়ীঘর সবই বেশী নোংরা লাগে, মানুষগুলিকেও এক একদিকে অসভ্য এবং অভব্য মনে হয়। অধিকাংশ মানুষের সঙ্গে কি নিয়ে যে আলোচনা করব ভেবে পাই না, নিতান্ত নিজের বয়সী ছেলেছোক্‌রার দলের সঙ্গে ছাড়া। আবার এতকাল পরে আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখছি, সেটা ভাল লাগ্‌ছে। লণ্ডনের ধোঁয়া আর কুয়াসার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে নীল আকাশ, চাঁদ তারাগুলো দেখতে পাচ্ছি, এটাও ভাল লাগ্‌ছে। হাজার কাটখোট্টা হ'লেও দেশের মাঠ, ঘাট, বন নদী দেখে খুসি না হয় এমন লোক আর কটা আছে?"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি রেঙ্গুনেই প্র্যাক্‌টিস্ করবেন, না কলকাতায় ফিরে আসবেন?"

দেবকুমার তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "রেঙ্গুনে করাই এক রকম স্থির করে ফেলেছি।"

হয়ত তাহার তাকান এবং কথার মধ্যে বিশেষ কোনোই অর্থ ছিল না, তবু মায়ার কানের কাছটা লাল হইয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণের জন্য সে থামিয়া গেল।

দেবকুমার বলিল, "গিয়ে দিন-কতক সারাবর্ম্মা ঘুরব ঠিক করেছি। তারপর বাবাকে নিয়ে পড়তে হবে তাঁর মেসে বাস ঘোচাবার জন্যে। এক ঘরে দশজন মানুষ বাস করে করে এমনি অভ্যাস করেছেন, যে, একটা ঘরে একলা থাকতেই তাঁর অসুবিধা বোধ হয়। বাড়ীতে একটার বেশী দুটো চাকর বা দুটোর বেশী তিনটে তরকারি দেখলেই তিনি অস্বস্তিতে অস্থির হয়ে ওঠেন।"

মায়া বলিল, "তবে ত আপনার বড় অসুবিধা হবে।"

দেবকুমার বলিল, "তিনি ষাট বছরের বুড়ো হয়ে যা
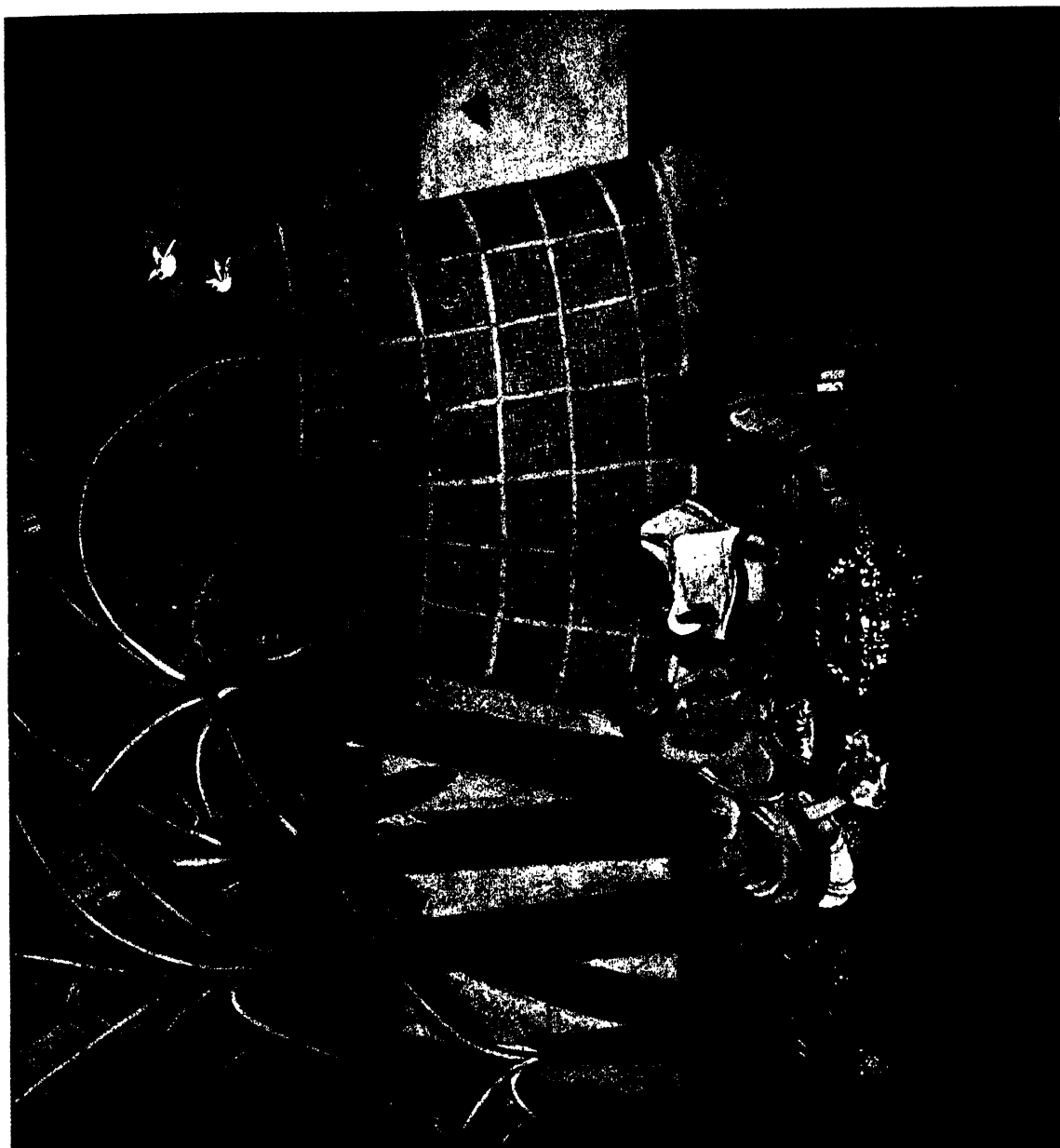
সহ্য করতে পারেন, আমি ইয়্যাংম্যান্ হয়ে যদি তা না পারি,তাহ'লে ত আমার ডুবে মরা উচিত। নিজের জন্যে ততটা নয়, তাঁরই জন্যে আমি একটু ব্যবস্থা বদল করতে চাইছি। আচ্ছা, বর্ম্মাটা আপনার কেমন লাগে ?"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। ওখানে যাবার আগে ত একেবারেই পাড়াগাঁয়ে থাক্‌তাম। ওখানে সবই নূতন রকম, কাজেই প্রথম প্রথম যদিও কয়েকদিন অসোয়াস্তি লেগেছিল, তারপর থেকেই মন্দ লাগে না। সারাক্ষণই একটা কিছু নিয়ে থাকতে হয়, কাজেই খারাপ লাগবার অবসরও থাকে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার বাবা ত বহুকাল এখানে, আপনারা এর আগে একবারও আসেন নি যে ?"

অন্য মানুষ হইলে এ প্রশ্নের উত্তর নিশ্চয়ই ভাল করিয়া পাইত না। মায়া যেমন করিয়া হোক কথাটা ফিরাইয়া দিত। কিন্তু কেন জানি না, দেবকুমারের কথার উত্তর না দিয়া সে থাকিতে পারিল না। বলিল, "মা সাহেবীআনা বড় বেশী অপছন্দ করতেন, তাই তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন আমাদের আর আসা হয়নি। মা মারা যাবার পর বাবা আমাকে আর পিসীমাকে নিয়ে যান্।"

দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার পিসীমা এখনও ওখানে আছেন না কি ?"

মায়া বলিল, "না, তিনি বছরখানেক থেকেই দেশে ফিরে যান। এবারে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্যে বাবা খুবই জেদ করেছিলেন, তিনি কিছুতেই এলেন না।"

দেবকুমার বলিল, "তাহ'লে রেঙ্গুনের ঘরসংসার সব আপনাকেই তদারক করতে হয় ?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "তদারক ত ভারি, এক পাল চাকর ঝি আছে, তারাই সব করে।"

দেবকুমার বলিল,"সেই ত আরও মুস্কিল। নিজে কাজ করা বরং সহজ, কিন্তু এক পাল ইন্‌এফিশিয়েণ্ট লোককে দিয়ে মনের মত করে কাজ করান খুবই শক্ত ব্যাপার'। বিলেতে একটা ঝি যা কাজ করে এখানে তিন চারটে চাকর দিয়ে সে কাজ পাওয়া যায় না।"

মায়া বলিল, "এপর্য্যন্ত যত বিলেত-ফেরৎ দেখলাম, ওদেশের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। ওখানের সব কিছু কি সত্যিই এত ভাল ?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "সবই ভাল মোটেই নয়। তবে কোনো কোনো বিষয়ে ভাল বই কি? আবার আমাদের দেশেও এমন জিনিষ আছে, যা ওখানে একেবারে দুর্লভ।"

এমন সময় খাওয়ার ঘণ্টা বাজিয়া ওঠাতে দেবকুমার উঠিয়া পড়িল। বলিল, "যাই, এ ব্যাপারটা সেরে আসি। এ লাইনে সেকেণ্ড ক্লাসে এমন বাজে খাওয়া দেওয়া হয় জান্‌লে আমি উইথ্ ডায়েট্ টিকিট করতাম না। বাবার মত চাল ডাল পুঁটলি বেঁধে আনতাম। বাবা আবার এমন হিসেবী মানুষ যে, একমুঠো কিছু বেশী আনেন নি। কাজেই এখন ব্যবস্থা বদলানো চলে না।"

খাওয়া-দাওয়ায় কাহারও অসুবিধা হইতেছে শুনিলে স্ত্রীজাতির মন কখনও অবিচলিত থাকিতে পারে না। মায়া তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "ওমা, আপনি এত কষ্ট করছেন কেন ? আমার সঙ্গে যা দিয়ে দিয়েছেন জেঠাইমা, তাতে চারজন লোক দশদিন বসে খেতে পারে। আমি কাল থেকে আপনাকে খাবার পাঠিয়ে দেব, আপনি জাহাজের খাবার খাবেন না। আজ রাত্রেও বলেন ত পাঠিয়ে দিই।"

দেবকুমার বিন্দুমাত্র আপত্তি করিল না। হয়ত মায়াকে এই কথা বলাইবার জন্যই সে খাওয়ার দুঃখ বর্ণনা করিতে বসিয়াছিল। মায়া ঠিক ততটা বুঝিল কি না সন্দেহ; তবে একটা কিছু বুঝিল বটে। দেবকুমার শুধু বলিল, "আপনার যদি অসুবিধা না হয়, তাহ'লে আমি ত বেঁচে যাই। চলুন আপনাকে কেবিনে রেখে আসি, আবার বিকেল বেলা আসছেন ত ?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, একেবারে ভাঁড়ারটাড়ার লোকটাকে বের করে দিয়ে, চা খেয়ে আসব।"

দেবকুমার মায়াকে কেবিন পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মায়া ঘণ্টা বাজাইয়া ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া, রাত্রের আহারের ব্যবস্থা করিতে বসিল। ওবেলা ডালভাত নিরামিষ তরকারিতেই কাজ চালাইয়াছিল। এ বেলা তাহাতে মন উঠিল না।

দেবকুমারকে সে এক রকম নিমন্ত্রণ করিয়াই আসিয়াছে, জাহাজের খাওয়ার চেয়ে ভাল না খাওয়াইতে পারিলে সে কি মনে করিবে? ভাণ্ডারীর কাছে খোঁজ লইয়া জানিল, ডিম, মাংস, এমন কি কই মাগুর মাছ পর্য্যন্ত পয়সা দিলে জাহাজেই পাওয়া যায়।

মাছ কি রকম দর জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল, কই মাছ এক আনা করিয়া একটা, শিঙি মাগুর দুই আনা করিয়া, কারণ সেগুলিকে আরও বেশীদিন বাঁচাইয়া রাখা যায়। মায়া ছয় আনা পয়সা দিয়া ছয়টা কই মাছ কিনিয়া রাঁধিতে বলিয়া দিল। তরকারিও প্রচুর পরিমাণে ঢালিয়া দিল।

নিজের চা খাওয়া হইয়া যাইবার পর হাতমুখ ধুইয়া, চুল বাঁধিয়া, আবার বেশ পরিবর্ত্তন করিল। তাহার কাপড় ছাড়া শেষ হইতে-না-হইতে কেবিনের দরজায় আবার টোকা পড়িল।

মায়ার মুখে একটু হাসি দেখা দিল। প্রথম সাক্ষাতের দিন তাহার যে ভয় হইয়াছিল, তাহা ত একান্তই অমূলক দেখা যাইতেছে। দেবকুমার যে নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছে, তাহা কিন্তু মায়ার মনে হইল না। ইহা অপেক্ষা যথেষ্ট কম করিলেও ভদ্রতা রক্ষা হইত। বৃদ্ধ শিবচরণবাবু জাহাজ ছাড়ার পর একবারের বেশী মায়ার কেবিনের দিকে আসেন নাই। জাহাজে উঠিলেই তিনি কিছু অসুস্থ বোধ করেন, ইহা একটা কারণ, আর পুত্র নিশ্চয়ই মায়ার যথেষ্ট তত্ত্বাবধান করিবে, এ বিশ্বাসও একটা হইতে পারে।

দেবকুমারের আগ্রহাতিশয্যে মায়ার মনেও যে কোনো রেখাপাত হয় নাই, তাহা বলা যায় না। ঠিক এইভাবে কেহ এপর্য্যন্ত তাহার নিকট আসিবার চেষ্টা করে নাই। রেঙ্গুনে সে বাড়ীতে একলা, তাহার পিতাও সারাদিনই প্রায় বাহিরে ঘুরিতেন, সুতরাং মায়ার সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার যথেষ্ট ইচ্ছা থাকিলেও কোনো যুবক বেশী আমল পাইত না। মায়ার মনোরাজ্য এতদিন অতিথিহীনই থাকিয়া গিয়াছিল।

এই একদিনের মধ্যেই সেখানে যেন একটা পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। দেবকুমার যতখানি আগ্রহ করিয়া তাহার কাছে আসিতে চাহিতেছিল, মায়ার মনের কোণেও যেন তাহার সাড়া জাগিয়া উঠিতেছিল। সে কি শুধু ভদ্রতার খাতিরেই এতটা করিতেছিল? মৃদু পুলকের শিহরণ কি থাকিয়া থাকিয়া তাহার হৃদয়কে দোলা দিতেছিল না? অথচ কে এই যুবক, কোথা হইতে আসিয়া একদিনেই মায়ার হৃদয়রাজ্যে এতখানি আলোড়নের সৃষ্টি করিল? কয়েকদিন পূর্ব্বে ইহার নাম ভিন্ন সে কিছুই জানিত না। সত্যই কি মানুষকে জয় করিবার জন্য সময়ের প্রয়োজন হয় না? শুধু শুভক্ষণের প্রয়োজন?

কিন্তু অধিক ভাবিবার সময় ছিল না। দ্বারে অতিথি তখনও দাঁড়াইয়া। মায়া কাপড় পরা শেষ করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

পুরাণে রাঢ়ের ইতিহাস

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ

মহাপুরাণ অষ্টাদশ, তন্মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ একখানি। কিন্তু এই পুরাণ বহু বিষয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। মৎস্য পুরাণ ও নারদ পুরাণে এই পুরাণের অনুক্রমণিকা আছে, কিন্তু তাহার কতকগুলি বিষয় বর্তমান সংস্করণে নাই। বস্তুতঃ "বঙ্গবাসী"র প্রকাশিত ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ প্রাচীন পুরাণের রাঢ়ীয় ও অর্বাচীন সংস্করণ। এই হেতু ইহাতে রাঢ়ের এক কালের ইতিহাস পাওয়া যায়।...

পুরাণখানি চারি খণ্ডে বিভক্ত। যথা,—(১) ব্রহ্ম খণ্ড, (২) প্রকৃতি খণ্ড, (৩) গণেশ খণ্ড, (৪) শ্রীকৃষ্ণজন্ম খণ্ড।...

কবির দেশ :—(১) পুরাণখানি পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন বাঙ্গালা পড়িতেছি ; যেন বাঙ্গালা ভাষাকে সংস্কৃত করা হইয়াছে। 'নিবেদনং চকার', 'রাজা চকার স্বীকারং, 'ক্রীড়ান্ চকার', 'প্রশ্নং চকার', 'ভূত্যদ্বারা চকার ধান্যসঞ্চয়ম্'. 'চকার ক্রোড়ে,' ইত্যাদির 'চকার' স্থানে 'করিলেন' বসাইলে অবিকল বাঙ্গালা শোনাইবে। 'হে নাথ', 'হে তাত', 'হে দীনবন্ধো' ইত্যাদির 'হে' প্রয়োগ বাঙ্গালা। 'দর্শনং দেহি,' 'বিদায়ং দেহি'। কেহ কেহ বলেন 'বিদায়' শব্দ সংস্কৃত নয়, আরবী 'বিদাআ'। প্রাচীন বাঙ্গালায় 'পরিহার' ছিল। বাঙ্গালায় বলি, শিশু মাতার স্তনপান করে। ইদানী কেহ কেহ 'স্তনপান' অশুদ্ধ মনে করিয়া 'স্তন্যপান' লেখেন। কিন্তু এই পুরাণে 'স্তনং দত্বা প্রবোধয়' (কৃ।১৮), ইত্যাদি আছে। এই পুরাণের স্থানে স্থানে বাঙ্গালা শব্দ কবির অজ্ঞাতসারে সংস্কৃত হইয়া গিয়াছে। দুর্বিনীত অর্থে বাং 'দুরন্ত' (যেমন দুরন্ত ছেলে), পুরাণে সং হইয়াছে।...মনে করিতাম, বাং সাঁকো, সং সংক্রম হইতে আসিয়াছে, কিন্তু এই পুরাণে দেখিতেছি শব্দটি 'শঙ্কুসেতু', শঙ্কুকাঠ দ্বারা যে সেতু। বরুণ বৃক্ষের এক নাম সেতুক্রম আছে। শঙ্কু শব্দ হইতে ঘরের শাঙ্গা। শঙ্কু দ্বারা নির্ম্মিত, শঙ্কুআ, শাঁকো, এই ব্যুৎপত্তি ঠিক বোধ হইতেছে।

২। চতুর্বর্ণ হইতে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি বর্ণনায় যে যে জাতির নাম আছে (ব্র।১০) দুই একটি ব্যতীত সব জাতির নাম রাঢ়ে অদ্যাপি বর্ত্তমান। রাঢ়ে যে 'নবসায়ক' নামে জাতিভাগ আছে, এই পুরাণে তাহার উৎপত্তি পাইতেছি। কবি লিখিয়াছেন, "ইহারা বিশ্বকর্মার সন্তান, নয়টি 'শিল্পকারী' ;—যথা, মালাকার, কর্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক (তাঁতি), কুম্ভকার, কংসকার, সূত্রধার, স্বর্ণকার, চিত্রকার। শেষোক্ত তিন জাতি ব্রহ্মশাপে পতিত হইয়াছে।" অদ্যাপি সকলে বিশ্বকর্মার পুজা করে কি না, বলিতে পারি না ; কিন্তু জানি কয়েকটি করে। এই নবসায়ক ভাগ বঙ্গ ব্যতীত আর কোথাও নাই। পুরাণের মহাদস্যু 'বাগতীত' রাঢ়ের বাগদী, দস্যু 'চলট' জাতি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে আছে। পুরাণে 'আগরী' বর্দ্ধমান জেলায়, 'জুঙ্গি' (জুগী বা যোগী), ও 'জোলা' রাঢ়ে প্রসিদ্ধ। 'সরাক' জাতি বাঁকুড়ায় আছে।

৩। কবি নানা স্থানে নানা বৃক্ষের নাম করিয়াছেন। এই সকল বৃক্ষ তাঁহার দেশের জীবন্ত সাক্ষী।...

(ক) বায়ু পিত্ত কফের বৃদ্ধি ও উপশম বর্ণনায় (ব্র।১৬) পাইতেছি,—বিল্ব, তালফল, রম্ভাফল, নারিকেল জল, 'তরুমুগ্না' কর্কটী ফল (কাঁকুড়), 'পিণ্ডারক', নারিকেল, তাল, খর্জুর বৃক্ষের 'মস্ত' (মেথি)।...লিখিত আছে, পক্ক তরমুজা ফল ও পক্ক কর্কটী ফল শ্লেষ্ম-কারক। পক্ক কর্কটী, ফুটী, তরুমুগ্না, তরমুজ। শব্দটী ফার্সী 'তরবুজ', অর্বাচীন সংস্কৃত 'তরম্বুজ'। প্রকৃত সংস্কৃত নাম কালিন্দ বা কালিঙ্গ।...তিনি লিখিয়াছেন, অপক্ক কদলী অর্থাৎ কাঁচকলা, এবং অপক্ক পিণ্ডারক শ্লেষ্মনাশক। পিণ্ডারক ফল যে কি, তাহা বাঁকুড়ায় না আসিলে বুঝিতাম না। এই ফল আরণ্য কণ্টকবৃক্ষজাত ; দুঃখীরা বাজারে বিক্রয়ার্থ আনে, নাম পিঁড়রা। ফলটী দেখিতে পেয়ারার আকার, গ্রীষ্মশেষে ধরে। ফুল বড় বড়, শাদা সুগন্ধ।...কবি বায়ু-নাশের নিমিত্ত নারিকেলোদক অর্থাৎ ডাবের জল, সদ্য পর্যুষিতান্ন অর্থাৎ ভিজাভাত, এবং সৌবীর অর্থাৎ আমানি ব্যবস্থা করিয়া রাঢ় হইতে ওড়িশ্যা প্রত্যক্ষ করাইয়াছেন।

(খ) কবি দন্তকাষ্ঠ নির্দেশ করিয়াছেন (ব্র।২৬)। যথা, অপামার্গ (আপাং), সিন্ধুবার (নিসিন্দা), আম্র, করবীর, খদির, শিরীষ, জাতি (চামেলী), পুন্নাগ, শাল, অশোক, অর্জুন, ক্ষীরিবৃক্ষ (যেমন আকন্দ), কদম্ব, জম্বু (জাম), বকুল, ওড্র (জবা), পলাশ,—দন্তকাষ্ঠে প্রশস্ত।... এক কালে পশ্চিম রাঢ়ে খদির বন ছিল ; ইহা হইতে খদির, খয়র বাহির করিবার খয়রা-জাতি নামে এক জাতি ছিল, এখনও আছে। খদিরের দন্তকাষ্ঠ, বাবলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। খদিরের এক নাম 'দন্তধাবন।'...

কবির কাল :—কবির কালনির্ণয়ে কষ্ট পাইতে হইবে না।

(১) কবির দেশের জাতিদিগের নাম আছে (ব্র।১০)। তিনি মুসলমানকে "ম্লেচ্ছ" বলিয়াছেন। লিখিয়াছেন, ইহাদিগের দ্বারা কুবিন্দ কন্যার গর্ভে জোলা জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। এই উৎপত্তি রাঢ়ে মুসলমান অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে হইতে পারে নাই। ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রাম, ত্রয়োদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুশাসনে ছিল। আরও এক শতাব্দ না গেলে একটা জাতি উৎপন্ন হইতে পারে না। কবি লিখিয়াছেন, কলিকালে ম্লেচ্ছ যবনেরা রাজা হইবেন (কৃ।৯০)। অর্থাৎ তিনি দেখিয়াছিলেন।

(২) কবির কালে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ও কতকগুলি সঙ্কর জাতি ছিল (ব্র।১১)। আর এক জাতি ছিল, 'বৈষ্ণব'। "স্বতন্ত্র-জাতিরেকাচ বিশ্বেষু বৈষ্ণবাভিধা।" কবির পূর্ব্বে বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব নামে জাতি ছিল না। শ্রীচৈতন্যের পরে এই জাতির উৎপত্তি। অতএব কবি ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের কথা লিখিয়াছেন।

(৩) আমাদের দেশে নাসিকার অলঙ্কার ছিল না। কালিকা পুরাণে নারীর চল্লিশটি অলঙ্কারের নাম আছে। সকল নাম বুঝিতে পারা যায় না, কিন্তু একটিও নাসিকার নাই। এই পুরাণ আসামে দশম খ্রীষ্ট-শতাব্দে প্রণীত মনে হয়। "প্রবাসী" পত্রে শ্রীযুত কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় দেখাইয়াছেন, পঞ্চদশ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পর ইরাণ দেশ হইতে এ দেশে নাসিকায় অলঙ্কার-ধারণ আরম্ভ হইয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে চারি খণ্ডের 'প্রকৃতি', 'গণেশ', ও 'শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম,' তিন খণ্ডে নাসিকায়

গজমুক্তা পাইতেছি। যথা, প্রকৃতি খণ্ডে (৬৪), দুর্গার ধ্যানে, 'নাসা দক্ষিণভাগেন বিভ্রতিং গজমৌক্তিকম্।' দেবীর দক্ষিণ নাসায় গজমুক্তা। গণেশ খণ্ডে (৪), নাসিকার রূপহেতু অমূল্য রত্ন। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে (৬১৯) নাসাগ্রে গজমুক্তা। এই মুক্তা, নাক-মুক্তা নামে অলঙ্কার। ফুলের আকৃতি হইলে নাক-ফুল। নাসিকার মধ্যস্থলে মুক্তার লোলকও আছে। যথা, শ্রীকৃষ্ণ (৪), 'গজেন্দ্রমুক্তালঙ্কারৈর্নাসিকামধ্যরাজিতৈঃ,' শ্রীকৃষ্ণ (১৫), 'তন্মধ্যস্থলশোভা-স্থূল মুক্তাফলোজ্জ্বলা' নাসিকা। কবির কালে 'নথ' আসে নাই, বেশ-র আসিয়া থাকিবে।

পুরাণখানির বর্তমান সংস্করণ ষোড়শ খ্রীষ্ট-শতাব্দের পূর্বে হয় নাই। কিন্তু আরও পরে নয় কেন, তাহা বিবিধ প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইবে।

বিবিধ প্রসঙ্গ :—কবি রাঢ়ী শ্রেণীর স্মার্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ তিনি সামবেদের কৌথুমশাখামতে দেবদেবীর পূজা করিতে বলিয়াছেন। কদাচিৎ যজুর্বেদের কাণ্ব শাখারও নাম করিয়াছেন। কবির কালে ব্রত ও পূজা বর্তমানের অপেক্ষা ন্যূন ছিল। শিবরাত্রি, উত্তর ফাল্গুনীযুক্তা পূর্ণিমায় দোলন, চৈত্র মাসে অথবা মাঘ মাসে [?] শিবের তুষ্টির নিমিত্ত বেত্রপাণি হইয়া নর্তন [গাজন], শ্রীরামনবমী, বৈশাখে শক্তু ও জলদান, পূর্ণিমায় রাস, মাঘ শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা।' শুক্ল সপ্তমীতে রবিবার ও সংক্রান্তি হইলে সূর্য পূজা। [কবি শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ভুলিয়াছেন।] নারীদিগের নিমিত্ত প্রতি মঙ্গলবারে মঙ্গল চণ্ডিকা, প্রতি শুক্ল ষষ্ঠীতে ষষ্ঠীপূজা, শুক্লাষ্টমীতে দুর্গা পূজা, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণচতুর্দশীতে সাবিত্রী ব্রত, আষাঢ় সংক্রান্তিতে মনসা পূজা (প্র।৩৪)। একাদশী সম্বন্ধে লিখিত আছে, শুক্ল অথবা কৃষ্ণপক্ষে একাদশী করিবে (প্র। ২৭)।...অন্যত্র (কৃ। ৭৬), রথস্থ জগন্নাথ, ভাদ্র মাসে ঝুলন, উত্তরায়ণে কোণার্কে [কণারকে] সূর্যপূজা, ইত্যাদি। এখানে কবি যেন কোনও পুরাণ হইতে এই কয়েকটি জানিয়াছিলেন।...কবি 'গ্রাম্য দেবতা,' 'গ্রামদেবী' এবং বোধ হয় 'ধর্ম-ঠাকুর' দেখিয়াছেন, কবির 'ধর্ম' দেবতার বাহন শ্বেত অশ্ব (ব্র। ৫), পত্নী 'মূর্তি'। ইনি যমরাজ নহেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের সমান। 'শুভা চণ্ডী এখন 'সুবচনী' নামে পূজিত হইতেছেন। মঙ্গলচণ্ডী ষোড়শ বর্ষীয়া, শ্বেতচম্পকবর্ণাভা, ঈষৎহাস্যপ্রসন্নাস্যা, জগদ্ধাত্রী। ইনি বাসলী নহেন, বাসলী ভয়ঙ্করী।

কবির কালে রাঢ়ে মুসলমান অধিকার হইলেও, হিন্দু রাজাও ছিলেন। তিনি রাজার ও রাজ্যের কাল জ্ঞান নিমিত্ত 'তাম্র ঘটিকা' নির্মাণের উপদেশ দুইবার দিয়াছেন।...কবি দ্বারকায় শিবির-নির্মাণচ্ছলে দুর্গ ও গৃহনির্মাণ সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উপদেশ দিয়াছেন (কৃ। ১০৩)। তিনি বাস্তুর পূর্বে বা দক্ষিণে পুষ্পোদ্যান, এবং ঈশানে, পূর্বে, পশ্চিমে কিম্বা উত্তরে জলাশয় করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীন বাস্তু শাস্ত্রমতে ঈশানে কিম্বা পূর্বে জলাশয়। আমরা বলি, "পূবে হাঁস পশ্চিমে বাঁশ।"...কবি বাস্তু চতুরস্র (দীর্ঘ প্রস্থে সমান) এবং তন্মধ্যে আবাস (রাজার "আওয়াস") উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ করিতে বলিয়াছেন।...

"গৃহ ও প্রাকারের মধ্যভাগে দ্বার না করিয়া কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক করিবে।" [এই প্রাচীন বিধি উত্তম ছিল। অধুনা না বুঝিয়া লোকে মাঝে দ্বার বসাইতেছে।] "গৃহ নির্মাণে শাল্মলী, তিন্তিড়ী, হিন্তাল, নিম্ব, সিন্ধুবার [নিসিন্দা], ডুম্বুর, ধুস্তূর, বট এবং এরণ্ড বৃক্ষের কাষ্ঠ নিষিদ্ধ।"...এই বিধি-নিষেধের দুই মূল। (১) অসার কাঠ, এবং (২) বট, অশ্বত্থ নিম্বাদি মাঙ্গল্য-বৃক্ষ ছেদন বর্জনীয়।...

কবি পুরাণ-পাঠক ছিলেন, পুরাণ-কথকের অত্যুক্তি ও পুনরুক্তি ছাড়িতে পারেন নাই। লক্ষ ও কোটির ন্যূন সংখ্যায় তাঁহার তৃপ্তি হইত না। মুক্তা, মাণিক, হীরা, ইন্দ্রনীল, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি যাবতীয় রত্ন ও রত্নেন্দ্রসার দ্বারা অসংখ্য মন্দির ও লক্ষ গবাক্ষ নির্মিত হইয়াছিল। 'ইষ্টক' মণি-নির্মিত [কবির দেশে প্রস্তর ছিল না], প্রাঙ্গণ ইন্দ্রনীল দ্বারা পরিষ্কৃত পদ্মরাগের। রাজমার্গ ও বীথী রত্নখচিত, কপাটে কঠিন দৃঢ় অর্গল ও কীলক, ইত্যাদি। পৃথিবীর মধ্যে স্যমন্তক মণি একটি ছিল। কবি নগর নির্মাণে স্যমন্তকও লাগাইয়াছেন। তিনি এই সকল মণির নাম কোথায় পাইয়াছিলেন, কে জানে?...

কবি বস্ত্র মধ্যে "সূক্ষ্ম বস্ত্র", "ক্ষৌম বস্ত্র" কদাচিৎ দেখিতেছেন। তিনি যে বস্ত্র, বোধ হয় পঁচিশ ত্রিশ স্থানে লিখিয়াছেন, সেটি "বহ্নিশুদ্ধ"। সে বস্ত্র জলে ও ক্ষারে শুদ্ধ ও নির্মল হইবার নয়, জ্বলদগ্নিতে শুদ্ধ হয়। এইরূপ বস্ত্র "মার্কণ্ডেয় পুরাণে" একবার মাত্র পাইয়াছি। সে বস্ত্র প্রাণিজ, উদ্ভিজ্জ কিংবা ধাতুজ নয়। খনিজ অগ্নি-অস্পৃষ্ট (asbestos) দ্বারা নির্মিত। কবি মার্কণ্ডেয় পুরাণ পড়িয়া "বহ্নি শুদ্ধাংশুক" দ্বারা দেবীর বসন করিয়াছেন। কবি উক্ত পুরাণের "একাকী হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্" স্থানে 'নিশায়াং হয়মারুহ্য জগাম গহনং বনম্' লিখিয়াছেন (প্র। ৬২)।

কবি নারীকে যুগ্ম বস্ত্র দিয়াছেন, কঞ্চুক দেন নাই।...ব্রহ্মবৈবর্তের কবি স্বদেশের বসনভূষণ পরিবর্তন করেন নাই। তিনি নারীর সীমন্তের অধোদেশে উজ্জ্বল সিন্দূরবিন্দু, ললাটে ও গণ্ডে সিন্দূর চন্দন অগুরু কুঙ্কুমের বিন্দু, তিল, তিলক, পত্রক, পত্রাবলী রচনা করিয়া মুখশ্রী সুন্দর করিয়াছেন। তিলক রচনা, কলা-বিশেষ, যার তার কর্ম নয়। কোন্ মুখে কেমন তিলক সাজে, তাহা গুণীই বলিতে পারেন। ইদানী বঙ্গদেশে তিলক রচনা উঠিয়া যাইতেছে, প্রাচীনকালের লোধ্রকুসুমের পরাগ স্থানে 'পাউডার' আরম্ভ হইয়াছে। তিলের আকারে ছোট হইলে 'তিল', বড় হইলে 'তিলক'। তমাল ও তিলক বৃক্ষপত্রের আকারে 'পত্রক', 'পত্রাবলী', 'চিত্রপত্রক'। কেহ কেহ তিলক বৃক্ষকে তিল গাছ ভাবিয়া বিষম ভ্রম করেন। তিলক গাছ অরণ্যে জন্মে। বাঁকুড়ায় প্রচুর। শীতকালে আমের মঞ্জরীর ন্যায় মঞ্জরী হয়; তদ্দ্বারা সরস্বতী দেবীর পূজা করা হয়।...

কবি কুত্রাপি তাম্বুল বিস্মৃত হন নাই। সেকালে 'কর্পূর-সুবাসিত পরিপক্ক পর্ণ' ভোগসার গণ্য হইত। 'তাম্বূল-করঙ্ক', 'তাম্বূল-সজ্জা' লোকের সঙ্গে থাকিত। তাম্বূল 'জিহ্বাজাড্যচ্ছেদকর'। কবি বলেন, নিত্য তাম্বূল ভোজন করিলে জরা আসে না (ব্র। ১৬)। সেকালে তামুক ছিল না, নস্য ছিল না, চা ছিল না, 'সিগ্রেট' ছিল না। তাম্বূল চর্বণ দ্বারা যৎকিঞ্চিৎ মাদকরসে শ্রান্তি দূর করিতে হইত। কবিকঙ্কণ হাতে পান-গুআ দিয়া কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন, অদ্যাপি গ্রামে পান-গুয়া দিয়া মানীর মান রাখিতে ও মানীকে নিমন্ত্রণ করিতে হয়। কবিকুল তাম্বূল সেবনে এত তৃপ্ত হইতেন যে ১৩ (অঙ্ক) না বলিয়া "তাম্বূল গুণাঃ' বলিতেন। বলিতেন, তাম্বূলের ত্রয়োদশ গুণ স্বর্গেও দুর্লভ। ইদানী লাট দরবারেও পাণ। কিন্তু সেকালে আতর ছিল না, ছিল চন্দন অগুরু কস্তুরী।

এই পুরাণে পুনরুক্তি এত আছে যে, পড়িতে বিরক্তি বোধ হয়। কথকের মুখে শুনিলে হয় ত ইহা গুণের হইত।...

কবির কালে দেশের দুর্দিন চলিতেছিল। প্রজার ধর্মভাব শিথিল, রাজা থাকিয়াও নাই, দেশ শাসন করিতে পারিতেন না। তখনকার যবন জাতি দুরন্ত প্রকৃতি ছিল। কবি লিখিয়াছেন, "ম্লেচ্ছ জাতি বলবন্ত, দুরন্ত, অবিদ্ধকর্ণ (?), ক্রূর, নির্ভয়, রণদুর্জয়, শৌচাচারবিহীন, দুর্ধর্ষ, ধর্মবর্জিত" (ব্র।১০)। তিনি লিখিয়াছেন, রাজা ও দৈব হইতে যে গো-পালন করিতে না পারে, সে গো-হত্যা করে (প্র।৩০)। এই রাজা অবশ্য হিন্দু ছিলেন না। বোধ হয়, কবির কালে "শূন্য পুরাণে"র

'নিরঞ্জনের উষ্মা' হইয়াছিল। কপট ব্রাহ্মণের অত্যাচার হেতু "ধর্ম্ম হৈলা জবন রূপি, মাথাএত কাল টুপি, হাতে সোভে কিরিচ কামান। চাপিআ উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয়, খোদায় বলিয়া এক নাম॥ দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড্যা কিড্যা খায় রঙ্গে, পাখড় পাখড় বোলে বোল। জতেক দেবতাগণ হয্যা সভে এক মন, প্রবেশ করিল জাজপুর।" প্রথমে মালদহ ধ্বংস হইয়াছিল। তারপর যাজপুর।*

কবি লিখিয়াছেন, "নিষ্কামা দুর্বলা নারী বলবান্ দ্বারা গ্রস্তা হইলে ধর্মচ্যুতা হয় না; প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধা হয়" (প্র। ৬১, কৃ। ৪৭)। এই ব্যবস্থা দুই স্থানে আছে। অনেক নারী দুর্বৃত্ত দ্বারা ধর্ষিতা না হইলে প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিত না, ধর্ষিতার আর্তনাদে সমাজও চমকিয়া উঠিত না। এই "বলবান", হিন্দু বোধ হয় না, হিন্দু হইলে নরক-কুণ্ডে স্থান হইত। ধর্ষিতা নারী শূদ্রা কিংবা অন্ত্যজা বোধ হয় না; কারণ তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত কি আছে। দেবীবর ঘটক সাক্ষী আছেন, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহের মেল বন্ধনে দোষে দোষে জুখিয়াছেন। যবনদোষ অনেক ব্রাহ্মণকুল স্পর্শ করিয়াছিল। তথাপি পুরাণ-কারের চৈতন্য হয় নাই, কোন কোন জাতির নামে ক্ষিপ্ত হইয়া জাতিকে জাতি নরককুণ্ডে ফেলিয়াছেন। তিনি বিপ্র, হরিভক্তি-পরায়ণ, বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধালু। কিন্তু বৈষ্ণবোচিত দৈন্য, দাস্য, কারুণ্য সর্বভূতে দয়া পুরাণের কুত্রাপি লিখিতে পারেন নাই। তিনিই লিখিয়াছেন, 'আচারে ব্যবহারে চ জ্ঞায়তে হৃদয়ং নৃণাম্' (প্র।৬০)। প্রতি মঙ্গলবারে যোষিৎ দ্বারা শুভা মঙ্গলচণ্ডিকার পূজা করাইতেছেন, সামবেদের কৌথুম শাখা ধরিয়া ষষ্ঠী পূজা, মনসাপূজা, শারদীয়া মহাপূজা করাইতেছেন, একবার নয়, দুই তিনবার; অজ, মেষ, মহিষ, গণ্ডার বলিদান দেখিতেছেন, 'নরবলি' না বলিয়া এক নূতন 'মায়াতি' নামে সৎশূদ্র ক্রয় করাইতেছেন (প্র। ৬৪)। নন্দরাজা ইন্দ্রযজ্ঞ করিবেন, অজ মেষ মহিষ গণ্ডক বলির সহিত যোলটি 'মায়াতি' লইয়া গিয়াছেন (কৃ। ২১)। এ সবে দোষ নাই, নৃত্য-গীত-বাদ্যের সঙ্গে "কৃষ্ণকীর্ত্তন" থাকিলেই স্থান পবিত্র (প্র।৪৪)। বৈষ্ণব পুরাণে এ কি ব্যাপার, বুঝিতে পারি না। বোধ হয় কবি মনে মনে বৈষ্ণব হইয়াও তৎকালের শক্তি-পূজা উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজা শাক্ত ছিলেন। ক্ষত্রিয়েরা চিরদিন শাক্ত কিংবা শৈব। পরমাশ্চর্য, এই অরাজককালে দলে দলে কবি জন্মিয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার গান বাঁধিতে বসিয়াছিলেন। সেই এক তাল, এক স্বর, এক ভাব। সে সহস্র পিষ্টপেষণ-শব্দ শুনিবার শ্রোতাও ছিল। রসিক জনে রসাস্বাদন করুন, রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে এই রস অতি-নিদ্রা, অপার নৈরাশ্যের প্রতিক্রিয়া, "দুদিন বই ত নয়"। কবি তৎকালের চিত্র গোপন করেন নাই। লিখিয়াছেন, (ব্র।১০), "যাহার সহিত বন্ধুতা হয়, তিনি মিত্র। মিত্র সম্বন্ধ ত্রিবিধ—বিদ্যাজ, উৎপত্তিজ, প্রীতিজ। প্রীতিজ-সম্বন্ধ সুদুর্লভ। আর এক সম্বন্ধ আছে, সেটি 'নামসম্বন্ধ'। জারোপপতি 'বন্ধু', স্বামী তুল্য। (বৈষ্ণবপদের "বঁধু") উপপত্নী 'নবজ্ঞা' (নয়ানী) গৃহিণীসমা। এই সম্বন্ধ সর্বদেশে বিগর্হিত বটে, কিন্তু দেশভেদে মহৎ দ্বারাও দুস্ত্যজ হইয়াছে। তবে কি না, যুগে যুগে বিদ্যমান আছে, 'তেজীয়সাং ন দোষায়', তেজস্বীর পক্ষে দোষ নাই।" বোধ হয়, এই দোষের প্রতিকারে "মহানির্বাণ তন্ত্রে"র শৈব বিবাহের উৎপত্তি। সে বিবাহে 'বন্ধু' ও 'নবজ্ঞা' থাকিত না, বিবাহিত পতিপত্নী হইত।

পুরাণে অবশ্য বহু ধর্মোপদেশ আছে। কবি বহুবার নরককুণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন, চৌরাশি কুণ্ডের দুই অধিক ছিয়াশি কুণ্ডে কত ছিয়াশি পাপকর্মাকে কতবার ফেলিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। ইহাদের অধিকাংশ চোর; পুংশ্চলীও অল্প নয়। দারুণ দুঃসময়ে অন্নাভাবে ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছসেবী, যবনসেবী, মসীজীবী, যবনভাষাপাঠী, হরিমন্ত্রবিক্রয়ী, বৈদ্যোপজীবী চিকিৎসক, গণক দৈবজ্ঞ, শূদ্রের পাকোপ-জীবী সূপকার, ধাবক, শূদ্রযাজী, শূদ্রের শবদাহী, বৃষবাহ ও নিষিদ্ধ দ্রব্য ব্যাপারী, ইত্যাদি হইয়া বিপ্রের অনুচিত কর্ম করিতেন। কবি অর্থকষ্ট নিবারণের উপায় করিলেন না, নরককুণ্ডে ফেলিতেছেন। শূদ্রের দানগ্রহণ ব্রাহ্মণের নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণকে দান করিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের জন্য নানাবিধ দানের পুণ্য বার বার অজস্র কীর্তন করিয়াছেন। কিন্তু তাহাদেরও অবস্থা ভাল ছিল না, ধর্মভাবও দুর্বল হইয়াছিল।...

ব্রাহ্মণ-কন্যা কখনও সুলভ ছিল না, কন্যা ক্রয়-বিক্রয় ইদানী নূতন নয়। কন্যাপণের কারণ এখন আছে, তখনও ছিল। তদুপরি, কুলীন ও মৌলিক, ভাগ দ্বারা বরকন্যা ন্যূনাধিক হইয়া পড়িল, কুলীন বর বহু স্ত্রী পাইত, লইত, মৌলিক একটিও পাইত না। পুরাণকার দরিদ্রের অভাব দেখিলেন না লিখিলেন, যে জ্ঞান-দুর্বল ব্রাহ্মণ শূদ্রপত্নী গ্রহণ করে, সে কুম্ভীপাকে পচিতে থাকে (ব্র। ২০)। কবি তেজীয়ানের 'নবজ্ঞা' সহিতে পারিতেন, শূদ্রাকন্যা বিবাহে অধীর হইয়াউঠিয়াছেন। কোন কোন ব্রাহ্মণ কন্যার শূদ্রপতি হইত, যদিও কদাচিৎ।...

আদি ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের দেশ ও কাল:—এই পুরাণ এত রূপান্তরিত হইয়াছে যে ইহার নূতন ও পুরাতন অংশ পৃথক করিবার উপায় নাই। রাঢ়ীয় একাধিক কবি পুরাতন পরিবর্তন ও নূতন শ্লোক যোজন করিয়াছেন। এই কারণে বর্তমান সংস্করণে এত পুনরুক্তি ঘটিয়াছে। কোনও কবি একই বিষয় দুইবার লেখেন না। এই পুরাণে দ্বিরুক্তি দশ বারটা পাওয়া যাইবে, কোন্ পাপে কোন্ নরকভোগ, গণিলে চারি পাঁচটা হইবে। আদি পুরাণে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ছিল, তাহা এই পুরাণেই লিখিত আছে, অন্য পুরাণেও আছে। কিন্তু বর্তমান সংস্করণের সম্পাদক [তর্করত্ন মহাশয়] ইহাতে একবিংশতি সহস্র শ্লোক গণিয়াছেন। কিন্তু সহস্র শ্লোক প্রক্ষিপ্তের পরিমাণ নয়। পুরাতন অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকের অনেক শ্লোক গিয়াছে; তাহাদের স্থানে নূতন শ্লোক বসিয়াছে। "পুরাণ নিরীক্ষণ" লেখক শ্রীযুত গুরুনাথ কালে মহাশয় নারদ পুরাণ প্রদত্ত অনুক্রমণিকার সহিত বর্তমান মিলাইয়া দেখাইয়াছেন, গণেশ-খণ্ড ও কৃষ্ণজন্ম খণ্ড, মাত্র এই দুই খণ্ড অনুক্রমণিকা অনুযায়ী আছে। আমারও মনে হইয়াছে, গণেশখণ্ডে হস্তক্ষেপ অল্প হইয়াছে; কৃষ্ণজন্মখণ্ডে তদপেক্ষা অধিক, অন্য দুই খণ্ডে মূল রূপ অল্পই আছে। অনুক্রমণিকা দ্বারা প্রক্ষিপ্তের পরিমাণ সম্যক বুঝিতে পারা যায় না।...

(১) গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' ইত্যাদি শ্লোকের বিষয়টি এই পুরাণেই পাওয়া যায় (কৃ। ১৫) অন্য পুরাণে নাই। গীতগোবিন্দ দ্বাদশ খৃষ্ট শতাব্দে রচিত। অতএব পুরাণের উক্ত অধ্যায় এই শতাব্দের পূর্বে ছিল।

(২) এই পুরাণে বর্তমান প্রচলিত পূজার পঞ্চদেবতার অতিরিক্ত বহ্নি দেবতা আছেন। বহুস্থানে ষট্‌দেবতার পূজা করিতে বলা হইয়াছে (প্র। ৪, প্র। ২৩)। মাত্র একটি স্থানে সৌর গাণপত্য শৈব শাক্ত বৈষ্ণব, এই পঞ্চদেবতার পঞ্চ উপাসক সম্প্রদায়ের

* কেহ কেহ এই যাজপুর রাঢ়ে খুঁজিয়া পায় নাই। সে যাজপুর এখন দাদপুর নামে খ্যাত। (জ স্থানে দ হয়, যেমন বীরভূমের 'যুবরাজ-পুর' এখন দুবরাজপুর হইয়াছে।) উত্তর রাঢ়ে দাদপুর নামে অনেক গ্রাম আছে দুই একটা "দাউদপুর" হইতে পারে। এই যাজপুর ত্রিবেণীর কিম্বা কালনার নিকটবর্ত্তী দাদপুর। পাণ্ডুয়ার নিকটেও এক দাদপুর আছে।

উল্লেখ আছে (প্র।৩০)। দুই স্থানে পঞ্চদেবতার পূজা আছে (কৃ।৮)। রাঢ়ে বহ্নিপূজা প্রচলিত নাই, কোনও কালে থাকিলে একেবারে লুপ্ত হইত না। পৃথক্ গণেশপূজা ও আদিত্য পূজাও নাই। এ বিষয় "বৃহদ্ধর্ম-পুরাণ" আলোচনায় দেখা গিয়াছে। অতএব বোধ হয় মূল পুরাণ দশম খ্রীষ্ট শতাব্দের পূর্বে পশ্চিম প্রদেশে রচিত হইয়াছিল। রাজপুতানায় অগ্নিকুল নামে এক রাজকুল আছে, এবং বোধ হয় রাজপুত জাতিই তাহাদের আদি দেশ হইতে সূর্য-পূজা আনিয়াছিল।

(৩) শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে, কৃষ্ণের অবতার নয়টি, তন্মধ্যে সাংখ্যকার কপিল এক। অন্যত্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, কার্তিকেয়, ধর্ম, নরক প্রভৃতি এবং প্রধান প্রধান গোপেরা এক এক অবতার। বর্তমান প্রচলিত দশ অবতার গণনা পূর্বকালে ছিল না। "বিষ্ণুপুরাণে" বৃক্ষলতা, পশু-পক্ষী, এই সবই ব্রহ্মের অবতার। "ভাগবত পুরাণ" মতে ভগবানের অবতার অসংখ্য, প্রজাপতি, দেবতা, ঋষি, মনু ও মানব সকলেই হরির অংশ। তথাপি ২০টি অবতার বিশেষ করা হইয়াছে। কালে অবতার সংখ্যা অল্পে অল্পে নির্দিষ্ট হইয়া দশে দাঁড়াইয়াছে। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, নবম খৃষ্টশতাব্দের পরে দাঁড়াইয়াছে। অতএব ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ এই শতাব্দের পূর্বের।

(৫) আদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের কালে গোমাংস ভক্ষণ নামে লোকে কানে আঙ্গুল দিত না। চন্দ্রপুত্র-বুধের চৈত্র নামে সপ্তদ্বীপপতি পুত্র জন্মে। ইনি ঘৃত দধি দুগ্ধের শত 'নদী', মধুর ষোড়শ, তৈলের দশ, শর্করা মিষ্টান্ন স্বস্তিকের লক্ষ 'রাশি', ইত্যাদির সহিত "পঞ্চকোটি গবাং মাংসং" ব্রাহ্মণগণকে নিত্য ভোজন করাইতেন (প্র। ৬১)। এইরূপ স্বায়ম্ভুব মনু ত্রিলক্ষ নরমেধ ; চতুর্লক্ষ গোমেধ করিবার কালে প্রত্যহ তিনকোটি ব্রাহ্মণকে "পঞ্চলক্ষ গবাং মাংসৈঃ সুপক্বৈর্ঘৃতসংস্কৃতৈঃ" ভোজন করাইতেন (প্র।৫৪)। এ সব কাহিনী শুনিলে মহাভারতের রন্তিদেবকে মনে পড়ে। পুনশ্চ, গর্গমুনি নন্দ যশোদাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিতে আসিলে যশোদা তাঁহাকে পাদ্য গোমধুপর্ক ও স্বর্ণ সিংহাসন দিয়া পূজা করিলেন (কৃ।১৩)। এখানে কথা উঠিবে, কবি পুরাকালের আচার ব্যবহার লিখিয়াছেন, তাঁহার কালের লেখেন নাই। এ তর্ক অবশ্য মান্য। কিন্তু আদি কবি গোমাংস ভক্ষণ মহাপাতক মনে করিলে সে স্থানে অজমাংস লিখিতেন, এবং প্রকৃত বৈষ্ণব হইলে ব্রাহ্মণগণকে মাংসও দিতেন না। যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির কালে (৪র্থ খ্রীষ্ট শতাব্দে) গোমাংস-ভোজন বর্জিত হয় নাই, পিত্রাদির শ্রাদ্ধে গোমাংস চলিত। কিন্তু পরবর্তী কালের টীকাকারেরা স্মৃতির বচনের অর্থান্তর করিয়া শান্তি পাইয়াছেন। "উত্তর রামচরিতে"র কবি ভবভূতি গোমাংস ভক্ষণে ভীত হন নাই। ইনি সপ্তম খ্রীষ্ট শতাব্দে ছিলেন। এই শতাব্দের পর হইতে গো-বধ অ-কথ্য, অ-শ্রাব্য হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলি প্রাচীন আচার-ব্যবহার কলিকালে নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই কলি পাঁজির কলিযুগ নয়। কলিকালের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যে কালে সে লক্ষণ দেখা যায়, সেকাল কলি। বোধ হয়, এই কলি অষ্টম শতাব্দে আরম্ভ হইয়াছে। এই শতাব্দে শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধ পাষণ্ডেরা প্রবল, ব্রাহ্মণ হীনবল। এই সময়ে আরবদেশীয় মুসলমান ভারতে প্রবেশ করিতে থাকে। ইহাদের পূর্বে যবন, শক, হূণ জাতিরা ভারতে আসিয়া স্থানে স্থানে ভূপতি হইয়াছিল। তাহারাও গোমাংস-ভোজী ছিল, কিন্তু তৎকালে গোমাংস অমেধ্য হয় নাই, তাহারাও স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া ক্রমে হিন্দু হইয়াছিল। কিন্তু আরবী মুসলমান হিন্দু হইল না ; যত্র তত্র হিন্দুর দৃষ্টিতে অনাবশ্যক ও অতিশয় গোবধ করিতে লাগিল। গো-ক্ষয় দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিশেষতঃ জৈনেরা ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু প্রতিকার করিতে পারিল না। পূর্বকালের হিন্দু গোমাংস খাইত, কিন্তু উৎসবের সময় খাইত, প্রত্যহ খাইত না। ইহাতে গোবংশের হানি হইত না, দধি দুগ্ধ ঘৃতের অভাব হইত না, কৃষি কর্মেও ব্যাঘাত হইত না। বিদেশী বিজয়ী মুসলমান এদিকে দৃষ্টি না করাতে সর্বত্র যেমন ঘটিয়া থাকে হিন্দুও তেমন নিজের নিজের গো-রক্ষায় অধিকতর মনোযোগী হইল, গো-বধ মহাপাপ গণ্য হইল। অর্থাৎ আত্মরক্ষার চেষ্টায় কলিকালের নিমিত্ত নূতন স্মৃতির ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিলে মনে হয়, ব্রহ্ম-বৈবর্তপুরাণ অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রণীত হইয়াছিল। এ বিষয়ে এক প্রমাণও আছে। শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে (৯৬) কালমান বর্ণিত হইয়াছে। এটি দ্বিতীয়বার, কিন্তু এইটি আদি পুরাণের। কারণ এখানে পঞ্চবর্ষে যুগ এবং নক্ষত্রের মধ্যে অভিজিৎ গণনা হইয়াছে। দেখিতেছি, এখানে শ্রাবণ হইতে দক্ষিণায়ন ও মাঘ হইতে উত্তরায়ণ এবং সপ্তবিংশতি যোগ ধরা হইয়াছে। ষষ্ঠ খ্রীষ্ট শতাব্দের পর উক্ত অয়ন এবং সপ্তম শতাব্দের পর যোগ গণনার আরম্ভ হইয়াছে। অতএব আদি ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ অষ্টম শতাব্দের পূর্বে হইতে পারে না।

ইহার উৎপত্তি বঙ্গদেশে হয় নাই বলিবার দৃঢ় প্রমাণ নাই। এক বাধা, গণেশখণ্ড। আর এক বাধা, রাধাকৃষ্ণের উপাসনা। অষ্টম শতাব্দে রাঢ়দেশ ঘোর শাক্ত ছিল। বোধ হয় দশম শতাব্দে এই পুরাণ বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল। তদবধি ষোড়শ পর্য্যন্ত রাঢ়ীয় কবি ইহাকে নিজের করিয়া ফেলিয়াছেন। অন্যান্য প্রদেশের সংস্করণ মিলাইলে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। বর্তমান প্রবন্ধের পক্ষে রাঢ়ীয় সংস্করণ বহুমূল্য।

(ভারতবর্ষ, আষাঢ়, ১৩৩৭) শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়

কালিদাসের বৃক্ষলতা

৫৩। বন্ধূক :—ভিন্নাঞ্জন প্রচয়কান্তি নভো মনোজ্ঞম্ বন্ধূক পুষ্পরচিতারুণতা চ ভূমিঃ। ঋ ৩।৫

দেশভেদে নাম :—বাং:—বাঁধুলি, বাঁদুল বা বানরী।

বাঁধুলী বাংলায় পরিচিত। ইহার ফুল লাল বলিয়া ইহার "রক্তক" এবং মধ্যাহ্নে ফোটে বলিয়া মাধ্যাহ্নিক বা দুপহরিয়া নাম হইয়াছে। ইহা শরৎকালের ফুল। ওষ্ঠের রং-এর সঙ্গে মহাকবি ইহার তুলনা করিয়াছেন।

৫৪। ভূর্জ :—ভূর্জেষু মর্মরীভূতাঃ কীচকধ্বনিহেতবঃ। র ৪।৭৩
দেশভেদে নাম :—বাং:—ভূর্জপত্র বা ভুজ্জিপত্র।
কালিদাস হিমালয় বর্ণনায় ভূর্জপত্র বৃক্ষের উল্লেখ করিয়াছেন।

৫৫। মধুক :—পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডু-মধুকদাম্না॥ কু ৭।১৪

দুই প্রকার মধুক আছে। এক "মধুক" (Bassia latifolia, Indian Butter tree), দ্বিতীয় "জলমধুকর" (Bassia longifolia).

জলমধুকের নাম :—মধুলক, দীর্ঘপত্রক, হ্রস্বপুষ্প, কীরেষ্ট, ফলস্বাদু।
ভারতবর্ষের বহু প্রদেশে "জলমধুক" বৃক্ষের চাষ হয়। ইহার কাণ্ড হ্রস্ব হইলেও বহু শাখাযুক্ত হয় বলিয়া ইহা উত্তম ছায়া এবং প্রচুর ফল দান করে।

মধু বা মৌয়া গাছের কাণ্ড হ্রস্ব ও মসৃণ, ভিতরে লাল, বাহিরে পাঁশুটে রঙের স্থূল কষায় স্বাদযুক্ত ছালে ঢাকা। শীতে গাছের পাতা ঝরিয়া যায়। বসন্তে ফুলের সঙ্গে নূতন পাতা জন্মায়।

মৌয়াফুলের মদ সুপরিচিত। মৌয়ার তেলে রাঁধা হয়। ঐ তেলে চুলকানি সারে। শীতকালে এই তেল জমাট বাঁধে। মৌয়ার ফুলেও মাদকতা আছে। মধুপুরে মৌয়াগাছ যথেষ্ট দেখা যায়। কালিদাস এই মৌয়ারই বর্ণনা করিয়াছেন।

৫৬। মন্দার :—করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্র-মন্দার রজোরুণাঙ্গুলী॥ কু ৫।৮০

মন্দার দেবতরু। ইহার ফুলের বর্ণনায় কালিদাস লিখিয়াছেন "হস্তপ্রাপ্য-স্তবক-নমিতঃ"।

৫৭। মল্লিকা :—বনেষু সায়ন্তন মল্লিকানাং বিজৃম্ভণোদ্ গন্ধিষু কুট্‌মলেষু। র ১৬।৪৭

মল্লিকা আমাদের অতিপরিচিত বেলফুল।

৫৮। মাধবী :—রক্তাশোকশ্চলকিসলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতে র্মাধবীমণ্ডপস্য। মে ২।১৫

দেশভেদে নাম :—বাঃ—মাধবীলতা।

৫৯। মালতী :—তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈ র্মালতীনাম্। মে ২।১৫

দেশভেদে নাম :—বাঃ—চামেলি, জাতি, মালতী।

মহাকবি বর্ষা ও শরতে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন।

৬০। মুস্তা :—উত্তস্থুষঃ সপদি পল্বলপঙ্কমধ্যান্ মুস্তাপ্ররোহকবলাবয়বানুকীর্ণম্। র ৯।৫৯

দেশভেদে নাম :—বাঃ—মুথা।

অমরকোষের অনুবাদক মুথার নামান্তর "ভদ্রমুস্তক" দিয়া উভয়কে এক করিয়াছেন। কিন্তু অমর মুস্তা ও ভদ্রমুস্তক আলাদা করিয়াছেন। এই ভদ্রমুস্তককে ভাদালিয়া মুথা বলে; কেহ বা ইহাকে নাগর মুথাও বলে। কালিদাস ঋতুসংহারে "ভদ্রমুস্তা"র উল্লেখ করিয়াছেন।

আমি মুথা ও ভদ্রমুথাকে ভিন্ন বলিয়া পূর্ব্বে দুই স্থানে উল্লেখ করি নাই। এখন দেখিতেছি বনৌষধিদর্পণ চারি প্রকার মুথা খাড়া করিয়াছে।

৬১। যব :—অরুণরাগনিষেধিভিরংশুকৈঃ শ্রবণলব্ধপদৈশ্চ যবাঙ্কুরৈঃ। র ৯।৪৩

দেশভেদে নাম :— বাঃ—যব।

যবাঙ্কুর মেয়েরা কাণে পরিত বলিয়া মহাকবি কালিদাস বর্ণনা করিয়াছেন। আর বসন্তকালেই যবাঙ্কুর জন্মায়।

মহেশচন্দ্র ঘোষ

শ্রীসুবিমল রায়

প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট মহেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নাম সুপরিচিত। গত ১২ই জুন পূজ্যপাদ মহেশবাবু পরলোকে গমন করিয়াছেন। আমরা হাজারিবাগে অবস্থানকালে নানাবিষয়ে তাঁহার অসাধারণত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলাম; এই প্রবন্ধে তাহার সামান্য বিবরণ দিবার চেষ্টা করিব।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, নভেম্বর মাসে, হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে মহেশবাবুকে প্রথম দর্শন করি। শরীর অত্যন্ত ক্ষীণ, কিন্তু তেজঃপুঞ্জ শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি। মস্তকে গেরুয়ারঙের পাগ্‌ড়ী; কাঁচাপাকা দাড়ি; কথায় ও চেহারায় পাণ্ডিত্য বিনয়, ধর্ম্মভাব ও তেজস্বিতা প্রকাশ পায়। কেহ প্রণাম করিতে গেলে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া পড়েন এবং বাধা দিবার চেষ্টা করেন। সুতরাং একরকম জোর করিয়াই প্রণাম সারিতে হইল।

ইহার পর হইতে মধ্যে মধ্যে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে আরম্ভ করি; সেখানে বহু লোকের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। তাঁহার আত্মীয় ধীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের গৃহেই তিনি অবস্থান করিতেন। একদিন পূজ্যপাদ মহেশবাবু বলিলেন, "প্রবাসীর পাঠকগণের মধ্যে যদি মুষ্টিমেয় লোকও আমার প্রবন্ধ পড়েন, তবে আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। উপনিষদাদি গ্রন্থ এবং দর্শন শাস্ত্র সম্বন্ধে প্রবন্ধ কম লোকেই পড়ে। সুতরাং আমি কিছুতেই আশা করিতে পারি না, যে, বেশী লোক আমার প্রবন্ধগুলি পড়িবে।"

তিনি অত্যন্ত অল্পাহারী ছিলেন এবং নিরামিষ খাইতেন। মানসিক শ্রমে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করিতেন না। অনেকে তাঁহাকে আমিষ খাইতে পরামর্শ দিতেন, এবং বলিতেন, যে, নিরামিষ খাইয়া বেশী

পরিশ্রম করিলে তাঁহার গুরুতর ক্ষতি হইবে। মহেশবাবু কিন্তু সে কথা স্বীকার করিতেন না। তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "বহু বৎসর পূর্ব্বে চিকিৎসকগণ আমাকে আমিষ খাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, এবং আমি আমিষ খাইয়া দেখিয়াছি। দেখিলাম আমিষ ও নিরামিষ উভয় প্রকার আহারের ফল প্রায় একই। আমিষ খাইয়া বিশেষ কিছু উন্নতি বুঝিলাম না। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় নিরামিষ আহার করিতে লাগিলাম।"

অল্পাহার সম্বন্ধে একটি মজার ঘটনার কথা মহেশবাবু বলিয়াছিলেন। একদিন একজন ভদ্রলোক আসিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সহিত মহেশবাবুকে বলিলেন, "আপনি নাকি অনাহারে থাকেন? একি কম শক্তির কথা! আপনি নিশ্চয় যোগ অভ্যাস করেন, কিছু না খেয়ে থাকা কি যার তার কর্ম্ম?"

মহেশবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আপনাকে কে বলিল, যে, আমি অনাহারে থাকি? আমি সামান্যই আহার করি, কিন্তু অনাহারে থাকি না এবং না খাইয়া বাঁচিয়া থাকিবার শক্তিও আমার নাই।"

ভদ্রলোকটি বলিলেন, "সাধুরা এই ভাবেই আত্মগোপন করেন।"

মহেশবাবুর খুব হাসি পাইল। তিনি নানাভাবে ভদ্রলোকটিকে বুঝাইলেন, যে, তিনি প্রত্যহ আহার গ্রহণ করেন; অনাহারে থাকেন না।

তাঁহার অসাধারণ মনের জোর ছিল। তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ছিলেন। কোন ঘটনায় তিনি বিচলিত হইতেন না। শারীরিক পীড়া তাঁহার শান্তি ও প্রফুল্লতা হরণ করিতে পারিত না। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তাঁহার ঘরে ঢুকিলেই দেখা যাইত, যে, ঘরময় রাশি রাশি পুস্তক সাজান রহিয়াছে। পাশের ঘরগুলিতেও তাই। তিনি একবার যাহা পাঠ করিতেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইতেন না।

তিনি বহু পুস্তকের সমালোচনা করিয়াছিলেন। অনেকে মনে করেন, সমালোচকের কাজ করিলে মানুষের মন তিক্ত ও রুক্ষ হইয়া যায়। কিন্তু মহেশবাবু সদানন্দ, সরল ও বিনয়ী ছিলেন। যশোমানের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে নানা গুণের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল। তিনি নির্জ্জনবাসী হইয়াও জনসমাজের সকল সংবাদ রাখিতেন। অসাধারণ পণ্ডিত হইয়াও অজ্ঞের ও অল্পজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দার্শনিক হইয়াও কর্ম্মকুশল ছিলেন।

তাঁহার দেহত্যাগের বহু বৎসর পূর্ব্বেই চিকিৎসকগণ তাঁহার জীবনের আশা একরকম ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন। অনেকেই বলিতেন, "মহেশবাবুর অসাধারণ ইচ্ছাশক্তি তাঁহাকে এখন বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।" তাঁহার ক্ষীণ দেহের মধ্য দিয়া আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ ও মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রকাশ পাইয়া সকলকে মুগ্ধ ও চমৎকৃত করিত।

তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ভাল জানিতেন। অনেক গরীব লোক তাঁহার নিকট ঔষধ লইতে আসিত। তাঁহার চিকিৎসায় উহারা বেশ ফল পাইত। একদিন আমি তাঁহার নিকট বসিয়া আছি, এমন সময় একজন লোক (বোধ হয় একজন গাড়োয়ান) আসিয়া তাঁহার নিকট ঔষধ চাহিল। তিনি রোগের সমস্ত লক্ষণের কথা শুনিয়া ঔষধ দিলেন। লোকটি চলিয়া গেলে তিনি বলিলেন, 'ইহারা বড় বেশী পেঁয়াজ রসুন খায়, তবু ইহাদের শরীরে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ক্রিয়া হইতে দেখা যায়।"

একবার বহুলোক তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করে। এক একজন প্রণাম করে আর মহেশবাবু দুই হাত পিছাইয়া যান। যখন শেষ ব্যক্তির প্রণাম করা হইয়া গেল, তখন দেখা গেল, যে, মহেশবাবু পিছাইতে পিছাইতে প্রায় ঘরের বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন।

একবার একজন শিক্ষিত ব্যক্তি কর্ম্মদোষে বিপন্ন হইয়া পড়েন; সেই ব্যক্তি এক সাধুর আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং সৌভাগ্যলাভের আশায় নানারূপ ক্রিয়া করাইতে থাকেন। মহেশবাবু সে কথা শুনিয়া বলিলেন, "শিক্ষিত লোকদের মধ্যেও এই দুর্ব্বলতা দেখা যায়। কেহ কেহ ধর্ম্মকর্ম্মকে সাংসারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায়-রূপে ব্যবহার করে। যদি হঠাৎ তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ

হইয়া যায় তবে তাহারা মনে করে, যে, ঐ সকল প্রক্রিয়াই তাহাদের সাংসারিক উন্নতির জন্য দায়ী।"

তিনি চিরকুমার ছিলেন। জ্ঞানচর্চ্চা তাঁহার জীবনে বল, আনন্দ ও শান্তি আনয়ন করিয়াছিল। তিনি শেষ-জীবন হাজারিবাগেই কাটাইয়াছিলেন। ১৯২৬ সনের এপ্রিল মাসে তাঁহার সহিত শেষ দেখা হয়। তখন বলিয়াছিলেন, "আর দেখা হয় কি না সন্দেহ।" কিন্তু তাহার পরেও চারি বৎসর পৃথিবীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

দেহত্যাগের দুইতিন মাস পূর্ব্বে তাঁহার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়ে। তখন হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজে উৎসব হইতেছিল। একা উৎসবের ভার বহন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না; সুতরাং কলিকাতা হইতে লোক পাঠান হয়। ইহার পর তাঁহার শরীর কিছু সুস্থ হয়, কিন্তু আবার অসুখের বৃদ্ধি হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কোন দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ করেন নাই। তিনি পরম নিশ্চিন্ত-ভাবে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, এবং প্রায় তিন মাস রোগে ভুগিয়া নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

নাস্তিক

শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

তারপর বিনোদ বলিল, খবর কি? এতদিন পর মনে পড়ল আমায়? কোথায় ছিলে এতদিন? তুমি কিন্তু একটুও বদলাও নি। তোমার সেই রোগাপট্‌কা চেহারা, ম্লান মুখ, ড্যাব্‌ড্যাবে কালো চোখ দুটি যেন কিসের সন্ধানে ঘুরে মরছে, যেন সবজিনিষেরই ভিতরকার কথা টেনে নিতে চায়! তোমায় পেয়ে ভারি খুশী হয়েছি কিন্তু।...কিন্তু সে যাক, বুড়ো ঠাকুমা'র মত কি সব আবোলতাবোল বকছি! আমায় এখানে এ অবস্থায় দেখে খুব আশ্চর্য্য হয়ে গেছ নিশ্চয়! ভাবছ আমি অনেকটা বুড়িয়ে গেছি, কেমন নয়?—তা বয়েসও ত নেহাৎ কম হ'ল না। এই যে হাত দুখানা দেখছ, এতে ডাক্তারের ছুরির বদলে চাষীর কাস্তেই মানায় ভাল। তোমার হাত দুখানা কিন্তু বেশ নরমই রয়ে গেছে—তোমার যৌবনশ্রীর এতটুকুও কম্‌তি হয় নি।

আমার কথাবার্ত্তা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হয়ে গেছ। হাঁ, আমিই তোমার সেই ছেলেবেলাকার সাথী, যৌবনের সহপাঠী; আজ আমি প্রৌঢ়, চোখ দুটো আমার কোটরে ঢুকেছে, কপালে সুস্পষ্ট বলিরেখা পড়ে গেছে! মনে পড়ে ছেলেবেলাকার কথা? বেরালের লেজে বিস্কুটের টিন বেঁধে তাকে একদিন ছাদের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলাম, সারাটা রাত্তির বেরালটার সে কি তাণ্ডব নৃত্য! পাশের বাড়ীর সকলেই ভূতের উপদ্রব মনে করে কি সাংঘাতিক ভয়ই না পেয়েছিল!

তোমার প্রাণখোলা সরল হাসিটি আজও মনে পড়ে অথচ কতদিন হয়ে গেছে!

মনে পড়ে স্কুলে সেই পিছনের বেঞ্চিতে বসে লেবেঞ্চুস খাওয়া। অঙ্কের ঘণ্টায় নিশিবাবুর সেই অতি-শাসন?—সামান্য ত্রুটি এড়িয়ে চলবার জো নেই, তাঁর উদ্যত বেত্রখণ্ডের সঙ্গে আমাদের সেই প্রতিদিনকার চির-মিলন। মনে পড়ে, একদিন তোমার 'হোম টাস্ক' আমি হরিপদর খাতা দেখে টুকে দিয়ে কি লাঞ্ছনাটাই না ভোগ করেছিলাম!

তারপর, সেবার বার্ষিক পরীক্ষার পর তোমাতে আমাতে একদিন দুপুরে আমাদের বকুল গাছটার তলায় শানবাঁধানো আসনে বসে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদার' কাব্যরসে মশ্‌গুল ছিলাম। তোমার স্বাভাবিক মৃদুমধুর সুকণ্ঠে সেই আবৃত্তি, তোমার সে আত্মহারা দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারিনি। তুমি হেসে আমায় বলেছিলে,

জানিস্ এ দৃষ্টি আমি উত্তরাধিকারসূত্রে কৃষ্ণ-সখার কাছ থেকে পেয়েছি। খুব সম্ভব সেদিন পাঠশেষে তুমি উদ্দেশে কবিগুরুর পায়ে শত শত প্রণাম নিবেদন করেছিলে। মনে পড়ে সব ?

তোমায় বিরক্ত করছি না ত ? দীর্ঘকাল পরে তোমায় পেয়ে আমার কত কথা মনে পড়ছে। অনেকদিন প্রাণ খুলে কথা কইতে পারি নি। এখানকার এ একঘেয়ে জীবন আর ভাল লাগে না। সারাটা দিন সেই রোগী দেখা, তাদের ওষুধ-পথ্যের ব্যবস্থা করা—নীতি-কথার মতই তেতো মনে হয়। রাস্তায় লোক-চলাচল বেশী নেই—মাঝে মাঝে দূরাগত দু'চার জন পথিক তাদের পদচিহ্ন এঁকে দিয়ে কোন্ সুদূরে মিলিয়ে যায়—কে জানে !

ওই দেখ অদূরে পাহাড়টা কেমন ঝুঁকে পড়েছে, যে-কোনো মুহূর্ত্তে ও যেন আমাদের উপর ধসে পড়বে—তাই দিনরাত্তির শাসাচ্ছে, যেন আমাদের গুঁড়িয়ে মারাই তার মতলব। হাসপাতালে রোগীর ভিড় তেমন নেই, যে কয়জন আছে, তাদের সে বিচিত্র অভিযোগের অদ্ভুত বিবরণ শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে যায়— তাদের মেজাজই যেন পাওয়া ভার ! তাদের চিকিৎসা করবার সুযোগ দিয়ে যেন তারা আমায় কৃতার্থ করেছে, পান থেকে চূণ খসলেই অনর্থ, শাপমন্যিরও সীমা নেই। যেন তারা সব আমার মেয়ের বিয়েতে বরযাত্রী এসেছে।

রবিবারে হাসপাতালে কাজের ভিড় একটু কম থাকে। তাই সেদিন আমার শান্তির যেখানে শেষ বিছানা বিছিয়ে দিয়েছি, সেই পাহাড়ের গায়ের সেই থানটায় গিয়ে একটু বসি। শান্তি কে ? জিজ্ঞাসা করছ ?—শান্তি আমার একমাত্র কন্যা, চার বছর হ'ল এক মেঘেভরা বৃষ্টিঝরা অপরাহ্ণে তাকে চিরদিনের মত হারিয়েছি। সে দিনটির কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে।

কিছুদিন থেকেই তার ক্ষয়রোগ হয়েছিল। নিজে চিকিৎসক, চিকিৎসার যে তেমন কোনো ত্রুটি হয়েছে তা বলতে পারি নে, তবে সেবাশুশ্রূষার যে প্রতিপদে ত্রুটি হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একা মানুষ, সব সময় নিয়মিত ওষুধপথ্য দিতে পারতাম না। ঘরে স্ত্রী আছেন বটে, কিন্তু তিনি সপত্নী-কন্যার সেবা করতে গিয়ে দুরারোগ্য ব্যাধি অর্জ্জন করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিশেষত রোগীর সেবা করা তাঁকে মোটেই পোষাত না।

সেদিন সকাল থেকেই থেকে থেকে জল ঝরছিল, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎও চমকাচ্ছিল। এক একবার এক একটা বজ্র কড়্ কড়্ শব্দে কানে তালা লাগিয়ে দিচ্ছিল। শান্তি সজল চক্ষে গলা জড়িয়ে আমায় আঁকড়ে ধরল। আমি নীরবে অশ্রুশূন্য চোখে তার সামনে বসে ছিলাম। আমি তখন কোনো একটা বিশেষ কিছু ভাবছিলাম না—মনটা নেহাতই যেন ফাঁকা। ক্রমে চারদিক নীরব নিস্তব্ধ হয়ে এল, কেবল মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝটকা বন্ধ-জানলার শাসিতে এসে পড়ে প্রকৃতির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করছিল। সেদিন স্ত্রী তার মাসতুত ভায়ের মেয়ের পুতুলের বিয়েতে যোগদান করবার জন্যে তার দাদার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। একটু পরেই জল থেমে গেল, আমার একটু অমনোযোগিতার ফাঁকে শান্তি যে কখন আমায় অশান্তির পাথারে ফেলে রেখে চলে গেল, তা জানতেও পারলাম না। তখনও সে কিন্তু আমায় জড়িয়ে ধরেই ছিল, চোখের শেষ অশ্রুবিন্দু তখনও তার গাল থেকে নিঃশেষে শুখিয়ে যায় নি।

তাকে ওখানে ঐ শিউলি ফুলগাছটার তলায় পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছি, তারপর ঐ যে দেখছ সমাধি-ফলকখানা, ও তারই স্মৃতির জন্য বানিয়েছি। প্রতি রবিবার সকালে ঐ শিলাখণ্ডের সামনে বসে অনেকটা সময় কাটাই, নিজের মনে ফুল দিয়ে প্রস্তর ফলকখানাকে সাজাই। আমার বিশ্বাস—বিশ্বাস কেন, আমি ঠিক অনুভব করি যে, শান্তি অদৃশ্যলোক থেকে সেই সময় আমার পাশে এসে উপস্থিত হয়। সে যেন আস্তে আস্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলে, 'বাবা, কেঁদ না, আমি ভাল আছি, আর কোনো অসুখই আমার নেই।'

অদূরে খ্রীষ্টানদের কবরখানায় একটি আধা-বয়সী স্ত্রীলোক কালো পোষাক পরে প্রতি রবিবারই প্রাতে এসে উপস্থিত হয়। কবরের উপরকার প্রস্তরফলক শাদা

ফুল দিয়ে সাজায়, বাইবেল পড়ে—পরে চোখ মুছতে মুছতে চলে যায়। একদিন মহিলাটির সঙ্গে যেচে আলাপ করে জানলাম, ওখানে তার একমাত্র সন্তানকে গোর দেওয়া হয়েছে।

শান্তির সমাধি-ফলকে বসে এক একসময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি, তখন এত বড় বিশ্বের আর কারুর কথাই মনে আসে না,—একমাত্র তোমার কথা সময় সময় মনে পড়ে। এখনও প্রতিষ্ঠা ও ধনসম্পদ কামনা করি—কেন-না দরিদ্র বলেই না শান্তি আমায় অত সহজে ছেড়ে যেতে পারল,—আমি ত বেশ জানি যে চিকিৎসার কোনো ভাল ব্যবস্থাই করতে পারিনি।

শান্তির সমাধিস্থান ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে প্রতি-বারেই নিজের মনে একটা পরম সান্ত্বনা পাই—মনে হয়, তাকে আমি আমার-জগতে হারিয়েছি বটে, কিন্তু তাকে বৃহত্তর জগতে বিরাটরূপে লাভ করেছি। শান্তি আমার ছিল, শান্তি আমার আছে।

দেখছ আমার কাণ্ডজ্ঞান! তুমি পথশ্রমে না জানি কত ক্লান্ত হয়েই এসেছ, অথচ সেদিকে আমার খেয়ালই নেই, নিজের দুঃখের কথাই বলে যাচ্ছি। মাফ্ করো ভাই। চল, ঘরে গিয়ে বসি। বসবে না?—বেশ, এখানে তাহ'লে এই ঘাসের উপর বসি।

তারপর কি বলছিলাম, হ্যাঁ। যতক্ষণ হাসপাতালে থাকি—নিজেকে বেশ ভুলে থাকি, কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এলেই নিজের ব্যর্থ জীবনের সে মর্ম্মন্তুদ করুণতা আমায় আত্মহারা করে তোলে। এতদিন পর তোমায় পেয়েছি, জীবনের সব কথা ব'লে দুঃখের ভার কিঞ্চিৎ লাঘব করে নিই। তোমায় বলতে কি ভাই, স্ত্রীকে আমি সইতে পারি নে, অথচ ছাড়বারও জো নেই।

না, দোহাই তোমার হেসো না শুনে! আমার ন্যায় দুর্ভাগার এই করুণ কাহিনী শুনে যার প্রাণে হাসি আসে তার মত পাপিষ্ঠ আর নেই। এ যে আমার কি পরম ব্যথা তা বলতে পারি নে, যাকে নিজের গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছি, তাকেও আপনার করে পেলাম না।

ভয়ের আমার সীমা নেই, পাছে আমার কোনো আচরণে সে মর্ম্মাহত হয়, পাছে সে মনে করে, তাকে আমি প্রতারিত করেছি, সেই ভয়েই সর্ব্বদা তটস্থ থাকি। বিলাসের উপকরণেরও কিছুমাত্র অভাব নেই তার, আব্দারও তার অফুরন্ত; এটা চাই, ওটা চাই—প্রতিদিনই দাবীর মাত্রা অব্যাহত বেড়ে চলে। গহনা, গ্রামোফোন, শাড়ী, জামা, সাবান এসেন্স,—নিত্য নতুন সব তার চাই। আব্দার পূরণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ নেই, এ যেন তার পাওনা। অর্থাভাবে তার দাবী পূরণে এতটুকু ত্রুটি হ'লে অনর্থপাত অপরিহার্য্য। আমি বাঁচি কি মরি, আমার কাজ হোক, কি না হোক, তা আর দেখবার প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই, তার দাবী পূর্ণ হলেই হ'ল।

যাক্-গে এ সব কথা। কই তোমার শরীরটাও ত তেমন ভাল দেখছি নে—তবে কি জগতে আমার মত সকলকারই দুঃখ-কষ্ট আছে!

• • •

হাঁ, কি বলছিলে?—শশাঙ্ক কোথায় আছে?—সে যেখানে আছে, সেখানকার খবর কেউ জানে না, আজ পর্য্যন্ত কেউ জানতে পারে নি। তুমি জান তার সেই নির্ব্বোধের মত চেহারাটা দেখলেই ছেলেবেলায় আমার হাসি পেত। তার বুদ্ধি কম ছিল বটে কিন্তু তার প্রাণ ছিল। যৌবনের সুরুতেই সংসারের জন্যে কি অসাধারণ খাটুনিই না সে খাটত। তার সেই রোগা ঢ্যাঙা চেহারা কাঠির মত হাত-পাগুলি, কোটরগত চোখদুটি, মুখখানা সর্ব্বক্ষণ বিষাদাচ্ছন্ন—এখনও যেন চোখের উপর ভাসে।

আমি তখন সবে এখানে ডাক্তার হয়ে এসেছি। একদিন তার বৃদ্ধ বাপ কেঁদে এসে আমায় বললেন, বাবা, আমার শশাঙ্ককে একবার দেখবে এস, তাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলাম না।

শশাঙ্কের বাবার কথা তোমার অবশ্যই মনে আছে, সেই সহৃদয় অতিদরিদ্র বৃদ্ধ এখানকার স্কুলে শিক্ষকতা করতেন, অথচ তিনি যে কোনদিন লেখাপড়া কিছু শিখেছিলেন তা কিন্তু তাঁকে দেখলে বা তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইলে কখনই মনে হত না।

আমি গিয়ে দেখি শশাঙ্ক একেই ত রোগা মানুষ, তার উপর রোগে ভুগে ভুগে তার দেহে মাংসের কণামাত্রও ছিল না। একখানা ক্যাওড়া কাঠের তক্তপোষে মলিন

শয্যায় শুয়ে ধুঁকছে। বুড়ি পিসিমা তার একপাশে বসে মালা জপ করছেন, যেন ভগবানের নিকট একাগ্রতার সঙ্গে ভ্রাতুষ্পুত্রের আয়ুভিক্ষা করছেন। দর্মার বেড়ার ফাঁক দিয়ে অস্তোন্মুখ সূর্য্যের শেষকিরণ-সম্পাতে রোগীর মুখখানাকে উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল। তোমার মনে আছে নিশ্চয় যে, মা তার ছাত্রজীবনেই মারা যান। ছোট ভাইটি দাদার অসুখ কিসে সারবে তারই ভাবনায় ব্যাপৃত, অথচ ছেলেমানুষ সে, জানে না যে, তার দাদার জীবন-প্রদীপের তৈল প্রায় নিঃশেষ হয়েই এসেছে।

শশাঙ্ককে মনোযোগ দিয়েই পরীক্ষা করলাম। কিন্তু বুঝলাম আর বেশী দেরী নেই। দীর্ঘকাল রোগে ভুগে, অনাহারে অর্দ্ধাহারে অমানুষী পরিশ্রমে অচিকিৎসায় তার জীবনের মূলে মরণের টানটা খুব স্পষ্ট হয়েই আমার চোখে ধরা পড়ল। আমায় দেখেই সে তার রোগজীর্ণ বিশীর্ণ হাত দুখানি প্রাণপণ চেষ্টায় বাড়িয়ে দিল, কিন্তু দুর্ব্বল দেহ তার ভারটুকুও বইতে পারল না। জড়িত স্বরে কি বললে, তার সব কথা স্পষ্ট বুঝতে পারলাম না, তবে তার অস্পষ্ট কথার মধ্যে থেকে এইটুকু বুঝতে পারলাম যে, মৃত্যুকালে আমায় দেখতে পেয়ে সে ভারি খুশী হয়েছে, তোমায় শেষ দেখা দেখতে পেলে আরও খুশী হত। কিন্তু তুমি তখন কোথায়!

আগেই বলেছি, শশাঙ্কর বুড়ি পিসিমা একধারে বসে বুঝি একমনে ভগবানকেই ডাকছিলেন। তাঁর সে আকুল প্রার্থনার সব কথা আমাদের কানে পৌঁছয় নি। শশাঙ্কর প্রাণে যেন কোনো দুঃখই নেই, কোনো আশা-আকাঙ্ক্ষাও নেই—তার মুখ দেখে আমার তাই মনে হ'ল।

আমার মুখে চোখে কি তখন অবিশ্বাসীর হাসি ফুটে উঠেছিল?—কেন-না, সঙ্গে সঙ্গেই সে তার ভীত কম্পিত হাতখানা আস্তে আস্তে আমার হাতে তুলে দিয়ে বিজড়িত স্বরে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা ভাই, সত্যি ভগবান আছেন?

আমি কি জবাব দিব? ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার কোনদিনই আস্থা ছিল না, ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু ভাবাও কোনদিন প্রয়োজন বলে মনে করি নি। কিন্তু তাই বলেই কি এখন আমি বলতে পারি যে, সত্যিই তিনি নেই? কিন্তু তবু আমার বার বার এই কথাই মনে হ'ল যে,হয় ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেহাতই অলীক, নেহাতই মানুষের মন-গড়া; দুর্ব্বল মানব জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে নিজেকে স্তোক দেবার জন্যে 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করে মাথা ঘামায়।...

আমার মতামতের যে তার কাছে তখন কি মূল্য তা আমার বেশ জানা ছিল। হয় ত সে মনে করেছিল যে, আমি অনেক পড়াশুনা করেছি, অনেক ভেবেছি, অভিজ্ঞতা আমার প্রচুর, আমি সম্ভবত তার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দিতে পারব, এই ভরসাতেই সে আমায় এ প্রশ্ন করল। কিন্তু আমি কোনরকম জবাবই দিলাম না কেন-না জবাব আমার মুখ দিয়ে বেরল না, কেমন একটা সঙ্কোচ এসে আমায় বাধা দিল।

আমায় নীরব থাকতে দেখে পিসিমার মুখে চোখে একটা তীব্র ঘৃণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, সে দৃষ্টি যেন আমায় বলছিল, দস্যু, আমার এই মরণপথযাত্রী পুত্রের শেষ বিশ্বাসটুকুও নষ্ট করলে!

শশাঙ্ক ব্যাকুলদৃষ্টিতে আমার দিকে চাইল, তার সেই আয়ত দৃষ্টির মধ্যে একটা আতঙ্কের ছায়া ঘনিয়ে এল। আমার জবাবের উপরই তার সব নির্ভর করছিল। যেই আমি জবাব দিতে যাব, ঠিক সেই মুহূর্ত্তে তার হাতে মৃত্যুর কম্পন যেন অনুভব করলাম। আর কিছু বলা হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গেই তার হিমশীতল হাতখানা অসাড় হয়ে তক্তপোষের পাশ দিয়ে ঝুলে পড়ল। পিসিমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। শশাঙ্কের বৃদ্ধ পিতা অপলক দৃষ্টিতে শশাঙ্কের মৃতদেহের দিকে চেয়ে রইল। ছোট ভাইটি তখনও জোড়হাতে শূন্যে তাকিয়ে বসে ছিল।

উঠে দাঁড়িয়ে টলতে টলতে দরজার সুমুখে গেলাম। তারপর কেমন করে যে সে বাড়ী থেকে চলে এসেছিলাম, আজ আর সে কথা মনে নেই। বাইরে তখন ভারি গরম—রৌদ্র খাঁ খাঁ করছিল, তারিণী মুদীর দোকানে তাদের সে বুড়ো সরকার তখন সবে কাশীদাসের মহাভারতখানা খুলে বসেছিল। কোনো রকমে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছুলাম। সারাক্ষণ আর ঘরের বার হইনি, দরজা-জানলা বন্ধ করে আচ্ছন্নের মত বসে রইলাম। এক এক সময় মনে হচ্ছিল,

শশাঙ্কের বুড়ি পিসিমা যেন বন্ধ ঘরের ফাঁক দিয়ে বার বার উঁকি মারছেন। তাঁর সে অগ্নিদৃষ্টি আমায় বার বার পুড়িয়ে দিতে লাগল। তারপর থেকে যতদিন তাঁরা এখানে ছিলেন আর কোনো দিন তাঁর মুখের দিকে তাকাতে পারি নি।

কিন্তু এসব করুণ কাহিনী ব'লে তোমায় দুঃখ দিচ্ছি মাত্র। আর এসব নয়। দু'একটা মজার কথা বলি। বলব না?—বেশ, যা বল। সত্যি বলতে কি, দুঃখের কাহিনী ছাড়া বলবার মত আমার জীবনে কিই-বা আছে। জীবনটাই আমার একটা বিরাট দুঃখের মহাভারত।

ওই শোন, গ্রামোফোন চলছে। কোনো দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, ভাবনা-চিন্তা নেই, বেশ আছেন। গ্রামোফোন আমি কিন্তু দু' চক্ষেও দেখতে পারি নে, গ্রামোফোনের স্বর আমায় জাগ্রত রাখে, উত্যক্ত করে, কিন্তু গৃহিণী দিনরাত লোকজন নিয়ে গ্রামোফোন বাজান। আমি কর্ম্মক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরে শোবার ঘরে বসে একদৃষ্টিতে শান্তির ছবিখানার দিকে চেয়ে থাকি! পাড়ার যত মেয়ে এসে গৃহিণীর সঙ্গে বসে জটলা করে, আমার অস্তিত্ব তাদের মনে কোনো উদ্বেগই এনে দেয় না।

ওই যে লোকটিকে দেখছ, ও তার কেমন সম্পর্কে দাদা নাকি। এ লোকটির আনাগোনা সম্প্রতি বড়ই হামেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সময় সময় ঘর ছেড়ে এই গাছটার নীচে এসে বসে থাকি। কতদিন যে এমনি নিঃসঙ্গ প্রবাস-জীবন যাপন করতে হবে কে জানে! শান্তি তাকে একদিনও ত মা বলে ডেকেছে, এই জন্যেই তাকে কিছু বলতে পারি নে হয় ত, কিন্তু তোমায় ব'লে রাখছি বিনোদ, যদি কোনদিন এখানে কাউকে খুন করা হয়েছে বলে শোন, আর সে খুনের সঙ্গে তোমার ডাক্তার-বন্ধুর নাম সংশ্লিষ্ট থাকে, তাহ'লে বিস্মিত হয়ো না, কেন-না বিস্মিত হবার তাতে কিছু নেই।

তুমি ভাবছ হয় ত, যে-লোক একটা পিঁপড়েকে মারতে ইতস্তত করে, সে কেমন করে একটা মানুষ খুন করবে, কেমন, তাই না? কিন্তু ভাই, আমি একেবারে বদলে গেছি—প্রতিদিনই বদলাচ্ছি। এক এক সময় হাসপাতালের রূপোর মত চকচকে অস্ত্রগুলির দিকে নিষ্পলক দৃষ্টিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাকিয়ে থাকি। এক একসময় হাসপাতাল থেকে বাড়ী আসবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে এসেও ফের অজানার আকর্ষণে হাসপাতালে ফিরে যাই এবং যে-ঘরে অস্ত্রগুলি থাকে সে ঘরের আলোটা জেলে অস্ত্রগুলির দিকে তাকিয়ে থাকি। অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কত-কি ভাবি। আমার কল্পনায় অস্ত্রগুলি যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। তারা যেন দন্তভরে আমায় ডাকে। আমি চোরের মত চুপি চুপি আলমারী খুলে অস্ত্রগুলি নাড়াচাড়া করি। অনুভব করি, একদিন আমায় খুনে হতেই হবে হয় ত।...

কে ডাকছে না আমায়?—সম্ভবত গৃহিণী। দেখি, কি হুকুম হয়। তুমি একটু বস ভাই, আমি এখুনি আসছি।...

বেশী দেরী হয় নি। গৃহিণীর সেই ভাই এসেছেন, তাকে খাওয়ান হবে—টাকা চাই। দিয়ে এলাম। কি বিনোদ, চোখ রাঙাচ্ছ যে! জানি তার হুকুম মেনে চলতে গিয়ে ভিক্ষুকেরও অধম হয়ে গেছি। আমার যেন অস্তিত্বই নেই। তাও বলি, রাগ করেই বা কি করব, কাকে তাড়াব? তাতে ত নিজেরই কলঙ্ক—লোকে হাসবে।

তুমি কি এখনই যেতে চাও নাকি? বেশ, যাবে যাও। মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিয়ো। এই ত ছোট্ট নদী, ওপারেই ত তোমার কর্ম্মক্ষেত্র। কত দিন এসেছ বদলি হয়ে?—পনর দিন?—তা হবে। এতদিন কাছে ছিলে না, তাই নিজেকে বড় একাকীই মনে হয়েছে। এখন মধ্যে মধ্যে তোমায় কাছে পেলে তবু মনে একটু সময়ের জন্যেও হয় ত শান্তি পাব। আজ যখন চলে যাবে, আমি তখন এখানে একাকী বসে বসে জীবনের পাতা উল্‌টিয়ে যাব—কত লোক এসেছে, কত লোক চলে গেছে—কত স্মৃতি বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে গেছে। ঘরের আলো তখন আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকবে—চোখ মুছে ধীরে ধীরে ঘরে ফিরব।

ওই তারা আবার গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। কি গান বাজছে ?—

তুমি যেয়ো না এখনি
এখনো আছে রজনী।

এ-কথা শোনাবার জন্যে গ্রামোফোন বাজাবার কোনোই দরকার ছিল না।

হাঁ, একটা জিনিষ তোমায় দেখাতে চাই। লাল নীল সবুজ কাগজ দিয়ে কতকগুলি ফুল তৈরী করছি—এগুলি আমার শান্তির জন্মদিনে উপহার দোবো—পরশু তার জন্মদিন। আসবে সেদিন ?……

কিন্তু, ওকি বিনোদ, দুহাতে মুখ ঢাকছ কেন ভাই ? তোমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে কেন ? কেন বন্ধু… কেন ?*

* এই গল্পের মূলগত ভাবটি একটি ফরাসী গল্প থেকে নেওয়া।

তারার মতন

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

মনে সাধ যায় মোর তারার মতন হয়ে থাকি,
সাঁঝে আসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
তপনের সাদাজরির চাদর তলে শুয়ে,
আকাশের নীল চাঁদোয়ার নীচে হ'তে নুয়ে,
সারা বেলা দেখি চেয়ে ধরণীর খেলা,
ঘরে ঘরে কত কাজ, গোধূলির বেলা
ধূপ দীপ জেলে নিয়ে ঘরে ঘরে চলা,
ছেলেদের কাছে নিয়ে রূপকথা বলা,
সকাল হতে-না-হতে পলায়ন এমনি সুদূরে,
খুঁজিলেও মিলিবে না ধরণীর কোনো অন্তঃপুরে!
কাজ নয় স্বপনের বুনি জালখানি,
বলার নূতন কথা খুঁজে পেতে আনি।

সাধ যায় মনে অমনি তারার মত হয়ে থাকি,
সাঁঝে হাসি, সারাদিন আপনারে লুকাইয়া রাখি,
চেয়ে দেখি ভালো করে দুই লোকে যাহা কিছু ঘটে,
আলোর মুখেতে শুনি, যাহা কিছু চিরদিন রটে,
ভালোমন্দ আলোকে ছায়ায় কাছে বহুদূরে,
সবার খবর রাখি, গানের সকলতর সুরে
প্রাণে পাই সাড়া, আর লয়ে তারি বাণী,
তোমাদের তরে আমি, মালা গেঁথে আনি,
ধরার চম্পক আর স্বর্গ পারিজাত,
মনের বাসরে মোর লভে একজাত,
স্বর্গ সুখ পাই যেন, ধরণীর প্রীতি না হারাই,
দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখি প্রাণ হতে প্রিয় তোমরাই,
সাধ যায় মনে অমনি তারার মত হয়ে থাকি,
স্মৃতিতে বিস্মৃতি নাই, স্বপ্নরাজ্যে খুলে যায় আঁখি।

ঢাকাই মসলিন

শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

এদেশের যে সকল শিল্প লোপ পাইয়াছে তাহার মধ্যে ঢাকার মসলিনের স্মৃতি সর্ব্বাপেক্ষা আধুনিক। অতি অল্প দিন—পঞ্চাশ বৎসর—পূর্ব্বেও এই বয়নশিল্পের প্রকৃষ্ট উদাহরণ এদেশের শিল্পীকে গৌরবান্বিত ও বিদেশীয়কে হতাশ করিত। অতি আধুনিক যুগে কলনির্ম্মিত স্বল্পমূল্য অনুকরণের ফলে ইহার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে।

ইহার ইতিহাস অতি প্রাচীন। সুদূর রোমে ইহা Ventus textilis বা Nebula নামে আদৃত ও বহুমূল্যে বিক্রীত হইত।* তাহারও বহুপূর্ব্বে এদেশের প্রাচীন পুস্তকে উহার উল্লেখ পাওয়া যায়। তখন কার্পাসবস্ত্রসকল মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও অতুলনীয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

ট্যাভরনীয়রের আমলেও (খৃঃ সপ্তদশ শতকের প্রথমার্দ্ধে) ইহা জগদ্‌বিখ্যাত ছিল এবং সর্ব্বত্র আদৃত হইত।† সে সময়ে পনের গজ লম্বা ও একগজ চওড়া সাধারণ মসলিনের ওজন হইত তিন বা চারি তোলা মাত্র।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ঐ মাপের শ্রেষ্ঠ মসলিন পাঁচ হইতে সাত তোলা ওজনের হইত। সে সময়ের দশগজ লম্বা এবং একগজ চওড়া উৎকৃষ্ট মসলিনের (মলমলখাস) টানায় ১০০০ হইতে ১৮০০ সংখ্যক সুতা থাকিত। ইহার ওজন হইত ১৪০০ হইতে ১৫০০ গ্রেণ অর্থাৎ চার হইতে পাঁচ তোলার মধ্যে।

বর্ত্তমান সময়ে সুতাকাটা ও বয়ন সম্বন্ধে দেশে পুনর্ব্বার চর্চ্চা আরম্ভ হইয়াছে, সেইজন্য এই শিল্পের খৃঃ উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে যে অবস্থা ছিল তাহার একটি বিবরণ দেওয়া গেল।‡

* Periplus, Schoff, 63. See notes.
† Tavernier's *Travels*. Ball's Edition Book II, Chap. II.
‡ Watson, *Textile Manufactures*.

মসলিন

মসলিন নানা প্রকারের ও তাহা বহু নামে পরিচিত। তন্মধ্যে সূক্ষ্ম, সাদা জমিন ও সাদা রঙের মসলিনের বিষয় এই স্থানে আলোচনা করা যাইতেছে।

এই মসলিনের বেশীর ভাগ ঢাকায় তৈরী হয় এবং ঐস্থানের মসলিনই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই কারণেই ভারতের যে সকল সূক্ষ্ম মসলিন আছে তাহা ঢাকাই মসলিন বলিয়াই আমরা নির্দ্দেশ করিয়া থাকি। ভারতের অন্যান্য স্থানেও সুশ্রী ও সূক্ষ্ম মসলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু ঢাকার তাঁতীরা এই সম্পর্কে অবিসম্বাদিরূপে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে। নিপুণতার দিক দিয়া এ পর্য্যন্ত ভারতের বা বিদেশের কোন তাঁতীই ইহাদিগকে হারাইতে পারে নাই। ঢাকার মসলিন হইলেই কেহ আর তাহা যাচাই করিতে যায় না। 'সান্ধ্যশিশির,' 'স্রোতের জল' ইত্যাদি চমকপ্রদ কবিত্বময় নামগুলিই লোকের মনে বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে।

টেকোয় সরু সুতাকাটা

টেলর সাহেবের মতে ঢাকাই মসলিনের পরিমাপ সচরাচর এক একখানা দৈর্ঘ্যে ২০ গজ এবং প্রস্থে এক গজ। টানার সুতার সংখ্যা পড়েনের সুতা অপেক্ষা অনেক বেশী। বিশ তোলা (এক পোয়া) ওজনের একখানা মসলিনে টানা এবং পড়েনের সুতার অনুপাত ১১:৯, বস্ত্রের দৈর্ঘ্য এবং ওজনের তুলনায় টানার সুতার সংখ্যা বিবেচনা করিয়াই মসলিনের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যেগুলির দৈর্ঘ্য যত বড়, টানার সুতার সংখ্যা যত বেশী এবং ওজন যত হাল্কা তাহার মূল্যই তত বেশী। চার পাঁচটি সুতা এক সঙ্গে পাকাইয়া তাহাতে গ্রন্থি দিয়া মসলিনের এক প্রান্তে ঝালরের মত কারুকার্য্য করা হয়। এই দিক দিয়া বিচার করিলে ঢাকাই মসলিন মিশর দেশের মমী বস্ত্রেরই কতকটা অনুরূপ। মমীবস্ত্রের দুই দিকেই কিন্তু শালের ন্যায়

ঝালর-যুক্ত আঁচলা দেওয়া থাকে। ঢাকার উৎকৃষ্ট সূক্ষ্ম মসলিন সকল সময়েই ফরমাশ মাফিক তৈরী হইত এবং প্রধানত ভারতীয় ধনী ও অভিজাত কুলের ব্যবহারের জন্যই বোনা হইত। মোগল রাজত্বের তুলনায় পরবর্ত্তী কালে মসলিনের চাহিদা খুব সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু যেটুকু আছে তাহাই এই শিল্পটিকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিয়াছে। ঢাকার সর্ব্বোৎকৃষ্ট মসলিন 'মলমলখাস' বা নবাবী মসলিন নামে অভিহিত হয়। ইহা সাধারণত দশ গজ দীর্ঘ ও এক গজ চওড়ায় আধখানা করিয়া তৈরী করে এবং এরূপ এক একখানা মসলিনে সাধারণত টানায় হাজার হইতে আঠার শত সুতা থাকে। 'স্রোতের জল' নামক মসলিন দ্বিতীয় শ্রেণীর।

টানা খাটানো

মসলিনের সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বোণ্টস্ সাহেব দুইটি গল্প বলিয়াছেন। তাঁহার একটি এই:—একদিন বাদশাহ আওরঙ্গজেব তাঁহার কন্যার নগ্নকান্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করেন। তাহাতে তরুণী বাদশাহজাদী প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনি মোটেই নগ্ন নহেন, সাত সাতটি জামা পরিধান করিয়া আছেন।

দ্বিতীয় গল্পটি এই:—নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময়ে একজন তাঁতী বিশেষ রূপে শাস্তি পাইয়াছিল এবং ঢাকা শহর হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহার অপরাধ—'আব্‌রয়ান' নামক একখণ্ড মসলিন সে ঘাসের উপর বিছাইয়া রাখিয়া ছিল, তাহা তাহার অসাবধানতায় সেখানেই পড়িয়া ছিল এবং তাহার গরু ঘাসের সঙ্গে তাহা গিলিয়া ফেলে।

'সাব্‌নাম্‌শিশির' নামে পরিচিত মসলিন তৃতীয় শ্রেণীর। তারপর 'সরকারালী,' তারপর 'তুণজেব'। জঙ্গলখাসা ও নয়নসুখও বেশ সুদৃশ্য মসলিন। ঢাকার অন্যান্য আরও যে সকল মসলিন আছে তাহা 'বুদ্ধুনখাস,' 'কুসীম,' 'ঝুনা' (ইহা বিশেষভাবে নর্ত্তকীদের দ্বারা ব্যবহৃত), 'রঙ্গ', 'আলাবল্লী', 'তুরনদম' (এই মসলিন এক সময়ে 'তারেন্দাম' নামে বিলাতে রপ্তানি করা হইত) প্রভৃতি...

এই সময়ে বিলাত ও ফ্রান্সে কলনির্ম্মিত মসলিন চালাইবার খুবই চেষ্টা হয়। কলওয়ালারা বলেন যে, তাঁহাদের মসলিন ঢাকাই মসলিন অপেক্ষা সূক্ষ্ম ও ঘন। এ বিষয়ে এদেশে গভর্ণমেণ্টের আদেশে ওয়াটসন্ সাহেব অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল নীচে দেওয়া গেল। ভারতীয় সুতা যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ তাহা ঐ পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছিল।

চারখানি মসলিন পছন্দ করা হয়, তাহার মধ্যে দুইখানা ইউরোপে আর দুইখানা ঢাকায় তৈরি। ইউরোপে তৈরি দুইখানার মধ্যে যেখানি অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট তাহা ১৮৫১ সালে, এবং অপরখানি ১৮৬২ সালে প্রদর্শিত হয়। ঢাকায় তৈয়ারী মসলিনের মধ্যে যেখানি সর্ব্বোৎকৃষ্ট সেখানি ১৮৬২ সালে প্রদর্শিত হয়, অপরখানি কলিকাতার যাদুঘর হইতে প্রদর্শিত হয়, সেখানি আরও সূক্ষ্ম।

ইউরোপে তৈরি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা অপেক্ষা ঢাকার তৈরি সুতার ব্যাস অনেক কম। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, ইউরোপে তৈরি প্রদর্শিত সূক্ষ্মবস্ত্রের ব্যাস যথাক্রমে '০০২২২ ও '০০২১৬৭ ইঞ্চি পাওয়া গিয়াছে, আর ভারতে প্রস্তুত কাপড়ের নমুনা যথাক্রমে '০০১৫২৬ ও '০০১৮৯৬ ইঞ্চি দেখা গিয়াছে। প্রথমদৃষ্টিতে লোকের মনে এই পার্থক্যটা বড় বেশী বলিয়া মনে না হইতে পারে, কিন্তু আসলে এই পার্থক্য যে উপেক্ষার যোগ্য নহে তাহা বলাই বাহুল্য, আর এই পার্থক্যটা ভারতবর্ষের বয়ন-শিল্পের বিশেষ নৈপুণ্যের ই পরিচায়ক।

সুতার ব্যাসের এই মাপ বাজারে বিক্রয়ার্থ মসলিন হইতেই লওয়া হইয়াছে। কিন্তু মাড় থাকার জন্য মাপের পার্থক্য হওয়া বিচিত্র নহে, এই কারণে সযত্নে প্রত্যেকখানা হইতে মাড় দূর করিয়া পুনর্ব্বার মাপা হইয়াছে।

নীচের তুলনামূলক তালিকা হইতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জানা যাইবে:—

		সুতার ব্যাস (এক ইঞ্চির অংশ)		
		সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	গড়পড়তা
ফরাসী মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	'০০৩২৫	'০০১৮৭৫
	২য় ,,	'০০১২৫	'০০২২৫	'০০১৯২৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৯
বিলাতী মসলিন (১৮৫১ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	'০০২৭৫	'০০১৮০
	২য় ,,	'০০১২৫	'০০২৫	'০০১৮০
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৮
ঢাকাই মসলিন (ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম)	১ম নমুনা	'০০০৭৫	'০০২	'০০১৩০
	২য় ,,	'০০১	'০০২৫	'০০১৩৭৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৩৩৭৫
ঢাকাই মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	'০০১	'০০২২৫	'০০১৫৫
	২য় ,,	'০০১	'০০২২৫	'০০১৫৭৫
	গড়পড়তা	—	—	'০০১৫৬২৫

ইহা হইতে পরিষ্কারই বুঝা যাইতেছে যে, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশদরূপে ও সম্পূর্ণরূপেই করা আবশ্যক। বস্ত্র-নির্ম্মাণের পূর্ব্বে ও পরে সুতার ব্যাসের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

কিন্তু ইহাও স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভারতীয় এবং

ইউরোপীয় সুতার প্রতিযোগিতায় ভারতীয় সুতাই উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রমাণিত হয়। আজ পর্য্যন্ত ইউরোপ যেরূপ সূক্ষ্ম সুতা তৈরি করিতে সক্ষম হইয়াছে, ভারতীয় সুতা তাহা অপেক্ষা অধিকতর সূক্ষ্ম। বয়নের উপযোগী করিতে গিয়া সুতা যেরূপ পাকাইতে হয় তাহাতে ঢাকাই মস্‌লিনের বিশেসত্বই প্রমাণিত হয়।

এ সম্পর্কে ইউরোপের তৈরি মসলিন ও ঢাকাই মসলিনে যে কি প্রভেদ তাহা নীচের তালিকা হইতে প্রমাণিত হইতেছে।—

		প্রতি ইঞ্চি সুতায় কতটা পাক দেওয়া হয়		
		সর্ব্বনিম্ন পরিমাণ	সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ	গড়পড়তা
ফরাসী মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	৩২	১৭২	৭৩·২
	২য় ,,	৪৬	১৬৬	৬৪·৪
	গড়পড়তা	—	—	৬৮·৮
বিলাতী মসলিন (১৮৫১ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	২৬	১১৪	৫৫·৬
	২য় ,,	২৮	১৪৬	৫৭·৬
	গড়পড়তা	·	—	৫৬·৬
ঢাকাই মসলিন (ইণ্ডিয়া মিউজিয়ম)	১ম নমুনা	৬৪	২৬০	১২১·৮
	২য় ,,	৪৬	১৯০	৯৮·৪
	গড়পড়তা	—	—	১১০·১
ঢাকাই মসলিন (১৮৬২ সালের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী)	১ম নমুনা	৪৮	১৯৬	৮২·৮
	২য় ,,	৩৮	১৪৪	৭৪·৬
	গড়পড়তা		—	৮০·৭

ইউরোপে প্রস্তুত মসলিন দুইখানার সম্পর্কে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক ইঞ্চি সুতায় গড়ে ৬৮·৮ এবং ৫৬·৬-টি পাক দেওয়া হইয়াছে; ইহার সঙ্গে তুলনায় ভারতীয় সুতায় ১১০·১ এবং ৮০·৭-টি পাক পড়িয়াছে। এই পার্থক্যের গুরুত্ব যে অত্যন্ত অধিক সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কলে-কাটা অপেক্ষা সুতা হাতে-কাটা সুতা যে বেশী মজবুৎ সে বিষয়ে কোনো মতভেদ নাই। আর ইহাও সকলেরই বিশেষরূপে জানা আছে যে, কলে-কাটা এই সব সূক্ষ্ম সুতার বস্ত্রাদি ব্যবহারের পক্ষে অযোগ্য। অথচ ভারতের হাতে-কাটা সূক্ষ্মতম সুতায় তৈরি বস্ত্র বিশেষ মজবুৎ এবং পুনঃ পুনঃ ধোলাই করিলেও খারাপ হয় না, কিন্তু বিলাতের অথবা ইউরোপের সূক্ষ্মতম মসলিন বেশী ধোলাই করিলে পরে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া যায়।

প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আমাদের (অর্থাৎ ইউরোপীয়) কারিগরদের যতই বড় বলিয়া জাহির করিতে চাহি না, তাহাদের এবিষয়ে এখনও অনেক শিখিবার আছে। ঢাকায় যেরূপ সূক্ষ্ম মজবুত মসলিন তৈরি করা সম্ভব হইয়াছে, আমাদের যন্ত্রপাতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মতরূপে তৈরি হওয়া সত্ত্বেও ঢাকার ন্যায় মসলিন তৈরি সম্ভব হয় নাই। ঢাকার যন্ত্রপাতি সেকেলে পুরনো হইলেও

নাটাইয়ে সুতা গুটানো

তাহা যে এরূপ সূক্ষ্মবস্ত্রবয়নের একান্ত উপযোগী সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

ওয়াটসন্ মসলিন প্রস্তুত করণের যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা এই :—

সুতাকাটা

যে সকল স্ত্রীলোক সুতা কাটে তাহারাই কাপাস (অর্থাৎ তুলা ও বিচি আলাদা করার পূর্ব্বাবস্থা) পরিষ্কার করে। গাছের পাতা, ডাটা ও বীজ-কোষ ইত্যাদি সযত্নে হাত দিয়া পরিষ্কার করে, তারপর বিচির গায়ে যে তুলা আঁটিয়া লাগিয়া থাকে তাহা বোয়ালমাছের চোয়াল (ইহা দেখিতে ঘন ও ক্ষুদ্র দাঁতওয়ালা চিরুণীর মত) দিয়া আঁচড়াইয়া লয়, তাহাতে তুলার আল্‌গা ও মোটা আঁশগুলি পিজিয়া মাটির টুকরা বা অন্যান্য অপরিষ্কার বস্তু দূর হয়। কাটুনিরা বেশীর ভাগই হিন্দু স্ত্রীলোক, তাহারা অক্লান্ত ধৈর্য্যের সঙ্গে বোয়াল মাছের চিরুণী দিয়া প্রত্যেকটি বিচি পরিষ্কার করে। পরিষ্কার করার কাজ শেষ হইলেই সে প্রত্যেকটি আঁশ হইতে বিচি বাহির করিয়া ফেলে। একখানা মসৃণ চালতা কাঠের তক্তার উপর আঁচড়ান-তুলা রাখিয়া লোহার একটা হুক্ দিয়া বিচি হইতে আঁশগুলি আল্‌গা করে। এই কাজ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে করিতে হয়, পাছে বিচি নষ্ট হয়। তারপর একটি ছোট ধুনুনি দিয়া তুলাগুলি ধুনিয়া ফেলে। তুলা বেশ তুলতুলে হইলে পরে একটা পুরু কাঠের বেলনে সেই তুলা পাট করা হয়, পরে বেলনটা সরাইয়া লইয়া দুইখানা তক্তা দিয়া তাহা চাপ দিতে হয়, তারপর সেই তুলা একটি ছোট্ট নলখাগড়ায় জড়াইয়া রাখা হয়। পরে সেই তুলা-

জড়ান নল কুঁচে-মাছের মসৃণ নরম চামড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখা হয়। কাজেই বাহিরের ধূলা বালি লাগিয়া তুলা নষ্ট হইবার কোনই সম্ভাবনা থাকে না, এবং সুতা কাটিবার সময়ও ময়লা হইতে পারে না।

ত্রিশ বৎসরের নীচে যে-সকল স্ত্রীলোকের বয়স তাহারাই সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা কাটিয়া থাকে। তাহাদের কাটনা যন্ত্রপাতি সবই ছোট চ্যাপটা বাক্সে রক্ষিত হয়। তাহাতে পুনি, টেকো, কাদামাটিতে প্রোথিত একটি ঝিনুক, চা-খড়ির গুঁড়ো ইত্যাদি থাকে। টেকো চালাইতে গিয়া ঘামে হাত ভিজিয়া উঠিলে চা-খড়ির গুঁড়া দিয়া আঙুলের ঘাম দূর করিয়া দেয়। টেকো গুণছুঁচ অপেক্ষা কিছু মোটা, ইহার দৈর্ঘ্য দশ ইঞ্চি

টানা গাথা

হইতে চৌদ্দ ইঞ্চি, এবং নীচের দিকে খানিকটা গোলাকার শুখনো মাটি লাগান থাকে, তাহাতে দুই আঙুলে টেকো ঘুরাইতে বেশ একটু ভার বোধ হয়। কাটুনি টেকো একটু আনত হইয়া ধরিয়া থাকে (১ম চিত্রে দ্রষ্টব্য) এবং টেকোর একদিক ঝিনুকের মধ্যে ও উপর দিকটা ডানহাতের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর চাপে ঘুরাইয়া থাকে, বাম হাতে তুলার পাঁজ হইতে সঙ্গে সঙ্গে সুতা বাহির করিয়া থাকে। খানিকটা সুতা হইলেই তাহা টেকোতে পাকাইয়া রাখে এবং বেশ খানিকটা সুতা টেকোতে জমা হইলে তাহা নলের কাঠিতে স্থানান্তরিত করে। শুষ্ক আবহাওয়ায় তুলার আঁশ হইতে খুব সরু ও লম্বা সুতা বাহির করা সম্ভব হয় না, কাজেই তাহা সূক্ষ্ম সুতা-কাটার পক্ষে বিশেষ প্রতিকূল। জলীয় হাওয়ার তাপ অন্তত ৮২ ডিগ্রী থাকিলেও এই কার্য্যের অনুকূল হয়। ঢাকার কাটুনিরা ঊষাকাল হইতে বেলা নয়টা দশটা পর্য্যন্ত এবং বৈকালে তিনটা চারটা হইতে সন্ধ্যার প্রাক্কাল পর্য্যন্ত এই কাজ করিয়া থাকে। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা কাটা রৌদ্র উঠিবার আগেই ভাল হয়। যদি দিনের অবস্থা এই কার্য্যের ঠিক অনুকূল না হয় তাহা হইলে একটা চ্যাপটা পাত্রে খানিকটা জল রাখিয়া তাহার মধ্যে ঝিনুকটি বসাইয়া সুতা কাটা চলে, কেন-না জল হইতে যে জলীয় বাষ্প উঠে তাহাতে কাজের সুবিধা হয়।

ঢাকার তাঁতীরা সুতা দেখিবামাত্র তার সূক্ষ্মতা ঠিক করিতে পারে। নলের মধ্যে কতটা সুতা পাকান আছে তাহা ঠিক করিবার তাহাদের কোনো তৌলদণ্ড নাই। সুতার শ্রেষ্ঠতা চোখ-চাহিয়াই ঠিক করে এবং দৈর্ঘ্য ঠিক করিতে হইলে খানিকটা খোলা জমিতে কিছু দূরে দূরে দুইটি কাঠি পুঁতিয়া তাহাতে সুতা মেলিয়া দিয়া স্থির করে। এই কার্য্যে বিশেষ সতর্কতা দরকার, সেইজন্য পাকা কাটানি কিংবা দক্ষ তাঁতী ছাড়া এ কার্য্য অপর কাহাকেও করিতে দেওয়া হয় না। সুতা মাপিতে এক হাত দুই হাত করিয়া গণনা করে এবং রতি দিয়া ওজন ঠিক করে। এক রতির ওজন, প্রায় দুই গ্রেণ। পূর্ব্বকালে যখন দিল্লীর বাদশার দরবারে মসলিন পাঠানো হইত তখন সেই মসলিনের দৈর্ঘ্য সাধারণত ছিল ১৫০ হাত লম্বা ও ওজন এক রতি; কিন্তু সময় সময় দৈর্ঘ্য কমবেশী হইয়া ১৪০ হাত হইতে ১৬০ হাত পর্য্যন্ত হইত। টানায় ১৪০ হাত আর পড়েনে ১৬০ হাত সুতা আবশ্যক হইত।

১৮০০ সালে ঢাকার তাঁত হইতে যে-সকল সর্ব্বোত্তম সুতা ব্যবহৃত হইত তাহা এক রতিতে ১৪০ হাতের বেশী হইত না। কেহ কেহ বলে, ঐ সময় সোনারগাঁয়ে এক-রতি ওজনের সুতা হইতে ১৭৫ হাত পর্য্যন্ত সুতা হইতে পারিত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ঢাকাতে ইহা অপেক্ষা সূক্ষ্মতর সুতা কাটা হইত। একজন তাঁতী আমার সম্মুখে ১৮৪৩ সালে একটা সুতার ফেটি মাপিয়া-ছিল, পরে খুব যত্নের সহিত তাহা ওজন করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এক পাউণ্ড সুতায় ২৫ মাইল দীর্ঘ সুতা হয়। ঢাকাই তুলার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তন্তু—যাহা হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতা পাওয়া যায়, তাহা হইতে কলে সুতা কাটা সুবিধা-জনক নহে। পক্ষান্তরে আমেরিকার তুলার আঁশ হইতে যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎকৃষ্ট সুতা কাটা সম্ভব; হিন্দু তাঁতীদের টেকোতে সেরূপ উৎকৃষ্ট সুতা বাহির করা সম্ভব হইবে না। ১৮১১ সালে ঢাকার তাঁতীদের বিদেশী গুটি বিতরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, কাটুনিরা তাহা হইতে সুতা বাহির করিতে পারে নাই; তাহারা বলিয়াছে যে, দেশী তাঁতে এই সুতা দিয়া কাপড় বোনা অসম্ভব।

ঢাকাই সুতা mule twist অপেক্ষা ঢের নরম এবং আমার বিশ্বাস ইহা দ্বারা যে সুতা তৈরি হয় তাহা কলে-কাটা সুতা অপেক্ষা ঢের বেশী মজবুৎ। যে-সকল আঁশ জলীয় হাওয়াতে স্ফীত হয় তাহাই নাকি তাঁতীদের মতে উৎকৃষ্ট তুলা। ধোলাই করিলে যে তুলা যত কম ফাঁপিয়া উঠে তাহা তাঁতীদের মতে উৎকৃষ্ট

বলিয়া গণ্য, অন্তত তাহা হইতে যে সূক্ষ্ম সুতা কাটা যাইবে ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা বলে, বিলাতী সুতা ধোলাই করিলে ফাঁপিয়া উঠে, পক্ষান্তরে ঢাকাই সুতা সঙ্কুচিত হয়, এই কারণে ঢাকাই কাপড় বেশী মজবুৎ হয়।

একজন কাটনি প্রতিদিন সারা সকাল বেলা টেকো কাটিলে একমাসে প্রায় আধা তোলা (৯০ গ্রেণ) সুতা কাটিতে পারে। ইহা অপেক্ষা বেশী কেহ কাটিতে পারে না, কিন্তু বর্ত্তমানে এই কাজটা অবসর সময়ে করার জন্য সারা মাসে ৪৫ গ্রেণের বেশী সূক্ষ্ম সুতা কাটা সম্ভব হয় না। কেন-না ইহা এখন একমাত্র ব্যবসায়রূপে কেহই গ্রহণ করে না। সূক্ষ্ম সুতা স্যাকরার তুলাদণ্ডে কুঁচ দিয়া মাপা হয়। এক একটি কুঁচের ওজন এক রতি। সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঢাকাই সুতা প্রত্যেক তোলার (১৮০ গ্রেণ) মূল্য আট টাকা মাত্র।

কাপড় বুনিতে কোন্ কোন্ ধারা পর পর অবলম্বন করা হয় তাহাদের নাম যথাক্রমে এই:—তুলা পেঁজা ও সুতা কাটা; সুতা পাকান; টানাতে নলের প্রয়োগ; তাঁতের প্রান্তে টানার প্রয়োগ; বয়নতন্ত্র বা সুতা, যাহাতে টানা-সুতা ফাঁক করিয়া মাকু যাতায়াতের পথ খোলসা করা হয়, তাহা প্রস্তুত করা; সর্ব্বশেষ বুনন।

সুতা নাটাই করা ও নলি ভরা

তাঁতীর নিকট সুতা দিলে সে ঐ সুতা ছোট ছোট নলিতে জড়ায়, অথবা ছোট ছোট ফেটি করিয়া লয়। তারপর সেই নলিভরা বা ফেটি করা সুতা জলে ভিজাইয়া রাখে। অতঃপর ৩নং চিত্রে যেরূপ আছে সেরূপে সুতা নাটাই করা হয়। নলির ছিদ্র দিয়া একটা কাঠি ঢুকাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই কাঠি একখণ্ড বাঁশের এক প্রান্ত চিরিয়া তাহাতে আটকাইয়া দেওয়া হয়। তাঁতী ঐ বাঁশ বাঁ-পায়ের আঙুলে আটকাইয়া ধরে এবং কাঠির উপর ঘূর্ণায়মান নলি হইতে সুতা বাহির করিয়া উহা নাটাইতে গুটাইয়া লয়। একটি নারকেলের মালার বাটীতে নাটাই ঘুরাইয়া সুতা গুটাইয়া লয়। এইরূপে সুতা ফেটি বাঁধা হইয়া গেলে বাঁশ এবং সুতা দিয়া তৈরি চরকীতে পরাইয়া দেওয়া হয়। এই চরকী একটা বাঁশের কালি বা কঞ্চির এক প্রান্তে বসাইয়া তাহা হইতে সুতা বাহির করিয়া লওয়া হয়।

সুতা দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা যথেষ্ট পরিমাণে পড়েনের জন্য রাখা হয় এবং অবশিষ্ট অংশ টানার জন্য ব্যবহৃত হয়। টানার সুতা তিনদিন জলে ভিজাইয়া রাখা হয় এবং ঐ জল দিনে দুইবার করিয়া বদলাইয়া দিতে হয়। চতুর্থ দিনে জল হইতে উঠাইয়া ফেটিগুলি হইতে জল ঝরাইয়া চরকীর উপর লওয়া হয় এবং তাহা হইতে পুনরায় উপরের লিখিত প্রণালীতে নাটাই করা হয়। সুবিধামত আকারের ফেটি তৈয়ারী করিয়া তাহা পুনরায় জলে ভিজান হয় এবং দুইটি কাঠির মধ্যে শক্ত করিয়া পাকান হয়। তারপর উহা ঐ কাঠিতেই রৌদ্রের তাপে রাখিয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সেগুলির পাক খুলিয়া লইয়া কাঠকয়লার গুঁড়া, প্রদীপের কালী, অথবা রান্নার হাঁড়ির কালী জলের সঙ্গে মিশাইয়া তাহাতে ঐ সুতা ভিজান হয়। এই কালীমিশ্রিত জলে দুইদিন ভিজাইয়া লইয়া তারপর পরিষ্কার জলে উত্তম করিয়া ধুইয়া লইতে হয় এবং জল নিঙড়াইয়া শুখাইবার জন্য ছায়ায় ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। প্রত্যেকটি ফেটি পুনরায় নাটাই করিয়া লইয়া একরাত্রির জন্য ভিজাইয়া রাখা হয় এবং পরদিন জল হইতে তুলিয়া একখানা তক্তার উপর বিছাইয়া রাখা হয়। পরে হাত দিয়া ডলিয়া, খইয়ের মণ্ড ও অল্প পরিমাণে পরিশোধিত চূণের জল দিয়া আছড়াইয়া লইতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলা যাইতে পারে যে, অতি প্রাচীনকাল হইতে বয়নকার্য্যে ব্যবহৃত মাড়-হিসাবে ভাতের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মাড় দেওয়া সুতার ফেটিগুলিকে তারপর নাটাইয়ে গুটাইয়া লইয়া রৌদ্রতাপে দেওয়া হয় এবং শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া
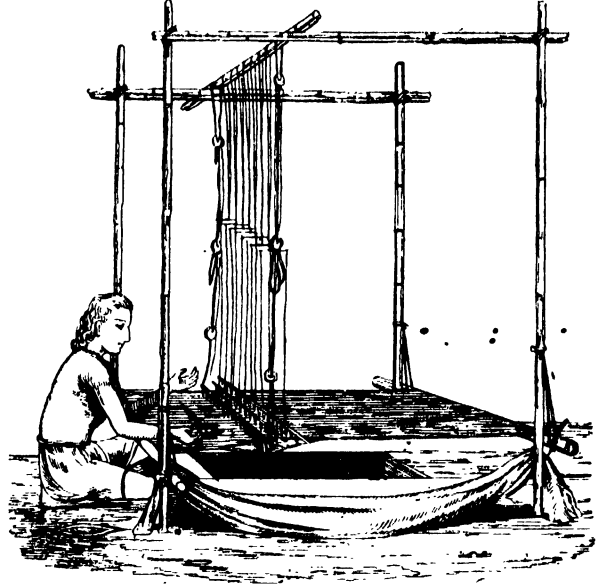
তাঁত বোনা

যাইবার জন্য নাটাইয়ের উপরেই ফেটিগুলিকে চওড়া করিয়া মেলিয়া দেওয়া হয়। পুনরায় ঐগুলিকে নাটাই করিতে হয় এবং টানা দিবার জন্য সুতা বাছিয়া লওয়া হয়। টানার সুতা তিনভাগে বিভক্ত হয়। টানার ডানদিকের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম সুতা বাছিয়া রাখা হয়। তারপর বাছিয়া যে সূক্ষ্ম সুতা পাওয়া যায় তাহা টানার বামদিকের জন্য লওয়া হয়। মোটা সুতা মাঝখানের কাজে লাগে।

পড়েনের সুতা বয়ন আরম্ভ করিবার দুইদিন আগে তৈরি করিয়া রাখা হয়। একদিনের কাজের উপযোগী সুতা চব্বিশ ঘণ্টা জলে ভিজাইয়া রাখা হয়। তার পরদিন উত্তমরূপে ধুইয়া লইয়া বড় নাটাইয়ে গুটানো হয় এবং টানার সুতায় যে মাড় দেওয়া হয় ঐরূপ মাড়ই অল্পমাত্রায় উহাতে দেওয়া হয়। ছোট নাটাই হইতে বড় নাটাইয়ে গুটাইয়া এগুলিকে ছায়ায় শুকাইতে দেওয়া হয়। বস্ত্রবয়ন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত পড়েনের সুতা এই প্রণালীতে রোজই তৈরি করিয়া লইতে হয়।

তাঁত ও বয়ন-প্রণালী

ভারতীয় তাঁতগুলি ভূমির সহিত সমতল করিয়া বসানো হইয়া থাকে। এই সকল তাঁত দেখিতে অনেকটা মিশরীয় তাঁতেরই অনুরূপ। তাঁতের চারিকোণে চারিটি বাঁশের খুঁটি শক্ত করিয়া মাটিতে পোঁতা হয় এবং পাশ ঘিরিয়া খুঁটির মাথায় বাঁশ বাঁধিয়া

যোগ করিয়া দেওয়া হয়। লম্বালম্বিভাবে পাশে বাঁধা বাঁশের উপর একটা আড়বাঁশ বাঁধা থাকে; তাহাতে 'দফ্‌তি' বা 'ব্যাটন' এবং 'ব-কাঠি' ঝুলাইয়া দেওয়া হয়। দফতি দুইখানা চওড়া কাঠ দিয়া তৈরি। কাঠ দুইখানার ভিতর দিকে একটু খাঁজ কাটা থাকে; সেই খাঁজে শানা বসাইয়া কাঠ দুইখানাকে 'খিল' দিয়া আটকাইয়া দেওয়া হয়।
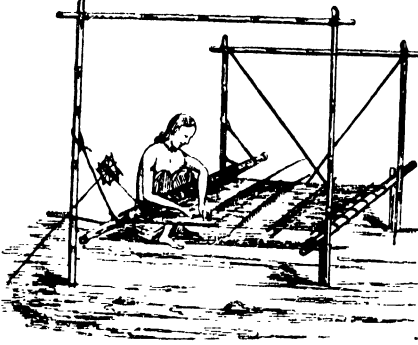
তাঁত বোনা

যে দড়ি দিয়া দফতি আড় বাঁশে ঝুলানো থাকে তাহাতে জায়গায় জায়গায় এমনভাবে কতকগুলি আংটি বসানো থাকে যে, ইচ্ছামত দড়িটাকে লম্বা অথবা খাট করা যায়, এবং তাহাতে দফতির দোলনকে নিয়ন্ত্রিত করা হয়, এবং বস্ত্রের জমিনের সূক্ষ্মতা ও স্থূলতা এবং ঠাশ বুনন ও হালকা বুনন অনুযায়ী এই দোলন নিয়ন্ত্রিত করা আবশ্যক, 'ব-কাঠিও' দফতির ন্যায়ই আড়-বাঁশে ঝুলানো থাকে। এই দোলন নিয়ন্ত্রণে অত্যন্ত নিপুণতার আবশ্যক। তাঁতের পা-দানি বাঁশের তৈরি। আনুমানিক দুই হাত লম্বা, পৌনে দুই হাত চওড়া এবং এক হাত গভীর গর্ত্তে এই পা-দানি ঝুলানো থাকে, এবং সেই গর্ত্তের ভিতর পা-দানিতে পা রাখিয়া তাঁতীরা তাঁত চালাইয়া থাকে। মাকুগুলি হালকা সুপারী কাঠের তৈরি (বর্ত্তমানে এগুলি কাঠ দিয়াও তৈরি হয়, কোন কোন স্থানে লোহার মাকুরও চলন আছে)। মাকুর দুই প্রান্ত বর্শার ফলকের ন্যায় চোখা এবং তাহা লোহার পাত দিয়া মোড়া থাকে। মাকুগুলি সাধারণত দশ হইতে চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা, তিন পোয়া ইঞ্চি চওড়া হয় এবং তার ওজন প্রায় এক ছটাক। মাকুর মাঝের খানিকটা স্থান ক্ষোদিয়া লইয়া তাহার ভিতর দিয়া একটি লোহার অত্যন্ত সরু শিক্ (শলা) বসানো থাকে, এই শলাটি আপনা হইতেই ঘুরিয়া থাকে, ইহার উপরই পড়েনের সুতার নলি গাঁথিয়া দেওয়া হয়। ফলে পড়েনের মুখে মাকুর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে যাওয়া-আসার সময় নলিও ঘুরিতে থাকে এবং মাকুর পেটের দিকে যে সরু ছিদ্র থাকে তাহা দিয়া পড়েনের সুতা অতি সহজেই বাহির হইয়া আসে। বুননের মুখে বস্ত্র তাঁতের উপর মেলিয়া রাখিবার জন্য ধনুকের মত বাঁশের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

বয়নকারী গর্ত্তের ভিতর পা দুইখানি পা-দানিতে রাখিয়া গর্ত্তের মুখে বসে, যে গোলাকার কাঠখণ্ডে বোনা বস্ত্র জড়াইয়া রাখে তাহা তাহার কোলের উপর আড়ভাবে থাকে। পা-দানির পরিচালনায় ব-বাঁধা সুতার উঠা-নামায় যে জালি উঠে তাহার মধ্য দিয়া তাঁতী এক হাত হইতে অন্য হাতের ঈষৎ আন্দোলনে মাকু ছুঁড়িয়া দেয় এবং দফতির আঘাতে সুতা ঠাসিয়া দেওয়া হয়।

এই প্রকার বয়ননৈপুণ্যে হিন্দু তাঁতীরা অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বাংলার অপরাপর যন্ত্রশিল্পীর ন্যায় ঢাকার তাঁতীদের দেহের গড়ন ছিপ্‌ছিপে ও কোমল। তাহাদের দৈহিক শক্তি ও উদ্দমের কিঞ্চিৎ অভাব পরিলক্ষিত হইলেও অপর পক্ষে তাহারা সূক্ষ্ম স্পর্শজ্ঞান ও ওজন সম্পর্কে সূক্ষ্মানুভূতিসম্পন্ন; শুধু তাহাই নহে, দেহপেশীর পরিচালনে তাহাদের যে অসামান্য ক্ষমতা আছে তাহার ফলে হাতের আঙুলের সঙ্গে পায়ের আঙুল ঠিক সমান তালে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐতিহাসিক অর্ম্মে ইহাদের সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, ইহারা যে-সকল যন্ত্রপাতির সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়ন করিতে পারে, ঐ সকল যন্ত্রপাতির দ্বারা ইউরোপীয় তাঁতীরা তাহাদের শক্ত ও স্থূল অঙ্গুলীর সাহায্যে মোটা চটও বয়ন করিতে কদাচিৎ সক্ষম হয়।
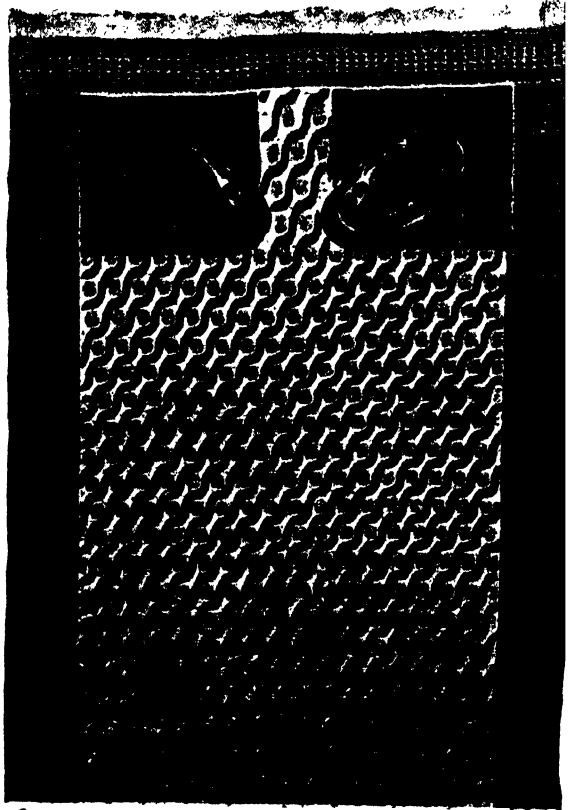
ঢাকাই মসলিন

বয়নকালে টানার সুতায় যাহাতে কম ঘর্ষণ লাগে, সেইজন্য মাকু, শানা ও দফতিতে সময় সময় তেল দেওয়া দরকার। গ্রীষ্মের তাপে টানার সুতা যাহাতে শুকাইয়া ভঙ্গুর অবস্থা প্রাপ্ত না হয় সেইজন্য নলখাগড়ার আঁশে তৈরী বুরুস দিয়া মাঝে মাঝে সুতায় সরিষার তেল মাখাইয়া দিতে হয়। দশ বার ইঞ্চি কাপড় বোনা হইয়া গেলে কাপড়-গুটানি গোলাকার কাঠে তাহা জড়াইয়া রাখিবার পূর্ব্বে তাহাতে চূণের জল ছিটাইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে কাপড় পোকায় নষ্ট করিতে পারে না। জলীয় হাওয়ার তাপ যখন ৮২ ডিগ্রী হয় তখন মসলিন-বয়ন সম্ভব হয়, তাহার বেশী তাপে কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। দুপুরে যখন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ চারিদিক ঝলসাইয়া দেয় তখন বয়নের কাজ সম্ভব হয় না। এই জন্য তাঁতীরা সকালে ও বিকালে বয়নকার্য্য চালাইয়া থাকে। আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র বয়নের পক্ষে বিশেষ উপযোগী সময়। অত্যন্ত গরমের দিনে বয়নকালে টানার সুতার নীচে অগভীর পাত্রে জল রাখার প্রয়োজন হয়। সেই জল হইতে জলীয় বাপ উঠিয়া সুতাগুলিকে আর্দ্র করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে বয়নকালে সুতা ছিঁড়িয়া যায় না। সম্ভবত এই প্রক্রিয়াই ঢাকাই মসলিন যে কখন কখন জলের ভিতর বয়ন করা হয়, এই ভ্রান্ত ধারণা লোকের মনে জাগাইয়া দিয়াছে। বস্ত্রের সূক্ষ্মতা ও দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে এবং শিল্পীর নিপুণতার ইতরবিশেষে বস্ত্র-বয়নে সময়েরও তারতম্য হইয়া থাকে। সাধারণ বস্ত্র বয়নে দশ হইতে পনের, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কুড়ি, তার চাইতেও উৎকৃষ্ট ত্রিশ, এবং তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট চল্লিশ হইতে পঁয়তাল্লিশ এবং উহা যদি খুব সূক্ষ্ম চারখানা বা ডুরীয়া রকমের হয় তাহা হইলে দুইজন লোকের ষাট দিন সময় লাগে। একজন বয়ন করে, অপর জন জোগান দেয়। আধখানা 'মলমলখাস' অথবা 'সরকারালী সূক্ষ্ম বস্ত্র'—যাহার মূল্য ষাট হইতে আশী টাকা পর্য্যন্ত—বয়ন করিতে অন্যূন পাঁচ ছয় মাস লাগে। কিন্তু দুই টাকা মূল্যের পরা একখানা 'নারায়ণপুর জাহাজী মসলিন,' বয়ন করা আট দিনেই সম্ভব।

উপরিউক্ত বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, এদেশের ছোট আঁশের তূলায়, অতি সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে এদেশের শিল্পী তাহার স্বভাবজাত কৌশলে জগতে অতুলনীয় বস্ত্র উৎপাদন করিত এবং ইহাও মনে হয় যে, পূর্ব্বের মত আদর পাইলে হয়ত কিছুকালের মধ্যে এই লুপ্তশিল্পের উদ্ধার সম্ভবপর হইতে পারে।

রঙ্গিণী

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১

- তাঁর মত শান্ত লোক পৃথিবীতে অন্য আর একজন ছিল কি না সন্দেহ!

—কার কথা বল্‌চেন?

—সে পরে বলব, ব'লে হেমপ্রভা একটু রহস্যের হাসি হাস্‌লেন।

এই কথায় আমাদের মন যেন সেদিকে একদম ঝুঁকে পড়ল।

উনি যখন গল্প বলেন, তখন একটি কথাও বানিয়ে বলেন না। উনি বলেন-এ জগতে সত্য এত বিস্তৃত এবং বহুল, এত তার বৈচিত্র্য যে, সত্যের অন্বেষণ করলেই মানুষের যথেষ্ট হয়; কল্পনার কোনো প্রয়োজন ত দেখিনে।

এই কথা শুনে রেবা প্রায় ক্ষেপে উঠ্‌ত, সে বল্‌ত, যান না উনি, গিয়ে বলুন ত একবার কবির সাম্‌নে, ওই কথা, বোলপুরে? মুখের মত জবাব শুনে ফিরে আসতে হবে! নিশ্চয় বলে দিচ্চি!

রেবা কবিতা লিখ্‌ত; আর এমন ছবিখানির মত সেজে থাক্‌তো, দেখলে মনে হয় পটে-আঁকা সরস্বতী ঠাকুরটি! কিন্তু রেবার বয়স ছিল কম; সবে এসে কলেজে ঢুকেচে।

আর হেমপ্রভা! বাবা! দুটো ফার্ষ্ট ক্লাশ এম্-এ! আর একটা দিলেই হয়!

কিন্তু সাধ্য কি তাঁকে কেউ দিদি বলে! তিনি বলেন, দাদা, দিদি, মাসী, পিসী,—যে দাদা, যে দিদি তাদেরই বল্‌তে হয়; পাতিয়ে দাদা-দিদি বাড়ালে কেবল

নিজের দুঃখকে বাড়িয়ে তুলতে হয়। কিসের দিদি আমি তোমাদের? আমি সকলের কাছেই হেমপ্রভা, খবরদার বলচি - দিদি বলবে না।

এ ধমকের মধ্যে রহস্যই বেশী, তবুও আমাদের কেমন ভয় ক'রে উঠ্‌ত।

হেমপ্রভার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধটা ধূপছায়া কাপড়ের মত ছিল। সবটাই বন্ধুত্ব আর প্রীতি, কিন্তু সেই নীলের আভার মধ্যে যেন কোথা দিয়ে লাল চম্‌কে যায়, কোথায় যেন একটু ভয়!

হেমপ্রভা বল্‌লেন, এই শান্ত মানুষটি কিন্তু একতিলের জন্যে শান্তি পেতেন না। তাঁর অপরাধ ছিল যে, তিনি একজন ডাক্তার ছিলেন। অম্বুডাক্তারের নাম করতে লোকের মুখ থেকে যেন নাল গড়িয়ে পড়ত। সাক্ষাৎ শিব। যাকে মনে করবেন যে বাঁচাব, তাকে যমরাজা আর মিছে টানাটানি করত না।

এ কথা সত্যি?

হেমপ্রভা হাসেন, বলেন, তাঁকে সেবা করার সৌভাগ্য আমার কিছুদিন হয়েছিল, তিনি যখন গিয়ে কাশীতে ছিলেন,—তেমন মানুষ আর জীবনে দেখ্‌ব বলে মনে হয় না।

হেমপ্রভার গলা হঠাৎ যেন ভারী হ'য়ে গেল। চোখ দিয়ে জল ফেলার দুর্ব্বলতা তাঁর বোধ হয় ছিল না।

অম্বুডাক্তার তখন কাশীতে। বড়োদার রাজার ছেলের অসুখ। তাঁকে ধরে টানাটানি। এদিকে রাজবাড়ীতে দেশ-বিদেশের ডাক্তারদের গাঁদি লেগে গেছে! কেউ স্যর, কেউ এম-ডি। কিন্তু ছেলের জর এক পয়েণ্টও নামে না! একশো-পাচে উঠে জর যেন বসে আছে পাথরের মত!

শেষকালে যেতে হ'ল অম্বুডাক্তারকে। গাইকোয়াড় নিজে এলেন।

ডাক্তারবাবু বল্‌লেন, সব ওষুধ বন্ধ করে দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টা ওষুধ বন্ধের পর আমি একটা শিরুয়া দেব, তাতেই জর ছাড়বে।

সায়েব ডাক্তার তর্জ্জন করে বল্‌লেন, আর যদি না ছাড়ে? এ জীবনের জন্য কে দায়ী হবে?

অম্বুডাক্তার বল্‌লেন, সে দায়িত্ব কি এখন আপনার হাতে আছে? যদি তাই থাকে ত আমি হাত দিতে চাইনে।...ডাক্তার সর্ব্বান্তঃকরণে চেষ্টা করে, তার বেশী সে কি করতে পারে?

কথা শুনে সায়েবের চোখ-মুখ রাঙা হ'য়ে গেল। দেশী লোকের এতবড় স্পর্দ্ধা!

অম্বুডাক্তার উঠে ধীরে ধীরে নিজের গাড়িখানিতে বসলেন।

সমস্ত কাশীময় একটা ঢি-ঢি পড়ে গেল। অম্বুডাক্তারকে অপমান! এ অপরাধ বিশ্বেশ্বর সইবেন না।

বেণীমাধব থেকে কেদারনাথ পর্য্যন্ত সমস্বরে সবাই যেন প্রতিবাদ করতে লাগ্‌ল। দশাশ্বমেধের চাতালের উপর সেদিন হাতাহাতি হ'য়ে গেল।

কিন্তু যাদের অম্বুডাক্তারকে প্রতি মুহূর্ত্তে দেখার সুবিধা ছিল, তারা বুঝলে যে, এই ঘটনায় তিনি একটুও বিচলিত হননি। ডাক্তারের চিক্কণ, মসৃণ মনটির উপর একটি আঁচড়ও পড়েনি। লোকে বল্‌লে বলতেন, উঃ ওদের দায়িত্বজ্ঞান? নিশ্চয়, আমাদের চেয়ে সহস্র গুণ বেশী ঠিকই বলেছেন ডাক্তার মর্গান্‌।

দুদিন কেটে গেল। তিন দিনের দিন গাইকোয়াড় নিজে ডাক্তার মর্গানকে সঙ্গে করে এসে উপস্থিত, সেই ছোট্ট বাড়িটিতে! অম্বুডাক্তার তখন গেছেন গঙ্গাস্নান করতে।

নামাবলী গায়ে, খালি পায়ে তিনি যখন ফিরে এলেন, তখন ডাক্তার মর্গানের আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। তিনি হেসে রাজাকে বল্‌লেন, এ কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই সম্ভব, অন্য দেশ হ'লে, এই লোকটাকে কখনও কেউ আমল দিত না।

গাইকোয়াড় বললেন, ডাক্তার, তোমার বোধ হয় অনধিকারচর্চ্চা হচ্চে, আমি বাইবেলের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্চি তোমাকে, জজ নট্‌—মানুষকে এমন ক'রে অবিচার করো না। তুমি ভারতবর্ষের কিছুই জান না, তার ধর্ম্ম-কর্ম্মের প্রতি তোমার পরিহাস, তোমার নিষ্ঠুর কটাক্ষ আমাদের বড় আঘাত করে।

ডাক্তার মর্গান উত্তরে বললেন, কিন্তু হীন জাতকে

তাদের ত্রুটি দেখিয়ে দেওয়া আমি অন্যতম কর্ত্তব্য মনে করি।

কোনো কথা না ব'লে, গায়কোয়াড় গাড়ি থেকে নেমে চালককে বললেন, তুমি সায়েবকে পৌছে দাও। তারপর আমাকে নিয়ে যেও।

শুনেছি সেইদিনই মর্গান একটা প্রকাণ্ড টাকার থলে ভর্ত্তি করে বিদায় নিয়েছিলেন।

অম্বু ডাক্তার গিয়ে পরীক্ষা ক'রে সেই একই কথা বললেন, চব্বিশ ঘণ্টা ওষুধ বন্ধ রাখতে হবে, তারপর যা-হয় আমি করতে পারি।

—কিন্তু ডাক্তারবাবু, আপনার এই কাজের যুক্তিটা কি, তা কি আমরা জান্‌তে পারিনে।

অম্বু ডাক্তার হেসে বললেন, একশো বার। যুক্তি খুব সোজা, মহারাজ, আপনার ছেলের জ্বর এখন অতিরিক্ত ওষুধ খেয়ে হয়েছে। ওষুধ বন্ধ করলে তবে ওঁর আসল অসুখটা বুঝতে পারা যাবে। সেটা বোঝার অবসর আমাকে দিতে হবে আপনাদের।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জ্বর ছাড়িয়ে দিয়ে অম্বু ডাক্তার বাড়ী ফিরে এলেন।

তখন গাইকোয়াড় তাঁকে কত টাকাকড়ি দিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যেতে চাইলেন।

অম্বু ডাক্তারের সেই একই উত্তর, আমি কাশী ছেড়ে কোথাও যাব না, মহারাজ!

২

হেমপ্রভা হেসে বললেন, কিন্তু যারা অম্বু ডাক্তারকে এইটুকু জেনেছে, তারা রত্ন ছেড়ে তীরের উপলখণ্ডকে রত্ন বলে ভুল করেছে। এটি ওঁর চরিত্রের বাইরের খোলার মত। ওঁর অন্তর ছিল কত বড়, কত সুন্দর, কত মহান্—তা ভাষায় প্রকাশ করা শক্ত।

হেমপ্রভা চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর দু'চোখ দিয়ে একটা আনন্দের আলো বার হ'তে লাগলো; মনে হ'ল তিনি চোখে স্বর্গের ছবি দেখছেন যেন।

অধীর হ'য়ে আমরা বলি, না তারপর বলুন, থামবেন না।

হঠাৎ তাঁর যেন একটা চট্‌কা ভাঙল, বল্‌লেন, বলব বই কি, তাঁর কথা বললেও হৃদয় মন শুদ্ধ হয়।

হেমপ্রভা আবার বলতে সুরু করলেন—অম্বু ডাক্তারের মনের যেন দুটো পরিষ্কার ভাগ ছিল; যেমন দিন রাত, যেমন মাসের শুক্ল পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষ।

চিন্তায় তাঁর এতটুকু গতানুগতিকতা ছিল না। প্রত্যেকটি কথা নিজে নূতন করে ভেবে দেখতেন। সকলের চিন্তাকে, সকলের মতামতকে, যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতেন। তিনি বলতেন, অন্যের মত আমাদের চলার পথ রোধ করে না, চলার পথে তা আলো দেয়, আমাদের চলার সাহায্য করে। নিজের মতকে অন্যের উপর চালাবার অধৈর্য্য যেন তাঁর ছিলই না। আবার পরের মতকে ঘাড়ে করে অন্ধের মত ছুটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়াকেও তিনি নির্বুদ্ধিতাই মনে করতেন।

সবচেয়ে বড় জিনিয তাঁর ছিল, অপক্ষপাত সুবিবেচনা আর মানুষের উপর সুন্দর বিচারটুকু। সে যে কত সুন্দর সংযত শান্ত, তা বর্ণনা করা যায় না।

এমন একজন লোকের জীবনের পথ খুব সহজ ছিল, এ অনুমান করে নেওয়া স্বাভাবিক হতে পারে। কিন্তু তা মোটেই সত্য নয়। জীবনে তাঁকে নিত্য-নিত্য কত যে পরীক্ষা দিতে হয়েছে, তার ঠিক ঠিকানা নেই।

চল্লিশের আগেই তাঁর পত্নীর বিয়োগ ঘটে। দুটি ছেলে নিয়ে অম্বু ডাক্তার সংসারে ভাস্‌লেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সবাই বল্‌লে, আর একটা বিয়ে কর। কিন্তু তিনি স্নিগ্ধমধুর হেসে বলতেন, তা কি হয়?

কেন হয় না? সবাই ত করছে?

অম্বু ডাক্তার কথা কইতেন না, চুপ ক'রে মৃদু-মধুর হাস্‌তেন।

অযৌক্তিক কথার নিরুত্তরে যে কত গভীর, অমোঘ উত্তর দেওয়া চলে, তা তাঁর কাছ থেকেই শিখ্‌তে হয়।

কিন্তু দুই ছেলেকে ত মানুষ করে তুলতে হবে? তিনি ধীরে ধীরে ডাক্তারীর সময়টা এই কাজে দিতে লাগ্‌লেন। কিন্তু তাতেও বিপদ ঘটল, ছোট ছেলেটির মার দুধের অভাবে লিভার খারাপ হ'ল। তাকে নিয়ে তিনি বিষম সঙ্কটে পড়ে গেলেন।

এ সংসারের মজা এই যে, বিপদের পিছনে পিছনে তার সমাধানও আসতে থাকে। সে এক অভাবনীয় ব্যাপার। দুশ্চিন্তায় অম্বু ডাক্তারের মন যখন প্রায় বিবশ তখন একখানি চিঠি পেলেন তিনি। চিঠিখানি তাঁর এক দূরসম্পর্কের শালা লিখেছিলেন। অম্বু ডাক্তারের পঠদ্দশায় এঁর সঙ্গে ভাল পরিচয়ই ছিল। নামটি তার মনোমোহন।

মনোমোহনের হয়েছিল কঠিন অসুখ। তাই চাকরি করা সম্ভব নয়, চিকিৎসা হওয়াও শক্ত। অম্বু ডাক্তার কিছু সাহায্য করেন।

চিঠির উত্তরে অম্বু ডাক্তার তাঁকে অবিলম্বে আস্‌তে লিখে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

আসার কিছুদিন পরেই মনোমোহন মারা গেলেন। তিনি সপরিবারে এসেছিলেন ; স্ত্রী এবং একটি মাস-ছয়েকের ছেলে। স্ত্রী বিমলা এমনি করে এসে অম্বু ডাক্তারের আশ্রয় পেলেন। তিনিই মোহিতকে মানুষ করতে লাগ্‌লেন। মায়ের অভাবে মোহিতের মাতৃদুগ্ধ জুটল। স্ত্রীর অভাবে অম্বু ডাক্তারের সংসারে গৃহিণী এলেন।

হরণ-পূরণের মালিকের এ কি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা!

কিন্তু আত্মীয় প্রতিবেশীর সঙ্গে এই নিয়ে লেগে গেল গোল।

সত্যের সরল সংকীর্ণ পথে চলা শক্ত বটে। কিন্তু তাই তার কেবল মাত্র বাধা নয়। বাধা বৃহত্তর করে রেখেছে, চতুর্দ্দিকের মানুষের অযথা নিষ্ঠুরতা, অকারণ কপটতা, আর হিংস্র পরশ্রীকাতরতা।

তবুও অম্বু ডাক্তারের ছিল টাকা, ছিল ডাক্তারির কাজে গভীর পারদর্শিতা। তাই তিনি সংসারের চাপে মারা না পড়ে, পিছ্‌লে বেরিয়ে গেলেন সেই চক্র থেকে।

বিমলাকে নিয়ে নিজের পৈতৃক সম্পত্তির খুদ-কুঁড়োটি পর্য্যন্ত বিক্রি ক'রে দিয়ে অম্বু ডাক্তার বেরিয়ে দাঁড়ালেন সংসারের অনন্ত পথে।

একদিন এসে বিশ্বেশ্বরের চরণের তলায় আশ্রয় পেয়েছিলেন। এই তাঁর কাশী আসার ইতিহাস।

বিমলা বিধবা হয়ে অন্যের ঘরে বাস করতে বাধ্য হলেন। আর মোহিতকে বাঁচাবার জন্য অম্বু ডাক্তারের বিমলাকে ঘরে স্থান দেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। এই সম্বন্ধের মধ্যে যারা কালসর্প দেখে শিউরে উঠ্‌ল, তাদের তুষ্ট করলে দুদিকের ক্ষতি। বহু তর্ক-বিতর্ক করে শেষে একদিন অম্বু ডাক্তার বিমলাকে ডাকলেন।

তিনি বিমলাকে বল্‌লেন, বিমলা, তুমি ঘরে থাক, বাইরের খবর জানার সুবিধা হয় না। কিন্তু তোমার আমার ঘরে বাস করা নিয়ে হয়ত অনেক লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সইতে হবে; হয়ত এমন একদিন আস্‌বে তোমার ছেলে আমার ছেলেরাও সেদিন এটিকে ভাল চোখে দেখে উঠ্‌তে পারবে না। ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সম্বন্ধে ভেবে চিন্তে তোমার সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করতে চাই, তাই তোমাকে ডেকেছি—

বিমলা কেঁদে অম্বু ডাক্তারের পায়ে পড়ে বল্‌লে,—পৃথিবীতে আর আমার আপনার বলার কেউ নেই ; যদি আপনি আমায় আশ্রয় না দেন ত কেমন ক'রে আমার ছেলেটি বাঁচ্‌বে ?

অনেক ভেবে অম্বু ডাক্তার বল্‌লেন,—কিন্তু বিমলা এই জন্যে অনেক নিন্দা গ্লানি আমাদের দুজনকেই হয়ত সইতে হবে, তার জন্য কি তুমি প্রস্তুত ?

বিমলা ছিল তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালিনী, সে আর কান্নাকাটি না ক'রে বল্‌লে,—ছেলের প্রাণ বড়, না আমার নাম বড় ? ঈশ্বর রইলেন সাম্‌নে, আমি কোনো নিন্দা গঞ্জনাকে ভয় করব না।

তার কয়েকদিন পরেই নিজের বিষয়সম্পত্তি বেচে দিয়ে—শ্রীরামপুর থেকে রাজপুতানায় একটা চাকরি নিয়ে তিনি চ'লে যান। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে শেষজীবনে এলেন কাশীতে।

৩

তখন ললিত, মোহিত আর বঙ্ক বেশ বড় হয়েছে। অম্বু ডাক্তার কাশীতে এসে বাঙ্গালী পল্লীতে রইলেন না। অল্প বাড়ীভাড়া দিয়ে, বিদেশীদের সঙ্গে বনিয়ে চলাই তিনি সহজ এবং বুদ্ধির কাজ মনে করতেন। তাই করে

গেছেনও শেষ পর্য্যন্ত। পরে একদিন অনেকেই ব্যাকুল হয়েছিল ঘনিষ্ঠতা করার জন্যে। কিন্তু তিনি আর ফিরেও চাইলেন না। তাঁর কাছে জানা, অজানা, দূর, নিকট, সবই যেন এক হয়ে গিয়েছিল।

সেই সময় পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে আস্‌ত পড়তে, শেলাই শিখ্‌তে, বিমলার কাছে। পায়ে মল ঝুম্ ঝুম্ করছে, কানে মাক্‌ড়ি! তার নাম ছিল একটা মস্ত বড় ভঙ্গকট, সাধ্যি কি বাঙ্গালীর জিবে তার উচ্চারণ হয়। তাই বিমলা তার নাম দিয়েছিলেন—রঙ্গিণী।

রঙ্গিণী পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়। কিন্তু ওদের সমাজে বিধবা বিয়ে মানা ছিল না।

রঙ্গিণীরও মা ছিল না, ছিল তারও এক বহু দূর সম্পর্কের মাসী। তার বাপ যে কোথায়, বেঁচে, কি মরে,—তাই কেউ জান্‌ত না। বিমলার স্নেহে রঙ্গিণী ক্রমেই যেন এ বাড়ীর মেয়ে হয়ে গেল, সে খাসা বাংলা বলতে লাগ্‌ল; কানের মাকৃড়ি খুলে বাঙ্গালীর কাপড় পরে, সে ঠিক বাঙ্গালী ঘরের নন্দিনীটি হয়ে পড়ল।

বিমলা শেষ পর্য্যন্ত রঙ্গিণীকে স্কুলে দিয়ে তাকে মানুষ ক'রে তোলার পথে নিয়ে চলেছিলেন। লোকে যেন ভুলেই গেল যে, রঙ্গিণী অম্বু ডাক্তারের বাড়ীর মেয়ে নয়। ডাক্তারবাবুর ক্রমে এমন প্রতিপত্তি হ'য়ে গেল যে, তাঁকে খুসী করার জন্যে রঙ্গিণীর মাসী রঙ্গিণীকে ফিরে চাইতেও সাহস করলে না।

এমনি ক'রেই দিন কেটে যেতে লাগ্‌ল।

দুই ভাই ললিত আর মোহিতের পার্থক্যটা প্রায় আকাশ-পাতাল দাঁড়াল। ললিত শান্তশিষ্ট একেবারে পুরোপুরি সাধুসজ্জন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে টপাটপ্ পাশ করে ব্যারিষ্টার হ'তে বিলেত চলে গেল। সে রঙ্গিণীকে ভালবাসত। যাবার সময় অনেক আদর করে বলে গেল, রঙ্গিণী ভাই, তুই ভাল করে থাকিস্, লেখা-পড়া করিস্। আমার যখন টাকা হবে তখন তোকে সঙ্গে করে বিলেত দেখিয়ে আন্‌ব।

রঙ্গিণী কেঁদে ফেলে বললে, কিন্তু ললিত দাদা, তুমি যদি আস্‌তে দেরী কর ত ভারি রাগ করব আমি, অন্য কোথাও চলে যাব।

ললিত তার গালে আদর করে চড় মেরে বললে, ছিঃ রঙ্গু, অমন কথা কি বল্‌তে আছে, পাগলী?

পাগলী সেদিন কেঁদেই ফেলেছিল। তার বুকের যে কত বড় ব্যথা, সে ললিত বুঝতে পারেনি। ললিত জান্‌ত যে রঙ্গিণী তাকে ভালবেসেছিল! তাকে সে সম্পূর্ণ নিজের মনে কবত।

তার কারণও ছিল। বিমলা মাঝে মাঝে যদি মনে করিয়ে দিতেন যে, রঙ্গিণী পরের ঘরের মেয়ে ত সে পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদত,—বিনিয়ে বিনিয়ে বল্‌ত, আমি অন্য কোনো ঘরে যাব না।

তখন অম্বু ডাক্তার এসে তাকে আদর করে বলতেন, আচ্ছা তুই যাসনি কোথাও, ললিতের সঙ্গে তোর বিয়ে দেব।

বিমলা বলতেন, তা কি হয়? ও যে……। সে কথা চাপা দিয়ে অম্বু ডাক্তার বলতেন, খুব হয়, সব হয়, মানুষ মনে করলে কি না হয়?

এসব কথার গভীর অর্থ ছিল। তলায় তলায় ললিত আর রঙ্গিণীর প্রাণে প্রেমের ফাঁস জড়িয়ে দিত।

কিন্তু মোহিত হল একটা জানোয়ার। এ রকম বদ্‌রাগী মানুষ পৃথিবীতে কম এসেছে। লেখাপড়ায় ফোর্থ ক্লাসেই গোঁফ উঠলো। আর ইস্কুলে যেতে লজ্জা হ'ত।

তাই সে তারপর জীবনের পাঠ নেবার জন্যে পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা বাদ রাখলে না যে, পরে কোনদিন আক্ষেপ করতে হয়।

কিন্তু এসব কাপতেনি করতে হ'লে টাকার দরকার ত? সেই বা আস্‌ছে কোত্থেকে? অবশেষে সে বিমলাকে ধরলে, বাবাকে বলে আমাকে একটা ওষুধের দোকান ক'রে দাও, মাসী!

বিমলা বললে, এ সব কথার মধ্যে, আমি বাইরের মানুষ, আমার থাকা উচিত নয়, মোহিত।

মোহিত রাগে জ্ঞানহারা হ'য়ে বললে, জানি, জানি তোমার সব বাইরের মানুষী, লোকে কি বলে শুনে

এসো গে না। একচোকো, ললিত, ললিত! ললিত বিলেত থেকে এসে ওঁর ছাতা দিয়ে মাথা রাখবে······ আর আমি এলুম ভেসে······

বিমলা কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে অন্য ঘরে চলে গেলেন।

একথা অম্বু ডাক্তারের কানে উঠলে কি হ'ত বলা শক্ত, কিন্তু বিমলা প্রাণপণে মোহিতের সকল দোষ তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতেন।

একটি ছোট ওষুধের দোকান খোলা হ'ল বটে; কিন্তু সে মোহিতের নামে নয়, বঙ্কুর।

বিমলার শত আপত্তি অম্বু ডাক্তার শুন্‌লেন না, বললেন, বঙ্কু শান্তশিষ্ট ছেলেটি, ওর ধীর বুদ্ধি, ও পারবে কম্‌পাউণ্ডারি করতে, দোকান চালাতে। মোহিতের ও কর্ম্ম নয়।

মোহিত খুব ভাল ক'রেই জান্‌ত যে বিমলার কোনো পরামর্শই ছিল না এতে। তবুও সে রাগে অধীর হয়ে এসে বললে, কি? নিজের ছেলের জন্যে ডিস্‌পেনসারি খুলিয়েচ ত—মালিনী মাসী।

বিমলার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

— ছিঃ বাবা মোহিত, আমার সঙ্গে কি অমন ক'রে কথা কইতে আছে? তোর সঙ্গে বঙ্কুর তুলনা হয়, বঙ্কু তোর পায়ের কড়ে আঙুলেরও সমান নয়। আমার দুধ খেয়ে যে মানুষ তুই বাবা, আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করতে হয় না।

মোহিত বললে, ও সবে মোহিত ভোলে না, বলে দিচ্চি। আমার এখ্‌খুনি দশ টাকার দরকার, দিতে যদি পারত—ভাল। নইলে আজ রাতে বঙ্কুকে মেরে তার সিন্দুক ভেঙে—মোহিত লম্বা দেবে।

বাক্স-পেটরা খুঁজে পেতে বিমলা দশটি টাকা বার ক'রে দিলেন।

কিন্তু একথা অম্বু ডাক্তারকে বলা তাঁর সাধ্যে হ'ল না।

রঙ্গিণী রাগে ফুঁসতে লাগল।

৪

মোহিতের নজর রঙ্গিণীর উপরেও ছিল। যে অন্যায় করে সে জানে যে, অসত্য আচরণ অন্যায়; সে জানে, গুরুজনকে অপমান ক'রে কটুবাক্য বলাও অন্যায়। হয়ত কোন সময়ে এই সবের জন্য মোহিতের মনে অনুতাপও দেখা দিত। কিন্তু সে একটা সাময়িক ব্যাপারমাত্র। তালপাতায় আগুন যেমন দপ্‌ ক'রে জলে, মোহিতের মনেও রাগ, লোভ, লালসা তেমনি সহসা জলে উঠলে, তাকে সংযত করার শক্তি তার ছিল না।

ভালবাসা দিয়ে রঙ্গিণীর মন জয় করার কাজ বহু ধৈর্য্য, বহু সংযমের কথা। সে পথে মোহিত যায় নি মোহিত সরল মেয়েটিকে ভুলিয়ে পথে বার করবার মতলব মনে মনে আঁটছিল। কিন্তু তাতে টাকার দরকার। সেই টাকা তার হাতে না আসাতেই তার মারমূর্ত্তি প্রকাশ পেত।

কিন্তু সে সুযোগ একদিন মোহিতের কপালগুণে ঘটে গেল। সেদিন বিমলা গিয়েছিলেন এক জমিদারের বাড়ীতে তাঁদের মেয়েদের সেলাই শেখাতে। অম্বু ডাক্তার গিয়েছিলেন একটা দূরের 'কলে'। তাড়াতাড়িতে লোহার সিন্দুকের চাবিটা টেবিলের উপর পড়েছিল।

মোহিত কি করতে বাড়ী এসে এই সুবর্ণ সুযোগটিকে বৃথা বয়ে যেতে দিলে না। সিন্দুকে যা ছিল সব আত্মসাৎ ক'রে এসে রঙ্গিণীকে বললে, দেখ্‌, আজ আমি সার্‌কাস দেখতে যাচ্ছি, চারটে থেকে ছটার মধ্যে, তুই যাবি দেখতে? প্রকাণ্ড দুটা সিঙ্গী এনেছে—তাদের ভীষণ লড়াই হবে। ওদিক দিয়ে মাসীকে ওরা নিয়ে যাবে, তুই যাবি?

রঙ্গিণীর দোষ ছিল যে, সে সব তাতেই নেচে উঠত। আর পৃথিবীতে কোনো মানুষকেই অবিশ্বাস করত না। সে রাজি হ'য়ে বেরিয়ে পড়ল।

পথে যেতে যেতে মোহিত বললে,—বড় খিদে পাচ্ছে, কি বলিস্‌, কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌, এখনও অনেক দেরি। গাড়ি থেকে নেমে অনেক খাবার কিনে নিয়ে এসে রঙ্গিণীর হাতে দিয়ে বললে, খা, আর এই পান রাখ।

রঙ্গিণী খেতে লাগ্‌ল।

সে খাবারে ছিল সিদ্ধি মেশান। কিছুক্ষণের মধ্যে রঙ্গিণীর বোধ-বিবেচনা চলে গেল। সে বললে,—মোহিত-দা, কত দূর যাব?

অনেক দূর রঙ্গিণী. সে অ-নে-ক দূর। বল্ ত কোথায় ?

—জানি, ব'লে রঙ্গিণী হাসে।

—বল্ না ?

—ক'ল্কাতায় নিয়ে যাচ্চ আমাকে সার্কাস দেখাতে ?

ছুদিন পর্য্যন্ত রঙ্গিণীর ঠিক জ্ঞান হয় নি।

জ্ঞান হ'য়ে সে দেখ্‌লে যে, খাঁচার পাখীর মত বন্দিনী হ'য়ে সে আছে। মোহিত যায় আসে, তাকে প্রবোধ দেয়, কিচ্ছু তোর ভয় নেই, তোকে আমি বিয়ে ক'রে বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যাব।

রঙ্গিণী কাঁদে, বলে,—তোমাকে কেন বিয়ে করতে যাব আমি ?

মোহিত নিষ্ঠুর হাসি হেসে বলে, তুই না করিস্, তোর ঘাড় করবে। দেখ্‌বি শেষ পর্যন্ত। রাগ করতে করতে মোহিত চলে যায়। কল্পনায় কাজটা যত সহজ মনে হয়েছিল, বাস্তবিক কিন্তু তত সহজ হল না।

একজন বুড়ীও আস্‌ত মধ্যে মধ্যে রঙ্গিণীকে বোঝাতে। সে বল্‌ত কেন রাজি হচ্ছিস্ না মা ? মোহিতবাবুর মত পাত্তর কে কোথায় পায় ? হাতে অগাধ টাকা, তোকে রাজরাণী করে রাখবে।

রঙ্গিণী কথার উত্তর দিত না, কেঁদে কেঁদে তার চোখ ছুটো ভাটার মত হয়ে গিয়েছিল।

একদিন মোহিত এল রাতে। মুখ থেকে বিশ্রী একটা কিসের গন্ধ বেরুচ্ছে। চোখ ছুটো লাল টকটকে। জিব যেন এড়িয়ে গেছে। এসে বললে, আজ একটা হেস্ত-নেস্ত করে ফিরব, নইলে এই দেখ,বলে সে একটা প্রকাণ্ড ছোরা বার করে বললে, এই দিয়ে তোকে ছুখানা করে কেটে তারপর ঝুলব গিয়ে ফাঁসি কাঠে।

রঙ্গিণী ঠক ঠক ক'রে কেঁপে বললে, তোমার পায়ে পড়ি মোহিত দাদা।

—দাদা! নেকি, খবরদার দাদা-টাদা নই তোর, বল আমার বিয়ে করবি কি না!

রঙ্গিণী বললে—করব যদি তুমি কাশীতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ডাক্তারবাবুর মত করতে পার।

মোহিত বললে, দেখ, এর নড়চড় হবে না ?

—না।

—তিন সত্যি কর্।

—তিন সত্যি করচি!

মোহিত সেইখানেই ঘুমিয়ে পড়ল।

সে গভীর রাতেও খাঁচার দরজা খোলা পেয়ে পাখী উড়ল!

রঙ্গিণীর ভয়-ডর কোথায় উড়ে গেল! খোলা পথের মুক্ত বাতাসে এসে, তার জীবনের আশা হল। এ পৃথিবীতে সবাই মোহিতের মত দুর্ব্বৃত্ত নয়। সে প্রাণপণে এগিয়ে চল্‌ল, দূরে, দূরে, মোহিতের কাছ থেকে যত দূরে পালিয়ে যাওয়া যায়।

সে রাতে ক'লকাতার পথে আলো ঝলমল করে, লোক ছুটো-একটা, হয় মাতাল, নয়ত ভারি মস্তন আর কেউ। মাতাল দেখে সে চিন্‌তে পারলে, তার চলায়, পথের একদিক থেকে আর একদিকে চলেছে, টল্‌তে টল্‌তে। সে থমকে দাঁড়ায়, কাজ নেই ওর আগে গিয়ে। রঙ্গিণী অল্প কয়েকদিনের মধ্যে বুদ্ধিতে অনেকখানি অসম্ভব রকম বেড়ে উঠেছিল।

হঠাৎ পিছনে একটা চীৎকার শুনে সে চমকে উঠ্‌ল। একটা গলির আড়ালের মধ্যে লুকিয়ে পড়ে সে দেখ্‌তে লাগ্‌ল, কারা হট্টগোল ক'রে চলেছে।

কাছে এসে লোকগুলো আবার চেঁচালে, বল হরি, হরি বোল্! সেই নিস্তব্ধ পথের ছুদিকের বাড়ীর দরজা-জান্‌লাগুলো যেন ঝন্‌ঝনিয়ে বেজে উঠ্‌ল।

একজন বল্‌লে,—ওরে দাঁড়া, কাঁধ বদল করি। আর একজন বল্‌লে, ভারি কাঁধটা ভেরে গেছে, একটু রাখবে। সেইখানে খাট রেখে লোকগুলো বসে বিড়ি টান্‌তে লাগল।

রঙ্গিণী চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে তাদের কথা শোনে। খানিক পরে ছুজন স্ত্রীলোক গুম্‌রে গুম্‌রে কাঁদতে কাঁদতে এসে সেখানে পৌছল। একজন কাঁদ্‌চে, আর একজন তার সঙ্গে কেঁদে কেঁদে বোঝাচ্চে, ছি মা, চুপ কর, এ সময় কাঁদতে নেই। মেয়েটি তবুও কাঁদে, বলে, ওগো, এমনি ক'রেই ত এবার থেকে কেঁদে কেঁদেই আমার দিন কাটবে, ওঁর সাম্‌নে কেঁদে নি, প্রাণ ভ'রে…

রঙ্গিণীরও জমা কান্নার অথই জল যেন উপ্‌চে পড়ে দুচোখ দিয়ে।

যে ডুবতে ব'সেছে, সে খড়কুটো ধরেও বাঁচার চেষ্টা করে। রঙ্গিণী বুঝলে, যে এই শোকসন্তপ্ত লোকগুলোর সঙ্গ নিলে রাত একরকমে কেটে যাবে। তারপর দিনের মালিকের কাছে সে আবার নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে ব'লবে, প্রভু যেদিকে নিয়ে যাবে, সেইদিকে যাব, কেবল মোহিতের হাতে সঁপে দিও না। লোকে যে তোমাকে দয়াময় বলে, সে কি একেবারে বানানো?

তাদের পিছনে পিছনে রঙ্গিণী গিয়ে গঙ্গার তীরে পৌঁছে, একটু দূরে ব'সে প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌ল কখন্ তাদের ছুটি হবে।

দিনের আলো ফুটে উঠ্‌লে রঙ্গিণী যেন লোকের কথাবার্ত্তা, সূর্য্যের আলো উত্তাপ থেকে অনেকখানি সাহস সঞ্চয় ক'রে, সেই সদ্যবিধবার পায়ের কাছে এগিয়ে কথা কইতে গিয়ে তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে শুধু একটি চির-করুণ অনাহত আদি শব্দ বার হ'য়ে প'ড়ল—মা!

৫

গঙ্গার ঘাটে রঙ্গিণী ঝাঁপিয়ে কেঁদে প'ড়ল অম্বু ডাক্তারের পায়ের তলায়। তিনি সেই সকালেই গাড়ি থেকে নেমে স্নান সেরে নিয়ে যাচ্ছিলেন রঙ্গিণীর খোঁজে, বাদুড়বাগানে।

রঙ্গিণী এসেছিল, তার নতুন মা'র সঙ্গে গঙ্গা-স্নানে। সে একতিলের জন্যও তাকে ছেড়ে থাক্‌ত না। পাছে, কোথা দিয়ে এসে মোহিত চুরি ক'রে ধরে নিয়ে যায়!

অম্বু ডাক্তার শান্তগম্ভীর গলায় বল্‌লেন, রঙ্গিণী, অধীর হয়ো না। আর ত তোমার কোন ভয় নেই। কা'র সঙ্গে এসেছ এখানে?

—নতুন মা।

—বেশ, চল তাঁদের বাড়ী যাই।

নতুন মা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। একখানা গাড়ি ডেকে তাঁরা রওনা হ'লেন।

গাড়ি চ'ড়ে ঠিক সেদিনের মতই রঙ্গিণীর মাথাটা নেশায় যেন টল্‌মল্ করে। যেন মনে হয়, এখুনি কোন্ অতলে তলিয়ে যাবে!

দুপুরে রঙ্গিণীকে নিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। একটি কথাও জিজ্ঞেস করার দরকার নেই। রঙ্গিণী যতটুকু চিঠিতে লিখতে পেরেছিল, তার বেশী বোধ হয় জানার কোনো দরকার ছিল না তাঁর।

একটা বড় বাড়ির সাম্‌নে গাড়িখানা দাঁড়াল। রঙ্গিণীকে সঙ্গে ক'রে সেই বাড়ীর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গিয়ে, দেয়ালের গায়ে একটা চাবি টেনে দিয়ে বললেন, ব'স ঐ চেয়ারে গিয়ে।

তাড়াতাড়ি পদ্দা টেনে একজন সায়েবি পোষাক-পরা বাবু বেরিয়ে এসে অবাক্ হ'য়ে দাঁড়িয়ে বললেন, অম্বু, তুমি? তারপর সব ভাল ত?

—ভাল আর কই! বাড়িতে অসুখ রেখে আসতে হ'য়েছে।...এই মেয়েটি তোমার জিম্মায় দিয়ে যাচ্চি। একে কাল স্কুলে ভর্ত্তি ক'রে দিতে হবে। আর তোমার ইচ্ছামত একটি বোর্ডিংয়ে ব্যবস্থা ক'রে রেখে দিও। ব'লে কিছু টাকা তিনি ডাক্তার ঘোষের হাতে তুলে দিয়ে বললেন,—আমাকে এই তিনটের গাড়ি ধরতে হবে। বাড়ীতে ভারি অসুখ ফেলে এসেছি, ভাই।

রঙ্গিণীর হাত ধরে ডাক্তার ঘোষ বাড়ির মধ্যে নিয়ে গেলেন।

পরের দিন ভর্ত্তি হবার সময় ডাক্তার ঘোষ লিখিয়ে দিলেন, মেয়েটির নাম হেমপ্রভা; আমি ওর গার্জ্জেন; বাপ মারা গেছেন। কাশীর ডাক্তার ব্যানার্জ্জির পালিতা কন্যা। তার বড় ছেলে বিলেতে, তার সঙ্গে ঈশ্বরের ইচ্ছা হ'লে, বিবাহ দেবার স্থির আছে। ওর খরচ-পত্রের সমস্ত ভার আমার ওপর।

রঙ্গিণীর নবজন্মলাভে হেমপ্রভার নূতন জন্ম। সে রঙ্গিণীর চেয়ে বছর পনেরর বয়সে ছোট।—এই কথাগুলি ব'লে হেমপ্রভা হাস্‌লেন।

আমরা সবাই অবাক হয়ে বসে রইলাম, সেই শীতের সন্ধ্যাবেলায়। মনে কত কথাই আসে, কিন্তু সাহস হয় না জিজ্ঞেস্ করতে।

মনে হল, ললিত কি ফেরেন নি? অম্বু ডাক্তার কি আর বেঁচে নেই? সে কার অসুখ হ'য়েছিল?

কিন্তু হেমপ্রভার মুখ দেখে স্পষ্টই আমরা বুঝতে পারছিলুম যে রঙ্গিণীর গল্পের যবনিকাপাত হ'য়ে গেছে। মাথা খুঁড়েও আর একটি কথা বা'র হবে না।

রেবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপি চুপি বললে আমার কানে কানে—এ যদি সত্যি হয় ত কি বলেচি···

বললুম, চুপ রেবা···হেমপ্রভাকে অবিশ্বাস?

রেবা কিন্তু দুর্দ্দম!

ভারতীয় প্রাচ্য কলা-পরিষদ ও বাঙ্গালীর শিল্প-শিক্ষা

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ভারতের নব্য শিক্ষা-তন্ত্রে, আমাদের স্কুল ও কলেজে, একটি বড় ও শক্তিমান জ্ঞানের বাহন ও সাধনকে নির্ব্বাসিত করে রাখা হয়েছে—সেটি হ'ল,—কলাবিদ্যা ও সৌন্দর্য্যের বিজ্ঞান। মানুষের স্বাভাবিক মানসিক বৃত্তির সহিত এই সৌন্দর্য্য-বিদ্যার খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই বৃত্তির সাধনা ও শিক্ষা বর্জ্জন করে আমাদের শিক্ষাপদ্ধতি ও উচ্চ-শিক্ষার ভাগ্য-বিধাতারা, আমাদের জাতীয় শিক্ষাকে যেন চিরকালের জন্য অঙ্গহীন ও পঙ্গু করে রেখেছেন। এই কলা-'শিক্ষাহীন' 'শিক্ষার' ফলে, আমরা যে শুধু কলা-শিল্পের মর্ম্ম গ্রহণ করবার শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়েছি তা নয়, উপরন্তু চিরকালের জন্য আমাদের মন কলা-লক্ষ্মীর রত্নমন্দিরের বিরুদ্ধে 'বিমুখী ভাব' ধারণ করে বসেছে, তাঁর রত্ন-বেদীর উজ্জ্বল ও নির্ম্মল পাবক-শিখার স্পর্শ থেকে আমাদের বঞ্চিত করে, সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের সিংহদ্বার চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়ে গেছে। পশ্চিম দেশে এমন বিশ্ব-বিদ্যালয়, স্কুল, কলেজ, বা পাঠশালা নাই, যেখানে কলা-সাধনার কিছু-না-কিছু ব্যবস্থা আছে। শুধু উচ্চ-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ বলে নয়, নিম্ন ও প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগেও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির উন্মেষ ও স্বাভাবিক স্ফুরণ ও পরিণতির উদ্দেশে কলাবিদ্যার জ্ঞান ও সাধনার বেশ একটা বড় স্থান দেওয়া হয়। এই শিক্ষার সুযোগ কেবল যে প্রাথমিক রেখা-চিত্র (elementary drawing) ও দৃষ্টি-শক্তির শিক্ষার (visual training) নানা ব্যবস্থাসূত্রে করা হয়, তা নয়, পরন্তু প্রাচীন ও নবীন নানা ওস্তাদ শিল্পীদের কলা ও সাধনার সঙ্গে অল্প বয়সের বালক-বালিকাদের সংযোগ ও পরিচয়ের নানা সুব্যবস্থা এখন য়ুরোপ ও আমেরিকার নানা বিদ্যাপীঠের শিক্ষা-প্রণালী ও পদ্ধতির অপরিহার্য্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের প্রচলিত বিদ্যাপীঠে কলাবিদ্যা এখনও স্থান-চ্যুত ও 'জাতিচ্যুত' হয়ে রয়েছে। 'কেতাবীবিদ্যার' অত্যধিক সম্মান ও প্রভাবে, যে-বিদ্যা লিখিত ও পঠিত ভাষার মধ্যে ধরা দেয় না, সে-বিদ্যাকে আমরা যথেষ্ট অবজ্ঞা ও সন্দেহের চোখে দেখতে শিখেছি —আর এই 'লিখিত পঠিত' ভাষাকেই জ্ঞানের একমাত্র পথ বলেই মেনে নিয়েছি। এর ফলে, সকলপ্রকার নেত্র-গ্রাহ্য বিদ্যা (visual knowledge) ও শিল্পকর্ম্ম অবজ্ঞার কর্ম্মনাশার অতল-জলে সমাধি লাভ করেছে। আমাদের দেশের পুরাতন ও নূতন পদ্ধতির নানা কারুশিল্পের (Industrial Arts) শোচনীয় দুর্দ্দশা যে আমাদের সৌন্দর্য্য-জ্ঞান ও শিল্প-বুদ্ধির অপমান ও শিক্ষাহীনতার ফল, এ কথা আমরা অনেক সময়ে উপলব্ধি, ও অনেক সময়ে স্বীকার করতে চাই না। "স্বদেশী প্রচেষ্টার" প্রেরণায় ও তাড়নায়, আমাদের কারুশিল্পের ক্ষেত্রে,— নানা নূতন 'স্বদেশ-জাত' শিল্পদ্রব্যের উৎপত্তি ও প্রচলন হয়েছে এবং হচ্ছে। এই নূতন পর্য্যায়ের শিল্প-সম্ভারের অধিকাংশ 'স্বদেশ-জাত' 'শিল্পদ্রব্য' শিল্পের স্পর্শ হতে,— রূপ-রসের মধুময় আলোক ও দীপ্তি হতে, একেবারে বঞ্চিত। রূপ-রসের অলৌকিক ইন্দ্রজালে, কলা-বুদ্ধির

সুকৌশলে, অনেক সাধারণ সামান্য ব্যবহারের জিনিষ— এমন একটা নূতন শ্রী ও দিব্য-মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠে, যাহার স্পর্শ পেয়ে এই সাধারণ ব্যবহারের উপকরণগুলি একটা নূতন আকর্ষণ ও 'মূল্য' লাভ করে। যে-সব শিল্পজাত দ্রব্য এই সৌন্দর্য্যের স্পর্শ হতে বঞ্চিত, বেচা-কেনার হাটের প্রতিযোগিতায় তারা চিরকাল পিছিয়ে পড়ে থাকে। এইজন্য পাশ্চাত্য দেশে শিক্ষা ও ব্যবসায়-ক্ষেত্রে –'কারু-শিল্পে কলা-কৌশলের প্রয়োগ' (application of art to industry) সম্বন্ধে নানা আলোচনা ও ঘোষণা সর্ব্বদাই শোনা যায়। বিদেশের মনীষীরা অনেকদিন স্বীকার করে নিয়েছেন, যে, কলা-বিহীন কারু-শিল্প পশুত্বেরই নামান্তর (industry without art is brutality)। ব্যবসায়-বুদ্ধির দিক দিয়ে এটা খুব সত্য কথা যে, যে-জিনিষে কলা-কৌশলের ছাপ আছে বিশ্বের বেচা-কেনার হাটে তার বাজার-দর খুব বেশী। জাপানের অতি তুচ্ছ জিনিষ, জাপানের জাতীয় কলার কল্যাণ-টীকা কপালে নিয়ে, য়ুরোপ ও আমেরিকার বাজারে প্রতিযোগিতায় সফল হয়ে, প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ভারতের শিল্পজাত দ্রব্য রূপের সৌন্দর্য্যে হীন হয়ে দিন দিন পিছিয়ে পড়ছে। আমাদের দেশের কারুশিল্প আবার কলা-লক্ষ্মীর কল্যাণ স্পর্শ না পেলে, এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপনার স্থান অধিকার করতে পারবে না। সুতরাং অর্থকরী শিল্পের ক্ষেত্রেও, কলা-লক্ষ্মীর আরাধনা ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধির সাধনার একান্ত আবশ্যক হয়েছে।

অবশ্য শিল্প-সাধনার এক ক্ষেত্রে নবীন-ভারত অনেকটা সম্মান ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটা হ'ল, চিত্র-কলা-বিদ্যার নানা নবীন প্রচেষ্টা। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নায়কতায় বাংলা দেশের নবীন শিল্পীরা নব-পর্য্যায়ের নবীন চিত্র-শিল্পে একটা নূতন প্রাণের স্পন্দন ও নব-জাগরণের উদ্বোধন এনে দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টা বহু প্রতিভাবান শিল্পীর সাধনা ও সাহায্য পেয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। দেশে ও বিদেশে বাংলার নবীন শিল্পীদের চিত্রপট যথেষ্ট আদর ও সম্মানে অভিনন্দিত হয়েছে। বাংলার নবীন শিল্পীরা প্রমাণ করেছেন যে, শিল্পের ক্ষেত্রে নবীন-ভারতের এমন অনেক কথা বলবার আছে—যে কথা, যে বার্ত্তা পশ্চিম-দেশের গুরুদের বিদ্যাপীঠের 'শেখা-বুলির' প্রতিধ্বনিমাত্র নহে। ভারতের নিজস্ব সাধনার ভাণ্ডার যে এখনও শূন্য হয় নাই সাহিত্যক্ষেত্রে সে-কথা প্রমাণ করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রে সে কথা প্রচার করছেন আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ। বাংলার নবীন-শিল্প-সাধনার বিশেষত্ব এই, যে, বাংলার নবীন-সাহিত্যে পশ্চিম-দেশের যে প্রভাব ও প্রতিপত্তি জাজ্জ্বল্যমান রয়েছে, বাংলার নবীন-চিত্র-শিল্পে তাহার বিশেষ কোনও চিহ্নই পাওয়া যায় না। এই নিজস্ব ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য,—এই স্বারাজ্যের জয়টীকা বাঙ্গালীর চিত্র-শিল্পের বড় গৌরবের কথা।

এই নবীন শিল্প-সাধনার আর একটা দিক আছে। সেটা হ'ল কাজের পর্য্যায়, বা অর্থকরী বিভাগ। আমাদের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষিত যুবকেরা অর্থ-উপার্জ্জনের নানা ক্ষেত্রে প্রবেশ চেষ্টায় কি পরিমাণ বিপর্য্যস্ত লাঞ্ছিত ও পরাজিত হচ্ছেন, তা এই অর্থসঙ্কট ও অন্নসঙ্কটের দিনে কাহারও অবিদিত নাই। দেশের 'চাকরীর' বাজার ও ব্যবসায়-কারবারে গ্রাজুয়েটের 'মূল্য' কি, তার কথা প্রকাশ্যে বলতে অনেকের লজ্জা করে। কিন্তু স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে যাদের প্রবেশলাভ ঘটেনি, এমন অনেক 'নিরক্ষর' বাঙ্গালী শিল্পী শিল্পের অক্ষর শিখে, বাংলার নবীন-শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে সিদ্ধিলাভ করে অনেক গ্রাজুয়েটের চেয়ে বেশী উপার্জ্জন করেছেন ও করছেন। অবশ্য সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ লাভ সমানভাবে ঘটেনি। কিন্তু সকলেই প্রায় প্রমাণ করতে পেরেছেন, যে, ভারতের শিল্পের ক্ষেত্রে একটা নূতন উপার্জ্জনের পথ আবিষ্কৃত হতে পারে। সকলে মিলে ঐ একই 'লিখিত পঠিত' বিদ্যার সংকীর্ণ ক্ষেত্রে নিষ্ফল প্রতিযোগিতা না করে শিল্পের নূতন ক্ষেত্রে অর্থ-উপার্জ্জনের সুযোগ খুঁজে নিতে পারেন, এ কথাটা যে আংশিকভাবে সত্য তাহা প্রমাণ হয়েছে। ভারতের চিত্রশিল্পে কৃতিত্ব লাভ করে দুচার-জন বাঙ্গালী যুবক এমন সব উচ্চ-বেতনের পদ পেয়েছেন, যে, সে-সব পদ অনেক M. A. এবং P. R. S.

উপাধিধারী শিক্ষিত যুবকের ভাগ্যে ঘটে নাই। সম্প্রতি ইণ্ডিয়া অফিসের নূতন আবাস-গৃহ অলঙ্কৃত ও চিত্রিত করতে ভারত-সরকার নিজব্যয়ে উপযুক্ত পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা করে পাচজন ভারতীয় শিল্পীকে বিলাতে পাঠিয়েছেন, তার মধ্যে চারজন বাঙ্গালী,—এবং বাংলার নবীন পদ্ধতির চিত্রকলার কৃতী সাধক। এঁরা কেহই 'লিখিত পঠিত' বিদ্যায় পারদর্শী নহেন, কিন্তু তুলি চালাতে বেশ ক্ষিপ্রহস্ত। বাঙ্গালীর কলমের খোঁচায় অনেক অসম্ভব জিনিষ সম্ভব হয়েছে, বাঙ্গালীর তুলির খোচায় নূতন কীর্ত্তি অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়ে ক্রমশঃ গৌরবের বস্তু হয়ে উঠেছে।

বাংলা দেশে শিল্পসাধনার শিক্ষাকেন্দ্র দুই চারটি আছে। তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হ'ল সরকারী 'স্কুল অফ আর্ট'। বে-সরকারী যে কয়টি স্কুল আছে তাহার মধ্যে প্রধান হ'ল বিশ্বভারতীর 'কলাভবন' ও কলিকাতার প্রাচ্য কলাপরিষদের (Indian Society of Oriental Art) সংলগ্ন কলাশালা। এই কলাপরিষদের সাম্বৎসরিক প্রদর্শনী কলিকাতার শিক্ষিত ও মনীষী সমাজে খুব খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেছে। ভারতের নানা স্থান ও বিদেশ থেকে অনেক সমঝদার সমালোচকেরা এই প্রদর্শনী প্রতিবৎসর দেখতে আসেন ও প্রীতি ও শ্রদ্ধার মাল্য দিয়ে যান। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে, আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই পরিষদের একটি ছোট স্কুল ও বিস্তৃত সাজপাটের সুন্দর কলাশালা আছে। এই স্কুলের প্রবেশিকা ও শিক্ষার ব্যবস্থা প্রচলিত সরকারী স্কুল হতে অনেক স্বতন্ত্র। সাধারণ স্কুলের কড়া নিয়মের বাঁধা-ধরা এই শিল্পশালায় বর্জ্জন করা হয়েছে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে একটা উচ্চ-মঞ্চের ব্যবধান এখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে পাশাপাশি বসে ছবি আঁকেন। ভারতের প্রাচীন শিল্পশালায় এই ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। গুরু ও শিষ্যের মধ্যে খুব একটা ঘনিষ্ঠ অতি-পরিচয়-লাভের সুবিধা ও সুযোগ, এই শিক্ষারীতির প্রধান অঙ্গ। গুরু বা শিক্ষকের শিক্ষা-পদ্ধতি হ'ল, নিজে হাতেকলমে কি রীতি প্রণালীতে চিত্র করছেন, শিষ্যকে তাহার অনুশীলন করবার সুযোগ দান। চিত্রশিল্পের চাক্ষুষ পরীক্ষা-ক্ষেত্রে (experiment) হাতেকলমে চিত্র-চর্চ্চার ও পট-লিখনের দেখবার সুযোগে বেশ একটা 'ছোঁয়াচ', একটা মাদকতা আছে,- যা শিক্ষকের 'কথার' ব্যঞ্জনায় পাওয়া যায় না। চিত্র-বুদ্ধি ও কল্পনা-শক্তির সহজ স্ফুরণ হয় চিত্র-চর্চ্চার মধুর পরিবেশের মধ্য দিয়ে,—ছবি তৈয়ারীর প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ পর্ব্বের মধ্য দিয়ে। এক প্রদীপ থেকে যেমন আর একটি প্রদীপ জ্বলে উঠে, তেমনই সাধক-শিল্পীর সাধনার ঘনিষ্ঠ সঙ্গলাভে তাঁর সাধনকালের উন্মীলিত ও উদ্‌বুদ্ধ সৌন্দর্য্য-শক্তির প্রজ্জ্বলিত মানসিক স্পর্শ পেয়ে, শিক্ষার্থীর নিজের ভিতরের শক্তি ও সৌন্দর্য্য-বুদ্ধি আপনি ফুটে উঠে। এই বিকাশ, এই উন্মীলন,—কোনও যান্ত্রিক, বাচনিক, কৃত্রিম, শিক্ষা-প্রণালীদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এই শিক্ষা-পদ্ধতির ফলে দেখা গেছে, যে, দু-এক বৎসরের মধ্যে শিক্ষার্থীরা শিল্পতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি অনায়াসে আয়ত্ত করে আপনার পথ অতি সহজেই আপনি কেটে নিতে পারেন। এদের শিক্ষা খুব একটা কৃত্রিম, যান্ত্রিক, অভ্যাস-তালিকার (programme) তাড়নায় ঘটে না, শিল্পসাধনার চাক্ষুষ পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনের ফলে আপনি ফুটে উঠে।

এই পরিষদের স্কুলে কোনও পরীক্ষার বালাই নাই, কোনও সার্টিফিকেটের ছাড়-পত্র নাই। কোনও শিক্ষার্থীর শিক্ষা-পর্ব্ব শেষ হয়েছে কি না সেটা আচার্য্য বিচার করে বলে দেন। কোনও ছাত্র কৃতী হয়ে উঠেন দু-বৎসরে, কারুর লাগে তিন, কারুর লাগে চার বৎসর। ইতিপূর্ব্বে কোনও ছাত্র আশাপ্রদ হাতের কাজ দেখাতে না পারলেই বিদ্যালয় থেকে আগেই অবসর নিতে হয়।

সম্প্রতি এই বিদ্যালয়ে একটি নূতন মহিলা-বিভাগ খোলা হয়েছে। এর বেশ একটা সার্থকতা আছে বলে মনে হয়। বাংলা দেশের মহিলারা শুধু যে জ্ঞানের ক্ষেত্রে, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, তাঁদের শক্তির প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন তা নয়, সম্প্রতি রাজনীতির কঠিন ও বিপদ সঙ্কুল পথে তাঁরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে অদ্ভুত সাহস, সহিষ্ণুতা ও শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

রাজনীতির দ্বন্দ্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার ন্যায্য কি না, শোভনীয় কি না, তাহা বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু বাঙ্গালীর মানসিক শক্তির অপরার্দ্ধ যে বাঙ্গালীর নারী-শক্তিতে নিহিত ও নিমজ্জিত আছে, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই। দুঃখের বিষয়, এ পর্য্যন্ত বাংলা দেশের শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে নারী-শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। দু-চারজন কৃতী মহিলা-শিল্পীর কথা বাদ দিলে, সাধারণতঃ শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালা দেশের, তথা ভারতের, মহিলা-সমাজ ভারতের শিল্প-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। নবীন শিল্পকলার নূতন বিকাশের নানা নূতন পথ খুলে দেবার তাঁদের যে উচ্চ অধিকার ও নিজস্ব শক্তি আছে, শ্রদ্ধেয়া সুনয়নী দেবীর অলৌকিক চিত্রকলায় তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে। কবিতার কুঞ্জবনে মহিলাদের যে স্নিগ্ধ-মধুর কলধ্বনি সর্ব্বদা শোনা যায়, তার প্রতিধ্বনি, রূপরেখা ও বর্ণ সঙ্গীতের জগতে এখনও ফুটে উঠেনি। ললিতকলার সাধনা-পীঠে বাঙ্গালী মহিলাদের নিশ্চয় নূতন বার্ত্তা ও বাণী প্রচারের অধিকার ও শক্তি আছে। এই শক্তির লীলা-স্পর্শ হতে বঞ্চিত হ'লে বাঙ্গালীর চিত্র-শিল্প চিরকালই অঙ্গহীন ও শক্তিহীন হয়ে থাক্‌বে। বাংলার গৃহ-লক্ষ্মীদের পূতসাধনার কল্যাণ-স্পর্শ পেলে ভারতের কলালক্ষ্মীর পদ্মবনে আবার নূতন কমল ফুটে উঠবে।

মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন*

আজ যাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিবার জন্য আসিলাম, তিনি পার্থিব সম্বন্ধে আমার মাতুল ছিলেন। সাধারণতঃ মাতুল সম্পর্কে যাহা বুঝায় এ তাহা নহে। সাংসারিক মাতুল সম্পর্ক হইতে কত অধিক মধুর সম্পর্কে সম্পর্কিত ছিলাম তাহা ভাষায় বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। শৈশব হইতে সন্তান যেমন পিতার ক্রোড়ে আদর-যত্নে প্রতিপালিত হয়, আমরাও সেই প্রকার তাঁহার পবিত্র নিঃস্বার্থ স্নেহ প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম। পিতার স্নেহ-প্রীতি অদৃষ্টে ঘটে নাই বটে, আমাদের মামা তাঁহার অন্তরের নিঃস্বার্থ ভালবাসা আমাদের প্রতি এত অধিক ঢালিয়া দিয়াছেন, যে, সে স্নেহ-ভালবাসা যাহারা সম্ভোগ করিয়াছে তাহারাই একমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে, অপরের বুঝিবার সাধ্য নাই। তিনি আমাদের পিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং পিতার অধিক যত্ন ও স্নেহে আমাদের প্রতিপালন করেন এবং আজীবন এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমাদের শারীরিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ-চিন্তা হইতে বিরত হন নাই।

আমাদের পরম পূজনীয় মাতুল মহাশয় ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে শুক্রবার পাবনা জেলার অন্তঃপাতী সাহাজাদপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতি অল্পবয়সেই পিতৃ-মাতৃহীন হন। আমার স্বর্গগতা জননীর মুখেই শুনিয়াছি, তাঁহাদের পিতা ও মাতা উভয়েই অতি ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। চারি পাঁচ বৎসরের শিশু পিতৃমাতৃহীন হইয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর (আমার জননীর) ক্রোড়ে আশ্রয় পাইলেন। মা কি তখন ভাবিয়াছিলেন এই শিশুভ্রাতাই তাঁহার সারাটা দীর্ঘজীবনের অবলম্বন হইবেন। প্রায় পঞ্চান্ন বৎসর এই চিরকুমার ভ্রাতার পরিচর্য্যা করিয়া মাত্র নয় মাস পূর্ব্বে প্রায় পঁচাত্তর বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। আমার মামারা পাঁচটি

* আদ্য শ্রাদ্ধবাসরে ভাগিনেয়ী শ্রীমতী বিনোদিনী চৌধুরী কর্ত্তৃক পঠিত। কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছে।

ভাইভগিনী ছিলেন। ইঁহার বড় আর এক মামা ছিলেন। সেই বড় মামা মাতামহীর দ্বিতীয় সন্তান। আমার এই মামা ছিলেন চতুর্থ। সকলের ছোট একটি ভগিনী। আমার মাতামহের নাম রামজয় ঘোষ। মাতামহীর নাম ৺ব্রহ্মময়ী। তাঁহারা দুজনই অতি শান্ত-প্রকৃতি, সরল দয়ালু ও সাধু চরিত্রের লোক ছিলেন। অতি কষ্টে বড়-মামা লেখাপড়া শিক্ষা করিয়া বৃহৎ পরিবারের ভার গ্রহণ করেন। তিনি অকালে মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে এই ছোটমামাকেই পরিবারের সকল ভার গ্রহণ করিতে হইল। বড়মামা হাজারিবাগে ডাক্তার ছিলেন। এখান হইতে অসুস্থ হইয়া দেশে গেলেন। তখন ছোটমামা হাজারিবাগ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এইখানেই তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেন। তাহার পর সরকারী বৃত্তি পাইয়া কলিকাতা সিটি কলেজ হইতে আই-এ ও বি-এ পাশ করিয়া পরিবারের ভার লইলেন। সাংসারিক অনটনের জন্য আর এম-এ পড়িতে পারিলেন না। অর্থোপার্জ্জনের জন্য চাকুরীতে প্রবেশ করিলেন। বড়মামা যখন ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন ছোটমামাও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। বড়মামার মৃত্যুতে বড় ভগিনীর তিন সন্তান, অর্থাৎ আমরা তিন ভাই বোন, এক বালবিধবা ভগিনী, বিধবা ভ্রাতৃবধূ সকলের ভার মামার উপর পড়িল। তিনি সকলকে দেশ হইতে লইয়া আসিলেন, কেবলমাত্র আমার মা কিছুকাল দেশে রহিলেন। মামা কনিষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণময়ীকে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়া বিবাহ দেন। তিনিও মাত্র বাইশ বৎসর বয়সে একটি কন্যা রাখিয়া পরলোকগমন করেন। বিধবা ভগিনীকেও ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ দেন, কিন্তু ভগিনীপতি তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরলোকগমন করিলেন। তখন এই অপোগণ্ড শিশুচতুষ্টয়ের ভারও তাঁহারই স্কন্ধে পড়িল। আমাদের দুই ভগিনীকে শিক্ষা দিয়া ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ দেন। কি ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতা, কিন্তু নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন তাহা সর্ব্বজনবিদিত, অথচ তিনি ছিলেন চিররুগ্ন, তিনি পঞ্চাশ পার হইবেন এ কথা কখনও তখন ভাবি নাই।

যে-বৃহৎ লাইব্রেরী তাঁহার বিদ্যার পরিচয়, তাহা রহিল, তাহা ত নির্জ্জীব। তিনি ছিলেন জীবন্ত লাইব্রেরী। আমার স্বামী বলেন, যে, যখনই কিছু জিজ্ঞাসা করা গিয়াছে তৎক্ষণাৎ বইখানি আনিয়া স্থানটি

পরলোকগত মহেশচন্দ্র ঘোষ

বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবিত থাকিতে যে লাইব্রেরী দিয়া এক মিনিটে কাজ হইত, এখন সেজন্য এক ঘণ্টা খাটিতে হইবে। আমার মামার চারি সহস্রাধিক গ্রন্থপূর্ণ বিশ হাজার টাকা মূল্যের এই লাইব্রেরী তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করিয়াছেন এবং যা কিছু নগদ রাখিয়া গিয়াছেন তাহাও এই লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নতিকল্পে ব্যয় করিবার জন্য আদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সকল প্রকার প্রাচীন ও নবীন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম্ম, ও সাধারণ

সাহিত্য, দর্শন, মনোবিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবনচরিত প্রভৃতি সকল প্রকার গ্রন্থই আছে। কিন্তু মামাকে বলিতে শুনিয়াছি এত দার্শনিক গ্রন্থ ভারতবর্ষের আর কোনো এক লাইব্রেরীতে আছে কি না সন্দেহ উপন্যাসের বইগুলি তিনি হাজারিবাগ ইউনিয়ন ক্লাবে ও আমাদিগকে দিয়া গিয়াছেন। মামার বিদ্যার পরিমাণ করিতে যাওয়া আমার ধৃষ্টতা। তিনি ইংরেজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পালি ও গ্রীক ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। যখন দেখিলেন খৃষ্টধর্ম্ম আলোচনা করিতে গ্রীক ভাষার সাহায্য প্রয়োজন, তখনই বৃদ্ধবয়সে ভগ্নশরীরে গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং কিয়ৎ পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন। খৃষ্টতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক অভিনব কথা তিনি শুনাইয়া গিয়াছেন। পালি ভাষা শিক্ষা করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অমূল্য উপদেশ-সকল জগতকে দান করিলেন। শ্রদ্ধেয় রামানন্দবাবু ঠিকই লিখিয়াছেন—"দেশের কল্যাণ তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যে যাহা করিয়াছেন তাহা লোকের উপলব্ধি করিতে সময় লাগিবে।" তাহার একটি কারণ এই বৌদ্ধ শাস্ত্র হইতে তিনি সংগ্রহ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও উপনিষদের ঋষিগণের ব্রহ্ম, এই দুইয়ের মধ্যে চল্লিশ পয়তাল্লিশটি স্বরূপের একতা রহিয়াছে। বুদ্ধদেবকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একরূপ নাস্তিকই সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার এই আবিষ্কারে সে মত অনেক পরিমাণে খণ্ডিত হইয়াছে। বাইবেল সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন কথা বলিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকের টীকা ও টিপ্পনীতে পণ্ডিতেরাও মুগ্ধ হইয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ঋষির দার্শনিক মত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অল্প কিছুদিন পূর্ব্বেও তিনি ভগ্নদেহে রুগ্নাবস্থায় গীতা-তত্ত্ব বিষয়ে যে-সকল সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পণ্ডিতদিগেরও গবেষণার বিষয়। বৈদিক ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট দখল ছিল। তাঁহার সমগ্র লেখাবলী সংগৃহীত হইলে বড় বড় গ্রন্থ হইবে। তিনি বিদ্যার্জ্জন করিয়াছেন জ্ঞানলাভের জন্য। সকল জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান তিনি লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্রহ্মধ্যান-নিরত ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের জীবন যাপন করিয়া অন্তে ব্রহ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া লোকান্তরিত হইয়াছেন। ব্রহ্মসঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি ভাবে বিভোর হইতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দুইটি ব্রহ্মসঙ্গীত করিতাম। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে তিনি কোন্ রাজ্যে চলিয়া যাইতেন, সে রাজ্যের খবর আমার জানা নাই। সঙ্গীতান্তে কোনো কোনো দিন তাঁহাকে যেন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছি। এমন কি, কোনো কোনো দিন ভয়ও পাইয়াছি।

জ্ঞানের এরূপ একনিষ্ঠ সেবক সচরাচর মিলে না। তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। জীবনে যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন জ্ঞানার্জ্জনে ব্যয় করিয়া গিয়াছেন। দারপরিগ্রহ করেন নাই বলিয়া যে তিনি পারিবারিক দায়িত্বভার গ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে। এ বিষয়েও তাহার ত্যাগ অতুলনীয়। যখন চল্লিশ টাকা মাত্র বেতন পাইতেন তখন ভাগিনেয়ীদিগকে কলিকাতায় বোর্ডিংয়ে রাখিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তখন তাঁহার প্রাতঃকালীন জলযোগ ছিল ভাত ও আলুসিদ্ধমাখা এক দলা। কিন্তু সেকথা তিনি আমাদিগকে জানিতে দেন নাই, পাছে আমরা খরচ কমাইয়া আপনাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত করি। এক ভাগিনেয়কে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইতেন। যখন তাহার এম-এ পরীক্ষার জন্য টাকা পাঠাইলেন, তখন মামার সেভিংস্ ব্যাঙ্কের খাতায় গোটাকয়েক পয়সা মাত্র রহিল। সেদিনও এক ভাগিনেয়—যে তাঁহার অনুমতি না লইয়াই বিদেশ চলিয়া গিয়াছে, তাহার দুরবস্থার কথা শুনিয়া অনেক টাকা পাঠাইলেন, যদিও সে তাঁহার কাছে টাকা চাহিতে সাহস করে নাই। কোন প্রার্থী তাঁহার নিকট আসিয়া প্রত্যাখ্যাত হয় নাই। যদি কেহ ধার করিতে আসিত এবং বুঝিতেন যে তাহার ধার শোধ করিবার ক্ষমতা নাই, পুনরায় ফিরিয়া পাইবার আশা ত্যাগ করিয়াই তাহাকে টাকা দিতেন। তিনি নিজে কষ্টে পড়িয়াও কখনও ঋণ করেন নাই। দোকানদারের টাকা মাস পড়িবামাত্র দিয়া আসিতেন। কোনো পাওনাদার টাকার তাগাদায় কখনও তাঁহার বাড়ী আসে নাই। সকল সৎকার্য্যে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন।

ভ্রাতা ও ভগিনীর নামে যে ফণ্ড করিয়াছেন, মৃত্যুর এই ক'দিন পূর্ব্বেও তাহাতে দুইশত টাকা দিয়াছেন। তাঁহার বিশাল হৃদয়ে তিনি সমগ্র প্রাণীজগতকে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিরামিষাশী ছিলেন, জীবে দয়ার জন্যই তিনি বলিতেন—"যদি আমাকে মদ ও মৎস্যমাংসের অন্যতরকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করে তাহা হইলে আমি মদই গ্রহণ করিব, মৎস্যমাংস গ্রহণ করিব না।" সাধারণতঃ মানুষেরা মনে করে, চাকরবাকরকে দশ পাঁচটাকা দিয়া কিনিয়া ফেলা হইয়াছে। তাহাদের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করা অন্যায় হয় না। তিনি অন্য অপেক্ষা অধিক বেতন দিতেন। তিনি চাকরবাকরের কদর বাড়াইয়া দিতেছেন বলিয়া বন্ধুদের মিষ্ট অনুযোগও তাঁহাকে সহিতে হইয়াছে। তবুও তাহাদের দ্বারা একটু বেশী কাজ করাইয়া লইতে হইলে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের আহার্য্য প্রস্তুত করাইয়া রাখিতেন। তাঁহার অতিথি-সৎকারের কথা এক বন্ধু যাহা লিখিয়াছেন তাহাই পাঠ করিতেছি—

"গত ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে হাজারিবাগে শ্রদ্ধেয় মহেশবাবুর সহিত পরিচিত হই। প্রথম পরিচয়েই তাঁহার সরলতা, অকপট প্রাণখোলা হাস্য, ও স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হই। দেখিলাম কঙ্কালসার দেহখানির মধ্যে এক মহাপ্রাণ প্রেমবাহু প্রসারিত করিয়া বিশ্বমানবকে আলিঙ্গন করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। যতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম, ততই এই প্রেমের অভিনব অভিব্যক্তির পরিচয় পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, তাঁহার এই প্রেম নিঃস্বার্থ ও উদার। হাজারিবাগের আপামরসাধারণ নরনারী বালক বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার এই প্রেমে মুগ্ধ ও বশীভূত। পীড়িতের গৃহে প্রেমিক মহেশচন্দ্রের সাদর কুশল সম্ভাষণ ও প্রাত্যহিক পরিদর্শন তাঁহার দৈনন্দিন কার্য্য। জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। বিদ্যালয়ের ছাত্রগুলির তিনি ঐকান্তিক হিতাকাঙ্ক্ষী ও অকপট সুহৃদ। তাঁহার গৃহে ছাত্রগুলির অবাধ প্রবেশাধিকার। গুরু ও শিষ্যের পবিত্র সম্বন্ধ যে এমন সৌহার্দ্দবন্ধনে সুশীতল ও সুমধুর হইতে পারে তাহা পূর্ব্বে দেখি নাই। দেখিলাম মহেশচন্দ্রের প্রেমের এই এক অপূর্ব্ব পরিণতি। দরিদ্রগণকে ঔষধ-বিতরণ তাঁহার নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। অভাবগ্রস্ত ও বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য প্রদানে তিনি অকাতর। চিররোগী চিরউদাসীন, অথচ লোকের দুঃখ বিমোচনে সদাই তৎপর। তাঁহার কোমলতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—উপাধিতে তাঁহার কোনই আসক্তি ছিল না, বরং তাহার বিপরীত। কিন্তু পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়া যখন তাঁহাকে বেদান্তরত্ন উপাধি দিলেন তখন স্বীকার না করিলে উপাধিদাতাকে অসম্মান করা হয়, কেবল এই বিবেচনাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ---

"সজ্ঞানে কাহারও প্রতি অবিচার করিতে তিনি স্বভাবতঃই অপারগ ছিলেন। কিন্তু অন্যের অন্যায় অবিচার অম্লানবদনে সহ্য করিতে পারিতেন। যাহারা ঘর পুড়াইয়া দিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিল, তাহাদের প্রতিও শত্রু শব্দ ব্যবহার করিতে দিলেন না। কিন্তু অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহাদের ছেলেপুলের সাহায্য করিয়াছেন।"

আমার মামাকে প্রাণ খুলিয়া যাহারা হাস্য করিতে দেখিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সরল প্রাণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। প্রাণ নিষ্পাপ ও অকলঙ্ক না হইলে এমন হাসি বাহির হয় না। একবার এখান হইতে কলিকাতা যাইবার সময় সব ঠিক্‌ঠাক্ করিয়াও মোটরকারের গোলমালে যাওয়া হইল না। মামা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোমাদের আজ যাওয়া হ'ল না।' আমি বলিলাম, 'আপনি হাসছেন, মামা, আমার কিন্তু ভাল লাগছে না।' মামা যেন একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'আমি ত ওরকম হেসেই থাকি।' হাস্যামোদে তিনি যোগ দিতেন। তিনি সুরসিক ছিলেন। তবে আনন্দ অপেক্ষা জীবনের পূর্ণতাকে লক্ষ্যস্থলে রাখিতেন। সেইজন্য 'আমি বাছিয়া লব না তোমারই দান,' রবিবাবুর এই গানটি তাঁহার অতি প্রিয় ছিল।

আমার মামার দেহ যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন শারীরিক বল তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু

আলস্যকে তিনি প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতেন। বিশৃঙ্খলতা তাঁহার ছিল না। নিজের কাজ নিজে গুছাইয়া করিতেন। অলস ব্যক্তি কখনও সময়মত কাজ করিতে পারে না। কিন্তু মামার দৈনন্দিন কার্য্য দেখিয়া অন্যেরা ঘড়ি মিলাইতে পারিত, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাকে কোনো পুস্তকের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে শায়িত থাকিলেও তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইয়া বই লইয়া আসিতেন। শত সহস্রবার ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। মামাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি মানুষের শক্তি তার দেহে নয়—মাথায়। মাথাটা শরীরের ক্ষীণতার অনুপাতে এমনই বড় ছিল যে, পাগড়ী পরিয়া দাঁড়াইলে তাঁহাকে পাঞ্জাবী, শিখ বলিয়া মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে শীতে তিনি পাগড়ী পরিতে বাধ্য হইতেন। মামা মনের জোরে বাঁচিয়া থাকিতেন ইহাই বিশ্বাস করিতে হয়। আহার-বিষয়ে এমন সংযম ও লোভদমন দেখা যায় না। ঘ্রাণ ও স্বাদ গ্রহণ শক্তি ছিল অত্যধিক। সন্দেশ চাখিতে দিলে চুষিয়া ফেলিয়া দিতেন। বলিতেন, 'জিনিষটা কি তা ত জানাই হ'ল, খাইয়া পেট ভারী করিবার প্রয়োজন কি?' এই আহার-সংযমই তাঁহাকে বাষট্টি বৎসর বাঁচাইয়া রাখিয়াছিল এবং এই অনাহারজনিত শীর্ণতার জন্যই কোন ওষুধপথ্য পরিণামে কার্য্যকরী হইল না, ইহাই অভিজ্ঞদের অভিমত। যাঁহারা তাঁহার খাদ্যের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, কি করিয়া তিনি এত বৎসর ধরিয়া এমন গুরুতর মানসিক শ্রম করিতে সমর্থ হইয়াছেন। হস্তপদাদির পরিচালন শক্তি যখন চলিয়া গেল, তখনও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার বিরাম হয় নাই। বসিবারও শক্তি নাই, শুইয়া শুইয়া বাড়ীর প্রত্যেক মানুষটির স্নানাহারের খবর লইতেছেন, মনোমত না হইলে ব্যবস্থা করিতেছেন। মৃত্যুর পূর্ব্বদিনও যে-বন্ধু তাঁহাকে সকালে টাট্‌কা গরুর দুধ খাওয়াইতেছিলেন, মাখনওয়ালাকে ডাকিয়া উক্ত বন্ধুকে ঘি করিয়া দিবার জন্য মাখনের ফরমাস দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, একটা নূতন বয়েম কিনিয়া তাহাকে ঘি উপহার দিতে হইবে। যখন সামর্থ্য ছিল, নিজে যাইয়া দেখিতেন কে কি খাইতেছে। এখন শুইয়া শুইয়াই বলিয়া পাঠাইতেন যে—যাহা আছে তাহা যেন সকলেই সমানভাবে ভাগ করিয়া খায়। পুরুষেরা খাইয়া গেলে যা থাকে তাই নারীরা খাইবেন, এই ব্যবস্থা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। এজন্য কত সময়ে না তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে খাইতে হইয়াছে। কোনো কাজই নিজে হাতে না করিলে তাঁহার তৃপ্তি হইত না। অন্যের সাহায্য লইতে তিনি নারাজ ছিলেন। মামা আমার কেবল দার্শনিক পণ্ডিত ছিলেন না, সাংসারিক সকল কাজেই পটু ছিলেন। জামা কাপড় মোজা নিজে হাতে রিপু করিতেন। আমরা যদি করিতে চাহিতাম, বলিতেন, তোমরা পারিবে না। তাঁর নিজের হাতে তৈয়ারী মশারি আজও ঘরে রহিয়াছে। উঠিবার ক্ষমতা নাই, "মেজদি বাতের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছেন"—অমনি উঠিয়া নিজ হস্তে ওষুধ প্রস্তুত করিয়া দিলেন। ওষুধ প্রস্তুত করিয়াই ক্ষান্ত নন, ওষুধ নিয়ম-মত ব্যবহার করা হইতেছে কি না তাহার খোঁজও লইতেন। তিনি যখন একেবারে অসমর্থ হইলেন তখন আমি বলিলাম—ইজিচেয়ারে মাথার কাছে শুইয়া থাকি। মামা তখন অশ্রুনয়নে বলিলেন—"মা, আমার অনুতাপের মাত্রা আর বাড়িও না।" দুদিন আগে বলিলেন—"আমার জন্য তোমরা বড়ই কষ্ট পাইতেছ। আর বেশী দিন নাই—দু একদিন মাত্র।" কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিল, তৃতীয় দিন আসিতে দিলেন না। অন্যের কষ্ট দেখিতে পারিতেন না, কিন্তু নিজের কষ্টসহিষ্ণুতা ছিল অসাধারণ। এই যে এতদিন ভুগিলেন, একদিনের তরে একটা উঃ আঃ কাতরোক্তি সজ্ঞানে অজ্ঞানে মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। শুশ্রূষাকারীদের পক্ষে বিপদ হইত। একদিন গভীর নিঝুম রাত্রে আমরা আস্তেই বলিয়াছিলাম - মামার ত কোনো সাড়া নাই। বিছানা হইতে উত্তর আসিল—"আ-মি ম-রি নাই।" মৃত্যুর দিন প্রথম রাত্রিতে তাঁকে জানাইলাম, কাল ডাক্তার আনিয়া পরামর্শ করা যাইবে। তিনি বলিলেন—আর কি হবে? তাঁহার কথা তখনও বুঝি নাই। শেষরাত্রে মাসিমাকে ডাকিয়া বলিলেন—মেজদি, বিনো ধীরেনবাবুরা

সকালে ডাক্তার আনতে চান্—তা আন্‌বেন! তখনও বুঝিলাম না যে, ইহার অর্থ—ডাক্তার আনিতে তিনি আর আমাদের অবসর দিবেন না। মৃত্যুর দশ ঘণ্টা আগে রাডকের প্রকাণ্ড বইখানি জীর্ণ বুকের উপর রাখিয়া আমার রাত্রি জাগরণের ওষুধ নির্দ্ধারণ করিলেন, অন্য কাহাকেও করিতে দিলেন না। বুদ্ধিবৃত্তি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ ছিল, কিছুই ভুল হয় নাই। বৃহৎ লাইব্রেরীর কোন্ পুস্তক কোথায় তাহা শেষ পর্য্যন্ত নির্দ্দেশ করিতে পারিতেন। এই লাইব্রেরীর চারিদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। সে চক্ষু খুলিলেন পরপারে যাইয়া। আন্দাজ তিন ঘণ্টা আগে ডানহাতে ঘড়ি ধরিয়া বাঁ-হাতে ডান হাতের নাড়ী ধরিয়া বলিলেন—"বড় thready pulse, গণা যায় না।" আমার স্বামীকে বলিলেন—"আপনি ভাল নাড়ী দেখতে পারেন না।" বড় ঘামিতেছিলেন, দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে বেশ শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমাদের সাহায্যে জামাটা ছাড়াইয়া লইলেন। এতক্ষণও কথা বলিতেছিলেন। এইবার কথা বন্ধ হইল। জ্ঞান তখনও ছিল। বুকের উপর হাত দুখানি রাখিয়া যেন ঘুমাইলেন। বসিবার ক্ষমতা ছিল না—এরূপভাবে বসিলে যোগস্থই মনে হইত। মৃত্যুর কোনো উৎপাতই লক্ষিত হইল না। এইরূপ অবস্থায় (১২ই জুন, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ বৃহস্পতিবার) ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে মামার অমর আত্মা ব্রহ্মলোকবাসী হইলেন। এ লোকে হাহাকার, সে লোকে আনন্দধ্বনি!

পুস্তক পরিচয়

রবীন্দ্র সাধনা—শ্রীশিবকৃষ্ণ দত্ত প্রণীত ও প্রকাশিত। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা সম্বলিত।

'রবীন্দ্র-সাধনা'য় লেখক কবির কাব্যসাধনার আলোচনা করেন নাই, কাব্যের ভিতর দিয়া কবির যে অধ্যাত্ম সাধনা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কাজেই 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালী', 'বলাকা' অপেক্ষা তাঁহাকে 'গীতাঞ্জলী' 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য' প্রভৃতি লইয়াই বেশীরকম আলোচনা করিতে হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন, তিনি ভক্ত ও দার্শনিক। কাব্যের যেখানে তিনি নিছক কবি নহেন, সেই সব স্থানগুলি বুঝিবার ও উপভোগ করিবার পক্ষে পুস্তকখানি সাহায্য করিবে। পরিচ্ছেদগুলির নামকরণ সম্বন্ধে আর একটু সতর্ক হইলে ভাল হইত। 'প্রতিভার উন্মেষ' আরম্ভ হইয়াছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে' এবং শেষ হইয়াছে 'দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী'তে। কবির অধ্যাত্মবাদ, কবিধর্ম্ম ও ভগবৎপ্রেম, কবির জগৎ, কবির কল্পলোক প্রভৃতি কয়টি প্রবন্ধে বইখানি সমৃদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

সহজ পাঠ। প্রথম ভাগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য পাঁচ আনা। সচিত্র।

সহজ পাঠ। দ্বিতীয় ভাগ—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য সাড়ে তিন আনা। সচিত্র।

এই দুটি বই কলিকাতায় ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে পাওয়া যায়। যে সব শিশুর সবে মাত্র হাতেখড়ি হইয়াছে, তাহাদের জন্য কবি এই দুখানি বহি লিখিয়াছেন। ইহা তাহারা আনন্দের সহিত দেখিবে এবং দেখিতে দেখিতে পড়িতে শিখিবে;—পড়িয়া আনন্দ পাইবে।

বহি দুখানির কবিতাগুলিতে কবিত্ব আছে, রবিবাবুর বহি হইলেও ইহা বলা দরকার এই জন্য, যে, অনেক বুদ্ধিমান্ লোকও ছোট ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া কিছু লিখিতে গিয়া এমন জিনিষ লেখেন যা সাহিত্য নয়। রবিবাবু শিশুদের জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহাদের ভাল লাগিবে, বুড়োদেরও ভাল লাগিবে। গদ্য গল্পগুলিও, অক্ষর পরিচয় এবং বানান শিখাইবার জন্য লিখিত হইলেও, উপভোগ্য।

ভানুসিংহের পত্রাবলী—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মূল্য এক টাকা। বিশ্ব-ভারতী-গ্রন্থালয়। ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

এই বহিখানির উৎসর্গে লেখা আছে—"এই পত্রগুলি দিয়ে যে পত্রপুট গাঁথা হ'য়েচে তার মধ্যে রাণুর প্রতি ভানুদাদার আশীর্ব্বাদ পূর্ণ রইলো।"

এই রাণুকে ভানু দাদা যখন চিঠিগুলি লিখিয়াছিলেন, তখন রাণু এত ছোট ছিল, যে, তাহাকে একথা বলিলে তাহার রাগ ও হিংসা হইত, যে, রবিবাবু কেবল তাহারই একার বন্ধু নহেন, এণ্ড্রুজ সাহেবকেও তিনি বন্ধু মনে করেন এবং হয়ত বর্ত্তমান সমালোচককেও কতকটা তাই মনে করেন। এখন সেই রাণু বড় হইয়াছে এবং সব কথা বুঝিতে শিখিতেছে। কিন্তু বোধ হয়, এই চিঠিগুলি চিরকাল তাহার কাছে সরস থাকিবে; কারণ বৃদ্ধ সমালোচকের কাছেও এগুলি অপূর্ব্ব ঠেকিতেছে। অনেক ভাষার অনেক সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় নাই; কিন্তু অল্প যাহা আছে, তাহাতে বলিতে পারি ছোট একটি মেয়েকে লেখা বৃদ্ধের এমন চিঠি বাংলা ছাড়া আর কোন সাহিত্যে আছে বলিয়া শুনি নাই।

অনেক পাঠক আছেন—বিশেষতঃ আজকালকার দিনে—যাঁদের রাষ্ট্রনৈতিক জিনিষ ছাড়া আর কিছু ভাল লাগে না। বহিখানির

একটা পাতা হঠাৎ চোখে পড়িল। তাহাতে দেখি, রাষ্ট্রনীতিগ্রস্ত লোকদের জন্যও কিছু খোরাক আছে। যথা—

"আকাশের এই প্রতাপ আমি একরকম করে সইতে পারি, কিন্তু মর্ত্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না। তোমরা তো পাঞ্জাবে আছো, পাঞ্জাবের দুঃখের খবর হয় ত পাও। এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে। ভারতবর্ষে অনেক পাপ জমেছিলো, তাই অনেক মার খেতে হচ্চে। মানুষের অপমান ভারতবর্ষে অভ্রংভেদী হয়ে উঠেচে। তাই কত শত বৎসর ধরে মানুষের কাছ থেকে ভারতবর্ষ এত অপমান সইবে, কিন্তু আজও শিক্ষা শেষ হয় নি। ইতি, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৬।"

সীবনী—শ্রীমতী ইন্দুসুধা ঘোষ, শান্তিনিকেতন, বোলপুর। মূল্য আট আনা। শান্তিনিকেতনের কারুসংঘ দ্বারা প্রকাশিত।

কলিকাতায় বুক কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়। এই বহিখানির 'পরিচয়ে' শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেনঃ—"শ্রীমতী ইন্দুসুধার আঁকা এই সেলায়ের নমুনাগুলি শুধু ছাপার কাগজে ও কালিতে থাকবার জিনিষ নয়, এগুলির যথাযথ ও যথোপযুক্ত স্থান হচ্ছে মেয়েদের অঙ্গবাথায়। সোনা ও বিচিত্রবর্ণের সূত্রে গাঁথা হওয়াতেই এদের সার্থকতা। আমি শ্রীমতী ইন্দুসুধার এই শিল্প ও কারুকার্য্যের সম্যক্‌রূপ আদর কামনা করি।"

র. চ.

"কৃষি-বিজ্ঞান"—রায় রাজেশ্বর দাশগুপ্ত বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রণীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ২৩৮ পৃষ্ঠা। মূল্য তিন টাকা (?)।

এই পুস্তকে ১০৮ পৃষ্ঠাব্যাপী মোটামুটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে এবং ১৩০ পৃষ্ঠা ধরিয়া কৃষি-বিজ্ঞানের কতক কতক বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইয়াছে। যখন উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এত বেশী আলোচনা করা হইয়াছে তখন এই পুস্তকের "কৃষি-বিজ্ঞান" নাম ঠিক হয় নাই। অধ্যাপক নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ভূপালচন্দ্র বসু কৃষিবিভাগের এসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাকৃত-বিভাগের শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও সরকারী কৃষিবিভাগের শ্রীযুক্ত নির্ম্মলকুমার দেব বইখানি দেখিয়াও দিয়াছেন। তবুও এই পুস্তকে বানান ভুল আছে, সে সব শুদ্ধিপত্রের অন্তর্গত করা হয় নাই—যেমন "Thalophyte," "Pterydophyte," "Bacilus," "Nyrotaceae" প্রভৃতি। বানান ভুল পূর্ণ পুস্তক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত করা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে লজ্জার কথা। ভারতবর্ষে প্রচলিত কতকগুলি উন্নততর লাঙ্গলের চিত্র যেখানে দেওয়া হইয়াছে, লাঙ্গলের বর্ণনা অনুযায়ী চিত্রগুলি সেখানে ঠিক পর পর সাজান নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে প্রচলিত "পাভার" নামক একটি বপন-যন্ত্রের নির্ম্মাণ-প্রণালী দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গে ঐ যন্ত্রের একটি চিত্র দিলে পাঠকদিগের বোঝা সোজা হইত। কয়েকটা জলসেচন-যন্ত্রের ব্যবহার-বিধির সঙ্গে উহাদের চিত্র দেওয়া উচিত ছিল।

ঐ পুস্তকের ভূমিকায় অধ্যাপক গঙ্গোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "এই ধরণের কোন পুস্তক বাংলা ভাষায় নাই।" বাংলা ভাষায় ইহা অপেক্ষা ভাল ও নির্ভুল বহু পুস্তক, যেমন মিঃ এন্‌. জি, মুখার্জি প্রণীত "সরল কৃষি-বিজ্ঞান," মূল্য ১৲ টাকা ও কৃষি-তত্ত্ববিৎ বাবু প্রবোধচন্দ্র দে প্রণীত "কৃষি ক্ষেত্র" (সপ্তম সংস্করণ) মূল্য দেড় টাকা, "মৃত্তিকা তত্ত্ব" (দ্বিতীয় সংস্করণ) মূল্য দেড় টাকা, "উদ্ভিদ খাদ্য" মূল্য ৷৷০ আনা, "উদ্ভিদ জীবন" মূল্য ৷৷০ আনা প্রভৃতি প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীসত্যশরণ সিংহ

বাতায়ন—শ্রীউমা দেবী প্রণীত। ১৫, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা, এম সি-সরকার এণ্ড সন্স-এর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য। মূল্য এক টাকা।

এখানি কবিতার বই। ইহাতে চাল্লশটি চতুর্দ্দশপদী কবিতা আছে। পুস্তকখানি সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য্যে মনোহর করিতে যত্ন ও অর্থব্যয়ের ত্রুটি করা হয় নাই। মোটা বাদামী রংের কাগজে নূতন পাইকা টাইপে লাল কালিতে পরিষ্কার ছাপা। মলাটে একখানি ছোট ছবি, বাতায়ন-পার্শ্বে এক তরুণী। স্বীকার করিতেছি বইখানি পড়িবার জন্য তুলিয়া লইবার সময় মন একটু দ্বিধাগ্রস্ত হইয়াছিল। ভাবিয়াছিলাম এ নিশ্চয় আধুনিক নারী লিখিত আধুনিক কবিতা—ঝাঁঝালো ধারালো স্পষ্ট অসঙ্কোচ। যখনকার যা। বাঙ্গালী মেয়ের চিরন্তন সলজ্জ ভঙ্গীটি যদি কবিতা-রাজ্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াই থাকে, ত করিয়াছে, দুঃখ করিয়া লাভ কি? সত্য কথাটা কেমন করিয়া প্রিয়ভাবে বলা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে বইখানি পড়িতে বসিলাম। পড়িতে পড়িতে মন যে কখন এই ছোট কবিতাগুলির মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা জানিতেও পারি নাই। এক একটি কবিতা যেন এক একটি করুণ ছোট গল্প, পড়া শেষ হইয়া গেলেও মনে হয় তার পর, তার পর। অলঙ্কারের প্রাচুর্য্য নাই, শব্দের ঘটা নাই, ছন্দ মিলের আড়ম্বর নাই, তবুও এই চতুর্দ্দশপদীগুলির শান্তসমাহিত শ্রী মনকে মুগ্ধ করে। মানব-সম্পর্ক লইয়াই সকল কবিতার গৌরব। জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, দিনেকের হাসি-কান্নাই কাব্যের সম্পর্কে আসিয়া অমূল্য ও অসামান্য হইয়া উঠে। গয়লা মেয়ে, মজুর বউ, ভিখারী ছেলে, পীড়িত শিশু, বুড়া চাকর, ময়রা বধূ—এমনি সব পাত্র-পাত্রী। ইহাদের প্রতিদিবসের অতি সাধারণ সুখ-দুঃখ লেখিকার করুণা-কোমল দৃষ্টি এবং সরল কৌতুহলের ভিতর দিয়া দেখা দিয়াছে বলিয়াই সেগুলি আমাদের প্রাণকে এমন-ভাবে স্পর্শ করে। পুস্তকে রবীন্দ্রনাথ লিখিত একটি ছোট ভূমিকা আছে।

রামপ্রসাদ—শ্রীকেশবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত। চাতরা শীতলা হোমিও হোম হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

ধর্ম্মমূলক নাটক। ভক্ত সাধক রামপ্রসাদ নাটকের নায়ক। গ্রন্থকারের ভক্তি আছে। কিন্তু গ্রন্থে নাটকত্ব নাই।

আত্মসমর্পণ যোগ—শ্রীমতিলাল রায় প্রণীত, এবং ২৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থকার সুলেখক। অতএব রচনা হিসাবে বইখানা ভালই হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থকারের চিন্তা সকল স্থানে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, এ কথা বলিতে পারি না। "এই সিদ্ধ জীবনের গোড়ার কথা—আত্মসমর্পণ। নীচের টানকে উপরে উঠাইয়া, উহা ভাগবত প্রবাহ-রূপে সৃষ্টি করার ইহা সিদ্ধ নীতি। সেইখানেই যদি চুরি হয়, অহংকার বাঁচিয়া যায়; তাহা হইলে আর নবজন্ম লাভের আশা কোথায়?"

টানকে উঠানো কি? জীবনকে ভগবানের দিকে প্রবাহিত করাই কি ভাগবত-প্রবাহ? 'টান' এবং 'প্রবাহে'র পরই 'চুরি'? এই ধরণের সাঙ্কেতিক রচনার দোষ এই, লেখার টানে চিন্তা ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। গ্রন্থলেখক বলিতে চান, ধর্ম্ম যুক্তি-তর্কের কথা নয়, উপলব্ধির বিষয়, এবং নিগূঢ় সাধনতত্ত্বের অধিকারী হইতে হইলে গুরুই একমাত্র সহায়। কথাটা আংশিকভাবে সত্য। জ্ঞান হইতে ধর্ম্মকে পৃথক করিলে, ধর্ম্ম অন্ধকার রহস্যবাদে পরিণত হয় মাত্র। গ্রন্থকার স্থানে স্থানে নিজের সাধনা ও ধর্ম্মজীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই ছায়াময় ভাষা ও রচনাভঙ্গীর অন্তরালে সব কথাই রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

ধর্ম্ম বিজ্ঞান—শ্রীকামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ৪৪ নং নিউ থিয়েটার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার যে একজন প্রবীণ চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহার পরিচয় পুস্তকের সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। এ যুগে আমরা সত্যকে সর্ব্বত্র খণ্ডিত-ভাবে দেখিতে পাই, সেজন্য সত্যের অখণ্ড অবিরোধী রূপ আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ সেই রূপটিরই ভিতর দিয়া সত্যের চিরন্তন মূর্ত্তি-পরিগ্রহ চলিতেছে—ব্যষ্টি সমষ্টিতে পরিণত হইতেছে। "দেশ কাল ও পাত্রভেদে মানবসমাজের কল্যাণের জন্য যুগে যুগে যে-সকল খণ্ডভাব প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই সমবায়ে জগতে একটি অখণ্ড-ভাবের ক্রমবিকাশ হইতেছে"—এই গভীর তত্ত্বটি গ্রন্থকার পরিস্ফুট করিয়া এক বিশ্বজনীন "প্রেমপরিবার" গঠনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সকলে পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

ক. ন.

বুকের ভাষা—শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী। গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস। ৪১।১।১ সি মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্। পৃষ্ঠা ১১৫, মূল্য এক টাকা।

ছোট গল্পের বই, চৌদ্দটী গল্প আছে। গল্পগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যাইতে পারে, কতকগুলি রূপক শ্রেণীর Prose Poem, বাকীগুলির বিষয় বাস্তব জীবন। কয়েকটি গল্প সত্যই ভাল লাগিয়াছে, বিশেষ করিয়া 'শরতের স্বপ্ন' ও 'বাড়ীর বৌ'। শেষোক্ত চিত্রটিতে বাঙ্গালী সংসারের পতিপুত্রহীনা তরুণী বিধবার দৈনন্দিন জীবনের কঠোরতা কি সুন্দর ফুটিয়াছে! লেখকের হাত মিষ্ট বলিয়াই একটা কথা এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করি। শেষের গল্পটিতে এমন কতকগুলি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, যেগুলি শ্লীলতা বজায় রাখিয়া সাহিত্যে ব্যবহার করা দুরূহ। শব্দগুলি বাদ দিলেও গল্পের আখ্যান-বস্তু ক্ষুণ্ণ হইত না। আশা করি পরবর্ত্তী সংস্করণে লেখক এদিকে দৃষ্টি রাখিবেন।

বিদ্যুৎ লেখা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সরকার। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্। পৃষ্ঠা ২০৮। মূল্য দুই টাকা।

উপন্যাসখানির ভাষা বেশ ঝরঝরে, কিন্তু পড়িয়া তেমন আনন্দ পাইলাম না—তাহার প্রধান কারণ আগাগোড়া কৃত্রিম ঘটনা ও কৃত্রিম চরিত্র-সৃষ্টিতে বইখানি পরিপূর্ণ। পড়িতে পড়িতে মনে হয় জীবনের বাস্তবতার দিককে বাদ দিয়া একটা প্রচারের ঝোঁকে বাছিয়া বাছিয়া লেখক এমন কতকগুলি ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, যাহা তাঁহার প্রচার-কার্য্যের পরিপোষক। মন হইতে এই unreality'র ভাবটকু কিছুতেই দূর হয় না। তারিণী রায়, শিবনাথ, বিজয়, সতীশ—ইহারা সকলেই প্রচার-কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য যতটুকু ও যে ধরণের কথাবার্ত্তা বলা প্রয়োজন, তাহা ছাড়া অন্য রকমের কথা কেহ বলে নাই। এই কৃত্রিমতার আবহাওয়ায় বইয়ের কোনো চরিত্রই তেমন ফুটিতে পারে নাই।

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হাইড্রোপ্যাথি বা জলচিকিৎসা—স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি-এল প্রণীত। ষষ্ঠ সংস্করণ, ২০।এ কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী ষ্ট্রীট, বাগবাজার, কলিকাতা হইতে এন্ সি, ব্রাদার্স এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, ১৬৪ পৃষ্ঠা, মূল্য ১।০

লুই কুনে নামক একজন জার্ম্মান পণ্ডিত মাটী, জল, রৌদ্র অগ্নি ও হাওয়ার সাহায্যে যাবতীয় রোগ চিকিৎসার বিধান আবিষ্কার করিয়াছেন। জলের সাহায্যই সর্ব্বত্র অধিক পরিমাণে আবশ্যক বলিয়া উক্ত প্রণালীর নাম "জলচিকিৎসা" দেওয়া হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে সুস্থ ও অসুস্থ শরীরের লক্ষণ, পাঞ্চভৌতিক দেহ ও তাহার সংক্ষিপ্ত তত্ত্ব, মনুষ্যদেহের সহিত মাটীর, জলের, উত্তাপের, বায়ু ও ব্যোমের বিভিন্ন সম্বন্ধ, বিবিধ প্রকারের স্নান-প্রণালী, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে সরল উপদেশ প্রভৃতি অনেকগুলি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে কয়েকখানি আরোগ্য-সংবাদসহ "সার্টিফিকেট" এবং পুস্তকের ভিতরে প্রকাশকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত, ইংরেজী ও বাঙ্গালা দুইখানি সাময়িক পত্রিকারও বিজ্ঞাপন দেখা যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সহিত বিজ্ঞাপনের বাহুল্য দেখিলে সমস্ত জিনিষটাকে "ব্যবসাদারী" বলিয়া মনে হয়। স্বভাব-চিকিৎসা সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাসের কোনও কারণ নাই, পুস্তকখানিও লোকের কাছে আদৃত হইয়াছে ও হইবে বলিয়া আমাদের মনে হয়; কিন্তু এই দৃষ্টিকটু বিজ্ঞাপনগুলি আগামী সংস্করণে বর্জ্জিত হইলে পুস্তক-খানির বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধিতই হইবে।

সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত পুস্তক

১। গুরু নানক—শ্রীরাখালদাস কাব্যানন্দ
২। শান্তির উপায়—শ্রীকেশবলাল সাধু
৩। শতদল- শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য
৪। জগন্মাতা—শ্রীরুক্মিণী দেবী
৫। চকুলো—সীতানাথ ব্রহ্মচৌধরী
৬। হুন্দাদার—রায় তারকনাথ সাধু বাহাদুর
৭। পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত সমিতি
৮। কলরব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ
৯। রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ—শ্রীঅজয়কুমার ভট্টাচার্য্য
১০। কাচ ও মণি—মৌলভী একরামদ্দিন
১১। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ সেন
১২। শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণের দাম্পত্য জীবন—শ্রীমতিলাল রায়
১৩। পথের গান—মহীউদ্দীন
১৪। জীবনীকোষ—শ্রীশশিভূষণ বিদ্যালঙ্কার
১৫। চায়ের ধোঁয়া—অধ্যাপক শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
১৬। আলোর পাহাড়—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সেন
১৭। কালুসর্দ্দার— ঐ
১৮। বিষুর বিভব—শ্রীপঞ্চানন মিত্র

বিদায়ের অর্ঘ্য

শ্রীকামিনী রায়

[পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয়ের কঠিন পীড়ার সংবাদ পাইয়া রচিত, কিন্তু রচয়িত্রীর নিজের অসুস্থতা ও স্থানান্তর গমন বশতঃ ইহা যথাকালে যথাস্থানে নিবেদিত হইতে পারে নাই।]

হে পূতচরিত বন্ধু, হে ভ্রাতৃপ্রতিম হিতকারী,
চির-নিরলস কর্ম্মী, জ্ঞানের তপস্বী, ব্রহ্মচারী,
তোমার জীবনসূর্য্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
নিভৃত হৃদয়ে মোর কত স্মৃতি নীরবে উথলে।
কত শ্রদ্ধা দিনে দিনে এ অন্তরে লভিয়াছে ঠাঁই ;
কত কৃতজ্ঞতা, যারে জানাইতে ভাষা মিলে নাই ;
কত না বিস্ময় হেরি ভগ্নদেহে অজেয় উদ্যম
তেজস্বী আত্মার তব। জ্ঞানার্জ্জনে করিয়াছ শ্রম
জ্ঞানের আনন্দ লাগি। নানা দ্বন্দ্ব কোলাহল মাঝে
অক্ষুণ্ণ রেখেছ নিত্য চিন্তায়, কথায়, সর্ব্বকাজে
অন্তরে স্বাধীনতা। কাহারেও কর নাই ভয়,
স্নেহ বাঁধে নাই মোহে ; অন্ধ ভক্তি, অযথা সংশয়
প্রোজ্জ্বল মানস দীপ পারে নাই করিতে মলিন
অথবা নির্ব্বাণ। তুমি ক্ষুরধার পথে চিরদিন
চলিয়াছ অবহিত, দিয়া সেবা, বিলাইয়া স্নেহ
বিপন্ন পথিকে—তাও দূর হতে জানে নাই কেহ ;
যারে দেছ তার কাছে প্রতি-দান চাহ নাই কভু
নির্ম্মুক্ত ভাণ্ডার তব ভরিতেন জীবনের প্রভু।

নাহি পত্নী, নাহি পুত্র, তথাপি নিঃসঙ্গ নাহি ছিলে,
দেহী ও বিদেহী ঋষি, স্বদেশী, বিদেশী সাধু মিলে'
দিয়াছেন পুণ্য সঙ্গ। গেহে তীর্থ করিয়া স্থাপন
ধ্যানে অধ্যয়নে কত দূরস্থেরে করেছ আপন।

গোধূলি রাগিণী

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

সিদ্ধতপা ত্যজি তব পরিচিত এই তপোভূমি,
চক্ষুর না-দেখা পথে ঊর্দ্ধলোকে চলিয়াছ তুমি,
যেথায় সুকৃতি আর ভক্তি, জ্ঞান-বিশোধিতা, তব
রচিয়াছে তোমা তরে সাধনার ক্ষেত্র অভিনব।

হেথাকার শেষ দিনে পশ্চাতে চাহিয়া, অশ্রুজল
জানি ঝরিবে না তব; চিত্ত মম না হোক্ চঞ্চল
তোমারে বিদায় দিতে। তোমারে যে জানিয়াছি, তাই
দুর্ল্লভ সৌভাগ্য মানি, আর দেখা পাই কি না পাই।
তোমারে জেনেছে যারা, ছিল যারা তব স্নেহভাগী
অনিন্দ্য তোমার স্মৃতি তাদের অন্তরে রবে জানি।
তোমার জীবনসূর্য্য দ্রুত যবে নামে অস্তাচলে
কল্যাণকামনা তব বার বার এ হৃদে উথলে।
মাতার বাৎসল্য আর ভগিনীর স্নেহ, শ্রদ্ধা দিয়া
বিদায়ের অর্ঘ্য এই আজ, বন্ধু, এনেছি রচিয়া।

কলিকাতা, ৯ই জুন ১৯৩০।

হালামদের কথা

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

হালামরা সাধারণতঃ শ্রীহট্টজেলার দক্ষিণ অংশে লুশাই পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য স্থানসমূহে বাস করে। ইহারা পার্ব্বত্য টিপরা জাতির শাখা-বিশেষ। ইহাদের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সবই অদ্ভুত। বর্ত্তমানকালে বাঙ্গালীদের সংস্পর্শে আসায় ইহারা কতকটা সভ্য হইয়াছে এবং নিজেদের প্রথাগুলি ক্রমশ পরিত্যাগ করিতেছে।

হালামরা ছোট ছোট পাহাড় বা টীলার উপর বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। উঁচু বাঁশের মাচার উপর বাড়ীগুলি তৈয়ারী। ধাপ-কাটা গাছের গুঁড়িতে প্রস্তুত সিঁড়ি বাহিয়া ঘরের বারান্দায় উঠিতে হয়। ঘরের ছাদ বাঁশ ও একরকম পাতায় ছাওয়া। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতে একখানামাত্র ঘর থাকে। উহার একদিকে রন্ধনশালা এবং আর একদিকে পরিবারস্থ সকলের শুইবার স্থান। মাচার নীচে শূকর কুক্কুট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আস্তানা।

হালাম-পুরুষেরা সকলেই ধুতি ও জামা পরিধান করে। স্ত্রীলোকেরা একখানা পাঁচ হাত ধুতি বুকের কাছে গেরো দিয়া পরে এবং আর একখানা ছোট চাদর কটিতে জড়াইয়া রাখে, কেউ কেউ লম্বা হাতাওয়ালা একরকম

কোর্ত্তাও গায়ে দেয়। বয়স্কা নারীরা হাটে সওদা করিতে যাইবার কালে মাথায় পাগড়ী বাঁধিয়া থাকে।

অলঙ্কারের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ইহাদের কর্ণভূষণ। হালাম নারীদের এক এক কানে দুইটা করিয়া ছিদ্র দেখিতে পাওয়া যায়। কানের উপরদিককার ছিদ্রটি ছোট, কিন্তু তেলোর ছিদ্রটি মস্ত বড়। রূপা দস্তা অথবা টিনের তৈয়ারী একটা অলঙ্কার কানের উপরিভাগে পরানো থাকে আর তেলোর ছিদ্রের ভিতর আন্দাজ দুই ইঞ্চি ব্যাসের একটা গোল রূপার চাক্‌তি পরানো থাকে। এই গহনাগুলির দরুণ হালাম নারীদের কানগুলি ভারী বিশ্রী দেখায়। প্রত্যেক হালাম নারীই রূপার তৈরী একপ্রকার হার এবং কাঁচ, গিল্টি, কুঁচ ইত্যাদির মালা গলায় পরে। অবস্থাপন্ন নারীরা টাকা আধুলি এবং সিকিতে কোঁড়া বসাইয়া হাররূপে গলায় পরিয়া থাকে। বাহুতে কোনো গহনা পরিবার রেওয়াজ ইহাদের নাই। ইহারা কেশে এবং কর্ণভূষণে বনফুল পরিতে বড়ই ভালবাসে। যুবতীরা বনফুল দিয়া একে অপরের কেশবিন্যাস করিয়া দেয়। হালাম-পুরুষদের কানে পিতলের অঙ্গুরীয় এবং গলায় তুলসীর মালা।

হালাম স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকা সকলেই মদ্য এবং ধূমপানে আসক্ত। ইহাদের হুঁকাগুলি অদ্ভুত ধরণের। মোটা একটা বাঁশের চোঙের ফুটার মধ্যে সরু আর একটি চোঙ বসানো থাকে। ঐ ছোট চোঙটির উপর কলিকা বসাইয়া তাহারা ধূম পান করে।

ভাত পচাইয়া ইহারা মদ তৈয়ার করে। পালা করিয়া এক একদিন এক এক বাড়ীতে মদ প্রস্তুত হয়। বাড়ীর উঠানের মধ্যে মদ্যপূর্ণ বড় বড় মৃৎপাত্র বসানো থাকে এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে সেগুলার চারিদিকে মণ্ডলাকারে বসে ও একটা সরু বাঁশের নল মৃৎপাত্রের ভিতর ঢুকাইয়া মদ্যপান করে। মদ খাইবার সময় কথা বলা কিংবা বাঁ হাত দিয়া নল ছোঁয়া ইহারা মহা দূষণীয় বলিয়া মনে করে। কচি কচি ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত মদ্যপান এবং ধূমপান করিতে দেখা যায়।

শূকর এবং কুক্কুটমাংস ইহাদের অতি প্রিয় খাদ্য। কলাগাছ টুকরা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া বেত ও মরিচচূর্ণ সংযোগে ইহারা এক অপূর্ব্ব ব্যঞ্জন তৈয়ার করে। ইহারা কাঁচা মাংস মরিচচূর্ণের সহিত ছেঁচিয়া এবং আগুনে পোড়াইয়া খাইতে খুব ভালবাসে। খাওয়ার পর কাহারও পাতে কিছু উদ্বৃত্ত থাকিলে পরিবেশনকারিণী তাহা তুলিয়া লইয়া যায় এবং অপরকে তাহা পরিবেশন করে। খাওয়া-দাওয়া চুকিলে একখানা কাপড় দিয়া উচ্ছিষ্ট ঝাড়িয়া মাচার নীচে ফেলিয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে খাওয়ার পর আঁচাইবার রেওয়াজ নাই।

হালাম যুবক-যুবতীদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা প্রচলিত আছে। বিবাহের আগেই যুবক-যুবতীদের মধ্যে প্রণয় হইয়া থাকে। গভীর রজনীতে বাড়ীর সকলে নিদ্রিত হইলে পর প্রণয়ীরা নিজ নিজ প্রণয়িনীর সহিত দেখা করে। আগেকার দিনে হালাম যুবকেরা মাথায় দীর্ঘ কেশ রাখিত। তখন প্রণয়িনীরা বাঁশের কাঁকই দিয়া তাহাদের মাথার চুল আঁচড়াইয়া খোঁপা বাঁধিয়া দিত। বিবাহের আগে বরকে কনের বাপের বাড়ীতে পাঁচ বছর জন খাটিতে হয়। এই পাঁচ বছর বর কনে স্বামী-স্ত্রীর মত একত্রে বাস করে। খাটুনির মিয়াদ ফুরাইলে বরের পিতা মদ্য সহ (কমপক্ষে বারো কলস) কনের পিতার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হয়। সেখানে সকলে মিলিয়া মদ্যপান করে। মদ্য-পাত্রসমূহের নিকটে একটা থালার উপর কিছু তুলা বিছানো থাকে। কনের জ্ঞাতি-সম্পর্কীয় ভাইরা ইচ্ছামত টাকা, আধুলি সিকি ইত্যাদি ঐ থালার উপর রাখে—এ সমস্ত কনের প্রাপ্য। কনের বাপের বাড়ী হইতে বরকনেকে একসঙ্গে কনের মামার বাড়ীতে যাইয়া কিছুক্ষণ থাকিতে হয়। তারপর বরের বাপ বরকনেকে লইয়া বাড়ীতে চলিয়া আসে। বিবাহের পর সাতদিন পর্য্যন্ত কনের পক্ষের বাপের বাড়ীর কাহারও মুখদর্শন করা না কি মহাপাপ।

বর জন খাটিতে রাজি না হইলে কনের পিতাকে ষাট টাকা পণ দিতে হয়। মেয়ের অমত থাকিলে বাপ মা জোরজবরদস্তি করিয়া তাহার বিবাহ দিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে সময় সময় বিবাহচ্ছেদ হইয়া থাকে। পরস্পরের মনোমালিন্যের দরুণ স্ত্রী যদি স্বামীর ঘর ছাড়িয়া

চলিয়া আসে, তাহা হইলে স্বামীর নিকট সে ষাট টাকা দাবী করিতে পারে।

অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত ইহারাও জুম কৃষি করে। প্রথমে পাহাড়ের উপরকার জঙ্গল পোড়াইয়া দা দিয়া মাটি কোপাইয়া হরেক রকম তরিতরকারীর বীজ একসঙ্গে বপন করে। তারপর প্রথম বৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গেই ধান্য রোপণ করে। ধান্য এবং কার্পাস ইহাদের প্রধান উৎপন্নদ্রব্য। পাহাড়ের উপর প্রত্যেকেরই এক একখানা করিয়া ছোট ঘর থাকে। সেগুলিতে তাহারা ধান্যাদি গোলাজাত করিয়া রাখে।

হালাম নারীরা খুব পরিশ্রমী। কৃষিকার্য্য হাট বাজার ইত্যাদি বেশীর ভাগ স্ত্রীলোকেরাই করে। ইহাদের মধ্যে 'জুমের গান' নামক একশ্রেণীর সঙ্গীত প্রচলিত আছে। ক্ষেত্রে কাজ করিবার সময় স্ত্রীলোকেরা সুর করিয়া জুমের গান গাহিয়া থাকে।

পোষাক-পরিচ্ছদ কিংবা ঘর-গৃহস্থালার দরকারী আসবাবাদির জন্য ইহাদিগকে পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় না। প্রত্যেক হালামের বাড়ীতেই চরকা ও তাঁত আছে। নিজেদের আবশ্যক বস্ত্রাদি হালাম-নারীরা নিজেরাই বুনিয়া থাকে। সূচীশিল্পেও ইহাদের অসাধারণ দক্ষতা আছে। হালাম-নারীরা এক মুহূর্ত্তও আলস্যে অতিবাহিত করে না।

বাঁশ ইহাদের বিশেষ একটি দরকারী জিনিষ। বাঁশ হইতে বেত তুলিয়া তাহা দ্বারা ইহারা এক ধরণের টুকরি তৈয়ারী করে। সেগুলিকে বলে 'চাম্পুই'। ওগুলিতে তরিতরকারী ভরিয়া লইয়া হালাম নারীরা বাজারে বিক্রয় করিতে যায়। মাদুর, দোলনা, কাকই ইত্যাদি আরও নানা জিনিষ ইহারা বাঁশ দিয়া তৈয়ার করে।

প্রত্যেক হালাম বস্তীতেই একজন 'গালিম' বা গ্রাম-প্রধান এবং তাহার একজন সহকারী থাকে। গালিমের সহকারীকে 'গাবুর' বলা হয়। গ্রামের লোকদের ছোটখাটো অপরাধের বিচার ইহারাই করিয়া থাকে। গ্রামের মাতব্বরদের সম্মতি ছাড়া কিন্তু ইহারা কাহাকেও দণ্ড দিতে পারে না। 'গালিম' ও 'গাবুর' কোনো সামাজিক অপরাধ করিলে গ্রামবাসীরা সকলে একমত হইয়া তাহাদের জরিমানা করিতে পারে।

হালামরা ভূতপ্রেত এবং উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। ইহাদের ভিতর কতকগুলি কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কাহারও ব্যারাম হইলে ইহারা মনে করে যে, রোগাক্রান্ত লোকটির উপর ভূতের আবেশ হইয়াছে। তাই, ভূত ছাড়াইবার জন্য ওঝাকে ডাকাইয়া আনা হয়। ওঝাকে ইহারা 'অচাই' বলে। 'অচাই' আসিয়া রোগীর নাড়ী টিপিয়া বলে যে, তাহার উপর অমুক ভূতের আবেশ হইয়াছে এবং ভূত তাহার নিকট অমুক জিনিষ চাহিতেছে, 'অচাই'র কথামত ভূতকে তাহার প্রার্থিত জিনিষ দেওয়া হয়, একবারে ফল না হইলে, তিন তিনবার ওরূপ করা হয়।

তিন বছর বয়সের সময় ছেলেমেয়েদের কর্ণবেধ করা হইয়া থাকে; কর্ণবেধের সময় গুরুজনেরা তাহাদিগকে চরকায় কাটা সুতা ও চাউল মাথায় দিয়া ও মুখে একটু নুন দিয়া আশীর্ব্বাদ করে।

কেহ মরিলে পর ইহারা কতকগুলি ঝাঁঝ বাজাইয়া প্রতিবেশীদিগকে জানায়। তখন প্রতিবেশীরা স্ত্রী-পুরুষ সকলে মৃতব্যক্তির বাড়ীতে আসিয়া জমায়েৎ হয়। মেয়েরা সকলেই আঁচল ভরিয়া ফুল লইয়া আসে, শবদেহটিকে গরম জলে স্নান করাইয়া নূতন কাপড়-চোপড় পরাইয়া ঘরের ভিতর শোয়াইয়া রাখা হয় এবং দুইটি টাকা দিয়া তাহার দুই চোখ, ও লাল রঙের সুতা দিয়া মুখের ছিদ্র, ঢাকিয়া দেওয়া হয়; মেয়েরা সকলে মিলিয়া শবদেহটিকে ফুল দিয়া সাজায় এবং নিজেরাও কানে ফুলের দুল পরে। বয়স্কা নারীরা বিড়বিড় করিয়া কতকগুলি কথা আওড়াইয়া মৃতদেহটির উপর পানসুপারি রাখে, তার পর শবদেহটির নিকট প্রণতি করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নৃত্য আরম্ভ করে। সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলা ঝাঁঝ ও ঢোলক বাজিতে থাকে এবং স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা সকলে মিলিয়া মদ্যপান সুরু করে, নৃত্য শেষ হইলে একজন বয়স্কা নারী সকলের মাথায় কিছু কিছু তেল মাখাইয়া দেয়।

এই সমস্ত অনুষ্ঠান সমাধা হইলে শবদেহটিকে আপাদ-মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া আনা হয় এবং বাঁশের তৈরি সুন্দর শবাধারে স্থাপিত করিয়া দাহ করিবার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর নদীতীরস্থ সৎকারভূমিতে লইয়া যাওয়া হয়। স্ত্রীলোকেরা টুক্‌রিতে করিয়া মদ্য, পুষ্প, ভাত-সিদ্ধ-করা কুক্কুটমাংস, কদলী, পান-সুপারি এবং একটি জীবন্ত কুক্কুটশাবক লইয়া শবের অনুগমন করে, দাহকার্য্য সমাধা হইলে মদ্য এবং কুক্কুট-মাংসাদি মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া সৎকার-ভূমিতে রাখিয়া দেওয়া হয় এবং কুক্কুটশাবকটিকে সে জায়গায় ছাড়িয়া দেওয়া হয় ও একটি গাছের ডাল মাটিতে পুঁতিয়া তাহাতে মৃতব্যক্তির 'চাম্পুই' এবং একটি পাখা বাঁধিয়া রাখা হয়। সৎকারান্তে বাড়ী ফিরিবার সময় সকলকেই একরকম গাছের ডাল ভাঙিয়া বাঁ হাতে করিয়া লইতে হয়, শেষে একই জায়গায় সবাইকে সেগুলি ফেলিয়া দিতে হয়।

পরদিন মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে পূজা হয় এবং 'অচাই' তুলসীর জল ছিটাইয়া ঘর শুদ্ধ করে।

ইহাদের বিশ্বাস মৃতব্যক্তি চিল কিংবা ঘুঘুপাখীর উপর চড়িয়া স্বর্গে যায় এবং সেখানে তার পাপপুণ্যের বিচার হয়।

কলেরা রোগে কাহারও মৃত্যু হইলে হালামরা তাহার মৃতদেহ দাহ করে না—কপালে আগুন ছোঁয়াইয়া মাটিতে পুঁতিয়া ফেলে।

ইহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকে। তন্মধ্যে 'তুইরেংপা', 'তুইতুংপা', 'শিবরাই' প্রভৃতি প্রধান। তা ছাড়া ভূতপ্রেত এবং উপদেবতাদির পূজাও ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, ভূতপ্রেতাদির পূজা উপলক্ষ্যে ইহারা শূকর বলি দেয়।

'খলাইরই' পূজা ইহাদের সকলের চেয়ে বড় পূজা। হালামরা অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমভাগে এই পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের মতে অগ্রহায়ণ মাস বৎসরের প্রথম মাস।

বাড়ীর উঠানের মধ্যে খানিকটা জায়গা সাফ্ করিয়া লইয়া কতকগুলি বংশখণ্ড মাটিতে পুঁতিয়া সেগুলির গায়ে আড়াআড়িভাবে আরও কতকগুলি বংশখণ্ড বাঁধিয়া রাখা হয় এবং ওগুলার উপর খানকতক তাঁতে-তৈরি কাপড় বিছাইয়া রাখা হয়। বাঁশগুলির গায়ে গুটিকতক সূক্ষ্মাগ্র মদ্যপূর্ণ বংশখণ্ড হেলান দেওয়া থাকে। বাঁশগুলিকে ইহারা চাঁচিয়া ছুলিয়া খুব সুন্দর করিয়া রাখে। 'অচাই' ফুল-পাতা-বাঁধা একগাছি চরকায়-কাটা লম্বা সুতা মাথায় জড়াইয়া বিড়-বিড় করিয়া মন্ত্র আওড়াইতে থাকে এবং এক একটি বাঁশ কাটিয়া ভিতরকার মদ মৃত্তিকায় প্রোথিত বংশখণ্ডগুলির উপর ঢালিয়া দেয়। 'অচাই'র সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকজন মাথায় সুতা বাঁধিয়া পূজাস্থানের নিকটে ঘুরিতে থাকে।

বংশখণ্ডগুলির সাম্‌নে একখানা পাতায় কিছু চাল রাখিয়া দেওয়া হয়। ইহাই তাহাদের নৈবেদ্য। 'অচাই' এই নৈবেদ্যের উপর কুক্কুট বলি দেয়। পূজা শেষ হইলে, চাল এবং কুক্কুটের রক্ত একত্র করিয়া মাখানো হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে আন্দাজ পঁচিশ ত্রিশটা কুক্কুট বলি দেওয়া হয়। পূজাস্থানের নিকটেই একটা কড়াইয়ে কুক্কুটগুলা সিদ্ধ হইতে থাকে।

বাহিরের অনুষ্ঠানাদি শেষ হইলে 'অচাই' দা-হাতে ঘরের ভিতরে আসিয়া ঢোকে, মেঝের উপর তণ্ডুলপূর্ণ একটি মৃৎপাত্র বসানো থাকে, এই পাত্রটির কাছে কিছু তুলাও বিছানো থাকে। এখানে কুক্কুটগুলিকে অবিকল মুসলমানদের মত জবাই করা হয়। 'অচাই' প্রথমে কুক্কুটগুলির গলার অর্দ্ধেক কাটিয়া ফেলে, তারপর কুক্কুট রক্ত দ্বারা তুলা ভিজাইয়া লয় এবং একটা পাত্রে খানিকটা রক্ত রাখিয়া দেয়। শেষে দা-দিয়া কুক্কুটগুলির পেট ফুঁড়িয়া ভিতরে কিছু জল ঢালিয়া দেয় এবং নাড়ি-ভুঁড়ি টানিয়া বাহির করে।

এর পর দুইটি মদ্যপূর্ণ মৃৎপাত্রের সাম্‌নেও কুক্কুট জবাই করা হয়। তখন সকলে সার বাঁধিয়া বসে এবং একজন একটি বংশখণ্ড উপুড় করিয়া প্রত্যেকের হাতে একটু একটু মদ ঢালিয়া দেয়। ওই মদ প্রথমে মাথায় ঠেকাইয়া শেষে খাইতে হয়। অতঃপর সকলকে এক এক পাত্র মদ দেওয়া হয়। তখন সকলে সমস্বরে

বলিয়া উঠে 'চুবাই' 'চুবাই' (নমস্কার নমস্কার) এবং মদ্য পান করে। মদ্যপান শেষ হইলে একটি যুবতী সকলকে পান পরিবেশন করে।

যাহার বাড়ীতে পূজা সে সেইদিন গ্রামের লোকদের এক বিরাট ভোজ দেয়। দ্বিপ্রহরে খাওয়া-দাওয়ার পর মদ্যপান সুরু হয় এবং পরদিন দুপুর রাত পর্য্যন্ত পূরাদমে মদ খাওয়া চলিতে থাকে।

পূজার পরদিন ইহাদের নাচিবার পালা। প্রথমে 'গালিম' মাথায় একটি পাগড়ী বাঁধিয়া বিবিধ অঙ্গভঙ্গী সহকারে নাচিতে আরম্ভ করে। অপর দুই ব্যক্তি দুইটি বাদ্যযন্ত্র বাজাইতে থাকে এবং সকলে মিলিয়া বিষম হল্লা জুড়িয়া দেয়। গালিমের নৃত্য শেষ হইলে অচাইকে নাচিতে হয়। অচাই'র সঙ্গে এক বুড়ী একখানা রঙীন কাপড় ওড়নার মত কাঁধের উপর ফেলিয়া নৃত্য করে। বছরিপূজার সময় যুবতীদের নাচিবার রেওয়াজ নাই, কিন্তু অন্যান্য পূজাপর্ব্ব উপলক্ষ্যে যুবতীরা নৃত্য করিয়া থাকে।

প্রত্যেক হালাম বস্তীতে সর্ব্বসাধারণের পূজার জন্য নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ঘর থাকে। সেইটির নাম 'বারেইন'। সকলে মিলিয়া চাঁদা করিয়া ঐ ঘর তৈয়ার করে। ফাল্গুন মাসে হালামরা 'বারেইনে'র চারিধারের জঙ্গল সাফ করে এবং ঘরের ভিটার মাটি কাটিয়া কতকগুলি ঢিবি তৈরি করে এবং সেগুলির গায় তুলা এবং চরকায় কাটা সুতা বাঁধিয়া রাখে।

হালামদের সবগুলি পূজার অনুষ্ঠানাদি অবিকল একই ধরণের। তবে কোনো কোনো পূজায় একটু আধটু ইতরবিশেষ যে নাই তেমন নহে। অধুনাকাল হিন্দুদের অনেক পূজা পদ্ধতি ইহারা গ্রহণ করিতেছে।

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৭) বলিদ্বীপ—কারাঙ্-আসেম

পদণ্ডদের সঙ্গে আমার আজকে বেশ আলাপ জ'মল। কবি বড়ই অসুস্থ বোধ ক'রছিলেন, একটু বিশ্রাম করা তাঁর পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক ছিল। কারাঙ্-আসেমে গুমট আর লোকজনের ভীড় তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকর হ'য়ে প'ড়ছিল। এদেশে ডচেরা আধুনিক সুবিধা সব এনেছে, খালি আনেনি বিজলীর পাখা। আমাদের মধ্যে স্থির হ'ল, কারাঙ-আসেমে তাঁর অবস্থানকে সংক্ষেপ ক'রে দুই এক দিনের ভিতর তাঁকে কোনও নির্জ্জন পাহাড়ে জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে।

রাজবাড়ীর উঠানের ছতরীওলা উঁচু চত্বরে ব'সে পদণ্ড কয়জনের সঙ্গে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হ'ল। আরও দু তিন জন পদণ্ড আর অন্য বলিদ্বীপীয় ব্যক্তি এলেন। দ্রেউএস দোভাষীর কাজ ক'রতে লাগলেন। এদের সঙ্গে কথা ক'য়ে একটা জিনিস শুনলুম — অল্প স্বল্প দু চার জন নিম্ন শ্রেণীর লোক মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। আরব ব্যবসায়ীরা আর অন্য মুসলমানেরা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণীর মেয়েদের সঙ্গে স্থায়ী বা অস্থায়ী বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়, আর তাদের সম্পর্কের দু চারজন লোক এদের প্রভাবে প'ড়ে মুসলমান হ'য়ে যায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকে এই ব্যাপারকে উপেক্ষার চোখে দেখে, এইমাত্র; প্রতীকারের চেষ্টা করে না। চার পাঁচ কোটি যবদ্বীপীয় আর অন্য মুসলমানদের মধ্যে মুষ্টিমেয় দশলাখ মাত্র—বলিদ্বীপীয়দের সকলেই যে পৈতৃক ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকবে, তা সম্ভব নয়। পদণ্ডদের মধ্যে দেখলুম, কেউ কেউ এ বিষয়ে উদাসীন, ঠিক ভারতবর্ষের সাধারণ হিন্দুর মতন। একজন ব'ললেন, ধর্ম তো সবই এক, আর মুসলমান হ'লেও এরা ঈশ্বরের নাম করে।

আবার দু চার জনকে এ সম্বন্ধে একটু সচেতও দেখলুম; তাঁদের ইচ্ছা, সাধারণ্যে হিন্দু ধর্ম্মের উচ্চ চিন্তা আর ভাবগুলি প্রকাশ হয়; কি ক'রে তা করা যায়, সে সম্বন্ধেও কেউ কেউ আমায় প্রশ্ন ক'রলেন। রাজা স্বয়ং এবিষয়ে খুব উৎসাহী। বলিদ্বীপ আগেকার মতন আর বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারছে না, কালধর্ম্মের প্রভাবে বাইরের জগতের সঙ্গে বলিদ্বীপের অধিবাসীদের মিশতে হবে; এ ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্কৃতি আর ধর্ম্ম থেকে কতটা শক্তি পাওয়া যায়, সে বিষয়ে বলিদ্বীপের অভিজাতজনগণ যে একটু চিন্তা ক'রতে আরম্ভ ক'রছেন, তার আভাস আমরা কিছু কিছু পেয়েছিলুম।

পদণ্ডদের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কিছু ব'লতে হ'ল। এদের জানা পৌরাণিক নাম সব আমি জানি, পৌরাণিক কাহিনী দু'চারটেও এদের সঙ্গে মিল্‌ল - এ দেখে এঁরা একটু হতভম্ব হ'য়ে গেলেন। সুদূর ভারত থেকে সুপ্রাচীন যুগে এঁদের ধর্ম্ম এসেছে, এ কথা এঁদের মনে যেন প্রথম প্রতিভাত হ'ল। কাগজে ম্যাপ এঁকে ভারতবর্ষের সংস্থান আর যবদ্বীপের সঙ্গে ভারতের যোগের পথ বুঝিয়ে দিলুম। পদণ্ডেরা মাথা নেড়ে নেড়ে দেশভাষায় এই সব বিষয়ে আপসে তুমুল আলোচনা ক'রে দিলেন।

এদিকে বেলা বেড়ে যাচ্ছে। রাজার ওখানেই মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'ল। ঠিক ছিল, আহারের পরে পাসাঙ্গাহান থেকে আমার ছবি বইটই আর ভারতবর্ষ থেকে পূজার তৈজসপত্রাদি যা এনেছি তা নিয়ে এসে পদণ্ডদের দেখাবো—রাজাও দেখবেন। আহার মিশ্র ডচ্-যবদ্বীপীয়-বলিদ্বীপীয় ধরণেই হ'ল। দুজন অভ্যাগত এলেন—Coen 'কুন' নামে একখানি জাহাজ বলিদ্বীপ হ'য়ে বলিদ্বীপের পাশের লম্বক-দ্বীপে যাচ্ছে, তার কাপ্তেন আর প্রথম অফিসার, রাজার সঙ্গে পরিচয় আছে, এঁদের জাহাজ বুলেলেঙ-এ একদিন থাক্‌বে, এঁরা সেই ফুরসতে একটু বেড়িয়ে যাচ্ছেন।

বিকালে 'সাদো' গাড়ী করে পাসাঙ্গাহান থেকে আমার পূজার জিনিস আর লাণ্টার্ণ-স্লাইড আর বই-টই নিয়ে এলুম। যবদ্বীপ-বলিদ্বীপ যাত্রার সময় আমার প্রস্তাব-মত ক'লকাতার হিন্দু-মিশনের প্রতিষ্ঠাতা আর অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দ আমার পূজার সমস্ত বাসন-কোসন এক প্রস্থ কিনে দেন। এইগুলি,—আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছিলুম একখানা 'পুরোহিত-দর্পণ' আর অন্য আনুষ্ঠানিক পুস্তক—এই সমস্ত বেশ কাজে লেগেছিল। শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার ভারতের দেবমূর্ত্তি আর মন্দিরের আর ভারতীয় কলা সম্বন্ধীয় স্লাইড-চিত্র অনেকগুলি দিয়েছিলেন, যদি কোথাও লাণ্টার্ণ-সহযোগে বক্তৃতা দিই। বলিদ্বীপে লাণ্টার্ণ পাওয়া যায় নি—এখানে খালি স্লাইডই দেখানো গেল। রাজা পদণ্ডদের নিয়ে সেই ছতরীযুক্ত চত্বরে এসে ব'সলেন। কোপ্যারব্যার্গ দ্রেউএস্‌ও রইলেন। ইতিমধ্যে বাজারের গুজরাটী কাপড়ওয়ালারা কবির সঙ্গে দেখা ক'রতে এল। এদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা কইলুম, দ্রেউএস্ মালাইয়ে আলাপ ক'রলেন, খানিক পরে এরা চ'লে গেল। বিকালে কবিকে একটু হাওয়া খাইয়ে আনবার জন্য রাজা তাঁর মোটরে ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। একটু দূরে সমুদ্রের ধারে Oedjoen উজুন্ ব'লে একটি জায়গায় রাজার এক বাগান আছে, সেখানে তাঁকে নিয়ে গেল। রাজা র'য়ে গেলেন। আমাকে ব'সে ব'সে আমাদের দেশের প্রচলিত পূজার অনুষ্ঠান সব দেখাতে হ'ল। আচমন থেকে সাধারণ পূজোর সব কর্ত্তব্যগুলি ব্যাখ্যা ক'রে ক'রে ব'লতে লাগলুম। এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে উপবীত-ধারণের নিয়ম নেই। আমার পইতে দেখাতে হ'ল—এঁরা বলিলেন হাঁ, 'সস্‌ট্রা' বা শাস্ত্র-গ্রন্থে 'ইয়াজ্‌নোপাউঈটা' বা যজ্ঞোপবীতের কথা আছে বটে, কিন্তু সে আগে 'রেসি' বা ঋষিরা তো প'রতেন। পূজার অনুষ্ঠান এঁরা তো বেশ নিবিষ্ট চিত্তে নানা প্রশ্ন সহকারে দেখ্‌তে লাগলেন, কতক কতক বিষয়ে এঁদের সঙ্গে মিল আছে ব'ললেন, আর বাকী জিনিস এদের কাছে অজ্ঞাত। 'পূজা' শব্দটী এঁরা ব্যবহার করেন না, বলেন 'ডেউ-অর্-চ-নো' বা 'দেবার্চ্চনা'। এরা তারপরে নানা বিষয়ে প্রশ্ন ক'রতে লাগলেন। পদণ্ডদের বেশীর ভাগ প্রশ্ন হ'ল, মৃতের সৎকার, অন্ত্যেষ্টি-বিধি, শ্রাদ্ধ, এই সব নিয়ে। অশৌচ-বিষয়ে ব্রাহ্মণের দশ দিন, ক্ষত্রিয়ের বারো দিন, বৈশ্যের পনেরো দিন, শূদ্রের এক মাস—এই

বিধি আমাদের দেশে আছে আর তা তাঁদের দেশের বিধির সঙ্গে মিলে যাচ্ছে দেখে, খুব যেন খুশী হ'য়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা ব'লতে লাগলেন। রাজা প্রশ্ন ক'রলেন,—জাতিভেদ, অসবর্ণ বিবাহ, সামাজিক রীতি-নীতি (যেমন বড়োভাইকে 'দাদা'র মতন সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করা, বয়সে বড়ো ভাইপোর বয়সে ছোটো খুড়োকে প্রণাম করা উচিত কিনা) ইত্যাদি গুরু লঘু নানা বিষয়ে। আমি লাণ্টার্নের স্লাইড একে একে আলোর দিকে ধ'রে দেখাতে লাগলুম—স্লাইডগুলি হাতে হাতে ঘুর্‌তে লাগ্‌ল—উত্তর আর দক্ষিণ ভারতের বিরাট শিব আর বিষ্ণুর মন্দির, আর এদেশেও পূজিত নানা দেবতার মূর্ত্তি, এসব দেখাতে লাগলুম। এঁরা বেশ চমৎকৃত হয়ে দেখতে লাগলেন। আমিও মাঝে মাঝে এদেশের রীতি-নীতি সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রতে লাগলুম। এইরূপে কথায় কথায় সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। তখন আমাদের আলোচনা-সভা ভঙ্গ হ'ল। রাজা সব শেষে একটী প্রশ্ন ক'রলেন,—দেবতা, মন্দির, দেবার্চ্চনা, শ্রাদ্ধ, সদাচার, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, এ সব তো বাহ্য অনুষ্ঠান, এ তো মানুষের জীবনের চরম উদ্দেশ্য হ'তে পারে না; মানুষের পক্ষে প্রধান আর প্রথম উদ্দেশ্য আর কর্ত্তব্য কি?—সমস্ত বিকাল ধ'রে যে সব বিষয়ে আমাদের আলোচনা হ'চ্ছিল, সে সমস্তকে যেন উল্‌টে দিয়ে এই প্রশ্ন; আমি এ রকম গভীর ভাবের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। রাজার এই প্রশ্ন শুনে মনে কিন্তু বেশ আনন্দ হ'ল; আমি নিজে জবাব না দিয়ে, দ্রেউএস-এর মারফৎ ব'ললুম—এ কথার উত্তর আপনিই দিন, আপনাকেই আমি জিজ্ঞাসা ক'রছি। রাজা ব'ল্‌লেন—দেবতা টেবতা কিছুই নয় অর্চ্চনা অনুষ্ঠান এ সমস্ত বাইরেকার কথা—মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হ'চ্ছে, নির্ব্বাণের জন্য সাধনা করা। রাজার শেষ কথা কানে যেন এখনও বাজ্‌ছে—তাঁর বলিদ্বীপের উচ্চারণে মালাই ভাষায় তিনি যখন ব'ল্‌লেন—'ডেউআ-ডেউআ টিডাঃ আপা—নির্‌ওআনা সাটু'—দেবতারা কিছু নয়—নির্ব্বাণই হ'চ্ছে একমাত্র বস্তু। সুদূর মালাই দ্বীপপুঞ্জে, সহস্র বৎসর কাল ধ'রে ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে থেকেও, ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা, যে নির্ব্বাণ-মোক্ষের সাধনাই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য,—কি ক'রে এদের মনে এমন ভাবে গেঁথে র'য়েছে, তা ভেবে বিস্মিত আর পুলকিত হ'তে হয়। আমি রাজাকে ব'ল্‌লুম—আপনি ঠিকই ব'লেছেন,—পুরুষার্থ যে এইই, তা আমাদের শাস্ত্রে বলে, শাশ্বত বস্তুর সাধনা জীবনের প্রথম আর প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত; বাহ্যিক ধর্ম্মানুষ্ঠান, সামাজিক রীতি-নীতি পালন, সেবাধর্ম্ম, এ সব আনুষঙ্গিক। রাজার এই প্রশ্ন আর মন্তব্যের কথা পরে রবীন্দ্রনাথকে আমি বলি; তিনিও এই কথা শুনে বিশেষ খুশী হন; আমায় তিনি বলেন,—দেখ হে, মালাইজা'তের লোক এরা, এদের চিন্তা-প্রণালী আমাদের থেকে কত আলাদা, এরা দুনিয়া দেখে অন্য ভাবে, আমাদের সভ্যতার বাহ্য অনুষ্ঠান অনেকগুলি এরা যা নিয়েছে তা তার spectacular বা দৃষ্টি-সুন্দর ভাবের দ্বারাই বেশী আকৃষ্ট হ'য়েই যে নিয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; আমাদের ইতিকথা আমাদের শিল্প-কলা এদের উপর তার প্রভাব সহজেই বিস্তার ক'রেছে; কিন্তু রাজা যে ভাবের কথা ব'ল্‌লেন, তাতে বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছে যে আমাদের সভ্যতার আধ্যাত্মিক বাণীও এরা ঠিক নিতে পেরেছে; আর তা না হ'লে এত বিরুদ্ধ প্রতিবেশ-প্রভাব সত্ত্বেও এরা এই সভ্যতাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থা'ক্‌তে পার্‌ত না। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের ভ্রমণ শেষ ক'রে পরে রবীন্দ্রনাথ যখন বলিদ্বীপের উপরে যে সুন্দর কবিতাটী লেখেন—যেটী প্রবাসীতে প্রকাশিত হ'য়েছিল আর যার কথা পূর্ব্বে অন্যত্র ব'লেছি,—তাতে, কারাঙ-আসেম-এর রাজার কথায়, আর তা ছাড়া অন্য দু-একটী খুঁটী-নাটী বিষয়ে, বলিদ্বীপীয়দের চরিত্রে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে একটী অনপেক্ষিত গভীরতার আর অন্তর্মুখিতার পরিচয় পেয়েই, এই ছত্র কয়টী লিখ্‌তে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন—

> পরের দিনে তরুণ উষা বেণুবনের আগে
> জাগিল যবে নব অরুণ রাগে,—
> নীরবে আসি দাঁড়ানু তব আঙন-বাহিরেতে;
> শুনিনু কান পেতে,
> গভীর-স্বরে জপিছ' কোন্‌ খানে
> উদ্বোধন-মন্ত্র যাহা নিয়েছ' তব কানে—
> একদা দোঁহে পড়েছি যেই মোহ-মোচনী বাণী
> মহাযোগীর চরণ স্মরি' যুগল করি' পাণি॥

রাজা তার পরে আমায় তাঁর লেখা ছোট্ট একখানি বই দিলেন। বইখানির নাম, Darmasoesila—dilahirkan oleh Anak Agoeng Bagoes Dj'lantik Stedehouder Karangasem Bali; বইখানি ১৯ পৃষ্ঠার, ভাষা মালাই, ডচ্ বানানে রোমান অক্ষরে সুরাবায়ায় ছাপা। এখানিতে রাজা বলিদ্বীপের প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম আচার আর হিন্দু সমাজের একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা ক'রেছেন। উদ্দেশ্য—বলিদ্বীপের আর অন্য জায়গায় মালাই প'ড়তে পারে এমন লোক তাঁদের হিন্দু সংস্কৃতির আর ধর্ম্মের কথা জানুক। বইখানির মোটামুটা আশয় ধ'রতে পারি;—এটা অনুবাদ ক'রে ফেলতে পারলে বেশ হয়—বলিদ্বীপের একজন অভিজাত ব্যক্তি পৈতৃক ধর্ম্মকে কি ভাবে নিচ্ছেন এ থেকে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। রাজাকে অনুরোধ করায় বলিদ্বীপের অক্ষরে বইয়ের উপরে তিনি আমার নাম লিখে দিলেন।

DARMASOESILA

DILAHIRKAN

OLEH

ANAK AGOENG BAGOES DJ'LANTIK

STEDEHOUDER

KARANGASEM-BALI
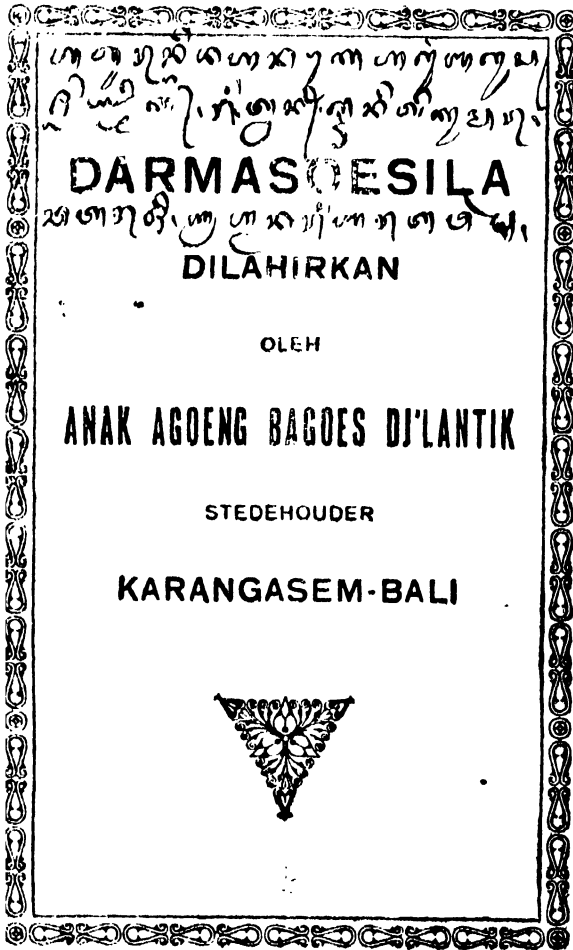
কারাঙ-আসেমের রাজা-কর্তৃক লিখিত পুস্তকের নামপত্র
(উপরে রাজার হস্তাক্ষর, বলিদ্বীপীয় লিপির নিদর্শন)

অর্থাৎ 'বলিদ্বীপের কারাঙ-আসেমের স্‌টেডেহোউডর্ আনাক্ আগুঙ্ বাগুস্ জলান্তিক্ কর্তৃক প্রকাশিত (dilahirkan অর্থাৎ 'জাহির' করা—আরবী শব্দ যা আমরা 'জাহির' রূপে উচ্চারণ করি মালাইদের মুখে তা lahir 'লাহির' হ'য়ে দাঁড়ায়) "ধর্ম্মসুশীল" নামে পুস্তক।'

স্থানীয় ডচ্ এসিস্‌টান্ট্-রেসিডেন্ট্ এলেন, সস্ত্রীক। লোকটা বেশ। কোপারব্যার্গ্ আলাপ করিয়ে' দিলেন। ইনি মোটে এক মাস হ'ল সুমাত্রা থেকে বদলি হ'য়ে বলিদ্বীপে এসেছেন। ইনি সুমাত্রায় Battak বাত্তাক্ জাতির সভ্যতা রীতি-নীতি আলোচনা ক'রছেন। ব'ল্লেন যে অর্দ্ধসভ্য আর সভ্য বলিদ্বীপীয়, এই উভয় শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে তিনটা স্তরের মনোভাব বা সভ্যতা দেখতে পাওয়া যায়—আদিম, ভারতীয় হিন্দু (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ), আর মুসলমান। বলিদ্বীপে আদিম হিন্দু-পূর্ব্ব যুগের অনেক জিনিস বিদ্যমান; এরা এখনও হিন্দু আছে, কিন্তু আশপাশের মুসলমানদের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারবে ব'লে তাঁর মনে হয় না। ব্যাপারীদের দ্বারাই সুমাত্রার অমুসলমান জঙলী জাতের মধ্যে মুসলমান ধর্ম্ম বেশী ক'রে প্রসার লাভ ক'রেছে; বলিদ্বীপেও সেই রকমটা হবে ব'লে তিনি মনে করেন; তবে বলির লোকেদের একটা দৃঢ়-মূল হিন্দু সংস্কৃতি আছে; সেটা কতটা গভীর, এইবার তার পরীক্ষা হবে। তবে এটাও বিবেচ্য, এখানকার মুসলমান ধর্ম্ম নিরুপদ্রব, কোমল ভাবের; আর এই জন্যই তার শক্তি বেশী।

এই রকম নানা কথায় প্রথম রাত্রির খানিকটা কাটিয়ে

কারাঙ-আসেমে রবীন্দ্রনাথ

দণ্ডায়মান—ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা, দ্রেউএস্, বাকে, কোপ্যার্ব্যার্গ, সুরেন্দ্রনাথ কর
উপবিষ্ট—বাকে-পত্নী, রবীন্দ্রনাথ, রাজা (পদতলে পুত্র), সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুরী থেকে রাত্রির মত বিদায় নিয়ে কোপ্যারব্যার্গ্ ধীরেন বাবু আর আমি পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরলুম। রাত্রি বেশী হয় নি, কিন্তু গেঁয়ো শহরে লোক চলাচল খুবই ক'মে গিয়েছে। রাস্তার কুকুরগুলো ধুলোয় শুয়ে আছে, আমাদের পায়ের আওয়াজে উঠে তার-স্বরে ঘেউ ঘেউ আরম্ভ ক'রে দিলে; সারা-পথটা এই কুকুরের ডাকে বিরক্ত হ'তে হ'তে বাসায় ফেরা গেল। তারপর খেয়ে দেয়ে পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে ব'সে অনেক রাত অবধি গল্প গুজব করা গেল।

২৮শে আগষ্ট ১৯২৭, রবিবার।—

কালকের মতন আজও সকালে সদর সড়কে নগরাভিমুখে গমনশীল গ্রামের মেয়েদের শোভাযাত্রা দেখা গেল। তারপরে স্নান আর প্রাতরাশ সেরে নিয়ে সকলে পুরী বা রাজবাটীর দিকে চ'ললুম। পথে চীনে ফোটো-গ্রাফওয়ালার দোকান থেকে স্থানীয় লোকেদের ছবি কিছু নিলুম। পুরীতে পৌঁছে দেখি, কালকেরই মতন পদণ্ডরা এসেছেন, আর রাজা তাঁর সেই তালপাতার পুঁথির ব্যাখ্যা শোনাবার জন্য প্রস্তুত। দ্রেউএস্কে কালকের মতন সংস্কৃত শ্লোকের কবির করা ইংরেজী তরজমা মালাইয়ে বুঝিয়ে দিতে হ'ল। রাজা তাঁর বাড়ীর মেয়েদের হাতে বোনা এক এক খণ্ড কাপড় আমাদের দিলেন—কতকগুলি কাপড় এদের মেয়েদের গায়ে ওড়নার মত ব্যবহৃত কাপড়, ঠিক জালের মতন; আর কতকগুলি লাল সবুজ রঙের রেশম আর সুতোয় মিশিয়ে লুঙ্গী বা সারঙের কাপড়; আমাকে

ঐ ধরণের লুঙ্গীর কাপড়ই একখানা দিলেন। কবিকে উপহার দিলেন ছুঁচে ক'রে রঙ্গীন রেশমের ফুল তোলা হাতে বোনা একখানা সাদা কাপড়। ইতিমধ্যে চীনে ফোটোগ্রাফার তার ছবি তোলবার সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত হ'ল, রাজার হুকুম মতন।—কবিকে আর রাজাকে নিয়ে আমাদের এক গ্রুপ তোলা হ'ল। এই ছবি পরে রাজা আমায় এক খণ্ড উপহার দেন। ছবিটীতে কবি রাজার উপহৃত বস্ত্রখণ্ড উত্তরীয়ের মতন গায়ে জড়িয়ে আছেন, আর কবি-কর্তৃক উপহৃত তাঁর নিজের ছবি একখানি রাজা নিয়ে ব'সে আছেন। রাজা তাঁর নিজের ছবি আমায় আর একখানি দেন, তাতে ইউরোপীয় বেশে তিনি দাঁড়িয়ে, আর দুপাশে তাঁর দুই ছেলে; রাজার গলায় সেই ফিতের মতন চওড়া সোনার ঘড়ির চেন পরা।
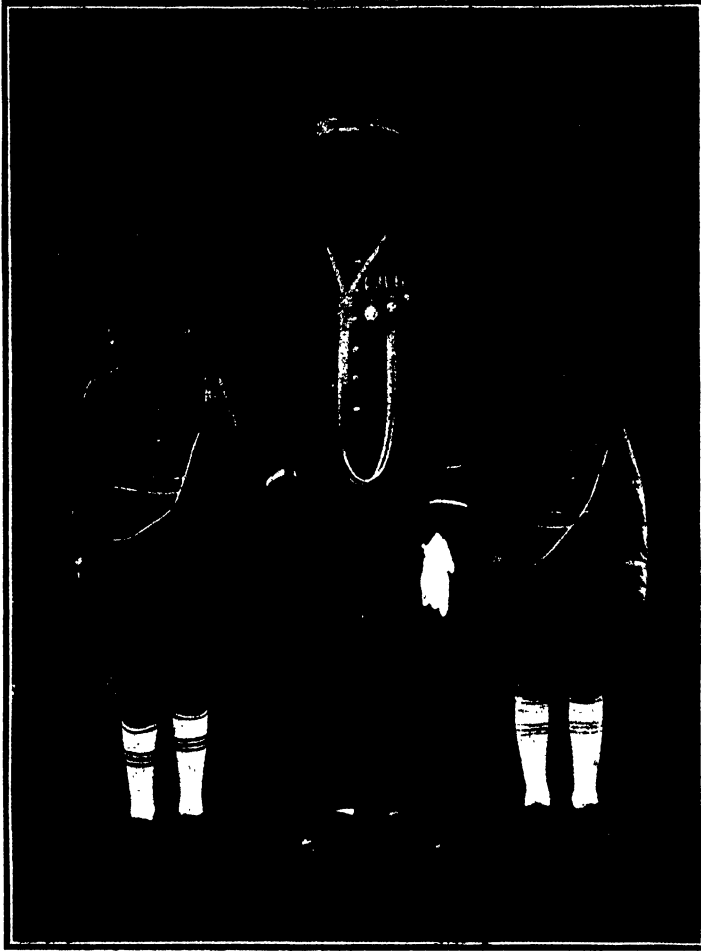
পুত্রদ্বয়-সহিত কারাঙ্-আসেমের রাজা

কারাঙ-আসেমের পূবে একটী প্রাচীন মন্দির আছে, মন্দিরটী একটি পাহাড়ের গায়ে, একটী স্বাভাবিক গুহাকে অবলম্বন ক'রে; এটীর নাম Goa Lawah বা 'বাদুড়-গুহা।' রাজা দুখানি মোটর হুকুম ক'রে দিলেন, কবির সঙ্গে আমরা সেটী দেখতে বা'র হ'লুম। কারাঙ্-আসেম রাজ্য ছাড়িয়ে যেতে হ'ল; সবুজের বন দিয়ে চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে—অনেকগুলি গ্রাম, বাজার, নারকেল বনের আর ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, কখনও কখনও পাহাড়ের গা দিয়ে আর সমুদ্রের ধার দিয়ে এঁকে-বেঁকে রাস্তা; আর সর্ব্বত্রই এদেশের প্রিয়দর্শন সুবেশ পুরুষ আর এদেশের সুন্দরী তন্বী মেয়ের দল, গ্রামে গৃহকর্ম্মে, বাজারে বিকি-কিনিতে আর ধানের ক্ষেতে চাষের কাজে রত। এই 'বাদুড়-গুহা'র মন্দির একেবারে রাস্তার উপরেই। তেমন বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নেই। মন্দিরটী হ'চ্ছে যেন ঘাসে ঢাকা হাতার মধ্যে পাশাপাশি কতকগুলি বাড়ী নিয়ে, ঘাসের মধ্যে দু একটি ছোটো ছোটো ঘর, আর পাথরের বেদী, আর ছোটো ছোটো কাঠের থামের উপর দেবতার প্রতীক বা মূর্ত্তি রাখবার কুলুঙ্গীর মতন; মাঝামাঝি একটি গুহা, তার ভিতরে কতকগুলি বেদি; আমাদের সে অন্ধকারময় গুহার ভিতরে যাবার প্রবৃত্তি হ'লনা; গুহার মুখেই ঝাঁকে ঝাঁকে বাদুড় গুহার ছাতে আর দেওয়ালে

ঝুলছে, আর কিচির-মিচির ক'রছে; দুচারটে উড়ে বেড়াচ্ছে, এদিক ওদিক ক'রছে; আর গুহাটি ভীষণ নোংরা আর দুর্গন্ধ। মন্দিরের অন্য গৃহ গুলি খালি প'ড়ে আছে, বেমেরামতী অবস্থায়; মন্দিরের ঘাস আগাছা আবর্জ্জনাও পরিষ্কার করা নেই। শুন্‌লুম, এদেশের মন্দিরগুলি সাধারণতো এই রকমই প'ড়ে থাকে, বহু মন্দিরে দেবমূর্ত্তি থাকে না, দৈনিক দেব-সেবাও হয় না; কেবল উৎসবের সময়ের মন্দির সাফ ক'রে সজ্জিত ক'রে দেবমূর্ত্তি বা দেবতার প্রতীক আনে, তখন খুব পূজার ঘটা লেগে যায়, আশপাশের গ্রাম থেকে বাদ্যভাণ্ড নৈবেদ্য খাদ্যদ্রব্য নিয়ে লোকেরা জমায়েত হয়—এদেশের মন্দিরের এইই হ'চ্ছে ব্যবহার বা সার্থকতা। বাদুড়-গুহা দেখে আমরা আবার সেই মনোহর দৃশ্যাবলীর মধ্য দিয়ে কারাঙ-আসেমের পুরীতে ফিরলুম, সাড়ে নটা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত দেড় ঘণ্টা চমৎকার ভাবে কাট্‌ল।

পুরীতে ফেরবার পরে রাজা তাঁর পুরাতন প্রাসাদ দেখাতে আমাদের নিয়ে গেলেন। নোতুন প্রাসাদের সাম্‌নে, একটা সরু পথ দিয়ে ঢুকতে হ'ল। পুরাতন বলিদ্বীপীয় পদ্ধতির বাড়ীর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ এই প্রাসাদটী। লাল ইটের দেয়াল, দেয়ালে বালী চুনকাম কিছু নেই; মাঝে মাঝে একরকম নরম পাথর, তাতে খুব নকশা কাটা—তাই দেয়ালে লাগানো আছে। আলাদা আলাদা দেয়াল দেওয়া কতকগুলি মহল। চার দিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা খানিকটা সমতল জায়গা, তার মধ্যে পৃথক্ পৃথক্ এক একটি কুঠরী, উঁচু দাওয়া বা রোয়াক বা চাতালের উপরে, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয় প্রত্যেক চাতালের উপরে; আর কুঠরীগুলির প্রত্যেকটীর সামনে একটু ক'রে রোয়াক বা বারাণ্ডা। প্রত্যেক মহলে ঢোকবার জন্য উঁচু দরওয়াজা। একটা মহলকে বাগান বাড়ী বলা যায়। ভিন্ন ভিন্ন মহলের ঘরগুলির বারান্দার দেয়ালে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে ছবি আঁকা—নানা রঙীন ছবি, কাপড়ের উপরে এঁকে দেওয়ালে লাগিয়ে দিয়েছে। দেব-দানবের যুদ্ধ, কর্ম্মবিপাক বা নরকের দৃশ্য, অর্জ্জুন-বিবাহ বা অর্জ্জুনের তপস্যা, কিরাতার্জ্জুনীয়, অর্জ্জুনের পাশুপত অস্ত্রলাভ, নিবাত-কবচ রাক্ষসের সঙ্গে অর্জ্জুনের যুদ্ধ, সুপ্রভা নামে অপ্সরার সঙ্গে অর্জ্জুনের বিবাহ—এই সব ব্যাপার নিয়ে ছবি। কোনও কোনও চাতালে ওঠবার সিঁড়ির দুপাশে দানবমূর্ত্তি আর কোথাও বা অন্য মূর্ত্তি আছে, ঐ নরম পাথরের তৈরী। একটি ঘরের চাতালে সিঁড়ির উপর দুটি পদণ্ড বা ব্রাহ্মণ মূর্ত্তি আছে—বেশ একটুখানি caricature বা ব্যঙ্গময় ভাবে তৈরী। আমার একটা ধারণা হ'য়ে গিয়েছিল যে, পদণ্ডরা সাধারণতো ততটা সুপুরুষ দেখতে হয় না—বলিদ্বীপের অন্য সাধারণ পুরুদের তুলনায় পদণ্ডদের যেন একটু কুশ্রীই বোধ হ'ত। এর কারণ কি তা ব'লতে পারি না। পদণ্ডদের দেহে ভারতের ব্রাহ্মণ-রক্ত কিছু বিদ্যমান আছে অনুমান করা যায়। তবে কি ভারতের ব্রাহ্মণ আর ইন্দোনেসীয় বা মালাই বলিদ্বীপীয়—এই দুই জা'তের মিশ্রণ দৈহিক সৌন্দর্য্যের পক্ষে উপযোগী হয় নি? যবদ্বীপের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় রক্ত যথেষ্ট বিদ্যমান, আর এদের অনেককে ভারতীয়দের থেকে পৃথক করা অনেক সময়ে দুষ্কর হ'য়ে পড়ে; কিন্তু এরা তো বেশ সুপুরুষ। আর একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রলুম: বলিদ্বীপে যখনই পদণ্ডদের ছবি আঁকে বা মূর্ত্তি তৈরী করে, তখনই তাতে একটু বিকট ভাবের, একটু ব্যঙ্গ করার যেন ইঙ্গিত থাকে। এর বা কারণ কি তাও বুঝ্‌তে পারলুম না। ঘরগুলির কাঠের চালের বাতায়, থামের গায়ে আর মাথায়, আর জানালা দরওয়াজায় বেশ খোদাই কাজ আছে। একটী প্রকোষ্ঠে দেখলুম বড়ো বড়ো চীনা ছবিতে ভর্ত্তি। ছবিগুলি বারান্দায় দেয়ালে আর থামে টাঙানো। বেশীর ভাগই হাতে আঁকা চীনা সুন্দরীদের মুখের রঙীন ছবি। চীনা প্রভাব সরাসরি চীন দেশ থেকে কিছু কিছু ইন্দোনেসিয়ায় এসে গিয়েছে, এদের শিল্পে, আর সঙ্গীতে। সমস্ত মহলগুলি পরিষ্কার ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অবস্থায় আছে; তবে ঘরগুলিতে লোকজন বেশী থাকে ব'লে মনে হ'ল না। ঠিক একটি মহলে ঢোকবার সামনেই একটা ইটের দেয়াল দেখলুম; দেয়ালটীর ভিতর দিকে

কারাঙ-আসেম্—প্রাচীন পুরী—ভাস্কর্য্যের নিদর্শন—কিরাতার্জ্জুনীয়-চিত্র
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

অর্থাৎ মহলের উঠানের দিকে, বেশ বড়ো খোদাই করা নরম পাথর একখানি লাগানো আছে; তাতে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় ভাস্কর্য্যের একটী সুন্দর নিদর্শন বিদ্যমান,—কিরাতার্জ্জুনীয়ের দৃশ্য। অর্জ্জুনের তপস্যা, বরাহ-বধ, কিরাত-বেশী শিব আর তাপস অর্জ্জুনের যুদ্ধ প্রভৃতি পৌরাণিক কাহিনী যবদ্বীপে আর বলিদ্বীপে খুবই জনপ্রিয় বস্তু। এই পাথরখানিতে খোদাই করা মূর্ত্তি জায়গায় জায়গায় ক্ষ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এতে পৌরাণিক গল্পটি বলবার যে ভঙ্গীটি প্রকাশ পেয়েছে সেটী আমার বেশ লাগ্‌ল—এই ভাস্কর্য্যটিকে এদেশের শিল্পের একটি ভালো নিদর্শন ব'লেই মনে হ'ল। আমরা পরে আর একবার এই প্রাচীন পুরী দেখতে যাই, তখন শ্রীযুক্ত বাকে এর কতকগুলি ছবি তোলেন, এই প্রস্তরখোদিত চিত্রটীরও একটি ছবি নেওয়া হয়। একদিকে ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হ'য়ে চারজন অপ্সরা অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে যাচ্ছে; অর্জ্জুন 'মিন্তারগ' বা 'বীতরাগ', নির্ব্বিকার চিত্তে যোগাসনে ব'সে আছেন; অপ্সরারা স্নান ক'রছে, তাঁকে প্রলুব্ধ করবার জন্য নানারূপ চেষ্টা ক'রছে; শেষে শিব প্রেরিত বরাহের আগমন, আর অর্জ্জুনের বাণ-নিক্ষেপ; অর্জ্জুনের সঙ্গে আছে তাঁর দুই খর্ব্বট অনুচর—এই অনুচরেরা ভারতে অজ্ঞাত। দ্বিতীয় দিন যখন আমরা পুরী আবার দেখতে যাই—৩০শে আগষ্ট তারিখে—সেদিন একটী মহলে একটি বলিদ্বীপীয় মেয়ে আর তার ছোট্ট একটি খোকাকে

কারাঙ্-আসেম—প্রাচীন পুরীর একটী ঘর
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

দেখি; আর দুজন পাইক বা রাজানুচরও ছিল। বাড়ীগুলির সঙ্গে প্রাচীন বলিদ্বীপীয় কাপড় পরা এদের এমন চমৎকার খাপ খাচ্ছিল যে কি আর ব'লবো। বাকের ছবিতে এরাও এসে গিয়েছে।—পুরীর মহলগুলি বেশ ফরদা জায়গা নিয়ে; ক'লকাতা শহরের উত্তরের পল্লীতে আমার বাড়ী, এই প্রশস্ত আঙিনা আর মধ্যে মধ্যে চার দিক খোলা এক এক খানা ঘর আমার দেখে বড়োই লোভনীয় বোধ হ'ল। একখানা ঘরের দরওয়াজার মাথায় 'চন্দ্রসংকাল' রীতিতে ছবি দিয়ে তারিখ জানানো হ'য়েছে—রাজা আমাদের দেখিয়ে ব্যাখ্যা ক'রে দিলেন, তারিখটা আমাদের শকাব্দতে দেওয়া—এসব দেশে শকাব্দই চ'ল্‌ত, বলিদ্বীপে এখনও চলে; তারিখ থেকে বোঝা গেল যে এই পুরীটী ২৩০ বছর আগে তৈরী।

প্রাচীন পুরী দেখে আমরা বাজারে গিয়ে খানিক ঘুরলুম, আর কিছু কিছু স্থানীয় বেতের কাজের মনি-ব্যাগ প্রভৃতি কিনলুম। তার পরে রাজবাটীতে ফিরে এসে পদণ্ডদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর আলাপ। মাধ্যাহ্নিক আহার রাজবাটীতেই হ'ল। আমার অনুরোধ মত দুজন পদণ্ড—পদণ্ড ওক আর পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক—বলিদ্বীপীয় পূজার অনুষ্ঠান দেখালেন। চত্বরের উপরে একটা কাঠের মাচা তৈরী ছিল,তাঁরা পূজার কাপড় চোপড় প'রে ব'স্‌লেন, পাশে আমিও ব'সলুম। মাথায় রঙীন কাপড়ের টোপরের মতন একটা।শিরস্ত্রাণ বা মুকুট প'রলেন, এ-রকম মুকুট দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন দেবমূর্ত্তিতে পাওয়া যায়। গায়ে নেয়ারের ফিতের মতন সাদা কাপড়ের একরকম যেন ব্যাণ্ডেজ জড়ালেন,—কাঁধের উপর দিয়ে, কোমর দিয়ে; প্রাচীন যোগী আর সন্ন্যাসীর প্রস্তর মূর্ত্তিতে, আর চোটদেশের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর মূর্ত্তিতে এই রকম বন্ধনের ব্যবহার দেখেছি। আর ঢোলের আকারের কালো কাঠের দানার আর স্ফটিকের দানার মালা প্রচুর প'রলেন, কানে কাঠের দানার মাকড়ী লাগালেন। এখানকার পদণ্ডেরা দুশ্রেণীতে পড়েন—শিব-পদণ্ড ও বুদ্ধ-পদণ্ড। এঁদের সম্প্রদায়ের পার্থক্য কি কি তা বোঝা সম্ভব হয়নি। তবে শিব-পদণ্ডেরা ব্রাহ্মণ্য বিধির অনুগামী, আর বুদ্ধ-পদণ্ডরা বৌদ্ধ বিধির; আর শিব-পদণ্ডরা মাথার চুল ঝুঁটি ক'রে বেঁধে রাখেন, বুদ্ধ-পদণ্ডরা চুল লম্বা ক'রে ঘাড়ে পিঠে ফেলে রাখেন। পূজার মন্ত্র একটু একটু আলাদা, তবে মুদ্রা করেন উভয়েই। সাম্‌নে কাষ্ঠাসনে তালপাতার আর ফুলের তৈরী দেবতার প্রতীক নিয়ে ব'সলেন, সামনে পঞ্চপাত্র, বাঁয়ে ঘণ্টা, বজ্র প্রভৃতি পিতলের তৈজস। এঁরা বিড় বিড় করে মন্ত্র ব'ল্‌তে ব'লতে অনুষ্ঠান ক'রে যেতে লাগ্‌লেন; আমি কৌতুহলের সঙ্গে দেখতে

পদণ্ডগণ কর্ত্তৃক পূজানুষ্ঠান (প্রবন্ধকার, পদণ্ড ওক, পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক)
(শ্রীযুক্তবাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত চিত্র)

লাগলাম বটে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেলনা। মনে বড়ো একটা আপশোশ র'য়ে গেল; ভাষা না জানা, পদণ্ডদের সঙ্গে বেশ কথাবার্ত্তা কইতে না পারা—এটা একটা অভেদ্য প্রাচীর।—পদণ্ডদের পাশে ব'সে তাঁদের অনুষ্ঠান দেখ্‌ছি এই অবস্থায় বাকে আর সুরেনবাবু আমাদের ছবি নিলেন। পদণ্ড ওক খর্ব্বকায় ব্যক্তি, গৌরবর্ণ সৌষ্ঠবশালী চেহারা, আর পদণ্ড বয়ন্ জিলাস্তিক্ লম্বা পাতলা শ্যামবর্ণের ব্যক্তি, হঠাৎ তাঁর চেহারা দেখে ততটা শ্রদ্ধা হয় না।

রাজা আমায় একখানি হাতে আঁকা ছবির বই উপহার দিলেন। হল ঘরে তাঁর বৈঠকখানায় টেবিলের উপরে একখানা বই ছিল—সাধারণ ফুল-স্ক্যাপ কাগজের

সমস্তটা জুড়ে তাঁরই চিত্রকরের হাতের আঁকা তুলি-টানা রেখা-চিত্রের বই. বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে কিরাতার্জ্জুনীয়ের ছবি খান ষাটেক এই বইয়ে আছে। প্রথম চিত্রে প্রভামণ্ডল-বেষ্টিত ইন্দ্র চারজন অপ্সরাকে পাঠাচ্ছেন অর্জ্জুনের তপোভঙ্গ ক'রতে; তার পরের চিত্রগুলিতে অপ্সরাদের আগমন, আর স্নান আর বেশভূষা ক'রে প্রস্তুত হওন; তার পরের কতকগুলি চিত্রে যোগাসনে উপবিষ্ট অর্জ্জুনের মন টলাতে অপ্সরাদের বিফল চেষ্টা; অপ্সরাদের ব্যর্থমনোরথ হ'য়ে দেবরাজের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন; ইন্দ্রের তখন শিবের কাছে যাওয়া; বরাহ-মূর্ত্তি ধ'রবে যে দৈত্য, তার অর্জ্জুনের তপোভূমির কাছে আগমন, বিরাট বরাহ মূর্ত্তি ধারণ, অর্জ্জুনের বাণদ্বারা এই বরাহকে আঘাত, কিরাতবেশী শিবের আগমন, অর্জ্জুনের সঙ্গে কলহ আর যুদ্ধ, আর শেষে শিবের পাশুপত অস্ত্র দান; তারপরে ইন্দ্র-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের নিকটে দূতপ্রেরণ, আর ইন্দ্রের কাছে অর্জ্জুনের গমন। এই সমস্ত বিষয়ে অনেকগুলি ছবি। পরেকার ঘটনারও কতকগুলি ছবি এই বইয়ে আছে—সে ঘটনাগুলি সংস্কৃত মহাভারত থেকে একটু পৃথক। সংস্কৃত মহাভারতে আছে অর্জ্জুনের সাহায্যে ইন্দ্র নিবাত-কবচ নামে কতকগুলি রাক্ষসকে সংহার করেন—ব্যস্; তার পরে অর্জ্জুনের মর্ত্তে পুনরাগমন। দ্বীপময় ভারতে 'নিবাত কবচ' নামটী নিয়ে 'নত কুবচ' বা 'কচ' অর্থাৎ 'নাথ বা রাজা কুবচ' ব'লে এক অসুর-রাজের কল্পনা করা হ'য়েছে; এই অসুরকে ধ্বংস করবার জন্য ইন্দ্র অর্জ্জুনের পরামর্শ আর সাহায্য চান। স্বর্গে সুপ্রভা নামে একজন অপ্সরা অর্জ্জুনের প্রেমের পাত্রী হন; অর্জ্জুনের পরামর্শে সুপ্রভা 'নত-কচ' কে মোহাবিষ্ট করবার জন্য অসুর-রাজের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হ'ল, 'নত-কচ' সুপ্রভাকে দেখে মুগ্ধ হ'য়ে অবরুদ্ধ ক'রে রাখ্‌লে,—আর পরে সুপ্রভার ইঙ্গিতে অর্জ্জুন এসে অসুরকে সংহার ক'রলেন। তারপরে অর্জ্জুন সুপ্রভাকে নিয়ে দেবরাজের কাছে ফিরে এলেন, ইন্দ্র খুশী হ'য়ে সুপ্রভাকে অর্জ্জুনের হাতে সমর্পণ ক'রলেন। ছবির বইখানিতে নিবাতকবচ সংহার করবার জন্য অর্জ্জুন আর সুপ্রভা ইন্দ্রের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসছেন, তারপরে সুপ্রভা নিবাতকবচের সামনে উপস্থিত হ'য়েছেন, নিবাতকবচের আদেশ মত এক পরিচারিকা সুপ্রভাকে প্রাসাদে নিয়ে যাচ্ছে—এই পর্য্যন্ত কতকগুলি ছবি আছে। এই বইখানি আমি প্রশংসার দৃষ্টিতে রাজার বৈঠকখানায় ব'সে উল্‌টে পাল্‌টে দেখি। রাজা এটী আমায় দিতে চাইতে আমি একটু ফাঁফরে পড়ি, কিন্তু যখন তিনি জানালেন যে প্রতিদানে দেশ থেকে তাঁকে রামায়ণ আর মহাভারত পাঠিয়ে দিলে তিনি খুশী হবেন, তখন শ্রেউএস্ আর বাকের পরামর্শে রাজার এই দান আমি গ্রহণ করি। রাজা বইখানির উপরে রোমান-মালাইয়ে তাঁর আর আমার নাম লিখে দিলেন, বইখানি যে তৎকর্ত্তৃক উপহৃত তাও লিখে দিলেন। এই ছবির বইখানি আমার বলিদ্বীপ-ভ্রমণের একটি অমুল্য স্মারক হিসাবে আর বলিদ্বীপের চিত্রশিল্পের একটি অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আমার কাছে আছে। পরে দেশে ফিরে এসে আমি রাজাকে আমার প্রতিশ্রুত বই পাঠিয়ে দিই - সংস্কৃত রাজা বুঝবেন না, তা দেবনাগরীতেই হোক বা বাঙলা অক্ষরেই হোক—আর সংস্কৃত মহাভারত দুর্লভ গ্রন্থ—তাই 'প্রবাসী' কার্য্যালয় থেকে প্রকাশিত বাঙলা কাশীদাসী মহাভারত আর কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঠিয়ে দিই; বইখানিতে রোমান মালাইয়ে এগুলি যে সংস্কৃত নয়, বাঙলা অনুবাদ, তাও লিখে দিই। রামায়ণ মহাভারতের এই সংস্করণ দুটি নন্দলাল বসু প্রমুখ আধুনিক ভারতের শ্রেষ্ঠ রূপকারদের আঁকা রঙীন ছবিতে ভরা—এই ছবিগুলি বলিদ্বীপের হিন্দুরাজার পক্ষে চিত্তাকর্ষক হবে অনুমান ক'রে পাঠাই; ছবিগুলির নীচে যথাজ্ঞান মালাই ভাষায় তাদের আশয় লিখে দিই। সঙ্গে অন্য বইও দুএকখানা পাঠাই। (এই রকম রামায়ণ মহাভারত বলিদ্বীপে অন্যত্রও পাঠিয়েছিলুম)। আর অভিধান আর ব্যাকারণ দেখে দেখে তৈরী ক'রে ক'রে মালাইয়ে একখানি চিঠি ও রাজাকে লিখি। পরে রাজার কাছ থেকে তার উত্তরও পাই।—ফরাসী পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সিলভ্যাঁ লেভি আর দুএকজন বাঙালী ভ্রমণকারী যাঁরা পরে বলিদ্বীপে কারাঙ-আসেমে যান, রাজা তাঁদের এই রামায়ণ আর মহাভারত দেখিয়েছেন শুনেছি।

আজ বিকালে কবি কারাঙ্-আসেম থেকে বিদায় নিলেন। কোপ্যারব্যার্গ ব্যবস্থা ক'রেছেন, কবি মধ্য-বলিতে পাহাড় অঞ্চলে 'তাম্পাক্-সিরিঙ' ব'লে একটি অতি সুন্দর নির্জ্জন আর ঠাণ্ডা জায়গায় থাকবেন। কারাঙ-আসেমে তাঁর আরও দুদিন থাকবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁর শরীরে আর বইছে না ব'লে তাঁকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া স্থির হ'ল। বিকাল পাঁচটায় কোপ্যারব্যার্গ আর সুরেন বাবুর সঙ্গে কবি যাত্রা করলেন। আমরা অর্থাৎ বাকে-দম্পতী, দ্রেউএস ধীরেনবাবু আর আমি আর দুটো রাতের জন্য কারাঙ-আসেমেই র'য়ে গেলুম।

(৮) বলিদ্বীপ—বেসাক্কিক্-এর মন্দির-দর্শন

২৯শে আগষ্ট ১৯২৭, সোমবার।—

পূর্ব্ব বলীতে পাহাড়ে' অঞ্চলের মধ্যে পাহাড়ের মাথায় কতকগুলি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি অতি বিখ্যাত, আর খুব প্রাচীন। স্থানটীর নাম Besakkik বেসাক্কিক্ (বা বেসাক্কিঃ)। আমাদের স্থির হ'য়েছিল যে আমরা কয়জনে মন্দির দেখে আসবো। খানিকটা পথ মোটরে যাওয়া যাবে, তারপরে হয় হেঁটে না টাট্টুতে ক'রে। মন্দির যে কতটা দূরে, সে সম্বন্ধে কারো ধারণা ছিল না। চড়াই উতরাই পথ। কোপ্যারব্যার্গ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন জায়গাটা খুব দূর নয়; তবে তিনি নিজে সেখানে যাননি। পরে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ ক'রলুম, যে বেশ দূর পথ, আর জায়গায় জায়গায় কষ্টকর পথও বটে। সকাল সাড়ে-সাতটায় প্রাতরাশের পরে আমরা পাঁচজনে যাত্রা ক'রলুম—স্ত্রীপুরুষে ডচ তিন জন, আর ভারতীয় আমরা দুজন। আমাদের পরণে ছিল ধুতি পাঞ্জাবী। চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে দিয়ে মোটরে ক'রে চড়াই পথে আমরা চ'ললুম—পাহাড়ের গায়ে থরে থরে ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে, প্রচুর বাঁশের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে, পাহাড় ব'য়ে এঁকে-বেঁকে আমাদের রাস্তা। আর সর্ব্বত্রই বলিদ্বীপের লোকেদের গতায়াত। Selat 'স্লাৎ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌঁছুলুম, শুনলুম তারপরে মোটরে যাবার পথ আছে, কিন্তু সে পথ ভালো নয়। আমাদের মোটরওয়ালা আরও উত্তরে Moentjang 'মুন্চাঙ' ব'লে একটি গাঁয়ে পৌঁছুলো, তখন বেলা নটা হবে। তারপরে আর মোটর যাবে না। স্থানটিতে একটি বড়ো বাজার আছে, ইট আর পাথরের ঘর বাড়ী অনেক আছে। এখানে

কারাঙ্-আসেম—সোনার তৈজস

টাট্টুই বেশী চলে দেখলুম, মালপত্র সব টাট্টুর পিঠে ক'রে নিয়ে যায়। বাজারে একটু ঘুরে বেড়ালুম—বাজারটী কারাঙ-আসেমেরই মতন। মেয়েদের কানের জন্য পাকানো তালপাতার আর কালো কাঠের গোঁজ বিক্রী হ'চ্ছে দেখলুম। কিছু ফল কেনা গেল, আর 'সালাক' ব'লে একরকম ফল চেখে দেখা গেল—আনারসের মতন। আমরা আমাদের নিয়ে যাবার জন্য টাট্টুর খোঁজ ক'রলুম, কিন্তু শুনলুম এত তাড়াতাড়ি টাট্টু পাওয়া মুস্কিল; আর স্থানীয় লোকেরা ব'ললে যে পথ তো খুব দূর নয়, হেঁটেই দেখে আসতে পারবেন। একটি ছোকরা সঙ্গে জুটল, মুনচাঙে তার বাড়ী, সে বেসাক্কিক্-এর পথ জানে,

প্রদর্শক হ'য়ে দেখিয়ে আনবে। ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ফিরে আসবো অনুমান ক'রে বেরুলুম। গাঁয়ের বাইরে এসেই পর্ব্বত-সঙ্কুল স্থানে একটী ছোটো নদী পেলুম—বেশ তোড়ের সঙ্গে চ'লেছে। নদীটার মাঝে চাবড়া চাবড়া পাথর প'ড়েছে, তার পাশ দিয়ে তর-তর শব্দে প্রচুর ফেনা আর জলের ছিটে তুলে নদী ছুটেছে। নদীর ধারে আর মাঝে চটান পাথরের উপরে ব'সে মেয়ের দল নাইছে, কাপড় কাচছে; গ্রাম্য লোকে আস্তে আস্তে নদী পেরুচ্ছে, টাট্টু পার ক'রছে। চারিদিকে পাহাড়, আর উঁচু পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধানের ক্ষেত। নদী পেরুতে আমাদের ঝঞ্চাট হ'লনা - আমাদের ধুতি মালকোঁচা ক'রে পরা, জুতো খুলে হাতে ক'রে নিয়ে বেশ ওপারে গিয়ে উঠ্‌লুম। কিন্তু বাকের, বাকে-পত্নীর আর ভ্রেউএস্‌এর হ'ল বিপদ; জুতো খোলো, মোজা খোলো, পেণ্ট লেন, গোটাও, আবার ওপারে গিয়ে পা মুছে মোজা জুতো পরো। ভ্রেউএস আর ধীরেন বাবু আগে আগে আমাদের সেথো বা পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে গেলেন, আমি পিছনে বাকেদের সঙ্গে রইলুম। বেচারীরা বড় মুস্কিলে প'ড়ল, খানিক পরে পাহাড়ের গায়ে ধানের ক্ষেতের মধ্যে গিয়ে। ক্ষেতের আ'লের উপর দিয়ে যেতে হ'ল। আমার পক্ষে কোনও ঝঞ্চাট নেই—দিব্যি খালি পায়ে জুতো হাতে ক'রে আ'লের কাদার উপর দিয়ে যেতে লাগলুম; বাঁ দিকে এক-গোড়ালি আর কোথাও বা হাঁটুর কাছাকাছি পর্য্যন্ত জলে কাদায় ভরা ধানের এক থর ক্ষেত, আর ডানদিকে তার চাইতে নীচু থর, হাত দুই আড়াই নীচু,—একটু পিছ্‌লে প'ড়লেই হয় এ-দিকে নয় ও-দিকে প'ড়ে জলে আর কাদায় অন্ততো হাঁটু পর্য্যন্ত মাখামাখি হ'য়ে যাবে, যদি আছাড় নাও খাই। আমার হাতে একটি বেশ শক্ত বাঁশের ছড়ি ছিল—ছোটোখাটো লাঠি ব'ল্‌লেই হয়—বিন্ধ্যাচল থেকে আনা, বিজয়গড়ের বাঁশে তৈরী আর শিশির তেল রোদ্দুর আর রান্নাঘরের ধোঁয়ায় পাকানো,—পাহাড়ে বেড়াবার পক্ষে বেশ, বাকেদের সেটী দিলুম। কিন্তু তাতে কি হয়—দুচারবার বেচারীদের ক্ষেতের কাদায় গোড়ালী ডুবিয়ে নামতে হ'ল। ধানের ক্ষেতের আ'ল দিয়ে খানিক ক্ষণ গিয়ে আবার চড়াই,—আবার সেই পার্ব্বত্য নদীটী ২।৩ বার পার হওয়া। এখানটায় পথটা একটু কষ্টকর, কিন্তু পাহাড়ে' হাওয়ায় আর চমৎকার দৃশ্যে কষ্ট আমাদের ততটা লাগ্‌ল না। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতি সুন্দর। নদীটী উপল-বিষম আকা-বাঁকা খাত দিয়ে ত্বরিতগতিতে চ'লেছে, কোথাও কোথাও বা বিশাল শিলা-খণ্ডে বাধা পেয়ে সফেন গর্জ্জনের সঙ্গে সেই বাধাকে ঘিরে উপহাস ক'রে কাটিয়ে যেন নৃত্যছন্দে যাচ্ছে; এক একটী শিলাস্তূপ থাকায় নদীর গতিবেগকে যেন বাড়িয়ে দিয়ে আরও সুন্দর ক'রে তুলেছে। এস্থানে লোক-সমাগম কম; অনেক ক্ষণ ধ'রে চ'লে চ'লে জন-মানবের সঙ্গে দেখা হয় না; শুধু পায়ে-চলা পথ ধ'রে যাচ্ছি, কখনও কখনও দূরে উঁচু চড়াইয়ে অগ্রগামী বন্ধুদের দেখতে পাচ্ছি; আর বাকে-দম্পতী কিঞ্চিৎ পশ্চাতে। এক জায়গায় নদী শেষবার পেরোবার সময়ে নদী-গর্ভস্থ প্রকাণ্ড গোলাকার একখণ্ড শিলা অতিক্রমণ ক'রেই দেখি, নদীরজল চারিদিকে শিলা-বেষ্টিত একটী স্বাভাবিক কুণ্ডের মত স্থলে জমা হ'য়ে চমৎকার একটি স্নানাগারের সৃষ্টি ক'রেছে, আর সেখানে শিলাসনের ধারে আবক্ষ জলে স্নান-নিরতা দুটী বলিদ্বীপের কন্যা; বিস্ময়-বিহ্বল দৃষ্টিতে এরা আমার দিকে চেয়ে রইল—এদের চোখে আদিমযুগের, সত্যযুগের সারল্য; চকিতের মত আমার মনে গ্রীক পুরাণোক্ত দেবকন্যাগণ সহ স্নাননিরতা কুমারী বনচারিণী দেবী আর্‌তেমিস্ আর মৃগয়ার্থ বনে আগত শ্বগণ-পরিবেষ্টিত যুবক আক্তাইওন্‌-এর কাহিনী মনে এলো। আমি নদী পার হ'তে হ'তেই বাকে-দম্পতী সেখানে এসে প'ড়লেন, তাঁদের চোখেও প্রাচীন গ্রীক পুরাণের কল্পলোকের উপযুক্ত এই জীবন্ত চিত্রটী এড়াল না।

চড়াই উতরাইয়ের পথ ছেড়ে, একটা পাহাড়ের শ্রেণী এই ভাবে পেরিয়ে, আমরা খানিকটা সোজা পথ পেলুম। মাঝে একটী গ্রাম প'ড়ল, সেখানে লোকজনের সঙ্গে দেখা হল। আশেপাশে খুব না'রকেল গাছ; আমাদের তেষ্টাও পেয়েছে; কতকগুলি লোককে স্থানীয় লোক ব'লে মনে হল,—এরা আমাদের চারিদিকে ভীড় ক'রে

দাঁড়াল, এদের কাছে ডাব খেতে চাইলুম। দুটো ডাব পেড়ে এনে একটা ছোটো ভোজালীর মতন অস্ত্র দিয়ে মুখ কেটে আমাদের খেতে দিলে। হাত মুখ ধোবার দরকার হওয়ায় আমার সামনেই একটী চাষীর বাড়ীতে গিয়ে জল চাইলুম—বাড়ীর ভিতরে উঠানে কতকগুলি শূওর বেড়াচ্ছে, মুরগী চ'রছে, একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে পালিয়ে গেল, আঙিনার মাঝে বলিদ্বীপীয় পদ্ধতিতে উঁচু দাওয়ার উপর কতকগুলি ঘর; একটা বৃদ্ধা আর দুটী কম-বয়সী মেয়ে বেরিয়ে এলো,—দুজন ইউরোপীয়, একজন ইউরোপীল মেয়ে, আর অজ্ঞাত দেশের অধিবাসী আমাদের দুজনকে দেখে একটু তটস্থ হ'য়ে গেল। ক্রেউএন্ মালাইয়ে ব'লতে আমাদের একটি মাটির হাঁড়ি ক'রে জল আর একটা না'রকেল মালা দিলে; মুখ হাত ধুয়ে ধন্যবাদ দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। ডাব দুটী প্রকাণ্ড; আমরা দুজন বাঙালী মিলে একটার জল শেষ ক'রতে পারলুম না; ডাবের শাঁসটুকু বাদ দিলুম না, খুব মিষ্টি ডাব। অল্প দু'চার পয়সা দাম নিলে।

এর পরে আমারা যে পথ পেলুম, সেটা সমতল ভূমির উপর দিয়ে,—সরু মানুষ চলা পথের দুধারে খালি বাগান বাড়ী। এ পথটীও অনেকটা। তারপরে আবার চড়াই উতরাই—একজাগায় খাড়াই এত উঁচু আর এত পিছল যে ফিরতি পথে উতরাইয়ের সময়ে আমাদের পা ঘ'ষটে ঘ'ষটে কতকটা ব'সে ব'সে চ'ল্‌তে হ'য়েছিল। এই চড়াই উতরাইয়ের সময়ে আমরা আবার পাহাড়ের মধ্যে সামান্য ঢল-যুক্ত বেশ খানিকটা খোলা জমী পেলুম—ঘাসে ভরা কতকটা, কতকটা ধানের ক্ষেত। এই হাঁটা-পথ দিয়ে আমরা চ'লেইছি—পথে থাকে জিজ্ঞাসা করি, বেসাক্কিক্ কত দূর,—জবাব পাই—বেশী দূর নয়; এ সেই উড়িষ্যার 'পোয়া-বাট'-র মতন। বেলা বারোটা বেজে গিয়েছে, সকলের ক্ষিদেও পেয়েছে; পথে একটী স্ত্রীলোক একটী ঝুড়িতে কলা নিয়ে বিক্রী ক'রতে ব'সেছে—দূরে দূরে ক্ষেতে যারা কাজ ক'রছে তাদেরই জন্য; আমরা কতকগুলি কলা কিনলুম; যদিও কলাগুলি অপুরুষ্ট কাঁচা-কাঁচা ছিল, তাই আমরা সানন্দে খেতে খেতে চ'ললুম। সাড়ে বারোটা বেজে গিয়েছে, একটা বাজে বাজে, এমন সময়ে সামনে খুব দূরে একটা ঢল জমি পেরিয়ে কতকগুলি অনুচ্চ পাহাড়ের মাথায় ইমারতের ছাত আর নেপালী মন্দিরের মত মন্দিরের মেরু বা চূড়া দেখা গেল; মন্দিরের সাম্‌নে একটী গ্রাম, গ্রামের সংলগ্ন সবুজে ভরা ক্ষেত। আমরা বেসাক্কিক্-এর কাছে এসে পৌছুলুম।

মহিলা-সংবাদ

লেডী বসন্তকুমারী দেবী।—পুরী বিধবাশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী লেডী বসন্তকুমারী দেবী গত ১১ই জুন পরলোকে গমন করিয়াছেন। ইনি লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতি স্যর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি সংসার হইতে দূরে সম্পূর্ণ অনাসক্তভাবে জীবনযাপন করিতেছিলেন। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ-দুর্দ্দশায় তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। তাহাদের দুর্দ্দশা-মোচনের জন্য তিনি সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলস্বরূপ তিনি পুরীতে একটি বিধবাশ্রম স্থাপন করিয়া তাহাই পরিচালন করিতেছিলেন। শীঘ্রই তাঁহাকে সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে ভাবিয়া বিধবা-শ্রমের কর্ম্মভার একটি উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানের হাতে সমর্পণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছিলেন এবং পরিশেষে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি তাঁহার আরব্ধ কর্ম্মভার গ্রহণ করায় সুখী হইয়াছিলেন।

বর্ত্তমানে বিধবাশ্রম এবং বালিকাবিদ্যালয়ে শ্রীমতী

তড়িৎবালা দাস বি-এ, বি-টি, মৃণ্ময়ী দত্ত এবং শ্রীমতী নন্দিনী ঘোষ শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিতেছেন। বসন্তকুমারী

স্বর্গীয়া বসন্তকুমারী দেবী

দেবী এতদিন স্বয়ং বিধবাশ্রমে উপস্থিত থাকিয়া ইহার পরিচালন কার্য্যে নানাভাবে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে বিধবাশ্রমের অনেক ক্ষতি হইল।

শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র ও তাঁহার ভগিনী শ্রীমতী রেণুকা মিত্র নওগাঁর (রাজসাহী) উকীল শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ মিত্রের কন্যা। ইহারা দুই জনেই এবার পুণার "ভারতবর্ষীয় মহিলা বিদ্যাপীঠে"র প্রবেশিকা পরীক্ষায় অতিশয় কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীমতী অরুন্ধতী মহিলা বিদ্যাপীঠের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। বিশেষ প্রশংসার বিষয় এই যে ইহারা স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন নাই, বাড়ীতেই লেখাপড়া শিখিয়াছেন।

শ্রীমতী অরুন্ধতী মিত্র শ্রীমতী রেণুকা মিত্র

শ্রীমতী তারামতি বাঈ পাটেল। ইনি গুজরাটী মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম এল-সি-বি [আইন] পরীক্ষা

শ্রীমতী তারামতি বাঈ পাটেল

উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহারা পটিদার সম্প্রদায়ভুক্ত ইহাদের মধ্যে এখনও অবরোধ প্রথা প্রচলিত।
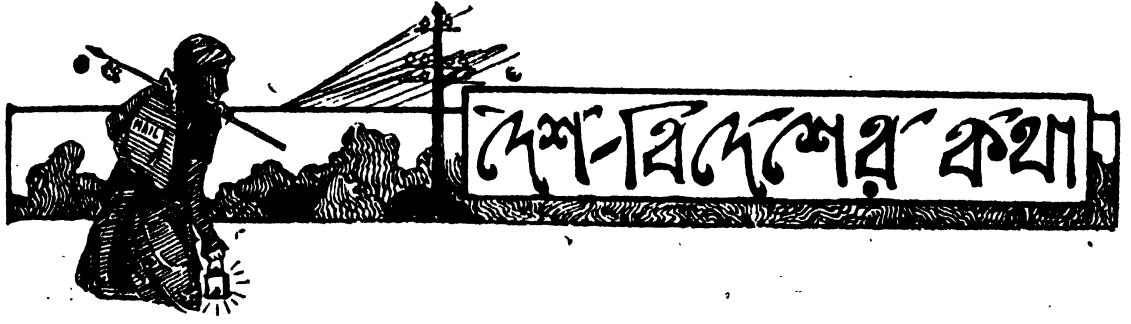
ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ—

রবীন্দ্রনাথ ইংলণ্ডের 'স্পেক্টেটর' পত্রে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহাতে বৃটিশের ভাবুকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতবর্ষ ও বৃটেনের সম্মিলন-সাধনের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন। ঐ প্রবন্ধে তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে আতঙ্ক ও স্পর্দ্ধাপ্রকাশসূচক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার অনতিক্রমনীয় ফল বাদ দিলে, একথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, ভারতবর্ষ তাহার আধ্যাত্মিক গৌরব অক্ষুন্ন রাখিয়া নিজের কঠিন আদর্শ ও মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় নেতার শিক্ষা পালন করিয়াছে।

তিনি বলিয়াছেন, য়ুরোপ সদাশয়তা প্রকাশ করিয়া তাহার সভ্যতা প্রদর্শন জন্য এশিয়াতে যান নাই, পরন্তু অহমিকা ও ক্ষমতা প্রকাশের অসীম ক্ষেত্রের অন্বেষণে গিয়াছিলেন। তিনি স্পষ্টরূপে বলিয়াছেন, এশিয়া কখনই ইহা স্বীকার করিবে না যে, মনুষ্যত্ববিহীন শক্তি বিজ্ঞানের সাহায্যে চিরদিনের জন্য সাফল্য লাভ করিবে।

তবে তিনি বৃটেনের প্রতি ন্যায়পরতা প্রদর্শন করিয়া এ কথা বলিতে ত্রুটি করিবেন না যে, ধ্বংসসাধনে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন জাতি ও নিরস্ত্র জাতির মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে যেরূপ নিগ্রহভোগের সম্ভাবনা, বৃটিশ শাসনে আমাদের ভাগ্যে তাহা ঘটে না, অন্য কোন সাম্রাজ্য-তান্ত্রিক শাসকের অধীনে ইহা অপেক্ষা অনেক গুণে অধিক যে লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইত, তাহা নিশ্চিত।

যখন গভর্ণমেণ্টের স্বাভাবিক ব্যবস্থার ব্যতিক্রম ঘটান হয়, তখন অত্যাচার উৎপীড়নের জন্য লোকের অভিযোগ করা সাজে না।

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, ইহা বীরের ন্যায় আপনার ধর্ম্ম রক্ষা করিবে এবং অত্যাচারে পরিবর্ত্তে অত্যাচার কখনই করিবে না।

"স্পেক্টেটর" পত্র ডাক্তার ঠাকুরের প্রবন্ধে টিপ্পনী করিয়া বলিয়াছেন যে, তিনি ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের লক্ষ্য ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ধীরপন্থী ভারতীয়গণের এ বিষয়ে অভিমত পরবর্ত্তীকালে লিখিত হইবে।

(বরিশাল)

বাংলার স্বাস্থ্য—

সম্প্রতি কলিকাতা গেজেটে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের ১৯২৮ সনের রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। বাংলার স্বাস্থ্য যে কিরূপ শোচনীয় তাহা এই রিপোর্ট পর্য্যালোচনা করিলে অতি সহজেই প্রতীয়মান হইবে।

১৯২১ সনের সেন্সাসে বাংলা প্রদেশের লোক সংখ্যা হইয়াছিল ৪,৬৪,২২,২৯৩ জন, আলোচ্য বর্ষে ৭৫৬৮০টি শিশুর জন্ম হইয়াছে; ইহার পূর্ব্ব বৎসর জন্ম হইয়াছিল ১২৮৬৮৬৩ জনের, অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে পূর্ব্ব বৎসর হইতে প্রায় ১০০,০০০ জন্ম-সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু এই বৎসরে মোট মৃত্যু ঘটিয়াছে ১১,৮৯,০১৫ জনের। তার পূর্ব্ব বৎসর মরিয়াছে ১১,৮৯,৩৭০ জন। সুতরাং মৃত্যুসংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই বলিলেই চলে।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা ছিল হাজার করা ২২৮৩, ১৯২৭ সনে সেই স্থলে হইয়াছে হাজার করা ১৭৮ এবং আলোচ্য বর্ষে হইয়াছে ১৭৮১ অর্থাৎ আলোচ্য বর্ষে শিশু-মৃত্যুর সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর হইতে সামান্য কিছু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষে কলেরা রোগে মৃত্যু অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ১৯২৭ সনে কলেরায় মারা যায় ১১৮৩৭৭ জন, সেই স্থলে ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ১৩৭২৪৫ জন অর্থাৎ শতকরা প্রায় ১৬টি মৃত্যু বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং গত পাঁচ বৎসরের গড়ের প্রায় দ্বিগুণ মৃত্যু এই বৎসর ঘটিয়াছে।

গত ৫ বৎসর ধরিয়া বসন্ত রোগের প্রকোপ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ১৯২৫ সনে এই রোগে মারা যায় ৪২৫১৪ জন আর আলোচ্য বর্ষে মারা গিয়াছে ৪৩৫৫৮ জন।

১৯২৬ সনে ম্যালেরিয়াতে মারা যায় ৪৫৮২০৮ জন, ১৯২৭ সনে মারা যায় ৪২৯১৪৩ জন, আর ১৯২৮ সনে মারা গিয়াছে ৩৬৮৬৯১ জন। ১৯২৭ সনে কালাজ্বরে মৃত্যু হয় ১১৮৫৫ জনের আর আলোচ্য বর্ষে সেই স্থলে মৃত্যু হইয়াছে ১০৭৪৬ জনের। জ্বররোগে মোট মৃত্যু ঘটে ১৯২৭ সনে ৭৮৯০০৬ জনের। সেই স্থলে আলোচ্যবর্ষে মৃত্যু ঘটে ৭৫২০০৭ জনের। এই রোগের দিক দিয়া স্বাস্থ্য বিভাগ অনেক খানি সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(শান্তিপুর)

ভারতীয় মিলে স্বদেশী সূতার ব্যবহার—

ভারতের যে যে কাপড়ের কলে স্বদেশী সূতা ব্যবহৃত হয় তাহার তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) স্বদেশী মিল কোম্পানী, বোম্বাই।
(২) টাটা মিল, বোম্বাই।
(৩) মেকেঞ্জি পেটিট মিল, বোম্বাই।
(৪) জুবিলি মিল লিমিটেড, বোম্বাই।
(৫) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, শ্রীরামপুর।
(৬) আকোলা কটন মিল কোং, আকোলা।
(৭) কেশরাম কটন মিল, বেঙ্গল।
(৮) নিউ বড়োদা মিল কোং, বড়োদা।
(৯) জিয়ানজিয়ারো কটন মিলস, গোয়ালিয়র।
(১০) মতিলাল হীরাভাই স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।

(১১) নন্দলাল ভাদুড়ী মিল লিমিটেড, ইন্দোর।
(১২) সরনারায়ণ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, গোয়া।
(১৩) সীতারাম স্পিনিং এণ্ড উইভিং, কোচিন।
(১৪) সিটি অব্ আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড ম্যাঃ।
(১৫) আমেদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, আমেদাবাদ।
(১৬) মহারাজা মিলস কোং লিমিটেড, বড়োদা।
(১৭) মোরারজি গোকুল দাস স্পিনিং এণ্ড উইভিং
(১৮) ব্রোচ ফাইন বাউণ্টস স্পিনিং এণ্ড উইভিং, বোম্বাই।
(১৯) দি গর্ডেন স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং।
(২০) প্রেম স্পিনিং এণ্ড উইভিং লিঃ।
(২১) দীনসোয়াদ পালিত মিল, বোম্বাই।
(২২) আর, বি. বংশীলাল আমির চাঁদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং, ওয়ার্দ্ধা সি, পি।
(২৩) বোম্বে মিলস কোং লিঃ, বোম্বাই।
(২৪) গুজরাট কটন মিলস কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৫) আর, এস, রইলকচাঁদ মেহেতা স্পিনিং মিলস, ওয়ার্দ্ধা।
(২৬) নিউম্যানেকচক স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(২৭) স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস, দিল্লী
(২৮) মোরাদাবাদ স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস লিঃ, মোরাদাবাদ।
(২৯) আমেদাবাদ জুবিলী স্পিনিং এণ্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোং, আমেদাবাদ।
(৩০) রায়পুর ম্যানুফ্যাচারিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩১) মডেল মিলস লিঃ, নাগপুর সিটি।
(৩২) আরাদয় স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিঃ।
(৩৩) কানপুর কটন মিলস কোং, কানপুর।
(৩৪) আলোকা মিলস লিমিটেড, আমেদাবাদ।
(৩৫) আমেদাবাদ ম্যানুফ্যাকচারিং এণ্ড ক্যালিকো প্রিণ্টিং কোং লিঃ, আমেদাবাদ।
(৩৬) ঢাকেশ্বরী কটন মিল, ঢাকা।

(শান্তিপুর)

শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী

শ্রীশ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী—

গত ১১ই আষাঢ় পরলোকে গমন করিয়াছেন। ১২৭৪ সালের বিক্রমপুর পশ্চিম পাড়া গ্রামে কুলীন বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে তাঁহার জন্ম। এই সুদীর্ঘ ৬৩ বৎসর কাল তিনি নানা ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ও সমন্বয়ে উদার নৈতিক জীবন যাপন করিয়া শাস্ত্র ও সদাচারের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। তিনি এক বিশিষ্ট তান্ত্রিক সাধকের পুত্র। ছাত্রজীবনে তিনি আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন। যৌবনে তিনি বিখ্যাত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অসাম্প্রদায়িক ভাবের সাধক হইয়াছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। তিনি কাহারও কোন প্রকারের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ না করিয়া কেবল শক্তির প্রভাবে প্রত্যেকের স্ব স্ব বিবেকবুদ্ধি জাগ্রত করিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ের ঘোর সাম্প্রদায়িক বিরোধে তাঁহার ন্যায় আদর্শ সমন্বয়বাদীর অভাব সকলকে ব্যথিত করিবে।

ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব

(একটি চিঠি)

ঢাকার শোচনীয় দাঙ্গা হাঙ্গামার বিস্তারিত বিবরণ আপনার নিকট নিশ্চয়ই পৌছিয়াছে। তবে নিজে সমস্ত দেখাশানা ও অন্যের কাছ হইতে জানার ভিতরে অনেকটা পার্থক্য থাকিয়া যায় এবং আমার মনে হয় আপনি নিজে যদি সমস্ত পরিদর্শন করিতেন, তবে খুবই ভাল হইত। সে যাহা হউক, আমি আজ এই দাঙ্গা-সম্পর্কীয় ব্যাপারেই কয়েকটি কথা লইয়া আপনার কাছে উপস্থিত হইতেছি এই আশাতে যে,—আমি যেদিক দিয়া আলোচনা করিতে চাই আপনার কাছ হইতে সে দিকটা আরও স্পষ্টতর ও সুচারুরূপে সাধারণের নিকট প্রকাশিত হইতে পারিবে।
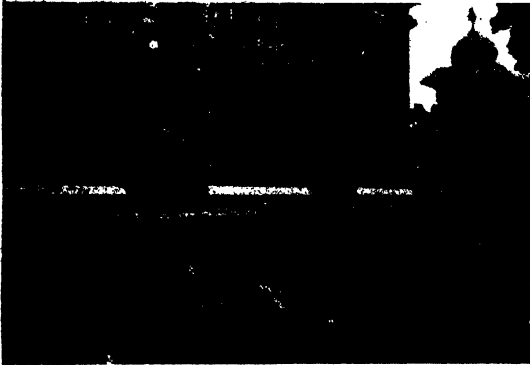
কায়েতটুলীতে অত্যাচারের সাক্ষী সুশীলা-নিবাস

আমি ঢাকাতেই থাকি এবং পুর্ণ দাঙ্গার সময় ঢাকাতেই ছিলাম ও সহরের বিপন্ন অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাইয়াছি। সহরের দাঙ্গা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ গ্রামগুলিতে যে লুণ্ঠন চলিয়াছিল তা'র মধ্যে রুহিৎপুর গ্রামের লুণ্ঠনাবশেষ দৃশ্য নিজে দেখিয়া আসিয়াছি। ঢাকা সহরের দাঙ্গা সম্পর্কে বর্ত্তমানে হিন্দু মুসলমান উভয় পক্ষ একে অন্যকে দোষী করিবার চেষ্টা দেখা যায়, কিন্তু গ্রামের লুণ্ঠন সম্পর্কে হিন্দুদের দায়ী করিবার এতটুকু সূত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমার ইচ্ছা হয়, শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে এই সম্পর্কে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি।

লুটপাট চিরদিন যুদ্ধোন্মত্ত সৈন্যসামন্ত অথবা লুণ্ঠন-বৃত্তি দস্যুরাই করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু রুহিৎপুরে কি

কায়েতটুলীতে আক্রমণের ফলে শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেনের বাড়ীর দুরবস্থা

দেখিলাম? সেখানে আশেপাশের, এমন কি গ্রামস্থের ভিতরও, কতক মুসলমান গৃহস্থ স্ত্রী-পুরুষ হিন্দু গৃহস্থ বাড়ী সব অকাতরে লুণ্ঠন করিয়াছে। রুহিৎপুরে দেখিলাম প্রায় দুইশ' গৃহস্থ বাড়ী লুণ্ঠিত হইয়াছে। শত শত মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ, তা'দের সঙ্গে নাকি ১০।১২ বৎসরের বালকও ছিল—প্রত্যেক ঘরে ঢুকিয়া বাড়ীর যাবতীয় জিনিষপত্র, এমন কি ঘরের কপাট এবং দু'এক স্থলে ঘরের চালের টিন পর্য্যন্ত, খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। মাটি খুঁড়িয়া ডোবা পুকুর ইত্যাদি,—অর্থাৎ যে সব স্থানে গহনা অথাদি কি থালা বাসন ইত্যাদি গৃহস্থের লুকাইয়া রাখা সম্ভব—সে সবই ঘাঁটিয়া যাহা পাইয়াছে সবই লইয়াছে। এমন কি দরিদ্রের ধান ভানিবার ঢেঁকীটি পর্য্যন্ত তুলিয়া লইয়াছে। একটি দরিদ্র স্ত্রীলোক, যে তার বৃদ্ধ স্বামী ও

তা'র নিজের গ্রাসাচ্ছাদন কেবলমাত্র একটি ঢেঁকীর উপরই নির্ভর করিয়া চালাইতেছিল, তা'র ঢেঁকীটি লইয়া যাওয়াতে সে আমাদের কাছে যে কান্না কাঁদিয়াছিল তাহা ভুলিতে পারিব না। বাস্তবিক পক্ষে যাহারা বংশানুক্রমে শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিয়া আসিয়াছে, এরূপ স্ত্রী-পুরুষ দলে দলে এইভাবে গৃহস্থ বাড়ী লুণ্ঠন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা বোধ হয় নিতান্ত বিরল। যখন ভাবি, অনেক মুসলমান আজ তাদের ঘরের মেয়েদেরও লুণ্ঠনকার্য্যে সঙ্গে আনিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন তাহাদের নৈতিক অধঃপতন যে কতদূর গড়াইয়াছে, ভাবিলে অন্তর অবসন্ন হয়। মুসলমান মৌলবীগণ তো অনেক রকম 'ফতোয়া' জারি করেন,—এ সম্বন্ধে তাঁহারা কি 'ফতোয়া' দিতে চাহেন ?

ঢাকা বংশালের একটি বাড়ী

রুহিৎপুরে তিনটি জিনিষ চোখের কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল—বর্ব্বরতা, কাপুরুষতা ও ইহার অন্তরালে অপ্রত্যক্ষভাবে সয়তানী চাল। রুহিৎপুরে মুসলমান বর্ব্বরতা সম্বন্ধে এতক্ষণ লিখিয়াছি, হিন্দুর কাপুরুষতার চূড়ান্ত যা' দেখিলাম তাহাই এখন লিখিতে চাই।

ঢাকা, বংশাল পাড়ার শ্যামচাঁদ বসাকের আড়তের ধ্বংসাবশেষ

মুসলমানরা অনেকেই দূর হইতে, এমন কি নৌকাতে খাল পার হইয়া স্ত্রীপুরুষ-বালক সব লুট করিতে আসিয়াছে প্রকাশ্য দিবালোকে,—তাহাতে তা'রা প্রাণের ভয় করে নাই। আর নিজ নিজ বাড়ীতে পৈত্রিক ভিটাতে দাঁড়াইয়া হিন্দুরা তাহা রক্ষা করিতে দাঁড়ায় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম হিন্দু স্ত্রীপুরুষ-বালক-বালিকা প্রায় সবই পাটক্ষেতে, কেহ বা নমঃশূদ্র পল্লীতে, কেহ বা দু'এক জন সাধুপ্রকৃতি মুসলমানবাড়ীতেও পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছে। তা'দের কাপুরুষতা ও একতার অভাব,—যা'তে নাকি তারা ২০০ঘর গৃহস্থ হইয়াও আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে পারে নাই,—এত সুস্পষ্ট-ভাবে চোখে পড়িয়াছিল, যে, তাহাতে লজ্জায় অবনত হইতে হয়। যাহারা আক্রান্ত হইয়াছে তাহারা প্রায়ই ব্যবসায়ী-শ্রেণী—ব্রাহ্মণাদিও আছে। কিন্তু অনেক জায়গাতেই দেখা ও শোনা যায়, যে, মুসলমানরা নমঃশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের আক্রমণ করিতে সাহস পায় না—কারণ জানে যে, তাদের সাহস ও একতা আছে অথচ এদেরই হিন্দু-সমাজ কোণ-ঠাসা করিয়া রাখিয়াছে! দু'এক স্থলে মুসলমানরা না কি নমঃ-শূদ্রদেরও উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে জাগিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছে শোনা যায়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সফল হয় নাই। হিন্দুসমাজে আত্ম-ভেদে যে দুর্ব্বলতা আসিয়াছে আজ বুঝি তা'রই প্রায়শ্চিত্ত সুরু হইয়াছে !
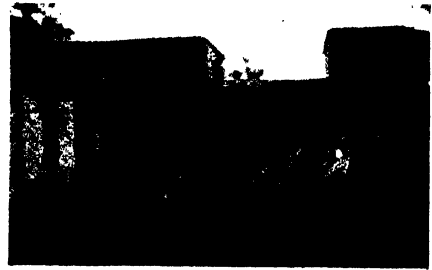
বংশালের একটি বাড়ী

মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্ততঃ কতক অংশও যে আজ এইরূপ হীনকার্য্যে যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইতে পারিতেছে, আর এরূপভাবে ব্যবহৃত হওয়াতে তাদের যে কতদূর নৈতিক অধঃপতন সূচিত হইতেছে, তাহা কি তাঁদের

ভিতর যাঁরা শিক্ষিত তাঁরা ভাবিয়া দেখিবেন না? আমি শুনিয়াছি কোনো কোনো সাধুপ্রকৃতি মুসলমান এই সমস্ত লুটের জিনিষকে 'হারাম' বলিয়া ঘৃণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁদের কি অগ্রসর হইয়া প্রকাশ্যভাবে এই ভাব

বংশালের একটি ডিস্পেন্সরীর দুরবস্থা

নিজেদের সমধর্ম্মীদের ভিতর প্রচার করা উচিত নয়? মুসলমান ধর্ম্মে কি বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া কিছু নাই? পরস্ব লুণ্ঠন কি তাঁদের ধর্ম্মে অধর্ম্ম নয়? মুসলমানকে লুণ্ঠন করিলে পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করিলে পাপ নয়, তাঁদের ধর্ম্মে কি এইরূপ বলে? লুণ্ঠনকারীদের অনেকে না কি বলিয়াছে, যে, সাত দিন কোন আইন নাই, এইরূপ তারা শুনিয়াছিল। যেন আইনের ভয়ই একমাত্র ভয়—ধর্ম্মভয় বলিয়া তাদের কিছুই নাই।

একজন ঠাট্টা করিয়া বলিতেছিলেন, যে, আজ হিন্দু মেয়েরা ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে স্বরাজ-পতাকা হাতে লইয়া, আর মোস্লেমনারী ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছে লুট করিতে। একদিক দিয়া উভয়েই সমান, যে, উভয়েই গণ্ডীর বাঁধন অতিক্রম করিয়াছে! মুসলমান ভ্রাতারা এ সম্বন্ধে কি বলেন?

আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিবার আছে। সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু হওয়ার পর ঢাকা সহরে হিন্দুনারীরা দলে দলে সহরের যে কোনো অলিগলি ঘুরিয়া সভাসমিতিতে যোগ দিয়াছে,—চাঁদা আদায় ইত্যাদি করিয়াছে—অনেক সময়ই কোনো পুরুষ সঙ্গে লওয়ার প্রয়োজন হয় নাই। মুসলমান ভ্রাতাদের দ্বারা কোনো প্রকার অনিষ্ট হইতে পারে, এরূপ ভাবই তাদের মনে আসে নাই। আমি নিজে এই দাঙ্গার অল্প কয়েকদিন পূর্ব্বে শুধু একটিমাত্র মহিলা সহ কংগ্রেসের কাজে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত মুসলমান গাড়োয়ানের গাড়ীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়াছি,—কোনো সংশয় বা সঙ্কোচ আসে নাই। বাস্তবিক এটা কত বড় বিশ্বাসের ভাব। আর আজ না কি মুসলমানেরা বলে, যে, কই হিন্দু স্ত্রীলোকেরা আজ স্বরাজ-পতাকা লইয়া বাহির হয় না? এখন তারা কই? তারা যে পূর্ব্বে অসঙ্কোচে মুসলমানদের মধ্য দিয়া বাহির হইতে পারিত, সেটাই তা'দের পক্ষে গৌরবের বিষয় ছিল, না আজ যে তা'রা পলে পলে তাদের ভয়ে শঙ্কিত, এটাই তা'দের গৌরবের? আশা করি, শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা ইহার উত্তর দিবেন।

মুসলমান লুণ্ঠনকারীরা না কি ঢাকার এক প্রভাবশালী মুসলমানের দোহাই দিয়াছে এবং তাঁহার হুকুমে তাহারা এরূপ করিতেছে ও তাঁহার রাজত্ব হইয়াছে এরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছে। ধরিলাম মুসলমান রাজত্বই হইয়াছে,—কিন্তু তাহার কি এই নমুনা? বাদশাহের রাজত্ব হইলে তাঁর মুসলমান প্রজা

বংশালের একটি বাড়ীর লুণ্ঠনান্তে দুরবস্থা

ছাড়া অন্যধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদের ধন প্রাণ নিরাপদ থাকিবে না, ইহাই কি বাদশাহী রাজত্ব দ্বারা বুঝায় এবং তাহাই কি ইস্লাম-সভ্যতার গৌরববর্দ্ধক? শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতারা ইহার উত্তর দিবেন কি?

বাস্তবিকপক্ষে মুসলমান ভ্রাতাদের ভিতর যাঁরা শিক্ষিত, তাঁদেরই দায়িত্ব অধিক। যারা অশিক্ষিত ও অজ্ঞান, তাদের বুঝাইয়া দেওয়া তাঁদেরই কর্ত্তব্য। হিন্দুসমাজেও অনেক দোষ ছিল ও আছে। কিন্তু সেই দোষ দূর করিবার জন্য যুগে যুগে সংস্কারকেরও অভাব হয়

নাই। মুসলমান সমাজও যদি এখন নিজেদের দোষ দেখিয়া তাহা সংশোধন করিতে অগ্রসর না হন, তাহা হইলে ইহার ফল যে কি বিষময় হইবে তাহা ভাবা যায় না।

আমার যাহা লিখিবার ছিল লিখিলাম। আমি খুবই আশা করিতেছি, যে, আপনি এই দাঙ্গা সম্পর্কে খুব বিশদভাবেই 'প্রবাসী'তে আলোচনা করিবেন—বিশেষ করিয়া শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায়কে এই সব বিষয়ে ভাবিয়া দেখিবার জন্য এবং তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিবার জন্য আহ্বান করিবেন। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামের দিনে কোথায় হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া দেশের পরাধীনতা মোচন করিতে অগ্রসর হইবে —আর কোথায় এই শোচনীয় অবস্থা! কিন্তু তবুও আশা করিতেছি যে, বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারিয়া এই স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিবেন।

জনৈকা হিন্দু-মহিলা।

সম্পাদকের মন্তব্য। এই চিঠিতে লিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের লোকদিগকে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

প্রবাসীর সম্পাদক।

খালাস

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটী হইয়াছে, নগেন্দ্রবাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু একজন পূর্ব্ববঙ্গের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্ব স্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটীতে তাঁহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্পপ্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুরমহাশয় পেনসনপ্রাপ্ত সবজজ। তাঁহার তিনটী শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকিল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না—সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্রবাবুর বয়ঃক্রম সাতাইশ বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটী হইয়াছেন। ইনি এম-এ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্টই আছে, সেইজন্য ইঁহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটীরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটীর নামই দীনবন্ধু "ঘটীরাম" রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া, কানাকে কানা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ্মচক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবুও ঘটীরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটীবাবু চা পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল—"ফরিদসিংহে এখন আর কোন হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজুৎ এখন আর কিছু নেই।"

ইন্দুমতী বলিল—"স্বদেশী কেমন চলছে?"

"মন্দ চলচে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়তাম তেমন ত কৈ দেখি নে।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"তা-ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটী বাবু বলিলেন—"তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী জোরে চলছে। প্রকাশ্যভাবে সেখানে একখানি বিলিতি কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল—"জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছুই বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে আর ছেলেরা বলচে—'এজি এজি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল—"আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গিয়ে এবার খোকাকে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন?"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আরে সর্ব্বনাশ! চাকরী যাবে।"

"চাকরী না গেলে আপনি দিতেন?"

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আছে?"

গিরীন্দ্র বলিল—"এমন চাকরী করেন কেন?"

"খাব কি?"

"কেন আপনার ত ল লেকচার কমপ্লিট রয়েছে। ওকালতিটা পাশ করে দিব্যি বড়দাদার সঙ্গে হাইকোর্টে বেরুতে আরম্ভ করুন।"

"আর কি বুড়ো বয়সে এগজামিন পাশ করা পোষায় ভাই?"

ইন্দুমতী বলিল—'ফিরিঙ্গীর চাকরী ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা আপনি বলুন ত আপনি স্বদেশীর সপক্ষে না বিপক্ষে?"

"সপক্ষে। এই দেখ না পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড়-চোপড় কিনে এনেছি নিয়ে যাব ব'লে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না নাকি?"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল—"বুঝতে পারিস্ নে ইন্দু, সেখানে কিন্‌লে পাছে সাহেবরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্ছেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন—"তাতেই বা ক্ষতি কি। লুকিয়ে পুণ্যকর্ম্ম করাতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।"

এই সময় বাহিরে সমবেতকণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল—"ঐ মাতৃপূজক সমিতি কংগ্রেসের জন্যে ভিক্ষা ক'রতে এসেচে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ী, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা পঞ্চম বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে বন্দে মাতরম্ অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস　　জনম ভূমির
　ভকত সন্তান,
মায়ের পূজা হবে,　　আয় নিয়ে আয়
　কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা,　　কার আছে রূপা,
　অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ও ভাই, এমন সুদিন　　কবে আর পাবি,
　দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
যার বেশী নাই　　দিক সে কিঞ্চিৎ,
　ছেড়ে লাজ অপমান।
যার কিছু নাই,　　সে দিক কেবল
　ব্যথিত হৃদয় খান॥

বাটীর সকলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ সিকি, থালার উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু একখানি দশ টাকার নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল—"মহাশয়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"নাম দরকার কি?"

"পাঁচ টাকার বেশী হ'লে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

তবে লিখুন "জনৈক বন্ধু।"

সত্যেন্দ্র বলিল—"ওহে লেখ জনৈক ডেপুটী। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটা ডেপুটী।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন—"না—না। জনৈক বন্ধু ব'লেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিন্‌লে দেখি?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল—"ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়।"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল—"বিলাতী চিজ্ হারামি হায়।"

লোকটি বলিল—"তোবা, তোবা। ঐসা বাৎ মৎ বলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে?"

"দেড় রূপিয়া।"

"অ্যাঁ, দেড় টাকা? এর চেয়ে ভাল, তাজা দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গলায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহার অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়, আমার আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল—"সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল—"হাঁ, সত্য বৈ কি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরিয়ে দেবে এস।"

চারি পাঁচজন বালক সে চাপরাশিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরিয়া লইতে কিছুতেই রাজী হইল না। সে বলিল—"একে স্বদেশীর জ্বালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোন ক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাশিকে বলিল—"দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাশিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাশি বলিল—"বাবু ইস্কাতো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল—"আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।" আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাশিকে দিল।

চাপরাশি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল—"বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। খাকে দেখো। আউর কভি বিলাতি বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

'তোবা তোবা' বলিয়া চাপরাশি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল—"ভাই এ টিনটাকে "বন্দেমাতরম" করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' এই গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেনে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিল। চাপরাশি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল—"বাবু-লোগ পাগলা হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল—"বন্দেমাতরম হইয়া অবধি লেড়কা লোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি, হোগা। সাহেব লোগকো দেখনে সে আজকাল লেড়কা লোক ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা লভ্য করিয়া চাপরাশি প্রফুল্লমনে ডাক-বাঙ্গলায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল। দেখিল সাহেব বারান্দায় পায়চারী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাশিকে দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?" বলিয়া বিস্কুটের টিনটি হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাশির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুঁড়িয়া মারিলেন। চাপরাশি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়াছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন—"ড্যাম শূয়ার কা বাচ্চা—ইয়া দেশী বিস্কিট কাহে লায়া?"

চাপরাশি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। "হুজুর—হাম বিলাতি বিস্কুট পহিলে লিয়া থা। লেকিন—"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকে লেড়কা লোক—চাপরাশি আট আনা পয়সার মায়া ত্যাগ করিয়া বলিয়া যাইতেছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বিস্কুটই ভাল শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহেব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বাধা দিয়া বলিলেন—"ইস্কুলকে লেড়কা লোক? বন্দেমাতরম্? ছিন্ লিয়া?"

এতক্ষণে চাপরাশিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রে কূল পাইল। বলিল—"হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া।"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উনলোগ বিশ পচাশ আদমি—হাম একেলা, কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন—"ইউ ড্যাম কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া?"

চাপরাশি বলিল—"হাম পুলিস্ পুলিস্ বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কনেটবিল নেহি আয়া। লেড়কা লোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পায়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে; হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হ্যায়, হামারা পাশ আপনা একঠো রূপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রূপিয়া সে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব পরবর।"

সাহেব বলিলেন—"আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকা পাশ আভি যাতা। লেড়কা লোককো হাম জেহেল মে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবরা হুইস্কি, পেগ এবং মেম সাহেবেরা ভার্মুথ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন—"Very sorry to intrude—" তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেবকে বলিলেন—"I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন—"আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দ্দালিকে বলিলেন—"কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাংলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন—"Tis really very good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, 'দিন দিন বন্দেমাতরম" নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কাজ।"

চা-সাহেব বলিলেন—"While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বেয়াদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে 'শ্বেতবাবু'গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"দারোগা আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জানতা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?'

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী ইহাঁ হ্যায়, ইতালা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাশিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজাহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাশি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা বলিল—"কোথাও জখম আছে?"

চাপরাশি, সাহেবের প্রহারে তাহার কপালে যে জখম হইয়াছিল, তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিল—"ড্যাম নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে।" দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এতেলা গ্রহণ হইলে—পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন—"আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।" হুকুম দিয়া চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল—"হুজুর আপনার এই চাপরাশিকে আসামী সেনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটি দিতে হইবে।"

"All right, চাপরাশি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখলাও।"

চাপরাশি বলিল—"হুজুর, অনেক ছেলে,তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন—"শূয়ার নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাশি প্রস্থান করিল। দারোগা তাহার সহিত আর কোন অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া একবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিনজনকে চাপরাশি অম্লানবদনে সেনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল। বলা বাহুল্য এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছুই জানিত না। বালকত্রয় বলিল—"দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ? আমরা কি করিয়াছি?"

দারোগা বলিল—"কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।" বলিয়া দারোগা তিনজন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাশিকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল—"থানায় চল।"

"কেন?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না। ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোন ডেপুটীবাবু আসিলে অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিনজনাকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া আইস।"

চাপরাশি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটি চাহিল। সাহেব ছুটি দিলেন এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম নেটিভ পুলিস, এই রকম dishonestই বটে।"

দারোগা তখন, বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন চারিজন লোক এবং সওদাগরকে সাক্ষী-স্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষী দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটিবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্রবাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা। চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন; বলিলেন—"আজ মনটা এমন ভার ভার দেখছি কেন?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন,- "না—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটীবাবু বলিলেন—"ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাক্‌তে আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন—"তোমার কাছে হবে? সে ত ভালই হ'ল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা?"

"যে কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, হয়ত সাহেবদের খুসী করবার জন্যে অবিচার করে ছেলে তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে হ'ল, আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততায় স্ত্রীর এই সরল বিশ্বাসে ডেপুটীবাবু মনে মনে হাসিলেন। বলিলেন,—"যদি প্রমাণ হয়, তা হ'লে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার করে তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন—"ছি! অবিচার কেন করবে। যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়,—ওরা আমার আপনার ছেলে হলেও আমি খালাস দিতে বল্‌তাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সেদিন মুন্সেফবাবুর বাড়ীতে বউভাতে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। সেখানে অনেকে বল্লেন যে ছেলেরা চাপরাশিকে রাজি করে তার কাছ থেকে বিলিতি বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েচে; নিয়ে ভেঙ্গেচে। কেড়েও নেয়নি, মারেও নি। তা ছাড়া যে তিনজন ছেলেকে পুলিশ ধরেচে তারা মোটে সেখানে ছিলও না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটীবাবু একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"এ সকল প্রমাণ হয় তবে না।"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"আর যদি প্রমাণ না-ই হয়, তবে না হয় কিছু জরিমানা করে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কাজ করেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক জায়গায় হ'য়েছে?"

কিন্তু ডেপুটীবাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটীবাবু যেন গিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে পোষাক পরিয়া নগেন্দ্রবাবু সাহেব ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েকজন ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্রবাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাশি আসিয়া তাঁহাকে আফিস কক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল—"সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্রবাবুকে বসাইলেন, বলিলেন—"এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই ?"

"কৈ তেমন ত কিছু দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot ;—নগেন্দ্রবাবু আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন ?"

"আজ্ঞা—"

"যথার্থ স্বদেশী—অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা, সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হাল্লা,—কাপড় পোড়ান, এ সব কি ?"

নগেন্দ্রবাবু অপরাধীর মত বলিলেন—"ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না ?"

"আজ্ঞা হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাশিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এসব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত না হয় তবে বড় হইলে ইহারা চোর ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্রবাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টিবদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন—"নগেন্দ্রবাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে ? আমি ত দেখিতেছি এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্রবাবু খুসী হইয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়, সব জিনিসই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে আট টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা, প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর-বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন ?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন ?"

"প্রায় তিন বৎসর।

"তি—ন—বৎ—স—র! Shame! 'Tis a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন—"স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadeshi must be stamped out at any cost."

বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"হাঁ হুজুর। আমার যথা সাধ্য আমি তাহা করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্রবাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যেদিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামীন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাশি পূর্ব্ব উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কীল চড় দ্বারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটীভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুঁড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সেনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে মুড়িয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগজিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সেনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন চাপরাশিসহ বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহু 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন—"কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন—"চড় দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল, আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাশি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে তাহাও দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তারবাবু স্বীকার করিলেন যে স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকার শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাঙ্গলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাশিকে টিন ছুঁড়িয়া মারিয়াছেন তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট, প্রভৃতি ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল ডেপুটীবাবু দুই তিন দিন ধড়াচূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিনমাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল বন্দেমাতরম বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত-গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকিল কালীকান্তবাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষীগণের উক্তিতে অনেকস্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকল minor discrepancies—উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে কোন কোন সাক্ষী বলিয়াছে হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়িজন ছেলে ছিল। আবার কেহ কেহ বলিয়াছে পঞ্চাশ ষাট জন ছিল, কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে ছেলেরা চড়-চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে। কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড়-চাপড়ে হইতে পারে না, ইহার উপর আসামীর উকিল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে বালকেরা তাহাকে ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষীগণের যে সমস্ত কথাই মিথ্যা তাহার কোন সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকিল বলিয়াছেন ডাকবাঙ্গলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে খানসামা উকিল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীলবাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপিল দায়ের করিয়া জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র বালকগণ ভীষণরবে বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল—

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে—
মোদের বাঁধন টুটবে ততই।...

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সেদিন ডেপুটীবাবু ক্ষুণ্ণ মনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে। ডেপুটীবাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটীবাবু বুঝিলেন এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি গো, অমন করে বসে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন ধরল? এস দেখি রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনি সেরে যাবে।

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন—"থাক্ দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্রবাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এসময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেনবাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া অপরাধীর মত আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন—"মাথাটা একটু সারল?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন, সারে নাই।

নগেনবাবু তাহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন—"এস এস উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, ব'লব মনে ক'রে কত আমোদ ক'রে এলাম, আর তুমি রাগ করে বসে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেনবাবু বলিলেন—"আজ সাহেব আমার ৫০৲ বেতন বৃদ্ধির জন্যে কমিশনার সাহেবকে অনুরোধপত্র লিখেছেন।"

একথা শুনিয়া চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেনবাবু বলিলেন—"ওকি, চোখের জল ফেল কেন?" বলিয়া একহাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্যহাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"ওগো আজ আমায় মাপ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোন কথা বলো না।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রবাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যেদিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারু-শীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম? কিসের জন্য? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,---শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি! ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত অশিক্ষিত ডেপুটীরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্রবাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে?

ডেপুটীবাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারী বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন—"আজ মফস্বল যাইব।" সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া

তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন "কবে ফিরবে?"

"কাল সকালেই ফিরব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন দেরী হ'লে তোমার দুঃখ কি?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ওকি—ওকি—শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারি নে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন কি করলে তুমি সুখী হও বল।"

চারুশীলা স্বামীবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন—'আমায় একটি ভিক্ষা দেবে?"

"কি, বল।"

"এ চাকরী ছাড়। যে চাকরী বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয় সে চাকরীতে কাজ কি? আমি তোমার তিন শো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত সোনারূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারী করেও আমায় মাসে ৫০৲ টাকা এনে দাও, আমি তাইতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

একথা শুনিয়া ডেপুটীবাবু এক মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিলেন। ভাবিয়া বলিলেন—"তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ট্রেনের সময় সন্নিকট। ডেপুটীবাবু বলিলেন—"তাই হবে। তুমি কেঁদ না।" বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাশি ডাক লইয়া আসিল। ডেপুটীবাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোন দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। "ফরিদ-সিংহে ঘটারাম-লীলা" নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারিপার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া 'সন্ধ্যা' তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্রবাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিলদ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরখানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্রবাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা"গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটীবাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারী গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন—"আজ ইস্কুল গেলি নে?

"না আজ যাব না।"

"কেন, ছুটি আছে নাকি?"

"না।"

"তবে?"

"ইস্কুল গেলে ছেলেরা আমায়"—বলিয়া বালক আর বলিতে পারিল না। তাহার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথেঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন—"আচ্ছা তবে থাক্। আমারও একটু কাজ আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্তবাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সেদিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোন কথা বলিলেন না। মুখভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন—"ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপিলে বোধ হয় টিকবে না, ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন—"তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা বলে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপিলের দিন কবে হয়েচে জানেন?"

"কবে ঠিক বলতে পারি নে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোন ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে? এঁরাই ক'রবেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিল—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্তবাবুর স্ত্রী বলিলেন—"আপনি দেবেন কেন?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন—"আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্য কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগ স্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্য কিছু ত্যাগ স্বীকার করবার অধিকারী নই? আমি এই এক জোড়া বালা এক জোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপিলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার ব্যবস্থা করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন।" ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বাহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্তবাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন—"আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে চারুশীলা বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বভবনে ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপিল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। জজ সাহেব আপিল ডিসমিস করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশানের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এদিকে নগেন্দ্রবাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কানেও একথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্রবাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাসকামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাজ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েকদিন পরে নগেন্দ্রবাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে নগেন্দ্রবাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া সাহেব আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্রবাবুকে অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন, মাঝে মাঝে স্বামী স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্ম ত্যাগ করিবেন ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপিল ডিসমিসের দুই এক দিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সেদিন প্রভাতে পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিম্বা বড় জমিদার আসিলে আপিস কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন। চুনাপুঁটিদরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দার বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাশি ফিরিয়া তাঁহাকে আপিস কামরায় না লইয়া গিয়া সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন চুনাপুঁটী পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া নগেন্দ্রবাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর ভিতর হইতে একজন চাপরাশি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল—"বাবু, জুতাকা আওয়াজ মত করিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্রবাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। চুনাপুঁটীগণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুইজন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্রবাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোট হাজরী সারিয়া আপিস কামরায় আসিলেন। প্রথম ডাকিয়া পাঠাইলেন নগেন্দ্রবাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্রবাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্রবাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কি ভাবে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্রবাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্মত্যাগ করিবেন এক মাস পরে নহে অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্রবাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড মর্ণিং সার।"

"গুড মর্ণিং বাবু।"

বাবু!—অন্যদিন হইলে সাহেব বলিতেন—নগেন্দ্রবাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্রবাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার মন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোনও নূতন বেদনা অনুভব করিলেন না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন—"সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট মোকর্দ্দমায় কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্রবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন, বলিলেন—"আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশী পণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্রবাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন—"তবে ভালই কেন বলিলেন? আপনিও একজন স্বদেশী নাকি?"

নগেন্দ্রবাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন—"স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি এক পয়সার বিলাতী জিনিষ আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প কেহ করে না। তিনি বুঝিলেন যে এই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সদ্যপ্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন—"হাঁ আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।" বলিয়া সাহেব একটু

হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন---"By the way---শুনিলাম নাকি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপিলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশেন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ স্থৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন—"এটা কি গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্রবাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন—"সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেন্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময় ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এতদিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই। সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্রবাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে চাকরিগতপ্রাণ বাঙ্গালী এখনি নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন—"সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাজকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতনবৃদ্ধির অনুরোধ-পত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয়ত বা আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্রবাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন---ঔষধ ধরিল কি না। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্রবাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণা-মিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন---"তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন---"তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই আপিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া, এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্রবাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া, দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন---"আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুড মর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া, দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন---'গুড মর্ণিং।"

* * * *

এক মাস কাটিল। আজ নগেন্দ্রবাবুর চাকরির শেষ দিন। বৈকাল বেলা দেখা গেল, তাঁহার এজলাসের বাহিরে বহুসংখ্যক স্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে বন্দেমাতরম্ ধ্বজা।

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফিটন গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্রবাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্রবাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতে-ছিল ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি, বাহে? বাবুর সাদি না কি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল---"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল হয়েছিল, আজ খালাস হইছে।"

এদিকে, বালকেরা নগেন্দ্রবাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্রবাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দুই মাস ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল। *

---

* ১৩১৪ সালের ভাদ্র সংখ্যা প্রবাসী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

"নো" নৃত্যের মুখোস—

জাপানী মুখোসের মধ্যে 'নো' মুখোস শ্রেষ্ঠ। প্রাচীন গিগাকু এবং বুগাকু নাচগানের মুখোসগুলিও সুন্দর কিন্তু তাহাতে জাপানের ধর্ম্মের প্রভাব তখন জাপানে খুব বেশী। যুবরাজ সোতাকু তাইসি তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রচারক। জনসাধারণকে আনন্দ দিবার জন্য তিনি মন্দিরে গিগাকু অভিনয় প্রচলন করেন। মুখোসগুলি, কতকগুলি পোষাক, এবং একখানি পুরাতন পুঁথি হইতে মনে হয় গিগাকু একপ্রকার প্রহসন গোছের অভিনয় ছিল। বুগাকুর প্রচলন

ডেমে ইয়োশিমিৎসু কৃত ওতোবিতে মুখোস (১৬১৬ খৃঃ অব্দ)
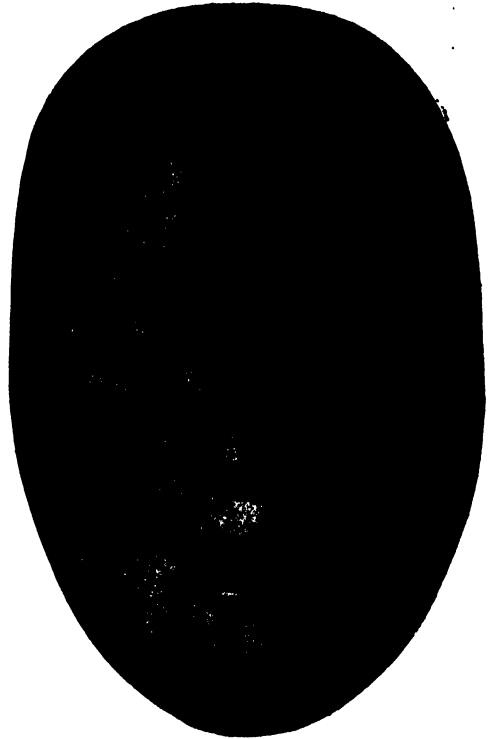
ইশিকাওয়া তাতশুয়েমন শিগেমাসা কৃত কুমোতে মুখোস (১২৮০খৃঃ অব্দ)

কোন বিশিষ্টতা দেখা যায় না। এইগুলি চীন, কোরিয়া এবং ইন্দো-চীনের মুখোসের অনুকরণে তৈরী। 'নো' মুখোসের উপর ইহাদের প্রভাব থাকিলেও নো মুখোস কালক্রমে এমন একটি স্বরূপ লাভ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণ জাপানী। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে সব দেশ হইতে জাপানে মুখোসের আমদানী সে সব দেশে এখন আর মুখোসের চিহ্নও নাই।

সপ্তম শতাব্দীতে সাম্রাজ্ঞী সুইকোর আমলে একজন কোরিয়াবাসী জাপানে প্রথম গিগাকু অভিনয় এবং কতকগুলি মুখোস আনে। বৌদ্ধ-গিগাকুর কিছু পারে হয় এবং গিগাকু হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বুগাকু অতি গুরুগম্ভীর। বুগাকু মুখোসগুলি ছোট এবং কেবল মুখ আবৃত করিয়া রাখে। গিগাকু মুখোস সে তুলনায় অনেক বড় এবং প্রাচীন গ্রীক মুখোসের মত সমস্ত মাথায় পরিতে হয়। মূলতঃ গিগাকু মুখোসগুলি বস্তুতান্ত্রিক এবং বুগাকু মুখোস রূপক। নো-মুখোস এ দুইএর এক দলেও পড়ে না। নো-মুখোস ভাবহীন। একই মুখোসে দুঃখ, আনন্দ, রাগ কিংবা

ফোজো মুখোস (১৩৭০ খৃঃ অব্দ)

হান্না মুখোস (১২৮০ খৃঃ অব্দ)

ভয়ের ভাব আনা যায়। সম্পূর্ণতার দিক হইতে দেখিতে গেলে গিগাকু কিম্বা বুগাকুই শ্রেষ্ঠ কিন্তু অভিনয়ে মুখোসের উদ্দেশ্যসিদ্ধির দিক হইতে নো-মুখোস চরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে। নো-মুখোসের মুখ সম্পূর্ণ বোজাও নয়; সম্পূর্ণ খোলাও নয়, বরং অর্দ্ধেক খোলা। এর ফলে এক একটা বিশেষ দিকে হইতে দেখিলে এই মুখ খোলাও দেখান যাইতে পারে আবার বোজাও দেখান যাইতে পারে। চোখের দৃষ্টিতে আরও বেশী বাহাদুরি আছে। এক রাজকুমারীর মুখোসের চোখের দৃষ্টি বক্রভাবে দেখিলে ঈর্ষ্যা-পরিপূর্ণ দেখায়, আবার সমান ভাবে দেখিলে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে।

নো-অভিনয়গুলি নানাভাগে বিভক্ত—যেমন দেবতা, সৈন্য, রমণী, উন্মত্ত রমণী এবং দানব। প্রত্যেক দৃশ্যের উপযোগী মুখোস আছে। সেইগুলি যথাযথক্রমে ব্যবহৃত হয়।

মুরোমাটি যুগে নো-অভিনয় চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং সেই সময়ই নো-মুখোসের গঠন সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে।
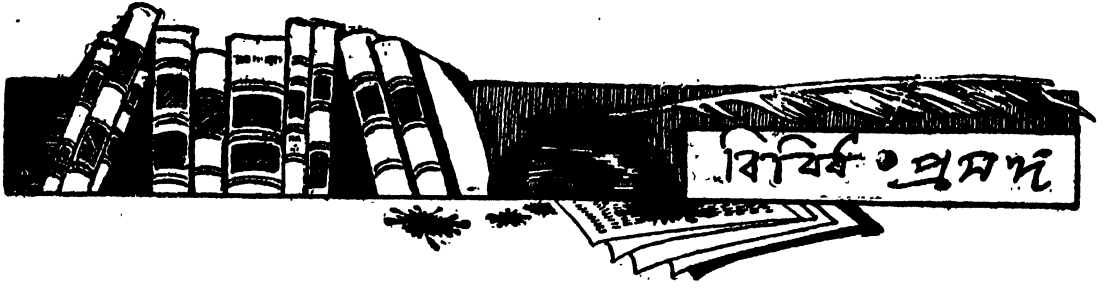
"গোল টেবিল"

"রাউণ্ড টেব্‌ল্‌" বা "গোল টেবিল" জিনিসটা কি তাহা আজকালকার দিনে স্মরণ রাখা দরকার।

কিম্বদন্তীতে ও কাব্যে আর্থার নামক ব্রিটেনের একজন ঐতিহাসিক বা অনৈতিহাসিক রাজার কাহিনী বর্ণিত আছে। "নাইট" বলিয়া পরিচিত তাঁহার বীর সহচরেরা যে টেবিল ঘিরিয়া বসিতেন,তাহা গোলাকার ছিল। টেবিলটি গোলাকার করা হইয়াছিল এইজন্য, যে, তাহা বেষ্টন করিয়া যাঁহারা বসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে পদমর্য্যাদায় যে সকলেই সমান, উহার গোল আকৃতি দ্বারা তাহা সূচিত হইবে।

"রাউণ্ড টেব্‌ল্‌" বা গোল টেবিলের সহিত এই সাম্যের ভাব জড়িত থাকায় "রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স" বা "গোল টেবিল বৈঠক" কথাটির ঠিক মানে, এরূপ একটি মন্ত্রণাসভা বা আলোচনাসভা, যাহার উভয় পক্ষের এবং প্রত্যেক সভ্যের মর্য্যাদা ও ক্ষমতা সমান, যাহাতে কোন পক্ষ বরদাতা প্রভু এবং কোন পক্ষ বরপ্রার্থী ভিক্ষুক রূপে উপস্থিত হয় না। ক্রয়ারের অভিধানেও ইহার মানে এই রূপ লেখা আছে:—

"A conference between political parties in which each has equal authority, and at which it is agreed that the questions in disputes shall be settled amicably," ইত্যাদি।

ভারতবর্ষের জন্য যাঁহারা পূর্ণস্বরাজ চাহিতেছেন, তাঁহারা ইংরেজ গবর্মেণ্টের সহিত সমানে সমানে গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজী আছেন। যাঁহারা, নামতঃ না হইলেও, কার্য্যতঃ পূর্ণস্বরাজ চান, তাঁহারাও গোল টেবিল বৈঠক চান। কিন্তু যাঁহারা ইংরেজের অনুগ্রহে যাহা পাওয়া যায়, তাহাই, ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুলের মত, উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার না করিয়া, গ্রহণীয় মনে করেন, তাঁহাদের বিবেচনায় টেবিলটা গোল না হইলেও চলিবে, এমন কি তাঁহাদের মধ্যে অনেকে টেবিলের চারি পাশে উপবেশনের পরিবর্ত্তে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান থাকিতেও রাজী হইবেন।

—

লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স বিষয়ে বড়লাটের বক্তৃতা

লণ্ডনে যে ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্স হইবে, সম্প্রতি বড়লাটের এক বক্তৃতায় তাহার কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু ঐ বক্তৃতার কোথাও কন্‌ফারেন্সটিকে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বলা হয় নাই। বড়লাটের এই সত্যবাদিতা প্রশংসনীয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত নেতা এই বক্তৃতার পরেও এই কন্‌ফারেন্সটাকে রাউণ্ড টেবিল কন্‌ফারেন্স বলিতেছেন! যাহারা আত্ম-প্রতারিত হইতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ও উন্মুখ, তাহাদিগকে সত্যের সম্মুখীন করিয়া দিলেও তাহাদের ভুল ভাঙিয়া দেওয়া সুকঠিন।

বড়লাটের বক্তৃতা হইতে ধ্রুব কোন আশার উদ্রেক হয় না। তাহার কারণ বলিতেছি।

ভারতবর্ষের যে-সব স্বাজাতিক ব্যক্তি (ন্যাশন্যালিষ্ট) অধুনা দেশের সম্বন্ধে শুধু কথা বলেন নাই এবং লেখেন নাই, কিন্তু দুঃখকে বরণ করিয়া দুঃখ পাইয়াছেন ও পাইতেছেন, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে চাহিয়াছেন দেশের সম্মান বা ইজ্জত। তাঁহারা ইহা কার্য্যতঃ স্বীকৃত হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন, যে, ভারতীয় লোকেরা নিজেদের হিতাহিত বুঝিতে সমর্থ এবং ভারতের হিত করিতে সমর্থ। সুতরাং তাঁহারা কার্য্যতঃ ইহাই চাহিয়াছেন, যে, দেশের প্রতিনিধিদের সহিত যদি ইংরেজ গবর্মেণ্টের

প্রতিনিধিরা ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে চান, তাহা হইলে ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে ভারতীয়েরাই নির্ব্বাচন করিবে। কিন্তু লণ্ডনের ইঙ্গ-ভারতীয় কনফারেন্সে ভারতের প্রতিনিধি কাহারা হইবেন এবং কে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচন করিবেন? ভারতবর্ষের ছোট বড় দলগুলি প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন না। ভারতবর্ষের বিদেশী গবর্মেণ্ট ভারতীয় প্রতিনিধিদিগকে মনোনীত করিবেন। ইহার মানে তলাইয়া বুঝা দরকার। ইহার অর্থ এই, যে, ইংরেজদের মতে আমরা এত মূর্খ ও অযোগ্য যে, আমাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার মত যোগ্যতাও আমাদের নাই; তাহাও তাঁহারাই দয়া করিয়া করিয়া দিবেন! ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পক্ষের প্রতিনিধিরা সমানে সমানে কথাবার্ত্তা চালাইলে তবে কন্‌ফারেন্সটা গোল টেবিল কন্‌ফারেন্স নামের যোগ্য হইত। কিন্তু আমাদের প্রতিনিধি পর্য্যন্ত তাঁহারা বাছিয়া লইবেন; তাহা হইলে টেবিলের গোলত্ব রহিল কোথায়? ইংরেজ যাহাদিগকে বাছিবেন, তাহারা যে ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি তাহার প্রমাণ কোথায়?

বস্তুত এই কন্‌ফারেন্সটা হইবে এমন দুই পক্ষের মধ্যে যাহার একপক্ষ ইংরেজ এবং অপর পক্ষের সব "প্রতিনিধি" ইংরেজ না হইলেও পরোক্ষ ভাবে ইংরেজদেরই লোক; কেন না, তাহারাই তাহাদিগকে বাছিবে।

আমাদের প্রতিনিধি ইংরেজরা বাছিয়া লইবে, ইহার মধ্যে একটা গুরুতর অসঙ্গতি আছে। ভারতবর্ষীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির অধিকাংশ সভ্য ইংরেজ-দেরই আইন অনুসারে ভারতীয় নির্ব্বাচকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হয়। এই সভ্যেরা যদি ভারতবর্ষের প্রকৃত প্রতিনিধি হন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ভারতীয় নির্ব্বাচকেরা তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে পারে। তাহা যদি পারে, তাহা হইলে লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে ভারতী-য়েরা সমর্থ, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, অথচ ইংরেজ সরকার কার্য্যতঃ তাহা স্বীকার করিতেছেন না। ভারতীয়েরা ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচন করিতে সমর্থ, কিন্তু লণ্ডন কনফারেন্সের জন্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে অসমর্থ—এই উভয় মতের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায়?

ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-যোগ্যতা অপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত যদি বলেন, যে, তাঁহাদেরই আইন অনুসারে ভারতীয়দিগের দ্বারা নির্ব্বা-চিত লোকেরা ভারতবর্ষের প্রতিনিধি নহেন, তাহা হইলে জগতের নিরপেক্ষ লোকেরা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, "তোমরা তবে জগদ্বাসীদিগকে কেন বলিয়া আসিতেছ, যে, ভারতবর্ষকে পার্লেমেণ্ট বা প্রতিনিধিসভা দিয়াছ? কেন বলিতেছ, গত দশ বৎসর কার্য্যতঃ ভারতের ডোমীনিয়ান ষ্টেটাস হইয়াছে? সত্য কথা তাহা হইলে এই, যে, তোমরা প্রতিনিধিতন্ত্র শাসন-প্রণালীর নামে ভারতীয়দিগকে একটা মেকি জিনিষ দিয়াছ।"

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলি যে বস্তুতঃ ভারতীয়দের প্রতিনিধিস্থানীয়, ইহা স্বীকার করায় ইংরেজদের মুস্কিলও আছে। কারণ, ইহা যদি স্বীকার করা হয় তাহা হইলে তাহাদের মতকে ভারতীয়দের মত বলিয়া গ্রহণ করিতেও হইবে। সকলেই জানেন, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা ও কোন কোন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা একাধিক বার যে ভারতবর্ষের জাতীয় দাবী অধিকাংশ সভ্যের মতে ধার্য্য করিয়া গবর্মেণ্টের ও জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসেরই দাবী করা হইয়াছে। সুতরাং ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভাকে ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে ভারতীয়দের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যে, ভারতীয়েরা ডোমীনিয়নগুলির মত স্বশাসক হইতে চায়। তাহা হইলে আমাদের দাবী নির্দ্ধারণের জন্য আর লণ্ডন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন থাকে না। কারণ, ভারতীয়েরা কি চায় তাহা জানা যদি এই কন্‌ফারেন্সের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহা ত আগে হইতেই জানা আছে।

ভারতীয়েরা কি চায়, তাহা ব্যবস্থাপক সভাগুলির বাহিরেও বার বার কথিত হইয়াছে। কংগ্রেসের সকল মতের সহিত প্রত্যেক ভারতীয় একমত না হউন, সকলকে

ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যে, সকল সম্প্রদায় ও প্রদেশের লোকদের ইহা বৃহত্তম সভা। কংগ্রেসবহির্ভূত লোকেরাও ইহা আজকাল স্বীকার করিতেছেন। জাতীয় উদারনৈতিক সংঘেও (ন্যাশন্যাল লিবার‍্যাল ফেডারেশনেও) সকল প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের লোক আছেন। কিন্তু এই সভার সভ্যসংখ্যা ও প্রভাব কংগ্রেসের চেয়ে অনেক কম। দেশের কেবল এই দুটি সভাতেই সকল প্রদেশের ও সম্প্রদায়ের লোক আছেন। কংগ্রেস আগে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস লইতে রাজী ছিলেন; এখনও কার্য্যতঃ ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সব বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা পাইলে আপাততঃ তাহাতেই মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতীলাল এবং কংগ্রেসের অন্য নেতারা রাজী হইতেন। সাম্প্রদায়িক সভাগুলির মধ্যে মস্লেমলীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখদের সভা, মান্দ্রাজ অঞ্চলের অ-ব্রাহ্মণ সভা উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা কেহই ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস অপেক্ষা কম কিছু চান নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসই ভারতীয়দের নিম্নতম রাষ্ট্রনৈতিক দাবী। অতএব এই দাবী নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কোন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন ছিল না।

গত মহাযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গবর্ন্মেন্টের লোকেরা বার বার ঘোষণা করিয়াছিলেন, যে, পৃথিবীতে সব জাতির সেল্‌ফ্‌-ডিটারমিনেশ্যনের অর্থাৎ নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নির্ব্বাচনের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধ করা হইতেছে। অথচ ভারতবর্ষকে যুদ্ধের অবসানে সে অধিকার দেওয়া হয় নাই, এখনও দেওয়া হইতেছে না।

কন্‌ফারেন্সের ব্যবস্থা দিল্লীতে না করিয়া লণ্ডনে করাতেও ত ভারতবর্ষকে হেয় করা হইয়াছে। আলোচিত হইবে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, ব্রিটেনের নহে। অতএব কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন থাকিলে তাহা ভারতবর্ষেরই কোথাও করিলে সঙ্গত হইত।

—

ভারতের প্রতিনিধিনির্ব্বাচন

ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরা ভারতীয়দের দ্বারাই নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত। তাহা ব্যবস্থাপকসভাগুলির নির্ব্বাচিত সভ্যদের দ্বারা হইতে পারিত। কিন্তু এখন কংগ্রেসওয়ালা প্রায় সব সভ্য পদত্যাগ করায় ব্যবস্থাপক-সভাগুলি আগেকার মত দেশের প্রতিনিধিত্ব দাবী করিতে পারে না। অতএব এখন কংগ্রেস, উদারনৈতিক সংঘ, মস্লেম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখসভা ও অব্রাহ্মণসভাকে প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিতে বলিলে ঠিক্ হয়। অবশ্য, কংগ্রেসকেই অর্দ্ধেকের কিছু উপর সভ্য নির্ব্বাচন করিতে দেওয়া উচিত; কারণ কংগ্রেস দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রতিনিধিস্থানীয়।

—

ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সের উদ্দেশ্য

ভারতবর্ষের লোকেরা কিরূপ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চায় তাহা জানিবার জন্য কোন কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন নাই, দেখাইয়াছি। তাহাদের ন্যূনতম ও নিম্নতম দাবী ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস। অবশ্য, যদি কংগ্রেসের অধিকাংশ সভ্য ইহাতে রাজী না হন, তাহা হইলে তাঁহাদের ঈপ্সিত পূর্ণস্বরাজের জন্যই তাঁহারা চেষ্টা করিবেন। কিন্তু আমরা দেশের বর্ত্তমান লোকমত যতটা বুঝিয়াছি, তাহাতে মনে হয়, পুরা ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ হইলেই এখন দেশ অনেকটা সন্তুষ্ট হইতে পারে, যদিও ব্যক্তিগত ভাবে অনেকে আমাদের মত পূর্ণস্বরাজের পক্ষপাতী।

ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস সকল ডোমীনিয়নে ঠিক্ এক রকম নয়। ভারতবর্ষের জন্য উহা যেরূপ হওয়া চাই, সেই ব্যবস্থার ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশগুলি স্থির করিবার নিমিত্ত এবং ভবিষ্যতে নির্দ্দিষ্ট কোন একটি তারিখে পূর্ণ ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস হইবার পূর্ব্বে আপাততঃ কোন কোন বিষয়ে অস্থায়ী বিধি কি হওয়া চাই, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য কন্‌ফারেন্স দরকার হইতে পারে।

কন্‌ফারেন্স ডাকিবার ইংরেজ-পক্ষের অন্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে, কিন্তু সেটা যে কি, তাহা কেবল অনুমান করা যায়, ঠিক করিয়া বলা যায় না। সেই উদ্দেশ্য অনুমান করিতে গেলেই অবশ্য রাজনৈতিক কূট চা'লের কথা উঠিবে। লর্ড আরুইন বা মিস্টার ম্যাকডোনাল্ড বা মিঃ বেন্ কূট

চা'ল চালিতেছেন, কিংবা ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কূট চাল চালিতেছেন, এরূপ কিছুই বলা যায় না। কিন্তু মোটের উপর স্বদেশবাসী ও ভারতপ্রবাসী ইংরেজদের ভারতবর্ষ সম্পর্কে মত যেরূপ এবং ব্রিটেনের শ্রমিক, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলগুলির আপেক্ষিক সংখ্যা ও শক্তি যেরূপ, তাহাতে কার্য্যতঃ কন্‌ফারেন্সটা যেরূপ দাঁড়াইতে পারে, তাহারই আলোচনা করিতে চাই।

—

ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে ঐকমত্যসাধন

লর্ড আরুইন তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে যাহা সকলের বা অধিকাংশের মনঃপূত হইবে, তাহাকে ভিত্তি করিয়া ভারতীয় ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটি বিল পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করা হইবে। মনঃপূত জিনিষটি ভোট লইয়া, না অন্য কি প্রকারে স্থির করা হইবে জানি না।

মতের মিল প্রথমতঃ ভারতীয়দের নিজের মধ্যে হওয়া চাই, তাহার পর ভারতীয়-পক্ষ ও ইংরেজ-পক্ষের মধ্যে হওয়া চাই।

ইংরেজরা যোগ্যতম ভারতীয়দিগকেই ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া মনোনীত করিবেন, ইহা মানিয়া লওয়া যায় না। যে সব ভারতীয় ভারতবর্ষে ইংরেজদের পূর্ণ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, অধিকাংশ ইংরেজ তাহাদিগকেই ভারতের যোগ্যতম প্রতিনিধি মনে করে। তাহার পর, যাহারা ইংরেজ-প্রভুত্ব কতকটা অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়, তাহাদিগকেও অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংরেজরা ভারতবর্ষের কতক লোকের প্রতিনিধি মনে করিতে পারে। কিন্তু যাহারা ইংরেজ-প্রভুত্বের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ চায়, তাহাদিগকে ভারতের প্রতিনিধি মনে করা ইংরেজদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অথচ এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোকদিগেরই প্রভাব ভারতবর্ষে অধিকতম ও বিস্তৃততম; কারণ, তাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতি ও দুঃখ এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়া আছে এবং অনেকে সহ্য করিয়াছে।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে, ইংরেজরা কিরূপ ভারতপ্রতিনিধি মনোনীত করিবে, তাহা বুঝা কঠিন নয়। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না যাহাদের পরস্পরের মতের মিল হওয়া কঠিন। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া বিচিত্র নয় যাহারা ভারতবর্ষের জন্য ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস অপেক্ষা অনেক নিম্ন অধিকারই চাহিবে। এমন কতকগুলি লোক মনোনীত হওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইবে না যাহারা এমন সব জিনিষ চাহিবে যাহা কোন কোন সম্প্রদায়ের স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, কিন্তু যাহা সমগ্র ভারতবর্ষের পক্ষে অনিষ্টকর, যাহা ভারতীয়দিগকে কখন একজাতি হইতে দিবে না এবং চিরকাল নানাদলে বিভক্ত, দুর্ব্বল ও পরপদানত রাখিবে।

কিন্তু যদি অঘটন ঘটে, যদি ইংরেজদের মনোনীত ভারতের তথাকথিত প্রতিনিধিরা সত্য সত্যই গণতান্ত্রিক ও হিতকর কিছু চাহিয়া বসে, তাহা হইলেও পার্লেমেণ্টে পেশ করিবার জন্য তদনুসারে বিল না হইবার সম্ভাবনা আছে। ভারত-পক্ষ যাহা বলিবেন, ইংরেজ-পক্ষ তাহাতে রাজী না হইতে পারেন—না হইবারই কথা। প্রমাণ, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট। এই কমিশনে সব ব্রিটিশ দলের লোক ছিল। অথচ তাহারা এমন একটা জিনিষ তৈরি করিয়াছে যাহা ভারতবর্ষের সব রাজনৈতিক দল ও ধর্ম্মসম্প্রদায় গ্রহণের অযোগ্য মনে করিয়াছে।

ভারতবর্ষের পক্ষে গ্রহণের যোগ্য এরূপ কোন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা লণ্ডন কন্‌ফারেন্সে ব্রিটিশ ও ভারতীয় উভয় পক্ষের মত অনুসারে নির্দ্ধারিত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না।

লর্ড আরুইন বলিতেছেন, কন্‌ফারেন্সটা ফ্রী অর্থাৎ স্বাধীন বা অবাধ হইবে। কিন্তু গোড়াতেই যে গলদ। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে যাহারা কথা বলিবে তাহাদিগকে বাছিয়া লইবে ইংরেজরা—ইহা কিরূপ স্বাধীনতা? ইংরেজদের লোক বাছুন ইংরেজরা, আমাদের লোক বাছি আমরা; তাহা হইলে অবাধ ও স্বাধীন কন্‌ফারেন্স হইতে পারে, নতুবা নহে।

আর, যদি স্বাধীনতা থাকেও, তাহা হইলেও তাহা কথা বলিবার স্বাধীনতা মাত্র; নিজেদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নিজেরাই

প্রণয়ন করিবার স্বাধীনতা নহে। প্রথমতঃ, ভারতীয় "প্রতিনিধি"দের মধ্যে মিল চাই। দ্বিতীয়তঃ, ভারত-পক্ষ ও ইংরেজ-পক্ষের মিল চাই। তাহার পর, যাহা উভয় পক্ষের মতানুযায়ী ঠিক্ তদনুসারে পার্লেমেণ্টের বিল্ প্রণীত হইবে, লর্ড আরুইন এমন কোন প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন, উভয়পক্ষের মতানুযায়ী জিনিষটিকে বিলের ভিত্তি করা হইবে। যাঁহারা বিল রচনা করিবেন, তাঁহারা উভয় পক্ষের নির্দ্ধারিত জিনিষটি হইতে তাঁহাদের পক্ষে সুবিধাজনক কেবল বা বেশী পরিমাণে এমন অংশগুলি লইতে পারেন, যাহা আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

—

কংগ্রেস ও লণ্ডনের কন্‌ফারেন্স

বড়লাটের বক্তৃতার ভাবটা এরূপ, যে, কংগ্রেস ইচ্ছা করিলে লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে পারেন। আবার, সরকার পক্ষ হইতে এমন কথাও বলা হইয়াছে, যে, নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা বন্ধ না করিলে মহাত্মা গান্ধীকে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে আহ্বান করা হইবে না —যেন মহাত্মা গান্ধী কন্‌ফারেন্সে যাইবার জন্য সরকার-পক্ষের পায়ে-ধরিয়া ধর্‌না দিতেছেন!

যাহা হউক, সকলে স্বীকার করুন বা না-করুন, ইহা নিশ্চিত, এরূপ কোন ব্যবস্থা নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে চালান যাইবে না যাহাতে কংগ্রেসের মত নাই—অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর মত নাই। ইহা ভারতবর্ষের কংগ্রেসবিরোধী উদারনৈতিক দল জানেন এবং দেশবাসীকে ও গবর্ন্মেণ্টকে স্পষ্টভাষায় বলিয়াছেন। গবর্ন্মেণ্ট ইহা জানেন কি না বলিতে পারি না—তাঁহারা সম্ভবতঃ কংগ্রেসকে বাদ দিয়াই একটা কিছু চালাইতে চাহিবেন। কিন্তু ইহা নিশ্চিত, যে, তাহা চলিবে না। মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসনপ্রণালী কংগ্রেসের মনঃপূত ছিল না, সুতরাং গবর্ন্মেণ্ট এপর্য্যন্ত বিনাবাধায় তদনুসারে কাজ করিতে পারেন নাই।

গবর্ন্মেণ্ট মনে করিতে পারেন, দমননীতি প্রয়োগ দ্বারা কংগ্রেসকে জনবলহীন ও কাবু করিয়া নিজেদের অভিপ্রেত ব্যবস্থা চালাইবেন। কিন্তু যদিই কংগ্রেস আপাততঃ কাবু হয়, তাহা হইলেও পূর্ণস্বরাজলাভের চেষ্টা অদূর ভবিষ্যতে পুনঃপুনঃ হইতে থাকিবে। তাহাতে ইংরেজদের পক্ষে শান্তিতে রাজত্ব করা চলিবে না, এবং ভারতবর্ষে বিলাতী জিনিষ বেচিয়া লাভবান্ হওয়াও চলিবে না। অতএব, কংগ্রেসের প্রতিনিধিদিগকে কন্‌ফারেন্সে লইয়া যাইবার চেষ্টা করা গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে সুবুদ্ধির পরিচায়ক হইবে। লর্ড আরুইনের বক্তৃতার আগে, মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মোতীলাল কিরূপ সর্ত্তে কন্‌ফারেন্সে যোগ দিতে রাজী হইতে পারেন, তাহা বলিয়াছিলেন। আমরা মনে করি না, যে, লর্ড আরুইন এমন কিছু নূতন কথা বলিয়াছেন যাহাতে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মোতী-লালের মত বদলাইতে পারে। তথাপি, যদি সরকার-পক্ষ মনে করেন, যে, বড়লাটের বক্তৃতায় রাজনৈতিক সিচুয়েশ্‌ন্ বা পরিস্থিতির কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা হইলে তাঁহারা কংগ্রেসের নেতাদিগকে ঐ বক্তৃতা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের মত জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। কাগজে এইরূপ গুজব বাহির হইয়াছে, যে, ম্যাক-ডোনাল্ড সাহেব গান্ধীজীর নিকট কোয়েকার সম্প্রদায়ের একজন ইংরেজ দূত পাঠাইয়াছেন, তাহা সত্য কি না জানি না। কিন্তু মহাত্মাজী ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী ব্যক্তি হইলেও, তিনি কংগ্রেসকে নিজের মত জানাইতে পারেন, কংগ্রেস কি করিবেন সহকর্ম্মীদের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতে তাঁহার অনিচ্ছুক হইবারই কথা। অতএব পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু, মিঃ আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীমতী সরোজনী নাইডু, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডাক্তার সৈয়দ মামুদ প্রভৃতি কংগ্রেসনেতাদিগকে অন্ততঃ এক পক্ষ কালের জন্য মুক্তি দিয়া তাঁহাদিগকে পরস্পরের সহিত পরামর্শ করিবার সুযোগ দিলে কংগ্রেসের কর্ত্তব্য-নির্ণয়ের পক্ষে সুবিধা হয়। তাহা না করিলে, কংগ্রেসের প্রধান অধিকাংশ নেতাকে কারারুদ্ধ করিয়া

রাখিয়া, "কন্‌ফারেন্সে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের স্বেচ্ছাধীন," এরূপ ভাব প্রকাশ করিলে তাহা উপহাসের মতই প্রতীত হইবে।

সরকার-পক্ষ হইতে এই আপত্তি হইতে পারে, যে, কারারুদ্ধ কংগ্রেসনেতাদিগকে একত্র হইবার সুযোগ দিলে তাঁহারা আইনলঙ্ঘনপ্রচেষ্টাকে প্রবল করিবার মন্ত্রণাও আঁটিবেন। এরূপ সন্দেহ হইলে, তাঁহাদের মন্ত্রণাস্থল কোন কারাগারে করিলেই হইবে, এবং তাঁহাদিগকে মুক্তি না দিয়া বড় কোন কারাগারে একত্র কিছু দিন রাখিয়া পরে এখনকার মত ভিন্ন ভিন্ন জেলে রাখিয়া দিলেই হইবে। সেখান হইতে তাঁহাদের বক্তব্য মুখে বা পত্রদ্বারা বাহিরে পৌছিবার পথ ত গবন্মেণ্ট বরাবরই নিজের আয়ত্ত রাখিয়াছেন।

—

কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে আমাদের মত

আমরা কোন রাজনৈতিক দলের লোক নহি, এবং ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার জন্য বিশেষ কোন ক্ষতি বা দুঃখ সহ্য করি নাই, করিতে প্রস্তুত আছি বলিয়াও কার্য্যতঃ দেখাই নাই। সুতরাং লণ্ডনের ইঙ্গ-ভারতীয় কন্‌ফারেন্সে কাহারও যাওয়া উচিত কি না, সে বিষয়ে কাহাকেও পরামর্শ দিবার আমাদের অধিকার নাই। কিন্তু সার্ব্বজনিক সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা সাংবাদিকদিগের কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যপালন জন্য আগেই কোন কোন কথা লিখিয়াছি। এখন আমাদের সিদ্ধান্ত বলিতেছি। ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, পরিষ্কার ভাষায় এইরূপ প্রতিশ্রুতি না পাইলে কোন দলের লোকেরই কন্‌কারেন্সে যাওয়া উচিত নয়, কংগ্রেসের লোকদের ত নয়ই।

যদি গবন্মেণ্ট ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে না পারেন, তাহা হইলে, কেন তাহা পারেন না, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক হিসাবে অসত্য কোন কারণ সরকারী লোকদের উল্লেখ না করাই ভাল। এইরূপ একটা কারণ এই বলা হয়, যে, "কিছু করা না-করা পার্লেমেণ্টের হাত; আগে হইতে কেমন করিয়া বলা হইবে কিরূপ বিল পার্লেমেণ্টে পেশ করা যাইবে?" তাহার উত্তর এই—"পার্লেমেণ্ট কি করিবেন, সে বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি আমরা চাহিতেছি না; ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট পার্লেমেণ্টে ভারতবর্ষকে ডোমীনিয়ন ষ্টেটাস্ দিবার বিল উপস্থিত করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি চাহিতেছি।" সত্য বটে, এরূপ বিল পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিলে শ্রমিক দলের পরাজয় হইয়া তাঁহারা সরকারীক্ষমতাচ্যুত হইতে পারেন। সেই বিপৎসম্ভাবনা তাঁহাদিগকে মানিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষের হিত করিতে যাইয়া তাঁহারা পার্লেমেণ্টে হারিয়া যাইবার আশঙ্কার মধ্যে যাইতে রাজী নহেন, অথচ ভারতহিতৈষী বলিয়া পরিচিত হইবার সখটুকুও তাঁহারা ছাড়িতে পারেন না।

ইংরেজদের জানা উচিত, যে, ভারতবর্ষের শিক্ষিত লোকেরা ইতিহাস পড়িয়াছে। যতদিন তাহারা সংঘবদ্ধ এবং খুব বেশী সংখ্যায় "মরিয়া" না হইতেছে, ততদিন তাহাদিগকে অধীন রাখা সহজ হইতে পারে, কিন্তু অনৈতিহাসিক মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদিগকে ঠকান যাইবে না। ভারতবর্ষকে একটা কিছু দিবার আগে যেমন "প্যাক্‌ট্" ('packed") প্রতিনিধিদলের অর্থাৎ নিজেদের অভিপ্রায়সিদ্ধির অনুকূল ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সহিত অনির্দ্দিষ্ট বিষয়ে কন্‌ফারেন্স্ করা হইবে, কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, আয়ার্ল্যাণ্ড প্রভৃতিকে স্বরাজ দিবার আগে সেরূপ কোন কন্‌ফারেন্স করা হয় নাই। সমান দুই পক্ষের মধ্যে স্বরাজের বন্দোবস্ত হইতেছে, এইভাবে কোন কোন স্থলে আলোচনা হইয়াছিল। গত কংগ্রেসের অধিবেশনের আগে লর্ড আরুইন যে গান্ধীজী প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে দাসত্ব হইতে পূর্ণ স্বাধীনতা পর্য্যন্ত সব বিষয়ের আলোচনা হইতে পারিবে, অনভিপ্রেত হইলেও তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতি অবজ্ঞাই সূচিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষ ভিক্ষুক, তাহাকে যাহা দেওয়া হইবে তাহা অনুগ্রহের দান, সুতরাং তাহার জন্য দাসত্বের ব্যবস্থারও আলোচনা হইতে পারে, এরূপ কল্পনা লর্ড আরুইনের মনে ও মুখে আসিয়াছিল। কানাডা, আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতিকে

ব্রিটেন বাধ্য হইয়া স্বরাজ দিয়াছিল, সুতরাং কোন ব্রিটেন-প্রতিনিধি দাসত্বের ব্যবস্থার কল্পনাটাও উল্লেখ করিতে সাহস পান নাই। আমাদের বিবেচনায় ভারতবর্ষও যতদিন নিজে নিঃসংশয় বিশ্বাস করিতে না পারিতেছে এবং অবশ্যস্বীকার্য্য ভাবে অন্যের নিকট প্রমাণ করিতে না-পারিতেছে, যে, সে ভিক্ষুক নহে, নিজের দাবী আদায় করিয়া লইতে সমর্থ, তত দিন কোন ভারতীয়ের ব্রিটেনের সহিত কোন কন্‌ফারেন্সে যাওয়া উচিত নয়। ভিক্ষুকের মন ও ভিক্ষুকের পদ লইয়া গেলে ভিখারী-বিদায় যেরূপ হয়, তাহাই হইবে। তাহাতে যাঁহারা রাজী আছেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য লণ্ডনে যাইতে পারেন, কিন্তু দয়া করিয়া এইটুকু করিবেন, যে, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া ভারতবর্ষকে অপমানিত করিবেন না।

—

কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (?) প্রভৃতির মত

দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, স্যার তেজ বাহাদুর সাপ্রুর এক বন্ধু লণ্ডন হইতে তাঁহাকে টেলিগ্রাফ করিয়াছেন, লর্ড আরুইনের বক্তৃতার বিষয় অবগত হইয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, মিস্টার এণ্ড্রুজ প্রভৃতি বলিয়াছেন, যে, লণ্ডনের কন্‌ফারেন্সে ভারতীয়দের এখন সহযোগিতা করা উচিত। স্যার তেজ বাহাদুরের কোন্ বন্ধু তার করিয়াছেন, জানা দরকার, এবং তিনি রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির মত কিরূপে জানিলেন, তাহাও জানা দরকার। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মহাশয়ের মত কিরূপ হইবে, অনুমান করিতে পারিতেছি না। কয়েক দিন হইল এণ্ড্রুজ সাহেব আমাদিগকে বিলাত হইতে তারযোগে জানান—"I have always advocated Independence, not Dominion Status," "আমি বরাবর পূর্ণ-স্বাধীনতার সমর্থন করিয়া আসিতেছি, ডোমীনিয়ন ষ্টেটাসের নহে।" সুতরাং তিনি যে হঠাৎ বড়লাটের "ধরি মাছ না-ছুঁই পানী" বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। তাঁহার ভারত-হিতৈষণা সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছি না। কিন্তু তিনি স্বদেশপ্রেমিক ইংরেজ; এই কারণে তাঁহার প্রত্যেক মতের অনুসরণ কোনও ভারতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া মনে না-করিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথ কি বলিয়াছেন, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ বোধ হইতেছে। কিছু দিন আগে দৈনিক কাগজে বাহির হইয়া গেল, রবিবাবু প্যারিসে বলিয়াছেন তিনি রোজ ২।৩ খানা ছবি আঁকিতেছেন, কবিতা লিখিতেছেন না, রাজনীতিতে তাঁহার অরুচি বাড়িতেছে, ইত্যাদি। অথচ তিনি এরূপ কোন কথাই কাহাকেও বলেন নাই। এবিষয়ে তাঁহার নিজের চিঠি স্বচক্ষে পড়িয়া একথা লিখিতেছি। সুতরাং স্যার তেজ বাহাদুরের অপ্রকাশিতনামা বন্ধু যাহা তার করিয়াছেন, রবিবাবুর সম্বন্ধে তাহা সত্য না-হইতে পারে। যাঁহারা দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দেন নাই এবং দেশের সব অবস্থাও যাঁহারা দূর হইতে জানিতে পারিতেছেন না, তাঁহারা খুব মহৎ হইলেও নির্দিষ্ট কোন একটি পন্থা অবলম্বনের পরামর্শ তাঁহারা দিতে অসমর্থ, এবং দিলেও সংগ্রামলিপ্ত লোকেরা তাহার অনুসরণ করা অকর্ত্তব্য মনে করিতে পারেন, রবীন্দ্রনাথের ইহা ভাল করিয়া জানিবার বুঝিবার কথা। এইজন্য মনে হইতেছে স্যার তেজ বাহাদুরের বন্ধু কবির সম্বন্ধে হয়ত ঠিক খবর পান নাই ও দেন নাই। অবশ্য নানা কারণে কবির বিবেচনার ভুলও ঘটিতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুটি কথার উল্লেখ করিতেছি। কবির আধুনিক দুটি বিলাতী লেখায় লর্ড আরুইনের এবং ইংরেজ জাতির যে প্রশংসা আছে, তাহা তাঁহার মতে সত্য হইলেও আমাদের বিবেচনায় ঠিক্ প্রাসঙ্গিক নহে এবং এরূপ প্রশংসা দ্বারা তাঁহার ইংরেজ দমননীতির প্রতিবাদ নিন্দাবাদ ও সমালোচনার জোর কমিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, তিনি যে বলিয়াছেন, ভারতবর্ষ ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন সাম্রাজ্যশাসক জাতির অধীন হইলে অত্যাচার আরও অনেক বেশী হইত, এই অপ্রাসঙ্গিক কথার দ্বারাও তাঁহার সমালোচনা দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। তিনি বলিতে পারেন, "আমি সত্য কথা

লিখিয়াছি।" তিনি সাম্রাজ্যস্থাপক সব জাতির সব কীর্ত্তি পড়িয়াছেন কিনা, জানি না; কিন্তু কি হইলে কি হইত, সেরূপ অনুমান তাঁহার মত প্রতিভাশালী ব্যক্তির অনুমান হইলেও তাহার মূল্য বেশী নয়।

দেশে এমন অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে, যাহার খবর, বিদেশে প্রকাশিত হওয়া দূরে যাক্, ভারতবর্ষেরই খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না। সুতরাং বিদেশপ্রবাসী ভারতীয়দিগের খুব বুঝিয়া সুঝিয়া হিসাব করিয়া কথা বলা উচিত।

—

লর্ড আরুইন ও বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার খুব নিন্দা করিয়াছেন এবং দেশে যত কিছু অশান্তি উচ্ছৃঙ্খলতা, রক্তপাত আদি ঘটিতেছে তাহার জন্য একমাত্র এই প্রচেষ্টাকেই দায়ী করিয়াছেন। এই প্রকার নিন্দা করা খুব সহজ। কারণ, মুদ্রাযন্ত্র ও খবরের কাগজের প্রতি প্রযোজ্য সাধারণ ফৌজদারী আইন এবং বিশেষ অর্ডিন্যান্স এপ্রকার নিন্দার সমুচিত সমালোচনা ও জবাব দেওয়া সাংঘাতিক করিয়াছে।

ভারত-সেবক সমিতির সহকারী সভাপতি পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভার সভ্য-পদ ত্যাগ করিবার নিমিত্ত বড়লাটকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে দমননীতিপ্রয়োগজনিত অত্যাচার তাঁহার পদত্যাগের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন। বড়লাট উত্তরে বলিয়াছিলেন, পুলিশ কেবল মাত্র ন্যূনতম বল প্রয়োগ করিয়াছে ও করিয়া থাকে। তাঁহার আধুনিক বক্তৃতাতে কেবল ঐটুকু বলিয়া তিনি ক্ষান্ত হন নাই। যে সব সরকারী কর্ম্মচারী দমননীতি প্রয়োগ করিতেছেন, তাঁহাদের অবিমিশ্র প্রশংসাও করিয়াছেন। যথা—

"Speaking generally, I have nothing but commendation for the servants, both Civil and Military, who have been doing their duty with great steadiness and courage, in conditions of the severest provocation and often of direct risk to their lives. Several, I speak of the police, have been brutally murdered and in many cases they and their families are subjected daily to the grossest forms of persecution."

পুলিসের লোক কয় জন নিহত হইয়াছে, এবং কে তাহাদিগকে কেন কি অবস্থায় বধ করিয়াছে, বড়লাট তাহা বলেন নাই।

তাঁহার প্রত্যেকটি কথা বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, তাহার বিচার করিতে হইলে বেসরকারী পক্ষের কি বলিবার আছে, তাহাও বিবেচিত হওয়া অবশ্যক ছিল। কিন্তু বেসরকারী লোকেরাও অন্ততঃ কতকটা বিশ্বাসযোগ্য, কাহারও এরূপ ধারণা থাকিলে বোধ করি তাঁহার দ্বারা দেশ-শাসন ও দমনের কাজ চলে না।

খুব ভক্ত ও সাধু লোকদেরও কখন কখন ভগবানের ন্যায়কারিতা প্রভৃতিতে সন্দেহ জন্মে। কিন্তু সিবিল ও মিলিটারী কর্ম্মচারীদের ন্যায়কারিতা প্রভৃতি সম্বন্ধে লর্ড আরুইন একেবারে নিঃসংশয়। তিনি শাসক না হইয়া ধর্ম্মক্ষেত্রে সাধক হইলে বিশ্বাসবলে সিদ্ধপুরুষ হইতে পারিতেন।

—

বঙ্গে অত্যাচারের অভিযোগ

মেদিনীপুর জেলায় ও বঙ্গের অন্যত্র লোকদের উপর অত্যাচার হইয়াছে, এইরূপ অভিযোগ খুব মৃদু আকারে কোন কোন কাগজে বাহির হইয়াছিল। কাঁথি অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের কোন কোন অংশ কোন কোন কাগজে ছাপা হইয়াছিল। সরকারী মতে উক্ত কমিটির রিপোর্টে লিখিত অভিযোগ মিথ্যা। ঐ বিষয়ে সম্প্রতি ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় তর্কবিতর্ক উপলক্ষ্যে যাহা কথিত হইয়াছিল, এসোসিয়েটেড প্রেসের তাহার রিপোর্টের কিয়দংশ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

SIMLA, JULY 12.

Mr. K. C. Neogy, resuming the debate in the Assembly on the Round Table Conference, said that the Viceroy had emphasized his determination to fight the Civil Disobedience movement. "I have no other desire except to uphold law and order and have nothing in common with civil disobedience, but if the Government must fight, it must fight clean.

"The Home Member contradicted Sir Cowasji Jehangir's statement yesterday that innocent persons were deliberately assaulted. I declare what Sir Cowasji said was quite true. It is happening not

only in Bombay, but all over India. The Home Member has either his eyes shut or is incompetent to hold the present office. This is nothing but the spirit of Dyer, the spirit of Jallianwala Bagh, that is stalking the land today. Jalianwalas are being enacted all over India. If the Home Member pretends ignorance, I can only say he is not fit to discharge the obligation of the office he holds and I do not consider he is loyal to the Viceroy, because I have no doubt about the sincerity of the Viceroy in his desire to promote an atmosphere of peace and goodwill in this land.

FACTS IN BENGAL

"My experience of Bengal enables me to bear testimony to the reign of terrorism that is going on there. The Government, instead of prosecuting the papers for publishing stories which the Government thought were incorrect, has gagged the press. Here is a picture in a paper showing a boy of ten unconscious because of the use of the hunter by the District Magistrate of Midnapur. Has Government prosecuted the paper for saying so and proved it to be untrue?"

CONTAI FIRING

MR. K. C. NEOGY ON GOVERNMENT COMMUNIQUE.

Continuing, Mr. Neogy referred to non-official inquiry committee set up to enquire into the Contai firing and police excesses in the sub-division. The president of the committee was Mr. J. N. Basu, president of the Indian Association, a Liberal politician, about whose position the law member, present in the house, would bear testimony. This committee, of which the speaker was a member and secretary, included no Congressman and its members were all opposed to civil disobedience. The committee, when it visited a village, was arrested on the plea that it was inciting the people (cries of "shame, shame") and an innocent person following the committee was assaulted. Later the members of the committee were released.

GAGGING THE PRESS

The Committee's report had been ready for some time, but Government's policy of gagging the press was so complete that not only not a single newspaper in Bengal would publish it, but not a single printing-press would print it. That was why, Mr. Neogy said, he had come to the Assembly to voice from this place his report.

Mr. Neogy read copious extracts from the report of the Committee to put them on the record of the Assembly. He said that the villagers were in a state of panic through police terrorism. The Committee had the evidence of women molested, one in the presence of a Magistrate.

Mr. H. G. Haig, Home Member, intervening, drew attention to the Bengal Government's communique that enquiries showed that these allegations about women were false.

Mr. Neogy: That communique is a lie. Let me publish this report and then you prosecute me for it, instead of believing a communique issued from a factory of lies.

Mr. Jayakar:—Has Government ascertained through whose instrumentality this matter was investigated by the Bengal Government?

Mr. Haig:—I have only a copy of the communique.

Mr. Neogy said that the conclusions of the Committee were that people were non-violent and prepared to suffer the legal consequences of breaking the salt laws, but Government resorted to terrorism. "People were breaking only the salt laws. But the authorities had broken all other laws, including the laws of humanity."—"Associated Press."

—

সাইমন রিপোর্ট সম্বন্ধে বড়লাট

বড়লাট তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, যে, সাইমন কমিশন রিপোর্ট সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার জন্য তিনি দেশী রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিগণের সহিত তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবেন। কংগ্রেস ভারতবর্ষের সকলের চেয়ে বড় ও প্রভাবশালী প্রতিনিধিসভা। তাহার প্রধান প্রধান নেতাদিগকে জেলে পুরিয়া কংগ্রেসবহির্ভূত অন্য সবদের সঙ্গে তোফা আলোচনা হইবে!

—

শান্তিনিকেতনের কারু-সঙ্ঘ

শান্তিনিকেতনের কলাভবনে ছবি আঁকা ছাড়া অন্য নানা রকম শিল্পও সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে শিখান হয়। এখানে শিক্ষা পাইয়া শিল্পীরা দেশের সর্ব্বত্র জ্ঞানবিস্তার করুন, ইহা বাঞ্ছনীয় বটে। কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত সব ভাল ছাত্র অন্যত্র চলিয়া গেলে মৌচাকটি ভাঙিয়া যাইবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। এইজন্য শান্তিনিকেতনে কারু-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রীত হইয়াছি। সর্ব্বসাধারণ যদি সঙ্ঘের সভ্যদিগকে কাজ দেন ও উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেন, তাহা হইলে কলাভবনের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুর মত অপেক্ষাকৃত অল্প আয়েই সন্তুষ্ট হইয়া অনেক ভাল শিল্পী শান্তিনিকেতনেই থাকিতে পারিবেন। কারু-সঙ্ঘ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথা নীচে মুদ্রিত বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যাইবে।

শান্তিনিকেতন কলাভবনে শিল্পিগণ এই সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছেন এখানে সংবাদ দিয়া সকলেই অল্প আয়াসে এক স্থানে নিজ নিজ প্রয়োজন মত শিল্পদ্রব্য বা তাহার নূতন ডিজাইন করাইয়া লইতে পারিবেন। বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত কারু-শিল্পসমূহের আয়োজন আছে :—

ছবি—জলবর্ণ (Water colour), তৈলবর্ণ (Oil colour), বইয়ের ছবি ও বিজ্ঞাপন (Book illustration and poster);

মূর্ত্তি (Designs and portraits in clay, terra-cota and plaster of Paris);

সূচীশিল্প (Embroidery);
বাটিকের কাজ (Battique work on handkerchiefs hand bags, table cloths and door curtains);
প্রাচীর চিত্র (Fresco);
বাসন এবং গহনার নূতন ডিজাইন;
দারুশিল্পের নূতন ডিজাইন (Furniture);
এতদ্ভিন্ন গৃহসজ্জার জন্য সকল রকম শিল্পদ্রব্যের ডিজাইন উপযুক্ত মূল্যে উপযুক্ত সময়ে করিয়া দেওয়া হয়।
পত্রাদি লিখিবার ঠিকানা:—
সম্পাদক কারুসঙ্ঘ, কলাভবন, শান্তিনিকেতন পোঃ।

—

চৈন বিদ্যাপীঠ দ্বারা আহূত হিন্দু অধ্যাপক

চীনের পেকিং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ তথায় হিন্দু দর্শনের অধ্যাপনার জন্য কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী মহাশয়কে আহ্বান করিয়াছেন। চৈনিক বিদ্যাপীঠের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তিন বৎসরের জন্য চান। অধিকারী মহাশয় জ্ঞানবত্তায় যোগ্য লোক; এবং তাঁহার সৌজন্যে চৈনিক ভদ্রলোকদের মনে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হইবে। আমাদের বিবেচনায় তাঁহার এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ চীনে কতিপয় সহচর সহ গিয়া সেই দেশের সহিত ধর্ম্ম ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রাচীন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিয়া আসিয়াছেন। অধিকারী মহাশয় চীনের উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে তিন বৎসর শিক্ষা দিলে সেই সম্বন্ধসূত্র ছিন্ন হইতে পাইবে না।

বদরুদ্দীন তৈয়বজী মহাশয়ের কন্যা শ্রীমতী লুক্‌মানীর পিকেটিং করা অপরাধে চারি মাস সশ্রম জেল হইয়াছে। তাঁহার বয়স পঁয়ষট্টি বৎসর।

বিহারে বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদের পর ভাগলপুরের বাবু দীপনারায়ণ সিংহ নেতা নিযুক্ত হইয়াছেন। তাঁহার পর কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ ব্যারিষ্টার সৈয়দ হাসান ইমাম তথাকার প্রাদেশিক কংগ্রেসনেতা হইবেন। তাঁহার জেল হইলে তাঁহার ভ্রাতা ভারত গবর্ন্মেণ্টের শাসন-পরিষদের ভূতপূর্ব্ব অন্যতম সভ্য সৈয়দ স্যার আলি ইমাম নেতৃত্ব করিতে রাজী হইয়াছেন এবং কংগ্রেসে যোগ দিয়াছেন।

অপেক্ষাকৃত বা সম্পূর্ণ অপ্রসিদ্ধ অনেক মুসলমানও দেশে স্বরাজ স্থাপন করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। পেশাওয়ারে যে এত উপদ্রব হইয়া গেল, তাহার কারণই এই, যে, মুসলমানপ্রধান প্রদেশের রাজধানী উক্ত মুসলমান-প্রধান শহরে বিস্তর মুসলমান স্বরাজের জন্য সর্ব্বস্বপণ ও প্রাণপণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে চূড়ান্ত দুঃখভোগও অনেকে করিয়াছেন।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যাইবে, যে, "ইঁহারা ভাগবখরার বেলায় অংশ এবং ন্যায্য পাওনা অপেক্ষা বেশী অংশ চান, কিন্তু ক্ষতি ও দুঃখ সহ্য করিবার সময় ইঁহাদের দেখা পাওয়া যায় না," এই অপবাদ সকল মুসলমানের প্রতি প্রযোজ্য নহে।

মুসলমান সমাজ ও কংগ্রেস

অনেক আগে হইতে এই ধারণা জন্মাইবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, যে, মুসলমানদের সঙ্গে কংগ্রেসের কোনই যোগ নাই—যদিও অনেক প্রসিদ্ধ মুসলমান কংগ্রেসের সভাপতি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান প্রবলতম প্রচেষ্টার সহিত মুসলমানদের কোনই যোগ নাই, ইহাও প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইতেছে। অথচ সব প্রদেশেই এই প্রচেষ্টার সম্পর্কে অনেক মুসলমান অভিযুক্ত হইয়া জেলে যাইতেছেন। মুসলমান মহিলাও বাদ যান নাই। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ পরলোকগত

ছাত্রসমাজ ও 'দেশের কাজ'

রাজনৈতিক কোন আন্দোলনে ছাত্রছাত্রীদের যোগ দেওয়া উচিত কিনা, স্বাধীন গণতন্ত্র দেশসকলে এ প্রশ্ন ও তাহার আলোচনা উগ্র আকার ধারণ করে না: কারণ, সে-সব দেশে ছাত্রদের ভাল কিসে হইবে, আলোচ্য বিষয় তাহাই; ছাত্রেরা কোন আন্দোলনে যোগ দিলে গবর্ন্মেণ্টের কি অসুবিধা হইবে তাহা বিবেচ্য নহে। কেন না, স্বাধীন গণতন্ত্র দেশে দেশের লোক ও গবর্ন্মেণ্ট বলিতে দুটা সম্পূর্ণ আলাদা মনুষ্যসমষ্টি বুঝায় না। পরাধীন দেশে এই প্রশ্ন ও তাহার আলোচনা একটা গুরুতর

সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়; কারণ, গবন্মেণ্টনামক মনুষ্য-সমষ্টি নিজেদের প্রভুত্ব ও মুনফা ছাড়িতে চান না বলিয়া স্বরাজ লাভ চেষ্টা হইতে যত লোককে পারেন নিবৃত্ত রাখিতে প্রয়াস পান।

ভারতবর্ষের মত পরাধীন দেশে ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে সরকারী নানা সার্কুলার ও অন্য চেষ্টা যে কেবল তাহাদের কল্যাণ-কামনা হইতে উদ্ভূত নহে, তাহার দু' একটা প্রমাণ দিতেছি। সরকারপক্ষ বলেন, ছাত্রেরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলে তাহাদের পড়াশুনার ক্ষতি হইবে, উত্তেজক আন্দোলনে তাহাদের সমুদয় বা কতক সময় গেলে অধ্যয়ন ও জ্ঞান লাভের জন্য তাহারা যথেষ্ট সময় দিতে পারিবে না, উত্তেজক আন্দোলনে যোগ দিলে তাহাদের চিত্তচাঞ্চল্য ও চিত্তবিক্ষেপ জন্মিয়া জ্ঞানলাভের দিকেই প্রধানতঃ তাহাদের মনের ঝোঁক থাকিবে না, ইত্যাদি। গড়ের মাঠে ফুটবল খেলার সময়, ঘোড়দৌড়ের সময়, ছাত্রেরা যে দর্শকরূপে রোদে জলে পুড়িয়া ভিজিয়া অনেক দিন অনেক ঘণ্টা সময় কাটায়, তাহাতে তাহাদের পড়াশুনার সুবিধা হয়, পড়াশুনার জন্য বেশী সময় তাহাদের হয়, জ্ঞানলাভই তাহাদের প্রধান উদ্দেশ্য এই বোধ জন্মে, মনে কোন উত্তেজনা বা চাঞ্চল্যের কারণ জন্মে না, ইহা কেহ বলিতে পারেন কি? অথচ সরকার বাহাদুর কখনও ত ফুটবল ম্যাচ ও ঘোড়-দৌড় দেখিয়া সময় নষ্ট করার বিরুদ্ধে কোন আদেশ প্রচার করেন নাই। খোলা মাঠে কতকটা সময় যাপন করিলে তাহার দৈহিক কিছু উপকারিতা অস্বীকার করি না; কিন্তু রাজনৈতিক কাজ উপলক্ষ্যে ঘুরিয়া বেড়াইলেও কখন কখন সেরূপ উপকার হয়। পতিতা নারীরা যে সব থিয়েটারের অভিনেত্রী, বিস্তর ছাত্র প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগিয়া সেখানে অভিনয় দেখে। তাহাতে তাহাদের অর্থব্যয় ও স্বাস্থ্যহানি হয়, মানসিক শুচিতা কমে, এবং কাহারও কাহারও চরিত্রভ্রংশও ঘটে। ইহাতে অধ্যয়নে অনুরাগ বাড়ে এবং অধ্যয়নের জন্য সময় বেশী পাওয়া যায়, এরূপ কেহ বলিতে পারেন না। কিন্তু সরকার বাহাদুর এ বিষয়ে কোন উপদেশ দেন না, হুকুম জারী করেন না। বলা বাহুল্য আমরা সব রকম অভিনয়ের বিরোধী নহি। সিগারেট বিড়ি খাইলে, অন্ততঃ অপরিণতবয়স্ক ছাত্রদের ক্ষতি হয়। গবন্মেণ্ট এই কুঅভ্যাস দমনের কি চেষ্টা শিক্ষকদের দ্বারা বা অন্য উপায়ে করাইতেছেন? মদ্যপান আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের (অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানদের) শাস্ত্র অনুসারে পাপ, এবং বিজ্ঞানও ইহার অনিষ্টকারিতা প্রমাণ করে। অথচ কোন ছাত্র মদের দোকানের সম্মুখে কোন মদ্যপায়ীকে মদ না-খাইতে বলিলে তাহার কারাদণ্ড হইবার অর্ডিন্যান্স হইয়াছে। এই অর্ডিন্যান্স কি ছাত্রদের চারিত্রিক উন্নতির জন্য জারী করা হইয়াছে?

আমরা বরাবরই সাধারণতঃ স্কুলের ছাত্রদের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেওয়ার বিরোধী। কিন্তু উপরকার ক্লাসের ছাত্রেরাও রাজনৈতিক সভায় গিয়া কখনও বক্তৃতা শুনিবে না কিম্বা কোন সভার বেঞ্চি সাজাইবে না, আমাদের মত এ রকম নয়। অবশ্য এমন অনেক বক্তার এমন বক্তৃতা আছে, যাহা বালক কেন বৃদ্ধেরও না শুনাই ভাল। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তৃতা মাত্রেই খারাপ এরূপ কোন সাধারণ নিয়ম নির্দ্দেশ করা যায় না। স্কুলের বড় ছাত্রেরা তাহাদের বিতর্ক সভায় রাজনৈতিক বিষয়ে নিজেরা তর্কবিতর্কও করিতে পারে। বস্তুতঃ, তাহারা বড় হইয়া নির্দ্দোষ যে যে সার্ব্বজনিক কাজ করিতে পারে, তাহার সহিত সংস্পর্শ ছাত্রাবস্থাতে ঘটিলেই তাহাদের মহা অনিষ্ট হইবে, আমরা এরূপ মনে করি না। একথা কলেজের ছাত্রদের পক্ষে আরও বেশী খাটে। রাজনৈতিক ও অন্যবিধ আন্দোলন সম্পর্কে স্কুলের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত।

কিন্তু মোটের উপর যিনি ছাত্র তিনি প্রধানতঃ বিদ্যার্থী, ইহা সত্য কথা। কিন্তু বিদ্যা জিনিষটি কি? "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে", "তাহাই বিদ্যা যাহা মুক্তির অনুকূল"। মুক্তি প্রধানতঃ মানুষের অন্তরের বন্ধন মোচন অর্থেই ব্যবহৃত হয়, এবং সেরূপ মুক্তি না ঘটিলে স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশের মানুষেরও দাসত্ব কাটে না। কিন্তু বাহিরের বন্ধন না ঘুচিলে মানুষের আভ্যন্তরীণ বন্ধনও যায় না। পরাধীন দেশসকলে এমন অসাধারণ মানুষ অতি অল্পসংখ্যক থাকিতে পারেন, যাঁহারা বাহিরের বন্ধনকে ভয় করেন না, গ্রাহ্য করেন না, এবং যাঁহাদের অন্তরের অজ্ঞানতাপাশ মোহপাশ প্রবৃত্তিপাশ আদি ছিন্ন হইয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ পরাধীন দেশের মানুষেরা বাহিরে ও ভিতরে দাস। এবং যে-সব অসাধারণ মানুষের কথা বলিলাম, তাঁহারাও বাহিরের বন্ধনের ভয়ের অতীত হইলেও নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে পারেন না—যেমন কারারুদ্ধ মহাত্মা গান্ধী।

আমাদের স্কুলকলেজসকলে পরোক্ষভাবে অজ্ঞাতসারে কোন কোন ছাত্রের ভিতরের বন্ধন মোচনের সুবিধা হয়ত হয়, কিন্তু অধিকাংশের তাহা হয় না, এবং সাক্ষাৎ-ভাবে তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করিবার চেষ্টা ত হয়ই না। বাহিরের যে বন্ধন, অর্থাৎ অধীনতা বা দাসত্ব, তাহা হইতে মুক্ত হইবার জন্য উপদেশ দান এবং তাহার উপায় নির্দ্দেশ, সরকারী পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে যে সব স্কুল-

কলেজের ছাত্রেরা চায়, সে সব স্কুলকলেজে হইতে পারে না। সুতরাং "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে," এইরূপ বিদ্যালাভ আমাদের স্কুলকলেজসকলে প্রধানতঃ বা বেশী করিয়া হয় না। ছাত্রদের কতকটা অজ্ঞতা ঘুচে, কেরানীগিরি, পণ্ডিতী, মাষ্টারী, ওকালতী প্রভৃতি দ্বারা কিছু রোজগারের উপায় হয়, কিন্তু দেশের পক্ষে সকলের চেয়ে বেশী ধনাগমের উপায় শিখান হয় না, চারিত্রিক উন্নতিও কাহারও কাহারও হয়, ইতিহাস পড়িয়া বাহিরের বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছাও কাহারও কাহারও হয়, কিন্তু প্রচলিত স্কুলকলেজপাঠ্য ভারতেতিহাসগুলিতে অনেক মিথ্যা কথা থাকায় অনেক ছাত্রের খুব অনিষ্টও হয়।

এই সব কথা বিবেচনা করিলে মনে হয়, আমাদের স্কুলকলেজগুলি ছাত্রছাত্রীদিগকে তাহাদের ভবিষ্যৎ মনুষ্যোচিত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে, ঠিক্ একথা বলা চলে না। সুতরাং ইহাও ঠিক্ বলা চলে না, যে, যেহেতু তাঁহারা অল্পবয়স্কদিগকে মানুষ করিতেছে অতএব তাহাদের এই মানুষ-করা কাজে কোন বাধা না-জন্মানই উচিত। তথাপি, আমরা বরাবর ইহা বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছি এবং বলিয়া আসিতেছি, যে, কতকটা জ্ঞান দিবার কতকটা মানুষ করিবার যখন অন্য শিক্ষালয় আমাদের নাই, তখন যাহা আছে তাহাতেই ছাত্রছাত্রীরা কিছু শিক্ষা পাক্। কিন্তু তাহাতেও ঐতিহাসিক মিথ্যাশিক্ষা ও কুশিক্ষার প্রশ্রয় কোনক্রমেই দেওয়া উচিত নহে।

ইহা গেল সাধারণ সময়ের ও সাধারণ অবস্থার কথা। কিন্তু এখন দেশের অবস্থা সাধারণ নহে, সময়ও সাধারণ নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলার আর্কার্ট সাহেব স্বয়ং একজন শিক্ষক—তিনিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন। ছাত্রদের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এবং তাঁহার প্রতি ছাত্রদের ব্যবহার যথাযোগ্য হইয়াছে। তিনি সীণ্ডিকেটের পক্ষ হইতে ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে বলিয়াছেন, ইহা করা সাধারণ রীতি নহে, কিন্তু অসাধারণ অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকে ইহা করিতে হইতেছে। ইহার উত্তরে ছাত্রেরাও বলিতে পারে, তাহারা যাহা করিতেছে তাহাও দেশের অসাধারণ অবস্থার জন্য করিতেছে। যাহা হউক, এরূপ কথা-কাটা-কাটি করা বা করিতে প্ররোচনা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নহে। ছাত্রেরা যাহা করিতেছে, সে সম্বন্ধেই কিছু বলিতে চাই।

যাহারা পরিশ্রম করিয়া, বেতন দিয়া ও পরীক্ষার ফী দিয়া পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, পিকেটিং দ্বারা তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা উচিত হয় নাই। মানুষের স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই যে আমরা একথা বলিতেছি তাহা নহে; কারণ, কখন কখন জোর করিয়াও মানুষকে কুকাজ হইতে নিবৃত্ত করা উচিত, যেমন বিষপান হইতে। কিন্তু ওকালতী পাশ করা বিষপানের তুল্য নহে। এবং সরকারী আদালতে এখন কেহ ওকালতী করিতে না চাহিলেও স্বরাজের আমলে তাঁহার ওকালতী করার প্রয়োজন হইতে পারে।

যাহারা পরীক্ষা দিতে আসিয়াছিল, তাহাদিগকে পরীক্ষা দিতে দিয়া পরে অন্ততঃ পরীক্ষার ফল বাহির না-হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কোন 'দেশের কাজে' প্রবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে চলিত না কি? পরীক্ষার হলের সম্মুখে তাহাদিগকে যেমন এক জায়গায় পাওয়া গিয়াছিল, তেমন এক জায়গায় তাহাদিগকে পাওয়া না গেলেও তাহারা দুরধিগম্য নহে। পরীক্ষার পর যাহাদিগকে 'দেশের কাজে' পাওয়া যাইত না, পরীক্ষা দিতে না-দিয়া কি তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, বা পাওয়া যাইবে? মানব প্রকৃতি সাধারণতঃ যেরূপ, তাহাতে যাহারা পরীক্ষা দিতে পাইল না তাহাদের বরং রাগ হইবারই কথা। তবে, এ কথা সত্য বটে, পরীক্ষাদানে বাধা পাইয়া যদি কেহ কেহ ওকালতীর ইচ্ছা ছাড়িয়া দিয়া দেশের ধনবৃদ্ধির কোন উপায়ে মন দেন, তাহাতে তাঁহাদের ও দেশের উপকার হইবার সম্ভাবনা আছে।

শিক্ষালয়সমূহে পিকেটিং করা সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিবার আছে। এই পিকিটিঙের উদ্দেশ্য কি স্কুল-কলেজগুলি ভাঙিয়া দেওয়া? এগুলি অবিমিশ্র অমঙ্গলের উৎপাদক নহে। সুতরাং যদি ইহাদের জায়গায় উৎকৃষ্টতর কিছু প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করা না যায়, তাহা হইলে এগুলি ভাঙিয়া দেওয়ার পক্ষপাতী আমরা নহি।

কাগজে দেখিয়াছিলাম, আপাততঃ তিনমাসের জন্য শিক্ষা বন্ধ রাখিয়া ছাত্রদিগকে 'দেশের কাজে' লাগান পিকেটিঙের উদ্দেশ্য। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে ইহাতে আমাদের অমত না থাকিতে পারে। যুদ্ধের সময় বিলাতে ও ইয়োরোপের অন্য অনেক দেশে বিস্তর ছাত্র শিক্ষালয়ের পরিবর্ত্তে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়াছিল। কিন্তু বঙ্গে যাহারা শিক্ষালয়ে যাইবে না তাহারা বাস্তবিকই কি 'দেশের কাজ' করিবে? এই যে লম্বা গ্রীষ্মের ছুটি গিয়াছে, ইহার মধ্যে দেশের কতকগুলি ছাত্র তাহা করিয়াছে, অন্যেরা—বোধ হয় অধিকাংশ-করে নাই। সম্ভবতঃ শিক্ষা বন্ধ করিলে অধিকাংশ ছাত্র আলস্যে কাল কাটাইবে, দেশের কাজ করিবে না। তথাপি, যদি কতক ছাত্রও করে, তাহা ভাল। কিন্তু তাহারা স্বাবলম্বী হইবে, না অভিভাবকের উপর নির্ভর করিবে? তাহারা যাহা

করিবে, তাহাতে অভিভাবকদের মত থাকিলে কোন কথা উঠিবে না; কিন্তু অভিভাবকদের মত না থাকিলে দেশের কাজে নিযুক্ত কর্ম্মীদের ব্যয়নির্ব্বাহ কে করিবে, জানিতে হইবে।

এ কথা বিশেষ করিয়া কলিকাতার সেই সব ছাত্রদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাস্য যাহারা মফঃস্বল হইতে আসিয়াছে। পড়াশুনা বন্ধ করিলে অনেক পিতামাতা তাহাদের কলিকাতার খরচ না দিতে পারেন। পিতামাতার অমতে দেশের কাজের জন্য তাহারা কলিকাতায় থাকিলে দুটি প্রশ্ন উঠে। কে তাহাদের খরচ জোগাইবে? পিতামাতার অবাধ্য হওয়া কি উচিত? যদি কোন ব্যক্তি, ব্যক্তিসমষ্টি, বা সমিতি টাকা দেন, তাহা হইলে প্রথম প্রশ্নের উত্তর হইয়া গেল। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর সাধারণ ভাবে দিতে গেলে বলিতে হয়, সাধারণতঃ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া উচিত নয়। কিন্তু স্থলবিশেষে অবস্থাবিশেষে নিজের বা দেশের শ্রেয়োলাভের জন্য গুরুজনের অমতেও কাজ করা কর্ত্তব্য হইতে পারে। অবশ্য, সেস্থলে কর্ম্মীকে গুরুজনের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার আশা ছাড়িতে হইবে।

এইরূপ যুক্তি শুনিয়াছি, পিকেটিঙের উদ্দেশ্য, শিক্ষা বন্ধ হইলে অনেক ছাত্র মফঃস্বলের গ্রামে নগরে চলিয়া যাইবে ও সেখানে দেশের কাজ করিবে। কিন্তু কয়জন করিবে?

যাহারা দেশের কাজ করিবে, তাহারা যদি স্বেচ্ছায় করে, কিম্বা যুক্তিতর্কের ফলে দেশের কল্যাণার্থ অবলম্বিত কোন পন্থায় বিশ্বাসবান্ হইয়া করে, তাহা হইলে ভাল।

নেতৃত্বের কথাও বিশেষ করিয়া ভাবিতে হইবে। যুবা বয়সে নেতৃত্বের শক্তি চরিত্রের দৃঢ়তা কাহারও জন্মে না, এমন নয়। কিন্তু সাধারণতঃ নেতা হইবার যোগ্যতা বিকশিত হয় অভিজ্ঞতা হইতে এবং তাহা একটু বয়স না হইলে হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রদেরও বয়স সাধারণতঃ তত নয়। মহাত্মা গান্ধীর মত নেতার পরিচালনায় সকল বিষয়ে সংযত, শুচি ও নিয়মানুবর্ত্তী হইয়া দেশের কাজ করা সুমহৎ শিক্ষা—তাহা স্কুলকলেজে হয় না। কিন্তু গান্ধী ত দেশে একটি; এবং তাঁহার সমতুল্য না হইলেও তাঁহার সদৃশ বহু নেতা কারাগারে। ছাত্রদিগকে চালাইবে কে? আমরা বিশেষ করিয়া কলিকাতার কথাই বলিতেছি।

কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়াছেন, অনেক শিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত লোক ত বেকার বসিয়া আছে; তাহাদিগকে দেশের কাজে লাগাইবার চেষ্টা না করিয়া ছাত্রদিগকে লইয়াই কেন টানাটানি করা হইতেছে? বেকার লোকদিগকে দেশের কাজে লাগাইবার চেষ্টা হইতেছে কিনা, এবং অন্ততঃ সেরূপ কতক লোকও দেশের কাজ করিতেছেন কিনা, বলিতে পারি না— কারণ, কোন প্রচেষ্টার সহিত আমাদের যোগ নাই। হয়ত এরূপ কতকগুলি শিক্ষিত লোক দেশসেবক হইয়াছেন। ছাত্রদের উপর বেশী করিয়া টান পড়িবার ও দাবী হইবার কারণটি ভুলিলে চলিবে না। যাহাদের শিক্ষা বা অর্দ্ধশিক্ষা সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং যাহাদিগকে সংসারের ভার লইতে এবং পোষ্য পোষণের চিন্তা করিতে হইতেছে, তাহাদিগকে নানা ধান্দায় ফিরিতে হয়। সেই কারণে দেশসেবার চিন্তা তাহারা করিতে পারে না, অবসরও পায় না। যদি বলেন, যত দিন কোন কাজকর্ম্ম না জুটিতেছে, বৃত্তি নির্ব্বাচন না হইতেছে, ততদিন তাঁহারা দেশসেবক হউন না? তাহার উত্তর এই, যে, তাহাতে কাজকর্ম্মের চেষ্টা করা চলে না; এবং আজকাল দেশের কাজে কেহ একবার নামিলে তাহার সরকারী কাজ পাওয়া দুর্ঘট হয়, সওদাগরী আপিসে ঢোকাও শক্ত হয়, এবং পুলিসের খাতায় নাম উঠায় স্বাধীন দোকানদারী আদিতেও ব্যাঘাত ঘটে। এইরূপ নানা কারণে, এখন আমাদের দেশে—এবং বোধ হয় স্বাধীনতালিপ্সু সব দেশেই—যৌবনের আদর্শপরায়ণতা, অভয়, দুঃখসহনক্ষমতা, উৎসাহ, শক্তি, সাংসারিক ক্ষতি লাভ গণনায় অনাসক্তি ও অনভ্যাস এবং সংসারভারবিমুক্ততা ছাত্রছাত্রীদের যে-পরিমাণে আছে, অন্য কোন শ্রেণীর লোকের সে পরিমাণে নাই। এই কারণে শৃঙ্খলিত বিপন্ন দেশের প্রকৃত উদ্ধারার্থী নেতাদের এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যলোভী ব্যক্তিদের দৃষ্টি বেশী করিয়া ছাত্রদের উপর পড়ে। প্রকৃত দেশহিতকামী ব্যক্তিদের প্রভাব যে-সকল ছাত্রের উপর পড়িবে, তাহাদের কল্যাণ হইবে। তাঁহারা নিজে অগ্রণী হইয়া বলিবেন, "এসো"। অন্যেরা আরামে ঘরে থাকিয়া বিপৎসঙ্কুল কর্ম্মক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিবে, "যাও"।

—

স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষগণ ও বর্ত্তমান প্রচেষ্টা

যে-সব স্কুলকলেজের কর্তৃপক্ষ শিক্ষালয় বন্ধ করাইবার চেষ্টার বিরোধী—বিরোধী তাঁহারা সবাই—তাঁহারা বলেন, লেখাপড়া বন্ধ করিলে ছাত্রছাত্রীদের মহা অনিষ্ট হইবে, শিক্ষালয়গুলি উঠিয়া যাইবে, তাহাতে দেশের প্রভূত ক্ষতি হইবে, ইত্যাদি। আমরাও বিশ্বাস করি, দেশের সকল অবস্থাতেই শিক্ষালয়ের প্রয়োজন। কিন্তু স্কুলকলেজের কর্ত্তারা একটু চিন্তা করিবেন, তাঁহারা কিরূপ শিক্ষা দেন, এবং ছাত্রদের ও দেশের ভবিষ্যতের

জন্যই তাঁহারা উদ্বিগ্ন, না নিজ নিজ অর্থাগমের পথ বন্ধ হওয়ার চিন্তাটাও তাহার মধ্যে আছে।

ছাত্রেরা তিনমাস শিক্ষা বন্ধ রাখিতে বলিতেছে। এমন কোন ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে হইতে পারে কি, যে, যাহারা সমস্ত সেশ্যনের বেতন দিবে, কিন্তু তিন মাস বা ছয় মাস পরে ক্লাসে উপস্থিত হইবে, তাহারাও পড়াশুনায় কাঁচা না থাকিলে যথাসময়ে পরীক্ষা দিতে পারিবে? কোন ছাত্রের সহিত আমাদের কথা হয় নাই, কিন্তু অনুমান হয়, যেসব ছাত্র নিজেরা দেশের কাজ কিছুদিন করিতে চায় তাহারা অন্য ছাত্রদিগকেও শিক্ষালয় হইতে দূরে রাখিতে চাহিতেছে এইজন্য, যে, সকলেরই সমান অবস্থা হইলে ভবিষ্যতে সকলের শিক্ষা ও পরীক্ষার একটা ব্যবস্থা হইতে পারিবে; কিন্তু এখন যদি কতক ছাত্র ক্লাসে যায় তাহা হইলে অনুপস্থিত অন্যদের ভবিষ্যতে কোন গতি হইবে না।

—

ছাত্রছাত্রীদের কর্ত্তব্য

আমরা নিজে যেরূপ বিপদের সম্মুখীন হই নাই, অন্য কাহাকেও সেরূপ বিপদাশঙ্কার মধ্যে যাইতে বলা অনুচিত মনে করি। কিন্তু দেশের কাজ—বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী অনেক কাজ—নিশ্চিত বিপদের মধ্যে না যাইয়াও করা যায়। তাহার একটি বলিতেছি।

বোম্বাই হইতে কিছু দিন আগে খবর আসিয়াছিল, যে, কর্ম্মীরা ঐ শহরের তিন লক্ষ লোকের নিকট হইতে কেবল স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিবার প্রতিজ্ঞা সংগ্রহ করিয়াছেন। ঐ শহরের লোকসংখ্যা মোটামুটি দশ লক্ষ। যে তিন লক্ষ প্রতিজ্ঞা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি যদি বাড়ীর কর্ত্তাদের নিকট পাওয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে বোম্বাইয়ের অধিকাংশ লোক স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, বলিতে হইবে। বাংলা দেশেরও ছোট বড় সব শহরে ও গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়া কর্ম্মীরা গৃহস্থদিগকে স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতে পারেন। যাঁহারা এই কাজ করিবেন, তাঁহাদের সঙ্গে বিক্রয়ার্থ দেশী কাপড় থাকিলে আরও ভাল হয়; কেহ দেশী কাপড় কিনিতে চাহিলে তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেওয়া চলে। অবশ্য সব রকমের কাপড় বা বেশী কাপড় কর্ম্মীরা সঙ্গে রাখিতে পারিবেন না—যাহা পারেন, তাহাই ভাল। যাঁহাদের কাপড় বিক্রী করিবার সুবিধা বা ইচ্ছা হইবে না, তাঁহারা কেবল স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতে সকলকে অনুরোধ করিয়া বেড়াইবেন। এই কাজ ছাত্রছাত্রীদের দ্বারাও তাঁহাদের অবসরসময়ে হইতে পারে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সময় অনেক ছাত্র 'স্বদেশী' প্রচার এবং দেশী কাপড় বিক্রী করিতেন।

—

মহেশচন্দ্র ঘোষ

সুপণ্ডিত ও সাধু শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ঘোষ বেদান্তরত্ন মহাশয় ৬২ বৎসর বয়সে হাজারীবাগে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার সম্বন্ধে অন্যত্র যে একটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল, তাহা হইতে পাঠকেরা তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইবেন। তিনি অকপট মানবপ্রেমিক ও ভক্তসাধক ছিলেন। সত্যের সন্ধানে তাঁহার জীবন ব্যতীত হইয়াছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শন ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল; তাঁহার লাইব্রেরী তাহার পরিচায়ক। অনেক ধনী লোক ঘর সাজাইবার আসবাব হিসাবে বহি কিনেন। তিনি ধনী ছিলেন না, পড়িবার জন্য বহি কিনিতেন। ডাকে প্রতিসপ্তাহে তাঁহার নিকট বহি আসিত। তাঁহার স্মৃতিশক্তি এরূপ ছিল, যে, আমরা তাঁহাকে তাঁহার জানা কোন বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া চিঠি লিখিলে ফেরত ডাকেই, অনেক সময়ে ফুলস্কেপ কাগজের ৮।১০ পৃষ্ঠাব্যাপী, উত্তর আসিত, এবং সেই উত্তরে বহু গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ থাকিত। তাঁহার পরলোকগমনে প্রবাসী ও প্রবাসীর সম্পাদক একজন পরম হিতকারী ও অতি শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু হারাইল। তাঁহার দানের মূল্য বুঝিতে শিক্ষিত সমাজের সময় লাগিবে।

—

সরকারী দর কষাকষি

বাংলা সরকারের প্রধান সেক্রেটারী হপ্‌কিন্স্ সাহেব সম্প্রতি এই মর্ম্মের একটি সার্কুলার জারী করিয়াছেন, যে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহাদের পোষ্য ও পরিবারবর্গের সকলের রাজনৈতিক মত ও কাজের জন্য দায়ী করা হইবে। এই সব 'গলগ্রহ' লোকেরা ('dependants') নিরুপদ্রব আইন-লঙ্ঘন প্রচেষ্টায় যোগ দিলে, তৎসংশ্লিষ্ট সভাআদিতে উপস্থিত থাকিলে, কংগ্রেসের কোন কাজে চাঁদা দিলে, তাহাদের পালক চাকর্য়েদের শাস্তি হইবে, ইহা ত সুস্পষ্ট। অধিকন্তু সার্কুলারটিতে আছে, যে, তাহারা নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্কিত ("allied") কোন প্রচেষ্টার সহিত সম্পর্ক রাখিলেও পালক সরকারী কর্ম্মচারীদের শাস্তি হইবে।

হিন্দু সমাজে ও মুসলমান সমাজে এবং কোন কোন স্থলে দেশী খৃষ্টিয়ান সমাজেও বহু একান্নবর্ত্তী পরিবার আছে। একান্নবর্ত্তী পরিবারের কেবল কর্ত্তা বা বয়োজ্যেষ্ঠ একজনই রোজগার করে এবং অন্যেরা তাঁহার আশ্রয়ে

থাকে, এমন নয়। অনেকস্থলে রোজগার অনেকেই করে। তাহাদের মধ্যে সরকারী চাকর্য়ে থাকিতে পারে, স্বাধীন ব্যবসায়ীও থাকিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে কেহ কাহারও উপর নির্ভর করে না, কেহ কাহারও গলগ্রহ নহে। সুতরাং একজন যদি সরকারী চাকর্য়ে হন, তাহা হইলে সরকার কি অন্যদের মত ও কাজের জন্য তাঁহাকে দায়ী করিবেন? তাহা খুব অদ্ভুত বিচার হইলেও বিপন্ন গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে অসম্ভব হইবে না।

আর যদি কেহ কেহ বাস্তবিকই অরোজগারী হন, তাহা হইলেও কি গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাদেরও স্বাধীনতা ক্রয় করিয়াছেন? বেতন ত দেন একজনকে, অথচ স্বাধীনতা কিনিতে চান অনেকের! এটা অত্যন্ত বেশী দরকষাকষি নয় কি? অবশ্য এক্ষেত্রে ক্রেতাবিক্রেতার মধ্যে (স্বাধীনতা-) ক্রেতা সরকার ক্ষমতাশালী প্রভু বটে; কিন্তু ক্ষমতার সব রকম প্রয়োগ সফল হয় না।

বৃদ্ধ পিতামাতাকে পালন অনেক সরকারী চাকরেকে করিতে হয়। পুত্রেরা তাঁহাদের প্রতি প্রভুত্ব বা অভিভাবকত্ব করিতে গেলে তাহা হিন্দু ভাব, প্রথা ও রীতির বিরুদ্ধ হইবে। পুত্র পিতামাতাকে পালন করিতে বাধ্য, আমরা হিন্দুরা ইহাই বিশ্বাস করি। এই পালনব্যয়ের বিনিময়ে তাঁহাদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কিনিয়া লইলাম, এরূপ যে মনে করে সে সুপুত্র নয়, হিন্দুও নয়। ভার্য্যাকে পালন করিতে পতি বাধ্য, কিন্তু পতি কেমন করিয়া পালন করিবেন তাহা তিনি ভাবিবেন, পত্নীর স্বাধীনতার মূল্য পালনব্যয়, ইহা সুপতি মনে করিতে পারেন না; পত্নীও মনে করিতে বাধ্য নহেন। যে রত্নাকর পরে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়াছিলেন, তাঁহাকে তাঁহার পিতা মাতা ও ভার্য্যা যাহা বলিয়াছিলেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণের গোড়ার কয়েকটা পৃষ্ঠায় তাহা পড়িলে এই বিষয়ে হিন্দুধারণা কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। অবশ্য, সরকারী কর্ম্মচারীরা এক এক জন আস্ত রত্নাকর বা এক এক জন হবু বাল্মীকি, এরূপ কিছু বলিয়া বা ইঙ্গিত করিয়া আমরা তাঁহাদিগকে অপমানিত বা সম্মানিত করিতে চাই না।

প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীনচেতা পুত্র পুত্রী, ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতির সুনিপুণ ও সফলকাম কারাধ্যক্ষ হইতে সরকারী চাকর্য়েরা সকল স্থলে পারিবেন কিনা, সন্দেহ। অনেক স্থলে অন্তর্বিদ্রোহ, গৃহবিচ্ছেদ ও গৃহত্যাগ ঘটিতে পারে। ভার্য্যা যদি বিদ্রোহিনী হন, তাহা হইলে চাকর্য়ে মহাশয় কি করিবেন? ব্রিটিশ আদালতে মানিত হিন্দু আইনে ডিভোর্স নাই। যদি 'সরকারী' স্বামী ও 'বেসরকারী' স্ত্রীতে রাজনৈতিক মত ও আচরণে প্রভেদ ঘটে, তাহা হইলে ঐ স্বামী ঐ স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে বাধ্য থাকিবেন না, গবর্ন্মেণ্ট এরূপ আইন করিবেন কি? কিন্তু যদি স্ত্রীও রোজগারী হন, তাহা হইলে তিনি কি ডিপেণ্ডেণ্ট বা 'গলগ্রহ' বিবেচিত হইবেন? এবং তিনি পিকেটিং করিলে স্বামীর চাকরী যাইবে কি?

হপ্‌কিন্স সাহেব যেমন সার্কুলার জারী করিয়াছেন, বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলনের যুগেও সেইরূপ একটা আদেশ সরকারী কর্ম্মচারীরা পাইয়াছিলেন। তাহা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তেইশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩১৪ সালের ভাদ্রের প্রবাসীতে "খালাস" শীর্ষক একটি পরিহাসাত্মক গল্প লিখিয়াছিলেন। তাহা প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হইল।

ভারতবর্ষে নানা রকম শ্রেণীভেদ থাকায় স্বরাজ লাভের এবং অন্য নানাদিকে উন্নতি করিবার বাধা হইয়াছে। এখন আর একটি বাধা সৃষ্ট হইতে চলিল। সরকারী লোক ও বেসরকারী লোক, এই পংক্তিভেদ আগে হইতেই আছে। এখন সরকারী চাকর্য়েদের বাড়ীর ছেলেমেয়েদের এবং পুরাঙ্গনা ও বৃদ্ধদের বেসরকারী লোকদের বাড়ীর ঐরূপ ব্যক্তিদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা করিতে হইলেও পরস্পরের রাজনৈতিক মতামত ও চালচলন জানিয়া লওয়া নিরাপদ হইবে। কথিত আছে, ইংরেজরা জাতিভেদ মানে না; কিন্তু যদি—অবশ্য আমাদেরই গ্রহবৈগুণ্যে—নূতন জাতিভেদের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে তাহাদের বেশী আপত্তি হইবে কি?

বর্ত্তমান ১৯৩০ সালে যে সাতটি অডিন্যান্স জারী হইয়াছে, তাহার একটিতে আছে, যে, কেহ কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে চাকরী ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ উপরোধ উত্ত্যক্ত আদি করিলে তাহার শাস্তি হইবে। আলোচ্য সার্কুলারটি পড়িয়া একজন সরকারী চাকর্য়েরও চিত্তবিক্ষোভ জন্মিবে না, বোধ হয় না। অতএব, আমাদের বিবেচনায়, সার্কুলারটি আরও অধিক মুন্‌শিয়ানার সহিত লিখিত হইলে ভাল হইত। একেবারে লিখিত ও মুদ্রিত না হইলে ত খুবই ভাল হইত। কিন্তু পূর্ণতার দিকে ক্রমশঃ অগ্রগামী এই জগতে পূরা ভাল ত কিছু পাওয়া যায় না—এমন কি ব্রিটিশ রাজত্বেও না। সুতরাং হঠাৎ পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা না-করা সুবুদ্ধির পরিচায়ক

—

"চলন্তিকা"

শ্রীযুক্ত রাজশেখর বসু মানবচরিত্রজ্ঞ ও সুরসিক গল্পলেখক বলিয়া ছদ্মনামে পরিচিত। বেঙ্গল কেমিক্যালের তৈরি কতকগুলি জিনিষের নামকরণ তিনি

করিয়াছেন বলিয়া আমাদের সন্দেহ হওয়ায় তাঁহার শব্দ-রচনানৈপুণ্যও আমরা অনুমান করিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন "চলন্তিকা" নামক তাঁহার অভিধানখানি হাতে পড়ায় সেই অনুমান যথার্থ মনে হইতেছে।

ইহার নাম হইতেই বুঝা যায়, ইহাতে বাংলা ভাষায় প্রচলিত শব্দের অর্থ দেওয়া হইয়াছে। "আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচলিত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল শব্দের যথোচিত বিবৃতির স্থান করিবার জন্য অল্পপ্রচলিত শব্দ যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হইয়াছে। বাংলায় অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ এবং অধুনা অপ্রচলিত প্রাচীন বাংলা শব্দ দেওয়া হয় নাই।" যাহা সহজে নাড়া-চাড়া করিতে পারা যায় অথচ যাহাতে মোটামুটি কাজ চলে, গ্রন্থকার এরূপ একটি অভিধান রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

অভিধানখানিতে ছাব্বিশ হাজারের অধিক শব্দের বিবৃতি আছে। তদ্ভিন্ন বানান, ণত্ব ষত্ব-বিধি, সন্ধি,শব্দরূপ, ক্রিয়ারূপ, সংখ্যাবাচক শব্দ, অশুদ্ধ শব্দ প্রভৃতি বিষয়ক ও বহু পারিভাষিক শব্দসম্বলিত বিস্তৃত পরিশিষ্ট আছে।

আমরা আমাদের সাধারণ কাজের জন্য ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিতেছি।

যিনি ইহার বিস্তৃত সমালোচনা করিবেন, তিনি ইহার কিছু খুঁৎ দেখাইতে পারিবেন। সেরূপ খুঁৎ প্রথম সংস্করণে অনিবার্য্য।

পুস্তকখানির আয়তন ও মূল্য বেশ সুবিধাজনক হইয়াছে।

—

"ইংলণ্ড স্বরাজের যোগ্য কি না?"

ভারতবর্ষে—আপনা আপনি কিম্বা দুষ্ট লোকদের প্ররোচনায়—হিন্দু মুসলমানে কিংবা জাতিতে জাতিতে সাংঘাতিক বিবাদ হয় বলিয়া এবং কখন কখন এক ধর্ম্মের লোক অন্য ধর্ম্মের লোকদের প্রতি অবিচার করে বলিয়া ভারতবর্ষকে স্বরাজের অযোগ্য মনে করা হয়। বোম্বাই হইতে একজন ইউরোপীয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "দি উইক" অর্থাৎ "সপ্তাহ" নামক একখানি কাগজ বাহির হয়। উহাতে সম্পাদক জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "Is England fit for swaraj?" "ইংলণ্ড কি স্বরাজের যোগ্য?" এই প্রশ্ন কেন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে তাহার কারণ উক্ত সম্পাদকের ভাষায় গত ৩রা জুলাইয়ের "দি উইক" হইতে নীচে উদ্ধৃত হইল।

British die-hards whose oracle is the *Morning Post*, oppose tooth and nail the grant of a Dominion Status to India on the specious plea among others that the antagonism between the different religious sections in this country is so strong and unreasonable that the British must perforce remain, if for nothing else, at least to keep the scales even between them. The position taken is that India will be unfit for self-government so long as the minority cannot expect justice and fair play from the major community. By way of comment we reproduce below what appeared in *The Universe* (London) of June 6th, and could quote many similar or worse instances where Protestant intolerance and bigotry has deprived Catholics of their due rights and privileges as *e. g.* the shameful attempt, happily frustrated, to prevent the Liverpool Catholics from obtaining the site for their proposed Cathedral, even though they offered £25,000 more than any one else. *The Universe* writes:—

"Charges of anti-Catholic prejudice in the appointment of doctors and nurses are made by a correspondent in the *Liverpool Daily Post.* The correspondent quotes the case of a doctor who applied for the post of medical officer. His qualifications were acknowleged unanimously, but after his interview with the selection committee the chairman recalled him and asked his religion. The doctor replied that he understood they required a medical officer, not a chaplain.

"However," writes the correspondent, "his appointment went through, as otherwise the reason for a change of decision would have been obvious."

It is alleged that an applicant for the post of sister tutor at a local hospital, a woman of outstanding ability, the author of books on her profession, failed to get the vote of any Protestant member of the selection committee. The correspondent states that his own daughter, a State-registered nurse with the additional qualification of C. M. B., who applied for a hospital post, was not invited to an interview after she had, on request, stated her religion."

The letter concludes: "Every Catholic realizes that the request to 'state religion' seals his doom."

So the pertinent question arises;—Is England fit for self-goverment?

এইরূপ আরও অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারা যায়। স্বাধীন দেশেও যে জাতিতে জাতিতে দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনাখুনি হয়, অথচ সেজন্য ইংরেজরা তাহাদিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য মনে করে না, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপ আমেরিকার ঐরূপ একটি দাঙ্গা সম্বন্ধে গত ৫ই জুলাইয়ের একটি রয়টারের টেলিগ্রাম উদ্ধৃত করিতেছি।

EMELLE (ALABAMA) JULY 5.

Two Whites and six Negroes were killed in a fierce racial battle originating from the sale of motor car battery by a White to a Negro.

Two Whites and one Negro were shot with revolvers, and two Negroes were burnt to death in a house and one hanged by the mob.—Reuter.

—

ঢাকার হাঙ্গামা

ঢাকার হাঙ্গামা সম্বন্ধে গত মাসের প্রবাসীতে যে চিঠিগুলি প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু কিছু ভুল ছিল—দাঙ্গাহাঙ্গামার মধ্যে একেবারে নির্ভুল খবর পাওয়া কঠিন। কয়েকটি ভুল নীচে সংশোধিত হইল। সংখ্যাগুলি পত্রাঙ্ক ও স্তম্ভ।

৪২৯।১। ভবানীবাবুরা নন্দীপরিবারকে ঢাকা হলে লইয়া আসেন নাই; পুলিসের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাদিরি তাহাদিগকে ঢাকা মিউজিয়মে পৌছাইয়া দেন এবং সেখান হইতে তাঁহার চাপরাসী তাঁহাদিগকে ঢাকা হলে পৌছাইয়া দেয়। ২৫শে মে ঢাকা হলে আশ্রিতদের সংখ্যা ১০০ হইয়াছিল।

৪২৯।২। কয়লার দোকান পুড়ায় নাই, লুট করিয়াছিল। ঢাকা হলের ছেলেরা কেহ কেহ খাইতে পায় নাই, সকলে উপবাসী ছিল না।

৪৩০।২। "কাপড়ের দোকানের লুণ্ঠনাবশেষ পুলিশের লোকে লইয়া গিয়াছে, লোকে এইরূপ বলাবলি করিয়াছিল," এইরূপ হইবে।

৪৩২।২। চোরাই মাল বিক্রী সম্বন্ধে যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহা এইরূপ হইবে—"কোন কোন দোকানী এই রকমে দোকান খোলা রেখেছে জান্‌তে পেরে তাদের দোকান থেকে জিনিষ কেনা ছেড়ে দেওয়া গেছে।"—ঘুষ "অনেক" লেক্‌চ্যারারদের নিকট হইতে চায় নাই, কোন কোন লেক্‌চ্যারারের নিকট চাহিয়াছিল। ভবেশ নন্দীর গ্রেপ্তার অর্ডিন্যান্স অনুসারে হয় নাই, অন্য অভিযোগে।—বাবুপুরা থানা নয়, পুলিশ সেকশ্যন।

৪৩৪।২। মুসলমান গুণ্ডারা কনষ্টেবলকে ধরিয়া লইয়া ছোরা লাঠি দেখাইয়া ভয় দেখাইয়াছিল, টাকা আদায় করিবার চেষ্টা করে নাই।

৪৩৬।১। "গেট বাহিরের দিকে খোলে," হইবে।

আমাদের গত সংখ্যার বিবিধ-প্রসঙ্গের কোন কোন কথারও সমালোচনা পাইয়াছি। যথা—

৪৬৮।২। "একজন মুসলমান হিন্দু কর্ত্তৃক হত হয়, এই অনুমানে নির্ভর করিয়া মুসলমানেরা দাঙ্গার সূত্রপাত করে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের ঠিক উত্তর নির্ণয় করা হয় নাই—(ক) মৃতব্যক্তি মুসলমান কি না? (খ) মৃত্যু স্বাভাবিক রোগজনিত, না হত্যাজনিত? (গ) হত্যাজনিত হইলে, হন্তা হিন্দু না মুসলমান?"

৪৬৫।১। "হিন্দুদের ধনপ্রাণ রক্ষা করবার চেষ্টা আরও কোন কোন মুসলমান করেছেন, সেগুলিও লেখা ভাল। যথা,—ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ইস্‌লামিয়া ইণ্টারমিডিয়েট কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ মুসা, অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ দলীলউদ্দীন, সব-জজ মিঃ হাসিবুদ্দীন; ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা বিভাগের দপ্তরী ও তার ভাই মুসলমান গুণ্ডাদের পায়ে ধ'রে নিবৃত্ত করতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছে এবং তা'রা ঢাকা ছেড়ে পালিয়েছে। শোনা যায়, কেউ কেউ স্বীকার ক'রেছে যে তা'রা দলে যোগ দিতে না চাওয়াতে তা'রা হিন্দুপক্ষপাতী ব'লে নিন্দিত হ'য়েছে এবং মারপিটের ভয়ে দলে ভিড়ে হল্লা ক'রেছে, প্রতিরোধকারী হিন্দুরা আস্‌ছে কি না, তাই পাহারা দিয়েছে, কিন্তু নিজেরা গৃহদাহে লুটে খুনজখমে যোগ দেয় নি। কায়েতটুলী আক্রান্ত হ'লে পুলিশ ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ কাদিরি বাবুপুরা পুলিশ সেক্‌শনে এসে পুলিশের সাহায্য চেয়ে লালবাগ থানায় ও পুলিশ আপিসে ফোন্ ক'রে কোনো সাহায্য পান নি, নাকি কোথাও পুলিশ ছিল না। তিনি যখন ফোন্ করেন, তখন সেখানে নলিনীকান্ত ভট্টশালী উপস্থিত ছিলেন এবং ভট্টশালীর যে রিপোর্ট 'ঈষ্ট বেঙ্গল টাইমস্' ছেপেছে, তা' থেকে মুসলমানের এই চেষ্টার কথাটুকু বাদ দিয়ে দিয়েছে।"

৪৭৪।১। "ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন মুসলমান কর্ম্মচারীর আহ্বানে ঢাকা-হল দেখিতে গিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ নাই।"

"যখন ভয়ে কেহ ঘরের বাহির হইতে পারে না, তখন ঢাকার হিন্দুসভার লোকেরা মোটর-বাসে করিয়া পাড়ায় পাড়ায় লোককে সাহস ও সান্ত্বনা দিয়া বেড়াইয়াছেন, আহত ও পীড়িতদের ডাক্তার ও ঔষধ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, দুঃস্থ ও নিঃস্বদের খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, বিপন্ন পরিবারদের শঙ্কাজনক স্থান থেকে উদ্ধার করিয়া

স্থানান্তরে বা আশ্রয় দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, ভগ্ন দগ্ধ বাড়ীর ও দোকানের ফটোগ্রাফ লওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছেন, এবং এখনও তাঁরা ক্ষতিগ্রস্তদের দিয়া মোকদ্দমা রুজু করাইতেছেন, মোকদ্দমার পরামর্শ দিতেছেন, আদালতে যাতায়াতের জন্য মোটর-বাস বাড়ীতে বাড়ীতে পাঠাইতেছেন। ঢাকার হিন্দু সম্প্রদায় এজন্য তাঁদের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ এবং এজন্য তাঁরা সমগ্র হিন্দুসমাজের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। হিন্দুসভার কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সদস্য শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস উকীল মহাশয়ের নাম এই সাহায্যদানের কাজ সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ঢাকার বাহিরেও এই ভয়ঙ্কর সময়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সাহায্য দিয়াছেন, বা বিরোধ যাহাতে না বাধে, তাহার চেষ্টা করিয়াছেন।"

—

বিশ্বভারতীর রিপোর্ট

বিশ্বভারতীর ১৯২৯ সালের রিপোর্ট পড়িয়া বুঝা যায়, কাজ ভালই চলিতেছে। কলেজ বিভাগে ছাত্রছাত্রী ঐ সালে বাড়িয়াছিল।

এ সালে সর্ব্বত্র কমিয়াছে। কিন্তু বিশ্বভারতীতে বাড়িতেও পারে, কারণ, সেখানে পিকেটিং নাই। যাঁহারা নিজেদের প্রকৃত উন্নতির এবং ভবিষ্যতে মানবের সেবার জন্য সদ্য সদ্য দেশের কাজে প্রবৃত্ত না হইয়া জ্ঞানার্জ্জনে কিছু কাল ব্যাপৃত থাকিবেন, তাঁহারাও দেশের কাজে ব্যাপৃত ছাত্র-ছাত্রীদের মত স্বদেশপ্রেমিক।

শ্রীনিকেতনের কাজ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। নূতন যে বিস্তৃত ভূখণ্ড লওয়া হইয়াছে, তাহাতে চাষ হইলে ক্রমে ক্রমে শ্রীনিকেতন স্বাবলম্বী হইয়া উঠিতে পারে।

বিশ্বভারতীতে সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সঙ্গীত চিত্রাদি ললিতকলা প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রামের উন্নতির চেষ্টা করা হইতেছে। বস্তুতঃ, বিজ্ঞান-শিক্ষার ব্যবস্থা ভাল করিয়া হইলে, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবজীবনের অন্তর ও বাহিরের সহিত যেরূপ সর্ব্বাঙ্গীন সংস্পর্শ স্থাপিত হইবে, ভারতের অন্য কোন বিদ্যাপীঠে তাহা নাই। এখনও, বিজ্ঞান ছাড়া, অন্য সব দিকে সংস্পর্শ আছে। বিজ্ঞান যে একেবারেই শিক্ষা দেওয়া হয় না, তাহা নহে।

ছাত্রীদের শিক্ষার ইহা উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। স্বাস্থ্যকর ও জনকোলাহল হইতে দূরবর্ত্তী খোলা মাঠে ইহা প্রতিষ্ঠিত বলিয়া তাহারা অসঙ্কোচে চলাফিরা করিতে পারে; এবং সাধারণ লেখাপড়া ছাড়া সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, মূর্ত্তিগঠন, সূচীশিল্প, নানাবিধ গৃহকর্ম্ম প্রভৃতি শিখিতে পারে, তাহার জন্য অতিরিক্ত বেতন দিতে হয় না।

বিশ্বভারতীর আগেকার ব্যবস্থা হইতে দুটি প্রভেদ লক্ষিত হয়। নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের বালক-বালিকাদিগকে এখনও তাহাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু আগে যেমন শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরাও পড়াইত, এখন তাহা হয় না। পড়ান এখনও হয়ত ভালই হয়, কিন্তু শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের সহিত গ্রামের প্রাণের সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। অতিথিশালায় যাঁহারা আসেন, তাঁহাদের আদর-যত্ন করিবার কতকটা ভার আগে ছাত্রদের উপর থাকায় তাহাতে ছাত্রদের উপকার হইত। এখন বন্দোবস্ত অন্যবিধ। এই উভয় প্রভেদে আগেকার চেয়ে ছাত্রেরা পড়িবার সময় একটু বেশী পায় কিনা জানি না, কিন্তু সম্ভবতঃ হৃদয় মন বড় হইবার সুযোগ কিছু কমিয়াছে। এই দুইটি বিষয় বিবেচনা করিতে কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করি।

—

মেডিক্যাল ছাত্র ও অন্য ছাত্র

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় অন্য সব কলেজ আপাততঃ বন্ধ করায় মত দিয়াছেন. অথচ মেডিক্যাল কলেজ বন্ধ করায় আপত্তি করিয়াছেন, ইহাতে কেহ কেহ তাঁহার সমালোচনা করিয়াছেন। আমাদের বিবেচনায় ইহাতে অসঙ্গতি নাই। মেডিক্যাল ছাত্রদিগকে কলেজ সংলগ্ন হাসপাতালে রোগীর শুশ্রূষাদি করিতে হয়। এইজন্য তাহাদের শিক্ষা বন্ধ রাখা চলে না। তা ছাড়া, দেশে সাধারণ গ্রাজুয়েট, আইন গ্রাজুয়েট এক বৎসর না বাড়িলেও চলে, কিন্তু চিকিৎসক এখনও অনেক বাড়া দরকার।

সাধারণ কলেজের শিক্ষা বন্ধ রাখা সম্বন্ধে আলোচনা আগে করিয়াছি।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেসে, শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৩শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৩৭

৫ম সংখ্যা

প্রাচীন ভারতে বন্দুক ছিল না

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

নানা জনে রামায়ণ-মহাভারতে বর্ণিত যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে বন্দুক ও কামান দেখিয়াছেন। অনেকে আগ্নেয়াস্ত্র, ব্রহ্মাস্ত্র, এই এই নামে ভুলিয়াছেন; নালীক, শতঘ্নী, ভুশুণ্ডী, প্রভৃতিকে বন্দুক কিংবা কামান মনে করিয়াছেন। প্রাচীন অধুনা-অজ্ঞাত দ্রব্যের স্বরূপ-নির্ণয় চিরকাল দুরূহ। কিন্তু সেটা কি বলা যত কঠিন, সেটা কি নয়, বলা তত কঠিন নয়। আমি এখানে 'নেতি-নেতি' বলিতে যাইতেছি।

কিন্তু নেতি-বচন দ্বারা মনস্তোষ হয় না, দ্রব্যটি কোন্ বর্গের (class), তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। কোন কোন অস্ত্রের নামের অর্থ বিচার দ্বারা এবং কদাচিৎ আসত্তি দ্বারা তাহার বর্গ অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু সকল অস্ত্রের নয়। নামের অর্থ দ্বারা বর্গের পর গণ (genus), ও জাতি (species) নির্ণয় হইতে পারে না। এ নিমিত্ত অস্ত্রের দ্রব্য, নির্মাণ, প্রয়োগ ও কর্ম, এই চারি জানা আবশ্যক হয়। প্রাচীন ধনুর্বেদে হয়ত এই চারি লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন বহু শাস্ত্রের ন্যায় প্রাচীন ধনুর্বেদও লুপ্ত হইয়াছে। এখন কদাচিৎ সংক্ষিপ্ত কিংবা খণ্ডিত সংস্করণ পাওয়া যায়। তাহাতে যাবতীয় যুদ্ধাস্ত্রের সবিশেষ বর্ণনা নাই। বর্ণনার প্রয়োজনও ছিল না; কে জ্ঞাত দ্রব্যের বিবরণ অন্বেষণ করে? আমরা কলম দিয়া লিখি। কিন্তু কেহ নানাবিধ কলমের স্বরূপ বর্ণনা করেন নাই, সে বর্ণনা কেহ খোঁজেও না। কিন্তু কালে হয়ত কলম দিয়া লেখা উঠিয়া যাইবে, সকলেই অক্ষর-কল টিপিয়া লিখিতে থাকিবে। তখন শরের কলম, খাগের কলম, কঞ্চির কলম, পালখের কলম, লোহার কলম ইত্যাদি কলম কেমন, তাহার নিমিত্ত গবেষণা করিতে হইবে। প্রাচীনকালের যুদ্ধাস্ত্র সম্বন্ধেও গবেষণা করিতে হইতেছে।

আমরা এখনও ধনু দেখিতে পাই; জানি ইহা দ্বারা দূর হইতে শর নিক্ষেপ করিতে পারা যায়।*

---

* এপানে একটা প্রয়োজনীয় কথা মনে পড়িতেছে। ডাকাত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত কেহ কেহ যষ্টিযুদ্ধ ও অসিযুদ্ধ শিখিতেছেন। কিন্তু এই দুয়ের দোষ এই, ডাকাতকে নিকটে আসিতে দিতে হয়। সেটা বিপজ্জনক। যে যতদূর হইতে শত্রুকে আঘাত করিতে পারে, সে তত নিরাপদ। এই হিসাবে পাথর ও ইটাল ছুঁড়িতে শেখা ভাল। ধনুর্বিদ্যা শেখা আরও ভাল। বালক-বালিকা সকলেই শরাভ্যাস করিতে পারে। গুলতই দ্বারা বাটুল ছুঁড়িতে শিখিয়া রাখিলে দূরে হইতে ডাকাত তাড়াইতে পারা যায়। বাঁশের বাখারির গুলতই আর চিট্‌কা মাটির পোড়া বাটুল পিস্তলের কাজ করে, কিন্তু প্রাণঘাতী হয় না। আমার জন্মস্থান ডাকাতের দেশে। আমরা বাল্যকালে 'ছড়ি' (বুক পর্য্যন্ত উচ্চ সরু লাঠি), ধনুক, গুলতই লইয়া খেলা করিতাম।

কিন্তু ধনু একপ্রকার ছিল না। এখানে ধনুর্বর্গের ভাগ দেখাইতেছি।

ধনুর্বর্গ

মহাযন্ত্র — গুণ যন্ত্রদ্বারা আকর্ষ্য
- বাণ-নিক্ষেপের
- পাষাণ-নিক্ষেপের

ধনুঃ — গুণ বাহুবলে আকর্ষ্য
- দারু নির্মিত (কার্মুক)
- বংশ নির্মিত (চাপ)
- শৃঙ্গ নির্মিত (শার্ঙ্গ)

ইত্যাদি।

রামায়ণ মহাভারতাদিতে অস্ত্রের কর্ম, এবং বিশেষ বিশেষ অস্ত্রের প্রয়োগও লিখিত আছে। কদাচিৎ অস্ত্রের বিশেষণ দ্বারা নির্মাণও জানিতে পারা যায়। যেখানে কেবল নামটি আছে, আর কিছুই নাই, সেখানে অস্ত্রটি অজ্ঞাত থাকিবে। বলা বাহুল্য, ধনু যেমন অস্ত্র নয়, যন্ত্র; বন্দুক ও কামানও অস্ত্র নয়; নিক্ষেপের যোগ্য না হইলে অস্ত্র বলিতে পারা যায় না। যদি বন্দুককে অস্ত্রও বলি, ইহা অগ্নিময় অস্ত্রও নয়, অগ্নিবলে প্রেরক অস্ত্র বলিতে হইবে। ইহাতে নল চাই, অগ্নিচূর্ণ বা বারুদ চাই, আর চাই ধাতুময় বটিকা বা গুলিকা। যদি বারুদ না পাই, যদি বাহুবল ব্যতীত অগ্নিবল না পাই, তাহা হইলে বন্দুক বা কামান হইতে পারে না।

যে যে অস্ত্রে বন্দুক বা কামান মনে হইয়াছে, সে সে অস্ত্র বিচার করিতেছি।

১। সূর্মি, সূর্মী। নামটি মনু-সংহিতায় (১১।১০৪) আছে। অর্থ ধাতুময় প্রতিমা; 'অয়োময়ী প্রতিকৃতি'। গুরু-পত্নী-গামীকে 'জ্বলন্ত' সূর্মী আলিঙ্গন করাইয়া বধের ব্যবস্থা ছিল। বোধ হয়, সূর্মী সুষির (ফাঁপা) হইত, এবং ভিতরে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখিয়া 'জ্বলন্ত' করা হইত। ধাতু পুড়িতে পারে না; অতএব 'জ্বলন্ত' অর্থে তাপে দীপ্ত বুঝিতে হইতেছে।

স্মৃতির এই সূর্মীকে কেহ কামান মনে করেন নাই, বেদের সূর্মীকে মনে করিয়াছেন। ঋগ্‌বেদে (৭।১।৩) সূর্মী শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, 'জ্বালা'। অগ্নিকে 'জ্বালা' (তাপ) দ্বারা দীপ্ত হইতে বলা হইয়াছে। বোধ হয় সু-ঊর্মি = সূর্মি। ঊর্মি দীপ্তি, দীপ্তির তরঙ্গ। তৈত্তিরীয় সংহিতায় (৪।৫।৯।২) 'সূর্মী' অর্থে সায়ণ 'শোভনা ঊর্মি-যুক্তা নদী' বুঝিয়াছেন। কিন্তু অন্যত্র (১।৫।৭।৬) 'কর্ণকাবতী সূর্মী' আছে। সায়ণ লিখিয়াছেন, "জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্মী সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ।" স্থূণা গৃহের স্তম্ভ, খুঁটি। তাহার মধ্যে ছিদ্র আছে, মাথায় কানা আছে। অতএব লোহার নল অর্থ পাইতেছি। 'জ্বলন্তী' অর্থ 'তাপে দীপ্যমানা' বুঝিতে হইতেছে। ঋগ্‌বেদে (৮।৬৯।১২), 'সূর্ম্যং সুষিরামিব' আছে। সূর্মি যে সুষির, তাহা এখানে স্পষ্ট হইয়াছে। এখানে 'জ্বলন্তী' নাই। অতএব বেদের সূর্মী ধাতুময় নল, তাহা আগুনে তপ্ত হইয়া 'জ্বলন্তী' হইতে পারে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও এই অর্থ বুঝিয়াছেন। অতএব সূর্মী শব্দের দুই অর্থ পাইতেছি। সু-ঊর্মী, শোভনতরঙ্গ-যুক্ত; আর, লৌহময় নল। এই দুই অর্থের একটাতেও বন্দুক কামান নাই। সায়ণ চতুর্দ্দশ খ্রীষ্টশতাব্দে ছিলেন। তখন বন্দুক কামান প্রচলিত ছিল। বেদের সূর্মী এরূপ কিছু হইলে তিনি 'সূর্মি' অর্থে নালীকাস্ত্র বলিতেন।

২। সীস। অথর্ববেদে 'সীস' দ্বারা শত্রুবিনাশের কথা আছে। কেহ কেহ এই সীসকে বন্দুকের সীস-ধাতুময় বটিকা মনে করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত বেদের সূক্ত ও সায়ণের ভাষ্য পড়িলে বন্দুকের গুলি পাওয়া যাইবে না। যথা, অথর্ববেদে (১।১৬।২), বরুণদেব সীসকে বলিতেছেন, 'হে সীস, অগ্নি তোমায় রক্ষা করিতেছেন। রাক্ষসাদি বিনাশের নিমিত্ত ইন্দ্র আমায় সীস দিয়াছেন।' এখানে সায়ণ 'সীস' শব্দে নদী-সীস, নদীফেন এই পরিভাষা উদ্ধার করিয়াছেন। বোধ হয়, অথর্ববেদের নদীফেন আয়ুর্বেদে সমুদ্রফেন নামে খ্যাত। সে যাহা হউক, 'সীস' সীসকধাতু নয়। সায়ণের বিস্তারিত ব্যাখ্যা হইতে বুঝিতেছি, দ্বেষ্য-মরণার্থে অভিমন্ত্রিত সীসচূর্ণ-মিশ্রান্ন প্রদান করা হইত। অমাবস্যার রাত্রে। শুধু নদী-ফেন নয়, তাহার সহিত লৌহচূর্ণ কৃকলাসশির থাকিত। কৌটিল্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্রে" এইরূপ

প্রয়োগকে 'পরঘাত প্রয়োগ' বলিয়াছেন। মন্ত্রিত 'বাণ' মারিয়া শত্রু বধ করিতে পারা যায়, এ বিশ্বাস এখনও আছে, সে 'বাণ' ধনুকের লৌহফল-বিশিষ্ট শর নহে, অভিমন্ত্রিত উপকরণ।

উক্ত শত্রু-মারক সীস একটু পরেও (১।১৬।৪) আছে। সায়ণের ভাষ্য এই,—হে শত্রু, যদি তুমি আমার গো অশ্ব ভৃত্য পুত্র হিংসা কর, তাহা হইলে আমি তোমাকে 'সীস' দ্বারা এমন মারিব যে পারিবে না।" এখানেও আভিচারিক মন্ত্র সহযোগে 'সীস' দ্বারা শত্রুবধের কথা। এই 'সীস,' বন্দুক নিক্ষেপ্য সীসক ধাতু নয়।

(৩) আগ্নেয়াস্ত্র। অর্থ, অগ্নিময় অস্ত্র। অস্ত্র, যেটা নিক্ষিপ্ত হয়। বন্দুক নিক্ষিপ্ত হয় না, বন্দুক অস্ত্র বলিতে পারা যায় না; বন্দুক যন্ত্র, নিক্ষিপ্ত গুলি অস্ত্র বটে। আগ্নেয়াস্ত্র যে ধনুদ্বারা নিক্ষিপ্ত হইত, ইহা যে বাণ-বিশেষ, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। যথা, রামায়ণে ("বঙ্গবাসী"র সংস্করণে, লং। ১০০) শ্রীরাম 'ধনু'দ্বারা আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা রাবণ বধ করিয়াছিলেন (লং।১১০)। এই ব্রহ্মাস্ত্র কেমন? "দীপ্তং নিশ্বসন্তমিবোরগম্ জাজ্বল্যমানং সুপুঙ্খং সধূমং।" স [রামঃ] রাবণায় সংক্রুদ্ধো ভৃশমায়ম্য কার্মুকং। চিক্ষেপ পরমায়ত্তঃ শরং মর্ম্ম-বিদারণম্॥"—রাম কার্মুক অত্যন্ত আকর্ষণ করিয়া মর্ম্ম-বিদারণ শর নিক্ষেপ করিলেন। শরটি প্রজ্জ্বলিত, জ্বলিবার সময় সাপের মত শোঁ শোঁ শব্দ করিতেছিল। মৎস্যপুরাণে ("বঙ্গবাসী"র,১৫৩ অঃ),জম্ভাসুর বধের নিমিত্ত ইন্দ্র কর্ণপ্রান্ত পর্যন্ত 'শরাসন' আকর্ষণ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র বাণ ত্যাগ করিলেন। এইরূপ, মহাভারতে আছে। ব্রহ্মশির, ব্রহ্মাস্ত্র, এবং রামায়ণের ঐষিকাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, সৌরাস্ত্র প্রভৃতি সব, আগ্নেয়াস্ত্রের ভেদ।

কেবল বাণে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া নিক্ষিপ্ত হইত না। অন্ত অগ্নিও শত্রুসেনার মধ্যে ফেলা হইত। রামায়ণে (লং। ৭৩) ইন্দ্রজিৎ স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকণা-সম্বলিত শূল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এত ক্ষিপ্র-হস্তে ও বেগে অগ্নিময় অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইত যে, লক্ষ্য-শত্রু বাম কিংবা দক্ষিণে সরিয়া দাঁড়াইবার অবসর পাইত না।.

৪। শতঘ্নী। একদা অনেক লোককে হত করিতে পারে। কিন্তু একমাত্র কামানের গোলাই যে পারে, তাহা নয়। কৌটিল্যে শতঘ্নী চলযন্ত্রবর্গের মধ্যে। টীকাকার লিখিয়াছেন, বহু-লৌহ-কণ্টক-সমাচ্ছন্ন বৃহৎ স্তম্ভ, দুর্গ-প্রাকারে স্থাপিত হয়। বৈজয়ন্তী কোষে (খ্রীঃ ১২শ শতাব্দের আদ্যে), শতঘ্নী "অয়ঃ-কণ্টক-সংছন্না মহাশিলা।" রামায়ণের টীকায় "শতঘ্নীচ চতুর্হস্তা লৌহ-কণ্টকিনী গদা, ইতি বৈজয়ন্তী।" শব্দকল্পদ্রুমে বিজয়-রক্ষিত, "অয়ঃ-কণ্টক-সংছন্না শতঘ্নী মহতী শিলা।" অর্থাৎ শিলাস্তম্ভের গায়ে লোহার কাঁটা পুতিয়া রাখা হইত শত্রুসেনা প্রাকারে উঠিবার উপক্রম করিলে তাহাদের উপরে স্তম্ভটি ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। তাহারা কাঁটায় বিদ্ধ ও শিলার ভারে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করিত। যথা, রামায়ণে (লং। ৩ "লঙ্কাপুরীর কবাটবদ্ধ চারি দ্বারে দৃঢ় ও বৃহৎ ইষু-উপল-যন্ত্র (শর ও পাষাণ নিক্ষেপের যন্ত্র) এবং শাণিত কৃষ্ণায়সময় শত শত শতঘ্নী আছে।" কৃষ্ণায়সময়,—ইস্পাতের কণ্টকময়। কামান শাণিত হয় না। হনুমান লঙ্কায় গিয়া "শতঘ্নী মুষলায়ুধ" শতঘ্নী ও মুষল নিক্ষেপের সেনা দেখিতে পাইল (সুং। ৪)। দুই আয়ুধই পিষিয়া মারে, এই কর্ম্মসাদৃশ্য হেতু কবির পরে পরে মনে হইয়াছে। শতঘ্নী রণস্থলে লইয়া যাওয়াও হইত। রাম-রাবণের যুদ্ধে, রাক্ষসেরা যুদ্ধস্থলে শতঘ্নী লইয়া গিয়াছিল (লং। ৭৮)। মহাভারতেও (দ্রোণপর্ব্ব) চাকার উপরে শতঘ্নী বাহিত হইয়াছিল। বহুকাল পরে, ১২শ খ্রীষ্ট শতাব্দের পরে, বাশিষ্ঠ ধনুর্ব্বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্করণে শতঘ্ন, কামান হইয়াছে। প্রাচীন নামের অর্থ ধরিয়া অর্থান্তরপ্রাপ্তির ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে।

৫। ভুশুণ্ডী। শব্দটি ভূ-শুণ্ডী, কি ভুশুণ্ডী, তাহা জানা নাই। অমরাদি-কোষে নাই। বৈজয়ন্তী কোষে, ভুশুণ্ডী। অর্থ, "দারুময়ী বৃত্তায়ঃ-কীল-সঞ্চিতা।" বোধ হয়, গোল লৌহ পিণ্ডাগ্র গদাবিশেষ। প্রয়োগ দেখি। মৎস্যপুরাণে (১৫১ অঃ), "হরি কৃতান্ত তুল্য ভুশুণ্ডী গ্রহণ করিয়া শুম্ভের মেষবাহন 'পিপেষ,' পিষিয়া মারিলেন। এইরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে, "শৈলবৎ গুরু ও ভীষণ ভুশুণ্ডী দ্বারা নিশাচরদিগকে নিষ্পিপেষ,' পিষিয়া মারিলেন। রামায়ণে (লং। ৬০), "নিদ্রিত কুম্ভকর্ণকে

জাগাইবার নিমিত্ত রাক্ষসেরা ভুশুণ্ডী, মুষল ও গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। মহাভারতে (দ্রোণ, ১৭৭), "খড়্গ, গদা, ভুশুণ্ডী, মুসল, শূল, শরাসন, ও হস্তীচর্মসদৃশ বর্ম।" এখানে গদা ও মুসলের মাঝে ভুশুণ্ডী থাকাতে মনে হয় উহা তদ্বৎ কিছু হইবে।

কিন্তু মহাভারতের (আদি, ২২৭) টীকাকার নীলকণ্ঠ (খ্রীঃ ১৬শ শতাব্দ) ভুশুণ্ডী অর্থে লিখিয়াছেন, "পাষাণ ক্ষেপণ-চর্মরজ্জুময় যন্ত্র।" এই যন্ত্র অদ্যাপি আছে। এক টুকরা চর্মের দুই প্রান্তে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দোড়ী বাঁধিয়া চর্মের উপরে পাষাণ রাখিয়া বেগে ঘুরাইয়া হ্রস্বরজ্জু ছাড়িয়া দেওয়া হয়। পাষাণখণ্ড বেগে দূরে গিয়া পড়ে। ছেলেরা তালপাতা কিংবা দু-ভাঁজ দোড়ীর করে। বাঁকুড়ায় বলে, 'ডেলাস' (ডেলা অস্ত্র ?)। আরামবাগ (হুগলী জেলা) অঞ্চলে বলে 'ইটাল চণ্ডী।' শুণ্ডাকার বলিয়া বলিয়া শুণ্ডী, ভূমি পর্যন্ত লম্বিত বলিয়া হয়ত ভু-শুণ্ডী। নীলকণ্ঠের ভুশণ্ডী এইরূপ হইবে। বশিষ্ঠ-ধনুর্বেদেও এই অর্থ। সেখানে আছে, পদাতি-সেনা ভুশণ্ডী কিংবা ধনু ধরিয়া গাছের আড়ালে থাকিয়া কিংবা গাছে চড়িয়া যুদ্ধ করিবে। অথাৎ ভুশুণ্ডী দ্বারা পাষাণ কিংবা ধনুদ্বারা শর নিক্ষেপ করিবে।

(৬) ঔর্বাগ্নি। কেহ কেহ ঔর্বাগ্নি, বারুদ মনে করিয়াছেন, কিন্তু বারুদকে অগ্নি বলিতে পারা যায় না। রামায়ণ মহাভারতে, ঔর্বাগ্নি, বড়বানল। রামায়ণে (কিঃ। ৪৪), সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে চতুর্দিকে বানর (অনার্য-মানুষ) পাঠাইলেন। বলিলেন, "পূর্বদিকে সপ্তরাজ্যোপশোভিত যব-দীপ ও সুবর্ণ-দীপ (সুমাত্রা) অন্বেষণ করিবে। ব্রহ্মা জলোদ-সাগরে ঔর্বঋষির কোপজ তেজে সর্বভূতভয়াবহ বৃহৎ অশ্বীমুখ করিয়াছেন। সে অদ্ভুত তেজে চরাচর বিনষ্ট হইয়া থাকে। বড়বামুখে পতনের ভয়ে প্রাণীগণের নাদ শুনিতে পাওয়া যায়।" এই বর্ণনা আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের। সুমাত্রার নিকটস্থ ক্রাকাতোয়া গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ প্রসিদ্ধ। বোধ হয় পূর্বকালেও এইরূপ উৎক্ষেপ হইত এবং তাহা দেখিয়া রামায়ণে লেখা। আগ্নেয়গিরিটি দেখিতে বড়বামুখ মনে হইতে পারে। মহাভারতে ঔর্ব-উপাখ্যান আছে। অতএব ঔর্বাগ্নি বা বড়বানল বহু পূর্বকালে দৃষ্ট হইয়াছিল।

(৭) নালীক। শ্রীযুত বঙ্কিমচন্দ্র লাহিড়ী তাঁহার বহু শ্রমসাধ্য "মহাভারত-মঞ্জরী"তে প্রাচীন বহু বৃত্তান্ত সঙ্কলন দ্বারা আমাদের শ্রম লাঘব করিয়াছেন। তিনি রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে পূর্বকালের বন্দুক কামানের নাম নির্দেশ করিয়াছেন। উপরে দেখিয়াছি, আগ্নেয়াস্ত্র, ব্রহ্মশির অস্ত্র ও বেদের সূর্মি বন্দুক নয়। এখন দেখি, নালীক ও বন্দুক এক কিনা। নালীক শব্দের অর্থ নল। নালীক, নলাকার অস্ত্র। কি রূপ ? নালীক ও নারাচ প্রায়ই একত্র উল্লিখিত হইয়াছে, যেন উভয়ের মধ্যে প্রয়োগ কিংবা কর্মে সাদৃশ্য ছিল। নারাচ জানি, সমগ্র লৌহময় বাণ, নির্ভট ও শিরাল। ভারী বলিয়া এই বাণ যে-সে ছুঁড়িতে পারিত না। তখন সর নলের কল্পনা আসিয়া থাকিবে। দৃঢ় ও লঘু করিতে গেলেই নলাকার চাই। বৈজয়ন্তী লিখিয়াছেন, নালীক—বাণ। প্রয়োগ দেখি। রামায়ণে (আরণ্য, ২৫),"শ্রীরাম-নিক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাগ্র নালীক ও নারাচ এবং বিকর্ণী দ্বারা ছিদ্যমান হইয়া নিশাচরেরা ভীম আর্তস্বর করিতে লাগিল।" এখানে স্পষ্ট লিখিত আছে, রামের "ধনুর্গুণ-চ্যুত বাণ।" নালীক, বোধ হয়, সুষির কিন্তু সূচ্যগ্র বাণ। কর্ণী, যে শরফলে কণ আছে, দেহে বিদ্ধ হইলে মাংস না ছিঁড়িয়া উঠাইতে পারা যায় না। এই কারণে ধর্মশাস্ত্রে কর্ণীবাণ নিক্ষেপ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। বিকর্ণী বোধ হয় দ্বিকর্ণীর রূপান্তর। কর্ণী ও দ্বিকর্ণী। রামায়ণে (আরণ্য, ২৬), "রাম এক শত কর্ণীদ্বারা এক শত রাক্ষস বধ করিলেন।" মহাভারতে (ভীষ্ম, ৯৫, ৩১) "কর্ণি-নালীক-সায়কৈঃ," (ভীষ্ম। ১০৬, ১৩) "কর্ণি-নালীক-নারাচৈঃ।" সায়ক অর্থে বাণ। বোধ হয়, কর্ণি, নালীক এক পদ। নালীকের কর্ণ থাকিত, সুতরাং বাণটি আরও ভীষণ। (সৌপ্তিক পর্বে ১০, ১৫), "কর্ণি-নালীক-দংষ্ট্রস্য খড়্গ-জিহ্বস্য সংযুগে।" যাহার দ্রংষ্ট্রা কর্ণি-নালীক, জিহ্বা খড়্গ। নালীক সূচ্যগ্রই বটে। স্ত্রী পর্বে (২০),"মহাত্মা ভীষ্ম কর্ণি-নালীক ও নারাচ প্রভৃতি শরনিচয় নির্মিত শয্যায় শয়ান আছেন।" এখানে নালীক স্পষ্ট শর।

বন্দুক-উদ্ভাবনার পর উহা নলাকার বলিয়া নালীক

নাম পাইয়াছিল। নালাস্ত্র, নালীকাস্ত্র নামকরণে একটু দোষও ঘটিয়াছিল। বন্দুক অস্ত্র নয়, ধনুর ন্যায় যন্ত্র। আশ্চর্য্য এই, শুক্রনীতিসার অস্ত্র ও শস্ত্র দুইভাগে আয়ুধ ভাগ করিয়াও নালিকাস্ত্র বলিয়াছেন। ইহাতেও সন্দেহ হয়, এই নাম প্রাচীন নয়।

(৭) অয়ঃ-কণপ। মহাভারতে (আদি। ২২৭, ২৫), বোধ হয় এই একটি স্থানে শব্দটি আছে। অন্য স্থানে থাকিলে "মহাভারত-মঞ্জরী"-কর্তার চোখে পড়িত। কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নির ভোজন-তৃপ্তির নিমিত্ত খাণ্ডববন রক্ষা করিতেছেন, "অয়ঃ-কণপ-চক্রাশ্ম-ভুশুণ্ডী-উদ্যত-বাহবঃ," হাতে অয়ঃ-কণপ, চক্রাশ্ম, ও ভুশুণ্ডী লইয়া। নীলকণ্ঠ তিনটিই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ভুশুণ্ডীর অর্থ পূর্বে দেখিয়াছি, পাষাণ-ক্ষেপণ চর্মরজ্জু। চক্রাশ্ম—"অতিদূরে বড় বড় পাষাণ নিক্ষেপের কাষ্ঠময় যন্ত্র। ইহার ঘূর্ণনবেগে পাষাণ নিক্ষিপ্ত হয়।" চক্র নাম হইতে বুঝিতেছি, এটি কাষ্ঠময় চক্র। সে যাহা হউক, পাষাণ-ক্ষেপণের দুইটি যন্ত্র পাইলাম। "অয়ঃকণপং—অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবতীতি তথাবিধমাগ্নেয়ৌষধি-বলেন গর্ভসম্ভূতা লোহগুলিকাস্তারকা ইব বিকীর্যন্তে যেন তৎযন্ত্রং লোহময়ং। "যে লোহময় যন্ত্রের গর্ভস্থ লৌহ-গুলিকা আগ্নেয় ঔষধিবলে তারকার ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া পড়ে।" অবিকল বন্দুক! কিন্তু, বন্দুক, লোহগুলিকা পান করে না, বমন করে। আর হাতে বন্দুক থাকিলে কৃষ্ণার্জুন পাষাণ ছুঁড়িতে গেলেন কেন? চক্রাশ্ম নিশ্চয় গুরুভার, নইলে অতিদূরে মহান্ পাষাণ নিক্ষিপ্ত হইতে পারে না। "চক্রাশ্ম" এক পদ কিনা, কে জানে। সে যাহা হউক নীলকণ্ঠের ব্যাখ্যায় সন্দেহ হইতেছে। অমর-কোষে (লিঙ্গ-সংগ্রহবর্গ, ২০) কণপ শব্দ আছে। ক্ষীরস্বামী অর্থ করিয়াছেন, প্রাস-বিশেষ। ভানুজি-দীক্ষিত লিখিয়াছেন, কণং পাতি পিবতি বা। অর্থ যাহাই হউক, অমরের কোন কোন সংস্করণে শব্দটি 'কণপ' নয়, 'কণয়।' সর্বানন্দ অর্থ করিয়াছেন, শরভেদে। কেশব কোষেও কণয় শরভেদে। ইহাতে কণপ নাই। মহেশ্বর টীকায়, কুণপ আছে; কণপ, কণয় নাই। কণপ শব্দের প্রচলিত অর্থ, শব। অমরে এই অর্থ। কিন্তু মহেশ্বর দিয়াছেন, কুণপ শরভেদে। শব্দকল্পদ্রুমে, কুণপ শব্দের এক অর্থ বড়শা ইতি ভাষা। অতএব দেখা যাইতেছে, কণপ, কণয়, কুণপ,—একেরই তিনরূপ। নাগরী প য অক্ষরে ভ্রম হইত। সে যাহা হউক অয়ঃ-কণপ লোহার বড়সা পাইতেছি। ইহার দণ্ড কাঠের না হইয়া লোহার। পাষাণের তুল্য এটি নিক্ষেপ্যও বটে। মৎস্যপুরাণে (১৫০-৭৩), "চক্র কুণপ প্রাস ভুশুণ্ডী পট্টিশ," পরে পরে একত্র আছে। মহাভারতের শ্লোকটিতেও "কণপ ভুশুণ্ডী" আছে। নীলকণ্ঠ খ্রীষ্ট ষোড়শ শতাব্দে ছিলেন, এবং বন্দুক কামান দেখিয়াছিলেন। ইদানী আমরা যেমন বন্দুক কামান দেখিয়া প্রাচীন নানা অস্ত্রে বন্দুক কামান পাইতেছি, তিনিও তেমনি পাইয়া থাকিবেন।

(৮) অয়োগুড়। কোথাও লৌহগুলিকা দেখিলে কিন্তু বারুদ না দেখিলে, বন্দুক কল্পনা মিথ্যা। মৎস্য-পুরাণে (১৫৩-১৩৩), "জম্ভাসুর দেব-সৈন্যের প্রতি প্রাস পরশ্বধ চক্র বাণ বজ্র মুদ্গর কুঠার খড়্গ ভিন্দিপাল এবং অয়োগুড় বর্ষণ করিতে লাগিল।" অয়োগুড় = অয়োগুল, লৌহগুলিকা। কিন্তু কে জানে লোহার গুলি ঢিলের মতন ছোঁড়া হইত কি না।

আমার অনুমানে ভারতেই বন্দুক কামানের উদ্ভাবনা হইয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টের সপ্তম শতাব্দের পূর্বে নয়। এ বিষয় অন্য এক প্রবন্ধে দেখা যাইবে। মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ ধরিলেও উহার বর্ত্তমান রূপ খ্রীষ্টের পূর্বের। রামায়ণেরও তাই। যে যে স্থানে আরও পরবর্তী কালের কথা আছে, তাহা যুদ্ধবিদ্যা সম্বন্ধে নয়। মৎস্যপুরাণের আদি মহাভারতের কালে হইলেও উহাতে নূতন যোজনা খ্রীষ্টের পর তিন চারি শত বৎসর চলিয়াছিল।

লীলা

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

একটি করে' তৃণ একটি মাস বহি'
চঞ্চুপুটে সযতনে,
ছোট্ট পাখীত্বটি বেঁধেছে নীড়খানি
নিভৃত ভাণ্ডীরবনে!
ফুলের বুকে সুখে দুজনে মধু খায়,
ফুলেরই বাসে পাশে দুজনে ঘুম যায়,
ভুলা'তে দুজনারে দুজনে গান গায়—
দুজনে বসে' তাই শোনে।

ছোট্ট পাখীত্বটি, কত-না আশা বুকে,
বেঁধেছে ছোট বাসাখানি,
বিরাট ধরণীর অজানা কোন্ কোণে—
কতই ছোট সে না জানি!
যতই ছোট হোক্, ভাবনা-ভয়ে ভরা,
ব্যথার কাঁটাঘরে নিয়ত বাস করা,
কখন্ কোন্ দিকে কবে যে পড়ে ধরা—
কে কোথা নিয়ে যায় টানি'!

ভাঁটের থোকা ভরি' বিকশে মঞ্জরী
ফাগুনী হাওয়া গায়ে লেগে,
পাখীর বুকে ঠোঁটে দ্বিগুণ রং ফোটে
কণ্ঠে সুর ওঠে জেগে;
তিনটি ছোট ডিমে ভরেছে বাসাখানি,
শিয়রে জাগে তারি ছোট্ট দুটি প্রাণী,
পাখাতে ঢাকি' তারে আদরে লয় টানি'
অজানা ব্যাকুলতা বেগে!

ক্ষুদ্র জীবনের মুগ্ধ খেলা হেরি'
রুদ্রদেব বুঝি হাসে;
দীপ্ত জ্যোতি তারি রৌদ্র-রূপধারী
ঊর্দ্ধে ফুটে নীলাকাশে!
সংখ্যাতীত জীব পঙ্কে মাথা কুটে,
উপরে নাকি তারি শূন্যে ফুল ফুটে!
নমিছে লীলা হেরি' ভক্ত করপুটে,
চক্ষু ধারাজলে ভাসে!

ভাঁটের ভাঙা বুকে এসেছে ভাঁটা পড়ে',
ফুলের মেলা হ'ল কাণা;
কালোর পাল তুলে' কালের বৈশাখী
কাননে দিল আসি' হানা;
মোহের বন্ধনে দণ্ড যেন দিতে
মাতিল সমীরণ গরজি' ধরণীতে,
কোথায় দুখসুখ দুঃখসুখাতীতে,
কে করে কারে আজি মানা!

কোথায় গেল উঠে' ভাঁটের খোলাভাঁটি,
কোথায় গেল উড়ে' পাখী,—
কোথায় গেল ভেঙে সাধের বাসাখানি,
কোথায় শাখা, কোথা শাখী?
বিধবা ডানাভাঙা লুটায় ভুঁয়ে পড়ি',
শূন্যে উঠে হাসি 'হা-হা'য় হাওয়া ভরি'!
বৈতরণীতীরে তরণী পার করি'
মরণে দিবি কে রে ফাঁকি!

প্রয়াগের চিঠি

শ্রীযতীন্দ্রকুমার ভৌমিক

সূর্য্যদেব অস্তাচলের অন্তরালে ঢলিয়া পড়িয়াছিলেন। সন্ধ্যার তিমিরাবরণে চারিদিক ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছিল। দিনের শেষরশ্মি তখনও আকাশের গা হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া যায় নাই। কৃষ্ণবিহারী ক্লান্ত পদবিক্ষেপে, শুষ্ক অপ্রসন্নমুখে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেলেন। হাতের পুঁটুলিটি রকের একপার্শ্বে ফেলিয়া রাখিয়া ক্রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "লতি! লতি! দেখদিকি কাণ্ডটা একবার! এই ভরসন্ধ্যে,—এরা সব গেল কোথায়?"

পথ হইতে স্বামীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর সুরবালার কানে গেল। তাড়াতাড়ি কলসীকক্ষে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি ঝঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কেন, হ'ল কি তোমার? চেঁচিয়ে পাড়াসুদ্ধ যে একেবারে তোলপাড় করে তুলেছ?"

কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "সন্ধ্যে উৎরে গেল, তবু বাড়ীতে পিদীমটা পর্য্যন্ত জল্‌লো না।"

সুরবালা জলের কলসীটা রান্নাঘরের বারান্দায় নামাইয়া রাখিয়া আর একটু সুর চড়াইয়া বলিলেন, "এই ত কেবল পুকুরের ঘাটে জল আন্‌তে গিয়েছি।"

ভোরের কুয়াসা যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্তর্হিত হইয়া যায়, কৃষ্ণবিহারীর ক্রোধের উত্তাপও তেমনি সুরবালার এক ফুৎকারে শীতল হইয়া আসিল। তিনি আর কোনো কথা না বলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুরবালা সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালিতে জ্বালিতে বলিলেন, "নাও, ঐ ঘটিতে জল আছে, হাত পা ধোও এখন।"

কৃষ্ণবিহারী ঘটিটা লইয়া চোখে মুখে জল দিয়া বলিলেন, "লতি গেল কোথায়, লতি? পাড়া বেড়িয়ে এখনও ফেরেনি বুঝি? নাঃ, এদের জ্বালায়—"

সুরবালা তখন তুলসীতলায় প্রদীপ দিয়া প্রণাম করিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "এই আবার বকুনি আরম্ভ হ'ল। ফেরেনি, ফেরেনি! তাতে তোমার কি?"

কৃষ্ণবিহারী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "দেখ, ছেলে-মেয়েদের অমন আস্কারা দেওয়া মোটেই ভাল নয়।"

সুরবালা স্বামীর মুখের কাছে হাত নাড়িয়া বলিলেন, "ভাল না হয়, মন্দই হবে। তাতেই বা কি? তুমি ত একবার ভাল হয়ে কত কি কর্‌লে?"

কত কি তিনি করিয়াছেন, না করিয়াছেন, সে কথা লইয়া আর কথা না বাড়াইয়া কৃষ্ণবিহারী হুঁকাটি লইয়া আপন মনে তামাক সাজিতে বসিয়া গেলেন।

সুরবালা ক্ষণকাল স্বামীর শুষ্ক আনত মুখখানার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরে এলে না যে? খাওয়া-দাওয়া কর্‌লে কোথায়?"

কৃষ্ণবিহারী মুখ হইতে হুঁকাটা সরাইয়া বলিলেন, "খাওয়া-দাওয়া আবার কোথায় হবে?"

"একটু জলটলও খাওনি?"

"সে না খাওয়ার মধ্যেই। নিতাই ছোঁড়াটা ঐ কুবরে ব্যাটার দোকান থেকে দু'পয়সার চিঁড়ে-মুড়কি এনে দিয়েছিল; রাম হে, সে কি খাওয়া যায়?"—বলিয়া হুঁকায় একটা টান দিয়া কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "এমন কাজের চাপও পড়েছে আজকাল। সকাল বেলায় হরেনকে ডেকে বল্‌লাম, আরে! কাছারীর দিকে যাস্ ত একবার। গিয়ে—"

সুরবালা মহা বিরক্তিভরে বলিয়া উঠিলেন, "নাঃ, তোমার আর বুদ্ধিসুদ্ধি হ'ল না। বিয়ের বাজারে দু'পয়সা পাওয়া যেত, সে আর তুমি হতে দিলে না দেখছি।"—বলিয়া লুণ্ঠিত অঞ্চলটা উঠাইয়া লইয়া বলিলেন, "তাই যদি হবে, তাহলে ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছি কি জন্যে? বি-এ পাশ ছেলে আমার—"

"বি-এ পাশ করার আবার দোষটা কি হ'ল ?"

"দোষ হ'ল না ?—ছেলে যদি গিয়ে তোমার সাহায্য করে, তাহলে কি বি-এ পাশের মান থাকে, না বিয়ের বাজারে আর তেমন আদর থাক্‌বে ?"

২

আষাঢ়ের মেঘমুক্ত আকাশ। শুভ্রোজ্জ্বল রৌদ্রে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। সেদিন সুরবালার হাতে কত কাজ,—তাড়াতাড়ি করিয়াও সব সামলাইয়া উঠা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। ঘরধোয়া, বাসন-মাজা, তরকারির জোগাড়, গোয়াল-ঘর পরিষ্কার করা—এসব দৈনন্দিন কাজ ত আছেই; তাছাড়া পুত্র হরেন্দ্র-নাথের ময়লা একটা জামা আর দুইখানি ধুতি আজ এই বেলার মধ্যেই পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে। হরেন্দ্রনাথ সে সম্বন্ধে সকালে মাতাকে বেশ করিয়া তাড়া দিয়া বলিয়া দিয়াছে। ঠিকা ঝি আসে নাই। আজ ছয় দিন হইল, সে তাহার বোন্‌ঝির বিবাহের কুটুম্বিতা রক্ষা করিতে গিয়াছে। সুরবালার একা সমস্ত কাজ সারিয়া উঠিতে বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া উঠিল। চট্‌পট্ একটু তেল মাখিয়া ঘড়া গামছা লইয়া বাড়ীর বাহির হইয়া স্নানের ঘাট অভিমুখে যাইতেই তিনি দেখিতে পাইলেন, সে-ই সকাল হইতে একটুখানি দড়িতে গরুটি তেমনি অবস্থায় খোঁটার সহিত বাঁধা রহিয়াছে। গাছের ছায়া কখন সরিয়া গিয়াছে;—সম্পূর্ণ অনাবৃত স্থানে দ্বিপ্রহরের সেই কাঠফাটা রৌদ্রে বেচারী অভুক্ত দাঁড়াইয়া ধুঁকিতেছে। সুরবালাকে দেখিয়া মুখ তুলিয়া ম্লান কাতরদৃষ্টিতে তাঁহার পানে চাহিল।

কৃষ্ণবিহারী সকালবেলায় কাছারীতে যাইবার পূর্ব্বে প্রত্যহ গরুটিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া তাহার জাব ইত্যাদির বন্দোবস্ত করিয়া যান। আবার দ্বিপ্রহরে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়া তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন। আজ অতি-প্রত্যূষে মনিবের বিশেষ কোন কার্য্যের জন্য তাঁহাকে বাহিরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি গরুটির সেরূপ কোনো ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

সুরবালা থমকিয়া দাঁড়াইলেন। "ওমা! গরুটাকে এখনও খেতে দেওয়া হয়নি। সকাল থেকে রোদেই বাঁধা রয়েছে। আহা বেচারী!" সুরবালা ঘড়া গামছা নামাইয়া রাখিয়া গরুটাকে খোঁটা হইতে খুলিয়া ঘরে লইয়া গিয়া বাঁধিলেন, তারপর তাহার সম্মুখে কতকগুলি শুষ্ক বিচালি আনিয়া দিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "একা আমি কোন্ দিকেই বা তাল সাম্‌লাব। যেদিকে না যাব—যেদিকে না দেখব—সেইদিকেই একটা বিতি-কিচ্চি কাণ্ড হয়ে পড়বে। আর এই ঝি? ঝি মাগী আজ ছ' দিন হ'ল, তার বোনঝির বিয়েতে গিয়েছে,—আসুক ঘুরে সে একবার! ভাত মাইনে ওকে এবার ভাল করেই দেব।" শেষটায় সুরবালা তাঁহার যত ক্রোধ সব ঝির উপর আরোপ করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্নানের ঘাটে চলিয়া গেলেন।

আহারাদি শেষ হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণবিহারী ঘরের মেঝেয় একখানা মাদুর পাতিয়া বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে বলিলেন, "আজ মাঝেরপাড়া থেকে লোক এসেছিল চিঠি নিয়ে।"

সুরবালা পান সাজিতে সাজিতে বলিলেন, "কি লিখেছে?"

কৃষ্ণবিহারী হাতের হুঁকাটা বৈঠকের উপর রাখিয়া দিয়া জামার পকেট হইতে চিঠিখানা বাহির করিয়া আনিয়া স্ত্রীকে পড়িয়া শুনাইলেন।

সুরবালা বলিলেন, "কই, তোমার টাকার কথা ত কিছু লেখেনি?"

কৃষ্ণবিহারী একটু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তাই ত দেখ্‌ছি। যা-ই হোক, আমি ত বাবা যা চেয়েছি, তার আধ পয়সার কমে ছাড়ব না। আমার কাছ থেকে পালাবে কোথায়?"—বলিয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া গোটা-দুই টান দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ—ঐ সঙ্গে মেয়ের একখানা কুষ্ঠীও পাঠিয়ে দিয়েছে।"

সুরবালা স্বামীর হাতে গোটা-দুই পান দিয়া বলিলেন, "মেয়ের বয়স হ'ল কত?"

"বয়স?"—বলিয়া কৃষ্ণবিহারী জামার অপর পকেট হইতে কোষ্ঠীখানা বাহির করিয়া আনিয়া খানিকক্ষণ বেশ ঠাহর করিয়া দেখিয়া বলিলেন, "এই গত কার্ত্তিক মাসে ষোল বছরে পড়েছে।"

"মা গো! এত বড় মেয়ে ঘরে রেখেছে কেমন করে! এই ত আমার মিনি, চোদ্দয় পড়তে-না-পড়তে তার বিয়ে হয়ে গেল। তাতেই লোকে কত কি যে বল্‌লে! হাতী মেয়ে, ধিঙ্গি মেয়ে, অত বড় মেয়ে ঘরে রেখে অন্নজল মুখে রোচে কি করে?—শুন্‌তে শুন্‌তে আমার কান দুটো একেবারে ভোঁতা হয়ে গেল।" বলিয়া মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিয়া হঠাৎ সুরবালা বলিয়া উঠিল, "ষোল বচ্ছর বয়েস! না, ও মেয়ের সঙ্গে আমি ছেলের বিয়ে দেব না।"

কৃষ্ণবিহারী সুরবালার মুখের কাছে ডান হাতটা নাড়িয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "তুমি বোঝ না। মেয়ের বয়স হয়েছে, তাতে আমাদের সুবিধে বই অসুবিধে নেই। এখন মেয়ের বাবাকে যে দিকে ঘোরাব, সেইদিকে ঘুর্‌বে,—যা চাইব, তাই দেবে। পাওনাটা বেশ মোটা-মুটি রকমই আদায় কর্‌তে পারা যাবে।"

সুরবালা মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "তা যদি হয়, সে ত বেশ ভাল কথা। এই দেখ না কেন, আমার ঐটুকু ত মেয়ে, তার বিয়েতে কত টাকাই যে খরচ করতে হয়েছে। বাবা! রবি সেনেদের ঘরের সে দেনা আজও শোধ হয়নি। মেয়ের বিয়ের সুদে আসলে আদায় করা চাই কিন্তু। হ্যাঁ আমাদের বুঝি কেউ ছেড়ে কথা কয়েছে তখন?"

৩

রামলোচন রায়ের সাংসারিক অবস্থা দিন দিন হীন হইয়া পড়িতেছিল। আয় হইল অল্প, অথচ ব্যয়ের মাত্রা বাড়িয়া উঠিল;—ইহাতে যে রাজার ভাণ্ডারও শূন্য না হইয়া যায় না। কিন্তু সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান বলিয়া গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের যথেষ্ট খাতির মর্য্যাদা ছিল। এজন্য রামলোচন মনে মনে বেশ গর্ব্ব অনুভব করিতেন।

পূর্ব্বে রায়-পরিবারের অবস্থা সচ্ছল ছিল। গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের জমিজমা, বিষয়-সম্পত্তি বেশ ভাল মতই ছিল। কিন্তু ক্রমে বংশবৃদ্ধি হওয়ায় সম্পত্তি কতকগুলি অংশে বিভক্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। উত্তরাধিকার-সূত্রে রামলোচন যাহা পান, তাহাতেই তাঁহার ক্ষুদ্র পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদন চলিয়া আসিতেছিল। সঞ্চয় না হইলেও তাঁহার সংসারে কোনো অভাব ছিল না। কিন্তু একটির পর একটি কন্যাদায় উপস্থিত হইয়া রামলোচনকে বিব্রত করিয়া তুলিল। প্রথমা কন্যা সূর্য্যমুখীর বিবাহ তিনি বেশ ধুমধামের সহিত সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন; এজন্য তাঁহাকে মহাজনের দ্বারে হাত পাতিতে হয় নাই। দ্বিতীয় কন্যা চারুবালার বিবাহ তেমনি ভাবেই হইল বটে, কিন্তু কিঞ্চিৎ ঋণ না করিয়া পারিলেন না। তারপর কয়েক বৎসর যাইতে-না-যাইতে তৃতীয় কন্যা নলিনীবালা বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল। রামলোচন মনে মনে কন্যার বিবাহের জন্য সচেষ্ট হইলেন;—দেখিতে শুনিতে চেষ্টা করিতে নলিনীর বয়স হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতির গণ্ডী ছাড়াইয়া অনেক দূরে চলিয়া গেল। কূল-কিনারা কিছুই হইল না। দুশ্চিন্তায় দুর্ভাবনায় রামলোচনের অন্তরাত্মা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

৪

একটু পূর্ব্বে পার্শ্বের বাড়ীর প্রবীণারা আসিয়া মেয়ের বিবাহের কথা লইয়া যে বাক্যবাণ বর্ষণ করিয়া গেলেন, তাহাতে ব্রজেশ্বরী জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন। এরূপ ঘটনা যে সংসারে বিরল নয়, এই ভাবিয়া তিনি কতকটা শান্ত হইলেন বটে, কিন্তু প্রতি পদক্ষেপে তাঁহাকে যেন কাঁটার মত বিঁধিতে লাগিল। শেষটায় তাঁহার সব ক্রোধ গিয়া পড়িল স্বামীর উপর।

রামলোচন চটি জোড়াটা পায়ে দিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই ব্রজেশ্বরী উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, তুমি মনে ভেবেছ কি বল ত?"

রামলোচন স্ত্রীর প্রদীপ্ত মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "এখন আবার তোমার কি হ'ল?"

"ব'ল তুমি মনে কি ভেবেছ?"

"আরে ছাই, বলই না কথাটা খুলে।"

"কেন, মেয়ের বিয়ে কি দিতে হবে না? এমনি আইবুড় আর কতকাল থাকবে ব'ল? ষোল পেরিয়ে সতেরোতে পড়্‌বে।"

রামলোচন একটা ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "চেষ্টা ত করছি।"

ব্রজেশ্বরী আর একটু স্বর চড়াইয়া বলিলেন, "তুমি চুপ

করে বসে থাকতে পার, কিন্তু লোকের কথায় কথায় এদিকে যে আমার কান দুটো ঝাঁঝরা হয়ে গেল।"

রামলোচন অপ্রতিভমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ব্রজেশ্বরী স্বামীর দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, "সেদিন যে রামনগরের ছেলেটার কথা বল্‌ছিলে, তার কি হ'ল? সেই কৃষ্ণবিহারী বাবুর ছেলে?"

রামলোচন ক্ষুণ্ণস্বরে বলিলেন, "তারা যে টাকা চায় ঢের। ছেলে ভাল।"

"ছেলে ভাল?"

"হ্যাঁ—বেশ ভাল।"

"খু-ব লেখাপড়া জানে?"

"জানে না? একেবারে বি-এ পাশ।"

"বি-এ পাশ? সে বুঝি খুব-ই পড়াশোনা?"

"আরে বাপরে! বলে কি? বি-এ পাশ, সে কি সোজা কথা! একটা মানুষের মতন মানুষ! জ্ঞানবুদ্ধির সাগর—যাকে ব'লে শিক্ষিত! কেষ্ট-বিষ্টু একটা কিছু হ'ল বলে।"

"তাহ'লে তুমি সেই ছেলেটির জন্যই চেষ্টা কর। টাকা খরচের ভয়ে পেছপা হয়ো না যেন। আমাদের আর ত ছেলেমেয়ে নেই যে ভাব্‌বে।" বলিয়া মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "হ্যাঁগা, রামনগর এখান থেকে কতদূর?"

রামলোচন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিলেন, "মাইল চোদ্দ পনের হবে, এখান থেকে সোজা দক্ষিণে। জায়গাটাও মন্দ নয়—হাটবাজার, পোষ্ট আপিস, এ সবই আছে। আর একটা মস্ত সুবিধা রেল ষ্টেশন বেশী দূরে নয়।"

ব্রজেশ্বরী দক্ষিণ হস্তটা ঈষৎ আন্দোলিত করিয়া বলিলেন, "এই যেমন আমাদের মদনপুর ইষ্টিশান।"

বেলা শেষ হইয়া আসিল। অপরাহ্ণ-সূর্য্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণ গাছের পাতায় পাতায় ঝল্‌মল্‌ করিয়া উঠিল। মাথার উপর খণ্ড ধূসর মেঘগুলি উড়িয়া উড়িয়া কোন্ অজানা দেশে চলিতেছিল।

রামলোচন বৈঠকখানা-ঘরে একটা তক্তপোষের উপর চিন্তিত মুখে বসিয়া আছেন। পার্শ্বে একটা আলো ক্ষীণভাবে জলিতেছিল। একটু পূর্ব্বে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। গাছপালার ফাঁকে ফাঁকে কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার চন্দ্রালোক তখন সিক্ত ধরণীর বক্ষে ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

হঠাৎ বাহিরে খড়মের খট্‌খট শব্দে মুখ তুলিয়া চাহিয়া রামলোচন ব্যস্ততার সহিত বলিয়া উঠিলেন, "আসুন, আসুন। বাড়ী ফির্‌লেন কখন?"

শিরোমণি মহাশয় রামলোচনের সম্মুখে আসন গ্রহণ করিয়া বলিলেন, "এই দুপুর—বেলা তখন প্রায় দুপুরই হবে। উঃ—জলকাদায় রোদ্দুরে টো টো করে ঘুরে দেহটা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মনে কর্‌লেম, আজ আর কোথাও বেরব না—"

"তারপর কেমন হ'ল এবার?"

"আরে ভায়া! সে কথা শুনে আর কাজ নেই। আর কি সে কাল আছে? গুরু ব্রাহ্মণ বলে লোকের সে ভক্তিই নেই। কলি! ঘোর কলি! এই ত সেদিন এক শিষ্যবাড়ীতে একজন আমাকে বলে বস্‌লে 'স্বার্থের উপর যাদের এত আকর্ষণ, তারা কি অন্যকে ত্যাগের পথে নিয়ে যেতে পারে?' শুনে আমি ত অবাক। তোমাদের সব ভাল?"

রামলোচন চুলের মধ্যে বাম হস্তের অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে বলিলেন, "এক রকম আর কি।"

শিরোমণি মহাশয় রামলোচনের চিন্তাক্লিষ্ট মুখখানার পানে চাহিয়া বলিলেন, "তারপর, মেয়ের বিয়ের কতদূর কি কর্‌লে?"

"সেই ত হয়েছে এখন মস্ত ভাবনা। ঠিক কিছুই হয়নি এ পর্য্যন্ত।"

"আরে বাপরে বল কি? এখনও চুপ করে বসে আছ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে মেয়ের বয়সও ত কম হ'ল না। যত সত্বর হয় একটা ঠিক করে ফেল। বড় মেয়ে,—আর কি ঘরে রাখা উচিত? এতে প্রত্যবায় ত হয়ই, তাছাড়া—যাক্, এখন যাতে শীগ্‌গিরই বিয়েটা হয়ে যায়, সেই চেষ্টা দেখ।"

রামলোচন গলদঘর্ম্ম হইয়া উঠিলেন। তাঁহার

মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ নীরব বসিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন, "সেই কৃষ্ণবিহারীবাবুর ছেলেটা কি—"

শিরোমণি মহাশয় ওষ্ঠাগ্রে একটু হাসি টানিয়া বলিলেন, "তখন যদি কথাটায় কান দিতে ভায়া, তাহ'লে কি মেয়ের বিয়ে নিয়ে এত ভুগতে হত? তুমি আমার আত্মীয় বলেই কথাটা তুলেছিলাম। কর্ত্তব্যের শেষ করলে কি না একখানা বাজে রকমের চিঠি লিখে;— দেনাপাওনার কথাটার কাছ দিয়েও ঘেঁসলে না। আরে! দু'পয়সা বেশী খরচ হ'লে কি হয়? ছেলেটি যে রত্ন— বি-এ পাশ!"

রামলোচন শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "আচ্ছা—ওরা যা চেয়েছে, তাই-ই আমি দিতে স্বীকার।"

শিরোমণি মহাশয় মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "সে আর হচ্ছে না এখন। আমি ঐ রাস্তা হয়েই আসছি। তোমার গিয়ে ঐ বালিগঞ্জে না কি টালিগঞ্জে ওরা আরও তিন হাজার টাকা বেশী পাচ্ছে। ছেলের মাতুল সে বিয়ের উদ্যোগ করছেন। ধরতে গেলে তিনিই ছেলেটিকে পড়িয়েছেন কি না।"

রামলোচন দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আমি তার চেয়েও বেশী দেব, দয়া করে আপনি আর একবার চেষ্টা করুন।"

৫

শ্রাবণের এক শুভদিনে বেশ ধুমধামের সঙ্গে হরেন্দ্রনাথের সহিত নলিনীবালার বিবাহ সুসম্পন্ন হইয়া গেল। লোকের মুখে প্রশংসা আর ধরে না—হাঁ, জামাইয়ের মতন জামাই। যেমন গায়ের রং, তেমনি চেহারা, আর গুণের ত কথাই নাই। একেবারে বি-এ পাশ। সার্থক টাকা-খরচ!

আশ্বিন মাস আসিল। জলদমালা অপসৃত হইয়া গিয়া আকাশমণ্ডল স্বচ্ছ সুনীল হইয়া উঠিল। বিহগকুলের আনন্দ কাকলী গৃহে গৃহে আগমনীর বার্ত্তা ঘোষণা করিতে লাগিল।

বয়স্থা মেয়ে বলিয়া আশ্বিন মাস পড়িতে-না-পড়িতেই শ্বশুরবাড়ীর লোক আসিয়া নলিনীবালাকে লইয়া গেল।

মহালয়ার পূর্ব্বদিন ব্রজেশ্বরী স্বামীকে বলিলেন, "মেয়ের বিয়ে ত দিলে খুব খরচ-পত্তর করে দিয়ে থুয়ে; এখন পূজোর তত্ত্বটা আবার সেই মত হওয়া চাই, বুঝলে? অমন রত্ন জামাই, হেঙ্গফেলা যেন না দেখায়!"

রামলোচন বাহিরের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন, "তাই ত।"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "দেখো, যেন এই নিয়ে শেষটায় আবার নিন্দে না হয়। সবই যখন হয়েছে, ওটুকু কি আর আটকাবে?

রামলোচন তেমনিভাবে বলিলেন, "সে ত সত্যিই।"

যাহা হউক ষষ্ঠীর দিন রামলোচন যথোপযুক্ত পূজার তত্ত্ব জামাইবাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। কুটুম্ববাড়ীর মিষ্টকথায় তত্ত্ববাহীরা খুসী হইয়া ফিরিয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে শারদোৎসব শেষ হইয়া গেল, দেশের আনন্দ-স্রোতে ভাটা পড়িয়া আসিল। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন রামলোচন স্ত্রীকে বলিলেন, "চল, এইবার আমরা গঙ্গাস্নান করে আসি।"

ব্রজেশ্বরী স্বামীর দিকে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া গিয়া বলিলেন, "যে দায় থেকে ভগবান আমাদের মুক্ত করছেন! বাবা! কন্যাদায় বিষম দায়! সত্যিই গঙ্গাস্নানটা আমাদের শীগগিরই সেরে ফেলা দরকার। যাবে কোথায়? নৈহাটি, না নবদ্বীপ?"

রামলোচন বলিলেন, "আমি ত মনে করছি, প্রয়াগ পর্য্যন্ত যাব।"

"প্রয়াগ? সে যে অনেকদূর! আর সেখানে গেলে ত মাথা মুড়োতে হয়। সেবার আমাদের গ্রাম থেকে আমার পিসীমা আর আরও পাঁচ ছ'জন গিয়েছিল। ওমা! ফিরে এলে দেখি, সকলেরই মাথা মুড়ানো।"

"মেয়ের বাবার কেবল মাথা মুড়ালেই চলবে না, মাথায় ঘোলও ঢালতে হবে। তবে ত কন্যাদায়ের ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করা হবে।"

"সত্যিই বলেছ তুমি। মানুষ যেন এমন দায়ে কখনও না পড়ে।"

"কাপড়চোপড়, পোট্‌লাপুঁট্‌লি—যা নেবে বেঁধে-ছেঁদে নাও। আগামী পরশুই বেরিয়ে পড়া যাবে, কি বল?"

একটু ভাবিয়া ব্রজেশ্বরী বলিলেন, "ফিরতে ত ঢের বিলম্ব হবে, বাড়ীঘরের কি ব্যবস্থা করলে ?"

রামলোচন বলিলেন, "সে ব্যবস্থা করেছি।"

ব্রজেশ্বরী তেমনিভাবে বলিলেন, "তারপর, জমি-জমা ? এবারের আমন ধানগুলো—"

রামলোচন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করিয়া বলিলেন, "সে ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছে।"

দুই দিন পর রাত্রির ট্রেনে রামলোচন সস্ত্রীক প্রয়াগের পথে যাত্রা করিলেন। গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার নূতন বৈবাহিক মহাশয়কে লিখিলেন :—

শ্রীহরি

প্রয়াগ।

বৈবাহিক মহাশয়,

আজ পাঁচ দিন হইল এখানে আসিয়াছি। কবে যে দেশে ফিরিব, কি এইখানেই জীবনের শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দিতে হইবে, তাহা ভগবানই জানেন। বোধ হয় শেষের ব্যবস্থাটাই তাঁহার একান্ত অভিপ্রায়। দেশে যাইয়া কোথায় দাঁড়াইব, আর কি ধরিয়া থাকিব ?—আমি আজ নিঃস্ব—রিক্ত—গৃহহীন। সেজন্য আমার একটুও দুঃখ নাই, কারণ জামাই ত পাইয়াছি, বি-এ পাশ। ইহার অধিক আমার কাম্য আর কি থাকিতে পারে ? যেখানে গিয়াছি, সেখানেই ঐ একই কথা, আমার কন্যার কোনো মূল্য নাই; আছে আমার রক্তক্ষয় করা অর্থের দাম। কন্যার জনক হওয়ার পাপ-ক্ষালন আমাকে করিতেই হইবে। দেখিলাম আর কোনো উপায় নাই—সমাজে মুখ দেখানও ভার হইয়া উঠিয়াছে, শেষে দিনের আলোয় বাহির হওয়াও হয়ত চলিবে না; তখন বিষয়-সম্পত্তি, বাড়ী-ঘর বন্ধক দিয়া আপনার সমস্ত দাবি পূরণ করিয়া কন্যাদায় হইতে মুক্ত হইলাম। তারপর পাওনাদারকে আমার যত-কিছু—সব লিখিয়া দিয়া ঋণমুক্ত হইয়া মাত্র ত্রিশ টাকা সম্বল লইয়া এই পবিত্র ক্ষেত্রে আসিয়া মাথা মুড়াইয়াছি।—গঙ্গাস্নান ত দুবেলাই চলিতেছে। বোধ হয় আমার সমস্ত পাপ এতদিনে ক্ষালন হইয়াছে। দেশে আর কিছুদিন অপেক্ষা করিলে সেই সবৃদ্ধিমূল ঋণের দায়ে ভাগ্যে যাহা ঘটিত, তাহা আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি।

যাহা হউক, এসব আমি হাসিমুখেই গ্রহণ করিয়াছি। কারণ, কন্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা বড় দায়। সেই দায় হইতে যে মুক্ত হইয়া আমার জাতি বাঁচিয়া মুখরক্ষা হইয়াছে, ইহাই আমার পরম ভাগ্য। নাই বা প্রাণ বেশী দিন বাঁচিল, প্রাণের অপেক্ষা মানের মূল্য যে বড়, ইহা সকলেই জানে। আপনার কোন দোষ নাই; আপনি পুত্রের পিতা; বিধাতা যাহা আপনার পাওনা বলিয়া লিখিয়া দিয়াছেন, তাহা আদায় করিয়া লইতে অপরাধ কি ? আমার নলিনীবালা রহিল। তাহাকে একটু দেখিবেন, এই আমার শেষ অনুরোধ। ভাল আছি। ইতি

নিবেদক—শ্রীরামলোচন রায়

চিঠি পড়িয়া কৃষ্ণবিহারী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "আমার নতুন বেয়াই মশাই ত কন্যাদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে একেবারে দেশ ছেড়ে প্রয়াগে গিয়ে হাজির! কিন্তু টাকাগুলো আমার ভাগ্যেই বা ক'দিন ? অর্দ্ধেক ত বিয়ের খরচেই গেছে। এদিকে হরেন বাবাজী ত একেবারেই বেকার। কতদিনে যে একটা চল্লিশ টাকার চাকরী জুটবে জানি না। গৃহিণী এমন রত্ন দিয়ে কার লাভ কি হ'ল বল্‌তে পার ?"

একটা চাপা দীর্ঘনিঃশ্বাস সুরবালার অন্তর মথিত করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

হুগলীর পল্লীকবি রসিক রায়

শ্রীমনোমোহন নরসুন্দর

দেশবন্ধু একবার আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—"বাংলার খাঁটি লোক-সাহিত্য ও গ্রাম্য-সাহিত্য দিন দিন লুপ্ত হ'তে চলেছে। এদিকে কারও লক্ষ্য নাই।" কবিওয়ালারা চল্‌তি কথার ভিতর দিয়া জীবনের যে আদর্শ গাহিয়া যাইত সহজ কথায় সাধারণের বোধগম্য ভাষায়—পুরাণের, ভাগবতের, গীতার, রামায়ণের, মহাভারতের বিশেষ বিশেষ চরিত্রের দোষগুণ বিচার করিয়া সাধারণের কাছে যে আদর্শ প্রচার করিত, সে প্রচারের কাল আর নাই। যাত্রাওয়ালার দল এখনও কোনো রকমে টিকিয়া আছে।

একশত বৎসর আগেকার কথা—বাংলার রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপট-সংযোগে নাটকীয় অভিনয় সুরু হয় নাই। কবিওয়ালার তর্জ্জা এবং যাত্রাওয়ালার যাত্রা-গানে তখন বাংলার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিত। সহরেই যাত্রা-গান ও কথকতার প্রাধান্য ছিল বেশী।

উভয় দলের তর্ক কবিওয়ালাদিগের গানের এক প্রধান অঙ্গ, আবার মস্ত বড় কলঙ্কের মূলও ছিল বটে। যে দল তর্কে জিতিত সেই দলেরই খাতির বেশী হইত। এই খাতিরের উপরই পয়সা-উপায়ের ভিত্তি স্থাপিত ছিল। তাই বিধিমত শাস্ত্রের বিচার অনেক সময়ে মাঠে মারা যাইত। অশিক্ষিত শ্রোতার মনোরঞ্জনের জন্য ইহাদিগকে বাধ্য হইয়া অন্যায় কুতর্কের আশ্রয় লইতে হইত। এই তর্কের হাত এড়াইয়া নির্ম্মলভাবে লোক-শিক্ষা দিবার ইচ্ছায় দাশুরায়ের মনে এক নূতন প্রেরণা জাগিল। সেই প্রেরণার ফলেই বাংলা-সাহিত্যে পাঁচালীর আমদানী। সরলপ্রাণ পল্লীকৃষকের মনে তখন কবির দলের গানের মস্ত বড় মোহ। সেই মোহ কাটাইয়া পাঁচালীকে জয়লাভ করিতে হইবে। ব্যাপারটি বড় সহজ ছিল না। কবিওয়ালারা যে কেমন করিয়া জনসাধারণের মনের উপর এতটা আধিপত্য করিয়া বসিল তাহার ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে মনে হয়, রায় গুণাকরের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর রাজসভায় গীত হইবার পর যখন ভারতের প্রভু-পরিবর্ত্তনে সাহিত্যের আসর রাজ-সভায় বসিবার সুযোগ হারাইল, তখন একদল লোক ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নূতন তথ্যের সন্ধান লইয়া রাজ-সভা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৌরসভায় আসর জুড়িয়া বসিল।

কবির সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—"কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের একটি অঙ্গ, এবং ইংরেজের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজন-সভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে, এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।"

সাধারণের বাহবা পাইবার জন্য বাধ্য হইয়া কবি-ওয়ালাদিগকে সাহিত্যরসকে বিকৃত করিয়া উত্তেজনার সৃষ্টি ও অনুপ্রাসের ঘটা—এই উভয়েরই আশ্রয় লইতে হইয়াছিল।

বাংলা-সাহিত্যে দাশরথি রায়কে প্রথম পাঁচালীকার বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তরুণ কবিওয়ালা দাশরথি যেদিন কবির আসর ছাড়িয়া পাঁচালীর আসর সরগরম করিয়া তুলিলেন, সেইদিন লোকশিক্ষার প্রভাব অন্যভাবে নিয়ন্ত্রিত হইল। কিন্তু লোকের বাহবা অর্জ্জন করিতে না পারিলে এই প্রকারের সাহিত্যিকের নাম হয় না। তার উপর পাচালী ত নূতন জিনিষ। এর জন্যই পাঁচালী-কারকেও ঐ একই প্রকার উত্তেজনা ও অনুপ্রাসের আশ্রয় লইতে হইল। তাহার ফলে পাঁচালীর মধ্যে (১) ছড়া ও (২) গানের সৃষ্টি।

পাঁচালীই বাংলার জনসাধারণের খাঁটি সাহিত্য। পথের কথা, নীতির কথা, পুরাণের কথা লইয়াই এগুলি রচিত। তাই কবিওয়ালাদিগের যুগে পাঁচালীকার

দাশরথি রায় সারা বাংলায় সমাদর লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তখন বাংলা-সাহিত্যের অতি দীন অবস্থা। বিদ্যাসাগরের প্রবল চেষ্টায় মাতৃভাঁষার অনুশীলন চলিতেছে।

লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইলে, এবং লোকশিক্ষার আদর্শ স্থাপন করিতে গেলে অনেক জিনিষেরই আশ্রয় লইতে হয়। তাই পাঁচালীকারদের অনেক কবিতায় তদানীন্তন সমাজ, জাতির গলদ ও পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে তীব্রভাবে নিন্দা করা হইয়াছে এমনও দেখিতে পাওয়া যায়।

দাশুরায়ের সমসাময়িক আর একজন পাঁচালীকার বাংলা-সাহিত্যে অনেকখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিলেন' সারা বাংলা তাঁর নাম না জানিলেও তাঁর কণ্ঠ এখনও নীরব হয় নাই। তাৎকালিক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নিকট তিনি সাহিত্য-স্রষ্টারূপে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অভিধানকার সুবলচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই রসিক-সাহিত্য সম্বন্ধে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁহার অভিধানে রসিকচন্দ্র ও তাঁহার সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমগ্র পশ্চিম বাংলায় তাঁর নাম আজও ছড়াইয়া আছে। কয়েকখানি পুস্তক তিনি অনুরোধে পড়িয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সমগ্র গ্রন্থাবলী প্রকাশের তাঁর কোনদিনই আগ্রহ ছিল না। নিরহঙ্কার কবি আপনাকে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। পল্লীমায়ের কোলের অন্তরালে থাকিয়া নিজের সরল জীবন যাপন করিতেন। কবি বুঝিয়াছিলেন—

"অপরার সমুন্নতি অবশ্য বাঞ্ছিত অতি,
পরাবিদ্যা কিন্তু গতি জেনো মনে সার।"

খোল ও খঞ্জনীর তালে তালে পাঁচালীর গান আজকাল বাংলার পল্লীতে বড় দেখা যায় না। পুস্তকের আকারে দাশরথি রায়ের পাঁচালী বাজারে এখনও কিনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কবির পাঁচালী আজও হয়ত বটতলার দোকানে খোঁজ করিলে মিলিবে কি না সন্দেহ। তবুও তাহা এখনও হুগলী, বর্দ্ধমান, চব্বিশ পরগণা, হাওড়া প্রভৃতি জেলার পল্লীতে পল্লীতে কালেভদ্রে গীত হইয়া থাকে। ইহা শ্রীযুক্ত গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী বলিয়া এখন কথিত। তিনি স্বকণ্ঠে উহা গাহিয়া থাকেন।

পশ্চিম-বাংলায় গৌরবাবু একজন নামজাদা পাঁচালীকার, একথা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে। এখনও অনেকেই বেতারে গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের পাঁচালী শুনিয়া থাকেন। বাড়ীর গিন্নীরা এখনও গৌরবাবুর পাঁচালী শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। কবি চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবির বাণী এখনও নীরব হয় নাই।

১২২১ সালের বৈশাখী পূর্ণিমায় কবিবর রসিকচন্দ্র রায় তাঁহার মাতুলালয় পাড়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা হরিকমল রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত হরিপালে বাস করিতেন। বড়া গ্রামের কিয়দংশ তাঁহার মাতামহের জমিদারী। মাতামহের সন্তান-সন্ততি না থাকায় রসিকচন্দ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন ও মাতুলালয়ে বড়া গ্রামেই আসিয়া বাস করেন।

তখনকার যুগে ইংরেজী শিক্ষার্থীরা অনেকেই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিতেন। তজ্জন্য পিতা হরিকমল ছেলেকে উচ্চশিক্ষা দিতে নারাজ ছিলেন। তাই গ্রাম্য পাঠশালার তখনকার যুগে শিশুবোধক, চাণক্য শ্লোক ও পত্রদলিল পড়িয়া তাঁহার পাঠ সমাপ্তি হয়। তখন হইতেই রসিকচন্দ্রের কবি-প্রতিভার বিকাশ আরম্ভ হয়। দশ বৎসর বয়সে তিনি ছড়ার মত কবিতা বলিতে পারিতেন। এই অল্প অনুশীলনের ফলেই তিনি একাদশ খণ্ড পাঁচালী ও বহুতর খণ্ডকবিতা রচনা করিয়া একজন সুকবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন।

ষোল বৎসর বয়সে রসিকচন্দ্র তাঁহার এক সহাধ্যায়ী কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া রাধিকার রূপ-বর্ণনা লিখিয়াছেন—

বর্ণ হেরে, স্বর্ণ পোড়ে চাঁপা পায় লাজ।
হিঙ্গুল মিশ্রিত হরিতালেই কি কাজ॥
চরণ বরণ হেরে জবা যায় দূর।
অরুণ কোথায় লাগে কি ছার সিঁদুর॥
রূপের তুলনা দিতে কে আছয়ে আর।
থাকুক উর্ব্বশী বসি রম্ভা কোন্ ছার॥
তিলোত্তমা তার কাছে তিল উত্তমা নয়।
রতিরূপে রতিতুল্য হয় কি না হয়॥

আঠার বৎসর বয়সে কবির প্রথম পুস্তক জীবন-তারা

প্রকাশিত হয়। হাস্য করুণ ও আদিরসের সমবায়ে জীবনতারা পাঠকের মনে আনন্দরসের সৃষ্টি করিত। অশ্লীল অংশবিশেষের জন্য গভর্ণমেণ্ট উহা বন্ধ করিয়া দেন। অশ্লীল অংশ পরিহারপূর্ব্বক নব্য জীবন-তারা পুনঃপ্রকাশিত হয়। ১২৪৫ হইতে ১২৫০ সালের মধ্যে কবির নব্যজীবনতারা ও ছয়খণ্ড পাঁচালী রচিত হয়।

রসিকচন্দ্র প্রত্যুৎপন্নমতি ও স্বভাবজাত কবি-প্রতিভার গুণে অনেক কবিওয়ালাকে কবিগান, তর্জ্জার উত্তর, তাহা ছাড়া বাউল কীর্ত্তনীয়া ও যাত্রাওয়ালাকে আবশ্যক-মত গান বাঁধিয়া দিতেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সহিত রসিকচন্দ্রের বিলক্ষণ বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই সমবয়স্ক ছিলেন। একদিন কার্য্যোপলক্ষে রসিকচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন—"আমাদের দেশে ছেলেদের পাঠোপযোগী কবিতা পুস্তকের বড়ই অভাব, আপনাকে এই অভাব পূরণ করিতে হইবে।"

রায় মহাশয় বলিলেন—"বর্ত্তমান কালের শিক্ষার ধারা ঠিক আমার জানা নাই; কাজেই একাজ আমার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয় পাকা জহুরী ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন স্বভাবকবি রসিকচন্দ্র উপস্থিত-রচনায়ও বিলক্ষণ পটু। তাঁহার পরীক্ষা করিবার কৌতুক হইল। তিনি বলিলেন - 'রায় মহাশয় আপনাকে একটু রচনা শুনাইতে হইবে।' বিদ্যাসাগর মহাশয় বর্ণনীয় বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন—প্রভাত-বর্ণন। বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়া চলিলেন, কবি আরম্ভ করিলেন—

রাতি পোহাইল ভাতি, দিল দিক সব
কল কল কুল কুল পাখী করে রব।
সোনার থালার মত উঠিল অরুণ
ছুটিল চৌদিকে তার কিরণ তরুণ।
গিরির চূড়ায় আর তরুর শাখায়
লাগিয়া সোনার যেন জড়িত দেখায়।

—ইত্যাদি।

ঈশ্বরচন্দ্র ভাবিলেন এ হয়ত কবির পূর্ব্বরচিত কবিতা, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। তখন আবার একটি কবিতা বলিতে বলিলেন। বিষয় নির্দ্ধারণ হইল—পরোপকার। রায় মহাশয় বলিতে লাগিলেন—

শুন হ'য়ে একচিত, কথা নহে অনুচিত
করিতে পরের ভাল, ভুলো না রে ভুলো না।
পরদুঃখে দুখী হ'য়ে ভাল কর ভার লয়ে
কদাচ ভুলিয়া যেন রয়ো না রে রয়ো না।
কর করি নিজহানি, পরপক্ষে টানাটানি
পরের অহিত কথা কয়ো না রে কয়ো না।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সন্দেহ দূর হইল। তিনি কবির প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও শব্দযোজনার স্বাভাবিক শক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সন্তুষ্ট হইয়া চুরি বিষয়ে একটি কবিতা বলিতে অনুরোধ করিলেন। রায় মহাশয়েরও বিরক্তি নাই, এমন পরীক্ষকের কাছে পরীক্ষা দেওয়াও গৌরবের কথা।

* * *

এ জগতে দোষ নাই চুরির সমান।
মন যায় ধন যায় আর যায় প্রাণ॥
দেশে অপবাদ অপরাধ কত।
সবার ঘৃণিত কাজ নিন্দা শত শত॥
একে পাপ যোগাযোগ তায় অনুযোগ!
কখনও চোরের দ্রব্য নাহি হয় ভোগ॥

সেকালের সেই সংস্কৃত শব্দবহুল, সমাস আড়ম্বরময় বাংলা-সাহিত্যে খাঁটি বাংলায় সহজ সুবোধ্য কবিতা প্রতিভাবান কবি ব্যতীত রচনা অসম্ভব। টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলালে'র মত তিনিও কতকটা পদ্যসাহিত্যে একটা বিশেষ পথের সন্ধান দিয়াছিলেন। বাংলা দেশে তৎকালে পদ্যের স্রোত যেন মাঝরাস্তায় আসিয়া থামিয়া গিয়াছিল। কবি তাই আফশোষ করিয়া লিখিয়াছিলেন—

হায় রে বঙ্গের পদ্য হায়! হায়! হায়!
পূর্ব্বের অপূর্ব্ব মান এখন কোথায়?
কত ছটা কত ঘটা কত দম্ভ ছিল
পদ রে! তোমার তেজ সকলি ঘুচিল॥
বিলাতী খেলাতি পদ্য দেখিয়া বিস্তার
বাঙালি! কাঙালী তোরে করেছে এবার।
পয়ার! দয়ার নাই তোর প্রতি টান।
হতিস্ বিলাতী বরং পেতিস্ সম্মান॥
বঙ্গের রঙ্গের পদ্য থাক্ থাক্ থাক্।
বাজুক কত না বাজে গদ্য-জয়ঢাক॥
ওরব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে॥

প্রাচীন সংস্কৃত হইতে আরম্ভ করিয়া পদ্যের স্রোত

সাহিত্যে সমানভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। মধ্যে বৈষ্ণব-সাহিত্যের জোয়ার কিছুকাল প্রবলভাবে চলিয়াছিল, তারপর পদ্য-সাহিত্যে নানা অনাচার দেখা দিয়াছিল। খাঁটি সাহিত্যের প্রেরণা লইয়া বড় আর কোন কবি সাহিত্যের আসরে নামিত না। কবি হতাশ হন নাই; তাই আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন—

ও রব নীরব হবে না, রহিবে এদেশে।
অক্ষয় মৃদঙ্গ তুই বাজিবি রে শেষে॥

কবির সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক হইয়াছে। বিশ্বকবি-সভায় রবীন্দ্রনাথকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কাক ও কোকিল, পর্ব্বত ও ভুজঙ্গ, ব্যাঘ্র ও মুকুর-বিক্রেতা, প্রভাত প্রভৃতি আরও কয়েকটি খণ্ড কবিতা লইয়া তাঁহার পদ্য-সূত্র প্রথমভাগ রচিত হয়।

তারপর প্রাঞ্জলভাষায় লিখিত পদ্যসূত্র দ্বিতীয়ভাগ প্রকাশিত হয়। পাঠকের কৌতুক নিবারণের জন্য পদ্য-সূত্র প্রথমভাগের প্রভাত শীর্ষক কবিতার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

গেল রাতি নানা জাতি, দিক ভাতি শোভিল।
সুধাময়, সুসময়, উষা হয় উদিত॥
ভাল ভাল উষাকাল হিমজাল ঘেরিল।
উপবন সুচিকণ, সুশোভন হইল॥
ক্ষিতিতল, সুশীতল, সুশীতল মাধবে।
দিক দশ, করে বশ পুষ্পরস সৌরভে॥
ফুল ফুটে ভৃঙ্গ ছুটে মধু লুটে উদ্যানে।
পাখী সবে প্রেমোৎসবে ডাকে তবে গগনে॥

কবি গৃহের অনতিদূরে বাগানের মধ্যে চণ্ডীমণ্ডপে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি উহার নাম রাখিয়াছিলেন—শান্তিনিকেতন। তাঁহার শান্তিনিকেতনের একমাত্র সঙ্গী ছিল দুর্গাচরণ পাঠক বলিয়া এক ব্রাহ্মণ-তনয়। দুর্গাচরণের যত্নে রসিকচন্দ্রের একাদশ পাঁচালী, ঘোর মন্বন্তর, জীবনতারা, শ্রীকৃষ্ণ, প্রেমাঙ্কুর, হরিভক্তি চন্দ্রিকা, পদাঙ্কদূত, দশমহাবিদ্যা, বৈষ্ণবমনোরঞ্জন, শকুন্তলা-বিহার, বর্দ্ধমানচন্দ্রোদয়, নবরসাঙ্কুর, কুলীনকুলাচার, শ্যামাসঙ্গীত প্রভৃতি কবিতা পুস্তক ক্রমান্বয়ে প্রচারিত হয়। রসিকচন্দ্র, গোবিন্দ অধিকারী, রাধাকৃষ্ণ, নবীন গুঁই, মহেশ চক্রবর্ত্তী ও লোকা ধোবাকে যাত্রা; সোনাপটুয়া, শশী চক্রবর্ত্তী ও ত্রিপুরা বিশ্বাসকে পাঁচালী; বাবুরাম প্রভৃতিকে কবি এবং নরোত্তম দাস, নকুড় দাস প্রভৃতিকে আবশ্যক মত কীর্ত্তন গীত ও ছড়া রচনা করিয়া দিতেন।

একবার জনৈক পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী শিক্ষক প্রসঙ্গক্রমে বলিয়াছিলেন—"রায় মহাশয়ের ছন্দ অনেকটা একঘেয়ে। মাইকেলী ছন্দে তিনি যদি কিছু লিখিতে পারেন তবেই বুঝি তিনি লেখক।" নূতন ছন্দ - কথাটি শুনিয়া তাঁহার কৌতূহল হইল। পরে যদুগোপালের পদ্যপাঠ তৃতীয় ভাগে লক্ষ্মণের শক্তিশেল, দশরথের প্রতি কৈকেয়ী, সীতা ও সরমার কথোপকথন পাঠ করিয়া ছন্দটি তাঁহার ভাল লাগিল। ইহার ফলেই কবির নবরসাঙ্কুরের সৃষ্টি।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ প্রচারে সমাজ যখন তোলপাড়, রায় মহাশয় সেই সময়ে উক্ত প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে তদানীন্তন যাত্রাওয়ালা নবীন গুঁইকে এক কৌতুকাবহ পালা রচনা করিয়া দেন। এই সময় হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব আরও গাঢ়তর হয় এবং তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে রায় মহাশয় কুলীন-কুলাচার নামক একখানি বহুবিবাহ-নিবারক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাহা বিনামূল্যে সাধারণের নিকট বিতরিত হয়। রায় মহাশয় বহুবিবাহ ও বিধবা-বিবাহ উভয়েরই বিপক্ষে ছিলেন।

কবির নবরসাঙ্কুর নয়টি রস বর্ণনা করিয়া অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত হইয়াছিল, পরে মিত্রাক্ষর ছন্দে দ্বিতীয় পর্য্যায় নবরসাঙ্কুর রচনা করেন। উহার কয়েকটি পদ্য তৎকালীন জন্মভূমি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে একটি কবিতা উদ্ধৃত হইল।

ভগ্নকুটীরে ব্রহ্মময়ী দর্শনে ফুল্লরা—

কে তুই সুন্দরী নারী, ব্যাধের আলয়।
ও তোর বদনে যেন চাঁদের উদয়॥
সুন্দরী সুন্দর রূপ দেখি যে গো তোর।
আসিতে পথে কি তোরে দেখে নাই চোর॥
পাকা তেলাকুচা যেন দুইখানি ঠোঁট।
অথবা তুলনা দিলে শিউলির বোঁট॥

শেষবয়সে তিনি তদানীন্তন অনেক সাপ্তাহিক,

পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতা, গান, পাঁচালী এ প্রদেশের অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে। প্রসিদ্ধ পাঁচালীকার গৌর-মোহন মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীও এই বড়া গ্রামে।

"কবিরা কালের সাক্ষী, কালের শিক্ষক।" কবি শব্দের মৌলিক অর্থ—যিনি স্বরচিত কাব্যের দ্বারা ভগবানের স্তবগান করেন। অতীত ভারতে এই অর্থেই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। কিন্তু কালক্রমে কবি শব্দের ব্যাপকতর অর্থ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ছিলেন সত্যকার কবি। বড় বড় কথা কহিয়া মনকে ফাঁকি দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তাই তিনি নিজের জ্ঞানকে সুস্পষ্ট করিবার জন্য, সত্যোপলব্ধিকে নির্ম্মল করিবার জন্য সেই সর্ব্বশক্তিমান পুরুষের আশ্রয় লইয়াছিলেন। অধ্যাত্ম সম্পদই চিরকাল ভারতবাসীর পরম সম্পদ।

রসিকচন্দ্রের পদ্য-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়—তিনি যেন একটি সর্ব্বতোব্যাপী পরমাশক্তির চেতনাময়ী অনুভূতি লইয়া সাহিত্যের আসরে নামিয়া-ছিলেন। তাঁহার সমগ্র পাচালীগুলি যেন মানুষের জীবনপথের পাচালীর কথা। মানবাত্মার সকল সংসর্গের মধ্যে যেন পরমাত্মার সংসর্গ লাভের সন্ধান খুঁজিতেছেন। মিথ্যাকে পদদলিত করিয়া সত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ মানবের পূর্ণপরিণতির লক্ষ্য। কবি এই আদর্শবাদ প্রচার করিবার নিমিত্ত জগতের যত অসত্য, প্রলোভন ও আবর্জ্জনাকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি দিন দিন গাঢ়তর হইতে থাকে। ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানে রসিকচন্দ্রের কোন আড়ম্বর ছিল না। অনন্ত বিশ্বসৃষ্টির কাছে তাঁর মত জ্ঞান, চরিত্র কত ক্ষুদ্র ভাবিয়া নিজকে সঙ্গোপনে রাখিতে ভালবাসিতেন। এইজন্য নাস্তিক আখ্যাও তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ব্যাকুল প্রাণে কাতরকণ্ঠে নিভৃত নিকেতনে বসিয়া "ইদানীঞ্চে-দ্বীতো মহিষ-গল-ঘণ্টা ঘন রবাৎ নিরালম্বো লম্বোদর জননী, কং যামি শরণম্" বলিয়া দরবিগলিত ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন।

শেষবয়সের রচিত তাঁহার শ্যামাসঙ্গীতের গানগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়—প্রেমাস্পদের জন্য প্রেমিকের কি আকুল প্রার্থনা। পার্থিব কোনো প্রকারের সম্পদই তাঁহার মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে নাই। বৈষ্ণব কবিদের ব্রজগোপীদের মত ধূলিকঙ্কর কণ্টকময় পথকে সম্বল করিয়া তিনিও নিশীথ পথের পথিক হইয়াছিলেন। তজ্জন্য তাঁহার অনেক কবিতায় বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয়।

বহির্মুখী মনটাকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারিতে-ছেন না; তাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

মন হলি না মনের মত।
তোরে বারে বারে বুঝাব কত।
বসে আছিস পাঁচটার মাঝে তাতে দুটার অনুগত
ওরে বিষয় ভোলা, নটা খোলা
কোন ধন কি হবি হৃত।

শ্যামাসঙ্গীতে রসিকচন্দ্র ভক্তিপ্রবাহে গদগদ হইয়া আদ্যাশক্তির নিকট প্রার্থনা করিতেছেন—

মা, মোর হৃদয়ে থেকো দেখ গো যেন ভুলো না।
চাই না আমি নির্ব্বাণ মুক্তি ওগো শবাসনা।
যদি আমায় দাও মা দৈন্য; তাও ভাল মা অন্নপূর্ণা
যেন দুর্গানাম ভিন্ন বলে না মম রসনা।

মা ভক্তবৎসল পুত্রের বাসনা পূর্ণ করিয়াছিলেন। ২০শ হইতে ৭২ বৎসরের মধ্যে তিনি বিশেষ কোনো অসুখে ভোগেন নাই—চিত্ত-শান্তির প্রভাবে আধি-ব্যাধির স্থান ছিল না। মৃত্যুর পূর্ব্বদিন অপরাহ্নে পুত্র দাশরথিকে বলিয়া গিয়াছিলেন—"দাশু আজ শরীর ভাল নাই, কি জানি কি হয়।" সেই রাত্রে চারি ঘটিকার সময় পুত্রের দেয় গঙ্গাজল পান করিয়া তুলসীতলায় সকলের নিকট বিদায় লইয়া রসিকচন্দ্র সুদূর শান্তিনিকেতনের যাত্রী হইলেন।*

* উনবিংশ বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের সাহিত্যশাখায় পঠিত

গঙ্গাফড়িং

শ্রীঅচ্যুত চট্টোপাধ্যায়

১

মা বললেন—দ্যাখো ত' বাবা বিশু, গঙ্গা সেই যে বাজারের পয়সা নিয়ে বেরল, আর ফেরবার নাম নেই! গাড়ীচাপা পড়লো কি কি……

এগ্‌জামিনের পড়া, তবুও বই ছেড়ে উঠ্‌তে হ'ল। মনে মনে বাঁদর গঙ্গারামের মুণ্ডপাত কর্‌তে কর্‌তে পথে বেরলাম।

সরু গলিটা পেরিয়ে বাঁ-হাতি মোড় ফির্‌তেই দেখি—ফুট্‌পাথের ওপর গ্যাসপোষ্টের পায়ের তলায় বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে, ছোট ছেলে থেকে আরম্ভ করে বুড়ো পর্য্যন্ত। ভিড়ের ভেতর থেকে টুং টুং ক'রে একটি ঘণ্টা বাজ্‌ছে, যেন গলায় লাল ফিতে দিয়ে ঘণ্টা-বাঁধা ছোট্ট ছাগলছানাটি তা'র মায়ের চারপাশে খেয়ালখুসীতে নেচে বেড়াচ্ছে।

ব্যাপার কি, দেখবার জন্যে এগিয়ে যেতেই গঙ্গার সঙ্গে চোখাচোখি। ও ত দে-ছুট্‌!

ভাবলুম, বাড়ীই গেল বোধ হয়।

ভিড়ের মধ্যে উঁকি মেরে দেখি—একখানা গোল পিচবোর্ডের ওপর ঘড়ির ডায়েলের মত এক, দুই, তিন, চার, এমনি বারো পর্য্যন্ত লেখা আর বোর্ডের ঠিক মাঝখান্‌টিতে একটি কাঁটা ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে; যেখানে গিয়ে কাঁটাটি থাম্‌চে, সেই দাগ অনুযায়ী বিস্কুট, দেওয়া হচ্ছে। লটারি আর কি!

মন্দ নয়। ছেলেরা লোকটাকে ছেঁকে ধরেছে; কেউ পাচ্ছে এক পয়সায় দশখানা, কেউ বা একখানা, আবার কারু কপালে শূন্য।

আমিও এক পয়সা খেললুম, বরাতে মিল্‌ল পাঁচখানা।

বাড়ীতে ফিরে দেখি—ঘরের এক কোণে গঙ্গারাম গুম্‌ হয়ে বসে আছে। ও গিয়েছিল ছ'আনা পয়সা নিয়ে বাজারে, ঝাড়া একঘণ্টা পরে ফির্‌ল খালি হাতে, দু'আনা ট্যাকে করে। মা ত রেগে অস্থির, বললেন—আজ তোকে মেরেই ফেল্‌বো হতভাগা, বাকী চার আনা কি ক'রেচিস্‌ বল্‌……

ও কিছুতেই বল্‌বে না, যেন শো'রের গোঁ। আমি আন্দাজে ব্যাপারটা অনেকখানি বুঝে নিলুম।

তারপর, ভুলিয়ে ভালিয়ে আসল কথাটি জান্‌তে পারলুম। বাজারে যাবার পথে ওর বন্ধু কেষ্টা আর রামার সঙ্গে ওর দেখা হয়, বিস্কুটের লটারী-খেলার ওখানে ওরা দাঁড়িয়েছিল। গঙ্গার হাতে পয়সা দেখে, ওর কাছ ছেকে দু'আনা দু'আনা চার আনা ধার নিলে—কেষ্টা আর রামা, লটারী খেল্‌বে বলে।

গঙ্গা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের খেলা দেখছিল, এমন সময় আমাকে দেখে ভোঁ-দৌড়!

২

আজ দু'বছর হ'ল গঙ্গাদের বাড়ীতে এসেচি। গঙ্গাকে পড়াই; ওখানেই খাই, থাকি।

আট বছরের গঙ্গা আমার চোখের সাম্‌নে বড় হয়ে দশ বছরে পা দিয়েছে। রোগা লিক্‌লিকে চেহারা; বড় বড় চোখ দু'টিতে স্পষ্ট বুদ্ধির আভা, মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া কালো কুচ্‌কুচে চুল। ওর মুখের দিকে চাইলে, যে জিনিষটি সব আগে চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে ওর ওপর-ঠোঁটের বাঁ কোণটির ওপর একটি ছোট্ট মিশ-কালো তিল। ভোরের আকাশের শুকতারার মতই চমৎকার।

রোগা হ'লে কি হয়, অত্যন্ত চঞ্চল আর তেম্‌নি একগুঁয়ে ও। পড়্‌তে বসে ঘণ্টায় তিন চার বার উঠে পালায়; আবার মা'র কাছে তাড়া খেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে ধুপ করে বসে আমার গা-ঘেঁষে। যেন সবে-হওয়া

ছোট্ট একটি বাছুর! হাঁপাতে হাঁপাতে বলে—উঃ, আর ভাল লাগে না পড়্‌তে। কখন্ ছুটি হ'বে?···

প্রথম যেদিন ওঁদের বাড়ীতে এলুম, ওর মা ওকে সঙ্গে করে আমার কাছে দিয়ে গেলেন; বল্লেন—তুমি বাবা আমার ছেলের বয়সী, তোমাকে নাম ধরেই ডাক্‌বো, কেমন? এই দুষ্টুটাকে সাম্‌লাতে পার্‌বে কি বিশ্বনাথ!

বল্লুম—কিছু ভাব্‌বেন না মা, সে আমি ঠিক করে নোব।

তারপর গঙ্গাকে জিগ্যেস্ করলুম—তোমার নাম কি ভাই খোকা?

ও বল্লে—শ্রীগঙ্গা······এই পর্যান্ত বলে মার মুখের দিকে তাকালো।

আমি হেসে বল্লুম—বেশ, বেশ, তোমাকে আমি বলবো গঙ্গাফড়িং, কেমন?

মা হেসে বল্লেন—তোমাকে কিন্তু গঙ্গা মাষ্টারমশাই বলে ডাক্‌বে না বিশ্বনাথ,—ও ব'লবে—বিশুদা।

আমি হেঁট হয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিলাম।

সহরের এক অপ্রশস্ত গলির উপর ছোট্ট একখানি একতালা বাড়ী।

স্নেহময়ী বিধবা মা আর দখিন্ হাওয়ার মত চঞ্চল এই ছেলেটিকে নিয়ে সংসার; তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে—ছেলের মাষ্টার আমি, অর্থাৎ গঙ্গাফড়িংয়ের বিশ্‌দা।

খেয়ালী ছেলেটিকে পড়ানোর চেয়ে গল্প বল্‌তে হয় বেশী। দুনিয়ার সমস্ত খবর ও জান্‌তে চায়। নায়েগ্রার তোড়কে বেঁধে কেমন ক'রে বিদ্যুৎ তৈরি হয়; এরোপ্লেন আকাশে ওড়ে কেমন করে; পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে ধনী কে; নোবেল প্রাইজ কাকে বলে; এই রকমের যে কত প্রশ্ন ও ক'রে তার ঠিক্ নেই।

সেদিন পূর্ণিমার সন্ধ্যায় ছাদে মাদুর পেতে বসে আছি; গঙ্গা এসে বসলো আমার পাশটিতে।

বুকচাপা চারতলা বাড়ীখানার পেছন থেকে চাঁদ উঠলো। একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চাঁদের দিকে চেয়ে থেকে ও জিগ্যেস্ করলে—আচ্ছা বিশ্‌দা, চাঁদের বুকভরা ও কালো কালো ছোপগুলো কিসের?

আমি বল্লুম—চাঁদের মধ্যেও এই পৃথিবীর মত পাহাড়পর্ব্বত, বনজঙ্গল আছে, মানুষও আছে, তবে তারা অন্য রকম ···

ও ত একেবারে অবাক্। তারপর অনর্গল কত যে প্রশ্ন করে গেল তার ঠিক নেই। আমি চুপ করে শুনি, উত্তর দিই না, আর দেবই বা কি!

অশান্ত গঙ্গাফড়িংয়ের মধ্যে যে একটি ছোট্ট কবি ঘুমিয়ে ছিল, তা একদিন হঠাৎ ধরা পড়লো। ওর রাফ্ খাতাখানা ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে দেখি এক জায়গায় লেখা আছে—

'মাগো, আমায় হাতছানি দেয় ভোরের হাওয়ায়;
ডাকে আমায় সাঁঝের তারা চোখের চাওয়ায়।'

ভাবলুম বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের কোনো কবিতার দু'লাইন ও খাতায় টুকে রেখেচে; কিন্তু সে ভুলও আমার ভাঙলো যখন ও একখানি ছোট্ট নীল রঙের বাঁধানো খাতা এনে আমায় দেখালে। খাতা বোঝাই কবিতা।

সত্যি অবাক্ হয়ে গেলুম। গঙ্গার মত দশ বছরের দুরন্ত ছেলে যে এমন কবিতা লিখতে পারে, এ-কথা কোনদিন ভাবতেও পারিনি। ওর কবিতার মধ্যে কাঠ্‌পিঁপড়ের গান শোনা যায়; বর্ষারাতের কোলাব্যাঙ ওর কাছে মনের গোপন কথাটি বলে গেছে; উচ্চিংড়ের এরোপ্লেনে চড়ে ও অনেকদূর পাড়ি দিয়েছিল; ঘাসের মধ্যে পথ-হারানো ফড়িং ওর কাছ থেকে পথ জেনে নিয়েছিল; দখিন হাওয়া চল্‌তে চল্‌তে ওর জান্‌লার সাম্‌নে থেমে ওকে সেলাম করে গিয়েছিল সেদিন ভোরবেলায়; সন্ধ্যাতারার চোখে ও ওর মরে-যাওয়া খেলার সাথী নন্দরাণীর মুখখানি স্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল সেদিন; এম্‌নি কত আবোল্ তাবোল্। ···

ওকে আমরা বারণ করিনি কোনদিনও, উৎসাহই দিয়েছি বরাবর কবিতা লেখবার জন্যে।

আরও দু'বছর কেটে গেছে।

অনেকদিন পরে দেশে এসেছি।

হঠাৎ একদিন একখানা চিঠি পাই, কল্‌কাতাথেকে গঙ্গার মা লিখেছেন। লিখেছেন :—

"পরম কল্যাণবরেষু—

বাবা বিশু, তুমি যাবার তিন দিন পরে, তোমার গঙ্গাফড়িংও উধাও হয়েচে। কিছুতেই তাকে ধরে রাখতে পারলুম না বাবা! কি যে কাল রোগ এল, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই বাছা আমার শেষ হয়ে গেল।

আশা করি ভাল আছ। আমার আশীর্ব্বাদ জেনো।

ইতি

তোমার গঙ্গাফড়িংয়ের মা—

পুনশ্চ—যাবার সময় গঙ্গা ব'লে গেছে—"মা, বিশ্‌দাকে আমার সেই নীল রঙের বাঁধানো খাতাখানা দিও। তুমি যখন কলকাতায় আস্‌বে আমার এখানেই এস।"

* * *

চঞ্চল গঙ্গাফড়িং পালিয়ে গেছে। তা ত যাবেই; দখিন্ হাওয়াকে কি ধরে রাখা যায়!

সবচেয়ে বেশী কষ্ট হয় যখন ভাবি, বাঙলার একটি সত্যিকারের কবি কুঁড়িতেই ঝরে গেল।

কণ্টক

শ্রীজগৎ মিত্র, বি-এ,

গোলাপ শুন গো, গোলাপ আমার
প্রাণের ফুল,
রূপের তলায় কেন গো জ্বালায়
কাঁটার হুল?
গন্ধ তোমার পাইনি, কভুও তুলিনি দল,
তবু যে গো হায় কণ্টক ঘায় হ'নু বিকল।
তবু যে ভুল—
চঞ্চরী-মন সঞ্চরি' ফেরে প্রেম-মধু আশে সে যে ব্যাকুল,
ফুল অতুল!
তোমারে ঘেরিয়া কত না কাব্য কত না স্বপ্ন কত না ভুল,
গোলাপ ফুল!

জগতে যত না সুখ আছে তার
বেশী যে দুখ;
যত বলা যায় নীরব ব্যথায়
বেশী যে মূক।
এত হাসি আর এত যে মিলন এত যে গান,
তা'রি সাথে সাথে না-গাওয়া গীতের আত্মদান।
গোলাপ ফুল,
তোমার কাঁটায় খুন্ ঝরে যা'র গান গেয়ে যায় সে বুলবুল—
—কি মশগুল!
প্রেম-বাগিচায় গন্ধ বিলায় কান্নাহাসির অরূপ গুল—
—রূপসী ফুল!

রাঢ়ের কয়েকটি পল্লী ভ্রমণ

শ্রীহরিহর শেঠ

প্রত্যূষে উঠিয়া কাটোয়া হইতে একখানি গাড়ী লইয়া দাঁইহাট যাত্রা করিলাম। ইহা কাটোয়া হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। আজকাল আমরা অনেকে প্রায়ই দেশ বিদেশে ভ্রমণে যাই; অনেক সময় বর্ম্মা, রেঙ্গুন, জাভা, জাপান প্রভৃতি স্থান বেড়াইয়া তথায় প্রাচীন হিন্দু সভ্যতার নিদর্শনগুলি দেখিয়া পুলকিত হই; কিন্তু ঘরের পাশে যে-সব বিলুপ্তপ্রায় প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি ও হিন্দু-প্রাধান্যের চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দেখিবার আগ্রহ নাই। হুগলী জেলার মধ্যে দ্বারবাসিনী, পাণ্ডুয়া, মহানাদ প্রভৃতির ন্যায় রাঢ়ে কাটোয়া, দাঁইহাট, অগ্রদ্বীপ, বীরহাট প্রভৃতি এমন অনেক স্থান আছে যাহার পূর্ব্ব ইতিহাস উদ্ধার করিতে পারিলে অনেক জ্ঞাতব্য কথা জানা যাইবে। আজিও এ সকল স্থানের বনজঙ্গলের মধ্যে এমন-সব ধ্বংসপ্রায় ঐতিহাসিক নিদর্শন রহিয়াছে, যাহা অবলম্বন করিয়া তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে লুপ্ত ইতিহাসের উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হইতে পারে। আজিও যাহা দেখা যাইতেছে কাল-প্রভাবে তাহাও হয়ত নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু এমনই দেশের দুর্ভাগ্য, যাঁহাদের যত্ন চেষ্টা ও পরিশ্রমে এই কার্য্য অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইতে পারে, তাঁহাদের এদিকে আগ্রহ নাই। আর যাঁহাদের ইচ্ছা আগ্রহ আছে তাঁহাদের হয়ত সময় বা সামর্থ্যের অভাব। স্থানীয় কৃতবিদ্য লোকেরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে কাজ সহজ হয়।

পূর্ব্বকালে কাটোয়া হইতে দাঁইহাট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটাই যে একটা বা একাধিক পরস্পর-সংলগ্ন সহর ছিল, তাহা প্রাচীন সমৃদ্ধির লুপ্তপ্রায় ক্ষীণ নিদর্শনগুলি হইতে বেশ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যে পথ ধরিয়া দাঁইহাট যাইতে হয়, তাহা গঙ্গার ধার দিয়া গিয়াছে; কিন্তু গঙ্গা এক্ষণে বহুদূরে সরিয়া যাওয়ায় পথ হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হয় না। গঙ্গাগর্ভ এখন কোথাও উদ্যান, কোথাও জঙ্গলে পরিপূর্ণ, আবার কোথাও বা আবাদ হইতেছে। এখনও যাহা কিছু প্রাচীন সমৃদ্ধির চিহ্ন দেখা যায় তাহা প্রায় পথিপার্শ্বেই অবস্থিত। এই স্থান পূর্ব্বকালে ইন্দ্রানী পরগণার কেন্দ্র ছিল। এখানে ইন্দ্রেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি গঙ্গাতটে এক সুবৃহৎ মন্দিরমধ্যে ইন্দ্রেশ্বর নামে শিব স্থাপনা করিয়াছিলেন। মুসলমান-বিজয়ে তাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই ইন্দ্রানী যে পূর্ব্বকালে

রাজাডাঙ্গার প্রাচীন শিবমন্দির

অতি প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা কবিকঙ্কণ চণ্ডীর নিম্ন-লিখিত অংশগুলি হইতে বুঝিতে পারা যায়।—

"মণ্ডলাহাট ডাইনে আছে, থাকিব হাটের কাছে,
আনন্দিত সাধুর নন্দন।
সম্মুখেতে ইন্দ্রানী, ভুবনে দুলভ জানি
দেব আইসে যাহার সদন॥"

* * *

"ডাহিনে লালিতপুর বাহিল ইন্দ্রানী।
ইন্দ্রেশ্বরে পুজা কৈল দিয়া ফুল পানি॥"

* * *

"লহনা খুল্লনা কাছে মাগিল মেলানি।
বাহিয়া অজয়নদ পাইল ইন্দ্রানী॥"

কথিত আছে, বার ঘাটতের হাটে এই স্থান প্রসিদ্ধ ছিল। তিন শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে কবি কাশীরাম দাস তাঁহার মহাভারতে এই দ্বাদশ ঘাটকে ভাগীরথী-তীরের দ্বাদশ তীর্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,

"ইন্দ্রানী নামেতে দেশ পূর্ব্বাপর স্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা বৈশে ভাগীরথী॥"

এই সকল ঘাটের স্থান নির্ণয় করা এক্ষণে দুরূহ। এখানে একটি স্থানকে লোকে ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট বলিয়া দেখাইয়া থাকে। এখনও ইন্দ্রদ্বাদশীর দিন এই ঘাটে বহু যাত্রী স্নান করিতে আসেন।

রামানন্দ-পূজিত সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের কালীর কাঠাম

ইন্দ্রেশ্বরের মন্দিরের দ্বারদেশের উপরের প্রস্তরখণ্ড

মুকুন্দরাম ও কাশীরাম উভয়েই কাটোয়ার নাম না করিয়া ইন্দ্রানীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনুমিত হয়, সে সময় কাটোয়া অপেক্ষা ইহার প্রসিদ্ধি অধিক ছিল। কালক্রমে চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবের সংখ্যাধিক্যের সহিত কাটোয়ার নাম বিখ্যাত হইল, আর ইন্দ্রেশ্বর মহাদেব ইন্দ্রানীর রাজসম্পদ ও এখানকার সমৃদ্ধিগুলি লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে নামও লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন সে শিবমন্দির রাজবাড়ী ঘাট প্রভৃতির স্থান নির্ণয় করা প্রত্নতত্ত্বের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে।

দাঁইহাট আসিতে সর্ব্বপ্রথম পথিকের নয়ন আকৃষ্ট করে, পথিপার্শ্বে একটি কারুকার্য্য-খচিত অর্দ্ধ-প্রোথিত সুন্দর প্রস্তর স্তম্ভ। উহা কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরে নির্ম্মিত, কে কবে কোথা হইতে আনিয়া এখানে স্থাপিত করিয়াছে তাহা স্থানীয় লোকেরা কেহই বলিতে পারিল না। তথায় 'হনুমানের লাঠি' নামে ইহা খ্যাত। কেহ কেহ বলেন ইহা রাজবাড়ীর স্তম্ভ। আমার মনে হয়, এ অনুমান সত্য। উহার পার্শ্বেই হরগৌরীর মন্দির। ইহা একটি আড়ম্বরহীন চতুষ্কোণ গৃহ, দ্বার রুদ্ধ থাকায় ভিতরের বিগ্রহ দর্শনলাভ ঘটিল না। জনৈক মুসলমান কৃষককে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম, এই স্থানের নাম রাজার ডাঙ্গা। সে ব্যক্তি দূরে একটি স্থান দেখাইয়া বলিল— উহাই রাজার বাড়ী। একটি বাগান পার হইয়া কিছুদূরে আমাদের লইয়া গিয়া একটি প্রাচীন ভগ্নপ্রায় শিব-মন্দির দেখাইল।

সময় ও সুযোগের অভাবে ইচ্ছা সত্ত্বেও আমরা বন-জঙ্গলের ভিতর ঘুরিয়া দেখিতে পারিলাম না। কৃষকের নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া আমরা আর তিনটি অতি প্রাচীন মন্দির দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলাম। সে পথে গাড়ী যায় না, পদব্রজেই একটি মেঠো গ্রাম্যপথ ধরিয়া গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। দেখিলাম,

পথের একপার্শ্বে দুইটি, অপর পার্শ্বে একটি অতি জীর্ণ শিবমন্দির গাছপালার মধ্যে অর্দ্ধ-আবৃত অবস্থায় রহিয়াছে। দুইটির মধ্যে এখনও লিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে, অন্যটির দ্বারসমীপে লতাগুল্মাচ্ছন্ন থাকায় নিকটে যাওয়া সম্ভবপর হইল না। মন্দিরগাত্রে ইটের কাজগুলি দেখিলে উহা যে এক সময় বিশেষ সৌষ্ঠবপূর্ণ ছিল তাহা বেশ বুঝা যায়। এখানে এখন আর কোনো লোকালয় দৃষ্ট হয় না।

ইহা দেখিয়া আমরা আবার গাড়ীতে উঠিলাম। কিছু দূর যাইবার পর পথের পার্শ্বে ঠিক বাম দিকে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছের তলায় একখানি কারুকার্য্যময় সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ বৃহদায়তনের প্রস্তরখণ্ড দেখিলাম। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৮ ফুট ও প্রস্থে দেড় ফুট। ইহার মধ্যভাগে একটি দ্বিভুজ গণেশ-মূর্ত্তি আছে। অনেকেই অনুমান করেন ইহা ইন্দ্রেশ্বরের প্রবেশ-দ্বারের উর্দ্ধাংশ। ইহার গঠন এবং গণেশ-মূর্ত্তি দেখিয়া এ অনুমানও সত্য বলিয়া মনে হয়। পূর্ব্বে যে হনুমানের লাঠির কথা উল্লেখ করিয়াছি, উহাকে কেহ কেহ রাজবাড়ীর থাম বলিলেও উহাও
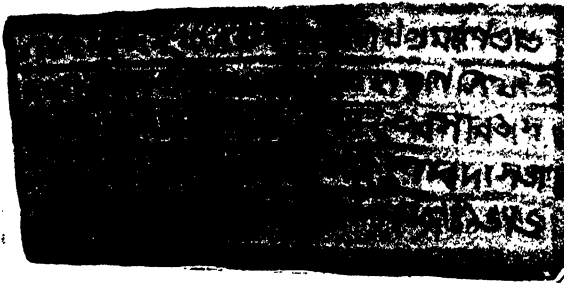
সুন্দরলাল তেওয়ারীর সমাধি-মন্দির-সংলগ্ন প্রস্তরলিপি

মন্দিরের অংশ হওয়া বিচিত্র নহে। এই নিদর্শনগুলি যেন পূর্ব্ববৈভবের সাক্ষ্য দিবার জন্য আজিও বিলুপ্ত না হইয়া ধরাপৃষ্ঠে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই-গুলি হইতে ইন্দ্রেশ্বরের অতীত গৌরব, উহার প্রস্তর-মন্দিরের সুবৃহৎ আয়তন ও সৌন্দর্য্যের কতকটা আভাস পাওয়া যায়। এখানে আরও কতকগুলি ছোট ছোট প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত রহিয়াছে।

এই গ্রামের নাম বেড়া বা বীরহাট। এখানে বৈদ্যনাথ সরকার নামক এক প্রবীণ গ্রামবাসীর সাক্ষাৎ পাইলাম। ইহার নিকটেই নিকারি পাড়ায়

সাধক রামানন্দ রায়ের পঞ্চমুণ্ডী আসন

ইন্দ্রেশ্বরের ঘাট ছিল, এইরূপ জনপ্রবাদ। পল্লীটি এ অঞ্চলে একটি পবিত্র স্থান। এককালে এখানে সুবিখ্যাত সাধক রামানন্দ, পূর্ণানন্দ, সুন্দরলাল তেওয়ারী প্রভৃতির পাট ছিল। আমরা ভদ্রলোকটির সহিত এই সকল পবিত্র স্থান দেখিতে যাইলাম। স্থানীয় জমিদার মহাশয়ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রথমেই সিদ্ধেশ্বরীতলায় রামানন্দের পাট দেখিতে গেলাম। স্নিগ্ধ পল্লীর তরুচ্ছায়াতলে একটি মন্দির পার্শ্বে ইহা অবস্থিত। ইহা সিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দির। এখানে প্রতি বৎসর মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি গঠিত হইয়া পূজা হইয়া থাকে। এই পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, একদিনের পরিবর্ত্তে অমাবস্যা, প্রতিপদ ও দ্বিতীয়া এই তিন দিবস এখানে পূজা হইয়া থাকে। কথিত আছে, সাধক রামানন্দ এই শ্যামা মায়েরই পূজা করিয়াছিলেন। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের ঠিক উত্তরে রামানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন। তৃণশষ্পসমাচ্ছন্ন তাঁহার পঞ্চমুণ্ডী আসন

আজিও দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। "শ্যামা দিগম্বরী রণ-মাঝে নাচো গো মা" প্রসিদ্ধ গানটি রামানন্দেরই রচিত।

মন্দিরের অদূরে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী দেখাইয়া আমাদের প্রদর্শক ভদ্রলোকগণ বলিলেন, উহার নাম 'কেশে পুকুর,' তাঁহাদের মতে উহা মহাভারত-প্রণেতা কাশীরাম দাসের স্মৃতিজ্ঞাপক। ইহার সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য কোনো চেষ্টা করিয়া তখন একটা সিদ্ধান্তে আসা আমার দ্বারা সম্ভবপর নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায়, কাশীরাম দাসের জন্মস্থান যদি সিঙ্গি গ্রাম হয় তবে তাহা এখানে নহে।

বদর সাহেবের আস্তানা

সমাজবাড়ী—দাঁইহাট

অল্প দূরে সুন্দরলাল তেওয়ারীর পাটে আমরা নীত হইলাম। এই স্থানে যাইতে আরও কতিপয় গ্রামবাসী আমাদের কাছে আসিলেন। তাঁহাদের মুখে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক কথা শুনিলাম। সুন্দরলালের পাটে তাঁহার অনতিবৃহৎ সুন্দর সমাধি-

দাঁইহাটের বিষ্ণুমূর্ত্তি—ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পুজিত

প্রাচীন ঘাট—দাঁইহাট
(কথিত আছে ইহা দ্বাদশ ঘাটের অন্যতম)

মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখিলাম। উহার গাত্রে সংলগ্ন প্রস্তরফলক হইতে জানা যায় ১৬৭৬ শকে শিষ্য নন্দকিশোর দাস দ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দাঁইহাট স্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দেব শর্ম্মণ মহাশয় আগ্রহসহকারে আমাদিগকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া এখানকার অনেক কথা বলিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পারিষদ শ্রীকৃষ্ণদাস ঠাকুরের পাট অনতিদূরে একাইহাটে ছিল। শোনা যায়, ভাস্কর পণ্ডিত এইখানেই দুর্গোৎসব করিয়াছিলেন।

এস্থান হইতে বিদায় লইয়া দেওয়ানগঞ্জ নামক স্থানে পৌঁছিলাম। এখানে বহুকাল পূর্ব্বে একটি সুবৃহৎ হাট ছিল; উহার প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান মাণিকচাঁদের নাম হইতে দেওয়ানগঞ্জ নাম হইয়াছে। বড় বড় অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায় স্থানটি জনবহুল ছিল। দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে এই প্রসিদ্ধ হাটের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন তাহা প্রায় এক মাইল সরিয়া গিয়াছে। বর্গীরা এই হাটের বিশেষ অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল বলিয়া শোনা যায়। এস্থানে এক সময় বড় বড় পাথরের মন্দির ছিল। বদর সাহেবের আস্তানা এখানে একটি প্রসিদ্ধ মুসলমান দরগা। ইহা বদর শাহ আউলিয়ার সমাধি। এই দরগার কোনো কোনো স্থানে যে প্রস্তর বসান আছে, তাহার শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়া বুঝা যায় উহা প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দিরের অংশ। বদর শাহ এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ। জনশ্রুতি এইরূপ, কোনো নৌকা বিপদে পড়িলে বদর সাহেবের পূজা মানত করিলে বিপদমুক্তি হইয়া থাকে। গঙ্গায় ঝড় উঠিলে অনেক মাঝিমাল্লাকে এখনও 'বদর বদর' বলিতে শুনা যায়। দেওয়ানগঞ্জের হাট এখন দাঁইহাটে উঠিয়া আসিয়াছে।

দেওয়ানগঞ্জ দাঁইহাটের অন্তর্বর্ত্তী বলিলেও হয়। এখানে পিতলের কাজ পূর্ব্বে খুবই ছিল। এই অঞ্চলের মত পাথরের দেব-দেবীর মূর্ত্তি গঠনে পারদর্শী ভাস্কর অন্যত্র খুব কমই আছে। ইহারা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে; এখন মাত্র এক ঘর আছে।

বর্দ্ধমানরাজের সমাজবাড়ী এই দাঁইহাটেই। ইহা কালনার সমাজবাড়ীর ন্যায় আড়ম্বরশালী না হইলেও, এখানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা আবু রায় হইতে মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্র পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানাধিপতিদের অস্থি সমাহিত আছে। ইহার অনতিদূরে পথিপার্শ্বে কতিপয় প্রস্তরমূর্ত্তি
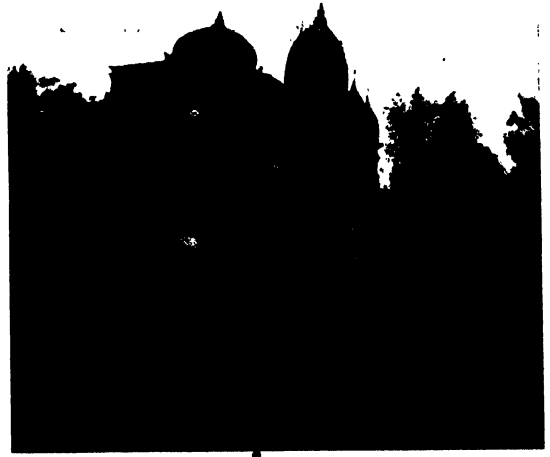
শ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তর মন্দির—জগদানন্দপুর

দেখিলাম। তিনটির মধ্যে একটি অর্দ্ধভগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি মনে হইল, অপর ভগ্নমূর্ত্তিটি ঠিক করিতে পারা গেল না। যেটি আজও অভগ্ন থাকিয়া ষষ্ঠী দেবী বলিয়া ভক্তের পূজা পাইতেছেন সেটি একটি বিষ্ণুমূর্ত্তি।

দাঁইহাটে আর দেখিবার মধ্যে দ্বাদশ ঘাটের অন্যতম দুই একটি জীর্ণ ঘাট। আর আছে পাইকপাড়ার পার্শ্বে জঙ্গল শাহের গড়ের চিহ্ন। তসরের কাজের জন্যও দাঁইহাটের প্রসিদ্ধি আছে। নিকটবর্ত্তী গ্রাম জগদানন্দপুরে একটি সুন্দর সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির আছে, আমরা তথায় যাত্রা করিলাম। এখানে গাড়ী যাইবার উপায় নাই, অগত্যা মধ্যাহ্নের রৌদ্রে মাঠ ভাঙিয়া চলিলাম। রেল পার হইয়া প্রায় দেড় মাইলের পর আমরা গন্তব্য স্থানে পৌঁছিলাম। স্থানটি জনবিরল,

সত্যই ইহা এ অঞ্চলের একটি অদ্ভুত কীর্ত্তি। মন্দিরটি উচ্চে তিন তলারও অধিক হইবে, পাঁচটি চূড়া-বিশিষ্ট। মন্দির নাটমন্দির ভোগ-মন্দির প্রভৃতি সমস্তই কারুকার্য্য-মণ্ডিত। লোহিতাভ প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বে উত্তর-রাঢ়ীয় ঘোষ-চৌধুরী বংশের রাধানাথ ঘোষ এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দির-মধ্যে শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দের বিগ্রহ বিরাজিত। সমস্ত রাঢ় দেশের মধ্যে এরূপ সুবৃহৎ প্রস্তরমন্দির আর একটিও নাই।

আসামের কুকি জাতি

শ্রীলালতুদাই রায়

বাঙ্গালী পাঠকগণ আসামের পার্ব্বত্য কুকি জাতির নাম শুনিয়া থাকিবেন। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড় ও পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পার্ব্বত্য অঞ্চলে এই কুকিজাতির বাস। আমি উক্ত কুকি-জাতীয় লোক। আমাদের সভ্যতা, বর্ব্বরতা, হিংস্রতা প্রভৃতি বিষয়ে নানা গল্প, আমাদের প্রতিবেশী বাঙ্গালী পাঠকগণ শুনিয়া থাকিবেন। আমিও আজ আমাদের অসভ্য সভ্যতা সম্বন্ধে কিছু বলিতে কিছু চেষ্টা করিতেছি,—বিশেষভাবে বাঙ্গালীদের নিকট। আমার গোত্র-পরিচয় অবগত হইয়া, পাঠকগণ নিশ্চয়ই আমার সর্ব্ববিধ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন, এই ভরসাতেই আমার এই প্রয়াস।

কুকিরা আপনাদিগকে কখনও কুকি বলিত না। কুকি বলিয়া কোন শব্দ তাহাদের ভাষাতে নাই। কখন কি ভাবে বলা যায় না, বাঙ্গালীগণ উহাদিগকে ঐ নামে ডাকিতে আরম্ভ করেন। উহার পর হইতেই কুকি শব্দের প্রচলন হইয়াছে। আজকাল কুকিরা আপনাদিগকে কুকি বলিয়াই পরিচয় দেয়। কুকি, লুসাই ও মণিপুরী একই জাতি। শারীরিক গঠনের কথা ছাড়িয়া দিলেও ভাষাতে এত সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতে স্পষ্টই উক্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়। শ্রীচৈতন্য দেবের পর বৈষ্ণব ধর্ম্ম মণিপুরীদের মধ্যে প্রচারিত হওয়াতে, মণিপুরীরা, কুকি ও লুসাই জাতি অপেক্ষা শিক্ষাদীক্ষায় আজকাল বেশী উন্নত।

কুকিরা কখনও লেখাপড়া জানিত না। জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস কতকটা অনুমান করিতে হয়। প্রবাদ যে, কুকিরা "সিনলুং" হইতে এদেশে আসিয়াছে। উহারা মঙ্গোলিয়ান জাতিরই এক শাখা। সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বে চীনদেশের কোনও স্থান হইতে এদেশে আসিয়াছে। ঐ চীন হইতে সিন এবং সিন হইতেই সিনলুং শব্দ পরিবর্ত্তিত ও প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

করুণাময় খৃষ্টান মিশনারীগণ যখন আমাদের কথা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহাদের প্রেমসিন্ধু উথলিয়া উঠিল। আমাদের ত্রাণের জন্য তাঁহারা এমন প্রেম করিলেন যে তাহাতে আমাদের হাবুডুবু খাইতে হইতেছে। আমাদের উপযুক্ত আলোকের সন্ধান এ দেশে না পাইয়া সাতসমুদ্র তেরনদীর পার হইতে উৎকৃষ্ট বিজলীবাতি আনিয়া আমাদিগকে আলোকিত করিয়াছেন। আলোকিত অবস্থার পূর্ব্বে আমাদের অন্ধকার অবস্থার কথা কিছু বলা দরকার।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি বিভাগ আছে এবং এক ব্রাহ্মণের মধ্যেই রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি নানা শ্রেণী আছে, সেইরূপ কুকিদের মধ্যেও প্রধানতঃ দুইটি বিভাগ—খসাক এবং খটলাং বা ঠিয়াক। খসাকদের মধ্যে খবুং, সেকং, লেইরি, হমারলুসেই, কেইভং, লুংটাও এবং ঠিয়াকদের মধ্যে আমং, খজল, তোলর, বুট্টীল, ভাংকাল, শেলাতে, পাকুমাতে, টাইতে, প্রভৃতি

নানা শ্রেণী আছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগানুসারে ভাষারও কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে।

কুকিরা বলিষ্ঠ, কষ্টসহিষ্ণু, যুদ্ধপ্রিয়, ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি। উহারা অন্যান্য অনেক পার্ব্বত্য জাতি অপেক্ষা শান্ত প্রকৃতির। পর্ব্বতে যাহাদের বাস, বাঘ ভালুক নেকড়ে যাহাদের প্রতিবেশী, তাহাদের যুদ্ধপ্রিয় হওয়াই স্বাভাবিক। কুকিরা চাষ করে, সুতা কাটে, কাপড় পরে, ভাত খায়, পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করে। গ্রামের প্রায় মাইল-খানেক দূরে কতকটা জঙ্গল পোড়াইয়া তাহাতে চাষের জমি তৈয়ার করে। তাহাতে ধান, তুলা, লাউ, কুমড়া, ভুট্টা, সীম, তিল, কচু, লঙ্কা,বেগুন, কাঁকুড় ইত্যাদির চাষ হয়। জমির একপার্শ্বে শস্য জমা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়। সেখান হইতে মাঝে মাঝে নিজেদের ব্যবহারোপযোগী শস্য বাড়ীতে আনা হয়। একজনের শস্য অন্যজনে কদাচ স্পর্শ করিবে না। চুরি করিলে ক্ষেত্রদেবতা রাগ করেন এবং ক্ষেত্রদেবতা রাগ করিলে ফসল হইবে না—এই বিশ্বাসেই কেহ কখন চুরি করে না। (এই সমস্তই অন্ধকার যুগের কথা, আলোকিত যুগে সমস্তই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে—তাহা পরে দেখান হইবে)। বাড়ীতে মুরগী, ছাগল, শূকর, মিথুন (এক প্রকার গরু), কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি পোষা হয়। মুরগী, ছাগল, শূকর, মিথুনের মাংস এবং বন্য শূকর, হরিণ, বন্যকুক্কুট ও নানা প্রকার পাখী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস পোড়াইয়া বা রান্না করিয়া খাওয়া হয়। শাক-সব্জী সিদ্ধ করিয়া লবণ ও লঙ্কা যোগে ভাতের সঙ্গে খাওয়া হয়। লবণ নিজেরা তৈয়ার করে। তুলা হইতে সুতা কাটিয়া মেয়েরা কাপড় বুনে। মেয়েরা দুইখানা কাপড় পরে—ছোট একখানা কোমরে ও বড় একখানা বুকে জড়ান থাকে। পুরুষেরা চার-পাচ হাত দীর্ঘ কাপড় লুঙ্গীর মত পরে। শিকার বা যুদ্ধের পোষাক স্বতন্ত্র। বড় একখানা মোটা চাদর মাঝে ভাঁজ করিয়া দুই পাড়ের দিক সেলাই করিলে একটি থলিয়ার মত হয়। তাহাতে হাতের ও গলার জন্য ছিদ্র থাকে। উহাতে কাঁধ হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত আবৃত হয়। ছোট আর একখানা কাপড় কোমরে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। মাথায় পাগড়ী থাকে। কাজের সময় যুবকেরা চার-পাচ হাতের একখানা গামছা মাত্র পরে। আজকাল ক্রমশঃ পোষাকের পরিবর্ত্তন হইয়া যাইতেছে।

বহু পরিবার একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কোন কোন গ্রামে ২৫০।৩০০ ঘর লোকও বাস করে। গ্রামে

প্রবন্ধ-লেখক—শ্রীযুত লালতুদাই রায়

একজন সর্দ্দার থাকেন, তাঁহাকে রাজা বলা হয়। রাজা তাঁহার অধীনস্থ প্রত্যেক শ্রেণী হইতে এক একজন মন্ত্রী গ্রহণ করিতেন। গ্রামবাসীদের আপদে বিপদে উঁহারা আবশ্যক-মত ব্যবস্থা করিতেন। ঝগড়া-বিবাদ উঁহারাই মীমাংসা করিয়া দিতেন। ব্যবস্থা বিচার সমস্তই রাজার ঘরে সম্পন্ন হইত। প্রত্যেক গ্রামবাসী রাজার আদেশ মান্য করিয়া চলিত। রাজা ছাড়া প্রত্যেক গ্রামেই একজন পুরোহিত ও একজন কর্ম্মকার থাকিতেন। যে-সমস্ত বিচার রাজা করিতে পারিতেন না, পুরোহিত নানা অভিনব উপায়ে সেই সব মীমাংসা করিয়া দিতেন। প্রতি বৎসর ফসল কাটা হইলে, রাজা, পুরোহিত ও কর্ম্মকার প্রত্যেকে এক এক ঝুড়ি ধান প্রতি গৃহস্থের নিকট কর স্বরূপ পাইতেন।

বাহিরের শত্রু এবং বন্য জন্তুর আক্রমণ হইতে গ্রামকে রক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে কাঠের বেড়া থাকিত। গ্রামস্থ যুবকেরা পালা করিয়া রাত্রে গ্রাম পাহারা দিত। শিকারে ও যুদ্ধে আগে তীর ব্যবহৃত হইত, পরে বন্দুকের প্রচলন হইয়াছে। পাহাড়ীদের মধ্যে এমন যুবক নাই, যে বন্দুক ব্যবহার করিতে জানে না। সাপের মাথা হইতে বিষ কৌশলে তীরের ফলাতে মাখাইয়া রাখা হইত। সেই তীর যাহাকেই বিদ্ধ করুক তাহার আর নিস্তার ছিল না। কুকি অধিকৃত স্থানগুলি ইংরাজের অধিকারে আসিবার পূর্ব্বে ইহাদের নিজেদের মধ্যেও যথেষ্ট যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে।

কুকিদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতামাতাই দিয়া থাকেন। বিবাহের পর বধূ শ্বশুরঘরে গিয়া বাস করে ও শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করে। কুকিরা ভাত হইতে এক প্রকার মদ্য তৈয়ারী করে। তাহা পান করিলে বেশী নেশা হয় না বা বিশেষ কোন অনিষ্টও হয় না। যুবক-যুবতীরা ক্ষেত্রে কাজ করে। বৃদ্ধবৃদ্ধারা বাড়ী ঘর ও ছোট ছোট ছেলেমেয়ের তত্ত্বাবধান করে। ক্ষেতে যাইবার পূর্ব্বে গ্রামের সমুদয় যুবক-যুবতী মদ্য পান করিয়া একত্রে দলবদ্ধ হইয়া ক্ষেত্রে রওয়ানা হয়। যুবকদের মধ্যে যাহার কণ্ঠস্বর অতিশয় মিষ্ট সেই দলের নেতা হয়। উক্ত নায়ক একটি ঢোলক ও শিঙ্গা বাজাইয়া গান করিতে থাকে। তাহার সঙ্গে সকলেই গান করিতে করিতে অগ্রসর হয়। সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দিন ধরিয়া ক্ষেতের কাজ চলিতে থাকে।

যদিও খৃষ্টান মিশনারীগণ অস্বীকার করেন—তবুও আমরা কুকি সমাজকে বিরাট হিন্দুজাতিরই একটি অংশ মনে করি। সরকারী গণনায় কুকিদিগকে হিন্দু লেখা হয় না; পার্ব্বত্যধর্ম্মী বলিয়া লেখা হয়। তাহার নানা কারণ আছে,—তাহা এখানে আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। কুকিরা পরমেশ্বরে বিশ্বাসী। ইহারা পরমেশ্বরকে "পাথিয়ান" বলে।

হিন্দুদের অনুরূপ বহুদেবতার পূজা শ্রাদ্ধাদি ও পিতৃদেবতার পূজা কুকিদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রচারিত আছে যে পার্ব্বত্যজাতিরা ভূতোপাসক। ভূতের পূজা আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অস্বীকার করি না। খৃষ্টান ও মুসলমানদের সয়তান, বা বৌদ্ধদের মারের সম্বন্ধে যে বিশ্বাস, আমাদের ভূত সম্বন্ধে বিশ্বাসও তদপেক্ষা বিশেষ নিকৃষ্ট নহে। আমরা শিব, কালী, গঙ্গা, রামলক্ষ্মণ, ও লক্ষ্মীর পূজা করি। কুকিদের বিশ্বাস, দেবতারা সুখসম্পদ দেন—ভূতেরা শুধু রোগ, শোক ও দুঃখ দেয়। হিন্দুসমাজের যে-কোনও নিম্নস্তরের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আচরণের সঙ্গে আমাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। পূজাতে পশুবলি হয়। মদ্যপান, নৃত্য, বাদ্য ও সঙ্গীত সবই হয়।

আমাদের দিনগুলি ভালভাবেই চলিয়া যাইত। আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল এবং তাহা পূরণের জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইত না। গ্রামস্থ সমুদয় লোক এক পরিবারের লোকের মত বাস করিত। একজন অন্যজনকে বিপদের সময় প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিত। সমুদয় অশান্তির মূল "স্বার্থ" জিনিষটি আমাদের মধ্যে বড় ছিল না।

অন্ধকার যুগের কথা সংক্ষেপে বলা হইল—এইবার আলোকিত যুগের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—মিশনারী মহাত্মারাই আমাদিগকে প্রেম দিয়া হঠাৎ এই আলোকে লইয়া আসিয়াছেন। অন্ধকার হইতে হঠাৎ এই তীব্র আলোকে আসিয়া আমাদের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়াছে। অন্ধকারে আমরা ছিলাম বরং ভাল। আলোকে যে চোখ যায়! পথও খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমাদিগকে পথের সন্ধান কে দিবে?

গৃহবিবাদে ও যুদ্ধবিগ্রহে দুর্ব্বল পার্ব্বত্যজাতি ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করিল। শাদা-লোক তাহাদের চোখে এক ভীতির বস্তু। সেই সময় মিশনারীরা গিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন,—'প্রভু যীশুকে বিশ্বাস কর—তোমরা পরিত্রাণ পাইবে। যীশু আমাদিগকে তোমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। তোমরা পশু, তোমরা অসভ্য, মূর্খ, বর্ব্বর, ভূত। তোমরা কিছু জান না। তোমরা খ্রীষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর। ইংরাজ খ্রীষ্টান, তাই দেখ কত বড়। দেখ—যীশু আমাকে কেমন সুন্দর

জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন। আমার কথা শুনিলে তোমরাও এইরূপ পাইবে। অসুখ হইলে তোমরা ভূতের পূজা কর। তোমরাও ভূত। এই দেখ যীশু আমাকে কেমন সুন্দর ঔষধ দিয়াছেন।' পাদ্রী গ্রামস্থ কোন রোগীকে কিছু ঔষধ খাওয়াইয়া দিলেন। জীবনে কখনও যে ঔষধ খায় নাই, ঔষধ খাওয়া মাত্রই হয় ত আরোগ্য লাভ করিল। খ্রীষ্টধর্ম্মে আর কি অবিশ্বাস থাকিতে পারে? অজ্ঞ সরল পার্ব্বত্যলোকেরা কতক ভয়ে, কতক বিস্ময়ে, কতক লোভে মিশনারীদের কথা শুনিতে লাগিল। ধীরে ধীরে কেহ কেহ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কোন কোন সংক্রামক রোগের লক্ষণ এইরূপ শুনিয়াছি, নিজে কষ্ট পাইতেছে এবং অন্যের সঙ্গে মিশিলে অন্যেরও রোগ হইতে পারে এ কথা জানিয়াও রোগী অন্যের সঙ্গে মিশিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করে। আমাদের বেলাও তাহাই হইতেছে, যাহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে তাহারা নিজে ভাল না থাকিলেও, অন্যকে সর্ব্বদা দলে টানিবার বিশেষ পক্ষপাতী। চা-বাগানের আড়কাঠির মত ইহাতে বেশ দুপয়সা রোজগারও হয়—প্রসাদী হ্যাট, কোট, জুতাও পাওয়া যায়।

মিশনারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ আমরা স্বর্গের দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। সেখানে নাকি আমাদের 'সিট্ রিজার্ভ' হইয়া আছে। আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনের উপর আজ খ্রীষ্টান। গ্রামে গ্রামে খড় ও বাঁশের চার্চ্চ ও স্কুল স্থাপিত। আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে সিগারেট ও মাথায় টুপি।

আমাদের পিতা, পিতামহ ভূত ছিলেন ও বর্ব্বর ছিলেন, আর আমরা আজ ধাপে ধাপে স্বর্গের দিকে অগ্রসর হইতেছি। আমরা সভ্য হইয়াছি, আলোকিত হইয়াছি। সুতরাং পাঠকগণের নিকট আমার বিনীত অনুরোধ, আপনারা আমাদিগকে আর ঘৃণা করিবেন না। আপনারা আমাদিগকে এখন আর ঘৃণা করিতে পারেনই না,—বরং আমরাই ত হিদেন ও পৌত্তলিক বলিয়া আপনাদিগকে কিছু কিছু ঘৃণা করিতে অভ্যাস করিতেছি।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখা দরকার। ব্যক্তিগত বা কোন সম্প্রদায়বিশেষের বিদ্বেষ বা নিন্দা প্রচার করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কুকিদের অবস্থা আজ জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যে-সব সমস্যা আজ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত, তাহার কোনও মীমাংসা করিতে না পারিয়াই সুধিগণের সহায়তা-কামনায় এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কুকিদের কথা আলোচনা করিতে গেলেই নানা অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা অনিবার্য্য। আমি অপ্রিয় কথাগুলি যথাসাধ্য বাদ দিয়াই লিখিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অবাঙ্গালী অপটু লেখকের বাঙ্গালা লেখাতে তাহার উদ্দেশ্যের বিপরীত ভাব কেহ দেখিতে পাইলে, তাহা তাহার অনভ্যস্ত হস্তেরই দোষ মনে করিয়া মার্জ্জনা করিবেন।

মিশনারীগণ আমাদের জন্য কি কি করিয়াছেন ও করিতেছেন?—(১) অসভ্যজাতিকে সভ্য করিতেছেন। (২) ধর্ম্মহীন জাতিকে ধর্ম্ম দান করিতেছেন। (৩) সাহিত্য-হীন জাতিকে সাহিত্য দান করিতেছেন। (৪) ঔষধ দিতেছেন। (৫) মদ্যপান বন্ধ করিয়াছেন।

(১) মিশনারীরা আমাদিগকে সভ্য করিতেছেন। এই সভ্যতার অর্থ কি? সভ্যতার অর্থ যদি পোষাক-পরিচ্ছদ হয় তবে কথাটি ষোল আনাই সত্য বটে। প্রত্যেক দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা, আবহাওয়া একরূপ নহে। যেখানের যে অবস্থা সেই অবস্থার সঙ্গে মিল করিয়া মানুষের আহার-বিহার, পোষাক-পরিচ্ছদের ব্যবস্থা করিতে হয়। আজ যখন আমাদের পল্লীতে পল্লীতে হ্যাট্, কোট, বুট, সিগারেটের ধূম দেখি,—তখন কাকের ময়ূর সাজিবার গল্পই মনে হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের অভাব অতি সামান্য ছিল, কিন্তু এখন নিত্য নূতন অভাবের সৃষ্টি হইতেছে, অথচ সেই অভাব মোচনের কোন নূতন বৈধ উপায় আবিষ্কৃত হইতেছে না। উদ্দাম বিলাসিতাই যদি সভ্যতা হয়, তবে সেই সভ্যতাকে দূর হইতে নমস্কার করাই ভাল। আমাদের যা-কিছু সবই খারাপ, আর পাশ্চাত্যের যা-কিছু সবই ভাল, এই একটা ভাব সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে যুবকদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এ ভাব আনিয়াছে কাহারা? আমাদের অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল না,—এবং

আমাদের আর্থিক অবস্থা তেমন ভালও নয়। আমাদের মত অজ্ঞ ও অসমর্থ জাতির মাথায় এইরূপ সভ্যতার প্রচণ্ড বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই ভাবি ইহার শেষ কোথায়? যদি বলা যায়, আমাদের নানা কুসংস্কার দূর করা হইতেছে। হইতে পারে, একথা আংশিক সত্য, কিন্তু গাছের আগাছা কাটিতে গিয়া, যে মালী গাছেরই মূলচ্ছেদ করে, আজ আমাদের শিক্ষকেরাও সেইরূপ করিতেছেন না কি? কুকিরা মনে করিত, চুরি করিলে দেবতা রাগ করেন, আর দেবতা রাগ করিলে শস্য হইবে না, এবং আরও নানা অমঙ্গল হইবে। এই বিশ্বাসে কেহ কখনও চুরি করিত না। ইহা একটি কুসংস্কার। আর আজ যিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন—তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রীষ্টই দায়ী। তিনি ত তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং যাহা প্রাণ চায় কর—কেবল খ্রীষ্টকেই বিশ্বাস করিলেই হইল। এই বিশ্বাসের নাম সুসংস্কার। সভ্যতার উচ্চ সোপানে আমরা কিরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছি, ইহা তাহার একটি মাত্র নমুনা। দরকার হইলে এইরূপ উদাহরণ অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। কুকিদের সত্যবাদিতা, সরলতা, সাধুতা, বিশ্বাসপরায়ণতা, আতিথেয়তা প্রসিদ্ধ। কিন্তু এখন সভ্য হইয়া সত্যবাদী হইলে ব্যবসায়ই যে বন্ধ হইয়া যায়। সরলতা, সাধুতা ও বিশ্বাসপরায়ণতার কথা বলিবার দরকার নাই। এ সব ত বোকামি। নিজের আত্মীয়কুটুম্বও সব সময়ে গৃহে স্থান পান না, এই ত গেল আতিথেয়তা। সভ্যতা লাভ করিতে গিয়া আমাদের যা কিছু ছিল সবই হারাইলাম।

গ্রামে গ্রামে স্কুল ও চার্চ্চ আছে। লেখাপড়া শিখিবার জন্য আমাদের জাতির কিরূপ উৎসাহ তাহা নিজে না দেখিলে বিশ্বাস করা যায় না। ৩০।৩৫ বৎসরের লোকেও ১০।১২ বৎসরের বালকের সঙ্গে লেখাপড়া করিতেছে, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মিশনারী বিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোনও বিদ্যালয় পাহাড়ে নাই, মিশনারীদের বিদ্যালয়ে অখ্রীষ্টান কোন ছেলেমেয়ে পড়ে এরূপ কথা কখনও শুনি নাই।

দেশীয় প্রচারককে পাস্তর বলে। গ্রামে গ্রামে পাস্তর আছে। এই পাস্তরগণ ও গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণই ধর্ম্ম প্রচার করেন, লোককে খৃষ্টান করিবার জন্য ও পাশ্চাত্য ভাব দিবার জন্য যে কিরূপ প্রোপ্যাগাণ্ডা করা হয় তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত। বলিতে গেলে সব সময় রুচি বা শ্লীলতা রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা জানি না। আমরা অজ্ঞ, সাহিত্যহীন, নিরাশ্রয়, অরণ্যবাসী, নাবালক মাত্র। যে আমাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতেছে তাহারই হাতে আত্মসমর্পণ করিতেছি। যে আমাকে, আমার পূর্ব্বপুরুষকে, আমার দেশকে, শতমুখে নিন্দা করিতেছে—আমরা তাহারই সঙ্গে সহস্রমুখে আমাদেরই বাপান্ত করিতেছি ও মাথায় কুঠার মারিতেছি। এইভাবেই ধ্বংসের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া আমরা সভ্যতা পাইতেছি—অন্ধকার হইতে আলোকে যাইতেছি।

(২) একটি ধর্ম্মহীন জাতিকে ধর্ম্মদান করা হইতেছে। আমরা কখনও ধর্ম্মহীন ছিলাম না। আমরা যদি ধর্ম্মহীন হই, তবে ভারতের ২০ কোটি হিন্দুর মধ্যে ১৫ কোটিই ধর্ম্মহীন। হইতে পারে, আমাদের কোন ধর্ম্মগ্রন্থ নাই, হইতে পারে, আমাদের মধ্যে ধর্ম্মের সম্যক বিকাশ হয় নাই, কিন্তু আমাদের যাহা আছে, তাহার উন্নতির চেষ্টা না করিয়া যে ধর্ম্মদান করা হইতেছে, তাহাতে মনে হয় গাছের মূলোচ্ছেদ করিয়া মাথায় জল দেওয়া হইতেছে, অথবা মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে যোগ করিয়া দেওয়া হইতেছে।

আমাদের প্রকৃত অভাব ধর্ম্মের নয়। শিক্ষার কালচারের। ধর্ম্মদান ব্যাপারটা অনেকেই যত সোজা মনে করেন তত সোজা নয়, যে-সে লোক ধর্ম্ম দিতেও পারে না, লইতেও পারে না। কিন্তু আজ দেখিতেছি, যে-সে লোক ধর্ম্মদাতা সাজিয়া মোটা বেতন (অবশ্য আমাদের তুলনায়) পাইতেছেন এবং হাজার হাজার লোককে ধর্ম্মদান করিতেছেন। এই ধর্ম্মদান ব্যাপার একটি বাহ্যিক ভাণ নয় কি?

(৩) আমাদের কোন লিখিত গ্রন্থ ছিল না। আমাদের ভাষার কোনও বর্ণমালাও নাই। পাদ্রীদের কল্যাণে আমাদের ভাষায় রোমান বর্ণমালায় অনূদিত হইয়া

মাত্র কতকগুলি খৃষ্ট ধর্ম্মগ্রন্থ ও চার্চ্চের গানের পুস্তক ছাপা হইয়াছে। তাহাতে আমাদের সাহিত্যের যে কি হইল বুঝিতেছি না। রোমান বর্ণমালা একে বিদেশী, তার উপর আমাদের ভাষার যথার্থ উপযোগী বলিয়া মনে হয় না। রোমান বর্ণমালা অপেক্ষা বাংলা বর্ণমালাতে আমাদের ভাষা ভাল লেখা হইবে বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালীরা আমাদের প্রতিবেশী। আমাদের সমুদয় ব্যবসা বাঙ্গালীদের সঙ্গে। সুতরাং বাঙ্গালা ভাসা জানা আমাদের নিতান্ত দরকার। তার উপর বাংলার মত একটি উন্নত ভাষার মানসিক সম্পদের অধিকারী হইবার সুযোগ পাইলে আমাদের যথার্থ উপকার হয়। আমাদের সমগ্র জাতিই বাংলা ভাষা শিখিবার জন্য খুব উৎসুক। কিন্তু সুযোগ কোথায়? মিশনারীদের বিদ্যালয়ে সামান্য ইংরেজী মাত্র শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রগণকে বেশী শিক্ষা প্রদান করা কর্তৃপক্ষ অনাবশ্যক মনে করেন, কোনও রকমে বাইবেলখানা পাঠ করিতে পারিলেই হইল। আবার যাহা শিক্ষা দেওয়া হয় তাহাও এত অপ্রচুর যে, যদিও বা কোন ছাত্র মিশনারীদের বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হইয়া শিলচর হাইস্কুলে ভর্ত্তি হয়, তাহা হইলে সেখানে পড়া ভাল চালাইতে পারে না। মিশনারীদের স্কুলে কখনও বাংলা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয় না। বিদেশী পোষাক আমাদের পোষাক হইয়াছে। পারি আর না পারি, বিদেশী আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছি। বিদেশী বর্ণমালায় আমাদের লেখাপড়া চলিতেছে। প্রতিবেশী বাঙ্গালীর সঙ্গে আমাদের কথা কহিতে হইলে আমাদের ইংরেজীর আশ্রয় লওয়া ছাড়া উপায় নাই। ইহাতে আমরা ক্রমশঃ এদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছি এবং ইহার একমাত্র কারণ এই মিশনারী আন্দোলন।

(৪) ঔষধ দেওয়া হইতেছে। ঔষধ দিয়া মিশনারীরা শুধু খ্রীষ্টান-পরিবারদের যথেষ্ট উপকার করিতেছেন,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তবে শিক্ষাহীন জাতির পক্ষে সবই বিড়ম্বনা। রোগ দিন দিন বাড়িতেছে। সুস্থ সবলকায় লোকের সংখ্যা দিন দিন কমিতেছে। পাহাড়ীরা নানা প্রকার গাছ-গাছড়া হইতে ঔষধ ব্যবহার করে। সেগুলি রোগে চমৎকার কাজ করিত। এখন এই সব অসভ্যতা। ঘরে ঘরে বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধ দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে বিক্রয় করা হইতেছে। ডাক্তারখানাতে ডাক্তারের দরকার হয় না—কম্পাউণ্ডার বাবুরাই ধন্বন্তরী। অনেক সময়ে অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী হইয়া দাঁড়ায়। তবে পাহাড়ীরা এ সব বোঝে না, তাই রক্ষা।

মিশনারীরা ঔষধ দিয়া আমাদের উপকার করিতেছেন। সেই ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে আমরা মিশনারীদের নিষ্কাম প্রেম ও প্রভু যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া দৃঢ় (অন্ধ নয়) বিশ্বাস করিতে ত্রুটি করিতেছি না।

(৫) যাহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহারা কেহই মদ্য পান করে না। বাহির হইতে দেখিলে এ একটা মস্ত কাজ বটে। মদ্যপান না করাই ভাল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমরা নিজে ভাত হইতে এক প্রকার মদ্য তৈয়ার করিয়া উৎসবের সময় বা ক্ষেতের কাজ করিবার সময় পান করি। তাহাতে স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করে বলিয়া কোথাও দেখি নাই। এই মদ্য বন্ধ করাতে আবালবৃদ্ধবনিতা সিগারেট ধরিয়াছে। পাঁচ বৎসরের শিশুরও সিগারেট না হইলে আর চলে না। কোনও জাতির মধ্যে মাদকদ্রব্যের ব্যবহার একেবারে বন্ধ করা শক্ত। স্বাস্থ্যহানি ও অর্থহানির দিক হইতে মাদকদ্রব্যের বিচার করিলে কি দেখি? আমাদের দেশীয় মদ্য অপেক্ষা শুধু সিগারেটে কমপক্ষে এক হাজার গুণ খরচ বেশী। দেশীয় মদ্য প্রস্তুত করিতে আমাদের কোনও খরচ লাগে না। দেশীয় মদ্যে কাহারও স্বাস্থ্যের কোন প্রকার হানি করিতে আমি কখনও দেখি নাই। সিগারেট কি ক্ষতি করে তাহা ত চিকিৎসকগণের অভিমতই প্রামাণ্য। সিগারেটের মত চায়ের কাটতিও দিন দিন ভীষণভাবে বাড়িতেছে। আমাদের মত গরীব জাতির পক্ষে এই সব বালাই সুখের না হইয়া দুঃখেরই হয়।

আমাদের উপার্জ্জনও বেশী ছিল না, সেইরূপ অভাবও বড় ছিল না। ছেলেমেয়েরা পিতামাতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিত। বধূরা শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করিত। দিনগুলি আমাদের শান্তিতে যাইত। বাইবেলের নিউ টেষ্টামেণ্টে আছে—যীশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা

পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, পিতামাতারা ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" এই কথার উপর খুব বেশী জোর দিয়া প্রচার করা হইতেছে। অধিকাংশ স্থলে যুবকেরাই পাশ্চাত্য চাকচিক্যে মোহিত হইয়া খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা যখন শুনিতে পায় পিতামাতার কথা শুনিবার দরকার নাই, তখন আর তাহাদিগকে কে রাখে? যুবক-যুবতীরা পিতা-মাতার অবাধ্য, অনেকস্থলে বৃদ্ধ পিতামাতাকে অসহায় অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া যায়। গ্রাম্য পাস্তর (প্রচারক) মুসলমান মোল্লার মত গ্রামের একচ্ছত্র অধিপতি। তাঁহার হুকুমই খোদার হুকুম। ছেলেমেয়ের উপর পিতামাতার কোন হাত নাই। তিনি যাহা বলেন তাহাই হয়। ছেলেমেয়ের বিবাহ পিতামাতাই দিত, এখন তাহা পাস্তরের ইচ্ছাধীন। তিনি যেখানে ইচ্ছা বিবাহ দিতে পারেন বা যখন ইচ্ছা বন্ধও করিতে পারেন। ইহাতে পিতামাতার বলিবার কিছু নাই। এই সব কারণে আমাদের পারিবারিক জীবন যে কিরূপ বিষময় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বলিবার নয়।

মিশনারী আন্দোলন সকল প্রকারে আমাদিকে ধ্বংসের পথে লইয়া চলিয়াছে। কে-ই বা বুঝিবে আর কাহার নিকটেই বা কাঁদিব? আমার স্বজাতীয় বৃদ্ধদের মধ্যে যাহারা এখনও খ্রীষ্টান হয় নাই, তাহারা সমাজে কোণঠাসা। তাহারা একে নিরক্ষর, তার উপর পাদ্রীদের অত্যাচারে জর্জ্জরিত। আর দেশবাসীর নিকট আমরা ত বাঘ ভালুক বা এই রকম কিছু।

পতিত জাতিদের সাহায্য করিবার জন্য আজ সারা ভারতময় আন্দোলন চলিতেছে। আমরা পতিত, নিরাশ্রয়। বিরাট হিন্দুসমাজের দ্বারে আমরা ভিক্ষা-প্রার্থী, কৃপাপ্রার্থী। আমরা পতিত, অক্ষম, বা যাই হই, আমরা হিন্দুই। সমগ্র জাতির এককোণে আমরাও কি একটু স্থান পাইব না? আমরা কি এতটুকু সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত হইব? মিশনারী আন্দোলন কি ভাবে আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেছে, তাহা লিখিতে গেলে একখানা বৃহৎ পুস্তক হইবে। আমি অতি সংক্ষেপে লিখিয়াছি।

খ্রীষ্টীয় আন্দোলন কেবল যে আমাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে তাহা নয়, ইহাতে সমস্ত দেশেরই একটি বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। আমি ধর্ম্মের দিক হইতে বলিতেছি না; কারণ শুধু ধর্ম্মের জন্য কাহারও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। ধর্ম্ম হিসাবে খ্রীষ্টধর্ম্মকে বা কোন ধর্ম্মকেই আমি অশ্রদ্ধা করি না। আমি দেশের দিক হইতে বলিতেছি, জাতীয়তার দিক হইতে বলিতেছি। আজ দেশের সমুদয় চিন্তাশীল ব্যক্তিই একটি কথা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছেন, "হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান না হইলে ভারতের কল্যাণ নাই।" এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার জন্য দায়ী কে? হিন্দুরাই নহে কি? যখন মুসলমানরা এদেশে আসিয়াছিল তখন তাহাদের কয়জনই বা এদেশে স্থায়ীভাবে বাস করিয়াছিল। ভারতের প্রায় সমুদায় মুসলমানই ত এককালে হিন্দু ছিল। কেন তাহারা মুসলমান হইল? কেন ইহারা হিন্দু-ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে এবং এই হিন্দু মুসলমান সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে? এর জন্য দায়ী কে? বলা যাইতে পারে, উচ্চবংশের হিন্দুরা কখনও স্বেচ্ছায় ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করে না। হইতে পারে ইহা সত্য কথা। হিন্দুসমাজ তাহার নিম্ন শ্রেণীকে আপন গণ্ডীর মধ্যে রাখিতে পারেন না কেন? কেবল দল ছাড়া নয়, প্রতিপক্ষের দল বৃদ্ধি করা। এই সব দেখিয়া মনে হয়, আজ হিন্দু মুসলমান সমস্যার সমাধান ত হইতেছেই না, উপরন্তু আবার খ্রীষ্টান সমস্যা নামক তৃতীয় সমস্যা ধীরে ধীরে মাথা তুলিতেছে। হিন্দুসমাজ আর কত কাল ঘুমাইবেন? এতদিনে অন্ততঃ ঠেকিয়াও শেখা উচিত ছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের বিষয় চিন্তা করিয়া কোন কূলকিনারা পাই না। সুধিগণের উপদেশ ও সহানুভূতি পাইবার আশাতেই এই প্রবন্ধ লিখিতেছি। কাছাড়, মণিপুর, লুসাই পাহাড়ের শত শত বর্গ মাইল ধরিয়া কেবল পাহাড় এবং এই পাহাড়ে হাজার হাজার পাহাড়ী লোক বাস করিতেছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে উহারা কিরূপ ভাবে দিন দিন সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দেশের নিকট পর হইয়া যাইতেছে, তাহা কেহই বুঝিতেছেন না।

পাহাড়ীরাও বুঝিতেছে না। কিন্তু কালে এর ফল বিষময় হইবে এবং সেই বিষময় ফল সমগ্র দেশবাসীকেই ভোগ করিতে হইবে। ইহারা চিরকালই অসভ্য থাকিবে না। এখনও সময় আছে। এখনও দেশবাসীরা ইচ্ছা করিলে ইহাদিগকে টানিয়া লইতে পারিবেন। বিশেষতঃ পাহাড়ীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা কমিয়া গিয়াছে। প্রচারকগণের চরিত্রই বোধ হয় এর জন্য দায়ী। খ্রীষ্টানদের মধ্যে অনেকেই আজকাল নাম কাটাইয়া লইতেছে। ইহারা এখন বাহিরের কোন জিনিষ চাহিতেছে। এখনই যদি উহাদিগকে শিক্ষা ও ধর্ম্ম দিয়া সাহায্য করিতে কেহ অগ্রসর হন তবে যথার্থ উপকার হইবে। একটা অবলম্বন ভিন্ন কেহ থাকিতে পারে না। আমাদের মধ্যে যাহারা মিশনারী আন্দোলনে যোগ দেয় নাই বা একবার যোগ দিয়া সংস্রব ত্যাগ করিয়াছে তাহারা আজ দেশবাসীর নিকট হইতে সারবান কিছু চাহিতেছে। কিছু দিন অপেক্ষা করিয়া যদি কিছু না পায়, তবে "পুনর্মূষিক" হইয়া যাইবে।

নিষ্কলঙ্ক

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাদ্রের অপরাহ্ণ। বেলা পাঁচটা। দুঃসহ গরম। পাথর-বাঁধা সহরের পথ ও বাড়ীগুলো হাপরের মত গরম নিঃশ্বাস ছাড়ছে। চুণকাম-করা সাদা দেয়ালে রোদের আভা যেন চোখ ঝলসায়। পথের পাশে বকুল দেবদারুর দীঘল ছায়া যেন শীর্ণ, ক্লান্ত, আতপতপ্ত। দূরে অচল নদীজল সূর্য্যালোকে পাণ্ডুর, মৃতের মত স্তব্ধ।

সহরের এক নাট্যমন্দিরে স্থানীয় কয়েকজন ব্যারিষ্টার সম্মিলিত হয়েছেন। ছোট একটি কমিটি। কিছুদিন আগে ইহুদীদের ওপর অযথা বিষম অত্যাচারে যারা ক্ষতিগ্রস্ত তাদের সম্বন্ধে সুবিচারের ব্যবস্থাই কমিটির উদ্দেশ্য। কমিটির সভ্যেরা সকলেই যুবা, উদীয়মান আইনজীবী। কর্ত্তব্যপরায়ণ, সজ্জন। যিনি যেখানে স্থান পেয়েছেন, সেখানেই বসেছেন—কেউ বেঞ্চে, কেউ বা ছোট একটা পাথরের টেবিলে—আর সভাপতি আসীন শূন্য "কাউণ্টারের" ভিতর দিকে। শীতকালে অভিনয়ের অবকাশে এখানে চা, কফি প্রভৃতি বিক্রী হয়।

বাইরে পথের কলরবে, রৌদ্রতাপে ও গরম হাওয়ার ঝাঁজে ব্যারিষ্টারদল অবসন্নপ্রায়। তদন্তের কাজ যেন গড়িয়ে চলেছে। সভ্যেরা কেবল উদাসীন নয়, ক্রমে যেন বিরক্ত হয়ে উঠছেন।

মনে মনে সবাই বাড়ীর কথা ভাবছেন। একবার এখানকার দরজার বাইরে পা বাড়াতে পারলে হয়—তাড়াতাড়ি বাড়ী গিয়ে অবিলম্বে বস্ত্রত্যাগ ও স্নান—দীর্ঘ স্নান। ভাবতেও যেন শরীর জুড়িয়ে যায়, দেহে যেন নববলের সঞ্চার হয়।

সভাপতি বোধ হয় এমনই একটা কিছু ভাবছিলেন—অধীরভাবে কাগজপত্র নাড়তে নাড়তে তিনি বললেন—"আজকার কাজ সম্বন্ধে বোধ করি একটা বিবৃতি লিখতে হবে—অবশিষ্ট করণীয়… .."

কথা শেষ হবার আগেই তিনি শুনলেন দলের সর্ব্ব-কনিষ্ঠ সভ্যটির স্পষ্ট অথচ অনুচ্চ স্বগতোক্তি—"অবশিষ্ট করণীয় শীতল পানীয়…"

পদমর্য্যাদার সম্মান রাখবার জন্য সভাপতি তরুণ সভ্যটির দিকে কটাক্ষ হানলেন, কিন্তু হাসি চাপতে পারলেন না। সভা ভঙ্গ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি সেই কথা বলতে উঠছেন, এমন সময় দরোয়ান এসে জানাল যে, সাতজন লোক বাইরে অপেক্ষা করছে। তাদের কি একটা জরুরী আরজী আছে।

আবার আরজী! সভাপতি অধীর দৃষ্টিতে সভার দিকে চাইলেন। "কি করা যায়?" সভাপতির প্রশ্ন

উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সভা সরব হয়ে উঠল। "আজ আর নয়!" কেউ বললে, "লিখিত দরখাস্ত পেশ করুক!" "যদি শীগগির শেষ করতে পারে—তবে!" "আর সময় পেলে না!"

সভাপতি কর্ত্তব্য স্থির করে ফেললেন, মাথা নেড়ে জানালেন, "তাদের আসতে বল।" পরে দরোয়ানকে ডেকে বললেন, "আমায় একগ্লাস সরবৎ—ঠাণ্ডা…"

দরজার বাইরে দরোয়ান ডাকল, "আপনারা ভিতরে যান, হুকুম হয়েছে।"

অদ্ভুতদেহ বিচিত্রবেশ এক অপূর্ব্ব অপ্রত্যাশিত মিছিল দরজায় দেখা দিল। দলের প্রথম ব্যক্তিটি দীর্ঘকায়, সবল ও সুবেশ। মুখ চোখের ভঙ্গী বেশ আত্মস্থ। প্যাঁসনে চশমা, জামায় রক্তগোলাপ, হাতে রূপা-বাঁধান আবলুসের ছড়ি ও নীল সিল্কের রুমাল। পরের ছয়জনকে দেখলে মন অসোয়াস্তিতে ভরে যায়। এমন বিরূপ অসঙ্গতি একসঙ্গে চোখে হঠাৎ পড়ে না। যেমন তেমন করে সংগ্রহ-করা জামা-কাপড় নয়, মনে হয় তাদের হাত পা, শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই তাদের নিজেদের নয়—যেমন তেমন করে সংগৃহীত, বিপর্য্যয় জোড়াতালির বৈষম্যের একটি স্তূপ। বয়স কারও খুব বেশী নয় অথচ প্রত্যেককে দেখলে বোঝা যায় যে, সংসার-সমুদ্রের অনেক বন্দরেই তারা ভিড়েছে। তাদের ব্যবহার অকুণ্ঠ, ভাবভঙ্গী বেশ সহজ, অথচ তারই তলে তলে যেন গোপন দুষ্টুমির ছাপ রয়েছে।

দলপতি নমস্কার জানিয়ে ধীর শান্ত কণ্ঠে বললে— "সভাপতি মহাশয়?"

পরিচয় দিয়ে সভাপতি প্রশ্ন করলেন,—"আপনাদের আরজী?"

রক্তগোলাপধারী ধীরোদাত্ত কণ্ঠে বললে, "আমরা—আপনাদের সামনে উপস্থিত এই ব্যক্তিবর্গ (এই বলে সে তার বন্ধুদের পানে হাত বাড়াল)—আমরা সকলে সম্মিলিত রষ্টভ-কারকভ-ওডেশা নিকোলেইভ তস্কর-সমিতির নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিরূপে আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি।"

তরুণ আইনজীবীর দল যে যার আসনে নড়ে বসল। সভাপতি নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে চোখ দুটো ভাল করে মেললেন। বিস্মিতকণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করলেন, "সমিতি? কিসের সমিতি?"

দলপতির শান্ত কণ্ঠে উচ্চারিত হ'ল, "তস্কর-সমিতি। আমার এই বন্ধুগণ আমায় তাঁদের মুখপাত্র নির্ব্বাচন করে বিশেষ সম্মানিত করেছেন।"

"বেশ…বেশ—" সভাপতি ভেবে ঠিক করতে পারলেন না, এ ক্ষেত্রে তাঁর কি বলা উচিত।

"ধন্যবাদ! আমাদের দলের এই সাতজনই সাধারণ চোর, অবশ্য প্রত্যেকের কাজের ধারা ভিন্ন।" পরে আবার সশ্রদ্ধ অভিবাদন করে দলপতি বললে, "আমাদের সমিতি আপনার এই মহামান্য সভার কাছে সাহায্য ভিক্ষার জন্য আমাদের পাঠিয়েছেন।"

"আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না…বাস্তবিক… ব্যাপার যে কি…" সভাপতি নিতান্ত নিরুপায় ও অসহায়-ভাবে হাত নাড়তে লাগলেন, পরে বললেন, "আচ্ছা, আপনার বক্তব্য শেষ করুন।"

"যে ব্যাপারে, সাহসে ও শ্রদ্ধায় আপনাদের শরণাপন্ন হয়েছি, তা যেমন স্পষ্ট, তেমনি সহজ, আর তেমনি সংক্ষিপ্ত। আমি পাঁচ সাত মিনিটের বেশী আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট হতে দেব না। সে কথা আগে থেকেই আপনাদের নিবেদন করছি, কারণ বেলাও পড়ে এসেছে আর গরম ১১৫ ডিগ্রির মাত্রা বুঝি বা ছাড়িয়ে যায়।" বক্তা এই কথার পর পকেট থেকে সোনার সুন্দর দামী ঘড়িটা বার করে তার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিল। "আপনারা বোধ করি লক্ষ্য করেছেন যে, ইহুদীদের উপর অকথ্য অত্যাচারের শেষদিকের বীভৎস দিনগুলির সম্বন্ধে খবরের কাগজে যে বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে বহুবার এ ইঙ্গিত আছে যে, পুলিসের পয়সার লোভে অত্যাচারীদলের মধ্যে সমাজের নিম্নস্তরের বহু জীবের সঙ্গে সহরের চোরেরাও যোগ দিয়েছিল। সে দলে ছিল সহরের যত গুণ্ডা, মাতাল, বেকার, ভবঘুরে, ভিখিরী, ও বস্তির বাসিন্দা—কাগজের বিবরণে যথেষ্ট আভাস আছে যে, এ দলে না কি চোরেরও অভাব ছিল না। প্রথমে আমরা চুপ করে ছিলুম। কিন্তু

পরে ভেবে দেখেছি যে, সমস্ত শিক্ষিত সমাজের এই গুরুতর ও অন্যায় নিন্দার প্রতিবাদ নিতান্ত প্রয়োজন। আমি একথা বেশ ভাল করেই জানি যে, আইনের চোখে আমরা অপরাধী—আমরা সমাজের শত্রু। কিন্তু দয়া করে একবার এই সমাজ-শত্রুর কথা ভেবে দেখুন। যে-অপরাধে সে আজ সরাসরি নিন্দিত, সে-অপরাধ সে কোনদিনই করেনি; কেবল তাই নয়, সে অপরকেও এই পাপকাজে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে বাধা দিতে প্রস্তুত। একথা বোধ করি বলা বাহুল্য যে, সাধারণ নাগরিকের চেয়ে এ অন্যায় নিন্দা ও অপমান তার বেশী করেই বাজবে। কিন্তু আমি স্পষ্টই জানাতে চাই যে, এই নিন্দার মূলে কোনো ভিত্তি নেই—না তথ্যের, না যুক্তির। দুচার কথায় আমার বক্তব্য আমি প্রমাণ করে দেব, অবশ্য মাননীয় সভ্যেরা দয়া করে যদি শোনেন।''

''বলুন'', সভাপতি বিনা দ্বিধায় অনুমতি দিলেন।

''শুনতে চাই'', ''বেশ বলছেন'', ''বলে যান''—ব্যারিষ্টারদলের আগ্রহ ও সজীবতা এই রকম নানা উক্তিতে প্রকাশ হ'ল।

''আমার বন্ধুদলের মুখপাত্ররূপে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের ব্যবসা হয় ত ঠিক ভদ্রজনোচিত নয়, কিন্তু বিপদসঙ্কুল নিশ্চয়ই; বাস্তবিক আমাদের কথা শুনলে আমাদের জন্যে সময় নষ্ট করেছেন বলে কোনদিন অনুতাপ হবে না। যাই হোক, প্রাচীন ভাষায় যাকে বলে 'অবধান করুন।' কিন্তু সভাপতি মহাশয়, বেয়াদবি মাপ করবেন, গলাটা একটু ভিজিয়ে নিতে চাই।'' দলপতি এই বলে দরোয়ানকে ডেকে ঠাণ্ডা সরবতের হুকুম দিল। পরে বললে, "আমি অবশ্য আমাদের ব্যবসার নৈতিক তত্ত্ব বা সামাজিক প্রয়োজনীয়তার বিচার করব না। আপনারা নিশ্চয়ই ফরাসী পণ্ডিতের ব্যঙ্গোক্তি জানেন। 'সম্পত্তি মাত্রেই চোরাই মাল!' কথাটা ব্যঙ্গ নিশ্চয়ই, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সম্পত্তির মালিক কেউ তো কথাটা উড়িয়ে দিতে পারলে না! এই ধরুন না—বাপ হয় তো নানা ফিকিরে লাখ টাকা জমিয়ে গেল; পেল কে?—না, তার বোকা, রোগা, আলসে, হাবা ছেলেটা—নিতান্ত হতভাগা, পরোপজীবী। লাখ টাকা জমা মানে কি? লাখ দিনের অনুবঞ্চিত বহু লোকের হাড়ভাঙা পরিশ্রম-ফলে অন্যায় দাবি তো? কেন? কোন যুক্তির বলে? এ যুক্তি তো কারও জানা নেই। কাজেই, একথা কেন আপনারা স্বীকার করবেন না যে, আমাদের ব্যবসা হচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের অতিরিক্ত সঞ্চয়ের প্রতিকার—বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পত্তি-লোভীর সৃষ্ট মানুষের অমানুষিক পরিশ্রম, অকথ্য অপমান, অবিচার ও অবহেলার প্রতিবাদ! একথা অস্বীকার করা চলবে না যে, আজই হোক বা কালই হোক, সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটবেই। বর্ত্তমান ব্যবস্থা সেদিন অচল হবে, দুঃখময় স্মৃতির মরণ-গহ্বরে সেদিন সম্পত্তির লোপ হবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে লোপ পাব আমরা—এই সম্পত্তি-পরিবেষ্টার দল…"

বক্তা একটু থেমে, দরোয়ানের হাত থেকে সরবতের গ্লাসটা নিয়ে টেবিলে রেখে দিল। "মাপ করবেন … আচ্ছা ভাই, এটা নিয়ে যাও…আর যাবার সময় দরজাটা ভাল করে বন্ধ করে দিও।"

''জী, হুজুর"—দরোয়ানের কথার মধ্যে বিদ্রূপের সুর বেজে উঠল।

সরবৎ-পানে পরিতৃপ্ত হয়ে দলপতি বক্তব্য সুরু করলে, "যাই হোক, আমি এ ব্যাপারের দার্শনিক, সামাজিক বা অর্থনৈতিক আলোচনায় আপনাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। কিন্তু একথা আমি বলবই যে, আর্ট বলতে যা বোঝায়, আমাদের ব্যবসাতে সেই জিনিষটি আছে। শিল্পসৃষ্টির উপাদান যা-কিছু, এর মধ্যে তার অভাব নেই। প্রেরণা, কল্পনা, উদ্ভাবনী শক্তি, উচ্চাশা—যাই বলুন—আর সেই সঙ্গে আছে বিজ্ঞান আয়ত্ত করবার বিপুল ধৈর্য্য, সুদীর্ঘ সাধনা। এর মধ্যে নেই যাকে আপনারা বলেন নীতি। আমার নিবেদন, আপনারা বিশ্বাস করুন, বাজে কথা বলে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করবার আমার আদৌ প্রবৃত্তি নেই। কিন্তু আমার কথাটা আর একটু পরিষ্কার করে বলতে চাই। বাইরের লোকের কাছে চোরের সাধনার কথাটা বাজে ও হাস্যকর হতে পারে, কিন্তু এ সাধনা কি সত্য নয়? আমাদের মধ্যে এমন লোকের সাক্ষাৎ মেলে

যার মধ্যে দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা ও ভ্রমহীনতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, হস্তকৌশল—এ সব শক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ হয়েছে। সেই সঙ্গে আবার এমন স্পর্শগুণ আছে যে, তার কাজ দেখলে মনে হয়, ভগবানের রাজ্যে শুধু 'হাত সাফাই' করবার জন্যেই তার সৃষ্টি। পকেট-মারা যার ব্যবসা—তার আছে অব্যর্থ সন্ধান, ক্ষিপ্রকারিতা, লঘু কোমল পরশ, তা ছাড়া উপস্থিতবুদ্ধি, চারদিকে সমান নজর রাখবার অপূর্ব্ব শক্তি। কেউ কেউ আবার যেন সিন্দুক ভাঙবার জন্যেই জন্মেছে বলে মনে হয়। তারা ছেলে-বেলা থেকেই নানা রকম কলকব্জা নিয়ে মেতে আছে—হাতের কাছে যা পায়, ঘড়ি বা বাইসাইকেল, স্প্রিংয়ের খেলনা বা সেলায়ের কল, সব তাতেই যন্ত্র-সংযোজনা জানবার তাদের অদম্য আগ্রহ। তা ছাড়া এমন লোকেরও অভাব নেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর যাদের জন্মাবধি বিদ্বেষ।

"আপনারা অবশ্য এ সব নৈতিক অবনতি বলে নিন্দা করতে পারেন, কিন্তু আসল চোরকে পথভ্রষ্ট করবার ক্ষমতা কি আপনাদের আছে? চুরিই যার আজন্মবৃত্তি, তাকে কি কোনদিন বাঁধা কাজ দিয়ে, টাকার লোভ দেখিয়ে বা নারীর প্রেম দিয়ে ভদ্র জীবনের অচল ব্যবস্থায় আটকে রাখা যায়? এর কারণ কি? কারণ এই, সে ভালবাসে বিপদের চিরন্তন সৌন্দর্য্য, তার জীবনে আছে সর্ব্বনাশের ভীষণ মোহ, ভয় উদ্বেগের নিত্য অপূর্ব্বতা, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জীবনের দুর্দ্দম স্পন্দন—বিরাট উল্লাস! সর্ব্বাঙ্গে রক্ষাকবচ বাঁধা আপনাদের জীবন—আইন আছে, তালা চাবি, টেলিফোন, গুলি-গোলা, পুলিশ পল্টন...কত কি! আর আমরা বাঁচি আমাদের দক্ষতায়, চাতুর্য্যে আর ভয়হীনতার জোরে। আমরা যেন শেয়াল, আর সমাজ যেন কুকুর-পাহারায় হাঁসের পাল। আপনারা কি জানেন যে, গ্রামের শক্তিশালী ও শিল্পকুশল লোকমাত্রেই এই ব্যবসাতে চলে আসে। করবেই বা কি? শক্তিমানের পক্ষে সমাজবদ্ধ খর্ব্ব ক্ষুদ্র বৈচিত্র্যহীন জীবনে স্ফূর্ত্তি কোথায়?

"প্রেরণার কথাই বলি—মাঝে মাঝে কাগজে আপনারা এমন সব চুরির কথা পড়েন যা কল্পনায় ও কাজে অমানুষী বলে' আপনাদের ধারণা হয়। খবরের কাগজে সেগুলোর 'হেডিং' দেয় 'বিস্ময়কর চুরি', কিংবা 'অপূর্ব্ব অন্তর্দ্ধান', বা এই রকম একটা কিছু। কাগজের বিবরণ দেখে সমাজের সাধুসজ্জন বলেন, 'কি ভয়ানক! আহা, যদি এদের শক্তি ভাল কাজে লাগত—এমন উদ্ভাবনী শক্তি, এমন অপূর্ব্ব মানব-চরিত্র-জ্ঞান, এমন আত্মবিশ্বাস, এই দুর্জ্জয় সাহস ও বিচিত্র অভিনয়-দক্ষতা—সমাজের কি উপকারই হ'ত!' এ সজ্জনদের আমি বেশ জানি। পরের কথার জাবর কাটতে এরা বেশ পারে। এই সব বাজে কথা নিয়ত আওড়াবার জন্যেই এরা জন্মেছে। যাক, এদের কথায় সময় নষ্ট করব না, কিন্তু এরা কোনদিনই বুঝতে পারে না যে, প্রতিভা যেখানেই প্রকাশিত হোক, তার মধ্যে একটা স্বাতন্ত্র্য, একটা সৌন্দর্য্য আছে। উন্নতির একটা নিজস্ব ধারা আছে এবং চুরি-বিদ্যারও অপূর্ব্ব উন্নতি করা সম্ভব!

"পরন্তু বাইরে থেকে যেমন মনে হয়, আমাদের ব্যবসা তত সহজ আর সুখের নয়। এতে সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা, নিত্য অভ্যাস, কষ্টকর ও বহুদিনব্যাপী সাধনা বিশেষ দরকার। এর মধ্যে এমন শত শত সূক্ষ্ম কৌশল আছে যা নামজাদা বাজীকরও ধারণা করতে পারে না।

"আমি যে বাজে কথা বলছি না, তা প্রমাণ করবার জন্যে আমাদের কাজের দু-একটা নমুনা আপনাদের দেখাতে চাই।...আশা করি আইনের হাত থেকে বর্ত্তমান সময়টুকুর জন্যে আমরা মুক্ত... ...।

"একটা কথা—যদি এর পরে বিভিন্ন অবস্থায় আপনারা আমাদের কাউকে দেখেন আর চিনতে পারেন, তখন যেন আপনাদের নাগরিক ও ব্যবসায়িক কর্ত্তব্য করতে ত্রুটি না করেন, এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা। কিন্তু আজ আমাদের প্রতি আপনাদের দয়ার কথা স্মরণ করে আপনাদের সম্পত্তি আমরা চিরকালই অস্পৃশ্য—পবিত্র জ্ঞান করব। যাক—এবার কাজ সুরু করা যাক......"

বক্তা এই কথা বলে' দলের দিকে চেয়ে ডাকলে, "সিসোয়া, দয়া করে একবার এখানে আসুন তো?"

অসুরের মত প্রকাণ্ড এক জোয়ান এগিয়ে এল। একটু কুঁজো-মত লোকটা—লম্বা হাত দুখানা হাঁটু যেন ছাড়িয়ে যায়—কপাল এত ছোট যে দেখাই যায় না—ঘাড় বলে' শরীরে কোন অঙ্গ নেই—মুখে তার বোকার মত হাসি, বিব্রতভাবে সে ভ্রূ খুঁটতে লাগলো। ভাঙা গলায় সে বললে, "এখানে করবার আছে কি?"

দলপতি সভার দিকে ফিরে বলতে লাগল, "এই সিসোয়াজীর বিশেষত্ব হচ্ছে সিন্দুক, লোহার বাক্স ইত্যাদি টাকাকড়ি রাখবার যত রকম আধার, তা ইনি খুলতে পারেন। রাত্রে কাজের সুবিধা করবার জন্যে ইনি মাঝে মাঝে ইলেকট্রিক কারেণ্ট দিয়ে ধাতু গলিয়ে ফেলেন; দুঃখের বিষয়, এখানে এমন কিছু নেই যাতে এঁর বাহাদুরী প্রকাশ পায়। যেমন জবরদস্ত তালা হোক না কেন ইনি অবলীলায় খুলতে পারেন···আচ্ছা এই দরজাটা তো বন্ধ রয়েছে···"

পাশের একটা দরজার দিকে সবার চোখ পড়ল—তার উপরে বড় হরফে লেখা—"সাজঘর—প্রবেশ নিষেধ।"

সভাপতি বললেন, "হুঁ, দরজাটা তো বন্ধই দেখছি।"

দলপতি সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বলল, "বেশ; সিসোয়া বাবুজী—দয়া করে একবার···"

সিসোয়া অলসভাবে বললে, "আরে এর আবার···"

পরক্ষণেই সে দরজার কাছে গেল। খুব সাবধানে সেটাকে নাড়া দিলে, পকেট থেকে চকচকে কি একটা ছোট যন্ত্র বার করলে, তার পর দরজার কলে কয়েকটা সামান্য খুটখাট করে' বড় দরজাটা সটান খুলে ফেললে।

সভাপতি ঘড়ি-হাতে বসেছিলেন—ব্যাপারটা দশ সেকেণ্ডেই শেষ হ'ল।

দলপতি হেসে বললে, "বহুত আচ্ছা বাবুজী! আপনি এবার বিশ্রাম করুন।"

সভাপতি একটু ভয় পেয়েছিলেন। তিনি বললেন, "অবশ্য ব্যাপারটা খুবই চমৎকার, কিন্তু আপনার বন্ধু কি দরজাটা ফিরে বন্ধ করতে পারেন?"

"মাপ করবেন—কথাটা ভুলে গিয়েছিলুম।" দলপতি বিনীত উত্তর দিয়ে আবার সিসোয়াকে ডাকলে। সে যেমন নিঃশব্দে কপাটখানা খুলেছিল, তেমনি অলক্ষ্য-কৌশলে ত্বরিতে বন্ধ করে দিল। তারপর লম্বা দুখানা বাঁকা ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটিয়ে থপ থপ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল।

"এইবার আমার আর এক বন্ধুর কৃতিত্ব দেখাব। ইনি রেল-ষ্টেশনে বা থিয়েটারে লোকের পকেট মারেন।" বক্তা বন্ধুটির দিকে সভার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "আমার এ বন্ধুর বয়স এখনও খুব কম, তবে এঁর বর্ত্তমান কাজ দেখে আপনারা বেশ বুঝতে পারবেন যে, রীতিমত সাধনায় এঁর ভবিষ্যৎ কি বিরাট ও অদ্ভুত হতে পারে। ইয়াসা "

ডাক শুনে ইয়াসা এগিয়ে এল। রং সামান্য ময়লা, গায়ে নীল রেশমের জামা, পায়ে চকচকে নরম চামড়ার বুট। বেদের মত তার পোষাক, পালোয়ানের মত দম্ভ-ভরা চলার ভঙ্গী, একচোখে ঈষৎ ভ্রূকুটি।

দলপতি আবার সভার দিকে ফিরে বললে, "যদি আপনাদের মধ্যে কেউ দয়া করে একবার পরীক্ষার জন্যে উঠে আসেন তবে যথেষ্ট বাধিত হব। আশা করি আমায় বিশ্বাস করবেন—এ শুধু খেলা দেখানো—আপনাদের লোকসানের কোনো ভয় নেই।"

দলের মাঝ থেকে ভাঁটার মত বেঁটে মোটা এক অল্প-বয়সী ব্যারিষ্টার উঠে এল। দলপতির দিকে ফিরে হাসি-মুখে বললেন, "আজ্ঞে আমি প্রস্তুত।"

ইয়াসা এতক্ষণ একমনে তার রেশমের দড়ি-জড়ানো কোমরবন্ধের মোটা ঝুরিটা নিয়ে খেলা করছিল, এবার সে ব্যারিষ্টারের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। তার বাঁ হাত ঢেকে একখানা বড় রেশমী রঙ্গীন রুমাল ঝুলছে।

"মনে করুন আপনি ষ্টেশনে কাউকে তুলে দিতে গেছেন কিংবা কোথাও ভিড়ের মাঝে দাঁড়িয়ে আছেন—" ইয়াসা ব্যারিষ্টারের সঙ্গে কথা বলতে সুরু করল। গলাটি তার ভারি নরম, কথার অবাধ গতি। —"দেখেই বুঝলুম 'মাল'—কিছু মনে করবেন না, ধরুন আপনিই যেন 'মাল'—না না, আমি অন্যায় কিছু বলিনি! আমাদের ভাষায় শাঁসাল লোক যার কাছে কিছু পাবার আশা রাখি—কি পাব তা ঠিক নেই, তবে একবারে যে ভুয়ো নয় এই আর কি!

'মালের' কাছে থাকে কি? কত কি—অন্য কিছু না থাকে তো ঘড়ি চেন। আচ্ছা তা রাখে কোথায়? টাকার ব্যাগ—সেই বা থাকে কোন্ পকেটে? কারও বা আবার সিগারেট কেস—সোনার, রূপার—আচ্ছা পকেট কটা?... এখানে, এখানে এই একটা, আর...এমনি করে হিসাব করে কাজে লাগতে হয়..."

ইয়াসা সপ্রতিভভাবে কথা বলছিল, জলজলে চোখদুটো ছিল ব্যারিষ্টারের চোখের উপর। শেষের কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সে অত্যন্ত দ্রুত ভদ্রলোকের শরীরের স্থানগুলো নির্দ্দেশ করছিল—কি কৌশলপূর্ণ তার ভঙ্গী।

"তা ছাড়া বুকে একটা পিন থাকে—টাইপিন—আমরা অবশ্য সে সব ছুঁই না—আজকালকার যে সব ভদ্রলোক—আসল পাথর তো কেউই পরে না! যাক—আমি তখন তার কাছে এগিয়ে যাই—ভদ্রলোকের মত তার সঙ্গে কথা জুড়ে দিই—পায়ে পা ঠেকিয়ে আলাপ আর কি! বলি, মশাই দয়া করে দেশলাইটা একবার... এমনি কিছু তারপর...তার মুখের দিকে সোজা চেয়ে থাকি.. এই এমনি করে...আর ..দুটি আঙুল—ব্যস্—এই দুটি আঙুল—এই আর এই..." ইয়াসা এই বলে ব্যারিষ্টারের মুখের কাছে মাঝের দুটো আঙুল নানা ভঙ্গীতে নাড়তে লাগল।

"দেখলেন তো? খালি দুটো আঙুলে যা কিছু—এতে অদ্ভুত কিছু নেই—রাম, দুই, তিন—ব্যস্...একেবারে বোকা না হ'লে এ শিখতে আর ক'দিন। যা-কিছু কায়দা এইমাত্র—এর আর অদ্ভুত কি! আচ্ছা, নমস্কার।"

ইয়াসা অভিবাদন জানিয়ে একটু টাল খেয়ে গেল, যেন কাজ শেষ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসবে।

"ইয়াসা!" দলপতি বেশ জোর করে ডাকলে। তার ডাকের যেন একটা অর্থ ছিল। সাড়া নেই। আবার দলপতি ডাক দিল, এবার স্বর যেন একটু কঠোর।

ইয়াসা থামল। সে ব্যারিষ্টারের দিকে পিছন ফিরে ছিল—দলপতিকে যেন অনুনয়ে কি জানাল, কিন্তু দলপতি কঠোর দৃষ্টিতে মাথা নাড়ল।

"ইয়াসা!"—দলপতির কণ্ঠে রাগের ঝাঁজ।

"ধ্যৎ!"—ইয়াসার মুখে ঈষৎ বিরক্তি। সে এবার ব্যারিষ্টারের দিকে চেয়ে বললে, "আপনার ছোট ঘড়িটা দেখুন তো, মশাই?" কণ্ঠ তার তীক্ষ্ণ।

ব্যারিষ্টারের যেন হঠাৎ চেতনা এল—"তাই তো!'

"এই তো এখন বলছেন 'তাই তো'"—ইয়াসা যেন ব্যারিষ্টারের বোকামিতে বিশেষ রেগেছে—"আপনি যখন আমার ডান হাতের আঙুলের তারিফ করছেন, ততক্ষণে বাঁ হাতে সে দুটো আঙুলেই এই রুমালের তলায়। এইজন্যেই রুমালটা ঝোলান। আমি অবশ্য আপনার চেনে হাত দিই নি—ওটি কোনো মক্কেলের দান—বাজে মাল—ঘড়িটি সোনার, তাই নিজে রেখেছি—আর হারানো ঘড়ির স্মৃতির জন্যে চেনটি আপনার পকেটে—" একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ইয়াসা ঘড়িটা ফিরিয়ে দিল।

ব্যারিষ্টার হতভম্ব। অপ্রতিভভাবে বললে, "খুব বাহাদুরী...হ্যাঁ...আমি একটুও জানতে পারিনি।"

ইয়াসা সদর্পে বললে, "এই তো আমাদের কায়দা।" হেলে দুলে সে সঙ্গীদের মাঝখানে ফিরে গেল।

এই অবসরে বাকি সরবৎটুকু একনিঃশ্বাসে শেষ করে দলপতি সভাকে সম্বোধন করলে, "এবার একটু নতুন খেলা দেখুন—তিনটি তাসের—টেক্কা, ছক্কা, বিবি—তে-তাসের কেরামতি—রেলে ষ্টীমারে মেলায় যা চলে মাত্র তিনখানি তাসে সহজে—কিন্তু আপনারা বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছেন..."

"না না, সে কি! খুব চমৎকার!"—সভাপতি সস্মিতভাবে সভার মনোভাব প্রকাশ করলেন। "তবে আমার একটা প্রশ্ন আছে—অবশ্য যদি কিছু মনে না করেন—আপনার বিশেষত্ব কি?"

"বিলক্ষণ......আমার বিশেষত্ব—না, এর আর মনে করবার কি আছে—আমি এই হীরে মুক্তোর দোকান, আর ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্ক......" বক্তার কথাগুলো মৃদু হাসিতে মিলিয়ে গেল। "অন্য কাজের চেয়ে এটা যে সোজা তা যেন ভাববেন না। তা মন্দ কি, গোটাচারেক ভাষা শিখেছি—জার্ম্মান, ফরাসী, ইংরেজী ও ইটালিয়ান, তা-ছাড়া অপভ্রংশ দু'চারটে ভাষার সঙ্গেও পরিচয় রাখতে

হয়। যাক্, সভাপতি মশায়, আরও দুএকটা খেলা দেখবেন কি?"

সভাপতি একবার ঘড়িটি খুলে দেখলেন। "দুঃখের বিষয়, সময় বড় সংক্ষেপ। তার চেয়ে আপনাদের বক্তব্যটা কি, সেইটে আলোচনা করলে ভাল হয় না? কারণ, আপনারা যে-সব খেলা দেখালেন তাতে আপনাদের গুণের তো যথেষ্ট পরিচয় পেলুম··কি বলেন?"—সভাপতি এই বলে ঘড়ি-হারান ব্যারিষ্টারের দিকে চাইলেন।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি সায় দিলেন, "সে আর বলতে ···"

দলপতি যেন দয়া করে এঁদের কথাটা মেনে নিলেন— "বহুৎ আচ্ছা, বড়বাবু, আপনার যন্ত্রপাতি রেখে দিন, ওগুলোর আর কোনো দরকার নেই।" শেষের কথাগুলো তিনি যাকে বললেন তাঁর মাথা-ভরা কোঁকড়া চুল, হাসি হাসি মুখ······আদুরে ছেলের ভঙ্গীতে হেলেদুলে সে নিজের জায়গায় চলে গেল।

দলপতি এবার সভাকে সম্বোধন করে বললে, "আর গোটা-দুই কথা বলে নিতে চাই। আশা করি এতক্ষণে আপনারা বেশ বুঝেছেন, সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের মনঃপূত না হলেও আমাদের এই কর্ম্মকৌশলে আর্টের অভাব নেই, এবং আমার বিশ্বাস এ বিষয়ে আমার সঙ্গে আপনারা একমত যে, এই কলা আয়ত্ত করতে বহুবিধ গুণের সবিশেষ প্রয়োজন। এ ছাড়া, দারুণ পরিশ্রম আছে, বিপদ-আপদ আছে, ভুল বোঝবার সম্ভাবনা আছে। শেষ কথা হচ্ছে যে, আপনাদের বোধ হয় এবার বিশ্বাস হয়েছে যে, বাইরে থেকে দেখলে বা হঠাৎ শুনলে যতই অদ্ভুত মনে হোক, এ কর্ম্মকৌশলে লোকের প্রীতি থাকা সম্ভব—একাজে কর্ম্মীর একটা শ্রদ্ধা থাকা সম্ভব। মনে করুন দেখি যে, বিখ্যাত মাসিকের পাতা ছাড়া যাঁর কাব্য সাহিত্য প্রকাশিত হয় না, দেশের এমন কোনো শক্তিমান নামী কবিকে যদি লাইন-পিছু এক আনা দাম ধরে কবিতা লিখতে বলা হয়—তাও আবার 'মাধুরী' বিড়ির বিজ্ঞাপন; কিংবা যদি এই কথা রটনা হয় যে, আপনাদের মত নামী ব্যারিষ্টারদের কেউ বিবাহচ্ছেদ মামলার জাল সাক্ষী তৈরী করেছেন কিংবা তাড়িখানার মালিকের কাছে গাড়োয়ানদের আর্জ্জি লিখে দিয়েছেন—এটা ঠিক যে আপনাদের আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউই সে কথা বিশ্বাস করবেন না। কিন্তু কুৎসা একবার রটলে তার বিষ ত ছড়িয়ে যায়, আর আপনাকে সেই বিষাক্ত বাতাসে নিঃশ্বাস নেবার সব কষ্টটুকুই পেতে হয়। এই-বার ভাবুন দেখি—এই রকম একটা জঘন্য ও বিরক্তিকর কুৎসা আপনাদের সুনামের বুক চেপে বসেছে—শুধু তাই নয়, আপনাদের স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত বিপন্ন করে তুলেছে···

"আমাদের—চোরদের—আজ এই দশাই হয়েছে— খবরের কাগজে আমাদের নামে এমনই কুৎসা রটনা হচ্ছে। কথাটা খুলে বলছি—সমাজের নিম্নস্তরে একদল নিতান্ত নচ্ছার লোক আছে—আমরা তাদের বলি 'গড়াচর চন্দর'—দুঃখের বিষয়, সাধারণ লোকে তাদের সঙ্গে আমাদের তফাৎ ধরতে পারে না। এই 'গড়াচর চন্দর' দলের না আছে লজ্জা, না আছে বিবেক—চরিত্রহীন আঘাটার জঞ্জাল, অশিক্ষিত, অভব্য অকর্ম্মার দল—চুরি করবার না জানে কৌশল, না আছে তার শিক্ষা, না তার সাধনা। বেশ্যার ঘাড়ে চেপে তাদের পয়সায় খেতে এদের কোনোদিনই ঘৃণা বাধও হয় না। দুটো পয়সার লোভে অন্ধকার গলিতে ছোটছেলের গলা টিপ্‌তে এরাই পারে—ঘুমন্ত লোককে খুন করে বুড়ীর ওপর অত্যাচারে প্রবৃত্তি শুধু এদেরই—আমাদের পেশাভুক্ত লোকের এরাই হ'ল লজ্জা—চৌর্য্যকলার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ও প্রাচীন ঐতিহ্যের কোনো ধারই এরা ধারে না। সিংহের পিছনে দূরে দূরে যেমন শেয়ালের পাল ফেউ লাগে এরা ঠিক আমাদের পিছনে সেই রকম করে ঘুরে বেড়ায়। মনে করুন, বেশ একটা জবর কাজ উদ্ধার হ'ল—বলা বাহুল্য চোরাই মাল যাঁরা বিক্রী করেন তাঁদের তো প্রায় অর্দ্ধেকের ওপর দিতে হ'ল—তারপর, ঘুষবিমুখ অকলঙ্ক পুলিশ আছেন—এদের ভাগ-বাটোয়ারা করে যা রইল তা থেকে আবার এই জঞ্জালদের ভাগ দিতে হবে— কেউ হয়ত লোকমুখে শুনেছেন—কেউ হয়ত একচোখে দেখেছেন—কারও বা হঠাৎ সামনে পড়ে গেছি। এই নচ্ছারগুলোকে দিতেই হয়, না হলে হয়ত পুলিশে লাগাবে—

অবশ্য তারা যে পুলিশে লাগায় না তা নয়—প্রাপ্তির আশায় তারা সবই করে—কিন্তু আমরা যারা সৎ—আপনারা কথাটা শুনে হাসছেন—কিন্তু কথাটা না ব্যবহার করে থাকতে পারছি না—আমরা, যারা সৎচোর, এই সব 'বিচ্ছুর' দলকে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি। তাদের আর একটা নাম আমরা দিয়েছি সেটা বিশ্রী গালাগালি—আপনাদের সাম্‌নে আর সে কুৎসিত কথা উচ্চারণ করব না। হাঁ, বলছিলাম কি, এই জঞ্জালের দল, এরাই কোনো লুট-তরাজ গুণ্ডামির খবর পেলে ছুটে আসে। গুণ্ডামির অপবাদও বুঝি সহ্য হয়, কিন্তু এই নচ্ছারদলের সঙ্গে আমাদের সংস্রব-কল্পনা শতগুণে অপমানজনক।

"ভদ্রমহোদয়গণ, আমি লক্ষ্য করেছি, আমার কথা শুনতে শুনতে বহুবার আপনাদের ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। আপনাদের মনোভাব আমি বুঝি। আমাদের এই আবির্ভাব—আপনাদের সাহায্যের জন্য আমাদের আর্জ্জী, এবং সবচেয়ে তস্কর-সমিতির মত একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার—তাদের প্রতিনিধি—তার দলপতি—যারা সবাই চোর সমস্ত জিনিষই এত নূতন, অদ্ভুত যে, শুনলেই হাসি পায়। কিন্তু বহিরঙ্গের বাধা ঘুচিয়ে একবার সমানে সমানে মানুষে মানুষে পরিচয় হয়ে যাক—

"আমাদের দলের সবাই শিক্ষিত, আমরা সবাই বই পড়তে ভালবাসি—আমরা যে কেবল অদ্ভুতকর্ম্মার কাহিনী পড়ি বাস্তব সাহিত্যিকের, একথা ঠিক নয়—আপনারা কি মনে করেন যে, যখন এই অন্যায় জঘন্য অত্যাচার চলছিল তখন ব্যথায় আমাদের বুক ফেটে রক্ত ঝরেনি—লজ্জায় আমাদের মাথা নীচু হয়নি? আপনারা কি সত্যিই ভাবেন যে, যখন কসাক সৈন্যের চাবুকে দেশ জর্জ্জরিত হয়ে উঠে—মরিয়া মানুষ উন্মাদ হয়ে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেদিন আমাদের রক্তে আগুন লাগে না? একথা কি আপনারা বিশ্বাস করবেন যে, আমরা, এই চোরের দল, পরম আগ্রহে অসীম আনন্দে অদূরাগত মুক্তির চরণধ্বনির অপেক্ষা করছি!

"জানি—আমরা সবাই জানি—হয়ত আপনাদের মত আইনজীবীদের চেয়ে কিছু কম বুঝি—কিন্তু বেশ জানি এই-সব মারামারির গূঢ় অর্থ কি! কে যে কি উদ্দেশ্যে নিরীহ ইহুদীর উপর অত্যাচারের লোভ দেখিয়ে সাধারণ লোকের জাগ্রত ক্রোধ শান্ত করে তা জানি—এ দলে ও-দলে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয় কোন্ সে শয়তান—এবিষম রক্তপাত—কার খেলা এই পিশাচ-প্রবৃত্তি লোকদের রক্ত-স্নানের উৎসব সৃষ্টি?

"কিন্তু এবার শেষ হয়ে এসেছে—আমলাতন্ত্রের নাভিশ্বাস উঠেছে, তার অঙ্গবিকৃতি দেখতে পেয়েছি! মাপ করবেন, একটা রূপক বলি—

—এক দেশে এক পীঠস্থান ছিল—বিরাট মন্দিরে তার গভীর ক্ষুদ্র গর্ভগৃহে ছিল রক্তপিপাসু এক দেবতা—লোকচক্ষের অন্তরালে কালো আবরণের আড়ালে—পাণ্ডা-পূজারী ঘেরা! একদিন এক দুঃসাহসী দিল সে আবরণ ছিঁড়ে ফেলে। আলো যখন পড়ল, তখন সবাই দেখলে দেবতা সে নয়—অতিকায়, কুৎসিত খাদ্যলোলুপ এক মাকড়সা! লোকেরা তাকে মারবার জন্যে অস্ত্র নিক্ষেপ করলে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার কেটে কেটে পড়তে লাগল। চরম যন্ত্রণার আবেগে সেই বিশ্রী ভয়ানক জানোয়ারের বীভৎস লোমশ পা-গুলো মন্দিরের চারপাশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, আর সেই পাণ্ডা-পূজারীর দল—মৃত্যু যাদের অবধারিত—তাদের ভীত কম্পিত হাতে যাকে ধরতে পাচ্ছে, তাকেই সেই রাক্ষসের কবলে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে!

"কিছু মনে করবেন না। যা বল্লুম তা হয়ত উদ্ভট, সামঞ্জস্যহীন। একটু বিচলিত হয়ে পড়েছি—আমায় মাপ করুন! যা বলছিলুম—চুরি যাদের পেশা তারা সবাই অন্য সবাইয়ের চেয়ে ভাল করেই জানে কেমন করে ইহুদীদের এই অত্যাচারের ব্যবস্থা হয়। আমরা কোথায় না যাই—বাজারে, চায়ের দোকানে, শুঁড়িখানায়, বস্তীর মাটকোঠায়, থিয়েটারে, গির্জ্জায়—সর্ব্বত্রই আমাদের গতি। ভগবান আর মানুষের সামনে, ভবিষ্যৎ বংশীয়দের মুখ চেয়ে আমরা শপথ করে বলতে পারি কেমন করে পুলিশ এই হত্যা-উৎসবের আয়োজন করে, নিতান্ত নির্লজ্জভাবে—তাদের দুষ্কার্য্য তারা গোপন করবারও চেষ্টা করে না! তাদের মুখ আমরা চিনি—উর্দ্দী পরেই তারা ঘুরুক বা ছদ্মবেশেই ফিরুক। আমাদেরও তারা ডেকেছিল, কিন্তু এমন হীনাত্মা আমাদের মধ্যে কেউ নেই

যে ধনমানের ভয়েও অন্তত মৌখিক সম্মতি জানিয়ে তাদের খুশী করবার চেষ্টা করে!

"আপনারা অবশ্য জানেন, রুশ-সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকেরা পুলিশের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে। যারা এই পুলিশের গোপন দুষ্কার্য্যের সাহায্য নেয় তারাও তাদের খাতির করে না। কিন্তু আমরা তাদের তিনগুণ—না দশগুণ ঘৃণা করি—গোয়েন্দা বিভাগের হাতে যন্ত্রণা পেয়েছি বলে নয়—অবশ্য সে যন্ত্রণা শুধু নয়—সে বিভীষিকা—চামড়ার চাবুক—দলের লোককে ধরিয়ে দেবার জন্যে বা স্বীকারোক্তি করাবার জন্যে অমানুষিক প্রহার—সেজন্যেও ঘৃণা করি; কিন্তু আমরা চোরেরা, যারা সবাই জেলে গেছি, আমরা, সবাই স্বাধীনতার উন্মত্ত উপাসক। তাই জেল-রক্ষীদের ওপর আমাদের অসীম ঘৃণা। আমার কথাই বলি। পুলিশ গোয়েন্দারা আমায় তিনবার যে যন্ত্রণা দিয়েছে আমি মরণাপন্ন হয়ে বেঁচেছি। আমার ফুসফুস লিভার একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখনও সকালে আমার মুখ দিয়ে রক্ত উঠে, আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আমায় যদি কেউ বলে যে. গোয়েন্দা পুলিশের বড়কর্ত্তার সঙ্গে হাত মেলালে আমায় আর কোড়া লাগাবে না, আমি তখনি তা অস্বীকার করব!

"আর খবরের কাগজে লেখে যে, এদের কাছ থেকে আমরা টাকা নিয়েছি—জুডাস—কেনা-টাকা রক্তমাখা টাকা! না, কখনও নয়, এ অপবাদ কলঙ্ক আমাদের বুকে ছুরির মত বেঁধে—অসহ্য যন্ত্রণা দেয়। টাকা, শাসন, লোভ—কোন কিছুরই বদলে আমরা ভাড়াটে খুনে সাজতে পারি না—তাদের কাজে সাহায্য করতে পারি না···

"কখনও না···না · না···" দলপতির কথায় সায় দিয়ে অন্য সবাই গুনগুন করে উঠল।

"শুধু তাই নয়", দলপতি বলতে লাগল, "আমাদের দলের অনেকেই এই দাঙ্গায় অত্যাচারিতের উপকার করেছে। আমাদের বন্ধু সিসোয়া—ইনি এক ইহুদী-পরিবারে বাস করেন—লোহার ডাণ্ডা নিয়ে একদল ভাড়াটে গুণ্ডার সঙ্গে যুদ্ধ করে সে পরিবারকে রক্ষা করেছেন—একথা ঠিক সিসোয়া বাবুজীর 'তাকুত' আছে—ওঁর গায়ের জোরের কথা ও-অঞ্চলের সবাই ভাল করেই জানে, কিন্তু সে সময় বাবুজীকে মৃত্যুর সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

"এই যে দেখছেন মার্টিন—এই ভদ্রলোক—" দলপতি এই বলে একজনের দিকে আঙুল দেখালেন—পাতলা গড়ন দাড়ি-ওয়ালা একটি লোক—সুন্দর স্বপ্নালস চোখে সে সবার পিছনে দাঁড়িয়েছিল। "ইনি একটী ইহুদী বুড়ীকে ঐ কুত্তাদলের মুখ থেকে বাঁচিয়েছেন—বুড়ীকে ইহ-জীবনে ইনি কোনদিন চোখেও দেখেননি। অথচ এই জন্যে খুনের দল এঁর মাথা ফাটিয়েছে. হাত ভেঙে দিয়েছে, পাঁজরের একটা হাড় চুরমার করেছে—ইনি হাঁসপাতাল থেকে সবে বেরিয়েছেন। আমাদের দলের উৎসাহী সভ্যেরা এমনই কর্ত্তব্য করে থাকেন—অক্ষম যারা তারা কাঁদে—রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে ওঠে।

"সেই হত্যা-উৎসবের রক্ত-মাখা দিনগুলো—মশাল-জ্বালানো রাত্রিগুলো কিছুই আমরা ভুলিনি। পথে পথে মেয়েদের সেই বুক-ফাটা কান্না, পথের ধূলায় ছড়ানো ছোট ছেলেমেয়ের খণ্ড বিখণ্ডিত দেহ—কিন্তু এ সবের জন্যে আমরা কোনদিন বিশ্বাস করি না যে, পুলিশ আর রাস্তার লোক এই পাপের মূল। এই সব বোকা ঘৃণ্য জীবগুলো আর এক হাতের অজ্ঞান যন্ত্র—যার পিছনে আছে নীচ মন আর শয়তানী ইচ্ছাশক্তি। চালক সেই।

"একথা সত্যি যে, চোরেরা আপনাদের আইন-গত ঘৃণার উপযুক্ত পাত্র। কিন্তু আপনাদের মত মহৎ লোকদের যেদিন লড়াই করবার জন্যে চতুর, সাহসী বাধ্য লোকদের প্রয়োজন হবে, বিশ্বের সব চেয়ে মহৎ যে বাক্য—স্বাধীনতা—তার জন্যে যেদিন হাসিমুখে প্রাণ দেবার দরকার হবে, সে দিন কি ঘৃণায় আমাদের দূরে সরিয়ে দেবেন?

"বেশী কথা কি? ফরাসী বিদ্রোহে যে প্রথম প্রাণ আহুতি দিয়েছিল—সে তো এক বেশ্যা! আলগোছে তার পোষাকের প্রান্ত ধরে সে পথে আগড়ের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল 'সৈন্যদের মধ্যে মেয়েকে গুলি করতে কার সাহস আছে?' হায় ভগবান—" বক্তার গলার স্বর হঠাৎ চড়ে গেল—সামনের পাথরের টেবিলের ওপর দুম্

করে এক কীল বসিয়ে সে বললে, "তারা তাকে গুলি করে মেরেছে—কিন্তু মহান তার কীর্ত্তি—মৃত্যুহীন সে বাক্যের সৌন্দর্য্য!"

"যদি সে মহান শুভদিনে আপনারা আমাদের দূরে সরিয়ে দেন, সেদিন আমরা আপনাদের এই প্রশ্ন করব, 'বলি অকলঙ্ক স্বর্গদূতের দল, যদি মানুষের চিন্তার জোরে মানুষের অর্থ-মান প্রতিপত্তি খর্ব্ব হয় তবে আপনাদের মধ্যে কোন্ সরল ঘুঘুটি সরকারের চাবুক আর সারাজীবন দ্বীপান্তর থেকে মুক্তি পাবেন?' ব্যস্, তারপর আপনাদের ছেড়ে আমরা চলে যাব—নিজেদের চোরেদের মজার আগড় তৈরি করে লড়াই দেব—এমন হাসিমুখে সম্মিলিত গানের সুরের মাঝখানে প্রাণ দেব, তখন হিংসেয় আপনাদের জান্ যাবে—আপনারা, যারা নাকি তুষারের চেয়ে নিষ্কলঙ্ক!

"এই দেখুন—আবার উত্তেজিত হয়ে গেছি—মাপ করবেন আমায়—আমার কথা শেষ হয়ে এসেছে—বুঝতেই পারছেন, খবরের কাগজের নিন্দায় আমাদের মন কি রকম বিকল হয়ে গেছে—আমাদের কথা সত্য বলে বিশ্বাস করুন এবং আমাদের নামে এই অন্যায় কলঙ্ক মোচনের একটা ব্যবস্থা করে দিন। আমার আর কিছু বক্তব্য নেই।"

টেবিলের কাছ থেকে সরে গিয়ে দলপতি স্বদলে ভিড়ল। ব্যারিষ্টার-মহলে চাপা-গলায় শতেক আলোচনার অস্ফুট গুঞ্জন ছাপিয়ে সভাপতির কণ্ঠস্বর বেজে উঠল, "আপনার কথা আমরা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেছি—এ অন্যায় অপবাদ থেকে আপনাদের মুক্ত করবার জন্যে আমাদের যথাসাধ্য করব। সভার মুখপাত্র-স্বরূপ আমার বন্ধুবর্গের অনুরোধ-মত আমি আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ ও গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—নাগরিক কর্ত্তব্যে আপনাদের অসীম আগ্রহ। আমার দিক থেকে আমি দলপতি-মশায়ের করমর্দ্দনের অনুমতি প্রার্থনা করছি।"

পুরুষোচিত সবল ভঙ্গীতে দীর্ঘায়ত দুইটি পুরুষ গম্ভীর ভাবে পরস্পরের হাত চেপে ধরল।

ব্যারিষ্টারের দল নাট্যমন্দির থেকে একে একে বেরিয়ে পড়ছেন—জনচারেক টুপী রাখবার আলনার কাছে জড় হয়েছেন—আইজকে সাহেবের নতুন-কেনা ফ্যাসানে টুপীর কোন পাত্তা নেই—তার জায়গায় সুতীর একটা সস্তা টুপী ঝুলছে।

"ইয়াসা!" দলপতির কঠোর উচ্চস্বর দরজার বাইরে থেকে শোনা গেল।

"ইয়াসা! এই শেষবার বলছি—কি-রে?"

ভারী বড় দরজাটা খুলে গেল—দলপতি আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকল—হাতে আইজাক সাহেবের সাধের নতুন টুপী—মুখে ভদ্রজনোচিত স্মিতহাস্য।

"মাপ করবেন—ভারি একটা ভুল হয়ে গেছে—টুপী বদলাবদলি হয়ে গিয়েছিল ও আপনারই? মাপ করবেন…" পরে দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিল, "আরে জিনিষ-পত্তর সামলাও না কেন? চোখ থাকে কোথায়… দাও, ঐ নেকড়ার টুপীটা আমায় দাও। আচ্ছা আসি, আপনারা আমায় মাপ করলেন তো?"

হাসিমুখে অভিবাদন করে চোরের সর্দ্দার তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে পড়ল। *

---

* রুশ-সাহিত্যিক A. I. Kuprin রচিত গল্পের অনুবাদ।

বাদশাহী বিচার-পদ্ধতি ও দণ্ডনীতি

শ্রীকমলকৃষ্ণ বসু, এম্-এ

ভারতে সর্ব্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আরম্ভ হলেও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর গোড়ায় আরবদেশীয় কাসিমের নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম প্রান্তস্থ সিন্ধু প্রভৃতি দেশসমূহের বিরুদ্ধে যে অভিযান হয় তাহা আগেকারগুলোর তুলনায় ছিল বেশ বড় রকমের। দেশ-জয়ের পর আরবরা সিন্ধুদেশে যে রাজ্য স্থাপন করেন তার বিস্তার ছিল যেমন কম, তেমনি ছিল তার অস্তিত্ব অল্পস্থায়ী। তিন অঙ্কে সমাপ্ত মুসলমান কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ বিষয়ক নাটকটির প্রথম অঙ্ক এখানেই শেষ হয়; দ্বিতীয় অঙ্কের আরম্ভ তুর্কী বংশীয় ঘজ্‌নী অধিবাসী মামুদের আক্রমণে এবং ইহার শেষ ঘোর-দেশজাত মহম্মদের ভারতজয়ের সঙ্গে; মোগল বংশীয় বাবরের আক্রমণ তৃতীয় অঙ্কের প্রারম্ভ এবং তাঁহার বংশধরগণের অধীনে রাজ্যস্থাপন ও বিস্তারে ইহার পরিসমাপ্তি।

সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমান আমীর বা সম্ভ্রান্ত সর্দ্দাররাই নিজেদের জমিদারীতে ইংলণ্ডের "ফিউড্যাল" যুগের ব্যারন-দের মত ছিলেন দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। কোরাণ অনুযায়ী বিচার করতেন কাজী—মুসলমানের উপর ত বটেই, হিন্দুরাও তা থেকে বাদ যেতেন না, বিশেষ যখন হিন্দুমুসলমানে কোনো মামলা হ'ত। আর এ ক্ষেত্রে হিন্দুরাই হ'ত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত, বিজিত যেমন হয়ে আসচে বিজেতার হাতে সেই আদিকাল হ'তে। রাজনীতিঘটিত মামলায় কি হিন্দু কি মুসলমান সকলের পক্ষে একই আইন ছিল। বাদী প্রতিবাদী উভয়ে হিন্দু হ'লে সে মামলা পেশ হ'ত হিন্দুদের পঞ্চায়েতীতে, যেখানে তাঁরাই ছিলেন বিচারের সর্ব্বেসর্ব্বা কর্ত্তা। সাধারণ সরকারী বিচারালয়গুলো ছিল হিন্দুদের উপর পীড়ন করবার এক একটা যন্ত্র-বিশেষ। তখন যাজকদের ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, আর যাজকীয় বিধি না মেনে চলবার শক্তি বা সাহস স্বয়ং বাদশাহেরও দেখা যেত না।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর গোড়ায় এলেন ঘজনীর মামুদ তাঁর উদ্দাম প্রচণ্ড জিঘাংসা সঙ্গে নিয়ে। তিনি যেখানেই গেলেন সেখানেই রেখে গেলেন তাঁর প্রতিনিধি-স্বরূপ বিরাট ধ্বংসের প্রতিচ্ছায়া আর আর্ত্তের গগনভেদী মর্ম্মঘাতী হাহাকার। গৃহবিবাদনিরত মৃতপ্রায় হিন্দুজাতি তখন অধঃপতনের শেষসীমায় উপনীত; শক্তি ছিল না তাদের এই দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণকারীর গতির বেগ রোধ করে জননী-জন্মভূমির বা নিজেদের স্ত্রীকন্যার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখে। লুটপাট করতেই মামুদের ভারতবর্ষে আগমন; রাজ্যস্থাপনের দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল না মোটেই, তাই লুটের বিপুল সামগ্রী নিয়েই তিনি নিজের জন্ম-ভূমির দিকে ফিরলেন।

মামুদের পদানুসরণ করে এলেন মহম্মদ, ঘজনী ও হিরাট মধ্যস্থিত দুর্জ্জয় দুরাক্রম্য গিরিসঙ্কুল উপত্যকা 'ঘোর' দেশ হ'তে। মধ্যযুগের খৃষ্টানগণ তাঁদের সেই চিরবাঞ্ছিত জেরুজালেম্ মুসলমানদের করতলগত হ'লে তার উদ্ধারকল্পে যুদ্ধযাত্রা করাটাকে যেমন ধর্ম্মকার্য্য মনে করতেন, খাটি মুসলমান ঘোর-এর মহম্মদ হিন্দুদের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' করতে তার চেয়ে কিছু কম গৌরব মনে করেন নি। ভারতে মুসলমান-রাজ্যের পুনরুদ্ধার বা পুনঃস্থাপন মানসে ও সেই সঙ্গে কাফিরদের বেশ একটু বড় রকমের শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে তাঁর বিরাট বাহিনীর দুর্ব্বার শক্তি ভারতের উপর প্রয়োগ করলেন। জয়ের পর তাঁর অধীনস্থ কুতুবুদ্দীনের উপর অধিকৃত রাজ্য দিল্লীর শাসনভার দিয়ে নিজের দেশে ফিরে গেলেন। আর এখান হ'তে সুরু হ'ল রীতিমত বাদশাহী আমল।

তুর্কী-বংশসম্ভূত ও পরে দাসশ্রেণীভুক্ত কুতুব ও তাঁহার বংশধরগণ যাঁরা ভারত ইতিহাসে 'দাস' রাজা নামে খ্যাত এবং এঁদের পরবর্ত্তী বাদশাহরা যথা খাল্‌জী, তুঘলক্, লোদি, ও সৈয়দবংশীয়গণ যথাক্রমে ভারতের

রাজদণ্ড হস্তগত করেন। তাঁদের আমলের বিচার-ব্যবস্থা সেই আরবদের মতই ছিল, সেই সরকারী ও বেসরকারী বিচারালয়, সেই পঞ্চায়েৎ, সেই আমীর, সেই কাজী আর সেই যাজকসম্প্রদায়; আমীর নিজের জমিদারীতে শাসনকারী, কাজীর অধীনে বিচারভার ন্যস্ত, আর যাজক-সম্প্রদায়ের অসীম ক্ষমতা,—ঐতিহাসিক ঘটনার পুনরাবর্ত্তন! খাল্‌জীকুলতিলক আলাউদ্দীন কিন্তু মোল্লাদের ক্ষমতা খর্ব্ব করে স্বীয় শক্তির ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার পরিচয় প্রদানে পশ্চাৎপদ হননি। তাঁর মতে 'আইন' ও বাদশাহ একার্থবোধক শব্দ; শাস্তিদান করাটা রাজারই বিশেষ স্বত্ব বা অধিকার। স্বতরাং সময়-বিশেষে তিনি মোল্লাদের বিরুদ্ধেও রায় প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। পঞ্চদশ শতাব্দীর 'ওয়ারস্ অফ দি রোজেস্' দেশের বীভৎস নগ্ন মূর্ত্তি প্রকাশ করলে পর, অত্যাচারপীড়িত ইংলণ্ডের জনসমূহ নিজেদের ধনজন রক্ষার্থ যেমন একজন ক্ষমতাশালী রাজার জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করে এবং সেই কারণবশতঃই টিউডর বংশীয়গণ নিজ ইচ্ছানুযায়ী রাজত্ব করলেও ষ্টুয়ার্ট-দিগের মত তাঁদের আমলে দেশে বিদ্রোহের তাণ্ডবলীলা পরিলক্ষিত হয়নি, সেইরূপ আলাউদ্দীন তাঁর পূর্ব্ববর্ত্তী বাদশাহদের তুলনায় স্বেচ্ছাচারী হলেও মোগল কর্ত্তৃক উপর্য্যুপরি আক্রান্ত ও তজ্জন্য ক্লিষ্টচিত্ত ও ব্যথিত প্রজাগণ আলাউদ্দীনের ন্যায় শক্তিমান রাজার বিরুদ্ধে তাঁর অবৈধ স্বেচ্ছাচারিতা সত্ত্বেও নিজেদের মাথা তুলতে সাহস পায় নি। সাধারণ জনসমাজে "ক্ষিপ্ত" আখ্যায় ভূষিত তুঘলক্ বংশীয় মহম্মদ, তাঁর আর যা-কিছু দোষ বা গুণ থাক্ না কেন, আলাউদ্দীন বা ইংলণ্ডের প্ল্যাণ্টাজেনেট বংশীয় দ্বিতীয় হেন্‌রির মত যাজকদের একচেটিয়া অধিকার নতমস্তকে মেনে নিতে মোটেই রাজি ছিলেন না। আর এর জন্য তাঁকে বেগ পেতে হয়েছেও যথেষ্ট। ক্ষুব্ধচিত্ত, অধিকারাবচ্যুত উলেমাগণ রাজার চরিত্রে অযথা দোষারোপ কর্‌তে কোন প্রকার ত্রুটি করেনি; এবং বোধ হয় এই কারণেই মুসলমান ইতিহাসকারেরা স্বকপোলকল্পিত ঘটনানিচয় নানাবর্ণে রঞ্জিত করে জগৎসমক্ষে বাদশাহকে অত্যাচারের পূর্ণাবতার বলে প্রচার করে গেছেন। কিন্তু ন্যায়প্রিয়তাই ছিল এই বাদশাহের একটি মহৎ গুণ। আদালতের খুঁটিনাটি যা-কিছু সবই তিনি নিজে দেখতেন এবং সময়-বিশেষে নিজের বিরুদ্ধেও আদালতের রায় মেনে নিয়েছেন এমন দেখা যায়। গোঁড়া মুসলমান ফিরোজের রাজত্বকালে পুরাতন ব্যবস্থা আবার নূতন করে ফিরে আসে। কোরাণানুযায়ী বিচার ত চল্‌তেই লাগল, তার উপর আবার মোল্লারা তাদের লুপ্ত অধিকার ফিরে পেল। মুফতিরা আইন ব্যাখ্যা করত আর কাজী সাহেব দিতেন বিচারে রায়, এই ছিল তাঁর সময়ের ব্যবস্থা। সে সময়কার আইন ছিল বড়ই কঠোর ও অমানুষিক; পীড়ন করাই ছিল সত্যনির্দ্ধারণের একমাত্র পন্থা; সংশোধন করা ত দূরের কথা, অপরাধীকে প্রতিশোধ দেওয়াই ছিল শাস্তিদানের আসল উদ্দেশ্য। মোটের উপর সে সময়ের দণ্ডনীতির ব্যবস্থা মধ্যযুগ বা ফরাসা বিপ্লবের আগে ইউরোপ বা ইংলণ্ডে যেপ্রকার দোষীদের শাস্তিদান বা পীড়ন করার রীতি ছিল তাই মনে করিয়ে দেয়।

ভারত-আক্রমণকারী দুর্দ্দমনীয় তৈমুর ও চেঙ্গিসের বংশধর, স্বচ্ছতোয়া জাক্‌সারটেস্ নদীকূলস্থিত সমরকন্দ অধিবাসী বাবর লোদিদের পরাস্ত করে ভারতে মোগল রাজবংশ স্থাপন করেন। নিজেকে মোগলবংশজাত বলে প্রচার করতে তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না, এবং স্বীয় ধমনীতে মোগল রক্ত প্রবাহিত ছিল ব'লে বিশেষ লজ্জিত হলেও তাঁর দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ও তাঁর বংশধরগণ ঐতিহাসিকদের নিকট মোগল বলেই প্রচারিত হ'য়ে আস্‌চেন। আড়াই শত বৎসর স্থায়ী মোগলদের শাসন সময়ে ভারতে কিরূপ বিচার-ব্যবস্থা কায়েম ছিল জানবার জন্য নজির পাওয়া যায়।

মোগল আমলের বিচারপ্রণালীর মূলে শৃঙ্খলা বা পর্য্যায়ের খুবই অভাব দেখা যায়। স্থান বা জনসংখ্যা অনুযায়ী বিচারালয়ের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হ'ত না। সেজন্য স্থান-বিশেষে জনাধিক্য হলেও হয়ত আদালতের সংখ্যা ছিল কম—হোক্ না কেন সেখানে বিচারের ত্রুটি! আজকালকার ইংরেজ রাজত্বে আদালতগুলোর যেমন পর্য্যায় আছে—মহকুমার আদালত হ'তে আরম্ভ করে হাই-কোর্টে বা প্রিভি-কাউন্সিল পর্য্যন্ত আপিল যাবার যেমন বন্দোবস্ত আছে, তেমনটি কিন্তু সেকালে ছিল না, এটা

জোর গলায় বলা যায়। তারপর তখন ভিন্ন আদালতে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বিচারের কোনো বাঁধাবাধি নিয়ম দেখা যেত না। বাদশাহ নিজে ও তাঁর 'সদর' দেওয়ানী মামলা বিচার করতেন। এ ছাড়া বাদশাহকে যে ফৌজদারী মামলা বিচার করতে হ'ত না তাও নয়। আর কাজীর কাজ ছিল প্রধানতঃ ফৌজদারী মামলা নিয়েই থাকা। অবশ্য সময়ে সময়ে ইহারও ব্যতিক্রম হত।

একাধিক ইউরোপীয় ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে বেড়াতে বা বাণিজ্য উপলক্ষ্যে এসে দিল্লী বা আগ্রায় বাদশাহী বিচার কিরূপ চলত তা নিজেদের ভ্রমণ-কাহিনীতে লিখে গেছেন। বাদশাহের দরবার সাধারণতঃ "কোর্ট অফ অ্যাপীল"হলেও সময়ে সময়ে court of first instance ও ছিল। কতকগুলো বাছা মোকদ্দমা ছাড়া তিনি সবগুলোর বিচার করতেন না। আকবরের সময়ে সম্রাটের বিচারের কোন নির্দ্দিষ্ট দিন ধার্য্য ছিল না; যেদিন তিনি বিচার করবেন ব'লে স্থির করতেন, সেদিন নাকাড়া বাজিয়ে লোকদের জানান হ'ত। কেহ কেহ বলেন যে, জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়ে রাজপ্রাসাদের বারান্দার সহিত একটি লোহার শিকল টাঙান থাকত। প্রজাবর্গ নিজেদের আর্জ্জি বা প্রার্থনাপত্র তা'তে বেঁধে দিত। পরে বাদশাহ সেগুলো নিজে দেখে যথাকর্ত্তব্য করতেন। ফিঞ্চ সাহেব (১৬১১ খৃঃ) জাহাঙ্গীরের সময়ে কেমন ক'রে বিচার-কার্য্য চ'লত তা বলে গেছেন। চারিটি তোরণবিশিষ্ট আগ্রা-দুর্গের পশ্চিমদিকেরটির নাম ছিল কাছারি ফটক; কারণ এখানে বসিতেন কাজীসাহেব, আর ছিল বাদশাহের উজীরের কাছারি বাড়ী। উজীর সাহেব রোজ সকালে তিন ঘণ্টা করে বিচারাসনে বসে খাজনা, বৃত্তি, ঋণ ও জমিজমা সংক্রান্ত যাবতীয় মামলার বিচার করতেন। প্রায় পাঁচ বছর পর টেরি সাহেব দেখেন যে, সম্রাট নিজে তাঁর দরবারের সন্নিহিত স্থানসমূহে সঙ্ঘটিত ব্যাপারের মোকদ্দমা দেখতেন; secundum allegata ও probata সম্পর্কীয় মামলার বিচার তিনি নিজেই করতেন। বিচার-কার্য্য যেমন তাড়াতাড়ি শেষ হ'ত, তেমনি হ'ত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপ্রদান। দরবারের বাইরে প্রাদেশিক কর্ত্তারাও রাজার পদাঙ্ক অনুসরণ করতে কসুর করতেন না। কোনো আইনের বই ছিল না, বাদশাহ বা তাঁর প্রতিনিধির ইচ্ছাই ছিল তখনকার আইন। ডচ্ কর্ম্মচারী ফ্রানসিস্কো পেল্‌সায়ের্ট (১৬২১ খৃঃ) বলেন যে, জাহাঙ্গীর রাজ্য নিয়ে বড়-একটা মাথা ঘামাতেন না, কেবল শিকার নিয়েই থাকতেন ব্যস্ত। দরবারে কোনো প্রার্থী উপস্থিত হ'লে তার যা বলবার ছিল সব শুনে বাদশাহ উত্তরে 'হাঁ' বা'না'কিছুই না ব'লে তাঁর শ্যালক আসফ খাঁকে যথাবিহিত করতে বল্‌তেন, আর খাঁ সাহেব তাঁর ভগ্নী নূরজাহানের পরামর্শ ব্যতিরেকে কিছুই করতেন না। প্রত্যেক শহরেই একটি ক'রে কাছারি ছিল, যেখানে সপ্তাহে চারিদিন ক'রে গভর্ণর, দেওয়ান, বক্সী, কোতওয়াল এবং কাজী একত্রে বসে মামলার বিচার করতেন। চুরি, খুন প্রভৃতি মামলার বিচার কর্ত্তে হ'ত গভর্ণরকে। আসামী গরীব হ'লে তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হ'ত। অন্যান্য অপরাধে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হ'ত; বিবাহবন্ধনচ্ছেদ, ঝগড়া, লড়াই, ভয়প্রদর্শন প্রভৃতি মোকদ্দমা কোতওয়াল বা কাজী বিচার করতেন। পেল্‌সায়ের্ট তাঁর "Remonstrantie"তে বাদশাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত বিচারকদের কষাঘাত করতে ত্রুটি করেননি; তারা যে কিরূপ লোভী ছিল ও আসামীর নিকট হ'তে অর্থগ্রহণে কিরূপ ক্ষিপ্রহস্ত ছিল তা তিনি ব'লে গেছেন। তাদের লুব্ধ চাহনি ও তাদের লোলুপ মুখবিবর আসামীর মনে সদাই আতঙ্কের সৃষ্টি করত।

শাজাহান বা ঔরংজীবের আমলের বিচার-প্রণালীও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। প্রতি বুধবার সকাল আটটার সময় সম্রাট দেওয়ানী খাসে আসন গ্রহণ করতেন এবং বেলা এগারটা পর্য্যন্ত বিচার-কার্য্যে নিযুক্ত থাকতেন। তাঁদের চারিদিকে আদালতের বড় বড় কর্ম্মচারী, যেমন যাজকীয় বিধিবেত্তা কাজী, চিরপ্রচলিত প্রথারূপ আইনশাস্ত্রে (Common Law) পারদর্শী আদিল, মুফ্‌তি, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ উলেমা, নজিরজ্ঞ আইনবেত্তা, এবং কোতওয়াল বা নগররক্ষক প্রভৃতি স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট থাকৃত। বিশেষ দরকার ছাড়া অন্য কোনো কর্ম্মচারীর সেখানে প্রবেশ

নিষেধ ছিল। ফরিয়াদীদের একে একে রাজার নিকট নিয়ে যাওয়া হ'ত, এবং তাদের বক্তব্য কর্ম্মচারীরা বাদশাহকে জানাত। মোকদ্দমা শুনানীর পর উলেমার সাহায্যে বাদশাহ নিজে রায় দিতেন। দূরদেশ থেকে কোনো বিচার-প্রার্থী এলে পরে জামিন তদন্তের ভার প্রাদেশিক কর্ত্তার উপর পড়ত ; হয় তিনি নিজেই বিচার করতেন,নয় বাদী ও ফরিয়াদীকে বাদশাহের কাছে আবার পাঠিয়ে দিতেন। ফরাসী পরিব্রাজক বার্ণিয়ে বলেন যে, সপ্তাহের এক নির্দ্দিষ্ট দিনে সম্রাট তাঁর গরীব প্রজাদের দশটি করে আবেদন নির্জ্জনে শুনতেন। এগুলো সাধারণতঃ কোনো সৎব্যক্তি বা বড়লোক কর্ত্তৃক রাজার নিকট দাখিল হ'ত। চুরি বা ডাকাতির মামলায় চোর বা ডাকাতের প্রাণদণ্ড হ'ত এবং প্রাদেশিক কর্ত্তাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করতে হ'ত। পাঠান-সম্রাট শের শাহের আমলেও এই আইনই বাহাল ছিল। গ্রামে কোনো চুরি বা খুন-খারাপি হলে ও অপরাধী ধরা না পড়লে, সমস্ত গ্রামকেই এর জন্য দায়ী করা হত। অপরাধী সনাক্ত না হ'লে গ্রামের মোড়লকে হয় কয়েদ না হয় অন্য কোন শাস্তি দেওয়ারই রীতি ছিল।

পূর্ব্বে একবার বলা হয়েছে যে, বাদশাহ ছাড়া 'সদর'-এর উপরও দেওয়ানি মামলা বিচারের ভার ছিল। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বিশেষ বিশেষ দেওয়ানি মামলা ছাড়া তিনি (সদর) সকলপ্রকার মামলার বিচার করতে পেতেন না। প্রত্যেক প্রদেশে একটি করে সদর নিযুক্ত ছিল এবং সবগুলি সদরের উপর একটি শ্রেষ্ঠ সদর বা 'সদর-উস্-সদুর' থাকত ; এই শ্রেষ্ঠ সদরই স্থান-বিশেষে 'সদর-ই-জহাঁ' বা 'সদর-ই-কুল' ব'লে অভিহিত হতেন। ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি, পণ্ডিত বা ফকির কর্ত্তৃক প্রাপ্ত সরকারী বৃত্তি বা নিষ্কর জমিগুলির যথারীতি ব্যবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হ'ত এই সদরদের। তিনি ছিলেন সরকারী ভিক্ষাবিতরণ-কর্ত্তা, সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, সদরের ক্ষমতা নিতান্ত অল্প ছিল না, এবং ইচ্ছা করলে তাঁরা অসৎ উপায়ে অনেক রোজগার করতে পারতেন। সেইজন্য এই কার্য্যে চরিত্রবান লোককে বাহাল করা হ'ত। শুনতে পাওয়া যায়, আকবরের সময়ে এই কর্ম্মচারীরা নাকি যথেচ্ছাচারী ছিলেন ও উৎকোচ-গ্রহণে কোনো দ্বিধা বোধ করতেন না।

ফৌজদারী আদালতখানার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন কাজী সাহেব এবং তাঁর কাজ ছিল ঘটনা শুনানীর পর মুফ্‌তির সহায়তায় নিজের রায় প্রকাশ করা। মুফ্‌তির কাজটি যে কি তা বোঝাতে হ'লে বলতে হবে যে, আজকালকার অ্যাডভোকেট জেনারেল মহাশয়কে যে কাজ করতে হয়, তাঁকে অনেকটা তাই করতে হ'ত। অর্থাৎ সাক্ষীসাবুদ নেওয়ার পর ঘটনার সারমর্ম্ম পেশ করে কোন্ আইনটা ঘটনাপ্রসঙ্গে কতদূর খাটতে পারে বা কোন্ দণ্ড অপরাধীকে দিতে পারা যায় এই বিষয়ে কাজী সাহেবকে পরামর্শ দেওয়া। এইখানেই মুফ্‌তি কাজে রেহাই পেতেন। কিন্তু এই কাজে পারদর্শিতালাভের জন্য মুফ্‌তি মহাশয়কে চব্বিশ ঘণ্টাই আইনের বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকতে হ'ত ; কোথায় কোন্ মামলায় কি রায় দেওয়া হয়েছে, সেটা তাঁকে কণ্ঠস্থ রাখতে হ'ত ; আইনের মারপ্যাচের মধ্যেই তিনি দিন কাটাতেন। নজিরের বিরুদ্ধে কাজী কোনো রায় দিলে, মুফ্‌তি অতি নম্রতা সহকারে বিচারককে বলতেন যে, এই জাতীয় ঘটনায় পূর্ব্বে অমুক সাজা দেওয়া হয়েছে আর তার নজির অমুক জায়গায় আছে ; তিনি এই বইটি পড়ে নিজের রায় দিলে ভাল হয়, ইত্যাদি। তখন কাজী সাহেব মুফ্‌তির বক্তব্য অনুযায়ী নিজের বিচারাজ্ঞা দিতেন। কাজীদের যে খুবই আইনজ্ঞ হ'তে হ'ত এমন নয়, কারণ তাঁর কাজ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে তাঁদের আইন জ্ঞানের ততটা দরকার হ'ত না, যতটা দরকার হ'ত সাধারণ বুদ্ধির ও আরবী ভাষায় বুৎপত্তির। তবে সাধারণতঃ এই চাকরীর জন্য আবেদনকারীদের আইন-জ্ঞানের প্রতি যে একেবারেই লক্ষ্য রাখা হ'ত না এমন নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে তাদের সত্যনিষ্ঠা নিরপেক্ষতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের প্রতি বেশী লক্ষ্য রাখা হ'ত। মুসলমান আইনে নিরক্ষর ব্যক্তিকে কাজীর পদে বাহাল করার রীতি দেখ্‌তে পাওয়া যায়, কারণ কাজীর কার্য্য মাত্র অন্যের পরামর্শ অনুসারে নিজের বিধান দেওয়া। প্রজার স্বাভাবিক অধিকার বজায় রাখবার জন্যই এই পদের

উৎপত্তি ও অন্যের মতানুযায়ী রায় দেওয়াতেই ইহার সার্থকতা। খৃঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীতে গ্রীস দেশে আইন-অনভিজ্ঞ লোককে বিচারকের পদে নিযুক্ত করার রীতিতেও বোধ হয় এই মূল নীতিই নিহিত থাক্‌তে পারে। বার্ণিয়ের বিবরণ থেকে জানা যায়, মোগল আমলে কাজীদের এমন ক্ষমতা ছিল না যে, তাঁরা পীড়নকারী প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা জায়গীরদারদের হাত থেকে অত্যাচারপীড়িত প্রজাদের রক্ষা করেন। রাজধানী বা তন্নিকটস্থ স্থানসমূহে এরূপ ঘটনা দেখা না গেলেও, দূরদেশে শাসনকর্ত্তার ক্ষমতা ছিল অপরিসীম, এবং তাঁরাই ছিলেন সেখানকার কর্ত্তা।

রাজধানী ছাড়া প্রত্যেক প্রদেশেই ছিল কাজীর আস্তানা। সবগুলি কাজীর উপরে ছিলেন এক শ্রেষ্ঠ কাজী, বা কাজী-উল্-কুজ্জৎ। তিনি সর্ব্বদাই বাদশাহের সঙ্গসুখ লাভ করতেন। যেখানেই সম্রাট গমন করুন না কেন, সঙ্গে যেতে হ'ত এই কাজী সাহেবকে। ইনিই ছিলেন বিচারের সময় রাজার ডানহাতস্বরূপ।

নূতন কাজীকে পদে বাহাল করবার সময় নিম্নলিখিত উপদেশগুলি দেওয়া হ'ত—

১। ন্যায়বিচারী, সৎপথাবলম্বী ও অপক্ষপাতী হবে।

২। বাদী ও প্রতিবাদীর সামনে বিচার করবে।

৩। কাছারী ছাড়া অন্য কোথাও বিচার করবে না।

৪। কাহারও নিকট হ'তে কোন রকম উপহার নেবে না বা যার তার মজলিশে বা নিমন্ত্রণে যাবে না।

৫। রায়, দলিল বা অন্যান্য আইন-ঘটিত কাগজপত্র এমন করে লিখবে যা'তে কেহ দোষ বার করে অপদস্থ না করে।

৬। দারিদ্র্যকেই নিজের গৌরব মনে করবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই উপদেশগুলি বড় একটা কাজে আসত না। কারণ কথিত আছে যে, কাজী সাহেবরা মোটেই উপদেশ অনুযায়ী কার্য্য করতেন না। কয়েকজন ছাড়া বেশীর ভাগ কাজীই ছিলেন অসৎকার্য্যের পূর্ণাবতার। ঔরংজীবের আমলের শ্রেষ্ঠ কাজী, আবদুল ওহ্‌হাব বোরা, তাঁর ১৬ বৎসর চাকরীর মধ্যে নগদ ৩৩ লক্ষ টাকা ছাড়া জহরৎ ও অন্যান্য অনেক মূল্যবান জিনিষ সঞ্চয় করেন। রাজ-দরবারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাজীই যখন এইরূপ, তখন অন্য পরে কা কথা। আবার মধ্যে মধ্যে ভাল লোকও দেখ্‌তে পাওয়া যায়। আবদুলের পুত্র শেখ-উল্-ইসলাম-এর (যিনি পরে তাঁর পিতার পদ পান) চরিত্র ছিল ঠিক তাঁর পিতার উল্টা। অসদুপায়ে সঞ্চিত পিতার বিপুল সম্পত্তি তিনি স্পর্শ পর্য্যন্ত করেন নি, এবং দান-খয়রাতে সব খরচ করেন। কারও কাছ থেকে কোনো সওগাদ তিনি গ্রহণ করতেন না। শেখ-উল্-ইসলামের মত লোক ছিল খুবই অল্প, বেশীর ভাগ লোকই ছিল অত্যাচারী। তাই, বড় দুঃখে ঔরংজীব তাঁর আদালতগুলিকে 'পীড়নের কাছারী' আখ্যায় ভূষিত করেন; আর বোধ হয় কাজীদের অত্যাচারের জন্যই 'কাজীর বিচার' প্রভৃতি প্রবাদবাক্য জনসাধারণে এতদিন চলে আসছে।

প্রতি সপ্তাহের বুধবার ও শুক্রবার ছাড়া আর সবদিনে কাজী বিচারে বসতেন। শুক্রবার ছিল ছুটীর দিন—আজকালকার রবিবারের মত সেদিন কাজকর্ম্ম সবই বন্ধ থাকত। প্রতি বুধবার কাজী সাহেবদের স্ব স্ব প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার সঙ্গে দেখা করতে হ'ত। সকাল থেকে আরম্ভ করে দুপুর পর্য্যন্ত বিচারের কাজ চলতে থাকত।

কাজী কোরাণ অনুযায়ী নগরের জুমা মসজিদে বা জনসাধারণের সামনে বিচার করতেন। সময়-বিশেষে স্বীয় বাসস্থানে বিচার করবার ব্যবস্থা কোরাণে নিষেধ না থাকলেও, এটা বেশ স্পষ্ট বলা ছিল যে, যদি কাজী নিজের বাড়ীতে বিচার করেন, তাহলে সেখানে সকলকে যেতে দিতে হবে, এবং এরূপ বন্দোবস্ত করতে হবে যে, কারও যেন কোনপ্রকার অসুবিধা না হয়।

পূর্ব্বে একবার বলা হয়েছে যে, সদর বা কাজীর আদালত প্রাদেশিক রাজধানীতে অবস্থিত ছিল, এবং ইহাকে 'মহকুমা-ই আদালত' বলে অভিহিত করা হ'ত। এখন প্রশ্ন হ'তে পারে এই যে, তাহলে ছোট ছোট গ্রামগুলিতে বিচারের কি ব্যবস্থা ছিল? অর্থশালীরা না হয় খরচ-খরচা করে নিজেদের অভিযোগ সদর আদালতে পেশ ক'রতেন, গরীবদের ত টাকা ছিল না,

তারা ক'রত কি? এরা নিজেদের মামলা, অভিযোগ প্রভৃতি কখন স্থানীয় পঞ্চায়েৎ, কখন বা শালিসের কাছে নিয়ে যেত। আর এখানে যে ফয়সালা হ'ত তা তাদের মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। আবার এ-ও দেখা যায় যে, তা'রা কখন কখন বা নিজেদের লাঠির জোরে যা-হক একটা কিছু নিষ্পত্তি করত। এক্ষেত্রে লাঠি যার মাটি তার।

এই ত গেল মোগল আমলের বিচার-পদ্ধতির কথা; এবার সে-সময়কার আইন-কানুন সম্বন্ধে দুই চারিটি প্রয়োজনীয় কথা বলা যাক। এটা সহজেই অনুমেয় যে, তখনকার ব্যবহার-বিজ্ঞানের উৎপত্তি ভারত-বর্ষের বাইরে হয়। কোরাণ বা তাহার টীকা অনুসারে বিচার চল্‌তি। প্রধানতঃ কোরাণের চারটি টীকাই দেখতে পাওয়া যায়, যথা হনাফি, মলফি, সফি, ও হন্‌-বালি। এর মধ্যে প্রথমটিরই ভারতবর্ষে মোগলদের আমলে বেশী চলন ছিল। কোরাণ ছাড়া নজিরের উপরও দৃষ্টি রাখার বিধি দেখতে পাওয়া যায়; আইন-ব্যবসায়ীর মতামত যে মোটেই লওয়া হ'ত না এমনও নয়। কোরাণ ছাড়া নজির বা ব্যবহারশাস্ত্রজীবীর মতামতের মূল্য কম না হলেও বা সেই অনুসারে বিচারকার্য্য পরিচালিত হলেও বাদশাহের বা কাজীর স্বীয় মীমাংসার দ্বারা কোনো রীতি-নির্দ্ধারণ বা কোরাণের কোনো অস্পষ্ট ধারাকে স্পষ্ট করার মোটেই ক্ষমতা ছিল না; নজির ও আইনজ্ঞদের মত কোরাণকে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা ছাড়া অপর কোনো নূতন কানুন বা মূলনীতি তাঁরা প্রণয়ন করতেন না। বস্তুতঃ কার্য্যক্ষেত্রে বিচারকগণকে সদাসর্ব্বদা আরবীয় লেখকগণ অনুমোদিত আইনশাস্ত্রের একটি চুম্বক নিজেদের নিকট রাখতে হ'ত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বাদশাহের রাজত্বসময়ে বিচারকার্য্যের সুবিধার জন্য একটি আইনের চুম্বক বা সারসংগ্রহ করা হয়। প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে বড় বড় আইনবেত্তার সাহায্যে আইনের যে বইটি ঔরংজীব সঙ্কলন করান, সেটির নামকরণ হয়—"ফতোয়া-ই-আলমগিরি।"

মোগল আমলে মুসলমান বা হিন্দুদের জন্য ভিন্ন আইন চলিত ছিল না—উভয়ের জন্য এক আইন বিধিবদ্ধ ছিল। হিন্দুদের জন্য যে একমাত্র কাজীর বিচারালয় ছিল এমন নয়। তাদের মধ্যে স্বজাতীয় আদালত বা শালিসি-করণের ব্যবস্থাও লক্ষিত হয়ে থাকে। তবে উহার বেশী প্রচলন ছিল দক্ষিণাপথে। উদারনীতিজ্ঞ আকবরের সময় হিন্দুদের জন্য আলাদা আদালত স্থাপিত হয়। এখানে মনুর ব্যবস্থা মত বিচারকার্য্য সম্পন্ন হ'ত। কোনো কোনো ইংরেজ-লেখক হিন্দুদের আদালতে যে আইন প্রচলিত ছিল তাকে 'জেন্টু কোড' বলে অভিহিত করেছেন।

বাদশাহী আমলে অপরাধীকে কি দণ্ড দেওয়া হ'ত জানার আগে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মুসলমান ব্যবহারশাস্ত্রে অপরাধকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা হয়েছে; যথা—

১। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ

২। সমাজ, জাতি, বা রাজার বিরুদ্ধে অপরাধ

৩। ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধে অপরাধ।

প্রথম অপরাধের শাস্তিবিধান-করণ স্বয়ং ঈশ্বরের অধিকার; দ্বিতীয় বা তৃতীয়টির উপর ব্যক্তিগত অধিকার। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়, নরহত্যা প্রথম পর্য্যায়ভুক্ত নয়, হত্যাকারীরা হত ব্যক্তির আত্মীয়কে খেসারৎ দিয়ে সন্তুষ্ট করতে পারলেই দায় হ'তে রেহাই পেত। আর যেখানে আত্মীয়েরা ক্ষতিপূরণে সন্তুষ্ট না হ'ত, সেখানে কাজীকে বিচার করে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিতে হ'ত।

সেকালে শাস্তিবিধান-কার্য্যের চারিটি শ্রেণীবিভাগ ছিল, যেমন হিদ্, তাজির, কিসস্, ও তহসীর। যে শাস্তিতে খাস্ ঈশ্বরের অধিকার ছিল, তাকে বলত হিদ্। কোরাণ অনুযায়ী এই শ্রেণীর শাস্তির কোনরূপ ব্যতিক্রম করার কারও ক্ষমতা ছিল না—তা তিনি, যিনিই হন না কেন। এই প্রকার শাস্তিবিধান নিতান্ত উদ্দেশ্যবিহীন ব'লে মনে হয় না ও প্রজাগণকে অপরাধ হতে বিরত রাখাই এরূপ দণ্ডবিধানের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

হিদের কয়েকটি নমুনা দেওয়া গেল।—

১। ব্যভিচার দোষে অভিযুক্ত দোষীদের পাথর ছুঁড়ে মারা হ'ত। অবিবাহিত স্ত্রী-পুরুষের অবৈধ সঙ্গমের জন্য একশটি বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা ছিল।

২। বিবাহিত নর-নারীর চরিত্রে অযথা ব্যভিচারিতা আরোপ করলে অপরাধীর দণ্ড ছিল আশীটি বেত্রাঘাত।

৩। মদ্য বা অপর মাদকদ্রব্য ব্যবহারের জন্য পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় দণ্ড দেওয়া হ'ত।

৪। চোরের ডান হাতটি কাটার বিধি ছিল (সরিক)। কোরাণেও এই ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। কোরাণেব টীকাকাববা স্পষ্টই লিখেছেন যে, প্রথম অপবাধেব জন্য ডান হাতের কব্জী কাটা হবে, দ্বিতীয় অপরাধে বাম পাযেব গোড়ালি অবধি; তৃতীয় অপরাধে বামহস্ত, চতুর্থ অপরাধে ডান পা। এখানে একটি কথা মনে বাখতে হবে যে, অপহৃত দ্রব্যেব মূল্য চারি দিনার বা তাব বেশী হলে অপরাধীব অঙ্গছেদনেব ব্যবস্থা হ'ত।

৫। বাহাজানিব জন্য অপরাধীব হাত ও পা কেটে দেওয়া হ'ত। কিন্তু বাহাজানিব সঙ্গে নবহত্যা সংশ্লিষ্ট থাকলে দোষীকে তববাবিব দ্বারা বা ক্রুশে মেবে ফেলা হ'ত।

৬। স্বধর্ম্মত্যাগেব শাস্তি ছিল প্রাণদণ্ড।

"তাজিব" নামে অভিহিত দ্বিতীয শ্রেণীব শাস্তিতে ঈশ্বরেব কোন অধিকার ছিল না; কাজীব মতানুযাযী দণ্ড নির্দ্ধাবিত হ'ত। কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় শাস্তির উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

১। মৃদু ভৎ সনা। ২। 'জির্' বা অপবাধীকে বল-প্রয়োগ সহকাবে আদালত-দ্বাবে নিয়ে যাওয়া বা জন-সাধারণ সমক্ষে অপদস্থ করা।

৩। কারাবাস বা স্বদেশ হ'তে নির্ব্বাসন।

৪। কানের উপব ঘুষি মারা বা বেত মারা। বেত্রাঘাতের সংখ্যা ছয় হ'তে উনচল্লিশ, বা কারও মতে পঁচাত্তর।

হন্‌ফি মতাবলম্বী আইনবেত্তা কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় সংগৃহীত "হেদায়া" নামক আইনশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, "জিদ্" অপরাধীর অবস্থাভেদ অনুযায়ী দেওয়া হবে; সদ্বংশজাত বা ধনশালী অপরাধীর জন্য কেবলমাত্র ভৎ র্সনা প্রয়োগই যথেষ্ট বিবেচিত হ'ত। তাহাকে বেত্রাঘাত বা মুষ্ট্যাঘাত করা বা বলপ্রয়োগ সহকারে কাছারিবাড়ীতে নিয়ে যাওয়া অসঙ্গত ছিল।

অর্থদণ্ড, যাহাকে ফারসী ভাষায় "তাজির-উল্-মাল" বলে, অধিকাংশ কোরাণের টীকাকারের মতে অবৈধ বিবেচিত হওয়ায়, অপরাধীকে এই শাস্তি দেওয়া হ'ত না। ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব কর্ত্তৃক গুজরাত বা অন্যান্য সুবা বা প্রদেশেব দেওয়ান বা সচিবকে লিখিত ফরমানে অনুজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে যে, বাজপুরুষ, জমিদার বা সাধারণ লোক অপবাধ করলে তাঁদেব যেন কারারুদ্ধ, কর্ম্মচ্যুত বা নির্ব্বাসিত করা হয়, কিন্তু যেন অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা না হয়।

ফারসী "কিসাসেব" বাঙ্গলা প্রতিশব্দ 'প্রতিশোধ'। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি নিজে বা তাঁর কোনো আত্মীয় অপরাধীর নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য দাবি ক'রতে পারত। তবে সাধারণতঃ নরহত্যা প্রভৃতি অভিযোগে বাদী এই ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'ত। বাদী দণ্ডবিধান প্রার্থনা করলে কাজীর গত্যন্তর ছিল না, বাদশাহ নিজে বা তাঁর কাজী কারও এমন ক্ষমতা ছিল না যে, শাস্তি অল্পবিস্তর লঘু করেন। হত ব্যক্তির আত্মীয়বর্গ ইচ্ছা করলে প্রতিবাদীর নিকট হ'তে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করতে পারত। বাদী price of blood বা অর্থগ্রহণে স্বীকৃত হ'লে অপরাধীকে অন্য কোনো শাস্তি দেওয়া হ'ত না। ইংলণ্ডের Anglo-Saxon যুগেব মত ছোটখাট অপরাধের শাস্তি ছিল, "a tooth for a tooth and an eye for an eye."

"তহসীব" অর্থে সাধারণ সমক্ষে অপরাধীকে অপমান-করণ। অপরাধীর মাথা মুড়িয়ে দেবার পর তাকে গাধার পিঠে, লেজের দিকে মুখ ক'বে চড়ান হ'ত; হয় তার সমস্ত শরীরে ধূলা মাখিয়ে দেওয়া হ'ত, না হয় তার গলায় একটি জুতাব মালা পরান হ'ত; এবং পরে বাদ্য-সহযোগে সহরের রাস্তার উপর দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে সহরের বাইবে তাড়িয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। কখনও কখনও বা অপরাধীব মুখে কালি মাখান হ'ত, তবে তার সঙ্গে চূনও লাগান হ'ত কিনা জানা যায় না।

রাজদ্রোহিতা, রাজকোষস্থ ধন অপহরণ বা সময়ে খাজনা দিতে ত্রুটি করলে কি শাস্তি দেওয়া হবে তার কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম দেখতে পাওয়া যায় না। বাদশাহ নিজের ইচ্ছানুযায়ী দণ্ডবিধান করতেন। সাধারণতঃ এই অপরাধে অভিযুক্ত লোকদের হয় হাতীর পায়ের তলায়

নিক্ষেপ করা হ'ত, না হয় মাটিতে জীবন্ত পুঁতে ফেলা হ'ত, বা বিষধরের দ্বারা দংশন করান হ'ত।

উত্তমর্ণ অভিযোগ আনলে কাজী প্রথমে অধমর্ণকে ঋণশোধ করতে বলতেন। আজ্ঞা পালন না করলে বা পালনে অক্ষম হ'লে প্রতিবাদীকে কারাগারে পাঠান হ'ত।

নালিশের বিচার বৈধ বলে প্রতিপন্ন ছিল। প্রয়োজনবিশেষে কাজী সাহেব তাদের যথাশক্তি সাহায্য করতে ত্রুটি করতেন না।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে ঔরংজীব কর্ত্তৃক গুজরাট প্রদেশের দেওয়ানকে লিখিত একখানি 'ফরমান' সমসাময়িক দণ্ড-ধারার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ। চুরি, রাহাজানি, বা অন্যান্য অপরাধের শাস্তি কিরূপ হবে জানানই এই ফরমানের আসল উদ্দেশ্য। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, ফারমানে লিখিত দণ্ডবিধি কোরাণে লিপিবদ্ধ দণ্ড থেকে কিছু লঘুতর ছিল। আর একটি কথা। যাতে বিচারকেরা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বেশীদিন বিচারের ছলে কারাগারে আবদ্ধ না রেখে শীঘ্র শীঘ্র বিচারের কাজ শেষ করেন, এই উদ্দেশ্যেও ফরমানটি লিখিত হয়। ঔরংজীবের ফরমান বাহির হবার প্রায় সাত বৎসর পর দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্ব-কালে যে হেবিয়াস কোর্পাস আইনটির (১৬৭৯ খৃঃ) প্রচলন হয় তার মূলেও এই একই সত্য নিহিত ছিল।

এইবার ঔরংজীবের ফরমানের গোটাকয়েক দরকারী দফা আলোচনা করা যাক্।

১। সাক্ষীসাবুদ দ্বারা চুরি প্রমাণিত হ'লে কিংবা অপরাধী স্বয়ং দোষস্বীকার করলে ও 'হিদ' ন্যায় বিবেচিত হ'লে কাজী দণ্ডবিধান করতেন এবং যতক্ষণ না অপরাধী অনুতাপানলে দগ্ধ হ'ত ততক্ষণ তাকে কারারুদ্ধ করাই ছিল ন্যায়সঙ্গত।

২। শহরে খুব চুরি হ'তে আরম্ভ হ'লে এবং চোর ধরা পড়লে, তার মস্তকচ্ছেদ বা তাকে শূলে চড়ান হ'ত না, কারণ এটা তার প্রথম অপরাধ হ'তে পারে।

৩। প্রথম অপরাধে বা অপহৃত দ্রব্যের মূল্য চারি 'দিনার' (স্বর্ণ মুদ্রা)-এর কম হ'লে, চোরকে 'তাজির' বা ভৎর্সনা করা হ'ত। কিন্তু উহাতেও অপরাধীর কোন শিক্ষা না হ'লে এবং পুনরায় সে এই অভিযোগে অভিযুক্ত হ'লে যে পর্য্যন্ত না সে অনুতাপ করে সে পর্য্যন্ত তাকে কারাগারে রাখা হ'ত। এবারেও তার চৈতন্য না হ'লে অনেক দিন পর্য্যন্ত কারাবাস (সিয়াসৎ) বা প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত। স্বত্ব প্রমাণিত হ'লে মালিক চোরাই মাল ফিরিয়ে পেতেন, নতুবা ইহা 'সরকারী খাজনায়' (বয়েত-উল্-মাল) জমা দেওয়া হ'ত।

৪। দুইবার চুরি করার পর প্রত্যেক বারেই হিদ দেওয়া সত্ত্বেও যদি কেহ পুনরায় চুরি করে বা চুরি করাটাই যদি তার স্বভাব হয়, তাহ'লে তাকে 'তাজির' দেওয়ার পর কারারুদ্ধ করা হ'ত। এতেও না শোধরালে তাকে যাবজ্জীবন কারাগারে পাঠান হ'ত।

৫। কবর খুঁড়ে মৃতদেহ বাহির করার অপরাধে, প্রথম অপরাধের জন্য মাত্র ভৎর্সনা। দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য নির্ব্বাসন বা হস্তচ্ছেদ।

৬। রাস্তায় ডাকাতী করার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজের দোষ স্বীকার করলে তাকে যথাযথ শাস্তিবিধান করা হ'ত। অপরাধ দোষীর প্রাণদণ্ডের উপযোগী না হ'লেও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা বা বিচারক প্রাণদণ্ডের পক্ষ-পাতী হ'লে এই শাস্তিবিধানই যুক্তিসঙ্গত ছিল।

৭। চোরাই মাল কারও কাছ থেকে পাওয়া গেলে বা সে চোরের সহকারী ব'লে প্রমাণিত হ'লে প্রথম অপরাধের জন্য 'তাজির', দ্বিতীয় অপরাধের জন্য কিছু দিনের কারাবাস ও পরবর্ত্তী অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাস। চোরাই মাল উপরোক্ত তৃতীয় দফার ন্যায় মালিককে ফেরৎ দেওয়া হ'ত, নয় খাজনায় জমা দেওয়া হ'ত।

৮। পেশাদারী ডাকাতদের প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত।

৯। জমিদার অথচ পেশাদারী ডাকাতদের শাস্তি ৮ম দফার মত।

১০। কোন ঠগের বিরুদ্ধে পথিককে শ্বাসরুদ্ধ ক'রে বধকরণের অভিযোগের প্রমাণাভাব হ'লেও তাকে তাজির এবং পরিশেষে কারারুদ্ধ করাই ছিল রীতি। অধিকন্তু ইহা তার পেশা বলে বিবেচিত বা প্রমাণিত হ'লে, বা সে জনসমাজে বা প্রাদেশিক কর্ত্তার নিকট এই কাজে নিযুক্ত

ব'লে পরিচিত থাকলে, বা হ'ত ব্যক্তিকে গলা টিপে মেরে ফেলার কোনো চিহ্ন বা অপরাধ বাহির হ'লে, বা সুবাদার ও আদালতের অন্য কোন কর্ম্মচারীর নিকট এই কাজের জন্য দায়ী ব'লে বিবেচিত হ'লে তার প্রাণদণ্ড হ'ত।

১১। চুরি, রাহাজানি, লোককে গলা টিপে বা অন্য কোনো উপায়ে মেরে ফেলা বা তৎসংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবাদার বা আদালতের কর্ম্মচারীর নিকট অপরাধী বিবেচিত হ'লে তাকে কারাবাস দেওয়া হ'ত। কারও বিরুদ্ধে এই অপরাধ আনীত হ'লে সেই মুহূর্ত্তেই অভিযোক্তাকে কাজীর নিকট যথাবিধি অভিযোগ করতে হ'ত।

১২। ঘরে অগ্নিসংযোগ, জনসমাকীর্ণ স্থানে চুরি, ধুতুরা বা সিদ্ধি খাওয়ান প্রভৃতি অপকর্ম্মের জন্য ধৃত ব্যক্তিকে ভৎর্সনা ও কারাবাস এবং অনুতাপ করা সত্ত্বেও পুনরায় এই অপরাধ করলে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ত। বাড়ী পুড়ে যাওয়ার দরুণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ করা হ'ত; এবং চোরাই মাল মালিককে ফেরৎ দেওয়া হ'ত।

১৩। বাদশাহের বিপক্ষে কোনো বিদ্রোহী যুদ্ধের আয়োজন করলে তাকে ধৃত ও কারারুদ্ধ করা গর্হিত বিবেচিত হ'ত না। তাদের ঘাঁটি আক্রমণ ক'রে যতক্ষণ না সে বা তার সহকর্ম্মিগণ ছত্রভঙ্গ হ'ত, তাদের আহত বা মুমূর্ষুদের বধ করাই রীতি ছিল। পলায়নকারীকে হত্যা বা আক্রমণ করা হ'ত না। বিপক্ষের কেহ বন্দী হ'লে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাদের দল ভেঙে যায়, ততক্ষণ তাদের বন্দী রাখা হ'ত বা মেরে ফেলা হ'ত, কিন্তু কেহ স্বীয় অপকর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করলে তার বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি তাকে প্রত্যর্পণ করা হ'ত।

১৪। কৃত্রিম মুদ্রাকারীদের প্রথম অপরাধের জন্য 'তাজির' বা ভৎর্সনা করা হ'ত; ইহাতেও তা'দের স্বভাব না বদলালে তাদের কারারুদ্ধ করাই ন্যায়সঙ্গত ছিল। পরবর্ত্তী অপরাধ হেতু বহুকালের জন্য কারাদণ্ড বিধেয় ছিল।

১৫। কেহ জেনে শুনে কৃত্রিম মুদ্রা খরিদ করলে তাকে ১৪শ দফা অনুযায়ী দণ্ড দেওয়া হ'ত। তবে তফাতের মধ্যে এই ছিল যে, এ ক্ষেত্রে অপরাধীকে অনেকদিনের জন্য কারাদণ্ড দেওয়া হ'ত না।

১৬। কেহ না জেনে শুনে কৃত্রিম মুদ্রা ব্যবহার করলে তার জাল টাকাগুলিই কেবল নষ্ট ক'রে দেওয়া হ'ত।

১৭। নিজেকে অ্যালকেমিষ্ট ব'লে প্রচার করে কেহ অপরের সম্পত্তি হরণ করলে তাকে 'তাজির' ও কারাবাস দেওয়া হ'ত এবং পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় দফা অনুযায়ী মালিককে তার সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত।

১৮। বিষপ্রয়োগের দণ্ড 'তাজির' ও কারাবাস।

১৯। অসদুপায়ে পরের স্ত্রী, পুত্র, কন্যা গ্রহণ করায় দণ্ড ছিল কারাবাস। তবে মালিককে তার জিনিষ ফিরিয়ে দিলে অপরাধ মার্জ্জনা করা হ'ত। প্রত্যর্পণের পূর্ব্বে অপহৃত স্ত্রী পুত্র বা কন্যার মৃত্যু ঘটলে অপরাধীর দণ্ড কঠিন 'তাজির' এবং পরে খালাস বা 'তাসির' ও নির্ব্বাসন। দূতী বা দুষ্কর্ম্মের উত্তরসাধকগণকে কারারুদ্ধ করা হ'ত।

২০। জুয়াখেলা অপরাধের জন্য 'তাজির' এবং কারাবাস। পুনরায় দোষ করলে অনেক দিনের জন্য কারাবাস। সম্পত্তি মালিককে প্রত্যর্পণ করা হ'ত বা সরকারে জমা রাখা হ'ত।

২১। শহরের বা গ্রামের মদ্যবিক্রয়কারীকে প্রহার দেওয়ারই ব্যবস্থা দেখা যায়। পরবর্ত্তী অপরাধের জন্য কারাবাস, যতদিন না অপরাধী শোধরায়।

২২। মদবিক্রয়কারীর জন্য ঘুষী ও কারাবাস। তবে কোনো পদস্থ কর্ম্মচারী এই অপরাধে অভিযুক্ত হ'লে ঘটনাটি বাদশাহের শ্রুতিগোচর করান হ'ত এবং অপরাধীর জন্য ব্যবস্থা প্রহার বা তিরস্কার।

২৩। সিদ্ধি বা অপর কোনো মাদকদ্রব্য বিক্রয়কারীর জন্য তীব্র ভৎর্সনা, উপর্য্যুপরি এই অপরাধের শাস্তি ছিল কারাবাস, যতদিন না সে স্বীয় কর্ম্মের জন্য অনুতাপ ক'রে।

২৪। জলে ডুবিয়ে মারা, কূয়ার মধ্যে ফেলে দেওয়া, পাহাড় বা ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দেওয়া প্রভৃতি অপরাধের জন্য কারাবাস। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী

বা আত্মীয়েরা অপরাধীর নিকট হ'তে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্থ পেত।' পুনরায় এই অপরাধ করলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হ'ত।

২৫। কোনো পরদারগামী অসৎ উদ্দেশ্যে অপরের বাড়ী প্রবেশ করলে তাজির এবং কারাবাস।

২৬। প্রাদেশিক কর্ত্তার কাছে মিথ্যা অভিযোগ এনে পরের অর্থক্ষতি করলে এবং এই অপরাধ অভিযুক্ত ব্যক্তির পেশা ব'লে প্রমাণিত হ'লে মৃত্যুদণ্ড, নতুবা ভর্ৎসনা ও কারাবাস। অপরাধীকে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ অর্থদণ্ড দিতে হ'ত।

২৭। কোনো বিধর্ম্মী স্ত্রী বা পুরুষ কোনো মুসলমানকে স্ত্রী বা পুরুষ দাসরূপে গ্রহণ করলে, কিংবা মুসলমান স্ত্রী গ্রহণ করলে বা কোনো মুসলমান বিধর্ম্মী স্ত্রী গ্রহণ করলে যাজকীয় বিধি অনুযায়ী দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। তবে কোনো বিধর্ম্মী ইহুদী বা খৃষ্টানকে যাদের People of the book বলা হ'য়েছে—দাস বা স্ত্রীরূপে গ্রহণ ক'রলে দণ্ড পেত না।

২৮। যদি কোনো বারাঙ্গনা, পরদারগামী, অস্বাভাবিক গমনকারী, মাতাল, প্রলোভন দ্বারা স্ত্রীলোকের ধর্ম্মনাশকারী বা তার চেষ্টাকারী ও স্বধর্ম্মত্যাগী, কাজীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বা কোনো দাসী বা দাস নিজেদের মালিকের কাছ থেকে পলায়ন করে এবং যদি তারা কোনো মহাজন ব্যবসায়ী বা দেওয়ানী কর্ম্মচারীর নিকট আইনের দোহাই দিয়ে আশ্রয় ভিক্ষা করে, তাহ'লে কাজীর পরামর্শানুযায়ী কাজ করাই বিধেয় ছিল।

২৯। হত্যার অভিযোগ প্রমাণিত হ'লে বা সে যে হত্যাকারী এটা খুবই সত্য বলে বিবেচিত হ'লে তাকে কয়েদ রেখে বাদশাহকে খবর দেওয়া রীতি ছিল।

৩০। কোনো বিধর্ম্মী সর্দ্দার অন্য কা'কেও নিজের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করার জন্য উৎসাহিত করলে মৃত্যুদণ্ডই ছিল ব্যবস্থা।

৩১। পরের ছেলেকে জোর ক'রে খোজা করার অপরাধে ভর্ৎসনা ও কারাবাস, অনুশোচনা করলে তার মুক্তি।

৩২। ফৌজদার বা অন্য কোনো কর্ম্মচারী দ্বারা কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তি সুবাদারের কাছে প্রেরিত হ'লে সুবাদারকে বিশেষ অবধানতাসহকারে ঘটনা তদারক করতে হ'ত। সরকারী খাজনা সম্পর্কীয় মোকদ্দমায়, সুবাদার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে রাজস্ববিভাগের কর্ম্মচারীর নিকট পাঠিয়ে দিয়ে যাতে মামলাটি শীঘ্র শীঘ্র শেষ হয় এরূপ আজ্ঞা দিত। তবে রাজস্বঘটিত মামলা না হ'লে উপরিলিখিত কোনো একটি দফা অনুযায়ী নিজেকে যথাবিহিত করতে হ'ত। মাসের মধ্যে একদিন সুবাদার 'কাছারী' বা 'পুলিশ চবুতরায়' অবরুদ্ধ কয়েদীদের খবর নিতেন। হয় নির্দ্দোষীকে মুক্তি দিতেন, নয় সত্বর যা'তে মামলাটি শেষ হয় এমন করতেন।

রাজস্ববিভাগীয় কোনো কর্ম্মচারী বা কোনো সাধারণ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি কোতওয়ালের অধীনস্থ কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হয়ে কোতওয়ালির 'চবুতরায়', যাকে ইতিপূর্ব্বে 'পুলিশ চবুতরা' বলা হয়েছে—আনীত হ'লে কোতওয়াল নিজে অভিযোগ তদারক করতেন, নির্দ্দোষিতা প্রমাণিত হ'লে আসামীকে খালাস দিতেন; কখনও বা অভিযোক্তাকে আদালতে গিয়ে ব্যবস্থানুযায়ী নালিশ করতে বলতেন। রাজস্বসম্পর্কীয় মোকদ্দমায় কোতওয়াল সুবাদারকে ঘটনাটি জানিয়ে তার পরামর্শানুযায়ী 'সনদ' নিয়ে যথাবিহিত করতেন। কাজী সাহেব কোনো লোককে ধরে আনতে আজ্ঞা দিলে, কাজীর হুকুম ক্ষমতাবিশিষ্ট বিবেচনা ক'রে, কোতওয়াল আসামীকে হাজতে রাখতেন। কাজীর দ্বারা বিচারের দিন স্থির হ'লে আসামীকে আদালতে পাঠান হ'ত, পরন্তু বিচারের দিন ধার্য্য না হ'লেও তাকে প্রত্যহ আদালতে পাঠিয়ে যাতে শীঘ্র শীঘ্র মামলাটি শেষ হয়, কোতওয়ালকে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হ'ত।*

* ভাগলপুর অধ্যাপক সঙ্ঘের ৩২শ অধিবেশনে পঠিত। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের *Mughal Administration* হইতে এই প্রবন্ধের উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে।

কষ্টিপাথর

শব্দ-চয়ন

বাংলা ভাষায় গদ্য লিখ্‌তে নতুন শব্দের প্রয়োজন প্রতিদিনই ঘটে। অনেক দিন ধ'রে অনেক রকম লেখা লিখে এসেছি। সেই উপলক্ষ্যে অনেক শব্দ আমাকে বানাতে হ'ল। কিন্তু প্রায়ই মনের ভিতরে খটকা থেকে যায়। সুবিধা এই যে, বার বার ব্যবহারের দ্বারাই শব্দবিশেষের অর্থ আপনি পাকা হয়ে ওঠে, মূলে যেটা অসঙ্গত, অভ্যাসে সেটা সঙ্গতি লাভ করে। তৎসত্ত্বে সাহিত্যের হট্টগোলে এমন অনেক শব্দের আমদানি হয়, যা ভাষাকে যেন চিরদিনই পীড়া দিতে থাকে। যেমন 'সহানুভূতি'। এটা sympathy শব্দের তর্জ্জমা। 'সিম্প্যাথি'-র গোড়াকার অর্থ ছিল 'দরদ'। ওটা ভাবের আমলের কথা, বুদ্ধির আমলের নয়। কিন্তু ব্যবহারতঃ ইংরেজীতে 'সিম্প্যাথি'র মূল অর্থ আপন ধাতুগত সীমা ছাড়িয়ে গেছে। তাই কোনো একটা প্রস্তাব সম্বন্ধেও সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়। বাংলাতেও আমরা ব'লতে আরম্ভ করেছি—'এই প্রস্তাবে আমার সহানুভূতি আছে'। বলা উচিত, 'সম্মতি আছে', বা 'আমি এর সমর্থন করি'। যাই হোক্—সহানুভূতি কথাটা যে বানানো কথা এবং ওটা এখনো মানান-সই হয়নি, তা বেশ বোঝা যায়—যখন ও শব্দটাকে বিশেষণ করবার চেষ্টা করি। 'সিম্প্যাথিটিক্'-এর কী তর্জ্জমা হ'তে পারে, 'সহানুভৌতিক', বা 'সহানুভূতিশীল', বা 'সহানুভূতিমান্'? ভাষায় যেন খাপ খায় না—সেই জন্যেই আজ পর্য্যন্ত বাঙালী লেখক এর প্রয়োজনটাকেই এড়িয়ে গেছে। দরদের বেলা 'দরদী' ব্যবহার করি, কিন্তু সহানুভূতির বেলায় লজ্জায় চুপ ক'রে যাই। অথচ সংস্কৃত ভাষায় এমন একটি শব্দ আছে, যেটা একেবারেই তথার্থক। সে হচ্ছে 'অনুকম্পা'। ধ্বনিবিজ্ঞানে ধ্বনি ও বাদ্যযন্ত্রের তারের মধ্যে সিম্প্যাথি-র কথা শোনা যায়—যে সুরে বিশেষ কোনো তার বাঁধা, সেই সুর শব্দিত হ'লে সেই তারটি অনুকম্পিত ও 'অনুধ্বনিত হয়। এই ত 'অনুকম্পন'। অন্যের বেদনায় যখন আমার চিত্ত ব্যথিত হয়, তখন সেই ত ঠিক 'অনুকম্পা'। 'অনুকম্পায়ী' কথাটা সংস্কৃতে আছে। 'অনুকম্পাপ্রবণ' শব্দটাও মন্দ শোনায় না। 'অনুকম্পালু' বোধ করি ভালোই চলে। মুস্কিল এই যে, দখলের দলিলটাই ভাষায় স্বত্বের দলিল হয়ে ওঠে। কেবলমাত্র এই কারণেই 'কান, সোনা, চুন, পান' শব্দগুলোতে মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের অনধিকার নিরোধ করা এত দুঃসাধ্য হয়েচে। ছাপাখানার অক্ষর-যোজকেরা সংশোধন মানে না। তাদের প্রশ্ন করা যেতে পারৃত যে, কানের এক সোনায় যদি মূর্দ্ধন্য ণ লাগ্‌ল, তবে অন্য শোনায় কেন দন্ত্য ন লাগে। 'শ্রবণ' শব্দের রফলা লোপ হবার সঙ্গে সঙ্গে তার মূর্দ্ধন্য ণ সংস্কৃত ব্যাকরণ মতেই দন্ত্য ন হয়েচে। অথচ 'স্বর্ণ' শব্দ যখন রেফ বর্জ্জন ক'রে 'সোনা' হ'ল, তখন মূর্দ্ধন্য ণ-য়ের বিধান কোন্ মতে হয়? হাল আমলের নতুন সংস্কৃত পোড়োরা 'সোনা'কে শোধন ক'রে নিয়েচেন, তাঁদের স্বকল্পিত ব্যাকরণবিধির দ্বারা। এখন দখল প্রমাণ ছাড়া স্বত্বের অন্য প্রমাণ অগ্রাহ্য হ'য়ে গেল। 'শ্রবণ' শব্দের অপভ্রংশ শোনা শব্দ যখন বাংলা ভাষায় বানান-দেহ ধারণ করেছিল, তখন বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রাচ পণ্ডিতেরা বিধানকর্ত্তা ছিলেন—সেদিনকার বানানে কান সোনা প্রভৃতিরও মূর্দ্ধন্যত্ব প্রাপ্তি হয়নি।

কিছুকাল পূর্ব্বে যখন ভারতশাসনকর্ত্তারা 'ইণ্টার্ন্' সুরু ক'রলেন, তখন খবরের কাগজে তাড়াতাড়ি একটা শব্দ সৃষ্টি হ'য়ে গেল—'অন্তরীণ'। শব্দসাদৃশ্য ছাড়া এর মধ্যে আর কোনো যুক্তি নেই। বিশেষণে ওটা কী হতে পারে, তাও কেউ ভাবলেন না। Externment-কে কি ব'লতে হবে 'বহিরীণ'? অথচ 'অন্তরায়ণ, অন্তরায়িত, বহিরায়ণ, বহিরায়িত' ব্যবহার ক'রলে আপত্তির কারণ থাকে না, সকল দিকে সুবিধাও ঘটে।

নূতন সংঘটিত শব্দের মধ্যে কদর্য্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা।' প্রথমতঃ শিক্ষার মূলের দিকে বাধ্যতা নয়, ওটা শিক্ষার পিঠের দিকে। বিদ্যাদান বা বিদ্যালাভই হচ্চে শিক্ষার মূলে—তার প্রণালীতেই 'কম্পাল্‌শন্'। অথচ 'অবশ্য-শিক্ষা' শব্দটা বলবামাত্র বোঝা যায় জিনিষটা কি। 'দেশে অবশ্য-শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা উচিত'—কানেও শোনায় ভালো, মনেও প্রবেশ করে সহজে। 'কম্পাল্‌সারি এডুকেশন'-এর বাংলা যদি হয় 'বাধ্যতামূলক শিক্ষা', 'কম্পাল্‌সারি সাবজেক্ট' কি হবে 'বাধ্যতামূলক পাঠ্য-বিষয়'? তার চেয়ে 'অবশ্য-পাঠ্য বিষয়', কি সঙ্গত ও সহজ শোনায় না? 'ঐচ্ছিক' (optional) শব্দটা সংস্কৃতে পেয়েছি, তারি প্রতিবর্গে 'আবশ্যিক' শব্দ ব্যবহার চলে কি না, পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করি। ইংরেজীতে যে সব শব্দ অত্যন্ত সহজ ও নিত্য প্রচলিত, দরকারের সময় বাংলায় তার প্রতিশব্দ সহসা খুঁজে পাওয়া যায় না, তখন তাড়াতাড়ি যা হয় একটা বানিয়ে দিতে হয়। সেটা অনেক সময় বেখাপ হ'য়ে দাঁড়ায়, অনেক সময় মূল ভাবটা ব্যবহার করাই স্থগিত থাকে। অথচ সংস্কৃত ভাষায় হয় ত তার অবিকল বা অনুরূপ ভাবের শব্দ দুর্লভ নয়। একদিন 'রিপোর্ট' কথাটার বাংলা করবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেটাকে বানাবার চেষ্টা করা গেল, কোনটাই মনে লাগল না। হঠাৎ মনে পড়ল কাদম্বরীতে আছে 'প্রতিবেদন'—আর ভাবনা রইল না। 'প্রতিবেদন, প্রতিবেদিত, প্রতিবেদক'—যেমন ক'রেই ব্যবহার করো, কানে বা মনে কোথাও বাধে না। জনসংখ্যার অতিবৃদ্ধি—'ওভারপপুলেশন'—বিষয়টা আজকাল খবরের কাগজের একটা নিত্য আলোচ্য; কোমর বেঁধে ওর একটা বাংলা শব্দ বানাতে গেলে হাঁপিয়ে উঠ্‌তে হয়;—সংস্কৃত শব্দকোষে তৈরি পাওয়া যায়, 'অতিপ্রজন'। বিদ্যালয়ের ছাত্র সম্বন্ধে 'রেসিডেণ্ট', 'নন-রেসিডেণ্ট' বিভাগ করা দরকার, বাংলায় নাম দেবো কি? সংস্কৃত ভাষায় সন্ধান ক'রলে পাওয়া যায় আবাসিক', অনাবাসিক'।...

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৩৬) শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?

য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি ?—এপ্রশ্ন আজকাল য়ুরোপীয়েরাও জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছেন।...য়ুরোপের গত যুদ্ধ সে দেশের লোকের আত্মপ্রসাদের সুখস্বপ্ন ভাঙিয়ে দিয়েছে। উক্ত যুদ্ধের প্রবল ধাক্কায়

হঠাৎ জেগে উঠে তারা এটা কি, ওটা কি, জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছে। য়ুরোপের লোক পরস্পর মারামারি কাটাকাটি ক'রে মরণের মুখে অগ্রসর হয়েছিল; সে ফাঁড়া কাটিয়ে উঠে এখন তাদের প্রধান ভাবনা হয়েছে, কি ক'রে তারা ভবিষ্যতে আত্মরক্ষা করবে। ফলে সকল জাতিকে একদলবদ্ধ করবার চেষ্টা সে দেশের পলিটিসিয়ানরা করছেন।...কিন্তু মনোরাজ্যে ঐক্য স্থাপন না করতে পারলে য়ুরোপীয়ের জীবনে যে ঐক্য থাকবে না, ধ'রে-বেঁধে যে ফ্রান্সের সঙ্গে জার্ম্মানীর পিরীত করানো যাবে না,—এই মোটা সত্যটি সে দেশের সূক্ষ্মদর্শী লোকদের চোখে পড়েছে।...

প্রথমেই এ বিষয়ে জনৈক জর্ম্মান পণ্ডিতের মত শোনা যাক্। Dr. Haas য়ুরোপের একজন খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক, এবং সেই সঙ্গে সহজ দার্শনিক। কারণ, তিনি জাতিতে জর্ম্মান।...

পুরাকালে ভারতবর্ষে বৈদান্তিকরা যখন বলেন যে, "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা," তখন মীমাংসকরা উত্তরে বলেন, এ জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কি? ব্রহ্ম যদি থাকেন ত এত বড় সত্য সম্বন্ধে কার জ্ঞান নেই? দ্বিতীয়তঃ, এ জিজ্ঞাসার ফলই বা কি? মানুষের কর্ম্মজীবনের উপর এ জ্ঞানের ফল কি? এ যুগেও তেমনি য়ুরোপের কর্ম্মীর দল, "য়ুরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি?"—এ প্রশ্ন শুনে এ কথা বলতে পারেন যে, য়ুরোপীয় সভ্যতা ব'লে যদি কোন বস্তু থাকে ত, সেই প্রকাণ্ড জল-জ্যান্ত সত্যের প্রতি কে অন্ধ? আর তার গূঢ় মর্ম্ম জেনেই বা কার কি লাভ? এ দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের কর্ম্মজীবনের কি ইতরবিশেষ করবে?...

এখন এ জিজ্ঞাসার সার্থকতা কি, তা Deutsche Hochschule *für* Politik-এর শিক্ষকের মুখে শোনা যাক্। য়ুরোপীয়েরা যে প্রকৃত পক্ষে একজাতি, এ বিষয়ে য়ুরোপের সকল জাতির সজাগ হওয়া উচিত, নচেৎ য়ুরোপীয় সভ্যতার ধ্বংস অনিবার্য্য। তিনি বলেছেন যে, অনেকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, জাতি-শত্রুতায় বলক্ষয় না ক'রে য়ুরোপের বর্ত্তমানে কর্ত্তব্য হচ্ছে, তার সম্মিলিত শক্তির দ্বারা বহিঃশত্রুকে পরাভূত করা; আর এই বহিঃশত্রু হচ্ছে এসিয়া।...

যেমন উক্ত জর্ম্মান পণ্ডিতের মতে সমগ্র য়ুরোপ একমন, একপ্রাণ, তেমনি তাঁর বিশ্বাস, সমগ্র এসিয়াবাসীরাও একমন ও একপ্রাণ; আর সে মনের একমাত্র প্রবৃত্তি হচ্ছে, য়ুরোপীয় সভ্যতাকে সমূলে বিনাশ করা। এ হচ্ছে ভূতপূর্ব্ব জর্ম্মান কাইসরের প্রসিদ্ধ আবিষ্কার। কারণ, এসিয়াবাসীরা যে য়ুরোপের মারাত্মক শত্রু, তার কোনও বাহ্য প্রমাণ নেই। য়ুরোপীয় সভ্যতাকে যে-এসিয়া মারবে—সে-এসিয়া বোধ হয় এখন গোকুলে বাড়ছে; কারণ, তার সন্ধান সকলে জানে না।...কিন্তু সে যাই হোক, পণ্ডিতমহাশয়ের বক্তব্য বোঝা যাচ্ছে। পৃথিবীর অপর ভূভাগের উপর যদি মালিকি-স্বত্ব বজায় রাখতে হয় ত, য়ুরোপীয়দের দলবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, এবং এই কারণেই তাঁর মতে "League of Nations, Disarmament, Economic conferences, Intellectual co-operation" প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে।...

য়ুরোপীয়দের বিশেষত্ব কোথায়, তার সন্ধান নিতে হ'লে প্রথমেই জানা দরকার, য়ুরোপ বলতে কি বোঝায়?

অধ্যাপক Haas-এর মতে য়ুরোপের অর্থ, একটি বিশেষ ভূভাগ নয়; কেন-না, পুরাকালে ভৌগোলিক-হিসেবে য়ুরোপের যে স্বাতন্ত্র্যই থাকুক না কেন, বর্ত্তমানে সে স্বাতন্ত্র্য নেই, অন্ততঃ থাকবে না। কারণ, "Everything connected with space, position and distance is steadily dwindling in importance."...

অবশ্য অধ্যাপক Haas ঠিক যে কি বলেছেন, তা বোঝা যায় না দেশকালের ব্যবধান অতিক্রম করবার কৌশল আজ মানুষের করায়ত্ত তাই ব'লে নানাদেশের যে position বদলে গেছে, তা নয়—অবশ্য position ব'লে বস্তুর যদি কোন অবস্থা থাকে। নব-অঙ্কের ঠেলায় here শুনছি now হয়ে গিয়েছে। সে যাই হোক, বিলেতও ভারতবর্ষ হয়ে যায়নি, ভারতবর্ষও বিলেত হয়ে যায়নি। এক দেশের সঙ্গে অপর দেশের physical ব্যবধান কমে গিয়েছে বলেই, তাদের ভিতর psychological ব্যবধানটা ফুটিয়ে তোলাই বোধ হয় অধ্যাপক মহাশয়ের উদ্দেশ্য। কারণ, এসিয়ার সঙ্গে য়ুরোপের decisive struggle-এর জন্য স্বদেশের যুবকদের মন প্রস্তুত করাই তাঁর অভিপ্রায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে য়ুরোপীয় পণ্ডিতরা মানুষের গুণাগুণের মূল সন্ধান করেছিলেন, এবং তা পেয়েছিলেন মাটির অন্তরে। বলা বাহুল্য যে, এ প্রবন্ধে আমি বাঙলা মাটিশব্দ সংস্কৃত পঞ্চভূত অর্থেই ব্যবহার করছি।...তারপর পণ্ডিতরা আবিষ্কার করলেন, সে ব্যাখ্যা অচল। একমাত্র জিওগ্রাফিই যে সভ্যতা গড়ে, এ কথা সত্য নয়। কারণ, তা যদি হয়, তা হ'লে Red-Indian-দের সঙ্গে বর্ত্তমান American-দের সভ্যতার, অর্থাৎ—কৃতিত্বের আকাশ-পাতাল প্রভেদ হত না। এর থেকে দেখা যায় যে, মানব-সভ্যতার অন্তরে soil নয়, race; ক্ষেত্র নয়, বীজই প্রবল। ক্ষেত্র ও বীজের বলাবলের বিচার মনুতেও আছে; অর্থাৎ এ সমস্যা বহু পুরাতন।

এই বস্তাপচা বিচার ethnology, anthropology প্রভৃতি নাম ধারণ ক'রে নব-বিজ্ঞানরূপে পরিচিত হ'ল। এই নব-বৈজ্ঞানিকরা প্রমাণ করলেন যে, মানবজাতির মধ্যে Aryan নামে এক দেবজাতি আছে। সেই জাতিই মানবসভ্যতা অতীতে গড়েছে, আর ভবিষ্যতেও গড়বে। কারণ, progress করা তাদের জাতিধর্ম্ম। আর এই জাতি মাটি ফুঁড়ে উঠেছিল উত্তর-জর্ম্মানীতে। মানুষের মধ্যে য়ুরোপীয়রা শ্রেষ্ঠ; কারণ, তাদের ধমনীতে নীললোহিত আর্য্যশোণিত তেড়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

এ বিষয়েও তাদের মনে এখন সন্দেহ জন্মেছে। তাই অধ্যাপক Haas বলেছেন, "It is true that Europe is on the whole inhabited by Aryan peoples, but the same Aryans have produced quite a different culture in India."...

অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল ক্ষেত্রও নয়, বীজও নয়।

য়ুরোপ বলতে লোকে যা বোঝে, তার মর্ম্ম য়ুরোপের মাটির অন্তরেও পাওয়া যাবে না, য়ুরোপীয়দের দেহের অন্তরেও পাওয়া যাবে না। কারণ, মানব-সভ্যতার সৃষ্টি জিওগ্রাফি করে না, করে হিষ্টরি; মানুষের দেহ করে না, করে তার মন। এই কারণে, "It is only as a spiritual and cultural entity that Europe can have a meaning for us."...অধ্যাপক মহাশয় বলেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দার্শনিকরা, যথা—Voltaire, Rousseau প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবীময় মানুষের একই চরিত্র, এবং Pekin থেকে Paris পর্য্যন্ত মানুষমাত্রই এক গোত্রজ। আর সে গোত্রের নাম মানব-গোত্র।...কিন্তু আজকের দিনে "Biology teaches us that every kind of living organism has a world of its own." অর্থাৎ—মানুষমাত্রেই এক জগতে বাস করে না, কেউ করে ব্রহ্মার সৃষ্ট পৃথিবীতে, কেউ বা আবার বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট জগতে। অতএব মানুষে মানুষে কতক অংশে মিল থাকলেও, অনেক অংশে প্রভেদ আছে।...

সুতরাং এ ক্ষেত্রে "what is the specifically European element"-এরই অনুসন্ধান করতে হবে ;…কোন্ গুণে সকল য়ুরোপীয় এক, এবং অন্-য়ুরোপীয়দের সঙ্গে পৃথক, তাই হচ্ছে জিজ্ঞাস্য। এখন এ জিজ্ঞাসার মীমাংসা শোনা যাক্।

য়ুরোপীয় সভ্যতার মূল কোথায় নিহিত? অধ্যাপক মহাশয় বলেন যে, এ সভ্যতা য়ুরোপীয় spirit থেকে উদ্ভূত হয়েছে।…এ প্রবন্ধে আমি European spirit-কে য়ুরোপীয় আত্মা বলব; কিন্তু সে আত্মাকে অহং অর্থে ই বুঝতে হবে।

য়ুরোপীয় আত্মার বিশিষ্টতা যে কি, তার পরিচয় নিতে হবে উক্ত আত্মার আত্মপ্রকাশ থেকে।…বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা হচ্ছে আসলে ব্যাবহারিক সভ্যতা।…

প্রকৃতির বশীকরণের মন্ত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন য়ুরোপের বৈজ্ঞানিকরা। কিন্তু এ মন্ত্র লাভ করা সাধনাসাপেক্ষ। য়ুরোপীয় আত্মা এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছে।…কিন্তু য়ুরোপীয়রা প্রকৃতিকে দাসীগিরি করাবার জন্য বিজ্ঞানের সাধনা করে নি, করেছিল শুধু তাকে প্রকৃষ্টরূপে জানবার জন্য। এ শাস্ত্রের প্রথম সূত্র হচ্ছে 'অথাতো প্রকৃতিজিজ্ঞাসা।'…

য়ুরোপীয় আত্মার ধর্ম্মই এই যে—"to organize everything with which it has to deal, to mould everything whether it be material or spiritual, in such a way that it constitutes a unity in multiplicity." অর্থাৎ—বহুকে এক ক'রে দেখবার এবং বহুকে এক সূত্রে গাঁথবার প্রকৃতি। এক কথায়, ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক জগৎকে organize করবার প্রবৃত্তি ও শক্তিই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার বিশেষত্ব।…

কিন্তু প্রকৃতিকে জানবার এবং বাগ মানাবার প্রবৃত্তি সার্থক হয়েছে এই জন্য যে, কি উপায়ে তাকে জানা যায়, সে পদ্ধতি গ্রীকরা উদ্ভাবন করে; তার পর কি উপায়ে মানুষের উপর প্রভুত্ব লাভ করা যায়, তার পদ্ধতি উদ্ভাবন করে রোমানরা। তার পর মধ্যযুগে য়ুরোপীয়েরা পরলোক জয় করবার জন্য যে আত্মশক্তি সঞ্চয় করে, সেই শক্তিই এ যুগে তারা ইহলোক জয় করবার কার্য্যে প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ—গ্রীকদের জ্ঞান, রোমানদের কর্ম্ম, এবং মধ্যযুগের ভক্তি, এই তিনে মিলেমিশে বর্ত্তমান technical civilization-এর সৃষ্টি করেছে। অতএব য়ুরোপীয় সভ্যতাকে একটি ভগবদ্গীতা বলা যায়। কারণ, জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তির সমন্বয়ে এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে; এবং বর্ত্তমানে য়ুরোপের পক্কবায় মন থেকেই technical civilization উদ্ভূত হয়েছে। এই হচ্ছে য়ুরোপীয় আত্মার চরম পরিণতি। এই কথাটা বুঝতে পারলেই য়ুরোপের জাতিসমূহ ভবিষ্যতে আর পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করবে না। একেই বলে জ্ঞানে মুক্তি।…

এখন এ বিষয়ে একটি ফরাসী লেখকের মতামত শোনা যাক।

Lucien Romier বিজ্ঞান কিংবা দর্শনের আচার্য্য নন, তিনি একজন প্রবন্ধলেখক সাহিত্যিক মাত্র; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জর্ম্মান অধ্যাপকের কথার অপেক্ষা, ফরাসী সাহিত্যিকের কথা ঢের বেশী সহজবোধ্য।…Romier প্রথমেই প্রশ্ন করেছেন,—qu'est-ce que l'Europe? অর্থাৎ—য়ুরোপ বস্তু কি? তিনি বলেন, এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। কারণ, আজকের দিনে বিশ্ব-মানবের কাছে য়ুরোপের নামডাক অসম্ভব রকম বেড়ে গিয়েছে। সুতরাং য়ুরোপ বলতে কি বুঝায়, তা বুঝতে হ'লে, য়ুরোপের জিওগ্রাফির এবং ইকনমিক অবস্থার জ্ঞানই যথেষ্ট নয়,—উপরন্তু য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রধান গুণগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে।…

কিন্তু য়ুরোপের material civilization য়ুরোপের যথার্থ civilization নয়।…একবার চোক তাকিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই তাদের নিজের নিজের দেশকে exploit করতে শিখছে, এবং করছে, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে য়ুরোপের মত সমান কৃতকার্য্য হবে।…

সত্য কথা এই যে, য়ুরোপকে সৃষ্টি করেছে প্রধানতঃ হিষ্টরি—জিওগ্রাফি নয়; অর্থাৎ—য়ুরোপীয় সভ্যতার সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ হচ্ছে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক নয়—আর তার ভিত্তি হচ্ছে একটি বিশেষ "moral and intelletcual tradition."…বস্তুজগতের উপর প্রভুত্ব যথার্থ সভ্যতার ফলমাত্র—তার মূল নয়।

গ্রীক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা ও খৃষ্টধর্ম্ম—এই তিনে মিলে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতাকে গড়ে তুলেছে।

গ্রীকজাতি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তি পত্তন ক'রে গিয়েছেন। রোমানজাতি সমাজরক্ষার ও রাজ্যশাসনের নিয়ম বিধিবদ্ধ ক'রে গিয়েছেন। খৃষ্টধর্ম্ম প্রেয়র চাইতে শ্রেয়র মাহাত্ম্য যুগ যুগ ধরে প্রচার করেছে।

খৃষ্টধর্ম্মের idealism, গ্রীক realism, ও রোমান legalism-এর মিলনের ফলে য়ুরোপীয় মানব তার গৌরব লাভ করেছে।

কিন্তু Renaissance-এর যুগ হতেই গ্রীক বিজ্ঞান, খৃষ্ট নীতি, ও রোমান রাজনীতি পরস্পর পৃথক্ হ'তে সুরু করে। য়ুরোপীয় সভ্যতার balance ভঙ্গ হয়।…শেষটা পলিটিকাল materialism যখন য়ুরোপের লোকের মনকে গ্রাস করলে, তখন গ্রীক বুদ্ধি এবং খৃষ্ট ধর্ম্মনীতি মানুষের মন থেকে খসে পড়ল। ফলে য়ুরোপীয় সভ্যতার এখন এই দুর্দ্দশা ঘটেছে। অর্থাৎ তার বাহ্য ঐশ্বর্য্য আছে, কিন্তু ভিতরটা ফোঁপরা হয়ে গিয়েছে।

পৃথিবীর অপরাপর জাতির কাছে য়ুরোপীয়েরা এখন আর একটা বড় সভ্যতার প্রতিনিধি ব'লে মান্য নয়। এ যুগে তারা চতুর বণিক অথবা নিপুণ শিল্পী বলেই গণ্য।…আর যখন পলিটিকাল nationalism এবং industrialism-এর মূলমন্ত্র হচ্ছে অপর জাতির সঙ্গে বিরোধ, তখন যে সব জাতিকে য়ুরোপ এই নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করবে, এবং সে মন্ত্রের সাধনে সিদ্ধিলাভ করবার যন্ত্রপাতিও তাদের দেবে, সে সব জাতি য়ুরোপের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য নিশ্চয়ই প্রস্তুত হবে। এই হচ্ছে য়ুরোপের তথাকথিত নব-সভ্যতার কর্ম্মফল।

এখন দেখা গেল যে, জর্ম্মান বৈজ্ঞানিক ও ফরাসী সাহিত্যিক উভয়ই মনে করেন যে, সম্মুখে মস্ত বিপদ আছে—অর্থাৎ য়ুরোপীয় সভ্যতা এখন টলমল করছে। তার পর য়ুরোপীয় সভ্যতা যে গ্রীক জ্ঞান, রোমান রাজনীতি ও খৃষ্টধর্ম্ম, এ তিনের সমবায়ে গড়ে উঠেছে, এ বিষয়েও উভয়েই একমত। শুধু বর্ত্তমান সভ্যতার রূপগুণ সম্বন্ধে তাঁদের মতে মেলে না।

জর্ম্মান অধ্যাপকের মতে technical civilization হচ্ছে য়ুরোপীয় সভ্যতার চরম পরিণতি; ফরাসী লেখকের মতে কিন্তু তা অবনতি। কারণ সভ্যতার যা প্রাণ—অর্থাৎ intellectual and moral tradition—বর্ত্তমান য়ুরোপ তার থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে।

ফরাসী লেখক বলেন যে, য়ুরোপের মনে আবার কেউ যদি ধর্ম্মজ্ঞান উদ্বুদ্ধ করতে পারে, তা হলেই য়ুরোপীয় সভ্যতা রক্ষা পায়, কিন্তু তা করবে কে?…

য়ুরোপ যখন গ্রীক সাহিত্যের ও রোমান রাজনীতির সন্ধান পেলে,

তখন মধ্যযুগের সভ্যতার অবসান হ'ল। যেমন এ যুগে আমরা য়ুরোপের জ্ঞানমার্গ ও কর্ম্মমার্গের সন্ধান পেয়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের অবলম্বিত ভক্তিমার্গ ত্যাগ করেছি।...

এর থেকে দেখা যায় যে, কোন জাতিবিশেষ যে অংশে সভ্য, সে অংশে অমর। শুধু তাই নয়, যে-ই সত্যের সন্ধান পাক্ না কেন, সে সত্য সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। গ্রীক জাতি মারা গেল, কিন্তু তার দর্শনবিজ্ঞান সাহিত্যের উত্তরাধিকারী হ'ল বিশ্বমানব। রোমান জাতি বিনষ্ট হ'ল, কিন্তু তার সাহায্যে য়ুরোপের তির্য্যক্ সামান্য অসভ্য জাতিরা মধ্যযুগের সভ্যতা গ'ড়ে তুললে গ্রীক ও রোমান সভ্যতার সাহায্যে। মধ্যযুগের ব্রহ্মবিদ্যা (theology) গ'ড়ে উঠেছে আরিষ্টটলের দর্শনের ভিত্তির উপর; এবং তার খৃষ্টসঙ্ঘ (church) গ'ড়ে উঠেছে রোমান রাষ্ট্রতন্ত্রের অনুকরণে।

সভ্যতা বলতে অধিকাংশ লোকে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও আর্ট বোঝে না—বোঝে অর্থ ও স্বার্থ; এবং তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুলও নয়। অর্থ ও কাম, প্রবৃত্তিরেষা নরাণাম্।...বর্ত্তমান য়ুরোপ, যে বিদ্যার বলে মানুষে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে, সে বিদ্যা অর্জ্জন করেছে। এ হিসাবে science-কেই য়ুরোপীয় মনের চরম পরিণতি বলা অত্যুক্তি নয়।

কিন্তু গ্রীক-দর্শন ও রোমান আইন যেমন ও দুই সভ্যতার একচেটে জিনিষ নয়—বিশ্বমানবের সম্পত্তি; তেমনি modern science-ও বর্ত্তমান য়ুরোপের একচেটে জিনিষ নয়। এ বিদ্যা বিশ্বমানব শিখবে, এবং ফলিত বিজ্ঞানও বিশ্বমানবের করায়ত্ত হবে। ফলে এ বিষয়েও য়ুরোপের বর্ত্তমান প্রাধান্য আর থাকবে না। য়ুরোপীয় অর্থে এসিয়াও সভ্য হবে। এর জন্য য়ুরোপের ভয় পাবার কোনও দরকার নেই। কোনও সভ্যসমাজকে অপর কোন সভ্যসমাজ বিনাশ করে নি। সভ্যতার প্রধান শত্রু যে অসভ্যতা, য়ুরোপের ও এসিয়ার ইতিহাসের পাতায় পাতায় তা লেখা আছে।

এ তো গেল বহিঃশত্রুর কথা। এ ছাড়া ধ্বংসের মূল জাতির অন্তরেও থাকে। য়ুরোপের material civilization-এর মূলে যদি এই মনোভাব থাকে যে, য়ুরোপীয়েরা পরের খাটনির ফল ভোগ করবে আর পরের দেশ লুটে খাবে, তা হ'লে অবশ্য গ্রীস-রোমের মতই তার ধ্বংস অনিবার্য্য।...

য়ুরোপীয় সভ্যতার spirit হচ্ছে অহঙ্কার—এই মনের পাপই য়ুরোপের প্রধান শত্রু; এবং Haas-প্রমুখ পণ্ডিতরা এ পাপের প্রশ্রয় আজও দিচ্ছেন।

(বসুমতী, আষাঢ় ১৩৩৭) শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

—

ঋণব্যবসায়ে সংহতি

ভারতের মনীষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চারিটি বস্তুই বিভিন্ন লোকের পক্ষে ও বিভিন্ন অবস্থায় সেবনীয় বলিয়া মনে করিতেন। আজকাল ভারতবর্ষে অর্থের অভাবই বহু অনর্থের মূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অর্থের অভাব দূর করিতে হইলে কৃষির উন্নতি, লুপ্তশিল্পের পুনরুদ্ধার, নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠা, এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি আবশ্যক। এই সকল কার্য্য সংসাধিত করিবার জন্য ব্যাঙ্কের প্রয়োজন। জগতের উন্নত জাতিসমূহের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।...

ভারতবর্ষে যে সকল ব্যাঙ্ক আছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশীয়দের দ্বারা পরিচালিত। এই সকল ব্যাঙ্কে ভারতবাসীর টাকা আমানত থাকে, কিন্তু ঐ টাকা দ্বারা ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের সহায়তা খুব কম পরিমাণেই হইয়া থাকে। ভারতবাসী দ্বারা পরিচালিত ব্যাঙ্কের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। এ অবস্থায় বঙ্গদেশের ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলি (Loan offices) দেশের একটি বিশেষ প্রয়োজন সাধন করে। এই ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলি বিদেশীয় ব্যাঙ্ক এবং দেশীয় মহাজন এই উভয়ের একটি মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া আছে। বঙ্গদেশের সামাজিক ও অর্থনীতিক অবস্থার বৈশিষ্ট্য হইতেই এই লোন আফিসগুলির উৎপত্তি।...

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরিদপুরে প্রথম লোন আফিস প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন লোন অফিসের সংখ্যা প্রায় ৮০০ দাঁড়াইয়াছে। যদি দেশের আর্থনীতিক প্রয়োজনবশতঃ এই সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিত, তবে ইহা সবিশেষ আনন্দের ব্যাপার হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, অনেক স্থলেই অবৈধ প্রতিদ্বন্দ্বিতাই এই সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ। যাহা হউক, এই লোন আফিসগুলির একটা সার্থকতা আছে। যে টাকা পূর্ব্বে ঘরে আবদ্ধ হইয়া থাকিত, লোন আফিসগুলি স্থাপিত হওয়ার পর হইতে সে টাকা এখন কাজে লাগিতেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক দরিদ্র কৃষক ও বিপন্ন ব্যক্তিকে মহাজনের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছে। ইহাদের দ্বারা দেশের আর একটি মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। লোন অফিস প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে দেশে সুদের হার কতক পরিমাণে কমিয়াছে।...

বঙ্গদেশের ঋণপ্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কাজ টাকা ধার দেওয়া। ইহাদের পরিচালকগণ যদি এই কাজের ভিতরেই নিজেদের চেষ্টা আবদ্ধ রাখেন, তাহা হইলেই ভাল হয়। কিন্তু কোন কোন স্থলে দেখা যায় যে, তাঁহারা অধিক পরিমাণে লাভবান হইবার জন্য নানা প্রকারের ব্যবসায়ের সহিত জড়িত হইয়া পড়েন। একসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারের কাজ করিতে গেলে কোনও কাজই সুসম্পন্ন করা যায় না। বিশেষতঃ ব্যবসায়ে অনভিজ্ঞতাবশতঃ লোকসান হওয়া অসম্ভব নহে।

ঋণদান-বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। লোন আফিসগুলি অধিকাংশস্থলে জমি বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিয়া থাকেন। তাঁহারা গহনা, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতি বন্ধক রাখিয়াও টাকা ধার দিয়া থাকেন। ইহাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কোন কোন স্থলে বিনা বন্ধকে শুধু লোকের জামিনে টাকা ধার দেওয়া হয়। এ সকল স্থলে টাকা আদায় হওয়া দুষ্কর হইয়া থাকে। জমিদারগণ অনেক সময় টাকা ধার করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের এই অর্থ প্রায়ই বিলাসিতার জন্য ব্যয়িত হয়, এবং উহা হইতে দেশের কোনও উপকার সাধিত হয় না। জমিদারদিগকে টাকা ধার দেওয়ার আর একটি অসুবিধা আছে। বন্ধকী জমিদারী অনেক সময়ে লোন আফিসের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে, এবং উহাদের টাকা আবদ্ধ হইয়া যায়। লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষেরা এই প্রকারের কাজ যত কম করেন ততই ভাল।

যাহাতে কৃষি, শ্রমশিল্প, ও ব্যবসায়ের সুবিধা হয় এই ভাবে টাকা ধার দিলে, লোন আফিসগুলির শ্রীবৃদ্ধি হয় ও দেশের উপকার হয়। হুণ্ডির কারবার যদি লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে গ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কার্য্যের প্রসার বৃদ্ধি হয় এবং ব্যবসায়ের একটা অভাব মোচন হয়। গুদামস্থিত মাল কিংবা রেল ও ষ্টীমারের

রসিদ বন্ধক রাখিয়া টাকা ধার দিলে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

লোন আফিসের টাকা লাভজনকভাবে খাটাইতে হইলে একটি "সমষ্টি ব্যাঙ্ক" (Federal Bank) আবশ্যক। অনেক সময় দেখা যায় যে, যখন মফঃস্বলে লোন আফিসের হাতে টাকা পড়িয়া থাকে তখন কলিকাতায় টাকার বিশেষ টানাটানি। আবার এমনও ঘটে যে, যখন কলিকাতায় টাকা সচ্ছল, মফঃস্বলে টাকার বিশেষ দরকার। যদি লোন আফিসগুলির একটি সমষ্টি-ব্যাঙ্ক কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে উভয় অবস্থাতে টাকার সদ্ব্যবহার হইতে পারে। এই Federal Bank অন্যান্য স্থল হইতে টাকা আমানত রাখিয়া লোন আফিসগুলিকে প্রয়োজন মত অর্থ সাহায্য করিতে পারে।...

কোন কোন ছোট সহরে একাধিক লোন আফিস পরস্পরের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছেন। ইহা বাঞ্ছনীয় নহে। যদি ইঁহারা একত্র হন, তবে সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইতে পারে। প্রত্যেক লোন আফিসের আভ্যন্তরীণ বন্দোবস্তও যাহাতে সন্তোষজনক হয়, সে বিষয়ে কর্ত্তৃপক্ষগণের লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। অনেক লোন আফিসের ডিরেক্টারগণ সময়াভাববশতঃ কার্য্য-পরিচালন-বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন না। এস্থলে তাঁহাদের ডিরেক্টার পদ আটকাইয়া রাখা উচিত নহে। অনেক ডিরেক্টার দূরদর্শিতার সহিত কার্য্য পরিচালন করেন না। তাঁহারা লভ্যাংশ (dividend) অতিরিক্ত পরিমাণে অংশীদারগণকে দেন, এবং উপযুক্তরূপ গচ্ছিত অর্থ-ভাণ্ডার (Reserved Fund) গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন না। ইহার ফলে লোন আফিসগুলির ভিত্তি দৃঢ়তা লাভ করে না। সুদের হারও অনেক স্থলে অত্যধিক। অল্প সুদে টাকা খাটাইলে লোন আফিসের কাজের পরিসর বাড়ে, এবং সাধারণেরও সুবিধা হয়। প্রত্যেক লোন আফিসের হিসাব যাহাতে ঠিকভাবে রাখা হয় এবং নিয়মিত অডিট হয়, এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কর্ম্মচারী-নিয়োগ-বিষয়ে লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। সুশিক্ষিত কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী না পাইলে লোন আফিসের উন্নতি সম্ভবপর হইবে না। যাহাতে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আবশ্যক।...

কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঋণ-প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেতভাবে কার্য্য করিবার কোনও সুযোগ ছিল না। এখন "ব্যাঙ্কসংঘ" প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই অভাব দূর হইয়াছে। প্রত্যেক লোন আফিসের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট আমার একান্ত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সকলেই এই সংঘভুক্ত হউন। "সংহতিঃ কার্য্যসাধিকাঃ"—এই পুরাতন বাক্যটি সকলেরই সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত।

বঙ্গীয় ব্যাঙ্ক-সংঘ পত্রিকা,

(বৈশাখ—আষাঢ় ১৩৩৭) শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাদ্র-লক্ষ্মী

শ্রীরাধাচরণ চক্রবর্ত্তী

কাল্‌ও সারা রাত শূন্য-সিন্ধু
মন্থিল দেবাসুর :—
মেঘ-'মন্দরে' বিজুরী-'বাসুকী'-
মন্থন-রজ্জুর
বিজড়ি' বন্ধ, আঁকড়ি' প্রান্ত
সে কি আলোড়ন অবিশ্রান্ত ;
বারিধিক্ষোভ শ্রাবণ-প্লাবনে
ছাপিল দিগ্‌-সুদূর !

মন্থন-শেষ প্রত্যূষে আজি
শান্ত অসীমা-কূল,—
সেথায় ফুটেছে শুচিসুশুভ্র
ভাদ্র-পদ্মফুল।
কক্ষে অমৃত-আলোক-গাগরী,
চক্ষে নবীন জীবন জাগরি'
লক্ষ্মী দাঁড়াল পদ্মদলে সে
পরশি' শ্রীপদমূল !

অনাসক্তিযোগ*

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

১

স্বামী আনন্দ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সপ্রেম অনুরোধে আমি যেমন শুধু সত্য প্রয়োগের উদাহরণস্বরূপ আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, শ্রীগীতার অনুবাদের বিষয়েও ঠিক তেমনি ঘটিয়াছিল।

"আপনি সমগ্র গীতার অনুবাদ করিয়া তাহার যে টীকা করা প্রয়োজন তাহা করিলে আমরা একবার সেটা পড়িয়া দেখিব এবং তখনি আপনি গীতার যে অর্থ করেন তাহা বুঝিতে পারিব। এখানকার ওখানকার কয়েকটা শ্লোক হইতে অহিংসানীতি প্রতিপাদন করা আমার ভাল বলিয়া মনে হয় না।" অসহযোগের যুগে স্বামী আনন্দ আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, কথাটা আমার ঠিক মনে হইয়াছিল; আমি তখন উত্তর দিয়াছিলাম, "অবসর পাইলে করিব।" পরে যখন জেলে গেলাম তখন কিছু গভীরভাবে গীতা অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইলাম। লোকমান্যের জ্ঞানের ভাণ্ডার পড়িলাম। তিনি পূর্ব্বেই অত্যন্ত প্রীতির সহিত মারাঠী, হিন্দী এবং গুজরাতী অনুবাদ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, যদি মারাঠী না পড়িতে পারি ত যেন গুজরাতী নিশ্চয়ই পড়ি। জেলের বাহিরে ত পড়িতে পারি নাই, কিন্তু জেলে গুজরাতী অনুবাদ পড়িলাম। তাহা পড়িয়া গীতার সম্বন্ধে আরও পড়িতে ইচ্ছা হইল এবং গীতা-সম্বন্ধীয় অনেক গ্রন্থ উল্‌টাইয়া পাল্‌টাইয়া দেখিলাম।

গীতার সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইয়াছিল ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে, এড্‌উইন্ আর্নল্ডের পদ্যানুবাদের ভিতর দিয়া। তাহাতে গীতার গুজরাতী অনুবাদ পড়িবার তীব্র ইচ্ছা হইয়াছিল, এবং যতগুলি অনুবাদ হাতে পাইয়াছিলাম পড়িয়াছিলাম। কিন্তু এই পড়া আমাকে সকলের সমক্ষে আমার নিজের অনুবাদ উপস্থিত করিবার অধিকার দেয় না—বিশেষত আমার সংস্কৃতজ্ঞান অল্প এবং গুজরাতীতে আমার পাণ্ডিত্যের দাবী নাই বলিয়া। তবে আমার এই অনুবাদ করিবার ধৃষ্টতা কেন হইল?

গীতাকে আমি যে-ভাবে বুঝিয়াছি সেইভাবে আচরণ করিবার প্রযত্ন আমার এবং আমার কয়েকজন সঙ্গীর সর্ব্বদাই আছে। আমাদের পক্ষে গীতা অধ্যাত্ম জীবনের নিদান গ্রন্থ। তদনুযায়ী আচরণ করিতে নিত্যই ব্যর্থতা আসিতেছে, তবুও আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নাই। এই ব্যর্থতার ভিতরেই আমরা সফলতার উদীয়মান আলোর আভা দেখিতে পাইতেছি। এই ক্ষুদ্র দলটি যে অর্থ কর্ম্মে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, এই অনুবাদে সেই অর্থই দেওয়া হইল।

তাহা ছাড়া স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শূদ্র যাঁহাদের অক্ষর-জ্ঞান অল্পই, যাঁহাদের মূল সংস্কৃত গীতা পড়িবার সময় বা ইচ্ছা নাই, অথচ যাঁহাদের গীতারূপ আশ্রয়ের বিশেষ প্রয়োজন, এই অনুবাদ বিশেষ করিয়া তাঁহাদেরই জন্য। আমার গুজরাতী জ্ঞান অল্প হওয়া সত্ত্বেও সেই অল্প জ্ঞানের দ্বারাই গুজরাতবাসিগণের আমার উপর যে দাবি, তাহা পূরণ করিবার তীব্র ইচ্ছা আমার সর্ব্বদাই আছে। আমি এটা বিশেষ করিয়া চাই যে, যখন চারিদিকে অশ্লীল সাহিত্যের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছে তখন হিন্দুধর্ম্মের এই অদ্বিতীয় গ্রন্থের সরল অনুবাদ গুজরাতী জনসাধারণের সম্মুখে আসে এবং তাহার সাহায্যে তাহারা এই বন্যার প্রতিরোধ করিবার শক্তি লাভ করে।

এই ইচ্ছার এই অর্থ নয় যে, আমি অন্যান্য গুজরাতী অনুবাদকে অবহেলা করিতেছি। তাহাদের স্থান ত আছেই, কিন্তু আমি জানি না, সে সকল অনুবাদের

---

* মহাত্মাজীর মূল গুজরাতী ভাষায় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার অনুবাদের প্রস্তাবনা হইতে শ্রীঅনাথনাথ বসু কর্ত্তৃক অনূদিত।

পিছনে অনুবাদকগণের আচারজাত অনুভূতির কোনও দাবি আছে কি না; এই অনুবাদের পিছনে আমাদের আটত্রিশ বৎসরের আচরণের চেষ্টার দাবি আছে। এইজন্য আমার একান্ত আগ্রহ যে, আমার যে-সকল গুজরাতী ভ্রাতা ও ভগিনীরা ধর্ম্মজীবন অভ্যাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই অনুবাদ পাঠ ও বিচার করিয়া তদ্দ্বারা শক্তিলাভ করেন।

এই অনুবাদে আমার সঙ্গীগণের পরিশ্রম রহিয়াছে। আমার সংস্কৃত জ্ঞান অত্যন্ত অপূর্ণ হওয়ার জন্য শব্দের অর্থ সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস না থাকায় এই অনুবাদ বিনোবা, কাকা কালেলকার, মহাদেব দেশাই এবং কিশোরলাল মশরুবালা দেখিয়া দিয়াছেন।

২

এইবার গীতার অর্থের বিষয় বলিব। ১৮৮৮-৮৯ খৃষ্টাব্দে যখন প্রথম গীতা দেখিলাম তখনই আমার মনে হইয়াছিল যে, ইহা ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে, বরং ইহাতে ভৌতিক যুদ্ধের বর্ণনাচ্ছলে প্রত্যেক মানুষের হৃদয়ে নিরন্তর যে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছে তাহারই বর্ণনা আছে। অন্তরের যুদ্ধকে সরস করিয়া দেখাইবার জন্য এখানে মানুষ যোদ্ধার কল্পনা করা হইয়াছে। এই প্রথম উপলব্ধি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং গীতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিচার করার পর দৃঢ়তর হইয়াছে। তাহা ছাড়া মহাভারত পাঠ করার পর এই বিচার আরও দৃঢ় হইয়াছে। আধুনিক অর্থে মহাভারতকে ইতিহাস বলিয়া আমি গণনা করি না। তাহার বিশেষ প্রমাণ আদিপর্ব্বেই আছে। গ্রন্থোক্ত পাত্রগণের অমানুষী এবং অতিমানুষী উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া ব্যাসদেব রাজাপ্রজার ঐতিহাসিকতার উচ্ছেদসাধন করিয়াছেন। মূলে তাঁহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইতে পারেন, কিন্তু মহাভারতে ব্যাসদেব তাঁহাদের অবতারণা করিয়াছেন ধর্ম্মের তত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্যই।

মহাভারতকার ত ভৌতিক যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করিলেন না, বরং প্রমাণ করিলেন তাহার ব্যর্থতা। তিনি বিজেতাকে কাঁদাইলেন, তাহাদের দিয়া অনুতাপ করাইলেন এবং দুঃখ ছাড়া আর কিছুই বাকি রাখিলেন না।

গীতা এই মহামন্ত্রের শিরোমণি। তাহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভৌতিক যুদ্ধ ব্যবহার শিখাইবার ছলে স্থিত-প্রজ্ঞের বর্ণনা-লক্ষণ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। আমার ত মনে হয় ভৌতিক যুদ্ধের সঙ্গে স্থিতপ্রজ্ঞের কোন সম্বন্ধ নাই, একথা তাহার লক্ষণের মধ্যেই রহিয়াছে। সামান্য একটা পারিবারিক বিবাদের যোগ্যতা-অযোগ্যতা নির্ণয় করিবার জন্য গীতার ন্যায় গ্রন্থের রচনা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না।

গীতার শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিমান শুদ্ধ ও পূর্ণজ্ঞান কিন্তু কাল্পনিক।

এখানে কৃষ্ণ নামক অবতারকে অস্বীকার করা হইতেছে না। শুধু ইহাই বলা হইতেছে যে, পূর্ণ কৃষ্ণ কাল্পনিক। পূর্ণাবতারের কল্পনা পরে করা হইয়াছে। অবতার কথার অর্থ শরীরধারী পুরুষবিশেষ। জীবমাত্রেই ঈশ্বরের অবতার, কিন্তু লৌকিক ভাষায় আমরা সকলকে অবতার বলি না। যে পুরুষ তাঁহার যুগে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মভাবপূর্ণ, উত্তরকালের জনসাধারণ তাঁহাকেই অবতাররূপে পূজা করে। ইহাতে আমি কোন দোষ দেখি না। ইহা দ্বারা ঈশ্বরের মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করা হয় না, সত্যকেও আঘাত করা হয় না। "আদম ভগবান নহেন, কিন্তু তিনি ঈশ্বরের জ্যোতি হইতে স্বতন্ত্রও নহেন।" যাঁহার মধ্যে সেই যুগে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ধর্ম্ম-ভাব জাগ্রত হইয়াছে, তিনিই বিশেষ অবতার। এইরূপ দৃষ্টি দিয়া দেখিলে শ্রীকৃষ্ণরূপী পূর্ণাবতার আজও হিন্দুধর্ম্ম-সাম্রাজ্যে একচ্ছত্রাধিপত্য করিতেছেন।

ইহার মধ্যেই মানুষের প্রিয়তম এবং চরমতম আকাঙ্ক্ষার সূচনা রহিয়াছে। ঈশ্বরত্বে পৌঁছিতে না পারিলে মানুষের আশা মিটে না, শান্তি মিলে না। ঈশ্বরত্ব লাভ করিবার চেষ্টাই একমাত্র সত্য পুরুষার্থ। ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শনই সকল ধর্ম্মগ্রন্থের এবং গীতারও উপপাদ্য বিষয়। কিন্তু গীতাকার এই বিষয় প্রতিপাদন করিবার জন্য গীতা রচনা করেন নাই। গীতার উদ্দেশ্য আত্মার্থীকে আত্মদর্শন-

লাভের এক অদ্বিতীয় উপায় প্রদর্শন করা। যে বস্তু হিন্দু-ধর্ম্মগ্রন্থে নানাস্থানে দেখা যায়; গীতায় তাহাই অনেকরূপে অনেকভাবে অনেক শব্দের ভিতর দিয়া পুনরুক্তি-দোষ স্বীকার করিয়াই পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে।

কর্ম্মফলত্যাগ এই অদ্বিতীয় উপায়।

এই মধ্যমণির চতুষ্পার্শ্বে গীতার সমগ্র পুষ্পরাজি গ্রথিত। ভক্তি, জ্ঞান, ইত্যাদি তারকামণ্ডলরূপে তাহার চারিপাশে সাজান আছে। যেখানে দেহ সেখানেই কর্ম্ম, তাহা হইতে কাহারও মুক্তি নাই। তবুও দেহকে প্রভুর মন্দির করিয়া তাহার দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, সকল ধর্ম্মই ইহা প্রতিপাদন করিয়াছে। কিন্তু কর্ম্মমাত্রেরই কয়েকটি দোষ আছে। মুক্তি ত দোষহীনেরই লভ্য। তাহা হইলে কর্ম্মবন্ধন হইতে, অর্থাৎ দোষস্পর্শ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে কেমন করিয়া? গীতা ইহার উত্তর অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা, যজ্ঞার্থ কর্ম্ম করিয়া, কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া, সমস্ত কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া—অর্থাৎ দেহমন এবং বাক্যকে শ্রীভগবানে আহুতি দিয়া।"

কিন্তু নিষ্কামভাব, কর্ম্মফলত্যাগ, শুধু মুখের কথা নয়, ইহা মাত্র বুদ্ধিরই প্রয়োগ নহে, ইহা হৃদয়মন্থন হইতে আসে। এই ত্যাগশক্তি উৎপন্ন করিবার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। অনেক পণ্ডিতেই এক প্রকারের জ্ঞান অবশ্য লাভ করেন, বেদাদি তাঁহাদের কণ্ঠাগ্রে বাস করে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই ভোগাদিতে লীন হইয়া রহিয়াছেন। যাহাতে জ্ঞানের আতিশয্য শুষ্ক পাণ্ডিত্যে পরিণত না হয় তাহার জন্য গীতাকার জ্ঞানের সহিত ভক্তিকে মিলাইয়াছেন এবং তাহাকেই প্রথম স্থান দিয়াছেন। ভক্তি বিনা জ্ঞান ব্যর্থ। তাই বলিয়াছেন—"ভক্তি করিলে জ্ঞান অবশ্যই পাইবে।" কিন্তু ভক্তি মাথার মূল্যেই কিনিতে হয়। সেইজন্য গীতাকার স্থিতপ্রজ্ঞের ন্যায়ই ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অর্থাৎ গীতার ভক্তি বীর্য্যহীনতা নহে, অন্ধ শ্রদ্ধা নহে। গীতায় বর্ণিত উপচারগুলির বাহ্য চেষ্টা বা ক্রিয়ার সহিত অত্যন্ত সামান্যই যোগ আছে। মালা তিলক অর্ঘ্য আদি সাধনগুলি ভক্তগণ ব্যবহার করুন, কিন্তু সেগুলি ভক্তির লক্ষণ নহে। যিনি অদ্বেষ্টা, যিনি করুণার ভাণ্ডার, যিনি মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, যাঁহার কাছে সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমান, যিনি ক্ষমাশীল, সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, যাঁহার আত্মা সম্বন্ধ, সংকল্প দৃঢ়, যিনি মন এবং বুদ্ধি শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াছেন, যিনি লোকের ভয়ের কারণ নহেন, যাঁহার কোন লোকেই ভয় নাই, যিনি হর্ষ শোকভয়াদি হইতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, কার্য্যদক্ষ হইয়াও তটস্থ, যিনি শুভাশুভ ত্যাগ করিয়াছেন, শত্রুমিত্রে যাঁহার সমভাব, মান অপমান যাঁহার কাছে তুল্যমূল্য, যিনি স্তুতিদ্বারা উৎফুল্ল বা নিন্দাদ্বারা দুঃখিত না হন, যিনি মৌনব্রতী, একান্তপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি, তিনিই ভক্ত। এ ভক্তি আসক্তিপূর্ণ নর-নারীর পক্ষে লাভ করা সম্ভবপর নহে।

ইহা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, জ্ঞান লাভ করা বা ভক্ত হওয়ার নামই আত্মদর্শন। আত্মদর্শন ইহা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে। যেমন একটি টাকা দিয়া বিষও আনা যায়, অমৃতও আনা যায়, তেমনি জ্ঞান অথবা ভক্তির দ্বারা বন্ধনও আসিতে পারে, মুক্তিও আসিতে পারে, এমন হইতে পারে না। এস্থলে সাধন ও সাধ্য একেবারে অভিন্ন না হইলেও প্রায় অভিন্ন। সাধনের চরম গতি মোক্ষ, এবং গীতায় মোক্ষের অর্থ পরম শান্তি।

কিন্তু এইরূপ জ্ঞান ও ভক্তিকে কর্ম্মফলত্যাগরূপ নিকষে কষিয়া লইতে হইবে। লৌকিক কল্পনায় শুষ্ক পণ্ডিত জ্ঞানীরূপে পরিগণিত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই করিতে হয় না, হাতে ঘটিটা তোলাও তাঁহার কাছে কর্ম্মবন্ধন। যজ্ঞশূন্য যেখানে জ্ঞানী বলিয়া পরিগণিত সেখানে ঘটিটা তোলার মত তুচ্ছ লৌকিক কর্ম্মের স্থান কোথায়?

লৌকিক কল্পনায় ভক্ত অর্থে ধরা হইয়াছে নির্ব্বীর্য্য মালাজপ-নিরত ব্যক্তি, সেবাকর্ম্মেও তাঁহার মালা-জপে বিক্ষেপ আসে। এইজন্য তিনি শুধু খাওয়া-পরা আদি ভোগের সময়ই মালা ত্যাগ করেন—কখনও ময়দা পেষার জন্য বা রোগীর সেবা করিবার জন্য নহে।

কাপাই
ণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা
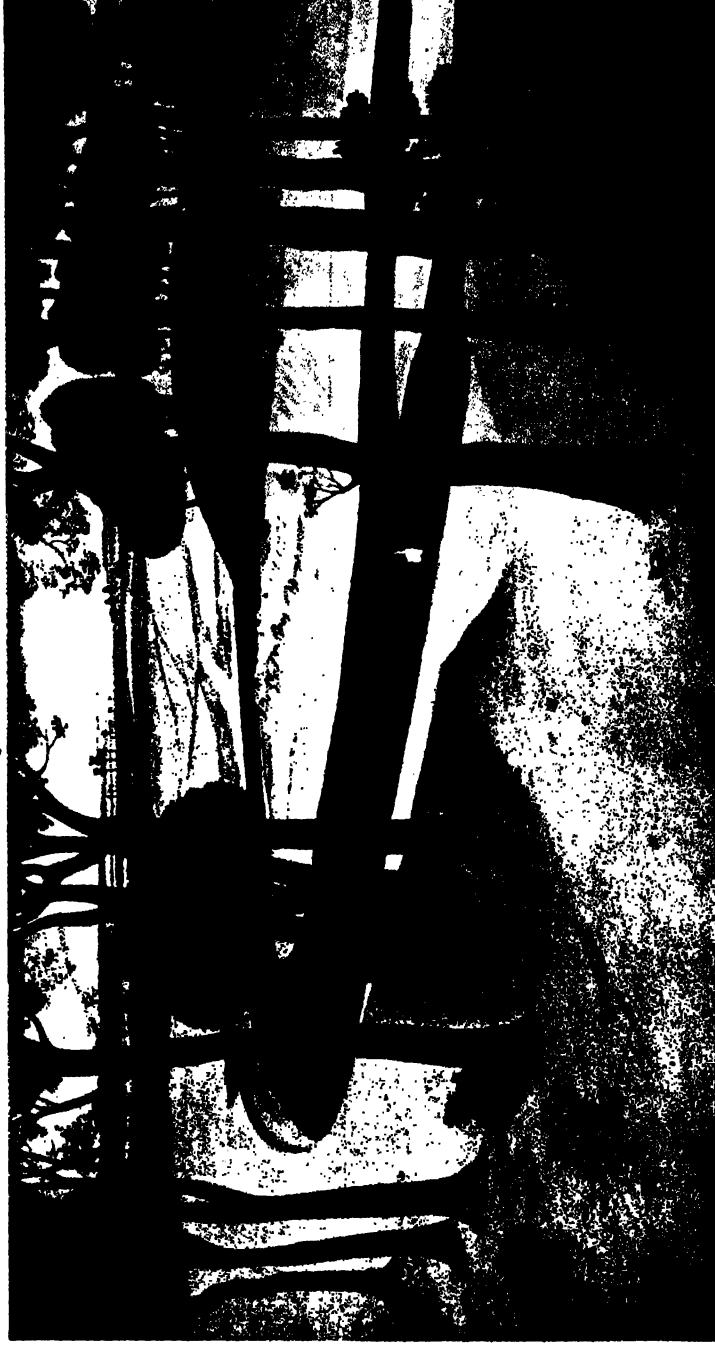
এই দুই প্রকারের লোককে গীতা স্পষ্টই শুনাইয়া দিয়াছে যে, "কর্ম্ম বিনা কেহই সিদ্ধিলাভ করে নাই; জনকাদিও কর্ম্ম দ্বারা জ্ঞানী হইয়াছিলেন। যদি আমিও আলস্যরহিত হইয়া কর্ম্ম না করি তাহা হইলে এই লোক ধ্বংস হইবে।" একথার পরও সাধারণ লোকের সম্বন্ধে আর কি বলার আছে?

কিন্তু একভাবে কর্ম্মমাত্রই বন্ধনস্বরূপ একথা অবিসম্বাদী। অপরদিকে দেহধারীমাত্রকেই ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক কর্ম্ম করিতে হয়, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টামাত্রই কর্ম্ম। তাহা হইলে কর্ম্মনিরত মানুষ কেমন করিয়া বন্ধনমুক্ত হইতে পারে? আমি যতদূর জানি, গীতায় এ প্রশ্নের যেরূপ সমাধান করা হইয়াছে, অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থেই সেরূপ করা হয় নাই। গীতায় বলা হইয়াছে—"ফলাসক্তি ছাড় এবং কর্ম্ম কর, নিরাশী হও এবং কর্ম্ম কর। নিষ্কাম হইয়া এই কর্ম্ম কর।" গীতার এই উক্তি ভুল বুঝিবার উপায় নাই। কর্ম্ম যে ছাড়িল তাহার পতন হইল; কর্ম্ম করিতে করিতেই ফল ত্যাগ করিলে ত উন্নতি হইল।

এস্থলে ফলত্যাগের এই অর্থ কেহই করে না যে, ত্যাগী কোন ফল পান না। গীতার কোথাও এই অর্থ নাই। ফলত্যাগের অর্থ ফলের বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ। প্রকৃতপক্ষে ফলত্যাগী হাজার গুণ ফল লাভ করেন। গীতার ফলত্যাগে অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার পরীক্ষা রহিয়াছে। যে লোক পরিণাম চিন্তা করে, সে বহুবার কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। সে অধীর হইয়া উঠে, তাহাতে সে ক্রোধের বশীভূত হয়, তখন সে যাহা করা উচিত নহে তাহাই করে, এবং এক কর্ম্ম হইতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হইতে তৃতীয়ে জড়িত হইয়া পড়ে। পরিণাম-চিন্তাকারীর অবস্থা বিষয়ান্ধের মতই হয় এবং শেষে সে-ও বিষয়ীর মত সারাসার নীতি-অনীতির বিচার ত্যাগ করিয়া ফললাভের-জন্য যে-কোন উপায় অবলম্বন করে এবং তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য করে। ফলাসক্তির এইরূপ কটু পরিণাম হইতে মুক্তির উপায়-স্বরূপ, গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্ম্মফলত্যাগের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করিয়াছেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় তাহা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, ধর্ম্ম ও অর্থ পরস্পর বিরোধী, "ব্যবসায় প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে ধর্ম্মের স্থানও নাই, ধর্ম্ম রক্ষাও হয় না,' ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা মোক্ষেরই জন্য হইতে পারে। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে ধর্ম্ম শোভা পায়, অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ।" আমার মতে গীতাকার এই ভুল ধারণার নিরাকরণ করিয়াছেন। তিনি মোক্ষ এবং লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে কোন ভেদ রাখেন নাই এবং ব্যবহারের মধ্যেই ধর্ম্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। আমার মনে হয়, গীতায় বলা হইয়াছে যে, যে-ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে অভ্যাস না করা যায়, তাহা ধর্ম্মই নয় অর্থাৎ গীতার মতে যে-সকল কর্ম্ম আসক্তি-বিনা করাই যায় না, তাহা পরিত্যাজ্য। এই সুবর্ণ নিয়ম মানুষকে বহু ধর্ম্মসঙ্কট হইতে বাঁচাইতেছে। এই মত দ্বারা হত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাচার প্রভৃতি সহজেই ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। মানুষের জীবন সরল হয় এবং সরলতা হইতেই শান্তি উৎপন্ন হয়। পরিণাম সম্বন্ধে বেপরোয়া ভাবও ফলত্যাগের অর্থ নয়। পরিণাম, উপায়-বিচার এবং তাহার সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলা হইলে যে লোক পরিণামের ইচ্ছা না করিয়াই সাধনের মধ্যে তন্ময় হইয়া যাইতে পারে সে-ই ফলত্যাগী।

এইরূপ দৃষ্টি দ্বারা বিচার করিতে করিতে আমার এরূপ বিশ্বাস হইয়াছিল যে, গীতার শিক্ষা যে কার্য্যে পরিণত কবিতে চাহে তাহাকে স্বভাবতই সত্য এবং অহিংসা পালন করিতে হয়। ফলাসক্তি না থাকিলে মানুষের পক্ষে অসত্য বলিবার বা হিংসা করিবার লোভ হয় না। হিংসা বা অসত্যমূলক যে-কোন কার্য্যই বিচার করা হউক না কেন, দেখা যাইবে যে, তাহার পিছনে নিশ্চয়ই ফলাকাঙ্ক্ষা আছে। কিন্তু অহিংসার প্রতিপাদন করাই গীতার উদ্দেশ্য নহে। গীতার যুগের পূর্ব্বেও অহিংসা পরমধর্ম্মরূপে গণ্য হইত। গীতার উদ্দেশ্য ছিল অনাসক্তিরূপ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই কথা স্পষ্টই দেখা যায়।

কিন্তু যদি অহিংসাই গীতার সিদ্ধান্ত হয়, কিংবা অনাসক্তির মধ্যে অহিংসা সহজেই আসে, তাহা হইলে

গীতাকার কেমন করিয়া ভৌতিক যুদ্ধের উদাহরণ গ্রহণ করিলেন? গীতার যুগে অহিংসা ধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইলেও ভৌতিক যুদ্ধ অত্যন্ত সাধারণ বস্তু ছিল বলিয়া গীতাকার এরূপ উদাহরণ গ্রহণ করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই, করার কারণও ছিল না।

কিন্তু ফলত্যাগের মহত্ত্ব বিচার করিতে গিয়া গীতাকারের হৃদয়ে কি সিদ্ধান্তের উদয় হইয়াছিল এবং অহিংসার মর্য্যাদার সীমা তিনি কিভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, এবিষয়ে আমাদের বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। কবি মহত্ত্বের আদর্শ জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। তাহার দ্বারা একথা বলা চলে না যে, তিনি তাঁহার মতবাদের মহত্ত্ব পূর্ণভাবে জানেন বা জানিয়া পূর্ণভাবে ভাষায় প্রকাশ করিতে পারেন। ইহাতেই কবির কাব্য এবং মহত্ত্ব। কবির অর্থের অন্ত নাই। মানব-চরিত্রের যেমন, মহাকাব্যের অর্থেরও তেমনি বিকাশ হইয়াই চলে। ভাষার ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, অনেক গভীর শব্দের অর্থ নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে; গীতার অর্থ সম্বন্ধে সেই কথা বলা যাইতে পারে। গীতাকার নিজেই মহত্ত্বপূর্ণ কঠিন শব্দগুলির অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতার যেখানে সেখানে দেখিলেই একথা বোঝা যাইবে। গীতার যুগের পূর্ব্বে সম্ভবতঃ যজ্ঞে পশুহিংসা প্রচলিত ছিল, কিন্তু গীতার কথিত যজ্ঞে কোথাও তাহার গন্ধ পর্য্যন্ত নাই। সেখানে জপযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। তৃতীয় অধ্যায়ে একথা সূচিত হইয়াছে যে, যজ্ঞের অর্থ মুখ্যভাবে পরোপকারের জন্য শরীরের উপযোগ। তৃতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় মিলাইয়া অন্য অর্থও করা যাইতে পারে, কিন্তু পশুহিংসা-ঘটিত অর্থ কোনমতেই করা যাইতে পারে না। গীতায় বর্ণিত সন্ন্যাস-সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে। গীতায় বলা হয় নাই যে, কর্ম্মমাত্রের ত্যাগই সন্ন্যাস। গীতার সন্ন্যাসী অতিকর্ম্মী এবং অতি-অকর্ম্মী উভয়ই। গীতাকার এইরূপে মহত্ত্বপূর্ণ শব্দগুলির ব্যাপক অর্থ করিয়া আমাদের ভাষায় অর্থের ব্যাপকতা বিষয়ে শিক্ষা দিয়াছেন। গীতাকারের প্রযুক্ত শব্দগুলি হইতে একথা ঠিকই প্রতিপাদন করা যায় যে, সম্পূর্ণ ফলত্যাগীর পক্ষে ভৌতিক যুদ্ধ অসম্ভব নহে। কিন্তু চল্লিশ বৎসর ধরিয়া গীতার শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মে পরিণত করিবার সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়া বিনীতভাবে একথা আমাকে বলিতে হইতেছে যে, সত্য ও অহিংসা পূর্ণভাবে পালন না করিলে সম্পূর্ণভাবে কর্ম্মফলত্যাগ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব।

গীতা সূত্রগ্রন্থ নহে। গীতা মহান্ ধর্ম্মকাব্যবিশেষ। তাহার মধ্যে যত গভীরভাবে প্রবেশ করিতে পারিবে, ততই নূতনতর এবং সুন্দরতর অর্থ পাইবে। জনসাধারণের সুবিধার জন্য তাহাতে একই কথা বহুবার বলা হইয়াছে। এইজন্য যুগে যুগে গীতার অর্থ পরিবর্ত্তিত হইবে এবং বিস্তারলাভ করিবে। কিন্তু গীতার মূলমন্ত্র কোনদিনই পরিবর্ত্তিত হইবে না। সে মন্ত্র যে-কোন ভাবে সাধন করা যাইতে পারে, জিজ্ঞাসু তাহার যে-কোন অর্থ করিতে পারেন।

গীতা বিধিনিষেধ নির্দ্দেশ করে নাই। একের পক্ষে যাহা বিহিত তাহাই অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতে পারে। বিশেষ কালে বিশেষ দেশে যাহা বিহিত, অন্য কালে অন্য দেশে তাহাই নিষিদ্ধ হইতে পারে। মাত্র ফলাসক্তি নিষিদ্ধ, অনাসক্তি বিহিত।

গীতায় জ্ঞানের মহিমা স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু গীতা বুদ্ধিগম্য নহে, হৃদয়গম্য, তাই তাহা শ্রদ্ধাহীনের জন্য নহে। গীতাকার বলিয়াছেন—

"যে তপস্বী নহে, ভক্ত নহে, যে শুনিতে চাহে না এবং যাহার আমার প্রতি বিদ্বেষ আছে তাহাকে তুমি এই (জ্ঞানের) কথা কখনও বলিও না।" ১৮।৬৭

"কিন্তু যে এই পরম গুহ্য জ্ঞান আমার ভক্তকে দান করিবে, সে-ই পরম ভক্তির জন্য নিঃসন্দেহে আমাকে লাভ করিবে।" ১৮।৬৮

"সেই সঙ্গে সঙ্গে যে দ্বেষ-রহিত হইয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ইহা শ্রবণ করিবে সে-ও মুক্তি লাভ করিয়া যেখানে পুণ্যবান্ বাস করেন সেই শুভলোক লাভ করিবে।" ১৮।৭১

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

(১৭)

ছুটি ফুরাইলে অপু বাড়ী হইতে রওনা হইল।

ষ্টেশনে আসিয়া কিন্তু ট্রেন পাইল না, গহনার নৌকা আসিতে অত্যন্ত দেরী হইয়াছে, ট্রেন আধঘণ্টা পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিয়াছে।

সর্ব্বজয়া ছেলের বাড়ী হইতে যাইবার দিনটাতে অন্যমনস্ক থাকিবার জন্য কাপড়, বালিশের ওয়াড় সাজিমাটি দিয়া সিদ্ধ করিয়া বাঁশবনের ডোবার জলে কাচিতে নামিয়াছে—সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে অপু বাড়ীর দাওয়ায় জিনিষপত্র নামাইয়া ছুটিয়া ডোবার ধারে গিয়া পিছন হইতে ডাকিল—ওমা!..

সর্ব্বজয়া ভুলিয়া থাকিবার জন্য দুপুর হইতেই কাপড় সিদ্ধ লইয়া ব্যস্ত আছে। চমকিয়া পিছন দিকে চাহিয়া আনন্দ-মিশ্রিত স্বরে বলে—তুই!...যাওয়া হ'ল না?...

অপু হাসিমুখে বলে—গাড়ী পাওয়া গেল নাঃ—এস বাড়ী—

বাঁশবনের ছায়ায় মায়ের মুখে সেদিন যে অপূর্ব্ব আনন্দের ও তৃপ্তির ছাপ পড়িয়াছিল, অপু পূর্ব্বে কোনো দিন তাহা দেখে নাই—বহুকাল পর্য্যন্ত মায়ের এ মুখখানা তার মনে ছিল। সেদিন রাত্রে দুজনে নানা কথা। অপু ছেলেবেলাকার গল্প শুনিতে চায় মার মুখে—নিশ্চিন্দিপুর সেখানকার সে-সব অপূর্ব্ব জ্যোৎস্না রাত্রি, অপূর্ব্ব সে-সব সন্ধ্যার মায়া গল্পগুলির সঙ্গে মাখানো। শুনিতে শুনিতে মন তাহার অসীম তৃপ্তি ও স্নিগ্ধতায় ভরিয়া ওঠে।

পরদিন সে কলিকাতায় ফিরিল।

কলেজ সেইদিনই প্রথম খুলিয়াছে, প্রমোশন পাওয়া ছেলেদের তালিকা বাহির হইয়াছে, নোটীশ বোর্ডের কাছে রথযাত্রার ভিড়—সে অধীর আগ্রহে ভিড় ঠেলিয়া নিজের নামটা আছে কিনা দেখিতে গেল।

আছে! দু' তিনবার বেশ ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিল। আরও আশ্চর্য্য এই যে, পাশেই যেসব ছেলে পাশ করিয়াছে অথচ বেতন বাকী থাকার দরুণ প্রমোশন পায় নাই, তাহাদের একটা তালিকা দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে অপুর নাম নাই, অথচ অপু জানে তারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বেতন বাকী!

সে ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া ভিড়ের বাহিরে আসিল। কেমন করিয়া এরূপ অসম্ভব সম্ভব হইল, নানাদিক হইতে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াও তখন কিছু ঠাহর করিতে পারিল না। দু তিন দিন পরে তাহার এক সহপাঠী নিজের প্রমোশন বন্ধ হওয়ার কারণ জানিতে আপিস্-ঘরে কেরানীর কাছে গেল, সে-ও গেল সঙ্গে। হেডক্লার্ক বলিল—একি ছেলের হাতের মোয়া হে ছোকরা!.. কত রোল?.....পরে একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—এই ছ্যাখো রোল টেন্ লাল কালির মার্কা মারা রয়েছে—দু মাসের মাইনে বাকী—মাইনে শোধ না দিলে প্রমোশন দেওয়া হবে না, প্রিন্সিপালের কাছে যাও, আমি আর কি করবো?

অপু তাড়াতাড়ি ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিতে গেল—তাহার রোল নম্বর কুড়ি—একই পাতায়। দেখিল অনেক ছেলের নামের সঙ্গে লালকালিতে 'ডি' লেখা আছে অর্থাৎ ডিফল্টার্—মাহিনা দেয় নাই। সঙ্গে সঙ্গে নামের উল্টা দিকে মন্তব্যের ঘরে কোন্ মাসের মাহিনা বাকী তাহা লেখা আছে। কিন্তু তাহার নামটাতে কোনো কিছু দাগ বা আঁচড় নাই—একেবারে পরিষ্কার মুক্তার মত হাতের লেখা জলজ্বল্ করিতেছে—রায় অপূর্ব্ব কুমার—লাল কালির একটা বিন্দু পর্য্যন্ত নাই!......

ঘটনা হয়ত খুব সামান্য, কিছুই না—হয়ত এটা সম্পূর্ণ কলমের ভুল, না হয় কেরানীর হিসাবের ভুল, কিন্তু অপুর মনে ঘটনাটা গভীর রেখাপাত করিল।

মনে আছে অনেকদিন আগে ছেলেবেলাতে তাহার দিদি যেবার মারা গিয়াছিল, সেবার শীতের দিনে বৈকালে নদীর ধারে বসিয়া ভাবিত, দিদি কি নরকে গিয়াছে? সেখানকার বর্ণনা সে মহাভারতে পড়িয়াছিল, ঘোর অন্ধকার নরকের দেশে শত শত বিকটাকার পাপী ও তাহাদের চেয়েও বিকট যমদূতের হাতে পড়িয়া তাহার দিদির কি অবস্থা হইতেছে! কথাটা মনে আসিতেই বুকের কাছটায় কি একটা আটকাইয়া যেন গলা বন্ধ হইয়া আসিত—চোখের জলে কাশবন শিমুলগাছ ঝাপ্‌সা হইয়া আসিত, কি জানি কেন সে তাহার হাস্যমুখী দিদির সঙ্গে মহাভারতোক্ত নরকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যেন কোনমতেই খাপ খাওয়াইতে পারিত না। তাহার মন বলিত না—না—দিদি সেখানে নাই—সে জায়গা দিদির জন্য নয়।

তারপর ওপারের কাশবনে ম্লান সন্ধ্যার রাঙা আলো যেন অপূর্ব্ব রহস্য মাখানো মনে হইত—আপনা আপনি তাহার শিশুমন কোন্ অদৃশ্য শক্তির নিকট হাতজোড় করিয়া প্রার্থনা করিত—আমার দিদিকে তোমরা কোনো কষ্ট দিও না—সে অনেক কষ্ট পেয়ে গেছে—তোমাদের পায়ে পড়ি তাকে কিছু বোলো না—

ছেলেবেলার সে সহজ নির্ভরতার ভাব সে এখনও হারায় নাই। এই সেদিনও কলিকাতায় পড়িতে আসিবার সময়ও তাহার মনে হইয়াছিল—যাই না, আমি ত একটা ভাল কাজে যাচ্ছি—কত লোক ত কত চায়, আমি বিদ্যে চাচ্চি—আমায় এর উপায় ভগবান ঠিক করে দেবেন—তার এ নির্ভরতা আরও দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন দেওয়ানপুরের হেডমাষ্টার মিঃ দত্ত। তিনি খৃষ্টান ছিলেন—ভক্ত ও বিশ্বাসী খৃষ্টান। তিনি তাহাকে যে-সব কথা বলিতেন অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে সে ভাবের কথা বলিতেন না। শুধু গ্রামার এ্যালজেব্রা যাহা অপর ছেলেদের সঙ্গে কহিতেন তাহা নয়—কত উপদেশের কথা, গভীর বিশ্বাসের কথা, ঈশ্বর, পরলোক, অন্তরতম অন্তরের নানা গোপন বাণী। কেমন করিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল এ বালকের মনের ক্ষেত্রে এ সকল উপদেশ সময়ে অঙ্কুরিত হইবে।

* * *

শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি, রাস্তায় ফেরিওয়ালা হাঁকিতেছে 'পেয়ারাপুলি আম', 'ল্যাংড়া আম'—দিন রাত টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, পথেঘাটে জল কাদা। এই সময়টার সঙ্গে অপুর কেমন একটা নিরাশ্রয়তা ও নিঃসম্বলতার ভাব জড়িত হইয়া আছে, আর-বছর ঠিক এই সময়টিতে কলিকাতায় নতুন আসিয়া অবলম্বন-শূন্য অবস্থায় পথে পথে ঘুরিতে হইয়াছিল, কি না জানি হয়, কোথায় না জানি কি সুবিধা জুটিবে—এবারও তাই।

ঔষধের কারখানায় এবার আর স্থান হয় নাই। এক বন্ধুর মেসে দিনকতক উঠিয়াছিল, এখন আবার অন্য একটি বন্ধুর মেসে আছে। নানাস্থানে ছেলে-পড়ানোর চেষ্টা করিয়া কিছুই জুটিল না, পরের মেসেই বা চলে কি করিয়া? তাহা ছাড়া এই বন্ধুটির ব্যবহার তত ভাল নয়, কেমন যেন বিরক্তির ভাব সর্ব্বদাই—তাহার অবস্থা সবই জানে অথচ একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল সে মেস্ খুঁজিয়া লইতে এত দেরী কেন করিতেছে—এ মাসটার পরে আর কোথাও সিট কি খালি পাওয়া যাইবে? অপু মনে বড় আহত হইল। কিছু না বলিয়া সে গলির ভিতর হইতে বাহির হইয়া শুনিল মোড়ের মাথায় কাগজ-বিক্রেতারা হাঁকিতেছে, ভারি কাণ্ড হ'ল বাবু, জারমানি জাহাজ ডুবিয়ে দিল বাবু। খবরের কাগজ বিক্রয় করিলে কেমন হয়? কলিকাতার খরচ চলে না? মাকেও ত‥ ‥

অপু সব সন্ধান লইল। তিন পয়সা দিয়া নগদ কিনিয়া আনিতে হয় খবরের কাগজের আপিস হইতে, চার পয়সায় বিক্রী, এক পয়সা লাভ কাগজপিছু। কিন্তু মূলধন ত চাই, কাহারও কাছে হাত পাতিতে লজ্জা করে, দিবেই বা কে? এই কলিকাতা সহরে এমন একজনও নাই যে তাহাকে টাকা ধার দেয়? সে সুদ দিতে রাজী আছে। সমীরের কাছে যাইতে ইচ্ছা হয় না, সে ভাল করিয়া কথা কয় না। ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে কারখানার তেওয়ারী-বৌয়ের কাছে গিয়া সব বলিল। তেওয়ারী বৌ সুদ লইবে না। লুকাইয়া দুটা মাত্র টাকা

বাহির করিয়া দিল, তবে আশ্বিন মাসে তাহারা দেশে যাইবে, তাহার পূর্ব্বে টাকাটা দেওয়া চাই।

ফিরিবার পথে অপু ভাবিল—বড়র পায়ের ধূলো নিতে ইচ্ছে করে, মায়ের মত দ্যাখে, আহা, কি ভাল লোক!

পরদিন সকালে সে ছুটিল অমৃতবাজার পত্রিকা আপিসে। সেখানে কাগজবিক্রেতাদের মারামারি, সবাই আগে কাগজ চায়। অপু ভিড়ের মধ্যে ঢুকিতে পারিল না—কাগজ পাইতে বেলা হইয়া গেল। তাহার পর আর এক নূতন বিপদ—অন্য কাগজওয়ালাদের মত কাগজ হাঁকিতে পারা ত দূরের কথা, লোকে তাহার দিকে চাহিলে সে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে, গলা দিয়া কোনো কথা বাহির হয় না। সকলেই তাহার দিকে চায়, সুশ্রী সুন্দর ভদ্রলোকের ছেলে কাগজ বিক্রয় করিতেছে, এ দৃশ্য তখনকার সময়ে কেহ দেখে নাই—অপু ভাবে—বা রে, আমি কি চড়কের নতুন সং নাকি? খানিক দূরে আর একটা জায়গায় চলিয়া যায়। কাহাকেও বিনীতভাবে মুখের দিকে না চাহিয়া বলে—একখানা খবরের কাগজ নেবেন? অমৃত বাজার?

কলেজে যাইবার পূর্ব্বে মাত্র আঠারোখানি বিক্রয় হইল। বাকীগুলা এক খবরের কাগজের ফেরিওয়ালা তিন পয়সা দরে কিনিয়া লইল। পরদিন আবার তাই। এবার লজ্জাটা অনেকটা কমিল, কিন্তু হাঁকিতে পারিল না, সেটা একেবারেই অসম্ভব তাহার দ্বারা; ট্রামে অনেকগুলা কাগজ কাটিল, বোধ হয় বাঙ্গালী ও ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া হউক বা যেজন্যই হউক তাহার নিকট হইতেই সকলে কাগজ লইল। দুজন হিন্দুস্থানী কাগজ-বিক্রেতা ছোক্‌রা তাহার সহিত ঝগড়া বাধাইল—নামিবার সময় ট্রামের পা-দানিতে একজন ছোক্‌রা ইচ্ছা করিয়া তাহার পা মাড়াইয়া দিল। অপুও কাগজের বাণ্ডিল নামাইয়া রাখিয়া ধাঁই করিয়া ছোক্‌রাটির নাকে মারিল এক ঘুষি। খুব গোলমাল বাধিত, হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা একযোগে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলও, পথযাত্রীদের অনেকে কিন্তু অপুর পক্ষে হইয়া বিবাদ মিটাইয়া দিল।

মাসের শেষে অপু মাকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিল। একদিন কলেজ লাইব্রেরীতে সে বসিয়া আছে, হঠাৎ হলে খুব হৈ চৈ উঠিল। সে গিয়া দেখে কোথাকার একজন ছেলে লাইব্রেরীর একখানা বই নাকি চুরি করিয়া পলাইতেছিল, ধরা পড়িয়াছে—তাহারই গোলমাল। অপু তাহাকে চিনিল—একদিন আর বছর সে ঠাকুরবাড়ীতে খাইতে যাইতেছিল, ওই ছেলেটিও বারাণসী ঘোস ষ্ট্রীটের দত্তবাড়ী দরিদ্র ছাত্র হিসাবে খাইতে যাইতেছিল। শীতের রাত্রি, খুব বৃষ্টি আসাতে দুজনে এক গাড়ী-বারান্দার নীচে ঝাড়া দুঘণ্টা দাঁড়াইয়া থাকে। ছেলেটি তখন অনেকদূর হইতে হাঁটিয়া অতদূরে খাইতে যায় শুনিয়া অপুর মনে বড় দয়া হয়। সে নামও জানিত, মেট্রোপলিটান্ কলেজে থার্ড ইয়ারের ছেলে তাহাও জানিত, কিন্তু কোনো কথা প্রকাশ করিল না। কলেজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট পুলিসের হাতে দিবার ব্যবস্থা করিতে-ছিলেন, দর্শনের অধ্যাপক বৃদ্ধ প্রসাদদাস মিত্র মধ্যস্থতা করিয়া ছাড়িয়া দিলেন।

অপুর মনে বড় আঘাত লাগিল—সে পিছু পিছু গিয়া অখিল মিস্ত্রি লেনের মোড়ে ছেলেটিকে ধরিল। ছেলেটির নাম হরেন। সে দিশাহারার মত পথ হাঁটিতেছিল, অপুকে চিনিতে পারিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। অত্যন্ত অচল হইয়াছে, ছেঁড়া কাপড়, চারিদিকে দেনা, দত্তবাড়ী আজকাল আর খাইতে দেয় না—বর্দ্ধমান জেলায় দেশ, এখানে কোনো আত্মীয়স্বজন নাই। অপু মির্জাপুর পার্কে একখানা বেঞ্চিতে তাহাকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসাইল, ছেলেটার মুখে বসন্তের দাগ, রং কালো, চুল রুক্ষ, গায়ের সার্ট কব্জির অনেকটা উপর পর্য্যন্ত ছেঁড়া। তাহার নিজের চোখে জল আসিতেছিল, বলিল—তোমাকে একটা পরামর্শ দি শোনো—খবরের কাগজ বিক্রি করবে? বাদামভাজা খাওয়া যাক এস—এই বাদাম ভাজা—এদিকে এস, দাও চার পয়সা—বেশ ভালো কাজ, আমি একটা টাকা দিচ্ছি। কাল আমার সঙ্গে যেও কিনিয়ে দোবো।

পূজা পর্য্যন্ত দুজনের বেশ চলিল। পূজার পরই পুনর্মূষিক—তেওয়ারী বৌয়ের দেনা শোধ করিয়া যাহ

থাকিল, তাহাতে মাসিক খরচের কিছু অংশ কুলান হয় বটে, বেশীটাই হয় না। আবার একবেলা খাওয়া, ছাতু, ময়লা কাপড়, কাপড়-কাচা সাবান সব উপসর্গই আসিয়া জুটিল। সেকেণ্ড ইয়ারের টেষ্ট পরীক্ষাও হইয়া গেল, এইবারই গোলমাল—সারা বছরের মাহিনা ও পরীক্ষার ফী দিতে হইবে অল্পদিন পরেই।

উপায় কিছুই নাই। সে কাহারও কাছে গিয়া কিছু চাহিতে পারিবে না—হয়ত পরীক্ষা দেওয়াই হইবে না। সত্যই ত, এত টাকা—এতো আর ছেলেখেলা নয়? মন্মথকে একদিন হাসিয়া সব কথা খুলিয়া বলে। মন্মথ শুনিয়া অবাক হইয়া গেল, বলিল—এসব কথা আগে জানাতে হয় আমাকে! মন্মথ সত্যই খুব খাটিল। নিজের দেশের বার লাইব্রেরীতে চাঁদা তুলিয়া প্রায় পঞ্চাশ টাকা আনিয়া দিল, কলেজে প্রোফেসরদের মধ্যে চাঁদা তুলিয়া ফেলিল, ইউনিভারসিটী ইন্‌ষ্টিটিউট হইতে পাওয়া গেল গোটাকড়ি টাকা। অল্পদিনের মধ্যে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকগুলি টাকা আসিতে দেখিয়া অপু নিজেই আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কিন্তু বাকী বেতন একরূপ শোধ হইলেও তখনও পরীক্ষায় ফিএর একপয়সার জোগাড় নাই, মন্মথ ও বৌবাজারের সেই ছেলেটি বিশ্বনাথ—দুজনে মিলিয়া ভাইস-প্রিন্সিপ্যালকে গিয়া ধরিল, অপর্ক্ককে কলেজের বাকী বেতন কিছু ছাড়িয়া দিতে হইবে।

এদিকে ঔষধের কারখানায় থাকিবার সুবিধার জন্য অপু পুনরায় একবার কারখানার ম্যানেজারের নিকট গেল। এই মাসতিনেক সে যদি সেখানে থাকিবার সুবিধা পায়, তবে পরীক্ষার পড়াটা করিতে পারে। এর ওর মেসে ত সারা বছর অস্থিতপঞ্চকভাবে থাকিয়া তেমন পড়াশুনা হয় নাই। ম্যানেজার অনুমতি দিলেন না। কারখানার আর সকলে অপুকে চিনিত, পছন্দও করিত, তাহারা বলিল—ওহে তুমি একবার মিঃ লাহিড়ীর কাছে যেতে পার? ওর কাছে বলাই ভুল—মিঃ লাহিড়ী কারখানার একজন ডিরেক্টার, তাঁর চিঠি যদি আন্‌তে পার, ও সুড়্‌ সুড়্‌ করে রাজী হবে তখন। ঠিকানা লইয়া অপু উপরি উপরি তিন চার দিন ভবানীপুরে মিঃ লাহিড়ীর বাড়ীতে গেল, দেখা পাইল না, বড়লোকের বাড়ী, গাড়ীবারান্দার ধারে একখানা বেঞ্চের উপর বসিয়া বসিয়া চলিয়া আসে।

সেদিন রবিবার। ভাবিল, আজ আর দেখা না করিয়া আসিবে না। গিয়া শুনিল, মিঃ লাহিড়ী বাড়ী নাই বটে, তবে বেলা এগারোটার মধ্যে আসিবেন। খানিকক্ষণ বসিয়া আছে, এমন সময় একজন ঝি আসিয়া বলিল—আপনাকে দিদিমণি ডাকচেন—

অপু আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কোন্ দিদিমণি তাহাকে ডাকিবেন এখানে? সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আমাকে? না—আমি ত—

ঝি ভুল করে নাই, তাহাকেই। ডানধারে একটা বড় কাম্‌রা, অনেকগুলা বড় বড় আলমারী, প্রকাণ্ড বনাত-মোড়া টেবিল, চামড়ার গদি-আঁটা আরাম চেয়ার ও বসিবার চেয়ার। সরু বারান্দা পার হইয়া একটা চক-মিলানো ছোট পাথর-বাঁধানো উঠান। পাশের ছোট ঘরটায় হাতল-হীন চেয়ারে একটি আঠারো উনিশ বছর বয়সের তরুণী বসিয়া টেবিলে বই কাগজ ছড়াইয়া কি লিখিতেছে, পরনে সাদাসিদে আটপৌরে লালপাড় শাড়ী, ব্লাউজ, ঢিলা খোঁপা, গলায় সরু চেন, হাতে প্লেন বালা—অপরূপ সুন্দরী! সে ঘরে ঢুকিতেই মেয়েটি হাসিমুখে চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইল।

অপু স্বপ্ন দেখিতেছে না ত? সকালে সে আজ কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছে!…নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করিয়াও করা যায় না—আপনা-আপনি তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল—লীলা!

লীলা মৃদু মৃদু হাসিমুখে তাহার দিকে চাহিয়াছিল। বলিল—চিন্‌তে পেরেচেন ত দেখ্‌চি?…আপনাকে কিন্তু চেনা যায় না—ওঃ কতকাল পরে—আট বছর খুব হবে—না?

অপু এতক্ষণ পরে কথা ফিরিয়া পাইল। সম্মুখের এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণী লীলাও বটে, না-ও বটে। কেবল হাসির ভঙ্গি ও এক ধরণের হাত রাখিবার ভঙ্গিটা পরিচিত - পুরানো।

সে বলিল, আট বছর—হাঁ তা—তো—তোমাকেও

দেখ্‌লে চেনা যায় না। অপু আপনি বলিতে পারিল না, মুখে বাধিল, লীলার সম্বোধনে সে মনে আঘাত পাইয়াছিল।

লীলা বলিল—আপনাকে দুদিন দেখেচি, পরশু কলেজে যাবার সময় গাড়ীতে উঠচি, দেখি কে একজন গাড়ীবারান্দার ধারে বেঞ্চিতে বসে—দেখে মনে হ'ল কোথায় দেখেচি যেন—আবার কালও দেখি বসে—আজ সকালে বাইরের ঘরে খবরের কাগজখানা এসেচে কিনা দেখ্‌তে জান্‌লা দিয়ে দেখি আজও বসে—তখন হঠাৎ মনে হ'ল আপনি!···তখনই মাকে বলেচি, মা আস্‌চেন—কি করচেন কল্‌কাতায়? রিপনে—? বাঃ তা এতদিন আছেন একদিন এখানে আস্‌তে নেই?

বাল্যের সেই লীলা!—একজন অত্যন্ত পরিচিত, অত্যন্ত আপনার লোক যেন দূরে চলিয়া পর হইয়া পড়িয়াছে। 'আপনি' বলিবে না 'তুমি' বলিবে দিশাহারা অপু তাহা ঠাহর করিতে পারিল না। বলিল, কি করে জান্‌ব? আমি কি ঠিকানা জানি?

লীলা বলিল—ভাল কথা, আজ এখানে হঠাৎ কি করে এসে পড়লেন?

অপু লজ্জায় বলিতে পারিল না, যে সে এখানে থাকিবার স্থানের সুপারিশ ধরিতে আসিয়াছে। লীলা জিজ্ঞাসা করিল—মা ভাল আছেন? বেশ—আপনারও বুঝি সেকেণ্ড ইয়ার? আমার ফার্ষ্ট ইয়ার আর্টস্।

একটি মহিলা ঘরে ঢুকিলেন।

অপু চিনিল, বিস্মিতও হইল। লীলার মা মেজ-বৌরাণী, কিন্তু বিধবার বেশ।

আট দশ বৎসর পূর্ব্বের সে অতুলনীয় রূপরাশি এখনও একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া না গেলেও দেখিলে হঠাৎ চেনা যায় না। অপু পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিল। মেজবৌরাণী বলিলেন—এস এস বাবা, লীলা কালও একবার বলেচে, কে একজন বসে আছে মা ঠিক বর্দ্ধমানের সেই অপূর্ব্বর মত—আজ আমাকে গিয়ে বললে, ও আর কেউ নয় ঠিক অপূর্ব্ব—তখুনি আমি ঝিকে দিয়ে ডাকতে পাঠালাম—বসো দাঁড়িয়ে কেন বাবা? ভাল আছ বেশ? তোমার মা কোথায়?

অপু সঙ্কুচিতভাবে কথার উত্তর দিয়া গেল। কি আন্তরিকতার সুর। যেন কত কালের পুরাতন পরিচিত আত্মীয়তার আবহাওয়া। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল। অপু কি করিতেছে, কোথায় থাকে, মা কোথায় থাকেন, কি করিয়া চলে, এবার পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পড়িবে কিনা, নানা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। তারপর তিনি চা ও খাবারের বন্দোবস্ত করিতে উঠিয়া গেলেন।

মেজবৌরাণী বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেলে অপু বলিল—ইয়ে তোমার বাবা কি—

লীলা ধরা গলায় বলিল—বাবা ত···এই তিন বছর হ'ল···এখানে এটা মামার বাড়ী—

—মিঃ লাহিড়ী বুঝি—

—দাদা মশায়—উনি ব্যারিষ্টার, তবে আজকাল আর প্র্যাক্‌টিশ করেন না—বড়মামা হাইকোর্টে বেরুচ্ছেন আজকাল। ও বছর বিলেত থেকে এসেচেন।

চা ও খাবার খাইয়া অপু বিদায় লইল। লীলা একবার বাড়ীর ভিতর দিয়া বাইরে আসিয়া বলিল—বড়-মামার মেয়ের নেম্‌-ডে পার্টি, অর্থাৎ অন্নপ্রাশন, সাম্‌নের বুধবারে এখানে বিকেলে আস্‌বেন অবিশ্যি অপূর্ব্ববাবু—ভুল্‌বেন না যেন—ঠিক কিন্তু।

পথে আসিয়া অপুর চোখে প্রায় জল আসিল। 'অপূর্ব্ব বাবু'!···লীলাই বটে, কিন্তু ঠিক কি সেই এগারো বছরের কৌতুকময়ী সরলা স্নেহময়ী লীলা?···কোথায় যেন বাধিতেছে। তবুও কি আন্তরিকতা ও আত্মীয়তা···আর নিজের আপনার লোক জেঠাইমাও ত কলিকাতায় আছেন—মেজবৌরাণী সম্পর্ণ নিস্পর হইয়া আজ তাহার বিষয়ে যত খুঁটিনাটি আন্তরিক আগ্রহের প্রশ্ন করিলেন, জেঠাইমা কোনো দিন তাহা করিয়াছেন?···

বাসায় ফিরিয়া কেবলই লীলার কথা ভাবিল। তাহার মনের যে স্থান লীলা দখল করিয়া আছে ঠিক সে স্থানটিতে আর কেহই ত নাই। কিন্তু সে এ-লীলা নয়। সে-লীলা স্বপ্ন হইয়া কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে—আর তাহার দেখা মিলিবে না। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না আজকার সাক্ষাতে সে আনন্দিত হইয়াছে কি ব্যথিত হইয়াছে।

বুধবারের পার্টির জন্য সে টুইল সার্টটা সাবান দিয়া কাচিয়া লইল। ভাবিল, নিজের যাহা আছে তাহাই পরিয়া যাইবে, চাহিবার চিন্তিবার আবশ্যক নাই। তবুও যেন বড় হীনবেশ হইল। মনে মনে ভাবিল হাতে যখন পয়সা ছিল, তখন লীলার সঙ্গে দেখা হ'ল না—আর এখন একেবারে এই দশা, এখন কিনা!

লীলার দাদামশায় মিঃ লাহিড়ী খুব মিশুক লোক। অপুকে বৈঠকখানায় বসাইয়া খানিকটা গল্পগুজব করিলেন, বলিলেন, তিনি তাহার কথা সবই শুনিয়াছেন, সে যে এখন কলেজ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করিতেছে ইহাতে খুব আনন্দ প্রকাশ করিলেন ও উৎসাহ দিলেন। লীলা আসিল, সে ভারি ব্যস্ত, একবার দু চার কথা বলিয়াই চলিয়া গেল। কোনে পার্টিতে কেহ কখনো তাহাকে নিমন্ত্রণ করে নাই, সে-সব অভিজ্ঞতাও নাই। যখন এক এক করিয়া নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক ও মহিলাগণ আসিতে আরম্ভ করিলেন, তখন অপু খুব খুসি হইল। কলিকাতা সহরে এ রকম ধনী ও উচ্চশিক্ষিত পরিবারে মিশিবার সুযোগ—এ বুঝি সকলের হয়? মাকে গিয়া গল্প করিবার মত একটা জিনিষ পাইয়াছে এতদিন পরে! মা শুনিয়া কি খুসিই যে হইবে!

বৈঠকখানায় অনেক সুবেশ যুবকের ভিড়, প্রায় সকলেই বড়লোকের ছেলে, কেহ বা নতুন ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া আসিয়াছে, কেহ বা ডাক্তার, বেশীর ভাগ বিলাত-ফেরৎ।

কি লইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া তর্ক হইতেছিল। কর্পোরেশন ইলেক্‌শনের ব্যাপার লইয়া কথা কাটাকাটি। অপু এ বিষয়ে কিছু জানে না, সে একপাশে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

পাড়াগাঁয়ের কোন-একটা মিউনিসিপ্যালিটির কথায় সেখানকার নানা অসুবিধার কথাও উঠিল।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক, মাথায় কাচাপাকা চুল, চোখে সোনা-বাঁধানো চশমা, একটু টানিয়া টানিয়া কথা বলিবার অভ্যাস, মাঝে মাঝে মোটা চুরটে টান দিয়া কথা বলিতেছিলেন—দেখুন মিঃ সেন এগ্রিকালচারের কথা যে বল্‌চেন, ও সখের ব্যাপার নয়- ও কাজ আপনার আমার নয়, ইট্ মাষ্ট বি ব্রেড্ ইন্ দি বোন্—জন্মগত একটা ধাত গড়ে না উঠলে শুধু কলের লাঙ্গল কিন্‌লে ও হয় না—

প্রতিপক্ষ একজন ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বৎসরের যুবক, সাহেবী পোষাক পরা, বেশ সবল ও সুস্থকায়। তিনি অধীর-ভাবে সাম্‌নে ঝুঁকিয়া বলিলেন - মাপ করবেন রমেশবাবু, কিন্তু একথার কোনো ভিত্তি আছে বলে আমার মনে হয় না, আপনি কি বল্‌তে চান তা হ'লে এড়ুকেশন, অর্গ্যানিজেসন, ক্যাপিটাল—এসবের মূল্য নেই এগ্রিকালচারে? এই যে—

—আছে, সেকেণ্ডারি—

—তবে চাষার ছেলে ভিন্ন কোনো শিক্ষিত লোক কখনো ওসবে যাবে না?...কারণ ইট্ ইজ্ নট ব্রেড্ ইন্ হিজ বোন্?.. অদ্ভুত কথা আপনার—আমার সঙ্গে কেম্বি্রজে একজন ছাত্র পড়তো—লম্বা লম্বা চুল মাথায়, সুন্দর চেহারা, ধরণধারণে ট্রু পোয়েট। হয়ত সারারাত জেগে হল্লা করছে, একটা বেহালা নিয়ে বাজাচ্ছে —আবার হয়ত দেখুন সারাদিন পড়চে বসে কি লিখ্‌চে —নয় তো ভাবচে—ডিগ্রি নিয়ে চলে গেল বেরিয়ে ক্যানাডায়...গবর্ণমেণ্ট হোমষ্টেড ল্যাণ্ডে জংলী জমি নিলে—ছোট্ট একটা কাঠের কুঁড়েঘরে সেই দুর্দ্ধর্ষ শীতের মধ্যে তিন চার বৎসর কাটালে—হোমষ্টেড ল্যাণ্ডের নিয়ম হচ্চে টাইটল্ হবার আগে পাঁচবৎসর জমির ওপর বাস করা চাই—থেকে জমি পরিষ্কার করলে, নিজের হাতে রোজ জমি সাফ করে—লোকজন নেই, দুশো একার জমি, ভাবুন কতদিনে—

— ইংরেজ অবিশ্যি?

ওদিকে একদলের মধ্যে আলোচনা বেশ ঘনাইয়া আসিল। একজন কে বলিয়া উঠিল—ও সব মর‍্যালিটী, আপনি যা বল্‌চেন, একটু এ্যান্টিডেটেড্ হয়ে পড়েচে—এটা তো আপনি মানেন যে ওসব তৈরি হয়েচে বিশেষ কোনো সামাজিক অবস্থায়, সমাজকে বা ইন্‌ডিভিডুয়ালকে একটা প্রোটেক্‌শন্ দেবার জন্যে, সুতরাং—

—বটে, তাহ'লে সবই সুবিধাবাদী আপনারা! নর্ম্যাটিভ ভ্যালু বলে কোনো কিছুর স্থান নেই দুনিয়ায়! ...ধরুন যদি—

অপু খুব খুসি হইল।

কলিকাতার বড়লোকের বাড়ীর পার্টিতে সে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা ছাড়া শিক্ষিত বিলাত-ফেরৎ দলের মধ্যে এভাবে! নাটক-নভেলে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা কখনো হয় নাই। সে অতীব খুসির সহিত চারিধারে চাহিয়া একবার দেখিল—মার্ব্বেলের বড় ইলেট্রিক ল্যাম্প কড়ি হইতে ঝুলিতেছে, সুন্দর ফুল-কাটা ছিটের কাপড়ে ঢাকা কৌচ, সোফা, দামী চায়না—বড় বড় গোলাপ, মোরাদাবাদের পিতলের গোলাপপাশ। নিজের বসিবার কৌচখানা সে দু'একবার অপরের অলক্ষিতে টিপিয়া টিপিয়া দেখিল কি নরম গদিটা! তাহা ছাড়া এধরণের কথাবার্ত্তা—এই ত সে চায়! কোথায় সে ছিল পাড়াগাঁয়ের গরীব ঘরের ছেলে—তিন ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মামজোয়ানের স্কুলে পড়িতে যাইত, সে এখন কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে!

অপু যে বিশেষ কোনো কথাবার্ত্তা মনোযোগ দিয়া শুনিতেছিল তাহা নয়, কিন্তু এমন আলোকোজ্জ্বল ঘর ও সুন্দর সাজসজ্জা, সুবেশ নিমন্ত্রিতের দল, ও মার্জ্জিত কথাবার্ত্তার—এ-ধরণের একটা উৎসবের মধ্যে তাহার উপস্থিতি ও পাঁচজনের একজন হইয়া বসিবার আত্মপ্রসাদে ঘরের তাবৎ উপকরণ ও অনুষ্ঠানকে যেন সে সারা দেহ মন দ্বারা উপভোগ করিতেছিল।

কৃষিকার্য্যে উৎসাহী ভদ্রলোকটি অন্য কথা তুলিয়াছেন, কিন্তু অপুর দক্ষিণ ধারের দলটি পূর্ব্ব আলোচনাই চালাইতেছেন এখনও। অপুর মনে হইল, সে-ও এ আলোচনায় যোগদান করিবে, আর হয়ত এ ধরণের শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ জীবনে কখনও ঘটিবে না। এই সময় দু এক কথা এখানে বলিলে সে-ও ত একটা আত্মপ্রসাদ! ভবিষ্যতে ভাবিয়া আনন্দ পাওয়া যাইবে, লোকের কাছে গল্প ত।..

ছিপছিপে চেহারায় ভদ্র লোকটিকে অপুর বেশ লাগিতেছিল—মুখে বেশ বুদ্ধি ও শিক্ষার ছাপ, কি কথায় তিনি বলিলেন—ও সব মানিনে বিমলবাবু, দেহ একটা এঞ্জিন—এঞ্জিনের যতক্ষণ ষ্টীম থাকে, চলে—যাই কলকব্জা বিগড়ে যায় সব বন্ধ—

অপু অবসর খুঁজিতেছিল, এই সময় তাহার মনে হইল এবিষয়ে সে কিছু কথা বলিতে পারে। সে দু' একবার চেষ্টা করিয়া সাহস সঞ্চয় করিয়া কতকটা আনাড়ি কতকটা মরীয়ার ভাবে আরক্ত মুখে বলিল—দেখুন মাপ করবেন, আমি আপনার মতে ঠিক মত দিতে পারিনে—দেহটাকে এঞ্জিনের সঙ্গে তুলনা করুন ক্ষতি নেই, কিন্তু যদি বলেন দেহ ছাড়া আর কিছু নেই—

ঘরের সকলেই তাহার দিকে যে কতকটা বিস্ময়, কতকটা কৌতুকের সহিত চাহিতেছে, সেটুকু সে বুঝিতে পারিল—তাহাতে সে আরও অভিভূত হইয়া পড়িল—সঙ্গে সঙ্গে সেটুকু চাপিবার চেষ্টায় আরও মরীয়া হইয়া উঠিল।

একজন বাধা দিয়া বলিল—মশায় কি করেন, জান্‌তে পারি কি?

—আমি কিছু করি নে আই-এ পাশ করেচি।

এবার পাস্‌নে চশমা পরা যে যুবকটি এঞ্জিনের কথা তুলিয়াছিল, সে বলিল, ইউনিভার্সিটির আরও দু এক ক্লাস পড়ে এসে এ তর্কগুলো করলে ভাল হয় না?

সে এমন অতিরিক্ত শান্তভাবে কথাগুলা বলিল যে, ঘরসুদ্ধ লোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

অপুর মুখ দাড়িমের মত লাল হইয়া উঠিল।

সে আরও মরীয়ার স্বরে বলিল—ইউনিভার্সিটির ক্লাসে না পড়লে যে কিছু জানা যায় না একথা আমি বিশ্বাস করিনে—আমি একথা বলতে পারি আমি ত কলেজে পড়ি নে, কিন্তু চ্যালেঞ্জ করচি কোনো ফোর্থ ইয়ারের ছাত্র যে-কোনো কলেজের, হিষ্ট্রিতে কি ইংলিশ পোইট্রিতে—কিংবা জেনারেল নলেজে—ইচ্ছে করেই আমি কলেজ ছেড়েচি।

সকলে আরও এক দফা হাসিয়া উঠিল।

তারপর তাহারা নিজেদের মধ্যে অন্য কথাবার্ত্তায় প্রবৃত্ত হইল। অপু আধ ঘণ্টা বসিয়া থাকিলেও তাহার অস্তিত্বই যেন সকলে ভুলিয়া গেল। উঠিবার সময় তাহারা

নিজেদের মধ্যে করমর্দ্দন ও পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল, তাহার দিকে কেহ ফিরিয়াও চাহিল না।

যেভাবে সকলে তাহাকে উড়াইয়া দিল, বা মানুষের মধ্যে গণ্য করিল না তাহাতে অপু অপমানে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার পাশ কাটাইয়া সকলে চলিয়া গেল—কেহ একটা প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিল না, তাহার সম্বন্ধে কেহ কোনো কৌতূহলও দেখাইল না। অপু মনে মনে ভাবিল—বেশ, না বলুক কথা—আমি কি জানি না জানি, তার খবর ওরা কি জানে? যে জান্‌ত অনিল—

সেও চলিয়া যাইতেছে, এমন সময় লীলা আসিয়া তাহাকে নিজে বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেল। বলিল মা, অপূর্ব্ববাবু না খেয়েই চুপি চুপি পালাচ্ছিলেন—

একটি ছোট আট নয় বছরের ছেলেকে দেখাইয়া বলিল—একে চেনেন অপূর্ব্ববাবু? এ সেই খোকামণি, আমার ছোট ভাই, এর অন্নপ্রাশনে আপনাকে একবার আসতে বলেছিলুম, মনে নেই? লীলার কয়েকটি সহপাঠিনী সেখানে উপস্থিত, ইতিপূর্ব্বে যে মহিলাটি 'আমি চঞ্চল হে আমি সুদূরের পিয়াসী' গানটি করিয়াছিলেন, তাঁহার ছোট বোন, নাম দীপ্তি, লীলারই এক ক্লাসে পড়ে, লীলা পরিচয় করাইয়া দিল। তাহার পর সে সকলকে বলিল—তোমরা জান না অপূর্ব্ববাবুর গলা খুব ভাল, তবে গান গাইবেন কিনা জানিনে' মানে বেজায় লাজুক, আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আস্‌চি, একটা অনুরোধ রাখবেন অপূর্ব্ববাবু?

অপু অনেকের অনুরোধ-উপরোধে অবশেষে বলিল—আমি বাজাতে জানি নে—কেউ যদি বরং বাজান—

দীপ্তি অর্গ্যানের কাছে গিয়া বসিল। অপুর গলা খুব সুন্দর, সকলে পর পর দু তিনটি গান শুনিল।

লীলার মা মাঝে মাঝে তাহাকে আসিবার জন্য বিশেষ করিয়া বলিলেন।

তবুও রাত্রে বাসায় ফিরিতে ফিরিতে তাহার মনে হইতেছিল আর কখনও এখানে সে আসিবে না। বড়লোকেরসঙ্গেতাহার কিসের খাতির—দরকার কি আসিবার? একটা দারুণ অতৃপ্তি।

যেদিন অপুর পরীক্ষা আরম্ভ হইবে তাহার দিন-পাঁচেক আগে অপু পত্রে জানিল মায়ের বড় অসুখ, হস্তাক্ষর তেলিবাড়ীর বড় বৌয়ের।

সন্ধ্যায় সময় অপু বাড়ী পৌছিল।

সর্ব্বজয়া কাঁথা গায়ে দিয়া শুইয়া আছে। দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া মনে হয়, অপুকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর উঠিয়া বসিল। অনেক দিন হইতেই অসুখে ভুগিতেছে পরীক্ষার পড়ার ব্যাঘাত হওয়ার ভয়ে খবর দেয় নাই, সেদিন তেলি-বৌ জোর করিয়া নিজে পত্র দিয়াছে। এমন যে কিছু শয্যাগত অবস্থা তাহা নয়, খায় দায়, কাজকর্ম্ম করে। আবার অসুখও হয়। সন্ধ্যা হইলেই শয্যা আশ্রয় করে, আবার সকালে যথারীতি উঠিয়া গৃহকর্ম্ম সুরু করে। চিরদিনের গৃহিণীপনা এ অসুস্থ শরীরেও তাহাকে ত্যাগ করে নাই।

অপু বলিল—উঠো না বিছানা থেকে মা—শুয়ে থাক—দেখি গা?

—তুই আয় বোস্—ও কিছু না—একটু জ্বর হয়, খাই দাই—ও এমন সময়ে হয়েই থাকে। বোশেখ মাসের দিকে সেরে যাবে—তুই যে মেয়েকে পড়াস, সে ভাল আছে ত?

সর্ব্বজয়ার রোগশীর্ণ মুখের হাসিতে অপুর চোখে জল আসিল। সে পুঁটুলি খুলিয়া গোটাকতক কমলা লেবু, বেদানা, আপেল, বাহির করিয়া দেখাইল। জিনিষপত্র সস্তায় কিনিতে পারিলে সর্ব্বজয়া ভারি খুসী হয়। অপু জানে মাকে আমোদ দিবার এটা একটা প্রকৃষ্ট পন্থা। কমলালেবুগুলা দেখাইয়া বলে—কত সস্তায় কল্‌কাতায় জিনিষপত্র পাওয়া যায় দ্যাখো—লেবুগুলো দশ পয়সা—

প্রকৃতপক্ষে লেবুগুলার দাম ছ আনা।

সর্ব্বজয়া আগ্রহের সহিত বলিল—দেখি? ওমা, এখানে যে ওগুলোর দাম বারো আনার কম নয়—এখানে সব ডাকাত।

চার পয়সায় এক তাড়া পান দেখাইয়া বলিল—বৈঠকখানা বাজার থেকে দু পয়সায়—দ্যাখো মা—

সর্ব্বজয়া ভাবে এবার ছেলের সংসারী হইবার দিকে মন গিয়াছে, হিসাব করিয়া সে চলিতে শিখিয়াছে।

অপু ইচ্ছা করিয়াই লীলার সঙ্গে সাক্ষাতের কথাটা ওঠায় না। ভাবে, মা মনে নানা দুরাশা পোষণ করে, হয়ত এখনি বলিয়া বসিবে—লীলার সঙ্গে তোর বিয়ে হয় না?···দরকার কি, অসুখের মধ্যে মায়ের মনে সে-সব দুরাশার ঢেউ তুলিয়া?

এমন সব কথা কখনো অপু মায়ের সাম্‌নে বলে না, যাহা কি না মা বুঝিবে না। জগৎ সংসারটাকে মায়ের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের উপযোগী করিয়াই সে মায়ের সম্মুখে উপস্থিত করে।

দিন-তিনেক সে বাড়ী রহিল। রোজ দুপুরে জানলার ধারের বিছানাটিতে সর্ব্বজয়া শুইয়া থাকে, পাশে সে বসিয়া নানা গল্প করে। ক্রমে বেলা যায়, রোদ প্রথমে ওঠে রান্নাঘরের চালায়, পরে বেড়ার ধারের পাল্‌তে মাদার গাছটার মাথায়, ক্রমে বাঁশঝাড়ের দগায়। ছায়া পড়িয়া যায়···বৈকালের ঘন ছায়ায় অপুর মনে একটা বিপুল নির্জ্জনতা ও সঙ্গীহীনতার ভাব আনে।

সর্ব্বজয়া হাসিয়া বলে—পাশটা হ'লে এবার তোর বিয়ের ঠিক করিচি এক জায়গায়। মেয়ের দিদিমা এসেছিল এখানে, বেশ লোক—

অপু চতুর্থদিন সকালে চলিয়া গেল, কালই পরীক্ষা। দিয়া গেলেই আবার আসিবে। শেষরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া জানে, সর্ব্বজয়া রান্নাঘরে ইতিমধ্যে কখন ঘুম হইতে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে, ছেলের সঙ্গে গরম পরেটা দেওয়া হইবে।

সর্ব্বজয়ার এরকম কোনদিন হয় নাই। অপু চলিয়া যাওয়ার দিনটা হইতে বৈকালে তাহার এত মন হু হু করিতে লাগিল, যেন কেহ কোথাও নাই, একটা অসহায় ভাব, মনের উদাস ভাব। কত কথা, সারা জীবনের কত কথা, কত আনন্দ ও অশ্রুজলের ইতিহাস একে একে মনে আসিয়া উদয় হয়। গত একমাস ধরিয়া এসব কথা মনে উঠিতেছে। নির্জ্জনে বসিলেই বিশেষ করিয়া···ছেলেবেলায় বুধী বলিয়া গাই ছিল বাড়ীতে···বাল্যসঙ্গিনী হিমি-দি, দুজনে একসঙ্গে দো-পেটে গাঁদাগাছ পুঁতিয়া জল দিত···একদিন হিমি-দি ও সে বন্যার জলে মাঠে ঘড়া-বুকে সাঁতার কাটিতে গিয়া ডুবিয়া···আর একটু হইলেই সেদিন ··

বিবাহ···মনে আছে সেদিন দুপুরে খুব বৃষ্টি হইয়াছিল ···তাহার ছোট ভাই তখন বাঁচিয়া, তাহাকে লুকাইয়া নাড়ু দিয়া গিয়াছিল হাতের মুঠায়। ছোট্ট ছেলেবেলার অপু···কাঁচের পুতুলের মত রূপ···প্রথম স্পষ্ট কথা শিখিল, কি জানি কি করিয়া শিখিল 'ভিজে'। একদিন অপুকে কদ্‌মা হাতে বসাইয়া রাখিয়াছিল। কেমন খেলি ও খোকা?

অপু দন্তহীন মুখে কদ্‌মা চিবাইতে চিবাইতে ফুলের মত মুখটি তুলিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল—ভিজে। হি, হি—ভাবিলে এখনও সর্ব্বজয়ার হাসি পায়।

সেদিন দুপুর হইতেই বুকে মাঝে মাঝে খিক্‌-ধরা বেদনা হইতে লাগিল। তেলি-বৌ আসিয়া তেল গরম করিয়া দিয়া গেল। দু তিনবার দেখিয়াও গেল। সন্ধ্যার পর কেহ কোথাও নাই। একা, নির্জ্জন বাড়ী। জ্বরও আসিল।

রাত্রে খুব পরিষ্কার আকাশে ত্রয়োদশীর প্রকাণ্ড বড় চাঁদ উঠিয়াছে। জীবনে এই প্রথম সর্ব্বজয়ার একা থাকিতে ভয় ভয় করিতে লাগিল। শেষরাত্রে একবার যেন মনে হইল, সে জলের তলায় পড়িয়া আছে, নাকে মুখে জল ঢুকিয়া নিঃশ্বাস একেবারে বন্ধ হইয়া আসিতেছে···একেবারে বন্ধ। সে ভয়ে এক গা ঘামিয়া ধড়মড় করিয়া বিছানার উপর উঠিয়া বসিল। সে কি মরিয়া যাইতেছে? এই কি মৃত্যু?·· সে এখন কাহাকে ডাকে? জীবনে সর্ব্বপ্রথম এই তাহার জীবনের ভয় হইল-- ইহার আগে কখনও ত এমন হয় নাই? পরে নিজের ভয় দেখিয়া তাহার একদফা ভয় হইল। ভয় কিসের? না--না--সে এ রকম নয়। ও কিছু না।

কিন্তু ভয় যেন যায় না, মরিতেও ভয় হয়। কত চুরি, কত পাপ, চুরি যে কত করিয়াছে তাহার কি ঠিক আছে? ছেলেমেয়েকে খাওয়াইতে অমুকের গাছের কলার কাঁদিটা, অমুকের গাছের শশাটা লুকাইয়া রাখিত

তক্তপোষের তলায়···ভুবন মুখুযোদের বাড়ী হইতে একবার দশ পলা তেল ধার করিয়া আনিয়া ভাল মানুষ রাণুর মায়ের কাছে পাঁচপলা শোধ দিয়া আসিয়াছিল, মিথ্যা করিয়া বলিয়াছিল—পাঁচ পলাই ত নিয়ে গিছলাম ন'দি—বোলো সেজঠাকুরঝিকে। সারাজীবন ধরিয়া শুধু দুঃখ ও অপমান।

অনেক রাত্রে ভয়ের ভাবটা কমিয়া গেল।

সে ছেলেমানুষ, খঞ্জনপাখীর মত তার ডাগর ডাগর নীল চোখ, মুখ তরুণ সুন্দর চুল কোঁকড়া কোঁকড়া··· একটু মুখচোরা, একটু ভালমানুষ, জগতের ঘোরপেঁচ সে কিছুই একেবারে বোঝে না, কোথায় যায়···যায়··· যায় যায় নীল আকাশ বাহিয়া বহুদূরে প্রসারিত তার গতিপথ। সুনীল মেঘপদবীর অনেক ওপরে, মেঘের ফাঁকে যাইতে যাইতে কোথায় মিলাইয়া যায়।

বুঝি মৃত্যু আসিয়াছে—কিন্তু তাহার ছেলের বেশে, তাকে আদর করিয়া আগু বাড়াইয়া লইতে—এতই সুন্দর।

কি হাসি! কি মিষ্টি হাসি ওর মুখের!

পরদিন সকালে তেলিবাড়ীর বড়বৌ আসিল। দরজায় রাত্রে খিল দেওয়া হয় নাই। খোলাই আছে, বড়বৌ আপন মনে বলিল—রাত্রে দেখচি মা-ঠাকরোণের অসুখ বড্ড বেড়েচে, খিলটাও দিতে পারেন নি।

বিছানার ওপর সর্ব্বজায়া যেন ঘুমাইতেছে। তেলি-বৌ একবার ভাবিল ডাকিবে না—কিন্তু পথ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ডাকিয়া উঠাইতে গেল। সর্ব্বজয়া কোনো সাড়া দিল না, নড়িলও না। বড়বৌ আরও দু একবার ডাকাডাকি করিল, পরে হঠাৎ কি ভাবিয়া সে নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া দেখিল।

পরক্ষণেই সে সব বুঝিল।

(১৮)

সর্ব্বজয়ার মৃত্যুর পর কিছুকাল অপু এক অদ্ভুত মনোভাবের সহিত পরিচিত হইল। প্রথম অংশটা আনন্দ-মিশ্রিত—এমন কি মায়ের মৃত্যু-সংবাদ প্রথম যখন সে তেলিবাড়ীর তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস···একটা বাঁধন-ছেঁড়ার উল্লাস—অতি অল্পক্ষণের জন্য—নিজের অজ্ঞাতসারে। তাহার পরই নিজের মনোভাবে তাহার দুঃখ ও আতঙ্ক উপস্থিত হইল। এ কি! সে চায় কি! মা যে নিজেকে একেবারে বিলোপ করিয়া ফেলিয়াছিল তাহার সুবিধার জন্য! মা কি তাহার জীবনপথের বাধা? ···কেমন করিয়া সে এমন নিষ্ঠুর, এমন হৃদয়হীন···

তারপর আসিল একটা তীব্র ঔদাসীন্য সব বিষয়ে, সকল কাজে এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক নির্জ্জনতার ভাব। পরীক্ষা শেষ হইয়া গিয়াছিল, কলিকাতায় থাকিতে একদণ্ডও ইচ্ছা হয় না, অথচ যাইবার জায়গাও ত নাই! এবার সে একটা ছোট একতলা বাড়ীর নীচের কুঠুরিতে সারা বছরটা কাটাইয়াছিল, একটা ছোট গলির ভিতর বাড়ীটা। কুঠুরিতে তাহার সঙ্গে আর-একজন ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্র থাকে, ছাত্রটিরই একটা ইক্‌মিক্ কুকার আছে, দুজনে তাহাতে রাঁধিয়া খাইত। ইহার পর অপু আর কখনও ইক্‌মিক্ কুকারের রান্না খাইতে পারে নাই জীবনে কোনদিন—কুকারের গন্ধটার সঙ্গে এই দিনগুলির গভীর ঔদাসীন্য, শোক, নির্জ্জনতার ভাব এমন ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া গিয়াছিল।

ছোট ঘরটাতে গুমট গরম। চৈত্র বৈশাখ মাসের গরমে এতটুকু হাওয়া চলাচল করে না, কেবলই মনে হয় অনেক দিন আগে বর্দ্ধমানে লীলাদের বাড়ীর সেই আস্তাবলের পাশের ঘরটার কথা, সেই রকমই বিশ্রী, অপরিসর অন্ধকার। অমনি সঙ্গে সঙ্গে মনে আসে মায়ের কথা, সেখানে যে মা ছিল, দুঃখের সাথী হইয়া মা-ও যে বুঝিয়াছে, তাহাকে কি কিছু জানিতে দিত! ···মন আরও পাগল হইয়া ওঠে, কেমন যেন পালাই পালাই ভাব হয় সর্ব্বদা, অথচ পালাইবার স্থান নাই, মুখের দিকে চাহিবার কেহ নাই, আহা বলিবার কেহ নাই, জগতে সে একেবারে একাকী—সত্যসত্যই একাকী।

এই ভয়ানক নির্জ্জনতার ভাব এক এক সময় অপুর বুকে পাথরের মত চাপিয়া বসে, কিছুতেই সেটা সে কাটাইয়া উঠিতে পারে না, ঘরে থাকা তাহার পক্ষে তখন আর সম্ভব হয় না। গলিটার বাহিরে বড় রাস্তা, সাম্‌নে গোলদিঘী, বৈকালে গাড়ী, মোটর

লোকজন, ছেলেমেয়ে। বড় মোটর গাড়ীতে কোনো সম্ভ্রান্ত গৃহস্থের মেয়েরা বাড়ীর ছেলেমেয়েদের লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছে, অপুর মনে হয় কেমন সুখী পরিবার!···ভাই, বোন, মা, ঠাকুরমা, পিসিমা, রাঙা-দি, বড়-দা, ছোট কাকা। যাহাদের থাকে তাহাদের কি সব দিক দিয়াই এমন করিয়া ভগবান দিয়া দেন!

অন্যমনস্ক হইবার জন্য এক একদিন সে ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের লাইব্রেরীতে গিয়া বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উলটাইয়া থাকে। কোথায় খনিতে গ্যাস ফুটিয়াছে, কে একজন রেস খেলার বাজিতে দশ হাজার পাউণ্ড জিতিয়াছে··যুদ্ধের দায়ে বিলাতে বাড়ী বাড়ী পোড়ো জমিতে আলুর চাষ, মটরশুটির চাষ চলিতেছে, কিন্তু যেমন কাহারও মায়ের ছবি, কি মা ও ছেলের সংবাদ, কি মা-ছেলে পাশাপাশি ছবি বাহির হইয়া পড়ে, অমনি অপু বইখানা মুড়িয়া ফেলে, বুকের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে একটা দারুণ শূন্যতা, একটা অনির্ব্বচনীয় বেদনা··

বাহিরে আসিয়া ভাবে যাই বরং মাঠে একটু বেড়িয়ে আসি··কি হবে বসে বসে?

কোথাও বেশীক্ষণ বসিবার ইচ্ছা হয় না, শুধুই কেবল এখানে-ওখানে, ফুটপাথ হইতে বাসায়, বাসা হইতে ফুটপাথে। এক জায়গায় বসিলেই শুধু মায়ের কথা মনে আসে জোর করিয়া মনে আসে, বন্যার স্রোতের মত জোরে, কত সময়ের কত কথা, রাশি রাশি অসংখ্য। উঠিয়া ভাবে, গোলদিঘীতে আজ সাঁতারের ম্যাচের কি হ'ল দেখে আসি যাই বরং—কলিকাতায় থাকিতে ইচ্ছা করে না, মনে হয় বাহিরে কোথাও চলিয়া গেলে শান্তি পাওয়া যাইত··যে-কোনো জায়গায়, যে কোনো জায়গায়···মনসাপোতার বাড়ীতে চাবি দিয়া আসিয়াছে, আসিবার সময় সর্ব্বজয়ার জাঁতিখানা, নখ কাটিবার নরুণটা, একটা সিঁদুর কৌটা, যে পুরানো তালি দেওয়া লেপটা শীতকালে মা গায়ে দিত—সেগুলিকে সঙ্গে আনিয়াছে—মা বিনা সেখানকার ঘর শূন্য, ভোঁ ভোঁ করিতেছে—সেখানে সে আর ফিরিবে না কখনও।

পাহাড়ে, জঙ্গলে, হরিদ্বারে, কেদার-বদরীর পথে—মাঝে মাঝে ঝরণা, নির্জ্জন অধিত্যকায় কত ধরণের বিচিত্র বন্যপুষ্প, দেওদার ও পাইন বনের ঘন ছায়া, সাধু-সন্ন্যাসী, দেবমন্দির, রামচটি, শ্যামচটী, কত বর্ণনা ত সে বইয়ে পড়ে, একা বাহির হইয়া পড়া মন্দ কি? ···কি হইবে এখানে সহরের গিঞ্জি ও ধোঁয়ার বেড়াজালের মধ্যে?

কিন্তু পয়সা কৈ? তাও ত পয়সার দরকার। তেলিরা কুড়ি টাকা দিয়াছিল মাতৃ-শ্রাদ্ধের দরুণ, নিরুপমা নিজ হইতে পনেরো, বড়বৌ আলাদা দশ। অপু সে টাকার এক পয়সাও রাখে নাই, অনেক লোকজন খাওয়াইয়াছে। তবুও সামান্যভাবে তিল-কাঞ্চন শ্রাদ্ধ করিতে অপুর বুকের মধ্যে কেমন করিয়াছিল, কৃতী হইলে সে বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করিত।

দশপিণ্ড দানের দিন সে কি তীব্র বেদনা! পুরোহিত বলিতেছেন—প্রেতা শ্রীসর্ব্বজয়া দেবী·· অপু ভাবে কাহাকে প্রেত বলিতেছে? সর্ব্বজয়া দেবী প্রেত? তাহার মা, প্রীতি আনন্দ ও দুঃখ মুহূর্ত্তের সঙ্গিনী, এত আশাময়ী, হাস্যময়ী, এত জীবন্ত যে ছিল কিছুদিন আগেও, সে প্রেত? সে 'আকাশস্থ নিরালম্বো বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ?'

তারপরেই মধুর আশার বাণী—আকাশ মধুময় হউক, বাতাস মধুময় হউক, পথের ধূলি মধুময় হোক্, ওষধি সকল মধুময় হউক বনস্পতিগণ মধুময় হউক, সূর্য্য, চন্দ্র, অন্তরীক্ষস্থিত আমাদের পিতা মধুময় হউন।

সারাদিনব্যাপী উপবাস অবসাদ, শোকের পরে অপুর মনে সত্য সত্যই মধুবর্ষণ করিয়াছিল চোখের জল সে রাখিতে পারে নাই। হে আকাশের দেবতা, বাতাসের দেবতা, তাই করো, মা আমার অনেক কষ্ট ক'রে গিয়েচে, তার প্রাণে তোমাদের উদার আশীর্ব্বাদের অমৃতধারা বর্ষণ কর।

এই অবস্থায় শুধুই ইচ্ছা করে যারা আপনার লোক, যারা তাহাকে জানে ও মাকে জানিত, তাহাদের কাছে যাইতে। এক জেঠাইমারা আছেন—কিন্তু তাহাদের

সহানুভূতি নাই, তবু সেখানেই যাইতে ইচ্ছা করে। তবুও মনে হয় হয়ত জেঠাইমা মায়ের সম্বন্ধে দু পাঁচটা কথা বলিবেন এখন, দুটা সহানুভূতির কথা হয়ত বলিবেন ··

(১৯)

মাস-তিনেক এভাবে কাটিল। এ তিন মাসের কাহিনী তাহার জীবনের ইতিহাসে একটা একটানা নিরবচ্ছিন্ন দুঃখের কাহিনী। ভবিষ্যৎ জীবনে অপু এ গলিটার নিকট দিয়া যাইতে যাইতে নিজের অজ্ঞাতসারে একবার বড় রাস্তা হইতে গলির মোড়ে চাহিয়া দেখিত, আর কখনও সে ইহার মধ্যে ঢোকে নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে সে একদিন খবরের কাগজে দেখিল যুদ্ধের জন্য লোক লওয়া হইতেছে, পার্ক ষ্ট্রীটে তাহার আপিস। দুপুরে ঘুরিতে ঘুরিতে সে গেল পার্ক ষ্ট্রীটে। অনেক লোকের ভিড়, অপু একজন আধাবয়সী লোককে জিজ্ঞাসা করিল—রিক্রুটীং অফিসারের ঘর কোন্‌টা জানেন? লোকটা বলিল—সামনের ঘরে সাহেব আছে, যান্ না—

একজন খাকী পোষাক পরা ছোক্‌রা সাহেব চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিল। সে ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করিল—আমি যুদ্ধে যেতে চাই—

সাহেব মুখ না তুলিয়াই বলিল—ফর্ম্মে দরখাস্ত কর—

টেবিলে একরাশি ছাপানো ফর্ম্ম পড়িয়াছিল, অপু একখানা তুলিয়া পড়িয়া বলিল—কোথাকার জন্যে লোক নেওয়া হবে?

—মেসোপোটেমিয়া, রেলওয়ে ও ট্রান্সপোর্ট বিভাগের জন্য। তুমি কি টেলিগ্রাফ জানো—না মোটর-মিস্ত্রী?

অপু বলিল, সে কিছুই নহে। ও সব কাজ জানে না, তবে অন্য যে-কোন কাজ কি কেরাণীগিরি···সাহেব বলিল—না, দুঃখিত। আমরা শুধু কাজ-জানা লোক নিচ্ছি—বেশীর ভাগ মোটর ড্রাইভার, সিগ্‌ন্যালার, ষ্টেশন মাষ্টার এই সব।

এই অবস্থায় একদিন লীলার সঙ্গে দেখা। ইতস্ততঃ লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন ড্যাল্‌হাউসি স্কোয়ারের মোড়ে সে রাস্তা পার হইবার অপেক্ষা করিতেছে, সাম্‌নে একখানা হল্‌দে রঙের বড় মিনার্ভা গাড়ী ট্রাফিক পুলিসে দাঁড় করাইয়া রাখিয়াছিল—হঠাৎ গাড়ীখানার দিক হইতে তাহার নাম ধরিয়া কে ডাকিল।

সে গাড়ীর কাছে গিয়া দেখিল, লীলা আরও দুই তিনটি অপরিচিতা মেয়ে। লীলার ছোট ভাই ড্রাইভারের পাশে বসিল। লীলা আগ্রহের সুরে বলিল—আপনি আচ্ছা ত অপূর্ব্ববাবু? তিন চার মাসের মধ্যে আর দেখা করলেন না কেন বলুন ত? মা সেদিনও আপনার কথা—

অপুর আকৃতিতে একটা কিছু লক্ষ্য করিয়া সে বিস্ময়ের সুরে বলিল—আপনার কি হয়েচে? অসুখ থেকে উঠেচেন নাকি? শরীর—মাথার চুল অমন ছোট ছোট, কি হয়েচে বলুন ত?

অপু হাসিয়া বলিল—কই না কি হবে—কিছু ত হয় নি?

—মা কেমন আছেন?

—মা? তা মা—মা তো নেই?··· ফাগুন মাসে মারা গিয়েচে।

কথা শেষ করিয়া অপু আর একদফা পাগলের মত হাসিল।

হয়ত বাল্যের সে প্রীতি নানা ঘটনায়, বহু বৎসরের চাপে লীলার মনে নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল, হয়ত ঐশ্বর্য্যের আঁচ লাগিয়া সে মধুর বাল্যমন অন্যভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল ধীরে ধীরে, অপুর মুখের এই অর্থহীন হাসিটা যেন একখান তীক্ষ্ণ ছুরির মত গিয়া তাহার মনের কোন্ গোপন মণিমঞ্জুষার রুদ্ধ ঢাকনির ফাঁকটাতে হঠাৎ একটা সজোর চাড়া দিল, একমুহূর্ত্তে অপুর সমস্ত ছবিটা তাহার মনের চোখে ভাসিয়া উঠিল—সহায়হীন, মাতৃহীন, আশ্রয়-হীন, পথে পথে বেড়াইতেছে—কে মুখের দিকে চাহিবার আছে?

লীলার গলা আড়ষ্ট হইয়া গেল, একটু পরে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আপনি আমাদের ওখানে কবে আস্‌বেন বলুন—না, ওরকম বললে হবে না। একথা আমাদের জানানো আপনার উচিত ছিল না? অন্ততঃ মাকেও বলা ত—কাল সকালে আসুন···ঠিক বলুন আস্‌বেন?

কেমন ঠিক ত ?...সেবারকার মত করবেন না, কিন্তু—ভাল কথা, আপনার ঠিকানাটা বলুন ত কি ?... ভুলবেন না, কিন্তু—

গাড়ী চলিয়া গেল।

বাসায় ফিরিয়া অপু মনের মধ্যে অনেক তোলাপাড়া করিল। লীলার মুখে আজ সে একটা আন্তরিকতার ছাপ দেখিয়াছে, বর্ত্তমান অবস্থায় মন তাহার এই আন্তরিকতার স্নেহস্পর্শটুকুরই কাঙ্গাল বটে—কিন্তু এই বেশে কোথাও যাইতে ইচ্ছা হয় না, এই জামায় এই কাপড়ে, এ ভাবে। থাক্ বরং।

তিনদিন পরে তার নিজের নামের একখানা পত্র আসিতে দেখিয়া সে বিস্মিত হইল—মা ছাড়া আর ত কাহারও পত্র সে কখনও পায় নাই, কে পত্র দিল ?

পত্র খুলিয়া পাড়ল :—

অপূর্ব্ববাবু,

আপনার এখানে আসবার কথা ছিল সোমবারে, কিন্তু আজ শুক্রবার হয়ে গেল, আপনি এলেন না। আপনাকে মা একবার অবিশ্যি অবিশ্যি আস্‌তে বলেচেন, না এলে তিনি খুব দুঃখিত হবেন। আজ বিকেল পাচটার সময় আপনার আসা চাই-ই। নমস্কার নেবেন।

লীলা

কথাটা মনের মধ্যে সে অনেক তোলাপাড়া করিল। কি লাভ গিয়া ? ওরা বড়মানুষ, কোন্ বিষয়ে সে ওদের সঙ্গে সমান যে ওদের বাড়ী যখন-তখন যাওয়া ? মেজবৌরাণী যে তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, সেই কথাটা তাহার মনে অনেকবার যাওয়া-আসা করিল—সেইটা, আর লীলার আন্তরিকতা। কিন্তু মেজবৌরাণী কি আর তার মায়ের অভাব দূর করিতে পারিবেন ? তিনি বড়লোকের মেয়ে, বড়লোকের বধূ। তাহার মায়ের আসন হৃদয়ের যে স্থানটিতে, সে শুধু তাহার দুঃখিনী মা অর্জ্জন করিয়াছে তাহার বেদনা, ব্যর্থতা, দৈন্যদুঃখ, শত অপমান দ্বারা—ছয় সিলিণ্ডারের মিনার্ভা গাড়ীতে চড়িয়া কোনো ধনীবধূ—হউন্ তিনি স্নেহময়ী, হউন্ তিনি মহিমময়ী—তাঁহার সেখানে প্রবেশাধিকার নাই।

জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রথম বিভাগের প্রথম সতের জনের মধ্যে তাহার নাম বাংলাতে ইউনিভার্সিটিতে প্রথম হইয়াছে, এজন্য একটা সোনার মেডেল পাইবে। এমন কেহ লোক নাই যাহার কাছে খবরটা বলিয়া বাহাদুরী করা যাইতে পারে। কোনো পরিচিত বন্ধুবান্ধব এখানে নাই—ছুটিতে সব দেশে গিয়াছে। জেঠাইমার কাছে যাইবে ?...গিয়া জানাইবে জেঠাইমাকে ?...কি লাভ, হয়ত তিনি বিরক্ত হইবেন, দরকার নাই যাওয়ায়।

(ক্রমশঃ)

বিশ্ববধূ

শ্রীনীলিমা দাস

তুমি শুধু আছ বসি একান্তে আপন মনে বিশ্ব-অন্তঃপুরে
আপনার সৌন্দর্য্য-ঐশ্বর্য্য মাঝে মগ্নচিত্ত আপনি বিলীন !
ঘেরি তব চারিধার রূপ-রস-গন্ধ-ভরা বসন্ত নবীন
ঢালিছে সুরভি-ধার ; যেন কোন্ দূরশ্রুত বাঁশরীর সুরে
সমীরণ মৃদুবহ—চুম্বন-চঞ্চল ; ওই মধুর মধুরে
নিত্য শোভাময় হাসি হাসে বন-কুসুম-কলিকা ; নিশিদিন
গগন-অঙ্গনে জ্বলে দীপ্ত তারকার দীপ ; বিরাম-বিহীন
ধ্বনিছে জলদ-শঙ্খ,—ডাকি' যেন আনে কাছে সুদূর মৃত্যুরে !

যুগ যুগান্তর ধরি ধরণীর মুগ্ধমত্ত যত কবিকুল
হেরি সেই অপরূপ নীরব আরতি-লীলা রাতুল চরণে
আপনারে রিক্ত করি সর্ব্বস্ব সঁপিয়া দেয় সজল নয়নে।
অবশেষে চিত্ত করি মধুসিক্ত কহি ওঠে আনন্দে আকুল,—
"চিরপ্রিয়া ওগো বধূ ! এবার হেরিনু সব, আজি শেষক্ষণে
গুণ্ঠনের যবনিকা অপসারি দেখাও ও মু'খানি অতুল !"

আওরংজীবের ব্যক্তিত্ব

প্রবাসীর গত বৈশাখ সংখ্যায় মাননীয় শ্রীযুক্ত স্যর যদুনাথ সরকার, সি-আই-ই মহাশয় লিখিত "আওরংজীবের জীবন-নাট্য" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক উক্ত সম্রাটকে বহু গুণে ও বহু বিশেষণে বিভূষিত করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে আমার দুই একটি বক্তব্য লিখিতেছি।

সম্রাট আওরংজীবকে লেখক "একজন মহাপুরুষ, মহা সাধু ও সজ্জন" বলিয়াছেন। মাননীয় লেখক মহাশয় কোন্ ভাবে এবং কোন্ অর্থে এই তিনটি বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যে যে লক্ষণ এবং গুণ থাকিলে কোন ব্যক্তিকে "মহাপুরুষ" কিংবা "মহা সাধু" বলা যাইতে পারে উক্ত সম্রাটের তাহা ছিল কি না তাহা আমাদের বিদিত নহে। অবশ্য উক্ত সম্রাট একজন মিতাচারী, মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, সাহসী ও সমর-কৌশলাভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে; কিন্তু কেবল ঐ গুণগুলি ছিল বলিয়াই তাঁহাকে আমরা "মহাপুরুষ" বা "মহা সাধু ও সজ্জন" আখ্যা দিতে রাজি নহি। কারণ, তাঁহার দোষও যথেষ্ট ছিল। সম্রাটের অনুগৃহীত বা তাঁহার ধর্ম্ম ও মতাবলম্বী কোন কোন ঐতিহাসিক ঐরূপ আখ্যা দিয়া থাকিলেও, কোন পক্ষপাতশূন্য ঐতিহাসিক সম্রাটকে ঐরূপ গুণশালী বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ইতিপূর্ব্বে আমরা দেখি নাই। ইতিহাসে তাঁহার যে যে কার্য্যাবলী লিপিবদ্ধ আছে তাহাতে আমরা তাঁহাকে একটি নিষ্ঠুর, প্রতিহিংসাপরায়ণ, স্বার্থপর, ঘোর হিন্দুবিদ্বেষী, অনুদার-প্রকৃতিবিশিষ্ট গোঁড়া লোক বলিয়া দেখিতে পাই। তাঁহার নিজের সিংহাসন লাভের জন্য ও তাহা নিরাপদ করিবার জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি নিষ্ঠুর ও অসৎ কার্য্য করিতে হইয়াছিল। রাজনীতির দিক দিয়া তাহার কোন আবশ্যকতা থাকিলেও তাহা কোন মহাপুরুষের বা মহা সাধুর ও সজ্জনের করণীয় নহে। মুরাদকে প্রবঞ্চনা করিয়া যুদ্ধে নামাইয়া স্বার্থসিদ্ধির পর তাহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া হত্যা করা, যুবরাজ দারাকে ও তাঁহার পুত্রকে নৃশংসভাবে হত্যা করান, পিতা সম্রাট শাজাহানকে বন্দী করা প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা তিনি স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছিলেন। যশোবন্ত সিংহকে কৌশলে বিনাশ করিবার মানসে আফগানিস্থানে পাঠানো এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পরিবারবর্গকে লাঞ্ছনা করা, শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা ইত্যাদি কার্য্য উক্ত সম্রাটের প্রতিহিংসা-বৃত্তির পরিচায়ক। তিনি যে রাজনীতিতে পটু ছিলেন তাহাও আমরা স্বীকার করি না। কারণ, "বৃক্ষ ফলেন পরিচীয়তে"। তিনি যে রাজনীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার জীবদ্দশাতেই অত বড় মুঘল-সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা "কঠোর অদৃষ্টের হাতে পুরুষকারের পরাজয় নহে।" ইহা তাঁহার কৃতকার্য্যের অবশ্যম্ভাবী ফল। একটা সংখ্যায় গরিষ্ঠ, সুসভ্য এবং অভিমানী (sensitive) জাতির উপর শুধু দমননীতি চালাইয়া তাহাকে বশে রাখিবার বা ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিলে তাহা যে কখনও ফলবতী হইতে পারে না, আওরংজীবের রাজত্ব তাহাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করিতেছে। তাঁহার ধর্ম্মের গোঁড়ামির জন্য মুঘল-সাম্রাজ্যের পুরাতন বন্ধু বহু হিন্দু রাজাকে তিনি শত্রুতে পরিণত করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার অনুষ্ঠিত আর্থিক ও রাজনৈতিক অত্যাচারে ও তাহাদের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপের ফলে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুজাতির উপর জিজিয়া কর স্থাপন এবং বারাণসী, মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানের প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন তাঁহার দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান হইতে হিন্দুধর্ম্ম লোপ করা তাঁহার জীবনের একটা মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিতে পারে এবং উহা তাঁহার ধর্ম্মানুমোদিতও হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখনই মহাপুরুষের বা মহাসাধুর করণীয় নহে। মাননীয় লেখকের মতে উক্ত সম্রাটের জীবন "ট্র্যাজেডীর" একটি সম্পূর্ণ দৃষ্টান্ত। আমরা বলি, ঐ ট্র্যাজেডীর কারণ তাঁহার বুদ্ধির দোষ এবং অদূরদর্শিতা। তিনি যদি প্রকৃত রাজনীতি-বিশারদ হইতেন তাহা হইলে হয়ত আজ ভারতবর্ষের ইতিহাস অন্য প্রকার হইত।

শ্রীনীরদকুমার বক্সী

—

মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সহযোগিতা

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে জনৈকা হিন্দু মহিলা লিখিত "ঢাকা ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহে দাঙ্গা" শীর্ষক লিপির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় "কোন কোন স্থলে মুসলমান গুণ্ডাগণ উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বিরুদ্ধে নমঃশূদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর হিন্দুদের প্ররোচিত করিয়াছিল, কিন্তু সৌভাগ্য-বশতঃ সফল হয় নাই"—সংবাদটি একেবারে নির্ভুল নহে। ঈষ্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ের দোলাইগঞ্জ ষ্টেশন হইতে দুই মাইল পূর্ব্বে নাতুয়াইল নামক গ্রামে যে বীভৎস লুট ও গৃহদাহ হইয়াছে তাহা মুসলমান ও নমঃশূদ্রের সমবায়ে। এই গ্রামে নমঃশূদ্রগণ সংখ্যায় প্রায় মুসলমানদের সমকক্ষ। এই সময়ে নমঃশূদ্রগণ এতদূর ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে, উহারা 'ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ' আর একটিও রাখিবে না বলিয়া বদ্ধপরিকর হইয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ দেখিলেই আক্রমণ করিত।

শ্রীসন্তোষকুমার রায়

—

"ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব"

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে 'ঢাকায় ও নিকটস্থ গ্রামে উপদ্রব' সম্বন্ধে জনৈক হিন্দু মহিলার চিঠি পড়িলাম। যে-সমস্ত ভয়াবহ ও অমানুষিক কাণ্ড সেই অঞ্চলে হইয়াছে, তাহাতে কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেরই লজ্জায় ও ঘৃণায় মাথা হেঁট করা উচিত। এই দুই জাতি যুগে যুগে এই দেশে পাশাপাশি বাস করিয়া আসিতেছে এবং করিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই রকম অমানুষিক সাম্প্রদায়িক বিবাদ এ দেশের ইতিহাসে বিরল।

চিঠিতে বর্ণিত ঘটনাবলীর কোন প্রতিবাদ করা আমার উদ্দেশ্য নহে, তবে ইহাতে মুসলমানদিগকে কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন করা হইয়াছে। আমি সেগুলি উল্লেখ করিয়া যতদূর পারি উত্তর দিবার চেষ্টা করিব।

১। "যখন ভাবি অনেক মুসলমান আজ তাদের ঘরের মেয়েদেরও লুণ্ঠনকার্য্যে সঙ্গে আনিতে কুণ্ঠিত হয় নাই, তখন তাহাদের নৈতিক

অধঃপতন যে কতদূর গড়াইয়াছে, ভাবিলে অন্তর অবসন্ন হয়। মুসলমান মৌলবীগণ তো অনেক রকম ফতোয়া জারি করেন—এ সম্বন্ধে তাঁরা কি ফতোয়া দিতে চাহেন ?"

২। "মুসলমান ধর্ম্মে কি বিশ্বজনীন সত্য বলিয়া কিছু নাই? পরস্ব লুণ্ঠন কি তাঁদের ধর্ম্মে অধর্ম্ম নয়? মুসলমানকে লুণ্ঠন করিলে পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করিলে পাপ নয়, তাদের ধর্ম্মে কি এই বলে ?"

১। 'নৈতিক অধঃপতন' বলিতে গেলে সমগ্র ভারতবাসীরই হইয়াছে। ইহার মাত্রা কোথায় বেশী, কোথায় কম, ইহা সমক্যরূপে বিচার করা অসম্ভব। যেখানে দুই দলে মারামারি কাটাকাটি হয়, সেখানে নৈতিকতার কথা কাহারও মনে না থাকাই সম্ভব। শিক্ষিত ও সভ্যভব্যদের কলহ-সম্পর্কেও এই কথা বলা যাইতে পারে। সুরাট কংগ্রেসে কোন সাম্প্রদায়িক বিবাদের কথা ছিল না; আর সেখানে উপস্থিত সকলেই সভ্যভব্যই ছিলেন; তবুও সেখানে মাথা কাটাকাটি হইয়াছিল। * লুণ্ঠনকার্য্য মারামারিরই একটা পরিণতি, বিশেষতঃ অশিক্ষিত বর্ব্বরদের মধ্যে। যে-সমস্ত মুসলমান নরনারীর লুণ্ঠনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই অতি নিম্নস্তরের। মানুষের ভিতরকার পশু যখন ক্ষেপিয়া উঠে, তখন যে হিন্দু হিন্দুত্ব, মুসলমান মুসলমানত্ব ভুলিয়া যাইবে ইহাতে বিচিত্র কি? বলে ও দলে প্রবল ও পুষ্ট থাকিলে সমান অবস্থার হিন্দু নরনারীরাও ঐ রকম লুণ্ঠন করিত, ইহা ভাবা বোধ হয় অন্যায় হইবে না। † কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমের আরা প্রভৃতি জেলায় আমাদের বক্‌রীদ পর্ব্বোপলক্ষে গো কোরবাণীর জন্য সেখানকার মুসলমানদের উপর সংখ্যাধিক হিন্দুরা যে অমানুষিক অত্যাচার, হত্যা, ও লুটতরাজ করিয়াছিল, তাহা ভাবিলেও গা শিহরিয়া উঠে। * মুসলমান মৌলবীগণের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। এ রকম স্থলে মৌলবী ও তার ফতোয়া, ব্রাহ্মণ ও তার শাস্ত্র † একেবারেই নিষ্ফল। বিশেষতঃ বাংলাদেশে খাঁটি মৌলবীর চেয়ে নকল মৌলবীই এত বেশী যে, তাদের ফতোয়ার কথা না বলাই ভাল।

লেখিকা মহোদয়ার দ্বিতীয় প্রশ্ন গুরুতর। প্রশ্নে তাঁর শিক্ষা ও জ্ঞানের চেয়ে ভাব-প্রবণতারই বেশী পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। নতুবা তিনি নিশ্চয় জানেন, বা তাঁহার নিশ্চয়ই জানা উচিত, যে, 'বিশ্বজনীন সত্য' সব ধর্ম্মেই বিরাজিত। পরন্তু লুণ্ঠন আমাদের ধর্ম্মানুমোদিত ত নহেই, বরং ইহা সর্ব্বতোভাবে মহাপাপ। 'মুসলমানকে লুণ্ঠন করা পাপ, অন্যকে লুণ্ঠন করা পাপ নয়', ইহা বাজে কথা—লুণ্ঠন কার্য্যটাই পাপ।‡

গোলাম মোর্ত্তাজা

* এস্থলে সুরাটে রাজনৈতিক দলাদলি-প্রসূত কলহের সহিত গ্রামলুণ্ঠনের সাদৃশ্য অনুমান, মস্তিষ্কের বিশেষ অবস্থা প্রসূত বলিয়া মনে হয়। —প্রবাসীর সম্পাদক

† লেখক আবালবৃদ্ধবনিতা মুসলমানদের দ্বারা গ্রামলুণ্ঠনের মধ্যে বলের পরিচয় পাইয়া আত্মপ্রসাদ অনুভব করিয়া থাকিবেন। ব্যাঘ্রাদি জীবের বলশালিতাও অবশ্যস্বীকার্য্য। —প্রবাসীর সম্পাদক

* ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশে, জেলায়, নগরে ও গ্রামে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু সংখ্যায় বেশী। সংখ্যায় বেশী হিন্দুরা কোথায়ও সংখ্যায় কম মুসলমানদের চেয়ে অধিক বলশালী কি না, জানি না। কিন্তু ইহা একটি ঐতিহাসিক সত্য, যে, শান্তির সময়ে লুণ্ঠনাদি কাজ মুসলমানদের দ্বারা বেশী হইয়াছে। মুসলমান লেখকেরা আরার ঘটনাটার উল্লেখ করিয়া হিন্দুদিগকে সমান দোষী প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু এরূপ ঘটনা আর কয়টি ঘটিয়াছে? ঢাকার নিকটস্থ গ্রামগুলিতে হিন্দুরা কি দোষ করিয়াছিল? —প্রবাসীর সম্পাদক

† ব্রাহ্মণেরা মুসলমানদের গ্রামলুণ্ঠনের ফতোয়া কখনও দিয়াছিল, এরূপ সত্য কথা দূরে থাক্, এরূপ অপবাদও আগে শুনি নাই। —প্রবাসীর সম্পাদক

‡ লেখক এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিয়াছেন, অতঃপর তাহার দ্বিগুণ অন্য কথা লিখিয়াছেন। তাহা অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া ছাপিলাম না। মুসলমানদের সম্বন্ধে হিন্দুদের অনেক ধারণা ও ব্যবহার ন্যায়সঙ্গত না হইতে পারে; তেমনই হিন্দুদের সম্বন্ধে মুসলমানদের ধারণা ও ব্যবহারে দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু তৎসমুদয়ের আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। —প্রবাসীর সম্পাদক

পুস্তক-পরিচয়

আমার জীবনী—প্রণেতা শ্রীযুক্ত ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পুস্তকে সত্যের অপলাপ বা অতিরঞ্জন নাই,—জীবনের ঘটনাবলী নির্ভীকভাবে বিবৃত হইয়াছে।

এদেশের হীনাবস্থ ভদ্রলোকের ছেলেরা যাহারা মনীষা-সম্পন্ন, তাহারা কত প্রকার কষ্টের মধ্যে থাকিয়া মানুষ হয়, তাহা এই পুস্তকে বেশ অঙ্কিত হইয়াছে। এদেশের অনেক ছাত্রকে তদপেক্ষাও অনেক বেশী কষ্টভোগ করিতে হয়। পূর্ব্বে বাঙ্গালার অনেক ছাত্রেরই ভাগ্য প্রায় এইরূপ ছিল।

এই জীবনীতে শিখিবার কথা অনেক আছে। যাঁহাদের ভাগ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান দর্শন ঘটে নাই, তাঁহারা অতি সংক্ষেপে অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত ঐ সকল স্থানের সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আমি নিজেও অনেকগুলি দ্রষ্টব্য অথচ অদৃষ্টপূর্ব্ব স্থান সম্বন্ধে অনেক কথা এই পুস্তক হইতে শিখিলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং, জরিপ, চামড়া-পাকান, এলুমিনিয়ামের দ্রব্য প্রস্তুত, চা-প্রস্তুতের প্রণালী প্রভৃতি অনেক অজানা শিল্প সম্বন্ধেও অনেক তথ্য এই পুস্তকে আছে। সেগুলি এরূপভাবে লিখিত যে, সাধারণ পাঠকেরও অরুচিকর নহে; বরং সুখপাঠ্য ও আগ্রহের উৎপাদক।

অদম্য উৎসাহ বলে মানুষে কত কঠিন কাজ করিতে পারে, এই জীবনীতে তাহার নিদর্শন অনেক আছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা যতই প্রতিকূল হউক না কেন, ভোলানাথ দমিবার লোক নহেন; তাহাতেই তাঁহার জয়লাভ হইয়াছে।

তাঁহার চরিত্রের অন্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে তাঁহার তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রধান। অন্য দেশে এই গুণগুলি লোককে অতি উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। কিন্তু এই পরাধীন দেশে এই শ্রেষ্ঠ গুণ দুটি ভোলানাথের অনেক লাঞ্ছনার কারণ হইয়াছিল।

বইখানি আগাগোড়া পড়িলে লেখকের আরও কতকগুলি চারিত্রিক

বৈশিষ্ট্য মনে স্পষ্ট অঙ্কিত হয়। সেগুলি—তাঁহার আত্মনির্ভরশীলতা, আর সর্ব্বোপরি ঐশী শক্তিতে পূর্ণবিশ্বাস।

লেখক বস্তুতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক হইলেও তাঁহার ভাষা ও লিখন-ভঙ্গী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের স্থায়। মোটের উপর বইখানি সুলিখিত উপন্যাসের ন্যায় আকর্ষক।

শ্রীনকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ

গীতায় স্বরাজ্য (১ম খণ্ড)—শ্রীত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র পাকড়াশী; ঢাকা। মূল্য এক টাকা। পৃঃ ১২০।

গীতার বহুপ্রকারের টীকা হইয়াছে। বিভিন্ন টীকাকার বিভিন্ন দৃষ্টি লইয়া স্বীয় মতের অনুকূলভাবে গীতার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। একই গ্রন্থের এত ভিন্ন অর্থের মধ্যে সবগুলিই সঙ্গত হইতে পারে না; কোন কোনটাতে টীকাকারের মত প্রতিপাদনের জন্য গীতাকে বাহন-রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে মাত্র।

বর্ত্তমান গ্রন্থের একটি বিশেষত্ব আছে। সত্বর স্বাধীনতা লাভ-চেষ্টার প্রথম যুগে যাঁহারা স্বরাজ্যসাধনার জন্য বহু দুঃখকষ্ট, নির্ব্বাসন নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন, গ্রন্থকার তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম এবং নেতৃস্থানীয়। গীতাই সে যুগে তাঁহাদের সাধনার আদিগ্রন্থ ছিল এবং তাহারই মধ্যে তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা খুঁজিয়া পাইয়াছিলেন। গীতার যে অর্থ তাঁহারা সেদিন করিয়াছিলেন, সেই অর্থের অনুযায়ী আদর্শই তাঁহারা সাধনা করিয়াছিলেন এবং তাহাকেই কার্য্যে পরিণত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এইখানেই এই ব্যাখ্যার বিশেষত্ব এবং এইজন্যই ইহা সকলের প্রণিধানযোগ্য। বর্ত্তমান খণ্ডে মাত্র প্রথম চারিটি অধ্যায়ের ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। আমরা সাগ্রহে বাকি খণ্ডগুলির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিব।

গ্রন্থের রচনা সুখপাঠ্য, ছাপাও ভাল, তবে মাঝে মাঝে বর্ণাশুদ্ধি আছে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

স্বদেশ-মঙ্গল—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এবং ২১, রাজাবাগান জংশন রোড, কলিকাতা, এরিয়ান লাইব্রেরী হইতে শ্রীবিজয়েন্দ্রকৃষ্ণ শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

বঙ্গসাহিত্যে স্বদেশ-প্রীতির যে ধারা বহিয়া আসিতেছে, বইখানি তাহারই ইতিহাস। দেশপ্রেম জাতির জীবনে দুই ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, এক জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং আন্দোলনের ভিতর দিয়া, আর এক সাহিত্যের ভিতর দিয়া। মূল এক হইলেও বিষয় হিসাবে এ দুটি জিনিষ বিভিন্ন। লেখক দেখাইয়াছেন, ডিরোজিও এবং তৎশিষ্য রামগোপাল ঘোষ আধুনিক স্বাদেশিকতার প্রবর্ত্তক। "প্রতীচীর অনেক কু-সামগ্রীর সঙ্গে দুই একটা ভাল জিনিসও এ দেশে আসিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ 'পেট্রিয়টিজম' এর নাম করিতে পারি।" লেখক দুটি বিষয়কে একত্রে না মিশাইয়া ফেলাতে বইখানি সহজ ও সরস এবং রচনা সুখপাঠ্য হইয়াছে। রামায়ণে ও বিষ্ণুপুরাণে কি ভাবে দেশ-প্রীতি প্রকাশ পাইয়াছে, উপক্রমণিকায় তাহা আলোচনা করিয়া পরবর্ত্তী অধ্যায়ে লেখক বঙ্গসাহিত্যে স্বাদেশিকতার সূচনা দেখাইয়াছেন। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া দেশবন্ধু পর্য্যন্ত যে ধারা ক্রমোচ্ছ্বসিত-ভাবে প্রবাহিত হইয়াছে, আজিকার জাতীয় আত্মবোধের দিনে সে বিবরণ বড়ই চিত্তাকর্ষক বলিয়া মনে হইল। দেশভক্তির প্রথম উচ্ছ্বাস, বঙ্কিম-যুগ, নাট্যসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম, পূর্ব্ববঙ্গে দেশাত্মবোধের গান, কংগ্রেস যুগ, স্বদেশী যুগ প্রভৃতি অধ্যায়ে লেখক বইখানিকে ভাগ করিয়াছেন। সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির এই সুনিবদ্ধ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রন্থকারের গবেষণার ফল। লেখকের পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বইখানিতে অনেক জানা লেখকের লেখার অজানা উদ্ধৃতাংশ পাঠ করিয়া এবং অজ্ঞাতপ্রায় লেখকের পরিচয় পাইয়া পাঠক খুসী হইবেন।

পরিণয়—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত এবং ৪১।১।১সি মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, গুরুচরণ পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

উপন্যাস। কলিকাতায় বাধা-বিঘ্নের ভিতর দিয়া পূর্ব্ববঙ্গবাসী নায়কের বিদ্যা ও বধূ লাভ, ইহাই গল্পের বিষয়। নায়ক বেচারা অত্যন্ত ভালমানুষ। এই সব মামুলি উপন্যাসে কোনরূপ ক্ষমতার আশা করা অন্যায়।

ভূদেব-নির্ব্বাণ—বিদ্যাদিত্য শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী প্রণীত এবং মেদিনীপুর হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনা।

কাব্য। স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পারলৌকিক লীলা অবলম্বনে লিখিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইহা চলিতে পারিত, আজিকার দিনে এ কাব্য অচল।

বিরহ-শতক—শ্রীমতিলাল দাশ, এম-এ, বি-এল প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স হইতে শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

কবিতার বই। অনেক সময় ছন্দ ভঙ্গ হইলেও, দু'এক জায়গায় কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

কলরব—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রণীত এবং ১৩ নিমতলা লেন, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কবিতার বই। 'জনম'-এর সঙ্গে 'নিমকহারাম', 'ছাড়ব'র সঙ্গে 'কলরব', 'এলে না'র সঙ্গে 'লাগে না', 'হানিলে'র সঙ্গে 'সাজালে' প্রভৃতির মিল পত্রে পত্রে পাওয়া যাইবে। ভক্তি না থাকিলে 'প্রভু' বলিয়া কবিতা লেখার মত অসহ্য কৃত্রিমতা আর কিছু নাই।

পথের গান—মহীউদ্দীন প্রণীত এবং ১৫ নয়ানচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। 'আমি অগ্নি', 'আমি ঝঞ্ঝা', 'আমি সর্ব্বনাশা', 'ধ্বংস', 'প্রলয়' 'খুন' প্রভৃতি থাকিলেও কয়েকটি কবিতার মধ্যে কাব্যের গতি ও বেগ আছে। লেখক নিজের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া লিখিতে পারিলে ভাল হইত।

শতদল—শ্রীভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন প্রণীত এবং ৭৫ বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে বি-সি-শেঠ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

গীতিকাব্য। ভাবে নূতনত্ব না থাকিলেও কয়েকটি ছোট কবিতা ভাল লাগিল। 'পাপরাশি', 'ব্রহ্মচর্য্য' প্রভৃতি গীতিকবিতায় যত না থাকে ততই ভাল।

মহুয়া—মহাম্মদ গোলাম জিলানি প্রণীত এবং যশোহর, পোঃ সুখপুরিয়া, কমলাপুর হইতে গোলাম রছুল কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা ছয় আনা।

কবিতার বই। গীতিকাব্যের সুর অনেকগুলি কবিতার মধ্যে আছে।

> পরাণে লুকানো গভীর বেদনা, নয়নে বরষা ছল ছল।
> জানি না কেমনে ভাসাব তরণী, অসীম সাগর টলমল।

—উপভোগ্য।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩১)

আজ জাহাজ রেঙ্গুন পৌঁছিবার দিন। সকাল হইতেই যাত্রীদের মধ্যে জিনিষপত্র গুছাইয়া পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধিবার বড় ধুম লাগিয়া গিয়াছে। ডাঙার জীবের প্রাণ কয়েকদিন জলের উপর থাকিয়াই একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, আজ আবার ডাঙায় নামিবার সম্ভাবনায় সকলেই উৎফুল্ল। যাহারা এই তিন দিন খালি মুড়ি দিয়া শুইয়া থাকিয়াই কাটাইয়া দিয়াছে, তাহারাও আজ উঠিয়া বসিয়াছে, সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতেছে। যাহারা নূতন ব্রহ্মদেশ যাইতেছে তাহারা পুরানো বাসিন্দার কাছে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মগের মুল্লুকের গল্প শুনিতেছে। পুরাতন প্রবাসীও নিজের বহুদিন-সঞ্চিত অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়া বেশ একটা আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে।

জলের রং ফিকা সবুজ হইয়া আসিয়াছে, দিক্‌চক্রবালের কাছে তটভূমির অস্পষ্ট রেখা দেখা যায়। যাত্রীদের মধ্যে মহিলা যাঁহারা, তাঁহারা এরই মধ্যে সব কাজকর্ম্ম সারিয়া নামিবার জন্য ফিটফাট হইয়া বসিতে পারিলে বাঁচেন। ছেলেমেয়েদের সাজসজ্জা এরই মধ্যে একরকম সারা হইয়া গিয়াছে। কর্ত্তাদের কোনোই তাড়া দেখা যায় না, কেহবা নিশ্চিন্ত মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, কেহ চুরুট ফুঁকিতেছেন, এমন কি এক আধজন তাস খেলিবার জোগাড় পর্য্যন্ত করিতেছেন। গিন্নিদের তাড়া আসিলে বলিতেছেন, "রোস রোস, এখনও কম করে চার ঘণ্টা দেরি আছে। তার ভিতর পঞ্চাশবার কাপড় ছাড়া হয়ে যাবে। এখনই কি জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে যেতে চাও?"

মায়ার কেবিনেও গোছান চলিতেছিল। একলা মানুষ, কাজ বেশী নাই, কিন্তু তাও যেন অগ্রসর হইতে চাহিতেছিল না। মায়ার মুখ বড় গম্ভীর, কি যেন একটা ভাবনা তাহার মনে গভীর ছায়াপাত করিয়াছে, কিছুতেই ক্ষণমাত্রও সেটার হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। অন্যমনস্কভাবে সে কাপড়-চোপড় পাট করিয়া স্যুটকেসে ভরিয়া রাখিতেছিল।

হঠাৎ কেবিনের দরজায় ঠক্‌ঠক্‌ করিয়া শব্দ হইল। মায়ার মুখে একটুখানি হাসি দেখা দিল। সে উঠিয়া আসিয়া দরজা খুলিয়া বলিল, "এখনও আমার ঢের কাজ বাকি, প্রায় ঘণ্টাখানেক লাগবে।"

আগন্তুক যে দেবকুমার তাহা বলাই বাহুল্য। সে বলিল, "যেমন-তেমন করে ঠেসে রেখে দিন না? এর পর ত খুলে আবার গুছিয়ে রাখতেই হবে।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "কিন্তু জিনিষগুলোর চিরদিনের মত শ্রাদ্ধপিণ্ডি হয়ে যাবে যে! আপনারও বোধ হয় এখনও গোছান হয়নি? আপনার হ'তে হ'তে আমারও হয়ে যাবে।"

দেবকুমার ক্ষীণ হাস্য করিয়া বলিল, "আমার আবার গোছান? পুরুষমানুষকে ভগবান গোছান জিনিষ অগোছাল করবার জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। দেখেন না যে পরিবারে গৃহিণী খুব গোছাল হয়, কর্ত্তা হয় ঠিক তার উল্টো। মেয়ে অগোছাল যেমন দেখতে বিশ্রী লাগে, গোছাল পুরুষমানুষ দেখলে তেমনি হাস্যকর লাগে।"

মায়া বলিল, "মন্দ নয়। নিজেদের দোষগুলোকেও গুণ বলে খাড়া করে দিচ্ছেন? ভগবান আপনাদের নিশ্চয় ওরকম করে সৃষ্টি করেন নি, বাড়ীর আত্মীয়স্বজনে আদর দিয়ে দিয়ে ওরকম করে তুলেছে। বিশেষ করে মা-মাসীর দল। আমাদের দেশের মেয়েদের ধারণা যে, ছেলেদের দিয়ে কোনো রকম কাজ করান ভয়ানক অশোভন ব্যাপার। তারা শুধু স্কুলে গিয়ে পড়বে, এবং বাড়ী এসে আবদার করবে এবং সর্দ্দারী করবে। তাই সব এ রকম ছেলে তৈরি হয়।"

দেবকুমার বলিল, "শুধু এদেশের মা-মাসী নয়, জগৎসুদ্ধ মা-মাসীই তাহলে এই রকম বল্‌তে হয়। আমাদের দেশের ছেলেদের চেয়ে ইউরোপের ছেলেদের 'মেনট্যালিটি'র খুব যে তফাৎ আছে, তা ত মনে হয় নি।"

মায়া জিজ্ঞাসা করিল, "তারাও ঠিক আপনার মত অগোছাল বুঝি ?"

দেবকুমার বলিল, "আমি ত তাদের কাছে সোনার চাঁদ। বাঙালীর ছেলে বড়জোর জিনিষপত্র কাপড়-চোপড়ই লণ্ডভণ্ড করে রাখে, তারা নিজেদের এবং পরের জীবনসুদ্ধ লণ্ডভণ্ড করে দেয়। গোছান সংসারের দোহাই একেবারেই মানে না।"

মায়া কি যেন বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। আধ মিনিট খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার কাজটা সেরে নিই আগে।"

দেবকুমার বলিল, "সেই ভাল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করার চেয়ে বসে বসে গল্প করতে ভালও ঢের লাগে, এবং ডেকের উপর বসে গল্প করাটা স্বাভাবিক বলেই সহযাত্রীরা বেশী হাঁ করে চেয়ে থাকে না। অবশ্য আমরা খুব বেশী 'কনসিডারেশন্' তাদের কাছে পাব না।"

মায়া হঠাৎ লাল হইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

দেবকুমার বলিল, "আমরা, আমরা বলেই। দেখবার জিনিষ যদি লোকে আগ্রহ করে দেখে, তাকে দোষ দিতে পারি না।"

মায়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "আপনার আর যে দোষই থাক, বিনয়ের আতিশয্য নেই, তা পরম শত্রুতেও স্বীকার করবে।"

দেবকুমার বলিল, "কি আশ্চর্য্য! বিনয় মানুষ নিজের হয়েই করে থাকে, আমি অন্যের জন্যে করতে যাব কেন ? বিশেষ করে যে-ক্ষেত্রে সেটা এমনই অনর্থক হবে, যে, তাকে অভদ্রতাও বলা চলবে।"

মায়া বলিল, "বাপ্‌রে বাপ, এতও বাজে বকতে পারেন আপনি! আপনার সঙ্গে কথায় কেউ কখনও পারবে না। আমি কাজগুলো সেরে নিই। আপনার কিছু করবার না থাকে, ততক্ষণ ম্যাগাজিন পড়ুন গিয়ে।"

দেবকুমার বলিল, "অগত্যা। কিন্তু খুব বেশী দেরী করবেন না।"

সে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন চলিয়া গেল। উল্টো দিকের কেবিনের খোলা দরজার ফাঁকে একটি গুজরাটি মেয়ে অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে এই দুটি গল্প-নিরত মানুষকে দেখিতেছিল। দেবকুমার চলিয়া যাইতেই সেও সরিয়া গেল। ব্যাপারটা মায়ার চোখ এড়ায় নাই। এতক্ষণ গল্প করিয়া তাহার মনের কালিমা কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই কাটিয়া গিয়াছিল, আবার সেটা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

এই তিন দিনের মধ্যে মায়া নিজের মনের একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতেছিল। জীবনে এত আনন্দ ও এতখানি বেদনা একসঙ্গে সে কখনও অনুভব করে নাই। অথচ কিই বা ঘটিয়াছে ? একটি মানুষের সহিত তাহার নূতন পরিচয় ঘটিয়াছে, এই ত ব্যাপার। সে মানুষটি দেখিতে সুন্দর, তাহার কথা কানে শুনিতে সুন্দর, তাহার চিন্তাও মনে আনন্দ আনিয়া দেয়। কিন্তু ইহাতেই কি শুধু মায়ার মনে এমন সুখের হিল্লোল জাগিয়া উঠিয়াছে ? সুন্দর মানুষ কি আর জগতে নাই ? সুন্দর করিয়া আর কেহ কি কথা বলিতে পারে না ? দেবকুমারের বিশেষত্ব কোন্‌খানে ?

মায়া বুঝিতে পারে না। ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়াই তাহার চিন্তা বাড়িয়া ওঠে। কেন সে এমন করিয়া এই যুবকের ইন্দ্রজালে ধরা দিতেছে ? তিনচার দিনের মাত্র পরিচয়। ইহারই মধ্যে তাহার পদধ্বনি মায়ার বুকে পুলকের শিহরণ আনয়ন করে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনায় দিনের আলো উজ্জলতর হইয়া উঠে, জগতের শোভা-সৌন্দর্য্য সহস্র গুণ বাড়িয়া উঠে। সকাল হইবামাত্র সে কান পাতিয়া থাকে, কখন দ্বারের কাছে তাহার পদধ্বনি শোনা যাইবে, রাত্রি হইলে সারাদিনের মধ্যে কতবার দেবকুমারের সহিত দেখা হইয়াছে। কখন্ সে মায়াকে কি বলিয়াছে,

তাহার কোন্ কথার লুকান কি অর্থ আছে, ইহাই ভাবিতে ভাবিতে মায়া ঘুমাইয়া পড়ে।

প্রেমের সিংহদ্বারে এই তাহার প্রথম আগমন, ভয় এবং আনন্দ মিশিয়া এক আশ্চর্য্য অনুভূতিতে তাহার বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিতে থাকে। এতদিন সে কেবল ইহার নামই শুনিয়াছে উপন্যাসে, কাব্যে; বন্ধুবান্ধবকে ইহা লইয়া ঠাট্টা করিয়াছে, চলচ্চিত্রে ইহার বিকাশ দেখিয়া হাসিয়াছে বা গোপনে চোখ মুছিয়াছে। কিন্তু নিজের জীবনে প্রেমের ছোঁয়াচ তাহার কখনও লাগে নাই। মাতা বাঁচিয়া থাকিতে এসব কথা চিন্তা করাই ত তাহার পাপ বলিয়া মনে হইত। যদিই-বা কৈশোরের নিয়মে কখনও প্রভাস সম্বন্ধে তাহার কল্পলোকে কোনো রঙ্গীন চিত্র সে আঁকিতে বসিত, অল্পক্ষণের মধ্যে নিজের কাছেই নিজে অপরাধী হইয়া থামিয়া যাইত। ছি ছি, হিন্দুর মেয়ের এ সকল কথা ভাবিতেও নাই।

রেঙ্গুনে আসার পর তাহার অবশ্য মতের পরিবর্ত্তন অনেক দিক দিয়াই ঘটিতেছিল। কিন্তু বিবাহের পূর্ব্বে ভালবাসা উচিত, কি অনুচিত, সে বিষয়ে মায়া এখনও কিছু ভাবিয়া স্থির করিতে পারে নাই। রেঙ্গুনে আসিবার সময় মনে মনে অনেক সঙ্কল্প লইয়াই সে আসিয়াছিল। পিতা তাহাকে যতই পাশ্চাত্য শিক্ষা দিন, সে নিজে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিয়াছে, তাহা কখনও ভুলিবে না। সে নিরঞ্জনের মেয়ে যেমন, সাবিত্রীর তেমনই। একের খাতিরে অন্য জনের সকল শিক্ষা-দীক্ষা কখনই বিসর্জ্জন দিবে না, বিশেষ করিয়া মাতার শিক্ষাকেই যখন সে সত্য বলিয়া মনে করে।

আহার সম্বন্ধে এতদিন পর্য্যন্ত সে খুব আচারবিচার রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। পূজাপার্ব্বণ প্রভৃতিতেও শ্রদ্ধা-সহকারে যোগ দিয়াছে, যদিও অন্য সকল দিকে সাহেবী-আনার অন্ত তাহার ছিল না। পূজা ইত্যাদিতে সে সত্যই বিশ্বাস করে কিনা, তাহা কখনও ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখে নাই, ভাবিতে গেলে বিপদ হইতে পারে জানিয়াই যেন জোর করিয়া ভাবে নাই। কিন্তু নিরঞ্জন তাহাকে বিলাত পাঠাইতে চান, তাহা সে জানিত, নিজেরও তাহার এখন কিছু অমত ইহাতে ছিল না। তাহার টাকার অভাব হইবে না, ইচ্ছামত বন্দোবস্ত করিয়াই সে বিলাতে থাকিতে পারিবে। আগে আগে অনেক ভারতীয় মেয়েই ত এইভাবে আচার বাঁচাইয়া বিদেশবাস করিয়া আসিয়াছেন, সে কেন পারিবে না? মোটের উপর অন্যেরা তাহাকে যতই মেমসাহেব বলিয়া ঠাট্টা করুক, সে জানিত সে হিন্দুর মেয়েই আছে। সাবিত্রী যদি আজ পরপার হইতে ফিরিয়াও আসেন, তবু কন্যাকে কোলে তুলিয়া লইতে তাঁহার কোনখানে বাধিবে না।

কিন্তু সংগ্রাম সুরু হইল এইবার। বিবাহ-সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচারিতাকে সাবিত্রী অত্যন্তই ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহার মতামত এমনই স্পষ্ট ছিল যে, ভুল করিবার সম্ভাবনামাত্রও সেখানে ছিল না। তাঁহার কন্যা হইয়া মায়া কি শেষে তাহাই করিবে? শুধু তাহাও ত নহে! দেবকুমার কায়স্থ, সে ব্রাহ্মণ-কন্যা। হিন্দু-শাস্ত্রমতে তাহাদের বিবাহ হইতেই পারে না। দেবকুমারকে বিবাহ করিতে হইলে চিরদিনের মত তাহাকে সনাতন ধর্ম্মের গণ্ডী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। ইহা ত শুধু ধর্ম্মত্যাগ নহে, পরলোকবাসিনী জননীর সঙ্গে তাহার জন্মজন্মান্তরের বিচ্ছেদ।

সাধারণত মাতা এবং কন্যার ভিতর যে সম্বন্ধটা থাকে, মায়া এবং তাহার জননীর সম্বন্ধটা তাহা হইতে কিছু অন্য ধরণের ছিল। সাবিত্রী সম্বন্ধে নিরঞ্জন ন্যায়বিচার করেন নাই, এ ধারণা এখনও মায়ার মন হইতে যায় নাই। সাবিত্রীর জীবন শেষ হইয়াছিল, অনাদর অবহেলার মধ্যে। নিজের জীবনে নিরঞ্জনের কৃত অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করিতে মায়া সঙ্কল্প করিয়াছিল। সত্য বটে সাবিত্রী এখন পরলোকে, স্বামীর অবহেলা বা কন্যার প্রায়শ্চিত্ত কিছুতেই তাঁহার কিছু আসিয়া যায় না, তবু মায়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল, এই ব্রত হইতে কখনও ভ্রষ্ট হইবে না। কিন্তু প্রলোভনের প্রথম সাক্ষাতেই কি তাহার পরাজয় ঘটিল?

যতক্ষণ দেবকুমারের সহিত কথা বলিত, ততক্ষণ এ সকল ভয়, ভাবনা সংশয় তাহার মনের কোথাও

ছায়াপাত করিত না, কিন্তু তাহা ভিন্ন আর সমস্ত সময়ই তাহার দুশ্চিন্তার সীমা থাকিত না। কি করিবে সে, কোন্ পথে যাইবে? সম্মুখে কর্ত্তব্যের পথে দারুণ অন্ধকার, নিরাশা এবং বেদনা, মায়ার প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিত। অন্য পথে আশা ও আনন্দের রঙীন আলোতে উদ্ভাসিত কল্পলোক, ইহার দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ হইতে কখনও কি সে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিবে? ক্রমেই নিজের সম্বন্ধে তাহার সন্দেহ বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই তিন দিনের ভিতরেই সে এক রকম স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছিল, ইহা ক্ষণিক মোহমাত্র নয়, এই আশ্চর্য্য অনুভূতি তাহার জীবনকে একেবারে স্পর্শমণির ছোঁয়ার মত আমূল পরিবর্ত্তিত করিয়া ফেলিয়াছে। সপ্তাহমাত্র আগে যে মায়া ছিল, তাহার সম্পূর্ণ মৃত্যু ঘটিয়াছে, আর তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার কোনোউপায় নাই।

এ-সকল ভাবনা ত তাহাকে সারাক্ষণ পীড়িত করিত, কিন্তু ইহা ছাড়াও তাহার অন্য ভাবনা ছিল। সম্প্রতি সেইগুলিই তাহার যথেষ্ট বেশী বেদনার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিজের মন বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই, ভাল করিয়াই সে বুঝিয়াছিল। দেবকুমারের দিক হইতে মনকে ফিরাইবার আর তাহার উপায় নাই। নিজে সে নিঃশেষেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছে। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের সুখদুঃখ আর তাহার নিজের নিয়ন্ত্রিত করিবার সাধ্য নাই, সে ক্ষমতা এখন অন্যের হাতে চলিয়া গিয়াছে। এত শীঘ্র এমন ঘটনা যে ঘটিতে পারে তাহা এতদিন সে কবি ও ঔপন্যাসিকের সৃষ্টিতে ভিন্ন বাস্তব-জগতে সম্ভব বলিয়াই মনে করিত না। কবির ভাষাতেই তাহার ক্রমাগত মনে হইতেছিল, "দৈবে যাহারে সহসা বুঝায় সে ছাড়া সে কেহ বোঝে না কভু।"

কিন্তু দেবকুমারের মনের কথা বুঝিবার তাহার কোনো উপায় ছিল না। সেও কি মায়ার প্রতি কিছুমাত্র আকৃষ্ট হইয়াছে, না, ইহা ক্ষণিকের খেলামাত্র? সে পুরুষ, সবেমাত্র বিদেশ হইতে ফিরিয়াছে; সেখানে এরকম অভিনয় সদাসর্ব্বদাই চলিতেছে। ইহা যে খেলামাত্র, তাহা উভয় পক্ষই মানিয়া লয়, এবং খেলা ভাঙিয়া গেলে কেহই কিছু মনে করে না। 'ফ্লার্টিং'-ব্যাপারটাকে দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ একটা ব্যাপার বলিয়াই সে-দেশে সকলে জানে। দেবকুমার যদি তাহাই মনে করিয়া থাকে? মায়া শিক্ষিতা, বিদেশের হালচাল সবই জানে, দেবকুমার যদি আশা করিয়া থাকে মায়া জিনিষটাকে তাহারই মত হাল্‌কাভাবে গ্রহণ করিবে? জাহাজে সময় কাটে না, সেই সময়টুকুর জন্যই কি দেবকুমার মায়াকে এতটা বন্ধুত্ব দেখাইতেছে। ইহার ভিতর আর কিছুই কি নাই? যাতনায় যেন মায়ার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, সে প্রাণপণে এই অসহনীয় চিন্তাকে মন হইতে দূর করিয়া দিল। এই ভাবনাই এখন তাহার মনে সকলের চেয়ে প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, অথচ ইহার কোনো সমাধান তাহার হাতে ছিল না। দেবকুমার নিজে ধরা না দিলে মায়ার কোনো কিছুই জানিবার উপায় নাই।

কিন্তু বর্ত্তমানের এই অমূল্য ক্ষণগুলিকে হেলায় বহিয়া যাইতে দিতে সে পারে না; মায়া কাজ সারিয়া উঠিয়া পড়িল, রঙীন সজ্জায় নিজের লাবণ্যকে উজ্জ্বলতর করিয়া ভাবনা-চিন্তাকে সবলেই যেন মন হইতে দূর করিয়া দিল। তাহার পর কেবিনের দরজায় তালা বন্ধ করিয়া ডেকের সিঁড়ির দিকে চলিল।

মাঝপথেই দেবকুমারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। সে এরই মধ্যে পূরা সাহেব সাজিয়া ফিটফাট হইয়া আসিয়াছে। মায়ার মনে হইল এত সুন্দর মানুষ ইতিপূর্ব্বে সে কখনও দেখে নাই। নিজের রূপের গর্ব্ব তাহার যথেষ্টই ছিল, কখনও সহজে সে কোনো মানুষকে সুন্দর বলিয়া স্বীকার করিত না। দেবকুমারই প্রথম তাহাকে হার মানাইল। মায়া ভাবিল, দেবকুমার তাহার চেয়ে আরও কত সুন্দর, ইহার কাছে তাহার নিজের রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ কতটুকুই বা হইবে? মনটা তাহার ভার হইয়া আসিল। নিজের অজ্ঞাতেই মুখের ভাবটাও একটু বিষণ্ণ হইয়া আসিল।

দেবকুমারের চোখে সবটাই ধরা পড়িল, যদিও সে তাহার অর্থ ঠিক বুঝিতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমার সাহেবী পোষাক দেখে বিরক্ত হলেন? এ বিষয়ে আপনার কোনো বিরুদ্ধতা

আছে জান্‌লে এগুলো পরিতামই না। আচ্ছা, এরকম ভুল আর হবে না।"

মায়া চম্‌কাইয়া গেল। তাহার মতামতের মূল্য কিছুও কি দেবকুমারের কাছে আছে? না, ইহাও খেলারই অংশমাত্র? কি করিয়া বুঝিবে সে? ব্যস্ত হইয়া বলিল, "না, না, তা কেন? ও সব বিষয়ে আমার কাটাছাঁটা কোনো মতামত নেই। যার যাতে সুবিধে হয়।"

দুইজনে ডেকের উপর গিয়া বসিল। দেবকুমার চেয়ার দুখানার উপর রাজ্যের মাসিক ও দৈনিক কাগজ বোঝাই করিয়া রাখিয়াছিল, যাহাতে তাহার অনুপস্থিতিতে আর কেহ আসিয়া সেগুলি দখল না করিয়া বসে। এখন ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া সেগুলা পায়ের কাছে ফেলিয়া দিয়া সে বলিল, "এগুলো শুধু শুধু নিয়ে এসেছিলাম একখানাও খুলে দেখিনি।"

মায়া ভালমানুষের মত বলিল, "কেন?"

দেবকুমার বলিল, "চোখ ছিল সিঁড়ির দিকে এবং মন ছিল অন্য কোথাও। ও দুটোর একটাও 'স্পেয়ার' করতে না পারলে বই খুলে রেখে লাভ কি?"

মায়া হাসিয়া বলিল, "ইংরিজিতে এ ধরণের কথাগুলো চলে যায়, বাংলায় কিন্তু বড় বাড়াবাড়ি মনে হয়, না?"

দেবকুমারও একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তা কোনো মানুষের মনোভাবে যদি বাড়াবাড়ি থাকে, ভাষায় সেটা খানিকটা প্রকাশ পেতে বাধ্য।"

মায়া বলিল, "মনোভাবে যদি সেটা থাকে, তাহ'লে ত প্রকাশ পাবেই। তবে বিলাত থেকে এলে কোন্‌টা মুখের কথা, আর কোন্‌টা মনের কথা, তা বুঝবার কোনো উপায় থাকে না।" কথাটা বলিয়াই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল; মনে হইল, এত খোলাখুলিভাবে না বলিলেও চলিত।

দেবকুমার একটু যেন গম্ভীর হইয়া গেল। মিনিট-খানেক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আমি যে কেবল মুখের কথাই বলি না সেগুলো 'মিন্'ও করি, তা আশা করি একদিন আপনাকে বিশ্বাস করাতে পারব।"

মায়ার বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। এও কি মুখের কথা? তাহাই যদি হয়, জীবনে আর কোনো মানুষের কথাকে, মুখের ভাবকে, ব্যবহারকে সে বিশ্বাস করিবে না। কিন্তু এ ভাবে কথা চালাইতে তাহার আর সাহস হইল না। অন্তত আরও কয়েকটা দিন কাটিয়া যাক্। তিন চারটা দিনের মধ্যে চিরজীবনের ব্যবস্থা না হয় নাই হইল?

যাত্রীদের ব্যস্ততা ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মায়া সেইদিকে চাহিয়া বলিল, "আমরা ত এসে পড়লাম ব'লে। বাবা, মানুষের যে কেন 'সি ভয়েজ' পছন্দ হয় জানি না, আমি ত কেবল দিন গুণি কখন ডাঙায় নামতে পারব।"

দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু এই 'সি ভয়েজ'টা শেষ হওয়ায় একটুও খুসী হইনি।"

মায়া ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া লইবার জন্য হাসিয়া বলিল, বি-আই-এস্-এন্ কোম্পানীকে এতবড় কম্‌প্লিমেণ্ট কেউ কখনও দেয়নি।"

দেবকুমার বলিল, "কম্‌প্লিমেণ্ট-ও নয়, এবং 'বি-আই-এস্-এন্'কেও নয়। কিন্তু আপনি আবার ভাববেন আমি বাজে কথা বক্‌ছি, কাজেই আর কিছু ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করব না।"

কথাটা অন্যদিকে চলিয়া গেল। দেবকুমারের বাবা আসিয়া পড়িয়া পুত্রকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন, যে, তাঁহাদের জিনিষপত্র ঠিকভাবে একটাও বাঁধাছাঁদা হয় নাই। দেবকুমারকে অগত্যা উঠিয়া যাইতে হইল। মায়া ভদ্রতার খাতিরে উঠিতে পারিল না। বসিয়া শিবচরণবাবুর সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল।

(৩২)

শনিবারের বিকালবেলা। মায়ার কলেজ সকাল সকাল ছুটি হওয়ায় সে বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে। নিরঞ্জন এখনও ফেরেন নাই, তবে শনিবারে মাঝে মাঝে তিনিও বেলা থাকিতে থাকিতে বাড়ী চলিয়া আসেন।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল মায়া রেঙ্গুনে ফিরিয়া আসিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে সংসারে অনেক বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহা গুছাইয়া লইতে তাহার

অনেক সময় গিয়াছে, তাহার উপর কলেজও খোলা। দেবকুমারের সহিত তাহার একদিনের বেশী দেখা হয় নাই, তবে চিঠি ইহারই মধ্যে দুই তিনখানা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বাড়ী খুঁজিতে, জিনিষপত্র কিনিতে, বারে ভর্ত্তি হইতে সে এখন মহাব্যস্ত। আসিয়া রোজ দেখা করিতে পারে না বলিয়া অনেক করিয়া ক্ষমা চাহিয়াছে, এবং শনিবারে নিজেই যাচিয়া চায়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া রাখিয়াছে।

এই দিনগুলি মায়ার মোটেই ভাল কাটে নাই। জাহাজে দেবকুমারের নিকটে যখন ছিল, তাহার চেয়ে এখন তাহার মন আরও অধীর আরও উতলা হইয়া উঠিয়াছে। কি যেন এক অদৃশ্য ডোরে তাহার জীবন ঐ মানুষটির সহিত গ্রথিত হইয়া গিয়াছে, মায়া যত দূরে যাইতেছে ততই উহাতে টান পড়িতেছে এবং বেদনায় তাহার হৃদয় হইতে রক্তক্ষরণ হইতেছে। নিজের অবস্থায় এক একবার তাহার হাসি পাইত। একি হইল? প্রেমকে উপহাস করা তাহার স্বভাব ছিল, ইহা কি প্রেমের দেবতার প্রতিশোধ? ভালবাসায় পড়িতে সে অনেক মানুষকেই দেখিয়াছে, কিন্তু এতখানি কষ্ট পাইতে কাহাকেও দেখে নাই। অন্যেরা ত দিব্য খায়-দায়, ঘুমায়, নানা রকম প্ল্যান্ করে, সেইমত কাজও করে। দেখিয়া মনে হয় না, ভালবাসাটা তাহাদের জীবনে বিশেষ কোনো বিশৃঙ্খলা আনিয়াছে। যেমন দিন চলিতেছিল, তেমনি চলে, উপরন্তু ফুর্ত্তি করিবার, আমোদ করিবার নূতন কতগুলি সুযোগ, সুবিধা ঘটিয়া যায়।

কিন্তু তাহার বেলা কি ঘটিল সকলই অন্য রকম? আমোদ ফুর্ত্তি ত দূরে থাক, তাহার বাঁচিয়া থাকাই যেন দায় হইয়া উঠিয়াছে। জীবনটা এমনই উলোট্‌পালট্ হইয়া গিয়াছে যে, সে যে ইহার পর কেমন ভাবে, কি করিয়া এটাকে কাটাইবে, তাহা ভাবিয়াই স্থির করিতে পারে না। চিরদিনের অভ্যস্ত পথে আর সে চলিতে পারিবে না, ইহা ধ্রুব সত্য, তাহার জীবনে দারুণ একটা সন্ধিক্ষণ যে দ্রুতবেগে ঘনাইয়া আসিতেছে, তাহাকে স্বীকার না করিয়া উপায় নেই।

জাহাজে থাকিতে এক একবার তাহার মনে হইত নিজের অভ্যস্ত জীবনধারার মধ্যে আবার গিয়া পড়িতে পারিলে হয়ত এই নূতন মোহের ঘোর তাহার কাটিয়া যাইবে। কিন্তু এখন দেখে বৃথা সে আশা। কর্ত্তব্য বলিয়া এতকাল যাহা সে বুঝিত, তাহা হইতে যদি ভ্রষ্ট হইতে না হয়, তাহা হইলে দেবকুমারের চিন্তাও মন হইতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে জীবনে আর তাহার থাকিবে কি? সে কি আর মাথা সোজা করিয়া চলিতে পারিবে? দুর্ব্বিসহ বেদনার ভারে একেবারে ভাঙিয়া পড়িবে না? ক্রমাগত নিজের মনের সহিত সংগ্রাম করিয়া মায়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর সে পারে না, ভাগ্যচক্রের আবর্ত্তনে যাহা ঘটিবার ঘটুক মনে করিয়া সে যেন হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল।

রোদ পড়িয়া আসিতেছিল। নিরঞ্জন চায়ের সময় আসিয়া জুটিতে পারিবেন কি না স্থিরতা নাই। অজয় আসিবে বলিয়া গিয়াছে, তবে সেটা তাহার দুষ্টামি, না, সত্য কথা, মায়া তাহা ঠিক জানে না। মনে মনে সে স্বীকার না করিয়া পারিতেছিল না যে, একজন আসিলেই তাহার আনন্দ পরিপূর্ণ হইবে, বাড়ীর লোকগুলি আসুক বা নাই আসুক, তাহাতে বিশেষ আসিয়া যায় না।

সম্প্রতি সে চায়ের জোগাড় করিতেই ব্যস্ত ছিল। দেবকুমার যেন মনে না করে যে, এ গৃহের গৃহিণী নাই বলিয়া অতিথির কোনো আদরযত্নই হয় না। চা-টা কোথায় দেওয়া হইবে, তাহা সে ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতেছিল না। তাহাদের বাগানটায় চারটা সাড়ে চারটা পর্য্যন্ত অত্যন্তই রোদ থাকে, কিন্তু ঐ জায়গাটার সম্বন্ধে মায়ার মনে খুব একটা পক্ষপাত আছে। বাড়ীতে অবশ্য বহুমূল্য আসবাবে সাজান ড্রয়িংরুম বা ডাইনিং-রুমের অভাব নাই, কিন্তু বিকাল বেলাটা ঘরের কোণে বসিতে মায়ার ইচ্ছা করে না। তাহা ছাড়া চারিদিকে চাকরবাকরের ভিড়। ভারতীয় চাকরবাকরের চোখে ধূলা দেওয়া বড়ই শক্ত ব্যাপার। দেবকুমার এবং মায়ার মনের সম্বন্ধটা তাহাদের বুঝিতে বিশেষ দেরি হইবে না, এবং তাহা লইয়া ঝি-চাকর-মহলে যে রসাল আলোচনার সূত্রপাত হইবে, তাহা ভাবিতেই মায়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু দেবকুমার সদ্য

বিলাত প্রত্যাগত, চা খাইতে সে চারটার মধ্যেই আসিবে, সন্ধ্যার পর আসিবে না, কাজেই ঘরে চা দেওয়ারই বোধ হয় ব্যবস্থা করিতে হইবে। দেশী,বিলাতি, সকল রকমের খাদ্যই প্রচুর পরিমাণে ফরমাস দিয়া, এবং একটি দামী চায়ের সেট্ বাহির করিয়া দিয়া মায়া উপরে চুল বাঁধিতে এবং কাপড় বদ্‌লাইতে চলিয়া গেল। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের মুখের বিবর্ণ প্রতিকৃতি দেখিয়া সে যেন চমকিত হইয়া উঠিল। যে মানুষ নিজে সুন্দর, সে সৌন্দর্য্যকে সমাদর করে, এবং সৌন্দর্য্যের অভাবের প্রতি অবজ্ঞা থাকাও তাহার মনে খানিকটা স্বাভাবিক। মায়ার এমন বিবর্ণ শ্রীহীন মুখ দেখিল দেবকুমার মনে করিবে কি? সে যথাসাধ্য যত্নে প্রসাধন করিয়া, নিজের রূপকে দীপ্ত উজ্জ্বল করিয়া তুলিল। নিজের বাড়ীতে এত সাজসজ্জা কখনও সে করে না, অজয় যদিও হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে মায়াকে যে সে ঠাট্টা করিয়া অস্থির করিয়া তুলিবে, তাহাও মায়া জানিত, তবুও লোভ সাম্‌লাইতে পারিল না। দেবকুমার যদি তাহাকে দেখিয়া একটু মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায়, তাহা হইলে আর সে কিছুকে ভয় করে না।

মাঝপথে তাহার বুড়ী আয়া আসিয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিল, "থোড়া সুন্নাউন্না নিকালকে ডালো না, ওসব ক্যা খালি পেটিমে রখ্‌নেকো ওয়াস্তে বনায়া?" মায়ার শরীরে অলঙ্কারের অপ্রাচুর্যটা তাহার ভাল লাগিল না।

মায়া বলিল, "ঘরে বসে আবার ক'ঝুড়ি গয়না পরতে হবে? যা পালা এখান থেকে। দেখ্‌গে যা, আমার ব্লু চায়ের সেট্‌টা ছোক্‌রা এখনি ভেঙে রাখবে।" অন্য চাকরবাকরকে গাল দিবার সুযোগ বুড়ী কখনও উপেক্ষা করিত না, সে তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল।

মায়া ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, চারটা বাজিতে আর কয়েক মিনিট মাত্র দেরী আছে। নীচে আগেই নামিবে, না, দেবকুমারের আসার খবর পাইলে পর যাইবে, তাহাই ভাবিতেছে, এমন সময় বেয়ারা আসিয়া খবর দিল, "সাহেবের গাড়ী এসেছে।"

মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। কিন্তু গিয়া দেখিল নিরঞ্জন আসেন নাই, শুধু গাড়ীই আসিয়াছে। ড্রাইভারের হাতে নিরঞ্জন চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, "আজ এত কাজের চাপ পড়েছে যে, কিছুতেই যেতে পারলাম না। দেবকুমারকে বোলো, সে যেন কিছু মনে না করে।"

চিঠি পড়িয়া মায়া ড্রাইভারকে বিদায় করিয়া দিল। তারপর আবার উপরে উঠিবে কি না ভাবিতেছে, এমন সময় ট্যাক্সি হাঁকাইয়া দেবকুমার স্বয়ং আসিয়া পড়িয়া সকল সমস্যার সমাধান করিয়া দিল।

দেবকুমার আজ ফিটবাবু সাজিয়া আসিয়াছে। শান্তিপুরে ধুতি, গরদের পাঞ্জাবী, এবং পায়ে কালো মখমলের নাগরা জুতা। বিলাতী সাজের মধ্যে হাতের মণিবন্ধে একটা 'রিষ্ট' ওয়াচ, আর বিদেশী-আনার কোনো চিহ্ন নাই।

মায়া অগ্রসর হইয়া আসিতেই দেবকুমার হাস্যমুখে তাহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, "দেখুন, আজ আপনার 'অনারে' পুরো বাঙালী বাবু সেজে এসেছি।"

মায়াও হাসিয়া বলিল, "যা নিজের থেকেই করা উচিত, তা অন্যের খাতিরে করলে তার কি খুব বেশী মান বাড়ে?"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়ই। একজন পথভ্রষ্টকে 'রিক্লেম' করার মাহাত্ম্য কি কম?"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, আচ্ছা এখন বসবেন চলুন, তারপর বক্তৃতা করবেন।"

দুজনে বসিবার ঘরে আসিয়া বসিল। দেবকুমার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার বাবা বুঝি এখনও এসে পৌছন নি?"

মায়া বলিল, তাঁর "আজ আসতে দেরিই হবে, বলে পাঠিয়েছেন।"

দেবকুমার আর সে বিষয়ে কোনো মন্তব্য না করিয়া বলিল, "এ ক'দিন এমন ভয়ানক ব্যস্ত ছিলাম, যে, কিছুতেই আসতে পারিনি। আপনি আমাকে নিশ্চয়ই ভয়ানক রকম অসভ্য ভেবেছেন।"

মায়া বলিল, "ওমা, তা মনে করতে যাব কেন? মানুষের কাজ আগে, না বেড়ান আগে?"

দেবকুমার বলিল, "ও ত নিতান্ত নীতিশাস্ত্রের কথা

হ'ল। মানবশাস্ত্রে, একটা বিশেষ কালে, অন্ততঃ স্থান-বিশেষে, বেড়ানটাই ঢের আগে। যখন নেহাৎ আর কিছু করবার থাকে না, তখনই মানুষ কাজ করে।"

মায়া বলিল, "আপনার মতানুসারে চল্‌লে পৃথিবী এতদিনে থেমে দাঁড়িয়ে যেত।"

দেবকুমার বলিল, "মোটেই না। বরং আপনি যা বল্‌ছেন সেইভাবে চল্‌লেই বিপদ হ'ত বেশী। জগতের অধিকাংশ মানুষই কর্ত্তব্য বলে কাজ করে না, হয় করে দায়ে পড়ে, নয় কাজের মধ্যেও 'প্লেজার' পায় বলে।"

মায়া বলিল, "থাক, আপনার সঙ্গে তর্কে পারবার কোনোই সম্ভাবনা যখন আমার নেই, তখন তর্ক নাই করলাম। বাড়ীটাড়ি পছন্দমত পেলেন কিছু?"

দেবকুমার বলিল, "এখানে বাড়ী থাকলে ত বাড়ী পাব? বাড়ী মানে'ত খাঁচার মত কতগুলি 'ফ্ল্যাট'? দেখলেই আমার হাড় জ্বলে যায়। যাও বা দু-একটা ভাল আছে একটু, সেগুলোর ভাড়া এত বেশী যে বাবা সে শুনলেই লাফিয়ে উঠেন। কি যে করি ভেবেই পাচ্ছি না। বেশীদিন এ ভাবে ভেসে বেড়ালে আমার মোটেই চল্‌বে না, আমি শীগগির করে গুছিয়ে বস্‌তে চাই।"

মায়া বলিল, "সত্যি এখানে বাড়ীর ভয়ানক অসুবিধে। ভাগ্যে বাবা এই বাড়ীটা করেছিলেন, নইলে আমাকেও কোন এক খাঁচায় গিয়ে উঠতে হ'ত তার ঠিকানা নেই। আমার আর সব দিকের অভাব সহ্য হয়, কিন্তু থাকবার জায়গাটা বেশ বড় না হ'লে ভারি কষ্ট হয়।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিল, বলিল, "থাবার পরবার অভাব যে কি জিনিষ, তা যদি সত্যি জান্‌তেন, তাহ'লে আর একথা বল্‌তেন না।"

মায়াও হাসিল, বলিল, "তা একেবারে একটুও যে জানি না তা নয়। চিরদিনই ত আমার এ রকম করে কাটেনি? গ্রামে যখন থাকতাম তখন কিছু কিছু প্রাইভেশন্ সয়েছি বই কি?"

দেবকুমার বলিল, "সত্যি, আপনার জীবনের এই অংশটার হিষ্ট্রি আমার ভারি অদ্ভুত লাগে। বাঙালীর মেয়ে 'রিলিজাস্ কন্‌ভিক্‌শন্'-এর খাতিরে স্বামীও ছেড়ে দেয় এ আর আগে কখনও শুনিনি।"

মায়া একটু গর্ব্বের সহিতই বলিল, "তাঁর ভিতর যে জিনিষ ছিল, সব বাঙালীর মেয়ের মধ্যে তা কোথায় পাবেন?"

দেবকুমার একটু দীর্ঘক্ষণ মায়ার দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "তিনি যা করেছিলেন, তাই কি আপনার ঠিক মনে হয়? ধর্ম্মমত কি মেয়েদের কাছে স্নেহ, প্রেম, সব কিছুর চেয়ে বড় হওয়া উচিত?"

মায়া কিছু না ভাবিয়াই তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "নিশ্চয়ই। মতের জন্যে যে ত্যাগস্বীকার করতে না পারে, তার মত থাকা-না-থাকা সমান।"

দেবকুমার গম্ভীর হইয়া গেল। খানিকক্ষণ পরে বলিল, "আমার কিন্তু তা মনে হয় না। ভালবাসার চেয়ে মতের দাম স্ত্রীলোকের কাছে বেশী হওয়া উচিত নয়। তাহ'লে সংসার টিকতে পারে না।"

মায়া যে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। তাহার অন্তরও এই কথাই বলে, কিন্তু তাহার বুদ্ধি এখনও ইহা স্বীকার করিতে চায় না। দেবকুমার এ কথা পাড়িতেই বা গেল কেন? সেও কি এই ভাবনায় পড়িয়াছে? কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়াই কি সে আজ এই আলোচনা উত্থাপন করিয়াছে? মায়ার মন সভয়ে পিছাইয়া গেল। না, না, এখনই এ মীমাংসার প্রয়োজন নাই। আরও কয়েকটা দিন অন্ততঃ অনিশ্চিতের আশ্রয়েই থাকিয়া দেখা যাক। সে কথা ঘুরাইবার জন্য তাড়াতাড়ি বলিল, "তর্ক করে ত গলা শুকিয়ে ফেল্‌লেন, এইবার চা আন্‌তে বলি?"

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু গলাটা একবার ভিজিয়ে নিয়ে আবার যদি দ্বিগুণ উৎসাহে তর্ক করি, তখন আমায় দোষ দেবেন না। মায়া ইলেট্রিক বেল বাজাইয়া চাকরকে ডাকিয়া চা আনিতে বলিয়া দিল। দেবকুমার ঘরের চারিদিকে ভাল করিয়া তাকাইয়া লইয়া বলিল, "আপনি সব জিনিষেই দেশী ভাব বজায় রাখবার খুব পক্ষপাতী, না?"

মায়া বলিল, "ছবি আর 'ফারনিচার' দেখে বল্‌ছেন? এগুলো আমারই আমদানী বটে, বাবা আগে সব কিছু

পুরো বিলাতি ষ্টাইলেই সাজিয়েছিলেন। আমি এখন অল্পে অল্পে বদল করছি।”

দেবকুমার বলিল, “আপনি দেখছি রিফর্ম্মার হয়েই জন্মেছেন।”

মায়া বলিল, “আমি ঠিক তার উল্টো। আমাকে এখানের সকলে ভয়ানক গোঁড়া বলেই গাল দেয়। বাবাকে বিরক্ত করতে চাই না ব'লে বেশী বাড়াবাড়িগুলো করি না, কিন্তু আসলে আমার মত আগেরই মত অর্থোডক্‌শ্‌ আছে।”

দেবকুমার বলিল, “আমার কিন্তু তা মোটেই মনে হয়নি।”

মায়া হাসিয়া বলিল, “আপনি আমাকে কতটুকুই বা জানেন? দুদিন জাহাজে দেখেছেন বই ত নয়?”

দেবকুমার বলিল, “মানুষকে বুঝবার জন্যে কি আর একজন্ম ব'সে দেখতে হয়? তার সত্যিকার পরিচয় অল্পক্ষণের দেখাতেই পাওয়া যায়।”

এই সময় চা-টা আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, “আপনি করেছেন কি? একটা মানুষে কি এত খায়?”

মায়া বলিল, “একটা কেন? আমিও রয়েছি।”

দেবকুমার বলিল, “যা দেখছি, এর ভিতর বেশী জিনিষই আপনি খাবেন না। আমার জন্যে কেন আনালেন?”

মায়া হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, “ওমা, আমি খাব না ত কি হবে? যে বাড়ীর কর্ত্তা নিরামিষ খায়, সে কি মাছ খেতে কাউকে ডাকেও না?”

দেবকুমার বলিল, “আমি বুঝি শুধু খেতেই এসেছি? না, এ গুলো নিয়ে যেতে বলুন, আপনি নিজে যা খেতে পারেন, সেইগুলোই শুধু থাক।”

মায়া ব্যস্ত হইয়া বলিল, “না, না, অততে দরকার নেই। আপনি খান ত, এখনি অজয় আস্‌বে, বাবাও আসতে পারেন, আপনাকে সঙ্গ দেবার লোকের অভাব হবে না।”

দেবকুমার একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বলিল, “এই হ'লেই আমার হবে, চা-টা অবশ্য খাব।”

মায়া বলিল, “আপনি ছোট জিনিষকে বড় বেশী বাড়ান। আচ্ছা, আচ্ছা, আমিও না হয় খাচ্ছি, আপনার অত রাগ করবার দরকার নেই।”

কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মন দমিয়া গেল। দেবকুমারের কথাই ত তাহা হইলে ঠিক বলিয়া প্রমাণ হইল। মেয়েদের মতের কোনই মূল্য সত্যই কি নাই?

দেবকুমার কিন্তু সে কথা আর তুলিল না। এমন ঘটা করিয়া খাইতে লাগিল, যেন মায়া তাহাকে খাইতে সুযোগ দিয়া একেবারে বাঁচাইয়া দিয়াছে।

খানিক পরে অজয় আসিয়া জুটিল। চীৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, “কি, কিছু বাকি আছে?”

দেবকুমার হাসিয়া বলিল, “বিশেষ কিছু নয়।”

ক্রমশঃ

মাতৃভূমির সেবা

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১

ওপারে নগরীর হাজারো ঘরে,
কত না কোলাহল কত না আলো!
এপারে জনহীন জলার চরে
নিশুতি নিশা নামে নিবিড় কালো।
প্রবল বায়ু-বেগে সমুখে পিছে—
—সঘনে তালবীথি মর্ম্মরিছে,
আঁধারে উদ্ভাসি জলিছে জলরাশি,
তারার ছায়া তাহে শোভিছে ভালো।
জনতা হ'তে দূরে বিজনপুরে
নীরব ম্লানালোক কুটিরখানি;
কঠিন ব্রত লয়ে মিলেছি আলয়ে
—আমরা জন-কত অবোধ প্রাণী।

আশায় উদ্বেগে অধীর হিয়া—
এসেছি গৃহ ছাড়ি পথের 'পরে ;
যাহারা বন্ধনে আরামে আছে
—মোদের সুখ নাই তাদের তরে ;
সমাজ সংসার মমতা স্নেহ—
বাঁধিতে পারে নাই আজকে কেহ,
দারুণ দেবতার ডাক যে পেল তার
আগুন লাগিয়াছে সুখের ঘরে।
আদেশ আসিয়াছে,—"ঘুচাতে হবে—
যে পাপ যুগে যুগে হয়েছে জমা ;
যাহারা অপমানে 'নিয়তি' বলি মানে—
নিয়তি তাহাদের করে না ক্ষমা।"

অনেক ঘুমায়েছি জাগিতে হবে,
অনেক সহিয়াছি, আর না সহে,
যে পাপে যে গরলে জ্বলিছে দেশ
তাহার শেষ আজ না হ'লে নহে।
আজিকে সব ভুলে অকুতোভয়ে
মরণে যেতে হবে অথবা জয়ে,
বসিয়া ভাবিবার সময় নাহি আর
যুগ যে কেটে গেল,—বেলা যে বহে
রুধিতে হবে আজ পাপের পথ
আপন বুক দিয়া জীবন দিয়া।
শুধিতে হবে ধার ক্ষুধিত দেবতার
অযুত নরমেধ অনুষ্ঠিয়া।

যাহারা জীবনেরে বেসেছে ভালো,
মরণ আজকে যে তাদেরি যাচে ;
বাঁচার মত যারা বাঁচিতে জানে
মরার অধিকার তাদেরি আছে।
এ রণ আজকার কঠিন বড়,
আজি এ অভিযান নূতনতর,
অরিরে ভালবেসে মরিতে শিখাবে সে—
মাথা না করি নত ভয়ের কাছে।
বিদেশী লোকদের ভোগের লাগি—
মানুষ ছিল পোষা পশুর মত,
মানুষ দেবতা যে জেগেছে তারি মাঝে—
পশুরে করিবারে সমুন্নত।

আঁধারে দেখা দেছে নূতন জ্যোতি-
পাথারে দেখা গেছে কূলের রেখা,
তরণী চল বেয়ে ত্বরিত গতি—
আজিকে ফিরে যাবে ললাট-রেখা,
সাগর আলোড়িত তুফান বেগে
আকাশে ঢেকে আসে প্রলয় মেঘে,
মাথার 'পরে থাকি অশনি উঠে ডাকি,
তড়িতালোকে সুখে চল রে একা।
যে তারা জ্বলিতেছে নিশায় আজি,
সে যদি ডুবে যায় আঁধার তলে,
নূতন উষা আসি তমসা দিবে নাশি
ধরণী যাবে ভাসি আলোর জলে।

রচিত যে কারার প্রাচীররাজি
তোমার ভয়ে আর তোমার পাপে,
তোমরা মাথা তুলে দাঁড়ালে আজি,
সে কারা যাবে ধসি বিধির শাপে।
যে জাতি এসেছিল আঁধার রাতে,
মাণিক দেছ তারে আপন হাতে ;
সে যদি আজি তায় ছাড়িতে নাহি চায়
কি হবে গালি দিয়া মনস্তাপে ?
সে যদি ভুলে থাকে আপন পদ,
শিখাতে হ'বে তারে নূতন করি।
চাহ যে প্রতিকার, উপায় কর তার—
গেয়ো না পুরাকথা ধূলায় পড়ি।

যে উষা আসিতেছে তাহারি আভা
জেগেছে বহুদূর দেউল জুড়ে,
মানুষ উঠিয়াছে মরণ জয়ী—
হাজার বছরের কবর ফুঁড়ে।
আজিকে ভাঙা চাই সকল বাধা,
অরি রে প্রেমডোরে চাই রে বাঁধা ;
চোখের ঠুলি খোলো, শেখানো বুলি ভোলো,
আশা জাগায়ে তোলো নিখিল জুড়ে।
আজি এ শুভদিনে সবাই এস,
জ্বলেছে হোমানল, ডাকিছে হোতা,
"মায়ের তরে প্রাণ কে দিবে বলিদান,
পূজার ফুল কই, আহুতি কোথা ?" *

৮

সবারি বুকে আছে পূজার ফুল—
সবারি দেহে হয় হোমের হবি ;
দিবে কি নাহি দিবে দৈব কাজে—
তোমার আপনার ইচ্ছা সবি।
সে হবি নিজ ভোগে গরল হবে,
তোমার তিলে তিলে জীবন লবে,
লুকায়ে রাখো লয়ে—সে ফুল কাঁটা হয়ে
বিঁধিবে নিতি নব জনম লভি।
নিজেরে না ভুলিলে নাহিক ত্রাণ,
উজল হতে চল অনলস্নানে
নিখিল নরলোক আজিকে সুখী হোক
মোদের ক'জনার জীবনদানে।

৯

অভাগা কোটি কোটি তোমার ভাই—
ক্ষুধায় রোগে শোকে জর্জ্জরিত
দুবেলা ঘরে বসি কলহ করে,
নেশায় ডুবে ভোলে প্রাণের ক্ষত।
তারা যে পড়িয়াছে বিধির রোষে—
সে শুধু তব পাপে তোমার দোষে,
তাদের সে নরকে বাঁচাতে কি কর কে ?
তাদের সাথে তব প্রভেদ কত ?
মাটির দীপে তার করেছ হেলা,
বিদেশী বাতি জ্বালি অশুভক্ষণে ;
উঠিবে দিবা যবে সে আলো কি বা হবে,
হারাবে মাঝে হতে আপন জনে।

১০

ক্ষুধিত লাঞ্ছিত ভাগ্যহত
বাঁচিয়া আছে মরি যাহারা সবে,
আজিকে পথে পথে তাদের লাগি
ফিরিতে হবে ডাকি মাভৈঃ রবে।
তোমার শুভবোধ তোমার স্নেহে,
চেতনা দাও শত অবশ দেহে।
তাদের ভাল যাহা তোমারে আজি তাহা
যতনে নতশিরে শিখিতে হবে।
ব্যথিত ভগবান, ব্যথিত ধরা,
পাপের পরিণাম হয়েছে সুরু।
মোদের সেনাপতি, আজি অখিল-পতি,
মোদের গুরু আজ জগদ্‌গুরু।

১১

যদি না ফিরি আর নাইক ক্ষোভ
যদি না দেখে যাই কাজের শেষ ;
কিছুরই 'পরে মোর রবে না লোভ
কাহারো 'পরে মোর রবে না দ্বেষ।
আঘাত যদি হয় কঠিন বড়,
মোদের হ'তে হবে কোমলতর,
মরিতে হবে যায়—তার কি আসে যায়—
কে তারে দিল গালি কে দিল ক্লেশ।
মেটেনি যত আশা মিটিবে না ক—
বাকী যা আছে কাজ রাখো তা তুলে;
রহি বা নাহি রহি—সকল ব্যথা সহি
আঘাত দিয়ে যাব পাপের মূলে।

১২

নিজের শত ক্ষত, হাজার ক্ষতি
ভুলিতে হবে আজ সবারে স্মরি;
সকল সুখসাধ যশের মোহ—
চলিতে হবে নিজে দলিত করি।
দেউলে দিবালোকে যে পূজা হবে;
জগৎ জুটিবে সে মহোৎসবে।
শেফালি তারি লাগি আঁধারে রবে জাগি—
উষার তরুমূলে পড়িবে ঝরি।
কেহ-বা পাবে ঠাঁই সোনার থালে
প্রভাতে দেবতার পূজার ক্ষণে
কেহ-বা ধূলি সাথে মিশায়ে যাবে প্রাতে
তাহারে কারো আর রবে না মনে।

মহিষবাথান
১০ বৈশাখ, ১৩২৭

মহিলা-সংবাদ

ভারতীয় নারীরা এইবারের রাজনৈতিক আন্দোলনে যে-ভাবে যোগ দিয়াছেন ও দিতেছেন, তাহা শত্রু, মিত্র ও নিরপেক্ষ, সকলেরই বিস্ময়ের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে,

নারী সত্যাগ্রহ সমিতির নেত্রীগণ
বাম দিকের সব শেষে শ্রীমতী শান্তি দাস, এম্-এ

বিশেষতঃ বাংলা দেশে যেখানে অবরোধপ্রথা এখনও বর্ত্তমান। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা, শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী, শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী, শ্রীমতী মোহিনী দেবী ও জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর কারারুদ্ধ হওয়ার সংবাদ আমরা ইতিপূর্ব্বেই প্রকাশিত করিয়াছি।

ইঁহাদের পর নিম্নলিখিত মহিলারা কারারুদ্ধ হইয়াছেন :—

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়

১। শ্রীমতী যোগেশ্বরী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
২। শ্রীমতী সরস্বতী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৩। শ্রীমতী ভকুয়ার দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৪। শ্রীমতী দেবী—চার মাসের কারাদণ্ড
৫। শ্রীমতী বাচুলী পাটেল—চার মাসের কারাদণ্ড
৬। শ্রীমতী চামেলী দেবী—ছয় মাসের কারাদণ্ড
৭। শ্রীমতী শান্তিদাস, এম-এ—চার মাসের কারাদণ্ড
৮। শ্রীমতী শোভনা রায়
৯। শ্রীমতী জ্যোৎস্না মিত্র
১০। শ্রীমতী সীতা দেবী
১১। শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস
১২। শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়

ইঁহাদের পর আরও কয়েকজন মহিলা কারারুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীমতী বিমলপ্রতিভা দেবী

শ্রীমতী উর্ম্মিলা দেবী

শ্রীমতী ইন্দুমতী গোয়েঙ্কা

শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী

অন্তরে বাহিরে

শ্রীআশীষ গুপ্ত

বাহিরে—

সাইন্‌বোর্ড-ওয়ালাটাকে সাইনবোর্ডটা লিখিতে দেওয়ার সময়ে অনেক চিন্তা করিয়াছি। লোকটা অক্ষর-পিছু চার চারটা পয়সা করিয়া চার্জ্জ করিয়াছে। নিজের নামটা তাই অনেক ইতস্তত করিয়া বাদ দিয়াছি। কম পয়সায় নাম লিখান যাইবে এমন নামও পিতামাতা রাখেন নাই,—কুলকুণ্ডলিনীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইহার উপরে বাংলায় স্বত্বাধিকারী না লিখিয়া ইংরেজী কেতায় 'প্রোঃ' লিখিলে মোটমাট দাঁড়ায় ষোলোটা অক্ষর, তাহার সহিত যদি যোগ করি M. A.-তবে হয় আঠারোটা, যদি করি এম্‌-এ, তবে হয় উনিশটা। সর্ব্বশেষে, যদি নিজেকে 'শ্রী'মণ্ডিত করি, তাহা হইলে গিয়া দাঁড়ায় কুড়িটাতে। এই সকলই বাদ দিয়াছি, পাচসিকা আন্দাজ পয়সা বাঁচিয়াছে। মোহনলাল সাহা লেন, আর বিষ্টু বসু ষ্ট্রীট এই দুইটি আট হাত চওড়া গলির মোড়ে, যে-কোনও চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিই 'দি গ্রেট্ ডিফারেনসিয়াল অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর সাইন্‌বোর্ড দেখিতে পাইবেন। চাল, ডাল, তেল, ঘি হইতে আরম্ভ করিয়া কাগজ, কলম, দোয়াত, পেন্সিল, হেজ্‌লিন, পোমেড্‌, পাউরুটি, বিস্কুট, লেমনেড, বিড়ি, সিগারেট—সকলই পাওয়া যায়। যদি কিছু না মেলে, তবে পূর্ব্বাহ্নে সংবাদ দিলে যত্নের সহিত মাল সরবরাহ করিয়া থাকি, ভেজাল দিই না একটুও। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

খোলার ঘর, মাসে ছয় টাকা করিয়া ভাড়া। সামনে খোলা নর্দ্দমা। কাদার উপর দিয়া ভাতের ফ্যান্, আঁস্তাকুড়ের আবর্জ্জনা গড়াইয়া চলে। একখানা পুরু তক্তা নর্দ্দমার এধার হইতে ওধার অবধি ফেলা আছে। কিছু দূরে একটা জলের কল, সকাল হইতে বেলা দশটা পর্য্যন্ত সেখানে অবিশ্রান্ত ভিড়। কোলাহল এবং গালাগালির বিরাম নাই। চারিদিকে খোলার বস্তি।

সকালবেলা, সবেমাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া, 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর ঝাঁপ খুলিয়া গঙ্গাজলের ছিটা দিয়াছি, এমন সময় সহদেব আসিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে হাসিমুখে কহিল, 'প্রাতোপেন্নাম দা'ঠাকুর, শরীর গতিক ভাল ত'?'

উপরের তাকে-রাখা একটা থামে সাদা রং করা গণেশ মূর্ত্তিকে নমস্কার করিতে করিতে জানিলাম যে, আজ যদি সহদেবকে ধারে পাচ সের চাল না দিই, তাহা হইলে সে ওই নর্দ্দমার উপর পড়িয়া গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা হইবে, এবং সে সকলের দরুণ যাহা কিছু পাপ সকলই নাকি আমাকে স্পর্শ করিবে।

সহদেব ছিল কণ্ডাক্টার, মাসে উনিশ টাকা মাহিনা পাইত, চোখ দুইটা দেখিলে ভয় হইত, যেন ভিতরকার সমস্ত বন্ধন ছাড়াইয়া তাহারা বাহির হইয়া আসিবে। সামনের গুটিতিনেক দাঁত নীচের পুরু ঠোঁটটা ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিল। গাঢ় হলুদ সেইগুলার রং, সমস্ত মিলিয়া মনে হইত, যেন একটা হিংস্র রক্তলোলুপ জীব, যে-কোন মুহূর্ত্তেই ঘাড় মট্‌কাইতে পারে।

সহদেব হাসিতে লাগিল, বলিল, "মাইরি দা'ঠাকুর, শালার আপিসে গেল মাসে পাঁচ পাঁচটা টাকা ফাইন করে দিলে, তাইতেই ত ধার চাইছি, নইলে,—আচ্ছা, তুমিই বল না, পিসে, সহদেব কি কোনদিন কারও ঠেঁয়ে এক পয়সা ধার করেছে, না, কারও একমুঠো খেয়েছে। হাজার হোক একটা পিরিন্‌সিপুল আছে ত।"

সহদেব বলিত, সে কায়েতের ছেলে, কুলীন কায়স্থের সন্তান সে,- থার্ড ক্লাস অবধি পড়িয়াছে।

বস্তির সরকারী পিসে কালীচরণ, ঘরামী এবং মহাশয় ব্যক্তি, সমস্ত শাস্ত্র সে জানে, ব্যাখ্যা করিতে

পারে। রামায়ণ এবং মহাভারত ত তাহার জিহ্বাগ্রে। একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "আচ্ছা দা'ঠাকুর, তুমি ত লেখাপড়া জান, শুবোদ্রার অগ্নি-পরীক্ষের পর রামায়ণে কি হ'ল বল দিকিনি।"

আমি জবাব দিতে পারি নাই, সেই হইতেই আমার বিদ্যাবুদ্ধির সত্যতা সম্বন্ধে কালীচরণের একটা সন্দেহ জন্মিয়া গেছে।

কালীচরণ কহিল, "তা সেকথা সত্যি দা'ঠাকুর, সদার আমাদের সে গুণটো আছে। দিয়ে দাও, দা'ঠাকুর, পাচ সের চাল, ছোড়া বেঁচে থাক্‌লে তোমার পয়সা মারা যাবে না।"

সহদেবের কাছে, আমার হিসাব মতন, আঠারো টাকা সাড়ে পাচ আনা পাওনা হইয়াছিল। খুচরা পয়সা কয়টা ছাড়িয়া দিয়া, তাহার নামে আঠারো টাকার জন্য নালিশ করিব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। কহিলাম, "'শালার আপিসে' ত প্রত্যেক মাসেই তোমার পাচ পাচটা টাকা ফাইন্ করে সহদেব,—তুমি তাহ'লে নগদ দাম দিয়ে চাল কিনবে কবে? পাচ সের চাল তোমায় এখন ধারে দিতে পারব না, বড়-জোর আধ সের পর্য্যন্ত পারি, যদি রাজী হও ত নিয়ে যাও। তবে পয়সাটা দয়া করে একটু শীগগির দিও।"

সহদেবের বহির্গমনোদ্যত চোখ দুইটা আর কোটরের ভিতর থাকিতে চাহিল না। স্বাভাবিক তিনটার স্থানে দুইপাটির বত্রিশটা হলুদ রংয়ের দাঁতই কালো মোটা ঠোঁট দুইটা অতিক্রম করিয়া যেন আমাকে আক্রমণ করিতে আসিল। সে কহিল, "ওঃ কি মস্ত বড় বাবু রে! একটা ভদ্দোর সন্তানকে পাচ সের চাল দিয়ে বিশ্বেস করতে পারেন না, উনি আবার অন্নপূন্নো!—আচ্ছা, দাও দাও, আধ সেরই দাও, আমিও দেখে নেব তোমার দোকান এখানে কদ্দিন থাকে,– হ্যাঁ বাবাঃ, সহদেব সে ছেলেই নয়—"

সহদেব আমায় প্রায়ই ভয় দেখাইত, সে দেখিয়া লইবে আমি কেমন করিয়া এ পাড়ায় থাকি। তাহার এবং আরও অনেকের আস্ফালন-সত্ত্বেও এখানে টিঁকিয়া আছি আজ পাঁচ বৎসর।

চাল ওজন করিয়া দিয়া বলিলাম, "আধ সের চালের দাম আট পয়সা, সহদেব। দশ টাকা হিসাবে মণ দিতে হবে, দাম বেড়ে গিয়েছে।" "আচ্ছা, দাও দাও,—এ মাসের মাইনে পেলে কোন্ শালা আর তোমার পয়সা ফেলে রাখে!" বলিয়া সে চলিয়া গেল। এই চালই সে অন্যত্র ছয় টাকায় পাইতে পারিত। আমি ধরিলাম চার টাকা বেশী, এক টাকা তাহার রক্তচক্ষুর খেসারত, এক টাকা তাহার ধারের সুদ, দুই টাকা আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর মূল্য। এই রেটেই সকলের কাছ হইতে লইয়া থাকি; যদিও অপরের বেলায় রক্তচক্ষুটা বাদ যায়। এম্-এ পাশের খরচ উঠিয়া গেলে সকল জিনিষের দর সুবিধা করিয়া দিব, নগদ পয়সায় লইলে আরও কিছু সস্তায় পাইবে।

• • •

বেলা বাড়িতে লাগিল। রাজমিস্ত্রী, ছুতোর মিস্ত্রী, গাড়োয়ান, মোটরগাড়ীর ড্রাইভার, ঘরামী, ডাকের কুলী, মজুর, মেছুনী, ঝি, ভিখারী প্রত্যেকেই আপন আপন কাজে বাহির হইয়া গেল। কিছু দূরের ডাক্তারবাড়ীর মহীনবাবুর ছেলে কুমার আসিয়া বলিল, "প্রসাদবাবু, বাবা বল্‌লেন যে, আমাদের একটা চাকর কাল পালিয়ে গিয়েছে কি না, একটা ঠিকে ঝি যদি আপনি জোগাড় করে দিতে পারেন, তাহ'লে খুব ভাল হয়।" জবাব দিলাম, "আচ্ছা—"

এলোকেশীকে ঝির সর্দ্দারণী বলিয়াই জানি। সকালবেলা কল্‌তলায় স্নান করিতে আসিয়া একবার দোকানের ঝাঁপটার কাছে দাঁড়ায়, চট্ করিয়া নারিকেল তেলের কলসীর ভিতর হইতে পলাটা আচম্‌কা তুলিয়া লইয়া, বাঁ হাতের চেটোয় তেল ঢালিয়া লয়। মাথার মাঝখানটায় একটা প্রকাণ্ড টাক পড়িয়া গিয়াছে, ঠিক সেইখানে সমস্তটা তেল ঢালিয়া দিয়া, মাথাটা অদ্ভুতভাবে চাপ্‌ড়াইতে চাপ্‌ড়াইতে বলে, "শরীলটা বড়ই কাহিল হ'য়ে পড়েছে, দা'ঠাকুর।"

আড়চোখে তাহার তেল লওয়ার বহর দেখি, চালের দাম ধরি, ছয় টাকার জায়গায় এগারো টাকা, সরিষার তেলের দাম ধরি সাড়ে ন' আনার জায়গায় বারো আনা।

দুই পয়সা দামের লাল, নীল, গোলাপী, সবুজ গায়ে মাখিবার সাবানের দাম ধরি চার পয়সা করিয়া—এই প্রকারেই বাঁচিয়া আছি।

সন্ধ্যাবেলায় 'অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স'-এর পিছনের খোলার ঘরে কালীচরণের শাস্ত্রচর্চ্চার বৈঠক বসে, সঙ্গে সঙ্গে চলে সঙ্গীত। এলোকেশীকে সেখানে বসিয়া অত্যন্ত গম্ভীর মুখে মহু, পরাশরের শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতে শুনি প্রায় প্রত্যহ। সেইদিন সন্ধ্যাবেলা তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, "এলোকেশী, আমাকে একটি ঠিকে ঝি জোগাড় করে দিতে পারবে, বাছা? মহীনবাবুদের দরকার, আমাকে বলেছেন।"

কথা শুনিয়া এলোকেশী চোখে কাপড় দিল, ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে বলিল, "যেমন বরাত করে' এইচি, দা-ঠাকুর—তোমাদের এই তুরুশ্চু কথাটিও যে রাখব, ভগবান কি সেই সুখটুকুনই আমার কপালে নিকেচেন? হারামজাদীরা কি আজকাল আর বাসন মাজতে চায় গো, দা'ঠাকুর। বললে, বলে কি জান? কালীঘাটে মা'র মন্দির আছে, সকালে বিকালে তারই দোরগোড়ায় যদি বসি, চোখ বুজে যদি বলি, দোহাই গো বাবু, দোহাই গো মা, এই গরীব, অন্ধ, অনাথাকে একটি পয়সা দিয়ে যাও গো দয়া করে, এক গুণ দিলে সহস্র গুণ হ'বে, ধনেপুত্রে লক্ষ্মীলাভ হবে,—তাহ'লে দু বেলায় কিছু না হলেও একটা টাকা ভিক্ষে মেলে,—গতর খাটাতে যা'ব কোন্ দুঃখে!" বলিতে বলিতে এলোকেশী কাঁদিয়া ফেলিল আর কি।

অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইলাম, বলিলাম, "তারা যদি না কাজ করে, তবে তুমি আর কি করবে বাছা! তোমার আর দোষ কি? তুমি নিজের কাজে যাও এলোকেশী, আমি মহীনবাবুদের বলব'খন যে, ঝি পাওয়া গেল না।" কিন্তু, আমার এই তুরুশ্চু কথাটা পর্য্যন্ত না রাখিতে পারিয়া, সে আবার চোখে আঁচল দিয়া অতীত কালের সমস্ত ঝি এবং বর্ত্তমান কালের ভিখারিণীদের উদ্দেশে অযথা বহু কটুকাটব্য করিয়া অতিশয় ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিল।

যথেষ্ট চেষ্টা করিলাম কয়েক দিন ধরিয়া, কিন্তু বেশ মোটা মাহিনা কবুল করিয়াও একটা ঝি জুটাইতে পারিলাম না।

দোকানের সম্মুখের নর্দ্দমাটার বিষাক্ত দূষিত বাতাস সমস্ত পল্লীটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। নিঃশ্বাস টানিতে ভয় হয়, মনে হয় যেন কখন কি অঘটন ঘটিয়া বসিবে। ইহারই মধ্যে দুইটা পয়সা সঞ্চয় করিবার আশায় চোখ কান বুজিয়া অগ্রসর হইয়াছি।

সন্ধ্যাবেলা, ধুনা দেওয়া হইয়া গিয়াছে। একটা কেরোসিনের আলো মাচার সহিত ঝুলাইয়া দিয়াছি। তাহারই নীচে একটা পাঁচসিকা দামের চৌকির উপরে বসিয়া স্পেনসারের "ফেয়ারি কুইন" খুলিয়া বসিয়া মনে মনে হাসিতেছি।

সহদেব আসিয়া ঘরে ঢুকিল। গায়ে তাহার ছেঁড়া জামা, চোখ দুইটা আরও ভয়ানক বলিয়া মনে হইতেছিল, ঠোঁটের কোণ দুইটা দিয়া পানের কস্ গড়াইয়া পড়িতেছিল, হল্‌দে রংয়ের দাঁতগুলাতে লালের ছোপ লাগিয়া একটা অসহ্য কদর্য্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল। সমস্ত মুখখানার দিকে যেন তাকাইতে পারা গেল না। মাথার চুলগুলা উস্কখুস্ক, জুতাটার পিছনের চামড়াটা হিল হইতে একেবারে আল্‌গা হইয়া গিয়াছিল, পা-টাকে ছেচ্‌ড়াইয়া ছেচড়াইয়া সেটাকে বহন করিতে হয়।

সহদেব আমার অত্যন্ত কাছ ঘেঁসিয়া আসিয়া বসিল। ভারি আত্মীয়ের মতন কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া বলিল, "বড় মজা দা'ঠাকুর—তুমি যদি দেখতে—মাইরি বল্‌ছি, এমন খাসা লাগ্‌ল,—কচি গলা, গাড়ীটাতে টেরও পেলুম্‌নি কোনও কিছুর ওপর দিয়ে যাচ্ছি, বেশ হয়েছে, শালার ছোঁড়ারা যেমন বদ্‌মাস। রোজ বারণ করি, বলি, 'বাচাধন যে দিন ধরতে পার্‌ব, সে দিন মজাটা টের পাইয়ে দেব।' এখন লাও ঠ্যালা।"

অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম, তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া নহে, তাহার কথা শুনিয়া বিস্ময় লাগিল।

একটা অতিশয় কালো রুমাল পকেট হইতে বাহির করিয়া কপালের ঘাম মুছিতে মুছিতে সহদেব বলিল,

"এক শালার বাবু ধরে ফেলেছিল আর একটুকুন হ'লে দা'ঠাকুর, আরে কলকেতায় আছি আজ বিশ বচ্ছর— সহদেব কি তেম্‌নি কাঁচা ছেলে!" বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

রুমালটা পকেটে রাখিয়া দিয়া আবার বলিল, "পাঁচ সাত শালা তেড়ে এল, দিলে হারামজাদা ব্যাটারা জামাটা ছিঁড়ে, এই দেখ না দা'ঠাকুর—" বলিয়া, জামার ছিন্ন স্থানগুলি সে অত্যন্ত কাতর মুখ করিয়া দেখাইল।

"তার পর এ-গলি, সে-গলি,—লে শালারা এখন কি কর্‌বি কর।" সহদেব অত্যন্ত হাসিতে আরম্ভ করিল, সে হাসি আর থামিতে চায় না।

খক্ করিয়া এক ড্যালা থুথু ঠোঁট ডিঙ্গাইয়া চিবুকের উপর গড়াইয়া আসিল,—ডান হাতের জামার আস্তিনটা দিয়া সেটা মুছিয়া ফেলিয়া সহদেব বলিল, "দাও দিকিনি, দা'ঠাকুর, নারকোল দড়িটে এগিয়ে, একবার বিড়িটে ধরাই।"

তাহার কথা কিছু বুঝি নাই;—এতক্ষণ পরে প্রথম জিজ্ঞাসা করিলাম, "কিন্তু সহদেব, ব্যাপারখানা কি বল দিকিনি পরিষ্কার করে?"

একটা প্রচণ্ড টানে বিড়ির মাথার আগুনটাকে তলায় নামাইয়া আনিয়া, কণ্ঠস্বর করুণ করিয়া সহদেব বলিল, "আর থাকব না এ শালার দেশে, দা'ঠাকুর,— এখানে ভাল মানুষের কদর নেই,—সন্ন্যাসী হ'ব। মাইরি বল্‌ছি, দা'ঠাকুর, আজই রাত্তির বেলা এখান থেকে চলে যাব, বিবাগী হ'ব। ওই যে গো তোমার অহীনবাবু না ফহীন্‌বাবু, তারই এগারো বারো বচ্ছরের ছেলেটা, রোজ ফাঁকি দিয়ে গাড়ী চড়ে ইস্কুলে যায় আসে। দল আছে আবার ওদের। যখন টিকিট্ কাট্‌তে যাই, অম্‌নি কোত্থেকে এসে উঠে পড়ে, টিকিট কাটা রেখে তেড়ে এলেই ঝুপ করে নেমে যায়। রোজ বলি, 'যেদিন ধরতে পারবো, সেদিন ফাঁদ দেখিয়ে ছাড়ব।' তা ব্যাটাদের ধর্‌তে গেলে চট্‌পট্ সরে পড়ে। কিন্তু কতদিন আর ফাঁকি দেবে? আজ ধরলুম ওই তোমার অহীনবাবুর ছেলেকে, বাকী সব ক'টা পালাল। বল্‌লুম, 'বাছাধন, এবার কি হয়?' ছোঁড়াটা চোখ রাঙিয়ে বল্‌ল, 'ভালো চাও ত ছেড়ে দাও বল্‌ছি।' আরে, মুনিবের নিমক খাই, রোজ রোজ চালাকী! কিন্তু এত করি শালা মুনিবের জন্যে, তবু বলে, তোমাকে দিয়ে কাজ হ'বে না, দূর করে দেব একদিন। আর ছোঁড়াটা কি বদ্‌মাইস্ দেখ দা'-ঠাকুর! একফোঁটা বিষ নেই, কুলোপানা চক্কর! গাড়ী ছাড়্‌ল ফুল ইস্পিডে, শালার ছেলেকে বল্‌লুম, 'এইবার ঠ্যালাখানা বোঝ্'—আস্তে আস্তে ধরে মারলুম জোর করে এক ধাক্কা,—পড়ল চাকার তলায়। রাস্তা গেল লালে লাল হয়ে—হুররে—রে—। দাও দিকিনি, দা'ঠাকুর, একটা কাঁচি সিগ্‌রেট, একটু মুখ বদ্‌লাই।"

বাহিরের আকাশ বৈশাখের শুক্‌না মেঘে কালোয় কাল হইয়া গেছে। ঝড়ের সম্মুখের পাতাগুলা উড়িয়া আসে হা হা করিয়া, ধূলার কণাগুলা চোখে মুখে আসিয়া লাগে, যেন কাহাকেও ক্ষমা করিবে না।

সহদেব সিগারেট ফুঁকিতে লাগিল। বলিল, "আজই যাচ্ছি, দা'ঠাকুর, ছিচরণে কত অপরাধ করে গেনু, কিছু যেন মনে কোরোনি।" সেই ছেলেটির কথা মনে পড়িল, অহরহ কত ছুটাছুটি করিতে দেখিয়াছি কাছাকাছি রাস্তা দিয়া, সারাদিনের মধ্যে কত অসংখ্যবারই না তার উল্লাসচঞ্চল খেলাধূলা চোখে পড়িয়াছে, উজ্জ্বল, সঙ্কোচহীন, বুদ্ধিদৃপ্ত দৃষ্টি,— সপ্রতিভ হাস্যমুখর বাক্য।

ছাতাটা হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম, দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করিয়া অহীনবাবুর বাড়ী গেলাম, থানায় গেলাম। ঘণ্টাখানেকের পরে দারোগা আসিল, কনেষ্টবল আসিল।

আস্তিন গুটাইয়া সহদেব বলিল, "ওই বজ্জাত বামুন শালাকে খুন করে ফাঁসী যাব।"

আকাশে আকাশে মেঘের খেলা, বিদ্যুতের খেলা, স্রেফ্ খেলা, শুধু খেলা, দুই একটা বাজ পড়ে না, ডাকেও না, আকাশ যায় পরিষ্কার হইয়া!

অন্নপূর্ণা ষ্টোর্স-এর পিছনে কালীচরণের শাস্ত্রব্যাখ্যা চলে।

বিচারের দিন, আদালতে গেলাম। বিচারকের পাশে একখানি কেদারায় বসিয়া ছিলেন সবিতা দেবী,—অহীনবাবুর স্ত্রী। বছর ত্রিশ বত্রিশ বয়স হইবে মেয়েটির। বড় চিন্তা করিয়া তাহার চোখ দুইটি কোন্ এক শিল্পী গড়িয়াছিলেন,—দুই চোখের দৃষ্টি দিয়া সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন তিনি গ্রহণ করিয়া লইতে পারেন। গভীর কালো তাঁহার দৃষ্টি, তাহার ভাবের কূল যেন পাই-পাই করিয়াও পাওয়া যায় না। সরু তুলির নিপুণ হাতের দুই টানে তাঁহার ভ্রূ দুইটি আঁকিয়া তাঁহার স্থষ্টিকর্ত্তা বোধ হয় নিজেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

কিন্তু, এখন সে চোখের পানে চাহিলে ভয় হয়,—দুইটা চোখের স্থির পলকহীন দৃষ্টি সহদেবের মুখের উপরে নিবদ্ধ ছিল। সহদেবের বুকে লাগিল ভয়, লাগিল শঙ্কা। মনে হইতেছিল ইহার কাছ হইতে লেশমাত্র দয়াও মিলিবে না, ইহার নিকটে ক্ষমার প্রস্তাব বাতুলেও করিতে পারে কিনা সন্দেহ, সহদেব মাথা নীচু করিল।

সবিতা দেবীর চোখের দিকে চাহিয়া আমার বিস্ময় লাগে। সমস্ত হৃদয়ের রুদ্ধ বেদনা তাহাদের পারে আসিয়া থমকাইয়া আছে, সামান্য একটু নাড়া পাইলেই ঝরিয়া পড়িবে। মুখের কথার নানারকম ভাষ্য চলে, সুবিধামতন অর্থ করিয়া লইয়া প্রয়োজন হইলে মনকে চোখ ঠারাও যে না যায় এমনও নয়। কিন্তু সবিতা দেবীর সে দৃষ্টিকে ভুল বুঝিবার উপায় ছিল না। মুখের ভাষার অপেক্ষা ঢের বেশী জোরালো ভাষায় সবিতা সহদেবকে বলিতেছিলেন, "তোমাকে নখে করিয়া সহস্র সহস্র টুকরা করিয়া যদি ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারিতাম, তাহার প্রতি টুকরাটিকে যদি অনন্ত নরককুণ্ডে নিক্ষেপ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে হয়ত শান্তি পাইতাম। কিন্তু তাহাও কতটুকু?—"

রায় বাহির হইল, পৃথিবীর বিচারক তাঁহার আইন-কানুন ঘাঁটিয়া এক্ষেত্রে যাহা চরম করিতে পারেন, তাহাই করিলেন,—সহদেব যাবজ্জীবনের জন্য দ্বীপান্তর গেল।

অহীনবাবু সবিতা দেবীকে লইয়া আদালতের বাহিরে আসিলেন, আমার পায়ের উপরে মাথা লুটাইয়া সবিতা পড়িয়া রহিল।

অন্তরে—

সবিতা তাহার ছেলের জামা, কাপড়, শার্ট, প্যাণ্টালুন জুতা, মোজা ইত্যাদি জড় করিয়া লইল। বই, খাতা, পেনসিল, দোয়াত, কলম সব এক জায়গায় গুছাইয়া রাখিল, কুমারের ছোট্ট লাইব্রেরীর সমস্ত বইগুলি ঝাড়িয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিল, আলমারীগুলার ধূলা সাফ্ করিয়া, কাচ পরিষ্কার করিয়া ঝক্‌ঝকে করিয়া তুলিল। ছেলের জামা কাপড়, ছেলের বই খাতা প্রভৃতি লইয়া মাথায়, মুখে, বুকে, হাতে স্পর্শ করাইয়া সবিতা ধীরে ধীরে ডাকে, "কুমার, কুমার,—খোকা, বাবা আমার মাণিক আমার, সোনা আমার—"

কুমারের খেলার জিনিসগুলা একত্র করিয়া তুলিয়া রাখিয়া সে আস্তে আস্তে বলে, "খোকা দুষ্টু, ইস্কুলের বেলা হ'য়ে যাচ্ছে, লাট্টু খেলা এখন থাক—"

সবিতা নিষ্পলকনেত্রে চাহিয়া থাকে, তাহার বিশাল চোখ দুইটি শুকনা খটখটে হইয়া আছে, আনাচে-কানাচে কোথাও এক ফোঁটা জলের সন্ধান নাই—কুমার কোন্ ফাঁক দিয়া কেমন করিয়া পালাইবে তাহাই দেখিবার জন্য যেন সে অতিশয় ব্যস্ত। তাহার কোলের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া ইলা কাঁদিয়া বলে, "কাকিমা—"। ইলার মাথার উপর নিজের ডান্ হাতখানি রাখিয়া সবিতা দিন কাটায়। একদিন আমাকে আসিয়া বলিল, "দাদা, পূজোর ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর গিয়েছিলাম,—কুমার কিছুতেই গেল না, বল্লে সবাই ওকে বলে যে, ও নাকি মাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারে না। সেইজন্যই ও এবার আমার সঙ্গে না গিয়ে, কল্‌কাতায় থেকে সকলকে দেখিয়ে দেবে যে, সে কথা সত্যি নয়। আমি কত বোঝালাম, উনি কত বললেন, কিন্তু দুষ্টু ছেলে কিছুতেই খেতে চাইলে না। শেষে ওকে মিহিরের জিম্মায় রেখে, মিহিরকে ভাল করে বলে-ক'য়ে উনি, আমি আর ইলা

ঠাকুর চাকর, সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম। কিন্তু মোটে চারদিন, তার ভিতরেই আমি উঠলাম অস্থির হয়ে, খোকাও তার চিঠিতে লিখল, 'মা, তুমি কি শীগগির আসবে না?'—আমি ফিরে এলাম, খোকাও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারল্ না, আমিও না।"

সবিতা ম্লান হাসিল, সে যেন হাসি নয়, ঠোঁটের কোণে দাঁড়াইয়া, "আচ্ছা তাহ'লে চল্লাম" বলিবার জন্য যেন প্রস্তুত হইয়াই থাকে।

সবিতা বলিল, "খোকা আমায় চিঠি লিখেছিল, তোমায় পড়ে' শোনাব, দাদা?"

বলিলাম, "পড়—"

ব্লাউজের ভিতর হইতে সবিতা একখানা চিঠি বাহির করিয়া বলিল, "আমার কুমার, কত তার বুদ্ধি, লেখা-পড়ায় কত তার আগ্রহ, একটু দুষ্টু, একটু দুরন্ত, কিন্তু সকলের জন্যে কত তার ভালবাসা, মার জন্যে কত তার টান—"

চিঠিটা খুলিয়া ঠিক করিয়া লইয়া, সবিতা বলিল, "দাদা, তুমি পড় আমি শুনি—"

পড়িতে লাগিলাম,—শিশু হাতের গোটা গোটা অক্ষর, কিন্তু কোথাও একটা ভুল নাই। পত্রখানির ভিতর দিয়া একটি তীক্ষ্ণধী শিশুর হাস্যসমুজ্জ্বল মূর্ত্তিটি বার বার মনে পড়িয়া গেল, চারিদিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া সে যেন চোখের সম্মুখে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। আমি চিঠিখানা পড়িয়া চলিলাম—

"শ্রীচরণেষু,

মা, তোমাদের পৌঁছা খবর এইমাত্র পেলাম। তুমি আমায় বলে গিয়েছিলে ত যে আমি যেন তোমার চিঠি পাওয়ামাত্রই উত্তর দিই,—সেইজন্যেই এক্ষুনি তোমার চিঠির উত্তর দিচ্ছি। নইলে খেয়ে দেয়ে তারপরে দিতাম। তুমি আরও বলেছিলে ত আমি যেন সমস্তদিনের সব কথা লিখি, একটুও যেন বাদ না দিই। তাই লিখ্‌ব। তুমি দেখো। তোমরা ত চলে' গেলে সাড়ে আটটার সময়; তারপর মিহির-দা একটি পরামাণিক ডেকে নিয়ে এসে চুল কাটতে বস্‌লেন, সাড়ে ন' টার সময় চুল ছাটা শেষ হ'ল, এবার স্নানের পালা। আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেলাম ক্যারম্ খেল্‌তে। প্রায় সাড়ে দশটায় সময় ফিরে এসে দেখি মিহির-দা বৈঠকখানা ঘরে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, আর ঝি এসে রান্নাঘর ধোয়া আর উনুনের ছাই তোলা আরম্ভ করে দিয়েছে। বুঝলাম, মিহির-দা'র খাওয়া হয়ে গিয়েছে। ঝির ঘর ধোয়া শেষ হ'লে আমি হাঁড়িটা দেখতে গেলাম তার ভিতরে কি আছে। একটা থালাতে ভাত, ডাল, ডিম-ভাতে, আর আলুভাতে নিয়ে আমি খেতে বসলাম। লছমি সিং তোমাদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে এল। আমি বল্লাম, 'লছমী সিং, তোমহারা আজ ছুট্টি, যাও—তব সাজকা বখৎ ফিরকে আও, হাম্ ভাসান দেখতে যায়েগা।'

লছমী বল্ল, 'বহুৎ আচ্ছা, খোকাবাবু'—বলে' চলে গেল।

আচ্ছা মা, ঠিক করে বোলো ত আমি যে হিন্দীতে লছমীর সঙ্গে কথা কইলাম, সে হিন্দীটুকু ঠিক হ'য়েছে কি না। মা তুমি যেন এ হিন্দীর কথা কাউকে বোলো না, বিশেষ করে দিদিমণির কানে যেন না যায়। সে-বার ত ও-ই শুধু শুধু আমার হিন্দী নিয়ে ঠাট্টা করেছিল, বলেছিল না, 'খোকা, তুই একটা হিন্দীতে বই লেখ্ ভাই, আমি কাকাকে বলে সেটা ছাপিয়ে দেব?'—সেইদিন থেকেই ত আমি লছমী সিং ওদের সঙ্গে পর্য্যন্ত বাংলায় কথা কই। কিন্তু সেদিন আমি কি বলেছিলাম জান, মা? লছমী সিং এসে আমায় বল্ল যে, বাবা ওকে শ্যামবাজার পাঠাচ্ছেন, কিন্তু ও জানে না যে, কোথায় গিয়ে ট্রামে চড়বে। দিদিমণি আর আমি তখন অঙ্ক কষ্‌ছিলাম। আমি লছমীকে বললাম, 'দ্যাখো লছমী সিং, বড় রাস্তাকা মোড়পর গিয়ে'—বলেই দেখি যে দিদিমণি আমার দিকে খুব ভালমানুষের মত তাকিয়ে যেন হাস্‌বার জন্য একেবারে রেডি হয়ে রয়েছে। আমি ঘাবড়ে গেলাম, তারপরে যা থাকে কপালে ভেবে, খুব জোরের সঙ্গেই বলে উঠলাম, 'শ্যাম-বাজারকা গাড়ী পর উঠে পড়।' অমনি দিদিমণি যেন হাসির চোটে ফেটে পড়ল, আর তারপরে যা হ'য়েছে তা ত তুমি জানই মা! দিদিমণির ক্লাশের মেয়েরা আমার হিন্দীর কথা শুনেছে, বাবার

বন্ধুরা সবাই শুনেছেন, তোমার বন্ধুরা শুনেছেন। দিদিমণি যত লোককে চেনে, সকলকে বলেছে। ভয়ানক মেয়ে মা ও! ওকে যেন তুমি কোনমতেই এবারকার হিন্দীর কথা বোলো না, তাহ'লে কল্‌কাতায় ফিরে ও আর আমায় আস্ত রাখবে না। আমি আর হিন্দী কোনদিন বল্‌তামও না ওর ভয়ে,—কিন্তু তখন দেখলাম কি, কেউ কোথাও নেই, তাই ভাব্‌লাম এই ফাঁকে যদি একটু হিন্দী শিখে ফেল্‌তে পারি তাহ'লে তোমরা ফির্‌লে পরে দিদিটাকে আচ্ছা জব্দ করা যাবে। —আচ্ছা, তুমি বল ত মা, ওই হিন্দীটুকুর ভিতর কি কোনও ভুল হ'য়েছে, বোধ হয় হয়নি, না?

কিন্তু আমার খাওয়ার কথা বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলাম—বেশ মজা, না? আমার খাওয়া শেষ হ'ল। গয়লা দুধ নিয়ে এল, আমি কড়াটা দিলাম, গয়লা দুধ দিয়ে গেল। কিন্তু দুধ গরম কর্‌ব কি করে? উনুন ত ঝি বেশ পরিষ্কার করে রেখেছে। আমি বিষ্টুদের বাড়ী গেলাম, লীলাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, ওদের বাড়ীর উনুনে আগুন আছে কি না। লীলা বল্‌লে যে আছে, কিন্তু এখনও রান্না শেষ হয়নি—যখন শেষ হ'বে তখন দুধ নিয়ে যাব গরম করবার জন্যে। আমি রান্নাঘরে দুধটা ঢাকা দিয়ে রেখে ঝির বাসন-মাজা শেষ হয়েছে দেখে বল্‌লাম, 'পচার মা, বাসনগুলো ওপরে দিয়ে যাও, আর রান্নাঘরের কোণে কালকের রাত্তিরের লুচি আছে নিয়ে যাও। ঝি বাসন রেখে গেল, লুচি নিয়ে গেল। মিহিরদা'র ঘুম তখনও ভাঙেনি। আমি লাইব্রেরী-ঘরে অঙ্ক কর্‌তে বস্‌লাম। বেলা তখন বোধ হয় একটা, নীচে বৈঠকখানা-ঘর থেকে চেয়ার সরানোর যে-রকম সাড়াশব্দ উঠতে লাগল, তাতে আমার মনে হ'ল যে, মিহির-দা নিশ্চয়ই উঠেছেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে লীলা বল্‌লে, 'মিহিরদা, খোকা বল্‌ছিল দুধ গরম কর্‌বার কথা। আমাদের উনুন এতক্ষণে খালি হ'ল, দুধটা এনে দিন। আশ্চর্য্য হ'য়ে মিহির-দা বল্‌লেন, 'দুধ? এঁ্যা, দুধ? দুধ কি দিয়ে গিয়েছে নাকি?'

লীলা বল্‌ল, 'হ্যাঁ দিয়ে গিয়েছে ত, আপনি এনে দিন।'

মিহির-দা খুব সম্ভব রান্নাঘরে গিয়ে দুধটা এনে দিলেন। খানিক বাদে লীলা এসে আবার জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'মিহির-দা দুধ কেটে গেল, তা মা জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, একটুখানি মিষ্টি দিয়ে এই দুধটুকু কি জ্বাল দিয়ে ঘন করে দেবেন?' উত্তর না দিয়ে মিহির-দা ডাক্‌লেন, 'খোকা, খোকা'—লাইব্রেরী থেকেই চেঁচিয়ে বললাম, 'কি?'

'শুনে যাও—'

বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হতেই মিহির-দা বল্‌লেন, 'ভাঁড়ার ঘরের কোথায় চিনি থাকে জান ত?'

আমি বল্‌লাম, 'আমি ঠিক জানি না ত'—তারপরে লীলাকে বল্‌লাম, 'লীলা ভাই, সইমাকে ওটা চিনি দিয়ে জ্বাল দিয়ে দিতে বলো গে'—

লীলা লাফাতে লাফাতে চলে গেল, আমিও ফিরে এসে লাইব্রেরী ঘরে বস্‌লাম।

তুমি জান মা, মিহিরদাকে আমার একটুও ভালো লাগে না। এই যে কিছু দিন আগে, দেশের থেকে বাবা গড়খালি যাচ্ছিলেন' প্রজাদের সঙ্গে কি একটা মারামারি না কি হ'য়েছে শুনে' তখন ত আমি তাঁর সঙ্গে গেলাম, না? সেখানে যেতে সবাই বাবাকে বল্‌ল যে, মিহিরদা না কি শুধু শুধু সব লোকেদের ঘরদোর জ্বালিয়ে দিয়েছে, দরোয়ানদের দিয়ে তাদের ঘরদোর লুঠ করিয়েছে. তাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করেও না কি মিছি-মিছি সব বলেছে যে, তারা টাকা দেয়নি। বাবা সব শুন্‌লেন, নায়েব-মশাইকে ডেকে সব জিজ্ঞেস্ কর্‌লেন, গড়খালির মোড়ল-মশাইকে ডেকে পাঠালেন, শেষে মিহিরদা'কে খুব বকে দিলেন। কিন্তু এসব ত তুমি শুনেছই, মা। এবার তুমি যে কথা জান না, সে কথা বল্‌ব। যেদিন বাবা মিহিরদাকে বক্‌লেন, সেইদিন বিকেল বেলা. বাবা গিয়েছিলেন চরণপুর, আমি ছাদের ওপর বেড়াচ্ছিলাম, হঠাৎ ঘাটের কাছে একটা ছেলের চীৎকার শুনতে পেলাম, 'ওগো বাবু গো, আর কর্‌ব না গো, মরে গেলুম গো—' আর একটা লোক বল্‌ছে, 'এবার ছেড়ে দিন বাবু, আর করবে না বাবু—।' কি হয়েছে দেখবার জন্যে আমি দৌড়তে দৌড়তে নীচে

নাম্‌লাম, তারপর তিন লাফে ঘাটের কাছে গিয়ে হাজির হ'লাম। গিয়ে দেখলাম যে, মিহির-দা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে প'ড়ে একটা বুড়ো মুসলমান খুব কাঁদছে, আর কাশিম খাঁ খুব জোরে জোরে একটা ছেলের পিঠে জলবিছুটি লাগাচ্ছে। আমায় দেখে কাশিম একটু থাম্‌ল। আমি অবাক হ'য়ে মিহিরদাকে জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কি হ'য়েছে মিহিরদা ?'

মিহির-দা কিছু বল্‌বার আগেই সেই বুড়ো মুসলমানটা একেবারে হাঁউমাউ করে উঠ্‌ল, আর আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে একসঙ্গে অনেক কথা বলে ফেল্‌ল। ক্রমে ক্রমে আমি বুঝলাম যে, তার নাম আহম্মদ শেখ, তার ছেলে ঘাটের পাশের গোলাপ গাছ থেকে আজ দুপুরে দুটো গোলাপ ফুল ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল, সেই কথা জান্‌তে পেরে ম্যানেজার বাবু রহমান্‌কে ধরে এনে জল বিছুটি লাগাচ্ছেন। খুব রেগে গিয়ে আমি মিহিরদার দিকে তাকিয়ে বল্‌লাম, 'বেশ করেছে গোলাপ ফুল নিয়েছে, আরও নেবে, রোজ নেবে, আপনি তাতে জলবিছুটি লাগাবার কে ?' তারপরে কাশিম খাঁর হাত থেকে জলবিছুটিটা কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম, 'ফের যদি আপনি কারও গায়ে জলবিছুটি লাগান, তাহ'লে আমি বাবাকে বলে এইটে দিয়ে পিট্‌তে পিট্‌তে আপনাকে থানায় দিয়ে আস্‌ব।' চেয়ে দেখি কাশিম আর সেই ছেলেটা, দুজনেই কখন সরে পড়েছে। মিহিরদাও কিছু না বলে চলে গেলেন,—আমার ওপর খুব রেগেছিলেন, বোধ হয়। বুড়ো কেবল তখনও ছিল আমাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্যে। সে যা আনন্দের চোটে করতে লাগল, মা, আমায় সমস্ত পৃথিবীটা দিতে বল্‌তে লাগল তার খোদাতালাকে, আর এমন করে বল্‌তে লাগল যে, আমি ভাবলাম লোকটা বুঝি-বা ক্ষেপেই গেল। আমি শুধু বল্‌লাম, 'আচ্ছা, হ'য়েছে—তুমি রহমান্‌কে বলো সে যেন রোজ ফুল নিয়ে যায়, ভয় খায় না যেন --'

তবু কি সে যেতে চায়। কত করে' তবে তার হাত থেকে ছাড়া পেয়েছিলাম। তুমি আমায় প্রায়ই বল না, মা,—'খোকা,' দুঃখীর দুঃখ দূর করিস্, বাবা, নিজের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না রেখে, যখন ব্যথিতের চোখের এক ফোঁটা জল্ মুছিয়ে দিবি, তখন ভগবানের দরবারে তোর নামে এমন একটা জিনিষ জমা হ'য়ে থাক্‌বে যার তুলনা এ পৃথিবীতে কোথাও মিল্‌বে না ?' তোমার মুখে কোন কথা একবার শুন্‌লেই ত সেটা আমার মুখস্থ হ'য়ে যায়। তোমার কোন কথা আমি ভুলি না ত, আর একথা ত তোমার কাছ থেকে কতবার শুনেছি। কিন্তু কিচ্ছুই বুঝিনি—ভগবানের 'দরবার' কি ? 'স্বার্থ' কাকে বলে ? কি জমা হ'বে ? কিচ্ছু বুঝি না। কিন্তু তোমার মুখে শুন্‌তে এত ভাল লাগে ! আচ্ছা মা, বল ত, সেদিন কি ভগবান সুখী হয়েছিলেন ? আর ভগবান সুখী হয়েছিলেন কি না, তা আমি জান্‌তেও চাইনে,—তুমি সেদিনকার কথা শুনে খুসী হচ্ছ কি না বল ত মা-মণি !—"

সবিতা কহিল "আমি খুসী হয়েছি খোকা,—ভগবানও হয়েছেন,—সোনা আমার, মার সব কথা তোর মনে থাকে ?"

আমি চুপ্ করিয়া রহিলাম।

সবিতা বলিল, "থাম্‌লে কেন, দাদা ? পড়ো—"

আমি আবার পড়িতে লাগিলাম,—"কিন্তু আমি আবার আমার চিঠির মাঝখানে থেমে গিয়েছি,—ভারি অদ্ভুত, না ? তোমাকে এতদিন এ কথা বলিনি কেন জান ? আমার রোজ ইচ্ছে কর্‌ত, তোমাকে বলি, কিন্তু ভারি লজ্জা কর্‌ত, সেইজন্যই বলিনি, আজকে ত বল্‌লাম, আগে বলিনি বলে তুমি যেন দুঃখ কোরো না লক্ষ্মীটি মা,—একথা ছাড়া আর সব দিন ত সবকথা তোমাকে বলেছি। তুমি যেন রাগ কোরো না, মা-মণি।

"আমি লাইব্রেরী-ঘরে গিয়ে অঙ্ক কষতে বস্‌লাম। বেলা তখন দুটো। বিষ্টুদের বাড়ী বিষ্টুকে ডাক্‌তে গেলাম, বাইরের ঘরে দেখলাম মিহির-দা ঘুমোচ্ছেন। বেলা তখন বোধ হয় সাড়ে তিনটে। আমি বিষ্টুদের বাড়ী থেকে ফিরে এলাম, মিহির-দা তখনও ঘুমোচ্ছেন। রামায়ণের কুম্ভকর্ণ ত ছ'মাস ঘুমোত, সে ত আর এখন বেঁচে নেই, কিন্তু যদি

সে এখন থাক্‌ত আর তার সঙ্গে মিহিরদার ঘুমের কম্পিটিশন হত, তাহ'লে কে জিত্‌ত বল ত! আমি বল্‌ব ?—মিহির-দা। আমি আবার অঙ্ক কষতে বস্‌লাম। চারটে বাজে, আমার খিদে পেয়েছে। ঝি ত আসেনি। খাবার আনবে কে ? ভাবতে ভাবতেই ঝি এল। ও অনেকদিন বাঁচবে, না মা ? আমি টাকা দিলাম, ও খাবার নিয়ে এল। কিছু ভেবো না, মা, মুখুয্যেদের দোকান থেকেই এনেছে। আমার খাওয়া শেষ হ'ল। জলের গ্লাস নিয়ে এসে ঝি জিজ্ঞেস্ করলে, 'খোকাবাবু, দুধ ত ছানা হয়ে রয়েছে, কিন্তু ওটাকে চিনি দিয়ে ঘন করলে কে ?'

আমি বল্‌লাম, 'সইমা।'

বুঝলাম যে লীলা ওটা একসময় দিয়ে গিয়েছে। বিষ্টুকে জিজ্ঞেস করতে গেলাম যে, ওরা কখন ভাসান দেখতে যাবে। মিহির-দা ঘুমোচ্ছেন। বেলা সাড়ে পাঁচটা, বাড়ী ফিরে এলাম, মিহির-দা খবরের কাগজ পড়ছেন। লছমী সিং এখনও ফেরেনি। সন্ধ্যে ছ'টা, মিহির-দা ভাসান দেখতে বার হলেন। একটু পরেই বিষ্টু, লীলা, খুকু, বিশু, রুচি ওরা সব হুড়্‌মুড়্ করে লাইব্রেরী-ঘরে এসে ঢুক্‌ল, সব কটাতেই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল, 'খোকা, শীগ্‌গির কর, বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমরা ভাসান দেখতে যাব।'

আমি দেখলাম, লছমী সিংয়ের জন্যে বসে থাক্‌লে চলবে না। চট্‌পট্ করে কাপড়, জামা, জুতো পরে বিষ্টুদের সঙ্গে ঠাকুর দেখতে বেরোলাম, গেটে তিনটে তালা দিয়ে। বেরোবার আগে একবার বৈঠকখানা-ঘরটার ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পেলাম, একটা কাচের গ্লাসে আধ গ্লাস জল, সেটা মেঝেতে পড়ে রয়েছে,—মিহির-দা জল খেয়ে রেখে গিয়েছেন বোধ হয়। তক্তপোষগুলোর ওপর আর মেঝের উপর কতকগুলো বাংলা খবরের কাগজ ছড়ান। ঘরের কোণে সেই যে মান্ধাতার আমলের টেবিলটা আছে, তার ওপরে পাতা খবরের কাগজগুলোতে অনেক পান আর চুনের দাগ। বাংলা খবরের কাগজগুলো 'হোয়াট-নট'টার নীচের তাকটা থেকে 'পড়ি-পড়ি' করছে। কতকগুলো জুতোর পাটি ঘরময় ছড়ান। মিহিরদা'র বড্ড দামী ভাঙা আয়নাটার খোঁজ নেই, বোধ হয় তক্তপোষের তলায় পড়ে গিয়েছিল। কৌচটার ওপর কতকগুলো মোজা গেঞ্জির খালি বাক্স ছড়ান। মিহির-দা কিন্তু একটু অপরিষ্কার আছেন, না মা ? আমরা ভাসান্ দেখতে গেলাম। যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন সাড়ে আটটা হ'বে। দরজার তালা সবেমাত্র খুলেছি, এমন সময় মিহিরদা' এসে বল্‌লেন, 'খোকা, তুমি এই আসছ ? আমি অনেকক্ষণ এসেছি, দরজায় তালা দিয়ে গিয়েছিলে, তাই ধীরেশবাবুদের বৈঠকখানায় ব'সে গল্প করছিলাম।' কাপড় জামা ছেড়েই তাড়াতাড়ি সইমাকে বিজয়ার প্রণাম করতে ছুটলাম। খানিকক্ষণ হুটোপাটি করলাম। বাড়ী ফিরে এসে শুন্‌লাম যে, পিসিমা খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। আবার একটু খাবার খেলাম। তারপরে এই ভেবে রান্নাঘরে ঢুকলাম যে, জ্বাল দেওয়া দুধটুকু খাব। কিন্তু দেখলাম যে কড়াইটা বেশ পরিষ্কার, আর তার ভিতর জল ঢালা রয়েছে। মিহিরদা' খেয়ে গেছেন নিশ্চয় ! আমার বেশ হাসি পেল। মিহির-দা কিন্তু বেশ লোভী আছেন, না ? 'লছ্‌মী সিং বাইরে থেকে ডাক দিল, 'খোকাবাবু—'

আমি বারান্দায় বেরিয়ে হিন্দীতে বল্‌লাম,'লছ্‌মী সিং, তোমায় না আমি সন্ধ্যের আগে ফিরতে বলেছিলাম।' লছ্‌মী সিং অনেক কাকুতি মিনতি করে বল্‌তে লাগ্‌ল যে অনেকদিন পরে তার কোন্ এক 'দেশকা আদ্‌মী'র সঙ্গে না কি দেখা, সে কিছুতেই ছাড়তে চায় না, তাই দেরী হ'য়ে গিয়েছে। তার অন্যায় হয়েছে, এমন আর কোন দিন হবে না, এইবারটা খোকাবাবু তাকে মাফ করুন। লছমী সিং চলে গেল। আমি হাত পা ধুয়ে এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

বিজয়ার দিন সকালবেলা ত তোমরা গিয়েছ, এই ত সেদিনকার সমস্ত খবর। তুমি আমায় বলেছিলে ত সমস্ত দিনের সব কথা লিখতে। ঠিক তাই লিখেছি। কিছুটি যে-বাদ দিয়েছি সে কথা আর কাউকে বল্‌তে হয় না। কিন্তু চিঠিটা কত বড় হ'য়েছে দেখেছ, মা ? —তোমরা কেমন আছ ? আমি ভাল আছি। তুমি
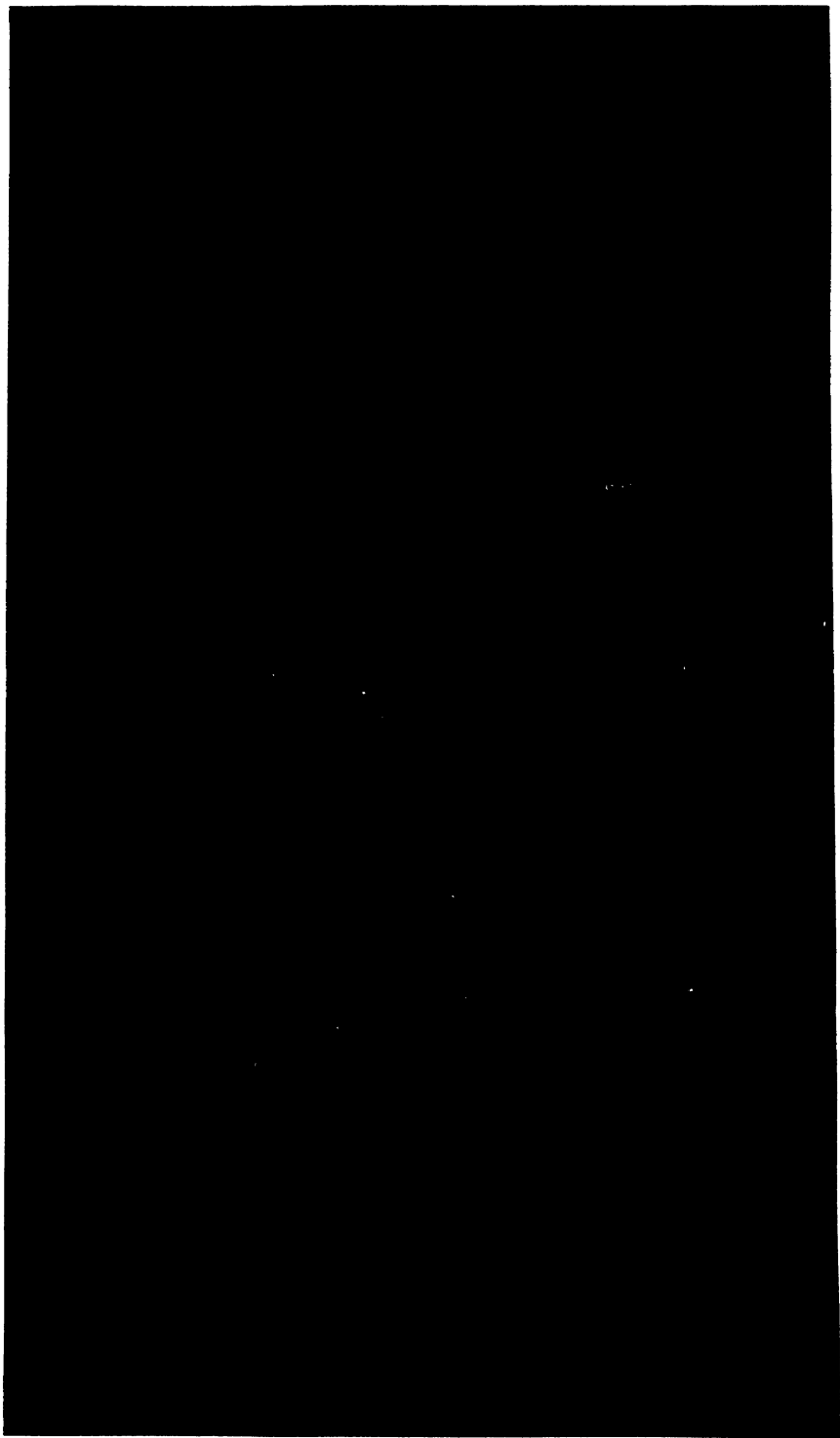
আনমনা

শ্রীকিরণময় ধর

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

আমার বিজয়ার প্রণাম, ভালবাসা, ভক্তি সব নিও। বাবাকে আমার বিজয়ার প্রণাম দিও। দিদিমণিটাকে দেবে? আচ্ছা দিও। দিদিমণির কাছে যে চিঠিটা লিখলাম, সেটা ওকে দিও। ঠাকুর, ঝড়ুয়া, কেষ্টা, ওদের সবাইকে বলো যে, খোকাবাবু বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছে। চিঠি পাওয়ামাত্র উত্তর দিও।

মা, আমার বড্ড মধুপুর দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আমি ত দু'তিনবার মধুপুর গিয়েছি, কিন্তু তবুও আমার এবারও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে, তোমার জন্যে মন কেমন করছে বলে যেতে চাইছি না, আমি এখানে থাকতে পারি, তোমার জন্যে কষ্ট হচ্ছে, তবু আমি থাকতে পারি। তুমি যদি মধুপুরে যেতে বল তবে আমি যাব মিহিরদার সঙ্গে। একথা কিন্তু আর কাউকে বোলো না যেন।

—তোমার খোকা

পুঃ—আচ্ছা মা, তোমরা যদি এখন ফিরে আস, তাহ'লে ত এর পরে বড়দিনের ছুটির সময় আমরা সবাই মধুপুর যেতে পারি,—আমিও সুদ্ধ। বড়দিনের সময় যদি আবার যাওয়া হয় তা'হলে মিছিমিছি ওখানে এখন বেশীদিন থেকে আর কি হবে? তোমরা কালই চলে আসতে পারবে না?—তোমার খোকা।

পুঃ—মা তুমি শীগগির আসবে না? খোকা"

পত্র পড়া শেষ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, আমার কিছু বলিবার ছিল না। কোন কথা না বলিয়া সবিতা আমার হাত হইতে চিঠিখানা গ্রহণ করিয়া সযত্নে ভাঁজ করিতে করিতে উঠিয়া গেল।

আমার মনে হয়, কুমার যেন অকস্মাৎ সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া আসিবে, লঘুচরণে আসিয়া সবিতাকে বলিবে, "মা, তোমায় ছেড়ে আমি থাকতে পারি,—বড় হয়েছি কি না, সেইজন্যে—তোমার জন্যে মন কেমন করে, তবু আমি থাকতে পারি। আমি এসেছি, তোমার জন্যে বড্ড কষ্ট হয়, কিন্তু সেজন্যে আসিনি,—এই এলুম, এম্‌নি..."

কুমার চলিয়া গেল,—সহদেবের দ্বীপান্তরবাসের সঙ্গে সঙ্গেই সবিতার বাহিরের দুঃখও যেন আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না। তাহার অন্তরের মন্দিরে আজ শিশুদেবতার পূজা চলে। উপকরণ সব কুমার নিজেই রাখিয়া গিয়াছে,—তাহার জুতা, মোজা, তাহার খাতা, বই, দোয়াত কলম, তাহার চিঠি, তাহার মাতৃস্নেহ লোভাতুর মন, তাহার সব-ভুলান "মা" ডাক। আয়োজনের ক্রটি নাই, নিষ্ঠারও অভাব হয় না। কিন্তু সবিতার চোখে রাস্তার পাশে পাশে কুমারের রক্ত দেখা যায়। বোন আমার শান্তি পায় না।

সেই আগেকার মতন দিন কাটিয়া যায়, পুরাপুরি চব্বিশ ঘণ্টাই লাগে, না কম, না বেশী। কিন্তু আমি সবিতার দাদার স্থান জুড়িয়া থাকি।

আমার কাঠখোট্টা চোখে জল আসে। ছোট ছেলেটি, হাসিমুখে আসিত, বলিত, "পাঁচ পোয়া আম চাই।" দাম ধরিতাম, আমার কেনা দামের অপেক্ষাও কম। ইউনিভার্সিটির ডিগ্রীর দাম, আমার লোকসানের দাম তাহার হাসির মূল্যে শোধ পাইয়াছি।
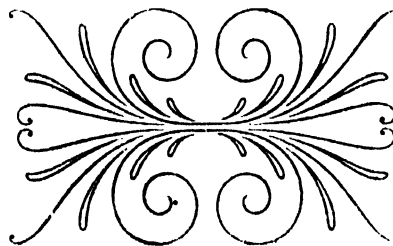
লবণ-রহস্য

শ্রীযোগেন্দ্রমোহন সাহা, এম্‌-এস্‌-সি

দীনতম ভিখারীর পর্ণকুটীর হইতে অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যেমন লবণের সমান ব্যবহার ও সমান আদর, তেমনি এই বিরাট বিশ্বের রন্ধ্র অনুরন্ধ্র প্রায় সকল স্থানেই লবণের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। যাবতীয় পাহাড়, পর্ব্বত, নদ, নদী, হ্রদ ও ঝরণা, সাগর ও মহাসাগর সর্ব্বত্রই প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে ন্যুনাধিক পরিমাণে লবণ বিরাজিত। অতি প্রাচীনকালেও লোকে লবণাম্বুরাশি সূর্য্যতাপে শুষ্ক করিয়া লবণ সংগ্রহ করিত। অধিক লবণাক্ত বলিয়া নদনদীর জলের তুলনায় সমুদ্র-জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব (specific gravity) অধিক। এইজন্য মালপূর্ণ জাহাজ সমুদ্র হইতে নদীতে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে উহার ভার লাঘব করা হয়, নতুবা ডুবিয়া যাইবার বিশেষ ভয় থাকে।

কিন্তু লবণ কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে পৃথিবীর শৈশব-ইতিহাসের আলোচনা করা আবশ্যক। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা পৃথিবী সৃষ্টির প্রারম্ভে রক্ত-তপ্ত গলিত গোলাকার বিরাট বস্তু-পিণ্ড মাত্র ছিল। সপ্তসমুদ্রের যত জল সেদিনে পুঞ্জীভূত তপ্ত ঘন বাষ্পাকারে এই পিণ্ডকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া ছিল।

ধরা ক্রমেই শীতল হইতে লাগিল এবং উহার বুকে ঐ মেঘ হইতে পতিত জলের সঞ্চার আরম্ভ হইল। বলা বাহুল্য, এই জল বিশুদ্ধ ও পরিস্কৃত ছিল। বস্তুতঃ, অনেক ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অনুমান করেন যে, সেই সুপ্রাচীন যুগের সাগর-সলিল নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ ছিল এবং ক্রমশঃ লবণ-দুষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই পৃথিবীর স্তরে স্তরে লবণ রহিয়াছে। বৃষ্টির জলে তাহা ধৌত হইয়া ক্রমশঃ সাগরে আসিয়া সঞ্চিত হইতেছে। সূর্য্যতাপে সাগরের জল অদৃশ্য লঘু বাষ্পে পরিণত হইয়া আকাশে উঠিয়া মেঘের আকার ধারণ করিতেছে। এই মেঘ বায়ু-ভরে পাহাড়-পর্ব্বতে গিয়া তথাকার শীতল বায়ুসংস্পর্শে আসিয়া পৃথিবীতে বারিপাত করিতেছে। এই জল পুনরায় লবণাক্ত হইয়া নদনদীপথে সাগরে গিয়া মিশিতেছে। এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন সৃষ্টির আদি হইতে অবিরাম চলিয়া আসিতেছে ও অনাগত অনন্ত ভাবী কালেও চলিবে। অথচ প্রতিবারেই লবণ পশ্চাতে পড়িয়া থাকে এবং প্রতি জলধারাই সাগরের বুকে কিছু-না-কিছু লবণ বহিয়া আনে। ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, প্রতি কয়েক হাজার বৎসরে সপ্তসমুদ্রের সমস্ত সলিল একবার বাষ্পাকারে উড়িয়া বৃষ্টি হইয়া পুনরায় সাগরে ফিরিয়া আসে।

যুগযুগান্তব্যাপী এই অপচয় সত্ত্বেও পাহাড় পর্ব্বত খনি গহ্বর প্রভৃতিতে এখনও এত লবণ আছে যে, আরও কোটি বৎসরেও তাহা নিঃশেষ হইবে না। কিন্তু এখনও সাগর-সলিল 'পূর্ণ লবণাক্ত' (saturated with salt) হয় নাই। কিন্তু অবশেষে এমন একদিন আসিবে যখন মহাসাগরের লবণ-তৃষ্ণার বিরাম হইবে—সামান্য পরিমাণ লবণও আর সে জলে দ্রবীভূত হইবে না। ফলে এই হইবে যে, সাগরের তলদেশে ও তীরভূমিতে স্তরে স্তরে দানাদার লবণ সঞ্চিত হইতে থাকিবে। জল এত গাঢ় হইবে যে, তাহাতে মৎস্য, কূর্ম্ম, কচ্ছপ, তিমি প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর পক্ষে নিমজ্জিত হইয়া বাস করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। তাহারা জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইবে ও অকাতরে মানুষের হাতে প্রাণবিসর্জ্জন করিবে। ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজ ডুবিলেও সে জলে মানুষ ডুবিয়া মরিবে না। কিন্তু দুর্ভাগ্য হইবে এই যে, তখন হইতে ক্রমে নদনদী, খালবিল প্রভৃতির জলও লবণাক্ত হইতে থাকিবে ও আজিকার সাগরজলের ন্যায় তাহাও মানুষের পক্ষে অপেয় হইয়া পড়িবে।

অনেকেই হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, সমুদ্রের লবণ দ্বারা পৃথিবীর বয়স নির্দ্ধারণ করা যায়। অধ্যাপক যলী (Joly) অতি সহজ উপায়ে তাহা সম্পাদন করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সাগরের জন্মের সময় উহার জল বিশুদ্ধ ছিল এবং বৃষ্টির জলে পাহাড় পর্ব্বতের লবণ ধৌত হইয়া নদীপথে সাগরে গিয়া পড়িয়া উহার জল ক্রমশঃ লবণাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। অধ্যাপক জলী প্রথমতঃ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত মহাসাগরের জলে কি পরিমাণ লবণ এখন আছে এবং বৎসরে প্রধান প্রধান নদনদীর জলের সঙ্গে কি পরিমাণ লবণ সাগরে গিয়া সঞ্চিত হয় তাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার গণনা মতে পৃথিবীর বয়স ১০কোটি হইতে ২০কোটি বৎসর বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। সাগরের জলে লবণের পরিমাণ শতকরা তিন ভাগের চেয়ে কিছু কম। যদি এই জল পূর্ণভাবে লবণাক্ত হইত তাহা হইলে উহাতে শতকরা ৩০ হইতে ৪০ ভাগ লবণ থাকিত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, এখনও পৃথিবীর শৈশবকাল। পূর্ণভাবে লবণাক্ত হইতে পৃথিবীর এখনও ন্যনাধিক দুই তিনশত কোটি বৎসর লাগিবে।

একশত ভাগ সাগরজলে প্রায় তিন ভাগ লবণ আছে। পৃথিবীর প্রায় চারিভাগের তিনভাগ সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্রের বিস্তৃতি মোটামুটি প্রায় ১৪১/২ কোটি বর্গমাইল। গড়ে সমুদ্রের গভীরতা প্রায় পৌনে তিন মাইল। সুতরাং সাগরপৃষ্ঠের প্রতি বর্গমাইল জলের নীচে প্রায় তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টন লবণ গলিত অবস্থায় আছে। এই হিসাবে সমগ্র সমুদ্রজলে লবণের পরিমাণ হয় ৪৫,৪০০,০০০,০০০,০০০,০০০ অর্থাৎ চারিশত চুয়ান্ন কোটি কোটি টন। সমস্ত ইউরোপের উপর এই পরিমাণ লবণ সমভাবে স্তূপীকৃত করিলে সেই স্তূপের উচ্চতা হইবে চারি পাঁচ মাইল। ইহা কি কম বিস্ময়ের কথা!

অবশ্য সকল সমুদ্রের জলই সমান লবণাক্ত নহে। মরু-সাগরের (Dead Sea) জলে শতকরা সাড়ে পঁচিশ ভাগ লবণ। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ইউটার (Utah) লবণ-হ্রদও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই হ্রদটি দৈর্ঘ্যে ৭৫ মাইল ও প্রস্থে ৫০ মাইল। সুতরাং ইহাকে সাগর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই হ্রদে মানুষ ডুবে না বরং অতি স্বচ্ছন্দে জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। এই শ্রেণীর হ্রদ সূর্য্যতাপের প্রভাবে শুষ্ক হইয়া গেলে প্রভূত পরিমাণে লবণ তলদেশে পড়িয়া থাকে। কালের প্রভাবে এই লবণস্তরের উপর মাটি চাপা পড়িয়া খনির সৃষ্টি হয়। আজকাল যে-সকল লবণের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের উৎপত্তিও বোধ হয় এই রূপেই হইয়াছে।

পৃথিবীর কোন কোন অংশে যে-সকল বিরাট সৈন্ধব বা সিন্ধু লবণের জমাট খনি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা অতীব বিস্ময়কর। জার্ম্মেনীর ষ্ট্রাস্‌ফুর্ট নামক স্থানে লবণের যে স্তর আছে, তাহা কোন কোন স্থানে অর্দ্ধ হইতে এক মাইল পুরু। অষ্ট্রিয়ার ভিলিৎস্‌কাতে যে লবণ স্তর আছে তাহা দৈর্ঘ্যে ৫০০ মাইল, প্রস্থে ২০ মাইল এবং গভীরতায় গড়ে ১,২০০ ফুট হইলেও, অনেক স্থলে তাহা ৪,৬০০ ফুটেরও অধিক। এখানকার লবণের খনিগুলি সম্ভবত পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যজনক। এখানে জমাট লবণ কাটিয়া সুরঙ্গ করিয়া সেই পথে ভিতরে যাতায়াতের সুবিধা করা হইয়াছে। খনির অভ্যন্তরে শুভ্র ঝলমলে চক্‌চকে লবণ-স্তর খুদিয়া অসংখ্য গহ্বরের সৃষ্টি করা হইয়াছে। মাঝে মাঝে বহু উজ্জ্বল উন্নত স্তম্ভরাজি সেই সকল গহ্বরের ছাদে সংযুক্ত হইয়া যে অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। এই খনিগর্ভে প্রায় ৩০ মাইল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া এইরূপ শতাধিক কক্ষ এক বিরাট গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছে। পাতালের এই লবণপুরী ৫ হইতে ৭ তালা বিশিষ্ট। প্রত্যেক তালাতেই অসংখ্য খিলানযুক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ও একতালা হইতে অন্য তালায় যাইবার জন্য লবণের সিঁড়ি রহিয়াছে। শুধু তাহাই নহে। সেই পাতালপুরীতে লবণ খুদিয়া একটি বিশাল খৃষ্টীয় ভজনালয় প্রস্তুত করা হইয়াছে। এই গির্জ্জার বেদী, আসন, আসবাব, দরজা, মহাপুরুষেদের মূর্ত্তি প্রভৃতি যাবতীয় জিনিষ লবণেই প্রস্তুত। ইহার নাম সেণ্ট এণ্টনীর গির্জ্জা। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়।

এই লবণপুরীর নৃত্যশালাটি আরও আশ্চর্য্যজনক। নৃত্যকালে স্ফটিকের দেওয়াল হইতে আলো এরূপ ভাবে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয় যে, সহসা মনে হয় বুঝি এই নাট্যমন্দিরের সর্ব্ব অঙ্গ লক্ষ লক্ষ হীরা-মুক্তা মণিমাণিক্যে গঠিত। বুঝি বা ধরণীর সর্ব্বাপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী অধীশ্বরেরও এমন উজ্জ্বল নৃত্যশালা নাই ক্ষণিকের তরে উর্ব্বশীর চারুচরণের নূপুরনিক্কণ-মুখরিত দেবরাজ ইন্দ্রের সভার কল্পনা মনকে মুগ্ধ অভিভূত করে।

কোন কোন প্রকোষ্ঠে লবণস্তর কাটিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফটিক ঝাড় প্রভৃতি প্রস্তত করা হইয়াছে। একটি প্রকোষ্ঠে ৩৫ ফুট লম্বা ও ৬০ ফুট ব্যাসের একটি ঝাড় আছে। এই সকল ঝাড় যখন উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হয় তখন তাহার সৌন্দর্য্য-মহিমা বর্ণনাতীত।

এই লবণপুরীতে হ্রদ সরোবর প্রভৃতিও খনন করা হইয়াছে এবং সেই সলিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরণীও ভাসিয়া বেড়ায়। কোন কোন হ্রদ শত শত ফুট লম্বা খালে অন্য হ্রদের সহিত সংযুক্ত। ইহাদের জল কোন কোন স্থলে প্রায় ২০ ফুট অবধি গভীর। কিন্তু ভূমধ্যসলিল এই সকল হ্রদ সরোবরের বুকে কখনও ধরণীর স্নিগ্ধ আলোবাতাসের ক্ষীণ স্পর্শটুকুও লাগে না; এই জলে কোন প্রকারের প্রাণী বা মৎস্যাদি খেলিয়া বেড়ায় না, বা কমুদ পদ্ম ইত্যাদি কোনও পুষ্প ফোটে না।

এই লবণপুরীর বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক, কাজে কাজেই এখানে জৈব বা উদ্ভিজ্জপদার্থ কোনোরূপ বিকারপ্রাপ্ত হয় না। অশ্ব প্রভৃতি পশুর মৃতদেহ এখানে কোথাও ফেলিয়া দিয়া কয়েক বৎসর পরেও দেখা গিয়াছে তাহা বেশ অবিকৃত অবস্থায় আছে।

ভিলিৎস্কা ব্যতীত আরও বহু লবণের খনি আছে। ঈশল্-এ একটি প্রকাণ্ড খনির অংশাবশেষ আছে। মাঝে মাঝে খনির গহ্বরগুলিতে পরিষ্কার বিশুদ্ধ জল ভরিয়া দেওয়া হয়। কিছু কাল অপেক্ষা করিবার পর এই লবণাক্ত জল পাম্প সাহায্যে উপরে তুলিয়া রবিতাপে শুষ্ক করিয়া লবণ উদ্ধার করা হয়।

পূর্ব্ব-টাইরোলের এক লবণের খনির অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রকাণ্ড একটি হ্রদের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার জল পূর্ণ লবণাক্ত এবং তাহা উপরে তুলিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য এবং ইংলণ্ডের চেশায়ার অঞ্চলে কয়েকটি বৃহৎ লবণের খনি আছে। ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থানে কৃত্রিম অগভীর উপহ্রদের সৃষ্টি করিয়া তাহাতে রবিতাপে সমুদ্রের নোনা জল শুষ্ক করিয়া লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে সৌর-লবণ (solar salt) কহে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যদি সমুদ্রের গভীরতা গড়ে তিন মাইল ধরিয়া লওয়া যায় তবে তাহা শুষ্ক হইয়া গেলে প্রায় ২০০ গজ গভীর লবণস্তরের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু স্থানে স্থানে প্রায় এক মাইল পর্য্যন্ত গভীর স্তর বিশিষ্ট লবণখনি দেখিতে পাওয়া যায়—কিরূপ বিরাট গভীর সাগর হইতে তাহাদের সৃষ্টি ইহা একটি সমস্যার বিষয়। পূর্ব্বোক্ত গণনা মতে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ভিলিৎস্কা ও ষ্টাসফুর্ট-এর লবণখনিগুলি নূন্যাধিক ১৫।২০ মাইল গভীর সাগর শুষ্ক হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতগণ বলেন যে, এরূপ সিদ্ধান্ত ভুল। সুদূর অতীতে যে উপায়ে এই সব গভীর খনির সৃষ্টি হইয়াছে আজিও পৃথিবীর নানা স্থানে প্রতিনিয়ত তাহা সংঘটিত হইতেছে। কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বতীরে কারা বাঘার নামে একটি উপহ্রদ আছে—উহার পরিধি প্রায় ২,০০০ বর্গ মাইল। ৩ হইতে ৫ ফুট গভীর ও ১৫০ গজ দীর্ঘ একটি সরু খালে এই উপহ্রদ কাস্পিয়ান হ্রদের সহিত সংযুক্ত। এই পথে কাস্পিয়ান হ্রদের লবণাক্ত জল সর্ব্বদা উপহ্রদে আসিয়া রবিতাপে শুষ্ক হইতেছে ও লবণ নীচে তলাইয়া জমা হইতেছে। এই হ্রদের জলে প্রায় এক ভাগ মাত্র লবণ—তবুও পণ্ডিতগণ গণনাদ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রতি বৎসর প্রায় ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টন লবণ এই হ্রদের তলদেশে জমা হইতেছে। পণ্ডিতগণের বিশ্বাস ষ্টাসফুর্ট প্রভৃতি অঞ্চলের গভীর খনিগুলির সৃষ্টিও উপরোক্তরূপে হইয়াছে।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক এক বৎসরে যে লবণস্তর জমা হইয়াছে, তাহার একটা

বিশেষ চিহ্ন আছে। এইরূপ বাৎসরিক চিহ্ন দ্বারা হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ষ্টাসফর্টের খনির সৃষ্টি হইতে প্রায় ১৫ হাজার বৎসর লাগিয়াছে।

আফ্রিকাতে সাহারা মরুভূমির পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তীর্ণ লবণখনি রহিয়াছে। আসা ডারওয়া প্রদেশের নিকটস্থ আবিসিনিয়ার সমতলভূমিতে একটি খনি আছে। এই বিস্তীর্ণ লবণভূমি অতিক্রম করিতে প্রায় চারি দিন সময় লাগে।

প্রাণীর ও উদ্ভিদের জীবনধারণের নিমিত্ত কিয়ৎ-পরিমাণ লবণ একান্ত আবশ্যক। লবণ উর্ব্বরা ভূমির একটি প্রধান উপাদান, কিন্তু পরিমাণের মাত্রা অধিক হইলে ইহা পচননিবারকের ন্যায় কার্য্য করে এবং জীবনীশক্তিকে ধ্বংস করে। সুতরাং অত্যধিক লবণসমন্বিত ভূমি অচিরেই মরুভূমিতে পরিণত হয়। আমেরিকা, পারস্য প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে এইরূপ বিস্তীর্ণ লবণমরু দেখিতে পাওয়া যায়।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের শরীরে এক পাউণ্ডেরও কিছু বেশী লবণ আছে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার্থ বৎসরে তাহাকে ন্যূনকল্পে ১৫ হইতে ১৮ পাউণ্ড পর্য্যন্ত লবণ খাদ্য-দ্রব্যের সহিত গ্রহণ করিতে হয়। এই লবণ হইতে বঞ্চিত হইলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কথিত আছে, চীনা ও ওলন্দাজরা এক সময় তাহাদের দেশের ঘোরতর অপরাধীদিগকে লবণবিহীন খাদ্য আহার করাইয়া তিলে তিলে হত্যা করিত। মানুষের পাকস্থলীর পাচকরসের (gastric juice) মধ্যে শত করা পাঁচভাগের এক ভাগ হাইড্রোক্লোরিক এসিড আছে। নিঃসন্দেহ ভক্ষিত লবণ হইতেই প্রকারান্তরে ইহার উদ্ভব হয় এবং এতদ্ব্যতীত পরিপাকক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না।

শরীররক্ষার জন্য লবণ এত অধিক প্রয়োজনীয় বলিয়া যে-সকল দেশে লবণ অপ্রতুল, সেখানে পর্য্যাপ্ত লবণ সংগ্রহ করা দুষ্কর ব্যাপার এবং উহা একটি বিলাস-দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত। আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশের কোন কোন স্থানের অবস্থা এইরূপ। এমনও স্থান সেখানে আছে যেখানে লবণ একেবারেই অপরিচিত অথবা স্বর্ণের চেয়েও মহার্ঘ। সুবিখ্যাত পরিব্রাজক মাঙ্গো পার্ক বলেন, আফ্রিকার অন্তঃপ্রদেশে লবণের চেয়ে অধিক মূল্যবান বিলাসসামগ্রী আর নাই।

অতীত যুগে এই লবণ-তৃষ্ণার জন্য দারুণ অনর্থ ঘটিয়াছে। জার্ম্মেনীতে লবণ-প্রস্রবণের অধিকার লইয়া আদিম অধিবাসিগণের মধ্যে কত যে রক্তারক্তি হইয়া গিয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের রাজাও সময় এবং সুযোগ বুঝিয়া একদা লবণের উপর কর বসাইলেন। অতীত কাল হইতেই দেখা গিয়াছে, যখনই আয়বৃদ্ধির আবশ্যক হয় তখনই দেশের শাসনকর্ত্তারা মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অপরিহার্য্য ও অনিবার্য্যরূপে আবশ্যক দ্রব্যাদির উপর কর বসাইয়া থাকেন।

মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণের জন্যও লবণের একান্ত আবশ্যক। অরণ্যে এমন অনেক লবণ নির্ঝর আছে যেখানে শত শত মাইল দূর হইতেও পিপাসু বন্য জন্তু তাহাদের লবণ-তৃষ্ণা দূর করিতে আসিয়া মানুষের হাতে প্রাণ দিয়াছে। কেণ্টকি প্রদেশের বুন জেলায় বিগ বোন লেক নামক লবণ-প্রস্রবণ এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। কত শত শতাব্দী ধরিয়া কত সহস্র সহস্র বন্য জন্তু যে এই নির্ঝরে তাহাদের লবণ-পিপাসার নিবৃত্তি করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাদের কেহ কেহ এখানে সমাধিও লাভ করিয়াছে। হয়ত তাহারা লবণ-তৃষ্ণা নিবারণে অতিমাত্র ব্যগ্রতাহেতু ভিড়ের গোলমালে পরস্পরের সহিত ধাক্কা লাগিয়া অধিক জলে গিয়া পড়িয়াছে কিংবা কাদায় বসিয়া গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছে। এই স্থানের উপরিভাগের লবণস্তরের মধ্যে বহু আধুনিক জীবজন্তুর দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু গভীর স্তর হইতে এমন সকল প্রাণীর প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বাহির হইয়াছে যাহারা বহুদিন হইল ধরাতল হইতে লোপ পাইয়াছে। তন্মধ্যে অতিকায় হস্তী, কস্তুরীবৃষ প্রভৃতি যে-সকল প্রাণীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে, তাহারা হয়ত সেই তুষার যুগে পৃথিবীর বুকের উপর বিচরণ করিত।

এক্ষণে লবণের আভ্যন্তরিক গঠনতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। লবণ সোডিয়াম নামক ধাতু ও ক্লোরিণ নামক গ্যাস, এই উভয় পদার্থের সমবায়ে গঠিত।

উচ্চ তাপসহনশীল পাত্রে লবণ তাপ প্রভাবে গলিত করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করিলে উহা উপরোক্ত মৌলিক পদার্থ দুইটিতে বিশ্লিষ্ট হয়। অন্যপক্ষে ক্লোরিণ গ্যাসপূর্ণ কাচপাত্রে সোডিয়াম ধাতু নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা প্রজ্জলিত হইয়া শুভ্র লবণে পরিণত হয়।

সোডিয়াম অতি অদ্ভুত ধাতু। ইহা রৌপ্যের ন্যায় শুভ্র এবং মাখন, সাবান প্রভৃতির ন্যায় কোমল; এই জন্য ছুরি দিয়া ইহাকে অনায়াসে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে পারা যায়। ইহা অত্যন্ত বিকারপ্রবণ বা ক্রিয়াশীল ধাতু।

মুক্তস্থানে রাখিয়া দিলে উহা বায়ুর অম্লজানের সংস্পর্শে জলিয়া উঠে। এইজন্য ইহা পেট্রোলিয়াম তৈলে নিমজ্জিত করিয়া রাখা হয়। জলে নিক্ষেপ করিলে ইহা এদিক ওদিক ভাসিয়া ঘুরিতে থাকে এবং উদজান্ উত্থিত হইয়া মুহূর্ত্তেই জলিয়া উঠে ও অনেক সময় বিস্ফোরণ পর্য্যন্ত হয় এবং সোডিয়াম্ সোডাতে পরিণত হয়।

অধুনাগলিত সোডার ভিতর দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালনা করিয়া সোডিয়াম ধাতু বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়। ইহা সোডামাইড্ সোডিয়াম পেরক্সাইড্ সোডিয়াম স্যায়েনাইড্ প্রভৃতি আবশ্যক দ্রব্যাদি প্রস্তুতের জন্য ও অন্যান্য বহুবিধ শিল্প ও রসকর্ম্মে ব্যবহৃত হয়

অত্যধিক ক্রিয়াশীলতার দরুণ সোডিয়াম ধাতু কিরূপ বিপজ্জনক নিম্নোক্ত ঘটনা হইতে তাহা অনুমিত হইবে।

১৯১১ সালের ১১ই ডিসেম্বর তারিখে ট্রিপোর্ট নামক বন্দর হইতে একটি সমুদ্রগামী জাহাজ অন্যান্য দ্রব্যের সহিত দুই টন. ওজনের সোডিয়াম পূর্ণ বিশটি বাক্স লইয়া দেশান্তরে যাইবার কালে ঝড় আরম্ভ হয়। ঝড়ের তাড়নায় সমুদ্রবক্ষ স্ফীত হইয়া পর্ব্বতপ্রমাণ ঢেউ জাহাজের বুকের উপর দিয়া সবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অচিরেই সোডিয়ামের বাক্সের ভিতর জল প্রবেশ করাতে উহা প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল ও মুহুর্মুহু বিস্ফোরণ আরম্ভ হইল। জাহাজের কাপ্তেন ইহার রহস্য কিছুই জানিতেন না। তাঁহার আদেশমত খালাসীরা হোজ পাইপ লইয়া প্রবল জল ধারা নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে আরম্ভ করিল। ফলে, অধিকতর জলের সংস্পর্শে যেন ঘৃতাহুতি পাইয়া অগ্নিশিখা ও বিস্ফোরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কাপ্তেন তখন অনন্যোপায় হইয়া বাক্সগুলিকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। সমুদ্রে পড়িবামাত্র বাক্সগুলি তীব্রতরভাবে জলিতে ও বিদারিত হইতে লাগিল ও অগ্নির বিরাট লেলিহান শিখা ষ্টীমারের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। উপরন্তু কতকগুলি বাক্স বিদারণের বেগে লাফাইয়া পুনরায় ষ্টীমারের উপর পড়িল এবং গলিত সোডিয়াম ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত হওয়ায় জাহাজের নানা স্থানে, এমন কি ইঞ্জিন কক্ষেও, আগুন ধরিয়া গেল। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয় সেই ষ্টীমারে প্রচুর পরিমাণে চর্ব্বিও বোঝাই ছিল। অগ্নির উত্তাপে তাহা গলিয়া চতুর্দ্দিক পিচ্ছল হওয়াতে খালাসীদের পদস্খলন হইয়া অনেকেই ন্যূনাধিক পরিমাণে দগ্ধ হইতে লাগিল। অবশেষে অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া সকলেই জীবন-তরণীতে অবতরণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিল, কিন্তু ষ্টীমারখানা অচিরেই দগ্ধ হইয়া সলিলসমাধি লাভ করিল।

ক্লোরিন গ্যাসও অত্যন্ত ক্রিয়াশীল পদার্থ। ইহা জলে অত্যন্ত দ্রবণীয়। ক্লোরিন মিশ্রিত জলের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইলে উহা হইতে অম্লজান গ্যাস উত্থিত হয় এবং জলের উদজান্ ভাগের সহিত রাসায়নিক সংযোগের ফলে ক্লোরিন্ হাইড্রোক্লোরিক এসিডে পরিণত হয়। ক্লোরিনের আরও একটি অদ্ভুত ধর্ম্ম আছে। যে-কোন প্রকারের আর্দ্র রঙীন্ বস্ত্রখণ্ড, পুষ্প কিংবা অপর কোনও দ্রব্য ক্লোরিন বাষ্পের সংস্পর্শে বিবর্ণ হয় বা শ্বেতবর্ণ ধারণ করে। এই নিমিত্ত ধোলাইকার্য্যে ইহা অত্যন্ত ব্যবহৃত হয়। বস্তুতঃ ক্লোরিনের এই ধর্ম্মের উপর একটি বিরাট শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহাতে লক্ষ লক্ষ টাকা ও হাজার হাজার লোক নিয়োজিত হইয়াছে। কাগজের মণ্ড, বস্ত্রাদি প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্য ধৌত ও শ্বেত করিবার জন্য উহা ব্যবহৃত হয়। কলিচুনের দ্বারা ক্লোরিন বাষ্প শোষণ করিয়া অতি উৎকৃষ্ট ও সুলভ 'বিরঞ্জন চূর্ণ প্রস্তুত

হয়। ইহার সহিত জল মিশ্রিত করিলে ক্লোরিন গ্যাস পুনরুত্থিত হইয়া আর্দ্র রঙীন্ দ্রব্যাদিকে শুষ্ক করে।

উদ্‌জানের প্রতিও ক্লোরিনের রাসায়নিক আসক্তি অত্যন্ত প্রবল। অন্ধকারপূর্ণ স্থানে ক্লোরিন বাষ্পের সহিত উদজান গ্যাস মিশ্রিত করিলে উহাদের মধ্যে সহজে রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না বটে, কিন্তু উহাদের উপর সূর্য্যালোক পতিত হইবামাত্র উদজান তীব্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে ও বিস্ফোরণ হয়। এই ক্রিয়াতে হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র উদজান-সমন্বিত যৌগিক পদার্থই যথেষ্ট। তার্পিন তৈল উদজান ও অঙ্গারক যুক্ত পদার্থ। ক্লোরিন গ্যাস পূর্ণ পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ তার্পিন তৈল নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ উহা জলিয়া উঠে। তৈলের উদজান ভাগ ক্লোরিনের সহিত মিলিত হইয়া হাইড্রোক্লোরিক এসিড বাষ্প উৎপন্ন হয় এবং কালো অঙ্গারক ভাগ পাত্রের গায়ে সঞ্চিত হয়। গলিত গন্ধক, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি ধাতু নির্ম্মিত তার তপ্ত করিয়া ক্লোরিন গ্যাসে নিমজ্জিত করিলে উহারা উজ্জ্বল ভাবে জলিতে থাকে। ক্লোরিন বিষাক্ত বাষ্প এবং সহজেই তরলীভূত হয়। গত মহাযুদ্ধে প্রচুর পরিমাণ তরল ক্লোরিন ব্যবহৃত হইয়াছিল।

মেঘলা সকাল

শ্রীঅশোকবিজয় রাহা

একলা ঘরে বসে আছি
সকালে,
আকাশে আজ মেঘ করেছে
অকালে।

ঝর্‌ণা ধারার জলের 'পরে
নাম্‌ল ছায়া কালো করে,
পাহাড়তলীর বনগুলাতে
নেই আলো,
আমি ভাবি, এমন দিনে
এই ভালো।

পথের ধারে আম্‌লকীর ঐ
তলেতে
ভিজেছে ঘাস ঝরা পাতার
জলেতে।

সে পথ দিয়ে থেকে থেকে
বাদ্‌লাখানি হাওয়ায় মেখে
লাগে আমার বাতায়নের
লতাতে;—
কচি পাতা কাঁপে কত
কথা তে!

মেঘের ছায়ায় আজ কেতকী
গোপনে
জানি না তো কি দেখে তার
স্বপনে!

শিশু শিরীষ ঐখানেতে
হাওয়ায় দিল হৃদয় পেতে,
শিরায় পুলক নাচে কিসের
আবেশে!
এমন দিনে, কি যেন আজ
পাবে সে।

ঝর্‌ণা তলায় বন-ডালিমের
আড়ালে,—
মেঘ্‌লা চোখে কে যেন ঐ
দাঁড়ালে!

জানি না সে হোথায় নামি
ভর্‌বে কি তার কলসখানি;
হয়তো তাহার কাঁখের কলস
জল ভরা;
আন্‌মনা তার মনখানি কোন্
ছল ভরা!

একলা ঘরে বসে আছি
সকালে,
ভোর থেকেই মেঘ করেছে
অকালে।

বসে বসে আপন মনে
দেখ্‌ছি স্বপন খনে খনে,
বাতাসে জল; আকাশেতে
নেই আলো।
এমন দিনে আজ্‌কে আমার
এই ভালো।
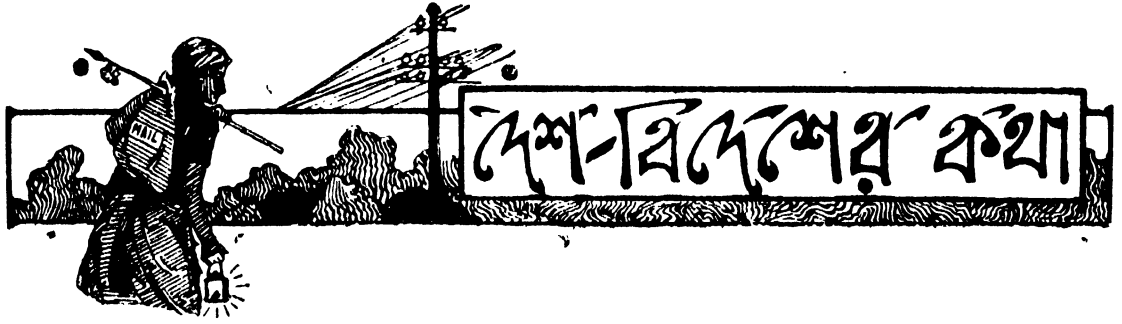
বিদেশ

বিলাতে বেকার—

বিলাতে সংবাদপত্রে বেকার জনগণের মোটামুটি হিসাব প্রদত্ত হইয়াছে। এই হিসাবে বিগত ৬ই জুন পর্য্যন্ত, কোথায় কত লোক বেকার বসিয়া আছে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। রিপোর্টে প্রকাশ, পশ্চিমোত্তর ডিবিসনে অর্থাৎ লাঙ্কাশায়ার, চেশায়ার, ও কাম্বারল্যাণ্ডে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত ৩,৪১,৪১৩ লোক কর্ম্মহীন হইয়াছে। তুলা ও বস্ত্রের কারখানায় প্রায় অর্দ্ধেক লোক বেকার হইয়াছে। ম্যাঞ্চেষ্টার ও সালফোর্ডে ৩৭,১৮৩ পুরুষ এবং ২২,০৮৩ স্ত্রীলোক, লিবারপুল জেলায় ৬৫,৭৯৬ পুরুষ ও ১১,৭৭৭ স্ত্রীলোক বেকার রহিয়াছে। লাঙ্কাশায়ারে এক কার্পাস ব্যবসায়েই বেকার সংখ্যা ২রা জুন তারিখে পুরুষ, ৮৭,৮০৬, ১৬ই জুন ১০১,৩৯৩ হইয়াছে। ঐ দুই তারিখে বেকার স্ত্রীলোকের সংখ্যা যথাক্রমে ৭৬,৯৩২ এবং ৯১,০৪৭ হইয়াছে। ভারতে বিলাতী বস্ত্র বয়কট করিবার ফলেই যে ল্যাঙ্কাশায়ারে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহা স্পষ্টই অনুমিত হয়।

—

ভারতবর্ষ

ভারত গবর্ণমেণ্টের রাজস্বে ঘাটতি—

ভারত গভর্ণমেণ্টের রেভিনিউ বিভাগে এপ্রিল ও মে মাসে নিম্ন লিখিতরূপে আয় কমিয়া গিয়াছে।

১৯২৮	১৯২৯	১৯৩০	
৫৪১২৭০০০—	৫৫৭৬৫০০০—	৫৩৭৬২ ০০	লেণ্ড রেভেনিউ
১৩৮৫০০০—	১৩৪৭৪০০—	১১০৮৬০০	লবণ—
২২৮৩১০০০—	২৯০৩৭০০০—	২২৪০৬ ০০	ষ্টাম্প—
২৯৫৪১০০০—	৩০২২৫০০০—	২৭৩০৫ ০০	আবগারী—
৭৬০৭৯০০০—	৮৭১৪১০০০—	৪৬৫৫৯ ০	কাষ্টম—
৩৭৮৩০০০—	৭০১৯০০—	৪৭৯৩০	ইন্‌কাম টেক্স-
৪০১৯০০০—	৪৪০১০০০—	৩৬৯৪ ০	বনবিভাগ
১৫৯১০০০—	১৯৭০০০০—	৮৮৭৪ ০	আফিং

বাংলা গেজেট

বাংলা

কিশোরগঞ্জের দাঙ্গাহাঙ্গামা—

কিশোরগঞ্জ দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্বন্ধে সরকারী ইস্তাহারে যে কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহার আলোচনা করিয়া ময়মনসিংহের সুপরিচিত সংবাদপত্র চারুমিহির বলিতেছেন।—

প্রথমতঃ দুর্ব্বৃত্তগণ যে সকলেই মুসলমান এবং মহাজনগণ সকলেই হিন্দু এই রিপোর্টে তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিশোরগঞ্জের এই উপদ্রুত স্থানে বহু মুসলমান মহাজন আছেন। কিশোরগঞ্জের হাঙ্গামার অনেক সংবাদ এখন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইতেছে। তাহাতে জানা যায়, যে দুই-তিন জন মুসলমান মহাজন হিন্দুগণকে আশ্রয় দিয়াছিলেন অথবা হিন্দুগণের দলিল গৃহে রাখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যেই দুই-তিন জনের গৃহমাত্র আক্রান্ত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের গৃহ হইতে কোন জিনিষ লট হইয়াছে এমন সংবাদ এখনও আমরা পাই নাই। দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচার কেবল হিন্দু মহাজনগণের উপরই নিবদ্ধ ছিল না। ঐ অত্যাচারিত স্থানে ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার হইয়াছে। এই সকল অত্যাচারের বিবরণ যথাসম্ভব চারুমিহিরে প্রকাশিত হইতেছে। এই অত্যাচার যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহাতে হিন্দুগণকে সর্ব্বপ্রকারে হৃতসর্ব্বস্ব করিয়া নিশ্চিহ্ন করাই আক্রমণকারীদের মুখ্য উদ্দেশ্য। জৈত্রা ও বিশুহাটীর নমঃশূদ্র, নাবারটীয়ার মালো সম্প্রদায় অত্যন্ত দরিদ্র। তাহাদের কোন প্রকার লগ্নী কারবার নাই। ইহাদেরও যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত ও ধ্বংস করা হইয়াছে। এমন কি ইহাদের গৃহে দুর্ব্বৃত্তগণ এক মুষ্টি চাউলও রাখিয়া যায় নাই। প্রত্যেক বাড়ীর বিছানাপত্র, তুলসীমন্দির ও দেবমন্দিরগুলিও ধ্বংস ও অপবিত্র করা হইয়াছে। হিন্দু ডাক্তার কবিরাজের ঔষধালয় ধ্বংস করা হইয়াছে। তাহাদের অস্ত্রোপচারের যন্ত্রাদিও ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা পায় নাই। দুর্ব্বৃত্তগণ অত্যাচারিত স্থান হইতে লক্ষ লক্ষ টাকা অপহরণ করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। হিন্দুর উপর নিষ্ঠুরভাবে উৎপীড়নের যে সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তবে আমরা এই কথা বলিতে পারি মুসলমানের এই অত্যাচার কেবল হিন্দু মহাজনের উপর আবদ্ধ ছিল না। যাহারা অত্যাচার করিয়াছে তাহাদের মধ্যে অনেকেরই আর্থিক অবস্থা অত্যাচারিত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক উন্নত।

এই সরকারী রিপোর্টের অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে মহাজন ব্যতীত অপর কাহারও উপর অত্যাচার হইয়াছে বলিয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট শোনেন নাই। হিন্দু বলিয়া কাহাকেও আক্রমণ করা হয় নাই।

তদন্ত করিয়া যদি ম্যাজিষ্ট্রেটের এইরূপ ধারণাই হয় তাহা হইলে আমাদের কিছু বলিবার নাই। কারণ, ঘটনা সংবাদপত্রেই প্রকাশিত হইতেছে। তাহা দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অভিমত কিছুতেই সমর্থিত হয় না। আমরা যতই ঘটনা পর্য্যালোচনা করিতেছি ততই আমাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতেছে যে হিন্দুকে সর্ব্বস্বান্ত করিয়া বিতাড়িত করাই এই অত্যাচারের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যদি হিন্দু মাত্রই মহাজন ও মুসলমান মাত্রই খাতক হয়, তাহা হইলে ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত আংশিক ভাবে সত্য হইলেও হইতে পারে। ঐ রিপোর্টের এক স্থানে লিখিত হইয়াছে গত জুলাই মাসের প্রথমভাগে কিশোরগঞ্জের প্রজাসাধারণের মধ্যে অর্থনৈতিক চাঞ্চল্য উপস্থিত হয় এবং কিশোরগঞ্জের ও হোসেনপুরে রায়তদের সভায় মহাজনগণের সুদ গ্রহণ কার্য্যের নিন্দা করা হয়। এই কথাও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই অত্যাচারিত স্থানে বহু মুসলমানের সভায় প্রকাশ্যভাবে হিন্দু মহাজনের কবল হইতে মুসলমানকে রক্ষা পাইতে হইবে পুনঃ পুনঃ এই কথা বলা হইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে কোন্ হিন্দু কোন্ মুসলমানের উপর ব্যক্তিগতভাবে কি অত্যাচার করিয়াছিল তাহা সংগ্রহ করিয়া সেই উত্তেজক তালিকা সভায় পাঠ করা হইয়াছিল। ইউনিয়ন বোর্ড, লোকেল বোর্ড, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের ইলেকশানে হিন্দু বিদ্বেষের মাত্রা চরম সীমায় উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্টের বিবৃতিতেও প্রকাশ ভাওয়াল ও ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক মৌলবী আসিয়া নিরক্ষর চাষীদের নিকট প্রচার করিয়াছিল যে সরকার তাহাদের পক্ষে রহিয়াছে, সুতরাং মহাজনদের নিকট হইতে যদি দলিলপত্রাদি বলপূর্ব্বকও তাহারা ছিনাইয়া নেয়, তাহা হইলে সরকার তাহাদিগকে কিছু বলিবে না।

দুই বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জে ইয়ং কমরেড্ লিগ নামক এক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাহার প্রচারকার্য্যও চলিয়াছিল। ইহাদের প্রচারের ফলে হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে জনসাধারণের মনে ধনী ও শ্রমিকের পার্থক্য বিশেষভাবে অনুভূত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান ফেনাটিকেল পার্টি নামে বলশেভিক নীতিবাদের এক দল আছে। ভারতের বহির্ভূত স্থানে ইহারা বলশেভিক নীতিবাদে দীক্ষিত হয় বলিয়া প্রকাশ। এই সম্প্রদায়ের অধিকাংশই মুসলমান। আমরা শুনিয়াছি নোয়াখালী, কোটচাঁদপুর এবং ঢাকা অঞ্চলের অনেক মৌলবী নাকি এই সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহারাও যে কিশোরগঞ্জ অঞ্চলে তাহাদের মতবাদ প্রচার করিয়াছে, পুলিশও সম্ভবতঃ তাহার সংবাদ রাখিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের মতবাদ হিন্দুমুসলমান নির্ব্বিশেষে ধনীসম্প্রদায়ের প্রতি প্রযুক্ত ছিল। যখন কিশোরগঞ্জ এই মতবাদে পরিপ্লাবিত হইতেছিল, তখন সাম্প্রদায়িক ভাবদুষ্ট মৌলবী ও মুসলমান শিক্ষিত ব্যক্তিগণ অভাবগ্রস্ত গ্রাম্য কৃষকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া কেবল হিন্দুর বিরুদ্ধেই এই প্রচার কার্য্য চালাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই আপাতঃমধুর বাক্যে নিরক্ষর মুসলমানগণের মধ্যে বলশেভিক প্রচার ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল এবং ইহার ফলেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের দানবীয় মূর্ত্তি প্রকটিত হইয়াছে।

ব্যঙ্গচিত্র

ডাক্তার—আপনার অসুখ হল কুড়েমি
রোগী—তা জানি ডাক্তার, কিন্তু ওর কি ডাক্তারী নাম নেই কোনো? আমার স্ত্রীকে যে বলতে হবে গিয়ে!

—*Bulletin*, Sydney.
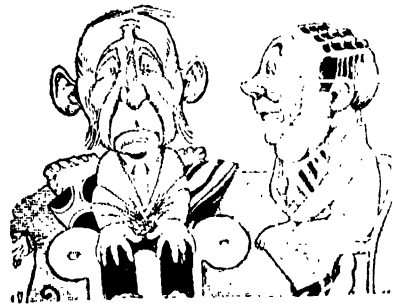
—কিন্তু ডাঃ স্কট, আপনি নিজে নিজের চিকিৎসা না করে ডাঃ ববসকে ডেকে আনেন কেন?
— কি করব, আমার কি এত টাকা আছে? আমার ফি হল গিয়ে বত্রিশ টাকা, আর ববসের মোটে আট টাকা।

Aussie, Sydney.
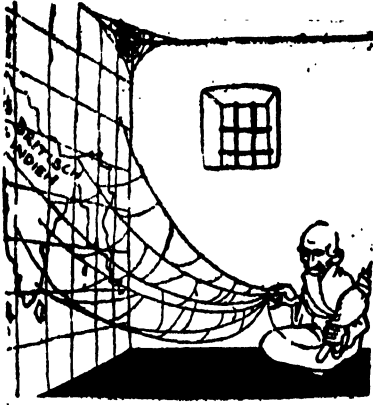
Mr. Gandhi in prison is passing the time spinning.
(মহাত্মা গান্ধী কারাগারে সুতা কাটিতেছেন)

Gotz, Vienna.

—তুমি কি সর্ব্বদাই তোমার স্ত্রীর ফটোগ্রাফ সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াও ?
—হাঁ, যখনই তার কাছে আবার ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় তখনি ওটা বার করে দেখি।

Smiths' Weekly, Sydney.

—আমার গাড়ীটা সারাতে কত লাগল ?
—দুই পাউণ্ড।
—কি হয়েছিল ওটার ?
—পেট্রোল ফুরিয়ে গিয়েছিল।

Bulletin, Sydney.
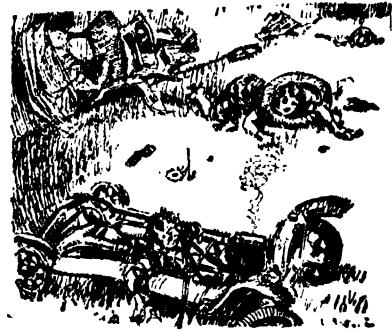
স্ত্রী—এ গাড়ীটা গেছে গেছে। পরের গাড়ীটার জন্য অনেক কলকব্জা হবে।

Smith's Weekly, Sydney.

দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৮) বলিদ্বীপ—বেসাকিক্-এর মন্দির-দর্শন

বেসাকিক্-এর মন্দিরগুলি সুখারোহ পাশা-পাশি একাধিক ঢালু পাহাড়ের উপরে অবস্থিত। গ্রামের কাছে এসে মাঝে নাতিনিম্ন উপত্যকা, তার ওপারে পাহাড়ের উপর মন্দিরগুলির panorama বা সাকল্য দৃশ্য বেশ চমৎকার লাগল। আমরা গ্রামের প্রান্তে এসে প'ড়লুম। গ্রামের বাইরে একটা উঁচু জায়গায় একটী সরকারী আপিস-বাড়ী দেখে সেদিকে অগ্রসর হ'লুম। ইটের পোতায় দরমার বেড়া, আর খড়ের চালের বাড়ী। সেখানে পঁউছে দেখি, সেটী বলিদ্বীপের সরকারী আরণ্য-বিভাগের একটী আপিস, এখানে একজন যবদ্বীপীয় ফরেস্ট্ অফিসার সস্ত্রীক থাকেন। ইনি আমাদের দেখে স্বাগত ক'রলেন। তাঁর আপিসে খানিকক্ষণ ব'সে আমরা শ্রান্তি দূর ক'রলুম। আর অতি বিনয়ী ফরেস্ট্ অফিসারটী কি ক'রে তিন জন ডচ ভদ্র ব্যক্তির আর আমাদের সমাদর ক'রবেন তা যেন ঠিক ক'রে উঠতে পারলেন না। আমাদের জন্য তাঁর স্ত্রী চা ক'রে দিলেন, টিনের দুধ মিশান পাতলা চা—আমরা ধন্যবাদের সঙ্গে সাদরে পান ক'রলুম। এখানে পাসাঙ্গ্রাহান ছিল না, তাই বেলা একটা হ'য়ে গেলেও আর জঠরাগ্নির দহন বিশেষ রকম অনুভূত হ'লেও বাধ্য হ'য়ে লঙ্ঘন দিতে হ'ল। আপিস বাড়ীটীর বারান্দায় ব'সে ব'সে উত্তরে পাহাড়ের গায়ে বেসাকিক্ গ্রামটী আর গ্রামের উপরে পাহাড়ের মাথায় মন্দিরগুলি খানিকক্ষণ ধ'রে আমরা দেখলুম। সমস্তটায় মিলে অতি মনোহর দৃশ্যপটের সৃষ্টি ক'রেছিল। একটী সরু পাহাড়ে' পথ উপত্যকায় নেমে গিয়েছে, তার পরে গ্রামে গিয়ে পৌঁছেচে। গ্রামে থাক থাক ঘর বাড়ী, গাছ-পালার আড়ালে আড়ালে দেখা যাচ্ছে। একটী তামাকের ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আর আশপাশ দিয়ে রাস্তার মস্ত মনোহর গতিশালিনী উজ্জ্বল রঙের 'কাইন্' বা কটিবস্ত্র প'রে কতকগুলি তন্বী তরুণীকে চলাফেরা ক'রতে দেখলুম। দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ ক'রছে, তার দরুন একটা আবছা আবছা ভাব যেন দূরের গাছপালা বাড়ীঘর পাহাড়পর্ব্বত আর বায়ুমণ্ডলকে ভ'রে রেখেছে।

আমরা পাহাড়ে' রাস্তা ধ'রে গ্রামে এসে পৌঁছুতে পৌঁছুতে একজন দুজন ক'রে অনেকগুলি স্থানীয় লোক আমাদের সঙ্গ নিলে। বলিদ্বীপীয়েরা বেশ স্বাধীনচেতা, ইউরোপীয় দেখে এরা ভয় পায় না। অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে এরা আমাদের পাছু পাছু চ'লল। দু এক জন সাহসী হ'য়ে মালাইয়ে দ্রেউএসকে জিজ্ঞাসা ক'রলে যে আমরা কে, কোথা থেকে আসছি। দ্রেউএস্ তাদের ব'ল্লেন যে তাঁরা ডচ্ সরকারী লোক, আর আমাদের দুজনকে দেখিয়ে দিয়ে ব'ল্লেন যে এঁরা হ'চ্ছেন ভারতবর্ষ থেকে আগত, একজন ব্রাহ্মণ, আর একজন ক্ষত্রিয়। ভারতবর্ষ কি আর কোথায়, আর সেখানে

বেসাকিক্-এ আরণ্য-বিভাগের আপিস
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

লোকে বলিদ্বীপের ধর্ম্ম মানে, এই কথা শুনে লোকেদের ভারী আশ্চর্য্য লাগ্‌ল। বেশ ভব্য চেহারার শ্যামবর্ণ লোক একজন এসে পরিচয় দিলে, সে বেসাকিক-মন্দিরের একজন Pamangkoe 'পামাঙ্ক' বা নিম্নশ্রেণীর পুরোহিত। আমরা মন্দির দেখতে আসছি শুনে সে ব'ল্‌লে আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে, তবে মন্দিরের অন্যতম প্রধান পুরোহিত একজন পদণ্ডর বাড়ী থেকে মন্দিরের চাবী নিয়ে আস্‌তে হবে। মন্দির চল্‌তি পথে বাঁ দিকে একটা রাস্তার ভিতরে খানিকটা গিয়ে পদণ্ড-মহাশয়ের বাড়ী, পামাঙ্কটি আমাদের সেখানে নিয়ে গেল; সঙ্গে চ'ল্‌ল এই কৌতূহলী মেয়ে পুরুষের দল। পদণ্ড মহাশয় তখন বাড়ীতে ছিলেন না। তাঁর বাড়ীর মেয়েরা বেরিয়ে এল', তারা পামাঙ্কর হাতে চাবির গোছা দিয়ে দিলে। এই পামাঙ্করা জাতে শূদ্র হয়। দেউএস-এর কাছে শুনলে যে আমি ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ—বেদ অধ্যয়ন ক'রেছি এমন পদণ্ড, অনেক মন্ত্র জানি—এরা বিস্ময় আর সম্ভ্রমের সঙ্গে যুক্তি-পরা আমাদের চেহারার প্রতি নেত্রপাত ক'রতে লাগল। সকলে আবার মালাই জানে না; যারা জানে, তারা আর সকলকে বুঝিয়ে দিতে দিতে চ'ল্‌ল। পামাঙ্কটির সঙ্গে আমার ভাঙা ভাঙা মালাইয়ে আমিও যথা সম্ভব আলাপ জুড়ে দিলুম। এই রূপে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই পথে ছোটো ছোটো দু' চারটে মন্দির পেরিয়ে শেষে বড়ো মন্দিরের দ্বারদেশে উপনীত হ'লুম। বাকে কামেরা বা'র ক'রে ছবি নিতে লাগ্‌লেন। মন্দিরের তোরণ দ্বারের কাছেই বাইরে ছোটো ছোটো কতকগুলি মন্দির আছে। অনেকগুলি সিঁড়ি ব'য়ে প্রথম তোরণ পার হ'য়ে একটা চাতাল, তারপরে আবার সিঁড়ি ব'য়ে তার উপরে চাতাল। দ্বিতীয় চাতালটি পাহাড়ের মাথায়। এটা বেশ চটান, প্রশস্ত জায়গা নিয়ে—চার দিকে পাথরের দেয়ালে ঘেরা, ভিতরে পাথর ইট আর কাঠের অনেকগুলি মন্দির আর প্রকোষ্ঠ আর অন্য ইমারত। যে মন্দিরের মধ্যে দেবতার বিগ্রহ রেখে পূজা হয় তাকে 'মেরু' বলে—নেপালী মন্দিরের মতন থাকে থাকে মেরুর ছাত ওঠে। মন্দির চত্বরের ভিতরে কতকগুলি মেরু আছে, আর কতকগুলি অন্য ঘর আর আটচালা আছে। দেবতাদের ভোগ সাজিয়ে রাখবার জন্য খুব খোদাই কাজ করা পাথরের তিনটি উঁচু বড়ো বড়ো বেদি—সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে তবে

বেসাকিক্‌—মন্দিরে উঠিবার সিঁড়ি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

ভোগ আর নৈবেদ্য তুলে রাখ্‌তে পারা যায়। বেদি তিনটী একটী ব্রহ্মার, একটী বিষ্ণুর, আর একটী শিবের। বেদিগুলির আকার কতকটা যেন সিংহাসনের মতো। বেসাকিক্‌-এর মন্দির একটা পীঠ-স্থানের মতন জায়গা শুনেছিলুম; ভেবেছিলুম, কত না ভীড় দেখ্‌বো, আমাদের দেশের তীর্থস্থানে যেমন তীর্থ-যাত্রী পুরোহিত দোকানী পসারী দেখা যায়, নানা রকম স্থানীয় হাতের কাজ পাওয়া যায়, এখানে সেই রকমটা কিছু দেখা যাবে। কিন্তু সে সব কিছুই নেই, সব খালি। কেবল আমাদের সঙ্গে যে কতকগুলি লোক এসেছিল, তাদেরই ভীড়; আর মন্দিরের ভিতর দু চার জন ব'সেছিল। এদেশের রীতি তখন বুঝলুম—বিশেষ পর্ব্ব দিন ভিন্ন মন্দির এককরম পরিত্যক্তই হ'য়ে থাকে, দৈনন্দিন পূজা অর্চ্চনা ও হয় না।

আমরা বিপুলায়তন মন্দির চত্বরের 'বালে আগ্‌ঙ্' বা বস্‌বার জন্য কাঠের তৈয়ারী মাচা-যুক্ত আটচালার, আর মেরুগুলির পাশে পাশে ঘুরে বেড়ালুম। একটু দূরে

বেসাকিক্‌—নৈবেদ্য-বেদি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

পূব দিকে আর একটা ঢালু-গা পাহাড়ের উপরে আর কতকগুলি মন্দির দেখতে পেলুম।

সঙ্গের পামাঙ্কুটীকে জিজ্ঞাসা ক'রলুম, 'রূপা দেওআ' অর্থাৎ দেব-রূপ বা দেবমূর্ত্তি কোথায়? মন্দির চত্বরের এক কোণের দিকে একটা কাঠের ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল; ঘরটার ভিতরে আর বাইরে কতকগুলি পাথরে কাটা মূর্ত্তি ভগ্নাবস্থায় র'য়েছে, কতকগুলি একেবারে টুক্‌রো টুক্‌রো হ'য়ে র'য়েছে, টুকরোগুলি ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত; আর কতকগুলি অনেকটা ভালো অবস্থায় bas-relief বা শিলা-ফলকে বা শিলা-খণ্ডে খোদিত মূর্ত্তি, পুরো কুঁদে বা কেটে বা'র করা নয় ঘরের ভিতরে দেয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড় করানো। অযত্নে রাখার দরুন, স্বাভাবিক কারণে ক'য়ে গিয়ে আর প'ড়ে গিয়ে ভেঙে যাওয়ায় মূর্ত্তিগুলির এই দশা। মূর্ত্তিগুলি উড়িষ্যার মন্দিরের গায়ে যেমন দেড় হাত দু হাত সব মূর্ত্তি থাকে, সেই ভাবের। কতকগুলি পুং দেবতার, কতকগুলি দেবীর; প্রাচীন যবদ্বীপীয় ধরণের কাজ ব'লে মনে হ'ল। শিব, বিষ্ণু আছেন আর দুর্গা আছেন ব'লে মনে হ'ল। এ মূর্ত্তিগুলির পূজা হয় না, প্রাচীনকালে হয় তো এখানে কেউ এনে রেখে থাকবে, তাই এমনি অযত্নে প'ড়ে আছে; বলিদ্বীপের মন্দির-গঠন প্রণালী প্রাচীন যবদ্বীপের প্রণালী বা ভারতবর্ষের প্রণালী থেকে আলাদা, পাথরের বিরাট মন্দির যবদ্বীপ আর ভারতে যেমন পাওয়া যায়, তেমন বলিদ্বীপে অজ্ঞাত; তাই মূর্ত্তিগুলি কোথাও লাগিয়েও রাখা হ'তে পারে নি।

আমরা দেব-মন্দিরের বিগ্রহ দেখতে চাইলুম। শুনলুম, কতকগুলি পিতলের মূর্ত্তি আছে, সে সব মূর্ত্তি উৎসব বা পর্ব্ব-দিবস উপলক্ষ্যে বা'র করা হয়। কিন্তু সেগুলি অতি পবিত্র জিনিস, স্বয়ং পদণ্ড-ঠাকুর ছাড়া আর কেউ সে মূর্ত্তি স্পর্শ করবার অধিকারী নন। এত দূরে এসেছি, মূর্ত্তিগুলি না দেখে যাওয়া ঠিক নয়, বিশেষ আমি ভারতবর্ষ থেকে আগত ব্রাহ্মণ, আমার সম্বন্ধে আপত্তি খাটতে পারে না। দ্রেউএস আর বাকেদের এই সুযোগে মূর্ত্তি দেখ্‌তে আপত্তি নেই। দ্রেউএস তখন পামাঙ্কুকে ব'ললেন, কুছ পরোয়া নেই, খাস ভারতবর্ষের পদণ্ড উপস্থিত, ইনি দেবার্চ্চনায় অধিকারী, একে দেখতে দাও। পামাঙ্কুটী কতকটা ইচ্ছায় কতকটা অনিচ্ছায় আঙিনার মধ্যে একটা মেরুর কাছে আমাদের নিয়ে গিয়ে ব'ল্‌লে, এই মেরুর ভিতরে মূর্ত্তি আছে। ব'লে চাবির গোছা থেকে একটা চাবি আলাদা ক'রে দেখিয়ে ব'ললে যে এই চাবি দিয়ে মেরুর দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকতে হবে। মেরুটা আর কিছুই নয়, উঁচু ইটের দাওয়ার উপরে কাঠের ছোট্ট একটা ঘর, দু তিনটা ধাপযুক্ত কাঠের সিঁড়ি দিয়ে ঘরের মেঝেয় উঠতে হয়; ঘরের চারদিকে বারান্দা; ঐ পাদপীঠরূপ দাওয়াকে অবলম্বন ক'রে; ঘরের কাঠের তৈরী ছাত, তার উপরে খড়ের চাল;—নেপালী মন্দিরের মতন, স্তরে স্তরে বাইরে খড়ে-ছাওয়া কয় স্তর ছাত্ বেরিয়ে এসেছে। পামাঙ্কু

শূদ্র ব'লে নিজে ঢুকবে না, চাবি আমার হাতে দিলে; নীচে জুতো রেখে আমি মন্দিরের দাওয়ায় উঠ্‌লুম, ধীরেন বাবুও উঠ্‌লেন; দ্রেউএস, আর বাকে-দম্পতী, আর পামাঙ্ক, আর আমাদের সঙ্গের বলিদ্বীপীয় লোকেরা সকলে মেরুর সামনে নীচে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল'। তলার চৌকাঠের সঙ্গে শিকল দিয়ে দরজা তালা-বন্ধ ছিল; চাবি খুলে ঘরে ঢুক্‌লুম। ছোট্ট ঘরটা, কাঠের মেঝে, দুধারে তক্তপোষের মত উঁচু কাঠের মাচা; খালি দরজার সামনেটা ফাঁক। একটু অন্ধকার লাগ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গে একটা ছাতা-ধরা ভাপসা গন্ধ নাকে এল'। কাঠের মাচাগুলি বহুদিনের সঞ্চিত ধূলোয় ভরা। মূর্ত্তি কিন্তু নজরে পড়্‌ল না, তবে মাচা দুটীর উপরে বেতের তালপাতার আর তাল আর না'রকেল্‌ বাল্‌দোর কতকগুলি চুবড়ী দেখলুম। বাইরে থেকে দ্রেউএস পামাঙ্কর কথা মতন আমায় ব'ল্‌লেন যে চুবড়ীগুলিতে মূর্ত্তি আছে। একটী, দুটী চুবড়ী খুলে দেখি, তার ভিতর সাদা আর লাল রঙের পুরোহিতদের পূজার কাপড় সব র'য়েছে—একটু ছাতাপড়া দাগ লেগেছে কতকগুলি কাপড়ে; আর র'য়েছে স্ফটিক কাঠ আর বীজের মালা, আর চওড়া সাদা জরীর গাত্র-বন্ধ—ফিতার মতন গায়ে যা জড়িয়ে পুরোহিতেরা পূজায় বসেন। এগুলি নাড়াচাড়া ক'রতে ক'রতে ধূলোয় হাত পা সব ভ'রে গেল। শেষে তালের বাল্‌দোর একটী চুবড়ীর ঢাকনী খুল্‌তে পাওয়া গেল, ভাঙা ম'রচে-ধরা পিতল আর তাঁবার টুক্‌রো এক রাশি—পুরাতন পূজার বাসন, ঘণ্টা প্রভৃতির ভগ্নাংশ এগুলি; আর তার তলা থেকে বা'র করা গেল গুটী চারেক পিতলের মূর্ত্তি। মূর্ত্তি কয়টী বিঘত-খানেক আকারের হবে; বেশ পরিষ্কার মাজা ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ব'লে লাগ্‌ল। দণ্ডায়মান রাজবেশী কোনও দেবতার মূর্ত্তি, দেবী মূর্ত্তি ছিল না; বলিদ্বীপের প্রাচীন পিতলের কাজের চমৎকার নিদর্শন। পিতলের মূর্ত্তিগুলির দুই ভুরুর মধ্যে একটী ক'রে রূপোর ফোঁটা কাটা। আর ত্রিনয়ন দেখে এক মূর্ত্তি শিবের ব'লে বোঝা গেল। (পরে আমি এই রকম দুটী মূর্ত্তি,—তবে এত ভালো কাজ নয়,—সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিলুম—একটী praboe 'প্রাবু' অর্থাৎ প্রভু বা রাজার, আর অন্যটী dewi 'ডেউঈ' অর্থাৎ দেবী বা রাণীর)। মূর্ত্তিগুলি নিয়ে তাদের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা ক'রে ধীরেন বাবুকে দেখাচ্ছি—ধীরেন বাবু দাওয়ার উপরে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—, বাইরে থেকে দ্রেউএস আর বাকে ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন, মূর্ত্তি বার ক'রে আনুন, আমরাও দেখি। দুটী মূর্ত্তি ধীরেন বাবু, আর দুটী আমি হাতে ক'রে নিয়ে এসে দাওয়ার ধারে পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে দিলুম।

যেমনি মূর্ত্তি দেখা, অমনি লোকজন যারা জড়ো হ'য়েছিল তারা মাটিতে উবু হ'য়ে ব'সে প'ড়ে দুহাতে মূর্ত্তিগুলিকে প্রণাম ক'রতে লাগ্‌ল। যুগপৎ এতগুলো লোকের মূর্ত্তিদর্শনমাত্র এইভাবে ভক্তি দেখিয়ে প্রণাম শুরু করাতে আমাদের একটু থম্‌কে যেতে হ'ল। পামাঙ্ক থেকে আরম্ভ ক'রে সকলেই উবু হ'য়ে ব'সে প্রণাম ক'রছে. ধীরেনবাবু আর আমি দাওয়ায়, আর ডচ্‌ বন্ধুরা মূর্ত্তির কাছে এসে দেখছে; এমন সময়ে আমাদের পথপ্রদর্শক, মুনচাঙ্‌ থেকে সেথো হ'য়ে এসেছিল যে ছোকরা—সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তারস্বরে বলিদ্বীপের ভাষায় আর মালাইয়ে উত্তেজিত ভাবে কি ব'ল্‌তে লাগল। তাতে দেখলুম যে সমাগত লোকেরা একটু যেন বিচলিত হ'য়ে প'ড়ল, একটু ভীত আর উদ্বিগ্নভাবে উঠে দাঁড়াল, আর আমার প্রতি আর মূর্ত্তিগুলির প্রতি তাকাতে লাগল। দ্রেউএস ও একটু যেন ভ'ড়কে গিয়ে মালাইয়ে ছোকরার সঙ্গে তর্ক ক'রতে লাগলেন। ব্যাপারটা বুঝলুম এই ছোকরা ব'লছে যে, আমরা এসে এই যে পবিত্র দেব-মূর্ত্তিতে হাত দিয়েছি, এতে আমাদের মহাপাতক হয়েছে—খালি পদণ্ডরা শুভদিন দেখে যে মূর্ত্তিকে স্পর্শ করেন, আমরা কোথাকার কে এসে সে মূর্ত্তিতে হাত দিলুম এতে দেবতারা রুষ্ট হবেন, আমার তো অশুভ হ'বেই, দেশেরও মহা অশুভ হবে। সব দেশেই ধর্ম্মবিষয়ে ভীতু লোক আছে, একথা শুনে সমাগত লোকেদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য আরম্ভ হ'ল—অনেকে তখন রাগতো ভাবে, পামাঙ্ক আমায় মূর্ত্তি বা'র করতে দিয়ে কাজটা ভাল করেনি, একথা ব'লতে লাগল। ছোকরারও ধর্ম্মভাব বেড়ে উঠল, সে আরও জোর গলায় তার আপত্তির কথা

ব'ল্‌তে লাগ্‌ল, ড্রেউএস এদের মালাইয়ে 'সম্‌ঝাতে' চেষ্টা ক'রলেন,—কিছু খারাপ বা অন্যায় হয় নি, খাস ভারতবর্ষের এত বড় একজন ব্রাহ্মণ আর পদণ্ড এসেছেন, তিনি মন্দিরে যদি দেবমূর্ত্তি না দেখেন তো দেখবে কে—দেবতারা কখনও রুষ্ট হবেন না, ইত্যাদি। কিন্তু গোলমাল থাম্‌তে চায় না। দেশটী নোতুন ডচেদের শাসনে এসেছে, দেশের লোকেদেব প্রকৃতি জানা নেই, খামকা কি জানি কি ঝঞ্ঝাট বেধে যায়। স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোষ এদেশে অজ্ঞাত, তবুও কে জানে, কি ভাবে নানা সংস্কার এদের মধ্যে কাজ করে। ডচ্‌ বন্ধুরা একটু উদ্বিগ্ন ভাবে এই কথা গুলি আমায় ব'ল্‌লেন, আর মূর্ত্তিগুলি যথা স্থানে রেখে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দিতে ব'ল্‌লেন। আমিও একটু চিন্তিত হ'য়ে প'ড়লুম। বলিদ্বীপের ধর্ম্ম আমারই ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের রূপান্তর মাত্র; আর দুদিন ধ'রে পদণ্ডদের সঙ্গে মিশে যে হৃদ্যতার পরিচয় পেয়েছি, তাতে ক'রে, হিন্দু ব'লে ব্রাহ্মণ ব'লে এখানেও একটা সহজ অধিকার আমার আছে, এই রকম একটা বোধ মনে এসে গিয়েছে—আমার সে অধিকারের দাবী আমি এই ছোকরার চীৎকারেই ছাড়বো কেন? রণে ভঙ্গ দেওয়া কোন কাজের কথা নয়। ড্রেউএসকে ব'ললুম—আপনি বলুন যে ইনি ব্রাহ্মণ, মন্ত্র জানেন, ইনি ব'ল্‌ছেন কোনও অমঙ্গল হবে না; আর তোমাদের বিশ্বাসের জন্য ইনি দেবতারা যাতে অপরাধ না নেন এইজন্য কতকগুলি মন্ত্র আর স্তোত্র পাঠ ক'রবেন তাতে সমস্ত অমঙ্গলের ভয় কেটে যাবে। ড্রেউএস এই কথা ব'ল্‌তে যার উপর দোষ প'ড়ছিল, সেই পামাঙ্কু বেচারা আর মাতব্বর আর মুরুব্বি গোছের দুচার জন লোক ব'ল্‌লে, এ বেশ কথা; উনি তাই করুন। অদ্ভুত পোষাক পরা ভারতবর্ষের এই ব্রাহ্মণ কিভাবে মন্ত্র প'ড়বেন সে বিষয়ে হয় তো কারু কারু মনে একটু কৌতূহলও হ'য়েছিল। আমি তখন ধীরে ধীরে মূর্ত্তিগুলিকে উঠিয়ে ঘরের মধ্যে যথাস্থানে রেখে দিলুম, তারপরে দরজা বন্ধ ক'রে তালা দিয়ে দাওয়া থেকে ভুঁয়ে নেমে চাবি পামাঙ্কুর হাতে দিলুম। আমার মন্ত্র শুনবে ব'লে সমাগত লোকেরা উৎসুক হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল'। আমি মন্দিরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জোড় হাতে 'ওঙ্‌ নমঃ শিবায়' 'ওঙ্‌ নমো বিষ্ণবে' এই মন্ত্র বার কতক উচ্চারণ ক'রে শিবের আর নারায়ণের ধ্যান, আর এ ছাড়া স্তোত্র যা-কিছু মনে ছিল, মায় জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র পর্য্যন্ত—উচ্চৈঃস্বরে একটু সুর ক'রে প'ড়ে গেলুম। আমার কথামত ড্রেউএস এদের ব'ললেন যে 'দেবতাস্তোত্র' পড়া হ'য়েছে, আর কোনও ভয় নেই। তারপরে আবার বেদপাঠ ব'লে গায়ত্রী মন্ত্র আর সন্ধ্যা-আহ্নিকের সূক্ত কতকগুলি প'ড়লুম। এদের ভয় গেল, সকলে আবার নিঃসঙ্কোচে কথাবার্ত্তা আরম্ভ ক'রলে। খালি সঙ্গের পথপ্রদর্শক ছোকরাটী গোমড়া মুখে রইল।

মন্দিরে যা দ্রষ্টব্য তা তো ঘুরে ঘুরে দেখা হ'ল; মাঝে এই ব্যাপারটা হ'য়ে গেল। এইবার ফেরা যাবে স্থির ক'রে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নাম্‌তে লাগলুম। পামাঙ্কুর কিন্তু ভয় কাটে নি। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আবার কিছু মন্ত্র-স্তোত্র পড়বার জন্য ড্রেউএসের মারফৎ আমায় অনুরোধ ক'রলে। আমি স্বীকার ক'রলুম—উপরের মন্দিরের চত্বর থেকে নামবার বড় সিঁড়ির নীচে মন্দির-মুখো হ'য়ে দাঁড়িয়ে আবার মন্ত্র পাঠ ক'রতে হ'ল। উপরে মন্দিরে যে সব লোক ছিল, তাদের সরিয়ে দিলে, মন্দিরের চত্বরে আর কেউ রইল' না। এদের কাছে যা তা প'ড়ে দিলেই হ'ত; মেঘদূতের শ্লোক আওড়ালেও চ'ল্‌ত, বাঙ্গলা কবিতা বা গদ্য আউড়ে গেলেও ক্ষতি ছিল না; কিন্তু আমি জুয়াচুরী করিনি! জনসাধারণ সব জায়গায় যেমন হ'য়ে থাকে, এরাও তেমনি দৈব-ভয়ে ভীত এদের সবচেয়ে পবিত্র দেববিগ্রহ অজ্ঞাত-কুলশীল লোকেদের এমনি ক'রে বিনা পরিচয়ে হাত দিয়ে নাড়ানাড়ি ক'রতে দেওয়া, এদের মধ্যে যারা বিশ্বাসী লোক তাদের মতে অন্যায় কার্য্য হবে বৈকি; আর তাতে যে দেব-রোষ আস্‌তে পারে, এরকম ধারণা হওয়া তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমায় মন্ত্র-টন্ত্র প'ড়ে আমার অধিকার প্রমাণ ক'রতে হ'ল; কিছু বুঝলে না, তবে খুশী হ'ল যে একটা কিছু দাবী আমার আছে, আর বিশেষতঃ ডচ্‌ ভদ্রলোকেরা যখন আমায় ব্রাহ্মণ ব'লে এদের কাছে পরিচয় দিচ্ছেন। মন্দির থেকে চ'লে আসছি, ড্রেউএস

ব'ল্লেন, যখন এদের মধ্যে মিছিমিছি এই গোলযোগের সৃষ্টি হ'য়েছে তখন পদণ্ড-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা না ক'রে আমাদের ফেরাটা উচিত হবে না। আমরা যাচ্ছি, পামাঙ্কটী আমাদের সঙ্গে র'য়েছে, পিছনে লোকেরা র'য়েছে,—এমন সময়ে পামাঙ্ক দু হাত জোড় ক'রে একটু কাতর ভাবে আমায় বলিদ্বীপীয় ভাষায় আর মালাইয়ে কি ব'ল্‌তে লাগ্‌ল। ভাবটা এই, যে সত্যি সত্যি যেন আমাদের ঠাকুর দেখানোতে কারো কোন অনিষ্ট না হয়। পদণ্ডের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'ল, তিনি

বেসাকিক্-এর পথের দৃশ্য
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্তৃক গৃহীত)

তখন ফিরেছেন। দু দণ্ড আলাপ হ'ল। আমার সঙ্গে কথা-বার্তায় আমার শাস্ত্রজ্ঞানের গভীরতা আর মন্ত্র আর স্তোত্রে আমার অসাধারণ দখল সম্বন্ধে সহজেই তাঁর সুদৃঢ় ধারণা হ'য়ে গেল! তিনি 'ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ', এই টুকু বুঝেই প্রথমটায় অভিভূত হ'য়ে প'ড়লেন। সমাগত জনতাকে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, আমি একজন খাটী লোক—ভেল নই। তাতে এদের মনে আর খট্‌কা বা বিরূপ ভাব কিছু রইল না। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা যবদ্বীপীয় জঙ্গল বিভাগের কর্ম্মচারীটার আপিসে এলুম, সেখানে তাঁকে বিদায়-সম্ভাষণ ক'রে বেলা আড়াইটের দিকে আমরা ফিরতী পথ ধ'রলুম।

আবার সেই দীর্ঘ পথ—সেই চড়াই-উতরাই, আর দু এক জায়গায় উতরাইয়ের কঠিনতা। অবশেষে পাহাড়ে' পথ ঘুরে নোতুন একটা গাঁয়ের পাশদিয়ে মুন্‌চাঙ-এ পৌছানো গেল। সারাদিন প্রায় কিছুই খাওয়া হয় নি। মুন্‌চাঙে এক যবদ্বীপীয় মণিহারের দোকানে বিয়ার পাওয়া গেল, ডচ বন্ধুরা সানন্দে তাই পান ক'রলেন। বলিদ্বীপে দেখেছি, সোডা লেমনেডের মতন বিয়ারের চলন খুব হ'য়েছে। বিয়ার অবশ্য ঠিক মদ নয়, নেসার জন্য লোকে খায় না। আমাদের পথপ্রদর্শক ছোকরাটী ফেরবার সময়ে সারা পথ অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে এসেছিল। তাকে দু গিলডার বক্‌শিশ দেওয়া গেল। সাড়ে চারটেয় মোটরে ক'রে মুন্‌চাঙ থেকে আমাদের কারাঙ-আসেম যাত্রা হ'ল। পড়ন্ত রোদ্দুরে চমৎকার দৃশ্য। বিকালে স্নান সেরে মেয়েরা চ'লেছে, এদের সদ্যঃস্নানের শুচিতাকে মাথার চুলে পরা ফুলে চমৎকার শ্রীমণ্ডিত ক'রে দিয়েছে।

পথে Bebandam বেবান্দাম্ ব'লে একটা গ্রামের মধ্য দিয়ে যাবার সময়ে দেখি, মন্দিরে পর্ব্বোৎসব লেগে গিয়েছে। মিষ্টি গামেলান বাদ্যের ধ্বনিতে আকৃষ্ট হ'য়ে মোটর থামিয়ে আমরা নামলুম। মন্দিরটী একটা টিলার উপরে। উজ্জ্বলবেশে নরনারী আর ছেলেমেয়েদের ভীড়। গাঁয়ের 'পুরা' বা মন্দির; শুনলুম ভূদেবীর বিশেষ অর্চ্চনা উপলক্ষ্যে এই উৎসব। মন্দিরটীকে সাফ-সুথরা ক'রে চমৎকারভাবে সংস্কার করা হ'য়েছে। মন্দির-তোরণের দুপাশে বাইরে দুটী খুব উঁচু বাঁশ পোতা হ'য়েছে, বাঁশ দুটীর মাথা কাটা হয়নি, স্বাভাবিক সরুই রাখা হ'য়েছে, মাথা বেঁকে সরু কঞ্চিতে পরিণত হ'য়েছে, তা থেকে খুব লম্বা নোতুন-কাটা হাতীর-দাঁতের মত সাদা কচি তালপাতার নানা রকম কাজ করা একটা লম্বা ঝালর উড়ছে, নানা রকমের ঝুরি দিয়ে এই তালপাতার ঝালর অলঙ্কৃত। আমাদের দেশে উৎসব নিকেতনের দু পাশে যেমন ফলন্ত কলাগাছ দেয়,এখানে দেখছি পুরা বংশদণ্ড পুতে অলঙ্কৃত ক'রে দেওয়া হয়। ভিতরে নৈবেদ্য সাজানো হ'চ্ছে; পদণ্ড-ঘরের

মেয়েরা এসেছেন, এঁরা এক শ্রেণীর দেয়াসিনী বা দেবসেবিকার কাজ করেন; এঁরাই সব সাজাচ্ছেন;

দ্বার-পার্শ্বে পদণ্ড-ঘরের মেয়ে—মাতা ও কন্যা

রঙীন 'কাইন' বা বস্ত্র প'রে চুলে ফুল গুঁজে সদ্য-স্নাতা অন্য মেয়েরা সাহায্য ক'রছে, বা হাঁটু গেড়ে ব'সে আছে। একটা আটচালায় গামেলান-বাজিয়েরা ব'সে তাদের ওই চমৎকার বাজনা বাজাচ্ছে। লোকজন এত, কিন্তু হৈ চৈ কলরব নেই ব'ল্লেই হয়। এটা ভারী আশ্চর্য্য লাগ্ল। উঁচু উঁচু কাঠের নৈবেদ্য-বেদির উপরে ফলের স্তূপ, আমাদের বিবাহের চালের গুঁড়োর তৈরী শ্রীর আকারে ভাতের স্তূপ, এই সব সাজাচ্ছে। পূজার উপচার দ্রব্য দেখলুম,—মেয়েরা সব সাজিয়ে সাজিয়ে তৈরী ক'রে রাখছে;—ফুলের মতন কাজ করা তালপাতার মূর্ত্তি; তালপাতার দোনায় নব পল্লব, কলা, আর তালপাতার মোড়কে কি একটা বস্তু র'য়েছে দেখলুম; আর বেলপাতার মতন একটা ক'রে পাতা কাঠি দিয়ে লাগিয়ে এই দোনায় রেখেছে; আর খুঁটিনাটি নানান্ জিনিস, এই সব পাতায় ফুলে ফলে তৈরী, একটার নাম শুনলুম 'সাম্পিয়াং', একটার 'পুসা', একটার 'রুরা';—এই পূজোপচারের অর্থ বা উদ্দেশ্য কে বুঝিয়ে দেবে? সন্ধ্যে তখনও হয় নি; বিকালের সূর্য্যাস্তের মধ্যে মন্দির প্রাঙ্গনে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলুম, সমস্ত জিনিসটা বাঙলির উৎসবের মতনই মনোহর লাগ্ল।

তার পরে সন্ধ্যের অন্ধকার ঘনিয়ে আস্তে পুনরায় যাত্রা ক'রলুম, ভরা সন্ধ্যায় পাসাঙ্গ্রাহানে বাসায় ফেরা গেল। মোটর গাড়ী সারাদিনের ভাড়া নিলে সাড়ে সতেরো গিলডার। সকলেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত্ত। স্নান-টান সেরে সায়মাশ চুকিয়ে নিয়ে বারান্দায় চেয়ারে গা ঢেলে আড্ডার জন্য বসা গেল।

কবি তাম্পাক্-সেরিঙ্-এ আছেন, ভালোই আছেন, টেলিফোন যোগে এ খবর তখন আমাদের কাছে এল।

(৯) বলিদ্বীপ—ক্লুঙ্-কুঙ্

৩০শে আগষ্ট ১৯২৭, মঙ্গলবার।—

আজ সকাল বেলাটা কারাঙ-আসেমেই কাট্ল। সকালে একবার রাজবাড়ীতে গেলুম, তার পরে প্রাচীন 'পুরী' আর একবার ঘুরে ফিরে দেখে এলুম। রাজার কাছ থেকে বিদায় নিলুম। তিনি তাঁর ছবি আমায় দিলেন, বলিদ্বীপীয় ধরণে আঁকা ছবিও একখানি দিলেন—বিষয়, 'স্মর-রতি'। শ্রীযুক্ত লোকুমলের দান ডচ ভাষায় অনূদিত গীতা একখানি, আর সঙ্গে ছিল কিছু মৈসূরের ধূপ, এই দুটা সামান্য জিনিস তাকে উপহার দিলুম।

সাড়ে দশটায় আমরা দুখানা মোটরে ক'রে কারাঙ-আসেমের পাসাঙ্গ্রাহান থেকে ক্লুঙ-কুঙ্ যাত্রা ক'রলুম। একখানা মোটরে সব মালপত্র উঠল। ক্লুঙ-কুঙ অবধি দুখানা গাড়ীর ভাড়া নিলে সতেরো গিলডার। সেই

চমৎকার দেশের মধ্যে দিয়ে আবার যাত্রা। এবার সমতল দেশের মধ্য দিয়ে পথ। দুপুরের মধ্যে ক্লুঙ্-কুঙ্-এ পৌঁছে সেখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে ওঠা গেল।

ক্লুঙ্-কুঙ্-এর বিচারালয়

এটাও একটা ছোটো শহর বা গণ্ডগ্রাম। আপিস আদালত আছে, ইস্কুল আছে, ডাকঘর আছে। টেলিফোন-আপিস আছে, কাছে পিঠে প্রাচীন মন্দির আছে, আবার রাজপুরীও আছে। একটা বড়ো রাস্তা, তার দক্ষিণ ধারে পাসাঙ্গ্রাহান। পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই Kretak Go.se বা স্থানীয় বিচারালয়—বিচারালয়টা আর কিছুই নয়, একটা বলিদ্বীপীয় pavilion বা ছত্রী মাত্র, উঁচু চাতালের উপর ছাতে ঢাকা একটি বড়ো ঘর, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হয়; এইখানেই বিচারক চেয়ারে ব'সে বিচার করেন। ঘরটার চারিদিকে ছাতের নীচেটায় নানা ছবি আছে, রঙীন ছবি, বলিদ্বীপীয় ঢঙে আঁকা, নরকে পাপের বিচারের ছবি। এই ছোট্ট ইমারতটী বেশ চমৎকার। সিঁড়ির মাথায় দুধারে পাথরের তৈরী দুটী সুন্দর উপবিষ্ট মূর্ত্তি, একটী পুরুষের, একটী মেয়ের।

বিশ্রাম করে আহার টাহার সেরে গ্রামটি একটু বেড়াতে বেরুলুম। দোকান পাট আছে। চীনা, আরব রোম্বাইয়ে খোজা—এরা দোকানী। এখানেও রাস্তার মধ্যে বলিদ্বীপীয় মেয়েরা তাদের সুন্দর গতিলীলার সঙ্গে চলাফেরা ক'রছে, মাথায় ক'রে জলের কলসী জিনিসপত্র সব নিয়ে চ'লেছে। কাল হলাণ্ডের মহারাণীর জন্মদিন। তদুপলক্ষে স্থানীয় ইস্কুল, ডাকঘর টেলিফোন-আপিস সব রঙীন কাপড় আর কাগজ আর বিশেষ করে না'রকেল পাতা দিয়ে সাজানো হ'য়েছে, লাল নীল সাদা তেরঙা ডচ্ নিশান উড়ছে—যে নিশানকে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের রঙের নিশান ব'লে ব্যাখ্যা ক'রে বলিদ্বীপীয়েরা যেন নিজেদেরই দেবতার ধর্ম্মের নিশান বলে মেনে নিয়েছে। কাল ইস্কুলের সামনে মাঠে সভা হবে, আর বলিদ্বীপীয় নাচ হবে—বাদুঙ বা দেন-পাসার নগর থেকে একটা নাচুনী মেয়েকে আনা হ'য়েছে, পেশাদার নাচিয়ে, সে নাকি খুব ভাল নাচতে পারে।

প্রাচীন একটা প্রাসাদের দরজার দুপাশে রাক্ষস দ্বারপালের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে প্রাসাদ-নির্ম্মাতা ডচেদের বিদ্রূপ

তোরণ-দ্বারে রাক্ষস দ্বারপাল মূর্ত্তি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

ক'রে দুটী ডচ পুরুষের মূর্ত্তি পাথরে খুদিয়ে রেখেছিলেন। তখন এই দ্বীপ ডচেদের হাতে আসে নি। সমগ্র দ্বীপময় ভারতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ক'রে ইউরোপীয় ডচেরাই এদেশের লোকেদের কাছে যেন রাক্ষসের প্রতীক হ'য়ে পড়েছিল;—এদের চিত্রিত করা হ'য়েছে, একজনের হাতে মদের বোতল, আর এক জনের হাতে টাকার থলি; দুজনেরই মাথায় টুপি, গম্ভীর ভাবে তোরণ-দ্বারের দু পাশে দুটী মূর্ত্তি ব'সে। এই ব্যঙ্গ-চিত্র ডচেরা বেশ প্রসন্নভাবে রসজ্ঞের মতই নিয়েছে,—ডচ ভদ্রলোকেরা গিয়ে এই দুটী মূর্ত্তি দেখে আসেন, আর তাদের ফোটোগ্রাফও নেন। আমরা যথারীতি গিয়ে দেখে এলুম, আর বাকে এই তোরণদ্বারের ছবিও নিলেন।

ক্ল‍ুঙ্‌-কুঙ্‌-এর প্রাসাদে দ্বারপাল মূর্ত্তিতে ডচ্ প্রতিকৃতি
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

এদিকে আমাদের পাসাঙ্গহানের হাতার মধ্যে প্রাচীন আর আধুনিক বলিদ্বীপীয় শিল্পদ্রব্যের একটা হাট ব'সে গেল। তিন চার জন স্ত্রীলোক আর দু একটী পুরুষ নানা রকমের মনোহর শিল্পজাতের পসার দিয়ে ব'স্‌ল। বলিদ্বীপের আর যবদ্বীপের 'বাতিক' বা ছাপা কাপড়; কাপড়ের উপর আর কাগজের উপরে নানা রঙে আঁকা বলিদ্বীপীয় পৌরাণিক চিত্র; কাঠের ছোট ছোট দেবতা মূর্ত্তি, আর অন্য মূর্ত্তি; চামড়ার wayang ওয়াইয়াঙ্ বা ছায়ানাট্যে ব্যবহৃত মূর্ত্তি; পিতলের তৈরী পূজার তৈজস; ছোট্টো ছোট্টো ক্রীস বা ছোরা; জরীর কাপড়—বেনারসী কাপড়ের মতন; সুরাতের রঙীন রেশমে বোনা 'পাটোলা' কাপড়ের মত কাপড়; এই রকম নোতুন পুরাতন নানা জিনিস, আমরা কয়জন ভ্রমণকারী বা যাত্রী পাসাঙ্গ্রাহানে উঠেছি দেখে এনে হাজির ক'রলে। আমরা সকলেই কিছু কিছু কিনলুম। বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্য কিছু জিনিস ধীরেন বাবু সংগ্রহ ক'রলেন। কাপড়ে আঁকা রঙীন পট কতকগুলি, আর দু একটী মূর্ত্তি, এই যা আমি নিলুম। বিদেশী যাত্রীদের কাছে বলিদ্বীপীয়েরা যেভাবে তাদের দেশের প্রাচীন শিল্পজাত উজাড় ক'রে বিক্রী ক'রে দিচ্ছে, তাতে মনে হয় বছর কতক পরে প্রাচীন জিনিস একটিও দেশে আর থাকবে না, সব আমেরিকান আর ইউরোপীয় টুরিসটদের সঙ্গে সাগর পারে চ'লে যাবে। একজন বলিদ্বীপীয় ছোকরা, মাটিতে পসরা পেতে এইসব জিনিস পত্রের বেচাকেনা দেখছিল। ভাঙাভাঙা ইংরিজিতে সে আমার সঙ্গে কথা কইলে। 'মহাগুরু' কোথায়, তাও জিজ্ঞাসা ক'রলে। ছোকরা এতটা খবর রাখে দেখে ভারী খুশী হ'লুম। একটু গর্ব্বের সঙ্গে নিজেকে হিন্দু ব'লে সে পরিচয় দিলে। ব'ল্‌লে, তার ও পুরাতন আর নোতুন শিল্পদ্রব্যের দোকান আছে—পাসাঙ্গ্রাহানের পাশেই তার দোকান। আমরা যদি তার দোকানে গিয়ে জিনিসপত্র দেখি, তাহ'লে সে ভারী অনুগৃহীত হয়। তার দোকানে গিয়ে যেন ছোটো খাটো একটী বলিদ্বীপীয় চিত্রশালা দেখ্‌লুম, নানা সুন্দর জিনিসের সমাবেশ। এখানেও দু একটী মূর্ত্তি নিলুম—আমার পিতলের মূর্ত্তি দুটী যার কথা একটু আগেই বেসাকিকের মন্দিরে মূর্ত্তি-দর্শন প্রসঙ্গে ব'লেছি

সেন্তটী এরই কাছ থেকে কিনলুম। পিতলের একটী বেশ বড়ো গরুড়-বাহন বিষ্ণু মূর্ত্তি দেখে নেবার বড়ই লোভ হ'ল, কিন্তু আমাদের ঘোরাঘুরি ক'রতে হবে ঢের, সেটীকে আর কেনবার সাহস হ'ল না। ছোকরাটী বেশ বুদ্ধিমান। আমার খাতায় নাম লিখে দিলে; এর নাম Wajan Pageh (ওয়াইয়ান পাগেঃ)।

এই সবে, দুপুর আর বিকাল বেলাটা বেশ কাট্‌ল। বিকালে তাম্পাক্‌ সেরিঙ থেকে শ্রীযুক্ত কোপ্যারব্যার্গ এলেন, কবির সন্দেশ নিয়ে। কবি ঐ সুন্দর ঠাণ্ডা পাহাড়ে' জায়গাটিতে ভালোই আছেন। কাল সকালে কোপ্যারব্যার্গ আমাদের সঙ্গে ক'রে সেখানে নিয়ে যাবেন ব'লে এসেছেন। কোপ্যারব্যার্গ এদেশের সকলকে জানেন, খবর-টবর খুবই রাখেন। তিনি সংবাদ পেলেন, কাছেই বলিদ্বীপীয়দের পল্লীতে রাত্রে নাচ দেখানো হবে, কালকের ব্যাপারের জন্য বাড়ঙ থেকে যে নাচের দল এসেছে তারা এমনি তাদের বাসায় নাচ দেখাবে। কাজেই, রাত সাড়ে আটটায় উৎসাহ ক'রে আমরা চ'ললুম। কোপ্যারব্যার্গ আঁচ ক'রে ক'রে পথ চিনে চিনে চ'ল্‌লেন। বড়ো সড়কের পূব মুখে খানিকটা গিয়ে ডান দিকের একটা রাস্তায় আমাদের ঢুক্‌তে হ'ল। এইবার হ'ল মুস্কিল। বড়ো রাস্তার মতন এখানে আলো নেই। আর রাস্তাটা বড্ড এবড়ো-খেবড়ো; পাথরের চাবড়া যথেষ্ট আছে, জায়গায় জায়গায় আবার দাপও আছে। অন্ধকারে একটু বিপদে প'ড়লুম। তবে একটু এগিয়েই দেখা গেল, একটা দোকান-ঘর, সেখানে আলো জ্ব'ল্‌ছে, লোকজন অনেকগুলি র'য়েছে। দোকানটি একটা চিনির মেঠাইয়ের। মদুরা দ্বীপ যবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্বে, ছোট দ্বীপটি; এই মদুরা দ্বীপ থেকে এই মিষ্টিওয়ালারা এসে এখানে দোকান খুলেছে। আমাদের অপটু চোখে বলি-দ্বীপীয়দের মধ্যে থেকে এদের পৃথক ক'রে ধরা কঠিন। কোপ্যারব্যার্গ এদের সঙ্গের মালাইয়ে কথা কইলেন, এদের সম্বন্ধে ওয়াকিব-হাল হ'লেন। কালকে হলাণ্ডের রাণীর জন্ম-দিন উপলক্ষ্যে যে উৎসব হবে, মেলা ব'সবে, তার জন্যেই এরা অনেক রাত অবধি এই সব মিষ্টি তৈরী ক'রছে—বিক্রী ক'রবে ব'লে। এরা ভদ্রতা ক'রে আমাদের একটা আলো দিলে। এইবার আমরা বেশ চ'ললুম। অস্ফুট নক্ষত্রালোকের তলা দিয়ে, রাস্তার দুধারে কেবল গাছপালা নজরে এলো, আর মাঝে মাঝে দু একখানা বাড়ী। লোকজনের চলাফেরা নেই, রাস্তা নির্জ্জন। পথে-শোয়া কুকুর মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গের আলোতে আর এতগুলি লোকের পায়ের আর গলার আওয়াজে বিরক্ত হ'য়ে ঘেউ ঘেউ ক'রতে ক'রতে উঠে পালাল। এই রকমে আমরা যে বাড়ীতে যেতে হবে সেখানে গিয়ে পৌছুলুম। আঙিনার পর আঙিনা পেরিয়ে যেতে হ'ল। ঘুমন্ত শূওর ছিল উঠানের ধারে, জেগে উঠে ঘোঁত ঘোঁত ক'রতে লাগল। একটা মহলে এসে প'ড়লুম, একটা ঘরের বারান্দায় আমাদের স্বাগত ক'রে ব'স্‌তে দিলে, খান কতক চেয়ার এনে দিলে ব'সতে। গোটা পাঁচেক হারিকেন লণ্ঠন জ্ব'ল্‌ছে, এতেই যা আলো হ'য়েছে; উপরে আকাশে একটা তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্ব'লছে, আর পরিষ্কার আকাশে ছায়াপথ বেশ দেখা যাচ্ছে। ছোটখাটো উঠোন, আশে পাশে ২।৪ খানি ঘর; এক পাশে কলাগাছ কতকগুলি আছে, সেগুলি স্তূপাকারে পিণ্ডীভূত অন্ধকারের মতন র'য়েছে, হাওয়ায় তাদের চওড়া পাতা কাপড়ের মতন ন'ড়ছে। উঠোনের একধারে গামেলান বাজনার দল ব'সছে। আমরা যখন পঁউছুলুম, তখন ঢাকে কাঠি পড়েছে—অর্থাৎ বাজনা আরম্ভ হ'য়েছে। আমরা ব'স্‌তেই নাচ শুরু হ'ল। যে মেয়েটী নাচবে, তার বয়স তেরো কি চোদ্দ হবে; সে আর তার চেয়ে ছোটো একটী মেয়ে, মেয়েটীর বাপ (বাপই তাকে নাচ শিখিয়েছে, আধা-বয়সী লোক এটা), আর অন্য একটী ছোকরা; নাচে এই কয় জন যোগ দিলে। সাধারণ 'কাইন' বা সারঙ পরা মেয়েটী, উত্তরীয় খানি বুকে বাঁধা; বাপের পরিধানে ধুতির মতন খাটো সারঙ একটী, খালি গা, মাথায় একখানা রঙীন রুমালের পাগড়ী। প্রথম মেয়েটী একা নাচতে লাগ্‌ল, মাঝে মাঝে তার বাপও এসে সঙ্গে যোগ দিতে লাগ্‌ল, মাঝে মাঝে অন্য পুরুষটী। ছোটো মেয়েটীও সঙ্গে একটু আধটু নাচলে। বাজনার তালে অত্যন্ত চমৎকার লাগ্‌ল এই নাচ। তনু দেহের লীলায়িত গতি, আর হাতের অপূর্ব্ব ভঙ্গী; মাঝে মাঝে

খুব দ্রুত তালে ঘুরে ফিরে নাচ চ'ল্‌ল। মলয়-উপদ্বীপে 'রোঙেঙ্‌' নাচ দেখেছিলুম, এ কতকটা তারই মতন লাগ্‌ল, তবে তার চেয়ে একটু বেশী কঠিন বেশী মার্জ্জিত ব'লে বোধ হ'ল; কিন্তু দুচার জায়গায় কখন ও কখন ও একটু suggestive, একটু যেন অভব্যতার আমেজ আমার চোখে লাগ্‌ছিল। ঘণ্টাখানেক নাচ দেখে, মেয়েদের মেঠাই খাবার জন্য দুটী টাকা বক্‌শিশ ক'রে আমরা বাড়ী ফির্‌লুম।—নাচ চ'ল্‌ছে, ও দিকে বাড়ীর মেয়েদের দৈনন্দিন কাজেরও বিরাম নেই। একখানা আটচালা ঘরে উখলী দিয়ে বাড়ীর কম-বয়সী দুটী মেয়ে চাল কাঁড়ছে দেখ্‌লুম—এ ও যেন এক ধরণের নৃত্য। আমরা ছাড়া বাইরের লোক দর্শনার্থী হ'য়ে বেশী আসে নি।

পাসাঙ্গ্রাহানের বারান্দায় ব'সে রাস্তার জনবিরল স্তব্ধতার দিকে চেয়ে গল্পগুজব ক'রছি এমন সময়ে দেখা গেল, একদল ছোকরা হল্লা ক'রতে ক'রতে যাচ্ছে। কোপ্যার্‌ব্যার্গ তাদের ডাকলেন। তাদের দিয়ে কোপ্যার্‌ব্যার্গ গানের নামে খানিকটা চেঁচামেচি করালেন। তাঁর কাছে উৎসাহ পেয়ে, গান ধ'রলে একটা ছেলে;—আস্তে আস্তে সুর আরম্ভ করে, আর বাকী কজন ব'সে ব'সে গা দোলায়; গানের একটা কলি যাই শেষ হয়, অমনি সমস্বরে কতকগুলি উৎকট চীৎকার করে,—যেন এটা গানের ধুয়া—চীৎকার না বলে একটা হাঁক বলা যায়—সেটা কতকটা এই ধরণের শব্দ নিয়ে—"এঃ এঃ এঃ, টিডা, টিডা, টিডা"। গান বা ছড়া বলির ভাষায়; আশয়টী কি, তা জানা গেল না। খানিকক্ষণ ধ'রে এদের এই রঙ্গ দেখা গেল।

(ক্রমশঃ)

তিস্তা

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

[প্রাচীন আসামী হইতে অনুবাদ]

তোমারে হেরিয়াছিনু বাংলার মাঠে
অয়ি তিস্তা! বিতরিয়া প্রতি ঘাটে ঘাটে
হিমানীর সন্তাষণ শুক্তিস্বচ্ছ জলে
অবশেষে মিলাইতে উদাস-কুন্তলে
দিগন্তরে মেঘম্লান! হেরিতেছি পুন,
এ গিরি-শিখরে নিত্য নর্ত্তন-নিপুণ
তন্বী মেনকার মত অজস্র প্রলাপে
উচ্চকি' পাইন বন নামো ধাপে, ধাপে॥

তোমারে হেরিয়াছিনু বঙ্গের প্রান্তরে
কম্পিত মল্লিকাদাম শঙ্কিত-চরণা!
আজি তুমি এ কি রূপে এ-হিমাদ্রি 'পরে
খররবি করে ক্ষীণ একটি ঝরণা!
হেরিতেছি আজি সখি তোমার অন্তরে
কি আকুতি অবিশ্রাম করে আনাগোনা॥

আধুনিক গৃহসজ্জা—

এক বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রেই আমরা আধুনিকের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করি না —আর্ট সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নয়। প্রাচীন যুগের শিল্পের সঙ্গে আধুনিক শিল্পের তুলনা চলে না। এমন কি আমাদের রসবোধও দিন দিন কমিয়া যাইতেছে বলিয়া আমাদের ধারণা। বাস্তবিকপক্ষে আধুনিক শিল্পে আমাদের প্রয়োজনীয়তাই একমাত্র চরিতার্থ হইতেছে, রসবোধ নয়। ইউরোপে গত কয়েক বৎসর ধরিয়া গৃহসজ্জায় একটা 'আধুনিকতা'র আন্দোলন চলিতেছে। এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকেরা এখন আর আধুনিক অর্থে কুৎসিৎ, একথা স্বীকার করেন না। আধুনিকই সুন্দর, তবে আমরা আধুনিক বলিতে যে কুৎসিৎ বুঝি তাহার জন্য দায়ী ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিভলিউশান-এর প্রথম বিভীষিকা এবং কলের নিষ্ফল অনুকরণের চেষ্টা। গত শতাব্দীতে কারখানা খুব রম্য স্থান ছিল না। মজুরদের দুর্দশা কিংবা অপরিণত বালকদের দিনে ১৩ ঘণ্টা করিয়া খাটার কথা কেহ ড্রয়িং রুমে বসিয়া মনে আনিতে চাহিত না। তাই সে যুগের গৃহকর্ত্রীরা এলিজাবেথীয় শয্যা হইতে উঠিয়া চিপেনডেল চেয়ারে বসিতেন। তাঁর পায়ের নীচে থাকিত সাভোনরি কার্পেট। বটিচেলী কিম্বা র‍্যাফেল ছাড়া অন্য কাহার চিত্র তাঁহার চোখে পড়িত না। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল-এর প্রথম বিভীষিকা কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর আধুনিক অর্থে অসুন্দর বুঝিবার কোন কারণ নাই।

হাতের কাজের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য যে যন্ত্রের দ্বারা অনুকরণ করা সম্ভব নয়, একথা আধুনিকেরাও স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন শিল্পে যন্ত্রের প্রথম প্রয়োগে এই খানেই সবচেয়ে বড় ভুল হইয়াছিল। অতিরিক্ত কারুকার্য্য রচনায় অক্ষম হইলেও কোন প্রকার সৌন্দর্য্যসৃষ্টি যন্ত্রের পক্ষে সম্ভব নয় ধরিয়া নেওয়া ভুল। বিজ্ঞানের প্রয়োগ চলিতে পারে আর্টের সেই স্বরূপটিই খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আধুনিক গৃহসজ্জায় তাঁহারা সেই সৌন্দর্য্যের সন্ধান পাইয়াছেন।

এতটা চরম মত অবশ্য সকলেই পোষণ করেন না। কেহ কেহ স্বীকার করেন যে, কলের পক্ষে হাতের মত প্রত্যেকটি বস্তুকে বিশিষ্টতা দেওয়া সম্ভব নয় এবং শিল্পীর নিজস্ব রসবোধের ও কলের আর্টে কোন
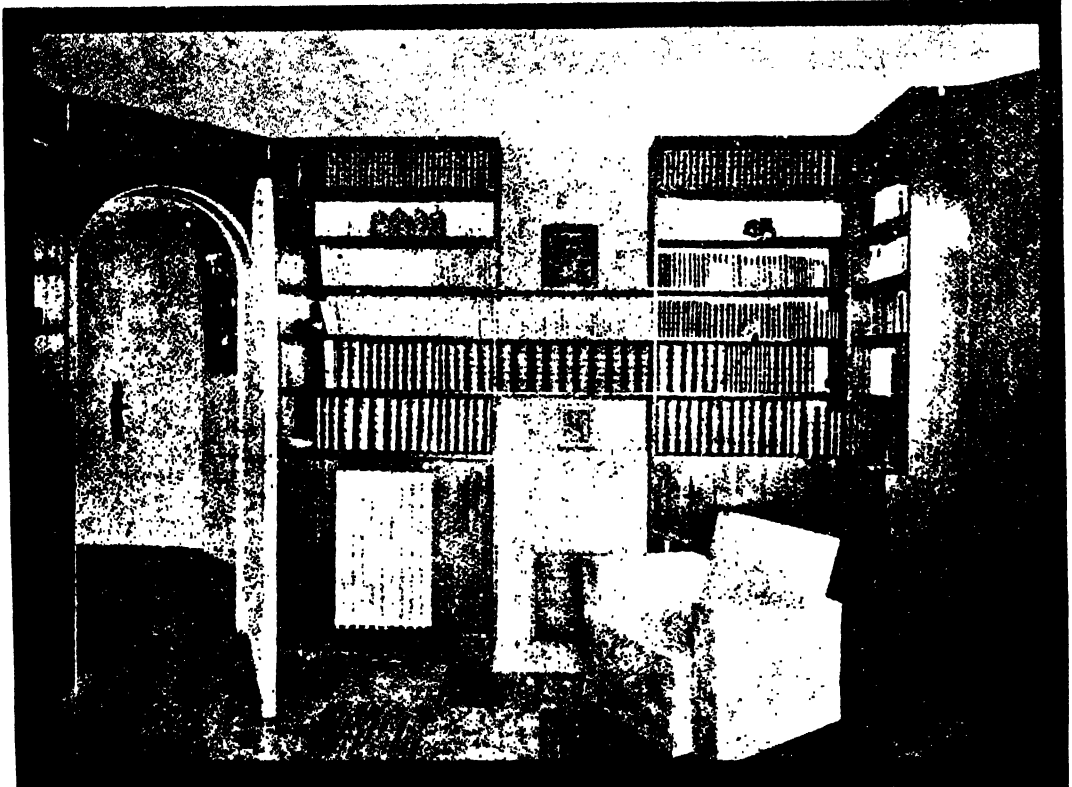
প্যারিসের জো-বুর্জোয়া কোম্পানী কর্তৃক পরিকল্পিত ও নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর
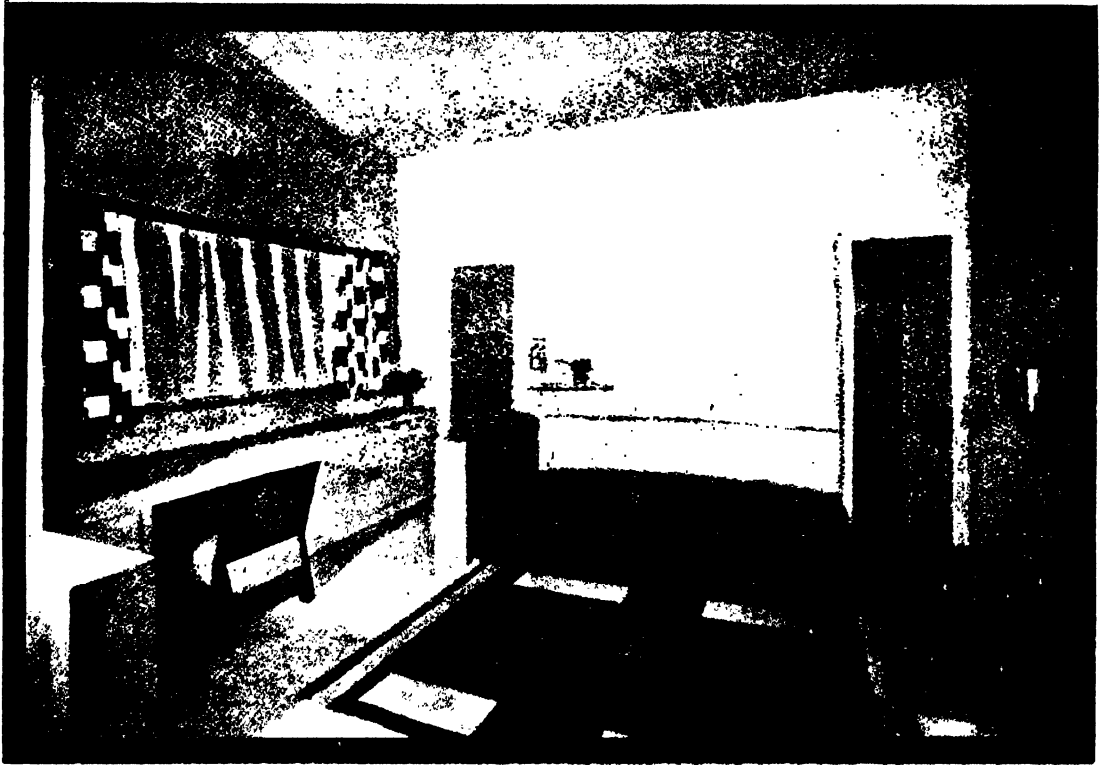
ঐ কোম্পানী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ—এই ঘরটিতে উপকরণবাহুল্যের অভাব লক্ষ্য করিবার বিষয়
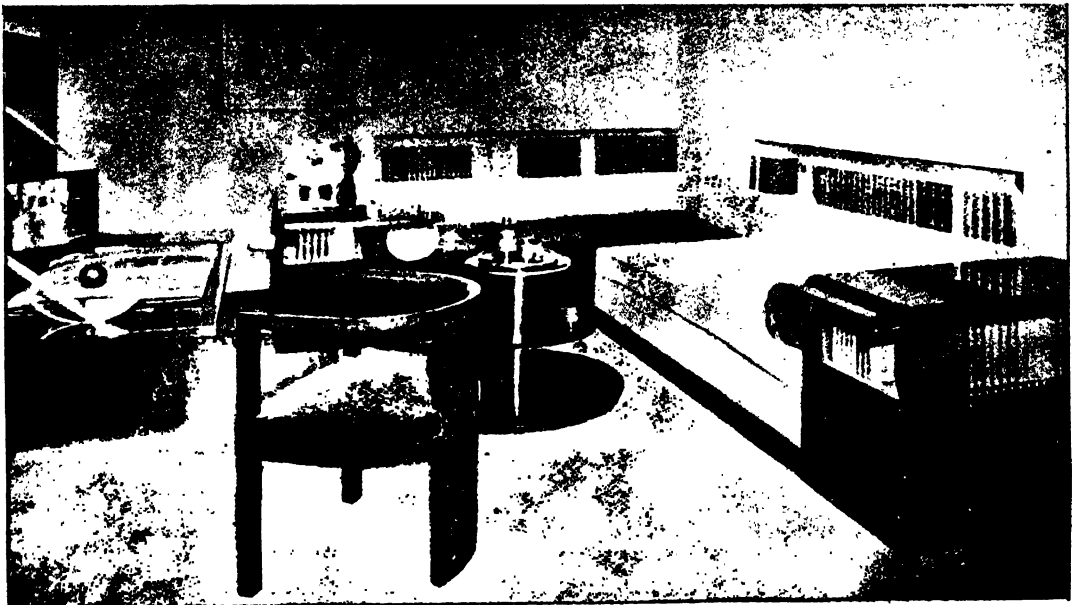
প্যারিসের 'সাদিয়ে এ ফিজ্র' কর্ত্তৃক নির্ম্মিত একটি পড়িবার ঘর

রেকো কেপি কর্তৃক নির্ম্মিত আবলুসের উপর ল্যাকার করা কৌটা

লৌহ নির্ম্মিত একটি দরজা
প্যারিসের রেমোঁ সুবেজ কর্তৃক পরিকল্পিত

স্থান নাই। বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্য্য খানিকটা বাদ দিয়া অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে অনেক বেশী লোককে রসভোগের সুযোগ দেওয়া হইতেছে, ইহাও কম লাভ নয়। ডেমোক্রেসীর যুগে অবশ্য ইহা অপেক্ষা বড় যুক্তি সম্ভব নয়। এর অর্থতাত্ত্বিক দিকটাই বা ভুলিলে চলিবে কেন? প্রাচীন শিল্পী যতই নিপুণ হোক, তার শিল্পসৃষ্টি যতই উৎকৃষ্ট হোক ম্যাস্‌-প্রোডাক্‌শন্‌-এর সঙ্গে তার শিল্পসাধনা কখনই পাল্লা দিয়া চলিতে পারিবে না।

প্যারিসের ফ্রেশে ও ভেরোট-কর্তৃক নির্ম্মিত একটি শয়নকক্ষ

কলের প্রবর্ত্তন যখন অবশ্যম্ভাবী তখন তার সৃষ্টিকে যথা সম্ভব সুন্দর করাই একমাত্র বিজ্ঞের কাজ। আমাদের রসবোধ এবং কলের ক্ষমতা এ দুই-এর সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য আধুনিকেরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। আবার অনেক সময় আমাদের নূতন
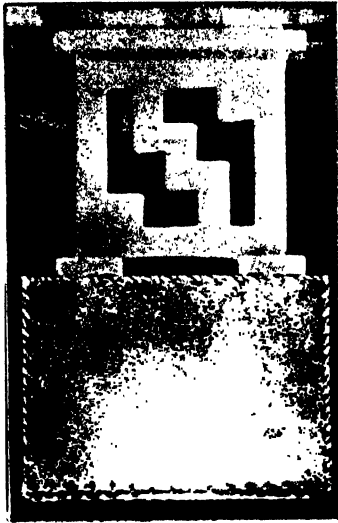
পোর্সেলেনে নির্ম্মিত তিনটি বাতি—মাঝেরটি ছাদ হইতে ঝুলাইবার ল্যাম্প, অপর দুইটি টেবিল ল্যাম্প
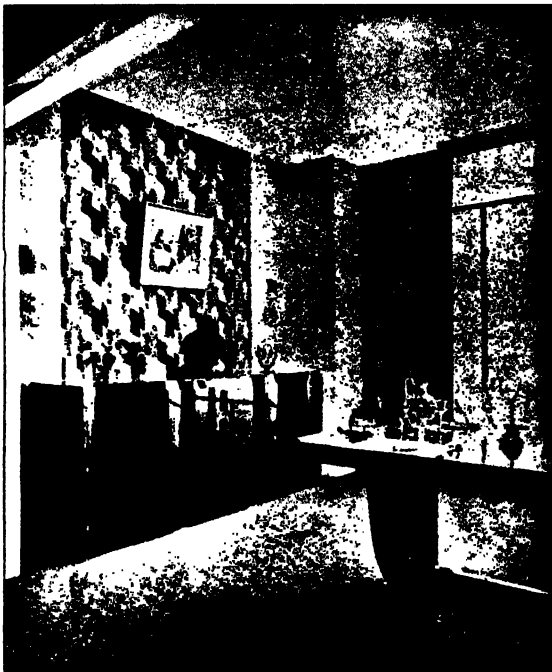
প্যারিসের 'দিম' কর্তৃক পরিকল্পিত একটি ডাইনিং রুম

একটি কক্ষাভ্যন্তর—এই ঘরের দেয়াল ও ঝাড়টি স্ফটিকে নির্ম্মিত

প্রয়োজনের দাবী মিটাইতে যাইয়া তাঁহাদিগকে বহু নূতন পন্থা আবিষ্কারে মন দিতে হইয়াছে।

এই নূতন শিল্পপদ্ধতির মূল কথা হইল, প্রয়োজনীয়তা ও অনাড়ম্বর সৌন্দর্য্য। কলের সৃষ্টি নিখুঁত, অনাবিল এবং বৈচিত্র্যহীন। জ্যামিতির রেখার মত সহজ, সরল এবং সম্পূর্ণ। তাই আধুনিকেরা তাঁহাদের গৃহসজ্জা রচনায় জ্যামিতির সাহায্য নিয়াছেন। কারুকার্য্যই

একমাত্র চারুশিল্প নয়, জ্যামিতির রেখার মধ্যেও আর্ট আছে; এ কথাটাই তাঁহারা তাঁহাদের গৃহসজ্জার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন। অনাবশ্যককে তাঁহারা সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারিয়াছেন। আধুনিক গৃহের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে হয়ত কেহ ভিন্নমত হইতে পারেন, কিন্তু তার আড়ম্বরশূন্যতাকে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

হাতে বোনা গালিচা—টমাস বেণ্টন কর্ত্তৃক পরিকল্পিত

আজকাল সব বড় সহরেই অত্যন্ত স্থানাভাব হইয়াছে। অধিকাংশ লোককেই অতি কম জায়গায় নিজের ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইতেছে, সুতরাং এখন তাহারা আর আগের দিনের মত অনাবশ্যক আসবাবপত্রে ঘর ভর্ত্তি করিতে পারেন না, সাদাসিধার আশ্রয় তাঁহাদের বাধ্য হইয়া লইতে হইতেছে। আধুনিক ঘরে কয়েকখানি চেয়ার ভিন্ন বিশেষ কিছু থাকে না। আলমারী, ওয়ার্ডরোব, বুক-শেলফ, কাবোর্ড প্রভৃতি সবই দেওয়ালের মধ্যে তৈরী করা হয়। বিলাতি ঘরে ফায়ার প্লেস আগে একটা খুব জাঁকজমকের বস্তু ছিল, কিন্তু এখন ইহাকে যথাসম্ভব সাদাসিধে করা হইয়াছে। শোবার ঘর হইতে ওয়াশ-ষ্ট্যাণ্ড দূরীভূত হইয়াছে; ড্রয়িং-রুম-এর সার্থকতা ছিল উৎসব উপলক্ষে; গৃহোৎসবের অভাবে ড্রয়িংরুম লিভিং রুম-এ পরিণত হইয়াছে; ডাইনিং রুম-এর জন্য যথাসম্ভব অল্প স্থান দেওয়া হইয়াছে। ঘরের সাজসজ্জাও অতি সাধারণ

নক্সা কাটা ইটের তৈরী ফায়ার প্লেস
অষ্ট্রিয়ার ভাকবের্গেয়ার ও শাড়লেয়ার কর্ত্তৃক নির্ম্মিত

ফরাসী শিল্পীগণ সাদা দেয়ালেরই পক্ষপাতী, তবে এখনও ক্রোম প্রভৃতি পাতলা রং ব্যবহৃত হইতেছে, মেঝের কার্পেট সাধারণতঃ প্যাটার্ণ বিহীন। কিম্বা প্যাটার্ণ থাকিলেও সেগুলি সম্পূর্ণ জ্যামিতিক।

আধুনিকতার দিক হইতে ফ্রান্স এবং জার্ম্মাণীই অগ্রণী। ইংলণ্ড তাহার স্বাভাবিক রক্ষণশীলতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিতে না পারিয়া পুরাতন এবং আধুনিকের সমাবেশের চেষ্টায় আছে।
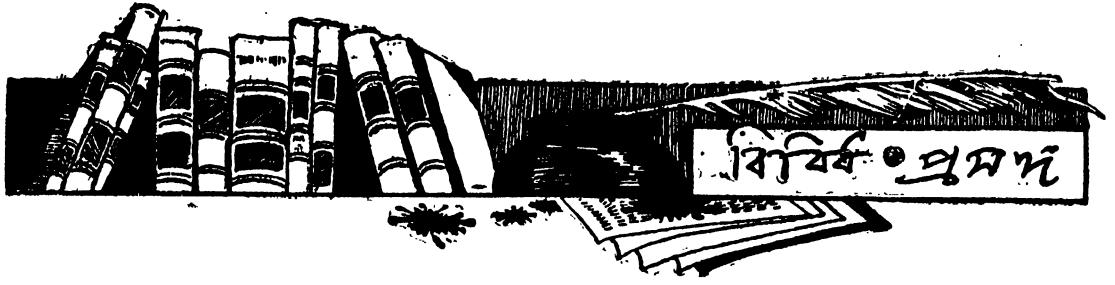
শাড়ি ও চুড়ি

ময়মনসিংহ জেলার পরলোকগত অন্যতম ভূস্বামিনী শ্রীযুক্তা জাহ্নবী চৌধুরাণী সম্বন্ধে একটা গল্প শুনিয়াছিলাম, যে, তিনি একবার তাঁহার এক প্রধান কর্ম্মচারীকে কোনও বিপৎসঙ্কুল দুঃসাহসের কাজ করিতে আদেশ করেন। কর্ম্মচারী সেই আজ্ঞা পালন করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি তাঁহাকে একখানা শাড়ি পাঠাইয়া দিতে আদেশ করেন এবং বলেন যে, কর্ম্মচারী মহাশয় যেন অতঃপর শাড়ি পরিয়া ঘোমটা দিয়া অন্তঃপুরে বাস করেন। কর্ম্মচারীটিকে লজ্জা দেওয়া এই আদেশের উদ্দেশ্য ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে যে স্বরাজ লাভ প্রচেষ্টা চলিতেছে, তদুপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও নারী-সত্যাগ্রহীরা কোন কোন সরকারী কর্ম্মচারীকে বা বেসরকারী অন্য লোকদিগকে চুড়ি উপহার পাঠাইয়া দিয়াছেন। এই বেসরকারী লোকদিগের মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার মান্দ্রাজী সভ্য শ্রীযুক্ত এম্-কে আচার্য্য (তাঁহার দেশী নামটা কাগজে বাহির হয় না) এইরূপ পরিহাসের বা উপহাসের পাত্র হইয়াছিলেন। ব্যবস্থাপক সভাভবনে তাঁহাকে একদিন একটি লোক একটা মোটা সরকারী খাম দিল। তাহার উপর তাঁহার নাম লেখা ছিল। তিনি স্বরাজ্য দলের লোক, কিন্তু সভ্যপদে ইস্তফা দেন নাই। লোকে বলে, লণ্ডনের গোল টেবিলের বৈঠকে নিমন্ত্রিত হইবার আশা তিনি পোষণ করেন। মোটা সরকারী খামটা দেখিয়া হয় ত বা তিনি ভাবিয়াছিলেন, উহার ভিতর সেই নিমন্ত্রণপত্র আছে। তাড়াতাড়ি খুলিয়া দেখেন, তাহার ভিতর সরকারী কিছু নাই, বেসরকারী কোন ব্যক্তি তাঁহাকে চুড়ি উপহার পাঠাইয়াছে। চুড়ি পাঠাইয়া তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া বোধ হয় কোন মহিলার বা পুরুষের অভিপ্রায় ছিল।

কিন্তু বাস্তবিকই কি এই লোকটি বা অন্য কোনও পুরুষ নানা প্রদেশের চুড়িপরিহিতা রাজবন্দিনী বা রাজঅতিথি মহিলাদের মত আচরণ করিলে তাহা পুরুষের পক্ষে অপমানকর হইত? তাহার বিপরীত হইত বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস।

মহিলারা এখন কোনও পুরুষজাতীয় ব্যক্তিকে লজ্জা দিবার জন্য আর শাড়ি ও চুড়ি পাঠাইবেন না;—শাড়ি ও চুড়ি পরিলেই এখন তাহা "অবলার" লক্ষণ বলিয়া নিঃসংশয়ে গৃহীত হইতে পারে না।' কোনও পুরুষকে লজ্জা দিবার প্রয়োজন হইলে মহিলারা যেন অতঃপর অন্য উপায় উদ্ভাবন করেন।

—

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার রেভারেণ্ড ডাক্তার আর্কার্টের কার্য্যকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় লেফটেন্যাণ্ট কর্ণেল সুহ্রাওয়ার্দী ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। মুসলমানদিগের মধ্য হইতে ইনিই প্রথম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন।

কোন কর্ম্মে কেহ নিযুক্ত হইয়া কিছুকাল সেই কার্য্য করিলে দেখা যায়, যে, নিতান্ত তাঁহার দলভুক্ত ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্যেরা তাঁহার সকল কাজের ও কথার সমর্থন করিতে পারেন না। যোগ্য অযোগ্য সকল কর্ম্মী সম্বন্ধেই ইহা প্রযোজ্য। কিন্তু কাহারও প্রত্যেকটি কাজ ও কথার সমর্থন করিতে না পারিলেই যে তাঁহার প্রশংসা করা যায় না, এমন নয়। ডাক্তার আর্কার্টের সব কথা ও কাজে আমরা সায় দিতে পারি নাই। কিন্তু ইহা বলা নিশ্চয়ই কর্ত্তব্য, যে, তিনি বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত ভাইস-চ্যান্সেলারের কাজ করিয়াছেন।

তিনি গবর্ন্মেণ্টকে বা দলবিশেষকে খুশি করিবার চেষ্টা করেন নাই। অন্য দিকে, কোন পক্ষকে কড়া কথাও তিনি বলেন নাই। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসওয়ালা কোন কোন নেতা ও অনেক ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উপস্থিতির এবং স্কুল কলেজে ছাত্রদের উপস্থিতির বিরোধী হওয়ায় এবং পিকেটিং চলায় বাংলা দেশে প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পুলিশের আবির্ভাব বশতঃ মারপিট কারাদণ্ড প্রভৃতি হইয়াছে। এরূপ সঙ্কট সময়ে আর্কার্ট সাহেব ভাইস্-চ্যান্সেলার রূপে এবং নিজের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল রূপে নিজের পদের মর্য্যাদা এবং বিরোধী ছাত্রদের সম্মান রক্ষা করিয়া নিজ কর্ত্তব্য পালন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

তিনি ভাইস্-চ্যান্সেলার হইবার আগে হইতে এ পর্য্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থাভাব চলিয়া আসিতেছে। ইহার কারণ একদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিবেচনা, কোন কোন ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতিত্ব, এবং অমিতব্যয়িতা ও অপচয়; অন্যদিকে গবর্ন্মেণ্টের কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে যথেষ্ট অর্থ দিতে অনিচ্ছা ও অসামর্থ্য। আর্কার্ট সাহেবের আমলে যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যয়-সংক্ষেপ এবং অধ্যাপকদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হয়, তাহার চেষ্টা হইয়াছে; আবার গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতেও যথেষ্ট টাকা পাওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে ঠিক ঠিক খবর যথাসময়ে পাওয়া কঠিন। আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সময়ে প্রকাশ্যভাবে মূল্য দিয়া বা না-দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিন্ন ভিন্ন কমিটি আদির কার্য্যের রিপোর্ট পাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু পাই নাই। এখনও পাই না। আর্কার্ট সাহেব সম্বন্ধে যাহা লিখিতেছি, তাহা সব কথা জানিয়া লিখিতেছি, বলিতে পারি না; যতটুকু আমাদের গোচর হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতেছি। যাহা জানিয়াছি, তাহাতে উক্ত উভয়বিধ চেষ্টার প্রত্যেক অংশের অনুমোদন আমরা করিতে না পারিলেও এরূপ চেষ্টা হওয়াটাই প্রশংসনীয় মনে করি।

তাঁহার আমলে এক দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে শৃঙ্খলা ও মিতব্যয়িতা এবং অধ্যাপকদিগের প্রতি ন্যায্য ব্যবহারের চেষ্টা, এবং অন্য দিকে গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে যথেষ্ট টাকা আদায়ের চেষ্টা যতটুকু হইয়াছে, তাহা এখনও সফল বা বিফল হয় নাই। এ অবস্থায় গবর্ন্মেণ্ট তাঁহাকে আরও দুই বৎসরের জন্য ভাইস্-চ্যান্সেলারের পদে নিযুক্ত করিলে ভাল হইত। এরূপ পুনর্নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নূতন হইত না। কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট অনেক সময় শিক্ষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভাইস্-চ্যান্সেলার নিয়োগ করেন না; কখন কখন রাজনৈতিক কারণে, কখন বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অনুরাগ বা বিরাগ বশতঃ নিয়োগ বা অনিয়োগ করেন। আর্কার্ট সাহেব গবর্ন্মেণ্টের অনুগ্রহভাজন হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টাকে ছাঁটিয়া খুব ছোট করিবার, ব্যয়সংক্ষেপের জন্যই উহার ব্যয়সংক্ষেপ করিবার, গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে টাকা না-চাহিবার বা খুব কম টাকা চাহিবার, এবং ছাত্রদের মনোভাব সম্বন্ধে অবুঝ হইবার ও তাহাদের প্রতি কড়া জবরদস্ত ব্যবহার করিবার প্রবৃত্তির পরিচয় দেন নাই।

যে-কোন সময়েই যোগ্য কোন মুসলমানকে ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত করা অনুচিত হইত না। এখন আর্কার্ট সাহেবকে পুনর্ব্বার নিযুক্ত না করিয়া একজন মুসলমানকে নিযুক্ত করিবার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এখন মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করা গবর্ন্মেণ্ট বিশেষ আবশ্যক বলিয়া অনুভব করিতেছেন। এবং বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী মুসলমান বলিয়া তিনিও একজন মুসলমান ভাইস-চ্যান্সেলার চাহিয়া থাকিবেন হিন্দুদের বা বিদেশী খৃষ্টিয়ানদের মধ্য হইতে এপর্য্যন্ত যাঁহারা ভাইস্-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই সেই সময়ে ঐ কাজের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন না। সুতরাং, এখন ডাক্তার সুহ্রাওয়ার্দী যোগ্যতম কি না,বিচার করা উচিত হইবে না। তিনি যোগ্য কি না ইহাই বিচার্য্য। একাজের জন্য তাঁহার সাধারণ রকমের যোগ্যতা নিশ্চয়ই আছে। তদপেক্ষা বেশী যোগ্যতা তাঁহার আছে কি না, জানি না; তাঁহার কাজ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। ইংরেজদের একটা কাগজে

তাঁহার নিয়োগের পর তাঁহার যে উক্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দিকে বিশেষ করিয়া মন দিবেন। তাহার প্রয়োজন আছে। যে-সব মুসলমান নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের কথা আলোচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে গোড়াতেই ধরিয়া লয়েন যে, গবর্মেণ্ট বা হিন্দুসমাজ শিক্ষাবিষয়ে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করিয়াছে। কোন মুসলমান ছাত্র বা শিক্ষক অধ্যাপকপদ-প্রার্থীর প্রতি কখনও অবিচার হয় নাই, বলিতে পারি না—সম্ভবতঃ অবিচার কোন কোন স্থলে হইয়াছে। কিন্তু মোটের উপর মুসলমান সমাজে শিক্ষার যথেষ্ট বিস্তার না হইবার জন্য তাঁহারাই দায়ী। বাংলা দেশে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দুস্কুল ছাড়া আর সমুদয় সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান যেমন হিন্দু-খৃষ্টিয়ান প্রভৃতির জন্য তেমনি মুসলমানের জন্যও খোলা রহিয়াছে। বেসরকারী কলেজগুলির মধ্যে বোধ হয় একমাত্র বিদ্যাসাগর কলেজে মুসলমান ছাত্র লওয়া হয় না। আর একটি কথা মনে রাখিতে হইবে। বঙ্গের অধিকাংশ বেসরকারী স্কুল ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক হিন্দুরা। মুসলমান সমাজ যদি শিক্ষার বিস্তার চান, তাহা হইলে কেবল অন্যের সৃষ্ট ও প্রদত্ত সুবিধা ভোগ করিবার জন্য আগ্রহ দেখাইলে চলিবে না, আপনাদিগকে ঐরূপ সুবিধার সৃষ্টি করিতে হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বেসরকারী যত টাকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তই হিন্দু এবং কিছু খৃষ্টিয়ানের দেওয়া। তাহার মোট পরিমাণ অনেক লক্ষ টাকা; মুসলমানদের দানের পরিমাণ সামান্য কয়েক হাজার টাকা মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে জড় বিত্ত ও মানসিক বিত্ত পাইবার ইচ্ছা করা মুসলমানদের পক্ষে স্বাভাবিক। উহাকে কিছু দিবার প্রবৃত্তিও স্বাভাবিক হওয়া উচিত। কারণ মুসলমানেরা সবাই দরিদ্র ও মূর্খ নহেন।

ডাঃ সুহ্রাওয়ার্দী যখন স্বসাম্প্রদায়িক হিতসাধনের চেষ্টা করিবেন, তখন মুসলমানদিগকে এই-সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিলে তাঁহাদের উপকার হইতে পারে।

জাপানীদের উদ্যোগিতা

আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জের নিকটস্থ সমুদ্রে এক রকমের শামুক বা ঝিনুক পাওয়া যায়। সিঙ্গাপুর হইতে প্রতিবৎসর ছোট ছোট জাহাজে করিয়া অনেক জাপানী ডুবুরী আসিয়া এই সব ঝিনুক তুলিয়া বহু লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়া আসিতেছে। ঝিনুক হইতে বোতাম হয়, কাঠের বাক্সের উপর নক্সা, কাল পাথরের উপর নক্সা প্রভৃতি শিল্পকার্য্য হয়। ভারতবর্ষেও এই সব কাজ হয়। আণ্ডামান জাপান অপেক্ষা বঙ্গের, ভারতবর্ষের, অনেক নিকটে। কিন্তু অর্থাগমের এই পথটি জাপানীরা আবিষ্কার করিয়াছে, বাঙালী বা অন্য ভারতীয়েরা করে নাই। এত দিন ভারত-গবর্মেণ্ট জাপানী ডুবুরীদের নিকট হইতে ট্যাক্স লইতেন না; অতঃপর লইবেন।

বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী

কোন যুগে কোন দেশের প্রত্যেক নারী "অবলা" ছিলেন না। ভারতবর্ষেরও প্রত্যেক নারী কোন যুগে "অবলা" ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে সকল প্রদেশের অনেক মহিলা সাহস ও শক্তির পরিচয় দিতেছেন। অধিকাংশ স্থলে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য তাঁহাদের সাহস ও শক্তি প্রযুক্ত হইতেছে। বাংলা দেশে নারীদের সাহস ও শক্তির এইরূপ ব্যবহার ছাড়া অন্যরূপ ব্যবহারেরও প্রয়োজন আছে, দুঃখ ও লজ্জার সহিত ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। বঙ্গে যত জায়গায় যত দুর্ব্বৃত্ত নারীদের উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে এবং অনেক স্থলে সফলকাম হয়, তাহার সবগুলার বৃত্তান্ত প্রকাশ পায় না, কিন্তু খবরের কাগজে যতগুলার খবর বাহির হয়, তাহার সংখ্যাও ভয়াবহ ও লজ্জাকর। পুরুষ ও নারী সকলে মিলিয়া দুর্ব্বৃত্তদের এই পৈশাচিক কার্য্যে বাধা দেওয়া উচিত। নারীরা আত্মরক্ষার্থ দুষ্টলোকদের প্রাণবধ পর্য্যন্ত করিলেও তাহা অধর্ম্ম ত নহেই, বে-আইনী কাজও নহে; বরং ধর্ম্মরক্ষার জন্য উহা আবশ্যক।

চব্বিশ পরগণা জেলার মহেশপুকুর গ্রামের শ্রীমতী মাতঙ্গিনী দাসীর স্বামীর অনুপস্থিতিকালে এক দুর্বৃত্ত তাঁহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে চেষ্টা করে। তিনি আত্মরক্ষার্থ তাহাকে দা'য়ের দ্বারা আঘাত করেন। তাহাতে লোকটা মারা যায়। আলিপুরে মাতঙ্গিনীর বিচার হয়। বিচারক তাঁহাকে খালাস দেন এবং তাঁহার সাহস ও সতীত্বের প্রশংসা করেন।

রংপুরের শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বর্ম্মা ঐ জেলার যে-সব ক্ষত্রিয় রমণী এইরূপে আত্মরক্ষা করিয়াছেন, তাঁহাদের ছবি ও বীরত্বকাহিনী সংগ্রহ ও কিছু কিছু মুদ্রিত করিয়াছেন। সকল জেলায় এইরূপ বীরত্বের ইতিহাস সংগৃহীত হওয়া উচিত।

ঢাকায় অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু

ঢাকায় অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য নামক একটি ছাত্রের শোকাবহ মৃত্যুর যেরূপ সংবাদ এসোসিয়েটেড্ প্রেস দৈনিক কাগজে প্রেরণ করেন, অমৃতবাজার পত্রিকা হইতে তাহা নীচে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সামান্য দু' একটি ভুল সংশোধন করিয়া দিয়াছি।

(Associated Press of India.)
Dacca, July 22.

While a number of volunteers, including ladies, was picketing at the Dacca Intermediate College yesterday, the Superintendent of Police, with a posse of men, charged them, as a result of which some of the volunteers, including a passer-by, sustained serious injuries.

It is reported tnat the volunteers picketed yesterday morning and prevented the students from entering the college building. Mr. S. N. Maitra, the Principal, it is understood, tried his best to induce the volunteers to leave the gate, but was unsuccessful. The Superintendent of Police, with a number of men, appeared and charged the young volunteers and the crowd of students who had gathered round them. At this the students began to run away in all directions, but the police, it is alleged, chased them and assaulted some of them in the compound of the Dacca University which they entered. A man who happened to pass by the road at the time on a bicycle was also attacked and assaulted, with the result that he fell unconscious, and his bicycle was taken away by the police.

It is understood that a young student who passed the I. A. examination this year from the Jagannath Intermediate College and stood 14th in order of merit and 1st in Logic, went to the Dacca University yesterday for admission, died last night as a result of assault alleged to have been committed upon him during the disturbance.

এই ঘটনার আরও অধিক বিস্তারিত এবং নির্ভুল বৃত্তান্ত আমরা পাইয়াছি। কাগজে দেখিয়াছি, মৃত ছাত্রটির ভ্রাতা পুলিসের নামে মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন, এবং পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নামে মোকদ্দমা করিবার জন্য গবর্মেণ্টের অনুমতি চাহিয়াছিলেন। তাহা হইলে হয়ত এত দিনে ব্যাপারটি বিচারাধীন হইয়াছে। এই জন্য আমাদের প্রাপ্ত বৃত্তান্তের অধিকাংশ এখন ছাপা চলে না।

অজিতনাথ ভট্টাচার্য্য

ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে তদন্ত করিতেছেন, তাহার ফলও এখনও বাহির হয় নাই।

আমরা যে বৃত্তান্ত পাইয়াছি, তাহার কোন কোন অংশ প্রকাশে বোধ করি কোন বাধা নাই।

"গত সোমবার, ২১শে জুলাই ইউনিভার্সিটিতে ও ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের সামনে ছাত্রদের পিকেটিং হচ্ছিল। সেই সময় ঢাকার পূর্ত্তবিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার নাকি পুলিসে খবর দেন, যে, ছেলেরা গাছপালা ভেঙে ফরেস্ট্ ল' (অরণ্য-সম্পর্কীয় আইন) ভঙ্গ করছে। পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইউরোপীয়ান সার্জ্জেণ্ট এবং হিন্দুস্থানী ও পাঠান কনষ্টেবল নিয়ে উপস্থিত হন। তারা এলে, পুলিস পিকেটারদের কি করে দেখবার জন্য ইউনিভার্সিটির বহু ছাত্র ইউনিভার্সিটির হাতায় জড় হয়। তাতে পুলিস্ সাহেব ক্রাউড্ ডিস্পার্স্ (জনতাকে বিতাড়িত) কর্‌বার হুকুম দেয়……।"

আমাদের পত্রলেখক ঘটনাটির উৎপত্তি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে যদি কোন ভ্রম না থাকে, তাহা হইলে লোকের সহজেই মনে হইতে পারে, ঢাকা শহর, বিশেষ করিয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অরণ্য সমাকীর্ণ। একদিন এই ঘটনাটি সম্বন্ধে ঢাকার স্থানবিশেষে আলোচনা চলিতেছিল। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঢাকায় অরণ্য কোথায়?" তাহার উত্তরে আলোচনা স্থলে উপস্থিত একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বলিলেন, "দেশভরাই তো অরণ্য, আর আমরা অরণ্যে রোদন কর্‌ছি!"

যাহা হউক, শুনা যাইতেছে, যে, পুলিসও না কি এখন আবিষ্কার করিয়াছে, যে, ঢাকায় অরণ্য-আইন খাটে না। সম্যক্ গবেষণা করিলে সম্ভবতঃ কালক্রমে ইহাও আবিষ্কৃত হইতে পারিবে, যে, ঢাকা শহরে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অরণ্য নাই।

অজিতনাথের মৃত্যু ও দাহ কি প্রকারে হইল, তাহার বৃত্তান্ত আমাদের প্রাপ্ত পত্রে এইরূপ আছে :—

প্রহারের চোটে "তার সংজ্ঞা লুপ্ত হয়, রক্তবমন হয়," কয়েকজন ডাক্তার তার চিকিৎসা করেন। "সিবিল-সার্জ্জন তাকে হাঁসপাতালে পাঠাতে বলেন, তার ইণ্টার্ণ্যাল হেমোরেজ হচ্ছিল, কন্‌কাশ্যন অব্ দি ব্রেন হয়েছিল, তার মাথায় অপারেশ্যন করা দরকার। বেলা ১॥ টার সময় সে মার খায়; রাত্রি ১০টার সময় হাসপাতালে নিয়ে যেতে যেতে পথে তার মৃত্যু হয়। গত হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় তাদের গ্রামের বাড়ী পুড়ে গেছে, দ্রব্যাদি লুট হয়েছে। এখন ছেলেটি মারা গেল। ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সমস্ত ছাত্র এই নির্দ্দোষী বলি বালককে দাহ কর্‌তে শ্মশানঘাটে যাবে ব'লে প্রস্তুত হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট শব নিয়ে প্রোসেশ্যন করতে দেন নি। তখন ছেলেটির মা ভাই বোন বলেন, ছেলেটির জন্য এত লোক যখন শোক কর্‌ছে, তখন তার তর্পণ ও সংকার হ'য়ে গেছে; তাঁরা নিহত বালকের সৎকার পুলিসের সাহায্যে করবেন না। তাঁরা হাসপাতালে শব রেখে গ্রামে চ'লে গেছেন। পুলিস ব্রাহ্মণ কনষ্টেবল দিয়ে শব দাহ করিয়েছে।"

"এই ছাত্রের অপঘাত মৃত্যুর জন্য ইউনিভার্সিটি এক দিন বন্ধ করা হয়। গবর্ন্মেণ্ট স্কুল কলেজ ছাড়া আর সব স্কুল কলেজের ছাত্রেরা হড়তাল করে। ইউনিভার্সিটির হিন্দু মুসলমান ছাত্ররা একমত হ'য়ে সাত দিন ক্লাসে গিয়ে পড়াশুনা করা স্থগিত রাখ্‌বে স্থির করেছে।"

"নিহত ছেলেটির মৃত্যুর পর শবপরীক্ষায় না কি দেখা গেছে, যে, লাঠির চোটে মাথার খুলি ফেটে খুলে গিয়েছিল যদিও বাহিরের চামড়া ফাটে নি; চামড়া কাটবামাত্র খুলিটা খুলে পড়ে; মস্তিষ্কে পেটে রক্তপাত হয়েছিল। ইউনিভার্সিটির ছাত্রেরা এই অপরিচিত ছাত্রটির যে সেবাশুশ্রূষা করেছে, তা চমৎকার। সকলে নিজের ভাইয়ের মতন তো তার মাথায় আইস্-ব্যাগ দিয়েইছে এবং বরফ কিনে এনেছে, অধিকন্তু বমি হাতে ক'রে ধ'রে পরিষ্কার করেছে এবং মৃত্যুর পর পর্য্যন্ত তার সঙ্গে থেকেছে।"

এই মর্ম্মান্তিক শোকাবহ ঘটনাটির বৃত্তান্তের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের ঐকমত্য হইতে মনে কিছু সান্ত্বনা পাওয়া যায়। [২৩শে শ্রাবণ লিখিত।]

—

বিশ্বভারতী শ্রীনিকেতনে পল্লীসেবক-শিক্ষণের ব্যবস্থা

আগামী পূজাবকাশের মধ্যে ৯ই অক্টোবর হইতে ৪ঠা নভেম্বর পর্য্যন্ত (২২শে আশ্বিন হইতে ১৮ই কার্ত্তিক পর্য্যন্ত) বিশ্বভারতীর পল্লী-সেবা বিভাগের তত্ত্বাবধানে পল্লীসেবকদিগের শিক্ষার জন্য শ্রীনিকেতনে একটি 'শিক্ষা-শিবির' পরিচালনা করা হইবে। শিক্ষার্থীদিগকে বিশেষ অভিজ্ঞদিগের দ্বারা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হইবে। (১) পল্লীসমস্যা ও পল্লী-সংগঠন, (২) কুটীর-শিল্প, (বয়ন ও রংয়ের কাজ), (৩) ব্রতী সংগঠন, (৪) পল্লী-স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক চিকিৎসা, (৫) প্রাথমিক কৃষি।

গত ছয় বৎসর হইতে নিয়মিতরূপে 'শিক্ষা শিবিরের' কার্য্য পরিচালনা করা হইতেছে। শিক্ষা শিবিরে এ-যাবৎ মোট ১২২ জন কর্ম্মী শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতের বিভিন্ন স্থানে পল্লী-সংগঠন কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। শিক্ষা-কালে শিক্ষার্থীদিগকে নিম্নলিখিত ব্যয়ভার বহন করিতে হয়। প্রবেশিকা ফি—১৲; আহার্য্য বাবদ ১৫৲ ও কুটির-শিল্প বাবদ = ৩৲; মোট = ১৯৲

যাহারা এই 'শিক্ষা শিবিরে' শিক্ষালাভ করিতে ইচ্ছুক তাঁহাদিগকে ১লা অক্টোবরের পূর্ব্বে প্রবেশিকা ফি সহ নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করিতে হইবে :—সম্পাদক, পল্লীসেবা-বিভাগ, শ্রীনিকেতন, পোঃ—সুরুল, জেলা বীরভূম।

—

বঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার বিল

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গের গ্রাম সমূহে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য দুটি বিল প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু কোনটিই আইনে পরিণত হয় নাই। এবার শিক্ষা-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের আমলে তৃতীয় বিল প্রস্তুত হইয়াছে। আগের দুটি বিলের আলোচনা উপলক্ষ্যে আমরা বার বার বঙ্গে আবশ্যিক শিক্ষার ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। বর্ত্তমান বিলটির আলোচনা উপলক্ষ্যে তাহার প্রধান কয়েকটি কথার পুনরুল্লেখ করিতেছি।

ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা সকলের চেয়ে বেশী, এবং বাংলা দেশ হইতে ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট সর্ব্বাপেক্ষা অধিক টাকা পাইয়া থাকেন। কোন্ ট্যাক্সের টাকা ভারত-গবন্মেণ্ট লইবেন, এবং কোন্‌টির টাকা প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট লইবেন, সে বিষয়ে কোন প্রাকৃতিক নিয়ম নাই। এবিষয়ের সব নিয়ম কৃত্রিম। ভারতবর্ষে যে নিয়ম চালান হইয়াছে, তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল এবং সর্ব্বাধিক রাজস্বদাতা বঙ্গদেশ বড় বড় প্রদেশগুলির মধ্যে সব চেয়ে কম টাকা নিজের সরকারী খরচের জন্য পায়। যদি বাংলা দেশ অন্যান্য বড় প্রদেশের তুলনায় নিজের লোকসংখ্যা ও আদায়ী রাজস্বের অনুপাতে সরকারী খরচের টাকা পাইত, তাহা হইলে শিক্ষার জন্য নূতন ট্যাক্স বসাইবার কথা উঠিতে পারিত না। পাট বঙ্গের একচেটিয়া ফসল। যদি অন্ততঃ পাট শুল্ক হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক চারি কোটি টাকা বঙ্গদেশ পাইত, তাহা হইলে তাহা হইতেই আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহাও ভারত-গবন্মেণ্ট লইয়া থাকেন, বাংলা দেশকে দেন না। বাংলার টাকার অধিকাংশ ভারত-গবন্মেণ্ট লওয়ায় বাংলা-সরকার দরিদ্র। সুতরাং এই কৃত্রিম দারিদ্র্য বশতঃ শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহার্থ নূতন ট্যাক্স বসাইবার প্রস্তাব গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষার প্রত্যেক বিলে করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে আমরা সম্মত নহি। ইহা আমরা অন্যায় মনে করি।

বাংলা-সরকার যে কম টাকা পান তাহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে, বঙ্গে জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় গবন্মেণ্ট অন্য অনেক প্রদেশ হইতে জমীর খাজনা যত পান, বাংলা দেশ হইতে তত পান না; সুতরাং জমীর খাজনা প্রাদেশিক গবন্মেণ্টের প্রাপ্য একটি ট্যাক্স বলিয়া, বাংলা-সরকার উহা হইতে কম টাকা পান ও তজ্জন্য বঙ্গের মোট সরকারী আয় কম হয়। কিন্তু এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলা দেশের লোকেরা করে নাই, ভারত-গবন্মেণ্ট এক সময়ে বঙ্গে জমীর

খাজনা আদায় দুঃসাধ্য দেখিয়া নিজের গরজে কতকগুলি লোককে জমীদার করিয়া তাহাদের সঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন। এই জমীদারেরা এই বন্দোবস্তে লাভবান্ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সাধারণতঃ দেশের স্বাস্থ্য, কৃষি ও শিক্ষার উন্নতির জন্য সেই লাভ বা তাহার কতক অংশ ব্যয় করেন না, সামান্য এক আধ জন করেন। সুতরাং তাঁহারা লাভবান্ হওয়ায় বঙ্গের স্বাস্থ্যরক্ষা, কৃষির উন্নতি ও শিক্ষাবিস্তারের সমস্যার সমাধান হয় নাই। এতএব, জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হইয়াছে বলিয়া বাংলা দেশকে এত কাল সার্ব্বজনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত রাখিয়া এখন তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত নূতন ট্যাক্স বসাইতে চাওয়া অন্যায় ও অযৌক্তিক।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জন্য বঙ্গে জমীর খাজনা আদায় কম হইলেও অন্যান্য অনেক বাবতে খুব রাজস্ব আদায় হয়। তাহাও সমস্ত বা তাহারও খুব বেশী অংশ ভারত-সরকার আত্মসাৎ করেন; যেমন পাটের শুল্ক, ইন্‌কাম্-ট্যাক্স ইত্যাদি। তাহা না করিলে নূতন ট্যাক্স না বসাইয়াও বঙ্গে আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা যাইত।

এই সব কারণে আমরা নূতন ট্যাক্সের প্রতিবাদ করিতেছি।

দ্বিতীয় আপত্তি এই, যে, লোকেরা নূতন ট্যাক্স দিতে বাধ্য হইবে, কিন্তু কর্ত্তৃত্ব করিবেন আমলাতন্ত্র। তদ্দ্বারা তাঁহারা বালক-বালিকাদিগকে শৈশব হইতে এরূপ শিক্ষা দেওয়াইতে পারিবেন যাহাতে তাহাদের মন ব্রিটিশ-প্রভুত্বের ও ভারতীয় অধীনতার অনুকূল হয়। এরূপ শিক্ষা অনিষ্টকর ও অবাঞ্ছনীয়।

এখন দেখা যাক্ কতগুলি বালক-বালিকার শিক্ষার জন্য এই বিলে ব্যবস্থা করা হইতেছে।

ব্রিটিশ-শাসিত বঙ্গের লোকসংখ্যা ৪,৬৬,৯৫,৫৩৬। বাংলা দেশ গ্রামপ্রধান। পাঁচ হাজারের কম অধিবাসী-বিশিষ্ট ১৮টি স্থানকেও শহর বলিয়া গণনা করিয়াও বঙ্গের শহরগুলিতে মোট ৩২,১১,৩০৪ জন লোক বাস করে। সুতরাং বঙ্গের প্রায় সমুদয় বালক-বালিকার প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এই বিলটির দ্বারা করিতে হইবে, ধরিয়া লইলে হিসাবে বিশেষ কিছু ভুল হইবে না।

শিক্ষামন্ত্রী রোটারী ক্লাবে তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছেন, এই বিল ২৭ লক্ষ বালকের এবং ১০ লক্ষ বালিকার, মোট ৩৭ লক্ষ বালক-বালিকার, প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছে। এখন বালক অপেক্ষা খুব কম সংখ্যক বালিকা শিক্ষা পায় বটে; কিন্তু নূতন ট্যাক্স বসাইয়া শিক্ষাবিস্তারের বেলাতেও সব বালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা না-করা অন্যায়। প্রথম প্রথম সব বালিকা আসিবে না, সত্য, কিন্তু ব্যবস্থা করিবার সময় এমন ব্যবস্থা করিলেই ভাল হয়, যাহাতে সব বালিকা পাঠশালায় আসিলেও স্থান সঙ্কুলান হয়।

শিক্ষামন্ত্রী রোটারী ক্লাবের বক্তৃতায় বলিয়াছেন :—

"If the Bengal Primary Education Bill is enacted into law, within seven years every boy in Bengal between the ages of six and eleven will be attending a primary school."

"যদি বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিল আইনে পরিণত হয়, তাহা হইলে সাত বৎসরের মধ্যে ছয় হইতে এগার বৎসর বয়স্ক বঙ্গের প্রত্যেক বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা পাইবে।"

ইহাদের সংখ্যা তিনি ২৭ লক্ষ ধরিয়াছেন, এবং বালিকাদের সংখ্যা ১০ লক্ষ; মোট ৩৭ লক্ষ। এই সংখ্যাগুলি কম ধরা হইয়াছে।

৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের কত ছেলেমেয়ে বঙ্গে আছে সেন্সস্ রিপোর্টে তাহা আলাদা করিয়া লেখা নাই, ৫ হইতে ১০ বৎসরের ছেলেমেয়ের সংখ্যা দেওয়া আছে। শেষোক্তদের সংখ্যা ও প্রথমোক্তদের সংখ্যায় বেশী তফাৎ হইবার কথা নয়। ১৯২১ সালের সেন্সস্ অনুসারে ৫ হইতে ১০ বৎসরের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা ৭৪,৮৮,২১৮; ছেলে ৩৮,০১,৫৪২, এবং মেয়ে ৩৬,৮৬,৬৭৬। অতএব শিক্ষামন্ত্রী প্রায় ৭৫ লক্ষ বালক-বালিকার মধ্যে কেবল ৩৭ লক্ষের অর্থাৎ প্রায় অর্দ্ধেকের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে চাহিতেছেন। শুধু বালকদিগকে ধরিলেও তিনি ৩৮ লক্ষের মধ্যে কেবল ২৭ লক্ষের জন্য বন্দোবস্ত করিতেছেন। প্রায় ৩৭ লক্ষ বালিকার মধ্যে কেবল ১০ লক্ষের জন্য ব্যবস্থা করিতেছেন। সুতরাং ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের

প্রত্যেক বালক স্কুলে যাইতে পারিবে, বলাটা ঠিক হয় নাই।

আয়ব্যয়ের ব্যবস্থা এইরূপ :—শিক্ষামন্ত্রী বলিতেছেন মোট ব্যয় ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইবে। নূতন ট্যাক্স হইতে ১ কোটি ১০ লক্ষ উঠিবে, এবং বর্ত্তমানে বাংলা-সরকার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে ২২ লক্ষ টাকা দেন তাহা দিতে থাকিবেন। ইহা প্রভূত দয়া! তাহার উপর এই দয়াও সরকার করিবেন, যে, স্কুল পরিদর্শন এবং শিক্ষকদের শিক্ষণের ব্যয়ও এখনকার মত প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে নির্ব্বাহিত হইবে।

—

ইঙ্গভারতীয় কন্‌ফারেন্সের বিলাতী সভ্য

শ্রাবণের প্রবাসীতে আমরা গোল টেবিল বৈঠকের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছি, যে, লণ্ডনের ইঙ্গভারতীয় কন্‌ফারেন্সটিকে গোল টেবিল বৈঠক বলা যাইতে পারে না। ঐ কন্‌ফারেন্সের বিলাতী সভ্য বর্ত্তমান বিলাতী গবন্মেণ্ট নামধেয় ব্যক্তিদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হইবেন, বড়লাট তাঁহার ৩১শে অক্টোবর—১লা নবেম্বরের ঘোষণায় এইরূপ বলিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জুলাই মাসে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই শাখার সম্মিলিত অধিবেশনে যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে গোল টেবিল বৈঠকটিকে "a joint assembly of the representatives of both countries" ("ব্রিটেন ও ভারতবর্ষ উভয় দেশের প্রতিনিধিদের মিলিত সভা") বলিয়াছেন। তাঁহার দুই সময়ের দুই উক্তিতে গরমিল দেখা যাইতেছে। এরূপ কেন হইল?

বড়লাটের শেষোক্ত বক্তৃতার পর বিলাতের রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের নেতারা দাবী করেন, যে, বৈঠকে তাঁহাদের দুই দলের প্রতিনিধিদিগকেও যোগ দিবার অধিকার দিতে হইবে। বর্ত্তমান শ্রমিক গবন্মেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ইহাতে সম্মত হইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য এই, বড়লাট যখন জুলাই মাসে ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতায় পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়াছিলেন, তখন কি তিনি জানিতেন, যে, রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকরা পূর্ব্বোক্ত দাবী করিবে এবং মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাহাতে রাজী হইবেন? জানিতেন না, মনে হয় না। কারণ বড়লাট গুরুতর সব বিষয়ে যাহা কিছু বলেন করেন, ভারতসচিব ও প্রধান-মন্ত্রীর সম্মতিক্রমেই করিয়া থাকেন। তাহা হইলে বলিতে হয়, যে, উদারনৈতিক ও রক্ষণশীলদের দাবী, এবং কিছু ইতস্ততঃ করিয়া, প্রধানমন্ত্রীর তাহাতে সম্মতিদান—এসমস্তই আগে হইতে বন্দোবস্ত করা অভিনয়। এবং ইহাও বলিতে হয়, যে, সরলতার সুখ্যাতিমান্ বড়লাট এ বিষয়ে যাহা জানিতেন তাহা খুলিয়া বলিবার ইচ্ছা না থাকাতেই "উভয় দেশের প্রতিনিধিদের" ("representatives of both countries") কথাগুলির অর্থ ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন নাই।

বৈঠকে সব ব্রিটিশদলের প্রতিনিধি না থাকিয়া কেবল শ্রমিকদলের প্রতিনিধি থাকিলেই যে আমরা স্বরাজ পাইতাম, এরূপ অনুমান করিতেছি না। কিন্তু রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের প্রতিনিধিরা থাকায় আমাদের অসুবিধা নিশ্চয়ই হইবে বলিতে পারা যায়। কারণ ঐ দুই দলের নেতারা, যাহাতে সাইমন রিপোর্টের ব্যতিক্রম না হয়, তাহার চেষ্টা খুব করিতেছেন; এবং ঐ রিপোর্ট যে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় গতি উন্নতির পথে না চালাইয়া পশ্চাৎদিকে চালাইবার প্রস্তাব করিয়াছে, তাহা সুবিদিত। ঐ দুই দলের লোক বৈঠকে থাকায় শ্রমিক গবন্মেণ্টেরও সুবিধা হইতে পারে। তাঁহারা যে বাস্তবিক ভারতবর্ষকে আত্মশাসন অধিকার দিতে চান, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তাঁহারা বাস্তবিক যদি স্বরাজ দিতে অনিচ্ছুক, তাহা হইলে না-দেওয়ার দোষটা এখন রক্ষণশীল ও উদারনৈতিকদের ঘাড়ে চাপাইতে পারিবেন;—বলিবেন, "তাহাদের মত হইল না, আমরা একা কি করিব?"

বর্ত্তমান শ্রমিক গবন্মেণ্ট ব্রিটেন সম্বন্ধে ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্বন্ধে যে-সব গুরুতর বিষয়ে নিজেদের কর্ত্তব্য করিতেছেন, তাহার জন্য রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সহিত কোন পরামর্শ করেন নাই। অন্যান্য দলের গবন্মেণ্টও নিজেদের দায়িত্বে সব কাজ করিয়া থাকেন। অতীতে যখন কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ-আফ্রিকা ও আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বশাসন অধিকার দেওয়া হয়, তাহার পূর্ব্বেও সেই সেই সময়কার ব্রিটিশ কোন দলের

গবর্ন্মেণ্ট অন্য দলগুলির সহিত কন্‌ফারেন্স করেন নাই,—যাহা করিয়াছেন নিজ নিজ দায়িত্বে করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বেলায় এই সব রীতির ব্যতিক্রম করা হইতেছে। ইহার অর্থ বুঝিবার এবং কারণ অনুমান করিবার সামর্থ্য ভারতবাসীদের আছে।

বিলাতের ডেলী মেল একটা প্রধান ভারতশত্রু কাগজ। তাহাতে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, যে, কানাডা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলির প্রতিনিধিসমূহকেও ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, পঞ্চকোণ, ষট্‌কোণ, বা সপ্তকোণ,······টেবিল বৈঠকে যোগ দিবার নিমিত্ত আহ্বান করা হউক। কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা প্রভৃতি ডোমিনিয়নগুলা ভারতীয়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে এবং ভারতীয়দের সম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কিরূপ নীচ, তাহা জানা কথা। তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে বৈঠকে স্থান দিবার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, যত বেশী সম্ভব ভারতশত্রু বৈঠকে একত্র করা। প্রস্তাবের মধ্যে এই অপমানকর ধারণাও উহ্য আছে, যে, অশ্বেত ভারতীয়েরা শুধু ব্রিটেনের নহে, শ্বেত ডোমীনিয়নগুলারও দাস এবং সেইজন্য ভারতের ভাগ্যনির্ণয় করিতে হইলে ডোমীনিয়নগুলার সহিতও পরামর্শ করা দরকার।

—

সাইমনের আমেরিকা-যাত্রা

ভারতীয়দের নানা প্রকার নিন্দা প্রচার, ভারতবর্ষের স্বশাসক হইবার অযোগ্যতা প্রচার অনেক ইংরেজ আমেরিকা ও অন্যত্র করিয়া থাকে। কোন একটা উপলক্ষ্য করিয়া অনেক ইংরেজ আমেরিকা গিয়া ইহা করে। যেমন বাঁকুড়া কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক মিঃ টমসন মেয়েদের ভাসার কলেজে (Vassar College) সাময়িক অধ্যাপকতা করিতে গিয়া ভারতের বিরুদ্ধে বিষ উদ্গীরণ করিতেছেন। অনেকে পরোক্ষভাবে ভারতবর্ষের রাজস্ব হইতে টাকা পায়। ভারত-গবর্ন্মেণ্টের কোন কোন ভৃত্য ছুটি লইয়া বা পেন্সান পাইবার পর এইরূপ কাজ করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের সপক্ষে কিছু বলিবার লিখিবার লোক আমেরিকায় বেশী নাই। তথাকার ভারতীয় ছাত্রেরা এবং দুচার জন অন্য শিক্ষিত ভারতীয় শত্রুপক্ষের মিথ্যা কথার প্রতিবাদ করেন এবং ভারতবর্ষের সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্যের প্রচার করেন।* ইহাতেই ব্রিটিশ ও ইঙ্গ-ভারতীয় অনেক কাগজ চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে, যে, আমেরিকায় মহাত্মা গান্ধী ও অন্য ভারতীয়েরা ভয়ানক ব্রিটিশ-বিরোধী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা চালাইতেছে!

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সত্য কথা আমেরিকায় জানাইবার ইচ্ছা অনেক ভারতীয়ের থাকিলেও তাহা করা তাহাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। তাহাদের লোকবল ও অর্থবল কম। আমেরিকায় কেহ যাইতে চাহিলে তাহার পাসপোর্ট (জাহাজের ছাড়পত্র) পাওয়া কঠিন। আমেরিকায় পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম দিলে তাহা না পাঠাইবার অধিকার টেলিগ্রাফ আফিসের আছে। চিঠি, রাজনৈতিক প্রবন্ধ প্রভৃতি আমেরিকায় যথাস্থানে পৌছান কঠিন। কারণ, ডাকে যাহা পাঠান হয়, তাহা আটক করিবার কিংবা বহু বিলম্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা এদেশে আছে। ইংরেজ পক্ষের এ রকম কোন বাধাই নাই। তা ছাড়া ইংরেজরা অন্য উপলক্ষ্যে আমেরিকায় গেলেও আসল উদ্দেশ্যটা প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করাই হইতে পারে। যেমন সাইমন প্রভৃতি ১৮০ জন ব্রিটিশ জাতীয় ব্যক্তি অন্যব্যপদেশে কানাডা ও আমেরিকা যাইতেছেন এবং আমেরিকাতেও বক্তৃতা করিবেন। যথা—

Montreal, Aug. 5.

The McGill University will confer an honorary degree on Sir John Simon when he attends the annual meeting of the Canadian Bar Association at Toronto during his forthcoming visit to Canada and America with a party of British lawyers who are returning the visit made by the American Bar to London.

The party of 180 including Sir John and Lady Simon, Lord Tomlin and Mr. Justice Macnaughten, left London to-day.

Sir John Simon, who is taking his first prolonged holiday since he undertook the Chairmanship of the Simon Commission, has accepted invitations to speak at a number of places, and said in an interview that he thought that he would be expected to say something about India. The party will be the guests of Lord and Lady Willingdon at Ottawa. —*Reuter.*

উপরের সংবাদ পড়িয়া ইহাও মনে হয়, যে, স্যার

* এক আধ জন ভারতীয় আমেরিকায় কখন কখন অযথার্থ কথাও বলেন। ইহা দুঃখ ও লজ্জার বিষয়।

জন্‌ সাইমনের ইচ্ছা এবং নির্ব্বন্ধ থাকিলেও মিঃ ম্যাকডোনাল্ড তাঁহাকে 'গোল' টেবিল বৈঠকে লইলেন না, এবং স্যার জন্‌ ত্যাগী ও সংযমী হইয়া বৈঠকে যাইবার অভিলাষ ত্যাগ করিলেন,—ইহার মধ্যে যোগ-সাজস অভিনয় থাকিতে পারে।

—

সিন্ধুদেশের তুর্দ্দিন

সিন্ধুনদের বন্যায় সিন্ধুদেশের অনেক গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছে, অনেক গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছে এবং কোন কোন শহর জলমগ্ন হইয়াছে। অনেক অধিবাসী মূল্যবান্ অস্থাবর সম্পত্তি গৃহে ফেলিয়া রাখিয়া অন্যত্র আশ্রয় লইয়াছে। বহুসংখ্যক ডাকাত ইহাকে সুযোগ মনে করিয়া নৌকাযোগে গ্রামে ও নগরে গিয়া পলাতক লোকদের সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে। মানুষের হিংস্রতা ও তুর্ব্বৃত্ততা কত রকমেরই হয়! ইহার উপর আবার সক্কর শহরে হিন্দু-মুসলমানের বিবাদে অনেক লোক হত ও আহত হইয়াছে। পুলিস ও সৈনিকের পাহারা চলিতেছে। ঢাকার তুরবস্থার কারণ যাহা, সক্করেরও সম্ভবতঃ তাহাই। প্রভেদ এই, যে, ঢাকায় পুলিসের রক্ষকবেশে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে যত বিলম্ব হইয়াছিল, সক্করে তাহা হয় নাই।

এই সব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ভারতবর্ষের স্বরাজ্য-লাভের অযোগ্যতার প্রমাণ বলিয়া উপস্থিত করা হয়। কিন্তু ক্রমবর্দ্ধমান এই উপদ্রবগুলো কি ব্রিটিশ-শাসনের উৎকর্ষের পরিচায়ক?

সক্করের ন্যায় আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের বালিয়াতে এবং পঞ্জাবের কোথাও কোথাও হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হইয়াছে, দেশের জন্য স্বরাজলাভের নিমিত্ত একদিকে ভারতহিতৈষী লোকেরা হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা বাড়াইতেছেন, অন্যদিকে তুর্ব্বৃত্ত ও তুর্বুদ্ধি লোকেরা তাহাদের মধ্যে বিবাদ বাধাইতেছে।

—

পাটিয়ালার মহারাজার সম্বন্ধে তদন্ত

ভারতীয় দেশী রাজ্যসকলের অধিবাসীদের কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে পাটিয়ালার মহারাজার নামে নানা গুরুতর অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত এক কমিটি নিযুক্ত হয়। ঐ কমিটি অনুসন্ধান করিয়া একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন। তাহাতে মহারাজার বিরুদ্ধে অভি-যোগের সমর্থক অনেক সাক্ষ্য ও অন্য প্রমাণ মুদ্রিত আছে। তাহার পর দেশী প্রায় সব খবরের কাগজ ঐ রিপোর্টে লিখিত সমুদয় অভিযোগের সত্যাসত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য গবর্ন্মেণ্টকে একটি কমিশন নিযুক্ত করিতে অনুরোধ করে। রাজ্যশাসক মহারাজাদের নামে গুরুতর অভিযোগ হইলে মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে ঐরূপ কমিশন নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। গভর্ন্মেণ্ট কমিশন নিয়োগ করেন নাই। কিছু কাল গত হইলে পর পাটিয়ালার মহারাজা ভারত-সরকারকে জানান, যে, পঞ্জাবে দেশী রাজ্যসকলের পলিটিক্যাল এজেণ্টকে তদন্তের ভার দিলে তিনি তাহাতে সম্মত আছেন। গবর্ন্মেণ্টও ঐ ব্যক্তিকে তদন্তের ভার দেন। অভিযুক্ত ব্যক্তির মনোনীত ব্যক্তিকে তদন্তের ভার দেওয়ায় দেশী রাজ্যসকলের অধিবাসীদের কন্‌ফারেন্সের পক্ষ হইতে ইহা অসন্তোষকর ব্যবস্থা বলা হয়, এবং প্রায় সমস্ত দেশী কাগজেও সেইরূপ মত প্রকাশ করা হয়। সন্তোষজনক তদন্ত করিতে হইলে আরও কোন কোন ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। যেমন, পাটিয়ালার প্রজারা সাক্ষ্য দিলে সাক্ষ্যের জন্য তাহাদিগকে কোন নির্যাতন সহ্য করিতে হইবে না, এইরূপ অভয় দিতে বলা হইয়াছিল, কিন্তু সেরূপ অভয় দেওয়া হয় নাই।

পলিটিক্যাল এজেণ্ট ফিজপ্যাট্রিক সাহেব তদন্ত শেষ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছেন, এবং ভারত-গবর্ন্মেণ্ট তাহা গ্রহণ করিয়া, মহারাজা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ বলিয়াছেন। তাহা বলিয়াই সন্তুষ্ট হন নাই। বলিয়াছেন, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ কতকগুলি লোকের ও সভার চক্রান্তের ফল।

যে-প্রকারে ও যে-ব্যক্তির দ্বারা তদন্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন নিরপেক্ষ লোক গবর্ন্মেণ্টের এই সিদ্ধান্ত ঠিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না। দেশী রাজ্য-সকলের প্রজাদের কন্‌ফারেন্স চক্রান্ত করিয়াছিলেন

এবং অমৃতলাল ঠক্করের (Thakkar) মত কমিটির সভ্য সেই চক্রান্তের মধ্যে ছিলেন, ইহাও কোন নিরপেক্ষ লোক বিশ্বাস করিবে না।

—

"আইনের বাধ্য ও শান্তিপ্রিয়" লোকদের সংখ্যা

বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক ছোট ছোট রাজকর্ম্মচারী বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষে নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘক বা তাহাদের সহিত সহানুভূতি-সম্পন্ন লোকদের সংখ্যা কম, অধিকাংশ লোক ব্রিটিশ-শাসনের অনুরাগী, আইনের বাধ্য এবং শান্তিপ্রিয়।

বিলাতের দৈনিক ডেলী হেরাল্ড তথাকার শ্রমিক দলের মুখপত্র, শ্রমিক গবর্ন্মেণ্টের কতকটা মুখপত্র। এই কাগজ মিঃ স্লোকম্ব (Slocombe) নামক একজন প্রতিনিধি পাঠাইয়া ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে সংবাদ পাঠাইতে বলেন। তিনি জেলে মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তিনি কি কি সর্ত্তে সত্যাগ্রহ বন্ধ করিতে রাজী তাহা প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক বৃত্তান্ত ডেলী হেরাল্ড কাগজে প্রকাশ করেন। তাহার মধ্যে ঐ কাগজের ৭ই জুলাইয়ের সংখ্যায় আছে:—

When one sees the enormous crowds that flock to meetings or march in processions under the Congress flag, and hears the same opinion, sympathetic to Congress and hostile to the Government, from Sikh or Mohammedan, Hindu or Parsee, high-caste Brahmin or sweeper of depressed classes, one wonders where that "Vast majority of law-abiding and peace-loving citizens," so often referred to in Government declarations, may be found.

—

মান্দ্রাজের মহিলাগণ ও বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন

রায় সাহেব হরবিলাস শারদা মহাশয়ের চেষ্টায় যে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পাশ হইয়াছে, সেই কল্যাণকর আইন রদ করিবার জন্য, অন্ততঃপক্ষে মুসলমান সমাজের জন্য রদ করিবার জন্য, বড়লাটকে অনুরোধ করিবার নিমিত্ত কতকগুলি মুসলমানের এক দল প্রতিনিধি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি তাহাদিগকে পুনর্বিবেচনার কতকটা আশা দেন। সম্প্রতি বাবু স্বরূপৎসিং নামক কৌন্সিল অব্ ষ্টেটের এক্ সভ্য একটি বিলের খসড়া ঐ সভায় পেশ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য, বিশেষ কারণ দেখাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি লইয়া চৌদ্দ বৎসর বয়সের আগে কোন কোন বালিকার বিবাহ দিতে অভিভাবকদিগকে সমর্থ করা।

মান্দ্রাজের মহিলারা সভা করিয়া বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন পণ্ড করিবার এই সব চেষ্টার নিন্দা ও প্রতিবাদ করিয়াছেন, এবং গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন যেন তাঁহারা এই সব চেষ্টায় কর্ণপাত না করেন। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন, যে, অনেক শিক্ষিতা মুসলমান মহিলা বাল্যবিবাহের বিরোধী। তাঁহাদের মত অগ্রাহ্য করিয়া কতকগুলি গোঁড়া মুসলমানের কথা শুনা কখনই গবর্ন্মেণ্টের পক্ষে উচিত হইবে না।

বস্তুতঃ গবর্ন্মেণ্ট যদি হিন্দু মুসলমান কোন ধর্ম্মের কতকগুলি লোকের কথা শুনিয়া শারদা আইন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পণ্ড করেন, তাহা হইলে লোকে ইহাই বুঝিবে, যে, গবর্ন্মেণ্ট এই সঙ্কট সময়ে কতকগুলি লোকের সমর্থন পাইবার জন্য ইহা করিতেছেন।

—

চিত্রকর রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথের অঙ্কিত কতকগুলি ছবি ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রদর্শিত হয়। তথাকার বিখ্যাত চিত্রসমালোচকেরা সেগুলির খুব প্রশংসা করেন। তাহার পর ছবিগুলি ইংলণ্ডের বার্মিংহাম শহরে প্রদর্শিত হয়। সেখানেও সেগুলি প্রশংসিত হয়। অতঃপর চিত্রগুলি জার্ম্মানীর রাজধানী বার্লিনে প্রদর্শিত হইতেছে। সেখানেও প্রশংসা হইবে, সন্দেহ নাই।

রবীন্দ্রনাথের মত বহুমুখী প্রতিভা সকল দেশে সকল সময়েই বিরল। বৃদ্ধ বয়সে ছবি আঁকিতে আরম্ভ করিয়া এরূপ প্রশংসালাভ কয়জনের ভাগ্যে পৃথিবীতে ঘটিয়াছে?

—

শান্তিনিকেতনে "বর্ষামঙ্গল"

রবীন্দ্রনাথ এই বর্ষায় বিদেশে থাকিলেও শান্তি-নিকেতনে বর্ষামঙ্গলের উৎসব হইয়াছিল। তিনি থাকিলে নূতন গান রচনা করিতেন, নূতন গল্প লিখিতেন। তাহা হইতে এবং তাঁহার উপস্থিতি হইতে অধ্যাপক ও ছাত্রেরা আনন্দ ও প্রেরণা পাইত। এবার তাঁহার পূর্ব্বরচিত গান শ্রীযুক্ত দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় গীত হয়।

বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা আরম্ভ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

বৃক্ষরোপণ বর্ষামঙ্গলের অন্তর্গত একটি অনুষ্ঠান। কলেজের ছাত্রনিবাস হইতে সঙ্গীত সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া একটি আমলকির চারা পুষ্প-পত্রে সজ্জিত ডুলিতে করিয়া তাহার মাথায় ছাতা ধরিয়া ছাত্রীদের আবাস শ্রীভবনের সম্মুখে আনা হয়। সেখানে সেটি রোপিত হয়। তাহার পূর্ব্বে ছাত্র ও ছাত্রীরা গান করে, পণ্ডিত শ্রীবিধুশেখর শাস্ত্রী অনুষ্ঠানের উপযোগী সংস্কৃত শ্লোক পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বৃক্ষরোপণে সাহায্য করেন।

সন্ধ্যার পর কবির বাসগৃহ উত্তরায়ণের প্রাঙ্গণে আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত হয়, এবং দুটি ছোট বালিকা সঙ্গীতানুসারী অঙ্গভঙ্গী সহকারে একটি গান করে।

উদ্ভিদসমূহ নানা প্রকারে মানুষের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করে। মানুষ অরণ্যানী ও উদ্যান হইতে নির্ম্মল আনন্দলাভ করে। মানুষের অনেক আগে পৃথিবীতে উদ্ভিদের আবির্ভাব হয়। উদ্ভিদকে মানুষের অগ্রজ বলিলে কোন ভ্রম বা অত্যুক্তি হয় না। উদ্ভিদের সহিত মানুষের হৃদয়ের যোগ আছে বলিলে তাহা অনেকের কাছে কবিকল্পনা বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। কিন্তু কবিকল্পনামাত্রই অলীক নহে। কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলে যেখানে শকুন্তলার প্রিয় লতিকাটির নিকট হইতে বিদায় লইবার বর্ণনা আছে, তখন হইতে এ-পর্য্যন্ত কত কবিই না নানা উদ্ভিদের সাহচর্য্যে শান্তি ও সান্ত্বনা পাইয়াছেন! উদ্ভিদরাজ্য হইতে আহার্য্য, পরিধেয়, বাসগৃহ, যানবাহন ও ঔষধের উপাদান সংগ্রহ ত করা যায়ই—অরূপ এমন কিছুও পাওয়া যায়, যাহার মূল্য আরও অধিক।

শাল-বীথিকায় বৃক্ষরোপণ শোভাযাত্রা
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

কলিকাতার শোচনীয় ও লজ্জাকর দলাদলি

শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পাঁচবার কলিকাতার মেয়র হইয়াছেন। সত্যাগ্রহ করায় তিনি কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তজ্জন্য যথাসময়ে শপথ গ্রহণ করিতে না

পারায় তাঁহার কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির অল্ডার্‌ম্যানের পদ বাতিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ পদে তিনি পুনর্নিযুক্ত হইতে পারেন। বঙ্গের কংগ্রেসদলের নেতৃত্বের জন্য তাঁহার সহিত শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। আবার মেয়র হইবার আকাঙ্ক্ষাও সুভাষবাবুর আছে। আগে অল্ডারম্যান না হইলে মেয়র হওয়া যায় না। সেইজন্য যে অল্ডারম্যান পদটি খালি হইয়াছে তাহাতে উভয় নেতার দলের লোকেরাই নিজ নিজ নেতাকে নির্ব্বাচিত দেখিতে চান। এই নির্ব্বাচন উপলক্ষ্যে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ইমারতে অতিশয় শোচনীয় ও লজ্জাকর গুণ্ডামি হইয়াছে। এই প্রকার দলাদলিতে সমুদয় বাঙালী জাতির গালে চূনকালী পড়িতেছে। দেশের প্রভূত অনিষ্ট হইয়াছে ও হইতেছে।

এই ব্যাপারে একমাত্র কিঞ্চিৎ পরিমাণে সন্তোষকর সংবাদ এই, যে, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জেলে তাঁহার স্ত্রীর প্রমুখাৎ গুণ্ডামির সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন, যে, তিনি অল্ডারম্যান নির্ব্বাচিত হইতে চান না। ইহা তাঁহার উপযুক্ত কাজ হইয়াছে।
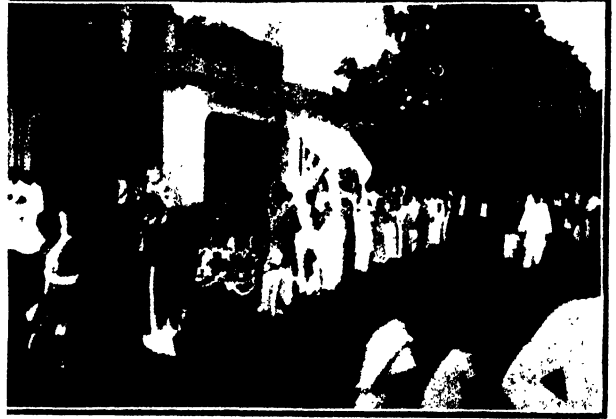
বৃক্ষরোপণের শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের নিকটস্থ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

শোভাযাত্রা গ্রন্থাগারের সম্মুখে
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

গুণ্ডামি কোন এক পক্ষ করিয়াছে বা উভয় পক্ষ করিয়াছে, কিংবা কোন পক্ষ কম, কোন পক্ষ বেশী করিয়াছে, তাহার আলোচনা করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। গুণ্ডামি যে বা যাহারা করুক, উহা বাঙালীর কলঙ্ক।

বিলাতে বেকার

বিলাতে বেকার লোকের সংখ্যা ২০,১১,০০০ হইয়াছে। ইহা কতকটা পৃথিবীব্যাপী বাণিজ্যিক অবসাদজাত, এবং কতকটা ভারতবর্ষে বিলাতী জিনিষ বর্জ্জনের ফল। এক খানা ইঙ্গ-ভারতীয় কাগজ এই বলিয়া সান্ত্বনালাভ করিয়াছে, যে, আমেরিকাতে বেকার লোকের সংখ্যা এখন ৬০ লক্ষ এবং জার্মেনীতে ৩০ লক্ষ।

ভারতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদন

বিলাতে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়িলেই, তাহা আমরা সন্তোষের বিষয় মনে করিতে পারি না। পরের দুঃখে সুখী হওয়া উচিত নয়। যাহারা আমাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তাহাদের দুঃখও সন্তোষের

বিষয় নহে। আমরা যদি আমাদের প্রয়োজনীয় প্রধান প্রধান সব জিনিষ নিজেরা উৎপাদন করিয়া ব্যবহার করিতে পারি, তাহা সন্তোষকর মনে করি। তাহার ফলে বিদেশী জিনিযের কাট্‌তি কমিলে যদি বিদেশে বেকার লোকের সংখ্যা বাড়ে, তাহার জন্য আমরা দায়ী নহি।

শ্রীভবনের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ
শ্রীদ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক গৃহীত ফটোগ্রাফ

রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিদেশী জিনিসের ব্যবহার পরিত্যাগ অবৈধ নহে। কিন্তু দেশী জিনিষ যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন ও উচিত মূল্যে প্রাপ্তব্য না হইলে বিদেশীবর্জ্জন নীতি বেশী দিন স্থায়ী হইতে পারে না।

—

রাজনৈতিক বন্দীদের দশা

রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত বা কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের আহার ও বাসগৃহাদি মনুষ্যোচিত যাহাতে হয়, যাহাতে দেশী বন্দী এবং ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গী বন্দীদের মধ্যে এই সব বিষয়ে অন্যায় পার্থক্য না থাকে, সেই উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ দাস স্বেচ্ছামৃত হইয়াছেন। গবর্মেণ্ট অনেকটা তাহার ফলে বন্দীদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর জন্য খাদ্যাদির ব্যবস্থা কাগজে কলমে ভিন্ন ভিন্ন রকম করিয়াছেন। এস্থলে এই শ্রেণীবিভাগের আলোচনা করিব না। কিন্তু যেরূপ শ্রেণীবিভাগ হইয়াছে সকল স্থলে তদনুসারে কাজ হইতেছে না। শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত, আরামে থাকিতে অভ্যস্ত ধনী লোকেরাও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলে বিচারক কোন কোন স্থলে তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণীভুক্ত করিতেছেন না। অথচ ভবঘুরে রকমের বদমায়েস ভিক্ষুক ফিরিঙ্গী বা ইউরোপীয় জেলে গেলে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যাদি পাইয়া থাকে।

এবম্বিধ কারণে আজকাল অনেক প্রদেশে জেলে রাজনৈতিক কয়েদীরা প্রায়োপবেশন করিতেছেন। তাঁহারা জানেন, জেল প্রমোদভবন নহে। কিন্তু সরকারী নিয়ম অনুসারে, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য যাহা যতটুকু তাঁহাদের প্রাপ্য, তাহা তাঁহারা কেন পাইবেন না, ইহাই জিজ্ঞাস্য।

—

সাধারণ কয়েদী খালাস

সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ফলে পুলিসের লোকদের লাঠির ব্যবহার খুব বাড়িলেও, শুধু তাহার দ্বারা ঐ প্রচেষ্টার প্রতিরোধ হইতেছে না;—কতকগুলি লোককে জেলে পাঠাইতে হইতেছে। রাজনৈতিক অপরাধে কারারুদ্ধ এই সকল লোকের সংখ্যা এত বেশী, যে, সাধারণ জেলসকলে তাহাদের স্থান হইতেছে না। কোথাও কোথাও দু'একটা নূতন জেলের ব্যবস্থা করিয়াও কার্য্য-সিদ্ধি হইতেছে না; কারণ নূতন জেল নির্ম্মাণ করিতে টাকার দরকার, এবং সত্যাগ্রহ আন্দোলনে একদিকে সরকারের আয় কমিতেছে, অন্যদিকে খরচ বাড়িতেছে।

রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে জেলে স্থান দিবার জন্য ভারতবর্ষের সব প্রদেশে সাধারণ অনেক কয়েদীকে তাহাদের মিয়াদ শেষ হইবার আগেই খালাস দেওয়া হইতেছে। তাহাতে এক কৌতুকাবহ অবস্থা ঘটিতেছে। চুরি ডাকাতী জাল জুয়াচুরি প্রতারণা প্রভৃতি অপরাধ নৈতিক দোষ হইতে উৎপন্ন। সকল সভ্য সমাজে চিরকাল এই সব কাজ দণ্ডনীয় হইয়া আসিতেছে, কিন্তু রাজনৈতিক অনেক "অপরাধ" এ জাতীয় নহে। সেগুলা কোন দেশে বে-আইনী, কোন দেশে নহে; আবার একই দেশে এক সময়ে যাহা বে-আইনী ছিল না, তাহ

পরে বে-আইনী হইয়াছে :—যেমন পিকেটিং, সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে কর্ম্মত্যাগ করিতে বলা, ইত্যাদি। কৌতুকাবহ ব্যাপার এই, যে, দুর্বৃত্ততার জন্য যাহারা দণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারা অকালে খালাস পাইতেছে, এবং জেলে তাহাদের কক্ষগুলাতে, দুর্নীতিপরায়ণ নহেন বরং বস্তুতঃ অতি উচ্চ চরিত্রের লোক, এরূপ অনেকে আবদ্ধ হইতেছেন। এরূপ অনেক লোকের নাম সকলেরই মনে পড়িবে, উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

যাহা হউক, যীশুখ্রীষ্টকে যখন চোরদের সঙ্গে ক্রুশ-বিদ্ধ করা হইয়াছিল, এবং মুক্তির পাত্র কে হইবে, জিজ্ঞাসা করায় জনতা যখন চোরেরই নাম করিয়াছিল, তখন বর্ত্তমান সময়ের কয়েদী খালাস বিস্ময়কর বা অভূতপূর্ব্ব নহে। আমাদের কেবল এই আশঙ্কা হয়, যে, অনেক চোর বদমায়েসকে খালাস দেওয়ায় দেশে অপরাধের সংখ্যা বাড়িবে, এবং তাহার দোষ সত্যাগ্রহীদের স্কন্ধে আরোপিত হইবে ;—যেমন বোম্বাইয়ের গবর্ণরের দ্বারা হইয়াছে এবং যেমন কিশোরগঞ্জের হত্যাকাণ্ড, গৃহদাহ ও লুট ভারত-গবর্ন্মেণ্টের এক সাপ্তাহিক বিবরণীতে নিরুপদ্রব আইন অমান্য প্রচেষ্টার ঘাড়ে চাপান হইয়াছে। বোম্বাইয়ের গবর্ণর বোম্বাই কৌন্সিলে বলিয়াছিলেন, যে, গুজরাটের খেড়া জেলার ডাকাইতীগুলা কংগ্রেস প্রচেষ্টার ফল।

—

কিশোরগঞ্জের উপদ্রব

কিশোরগঞ্জের উপদ্রব সম্বন্ধে ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন, যে, ঢাকা জেলা হইতে আগত কতকগুলা মৌলবীর প্ররোচনায় উহা ঘটিয়াছে। বঙ্গের গবর্ণর বলেন, উহা আর্থিক কারণে ঘটিয়াছে। দেনদার রায়তরা মহাজনদের ঘরবাড়ী লুট ও দাহ করিয়াছে এবং কোথাও কোথাও তাহাদের প্রাণবধ করিয়াছে। আমাদের মতে দেনা-পাওনার ব্যাপারটা একটা ছল মাত্র। অনেক গ্রামের সমুদয় হিন্দু দোকান এবং কেবল মাত্র হিন্দু দোকানই লুট হইয়াছে। পালেরঘাটের একটি হিন্দু দোকানে ২৫ বস্তা ধান ছিল। যখন মুসলমান লুণ্ঠকরা জানিতে পারিল উহা মুসলমানের, তখন তাহারা উহা স্পর্শ করিল না, কিন্তু দোকানের আর সব জিনিষ লুট করিল। কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কিশোরগঞ্জ মহকুমার ষাটের অধিক গ্রাম লুণ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এরূপ খবর পাওয়া যায় নাই, যে, কোন মুসলমানের এক পয়সার জিনিষও লুট হইয়াছে। হিন্দুদের যে-সব বাড়ী লুট হইয়াছে, তাহাদের মালিকরা সবাই কুসীদজীবী মহাজন নহে। মহাজনী কাজ কেবল যে হিন্দুরাই করে তাহা নহে, অনেক মুসলমানও করে ; অথচ তাহাদের বাড়ী লুট হয় নাই। দেনদাররা সবাই মুসলমান নহে, ঋণগ্রস্ত হিন্দুও অনেক আছে। কিন্তু ঋণগ্রস্ত হিন্দুরা হিন্দু বা মুসলমান মহাজনদের বাড়ী লুট বা দাহ করে নাই, বা তাহাদের প্রাণবধ করে নাই।

এই সব কারণে মনে হয়, কিশোরগঞ্জের উপদ্রব সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার ফল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে, টিক্‌টিকি পুলিস কোন্ অলিগলির মধ্যে আঁধার কোণে বোমা আদি লুক্কায়িত আছে তাহা আবিষ্কার করিতে পারে, কোথায় গোপনে চিঠিপত্র দ্বারা বা মৌখিক রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র হইতেছে তাহা ধরিতে পারে ; কিন্তু ঢাকা জেলায় ও ময়মনসিংহ জেলায় মৌলবীরা লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া যে এরূপ ভীষণ উপদ্রব ঘটাইল তাহার পূর্ব্বাহ্নে কিছুই জানিতে পারিল না। অথবা ভারতে আশ্চর্য্য কিছুই নহে।

যাহা হউক, বঙ্গের লাট ও ময়মনসিংহের ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি বঙ্গীয় সরকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিশোরগঞ্জের উপদ্রবের যে-যে কারণই অনুমান বা সাব্যস্ত করুন, তাঁহারা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টাকে ইহার জন্য দায়ী করেন নাই। কিন্তু ইংরেজীতে একটা কথা আছে, ক্রীড়কদের চেয়ে দর্শকরা বেশী দেখে। সেইজন্য বঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই, সিমলাশৈলে অধিষ্ঠিত ভারত-সরকারের সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে সাপ্তাহিক মন্তব্যের লেখকের অন্তশ্চক্ষুর তাহা গোচর হইয়াছে। তাঁহার মতে কিশোরগঞ্জের লুণ্ঠক ও ঘাতকেরা সত্যাগ্রহের

দ্বারা উৎসাহিত হইয়াছিল। তাঁহার ঠিক্ কথাগুলি এই :—

"More evidence has been received of the effect of the Civil Disobedience movement in encouraging lawlessness in directions not connected with the movement. In Bengal there were disturbances involving many villages, caused by attacks upon money-lenders by debtors."

বোম্বাইয়ে নেতাদের শাস্তি

লোকমান্য বাল গঙ্গাধর টিলক মহোদয়ের বার্ষিক শ্রাদ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে বোম্বাইয়ের কংগ্রেস কমিটির কর্ত্তৃপক্ষ একটি মিছিলের ব্যবস্থা করেন। তথাকার পুলিস কমিশনার তাহা নিষেধ করেন, এবং যে যে রাস্তা দিয়া বহুবার বৃহত্তর মিছিল কিছুদিন আগেও গিয়াছে, সেই ক্রুকশ্যাঙ্ক রোড ও হর্ণবি রোডের

এসপ্লানেড হাজত হইতে কয়েদীগাড়ী নেতৃগণকে বাইকুল্লা জেলে লইয়া চলিয়াছে

সন্ধিস্থলে লাইনবন্দী পুলিসের দ্বারা তাহার গতিরোধ করেন। তাহাতে নেতৃবর্গ ও জনতা রাস্তায় বৃষ্টির মধ্যে বসিয়া থাকেন। তাঁহারা সন্ধ্যার আগে হইতে পরদিন প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ১৪ ঘণ্টা এই অবস্থায় থাকেন। তখন নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়, এবং জনতার অনেকে চলিয়া যান। বাকী কয়েক শত লোক ভিজা রাস্তায় বসিয়াই থাকেন। পুলিস লাঠি চালাইয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। কয়েক শত লোক জখম হয়, ও অনেককে হাঁসপাতালে যাইতে হইয়াছে।

যাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল, তাঁহাদের মধ্যে

নেতৃগণকে কয়েদীগাড়ী হইতে নামান হইতেছে

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল প্রভৃতি দেশমান্য নেতারাও ছিলেন। সাধারণ কাণ্ডজ্ঞান বিশিষ্ট কোন লোক মনে করিবেন না যে, এরূপ লোকদের মিছিলের উদ্দেশ্য ছিল শান্তিভঙ্গ করা। তাঁহারা রাস্তার একপাশ দিয়া ৪ জন বা ২ জনের লাইন বাঁধিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন। পুলিস তাহাতেও রাজী হয় নাই। বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিচার হয়। সচরাচর এরূপ বিচারে সত্যাগ্রহী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না, সরকারপক্ষের সাক্ষীদিগকে প্রশ্ন করেন না, নিজেরা দোষী কি নির্দোষ কিছুই বলেন না, মোকদ্দমার সহিত কোন সংস্রব রাখেন না। সুতরাং সত্যাগ্রহী অভিযুক্তদিগকে দণ্ড দেওয়া খুব অল্প সময়সাপেক্ষ ও সহজ হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় ছাড়া আর সকলেই মোকদ্দমার সহিত কোন সংস্রব রাখেন নাই। তিনি সরকারী সাক্ষীদিগকে জেরা করেন, এবং আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ বক্তৃতা করেন। অবশ্য, তাহাতেও মোকদ্দমার ফল যাহা হইবার তাহা হইয়াছে—সকলেই দণ্ডিত হইয়াছেন। কিন্তু অন্যবিধ একটা ভাল ফল হইয়াছে। সংবাদপত্রের পাঠকেরা

বুঝিতে পারিয়াছেন, যথেষ্ট এবং ন্যায্য কারণ ব্যতিরেকে পুলিসের যে-কোন মিছিল ও সভা নিষেধ করিবার ন্যায্য অধিকার নাই। আমাদের বিবেচনায় বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার বোম্বাই কংগ্রেস কমিটির নেত্রী শ্রীমতী হংসা মেহতাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহা আইনানুযায়ী হুকুম নহে, সুতরাং তাহাতে যে নিষেধ ছিল তাহা লঙ্ঘন করায় আইন অমান্য করা হয় নাই। কিন্তু ঐ চিঠিকে আইনানুযায়ী হুকুম মনে করিলেও মালবীয়জী দেখাইয়াছেন, যে, উহা অযৌক্তিক ও অনাবশ্যক হুকুম, সুতরাং তাহা মানিতে কেহ বাধ্য নহে। কেন-না মিছিলটির দ্বারা শান্তিভঙ্গের কোনই সম্ভাবনা ছিল না, এবং উহার দ্বারা গভীর রাত্রে এবং ভোরেও লোক ও যানবাহনের চলাচল বন্ধ হইত, কখনই বলা যায় না।

ম্যাজিষ্ট্রেট মালবীয়জীকে কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে দেন নাই। দিলে আরও অনেক কথা বাহির হইত। মালবীয়জী বোম্বাই গবর্ন্মেণ্টের হোম মেম্বর

বাইকুল্লা জেলের দ্বারদেশে

কয়েদীগাড়ী হইতে নামিয়াছেন—পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরাম, ডাক্তার এন্. এস্. হর্দ্দিকর, শ্রীযুক্ত আয়ার। মৌঃ শেরওয়ানী সাহেব পুলিশ সার্জ্জেণ্টের আড়ালে পড়ায় তাঁহাকে দেখা যাইতেছেনা।

হটসন সাহেবকে সরকারী সাক্ষীরূপে হাজির করিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করেন নাই। করিলে আরও কিছু তথ্য জানা যাইত। কারণ হটসন সাহেব মিছিল উপলক্ষ্যে তাড়াতাড়ি পুনা হইতে বোম্বাই আসিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত অন্য সরকারী লোকদের এ বিষয়ে পরামর্শ
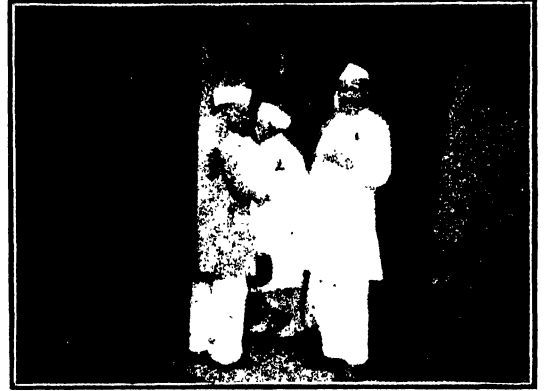
কারাদ্বারে

১। শ্রীযুক্ত শেরওয়ানী, ২। শ্রীযুক্ত মদনমোহন মালবীয় ৩। শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলৎরাম।

হইয়াছিল, এবং তিনি ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী একটি বাড়ী হইতে পুলিস কর্ত্তৃক প্রহারদ্বারা সত্যাগ্রহী বিতাড়ন প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন এবং আরও কয়েকজনের এক শত টাকা করিয়া জরিমানা এবং তাহা না দিলে ১৫ দিনের অশ্রম কারাদণ্ডের হুকুম হয়। পণ্ডিতজী জরিমানা দিতে রাজী হন নাই। কিন্তু তাঁহার অসম্মতি ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও একজন তাঁহার জরিমানা দিয়া দেওয়ায় তাঁহাকে খালাস দেওয়া হইয়াছে। কে টাকা দিয়াছেন, পণ্ডিতজী তাহা জানেন না। জেলে, তাঁহার জরিমানা দেওয়ার সংবাদ তাঁহাকে জানান হইলে তিনি প্রথমে জেল ছাড়িয়া আসিতে চান নাই। পরে সঙ্গীদের অনুরোধে বাহির হইয়া আসেন, এবং এক প্রকাশ্য সভায় বলেন, "যিনি টাকা দিয়াছেন তিনি দেশের ক্ষতি করিয়াছেন এবং আমার প্রতি অমিত্রজনোচিত কাজ করিয়াছেন ; পুলিস কমিশনারের হুকুম স্বেচ্ছাচারমূলক ছিল। আমি পুনর্ব্বার সেরূপ হুকুম অগ্রাহ্য করিতে প্রস্তুত।" শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পটেল পণ্ডিতজীর সহিত ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

এই মোকদ্দমার সময় আদালতে শ্রীযুক্ত বল্লভভাই পটেল এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটকে শীঘ্র শীঘ্র মোকদ্দমা শেষ করিতে বলেন, যে, তাঁহাদিগকে যে হাজতে রাখা হইয়াছে তাহা দুর্গন্ধ ও নোংরা গোরুর খোঁয়াড়ের মত এবং মহিলাদিগকেও তাহাতেই আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মত সম্ভ্রান্ত লোকদিগের কথা দূরে থাক কোন শ্রেণীর কোন অবস্থার কোন আসামীকেই এমন ঘরে রাখা উচিত নহে। ঘোরতর অপরাধী আসামীও মানুষ। তাহার সহিত মানুষের মতই আচরণ করা কর্ত্তব্য। অপরাধীদিগকে যে শাস্তি দেওয়া হয়, তাহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত তাহাদের চারিত্রিক সংশোধন, কিন্তু তাহারা কোন প্রকারে অত্যাচরিত, উৎপীড়িত, নিগৃহীত বা লাঞ্ছিত হইলে তাহাদের কোন উন্নতি হইতে পারে না। অধিকন্তু যাহারা অত্যাচার, উৎপীড়ন নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা করে, তাহাদেরও অবনতি হয়। আমরা এসব কথা লিখিতেছি এই জন্য, যে, সরকারী লোকেরা বলিতে পারেন, হাজতগুলা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল প্রভৃতির মত ব্যক্তিদের জন্য নির্ম্মিত হয় নাই। তাহারই উত্তরে আমরা সংক্ষেপে দেখাইয়াছি, যে, কোন রকম আসামীর জন্যই ওরকম ঘর নির্ম্মাণ করিয়া অত্যন্ত অপরিষ্কার ও অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় রাখা উচিত নয়।

একই ঘরে অভিযুক্ত পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে রাখা বর্ব্বরোচিত ব্যবস্থা।

—

সাপ্রু-জয়াকর মধ্যস্থতা

শ্রীযুক্ত তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও মুকুন্দরাম জয়াকর প্রথমে গান্ধীজী ও পরে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও জবাহরলাল নেহরুর সহিত কথা কহিয়া এবং তদনন্তর মহাত্মাজীর নিকট নেহরু পিতাপুত্রের বক্তব্য পৌঁছাইয়া দিয়া বড়লাটকে এই অনুরোধ করেন, যে, এই তিনজন নেতাকে একত্র পরামর্শ করিবার সুযোগ দেওয়া হউক। লর্ড আরুইন তাহাতে মত দিয়াছেন। বড়লাটের বিবেচনা অনুমোদনীয়। সাপ্রু ও জয়াকর যদি তিনজন কারারুদ্ধ নেতার সহিত কারাগারের বাহিরের প্রধান একজন নেতার সাক্ষাৎকারের অনুমতি চাহিতেন ও পাইতেন, তাহা হইলে ভাল হইত। এখন সর্দ্দার বল্লভভাই পটেল কারারুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাকে অপর তিনজন নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দিলে তাঁহারা সম্মিলিতভাবে যাহা বলিবেন তাহার মূল্য বাড়িবে।

ভারত-গবর্মেণ্ট বলিতে শুধু বড়লাটকে বুঝায় না। তাঁহাকে ও তাঁহার শাসনপরিষদের সভ্যদিগকে লইয়া ভারত-গবর্মেণ্ট। এই সভ্যেরা সকলেই সত্যাগ্রহীদের সহিত রফা করিতে চাহিতেছেন, বোধ হয় না। সমুদয় প্রাদেশিক গবর্মেণ্টকেও রফার পক্ষপাতী বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে বোম্বাইয়ে টিলক তর্পণের মিছিলের সংস্রবে নেতাদের শাস্তি এবং অন্য কয়েক শত লোকের উপর বেদম লাঠি প্রয়োগ হইত না।

—

বঙ্গের মিউনিসিপালিটী সমূহের আর্থিক অবস্থা

সরকারী লোকাল অডিট (স্থানীয় হিসাব পরীক্ষা) বিভাগের ১৯২৮-২৯ সালের রিপোর্ট হইতে জানা যায়, যে, বঙ্গের অনেক মিউনিসিপালিটীর আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। সংক্ষেপে তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ উল্লিখিত হইয়াছে, যথা—আগামী বৎসরে কিরূপ ব্যয় হইবে তৎসম্বন্ধে অবিবেচনাপ্রসূত বজেট ধার্য্য করা, ট্যাক্স আদায় সম্বন্ধে যথোচিত তত্ত্বাবধানের অভাব, যাহারা যথাসময়ে ট্যাক্স দেয় নাই তাহাদিগকে উহা দিতে বাধ্য করিবার নিমিত্ত আইনানুমোদিত উপায় অবলম্বন না করা, মিউনিসিপালিটী শহরবাসীদের যে-যে প্রকার সেবা করেন তাহার সবগুলির জন্য যথেষ্ট বা কিছুমাত্র ট্যাক্স না লওয়া, এবং আয়ের অতিরিক্ত ব্যয় করা। দুএকটি মিউনিসিপালিটীতে তহবিল তছরুপ ও প্রতারণাও হইয়াছে। প্রত্যেক মিউনিসিপালিটীর এই সব বিষয়ে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

—

দেশী কাপড়ের কল

বিদেশী কাপড় বর্জ্জনের জন্য আন্দোলন হওয়ায় দেশী কাপড়ের কাটতি খুব বাড়িয়া যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া বোম্বাইয়ের অনেক কাপড়ের কলে মাল অনেক জমিয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি মিল বন্ধ হইয়াছে; আরও মিল বন্ধ হইতে পারে। ইহার কারণ কি? সরকারী লোকেরা অবশ্য সমস্ত দোষটা সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ঘাড়ে চাপাইবেন। দেশব্যাপী এরূপ কোন আন্দোলন হইলে অবশ্য সব বিষয়ে দেশব্যাপী একটা অনিশ্চয়ের ভাবও আসে। তাহাতে সব ব্যবসায়ের বাজারে মন্দা পড়ে ও লোকের হাতে টাকা কম আসে। সুতরাং কাপড় কিনিতেও লোকের অসুবিধা হয়। অতএব সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত কোন জিনিষেরই বাজার খারাপ হওয়ার বিন্দুমাত্রও সম্পর্ক নাই বলিলে ঠিক বলা হইবে না। কিন্তু বাজার মন্দা হওয়ার ইহা প্রধান কারণ নহে। এখন ব্যবসা বাণিজ্য পৃথিবীর সর্ব্বত্রই মন্দা। এইজন্য ভারতের কাঁচা মালের চাহিদা বিদেশে কমিয়াছে ও তজ্জন্য চাষীদের হাতে নগদ টাকা কম আসিতেছে। আর একটা কারণ, বিলাতী মুদ্রা ও ভারতীয় মুদ্রার বিনিময়ের হার। আগে বিনিময়ের হার ছিল মোটামুটি ১ টাকা=১৬ পেনী, এখন হইয়াছে ১ টাকা=১৮ পেনী। আপাততঃ মনে হইতে পারে ইহাতে আমাদের সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু তাহা হয় নাই। ইহার দ্বারা ভারতবর্ষের আয় কমান হইয়াছে এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যের ক্ষতি করা হইয়াছে। বিলাতী বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য এই নূতন বিনিময়ের হার নির্দ্ধারিত হয়। আগে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডকে কোন জিনিষ বিক্রী করিয়া এক পাউণ্ড পাইলে, সেই পাউণ্ডের মূল্য ছিল ১৫ টাকা; এখন এক পাউণ্ড পাইলে তাহার মূল্য হয় ১৩।/৪ পাই।

এই সব কারণে লোকের হাতে টাকা কম আসিতেছে এবং প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার ক্ষমতাও তাহাদের কমিয়াছে।

—

'য়্যাড্‌ভান্স' ও 'লিবার্টি' সম্পাদকদের দণ্ড

'য়্যাডভান্স' ও 'লিবার্টি'র সম্পাদকদ্বয় ছাত্রদের প্রতি শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবীর পিকেটিং সম্পর্কে একটি উৎসাহ-বাণী ও অনুরোধ প্রকাশ করায় দণ্ডিত হইয়াছেন। আইনের মর্ম্ম ও মহিমা আমরা সব সময়ে বুঝিতে পারিবার দাবী করি না। বঙ্গের বাহিরের কয়েকটি দৈনিক কাগজ আমরা দেখি। তাহাতে কখন কখন কোন কোন কংগ্রেসনেতার বক্তৃতা আগাগোড়া ছাপা দেখিতে পাই। অনেক বক্তৃতায় সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার অন্তর্গত সব কাজ খুব জোরে চালাইবার অনুরোধ থাকে। এগুলি ছাপিয়া বঙ্গের বাহিরের কোন সম্পাদক এপর্য্যন্ত বিপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অবগত নহি। প্রেসের বিরুদ্ধে সাধারণ আইনের ও বিশেষ অর্ডিন্যান্সের সব প্রদেশে একপ্রকার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ হইতেছে না। সব প্রদেশে উহার ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ খুব বেশী কড়া করিয়া সাম্য স্থাপন করিতে বলিতেছি না। আমরা চাই, অন্যান্য প্রদেশে খবরের কাগজওয়ালারা কার্য্যতঃ যতটা স্বাধীনতা ভোগ করিতেছেন, বঙ্গের সাংবাদিকরাও ততটা স্বাধীনতা ভোগ করুন।

—

পিকেটিং ও বিরক্তিকরণ

আহমদাবাদের ম্যাজিষ্ট্রেট একটা মোকদ্দমায় তাঁহার রায়ে বলেন, যে, শান্তিপূর্ণ পিকেটিং, অর্থাৎ কোন বল প্রয়োগ না করিয়াও কাহাকেও উত্ত্যক্ত না করিয়া পিকেটিং করিলে তাহা অপরাধ নহে। বঙ্গে আইনের এই ব্যাখ্যা গৃহীত হয় নাই। অর্ডিন্যান্সটি পড়িলে কিন্তু মনে হয়, পিকেটিং হেতু লোকে ত্যক্ত বিরক্ত হয় বলিয়াই এবং হইলেই উহা অপরাধ।

যাহা হউক, আইনের কূটতর্ক করিবার যোগ্যতা ও অধিকার আমাদের নাই। আমরা খবরের কাগজে দেখিয়াছি, কলিকাতার বড়বাজারে মহিলা পিকেটার-দিগকে পুলিস গ্রেপ্তার করায় কয়েকবারই বিদেশী কাপড়ের দেশী দোকানওয়ালারা হরতাল করিয়া দোকান বন্ধ করিয়াছেন। তাহাতে বুঝা যায়, এই পিকেটারদের

কাজে তাঁহারা উত্ত্যক্ত হন নাই। উত্ত্যক্ত হইলে তাঁহারা হরতাল না করিয়া মহিলা পিকেটারদের গ্রেপ্তারে উল্লাস প্রকাশ করিতেন এবং হরির লুট দিতেন। এইজন্য অনুমান হয়, পিকেটিঙে দেশী দোকানদারদের চেয়ে ব্রিটিশ গবন্মেণ্টের আপত্তি বেশী, অবশ্য বিলাতী মিলওয়ালাদেরও আপত্তি আছে। ভারতবর্ষের গবন্মেণ্ট ও ভারতবর্ষের জনগণ বলিলে দুটি যেরূপ বিভিন্ন মানবসমষ্টি বুঝায়, ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট বলিলে তদ্রূপ আলাদা আলাদা জিনিষ বুঝায় না।

—

বিশ্বভারতীর ছাত্রী ও ছাত্রদের দ্বারা পল্লীসেবা

আমরা বিশ্বভারতীর ১৯২৯ সালের রিপোর্ট পড়িয়া শ্রাবণের প্রবাসীতে লিখিয়াছিলাম, যে, আগে যেমন শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা নিকটবর্ত্তী কোন কোন গ্রামের বালক-বালিকাদিগকে পড়াইত, এখন তাহা হয় না। রিপোর্টে এরূপ কোন ব্যবস্থার উল্লেখ না থাকায় এইরূপ লিখিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরে দেখিতেছি শান্তি-নিকেতনের ছাত্রী ও ছাত্রেরা কেহ কেহ পল্লীসেবা করিতেছেন।

ছাত্রীসংঘ হইতে ভুবনডাঙ্গা ও সাঁওতাল গ্রামে প্রত্যহ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটা হইতে সাতটা পর্য্যন্ত ঐ দুই গ্রামের ছাত্রীদিগকে পড়া, লেখা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সেলাই, চরকায় সুতাকাটা, সেবা, এবং লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা দেওয়া হয়। গড়ে ৩০টি ছাত্রীকে শিক্ষা দেওয়া হয়। গড়ে প্রত্যহ শান্তিনিকেতনের চারিজন ছাত্রী এই সকল বিষয় শিখাইবার জন্য গিয়া থাকেন।

কলেজ বিভাগের ছাত্রদের মধ্য হইতে প্রত্যহ গড়ে দুই জন নিকটস্থ গ্রামে শিক্ষা দিতে এবং অন্যবিধ সেবার কর্ম্ম করিতে যাইয়া থাকেন। কাজের সময় সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৮টা। তাঁহারা গ্রামস্থ ১৮ জন ছাত্রকে শিক্ষা দেন। শিক্ষার বিষয় পড়া, লেখা, বাগানের কাজ প্রভৃতি। কথকতা ও লণ্ঠনসহযোগে বক্তৃতার দ্বারা তাঁহারা সামাজিক অনেক বিষয়েও শিক্ষা দেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক বুধবার এবং অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় ছুটি থাকায় গ্রামগুলিতে ডোবা-বুজান, পথ-সংস্কার এবং নর্দ্দমা-কাটার কাজ তাঁহারা ঐ ঐ দিনে করেন।

এই সকল কাজের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আশ্রমের অতিথিবর্গের নিকট হইতে কিছু কিছু দান চাওয়া হয়। তদ্ভিন্ন সম্প্রতি একদিন আনন্দবাজার খোলা হয়। তাহাতে মোট নব্বই টাকা আট আনা আয় হইয়াছে।

—

মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষ

মাননীয় শ্রীযুক্ত এস্ এন্ ঘোষ আফ্রিকার টাঙ্গান্‌য়ীকা দেশের প্রধান শহর দার-এস্-সালামে ব্যারিষ্টারী করিতেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ১৯২৪ সালে ঐ দেশে ব্যারিষ্টারী করিতে যান, এবং প্রথম হইতেই তাঁহার পসার জমিতে থাকে। তিনি সাতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং সমুদয় লোক-হিতকর কাজে সহায়তা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি নেতা হইতে অভিলাষী ছিলেন না। কিন্তু সামাজিক বা রাজনৈতিক এমন কাজ খুব কমই ছিল, যাহাতে লোকে তাঁহার নেতৃত্ব চাহিত না। তিনি টাঙ্গান্‌য়ীকার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। তিনি স্থানীয় সেণ্ট্রাল স্কুলে অনেক সাহায্য করেন এবং উহার জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেন। ভারতীয় লাইব্রেরী স্থাপন ও পরিচালনের জন্যও তিনি অনেক পরিশ্রম করেন। তিনি সম্প্রতি হৃদরোগ প্রভৃতিতে এত দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, যে, সুচিকিৎসার জন্য ইউরোপ কিংবা ভারতবর্ষে আসিতে পারেন নাই। তাঁহার দৈহিক অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়ে, তখন তাঁহাকে স্থানীয় ইউরোপীয় হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হয়, এবং সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। দুঃখের বিষয় সেখানে তাঁহাকে ইউরোপীয়দের জন্য অভিপ্রেত ভাল কোন কক্ষে রাখিয়া ভালরূপ চিকিৎসা করা হয় নাই, ভৃত্যদের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা হইয়াছিল। টাঙ্গান্‌য়ীকার গবর্ণর ও চীফ্ জষ্টিস্ তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে তাঁহাদের বন্ধু বলিয়া উল্লেখ করেন, এবং তিনি অনেক বার তাঁহাদের সহিত ভোজও খাইয়াছিলেন। কিন্তু, "……শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ।" শ্মশানের আগে তাঁহার প্রতি

ইউরোপীয়েরা বন্ধুত্ব দেখান নাই। এইরূপ ব্যবহার যে-সাম্রাজ্যে হয়, সাম্য লাভ করিয়া তাহার অন্তর্গত থাকিবার আশা কতটুকু ?

—

জেলে বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা

বঙ্গে কয়েকটি জেলে বালক কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাংলার সর্ব্বত্রই এইরূপ বন্দোবস্ত হওয়া উচিত, এবং প্রাপ্তবয়স্ক প্রত্যেক নিরক্ষর কয়েদীকে লেখাপড়া শিখান কর্ত্তব্য।

—

বিদ্যাসাপেক্ষ উপার্জ্জনে অধিকার

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম জয়াকর একটি আইন করিয়াছেন, যাহার বলে একান্নবর্ত্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত থাকিয়াও কোন হিন্দু নিজের বিদ্যার দ্বারা উপার্জ্জিত ধনে সম্পূর্ণ অধিকারী থাকিতে পারিবেন, সেরূপ ধন এজমালী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে না। অবশ্য এরূপ উপার্জ্জক নিজের উপার্জ্জন একাই ভোগ না করিতেও পারিবেন। ইহা ন্যায্য আইন, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারে কতকগুলি লোকের আলস্য অতঃপর প্রশ্রয় পাইবে না।

—

কংগ্রেস ও ব্যবস্থাপক সভা

কংগ্রেস নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। সুতরাং আইনপ্রণয়ন যাঁহাদের কাজ ব্যবস্থাপক-সভা নামক সেই সব সভার সভ্য হইতে না চাওয়া তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। এতটুকু পর্য্যন্ত তাঁহাদের সহিত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকদের মতভেদ না থাকিবারই কথা। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্যসাধক কমিটি স্থির করিয়াছেন, যে, অন্যেরাও ব্যবস্থাপক-সভাসমূহের সভ্য হইতে চাহিলে তাঁহারা তাহারও বিরোধিতা করিবেন ও করাইবেন, ভোটারদিগকে ভোট দিতে নিষেধ করিবেন ও নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিবেন। এ বিষয়ে মতভেদ হইবে। কংগ্রেসওয়ালারা বলিতে পারেন, "আমরা যখন সরকারী আইন মানি না, তখন সেরূপ আইন প্রণীত হইতেও দিব না।" কিন্তু সব আইন খারাপ নয়, এবং তাঁহারা যদি ব্যবস্থাপক-সভা গঠিত হইতে না দেন (তাঁহাদের সেরূপ চেষ্টা ব্যর্থ হইবারই সম্ভাবনা), তাহা হইলে বড়লাট আরও অর্ডিন্যান্স জারী করিবেন। তাহাতেও অবশ্য প্রকারান্তরে কংগ্রেসের জয় হইবে বটে। আর একটা কথা বঙ্গের লোকদের মনে উদিত হইবে, যে, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগীর মত সভ্য ব্যবস্থাপক-সভায় থাকিলে অত্যাচারের প্রতিকার না হউক, অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশিত হইতে পারিবে।

কংগ্রেসকে ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যে, তাঁহাদের লোকবল, অর্থবল এবং কর্ম্মশক্তি অসীম নহে। তাঁহারা প্রধান কাজ ব্যতীত খবরের কাগজের আফিসে পিকেটিং, ইস্কুল কলেজে পিকেটিং এবং ভোটারদিগকে নির্ব্বাচন কার্য্য হইতে নিবৃত্তকরণ প্রভৃতি কার্য্যেও শক্তি ব্যয় করিলে, প্রধান কাজ করিবার জন্য যথেষ্ট লোক, অর্থ ও শক্তি নিযুক্ত ও প্রযুক্ত হইতে পারিবে কি ? তাঁহারা গবর্মেণ্টের সহিত শক্তিপরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। অধিকন্তু অবিরোধী কোন কোন শ্রেণীর দেশের লোকদের সহিতও শক্তি পরীক্ষায় যুগপৎ প্রবৃত্ত হওয়া কি সমীচীন ? আমরা কংগ্রেসওয়ালাদের মত আইন অমান্য করিতেছি না। সুতরাং তাঁহাদের ঐ কাজ কি উপায়ে সফল হইতে পারে, সে বিষয়ে আমরা কোন পরামর্শ দিতে অনিচ্ছুক, অসমর্থ ও অনধিকারী। কিন্তু একথা বলিবার অধিকার আমাদের আছে, যে, স্বদেশী সুতা ও কাপড় উৎপাদন কংগ্রেসের একটি গঠনমূলক কার্য্য; নানা অপ্রধান কাজে তাঁহাদের যে শক্তির অপচয় হইতেছে, তাহা এই গঠনমূলক কার্য্যে প্রযুক্ত হইলে দেশের কল্যাণ হইবে এবং স্বরাজলাভরূপ তাঁহাদের মূল উদ্দেশ্য পরোক্ষ উপায়ে সিদ্ধ হইবে।

—

ছাত্রদের কর্ত্তব্য

শিক্ষালয়সকলে পিকেটিং প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য মোটামুটি শ্রাবণের প্রবাসীতে বলিয়াছি। এখন একটা সময়োচিত কথা অন্য প্রকারে বলি। অধ্যয়নাদি

ছাত্রদের প্রধান কর্ত্তব্য। অন্যবিধ কর্ত্তব্যের কথাই বলিতেছি। পূজার ছুটি নিকট হইয়া আসিতেছে। শীঘ্রই নিতান্ত অসমর্থ লোক ব্যতীত হিন্দু বাঙালী মাত্রেই কিছু নূতন কাপড় কিনিবেন। এই সময় সকলেই যাহাতে দেশী কাপড় ক্রয় করেন, এই অনুরোধ ছাত্রেরা ছুটির আগে ও ছুটি আরম্ভ হইলে বাড়ী বাড়ী গিয়া সকলকে নম্রতাসহকারে জানাইতে পারেন। দেশী কাপড় কোথায় কি প্রকারে কি দরে পাওয়া যায়, তাহাও আবশ্যক মত জানাইতে পারিলে ভাল হয়। দেশীবস্ত্র উৎপাদনে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষ ভাবে ছাত্রেরা যদি সাহায্য করিতে পারেন, তাহা হইলে ত আরও ভাল।

—

"মিথ্যা বানাইবার কারখানা" ?

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার কোন কোন গ্রামে সরকারী দমননীতি কি ভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবার জন্য কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের একটি বেসরকারী কমিটি আলবার্ট হলের এক সভায় নিযুক্ত হয়। তাঁহারা কেহই কংগ্রেসদলের লোক নহেন। তদন্তের পর তাঁহারা যে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, তাহার অনেক অংশ যখন শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক-সভায় পাঠ করিতেছিলেন, তখন অস্থায়ী হোম মেম্বার হেগ সাহেব রিপোর্টের অংশ-বিশেষ সম্বন্ধে বলেন, বাংলা গবর্মেণ্টের কম্যুনিকে (বিজ্ঞাপনী) অনুসারে উহা অমূলক। তখন ক্ষিতীশবাবু বলেন, সরকারী কম্যুনিকের ঐ কথা একটি "লাই" অর্থাৎ মিথ্যা কথা। যে সরকারী আফিস হইতে ঐরূপ কম্যুনিকে বাহির হয়, তাহাকে তিনি "ফ্যাক্টরী অব্ লাইজ" অর্থাৎ মিথ্যা কথা বানাইবার কারখানা বলেন। বাংলা গবর্মেণ্ট তাঁহার এই গুরুতর উক্তির একটি প্রমাণপূর্ণ উত্তর দিলে ভাল হয়।

—

সরকারী প্রপ্যাগ্যাণ্ডা

সরকারী সার্কেল অফিসাররা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টদের মারফৎ কতকগুলা ছোট ছোট হ্যাণ্ডবিলের মত কাগজ বিলি করাইতেছেন। তাহার কয়েকটা আমাদের হাতে আসিয়াছে। তাহাতে মিথ্যা ও অর্দ্ধ-সত্যের সাহায্যে দেশের লোকদিগকে ভুল বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। এই কাগজগুলার বিস্তারিত জবাব দিবার প্রয়োজন নাই, তাহা করিবার স্থান এবং সময়ও আমাদের নাই। আর একটা বাধার কথাও বলা দরকার। সরকার এমন আইন ও অর্ডিন্যান্স সকল করিয়াছেন, যে, সরকারপক্ষের সব কথার জবাব থাকিলেও তাহা প্রমাণসহ ভাল করিয়া দিতে গেলে জবাবদাতাকে বিপন্ন হইতে হইবে। সুতরাং এখন গবর্মেণ্টের ধামাধরা লোকদের অবাধে যা তা বলিবার খুব সুবিধা হইয়াছে।

আমাদের হাতে যে কাগজগুলা আসিয়াছে তাহার এক একটাতে নীচের তালিকার এক একটা বিষয়ে তথাকথিত যুক্তিতর্ক আছে :—

আমাদের আসন্ন বিপদ, স্বরাজ, পরিধেয় বস্ত্র, পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা, আবগারী, স্বাধীনতার ভিত্তি শিক্ষায়। প্রথমটাতে বুঝান হইতেছে, পুলিস থাকার কি রকম দরকার। সে প্রয়োজন ত কেহ অস্বীকার করে না, কংগ্রেসওয়ালারাও করে না। পুলিসের কাজ লোকের ধন প্রাণ মান রক্ষা করা। তাহারা যদি তাহা করে, এবং অন্যায় কাজ না করে, তাহা হইলে কেহ তাহাদের বিরুদ্ধে কোন ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ করিতে পারে না। কাগজটাতে লেখা হইয়াছে, যে, পুলিস না থাকিলে "দেশ এমন বিশৃঙ্খল ও অরাজক হবে যে, আমাদের গৃহসম্পত্তি গুণ্ডা ও দস্যুদের হস্তগত হবে। আমাদের সমস্ত সম্পত্তি নির্ব্বিরোধে লুঠ্ করবার এমন সুযোগ আর তারা পাবে না। আমাদের জীবন এবং নারীর সতীত্ব রক্ষা করা অসম্ভব হবে।" পুলিস না থাকিলে এই সব বিপদ ঘটিবে বলা হইয়াছে। কিন্তু পুলিস থাকাতেও ত ঢাকা শহরে ও জেলায়, কিশোরগঞ্জ মহকুমার বহু সংখ্যক গ্রামে, ও অন্যত্র এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনা দিনের পর দিন ঘটিয়াছে। এই কাগজটাতে স্বীকার করা হইয়াছে, যে, "পুলিস দু'-একটা অন্যায় কাজ করে বটে!"

আর একটাতে বিদেশী কাঁপড় কেনার ও পরার কত সুবিধা এবং দেশী কাপড় ক্রয়ে দেশের কিরূপ ভীষণ ক্ষতি, তাহাই বুঝান হইয়াছে। বড়লাট ও অন্য লাটেরা—অর্থাৎ সাধারণতঃ গবর্ন্মেণ্ট—বলিয়া থাকেন, তাঁহারা স্বদেশীর খুব পক্ষপাতী। তাহা হইলে এই রকম ইস্তাহার কেন ছড়ান হইতেছে যাহাতে দেশী কাপড়ের অনুকূলে একটা কথাও লেখা হয় নাই ?

অন্য একটা কাগজে বলা হইতেছে, ইউনিয়ন বোর্ড দ্বারা স্বরাজের ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে। সরকারী লোকদের তাঁবেদারী করিয়া স্বরাজ লাভ হয়, ইহা নূতন কথা বটে। আলোচ্য কাগজগুলা একটা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সার্কেল অফিসারের হুকুমে বিলি করিতেছেন। ইহাই কি স্বরাজের নমুনা ?

"পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা" শীর্ষক চমৎকার পত্রীটিতে বলা হইতেছে, "একা মেদিনীপুর জেলার কাঁথি অঞ্চলে গত তিন মাসে দশটি ডাকাতি হয়েছে। এই হুজুগের পূর্ব্বে সারা বৎসরে একটি জেলাতে এত-গুলি ডাকাতি হ'ত কিনা সন্দেহ।" অর্থাৎ কিনা, সত্যাগ্রহীরা ডাকাত, কিংবা তাহারা পরোক্ষভাবে ডাকাতির প্রশ্রয় দেয়, কিংবা সত্যাগ্রহের জন্য অন্য কোন ভাবে ডাকাতি বাড়িতেছে। চমৎকার সিদ্ধান্ত !

আমরা অনেক বৎসর ধরিয়া খবরের কাগজ পড়িয়া আসিতেছি। সত্যাগ্রহের বহু পূর্ব্বে অনেক সময়ে এক এক মাসে, কখন কখন এক এক সপ্তাহে, এক একটা জেলায় পাঁচ সাত দশটা ডাকাতির খবর পড়িয়াছি। সেগুলা কেন হইত ? এখন যদি কোথাও সত্যসত্যই ডাকাতি বাড়িয়া থাকে, তাহার একটা কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, পুলিস অন্য কাজে ব্যস্ত থাকায় ডাকাতরা, সুযোগ বুঝিয়াছে। অন্নাভাব এবং অর্থাভাবও আর একটা কারণ হইতে পারে।

"আবগারী"তে লেখা হইয়াছে, যে, আবগারী "ট্যাক্স ধার্য্য এবং তাহার ক্রমবৃদ্ধির প্রধান উদ্দেশ্য আবগারী জিনিষের ব্যবহার ক্রমশঃ কমাইয়া দেওয়া।" ভাল কথা। তাহা হইলে, মদ গাঁজা প্রভৃতির ক্রেতা যত কমিবে, যত লোকে নেশা ছাড়িবে গবর্ন্মেণ্টের উদ্দেশ্য তত বেশী পরিমাণে সিদ্ধ হইবে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে পিকেটিঙের প্রভাবে অনেক গাঁজাখোর গাঁজা ছাড়িয়াছে, কিন্তু পিকেটিং বে-আইনী কাজ। অতএব "আবগারী" শীর্ষক লেখাটার সব কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে বর্ণিত সরকারী আবগারী নীতির সহিত পিকেটিং অর্ডিন্যান্সের সামঞ্জস্য দেখা যাইতেছে না।

শেষ যে কাগজটার কথা বলিব, তাহার মাথায় বড় অক্ষরে লেখা আছে, "স্বাধীনতার ভিত্তি শিক্ষায়"। সত্য কথা। কিন্তু সব রকম শিক্ষা স্বাধীনতার ভিত্তি নহে। "সা বিদ্যা যা বিমুক্তয়ে"। এরূপ বিদ্যাই, এরূপ শিক্ষাই, স্বাধীনতার ভিত্তি হইতে পারে যাহা বাহ্য এবং আন্তরিক মুক্তির জন্য দেওয়া হয়। ভারতবর্ষে সেই রকম শিক্ষা কোন্ কোন্ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া হয় ? আমরা কিছু দোষ ত্রুটি বিশিষ্ট সব স্কুল কলেজাদি বন্ধ করিয়া দিবার পক্ষপাতী নহি; তাহা-দিগকে রক্ষা করিয়া তাহাদের সংস্কারের, শিক্ষা-প্রণালী সংস্কারের, ইতিহাসাদি পাঠ্যপুস্তকের সংস্কারের পক্ষ-পাতী। কিন্তু আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষা স্বাধীনতার ভিত্তি, ইহা স্বীকার করি না।

এই কাগজটাতে লেখা হইয়াছে, "স্বয়ং গান্ধী বলেছেন যে, এই স্বাধীনতালিপ্সা ভারতবাসীদের চিত্তে এনেছে একমাত্র ইংরাজী শিক্ষা।" গান্ধী কোথায় কখন কোন্ বক্তৃতায় একথা বলিয়াছেন, কোন্ কাগজে বা বহিতে লিখিয়াছেন ? একমাত্র ইংরেজী শিক্ষা আমাদের স্বাধীনতালিপ্সা জন্মাইয়াছে, মহাত্মা গান্ধী এমন কথা বলিতেই পারেন না।

তারপর গুপ্তনামা লেখক বলিতেছেন :—"বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই সেদিনও বলেছেন, যে, ভারতের এই স্বাধীনতালাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা শুধু ইংরাজ কবিদিগকেই গৌরবময় করে তুলছে। এ সংগ্রাম শুধু তাঁদেরই পদে পুষ্পাঞ্জলি।" রবীন্দ্রনাথের কোন উক্তিকে বিকৃত না করিলে তাহার চেহারা এরূপ দাঁড়ায় না। তিনি এরূপ কথা বলেন নাই। যদি রবীন্দ্রনাথ এইরূপ কথা বলিয়াছেন ধরিয়া লওয়া যায়,

তাহা হইলে ইংরেজ জাতির গৌরববর্দ্ধক এই সত্যাগ্রহ-সংগ্রামকে পিষিয়া ফেলিবার জন্ম প্রায় সব ইংরেজ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কেন হইয়াছে ?

গুপ্তনামা লেখকের মুখে গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের দোহাই ভূতের মুখে রাম নামের মত।

—

রায় বাহাদুর চুণীলাল বসু

গত ১৭ই শ্রাবণ, শনিবার, রায় বাহাদুর চূণীলাল বসুর মৃত্যুতে বাংলা দেশ একজন কৃতী সন্তান হারাইল। জীবদ্দশায় বসু মহাশয় এদেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধীয় প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এতদ্ব্যতীত বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধে গবেষণা তাঁহার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্ত্তি।

ইংরেজী ১৮৬১ সনে বসু মহাশয়ের জন্ম হয়, এবং ১৮৮৬ সনে মেডিক্যাল কলেজ হইতে পাঠ সমাপন করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্টের চাকুরী গ্রহণ করেন। কিছুদিন অ্যাসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জনরূপে কাজ করিবার পর তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের রাসায়নিক পরীক্ষক পদে নিযুক্ত হন এবং কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করা পর্য্যন্ত এই কার্য্যেই নিযুক্ত থাকেন। ১৮৯৪ সনে বসু মহাশয় প্রথম ভারতীয় চিকিৎসা কংগ্রেসের চিকিৎসা ও আইন বিভাগের সহকারী সভাপতি হন ও বিষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার ফলে "বিষ আইন" (Poison Act) পাশ হয়। ১৯২১ সনে তিনি কলিকাতার শেরিফ নিযুক্ত হন।

বসু মহাশয় তিন বৎসর ধরিয়া "ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নেল" সম্পাদন করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদেরও অন্যতম সহকারী সভাপতি ছিলেন। রাসায়নিক ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতিষ্ঠানের সহিতও তাঁহার যোগ ছিল। তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল ও ফার্ম্মাসিউটিকেল ওয়ার্কস্ এর বোর্ড অফ ডিরেক্টরের সভাপতি ছিলেন এবং কলিকাতা কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ ও কলিকাতা সোপ ওয়ার্কসের ডিরেক্টর ছিলেন।

চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণায় বসু মহাশয় কুষ্ঠরোগের কারণ নির্ণয়ে স্যর লিওনার্ড রোজার্সকে অনেক সাহায্য করেন। তাঁহার সমস্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণাই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা রায়
সত্যাগ্রহের জন্ম কারাদণ্ডে দণ্ডিত

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের প্রবাসী

আশ্বিন ও কার্ত্তিকের প্রবাসী পূজার পূর্ব্বেই বাহির করিতে হইবে বলিয়া ভাদ্রের প্রবাসীর বিবিধ প্রসঙ্গ অদ্য ২৫শে শ্রাবণ শেষ করিলাম।

ভ্রম-সংশোধন

গত শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীর ৬১৭ পৃষ্ঠার ২ পাটির—১৯ পংক্তিতে "স্কুলের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত" স্থলে "স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে কলেজের ছাত্রদের বেশী স্বাধীনতা থাকা উচিত" হইবে।
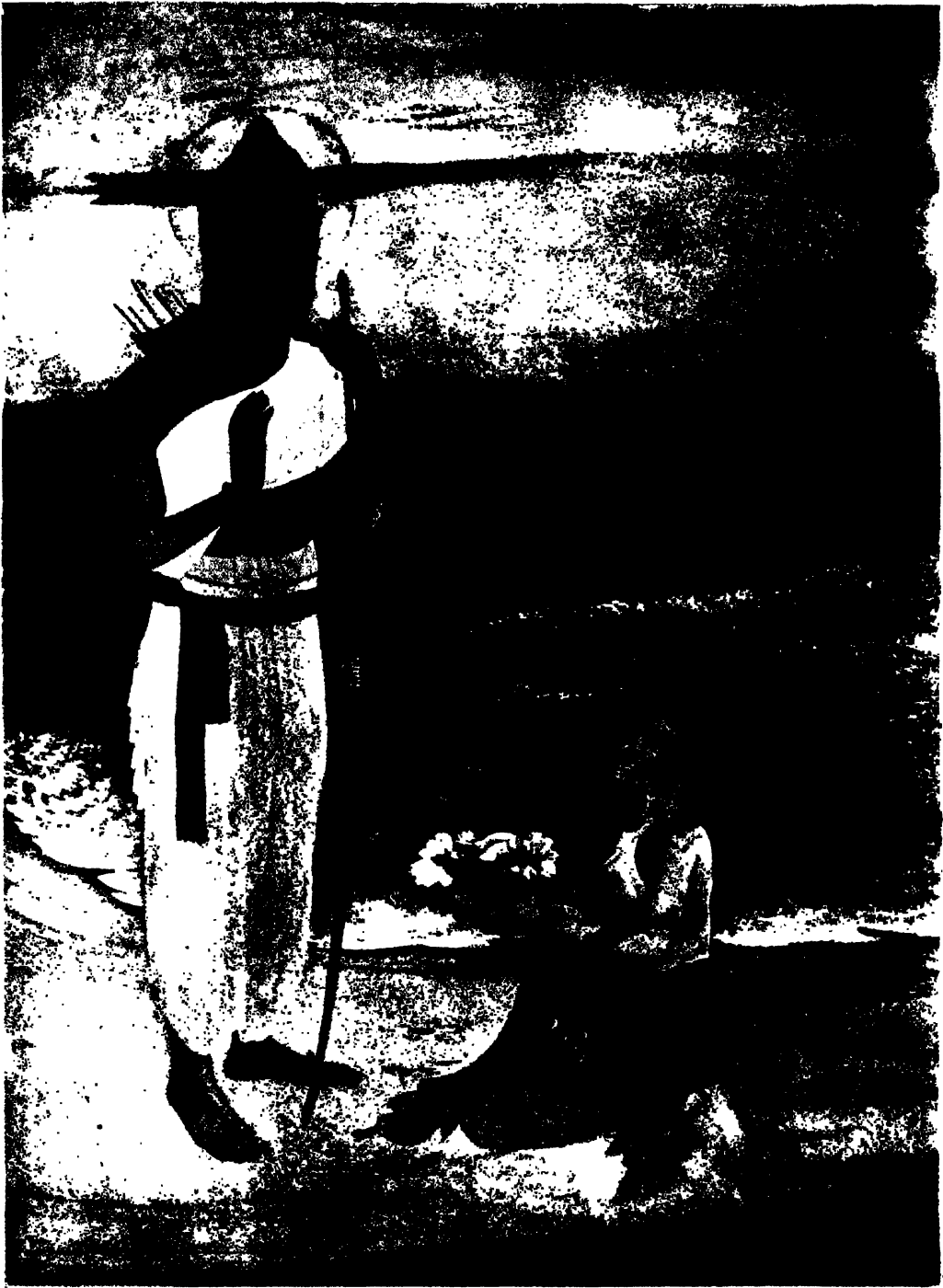
১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

যবদ্বীপের আমন্ত্রণ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

প্রবাসী প্রেস কলিকাতা

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩০শ ভাগ } আশ্বিন, ১৩৩৭ { ৬ষ্ঠ সংখ্যা
১ম খণ্ড

ভারতে মুসলমান

স্যর যদুনাথ সরকার, সি. আই. ই

বর্ত্তমানের মধ্যে অতীতের প্রভাব

আমরা সচরাচর ভারতবর্ষের যে-সব ইতিহাস পড়ি, তাহার ভিতর এই জাতির প্রাণের সাড়া পাই না। এই-সব স্কুলপাঠ্য পুস্তকে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান ও ইংরাজ অধিকার, এই চারিটি যুগ একেবারে ভিন্ন ভিন্ন কোঠায় আবদ্ধ করিয়া দেখান হয়,—যেন একটিকে সংহার করিয়া, তাহার সমস্ত চিহ্ন লোপ করিয়া তবে তৎপরবর্ত্তী যুগ বা জাতি ভারতবর্ষ দখল করিয়াছে, পূর্ব্ব ও পরের মধ্যে কোনই সম্বন্ধ নাই; আগেকার যুগের প্রভাব, আগেকার যুগের দান, যেন পরের যুগে চলিয়া আসে নাই, যেন এই ভারতীয় জাতি প্রত্যেক যুগের শেষে মরিয়া গিয়া আবার নূতন শিশু হইয়া জন্মিয়াছে।

কিন্তু এইরূপ মনে করা ভুল। ইতিহাসের প্রকৃত শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। যুগে যুগে ভারতের সেই একই প্রাণ, সেই একই জাতীয় বিশেষত্ব রাজা-রাজড়ার, ধর্ম্ম ও ভাষার অসীম পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সজীব থাকিয়া অগ্রসর হইয়াছে; বাহ্যবেশ বদলাইয়াছে বটে, কিন্তু মরে নাই, নিজ আত্মাকে হারায় নাই। সহস্র সহস্র বৎসরের শত শত রাজনৈতিক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভারতীয় জনসঙ্ঘের (nationalityর) প্রাণ ও ব্যক্তিত্ব কিরূপে জীবন্ত থাকিয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, প্রত্যেক যুগ হইতে, প্রত্যেক রাজার জাতি হইতে ভারতীয় জাতি কিরূপে দেহ ও চিত্তের পুষ্টিলাভ করিয়াছে, ভারতবর্ষ কিরূপে সেই যুগের দানগুলি নিজস্ব করিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের দানগুলির সহিত তাহার সামঞ্জস্য করিয়া লইয়াছে, এবং ইহার ফলে যে ভারতীয় জাতি আমরা আজ চোখের সম্মুখে দেখিতেছি, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় কেমনে উপনীত হইয়াছে, এই জনসঙ্ঘের চরিত্রের বিশেষত্ব ও গুণ, সভ্যতা ও চিন্তার সেই ক্রমবিকাশ পদে পদে দেখানই ইতিহাসের প্রকৃত কাজ।

প্রত্যেক মানুষের যেমন বাল্যকাল, যৌবন ও বার্দ্ধক্য ব্যাপিয়া একই দেহ, একই মন, একই আত্মা চলিয়া আসিয়াছে, সে যে যে বয়সে যাহা খাইয়াছে, করিয়াছে, ভাবিয়াছে তাহার সমষ্টি, যে যে দেশে বাস করিয়াছে তাহার জলবায়ুর ফলাফল তাহার দেহে এখন প্রকাশ পাইতেছে,—তেমনি হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ও ব্রিটিশ যুগে ভারতে যাহা ঘটিয়াছিল, যে চিন্তা, যে সভ্যতা

প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা একেবারে লোপ পায় নাই, তাহার শ্রেষ্ঠ অংশগুলির সমবেত ফল বর্ত্তমান ভারতের জাতীয় চরিত্রে ও চিন্তায় রহিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কোন একজন মানুষ যেমন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সেই একই ব্যক্তিবিশেষ থাকে, সেইরূপ ভারতবাসী লোক-সমষ্টিরও একটি বিশেষ ব্যক্তিত্ব আছে; প্রাচীনতম জ্ঞাত আর্য্যযুগ হইতে তাহা ধারাবাহিকরূপে নানা পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিয়াছে; এবং তাহার শেষ ফল এখনকার আমরা।

স্মরণাতীত যুগ হইতে সময়ের স্রোতে ভাসিয়া কত ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে আসিয়া বসতি করিয়াছে। তাহাদের আদিম যে-সব পার্থক্য ও বিশেষত্ব ছিল, ক্রমে ক্রমে ভারতের জলবায়ু রোদ বৃষ্টি ভাত রুটির প্রভাবে তাহা লোপ পাইয়া তাহারা সকলেই এক ভারতীয় ছাপ লইয়াছে। আর্য্য হিন্দুই বলুন, আরব সৈয়দই বলুন, আর খৃষ্টান পর্তুগীজই বলুন, যে-সব লোক ভারতে স্থায়ী বসতি করিয়াছে, মুষ্টিমেয় পারসী জাতি বাদে তাহারা সকলেই নিজ নিজ আদি দেশের রক্তের বিশুদ্ধতা হারাইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে মিশ্র ভারতীয় জাতি হইয়াছে। নানা দেশ, নানা জাতি হইতে ভারতে আগত এই জনসঙ্ঘের উপর এই দেশের প্রভাবে যে এক ভারতীয় ছাপ পড়িয়াছে, তাহারা যে কার্য্যতঃ এখানে থাকিয়া এক বিশেষ জাতি, এক বিশেষ সভ্যতার স্রষ্টা ও অংশীদার হইয়াছে—নিজ নিজ পূর্ব্বতন বিদেশীত্ব হারাইয়াছে—তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে রীজ্‌লী সাহেব ভারতের রাষ্ট্রীয় একতা অসম্ভব মনে করিতেন, তিনিও বলিয়াছেন—"বিদেশী ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে আসিয়া নানা প্রদেশে নানা জাতির মধ্যে আকৃতিতে, সমাজনীতিতে, ভাষায়, ধর্ম্মে, আচার-ব্যবহারে বিবিধ পার্থক্য দেখেন বটে, কিন্তু তিনি লক্ষ্য না করিয়া থাকিতে পারেন না যে, 'হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ ব্যাপিয়া তলে তলে একটা অনির্ব্বচনীয় জীবনের একতা' (uniformity of life) আছে। প্রকৃতই একটা সর্ব্ব-ভারতীয় চরিত্র, একটা সর্ব্ব-ভারতীয় ব্যক্তিত্ব আছে, তাহার অংশগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান সম্ভব নহে।" এই "সাধারণ সর্ব্ব-ভারতীয় বিশেষত্ব" আবহমানকাল হইতে গঠিত হইয়া আসিয়াছে, যুগে যুগে অল্পবিস্তর বাহ্যবেশ বদলাইয়াছে, আজও বদলাইতেছে, কিন্তু কখনও একেবারে নষ্ট হয় নাই।

চারি যুগে চারি জাতির দান

আজিকার ভারতবাসীদের এই সম্মিলিত ব্যক্তিত্ব প্রধানতঃ চারিটি জাতির দান লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে, তাঁহারাই প্রকৃত যুগ-কর্ত্তা, ভারত-ভাগ্যবিধাতা; তাঁহাদেরই প্রভাব ঔষধের মধ্যেকার ধাতুপদার্থের মত আজ পর্য্যন্ত আমাদের রক্তে প্রবাহিত হইতেছে। তাঁহারা (১) বৈদিক আর্য্যগণ, (২) বৌদ্ধগণ, (৩) মুসলমান ও (৪) ইংরাজ। ইঁহাদের প্রত্যেকেই এই দেশে একটি নূতন জিনিষ একটি নূতন ধরণের শক্তি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, তাহা পুরাতনের সহিত মিশ্রিত হইয়া পুরাতন ভারতকে পরিবর্ত্তিত করিয়াছে এবং নিজেও পরবর্ত্তী যুগে পরিবর্ত্তিত আকারে রহিয়া গিয়াছে। কোন যুগের কোন জাতির কোন ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ দানই ভারত হারায় নাই,—এগুলি আজিকার ভারতের সার্ব্বজনীন সম্পত্তি।

আর্য্য ও বৌদ্ধযুগের ভারত সম্বন্ধে সুধীগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন; সে সম্বন্ধে আমি কিছু না বলিয়া, মুসলমান যুগে ভারত নূতন কি পাইয়াছিল, এবং তাহার কতটা এপর্য্যন্ত রাখিতে পারিয়াছে, তাহাই এখানে বিচার করিব। মুসলমান অধিকার আজ দেড় শত বৎসর হইল ভারতবর্ষ হইতে লোপ পাইয়াছে, কিন্তু ব্রিটিশ যুগের এই সব সহস্র সহস্র প্রবল পরিবর্ত্তনের মধ্যেও মুসলমান যুগের দান কত বেশী রহিয়া গিয়াছে, ব্রিটিশ-শাসকেরা তাহার কত বেশী অংশ নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ভারতে মুসলমান বসতির বিশেষত্ব ও প্রকৃত স্বরূপ

মুসলমানদের পূর্ব্বে অনেক বিদেশী ও বিধর্ম্মী জাতি আসিয়া ভারতে বসতি করে,—যেমন গ্রীক, সিথীয়

(শক), পার্থীয়, মোঙ্গোলীয়। কিন্তু তাহাদের বংশ দুই তিন পুরুষ পরেই হিন্দুসমাজে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়, হিন্দু নাম, হিন্দু ভাষা, বেশভূষা, ধর্ম্ম ও চিন্তা অবলম্বন করে ; আর এদিকে হিন্দু ধর্ম্ম এবং সমাজও এই সব জাতির বিদেশ হইতে আনীত প্রাচীন প্রথা ও পূজার সহিত একটা বোঝাপড়া করিয়া, তাহার কিছু কিছু নিজস্ব করিয়া লইয়া, সবটার উপর ভারতীয় ছাপ লাগাইয়া দেয়। অর্থাৎ হিন্দুসমাজ একটা সার্ব্বজনীন মিলনের ও একত্রীকরণের প্রকাণ্ড যন্ত্র। এই যেমন,—খৃষ্টের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে, গ্রীক দিয়নের পুত্র হেলিওডোরস্, যবন-রাজ আণ্টালকিদসের দূত হইয়া ভারতীয় রাজা ভাগভদ্রের সভায় আসেন; তিনি পথে মালব প্রদেশে বেসনগর নামক শহরে বিষ্ণুর পূজা করিয়া একটি গরুড়স্তম্ভ স্থাপিত করেন, এবং তাহার ফলকে নিজকে "ভাগবত" অর্থাৎ বৈষ্ণব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গ্রীক যবন (যবন = Ionian) অনায়াসে হিন্দু হইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমান বিজয়ের পর এইরূপ মিলন ও একত্রীকরণ বন্ধ হইল। হিন্দুধর্ম্ম ইসলামকে নিজস্ব করিয়া, মুসলমান জাতিগুলিকে হজম করিয়া ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত করিতে পারিল না। কারণ, ইস্লামের মূলমন্ত্র একেশ্বরবাদ। ইহুদীধর্ম্ম হইতে ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্ম্মের জন্ম; এই তিন ধর্ম্মেই ঈশ্বর একমেবাদ্বিতীয়ম্, তিনি "জাগ্রত এবং প্রতিদ্বন্দ্বিহীন",—অর্থাৎ আল্লার (বা জিহোবার) সঙ্গে সঙ্গে আর কোন দেবদেবীকে উপাসনা করিলে তিনি ভীষণ রাগ করিবেন। হিন্দুদের কথাই আলাদা, তাহারা তেত্রিশ কোটী দেবদেবীকে পূজা করে, উহার সঙ্গে আল্লা, মহম্মদ বা যিশু নামে আর দু-তিনটা দেবতা যোগ করিয়া দিলে এই যৎসামান্য "বোঝার উপর শাকের আটি" হিন্দু উপাসক সমাজ অতি সহজে সহ্য করিতে পারিত ;— এই যেমন অনার্য্যদের ও বৌদ্ধদের কত দেবতা অপদেবতা আমরা পূর্ব্বে লইয়াছি। কিন্তু ইসলামী (এবং ব্রিটিশ যুগে খৃষ্টান) সম্প্রদায় কিছুতেই বহু-ঈশ্বর মানিতে সম্মত হইল না। হিন্দুরা অনেক চেষ্টা করিল, তাহারা "আল্লোপনিষৎ" লিখিল, বাদশাহ আকবরকে যুগ-ত্রাতা অবতার বলিয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিল, এবং দরকার হইলে আরবীয় দেবদূতকে রামানুজ শঙ্কর প্রভৃতির ভাই বলিয়া মানিয়া লইত। কিন্তু মুসলমানেরা কোনমতে ইস্লামের মূলমন্ত্র ছাড়িয়া হিন্দুধর্ম্মের সহিত আপোষ করিলেন না। কোরাণে আছে—"অপবিত্র কেহই কাবাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। বহু-দেব-উপাসকগণ অপবিত্র।" এইজন্য হিন্দুসমাজ ইস্লামকে গ্রাস করিতে পারিল না।

অতএব হিন্দু ও মুসলমান (পরে হিন্দু ও খৃষ্টান) একই দেশে শত শত বর্ষ বাস করিয়াও সমাজে জীবনে এক হইতে পারে নাই। ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয়ের দ্বার ভারতের দিকে বন্ধ,ভারতের বাহিরের দিকে খোলা। এখনও তাঁহারা প্রার্থনার সময় মক্কার একটি গৃহের দিকে মুখ ফিরান ; তাঁহাদের চিন্তার, আইন-কানুনের, শাসন-পদ্ধতির, প্রিয় সাহিত্যের আদর্শ ভারতের বাহির হইতে আসে, তাঁহাদের নিজস্ব সভ্যতার উৎস আরবে, সিরিয়ায়, পারস্যে ও মিশর দেশে,—ভারতে ছিল না। হিন্দুদের সব দৃষ্টি, সব আদর্শ, সব কেন্দ্রই ভারতবর্ষের মধ্যে আবদ্ধ; ইসলামীয়দের ধর্ম্মের ভাষা, শকাব্দ, সাহিত্য, শিক্ষক, সাধুপুরুষ এবং তীর্থ সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া এক, এসব ভারতের বাহিরের বস্তু।

মুসলমান যুগের দান

মুসলমান যুগে ভারতবর্ষের দশটি লাভ হয়, যথা—

(১) বাহিরের জগতের সঙ্গে আবার সংস্রব স্থাপন, আবার ভারতীয় নৌবল গঠন ও সমুদ্র পার হইয়া বাণিজ্য।

(২) একচ্ছত্র রাজত্বের ফলে ভারতের বহু প্রদেশ ব্যাপিয়া শান্তি, বিশেষরূপে আর্য্যাবর্ত্ত বা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরের দেশগুলিতে।

(৩) সমস্ত দেশময় একই শাসন-প্রণালী এবং একই প্রভুর অধিকারের ফলে, লোকের মধ্যে কাজকর্ম্মে ব্যবসা-বাণিজ্যে, বাহ্যজীবনে এবং কিছু পরিমাণে চিন্তায়ও একতা স্থাপন।

(৪) হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে উচ্চ এবং চাকরে

সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক আচার ব্যবহারে, পরিচ্ছদে ও ভব্যতায় এক প্রণালী অনুসরণ।

(৫) মুঘল চিত্রকলার উদ্ভব। ইহাতে প্রাচীন হিন্দু (অর্থাৎ অজন্তার) চিত্রপ্রণালী এবং নব আনীত চীনা প্রণালী একত্র মিলিত হইয়া তাহাদের সমাবেশ ও পরস্পর পরিবর্ত্তনের ফলে এক নবীন রমণীয় প্রণালীর উদ্ভব হয়। হিন্দু বিষয় লইয়া মুঘল চিত্রপ্রণালীতে যে-সব দৃষ্টান্ত অঙ্কিত হইয়াছে তাহাদের "রাজপুত-প্রণালী"র চিত্র বলা হয়।

গৃহনির্ম্মাণে মুসলমান যুগের কীর্ত্তি অমর হইয়া রহিয়াছে। হিন্দু রাজারাও ইহার অনুকরণ করিতেন।

কতকগুলি নবীন শিল্প,—যথা শাল, কিংখাব, মস্‌লীন্, গালিচা বুনান, পাথর বসান, বা অন্যধাতুর ফলকে সোনা রূপার কাজকরা (কোফ্‌ৎগরী) প্রভৃতি।

(৬) সাধারণের জন্য একটা বিষয়কর্ম্মের উপযোগী চলিত ভাষা, উর্দ্দু—অর্থাৎ সেনানিবাসের ভাষা, যে ভাষায়, তুর্কী ও পাঠান সৈন্যগণ ভারতীয় দোকানদার চাকর বা দূতদিগের সহিত কথাবার্ত্তা বলিত। ফারসীতে ইহার নাম "হিন্দবী" অর্থাৎ "ভারতীয়" ভাষা, বর্ত্তমান নাম হিন্দুস্থানী, দাক্ষিণাত্যে নাম "রেখ্‌তা" (অর্থাৎ পতিত, অপভ্রংশ)। কিন্তু এই কথিত ভাষায় উত্তর-ভারতে অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত সাহিত্য রচিত হয় নাই, সরকারী চিঠি, হিসাব এবং আদালতের রায় লিখিত হয় নাই। এই দুইটি কাজের জন্য ফারসী ভাষা ব্যবহৃত হইত। হিন্দু মুসলমান সব কর্ম্মচারী, এমন কি অনেক করদ হিন্দুরাজার দরবারও এই ফারসী ভাষা ব্যবহার করিতেন; ইহাই সেযুগে ভারতে একমাত্র রাজকার্য্যের ভাষা (official language) ছিল। ইহাও জাতীয় একতাবন্ধনের একটি কারণ হয়।

(৭) অপর দিকে, সংস্কৃতের ব্যবহার প্রায় লোপ পাওয়ায় মুসলমান যুগের দেওয়া শান্তি ও ঐশ্বর্য্যের ফলে হিন্দী বাংলা মারাঠী প্রভৃতি নব্য ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি আরম্ভ হইল।

(৮) হিন্দুসমাজের ভিতর একেশ্বরবাদী ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব। বৈদান্তিক সুফী ধর্ম্মের প্রসার।

(৯) ইতিহাস-রচনা।

(১০) যুদ্ধবিদ্যায় এবং সভ্যতার সর্ব্বপ্রকার বিভাগে উন্নতি।

আমরা এখন কিছু বিস্তৃতভাবে এগুলি বুঝিবার চেষ্টা করিব।

ভারত বাহিরের জগতকে আবার চিনিল

বৌদ্ধযুগের শেষ পর্য্যন্ত ভারতের সহিত দক্ষিণ ও পূর্ব্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, লোকের যাতায়াত, বাণিজ্যদ্রব্য ও গ্রন্থ বিনিময়, এমন কি বিদেশে উপনিবেশ-স্থাপন পর্য্যন্ত অবাধে চলিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু হূণদের শেষ পরাভবের পর অষ্টম শতাব্দীতে নবজাগরিত হিন্দু ধর্ম্ম নিজের ঘর গুছাইয়া তুলিল, হিন্দুসমাজকে নূতন করিয়া সাজাইয়া অতি কঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া রাখা হইল, বিদেশীবর্জ্জন সম্পূর্ণ হইল, সমাজের অঙ্গে নূতনের যোগ বা পরিবর্ত্তন মাত্রই পাপ ও আচারভ্রষ্টতা বলিয়া গণ্য হইল। তখন হিন্দুসমাজ প্রকৃতই "অচলায়তন" হইল, দেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে চোখ বুজিয়া নিজকে বন্দী করিয়া রাখিল যেন, এদেশের বাহিরে কোন জনমানব নাই।

কিন্তু মুসলমানদের ভারত জয় করিবার ফলে ভারতবর্ষ আর একধরে কোণঠেশা হইয়া রহিল না, আবার অন্যান্য দেশের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ও আদান-প্রদান আরম্ভ হইল। কিন্তু বৌদ্ধযুগে যেমন অগণিত ভারতীয় লোক—পণ্ডিত শ্রমণ বণিক ও উপনিবেশ-স্থাপনকর্ত্তা—বিদেশে চলিয়া গিয়াছিল, এই মুসলমান যুগে ভারতীয় হিন্দু কেহই বাহিরে গেল না, গেল কতকগুলি ভারতীয় মুসলমান, আর আসিল অসংখ্য বিদেশী মুসলমান খৃষ্টান প্রভৃতি; ভারতের সহিত বাহিরের বাণিজ্য আরব ও বোহোরা, ডচ্‌ ও ইংরাজদের হাতে রহিল। বুখারা ও সমরকন্দ, বল্‌খ ও খুরাসান, খারিজম্ (খিভা) ও পারস্য হইতে জনস্রোত এবং পণ্যদ্রব্য আফঘান গিরিসঙ্কট দিয়া স্থিরভাবে নির্ব্বিবাদে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতে লাগিল, কারণ তখন আফঘানিস্থান দিল্লী-

সাম্রাজ্যের প্রদেশ মাত্র ছিল। (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ইহা ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হয়)। বোলান্ পাস দিয়া প্রতিবৎসর চৌদ্দ হাজার ভারবাহী উট ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য কান্দাহার ও পারস্যে লইয়া যাইত (১৭ শতাব্দীর প্রথমাংশে)। বঙ্গে উপকূলের বন্দরগুলি বাহিরের সমুদ্র-তীরবর্ত্তী দেশগুলির পক্ষে ভারতে ঢুকিবার জন্য অত্যন্ত সুবিধাজনক দ্বার হইল। আর, আমাদের পূর্ব্ব উপকূলে মছলিপটন বন্দর হইতে অসংখ্য জাহাজ যাইত সিংহল, সুমাত্রা, জাভা, শ্যাম, চীনদেশে, এমন কি জান্‌জিবরেও!

এক শাসন-যন্ত্রের ফলে জাতীয় একতা

মুঘল সম্রাটদের দুইশত বৎসর ধরিয়া সতেজ অধিকারের ফলে, সমস্ত উত্তর-ভারত—এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক অংশও—এক সরকারী ভাষা, শাসন-প্রণালী, মুদ্রা, এবং কথ্য সাধারণ ভাষা লাভ করিল। জাতীয় একতা সাধন করিবার পক্ষে এই উপাদানগুলি অমূল্য। মুঘল বাদশাহদের নিজেদের শাসিত প্রদেশের বাহিরেও অনেক হিন্দুরাজা তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতি, কর্ম্মচারী বিভাগ ও উপাধি, সভার আদব-কায়দা, মুদ্রা প্রভৃতি অনুকরণ করিয়া সমস্ত ভারতের বাহ্যএকতা আরও বাড়াইয়া দিলেন।

দিল্লী-সাম্রাজ্যের বিশটি ভারতীয় সুবায়—অর্থাৎ পেশাওয়ার হইতে চাটগাঁ, এবং কাশ্মীর হইতে কৃষ্ণা নদী পর্য্যন্ত—ঠিক এক ছাঁচে ঢালা শাসন-পদ্ধতি, কর্ম্মচারিবৃন্দ, আইন-কানুন এবং দরবার ও আদালতের ভাষা এবং কার্য্য-প্রণালী চলিত। সমস্ত সরকারী চিঠিপত্র ও হিসাবে এক ভাষা (ফারসী) ব্যবহৃত হইত। রাজকর্ম্মচারী ও সৈন্যগণ এক প্রদেশ হইতে অপর প্রদেশে ঘনঘন বদলি হইত। এইরূপে, কোন প্রদেশের অধিবাসী অপর প্রদেশে গিয়া বিদেশে আসিলাম বলিয়া মনে করিবার কারণ পাইত না; বণিক ও পথিকেরা এক সুবা হইতে অন্য সুবায় অতি সহজে যাতায়াত করিত। সকলেই বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের ছায়ার তলে ভারতকে এক দেশ এক জন্মভূমি বলিয়া বুঝিতে লাগিল। জাতীয়তার কল্পনা সম্ভব হইল।

মুঘল চিত্রবিদ্যার ক্রমবিকাশ

শিল্পকলায় মুসলমানদের দান ভারতবর্ষ এখনও হারায় নাই, এগুলি আমাদের অমূল্য সম্পদ হইয়া রহিয়াছে। আগে চিত্রবিদ্যার বিকাশ দেখা যাউক। মুসলমান যুগের প্রথম প্রথম যে-সব চিত্র ভারতে পৌছিয়া-ছিল সেগুলি খুরাসান ও বুখারা (অর্থাৎ মধ্যএশিয়া)তে চিত্রিত হয়, তাহাদের শিল্পীরা চীনা চিত্রকর অথবা চীনাদের ছাত্র; এই সব "বিশুদ্ধ মধ্যএশিয়া বিদ্যালয়ের" ছবিগুলিতে চীনদেশীয় চিত্রপদ্ধতি ছত্রে ছত্রে দেখা যায়,—মুখচোখ,পর্ব্বত, জলাশয়, আগুন, এবং রাক্ষস সব অবিকল চীনা ধরণের, ইহা দেখিবামাত্র বুঝা যায়। আকবরের রাজসভায় এই চীনা চিত্রপদ্ধতি এবং প্রাচীন হিন্দু অর্থাৎ অজন্তার শিল্পরীতি একত্র জুটিল; প্রত্যেকেই নিজের প্রখর বিশেষত্বগুলি অল্পে অল্পে ছাড়িতে লাগিল, অপর পক্ষের রীতিনীতি লইতে লাগিল। চীন হইতে আনীত মধ্য-এশিয়ার চিত্রকলার কঠিনতা, একঘেয়ে ভাবগুলি লোপ পাইল, তাহার বাহ্য আকারে পরিবর্ত্তন হইল। আর, অজন্তা-এলোরার শিল্পীদের বংশধরগণও দেখিলেন যে শত শত বৎসর পূর্ব্বের পৈতৃক অচল প্রণালী ও নিয়ম এই নবীন যুগে চলে না, অন্যত্রও সৌন্দর্য্যবোধ আছে, অন্য দেশেও শিখিবার জিনিষ আছে, তাহার দিকে চোখ বুজিয়া থাকিলে নিজেই ঠকিতে হইবে। তাই চীনা ও হিন্দু চিত্র-কলার মিলনে ভারতে এক নবীন মিশ্র শিল্পরীতির জন্ম হইল, ইহাকে আজকাল "ইণ্ডিয়ান আর্ট," "ইণ্ডো-স্যারাসেন বা মুঘল চিত্র-বিদ্যালয়" বলা হয়। প্রথম প্রথম অর্থাৎ আকবরের উৎসাহে অঙ্কিত চিত্রে, দেখি যে চীনা চিত্রকলা যেন গলিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে, পর্ব্বত জলাশয় আগুন প্রভৃতি এক নূতন ধরণে আঁকা হইতেছে, সে ধরণটা চীনা প্রণালীর আভাস দেয় বটে কিন্তু অনেক পরিবর্ত্তিত আকারে, যেন কঠিন ধারাবাহিক বদ্ধমূল সংস্কার ছাড়িয়া দিয়া ঠিক প্রকৃতিকে অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই সব চিত্রে মানুষ ও জীবজন্তুর মুখ এবং বাহ্য প্রাকৃতিক দৃশ্য সব পরিষ্কার ভারতীয়।

আকবরের পরে পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এইরূপে প্রাচীন

ভারতীয় অর্থাৎ হিন্দু চিত্রকলার প্রভাব মুসলমান চিত্রকলাকে সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া নূতন কলেবর দান করিল। শাহজাহানের সময়ে (১৬৫০ খৃষ্টাব্দ) এই প্রণালীর পূর্ণ বিকাশ হইল, নব-ভারতীয় কলার সম্পূর্ণ জয় হইল, চীনা চিত্রবিদ্যার কোন চিহ্নই রহিল না, ভারতীয় প্রণালী সর্ব্বত্রই সুস্পষ্টভাবে দেখা যাইতে লাগিল; মুখে চোখে এমন একটা কোমলতা,লাবণ্য ও বর্ণের সামঞ্জস্য, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশগুলি এমন যত্নে আঁকা, অলঙ্কার ও সজ্জা এত বিবিধ এবং মহিমাশালী, এবং চিত্রগুলি প্রকৃতির এত অনুরূপ— যে দেখিলেই মনে হয় ইহা ইউরোপীয় প্রভাবের পূর্ব্বকালীন ভারতের হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ নিজস্ব উপহার। ইউরোপীয় চিত্রবিদ্যার দুটি সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ পারস্পেকটিভ (দূরের বস্তুকে ছোট করিয়া দেখান) এবং লাইট এণ্ড শেড (ছায়ার দ্বারা উঁচুনীচু বুঝান) মুঘল চিত্রে কখনও আসে নাই, কিন্তু অপর সকল গুণই ছিল। পণ্ডিতেরা প্রায়ই মুঘল চিত্রকে "রাফেলের পূর্ব্বের" ইটালীয় চিত্রকলার মত বলেন। অসংখ্য অকৃত্রিম আদি মুঘল চিত্র দেখিয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে শ্রেষ্ঠ মুঘলচিত্র (অর্থাৎ শাহজাহানের যুগে অঙ্কিত দৃষ্টান্ত)গুলি বটিচেলীর ছবিগুলির অনেক উপরে; এদুটির মধ্যে ঠিক তুলনা হয় না।

মুঘল চিত্রশিল্পের বিস্তার ও অবনতি

বাদশাহের দরবারে যে-সব বড় বড় চিত্রকরের ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত পরে তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক'জন নিজ গুরুর পদ পাইত, অপর সব ছাত্র ওম্‌রা বা করদ রাজাদের দরবারে গিয়া অন্ন উপার্জ্জন করিত। ইহাদের চিত্রের বিষয় শাহনামা, জামী-নিজামীর কাব্য, তাইমুর-জীবনী, বা বাদশাহদের কীর্ত্তিকলাপ নহে—রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি হিন্দু সাহিত্য হইতে লওয়া। কিন্তু বিষয়গুলি হিন্দু হইলেও প্রণালী সম্পূর্ণ মুঘল রাজদরবারের অর্থাৎ ইণ্ডো-স্যারাসেন স্কুলের। সুতরাং ইহাকে এক স্বতন্ত্র "রাজপুত স্কুল" বলা ভুল। ক্রমে ক্রমে এই সব রাজার পালিত রাজস্থানের চিত্রকরগণ বাদশাহী সভার গুরুদের বিদ্যা অল্পে অল্পে ভুলিতে লাগিল, তাহাদের ছবিগুলিতে কোমলতা ও সূক্ষ্মদৃষ্টি লোপ পাইল, রঙের জাঁকজমক প্রখর হইয়া চোখে রূঢ় ঠেকিতে লাগিল; ছবিগুলি দেখিয়াই বোধ হইল যেন কাঁচা কারিকরদের দ্বারা তাড়াতাড়ি আঁকা কম খরচে প্রস্তুত দ্রব্য। (মোলারাম ও কাংগ্রা-প্রদেশীয় চিত্রকরগণ এই স্কুল হইতে বিভিন্ন)।

আওরংজীবের সময় হইতেই বাদশাহের অনাদরে, রাজকোষ শূন্য হওয়ায়, অবিরাম যুদ্ধে এবং তাঁহার পুত্র-পৌত্রগণের নৈতিক অবনতির ফলে মুঘল চিত্রবিদ্যা ডুবিয়া গেল, কারণ এটির জন্ম ও বৃদ্ধি রাজসভায়, ইহার জীবন রাজা ও ওমরার অর্থব্যয়ের উপর নির্ভর করিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই মুঘল চিত্রবিদ্যার দ্রুত অবনতি; ওস্তাদ চিত্রকরগণ বৃদ্ধ বয়সে না খাইয়া মারা গেল, তাহাদের পুত্রগণ পৈতৃক ব্যবসার বৃথা আশা ছাড়িয়া দিয়া মুটে মজুর হইয়া মোটা ভাতকাপড় উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে লক্ষ্ণৌয়ের নবাবদের অনুগ্রহে যে ভারতীয় চিত্রকলা জাগিয়া উঠে তাহা ইংরাজী ও মুঘল স্কুলের এক হাস্যাস্পদ খিচুড়ী, পিতামাতার কোন গুণই পায় নাই। ("আকবরের খৃষ্টান বেগম" এই মিথ্যা নামে পরিচিত চিত্রখানি এই স্কুলের একটি দৃষ্টান্ত)।

স্থপতি শিল্পে ভারতে মুসলমান কীর্ত্তি

আর, স্থপতিবিদ্যায় মুসলমান রাজা নবাবেরা ভারতকে যাহা দিয়া গিয়াছেন তাহার অনেকগুলিই আমাদের চোখের সম্মুখে বিদ্যমান। ভারতে মুসলমান অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-কলার যুগে যুগে ক্রমবিকাশ এখনও অতি সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতে পারা যায়। আকবরের পূর্ব্বেকার রাজবাড়ীগুলি প্রায় ধ্বংস হইয়াছে বা পরিবর্ত্তিত হওয়ায় চেনা যায় না, কিন্তু অনেক মসজিদ সমাধি এবং দুর্গ এখনও বর্ত্তমান আছে। দিল্লী এবং দিল্লীর বাহিরে দশ বারো মাইল স্থান যত্নের সহিত ঘুরিয়া দেখিলে এই যুগের অসংখ্য দৃষ্টান্ত চোখে পড়িবে। দাস-বংশের, খিলজীদের, তুঘলকদের, লোদীদের এবং শূর-বংশীয়দের সমাধি মসজিদ প্রভৃতি প্রত্যেকটি পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী যুগের দৃষ্টান্ত হইতে বেশ ভিন্ন, অথচ প্রত্যেক দৃষ্টান্তটি যে পূর্ব্ব হইতে

কোন কোন অংশ লইয়াছে এবং পরের যুগের স্থাপত্যকে কতকগুলি অঙ্গ দান করিয়াছে, ইহা পণ্ডিত না হইলেও দেখিবামাত্র বুঝা যায়।

তেমনি মুঘল যুগেও আকবর হইতে শাহজাহান (এবং আওরংজীবের প্রথম দশ বৎসর) পর্য্যন্ত যে-সব রাজকীয় প্রাসাদ ধর্ম্মমন্দির ও সমাধি নির্ম্মিত হয় তাহার মধ্যে একটা ক্রমবিকাশ আছে; এক কথায় বলা যাইতে পারে যে ক্রমে যেন শক্তি সরলতা ও কতকটা কর্কশতা সরিয়া গিয়া অলঙ্কার-বহুল স্নিগ্ধ কোমলতা বা দুর্ব্বলতাকে স্থান দিয়াছে। তাহার পর চিত্রের মত অট্টালিকা-নির্ম্মাণ-শিল্পেরও অবনতি রাজকোষের অর্থাভাবে ঘটিল। অবশেষে মাটীর বাড়ী বা সমাধি গড়িয়া তাহার বাহিরে একসার ইঁটের আবরণ অথবা সুর্কির আস্তর দিয়া ঢাকিয়া তাহার উপর রঙের বাহার ফলান হইলে লাগিল (মধ্য অষ্টাদশ শতাব্দী)।

নব্য প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্য-সৃষ্টি

কালক্রমে ভারতের অজস্র ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্যে প্রাচীন হিন্দু ও বৌদ্ধ সাহিত্যের ভাষা—সংস্কৃত এবং পালি, লোপ পাইল। সংস্কৃতের জ্ঞান ও চর্চ্চা চলিতে থাকিল বটে, কিন্তু তাহাতে আর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি হয় না, শুধু Manual of Hindu Law, Astronomy made Easy, A short cut to Yoga এই ধরণের বহি, অর্থাৎ টীকার টীকা তস্য টীকা, লিখিত হইতে লাগিল। ইহা সাহিত্য নহে, ইহার ভিতর দিয়া জাতীয় প্রাণের সাড়া পাওয়া যায় না, লোকের হৃদয়ে পৌছান যায় না। এইরূপে দুঃখে অন্ধকারে কত শতাব্দী কাটিয়া গেল। তাহার পর মধ্যযুগের শেষাশেষি ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জনসাধারণের ভাষা,—একটি একটি প্রাদেশিক "প্রাকৃত"—মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, নিজ অধিকার স্থাপিত করিল। আকবরের সময় হইতেই ইহার পূর্ণ প্রকাশ বলিতে হয়। সত্য বটে ষোড়শ শতাব্দীর অনেক পূর্ব্বেও এই সব আধুনিক প্রাকৃত ভাষায় কিছু কিছু দোঁহা, ধর্ম্মকথা, গান ও মন্ত্র দেখা দেয়, কিন্তু তাহাকে সাহিত্য বলা যায় না, এবং তাহার অবয়বও অতি ক্ষীণ ছিল। প্রকৃত হিন্দী, বাংলা, মারাঠী, আসামী, ও পাঞ্জাবী সাহিত্যের প্রবহমান জীবনধারা ষোড়শ শতাব্দী হইতেই গণিতে হয়। মুঘল বাদশাহরা দেশকে শান্তি ও সুশাসন দান করিলেন, শান্তির ফলে লোকে নিশ্চিন্তমনে অর্থ উপার্জন করিতে লাগিল, দেশ ধনে ধান্যে পূর্ণ হইল; লোকে অবসর ও মনের শান্তি পাইল, সাহিত্যসৃষ্টির ইচ্ছা, সাহিত্য উপভোগের ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের কিছু পর হইতেই আমরা নানা প্রদেশে নানা নব্য ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি দেখিতে পাই। বঙ্গে বৈষ্ণব লেখকগণ, ধর্ম্ম জীবনী সঙ্গীত তর্ক প্রভৃতি বিভাগে অগণিত বাংলা গ্রন্থ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর মৃত্যু (১৫৩৩) হইতে আওরংজীবের অধিরোহণ (১৬৫৮) পর্য্যন্ত সওয়া শ' দেড় শ' বৎসরকাল উজ্জ্বল করিয়া তুলিলেন। হিন্দীতে অতুলনীয় কাব্য "রামচরিতমানস" (তুলসীকৃত) ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়, কিন্তু এই পূর্ণচন্দ্রের উদয়ের পূর্ব্বে কতকগুলি তারকা হিন্দী-আকাশে দেখা দিয়াছিল,—যেমন মালিক মুহম্মদ জয়সীর "পদুমাবৎ" ১৫৪০ সালে সম্পূর্ণ হয়, এবং তুলসীদাসের সমকালে বা অল্প পরে অখরাবৎ, স্বপনাবৎ, মধুমালতী প্রভৃতি কাব্য লিখিত হয়। মধ্য-ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কবীর দাদূ ও নানক যে-সব ধর্ম্ম সঙ্গীত এবং বাণী রচনা করেন তাহা হিন্দী হইলেও ঠিক সাহিত্য নহে, ওগুলি যেন জীবনযাত্রার পক্ষে মন্ত্র, মুখস্থ করিয়া রাখিবার জন্য রচিত।

ভারতীয় বাদশাহদের দরবারে যে-সব পারসিক কাব্য এবং রামায়ণ মহাভারতেব সংক্ষিপ্ত অনুবাদ রচিত হয় তাহা উল্লেখ করিব না, কারণ পারসিক সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি হেয়,—ঠিক যেমন আমাদের লেখা ইংরাজী কাব্য; অথচ পারস্যে জন্ম এমন পারসিক লেখকও কয়েকজন ভারতে আসিয়া এইরূপ কাব্য লেখেন। ফলতঃ, রাজদরবারের সাহিত্য কখনও উচ্চ শ্রেণীতে উঠিতে পারে না, উহার প্রাণ নাই, বাহিরে বার্ণিশ আছে মাত্র। সে যুগের ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে দশ হাজারে একজনের বেশী আরবী ভাষা ব্যবহার করিতে পারিতেন না, (চোখ বুজিয়া কোরাণ মুখস্থ করা অন্য কথা), আর হয়ত পাঁচজন ফারসী ভাষায় লিখিতে বলিতে পারিতেন।

অবশিষ্ট সহস্র সহস্র মুসলমানের পক্ষে উর্দ্দুই কথ্যভাষা ছিল। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় মুসলমানেরা উর্দ্দুতে সাহিত্য সৃষ্টি করিতে, ইতিহাস রচনা করিতে, চিঠিপত্র ও আদালতের কার্য্যাবলী লিখিতে ঘৃণা করিতেন; বেতনভোগী কেরানী দ্বারা এসব কাজ ফারসী ভাষায় করা হইত। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলমানদের নিজস্ব সাহিত্য ছিল না। আওরঙ্গাবাদ নগরবাসী ওয়ালী (১৭১০—৩০) প্রথম উর্দ্দু পদ্য ভদ্রসমাজে অধিক প্রচার করেন এবং পঞ্চাশ যাঠ বৎসর পরে তাহাই সার্ব্বজনীন হইয়া উঠে। দাক্ষিণাত্যে ওয়ালীর অনেক পূর্ব্বে রাজা উজীর রেখ্‌তায় পদ্য লেখা অগৌরবের বিষয় মনে করিতেন না, কিন্তু এই রীতি উত্তর-ভারতে আসে নাই।

হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে ঘাত-প্রতিঘাতের ফল

এই যে এত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু মুসলমান একই দেশে একই রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহার ফলে এই দুই ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের কি কি প্রভাব, কি কি আদান-প্রদান ঘটিয়াছে? প্রথমে ইহারা শত্রু ছিল, একের সহিত অপরের অস্তিত্বও যেন অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। কিন্তু আট শত বৎসরেও একে অপরটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নাই, লোপ করিয়া দেয় নাই। দুইজনেই জীবিত আছে, কিন্তু অশেষ পরিবর্ত্তন গ্রহণ করিয়া।

শিখ জাতির বিখ্যাত ঐতিহাসিক কানিংহাম্ মুসলমান-বিজয়ের নৈতিক ফল এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন :—

"এই নবাগত জাতি বীরত্বে ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা কম নহে, অথচ ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠতা মানে না, এবং একেশ্বরবাদ প্রচার ও মূর্ত্তিপূজার অবৈধতা ঘোষণা করে। ইহাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা ভারতীয় লোকদের মনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘাত-প্রতিঘাত করিতে লাগিল। * * * তাহার ফলে এদেশে নূতন নূতন কুসংস্কার গজাইয়া উঠিল, সেগুলি পুরাতন হিন্দু অন্ধবিশ্বাসের অনুরূপ; যেমন, পীর ও শহীদ, সাধু ও মৃত ধর্ম্মযোদ্ধা, কৃষ্ণ এবং ভৈরবের মতই অলৌকিক ক্রিয়া করিতে লাগিলেন। ভারতে আসিয়া মুসলমানেরা ঈশ্বরের একত্ব ভুলিয়া তাঁহার শত শত পার্থিব সেবক ও প্রিয়পাত্রকেই পরিত্রাণলাভের উপায় বলিয়া জড়াইয়া ধরিল, [যেন বুদ্ধকে ছাড়িয়া বোধিসত্ত্বের আরাধনায় মন দিল।] * * অপর দিকে, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের সংঘর্ষের প্রথম ফল হইল রামানন্দ কর্ত্তৃক ১৪ শতাব্দীর শেষভাগে এক মিলিত উপাসক সম্প্রদায় স্থাপন। * * * ঈশ্বরের চোখে সব লোকই যে-সমান, এই মতের উপর তিনি জোর দিলেন, সব খুঁটিনাটি আচার ও বিভাগের চিহ্ন ছাড়িয়া দিলেন, এবং সর্ব্ব জাতের লোককে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত জোলা কবীর একদিকে হিন্দুর মূর্ত্তিপূজা ও ধর্ম্মশাস্ত্র, অপর দিকে কোরান এবং ধর্ম্মধ্বজিতার উপর আক্রমণ করিলেন, এবং প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থের কঠিন ভাষা ছাড়িয়া নব্য চলিত ভাষায় ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।"

একেশ্বরবাদের প্রচার

কিন্তু স্যার উইলিয়ম হাণ্টার ও অন্যান্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের মত যে জাতিভেদ-বিরোধী এবং একেশ্বরবাদী যে-সব ধর্ম্ম মধ্যযুগের ভারতে জাগিয়া উঠে ইসলাম্ হইতে সেগুলির জন্ম—ইহা ইতিহাসের বিরোধী। আমরা জানি যে অতি প্রাচীন কাল হইতে যুগে যুগে হিন্দু সমাজে সকল ধর্ম্ম-সংস্কারক, উচ্চচেতা মনীষী এবং ভক্ত সাধক চেঁচাইয়া বলিয়াছেন যে তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর উপরে একমাত্র পরমেশ্বর আছেন, তিনিই সর্ব্বোচ্চ উপাস্য; প্রকৃত ভক্ত সাধকগণ সকলেই সমান, সকলেই একজাতের, সরল বিশ্বাস ও পবিত্র জীবন যাপন জমকাল বিপুল কর্ম্মকাণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা সকলেই আরাধনা-পদ্ধতি ও মন্ত্রতন্ত্রকে সহজ এবং সাধারণের বোধগম্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই যেমন, তামিল কবি গাহিয়াছিলেন :—

How many various flowers
Did I, in bygone hours,
Cull for the gods, and in their honour strew ;
In vain how many a prayer
I breathed into the air,
And made, with many forms, obeisance due.
Beating my breast aloud
How oft I called the crowd,
To drag the village car ; how oft I stray'd
In manhood's prime, to lave
Sunwards the flowing wave,
And, circling Shiva fanes, my homage paid.
But they, the truly wise,
Who know and realize
Where dwells the Shepherd of the Worlds, will ne'er
To any visible shrine,
As if it were divine,
Deign to raise hands of worship or of prayer.

কেহ কেহ বলেন যে খৃষ্টীয় পাদ্রিদের প্রচ্ছন্ন প্রভাবে এই পদ্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হয় ; কিন্তু পাঠকেরা খাঁটি হিন্দু ভক্তি-সাহিত্য হইতে ইহার অনেক পূর্ব্বেকার একেশ্বরবাদী স্তোত্র দেখাইয়া দিতে পারিবেন।

সুতরাং, ইতিহাস পড়িয়া আমার মনে হয় যে মধ্যযুগে হিন্দুদের মধ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে এইরূপ :—মুসলমান ধর্ম্ম ও সমাজের নিত্য প্রতিবেশী হইয়া থাকিয়া,তাহাদের কাজকর্ম্ম দেখিয়া দেখিয়া, হিন্দুদের মধ্যে অন্তর্নিহিত ধর্ম্মসংস্কারের বা সমাজসংস্কারের চেষ্টা এবং গড্ডলিকা প্রবাহের মত পুরাতন রীতিনীতি অনুসরণ না করিয়া নূতন স্বাধীন সম্প্রদায় স্থাপন করিবার আকাঙ্ক্ষা সতেজ এবং ফলবান হইয়া উঠিল, নবজীবন লাভ করিল। মুসলমানদের চাক্ষুষ দৃষ্টান্ত এসিডের মত হিন্দুদের কুসংস্কার গলাইয়া দিতে লাগিল ; হিন্দু সংস্কারকদিগের হৃদয়ে নূতন সাহস ও প্রেরণা আনিল।

এই যুগে অনেক নূতন ধর্ম্মসম্প্রদায় সৃষ্ট হইল, তাহাদের উদ্দেশ্য হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের মধ্যে মিলন স্থাপন করা ; এগুলির প্রতিষ্ঠাতারা ধর্ম্মের সব বিশেষ বিশেষ বাহ্য চিহ্ন, ক্রিয়াকাণ্ড, এবং বাঁধা মন্ত্রতন্ত্র ত্যাগ করিয়া, দুই দলেরই প্রকৃত ভক্ত ও সাত্ত্বিক লোকেরা যাহাতে আরামে একত্র মিশিতে পারে, এক উপাসনায় যোগ দিতে পারে, তাহার জন্য সহজ পথ খুলিয়া দিলেন। যাহারা তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইল তাহারা নিজের পূর্ব্বতন গোঁড়া ধর্ম্ম—ইসলাম বা হিন্দুত্ব—ছাড়িয়া দিয়া এই নূতন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাইয়ের মত সমান হইয়া মিশিয়া গেল। কবীর ও দাদু, চৈতন্য ও নানক, ঠিক এইরূপে হিন্দুমুসলমান-নির্ব্বিশেষে ভক্তদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ে স্থান দিলেন, এই সব শিষ্য এক নূতন একতার বন্ধনে আবদ্ধ হইল।

সুফী ধর্ম্মের বিস্তার

হিন্দু মুসলমান দুই সমাজেরই মূর্খ সাধারণ লোক, সংসার-বিরাগী সাধক, সন্ন্যাসী ফকির প্রভৃতির মধ্যে এই সব মহাপুরুষদের প্রভাব জয়লাভ করিল। আর, শিক্ষিত ভদ্রলোক, বিশেষতঃ কর্ম্মচারী-শ্রেণীর মধ্যে সুফীমতের বহুল বিস্তৃতি হইল। সুফী-মতকে একটা ধর্ম্মবিশেষ বলা ভুল ; উহা চিন্তা করিবার, উপভোগ করিবার জিনিষ যতটা, জীবনের কর্ত্তব্যের পথনির্দ্দেশক নিয়মাবলী ততটা নহে। পণ্ডিত, দার্শনিক, লেখক, উদারচেতা সর্ব্বজীবে সমদর্শী বৈদান্তিক, ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা ভক্ত সাধক—এই শ্রেণীর লোকেরাই সুফী হইতে পারিতেন। ঈশ্বর সর্ব্ব জীবে সর্ব্ব দ্রব্যে,—গাছপাতায়, প্রস্তরে নদীতে, চন্দ্রের কিরণে, নির্ঝরের জলতরঙ্গে, ধাতুর দ্রব্যে, মৃত্তিকায়—"ঘটে পটে" পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছেন ; তাঁহারই এক টুকরা আত্মার আকারে আমাদের দেহের মধ্যে আছে ; মানুষের জীবাত্মা এই পরমাত্মার সহিত মিলিত হইলেই চরম শান্তি, পরম সুখ পায়, তাহার আর কোন উদ্বেগ আকাঙ্ক্ষা থাকে না, পুনর্জ্জন্ম হয় না ; মানব প্রেমিক যেমন প্রেয়সীর সঙ্গে বিচ্ছেদহীন বাধাহীন চিরমিলনের লালসায় পাগল, তাহাকে কাছে পাইবার জন্য জগৎ ব্যাপিয়া ব্যর্থ চেষ্টায় ছুটিয়া বেড়ায়,হতাশ ক্রন্দন করে, নিজ অঙ্গে আঘাত করে, আবার দূরে ক্ষণমাত্র তাহার মূর্ত্তি দেখিলে আনন্দে নাচিতে থাকে,—সেইরূপ ভক্তের প্রাণও প্রিয়তমের সহিত ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনে চিরকালের জন্য লয় পাইবার, অর্থাৎ পূর্ণ একাত্মভাব (তৌহিদ্) সাধনার দ্বারা লাভ করিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করে। তাই, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক মেঘমুক্ত রাত্রে পূর্ণচন্দ্রের বিকাশ দেখিয়া ছাদের উপর আত্মহারা হইয়া নাচিয়াছিলেন। শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনী, ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল, জলপ্রপাতের জীবন্ত প্রবাহ—এ সমস্তই সেই চিরসুন্দর চিরকাঙ্ক্ষিত

কিন্তু চির দূরবর্ত্তী প্রিয়তমের মূর্ত্তি দেখাইয়া দিয়া সুফীকে পাগল করে। অনেক সুফী-সাধক প্রেমের উন্মাদনায় নাচিতে নাচিতে মূর্চ্ছা যাইতেন (যেমন রাধা-নামের প্রথম অক্ষর শুনিবামাত্র চৈতন্যদেবের ভাব হইত)। তখন তাঁহাদের মুখ হইতে ভবিষ্যদ্বাণী ভগবৎবাক্য আপনা হইতে বাহির হইয়া আসিত। ইহার ফারসী ভাষায় নাম 'হাল্ কাল' (=দশা ও দৈববাণী) এবং এগুলি সিদ্ধ সুফীর চিহ্ন বলিয়া গণিত হইত। সজ্ঞান অবস্থায় ইঁহারা—এমন কি নিরক্ষর সুফী সিদ্ধপুরুষগণও—অজস্রধারার মুখে মুখে এই ঈশ্বর প্রেমের কবিতা রচনা করিতেন। ইহাই সে যুগে শিক্ষিত ভারতবাসীদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয়, অধিক প্রচলিত সাহিত্য ছিল। অনেক হিন্দু কেরাণী (লালা কায়েথ এবং পঞ্জাবী ক্ষত্রী) এরূপ পদ্য লিখিয়া বই ভরাইয়াছেন।

সুফী-মতের দুইটি শাখা—পশ্চিম-এশিয়ার ও ভারতীয়। প্রথমটি গ্রীক দর্শনের, বিশেষতঃ আলেকজান্দ্রিয়া নগরের নব-প্লেতোনিষ্ট লেখকদের প্রভাবে গঠিত; দ্বিতীয়টি সংস্কৃত উপনিষদের নিকট ঋণী। বাদশাহ আকবর পারস্য হইতে আগত কয়েকজন বড় সুফী পণ্ডিত ও ভক্তকে আদর করিতেন, এবং নিজেও তাঁহাদের ধর্ম্মালোচনায় যোগ দিয়া আনন্দ পাইতেন। তাঁহারই আহ্বানে এবং অনুগ্রহে গোঁড়ামীশূন্য হিন্দু ও মুসলমান প্রকৃত ভক্তদের একত্র করিয়া এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের এবং এক সম্মিলিত উদারচেতা উপাসক-সম্প্রদায় গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা হইল; দেশে সুফী-মতের বহুল প্রসার হইল। উভয় ধর্ম্মের মধ্যে একটি সেতু বাঁধিয়া দিবার এই যে চেষ্টা তিনি আরম্ভ করেন, তাহাতে তাঁহার প্রপৌত্র দারা শুকো প্রাণ ঢালিয়া দিলেন। এলাহাবাদের সুবাদার থাকার সময় দারা কাশীর পণ্ডিতদের সাহায্যে পঞ্চাশখানা উপনিষদের ফারসী অনুবাদ রচনা করিলেন, তাহার নাম দিলেন "গূঢ়তম মন্ত্র", এবং বেদান্তে ব্যবহৃত দার্শনিক শব্দগুলির ফারসী ভাষায় প্রতিশব্দ দিয়া, এবং পারসিক সুফী-সাহিত্য হইতে অনুরূপ বচন উদ্ধৃত করিয়া, মুসলমান জগতের পক্ষে সহজে বেদান্ত বুঝিবার উপায় করিয়া দিলেন। এই গ্রন্থের নাম "মজ্‌মুয়া-উল-বহরাইন্" অর্থাৎ "দুই সমুদ্রের সঙ্গম" তাঁহার এই উদার মিলন-চেষ্টার প্রমাণ দিতেছে।

ইতিহাস-রচনা

ঐতিহাসিক সাহিত্য ভারতে যে মুসলমানদের দান তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, এবং এই দান যে কত মূল্যবান তাহা যাঁহারা এ বিষয় চর্চ্চা করিয়াছেন তাঁহারাই পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে পারেন। হিন্দুদের পাথিব ঘটনার ইতিহাস লিখিবার এবং সময়ের হিসাব রাখিবার অভ্যাস, এমন কি প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত, ছিল না। [ইউয়ান্ চুয়াং কথিত "নীলপীত" বৃত্তান্তের কোন প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় নাই।] আমরা অকালের ধ্যানে এত মগ্ন যে কালের গতির প্রতি দৃষ্টিই রাখি না। এই বেদান্তিক জাতির নিকট মানুষের পার্থিব জীবন যেন একটা সরাই, অথবা যেমন

নানাপক্ষী এক বৃক্ষে
নিশীথে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে সবে
কে কোথায় উড়ে যায়!

অতএব এ সংসারে কি ঘটিল, কে কি করিল, তাহার বিবরণ রক্ষা করা, এমন কি তাহার দিকে মন দেওয়াও অমূল্য মানব জীবনের অপব্যয়মাত্র, নিজ চরম লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়া। এই মনোবৃত্তির ফলে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে হিন্দুরা ইতিহাস লেখে নাই; রাজার স্তুতির প্রশস্তি বা অতিরঞ্জিত কাব্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু তাহা ইতিহাস নহে, তাহাতে তারিখ নাই বলিলে হয়; এবং শকাবলী (chronology) শ্রেণীর গ্রন্থ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। কিন্তু আরবেরা খুব হিসাবী লোক, বাস্তব জিনিষের প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখে; এজন্য তাহারা ইসলামের আদি যুগ হইতে ঘটনার ইতিহাস, শকাবলী এবং জীবনী লিখিয়া গিয়াছে, এবং তাহাদের কাহিনীতে প্রচুর পরিমাণে তারিখ দেওয়া। প্রত্যেক দেশেই মুসলমানগণ বিপুল ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছে, সেগুলি উচ্চ দার্শনিক চিন্তায় বা বিশ্লেষণে পূর্ণ না হইলেও, শ্রেণিবদ্ধ-ভাবে সুসজ্জিত, বাস্তব ঘটনার ভিত্তির উপর গঠিত, অনেক

স্থলে লেখকের নিজ অভিজ্ঞতা বা অনুসন্ধানের ফল, এবং প্রকৃত ইতিহাসের ভাষায় ও প্রণালীতে রচিত। অতীত যুগের ঘটনাপরম্পরা কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ও দেশের দশা সত্যরূপে জানিবার পক্ষে এগুলি অমূল্য এবং একমাত্র বিশ্বাসযোগ্য উপকরণ। এই-সব মুসলমান রচিত গ্রন্থ হইতে আমরা সে সময়কার হিন্দুজাতির এবং পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুরাজাদের পর্য্যন্ত সত্য কাহিনী জানিতে পারি। ক্রমে এই দৃষ্টান্ত হিন্দু লেখকগণ অনুকরণ করিতে শিখিলেন, মুঘল যুগে অনেক হিন্দু ফারসী ভাষায় ইতিহাস, জীবনী, ঐতিহাসিক পত্রাবলী লেখেন। এবং হিন্দুরাজগণও মুঘল বাদশাহদের অনুকরণে নিজ কীর্ত্তিকলাপ এবং বংশচরিত রচনা করাইলেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারত এই কারণে আমাদের নিকট অতি বিশদভাবে পরিচিত হইয়া আছে, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন শতাব্দী ইহার সিকির সিকি পরিমাণ ঐতিহাসিক উপকরণও রাখিয়া যায় নাই। প্রত্যেক মুঘল বাদশাহ এবং তাঁহাদের পূর্ব্বের সুলতানগণের মধ্যে অনেকেই নিজ নিজ রাজত্বের ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য বেতনভোগী লেখক রাখিতেন এবং তাহাদের সব সরকারী কাগজপত্র দেখাইয়া ঐ ইতিহাসগুলিকে বাস্তব ভিত্তি দান করিতেন। এই সাহিত্য এদিকে হিন্দুদের চোখ ফুটাইয়া দিল।

সভ্যতার বৃদ্ধি ও প্রচার

শত শত বৎসর মুসলমান রাজত্বের ফলে ভারতীয় সভ্যতা নানা দিকে বিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। শিকার, বাজপক্ষী দিয়া অন্য পাখী মারা, নানা প্রকার খেলা এখনও তাহাদের মুসলমানী শব্দাবলী ও প্রণালী রক্ষা করিয়া এই বাহ্য প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছে। অসংখ্য ফারসী তুর্কী ও আরবী শব্দ চলিত হিন্দী, বাংলা ও মারাঠী ভাষায় ঢুকিয়া তাহাদের স্থায়ী অংশ হইয়া রহিয়াছে। মুসলমান যুগে রণনীতি খুব বেশী উন্নতি লাভ করে, কারণ ভারতীয় মুসলমানগণ বাহিরের গতিশীল ইস্লামীয় জগতের সঙ্গে সদা সংস্রব রাখিত এবং তথাকার জ্ঞানের উন্নতির ভাগ পাইত। শেষে, স্বাধীন হিন্দুরাজারা মুঘল যুদ্ধ-পদ্ধতি ও অস্ত্রসজ্জা অনুকরণ করিতে লাগিলেন, মুসলমান সেনানী ভাড়া করিতে লাগিলেন। এই যুগে বারুদ ও কামানের ব্যবহার প্রথম আসিল, এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে দুর্গ-রচনার প্রণালী সম্পূর্ণ বদলাইতে হইল। প্রাচীন হিন্দুযুগে যুদ্ধে গজের স্থান ছিল শ্রেষ্ঠ, এখন অশ্বারোহী সৈন্য প্রধান হইয়া উঠিল, আর হাতী শুধু সর্ব্বোচ্চ নেতার চড়িবার এবং শিবিরের বোঝা বহিবার বাহনে পরিণত হইল।

শুধু যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রণালীতে, শাসনবিধি ও কর্ম্মচারিবৃন্দের বিভাগ এবং নামকরণে, রাজসভার আদব-কায়দাতে নহে,—বিলাসিতায়, অট্টালিকা-নির্ম্মাণে, উদ্যান-রচনায়, উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের সর্ব্ববিধ বাহ্য জীবনে মুসলমান প্রভাব বিজয়ী হইয়া, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল; এই সেদিন মাত্র আমরা বৃটিশের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছি, আর মুঘল-প্রভাবের অর্দ্ধশশী অস্তমিত হইয়াছে।

অনেক শিল্প, অনেক কলাবিদ্যা মুসলমান যুগের দান-স্বরূপ ভারতে স্থান পাইয়াছে; তাহার মধ্যে কাগজ-নির্ম্মাণ এবং কাগজের পুথির পাতায় ছবি আঁকার প্রতি বিশেষ করিয়া পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা আবশ্যক। আর-সব দৃষ্টান্ত সকলের সহজেই স্মরণ হইবে, সেগুলি আজও নানা দিকে আমাদের নিত্য ব্যবহারে আসিতেছে।
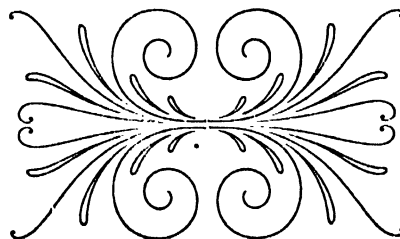
ছেলেধরা

পরশুরাম

শহরে আবার ছেলেধরার উপদ্রব সুরু হইয়াছে। অজ্ঞলোকে রটাইতেছে—বালি ব্রিজের বনিয়াদ পোক্ত করিবার জন্য দশ হাজার ছেলে পুঁতিবে। বিজ্ঞলোকে বলিতেছেন—ছেলেরা এখানকার কর্ত্তব্য শেষ করিয়া বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতেছে। গরম দলের মুখপত্র দৈনিক ধূমকেতু ভ্রূকুটিকুটিল অক্ষরে প্রশ্ন করিয়াছে,—কোন্ দুরাত্মা স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেশমাতৃকাকে সন্তানহারা করিতেছে? দেশদ্রোহী চুনকালি পত্রিকা ছোট্ট অক্ষরে জবাব দিয়াছে—তৎ ত্বমসি ধূমকেতো।

বংশলোচনবাবুর বৈঠকখানায় এই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। তাঁর ছোট ছেলে ঘেণ্টু বলিল—'বাবা, ছেলেধরা বাবা ধরে? বল না বাবা।'

উকিল বিনোদবাবু বলিলেন—'তেমন-তেমন বাবা হ'লে ধরে বই কি। কিন্তু তুমি ভেবো না খোকা, আমরা রক্ষা ক'রব।'

বংশলোচনের শালা নগেন বলিল—'চাটুয্যে মশায়, আপনি সাবধানে চলা-ফেরা করবেন।'

বংশলোচন বলিলেন—'উনি ত প্রবীণ লোক, ওঁকে ধরবে কেন?'

নগেন বলিল—'মনেও ভাববেন না তা। হনুমানের আরক খাইয়ে তরুণ বানাবে, তারপর চালান দেবে।'

বংশলোচনের ভাগনে উদয় সভয়ে বলিল—'তরুণদেরই ধরচে বুঝি?'

কেদার চাটুয্যে হুঁকা রাখিয়া কহিলেন—'উদো, তুই কি রকম লেখাপড়া শিখেচিস দেখি। জোয়ান, যুবক আর তরুণ—এদের মধ্যে তফাৎ কি বল্ ত।'

উদয় বলিল—'জোয়ান হচ্চে যার গায়ে খুব জোর। যুবক মানে যুবা। তরুণ হ'ল গিয়ে মানে অর্থাৎ যাকে বলে—থামুন, অভিধান দেখে বল্‌চি—'

চাটুয্যে কহিলেন—'অভিধানে পাবি না, আজকাল মানে বদ্‌লে গেছে। আমি অনেক ভেবে-চিন্তে যা বুঝেচি বলি শোন্।—যাঁর দাড়ি গোঁপ দু-ই আছে তিনি হলেন জোয়ান, যেমন রবিঠাকুর, পি. সি. রায়। যাঁর দাড়ি নেই কিন্তু গোঁপ আছে তিনি যুবক, যেমন মহাত্মা গান্ধী, আশু মুখুয্যে। আর, যাঁর দাড়িও নেই গোঁপও নেই তিনি তরুণ, যথা—বঙ্কিম চাটুয্যে, শরৎ চাটুয্যে আর এই কেদার চাটুয্যে।'

উদয় বলিল—'আর আমি? নগেন মামা?'

চাটুয্যে কহিলেন—'তোরা হলি ওই তিনের বার, যাকে বলে অপোগণ্ড। ধরতে হয় তোদেরই ধরবে।'

উদয় চিন্তা করিয়া বলিল—'আমি দাড়ি রাখতুম, কিন্তু বউ বলে—'

নগেন ধমক দিল—'খবরদার উদো।'

চাটুয্যে মশায় বলিলেন—'এবার যে ছেলেধরার উপদ্রব হয়েচে সেটা কিছুই নয়। হয়েছিল বটে পাঁচ বছর আগে, যেবার আমাদের মজিলপুরের চরণ ঘোষের ছেলে নিরুদ্দেশ হয়।'

বিনোদবাবু বলিলেন—'কি হয়েছিল বলুন না চাটুয্যে মশায়!'

চাটুয্যে মশায় বলিতে লাগিলেন।

কার্ত্তিক ছেলেটি শিশুকাল থেকেই বেশ চৌকস। যখন দশ বছর বয়েস, তখন সে তার বান্ধবীদের ব'লত—মেয়েগুনো আবার মানুষ! মাথায় একগাদা চুল, আবার ফিতে-বাঁধা, আবার শুধু-শুধু দাঁত বার ক'রে হাসে! মারতে হয় এক ঘুঁষি। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে সে তার পরম বন্ধুকে লিখলে—নারীর প্রেম? কখনই নয়। ভাই বাঁটলু, এ জগতে কারো থাকবার দরকার নেই, শুধু তুমি আর আমি। কিন্তু দু-বছর যেতে না-যেতে তার যৌবন-নিকুঞ্জের পাখী কা কা ক'রে

উঠল। কাৰ্ত্তিক তার কবিতার খাতায় লিখলে—
নারী, বুঝিতে না পারি কবে, একান্ত আমারি তুমি হবে,
কত দিনে ওগো কত দিনে, পারচি নে আর পারচি নে।

ছেলের বয়েস হু হু ক'রে বেড়ে চল্‌ল, কিন্তু বাপের আক্কেল হ'ল না। চরণ ঘোষ অন্য বিষয়ে সেকেলে হলেও ছেলের বিয়ে দেবার বেলায় একেলে। ব'লত—ভাল ক'রে লেখাপড়া শিখুক, রোজগার করুক, তারপর। কাৰ্ত্তিক বেচারা কি আর করে, লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাব্য উপন্যাস পড়ে, বন্ধুদের সঙ্গে প্রেমতত্ত্ব চর্চ্চা করে, থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখে। এমন সময় শহরে ছেলেধরার উপদ্রব সুরু হ'ল।

সে এক হুলস্থূল কাণ্ড। আজ পঞ্চাশটা ছেলে হারিয়েচে, কাল পঁচাত্তরটা; কিন্তু আশ্চর্য্য এই, যারা নিরুদ্দেশ হচ্চে তাদের নাম-ধাম কেউ টের পায় না। এদিকে লোকে খেপে উঠেচে, মোটর গাড়ি পোড়াচ্চে, রাস্তার মানুষকে ধ'রে ধ'রে ঠেঙাচ্চে। কাৰ্ত্তিকের কলেজ বন্ধ, চরণ ঘোষ তাকে দেশে এনে রেখেচে। একদিন কাৰ্ত্তিক বল্‌লে—'হিষ্ট্রির খান-দুই বই বাঁটলোর কাছে রয়েচে, কলকাতায় গিয়ে নিয়ে আসি।' চরণ বল্‌লে—'যাবি আর আসবি, দুপুরের গাড়িতে ফিরে আসা চাই।'

বেলা শেষ হয়ে এল, কিন্তু কাৰ্ত্তিকের দেখা নেই। তার মা কান্নাকাটি আরম্ভ করলেন, কারণ আগের দিন না-কি তেষট্টিটা ছেলে চুরি গেছে। অগত্যা কাৰ্ত্তিকের খোঁজ ক'রতে চরণ ঘোষ আর আমি কলকাতায় চ'লে এলুম। বাঁটলোর ছোট ভাই সাঁটলো বল্‌লে, তার দাদা আর কাৰ্ত্তিক ক'জন বন্ধুর সঙ্গে ওভারটুন হলে বক্তৃতা শুনতে গেছে। কিন্তু বাঁটলোর বোন তুবড়ি বল্‌লে—'শোনেন কেন, সব মিথ্যে কথা, বাবুরা অ্যাংলো-মোগলাই হোটেলে খেতে গেছেন, তারপর যাবেন বায়োস্কোপে, তারপর অনেক রাত্রে বাড়ি এসে দরজায় ধাক্কা লাগাবেন।' সারা পথ কাৰ্ত্তিকের বাপান্ত ক'রতে ক'রতে চরণ ঘোষ আমার সঙ্গে হোটেলের খোঁজে চল্‌ল।

হোটেলটি বড়-রাস্তার ওপর, আলোয় গন্ধে কলরবে ভরপূর। সায়েবদের আমরা বলি গোস্তখোর। খোর কাকে বলে বাঙালীর হোটেলে গিয়ে দেখে এস। খোপে খোপে ছেলে-বুড়োর দল টেবিলে ব'সে পেটে মাংস ঠুসচে। বেচারাদের অপরাধ নেই, হাজার বছর ধ'রে শুনে এসেচে—এটা খেও না, ওটা খেও না। এখন যখন ভগবান সুবুদ্ধি আর সুবিধে দিয়েচেন তখন জন্ম-জন্মান্তরের অতৃপ্তি চটপট্‌ মিটিয়ে নিতে হবে। মনে মনে আশীর্ব্বাদ করলুম—আহা এদের ভোজন সার্থক হোক। এই যে এরা বাঘের মতন গব্‌গব্‌ ক'রে খাচ্চে, সেই সঙ্গে যেন বাঘের সদ্‌গুণও কিছু পায়। এদের গায়ে গত্তি লাগুক, মনে সাহস হোক, খোঁচা দিলে এরা যেন খ্যাক্‌ ক'রে নির্ভয়ে তেড়ে যেতে পারে।

ঘরের শেষে একটা খাটো পরদার আড়ালে আমাদের শ্রীমানরা খাচ্চেন আর নানাপ্রকার তত্ত্বকথার আলোচনা করচেন। আমাদের দেখতে পান নি। চরণ ঘোষ তখন সবে গোঁসাই-মহারাজের কাছে মন্তর নিয়ে কণ্ঠি ধারণ করেচে, মাংসের গন্ধে কানে আঙুল দেয়। হোটেলের খোশবায় শুঁখে তার খুন চ'ড়ে গেল, ছেলেকে মারে আর কি। আমি তাকে জোর ক'রে থামিয়ে বল্‌লুম—'কর কি চরণ, নিজের ছেলেবেলার কীর্ত্তিকলাপ সব ভুলে গেলে? সেই যে কাবাবের ঠোঙা নিয়ে গাব গাছে চ'ড়ে খেতে আর কোকিল ডাকতে তা কি মনে নেই? ছেলের খাওয়া শেষ হোক, তারপর একটু আধটু ধমক দিও। আপাতত এদিকে চুপ্‌টি ক'রে বোসো, একটু ঘোলের সরবৎ খেয়ে ঠাণ্ডা হও, আর শ্রীমানরা কি আলোচনা করচেন তাই আড়ি পেতে শোনো। যদি কিছু অশ্রাব্য অলৌকিক কথা কর্ণগোচর হয়, তখন না-হয় গলা খাঁকার দিয়ে আত্মপ্রকাশ করা যাবে।'

ছেলেরা যে-ভাষায় আলাপ করছিল তার চার আনা বাংলা, আট আনা ইংরিজী, আর চার আনা বোধ হয় ফ্রেঞ্চ, কারণ চন্দ্রবিন্দুর রেশ প্রায়ই কানে আসছিল। আন্দাজে বুঝলুম, আলোচ্য বিষয়টি হচ্চে কার কি রকম প্রণয়িনী পছন্দ। শেষটায় কাৰ্ত্তিক টেবিল চাপড়ে বল্‌লে—'থিওরি টিওরি আমার নেই; আমি চাই এমন নারী যে বল্লরী বাঁড়ুয্যের মতন রূপসী, মিসেস চৌবের

মতন সাহসী, জিগীষা দেবীর মতন লেখিকা, মেজদির ননদের মতন রসিকা, লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাথ্‌তা খাঁর মতন নাচিয়ে।'

চরণ ঘোষের চোদ্দপুরুষ কখনো এমন তিলোত্তমা দেখে নি। চুপি চুপি বললুম—'চরণ, আর কথাটি নয়, বাবাজাকে এই আস্‌চে অঘ্রানেই ঝুলিয়ে দাও, নইলে বেচারা বাড়ি-বাড়ি হ্যাংলা-দিষ্টি দিয়ে বেড়াবে।' চরণ লাফিয়ে উঠে বল্‌লে—'দাঁড়াও, হ্যাংলাপনা ঘুচচ্চি।'

তারপর মশায় চরণ ঘোষ হাত-নেড়ে এমন চীৎকার আরম্ভ করলে যে, হোটেল-সুদ্ধ লোক হকচকিয়ে গেল। নিজের ছেলে, তার বন্ধুর দল, হোটেলওয়ালা, ইউনিভার্সিটি, আধুনিক সভ্যতা, কাকেও বাদ দিলে না। কার্ত্তিক ঘাড় হেঁট ক'রে গালাগাল হজম ক'রতে লাগ্‌ল, কিন্তু অন্য ছেলেরা রুখে উঠল, হোটেলের ম্যানেজারও আস্তিন গুটিয়ে লড়তে এল।

বাঁটলো ছেলেটি অতি মিষ্টভাষী আর বিনয়ী। সে খুব মোলায়েম ক'রে বল্‌লে—'দেখুন চরণবাবু, নিজের ছেলেকে আপনি যা খুশী বলতে পারেন, কিন্তু আমরা কি করি না-করি আপনার পিতার তাতে কি?'

ম্যানেজার বল্‌লে—'জানেন, আপনাকে পুলিসে দিতে পারি?'

চরণ মুখ ভেংচে বল্‌লে—'দাও না দেখি।'

ম্যানেজার বল্‌লে—'জানেন, এটা অ্যাংলো-মোগলাই কেফ?'

বাঁটলো বল্‌লে—'কেফ নয়, কাফে।'

ম্যানেজার বল্‌লে—'ওই হ'ল। জানেন, এটা একটা রেস্‌পেক্‌টেব্‌ল রেষ্টাউর্যাণ্ট?'

বাঁটলো বল্‌লে—'রেস্তোরাঁ।'

ম্যানেজার বল্‌লে—'এক-ই কথা। জানেন, এটা হচ্চে শিক্ষিত লোকের রেণ্ডেজভোস?'

বাঁটলো বল্‌লে—'রাঁদেভূ।'

বার-বার বাধা পেয়ে ম্যানেজার বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল। বল্‌লে—'আরে থামো ডেঁপো ছোকরা। ডেভিল মামলেট দেরাই বেচে বুড়িয়ে গেলুম, এখন ইনি এলেন উরুশ্চারণ শেখাতে!'

বাঁটলো গর্জ্জন করে বল্‌লে—'খদ্দেরকে অপমান? টেক্‌ কেয়ার, তোমার হোটেল বয়কট ক'রব, কেবল কুকুরের ঠ্যাং আর সাপের চর্ব্বি চালাচ্চ!'

আমার পাশের টেবিলে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসেছিলেন। ইনি একজন নীরব-কর্ম্মী, দু প্লেট কোর্মা চুপচাপ শেষ ক'রে রাইসরষে আর নেবুর রস দিয়ে কাঁচা টোমাটো খাচ্ছিলেন। ইনি চম্‌কে উঠে বল্‌লেন—'কী ভয়ানক! সেজন্যেই ত আমি ওসব খাওয়া ছেড়ে দিয়েচি, কেবল জোচ্চুরি, ভাইটামিনের নামগন্ধ নেই।'

আমি বল্‌লুম—'ভাইটামিন যদি চান, তবে কাঁটাল খান।'

বাল্যে দুগ্ধ, যৌবনে লুচি-পাটা, বার্দ্ধক্যে একটু নিমঝোল আর প্রচুর হরিনাম—এই হ'ল মানুষের স্বাভাবিক পথ্য। কিন্তু আজকাল বৃদ্ধরা শিখেচেন যে ভাইটামিনই হচ্চে ভবনদীতে ভাসবার ভেলা। হোটেলের সমস্ত প্রবীণ খদ্দের চোপ্‌ চোপ্‌ ক'রে ধমক দিয়ে বাঁটলো, ম্যানেজার আর চরণ ঘোষকে থামিয়ে দিলেন। তারপর আমার চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে উৎসুক হয়ে বল্‌লেন—'হাঁ, তারপর মশায়, কাঁটালের কথা কি বলছিলেন?'

আমি একটি ছোট্ট বক্তৃতা দিলুম।—ফলের শ্রেষ্ঠ হচ্চে কাঁটাল, আবার কাঁটালের রাজা হচ্চে ওতোর-পাড়ার বঞ্জুলবাবুদের গাছের রস-খাজা। এক-একটি কোয়া এক-এক পো, কাঁচা সোনার বর্ণ, ভাইটামিনে টইটম্বুর। গালে দিয়ে বার-পাচেক এদিক ওদিক চলাচল করুন, তারপর চক্ষু বুঁজে একটু চাপ দিন, অবলীলাক্রমে গন্তব্যস্থানে পৌছে যাবে। কোথায় লাগে সন্দেশ পানতুয়া রসগোল্লা।

টোমাটো-ভোজী বাবুটি বল্‌লেন—'কোন্‌ ক্লাসের ভাইটামিন মশায়—এ, বি, না সি?'

বল্‌লুম—এ-বি-সি-ডি, বি-এল-এ-ব্লে, স্লাই-ফক্স-মেট-এ-হেন, যা বলেন। হেন বস্তু নেই যা কাঁটালে পাবেন না। গুঁড়ি চিরুন, তক্তা হবে। পাতা পাকিয়ে নিন, তামাক খাবার উত্তম নল হবে। আর ফলের ত কথাই নেই। কাঁচার কালিয়া খান, যেন পাটা। বিচি

পুড়িয়ে খান, যেন কাবুলী মেওয়া। পাকা কোয়ার রস গ্রহণ ক'রে ছিবড়েটা চরকায় চড়িয়ে সুতো কাটুন, বেরুবে সিল্ক।'

ভদ্রলোক মুখ বেঁকিয়ে বল্‌লেন—'ননসেন্স।'

আমি বল্‌লুম—'বিশ্বাস হ'ল না? তবে মরুন কাঁচা টোমাটো খেয়ে। আমরা চল্‌লুম, নমস্কার।'

ম্যানেজার তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—'ও মশায়, দুটো ঘোলের দাম দিলেন না?'

আরে মোলো, আবার দাম চায়! এত-বড় একটা কুরুক্ষেত্র থামিয়ে দিলুম সেটা কিছু নয়? আচ্ছা বাবা, নাও এই সিকি। দাম চুকিয়ে কাত্তিককে চুপিচুপি কিছু সদুপদেশ দিয়ে চরণকে বল্‌লুম—'তুমি এবার সেয়ালদ যেতে পার, ন'টার ট্রেন এখনো পাবে। আমি আর কাত্তিক আজ রাত্রে বাঁটলোদের বাড়িই থাকব। দুদিন পরে বাবাজীর রাগ পড়লে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাব এখন।'

চরণ ঘোষ চ'লে যাবার পর আমি, কাত্তিক, আর তার চার বন্ধু বাঁটলো কেলো গোপলা ঘনেন হোটেল থেকে একসঙ্গে বেরিয়ে এলুম। পথে যেতে যেতে কেলো বল্‌লে—'এ অপমান কখনই সহ্য করা যায় না, আমরা বানের জলে ভেসে এসেচি না-কি? কাত্তিক, তোর বাপকে এক্ষুনি উকিলের চিঠি দে, পাঁচশো টাকা ড্যামেজ। মকদ্দমায় আমরা সাক্ষী হব।'

গোপলা বল্‌লে—'বাপের নামে নালিশ দেখায় খারাপ। বরং খবরের কাগজে ছাপিয়ে দে, সমস্ত ছেলের দল খেপে উঠবে।'

ঘনেন বল্‌লে—'উঁহু। তার চেয়ে জিগীষা দেবীর কাছে চল্, তাঁকে ব'লে ক'য়ে আমরা একটা আশ্রম খুলব। কাগজে ছাপাব—এস কে কোথায় আছ বাংলার ছেলেরা—নির্য্যাতিত উৎপীড়িত অসহায় বুভুক্ষু—'

কেলো বল্‌লে—'ঐ সঙ্গে একটা মেয়েদের বিভাগও খোলা উচিত।'

কাত্তিকের এসব পরামর্শ পছন্দ হ'ল না। বল্‌লে—'বাঁটলো, হাইড্রোসায়ানিক এসিডের দাম কত রে?'

বাঁটলো বল্‌লে—'অনেক দাম। তার চেয়ে কেরাসিন তেল ঢের সস্তা। দশ পয়সায় কাজ সাবাড়।'

কাত্তিক বল্‌লে—'কিন্তু বড্ডো জ্বালা ক'রবে যে?'

বাঁটলো আশ্বাস দিলে—'সে কতক্ষণ? একবার মরতে পারলে মোটেই টের পাবি না।'

আমি বল্‌লুম—'ছি বাবা কাত্তিক, দুঃখু কোরো না। একে বাপ তায় বয়সে বড়, বল্‌লেই বা একটু কড়া কথা। বাপের সুপুত্তুর হ'লে সব দেবতা খুশী হন। এই দেখ, রামচন্দ্র পিতৃ-আজ্ঞায় বনে গিয়েছিলেন।'

ঘনেন বল্‌লে—'বুদ্ধও হয়েছিলেন তেমনি। মাথায় জটা, গায়ে জামা নেই, পায়ে জুতো নেই, চোদ্দ বচ্ছর ভ্যাগাবণ্ড, বউ গেল চুরি। চল্ রে বাঁটলো, আমরা একবার জিগীষা দেবীর বাড়ি গিয়ে তাঁর বাণী নিয়ে আসি।'

ছেলেদের বল্‌লুম—'এত রাত্রে কেন আর তাঁকে বিরক্ত করা, এখন নিজের নিজের ব্যড়ি গিয়ে ঘুমও গে।' কিন্তু তারা বাণী না নিয়ে ফিরবে না, অগত্যা আমিও সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লুম। বুড়োদের রাজত্ব শেষ হয়েচে, এখন ছোকরাদের পেছু-পেছু দৌড়নোই বুদ্ধিমানের কাজ।

করলাবাগান ফার্ষ্ট লেনে জিগীষা দেবীর বাসা। রাত প্রায় ন'টা, কিন্তু বাড়ির দরজা তখনো খোলা রয়েচে। ঘনেন দু-বার ব্যায়রা ব্যায়রা বলে চেঁচাতেই নাকে ঝুমকো পরা একটা নেপালী ঝি বেরিয়ে এল। বাঁটলো বললে—'চাটুয্যে মশায়, আপনিই আমাদের দলের সর্দ্দার, দিন আপনার কার্ড পাঠিয়ে।'

কার্ড-ফার্ড আমার কোনো কালে নেই। ঝিকে বল্‌লুম—'মাইজীকে গিয়ে খবর দাও কেদার চাটুয্যে আর পাঁচ ছোকরা মোলাকাৎ করনে মাংতা।'

ঘনেন বল্‌লে—'ছোকরা নয়, বলুন তরুণ।'

—'হাঁ হাঁ, বোলো পাচঠো তরুণ আর একঠো বুড্ঢা মাইজীর সাথ দেখা করেগা।'

ঝি চোখ কুঁচকে বললে—'মাইজী?'

বল্‌লুম—'হাঁ রে বাপু, জিঘাংসা দেবী।'

ঘনেন ধমকে উঠে বললে—'জিগীষা দেবী। চাটুয্যে

মশায়, আপনার ভীমরতি ধরেচে, ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে অসভ্যতা করবেন দেখচি।'

আমার বড় রাগ হ'ল। নাম বলতে একটু ভুল করেচি তাতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েচে? বল্লুম—'দেখ্ ঘনা, তুই আর আমার কাছে সভ্যতার বড়াই করিস না। ক'টা মহিলা দেখেচিস তুই? জানিস, আমার তিন খুড়শাশুড়ী, চার শালাজ, সাত শালী, আর গিন্নী ত আছেনই—এই চল্লিশ বৎসর তাঁদের সঙ্গে কারবার করে আসচি?'

ঝি ফিরে এসে আমাদের নিয়ে গেল দোতলার একটি ছোট ঘরে। জিগীষা দেবী টেবিলের কাছে ব'সে খানকতক মোটা-মোটা হিসেবের খাতা উল্‌টচ্চেন। বল্লেন—'আমাকে এখনি একটা কমিটি মিটিং-এ যেতে হবে, আপনারা একটু তাড়াতাড়ি বক্তব্য শেষ করলে বাধিত হব।'

জিগীষা দেবী বেশ দশাসই মহিলা, জবরদস্ত চেহারা, পরিপাটি সাজগোজ। পাউডারের স্তর ভেদ ক'রে সুগোল মুখের নিবিড় শ্যামকান্তি উঁকি মারচে, কালিদাস যদি দেখতেন ত লিখতেন—যেন খড়িপড়া ছাঁচিকুমড়ো। আমি একটু ঘবড়ে গিয়েছিলুম, কারণ এরকম ডেপুটেশনে আসা আমার অভ্যেস নেই। কিন্তু ছেলেরা যখন আমাকেই মুখপাত্র স্থির করেচে তখন কথা কইতেই হবে। বল্লুম—'মা লক্ষ্মী, এই যে দেখচেন পাঁচজন ছোকরা, এরা হচ্চে পাঁচটি তরুণ। এটির নাম কাত্তিক, চমৎকার ছেলে, কিন্তু এর বাপ চরণ ঘোষ একে বলেচে শুয়োর-কা-বাচ্চা, তাতে বাবাজীরা সকলেই বড় মর্ম্মাহত হয়েচেন। আমরা ছেলেবেলায় বাপ-জ্যাঠার গালাগাল বিস্তর খেয়েচি, সোনা-পারা মুখ ক'রে সমস্ত সয়েচি। কিন্তু সেদিন আর নেই মশায়। তখন এই কলকাতায় ঘোড়ার ট্রাম চ'লত, ছেলেরা গোঁপ রাখত, কোটের ওপর উড়ুনি ওড়াত, মেয়েরা নোলক প'রত আর নাইবার ঘরে লুকিয়ে গান গাইত, গভর্ন্মেন্টকে লোকে তখন ব'লত সদাশয় সরকার বাহাদুর।'

জিগীষা দেবী বাধা দিয়ে বল্লেন—'তরুণদের দলে আপনি কেন?'

শক্ত সমস্যা। কিন্তু কেদার চাটুয্যে ঠকবার ছেলে নয়, বল্লুম—'আজ্ঞে আমি একজন প্রবীণ তরুণ।'

বাঁটলো এক্সপ্লেন ক'রে দিলে—'ওঁর বয়েস হয়েচে বটে, কিন্তু মনটি একদম কাঁচা।'

জিগীষা দেবী কিন্তু খুশী হলেন না। আমি উপমা দিয়ে বুঝোবার চেষ্টা করলুম—'কি রকম জানেন্? এই গুজরাটী ডাব আর কি, ওপরে ঝুনো ভেতরে নেয়াপাতি।'

ঘনেন তখন রেগে কাঁই হয়েচে। আমাকে ধম্‌কে বল্‌লে—'চুপ করুন চাটুয্যে মশায়, কেবল আবোল-তাবোল বকচেন। কেলো, তুই বল্।'

কেলো তখন হোটেলের সমস্ত কাণ্ড বর্ণনা ক'রে বল্‌লে—'দেখুন, আমরা বড়ই অপমানিত উৎপীড়িত নির্য্যাতিত হয়েচি। বাড়িতে অধীনতার আবেষ্টনে আর থাকতে চাই না, নিজেদের একটা স্বাধীন আশ্রম বানাতে চাই। পিঁজরে-ভাঙা চন্দনা চায় পাখ্‌না মেলে বাঁচতে রে, অরুণ-রাঙা মুক্তাকাশের তক্তাপোষে নাচতে রে। আপনি যদি একটু চেষ্টা করেন তবে অনায়াসে একটা আশ্রম গ'ড়ে উঠবে। এখন এ সম্বন্ধে একটি বাণী আমরা আপনার কাছে প্রার্থনা করি।'

জিগীষা দেবী কিছুক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন। তারপর শিস দিয়ে ডাকলেন—'সুষ্, সুষ্—'

একটি ছোট্ট প্রাণী গুট্‌গুট্ ক'রে ঘরে এল। কুত্তা নয়। ইনি সুষেণবাবু, জিগীষা দেবীর স্বামী। রোগা, বেঁটে, চোখে চশমা, মাথায় টাক, কিন্তু গোঁপজোড়াটি বেশ বড় আর মোম দিয়ে পাকানো। সতীসাধ্বী যেমন সর্ব্বহারা হয়েও এয়োতের লক্ষণ শাঁখাজোড়াটি শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করে, বেচারা সুষেণবাবুও তেম্‌নি সমস্ত অধিকার খুইয়ে পুরুষত্বের চিহ্নস্বরূপ এই গোঁপজোড়াটি সযত্নে বজায় রেখেচেন। ঘরে এসে ঘাড় নীচু ক'রে সবিনয়ে বল্লেন—'ডেকেচ?'

জিগীষা দেবী ছেলেদের দেখিয়ে বল্লেন—'এঁরা বাণী নিতে এসেচেন।'

সুষেণবাবু চোখ কপালে তুলে বল্লেন—'বানি? এই যে সেদিন ননী স্যাকরা বেয়াল্লিশ টাকা নিয়ে গেল?'

জিগীষা দেবী ভ্রূকুটি ক'রে বল্‌লেন—'ঈডিয়ট! স্যাকরার বানি নয়, আমার মুখের বাণী। যাও, সবুজ ফাউনটেন পেনটা আর এক শিট কাগজ নিয়ে এস।'

সুষেণবাবু কাগজ কলম আনলেন, জিগীষা দেবী খচ্‌খচ্‌ ক'রে দু-পাতা বাণী লিখলেন। ভাষাটা ঠিক মনে নেই, তবে তাতে অনেক উঁচুদরের কথা ছিল, যথা—প্রবীণের রক্ত, তরুণের খুন, ধনিকের রুধির, শ্রমিকের লেহু। শেষটা হচ্চে—আশ্রম গ'ড়ে তোলা অতি সহজ কাজ; হে ছেলেরা, তোমরা লাখ টাকা যোগাড় কর; আপাতত আমাকে হাজার-দশেক এনে দাও, তাতেই কাজ আরম্ভ হতে পারবে।

আমরা বাণী পেয়ে কৃতার্থ হয়ে নীচে নেমে এলুম। হঠাৎ সুষেণবাবু পিছন থেকে চুপি চুপি ডাকলেন—'ও মশায়, বলি শুনচেন? একবার আমার ঘরে আসুন।'

ইনিও একটা বাণী দিতে চান না-কি? গেলুম সঙ্গে সঙ্গে। সুষেণবাবুর খাস কামরাটি নীচের তলায়। ছোট্ট কুঠরি, আসবাব বেশী নেই, দেওয়ালে কতকগুলো বাঘ-সিঙ্গির ছবি, ইংরিজী পত্রিকা থেকে কাটা। তক্তাপোষের ওপর ময়লা বিছানা পাতা, তার ওপর একটা জরাজীর্ণ বন্দুক, এক শিশি তেল, আর খানিকটা সুরকির গুঁড়ো। সুষেণবাবু বোধ হয় বন্দুকটার মরচে তুলছিলেন।

বল্‌লুম—'এটি আপনার বৈঠকখানা? বাঃ, খাসা বন্দুকটি ত। আপনি বুঝি রোজ ওতে তেল লাগান?'

সুষেণবাবু খুশী হ'য়ে বল্‌লেন—'লাগাতেই হবে, নইলে দরকারের সময় আটকে যাবে যে। বলছিলুম কি—আপনারা কানাই ঘোষালকে চেনেন?—যে ছোকরা নাগাড় পঁচাত্তর ঘণ্টা লালদিঘিতে সাঁতার দিয়েছিল? সে আমার খুড়তুতো ভাই হয়।'

আমি বললুম—'বটে?'

সুষেণবাবু সগর্ব্বে বল্‌লেন—'হাঁ। বলাই বাঁড়ুয্যেকে চেনেন?—যে ছোকরা সেদিন গড়ের মাঠে তিনটে গোরাকে ছাতা-পেটা করেছিল? আমার আপন মাসতুতো ভাই।'

বল্‌লুম—'বলেন কি! আপনারা দেখচি বীরের বংশ। বড় সুখী হলুম। আপনার আর কিছু বাণী নেই ত? আচ্ছা, বসুন তা হ'লে, নমস্কার।'

সুষেণবাবু হঠাৎ মুখখানি করুণ-পানা ক'রে বল্‌লেন—'পাঁচটা টাকা হবে কি? মাসকাবার হ'লেই শোধ ক'রে দেব।'

বাঁটলো একটা আধুলি ফেলে দিলে। আমরা রাস্তায় বেরিয়ে এলুম।

ছেলেদের বল্‌লুম—'আর ভাবনা কি, কেল্লা মার দিয়া। এখন চট্‌পট্‌ লাখ টাকা তুলে ফেল, নিদেনে দশ হাজার।'

কেউ উত্তর দিলে না, চুপচাপ একে একে নিজের নিজের ঘরমুখো হ'ল। কাত্তিক আর আমি বাঁটলোর সঙ্গে তার বাড়ি এলুম। বাঁটলোর বাপ নেই, নিজেই কত্তা, আর তার মা আমাকে খুব শ্রদ্ধা করেন। বাড়িতে অন্নছত্র লেগেই আছে, যতদিন খুশি থাকো, আদরযত্নের ত্রুটি হবে না।

বাঁটলোর পেটে কথা থাকে না, এসেই তার বোন তুবড়িকে সমস্ত ব্যাপার জানালে। মেয়েটা বিষম ফাজিল। তার ছোট খুবড়িও ফেলা যায় না, একটি খুদে পিঁপড়ে বিশেষ।

সকালবেলা তুবড়ি বললে—'চাটুয্যে মশায়, ছেলে-ধরারা আপনাদের ছেড়ে দিলে যে বড়?'

বল্‌লুম—'ছেড়ে আর দিয়েচে কই, বাড়ি না পৌঁছলে ভরসা পাচ্চি না।'

খুবড়ি কাত্তিকের সামনে হাত নেড়ে বল্‌লে—'চিনি দেবে থাবা থাবা, থলির ভেতর পুরবে বাবা—'

তুবড়ি বল্‌লে—'যা যা এখন বিরক্ত করিস না, বেচারা আগে তেল মেখে ঠাণ্ডা হোক। কাত্তিক-দা, তা হ'লে কেরাসিন আর দেশলাই এনে দি?'

কাত্তিক মুখখানা হাঁড়ি ক'রে ব'সে রইল।

তুবড়ি একটা পয়সা বার ক'রে বল্‌লে—'কাত্তিক-দা, এই লাখ টাকা ভরতি ক'রে দিলুম, জিগীষা দেবীকে আমার চাঁদাটা পাঠিও।'

থুবড়ি বল্‌লে—'ও কাত্তিক-দা, তোমার বাবা তোমায় কি বলেছিলেন বল না ?'

আমি বল্‌লুম—'কি আবার বলবেন, বলছিলেন খবরদার কাত্তিক, তুবড়ি থুবড়িকে বে করিস্ নি, তোর টুকটুকে বউ এনে দেব।'

তুবড়ি বল্‌লে—'লোটি রায়ের মতন গাইয়ে, ফাখ্‌তা খাঁর মতন নাচিয়ে। আচ্ছা কাত্তিক-দা, তুমি আমাদের ক্লাসের থাকোমণিকে বে করলেই ত পার, ঠিক যেমনটি চাও। ব'লব তাকে ?'

কাত্তিক তেড়ে উঠে বল্‌লে—'দেখ তুবড়ি আমায় রাগিও না বল্‌চি !'

তুবড়ি তিন হাত পেছিয়ে বল্‌লে—'বাস্ রে ! তরুণের খুন আগুন হয়েচে।'

এই রকম সারাদিন তুবড়ি আর থুবড়ির আক্রমণ চল্‌ল। বিকেলে কাত্তিক অতিষ্ঠ হয়ে বল্‌লে—'চাটুয্যে মশায়, এর চেয়ে বাবার গালাগাল ভাল, বাড়ি চলুন।'

যাবার সময় তুবড়ি বল্‌লে—'কাত্তিক-দা, রাগ করলে ?' কাত্তিক ভীষণ অবজ্ঞার ভঙ্গী ক'রে মুখ বাঁকালে। তুবড়ি একটু জিব বার ক'রে ভেংচালে।

চরণ ঘোষের মনে অনুতাপ হয়েছিল। আমায় বল্‌লে —'চাটুয্যে, কাত্তিককে জিজ্ঞেস কর ও কি চায়, দেড়শ টাকা অব্‌ধি খরচ করতে রাজী আছি। বাইসিকেল, সোনার হাতঘড়ি, এক সেট বই—যা ওর পছন্দ।'

কাত্তিককে জিজ্ঞাসা করলুম। একটু ভেবে বল্‌লে—'দেড়শ টাকায় মিটবে না চাটুয্যে মশায়।'

'বেশ ত, তোর কি জিনিষ পছন্দ বল্ না।'

'জিনিষ চাই না, মানুষ চাই।'

'কাকে চাস রে ?'

'তুবড়ি।'

'কিন্তু বল্লরী বাঁড়ুয্যে, লোটি রায়, ফাখ্‌তা খাঁ, এরা সব গেল কোথা ?'

কাত্তিক আমায় বুঝিয়ে দিলে যে তুবড়িই একমাত্র নারী। জিজ্ঞাসা করলুম—'কি দেখে ভুল্‌লি রে কাত্তিক ?'

'সেই যে, চ'লে আসবার সময় ভেংচেছিল, দেখেন নি ?'

চরণ ঘোষ বিচক্ষণ লোক, আপত্তি করলে না। অঘ্রান মাসেই কাত্তিকের বিয়ে হয়ে গেল। শুভকর্ম্ম চুকে গেলে রাত দশটার সময় থুবড়ি আমাকে আড়ালে ডেকে বল্‌লে - 'চাটুয্যে মশায়, হি হি হি !'

'কি হয়েচে রে ?'

'এই—দিদি—হি হি হি !'

'আরে গেল যা, হেসেই অস্থির! দিদির কি হয়েচে ?'

'এই—দিদি শুভদৃষ্টির সময় আবার জামাইবাবুকে—হি হি হি !'

'কি করেচে ?'

'ভেংচেচে।'

মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা

শ্রীকালিকারঞ্জন কানুনগো, এম-এ

"ইক্ হাড়া বুন্দী ধনী, মরদ মহোবাপাল।
সালত ঔরঙ্গজেব উর, বে দোনো ছত্রসাল॥"

ইতিহাসে ছত্রসাল (সংস্কৃত শত্রু-শাল) নাম সার্থক করিয়াছেন দুইজন। একজন—হাড়াবংশী বুন্দীরাজ ছত্রসাল, অপর জন—বুন্দেলখণ্ড-কেশরী মহারাজ ছত্রসাল বুন্দেলা। ইঁহারা দুইজনই ঔরঙ্গজেবের বুকে শল্য-স্বরূপ ছিলেন। প্রথম ছত্রসাল দারার পক্ষে সামুগড়ের যুদ্ধে বীরত্ব ও স্বামিধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া সবংশে নিহত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় ছত্রসাল শিবাজীর মন্ত্রশিষ্য—সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুজাগরণের অন্যতম নেতা এবং স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক। এই শেষোক্ত ছত্রসালের জীবন-চরিত সংক্ষেপে আলোচনা করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বংশ-পরিচয়

গহিরবার ক্ষত্রিয়গণ কাশী ও কনৌজে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঘোরী সুলতান শিহাবুদ্দীন কর্ত্তৃক পৃথ্বিরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী জয়চন্দ্রের পরাজয়ের পর গহিরবার বংশের এক শাখা বুন্দেলখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময়ে চন্দেল বংশীয়দের ক্ষমতা হ্রাস হওয়ায় নবাগত গহিরবারগণ তথায় সহজে আধিপত্য স্থাপন করেন। বুন্দেলা ও বুন্দেলখণ্ড নামের উৎপত্তি যাহা আমরা লাল কবির ছত্রপ্রকাশে পাই তাহা নিতান্তই বিশ্বাসের অযোগ্য। যাহা হউক পলাতক গহিরবারগণ রাজপুতানায় যেমন পরবর্ত্তীকালে রাঠোর নামে পরিচিত হইয়াছেন, সেরূপ ইঁহাদের অন্য শাখা নূতন উপনিবেশে বুন্দেলা বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহাদের নামানুসারে যমুনার দক্ষিণ, মালবের পূর্ব্ব, এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতের শাখা কৈমুর পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যাকীর্ণ ভূমি বুন্দেলখণ্ড নামে পরিচিত হইল। লালকবির মতে বুন্দেলখণ্ডে বুন্দেলাদের আদি রাজধানী ছিল ধরমপুর। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে এই বংশীয় প্রতাপরুদ্র * বা রুদ্রপ্রতাপ দেব ঔরছা নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া প্রায় সমস্ত বুন্দেলখণ্ড আপন অধিকারে আনিয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের প্রথম পুত্র ভারতীচন্দ্র, এবং অপুত্রক ভারতীচন্দ্রের মৃত্যুর পর রুদ্রপ্রতাপের দ্বিতীয় পুত্র আকবরের সমকালিক মধুকর শাহ ঔরছায় রাজা হইয়াছিলেন। রুদ্রপ্রতাপের তৃতীয় পুত্র উদয়াজীৎ মহোবায় সামন্তরাজরূপে রাজত্ব করিতেন। এই উদয়াজীতের প্রপৌত্র চম্পৎ রায় মহারাজ ছত্রসালের পিতা। মধুকর শাহের পুত্র বীরসিংহ দেব ঐতিহাসিক আবুল-ফজলকে হত্যা করিয়া জাহাঙ্গীরের অনুগ্রহে ঔরছার রাজত্ব পাইয়াছিলেন। বীরসিংহ দেবের পুত্র জুঝার সিংহ চৌরাগড় লুটের অংশ সম্রাট শাজাহানকে দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মোগল সৈন্য বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিল। এই বিদ্রোহদমন-ব্যাপারে বাদ্‌শাহের অন্তররুদ্ধ ধর্ম্মান্ধতার প্রথম গৈরিকস্রাব মোগল-সাম্রাজ্যের ভাবী অমঙ্গলের সূচনা করিল। ঔরছার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দেবমন্দির তাঁহার আদেশে মস্‌জিদে পরিণত হইল। জুঝার সিংহের স্ত্রী-কন্যারা মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মোগল-অন্তঃপুরে চিরবন্দিনী হইলেন। জুঝার সিংহের এক পুত্র ও মন্ত্রী স্বধর্ম্ম ত্যাগে অস্বীকৃত হওয়ায় ঘাতকের খড়্গে প্রাণবলি দিল। জুঝার সিংহের সহিত চম্পৎ রায়ের সদ্ভাব ছিল না। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি গৃহবিরোধ ভুলিয়া গেলেন। মোগল-সম্রাট বুন্দেলার বিভীষণ দেবীসিংহকে ঔরছার গদীতে বসাইয়াছিলেন (১৬৩৫ খৃঃ)। কিন্তু শত্রু দ্বারা রক্ষিত

---

* লালকবির বর্ণনানুসারে প্রতাপরুদ্রের একপুত্র ছিল কীরৃতি শাহ। ইনি নিশ্চয়ই আব্বাস সরবাণী কথিত কালিঞ্জর-রাজ কিরত (কিরাত নয়) সিংহ---যিনি শের শাহের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

বিজেতার হাতের পুতুলকে আত্মসম্মানী কোনো বীরজাতি রাজা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারে না।

চম্পৎ রায় মোগল-বিরোধী বুন্দেলা জাতীয় দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া, জুঝার সিংহের শিশুপুত্র পৃথ্বিনারায়ণকে ওরছার রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিছুদিন পরে পৃথ্বিনারায়ণ ধৃত হইয়া গোয়ালিয়র-দুর্গে প্রেরিত হইল; কিন্তু চম্পৎ রায় মোগলের সিংহাসনতলে মাথা নোয়াইলেন না। শিবাজীর পিতা শাহজীর মত তিনিও রাজা এবং রাজ্যশূন্য দলের অধিনায়ক হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বীরদর্পে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। মোগল-ঐতিহাসিকের চক্ষে চম্পৎ রায় সাম্রাজ্য ও সমাজের শত্রু—বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডের ইতিহাসে তিনি নির্ভীক স্বদেশপ্রেমিক—দেশ ও জাতির ত্রাণকর্ত্তা। আধুনিক ঐতিহাসিক চম্পৎ রায়কে দেশভক্ত বা বিদ্রোহী যাহাই বলুন ক্ষতি নাই। উভয়ের মধ্যে তফাৎটাও বড় বেশী নয়, কৃতকার্য্যতার মাপকাটি দিয়া বিচার করিলে অবশ্যই চম্পৎ রায় বিদ্রোহী দস্যু। কিন্তু বুন্দেলখণ্ডবাসী চিরদিন মনে রাখিবে—

> "প্রলয় পয়োধি উমণ্ড মে জ্যোঁ গোকুল যদু রায়।
> ত্যোঁ বুড়ত বুন্দেল কুল রাখ্যো চম্পৎ রায়॥"

অর্থাৎ, যদুপতি শ্রীকৃষ্ণ যেমন প্রলয় মেঘের অবিরাম বর্ষণ হইতে গাভীগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, তেমনই নিমজ্জমান বুন্দেলা-কুল চম্পৎ রায়কে আশ্রয় করিয়া রক্ষা পাইয়াছিল।

১৭০৬ বিক্রম সম্বতের (১৬৫০ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠ শুক্লা তৃতীয়ায় চম্পৎ রায়ের চতুর্থ পুত্র ছত্রসাল জন্মগ্রহণ করেন। ছত্রসাল অল্পবয়সেই অস্ত্রচালনা ও লেখা-পড়া বেশ শিখিয়াছিলেন। শিবাজী, আকবর, রণজিৎ সিংহ, হায়দর আলী ইত্যাদি মধ্যযুগের অধিকাংশ খ্যাতিমান পুরুষের মত ছত্রসাল নিরক্ষর ছিলেন না। মাতৃভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল, তিনি পরিণত বয়সে "শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন", "শ্রীরাম-যশ-চন্দ্রিকা", "হনুমদ্-বিনয়" ইত্যাদি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন—এগুলি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মুদ্রিত হইয়াছে। এই কবিতাগুলি উচ্চাঙ্গের না হইলেও ছত্রসালের জ্ঞানচর্চা এবং ধর্ম্ম-জীবনের একটা দিক হিসাবে এগুলির মূল্য আছে। ছত্রসালের পিতা চম্পৎ রায় নিরুপায় হইয়া কিছুকাল মোগল-সরকারে চাকরি করিয়াছিলেন। কিন্তু চাকরি করিতে হইলে ত্বকের স্থূলতা, চাটুবাদ, চুকলি ইত্যাদি যে-সব গুণ থাকা দরকার চম্পৎ রায়ের তাহা অর্জ্জন করিবার সুযোগ ঘটে নাই। এজন্য তাঁহার মুরব্বী শাহজাদা দারা শুকো তাঁহার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চম্পৎ রায় দারার সহিত ঝগড়া করিয়া মহোবায় ফিরিয়া আসিলেন। ছত্রসালের বয়স তখন পাঁচ ছয় বৎসর মাত্র। বিপদ, অভাব ও চাঞ্চল্যের মধ্যেই তিনি বাড়িয়া উঠিয়াছিলেন। ঔরঙ্গজেব দিল্লীর তক্তে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চম্পৎ রায়কে দমন করিবার জন্য সচেষ্ট হইলেন। বুন্দেলখণ্ডে আত্মরক্ষা অসম্ভব ভাবিয়া চম্পৎ রায় মুক্তপিঞ্জর ব্যাঘ্রের মত পঁচিশজন মাত্র অনুচর লইয়া দক্ষিণ দিকে ছুটিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের মত দক্ষ শিকারীর হাত হইতে তিনি পলাইবেন কোথায়? ছত্রসালের মাতুল সাহেব রায় নিজ ভগ্নীপতিকে কয়েদ করিয়া বাদশাহের হাতে সঁপিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন। চম্পৎ রায় ও রাণী কালীকুমারী বিশ্বাসঘাতক ধন্ধেরাদের হাতে পড়িবার ভয়ে আত্ম-হত্যা করিলেন।

মাতাপিতার শোচনীয় মৃত্যুর পর, মাতুলালয় ছত্রসালের পক্ষে জতুগৃহবাসের ন্যায় হইয়া উঠিল। একদিন সুযোগ পাইয়া তিনি বড়ভাই অঙ্গদ রায়ের নিকট দেবগড়ে পলাইয়া গেলেন। কপর্দ্দকশূন্য, আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত দুই ভাই মায়ের কিছু অলঙ্কার (যাহা অঙ্গদ রায় দৈলবারায় লুকাইয়া রাখিয়া-ছিল)—বিক্রয় করিয়া পাথেয় সংগ্রহপূর্ব্বক দাক্ষিণাত্যে মির্জ্জারাজা জয়সিংহের অধীনে মোগল-সৈন্যে যোগ দিলেন (১৬৬৫ খৃঃ)। এই সময়ে ছত্রসালের বয়স মাত্র পনর বৎসর।

মোগল-সেনাপতি লোক চিনিতেন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পুরন্দর-দুর্গ অবরোধকালে ছত্রসাল ও অঙ্গদ রায় বিশেষ সাহস ও কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। জয়সিংহের সুপারিশে সম্রাট ঔরঙ্গজেব চম্পৎ রায়ের দুই পুত্রের

বুন্দেলা-কেশরী ছত্রসাল

একখানি প্রাচীন চিত্র হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া পুরস্কার-স্বরূপ অঙ্গদ রায়কে এক হাজারী ও ছত্রসালকে তিনশত সদী মন্‌সব্‌দারের পদ দিলেন। পুরন্দরের সন্ধির পর সম্মিলিত মোগল ও মারাঠা সৈন্য যখন বিজাপুর আক্রমণ করে, ছত্রসাল তাহাদের বিভিন্ন যুদ্ধনীতি বিশেষভাবে শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। পাঁচ বৎসর (১৬৬৫—১৬৭০ খৃঃ) মোগল-সরকারে চাকরি করিবার পর ছত্রসাল শেষে মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীর কাছে পলাইয়া গেলেন।

মির্জ্জারাজা জয়সিংহ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন চাকরির আঁচ ছত্রসালের গায়ে লাগে নাই। ১৬৬৭, জুলাই মাসে তাঁহার মৃত্যুর পর ছত্রসাল সম্ভবতঃ পাঠান সেনাপতি দিলীর খাঁর অধীনে দেবগড় আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। এ যুদ্ধে ছত্রসাল আহত হন। কিন্তু পুরস্কারের বেলা তাঁহার ভাগ্যে কিছুই মিলিল না, অথচ সেনাপতির মন্‌সব্ বাড়িয়া গেল। এই ব্যাপারে চাকরিতে তাঁহার ঘৃণা ও ধিক্কার জন্মিল। তাঁহার মুরব্বী জয়সিংহের প্রতি বাদশাহ ঔরঙ্গজেবের ব্যবহার দেখিয়াও তাঁহার চোখ খুলিয়াছিল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের স্বধর্ম্মপ্রীতি পরধর্ম্মনির্যাতনের আকার ধারণ করিল। ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সমস্ত সুবাদারগণের প্রতি আদেশ জারি হইল যেন তাঁহারা নিজ নিজ প্রদেশে অ-মুসলমানদের পাঠশালা এবং দেবমন্দির ধ্বংস করেন। ঔরঙ্গজেব এ বিষয়ে পিতৃ-পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পূর্ব্বে কোনো মুসলমান রাজার কোপদৃষ্টি হিন্দু গৃহস্থবাড়ীর বাঁশ-খড়ের ঠাকুরঘর পর্য্যন্ত পৌছায় নাই। বাদ্‌শা যে-হিন্দুসমাজকে মৃত মনে করিয়া কবরের ব্যবস্থা করিতেছিলেন তাহাই সহসা গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। হিন্দুর এই পুনরুত্থানকে সপ্তদশ শতাব্দীর এক বিরাট শূদ্র-জাগরণ বলা যাইতে পারে। শূদ্র শিবাজীই এই নব-বোধনের পুরোহিত। আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কিছুকাল নীরব থাকিয়া শিবাজী এ সময়ে (১৬৭১ খৃঃ) আবার ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। শিবাজীর এই শেষ যুদ্ধই প্রকৃত স্বাধীনতাসংগ্রাম—যাহার লেলিহান শিখা দক্ষিণী হাওয়ায় উত্তরাপথে বিস্তৃত হইয়া সম্রাট্ ও সাম্রাজ্য উভয়কেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। কুমার ছত্রসাল এই স্বাধীনতা-যজ্ঞে আত্মাহুতি দিবার জন্য সহস্র বিপদ তুচ্ছ করিয়া শিবাজীর কাছে উপস্থিত হইলেন। সম্রাটের আশ্রয়, উন্নতির সুপ্রশস্ত পথ, আত্মীয়-স্বজন এবং জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডের মায়া কাটাইয়া ছত্রসাল যে মহান্ ভাবের অনুপ্রেরণায় স্বেচ্ছাসেবকরূপে শিবাজীর সহায় হইতে চাহিয়াছিলেন তাহার উপমা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিরল। দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া স্বাধীনতাকামীদের জন্য যুদ্ধ করিবার যে প্রেরণা রুসোর মন্ত্রশিষ্য ফরাসী যুবকগণ পাইয়াছিলেন, যে অজ্ঞাত আহ্বানে তাঁহারা মার্কিনের স্বাধীনতা-সংগ্রামে জর্জ্জ ওয়াশিংটনের পতাকাতলে সমবেত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন, একশত বৎসর পূর্ব্বে সেই একই প্রেরণাবলে ভাবপ্রবণ যুবক ছত্রসাল মহারাষ্ট্র শিবিরে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। ছত্রসালের নিভীক নিঃস্বার্থ আত্মদানে শিবাজীর বুক আনন্দে ও আশায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি মনে করিলেন, ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলে তাঁহার সুযশটুকু মহারাষ্ট্রই আত্মসাৎ করিবে। ভারত-আকাশের প্রভাতী তারকা সহ্যাদ্রির নিবিড় অরণ্যানীর অন্তরালে ক্ষীণভাবে জ্বলিয়া অস্ত যাইবে। অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত সমাজে ছত্রসালের প্রতিভার সহজ স্ফূর্ত্তি হইবে না—তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র বুন্দেলখণ্ড। তাই তিনি কয়েক দিন পরে ছত্রসালকে সস্নেহে জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন।

কেহ কেহ বলেন, শিবাজী ফাঁকা কথায় ছত্রসালকে বিদায় দিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রত্যাখ্যানে ছত্রসাল ভগ্নহৃদয়ে মারাঠা-দরবার হইতে প্রস্থান করেন। লালকবি কোথাও এরূপ আভাস দেন নাই—এই সঙ্কীর্ণতার ইঙ্গিত করিলে শিবাজীর প্রতি অবিচার করা হয়। ছত্রসালের শক্তি ও মহান্ ভাব শিবাজী নিজ স্বার্থে ব্যয় না করিয়া মধ্যভারতে স্বাধীনতা-যুদ্ধের আয়োজনে নিযুক্ত করেন।

ছত্রসাল দেশ ও ধর্ম্মের জন্য যুদ্ধে নামিতে কৃতসঙ্কল্প, সুতরাং শত্রুমিত্রনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক হিন্দুকে এ কার্য্যে

ব্রতী করিবার চেষ্টা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। তিনি নিজের সঙ্কীর্ণতা ও পূর্ব্ব শত্রুতা ভুলিয়া তাঁহার পিতার পরম শত্রু রাজা শুভকরণ বুন্দেলার সহিতই প্রথমে দেখা করিলেন। শুভকরণ কয়েকদিন বিশেষ স্নেহ করিয়া ছত্রসালকে নিজের কাছে রাখিলেন এবং যুবকের উৎকণ্ঠা এবং বিষণ্ণতায় দয়াপরবশ হইয়া বাদশাহের কাছে তাহার জন্য উচ্চ মনসব এবং মহোবার জাগীর প্রার্থনা করিয়া উকীল পাঠাইতে চাহিলেন। এক সময়ে ইহা অপেক্ষা অল্পেও হয়ত ছত্রসাল আজীবন সম্রাটের সেবা করিতেন। কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া আজ তাঁহার প্রেয় কিছুই নাই। তিনি বিনা দ্বিধায় বলিয়া ফেলিলেন—আমি চাকরি করিব না—বাদশার সহিত যুদ্ধ করিব। দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ? এ যেন গলায় পাথর বাঁধিয়া সন্তরণের চেষ্টা। শুভকরণ ত অবাক! আন্তরিক রাজভক্তি না থাকিলেও শুভকরণ সে কালের 'মডারেট'—পাছে বিপদে পড়েন এই ভাবিয়া তিনি ছত্রসালকে তৎক্ষণাৎ বিদায় দিলেন। ধরাইয়া দিলে নিশ্চয়ই কিছু পুরস্কার মিলিত, কিন্তু বাদশা ঔরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ হিন্দু-গণকে এই নীচতার কিছু উর্দ্ধে টানিয়া তুলিয়াছিল। রাজদণ্ড কিংবা নেতৃত্বলাভের দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা লইয়া ছত্রসাল এ কার্য্যে অবতীর্ণ হন নাই—যোগ্যতর ব্যক্তির পরিচালনায় তিনি কাজ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। সুতরাং শুভকরণ তাঁহাকে এ ভাবে বিদায় দেওয়ায় তাঁহার দুঃখ কিংবা চিত্তের অবসাদ ঘটিল না। তিনি অন্যান্য হিন্দুরাজাদের কাছে গেলেন, কিন্তু সর্ব্বত্রই ব্যর্থমনোরথ হইলেন। দিল্লীশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া স্বাধীনাতলাভের দুরাশা কাহারও মনে স্থান পাইল না। ঠিক এই সময়ে ঔরঙ্গজেব ফিদাই খাঁকে ঔরছার মন্দির-গুলি ধ্বংস করিবার আদেশ দিলেন। শঙ্খধ্বনি কানে গেলে মুসলমানের নিস্তার নাই—এ কথা সম্রাট নূতন ভাবে ঘোষণা করিলেন—

"কৌ কহুঁ কান সংখ ধুনি আওবে।
মুসলমান তৌ ভিস্ত ন পাওবে॥
সিসৌ ঔটি কান জৌ নাওবে।
তৌ দোজখ তে খুদা বচাবে॥
তাতে চাহি দেবালৈ দীহৈ।
তিনকে ঠৌর মসীদে দীজৈ॥
মুলনা তহাঁ নিবাজ গুদারে।
বাঁগ দেহি নিত সাঁঝ সকারে॥
ন্যাউ চুকাবে ফাজিল কাজী।
জাতে রহে গোসাই রাজী॥*

ফিদাই খাঁ গোয়ালিয়র হইতে একদল সৈন্য লইয়া বাদশাহের হুকুম তামিল করিতে ঔরছায় আসিল। ঔরছার রাজা সুজান সিংহ এ সময়ে বাদশাহের কাজে দাক্ষিণাত্যে গিয়াছিলেন। তিনি ঔরছায় উপস্থিত থাকিলে হয়ত তাঁহার পিতা (?) দেবীসিংহের মত মন্দিরধ্বংস-ব্যাপারে উদাসীন থাকিতেন, অন্তত বাধা দিতে সাহস করিতেন না। হিন্দু রাজা-মহারাজাদের মধ্যে যাঁহার মনসব যত উঁচু এবং রাজ্য যত বড়, তাঁহার মানসিক কাপুরুষতাও সে অনুপাতে বেশী ছিল। ভয়ভাবনা বা পাটোয়ারি বুদ্ধি জনসাধারণের স্বাভাবিক সাহস ও সৎকর্ম্মের প্রেরণাকে দমিত করে না। এজন্য ঔরছাবাসীরা রাজার অনুমতির অপেক্ষা না রাখিয়া বক্‌শী ধর্ম্মাঙ্গদের সেনাপতিত্বে মোগল সৈন্যকে গোয়া-লিয়রের সীমা পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিল। এ সংবাদ রাজা সুজান সিংহের কাছে পৌঁছিলে তিনি প্রমাদ গণিলেন। বাদশাহের সহিত শত্রুতায় পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। জুঝার সিংহের শোচনীয় অবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি অৰ্দ্ধমৃত হইলেন। এ অপরাধের জন্য ঔরঙ্গজেবের ক্ষমা লাভ করিতে হইলে, হয়ত মন্দিরগুলি নিজ খরচায় ভাঙিতে হইবে—যাহারা ধর্ম্মরক্ষার জন্য ফিদাই খাঁর সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাদিগকে সম্রাটের নির্দ্দেশ-মত শাস্তি দিতে হইবে। গোঁয়ার বুন্দেলাগণের এ হঠকারিতায় রাজার পশ্চাৎ অপসরণের পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। তিনি দায়ে পড়িয়া বুন্দেলখণ্ডের গৌরব ও হিন্দুর মালা-তিলক রক্ষার জন্য সচেষ্ট হইলেন। সুজান সিংহ শুনিলেন, ছত্রসাল মোগলদের সহিত যুদ্ধ করিবার

---

* কানে শঙ্খধ্বনি আসিলে মুসলমান ত বেহেস্তে যাইতে পারিবে না। এক্ষেত্রে যদি দুইটি কান ধরিয়া জমিতে মাথা ঠেকায় তবে খোদা তাহাকে দোজখ হইতে বাঁচাইতে পারেন। দেবালয়গুলি ধ্বংস করিয়া উহার উপর মসজিদ তৈয়ার করা হোক্, যেখানে মৌলানা নিত্য সকালসন্ধ্যায় আজান দিয়া নমাজ পড়িবে; বিদ্বান কাজী ন্যায় বিতরণ করিবে। এরূপ করিলে খোদাতালা রাজী থাকিবেন।

জন্য বুন্দেলখণ্ডে যাইতেছেন। চম্পৎ রায়ের পুত্র তাঁহার পরিবারের শত্রু। কিন্তু পরের সহিত বিবাদে জ্ঞাতিশত্রুতা ভুলিয়া যাওয়াই মহত্ত্বের পরিচায়ক। ছত্রসাল সুজান সিংহের কাছে কিছু ভরসা পাইয়া ঔরঙ্গাবাদে বলদেব নামক বুন্দেলা-সর্দ্দারের সহিত দেখা করিলেন। এখানে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি "ইসারা" বা দেবাদেশ গ্রহণ করিয়া উভয়ে একত্র বুন্দেলখণ্ডের দিকে অগ্রসর হইলেন।

১৬৭২ খৃষ্টাব্দে (১৭২৮ বিঃ সম্বৎ *) বাইশ বৎসর বয়সে ছত্রসাল অখণ্ডপ্রতাপ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। অনেকদিন বেকার বসিয়া থাকায় তাঁহার হাতে কিছুই ছিল না। মাতা কালীকুমারীর অবশিষ্ট কয়েকখানি অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া মাতৃভূমির দাসত্ব-মোচনের মূলধন সংগৃহীত হইল। পাঁচজন অশ্বারোহী এবং পঁচিশজন মাত্র পদাতিক অনুচর লইয়া তিনি যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন। ছত্রপুরের বাইশ মাইল দক্ষিণে বিজোর বা বিজোরী নামক স্থানে ছত্রসালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রতন শাহ বাদ্‌শাহের প্রদত্ত জাগীর ভোগ করিতেছিলেন। ছত্রসাল তাঁহাকে আঠার দিন পর্য্যন্ত অনেক বুঝাইয়াও ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধাচরণে রাজী করাইতে পারিলেন না। কিন্তু এ সময়ে বাকী খাঁ বুন্দেলা নামক পাঠান দস্যুসর্দ্দার আসিয়া অপ্রত্যাশিতভাবে ছত্রসালের দলে যোগ দিল। বাকী খাঁ দস্যু হইলেও মোগলের শত্রু এবং বুন্দেলখণ্ডের সন্তান। কোনো দেশে দেশভক্তের দলে সবই "কেটো", "ব্রুটাস্" হয় না। কার্য্যারম্ভের প্রথমে স্থির হইল, বুন্দেলখণ্ডের এই স্বদেশী দল লুটতরাজ করিয়া হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে মোগলপক্ষীয় জাগীরদারগণকে উত্যক্ত করিবে। তাহারা যদি দলে যোগ দেয় কিংবা "চৌথ" (রাজস্ব) দিতে স্বীকৃত হয় তবেই অব্যাহতি পাইবে। সমস্ত দেশে লুটতরাজ আরম্ভ করিলে শত্রুরা মানভয়ে পলাইয়া যাইবে এবং দেশ নিজেদের হাতে আসিবে ও লোকেরা তাহাদের দলভুক্ত হইবে। এই ডাকাত-জয়েণ্ট-ষ্টক্ কোম্পানির লাভের শতকরা পঞ্চান্ন ভাগ ছত্রসাল এবং পঁয়তাল্লিশ ভাগ দেওয়ান বলদেব পাইবেন—ইহাও কথা-বার্ত্তায় স্থির হইল। এইভাবেই বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতা-সমরের উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত হইল। বারান্তরে যুদ্ধপর্ব্ব আলোচিত হইবে।

* ছত্রপ্রকাশ, পৃঃ ৭৯।

নিরুপায়

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

শ্রমিকের ফাট্‌ছে পিলে ধনিকের বুটের ঘায়ে,
বণিকের বংশ বাড়ে তেতলার প্রাসাদ-ছায়ে;
কে খাটে কেই বা খাটায়,
কেবা কাল খেলায় কাটায়,—
যে বোনে গায়ের কাপড়, সে মরে আদুল গায়ে!

বাহবা বিধির বিধান, বাজা ভাই বাজ্‌না বাজা,
ঢেকে দে ভাব্‌না যত,—দুনিয়ার এম্‌নি রাজা!
চোরেরা বাড়ছে খাসা,
সাধুরা কোণায় ঠাসা,
রেখে দে ধর্ম্ম কথা, নিয়ে আয় কাঁক্‌ড়া ভাজা!

ওরে ভাই বড্ড ক্ষিদে, কি করি, বল্‌তো উপায়,
লাগা না ফন্দী ফিকির, যা' করে' ভাই মিলবে দুপাই!
পশুরাও খাচ্ছে চরে',
মানুষে ক্ষিদেয় মরে—
রাজাদের ঘর ভরে' যায় প্রজাদের শ্রমের রূপায়!

কত আর সহ্য হবে, বেটারা মোটর চড়ে;
দুবেলা পোলাও খেয়ে বসে' বেশ আরাম করে!
দেখা হয় পথের ধারে—
গুমরে চিন্‌তে নারে,
দুটাকা চাইতে গেলেই মাথাতে টনক নড়ে!

চুরিটা মন্দ কিসে—যত সব ফক্কিকারী,
গরিবে রাখতে চেপে বড়দের খবরদারী !
এদিকে পেট জ্বলে' যায়,
কি হবে পুঁথির কথায় ?
পরকাল পচুক চুলায়—বাঁচাটাই কেলেঙ্কারী !

যদি বা ধরাই পড়ি, তাতে আর ভয় কি আছে !
ছেলেটা ধুঁকছে জ্বরে, রেখে যাই কা'র বা কাছে ?
সে মাগী গর্ভে ধরে',
বেঁচেছে পূর্ব্বে মরে',
একা তাই ভাবছি বসে', কি করে দুদিক্ বাঁচে !

জমীটার খাজনা দেবার এসেছে জোর তাগাদা,
মোটে যে হয়নি ফসল, রাজা তো বুঝবে না তা !
ভিটে'মোর সাত পুরুষে
তবু নেয় পয়সা ঠুসে',—
কোথাকার কেমন বিধান, বুঝি না তাও তো দাদা !

মাটি তো সঙ্গে করে' আনেনি রাজার ছেলে,
সে বেটা জন্মে' শুধু কি করে' দখল পেলে ?
চিরদিন লাঙ্গল ধরে'
এসেছি আবাদ করে'—
তার আবার পাওনা কিসের, দিব যে চাইতে এলে !

মাটি তো মাটিই বেটি, মুখে তার রা না কাড়ে,
নইলে ছিদাম দুলে কারুকে এম্নি ছাড়ে !
থাক্ তোর আইন কানুন,
ঘরে যার জুটছে না নুন,
সে দেবে পয়সা গুণে', কে বা তা চাইতে পারে !

পেটে যে পায়না খেতে, সে দেবে মাশুল কড়ি —
কা'কে—যে সোনার খাটে শুয়ে রয় উদর ভরি',
অথচ কুপিয়ে মাটি
না খেয়ে মোরাই খাটি,—
টাকা তো সৃষ্টি মোদের, তারা পায় কেমন করি' ?

সাধে কি রাগছি রে ভাই—ছেলেটা কদিন ধরে'
বাদলে আমন রুয়ে পড়েছে এম্নি জ্বরে !
দেখাব বদ্দি যে ভাই,
তারো যে পয়সাটি নাই,
পাওয়াব মিছরী সাবু—তাই বা পাই কি করে' ।

যাক্‌গে,—মোড়ল দাদা, ঠিলি কি খালিই নাকি ?
দ্যাখো না উপুড় করে', দুফোঁটা নাই কি বাকী ?
ভেবোনা ছিদাম দুলে
নেশাতে পড়বে ঢুলে'—
নসীবে ঘটবে না তা—তা'তে যে ভালোই থাকি !

মাগীটা ভালোই গেছে—কি বলো বলাই কাকা,
দুনিয়ায় মরাই ভালো, নাই যার পয়সা টাকা !
ছেলেটা ধুঁকছে জ্বরে—
দ্যাখোনা, মরছি ডরে,
সে মাগী ভাগ্যবতী, পড়েছে চিতায় ঢাকা !

ভগবান্ ! থাকিস্ যদি, একবার আয় তো কাছে,
আমি যে মুখ্যু মানুষ—শুনি কি বলার আছে !
কতদিন লুকিয়ে র'বি,
দুনিয়ায় পয়সা সবই—
কথাটা বল্‌তো মুখে—বুঝে' নিই কতক আঁচে !

মানুষের সাচ্চা—ঝুটার যদি-না কদর থাকে,
দেহে যার শক্তি আছে, বুঝানোর কাজ কি তাকে ?
ডাকাতী জুচ্চুরী ত,
কেহ নাই দণ্ড দিতে—
যদি হয় এমন ধারা, কে ফাঁকে ছাড়বে কা'কে !

কি বলিস্ মোড়ল দাদা, ভয়ে কি ভড়কে গেলি ?
মনে হয়, মাটির মতন দুনিয়ায় পাল্‌টে ফেলি ।
উঁচু সব ঢেলায় ধরে'
চষে দিই সমান করে',—
পয়সার কোথায় বাসা, দেখি তাই কোদাল ঠেলে' !

রাত, ভাই অনেক হ'লো, ছোঁড়াটা করছে বা কি !
ভাল না লাগছে কিছু, না-লাগার কসুরটা কি ?
সাবু আর মিছরী কেনা,—
কেউ তো ধার দেবে না,—
যা থাক্‌ক কপাল ঠুকে' লাঠিটা বাগিয়ে রাখি !

খুকীর কাণ্ড

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

হরি মুখুয্যের মেয়ে উমা কিছু খায় না। না খাইয়া খাইয়া রোগা হইয়া পড়িয়াছে বড়।

উমার বয়স এই মোটে চার। কিন্তু অমন দুষ্ট মেয়ে পাড়া খুঁজিয়া আর একটি বাহির করো তো দেখি?··· তাহার মা সকালে দুধ খাওয়াইতে বসিয়া কত ভুলায়, কত গল্প করে, সব মিথ্যা হয়। দুধের বাটিকে সে বাঘের মত ভয় করে—মায়ের হাতে দুধের বাটি দেখিলেই সোজা একদিকে টান্ দিয়া দৌড়।

মা বলে—রও, দুষ্টু মেয়ে, তোমার দুষ্টুমি আমি—দুধ খাবেন না, সুজি খাবেন না, খাবেন যে কি দুনিয়ায় তাও তো জানি নে—চলে আয় ইদিকে—

খুকী নিরুপায় দেখিয়া কান্না সুরু করে। তাহার মা ধরিয়া ফেলিয়া জোর করিয়া কোলে শোয়াইয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দুধ খাওয়ায়। কিন্তু জোরজবরদস্তিতে অর্দ্ধেকের ওপর দুধ ছড়াইয়া গড়াইয়া অপচয় হয়,—বাকী অর্দ্ধেকটুকু কায়ক্লেশে খুকীর পেটে যায় কি না যায়।

সময়ে সময়ে সে আবার মায়ের সঙ্গে লড়াই করে। চার বছর বয়স বটে, না খাইয়া খাইয়া কাটি কাটি হাত-পাও বটে, কিন্তু তাহাকে কায়দায় ফেলিতে তাহার মায়ের এক একদিন গলদ্‌ঘর্ম্ম। রাগ করিয়া মা বলে—থাকো আপদ বালাই কোথাকার—না খাও তো বয়ে গেল আমার—সারাদিন খেটে খেটে মুখে রক্ত উঠবে, আবার ওই দস্যি মেয়ের সঙ্গে দিনে পাচবার কুস্তী করে দুধ খাওয়াবার শক্তি আমার নেই—মর শুকিয়ে।

খুকী বাঁচিয়া যায়, ছুটিয়া একদৌড়ে বাড়ীর সাম্‌নের আমতলায় দাঁড়াইয়া চেঁচাইয়া সমবয়সী সঙ্গিনীকে ডাকে—ও নেনু-উ-উ—

তাহার বাবা একদিন বাড়িতে বলিল—দ্যাখো খুকীটাকে আজ দিন-পনেরো ভালো করে দেখিনি---আস্‌বার সময় দেখি পথের ওপর খেলা কচ্চে, এমনি রোগা হয়ে গিয়েচে যেন চেনা যায় না, পিঠটা সরু, কণ্ঠার হাড় বেরিয়েচে, অসুখ-বিসুখ নেই, দিন দিন ওরকম রোগা হয়ে পড়্‌চে কেন বলো তো?

খুকীর মা বলে—পড়্‌বে না আর রোগা হয়ে? সারা দিন রাতে ক'ঝিনুক দুধ পেটে যায়? মরে মরুক্, আমি আর পারি নে লড়াই করতে···কে এখন অই দস্যি মেয়েকে রোজ রোজ যায় দুধ খাওয়াতে? যাই ওর কপালে থাকে তাই হোক্ গে—

তাই হয়। দস্যি মেয়ে শুকাইতে থাকে।

•

ভাদ্র মাস, হঠাৎ বর্ষা বন্ধ হইয়া রৌদ্র বড় চড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রামের ডোবা পুকুরে সারা গাঁয়ের পাট-ক্ষেতের পাটের আঁটী ভিজানো। নদীর ধারে কাশের ফুল ফুটিয়াছে।

গ্রামের হীরু চক্রবর্ত্তীর আড়তে এই সময়ে কাজকর্ম্মের বড় ভীড়। নানাদেশের ধানের ও পাটের নৌকা সব গঙ্গার ঘাটে জড় হইয়াছে। হরিশ যুগী আড়তের কয়াল, কাঁটার ফের্‌ত্তায় এক মণ ধানে আরও সের-দশেক ঢুকাইয়া লওয়া তাহার কাছে ছেলে-খেলা মাত্র। হাঙ্গরের মুখ-খোদাই বড় একখানা মহাজনী নৌকা হইতে ধানের বস্তা নামিতেছে, পট্‌পটি গাছের ছায়ায় উঁচুকরা ধানের স্তূপ হইতে হরিশ সুর সংযোগে কাঠায় করিয়া ধান মাপিতেছে—রাম রাম, রাম-হে রাম, রাম-হে দুই, দুই-দুই, দুই-হে তিন, তিন-তিন—

গফুর মাঝি ডাবা হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে বলিতেছে—তা নেন্ গো কয়াল মশাই, একটু হাত চালিয়ে নেন্ দিকি মোরা একবার দেখি? ইদিকি নোনা গাঙের গোন্ নাম্‌লি কি আর নৌকো বাইতি দেবানে?···

হরি মুখুয্যে মশায়কে একটু ব্যস্তসমস্তভাবে

আসিতে দেখিয়া হীরু চক্রবর্ত্তী বলিলেন —আরে এসো হরি, কি মনে করে ?…এসো তামাক খাও—

—না থাক্ তামাক---ইয়ে আমার মেয়েটাকে ইদিকে দেখেচো হীরু ? না ?…বড় মুস্কিলে ফেলেচে বাঁদর মেয়ে— বারোটা বাজে, সেই বাড়ী থেকে নাকি বেরিয়েচে সকাল ন'টার সময়—একটু দেখি ভাই খুঁজে—এত জ্বালাতনও করে তুলেচে মেয়েটা সে আর তোমাকে কি বোল্‌বো—

অনেক খোঁজাখুঁজির পরে রায়বাড়ীর পথে উমারাণীকে ধূলার উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া কি-একটা হাতে লইয়া চুষিতে ও আপন মনে বকিতে দেখা গেল।

— ওরে দুষ্টু মেয়ে—

হরি মুখুয্যে গিয়া মেয়েকে কোলে তুলিয়া লইলেন। বাবার কোলে উঠিতে পাইয়া উমা খুব খুশি হইল—হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিল—বাবা, ও বাবা—ওই ওদের নান্থ—ভারি দুঁত্তু—এঁই—এই—দুধ খায় না—আমি দুধ খাই—না বাবা ?

—বেশ মেয়ে, দুধ খেতে হয়। ওটা কি খাচ্চিস, হাতে কি ?

—নেবেঞ্চুস্—ওই —ওই পুঁটির মামা এসেচে, তাই দিয়েচে।

বাড়ীতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উমারাণীর শাস্তি সুরু হয়। বাটিভরা দুধ, ঝিনুক, টানাটানি ইত্যাদি। তাহার কান্না, কাকুতি-মিনতি পাষাণী মা শোনে না— জোর করিয়া ঝিনুক মুখে পুরিয়া দিয়া ঢোকে ঢোকে দুধ খাওয়ায়—শেষের দিকটায় সে পা ছুড়িতে গিয়া খানিকটা দুধসুদ্ধ বাটিটা উল্টাইয়া ফেলিয়া দিল।

দুম্-দুম্ দুই নির্ঘাত কিল পিঠে। পিঠ প্রায় বাঁকিয়া যায়।

—হতভাগা দস্যি আপদ কোথাকার—ছ'সের করে দুধ টাকায়,ভাত জোটে না দুধের খরচ যোগাতে যোগাতে প্রাণ গেল – দস্যি মেয়ের ন্যাক্‌রা দেখো—আদ্ধেকটা দুধ কি না ঠ্যাং ছুঁড়ে মাটিতে দিলে ফেলে ?…

খুকী দম্ সামলাইয়া লইবার পরে পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল—অনেকক্ষণ কাঁদিল।

বেলা পড়িয়া আসে। ওদের উঠানে পূর্ব্বপুরুষের আমলের বীজু আমগাছের ছায়ায় অপরাহ্নের রোদকে আটকাইয়া রাখে। উমারাণী বসিয়া বসিয়া ভাবে— অপরের বাড়ীতে ভাল খাবার খাইতে পাওয়া যায়— মিষ্টি—তাহাদের বাড়ীতে শুধু দুধ আর দুধ।

তাহার মা বলিল—টীপ্ পরবি ও দস্যি ?

উমারাণী ঘাড় নাড়িয়া মায়ের কাছে সরিয়া আসিল।

—বলে নয়ন তারা টীপ্, দুটো করে এক পয়সায়,— বেশ টীপ্‌গুলো —সরে এসে বোস্ দিকি ?

টীপ পরিয়া খুকী আবার পাড়া বেড়াইতে বাহির হয়, বাঁশবনের তলা দিয়া গুটিগুটি হাঁটে। পুনরায় সে লোভে লোভে রায়বাড়ী যায়, পরের বাড়ীতেই যত ভাল খাবার। বিস্কুট, লেবেঞ্চুস্, কত কি।

নান্থদের উঠানে পেঁপেগাছের মাথার দিকে তাহার চোক পড়িতে সে প্রথমটা অবাক হইয়া গেল—সঙ্গিনীকে ডাকিয়া দেখাইয়া কহিল — ও নান্থ —ঐ পিঁপে !

পেঁপে তাহার মা কাটিয়া খাইতে দেয়, বেশ খাইতে লাগে, কিন্তু তাহা গাছের আগ্‌ডালে কি অমনভাবে দোলে ! ··চাহিয়া চাহিয়া সে কিছু ঠাহর করিতে পারিল না।

পূজার কিছু পূর্ব্বে উমারাণীর আপন মামা কলিকাতা হইতে আসিল। এত ধরণের খাবার কখনও সে চক্ষেও দেখে নাই। কিস্‌মিস্ দেওয়া মেঠাই, বড় বড় অমৃতি জিলিপি, গজা, কমলালেবু আরও কত কি।

পাশের গ্রামে মামার এক বন্ধুর বাড়ী। মামা পরদিন সকালে উঠিয়া তাহাকে সাজাইয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল।

পথে কে একজন সাইকেলে চড়িয়া যাইতেছে, উমারাণী চাহিয়া চাহিয়া দেখিল। মামাকে বলিল— ও কে গেল মামা ?

—ও রাস্তা দিয়ে যাচ্চে একজন লোক—

উমারাণী বলিল—ফরসা মুখ, ফরসা জামা গায়, না মামা ?…চমৎকার !…

তাহার মামা হাসিয়া বলিল—'চমৎকার' কথাটা তুই শিখলি কি করে ?—আচ্ছা খুকু তুই ওকে বিয়ে করবি ?

উমারাণী সপ্রতিভ মুখে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল তাহার কোন আপত্তি নাই।

ভাদ্রের শেষ, ম্যালেরিয়ার সময়, তবে এখনও খুব বেশী আরম্ভ হয় নাই, বাড়ী বাড়ী কাঁথামুড়ি দেওয়া সুরু হইতে এখনও দেরী আছে।

উমারাণীর হাঁটুনির বেগ নিস্তেজ হইয়া পড়িতে থাকে, ক্রমে সে মাঝে মাঝে পথের ধারে বসিতে লাগিল, মাঝে মাঝে হাই তুলিতে লাগিল। তাহার মামা বলিল—কি হয়েচে খুকু, রদ্দুর বড্ড বেশী, আর বেশী নেই চলো—

বন্ধুর বাড়ি পৌছিবার পূর্ব্বেই উমারাণী বলিল—মামা আমার শীত লাগচে—

—শীত কি রে? ভাদ্রমাসে এই গরমে শীত? ও কিছু না, চলো—

খুকী আর কিছু না বলিয়া বেশ চলিল বটে, কিন্তু খানিকদূর গিয়া তাহার মনে হইল শীত একটু বেশী বেশীই করিতেছে। শুধু শীত নয়, তৃষ্ণাও পাইয়াছে। সে সাহসে ভর করিয়া বলিল—মামা, আমি জল খাবো—

—বড় বিপদ দেখচি, আচ্ছা আগে চলো গিয়ে পৌছুই—খেও এখন জল—

গন্তব্যস্থানে পৌছিয়া উমারাণীর মামা তাহার কথা ভুলিয়াই গেল। অনেকদিন পরে পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ, গল্পগুজব ও হাসিঠাট্টায় মসগুল হইয়া উমারাণীর সুখদুঃখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইল না। উমারাণী দু-একবার কি বলিল, আলাপের গোলমালে সে কথা কেহ কানে তুলিল না।

খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা ফিরিয়া দেখিল সে গুটিসুটি হইয়া রৌদ্রে বসিয়া আছে, মামার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—জল খাবো মামা, জল তেষ্টা পেয়েচে—

—দেখি? তাই তো রে, গা যে বড় গরম—উঃ, খুব জ্বর হয়েচে—যে ম্যালেরিয়ার জায়গা!...আয় চল্ ওদের ঘরে শুইয়ে রাখি গে—ওঠ্—

উমারাণীকে জল খাওয়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিয়া মামা পুনরায় পাড়ার দিকে বাহির হইল। স্নানাহার বন্ধুদের বাড়িতেই সম্পন্ন হইল, ক্রমে দুপুর গড়াইয়া গেল, মুখুয্যে পাড়ার হাফ্-আখড়াই-এর ঘরে গ্রামের নিষ্কর্ম্মা ছোক্‌রার দল একে একে আসিয়া পৌছিল, প্রকাণ্ড কেট্‌লিতে চায়ের জল চড়িল, গল্পে গল্পে বেলা একেবারেই গেল পড়িয়া।

এতক্ষণে হঠাৎ খুকীর কথা মনে পড়িয়া গেল তাহার মামার। সে বলিল—ওই যাঃ, তোমরা বোসো ভাই, খুকীটার অসুখ হয়েচে ব'লে ভড়লদের বাইরের ঘরে শুইয়ে রেখে এসেচি অনেকক্ষণ, দেখে আসি দাঁড়াও—

ভড়লদের বাড়ির বাহিরের উঠানে গোয়ালের কাছে আসিতে ভড়লের বড়ছেলে টোনা বলিল—খুকু কোথায় কাকা?

খুকীর মামা বিস্ময়ের স্বরে বলিল—কেন, সে তোদের বাইরের ঘরে শুয়ে নেই?

—না কাকা, সে ত অনেকক্ষণ আপনার কাছে যাবে ব'লে বেরিয়েচে—তখন খুব রদ্দুর—উঠে কাঁদতে লাগলো, বল্লে মামার কাছে যাবো—শুন্‌লে না, তখুনি সেই রদ্দুরে আপনাকে খুঁজতে বেরুলো—

—সে কি রে! আমি কোথায় আছি তা সে জানবে কেমন কোরে?...আর তোরা বা ছেলেমানুষকে ছেড়ে দিলি কি ব'লে?...বেশ লোক তো!...আর এ মেয়ে নিয়েও হয়েচে—মামা অত্যন্ত ব্যস্ত ও উদ্বিগ্নভাবে পুনরায় পাড়ার দিকে ফিরিল। পরিচিত স্থানগুলাতে খোঁজা শেষ হইল, কোথাও সে নাই, কোন্ পথ দিয়া কখন চলিয়া গিয়াছিল কাহারও চোখে পড়ে নাই, কেবল মতি মুখুয্যের ছেলে বলিল, অনেকক্ষণ আগে একটি অপরিচিত ছোট খুকীকে চড়্‌চড়ে রৌদ্রে টলিতে টলিতে ভড়লদের বাড়ির উঠানের আগল পার হইয়া আসিতে দেখিয়াছিল বটে, খুকীকে সে চেনে না, ভাবিয়াছিল ভড়লদের বাড়িতে কোনো কুটুম্ব হয়ত আসিয়া থাকিবে, তাহাদের মেয়ে।

অবশেষে তাহাকে পাওয়া গেল গ্রামের বাহিরের পথে। মামাকে খুঁজিতে বাহির হইয়া পথ হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে নিরুপায় অবস্থায় পথের উপর বসিয়া কাঁদিতেছিল, বৃদ্ধ হারাণ সরকার দেখিতে পাইয়া লইয়া আসেন।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, সে সারাদিন কিছুই খায় নাই,—খাইবার মধ্যে দুপুরবেলা ভড়লদের বাড়ীর কোন্

ছেলে এক টুক্‌রা আমসত্ত্ব হাতে দিয়াছিল, জ্বরের ঘোরে সেটুকু শুধু চুষিয়াছে শুইয়া শুইয়া। তাহার মামাকে সকলে বকিতে লাগিল। সরকার মশায় বলিলেন—তোমারও বাপু আক্কেলটা কি—ছোট মেয়েটাকে নিয়ে দুপুর রোদে এককোশ হাঁটিয়ে আনলে, পথে এল তার জ্বর, দেখলেও না, শুন্‌লেও না, ওদের চণ্ডীমণ্ডপে কাৎ করে ফেলে রেখে তুমি বেরুলে আড্ডা দিতে—না একটু দুধ, না কিছু—ছিঃ—

তাহার মামা অপ্রভিত হইয়া বলিল—তা আমি কি আন্‌তে গেছলাম, আমি বেরুবার সময় ছাড়ে না কোনো রকমে, তোমার সঙ্গে যাবো মামা, তোমার সঙ্গে যাবো মামা—আমি কি করবো ?

—বেশ, খুব আদর করেচো ভাগ্নীকে—এখন চলো আমার বাড়ি, ওকে একটু দুধ খাইয়ে দি—কচি মেয়েটাকে সারাদিন—ছিঃ—

খুকীর মামা একটু দমিয়া গিয়াছিল, বাড়ি ফিরিবার সময় খুকীকে বলিল—কিন্তু বাড়ি গিয়ে কিছু বোলো না যেন খুকু ? মার কাছে যেন বোলো না যে জ্বর হয়েছিল, কি হারিয়ে গিয়েছিলে, কেমন তো ? লক্ষ্মী মেয়ে, বল্‌লে আমি কল্‌কাতা যাবো পরশু, সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো না—

—আমি কলকাতা যাবো মামা—

—যদি আজ কিছু না বলো, পরশু ঠিক নিয়ে যাবো—বল্‌বি নে তো ?

কিন্তু বাড়ী পৌঁছিয়া খুকী বুদ্ধির দোষে সব গোলমাল করিয়া ফেলিল। তাহার শুষ্ক মুখ ও চেহারায় তাহার মা ঠাওরাইয়া লইল একটা কিছু যেন ঘটিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি খেলি রে খুকী সেখানে ?

খাওয়ার কথা মামা কিছু শিখাইয়া দেয় নাই, সুতরাং খুকী বলিল—আমসত্ব খুব ভালো—এতো বড় আমসত্ত্ব—

—আমসত্ত্ব ? আর কিছু খাস নি সেখানে সারাদিনে ? হ্যাঁরে ও যতীশ, খুকী সেখানে কিছু খায় নি ?

—খেয়েচে বৈকি—খেয়েচে বৈকি—তা—হ্যা—জানই তো ওকে কিছু খাওয়ানোই দায়—

মা একটু আড়ালে গেলে খুকী মুখ নীচু করিয়া হাসিমুখে মামার দিকে চাহিয়া হাত নাড়িয়া বলিল—মাকে কিছু বলিনি মামা—কাল আমায় কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে তো ?

—ছাই যাবো, না-খাওয়ার কথা বল্‌লি কেন ? বাঁদর মেয়ে কোথাকার—

মামার রাগের কারণ খুকী কিছু বুঝিতে পারিল না।

খাওয়ার কথা সম্বন্ধে মামা তো কিছু বলিয়া দেয় নাই, তবে সে কথা যদি বলিয়া থাকে, তাহার দোষ কি ?

তাহার মামা একথা বুঝিল না। রাগিয়া বলিল—তোমার জন্যে যদি আর কখনো কিছু কিনে আনি খুকী—তবে দেখো—ব'লে দিলাম—কখ্‌খনো আন্‌বো না—কল্‌কাতাতেও নিয়ে যাবো না।

তাহার প্রতি এই অবিচারে খুকীর কান্না আসিল। বা রে, তাহাকে যে কথা বলিয়া দেয় নাই, তাহা বলাতেও দোষ ?···সে কি করিয়া অতশত বুঝিবে ?···

খুকী খুব অভিমানী, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে বসিল না, এককোণে দাঁড়াইয়া চুপ করিয়া নিঃশব্দে ঠোঁট ফুলাইয়া ফুলাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

পরদিন সকালে তাহার মামা কলিকাতায় রওনা হইল—যাইবার সময় তাহার সহিত কথাটিও কহিল না।

আবার দিন কাটিতে লাগিল। বর্ষা শেষ হইয়া গেল, শরৎ পড়িল—ক্রমে শরৎও শেষ হয়-হয়। পূজা এবার দেরীতে, কার্ত্তিক মাসের প্রথমে। কিন্তু বাড়ী বাড়ী সবাই জ্বরে পড়িয়া, পূজায় এবার আনন্দ নাই। প্রবীণ লোকেও বলিতে লাগিলেন, এরকম দুর্ব্বৎসর তাঁহারা অনেক দিন দেখেন নাই।

উমারাণী সারা আশ্বিন ধরিয়া ভুগিয়া ভুগিয়া সারা হইয়াছে। একে কিছু না খাওয়ার দরুণ রোগা, তাহার উপর জ্বরে ভুগিয়া রোগা—তাহার শরীরে বিশেষ কিছু নাই। তবুও জ্বরটা একটু ছাড়িলেই কাঁথা ফেলিয়া উঠিয়া পড়ে—কারুর কথা শোনে না—তারপর গয়লা-পাড়া, সদ্‌গোপ-পাড়া, কোথার নবীন ধোবার তেঁতুলতলা—এই করিয়া বেড়ায়। বাড়ি ফিরিলেই দুম্‌দুম্

কিল পড়ে পিঠে। মা বলে দস্যি মেয়ে, মরেও না যে আপদ চুকে যায়, কবে যাবে ষষ্ঠীর মাঠে। কবে তোমায় রেখে এসে খুকী-খুকী বলে কাঁদতে কাঁদতে আস্‌বো—

ওঘর হইতে বড়-জা বলিয়া ওঠে—আচ্ছা ওসব কি কথা সকালবেলা ছোট বৌ?…বলি মেয়েটার ষষ্ঠীর মাঠে যাবার আর তো দেরী নেই—ওর শরীরে আর আছে কি?… তার ওপর রোগা মেয়েটাকে—ওই রকম করে মার? ছি ছি, একটা পেটে ধরেই এত ব্যাজার—তবুও যদি আর দু-একটা হ'ত!…এসো উমা, আমার দাওয়ায় এসো তো মাণিক? এসো এদিকে?…

তাহার মা পাল্টা জবাব দিয়া বলে—বেশ করচি—আমি আমার মেয়েকে বল্‌বো তাতে পরের গা জ্বলে কেন? যাস্‌নে ওখানে যেতে হবে না—সৌখীন কথা সকলে বল্‌তে পারে—যখন জ্বর হয়ে পড়ে থাকে, তখন যত্ন করতে তো কাউকে এগুতে দেখিনে—তখন তো রাত জাগতেও আমি—ডাক্তার ডাক্‌তেও আমি—ওষুধ খাওয়াতেও আমি—মুখের ভালোবাসা অমন সবাই বাসে—

দুই জায়ে তুমুল ঝগড়া বাধিবার কথা বটে এ অবস্থায়, কিন্তু বড়-জা হরমোহিনী বড় ভালমানুষ। সাতেপাঁচে থাকিতে ভালবাসে না, খুকীর ওপর একটা স্নেহও আছে, সে কিছু না বলিয়া নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া যায়।

পূজার সময় খুকীর মামা আবার আসিল। তাহারও বয়স এই কুড়ি একুশের বেশী নয়, এই দিদিটি ছাড়া সংসারে তাহার আর কেহ নাই। এতদিন কলিকাতায় চাকুরির চেষ্টায় ছিল, পূজার কিছুদিন মাত্র পূর্ব্বে কোন্ ছাপাখানায় মাসিক আঠারো টাকা বেতনে লিনোটাইপের শিক্ষানবিসী করিতে ঢুকিয়াছে।

অনেক খাবারদাবার, খুকীর জন্যে ভাল ভাল দু-তিনটা রঙীন জামা, ছোট ডুরে শাড়ী ও জাপানী রবারের জুতা আনিয়াছে। তাহার দিদি বকে—এসব বাপু কেন আন্‌তে যাওয়া, সবে তো চাকরি হয়েচে—নিজের এখন কত খরচ রয়েচে, দু-পয়সা হাতে জমাও, ভাল খাও-দাও— শরীর তো এবার দেখচি বড্ডই খারাপ—অসুখ-বিসুখ হয় নাকি?…

ছেলেটি হাসিয়া বলে—না দিদি অসুখ-বিসুখ তো নয়, বড্ড খাটুনি, সকাল ন'টা থেকে সারাদিন বিকেল ছ'টা অবধি—এক একদিন আবার রাত আটটাও বাজে—এক একদিন আবার রবিবারেও বেরুতে হয়—তবে তাতে ওপর-টাইন পাওয়া যায় বারো আনা ক'রে—এবার গুড় উঠলে এক কলসী গুড় নিয়ে যাবোই এখান থেকে, ভিজে ছোলা আর গুড় সকালে উঠে বেশ জল খাবার হবে—

তারপর সে চীনামাটির খেল্‌না বাহির করিয়া খুকীকে ডাকে—ও উমা, দেখে যা কেমন কাঁচের ঘোড়া সেপাই— এদিকে আয়—

খুকী নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া আসিল, মামা আসাতে খুকীর খুব আহ্লাদ হইয়াছে, এসব ধরণের খাবার মামা না আসিলে তো পাওয়া যায় না? পূজার কয়দিন খুকী মামার কাছেই সর্ব্বদা থাকিল। সকাল হইতে-না-হইতে খুকী চোখ মুছিয়া আসিয়া মামার কাছে বসে, মাঝে মাঝে বলে—এবার কল্‌কাতায় নিয়ে যাবে না মামা?

পূজা ফুরাইয়া গেলে খুকীর মামা দিদির কাছে প্রস্তাবটা উঠায়। দিদি সহোদর বোন নয়, বৈমাত্রেয়, তবুও তাহাকে বেশ ভালবাসে, যত্ন করে। সেও ছুটি-ছাটা পাইলে এখানেই আসে। স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দিন-দশেকের জন্য আপাততঃ খুকীকে কলিকাতায় ঘুরাইয়া আনিবার সম্মতি দিল।

খুকীর মামা খুশি হইয়া বলে—আমি ওকে লেখাপড়া শেখাবো—সেখানে গিয়ে মহাকালী পাঠশালায় ভর্ত্তি ক'রে দেবো—দেখতে পাই কেমন গাড়ী আসে, বাড়ি থেকে ছেলে মেয়েদের তুলে নিয়ে যায়—গাড়ীর গায়ে নাম লেখা আছে 'মহাকালী পাঠশালা'।

ভগ্নীপতি হরিশ মুখুয্যে বলেন—পাগল আর কি! অতটুকু মেয়ে ইস্কুলে ভর্ত্তি আবার কি হবে?…হুজুগে পড়ে যেতে চাচ্চে—ছেলেমানুষ, ও কি আর গিয়ে টিকতে পারে? যাও নিয়ে দু-দিন—এখানে তো ম্যালেরিয়ায় ম্যালেরিয়ায় হাড় সার করে তুলেচে—যদি দু-দিন হাওয়া বদ্‌লাতে পারলে সেরে যায়—

ট্রেনে কলিকাতা আসিবার পথে উমারাণী খুব

খুশি। প্রথমটা তাহার ভয় হইয়াছিল, রেলগাড়ীর জানালার ধারে মামা বসাইয়া দিয়াছে, গাড়ীটা চলিতেই খুকীর মনে হইল তাহার পায়ের তলা হইতে মাটিটা সরিয়া যাইতেছে, ভয়ে তাহার চোখ বড় বড় হইল—আতঙ্কে মামাকে জড়াইয়া ধরিতে যাইতেই তাহার মামা হাসিয়া বলিল---ভয় কি, ভয় কি খুকু? এ যে রেলের গাড়ী—দেখো আরও কত জোরে যাবে এখন—

রেলগাড়ী চড়িবার আনন্দকে যে-বয়সে বুদ্ধি দিয়া উপভোগ করা যায়, উমারাণীর সে বয়স হয় নাই। সে শুধু চুপ করিয়া জানালার বাহিরে চাহিয়া বসিয়া থাকে। মাঝে মাঝে তাহার মামা উৎসাহের স্বরে বলে---কেমন রে খুকী---সব কেমন বল্ তো? কেমন লাগচে রেলগাড়ী? খুকী বলে, খুব ভালো—

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে তাহার মামা দুঃখের সহিত লক্ষ্য করে যে খুকী বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে, দেখিতে দেখিতে সে ঘুমাইয়া পড়ে।

গাড়ী কলিকাতায় পৌছিলে একখানা রিক্সা ভাড়া করিয়া তাহার মামা তাহাকে বাসায় আনিল। অখিল মিস্ত্রির লেনে একটা ছোট মেসে বাসা, আপিসের বাবুদের মেস, সকলেই বয়সে প্রবীণ, সেই কেবল অল্পবয়স্ক। খুকীর আকস্মিক আবির্ভাবে সকলেরই আনন্দ হইল। বাড়ীতে ছেলেমেয়ে সকলেরই আছে, কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশ টাকা মাস-মাহিনার বেড়াজালে অষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া পড়িবার দরুণ মাসে একবার কি দুইবার ভিন্ন বাড়ি যাওয়া ঘটে না, ছেলেমেয়ের মুখ দেখিতে পাওয়া যায় না। খুকীকে পাইয়া একটা অভাব দূর হইল। চার-পাচ বছরের ছোট ফুটফুটে মেয়ে, চাঁদের মত মুখখানি, কোঁকড়া কোঁকড়া কালো চুল, কালো চোখের তারা—আপিসের ছুটির পর তাহাকে লইয়া কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। এ ডাকে উহার ঘরে, ও ডাকে তাহার ঘরে।

কিন্তু তাহার মামার বড় দুঃখ, খুকীর বেশভূষা একেবারে খাটি পাড়াগেঁয়ে। মাথায় বিনুনী, কপালে কাঁচপোকার টীপ, অতটুকু মেয়ের পায়ে আবার আল্‌তা, ছোট চুমুরী শাড়ী পরনে—ওসব সেকেলে কাণ্ড আজকাল শহর বাজারে কি আর চলে? দিদি পাড়াগাঁয়ে পড়িয়া থাকে, শহরের রীতিনীতি বেশভূষার কি ধার ধারিবে? এখানকার ভদ্রঘরের ছেলেমেয়েদের কেমন সুন্দর চুলের বিন্যাস, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ফিটফাট সাজানো, দেখিতে যেন কাঁচের পুতুল। খুকীকে ঐ রকম সাজানো যায় না?

ভাবিয়া ভাবিয়া সে খুকীকে সঙ্গে করিয়া ট্রামে ধর্ম্মতলার এক চুলছাটাই দোকানে লইয়া গেল। নাপিতকে বলিল—ঠিক সায়েবদের ছেলেমেয়েদের মত যদি চুল কাট্‌তে পারো, তবে কাঁচি ধরো, নইলে অমন ঘনকালো চুল নষ্ট কোরো না যেন।

মেস হইতে সে খুকীর মাথার বিনুনী খুলিয়া আনিয়াছিল।

চুল ছাটিতে উমারাণীর বেশ ভাল লাগিতেছিল। সাম্‌নে একখানা প্রকাণ্ড আয়না, চার-পাচটা বড় বড় আলো জ্বলিতেছে, নাপিত মাঝে মাঝে আবার ময়দার মত কি একটা গুঁড়া তাহার ঘাড়ের চুলে মাখাইতেছিল—এমন সুড়সুড়ি লাগে!…

তাহাকে সাজাইতে খুকীর মামা পাচ ছয় টাকা খরচ করিয়া ফেলিল। মেসের নিয়োগী মশায় একে একে কয়েকটি পুত্র কন্যাকে উপরি উপরি চার পাচ বৎসরের মধ্যে হারাইয়াছেন, উমারাণীকে পাইয়া আর ছাড়িতে চাহিতেন না। সন্ধ্যার পর রঙীন ফ্রক-পরা, বব্‌ড্ চুল, মুখে পাউডার, পায়ে জরির জুতা—আর এক উমারাণী যখন তাহার ঘরে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহাকে দেখিয়া তো নিয়োগী মশায় বিষম খাইবার উপক্রম করিলেন।

তাহার মামা হাসিয়া বলে—গেলই না হয় কিছু খরচ হয়ে, এমন সুন্দর মেয়ে, কি ক'রে ভূত সাজিয়ে রেখেছিল বলুন দিকি?…ও কুণ্ডু-মশায়, চেয়ে দেখুন, পছন্দ হয়?

কি করিয়া খুকীর শীর্ণতা দূর করা যাইতে পারে, এ সম্বন্ধে নানা পরামর্শ চলিল। গলির মোড়ের একজন ডাক্তার কড লিভার অয়েল ও কেপ্‌লারের মল্ট্ এক্সট্রাক্টের ব্যবস্থা দিলেন—তাহা ছাড়া বলিলেন,—খাওয়া চাই, না খেয়ে খেয়ে এমন হয়েচে—পুষ্টির অভাব, এ বয়সে এদের খুব পুষ্টিকর জিনিষ খাওয়ানো চাই কিনা?- সকালে

কোয়েকার ওট্স্ খাওয়াবেন দিন-পনেরো, দেখুন কেমন থাকে।

কিন্তু চতুর্থ দিনে খুকীর কম্প দিয়া জ্বর আসিল। খুকীর মামার লিনোটাইপের কাজে যাওয়া হইল না, সারাদিনই খুকীর কাছে বসিয়া রহিল। অন্যদিন বৃদ্ধ নিয়োগী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া ছাপাখানায় যাওয়া চলিত, আজ আর তাহা হইল না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে জ্বর ছাড়িয়া গেল, খুকী উঠিয়া বসিয়া একটুক্‌রা মিছরী চুষিতে লাগিল। আপিস-ফেরতা ফণিবাবু একটা বেদানা ও গোটাকতক কমলালেবু খুকীর জন্য আনিয়াছেন, সতীশবাবু পোয়াটাক ছোট আঙুর ও পুনরায় গোটা-তিনেক কমলালেবু, আরও দু-তিনজনের প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু কিনিয়া আনিয়াছেন। সকলে চলিয়া গেলে খুকী মামার দিকে একবার চাহিল, পরে ঠোঁট ফুলাইয়া মাথা নীচু করিল—মামা বিস্মিত হইয়া বলিল—কি রে খুকী? কি হয়েচে?...

খুকী দুঃখের চাপা কান্নার মধ্যে বলিল—বাড়ি যাবো মামা—মার কাছে যাবো—

—আচ্ছা, কেঁদো না খুকু—জ্বর সারুক, নিয়ে যাবো এখন।

দু-তিন দিন গেল। জ্বর সারিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু রাত্রে মাঝে মাঝে সে ঘুমের ঘোরে মায়ের জন্য কাঁদিয়া ওঠে। ভুলাইবার জন্য তাহাকে একদিন হগ্‌ সাহেবের বাজারের খেলানার দোকানে লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে একটা খুব বড় মোমের খোকা পুতুল তাহার খুব পছন্দ হইল, কিন্তু দামটা বড় বেশী, সাড়ে চার টাকা—খুকীর মামার একমাসের মাহিনার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। মামা বলিল—অন্য একটা পুতুল পছন্দ কর খুকু, ওটা ভালো না কেমন ছোট ছোট এই-সব কুকুর, হাতী, কেমন না?

খুকী দ্বিরুক্তি না করিয়া ঘাড় নাড়িল বটে, কিন্তু পুতুলটা ফিরাইয়া দিবার সময় (সে পূর্ব্ব হইতেই পুতুলটাকে দখল করিয়া বসিয়াছিল) তাহার ডাগর চোখ দুটি ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল।

দোকানদার বলিল—বাবু, খুকীর মনে কষ্ট হয়েচে, আপনি বড় পুতুলটাই নিন্, কিছু কমিশন বাদ দিয়ে দিচ্চি—

তাহার মামা বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা খুকু, তুমি বড় খোকা-পুতুলটাই নেও—কুকুরে দরকার নেই—ধরো বেশ করে যেন ভাঙে না দেখো—

প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। সেদিন রবিবার, খুকীর মামা বিশেষ কারণে চেতলার হাটে এক বন্ধুর সহিত দেখা করিতে গিয়াছে। এখনি আসিবার কথা, কিছু টাকা পাওনা আছে, তাহারই আদায়ের চেষ্টায় যাওয়া, ততক্ষণ অন্যান্য দিনের মত নিয়োগী-মশায়ের তত্ত্বাবধানেই খুকীর থাকিবার কথা। খানিকক্ষণ খুকীর সহিত গল্পগুজব করিবার পরে বৃদ্ধ নিয়োগী-মশায়ের মাধ্যাহ্নিক নিদ্রাকর্ষণ হইল। কথা বলিতে বলিতে খুকী দেখিল তিনি আর কথা বলিতেছেন্ না, অল্প পরেই তাঁহার নাসিকা গর্জ্জন সুরু হইল। মেসে কোনো ঘরে কেহ নাই, উমারাণীর ভয় ভয় করিতে লাগিল। একবার সে জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া চাহিয়া দেখিল, গলির মোড়ে দুজন কাবুলীওয়ালা দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছে, তাহাদের ঝোলাঝুলি, লম্বা চেহারায় ভয় পাইয়া সে জানালা হইতে মুখ সরাইয়া লইল।

মামা কোথায় গেল? মামা আসে না কেন?

সে ভয় পাইয়া ডাকিল—ও জ্যাতাবাবু, জ্যাতাবাবু?...

তাহার মামা তাহাকে শিখাইয়া দিয়াছে নিয়োগী মহাশয়কে জ্যাঠাবাবু বলিয়া ডাকিতে।

সাড়া না পাইয়া সে আর একবার ডাকিল—আমার মামা কোথায় ও জ্যাতাবাবু?...

নিয়োগী মহাশয় জড়িতস্বরে ঘুমের ঘোরে বলিলেন—হুঁ—আচ্ছা, আচ্ছা—

তিনি স্বপ্ন দেখিতেছিলেন দেশের বাটীতে রাত্রিতে শুইয়া আছেন, মালপাড়ার কেতু মাল চৌকীদার লাঠি ঘাড়ে রোঁদে বাহির হইয়া তাঁহার নাম ধরিয়া হাঁক দিতেছে।

খুকী এদিক-ওদিক চাহিয়া উঠিয়া পড়িল—সিঁড়ির দরজা খোলা ছিল, সে নীচে নামিয়া আসিল। ঝি চাকর রান্নাঘরে তালা বন্ধ করিয়া অনেকক্ষণ চলিয়া গিয়াছে,

একটা কালো বিড়াল চৌবাচ্চার উপর বসিয়া মাছের কাঁটা চিবাইতেছে।

বাহির হইয়াই রাস্তা। খুকীর একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে যে, এই রাস্তাটা পার হইলেই তাহার মামার কাছে পৌছানো যাইবে, এই পথের যেখানটাতে শেষ, সেখান হইতেই পরিচিত গণ্ডীর আরম্ভ।

ঘুরিতে ঘুরিতে সে পথ হারাইয়া ফেলিল, গলি পার হইয়া আর একটা বড় গলি, তাহার পর একটা লোহার বেড়া-ঘেরা মাঠ-মত, সেটার পাশ কাটাইয়া আর একটা গলি। ক্রমে খুকীর সব গোলমাল হইয়া গেল, এ পর্য্যন্ত সে একবারও পিছনের দিকে চাহে নাই, এবার পিছনের দিকে চাহিয়া তাহার মনে হইল সেদিকটাও সে চেনে না। সাম্‌নের পিছনের দুই জগতই তাহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, কোথাও একটা এমন জিনিষ নাই যাহা সে পূর্ব্বে কখন দেখিয়াছে।

সে ভয় পাইয়া কাঁদিতে লাগিল, ঠিক দুপুর বেলা, পথে লোকজনও কম, বিশেষতঃ এই সব গলির মধ্যে। আরও খানিক দূর গিয়া একটা লালরঙের বাড়ীর সাম্‌নে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছে, তাহাদের বাড়ির মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে একজন স্ত্রীলোক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—কি হয়েচে খুকী, কাঁদ্‌চ কেনে? তোমাদের কোন্ বাড়িটা, এইটে?···

খুকী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—আমি মামার কাছে যাবো—

—তোমাদের ঘর কোথা গো?

খুকী আঙ্‌ল তুলিয়া একটা দিক দেখাইয়া বলিল ওই দিকে—

—তোমার বাপের নাম কি?

বাপের নাম? কই তাহা তো সে জানে না! বাপের নাম 'বাবা', তা ছাড়া আবার কি? সে চোখ তুলিয়া ঝিয়ের মুখের দিকে চাহিল।

স্ত্রীলোকটি একবার গলির দুইদিকে চাহিয়া দেখিল, পরে বলিল—আচ্ছা, এসো, এসো খুকী, আমার সঙ্গে এসো, আমি তোমার মামার কাছে নিয়ে যাচ্ছি, এসো—

এ গলি, ও গলি ঘুরিতে ঘুরিতে অবশেষে একটা ছোট্ট খোলার বাড়ি। ঝি কাহাকে ডাকিয়া কি-একটা কথা নীচুস্বরে বলিল, তারপরে দুইজনেই খানিকক্ষণ কি বলাবলি করিল, নবাগতা স্ত্রীলোকটি হাত দিয়া কি-একটা দেখাইল, খুকী সে-সব বুঝিতে পারিল না। পরে তাহারা খুকীকে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে লইয়া গেল—ছোট্ট ঘুলঘুলির কাছে একটা নীচু তক্তাপোষ, সাদা চাদর পাতা। কিন্তু ঘরের এককোণে একটা প্রকাণ্ড মাটির জালা, ও তাহার চারিপাশে একরাশ অন্ধকার। খুকীর কেমন ভয় ভয় করিতে লাগিল—যক্ষিবুড়ীর যে জালাতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের লুকাইয়া পুরিয়া রাখিবার গল্প শুনিয়াছে যেন সেই ধরণের জালা। সে কাঁদো-কাঁদো স্বরে বলিল—আমার মামা কোথায়?

নবাগতা স্ত্রীলোকটি বলিল—কেউ দেখেনি তো আনবার সময়ে? আমার বাপু ভয় করে। এই সেদিন সৈরভির বাড়ীতে পুলিশ এসে কি তম্বি, আমি থালা ফেরৎ দিতে গেনু তাই—

খুকীদের বাড়ির মতি-ঝিয়ের মত দেখিতে যে স্ত্রীলোকটি, সে বিদ্রূপ করিয়া বলিল—নেকু!···যাও, সাম্‌নের দরজাটা খুলে ঢাক করে রেখে এলে কেনে?··· নেকু, জানেন না যেন কিছু!···

সে খুকীকে চৌকীর উপর বসাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া অনেক আদরের কথা বলিল, তাহাকে একটা রসগোল্লা খাইতে দিল। পরে খুকীর হাতের সোনার বালা দুগাছা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া বলিল—এখন তুলে রেখে দি খুলে, কেমন তো খুকী?···বেশ নক্ষি মেয়ে—দেখি—

খুকী ভয়ে ভয়ে বলিল—বালা খুলো না—আমার মামাকে ডেকে দেও—

কিন্তু ততক্ষণ ঝি তাহার হাত হইতে বালা দুগাছ অনেকটা খুলিয়াছে, দেখিয়া খুকী কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—আমার বালা নিও না, মামাকে ব'লে দেবো—আমা বালা খুলো না—

মতি-ঝিয়ের ইঙ্গিতে নবাগতা স্ত্রীলোকটি তাহার মু চাপিয়া ধরিল। কিন্তু একটা বিষয়ে দুজনেই বড় ভু করিয়াছিল, উমারাণীর কাটি কাটি হাত পা দেখিয়া তাহা

লড়াই করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে সাধারণের হয় তো সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু এ ধারণা যে কতদূর অসত্য, তাহা গতমাসে দুগ্ধপানের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের সময় উমারাণীর মা ভালরূপই জানিত। ইহারা সে-সব খবর জানিবে কোথা হইতে? বেচারীদের ভুল ভাঙিতে কিন্তু বেশী বিলম্ব হইল না, ধ্বস্তাধ্বস্তিতে বিছানা ওলটপালট হইয়া গেল, উমারাণীর আঁচড়-কামড়ে মতি-ঝি তো বিব্রত হইয়া উঠিল। গোলমালে একগাছা বালা হাত হইতে খুলিয়া কোথায় চৌকীর নীচের দিকে গড়াইয়া গেল। পিছন হইতে তাহার হাত মুখ চাপিয়া ধরিয়া অন্যগাছা নবাগতা স্ত্রীলোকটি ছিনাইয়া খুলিয়া লইল।

মতি-ঝি বলিল—ছেড়ে দে, ছেড়ে দে—হাঁপিয়ে মরে যাবে—দেখি ও আপদ্ রাস্তার ওপর রেখে আসি—বাপ্‌রে কি দস্যি!...

—এখন কোথায় রাখ্‌তে যাবি লো?... খ্যান্তমণিকে একটা খবর দিবি নি।

—না বাপু, তাতে আর দরকার নেই, ওকে রেখে আসি—কেউ টের পাবে না, ছ্যাখ না বসে বসে—

* * * *

তুমুল গোলমাল, খোঁজাখুঁজি, হৈ-চৈএর পরে সন্ধ্যার সময় উমারাণীকে পাওয়া গেল নেবুতলার সেন্ট-জেম্‌স্ পার্কের কোণে। কেবিন-ছাঁটাই বব্‌ড চুল ছেঁড়াখোঁড়া, কপালে ও গালে আঁচড়ের দাগ, হাত শূন্য, ফ্রকের কোমরবন্ধ ছিঁড়িয়া ঝুলিতেছে,—'মামা', 'মামা' বলিয়া কাঁদিতেছিল, অনেক লোক চারিধারে ঘিরিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছে, একজন গিয়া একটা পাহারাওয়ালাও ডাকিয়া আনিয়াছে—ঠিক সেই সময় নিয়োগী-মশায়, কুণ্ডু-মশায়, সতীশবাবু, অখিলবাবু, খুকীর মামা সবাই গিয়া উপস্থিত হইলেন।

যথারীতি থানায় ডায়েরী ইত্যাদি হইল। কে তাহার বালা খুলিয়া লইয়াছে এ সম্বন্ধে খুকী বিশেষ কোনো খবর দিতে পারিল না। খুকীর মামাকে সকলে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল। খবরদারী করিবার যখন সময় নাই, তখন পরের মেয়ে আনা কেন, ইত্যাদি। সবাই বলিল—যাও ওকে কালই বাড়ি রেখে এসো, ছিঃ, ওই রকম ক'রে কি কখনো—। মেসের সকলে চাঁদা তুলিয়া খুকীকে দুগাছা পালিশ-করা বিলাতী সোনার বালা কিনিয়া দিল।

গাড়ীতে উঠিবার সময় তাহার মামা বলিল—খুকু, বাড়িতে গিয়ে যেন এসব কথা কিছু ব'লো না!... কেমন তো?...কক্ষনো ব'লো না যেন? হ্যাঁ, লক্ষীমেয়ে—তা হ'লে আর কল্‌কাতায় নিয়ে আস্‌বো না—

খুকী ঘাড় নাড়িয়া রাজী হইল। বলিল—আমায় তখন একটা পুতুল কিনে দিও মামা—আর একটা মেম পুতুল—

সাবিত্রী ব্রত

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

আমাদের সাক্ষাতে আজ মস্ত বড় সমস্যা দেখা দিয়াছে। এ সমস্যা বড় সহজ সমস্যা নয়, তাই তার সমাধানও সহজ হওয়া সম্ভব নহে। এ সমস্যা জীবন-মরণের, চির ভবিষ্যতের, সমস্ত বর্ত্তমানের ও উত্তরপুরুষের ভালমন্দের সমস্যা। এই বর্ত্তমান সমস্যা সমাধানের উপরেই আমাদের সমগ্র জাতীয় জীবন গঠন নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। আজ যদি আমরা এ সমস্যার পূর্ণ সমাধান করিতে সমাহিত না হই, আমাদের ভবিষ্যৎ চিরঅন্ধকারে সমাবৃত হইয়া যাইবে। কারণ মানুষের কাছে সুযোগ বারেবারেই দেখা দেয় না, সুসময় সকল সময়েই আসে না। অন্ধকারের অন্তরাল হইতে উদীচির যে আলোকচ্ছটা ধীরে ধীরে উদিত হইতেছে, ঐ সমুজ্জ্বল

উষালোককে আমাদের মঙ্গল আরতি করিয়া বরণ করিয়া লইতে হইবে। দীর্ঘ রজনীর গম্ভীর ও তন্দ্রামগ্নতায় নিমগ্ন থাকিয়া যে নিবিড় আলস্যে আমরা আমাদের অভিভূত করিয়া রাখিয়াছি, সেই সর্ব্বনাশী বিলাসশয্যা আজও যদি আমরা না ছাড়ি, তন্দ্রাসুখে এ সময়েও যদি বিহ্বল হইয়া থাকিয়া এত বড় সুযোগকেও আমাদের সম্মুখ হইতে প্রত্যাখ্যাত হইতে দিই, দুর্য্যোগ সম্পূর্ণরূপেই আমাদের আশা সূর্য্যকে গ্রাস করিবে, উদয়ের উদ্দীপ্ত ভাস্কর চিররাহুগ্রস্ত হইয়া যাইবে।

সকল দেশে, সকল যুগে, সকল সময়েই যে-কোন মহৎ কার্য্য মহৎ ত্যাগ ব্যতীত সম্পন্ন হয় নাই। উদ্দেশ্য যত বড় হয়, উদ্যোগ ততই বৃহৎ হওয়া আবশ্যক, ত্যাগ ততই কঠিন হওয়া প্রয়োজন। নর এবং নারী লইয়া সমগ্র সমাজ, সমস্ত জগৎ। এখানে নরের সহিত নারীশক্তি না মিলিলে সৃষ্টি হইতে পারে না। যেমন জীবসৃজনে তেমনি জাতি সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রেই নারীশক্তির নরশক্তির সহিত সংমিশ্রণ একান্তরূপে প্রয়োজনীয়। ব্রহ্ম যখন এক অদ্বিতীয়, সৃষ্টি তখন লয়প্রাপ্ত। প্রকৃতির সহায়তা ব্যতীত পরমেশ্বরও শক্তিহীন, শিব শবে পরিণত। অসুরজয় কখন্ সম্ভব হইয়াছিল? যেদিনে সুররাজের কঠোর তপস্যায় প্রসন্না মহাশক্তি তাঁহার সহায়তায় স্বীকৃতা হইয়া সমরাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সেই অসুরনাশিনী মহাশক্তি নারীশক্তি।

স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু।

জগতের সমস্ত নারীর মধ্যেই সেই সুরবর-বন্দিত মহাশক্তির অংশ নিহিত আছে। এই শক্তিসমষ্টি কেন্দ্রীভূত হইলে ইহা হইতে আজও অসাধ্য সাধন কেন না হইতে পারিবে?

"কোমল কুসুমে বিধি গড়েছে রমণী হৃদি,
তাতেও নিহিত আছে কঠোর পাষাণ,
সহে না সতীর প্রাণে পতি অপমান।"

আজ ঘরে ঘরে পতিপুত্রের অবমাননার সীমা পরিসীমা নাই, ধিক্কারে সমস্ত সভ্য জগৎ পরিপূর্ণ, এতেও কি আমাদের দেশের সতীচিত্ত বিচলিত হইবে না? নারীর আজ সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী, সহযাত্রিণী হইয়া পুরুষের অবমাননার প্রতিকার প্রচেষ্টাকে, সফলতায় পরিণত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই তিনি যথার্থ সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন, সতী বলিয়া সম্পূজিতা হইবেন। যেদিন ভারতীয় পুরুষের শৌর্য্যবীর্য্য জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল, সেদিন ভারতীয়া নারী বীরনারী নামে পরিচিতা ছিলেন। অর্জ্জুনের পার্শ্বেই সুভদ্রার সম্ভব হইয়াছিল, পৃথ্বীরাজের সহিত সংযুক্তার সংযোগ ঘটিয়াছিল। আবার ভারতীয় পুরুষের কর্ম্মোদ্যম দেখা দিয়াছে, ভারতীয়া নারী আজ কায়মনোবাক্যে তাঁর পার্শ্বচারিণী না হইলে ভারত-সতীর মর্য্যাদাহানি হইবে।

আমাদের বিবাহমন্ত্রে আমরা যে তাঁদের সহিত এক-মন, একপ্রাণ, একচিত্ত হইতে চির অচপল ধ্রুবতারা সাক্ষ্যে কঠোর শপথ লইয়াছি। আজ সে প্রতিজ্ঞা ভুলিলে ত চলিবে না। ভারতনারীর এই একপ্রাণতা যুগে যুগেই রক্ষিত হইয়াছিল। তার দীর্ঘ অবনতির যুগেও এই নীতি প্রতিপালিত হইয়া আসিয়াছে। আজ জীবন-যুদ্ধে তাঁরা যদি নেতৃত্ব করিতে আসিয়া থাকেন আমরাও কায়মনে তাঁদের পার্শ্বচারিণী না হইব কেন? "ছায়া যেমন সূর্য্যকে অনুসরণ করেন, তোমরাও তেমনই পতির অনুসারিণী হইবে," শাস্ত্রের এই উপদেশ। আর দুহিতা, ভগিনী, জননিগণ! আপনাদের কর্ত্তব্য আপনাদের পিতা ভ্রাতা সন্তানের কর্ত্তব্যের সহিত সংযুক্ত। একবার সেই জাপানী মায়ের কথা আপনারা স্মরণ করুন। অক্ষম বৃদ্ধা মাতার প্রতিপালক বলিয়া পুত্র স্বদেশরক্ষাকল্পে যোদ্ধা রূপে গৃহীত না হইলে যে, মা নিজে আত্মঘাতিনী হইয়া পুত্রকে সমরাঙ্গণে যাত্রার পথ মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

তারপর আর এক কথা, এবং এই কথাই আজিকার প্রধান কথা, আমাদের এ যুদ্ধ হাতে হাতিয়ারে নয়। এই জীবন-মরণের প্রবল সংগ্রাম বিপুল। এই অভিযান নিরস্ত্র জাতির নিরস্ত্র সংগ্রাম। জগতের কোন দেশের কোন ইতিহাসেই এত বড় অসমসাহসিকতার যুদ্ধযাত্রা আর কখনও দেখা যায় নাই! এ প্রচেষ্টা সম্পূর্ণই অভিনব, এবং অদ্ভুত। সমগ্র

জগৎ আজ উদ্‌গ্রীব হইয়া আমাদের এই অহিংস যুদ্ধের পরিণাম প্রতীক্ষা করিতেছে। এর ফলাফলের উপরেই আমাদের মানসম্ভ্রম, জীবনমরণ নির্ভর করিয়া আছে। আজ যদি এই মহাযজ্ঞকে আমরা স্বাভাবিক ঔদাসীন্য, দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রযুক্ত আলস্য এবং বিলাসলালসার দ্বারায় ব্যর্থ হইতে দিই, সমস্ত সভ্য-জগতে আমাদের আর মুখ দেখাইবার কিছুমাত্র উপায় বাকি থাকিবে না। এই মহাযজ্ঞকে আমাদের পূর্ণ করিতে হইবে। যজ্ঞভ্রষ্ট হইলে সাধকের সর্ব্বনাশ! একচিত্ত একমন হইয়া কোটি কোটি ভারতনারী পুরুষকে এ যজ্ঞের নেতৃত্ব করিতে হইবে। যজ্ঞেশ্বর বিরাটপুরুষ কখনই নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারিবেন না।

তাঁর নিজ বাক্যে তিনি আমাদের জানাইতেছেন—

"যে যথামাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্"

তাঁকে যেভাবে যে কামনা করে, তিনি সেইভাবেই তাহাকে আশ্রয় দেন। আজ আমরা কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে আত্মীয়জনবিয়োগ দুঃখ ভীত অর্জ্জুনের সহিত সমাবস্থাপন্ন। আমরাও যদি তাঁর সেই বাণী, সেই মহাবাণী—"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" এই অভয়মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক উত্থিত হইতে পারি,—উত্থিত ও জাগ্রত হইতে পারি, আমাদের পক্ষেও জয় অসম্ভব হইবে না। ভারতের অধিদেবতা "উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত" বলিয়া আজ ডাক দিয়াছেন যে! নতুবা জড়ে কি চেতনা সঞ্চার হইত?

আজ আমাদের চাই শুধু একতা, চাই শুধু এক-প্রাণতা, চাই একচিত্ততা জীবনে এক উদ্দেশ্য।

"সমানীবঃ আকুতি সমানাহৃদয়ানি বঃ। সমানবস্ত বো মনঃ"

দেশের স্বরাজ্যলাভই নারী পুরুষের, শিক্ষিত অশিক্ষিতের, ধনী দরিদ্রের একমাত্র লক্ষ্য কেন্দ্র। ক্ষুদ্র স্বার্থ, তুচ্ছ মোহ, হীন আলস্য, সমস্ত জড়তা পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সমবেত শক্তিকে একপথে পরিচালিত করিতে হইবে। স্বদেশী গ্রহণ এ যুদ্ধের এই প্রধান দিব্যাস্ত্র! এ অস্ত্রের সন্ধানে যদি ভারত আজ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, বিশ্বের দরবারে তার আসন স্বতই শ্রদ্ধাসনে পরিগণিত হইয়া যাইবে। সম্মান-মুকুট তার আপনা হইতেই প্রাপ্য হইবে। আর যদি চিরদিনের মতই গৃহবিচ্ছেদের বিভীষণ এবারেও আমাদের মধ্যে তার সনাতন নীতির অনুসরণ করিতে সুযোগ পায়, যদি হিন্দুর সহিত হিন্দু, হিন্দুর সহিত মুসলমান নিজেদের প্রকৃত উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা না চিনিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থ মোহে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া সমচিত্ততা দ্বারা পরস্পরের সহিত সংযুক্ত না হইয়া বিযুক্ত হয়, পরস্পরে খাওয়াখাওয়ি করিয়া নিঃশেষে ধ্বংসপ্রাপ্তি এবারেও আমাদের ভাগ্যফল দাঁড়াইবে।

আজ আমাদের সযত্নে ও সাবধানে এই বিরোধের বিদ্বেষকে বিদূরিত এবং ইহার স্থলে নারীজাতির জাতীয়-স্বভাবানুমোদিত প্রেম ও মৈত্রীর সংস্থাপন করিতে হইবে। "সমানাহৃদয়ানি বঃ" এই দুরূহ ব্রতে এস আমরা দীক্ষা গ্রহণ করি। "সমানা বস্তু বো মনঃ" এই মন্ত্রের সাধনায় এস আমরা প্রাণপণ করিতে সচেষ্ট হই। চেষ্টা যত্নে কোন্ কার্য্য কবে কার না সিদ্ধ হইয়াছে? বাহিরে মতবিরোধ যার সঙ্গে যতই থাক, আজ ভারতের ভাগ্যবিধাতার কাছে আমরা একচিত্তে, সহানুভূতির সহিত একই কামনা ও একমাত্র লক্ষ্য লইয়া যেন দাঁড়াইতে পারি। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য থাকুক স্বরাজ।

ভারত-মহাসাগরের পরিবেষ্টনীর মধ্যে সশস্ত্র প্রহরী ও চেড়ীদলের প্রহরায় স্থাপন করিয়াও অপহৃতা সীতা দেবীর স্বাধীনতাকে চির অপহৃত রাখা যায় নাই। পথ খুঁজিয়া দেখিলে চারিদিক দিয়াই পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায়, তবে সেই-সব পথে চলার জন্য লোক চাই। সরবে কাজ করার লোক পাওয়া গেলেও পাওয়া যায়, নীরব কর্ম্মীর অভাবটাই সকল ক্ষেত্রে বেশী। কিন্তু শব্দভেদী বাণ যখন অপর পক্ষের ধনুকে চড়ান, তখন যতখানি সম্ভব নিঃশব্দেই নিজের নিজের কাজ কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে করিয়া যাইতে হইবে। আমাদের দেশের ধর্ম্মেও বাহ্যপূজার অপেক্ষা আন্তর পূজাকেই উচ্চাসন দেওয়া হইয়া থাকে।

মানুষকে পৃথিবীতে জন্মিয়া অনেকগুলি ঋণে ঋণী হইতে হয়। ঐ সকল ঋণের মধ্যে দেশঋণ একটি প্রধান ঋণ। অন্য সকল ঋণ নিজের এবং নিজ পরিবারের উন্নতিকল্পেই পর্য্যবসিত, কিন্তু দেশঋণেই একমাত্র নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম্মের উপায় নিহিত আছে। দেশের প্রত্যেক লোকের উন্নতিলাভের সহায়তা করিয়াই এ ঋণ শোধ করিতে হয়, এইজন্যই আমাদের সকল ঋণের মধ্যেই এই দেশঋণই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম ঋণ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। এঋণ যে পরিশোধ করিতে পারিয়াছে, ইহ-পরলোকে তার আর কোন কঠিন ব্রত পালনের আবশ্যকতা নাই।

এমন কঠোরব্রত আমার চিরকল্যাণী স্বদেশবাসিনীরা কায়মনে পালন করিবেন কি? এ ব্রত গ্রহণে ও পালনে দুঃখ আছে বই কি, নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু অমঙ্গল মঙ্গলের পথ নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। আমাদের মধ্যের আদর্শ সতী—সাবিত্রী। সেই সাবিত্রী শুধুই আমাদের কাছে সতীত্বেই আদর্শনারী নহেন, পরন্তু সকল বিষয়েই তাঁর আদর্শ আমাদের নিকট পূর্ণ। তিনি তাঁর পতি-গ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন তাঁহার সেই প্রিয়তম পতি অল্পজীবী। এই এত-বড় বিপদের নিশ্চিত বার্ত্তা পাইয়াও তিনি বিন্দুমাত্র ভীতা হন নাই। তিনি বিপদকে বরণ করিয়াই পতিবরণ করিলেন। এইখানেই সাধারণ নারীর সহিত তাঁহার একান্তভাবে প্রভেদ দেখা দিল। তারপর প্রতীক্ষিত কাল আসিল, ধৈর্য্যশীলা সতী তাঁর অটুট ধৈর্য্যসহকারে সকল কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। কোথাও কোন ত্রুটিবিচ্যুতি নাই। পতির সহকারিণীরূপে দুর্গম অরণ্যপথে গমনকালেও একবার তাঁর মুখে আমরা পতিকার্য্যের ব্যাঘাতক উদ্বেগক দুর্ব্বলতা দেখিতে পাই না।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে—'There are remedies for all things but death"—কিন্তু মহাকালও এই অসমসাহসিকা মহাপ্রাণা মহীয়সী মহিলার অনতিক্রম্য পুণ্যপ্রভাবকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইলেন না। দৃঢ়ব্রতা অনন্যচিত্তা সাধিকার একান্ত সাধনায় কালচক্রের অভিভব হইয়া গেল, সাবিত্রী জয়যুক্তা হইলেন।

হে নবীন ভারতের সতী সাবিত্রীগণ! আপনারাও আজ আপনাদের অপরাজেয় পুণ্যবলযুক্ত দৃঢ়চিত্ততার বলে অন্ধ শ্বশুরকে চক্ষুষ্মান্ করিতে থাকুন, অপহৃত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার করিয়া লউন, কুপুত্রক অ-পুত্রক পিতৃগণকে সুপুত্র গঠনে পুত্রযুক্ত করিয়া তুলুন, মৃত-পতিকে জীবন্ত করুন। বিশুদ্ধচরিত্রতার দীপ্তিতে দীপ্তিমতী দেবী সাবিত্রী যখন কাল-সাক্ষাতেও নির্ভীক অটল থাকিয়া আপনার প্রত্যেক কর্ত্তব্যটি পালন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, আপনারাই বা পারিবেন না কেন?

আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে সাবিত্রী ব্রতই সবচেয়ে প্রধান এবং সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর ব্রত। আমাদের এ দিনের সাবিত্রীব্রতের বিধি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আজ ঘরে বসিয়াই শুধু সাবিত্রী ব্রত পালন চলিবে না, সত্যবানের সহিত সাবিত্রীকে আজ পথে পথে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে হইবে। তবেই আবার ভারতে অন্ধ দৃষ্টিলাভ করিবে, অপুত্রক পুত্র লাভে ধন্য হইবে, মৃত জড় পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিয়া ভ্রষ্ট রাজ্যের রাজদণ্ড ধারণ করিতে সমর্থ হইবে। শত শত সন্তানের উচ্চারিত "জয় মা!" রবে গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিবে।

ইহাই এ যুগের সাবিত্রী ব্রতের মূল তত্ত্ব।*

* কোন এক নারী-সমিতিতে পঠিত।

জৈনধৰ্ম্ম

আৰ্য্যপট্ট

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক দিন পূর্ব্বে ইংরেজ-রাজ্যের প্রারম্ভে যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতবর্ষের সংস্কৃত, পালি বা প্রাকৃত সাহিত্য পড়িতে আরম্ভ করিলেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে পালি ভাষায় লিখিত বৌদ্ধসাহিত্য তাঁহাদের নজরে পড়িল। তাঁহারা প্রথমে যাহা শুনিলেন তাহাই ধ্রুবসত্য বলিয়া মানিয়া লইলেন। সিংহলে ও শ্যামদেশে বৌদ্ধেরা তাঁহাদের শুনাইলেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন। গৌতম বুদ্ধ যখন জীবিত ছিলেন তখন নিগ্রন্থ জ্ঞাতৃপুত্র নামক একজন শিক্ষক জৈনধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌতমের পূর্ব্বে আবার সাতজন বুদ্ধ ছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্ম জৈন ধর্ম্মাপেক্ষা অনেক পুরাতন। বৌদ্ধমূর্ত্তি এবং জৈনমূর্ত্তিতে এতটা মিল আছে যে, প্রথম প্রথম পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা জৈনমূর্ত্তিকে বৌদ্ধমূর্ত্তির একটা শাখা বলিয়াই মানিয়া লইতে বাধ্য হইতেন। গত দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে জৈনধর্ম্মের প্রকৃত ইতিহাস প্রকাশ পাইয়াছে। এখন আমরা জানিতে পারিতেছি, বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তুলনায় জৈনধর্ম্ম কত পুরাতন, অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম্ম গড়িয়া উঠিবার সময় জৈনধর্ম্মের আকার কিরূপ ছিল, এবং গত আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া তাহা কি ভাবে গড়িয়া উঠিয়াছে।

জৈনধর্ম্ম তখন অতীব রক্ষণশীল। ইহাতে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ অতি অল্প, সুতরাং বিদেশীয় জাতি অথবা নূতন জাতি ইহাতে অতি অল্পই আশ্রয় পাইয়া থাকে। তথাপি জৈনধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম এবং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী। কেবল রক্ষণ-শীলতার জন্য ভারতবর্ষের ধর্ম্মের সংগ্রামে জৈনধর্ম্ম আড়াই হাজার বৎসর রক্ষা পাইয়া আসিয়াছে। এই আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে পার্শী, গ্রীক্ বা যবন, শক, কুশান, হূণ, গুর্জ্জর, রাজপুত, আরব, তাজিক প্রভৃতি শত শত বিদেশীয় জাতি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া এদেশে বসতি করিয়াছে, আপনাদের পুরাতন ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া হিন্দু অথবা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং ভারতবর্ষের লোক হইয়া গিয়াছে। আজ তাহাদের মধ্যে খুঁজিয়া আদিম ভারতবাসী আর্য্য অথবা অনার্য্য স্থির করা বড়ই কঠিন। কিন্তু এ বিষয়ে স্থির মীমাংসা ক্রমশঃ ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে আবশ্যক হইয়া উঠিতেছে। দুই-একজন পণ্ডিত ক্রমশঃ বুঝিতেছেন যে, ভারতবর্ষে যত ধর্ম্ম জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জৈনধর্ম্ম তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রাচীন না হইলেও, ভারতের একটি অতি প্রাচীন ধর্ম্ম। আমাদের বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম ইহার তুলনায় বয়সে অতি শিশু, ধর্ম্মভাবে অতি নবীন এবং বৈদিক ধর্ম্মের দর্শন নাই বলিলেই চলে। শঙ্কর প্রভৃতি আর্য্য-দর্শনবাদীরা জৈন দর্শনবাদীদের তুলনায় নবীন।

যীশুখৃষ্ট জন্মিবার প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে জৈনধর্ম্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। জৈন দার্শনিকেরা তখনই বুঝিয়াছিলেন যে, কোনও দুই জন মানুষই জগতে সমান হইয়া জন্মে নাই, মানসিক শক্তির বৈষম্যে মানুষ মানুষকে জয় করে এবং মানসিক শক্তির বৈষম্যেই মানুষ দেবত্বের অধিকারী হয়। বিবেক-শক্তির অতি-বৃদ্ধিলাভেই মানুষে মানুষে প্রভেদ জন্মায়। জৈনধর্ম্মের মূল গুরু চব্বিশ জন, তাঁহারা সকলেই মানুষ এবং কেহই ব্রাহ্মণ-বংশজাত নহেন। বেদকর্ত্তা ব্রাহ্মণ যে বংশজাত গুরুপদ এতদিন ভারতবর্ষে দাবী করিয়া আসিয়াছেন এইরূপে জৈনগুরুগণ সর্ব্বপ্রথমে তাহার প্রকাশ্য প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। দেববংশজাত উপাস্য দেবতা সৃষ্টির বিরুদ্ধে জৈনগুরুরাই প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী জৈনধর্ম্মে গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস প্রভৃতি অর্দ্ধদেব ও কিম্পুরুষ জাতীয় দেবগণ প্রভূত পরিমাণে প্রবেশ করিয়াছিল, কিন্তু জৈনগণের প্রধান উপাস্য দেবতা মানুষ। চব্বিশ জন তীর্থঙ্কর,

তাঁহারা মানুষ—ক্ষত্রিয়-বংশজাত, চিন্তাশক্তি বা তপস্যার বলে অপরিসীম মানসিক শক্তিধারী অথবা মহাপুরুষ। সুতরাং জৈনধর্ম্ম ভারতীয় ধর্ম্মসমূহের মধ্যে একমাত্র

আয়াপট্ট

মানবিক ধর্ম্ম (অবশ্য প্রথম প্রথম গৌতম বুদ্ধের সরল বৌদ্ধধর্ম্মও এই রকম সরল মানবিক ধর্ম্ম ছিল)।

জৈনধর্ম্ম গত আড়াই হাজার বৎসরের মধ্যে অনেক ক্ষতি সহ্য করিয়াছে। জৈনদের মধ্যে বিবাদে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র প্রচুর নষ্ট হইয়া গিয়াছে, বিবাদ বাধিয়া অনেক ধর্ম্মমত পতিত শাখা হইয়া লোকের স্মৃতিপথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, অনেক শাখার লোক ভ্রান্তমত গ্রহণ করিয়া নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। বর্ত্তমানে জৈনধর্ম্মের তিনটি প্রধান বিভাগ—"শ্বেতাম্বর" "দিগম্বর" ও "তেরপন্থী"—ছাড়া ক্ষুদ্র বৃহৎ আরও অনেক শাখার লক্ষণ এখনও ভারতের নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই সমস্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ জৈনধর্ম্মের শাখা, তাহাদের দেবার্চ্চনা-পদ্ধতি, দেবপ্রতিমালক্ষণ ও দর্শনের মূলকথা হইতে ভারতের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মমত কিঞ্চিৎ পরিমাণে বোধগম্য হইতে পারে।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মশাস্ত্র বহুবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং বহুবার পুনর্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং জৈনধর্ম্ম আদিমকালে কি ছিল, তাহা বুঝিবার উপায় ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। এখন হইতে ২২০০—২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে আদিম জৈনেরা কি পূজা করিতেন এবং কি ভাবে পূজা করিতেন তাহাই বিবেচনা করা উচিত। খৃষ্টের জন্মের দুই-তিনশত বৎসব পূর্ব্বে উত্তর-ভারতের জৈনেরা মূর্ত্তিপূজা করিতেন এবং মথুরা, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাচীন নগরে এই জাতীয় প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখনকার জৈনমূর্ত্তিতে যে-সমস্ত লক্ষণ থাকে প্রাচীন কালের জৈনমূর্ত্তিতে সেগুলি সমস্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ত্তমান যুগের জৈনমূর্ত্তিতে বৃক্ষ, শাসনদেবী, যক্ষ, লাঞ্ছন ইত্যাদি যে-সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বের জৈন-মূর্ত্তিতে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি প্রাচীন কালের জৈনমূর্ত্তি একখানি পাথরের পট্ট, ইহার উপরে কতগুলি চিহ্ন আঁকা থাকে। এলাহাবাদের বাহাদুরগঞ্জের স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ডাক্তার বামনদাস বসু মহাশয়ের সংগ্রহশালায় অনেক ভারতীয় পুরাকীর্ত্তি রক্ষিত আছে, তাহার মধ্যে একখানি অতি প্রাচীন পট্ট প্রাচীন কৌশাম্বী

শিবঘোষক পত্নী কর্ত্তৃক স্থাপিত আর্য্যপট্ট

হইতে আনীত হইয়াছিল। ষোলবৎসর পূর্ব্বে এই প্রাচীন জৈন পট্টটি দেখিতে পাইয়া আমি ইহার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলাম। ইহার একপার্শ্বে লিখিত আছে—
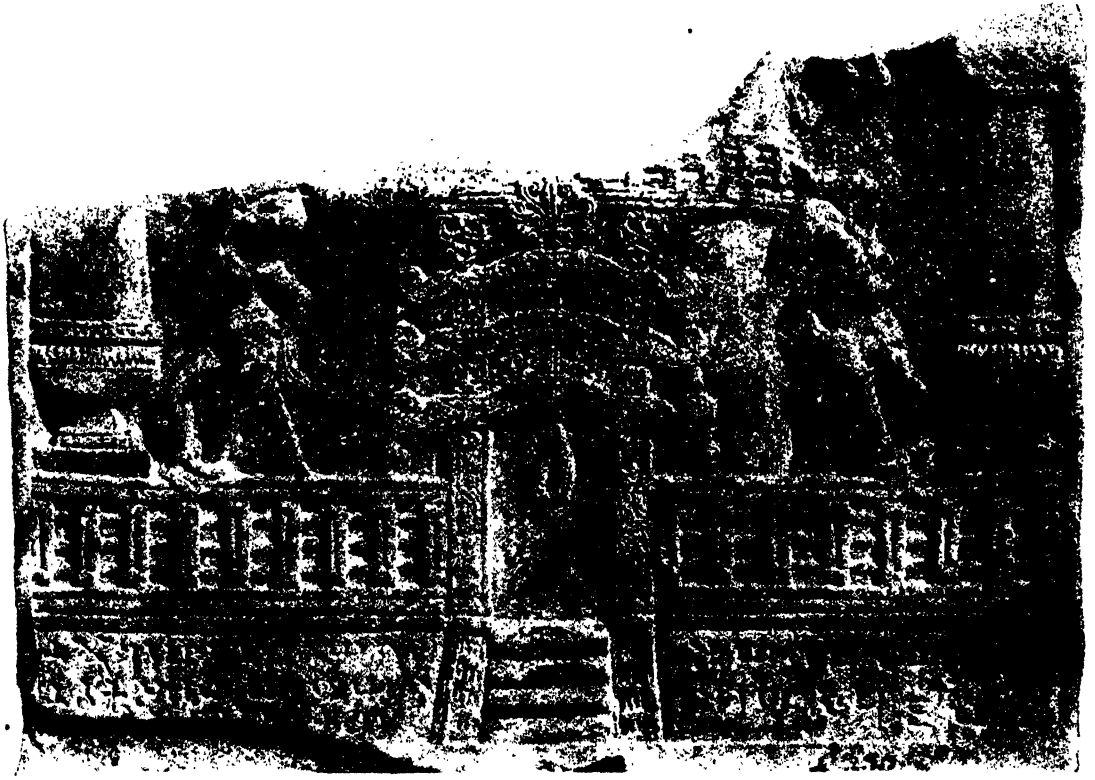
নট ফগুযশের পত্নী শিবযশা কর্ত্তৃক স্থাপিত আয্যপট্ট

(১) সিদ্ধম রাঞ্জো শিবমিত্রস্য সংবছরে ১০ .... খ
মাহকিয়...

(২) থবিরস বলদাসস নিবর্তন শ...শিবনন্দিস অন্তেবাসিস...

(৩) শিবপালিতান আয়পটো থাপয়তি অরহত পূজায়ে।

"সিদ্ধ, রাজা শিবমিত্রের রাজ্যের দ্বাদশ সংবৎসর, স্থবির বলদাসের অনুরোধে...শিবনন্দীর শিষ্য...শিবপালিতের...এই আয্য অরহৎদিগের পূজার নিমিত্তে প্রতিস্থাপিত হইল।"

প্রাচীন মথুরা নগরের বাহিরে এই একটিমাত্র আয্য-পট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজা শিবমিত্র কে ছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় না, তবে মথুরায় খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ একশত বা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে এরকম অনেকগুলি আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাহা গত পঞ্চাশ বছর ধরিয়া মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মথুরা ও লক্ষ্ণৌয়ের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

এই পট্টগুলি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখন হইতে আড়াই হাজার বা দুই হাজার দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জৈনদের উপাসনার দ্রব্য অথবা মূর্ত্তি বেশ অনেক দিন ধরিয়া রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পট্টগুলির উপরে শিলালেখে 'আয়পট' অথবা 'আয়াগপট' লিখিত থাকে, সুতরাং ইহাই প্রাচীনকালের জৈনদের উপাস্য দেবতার নাম। এই আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্টগুলি একেবারে নূতন জৈনমূর্ত্তি নহে; বর্ত্তমান কালের জৈনমূর্ত্তি বা অন্য উপাস্য দ্রব্যের সহিত ইহার অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টগুলি বড় লম্বা ও চওড়া পাথরের পট্ট, অধিকাংশ পট্টের উপরে অনেক গুলি চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এই সমস্ত চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মে প্রাচীন ও বর্ত্তমান কালে মঙ্গল-চিহ্ন বলিয়া পূজিত হইত। অনেক আর্য্যপট্টের উপরে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠিক পট্টটির

মধ্যে যেখানে চারিটি মৎস্যপুচ্ছ যুক্ত হইয়াছে, সেইখানে একটি চক্র দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্ন ভিন্ন আর্য্য-পট্টে এই চক্রটির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন অথবা মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। মেজর বামনদাস বসু মহাশয় কৌশাম্বী হইতে যে আর্য্যপট্টটি এলাহাবাদে আনিয়াছেন তাহার মধ্য-স্থলের চক্রে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম আছে। মথুরায় যতগুলি 'আয়াগপট' পাওয়া গিয়াছে, তাহার অনেক-গুলির মধ্যস্থলের চক্রে ভিন্ন ভিন্ন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি আছে, দুই-একটিতে একটি রথচক্র অথবা অন্য দুই-

আয্যপট্ট—মথুরাবাসীদের দ্বারা উৎসর্গীকৃত
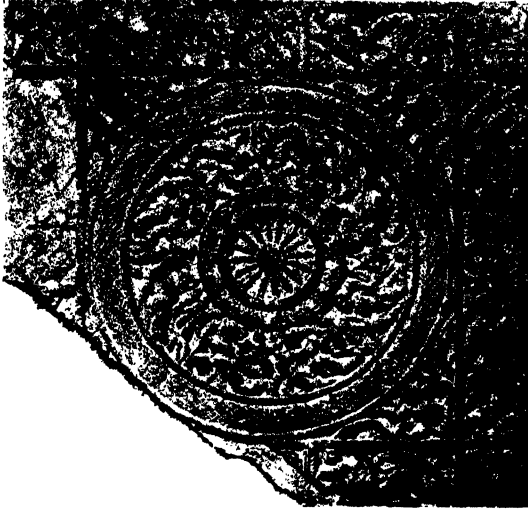
একটি চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায়। পট্টের মধ্যস্থলের এই চক্রের মধ্যে তীর্থঙ্কর বা জীনমূর্ত্তি অথবা চিহ্ন ব্যতীত আয্যপট্টের আরও অনেকগুলি মঙ্গলচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় যেমন, মৎস্যযুগল, মঙ্গলঘট, পদ্ম, শঙ্খ, রথচক্র, ইত্যাদি। এই সমস্ত চিহ্নাদি বর্ত্তমান সময়ের চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের 'লাঞ্ছন'। জৈনেরা পূজার সময়ে কুঙ্কুম-রঞ্জিত তণ্ডুল (জাফরাণের রং করা চাউল) পাত্রে লইয়া তাহাতে এই সমস্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া থাকেন।

আর্য্যপট্ট বা আয্যাগ্রপট্টগুলি যে-সমস্ত স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে সেগুলি ভারতবর্ষ বা আর্য্যাবর্ত্তের অতি প্রাচীন কেন্দ্র এবং আবিষ্কৃত শিলালেখ হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টের জন্মের সমকাল পর্য্যন্ত জৈনদের প্রধান তীর্থ ও কেন্দ্র ছিল। ভাগলপুর বা চম্পা, পাবাপুরী বা অপাপপুরী, সমেতশিখর বা পার্শ্বনাথ পর্ব্বত, প্রাচীন রাজগৃহ বা গিরিব্রজ অতি প্রাচীন জৈনতীর্থ, কিন্তু মধ্যদেশ বা যুক্তপ্রদেশের শৌরসেন রাজধানী মথুরা, প্রাচীন বৎসদেশের রাজধানী কৌশাম্বী বা কোসাম, প্রাচীন পঞ্চালের পুরাতন রাজধানী অহিচ্ছত্র বা বারেলীর নিকট রামনগর আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে সুবিখ্যাত। উপস্থিত এই তিনটি স্থানে আবিষ্কৃত জৈন পুরাকীর্ত্তি হইতে প্রাচীন জৈনধর্ম্মের অবস্থা আলোচনা করিব।

১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচীন মথুরায় প্রথম খনন আরম্ভ হইয়াছিল। এই বৎসরে অনেকগুলি প্রাচীন জৈন শিলালেখ মথুরার কঙ্কালীটিলা নামক স্থানে প্রাচীন জৈন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে আর্য্যপট্ট সংখ্যায় অতি অল্প। খনন কিছুদিন চলিবার পর কঙ্কালীটিলার নিম্নের স্তরে আর্য্যপট্ট আবিষ্কৃত হইতে আরম্ভ হইল। মথুরার সর্ব্বপুরাতন আয্যপট্টটি আকারে বৃহৎ ও খণ্ডিত, ইহার শিলালেখও অসম্পূর্ণ। ইহাতে লিখিত আছে—

নমো অরহতো বধমানস্য গোতিপুত্রস পোঠয় শককাল বালস কোশিকিয়ে শিমিত্রায়ে আয়াগপটো পতি (ঠাবিত)

—অর্হত বর্দ্ধমানকে নমস্কার। গৌপ্তীপুত্র…প্রোষ্ঠয় ও শকদিগের কালব্যাল (স্বরূপ)…শিমিত্রা…কর্ত্তৃক আর্য্যাগ্রপট্ট প্রতিষ্ঠাপিত।

এই সঙ্গে আরও দুই-একটি খণ্ডিত আর্য্যপট্ট আবিষ্কৃত হইয়াছিল; তাহার মধ্যে একটি বারণগণের আর্য্যহাটিয় কুলের বজ্রনাগরিক শাখার এবং আর্য্যশ্রীক সম্ভোগের কোনও জৈনগুরুর আদেশে প্রদত্ত একটি আর্য্যপট্ট। তৃতীয় আর্য্যপট্টটি রসনন্দীর পুত্র নন্দীঘোষ নামক ত্রৈবর্ণিক কর্ত্তৃক প্রদত্ত। (১)

মথুরার খননকার্য্য চলিতে লাগিল। পরবর্ত্তী দুই বৎসরে আরও অনেক প্রাচীন জৈনমূর্ত্তি ও শিলালেখ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন পর্য্যন্ত ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বে বৌদ্ধধর্ম্মই পুরাতন বলিয়া আদরের বস্তু ছিল, কিন্তু জর্জ বিউলর, প্রমুখ জর্ম্মন পণ্ডিতেরা জৈনধর্ম্মকে বৌদ্ধধর্ম্ম অপেক্ষা অতি পুরাতন বলিয়া আসিতেছিলেন। এতদিনে

---

১ Epigraphia Indica, Vol. I. pp 396-7

তাহার সমসাময়িক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইল। এতদিন কেবল জৈনদের কাছেই জৈনধর্ম্ম প্রাচীন ছিল, এইবার তাহা জগতের একটি অতি পূজ্য এবং অতি পুরাতন ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইল। আরও দেখিতে পাওয়া গেল যে, উপাস্য উপাসনা সম্বন্ধে বৌদ্ধধর্ম্ম যে-সমস্ত দেবার্চ্চনা-বিধি বা দেবতা এতদিন নিজস্ব বলিয়া দখল করিয়া আসিতেছিল, তাহা প্রাচীনকালে জৈনদেরও ছিল। যথা, "স্তূপ," 'সাধুদের ভস্মরক্ষা' ইত্যাদি। পরবর্ত্তী যুগে জৈনধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়া জৈনদের মধ্যে স্তূপ পূজা, সাধুদের ভস্ম পূজা উঠিয়া গিয়া কেবল বৌদ্ধদের মধ্যেই রহিয়া গিয়াছে। জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্ত্তি নূতন রীতি অনুসারে গঠিত হওয়ার ফলে একটা স্বতন্ত্র ধারা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপে বর্ত্তমান জৈনধর্ম্মের ও উপাসনা-পদ্ধতির সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু আধুনিক জৈনরা তাহার আদিম পরিকল্পনা ও উৎপত্তির কারণের বিবরণ একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। পুরাতন জৈনস্তূপ বা আর্য্যপট্ট যখন গত শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন কোনও জৈন-মুনি স্বর্গগত ডক্টর জর্জ্জ বিউলর বা তাঁহাকে আর্য্যপট্ট জিনিষটি বুঝাইয়া দিতে পারেন নাই। দুই তিন বৎসর ধরিয়া কিছু পরিমাণে আবিষ্কৃত হইয়া ভারতবর্ষে আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট আবিষ্কার হওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে প্রমাণ হয়, আর্য্যপট্টগুলি একটি বিশেষ যুগের জিনিষ, সেই যুগের পূর্ব্বে ও পরে আর্য্যপট্ট-পূজার প্রচলন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যুগটা মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পরে এবং কুশান অর্থাৎ শক সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আসিয়াছিল। যে দুই-চারিজন রাজার নাম এই সময়ের আর্য্যপট্টে পাওয়া গিয়াছে, তাঁহারা প্রায় অজ্ঞাত। মথুরার রঞ্জুবুলো ও তাঁহার পুত্র শোভাস এবং কৌশাম্বীর শিবমিত্র এই সময়ের রাজা। শিলালেখ ও প্রাচীন মুদ্রা ব্যতীত এই সমস্ত রাজার নাম আর কোথাও পাওয়া যায় না। রঞ্জুবুলো এবং শোভাস শক-জাতীয় রাজা; তাঁহারা

আর্য্যপট্টের ভগ্ন অংশ গোতিপুত্রের পত্নী শিবমিত্রা কর্ত্তৃক স্থাপিত

প্রথমে শকরাজাদের কর্ম্মচারী ছিলেন, পরে স্বাধীন হইয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াও রাজ-কর্ম্মসূচক 'মহাক্ষত্রক' উপাধি মহারাজ উপাধির সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। পুরাণে বা অন্য কোনও ইতিহাসে রঞ্জুবুলো অথবা তাঁহার পুত্র শোভাসের নাম পাওয়া যায় না। মথুরায় আবিষ্কৃত অনেক শিলালেখে শিবমিত্র নামক একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। মথুরার শিবমিত্র ও কৌশাম্বীর শিবমিত্র দুইজনকেই একই যুগের লোক বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাঁহারা একব্যক্তি কিনা বলা যায় না। জৈন-ধর্ম্মের প্রাচীনতম মূর্ত্তির যুগ সম্ভবতঃ মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপের যুগে আরব্ধ হইয়াছিল এবং মৌর্য্য সাম্রাজ্যের লোপের অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় যুগ আরম্ভ হইল। ইহা কুশান সম্রাটদের আমলের জৈনমূর্ত্তির যুগ। কুশান সম্রাটদের আমলে চব্বিশজন জৈন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি একটা বাঁধাবাঁধি রীতি অনুসারে গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু ঠিক ইহার পূর্ব্বের যুগে এতটা বাঁধা-বাঁধি ছিল না।

জৈনধর্ম্মের প্রাচীনতম যুগে জৈনদিগের উপাস্য দেবতা কি ছিল, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত আয়পট বা আয়াগপট-গুলি লক্ষ্য করিয়া দেখা উচিত। মথুরায়, কৌশাম্বীতে অথবা অহিচ্ছত্রে কোনও জৈন স্ত্রী বা পুরুষ একটি 'আয়পট' প্রতিষ্ঠা করিলেন। 'আয়পট'টি একখানি বড় শিলাপট্ট, তাহার উপরে অনেক নক্সা আছে, প্রথমে একটি চারিকোণ নক্সা, এই নক্সার দুইদিকের অথবা চারিদিকের পাড়ে আট, বার, বা ষোলটি মঙ্গলচিহ্ন আছে। পট্টের মধ্যস্থলে এক বা ততোধিক বৃত্ত, তাহার ভিতরে চারিটি অথবা চারিজোড়া মৎস্যপুচ্ছ চারিদিকে সাজানো। এই মৎস্যপুচ্ছ একটি মঙ্গলচিহ্ন। সাধারণতঃ এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের কেন্দ্রস্থলে একটি গোলাকার স্থানের মধ্যে একটি উপবিষ্ট জিনমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যীশুখৃষ্টের জন্মের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে সিংহক বণিকের পুত্র এবং কৌশিকীগোত্রীয়া মাতার সন্তান সিংহনাদিক মথুরায় যে আয়াগপট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাতে এই রকম বইব্যবস্থা দেখা যায়। এ পট্টটির উপরে চারিপাশে চারিটি চারি-কোণা সরু পাড় আছে। উপরের দুইটিতে চারিটি করিয়া মঙ্গলচিহ্ন ও পাশের দুইটিতে কেবল দুইটি স্তম্ভ অঙ্কিত হইয়াছিল। পট্টের উপরে যে চারিকোণ জায়গাটুকু রহিল তাহার নীচের দিকে একটু পাড় কাটিয়া লইয়া দাতার পরিচয় লিখিবার জায়গা করা হইল এবং অবশিষ্ট চতুষ্কোণটুকুর মধ্যস্থলে একটি বৃত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে চারিটি যুগ্ম মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত হইল। মধ্যস্থলের বৃত্তের মধ্যে পদ্মাসনের উপরে ধ্যানমুদ্রায় উপবিষ্ট ছত্রনিম্নে একটি নগ্ন জিন বা তীর্থঙ্কর মূর্ত্তি। *
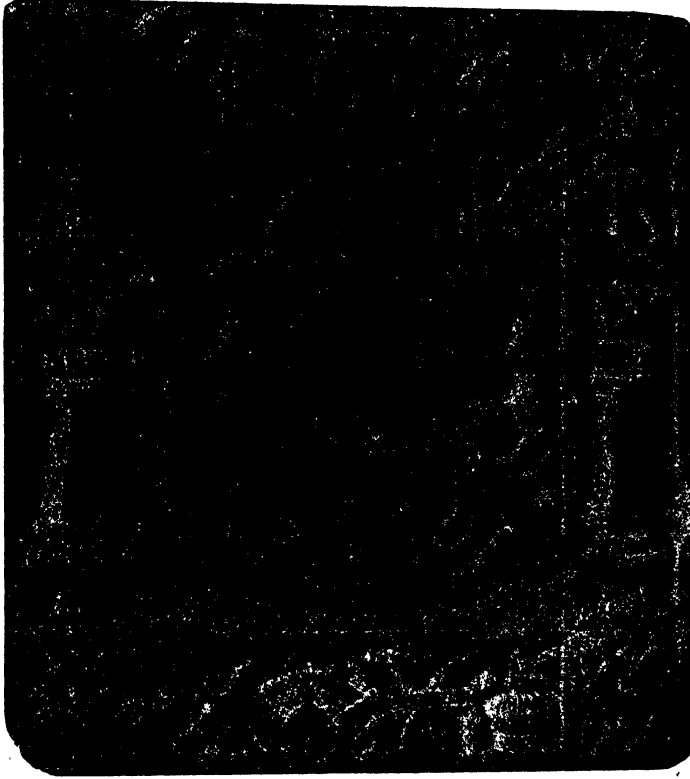
আর্য্যপট্ট—অর্হৎদিগের পূজার জন্য স্থাপিত

বিশেষ বিশেষ নমুনায় নক্সা পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় আর্য্যপট্টের পাড়ে অর্দ্ধ-অশ্বীকিন্নরী, ভিতরের চারিকোণের প্রতিকোণে অর্দ্ধ-মৎস্যকিন্নর, বৃত্তের গোলে একশ্রেণী যুবতী ও কেন্দ্রে জিন অথবা তীর্থঙ্করের পরিবর্ত্তে অর্হত নেমিনাথের লাঞ্ছন একটি রথচক্র অঙ্কিত আছে। এই আর্য্যপট্টের উপরে শিলালেখ সম্পূর্ণরূপে পড়িতে পারা যায় না। † মথুরায় আবিষ্কৃত তৃতীয় আর্য্যপট্টটি অন্য রকমের। ইহার মধ্যস্থলে একটি বৃহত্তর বৃত্তের মধ্যে একটি ছোট কেন্দ্র বা বৃত্ত আছে এবং এই ক্ষুদ্র বৃত্তের মধ্যে

* V. A. Smith—*The Jaina Stupa and other Antiquities of Mathura*, page. 15, pl. VII.

† *Ibid.* pl VIII.

পদ্মাসনের উপরে একটি জিনমূর্ত্তি ও বাহিরে চারি জোড়া মৎস্যপুচ্ছ অঙ্কিত। এই চারি জোড়া মৎস্য-পুচ্ছের বাহিরে প্রথমে বৃত্ত এবং তাহার বাহিরে চারিদিকে চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ। চিংড়িমাছের লেজের মত এই চারিটি লম্বা মৎস্যপুচ্ছ বাঁকিয়া আছে এবং এই চারিটির গর্ভে চারিটি মঙ্গলচিহ্ন অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়—(১) স্বস্তিক, (২) মৎস্যযুগ্ম, (৩) ঘটিকা, (৪) ভদ্রাসন। এই চারিটি মৎস্যপুচ্ছের বাহিরে অপ্সরাদিগের স্কন্ধে বাহিত একটি মালা; কিন্তু এই মালার সমান্তরালে (১) জিনমূর্ত্তি, (২) আর্য্যবৃক্ষ, (৩) স্তূপ, (৪) মন্দির। এই মালার বৃত্তের বাহিরে চারিকোণে চারিটি নাগিনী এবং তাহাদের নীচে একটি লম্বা পাড়ের উপরে আটটি মঙ্গলচিহ্ন।* মোটের উপরে দেখিতে পাওয়া যায়, অধিকাংশ আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্টের কেন্দ্রস্থলে একটি বৃত্তের মধ্যে জিনের মূর্ত্তি; দুই একটি আর্য্যপট্টের উপরে এই বৃত্তের মধ্যে জিনমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে জিনের লাঞ্ছন বা চিহ্ন, যেমন—মথুরার আর্য্যপট্টের উপরে অর্হত নেমিনাথের মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে তাহার চিহ্ন বা লাঞ্ছন—রথচক্র, কৌশাম্বীর আর্য্যপট্টের উপরে কৌশাম্বীতে জাত ষষ্ঠ তীর্থঙ্কর পদ্ম-প্রভের লাঞ্ছন একটি ফুল্লাব্জ।

মথুরার নানাস্থানে আবিষ্কৃত আরও কতকগুলি আর্য্যপট্ট অন্য প্রকারের কোনটিতে জৈনমন্দির অথবা জৈনস্তূপ অঙ্কিত আছে। এই জাতীয় নিদর্শন হইতে সর্ব্বপ্রথম প্রমাণ হইয়াছিল যে, প্রাচীন জৈনধর্ম্মের আদিম অবস্থাতে বৌদ্ধধর্ম্মের ন্যায় স্তূপের উপাসনাও বিশেষ-ভাবে প্রচলিত ছিল। পরে ১৮৯৮ সালের খননকালে মথুরাতে একটি জৈনস্তূপ আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইয়াছিল যে স্তূপ বা চৈত্য হিন্দু বৌদ্ধ অথবা জৈন, ভারতীয় কোনও সম্প্রদায়বিশেষের নিজস্ব সম্পত্তি নহে। পুরাতন স্তূপগুলি পুরাতন জিনমূর্ত্তির মত আর্য্যপট্টের উপরে অঙ্কিত হইয়া মন্দিরে অথবা বৃক্ষতলে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত। জিনমূর্ত্তিযুক্ত, জিনের লাঞ্ছনযুক্ত, অথবা স্তূপযুক্ত কোন' আর্য্যপট্টেই কোনরূপ প্রভেদ লক্ষ্য করিবার উপায় নাই, সকলেরই শিলালেখে এক কথায় দেখিতে পাওয়া যায়, "নমো অরহতো নম ফগুয়শস নতকস ভয়ায়ে শিবযশায়ে আয়াগপটো কারিতো অরহত পূজায়ে।" ইহাতে জিনের মূর্ত্তি, জিনের চিহ্ন ইত্যাদি কিছুই নাই। রেলিং-এ বেষ্টিত একটি স্তূপ, তাহার সম্মুখে তোরণ এবং তোরণের সম্মুখে সিঁড়ি, তোরণের দুই পার্শ্বে দুইটি অর্দ্ধ-বিবস্ত্রা নারী, ইহাই অর্দ্ধভগ্ন আর্য্যপট্টের বিবরণ।

বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস হইতে ভারতীয় জৈনধর্ম্মের আদিম যুগ সম্বন্ধে যাহা জানিতে পারা যায় তাহা আর্য্যপট্ট বা আর্য্যাগ্রপট্ট লইয়াই আরব্ধ। বর্ত্তমান জৈনেরা স্তূপের উপাসনা বড় করেন না, করিলেও প্রচ্ছন্নভাবে করিয়া থাকেন। সুতরাং জৈনস্তূপের আলোচনা বাদ দিয়া মধ্যযুগের জৈনধর্ম্মের আলোচনা করিতে যাওয়া অসম্ভব।

* *Ibid.*, p. 16, pl ix; *Epigraphia Indica*, Vol. II, pp. 311-13.

রূপের ফাঁদ

শ্রীসীতা দেবী
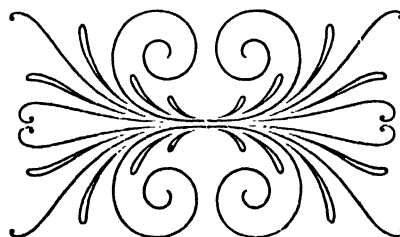
রেঙ্গুনের—নং গলিতে হঠাৎ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া পড়িয়া গেল। ভূতুড়ে বাড়ী বলিয়া মাড়োয়ারী লছমন দাসের বাড়ীটা এতদিন খালিই পড়িয়াছিল। আজ দেখা গেল তাহার তিনতলাটার সব দরজা জানালা খোলা, একজন মান্দ্রাজী চাকর এবং একটি ব্রহ্মদেশীয়া ঝি মহা উৎসাহে ঝাড়পোছ করিতেছে। আসবাব অনেকগুলাই আসিয়া পৌছিয়াছে, এবং তখনও আসিতেছে। যেগুলি তখনও উপরে উঠাইয়া ফেলা হয় নাই, নীচে ফুটপাথে জমা করা রহিয়াছে, সেইগুলি দেখিয়াই সকলের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, যাহারাই আসিয়া থাকুক, নিতান্ত গরীব নয়, বেশ উত্তম রকম দু'পয়সা তাহাদের আছে।

বাড়ীর আসল অধিবাসীদের দেখিয়া চক্ষু সার্থক করিবার আশায় অনেকেই অনেকক্ষণ দরজা বা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল, কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ঝি চাকর ভিন্ন আর কাহারও সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। অবশেষে যখন হতাশ হইয়া যে যাহার কাজে প্রস্থান করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন মস্ত বড় একটা মোটরকার আসিয়া বাড়ীটার সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেল। দিব্য নূতন ঝক্‌ঝকে গাড়ী। দামী, কি খেলো, তাহা বুঝিবার মত জ্ঞান গলির অধিবাসীদের মধ্যে বেশী লোকের ছিল না বটে, তবু চালকের ফিটফাট পোষাক, গাড়ীর ভিতরে নীল সাটিনের ঝালর এবং গদি ইত্যাদি দেখিয়া সকলেরই মনে একটা সম্ভ্রমের ভাব আসিয়া পড়িল। ছোট ছেলেমেয়ের দল আবার নূতন উৎসাহে ফুটপাথে ঘুরিতে আরম্ভ করিল এবং বড়র দল দরজা জানালার ধারে আসিয়া জুটিল।

এতক্ষণ পরে তাহাদের ধৈর্য্যের পুরস্কার মিলিল। দুটি মহিলা অতি যত্নে সাজসজ্জা করিয়া নামিয়া আসিলেন, এবং ধীরমন্থরগতিতে অগ্রসর হইয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন। ব্রহ্মদেশীয় রূপের আদর্শে দুইজনেই সুন্দরী। গায়ের রং উজ্জ্বল, বিপুল কবরীর ভারে মাথা যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। বহুমূল্য রেশমের লুঙ্গি এবং হীরা ও চুণীর অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে তাঁহাদের স্বাভাবিক শ্রী আরো যেন দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। একজন তরুণী, আর একজনের যৌবনে ভাঁটা পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু ঝরিবার মুখে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পুষ্পের যে শোভা, তাহা তখনও তাঁহার দেহে বিরাজ করিতেছে। দুজনেরই চালচলন আভিজাত্যব্যঞ্জক।

তাঁহারা গাড়ীতে উঠিয়া বসিবামাত্র গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মান্দ্রাজী ভৃত্যটি তাঁহাদের সঙ্গে ছোট একটি হাত-ব্যাগ বহন করিয়া নামিয়া আসিয়াছিল, গাড়ীর দরজা বন্ধ করিয়া সে উপরে উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই, গলির প্রায় সব ক'জন অধিবাসী একজোটে তাহাকে গিয়া আক্রমণ করিল। মিনিট কয়েক সেখানে মিশ্রিত হিন্দী, বর্ম্মা এবং তামিল ভাষায় এমন একটা প্রশ্নের ঝড় উঠিল যে, বেচারা প্রায় হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সকলেই জানিতে চায়, তাহার স্বামিনীদ্বয় কোথা হইতে আসিলেন, তাঁহারা কে, কতদিন এখানে থাকিবেন, এবং এত স্থান থাকিতে, এই ভূতুড়ে বাড়ীটাই তাঁহাদের পছন্দ হইল কেন? বাড়ীতে খালি এই দুটি স্ত্রীলোক, না পুরুষও কেহ আছেন, এ প্রশ্নও কেহ কেহ করিতে ত্রুটি করিল না।

মান্দ্রাজীটি খানিক পরে সামলাইয়া উঠিয়া প্রশ্নের উত্তর দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার কথায় বোঝা গেল যে, ইঁহারা এক ধনী ব্রহ্মদেশীয় জমিদারের বিধবা পত্নী এবং কন্যা। বাড়ীতে পুরুষ কেহই নাই। মহিলাদ্বয় পল্লীগ্রামে বাস করিয়া করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাই বৎসরখানিক সহরে কাটাইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের রেঙ্গুনে আবির্ভাব। এই বাড়ীতেই

বিশেষ করিয়া তাঁহারা কেন আসিয়া জুটিলেন, তাহার কোনো কারণ ভৃত্যটি বলিতে পারিল না। দুই একটি যুবক জিজ্ঞাসা করিল, জমিদার-কন্যাটির বিবাহ হইয়াছে কি না। ভৃত্য বলিল, এখনও হয় নাই, সৎপাত্র দেখিয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াও জমিদার-গৃহিণীর সহরে আগমনের একটা কারণ।

অতঃপর যে যাহার কাজে চলিয়া গেল। প্রতি-বেশিনীর হাঁড়ির খবর জানিতে যতই সকলের ঔৎসুক্য থাক্, তাহার জন্য কাজ কামাই করা ত আর চলে না? অগত্যা স্নানাহারের জন্য পুরুষগুলি ঘরে ঢুকিল, এবং তাহাদের খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করিতে মেয়েরাও যাইতে বাধ্য হইল। তিনতলার অধিবাসিনীরা কখন যে ঘরে ফিরিলেন তাহা দুই চারিজন বালকবালিকা ভিন্ন বড় কাহারও চোখে পড়িল না।

বিকালবেলা কাজকর্ম্ম বড় কাহারো থাকে না, তখন গলির মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন দেখা গেল। মহিলারা সকলেই চুল ফিটু ফাটু করিয়া বাঁধিয়াছেন, তরুণীর দল পুষ্পগুচ্ছে কবরীর শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছেন। যাহার বাক্সে যত উজ্জ্বল রংএর রেশমের লুঙ্গি ছিল সব বাহির হইয়াছে, সোনার চেন, চুণীর বোতাম, কানের ফুল, হাতের চুড়ি, যাহার যা ছিল, সবই গায়ে উঠিয়াছে। না হয়, তিনতলার নবাগতা অধিবাসিনীদের মত টাকা তাহাদের নাই, তাই বলিয়া কি দুইটা ভাল জিনিষ তাহারা পরিতে পারে না? না, পরিলেই লোকে তাহাদের দিকে ফিরিয়া চায় না?

মেয়েরাই যে শুধু যথাসাধ্য সাজসজ্জা করিয়া বাহির হইল তাহা নয়, যুবকবৃন্দের উৎসাহও কিছু কম দেখা গেল না। সকলেই প্রায় কাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্নান করিল, ভাল পোষাক পরিল, মাথায় রঙীন রেশমের রুমাল বাঁধিয়া বর্ম্মা চুরুট ধরাইয়া গলির ভিতর সান্ধ্য ভ্রমণ করিতে সুরু করিল। গৃহস্বামিনীর কন্যা বারান্দায় বাহির হন কিনা, কিম্বা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়ান কি না, সেই দিকেই ছিল প্রায় সকলের লক্ষ্য। মহিলাদ্বয়ের সহরে আসার একটা উদ্দেশ্য অন্ততঃ যাহাতে বিফল না হয়, ইহা তাহাদের সকলেরই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল। বিবাহ পর্য্যন্ত নাই গড়াক, একটু আলাপ সালাপ করিতে পাইলেই অনেকেই পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিত।

বিকালে আবার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। খানিক পরে আবার নূতন সাজে মা ও মেয়ে নামিয়া আসিলেন। এবার আর সকালের মত অবজ্ঞাপূর্ণ ভাব নয়। দুই জনেই চারি দিকে তাকাইয়া দেখিলেন, তরুণীটির মুখে একটু যেন হাসির চিহ্নও দেখা গেল। তাঁহার জননী দু'একটি ছোট ছেলের পিঠ চাপড়াইয়া, তাহাদের মাতাদের আনন্দের সাগরে নিমজ্জিত করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী আর একজনকে ডাকিয়া বলিল, "যতটা নাকটান ভেবেছিলাম, ঠিক ততটা নয়।"

অন্য জন উত্তর করিল, "তাই ত দেখছি। ছেলে-পিলে খুব ভালবাসে বোধ হয়। হাজার হোক্ মেয়েমানুষ ত! বড়মানুষ হলেই বা!"

সকলেরই মনে ধারণা হইয়া গেল, মানুষগুলি ভালই। ছেলেপিলের মায়েরা গৃহিণীটির সঙ্গে ভাব করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। যুবকরা ভাবিল কোনো গতিকে একটা কথা বলিবার সুযোগও যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে বাকি পথ তাহারা নিজের জোরেই করিয়া লইবে। বায়োস্কোপের বহুল প্রচারের ফলে এই সকল বিষয়ে অন্ততঃ তাহাদের বুদ্ধি খুব খুলিয়া গিয়াছিল। সন্ধ্যার পর, গিটার বাজাইয়া গান গাহিবার শব্দে গলিটা মুখর হইয়া উঠিল।

যাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এত আয়োজন, তাঁহাদের কিন্তু কিছুমাত্রও বিচলিত হইতে দেখা গেল না। সন্ধ্যার পর তাঁহারা বেড়াইয়া ফিরিলেন। মা নিজের শয়নকক্ষে চলিয়া গেলেন, সঙ্গে গেল তাঁহার ঝি। মেয়েও নিজের ঘরে গিয়া ঢুকিল। কাপড় চোপড় বদ্‌লাইয়া, হাত মুখ ধুইয়া দুজনে খাবার ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল।

মা মেয়েকে দেখিয়া বলিলেন, "কাল তুই একলাই যাস্, কেমন?"

মেয়ে বলিল, "দাঁড়াও আগে রাস্তা ঘাট সব ভাল করে

চিনে নিই, তারপর ত একলা যাব! এখন কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে উঠব তার ঠিকানা নেই। আরো দুচার জায়গায় ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে হবে, দুচার দিন! তাড়াতাড়ি করে লাভ কি?"

মা ডুরিয়ান ফলের একটা কোয়া মুখে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "তা অবিশ্যি। তাড়াতাড়ি করতে আমিও তোকে বল্‌ছি না। তবে দুজনে একসঙ্গে ঘুরে বিশেষ কোনো লাভ নেই, সেই কথাই বল্‌ছিলাম। চেনাশোনা জায়গাগুলোয় অন্ততঃ তুই একলা যেতে ত পারিস্। না হয় ঝিটাকে নিয়ে যাস্।"

মেয়ে বলিল, "যা তোমার ঝির বুদ্ধি! ওকে নিয়ে কি পথে ঘাটে চলা যায়? কি বল্‌তে কি বলে তার ঠিক থাকে না, আমি শেষে অপ্রস্তত হয়ে মরি।"

খাওয়া দাওয়া শেষ হইল। চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িয়া মেয়ে বলিল, "পাড়ার ছেলেগুলো সুরু করেছে দেখ, ঠিক যেন সং। আমি ওদের গান বাজনা শুন্‌বার জন্যেই এখানে এসেছি আর কি! সব এই বাড়ীর নীচেই ধর্‌না দিচ্ছে। ইচ্ছে করে, ওপর থেকে এক বাল্‌তি জল ঢেলে দিই।"

মা বলিলেন, "না, না, ওসব কর্‌তে যাস্ না। মানুষের সঙ্গে সদ্ভাব রাখ্‌তে হয়। ওরা গান করছে করুক না, তোর ত গায়ে ফোস্কা পড়ছে না? তুই নিজের কাজ কর গিয়ে। উপকার কর্‌তে না পারুক, অপকার করতে সব মানুষই পারে, যতই ছোট হোক্। সেই জন্যে শুধু শুধু কাউকে চটাতে নেই।"

মা নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন, বর্ম্মা ঝি তাঁহার হাত পা টিপিয়া দিতে লাগিল। মেয়ে ঘরে বসিয়া মাসিক পত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিল। সেগুলি বর্ম্মা ভাষায় প্রকাশিত, চলচ্চিত্র জগতেরই পত্রিকা। ব্রহ্মদেশে আজকাল এ সবের প্রচারও যেমন, আদরও তেমন।

—নং গলিটাতে সবই গরীব লোকের এবং মধ্যবিত্ত লোকের বাস। হঠাৎ কেহ কাহাকেও চমক্ লাগাইয়া দিতে পারে না। সুতরাং এই দুজন নবাগতাকে লইয়া দিন কতক খুবই উৎসাহ সবাই দেখাইল। কিন্তু জগতের নিয়মে কোন বিষয়েই মানুষের উৎসাহ বেশী দিন স্থায়ী হয় না. কাজেই ইহাদের বিষয়েও সকলের ঔৎসুক্য ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতে লাগিল। কেবল যুবক মঙজীর উৎসাহটা যেন বাড়িয়াই চলিল। সে একেবারেই হৃদয় হারাইয়া বসিয়াছিল। সে দরিদ্র কেরানী মাত্র, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা তাহার কিছুমাত্র কম নয়। বয়স প্রায় ত্রিশ হইতে চলিল, কিন্তু এত দিন পর্য্যন্ত বিবাহাদি কিছুই করে নাই। কাহাকেও তাহার মনেই ধরে না। সে যেমনটি চায়, তাহা এক বায়োস্কোপেই পাওয়া যায়, গৃহস্থ-ঘরে সে রকম জোটা অসম্ভব। মঙজীর মনে হইতেছিল, এতদিনে ভাগ্য বুঝি সুপ্রসন্ন হইল। তেতলার রূপসী তরুণীটি যে-কোনো বায়োস্কোপের অভিনেত্রীকে সৌন্দর্য্যে হার মানাইতে পারে। এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া যে-কোনো রকম রোম্যান্টিক অবস্থা কল্পনা করা যায়। টাকাকড়িও প্রচুর পরিমাণে মেয়েটির থাকা সম্ভব, জমিদারের মেয়ে যখন। কিন্তু সে সব ত গেল পরের কথা, আসল কথা যুবতীর রূপ মঙজীর হৃদয়ে এমন তুফান তুলিয়াছিল, যে, মনে মনে সে জীবন পণ করিয়া বসিয়াছিল, যেমন করিয়াই হউক্, উহাকে তাহার চাইই।

দিনের পর দিন কাটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে ধনী গৃহিণী বা তাঁহার রূপসী কন্যার বিশেষ ভাবসাব হইল না। তাঁহারা জানালা বা বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলে এপাশের ওপাশের বাড়ীর মেয়েরা মধ্যে মধ্যে সাহস করিয়া দু' একটা কথা বলিত। দু' এক কথায় উত্তর পাইত, কাজেই আলাপটা আর বেশী দূর অগ্রসর হইত না। তবে সেই দু' একটি কথার সহিত যে মিষ্টি হাসিটুকু মিশান থাকিত, সেই টুকুর খাতিরে কেহ রাগ করিতে পারিত না।

মঙজী অনেক চেষ্টা করিয়াও কোনো সুবিধা করিতে পারিল না। সকাল বিকাল যুবতী যখন বেড়াইতে যায়, সে কাছাকাছি দাঁড়াইয়া থাকে, যদিই তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত হয়, যদিই তাহার সামান্য একটু কাজ করিয়া দিবার সুযোগ ঘটে। কিন্তু বিধাতা নিতান্তই বিরূপ, কোনো সুযোগই ঘটিল না। চোর, ডাকাত, দুর্ব্বৃত্ত

কাহাকেও রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল না, তরুণী কাদায় আছাড় খাইল না, বা গাড়ী চাপা পড়িবারও কোনো লক্ষণ দেখাইল না। মঞ্জীর দিকে মাঝে মাঝে তাকাইয়া দেখিত বটে, তবে সে দৃষ্টির ভিতর বিশেষ কোনো ভাব প্রকাশ পাইত না।

মঞ্জী কিন্তু দমিবার ছেলে নয়। তাহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল, তরুণীর নিশ্চয়ই কোনো প্রেমাস্পদ আছে, না হইলে এই বয়সের মেয়ে দিনের পর দিন কাহারও দিকে তাকায় না, সোজা গিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসে, ইহা কেমন যেন অস্বাভাবিক। নিজের কাল্পনিক প্রতিদ্বন্দ্বীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল। একবার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিলে হয়, তাহাকে কি আর সে আস্ত রাখিবে? বর্ম্মা যুবকের পক্ষে ছোরা চালান কিছুই নূতন ব্যাপার নয়, প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বীকে বাঁচিতে দেওয়াই যেন তাহাদের লজ্জার বিষয়।

তরুণীর প্রণয়ীটি যে কে, তাহা গলিতে বসিয়া বুঝিবার কোন উপায় ছিল না, কারণ বাড়ীতে কেহই আসিত না। মঞ্জী স্থির বুঝিল, তরুণী সকালে এবং বিকালে যখন মোটর চড়িয়া বেড়াইতে বাহির হয়, তখনই দেখা সাক্ষাতের কাজটা সারিয়া আসে। আচ্ছা, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া এত সহজ ব্যাপার নয়, ট্যাক্সি চড়িয়া পিছন পিছন দুই দিন ঘুরিলেই সব সন্ধান জানা যাইবে। অবশ্য পয়সা খরচ হইবে, বেশ কিছু। তাহার মত দরিদ্রের পক্ষে এতখানি দেওয়া শক্ত, তবু না দিলে যখন নয়, তখন সে দিবেই। যুবতীকে পাইবার জন্য সে প্রাণও দিতে পারিত, টাকা ত তুচ্ছ জিনিষ।

মঞ্জী বিধবা মাতার সহিত দোতলা একটি ছোট ফ্ল্যাটে বাস করে। একটি মাত্র ঘর, পিছনে রান্নাঘর, স্নানের ঘর প্রভৃতি। সামনের ঘরখানি দিনের বেলা বসিবার ঘররূপে এবং রাত্রে শয়নকক্ষরূপে ব্যবহৃত হয়। মঞ্জীর মেজাজে সাহেবীআনাটা বড় বেশী, বন্ধুবান্ধব আসিয়া যে শুইবার খাট ভিন্ন আর বসিবার কোনো আসন পাইবে না, ইহা ভাবিতেই তাহার মাথা গরম হইয়া উঠিত। কাজেই বৃদ্ধা মাতাকে বাধ্য হইয়া বাক্স প্যাঁট্‌রা সব রান্নাঘরে এবং এখানে ওখানে লুকাইয়া রাখিতে হইত। আবার প্রতি রাত্রে চেয়ার টেবিল সরাইয়া, কোণে গাদা করিয়া রাখিয়া, বিছানা পাতিতে হইত।

এই বাড়ীটাতে বধূ লইয়া আসিবার কথা মনে হইলেই মঞ্জীর মন দমিয়া যাইত। এমন আবহাওয়ায় কি কখনো প্রেম স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে? তবে মনে এ সান্ত্বনাও ছিল যে, তাহার আকাঙ্ক্ষিতা বধূটিকে যদি সে ঘরে আনিতে পারে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি রকম টাকার বস্তাও আসিয়া পড়িবে এবং তখন পছন্দমত বাড়ী জোগাড় করা কিছুমাত্র শক্ত হইবে না।

সকাল বেলা চা খাইয়া, ঘরের সামনের তিনহাত ছোট বারান্দাটিতে বসিয়া মঞ্জী নানা কথা ভাবিতেছিল। সেদিন কি একটা বর্ম্মা পর্ব্ব উপলক্ষ্যে ছুটি, আপিস যাইবার তাড়া নাই। খানিক পরে স্নানাহার করিয়া, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে বাহির হইলেই চলিবে, এখন বসিয়া বসিয়া সে কল্পনাকে লাগাম ছাড়িয়া দিতে ছিল।

হঠাৎ একটা ট্যাক্সি আসিয়া সামনের তেতলা বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। মঞ্জী চমকিত হইয়া উঠিল। আজ হঠাৎ ট্যাক্সি কেন? নিজেদের গাড়ী কি হইল? তাড়াতাড়ি চটিজোড়া পায়ে দিয়া সে রাস্তায় নামিয়া আসিল। এবাড়ীতে কে আসিল, কে কোথায় গেল, কোনো খবর সে পারতপক্ষে জানিতে ত্রুটি করিত না।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল না। যুবতী মা সান্ নয়নমনোহর পোষাকে রূপের দীপ্তি ছড়াইতে ছড়াইতে নামিয়া আসিয়া ট্যাক্সিতে চড়িয়া বসিল। গাড়ীটা ছাড়িবার জন্য ষ্টার্ট দিতেছে দেখিয়া মঞ্জীর একেবারে মাথা গরম হইয়া উঠিল। এইরূপ একাকী যাওয়া যখন হইতেছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার ভিতর কোনো অভিসন্ধি আছে। অন্যদিন মায়ের সঙ্গে বাড়ীর গাড়ীতে যায়, আজ ট্যাক্সিতে একলা যাইবার মানে? অবশ্যই মাকে লুকাইয়া কোনো নিষিদ্ধ স্থানে যাইবার উদ্দেশ্য। মঞ্জী তৎক্ষণাৎ স্থির করিয়া ফেলিল, সে পিছু লইবে!

কপাল তাহার ভাল ছিল, গলির মোড়ে আর একট

ট্যাক্সি দেখা দিল মঙ্‌জী সঙ্কেত করিয়া তাহাকে ডাকিয়া নিল এবং চালকের পাশে চড়িয়া বসিল। তাহাকে ফিশ ফিশ্ করিয়া বলিল, "সামনের ঐ গাড়ীটা যে দিকে যাবে, তুমিও সেইদিকে যাবে। দাঁড়ালে দাঁড়াবে, জোরে চললে জোরে চালাবে। দেখো, যেন কিছুতেই চোখের আড়াল না হয়।"

শিখ মোটর-ড্রাইভারের গোঁফের কোণে একটুখানি হাসির রেখা দেখা দিল। সে তৎক্ষণাৎ গাড়ী ছাড়িয়া দিল। মঙ্‌জী তাহার পাশে বসিয়া দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া সামনের গাড়ীখানার দিকে চাহিয়া রহিল।

রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু সামনের গাড়ীখানা থামিবার কোনোই লক্ষণ দেখায় না। রেঙ্গুন সহর শেষ হইয়া গাড়ী অবশেষে সহরতলির দিকে চলিল। মঙ্‌জীর বিস্ময় ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল, এ মেয়ে এমন ভাবে চলিয়াছে কোথায়? এ কি একেবারে পলায়নের ব্যবস্থা, শুধু গোপন সাক্ষাতের নয়? তাহা হইলে ত বিপদ, মঙ্‌জী কিছুই করিতে পারিবে না। সে একাকী এবং সঙ্গে তাহার কোনোই অস্ত্র নাই। তাহাকে শুধু চাহিয়া দেখিতে হইবে!

সামনের ট্যাক্সিখানা হঠাৎ থামিয়া গেল। মঙ্‌জীর গাড়ীও দাঁড়াইল। সামনে একখানা বড় বাড়ী। যুবক বিস্মিত হইয়া দেখিল যে, বাড়ীখানা তাহার পরিচিতই, এখানে সহরের বিখ্যাত এক গুজরাটী বণিকের বাস। তাঁহার হীরা জহরতের বেশ বড় কারবার আছে। কিন্তু সে ব্যক্তি প্রৌঢ় এবং বিবাহিত, দেশে স্ত্রী-পুত্র সকলই আছে বলিয়া জানা যায়, তাঁহার সহিত এই ব্রহ্মদেশীয়া যুবতীর কি সম্পর্ক? সে কি অর্থের লোভে এতখানি নীচে নামিতে পারে? এমন যাহার রূপ, প্রতি পদক্ষেপ যাহার রাণীর মত দৃপ্ত, সে তুচ্ছ টাকার লোভে নিজেকে বিক্রয় করিবে? হইতে পারে জগতে সবই সম্ভব।

যুবতী নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। মঙ্‌জী ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িল। সন্ধান ত পাওয়াই গেল, এখন আর ট্যাক্সি দাঁড় করাইয়া রাখিয়া লাভ কি? বাড়ী ফিরিবার জন্য ট্রাম রহিয়াছে, রিক্‌স রহিয়াছে। সে ভাড়া চুকাইয়া ট্যাক্সিওয়ালাকে বিদায় করিয়া দিল। বাড়ীটার সামনের ফুটপাথে সে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশ্য একটু সতর্কভাবে, যাতে সহজেই লোকের চোখে ধরা না পড়ে।

খুব বেশীক্ষণ তাহাকে অপেক্ষা করিতে হইল না। আধঘণ্টার মধ্যেই যুবতী আবার বাহির হইয়া আসিল, গৃহস্বামী তাহার সঙ্গে। তাঁহার মুখ একেবারে হাস্য-বিকশিত। মা সান-ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে। মঙ্‌জীর একেবারে অন্তরাত্মা পর্য্যন্ত জ্বলিয়া গেল। হাতে কিছু থাকিলে, গুজরাটী ভদ্রলোকের সেদিন একটা অপঘাত ঘটিয়া যাইত। ভাগ্যগুণে তিনি তখনকার মত বাঁচিয়া গেলেন।

মা সান্ চলিয়া যাইতেই, মঙ্‌জী তাড়াতাড়ি একটা রিক্স চড়িয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। ছুটির দিনটা তাহার একেবারে ব্যর্থ হইয়া গেল। কোথাও সে বাহির হইল না, সারাদিন ঘরে বসিয়া, প্রতিহিংসা গ্রহণের যত অদ্ভুত প্ল্যান্ করিতে লাগিল বন্ধুরা আসিয়া ডাকাডাকি করিয়াও তাহাকে বাহির করিতে পারিল না। সামনের বাড়ীর দিকে সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিল, যেন তাহার অজ্ঞাতে কেহ বাড়ী হইতে বাহির হইতে বা বাড়ীতে ঢুকিতে না পারে।

বিকালের দিকে বাড়ীর গৃহিণী নিজের গাড়ীতে বাহির হইয়া গেলেন। তিনিও একাকিনীই গেলেন, কন্যা বাড়ীতেই রহিল। মঙ্‌জী ভাবিল, ইহাদের হইল কি? এতকাল ত দুজনে সর্ব্বদাই এক সঙ্গে বাহির হইত, আজ এত একলা ঘোরার ঘটা কেন? মা-মেয়েতে কিছু লইয়া বিশেষ একটা মনোমালিন্য হইয়া থাকিবে। যা মেয়ের ব্যবহার, হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়।

গৃহিণীর গাড়ী যে দিকে চলিয়াছিল, তাহা জানিলে মঙ্‌জীর বিস্ময় আরো শতগুণ বাড়িয়া যাইত। সহরের নামজাদা চিকিৎসক ডাঃ মরফি তখন নিজের পড়িবার ঘরে বসিয়া ধূম পান করিতেছিলেন, পায়ের কাছে তাঁহার পোষা কুকুরটি কুণ্ডলী পাকাইয়া শুইয়াছিল। ভদ্রলোক বিপত্নীক, দুইটি কন্যা আছে, দুইজনেই বিলাতে বোর্ডিং-এ থাকিয়া পড়াশোনা করিতেছে।

হঠাৎ বেয়ারা ভিতরে ঢুকিয়া সেলাম করিয়া জানাইল, একটি ব্রহ্মদেশীয়া ভদ্রমহিলা তাঁহার সঙ্গে বিশেষ প্রয়োজনে

সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ডাঃ মরফি অবাক হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, ভদ্রমহিলা অকস্মাৎ তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া হাজির হইলেন কেন? বিশেষ কোনো বিপদে পড়িয়া আসিয়া থাকিবেন, মনে করিয়া তিনি বাহিরের ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন, বেহারাকেও হুকুম দিলেন মহিলাটিকে উক্ত ঘরে লইয়া গিয়া বসাইতে।

ডাঃ মরফি ঘরে ঢুকিতেই আগন্তুক মহিলাটি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া চলনসই ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। ডাক্তার তাঁহাকে বসাইয়া, নিজেও বসিলেন, এবং রূপসী ব্রহ্মবাসিনীকে একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইলেন। দেখিতে সুন্দরী বটে, এবং অলঙ্কারের ঘটা যে রকম, তাহাতে ধনশালিনী বলিয়াই মনে হয়।

যাহা হউক ভদ্রমহিলা তাঁহাকে নিজের রূপ দেখিবার খুব বেশী অবসর দিলেন না। তাঁহার কথার স্রোতে হাবুডুবু খাইতে খাইতে ডাক্তার আবিষ্কার করিলেন যে ভদ্রমহিলার স্বামীটি অসুস্থ, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ডাক্তারকে লইয়া যাইতেই শ্রীমতীর আগমন।

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি অসুখ তাঁর?"

মহিলা উত্তর দিলেন, নানারকম অসুখেই এতকাল ভুগছিলেন, কিছু দিন থেকে মস্তিষ্কের গোলমাল সুরু হওয়াতে আমরা বড় বিপদে পড়েছি। বাড়ীতে কেবল দুটি মেয়ে মানুষ আমরা, আমি এবং আমার মেয়ে, কিছুতেই তাঁকে সামলাতে পারি না।"

ডাঃ মরফি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাঁকে এত দিন ডাক্তার দেখান হয়নি?"

মহিলা উত্তর করিলেন, "তা হয়েছে বৈ কি? কিন্তু এক একজন পাগল মানুষ কি রকম চালাক হয় জানেন ত? বাইরের লোক দেখলেই আমার স্বামী এমনভাবে কথাবার্ত্তা বলতে সুরু করেন যে তাঁকে পাগল বলে কেউ বিশ্বাসই করে না। আমি তাঁকে বিকৃতমস্তিষ্ক প্রমাণ করে নিজের কোনো সুবিধা করতে চাই, এই সকলের ধারণা হয়।"

ডাক্তার বলিলেন, "হ্যাঁ, এরকম অনেক পাগলের কথা শোনা যায় বটে। তা আমাকে কি করতে বলেন?"

অভ্যাগতা বলিলেন, "আপনি যদি দয়া করে আমার বাড়ী কাল বিকালে যান, এবং তাঁকে পরীক্ষা করেন ত বড় ভাল হয়। আপনি বহুদর্শী অভিজ্ঞ ডাক্তার, আপনাকে তিনি ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমার সাধ্য নেই তাঁকে সামলাবার, কিন্তু পাগল বলে ডাক্তারে সার্টিফিকেট না দিলে, কোনো পাগলা গারদে তাঁকে দিতে পারব না। সঙ্গে যদি দু' একজন লোক নিয়ে যান ত আরো ভাল।"

ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন? তিনি কি খুব বেশী উৎপাত করেন?"

ভদ্র মহিলা বলিলেন, "সব সময় নয়। তবে বহুকাল আগে তাঁর কিছু জহরৎ চুরি যায়, সেইগুলোর কথা মনে হ'লেই ভয়ানক ক্ষেপে ওঠেন এবং 'আমার হীরে কই? সর্ব্বনাশ হয়ে গেল' ব'লে চেঁচামেচি করতে থাকেন, তখন তাঁকে ঠাণ্ডা করা দায় হয়। রাস্তায় ছুটে যেতে চান, মানুষকে মারতে যেতে চান, এই সব কাণ্ড। আপনার যা ফিস্ তা আমি দেব, লোকগুলিকেও কিছু কিছু দেব। আশা করি, আপনি দয়া করে যাবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "অবশ্যই যাব। এর ভিতর আর দয়ার কথা কি? এই ত আমাদের কাজ।"

মহিলাটি উঠিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, এখন তবে আসি। কাল বিকাল চারটায় তাহলে আমি আপনার জন্যে অপেক্ষা করব।"

ভদ্রমহিলার গাড়ীটা ছাড়িয়া দিল। ডাঃ মরফি একটা গানের সুর শিষ দিতে দিতে আবার পড়িবার ঘরে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন মঞ্জরী সবেমাত্র আপিস হইতে ফিরিয়াছে, এমন সময় একটা ট্যাক্সি আসিয়া মা সানদের বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। মঞ্জরী তাড়াতাড়ি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ট্যাক্সি হইতে সেই গুজরাটী রত্নবণিককে নামিতে দেখিয়া সে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ কি ব্যাপার! মা সানের মাও কি এমনি নীচ, যে, টাকার লোভে এই বৃদ্ধের কাছে কন্যাকে বলি দিতে যাইতেছেন। ইহার পর কোনো মানুষকে বিশ্বাস করাই অসম্ভব হইয়া উঠিবে দেখা যাইতেছে। কি

করিবে স্থির করিতে না পারিয়া সে যেখানে ছিল সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। বুকের ভিতরটা তাহার জ্বালা করিতে লাগিল।

গুজরাটী বণিক তেতলায় উঠিবামাত্র বর্ম্মা ঝিটি আসিয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া বসিবার ঘরে লইয়া গেল। মিনিট দুই তাঁহাকে একলা বসিতে হইল। তিনি চারিদিকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, হাঁ্যা বড়মানুষের বাড়ী হওয়াই সম্ভব বটে। কিন্তু বাড়ীর সুন্দরী কর্ত্রীটি কোথায় গেলেন? তাঁহারই সহিত আর একবার সাক্ষাতের আশায় ভদ্রলোক নিজেই আসিয়াছিলেন, তাহা না হইলে একজন কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেই কাজ চলিয়া যাইত।

মা সান্ শীঘ্রই আসিয়া পৌছিল। মধুর হাস্যে বণিককে মুগ্ধ করিয়া বলিল, "এই যে আপনি এসে বসে আছেন। সে জিনিষগুলি এনেছেন কি?"

রত্নবণিক নিজের লম্বা কোটের পকেট হইতে একটি চামড়ার কেস্ বাহির করিলেন, সেইটি যুবতীর দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিলেন, "এরই ভিতর কতকগুলো আছে, আপনার যদি না পছন্দ হয় তাহলে কাল আরো মাল নিয়ে আস্‌ব, আপনি পছন্দ করে নেবেন। সব চেয়ে ভাল হয় যদি আপনি একবার আমার দোকানে আস্‌তে পারেন। সেখানে যা চান সবই পাবেন, বেশী জিনিষ ত নিয়ে বেড়ান যায় না? পথে ঘাটে নানা বিপদ আছে।"

মা সান্ বলিল, "আমার একলার পছন্দে যদি কাজ হত, তা হলে কি আর আপনাকে এত কষ্ট দিতাম? আমার মা পছন্দ না করলে ত আমি কিছু কিন্‌তে পারি না। দুঃখের বিষয়, তিনি এমন পীড়িত, যে, বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। কাজেই আপনাকে এতটা অসুবিধায় ফেলতে হল।"

গুজরাটী ভদ্রলোক অমায়িক হাসিতে সারামুখ ভরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "না, না, অসুবিধা আবার কি? আমাদের কাজই এই। আপনি যে অনুগ্রহ করে আমায় ডেকেছেন, সে-ই যথেষ্ট।"

মা সান্ বলিল, "আচ্ছা, জিনিষগুলো তাহলে মাকে দেখিয়ে আসি? তিনি পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন। আপনাকে একটু চা দিতে বলি?'

সুন্দর মুখের খাতিরে ভদ্রলোক অনেকটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন, তাই বলিয়া গোঁড়া হিন্দুমানুষ, বর্ম্মার বাড়ীতে চা খাইয়া জাত দিতে রাজী ছিলেন না। ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "না, না, আমার চা খাওয়া মোটেই অভ্যাস নেই।"

মা সান্ আবার ভুবন-ভুলান হাসি হাসিয়া জহরতের কেস্‌টি লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেল। ভদ্রলোক বসিয়া বসিয়া একখানা খবরের কাগজ উল্টাইতে লাগিলেন। সিঁড়িতে খুব ভারি পায়ের শব্দ খানিক পরে শোনা গেল। রত্নবণিক যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে সিঁড়ি দেখা যায় না। ঝিটা তখনি ঘরের ভিতর দিয়া ছুটিয়া কোথায় যাইতেছিল তাঁহাকে বলিয়া গেল, "ডাক্তার এসেছেন, আপনার একটু দেরি হবে।"

দেরি হইলেই বা উপায় কি, ভাবিয়া ভদ্রলোক খবরের কাগজ উল্টাইয়াই চলিলেন। মা সান্ বোধ হয় ডাক্তারকে লইয়া ব্যস্ত, তাই বলিয়া তাঁহাকে এতটা উপেক্ষা না করিলেও চলিত। তাঁহার অনেক কাজ ফেলিয়া আসিয়াছেন মনে করিয়া একটু অনুতাপ হইতে লাগিল।

ডাঃ মরফি ঠিক সময়েই আসিয়াছিলেন। উপরে উঠিবামাত্র মা-সান্ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে ছুটিয়া আসিল, বলিল "আসুন, আসুন, আমার মা এই ঘরে আছেন। তিনি আজ একটু অসুস্থ। কাল বাবাকে নিয়ে আমাদের বড় মুস্কিল গিয়েছে। সারারাত কেউ ঘুমতে পায়নি।"

ডাক্তার মা-সান্‌কে দেখিয়া খুসি হইলেন। মেয়েটি দেখা যাইতেছে মায়ের চেয়েও সুন্দরী এবং সুশিক্ষিতা, ইংরেজী বলে প্রায় ইংরেজের মতই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গৃহিণীর ঘরে আসিয়া ঢুকিলেন। ঘরখানি ছোট, তবে বেশ ফিটফাট করিয়া সাজান।

ডাঃ মরফিকে দেখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "আসুন, আসুন, আপনার খুব অনুগ্রহ। কাল ওকে নিয়ে বড় কষ্ট পেয়েছি। এ রকম হলে আমরা আর বেশীদিন টিঁক্‌ব না।"

মনে মনে হতভাগ্য পাগলটার প্রতি অত্যন্ত চটিয়া ডাক্তার বলিলেন, "আমার যথাসাধ্য আমি করব। আশা করি মেণ্ট্যাল হোমে তাঁকে ভর্ত্তি করা বেশী শক্ত হবে না। তিনি কোথায়?"

মা-সান্ বলিল, "তিনি সাম্‌নের বড় ড্রয়িং রুমে বসে আছেন। আপনি যান। একলা গেলেই ভাল, আমাদের দেখ্‌লে বাবা বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার সঙ্গে আরও লোক আছে ত? তিনি ক্ষেপলে, একলা তাঁর সঙ্গে পেরে ওঠা শক্ত।"

ডাক্তার বলিলেন, "আপনি নীচে কাউকে পাঠিয়ে দিন, আমার মোটরে দুজন লোক বসে আছে, তাদের ডেকে নিয়ে আসুক। ওরা হাঁসপাতালের সহকারী, এসব কাজ করা অভ্যাস আছে। যদি বেশী বাড়াবাড়ি দেখি, এখান থেকে সোজা হাঁসপাতালে নিয়ে যাব।"

গৃহিণী এবং মা-সান্ প্রায় এক সঙ্গেই বলিলেন, "সেই ভাল।" তাঁহার ঝি নীচে ছুটিল, লোক দুইজনকে ডাকিয়া আনিতে।

গুজরাটি ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া কাহাকেও ডাকিবেন কি না ভাবিতেছেন, এমন সময় গট্‌গট্ করিয়া এক সাহেব সোজা ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজ কেমন আছেন?"

বণিক ধরমদাস বিস্মিতভাবে বলিলেন, "ভালই আছি। আপনি কাকে চান?"

সাহেব বলিল, "সম্প্রতি আপনার কাছেই এসেছি। কাল আপনার শরীর বড় খারাপ গিয়েছে শুন্‌লাম?"

ধরমদাস বলিলেন, "আপনি কে? আমার সম্বন্ধে এসব কথা আপনি কার কাছে শুন্‌লেন? আমার বোধ হচ্ছে আপনি আমাকে অন্য মানুষ ভাবছেন। আমি এ বাড়ীর কেউ নই।"

ডাক্তারের গোঁফের কোণে একটু হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন, "হ্যাঁ, তা শুনেছি। তা আপনার ঘুমটুম বেশ হয়? হজম কি রকম?"

ধরমদাস বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন। আমার কোনো অসুখ হয়নি। এ বাড়ীর গৃহিণী এবং তাঁর মেয়ে কোথায়? তাঁদের জিগগেষ করলেই আপনি নিজের ভুল বুঝতে পারবেন।"

ডাক্তার বলিলেন, "তাঁরা বেড়াতে চলে গেছেন। আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিন না।"

ধরমদাস লাফাইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বেড়াতে গিয়েছেন মানে? এসব কি কাণ্ড! তা হলে আমার হীরেগুলো কি হল? প্রায় এক লাখ টাকার হীরে।"

ডাক্তার তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া তাঁহার পিঠে হাত দিয়া বলিলেন, "আপনি শান্ত হোন্, শান্ত হোন্, আপনার জিনিষ ঠিক আছে, কোনো ক্ষতি হয়নি।"

ধরমদাস অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তারের হাত ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "শান্ত হব কি রকম? আমি চোরের হাতে পড়েছি, ডাকাতের হাতে পড়েছি। আমার সর্ব্বনাশ হল! পুলিশ, পুলিশ!"

তিনি ঘর হইতে ছুটিয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেই ডাক্তার অদ্ভুতভাবে শিষ দিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ইউনিফর্ম পরা দুইজন জোয়ান লোক ঘরের ভিতর আসিয়া ঢুকিল, এবং নিমেষের মধ্যে ধরমদাসকে এমনভাবে চাপিয়া ধরিল যে, তাঁহার আর নড়িবার সাধ্য রহিল না।

ডাঃ মরফি তাহাদের হুকুম দিলেন, "নীচে আমার গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে বসাও।"

খুব খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তি, চেঁচামেচি চলিল। তাহার পর ধরমদাসের মুখ বাঁধিয়া টানিতে টানিতে গাড়ীর মধ্যে লইয়া গিয়া ফেলা হইল। গলির লোক একটু অবাক হইয়া তাকাইল বটে, তবে সাহেব ডাক্তারকে অনেকেই চেনে বলিয়া কেহ কোনো কথা বলিল না। হতভাগ্য বণিককে লইয়া ডাক্তারের গাড়ী বিদ্যুৎবেগে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মঙ্‌জী এতক্ষণ কি করিতেছিল, তাহা জানিতে পাঠকের ইচ্ছা হইতে পারে। গুজরাটী বণিক উপরে উঠিয়া যাইবার আধঘণ্টা পরেই ডাক্তারকে হাজির

হইতে দেখিয়া তাহার ক্রোধটা বেশীর ভাগই বিস্ময়ে পরিণত হইয়াছিল। এদের বাড়ী আজ হইতেছে কি? এতবড় ডাক্তার কি করিতে আসিল? কাহারও শক্ত অসুখ হইল না কি? মা-সানের কি? হায়, কাহার কাছে সে খবর লইবে? মান্দ্রাজী হতভাগারও ত কয়েক দিন হইল দেখা নাই।

অকস্মাৎ মা-সান্, তাহার মা, এবং তাহাদের ঝিকে এক সঙ্গে নামিতে দেখিয়া সে আরো হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এ যে চোখের সাম্‌নেই বায়োস্কোপ। ব্যাপারখানা কি? ইহাদের মুখের ভাবই বা এমন উত্তেজিত কেন? মঙ্‌জী ভাল করিয়া সব দেখিবার জন্য তাড়াতাড়ি উপর হইতে নামিয়া আসিল॥

সে নামিতে নামিতে মা-সান্‌দের মোটরও আসিয়া দাঁড়াইল, এবং পর মুহূর্ত্তেই সুন্দরীত্রয়কে লইয়া গলি ছাড়িয়া চলিল।

আর সময় নাই। মঙ্জী এধার ওধার চাহিয়া দেখিল। তাহার প্রতিবেশী এক যুবকের সাইকেলখানা দরজার পাশে ঠেসান রহিয়াছে দেখিতে পাইল। আর কোনো কিছু না ভাবিয়া সে উহাতে চড়িয়া বসিল। মোটর তখনও বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। সে প্রাণপণে তাড়া করিল।

সেদিন রাত্রে ছেলে বাড়ী না ফেরাতে মঙজীর বুড়ী-মা সারারাত ঘর-বাহির করিল। সকাল হইতেই তাহার ছেলের যত বন্ধু ছিল, সকলের ঘরে খোঁজ করিল। মঙজী কোথাও যায় নাই। বৃদ্ধা কাঁদিয়া-কাটিয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

পুলিশে খবর দিতে যাইতেছে এমন সময় তাহার হারান ছেলে ফিরিয়া আসিয়া হাজির হইল। তাহার মাথায় ব্যাণ্ডেজ, বেশভূষা কাদা এবং রক্তে মাখামাখি হইয়া গিয়াছে।

বৃদ্ধা ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কাণ্ড! কোথায় ছিলি সারারাত?"

মঙজী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "সে আর শুনে কি করবে মা? যা হবার তা হয়ে গেছে। ওঃ, কতবড় শয়তানী।"

তাহার মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

মঙজী বলিল, "ঐ তেতালার। যাক্ কারো কাছে এ সব বোলো না। মরতে মরতে বেঁচেছি, কিন্তু পরের ঠাট্টা সইতে পারব না।"

দিন চার পরে খবরের কাগজে এক তাজ্জব খবর দেখা গেল। বড় বড় হরফে উপরে ছাপা, "**অদ্ভুত ডাকাতি, মেয়ে জুয়াচোর।**"

নীচে গুজরাটী ধরমদাসের দুঃখকাহিনী। অনেক বলিয়া কহিয়া ব্যবসায়ের কার্ড দেখাইয়া ও সাক্ষীসাবুদ ডাকিয়া চার দিন পরে সে পাগলা গারদ হইতে ছাড়া পাইয়াছে। কিন্তু লক্ষটাকার হীরার শোকে সে মৃতপ্রায়।

মঙজী আজকাল আর বায়োস্কোপ দেখে না।

একটি আহার্য্য ছাতা

চিত্র—ঙ

দুইটি বিষাক্ত ছাতা

চিত্র—ঘ, ও গ.

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
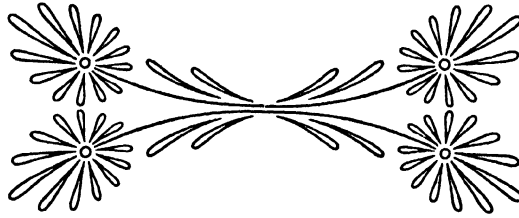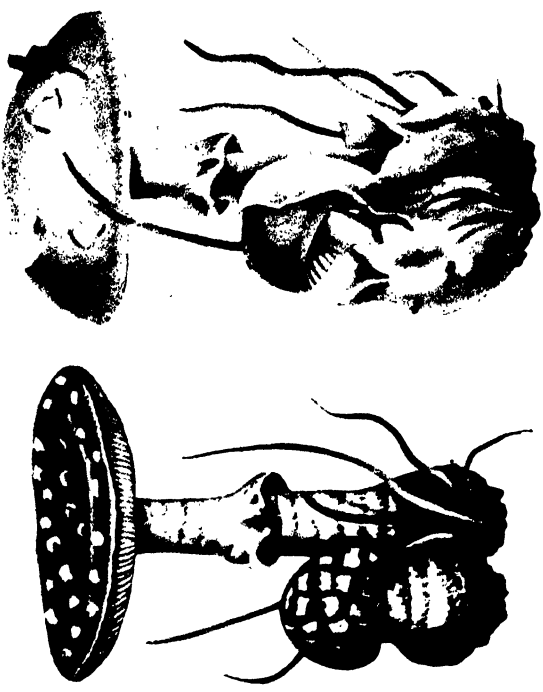
আহার্য্য ও বিষাক্ত ছত্রাক

ডাঃ শ্রীসহায়রাম বসু

কি উপায়ে আহার্য্য ছাতা বিষাক্ত ছাতা হইতে প্রভেদ করিতে পারা যায় এই প্রবন্ধে তাহাই আগে বলিব।

সবচেয়ে বিষাক্ত ছাতাগুলি য়্যামানিটা (Amanita) শ্রেণীর অন্তর্গত, কাজেই মোটামুটি য়্যামানিটার বিশেষত্বগুলি ভাল করিয়া মনে রাখিলে ছাতা খাইয়া জীবন হারাইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে না। য়্যামানিটাগুলির আহার্য্য ছাতা হইতে আকৃতিগত পার্থক্য এতই বেশী যে, অতি সহজেই প্রভেদ করিতে পারা যায়।

প্রথমতঃ, বিষাক্ত ছাতা খুব ছোট অবস্থায় ডিম্বাকৃতি থাকে এবং একটি আবরণে সম্পূর্ণভাবে আবৃত থাকে; যখন টুপির মত অগ্রভাগ বাড়িতে থাকে, তখন এই আবরণটি ছিঁড়িয়া গিয়া স্ফীত ডাঁটার নিম্নদেশে একটি বাটির ন্যায় ছড়াইয়া পড়ে এবং কখনও কখনও অতি সূক্ষ্ম ত্বকাবরণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ন্যায় বিভক্ত হইয়া যায়। এই অবয়বটির অস্তিত্ব নিরূপণের জন্য ছাতাগুলি খুব সাবধানে মাটি হইতে আমূল তুলিতে হইবে, কেন না, ঐ অংশটি মাটির নীচে সম্পূর্ণরূপে পড়িয়া থাকিতে পারে। আহার্য্য ছাতার বৃন্তের নিম্নভাগে এইরূপ বাটির ন্যায় কোনও অংশ বা চিহ্ন থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ, য়্যামানিটা শ্রেণীর ছাতাগুলির ডাঁটার উপর টুপির কিছু নিম্নভাগে একটি করিয়া আংটির ন্যায় খাঁজ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক আহার্য্য ছাতার (*Entoloma microcarpum*, *Volvaria terastrius*, *etc.* চিত্র ক) ঐরূপ কোনও খাঁজ থাকে না।

তৃতীয়তঃ, বিষাক্ত য়্যামানিটাগুলির টুপির ঠিক নিম্নভাগে মাছের কান্‌কোর ন্যায় ধবধবে সাদা স্তরে স্তরে পাতলা গুচ্ছ—গিল (gills)—থাকে। এবং যদি ডাঁটাগুলি কাটিয়া ফেলিয়া উহাদের টুপিগুলি কাগজের উপর রাখা যায়, তাহা হইলে উহা হইতে যে সব বীজকোরক (spores) কাগজের উপর পতিত হয়, সেগুলি সম্পূর্ণ সাদা রঙের। কিন্তু আহার্য্য ছাতার (সাধারণ Agaricus campestris—চিত্র খ) গিলগুলি (gills) প্রথম অবস্থায় ঈষৎ লাল রঙের হয় এবং তাহারা য়্যামানিটার ন্যায় ডাঁটার সহিত একেবারে সংলগ্ন থাকে না, কিছু তফাতে থাকে এবং
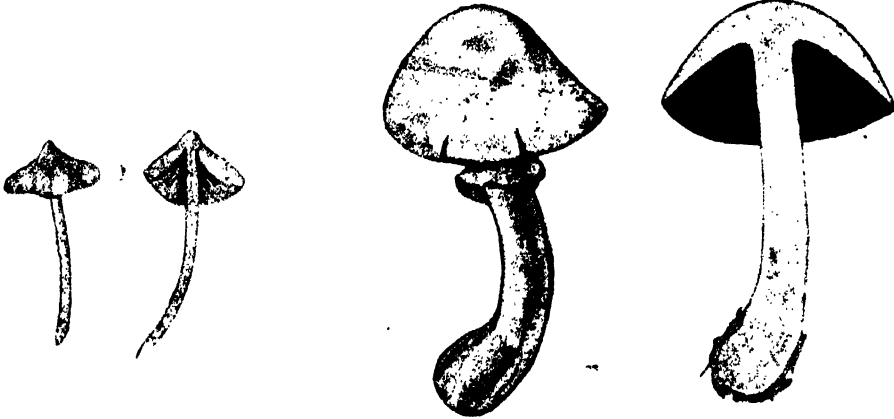
চিত্র—ক এণ্টোলোমা মাইক্রোকার্পাম্ নামক ছাতা

চিত্র—খ অ্যাগারিকাস্ ক্যাম্পেষ্ট্রিস্ নামক ছাতা

এগরিকসের বীজকোরকগুলি (spores) কখনই সাদা রঙের হয় না, তাহারা ঈষৎ লাল ও ক'ল রঙে মিশ্রিত। উহাদের ডাঁটায় আংটির মত পরিবেষ্টন থাকে বটে, কিন্তু বোঁটার নিম্নভাগে বাটির ন্যায় কোন আবরণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই য্যামানিটাগুলি কখনই পরগাছার ন্যায় গাছের উপর জন্মে না। তাহাদিগকে সব সময়ে বনের মধ্যে মাটির উপর দেখিতে পাওয়া যায়। আহার্য্য এগারিকস্‌গুলি সচরাচর খোলা মাঠে ঘাসের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা কখন ঘন বনে হয় না।

এ বিষয়ে অনভ্যস্তদিগের পক্ষে কতকগুলি সাধারণ নিয়ম জানিয়া রাখা উচিত :—যে ছাতাগুলি টাট্‌কা এবং শক্ত নয়, সেইগুলি কখনই খাদ্যরূপে আহার করিবে না। কিংবা যেগুলি পোকামাকড়ে পূর্ণ অথবা কোন তীব্র গন্ধ পরিপূর্ণ সেগুলি সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিবে। যেগুলি হইতে দুগ্ধের ন্যায় রস বহির্গত হয় সেগুলিও পরিত্যাগ করিবে। নানা বর্ণে বিশেষভাবে চিত্রিত বড় ছাতাগুলি সাধারণতঃ বিষাক্ত শ্রেণীভুক্ত, সুতরাং তাহাও পরিহার্য্য। আহার্য্য ছাতা সম্বন্ধে সকল সময়ে নিজের কিছু কিছু জানিয়া রাখা আবশ্যক। পরের প্রতি নির্ভর করিলে অনেক সময়ে বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে। গরম জলে ফুটাইয়া লইলে বা লবণ দ্বারা সিদ্ধ করিলে বিষাক্ত ছাতার বিষ নষ্ট হয় না। এ সম্বন্ধে ভুল ধারণাগুলি দূরীভূত করা বিশেষ প্রয়োজন। য্যামানিটার বিষ কেবল সতেজ য্যাসিডে বহুক্ষণ সিদ্ধ করিলে নষ্ট করা যাইতে পারে। দুইটি ভয়ানক বিষাক্ত য্যামানিটা জাতীয় ছাতার (Amanita muscaria এবং Am.phalloides) ছবি দেওয়া গেল (চিত্র গ ও ঘ)। এই দুই শ্রেণীর বিষাক্ত ছাতা খাইয়া আকস্মিক দুর্ঘটনার শতকরা নব্বুইটি মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। আমাদের সাধারণ আহার্য্য ছাতাগুলির ছবিও দেওয়া হইল (চিত্র ক, খ, ঙ)। এই ছবিগুলির সাহায্যে সাধারণে উহাদের প্রভেদ সহজেই ধরিতে পারিবেন।

ইউরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, নিউজিলণ্ড প্রভৃতি দেশে ছাতা নিত্যব্যবহার্য্য তরিতরকারীর মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুইজারলণ্ডের জুরিক্ সহরে আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি বাজারের এক অংশ ছাতা-বিক্রয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। আমাদের এখানে যেরূপ আলু স্তূপাকার করিয়া বিক্রয়ের জন্য সজ্জিত রাখে, সেইরূপ পাশাপাশি বহু দোকানে ছাতা সজ্জিত রহিয়াছে। ইহা হইতেই সহজে বুঝিতে পারা যায়, ওসব দেশে ছাতার কাটতি কেমন বিস্তৃত এবং ইহার
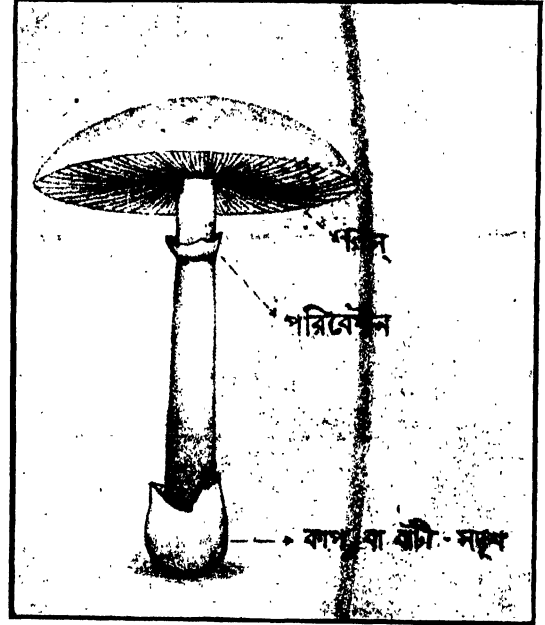
ছত্রাক বা ব্যাঙের ছাতার বিভিন্ন অংশ

ব্যবসা কেমন দ্রুতবেগে বাড়িয়া চলিতেছে। প্যারিস সহরের কাছে পরিত্যক্ত চুনের ও পাথরের খনিতে মাটির নীচে খুব বিস্তৃত সুড়ঙ্গের মধ্যে ফরাসীরা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাতার চাষ করিয়া আসিতেছে। এই সব সুড়ঙ্গের এক একটির দৈর্ঘ্য সাত আট মাইল হইবে। বিগত যুদ্ধের সময়ে শত্রুপক্ষের গুলিবর্ষণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য ঐ সব সুড়ঙ্গে অনেকে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২৪ সালে প্যারিসে অবস্থানকালে আমি প্রায় তিন মাসকাল মধ্যে মধ্যে কয়েকটি সুড়ঙ্গের ছাতা চাষের পদ্ধতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলাম এবং দেখিয়াছিলাম ফরাসীরা কিরূপ যত্নসহকারে উহার চাষ আবাদ

করিতেছে এবং ফলন কিরূপ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াইয়াছে। ১৯০১ সালে প্যারিস সহরের বাজারে ১২৫,০০০ মণ ছাতা বিক্রয় হইয়াছিল। একটি ছাতা চাষের ছবি দেওয়া হইল (চিত্র চ)। উহা হইতে দেখিতে পাওয়া যাইবে কেমন ক্ষেত হইতে ছাতা সংগ্রহ হইতেছে।

চিত্র---চ, ব্যাঙের ছাতা চাষ করিবার প্রণালী

জাপানীরা এক অদ্ভুত উপায়ে বনের মধ্যে নানা প্রকার কাষ্ঠখণ্ডের উপর গর্ত্ত করিয়া একপ্রকার আহার্য্য ছাতার অণুসূত্র (Mycelium) রোপণ করে (চিত্র ছ। এই ছাতার নাম Cortinellus Shiitake ; দুই তিন বৎসরের মধ্যে ঐসব অণুসূত্র (Mycelium) হইতে ছত্রাকার ছাতা বহুলপরিমাণে উৎপন্ন হয়। জাপানীরা উহাদিগকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং শুষ্ক অবস্থায় চীন দেশে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি করে। এমন কি কলিকাতার চীনা হোটেলগুলিতে এই জাতীয় ছাতা (Cortinellus Shiitake) নিত্য আহার্য্যের পাকের নির্ঘণ্টে পাওয়া যায়। আমি কটকে বর্ষাকালে স্থানীয় ভদ্রলোকদিগকে নিজ নিজ তরি-তরকারীর সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে ছাতা প্রায় নিত্য ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি।
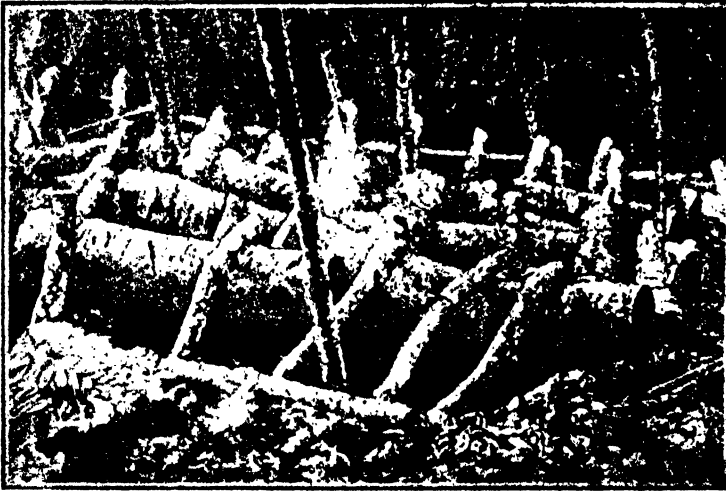
ছাতা চাষের জাপানী প্রণালী

হরির লুট

শ্রীদিবাকর মিত্র

(১)

বিষ্টুমামা তাঁর জীবনে একটা অতি গভীর দুঃখকে আশৈশব নীরবে বহন করে এসেছিলেন এবং আমরণ বহন কর্‌তে হবে তাও জান্‌তেন,---সে তাঁর বাপমায়ের দেওয়া নামটা। যথাসাধ্য ইংরেজিয়ানা করে বিষ্ণুচরণ ঘোষকে Bestow Churn Gosse লিখে এবং বলেও তাঁর মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। তাঁর কোনো কথাতে এ দুঃখকে ধর্‌বার উপায় ছিল না, কিন্তু যখনই কোনো কারণে তাঁকে নামটা ব্যবহার কর্‌তে হত, কোথাও কিছু নেই অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে গিয়ে আচম্‌কা "দুত্তোর" বলে তিনি এক-একটা হাঁক দিয়ে উঠতেন।

নামটা কেবল যে তাঁর সাহেবিয়ানায় বাধ্‌ত তা নয়। হিন্দুদেবতার নাম বলে' বিষ্ণু কথাটাতে বেশী বাধত। কিন্তু মজা এই, বিষ্টুমামা খ্রীষ্টিয়ান, বৌদ্ধ, মুসলমান অথবা ব্রাহ্ম ছিলেন না, ঠিক হিন্দু বল্‌তে যা বোঝায় তাও তিনি ছিলেন না, অথচ হিন্দু দেব-দেবীর অস্তিত্বে তিনি সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর্‌তেন। অত্যন্ত গোঁড়া হিন্দুও অনেক সময় তেত্রিশ কোটির মধ্যে দুচারজনকে বাদসাদ দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়, এমন দেখা গেছে। কিন্তু বিষ্টুমামা কাউকেই বাদ দিতেন না, বল্‌তেন, "তেত্রিশ কোটি কেন, সম্ভবতঃ তার চেয়ে ঢের বেশীই আছে। এই অসীম সৃষ্টির মধ্যে আমরা যা ভাবতে পারি না, এমন জিনিষও আছে। চারটে হাত বা তিনটে চোখ বা পাঁচটা মাথা কারো কারো থাক্‌বে, এ আর আশ্চর্য্য কি? আমি কেবল বল্‌তে চাই, তাঁরা আর যাই হোন্ দেবতা নন্। ভালো কর্‌বার ক্ষমতা তাঁদের থাক্‌তে পারে, মন্দ কর্‌বার ক্ষমতা যে আছে তা ত তোমরাই স্বীকার কর, কিন্তু সে ক্ষমতাগুলো মানুষেরও ত আছে? তার জন্যে তাঁদের দেবতা বলে মান্‌ব কেন? মানুষকে যতটা খাতির করি তার চেয়ে বেশী খাতিরই বা তাঁদের কি জন্যে কর্‌ব?"

কিন্তু হলে কি হয়, ভারতবর্ষের মানুষ ত? দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি না থাক্‌লেও, তাঁদের জায়গা আর কাউকে দিয়ে পূর্ণ না করে বিষ্টুমামার চল্‌ল না। ইংরেজ জাতি ছিল বিষ্টুমামার ব্রাহ্মণ, তারাই ছিল তাঁর দেবতা। তিনি বল্‌তেন, "তোমাদের দেবতারা ত হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর, ষাঁড় এই-সব চড়ে বেড়ান, একটা আর্‌বী ঘোড়ায় চড়া দেবতাও তোমাদের দেখলাম না। ইংরেজের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাঁরা পার্‌বেন? তারা চড়ে এরোপ্লেনে, ঘণ্টায় যা দুশো মাইল যায়। তোমাদের বিষ্ণুকে গোকুল থেকে কৈলাসে আস্‌তে হয় শিবের কাছে কৈলাসের খবর জান্‌তে; ওরা লণ্ডন থেকে কথা কয়, নিউইয়র্কে বসে শোনে।"

আমরা বল্‌তাম, "হ্যাঁ, শিব খেতেন এক ভাঙ, ওরা খায় পাঁচ-মিশুলী punch, cocktail, cobbler।"

বিষ্টুমামা বল্‌তেন, "ঠাট্টা কর্‌তে চাও কর, কিন্তু সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে দেবতারা মানুষদের দেখা দিতে আস্‌তেন, তা ত মানো?"

"সত্য ত্রেতা দ্বাপর মান্‌লে ওটাও মান্‌তেই হয়।"

"বেশ, কলিতে কেন আসেন না?"

"ঘোর কলি বলে'।"

বিষ্টুমামা বল্‌তেন, "দুত্তোর। আস্‌বার জো কি? ভয় আছে না? কলিতে যে ইংরেজ বলবান্। এলেই সব জারিজুরী ফাঁস হয়ে যাবে যে। ইংরেজের সঙ্গে চালাকী চল্‌বে না।"

কিন্তু এই কলিযুগেও, কেষ্ট না বিষ্টু না, একটি অতি সাধারণ দ্বিপদ সার্দ্ধতিনহস্তপরিমিত মনুষ্য ইংরেজের সঙ্গে 'অহিংস অসহযোগ' নামক এক অতি বিষম চালাকীর অভিনয় আরম্ভ করে দিলে। বিষ্টুমামা খবরের কাগজ না পড়ে জলগ্রহণ কর্‌তেন না, একদিন হঠাৎ বলে "উঠলেন, গিন্নী, কাগজ পড়া এর পর বন্ধ কর্‌তে হলো।"

মামী বল্‌লেন, "সে কি গো? চোখ খারাপ হচ্ছে বুঝি?"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "হতেও পারে। যা দেখছি তা যে সত্যিসত্যিই দেখছি, সব সময় তা ভাবতে ইচ্ছে করে না। ইংরেজের সঙ্গে ওরা বিনা-অস্ত্রে লড়বে! পাগল আর-কি!"

মামী বল্‌লেন, "তা অস্ত্র ছাড়া কি আর লড়াই হয় না, --তোমাকে নিয়ে আমার দশাটা কি হ'ত তাহলে?"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "গান্ধী ত আর ইংরেজের ধর্ম্ম-পত্নী নন্, যে, 'আড়ি' বলে' বেঁকে বসলেই তাঁর পায়ে ধরে' তারা সাধাসাধি সুরু কর্‌বে।"

মামী বল্‌লেন, "তুমি তাই বলে' আর আমার পায়ে ধরে' সাধনি কখনো। কিন্তু ধরবো, ইংরেজ যদি সাধেই।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "ইংরেজ? গান্ধীকে সাধবে? ছত্তোর।"

মামী বল্‌লেন, "শুধু কি গান্ধী? দেশসুদ্ধ লোক আড়ি বলে' বেঁকে বসলে না-সেধে তারা কি কর্‌বে?"

বিষ্টুমামা বলতেন, "কিছুই কর্‌বে না, যেমন রাজ্য চালাচ্ছে তেমনি চালাবে।"

"কাদের দিয়ে চালাবে? সব-কিছুতেই ত দেশের লোক দিয়ে তাদের চল্‌ছে।"

"তাদের যতটা চলা দর্‌কার তা তারা নিজেরাই চালাবে। আর দেশের লোকের কথা বল্‌ছ? দুদশ হাজারকে গুলি করে' মার্‌লেই সব ঢিট্ হয়ে যাবে।"

"ঢিট্ যদি না হয়?"

"গুলি চালাতে থাক্‌বে।"

"সে কি গো, দেশ উজোড় হ'য়ে যাবে যে।"

"তাতে তাদের কি, যাক্ না দেশ উজোড় হয়ে।"

"কাদের নিয়ে তাহলে রাজত্ব কর্‌বে?"

"কেন, লোকের অভাব কি? অন্য দেশ থেকে প্রজা এনে বসাবে। কত লোক কত জায়গায় না খেতে পেয়ে মর্‌ছে।"

মামীর তর্ক করা এইখানেই শেষ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে' ভেবে বল্‌লেন, "তা তারা কর্‌বে না। তাদের প্রাণে কি আর দয়ামায়া নেই, ধর্ম্মজ্ঞান নেই?"

বিষ্টুমামা বিজয়গর্ব্বে [illegible] হয়ে উঠে বল্‌লেন, "হ্যাঁ, পথে এসো এই [illegible] শেষ অবধি যাদের দয়ামায়া আর ধর্ম্মজ্ঞানের [illegible] নির্ভর করা ছাড়া উপায় নেই, তাদের সঙ্গে [illegible] কেন রে বাপু? দেশকে যারা ঠগীর অত্যাচার, বর্গীর হাঙ্গামা থেকে বাঁচিয়েছে, সতীদাহ নিবারণ করেছে, গঙ্গাসাগরে শিশু-বিসর্জ্জন বন্ধ করেছে, খাল কেটেছে, রাস্তা বেঁধেছে, স্কুল কলেজ আপিস আদালত হাসপাতাল বসিয়েছে, রেল ষ্টীমার টেলিগ্রাফ সস্তার ডাক টেলিফোন ট্রাম মোটর ইলেক্‌ট্রিক বাতি—এক কথায় সভ্যতার সমস্ত উপাদান দেশকে যারা জুগিয়েছে, নিতান্ত মাথা-খারাপ না হলে তাদের সঙ্গে কেউ লড়াই করে না।"

মামী বল্‌লেন, "হ্যা গো, তুমি উকীল হলে না কেন, নিশ্চয় ওরা তোমায় এডভোকেট জেনেরাল করে' দিত।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "তা হয়ত দিত। ইংরেজ গুণের আদর জানে।"

কিন্তু বিষ্টুমামা তাঁর গুণের আদর কর্‌বার কোনো সুযোগ ইংরেজকে কোন্‌দিন দেননি। চাক্‌রীর উমেদার হয়ে কোনোদিন ইংরেজের দরজায় তিনি দাঁড়ান নি। বাল্যে ও যৌবনে ইংরেজের বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষালাভ করেছিলেন, তারপর থেকে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ কোনোরূপ সম্পর্কই তাঁর আর ছিল না। দেশে ছোটখাট একটি জমিদারী ছিল, তারই আয়ে তাঁর চল্‌ত; জমিদারীর খাজনাও সরকারকে সাক্ষাতে তিনি দিতেন না, বড় সরিকেরা সরকারী খাজনা কেটে রেখে জমিদারীতে তাঁর অংশের আয় কল্‌কাতায় তাঁকে পাঠিয়ে দিত। মামলা মোকদ্দমা যা কর্‌বার তাও তারাই কর্‌ত, সুতরাং বাইরের দিক্ দিয়ে বিষ্টুমামার অসহযোগ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ অপেক্ষা কিছুমাত্র কম ছিল না। অহিংস ত তিনি ছিলেনই,—মাছ-মাংসটা খেতেন, কিন্তু সে নিতান্ত নিরামিষ মুখে রুচ্‌ত না বলে'। তা সত্বেও জীবহত্যা না করে' আমিষ-আহার চল্‌তে পারে কি না এ-বিষয়ে একবার তিনি গবেষণা করেছিলেন। তার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর বাড়ীর সম্মুখের বাগানের এক কোণে একটা খোঁড়া

ভেড়াকে বাঁধা থাক্[illegible] যেত। বহুকাল আগে বিষ্টুমামা বহুযত্নে [illegible]-প্রয়োগে তার একটি পা য়্যাম্পুটেট্ করে' তা[illegible] ষ্টু তৈরী করে' খেয়েছিলেন। কিন্তু প্রক্রি[illegible] ব্যয়সাপেক্ষ বলে' এবং খোঁড়া ভেড়াগুলিকে নিয়ে তারপর কি করা যাবে স্থির কর্‌তে না পেরে বিষ্টুমামা এই অহিংস আমিষ-আহারের চেষ্টা দ্বিতীয়বার আর কখনো করেন নি।

কিন্তু বাইরের দিকে নিজের এই অনিচ্ছা-অবলম্বিত অসহযোগের কোনো প্রতিকার তাঁর হাতে ছিল না, থাক্‌লে প্রতিকার তিনি কর্‌তেন। কাজেই একমাত্র অহৈতুক ইংরেজ-প্রীতির দ্বারা অন্তরের দিকে তিনি তার যতটা শোধ তোলা সম্ভব তা তুল্‌তেন। বিষ্টুমামাও বয়কটে বিশ্বাস কর্‌তেন, কিন্তু তিনি বয়কট করেছিলেন, বিলিতি পণ্যকে অবশ্যই নয়, জাপানী পণ্যকেও নয়, তাঁর বাড়ীতে পুঁইশাক, পটল, ঢেঁড়শ, ইত্যাদি ছাড়া স্বদেশী কোনো জিনিষ সহজে ঢুকতে পেত না। যে-সব জিনিষ এম্‌নিতেই স্বদেশী সকলে ব্যবহার করে, বিলিতি বড়-একটা এদেশে আসেই না, বিষ্টুমামার দর্‌কার হলে তাও সংসার তোলপাড় করে' তিনি বিলিতি খুঁজে বের কর্‌তেন। তাঁর বাঁশের লাঠিটি ছিল বিলেতে পালিশ করা, বিলেত থেকে পার্শেল হয়ে তাঁর জন্যে নস্য আস্‌ত, দেশী চিতল, কই, বাটা ইত্যাদির চাইতে বিলিতি স্যামন্, সার্ডিন্ ইত্যাদি তাঁর বেশী মুখরোচক ত ছিলই, আপেল, ষ্ট্রবেরি, আঙুর ইত্যাদি যে-সমস্ত ফল দেশেও জন্মায়, তাও বিলেত থেকে টিনে প্যাক না হয়ে এলে তাঁর খেয়ে তৃপ্তিবোধ হত না।

বিষ্টুমামা বাংলা বই পড়েন না, একথা সদর্পে প্রচার কর্‌তেন। রবিবাবুর ইংরেজি বইগুলি লাইব্রেরীতে রাখা যেতে পারে কি না, এবিষয়ে বহুদিন তাঁর মনে একটা খট্‌কা ছিল,—সেগুলি বাংলার হুবহু অনুবাদ নয় জান্‌তে পার্‌বার পর নিঃসংশয় হয়ে এক সেট বই তিনি ক্রয় করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিও আলমারির নীচের তাকেই প্রায় পড়ে' থাক্‌ত। দেশী ছবিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা সম্ভব নয় বলে' তাঁর বাড়ীতে দেশী ছবির জায়গা ছিল না।

নব্‌নেটার অসাধ্য কাজ নেই; এহেন মানুষের বাড়ীতে গান্ধী-টুপী মাথায় দিয়ে সে গিয়ে উঠল পিকেট কর্‌তে। "আপনাকে বিলিতি ছাড়তে হবে।"

এক টিপ বিলিতি নস্য নিয়ে বিলিতি আদ্দির রুমালে নাক মুছতে মুছতে বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "স্বদেশী জিনিষ আমি ছুঁই না, বিলিতিও যদি ছাড়ি, আমার কি করে' তাহলে চল্‌বে?"

"আপনাকে স্বদেশী কিন্‌তে হবে।"

বিষ্টুমামা কেবল বল্‌লেন, "পয়সা দিয়ে? ছুত্তোর।"

নব্‌নে বল্‌লে, "না-হয় দেশী জিনিষ তুলনায় একটু খারাপই, তবু দেশী ত?"

"দেশী জিনিষ খারাপ হলেও যে দেশী তা ত আমি অস্বীকার কর্‌ছি না।"

"দেশী বলে'ই ত কেনা উচিত।"

"আমি বিলিতি জিনিষকে বিলিতি বলে'ই কিনে থাকি, সুতরাং যুক্তির দিক্ দিয়ে তোমার সঙ্গে আমার কোনো বিরোধ নেই।"

"কিন্তু দেশের লোকরা খেতে পায় না যে।"

"সে তাদের দোষ, আমার নয়। সকলে মিলে বিলিতি কেনা ছেড়ে দিলে বিলেতের লোকেরাও অনেকে খেতে পাবে না,—তাদেরও ত খেতে পাওয়াটা দেশী লোকের সমানই প্রয়োজন।"

"তবু দেশের কথা আগে ভাব্‌তে হবে।"

"দেশের কথা ভাব্‌লে ত আরোই দেশী জিনিষ কেনা চলে না।"

"কেন?"

"বেশী পয়সায় তুলনায়-নীরেস দেশী জিনিষ কিন্‌লে ইনেফিশিয়েন্সীকে প্রশ্রয় দিয়ে তাদের মাথা খাওয়া হবে। কোনোদিনই তারা আর কিছু করে' উঠতে পার্‌বে না।"

"কিন্তু কিছুদিন তাদের মাথা খেয়েও যদি দেশটা স্বাধীন হয়?"

"দেশ স্বাধীন? ছুত্তোর!"

নব্‌নে বল্‌লে, "আপনি মামীমাকে কি-সব বলে' বুঝিয়েছেন, আমি শুনেছি, কিন্তু আমি যদি প্রমাণ কর্‌তে

পারি যে, বিলিতি বর্জ্জন করে' ইংরেজদের সঙ্গে সবরকমে অসহযোগ করে' দেশকে স্বাধীন করা সম্ভব ?"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "তা যদি প্রমাণ কর্‌তে পার তবে দেশী জিনিষ ত আমি আরোই কিন্‌ব না সুতরাং সেটা তোমার দিক থেকে পণ্ডশ্রম হবে।"

"কেন ?"

'সবে ত কথা বল্‌তে শিখেছ, আরও কিছুদিন যাক্, ইংরেজের সঙ্গে থেকে তাদের দেখাদেখি একটু মানুষের মত হতে শেখ, তারপর স্বাধীন হবার কথা ভেবো। এখনো যে-ইংরেজকে গালাগাল দাও, তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়ালে নিজে থেকে তোমাদের শিরদাঁড়া নুয়ে পড়ে, সে হেসে কথা কইলে মনে মনে বর্ত্তে' যাও, দেশে যখন লড়াই তখনও সর্দ্দারি নিয়ে তোমাদের ঝগড়ার শেষ নেই, হিন্দু মুসলমানের, মুসলমান হিন্দুর ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে তামাসা দেখ্‌ছ,তেরো বছরের শিশু-কন্যাকে স্বামীর অঙ্কশায়িনী কর্‌তে পার্‌ছ না বলে' দেশসুদ্ধ লোক ধর্ম্ম গেল বলে' চেঁচাচ্ছ, এখনো বিদেশে গেলে গোবর খেয়ে তোমাদের জাতে উঠ্‌তে হয়, তোমরা স্বাধীন হলে আমায় ত দেশ ছেড়ে চলে' যেতে হবে। দেশী জিনিষ কিনে তাতে আমি সাহায্য কর্‌ব ? দুত্তোর !"

নবনে বিষ্টুমামাকে টিপ করে' একটা প্রণাম কর্‌লে, বল্‌লে, "বিষ্টুমামা, দেশের কাজ কর্‌তে নাম্‌বার যোগ্যতা যে এখনো লাভ করিনি, আপনি সেটা আমায় বুঝিয়ে দিলেন। আপনার সব-ক'টা কথারই জবাব আছে, বাড়ী গিয়ে সেগুলি ভাব্‌ব, এবং ফিরে এসে জবাব না দিতে পারা পর্য্যন্ত আর কাজে নাম্‌ব না। যারা গান্ধীর হুকুম বলে' পিকেটিং মান্‌তে তৈরী হয়েই আছে তাদের পিকেট্ করা ত সোজা কাজ, আপনাকে দিয়েই আমার শক্তির পরীক্ষা হবে।"

(২)

কিন্তু নবনের হাত থেকে যত সহজে বিষ্টুমামা নিষ্কৃতি পেলেন, মামীমা তাঁকে ঠিক ততটা সহজে নিষ্কৃতি দিলেন না। মামার সঙ্গে তর্ক করে' জিত্‌বার কোনো অভিপ্রায় যে তাঁর আছে তাঁর কোনো ব্যবহার দেখে' তা মনে হলো না, কিন্তু [illegible] গোপনে তাঁর বাক্স প্যাঁট্‌রা খদ্দরের শাড়ী, দেশী সাবান, দেশী মাথার তেল ইত্যাদিতে ভরে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল। বিষ্টুমামার বয়স হয়েছিল, সুতরাং গৃহিণীর সাজসজ্জা ও অঙ্গরাগের পরিবর্ত্তনটা প্রথম কিছুদিন তিনি বেশী লক্ষ্য কর্‌লেন না। মামীমাও প্রথম-প্রথম যথেষ্ট সাবধান হয়েই চল্‌তেন, এমন মিহি সুতোর খদ্দর কিন্‌তেন যাকে সহজে খদ্দর বলে' চেন্‌বার উপায় ছিল না, সাবান খুলে রেখে সাবানের বাক্স ফেলে' দিতেন, পুরনো হেয়ার লোশনের বোতলে গন্ধতেল ঢেলে রাখ্‌তেন। কিন্তু একদিন হঠাৎ মামীমার শোবার ঘরে অসময়ে হাজির হয়ে তাঁকে একটা দেড়হাত লম্বা খটখটে কাঠের চরকাতে সুতো কাট্‌তে দেখে' বিষ্টুমামা মাথায় হাত দিয়ে মাটিতে বসে' পড়্‌লেন। বল্‌লেন, "ও কি হচ্ছে ?"

মামীমা বল্‌লেন, "দেখ্‌তেই ত পাচ্ছ।"

মামা বল্‌লেন, "ওসব চল্‌বে না।"

মামীমা বল্‌লেন, "বেশ ত চল্‌ছে। গোড়ায় একটু অসুবিধা হয়, যতটা সুতো কাটা হয় তার চেয়ে বেশী সুতো ছেড়ে। দুদিনেই অভ্যাস হয়ে যায়। আজ ত্রিশ নম্বর কাট্‌ছি।"

মামা বল্‌লেন, "ছি ছি, তুমি শেষটা চর্‌কায় সুতো কাট্‌ছ ? কেন, তোমার কিসের অভাব ?"

মামী বল্‌লেন, "চর্‌কাটারই অভাব ছিল, সেটা মিটেছে।"

মামা বল্‌লেন, "তোমায় সুতো কাট্‌তে দেব না আমি।"

মামী থেইটা জড়িয়ে রেখে ঘুরে বসে' বল্‌লেন, "তোমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে ? আমি চর্‌কা কাট্‌ছি, তাতে তোমার কি ?"

মামা বল্‌লেন, "আমার কি মানে ? তুমি যা-খুশি তাই কর্‌বে, আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব ?"

"না দেখ্‌তে চাও দেখো না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়াও ত তোমার কাজের অভাব নেই।"

"তাকিয়ে থাকার কাজটাই এর পর বাড়্‌ল।

তোমাকে যথেষ্ট চোখে চোখে না রাখাতে ত এতদূর গড়িয়েছে, এর পর কোন্‌দিন স্বদেশী বক্তৃতা করে' জেলে যাবে, সে আমি হতে দিতে পারব না।"

মামীমা বল্‌লেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করব না আমি, কিন্তু চর্‌কায় সুতো কেটে আমি কিছুমাত্র অন্যায় কর্‌ছি তা তুমি আমায় বোঝাতে পার্‌বে না।"

মামা বল্‌লেন, "আমিও তোমাকে বোঝাবার কোনো চেষ্টা কর্‌ব না,—কিন্তু এ চল্‌বে না।"

'যদি চলে?"

"আমিও চল্‌ব, যেদিকে দু চোখ যায়।"

মামী বল্‌লেন, "তোমারই উচিত ছিল সকলের আগে সত্যাগ্রহী হওয়া, কিন্তু দেশের যেমন অদৃষ্ট! আচ্ছা, এই রইল চর্‌কা। তোমার কাছে হারই মান্‌লাম।"

কিন্তু হার মান্‌বার মেয়ে মামীমা ছিলেন না। দেখা গেল, কেবল যে চর্‌কাই রইল তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক-কিছুই তাকে তোলা হয়ে থাক্‌ল: বিষ্টুমামার ভোরবেলার ওম্‌লেট্ ওভ্যাল্‌টিন্ মামীমা স্বহস্তে তৈরী করে' দিতেন, হঠাৎ সেকাজের ভার বাড়ীর চাকরদের উপর গিয়ে পড়্‌ল, ওম্‌লেট্ পুড়ে কালো হয়ে যেতে লাগ্‌ল, ওভ্যাল্‌টিন্ দুধের সঙ্গে ভালো করে' মিশ্‌ল না, চাপ বেঁধে বেঁধে রইল, কিন্তু মামীমা কিছুতেই টল্‌লেন না। রান্নার কাজে আগে মাঝে-মাঝে তিনি যেতেন, অন্ততঃ চাকরদের কাজ দেখিয়ে দিয়ে আস্‌তেন, সেটা বন্ধ হয়ে গেল। বিষ্টুমামার মুখে কেবল যে নিরামিষই রুচ্‌ত না তা নয়, একটু রান্না খারাপ হলে কিছুই প্রায় তিনি মুখে তুল্‌তে পার্‌তেন না: দিনকের দিন বেচারা কৃশ হতে লাগ্‌লেন। তাঁর অন্য নানা খুঁটিনাটি আরামের সহস্র উপাদানের জন্যে সারাক্ষণ মামীর উপর তাঁকে নির্ভর করে' থাক্‌তে হ'ত, তার সব-ক'টাতে ব্যাঘাত ঘটতে লাগ্‌ল। স্নানের সময় গরম জল পাওয়া যায় না, স্নানের ঘরে গামছা নিয়ে যেতে ভুল হয় এবং স্নানের শেষে ভিজে গায়ে সেটা ধরা পড়ে। দুপুরে দারুণ গরমে পাখা চলে না, সময়ে বিল্ দেওয়া হয়নি বলে' ইলেক্‌ট্রিক্ কোম্পানী তার কেটে দিয়ে যায়। মাথা ধর্‌লে নিজের হাতে নিজের মাথা টিপ্‌তে হয়। বোতাম হারিয়ে যায়, জামা ইস্ত্রি হয় না, এমনি-ধারা সব অঘটন ক্রমশঃ বেশী করে' ঘট্‌তে লাগ্‌ল।

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "তুমি কি শেষটা আমার সঙ্গেই অসহযোগ সুরু কর্‌লে? মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষা কি এই?"

মামী বল্‌লেন, "স্ত্রীলোকের কাছে তাদের স্বামীরাই একমাত্র মহাত্মা। আমি তোমার কাছেই শিক্ষা পেয়েছি।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "আমি তোমাকে কি এই শিক্ষা দিয়েছি যে কায়মনোবাক্যে স্বামীকে বর্জ্জন করে' চল্‌বে?"

মামী বল্‌লেন, "তা জানি না, স্ত্রীর হাতে-কাটা সুতোতে যার আপত্তি, স্ত্রীর হাতে তৈরী অন্য-সব জিনিষে তার সমানই আপত্তি হওয়া উচিত। তুমি স্বদেশী বর্জ্জন কর্‌তে চাও, আমি তাতে তোমায় বাধা দিতে চাইনে। আমি নিজে যা কর্‌ব, তাই যে স্বদেশী হবে।"

বিষ্টুমামা বল্‌লেন, "না না, তোমার কথা আলাদা, এসো, কাছে এসো দেখি লক্ষ্মীটি!"

মামী বললেন, "উঁহু! আমিও যে এই দেশেরই মেয়ে এবং সে-হেতু স্বদেশী, সেটা ভুলে গেলে চল্‌বে না।"

মামা বল্‌লেন, "নাঃ, এবারে তোমার কাছেই আমায় হার মান্‌তে হলো দেখ্‌ছি। আচ্ছা, তুমি চর্‌কা কাট্‌তে পাবে, কিন্তু ঐ চর্‌কাটা না, আমি তোমায় ভালো চর্‌কা এনে দিচ্ছি। ওটাকে তুমি বিদেয় করো। এমন কুৎসিত দেখ্‌তে।"

মামী বল্‌লেন, "ভালো চর্‌কাতে আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু একমাস কেটে গেলেও ভালো, মন্দ, বা ভালোমন্দের মাঝামাঝি কোনোরকম চর্‌কাই যখন এল না, তখন আবার গোলযোগ সুরু হলো। বিষ্টু-মামার মুখে কেবল এক কথা, "আস্‌ছে, চর্‌কা আস্‌ছে, এত উতলা হ'লে চলে? ভালো জিনিষের জন্যে একটু ধৈর্য্যসহকারে অপেক্ষা কর্‌তে হয়।"

মামী বল্লেন, "ওসব তোমার চালাকি, ফাঁকি দিয়ে আমার চর্‌কাটাকে বাড়ী থেকে সরালে।

তুমি কি ভেবেছিলে চিরকালটাই আমি তোমার ফাঁকিতে ভুল্‌ব, বা বাজারে আর চর্‌কা কিন্‌তে পাওয়া যাবে না?”

সুতরাং দ্বিতীয়বার চর্‌কা এল, এবং দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীর মতই তার যথাযোগ্য স্থানের ঢের উপরে সে আসন লাভ কর্‌লে। মামী এখন সারাক্ষণই প্রায় সুতো কাটেন, চর্‌কা কাট্‌তে না দেওয়াতে অভিমান করে' যে-কাজগুলি তিনি অবহেলা কর্‌ছিলেন, এর পর চর্‌কা কাটার উৎসাহেই সে-গুলিতে নিদারুণতর অবহেলা ঘট্‌তে লাগ্‌ল।

বিষ্টুমামা থেকে থেকে আচম্‌কা "দুত্তোর" বলে' হাঁক দিতে লাগ্‌লেন, বিলিতি নস্যের কৌটো তাড়াতাড়ি খালি হয়ে যেতে লাগ্‌ল, কিন্তু বাড়ীতে দিবারাত্র চর্‌কা চলা সত্ত্বেও নিজে যেদিকে দুচোখ যায় চলে' যাবার সঙ্কল্পটাকে কাজে পরিণত কর্‌বার কোনো লক্ষণ দেখালেন না।

পরে সেঁটে বসে' চর্‌কার বিরুদ্ধে ষ্টেট্‌স্‌ম্যানের চিঠিপত্রের স্তম্ভে দিনের পর দিন অত্যন্ত উগ্ররকম সব লেখা পাঠাতে লাগ্‌লেন। স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে তাঁর চিরকালের যুক্তিগুলি নিঃশেষ হয়ে যাবার পর স্বাদেশিকতার স্বপক্ষ থেকেই নানা অকাট্য যুক্তির তিনি অবতারণা কর্‌তে লাগ্‌লেন। দেশের কাপড়ের কলের যে শিশু-ব্যবসা নানা প্রতিবন্ধকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে' ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠ্‌ছিল, চর্‌কা তাকে গলা টিপে মার্‌ছে এবং তার ফলে দেশের ভিতরের চাহিদা চর্‌কা দ্বারা ত মিট্‌বেই না, কলের কারবার নষ্ট হওয়াতে দেশের বাইরে থেকে উপার্জ্জনের যে পথ ছিল সেটাও বন্ধ হবে। সচ্ছল পরিবারের শিক্ষিতা মহিলার পক্ষে চরকায় সুতো কাটা যে সময় এবং সামর্থ্যের কতবড় অপব্যয় ইকনমিক্সের দিক্ থেকে অঙ্কশাস্ত্রের সহায়তায় তিনি সেটা প্রমাণ কর্‌লেন। দেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তার কাল্‌চারের সঙ্গে, এবং কাল্‌চার জিনিষটা মানুষের সৌন্দর্য্য-বোধের সঙ্গে কি-প্রকার ঘনিষ্ঠ বন্ধনে জড়িত সেটা সাব্যস্ত করে', খদ্দর যে দেশের লোকের সৌন্দর্য্য-বোধকে নিঃশ্বাস চাপা দিয়ে মার্‌ছে তা বলে' তিনি তাঁর পাঠকদের মনে ভীতি-সঞ্চার কর্‌বার চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌লেন।

কিন্তু পাঠক তাঁর সত্যিই কেউ ছিল কি না জানা সহজ ছিল না। জান্‌বার প্রয়োজনও তাঁর বিশেষ ছিল না। কাজটা আগাগোড়াই ছদ্মনামে চল্‌ছিল, লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জ্জনের স্পৃহাও কিছু-মাত্র তার ছিল না। রোজকার কাগজটি স্ত্রীর হাত পর্য্যন্ত পৌঁছলেই তিনি তাঁর শ্রম সার্থক জ্ঞান কর্‌তেন, কিন্তু বহুদিন ধরে' বহু শ্রম করা সত্ত্বেও মামীমার মত কিছুমাত্র বদ্‌লাল না। চর্‌কা সমানই চল্‌তে লাগ্‌ল।

পৃথিবীতে সব জিনিষেরই সীমা আছে, বিষ্টুমামার ধৈর্য্যেরও সীমা ছিল। যেদিন বিকেলে বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এসে তিনি দেখ্‌লেন তাঁর বাড়ীর সবকটা ঘরের জানালা থেকে শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মতো স্নিগ্ধ ধবল দ্যুতিমান্ পর্দ্দাগুলি সরিয়ে তাদের জায়গায় খদ্দরের শাড়ী কাটা পর্দ্দা ঝুলানো হয়েছে, বস্‌বার ঘরের চেয়ারগুলির উপরে সাটিনের উপর জরীর ফুলকাটা কুশনগুলির জায়গায় তুলো-ভরা খদ্দরের পুঁট্‌লি বিরাজ কর্‌ছে, খদ্দরের শাড়ী জুড়ে টেবিল-কভার তৈরি হয়েছে, বহুমূল্য চৈনিক ফুলদানির স্থানে কাঁসার ঘটি অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেদিন তাঁর ধৈর্য্যের বাঁধ একেবারেই ভাঙ্‌ল। নিজের ওপর কোনো শাসনই সেদিন আর তাঁর রইল না। দুহাতে জান্‌লা-দরজায় ঝুলানো পর্দ্দাগুলি টেনে ছিঁড়ে, টেবিল-কভার উঠিয়ে, খদ্দরের কুশন্‌গুলি সমেত সব তিনি ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাড়ীর সাম্‌নের রাস্তায় ফেল্‌তে লাগ্‌লেন। তারপর নীচে নেমে সেগুলিকে এক জায়গায় জড়ো করে' কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেখানে দস্তুর-মত লোকের ভিড় জমে' উঠ্‌ল। সবাই দিব্য নিঃসন্দেহে সিদ্ধান্ত করে' নিল বিষ্টুমামা বিলিতি বস্ত্রের বন্‌ফায়ার্ কর্‌ছেন। শতকণ্ঠে জয়ধ্বনি উঠ্‌ল, "বল মহাত্মা গান্ধীজি কি জয়!" আশপাশের বাড়ীর জান্‌লা থেকে পুরনো ছেঁড়া

বিলিতি কাপড়ের পুঁটুলি ঝুপ ঝুপ করে' সেই আগুনের ওপর পড়তে লাগল। বিষ্টুমামার উচ্চকণ্ঠের প্রতিবাদ সেই গোলমালে কারুর কানেই গেল না।

হঠাৎ দেখা গেল বিষ্টুমামার বাড়ীর চাকররা ধরাধরি করে' একটা বেশ বড় প্যাকিং কেস্ রাস্তায় নামিয়ে নিয়ে আস্‌ছে। সেটাকে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে রেখে বেশ করে' কেরোসিন ঢেলে কাঠ-কুটো জড়ো করে' তারা নতুন করে' আবার আগুন ধরিয়ে দিল, আবার শত কণ্ঠের চীৎকারে গগন বিদীর্ণ হতে লাগল, "বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" বিষ্টুমামা সেই ভিড় ঠেলে চাকরদের একজনের কাছ থেকে আর-একজনের কাছে ছুটোছুটি কর্‌তে কর্‌তে উত্তেজিত স্বরে ক্রমাগত প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌লেন, "ওটা কি রে, ওটা কি ?"

সেটা যে কি তারা কেউ তা বল্‌তে পার্‌লে না। কেবল জানা গেল, মাইজী সেটাকে এনে আগুনে দিতে বলেছেন।

ত্রস্তে উপরে গিয়ে বিষ্টুমামা চীৎকার করে' জিজ্ঞেস কর্‌লেন, "কাঠের বাক্সে করে' কি পাঠিয়েছ আগুনে দেবার জন্যে ?"

মামী বল্‌লেন, "আমার মুণ্ড।"

মামা বল্‌লেন, "সেটা আগুনে দিয়েছ ত অনেকদিন আগেই, আজকেরটা কি ?"

মামী বল্‌লেন, "আর-একটু দেরি কর্‌লেই দেখ্‌তে পেতে, কাঠের বাক্স পুড়ে যেতে বেশীক্ষণ লাগে না। ভালো জিনিষের জন্যে এইটুকু ধৈর্য্য-সহকারে অপেক্ষা কর্‌তে পার্‌লে না ?"

বিষ্টুমামা গলার স্বর সপ্তমে চড়িয়ে বল্‌লেন, "এ তোমার জন্যে বিলেত থেকে অর্ডার দিয়ে আনানো চর্‌কাটা নয় ?"

মামী বল্‌লেন, "চর্‌কাই বটে, জিনিষটাও বেশ, পাছে ব্যবহার করতে লোভ হয় তাই পুড়িয়ে দিচ্ছি। লোহার জিনিষ, তবু আগুনে পুড়্‌লে খানিকটা নষ্ট হবেই, কাঠও জায়গায় জায়গায় আছে।"

মামা বসে' পড়ে' বল্‌লেন, "কী সর্ব্বনাশ! ওটার জন্যে কত দাম দিতে হয়েছে তা জানো ?"

মামী বল্‌লেন, "তাও জানি। ঐ যে টমাস কুকের কাগজপত্র সব ঐখানে পড়ে' আছে। ওগুলিতে তোমার কাজ থাক্‌তে পারে ভেবে আমি আর পোড়াইনি।"

বিকৃত কণ্ঠে মামা বল্‌লেন, "তোমার অনুগ্রহ!"

তারপর মামীমা গুনগুন করে গান কর্‌তে কর্‌তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলে দরজায় খিল দিয়ে এসে একটা চেয়ারে বসে' পড়ে' বল্‌লেন, "দুত্তোর!"

(৩)

এর পর বিষ্টুমামা মরীয়া হয়ে উঠ্‌লেন। এমন যে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ সেও তাঁর লেখা আর ছাপ্‌তে চায় না দেখে' নিজে খরচ করে' পুস্তিকা ছাপাতে লাগ্‌লেন। স্বদেশীর বিরুদ্ধে ঘরের সংগ্রামে পরাজিত হয়ে, ঘরের বাইরে অকস্মাৎ অহীরাবণের মত অমিত-পরাক্রমে তিনি লড়্‌তে লাগ্‌লেন। ছদ্মনামটি নানা কারণে অবশ্য বাহাল রইল। কিন্তু একাজেও বাধা ঘট্‌তে লাগ্‌ল। দেশী ছাপাখানার মালিকেরা ছাপ্‌তে অস্বীকার কর্‌তে লাগ্‌ল, সাহেবদের ছাপাখানার শরণাপন্ন হয়ে সে-সমস্যা মিট্‌ল। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, পুস্তিকা ছাপা হয়ে পড়ে' থাকে, সেগুলি বিলি কর্‌বার লোক পাওয়া যায় না, মার খাওয়ার ভয়ে কেউ সেগুলি নিতে চায় না। নূতন লোক পাক্‌ড়াও করে' করে' কিছুদিন চল্‌ল, অবশেষে দেখা গেল বিলি কর্‌বার লোক পাওয়া সত্ত্বেও সেগুলি আর বিলি হয় না, বিনি-পয়সার জিনিষ হলেও কেউ সেগুলি নিতে চায় না।

এমনি অবস্থায় বিষ্টুমামাকে বাধ্য হয়ে গোলদীঘিতে তাঁর প্রথম বিদেশী বক্তৃতা দিতে যেতে হলো। ছদ্মনামের আড়ালটা আর রাখা চল্‌ল না।

বিষ্টুমামার চেহারাতে এমন-একটা কিছু ছিল যাতে তিনি যত বেশী গম্ভীর হতেন তাঁকে দেখে' লোকের তত বেশী হাসি পেত। দেখ্‌তে যে তিনি কুৎসিত ছিলেন তা নয়। পরিষ্কার গায়ের রঙ, পাঁচফুট সাড়ে-আট ইঞ্চি-লম্বা, একহারা চেহারা, সবল মাংসপেশী, নাক মুখ চোখ মোটামুটি ভদ্র বাঙালীর যে-রকম হয়ে থাকে। কিন্তু বিষ্টুমামার ধারণা ছিল পুরুষ মাত্রেরই

পাটের আপিসের বড়-সাহেবদের মত সারাক্ষণ বদমেজাজী থেকে মুখ করে' থাকা দরকার, নয়ত তাদের এফিসিয়েন্ট দেখায়। তাঁর মুখের যে একটি স্বভাব-সুলভ কমনীয় শ্রী ছিল, বড়সাহেবী মুখভঙ্গিটা তার ওপর একেবারেই মানাত না বলে' তাঁকে দেখতে ভারি মজার লাগ্‌ত, কিন্তু বিষ্টুমামা সেটা বুঝ্‌তেন না এবং সেই কারণেই তাঁকে আরো বেশী মজার লাগ্‌ত। গোলদীঘির যে বেঞ্চিটার উপর তিনি বক্তৃতা দেবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর সাম্‌নে কৌতূহলী লোকের ভিড় জমে' গেল। স্বাদেশিকতার বিপদ্ সম্বন্ধে বিষ্টুমামা তাঁর প্রথম বক্তৃতা সুরু করলেন।

দেখা গেল শ্রোতারা অবহিত হয়ে শুন্‌ছে। বিষ্টু-মামার উৎসাহ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাদেরও উৎসাহ বাড়্‌তে লাগ্‌ল, ঘন ঘন করতালি পড়্‌তে লাগ্‌ল। এতদিনকার সঞ্চিত সমস্ত চিত্তবেগকে বাগ্মিতার স্রোতে লঘু করে' নিয়ে ঘর্ম্মস্রোতে দেহ প্লাবিত করে' তিনি যখন বেঞ্চি থেকে নাম্‌লেন্ তখন করতালির শব্দ কিছুক্ষণ ধরে' থাম্‌তে চাইল না। শব্দ একটু কম্‌লে শ্রোতাদের মধ্যে বিষ্টুমামার' পরিচিত এক ব্যক্তি বেঞ্চির উপরে বিষ্টুমামার পরিত্যক্ত জায়গাটাতে উঠে দাঁড়ালেন, তারপর দুহাত তুলে সকলকে নিবৃত্ত হতে বলে', বল্‌লেন, "আপনাদের সকলের তরফ থেকে শ্রীযুক্ত বিষ্ণুচরণবাবুকে আমি তাঁর আজকের এই পরম উপভোগ্য বক্তৃতার জন্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। বিষ্ণুচরণবাবুর বাগ্মিতা অসাধারণ। আমাদের দেশের শাসকসম্প্রদায়ের মনের কথাটি আগাগোড়া ব্যঙ্গচ্ছলে তিনি এমন আশ্চর্য্য সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন, যে, মনস্তত্ত্বে অদ্ভুত পারদর্শিতা এবং অত্যন্ত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি না থাক্‌লে কারও পক্ষে তা সম্ভবই নয়। যাদের সঙ্গে লড়্‌ব, সারাক্ষণ তাদের এক-তরফা গালাগালি না দিয়ে তাদের বুঝ্‌তে চেষ্টা কর্‌লে যে লড়াই জেতা সহজ হয় তা আপনারা সকলেই স্বীকার করবেন। বিষ্ণুচরণবাবু ধন্য, যে; তিনি সেইটে বুঝে, সেইদিক্ থেকে দেশকে সেবা কর্‌বার জন্যে অগ্রসর হয়েছেন। আপনারা বলুন সকলে, মহাত্মা গান্ধীকি জয়!"

সহস্র কণ্ঠে ধ্বনিত রণিত হতে লাগল, "মহাত্মা গান্ধীকি জয়, বলো মহাত্মা গান্ধীকি জয়!" বক্তৃতামঞ্চের সাম্‌নের ভিড় ক্রমে আরও বাড়তে লাগল, কিন্তু বিষ্টু-মামাকে সে ভিড়ের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না। এর পর পুলিশ এল, লাঠি charge হলো, যারা বক্তৃতা শুন্‌তে এসেছিল, তারা কেউ ভাঙা হাত, কেউ ফাটা মাথা নিয়ে বাড়ী ফির্‌লে, বিষ্টুমামা তখন দরজায় খিল দিয়ে বসে' তাঁর পরবর্ত্তী বক্তৃতার জন্যে নোট লিখছেন। পাশের ঘরে চর্‌কার শব্দে তাঁর কাজের উৎসাহ বাড়ছেই।

রাশীকৃত অকাট্য যুক্তির নোট নেবার অবকাশে বিষ্টুমামা ঠিক কর্‌লেন, কাপড়ের দোকানে পিকেট কর্‌তে বেরুবেন। নিজের জন্যে বিলিতি কাপড় চোপড় কিছু কিছু কেন্‌বার দর্‌কার ছিল, কাছাকাছি একটা দোকানেও বিলিতি কাপড় পাওয়া যায় না; স্থির কর্‌লেন বাজার ঘুরে প্রয়োজনীয় কাপড় সংগ্রহ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলিতির জন্যে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা করে' ফির্‌বেন। শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না, এবারে কাজের আসরে নাম্‌তে হবে। গিন্নীকে দেখাতে হবে যে, গৃহে যে-অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলটা সত্যিই কত গভীরতার জায়গায়, তিনি যা অনুভব করেন তা সত্যিই কত নিবিড় করে' অনুভব করেন।

বিলিতি কাপড়ের সন্ধানে সমস্ত দিন বিষ্টুমামা দোকানে দোকানে ঘুর্‌তে লাগ্‌লেন।

"বিলিতি কাপড় আছে?"

"না মশাই না, কতবার আর বল্‌ব? একমাস ধরে' ত বল্‌ছি।"

"কেন রাখেন না?"

"এও ত মুস্কিল কম নয়। শুধু না-রেখেই নিস্তার নেই, আবার কেন রাখি না তার কারণগুলোও এর পর আওড়াতে হবে। আমাদের এত কথা বল্‌বার সময় নেই, যান্।"

আর এক দোকানে ঢোকেন।

"বিলিতি কাপড় আছে?"

"আরে রামঃ! আজ আপনারা ক'জন বেরিয়েছেন?"

"ক'জন বেরিয়েছি মানে ?"

"পিকেট করতে ক'জন বেরিয়েছেন, তাই জান্‌তে চাচ্ছি।"

"আমি একলাই। আপনি যা মনে করেছেন তা নয়, আমি স্বদেশীদলের কেউ নই। বিলিতি কাপড় কেন আপনাদের রাখা উচিত তাই আপনাদের বল্‌তে বেরিয়েছি।"

"ও! চিনেছি মশায় এতক্ষণে। আপনি বিষ্টুচরণ-বাবু, না? সেদিন গোলদীঘিতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন? হাঃ হাঃ! এত ফিকিরও আপনার মাথায় আসে মশায়। পিকেটিও করা হবে অথচ পুলিশও কিছু বল্‌তে পারবে না, বেড়ে! পোষাকসুদ্ধ আগাগোড়া বিলিতি করে' এসেছেন, হাঃ হাঃ! বসুন, বসুন ভালো করে'। পান আনিয়ে দিচ্ছি। বলুন ত আপনার কথাগুলো, কেন বিলিতি কাপড় আমাদের রাখা উচিত? ওরে মনোরঞ্জন! ওরে ও হরিকিশোর! এদিকে আয় শীগগির! মজা আছে।"

রেগে মুখচোখ লাল' করে' বেরিয়ে এসে তিনি অন্য দোকানে ঢোকেন। রাগটা ভালো করে' না পড়্‌তেই জিজ্ঞেস করেন, "বিলিতি কাপড় আছে?" গলার স্বরে মেজাজের তাপটা ধরা পড়ে।

দোকানী বলে, "উঃ, তম্বি দেখ না। যদি বলি আছে, তাই কি?"

"আছে কি না জান্‌তে চাই।"

"আপনি জান্‌তে চাইবার কে?"

"আমার দরকার আছে।"

"না, দরকার নেই।"

"আমি বল্‌ছি আছে, আর আপনি বল্‌ছেন নেই?"

"হ্যাঁ, আমি বল্‌ছি নেই। একশোবার বল্‌ছি নেই।"

"ভালো জ্বালা! আমি বিলিতি কাপড় কিন্‌তে চাই মশাই, কোথায় আছে বিলিতি কাপড় বার করুন।"

"বার করছি; ওরে ভুতো, ডাক্ ত পুলিশ, মোড়ের কাছেই আছে দেখ্‌তে পাবি। চালাকিটা বার করছি। দোকানপাট উঠে যাবার জোগাড়, তাতেও খুশি নয়, রোজ পাঁচবার আস্‌বে জ্বালাতন কর্‌তে, আবার ঢং করে' বল্‌ছে, বিলিতি কাপড় কিন্‌তে চাই মশাই! ডাক্ পুলিশ।"

"পুলিশ, পুলিশ!"

বিষ্টুমামা বাড়ী এসে আবার দরজায় খিল দেন। দ্বিতীয় বক্তৃতার নোট্ নেওয়া চল্‌তে থাকে।

কিন্তু পাশের ঘর থেকে চর্‌কার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আজ চুড়ির রুনুঝুনু কানে আসে এবং আজ তাতে কাজের ব্যাঘাত হয়। বহুকাল পরে সেই শব্দের আঘাতে বুকের রক্ত বায়ুস্পৃষ্ট দীপ-শিখার মত চঞ্চল হয়ে কাঁপে। দুটি হাস্যস্ফুরিত অধরোষ্ঠ এবং প্রীতিভারনমিত স্নিগ্ধ চোখ মনে করে' দেশী-বিদেশীর বিরোধ, প্রবন্ধ, বক্তৃতা, পিকেটিং, সমস্ত-কিছুকে তার পাশে অত্যন্ত অর্থহীন উদ্দেশ্যহীন পাগলের প্রলাপ বলে' বোধ হতে থাকে। আর এই পৃথিবী, কি নিষ্ঠুর মমতাহীন এর বাইরেটা। কেবল ভিড়, কেবল ঠেলাঠেলি, একটা বিপুলাকার গুরুভার জগদ্দলপাথরের রোলার টেনে সকলে চলেছে, দাঁড়িয়ে কারও সঙ্গে ভালো করে' চোখ-চাওয়াচাওয়ি করবার উপায় নেই, অম্‌নি চাপা পড়তে হয়। কেউ কারুকে কাছে ডাকে না, কেউ কারুকে বুঝতে চেষ্টা করে না, বল্‌বার কথা শেষ হবার আগে করতালি দিতে থাকে, ভালো করতে গেলে মন্দ বোঝে। আজ একটু স্নেহসমবেদনার জন্যে তাঁর শুষ্ক চিত্ত থেকে থেকে হাহাকার করে' উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

কতকাল গৃহিণীকে কাছে পাননি, ভালো করে' তাঁর মুখের দিকে তাকান নি, হেসে দুটো কথা বলেন নি। তিনি নিঃসন্তান, সংসারে তাঁর মনের আর ত কোনো অবলম্বনই নেই।

রাত্রিতে আহারাদির পর সন্তর্পণে মামীমার শয়ন-মন্দিরে এসে ঢুক্‌লেন। দেখলেন, মামীমা চর্‌কার সুতো নাটাইয়ে জড়িয়ে রাখছেন। যেন কোথাও কিছু হয়নি এমনি গম্ভীরভাবে মামী বল্‌লেন, "দেখছ সুতো?"

মামা বল্‌লেন, "হুঁ, ঐ দিয়ে আমার জন্যে দড়ি তৈরি হবে, আমি গলায় দেব।"

মামী চোখের তারা কপালে তুলে বল্‌লেন, "ওমা,

সেকি কথা গো, দড়ি কি? এমন মসলিনের মত মিহি সুতো—"

মামা বল্‌লেন, "দেখো গিন্নি, ঠাট্টা না, তুমি কি শেষ পর্য্যন্ত আমার একটা বিপদ না ঘটিয়ে ছাড়বে না?"

মামীমা সত্যই একটুখানি ভয় পেলেন বলে' মনে হলো, বল্‌লেন, "কেন, আমি আবার কি করেছি?"

মামা বল্‌লেন, "কি করনি? দিনরাত চর্‌কা কাটছ, বাড়ীটাকে খদ্দরের গুদোম করে' তুলেছ, আরও কি কর্‌তে বাকী আছে?"

মামী বল্‌লেন, "এর মধ্যে তোমার বিপদ্‌টা কোন্‌খানে?"

বিষ্টুমামার কানে তখনও বড়বাজারের দোকানীর সক্রোধ তর্জ্জন থেকে থেকে বাজ্‌ছিল, বল্‌লেন, "আমার বিপদ্‌টা যে কোন্‌খানে তা যদি তুমি বুঝ্‌তেই পারবে তাহলে আর এদশা আমার হবে কেন?"

মামী বল্‌লেন, "কি হয়েছে শুনিই না?"

মামা বল্‌লেন, "কি আবার হবে, যেদিন হবে সেদিন আর আমায় কষ্ট করে' এসে খবর দিতে হবে না। বাপ, আজ মার খেতে খেতে বেঁচে এসেছি।"

মামীমা একটু ভেবে বল্‌লেন, "ও, বুঝেছি। তা লোকে স্বদেশীর জন্যে দলে দলে এত মার খাচ্ছে, তুমি বিদেশীর জন্যে একটু খাও না? দেশকে যারা ঠগী বর্গীর অত্যাচার থেকে বাঁচিয়েছে, খাল কেটেছে, রাস্তা বেঁধেছে, তাদের পক্ষ হয়ে না-হয় দু'একঘা খেলেই, তাতে তাদের জন্যে তোমার ভালবাসাটা একটু প্রমাণ হবে। দেশ স্বাধীন হ'লে যে অঘটনগুলো ঘট্‌বে বলে' বিশ্বাস কর, তার প্রতিবিধানের জন্যেও ত তোমার লড়া উচিত।"

"আমি ত লড়্‌ছিই।"

"একে কি আর লড়াই বলে? লড়্‌তে গেলে মার খাওয়াকে ভয় করলে চ'ল না।"

"আমি মার খাই, সেইটেই তুমি তাহলে ইচ্ছে কর?"

"আমার ইচ্ছা অনিচ্ছাতে কিছু যায় আসে না। আমি ইচ্ছা না করলেও মার দেবার লোকের হয়ত অভাব হবে না।"

পূর্ব্বেই বলেছি, বিষ্টুমামার ধৈর্য্যেরও সীমা ছিল। হঠাৎ তাঁর গায়ের রক্ত টগবগ করে' ফুট্‌তে লাগ্‌ল। কাঁপা গলায় বল্‌লেন, "আমায় মার্‌বে, আমায়?"

মামী নাটাইটাকে কাপড়ের আল্‌মারির ওপর উঠিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন, "তা বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে মার্‌তেও পারে।"

মামা বল্‌লেন, "মেরে দেখুক না।"

মামী বল্‌লেন, "তুমি তাদের যা দেখাবে তা মার খাবার পরে ত?"

মামা বল্‌লেন, "বটে! আচ্ছা, দেখি কার বাবার সাধ্যি আমায় মারে। মারা অম্‌নি কথার কথা কি-না? মার্‌লেই হলো! মার্‌বে, আমায় মার্‌বে, আচ্ছা দেখ্‌ব, কালই দেখ্‌ব।"

বীরপদভরে বাড়ী কাঁপিয়ে বিষ্টুমামা তখনই নিজের শোবার ঘরটায় এসে দরজায় খিল দিলেম। 'দুত্তোর' বলে' হাঁক দিতে গিয়েও দুঃখে অপমানে লজ্জায় হাঁকটা গলার কাছে এসে বাধ্‌ল। বহু রাত অবধি চোখে ঘুম এল না, শূন্য শয্যায় এপাশ-ওপাশ কর্‌তে কর্‌তে কালকের অভিযানের জন্যে নানা ফন্দি আঁট্‌তে লাগ্‌লেম।

(৪)

পরদিন খুব ভোরে উঠেই বিষ্টুমামা তাড়াতাড়ি সাহেব-বাড়ীর ছাপাখানায় গিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বিদেশী বক্তৃতার হ্যাণ্ডবিল্‌ ছাপিয়ে নিয়ে এলেন। বেলা দশটার মধ্যে সে হ্যাণ্ডবিল ২০,০০০ কল্‌কাতার পথে পথে বিলি হয়ে গেল।

বিদেশী পণ্যের স্বপক্ষে
বিস্ময়কর চিত্তবিভ্রান্তকারী বক্তৃতা
বক্তা
শ্রীবিষ্ণুচরণ ঘোষ
অদ্য সন্ধ্যা সাড়ে-পাঁচ-ঘটিকায় কলেজ স্কোয়ারে

—

ইহা হাস্যরসাত্মক নহে, হাস্যরসাত্মক নহে,
যুক্তিতর্ক ও সূক্ষ্মবিচারের সাহায্যে
সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার সরল প্রয়াস
(সভায় কেহ করতালি দিবেন না)

শহরে শহরতলীতে ঘরে বাইরে হাটে বাজারে দস্তুরমত একটা সাড়া পড়ে' গেল। পথের মোড়ে মোড়ে লোক জটলা করে' সন্ধ্যার বক্তৃতা আলোচনা কর্‌তে লাগ্‌ল। ব্যাপারটা যারা বুঝ্‌তে পার্‌ল না, অন্যেরা তাদের বুঝিয়ে দিতে লাগ্‌ল। সমস্ত দিন হাণ্ড্‌বিল্‌গুলি লোকের হাতে হাতে ঘুরতে লাগ্‌ল!

বাড়ী এসে বিষ্টুমামা পুলিশ-কমিশনারকে চিঠি লিখ্‌লেন। তিনি যে ইংরেজ গবর্ণ্‌মেণ্টের কত-বড় হিতার্থী বন্ধু, সমস্ত জীবন তিনি যে বিলাতী ভিন্ন অন্য কোনো-জাতীয় দ্রব্য স্পর্শ করেন নি, ইংরেজ-রাজত্বকে তিনি যে এদেশের কল্যাণের পক্ষে অপরিহার্য্য বলে' বিশ্বাস করেন, এসমস্ত কথা বিশদভাবে ব্যক্ত করে' তিনি তাঁর সেদিনকার সন্ধ্যার বক্তৃতার উদ্দেশ্যের কথা সবিস্তারে লিখ্‌লেন। তারপর লিখ্‌লেন, ইংরেজ-সরকারের এতবড় বন্ধুর যাতে কোনো বিপদ্ না হয়,ইংরেজ-সরকারের তা দেখা উচিত; এবং তিনি আশা করেন, তাঁকে সভাস্থলে আততায়ীর আক্রমণ থেকে প্রয়োজন হলে রক্ষা কর্‌বার জন্যে উপযুক্তসংখ্যক অস্ত্রধারী পুলিশ দেহরক্ষী তাঁকে দেওয়া হবে।

বক্তৃতার সময়ের ঘণ্টা-দুই আগে পুলিশ-আপিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন, তাঁর ভয়ের কোনো কারণ নেই, সভায় পুলিশ রাখ্‌বার ব্যবস্থা তাঁর চিঠি পৌছবার আগে থাক্‌তেই করা হয়েছে, অস্ত্রধারী পুলিশও সেখানে থাক্‌বে।

বাড়ী ফির্‌বার পথে গোলদীঘির ধার হয়ে এলেন। দেখ্‌লেন, তত আগে থাক্‌তেই কিছু কিছু করে' লোক জমা হচ্ছে। বড় বড় তৈলপক বাঁশের লাঠি হাতে তিন দল পুলিশ স্কোয়ারের তিন দিকের পথের পাশে ঘাঁটি করেছে। নিশ্চিন্ততায়, সাহসে, গর্ব্বে বিষ্টুমামার বুক তিন হাত উঁচু হয়ে উঠ্‌ল। মোটরে আয়েস করে' গা এলিয়ে বসে' তিনি এক পায়ের উপর আর-এক পা তুলে তাতে ঘনঘন হাত বুলাতে লাগ্‌লেন।

সাড়ে-পাঁচটায় বক্তৃতা সুরু হলো। গোলদীঘি লোকে লোকারণ্য। বিষ্টুমামার মনে একটা বেদনা তবু কাঁটার মত বিঁধতে লাগ্‌ল, গিন্নিকে এ দৃশ্য তিনি দেখাতে পার্‌লেন না! তা হোক; খবরের কাগজগুলিতে যাতে তাঁর বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিক ঠিক বেরোয় রাত্রে সব-ক'টা কাগজের আপিসে ঘুরে তিনি তা দেখ্‌বেন। কোনো খুঁটিনাটি বাদ গেলে চল্‌বে না।

বক্তৃতার তোড়ের মুখে, ভারতবর্ষের ধর্ম্ম সাহিত্য সভ্যতা, তার বহুসহস্রবর্ষব্যাপী ইতিহাস, তার রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, কংগ্রেস, গান্ধী, অসহযোগ, সমস্ত-কিছু প্লাবনের মুখে তৃণের মত অবলীলায় ভেসে যেতে লাগ্‌ল। এতদিন ধরে' স্বাদেশিকতার বিরুদ্ধে যেখানে যতকিছু যুক্তি তিনি প্রয়োগ করেছেন আজ এক-এক করে' সবগুলির পুনরুক্তি কর্‌লেন, কিন্তু এমন আশ্চর্য্য জোরের সঙ্গে, এমন মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় মণ্ডিত করে' কর্‌লেন, যে, নিজের কৃতবিদ্যতায় নিজেরই তাঁর আশ্চর্য্য বোধ হতে লাগল। বল্‌তে লাগ্‌লেন আর তাঁর মনের মধ্যে ছাপার হরফে সেগুলি সাজানো হতে লাগল, আর তাঁর গিন্নি চর্‌কা ফেলে' উদ্দীপনামণ্ডিত মুখে ঝুঁকে পড়ে' তা পড়তে লাগলেন। জনসমুদ্রও কিসের উদ্দীপনায় থেকে থেকে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল, কিন্তু তারপরই কানাকানি, চোখের ইসারা, হাতের ইঙ্গিত—আবার মন্ত্রবলেই যেন সে চাঞ্চল্যও প্রশমিত হয়ে যেতে লাগ্‌ল। বিষ্টুমামা নিঃসন্দেহে বুঝ্‌লেন, আজ আগে থাক্‌তে পুলিশ রাখার ব্যবস্থা করাতেই এরকম হচ্ছে। উৎসাহে তাঁর মনের বাঁধন মুখের বাঁধন আরোই আল্‌গা হয়ে যেতে লাগল।

দুইঘণ্টা ধরে' আশ্চর্য্য বাগ্মিতার সাহায্যে বহু বিচিত্র ও সূক্ষ্ম তর্কের জাল বিস্তার করে' বিষ্টুমামা এই বলে' সে জাল গুটিয়ে তুল্‌লেন, যে, অন্য-সব কথা ছেড়ে দিলেও, ইংরেজ যে দেশশাসনরূপ অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ ও গুরুভার বোঝা বহন করার থেকে আমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন কেবল সেই কারণেই তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। ইংরেজ খেটে মর্‌ছে, আমরা আরামে তাদের পরিশ্রমের ফল ভোগ কর্‌ছি; তারা লড়াই করে মর্‌ছে, আমরা নিরুপদ্রব শান্তিতে জীবনধারণ কর্‌ছি; তারা কাপড় বুন্‌ছে, আমরা সেই ফিনফিনে কাপড়ে বাবু সেজে বেড়াচ্ছি। ইংরেজ শীতের দেশের

মানুষ, বসে' থাকলে তাদের গায়ের রক্ত জমে' যায়, তারা খাটুক, খাটুনীটা তাদের, আমীরিটা আমাদের, আমাদের জাত আমীরের জাত, আমাদের দুঃখ কিসের? আমীরি করতে পেলে খেটে মরতে কে চায়? লাভ ত সবদিকে আমরাই করছি। এ ব্যবস্থা উল্টে দেবার চেষ্টা করার চেয়ে মূর্খতা কি আর আছে?

বক্তৃতা শেষ হতেই আজ আবার অযুত কণ্ঠে মহাত্মা গান্ধীর জয়ধ্বনি উঠে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত করতে লাগল। বিষ্টুমামা বেঞ্চির থেকে মহাবিরক্তিপূর্ণ মুখে নীচে নেমে পড়লেন, তাঁকে দেখবার জন্যে শ্রোতাদের মধ্যে বিষম ঠেলাঠেলি সুরু হলো। বিষ্টুমামা দু'হাতে সেই ভিড় ঠেলে বেরুতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারলেন না। চারদিক্ থেকে সকলে তাঁকে এমন ভাবে চেপে রইল যে, তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার জো হলো। "বেশ বক্তৃতা হয়েছে," "বড় আমোদ পেয়েছি," "আপনি সব কথাকে এত সুন্দর ঘুরিয়ে বলতে পারেন," "যাদের বুঝবার তারা সব ঠিকই বুঝবে," ইত্যাকার বাক্যে সকলে মহা উৎসাহে তাঁকে অভিনন্দিত করতে লাগল।

বিষ্টুমামার রক্ত আবার গরম হয়ে ওঠে, চেঁচিয়ে বলেন, 'আপনারা ভুল করছেন, এ হাসির কথা নয়। আমি হাস্যরস সৃষ্টি করবার জন্যে একটা কথাও বলিনি।"

শ্রোতাদের মধ্যে থেকে একজন উঠে বলে, "ভাই-সব, বিষ্টুচরণবাবু ঠিক কথাই বলছেন। তোমরা যেটাকে হাসির কথা মনে করছ, তা হাসি সত্যিই নয়, তার সবটাই কান্না। বিষ্টুচরণবাবু দেশের দুঃখে হাসির ছল করে' আজ কেঁদেছেন। তাঁর দুঃখ যে কত বড় তা এই থেকেই তোমরা বুঝতে পারবে, যে, সে-দুঃখে কাঁদবারও তাঁর অধিকার নেই—"

এমন সময় ভিড় ঠেলে একদল পুলিশ এগিয়ে এল এবং বক্তৃতামঞ্চে উঠে বক্তাকে গ্রেপ্তার করলে। জনতা উদ্দাম আবেগে চীৎকার করতে লাগল, 'মহাত্মা গান্ধী-কি জয়।"

বিষ্টুমামার মুখে এতক্ষণে একটু হাসি ফুটে উঠল। চাদরটাকে টেনে ভালো করে' গায়ে জড়িয়ে তিনি পুলিশকে দুই চোখের স্নিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করলেন, তারপর জনতার মধ্যে একটা ফাঁক আবিষ্কার করে' সেদিক্ দিয়ে প্রস্থান করবেন ভাবছেন এমন সময় আর-একদল পুলিশ এসে তাঁকেও ঘেরাও করল। বিষ্টুমামা বিস্মিত আতঙ্কে মুখ ভরে' তুলে বললেন, "সে কি, আমায়?"

পুলিশের দারোগা বললে, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনিই ত আজকের বড় আসামী।"

বিষ্টুমামা বললেন, "নিশ্চয়ই আপনারা একটা ভুল করেছেন, আমার নাম Bestow Churn Gosse।"

দারোগা পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে' দেখে' বললে, "হ্যাঁ, ঠিকই হয়েছে। বেষ্ট চারন্ গস্-ই বটে।"

বিষ্টুমামা একবার চারিদিকে তাকিয়ে তিনি জেগে আছেন, না ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখছেন, সেটা ধারণা করতে চেষ্টা করলেন। তারপর আচম্কা হাঁক দিয়ে উঠলেন, "দুত্তোর!"

লালবাজারের হাজতে বসে' শুনতে লাগলেন, বাইরে জনতা ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে চীৎকার করছে, "বল মহাত্মা গান্ধীকি জয়," "বল বিষ্টুচরণ ঘোষ-কি জয়।" বহুতর লাঠির ফটাফট শব্দ শুনতে পাওয়া গেল মনে হলো, কিন্তু কিছুতেই তারা দমল না, দ্বিগুণতর জোরে শব্দ হ'তে লাগল, "বল বিষ্টুচরণ ঘোষ-কি জয়!"

* * *

পরদিন বিচারে বিষ্টুমামার ন'মাসের জেল হয়ে গেল। সরকারপক্ষের উকীল তাঁর চার্জ্ শীট দাখিল করে, বললেন, "ধর্ম্মাবতার, এ ব্যক্তি পরিহাসচ্ছলে রাজদ্রোহ প্রচার করে। যা বলতে চায় ঠিক তার উল্টোটা বলে। তার ফলে তার বলবার কথাটা আরও বেশী জোরালো হয়।"

ধর্ম্মাবতার বললেন, "ও! তুমি ভেবেছিলে তোমার চালাকি কেউ ধরতে পারবে না? তুমিই একমাত্র চালাক, আর পুলিশের লোকেরা সব মূর্খ?"

বিষ্টুমামা বললেন, "না ধর্ম্মাবতার, আমি বুঝতে পারছি আমিই একমাত্র মূর্খ।"

প্রশ্ন হলো, "তোমার কিছু বলবার আছে?"

বিষ্টুমামা বললেন, "আছে, কিন্তু সেটা জেল থেকে বেরিয়ে বলব।"

* * *

আজ রাত্রে মামীমার বাড়ী আমাদের সকলের হরির লুটের নিমন্ত্রণ।

ক্ষ্যাপার গান

শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

সোনার থালা, গিনির মালা,
ভালবাসার ভাণ,
অভিনয়ের উৎপাতে হায়
বিষিয়ে গেছে প্রাণ।
শয়তানেরি জয়-তানেরি
কোরস্-স্বরে বাজিয়ে ভেরী,
দোস্ত-মুখের মুখোশ পরে'
শত্রু হানে বাণ।
মদন-পূজার পাত্র ভরি'
ফেনিল মহুয়ায়,
করছে দেখ' খুনোখুনি
রাঙিয়ে দুনিয়ায়;
রূপের রঙীন মাকাল ফলে
মুনির মানস নেশায় টলে,—
কাব্যে ডাহা মিথ্যা কথা
প্রেমের কল্পনায়।
আর্সিতে মুখ- দেখাদেখি,
বুদ্ধি পাটোয়ারি,
স্বার্থ শানায় গুপ্তি-ফলক,—
যাই গো বলিহারি!
বাইরে চিকণ, ভিতর ভুয়া,
আশার পাশায় খেল্‌ছে জুয়া,
বিনয়-ঢাকা অহংকারে
মত্ত নরনারী।
'ধর্ম্ম? সে তো দুর্ব্বলতা'—
হাঁকে নাদির শাহ—
'জোর-জুলুমে লও গো কাড়ি'
যে ধন তুমি চাহ।
চায় রমণী বীরের পাণি,
এইটুকু সার সত্য মানি,—
যৌবনেরি বারুদ-আগুন
করুক্ গৃহ-দাহ।

'বহুৎ আচ্ছা, সাবাস্ সাবাস্,
রট্‌বে তোমার নাম,—
কোমলতায় খেদিয়ে দূরে
বাজাও আপন কাম।
ত্যাগের চেয়ে ভোগ সে ভালো,
জ্বালো মশাল প্রলয়-আলো,
চিতার পারে শান্তি আছে
নাই বা জানিলাম!
পুণ্য-পাপের শূন্য দাবি,
ফাঁকা আওয়াজ তার;
অরণ্যে হায় রোদন মিছে,
ব্যর্থ হাহাকার!
কতই দুখী আতুর জনা
ফেল্‌ছে চোখের জলের কণা,—
কি যায় আসে? কাঁদে—হাসে
দুনিয়া চমৎকার!'

* * *

তোমরা শেষে বক্র হেসে'
করলে প্রবঞ্চনা!—
প্রতিদানে পেলাম শুধু
দুর্দ্দশা-লাঞ্ছনা।
ডরাইনেক সমাজকে আর,
পায় দলি তার সূক্ষ্ম বিচার,—
ফুঁস্‌ছে বুকে কেউটে সাপের
প্রতিশোধের ফণা।
ভেকের মত মুখ লুকাবে
ভণ্ড-ভীরুর দল,
চোরাবালির চরে তাদের
থাম্‌বে কোলাহল।
বাঁধা-বটের কোটর-বাসী
জরদ্‌গবের গলায় ফাঁসি

লাগিয়ে দিয়ে দাও টাঙিয়ে,—
বেঁচে কি তার ফল !
বেরিয়েছে মন- কালাপাহাড়,
চালায় হাতিয়ার,
পণ করেছে জীর্ণ দারু
কর্‌বে সে চূর্‌মার,—
ভাব্‌ছে যারা কপাল-দোষে
ক্ষয়-জ্বরে হায় হৃদয় শোষে,
বাসুকী আর বইতে নারেন
তাদের জরা-ভার।
মৃত্যু-দ্বারে সত্য-খবর
বেতার আসিয়াছে,
খুঁড়ে রাখো নিজের কবর,
রইবে না কেউ কাছে।
চোখ রাঙাবেন প্রাণেশ্বরী,
পুত্র রবেন দূরে সরি',
হিসাব নেবেন ব্যাঙ্কে তোমার
অঙ্ক কত আছে।
ঠকিয়ে যাবেন আত্মীয় জন
স্কন্ধে করি' ভর,
চাম্‌ড়া চোখে নেইক তাঁদের
মজিয়ে যাবেন ঘর !
ওষ্ঠ-পুটের আহা-ধ্বনি
ক্ষেপিয়েছে প্রাণ,—বয় ধমনী
টগ্‌বগে খুন, তুব্‌ড়ী-আগুন
ঝর্‌ছে রে ঝর্ঝর।
যে দিক্ পানে চাই রে ফিরে
দুনিয়ার এই ভাও,
বোবায় বলে— 'লাগাও কোড়া,
ডুডুম্ ঠুকে দাও।'

কাঁপ্‌বে সবাই, তোমার ভয়ে,
ক্ষ্যাপার প্রলাপ মিথ্যা নহে,
খিটিমিটি ছাড়া হেথায়
নেই বনি-বনাও।

* * *

জীবন-ভরা বিড়ম্বনা,
ভূতের নাচন নাচা,
বিগ্‌ড়ে গেছে মাথার মগজ
ভেঙেছি তাই খাঁচা।
দেঁতো হাসির পরতাপে,
গালিগালাজ অভিশাপে,
নফর-বেশে কপট হেসে
ছেড়েছি ভিক্-যাচা।
আর তো কভু কারো সহিত
করব না মিটমাট,—
সওদা ফেলে' এলাম চলে'
ছড়িয়ে দোকান-পাট।
গভীর খেদে মরীয়া হয়ে',
'বেদে'র মত তাঁবু ব'য়ে
বেড়াই ঘুরে— কত দূরে
খেয়া-পারের ঘাট ?
(ওরে) আমার মত ফতুর যারা
দরদ্-জ্বালা পায়
শ্মশান-ঘরে ;— তারাই মোরে
সম্‌ঝাইবে হায় ;—
ডাক দিয়েছে কর্ম্মনাশা,
টুট্‌ল গুমর, উঠ্‌ল বাসা,—
মর্ত্ত্য-ভূমির কুম্ভ-মেলায়
সন্ন্যাসী গান গায়।

একরাত্রি

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

১

ঘটনাটির সূত্রপাত হয় মোকামাঘাটে।

ভিড় ছিল, তবে এমন নয় যে উঠিতেই পারিতাম না—একলা লোক—তায় লটবহর নাই। স্থান হইল না অন্য কারণে; আসলে মনটা কাব্যরসে সিক্ত হইয়া অত্যন্ত উদার হইয়া পড়িয়াছিল, কেমন যেন মনে হইতেছিল এপর্য্যন্ত পৃথিবীর যথেষ্ট উপকার করা হয় নাই। তাই নিজে সরিয়া দাঁড়াইয়া আর সকলকেই উঠিবার সুবিধা করিয়া দিতেছিলাম।

এমন সময় গাড়িটা ছাড়িয়া দিল। যে বাবুটিকে সবার শেষে সপরিবারে উঠিতে সাহায্য করি তিনি চলতি গাড়ির দুয়ার আগলাইয়া বলিলেন, "খবরদার মশায়, ঠেলে দিতেও পেছপা হব না, হাঁ, দেখচেন গাড়ির অবস্থা? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলেন কি?......"

এক্সপ্রেস্টা মিস্ করিলাম, বলিলাম—'যাক্‌গে, প্যাসেঞ্জারে দিব্যি শুতে শুতে যাওয়া যাবে।' ষ্টিমারের জেটির উপর গিয়া আসন্নসন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে বইটা খুলিয়া আবার পড়িতে লাগিয়া গেলাম। রবিবাবুর গল্পগুচ্ছ। "একরাত্রি" গল্পটা চলিতেছিল,—যেখানটায় নূতন স্কুলমাষ্টারি লইয়া আবার সুরবালার বড় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি সেইখানটা। নিজেকেই নায়কের পদে বসাইয়া দিলাম বলিয়া কেহ যেন কিছু মনে না করেন—অবস্থাটা তখন প্রায় এমনই হইয়া পড়িয়াছে।

গাড়ি আসিলে বইয়ের পাতায় আঙুল গুঁজিয়া দিয়া অলস গতিতে গিয়া এক ইণ্টার ক্লাসে উঠিলাম। গুছাইয়া-সুছাইয়া বসিয়া এইবার বইটি খুলিব, এমন সময় সামনের দিকে নজর পড়ায় একটু সচকিত হইয়া উঠিলাম। গাড়ীর ও-পাশটায় কোণে জড়সড় হইয়া একটি রমণী। ভাবেও, এবং বিদ্যুতের আলোয় সযত্নআচ্ছাদিত হস্তপদাদির যেটুকু দেখা গেল তাহা হইতেও বোঝা গেল রমণী যুবতী। পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে বেশ ধারণা পাওয়া গেল না, তবে সমস্ত অঙ্গটি বেড়িয়া আল্‌গা ভাবে যে একখানা রেশমী চাদর জড়ান ছিল, তাহা হইতে বেশ বোঝা গেল সে কোন অবস্থাপন্ন ঘরেরই মহিলা;—ইণ্টার ক্লাসে বসার ব্যাপারটাও এ-অনুমানটুকুর পরিপোষণ করিল।

ভাবিলাম মরুক গিয়া, আমার এ কৌতূহলের অধিকার কি? মনের লাগাম কসিয়া পুস্তকের অক্ষর-পথে চালিত করিবার চেষ্টা করিলাম। কিন্তু ক্রমেই বিষয়টার অপূর্ব্বত্ব আমায় নাছোড়বান্দা হইয়া যেন পাইয়া বসিল। তখন অধিকার লইয়া তর্কটুকুই অন্য আকারে আসিয়া দেখা দিল, মনে হইল এ-ক্ষেত্রে এমন উদাসীনভাবে বসিয়া থাকিবারই কি আমার কোন অধিকার আছে? এই ব্যাটাছেলেদের গাড়িতে আমি আর একটিমাত্র স্ত্রীলোক—সে অপরিচিতা। এই তো গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গেই আমি উঠিয়া বসিয়াছি, কই কেহ তো নামিয়া যায় নাই। তবে এ অভিভাবকহীনা কে? যদিই বা অভিভাবক ছিল, দৈবযোগে সঙ্গচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে একবার প্রশ্ন করিয়া বিষয়টা জানা উচিত নয় কি আমার?

ইহাতেও একটু সন্দেহ হইল—এই কি বিপদে পড়ার ভাব? বিশেষ করিয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে? যাহোক্, ভাবিলাম গাড়িটা খুলিয়া যাক্ না, শেষ পর্য্যন্ত যদি কেহ না আসিয়া পৌছায় তো ব্যাপারটা তখন একদিকে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। প্যাসেঞ্জার ট্রেন, পরের ষ্টেশনেই তো থামিতেছে, এত তাড়াতাড়ি কিসের?

গাড়ি ছাড়িল, কেহ আসিল না। আমার রহস্যময়ী সঙ্গিনী একটু নড়িয়া-চড়িয়া বস্ত্রাবরণে একটা হিল্লোল তুলিয়া আবার সেইরূপ জড়বৎ বসিয়া রহিলেন। গাড়িটা শুধু গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই মৃদু দোল দিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

ব্যবধানটা একটু বেশী ছিল বলিয়া গাড়ির আওয়াজটা বাড়িবার পূর্ব্বেই প্রশ্ন করিলাম—"আপনি কি একা ···· "

শেষ করিতে পারিলাম না, কারণ ছাঁৎ করিয়া মনে হইল "একা" কথাটা ব্যবহার করা বড় ভুল এবং নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া গিয়াছে, বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসার আকারে।

আমি মনের ভাবটা গুছাইয়া বলিবার জন্য ভাষা খুঁজিতে লাগিলাম। তরুণী উত্তরস্বরূপ বাম হাতখানি বাহির করিয়া ঘোমটাটা একটু টানিয়া দিলেন। একখানি পেলব, নধর ভুজলতা—তুলিতেই একগাছি রুলী আর গুটিকয়েক রেশমী চুড়ী ঠুন্ ঠুন্ শব্দে মণিবন্ধ ছাড়িয়া হাতের মাঝখানে নামিয়া আসিল,—মনে হইল যেন আমার ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা একে অন্যের গায়ে হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

ব্যাপারটুকু সামান্যই এবং সত্যিই কিছু আমাকে বিদ্রূপ করিবার জন্য চুড়ীমহলে মাথাব্যথা পড়িয়া যায় নাই। কিন্তু আমার একটু চমক ভাঙিল; হাসিয়া মনে মনে বলিলাম—"মিছে নয়, জড়ের মুখে হাসি ফুটাইবার মতই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে বটে।" তখন পৌরুষকে জাগ্রত করিয়া বেশ স্পষ্ট, সবল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি একলা এ অবস্থায় রয়েছেন, —কোন বিপদ আপদ ঘটেনি তো? কোন রকম সাহায্য করতে পারি কি? সব কথা খুলে বলুন, কোন দ্বিধা করবেন না।" এই অকুণ্ঠিত কথাগুলিতে মনে মনে বেশ একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম, যেন এক মুহূর্ত্তে বিশ্বের নারীর দায়িত্ব লইয়া আমি, পুরুষ, সর্ব্ববিধ অলস লঘুত্বের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ফেলিলাম। বোঝা শক্ত হইয়া উঠিল যে, আমরা এই স্বল্পপ্রাণা জাতিটার কাছে হঠাৎ থাকিয়া থাকিয়া এমন দুর্ব্বল হইয়া পড়ি কোথা হইতে যাহাতে এমন গোটাকতক সোজা কথা বলিলেও জিহ্বা জড়াইয়া আসে।

আমার স্বল্পপ্রাণা সঙ্গিনী কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না; তাহার পরিবর্ত্তে যাহা করিলেন, তাহাতে জটিল সমস্যাটি আরও নিবিড়ভাবে জটিল হইয়া উঠিল মাত্র। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে চাপা ক্রন্দনের আভাস পাওয়া যাইতে লাগিল—ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদা—মাঝে মাঝে সমস্ত শরীরটা কাঁপিয়া উঠিতেছে। যুবতী কখন-বা বস্ত্রাঞ্চলে, কখন-বা ঘোমটার অল্পপরিসর কাপড়টুকু দিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছে। মনটা বড়ই ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিন্তু কি উপায় আমার? আমার ক্ষুদ্র পৌরুষ লইয়া ওর নীরবতার গণ্ডীর বাহিরে বিফল উদ্বেগে বসিয়া থাকা ভিন্ন আর উপায় ছিল না। বসিয়া বসিয়া নানান রকম সম্ভব অসম্ভব কল্পনা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কোনটাকেই একটা সন্তোষজনক মীমাংসায় লইয়া যাইতে পারা গেল না।

এই অবস্থাতেই কয়েকটা ষ্টেশন পার হইয়া গেল—গাড়ির এক কোণে পৃথিবীর চিররহস্যময়ী নারী রহস্যের এ একটা নূতনতর আবরণে আর অন্য কোণে চিরমূঢ় পুরুষের প্রতিভূ আমি, এই এক নূতনবিধ ফাঁপরে পড়িয়া! গতিকটা মোটেই বলিবার বুঝাইবার যোগ্য নয়।

অবশেষে ঘটনাটা ক্রমশঃ একঘেয়ে এবং অল্পবিস্তর ভয়াবহ হইয়া পড়ার দরুণ তাহা হইতে কাব্যের অংশটুকু উবিয়া যাওয়ার জন্য হোক আর যাই হোক, মাথায় একটু বুদ্ধি আসিয়া জুটিল। একটা ষ্টেশনে গাড়ি আসিয়া থামিতে বলিলাম—"আপনি না-হয় স্ত্রীলোকের কামরায় চলুন না, সঙ্গে করে দিয়ে আস্‌ছি। সেখানে সব কথা খুলে বলতে পারবেন।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, রমণী ইহাতে তীব্র আপত্তির সহিত সঘনে হাত নাড়িয়া উঠিল; অনামিকাতে একটি নীলার আংটি যেন কয়েকটি মিনতি অশ্রুকণা বর্ষাইয়া ঝিক্‌ঝিক্ করিয়া উঠিল।

তখনও বুদ্ধিটার কিছু অবশিষ্ট ছিল বলিতে হইবে, বলিলাম—"বেশ, না-হয় কোন স্ত্রীলোককে ডেকেই

আন্‌চি, মেয়েগাড়িতে অনেক বয়স্থা স্ত্রীলোকও তো থাকেন…"

এবার ত্রস্ত, শঙ্কিতভাবে রমণীর মাথা পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল এবং অস্ফুটস্বরে দুই তিনবার শোনা গেল—"না—না—না।"

তখন আমি কড়া হইয়া বলিলাম—"তাহ'লে আমাকেই বলতে হবে ব্যাপারটা কি। কেন কাঁদছিলেন বলুন তো?"

আবার সেইরূপ জড়বৎ নিশ্চল, নীরব। প্রশ্ন করিলাম—"বাড়ী কোথায় আপনার?"

উত্তর না পাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"স্বামীর নাম?"

মাথাটি "না"—এর ভঙ্গিতে নড়িয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিবাহ হয়নি?" মাথা নাড়িয়া জানাইলেন—"না।"

একটু থামিয়া কথাটা যথাসম্ভব গুছাইয়া বলিলাম—"কোন দুর্বৃত্তের হাতে পড়েচেন কি?"

আর কোন উত্তর পাওয়া গেল না—অস্ফুট স্বরের মধ্য দিয়াও নয়, কিংবা ঘোমটা-ঢাকা মাথার মৃদু সঞ্চালনেও নয়। এত কাছাকাছি, অথচ সমস্ত রাতের ভিতর কথার মধ্যে পাওয়া গেল ঐ তিনটি ত্রস্ত, চাপা—"না না—না" আর পরিচয় ঐ দুটি ইঙ্গিত থেকে যা চুনিয়া লওয়া যায়। এতে অন্তরের উদ্বেগ তো শীতল হইলই না, বরং কল্পনার উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া মনটাকে ক্রমে একটা ব্যথা আশঙ্কার বাষ্পে ভরিয়া দিল।

গাড়ি নক্ষত্রবেগে ছুটিয়াছে। মুখ বাহির করিয়া নৈশ প্রকৃতির পানে চাহিলাম। স্তব্ধ, অপরিস্ফুট জ্যোৎস্না প্রাণময় জগতকে আপনার মোহ-আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া যেন ঘুমাইয়া আছে। বিরল-নক্ষত্র আকাশ। চাঁদের উপর একখণ্ড মন্থরগতি মেঘের আবরণ পড়িয়াছে। একটি মাত্র তার চোখে পড়ে,—সে যেন তাহার সমস্ত দীপ্তি দিয়া ঐ মেঘাবগুণ্ঠনের ওপারে তাহার কৌতুকদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে চায়।

বলিতে কি, বেশ বুঝিতে পারিলাম আমি পরাভূত হইয়া আসিতেছি। একেই পড়িতেছিলাম "একরাত্রি", তাহার উপর একরাত্রিব্যাপী একখানি খণ্ডকাব্যের এই অতিবাস্তব আয়োজন—এক্ষেত্রে পরাভব হওয়া ছাড়া আর উপায়ান্তর ছিল না।…মনে হইল, কি-ই বা ক্ষতি এমন? জীবনের এই নিরুদ্দেশ যাত্রাপথে শুধু একটি রজনীর জন্য আমরা অপরিচিত দুটিতে যদি এত কাছাকাছি আসিয়াই পড়িয়া থাকি, তা এমন বিরসভাবে পাশ কাটাইয়া যাইবারই বা সার্থকতা কোথায়? কি জানি আমার এ সাহচর্য্য ওর মনে কি ভাব তুলিয়াছে—কোনো ভাবই তুলিয়াছে কি না, তারই বা স্থিরতা কি? কিন্তু তা ভাবিয়া আজিকার রাত্রে তীব্রগতির এই মাদকতা ও নিথর জ্যোৎস্নার মধুর অবসাদের মধ্যে উহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যদি খানিকটা ভাবের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া লইতে পারি তো কাহার তাহাতে আসে যায়? ওর দুটি বাণী, কি এতটুকু দৃষ্টি যদি আমার সে কল্পনাকে পুষ্ট করেই তো সেটা কি এতই আশঙ্কার বিষয় হইয়া পড়িবে?

বিধাতার দয়াই হোক, আর চক্রান্তই হোক্ সব দিক দিয়াই যেন কাব্যটুকু জমিয়া উঠিতে লাগিল।

লক্ষীসরাই ষ্টেশনে একজন শুভ্র-শ্মশ্রু প্রাচীনপন্থী মুসলমান উঠিলেন। আদবকায়দার মত অভিবাদনাদি শেষ হইলে ও-কোণে নজর পড়িতে অতিমাত্র সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন,—"এঃ, আপনার বিবিসাহেবা এ গাড়িতে রয়েচেন না দেখে প্রবেশ করে বড়ই বেয়াদবি করে ফেলেচি, মাফ করবেন। আপনি বারণ করে দিলেই পারতেন। আমি নেমে অন্য গাড়িতে যাই· বেয়াদবিটা মাফ করতে হবে…কুলি?…"

আমি এক অদ্ভুত উত্তর দিয়া বসিলাম—"না, না, সে কি, যখন উঠে পড়েচেন, থাকুন। আপনি আমাদের পিতার বয়সী·"

"বিবিসাহেবার" প্রতিবাদ ত করা হইলই না, অধিকন্তু মুখ থেকে বেশ সরলভাবে বাহির হইয়া গেল—"আপনি আমাদের পিতার বয়সী।"

একবার সেই জড়মূর্ত্তির উপর আপনিই দৃষ্টিটা গিয়া পড়িল। না—অনুমোদনের সুস্পষ্ট আভাস না থাকিলেও, আপত্তিরও তো কোন ইঙ্গিত নাই।

রহস্য অতল!

২

কিউলে গাড়ী থামিলে হঠাৎ একটু বড়মানুষী করিয়া কেলনারের হোটেল হইতে 'খানা' সারিয়া আসিবার ইচ্ছাটা বলবতী হইয়া উঠিল। কেন, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। তবে নিজেকে যেন আজ রাত্রে ইতরসাধারণের অপেক্ষা বিশিষ্ট বলিয়া মনে হইতে লাগিল। নীচেকার রাস্তা দিয়া ও-প্ল্যাটফরমে গিয়া উঠিলাম, সদর্পে হোটেলের সাম্‌নে পর্য্যন্তও গেলাম, তাহার পর ভিতরে ভোজনরত লালমুখের ভিড় দেখিয়া আস্তে আস্তে, শিস দিতে দিতে ফিরিয়া আসিলাম। প্ল্যাটফরমের ভেণ্ডরের নিকট একপেয়ালা চা পান করিয়া কেলনারের সখ মেটান গেল। তাহার পর ইতরসাধারণের মত কিঞ্চিৎ পুরি ও মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া গাড়ীতে আসিয়া উঠিলাম। সব মিলিয়া একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল।

আসিয়া দেখি ব্যাপার গুরুতর! আমার সঙ্গিনী গাড়ীর কোণে বস্ত্রের একটি পুঁটুলি বিশেষ হইয়া ক্রন্দনরতা। সাম্‌নে দুইজন পুরুষ এবং একটি স্ত্রীলোক টিকিট কালেক্টার। মেম বলিতেছে—"জলদি বোলো, নেহিতো উতার দেঙ্গি, আভি গাড়ী খুলতি হ্যায়; টিকিট অপানে পাস কেঁউ নহি রখি?"

একজন টিকিট কালেক্টার ফিরিঙ্গি। হাত ঘুরাইয়া রিষ্টওয়াচটা দেখিয়া ইংরাজিতে বলিল—"আচ্ছা ফেসাদে পড়া গেল তো,—সময় যে হয়ে এল… "

অপরটি হিন্দুস্থানী, বলিল—"আপনি কি বাঙ্গালীন আছে? কোন ভাখায় কোথা বলতে পারেন? আমাদের তিনজোনারহি বোলি সোমঝাতে পারছেন না? "

আমায় উহারা কেহ দেখিতে পায় নাই, এদিকে পিছন ফিরিয়া ছিল। বুঝিলাম সঙ্গিনী টিকিট-হীনাও! যাহোক্, ভাবিবার সময় ছিল না, যেন এইমাত্র ঢুকিয়াছি, এইভাবে বলিলাম—"একি! কি ব্যাপার মেমসাহেব?"

আমার দিকে চাহিয়া একসঙ্গে ফিরিঙ্গি ইংরাজিতে, মেমসাহেব হিন্দীতে ব্যাপারটা বুঝাইতে সুরু করিয়া দিল। বেহারীটি তাড়াতাড়ি বারণস্বরূপ হাতদুখানা তাহাদের মুখের কাছে ধরিয়া বলিল "সব বাঙ্গালী মাসা হিন্দী, ইংলিশ নেহি জানতা। I am understanding him in Bengali……এই আওরাৎ লোকটির সাথমে……"

আমি তাহার বাংলার স্রোতে বাধা দিয়া শুদ্ধ হিন্দিতে বলিলাম—"বুঝেছি; তা মেয়েছেলেদের টিকিট প্রায়ই তাঁদের অভিভাবকদের কাছে থাকে, এটা বুঝে আপনারা একটু অপেক্ষা করতে পারতেন। এই নিন্, তবে ব্যাপার এই যে আর একখানা, অর্থাৎ এক হিসেবে আমার টিকিটখানা আপনাদের দেখাতে পারলাম না। দুইতিন জায়গায় দাম চুকাইবার জন্য ব্যাগ খুলিতে একখানা কোথায় পড়ে গেছে—সেই খোঁজেই এতটা দেরিও হয়ে গেল।……মোতিহারি থেকে বর্দ্ধমান—এই টিকিট দেখলেই বুঝতে পারবেন, —কত দিতে হবে?"

আমার নূতন ওয়ার্ডের পানে একবার চাহিলাম। ঘোমটাটানা মুখটা এদিকে ফিরান রহিয়াছে। ঘোমটার পাশের কাপড়টা ঘুরাইয়া মুখের নিম্নভাগটা চাপিয়া আছেন; ঠিক চক্ষু দুইটির পরিমাণে সামান্য একটু অবকাশ। চক্ষু দেখা যায় না,—বোধ হয় কাল চোখের দীর্ঘ পল্লবে ঘোমটার ছায়াটা আরও নিবিড় করিয়া দিয়া থাকিবে। কিন্তু নাই দেখি, বেশ অনুভব করিতেছিলাম—দুটি ডাগর চোখের স্নিগ্ধদৃষ্টি আমার সমস্ত শরীরে প্রসন্নতা বর্ষণ করিতেছে। সারা দেহে রোমাঞ্চ দিয়া উঠিল। ভাবিলাম, কৃপণের মত এই অতিসংযত দান, কিন্তু এটুকুরই জন্য কি-ই না দেওয়া যায়—কি-ই না করা যায়—এই প্রসাদ-কণিকার জন্য নিজের সমস্ত দেওয়া-করাকে কতই না তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়… ..

অমি শুদ্ধ হিন্দী বলিতে পারি, বোধ হয় সেই অপরাধে বেহারী টিকেট কালেক্টারটি জরিমানার জন্য জিদ করিলেও, ফিরিঙ্গি মোতিহারি হইতে বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত, নিছক ভাড়া লইয়াই ছাড়িয়া দিল। দলটা নামিয়া গেলে

একটু নিকটে গিয়া বলিলাম—"এই রাখুন টিকিটটা। আগে বলেন নি কেন? টিকিটের জন্য কত বিড়ম্বিত হলেন দেখুন তো।"—একটু অভিমানের সুরেই কথাগুলো বাহির হইল; আঘাতটা আমারই বেশী লাগিয়াছিল কি না।

ডান হাতের শুধু আঙুল ক'টি কাপড়ের রাশির মধ্য হইতে বাহির করিয়া প্রসারিত করিয়া ধরিলেন। রাঙা টিকিটখানি মাঝখানে আলগোছে রাখিয়া দিয়া কহিলাম, "কই আপনার তো কিছু খাবার কেনা দেখছি না?"

এই সময় গার্ড হুইস্‌ল দিল। দুয়ারের কাছে তাড়াতাড়ি আসিয়া "খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা" করিয়া চীৎকার করিলাম।

কেহ উত্তর দিল না। নিকটে একটা ছিল, ভ্রূ নাচাইয়া বলিল, "খড়া চালাক হ্যায়, হুইসিল দিয়া আউর খাবারওয়ালা, খাবারওয়ালা!"

ডাকিলাম "পানিপাঁড়ে!"

সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "ঘটি আছে?"

বেঞ্চের নীচের পানে তর্জনীর সঙ্কেত হইল—একটি সুদৃশ্য জারমান সিল্‌ভারের ঘটী। বাহির করিয়া পানিপাঁড়ের নিকট জল লইলাম। তাড়াতাড়িতে খঞ্চেতে একটা আট আনি দিয়া চার দোনা অর্থাৎ এক আনার পান লইলাম। পয়সা ফেরৎ পাইলাম না। কারণ খঞ্চের মাঝখানে চোখের সামনে এককাঁড়ি পয়সা থাকিলেও পানওয়ালার হঠাৎ বিশ্রীরকম দৃষ্টিবিভ্রম আসিয়া পড়িল—সেই অবসরে গাড়ির বেগ বাড়িয়া আমরা প্লাটফর্মের বাহিরে আসিয়া পড়িলাম।

সাত আনা পয়সা গেল, কিন্তু সাত আনা পয়সা অথবা পয়সা মাত্রই গ্রাহ্য করি, মনটা সে-সময় এরূপ বস্তুতান্ত্রিক ছিল না। সঙ্গিনীকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম, "এসব তো হ'ল, কিন্তু খাবার আপনার? ...তা হোক্ আমার দরকার হবে না—চা' টা খেয়েচি।" বলিয়া সমস্ত খাবার, জল, তিনদোনা পান সাম্‌নের বেঞ্চের উপর রাখিয়া দিলাম। একটু ক্ষুব্ধভাবে বলিলাম, —"অনেকক্ষণ খান্‌নি নিশ্চয়। খাবার খুবই সামান্য হ'ল...এ পর্য্যন্ত মুখ ফুটে কিছু বললেন না তো— আমার আর দোষ কি বলুন?"

এখানে সুন্দরী আমায় একটু কৃতার্থ করিলেন। খাবারের ঠোঙাটি লইয়া আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া বসিলেন। ঘটী হইতে জল লইয়া মুখ ধুইয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দু'চার মিনিটের মধ্যেই ঠোঙাটি খালি করিয়া জানালা গলাইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ঘটীর প্রায় অর্দ্ধেক জল ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিলেন।

বলিতে কি, আমি ঠিক এরকমটি আশা করি নাই। আশা যা করিয়াছিলাম তা বরং এই যে, আহার্য্যের কিছু অংশ দরদভরে আমি শ্রীহস্ত হইতে লাভ করিব।... আমার কাব্যের অতিকোমল অঙ্গে একটি রূঢ় আঘাত লাগিল। কিন্তু সুখের বিষয়ই হোক্ আর যাই হোক্ ব্যথাটা স্থায়ী হইল না। সঙ্গিনীর গ্রহণ এবং ভোজনের মধ্যে যে একটা নগ্ন স্থূলতা ছিল, একটু চেষ্টা করিয়া ভাবিতেই সেইটেই আমার চক্ষে সুন্দর হইয়া ফুটিয়া উঠিল। মনকে বুঝাইলাম—প্রত্যেক মানুষটির মধ্যে একটি পশু বর্ত্তমান। আমরা তাহাকে চাপড়াইয়া-চুপড়াইয়া শিষ্ট এবং সংযত করিয়া রাখি—এবং লোকচক্ষুতে এই শিষ্টতাটি হয় সৌন্দর্য্য। এ এক ধরণের সৌন্দর্য্য বটে। কিন্তু ইহার মধ্যে সৌন্দর্য্যের পূর্ণরূপটি তো পাওয়া যায় না। সে-রূপ পাওয়া যায়, যখন প্রকৃতির তাড়নায় সেই পশুটি সংযমের এবং আচারের সমস্ত শৃঙ্খল ঝন্‌ঝনাইয়া তাহার সমগ্র বীভৎসতায় বাহির হইয়া আসে। তখন মানুষের কোমলতা ও পশুর কঠোরতা মিলিয়া এক অপরূপ রূপের সৃষ্টি হয়, সেই পূর্ণ। ঝরণার শ্রী যেমন, শুধু স্নিগ্ধ, স্বচ্ছ কালো জল হইলেই হয় না— তাহার সঙ্গে গর্জ্জন চাই আর চাই উপলবিক্ষুব্ধ ফেনার আবিলতা।

এই রহস্যময়ী কোমলাঙ্গিনীর ক্ষুধা-উগ্র আহারের মধ্যে আমি এই রকম গোছের একটা মাধুর্য্য দেখিয়া নিজেকে কৃতার্থ মনে করিলাম।

দেখিলাম সুন্দরী পানের দোনা হইতে পান বাহির করিয়া হাতে ধরিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন। প্রশ্ন করিলাম—"জরদা খান?"

ঘোমটাটি সম্মতির ভঙ্গিতে দুলিল। মৌন হইলেও এ-উত্তরটুকু শব্দের এত কাছাকাছি যে আমি প্রায় আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলাম। পকেটে বন্ধুর-দেওয়া বিদায়ের স্মৃতিচিহ্ন, খাঁটিরূপার একটা জরদার কৌটা ছিল—মিনার কাজ করা এবং মাঝখানে সোনার একটি পান বসান। একটু জরদা নিজের জন্য ঢালিয়া রাখিয়া কৌটাটা দিবার জন্য উঠিয়া গেলাম, বলিলাম—"রাখুন আপনার কাছে, পান খাওয়া হ'য়ে গেলে দিলেই হবে।"

আবার একবার পাঁচটি সোনার আঙুল প্রসারিত হইল। সামান্য একটা রাঙা রেলটিকিট পড়িয়া যেখানে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, সেখানে কারুমণ্ডিত সৌখীন সেই সোনা-রূপার পাত্রটি সে কী মোহ রচনা করিল কি করিয়া জানাই? দেখিলাম একটু। কিন্তু আশ মিটিবার পূর্ব্বেই আঙুল ক'টি চাদরের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। আর, কতক্ষণে—কতদিনেই বা মানুষের এ আশ মিটে? কবেই বা মিটিয়াছে?...

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস আপনি বাহির হইয়া আসিল।

নিজের সীটে আসিয়া বসিলাম এবং বেদনাটাকে চাপা দিবার জন্য বইটা খুলিয়া বসিলাম। গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে,—পড়িয়া চলিয়াছি—"আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ-ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুইটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।...আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই।...আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি। ...আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে এই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা......"

—বই মুড়িলাম। ভাবিতে লাগিলাম, সেই মহাসঙ্কট, পৃথিবীর আর সত্যমিথ্যা সমস্ত বন্ধন মুছাইয়া দিয়া কবেকার একটা তুচ্ছ সম্বন্ধকে মৃত্যুর চিরান্ধকারের সম্মুখে মুহূর্ত্তের জন্য এমন উজ্জ্বলভাবে সত্যের আলোকে ফুটাইয়া তুলিল কেন? কোন্ রহস্যময়ের ইঙ্গিতে সুরবালা আজ সমস্ত জীবনের সম্বলস্বরূপ একটি রাত্রির নিবিড় সান্নিধ্যের উপহার দিবার জন্য সেই ব্যর্থজীবন স্কুলশিক্ষকের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল? সেই অদৃশ্য শক্তির নির্দ্দেশেই কি আজিকার রাত্রে এই মায়ারূপিণী আমার পথে আসিয়া পড়িয়াছে? কয়েক দণ্ড মাত্র লইয়া এই যে নীরব মিলন, ইহার মধ্যে কত যুগ, কত জন্মজন্মান্তরব্যাপী সাধনার সিদ্ধি কি পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিয়াছে?—কে জানে?

আমার সুরবালা তখন একেবারে মাথা উল্টাইয়া চার আঙুলে মোটা রকম জর্দ্দা লইয়া একটু গদ্যময় ভঙ্গিমায় মুখবিবরে চালান দিতেছিলেন। কিন্তু তাহাতে আমার কাব্যের রসটুকুকে একটুও বিস্বাদ করিতে পারিল না। অত কথা কি, ক্ষিদেয় যে নাড়ী জোট পাকাইয়া যাইতেছিল সেইদিকেই বড় একটা ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

জামুই ষ্টেশনে নামিয়া একটু দূরে গিয়া তাড়াতাড়ি এক ঠোঙা ছোলার অখাদ্য ঘুঘনি চিবাইয়া লইলাম, তাহার পর গাড়ি ছাড়িলে সঙ্গিনীর নিকট জলের ঘটাটি ভিক্ষা করিয়া লইয়া তাঁহার পানের পর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সমস্ত দেহমন দিয়া সেটুকু পান করিয়া লইলাম। তিনি আলগোছে পান করিলেও জলটুকু একহিসাবে উচ্ছিষ্টই ছিল। মানি—ছিল; এবং সেইজন্যই তখন বোধ হইল যেন দুইটি প্রাণীর মধ্যে একটা সুস্পষ্টই যোগ স্থাপিত হইয়া গেল, আমাদের মধ্যে কোথায় যে একটা পার্থক্যের রেখা ছিল ঐ একঘটী জলে সেটা ধুইয়া, মিটাইয়া দিল।

নিজেকে এটুকু প্রশ্রয় দিবার ফল এই হইল যে এই যোগটুকুকে আরও ঘনিষ্ঠ করিয়া লইবার জন্য মনটা উৎকট রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। জল পান করিয়াই যে ফিরিয়া আসা উচিত ছিল সেটা মনেই পড়িল না। পড়িবে কোথা হইতে? তখন সমস্ত মন জুড়িয়া এই একটা আকাঙ্ক্ষাই তোলপাড় করিতেছিল—হে সুন্দরি, আর কিছু নয়, দুটি কথা দাও—তা সে যেমনই হোক না —তা'তে আমার এ-কাব্য-রজনীর রঙীন স্বপ্ন এক নিমেষে চুরমার হইয়াই যাক্ - বা সে-স্বপ্নের মোহ আমায় আরও–আরও হতচেতন করিয়া দিক—কিছুই যায়

আসে না। সমস্তর উপরে আমি ঐ দুটী বাণী পাওয়াকেই আমার জীবনের পরম সত্য করিয়া রাখিব।

হঠাৎ চেতনা হইল। তাহাকে চেতনা বলি, কি ক্ষুব্ধ অভিমান বলি, কি নিরাশার আত্মগ্লানি বলি?··· নিজের জায়গায় আসিয়া বসিলাম। মনে মনে বলিলাম "না; এই ঠিক করিয়াছ। আমার একরাত্রির সমস্ত প্রগল্‌ভতা এই বজ্রশাসনেই তুমি খর্ব্ব করিয়া রাখ, হে সম্রাজ্ঞি,—আমার কি অধিকার তোমার বাণীতে? আর তোমার ধ্যানেই বা আমি তৃপ্তি খুঁজি সে কিসের জোরে? তোমার এই বিধানই উপযুক্ত। এই কঠিন নীরবতার বাঁধ দিয়া আমার এই তোমা-মুখী চিন্তা-স্রোতকে সারা রজনী এমনি করিয়াই নিরুদ্ধ করিয়া রাখ।"

নিজেকে ভাগ্যহীন তো মনে হইলই, সেই সঙ্গে এই অভিমানটা বুকের মধ্যে গুমরিয়া উঠিয়া নিজেকে প্রবল অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তবে শান্ত হইলাম। নিজেকে লইয়া এই দারুণ দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া এমনি শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম যে স্থির করিলাম পরের ষ্টেশনে নিজে হইতেই কোন সঙ্গী ডাকিয়া লইব; কিংবা এই কামরাটাই ত্যাগ করিয়া যাইব। এই গাড়ির মধ্যেকার অসহ্য গুমট আর যেন বরদাস্ত হয় না।

—হায় রে মানুষের এত দম্ভের আত্মজ্ঞান আর এত আড়ম্বরের আত্মবিশ্বাস!

পরের ষ্টেশনে একটি বাঙ্গালী যুবক বোধ হয় তাহার বৃদ্ধ পিতামাতা, স্ত্রী, একটি ছোট কন্যা ও দু' কুলি মালপত্র লইয়া খানিকদূর ছুটাছুটি করিয়া, শেষে আমার গাড়ির সামনে আসিয়া হন্তদন্ত হইয়া বলিল—'মশায়, আর বোধ হয় এক মিনিটও সময় নেই, থার্ড ক্লাসে তো উঠতে পারলাম না, একটু দয়া করে যদি······নাও বাবা, তুমি আগে ওঠো দিকিন্···"

আমি একটু ভাবিলাম,—কি যে মাথামুণ্ড ভাবিলাম জানি না। পকেট হইতে রেলের চাবিটা বাহির করিয়া আস্তে আস্তে কুলুপ ভরিয়া মোচড় দিতে দিতে নির্ব্বিকার-ভাবে বলিলাম—"আজ্ঞে না, এখানে ভিড় করলে চলবে না, এগিয়ে দেখুন।"

ঈশ্বর আমার অসহ অবস্থায় করুণা করিয়া সঙ্গী দিলেন অকার্পণ্যের সহিত; আর আমি এমনই করিয়া তাঁহার সেই মহা দান প্রত্যাখ্যান করিলাম। আজ ভাবি—কি ভূত যে মাথায় চাপিয়াছিল সেদিন!

সমস্ত রাত এই রকমে কাটিল—কখন আশার তীব্র উন্মাদনায়—সমস্ত শরীর মন জাগ্রত—এতটুক তন্দ্রার লেশ নাই যে কল্পনার মধ্যে অস্পষ্টতা আনিতে পারে; আবার কখনও বা হতাশার অবসাদে যাহাতে জাগরণ-টাকেও যেন নিদ্রার মতই শিথিল বলিয়া বোধ হয়।··· সঙ্গিনী খানিকটা দিব্য ঘুমাইয়া লইলেন। একটু হিংসা হইল। ভাবিলাম—"আচ্ছা ভাল তোমরা, যত মাথা-ব্যথা কি ভগবান আমাদেরই দিয়াছেন?"

৩

এই আমার একরাত্রির ইতিহাস। আমার অন্তরের বাসনা রাত্রির সামান্য ঘটনা-সমাবেশের গায়ে যেমন ভাবে রং ধরাইয়া আসিয়াছিল যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস করিয়াছি।

—শেষ পর্য্যন্ত একটা গভীর নিরাশার কাহিনী। এ শুনাইয়া কাহাকেও বিড়ম্বিত না করিলেই ভাল হইত। তবে, আমরা সবাই মায়াসঙ্কুল সংসার-পথের যাত্রী, আর যাত্রাটা অনেক সময় আবার রেলপথে সাধিত হয়—যেখানে মায়ারাক্ষসী সহস্ররূপে সদাই ওৎ পাতিয়া আছে, সেইজন্য যতটা পারিলাম সেই রাত্রের আমার দুর্ব্বল মনের ভাবটা লিখিয়া গেলাম। তখন ভাবিয়াছিলাম এ-কাহিনী কি এমনি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে? দিনের আলো একে কি একটা বিপুল সার্থকতার মধ্যে পূর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে না?

—আর এখন ভাবি·····যাক্, সেকথা তুলিতে আর প্রবৃত্তি নাই। সামান্য ভুলে সেদিন কি দুর্লভ সম্পদকে হারাইলাম,—কি তীব্র একটা অনুশোচনার দাগ যে সে আমার মনে মুদ্রিত করিয়া গিয়াছে—সে কথা ভাবিতে এখনও নিজের পৌরুষে ধিক্কার জন্মে।

তাই এই দুঃখের কাহিনীটা শেষ করিতেই চাহি—

খুব ভোর থাকিতে—তখনও অন্ধকারের পরদাটা একেবারে গুটাইয়া যায় নাই—ট্রেনটা আসিয়া পানাগ

ষ্টেশনে দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই মূর্ত্তিটি আপাদমস্তক বস্ত্রাবরণে ঢাকিয়া গাড়ির দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিয়া ধীরে ধীরে নামিয়া গেল।

ঘটনাটা লিখিতে সামান্য, কিন্তু তখন আমার কাছে সামান্য ছিল না। একবার মনে হইল সারা রাত্রের সমস্ত অসাড় তর্কবিতর্ক ছিন্নভিন্ন, লণ্ডভণ্ড করিয়া শেষবারের মত একবার ননীর হাত দুখানি ধরিয়া নামাইয়া দিয়া এই জীবনের প্রথম এবং শেষ স্পর্শের একটা আভাস লই।···তাহা কিন্তু করা হইল না।

মূর্ত্তি নামিয়া, দুই পদ অগ্রসর হইয়া, আমি যেখানটায় বসিয়াছিলাম প্লাটফরমে ঠিক তাহার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল। নতমুখী, বুঝিলাম কৃতজ্ঞতা জানাইতে চাহে—নারীহৃদয়ের অসীম কৃতজ্ঞতার দুটি কথায় বিদায়ের শঙ্কাসরমহীন লগ্নটুকু ভরিয়া যাইতে চায়।

তখনও বিনিদ্র রজনীর নেশা মাথার মধ্যে ঘূর্ণি দিতেছিল।···মনে মনে এই ব্রীড়ানতা কুণ্ঠিতা মূর্ত্তিকে ডাকিয়া বলিলাম—না, হে সুন্দরী, আর কৃতজ্ঞতার আবশ্যক নাই। একটি রাত্রির জন্য তুমি যে আমার দেহের এত কাছে এবং মনের এমন গভীর অন্তঃস্থলে প্রবাস করিয়া গেলে সেই আমার মহা পুরস্কার। হে মৌনে, আকাশের ঐ অস্তমান নক্ষত্রের মত তুমি রজনীর এক প্রান্ত হইতে উদয় হইয়া অন্য প্রান্তে বিলীন হইতে চলিয়াছ। তোমার আদি রহস্যে, তোমার অবসান রহস্যে, এই দুই সীমাহীন রহস্যের মাঝখানে একটি রাতের আধ বাস্তবতার মধ্যে তুমি আমার কাছে যে জাগিয়া উঠিয়াছিলে, সেই আমার মহাসম্পদ—সেজন্য তুমিই আমার সমস্ত মনপ্রাণের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ কর···

গার্ড হুইস্‌ল দিল, সঙ্গে সঙ্গে অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত হইল এবং ফিক্ করিয়া একটু হাসি!—

—ইয়া গোঁফ, একমুখ ছাটা দাড়ি, খুর দিয়া কামান মাথা, রগ-বসা গাল-তোবড়ান—দুষমন্ কাল এবং হাতে পায়ে সুকৌশলে ঈষৎ হলুদ রঙের সঙ্গে খড়ি মাখান···

—হাসিটা কান থেকে কান পর্য্যন্ত প্রসারিত করিয়া বলিল—"সেলাম আলেকুম্ কত্তা; গোস্তাকি লেবেন না—আওরাতের ওপর কর্ত্তার বেজায় নেক নজর দেখি—হি—হি—হি···সব খোদার মর্জ্জি—মাঝ হ'তে আমার একটু ফায়দা হয়ে গেল··হি—হি—হি···"

গাড়ি ছাড়িয়া দিল। লোক ডাকিব কি, আমার বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছিল। চেন টানিবার কথাটা তো মনেই আসিল না। ভ্যাবাগঙ্গারাম হইয়া বসিয়া রহিলাম।

সেই উৎকট হাসি লইয়া গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে দুইপা চলিতে চলিতে বলিল—"আবার সেলাম আলেকুম, চল্‌লাম,—জর্দার কৌটটা আসনাইয়ের নেশানা ক'রে রাখলাম, কত্তা—এই চাদর আর সিলভারের ঘটীর সাথে খুব মানাবে—হি—হি—হি···অধীনের নাম অছিমুদ্দিন—মেহেরবাণী ক'রে ইয়াদ রাখবেন······"

পিতা নোঽসি

মানুষ যতক্ষণ বাইরের শক্তিকে বাইরের সামগ্রীকে বড় ক'রে দেখ্‌বে ততক্ষণ কোন ব্যবস্থায় কোনো বিধানে তার বিরোধ মিটবে না। জগৎ যতক্ষণ আমাদের কাছে শক্তির জগৎ দ্রব্যের জগৎ ততক্ষণ স্বভাবতই সে আমাদের স্বার্থের জগৎ; এই স্বার্থকে শুধুমাত্র শাস্তির দোহাই দিয়ে কিম্বা শাসনের ভয় দেখিয়ে চিরদিন সংযত রাখা অসম্ভব। একদিকে তার বাঁধ বাঁধ্‌লে আর একদিকে তার ধারা বইবেই।...

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে শক্তির লোভ স্বার্থের টান আছে, তাতেই সে কাড়ে, মারে, ঠেলাঠেলি করে; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য হচ্চে প্রেম, তাতেই সে আপনাকে ত্যাগ করে, মৃত্যুর উপরে ক্ষতির উপরে জয়ী হয়। জগতে যতক্ষণ শক্তির রূপকেই স্বার্থের রূপকেই একান্ত ক'রে দেখি, তার চেয়ে বড় আর কিছুকে দেখ্‌তে পাইনে, ততক্ষণ আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সত্য যে প্রেম, বিশ্ব-নিয়মের মধ্যে তার কোনই আশ্রয় পাইনে; মানুষের মনের মধ্যে সে একটা খাপছাড়া জিনিষ হয়ে থাকে। তাই সে অবস্থায় আমাদের ব্যবহারে তার প্রভাব ক্ষীণ হয়।

জীববিজ্ঞান কিছুদিন আগে এই কথাই বলেছিল যে, শক্তিই হচ্চে জগতের মূল নীতি, স্বার্থের সংঘাতই হচ্চে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের পদ্ধতি। যার জোর আছে সে-ই জিৎবে সেই টি‍ক্‌বে। এই সত্যই বিশ্বের সত্য একথা মানুষ যেদিন স্থির করলে সেদিন থেকে আপনার প্রকৃতির পরম সত্য যে প্রেম তাকে ভিতরে ভিতরে অশ্রদ্ধা করতে লাগ্‌ল। তখন থেকে য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রতাপ নিষ্ঠুর হয়ে সমস্ত পৃথিবীকে পীড়িত করচে।

এই পীড়া যখন স্বয়ং য়ুরোপকে আজ স্পর্শ করেচে তখন সে আপনাকে প্রশ্ন করতে প্রবৃত্ত হয়েচে কি করলে এই পীড়া দূর হয়। প্রশ্নের উত্তরে নানা কৌশলের কথা তার মনে উদয় হচ্চে। একটা কথা এখনো সে সম্পূর্ণ বুঝচে না যে, সত্যের উপলব্ধি যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের অসম্পূর্ণ থাকে ততক্ষণ দুঃখ দেওয়া এবং দুঃখ পাওয়া থেকে কেউ আমাদের বাঁচাতে পারবে না। যতক্ষণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে শক্তিকেই প্রধান ক'রে দেখব ততক্ষণ স্বার্থকেই আশ্রয় ব'লে আঁকড়ে ধরব। অবশেষে "স্বার্থের সমাপ্তি অপঘাতে।"

মানব প্রকৃতির সব চেয়ে বড় সত্য যে প্রেম সে যদি একটা সৃষ্টি-ছাড়া পদার্থ না হয়, বিশ্ববিধানে সেও যদি সবচেয়ে বড় সত্য হয় তবে এই প্রেমের আশ্রয় ও উৎস বিশ্বের মূলে কেউ আছেন। কেন না প্রেম-পদার্থ ব্যক্তিগত। ব্যক্তির সঙ্গে সত্য সম্বন্ধ ছাড়া প্রেমের আর কোনো অর্থ থাক্‌তে পারে না। শক্তির ঊর্দ্ধে সেই ব্যক্তিকে সেই পরমপুরুষকে যদি দেখ্‌তে পাই তাহলেই আমাদের প্রকৃতির পরম সত্য আপন চরম পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে। সেই পরিতৃপ্তি স্বার্থকে ত্যাগের দ্বারাই আপনাকে প্রকাশ করে। এই পরিতৃপ্তিতেই কল্যাণ।...

মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে অশিব কি? বিশ্বকে জড়শক্তির ক্রিয়া ব'লে জানা। কেননা, তাতে ক'রে সমস্ত জগতের সঙ্গে মানুষের একেবারে গোড়ায় তফাৎ ঘটে। সেই ভয়ঙ্কর অসামঞ্জস্যে মনুষ্যত্বটা একটা মূলহীন পদার্থ হয়ে দেখা দেয়; কাজেই ধর্ম্মকে একটা বানানো জিনিষ মনে করায় তার দাম ক'মে যায়, ত্যাগমাত্রকে নিতান্ত ফাঁকি ব'লে মনে হয়। মানুষের একটি ব্যক্তিত্ব আছে অথচ যে জগতে তার জন্ম, যেখানে তার স্থিতি, সেখানে সর্ব্বত্র বস্তু অসীম, শক্তি অমর, তথাপি সেখানকার আদি অন্তে ব্যক্তিত্বের লেশ নেই, এই কথা যদি মনে করি,—অর্থাৎ যে আত্মাকে নিজের মধ্যে একান্ত উপলব্ধি করচি, যে আত্মা কেবল যে আপনাকে জানে তা নয় আপনার স্বরূপে স্বভাবে যার আনন্দ, এবং সেই আনন্দে যে আপনাকে নানা কর্ম্মে ও নানা সম্বন্ধে দান করে সেই আমার আত্মার সঙ্গে বিরাট বিশ্বে কোথাও আত্মিক সম্বন্ধের কোনো আশ্রয় নেই, এই কথাটা যদি স্বীকার করি তবে তার মত এমন ভয়ঙ্কর অকল্যাণ মানুষের পক্ষে আর কিছু হ'তে পারে না। আমাদের যা কিছু পাপ, পরস্পরের প্রতি যা কিছু অন্যায় সমস্তেরই মূল এইখানে। আধ্যাত্মিক সত্যকে জগতে জীবনে যে পরিমাণে কম উপলব্ধি করচি সেই পরিমাণেই বেশি ক'রে নিজের ও অপরের পক্ষে দুঃখের কারণ হয়ে উঠচি।

বিচিত্রা—শ্রাবণ, ১৩৩৭ — শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

—

বর্ত্তমান যুগের নারীসমস্যা

স্ত্রীপুরুষ লইয়া সংসার—উভয়ের সমবেত চেষ্টায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়। এ দুইয়ের শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি যদি একরূপ না হয়, তবে সংসার কতকটা অচল হয়, একপায় খুঁড়াইয়া খুঁড়াইয়া কোন-রকমে চলিতে পারা যায় বটে কিন্তু তা বেশীক্ষণ নয়।...

পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষা টুলো-পণ্ডিতদের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। তাঁহাদের মেয়েরাও অনেক সময়ে খুব উচ্চশিক্ষা পাইতেন। ফরিদপুরের বৈজয়ন্তী দেবী বিবিধ সংস্কৃত-গ্রন্থ লিখিয়া যশস্বিনী হইয়াছিলেন; লালা জয়নারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্রী, লালা রামগতির কন্যা আনন্দময়ী দেবী রাজবল্লভের অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের কুণ্ড কিরূপ হইবে, তাহা শাস্ত্র দেখিয়া স্বয়ং আঁকিয়া দিয়াছিলেন; ষোড়শ শতাব্দীতে বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাদেবী রামায়ণের যে সুললিত বঙ্গানুবাদ করেন তাহা মৈমনসিংহের মহিলারা বিবাহ-উৎসবে এখনও গান করিয়া থাকেন। এরূপ বিদুষী মহিলাদের অনেকের নাম আমরা জানি।

কিন্তু সাধারণ ভদ্রসমাজের মহিলারা উচ্চশিক্ষা না পাইলেও তাঁহাদের অনেকেই রামায়ণ, মহাভারত পড়িতে পারিতেন; পুরাণের উপাখ্যান সকলেই জানিতেন, গৃহস্থ ভদ্রলোকদের বিদ্যার দৌড়ও তাহা হইতে বড় বেশী ছিল না। স্ত্রী, পুরুষ ইঁহাদের উভয়ের আদর্শ ও জ্ঞান অনেকটা একরূপ ছিল। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া স্বচ্ছন্দে

সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পুরুষ কৃষি, জমিজমার কাজ, দরবারে দপ্তরে লেখাপড়া এবং রাষ্ট্রশাসনের কাজ করিতেন; মেয়েরা ঘরের সমস্ত কাজ অতি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করিতেন। তাঁহারা প্রিয়-জনের জন্য রান্নাঘরে নূতন নূতন খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া উদ্ভাবনী-শক্তির পরিচয় দিতেন; ক্ষেত্র হইতে ফসল আসিলে তাহা গোলায় তুলিতেন; ভাঁড়ার রাখিতেন; কন্থাসীবন ও আলিপনায় বিচিত্র কৌশল দেখাইতেন—তাঁহারা কথকতা, কীর্ত্তন, গীতার ব্যাখ্যা ও পুরাণপাঠ শুনিতেন। এখন চাকর ও বামুনেরা যাহা করে তাহার অনেক কাজই তাঁহারা প্রসন্নমনে করিতেন। ইহা তাঁহাদের দাসীবৃত্তি ছিল না, প্রিয়জনের জন্য এই সেবাবৃত্তি ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।...

এখন মহিলাদের জীবনের প্রয়োজনের অঙ্ক প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে। সহরে যাহা দেখি তাহাতে ত মনে হয় তাঁহাদের কোন প্রয়োজনই নাই। পাড়াগাঁয়েও সহরের এই আবহাওয়া বহিতে সুরু করিয়াছে। মধ্যবিত্তগণের সংসারে স্ত্রীলোকের প্রয়োজন ক্রমে হ্রাস পাইয়া যাইতেছে। তিনি রান্নাঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখিতে ইচ্ছুক নহেন। শিশুপালনের ভারে তিনি ক্লান্ত হইয়া পড়েন। সেকালে মেয়েরা ঢেঁকি কুটিতেন, আধক্রোশ দূরের নদী হইতে কলসী করিয়া জল আনিতেন, জাঁতা চালাইতেন, চরকায় সুতা কাটিতেন, অম্লানবদনে গরুর সেবা, গোয়ালে ধোঁয়া দেওয়া ও গোময়ে ঘরের মেঝে ও উঠান মার্জ্জনা করিতেন—এই সকল কার্য্যে শরীর সবল ও পুষ্ট হইত—ইহা একরূপ ব্যায়াম ছিল। এখনকার মেয়েরা গোময় এবং ঢেঁকির কথা শুনিলে আতঙ্কিত হইবেন। বাসনকোশন ঝিয়েরা মার্জ্জনা করিয়া থাকে, লবণসমুদ্রের তীরবাসী উড়ে-বামুন ব্যঞ্জনাদি অতিরিক্ত লবণে অখাদ্য করিয়া গৃহস্বামীর পাতে দিয়া যায়,—অনেক সময়ে গৃহিণী উঁকি মারিয়াও রান্নাঘরের ব্যাপার দেখেন না।

এখন অনেক সময়ে গৃহিণী সংসারের পক্ষে শুধু অপ্রয়োজনীয় নহেন, তিনি গৃহস্থের কাঁধের একটা অতিরিক্ত বোঝা—অষ্টপ্রহর তাঁহার পীড়া লাগিয়াই আছে; শিশুসন্তানগুলি ঘর ভর্ত্তি করিয়া গৃহস্থের মাথা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগে বিব্রত করিয়া ফেলিতেছে। ইহা ছাড়া তাঁহার সিনেমা, নাটক, সার্কাস, প্রহসন প্রভৃতি দেখার সখ পুরুষটিকে মিটাইতে হয়। রিক্তহস্ত ভদ্রলোকের সংসার যে কতখানি দুঃসহ হইয়াছে তাহার চিত্র বাঙ্গালার ঘরে ঘরে মর্ম্মন্তুদ রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে।...

তারপর যে-কথা লইয়া সুরু করা গিয়াছিল, শিক্ষিত যুবককে প্রায়ই অশিক্ষিত স্ত্রীকে লইয়া সংসার চালাইতে হয়।—উভয়ে শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে দুই বিভিন্ন মেরুতে দাঁড়াইয়া আছেন।...স্বামী যে-সকল বিষয় চিন্তা করেন স্ত্রী তাহার কোন ধার ধারেন না। যৌন বা দাম্পত্যের যে সুখস্বপ্ন যৌবনের একটা বড় আনন্দ, এইরূপ অসম মিলনে তাহা হইতে তাঁহারা বঞ্চিত হন।...

পূর্ব্বতন সমাজের রীতিনীতি এখন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক। দুঃখের বিষয় প্রাচীন সংস্কারের মৃতদেহটা মেয়েরাই অতিরিক্ত শ্রদ্ধায় আঁকড়াইয়া ধরিয়া রহিয়াছেন।

তথাকথিত হীন জাতির স্পর্শ ইঁহাদের নিকট বিষতুল্য। চণ্ডীদাস বলিয়াছেন—"চলিবার তরে কর উপদেশ পাথর চাপিয়া পিঠে"—আমরাই যাহাদিগকে হীন করিয়া গড়িয়াছি তাহাদের এতটা ঘৃণা করা কি আমাদের সাজে? আপনারা জানেন কি না জানি না, হাড়ি জাতি এককালে বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পুরোহিতের কাজ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের গুরু হাড়ি সিদ্ধার নাম অনেকেই শুনিয়াছেন। দুর্গাপূজার প্রধান পুরোহিত এককালে হাড়িরা ছিলেন, এইজন্য দুর্গা হাড়ির মেয়ে বলিয়া উল্লিখিত। এখনও অনেক কালীমন্দিরের পুরোহিত হাড়ি। মেথর 'মহত্তর' শব্দের অপভ্রংশ;—ইঁহারা বৌদ্ধাধিকারে মহাতান্ত্রিক ছিলেন।...

এই হীন ও অনিষ্টকর জাতিভেদ-প্রথা স্ত্রীলোকেরা যেরূপ উৎকট-ভাবে পালন করিতেছেন তাহাতে হিন্দুসমাজ একেবারে সর্ব্বনাশের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সভাসমিতির সমস্ত প্রস্তাব, সংস্কারকের সমস্ত চেষ্টা উগ্রচণ্ডী পিসী বা বিধবা মাতুলানীর বিক্রমে একেবারে নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে।...

বিবাহের অতিরিক্ত ব্যয় ও পণপ্রথা মেয়েদের প্রশ্রয়ে বাড়িয়া চলিতেছে। স্বামী কন্যাদায়ে ঋণজালে আবদ্ধ, তথাপি সন্তানের বিবাহ উপলক্ষ্যে মেয়েরা তত্ত্ব ও উৎসবাদির জন্য সেই শুষ্কমুখ, নিরাশাগ্রস্ত পুরুষটিকে এরূপ পীড়াপীড়ি করেন, যে, তাঁহাকে আরও ঋণে জড়াইয়া পড়িতে হয়।...

ভদ্রঘরের মেয়েরা পূর্ব্বকালে অর্জ্জন করিতেন; তাঁহারা চরকা কাটিয়া, কাপড়ে ফুল তুলিয়া, কাঁথাদি সীবন করিয়া এবং পৈতা তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করিতেন। বিধবারা নিতান্ত নিরাশ্রয় অবস্থাতেও নিজের পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেন। তাঁহাদের আর একটি প্রধান স্বাবলম্বনের ভিত্তি ছিল কবিরাজী ব্যবসা। বৈদ্যের ঘরের মহিলারা অনেকে নানাপ্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিতেন ও মুষ্টিযোগ জানিতেন; অনেক সময়ে তাঁহাদের খ্যাতি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়িত।...পুরুষ ও স্ত্রীলোক, ইঁহাদের এক শ্রেণী কাজ করিবেন, আর এক শ্রেণী পঙ্গু হইয়া শুইয়া-বসিয়া কবিতা ও গল্পের বই লইয়া সময়াতিপাত করিবেন এবং আলস্য ও কুঅভ্যাসজনিত পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া দিবারাত্র পরিশ্রমে ক্লান্ত স্বামীকে হায়রাণ করিয়া তুলিবেন—এই বিসদৃশ দৃশ্য সেকালে দেখা যাইত না।...

যদি আমাদের মেয়েরা শিক্ষয়িত্রী হইয়া গ্রামের মেয়েদের শিক্ষাদান করেন, যদি ভিষকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ঘরে বসিয়া মুষ্টিযোগ ও ঔষধ বিক্রয় করেন ও নিজগৃহে স্ত্রীরোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করেন, নানারূপ জামা, রুমাল প্রভৃতি তৈয়ারী করিয়া বিক্রয়ার্থ বাজারে পাঠান, যদি তাঁহারা খদ্দর তৈয়ারী করিয়া বিক্রয় করেন, তবে তাঁহাদের আর পুরুষের গলগ্রহ হইতে হয় না।

বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ ১৩৩৭ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

আসামের কুকি জাতি

ভাদ্র মাসের প্রবাসীতে শ্রীলালতুদাই রায় মহাশয় "আসামের কুকিজাতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। প্রবন্ধে খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে- এই সম্বন্ধে আমার দুই একটি বক্তব্য লিখিতেছি।

লালতুদাই রায় মহাশয় 'অবাঙ্গালী' হইলেও লেখক-হিসাবে তিনি অপটু নন, এবং তাঁহার 'অনভ্যস্ত হস্তের' লেখাতেও তাঁহার মনোভাব যথাযথ প্রকাশ পাইয়াছে। রায় মহাশয় খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী কি-না জানি না, তবে তাঁহাকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া মনে হয়— আর তিনি যে নিজে শিক্ষিত এজন্য তিনি নিশ্চয়ই দুঃখিতও নন।

খ্রীষ্টিয়ান মিশনারীগণ যে ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন সেটা বাস্তবিকই প্রেমের ধর্ম্ম। সকলক্ষেত্রে মিশনারীগণ যথার্থ প্রেমিক না হইতে পারেন, কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের অতুলনীয় প্রেমের প্রেরণাতেই তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এখনও করিতেছেন। প্রভু যীশুখ্রীষ্টের প্রেম হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টিয়ান, সভ্য অসভ্য সকল জাতির কাছেই প্রচারিত, প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্টের এই আদেশ "তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার কর।"

রায় মহাশয় কোন্ প্রেমের কথা বলিতেছেন? মিশনারীদের প্রেমে হাবুডুবু খাইবার দরকার নাই।

রায় মহাশয় নিজে বুঝিতে পারিয়াছেন যে, ভূতের পূজা ঠিক নয়। তিনি ভূত, শয়তান এবং মারের যে তুলনা করিয়াছেন সেটা মোটেই ঠিক হয় নাই। ভূতের পূজা হয় ভূতকে শান্ত রাখিবার জন্য, কারণ কুকিদের বিশ্বাস এই, ভূতের দ্বারাই জগতে রোগ, শোক, ঝড়, ভূমিকম্প ইত্যাদি হইয়া থাকে। ব্যাধি এবং নৈসর্গিক বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই ভূতকে মুরগী, মদ ইত্যাদি দিয়া শান্ত রাখিবার চেষ্টা করা হয়।

বৌদ্ধগণ মারের এবং মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানগণ শয়তানের পূজা করেন না, তাহাকে তুষ্ট রাখিতে চেষ্টা করেন না। যে বিরুদ্ধ কামনার বশবর্ত্তী হইয়া আমরা পাপ করি, যে 'বিপক্ষ' আমাদিগকে বিবেকের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে, সেই শয়তানের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই যীশুখ্রীষ্টের স্মরণ লইতে হয়।

"যীশু আমাকে কেমন সুন্দর জুতা দিয়াছেন, টুপি দিয়াছেন, কোট দিয়াছেন, সিগারেট দিয়াছেন" এই কথাগুলি শ্লীলতার সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে—ইহা কটূক্তি। 'সিট্ রিজার্ভ' কথাটাও না লিখিলেই ভাল হইত।

রায় মহাশয় বাঁশের চার্চ্চ ও স্কুলের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি চার্চ্চের উপর বিরূপ হইতে পারেন কিন্তু যে স্কুলে (মিশনারী স্কুল না হইতেও পারে) তিনি শিক্ষিত হইয়া আজ নিজের মনোভাব এই ভাবে প্রকাশ করিতে পারিতেছেন, এবং নিশ্চয়ই একটা আত্মপ্রসাদও লাভ করিতেছেন, সেই স্কুলগুলির দোষ কি? স্কুলগুলিতে হয়ত উপযুক্ত শিক্ষক না থাকিতে পারে, রীতিমত তত্ত্বাবধান না হইতে পারে—ঐগুলির উন্নতির চেষ্টা করিতে হইলে অন্যভাবে করাই প্রীতিকর।

১। মিশনারীগণ হ্যাট, কোট, বুট পরিতেও বলেন না, সিগারেট পান প্রচলনের চেষ্টাও করেন না। শুধু শুধু ঐ সমস্ত অভ্যাস না করিলেই হয়। আমাদের সবই খারাপ আর পাশ্চাত্যের যা-কিছু সবই ভাল একথা এপর্য্যন্ত কোন মিশনারী বলেন নাই, আর আমাদের সবই ভাল পশ্চিমের সবই খারাপ এও হইতে পারে না। খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম উদ্দাম বিলাসিতা শিখায় নাই। পোষাকের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় উহা আমাদের নিজেদের দোষ।

পৃথিবীতে এককালে অর্থের তত প্রয়োজন ছিল না, তখন মানুষ অদলবদল করিয়া সংসার চালাইত। এখন আর সেদিন নাই, মানুষ বাহির হইয়া পড়িয়াছে, দেশ দেশান্তরে যাইতেছে—অর্থের প্রয়োজনও বাড়িয়াছে। নিজেদের অভাব নিজেরাই বাড়াইয়া তুলিতেছি, অন্যকে দোষী করি কেন?

যেরূপ আগুনে হাত দিলে বাঘে খায় না, কিন্তু হাত পোড়ে, তদ্রূপ চুরি করিলে ভূতে রাগ করিবে এ ধারণা না রাখিয়া 'পাপ হইবে এবং ঈশ্বর শাস্তি দিবেন' এই সত্য উপলব্ধি করাই শ্রেয়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের কোথাও এমন শিক্ষা নাই যে, "যিনি খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করেন, তিনি চুরি করুন, নানা অসৎ কাজ করুন, তাহাতে কোন আপত্তি নাই, তার জন্য যে খ্রীষ্টই দায়ী। তিনি ত তাঁর আসন স্বর্গে রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছেন, সুতরাং যাহা প্রাণ চায় কর, কেবল খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করিলেই হইল।"

খ্রীষ্টকে যিনি বিশ্বাস করেন তিনি আর তাঁর ইচ্ছামত কাজ করিতে পারেন না, তিনি ত খ্রীষ্টের। খ্রীষ্টকে ঈশ্বর-প্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া প্রাণপণে তাঁহার আদেশসমূহ পালনের চেষ্টা করা দরকার।

যে খ্রীষ্টকে বিশ্বাস করে সে তাঁহার আদেশ পালনে যত্নবান হয়। কোন মিশনারী কি কুকিদিগকে মিথ্যাকথা বলিতে, অসরল হইতে শিক্ষা দিয়াছেন? আত্মীয় কুটুম্বদিগকে গৃহে স্থান দিতে নিষেধ করিয়াছেন? খ্রীষ্টধর্ম্মের কোথায়ও ত এই প্রকার শিক্ষা নাই।

২। মেষের মাথা কাটিয়া বলদের স্কন্ধে দেওয়ার অর্থ কি?

রায় মহাশয় যদি মনে করেন, কুকি জাতি পূর্ব্বে ধর্ম্মহীন ছিল না, ইহার বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। খ্রীষ্টিয়ানদের ধর্ম্মদানটি বাহ্যিক নয়,—আন্তরিক। বহু পূর্ব্বকাল হইতেই পৃথিবীতে ধর্ম্মপ্রচার-পদ্ধতি বর্ত্তমান আছে।

৩। সাধারণতঃ ইংরেজ পাদ্রীগণ বাংলার চেয়ে তাহাদের দেশীয় ভাষাই বেশী জানেন। যদি তাঁহারা পূর্ব্বে বুঝিতে পারিতেন যে, কুকি জাতি বাংলা ভাষাকে নিজেদের ভাষা বলিয়া স্বীকার করিবে তবে হয়ত তাহারা কুকি জাতির জন্য বাংলা ভাষায় পুস্তক ছাপাইতে চেষ্টা করিতেন। এখন কুকি জাতির মধ্যে যাঁহারা শিক্ষিত

হইয়াছেন তাঁহারা ত চেষ্টা করিলে নিজেদের জন্য একটা ভাষা সৃষ্টি করিতে পারেন, অথবা বাংলা ভাষায় জোর দিতে পারেন।

৪। ঔষধ দেওয়াটা যে কিসে দোষের হইল তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। রোগ বৃদ্ধি এবং সুস্থ সবলকায় লোক কমিয়া যাওয়ার কারণ কি ঔষধ দেওয়া? গাছ-গাছড়া ব্যবহার করাটা অসভ্যতা নয়। টাকা খরচ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ না কিনিলেই হয়। ঔষধ দেওয়ার উদ্দেশ্য বাস্তবিকই দরিদ্র ও অসহায় লোকের সাহায্য করা। "ঔষধ গলাধঃকরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রভু যীশুকে একমাত্র পরিত্রাতা বলিয়া বিশ্বাস করা" কথাটি রায় মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

৫। মদ বন্ধ হইয়াছে ভালই, এখন সিগারেট বন্ধ করিবার চেষ্টা করা দরকার। যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ান নন, কোনদিন মিশনারীদের সংস্পর্শে আসেন নাই এমন লক্ষ লক্ষ লোক আজ সিগারেট, চা ব্যবহার করিতেছেন।

"যীশুর ভাব পাইয়া ছেলেরা পিতামাতার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, পিতামাতা ছেলের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে।" নিউ টেষ্টামেণ্টের এই কথার বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া যদি কোন প্রচারক প্রচার করেন তবে তিনি ভুল করিতেছেন। যতদূর মনে হয় সে ভাবের প্রচার হয় নাই।

ব্যর্থ এবং নিষ্প্রয়োজনীয় অনুকরণ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ময়ূর কখনও কাককে ময়ূর সাজিতে ডাকে না, কাক যদি নিজে ইচ্ছা করিয়া ময়ূর হইতে চায় তবে তাহাতে ময়ূরের দোষ দেওয়া যায় না; কাককেই নির্যাতিত ও হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ সোমদ্দার

নক্ষত্র সমাজ*

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী

শীতের তুষার রাতে আকাশের পশ্চিম কোণার
রঙীন তারাটি মোরে শুধাইল ডাকি,
"ঘুমাইলে নাকি?
কথা যে বলিতে চাই যতটুকু রাত আছে বাকী
মোর সুখ দুখ গাঁথা মনের কথা সে আপনার!
ভোরের নাহিত দেরী, আর কেন ঘুমের প্রয়াস?
মিলিত এখন যদি মদিরা মধুর,
করি ভরপুর
পাত্রখানি তুলিয়া দিতাম হাতে হয়ে যেত দূর,
শ্রান্তি যত, ভুলে যেতে বেদনার শত হা-হুতাশ
তোমারো কি লাগে শীত, হে মঙ্গল, এই পৌষ রাতে?
সংগ্রাম অসুর তুমি, অমঙ্গল সাথী
কেন জাগো রাতি,
কিসের সে বিভীষিকা অনিদ্রায় ম্লান করে ভাতি
মুদিতে পার না আঁখি নিদ্রা লাগি নিশি না পোহাতে?
কৃত্তিকা, ভরণী, পুষ্যা, মঘা আর দীপ্ত মৃগশিরা
অশ্লেষা অশুদ্ধযাত্রা, যমজ অশ্বিনী, অদৃষ্ট কাহিনী
বলাবলি করি কা'র, ভোর কর ত্রিযামা যামিনী?
শুক্লা রাতি ম্লান হেন, আসে যেন অমা সে তিমিরা
পুষ্যা সে মুচকি হেসে বাঁকা চোখে, কয় চুপি চুপি,
শোন নাই বুঝি?
অরুন্ধতী কত ধন করিয়াছে পুঁজি
সপ্তর্ষি সাধিয়া, আর শনৈশ্চর অনিবার যুঝি,
রক্ত নীল বর্ম্মধারী মৃত্যু-সম নিত্য বহুরূপী!
শীতে হিম তারা ভরা এ নিশীথে ও কালপুরুষ
কি শিকার করে?
বৃষ মেষ সিংহ আর প্রহরে প্রহরে,
আকাশ অরণ্য দম্ভে চরণে দলিয়া যারা চরে
শাসন মানে না কারো, নিষ্করুণ একান্ত পরুষ!
কুম্ভ কে ভরিছে রাতে, অন্ধমুনি পুত্র সিন্ধুসম?
শব্দভেদী বাণ
বক্ষে বিদ্ধি হরিয়া যে লইবে পরাণ,
দশরথ ব্যাধসম, অন্ধকারে পাবে না সন্ধান
অকস্মাৎ ঘুচাইবে জীবনের তৃষ্ণা তীক্ষ্ণতম!
নীরবে হাসিছে শুকতারা,
শুচি-শুভ্র ধ্রুব নিরুদ্বেগ,
চারিদিক হতে উঠিছে কত না বাণী দূর স্বর্গপথে,
অবোধ্য নহে সে ভাষা, ভাবের উচ্ছ্বাস মনোরথে,
ধরিত্রী পুত্রেরি মত, ভিন্ন শুধু গতি আর বেগ।

* Robert Greaves-এর ছায়া অবলম্বনে

কিশোরগঞ্জ

শ্রীভূপেন্দ্রচন্দ্র লাহিড়ী

পাবনার পর ঢাকা, ঢাকার পর ময়মনসিংহ। বাংলা দেশের একশ্রেণীর মুসলমানদের তীব্র হিন্দুবিদ্বেষ কিশোরগঞ্জে লুণ্ঠন, পীড়ন, নির্ম্মম অত্যাচার এবং অমানুষিক বর্ব্বরতার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

ময়মনসিংহের মহকুমাগুলির মধ্যে কিশোরগঞ্জ অন্যতম। ইহার লোকসংখ্যা ৮,৬৭,৪২৯, তাহার মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ২৩২,০৭২, মুসলমানের সংখ্যা ৬৩৫,২২১। স্বাস্থ্য সমৃদ্ধিতে কিশোরগঞ্জের গ্রামগুলি বাংলা দেশের মধ্যে অতুলনীয় বলিলেও চলে।

কিশোরগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া মঠখলা পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ মাইল দীর্ঘ একটি রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তাকে কেন্দ্র ধরিয়া উভয় পার্শ্বে প্রায় দশ মাইল ব্যাসার্দ্ধের মধ্যের সমস্ত গ্রাম গত ১০ই জুলাই হইতে ১৬ই জুলাই পর্য্যন্ত মুসলমানদের অত্যাচারের লীলাভূমি হইয়াছিল। এই রাস্তায় অগ্রসর হইলে বাংলা দেশের চিরাভ্যস্ত পল্লীদৃশ্যগুলি চোখে পড়ে। উচ্চ, উর্ব্বর জমি, কোনও কোনও স্থানে রাস্তা এবং দুই পাশের জমির সমতা অভিন্ন। এই জমিতে আট দশ হাত উঁচু পাট এবং সুপুষ্ট আশ জন্মিয়াছে। কিছু দূর দূরই রাস্তার পাশে একটা বৃহৎ বট কি অশ্বত্থ গাছের তলায় ছোট কয়েকখানা কুটীর; এখানে সপ্তাহে এক কি দুই দিন করিয়া হাট বসে। আর একটু ব্যবধানে, হয়ত আট দশ মাইল দূরে দূরে এক একটি করিয়া বড় বাজার। এই সকল বাজারে বড় বড় মহাজনের গদী এবং দোকান-পাট। মহাজনেরা প্রায়ই হিন্দু, পুরুষানুক্রমে সঞ্চয় ও মিতব্যয়িতার ফলে বৃহৎ বৃহৎ ব্যবসা গড়িয়া তুলিয়াছে। তাহারা আশে-পাশের গ্রামের সর্ব্বপ্রকার ব্যবহার্য্য দ্রব্য, দূর দূরান্তরের মোকাম হইতে আনিয়া সরবরাহ করে, আবার গ্রামের কৃষকদের উৎপন্নদ্রব্য বাহিরে চালান দেয়। তাহাদের মধ্য দিয়াই বাংলার অসংখ্য অখ্যাত গ্রামের সঙ্গে কলিকাতা, ডাণ্ডী, লণ্ডন ও সমস্ত বহির্জ্জগতের যোগসূত্র গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সকল বাজারকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে অজস্র ঘনসন্নিবিষ্ট গ্রাম। গ্রামের অধিবাসীরা হিন্দু ও মুসলমান, পুরুষানুক্রমে নানা সুখ দুঃখের মধ্য দিয়া বাস করিয়া আসিতেছে। তাহাদের মধ্যে ভেদ, বিরোধ, ঈর্ষা, কলহ ছিল না, এমন নহে, কিন্তু তাহা ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, সম্প্রদায়ের সহিত সম্প্রদায়ের নহে। সম্প্রদায়ের এই দুই প্রতিবেশীর স্নেহপ্রীতি এবং ব্যবসা বাণিজ্যের অজস্র আদানপ্রদানের অন্তরালে এমন সাম্প্রদায়িক আগ্নেয়গিরি উদ্যত হইয়াছিল, তাহা আগে কে ভাবিয়াছিল?

কি করিয়া হঠাৎ অতর্কিতভাবে এই সাম্প্রদায়িক আগুন জ্বলিয়া উঠিল, তাহার কারণ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ বলেন ইহার কারণ শ্রেণীবিদ্বেষ, কেহ বলেন ইহা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক, কেহ বা বলেন ইহার মূল কৃষকের আর্থিক দুরবস্থায় নিহিত আছে। কারণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এক বিষয়ে সকলেই একমত। এই ব্যাপারের পিছনে অনেক দিনের প্রচার এবং আয়োজন চলিয়াছে এবং তাহার বিষময় ফলের এখনও শেষ হয় নাই; আরম্ভের সূচনা দেখা দিয়াছে মাত্র।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কিশোরগঞ্জ শহরে 'ইয়ং কমরেড লীগ' নামক একটি কম্যুনিষ্ট প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছিল। এই প্রতিষ্ঠানটির প্রচারকেরা ধনী মহাজন ও জমিদারের বিরুদ্ধে প্রকাণ্ড এক প্রচারকার্য্যের সূচনা করিয়াছিল। বর্ত্তমান আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এই লীগের কার্য্যকারিতা খুব বাড়িয়া উঠে। গ্রামে গ্রামে মুসলমান কৃষকদের খুব বড় বড় সভা এই লীগের দ্বারা আহূত হয়। তাহাতে বক্তারা তীব্রভাষায় ধনী, জমিদার ও মহাজনের বিরুদ্ধে শ্রোতৃবর্গকে উত্তেজিত করেন। হিন্দুরা ইহাতে স্বরাজ আন্দোলনের সহায়তা হইতেছে মনে

করিয়া ইহার কোনও প্রতিবাদ করেন নাই। এইরূপে একশ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলমানদের মন উত্তেজিত ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আছে, এমন সময় ঢাকার হাঙ্গামা বাধিয়া উঠিল। ঢাকা হইতে দলে দলে মোল্লাপ্রচারকেরা আসিয়া এই বিদ্বেষাগ্নিতে ইন্ধন যোগাইতে লাগিল। ধনী, মহাজন ও জমিদারের বিরুদ্ধে ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়াই ছিল, ঢাকার মোল্লারা আসিয়া তাহার সঙ্গে হিন্দু কথাটা বসাইয়া দিল। গ্রামে গ্রামে, দিনে এবং রাত্রে, সম্পন্ন মুসলমানদের বাড়ীতে এবং মসজিদে মুসলমানদের গুপ্তসভা হইতে লাগিল। তাহাতে মোল্লারা সাম্প্রদায়িক বিষ উদ্গীরণ করিতে লাগিল। কিরূপে হিন্দু জমিদার, মহাজন ও ধনীদের উচ্ছেদ সাধন করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করা হইল। স্থির হইল জমিদারদের খাজনা বন্ধ করিতে হইবে, আর ধনীর ধন লুঠ করিয়া তাহার ধনাগমের পথ রোধ করিয়া তাহাকে দরিদ্রের সঙ্গে এক করিতে হইবে। তারপর আর এক সমস্যা। মুসলমানকে কি করিয়া ঋণমুক্ত করিয়া হিন্দু মহাজনের কবল হইতে মুক্ত করা যায়। তাহারও সোজা উপায় নির্দ্ধারিত হইল, 'পিকেটিং'; অর্থাৎ খাতকেরা সমবেত হইয়া মহাজনের বাড়ীতে গিয়া খতপত্র ফেরৎ চাহিবে। না দিলে সত্যাগ্রহ করা হইবে, অর্থাৎ কেহ সেখান হইতে নড়িবে না। তবে এ সত্যাগ্রহ অহিংস হইবার দরকার নাই। দরকার হইলে বলপ্রয়োগ করিতে হইবে। এই সকল কাজ দিবাভাগে করিতে হইবে, কারণ লুণ্ঠনাদি রাত্রে করিলেই 'গোনা' হয়, দিনে করিলে পাপ নাই। তাহার পর আসিল, কাফেরের ধন লুণ্ঠন করিলে পাপ নাই। হিন্দুদিগকে লুঠপাট করিয়া উত্যক্ত করিলে হয় তাহারা মুসলমান হইয়া যাইবে, নয় গ্রাম ছাড়িয়া পলাইবে, তাহাতেও দেশে 'সাম্য' স্থাপনের সুবিধা হইবে। এই সঙ্গে প্রচার করা হইল গবর্ণমেণ্ট কোনও নবাবের কাজে খুশী হইয়া তাহাকে তেরদিনের জন্য 'চার জেলার' লাট করিয়া দিয়াছেন। এই তেরদিন হিন্দুর উপর অত্যাচার করিলে কোনও দণ্ড হইবে না। ঢাকা হইতে আগত লোকের মুখে তথাকার বিবরণ শুনিয়া এ বিষয়ে লোকের আর সন্দেহ রহিল না। এইরূপে ধনসাম্যবাদ, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, ধর্ম্মের বিধান, শরিয়তের আদেশের সমন্বয় করিয়া মুসলমানদিগকে হিন্দুর বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তোলা হইল।

আগুন যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন তাহাতে শ্রেণী-বিদ্বেষের নামগন্ধ রহিল না, সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক আকারেই তাহা দেখা দিল। ধনী দরিদ্র, মহাজন খাতকের পার্থক্য রহিল না। ধনী হিন্দুর গৃহও লুণ্ঠিত হইল, দরিদ্র হিন্দুর পর্ণকুটীরও লুণ্ঠিত হইল; ধনী হিন্দুর গৃহ ভস্মীভূত, আসবাবপত্র চূর্ণবিচূর্ণ হইল; দরিদ্র হিন্দুর মৃৎপাত্র ও ছিন্ন কাঁথাটুকুও রেহাই পাইল না। সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত মুসলমানেরা কেহ সম্মুখে আসিয়া, কেহ পশ্চাৎ হইতে মুসলমানদিগকে প্ররোচিত করিতে লাগিল; ধনীদরিদ্র-নির্ব্বিশেষে সমস্ত হিন্দু পর্য্যুদস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল

কিশোরগঞ্জ হইতে প্রায় মাইল-দশেক দূরে চণ্ডীপাশা গ্রামের শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সম্পন্ন গৃহস্থ ও তালুকদার। ১০ই জুলাই সকাল বেলা তিনি সংবাদ পাইলেন যে, স্থানীয় গ্রামস্থ মুসলমানেরা তাঁহার বাড়ী লুঠ করিবার জন্য দলবদ্ধ হইয়াছে। তিনি সংবাদ পাইয়া ভীত হইয়া গ্রাম ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করিলেন। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কয়েকজন মুসলমান মাতব্বর আসিয়া তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিল যে, তাঁহার কোন ভয় নাই। তাঁহার উপর যাহাতে কোনও অত্যাচার না হয় তাহার ব্যবস্থা তাহারা করিবে। সুরেনবাবু নিরস্ত হইলেন, কিন্তু নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। সেদিন শুক্রবার; ক্রমে বেলা বাড়িয়া দ্বিপ্রহর হইল। মুসলমানরা সেদিন দলে দলে স্থানীয় মসজিদে সমবেত হইতে লাগিল। গ্রাম্য মসজিদে এত অধিকসংখ্যক লোক আর কখনও হয় নাই। নমাজ হইয়া যাইবার পর মুসলমানেরা দল বাঁধিয়া সুরেনবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। ইহাদের মধ্যে অনেকেই সুরেনবাবুর প্রজা ও খাতক। সুরেনবাবু নির্ব্বিবাদে দলিলপত্র দিয়া দিলেন। সেখান হইতে তাহারা ঈশ্বরচন্দ্র শীলের বাড়ী গিয়া জোর করিয়া সমস্ত দলিলপত্র আদায় করিয়া লইল। ক্রমে সমস্ত হিন্দু মহাজনের বাড়ী গিয়া কোথাও জোর

করিয়া, কোথাও বা ভয় দেখাইয়া দলিলপত্র বাহির করিয়া লইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে লুটতরাজ চলিতে লাগিল।

এইরূপে সেদিন কাটিয়া গেল। সে রাত্রে আর সে-অঞ্চলের কাহারও চোখে ঘুম রহিল না। হিন্দুরা ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া জাগিয়া কাটাইল। মুসলমানরা গ্রামে গ্রামে দলে দলে একত্র হইয়া পর দিনের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। রাত্রি শেষ হইতেই তাহাদের ঘন ঘন 'আল্লা হো আকবর' এবং কয়েকজন নামজাদা মুসলমানের জয়ধ্বনিতে গ্রামের আকাশ মুখরিত হইয়া উঠিল। আগের দিনের সাফল্যে তাহাদের উৎসাহ এবং নিষ্ঠুরতা বাড়িয়া গিয়াছে। সকাল হইতেই তাহারা দলে দলে হিন্দুদের বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। আজ তাহাদের মূর্ত্তি বদলাইয়া গিয়াছে। তাহাদের হাতে লাঠি, সড়কি, দা প্রভৃতি সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র, চোখে হিংস্র দৃষ্টি। ভোর হইতেই গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। হিন্দুরা কেহ সপরিবারে গৃহত্যাগ করিয়া বাড়ীর পার্শ্বে জঙ্গলে পলায়ন করিল, অতি অল্পসংখ্যক লোক কোনও কোনও মুসলমানের বাড়ী আশ্রয় লইল। ১১ই জুলাই বেলা ৭টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, প্রায় ১০০ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ১৮ খানি গ্রাম লুণ্ঠিত হইল।

১২ই জুলাইও আক্রমণ বাড়িয়া চলিল। যে-সকল গ্রাম লুণ্ঠিত হয় নাই তাহা লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। লুণ্ঠিত গ্রামে যে-সকল বাড়ী বাদ পড়িয়াছিল তাহা লুণ্ঠিত হইল। যে-সকল বাড়ী একবার লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহা আর একদল আসিয়া আবার লুণ্ঠন করিল। যেখানে কোনও লুণ্ঠনোপযোগী জিনিষপত্র আর অবশিষ্ট ছিল না, সেখানে গৃহের আসবাবপত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে লাগিল, কোথাও গৃহে আগুন ধরাইয়া দিল। এইরূপে তিন দিন ধরিয়া প্রায় ষাট খানি গ্রামের উপর প্রায় পাঁচশত বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া মুসলমান দুর্ব্বৃত্তদের তাণ্ডবলীলা চলিল; কেহ রোধ করিল না, কেহ বাধা দিল না; কেহ একটি অঙ্গুলি উত্তোলনও করিল না,—না গবর্ণমেণ্ট, না হিন্দুর সঙ্ঘবদ্ধশক্তি, না মুসলমানের লুপ্তাবশেষ ধর্ম্মবুদ্ধি।

এই বিয়োগান্ত নাটকের সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে জাঙ্গালিয়া গ্রামে। এই গ্রাম কিশোরগঞ্জ হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় এখানকার অবস্থাপন্ন তালুকদার ছিলেন। কৃষ্ণবাবু তাঁহার চরিত্রবল ও দৃঢ়চিত্ততায় স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তিনি স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন এবং প্রেসিডেণ্ট হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। ১০ই জুলাই রাত্রেই কৃষ্ণবাবু চণ্ডীপাশার সংবাদ এবং তৎসঙ্গে পরদিন তাঁহাদের গ্রাম লুণ্ঠিত হইবার সম্ভাবনার কথা অবগত হইয়াছিলেন। পরিবারবর্গকে কিশোরগঞ্জ পাঠাইবার জন্য শেষরাত্রে হোসেনপুর হইতে একখানা মোটর আনাইয়াছিলেন। কিন্তু মোটরখানা আসিবার পর তাহার ইঞ্জিন খারাপ হইয়া যাওয়ায় মোটরখানা অচল হইয়া পড়িল।

পরদিন বেলা সাতটার সময় দলে দলে মুসলমান আসিয়া কৃষ্ণবাবুর বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিল। কৃষ্ণবাবুর বৃহৎ বাড়ীতে গ্রামের আরও বহু বাড়ীর স্ত্রীপুরুষ আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল। বাড়ীতে দুইটি বন্দুক ছিল। কৃষ্ণবাবু একটি বন্দুক নিজে লইলেন, আর একটি তাঁহার অষ্টাদশবর্ষীয় একমাত্র পুত্র সুবোধ লইল। ইত্যবসরে জনতা আসিয়া বাড়ীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল।

কৃষ্ণবাবুর ইউনিয়ন বোর্ডে একজন মুসলমান কর্ম্মচারী ছিল। কৃষ্ণবাবু তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। তিনি তাহার বহু উপকার করিয়াছিলেন এবং তিনিই তাহার চাকরি করিয়া দেন। বাড়ীতে বন্দুক থাকিলেও কার্টিজ ছিল মাত্র কুড়ি একুশটি। তাহার মধ্যে আবার বেশীর ভাগই ছর্‌রা, বুলেট খুব কমই ছিল। সেজন্য কৃষ্ণবাবু কি উপায়ে জনতাকে শান্ত করা যায় তাহা জানিবার জন্য তাহাকে পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সে ত আর ফিরিলই না, তাঁহার হাতে যে গুলিবারুদ বেশী নাই এই সংবাদটি জনতার কাছে গিয়া পৌঁছিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই জনতা তাঁহার বাড়ীতে ঢুকিয়া আক্রমণ করিল। কৃষ্ণবাবু ও সুবোধ প্রথমে কয়েকটি
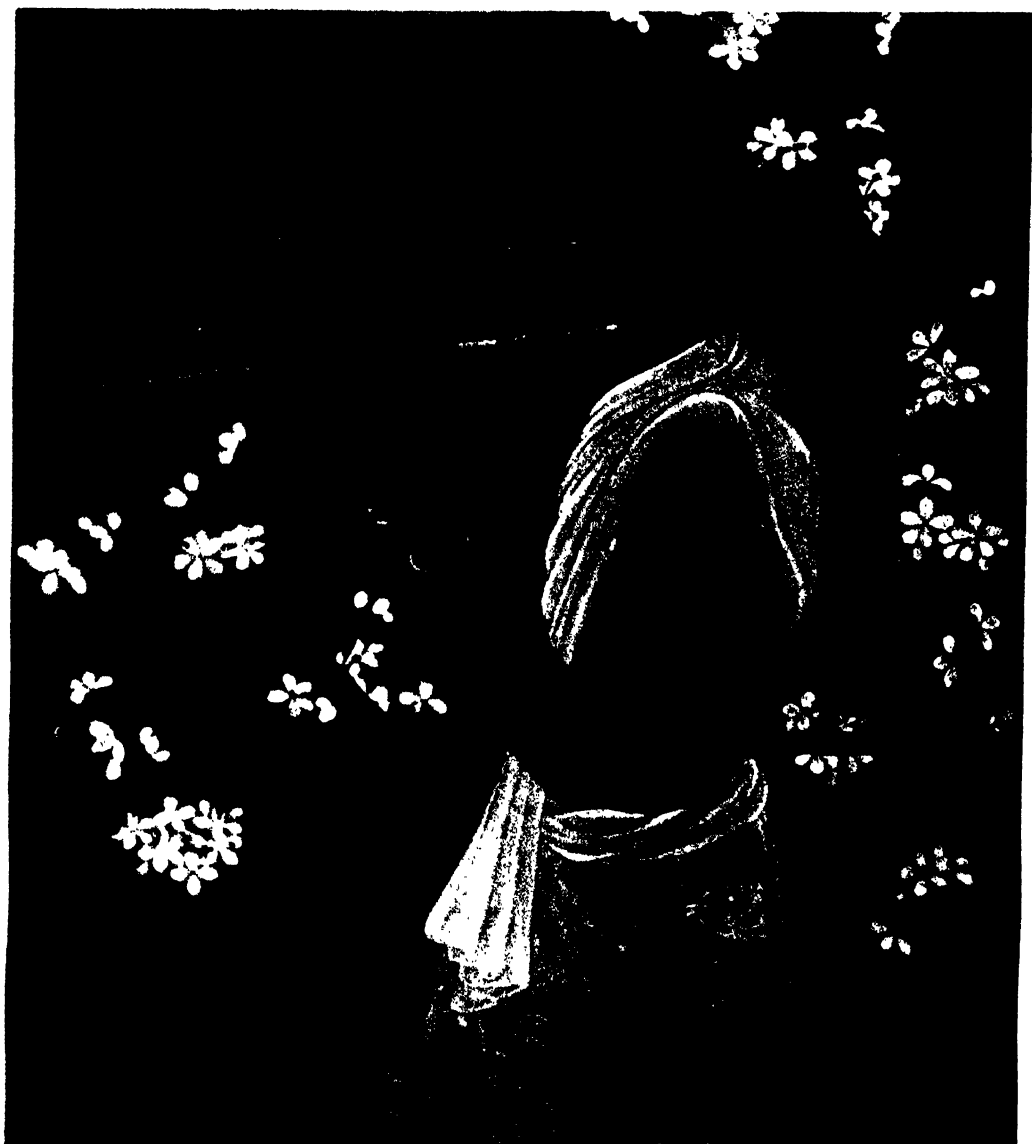
ফাঁকা আওয়াজ করিয়া পরে গুলি ছাড়িতে লাগিলেন। কয়েকজন মুসলমান হতাহত হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তখন পিছু হটিয়া বাড়ীর পার্শ্বস্থ মাঠে সমবেত হইল। একটি মোল্লা সেখানে উপস্থিত ছিল। সে জনতাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। এবার যদি তোরা কৃষ্ণবাবুকে জীবিত রাখিয়া যাস, তবে আর ভবিষ্যতে এ গ্রামে টিকিতে পারিবি না; তোদের মধ্যে যে পলাইবে সে মুসলমান নয়, সে শূওরের 'লৌ' (রক্ত) খায়। অশিক্ষিত জনতা ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। তাহারা আবার দলে দলে বাড়ীতে ঢুকিতে লাগিল। আবার গুলি চলিতে লাগিল। কয়েকজন মুসলমান আবার হতাহত হইল।

ক্রমে কৃষ্ণবাবুর গুলি কয়টি ফুরাইয়া গেল। একথা বুঝিতে জনতার বেশী দেরি লাগিল না। কিন্তু তাহারা হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে না ঢুকিয়া খড়ের গাদা হইতে খড় লইয়া একখানির পর আর একখানি ঘরে আগুন ধরাইয়া দিতে লাগিল। যে ঘরখানির মধ্যে কৃষ্ণবাবু সপরিবারে এবং গ্রামের অন্যান্য বহু স্ত্রীপুরুষ আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহার চারিদিকে আগুন ধরিয়া উঠিল। তখন ঘরের মধ্যেকার লোকেরা নিরুপায় হইয়া ঘরের দরজা খুলিয়া বাহির হইতে লাগিল। এইবার বর্ব্বরেরা তাহাদের পাশবিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইল। কৃষ্ণবাবুর পরিবারের এক একজন লোক বাহির হইতে লাগিলেন আর মুসলমানেরা পৈশাচিক উল্লাসে চীৎকার করিতে করিতে তাঁহাকে শত শত লাঠির আঘাতে হত্যা করিয়া, কুঠারে তাহাদের দেহ ছিন্নভিন্ন করিয়া মৃতদেহগুলি ইতস্ততঃ ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিল। একে একে কৃষ্ণবাবু, তাঁহার একমাত্র ছেলে সুবোধ, তাঁহার ভ্রাতা ও দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার শ্বশুর এবং বাড়ীর অন্যান্য কয়েকজন, সর্ব্বশুদ্ধ নয়জন নিহত হইলেন।

ঘটনার কয়েকদিন পরে আমরা কৃষ্ণবাবুর বাড়ী দেখিতে গিয়াছিলাম। সুবৃহৎ আঙ্গিনার মধ্যে বড় বড় পনেরখানা পাকা ভিটা পড়িয়া আছে। দগ্ধ টিনগুলি আশে-পাশে ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কয়েকদিন আগে যে এখানে এক জনমুখরিত সুবৃহৎ পরিবারের আবাসস্থল ছিল, আজ তাহার চিহ্নমাত্র নাই। সমস্ত গৃহের সমস্ত জিনিষপত্র নিঃশেষে লুণ্ঠিত এবং ভস্মীভূত হইয়াছে। শুধু একখানা ঘরের মধ্যে অর্দ্ধদগ্ধ একখানা খাট পড়িয়া আছে। কৃষ্ণবাবু গত মাঘ মাসে তাঁহার ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন, উহা তাহারই যৌতুকের খাট। কোন্ অভাগিনী বালিকার বাসরশয্যার এই চরম চিহ্নটুকু তাহার পরম দুর্ভাগ্যের সাক্ষীস্বরূপে বিরাজ করিতেছে। আর আছে কয়েকটি গরু, আগন্তুক পুলিশকর্ম্মচারী ও রিলিফকর্ম্মীদের মুখের দিকে করুণ নেত্রে চাহিয়া থাকে, যেন জিজ্ঞাসা করে এখানে যাহারা ছিল, তাহারা কোথায় গেল? আর একটি প্রভুভক্ত মুসলমান চাকর সেই শ্মশানক্ষেত্রে প্রেতের ন্যায় বিচরণ করে।

এই লুণ্ঠন, পীড়ন, নৃশংস অত্যাচারের অন্তরালে কত যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছে তাহার ইয়ত্তা

পরলোকগত কৃষ্ণচন্দ্র রায়, তাঁহার পত্নী ও জ্যেষ্ঠ পুত্র সুবোধ

নাই। যখন দুর্ব্বৃত্তেরা কৃষ্ণবাবুকে পৈশাচিক উল্লাসে লাঠি মারিতেছিল, তখন তাঁহার সাধ্বী পত্নী তাঁহার

হতজ্ঞান মৃতপ্রায় দেহের উপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া স্বামীকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন, 'ওরে, তোরা আমাকে মারিয়া ওঁর জীবন ভিক্ষা দে।' পশুরা তাহা গ্রাহ্য না করিয়া লাঠি ও দা চালাইতে লাগিল। সাংঘাতিক আহত হইয়াও যখন তিনি স্বামীকে ছাড়িলেন না। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা জোর করিয়া কৃষ্ণবাবুর দেহ হইতে তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছিল।

কৃষ্ণবাবুর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ

কৃষ্ণবাবুরা ঘরে থাকিতেই, তাঁহার এক আত্মীয় মুসলমানদের বন্দুকের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। যখন চারিদিক হইতে আগুন ধরিয়া উঠিল, তখন আর উপায় নাই দেখিয়া গৃহের সকলে দরজা খুলিয়া একে একে বাহির হইতে লাগিলেন। আহত ব্যক্তি তখন চলচ্ছক্তিবিহীন। কৃষ্ণবাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শৈলেশ এই আহত ব্যক্তিকে কাঁধে লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। চারিদিক হইতে তাহার উপর অজস্র লাঠি পড়িতে লাগিল। তবুও সে বিচলিত হইল না, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই শত শত লোক আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। গুরুতর আহত হইয়া সে পড়িয়া গেল। তখন দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাকে হত্যা করিয়া, তাহার দেহ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার আহত হতজ্ঞান আত্মীয়কে মৃত মনে করিয়া চলিয়া গেল।

এক গ্রামে এক নারী প্রসব-বেদনায় কাতর, এমন সময় দুর্ব্বৃত্তেরা বাড়ী আক্রমণ করিল। বাড়ীর সমস্ত গৃহ লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত করিয়া তাহারা যখন সূতিকাঘরে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল তখন তাহাদিগকে সেই নারীর অবস্থার কথা বলা হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাহাতেও নিবৃত্ত না হইয়া সেই গৃহে ঢুকিয়া পড়িল। তখন সেই গৃহের একটি নারী সেই ক্ষিপ্ত জনতার সম্মুখীন হইয়া বলিলেন, 'ওরে তোরা একি কচ্ছিস্, তোরা কি কেউ মায়ের পেটে জন্মাস্ নাই,' জনতার লুপ্ত মনুষ্যত্বের খানিকটা বুঝি ফিরিয়া আসিল। সেদিন আর তাহারা সেখানে লুঠ করিল না।

এই নিদারুণ মর্ম্মান্তিক বিয়োগান্ত নাটকের মাঝে মাঝেও হাস্যরসের ক্ষীণ রেখাপাত হইয়াছে। চার জিলার নব নিযুক্ত লাটের অনেক আমীর-ওমরাও দরকার হইবে ইহা অশিক্ষিত জনতার অবিদিত ছিল না। তাহারা সেজন্য নিজেদের মধ্যে কে আমীর-ওমরাও হইবে তাহা আগে হইতেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। এক গ্রামের একটি যাত্রাদলের পোষাকগুলি লুণ্ঠিত হয়। জনতার নেতারা এই-সকল পোষাক, তাজ উষ্ণীষ পরিয়া লুণ্ঠনকারীদিগকে চালিত করিতেছিল এইরূপ পোষাক পরিহিত কয়েকজন আমীর ওমরাহ ও সেনাপতি পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে।

এক গ্রামের একজন ধনী জমিদারের চাকরের তাহার প্রভুর স্থান অধিকার করিবার আকাঙ্ক্ষা হয়। ঘটনার পূর্ব্বদিন সে যথারীতি ধান মাড়াইয়া এবং গোয়ালঘরে গরু তুলিয়া চলিয়া গিয়াছে। পরদিন সকালবেলায় সে জনতার সঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল। জমিদারের বৈঠকখানায় তাঁহার বসিবার চেয়ারে বসিয়া

প্রভুকে ডাকিয়া পাঠাইল। প্রভু আসিতেই তাহার উপর হুকুম হইল যে, তাঁহাকে এখনই দলিলপত্রগুলি বাহির করিয়া দিয়া 'মা-ঠাকরুণদের' লইয়া বাড়ী ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কারণ বাড়ী লুঠ করিবার হুকুম হইয়াছে। এইরূপে আবুহোসেনের মত তিন দিন প্রভুগৃহে রাজত্ব করিয়া সে ফেরার হইয়াছে।

এই ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি কত হইয়াছে তাহা এখনও নিরূপণ করা কঠিন। সম্ভবতঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকার কম হইবে না। কিন্তু এই ঘটনায় সবচেয়ে যে ক্ষতিটি বেশী হইয়াছে তাহা আর্থিক নয়,—নৈতিক। এই চারদিনের ঘটনাবলী হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার আদান-প্রদান ও সম্পর্কের ভিত্তি নাড়াইয়া দিয়া গিয়াছে। জমিদার ও প্রজা, মহাজন ও খাতক, উপকারী ও উপকৃত সর্ব্বপ্রকার সম্বন্ধের বন্ধন শিথিল এবং স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। কারণ যে-রোগীকে চিকিৎসক হয়ত বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিয়া বাচাইয়া তুলিয়াছেন, আজ সে লাঠি লইয়া আসিয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিয়াছে, তাঁহার ঔষধপত্র যন্ত্রপাতি চুরমার করিয়াছে। কাল যে খাতক মহাজনের দ্বারে ধর্ণা দিয়া টাকা কর্জ্জ লইয়া গিয়াছে, আজ সে আসিয়া মহাজনের মাথার উপর দা উঠাইয়াছে। কাল যে ভৃত্য ছিল, যে হয়ত পুরুষানুক্রমে এই বাড়ীর অন্নে, অর্থে প্রতিপালিত হইয়াছে, পুষ্ট হইয়াছে, আজ সে আসিয়া প্রভুর মাথায় লাঠি উদ্যত করিল। কাল যে বিশ্বাসভাজন প্রতিবেশী ছিল, যাহার সঙ্গে দাদা, মামা, ভাই প্রভৃতি অজস্র স্নেহসম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল, যে চিরকাল আপদে-বিপদে উৎসবে-বাসনে পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, আজ সে যখন বাড়ী লুঠ করিতে আসিল, কোনও প্রকার নৃশংস অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হইল না, তখন বহুদিনের গঠিত সৌধ যেন ভূমিকম্পের এক আঘাতে হঠাৎ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অপ্রশস্ত স্থানের যাহারা শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও চিন্তাশীল হিন্দু আছেন, সর্ব্বপ্রকার ক্ষতির চেয়ে এই আঘাতই তাঁহাদের বেশী বাজিয়াছে। কোনও গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত কংগ্রেসকর্ম্মীকে গ্রামের অন্যান্য সকলে এই ব্যাপারে কয়েকদিন পূর্ব্বে সাবধান হইতে বলেন। তিনি কংগ্রেসকর্ম্মী, প্যাক্ট-পন্থী, হিন্দু মুসলমানের মিলনের জন্য হিন্দুর ত্যাগ স্বীকার নীতিতে বিশ্বাসবান। আজ যখন এই স্বরাজ-সংগ্রামের দিনে দেশের দিক হইতে মিলনের ডাক আসিতেছে, তখন এমন কিছু হইতে পারে তাহা তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তারপর সত্যসত্যই যখন একদিন সকালে লুণ্ঠনকারীরা তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল, তাঁহার চোখের সামনে তাঁহার বাড়ীঘর লুঠ করিয়া বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিল, তখন তিনি অসহ বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন। তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। কিন্তু আর্থিক ক্ষতি তাঁহার বুকে তেমন করিয়া বাজে নাই, যেমন বাজিয়াছে এই বিশ্বাসভঙ্গের আঘাত। এ যেন, যখন দুই ভাই এক অন্যের উপর পরম নির্ভরতার সহিত, এক বিপদসঙ্কুল পথে পাশাপাশি চলিতেছে, তখন একে অন্যের বুকে ছুরি বসাইয়া দিল। তাঁহার সুদীর্ঘ সাধনা, আজীবনের বিশ্বাস একমুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে।

কিশোরগঞ্জের সমস্যা স্থানীয় সমস্যা নহে। তাহা সমগ্র বাংলার এবং কোনও কোনও বিষয়ে সমগ্র ভারতবর্ষের সমস্যা। যদি কোন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক, সময়ে সময়ে, হয়ত কোনও কারণে, হয়ত বা অকারণে (যেমন কিশোরগঞ্জে হইয়াছে) এমন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিতে পারে যে, তাহাদের মধ্যে দয়া, মায়া, স্নেহ, শিশুর প্রতি করুণা, নারীর প্রতি মর্য্যাদাবোধ, একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়; যে সকল নীতি এবং আইনের বন্ধন সভ্য জগতে বহুদিন ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং যাহার ফলে বহু মানুষের একত্র বাস করা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদি ভগ্ন হইয়া যায়,—তবে এই সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অত্যন্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ আর এক সম্প্রদায়ের বাস করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহাই কিশোরগঞ্জের সমস্যা। এই সমস্যার আজ মাত্র উদ্ভব হইয়াছে, কবে ইহার শেষ বা সমাধান হইবে তাহা বলা যায় না, কিন্তু প্রত্যেক হিন্দুর এই সমস্যার কথা ধীর এবং গভীরভাবে চিন্তা করিবার সময় আসিয়াছে এবং প্রত্যেক মুসলমানেরও।

অভিধান

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, সি-আই-ই

অভিধান বলিতে গেলে সংস্কৃতে তিনটি জিনিষ বুঝায়,—(১) পর্য্যায়, (২) নানার্থ, (৩) লিঙ্গ। একটি জিনিষের যতগুলি নাম থাকে সেগুলি একত্র করিলে পর্য্যায় হয়। একশব্দের নানারূপ অর্থ থাকিলে তাহার নাম নানার্থ হয়। সংস্কৃত সকল শব্দেরই একটা লিঙ্গ আছে, সেগুলি নির্ণয় করা বড় কঠিন। অভিধানের যে ভাগে শব্দের লিঙ্গ নির্ণয় করা থাকে তাহার নাম লিঙ্গ। (১) পর্য্যায়ের সকলের চেয়ে পুরাণ পুঁথির নাম নিঘণ্টু। ইহা বেদের অঙ্গ, মুখস্থ করিয়া রাখিতে হয় বলিয়া ইহারও নাম আম্নায় বা সমাম্নায়। বেদের পর ব্যাড়ির 'সংগ্রহে' বোধ হয় অনেক পর্য্যায়ের কথা ছিল। (২) নানার্থের অনেক প্রাচীন পুঁথি আছে, তাহার মধ্যে 'নানার্থ-শব্দরত্ন' নামে কালিদাসের এক পুঁথি আছে। (৩) লিঙ্গের পুঁথির আদি আচার্য্য বররুচি, কারণ এ-সম্বন্ধে সকল লোকই ববরুচির দোহাই দেয় এবং তাঁহার নামেও পুঁথি চলে।

সংস্কৃত অভিধানের মধ্যে অমরকোষের খুব খাতির, কারণ উহাতে তিনই আছে। অল্পেই মুখস্থ করা চলে, আর মুখস্থ করিলে শব্দশাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায়। অনেক জায়গায় ব্রাহ্মণের ছেলেরা এখনও সাত আট বৎসর বয়সেই অমরকোষ মুখস্থ করিয়া ফেলে। অমরকোষ মুখস্থ না থাকিলে পণ্ডিতের ভিতর গণ্যই হয় না। সংস্কৃতে আরও অনেক অভিধান আছে। সংস্কৃত সব অভিধান একত্র করিলে ঘর ভরিয়া যায়। কিন্তু অমর-কোষের আদর সকলের চেয়ে বেশী, উহার চল্লিশখানির অধিক টীকা আছে ও পরিশিষ্ট আছে। বাঙ্গালায় উহার দুইখানি টীকা খুব ভাল—একখানি সর্ব্বানন্দ বাঁড়ুয্যের, লেখা ১১৫৯ খৃষ্টাব্দে, উহার নাম 'টীকাসর্ব্বস্ব'। দশখানি টীকা দেখিয়া এই নূতন টীকাখানি লেখা। এই টীকায় প্রায় ২০০ শত সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রতিবাক্য দেওয়া আছে। আর একখানি টীকার নাম 'পদচন্দ্রিকা'। টীকাকারের নাম বৃহস্পতি মাহিন্তা বা মতিলাল। ইনি গৌড়ের হিন্দু সুলতানের নিকট 'রায়মুকুট' উপাধি পান। টীকাখানি ১৪৩১ খৃষ্টাব্দে লেখা হয়। অমরকোষের একখানি পরিশিষ্ট আছে, উহার নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ'। অমরকোষে পর্য্যায়, নানার্থ ও লিঙ্গ নামে তিনটি কাণ্ড আছে, সেজন্য উহার আর এক নাম 'ত্রিকাণ্ড'। সুতরাং অমরকোষের পরিশিষ্টের নাম 'ত্রিকাণ্ডশেষ' হইয়াছে। পরিশিষ্টকার একজন বৌদ্ধ পণ্ডিত—তিনি কত পুরাণ বলা যায় না, তবে সর্ব্বানন্দ ১১৫৯ সালে তাঁহার বই হইতে অনেক জিনিস লইয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বানন্দেরও আগেকার লোক, তাঁহার নাম পুরুষোত্তম দেব। অমরকোষ যেখানে এক পর্য্যায়ে সতেরটি শব্দ লিখিয়াছেন ইনি সেখানে সাঁইত্রিশটিও করিয়াছেন, সুতরাং তিনি অমরকোষের অনেক পরের লোক এবং অমরকোষের পর যত শব্দ চলিত হইয়াছিল তাহাদের একটা "চলন্তিকা" লিখিয়াছেন। ইনি একজন বড় শাব্দিক পণ্ডিত ছিলেন। ইনি পাণিনির বৈদিকসূত্র ছাড়িয়া দিয়া ভাষাসূত্রগুলির বৌদ্ধমতে এক বৃত্তি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম 'ভাষাবৃত্তি'। সম্প্রতি নেপাল হইতে পুঁথি আসিয়াছে। তিনি অনেকগুলি প্রাকৃতভাষার একখানি ব্যাকরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ইনি আরও একখানি ছোট অভিধান লিখিয়া গিয়াছেন, সেখানির নাম "হারাবলি"। এই ছোট অভিধান লিখিবার জন্য তিনি ১২ বৎসর খাটিয়াছেন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের বাড়ী তিনি এইজন্য পড়িয়া থাকিতেন। বইখানি খুব সুন্দর হইয়াছে। যে-সকল শব্দ চলতি ছিল, অথচ উঠিয়া যাইতেছে তাহারই অর্থ করা এই অভিধানের উদ্দেশ্য, সুতরাং এখানিকে আমরা 'অচলন্তিকা' বলিতে পারি। কিন্তু পুরুষোত্তম আর একটি কাজ করিয়া গিয়াছেন, ভিন্ন ভিন্ন দেশে পড়িয়া সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ ভেদ হইয়া গিয়াছিল—অনেকে উচ্চারণ ধরিয়া বানান করিত, আবার অনেকে পুরাণ সংস্কৃতের বানান ধরিয়া বানান করিত—অনেক গোলমাল হইত। সংস্কৃত শব্দ সংবৎ—ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলে কিন্তু সম্বৎ বলিত, আবার অক্ষরভেদেও অনেক গোলমাল হইত—সেকালে বাঙ্গলায় খ, ক্ষ, ও ষ একই রকমে লেখা হইত—কোথাও ষ-কে খ লিখিত, কোথাও য-কে ক্ষ লিখিত, আবার খ-কে ষ লিখিত বা ক্ষ লিখিত, সুতরাং গোলযোগ বাড়িয়া যাইত। এই সকল গোলযোগের জন্য তিনি "বর্ণযোজনা" বলিয়া একখানি বানানের বই লেখেন। উহারই অংশ হয় ব-কারভেদ, য-কারভেদ, স-কারভেদ ও ন-কারভেদ। তিনি যে-শব্দে যে ব-কার, যে য-কার যে স-কার ও যে ন-কার লিখিতে হইবে তাহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিয়া যান—পণ্ডিতেরা

তাঁহার কথা মানিয়া চলেন, অপণ্ডিতেরা মানেন না, তাই দু'রকম বানান আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। অপণ্ডিতের বানানই বেশী পরিমাণে চলন্তিকা হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তিনি বলেন রাজার হুকুম যেমন দ্বিধা না করিয়া মানিয়া যাইতে হয় বর্ণযোজনার হুকুমও তেমনি মানিতে হইবে। কিন্তু রাজার হুকুম রাজভক্তরাই মানিয়া চলে, অভক্তেরা মানে না, তেমনি পণ্ডিতেরা পুরুষোত্তমের হুকুম মানিয়া চলেন, অপণ্ডিতেরা মানেন না। রাজশেখরবাবুর "চলন্তিকায়" বানান লইয়া যতগুলি গোলযোগের কথা আছে প্রায় ১০০০ বৎসর আগে সেই সকল কথারই আলোচনা পুরুষোত্তম করিয়া গিয়াছেন। তবে এখন গোলযোগটাই কিছু বেশী হইয়াছে, কারণ বাঙ্গলায় এমন কি সংস্কৃতেও আরবী, পারসী, ইংরেজি, পোর্ত্তুগীজ প্রভৃতি অনেক শব্দ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাদের ব-কারভেদ, য কারভেদ, স-কারভেদ ও ন-কারভেদ লইয়া অনেক বেশী গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে।

সংস্কৃত অভিধান বলিলেই বুঝিতে হইত যে, অভিধানখানি মুখস্থ করিতে হইবে, কিন্তু ইউরোপে এখন আর অভিধান মুখস্থ করিতে হয় না। শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে, অভিধান খুলিয়া অনায়াসেই শব্দ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, মুখস্থ করার পরিশ্রমটা একেবারেই না করিলেও চলে। ইংরাজেরা বাঙ্গলায় আসার পর হইতেই এইরূপ বর্ণমালানুক্রমে অভিধান লিখিবার চেষ্টা হয়। কোলব্রুক সাহেব একবার অমরকোষ ছাপান এবং তাহার শেষে বর্ণমালা অনুসারে এক পরিশিষ্ট দেন তাহাতে অমরকোষের সব শব্দ থাকে। এদেশীয় অভিধানে সেই বোধ হয় বর্ণমালানুক্রমের প্রথম ব্যবহার। তাহার পর লীডন সাহেব এক বাঙ্গলার অভিধান লেখেন—তাহাতে বাঙ্গলা শব্দগুলি বর্ণমালা অনুসারে সাজান থাকে। লীডন সাহেব বোধ হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র, পণ্ডিত মহাশয়দের নিকটে বাঙ্গালা শেখেন তাই তাঁর বাঙ্গালা ভাষাটা পণ্ডিতী ভাষা—সংস্কৃত শব্দেরই অভিধান, কারণ পণ্ডিত মহাশয়রা মনে করিতেন চলতি ভাষার আবার একটা অভিধান কি? চলন্তিকা ত সবাই জানে, তার জন্য আবার চলন্তিকার অভিধান কেন? কিন্তু সে সময়কার কলিকাতার ইংরাজি জানা প্রধান পণ্ডিত ৺রামকমল সেন মহাশয়, পণ্ডিত মহাশয়দের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তিনি চলন্তিকা, অচলন্তিকা দুই লইয়া এক প্রকাণ্ড অভিধান লেখেন, কিন্তু এই দু'খানি অভিধানই আর পাওয়া যায় না, দুইখানিই ১০০ বৎসর পূর্ব্বের লেখা, দুইখানিতেই যথেষ্ট গুণপণা ছিল।

তাহার পর বাঙ্গালায় অনেক অভিধান হইয়াছে। কতকগুলি সংস্কৃত অভিধান বাঙ্গলা অক্ষরে ছাপা হইয়াছে, যেমন গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়ের "শব্দসার"। অভিধানখানি বেশ ছোটখাটো, সর্ব্বদাই ব্যবহার করা চলে, কিন্তু শব্দগুলি সব সংস্কৃত—সংস্কৃত ছাত্রদের জন্যই লেখা। স্কুলবুক সোসাইটি একখানি ছোটখাটো বাঙ্গালা অভিধান লেখাইয়াছিলেন—সেখানি খুব কাজের বই হইয়াছিল, কিন্তু এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। বটতলা হইতে "শব্দার্থ-প্রকাশিকা" নামে একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল, সেখানি আমরা ছেলেবেলায় খুব ব্যবহার করিয়াছি এখন আর দেখিতে পাই না। বটতলা হইতে আরও দু-একখানি অভিধান বাহির হইয়াছিল তাহাও অচলন্তিকা হইয়া গিয়াছে। ৺ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় একখানি অভিধান লিখিয়াছিলেন—'প' অক্ষর পর্য্যন্ত ছাপা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর তিনি অভিধান লেখা ছাড়িয়াই দিলেন।

এখন অনেকগুলি অভিধান বাঙ্গালায় চলিত আছে, যথা রামকমল বিদ্যালঙ্কারের প্রকৃতিবাদ অভিধান, সুবলচন্দ্র মিত্রের সরল বাঙ্গালা অভিধান, যোগেশচন্দ্র রায়ের বাঙ্গালা শব্দকোষ, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের বাঙ্গালা ভাষার অভিধান। প্রথম দুইখানি প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দের অভিধান, তৃতীয়টি কেবল বাঙ্গালা শব্দের, চতুর্থটিতে সংস্কৃত অসংস্কৃত দুই রকম শব্দই আছে। এই অভিধানগুলি বেশ একটু বড়, সর্ব্বদা ব্যবহারের উপযুক্ত নয়। সুবলচন্দ্রের ছোট একখানি অভিধান আছে বটে, কিন্তু তাহাতে অসংস্কৃত শব্দ নাই বলিলেই হয়। তাই একখানি ছোটখাটো প্রকৃত বাঙ্গালা অভিধানের বড়ই দরকার ছিল। শ্রীযুক্ত বাবু রাজশেখর বসু 'চলন্তিকা' লিখিয়া সে অভাব পূরণ করিয়াছেন। তাঁহার চলন্তিকায় লেখা আছে ২৬,০০০ কথার অভিধান—প্রথম আমার বিশ্বাস হয় নাই, তাহার পর দেখিলাম বইখানির অভিধান অংশে ৫৬০টি পাতা, প্রতি পাতায় দুইটি করিয়া কলম, দুই কলমে গড়পড়তা ৪৫টি করিয়া কথা—৫৬০ × ৪৫ = ২৫২০০, তাহারই নাম ২৬০০০। ছাপাটি অতি পরিষ্কার হইয়াছে, টাইপ সব নূতন, কিন্তু একই টাইপে ছাপা, ভিন্ন ভিন্ন টাইপ ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হইত। ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন প্রেস গ্রিয়ারসন সাহেবের যে কাশ্মীরী রামায়ণ ছাপিয়াছে তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন টাইপ ব্যবহার করায় শব্দ খুঁজিয়া বাহির করিবার খুব সুবিধা হইয়াছে। "চলন্তিকায়" অনেক-শব্দের ব্যুৎপত্তি দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে-সকল শব্দ সংস্কৃত হইতেই আসিয়াছে। তিনি সংস্কৃত শব্দ ও

চলিত শব্দ তফাৎ করিবার জন্য নানারূপ চিহ্ন দিয়াছেন, সে সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি বিশেষরূপে জানিয়া রাখিলে তবে অভিধান যে কতদূর উপকারী হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা ভাষায় নানা ভাষা আসিয়া মিশিয়াছে। সেগুলিও চলন্তিকায় দেখাইয়া দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা হইয়াছে এবং সেজন্যও ভাষার আদি অক্ষর দিয়া ভাষা জানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। বেশ সাবধান হইয়া সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হইয়াছে। অভিধানখানি যাহাতে লোকে ব্যবহার করিয়া ফল পায় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা হইয়াছে, চেষ্টা সফল হইলে আমরা সকলে সুখী হইব। অভিধানের দাম ২৸৹ করা হইয়াছে। ইহা একটু খাপছাড়া হইয়াছে—২॥৹ বা ৩৲ টাকা করিলে খাপ খাইত। কিন্তু ইহার জন্য আমরা প্রকাশককে দোষী করিতে পারি না, কারণ ভাল কাগজ দেওয়া হইয়াছে, ভাল ছাপা হইয়াছে ও ভাল বাঁধা হইয়াছে; এ-সকলেরই দাম দশ বৎসরের মধ্যে দ্বিগুণ তিনগুণ হইয়া গিয়াছে; সুতরাং বইয়ের দাম ত নিশ্চয়ই বাড়িবে, কিন্তু যদি তেমন কাটতি হয়, গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মত দু-এক লাখ ছাপা হয়, তাহা হইলে দাম অনেক কমিতে পারে এবং ভরসা আছে 'চলন্তিকা'র কাটতি সেইরূপই হইবে।

"চলন্তিকা"র অভিধান অংশের কথা বলিলাম, কিন্তু উহার ভূমিকায় ও পরিশিষ্টে বাঙ্গালা ভাষার শব্দশাস্ত্রের অনেক নূতন কথা তোলা হইয়াছে। সে কথাগুলির আলোচনা নিতান্ত প্রয়োজন, নহিলে 'চলন্তিকা'র সমালোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে।

চলন্তিকার ভূমিকার ৵৹ আনা পত্রে বাঙ্গলা বর্ণমালা হইতে দীর্ঘ 'ৠ' হ্রস্ব 'ঌ' দীর্ঘ 'ৡ' এবং অন্তস্থ 'ব' এই কয়টি অক্ষর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ বর্ণমালানুক্রমে এই কয়টি অক্ষর নাই। দীর্ঘ 'ৠ' হ্রস্ব 'ঌ' দীর্ঘ 'ৡ' এই তিনটি অক্ষর উঠিয়া যাওয়ায় ক্ষতি নাই, কারণ সংস্কৃতে দীর্ঘ 'ৡ' সকলে স্বীকার করেন না, পাণিনিও করেন না। সংস্কৃতে হ্রস্ব 'ঌ' ও দীর্ঘ 'ৠ'র ব্যবহার খুব কম। বাঙ্গালায় উঠিয়া যাইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু অন্ত্যস্থ ব তুলিলে চলিবে কি? সংস্কৃতে অন্ত্যস্থ ব বর্গীয় ব অপেক্ষা অনেক বেশী। তাহার পর সংস্কৃতে এক শ্লোক আছে—

উদূটৌ যত্র বিদ্যেতে যো বঃ প্রত্যয়সন্ধিজঃ।
অন্ত্যস্থং তং বিজানীয়াৎ তদন্যো বর্গ উচ্যতে॥

ধাতুপাঠে অধিকাংশ ব-কারাদি ধাতুরই উং ও উট হয়, সুতরাং অন্ত্যস্থ 'ব' সেখানে খুব বেশী। বাঙ্গালায় ব-কারাদি শব্দ হইলেই প্রায় ব অর্থাৎ ইংরাজি 'বি'র মতন উচ্চারণ হয়। তাই বলিয়া অন্ত্যস্থ 'ব'কে তুলিয়া দেওয়া ঠিক হইয়াছে কি না বুঝিতে পারি না। বর্ণানুক্রম আদি বর্ণেরই অনুক্রম। মাঝের বর্ণের ত অনুক্রম চলে না, সুতরাং প্রত্যয়ের 'ব' আর সন্ধির 'ব' অন্ত্যস্থ 'ব' হইলেও বর্ণানুক্রমে তাহার উল্লেখ না থাকিলেও চলে। কিন্তু বেদ, বৈদ্য, বিবিধ এসকল জায়গায় আমরা বাঙ্গালীরা কি একেবারে ইংরাজি 'বি' এর মত উচ্চারণ করি? বর্গীয় 'ব' ওষ্ঠবর্ণ। দুটী ঠোঁট মিলিয়া গেলে তবে উহার উচ্চারণ হয়। কিন্তু আমরা বেদ প্রভৃতি শব্দ যতই বর্গীয় ভাবে উচ্চারণ করি, ঠোঁট দুটি একেবারে মেলে না - খানিকটা 'v'-এর মত উচ্চারণ হয়। সুতরাং বর্ণানুক্রম হইতে অন্ত্যস্থ 'ব'কে একেবারে বাদ দিলে চলিবে না। চলন্তিক ও দেন নাই। তিনি অন্ত্যস্থ 'ব'-এর বেলা * চিহ্ন দিয়া সারিয়াছেন।

চলন্তিকার ভূমিকায় 'ড়' ও 'ঢ়' দুটি নতুন বর্ণ বর্ণানুক্রমে যোগ করা হইয়াছে, কিন্তু আদি অক্ষর কোন জায়গায় 'ড' 'ড়' হয় না এবং 'ঢ' 'ঢ়' হয় না—সুতরাং বর্ণানুক্রমে ও দুটি অক্ষর যোগ করা ঠিক হয় নাই। চলন্তিকা অভিধানের ভিতরও কোন শব্দের আদ্যক্ষর 'ড়' 'ঢ়' নাই। সুতরাং ও দুটিকে স্বতন্ত্র অক্ষর না করিয়া শব্দের মধ্যস্থিত ড ও ঢ-কারের উচ্চারণ বলিয়া দিলেই হইত।

চলন্তিকার ভূমিকার ৵৹ আনা পত্রে চলন্তিকা বলিতেছেন, "সংস্কৃত শব্দের বানান যেমন সুনির্দ্দিষ্ট, অ-সংস্কৃত শব্দের তেমন নয়।" সংস্কৃত শব্দের বানান কি খুব সুনির্দ্দিষ্ট? বশিষ্ঠ, বসিষ্ঠ, কোশল, কোসল হয়; শস্য, সস্য হয়; যুবতী, যুবতি, হয়; সুতরাং সংস্কৃত শব্দের বানান যে খুব সুনির্দ্দিষ্ট তা নয়। না হইলেও বাঙ্গালার মতন একেবারে অনির্দ্দিষ্ট নয়—বিশেষ পারসী, আরবি, পোর্ত্তুগীজ হইতে যে-সব শব্দ আসিয়াছে তাহাদের বানান নাই বলিলেই হয়; যেমন—জায়গা, যায়গা, জা'গা; আপিস, আপীশ, আপীষ; ইত্যাদি।

ভূমিকায় চলন্তিকা আর যে-সমস্ত কথা কহিয়াছেন তাহার বাদ-প্রতিবাদ চলে না। শব্দগুলি সাজাইবার জন্য, শব্দের অর্থগুলি পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য তিনি যে-সকল সঙ্কেত করিয়াছেন তাহাতে অন্যের কথা বলা ঠিক নয়। সে-সকল সঙ্কেতের জন্য তিনিই দায়ী। সঙ্কেতে যদি লোকের সুবিধা হয় সঙ্কেত চলিয়া যাইবে আর সুবিধা না হইলে অন্যরূপ সঙ্কেত করিতে হইবে—সেটা লোকের সুবিধা-অসুবিধার উপর নির্ভর করিবে। তবে একটা কথা বলিয়া রাখি। চলন্তিকার ভূমিকায় লেখা আছে, "পদ-নাম (parts of speech) প্রায়ই অর্থ হইতে বুঝিতে পারা যায়, সেজন্য সর্ব্বত্র নির্দ্দেশ করা হয় নাই। যেখানে সন্দেহ হইতে পারে সেখানে নির্দ্দেশ-চিহ্ন আছে।" এইখানেই গোল। Parts of speech কাহাকে

বলে? ইংরাজীতে আটটা parts of speech, কেহ কেহ নয়টাও বলিতেন। প্রাচীন সংস্কৃত ব্যাকরণে ও নিরুক্তে নাম, আখ্যাত, উপসর্গ ও নিপাত—এই চারিটী parts of speech আছে। কোন কোন অলঙ্কারের বইতে কর্ম্মপ্রবচনীয় বলিয়া আর একটি জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। পাণিনি এ সকল কিছুই মানেন না। তাঁহার মতে parts of speech দুটি—সুবন্ত ও তিঙন্ত। তিনি বলেন, বিভক্তিযুক্ত না হইলে সে শব্দ শাস্ত্রে প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহার হয় না—সুতরাং এমন শব্দ নাই যাহার উত্তর বিভক্তি বসে না। যদি শাস্ত্রে প্রয়োগ, ভাষায় ব্যবহার না কর, বিভক্তি না দিয়াও ব্যবহার করা চলে; যেমন জপের সময় রাম রাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ, দুর্গা দুর্গা; কিন্তু ভাষায় ব্যবহার করিতে হইলেই বিভক্তি দিতে হইবে। কিন্তু কই চ, বা, হা, চৈ, সায়ং, প্রাতঃ – এ সকলে ত বিভক্তি নাই। পাণিনি বলেন,বিভক্তি হইয়াছিল, লোপ হইয়াছে। Max Muller ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছেন, পাণিনি শব্দের শ্রেণীবিভাগ করিতে গিয়া লোপ নামে একটা fiction স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি শব্দগুলিকে তিনভাগে বিভক্ত করিতে নারাজ—নারাজ ত হইবারই কথা; সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে ভাগ দুই না করিয়া তিন করিতে গেলেই ভাগের গোড়া স্থির থাকে না—এভাগের জিনিষ ওভাগে গিয়া পড়ে (অর্থাৎ অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি হয়)। তাই পাণিনি শব্দরাশিকে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন - এক ভাগের উত্তর সুপ্ বিভক্তি ও আর একভাগের উত্তর তিঙ বিভক্তি হয়। ধাতুর উত্তর যে-সব বিভক্তি হইয়া ক্রিয়া-পদ তৈয়ারি হয় তাহাকে তিঙ বিভক্তি বলে, আর নামের উত্তর যে বিভক্তি হইয়া পদ ভাষায় ব্যবহার হয় তাহাকে সুপ্ বিভক্তি কহে। কিন্তু অনেক শব্দের উত্তর বিভক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না—পাণিনি বলেন, বিভক্তি হইয়া লোপ হইয়াছে। তাহা হইলে ভাগ এইরূপ হইল---
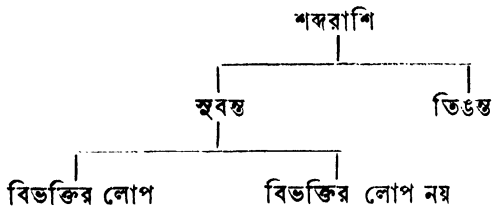
এখন দেখা যাইতেছে parts of speech শব্দের অর্থ হইতে বোঝা যায় না। ইংরাজি ব্যাকরণের মতে বোঝা যায় বলে, কিন্তু সেটাও ঠিক কথা নয়। পাণিনির মতে সে কথা উঠিতেই পারে না। মানের সঙ্গে parts of speech-এর কোন সম্বন্ধ নাই। ব্যবহার দেখিয়া অথবা বিভক্তি দেখিয়া বুঝিতে হয়।

ইংরাজিতে আট নয় ভাগে শব্দরাশিকে ভাগ করায় এক that কখনও conjunction হইতেছে, কখনও relative pronoun হইতেছে, আবার কখনও adjective-ও হইতেছে, কিন্তু পাণিনির মতে হইবার জো নাই। পদ হইলেই হয় সুবন্ত নয় তিঙন্ত হইতেই হইবে—কোন পদ দুই অন্ত হইতে পারে না।

যে-সকল শব্দের উত্তর বিভক্তির লোপ হয় তাহাদিগকে অব্যয় বলে। অব্যয় আবার দুই রকম। কতকগুলি ধাতুর সহিত জুড়িয়া যায়, সেগুলিকে উপসর্গ বলে। যখন সেগুলি ধাতুর সঙ্গে জুড়িয়া যায় না অথচ তাহাদের যোগে বিভক্তি হয়, তখন সেগুলিকে কর্ম্মপ্রবচনীয় বলে। বাকী অব্যয়ের নাম নিপাত।

ইংরাজিতে কারক ও বিভক্তি দুটি জিনিষ নয়। অন্ততঃ দুটি জিনিষ বলিয়া ধরে না। কিন্তু সংস্কৃতে এবং বাঙ্গলায় দুটি স্বতন্ত্র জিনিষ---কারক সম্বন্ধ বুঝায়। সম্বন্ধ বুঝাইলে সে ব্যাকরণের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়। যে শাস্ত্রে গিয়া পড়ে তাহার নাম বাদার্থ, ন্যায়শাস্ত্র অথবা ন্যায়শাস্ত্রের শব্দখণ্ড। কিন্তু বিভক্তি খাঁটি ব্যাকরণের কথা, কারণ বিভক্তি না হইলে পদ শুদ্ধ হইল কিনা বুঝা যায় না।

এইস্থলে বলিয়া রাখি, আমাদের ব্যাকরণ ও ইংরাজি grammar এক জিনিষ নয়। Grammar is the art of speaking and writing a language correctly. সংস্কৃত ব্যাকরণের মানে কিন্তু আর কিছু। ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেন ব্যাকরণং—অর্থাৎ শব্দটি শুদ্ধ করা পর্য্যন্তই ব্যাকরণের সীমা। ইংরাজিতে গ্রামারের মধ্যে উচ্চারণ পড়ে। উচ্চারণের জন্য সংস্কৃতে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র আছে—তাহার নাম শিক্ষা। গ্রামারে Etymology থাকে, ইহারই সংস্কৃত নাম ব্যাকরণ। ইংরাজিতে গ্রামারে syntax থাকে---সংস্কৃতে syntax-এর মোটা মোটা গোটা-কতক কথা যাহা নহিলে ব্যাকরণ চলে না,তাহাই ব্যাকরণে থাকে—বাকীটা বাদার্থশাস্ত্রে গিয়া পড়ে। ইংরাজি গ্রামারে ছন্দের উপর একটা অধ্যায় থাকে, সংস্কৃতে ছন্দশাস্ত্র স্বতন্ত্র। গ্রামারে figures of speech থাকে, সংস্কৃতে অলঙ্কার-শাস্ত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং ইংরাজি গ্রামার ও সংস্কৃত ব্যাকরণ এক নহে। ইংরাজি গ্রামারকে শব্দশাস্ত্র বলা যাইতে পারে, সংস্কৃত ব্যাকরণ শুধু পদের আকার লইয়া। ব্যাকরণ ও গ্রামারে যখন এত তফাৎ তখন ব্যাকরণকে গ্রামার বলা কিছুতেই উচিত নহে। এক বলিয়া মনে করিলেই গোলযোগ হইবে।

এক জায়গায় খুব গোলোযোগ হইয়াছে। ব্যাকরণে ছয়টা বই কারক নাই, কিন্তু ইংরাজিতে আটটা কারক—কেন এরূপ হয়? ব্যাকরণে সম্বন্ধকে কারক

বলে না—ইংরাজিতে কিন্তু possessive একটা case, সম্বোধন ব্যাকরণে কারক নহে—ইংরাজিতে উহা vocative case. ব্যাকরণে কারক বলিতে বুঝায় ক্রিয়ান্বয়ি—গ্রামারে case বলিতে গেলে shows relation between words in a sentence, তা ক্রিয়া হউক আর নাই হউক। সেইজন্য ব্যাকরণে সম্বন্ধ কারক হইতে পারে না, কারণ উহার সহিত ক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বয় হয় না। কিন্তু case অনায়াসেই হইতে পারে, কারণ বাক্যের মধ্যে উহার কোন-না-কোন শব্দের সহিত সম্বন্ধ আছে।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মতে শব্দের উত্তর বিভক্তি না হইলে পদ হয় না, পদ না হইলে ব্যবহারে চলে না। এখন এই বিভক্তি কোথায় হয়, কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া পদকে শুদ্ধ করে, তাহার কিছু কিছু জানা দরকার। কারকে বিভক্তি হয়—যেমন, কর্ত্তায় প্রথমা ও তৃতীয়া, কর্ম্মে দ্বিতীয়া করণে তৃতীয়া, সম্প্রদানে চতুর্থী, অপাদানে পঞ্চমী ও অধিকরণে সপ্তমী ; আমরা মোটা-মুটি বলিলাম, কারকে অনেক সময় বিভক্তির ব্যত্যয় হইয়া থাকে। সম্বন্ধ বুঝাইতে কারক হয় না বটে, কিন্তু বিভক্তি হয় ; সম্বোধন কারক হয় না বটে, কিন্তু বিভক্তি হয়। কতকগুলি অব্যয় শব্দের যোগে বিভক্তি হয়—এই অব্যয়গুলিকে কর্ম্মপ্রবচনীয় কহে। নানা অর্থেও বিভক্তি হয়, যেমন সহার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয় ; সুতরাং কারক ও বিভক্তি দুই শাস্ত্রের দুই জিনিষ একত্র করিলেই গোলযোগ হইবে। ব্যাকরণে এইরূপ গোলযোগের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু গ্রামারে খুবই আছে।

বিশেষ যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ ইংরাজিতে তর্জ্জমা করিতে বসেন তাঁহাদের বড় বিপদে পড়িতে হয়। ইংরাজিতে ত বিভক্তি নাই, সুতরাং তাঁহাদের বলিতে হয় nominative sometimes becomes instrumental case অর্থাৎ কর্ত্তৃকারক সময় সময় করণ কারক হইয়া যায়—এক কারক ত দুই হইতে পারে না, সুতরাং গোলযোগ হয়। ব্যাকরণে এই গোলযোগ হয় না, কারণ ব্যাকরণ বলে কর্ত্তায় তৃতীয়া হয়—করণ কারক বলে না, গোলযোগ হয় না। ভাবে সপ্তমী হয়, অর্থাৎ ভাব বুঝাইলে কর্ত্তায় সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইংরাজিতে বলিতে গেলে বলিতে হইবে nominative case locative case হয় অর্থাৎ কর্ত্তা অধিকরণ হইয়া যান—তাহার মানেই গোলযোগ।

ব্যাকরণে বিভক্তি থাকার দরুণ অনেক গোলযোগ নিবারণ হয় এবং অনেক জিনিষ পরিষ্কার বুঝা যায়। যাঁহারা গ্রামার হইতে বাঙ্গালা ব্যাকরণ করেন তাঁহাদের অনেক সময়ে গোলযোগে পড়িতে হয়, কারণ তাঁহারা মাঝখানে বিভক্তির কথা বলেন না অথবা এমন করিয়া বলেন যে, বিভক্তির যে বিশেষ একটা দরকার আছে তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু চলন্তিকার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বিভক্তি মানিয়া লওয়ায় অনেক কথা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় বিভক্তি বড় বেশী নাই—পাঁচ সাতটি মাত্র ; কিন্তু সেইগুলিকে প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া প্রভৃতি করিয়া সাজাইয়া লইতে হয়। বাঙ্গালায় দ্বিবচন ত নাই, বহুবচনও নাই বলিলেই হয়। পুরাণ বাঙ্গালায় একেবারে ছিল না, গণ-বাচক শব্দ দিয়া বহুবচন করিতে হইত। এখন বহুবচনে একটা "রা" বিভক্তি হইয়াছে, সে শুধু প্রথমাতেই ব্যবহার হয়। সংস্কৃত হইতে ভাষা যতদূরে আসিতেছে, বিভক্তি ততই কমিয়া যাইতেছে। তৃতীয় শতকের বাঙ্গালা দেশের প্রাকৃতে যত বিভক্তি ছিল নবম শতকে তাহা অপেক্ষা অনেক কম। যত দিন যাইতেছে ততই কমিয়া আসিতেছে, কিন্তু বিভক্তি আছে এবং আছে স্বীকার করার দরুণ ব্যাকরণ বুঝিবার সময় অনেক সুবিধা হইয়াছে। অধিকাংশ শব্দরূপ, বিভক্তি কমিয়া যাওয়ায় অনেক সোজা হইয়া আসিয়াছে। কেবল এক জাতীয় শব্দে বিভক্তি একটু বেশী আছে—সে শব্দগুলিকে সর্ব্বনাম বলে। সর্ব্বনামের লক্ষণ ব্যাকরণে করে নাই, তবে সর্ব্বনামের রূপ দেখাইয়া দিয়াছে। চলন্তিকাও সেই পথ অবলম্বন করিয়াছেন।

ব্যাকরণে ক্রিয়ার রূপ অত্যন্ত জটিল ছিল—গ্রামারে আরও জটিল। পাণিনি সে জটিলতা ভাঙ্গিয়া খানিকটা সোজা করিয়াছিলেন, কিন্তু বোপদেব একেবারে বীজগণিতের মত ১৮০টি বিভক্তি স্বীকার করিয়া এবং সেই বিভক্তিগুলিকে দশটি ভাগ করিয়া অনেক সোজা করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালায় ক্রিয়া বিভক্তি অত্যন্ত জটিল। চলন্তিকা কলাপ ব্যাকরণের ছাঁচে সেই বিভক্তিগুলি ঢালিয়া বিশেষ সুবিধা করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। ক্রিয়া বিভক্তি হইতে আমরা নানা জিনিষ বুঝিতে পারি—প্রথম কাল বুঝিতে পারি, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তাহার মধ্যেও আবার কোন্ জায়গায় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইবে ও ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে তাহাও বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। আজ্ঞা বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। বিধি বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। আশীর্ব্বাদ বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। একটা ক্রিয়া যদি অন্য ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে তাহাও বিভক্তির দ্বারা জানা যায়। সুতরাং বিভক্তি দিয়া আমরা অনেক জিনিষ জানিতে পারি। এইসব কথা বাঙ্গালায় বুঝাইবার চেষ্টা চলন্তিকাই প্রথম করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বাহাদুরী আছে, কিন্তু এ চেষ্টাটা কোথায়

গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা বলা যায় না এবং তিনি যে-পথ ধরিয়াছেন সে-পথও যে ঠিক তাহাও বলিতে পারি না। চলন্তিকা ক্রিয়ারূপ প্রকরণে তিঙন্ত পদের সঙ্গেই অসমাপিকা কৃদন্ত পদ দেখাইয়াছেন। ইহা ইংরাজি গ্রামারের অনুকরণ, কিন্তু ব্যাকরণের বিরুদ্ধ। ধাতু হইতে শব্দ গড়িতে গেলে কৃৎ প্রত্যয় করিতে হয়। এইরূপে (১) শব্দ হইতে নূতন শব্দ করিতে হইলে তদ্ধিত প্রত্যয় করিতে হয়, (২) শব্দ হইতে ধাতু গড়িতে গেলে নামধাতু প্রত্যয় করিতে হয়, ৩) আবার ধাতু হইতে ধাতু গড়িতে গেলে ণিচ্ সন ও যঙ্ প্রত্যয় করিতে হয়, (৪) আবার ধাতু হইতে শব্দ গড়িতে গেলে কৃৎ প্রত্যয় করিতে হয়। ব্যাকরণের এই চারটি ডাল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে ব্যাকরণের জটিলতা অনেক কমিয়া যায়। ইংরাজিতে অসমাপিকা ক্রিয়া ধাতুরূপের মধ্যে দিয়াছে আর ব্যাকরণে অসমাপিকা ক্রিয়া কৃৎপ্রকরণে দিয়াছে—তিঙন্তে নহে। বাঙ্গালায়ও বোধ হয় তাই করিলে ভাল হইত—অনেক গোলযোগ নিবারণ হইত।

চলন্তিকা একটি কাজ করিয়াছেন সেটি আর কেহ করেন নাই—এই কাজটিতে সূক্ষ্মদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাঙ্গলার সমস্ত ধাতুরাশিকে বানান অনুসারে ২০ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন এবং সংস্কৃতে যেমন দশগণের দশরকম রূপ হয় বাঙ্গালায় সেইরূপ কুড়িগণের কুড়িটি রূপ করিয়াছেন— এটা বাঙ্গালা ব্যাকরণে খুব নতুন, আমার বোধ হয় অন্য ব্যাকরণে এইরূপ গণভাগ করিলে সুবিধা হইত—এটা খুব ভাল হইয়াছে। পরবর্ত্তী শাব্দিকেরা এ গণভাগ লইবেন কি না জানি না, তবে লইলে একটা অতি জটিল জিনিষ সোজা হইয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত ভাষায় সন্ধি একটা বিষম জিনিষ। প্রায়ই সংস্কৃত ব্যাকরণে গোড়ায় সন্ধি দিয়া আরম্ভ করে, পাণিনি কিন্তু সন্ধিকে সকলের শেষে দিয়াছেন। সন্ধিটি উচ্চারণের কথা—শিক্ষাশাস্ত্রের কথা—ব্যাকরণের কথা নয়। কিন্তু একটা বিষয় সকলের চোখে পড়ে না। সন্ধি দুই প্রকার (১) পদান্ত সন্ধি, ও(২) পদমধ্যগত সন্ধি। পদান্তসন্ধি সংস্কৃতে আছে, বাঙ্গালায় নাই। পদমধ্যগত সন্ধিও বাঙ্গালায় নাই। যে সমাস করা শব্দগুলি আমরা সংস্কৃত হইতে লইয়াছি সেইগুলিতেই আছে। আমরা নূতন করিয়া বাঙ্গলায় যে-সকল সমাস করি তাহাতেও সন্ধি করি না। সুতরাং সন্ধির নিয়ম করিয়া বাঙ্গলা ব্যাকরণকে ভারী করা ঠিক নয়। যখন পদান্ত সন্ধি নাই তখন ব্যাকরণের গোড়াতেই সন্ধির নিয়ম দেওয়া একেবারে বৃথা। যদি দিতে হয় যেখানে সংস্কৃত হইতে লওয়া সমাস-করা পদ আছে সেইখানে দেওয়াই ভাল—না দিলেও ক্ষতি নাই; কারণ সমাস ত আর বাঙ্গালায় হয় নাই, সংস্কৃত অবস্থায় হইয়াছিল। বাঙ্গালায় বিসর্গসন্ধির স্থান কোথায় আমি জানি না, বোধ হয় একেবারেই নাই; তবে চলন্তিকা ব্যাকরণ নয় অভিধান। অভিধানে সংস্কৃত কথা লইয়াও নাড়াচাড়া করিতে হয়, সুতরাং সংস্কৃত সমাসের ভিতর সন্ধির গোটাকতক সূত্র করিতেও পারেন।

চলন্তিকায় অনেক পারিভাষিক শব্দ দিয়াছেন। অঙ্কের, রসায়নের, ভূগোলের, গণিতের, ডাক্তারীর, কবিরাজীর অনেক রকম পারিভাষিক শব্দ দেওয়া আছে। কড়া পারিভাষিক শব্দ ত চলন্তিকায় থাকিতেই পারে না যাহা চল্‌তি তাহাই থাকিবে। কিন্তু থাকার একটা কথা আছে। রসায়নশাস্ত্রটা আমরা ইংরাজি হইতে লইয়াছি, উহার পরিভাষা আমরা কি ইংরাজিই রাখিব, না, উহার তর্জ্জমা করিয়া লইব। দুইদিকেই গোল। যদি ইংরাজিই রাখি আমাদের উচ্চারণের দোষে সে এমন বিশ্রী হইয়া যাইবে যে তাহাকে আর ইংরাজি বলিয়াই টের পাওয়া যাইবে না, আর যদি তর্জ্জমা করিয়া লই আমরা ভিন্ন কেহই বুঝিতে পারিবে না। দু'দিকে গোল হইলেও আমার বোধ হয় প্রথমটাই ভাল, আর পৃথিবীতে চলিয়াও আসিতেছে তাই। যে ভাষায় একটা পারিভাষিক শব্দের উৎপত্তি হয় অন্য ভাষায়ও সেই শব্দটা ব্যবহার করে।

অপরাজিত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি সব কলেজ খুলিয়া গেল, অপু কোনো কলেজে ভর্ত্তি হইল না। অধ্যাপক মিঃ বসু তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়া ইতিহাসে অনার্স কোর্স লওয়াইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। অপু ভাবিল—কি হবে আর কলেজে পড়ে? সে সময়টা ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে কাটাব, বি-এর ইতিহাসে এমন কোনো নতুন কথা নেই যা আমি জানি নে। ও দু-বছর মিছি-মিছি নষ্ট, লাইব্রেরীতে তার চেয়ে অনেক পড়ে ফেলতে পারবো এখন। তা ছাড়া ভর্ত্তির টাকা, মাইনে, এসব পাই বা কোথায়?

একটা কিছু চাকরি না খুঁজিলে চলে না। খবরের কাগজ বিক্রয়ের পুঁজি অনেক দিন ফুরাইয়া গিয়াছে, মায়ের মৃত্যুর পর সে কাজে আর উৎসাহ নাই। একটা ছোট ছেলে পড়ান আছে, তাতে শুধু দুটো ভাত খাওয়া চলে দুবেলা—কোনো মতে ইক্‌মিক্ কুকারের আলুসিদ্ধ, ডালসিদ্ধ ও ভাত। মাছ, মাংস, দুধ, ডাল তরকারী তো অনেক দিন আগে দেখা স্বপ্নের মত মনে হয়—যাক্ সে সব, কিন্তু ঘরভাড়া, কাপড় জামা, জল খাবার এসব চলে কিসে? তাহা ছাড়া অপুর অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে যে, কলিকাতায় ছেলে-পড়ান বাবার মুখে শৈশবে শেখা উদ্ভট শ্লোকের পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর মত চপল, আজ যদি যায়, কাল দাঁড়াইবার স্থান নাই।

কয়েক দিন ধরিয়া খবরের কাগজ দেখিয়া দেখিয়া পাইওনিয়র ড্রাগ ষ্টোর্সে একটা কাজ খালি দেখা গেল দিনকতক পরে। আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে বড় দোকান, পিছনে কারখানা। তখনও ভিড় জমিতে সুরু হয় নাই, অপু ঢুকিয়াই এক স্থূলকায় আধাবয়সী ভদ্রলোকের একেবারে সাম্‌নে পড়িল। ভদ্রলোক বলিলেন, কাকে চান্?

অপু লাজুক মুখে বলিল—আজ্ঞে, চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে—তাই—

—ও! আপনি ম্যাট্রিক পাশ?

—আমি এবার আই-এ—

ভদ্রলোক পুনরায় তাকিয়ায় ভর দিয়া হাল ছাড়িয়া দিবার সুরে বলিলেন—ও আই-এ পাশ নিয়ে আমরা কি করব, আমাদের লেবেলিং ও মাল বট্‌লিং করার জন্যে লোক চাই। খাটুনিও খুব, সকাল সাতটা থেকে সাড়ে দশটা, মধ্যে দু ঘণ্টা খাবার ছুটি, আবার বারোটা থেকে পাঁচটা, কাজের চাপ পড়লে রাত আটটাও বাজবে—

—মাইনে কত?

—আপাতক পনেরো, ওভার-টাইম খাটলে দু' আনা জলখাবার—সে সব আপনাদের কলেজের ছোক্‌রার কাজ নয় মশায়—আমরা এম্‌নি মোটামুটি লোক চাই।

ইহার দিনকতক পরে আর একটা চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখিয়া গেল ক্লাইভ ষ্ট্রীটে। দেখিল, সেটা একটা লোহা-লক্কড়ের দোকান, বাঙ্গালী ফার্ম্ম। একজন ত্রিশ বত্রিশ বছরের অত্যন্ত চুল ফাঁপানো টেরি-কাটা লোক ইস্ত্রি-করা কামিজ পরিয়া বসিয়া আছে, মুখের নীচে দিকের গড়নে একটা কর্কশ ও স্থূলভাব, এমন ধরণের চেহারা ও চোখের ভাবকে সে মাতাল ও কুচরিত্র লোকের সঙ্গে মনে মনে জড়িত করিয়া থাকে। লোকটি অত্যন্ত অবজ্ঞার সুরে বলিল—কি, কি এখানে?

অপুর নিজকেই অত্যন্ত ছোট বোধ হইল নিজের কাছে। সে সঙ্কুচিত সুরে বলিল—এখানে একটা চাকরী খালি দেখে আস্‌চি—

লোকটার চেহারা বড়লোকের বাড়ির উচ্ছৃঙ্খল অসচ্চরিত্র, বড় ছেলের মত। পূর্ব্বে এ ধরণের চরিত্রের সহিত তাহার পরিচয় হইয়াছে লীলাদের বাড়ী বর্দ্ধমানে থাকিতে। নিজের অজ্ঞাতসারে একটা ঘৃণা ও অসন্তোষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল। এই টাইপটা সে চেনে।

লোকটা কর্কশ সুরে বলিল—কি কর তুমি?

—আমি আই-এ পাশ—করি নে কিছু—আপনাদের এখানে—

—টাইপরাইটিং জান? না?···যাও যাও, এখানে হবে না—ও কলেজ-টলেজ এখানে চলবে না—যাও—

সেদিনকার ব্যাপারটা বাসায় আসিয়া গল্প করিতে তাহার বন্ধু ক্যাম্বেল স্কুলের ছাত্রটির এক কাকা সব শুনিয়া বলিলেন—ওদের আজকাল ভারী দেমাক, যুদ্ধের বাজারে লোহার দোকানদার সব লাল হয়ে যাচ্ছে,দালালেরা পর্য্যন্ত দু-পয়সা নিলে। তাহার পর তিনি লোহালক্কড়ের কোন্ দালাল কি উন্নতি করিয়াছে তাহার একটা ফর্দ্দ দাখিল করিলেন, হঠাৎ পয়সা আসিবার সম্বন্ধে নানা আজগুবি গল্প করিলেন।

অপু বলিল—দালাল আমি হতে পারি নে?

—কেন পারবেন না, শক্তটা কি? আমার শ্বশুর একজন বড় দালাল, আপনাকে নিয়ে যাব একদিন—সব শিখিয়ে দেবেন, আপনাদের মত শিক্ষিত ছেলে তো আরও ভাল কাজ করবে—

সপ্তাহ-খানেক পরে অপু মহা উৎসাহে ক্লাইভ ষ্ট্রীট অঞ্চলের লোহার বাজারে দালালী করিতে বাহির হইল। প্রথম দিন-চার-পাচ ঘোরাঘুরিই সার হইল, কেহ ভাল করিয়া কথাও বলে না, একদিন একজন বড় দোকানী জিজ্ঞাসা করিল বোল্ট আছে? পাচ ইঞ্চি পাচ জ? অপু বোল্ট কাহাকে বলে জানে না, কোন্ দিকের মাপ পাচ ইঞ্চি পাঁচ জ তাহাও বুঝিতে পারিল না। নোটবুকে টুকিয়া লইল, মনে মনে ভাবিল একটা অর্ডার তো পাইয়াছে, খুঁজিবার মতও একটা কিছু জুটিয়াছে এতদিন পরে।

কোথায় পাঁচ ইঞ্চি পাঁচ জ? বোল্টু পাওয়া যায়, সে জানে না, এ-দোকান ও-দোকানে জিজ্ঞাসা করে। দিন-চারেক বৃথা খোজাখুঁজির পর তাহার ধারণা পৌছিল যে জিনিষটা বাজারে সুলভপ্রাপ্য নয় বলিয়াই দোকানী হয়ত অত সহজে তাহাকে অর্ডার দিয়াছিল। একদিন একজন দালাল বলিল—মশাই সওয়া ইঞ্চি বেড়ের সীসের পাইপ দিতে পারেন যোগাড় করে আড়াই শো ফুট? যান্ না অর্ডারটা নিয়ে আসুন এই পাশেই ইউনাইটেড মেসিনারি কোম্পানীর আপিস থেকে।

পাশেই খুব বড় বাড়ি। আপিসের লোকে প্রথমে তাহাকে অর্ডার দিতে চায় না, অবশেষে জিজ্ঞাসা করিল—মাল আমাদের এখানে ডেলিভারী দিতে পারবেন তো?···

একথার মানে সে ঠিক না বুঝিয়াই বলিল—হুঁা তা দিতে পারব।

বহু খুজিয়া কলেজ ষ্ট্রীটের যে দোকান হইতে মাল বাহির হইল, তাহারা মাল নিজের খরচে কোথাও ডেলিভারী দিতে রাজী নয়, অপু নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি লইয়া গরুর গাড়িতে সীসার পাইপ বোঝাই দেওয়াইল—রাজা উডমাণ্ট্ ষ্ট্রীটে দুপুর রৌদ্রে মাল আনিয়া হাজিরও করিল। ইউনাটেড মেসিনারী কোম্পানী গাড়ির ভাড়া দিতে একদম অস্বীকার করিল, মাল তো এখানেই ডেলিভারী দিবার কথা ছিল, তবে গাড়ি ভাড়া কিসের? অপু ভাবিল না হয় নিজের দালালীর টাকা হইতে গাড়ির ভাড়াটা মিটাইয়া দিবে এখন। এখন কাজে নামিয়া অভিজ্ঞতাটাই আসল, নাই বা হইল বেশী লাভ?
সে বলিল—আমার ব্রোকারেজটা?

—সে কি মশাই আপনি সাড়ে পাঁচ আনা ফুটে দর দিয়েচেন, আপনার দালালী নেন্ নি? তা কি কখনো হয়!···

অপু জানে না যে, প্রথম দর দিবার সময়ই তাহার মধ্যে দালালী ধরিয়া দিবার নিয়ম, সবাই তাহা দিয়া থাকে, সেও যে তাহা দেয় নাই, একথা কেহই বিশ্বাস করিল না। বার-বার সেই কথা তাহাদের বুঝাইতে গিয়া নিজের আনাড়িপনা ও কাঁচামিই বিশেষ করিয়া পড়িল ধরা। সীসার পাইপওয়ালা গোমস্তা তাহাদের বিল বুঝিয়া পাইয়া চলিয়া গেল—তিনদিন ধরিয়া রৌদ্রে ছুটাছুটি ও পরিশ্রমই অপুর সার হইল, একটি পয়সাও তাহাকে দিল না কোনো পক্ষই। খোট্টা গাড়োয়ান পথ বন্ধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আমার ভাড়া কৌন্ দেগা?

একজন বৃদ্ধ মুসলমান দালানের এক পাশে দাঁড়াইয়া ব্যাপার দেখিতেছিল, অপু আপিস্ হইতে বাহিরে

আসিলেই সে বলিল বাবু আপনি কত দিন এ কাজে নেমেচেন—কাজ তো কিছুই জানেন না আপনি দেখচি—

অপু সে কথা স্বীকার করিল। লোকটি বলিল—আপনি লেখাপড়া জানেন, ওসব খুচরো কাজ করে আপনার পোষাবে না। আপনি আমার সঙ্গে কাজে নাম্‌বেন?···বড় মেসিনারীর দালালী, ইঞ্জিন, বয়লার এই সব। এক এক বারে পাঁচ শো সাত শো টাকা রোজগার হবে—বাবু ইংরেজি জানিনে তাই, তা যদি জান্‌তাম, এ বাজারে এতদিন গুছিয়ে···নামবেন আমার সঙ্গে?

অপু হাতে স্বর্গ পাইয়া গেল। আনন্দের আতিশয্যে সে গাড়োয়ানকে ভাড়াটা যে দণ্ড দিতে হইল, সেটাও গ্রাহ্যের মধ্যে আনিল না। মুসলমানটির সঙ্গে তাহার অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা হইল—অপু নিজের বাসার ঠিকানা দিয়া দিল, স্থির হইল, কাল সকালে দশটার সময় এইখানে মুসলমান দালালটা তাহার অপেক্ষা করিবে।

অপু রাত্রে শুইয়া মনে মনে ভাবিল—এতদিন পরে একটা সুবিধা জুটেচে,—এইবার হয়ত পয়সার মুখ দেখ্‌ব।

মাসখানেক কিছুই হইল না। একদিন দালালটি তাহাকে বকিল—দুটোর পরে আর বাজারে থাকেন না, এতে কি হয় কখনো বাবু? যান কোথায়?

অপু বলিল—ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়তে যাই—দুটো থেকে সাতটা পর্য্যন্ত থাকি। একদিন যেও তোমায় দেখাবো কত বড় লাইব্রেরী।

রোজ রোজ বাজারের হৈ চৈ, মাড়োয়ারীদের ভিড়, চারিধারের অত্যন্ত হুসিয়ারি দর-কসাকসি, শুধু টাকা, টাকা, টাকা সংক্রান্ত কথাবার্ত্তা—এসব অপুর কেমন ভাল লাগে না। লাইব্রেরীতে আসিয়া সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে।

ইতিহাস খুব আগ্রহের সঙ্গে পড়ে, কোনো এক দরিদ্র ঘরের ছোটছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়···সংসারে দুঃখকষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ···তাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ঠ ধরণের সংবাদ জানিতে মন যায়।

মানুষের সত্যকার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোষাকের জাঁকজমকে দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাদের পুঁটুলি-বাঁধা ছাতু কবে ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট থেকে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল—ছ হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নেই—থাকিলেও বড় কম। রাজা যযাতি কি সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প সবাই শৈশব থেকে মুখস্থ করে—কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ্‌ বন্যদ্রাক্ষা, মার্টল ঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকাল সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে—তাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার গল্প, তাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।

কেবল মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ঐতিহাসিকদের পাতায়, সম্মিলিত সৈন্যব্যূহের এই আড়ালটা সরিয়া যায়, সারি বাঁধা বর্শার অরণ্যের ফাঁকে দূর অতীতের এক ক্ষুদ্র গৃহস্থের ছোট বাড়ি নজরে আসে। অজ্ঞাত-নামা কোনো লেখকের জীবন-কথা, কি কালের স্রোতে কূলে-লাগা এক টুকরা পত্র, প্রাচীন মিশরের কোন্ কৃষক শস্য কাটিবার কি আয়োজন করিতে লিখিয়াছিল,—বহু হাজার বছর পরে তাদের টুকরা ভূগর্ভে প্রোথিত মৃন্ময়পাত্রের মত দিনের আলোয় বাহির হইয়া আসে।

কিন্তু আরও ঘনিষ্ঠ ধরণের, আরও তুচ্ছ জিনিষের ইতিহাস চায় সে। মানুষ মানুষের বুকের কথা জানিতে চায়। আজ যা তুচ্ছ, হাজার বছর পরে তা মহাসম্পদ। ভবিষ্যতের সত্যিকার ইতিহাস হইবে এই কাহিনী, মানুষের মনের ইতিহাস, তার প্রাণের ইতিহাস।

আর একটা দিক তার চোখে পড়ে। একটা জিনিষ বেশ স্পষ্ট হইয়া ওঠে তার কাছে—মহাকালের এই মিছিল। বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাস গিবন

ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন কি অন্যকেহ ভ্রমশূন্য লিখিয়াছেন, এ বিষয়ে তার তত কৌতূহল নাই, সে শুধু কৌতূহলাক্রান্ত মহাকালের এই বিরাট মিছিলে। হাজার যুগ আগেকার কত রাজা, রাণী, সম্রাট, মন্ত্রী, খোজা, সেনাপতি, বালক, যুবা, কত অশ্রুনয়না তরুণী, কত অর্থলিপ্সু রাজপুরুষ—যারা অর্থের জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধুর গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া তাহাকে ঘাতকের কুঠারের মুখে দিতে দ্বিধা বোধ করে নাই—অনন্ত কালসমুদ্রে ইহাদের ভাসিয়া যাওয়ার, বুদ্বুদের মত মিলাইয়া যাওয়ার দিক্‌টা। কোথায় তাদের বৃথা শ্রমের পুরস্কার, তাদের অর্থলিপ্সার সার্থকতা ?

এদিকে ছুটাছুটিই সার হইতেছে—কাজে কিছুই হয় না। সে তো চায় না বড়মানুষ হইতে—খাওয়া-পরা চলিয়া গেলেই সে খুশি—পড়াশুনা ধরার সে সময় পায় ও নিশ্চিন্ত হইতে পারে। কিন্তু তাও তো হয় না, টুইশানী না থাকিলে একবেলা আহারও জুটিত না যে।

একদিন মুসলমান দালালটি বাজারে তাহার কাছে দুইটি টাকা ধার চাহিল। বড় কষ্ট যাইতেছে, পরের সপ্তাহেই দিয়া দিবে এখন। অপু ভাবিল সে তো তাহার দুঃখদিনের সঙ্গী, হয়ত বাড়ীতে ছেলে-মেয়ে আছে, রোজগার নাই এক পয়সা। অর্থাভাবের কষ্ট যে কি সে তাহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছে এই দুই বৎসরে—নিজের বিশেষ স্বাচ্ছল্য না থাকিলেও একটি টাকা বাসা হইতে আনিয়া পরদিন বাজারে লোকটাকে দিল।

ইহারই দিন-সাতেক পরে অপু সকালে ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া ঘরের দোরে কাহার ধাক্কার শব্দ পাইল। দোর খুলিয়া দেখিল মুসলমান দালালটি হাসিমুখে দাঁড়াইয়া।

—এস, এস আবদুল, তারপর খবর কি ?

—আদাব বাবু, চলুন ঘরের মধ্যে বলি। এ ঘরে আপনি একলা থাকেন, না আর কেউ—ওঃ—বেশ ঘর তো বাবু।

—এস বসো। চা খাবে ?

চা-পানের পর আবদুল আসিবার উদ্দেশ্য বলিল। বারাকপুরে একটা বড় বয়লারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেই ধরণের বয়লারেরই আবার এদিকে একটা খরিদ্দার জুটিয়া গিয়াছে, কাজটা লাগাইতে পারিলে তিনশো টাকার কম নয়—একটা বড় দাঁও। কিন্তু মুস্কিল দাঁড়াইয়াছে এই যে এখনই বারাকপুরে গিয়া বয়লারটি দেখিয়া আসা দরকার এবং কিছু বায়না দিবারও প্রয়োজন আছে—অথচ তাহার হাতে একটা পয়সাও নাই। এখন কি করা ?

অপু বলিল—খদ্দের মাল ইন্‌স্পেক্‌শনে যাবে না ?

—আগে আমরা দেখি, তবে তো খদ্দেরকে নিয়ে যাব ?···দেড় পার্সেণ্ট করে গেলেও সাড়ে চারশো টাকা থাকবে আমাদের—খদ্দের হাতের মুঠোয় রয়েচে—আপনি নির্ভাবনায় থাকুন—এখন টাকার কি করি ?

অপু পূর্ব্বদিন টুইশানীর টাকা পাইয়াছিল, বলিল—কত টাকা দরকার ? আমি তো ছেলে-পড়ানোর মাইনে পেয়েচি—কত তোমার লাগবে বল।

হিসাবপত্র করিয়া আট টাকা পড়িবে দেখা গেল। ঠিক হইল আবদুল এবেলা বয়লর দেখিয়া আসিয়া ওবেলা বাজারে অপুকে সব খবর দিবে। অপু বাক্স খুলিয়া টাকা আনিয়া আবদুলের হাতে দিল।

বৈকালে সে পাটের এক্সচেঞ্জের বারান্দাতে বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আগ্রহের সহিত আবদুলের আগমন প্রতীক্ষা করিল। আবদুল সেদিন আসিল না, পরদিনও তাহার দেখা নাই। ক্রমে একে একে সাত আটদিন কাটিয়া গেল—কোথায় আবদুল ? সারা বাজার ও রাজা উড্‌মাণ্ট ষ্ট্রীটের লোহার দোকান আগাগোড়া খুঁজিয়াও তাহার সন্ধান মিলিল না। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের একজন দোকানদার শুনিয়া বলিল—কত টাকা নিয়েচে আপনার মশাই! আবদুল তো ?···ও মশাই জোচ্চোরের ধাড়ী—আর টাকা পেয়েচেন,···টাকা নিয়ে সে দেশে পালিয়েচে—আপনিও যেমন!···

প্রথমে সে কথাটা বিশ্বাস করিল না। আবদুল সে

রকম মানুষ নয়, তাহা ছাড়া এত লোক থাকিতে তাহাকে কেন ঠকাইতে যাইবে ?

কিন্তু এ ধারণা বেশীদিন টিকিল না। ক্রমে জানা গেল আবদুল দেশে যাইবে বলিয়া যাহার কাছে সামান্য যাহা কিছু পাওনা ছিল, সব আদায় করিয়া লইয়া গিয়াছে দিন-সাতেক আগে। কাঁটাপ্রেকের দোকানের বৃদ্ধ বিশ্বাস-মহাশয় বলিলেন—আশ্চর্য্যি কথা মশাই, সবাই জানে আবদুলের কাণ্ডকারখানা, আর আপনি তাকে চেনেন নি দু-তিন মাসেও ? সেটা জুয়োচোরের ধাড়ী, হার্ডওয়ারের বাজারে সবাই চিনে ফেলেচে, এখানে আর সুবিধে হয় না, তাই গিয়ে আজকাল জুটেচে মেসিনারির বাজারে। কোনো দোকানে তো আপনার একবার জিগ্যেস করাও উচিত ছিল ! হার্ডওয়ারের দালালী করা কি আপনার মত ভালমানুষের কাজ মশাই ? আপনার অল্প বয়েস, অন্য কাজ কিছু দেখে নিন্ গে। এখানে কথা বেচে খেতে হবে, সে আপনার কর্ম্ম নয়, তবুও ভাল যে আটটা টাকার ওপর দিয়ে গিয়েচে—

আট টাকা বিশ্বাস-মহাশয়ের কাছে যতই তুচ্ছ হোক অপুর কাছে তাহা নয়। ব্যাপার বুঝিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিল—গোটা মাসের ছেলে-পড়ানোর দরুণ সব টাকাটাই যে সে তুলিয়া দিয়াছে আবদুলের হাতে ! এখন সারা মাস চলিবে কিসে ! বাড়ি ভাড়ার দেনা। গত মাসের শেষে বন্ধুর কাছে ধার—এ সবের উপায় ?

দিশাহারাভাবে পথ চলিতে চলিতে সে ক্লাইভ ষ্ট্রীটে শেয়ার মার্কেটের সামনে আসিয়া পড়িল। দালাল ও ক্রেতাদের চীৎকার, মাড়োয়ারীদের ভিড় ও ঠেলাঠেলি থর্নিক্রফ্‌ট ছ' আনা, থর্নিক্রফট ছ' আনা, নাগরমল সাড়ে পাঁচ আনা—বেজায় ভিড়, বেজায় হৈ চৈ, বিলাসপুর চিনির কারখানার শেয়ারের বর্ত্তমান দর লইয়া সবাই বেজায় ব্যস্ত। কেমন যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। লালদিঘীর পাশ কাটাইয়া লাটসাহেবের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া সে একেবারে গড়ের মাঠের মধ্যে কেল্লার দক্ষিণে একটা নির্জ্জন স্থানে একটা বড় বাদামগাছের ছায়ায় আসিয়া বসিল।

আজই সকালে বাড়ীওয়ালা একবার তাগাদা দিয়াছে, কাপড় একেবারে নাই, না কুলাইলেও ছেলে-পড়ানোর টাকা হইতে কাপড় কিনিবে ঠিক করিয়াছিল, রুম-মেট তো ধারের জন্য তাগাদার উপর তাগাদা করিতেছে। আবদুল শেষকালে এভাবে ঠকাইল তাহাকে ? চোখে তাহার জল আসিয়া পড়িল—দুঃখদিনের সাথী বলিয়া কত বিশ্বাস করিত যে সে আবদুলকে !

রাত্রি অন্ধকার হয়, বড় দুর্য্যোগ আসে, ক্ষীণ প্রদীপের শিখা কাঁপিতে থাকে অনভিজ্ঞ, তরুণ হৃদয় একেবারে বিভ্রান্ত, দিশাহারা হইয়া পড়ে। তারা জানে না আবার সকাল হইবেই, আবার সূর্য্য উঠিবেই, তখন মনেও হইবে না যে কোনো কালে আকাশভরা দিনের আলো মেঘের আড়ালে ঢাকা ছিল।

অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল। ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে দুপুর, বেলা দেড়টা আন্দাজ কেহ কোনো দিকে নাই, আকাশ মেঘমুক্ত, দূরপ্রসারী নিঃসীম নীল আকাশের গায়ে কালো বিন্দুর মত চিল উড়িয়া চলিয়াছে···দূর হইতে দূরে সেই ছেলেবেলাকার মত ছোট হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া চলিয়াছে···হঠাৎ একটা অপূর্ব্ব ব্যাপার ঘটিল—আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে এক অপূর্ব্ব অদ্ভুত ভাব অপুর মনে আসিল, ঠিক এ ধরণের ভাব কখনো আর তাহার হয় নাই। কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য ? মা তো তাহাকে মুক্তি দিয়া গিয়াছে—সে-ই তো নিজে নিজের চারিদিকে গণ্ডী রচনা করিয়া রাখিয়াছে, কেন এঁদের হাতে স্বেচ্ছায় খাঁচার পাখীর মত বন্দী···এই চারিধারের পরিপূর্ণ মহিমার মধ্যে··এই কম্পমান শ্রাবণ দুপুরের খর রৌদ্র···মাথার উপরে নিঃসীম অনন্ত নক্ষত্রশূন্য নীল আকাশ।...বিদ্যুৎ সূর্য্য··· রাত্রির তারা···প্রেম···মৃত্যুপারের দেশ · মা অনিল · চিররাত্রির অন্ধকারে যেখানে সাঁই সাঁই রবে ধূমকেতুর দল আগুনের পুচ্ছ দুলাইয়া উড়িয়া চলে···কোন্ সৃজনী শক্তির অসীম তেজে লক্ষ আলোকবর্ষ দূরের দেশে নীহারিকাপুঞ্জ দীপ্যমান হইয়া ওঠে, গ্রহ ছোটে, তারারা মিটমিট করে, চন্দ্রসূর্য্য লাটিমের মত আপনার বেগে আপনি ঘুরিয়া বেড়ায়···তুহিন শীতল ব্যোমপথে দূরে দূরে কোথায় দেবলোকের মেরুপর্ব্বত···

চিন্তাটা মনে আসিতেই জগতের চেহারা একমুহূর্ত্তে যেন একেবারে বদ্‌লাইয়া গেল তাহার চোখে···এ কোন্ বিচিত্র জগৎ! কিসের দু-দিনের দৈন্য, দু-দিনের লাভলোকসান লইয়া মন-কসাকসি?—কিসের থর্নিক্রফ্‌ট্‌ আর নাগরমল?

সে এসব চায় না—সে চায় সত্যের শক্তি, যা আসে ঐ বিদ্যুৎ থেকে, নিঃসীম শূন্য থেকে, যার শক্তি ঐ বিরাট সৃজনী শক্তির সঙ্গে এক। শৈশবে নদীর তীরে তার যে দীক্ষা হইয়াছিল, বিরাট অনন্তদেব আশীর্ব্বাদ করুন, অনন্তের সে স্পর্শ যেন প্রাণে তার পৌঁছায়।—

কখন বেলা পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছিল, কখন একটু দূরে একটা ফুটবল টিমের খেলা আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল—একটা বল দুম্ করিয়া তাহার একেবারে সামনে আসিয়া পড়াতে তাহার চমক ভাঙিল। উঠিয়া সে বলটা দুহাতে ধরিয়া সজোরে একটা লাথি মারিয়া সেটাকে ধাবমান লাইন্‌স্‌ম্যানের দিকে ছুঁড়িয়া দিল।

(১৯)

একদিন পথে হঠাৎ প্রণবের সঙ্গে দেখা। দুইজনেই ভারী খুশী হইল। সে কলিকাতায় আসিয়া পর্য্যন্ত অপুকে কত জায়গায় খুঁজিয়াছে, প্রথমটা সন্ধান পায় নাই, পরে জানিতে পারে অপূর্ব্ব পড়া-শুনা ছাড়িয়া দিয়া কোথায় চাকরিতে ঢুকিয়াছে। প্রণব রাজনৈতিক অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বৎসরখানেক হাজত-ভোগের পর সম্প্রতি খালাস পাইয়াছে, হাসিয়া বলিল—কিছুদিন গবর্ণমেণ্টের অতিথি হয়ে এলুম রে, এসেই তোর কত খোঁজ করেচি—তারপর কোথায় চাকরি করিস্ বল তো—বাসা কোথায়?

অপু হাসিমুখে বলিল—খবরের কাগজের আপিসে, সোজা নয়, রয়টারের বাংলা করার ভার আমার ওপর—বুধবারের কাগজে 'আর্ট ও ধর্ম্ম' বলে লেখাটা আমার দেখেস পড়ে।

প্রণব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—তুই ধর্ম্মের সম্বন্ধে লিখতে গেলি কি নিয়ে রে! কি জানিস্ তুই—

—ওখানেই তোমার গোলমাল—ধর্ম্ম মানে তুমি যা বলতে চাইচ, সেটা হচ্ছে collective ধর্ম্ম, আমি বলি ওটার প্রয়োজনীয়তা ছিল আদিম মানুষের সমাজে, আর একটা ধর্ম্ম আছে যা কিনা নিজের নিজের, আমার ধর্ম্ম আমার, তোমার ধর্ম্ম তোমার, এইটের কথাই আমি—যে ধর্ম্ম আমার নিজের তা যে আর কারুর নয়, তা আমার চেয়ে কে ভাল বোঝে?

—বৌ-বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে ওসব কথা হবে না, আয় গোলদিঘীতে দাঁড়িয়ে লেকচার দিবি।

—শুন্‌বি তুই? চল তবে—

গোলদিঘীতে আসিয়া দুজনে একটা নির্জ্জন কোণ বাছিয়া লইল। প্রণব বলিল—বেঞ্চের উপর দাঁড়া উঠে।

অপু বলিল—দাঁড়াচ্চি, কিন্তু লোক জমবে না তো?···তা হ'লে কিন্তু আর একটি কথাও বলব না।

তারপর আধঘণ্টাটাক অপু বেঞ্চির উপর দাঁড়াইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দিয়া গেল। সে এবিষয়ে অত্যন্ত নিষ্কপট ও উদার—যা মুখে বলে, মনে মনে তাহা বিশ্বাস করে। প্রণব শেষপর্য্যন্ত শুনিবার পর ভাবিল—এসব কথা নিয়ে খুঁব তো নাড়াচাড়া করেছে মনের মধ্যে? একটু পাগলামির ছিট্ আছে, কিন্তু ওকে ঐজন্যই এত ভালবাসি—

অপু বেঞ্চ হইতে নামিয়া বলিল—কেমন লাগ্‌ল?···

—তুই খুব sincere, যদিও একটু ছিটগ্রস্ত—

অপু লজ্জামিশ্রিত হাস্যের সহিত বলিল—যাঃ—

প্রণব বলিল—কিন্তু কলেজটা ছেড়ে ভাল কাজ করিস্ নি, যদিও আমি জানি তাই সেদিন বিনয়কে বলছিলাম যে অপূর্ব্ব কলেজে না গিয়েও যা পড়াশুনা করবে, তোমরা দুবেলা কলেজের সিমেণ্ট ঘসে ঘসে উঠিয়ে ফেললেও তা হবে না। ওর মধ্যে একটা সত্যিকার পিপাসা রয়েচে যে—

নিজের প্রশংসা শুনিয়া অপু খুব খুশি—বালকের মত খুশি। উজ্জ্বলমুখে বলিল—অনেকদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা, চল তোকে কিছু খাওয়াইগে—কলেজ মেট্‌দের আর কারুর দেখা পাইনে - আমোদ করা হয় নি কতদিন যে - মা মারা যাওয়ার পর থেকে তো—

প্রণব বিস্ময়ের সুরে বলিল - মাও মারা গিয়েচেন!

—ওঃ, সে কথা বুঝি বলিনি? সে তো প্রায় এক বছর হতে চলল—

সামনেই একটা চায়ের দোকান। অপু প্রণবের হাত ধরিয়া সেখানে ঢুকিল। প্রণবের ভারী ভাল লাগিল অপুর এই অত্যন্ত খাঁটি ও অকৃত্রিম, আগ্রহ-ভরা হাত ধরিয়া টানা। সে মনে মনে ভাবিল—এ রকম warmth আর sincerity ক'জনের মধ্যে পাওয়া যায়? বন্ধু তো মুখে অনেকেই আছে—অপু একটা জুয়েল।

অপু বলিল—কি খাবে বল?…এই বেয়ারা, কি আছে ভাল?

খাইতে খাইতে প্রণব বলিল—তারপর চাকরির কথা বল্—যে বাজার, কি করে জোটালি?

অপু প্রথমে লোহার বাজারের দালালীর গল্প করিল। হাসিয়া বলিল—তারপর আবদুলের মহাভিনিষ্ক্রমণের পরে হার্ডওয়ার আর জমলো না—ঘুরে ঘুরে বেড়াই চাকরি খুঁজে, বুঝ্‌লি?…একদিন একজন বললে বি-এন-আর আপিসে অনেক নতুন লোক নেওয়া হচ্চে—গেলুম সেখানে। খুব লোকের ভিড়, চাকরি অনেক খালি আছে, ইংরিজি লিখ্‌তে পড়তে পারলেই চাকরি হচ্চে। ব্যাপার কি, শুনলাম মাস-দুই হ'ল ষ্ট্রাইক্ চল্‌চে—তাদের জায়গায় নতুন লোক নেওয়া হবে—

প্রণব চা-য়ে চুমুক দিয়া বলিল—চাকরি পেলি?

—শোন্ না, চাকরি তখুনি হয়ে গেল, প্রিন্সিপ্যালের সার্টিফিকেটটাই কাজের হ'ল, মোটামত এক সাহেব ছিল, তখুনি ছাপানো ফর্ম্মে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে দিলে, তারপরে বাইরে এসে ভারী আনন্দ হ'ল মনটাতে। চল্লিশ টাকা মাইনে, যেতে হবে গঞ্জাম জেলায়, অনেক দূর, যা ঠিক চাই তাই—বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটের মোড়ে একটা চায়ের দোকানে বসে মনের খুশিতে উপরি উপরি চার কাফ চা খেয়ে ফেললাম—ভাবলাম এতদিন পরে পয়সার কষ্টটা তো ঘুচল?… আর কি খাবি? এই বেয়ারা, আর দু'টো ডিম ভাজা—না-না খা—

—দুদিন চাকরি হয়েচে বলে বুঝি—তোর সেই পুরনো রোগ আজও—হাঁ তারপর?

—তারপর বাড়ি এসে রাতে শুয়ে শুয়ে মনটাতে ভাল বল্‌লে না—ভাবলাম ওরা একটা সুবিধে আদায় করবার জন্যে ষ্ট্রাইক করেচে, দুমাস তাদেরও ছেলেমেয়ে কষ্ট পাচ্চে, তাদের মুখের ভাতের দলা কেড়ে খাব শেষ কালে?…সারারাত সে একটা যুদ্ধ ভাই—একবার ভাবি যাই চলে, অতদূর কখনো দেখিনি, তা ছাড়া মা মারা যাওয়ার পরে কলকাতা আর ভাল লাগে না, যাই গে—কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত মনে হ'ল এ ভারী স্বার্থপরের কাজ হচ্চে—এ ধরণের স্বার্থপর হতে পারব না কখনো—

—তারপর বুঝি—

—পরদিন দশটার সময়ে ফের ওদের আপিসে গেলাম —ছাপান ফর্ম্মখানা ফেরৎ দিয়ে এলাম, ব'লে এলাম আমার যাওয়ার সুবিধে হবে না—

প্রণব বলিল—তোর মুখ আর চোখ look full of music & poetry. প্রথম থেকে আমি জানি এ একজন আইডিয়ালিষ্ট ছোক্‌রা—তোদেরই দিয়েই তো এসব হবে—তোর এ খবরের কাগজের কাজ কখন?

—রাত ন'টার পর যেতে হয়, রাত তিনটের পরে ছুটি। ভারী ঘুম পায়, এখনও রাত-জাগা অভ্যেস হয় নি তবে সুবিধে আছে, সকাল দশটা এগারোটা পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে নি, সারাদিন লাইব্রেরীতে কাটাতে পারি—

খাওয়া-দাওয়া ভালই হইল। অপু বলিল—জল খাস্‌নে—চল্ কলেজ স্কোয়ারে সরবৎ খাব—বেশ মিষ্টি লাগে খেতে, লেমন স্কোয়াশ খেয়েছিস্—আয়,—

কলেজের অত ছেলের মধ্যে এক অনিল ও প্রণব ছাড়া সে আর কাহাকেও বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই, অনেক দিন পরে মন খুলিয়া আলাপের লোক পাইয়া তাহার গল্প আর ফুরাইতেছিল না। বলিল, গাছপালা যে কতদিন দেখিনি, ইট আর সিমেণ্ট অসহ্য হয়ে পড়েচে। আমাদেব আপিসে একজন কাজ করে, তার বাড়ি হাওড়া জেলা, সেদিন বল্‌চে বাড়ির বাগানে আগাছা বেড়ে উঠেচে, তাই সাফ্ করচে রবিবারে, রবিবারে। আমি তাকে বলি কি গাছ মিত্তির-মশাই? সে বলে—কিছু না, ঝুপি গাছ। আমি বলি—বলুন না কি কি গাছ? রোজ সোমবারে সে বাড়ি থেকে এলে তাকে এই কথা জিগ্যেস করি—সে হয়ত ভাবে, আচ্ছা পাগল!…রাত্রে, ভাই, সারারাত প্রেসের ঘড়ঘড়ানি, গরম, প্রিণ্টারের তাগাদার মধ্যে

আমার কেবলই মিস্তির-মশায়ের বাড়ির সেই ঝুপি বনের কথা মনে হয়—মনে ভাবি কি কি না জানি গাছ। এদিকে চোখ ঘুমে ঢুলে আসে, রাত একটার পরে শরীর এলিয়ে পড়তে চায়, শরীরের বাঁধন যেন ক্রমে আলগা হয়ে আসে, কুঁজোর জল চোখেমুখে ঝাপটা দিয়ে ফুলো ফুলো, রাঙা রাঙা, জ্বালা করা চোখে আবার কাজ করতে বসি—ইলেক্‌ট্রিক্ বাতি যেন চোখে ছুঁচ বেঁধে—আর এত গরমও ঘরটাতে!

পরে সে আগ্রহের সুরে বলিল—একদিন রবিবারে চল্ তুই আর আমি কোনো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাঠে, বনের ধারে ধারে সারাদিন বেড়িয়ে কাটাব—বেশ সেখানেই লতা-কাটি কুড়িয়ে আমরা রাঁধব—বিকেল হবে—পাখীর ডাক যে কতকাল শুনিনি!···দোয়েল কি বৌ-কথা-ক, এদের ডাক ত ভুলেই গিয়েচি, রবিবার দিনটা ছুটি, চল্ যাবি?···এখন কত ফুল ফুটবারও সময়—আমি অনেক বনের ফুলের নাম জানি, দেখিস চিনিয়ে দোবো—

ইহারই দিন-পনেরো পরে একদিন প্রণব আসিয়া বলিল—তোকে নিয়ে যাব ব'লে এলাম—আমার মামাতো বোনের বিয়ে হবে সোমবারে, শুক্রবার রাত্রে আমরা যাব, খুলনা থেকে ষ্টীমারে যেতে হয়, অনেক দিন কোথাও যাস্‌নি, চল আমার সঙ্গে। দিন-চারপাঁচের ছুটি পাবি নে?

ছুটি মিলিল। তাহার কাজে ও লেখায় এডিটার সন্তুষ্ট ছিলেন, এক সপ্তাহ ছুটি দিতে আপত্তি করিলেন না।

ট্রেনে উঠিবার সময় তাহার ভারী আনন্দ। অনেক দিন কলিকাতা ছাড়িয়া যায় নাই, অনেক দিন রেলেও চড়ে নাই। রাত্রে কিছু দেখা না গেলেও সে জানালার কাছে বসিয়া ছেলেমানুষের মত উৎসাহে জানালার বাহিরে মুখ বাহির করিয়া রহিল। সকালবেলা ষ্টীমারে উঠিবার সময় ভৈরবের ওপার হইতে তরুণ সূর্য্য ওঠার দৃশ্যটা তাহাকে মুগ্ধ করিল। নদী খুব বড় ও চওড়া, ষ্টীমার প্রণবের মামার বাড়ির ঘাটে ধরে না, পাশের গ্রামে নামিয়া নৌকায় যাইতে হয়। অপু এ অঞ্চলেই কখনো আসে নাই, অপরিচিত ধরণের গাছপালা, সম্পূর্ণ অপরিচিত দেশ, সে এমন ধরণের সব প্রশ্ন প্রণবকে করিতে লাগিল, যাহাতে মনে হইবার কথা যে এ অঞ্চলে দুই হাত দুই পা বিশিষ্ট মনুষ্যজাতি বাস করে কিনা, সে বিষয়ে তাহার যেন সন্দেহ আছে। নদীর ধারে সুপারির সারি, বাঁশ, বেত বন, অসংখ্য নারিকেল। টিনের চালাওয়ালা গোলা গঞ্জ। অদ্ভুত ধরণের নাম, স্বরূপকাটি, যশাইকাটি।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণ ও খাড়া পশ্চিম, দুদিক হইতে প্রকাণ্ড দুটা নদী আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে, অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিস্তীর্ণ জলরাশি বাঁদিকের উঁচু পাড় ছুঁইয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বাঁকিয়া গিয়াছে, ও-দিক হইতে বড় দল খাড়া তীরের মত সোজা আসিতে আসিতে কিসে বাধা পাইয়া হঠাৎ যেন থামিয়া গিয়াছে, দুই নদীর জল যেখানে একত্র মিলিল, সেখানটাতে জলের রং ঈষৎ সবুজ, এবং সঙ্গমস্থানেরই ও-পারে আধ মাইলের মধ্যে প্রণবের মামার বাড়ির গ্রাম গঙ্গানন্দকাটি।

নদীর ঘাট হইতে বাড়িটা অতি অল্প দূরে। এ গ্রামের মধ্যে ইহারাই অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ।

অনেকবার অপু এ-ধরণের বাড়ির ছবি কল্পনা করিয়াছে, এই ধরণের বড় নদীর ধারে, শহর বাজারের ছোঁয়াচ ও আবহাওয়া হইতে বহু দূরে, কোনো এক অখ্যাত ক্ষুদ্র পাড়াগাঁয়ের সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ, আগে অবস্থা ভাল ছিল, অথচ এখন নাই, নাটমন্দির, পূজার দালান, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ সবই থাকিবে, অথচ সে-সব হইবে ভাঙা, শ্রীহীন, আর থাকিবে প্রাচীন ধনী-বংশের শান্ত মর্য্যাদাবোধ, মান-সম্মান, উদারতা। প্রণবের মামার বাড়ির সঙ্গে সব যেন হুবহু মিলিয়া গেল।

ঘাট হইতে দুই সারি নারিকেল গাছ সোজা একেবারে বাড়ির দেউড়ীতে গিয়া শেষ হইয়াছে, বাঁয়ে প্রকাণ্ড পূজার দালান, ডাইনে হলুদ রঙের কলসী-বসানো ফটক ও ফুলবাগান, দোলমঞ্চ রাসমঞ্চ, নাটমন্দির। খুব জলুস নাই কোনোটারই, কার্ণিস্ খসিয়া পড়িতেছে, একরাশ গোলা পায়রা নাটমন্দিরের মেজেতে চরিয়া বেড়াইতেছে, এক-আধটা ঝটাপট্ করিয়া ছাদে উড়িয়া পলাইতেছে, একখানা ষোল-বেহারার সেকেলে হাঙর-

মুখো পাল্কী অব্যবহৃত অবস্থায় পড়িয়া আছে। দেখিয়া মনে হয় এক সময়ে ইহাদের অবস্থা খুবই ভাল ছিল, বর্ত্তমানে পসার-হীন ডাক্তারের দ্বারসংযুক্ত অনাদৃত পিতলের পাতের মত শ্রীহীন ও মলিন।

'পুলু এসেচে, পুলু এসেচে'—'এই যে পুলু'—'এটী কে সঙ্গে?' 'ও! বেশ, বেশ', ষ্টীমার কি আজ লেট্? ওরে নিবারণকে ডাক ব্যাগটা বাড়ির মধ্যে নিয়ে যা', 'আহা থাক্ থাক্, এস এস দীর্ঘজীবি হও।'

প্রণব তাহাকে একেবারে বাড়ির মধ্যে লইয়া গেল। অপু অপরিচিত বাড়ির অন্দরমহলে যথারীতি অত্যন্ত লাজুক মুখে ও সঙ্কোচের সহিত ঢুকিল। প্রণবের বড় মামীমা আসিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। অপুকে দেখিয়া বলিলেন—এ ছেলেটিকে কোত্থেকে আন্লি পুলু? এ মুখ যেন চিনি—

প্রণব হাসিয়া বলিল—কি করে চিন্বেন মামীমা? ও কি আর বাঙ্গাল দেশের মানুষ?

প্রণবের মামীমা বলিলেন—তা নয় রে কতবার পটে আঁকা দেখেচি, ঠাকুরদেবতার মুখের মত মুখ—এস এস দীর্ঘজীবী হও—

প্রণবের দেখাদেখি অপুও পায়ের ধূলা লইয়া প্রণাম করিল।

—এস এস, বাবা আমার এস—দেশ কোথায় বাবা?

তার পরে উপরের ঘর। ডাব, চিনির সরবৎ, সন্দেশ, ছানা। ছেলেমেয়ের ভিড় পূর্ব্ববৎ। সন্ধ্যার পরে সারাদিনের গরমটা একটু কমিল। দেউড়ির বাহিরে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, চারিদিকে শাঁখ বাজিল। উপরের খোলাছাদে শীতলপাটী পাতিয়া অপু একা বসিয়াছিল, প্রণব ঘুম হইতে সন্ধ্যার কিছু আগে উঠিয়া কোথায় গিয়াছে। কেমন একটা নতুন ধরণের অনুভূতি—সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, কি সেটা? কে জানে হয় তো শাঁখের রব বা আরতির বাজনার দরুণ.. কিংবা হয়ত—

মোটের উপর এ এক অপরিচিত জগৎ। কলিকাতার কর্ম্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ধূমধূলিপূর্ণ আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এক ভিন্ন জীবন-ধারার জগৎ।

নারিকেল শ্রেণীর পত্রশীর্ষে নবমীর জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে এইমাত্র ফুটিল, অপু লক্ষ্য করে নাই। কি কথা যেন সব মনে আসে। অনেক দিনের কথা।

পিছন হইতে প্রণব বলিল—কেমন, গাছপালা গাছ-পালা করে পাগল, দেখলি তো গাছপালা নদীতে আসতে? কি রকম লাগ্‌ল বল শুনি—

অপু বলিল—সে যা লাগল তা লাগ্‌ল—এখন কি মনে হচ্ছে জানিস্ এই আরতি শুনে? ছেলেবেলায় আমার দাদু ছিল, ভক্ত বৈষ্ণব, তাঁর মুখে শুন্‌তাম "বংশী বটতট কদম্ব নিকট, কালিন্দী ধীর সমীর"—যেন—

সিঁড়িতে কাহাদের পায়ের শব্দ শোনা গেল। প্রণব ডাকিয়া বলিল—কেরে? মেনী? শোন—

একটি তেরো চৌদ্দ বছরের বালিকা হাসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—কে, কে, রে? মেয়েটি পিছন ফিরিয়া কাহাদেরদিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া বলিল—সবাই আছে, ননীদি, দাসী-দি, মেজ-দি, সরলা—তাস খেল্‌ব চিলেকোটার ঘরে—

অপু মনে মনে ভাবিল—এ বাড়ির মেয়েছেলে সবাই দেখতে ভারী সুন্দর তো?

প্রণব বলিল—এটি মামার ছোট মেয়ে, এরই মেজ বোনের বিয়ে। ক বোনের মধ্যে সে-ই সকলের চেয়ে সুশ্রী আর ভারী চমৎকার মনটি—মেনী ডাক তো একবার অপর্ণাকে?

মেনী সিঁড়িতে গিয়া কি বলিতেই একটা সম্মিলিত মেয়েলি কণ্ঠের চাপা হাস্যধ্বনি শুনিতে পাওয়া গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটি ষোল-সতেরো বছরের নতমুখী সুন্দরী মেয়ে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। প্রণব বলিল—ও আমার বন্ধু, তোরও সুবাদে দাদা—লজ্জা কাকে এখানে রে? এইটি মামার মেজ মেয়ে অপর্ণা—এরই—

মেয়েটি চপলা নয়, মৃদু হাসিয়া তখনই সরিয়া গেল, অথচ কেমন একটা ধীর, শান্ত ভাব। মুখের ভাব দেবীমূর্ত্তির মুখের মত পবিত্রতা মাখানো, স্নিগ্ধ ধরণের সৌন্দর্য্য। কিছুদিন আগে পড়া একটা ইংরাজী উপন্যাসের একটা লাইন বার-বার তাহার মনে আসিতে

লাগিল—Do they breed goddesses at Slocum Magna ? ··Do they breed goddesses at Slocum Magna ?

এ গাঁতটার কথা অপুর চিরকাল মনে ছিল।

পরদিন প্রণবের সঙ্গে অপু তাহার মামার বাড়ির সবটা ঘুরিয়া দেখিল। প্রাচীন ধনীবংশ বটে। বাড়ির উত্তরদিকে পুরাতন আমলের আবাস বাটী ও প্রকাণ্ড সাত-দুয়ারী পূজার দালান ভগ্ন অবস্থায় পড়িয়া আছে, ওপারে অন্যতম সরিক রামদুর্ল্লভ বাঁড়ুয্যের বাড়ি। পুরাতন আমলের বসতবাটী বর্ত্তমানে পরিত্যক্ত, রাম-দুর্ল্লভের ছোট ভাই সেখানে বাস করিতেন। কি কারণে তাঁহার একমাত্র পুত্র নিরুদ্দেশ হইয়া যাওয়াতে তাঁহারা বেচিয়া কিনিয়া কাশীবাসী হইয়াছেন। কাছারীর নায়েব গোমস্তারা কেহ কেহ সেখানকার বাহিরের ঘরগুলিতে বাস করে। কোনো তরফেই বেশী আয় না থাকায় উভয় সরিক মিলিয়া একযোগে কাছারী করিয়াছেন, খরচ-পত্রের আধাআধি ব্যবস্থা।

এসব কথা প্রণবের মুখেই ক্রমে ক্রমে শোনা গেল।

স্নানের সময়ে সে নদীতে স্নান করিতে চাহিলে সকলেই বারণ করিল—এখানকার নদীতে এ সময়ে কুমীরের উৎপাত খুব বেশী, পুকুরে স্নান করাই নিরাপদ। কুমীর দেখা যায় ? অভাব কি ? সে যদি দুপুরে একবার কষ্ট করিয়া গ্রামের প্রান্তের বড় চড়ার ধারে যায়, দেখিতে পাইবে মাঝে মাঝে কাঠের গুঁড়ির মত কুমীর বালির উপর পড়িয়া আছে।

বৈকালে একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক কাছারী-বাড়ীর বারান্দাতে বসিয়া গল্প করিতেছিলেন, দিন-পনেরো পূর্ব্বে নিকটস্থ কোন গ্রামের জনৈক তাঁতির ছেলে হঠাৎ নিরুদ্দেশ হইয়া যায়, সম্প্রতি তাহাকে রায়মঙ্গলের এক নির্জ্জন চরে অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। ছেলেটি বলে তাহাকে নাকি পরীতে ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, প্রমাণস্বরূপ সে আঁচড়ের খুঁট খুলিয়া কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ ও জায়ফল বাহির করিয়া দেখাইয়াছে, এ-অঞ্চলের ত্রিসীমানায় এ সকলের গাছ নাই—পরী তাহাকে আদর করিয়া কোথা হইতে এগুলি আনিয়া নাকি উপহার দিয়াছিল।

অপু ভাবে—পরীর দেশই বটে, ঠিক একটা পরীরই দেশ। অনেক দিন তাহার অদৃষ্টে এত যত্ন আদর বা এত ভাল খাওয়া-দাওয়া জোটে নাই। প্রণবের মামী-মা কাছে বসিয়া দুপুরে দুজনকে খাওয়াইলেন, এত মাছ, এত দুধ, এমন সুন্দর, ঘরের তৈয়ারী দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রপুলি—জীবনেও কখনো তাহাদের দরিদ্র গৃহস্থালীতে এ সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে নাই। মায়ের সংসারে চালের গুঁড়া, গুড় ও সরিষার তৈলেরই কারবার ছিল বেশী,—চিনি, ক্ষীর, মসলা, কর্পূর, ঘৃত, এসব তো ছিল হাতের নাগালের বাহিরের জিনিষ।

(ক্রমশঃ)
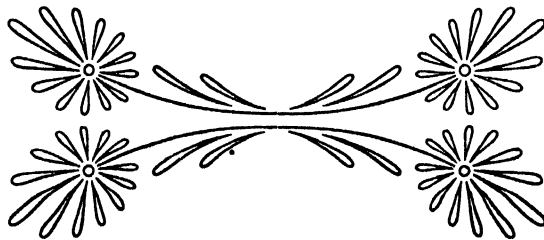
দ্বীপময় ভারত

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

(৯) বলিদ্বীপ—তাম্পাক্-সেরিঙ্

৩১শে আগষ্ট ১৯২৭, বুধবার।—

ক্লুঙকুঙ্ বলিদ্বীপের শিল্পকলার আর প্রাচীন জীবনের একটা কেন্দ্র। প্রাচীন ধরণের মূর্ত্তি আর অন্য ধাতুর জিনিস আর কাপড়-চোপড় এ অঞ্চলে এখনও খুব তৈরী হয়। এই শহরের দক্ষিণে কতকগুলি মন্দির আছে, সেগুলি আমাদের দেখা হ'ল না। ডচ্‌দের দ্বারা যখন বলি-বিজয় হয়, তখন এই ক্লুঙ্কুঙের রাজা সপরিবারে রাজপুতদের জৌহরের মতন 'পুপুতান' ক'রে আত্মাহুতি দেন, এ কথার উল্লেখ পূর্ব্বে ক'রেছি। ইচ্ছে থাক্‌লেও এখানে এক রাত্রের বেশী কাটাতে পারা গেল না।

সাড়ে সাতটায় তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ সেরে আমরা Tampak Sering তাম্পাক্-সেরিঙ্ যাত্রা করলুম। তাম্পাক-সেরিঙ-এর ডাক বাঙলায় কবি আছেন; আমরা ঐ স্থানটি দেখে আস্‌বো, আর কবিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে Gianjar গিয়াঞ্জার-এ আস্‌বো। সারা দিনের মোটর ভাড়া হ'ল পঁচিশ গিলডারে। তাম্পাক-সেরিঙ পাহাড়ের মধ্যে চমৎকার একটা স্থান, নির্জ্জন, শান্তির আবাস-ভূমি। একটা ছোট পাহাড়ের উপরে 'পাসাঙ্গ্রাহান'টা, আশে পাশে খুব গাছ পালা, স্থানটা বেশ ঠাণ্ডা। পাসাঙ্গ্রাহানের সামনে একটা পোস্তার মতন আছে, সেখান থেকে নীচে মাঠ রাস্তা গ্রাম এসবের সুন্দর দৃশ্য দেখা যায়। পাহাড়ে' নদী একটা আছে, আর বলিদ্বীপের বিশেষত্ব পাহাড়ের গা কেটে কেটে ধানের ক্ষেতের স্তর। প্রচুর নারকেল বন। পাসাঙ্গ্রাহান থেকে নীচের উপত্যকায় একটা চমৎকার স্নানের জায়গা দেখা গেল। বলিদ্বীপীয়েরা বড়ই স্নান-প্রিয়। দ্বীপের মধ্যে যেখানে জলের স্রোতের সুবিধে পেয়েছে, সেখানেই ইটের দেয়ালে ঘেরা স্নানাগার বানিয়েছে। কতকগুলি মকর-মুখ বা সাদা নল দিয়ে স্বাভাবিক তোড়ে জল এসে পড়ে, একটা চৌবাচ্চা বা হৌজে; তাতে এক বুক বা এক কোমর বা এক হাঁটু জলে নলের সামনে ব'সে লোকেরা স্নান করে—বাড়তি জল নরদমা বা নালা দিয়ে ক্রমাগত বেরিয়ে যাচ্ছে। এই রকম স্নানাগার মেয়েদের জন্য আর পুরুষদের জন্য আলাদা আলাদা। বলিদ্বীপের সভ্যতার পরিচায়ক একটি সুন্দর জিনিস হ'চ্ছে এই স্নানাগারের ব্যবস্থা।

পাসাঙ্গ্রাহানের সামনে যে জলধারাকে অবলম্বন ক'রে স্নানাগার করা হ'য়েছে, সেটার নাম 'তীর্ত আম্পুল' বা 'আম্পুল তীর্থ'। এটাকে স্থানীয় লোকেরা অতি পবিত্র ব'লে মনে ক'রে থাকে। বিশেষ উৎসব উপলক্ষে দূর থেকে বহু স্নানার্থী এখানে নাকি এসে থাকে। এই তীর্থের পবিত্রতা সম্বন্ধে একটা 'স্থল-পুরাণ' বা স্থানীয় কাহিনী আছে, সেটি বড়ো সুন্দর। একটা সুন্দরী রাজকন্যা তাঁর পিতার একজন যুবক অনুচরকে ভালো বেসেছিলেন। এই অনুচরটাও মনে মনে রাজকন্যাকে ভালো বাসতেন, কিন্তু তাঁর এই বোধ ছিল যে বংশ-গৌরবে তিনি রাজার মেয়ের অনুপযুক্ত, রাজকন্যাকে বিবাহ ক'রলে রাজার মর্য্যাদার হানি হবে; এইজন্য তিনি রাজকন্যার প্রণয়কে প্রভুর প্রতি কর্ত্তব্য হেতু প্রত্যাখ্যান করেন। রাজকন্যা কিন্তু এতে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হন, আর পিতার এই পারিষদের পানীয়ে বিষ মিশিয়ে দেন। যুবক এই বিষ পান করেন, আর তখনই ব্যাপারখানা বুঝতে পারেন। পাছে তাঁর মৃত্যুতে রাজকন্যার নাম জড়িয়ে রাজকন্যার কোনও অপযশ রটে, সেইজন্য তখনি এই তীর্থ-আম্পুলের কাছে বনে গোপনে প্রাণত্যাগ করবার জন্য পালিয়ে আসেন। তাঁর চরিত্রে প্রীত হ'য়ে দেবতারা এই তীর্থের জল খাইয়ে তাঁর প্রাণদান করেন। সেই থেকে এই তীর্থের পবিত্রতা।

এই সুন্দর শান্তিপূর্ণ স্থানে ক'দিন কাটিয়ে কবির শরীর আর মন দুইই ভালো আছে দেখে আমরা আশ্বস্ত

হ'লুম। পাসাঙ্গ্‌হানে কবির সঙ্গে সুরেন বাবু আর কোপ্যারব্যার্গ ছিলেন, আর ছিলেন ডক্টর Goris খোরিস্। সংস্কৃতজ্ঞ এই যুবক পণ্ডিতটির সঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই বাঙলির শ্রাদ্ধক্ষেত্রে দেখা হ'য়েছিল। এই দু তিন দিন ইনি কবির সঙ্গে আছেন। ইংরেজী ভালো ব'লতে পারেন না, কিন্তু কবিকে দুচারটি বিষয়ে যে প্রশ্ন করেন, তাথেকে এঁর আন্তরিকতা আর মানসিক গভীরতা দেখে কবি খুব খুশী হ'য়েছেন। ডক্টর খোরিস বলিদ্বীপীয়দের মতন পোষাক পরে র'য়েছেন দেখলুম, গায়ে কোট জামা, মাথায় রঙীন রুমাল বাঁধা, পরণে রঙীন লুঙ্গী, পায়ে চাপলি জুতো।

তাম্পাক্-সেরিঙ্—গ্রাম ও স্নানাগার
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

খাস তাম্পাক-সেরিঙ স্থানটী পাসাঙ্গ্‌হান থেকে কিছু দূরে, গ্রাম ছাড়িয়ে, একটি পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনীর ধারে। এখানকার দ্রষ্টব্য, সমগ্র বলিদ্বীপের মধ্যে একটী অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার—পাহাড়ের গা কেটে তৈরী কতকগুলি মন্দির। মন্দির না ব'লে, সমাধি-স্থান আর বিহার বলাই ভালো। পাসাঙ্গ্‌হান থেকে আমরা মোটরে ক'রে গ্রামের ভিতর দিয়ে গেলুম। বড়ো সড়কে গাড়ী রেখে, রাস্তার বাঁ দিক দিয়ে একটী চলা-পথ ধ'রে আমরা চ'ললুম। খোরিস আর কোপ্যারব্যার্গ আমাদের পথ প্রদর্শক হ'য়ে চ'ললেন, সঙ্গে স্থানীয় লোকও জনকতক জুটে গেল। উঁচু নীচু পথ, দু এক জায়গায় পাথরের ধাপ ক'রে দেওয়া। ঘন গাছ-পালা, দু পাশের বাঁশ-ঝাড় আর অন্য গাছের ডাল কখন কখন মাথায় ঠেকে। খানিকটা এই ভাবে গিয়ে, আমরা পাহাড়ে' নদীটার পাশে এসে পৌঁছুলুম। চমৎকার দৃশ্য এখানকার; বড়ো বড়ো পাথরের চাবড়ার আশ-পাশ দিয়ে নদীটী নৃত্যচ্ছন্দে
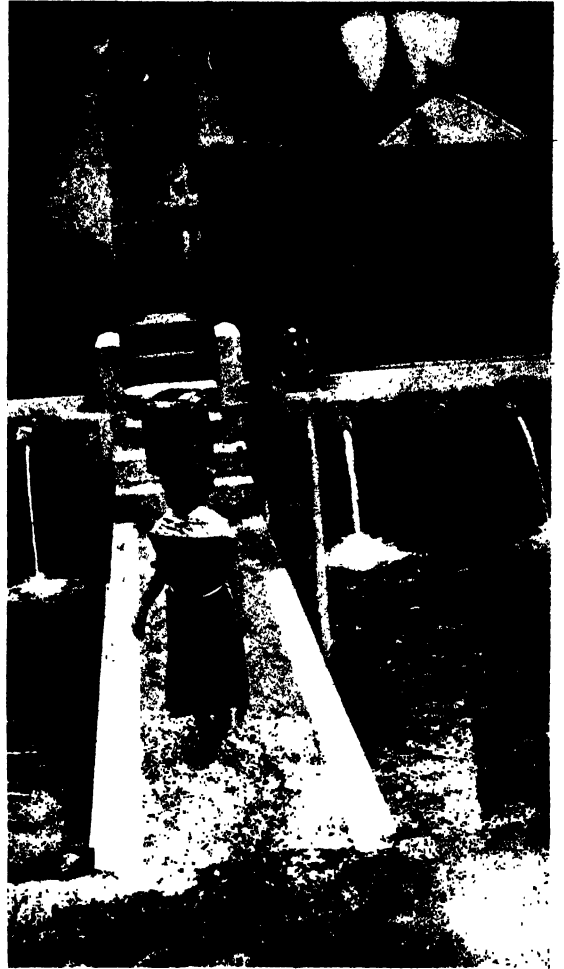
বলিদ্বীপের স্নানাগার
(শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কর কর্ত্তৃক গৃহীত)

ঝঙ্কার তুলে চ'লেছে; কতকগুলি বড়ো বড়ো গাছ আছে; কাছে সামনেই নদীর ওপারে পাহাড়ের গা, তার পাথর কেটে কুলুঙ্গীর মতন জায়গা ক'রে নিয়ে পাঁচটী মন্দিরের কাঠামো পাহাড়ের গায়ে খোদা হ'য়েছে। পাহাড়ের পিছনে নারকেল বন, আর চারিদিক সবুজে ভরা—

ধানের ক্ষেত, বাগান। একটা বাঁশের সাঁকো দিয়ে নদীটা পেরিয়ে আমরা এই মন্দিরের মধ্যে এসে পৌঁছুলুম

বলিদ্বীপের অভিজাত বংশের কন্যা

আধুনিক বলিদ্বীপীয় রীতির ছোটো ছোটো কতকগুলি ইমারত আছে, পাহাড়ের সামনেই একটু উঠানের মতন স্থান সেই খানে। পাহাড়ের গায়ে যে পাঁচটী মন্দিরের চিত্র খোদাই করা হ'য়েছে, সেগুলি প্রমাণ আকারের; ডচ পণ্ডিতদের মতে সেগুলি স্থানীয় রাজাদের সমাধি। প্রাচীন যবদ্বীপীয় অক্ষরে দুএক ছত্র ক'রে লেখা আছে, আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। চিত্রিত মন্দিরগুলি যবদ্বীপের প্রাচীন যুগের মন্দিরের মতো। বলিতে অন্যত্র আর এমনটী নেই। এই খোদাই-করা মন্দিরের চিত্র খ্রীষ্টীয় দশম শতকের ব'লে ডচ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন। এই পাহাড়টীর নাম হ'চ্ছে Goenoeng Kawi গুনুঙ কাউই (বা কবি)। সমাধিমন্দিরগুলির পাশে পাহাড় কেটে কতকগুলি অনুচ্চ গুহা তৈরী করা হয়েছে। গুহাগুলি ছোটো, অল্প পরিসর, অনুচ্চ। স্থানীয় প্রবাদ

তাম্পাক্-সেরিঙ্-এর মন্দির
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

অনুসারে, এই গুহাগুলি একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিতের সমাধি-মন্দির। ডচ্ প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অনুমান করেন যে এগুলিতে একটী বৌদ্ধ বিহার ছিল।

তাম্পাক্-সেরিঙ-এর গুহার সামনে
(শ্রীযুক্ত বাকে-কর্ত্তৃক গৃহীত)

গুহাগুলির সামনে কেবল ধানের ক্ষেত; পাহাড়ের গায়ে, স্তরে স্তরে ক্ষেতে ধান হয়ে র'য়েছে; পাহাড়ে'

নদীটীর অবিশ্রান্ত কলধ্বনির সঙ্গে ঢেউ-খেলানো ধানের শীষের মধ্য দিয়ে হাওয়া যেন ঐক্যতানে বাঁশী বাজিয়ে চ'লেছে। অতি মনোরম দৃশ্য; পাহাড়ের ধারে যেন সজীব সবুজের আর জলের এক অপূর্ব্ব সমাবেশ—এ দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়ে গেলুম।

পাসাঙ্গ্রাহানে ফিরে এসে স্নান সেরে নিলুম। গতকল্য গিয়াঞারের Regent রেখণ্ট, ইনি স্থানীয় রাজা বা জমীদার, ঐ অঞ্চলের ডচ Controleur কণ্ট্রোলারের সঙ্গে তাম্পাক-সেরিঙ্-এ এসে কবিকে নিমন্ত্রণ ক'রে গিয়েছেন, তাঁর বাড়ীতে কবিকে গিয়ে অতিথি হ'তে হবে—অন্ততঃ একদিনের জন্য। কবি, কোপ্যারব্যার্গ, দ্রেউএস, আর আমি, এই ক'জনে গিয়াঞারের দিকে যাত্রা ক'রলুম, গিয়াঞারে সেই দিন আর রাতটি কাটিয়ে পরের দিনে আরও দক্ষিণে Badoeng বাদুঙ্ বা Den Pasar দেন্-পাসার-এ যাত্রা ক'রবো। সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু ডক্টর খোরিস, আর বাকেরা আমাদের সঙ্গে গিয়াঞারে না এসে Oeboed উবুদ্-এ গেলেন, সেখানকার রাজার সঙ্গে দেখা ক'রে আস্‌বেন; এঁরা গিয়াঞারে থাকবেন না। পথে Pedjeng পেজেঙ্ ব'লে একটী গ্রাম প'ড়ল। শুন্‌লুম, এই গ্রামে খ্রীষ্টীয় অষ্টম নবম শতকের কতকগুলি সংস্কৃত তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, গ্রামটী নাকি প্রাচীনকালে এখানকার সভ্যতার একটী কেন্দ্র ছিল।

গিয়াঞারের রাজার পুরা নাম আর পদবী হ'চ্ছে—Hida Anake Agoeng Ngoerah Agoeng হিডা আনাকে আগুঙ্ ঙুরাঃ আগুঙ্। বেশ সুপুরুষ গৌরবর্ণ ব্যক্তি, কারাঙ্-আসেম-এর রাজার সঙ্গে তুলনা ক'রলে বেশ দীর্ঘকায় বলিষ্ঠ ব'লেই বোধ হয়। তবে বুদ্ধিতে আর শিক্ষায় কারাঙ্-আসেম-এর রাজাকেই আমাদের বেশী ভালো লেগেছিল। গিয়াঞার-এর পুরী বা

পুরী বা প্রাসাদ দ্বারে দণ্ডায়মান গিয়াঞারের রেখণ্ট্
(পদতলে উপবিষ্ট পানের চোকা বাটা হাতে তাম্বূলকরঙ্কবাহী,
তৎপার্শ্বে তরবারী-বাহক, এবং পশ্চাতে অন্য একজন ভৃত্য)

রাজবাটীতে এসে উপস্থিত হ'লুম, দুপুরের দিকে। রাজবাড়ীটী বেশ প্রকাণ্ড, কতকগুলি মহল নিয়ে। সাবেক বলিদ্বীপীয় প্রথায় প্রস্তুত। গিয়াঞ্ঞার গ্রামখানির কেন্দ্রস্থান হ'চ্ছে এই রাজপুরী। রাজবাটীটি একটী চৌরাস্তার উপরে। সামনেই রাস্তার ওপারে একটা প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী খড়ে ছাওয়া আটচালা, তার ছাত আবার মন্দিরের মেরুর মতন থাকে থাকে উঠে গিয়েছে। এই আটচালাটা শুনলুম বিশেষ উৎসব উপলক্ষে মোরগের লড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। মোরগের লড়াই বলিদ্বীপীয়দের একটী প্রধান ব্যসন। প্রত্যেক যুবক বা বিশিষ্ট লোকের একাধিক লড়াইয়ে' মোরগ আছে। বলিদ্বীপের গ্রামে প্রত্যেক বাড়ীতে এই সব মোরগ অতি যত্নের সঙ্গে পোষে, আর এদের মস্ত মস্ত চুবড়ীর মত খাঁচায় ঢেকে রেখে দেয়; নইলে ছাড়া পেলেই পরস্পর মারামারি ক'রবে; বলিদ্বীপের গ্রামগুলি এই সব মোরগের আওয়াজে নিত্য মুখরিত। বাজী রেখে লড়াই হ'ত, আর এই বাজীতে আগে অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হ'ত, আর হার-জিত নিয়ে খুনোখুনিও হ'ত। তাই ডচেরা আগেকার মতন আর যখন-তখন লড়াইয়ের খেলা হওয়া আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছে, খালি বৎসরে কতকগুলি বিশেষ পর্ব্বদিনে খেলা হ'তে পারে। কিন্তু ডচ পুলিসের চোখের আড়ালে লোকে লুকিয়ে-চুরিয়ে খুবই এই লড়াই করায়। আমাদের এই মোরগের লড়াই দেখার সুযোগ হয় নি। সমগ্র মালাই জাতির মধ্যে এই লড়াই একটা অত্যন্ত সাধারণ, জনপ্রিয় বস্তু। যবদ্বীপেও খুব ছিল, এখন অল্প কিছু ক'মেছে শোনা যায়; খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতকের গোড়ায় যবদ্বীপের এক বিখ্যাত রাজার উপনাম-ই ছিল Hayam Woeroek হায়াম্ বুরুক্ বা লড়াইয়ে' মোরগ। রাজবাটীর কোণাকুনি, চৌরাস্তার ওপারে, স্থানীয় বাজার; খানিকটা খোলা জায়গায় বলিদ্বীপের সহজ-সুন্দরী মেয়েরা ফল-ফুলুরী মাছ শাক-শবজীর পসরা নিয়ে বসে; আর চারি দিকে দোকান—চীনাদের দোকানই বেশী, আর তাছাড়া দু একখানা গুজরাটী খোজাদেরও দোকান আছে।

রাজা আমাদের স্বাগত ক'রে নামিয়ে নিলেন। তাঁর প্রাসাদের বহির্বাটীতে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য কতকগুলি ঘর আছে, কবির আর ব্রেউএসের আর আমার থাকবার ব্যবস্থা হ'ল এক একখানি ঘরে। ঘরগুলি বলিদ্বীপীয় কায়দায় তৈরী, মিশ্র ইউরোপীয় ভাবে সাজানো। আলাদা কল-ঘর গোসলখানা সব আছে। মোটরে তোরণ-দ্বার পার হ'য়ে একটা আঙিনা; তার মাঝে একটী ফোয়ারা, সঙ্গে ফুলগাছ; আঙিনায় ঢুকে বাঁদিকে দালানযুক্ত কতকগুলি ঘর, স্লেটের টালি ঢাকা, এগুলি নিয়ে রাজার বৈঠকখানা আর খাস কামরা। গিয়াঞ্ঞারের রাজাকে কারাঙ-আসেমের চেয়ে বেশী অবস্থাপন্ন ব'লে মনে হ'ল।

একটু বিশ্রাম ক'রে মধ্যাহ্ন ভোজন সারা গেল। স্থানীয় ডচ্ কণ্ট্রোলার শ্রীযুক্ত Boersma বুর্স্‌মা উপস্থিত ছিলেন। বেশ লোক ইনি।

তারপরে এখানেও কারাঙ-আসেমের মতন পদণ্ডদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। রাজার নির্দ্দেশ মত গ্রামের পদণ্ডরা এসে উপস্থিত হ'লেন। ব্রেউএস পূর্ব্ববৎ দোভাষীগিরি ক'রলেন। এখানকার পুরোহিতদের নানা প্রশ্নের মধ্যে, আমাকে আসন পেতে ব'সে সন্ধ্যা-আহ্নিক আর পূজার সাধারণ অনুষ্ঠানগুলি দেখাতে হ'ল। আমাদের বৈদিক সন্ধ্যার মতন কোনও অনুষ্ঠান এদেশের ব্রাহ্মণদের মধ্যে আর প্রচলিত নেই—তান্ত্রিক পূজাই এঁদের অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। পদণ্ডরা গায়ত্রী মন্ত্রের নাম শুনেছেন, কিন্তু গায়ত্রী মন্ত্র কেউ জানেন না। ব্রাহ্মণের পক্ষে গায়ত্রী জানাটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় একথা স্বীকার ক'রলেন; আর আমাকে এঁরা অনুরোধ ক'রলেন যে আমি মন্ত্রটা এঁদের লিখে দিলে এঁরা ভারী অনুগৃহীত হবেন। বলিদ্বীপের অক্ষর জানি না—দেবনাগরীতে গায়ত্রী লিখে তারপরে এঁদের কাছে সুপরিচিত ডচ্ বানানে রোমান প্রত্যক্ষর লিখে দিলুম—Ong। Tat sawitoer warenyam। bhargo dewasya dhimahi। dhijo jo nah pratjodajat॥ প্রত্যেক শব্দের আর সমগ্র মন্ত্রটীর অর্থ ইংরিজিতে লিখে ব্রেউএসকে বুঝিয়ে দিলুম। ব্রেউএস তার মালাই অনুবাদ ক'রে

অর্জ্জুনের তপোভঙ্গের জন্য অপ্সরাগণের প্রয়াস

বরিশালের পট—শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সংগ্রহ হইতে

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

লিখে, এঁদের বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে ডচ্ পণ্ডিতের মধ্যস্থতায় সাবিত্রী-দান হ'ল। এঁরা কতকগুলি তাল-পত্রের পুঁথি দেখালেন; আমরা তা প'ড়তে পারলুম না। বেশ পরিষ্কার মাজা তাল-পাতায় লোহার 'লেখন' দিয়ে অক্ষরগুলি লেখা। ঠিক উড়িয়া বা তেলুগু বা সিংহলী পুঁথির মতন। চারখানি পত্রের একখানি ছোটো পুঁথি পদণ্ডরা আমায় উপহার দিলেন। সংস্কৃত পুঁথি এই রাজার কাছে কিছু নেই, সব বলিদ্বীপীয় আর প্রাচীন যবদ্বীপীয় ভাষার পুঁথি।

রাজা ব'সে ব'সে সব শুনছিলেন আর দেখছিলেন। মহাভারতের কথা উঠ্ল। তিনি ব'ল্লেন, মহাভারতের সমগ্র আঠারো পর্ব্ব বলিদ্বীপে নেই, অন্ততঃ ভাষায় নেই; ভারতবর্ষ থেকে তাঁকে আমি সমগ্র মহাভারত পাঠিয়ে দিতে পারি কি না। সভা, বন, মৎস্য, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, অনুশাসন, রাজধর্ম্ম—এইগুলি ওদেশে পাওয়া যায় না। রাজাকে দেখলুম যে, তিনি সাধারণ দেবতাবাদে বিশ্বাসী। দার্শনিক চিন্তার ধার ধারেন না। দশ লোকপালের কথা হ'ল; ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ—এঁদের মন্ত্র বা স্তব রাজার বা তাঁর পুরোহিতদের জানা নেই; রাজা আমাকে অনুরোধ ক'রলেন যেন আমি দেশে ফিরে গিয়ে 'ইন্দ্রাস্টাউআ' (ইন্দ্রস্তব), 'ইয়ামাস্টাউআ' (যমস্তব) 'কেরাস্টাউআ' (কুবেরস্তব) আর 'উআরুনাস্টাউআ' (বরুণ স্তব) লিখে পাঠিয়ে দিই। দেশে ফিরে আমি এই সব দেবতার ধ্যান আর প্রণাম রোমান অক্ষরে লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিলুম; আর সংস্কৃত মহাভারত তো ওখানে কেউ প'ড়তে পারবেন না, তাই ছবিওয়ালা বাঙলা মহাভারত আর রামায়ণ পাঠিয়ে দিয়েছিলুম। রাজা আমাদের মাঝে মাঝে দুএকটি প্রশ্ন ক'রেছিলেন—খুব গভীর ভাবের প্রশ্ন সেগুলি নয়। 'ইন্দ্র-লোক কোথায়?' 'নক্ষত্রগুলি কি?' এই ধরণের প্রশ্ন। প্রশ্ন ক'রে ইনি উত্তরের অপেক্ষা রাখেন না অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেলেন। ভাবে মনে হ'ল, পুরাণোক্ত বর্ণনাকে তিনি
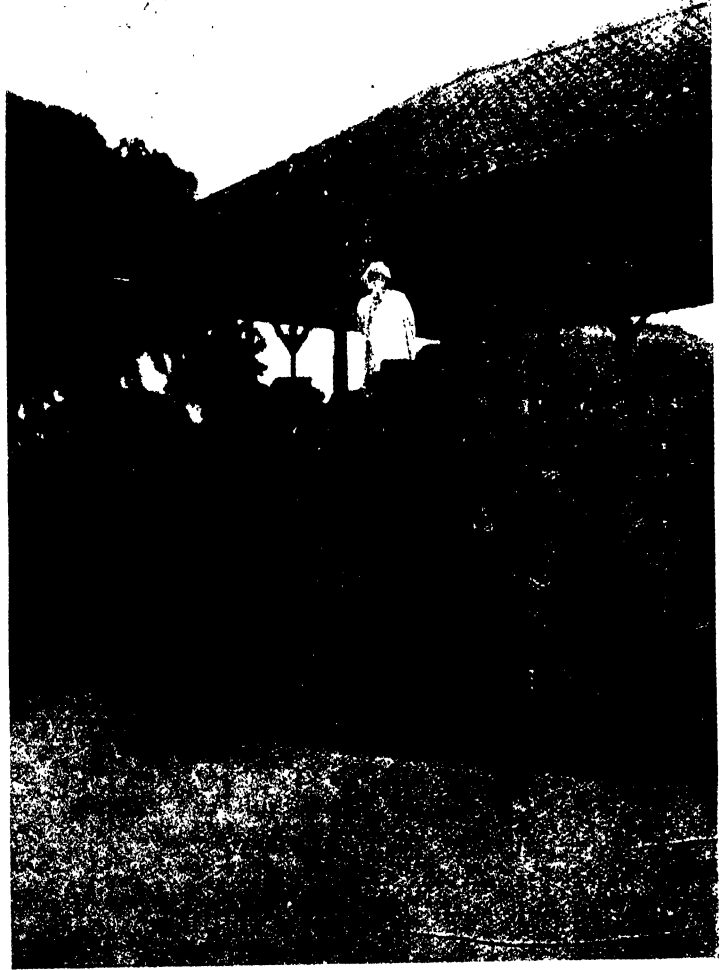
গিয়াঞারের পুরীতে রবীন্দ্রনাথ
(শ্রীযুক্ত বাকে কর্ত্তৃক গৃহীত)

তোপেঙ্ বা মুখস-পরা অভিনেতার দল

বাস্তব সত্য ব'লেই গ্রহণ ক'রেছেন—তাইতেই তিনি সুখী, অন্য জিজ্ঞাসা তাঁর মনে আসে না।

রাজবাড়ীর আঙিনার লাগোয়া সদর তোরণ-দ্বারের পাশেই বড় রাস্তার উপরে একটী একতালার সমান উঁচু Pavilion বা ছতরী আছে—বেশ প্রশস্ত স্থান এটী, চারিদিকে খোলা—এখানে ব'সে ব'সে সামনের চৌরাস্তায় লোক-চলাচল দেখা যায়, রাস্তার ওধারে মোরগ-লড়াইয়ের আটচালা আর বাজারও বেশ দেখা যায়। আমাদের আলাপ-টালাপের পরে এই Pavilionএ পদণ্ডদের খাওয়ানো হ'ল। কলাপাতায় ভাত তরকারী দিয়ে গেল, এঁরা বাঁ হাতে পাতাটা ঠোঙার মতন ক'রে তুলে ধ'রে ডান হাতে খেতে লাগ্‌লেন। পদণ্ডদের 'সেবা'র পরে, ছতরীটা সাফ ক'রে দেওয়া হ'ল, কবির জন্য একখানা চেয়ার দিলে, তিনি ছতরীর উপরে উঠে ব'সে রাস্তার লোকজন একটু দেখতে লাগলেন। এদেশের গণ্ড-গ্রামের জীবন প্রবাহের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয় করবার এইই ছিল প্রকৃষ্ট উপায়—ভীড়ের মধ্যে নেমে গিয়ে দেখা তাঁর বয়স আর স্বাস্থ্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বিকালটা এই ভাবে আলোচনায় আর বিশ্রামে কেটে গেল।

সন্ধ্যায় বাকেরা, ধীরেনবাবু, সুরেনবাবু, কোপ্যারব্যাগ আর খোরিস্ উবুদ থেকে ফিরে এলেন। কবিকে দেখাবার জন্য গিয়াঞরের রাজা সন্ধ্যায় নাটক বা যাত্রার আয়োজন ক'রেছিলেন। মুখস প'রে এই নাটকের অভিনয় হয়, এই মুখস-পরা অভিনয়ের নাম Topeng তোপেঙ। যাত্রার অভিনয় হ'ল, আমরা যে বাইরে-বাড়ীর মহলে ছিলুম, তার পাশে আর একটা মহলের প্রশস্ত আঙিনায়। অভিনয় দেখবার জন্য গ্রামের ছেলে বুড়ো মেয়েদের খুবই ভীড় হ'য়েছিল। একপাশে তাদের যন্ত্রপাতি নিয়ে 'গামেলান্' বাদকেরা ব'সে; অভিনেতাদের জন্য মাঝে খানিকটা

জায়গা খালি রাখা; লম্বালম্বি সার দিয়ে কতকগুলি চেয়ার পাতা, রাজা, কবি,আর অন্য অভ্যাগতদেরর বসবার জন্য; আর অভ্যাগতদের পিছনে আর সামনে আসরের পাশে স্থানীয় লোকেরা আর রাজার অনুচরেরা দাঁড়িয়ে'। মিষ্টি গামেলানের বাজনা শুরু হ'তে আমরা গিয়ে ব'সলুম। নাটক অভিনয় হ'ল, অনেকটা আমাদের যাত্রার মতন। খালি এই পার্থক্য যে, অভিনেতারা মুখস প'রে। মুখস প'রে যাত্রা বা নাটক করার রীতি ভারত থেকেই গিয়েছে। হয় তো বা মুল অস্‌ট্রিক জাতির মধ্যেই এই ধরণের চিত্তবিনোদন বা ধর্ম্মানুষ্ঠানের উপায় উদ্ভূত হ'য়েছিল। এখনও পশ্চিমের রামলীলায় রাক্ষস আর বানরদের মুখে এই রকম মুখস পরবার, আর রাম সীতা লক্ষ্মণের মুখে বর্ণ-চুর্ণ মাখিয়ে অভিনয় করার প্রথা প্রচলিত আছে। আসাম অঞ্চলে মুখস প'রে অভিনয় এখনও হ'য়ে থাকে,—ধর্ম্মোৎসবের অঙ্গ হিসাবে, বৈষ্ণব সত্রগুলিতে; আসামী ভাষায় মুখসকে 'ছোঁ' আর মুখস প'রে নাট্টাভিনয়কে 'ভাওনা' বলে; বাঁশের চাঁচাড়ীর কাঠামের উপর এই সব মুখস চিত্রিত হয়। আবার ওদিকে সুদূর কেরল দেশে মালাবারেও মুখস প'রে বা মুখের উপরই রঙচঙ লাগিয়ে মুখস এঁকে 'কথা-কলি' ব'লে একরকম নাটকের অভিনয় প্রচলিত আছে; মুখস প'রে বা মুখসের পরিবর্ত্তে মুখে রঙ মেখে নাচও কেরলের সংস্কৃতির একটী বিশিষ্ট বস্তু। বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপের মুখসগুলি কাঠের তৈরী হয়; হালকা শক্ত কাঠে কুঁদে তৈরী, তাতে নানান্ রকম রঙ চঙ করা থাকে, চোখ দুটোতে ছেঁদা থাকে তাই দিয়ে অভিনেতা দেখতে পায়, আর মুখসের ভিতরদিকে একটা ক'রে চামড়ার জীভ মতন থাকে, অভিনেতা সেটা নিজের মুখের ভিতরে পুরে মুখসটী ঠিক ক'রে আটকে রাখে। যবদ্বীপ বলিদ্বীপের এই সব কাঠের মুখস এদের শিল্পের একটা চমৎকার নিদর্শন-বস্তু হ'য়ে থাকে। মুখস পরে অভিনয় জাপানের প্রাচীন 'নো' নাটকের একটি অতি বিশিষ্ট ব্যাপার; জিনিসটী চীনে ও আছে, আর চীনের নাটকে মুখে নানান্ রঙ মেখেও মুখসের কাজ চালায়। এছাড়া কম্বোজ আর শ্যাম দেশেও আছে।

নাটকটী হ'চ্ছিল, শুনলুম তার আখ্যান-বস্তু যবদ্বীপের প্রাচীন ঐতিহ্য নিয়ে—মজপহিত নগরের রাজা হর্ষ-বিজয়ের চরিত্রের কোন ঘটনা অবলম্বন ক'রে। সবটা ভালো বুঝতে পারলুম না। নাটকের আরম্ভে জন আষ্টেক সঙ্ এল,এরা বেশ হাস্যরসের অবতারণা ক'রতে লাগ্‌ল— এদের কথাবার্ত্তা একটুও বুঝতে পারছিলুম না, তবে এদের কথায় শ্রোতৃবর্গের ঘন ঘন হাসি থেকে বুঝলুম যে অভিনয়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধি ভালোই হ'চ্ছে—যদিও আমাদের কাছে একটু বেশী অঙ্গভঙ্গি যুক্ত, একটু খোঁচা মেরে আর চিমটী কেটে হাসানো গোছ লাগ্‌ছিল। নাটকের কথাবার্ত্তা চ'ল্‌ছে; সঙ্গে সঙ্গে গামেলান বাজনার ও বিরাম নেই। দর্শক আর শ্রোতারা নিবিষ্ট চিত্তে শুন্‌ছিল। একটা বিষয় বেশ লক্ষ্য ক'রলুম—আর ব্যাপারটী কবিরও দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছিল—এত মেয়ে-পুরুষ কাচ্ছা-বাচ্ছা এসেছে, কিন্তু হৈচৈ চেঁচামেচি কিছুই নেই, ছেলেপুলেরাও বেশ গম্ভীর ভাবে ভব্যতার সঙ্গে ব'সে বা দাঁড়িয়ে। আসরে বাজে গোলমাল মোটেই নেই। জা'তটাকে বেশ সুসভ্য আর আত্মসমাহিত ব'লে বোধ হ'ল, এদের চরিত্রের এই গুণটী বারবার রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ অর্জ্জন ক'রলে।

যাত্রা চ'ল্‌তে লাগল, ঘণ্টাখানেক পরে আমরা আহার ক'রতে গেলুন। রাজার অতিথি হয়ে এসেছেন একজন ডচ্ চিত্রকর—Charles Eugene Henri Sayers। গুণী যুবক; বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ বড়ো ভালো লেগেছে, বাতুঙ-এ গত দুমাস ধ'রে আছেন, বলিতে আরও ছ-সাত মাস থাকবেন, খুব ছবি আঁকছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে বেশ খুশী হওয়া গেল।

আহারের মধ্যে দ্রেউএস্ রাজাকে ধন্যবাদ দিয়ে আর কবিকে সংবর্দ্ধনা ক'রে মালাই ভাষায় একটি বক্তৃতা দিলেন। রাজা তার উত্তর দিলেন, দ্রেউএস আমাদের জন্য ইংরিজিতে তরজমা ক'রে দিলেন। রাজার প্রধান বক্তব্য—বলিদ্বীপের লোকেরা আর ভারতের লোকেরা একই বংশের; ভারতের সঙ্গে এই সংযোগ তাঁদের কাছে গৌরবের বস্তু; কবির আগমনে এই গৌরববোধ আর তদনুসারে কার্য্য ক'রে যাওয়া বলিদ্বীপের লোকদের মধ্যে

যেন প্রসার লাভ করে। কবিকে এর উত্তরে কিছু ব'লতে হ'ল—তিনি ব'ললেন যে তাঁর এই বলি আর যবদ্বীপভ্রমণ পিতৃপুরুষদের ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধের জন্যই তিনি ক'রতে এসেছেন ; যে প্রাচীন ভারত এই সমস্ত দূর দেশকে ভারতের আপনার জন ক'রে তুলেছিল, তাঁর ভ্রমণ সেই ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনের জন্য, আর সেই

পুঙ্গব-পুত্রী
(লেগোঙ্-নৃত্যে এইরূপ পোষাক পরে)

ভারতকে বোঝবার জন্য—আর সেই সংস্কৃতিকে আবার এদেশে আর ভারতবর্ষে সুদৃঢ় ক'রে তোলবার জন্য।

খাওয়ার পরে রাজার বৈঠকখানা আর অতিথিশালার বা'রবাড়ীতে আর একটী অনুষ্ঠান হ'ল—Legong লেগোঙ নামে এক রকমের নাচ। দুটী ছোটো ছোটো মেয়ে খুব জমকালো কিংখাবের পোষাক প'রে আর মাথায় সোনার আর ফুলের মুকুট প'রে নাচ্‌লে। এই নাচে মেয়ে দুটীর হাতে দু'খানি জাপানী পাখা ছিল। একটুখানি quaint বা অদ্ভুত ভাবের লাগলেও এই পাখা হাতে গম্ভীর ভাবে ক্ষুদে' ক্ষুদে' দুটী মেয়ের নাচ, মোটের উপর বেশ সুরুচিকর আর সুন্দর জিনিস ব'লে বোধ হ'ল। এই নাচ নাকি বারো বছরের উপরের মেয়েরা নাচে না।

সুরেনবাবু, ধীরেনবাবু, কোপ্যারব্যার্গ, খোরিস, এঁরা নাচ দেখে মোটরে ক'রে গেলেন ক্লুঙ্‌কুঙ-এ, সেখানকার পাসাঙ্গ্রাহানে থাকবেন, আর ক্লুঙ্‌কুঙ থেকে সুরেনবাবু বিশ্বভারতীর কলাভবনের জন্য কিছু প্রাচীন আর আধুনিক শিল্পদ্রব্য কিনবেন। রাজা তারপরে রাত্রির মতন কবির কাছথেকে বিদায় নিলেন। আমরা যখন শুতে গেলুম তখন রাত বারোটা।

১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৭, বৃহস্পতিবার।—

সকালে কবি রাজবাড়ীর উঁচু ছতরীতে ব'সে লিখতে লাগলেন, আর নীচেকার বহমান জীবনস্রোতও দেখতে লাগলেন। বেশ ঝির ঝিরে হাওয়া বইতেছিল, ব'সে সময় কাটাবার পক্ষে জায়গাটী বেশ। রাস্তার লোকেরা সসম্ভ্রমে ভারতবর্ষথেকে আগত মহাগুরু ব'লে তাঁরদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে যাচ্ছিল। কিন্তু এদের সহজ ভদ্রতাজ্ঞান এমনি যে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখবার জন্য এরা মেটেই ভীড় ক'রছিল না। রাজার সঙ্গে একত্র প্রাতরাশ সারা গেল। ভারতবর্ষ আর বলির হিন্দুধর্ম্ম, বলিদ্বীপের সাহিত্য, এই সব বিষয়ে আলাপ হ'ল। খেতে খেতে শুন্‌লুম, হিন্দু শূদ্রদের মধ্যে গোমাংস ভক্ষণ একেবারে নিষিদ্ধ নয়,তবে উচ্চ জাতির লোকেরা খায় না। বলিদ্বীপের ভাষায় প্রাচীন যবদ্বীপের কবি-ভাষার মতন নানা সংস্কৃত ছন্দ প্রচলিত। কবির কাছে রাজা সংস্কৃত শ্লোক শুনতে চাইলেন। কবি দুএকটা শ্লোক পাঠ ক'রতে রাজা শ্লোকগুলির কি ছন্দ তা জানতে চাইলেন। একটা শ্লোক ছিল 'শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত' ; শুনে রাজা ব'ল্‌লেন 'সরূড়ুলা-উইক্রীডিটা' ; আর আরও দু চারটে সংস্কৃত ছন্দের নাম ক'রলেন। কতকগুলি ছন্দের নাম যেন নোতুন লাগ্‌ল, কবিও ব'ললেন যে এই ছন্দগুলির নাম তিনিও শোনেন নি। হয় তো এগুলি যবদ্বীপেরই কবিদের সৃষ্ট।

রাজা আমাদের এক এক খণ্ড ক'রে বলিদ্বীপের তাঁতে বোনা লুঙ্গীর মতন রঙীন সুতোর বস্ত্র উপহার দিলেন। ক্লুঙকুঙ-এ একটা স্কুল খুলতে যাবেন ব'লে রাজা ক'বির কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তার পরে আমি ফ্রেউএস-এর সঙ্গে বাজারে একটু ঘুরলুম। সকালবেলার ভরা বাজার, বলিদ্বীপের জীবনযাত্রার সচল চিত্রাবলী যেন। সামনে রাজার এক পারিষদের বাড়ী। এই পারিষদটী আবার মন্দিরের একজন 'পামাঙ্কু', মাথায় ঝুটী-বাঁধা এই ব্যক্তিটী গম্ভীরভাবে বাড়ীর দাওয়ায় ব'সে আছে। অতি সুশ্রী কতকগুলি ছেলেমেয়ে ঘোরা-ঘুরি ক'রছে। বাড়ীর বাহির দেওয়ালে একটা জিনিস দেখলুম—একটি মোরগের দেহ ডানায় পেরেক দিয়ে দেওয়ালে লটকানো। শুনলুম অসুখ বিসুখ হ'লে ভূত শান্তির জন্য মোরগ বলিদান দিয়ে এই রকম ক'রে দেওয়ালে লাগিয়ে দেয়। এইরূপে অপদেবতার বশী-করণ বা বিতাড়নের ব্যবস্থা কোনও বাড়ীতে যে হ'য়েছে তা ঘ্রাণেন্দ্রিয় সাহায্যে দূর থেকেই বুঝতে পারা যায়। বাঙলাদেশে আর বিহারে কোথাও কোথাও গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দিলে একটা ছাগল মেরে তার চামড়ায় খড় পুরে উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙিয়ে রাখার রীতির কথা মনে প'ড়ল।

দুপুর হ'তে চ'লে, ক্লুঙকুঙ থেকে সুরেনবাবু আর অন্য সবাই এলেন। তারপরে আমরা দক্ষিণ বলির প্রধান নগর Badoeng বাদুঙ বা Den Pasar দেন পাসার অভিমুখে যাত্রা ক'রলুম। পথে Oeboed উবুদ গ্রামে স্থানীয় Poenggawa পুঙ্গব বা জমীদার মহাশয়ের বাড়ী হ'য়ে গেলুম। এই জমীদার বা ক্ষুদ্র রাজাটী বলিদ্বীপের একজন প্রধান শিক্ষিত ব্যক্তি। এঁর পুরো নামটী হ'চ্ছে Gade Rake Tjokorde Soekawati গডে রাকে চকর্দে সুখবতী। ইনি ডচ ভাষা বেশ ভালোই জানেন, আর বাতাবিয়ায় যে রাজকীয় ব্যবস্থাপক সভা আছে, আমাদের দিল্লীর সভার মতন,—তাতে ইনি বলিদ্বীপের প্রতিনিধিরূপে যান। বলিদ্বীপের রীতিনীতি চাষবাসের কথা পোষাকের কথা নিয়ে ইনি ডচ ভাষায় কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন, সেগুলির ইংরিজি অনুবাদও প্রকাশিত হ'য়েছে। দিন দুই পরে উবুদে এঁরই বাড়ীতে এঁর এক পিতৃব্যের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া হবে—তিন চার মাস আগে তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে, এতদিনে দেহের অগ্নিসংকার হবে, তদুপলক্ষে একটা বিরাট উৎসব জ'মবে। আমরা বাদুঙথেকে দু তিন দিন ধ'রে মোটরে ক'রে এসে এইসব ব্যাপার দেখবো। পুঙ্গব সুখবতীর সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বাঙলির পুঙ্গবের বাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে বলিতে আমাদের প্রথম অবতরণের দিনই আলাপ হ'য়েছিল। এঁর বাড়ী সেকেলে ঢঙের, ইনি আমাদের স্বাগত ক'রলেন, তবে তাঁর বাড়ীর ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষ্যে তিনি বড়ো বেশী ব্যস্ত ছিলেন। ডক্টর খোরিস এঁর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে ছিলেন, ইনি আমাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন, কোথায় কি হ'চ্ছে। উবুদের পুঙ্গব-গৃহে এই রূপে খানিক বিশ্রাম ক'রে আমরা বাদুঙ অভিমুখে প্রস্থান ক'রলুম। বেলা পৌনে দুটো আন্দাজ বাদুঙে পৌছানো গেল।

ক্রমশঃ
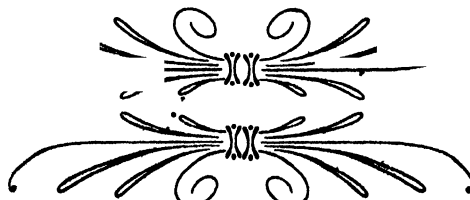
মহামায়া

শ্রীসীতা দেবী

(৩৩)

এই পার্টির কথা মায়া জীবনে কোনোদিন ভুলিতে পারে নাই। ঘণ্টা দুই তিনের ভিতর তাহার সারা জীবনের ধারা যেন এইখানেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া গেল। কিন্তু সমস্যার কোনো সমাধানই হইল না, মায়া বুঝিল এতদিন সে যাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া জানিয়াছে, চিরদিন যাহা দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাখিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছে, তাহার কিছুই আর পূর্ব্বের মূর্ত্তিতে তাহার চোখে পড়িতেছে না। দেবকুমারের দৃষ্টি এখনই যেন তাহার দৃষ্টিকে অনুরঞ্জিত করিতেছে। তাহার স্বাধীন সত্তা এখনই যেন অবলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। বুদ্ধির দিক হইতে সে বুঝিতেছিল, সে নিজের অপমান করিতেছে, কিন্তু হৃদয়ের দিক হইতে এই পরাজয় স্বীকারেই তাহার এক আশ্চর্য্য আনন্দ হইতেছিল। মানুষের প্রিয় যাহা কিছু সকলের জন্যই তাহাকে মূল্য দিতে হয়। মায়ার কাছে নিজের স্বাধীনতার মূল্য অনেকখানিই ছিল, তাহা বিসর্জ্জন দিয়া সে যেন দেবকুমারের ভালবাসা পাইবার অধিকার অর্জ্জন করিল।

অজয় ভদ্রতার খাতিরে চা খাইতে আসিয়াছিল বটে, এবং খানিকটা মজা দেখিতে পাইবার আশায়ই যেন খানিকক্ষণ বসিয়াও ছিল, কিন্তু তাহাকে নিরাশই হইতে হইল। দেবকুমার নিতান্তই সাধারণভাবে গল্প করিতে লাগিল। প্রেমিক প্রেমিকার আলাপের যেরকম ধারণা অজয়ের মনে ছিল, তাহার সঙ্গে কিছুই মিলিল না। চাক্ষুষ এসব কোনোদিনই সে দেখে নাই। হিন্দু ব্রাহ্মণ ঘরে তাহার জন্ম, কলিকাতায় বাস করিলেও তাহাদের পরিবারে কোনোরকম আধুনিকতা প্রবেশ করে নাই। কাজেই এবিষয়ে তাহার সমস্ত ধারণাটাই নভেল, নাটক এবং বায়োস্কোপ হইতে সংগৃহীত ছিল। মায়া এবং দেবকুমার তাহার কৌতূহলের কোনো খোরাকই জোগাইবার লক্ষণ দেখাইতেছে না দেখিয়া সে খানিক পরে কাজের ছুতা করিয়া উঠিয়া চলিয়া গেল।

সে যাইতেই দেবকুমার বলিল, "আমি কিন্তু অভদ্রের মতই বসে আছি, নড়বার নাম নেই। হয়ত আপনার কাজের অসুবিধা হচ্ছে এবং বিরক্তও হচ্ছেন। তা যদি হয় ত বলুন, কিছু সঙ্কোচ করবেন না।"

মায়া বলিল, "আমারও কাজের সীমা নেই। সন্ধ্যার সময় আবার কি কাজ থাকবে? অন্যদিন ত সময়ই কাটে না। একটা যে কেউ এলেও বর্ত্তে যাই।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার কথার গোড়াটা শুনে সবে একটু খুশি হতে আরম্ভ করেছিলাম, এমন সময় আপনি সব মাটি করে দিলেন।"

মায়া হাসিয়া বলিল, "Fishing for compliments-টা দেখছি স্ত্রীজাতির একচেটিয়া গুণ নয়। আপনাদেরও সেটা দিব্যি আছে দেখছি। যা নিজে জানেনই, তা আর একবার আমার মুখ থেকে শুনে কি হবে?"

দেবকুমার বলিল, "পৃথিবীতে কতকগুলো কথা আছে, যা হয়ত খুবই জানা, তবু বার-বার লোকের মুখে শুনতে ইচ্ছে করে। অবশ্য সব লোকের মুখে নয়।"

মায়া উত্তরে কিছু না বলিয়া খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পর কথা বদলাইয়া বলিল, "আপনার কাজ আরম্ভ করছেন কবে?"

দেবকুমার বলিল, "এখন করলেই হয়। খরচ ত বাপের টাকা অনেক করা গেল, উপার্জ্জনটা নিতান্তই অতঃপর সুরু করতে হয়। কতদূর পেরে উঠব তা জানি না, তবে সবাই বলে রেঙ্গুনে উকীল ব্যারিষ্টারের কপাল খুব দরাজ, এই যা ভরসা।"

মায়া বলিল, "তা সত্যি, এখানে নিতান্ত হাবা বোকা মানুষেও যে-পরিমাণ টাকা রোজগার করে তা দেখলে

অবাক হয়ে যেতে হয়। তখন আর মনে হয় না যে মানুষের বুদ্ধি বা culture-এর কোনো দাম আছে।"

দেবকুমার বলিল, "আচ্ছা, খুব গাদাখানেক টাকা পেতে আপনার কি ইচ্ছে করে? আপনার অবশ্য তা আছেই, তবু এর চেয়েও বেশী হ'লে ছিল ভাল, একথা কখনও মনে হয়?"

মায়া সংক্ষেপে বলিল, "না, যখন গরীব ছিলাম, তখনও টাকার অভাব কিছু অনুভব করিনি। এখন হয়ত নানাদিকে আমি তখনকার চেয়ে সুখী, কিন্তু তার অন্য কারণ রয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "তবু টাকা জিনিষটা খুবই যে দরকারী, তা ত আর আপনি অস্বীকার করেন না?"

মায়া বলিল, "না, তা মোটেই করি না। লেখাপড়া শেখা, ইচ্ছামত কাজ বেছে নেওয়া, দেশের বা দশের উপকার করা, এসবের কোনোটাই ত টাকা না হ'লে করা যায় না। মনটা-সুদ্ধ অভাবে শুকিয়ে আসে, নিজের খাওয়া-পরা আর থাকার ভাবনা ছাড়া আর কিছু মানুষ তখন ভাবতেই পারে না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনার মুখে এ কথাটা শুনে খুব ভাল লাগল। আপনি নিজে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকেও তার যথার্থ দামটা যে ভোলেন নি, এইটাই আশ্চর্য্য। ওদেশে পথে-ঘাটে ঘরে-বাইরে, খালি টাকার জন্যে লোলুপতা দেখে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। বিশেষতঃ অল্পবয়সী মেয়েদের-সুদ্ধ টাকার পিছনে পাগল হয়ে ছুটতে দেখলে বড় খারাপ লাগে।"

মায়া বলিল, "চলুন, এবার আমার বাগানটা আপনাকে দেখিয়ে আনি। রোদটা বেশ পড়ে গিয়েছে। সমাজতত্ত্ব আলোচনা ক'রে ক'রে আপনিও হাঁপিয়ে গিয়েছেন।"

দেবকুমার হাসিয়া উঠিয়া পড়িল। বলিল, "আপনার বয়সের পক্ষে আপনি মানুষ চেনেন বড় বেশী দেখছি। সমাজতত্ত্বের আলোচনাটা যে আমার খুব মুখরোচক নয় তা এরই মধ্যে ধরে ফেলেছেন? কিন্তু কি করব বলুন? যাবার মতলব মোটেই নেই, তাই আজেবাজে বকে আপনাকে entertain করবার চেষ্টায় আছি। আপনার gardening খুব ভাল লাগে না কি?"

মায়া বলিল, "খুব। দেশে থাকতে কত গাছ যে লাগিয়েছিলাম তার ঠিক নেই, ফলের গাছ, ফুলের গাছ। এবারে গিয়ে দেখলাম, ফুলের গাছগুলো একটাও নেই, ফল এবং তরকারির গাছগুলো তবু আছে। এখানে বাগান একটা আগেই ছিল, আমি সেটা বদলে নিজের পছন্দমত করেছি। তবে মালীটি মাঝে মাঝে সর্দ্দারি করে আমায় খুব জ্বালিয়ে তোলে।"

কথা বলিতে বলিতে দুইজনেই বাগানের মধ্যে আসিয়া পড়িল। দেবকুমার বলিল, "আমাদের দেশ ছাড়া অন্য কোনো স্থানে ফুলের বাগানের তদারক করতে উড়ে রাখার কথা কেউ স্বপ্নেও মনে স্থান দিত না। ফুলের সঙ্গে যাদের আকৃতি এবং প্রকৃতিগত সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী, তাদেরই একাজটা মানায়। আপনার বাগানটি দেখতে বেশ, তবে খানিকটা Eurasian."

মায়া বলিল, "style-এর শুদ্ধতা রক্ষা করার মত জ্ঞান ত আমার নেই, কাজেই এরকম ভুল হওয়া অনিবার্য্য। যেখানে যা ভাল লাগে, তাই করি, চোখে কেমন দেখায় এইটাই মাত্র বিচার করি।"

দেবকুমার বলিল, "সেইটাই আসল প্রয়োজন যদিও। আমার কাছে gardening বিষয়ে কতকগুলি বই আছে ছবি সমেত, সেগুলো আপনাকে এনে দেব। ছবিগুলো দেখতে মন্দ নয়। আমাদের দেশেও বাগান করার এক সময় খুব চলন ছিল, মুসলমানদের আমলে। আগ্রা, দিল্লী, লাহোর, কাশ্মীর প্রভৃতি বেড়ালে, দিশী gardening-এর আন্দাজ পাওয়া যায়। ওদিকে কখন যাননি বুঝি?"

মায়া বলিল, "কখন আর গেলাম? ছিলাম পাড়াগাঁয়ে, সেখান থেকে সোজা বর্ম্মায়। ওসব বুড়ো বয়সের জন্যে তোলা রইল।"

দেবকুমার বলিল, "বুড়ো বয়সে কেন, অল্প বয়সেই যাবেন। এখনই ত সময়, বেশী বয়সে কি আর ওসব খেয়াল থাকে?"

মায়া বলিল, "এখন যেতে চাইলেই বা নিয়ে যাবে

কে ? বাবা ত তাঁর ব্যবসা ছেড়ে একদিনের জন্তেও নড়তে চান না, তিনি আবার যাবেন বেড়াতে।"

দেবকুমার বলিল, "না হয় একলাই যাবেন। আর আপনার বাবা ছাড়া নিয়ে যাবার অন্য লোক ও কেউ জুটে যাওয়া বিচিত্র নয়।"

মায়ার গালের কাছটা একটু লাল হইয়া উঠিল। সে বলিল, "অনেক ত ঘোরা হ'ল, এখন একটু বসা যাক, চেয়ার দিয়ে গিয়েছে।"

দেবকুমার বলিল, "আমি যাচ্ছি না একেই, তার উপর আপনি আমায় আরও প্রশ্রয় দিচ্ছেন। এরকম করলে আমি রোজ এসে উৎপাত করব।"

মায়া বলিল, "ভালই ত, আমি তাতে মোটেই দুঃখিত হব না।"

দেবকুমার বলিল, "দেখুন একথাটা আমি কিন্তু seriously-ই 'নিলাম,' আপনি যদিও খুব সম্ভব ভদ্রতা করে বলেছেন।"

মায়া লজ্জিত হইয়া ভাবিল, ঠিক এমনভাবে কথাটা না বলিলেও হইত। কিন্তু বলিয়াছে যখন তখন ফিরান আর যায় না। মনের ভিতর কে যেন তাহাকে এই কথাটা বলাইতেই চাহিতেছিল। দেবকুমার আসিলে সে যে খুশি হয়, তাহা দেবকুমার জানিলে দুঃখটা কি ?

কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, অন্ধকার হইয়া আসিল। এদিকটা সব সময়েই নীরব, এখন যেন নীরবতাটা আরও গভীরতর হইয়া আসিল। মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দও যেন স্পষ্ট হইয়া কানে বাজিতে লাগিল।

দেবকুমার বলিল, "চা খেতে এসে ত রাত হয়ে গেল। অন্য মানুষ হ'লে মনে করত যে, রাত্রের খাওয়াটাও খেয়ে যাবার মতলব। আপনি অবশ্য তা মনে করছেন না ?"

মায়া বলিল, "না, জাহাজে আপনার খাওয়ার নমুনা ত দেখেছি, কাজেই অত পেটুক আপনাকে মনে হচ্ছে না।"

দেবকুমার নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আপনার বাবা বাড়ী এসে আমাকে বসে থাকতে দেখলে নিশ্চয়ই পাগল মনে করবেন। আপনি কি শহরের দিকে একেবারেই যান না ?"

মায়া বলিল, "যাই বই কি ? বন্ধুবান্ধবের বাড়ী যাই, সিনেমায় যাই, ভাল opera কি ballet এলে তাতেও যাই।"

দেবকুমার খুব উৎসাহিত হইয়া বলিল, "একটা খুব ভাল Russian ballet এসেছে, যাবেন ? বলেন ত টিকিট করে রাখি।"

মায়া বলিল,"বাবার সময় হবে কি না তাত জানি না। তাঁকে জিগগেষ করে জানাব।"

দেবকুমার একটু দমিয়া গেল, বলিল, 'তা ঠিক, আমারই ভুল হয়েছিল। ওদেশে ত বাপ-মার অনুমতি নেওয়া জিনিষটা একটা প্রাগৈতিহাসিক কাণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, এখানে যে তা মোটেই নয়, তা মনে ছিল না। আমি টেলিফোন নিয়েছি, আমার রুম্-এ। আমায় তাহ'লে কাল দয়া করে জানাবেন।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, বাবার এসবে এখনও উৎসাহ আছে, সময় থাকলে তিনি কখনও না বলবেন না।"

দেবকুমার বলিল, "আপনাকে এতক্ষণ জ্বালানোর শাস্তি-স্বরূপ এরপর আমায় হেঁটে রেঙ্গুন ফিরতে হবে বোধ হয়। এ দেশে গাড়ী ট্যাক্সি কিছুই পাওয়া যায় না, ত ?"

মায়া বলিল, "আমার গাড়ীতে যান, আমি ড্রাই-ভারকে বলেই রেখেছি। এদিকে মোটর-বস্ ট্রাম সবই আছে, কিন্তু তাতে যাবার কিছু দরকার নেই।"

দেবকুমার বলিল, "আপত্তি করা উচিত ছিল, কিন্তু করব না। আপনার ড্রাইভার যদিও মনে মনে আমাকে খুব গাল দেবে।"

মায়া বলিল, "গাল দেবার জন্যে ত তাকে রাখা হয়নি, কাজ করবার জন্যে রাখা হয়েছে। তা ছাড়া বিকেলের দিকে আমাদের বাড়ী অতিথি অভ্যাগত কেউ এলে তাঁদের যে আমরা বাড়ী পৌছে দিতে বলব, তা তাদের জানাই আছে।"

দেবকুমার এবং মায়া দুইজনেই গাড়ী-বারান্দার দিকে অগ্রসর হইল। দেবকুমার নীচু গলায় বলিল, "আমি যদি কবি হতাম, তাহলে এই রাত্রিটার বিষয়ে একটা কবিতা লিখতাম। কিন্তু সে ক্ষমতাটা নেই। আমার দিক দিয়ে তাতে ক্ষতি নেই, কারণ অনুভূতির মধ্যে

আমার যা পাবার ত পাওয়া হয়ে গিয়েছে, তবে বঞ্চিত হ'ল অন্তরা, যারা এটার ভাগ কবিতার মধ্যে দিয়ে পেতে পারত।"

মায়া বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাইল না। তাহার মনের কথাই দেবকুমারের মুখ দিয়া বাহির হইতেছে যেন!

গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মায়া বলিল, "আপনি সত্যি যেন ভাববেন না, এতক্ষণ থেকে আপনি আমায় একটুও বিরক্ত করেছেন। আমি এত বেশী একলা থাকি যে কেউ দয়া করে এলে অত্যন্ত খুশি হই।"

দেবকুমার বলিল, "দয়াটা আপনিই তাদের করেন, এবং সেটা বুঝতেও পারেন না। আচ্ছা, এখন আসি।" সে নমস্কার করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

মায়া খানিকক্ষণ নীচেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর আস্তে আস্তে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। অজয় বা তাহার পিতা যে বাড়ীতে নাই, ইহাতে সে খানিকটা যেন স্বস্তি পাইতেছিল। তাহার মনের অবস্থাটা এমনি হইয়াছিল যে, কাহারও সঙ্গে কথা বলাই তাহার অসম্ভব বোধ হইতেছিল।

নিজের শুইবার ঘরে ঢুকিয়া দেখিল আয়া তখনও বিছানা করিতেছে। মায়াকে দেখিয়া সে তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু চলা গিয়া দিদিমণি?"

মায়া বলিল, "হাঁ।" সে অন্যমনস্কভাবে ব্রোচ, নেক্লেশ প্রভৃতি খুলিয়া রাখিতে লাগিল। আয়া একটু পরে বলিল, "বহুৎ আচ্ছা দেখনে কো হায়। ছোক্‌রা বোল্‌তা বারিষ্টার বন্‌কে আয়া?"

মায়া জোর করিয়া হাসিল, বলিল, "যা, যা, তোর অত খবরে কাজ কি? বারিষ্টার ত কত লোকেই হয়।" আয়ার কাজ আর শেষই হয় না। চাদর ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিল, "সাদি হোনে সে বহুৎ আচ্ছা।"

মায়া চম্‌কিয়া উঠিল। চাকরবাকরেও হঠাৎ এ-কথা বলিতে সুরু করিল কেন? তাহার যে দেবকুমারের সঙ্গে বিবাহ হইতে পারে তাহা মনে করিবার উহাদের কি কারণ ঘটিয়াছে? মায়া ত যথেষ্ট সাবধান হইয়াই চলিয়াছিল, দেবকুমারের ব্যবহারেও কোথাও কোনো ত্রুটি হয় নাই। তাহা হইলে এমন কথা উহাদের মনে আসিল কেমন করিয়া?"

সে আয়াকে তাড়া দিয়া বলিল, "কি বাজে বকিস্? ফের্ এসব কথা শুনলে তোর চুল ছিঁড়ে দেব। যত বড় বুড়ো হচ্ছিস, তত আক্কেল কমছে।"

আয়া হাসিয়া ঘর হইতে চলিয়া গেল। যাইবার আগে একখানা চিঠি মায়ার হাতে দিয়া বলিল, চিঠিখানা খানিক আগে আসিয়াছে, বাহিরের বাবু থাকার জন্য সে দিতে পারে নাই।

উপরের হাতের লেখাটা দেখিয়া চিনিল, প্রভাসের চিঠি। খুলিতে বিশেষ উৎসাহ বোধ হইল না। চিঠিখানা ড্রেসিং টেবিলের উপর রাখিয়া সে আস্তে আস্তে কাপড়চোপড় ছাড়িতে লাগিল। তাহার মনোজগতে এখন প্রবাসের স্থান কোথায়? সাবিত্রী, তাঁহার স্মৃতি-মন্দির স্থাপন, দেশের কাজ করা, সবই যেন মায়ার জীবন হইতে একেবারে মুছিয়া গিয়াছে। সেখানে এখন একাধিপত্য। কয়েকটা মাত্র দিন আগে যে মানুষের অস্তিত্ব সে জানিত না বলিলেই হয়, এখন তাহাকে ছাড়া আর কিছু মায়া ভাবিতেই পারে না। কিন্তু সে ভাবনায় আনন্দ যত, বেদনা তত। মায়া কি করিবে, কোন্ পথে যাইবে?

কাপড়চোপড় ছাড়া হইয়া গেল। নিজে আর সে-সব গুছাইয়া রাখিতে তাহার ইচ্ছা করিল না, আয়ার জন্য ইলেক্‌ট্রিক বেল্ বাজাইয়া, চিঠিখানা হাতে করিয়া সে নিজের পড়ার ঘরে চলিয়া গেল।

প্রভাস বেশী কিছু লেখে নাই। সে সময়-মত ছুটি পায় নাই। কয়েক দিন পরে মাস-দেড়েকের ছুটি লইয়া বাড়ী যাইবে। ছোট ভাই সুভাসের বিবাহ সেই সময়। বিবাহ এবং তদানুসঙ্গিক সব গোলমাল চুকিয়া গেলেই সে মায়ার কাজ লইয়া পড়িবে। Plan সব ঠিক হইয়া গেলেই সে বর্ম্মা যাত্রা করিবে। তাহার দেশ-বেড়ানোও হইবে, মায়ার কাজও হইবে। অনেকদিন হইতেই তাহার দেশবিদেশ বেড়াইবার

ইচ্ছা কিন্তু এতদিন সময়ও পায় নাই, অর্থও ছিল না। এখন দুইটার ব্যবস্থাই এক রকম হইয়াছে, কাজেই ভাবনা নাই। মায়া এবং নিরঞ্জনের সঙ্গে মুখোমুখি পরামর্শ করিয়া কাজ করাই ভাল, না হইলে চিঠি লেখালেখি করিয়া অনর্থক সময়ও যাইবে, এবং কাজও ভাল করিয়া হইবে না।

মায়ার আর একটা ভাবনা আসিয়া জুটিল। মায়ের স্মৃতি-মন্দির স্থাপনের মধ্যে নিরঞ্জনকে না জড়ানই তাহার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রভাসের চিঠিতে বুঝিল তাহা হইবার নয়। রেঙ্গুনে আসিলে, সে তাহাদের বাড়ীতেই আসিবে এবং নিরঞ্জনকে বাদ দিয়া কোনো কথাই সেই বলিবে না, এবং সম্ভবও হইবে না। কাজেই যেমন করিয়া হোক, কথাটা তাহাকে আগে পাড়িয়া রাখিতেই হইবে।

তাহার শরীর মন অকারণেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। আর কিছু ভাবিতে তাহার ইচ্ছা করিতেছিল না। সে চিঠিখানা দেরাজে রাখিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। সে রাত্রে আর আহারাদি করিতেও উঠিল না।

(৩৪)

নিরঞ্জন সকালে আপিসঘরে বসিয়া কাগজপত্র দেখিতেছিলেন। আগের দিন রাত্রে ফিরিতে তাঁহার অত্যন্ত দেরি হইয়া গিয়াছিল, আসিয়া আর মায়ার সঙ্গে দেখা হয় নাই। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলেন, সে শুইতে চলিয়া গিয়াছে, কাজেই আর ডাকেন নাই।

ছোকরা আসিয়া খবর দিয়া গেল চা দেওয়া হইয়াছে। কাগজপত্র রাখিয়া নিরঞ্জন খাবার ঘরে চলিলেন। মায়া নামিয়া আসিয়াছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল দেবকুমার এসেছিল ত ?"

মায়া চোখ নীচু করিয়াই উত্তর দিল, "হাঁ, এসেছিলেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "এমন কাজের তাড়া পড়েছে যে, কিছুতেই আগে আসতে পারলাম না। আজও ঐ রকম রাত হবে। এ সপ্তাহটাই বোধ হয় যাবে এইভাবে। তা অজয় ছিল ত ?"

মায়া বলিল, "হাঁ, অজয় এসেছিল। দেবকুমার বাবু বল্‌ছিলেন খুব ভাল একটা Russian ballet এসেছে। তিনি যাবেন, আমরাও যাব কিনা তাঁকে জানালে তিনি টিকিট করে রাখবেন কালকের জন্যে।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "সময় পাওয়া শক্ত। দেখি আপিসে গিয়ে যদি ব্যবস্থা করতে পারি।"

খানিকক্ষণ আর কিছু কথাবার্ত্তা হইল না। নিরঞ্জন খবরের কাগজ পড়িতে লাগিলেন, এবং মায়া চা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। প্রভাসের কথা বাবাকে না বলিলেও নয়, অথচ কেমন করিয়া যে সে কথাটা পাড়িবে, তাহা ভাবিয়াই পাইতেছিল না।

অবশেষে আর কিছু ভাবিয়া না পাইয়া বলিল, "কালকে আমাদের গ্রামের প্রভাস-দার একটা চিঠি পেয়েছি।"

নিরঞ্জন মুখ তুলিয়া বলিলেন, "ও প্রভাসের ? সে তোকে মাঝে মাঝে চিঠি লেখে বুঝি ? কি লিখেছে সে ?"

মায়া বলিল, "না, আগে ত লিখতেন না; এবার গিয়ে তাঁকে একটা কাজের ভার দিয়ে এসেছিলাম, তারই জন্যে লিখেছেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "কি কাজ ? গ্রামে গিয়ে তাই বুঝি আসতে দেরি হচ্ছিল ?"

আর না বলিলে নয় যখন, তখন মায়া বলিয়াই ফেলিল। "মায়ের স্মৃতিরক্ষার জন্যে গ্রামে একটা কিছু করব, ঠিক করেছিলাম। আমার হাতে কিছু টাকা জমেছে। তাই কি রকম জিনিষ হ'লে সব চেয়ে ভাল হয়, সেটা জান্‌তে প্রভাস-দাকে বলে এসেছিলাম। সেই বিষয়ে লিখেছেন, এখানে কিছুদিন পরে একবার আসবেন এবং মুখোমুখি সব আলোচনা করবেন, তাঁর ইচ্ছে।"

কথাটা বলিয়াই মায়া একবার ভয়ে ভয়ে পিতার মুখের দিকে তাকাইল। তিনি বিরক্ত হইবার কোনো লক্ষণ না দেখাইয়া বলিলেন, "তা বেশ ত। কবে আসছে ?"

মায়া বলিল, "দিন পনেরো কুড়ি পরে বোধ হয়। তাঁর ছোট ভাইয়ের বিয়ে এই সময়, সেটা হয়ে গেলেই আসবেন।"

নিরঞ্জন বলিলেন, "উৎসাহ থাকতে থাকতে করে ফেলা ভাল। বেশী দেরি করলে শেষ অবধি আর হয়েই ওঠে না। আমার ইচ্ছা ছিল, আমার বাবার নামে ভাল একটা টোল খুলব, কিন্তু হাতে তখন বেশী ত পয়সা থাকত না? সর্ব্বদাই দেখতাম যে মৃতের চেয়ে জীবিতের claim-টাই বড়। শেষ অবধি আর হ'লই না। যখন টাকা হ'ল, তখন ওটা মনের মধ্যে অনেক জিনিষের তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে, আর কিছু করে উঠ্‌তে পারলাম না। কিন্তু কত টাকাই বা তোর কাছে আছে? আচ্ছা প্রভাস আসুক, তারপর সবাই মিলে পরামর্শ করে ঠিক করব। করতে হ'লে ভাল করেই করা উচিত।"

মায়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। ইহা লইয়া যদি আবার গোলমাল কিছু হইত, তাহা হইলে বেচারীর আর যন্ত্রণার সীমা থাকিত না। সে এখন কোন কিছুতেই মন দিতে পারে না, বাপের সহিত মায়ের স্মৃতি লইয়া তর্ক করার অবস্থা তাহার মোটেই নয়। পড়াশুনায় একেবারেই মন দিতে পারে না। কলেজে নিতান্ত না গেলে নয়, তাই যায়। কিন্তু সেখানে কি যে হয় না-হয়, কিছুই যেন তাহার মাথায় ঢোকে না। বাড়ীতেও বই হাতে করিয়া সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়া থাকে, তবু মন দিতে পারে না। নিজের অজ্ঞাতসারেই দেবকুমারের চিন্তা আসিয়া তাহার মন জুড়িয়া বসে। সে কখন কি বলিয়াছিল, কি মনে করিয়া বলিয়াছিল, তাহাই শতবার ভাবে। মানসদৃষ্টিতে সেই-সব দৃশ্য আবার দেখিয়া পুলকিত হয়। মনোরাজ্যের মধ্যে যেখানে মানুষের স্মৃতির চিত্রশালা, সেইখানে ঘুরিয়া বেড়ায়, প্রেমের আলোকে প্রিয়ের মুখ আরও উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখে।

নিরঞ্জন উঠিয়া যাইবার পর মায়া অনেকক্ষণ খাবার টেবিলেই বসিয়া রহিল। Russian ballet-এ যাইতে পারিবে কি না, তাহা সকালের মধ্যেই দেবকুমারকে টেলিফোন করিয়া জানাইতে পারিলে ভাল হইত, কিন্তু নিরঞ্জন আপিস গিয়া ব্যবস্থা করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিতে না পারিলে, সে দেবকুমারকে কি জানাইবে? কিন্তু দেবকুমার হয়ত জানিবার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। কোনো খবর না পাইলে সে মায়াকে মনে করিবে কি? একটা কোনো রকম খবর ত দেওয়া উচিত? মায়া ধীরে ধীরে টেলিফোনের কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

দেবকুমারের সাড়া পাইতে মোটেই দেরি হইল না। ভাবে মনে হইল সে রিসিভার হাতে করিয়াই যেন বসিয়াছিল। খুব উৎসাহিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "কি খবর? আজ যাচ্ছেন ত?"

মায়া বলিল, "বাবা আপিসে না-যাওয়া পর্য্যন্ত কিছু বল্‌তে পারছেন না। তাঁর কাছ থেকে খবর পেলেই আপনাকে জানাব।"

দেবকুমার বলিল, "খবরটা আপিই ত তাঁর আপিস থেকে জেনে আপনাকে জানাতে পারি। কোকাইন ঘুরে রেঙ্গুনের খবর আবার রেঙ্গুনে ফিরে আসার কি দরকার? অনর্থক খানিকটা সময় যাবে।"

মায়া বলিল, "আচ্ছা, তাই করবেন, আমাকে সাড়ে দশটার মধ্যে জানালে ভাল, কারণ তারপর ত আমি কলেজ চলে যাব।"

দেবকুমার বলিল, "নিশ্চয়, আমি এখনি যাচ্ছি তাঁর কাছে।"

মায়া টেলিফোন রাখিয়া উপরে উঠিয়া গেল। প্রভাসের চিঠিখানার একটা সংক্ষিপ্ত জবাব লিখিয়া রাখিল। দেবকুমার কখন যে তাহাকে টেলিফোন করিবে স্থির নাই। আয়া আসিয়া স্নান করিবার জন্য বার-দুই তাড়া দিয়া গেল, কিন্তু মায়া নড়িবার নাম করিল না। আয়াকে বলিয়া দিল, তাহার শরীর বিশেষ ভাল লাগিতেছে না, স্নান করিলেও পরে করিবে। সে উৎকর্ণ হইয়া বসিয়া রহিল, কখন ডাক আসে। দেবকুমারের ঘর নিরঞ্জনের আপিসের কাছেই, কাজেই খবর নিতে খুব বেশী দেরি হইবার কথা নয়।

টেলিফোনের ঘণ্টা টিং টিং করিয়া উঠিল। মায়ার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছুটিয়া নীচে যায়, কিন্তু তাহা হইলে, চাকরবাকরে মনে করিবে কি? কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া সে খাটের উপর বসিয়া রহিল। কিন্তু

কেহই তাহাকে ডাকিতে আসিল না। মায়া নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। নিরঞ্জন হয়ত এখনও আপিসে পৌছান নাই, দেবকুমার তাঁহার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। নয়ত তাহার নিজেরই কোনো কাজ আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার জন্য দেরি হইতেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখিল, সময় হইয়া আসিতেছে, কলেজ যাইতে হইলে আর দেরি করা চলে না। নিতান্তই অনিচ্ছাসত্ত্বে এবং নিরুৎসাহভাবে উঠিতে যাইতেছে এমন সময় আর একবার টেলিফোনের ঘণ্টা শোনা গেল। এবং মিনিট-খানেকের মধ্যেই ছোক্‌রা আসিয়া খবর দিল যে, নীচে টেলিফোনে দিদিমণিকে ডাকিতেছে।

মায়া তাড়াতাড়ি নামিয়া গেল। দেবকুমার তাহার সাড়া পাইবামাত্র বলিল, "দেখুন, আপনার বাবা ত যেতে পারবেন না। কিন্তু থামুন, এখনি চটে রিসিভারটা ফেলে দেবেন না। তিনি আমাকে অনুমতি দিয়েছেন, আপনাকে নিয়ে যেতে। আপনি কি যাবেন? তাহ'লে এখুনি গিয়ে টিকিট করে রাখি।"

মায়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা যাব।" সে আর কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি উপরে চলিয়া আসিল।

নিরঞ্জন সব বিষয়েই সাহেবীআনার ভক্ত। কিন্তু এতদিন পর্য্যন্ত কন্যা সম্বন্ধে একটু যেন বাঁধাবাঁধি করিতেন। অবশ্য মায়া আলাপ করিত সকলের সঙ্গেই, কিন্তু ইহার বেশী ঘনিষ্ঠতা করা কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় নাই। হঠাৎ দেবকুমারকে এতখানি নিকটে আসিবার সুবিধা একরকম যাচিয়া দেওয়াতে মায়া অবাক হইয়া গেল। পিতা কি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়াছেন? এই কি তাঁহার আশীর্ব্বাদ? মায়ার বুকের ভিতরটা দুরদুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কলেজে যাইতে তাহার মন কিছুতেই যেন রাজী হইল না। শরীর খারাপের ছুতা করিয়া সে গিয়া শুইয়া পড়িল। অনেক বেলায় তবে উঠিয়া স্নানাহার করিল। একবার আশা করিল, দেবকুমার আবার হয়ত টেলিফোন করিবে। কিন্তু আর কোনো আহ্বান আসিল না।

মায়ার ষোড়শ জন্মদিনে নিরঞ্জন তাহাকে এক প্রস্থ হীরার অলঙ্কার উপহার দিয়াছিলেন। উহা বহুমূল্য বলিয়া মায়া বিশেষ কখনও পরে নাই, ব্যাঙ্কেই জমা থাকিত। আজ সখ করিয়া মায়া তাড়াতাড়ি সেগুলি আনিতে লোক পাঠাইয়া দিল। তাহার বন্ধুবান্ধবরা সর্ব্বদা ঠাট্টা করিত যে, বর না আসিলে মায়া এগুলি কখনও পরিবে না। সেই কথা মনে করিয়া মায়ার মুখটা একটু লাল হইয়া উঠিল।

বেলাটা শীঘ্রই কাটিয়া গেল। দেবকুমার টেলিফোন করিয়া জানাইল সে সাড়ে চারটার সময় মায়াকে আনিতে যাইবে। আজ ম্যাটিনি পারফরম্যান, কাজেই তাড়া একটু আছে।

মায়া সাজসজ্জা আরম্ভ করার আগে ছুটিয়া গিয়া তাড়াতাড়ি চা ঠিক করিতে বলিয়া আসিল। দেবকুমার আসিলে তাহাকে একেবারে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় না।

তাহার পর আসিল সাজের পালা। এত যত্ন করিয়া মায়া কোনোদিন সাজে নাই। কোথাও কোন খুঁৎ সে রাখিল না। হীরার গহনার সঙ্গে ভাল মানাইবে বলিয়া খুব চওড়া ঢালা জরির পাড়ের শাদা মান্দ্রাজী শাড়ি এবং সেই কাপড়ের ব্লাউস পরিল। খোঁপায় পরিবার হীরা-বসান একটা বড় গোল ফুল ছিল। সেইটা খোঁপায় পরিল বলিয়া আর মাথায় কাপড় দিল না। আয়নার ভিতর চাহিয়া দেখিয়া খুশি না হইয়া সে পারিল না। অগ্নিশিখার মতই তাহাকে দেখাইতেছে। ঘড়িতে চারটা বাজিতেই সে চা ঠিক করিতে হুকুম দিয়া জুতা মোজা পরিতে আরম্ভ করিল। ঠিক সাড়ে চারটা বাজিতেই দেবকুমারের ট্যাক্সি গেটের ভিতর প্রবেশ করিল।

ক্রমশঃ

লালকালো—শ্রীগিরীন্দ্রশেখর বসু। শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন চিত্রিত। কলিকাতা। ১৩৩৭। মূল্য দুই টাকা।

এটি কালো পিঁপড়ে ও লাল পিঁপড়েদের যুদ্ধের গল্পের বহি। বৃদ্ধের মন দিয়া ইহা বিচার্য্য নহে। যে-সব শিশু পড়িতে জানে না, তাহারাও ইহার অপূর্ব্ব ছবিগুলির জন্য ইহা দখল করে। যাহারা পড়িতে জানে, তাহারা গল্প ও ছবি উভয়েরই জন্য বহিখানা ঘিরিয়া দল বাঁধিয়া পড়িতে বসিয়া যায়। ইহার ছবি, ছাপা, কাগজ, বাঁধাই—সবই মনোহর।

ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের 'অধর মুখার্জ্জি' লেক্‌চর। কবিবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় লিখিত ভূমিকা সহ। শ্রীক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক, বিদ্যাভবন, বিশ্বভারতী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত। ১৯৩০। ডিমাই আট পেজী ১২১+১২ পৃষ্ঠা। কাপড়ের বাঁধাই। সোনার জলে নাম লেখা। মূল্যের উল্লেখ নাই। কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট।

এই পুস্তকখানি ছোট কিন্তু অতিশয় মূল্যবান। ইহাতে ভারতের মধ্যযুগের বহুসংখ্যক সাধকের ও তাঁহাদের উপদেশের সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে। তাহা পড়িয়া এই ইচ্ছা প্রবল হয়, যে, ক্ষিতিমোহনবাবু এই বিষয়ে একটি বড় বহি লিখুন। তিনি হয়ত লিখিতেও পারেন—যদিও তিনি এখনও ক্রমাগত অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু তিনি লিখিলেও প্রকাশ করিবে কে? আমরা বলি, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই প্রকাশ করুন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যখন এই সৎ ও মহৎ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়াছেন, তখন আরও অগ্রসর হওয়া তাঁহাদেরই কর্ত্তব্য।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—

"ভারতের একটি স্বকীয় সাধনা আছে; সেইটি তা'র অন্তরের জিনিষ। সকল প্রকার রাষ্ট্রিক দশা-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়ে তা'র ধারা প্রবাহিত হ'য়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধারা শাস্ত্রীয় সম্মতির তটবন্ধনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের প্রভাব যদি থাকে তো সে অতি অল্প। বস্তুত এই সাধনা অনেকটা পরিমাণে অশাস্ত্রীয়, এবং সমাজ শাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এর উৎস জনসাধারণের অন্তরতম হৃদয়ের মধ্যে, তা সহজে উৎসারিত হয়েছে, বিধি-নিষেধের পাথরের বাধা ভেদ ক'রে। যাঁদের চিত্তক্ষেত্রে এই প্রস্রবণের প্রকাশ, তাঁরা প্রায় সকলেই সামান্য শ্রেণীর লোক, তাঁরা যা পেয়েছেন ও প্রকাশ ক'রেছেন তা "ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।

"ভারতের এই আন্তরিক সাধনার ধারাবাহিক রূপ যদি আমরা স্পষ্ট ক'রে দেখতে পেতুম তাহলে ভারতের প্রাণবান্ ইতিহাস যে কোন্‌খানে তা আমাদের গোচর হতে পারত। তাহলে জানা যেত ভারতবর্ষ যুগে যুগে কি লক্ষ্য করে চলেছে, এবং সেই লক্ষ্য সাধনে কি পরিমাণে তা'র সিদ্ধি। সুহৃদ্বর ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর এই গ্রন্থে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘকালের সেই চিত্তপ্রবাহের পথটিকে তা'র ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় অনুসরণ করে এসেছেন। আমরা দেখতে পেরেছি এই প্রবাহটি গভীররূপে সত্য এবং একান্তভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয়। ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সাধনার যে স্বাভাবিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে ক্ষিতিমোহনের এই রচনায় তাকে আবিষ্কার করা গেল। এই প্রকাশের অভিব্যক্তির যে ধারা অন্তর-বাহিরের বাধার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এই গ্রন্থের সীমারেখায় তার একটা রূপচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এখন তার উদ্ভাবনের, তার প্রাগ্রসর যাত্রার সম্পূর্ণ একটি ইতিহাস পাবার অপেক্ষা রয়ে গেল, না পেলে ভারতবর্ষের ধ্রুব স্বরূপটির পরিচয় ভারতবর্ষের লোকের কাছে অসম্পূর্ণ, এমন কি ভ্রমসঙ্কুল হয়ে থেকে যাবে।"

ক্ষিতিমোহনবাবু স্বয়ং তাঁহার "নিবেদনে" বলিয়াছেন :—

"যাঁহারা আলোচনা করিবেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন লিখিত সব শাস্ত্র ও গ্রন্থ অপেক্ষা এই সব নিরক্ষর সাধকদের এক একটি বাণী কত মহান্, কত গভীর। ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান বা সম্প্রদায়-গত কোনো ভেদ-বুদ্ধি নাই। ইঁহারা অধিকাংশই নিরক্ষর এবং সকল সাধনার মৈত্রী ও যোগই ইঁহাদের আপন সাধনার ধন। সেই যোগ সাধনাই ভারতের সাধনা, বাহিরে, ইহার যত প্রতিকূল লক্ষণই দেখা যাক না কেন।"

মহুয়া—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২৲; বাঁধান ২।৶০ ও ২৸০।

বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দিবার নিমিত্ত, রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী হইতে কতকগুলি প্রেমের কবিতা সংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত তাঁহার কতকগুলি নবরচিত ঐ শ্রেণীর কবিতা সংযুক্ত করিয়া, একখানি বহি বাহির করিবার কথা হয়। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই কয়েকটির জায়গায় অনেকগুলি নূতন কবিতা লেখা হইয়া যায়, এবং সেই সব কবিতাই "মহুয়া" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "লেখার বিষয়টা ছিল সংকল্প করা—প্রধানতঃ প্রজাপতির উদ্দেশে—আর তাঁরই দালালী করেন যে-দেবতা তাঁকেও মনে রাখতে হ'য়েছিলো।"

ইহা প্রেমের কবিতার বহি। প্রেম বলিতে নানা জনে নানা জিনিষ বুঝে, এবং এই বহিখানির সকল কবিতাও এক রকমের নয়। কিন্তু সবগুলি কি সুরে বাঁধা, তাহার আভাস "উজ্জীবন" শীর্ষক নিম্নমুদ্রিত প্রারম্ভিক কবিতাটিতে আছে—

> ভস্ম-অপমান শয্যা ছাড়ো, পুষ্পধনু,
> রুদ্র-বহ্নি হ'তে লহো জ্বলদর্চ্চি তনু।
> যাহা মরণীয় যাক্ ম'রে,
> জাগো অবিস্মরণীয় ধ্যানমূর্ত্তি ধ'রে।
> যাহা রূঢ়, যাহা মূঢ় তব,
> যাহা স্থূল, দগ্ধ হোক্, হও নিত্য নব।
> মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
> হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

মৃত্যুঞ্জয় তব শিরে মৃত্যু দিলা হানি,'
অমৃত সে-মৃত্যু হ'তে দাও তুমি আনি'।
সেই দিব্য দীপ্যমান দাহ,
উন্মুক্ত করুক্ অগ্নি উৎসের প্রবাহ।
মিলনেরে করুক্ প্রখর
বিচ্ছেদেরে ক'রে দিক্ দুঃসহ সুন্দর।
মৃত্যু হ'তে জাগো, পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥
দুঃখে সুখে বেদনায় বন্ধুর যে-পথ,
সে-দুর্গমে চলুক্ প্রেমের জয়রথ।
তিমির তোরণে রজনীর,
মন্দ্রিবে সে রথচক্র নির্ঘোষ গম্ভীর।
উল্লঙ্ঘিয়া তুচ্ছ লজ্জা ত্রাস,
উচ্ছলিবে আত্মহারা উদ্বেল উল্লাস।
মৃত্যু হ'তে ওঠো পুষ্পধনু,
হে অতনু, বীরের তনুতে লহো তনু॥

অবলা থাকাই যে নারীর ললাটে লেখা বিধিলিপি নহে, তাহা নবযুগের নারীরা বুঝিতেছেন। কিন্তু বহু কাব্যে নারীর প্রেম মাধবীলতার সহকার তরুকে আশ্রয়ের মত বলিয়া আভাস দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইতে নবযুগের সবলারা কি প্রেমহীনা হইবেন? উত্তরের জন্য কবির "সবলা" শীর্ষক কবিতা পাঠ করুন। যথা—

নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার,
হে বিধাতা?
পথপ্রান্তে কেন রবো জাগি,
ক্লান্ত ধৈর্য্য প্রত্যাশার পূরণের লাগি'
দৈবাগত দিনে?
শুধু শূন্যে চেয়ে রবো? কেন নিজে নাহি লবো চিনে
সার্থকের পথ?
কেন না ছুটাবো তেজে সন্ধানের রথ,
দুর্দ্ধর্ষ অশ্বেরে বাঁধি' দৃঢ় বল্গা-পাশে?
দুর্জ্জয় আশ্বাসে
দুর্গমের দুর্গ হ'তে সাধনার ধন
কেন নাহি করি আহরণ,
প্রাণ করি' পণ?
যাবো না বাসর-কক্ষে বধূবেশে বাজায়ে কিঙ্কিণী,—
আমারে প্রেমের বীর্য্যে করো অশঙ্কিনী,
বীরহস্তে বরমাল্য লবো একদিন
সে-লগ্ন কি একান্তে বিলীন
ক্ষীণদীপ্ত গোধূলিতে?
কভু তা'রে দিব না ভুলিতে
মোর দৃপ্ত কঠিনতা।
বিনম্র দীনতা
সম্মানের যোগ্য নহে তা'র,—
ফেলে দেবো আচ্ছাদন দুর্ব্বল লজ্জার।
দেখা হবে ক্ষুব্ধ সিন্ধুতীরে;
তরঙ্গ গর্জ্জনোচ্ছ্বাস, মিলনের বিজয়ধ্বনিরে
দিগন্তের বক্ষে নিক্ষেপিবে।
মাথার গুণ্ঠন খুলি' কবো তা'রে মর্ত্ত্যে বা ত্রিদিবে
একমাত্র তুমিই আমার।
সমুদ্র পাখীর পক্ষে সেই ক্ষণে উঠিবে হুঙ্কার
পশ্চিম পবন হানি',
সপ্তর্ষি আলোকে যবে যাবে তা'রা পন্থা অনুমানি'।
হে বিধাতা, আমারে রেখো না বাক্যহীনা
রক্তে মোর জাগে রুদ্র বীণা!
উত্তরিয়া জীবনের সর্ব্বোন্নত মুহূর্ত্তের 'পরে
সর্ব্বোত্তম বাণী যেন ঝরে জীবনের কণ্ঠ হ'তে
নিবারিত স্রোতে।
যাহা মোর অনির্ব্বচনীয়
তা'রে যেন চিত্ত মাঝে পায় মোর প্রিয়।
সময় ফুরায় যদি, তবে তা'র পরে
শান্ত হোক্ সে-নির্ঝর নৈঃশব্দ্যের নিস্তব্ধ সাগরে॥

র. চ.

জীবন পথে—শ্রীকামিনী রায় প্রণীত। কবি কামিনী রায়ের পরিচয় নূতন করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। বাংলা সাহিত্যের সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহারাই তাঁহার কবিত্বের আস্বাদ বহুরূপে পাইয়াছে। আজ যাঁহারা অনেকে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের শৈশবে সাহিত্যের সহিত প্রথম পরিচয় হয় কবি কামিনী রায় মহাশয়ার "গুঞ্জন" গানের ভিতর দিয়া, এ সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি।

আজকাল সাহিত্যক্ষেত্র হইতে ইনি দূরে সরিয়া আছেন, তাই অনেকে ইঁহাকে নামে জানিলেও ইঁহার কবিত্ব-প্রতিভার সাক্ষাৎ স্পর্শ পায় না। এই নব প্রকাশিত সনেটগুচ্ছটির অধিকাংশই যদিও ১৫।২০ বৎসর আগে রচিত তবু ইহারই সাহায্যে বাণীমন্দিরে তাঁহার স্থান নূতন পূজারীরা বুঝিতে পারিবেন। এতদিন 'সাহিত্য-রসিক দুই তিনটি বন্ধুও নিতান্ত আপনার কয়েকটি আত্মীয় ভিন্ন এগুলির অস্তিত্বও বিশেষ কেহ জানেন নাই।... ... ১৯২৭ সনে বিলাত ভ্রমণ কালে শ্রীযুক্তা জেসিকা ওয়েষ্টব্রুক নাম্নী জনৈক ইংরেজ মহিলা তাঁহার কোনো বাঙ্গালী বন্ধু কর্তৃক 'আলো ও ছায়া'র কবিতা অনুবাদ করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া আসিয়া, এই সনেটগুলিরই অনুবাদ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।" তাঁহার অনূদিত ১১টি সনেট এদেশের একটি বিখ্যাত মাসিকপত্রে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হয়। কবিতাগুলি কবির দাম্পত্য জীবনের মিলন বিরহ, সুখ দুঃখ ও শোকাশ্রু লইয়াই বিশেষভাবে রচিত বলিয়াই সম্ভবত তাঁহার জীবদ্দশায় তিনি তাহা প্রকাশিত করিতে চান নাই। কিন্তু কবির জীবন লইয়া রচিত হইলেও কবিতাগুলি মানব-জীবনের নানা অবস্থারই ছবি, কবির নিপুণ ও সংযত তুলিকাপাতে সরস ও গভীর রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জাপানী চিত্রী তাহার চিত্রবীথি যেমন একের পর এক ঘুরাইয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখায়, কবিও যেন তেমনি করিয়া তাঁহার জীবন কাব্য খুলিয়া দেখাইয়াছেন। এক একটি চিত্র জাপানী চিত্রের মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, আবার চিত্রমালারও এক একটি মণির মত। পূর্ব্বরাগ, মিলন, বিরহ, অভিমান, সংশয়, সংগ্রাম, পুনর্মিলন, শোক, সান্ত্বনা দাম্পত্য জীবনের অসংখ্য রূপ এই ক্ষুদ্র কয়টি কবিতার ভিতর হাসি ও অশ্রুর বন্যা বহাইয়াছে।

"দুটি তরী, বাঁধা পাশাপাশি,
ভেসে যাই স্বপন সাগরে,
লক্ষ্য করি অনন্ত জীবন;

নেত্র পথে উঠিতেছে ভাসি
নব তারা, নব নভস্তরে,
অতলে ডুবায়ে পুরাতন।"

পুরাতন সকল সংগ্রামকে জয় করিয়া নারী তাহার সকল ভার সাথীর হস্তে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। "কর স্পর্শে করিও সঙ্কার না দৃষ্টি, দীপ স্পর্শে দীপ যথা জাগে।" কারণ "বহু ভার বহে নারী, ... কেবল নিজের ভার দুর্ব্বহ তাহার।" কিন্তু এ নিশ্চিন্ত স্বপ্নসুখ টুটিয়া গেল।

"হাতে রহিয়াছে হাত, শিথিল বন্ধন,
কণ্ঠের মালতী মালা ক্ষীণগন্ধ, ম্লান,
সহসা থামিয়া গেছে অসমাপ্ত গান,
নয়নে জমিছে মেঘ ভেঙ্গে আসে মন ;—
একি স্বপ্ন শেষ, কিবা একি দুঃস্বপন ?
জীবনের বসন্ত কি হল অবসান ?"

দৃষ্টি সংশয়ে আকুল হইয়া উঠিল কিন্তু

"তবু হাতে থাক্ হাত, চলি পাশাপাশি,
এক পথে, এক দুঃখে দুঃখী দুইজন।
আর কিছু নাই হোক্, করুণাবন্ধন
বাঁধুক দোঁহারে।"

সংশয় নারীকে হতাশায় ফেলিল না—

"কল্পনার পুরে
প্রতিষ্ঠিত যেই প্রেম, সে যে বহুদূরে
মানবের গৃহ হ'তে ; চন্দ্রমা তপন
ধরা হতে যথা দূর ; করি প্রাণপণ
যে ছোটে ধরিতে, সে তো মরে শুধু ঘুরে।

নারীই আবার শ্রান্ত সঙ্গীর সহায় হইয়া উঠিলেন !—

————আজ শ্রান্ত তব শির
রাখ এ দুর্ব্বল স্কন্ধে ; তপ্ত অশ্রু সাথ
গলিয়া বাহির হোক্ বেদনা কঠিন ;
আজ অন্ধকার রাত্রে তব সঙ্গিনীর
দৃষ্টি হোক্ তব দৃষ্টি ; হাতে দিয়া হাত
চল ধীরে, দেখা দিবে কাল শুভদিন।

তারপর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল ; মৃত্যুর দূত আসিয়া সহযাত্রীকে হরণ করিয়া লইল, দীর্ঘদিনের মিলিত জীবনের গগনে—

"কত রৌদ্র কত মেঘ, বজ্র বরিষণ
কত বিদ্যুতের হাস, চন্দ্রালোক কত,"

দেখা দিয়াছিল তাহার প্রতিচিত্র পিছনে ফেলিয়া সাথী বিদায় লইলেন। বিচ্ছেদের আগুনে পুড়িয়া প্রেমের মূর্ত্তি শুদ্ধ হইয়া দেখা দিল, অভিমান সংশয় সংগ্রামের ধূলির চিহ্নমাত্র নাই।

"আজ-অশ্রু-আবরিত ক্ষীণ দৃষ্টি লয়ে
নিয়োজিয়া ভগ্ন তনু ব্রত তপস্যায়,
সেই সুদিনের তরে চেয়ে আছি পথ,
মোর দীর্ঘ তপস্যায় বরদাত্রী হয়ে
দেবতা করুন পূর্ণ এই মনোরথ
লোকান্তরে হই তব সখী যোগ্যতরা।"

সমস্ত বইখানি না তুলিয়া দেখাইতে পারিলে ইহার ঠিক মূল্য নিরূপণ করা যায় না। জানি না আংশিকভাবে দেখাইয়া সুবিচার করিলাম কি অবিচার করিলাম। পাঠকেরা নিজেরা যদি ইহাতে সনেটগুচ্ছটির সৌরভে আকৃষ্ট হন তাহা হইলে এ সামান্ত চেষ্টা সার্থক হইবে।

কবির পূর্ব্বতন রচনার তুলনায় এই কবিতাগুলির সংযম ও গভীরতা বেশী, বাঁধন দৃঢ়তর এবং তুলিকাপাত সুমার্জ্জিত বলিয়া মনে হয়। কবিতাগুলিতে অন্য কবির রচনা-ভঙ্গীর ছায়া বিশেষ নাই।

শ্রীশান্তা দেবী

—

শতনরী—শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত এবং ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, বাগচী এণ্ড সন্স হইতে শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য—সাধারণ সংস্করণ আড়াই টাকা, রাজসংস্করণ তিন টাকা।

'শতনরী' করুণানিধানের কাব্য-চয়নিকা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া যাঁহারা গত বিশ বৎসরের মধ্যে কবি খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, করুণানিধান তাঁহাদের অন্যতম। করুণানিধান সত্যকারের কবি। কাব্য রূপের দিক দিয়া বিচার করিলে তাঁহার কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব হয় ত ধরা পড়ে। কিন্তু শ্রেষ্ঠ কবির প্রভাব একান্তভাবে অনুভব করিয়াও প্রকৃত কবিতা রচনা করা ক্ষমতার কাজ। সেই ক্ষমতা আছে বলিয়াই রসসৃষ্টি হিসাবে করুণানিধানের কবিতাগুলি সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।

"সিমন্তিনীর শিবিকা দুয়ারে
চোখে জলভার, ঘিরিল তোমারে
তোরণ-মঞ্চে অদূরে শানাই
ধরিল তোড়ী।"

—সুন্দর !

প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধান-দুর্ব্বা প্রভৃতি কাব্য হইতে সকল ভাল কবিতাই এই চয়ন-গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। তাঁহার প্রেমের কবিতাগুলি ভাল, কিন্তু তাঁহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কবিতাগুলি অনুপম।

"স্বপন দেখিছে ভূর্জ্জবনানী সবুজ টোপর পরি
ঝর্ণাতলায় ঝরিছে কাহার রতনের শতনরী।"

চমৎকার !

করুণানিধান নিপুণ শব্দশিল্পী। এই শব্দসঙ্গীত তাঁহার সকল কবিতার মধ্যেই বিচিত্র ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যামোদী মাত্রেই শতনরী পাঠে আনন্দ উপভোগ করিবেন।

আজ এবং আগামী কাল—শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত এবং ১৫ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা হইতে এম-সি-সরকার এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

একখানি প্রবন্ধ-পুস্তক। অধিকাংশ প্রবন্ধই সাময়িক বাদবিসংবাদ-প্রসূত। 'সাহিত্য' ও 'সমাজ'—এই দুই ভাগে বইখানি বিভক্ত। রাসিয়ার নব সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুব গভীর নয়। কাজেই আমাদের দেশে যখন এই অপরিচিত বিষয়টি লইয়া আলোচনা চলে, তখন উভয় পক্ষের তর্কই কতকটা ভাসাভাসা রকমের থাকিয়া যায়। তৎসত্ত্বেও লেখকের সহানুভূতি আছে বলিয়া সামাজিক প্রবন্ধগুলি অনেকটা উপভোগ্য হইয়াছে। সাহিত্য-সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলি ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-ধর্ম্ম নামক যে রচনাটি মাসিক ও সাময়িক পত্রগুলিতে কিছুদিন ধরিয়া বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল পাঁচটি সাহিত্য প্রবন্ধের মধ্যে তিনটিই সেই বিক্ষোভের ফল।

বিতর্কের মধ্য দিয়া যদি কোন সত্যে উপনীত হইতে পারি ত সে তর্কে আপত্তি নাই। প্রবন্ধগুলিতে সে চেষ্টা লক্ষিত হয় না। শুধু বিতণ্ডা-মূলক বলিয়াই নয়, সাহিত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট ধারণাই ইহাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠে নাই। কথার কেরামতি দিয়া সেই অভাব পূর্ণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। 'বীরবলে'র অননুকরণীয় ভঙ্গী অনুসরণ না করিতে যাওয়াই ভাল। বহিরঙ্গের সৌষ্ঠবে বইখানি সত্যই সুন্দর হইয়াছে।

রাখালী—জসিম উদ্‌দীন প্রণীত ও ১০ দেওয়ান বাজার, ঢাকা হইতে আবদুল মজিদ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

কবিতার বই। নানারূপ ছন্দের কারচুপি ও লেখার কায়দায় মন যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন এই রকম সহজ সরল গ্রাম্য কবিতা সত্যই ভাল লাগে। পল্লীগীতি-হিসাবে 'রাখালী'র কবিতাগুলিতে বৈশিষ্ট্য আছে। মেয়েলি গানের সুরে 'সিঁদুরের বেসাতি,' বারমাসির সুরে 'বৈদেশী বন্ধু' অথবা বন্ধের গানের সুরে 'সুজন বন্ধুরে', বাংলা ছড়া ও পল্লীগাথার সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য কবিতাগুলিও গ্রাম্যজীবন লইয়া রচিত। প্রথম কবিতা 'রাখালী'।

"এই গাঁয়েতে একটি মেয়ে চুলগুলি তার কালো কালো
মাঝে সোনার মুখটি হাসে আঁধারেতে চাঁদের আলো।
*   *   *
মুখখানি তার কাঁচা কাঁচা, না সে সোনার না সে আবীর
না সে করুণ সাঁঝের গাঙে আধ-আলো রঙীন রবির।"

—এ ছবি সকলেই উপভোগ করিবে।

সব কবিতা এইরূপ উপভোগ্য হইয়া না উঠিলেও বইখানি পড়িয়া তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

শ্রীমতী—শ্রীজগদীশ গুপ্ত প্রণীত ও ২০৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী কর্তৃক প্রকাশিত, ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশিত ১৮২ পৃষ্ঠা। কাপড়ের মলাট—দাম দেড় টাকা।

জগদীশবাবু ছোটগল্প লিখিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁর নূতন পরিচয় অনাবশ্যক। "শ্রীমতী" তাঁর লেখা সাতটি গল্প লইয়া দেখা দিয়াছে। এগুলি ইতিপূর্ব্বে বিভিন্ন সাময়িক পত্রে ছাপা হইয়াছিল। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গীতে বৈশিষ্ট্য আছে—ভাষাও শিষ্ট ও মার্জ্জিত। সব লেখা উঁচুদরের না হইলেও, প্রায়ই সুখপাঠ্য। আলোচ্য গল্পগুলির মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রচনা নাই—ইহার চেয়ে ঢের ভালো গল্প তিনি লিখিয়াছেন। সে যাই হোক, 'আহুতি', 'ঘেন্নার কথা', 'অবাক্ জোৎস্না' ভালো লাগিল। 'কার্য্যকারণ' গল্পের humour খুব উপভোগ করিয়াছি।

বইখানিতে ছাপার ভুল বেশী চোখে পড়িল না, কিন্তু চন্দ্রবিন্দুকে এমন নির্ম্মমভাবে কে নির্ব্বাসনে দিল? স্বস্থানে বার-বার তার দেখা না পাইয়া পড়িবার সময় মন তিতিবিরক্ত হইয়া ওঠে।

স, ব

ময়মনসিংহ কিশোরগঞ্জে হিন্দুর দুর্গতি—(প্রথম খণ্ড) নরহত্যা, গৃহদাহ, লুণ্ঠন প্রভৃতি অত্যাচারের বিস্তৃত বিবরণ। হিন্দুমিশন কর্তৃক সংগৃহীত। মূল্য দুই আনা।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও তাহার প্রতিকার—ঢাকা হিন্দুমিশন হইতে গণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই পয়সা।

এই পুস্তিকা দুইখানিতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় মুসলমান উপদ্রবের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে ও তাহার প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই পুস্তকগুলিতে যে সকল বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহার সমর্থক বহু জবানবন্দী হিন্দুমিশনের নিকট আছে। সুতরাং ইহাদের সাময়িক মূল্য ছাড়া ঐতিহাসিক মূল্যও আছে। পুস্তক দুইখানি ১৯ নং জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, ঢাকা (বাংলা বাজার) এই ঠিকানায় হিন্দুমিশনের সভাপতি—শ্রীযুক্ত স্বামী সত্যানন্দের নিকট হইতে প্রাপ্তব্য।

ন,

শব্দতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ

শ্রীচারু বন্দ্যোপাধ্যায়

শুনেছি শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি রায়বাহাদুরের পরম উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা শব্দকোষ প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেছে; তিনি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করবার জন্ত বহুকাল থেকে একজন প্রকাশক খুঁজ্‌ছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত একজন প্রকাশকও উদ্যোগী হয়ে অমন মহামূল্যবান পুস্তক প্রকাশের ভার গ্রহণ করেন নি। যিনি এই সৎকর্ম্মে অগ্রসর হবেন, তিনি বঙ্গবাসীর ও বঙ্গভাষীর পরম বন্ধুর কাজ করবেন।

শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের বাঙ্গলা ভাষার অভিধানেরও দ্বিতীয় সংস্করণ করা শীঘ্রই আবশ্যক হবে; তিনি কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গবাসী ও বঙ্গভাষীদের কাছে শব্দ-সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্ত কোনো ব্যক্তি এদিকে দৃক্‌পাত করেন নি। অধ্যাপক মারে সাহেব যখন নিউ অক্‌সফর্ড ডিক্‌শনারী সঙ্কলন করবার জন্ত ইংরেজীভাষী লোকদের কাছে শব্দ-সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছিলেন তখন ইংলণ্ড স্কট্‌ল্যাণ্ড আয়ার্ল্যাণ্ড ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশ থেকেও লক্ষাধিক লোক তাঁকে শব্দ ও শব্দের ইতিহাস ও প্রয়োগ সংগ্রহ ক'রে দিয়েছিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় দু-একজনকে ছাড়া আর কোনো লোককে এই কর্ম্মে ব্রতী দেখ্‌তে পাই না। প্রবাসীর বেতালের বৈঠকে মধ্যে মধ্যে দু-চারটা শব্দের সন্ধান দেওয়া হয়েছে।

গত বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ভারতবর্ষে শ্রীযুক্ত অমিয়ময় দাস মহাশয় "বঙ্গভাষার সহিত পালিভাষার সংমিশ্রণ" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছেন।

বোলপুর বিশ্বভারতীর সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবৎ একখানি বিরাট বাঙ্গলা অভিধান সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন; তিনি নিরন্তর পরিশ্রমের সহিত অনন্যকর্ম্মা ও তদ্‌গতচিত্ত হ'য়ে শব্দ প্রয়োগ ইতিহাস সংগ্রহ করছেন দেখেছি ও শুনেছি। তাঁরও ঐ মহতী কীর্ত্তি প্রকাশিত হবে শুনছিলাম।

এখন যিনিই অভিধান প্রকাশ করবেন তাঁকে প্রত্যেক শব্দের নিরুক্ত ইতিহাস ও প্রাচীনতম প্রয়োগ দিতে হবে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের অভিধান প্রাচীনতর প্রকৃতিবাদ অভিধান অবলম্বনে গঠিত হ'লেও তিনি প্রকৃতিবাদে প্রদত্ত সংস্কৃত শব্দের নিরুক্তগুলি ত্যাগ ক'রেছেন। অনেক শব্দ কেবল হিন্দী ইত্যাদি ব'লে ছেড়ে দিয়েছেন, কিন্তু হিন্দী প্রভৃতি ভাষাতেই বা ঐ শব্দ কোথা থেকে এল' তার সন্ধান করেন নি।

যোগেশ-বাবুর শব্দকোষে শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ দেবার কিছু কিছু চেষ্টা আছে। কিন্তু তাঁর সংস্কৃত-পক্ষপাত তাঁকে অনেক জায়গায় তথ্যনির্ণয়ে বাধা দিয়েছে।

এখন যিনিই অভিধান প্রকাশ করবেন তাঁকে বর্ত্তমান সমস্ত অভিধান বিচার ক'রে সকল অভিধানের উৎকৃষ্ট গুণ ও বিশেষত্বটি আত্মসাৎ করতে হবে এবং সর্ব্বোপরি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত বঙ্গভাষার উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব পুস্তকের শরণাপন্ন হতে হবে পদে পদে।

এখন যদি কেউ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা করতে চায়, তবে তাকে নিম্নলিখিত বইগুলি হাতের কাছে রাখতে হয়—(১) বাঙ্গলা শব্দকোষ, (২) বাঙ্গলা ভাষার অভিধান, (৩) প্রকৃতিবাদ অভিধান, (৪) সুবল মিত্রের অভিধান, (৫) সুনীতি-বাবুর বই এবং সম্ভব হ'লে (৬) শব্দকল্পদ্রুম ও (৭) বিশ্বকোষ। ভবিষ্যৎ অভিধানকারদের কর্ত্তব্য হবে এই বোঝা হাল্কা করা; সকল অভিধানের বিশেষত্ব দ্বারা নিজের অভিধানকে ভূষিত করা।

রামচন্দ্রের সেতুবন্ধের সময় কাঠবিড়ালীর সাহায্যও তিনি সমাদর ক'রে গ্রহণ ক'রেছিলেন। আমি শব্দসমুদ্র থেকে রত্ন আহরণ করতে অক্ষম; কিছু বালি আর কিছু শুক্তি সংগ্রহ ক'রে উপস্থিত করছি; যদি কারো কিছু কাজে লাগে কৃতার্থ হব। আমার চণ্ডীমঙ্গলবোধিনী নামক দুইখণ্ড পুস্তকে ও আমার সম্পাদিত শূন্যপুরাণের টীকায় ভবিষ্যৎ অভিধানকার এইরূপ কিছু উপকরণ সংগৃহীত পাবেন; তারও কিছু গ্রাহ্য হ'লে ধন্য হব। আমি আজ যে-সব শব্দ উপস্থিত করব তার কিছু কিছু হয়ত কোনো-না-কোনো অভিধানে বা সুনীতি-বাবুর শব্দভাণ্ডারে সংগৃহীত ও যাচাই হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি শব্দ প্রত্যেক গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারিনি; যথাসম্ভব পুনরুক্তি পরিহার করতে চেষ্টা করেছি; তবু পুনরুক্তি থাকবে; সেগুলি মার্জ্জনীয় হবে আশা করি। আজ আমি যা উপস্থিত করছি, এর মধ্যে আমার নিজস্ব কিছু নেই; আমি নানা স্থান থেকে মাধুকরী ক'রে এগুলিকে একত্র সহজপ্রাপ্য ক'রে দিচ্ছি মাত্র। আমি প্রধানতঃ যোগেশ-বাবুর শব্দকোষ সাম্‌নে রেখেই অভাব পূরণের চেষ্টা করছি।

[সঙ্কেত ব্যাখ্যা—সং = সংস্কৃত; প্রাং = প্রাকৃত; পাং = পালি; ফাং = ফার্সী, প্রা-পার = প্রাচীন পারসীক; নূ-ফাং = নূতন ফার্সী; সর্ব্বানন্দ = সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্ব।]

অগ্রিম—অগ্র + তম > অগ্র + ম > অগ্রিম (অনুনাসিক বর্ণের পূর্ব্ববর্ত্তী অ-আ স্থানে এ অথবা ই হয়।—পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর নিয়ম সন্ধ্যক্ষরতত্ত্ব ও ১৩২১ সালের প্রবাসীতে "ব্যাকরণ বিভীষিকা" সমালোচনা দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গুস্তানা—সং অঙ্গুষ্ঠত্রাণ > ফাং অঙ্গুস্তানা। সং অঙ্গুষ্ঠ > আবেস্তা বা প্রাচীন-পারসীক অঙ্গুশ্‌ত > পহ্লবী বা মধ্য-পারসীক অঙ্গুস্ত > নূতন-ফারসী অঙ্গুশ্‌ত্। ফাং অঙ্গুশ্‌ত্ + আনা (< সং—পান = রক্ষণ)।

অথর্ব্ব—সং অথর্‌ন্ > প্রা-পার আথর্‌ন > নূ-ফাং অতুরবান (আতর্ = অগ্নি + √ বন + সেবা করা, স্তব করা) = অগ্নিপূজক, যাজ্ঞিক।

অধর—অধঃ + তর > অধ + র।

অধম—অধঃ + তম > অধ + ম। (এখানে কিন্তু অগ্রিম শব্দানুযায়ী অধিম হয়নি)।

অন্তর—(সং) = শেষ, দূর। প্রঃ—দারুণ বরিখা, জিউ ভেল অন্তর। —বিদ্যাপতি।

অন্তিম—অন্ত + তম > অন্ত + ম > অন্তিম (অগ্রিম শব্দ দেখুন)।

অন্দর—সং অন্তঃপুর > * অন্তেউর > প্রাং অন্দেউর (শকুন্তলা)। প্রা-পার অঁতরে, Lat. inter, Gk. entos, ফারসী অন্দর।

অপরূপ—সং অপূর্ব্ব > প্রাং অপূরব (বিক্রমোর্ব্বশী); অপুরুব (বিদ্যাপতি); সং অপরূপ।

অম্বল—সং অম্ল > * অম্ব > পালি-প্রাকৃত অম্বিল (অম্ব শব্দে ইকার যোগ সুখোচ্চারণের জন্য—anaptyxis) > অম্বল।

অসার—(সং) উচ্চারণে ওসাড় = বিস্তার। সং *পসার > প্রাঃ ওসার (ওসারিঅ পাণ্ডু-পত্তা......লদাও,—শকুন্তলা)। মালদহে ওসরা = দালান, রক, পিঁড়া বা বারান্দা—সং অবসরক > পালি ওসরক। সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে—বস্ত্রবিষয়ে অয়ম্ ওরাপ ইতি খ্যাতে।—কাপড়ের ওসার বা প্রস্থ?

অসুর—অসু (প্রাণ) + র (অস্ত্যর্থে) = প্রাণবান্, প্রাণশক্তিতে বীর্য্যবান্। অ (না) + সু (উত্তম) + র = অনুত্তম, মন্দ।—যাস্ক।

আই—সং অত্তা (মাতা, জ্যেষ্ঠা ভগিনী) > প্রাং আতা, আআ > আই। তুলনীয়—মাতা > মাঈ; ভ্রাতা > ভাই।

অত্তা শব্দটি মূলে দ্রবিড়, সংস্কৃতে ধার নেওয়া।—অধ্যাপক গুণে ও অধ্যাপক এম কলিন্‌স্।

আইন—ফাং আয়ীন < পহ্লবী আঈন, আঈনহ (= বিধি, প্রকার, রীতি) < সং অয়ন = পথ। পহ্লবী আঈনহ্ = ফাং আয়না = সং আদর্শ বা আরসী।

আউল—সং আকুল > আউল। অথবা আরবী আউলিয়া = পীর, সাধু।

আওয়াজ—সং আতোদ্য > প্রাং আওজ্জ > আওয়াজ। অথবা আবাদ্য > আওয়াজ।

আঁকাড়—সং আকর্ষণ > পালি আকড্‌ঢণ > আকাড় ধাতু।

আকাল—তামিল-তেলেগু আকাল = ক্ষুধা; গোন্দ ভাষায় আকাল = দুর্ভিক্ষ। সং অকাল থেকে আকাল, না দ্রবিড় শব্দ?

আকাল ধাতু = (কেশ) আকুলায়িত বা আলুলায়িত করা। প্রঃ—আকাইলেক কেশ তোর সুচিত্রক মাঝা। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন।

আথর, আঁথর—সং অক্ষর > প্রাং অক্‌খর > আথর, আঁথর (যুক্ত বর্ণের একতমের লোপে পূর্ব্ব স্বর অনুনাসিক হয়)।

আগা—অগ্র > প্রাং অগ্‌গ > আগা।

আগুন—সং অগ্নি > প্রাং অগণী, পালি গনি > বাং আগুনি, আগুন। অগ্নি > প্রাং অগ্‌গি > সিন্ধী অগ্‌গ্, হিং আগ। বিধুশেখর শাস্ত্রী বল্‌তে চান—সং অগ্রণী > প্রাং অগ্‌গণী > সং অগ্নি।

আঠি—সং অঙ্গুষ্ঠিকা। সং অঙ্গুষ্ঠ > প্রাং অংগুট্‌ঠ > মরাঠী আংগঠা, গুজরাটী অংগুঠা, হিন্দী অংগুঠা, পঞ্জাবী অংগুঠ, সিন্ধী আঙঠো। (অঙ্গুস্তানা দ্রষ্টব্য)।

অঙ্গুলি—ঋগ্বেদে অঙ্গুলি নেই; অঙ্গুরি শব্দ আছে, অর্থ অঙ্গুলি। পরে অঙ্গুরি শব্দের অর্থান্তরপ্রাপ্তি হয়েছে = অঙ্গুলি বলয়।

আচার—ফাং এবং পর্ত্তুগীজ achar = চাটুনি।

আঞ্জুমান—ফাং অঞ্জুমন্ (= সভা, সমিতি) < আবেস্তায় হঞ্জমন < সং সংযমন, সংগমন (তুলনীয়—সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং।—ঋগ্বেদের শেষ সুক্ত)।

আঁট—সং আবর্ত্ত > প্রাং অট্টতি = মোচড় দেয়, পাক দেয়।

আটা—সং অট্ট. গ্রীক ateo = খাদ্য।

আটাশ—সং অষ্টাবিংশ > পালি অট্‌ঠবীস।

আঁঠু, হাঁটু—সর্ব্বানন্দের টীকাসর্ব্বস্বে অণ্ডু। হিন্দী ঠিহুন। বঙ্কিমচন্দ্র আঁঠু মাতা (মাথা) লিখে গেছেন।

আড়—(১) সং অর্দ্ধ > প্রাং অড্‌ঢ, অড্ডো। (২) (√ অডড = নির্ব্বাহ, অভিযোগ; √অড্ = ব্যাপন—তা থেকে আড় = অন্তরাল ?)

আতস—ফাং আতিশ্ < প্রাং-পার আতরশ্। বৈদিক হুতাশ, হুতাশন।

আতা—ফল-বিশেষ। পর্ত্তু আতা। কানিংহামের মতে আতা দেশী ফল—সং আতৃপ্য; হব্‌সন্-জবসনের মতে বিদেশী, পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক ভারতে আনীত। *

আতুড়—অন্তঃকুটি > অন্তউড়ি > ওড়িয়া অন্তড়ি (সুনীতি-বাবু)। কবিকঙ্কণে আতুড়ি। সংস্কৃত পদ্মপুরাণে আত্রেয়ী = সূতিকাগার।

আতুর—রোগী। সং √ তূ (তুর) = আক্রমণ, পরিভব।

আদা—সং আদ্রক। বৈদিক আদার (শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার) প্রাং অদ্দঅ, অল্লঅ < সং আদ্রর্ক থেকে। হিন্দী আদরক।

আঁধার—সং অন্ধকার > প্রাং অন্ধআর, অংধার > হিন্দী মরাঠী অংধের। আন্ধারিয়া—সং অন্ধকারিত > * অন্ধআরিঅ > প্রাং অন্ধারিঅ।

আনচান—হিন্দী আনথান, যশোরে আনথানা।

আনা—সং আনক > প্রাং আনঅ = টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ।

আনাড়ী—সং অজ্ঞানী > প্রাং অন্নানী (কুমারপালচরিত ৩।৩৭)।

আনারস—১৫৯৪ খৃষ্টাব্দে ব্রেজিল থেকে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে প্রথম আনীত হয়। (শ্রীযুক্ত হরিহর শেঠ, পুরাতন কাহিনী।

আন্দাজ—ফারসী শব্দ। নুতন ফারসী অন্‌দাখ্‌-তন্ > অন্দাজ (= নিক্ষেপ < প্রা-পার হম্ + √ তচ্ < সং সং + ত্যজ্। বৈদিক ত্যজঃ = আক্রমণ।

আপন, আপোষ—সং আত্মনঃ > * আত্তণ > প্রাং আপস্‌স > হিং আপন-মে = ওড়িয়া আপস-রে।

আপসা—সং আস্ফালন। প্রয়োগ—বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৬৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য—

কিলাইতে কিলাইতে হাত হাপসাইল'।
চিতর করিয়া ফেলাইয়া যমক দেয়াবার লাগিল'॥
—মাণিকচন্দ্র রাজার গান।

আফগান—ফারসী অফ্‌-ঘান্ (সাহায্য-প্রার্থনা। < প্রাঃ-পার অবিয়-গান (চীৎকার করা) < সং অভি-গান। ফাং আফগান = শোকার্ত্ত বিলাপ।

আব—সং অভ্র > পালি-প্রাং অব্ভ > আব।

আবলুস—মূলে গ্রীক শব্দ; আরব কর্ত্তৃক পারস্যে আনীত; ফাং আবনুস।

আবার—সং অপর > প্রাং অবর > হিন্দী ওড়িয়া আবর (আউর)।

আম—সং অম্ল > সং অম্ব্র, আম্র > পালি-প্রাকৃতে আম্ব > আম, আব।

আমড়া—অম্ল > অম্র, আম্র। সং আম্রাতক > প্রাকৃত অম্বার ও অপভ্রংশ-প্রাকৃত অম্বাড়উ। সর্ব্বানন্দ অম্বাড়, মরাঠী, হিন্দী অম্বাড়া, কৃষ্ণকীর্ত্তনে আম্বড়া।

আমদানী—সং আগমন > * আগ্‌মন্, * আঅমন > ফারসী আমদন (ফারসী ধাতুর অন্তে দন্ বা তন্ থাকে)—আ (অভিমুখে) + মদন (গমন)।

আমরুত—হিন্দী। পেয়ারা। প্রাচীন-পারসীক আম্‌রূদ্ > সং অমৃত (ফল)।

আমলা—সং আমলক > প্রাং আমলও, অপভ্রংশ আবেলউ।

আমেজ—নূতন-ফারসী আমীজ = মিশ্রণ—আ মিখ্‌-তন্ = মিশ্রিত করা। প্রা-পার আ + √মিশ্ = সং আ + √ মিশ্র্।

আয়া—সং আয্যা।

আয়ান—সং অভিমন্যু > প্রাং অহিমন্ন > আইহন (শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন)।

আর—অপর > অঅর > আর। ওড়িয়া আবর; অসমীয় ও মেদিনীপুরে আউর; পঞ্জাবী অর; হেমচন্দ্রকোষে আরু। ওড়িয়া আরু।

আরজ, আরজি—ফারসী অরজ (z) < পহ্লবী অরজ, অরেজ < আবেস্তা অরেজহ্ < সং অর্হ, অর্ঘ = মূল্য, শাসন।

আরতি—সং আর্ত্তি (= অভিলাষ) < আ + রতি = অনুরাগ।

আরা, আড়া—করাত। সং আরা, ফাং অরহ্।

আরাম—সং আরাম, প্রা-পার রামন, ফাং আরাম = উদ্যান, বিশ্রাম, আনন্দ।

আরড়ী, আড়ড়ী—সর্ব্বানন্দে অরড় = প্রপাত। নদীর উচ্চ তট, ভাঙন-ধরা খাড়া উচ্চভূমি।

আল, আলটা—ছল। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ৩৬ পৃষ্ঠা।

ঔষধ করিবার আলে জন জন পালায়।—মানিকচন্দ্র রাজার গান।
আলটা করিল' বেনে তাহার কারণে॥—কবিকঙ্কণচণ্ডী, বঙ্গবাসী-১৮০।২।

আলাদ—সং অলগর্দ > সর্ব্বানন্দ অগাধ = জলকেঁচুড়িয়া (ভরত)।

আলি, আলী—তামিল আলী = নারী।

আলু—গোল আলু ও লাল আলু ব্রেজিল থেকে পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বঙ্গে আনীত হয়।

আলপিন—পর্ত্তু alfinete.

আল্লা—মূলে ক্যাল্‌ডীয় আলহা = পরমেশ্বর, আলহি = ঐশ্বরিক।

---

* অজন্টাগুহা চিত্রাবলীতে আতার ছবি আছে বলিয়া ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে গ্রিফিথসের তদ্বিষয়ক বহিতে দেখিয়াছিলাম মনে হইতেছে। তাহা ঠিক্ হইলে আতা দেশী ফল।—প্রবাসীর সম্পাদক

আসা—পচা। প্রঃ—তিল আনা, জলে পাট আনা।

আসান—ফারসী ও পহ্লবী আসান ৎ জেন্দ্ আ+স্পেন < সং আ+স্বন্=সহজে।

আসোয়ার, সোয়ার—I E ekwos+ * √ bher, bhr, bher, bhor > Indo-Iranian (c. 1800 B. C.) as was + √ bhar, bhr, bhar > (1) Indo-Aryan Vedic অশ্ব + √ভৃ (সংস্কৃত বা প্রাকৃতে এই দুইয়ের সম্মিলিত পদ কখনো ব্যবহৃত হয় নি); (2) আবেস্তা অস্প অস্পো; ইরাণী প্রা-পার অস+ √ বর, বার > অস-বার্-ই (c. 500 B. C.) (found in OP Cuneiform inscription) এই শব্দ প্রাচীন পারসীকদের পঞ্জাব দখলের সঙ্গে সঙ্গে ৫০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ভারতে আসে। সাঁচীতে প্রাকৃত ভাষায় ব্রাহ্মী-লেখে অসবারি রূপে পাওয়া যায়। > মধ্য-পার বা পহ্লবী * অসবার > ফা° আসবার, সবার।

আসমান-ফারসী আস্মান < প্রা-পারসীক অসমানম্ [দরিয়াবুস (দারায়ুস) ও ক্ষয়ার্ষ (জের্ক্সেস্) কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ পার্সিপোলিস-শিলালেখে] < আবেস্তা অশ্মন্=আকাশ। সং অশ্মন্=প্রস্তর। প্রথমে লোকে মনে করত আকাশটা পাথরে তৈরী। তুলনীয় ঋগ্বেদে পর্ব্বত=মেঘ। তাই থেকে পুরাণে পর্ব্বতের পাখায় ভর ক'রে ওড়ার কাহিনী রচিত হয়েছিল।

আড়িড়ী—সং আখেট > প্রা° আহেড় > হিন্দী অহের, কবিকঙ্কণে আহড়ি=ব্যাধ, শিকারী।

আক্ষি—সং অস্মাদিঃ > প্রা° অম্হহি। সং অস্মন্ > পালি অম্হ। বৈদিক অস্মে (বয়ম্) > পালি-প্রাকৃত অম্হে > প্রাচীন বাঙলা আহ্মে, অহ্মে, আহ্মি। সং অস্মান্ > প্রাচীন-পারসীক অহ্ম; সং অস্মাকম > প্রা°-পার অহ্মাকম্।

অষ্ট—সংস্কৃত অষ্টন্ শব্দ দ্বিবচনে প্রয়োগ হয়—অষ্টৌ। কেন? আদিম সমাজের লোকেরা গণ্ডা গণনা করত ৪ অথবা ৫ দিয়ে; গোরু-ছাগল প্রভৃতি পশুর ৪ পা আর মানুষের হাতে ৫ আঙুল ছিল তাদের গণনার এক এক থোক সংখ্যা। তার ফলে চতুর্দ্দিক, চার বেদ, চার ঋতু, ইত্যাদি। চতুর্ (৪) ছিল একটা unit বা standard সংখ্যা, এক অষ্ট (অষ্ট=√অশ্ ধাতু=ব্যাপন, রাশি করা; অষ্ট=প্রাপ্ত)। অতএব দুই অষ্ট (৪+৪) অষ্টৌ দ্বিবচন।

আশি, আশী—সং অশীতি > প্রা° আসীঈ।

(ক্রমশঃ)

হিমাদ্রি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হে হিমাদ্রি, তুমি চির অগম্য বেদের !
ভারতের শিরোদেশে তুমি নিত্যকাল
মূর্ত্ত সমস্যার মত; কতনা যুগের
সহস্র মনস্বী যত চিন্তাক্ষুব্ধ ভাল
বসেছে তোমার পায়ে। একদিন শেষে
না লভি উত্তর কোনো তব রহস্যের
নত মাথে চলি গেছে উত্তরের দেশে
উত্তরি' উত্তুঙ্গ গিরি।

ওগো হিমাচল,
আমি তোমা বুঝিয়াছি—লভিয়াছি তল
ধ্যান সরোবর নীরে; তারি নয়নের
অলৌকিক আলোকের অপূর্ব্ব আভায়
রহস্য-নিভৃত তব কান্তি শোভা পায়।
সত্যের শুভ্রতা পরে প্রেমের আলোকে
সৌন্দর্য্যের শতদল ফুটিল দ্যুলোকে॥
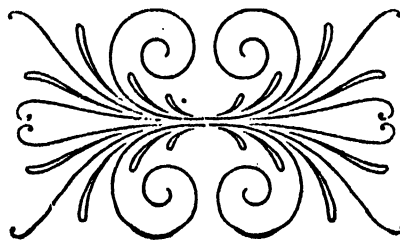
ভারতবর্ষ

কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের পঞ্চম অধিবেশন—

বিগত ৭ই ভাদ্র রবিবার কাশী ভারত স্ত্রীমহামণ্ডলের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশন সমারোহপূর্ব্বক সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। কাশীর বহু সম্ভ্রান্ত মহিলা উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণীভূষণ অধিকারী এম-এ মহাশয়ের সুযোগ্যা পত্নী শ্রীমতী সরযূবালা দেবীকে সভানেত্রীরূপে মনোনীত করা হয়। শ্রীমতী মানময়ী দেবীর সংস্কৃত বন্দনার পর শ্রীমতী ছায়ারাণী সান্যাল ও কুমারী সুকৃতি সান্যালের সুললিত সঙ্গীত হইলে, সভানেত্রী ও শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবী সম্ভাষণ, সম্পাদিকা শ্রীমতী স্নেহলতা চৌধুরী প্রবন্ধ এবং স্ত্রীমহামণ্ডলের বাৎসরিক কার্য্য বিবরণী পাঠ করেন। তাহার পর কুমারী অনুরূপা দেবীর মধুর সঙ্গীত হয়। অতঃপর দুইটি ছোট বালিকা "দেশের মেয়ে" কবিতাটি আবৃত্তি করে। তারপর শ্রীমতী নির্ম্মলা সান্যালের নারীশিল্প ও তাহাদিগের স্বাবলম্বী হওয়া সম্বন্ধে, শ্রীমতী সরোজিনী দেবীর মানুষের তর্কবাদের ফলাফল এবং অমলা দেবীর বর্ত্তমানে দেশের অবস্থায় নারীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিলে পর শ্রীমতী মানময়ী দেবী হরিকীর্ত্তন করেন। অতঃপর সিন্দুর চন্দন এবং তাম্বুলাদি দ্বারা সমবেত মহিলাগণের সম্বর্দ্ধনা অন্তে সভাভঙ্গ হয়।

দিল্লীর অন্যতম আদি প্রবাসী বাঙ্গালী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র বসু—

আমরা শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত সোমের নিকট হইতে দিল্লীর অন্যতম প্রবাসী বাঙ্গালী খ্যাতনামা স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র বসুর নিম্নোক্ত জীবন-কাহিনীটি পাইয়াছি।

দিল্লীর আদি প্রবাসী-বাঙ্গালীদের অন্যতম অক্ষয়চন্দ্র বসু মহাশয় গত ১লা ভাদ্র সোমবার ৮৩ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বসু মহাশয় কৃতী পুরুষ ছিলেন। একজন উচ্চশ্রেণীর য়্যাড্‌ভোকেট বলিয়া এ অঞ্চলে তাঁর খুব সুনাম ছিল। কিন্তু মানুষ হিসাবে তিনি আর অনেক বড় ছিলেন। তিনি আজীবন সত্যাশ্রয়ী ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। এ জন্য এদেশের লোক তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিত। বসু মহাশয়ের পূর্ব্বপুরুষেরাই ছিলেন দিল্লীর আদি প্রবাসী বাঙ্গালী। ইঁহাদের আদি নিবাস চন্দননগর। ইঁহাদের দিল্লী-উপনিবেশের কাহিনী সংক্ষেপতঃ এই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে বসু মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় চুণীলাল বসু মহাশয় যতদূর শোনা গিয়াছে দেশপর্য্যটন উপলক্ষে দিল্লী পর্য্যন্ত আসেন ও পরে "স্কিনার্স হর্স" নামক সেনাবিভাগের আপিসে কর্ম্মগ্রহণ করেন। চুণীলালের জ্যেষ্ঠপুত্র তারকনাথ বসুও পিতার অনুবর্ত্তী হন। তিনি ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লী আসিয়া পিতার কাজে বহাল হন। তারকনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমাচরণের বয়স তখন ১৫।১৬ বৎসর। তিনি দেশে ঠাকুরমার নিকট থাকিতেন। হঠাৎ একদিন তিনি ঠাকুরমার উপর রাগ করিয়া দিল্লী পলাইয়া আসিলেন। তখনকার দিনে বাঙ্গালা দেশ হইতে এ অঞ্চলে যাতায়াতের পথ একেবারেই সহজ ছিল না। এই উমাচরণই ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা। উমাচরণ দিল্লীতে আসিয়া ভাল করিয়া লেখাপড়া শেখেন এবং ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে গবর্ন্মেণ্টের খাজাঞ্চিখানার কর্ম্মে বহাল হন। নানা বিপদ আপদের মধ্য দিয়া ইঁহারা এখানে স্থায়ী হন।

ইহলোক ত্যাগ করিয়া মানুষ পরলোকে চলিয়া গেলেই তাঁহার সম্বন্ধে প্রশংসার শতমুখ হইয়া উঠা সাধারণ নিয়ম। বসু মহাশয় জীবদ্দশাতেই সকলের নিকট সকল বিষয়ে প্রশংসাভাজন ছিলেন। তাঁহার ব্যবহারিক জীবন, সমাজ জীবন ও পারিবারিক জীবন এমনই উদার, উন্নত ও স্নেহময় ছিল যে তাহা প্রবাসী বাঙ্গালীদের আদর্শ হওয়ার যোগ্য।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা কেবল স্বজাতির বিশিষ্টতা লইয়া গৌরব করেন এবং এ দেশীয় সকল ব্যাপারেই উদাসীন থাকেন। বসু মহাশয় কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি অ-বাঙ্গালীদের সঙ্গে সকল বিষয়ে অন্তরের সহিত মিশিতেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদেরই একজন, যাঁহাদের উন্নত চরিত্র বাঙ্গালীকে এ দেশবাসীর নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র করিয়া তুলিতে পারে। তাঁহার শক্তি ও অর্থ কেবল নিজের স্বার্থেই ব্যয়িত হইত না। লোকহিতকর সকল অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তাঁহার আন্তরিক সহযোগিতা ছিল। তাঁহাকে পাইলে সকল অনুষ্ঠানই সাফল্যলাভ করিত। তাঁহার গোপনদান অনেক ছিল। বহু দরিদ্র ছাত্রকে তিনি অর্থসাহায্য করিতেন—তার ভিতর বাঙ্গালী, অবাঙ্গালী এবং মুসলমান ছাত্র ও ছিল। সকলকেই তিনি সমানভাবে দেখিতেন।

তিনি নানা ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন ও একজন দক্ষ আইনবেত্তা ছিলেন। দিল্লীতে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আইনের ক্লাস খোলা হইলে বসু মহাশয় "ডীন অফ দি ফ্যাকাল্টি অফ ল" এই সম্মানের পদ পাইয়াছিলেন এবং তিন বৎসর যোগ্যতার সহিত এই পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

তিনি আজীবন প্রবাসী ছিলেন। কিন্তু বহুকাল এদেশে থাকিয়াও নিজের বাঙ্গালীত্ব ভুলিয়া যান নাই। তিনি সেকালের একজন খাঁটি বাঙ্গালী ছিলেন। বাঙ্গালীর সমাজজীবন যাহাতে অটুট থাকে, বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা যাহাতে বজায় থাকে, তজ্জন্য তিনি প্রাণপণ যত্ন করিতেন, অর্থব্যয়ও করিতেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের স্থাপিত দিল্লীর অতি প্রাচীন উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়টি তাঁহার অত্যন্ত আদরের ছিল। নিজের ছেলেদের মত করিয়াই এটিকে তিনি পোষণ করিতেন।

দিল্লীর বাঙ্গালী সমাজ ঠিক যেন একটি বৃহৎ পরিবার—এমনই তা সখ্যসূত্রে আবদ্ধ। আর বসু মহাশয় ছিলেন তার কর্ত্তৃস্থানীয়। বস্তুতঃ যে-সকল গুণ থাকিলে শীর্ষস্থানীয় হওয়া যায়, তার মধ্যে বোধ করি তার কোনটিরই অভাব ছিল না। স্নেহের আবেষ্টন দিয়া তিনি সকলকেই ঘিরিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনে প্রবাসী বাঙ্গালীদের যে ক্ষতি হইল, কোনরকমেই তা পূর্ণ হইবার নয়।

"পিয়েটা"
ডেট্রয়েট ইনষ্টিটিউট অফ আর্ট — কার্লো ক্রিভেলী

ইতালীয় চিত্রকলার পরিচয়

শ্রীমন্মথ চৌধুরী

১

মনোরম রমণীমূর্ত্তি, ঠিক মানুষের মত দেখিতে মানুষ, শিশুর মত দেখিতে শিশু, ঘর-বাড়ী, গাছ-পালা, জীব-জন্তু, সবই নৈসর্গিক, মোটের উপর ক্যানভাসের উপর রং-এ ও রেখায় আবদ্ধ সাধারণ দৃশ্যজগতেরই একটি প্রতিচ্ছবি—এই হইল ইতালীয় চিত্র সম্বন্ধে আমাদের ধারণা। কিন্তু জনপ্রচলিত হইলেও এ ধারণা ভুল। ইহার জন্য দায়ী সপ্তদশ শতাব্দীর বারোক চিত্রকলা ও তাহার অনুকরণে সৃষ্ট অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর অ্যাকাডেমিক চিত্র। এই আর্টের উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতিকে প্রকৃতির মত করিয়া দেখান। আর্টের প্রধান যে উদ্দেশ্য রূপসৃষ্টি, সেদিকে তাহার মন ছিল না। ইতালীয় চিত্রকরেরাও প্রকৃতিকে ধরিতে চাহিয়াছেন সত্য, কিন্তু ক্যামেরার দৃষ্টিতে নয়। রস-জ্ঞানের ভিতর দিয়া চিত্রে তাহার পুনর্জ্জন্ম ঘটিয়াছিল। একথা অবশ্য সত্য যে ইতালীয় চিত্রকরের সেই শ্রেষ্ঠ মনোবৃত্তি—সত্যনিষ্ঠা, বারোক শিল্পীরাও সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পূর্ব্বতন ইতালীয়দের সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে যে রসবোধের সংযোগ ছিল, বারোকেরা তাহা হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্রকলার মধ্যে যখন আমরা ব্যবধান টানি, তখন পাশ্চাত্য বলিতে আমরা বারোক ও বারোক অনুকারী চিত্রকলা বুঝি—ক্ল্যাসিকাল ইতালীয় নয়।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর আগেকার যে ইয়ুরোপীয় চিত্রকলা, তাহার সঙ্গে ভারতীয়, চীনা, জাপানী, কোন প্রাচ্য চিত্রকলার প্রভেদ নাই। এ চিত্রকলায় বস্তুর স্থূলতাকে সম্পূর্ণভাবে দেখাইবার কোন চেষ্টা নাই; পারস্পের্ক্টিভের জ্ঞান তাহাতে খুব বেশী দেখি না; চিত্রের রচনা একটি মাত্র প্লেনেই সম্পূর্ণ। ইহার ফলে এই আর্টে প্রতিকৃতির দিক চিত্রের ডেকোরেটিভ বা আলঙ্কারিকদিককে পরাভূত করিতে পারে নাই, বরঞ্চ ইহার বিপরীতটাই চিরকাল বজায় রহিয়াছে; অর্থাৎ

উর্বিনোর ডিউক ও ডাচেস—পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চেস্কা
উফিৎজি, ফ্লোরেন্স

ছবির আলঙ্কারিক দিকের প্রয়োজন অনুযায়ীই তাহাতে রেখাপাত হইয়াছে, রেখার অর্থজ্ঞাপনের দিকটা সম্পূর্ণরূপে বিচার করা হয় নাই। এইখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন আসে যে, ছবির আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য কি কেবল একটি মাত্র সারফেসেই সম্ভব? বিভিন্ন প্লেনে এ কি ডেকোরেশন সম্ভব নয়? স্থপতি শিল্পের যে সৌন্দর্য্য, দেখিতে পাই তাহা কেবল একটি মাত্র প্লেনের উপর নির্ভর করে না, তবে এই ধরণের রচনা চিত্রে রূপসৃষ্টি করে কিনা তাহা ইতালীয় চিত্র হইতে বিচার্য্য। প্রাচ্য কিম্বা মধ্যযুগের ইয়ুরোপীয় চিত্রের অলঙ্কার আলপনার মত, একটি মাত্র সারফেসে রেখা এবং বর্ণ সংযোগে তাহার সৃষ্টি, ছবির এত আঙ্গুল লম্বা এত আঙ্গুল চওড়া তুলোটের কিংবা এত ইঞ্চি লম্বা এত ইঞ্চি চওড়া ক্যানভাসের সীমায় তাহা আবদ্ধ। এই বিশেষ রকমের অলঙ্কার অবশ্য বিভিন্ন প্লেনে রচনা করা সম্ভব নয়।

প্রাচ্য কিম্বা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় চিত্রকলায় অলঙ্কারের স্থান উপরে থাকিলেও চিত্রকরের উদ্দেশ্য ছিল তুলিতে একটা কিছুর প্রতিচ্ছবি আঁকা। গুহাবাসী মানব হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা, জাপানী, ভারতীয়, ইতালীয়, আধুনিক ইউরোপীয়, সকল চিত্রকরের উদ্দেশ্য একই—প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আঁকা। কিন্তু অজ্ঞানে সকলেই তাহা সুন্দর ভাবে করিবার চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই জন্যই

তাহারা চিত্রকর। প্রকৃতিকে সুন্দরভাবে আঁকিতে হইবে, ইহা সকল আর্টেরই গোড়ার কথা। প্রকৃতিকে আঁকা ইচ্ছানুগত হইতে পারে, কিন্তু সুন্দরভাবে আঁকা চিত্রকরের ইচ্ছার বাহিরে। চিত্রকরের রসবোধ সে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির মূলে। আর্টে শুধু সত্যের কোন মূল্য নাই, যদি না তাহা সুন্দর হয়। হয়ত যাহা সুন্দর নয়, তাহা চরম সত্য নয়। প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি আমাদের আনন্দ দেয় না, অথচ কয়েকটি অর্থশূন্য রেখা এবং কতকগুলি রং-এর সমাবেশ আমাদের মুগ্ধ করে। চিত্রকলার উদ্দেশ্য যখন প্রতিচ্ছবি আঁকা এবং আমাদের রসবোধ যখন শুধু প্রতিচ্ছবিতে তৃপ্ত হইবার নয়, তখন আর্ট সৃষ্টি করিতে হইলে এ দুয়ের যোগাযোগ প্রয়োজন, সুতরাং শ্রেষ্ঠ চিত্রকলা আমরা তাহাকেই বলিতে পারি যাহাতে প্রতিচ্ছবির মধ্যে রসভোগের সম্পূর্ণ উপাদান পাওয়া গিয়াছে।

যীশু ও মেরী---লুকা সিনিওরেলি
ইউলিয়ুস বাকে সংগ্রহ, নিউইয়র্ক

তাই মনে হয়, প্রতিচ্ছবির সঙ্গে সৌন্দর্য্যসৃষ্টির কোন বিরোধ নাই। তাহা করিতে গিয়া কেবলমাত্র প্রতিচ্ছবির সেই আদর্শ রূপটির সন্ধান করিতে হইবে যাহার সঙ্গে রসবোধের কোন অমিল নাই। মানবমূর্ত্তির সৌন্দর্য্য আমরা উপভোগ করি কি করিয়া? সে কি মানুষ বলিয়া, না তাহার দেহের রূপে

বেয়াত্রিচে দেস্তে—আম্ব্রোজো ডা প্রেডিস্
আম্ব্রোজিয়ানা গ্রন্থাগার, মিলান

আমাদের রসজ্ঞান পরিতৃপ্ত হয় বলিয়া? সুতরাং মানব দেহের সেই রূপ যাহারা খুজিয়া পাইয়াছে, তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলিতে পারি। গ্রীক মূর্ত্তিকে অনেকে বাস্তব মূর্ত্তি বলেন, প্রাচ্য ভাস্কর শিল্পের সঙ্গে তুলনা করিয়া। কিন্তু ঐ সকল মূর্ত্তিতে যে মানুষ দেখি সে প্রকৃতির মানুষ নয়, সে আদর্শ সুন্দর মানুষ। মানুষের রসজ্ঞানে তাহার জন্ম, শিল্পীর রচনায় তাহার প্রকাশ।

প্রাচ্য চিত্রকলার যে পদ্ধতি তাহাতে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির আদর্শে ছবি আঁকা সকল সময়ে সম্ভব নয়। সে-সকল চিত্রে আলো-ছায়া নাই, দৃশ্য-বিজ্ঞান নাই, স্থূলতা (plasticity) নাই। তাহাতে প্রকৃতির অনুকরণের

একমাত্র অবলম্বন রেখা। যেখানে রেখার ভঙ্গিতে সম্পূর্ণভাবে বাস্তবের ভ্রম সৃষ্টি করা সম্ভব হইয়াছে, সেইখানেই উহা চরম উৎকর্ষে পৌছিয়াছে। বাস্তবিক

তরুণীর প্রতিকৃতি—লিয়োনার্ডো
চারটোরিস্কি সংগ্রহ, ক্রাকভ

পক্ষে প্রাচ্য কিম্বা প্রাচীন ইয়ুরোপীয় চিত্রকলার অবাস্তবতার জন্য তাহাদের শিল্প-পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশী দায়ী সে-সকল যুগের গতানুগতিকের শৃঙ্খল।

ইতালীয় চিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্য তাহাকে কেবল আর্টের একটা ধারা বলিয়া শেস করিয়া দেওয়া চলে না। এই আর্টের বৈশিষ্ট্য ইউরোপীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছায়া। মধ্যযুগের কিম্বা প্রাচ্য আর্টের সঙ্গে এ আর্টের প্রভেদ শুধু পদ্ধতিতে কিম্বা শিল্পবিজ্ঞানে নয়। রেণেসান্সের সত্যনিষ্ঠা, জ্ঞানপ্রতিভা, মনের উদারতা এই আর্টকে অন্য রূপ দিয়াছে। সত্যকে প্রকাশ যদি আর্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে মানুষকে মানুষের মত আঁকিতে বাধা কি, এটাই এই নূতন যুগের আর্টের মূল কথা। Convention কিংবা tradition তাহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। কিন্তু এই যুগের আর্টের রসের দিকটা বিজ্ঞানের দান নয়—তাহা শাশ্বত। তাই ইতালীর শিল্পীরা মানুষের আদর্শ লইয়াছিলেন গ্রীক মূর্ত্তি হইতে। বিজ্ঞানের আধিপত্য স্বীকার করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপ আর্ট ও রসসৃষ্টির কথা ভুলিয়া গিয়া সঙ্গীতে কাওলাতীর মত চিত্রকলাতেও দৃশ্যবিজ্ঞান ও তদনুরূপ বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া সুরু করিয়াছিল। কিন্তু যখন এই ভ্রান্তি ঘটিল, তখন ইউরোপীয় আর্টের শ্রেষ্ঠ যুগ অতীত।

জোভানা টোর্ণাবুয়োনি—গিরলাণ্ডাইও
পিয়েরমন্ট মর্গ্যান সংগ্রহ, নিউইয়র্ক

২

ইতালীয় চিত্রকলার বিশিষ্টতার সূচনা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে। কিন্তু ইতালীর সকল জায়গার চিত্রকলা কালক্রমে ধারাবাহিক রূপে চলিয়া আসে নাই। ফ্লোরেন্স,

একটি সিবিল—পেরুজিনো
সালা ডেল কাম্বো, পেরুজিয়া

সেণ্ট জন দি ব্যাপ্‌টিষ্ট—লিওনার্দো
লুভর, প্যারিস

একটি সিবিল—পেরুজিনো
সালা ডেল কাম্বো, পেরুজিয়া

যীশু - লিওনার্ডো
ব্রেরা গ্যালারী, মিলান

সিয়েনা, আম্ব্রিয়া, ভেনিস সকলেই স্থানীয় বিশেষত্ব বজায় রাখিয়াছে। আবার এক জায়গার আর্ট যখন উন্নতির কতগুলি ধাপ ছাড়াইয়া গিয়াছে, তখনও অন্য আর এক জায়গার চিত্রকলা নূতন আলো দেখে নাই। ফ্লোরেন্স এবং সিয়েনা এক সঙ্গে রওনা হইলেও সিয়েনার গতি ফ্লোরেন্সের বহুপূর্ব্বেই রুদ্ধ হইয়াছিল। আবার ভেনিস তার নিজস্বতা সত্ত্বেও ফ্লোরেন্সের কীর্ত্তিকে আরও কিছু দূর অগ্রসর করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই ভাবে ইতালীর বিভিন্ন স্কুলের এবং বিভিন্ন কালের চিত্রকে একত্র করিয়া আমরা যে আর্ট পাইয়াছি, সেই সমষ্টিটুকুর বিশেষত্বকে আমরা ইতালীয় চিত্রকলার কীর্ত্তি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ফ্লোরেন্স এবং সিয়েনাতে নূতন আর্টের দিকে প্রথম প্রচেষ্টা হয়। ফ্লোরেন্সে জোত্তো এবং সিয়েনাতে ডুট্‌চো আর্টকে মধ্যযুগের বাইজেণ্টাইন প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তি দেন। জোত্তো এবং তাঁহার গুরু চিমাবুয়ে বস্তুর স্থূলতার (plasticity) দিকে নজর দেন। চিত্রে এই নূতনত্বের প্রবর্ত্তন করিয়াও যে জোত্তো আর্টের দিক হইতে চিত্রকে নিখুঁত রাখিতে পারিয়াছিলেন, ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। ইতালীর সমগ্র রেণেসান্স চিত্রকলার পূর্ব্বাভাস তাঁহার চিত্রে দেখিতে পাই। তবে তিনি স্থূলতাকে অথবা তিন ডাইমেনশনকে চিত্রে টানিয়া আনিলেও তিন ডাইমেনশনে চিত্ররচনা করিবার সমস্যা তাঁহার চিত্রে দাঁড়ায় নাই। সুতরাং ঠিক আলপনার মত না হইলেও তাঁহার চিত্র একেবারে প্যাটার্ণ বর্জ্জিত নয়।

যীশু, মেরী ও জোসেফ—মাইকেল এঞ্জেলো
উফিৎজি, ফ্লোরেন্স

সিয়েনার চতুর্দ্দশ শতাব্দীর চিত্র সেইখানকার পরবর্ত্তী যুগের চিত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। ডুট্‌চো স্থূলতা লাভ করিয়াছেন এক অভিনব উপায়ে। রং-এর মূল্য সিয়েনীয়রা বেশ বুঝিতেন। ডুট্‌চো সোনালি পশ্চাৎ পটের উপর রং দিয়া তিনটি মূর্ত্তি এমন ভাবে আঁকিয়াছেন, যে, মনে হয় যেন দূর পশ্চিম আকাশে সূর্য্যাস্তের সময় তিনটি মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ইতালীর অন্যান্য স্থানের চিত্রকরেরা যে-ভাবে স্থূলতাকে চিত্রে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সিয়েনীয়রা সে ভাবে কখনই করে নাই। তাহাদের চিত্রে প্যাটার্ণ চিরকালই বজায় ছিল।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যে নূতনত্বের আভাস মাত্র দেখিতে পাই, ফ্লোরেন্সে পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়; চিত্রকলার শিল্পের দিকটা প্রকৃত উন্নতি লাভ করে। বিজ্ঞানের তথ্যকে তখনই রূপসৃষ্টির কাজে লাগান হয়। রেখা, শূন্য এবং ছায়ার বিজ্ঞানের তখনই সম্পূর্ণ চর্চ্চা

আরম্ভ হয়; দেহতত্ত্বের জ্ঞান যথেষ্ট বাড়িয়া যায়;-প্রাণবান ও প্রাণহীন সকল বস্তুরই সূক্ষ্ম আলোচনা সুরু হয়। এই নবলব্ধ জ্ঞান এবং পদ্ধতির সফলতা চিত্রের রচনাকে পরিবর্ত্তিত করিতে বাধ্য করে। প্যাটার্ণ নির্ম্মাণ ছাড়িয়া চিত্রকরকে বিভিন্ন প্লেনে চিত্ররচনায় মন দিতে হয়। মাসাচ্চো, পলাউওলো, ডা ভিঞ্চি প্রভৃতি চিত্রকরেরা ফ্লোরেন্সে নূতন চিত্রকলার স্থায়ী ভিত্তি নির্ম্মাণ করেন।

ভেনিসে এই সময়ে মানটেনিয়া প্রভৃতি বড় চিত্রকরেরা চিত্রকলায় নূতনত্বের আমদানী করিতেছিলেন। ভেনিসের আর্টে বাইজেনসিয়ামের প্রভাব অনেকদিন পর্য্যন্ত এবং অনেক বেশী পরিমাণে ছিল। ভেনিস সেই যুগে বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল—প্রাচ্যের সঙ্গে তাহার আদান-প্রদান ছিল। এই সকল কারণে ভেনিসের চিত্রকলায় সেই ঐশ্বর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার রংএর উজ্জ্বলতাও কোনদিনই কমে নাই। ভেনিসের সমুদ্রও ভেনিসের আর্টে উপর তাহার ছাপ রাখিয়া গিয়াছে। ভেনিসীয় চিত্রে একটা দৃষ্টির প্রসারতা আছে। জোর্জ্জোনের চিত্রকলায় তাহার সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম প্রকাশ।

নারীর সৃষ্টি—মাইকেল এঞ্জেলো
সিষ্টাইন চ্যাপেল, রোম

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইতালীর সর্ব্বত্রই নূতন আর্ট ফুটিয়া উঠে। সকল চিত্রকরই নূতন বিজ্ঞান, নূতন অভিজ্ঞতা এবং নূতন পদ্ধতিকে কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন। ফ্লোরেন্সের প্রাধান্য তখন কমিয়া আসিয়াছ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দুইজন শিল্পী মাইকেল এঞ্জেলো এবং রাফায়েল রোমে আহূত হন এবং কয়েক বৎসরের পরিশ্রমের ফলে রোমকে চিঙ্কেচেন্তোর অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিত্রে ভূষিত করেন। মিলানে লিওনার্ডো তাঁহার অসাধারণ মনীষার পরিচয় দেন। পারমায় করেড্জো জন্মগ্রহণ করেন। ভেনিসে জর্জ্জোনের রোমান্স এবং বেলিনির সূক্ষ্ম শিল্পচাতুর্য্য মিলিয়া টিশিয়ানের শিক্ষা সমাপ্ত করে।

এই শতাব্দীর মধ্যভাগে রোম, ফ্লোরেন্স ও মিলানের গৌরব লুপ্ত হইয়া আসে,কিন্তু ভেনিসে টিশিয়ান, টিনটরেটো এবং পল ভেরোনিজে চিত্রকলার উচ্চ আদর্শ বজায় রাখেন। অবশেষে বলোনিয়াতে একটি নূতন প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। গড়নের সৌন্দর্য্যের সঙ্গে ভেনিসীয় রংএর চাকচিক্য মিশানোই এই স্কুলের উদ্দেশ্য ছিল। কারাভাডজোর নেতৃত্বে একটু রূপান্তরিত হইয়া এই ধারাটি আবার রোমে এবং নেপ্‌লসে ফিরিয়া যায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন স্কুলের বিশেষত্ব মুছিয়া গিয়া ইতালীয় চিত্রকলা এক হইতে আরম্ভ করে। এই যুগে কোন নূতন পদ্ধতি কিংবা নূতন জ্ঞানের আবির্ভাব হয় নাই। পুরাতন প্রথা অনুযায়ীই শিল্প রচনা হইতে থাকে। ইতালী তখন সমগ্র ইয়ুরোপের শিক্ষা-কেন্দ্র হইয়া উঠে। নেদারলেণ্ডস্ হইতে রুবেন্স্, স্পেন হইতে ভেলাস্কেথ এবং ফ্রান্স হইতে পুসে ইতালীতে তাঁহাদের শিক্ষা সমাপ্ত করিতে আসেন।

৩

চিমাবুয়ে হইতে আরম্ভ করিয়া মাইকেল এঞ্জেলো পর্য্যন্ত ফ্লোরেন্সের চিত্রকলা ক্রমবিকাশের পথে চলিয়াছে। চিমাবুয়ে যে প্ল্যাষ্টিক রচনার আভাস দেন, তাহার পূর্ণ পরিণতি হয় মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রে।

দান্তে—রাফায়েল অঙ্কিত ফ্রেস্কোর অংশ
'সেন্টপিটার্স', রোম

মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৩—১৫৬৩) ছিলেন মুখ্যত ভাস্কর। তাঁহার চিত্রকলাতেও ভাস্কর্য্যের প্রভাব লক্ষিত হয়। তিনি চিত্রে আলো-ছায়ার দিকে বেশী নজর দেন নাই। তাহার বেশীর ভাগ চিত্রই ফ্রেস্কো অর্থাৎ দেয়াল চিত্র। চিত্রকর হিসাবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ দান সিষ্টাইন চ্যাপেলের চিত্রিত ছাদ।

ভাস্কর শিল্পের অতিরিক্ত প্রভাব মাইকেল এঞ্জেলোর চিত্রকলাকে সকল সময় চিত্রকলা হিসাবে সম্পূর্ণতা দিতে পারে নাই। লিওনার্ডো (১৪৫২-১৫২১) স্থূলতাকে চিত্রে প্রতিফলিত করিয়াছেন, কিন্তু চিত্রকে ভাস্কর্য্যের মত করিয়া নয়। মাইকেল এঞ্জেলোর মত তিনি স্থূলতার দিকে অতিরিক্ত জোর দেন নাই বটে, কিন্তু আলো-ছায়ায় রচনার যে আভাস তিনি দিয়াছেন তাহার পরিণতি হইয়াছে রেমব্রাণ্টের চিত্রকলায়। তাঁহার মধ্যে বাস্তবকে সম্পূর্ণভাবে আঁকিবার চেষ্টা এবং নিজস্ব শিল্পরচনার ক্ষমতা সকল সময় মিশ রাখিয়া চলিতে পারে নাই। তাই তাঁহার বহু ছবি অসম্পূর্ণ। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্র লা জোকোণ্ডাকেও তিনি সম্পূর্ণ মনে করেন নাই। লিওনার্ডোর চিত্রের আর একটি বিশেষত্ব তাহার মনস্তত্ত্বের দিক। পরবর্ত্তী যুগে অবশ্য মনস্তত্ত্বকে এত উপরে স্থান দেওয়া হইয়াছে

গ্যালাটিয়া—রাফায়েল
ফার্ণেজিনা, রোম

যে, চিত্র নাটকে পরিণত হইয়াছে। ছবির মুখ্য উদ্দেশ্য চিত্রের দ্বারা আমাদিগকে সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করান। মনস্তত্ত্বকে অবশ্য কোন ছবিই সম্পূর্ণ বাদ দিতে পারে নাই, কিন্তু তাহার স্থান চিত্রে ততখানিই, যতখানি মানুষ হিসাবে মানুষের দেহের প্রয়োজন। বারোক এবং তাহার

পরবর্ত্তী চিত্রকলা শুধু প্রতিচ্ছবিকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দেয় নাই। দৃশ্যের দৃষ্টিগত অর্থকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতার দিকে মন দিয়াছে। লিওনার্ডোই একমাত্র চিত্রকর যিনি মনস্তত্ত্বকে উপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন।

বটিচেলীর (১৪৪৪-১৫১০) আর্টে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলার যাহা শ্রেষ্ঠ তাহার সমাবেশ ঘটিয়াছে। তাঁহার আর্ট সম্পূর্ণ তাঁহার নিজস্ব। তাঁহার চিত্রকলার বিজ্ঞানের ভারে ভারাক্রান্ত নয়। চিত্রকরের স্বাভাবিক সংস্কারের প্রেরণায় তিনি চিত্র আঁকিয়াছেন। স্থূলতাকে তিনি ফুটাইয়াছেন, কিন্তু আলো-ছায়া দিয়া নয়। তাঁহার রেখার ভঙ্গি ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। চীনা, জাপানী ও ভারতীয় চিত্রকরের

রাফায়েল অঙ্কিত ফ্রেস্কো
ষ্টানজা দেলা সেনিয়াতুরা (ভ্যাটিকান), রোম
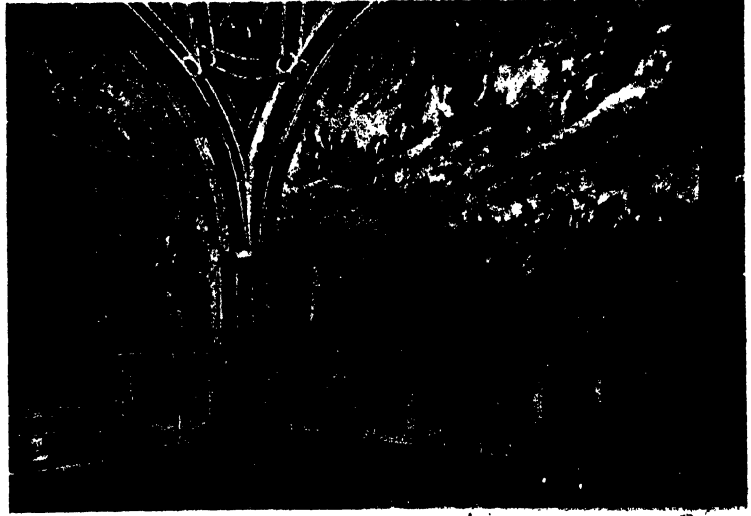
ষ্টানজা দেলা সেনিয়াতুয়ার ফ্রেস্কোর একটি অংশ---রাফায়েল
ভ্যাটিকান, রোম

রেখা হইতেও তাঁহার রেখা মনোরম। "ভিনাসের জন্ম" নামক চিত্রে তাঁহার চিত্রকলার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে। বটিচেলীর রচনা তিন ডাইমেনশনে নয়, অথচ তিনি বাস্তবকেও ভুলিয়া যান নাই। প্রাচ্যজাতির কাছে বোধ হয় বটিচেলীর চিত্রকলাই ইতালীর চিত্রকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলিয়া মনে হইবে। রেখাকে ছাড়িয়া যে চিত্র, তাহার সৌন্দর্য্যবোধ আমাদের কাছে সহজে হয় না।

আম্ব্রিয়ার চিত্রকলা ফ্লোরেন্সের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। পিয়েরো দেলা ফ্রাঞ্চে-

শ্বাকে (১৪১৬ ?—১৪৯২) ফ্লোরেন্সের চিত্রকর বলিলেও ভুল হয় না। চিত্রকর হিসাবে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। উফিৎজির Triumph, উরবিনোর যিশু, এই দুইখানি চিত্রই তাঁহার যশের পরিচয় দেয়।

সিনিয়োরেলি (১৪৪১-১৫২৩ পিয়েরোর শিষ্য। ফ্লোরেন্সের প্রথা অনুযায়ী তিনি দেহতত্ত্ব এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তবুও

যীশুমাতা—করেড্জো
গ্যালারী, পারমা

তিনি আম্ব্রিয়ার চিত্রকরের যে বিশেষত্ব মুক্ত রচনা, তাহাতে দক্ষতা দেখাইয়াছেন। তাঁহার চিত্রিত Flagellation-এ তাঁহার গুরুর স্নিগ্ধ বর্ণবিন্যাসের পরিচয় পাওয়া যায়।

পেরুজিনো (১৪৪৬ ১৫২৩) আম্ব্রিয়ার বিশেষত্বকে খুব ভাল করিয়া ফুটাইতে পারিয়াছেন। দূরের দৃশ্য, ইতালীর অসমতল ভূমির তরঙ্গ, পশ্চাতে সুনীল আকাশে মিলিয়া যাওয়া সবুজ উপত্যকার সারি, পেরুজিনোর চিত্রকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০) যখন অপরিণত বয়স্ক যুবক, তখন ইতালীর আর্ট জগতে লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো, ফ্রা বার্টোলোমিয়ো প্রভৃতি চিত্রকরেরা অতুলনীয় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। প্রথমে পেরুজিনোর এবং পরে বার্টোলোমিয়োর কাছে রাফায়েল শিক্ষালাভ করেন। স্বাভাবিক প্রতিভা তাঁহাকে চিত্রকর হিসাবে উচ্চ স্থান দিয়াছিল। কিন্তু ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি যে সকল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তাঁহাকে অসাধারণ আখ্যা দেওয়া যায় না। ১৫০৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রোমে যান এবং সেইখানকার গ্রীক প্রভাবে তাহার চিত্রবিদ্যা নবজন্ম লাভ করে। ভ্যাটিকানে তিনি Dispute of the Sacrament চিত্রিত করেন এবং তাহা হইতেই তাঁহার মনের প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রতিকৃতি অঙ্কণে তিনি খুব সিদ্ধহস্ত ছিলেন। Baldassare Castiglione নামক চিত্রে কিম্বা The Mass of Bolsena তে এই বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভেনিসের চিত্রকলায় নূতন যুগের প্রথম প্রকাশ হয় পাডুয়ার চিত্রকর মানটেনিয়ার চিত্রে। রোমের প্রভাব মানটেনিয়ার মনে খুব বেশী ছিল, তাই তাঁহার মনুষ্যমূর্ত্তি প্রাচীন রোমের মূর্ত্তির মত। মানটেনিয়ার চিত্রের কঠিনতাটুকু জোভানি বেলিনি (১৪৩১-১৫১৬) বাদ দিতে পারিয়াছিলেন। ভাস্কর শিল্পের প্রভাব তিনি একমাত্র তাঁহার চিত্রের মানব মূর্ত্তিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে তিনি মধুর ভাবে আঁকিয়াছেন। বেলিনির প্রতিভা অসাধারণ ছিল। তাঁহার শিল্পপদ্ধতি এবং বর্ণবিন্যাস অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া ভেনিসের চিত্রকলাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল The Agony in the Garden, নেপলসের Transfiguration এবং ন্যাশান্যাল গ্যালারীর Madonna of the Meadow, Doge Leonardo Loredano,—এইগুলি তাঁহার বিখ্যাত চিত্র।

টিশিয়ানের (১৪৭৭-১৫৭৬) চিত্রকলার প্রারম্ভ যেখানে, সেখানে বেলিনির চিত্রকলার শেষ; এবং টিশিয়ানের সমাপ্তি যেখানে সেইখানে রেমব্রাণ্ট-এর আর্টের সূচনা। টিশিয়ান ও জর্জ্জোনে (১৪৭৮-১৫২৪) সমসাময়িক, কিন্তু টিশিয়ান জর্জ্জোনের শিষ্য ছিলেন। জর্জ্জোনের প্রভাব তাঁহার মধ্যে যথেষ্টই ছিল। জর্জ্জোনে ইতালীর চিত্রকলাকে Classicism হইতে Romanticism এ লইয়া যান। বেলিনিই প্রথমে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের প্রাণের যোগ দেখাইয়াছিলেন। জর্জ্জোনে ভেনিসের রংএর বিচিত্রতা তুলিতে ফলাইয়াছেন। The Tempest এবং Fête Champetre তাহার দুইখানি বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত চিত্র। টিশিয়ানের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি তার Bacchus ও Ariadne। টিশিয়ানের চিত্রকলার আরও দুইটি ধারা ছিল, একটি আলেখ্য অঙ্কণ, অপরটি ধর্ম্মবিষয়ক চিত্র। Pieta ধর্ম্মচিত্রে তাহার শ্রেষ্ঠ দান—ধর্ম্মভাবের দিক হইতে ইহাকে জোত্তো হইতে মাইকেল এঞ্জেলো পর্য্যন্ত যে কোন চিত্রকরের চিত্রের সহিত তুলনা করা চলিতে পারে।

তৃণাঙ্কুর

শ্রীমতী শান্তি সেন

আসন্নমৃত্যুর ছায়া দুর্য্যোগের মেঘের মত বাড়ীখানিকে ছাইয়া রাখিয়াছে। অস্ফুট বিলাপধ্বনি ও অশ্রুপাত ক্রমেই যেন নিবিড় হইয়া উঠিতেছে, জীবনযাত্রার আনন্দটুকু ক্ষণকালের জন্যও একবার উঁকি মারে না। দেখিয়া শুনিয়া তিন চার বছরের মেয়েটিও পর্য্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে।

সবাই বলিতেছে, আহা এমন লক্ষ্মীশ্রী এম্‌নি হ'য়ে গেল, এই বয়সেই,—

বলিবারই কথা! যে রূপ দেখিলে চোখ ফিরিয়া আসে না, সেই রূপেরও যে এই পরিণতি হইতে পারে, কল্পনাও করা যায় না। দেহখানি যেন বিছানার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে; তবু মুখখানা টল্ টল্ করিতেছে। চোখ দুটি উজ্জ্বল দেখায়।

পড়শী বউয়েরা আসিয়া দেখিয়া যায়, যাইবার সময় নিজেরাই বলাবলি করে,—"মুখখানি কি মিষ্টি ভাই,— আর কি মিষ্টিই-বা কথাগুলো, আঃ—"

—কিন্তু বাঁচবে না।

– ওই ছোট্ট মেয়েটি বুঝি ওরই—আহা—বেচারা"

এম্‌নি আরও কত কথা—

রাস্তায় নামিয়াও তাহারা তাকায়, দেখে,—জানালার ভিতর দিয়া রোগী শূন্যদৃষ্টিতে বাহিরের পানে তাকাইয়া আছে।

শহর ছাড়াইয়া বহুদূরে খোলা মাঠের উপর বাড়ীখানি।

সৌধ সমাজ হইতে একেবারেই যেন বিচ্ছিন্ন। চারিদিকে ফাঁকা মাঠ,—কেবল ধূ ধূ করিতেছে। বাড়ী এদিকে আরও আছে, কিন্তু কোনোটাই কোনোটাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে নাই,—খুব দূরে দূরে। একটা রাস্তা সেই দূরের বাড়ীগুলিকে একখানি মালার মত গাঁথিয়া চলিয়া গিয়াছে। কাছেই একটা পাহাড়ী নদী। শীর্ণ দেহের ধমনীর মত নদীটা মাঠের বুক চিরিয়া বালুরাশির উপর দিয়া গড়াইতে গড়াইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর দেখাই যায় না। কাঁকর পাথরের পার দুইটি রৌদ্রে ঝক্ ঝক্ করিতে থাকে। ওপারে কতগুলি খড়ের ঘর। তারই আশেপাশে বহুদূরব্যাপী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র। আকাশটা যেন ঘরগুলির গা বাহিয়া নামিয়া আসিয়া সবুজ ক্ষেতগুলির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। লাল

সুরকীর সোজা রাস্তাটার দুই ধারে সারি দেওয়া বড় বড় গাছ। কৃষ্ণচূড়া, অশ্বত্থ, আম, জাম, তেঁতুল আর তারই মাঝে মাঝে ছাতার মত ছাঁটাকাটা গোল-ধরণের কতগুলি বকুল গাছ। গাছগুলির মাঝখান দিয়া চওড়া লাল রাস্তাটা একেবারে সরু হইয়া কোথায় যেন সবুজের আড়ালে মিশিয়া গিয়াছে। ঠিক যেন সীমন্তে উজ্জ্বল সিঁদুর রেখা

মেয়েটি বিছানায় শুইয়া শ্রান্ত চোখে সারাদিন তাকাইয়া থাকে। নাম বকুল। দেখিতেও যেন বকুলের মতই,— সুকোমল ও সুন্দর।

পাশাপাশি দুইখানা ঘর। মাঝখানে সরু একটা গলি। সুমুখের একখানি ঘরে বকুল একটা তক্তাপোষের উপর সারাদিন শুইয়া থাকে। বিছানার উপর শিয়রের দিকে একখানা আরসী,—মাঝে মাঝে আরসীতে নিজের শীর্ণবিবর্ণ মুখখানা এক-একবার দেখিয়া লইত। দেখিতে দেখিতে মুখের উপর একটা বেদনার ছায়া ফুটিয়া উঠিত। বুক ভাঙিয়া একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বাহির হইয়া আসিত।

ঘরের ভিতর ঔষধপত্র ফলফুলারি দেয়ালের তাকে সুন্দর করিয়া সাজানো। রোগীর যা-কিছু দরকার সবই আছে। সেই দিকে দৃষ্টি পড়িতেই তার মনটা হতাশায় ভাঙিয়া পড়ে। দিনের পর দিন কেবল ওষুধ আর ওষুধ,—শিকড় আর মাদুলীর ছড়াছড়ি। অসহ্য বোধ হয়। চোখের সুমুখে দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো সস্তা দামের ছোট একখানি মহাদেবের ছবি। বহুদিনের বহু শুষ্ক মালায় যেন ঢাকিয়া গিয়াছে। ছবিখানির দিকে কাতরদৃষ্টিতে তাকাইয়া কত প্রার্থনা করে,—কতই-বা মিনতি জানায়। চোখ দিয়া দর্ দর্ করিয়া জল বাহির হইয়া আসে।

পাশের ঘরে তার ছোট্ট মেয়ে, ছবির কলকণ্ঠে বকুলের তন্ময়তা ভাঙিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল, ছবি রান্না করিতেছে,-খুব উৎসাহের সহিত ডাল নামাইয়া ভাত চড়াইতেছে, আবার মাছ ভাজিবার মত মুখে মুখেই ছ্যাঁৎ ছ্যাঁৎ শব্দ করিতেছে। তাহার রান্নার জল বুঝি ফুরাইয়া গেল। এঁটো হাত ধুইবার জন্য তাড়াতাড়ি উঠিল। উঠিতেই মায়ের দিকে নজর পড়িল, লজ্জায় দুই হাতে মুখখানা ঢাকিয়া ছবি ছুটিয়া গিয়া মায়ের কাপড়ের আঁচলে মুখ লুকাইল, তারপর মুখ বাহির করিয়াই দেখে, মায়ের চোখে জল। লজ্জা চলিয়া গেল, ব্যস্তভাবে ছবি বলিল,- "মা, তোমার খিদে পেয়েছে - তুমি এখন খাবে ?"

বকুল মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না।"

ছবি তাড়াতাড়ি নিজের ফ্রকটা তুলিয়া মায়ের চোখের জল মুছিয়া দিল। বলিল,—' কাঁদছ কেন ?"

তারপর তাহার চুলগুলিতে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল,—"কেঁদনা, তুমি ঘুমোও।"

বকুল ছবির হাতটা সরাইয়া দিয়া বলিল,—"উঁহুঁ, আমি বেশ আছি তুমি যাও, খেলা করোগে।"

ছবি চলিয়া গেল। বকুল পাশ ফিরিয়া শুইল। শুইয়া নানা কথাই মনে আসে,—জীবনের দিনগুলি হয়ত শেষ হইয়া আসিতেছে, আসুক—কিন্তু দুঃখ হয় মেয়েটার জন্য—

বকুল জানালাটা অল্প একটু খুলিয়া দূরের পানে তাকাইয়া রহিল। ঐ ফাঁকটুকু দিয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত দেখা যায়। অদূরে ইউক্যালিপ্‌টাস্ গাছের রূপালী ঝালরের মত ছাড়া ছাড়া ডালপালাগুলি। সেই ডালের আড়াল হইতে কয়েকখানা বাড়ী একটু একটু নজরে আসে। তার পিছনে কালো মেঘের মত একখণ্ড পাহাড়। ভারি সুন্দর দেখায়।

দূরে গাঁয়ের পথ ধরিয়া ছোট জাতের মেয়েরা যাতায়াত করে। কাহারও মাথায় ঝাঁকা, কাহারও মাথায়-বা বাজারের সওদা। মেয়েগুলি বিড়ি টানিতে টানিতে চলিতেছিল। বহু দূরের লোক যেন পুতুল। একটু একটু নড়ে,—আসে কি যায় অনেক সময় বুঝাই যায় না। দেখিতে দেখিতে তার চোখ শ্রান্ত হইয়া আসিল। আবার চিন্তারাশি মনের ভিতর ভিড় করিয়া দাঁড়াইল,—মরিয়া গেলে মেয়েটার কি দুর্দ্দশাই না হইবে!—কে দেখিবে? এইটুকু মেয়ে, কত অসহায়—

ব্যথায় বুকটা টন্ টন্ করিয়া ওঠে।

বকুল স্বামীকে বলিল,—"তোমার আর কি—তোমার ত আবার সবই হবে—যায় ত এই মেয়েটার মা যাবে—আর আমার বাপমার—"

আবার চোখে জল আসিয়া গেল।

স্বামী বুঝি-বা মনে ব্যথা পাইল। কি যেন বলিতেও গেল।

বকুল বাধা দিয়া বলিল,—"যাও যাও, আর বেশী বোলো না—আর বোঝাতে হবে না—সবই বুঝেচি—"

কথাগুলি শুনিয়া বকুলের মাও চোখে জল রাখিতে পারিলেন না। বাঁ-হাতে নিজের চোখ মুছিয়া, কাপড়ের আঁচল দিয়া মেয়ের চোখের জল মুছিয়া দিতে দিতে বলিলেন, "ছিঃ বকুল, কেঁদ না—অসুখ কি আর লোকের হয় না? কত খারাপ রোগীও ত ভাল হ'য়ে উঠচে—তোমার শুধু জরটা ছেড়ে গেলেই ত হয়। যাবে—সব সেরে যাবে"।

তারপর তিনি ম্লানমুখে শূন্যদৃষ্টিতে জানালাটার পানে তাকাইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরের সূক্ষ্ম দৃষ্টিটি অতি সন্তর্পণে থামিয়া থামিয়া একেবারে মেয়ের মৃত্যু পর্য্যন্ত গিয়া পৌছিল। মৃত্যুর অস্পষ্ট ছায়াটা অন্তরের উপর ছবি আঁকিতে লাগিল—সে কি এক ভয়ানক দৃশ্য—বকুলের পাংশু ম্লান মৃতদেহ—সেই মৃতদেহের চারি পাশে স্বজনবর্গের ভিড় ও কাতর আর্ত্তনাদ।

ভাবিতেও মা শিহরিয়া উঠেন। মুখে বিষাদ ও নৈরাশ্যের চিহ্ন সুস্পষ্ট ফুটিয়া উঠিল।

বকুল মা'র মুখের পানে তাকাইয়া দেখিল—হয়ত কিছু বুঝিতেও পারিল।

ছবি কেবলই তার মায়ের কাছে যাইতে চাহিত, ফাঁক পাইলেই ছুটিয়া যাইত। মাসীকে বলিত, "ছাড় মাসী,—ছাড়,—আমি বাবার কাছে যাই।" তারপর কোন রকমে ফাঁকি দিয়া মায়ের কাছে ছুটিয়া আসিত। বলিত,—"মা ভাল আছ?"

বকুল মাথা নাড়িত।

ছবি আব্দার করিয়া বলিত, "আমি তোমার কাছে শোবো—"

বকুলের বিরক্তি বোধ হয়। বলে, "না আমার অসুখ ভাল হ'লে শোবে।"

ছবি মানিত না। একপাশে শুইয়া পড়িত। বলিত, "তোমাকে বিরক্ত কোর্‌ব না মা, চুপ করে শুয়ে থাক্‌ব।"

সেদিন কাতরকণ্ঠে বকুল বলিল, "আমার ভাল লাগ্‌ছে না—তুমি এখন যাও।"

ছবি ব্যস্তভাবে উঠিয়া পড়িল। অপরাধীর মত নামিয়া গেল। যাইবার সময় একটু দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবাকে ডেকে দি? ওষুধ দেবে। ওষুধ খেলেই ভাল হ'য়ে যাবে। লক্ষ্মীমেয়ে—ওষুধ খেয়ো, কেমন? ডাকি বাবাকে—"

বকুল মাথা নাড়িয়া বলিল, "উঁহু—যাও—বিরক্ত কোরো না।"

ছবি ম্লানমুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তারপর আবার ফিরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"মা, তুমি একলা রয়েছ? আমি আসি?"

কিন্তু বকুলের কোন সাড়াশব্দ না পাইয়া আবার চলিয়া গেল।

ছবির যেন সোয়াস্তি নাই। একবার ওর কাছে, আবার তার কাছে এই করিয়াই দিন কাটায়। সারাদিন এঘর-ওঘর করে। কি যে চায় নিজেও হয়ত বোঝে না। জন্মের পর হইতেই মায়ের অসুখ, মায়ের স্নেহ যে কি—জানেও না। রস না পাইয়া তার ভিতরটা হয়ত শুকাইয়া মরে। স্নেহের নীড়ে স্থান না পাইয়া নিজকে কোথাও যেন জড়াইয়া রাখিতে পারে না। তাই বুঝি-বা ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়ায়।

বকুল বুঝিয়াও নিঃশব্দে পড়িয়া থাকিত, ইচ্ছা হইলেও কিছু করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে ডাকিত, "ছবি এস ত, আমার মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দাও।"

ছবি মায়ের মাথায় হাত বুলাইয়া দিত।

বকুল ছবির দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকিত। চোখ ভরিয়া জল আসিত, বলিত, "এখন যাও, আবার এসো।"

ছবি চলিয়া না যাইয়া কি করে?

বকুল স্বামীকে বলিত, "এই কি আমার কপালে

ছিল? উঃ, আমার কষ্ট যদি বুঝতে, মেয়েটা মা মা করে, আর আমি! কিন্তু আমি—আমি কি করব? আমার কি সাধ্য আছে! তোমরাই আমাকে শেষ করলে, তোমাদের সংসারেই আমি ফুরিয়ে গেলুম—" তারপর নিজের দিকে একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া বলিত, "ইস, কি হ'য়ে গেছি!"

স্বামী বলিত, "কি করব,—আমাদের অদৃষ্ট, না হ'লে কি এমন হয়!"

মা বলিতেন, "তাতে আর কি হয়েচে—ভাল হ'লেই চেহারা সেরে যাবে। ছিঃ, তার জন্যে কি কাঁদে?"

বকুল বলিত, "হ্যাঁ, আর হয়েছে, বুঝতেইত পাচ্ছি। কত আশাই ছিল, কিন্তু হ'ল কই! আর মিছে কেন বল" —কণ্ঠ ধরিয়া যাইত, চোখে জল আসিত আর বলিতে পারিত না। প্রবল কাশিতে অস্থির হইয়া পড়িত।

কাশিটা খুব বাড়িয়াছিল। রাতদিন কেবল ঐ খক্-খক্—খক্-খক্—রাত্রিতে ঘুম হয় না। সারারাত্রি এপাশ ওপাশ করিতে করিতেই কাটিত। একটু ঘুম আসে ত কাশি আসিয়া তন্দ্রাটুকুও ভাঙিয়া যায়। সন্ধ্যা হইলেই তার ভয় হইত, বলিত,—"কালরাত্রি আসচে! আমি আর পারি না। অসহ্য—"

সারারাত্রি বিনিদ্র কাটাইলে সকালবেলার দিকে চোখ আপনি বুজিয়া আসে। কিন্তু ঘুমাইবার যো নাই। দিনের জাগরণে রাত্রির নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া গৃহস্থের কোলাহল সুরু হয়,—আর তন্দ্রা টুটিয়া যায়।

পিসীমার সোরগোলে বাড়ীতে যেন হাট বসিত। ঠাকুর চাকরের একটুও ত্রুটি হইবার সাধ্য নাই। চীৎকার করিয়া বলেন, "ঠাকুর, তোমার দিন দিন কি বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাচ্ছে? বলি এক—করবে আর, সারাদিন তোমার পেছন পেছন থাকতে পারি তবে হয়! আমারও ত একটা পেট আছে। ষোল আনা ক'রে তবে ত খেতে হবে! যত মরণ হয়েছে আমার—"

চীৎকার শুনিয়া ছবি ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিত। ভ্রূ কোঁচকাইয়া পিসীমার সাদা কাপড়ের আঁচলটা টানিয়া বলিত, "চুপ কর দিদিমণি, চেঁচিও না, মার ঘুম ভেঙে যাবে। অসুখ করেচে, জান না?"

পিসীমা ছবির কথায় বিরক্ত হইতেন। ফিরিয়া যাইতে যাইতে বলিতেন, "আহা লো—দরদী আমার! নে,—ছাড় কাপড়! এত করি-ধরি তবুও কারুর মন পাই না। এতটুকু মেয়ে সেও বল্‌তে ছাড়ে না, কপাল আর কি—" তারপর আপন মনে আরও কি বলিতে বলিতে চলিয়া যাইতেন।

কথাগুলি বকুলের কান পর্য্যন্ত গিয়া পৌছাইত; বুকে গিয়া কঠিন হইয়া বাজিত। কিন্তু কি আর করিবে! মেয়ে নিরুপায়!—সামর্থ্য নাই বলিয়াই মেয়েটাকে কাছে রাখিতে পারে না। নয়ত তার বুকের ধন, সেই-ই বুকে করিয়া রাখিত। কিন্তু সে বাঁচিয়া থাকিতেই তার সন্তান সকলের কাছে তুচ্ছ হইয়া যাইবে, ইহা যেন সহ্য করিবার নয়। ছবিকে ডাকিত, "ছবি, আয় আমার কাছে আয়—"

ছবি তখন তার মাসী বেলার সহিত কথা বলিতেই ব্যস্ত। পিসীমার কথাগুলি মুখভঙ্গী করিয়া বলিতে তাহার বড় উৎসাহ।

ছবির ভাব দেখিয়া তার মাসী হাসিত। ছবির দুই গাল শক্ত করিয়া ধরিয়া একবার মুখে আবার গালে লাগাইয়া বলিত, "পাকা মেয়ে—"

ছবি বিরক্ত হইত। নিজেকে ছাড়াইয়া লইতে চেষ্টা করিত; কিন্তু পারিত না। বেলা আরও জোরে চাপিয়া ধরিত। কিন্তু আদরের আতিশয্য ছবি সহ্য করিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিত। বেলা ভয়ে ভয়ে তাড়াতাড়ি ছাড়িয়া দিত। ছবিকে ভুলাইতে চেষ্টা করিত। কিন্তু কিছুতেই ছবির আর কান্না থামিত না।

আবার নূতন একটা গোলযোগ বাধিয়া যাইত। কান্না শুনিয়া পাশের ঘর হইতে ছবির বাবা নরেন ছুটিয়া আসিত। বিরক্তভাবে ছবিকে বলিত, "কি—রে—কি—হয়েচে, কাঁদ্‌ছিস কেন? আয়—এদিকে আয়—আমার আর সহ্য হয় না—"

ছবি তার বাবার কাছে গিয়া বলিত, "মাসী আমায় মেরেছে।"

বেলা অপ্রস্তুত হইয়া পড়িত, বলিত, "চেপে ধ'রে আদর কচ্ছিলাম—তাই কাঁদছে—"

নরেন অসন্তুষ্ট হইত। মুখখানা একটু কেমন করিয়া বলিত, "তোমাদের কারুরই কোনো খেয়াল নেই—বাড়ীতে রোগী, অথচ সারাদিন হৈ-চৈ লেগেই আছে।"

নরেন ছবিকে লইয়া চলিয়া যাইত।

বেলা একলা ঘরে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিত। ভ্রূ দুইটি সঙ্কুচিত হইয়া আসিত, দাঁত দিয়া ঠোঁট চাপিয়া ধরিত।

দূরে বকুলের কাতরকণ্ঠ শুনিতে পাইত। খুব যেন বেদনার সহিত বলিতেছে, "হা ভগবান—আমার মরণও হয় না—তুমি কেন আবার গেলে"... ...আর কিছু বুঝা যায় না।

সন্ধ্যা।

সন্ধ্যার বিবর্ণ পাণ্ডুর আলোতে আকাশ ও পৃথিবী ঝাপ্‌সা হইয়া আসে। দূরের পাহাড় ও মাঠের শেষের গাছগুলি একাকার হইয়া একটা কালো রেখার মত দেখাইতে থাকে। নদীটা অন্ধকারের বুকে গা ঢাকা দিয়াছে। বকুলের বিশাল পৃথিবীও সঙ্কুচিত হইয়া উঠিত।

বাহির হইতে নিজেকে টানিয়া আনিয়া আপনার ক্ষুদ্র পৃথিবীতে গুটাইয়া লইত। সে পৃথিবীতে আশা নাই—উৎসাহ নাই—কিছু নাই।

ব্যাধি-জর্জ্জরিত দেহের বিষাক্ত কীট বাহিরে বিচরণ করে, আর কোন্ অদৃশ্য জ্বালা কীটের চেয়েও তীব্র হইয়া অন্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

নরেন জানালা বন্ধ করিয়া দিল। বকুল বলিল, "ওটা আবার খোলা রাখ্‌লে কেন—ওটাও বন্ধ কর—"

—"না, থাক্ ওটা,—তুমি ঘুমোও" বলিয়া নরেন শিয়রের কাছে বসিয়া পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

বকুল তবুও ছট্‌ফট করিতে করিতে বলিল, "আর পারি না—এর চেয়ে মৃত্যুও আমার ভাল—"

নরেন বলিল, "ছিঃ ওকথা বোলো না। আবার ভাল হয়ে যাবে—আবার সংসার করবে। ভাল হ'য়ে ওঠ—তারপর তুমি যা বল্‌বে—তাই করব।"

—আর কাজ নেই, থাক্। কিচ্ছু চাইনে—কি দরকার? কিন্তু আমাকে নিয়ে তুমি কতদিন আর বসে থাক্‌বে—তুমি যাও, বসে থাক্‌লে তোমার যে—"

—ক্ষতি হবে? হোক। তবু তুমি ভাল হয়ে ওঠ। তোমার চেয়ে আজ আমার আর কিছুই বড় নয়।

তারপর দুইজনেই চুপ। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। বকুলের একটু তন্দ্রা আসিতেছে। নরেন তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখের পানে তাকাইয়া দেখিতে লাগিল।

মা আসিয়া বলিলেন, "তুমি শোওগে নরেন, একটু ঘুমিয়ে নাও, ততক্ষণ আমি বসি।

নরেন উঠিয়া গিয়া শুইয়া পড়িল। ঘরে জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল, বাহিরের দিকে তাকাইয়া নরেন দেখিল, একাদশীর চাঁদ উঠিয়াছে, মাঝে মাঝে এক এক খণ্ড মেঘ আসিয়া চাঁদটাকে আড়াল করিয়া দেয়, আবার সব ম্লান হইয়া যায়।..ভাবে—এম্‌নি করিয়াই হয়ত মৃত্যু জীবনকে আড়াল করিয়া ফেলে, মুখের হাসি ম্লান করিয়া দেয়।

নরেন ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু দুশ্চিন্তায় ঘুম আর আসে না। দিনের অস্পষ্ট চিন্তাগুলি অন্তরে নানা রেখাপাত করিতে থাকিল। বকুলের মৃত্যু যেন চোখের সুমুখে পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছে। অন্তরে প্রবল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইল। বকুলের মৃত্যুর জন্য কে কতখানি দায়ী অন্তর দিয়া সে বিচার করিতে গিয়া পারে না। কেবল অস্বস্তিতে এপাশ ওপাশ করিতে থাকে।

রাত্রি ন'টা বাজিল। ছবিকে লইয়া ছোক্‌রা চাকরটি অনেকক্ষণ বাহির হইয়াছে—আর ফিরে নাই।

পিসীমা কেবলই ঘর বাহির করিতেছেন। বার-বার বলিতে থাকেন, "কোথায় রে বেলা, মহীরু ত এখনও ছবিকে নিয়ে এলো না, তোরা আর ওকে একদণ্ড ঘরে দেখ্‌তে পারিস্ না.—রোজই বের করে দেওয়া চাই।"

বেলা পিসীমার কথা গ্রাহ্য করে না। বাহিরে আসিয়া বসিয়া পড়িল। এদিক-ওদিক তাকাইয়া দেখিল। কি ভাবনা তার কে জানে?

ছোট্ট উঠানে লোহার তারে তখনও কাপড়গুলি মেলা রহিয়াছে, তারই ছায়া উঠানে পরিষ্কার দেখা

যায়। জ্যোৎস্নাটা নিস্তেজ রোদের মত, তারই পানে তাকাইয়া বেলা বসিয়া রহিল।

একটু বাদেই ছোক্‌রা-চাকরটা ছবিকে অতিকষ্টে লইয়া আসিল। ছবি ঘুমে চাকরটার কাঁধে এলাইয়া পড়িয়াছে।

বেলা বলিল, "সর্ব্বনাশ করেছিস মহীরু—ওকে ঘুম পাড়িয়েছিস্? পিসীমা যে—"

কথা শুনিবার মত ধৈর্য্যও চাকরটার নাই। তাড়াতাড়ি বলিল, "হেই দিদিমণি, ধর, ধর—বাব্বাঃ—"

বেলা ছবিকে লইয়া পিসীমার কাছে গেল।

পিসীমা ছবিকে দেখিয়াই রুষ্ট হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, "যা ভেবেচি—হ'লও তাই। বিকেলে কিছু খাওয়াইনি, ভেবেচি সন্ধ্যেবেলাই একেবারে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখব। আমি পারব না—এত বারণ করি, অসময়ে বের করিস্ না—কারুর যেন গ্রাহ্যই হয় না।"

বেলা বলিল "বাঃ—আমি কি জানি? জামাই-বাবুই ত বল্লেন—"

"বললেন ত,—কিন্তু এখন?—এখন জাগাতে গেলেই ত মেয়ে সাত বাড়ী এক করবে। আমি পারব না—থাক্—"

শুনিয়া নরেন বিছানায় উঠিয়া বসিল। ভাবিল, কি করিবে! উঠিতে কুণ্ঠায় ও সঙ্কোচে বাধে।

পিসীমাই ছবিকে কোলে বসাইয়া ধীরে ধীরে ডাকিলেন, "ছবু—ছবু, যাও, ভাত খেয়ে এসোগে—ওঠো—ওঠো।"

অনেক বলিতে বলিতে ছবির ঘুম ভাঙিল। পিসীমা বলিলেন, "যাও—ভাত খেয়ে এসো। শম্ভু নিয়ে যাও। খাইয়ে হাতমুখ ধুইয়ে—জামাটা ছাড়িয়ে দিয়ে যেও।"

শম্ভুঠাকুর 'হুঁ' করিয়া ছবিকে লইয়া চলিয়া গেল। খাইতে বলিলেই যত নটখটি লাগে। তাহার উপর আবার ঘুমের চোখ। শম্ভু গ্রাস তুলিয়া ছবির মুখের কাছে ধরিতেই ছবি মুখ ঘুরাইয়া বসে। একবার বলে, "খাব না"—আবার বলে, "হাত দিয়ে খাব—বাবা খাইয়ে দেবে"—এমন আরও কত কি বলিতে থাকে। কিছুই তাহার পছন্দ হয় না।

পিসীমার বড় অস্বস্তি বোধ হয়। আপন মনেই বলিতে বলিতে উঠিলেন, "নাঃ—মেয়েটার জ্বালায় আর পারা গেল না।" শেষে রান্নাঘরের দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "খা শিগ্‌গির—পাজী মেয়ে! সব সময়ে কেবল মতলব, - টেনে ফেলে দেব।"

ছবি দুইহাতে শম্ভুর কাপড় শক্ত করিয়া ধরিল। ঠোঁট দুটি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল।

পিসীমা বলিলেন, "জোর করে খাইয়ে দাও, শম্ভু।"

শম্ভু খাওয়াইতে যাইতেই ছবিও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

বেলা ছবির কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। বলিল, "ছবি কাদ্‌চে কেন শম্ভু—"

পিসীমা রাগ করিয়া জবাব দেন, "কাঁদ্‌চে—আমি মেরেছি—একটু কান্না তোদের সহ্যি হয় না ত তোরা এসে খাইয়ে দিলেই পারিস্—"

বেলা বলিল, "তাই বলেছি না কি? দিদির ঘুম ভেঙে যাবে—দেখবেন, জামাইবাবু এখ্‌নি এসে পড়বেন। আমার কি!"

পিসীমা আপন মনেই বলিলেন, - "তা আসুক—"

সত্যই নরেন উঠিয়া আসিল। রান্নাঘরে আসিয়া শম্ভুকে গম্ভীর স্বরে বলিল, "সরে বোসো শম্ভু—আমি খাইয়ে দিচ্ছি ছবিকে।"

পিসীমা মোলায়েম স্বরে বলিলেন, "তুমি আবার এলে কেন নরেন, সারাদিন পরে এই একটু শুয়েছ—"

নরেন রুক্ষস্বরে জবাব দিল, "আমি না এলে আবার কিছু হয় না কি? সব কাজেতেই দেখি আপনারা একটা গোলমাল বাধিয়ে নেন। আমার জন্যে কিছু নয়। সারাদিন পরে এই ত একটু ঘুমিয়েছে। যদি জাগে—তাহ'লে?"

—রোগীর ঘুমইত সব চেয়ে বড় ওষুধ।

পিসীমার রাগে দুঃখে মুখ লাল হইয়া উঠিল। কতক্ষণ পর্য্যন্ত মুখে কোনো কথা যোগাইল না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিতে শুরু করিলেন, "ওকে ত কেউ কিছু বলেনি—তবু ও কেন তোমাদের

অমন ধারা বিশ্বেস হয় ? আর একটু কেঁদে উঠলেই সবাই দৌড়ে আস। আমি কি মারি ?"

বকুলের অনেকক্ষণ তন্দ্রা ভাঙিয়া গিয়াছে। উৎকর্ণ হইয়া সবই সে শুনিল, কিন্তু চুপ করিয়া রহিল।

সন্তানের জন্য মায়ের অন্তর কাঁদিয়া ওঠে কিন্তু নিরুপায় মাতার চোখের জলেই সব শেষ হইয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে দম আট্‌কাইয়া আসে—আবার কাশি ওঠে। কাশির শব্দে নরেন ছবির খাওয়া ফেলিয়াই উঠিয়া আসিয়া বকুলের কাছে বসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কষ্ট হচ্চে ?"

বকুল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, "আমার কষ্ট কে বুঝবে ? কেন আর জিগেস কর—" বলিয়াই কাঁদিতে কাঁদিতে পাশ ফিরিয়া মুখ লুকাইয়া শুইল।

নরেন অপরাধীর মত চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

মৃত্যুর ম্লানছায়া গাঢ়তর হইয়া আসিল। ডাক্তার, কবিরাজ, সন্ন্যাসী, ঠাকুরদেবতা সকলেই পরাস্ত হইল। সবাই বোঝে কোন আশাই নাই। কঙ্কালসার দেহখানি বিছানার সঙ্গে একেবারেই যেন মিশিয়া গিয়াছে—চোখ-দুটির উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়াছে। হঠাৎ দেখিলে যেন কি রকমই মনে হয়—একটু ভয় ভয়ও করে।

সারাদিন কেবল অনর্গল বকে—বকিয়াই যায়। বলে, "কি নিষ্ঠুর গো—উঃ একটু কষ্টও হয় না ? এ কেমন লোক !" ব'লতে বলিতে কাঁদিয়া ফেলে, কাঁদিয়া বলে, "মাগো আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিলে,—এখানে আমি থাকতে পারব না—না—না—না—তারপর যেন স্বামীর উদ্দেশেই বলে, "ওগো, তুমি অমন কোরো না, সত্যি বল্‌ছি আমাকে ভুল বুঝো না—" যাহারা কাছে বসিয়া থাকে তাহারা কিছুই বুঝিতে পারে না।

ছবি গিয়া মায়ের কাছে দাঁড়ায়। একটু গায়ে একটু মাথায় হাত দেয়।

নরেন বলে, "ছবি, ওঘরে যাও। এখন বিরক্ত কোরো না।"

বকুল বলে, "থাক্ না ও—"

—না বিরক্ত করবে।

ছবি একদিকে চলিয়া যায়। কিন্তু গিয়াও থাকিতে পারে না। বার-বার দুয়ারের কাছে মুখ বাড়াইয়া দেখে, কি দেখে, সে-ই জানে, হয়ত তার সমস্ত অন্তর ওই ক্ষুদ্র দেহের ভিতর হইতে বাহির হইয়া মায়ের শয্যাপার্শ্বে পড়িয়া থাকিতে চায়, তাড়াইলেও যায় না।

বকুল এক-একবার তার পানে তাকায়, ছবি ওই একটি দৃষ্টিতেই যেন আত্মহারা হইয়া ওঠে। নিষেধ-মানা ভুলিয়া গিয়া আবার আগাইয়া আসে, বকুল হাত বাড়াইয়া বোধ করি বা তার হাতখানি ধরিতে চেষ্টা করে, কিন্তু শিথিল হাতখানি ঝরাফুলের মত বিছানায় পড়িয়া যায়, হতাশায় বুকের ভিতর কান্নার সমুদ্র ফুলিয়া ফুলিয়া ওঠে, ভাবে, আর হয়ত দেরি নাই! মৃত্যুর হিমস্পর্শ একটু একটু করিয়া দেহে ছড়াইয়া পড়িতেছে—কখন্ এক সময় সর্ব্বাঙ্গ একেবারে শীতল ও নিস্তরঙ্গ করিয়া রাখিয়া যাইবে।

ভাবিতেও যেন কষ্ট হয়, এত তাড়াতাড়ি! এখনও ত আশা মিটে নাই।—অপূর্ণতার বেদনা সারা বুকেই যেন খচ্‌খচ্ করিয়া বিঁধিতেছে। প্রভাতের প্রথম অরুণোদয়ে প্রভাতীর সুরেই কি বিদায়-সঙ্গীত গাহিয়া যাইতে হইবে ? কিন্তু এই যে তৃণাঙ্কুর পৃথিবীর আঙ্গিনায় একটি দুটি পাতা মেলিয়া শ্যামশষ্পের সারিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাকে ফেলিয়া কিছুতেই যে যাওয়া চলে না! কিন্তু যাইতেই হয়!—ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় কিছু আসে যায় না।

কঙ্কালসার ভগ্নদেহে কতদিনই বা প্রাণ থাকে। ছিন্নতারে তড়িৎশক্তি ধরিয়া রাখা যায় না।

বকুলের প্রাণ যাই-যাই করিয়াও যায় নাই। রোগের যন্ত্রণা, অত্যাচারের মত প্রতিক্ষণ দুঃসহ বেদনা দিয়াই চলিয়াছে, এ যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যুও হয়ত বাঞ্ছনীয়। এ যেন কোন্ এক অকরুণ বিচারকের দণ্ডদান।—অসহ্য! হাত পা অবশ হইয়া গিয়াছে। চৈতন্য মাঝে মাঝেই লোপ পায়। এক-একবার স্বামীর দিকে তাকায়, আবার এদিক-ওদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। দিনরাত কি যেন ভাবে, কি যেন দেখে। অচৈতন্য অবস্থায়ও

বলে, "ছবি, আয়, আমার কাছে আয়" কণ্ঠ অত্যন্ত ক্ষীণ। কথাও খুব অস্পষ্ট। কাত্‌রানির মত শোনায়। বলে, "এই শেষ। ওগো শুনচ—" স্বামীর দিকে তাকাইয়া বলে, "তোমাকেই বল্‌চি,—অনেক কষ্ট দিলুম। অনেক—অনেক। কি করব—উপায় নেই, আমাকে—আমাকে তোমরা ক্ষমা কোরো।"

কাশি উঠিয়া দম বন্ধ হইয়া যায়। কাশিটা থামিয়া গেলে স্বামীর দিকে তাকাইয়া শুধাইল, "আমাকে ক্ষমা করতে পারনি? কেন? ক্ষমা কি নেই? ওগো, আমি বড্ড কষ্ট পেয়ে যাচ্ছি—তোমরা আমায় ক্ষমা কোরো—ক্ষমা—"

তারপর মুখখানা দুবার একবার বাঁকাইল।

নরেন হতাশ হইয়া পাগলের মত স্থিরদৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল।

মা বুকভাঙা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন, "বকুল—বকুল,—ও কি? কি হ'ল?"

ছবিও সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "মা—মা—মাগো—"

কান্নাকাটি শুনিয়া পাড়ার মেয়েরা ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিল। কে যেন ছবিকে সেখান হইতে জোর করিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

... ...

পরদিন ছবি ফিরিয়া আসিল। প্রশ্ন করিল,— "আমার মা কোথায় গেল?"

তার বাবা বুঝাইয়া বলিল, "তোমার মা মন্দিরে পূজো দিতে গেছে,—আবার আস্‌বে—"

ছবি হয়ত তা'ই বোঝে। কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া চলিয়া গেল। আবার ঘুরিয়া আসিল। বলিল, "মাসী, তোমরা অত কাঁদ্‌চ কেন?"

বেলা কিছুই জবাব দিল না।

ছবি পুনরায় প্রশ্ন করিল, "মাসী—ও মাসী—মাকে তোমরা দর্‌জা বন্ধ ক'রে রেখেচ? মার খিদে পেলে কি হবে? দর্‌জা খুলে দাও—খোল শিগ্‌গির—খোল—"

তারপর চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল, বলিল,— "খুল্‌বে না?" নিজে দরজাটায় জোরে ধাক্কা দিয়া, বলিল, "মা—মা—ওমা!"

সকলেই বিষণ্ণদৃষ্টিতে ছবির দিকে তাকাইয়া রহিল। মা ত আর সাড়া দিল না, বিরক্তও হইল না একটু।

মহিলা-সংবাদ

পাটনার প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের কন্যা শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যে এম্-এ পরীক্ষা দেন। তাহাতে তিনি প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন। যখন তিনি এম্-এ পরীক্ষা দেন, তখন তাঁহার বয়স ১৮ বৎসর। তিনি বাড়ীতে পড়াশুনা করিয়া বি-এ পর্য্যন্ত পরীক্ষাসমূহে উত্তীর্ণ হন। বিবাহের পর তিনি এম্-এ দেন। সম্প্রতি তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজী সাহিত্যে উচ্চতম উপাধি লাভ করিবার জন্য এবং ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার পিতা পাটনায় ব্যারিষ্টারী করেন। বিহার প্রদেশ হইতে ইতিপূর্ব্বে একটি মাত্র হিন্দুমহিলা সাধারণ শিক্ষালাভের জন্য ইংলণ্ড গিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার হইবার জন্য বিহারের নারীদের মধ্যে শ্রীমতী ধর্ম্মশীলাই প্রথম ইংলণ্ড যাইতেছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ ১৯২৩ সনের ম্যাট্রিকুলেশন ও ১৯২৫ এর আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে সপ্তম ও পঞ্চম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ১৯২৭এ বি-এ পরীক্ষায় গণিতে অনার্স পাইয়া ১৯২৯ এ ইংরাজী সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; পরে ইউনিভার্সিটি 'ল' কলেজে প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর স্কলার্শিপ পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ করিয়া এই বৎসর ষ্টেট্‌ স্কলার্শিপ পাইয়া ইংরাজী সাহিত্যে অনার্স পড়িতে অক্সফোর্ডে যাইতেছেন।

শ্রীমতী অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ

শ্রীমতী ধর্ম্মশীলা জায়সবাল, এম-এ

শ্রীমতী শান্তি দাস, এম-এ

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস

অক্সফোর্ড হইতে প্রেরিত স্কলাশিপ টেষ্ট পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়ার পর অক্সফোর্ডে ইহার স্থান হইয়াছে। ইনি হাওড়ানিবাসী মুন্সেফ শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা।

শ্রীযুক্তা অশোকলতা দাস ও তাঁহার কন্যা শ্রীমতী শান্তি দাস, এম-এ, উভয়েরই সত্যাগ্রহের জন্য চারি মাস করিয়া কারাদণ্ড হইয়াছে।
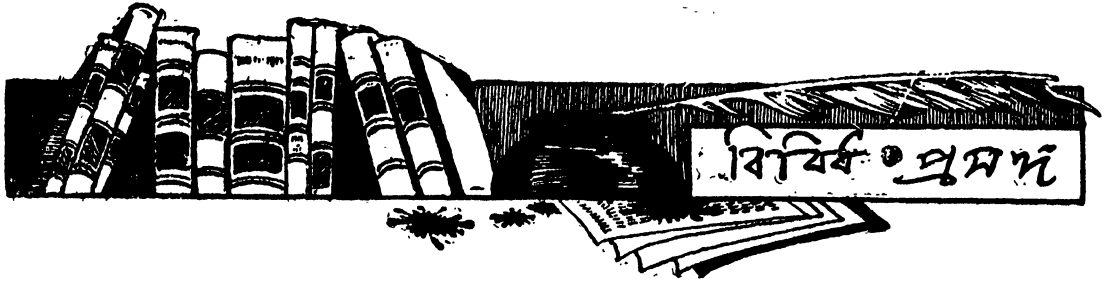
জনৈক সাবেক লাটের মিথ্যাবাদিতার নমুনা

যাহারা জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা কথা বলে না, সত্য যাহাদের নিকট উপস্থাপিত করিলে যাহারা চোখ বুঝিয়া থাকে না, তাহাদের সঙ্গে তর্ক করা চলে। কিন্তু যাহারা ইচ্ছা করিয়া অন্ধ, অথবা—তার চেয়েও খারাপ—চোখ খুলিয়া রাখিয়া সাদাকে কাল ও কালকে সাদা বলে, তাহাদের সহিত তর্কযুক্তি পণ্ডশ্রম মাত্র। তাহাদিগকে নিরস্ত করিবার একমাত্র উপায় বিরুদ্ধশক্তি প্রয়োগ দ্বারা তাহাদিগকে শক্তিহীন করা। আমরা অহিংসা-ব্রতী বলিয়া অবশ্য কেবল অহিংসশক্তি প্রয়োগেরই সমর্থন করি।

আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশের একজন সাবেক লাট লর্ড মেস্টন বিলাতী সেই দলের লোক যাহারা সাদাকে কাল ও কালকে সাদা বলিতে সমর্থ। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অশান্তির কারণ সম্বন্ধে এই সাবেক লাট-পুঙ্গব কণ্টেম্পোরারী রিভিউএর আগষ্ট সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার এক জায়গায় তিনি বলিতেছেন—

"Our offence is not this or that political formula, but our whole democratic conception of national life. Any project which promises to fasten that conception on India will be fought with every available weapon—reason, unreason, polished expostulation, revolutionary violence. For what faces us in India now is nothing less than orthodox Hinduism at bay. Its power and its ingenuity are equally formidable; and we have to make up our minds whether we are to yield or to join issue," তাৎপর্য্য। এই বা ঐ রাজনৈতিক সূত্র আমাদের অপরাধ নহে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে আমাদের সমগ্র গণতান্ত্রিক ধারণাই আমাদের অপরাধ। যে-কোন পরিকল্পনা ঐ ধারণাকে ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপাইয়া দিবে বলিয়া মনে হইবে, তাহারই বিরুদ্ধে সর্ব্ববিধ অধিগম্য অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা হইবে; যথা---বুদ্ধি, অপবুদ্ধি, মার্জ্জিত অনুযোগ বা বাদানুবাদ, বৈপ্লবিক দৌরাত্ম্য। কারণ, এখন যাহা ভারতবর্ষে [বিরোধীভাবে] আমাদের সম্মুখীন, তাহা কোণঠাসা নিরুপায় অথচ আমাদের সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়াইতে বাধ্য গোঁড়া হিন্দুয়ানী। ইহার শক্তি ও ইহার চাতুর্য্য সমান ভয়াবহ; এবং আমাদিগকে এখন স্থির করিতে হইবে, যে, আমরা ইহার নিকট হার মানিব, না ইহার বিরোধিতা করিব।"

মেস্টন এদেশে সাধারণ সিবিলিয়ান ছিলেন; দীর্ঘ কাল চাকরী করিয়া শেষে আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন। সুতরাং অজ্ঞতা তাঁহার মিথ্যা উক্তির কারণ নহে। তিনি জানিয়া শুনিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অজ্ঞ বিলাতী জনসাধারণকে ভ্রমে ফেলিবার জন্য মিথ্যা কথা লিখিয়াছেন। এই জন্য তাঁহার অপরাধ অমার্জ্জনীয়।

তিনি বলিতে চান, ব্রিটেন ভারতবর্ষে গণতন্ত্র অর্থাৎ ভারতীয় সমুদয় লোকদের প্রভুত্ব স্থাপন করিতে চান, কিন্তু গোঁড়া হিন্দুয়ানী তাহাতে বাধা দিতেছে; ইহাই অশান্তির কারণ। ইহার প্রত্যেকটা কথাই মিথ্যা। ভারতীয় সকল প্রধান রাজনৈতিক দলের লোকেরা গণতন্ত্র চাহিতেছে, স্বরাজ চাহিতেছে; তাহাদের মধ্যে মতভেদ অবান্তর বিষয়ে, মূল বিষয়ে সকলে একমত। স্বরাজের বিরোধিতা করিতেছে ভারতপ্রবাসী ও বিলাতী ইংরেজরা এবং তাহাদের গোলাম কতকগুলি ভারতীয়। ইংরেজরা নিজেদের প্রভুত্ব ও বাণিজ্যপ্রাধান্য রক্ষা করিতে চায়, কোন প্রকার ভারতীয় গণতন্ত্র চায় না।

অশান্তি ঘটিয়াছে কিসের জন্য? কংগ্রেস সত্যাগ্রহ করিয়াছে বলিয়া। কংগ্রেস কি চায়? পূর্ণস্বাধীনতা ও গণতন্ত্র চায়,এবং সাবালক পুরুষ ও স্ত্রীলোক মাত্রকেই ধনী-দরিদ্র শিক্ষিত নিরক্ষর নির্বিশেষে প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা দিতে চায়। কংগ্রেস হিন্দু মহাসভা নহে, যে, সত্যাগ্রহকে গোঁড়া হিন্দুদের সৃষ্ট অশান্তি বলিবে; বরং কংগ্রেসে হিন্দু মহাসভার কোন কোন বিষয়ে মতভেদ আছে। হিন্দুদের ভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল আছে, সনাতনধর্ম্ম মহাসভা আছে। তাহাদেরও সহিত কংগ্রেস অভিন্ন বা একমত নহে।

অশান্তিটা হিন্দুরাই জন্মাইয়াছে বা জীয়াইয়া রাখিয়াছে বলাও মিথ্যা কথা। সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা সম্পর্কে বড় ছোট অনেক অহিন্দু নেতা এবং কর্ম্মীও জেলে গিয়াছেন।

গোঁড়া হিন্দুয়ানী অশান্তির জন্য দায়ী বলিলে অদ্ভুত মিথ্যা কথা বলা হয়। কংগ্রেসের সত্যাগ্রহী হিন্দু-নেতাদের মধ্যে একমাত্র পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়কে গোঁড়া বলিলেও বলা যাইত; কিন্তু তিনি এই সেদিন মাত্র সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টায় যোগ দিয়াছেন, এবং "খাটি" গোঁড়াদের মতে তিনিও যথেষ্ট গোঁড়া নহেন। কারণ, সকলেরই মনে আছে, তিনি সকল জাতির হিন্দুকে মন্ত্র দেওয়ায় "খাটি" গোঁড়ারা তাঁহার গায়ে পাক ও কাদা ছুঁড়িয়াছিল।

ইংরেজরা ভারতবর্ষে গণতন্ত্র স্থাপিত করিতে চায় এবং তাহাদের সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার নিমিত্ত বিপ্লবীরা বোমা গুলি প্রভৃতি দ্বারা দৌরাত্ম্য করে, ইহা নিতান্ত গাঁজাখুরি মিথ্যা কথা। লর্ড মেস্টনের মাতৃভাষায় প্রচলিত একটা কথা অনুসারে শয়তানকেও তাহার ন্যায্য পাওনা দেওয়া উচিত। বিপ্লবীদিগকেও তাহাদের ন্যায্য পাওনা দেওয়া উচিত। প্রতিহিংসা ছাড়া তাহাদের অপকর্ম্মের যদি অন্য কোন উদ্দেশ্য—রাজনৈতিক উদ্দেশ্য—থাকে, তবে তাহা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা। তাহাদের কাজের দ্বারা অবশ্য এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু উদ্দেশ্যটা ইহার বিপরীত নহে।

—

মুসলমান ভারতীয় ও অন্যান্য ভারতীয়

আমাদের বিরোধীরা চায়, আমরা সব ভারতীয় একমত হইয়া একাগ্রতার সহিত তাহাদের শত্রুতা বিফল করিতে না পারি। এইজন্য তাহারা বার-বার বলিয়া আসিতেছে সমুদয় মুসলমান ভারতীয়দের রাজনীতি অন্য সব ভারতীয়দের রাজনীতি হইতে পৃথক্। কিন্তু প্রত্যহ নানা ঘটনা এইরূপ উক্তির অসত্যতা প্রমাণ করিতেছে। আব্বাস তৈয়বজী, আনসারী, আবুল কালাম আজাদ, শৈফুদ্দিন কিচলু, শেরওয়ানী, প্রভৃতি বড় বড় মুস্লিম ভারতীয় নেতা জেলে গিয়াছেন। বিহারে দুইজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা দণ্ডিত হইয়াছেন। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশেই সকলের চেয়ে ওঁছা রকমের অনেক মুসলমান বাস করে। কিন্তু বঙ্গেও অনেক মুসলমান বাঙালী সত্যাগ্রহ উপলক্ষে জেলে গিয়াছেন। পাঠানপ্রধান উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে অনেক পাঠান হতাহত ও বন্দী হইয়াছেন। তথাকার বন্নু শহরে সত্যাগ্রহী পুরুষদিগকে শহর হইতে তাড়াইয়া দিয়া ফাটক বন্ধ করিয়া দেওয়ায় তথাকার মুসলমান মহিলারা মদের দোকানে পিকেটিং করেন। ৫ই আগষ্টের খবরে জানা যায়, একদল মহিলা গ্রেপ্তার হওয়ায় আর একদল তাঁহাদের স্থানে কাজ করিতেছেন। বোম্বাইয়ে উষা কীর্ত্তনের দলকে "প্রভাতফেরী" বলে। আজকাল প্রভাতফেরীরা প্রাতঃকালে জাতীয় সঙ্গীত গাইয়া বেড়ায়। সেদিন একদল মুসলমান মহিলার প্রভাতফেরী প্রাতঃকালে রাস্তায় রাস্তায় জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষ যে-ঘটনা মুসলমান ভারতীয়দের ভারতীয়ত্ব প্রমাণ করিয়াছে, তাহা এই, যে, বর্ত্তমান ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির মধ্যে নূতন অর্দ্ধেক সভ্য মুসলমান এবং সভাপতি মুসলমান। ইহার আগেকার দুজন সভাপতিও ছিলেন মুসলমান। বর্ত্তমানে ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদিগের নাম—কার্য্যকারী অস্থায়ী সভাপতি লক্ষ্ণৌয়ের য্যাডভোকেট খালিক উজ্জমান, লক্ষ্ণৌয়ের ব্যারিষ্টার পণ্ডিত হরকরণ নাথ মিশ্র, বোম্বাই ক্রনিক্লের সম্পাদক সৈয়দ আবদুল্লা ব্রেল্‌ভী, কোষাধ্যক্ষ বোম্বাইয়ের বেলজী নাপ্‌পু, রাজমহেন্দ্রীর কে ভি আর স্বামী, বীজাপুরের এস্ ভি কৌজাল্গী, এলাহাবাদের এ এম্ খাজা, অমৃতসরের ইস্মাইল গজনভী, কলিকাতার শরৎচন্দ্র বসু, পাটনার অধ্যাপক আবদুল বাকী, দিল্লীর আসফ আলী, দিনাজপুরের মৌলানা আবদুল বাকী। তদ্ভিন্ন কমিটির যে তিন জন সভ্য গ্রেপ্তার হইতে বাকী ছিলেন তাঁহারাও সভ্য; যথা কাশীর ডক্টর শ্রীভগবান দাস, এলাহাবাদের শ্রীমতী কমলা নেহরু এবং বোম্বাইয়ের শ্রীমতী হংসা মেহতা। জমায়েত উল উলেমা মুসলমান ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞদিগের কেন্দ্রীয়

তাহার সভাপতি মুফতী কিফায়েৎউল্লা এবং সম্পাদক মৌলানা আহমদ সাইয়েদ ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ডাঃ আনসারীকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটিতে কাজ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিন্তু তখন সকল নূতন সভ্যের নিয়োগ হইয়া গিয়াছিল। এইজন্য ডাঃ আনসারী বলেন, তাঁহারা ইহার পরের কমিটিতে সভ্য নিযুক্ত হইবেন।

অতএব, মুসলমান ভারতীয়দের রাজনীতি অন্যান্য ভারতীয়দের রাজনীতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, ইহা সত্য নহে।

—

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্র

ঢাকা-হলের বার্ষিক পত্র "শতদলে"র ভূমিকায় প্রভোষ্ট শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ লিখিয়াছেন :—

"এই বৎসরের আর একটি ঘটনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসের দাঙ্গার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা একযোগে তিনরাত্রি শহরে শান্তিরক্ষায় সাহায্য করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দুমুসলমান ছাত্রদের মধ্যে কোনও মনোমালিন্য ছিল না। এতে আশা হয় যে, সুশিক্ষার গুণে ও পরস্পরকে বন্ধুভাবে জানবার সুযোগ পেলে আমাদের দেশের এই কলঙ্ক শীঘ্রই দূরীভূত হ'বে।"

শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অজিতনাথ ভট্টাচার্য্যের পৈশাচিকভাবে প্রাণবধের বৃত্তান্ত সকলের গোচর করেন। এই অজিতনাথের মৃত্যুর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু-মুসলমান ছাত্রেরা সম্মিলিতভাবে সাত দিন অনধ্যায়ের সঙ্কল্প করে।

—

ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহের অবস্থা

ভারত-গবর্ন্মেণ্ট প্রতি সপ্তাহে অহিংস আইনলঙ্ঘন প্রচেষ্টার অবস্থা সম্বন্ধে একটি মন্তব্য প্রকাশ করেন। এই মন্তব্যগুলি পরে পরে সাজাইয়া পড়িলে দেখা যাইবে, সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা ভারত-সরকারের মতে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতেছে। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই অন্য কতকগুলি সরকারী জ্ঞাপনী ছাপা হইতেছে যাহা হইতে জানা যায়, কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স নূতন নূতন জেলায় জারী ও প্রয়োগ করা হইতেছে। অর্ডিন্যান্সগুলি সত্যাগ্রহ-প্রচেষ্টার প্রাণবধ করিবার জন্য প্রণীত হইয়াছে। সুতরাং নূতন নূতন স্থানে কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করার মানে সেই সব জায়গায় সত্যাগ্রহ বাঁচিয়া আছে এবং তাহাকে পিষিয়া ফেলা দরকার। তাহা হইলে কতকগুলি প্রশ্ন উঠিতেছে :—(১) যে-সব নূতন জায়গায় কোন অর্ডিন্যান্স জারী হইতেছে, সেখানে আগে সত্যাগ্রহ ছিল কি না? (২) যদি ছিল, তাহা হইলে আগেই সেখানে অর্ডিন্যান্স প্রযুক্ত হয় নাই কেন? (৩) যদি আগেই ছিল না, এখন সত্যাগ্রহ নূতন করিয়া সেখানে দেখা দিতেছে, তাহা হইলে ইহা সত্য কি না, যে, সত্যাগ্রহ সব জায়গায় মরিতেছে না, কোথাও কোথাও রক্তবীজের মত গজাইতেছে? (৪) যদি আগে সেই সব জায়গায় ছিল, তাহা হইলে আগেই তথায় অর্ডিন্যান্স জারী না করিয়া এখন জারী করিবার কারণ কি এই, যে, এখন সেখানে সত্যাগ্রহ প্রবলতর হইতেছে? (৫) যদি এই অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে কি, যে, অনেক জায়গায় সত্যাগ্রহ প্রবলতর হইতেছে? (৬) যদি এই অনুমান সত্য না হয়, যদি ইহাই সত্য হয়, যে, ঐসব জায়গায় আগে হইতে সত্যাগ্রহ ছিল ও আগে প্রবল ছিল, এখন দুর্ব্বল ও ম্রিয়মাণ হইতেছে, তাহা হইলে ম্রিয়মাণের, অর্দ্ধমৃতের, উপর অর্ডিন্যান্সঅস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন কি? যাহা নিজেই মরিতেছে, তাহাকে খোঁচাইয়া কতকটা জীবিতবৎ করিয়া তুলিবার আবশ্যক কি?

অথবা ইহার মধ্যে গূঢ় রাজনৈতিক বিচক্ষণতা থাকিতেও পারে। সত্যাগ্রহ যখন যেখানে প্রবল থাকে তখন তাহাকে তথায় আঘাত করিলে প্রতিক্রিয়াবশতঃ তথায় কর্ম্মীদের মধ্যে নূতন উৎসাহের সঞ্চার হইতে পারে এবং নূতন কর্ম্মীও জুটিতে পারে। কিন্তু যখন উহা কোথাও খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তখন আঘাত করিলে জীবনীশক্তির হ্রাসবশতঃ কোন প্রতিক্রিয়া হয় না, তখন উহার মরণ নিশ্চিত। এইরূপ ভাবিয়া কি গবর্ন্মেণ্ট নূতন নূতন জায়গায় কোন-না-কোন অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করিতেছেন?

সমস্তই অনুমান, ঠিক কিছুই বলিতে পারি না। কারণ, খবরের কাগজগুলিকে—বিশেষতঃ বঙ্গে—দরকারী খবর-বিহীন করিয়া তুলায় কোন একটা বেসরকারী-সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নাই। প্রত্যেক জায়গায় স্থানীয় সত্যাগ্রহীরা অবশ্য সেখানে সত্যাগ্রহের অবস্থা জানেন।

—

কংগ্রেস কমিটিগুলিকে বেআইনী ঘোষণা করা

একদিকে, সত্যাগ্রহ দুর্ব্বল হইতেছে, এই কথা বলিয়া অন্যদিকে নূতন নূতন জায়গায় অর্ডিন্যান্স প্রয়োগ করা যেমন হেঁয়ালির মত বোধ হয়, তেমনি আর একটা হেঁয়ালি সরকারকর্ত্তৃক ঘোষিত সত্যাগ্রহের ক্রমবর্দ্ধমান দুর্ব্বলতার সঙ্গে সঙ্গে নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি এবং জেলা কংগ্রেস কমিটি-সমূহকে ক্রমে ক্রমে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা। মহাত্মা গান্ধী যে-দিন লবণ-আইন ভঙ্গ করিতে সঙ্কল্প করেন, যে-দিন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটি অহিংস আইনলঙ্ঘন অনুমোদন করেন, যে-দিন মহাত্মাজী লবণ প্রস্তুত করেন, যেদিন তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া আরও হাজার হাজার লোক লবণ প্রস্তুত করে, যে-দিন নানা প্রদেশে বেআইনী লবণ বিক্রী হয়, যে-দিন অর্ডিন্যান্সের নিষেধসত্ত্বেও মদের দোকানে ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং আরম্ভ হয়, যে-দিন অরণ্য-আইন ভগ্ন করা হয়, যে-দিন চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে কোথাও লোকে অস্বীকার করে, যে-দিন নিষেধসত্ত্বেও লোকে সভা করে ও মিছিল বাহির করে—ইহার মধ্যে কোন্ তারিখে কংগ্রেস বেআইনী সমিতি ছিল না, বৈধ সমিতি ছিল? যাহা অনিষ্টকর, তাহাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার সমীচীনতা সম্বন্ধে নানা দেশে প্রবাদ আছে। সে প্রবাদ কি তাহা হইলে মানুষের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে?

হইতে পারে, গবর্মেণ্ট প্রথমে ভাবিয়াছিলেন সত্যাগ্রহ অচিরে আপনা আপনিই মারা যাইবে, সেইজন্য প্রথমে কিছু করেন নাই। কিন্তু যখন উহা প্রবল আকার ধারণ করিল, নানা জায়গায় লাঠি ও গুলি চলিল, এবং তাহাতেও লোকে বাগ মানিল না, তখন কেন কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলিকে সর্ব্বত্র যুগপৎ বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল না? এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর আমরা দিতে অসমর্থ এবং সরকার বাহাদুরের নিকট হইতেও পাইব না। কেবল অনুমান করা যাইতে পারে। এক অনুমান এই, যে, সত্যাগ্রহ বাস্তবিক দুর্ব্বলতর না হইয়া কোন-না-কোন আকারে (যেমন বিদেশীবর্জ্জনের আকারে) প্রবলতর হইতেছে বলিয়া সরকার খুব কড়া ব্যবস্থা করিতেছেন। আর এক অনুমান এই হইতে পারে, যে, উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ায় উহাকে এখন আঘাত করিলে কোন প্রতিক্রিয়া হইবে না বলিয়া উহাকে মরণ-ঘা মারা হইতেছে।

—

রফা ও সন্ধির কথা এবং কংগ্রেসকে আঘাত

একদিকে পণ্ডিত তেজ বাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত মুকুন্দরাম জয়াকর শান্তি স্থাপনার্থ কংগ্রেস-নেতাদের ও বড়লাটের মধ্যে রফা ও সন্ধির কথাবার্ত্তা চালাইতেছেন, অন্যদিকে ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় কংগ্রেস-নেতাদিগকে জেলে পুরা হইতেছে। ইহাও এক রহস্য। এই দুটা চা'লের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যাইতেছে না। কেহ কেহ অনুমান করিতেছেন, ব্যক্তিগতভাবে লর্ড আরুইন শান্তিস্থাপনপ্রয়াসী, কিন্তু তাঁহার শাসনপরিষদের অধিকাংশ সভ্য কড়া শাসনের পক্ষপাতী, তাঁহারা সন্ধি ও রফা চান না, কংগ্রেসকে পিষিয়া ফেলিতে চান, এবং তিনি তাহাদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছেন না; এইজন্য পরস্পর অসঙ্গত দুই রকমের ব্যবহার হইতেছে। ইহা যে নিশ্চয়ই অমূলক অনুমান তাহা বলিতে পারি না। আর একটা অনুমান এই:—জেলে অবস্থানকালে লণ্ডনের ডেলী হেরাল্ডের প্রতিনিধি মিঃ স্লোকুম্বের সহিত মুলাকাতে গান্ধীজী পুরা স্বাধীনতা না চাহিয়া স্বাধীনতার সার অংশ চাহিয়াছিলেন, তাহার পর জেলে যাইবার আগে মোতীলালজীও কতকটা ঐ রকম সর্ত্তের উল্লেখ করিয়াছিলেন। তাহাতে শাসনপরিষদের কড়া শাসনের

পক্ষপাতী সভ্যদের ধারণা হইয়া থাকিবে, যে, আরও অধিকসংখ্যক কংগ্রেসনেতাকে জেলে পাঠাইলে কংগ্রেস-পক্ষের স্বর আরও নরম হইবে এবং তাহাদের সন্ধিসর্ত্তও আরও নরম হইবে, এইজন্য কড়া শাসন চালান হইতেছে। এই অনুমানও সম্পূর্ণ অমূলক না হইতে পারে।

যে অনুমানই, বা উভয় অনুমানই, সত্য বা অসত্য হউক, আমাদের বিবেচনায় শাসনকর্ত্তাদের দু-একটা বিষয়ে ভ্রম হইতেছে। কংগ্রেসের নেতারা ভয়ে বা অন্য কারণে ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আবশ্যক ন্যূনতম রাষ্ট্রিক অধিকারের কম কিছু চাহিবেন না, চাহিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহাদের উপর বেশী চাপ দেওয়া সুবিবেচনার কাজ নয়। আর একটা কথাও মনে রাখিতে হইবে। যে-কোন কারণেই হউক, নেতারা যদি এমন কিছু চান, যাহা কংগ্রেসওয়ালাদের অধিকাংশের মনঃপূত নহে, তাহা হইলে তাঁহারা নেতাদের সর্ত্তের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারেন। সেরূপ সাহস, স্বাধীন-চিত্ততা ও দৃঢ়তা তাঁহাদের অনেকের আছে। তাহা যদি ঘটে, তাহা হইলে দেশটা ঠাণ্ডা হইবে কেমন করিয়া? [১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর প্রাতে লিখিত।]

হিংসাত্মক ও অহিংস সংগ্রামে কত সময় লাগে

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, তিনি ভারতবর্ষের জন্য স্বাধীনতার সার অংশ চান। অর্থাৎ তিনি দেশের জন্য এমন অধিকার চান, যাহা নামে স্বাধীনতা না হইলেও কার্য্যতঃ স্বাধীনতার সমতুল্য। নামে ও কাজে উভয়েই স্বাধীনতা পাইতে হইলে যতটুকু শক্তি ও সামর্থ্যের পরিচয় দিতে হয়, নামটা বাদ দিয়া শুধু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা পাইতে হইলে তার চেয়ে কম যোগ্যতার প্রমাণ দিলে চলিবে না। ভারতীয়েরা কিছু অল্প শক্তির পরিচয় দিলেও স্বাধীনতার সার অংশ পাইতে পারিবে মনে করা ভুল। কারণ, সার অংশটাই আসল জিনিষ, নামটা তত দরকারী নয়; "যেহেতু আমরা নামটা চাহিতেছি না অতএব, হে বিধাতা, কিয়ৎপরিমাণে-শক্তিহীন আমাদিগকে আসল জিনিষটা দিয়া ফেলুন"—এরূপ প্রার্থনা গম্ভীরভাবে করা যায় না।

ইতিহাসে দেখা যায়, যে-সকল জাতি অতীতকালে স্বাধীন হইতে চাহিয়াছে তাহারা হিংসাত্মক যুদ্ধ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধীই ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম অহিংস-সংগ্রাম আরম্ভ করিয়াছেন, এবং দেশের সমুদয় প্রধান নেতা অহিংস চেষ্টার পক্ষপাতী। যে-সকল প্রধান নেতা কংগ্রেসের অবলম্বিত অহিংস সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন নাই এবং তাহার বিরোধী, তাঁহারা স্বরাজ লাভের জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতে বলেন, তাহাও অহিংস। হিংসাত্মক চেষ্টার পক্ষপাতী ভারতীয়দের মধ্যে কেহ নাই, বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, যাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কাজ করেন ও নিজেদের মত ব্যক্ত করেন, এরূপ নেতা ও অনুচরদের কেহই স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভের জন্য হিংসাত্মক চেষ্টা করিবার পক্ষপাতী নহেন।

কোন দলের বর্ত্তমান অহিংস চেষ্টা সফল হইবে কি না, বলিতে পারি না। আমরা কেবল ইহাই বুঝিতে চাহিতেছিলাম, যে, ঐ চেষ্টা সফল বা আপাততঃ বিফল হইতে কত সময় লাগিতে পারে। অবশ্য, ঐতিহাসিক নজীর হইতে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। হিংসাত্মক স্বাধীনতা-যুদ্ধ সব স্থলে সমানকালব্যাপী হয় নাই। কিন্তু যদি মনে করা যায়, যে, অহিংস-সংগ্রাম হিংসাত্মক যুদ্ধ অপেক্ষা দীর্ঘকালব্যাপী হওয়ার সম্ভাবনা, তাহা হইলে সেরূপ অনুমান অমূলক না হইতেও পারে। অবশ্য, অল্প সময়ের মধ্যেই ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কংগ্রেসের অহিংস-যুদ্ধ ব্যর্থ করিয়া দিতে পারেন, কিম্বা উহা দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতেও পারে।

কিন্তু হিংসাত্মক যুদ্ধ এবং বর্ত্তমান ভারতীয় অহিংস যুদ্ধের মধ্যে একটা প্রভেদ সকলেই সহজে বুঝিতে পারেন। হিংসাত্মক যুদ্ধে বড় বা ছোট নানা শ্রেণীর সেনানায়ক এবং সাধারণ সৈনিকদিগকে বিপক্ষ যদি বন্দী করিতে চায়, কিম্বা অন্য কোনরূপে তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ করিতে চায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ অনায়াসে সে উদ্দেশ্য সফল হয় না। সে উদ্দেশ্য সফল করিতে হইলে বিপক্ষকে সাধারণতঃ যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধের ফল অনিশ্চিত। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয়

অহিংস-সংগ্রামে গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলেই যত জন ইচ্ছা নেতাকে ও সাধারণ কর্ম্মীকে অনায়াসে বন্দী করিতে পারেন এবং করিতেছেন। "তোমাকে গ্রেপ্তার করিতে চাই বা করিলাম", পুলিস এই কথা বলিবামাত্র যে-কোন নেতা বা সাধারণ কর্ম্মী বিন্দুমাত্রও বাধা না দিয়া ধরা দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতেও দিবেন। আদালতে বিচারের সময়েও তাঁহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না। এই সব কারণে, যথেষ্টসংখ্যক জেল নাই, বর্ত্তমান জেলসকলে যথেষ্ট জায়গা নাই, নূতন যথেষ্টসংখ্যক জেল নির্ম্মাণ করিবার টাকা নাই, এবং বর্ত্তমান জেলসকলে ও পরে নির্ম্মেয় জেলসকলে যথেষ্ট জায়গা থাকিলেও সমুদয় সত্যাগ্রহী কয়েদীকে খাইতে পরিতে দিবার টাকা গবর্মেণ্টের নাই বলিয়াই সকল সত্যাগ্রহীকে গবর্মেণ্ট কারারুদ্ধ করিতে পারেন নাই। হিংসাত্মক যুদ্ধেও অবশ্য টাকার দরকার হয়, কিন্তু কেবল টাকার দ্বারা হিংসাত্মক যুদ্ধ চালান যায় না, অন্যান্য যাহা আবশ্যক তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতীয় অহিংস সংগ্রামে গবর্মেণ্ট জেল নির্ম্মাণ করিবার এবং জেলে কয়েদীদিগকে খাওয়াইবার টাকার জোগাড় করিতে পারিলেই সত্যাগ্রহী সকল নেতা ও অন্য কর্ম্মীদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া কাজের বাহির করিয়া ফেলিতে পারেন। টাকার জোগাড় হইলে পুলিসের লোক বাড়াইবার বা বর্ত্তমান পুলিসের লোকদের লাঠি চালাইবার কোনই দরকার হয় না। আমরা বিলাতী কাগজের মতামত পড়িয়া যাহা বুঝিতে পারি, তাহাতে মনে হয়, বিলাতের অধিকাংশ লোক ইহা চায় না, যে, আমরা হিংসাত্মক বা অহিংসাত্মক সংগ্রামে শক্তির পরিচয় দিয়া স্বরাজ পাই, আমরা ইংরেজের কাছে অনুগ্রহ চাহিলে সংখ্যায়-ন্যূন কতকগুলি ইংরেজ কিছু দিতে রাজী হইতে পারে বটে, কিন্তু সেই কিছুও দিবার বাস্তবিক ক্ষমতা তাহাদের আছে কি না জানি না। যাহা হউক, ওরূপ কিছু জল্পনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা কেবল অবান্তর এই কথাটা বলিতে চাই, যে, ইংরেজ জাতি নিজেদের ধন-ভাণ্ডার হইতে ভারতে যথেষ্ট জেল নির্ম্মাণের জন্য ও তাহার ভাবী কয়েদীদের খোরাক পোষাকের জন্য যথেষ্ট টাকা ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেই অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বর্ত্তমান সত্যাগ্রহীদিগকে কাজে অক্ষম করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে, আমেরিকা ও অন্য কোন কোন দেশে লাঠি প্রয়োগের যে নিন্দা হইতেছে, ইংরেজদিগকে তাহাও আর সহ্য করিতে হয় না।

আমরা অবশ্য জানি, ভারতবর্ষ অর্জন ও স্বহস্তে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজ-জাতি দ্বারা এ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে লব্ধ ধনই ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে, গ্রেট ব্রিটেনের ধনভাণ্ডারের টাকা ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইতিহাসে কেবল যে পুনরাবৃত্তিই হয়, তাহা নহে; নূতনও কিছু কিছু ঘটিতে পারে।

অথবা নূতন কিছু ঘটিবার কথাই বা ওঠে কেন? আমেরিকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি স্বাধীন হইবার জন্য যখন ব্রিটেনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল, তখন ইংরেজ-জাতি উপনিবেশগুলির টাকার সাহায্যে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালায় নাই, নিজেদের টাকার দ্বারাই চালাইয়াছিল। ভারতীয় অহিংস-সংগ্রামে ভারতীয়দিগকে অহিংস উপায়ে পরাস্ত করিবার জন্য আমরা যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, ইংরেজ-জাতিকে তাহার নিমিত্ত যাহা খরচ করিতে হইবে, আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধে তার চেয়ে অনেক বেশী খরচ করিতে হইয়াছিল। আমাদের সঙ্কেত অনুযায়ী উপায় অবলম্বিত হইলে, ইংরেজ-জাতি অহিংস চেষ্টার বিরুদ্ধে অহিংস উপায় অবলম্বন করিলে, তাহাদের কোন নৈতিক অখ্যাতিও কেহ করিতে পারিবে না।

এই অহিংস সংগ্রামে ইংরেজের বা ভারতীয়দের জয় বা পরাজয় কত দিনে হইবে, তাহা অবশ্য কেহ বলিতে পারে না।

আমেরিকানরা স্বাধীনতা লাভের জন্য যে যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহাতে উভয় পক্ষেই অস্ত্রের ব্যবহার ও রক্তপাত হইয়াছিল, তাহা হিংসাত্মক যুদ্ধ। কিন্তু তাহা হিংসাত্মক হইলেও এবং তখনকার ব্রিটিশজাতি এখনকার চেয়ে কম ধন ও শক্তির অধিকারী হইলেও, যুদ্ধ অনেক বৎসর চলিয়াছিল। ১৭৭৫ সালের ১৯শে এপ্রিল এই

যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এবং ১৭৮১ সালের ১৯শে অক্টোবর ইংরেজ-সেনাপতি কর্ণওয়ালিস আত্মসমর্পণ করার পর যুদ্ধের অবসান হয়। সন্ধি হইতে আরও দুই বৎসর লাগিয়াছিল। যাহা হউক, যুদ্ধ চলিয়াছিল সাড়ে ছয় বৎসর।

বিপক্ষকে কাবু করিতে পারিলে হিংসাত্মক সংগ্রামে জয়লাভ করা যায়। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী তাঁহার প্রবর্ত্তিত অহিংস সংগ্রামে সফলকাম হইতে চান, ইংরেজ-জাতি ও গবর্ন্মেণ্টের হৃদয়ের পরিবর্ত্তন দ্বারা। কিন্তু এই পরিবর্ত্তনের এপর্য্যন্ত কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। তিনি মনে করেন, সত্যাগ্রহীদের নানাবিধ দুঃখে ইংরেজ-জাতির হৃদয় দ্রবীভূত হইবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সমুদয় ঘটনার প্রকৃত সংবাদ ইংলণ্ডে না পৌছায়, অন্ততঃ শীঘ্র না পৌছায়, এই উপায়ে হৃদয় পরিবর্ত্তন হইবে কি না, অথবা কখন হইবে, বলা যায় না।

ভারতীয় উদারনৈতিক ও অন্যান্য রাজনৈতিক দলের লোকেরা সত্যাগ্রহ নীতি অবলম্বন করেন নাই। তাঁহারা যুক্তিতর্কের দ্বারা ইংরেজকে বুঝাইয়া স্বরাজ পাইতে চান। যুক্তিতর্ক প্রায় পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া চলিতেছে; এপর্য্যন্ত ইংরেজকে কেহ ইহা বুঝাইতে পারে নাই, যে, ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়া উচিত। যে অল্পসংখ্যক ইংরেজ ভারতবর্ষের স্বরাজ পাওয়ার পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বেসরকারী লোক। যখন বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী মিঃ ম্যাকডোন্যাল্ড বেসরকারী লোক ছিলেন, তখন তিনি ভারতীয় স্বরাজের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ও তাঁহার দলের লোকেরা "গবর্ন্মেণ্ট" হইয়া পড়িবার পর আর বলিতেছেন না, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে স্বরাজ দিবার জন্য নিশ্চয়ই পার্লেমেণ্টে আইনের খসড়া পেশ করিবেন। অতএব তর্কযুক্তির পথে কখন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হইবে, বলা যায় না।

সত্যাগ্রহ এবং তর্কযুক্তি ছাড়া আর একটা অহিংসাত্মক পথ আছে। তাহা ভিক্ষা। কিন্তু তাহাতে বিশ্বাসবান্ কোন ভারতীয় রাজনৈতিক দল আছে বলিয়া আমরা জানি না। ব্যক্তিগতভাবে কাহারও কাহারও এরূপ বিশ্বাস থাকিতে পারে। উদারনৈতিক দলের বিশ্বাস এইরূপ বলিলে তাঁহাদের প্রতি অবিচার করা হইবে। তাঁহাদের প্রসিদ্ধতম নেতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সেদিন বিলাতে এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন, ট্রাব্‌ল ("trouble") উৎপন্ন না করিলে রাষ্ট্রিক উন্নতি লাভ করা যায় না। ট্রাব্‌লের মানে বিরক্ত উত্ত্যক্ত করা, অসুবিধায় ফেলা, কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি। তিনি ঠিক্ কি অর্থে উহা ব্যবহার করিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু ইহা বলিয়াছিলেন, যে, বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টা ঠিক্ রকমের ট্রাব্‌ল্ নহে; অথচ ঠিক্ রকমের ট্রাব্‌লটি যে কি, তাহা তিনি বলেন নাই। বিলাতী জিনিষ না কিনিলে ইংরেজদিগকে অসুবিধায় ফেলা হয় বটে। এই চেষ্টাকে কেহ হিংসাত্মক বলিতে পারেন না। কিন্তু বর্জ্জনকারীদের মনে ইংরেজ বণিকদের উপর রাগ থাকিলে ইহা আধ্যাত্মিক অর্থে সম্পূর্ণ অহিংসাত্মক না হইতে পারে—যদিও তাহা হইলেও সাধারণ অর্থে ইহা নিশ্চয়ই অহিংসাত্মক। বিলাতী পণ্য বর্জ্জনের পথে চলিলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কত দিনে হইবে, বা চেষ্টার বিফলতা কত দিনে বুঝা যাইবে, কেহ বলিতে পারে না।

—

বিলাতীপণ্যবর্জ্জন ও স্বরাজ

কাহারও কথায় বা কাজে যদি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, যে, স্বরাজ লব্ধ হইলেই বিলাতীপণ্যবর্জ্জন নীতি পরিত্যক্ত হইবে ও হওয়া উচিত, তাহা হইলে তিনি ভ্রান্ত। স্বরাজ লব্ধ হইবার পর "বয়কট" কথাটার ব্যবহার পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু স্বদেশী পণ্যদ্রব্য উৎপাদন, ক্রয় ও ব্যবহার কখনও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এবং স্বদেশী যে-যে রকম জিনিষ কেহ কিনিবেন, তিনি বিদেশী সেই সেই রকম জিনিষ নিশ্চয়ই কিনিবেন না; সুতরাং স্বদেশী জিনিষ ব্যবহার বিদেশী জিনিষ পরিহারের উন্টা পিঠ চিরকালই থাকিতে পারে। অতএব স্বরাজ পাইলেই আমরা স্বচ্ছন্দে খুব বিলাতী জিনিষ কিনিতে থাকিব, সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে ইংরেজদের মনে এরূপ ধারণা জন্মান কাহারও উচিত নহে।

—

রাষ্ট্রীয় প্রগতির হিংস্র ও অহিংস পন্থা

কোন পত্রিকাসম্পাদক যদি বলেন, স্বরাজ লাভের জন্য হিংস্র পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা হইলে তাঁহার শাস্তি হইবে। আবার তিনি বা অন্য কোন সম্পাদক যদি বলেন, ঐ উদ্দেশ্যে সত্যাগ্রহ বা নিরুপদ্রব আইনলঙ্ঘন পন্থা অবলম্বন করা উচিত, তাহা হইলেও তাঁহার শাস্তি হইবে। প্রেস-সম্পর্কীয় অর্ডিন্যান্সে হিংস্র ও অহিংস উক্ত উভয় উপায়কে কতকটা একই শ্রেণীতে ফেলা হইয়াছে। এইজন্য হিংস্র পন্থা হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত, কোনও সম্পাদক তাহাকে অহিংস সত্যাগ্রহের শ্রেষ্ঠতা বুঝাইবার চেষ্টা নিশ্চিন্ত মনে করিতে পারেন না। যদি এমন আইন হয়, যে, মদ ছাড়াইবার জন্য কাহাকেও ঘোলের শরবৎ খাইতে বলিতে পারিবে না, অর্ডিন্যান্সটা কিয়ৎপরিমাণে সেইরূপ। অবশ্য, উপমান ও উপমেয়ে সম্পূর্ণ মিল নাই। কেন-না, কাহাকেও মদ ছাড়িতে বলিলে অর্ডিন্যান্সের পিকেটিং-সম্পর্কীয় ধারার কবলে পড়িতে হইতে পারে বটে, কিন্তু শুধু শরবৎ পান করিতে বলিলে বোধ করি কোন আইন লঙ্ঘিত হয় না।

যাহা হউক, হিংস্র পন্থার নিন্দা অবাধে ও অকপটভাবে করা যাইতে পারে। হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে আমরা আগে আগে অনেক কথা লিখিয়াছি। এখন আবার হিংস্র পন্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার কারণ, সম্প্রতি পুলিসের উচ্চ ও নিম্নপদের কয়েকজন কর্ম্মচারীকে মারিবার জন্য বোমা ও গুলি ছোঁড়া হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, দেশে এমন কতকগুলি লোক আছে যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিম্বা গুপ্ত উত্তেজক চরের প্ররোচনাবশতঃ এইরূপ গর্হিত কাজ করিতেছে। এইরূপ অবৈধ কাজ করিবার কারণ নানা রকম হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত প্রতি-হিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য কেহ ইহা করিতে পারে, কিম্বা কাহাকেও কোন লোকসমষ্টির পক্ষে আশঙ্কার কারণ অনুমান করিয়া ইহা করিতে পারে, অথবা সরকারী লোকদের মনে ভয় উৎপন্ন করিয়া স্বাধীনতা লাভ করিতে পারা যায় এইরূপ ধারণাবশতঃ কেহ কেহ এইরূপ কাজ করিতে পারে। এইরূপ অনুমান বা ধারণা কোনস্থলেই বিন্দুমাত্রও সত্য কি মিথ্যা, তাহার সহিত আমাদের এই আলোচনার কোন সম্পর্ক নাই।

সকল দেশেই অসভ্যতার যুগে যখন আইন আদালত ছিল না, তখন কেহ কাহারও দৈহিক বা অন্যবিধ অনিষ্ট করিলে অনিষ্টকারীকে শাস্তি দিবার ভার অত্যাচরিত উৎপীড়িত বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তাহার আত্মীয়গণ লইত, এবং কেহ সাধারণভাবে অত্যাচারী মনে হইলেও তাহার শাস্তির জন্যও ব্যক্তিগত বা দলগত চেষ্টা হইত। কিন্তু সভ্যতার প্রগতিক্রমে যখন হইতে সভ্যদেশসমূহে আইন আদালত প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন হইতে শাস্তি দিবার ভার ব্যক্তির বা দলের হাত হইতে রাষ্ট্রের হাতে গিয়াছে, এবং তাহা ভালই হইয়াছে। শাস্তি দিবার ভার রাষ্ট্রের হাতে যাওয়ায় সকল রকমের সব অনিষ্টকারীর দণ্ড সব স্থলে হইয়া থাকে, কিম্বা যাহাদের দণ্ড হয় তাহারা সবাই দোষী, অথবা কেবল দোষীদেরই দণ্ড হয়, এমন নয়। কিন্তু, তাহা হইলেও, লোকস্থিতির জন্য, আইনের সাহায্যে আদালতের দ্বারা বিচারের পর যথাযোগ্য শাস্তির ব্যবস্থাই শ্রেষ্ঠ। আইনের ও আদালতের দোষে যদি অনেক নিরপরাধ লোকের শাস্তি হয় এবং অনেক দুষ্টের শাস্তি হয় না দেখা যায়, তাহা হইলে শাস্তি দিবার ভার নিজেদের হাতে না লইয়া আইনের ও আদালতের পরিবর্ত্তন ও উন্নতির চেষ্টা করাই বিহিত। আইন আদালতের দোষত্রুটিবশতঃ যে-সব অপরাধীর শাস্তি হয় না, তাহাদের শাস্তির ভার বিশ্বের নিয়মের উপরও অর্পিত হইতে পারে। ব্যক্তিগত বা দলগত প্রতিহিংসার রীতিতে যে-সব দোষত্রুটি ঘটে, তাহার আলোচনা বা উল্লেখ খুব সংক্ষেপে করা যায় না।

ইহাও এখানে উল্লেখ করা দরকার, যে, দুষ্টের চারিত্রিক উন্নতিসাধন তাহাকে শাস্তি দিবার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, শাস্তিতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে এইরূপ মত প্রচলিত হইতেছে। সেইজন্য অনেক দেশে প্রাণ-দণ্ডের ব্যবস্থা উঠিয়া যাইতেছে। শাস্তি দিবার সরকারী ব্যবস্থা যখন প্রাণদণ্ডের বিরুদ্ধে যাইতেছে, তখন তাহার বেসরকারী কোন উপায় সভ্যজগতের মতের গতির

বিপরীত হওয়া ভাল নয়। আপত্তিকারীরা অবশ্য বলিতে পারেন, ভারতবর্ষের সরকারী ব্যবস্থা এখনও এই মতের অনুযায়ী হয় নাই এবং এদেশে অনেক নিরপরাধ লোকও আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা এবং অন্য উপলক্ষ্যে হতাহত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের অবস্থা যাহাই হউক, আমরা শ্রেষ্ঠ যাহা তাহারই আলোচনা ও অনুবর্ত্তন করিতে চাই।

লৌকিক ব্যবহারে কোন জাতি বা কোন গবর্ন্মেণ্টের দ্বারাই এ পর্য্যন্ত শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের উচ্চতম উপদেশ পালিত হয় নাই। তথাপি তাহা পালনীয় মনে করি বলিয়া উল্লেখ করিতেছি। মহাভারতে উপদেশ আছে, প্রেমের দ্বারা অপ্রেমকে পরাজয় করিতে হইবে; বুদ্ধদেবের উপদেশও তাই। যীশু খ্রীষ্টের উপদেশও সেইরূপ।

রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার মধ্যে এইরূপ কথা তোলায় অনেকে হাসিবেন। কিন্তু হাসিলেও, মহাপুরুষেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্মরণ করিতে হইবে।

বিশেষ করিয়া তাহা স্মরণ করিতে হইবে এইজন্য, যে, জগতের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতবর্ষে অহিংসার পথে স্বাধীনতালাভের চেষ্টা হইতেছে। মহাপুরুষদের বাণী মহাত্মা গান্ধীর জীবনে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, এখন আর তাহা পুস্তকের পৃষ্ঠায় আবদ্ধ নাই। সত্যাগ্রহ অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া এবং হাজার হাজার সত্যাগ্রহী ভীষণ যন্ত্রণা সত্ত্বেও প্রতিশোধের চেষ্টা করেন নাই বলিয়া ভারতবর্ষ বিদেশে সম্মানিত হইতেছে। এবং ভারতবর্ষের আদর্শ সম্মানিত হইতেছে বলিয়াই আমাদের যাহারা বিরোধী তাহারা জগতকে ইহা বুঝাইতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে, যে, হিংসাত্মক কাজ ভারতে যাহা কিছু হইতেছে, তাহা সত্যাগ্রহীদের দ্বারাই হইতেছে। শ্রেষ্ঠ পথ যাহা, তাহা শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়াই অবলম্বনীয়। তাহার উপর, মহাত্মা গান্ধী যখন তাহার সাধ্যায়ত্ততা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন, তখন তাহা আরও অবলম্বনীয়।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাহা মহাপুরুষদের উপদেশ ও আচরণ অনুসারে লিখিলাম। নিজের সাধনা এবং জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে এই সব কথা লিখিতে পারিলে অধিকতর তৃপ্তিলাভ করিতাম, এবং আরও জোরের সহিত কথা কহিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা পারিলাম না বলিয়া মহাপুরুষদের বাণী ও দৃষ্টান্তের মূল্য কম হইয়া যাইতে পারে না।

যাঁহারা আপনাদিগকে প্র্যাক্টিক্যাল মনে করেন, কাজ উদ্ধার কিসে হয় কেবল তাহাই দেখিতে চান, মহাপুরুষদের উপদেশ শুনিতে চান না, তাঁহারা বলিবেন, "অহিংস চেষ্টার দ্বারা দেশ স্বাধীন হইয়াছে, তাহার দৃষ্টান্ত দেখান।" তাহার উত্তরে আমরা বলি, অতীত ইতিহাসে যাহা ঘটে নাই, তাহা ঘটিতে পারে না, কেন মনে করেন? দু-হাজার, এক হাজার, পাঁচশত, একশত, পঞ্চাশ বৎসর আগে যাহা ঘটে নাই, আজকাল সেরূপ অনেক ব্যাপার ঘটিতেছে। সুতরাং অহিংস চেষ্টা সফল হইবে না, অতীত ইতিহাস হইতে তাহা প্রমাণ হইতে পারে না। যাহা করিতে চাই, আত্মা তাহাতে সায় দেয় কি না দেখুন। শান্ত সমাহিত ধীরভাবে চিন্তার পর যাহা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিব, নিশ্চয়ই সেই পথে সিদ্ধিলাভ হইবে—যদিও তাহাতে বিলম্ব হইতে পারে।

যাঁহারা ঐতিহাসিক প্রমাণ চান, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, দু-এক জন, দু-দশ জন, বিশ-পঞ্চাশ জন বিদেশী বা স্বদেশী সরকারী কর্ম্মচারীকে বধ করিয়া কোনও পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা গিয়াছে, তাহার একটাও ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন কি? ইংরেজদের দৃষ্টান্তই ধরুন। তাহারা যত যুদ্ধ করিয়াছে, তাহাতে তাহাদের অনেক সেনানায়ক ও সাধারণ সৈনিক মারা পড়িয়াছে। কিন্তু কোন যুদ্ধেই মৃত লোকদের স্থান পূরণের জন্য ভয়ে অন্য কেহ অগ্রসর হইতেছে না, এরূপ শুনা যায় নাই। ইংরেজরা অন্য জাতিদের চেয়ে সাহসী, বলিতেছি না। যে-কোন জাতি যুদ্ধ করে, তাহাদেরই অনেক লোক মরে, আবার মৃত লোকদের জায়গায় অন্যেরা আসিয়া দাঁড়ায়। ইংরেজ কর্ম্মচারীদিগকে মারিয়া যাঁহারা ইংরেজ মহলে আতঙ্ক জন্মাইতে চান, তাঁহারা জানিবেন, ইংরেজ কর্ম্মচারীরা মনে করিবে

তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে আছে এবং তদনুরূপ সতর্কতা ও সাহস অবলম্বন করিবে। ইংরেজরা শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়াই এরূপ ধারণা করিতে পারিবে, তাহা নয়। সরকারী বাঙালী কয়েকজন লোকেরও ত এপর্য্যন্ত ভীতি-উৎপাদক (টেরারিষ্ট) দলের হাতে প্রাণ গিয়াছে। কিন্তু তাঁহাদের জায়গায় কাজ করিবার জন্য বাঙালীর অভাব হয় নাই। অতএব ভয় জন্মাইয়া কাজ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যদি কেহ বোমা বা গুলি ছোঁড়েন, তিনি জানিবেন তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। অবশ্য, ভীতি-উৎপাদক দলে এমন লোক থাকিতে পারেন, যাঁহারা ফলাফলের প্রতি দৃক্‌পাত করেন না, কেবল প্রতিহিংসার দ্বারাই চালিত হন। তাঁহাদিগকে শুনাইবার মত "কেজো" যুক্তি কিছু নাই। শাস্ত্রের ও মহাপুরুষদের বাণী আগেই শুনাইয়াছি। কেবল একটা কথা বলিবার আছে। বোমা ছুঁড়িলে প্রায় দু-একজন নিরপরাধ লোক হত বা আহত হয়, গুলিতেও তাহা হইতে পারে। এবং তাহা অপেক্ষাও শোচনীয় ব্যাপার এই যে, এইরূপ প্রত্যেক ঘটনার পর অপরাধী আবিষ্কার করিবার নিমিত্ত বিস্তর নিরপরাধ লোককে গ্রেপ্তার করা হয় এবং অনেককে প্রহার ও তদপেক্ষা দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। যাহারা বধের চেষ্টা করে, তাহারা স্বয়ং হত হইলে বা আত্মহত্যা করিলেও তাহাদের দলে কেহ ছিল কি না আবিষ্কার করিবার চেষ্টা হয়। সেই চেষ্টার ফলে বিস্তর নিরপরাধ লোক যন্ত্রণা ভোগ করে। এই সব কথার আধুনিক দৃষ্টান্ত পাঠকেরা সংবাদপত্রে পড়িয়াছেন।

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিংসাত্মক যুদ্ধ দ্বারা অনেক পরাধীন দেশ স্বাধীন হইয়াছে, এবং অনেক লোক হিংসাত্মক যুদ্ধের বিরোধী হইয়া থাকিলেও যুদ্ধ ও যুদ্ধের আয়োজন পরিত্যাগ এপর্য্যন্ত কোন মহাজাতি করে নাই। যেরূপ হিংসাত্মক যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষ স্বাধীন হইতে পারে, তাহার আয়োজন ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় হইতে পারে কি না, বলিবার মত জ্ঞান আমাদের নাই; কিন্তু ভীতি-উৎপাদক দলের সেরূপ আয়োজন নাই, তাহা সকলেই জানে।

হিংসাত্মক যুদ্ধ দ্বারা স্বাধীন হইবার মত অবস্থা ভারতবর্ষের হইলেও, অহিংস চেষ্টা অন্য কোন কোন কারণে বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। স্বাধীনতার জন্য হিংসা করিলেও হিংসা হিংসাই, তাহা মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ নহে। সুতরাং তাহাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়—বিশেষতঃ যখন অন্য পথ রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের জন্যও মানব-প্রকৃতির কোন অমূল্য সম্পদ্ বিসর্জ্জন দেওয়া উচিত নয়। হিংসাত্মক যুদ্ধ করিলে অপর পক্ষের প্রতিহিংসা-বৃত্তি উত্তেজিত হয়, সুতরাং তাহাকে প্রতিহত করিবার জন্য নিজেদের প্রতিহিংসা-বৃত্তিকেও প্রবলতর করিবার চেষ্টা করিতে হয়। কিন্তু প্রতিহিংসায় অন্যের চেয়ে বড় হওয়াটা আমরা ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করি না। অহিংস সাহসে, আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে শ্রেষ্ঠ হওয়াকেই আমরা ভারতবর্ষের আদর্শ মনে করি। বোম্বাইয়ের এস্প্লানেডের মাঠ হইতে অপ্রতিরোধী সত্যাগ্রহীদিগকে তাড়াইবার নিমিত্ত পুলিসের লাঠির "ন্যূনতম বল" প্রয়োগের বর্ণনা শিকাগো ডেলী নিউসে পড়িয়া আমেরিকার ক্রিশ্চিয়ান্ সেঞ্চুরী নামক বিখ্যাত কাগজ লিখিয়াছেন, 'পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রাচ্য আধ্যাত্মিক শৌর্য্যের গায়ে ঠেকিয়া খণ্ড খণ্ড হইয়া গিয়াছে।' আধ্যাত্মিক শৌর্য্যে আমরা সকল জাতির অগ্রণী হইতে চাই।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন হইতে হইলে তাহার বিরুদ্ধে বলিবার মত আর একটা কথা আছে। ভারতবর্ষের যে-সব প্রদেশ এবং প্রত্যেক প্রদেশের যে-সব শ্রেণীর লোক জ্ঞানে ধর্ম্মে কৃষ্টিতে (কালচ্যারে) সভ্যতায় অগ্রসর, তাহারা সৈন্যদল হইতে দীর্ঘকাল বাদ পড়ায় যুদ্ধের জ্ঞান তাহাদের নাই। অতএব এখন যুদ্ধের দ্বারা স্বাধীন হওয়া সম্ভব হইলে এমন সব লোকের প্রাধান্য স্বীকার করিতে হইবে, যাহারা মানব-প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ অনেক গুণে অগ্রণী হইবার যোগ্য নহে। তাহাদের প্রাধান্যে দেশ নৈতিক ও আধ্যাত্মিক হিসাবে পিছাইয়া পড়িবে ও প্রকৃত স্বাধীনতা হারাইবে। কিন্তু অহিংস উপায়ে স্বাধীন হইবার চেষ্টার নেতা গান্ধীজীর মত শ্রেষ্ঠ পুরুষ, এবং তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক অন্য অনেকে। তাহাতে দেশের নৈতিক আধ্যাত্মিক কোন ক্ষতি নাই। অথচ যুদ্ধের যে প্রধান প্রশংসা সাহসিকতা এবং যে-কোন মুহূর্ত্তে প্রাণ দিবার জন্য প্রস্তুত থাকা, তাহা সত্যাগ্রহে আছে। যুদ্ধে হিংসা ছাড়া প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা, চুরি, লুট, নারীর উপর অত্যাচার আছে; সত্যাগ্রহে তাহা নাই।

অতর্কিতে কাহাকেও মারিয়া ফেলিবার চেষ্টাকে যুদ্ধের সহিত, এমন কি খণ্ডযুদ্ধেরও সহিত, তুলনা করা আর এক কারণে চলে না। বড় রকমের যুদ্ধ এবং খণ্ডযুদ্ধ প্রায়ই আগে ঘোষিত হয়, এবং কথায় বা কাজে ঘোষিত হইবার পর উভয় পক্ষের নেতা কে, কেন যুদ্ধ হইতেছে, ইত্যাদি বিষয় জানিতে বাকী থাকে না। কিন্তু অতর্কিতে কাহাকেও মারিবার আগে, বা পরেও, যুদ্ধঘোষণা হয় না; কাহার নেতৃত্বে কি কারণে এই প্রকার বধ-চেষ্টা হইতেছে, তাহাও জানা পড়ে না।

সুতরাং বড় যুদ্ধে ও খণ্ডযুদ্ধে সাহসের পরিচয় যেরূপ পাওয়া যায় অতর্কিত বধ-চেষ্টায় সেরূপ পাওয়া যায় না।

—

ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্ত

গত মে ও জুন মাসে অনেকদিন ধরিয়া ঢাকায় অরাজকতা অপেক্ষা অধম যে অবস্থা ঘটিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সরকারী তদন্ত করিবার জন্য গবন্মেণ্ট দুজন সিবিলিয়ানকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দুজন সরকারী কর্ম্মচারীর দ্বারা তদন্তের ব্যবস্থায় সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হয় নাই—ঢাকার হিন্দুরা ত হয়ই নাই, তাহারাই সকলের চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এইরূপ তদন্তের ব্যবস্থা হওয়ায় অনেকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, ইহা চুণকামের বন্দোবস্ত। তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পড়িয়া মনে হয়, যাঁহারা রিপোর্টের দ্বারা ঢাকার অপকর্ম্মসকল চুণকাম করা হইবে অনুমান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনুমান সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। রিপোর্টটা বস্তুতঃ তাহা অপেক্ষাও অনিষ্টকর।

যে-সব ব্যাপার হিন্দু ও মুসলমানের ঝগড়া বলিয়া প্রকাশ পায়, তাহার সম্বন্ধে আমাদের কিছু লিখিতে ইচ্ছা হয় না। তাহার একটা কারণ, অনেক ঝগড়া স্বাভাবিক নয়, দুষ্টলোক কৃত্রিম উপায়ে ঝগড়া বাধাইয়া দেয়। কিরূপ উপায়ে বাধাইয়া দেয়, তাহা খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় না, বর্ত্তমান অবস্থায় হইতেও পারে না।

তদন্ত কমিটি রিপোর্টে নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, যে, সব সাক্ষ্য তাঁহারা শুনেন নাই বা পান নাই। বস্তুতঃ অনেক লোক, কমিটির দ্বারা নিরপেক্ষ তদন্ত হইবে না বলিয়া, সাক্ষ্য দেয় নাই। সাক্ষ্য লইবার প্রণালীও পক্ষপাতদুষ্ট ছিল। অথচ এইরূপ অসম্পূর্ণ ও অঙ্গহীন সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করিয়া কমিটি পুলিস ও শাসকদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়াছেন, শুধু নির্দ্দোষ বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই, তাহাদের গুণগান ও কৃতিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, মুসলমানদের দোষ ওকালতী দ্বারা যতটা সম্ভব ক্ষালন করিবার বা কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, এবং সমস্ত দোষ হিন্দুদের উপর—বিশেষতঃ যাহারা কংগ্রেসওয়ালা ও সত্যাগ্রহের সমর্থক তাহাদের উপর—আরোপ করিয়াছেন। যতগুলি হিন্দু বাড়ী আক্রমণের ও তাহাদের বন্দুক কাড়িয়া লইবার অভিযোগ কমিটির গোচর হইয়াছিল, সবগুলিই কমিটি উড়াইয়া দিয়াছেন। বস্তুতঃ কমিটির মতে হিন্দুরা সর্ব্বদোষাকর—তাহারা যে মোটের উপর মুসলমানদের চেয়ে ধনী ও তাহাদিগকে টাকা ধার দিতে সমর্থ, এটাও তাহাদের একটা দোষ।

আমরা যাহা লিখিতেছি, অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্টের প্রতিলিপি পড়িয়া তাহা লেখা। ঐ কাগজে রিপোর্টটি আদ্যোপান্ত বাহির হইয়াছে কি না, জানি না। মূল রিপোর্ট গবন্মেণ্ট আমাদিগকে দেন নাই। উহার সঙ্গে সমুদয় সাক্ষ্য প্রকাশিত হইয়াছে কি না, জানি না। কমিটি কি সাক্ষ্য পাইয়াছিলেন, তাহা না জানিলে রিপোর্ট সাক্ষ্যের অনুযায়ী হইয়াছে কিনা বলা যায় না। আমরা দু এক জনের লিখিত সাক্ষ্যের নকল পাইয়াছিলাম। তাঁহারা গবন্মেণ্টের কর্ম্মচারী। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় কাহারও কাহারও লিখিত জবানবন্দী হইতে অনেক বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। এই সকল সাক্ষ্যের সহিত রিপোর্টের মিল নাই।

রিপোর্টটা যে নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়, তাহা দেখান কঠিন নয়। কিন্তু তাহা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। আমরা খুব সুযুক্তিপূর্ণ কিছু লিখিলেও গবন্মেণ্টের সিদ্ধান্ত ও কাজে একচুলও তফাৎ হইবে না। বাকী থাকে সর্ব্বসাধারণ। হিন্দুদিগকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই, যে, রিপোর্টটা পক্ষপাতদুষ্ট ওকালতী। মুসলমানদের মধ্যেও কতক লোকের ধারণা সেইরূপ হইতে পারে। বাকী মুসলমানেরা বুঝিবে না, যে, তাহাদের কোন দোষ ছিল। এ অবস্থায় রিপোর্টটার সব দোষত্রুটি দেখাইবার চেষ্টা করা অনাবশ্যক ও বিড়ম্বনামাত্র। তাহা করিতে গেলে রিপোর্টটার চেয়েও লম্বা কিছু একটা লিখিতে হইত। অনর্থক এত সময় ও এতগুলা পৃষ্ঠা নষ্ট করিতে চাই না।

সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে কমিটি যে দুজনকে দোষ দিয়াছেন, তাঁহারা দুজনেই দেশী লোক। তাঁহারা কিন্তু পুলিশ ও শাসন বিভাগের বড় কর্ত্তা নহেন। বড় কর্ত্তারা ইংরেজ—সুতরাং তাঁহাদের দোষত্রুটি অবহেলা হইতেই পারে না। নিন্দিত দুজন দেশী কর্ম্মচারীর মধ্যে একজন পুলিশের ডেপুটী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট। তিনি নন্দী পরিবারকে ঢাকা হলে পৌঁছাইয়া দেন। এটা যে একটা দোষ, তাহা অবশ্য রিপোর্টে কমিটি লেখেন নাই। আমরা ঢাকার উপদ্রব সম্বন্ধে যে-সব চিঠি বাংলায় ও ইংরেজীতে ছাপিয়াছিলাম, তাহাতে ছিল, যে, একজন পুলিশ কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "আপনি কেন দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি চালান নাই?" তাহাতে তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, "আমার উপরওয়ালা উপস্থিত ছিলেন এবং গুলি চালান নাই; সুতরাং আমি কি প্রকারে গুলি চালাইতে পারি?" ইনি কোন্ পুলিস কর্ম্মচারী? একজন নাকি বলিয়াছিলেন, "আপনারা ত জানেন, কাহার প্ররোচনায় এই সব ব্যাপার ঘটিতেছে।"

কে এই কথা বলিয়াছিলেন? এইরূপ গুরুতর কথা বলার জন্য তিনি তিরস্কৃত বা দণ্ডিত হইয়াছেন কি?

রিপোর্টটা পড়িলে এই ধারণা হয়, যে, ভবিষ্যতেও কোন উপদ্রব হইলে লোকে—বিশেষতঃ হিন্দুরা—ধনপ্রাণ রক্ষার নিশ্চিত আশা করিতে পারে না। আমরা সম্ভবতঃ নিরপেক্ষ লোক নহি। সেইজন্য, রিপোর্টটার কোন নিরপেক্ষ পাঠকেরও এইরূপ ধারণা হয় কি না, জানিতে ইচ্ছা করি।

রিপোর্টের হিন্দু ও মুসলমান পাঠকদের প্রতি আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপেই বলিতেছি। হিন্দুদের বিরুদ্ধে অনেক কথা লেখা হইয়াছে। হিন্দুরা তাহা শান্তভাবে পাঠ করুন। তাঁহাদের যত দোষ দেখান হইয়াছে, তাহার মধ্যে যদি কিছু সত্য থাকে, তাহা সংশোধন করিতে হিন্দুরা চেষ্টা করুন। ভীরুতা, কপটতা ও ধর্ম্মদ্রোহিতার আশ্রয় না লইয়া মুসলমানদের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে চেষ্টা করুন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহাদের মনে মুসলমানদের উপর সন্দেহ ও বিদ্বেষ আছে, তাঁহাদের সন্দেহ ও বিদ্বেষ মহাভারতের উপদেশ অনুসারে হিতৈষণা দ্বারা দূর করিতে চেষ্টা করুন। এবং কে ছোট কে বড়, তাহা ভুলিয়া গিয়া একতা ও সাহসের দ্বারা সমুদয় আততায়ী হইতে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করুন। মনে করিবেন না, কেবল মুসলমানই বা মুসলমান মাত্রেই আততায়ী।

মুসলমানদের প্রতি আমাদের যাহা বক্তব্য তাহাও সংক্ষেপে বলিতেছি, যদিও সঙ্কোচের সহিত বলিতেছি। রিপোর্টে তাঁহাদের সব দোষ ক্ষালন করিবার বা কমাইবার চেষ্টা বরাবর করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে খুব কম দোষই দেওয়া হইয়াছে—প্রায় হয় নাই বলিলেই চলে। তাঁহারা বস্তুতঃ এতটা নির্দ্দোষ কি না, তাহা তাঁহারাই স্থির করুন। যদি কিছু দোষ হইয়াছে মনে করেন, তাহা হইলে তাহা সংশোধনের চেষ্টা করুন। দোষ হইয়া থাকিলে, ইংরেজরা নির্দ্দোষ বলিলেই দোষ-মুক্ত হওয়া যায় না। কাহারও দোষ হইয়া থাকিলে, ইংরেজরা যাহাই বলুক, দোষের ফল ফলিবেই। কমিটির রাজনৈতিকবুদ্ধিপ্রসূত রিপোর্টে কেহ দোষী বা নির্দ্দোষ হউন বা না-হউন তাহাতে কিছু আসে যায় না। বাস্তবিকই কেহ দোষী বা নির্দ্দোষ, তাহাই তাঁহার নিজের ভাবিয়া দেখা দরকার। হিন্দুদিগকে যেমন ও যেভাবে মুসলমানদের সহিত সদ্ভাবে বাস করিতে অনুরোধ করিয়াছি, মুসলমানদিগকেও সেইরূপ অনুরোধ করিতেছি। তাঁহারাও হিতৈষণার দ্বারা হিন্দুদের সন্দেহ ও বিদ্বেষ দূর করিতে চেষ্টা করুন। সমুদয় আততায়ীর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা তাঁহারাও করুন; মনে করিবেন না, কেবল হিন্দুই আততায়ী বা হিন্দুমাত্রেই আততায়ী।

কমিটি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন, ঢাকায় কয়েকদিন আইন ও শৃঙ্খলা ছিল না। কেন ছিল না? অশেষ প্রশংসিত প্যাক্সব্রিটানিকা বা ব্রিটানিকী শান্তি কোথায় গিয়াছিল? হিন্দু দোষী বা মুসলমান দোষী, অথবা উভয়েই দোষী হইলে কে বেশী দোষী, তাহা সকলের চেয়ে গুরুতর কথা নয়। সকলের চেয়ে গুরুতর কথা এই, যে, ঢাকা দীর্ঘকাল অরাজক ছিল। ইহার জন্য কে দায়ী? মেদিনীপুর জেলার অতি অজ্ঞাত কোন গ্রামে রাজনৈতিক কিছু একটা ঘটিলে স্বয়ং পুলিস ইন্স্পেকটার জেনার‍্যাল সদলবলে অতি শীঘ্র উপস্থিত হইতে পারেন, আর বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় এতদিন ধরিয়া লুটখুন গৃহদাহ মারপিট অবাধে চলিতে পারিল, যথেষ্ট পুলিস ছিল না বা শীঘ্রই বাহির হইতে আসিয়া পৌছিল না, ইহা কিরূপ কথা?

—

ব্রিটিশ রাজত্বে অবনত শ্রেণীর অবস্থা

ইংরেজরা যে-সকল কারণে ভারতবর্ষের প্রভুত্ব ছাড়িয়া দিতে চান না, তাহার মধ্যে একটা কারণ এই বলেন, যে, ভারতবর্ষে স্বরাজ স্থাপিত হইলে অবনত শ্রেণীর লোকদের বড় দুর্গতি হইবে, "উচ্চ" জাতির লোকেরা তাহাদের উপর উৎপীড়ন করিবে, তাঁহারাই (ইংরেজরাই) অবনত শ্রেণীর লোকদের বন্ধু ও সহায়। ইংরেজপক্ষের এই যুক্তির ও স্বরাজ্যবিরোধী অন্য সমুদয় যুক্তির উত্তর আমরা অনেকবার দিয়াছি। ভারতে ও বিদেশে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত অবনত শ্রেণীরই একজন প্রধান ব্যক্তি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা প্রণিধানযোগ্য। ইনি ডক্টর আম্বেদকর, পি-এইচ ডি। সম্প্রতি নাগপুরে সমগ্রভারতীয় অবনত শ্রেণী-সমূহের যে কন্‌ফারেন্স হইয়াছিল, ইনি তাহার সভাপতিত্ব করেন। ইনি সত্যাগ্রহ-বিরোধী। বোম্বাইয়ের ব্যবস্থাপক সভায় ইনি এক জন সভ্য ছিলেন, এবং সাইমন কমিশনের সহিত সহযোগিতা করিবার নিমিত্ত ঐসভার যে কমিটি নিযুক্ত হয়, ইনি তাহারও সভ্য ছিলেন। সুতরাং ইংরেজদের তাঁহার কথা উড়াইয়া দিবার যো নাই। তিনি সভাপতি-রূপে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে তিনি বলেন, ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের তুলনা পৃথিবীর কোথাও মিলে না এবং এই দারিদ্র্যের কারণ ব্রিটেনের ভারতশাসননীতি। তাঁহার মত সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সত্য কি না, তাহার বিচার এখানে করা চলিবে না; কেবল তাঁহার মতের

উল্লেখ করিতেছি। তিনি প্রমাণ সহকারে ইহাও বলেন, যে, ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বাড়িয়াই চলিতেছে। তাহার পর বলেন :—

"In this progressive impoverishment of the people, who are those that suffer most? I am sure that of the half of the agricultural population which is admitted not to know from one half years' end to another what it is to have a full meal, the Depressed Classes must form the largest part. Their abject poverty must make them ready victims of famines to which they must be paying the largest toll."

তাৎপর্য্য। "জনগণের এই ক্রমবর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যে কাহারা সকলের চেয়ে দুঃখ পায়? অর্দ্ধেক বৎসরের শেষ হইতে আরেক অর্দ্ধবৎসরের শেষ পর্য্যন্ত যাহারা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না বলিয়া সবাই স্বীকার করেন, চাষীদের সেই অর্দ্ধেকসংখ্যক লোকদের মধ্যে অধিকাংশ অবনত শ্রেণীর লোক, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। তাহাদের ঘোর দারিদ্র্যবশতঃ দুর্ভিক্ষে তাহারাই বেশী মরে।"

অবনত শ্রেণীর লোকদের মধ্যে শতকরা নিরক্ষরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী। অতএব ব্রিটিশ রাজত্বে ব্রিটিশ বন্ধুত্ব সত্ত্বেও তাহাদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হয় নাই। অন্যান্য দিকে কি কি সুবিধা হইয়াছে, দেখা যাক্। ডক্টর আম্বেদকর তাঁহার সমশ্রেণীস্থ লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

"Before the British you were in a loathsome condition due to your 'untouchability'. Has the British Government done anything to remove your 'untouchability'? Before the British you could not draw water from the village well. Has the British Government secured you the right to the well? Before the British you could not enter the temple. Can you enter now? Before the British you were denied entry to the Police force. Does the British Government admit you in the force? Before the British you were not allowed to serve in the military. Is that career open to you now? Gentlemen, to none of these questions you can give an affirmative answer. Those who have held so much power over the country for such a long time must have done some good. But there is certainly no fundamental alteration in your position. So far as you are concerned, the British Government has accepted the arrangements as it found them and has preserved them faithfully in the manner of the Chinese tailor who, when given an old coat as a pattern, produced with pride an exact replica, rents, patches and all. Your wrongs have remained as open sores and they have not been righted, and I say that the British Government, actuated with the best of motives and principles, will always remain powerless to effect any change so far as your particular grievances are concerned. Nobody can remove your grievances as well as you can, and you cannot remove them unless you get political power in your own hands. No share of this political power can come to you so long as the British Government remains where it is."

তাৎপর্য্য। "ইংরেজ আমলের আগে আপনাদের 'অস্পৃশ্যতা' বশতঃ আপনারা ঘৃণ্য অবস্থায় ছিলেন। ব্রিটিশ সরকার 'অস্পৃশ্যতা' দূর করিবার জন্য কিছু করিয়াছেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা গ্রামের কূপ হইতে জল তুলিতে পারিতেন না। সরকার আপনাদিগকে কূপের উপর অধিকার দিয়াছেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা দেবমন্দিরে ঢুকিতে পারিতেন না। এখন ঢুকিতে পারেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনাদিগকে পুলিস বাহিনীতে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হইত না। সরকার আপনাদিগকে ঢুকিতে দেন কি? ইংরেজ আমলের আগে আপনারা সৈন্যদলে সিপাহী হইতে পারিতেন না। ঐ বৃত্তির দ্বার কি আপনাদের জন্য এখন অবারিত? ভদ্রমহোদয়গণ, এই সব প্রশ্নের কোনটিরই উত্তরে আপনারা "হাঁ" বলিতে পারেন না। যাহারা এত দীর্ঘকাল ধরিয়া দেশের উপর ক্ষমতার অধিকারী হইয়া আছে, তাহারা অবশ্যই ভাল কিছু করিয়াছে। কিন্তু আপনাদের অবস্থাতে কোন ভিত্তিগত পরিবর্ত্তন হয় নাই। আপনাদের সম্পর্কে, ব্রিটিশ সরকার দেশে যেরূপ বন্দোবস্ত বিদ্যমান দেখিয়াছিলেন, তাহাই গ্রহণ করিয়া ঠিক তাহা রক্ষা করিয়াছেন— যেমন একজন চীনা দরজিকে নমুনা স্বরূপ একটা পুরাতন কোট দেওয়ায় সে অহঙ্কারের সহিত ছেদ, ছিদ্র, তালিসমেৎ ঠিক্ তাহারই মত একটি নূতন কোট তৈয়ার করিয়া দিয়াছিল। আপনাদের নানা দুঃখ ক্ষতের মত হইয়া আছে, তাহার কোন প্রতিকার হয় নাই; এবং আমি বলিতেছি, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট, শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও নীতির দ্বারা চালিত হইলেও, আপনাদের বিশেষ দুঃখ সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিতে চিরকালই শক্তিহীন থাকিবে। আপনারা আপনাদের দুঃখ যেমন দূর করিতে পারেন, এমন আর কেহই পারে না; এবং আপনাদের নিজের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা না আসিলে আপনারা তাহা দূর করিতে পারেন না। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যেখানে আছেন, যতদিন সেখানে থাকিবেন, ততদিন এই রাজনৈতিক ক্ষমতার কোন অংশ আপনারা পাইতে পারেন না। (অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রভুত্ব থাকিতে অবনত শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার যথাযোগ্য অংশ পাইবে না)।"

ডক্টর আম্বেদকরের মতে কেবলমাত্র স্বরাজ দ্বারাই অবনত শ্রেণীর অভাব অভিযোগ দুঃখ দূরীভূত হইতে পারে;

"It is only a Government which is of the people, for the people and by the people, in other words, it is only the Swaraj Government that will make this possible."

স্বরাজের আমলে তিনি ব্যবস্থাপকসভাসমূহে অবনত শ্রেণীর লোকদের জন্য যথেষ্টসংখ্যক নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি চান, এবং সমুদয় রাজকার্য্যে তাহাদের জন্য যথাযোগ্য অংশ চান। ইহার ব্যবস্থা করা অসাধ্য বা দুঃসাধ্য নহে।

—

ঢাকায় মুসলমানদের অবস্থা

ঢাকায় যখন উপদ্রব চলিতেছিল, তখন সেখান হইতে প্রাপ্ত চিঠি হইতে এবং খবরের কাগজে প্রকাশিত ম্যাজিষ্ট্রেটের বর্ণনা হইতে জানিয়াছিলাম,

যে, সেখানকার অনেক মুসলমানের বড় অন্নকষ্ট হইয়াছে। কারণ, হিন্দুরা মুসলমানদের গাড়ী চড়ে না, মুসলমান রাজমিস্ত্রী, দরজি, মজুর ডাকে না, মুসলমানের নিকট হইতে কোন জিনিষ কেনে না। এখন অবস্থা কিরূপ হইয়াছে, খবর পাই নাই। কিন্তু একটা প্রশ্ন আমাদের মনে উদিত হইয়াছে। তাহা এই—যে-যে শ্রেণীর মুসলমানদের অন্নকষ্ট হইয়াছে বলিয়া খবর পাইয়াছিলাম, সেই সেই শ্রেণীর অনেক লোক লুট করিয়াছিল। লুণ্ঠিত সম্পত্তির মূল্য অনেক লক্ষ টাকা। নগদ টাকা, নোট, অলঙ্কার অনেক লুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেই সব টাকাকড়ি ও অন্য লুণ্ঠিত সম্পত্তি কোথায় গেল, কে লইল, যে, লুটের কয়েকদিন পরেই বিস্তর মুসলমানের অন্নকষ্ট হইল? এরূপ অনুমান করিবার কোন কারণ আছে কি, যে, যাহাদের অন্নকষ্ট হইয়াছে তাহারা লুটে দাঙ্গা হাঙ্গামায় যোগ দেয় নাই? লুট যেই করিয়া থাকুক, বহুসংখ্যক মুসলমানের অন্নকষ্টে প্রমাণ হইতেছে, যে, লুটের দ্বারা একটা সমগ্র সমাজ সঙ্গতিপন্ন হয় না, যদিও বদনামটা সমগ্র সমাজের হয়। আরও এই একটা কথা প্রমাণিত হইতেছে, যে, লুট করিয়া যদি বা কেহ কেহ ধনী হইয়া থাকে, তাহারা গরীব জাতভাইদের কোন সাহায্য করিতেছে না। সর্ব্বশেষে জিজ্ঞাস্য এই, ঢাকার কংগ্রেসবিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী মুসলমানদের নেতা নবাব কেন গরীব জা'ত-ভাইদিগের দুঃখ দূর করেন না? তিনি ত খুব ধনী ও খুব প্রভাবশালী।

—

বঙ্গের ও অন্যান্য প্রদেশের সংবাদপত্র

শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী পিকেটার ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা প্রকাশ করায় কলিকাতার দুটি ইংরেজী দৈনিকের সম্পাদকদ্বয় দণ্ডিত হন। কিন্তু তাহা অপেক্ষা সত্যাগ্রহে উৎসাহজনক বক্তৃতা বঙ্গের বাহিরে অনেক কংগ্রেস-নেতা করিয়াছেন ও তাহা তথাকার খবরের কাগজে বাহির হইয়াছে, অথচ ঐ সব কাগজের কোন শাস্তি হয় নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে কারারুদ্ধ বিঠলভাই পটেল, বিধানচন্দ্র রায়, লালা দুনীচাঁদ এবং রাজা রাওয়ের স্বদেশবাসীদের প্রতি অনুরোধ বঙ্গের বাহিরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছে। কংগ্রেস কার্য্য-নির্ব্বাহক কমিটির সভ্যদের গ্রেপ্তারের আগে পর্য্যন্ত তাঁহারা যে-সব প্রতিজ্ঞা ধার্য্য করেন, তাহাও প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশকারী কাগজগুলির কোন শাস্তি হয় নাই। এগুলি কলিকাতার কোন কাগজে দেখি নাই। এই প্রভেদের কারণ কি? অর্ডিন্যান্সের ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ বঙ্গে যেভাবে হইতেছে, অন্য অনেক প্রদেশে সেভাবে হইতেছে না।

—

সংবাদ প্রকাশিত না হওয়ার অনিষ্টকারিতা

মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অনেক গ্রামে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ খবরের কাগজে বাহির হইতেছে না; যাহা বাহির হইতেছে, তাহাও যথাযথ ও সম্পূর্ণ বাহির হইতেছে না। এই কারণে নানা প্রকার ভীষণ গুজব রটিতেছে।

—

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলী

বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্যোগে অনেক যোগ্য লোক স্বাস্থ্যরক্ষা ও পল্লীসেবা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছেন। ম্যাজিক লণ্ঠন সহযোগে ছবি দেখাইয়া কোন কোন বক্তৃতা করা হইতেছে। হিতসাধনমণ্ডলীর এই আয়োজন প্রশংসনীয়। বক্তৃতা হইতে শিক্ষালাভ করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট শ্রোতা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাহাতে দেশের উপকার হইবে।

—

দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা

নানা প্রকারে দৈহিক বল চর্চ্চায় উৎসাহ দিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর হইল বঙ্গীয় ওলিম্পিক সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্প্রতি তাহার এক অধিবেশনে স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একটি ষ্টেডিয়াম বা দৌড়-চক্র ও ব্যায়ামশালা নির্ম্মাণের কথা বলেন। ইহার খুব প্রয়োজন আছে। শুধু কলিকাতায় নয়, বঙ্গের যত বেশী জায়গায় দৌড়চক্র ও ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হয়, ততই ভাল।

—

বাঙ্গলা ও আসামে অবনতশ্রেণীদের শিক্ষা

বাংলা ও আসামের অবনতশ্রেণীর লোকদের উন্নতিবিধায়িনী সমিতির ১৯২৯-৩০ সালের রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। সকল শিক্ষিত ব্যক্তিকে আমরা ইহা পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহা কলিকাতায় ৩নং বাদুড়বাগান রো ঠিকানায় পাওয়া যায়। আলোচ্য বৎসরে সমিতির অধীনে ৪৩৯টি বিদ্যালয় ছিল। তাহার মধ্যে

একটি উচ্চশ্রেণীর ইংরেজী স্কুল, ৯টি মধ্য-ইংরেজী স্কুল, ৩০৭টি বালকদের প্রাথমিক পাঠশালা, ১৩টি বালকদের নৈশ পাঠশালা, এবং ১০৯টি বালিকাদের প্রাথমিক পাঠশালা। মোট ছাত্রসংখ্যা১৩,৩৪৯, ছাত্রীসংখ্যা ৪,৩০৮; মোট ছাত্রছাত্রী ১৭,৬৫৭।

আলোচ্য বৎসরে সমিতি সরকারী সাহায্য পাইয়াছিলেন মোট ৯৩০০ টাকা, সাসেক্স ট্রাষ্টের ১৮৩৯৮৶৯ সমেত সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা পাইয়াছিলেন ২২৪৪২।৶৩, কিন্তু যে-সকল গ্রামে সমিতি কাজ করিতেছেন তথাকার লোকদের চাঁদা ও ছাত্রছাত্রীদের বেতনে উঠিয়াছিল ৪৩৬৫৮৷৹। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে, গ্রামের লোকদিগকে সমিতি কিরূপ স্বাবলম্বী করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ইহা ছাড়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড-সমূহ সাহায্য দিয়াছিলেন ২৪:৬৬৷৹।

বর্ত্তমান ১৯৩০-৩১ সালে সমিতির ব্যয় আনুমানিক ৯০১৩০ টাকা হইবে। আয় আনুমানিক ৮৪১০০ হইতে পারে, কমও হইতে পারে। সুতরাং ন্যূনকল্পে ছয় হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবার কথা। অতএব সকলকে বেশী বা অল্প, যিনি যত পারেন, দান করিতে অনুরোধ করিতেছি।

হিন্দু মুসলমান আদিমনিবাসী ৭৮টি জাতি বা শ্রেণীর বালকবালিকা সমিতির বিদ্যালয়সকলে শিক্ষা পায়। নমঃশূদ্র বালকবালিকাই সকলের চেয়ে বেশী—যথাক্রমে ৫৫৩৩ ও ২০৫৪। তাহার নীচে মুসলমান—যথাক্রমে ২২৩৭ ও ৫০৬। সমুদয় "উচ্চ" জাতির ছাত্রছাত্রীও অনেক আছে।

যদিও প্রায় তিন হাজার মুসলমান ছাত্রছাত্রী সমিতির বিদ্যালয়সকলে পড়ে, তথাপি চাঁদাদাতাদিগের মধ্যে একজন মুসলমান ভদ্রলোকেরও নাম দেখিতে পাইলাম না। সমিতির স্থায়ী ফণ্ডে যে ১৭০১১॥৹ উঠিয়াছে, কেবল তাহাতে লাহোরের স্যার মুহম্মদ শফী দশ টাকা দিয়াছেন দেখিলাম।

জেলে অল্পবয়স্কদের শিক্ষা

আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বালক কয়েদীদিগকে প্রাথমিক শিক্ষা দিবার বন্দোবস্তের ফল সন্তোষজনক হওয়ায় তাহা স্থায়ী করা হইবে, এবং আর চারিটি সেণ্ট্রাল জেলে ঐরূপ বন্দোবস্ত করা হইবে। ইহা ভাল। সমুদয় বালক কয়েদীর শিক্ষার ব্যবস্থা ত হওয়াই উচিত; সাবালক নিরক্ষর কয়েদীদেরও শিক্ষার বন্দোবস্ত করা কর্ত্তব্য। যে-সব শিক্ষিত লোক কারারুদ্ধ হন, তাহাদের মধ্যে বাছিয়া কাহাকেও কাহাকেও জেলে শিক্ষক নিযুক্ত করিলে এই কাজ অনায়াসে হইতে পারে।

—

মোতীলাল নেহরু দয়া চান না

৩রা সেপ্টেম্বরের বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান ডেলী মেল কাগজে দেখিলাম, পশ্চিমভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সভার কৌন্সিল ভারত-গবন্মে´ণ্টকে জানাইয়াছেন, যে, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরুর স্বাস্থ্যের বর্ত্তমান অবস্থায় তাঁহাকে জেলে আবদ্ধ রাখিলে তাঁহার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া তাঁহাকে অবিলম্বে খালাস দেওয়া বাঞ্ছনীয়। আমাদেরও মত তাই।

উক্ত সংবাদের নীচে ডেলী মেলের পক্ষ হইতে লেখা হইয়াছে, পণ্ডিত মোতীলাল নেহরু বড়লাটকে লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি দয়া করিয়া কিছু করিবার আবশ্যক নাই। এ কথা মোতীলালজীর উপযুক্ত। অনুগ্রহ লইতে কষ্ট ও অপমান বোধ হওয়া স্বাভাবিক—বিশেষতঃ তাহাদের অনুগ্রহ লইতে যাহারা বন্ধু নহে।

—

বোমা নিক্ষেপ সম্পর্কে বালিকা গ্রেপ্তার

কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেবের উপর বোমা নিক্ষেপ উপলক্ষ্যে অনেক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি অল্পবয়স্কা বালিকাও আছে।

কাহার বিরুদ্ধে কিরূপ প্রমাণ আছে, তাহা প্রকাশ পায় নাই, পাইতে পারেও না। কিন্তু যদি অল্পবয়সের বালিকাকেও সন্দেহ করিবার যথেষ্ট প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে দেশের অবস্থা খুব সঙ্গীন হইয়াছে, সামাজিক পরিবর্ত্তন খুব বেশী হইয়াছে এবং জনগণ ও গবর্মে´ণ্টের ধীরভাবে চিন্তা করিবার কারণ ঘটিয়াছে, বলিতে হইবে।

লবণের কথা

বিলাতী এক পাউণ্ড ওজনকে মোটামুটি আধ সেরের সমান ধরিলে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে পঞ্জাবে লোকে মাথাপিছু বৎসরে ৫ সের নুন খায়, বোম্বাইয়ে ৭ সের এবং মাদ্রাজে ৯।৹ সের। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যে, প্রধানতঃ নিরামিষভোজী ও তণ্ডুলভোজী মাদ্রাজীদের প্রধানতঃ গোধূমভোজী ও কতকটা আমিষভোজী

পঞ্জাবীদের চেয়ে বেশী মুন খাওয়া দরকার হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের যে প্রদেশের লোকেরা মাছমাংস যতই খাক না, ইউরোপের লোকদের মত এত বেশী মাংসাশী তাহারা নহে। অথচ সমগ্র ভারতে গড়ে মাথা-পিছু এক একজন লোক বৎসরে ৬ সের মুন খায়; কিন্তু ইংরেজরা মাথাপিছু ২০ সের, পোর্তুগীজরা ১৭৷৷০ সের খায়। ভারতবর্ষের লোকদের স্বাস্থ্যের জন্য ঐ ইউরোপীয়দের চেয়েও অনেক বেশী মুন খাওয়া দরকার, কিন্তু তাহারা খাইতে পায় না।

খরচ-খরচা বাদ লবণ শুল্ক হইতে ভারত-গবন্মেণ্ট মোট সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা পান। তাহা আদায় করিতে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকা খরচ হয়। ৫০ কোটি টাকা বাণিজ্যশুল্ক আদায় করিতে মোট ৭৫ লক্ষ টাকা মাত্র খরচ হয়। ইহা হইতে বুঝা যায়, লবণশুল্ক আদায় করা কিরূপ ব্যয়সাধ্য।

—

ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট কখন পাইব ?

২৭শে আগষ্ট ১০ই ভাদ্রের অমৃতবাজার পত্রিকায় ঢাকা উপদ্রবের সরকারী তদন্তের রিপোর্ট বাহির হয়। ঐ তারিখে বা উহার কাছাকাছি তারিখে "য্যাডভ্যান্সে" রিপোর্টের উপর প্রবন্ধ বাহির হয়। ৪ঠা সেপ্টেম্বর ১৮ই ভাদ্রের একটি বাংলা সাপ্তাহিকে আমরা রিপোর্টের সারসঙ্কলন দেখিতে পাইলাম। এই সকল কাগজের সম্পাদকেরা সম্ভবতঃ রিপোর্টটি বিনামূল্যে পাইয়াছেন। আমরা তাহা পাই নাই। ৫ই সেপ্টেম্বর ১৯শে ভাদ্র আমরা বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট বুক ডিপোতে ঐ রিপোর্ট একখানি কিনিতে পাঠাই। পাওয়া যায় নাই। ঐ সরকারী দোকানের কে একজন—তাঁহার স্বাক্ষর পড়িতে পারা যায় না—লাল কালীতে লিখিয়া দিয়াছেন, "Not yet ready for issue. 5-9-30." কতকগুলি সম্পাদক শীঘ্র বিনামূল্যে সরকারী রিপোর্ট পাইবেন, অন্য সম্পাদকেরা বিলম্বে পয়সা দিয়াও তাহা পাইবেন না, এ রীতি ভাল নয়।

—

বোম্বাই প্রদেশে রাজস্ব হ্রাস

বোম্বাই প্রদেশের সংবাদপ্রকাশ বিভাগের ডিরেক্টর তথাকার খবরের কাগজগুলিকে ঐ প্রদেশের রাজস্ব হ্রাস সম্বন্ধে কতকগুলি সংবাদ জানাইয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায়, এপর্য্যন্ত রাজস্ব এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা কমিয়াছে। ইহা প্রধানতঃ সত্যাগ্রহ প্রচেষ্টার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। আবগারী রাজস্বই সকলের চেয়ে বেশী কমিয়াছে—ষাট লক্ষ কমিয়াছে। অরণ্যের রাজস্ব ১৫ লক্ষ এবং ভূমির রাজস্ব ১৫ লক্ষ কমিয়াছে; ষ্ট্যাম্প হইতে রাজস্ব হ্রাস ১১ লক্ষ। ঘোড়দৌড়ে বাজীরাখা হইতে ১২ লক্ষ টাকা আয় হইবে, ধরা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে আন্দাজী ৩ লাখ টাকা কম আয় হইবে।

বোম্বাইয়ে এপর্য্যন্ত সওয়া কোটি টাকা রাজস্ব কমিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশেও কমিয়াছে, কিন্তু কত তাহা এখনও জানা যায় নাই। সমগ্র ভারতে ছয় সাত কোটি রাজস্ব কমিবে, অনুমান করিলে আন্দাজটা বোধ করি বেশী হইবে না। অন্য দিকে পুলিস ও জেলের জন্য অতিরিক্ত খরচও সমগ্র ভারতে কয়েক কোটির কম হইবে না।

মহাত্মাজী যখন লবণ-আইন ভঙ্গ করিয়া সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিবেন স্থির করেন, তখন গবন্মেণ্ট যদি জনসাধারণের দুঃখের কারণের বিদ্যমানতা স্বীকারের চিহ্নস্বরূপ মহাত্মাজীর অনুরোধ অনুসারে মুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিতেন, তাহা হইলে রাজস্বের ক্ষতি সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা হইত। কিন্তু এখন তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইতেছে। অধিকন্তু পুলিস ও জেলের ব্যয় খুব বাড়িয়াছে। শান্তি ও অশান্তির দিকটাও ভাবিবার বিষয়। মুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিয়া মহাত্মাজীর সহিত রফা ও সন্ধির কথা চালাইলেই সত্যাগ্রহ বন্ধ হইতে পারিত কারণ মহাত্মাজী অবুঝ জেদী লোক নহেন। সত্যাগ্রহ বন্ধ হইলে এত লোক প্রহৃত, হতাহত, কারারুদ্ধ হইত না, দেশে এত হুলস্থুল অশান্তি হইত না। কিন্তু তখন যে সরকার বাহাদুর মুনের ট্যাক্স তুলিয়া দিতে রাজী হন নাই, তাহার কারণ তাঁহারা মহাত্মাজীর প্রভাবের এবং লোকের অসন্তোষের দুঃখসহিষ্ণুতার ও সাহসের পরিমাণ আন্দাজ করিতে পারেন নাই, তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছিলেন; আপনাদের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহাদের ধারণা অতিরিক্ত রকম উচ্চ ছিল এবং এখনও আছে

অনেকে বলিতে পারেন, প্রবলপরাক্রান্ত গবন্মেণ্ট কেমন করিয়া একজন প্রজার সঙ্গে রফা ও সন্ধির কথা চালাইবেন? সত্য। কিন্তু রফা সন্ধি ও শান্তির কথার আরম্ভ যিনিই করুন, কংগ্রেসনেতারা করেন নাই, এবং কথাবার্ত্তা ব্রিটেনের মন্ত্রীমণ্ডল ও বড়লাটের সম্মতিক্রমেই চলিতেছে। সুতরাং এখন এরূপ কথাবার্ত্তা চালানতে যদি গবন্মেণ্টের লাঘব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে

আগে তাহা চালাইলেও লাঘব হইত না। গবর্মেণ্ট বা কংগ্রেস, কোন পক্ষেরই আত্মাভিমানের আতিশয্য বাঞ্ছনীয় নহে। [১৯শে ভাদ্র, ৫ই সেপ্টেম্বর লিখিত।]

—

বঙ্গে গ্রাম্য প্রাথমিক শিক্ষা আইন

ভাদ্রের প্রবাসীতে দেখান হইয়াছে, শিক্ষামন্ত্রী ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের যত বালকের জন্য পাঠশালা খুলিবেন বলিয়াছেন, বঙ্গে তাহা অপেক্ষা ঐ বয়সের অনেক বেশী বালক আছে; যত বালিকার জন্য খুলিবেন বলিয়াছেন, তাহার সাড়ে তিন গুণেরও অধিক ঐ বয়সের বালিকা আছে। ঐ বয়সের যত বালক ও বালিকা এখন শিক্ষা পায়, তাহার উপর আরও ২৭ লাখ ও ১০ লাখকে শিক্ষা দিবেন, তাঁহার রোটারী ক্লাবের বক্তৃতার এরূপ অর্থও হইতে পারে না। কারণ এখন ১৯,৫৯,০৯৮ জন বালক প্রাথমিক পাঠশালাসমূহে শিক্ষা পায়। এই কুড়ি লাখের সহিত সাতাশ লাখ যোগ করিলে ৪৭ লাখ হয়। কিন্তু বঙ্গে ৬ হইতে ১১ বৎসর বয়সের বালক মোটে ৩৮,০১,৫৪২ জন আছে। মোট যত বালক আছে, তার চেয়ে ৯ লাখ বেশী বালকের শিক্ষার ব্যবস্থা অবশ্য শিক্ষামন্ত্রী করিতেছেন না।

এখন দেখা গেল, যে, যদিও সরকার বঙ্গের সকল জায়গা হইতে শিক্ষা-ট্যাক্স আদায় করিবেন, তথাপি সব জায়গায় নির্দ্দিষ্ট বয়সের সব বালকবালিকার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন না, সমুদয় বালকবালিকার কিয়দংশেরই জন্য পাঠশালা খুলিতে পারিবেন। তাহার মানে, কোন কোন জেলার কোন কোন স্থানে যথেষ্ট পাঠশালা খোলা হইবে না; অথচ সব জেলার সব জায়গা হইতেই ট্যাক্স আদায় হইবে। যাহারা ট্যাক্স দিবে অথচ যাহাদের বালকবালিকারা শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিবে, কি নীতি বা নিয়ম অনুসারে কোন্ কোন্ জেলার কোন্ কোন্ স্থান হইতে এইরূপ সব লোক বাছিয়া বাছিয়া বাহির করা হইবে?

বঙ্গের এই প্রাথমিক শিক্ষা আইনটির বিরোধিতা আমরা প্রথম হইতে করিয়া আসিতেছি, অন্য কোন কোন সম্পাদকও করিতেছেন। কিন্তু কেবল বাঙ্গালী সম্পাদকেরাই ইহার বিরোধী নহেন। গোখলে কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত দারিদ্র্যব্রতী ভারতভৃত্য সমিতির (দি সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটীর) মুখপত্র সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া পুণা হইতে প্রকাশিত হয়। ভারতভৃত্য সমিতির সভ্যেরা উহার নিয়ম অনুসারে কোন সাম্প্রদায়িক সভা সমিতির সভ্য হন না, এবং সাম্প্রদায়িকতার তাঁহারা বিরোধী। এই কাগজ বঙ্গের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ও জমিদারী প্রথার বিরোধী। এই কাগজে বঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষা আইনটার সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে বলা হইয়াছে:—

It so happens that the great bulk of the landlords are Hindus and the tenants Muslims. The collection of the tenants' share by the landlords, who are already none too popular with the tenants, will make them more unpopular still. The Muslim Education Minister toured East Bengal to seek popular support for his Bill. East Bengal has a majority of Muslims, who seemed to have been led to read into the Bill a communal triumph for Muslims: getting the Hindus to pay for the benefit of the Muslims.

তাৎপর্য্য। "বঙ্গের অধিকাংশ জমিদার হিন্দু, অধিকাংশ রায়ৎ মুসলমান। জমিদারদের দ্বারা রায়তদের নিকট হইতে শিক্ষা-ট্যাক্সের তাহাদের অংশের আদায়ের ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই রায়তদের অপ্রিয় জমিদারশ্রেণীকে তাহাদের আরও অপ্রিয় করিবে। মুসলমান শিক্ষামন্ত্রী তাঁহার বিলের সমর্থন সংগ্রহার্থ পূর্ব্ববঙ্গে সফর করেন। পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশী। বিলটি মুসলমানদের পক্ষে সাম্প্রদায়িক জয়, তাহার মধ্যে এইরূপ একটা মানে তাহাদের মাথায় ঢুকান হইয়া থাকিবে—অর্থাৎ মুসলমানদের সুবিধার জন্য হিন্দুদিগকে টাকা দিতে হইবে।"

মুসলমান রায়তদের কাছে যে-সব হিন্দু জমিদার খাজনা পান, তাহাদের শিক্ষার জন্য তাঁহারা কতকটা টাকা দিবেন, ইহাতে আমরা কিছু অন্যায় দেখি না। কিন্তু, শিক্ষামন্ত্রী যাহাই বলুন, ট্যাক্স দেওয়াটা কাহারও পক্ষে প্রীতিকর নহে। সুতরাং জমিদারেরা নিজেদের ও প্রজাদের অংশ দিতে বাধ্য হইবেন, কিন্তু প্রজাদের অংশ আদায় করিতে তাঁহাদিগকে অপ্রিয় হইতে ও বেগ পাইতে হইবে। হয় ত রায়তদের অংশ তাহাদের নিকট হইতে অনেক স্থলে আদায় হইবে না। কিন্তু তাহাতে গবর্মেণ্টের কোন ক্ষতি হইবে না; কারণ জমিদারদিগকে সবটাই দিতে হইবে। অধিকাংশ জমিদার হিন্দু ও অধিকাংশ রায়ৎ মুসলমান হওয়ায় এই শিক্ষা-ট্যাক্স হিন্দু-মুসলমানের বিবাদের আর একটা স্থায়ী কারণ হইবে। এই জন্য প্রজার অংশ আদায়ের ভার ব্রিটিশ সরকারের লওয়া উচিত ছিল। ইহা যে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়ার একটা নূতন কারণ হইবে, তাহা বুঝিবার মত বুদ্ধি সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ এবং মুসলমান শিক্ষামন্ত্রী ও অন্য অনেক মুসলমান সভ্যের আছে। অথচ তাঁহারা রায়তদের অংশ আদায়ের ভার গবর্মেণ্টের উপর অর্পণ করিয়া

আগে হইতেই সহজে বিবাদ নিবারণের ব্যবস্থাটুকু করিলেন না। ইহাতে আমরা বিস্মিত হই নাই। কিন্তু আমাদের উল্লিখিত উক্তরূপ ব্যবস্থা করিলে বিলের সমর্থক ইংরেজ ও মুসলমানদের সদাশয়তায় প্রীত হইতাম।

সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া পত্রিকা আরও বলিতেছেন :—

"There seems to be a feeling that the action of the Muslim Minister was more in the nature of an electioneering stunt to secure him a personal victory at the polls."

তাৎপর্য্য। "এরূপ একটা ধারণা জন্মিয়াছে বোধ হইতেছে, যে, মুসলমান শিক্ষামন্ত্রীর কাজটা কতকটা আগামী নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে জিতিবার একটা চা'ল।"

সর্ব্বশেষে ঐ পত্রিকা বলিতেছেন :—

"The principle and the procedure of the Bill are both open to grave objection. Primary education should be financed from the general revenues to which all classes contribute according to their ability and not by means of a cess on land alone. It is equally objectionable to make the landlords responsible for the collection of the cess from their tenants. It was impolitic to attempt to rush the Bill through the Council without referring it to a select committee. It was equally impolitic to ignore the views of the opposition of the Hindu members and adopt the methods of the steam roller particularly on the question of the spread of primary education on which there can be no difference in principle."

তাৎপর্য্য। "এই বিলের মূলনীতি এবং ইহাকে আইনে পরিণত করিবার পদ্ধতি উভয়ই গুরুতর আপত্তিজনক। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সকল শ্রেণীর প্রদত্ত সাধারণ রাজস্ব হইতে হওয়া উচিত, কেবল জমীর উপর ধার্য্য কর দ্বারা নহে। জমিদারদিগকে তাহাদের প্রজাদের নিকট হইতে এই কর আদায়ের জন্য দায়ী করাও সমান আপত্তিকর। সিলেক্ট কমিটিকে বিবেচনার জন্য না দিয়া ইহা কৌন্সিল দ্বারা তাড়াতাড়ি পাস করান রাজনীতির অননুমোদিত হইয়াছে। প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে মূলনীতিগত কোন মতভেদ থাকিতে পারে না। অতএব বিশেষ করিয়া এরূপ একটি বিষয়ে হিন্দুসভ্যদের মতের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ মত দলিত করিয়া অগ্রসর হওয়া সমান অসমীচীন হইয়াছে।"

জমিদার ও রায়ৎ ছাড়া, পল্লীগ্রাম অঞ্চলের কারিগর ব্যবসাদারদের উপরও শিক্ষাকর বসিবে বটে; কিন্তু বেশী টাকা আয়ের কলকারখানা ও ব্যবসা এবং বড় বড় ব্যারিষ্টার উকীল ডাক্তার পল্লীগ্রামে নাই। সুতরাং জমিদার ছাড়া অন্য ধনী লোকেরা এই কর দিতে বাধ্য হইবে না। যাহা হউক, আইনটা ত পাস হইয়া গেল। গবর্ন্মেণ্ট নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া দিলেন, এবং যে টাকাটা অন্যে দিবে এবং অন্যে আদায় করিয়াও দিবে, তাহা স্বেচ্ছায় খরচ করিবার সুখটা ভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু এ উপায়ে দেশে সুশিক্ষার বিস্তার ও সন্তোষ বৃদ্ধি হইবে না নিশ্চিত।

—

বিলাতী সংবাদপত্র ও ঢাকার উপদ্রব

রবীন্দ্রনাথ বিদেশে থাকিয়া লক্ষ্য করিয়াছেন এবং বিলাতী কাগজে লিখিয়াছেনও, যে, বিলাতের সব সংবাদপত্র ঢাকার দীর্ঘকালব্যাপী ভীষণ উপদ্রব ও অরাজকতা সম্বন্ধে একেবারে চুপ। ইহা বিন্দুমাত্রও আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। জালিয়ানওয়ালাবাগের ব্যাপারের সংবাদ ভারতসচিব মণ্টেগু আটমাস পরে পাইয়াছিলেন। ঢাকার খবরও হয় ত যথাসময়ে বিলাতে পৌছে নাই। খবর পৌছিয়া থাকিলেও, ঢাকায় অরাজকতার দ্বারা ব্রিটানিকী শান্তির মহিমা এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শান্তিরক্ষার ক্ষমতা প্রমাণিত না হওয়ায়, বিলাতী কাগজগুলারি 'পক্ষে' সে বিষয়ে বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করাই ভাল বোধ হইয়া থাকিতে পারে। ঢাকায় যে অরাজকতা হইয়াছিল, তাহা চট্টগ্রামের দৌরাত্ম্যের মত ব্রিটেনের সিংহাসন টলাইবার জন্য হয় নাই, তদ্দ্বারা ব্রিটিশ রাজত্বের ভিত্তি কাঁচা হইয়া যায় নাই; তাহা কেবল হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া মাত্র। সুতরাং এদিক্ দিয়াও, বিলাতী কাগজওয়ালাদের মাথা-ব্যথার কোন কারণ হয় নাই। তাহারা হয়ত বরং ভ্রমবশতঃ ভাবিয়া থাকিবে ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি আরও কিছুদিনের জন্য পাকা হইল।

—

ধানের চাষের উন্নতি

কৃষিবিষয়ক গবেষণার সাম্রাজ্যিক কৌন্সিলের অধ্যক্ষ সমিতি ("The Governing Body of the Imperial Council of Agricultural Research") মোট ২০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের বাইশ রকম কার্য্যপদ্ধতি মঞ্জুর করিয়াছেন। তাহার মধ্যে আসাম বাংলা বিহার ও ব্রহ্মদেশে ধানের চাষের উন্নতির গবেষণার জন্য বার লাখ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। গবেষণা ভাল জিনিষ। কিন্তু সেগুলা কাজে লাগাইতে হইলে চাষীদের শিক্ষার দরকার। সকলের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের জন্য গবর্ন্মেণ্ট সাধারণ রাজস্ব ব্যয় করিবেন না, অথচ কৃষিসম্বন্ধে গবেষণা চলিবে, এ নীতি ভাল নয়। লিন্‌লিথ্‌গো কমিশন নামে

পরিচিত রাজকীয় কৃষিকমিশন গ্রামসমূহে বালকবালিকা ও প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার দ্বারা একেবারে তাহাদের মনের গতি বদলাইয়া দিতে বলিয়াছিলেন, তাহাদিগকে প্রগতি ও উন্নতিতে বিশ্বাসবান্ করিতে বলিয়াছিলেন। তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে তাহারা গবেষণালব্ধ সমুদয় জ্ঞান কাজে লাগাইতে পারিত। কিন্তু সরকার বাহাদুর এই অনাড়ম্বর অথচ একান্ত প্রয়োজনীয় কাজটিতে মন না দিয়া মোটা বেতনের কর্ম্মচারীবহুল আড়ম্বরপূর্ণ ব্যবস্থা আগে করিয়াছেন এবং একগজ লম্বা নামওয়ালা "দি গভর্ণিং বডি অব্ দি ইম্পীরিয়্যাল কৌন্সিল অব্ এগ্রিকাল্চ্যার‍্যাল রিসার্চ" প্রভৃতি খাড়া করিয়াছেন। ইংরেজীতে ইহাকে বলে অশ্বের সম্মুখে শকট স্থাপন।

—

বিদেশে বাঙ্গালীর কলঙ্ক

আমরা সংবাদপত্রে পড়িয়া লজ্জিত ও মর্ম্মাহত হইলাম যে, রেঙ্গুনে চারিজন বাঙালী যুবক তথাকার বাঙালীদের বিদ্যালয়ের কেরানী ও দারোয়ানের হাত হইতে গুলি করিবার ভয় দেখাইয়া তিন হাজার টাকা ছিনাইয়া লইয়া মোটর যোগে পলাইতেছিল। কেরানী ও দারোয়ান ঐ টাকা ব্যাঙ্ক হইতে লইয়া আসিতেছিল। যুবকেরা ধরা পড়িয়াছে।

—

কিশোরগঞ্জ সম্বন্ধে পুস্তিকা

ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জে হিন্দুর দুর্গতি বর্ণনা করিয়া হিন্দুমিশন দুই খণ্ড পুস্তিকা বাহির করিয়াছেন। ঐ দুই খণ্ডে সমুদয় গ্রামের বৃত্তান্ত কুলায় নাই বলিয়া আরও একখণ্ড পুস্তিকা বাহির হইবে। প্রথম খণ্ডটির পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬৪, দ্বিতীয়টির ৮০। মূল্য সস্তা, দু আনা করিয়া। ডাকমাশুল আলাদা। বহি দুখানি সব বাঙালীর ও গবন্মে'ণ্টের পড়া উচিত। পাইবার ঠিকানা, ঢাকা, হিন্দুমিশন, ১৯নং জয়চন্দ্র ঘোষ লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

দ্বিতীয় খণ্ডে হিন্দুমিশন যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতে সামান্য কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি। কিন্তু সমস্তটাই পঠনীয়।

"এ কথা সত্য যে ২।১ জায়গায় কোন কোন হৃদয়বান মহানুভব মুসলমান স্বধর্ম্মাবলম্বীর এই ঘৃণিত কার্য্য হইতে দূরে রহিয়াছেন এবং স্বেচ্ছায় বিপদের সম্মুখীন হইয়াও কোন কোন হিন্দু গৃহস্থের মানসম্ভ্রম রক্ষা করিয়াছেন। একটা সমাজের সকলেই যে একই সময়ে মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত হইতে পারে না ইহা তাহারই পরিচয়। তাঁহাদিগের মহত্ত্বের জন্য তাঁহারা সমগ্র হিন্দুসমাজের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন।"

নিম্নমুদ্রিত কথাগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

"এই বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী শতাংশের একাংশও আমরা জানিতে পারি নাই। যাহা জানিয়াছি তাহারও মাত্র দশভাগের একভাগ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি। একদিকে দুরন্ত আইনের চাপ, অপরদিকে বর্ত্তমান রাজনৈতিক অবস্থা, এই উভয় কারণেই অনেক কথা কাট-ছাঁট দিয়া প্রকাশ করিতে হইয়াছে।

"যে অঞ্চলে লুণ্ঠন চলিল, সে অঞ্চলে হিন্দু মুসলমান উভয়েই বুঝিল রাজা ও রাজশাসনের অবসান হইয়াছে। হিন্দুগণ বুঝিল, তাহাদের মানমর্য্যাদা, ধনদৌলত, এমন কি ধর্ম্ম ও প্রাণ পর্য্যন্ত মুসলমানের কৃপার উপর রহিয়াছে। মুসলমানগণ বুঝিল তাহাদের অপরাজিত শক্তি ও সামর্থ্য দ্বারা তাহারা অনায়াসে হিন্দুর অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলীন করিয়া দিতে পারে। শুধু তাই নহে; হিন্দু বুঝিল, তাহার উচ্চতর শিক্ষা, তীক্ষ্ণতর বুদ্ধি, উন্নততর প্রতিভা, অতুল ধনসম্পদ ইহার কিছুই তাহাকে রক্ষা করিতে পারে না, যদি মানসিক সাহস ও শারীরিক শক্তি দ্বারা দস্যুকে বিতাড়িত করিবার উপযুক্ত ক্ষমতার অভাব হয়। অন্যদিকে মুসলমান বুঝিল, যদি শরীরে বল ও বুকে সাহস থাকে, তবে বিদ্যাবুদ্ধি ধনসম্পদ সবই পায়ে লুটাইয়া পড়ে। হিন্দু বুঝিল, সংখ্যায় অল্প হইলে তাহার ধর্ম্ম রক্ষা হয় না, তাহার সম্পদ রক্ষা হয় না। মুসলমান বুঝিল, সংখ্যায় অধিক হইলে তাহাদের শক্তিও অধিক হয়, সে লুণ্ঠন করিতে পারে, হত্যা করিতে পারে, যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে।"

এখানে আমরা এইটুকু মাত্র বলিতে চাই, ঢাকা শহরে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশী হইলেও লুণ্ঠিত হইয়াছে এবং পঞ্জাবে শিখরা সংখ্যায় ন্যূন হইলেও রাজত্ব করিয়াছে এবং এখনও লুণ্ঠিত হয় না।

নিম্নলিখিত কথাগুলি গবন্মে'ণ্টের পঠিতব্য।

"গবন্মে'ণ্ট কি বুঝিলেন? গবন্মে'ণ্ট বুঝিলেন, গুণ্ডার দল যখন লুণ্ঠনের আস্বাদ পায়, তখন হিন্দুবাড়ী লুট করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; থানা, ডাকঘর প্রভৃতিও লুট করিতে অগ্রসর হয়; সার্কেল অফিসার ও মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটকেও আক্রমণ করে, পুলিস সাহেবকেও যুদ্ধে আহ্বান করে, গুরখা সৈনিককেও আঘাত করিতে ভীত হয় না। আরও বুঝিলেন, সরকারের চৌকিদার দফাদারও লুণ্ঠনে যোগ দিতে পারে।"

—

"কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার কারণ"

এই শিরোনাম দিয়া ৪ঠা ভাদ্রের "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন,

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্নের উত্তরে চীফ সেক্রেটারী মিঃ হপকিন্‌স্ বলেন,—"কিশোরগঞ্জের দাঙ্গার কারণ লুণ্ঠনকারীদের অর্থাভাব।

ক্ষুধার তাড়নাতেই তাহারা এরূপ করিয়াছে। কতকগুলি লোক এই লুণ্ঠনকারীদিগকে প্ররোচিত করিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল গবর্ণমেণ্ট লুণ্ঠনকারীদের সাহায্য করে না, তখন তাহারা নিবৃত্ত হইল।"

অধিবাসী হিন্দুদিগের পুস্তিকার মত ভিন্ন। তাহাতে লিখিত আছে, "মূল উদ্দেশ্য ভবিষ্যৎ দেনা হইতে মুক্তি লাভ, বর্ত্তমান আর্থিক অনটন দূরীকরণ নহে।" এই মতের সমর্থক প্রমাণও পুস্তিকাতে আছে।

"প্ররোচনা" দীর্ঘকাল ধরিয়া বিস্তৃত ভূখণ্ডে চলিল, অথচ সরকার তাহা জানিতে পারিলেন না, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হইল?

৪ঠা ভাদ্রের "সঞ্জীবনীতে" আরও আছে :—

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী জানিতে চাহেন, কেন এই সকল দাঙ্গাকারীকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই। এ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলেন যে, 'যদি সকল মুসলমান দাঙ্গাকারীকেই গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হইত, তবে মুসলমানদের অভাবে জমি চাষ করা হইত না, দেশে ঘোর দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত।" এই উক্তি হইতে বুঝা যায় যে একদল লোকের এই ভরসা করিবার অবকাশ হইয়াছিল যে, দাঙ্গাকারীদের গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিতে পারেন। সকল দাঙ্গাকারীদের গ্রেপ্তার না করার কারণ সম্বন্ধে ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, সে যুক্তি অবলম্বন করিলে আইন অমান্যকারী অনেক লোককে মুক্তি দিবার প্রয়োজন হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইহার উত্তরে কি বলিবেন?

ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের কথিত কারণ যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, লুণ্ঠনকারীরা দলে যত পুরু হইবে, গবর্ন্মেণ্ট ততই তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিতে অসম্মত হইবেন, সুতরাং দলে পুরু হইলেই অবাধে লুণ্ঠন করা যাইবে, আইনটা সংখ্যান্যূন 'ধর্ম্মভীরু' লোকদের জন্য।

অনেক সত্যাগ্রহীকে সরকারী কর্ম্মচারীরা গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি দ্বারা শাস্তি দেন। লুণ্ঠনকারীদের জন্য অন্ততঃ সেই ব্যবস্থা কেন হইল না? আইনের জারি-জুরি কি কেবল তাহাদের জন্য যাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কিম্বা লাঠির উত্তরে, লাঠি না ধরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? এই প্রশ্ন ময়মনসিংহের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্য।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিকার

ঢাকার হিন্দু-মিশন এই নামের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছেন। মূল্য দুই পয়সা, ডাকমাশুল দুই পয়সা। ইহাও সকলের পঠনীয়। ইহাতে পৃথিবীর হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসীদের যে হিসাব দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধদিগকে না ধরিলেও—না-ধরাই ভাল—দেখা যাইবে, মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কিন্তু শুধু সংখ্যায় কি হয়, যদি সামাজিক সাম্য ও একপ্রাণতা না থাকে?

—

নারীহরণের প্রতিকার

যশোহর জেলার মাগুরা মহকুমার একটি গ্রামে একটি সধবা স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচারের বর্ণনা ১৮ই ভাদ্রের "সঞ্জীবনী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে দেখা যায়, শ্রীপুর থানার দারোগা এজাহার লইতে একাধিকবার অস্বীকৃত হন। শেষে "এস্ ডি ও'র নিকট যাইতে উদ্যত হইলে নানাপ্রশ্নের পর রাত্রিকালে এজাহার নেন, তখন রাত্রি প্রায় ৭টা বাজিয়াছিল। উক্ত এজাহার লওয়ার পর দারোগাবাবু ঐ রাত্রিতে বরিশাট গ্রামে চলিয়া যান, কিন্তু সেখানে প্রায় ৩ দিন পর্য্যন্ত যাতায়াত করিলেও দারোগাবাবু আসামীদিগকে গ্রেপ্তার করেন নাই। যাহা হউক, উক্ত মোকদ্দমায় যশোহর সেশ্যন আদালতে আসামীগণের ৬ ও ৫ বৎসরের কারাদণ্ড হইয়াছে।"

এই ঘটনাটি-সম্বন্ধে সম্পাদক লিখিতেছেন :—

পত্রপ্রেরক শ্রীপুর থানার দারোগার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষ তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহার অনুসন্ধান করিবেন, ইহাই আমাদের নিবেদন। কিয়দ্দিন হইল পুলিশের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল পরলোকগত মিঃ লোম্যান পুলিশ কর্ম্মচারীদিগকে নারীহরণ বিষয়ক এজাহারের তদন্ত করিতে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার ন্যায়পরতা ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু থানার কোন কোন দারোগা তাঁহার মহৎ উদ্দেশ্য বিফল করিয়া থাকেন। শ্রীপুর থানার দারোগা কি করিয়াছেন—আমরা আশা করি শীঘ্রই কর্ত্তৃপক্ষ তাহা প্রকাশ করিবেন।

বাঙ্গালাদেশে এখন বালক ও স্ত্রীলোকদের মুখেও স্বদেশপ্রেমের কথা শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সকলেই স্বদেশপ্রেমে মত্ত অথচ অবাধে নারীগণ অপহৃতা হইতেছেন। যে নারীরা পুলিশকে অগ্রাহ্য করিয়া সংগ্রাম করিতেছেন, তাঁহারা নারীকে রক্ষা করিবার জন্য ত দুর্দান্ত লোকদিগের সম্মুখে যাইতেছেন না। নারীরা কি নারীর ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবেন না?

বঙ্গের পুরুষ ও নারী, বালক ও বালিকা অনেকে নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য করিতে গিয়া প্রহৃত, কারারুদ্ধ এবং দুই একস্থলে নিহত হইতেছেন। সুতরাং বঙ্গে সাহসের একান্ত অভাব হইয়াছে বলিতে পারি না। অথচ নারীর সতীত্ব ও সম্মান রক্ষার জন্য বঙ্গের যথেষ্ট লোক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইতেছেন না, ইহা সত্য কথা এবং লজ্জা ও দুঃখের কথা। এ অবস্থার কারণ কি, ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না।

—

ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ

ইউরোপের নানা জায়গায় রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে-সব বক্তৃতা করিতেছেন, তাহা সবিশেষ আদৃত হইতেছে। হইবারই কথা। বার্লিনে তাঁহার অঙ্কিত চিত্রাবলী প্রদর্শিত হইবার পর তাহার মধ্যে পাঁচখানি জার্মান জাতীয় চিত্রশালায় রক্ষিত হইবার পর ক্রীত হইয়াছে। কবির এতদিনে জেনিভা পৌঁছিবার কথা। বৎসরের অল্প সময়েও জেনিভায় পৃথিবীর সব মহাদেশ ও দেশের লোক থাকে। এই সেপ্টেম্বর মাসে লীগ অব্ নেশ্যন্সের মহাসভার অধিবেশন হওয়ায় তাহাদের সংখ্যা আরও বাড়ে। এমন সময়ে তাঁহার জেনিভায় উপস্থিতি ভারতবর্ষের পক্ষে হিতকর হইবে।

—

কংগ্রেসের সহিত সন্ধি হইল না

অদ্য দুঃখের সহিত দৈনিক কাগজে পড়িলাম, সাপ্রু ও জয়াকরের মধ্যস্থতায় কংগ্রেসের সহিত গবর্ন্মেণ্টের কথাবার্ত্তা ব্যর্থ হইয়াছে। এ বিষয়ে সাপ্রু ও জয়াকর মহাশয়েরা ধৈর্য্যের সহিত যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। কাগজে দেখিতেছি, কংগ্রেসনেতাদের দাবী নিম্নলিখিতরূপ ছিল :—

Congress leaders in Jail after the Conference at Yarvada in a joint letter to Sir Tej Bahadur Sapru and Mr. Jayakar laid down as main terms for settlement (1) Recognition of India's right to secede from the Empire, (2) Complete National Government responsible to her people, (3) India's right to refer, if necessary, to an independent tribunal British claims and concessions in India including Public debt, (4) Release of Political Prisoners except those who have committed violence (5) Civil Disobedience to be called off but not picketing of foreign cloth and liquor-shops and manufacture of salt by the people

[তাৎপর্য্য]

ইয়ারভাদা জেলে পরামর্শের পর কংগ্রেস নেতারা স্যর তেজবাহাদুর সাপ্রু ও শ্রীযুক্ত জয়াকরের নিকট একটি পত্রে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি উপস্থাপিত করেন—(১) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সম্বন্ধবিচ্ছেদের অধিকার, (২) ভারতবর্ষের লোকের নিকট দায়ী জাতীয় শাসনতন্ত্র, (৩) ভারতবর্ষে যত ব্রিটিশ দাবীদাওয়া ও সুবিধা আছে (রাষ্ট্রীয় দেনা সহ) প্রয়োজন হইলে কোনও নিরপেক্ষ বিচারকের সম্মুখে ঐ সকল বিষয়ের বিচারের ভার অর্পণ করিবার অধিকার; (৪) যাহারা হিংস উপায় অবলম্বন করে নাই সেইরূপ সকল রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান, (৫) আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ হইবে, কিন্তু মদের ও বিলাতী কাপড়ের দোকানে পিকেট করা বন্ধ হইবে না, এবং লোকে নিজে নিজের নুন তৈয়ারী করিবার অধিকার পাইবে।

আমরা এই দাবীগুলি অযৌক্তিক মনে করি না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইবার অধিকার মডারেট-নেতা শ্রীনিবাস শাস্ত্রীও চাহিয়াছেন। এই অধিকার থাকিলেই যে ভারতবর্ষ আলাদা হইবেই, এমন নয়। বিদেশী কাপড় বিক্রী অবাধে চলিতে থাকিলে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতার মূল্য বেশী থাকিবে না, কারণ উহার অর্থনৈতিক দাসত্ব ঘুচিবে না। ভারতবর্ষের লোক নুন যথেষ্ট খাইতে পায় না, সুতরাং নুন অবাধে তৈরী করিবার অধিকার অন্যায় দাবী নহে।

আজ ২০শে ভাদ্র আশ্বিন সংখ্যার বিবিধ প্রসঙ্গ শেষ করিতে হইল বলিয়া অধিক কিছু লিখিতে পারিলাম না।

—

বিজ্ঞাপন-দাতাদের প্রতি

কার্ত্তিক সংখ্যা প্রবাসী ৫ই আশ্বিন নাগাদ প্রকাশিত হইবে। ঐ সংখ্যার জন্য বিজ্ঞাপনের নূতন ও বদল কপি আগামী ৩০শে ভাদ্রের মধ্যে আপিসে পাঠাইয়া দিলে বাধিত হইব।

প্রবাসী কার্য্যাধ্যক্ষ

১২০।২, আপার সারকুলার রোড কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত